

সাপ্তাহিক সমসাময়িক

মরণ সাগরপারে

৭ তোমরা অমর



সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

* স্বাধীনতা সংখ্যা *

12th Aug., 1965 * Vol. 70, No.



ফার্সি প্রা

একালের রূপ-কথায় শেষ কথা

হরপ্রসাদ

বিষয়
 প্রসাদকীয়
 আজকের মানুষ
 সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর
 স্রষ্টা (কবিতা)
 ভারতদেশ
 অবিচ্ছিন্নতার স্মৃতি
 আন্তর্জাতিক
 সামান্য স্মৃতি
 ভারতের স্বাধীনতার ভাবরূপের বিবর্তন
 গ্রন্থমালা
 অক্সফোর্ড থেকে লিখা
 বঙ্গদেশ
 স্থানি কালে হাত (পত্র)

লেখক
 ...
 হরপ্রসাদ মিত্র
 বিমোদ বেরা
 ...
 ইয়েজাগনি চেলিপেস্ত
 ...
 দুর্গাদাস সরকার
 ডঃ রামেশচন্দ্র মজুমদার
 জয়ন্তী সেন
 অশোক দেব চৌধুরী
 ...
 রক্ত রায়াচৌধুরী

পৃষ্ঠা
 ৩
 ৪
 ৫
 ৭
 ৮
 ১৩
 ১৫
 ১৯
 ২১
 ২৫
 ২৭
 ২৯
 ৩৩



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেশ্বনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মঙ্গলকামী
 যোমের অলকমলা
 জামের আকাশমল
 বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাপ্রেরণ আর নাই
 চিত্রসমূহ—শ্রীশ্যাম—সম্বোধন সংকলন
 মূল্য পনের টাকা

যে জ্ঞান-সুখের সর্বতোমুখী প্রতিভার
 কিরণছটায় ভারত-মহিমা চির-তাম্বল—
 সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও
 মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্বিনি—
 মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কালকলা, বেণের মেয়ে, যেরদত
 বাঙ্গালির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা
 সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধ
 মালা, শিক্ষাসম্বন্ধ, সমাজসংস্কার নিবন্ধ—
 এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী যায় ১১০
 খাজ, মোহিনী।

নীলাচলে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগোরাধ ও প্রকল্প
 শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত
 ১১ দ্বিতীয় সংস্করণ ১১
 মূল্য দুই টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বয়স	লেখক	পৃষ্ঠা
অষ্টতীয়া (বার্ষিক উপভাস)	মুশোল রায়	৩৬
আলেখ্য	লীলা মজুমদার	৩৯
বাণিজ্য (সকাল ও একাল)	মুনপতি সওদাগর	৪১
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৪৩
সি বি আই রিপোর্ট	...	৪৬
অবসরের অবস্থাব (কবিতা)	বিশ্বনাথ কয়াল	৪৮
চমণীরা যাহু জানে (কবিতা)	বরুণ মজুমদার	৪৮
গ্রামানন্দবাবু	বিশ্ব মুখোপাধ্যায়	৪৯
চালি চ্যাপলিন	আশোক সেন	৫১
রঙ্গমঞ্চ—ওদোশ এবং এদোশ	শিলালি	৫৩
রঙ্গরঙ্গ	...	৫৫
খেজাধলা	শ্রীঅমিতাভ	৬২

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান
ভক্তিজগতের কৌতুভরস, ভগবন্তজগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা
সদশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমগ্র।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্রূপায় প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের ঐক্যলাভের জন্য যে
উৎকর্ষ, এই 'প্রলাপে' তাহার অভিযুক্ত।
শ্রীমদ্রূপায়ের শ্রীমদ্বিংশতি শ্লোকিক
শ্লোকই তাহার একমাত্র রচনা। শ্রীল
কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পঞ্চাশবাদের
এই অমিয় বাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস
বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য
ভক্তচরিতামৃত।

হুলভসার
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস
বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপৃজিত।

আত্মতত্ত্ব
বৈষ্ণব দর্শনের স্মরণীয় অঙ্গস্বরূপ।
মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রমোদ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-
সিদ্ধান্ত সাধন-জ্ঞানের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত
সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার সুযোগ্য শিষ্য
পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত
পঞ্চাশবাদ।

পাশু-দলন

মুন্নিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর
বিরচিত প্রেমভক্তির লহরী-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপন্থন, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বননা, নামসংকীর্ণন
চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর
শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি
চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৩ টাকা।

প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের
রামপদ গ্রন্থাবলী
৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩ টাকা

পিরান্নমোহিনী দেবীর
গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

বিগতকালের বরেন্দ্র সাহিত্যজ্ঞা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

কোকলা দিগম্বর, পার্শ্বের পরিণাম,
ভয়কচরিত।

মূল্য এক টাকা

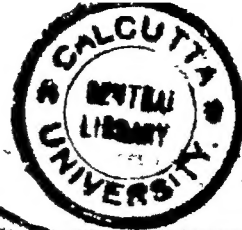
২য় ভাগে—

ভূত নৃ বাহুব, কঙ্কাবতী, ...
মুক্তামা...

মূল্য : দুই টাকা

বঙ্গুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২



৭০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ
বৃহস্পতিবার, ২০শে জুন, ১৩৭২

Price : 25 Paise
Thursday, 3rd June 1965

রামানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের যে আয়োজন হয়েছে, তাতে অংশ গ্রহণের স্বযোগ লাভ করে আমরা ধন্য। আমরা যেন তাঁর বলিষ্ঠ আদর্শবাদিতার অংশ-ভাগী হতে পারি, তাঁর ন্যায়নিষ্ঠতা কর্মোন্মাদনা সদাচার আমাদের মধ্যে লক্ষ্যিত হোক। বর্তমানকালের পরিধিতে যে অস্বাচ্ছন্দ্য পরিব্যাপ্ত—শতবার্ষিকীর পবিত্র প্রতিশ্রুতিতে তা দূরীকৃত হোক। রামানন্দ-প্রদর্শিত পথে আমরা নবদিগন্ত-সন্ধানী হোলে আমাদের জীবন-সারণা পূর্ণ হবে।

শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবেই রামানন্দ বিশুবিশ্রুত। 'ডার্ন রিভিউ' ইংরেজী মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে পরাবীন ভারতের কথা বিশুব দরবারে তিনি হাজির করেছিলেন। আবার বিশ্বের রচনা প্রকাশের মাধ্যমে রীকি আরো জোরদার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্যাসিস্টদের আগরণে, রচনা ও

গান্ধিজী সাংবাদিক রামানন্দের যে সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেছিলেন, একমাত্র স্বাধীনতার ইতিহাসপ্রণেতারা সেট অসাধারণ কৃতিত্বের কথা লিপিবদ্ধ করবেন। তবু আমাদের মনে রাখতে হবে, তাঁর এই পরিচয় কর্মময় জীবনের একাংশ মাত্র।

বঙ্গদর্শনের পরও বাংলা সাহিত্যভূমি তেমন লহজ ছিল না। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা বাববার প্রতিহত হয়েছে। একমাত্র রামানন্দই কোনো-রূপ বিরোধিতার পরিবর্তে, সাদরে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেছিলেন। পুঁবাতন 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তার স্বাক্ষর আজো মেলে। যথার্থ বলতে কী, এই কারণে বয়সে চার বৎসরের কনিষ্ঠ হলেও রামানন্দ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চিরস্বহৃদ। যেকালে রবীন্দ্রনাথ 'নাইটহুড' পদবী ত্যাগ করেন, তখনো রামানন্দের পরামর্শই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অসত্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে দুজনই ছিলেন আপোষহীন—তাঁর দুই স্বহৃদের মিলন ছিল এত স্থলর ও

সার্বিক—যা জাতির কাছে চিরকালীন গৌরবের।

একদিকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে রামানন্দের ব্যুৎপত্তি অতুলনীয়, অন্যদিকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য উদ্ধারকল্পে তিনি আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের স্বাক্ষর তাঁরই সময়ে বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ভারতীয় চিত্রকলার সন্ধানে রামানন্দের অবদান চিবকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সমাজকর্মী হিসেবেও রামানন্দ আজো স্মরণীয়। সাদাসিধে জীবন ধারণে অভ্যস্ত রামানন্দকে প্রায়ই নিরানন্দ করতে তাঁর জন্মভূমির দৈন্য, ক্ষুধা, ব্যাধি, তৃষ্ণা, অশিক্ষা। আজ রামানন্দের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর অপূর্ণ কাজ আমরা সম্পূর্ণ করতে পারলেই আমাদের প্রণাম তাঁর কাছে নিবেদনের উপযুক্ত হবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

'আবার উঠবো আমি,' প্রিন্সিপ্যাল জয়গওয়ালের কানে কানে বললেন গধু, মুখে-চোখে তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের অশ্রু স্বাক্ষর। দাঙ্গিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যালের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন নওয়াঙ গধু, লে: কম্যাণ্ডার এম এল কোহলির নেতৃত্বে তৃতীয় ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের সদস্য হিসেবে যিনি দুইবার এভারেস্ট শীর্ষে উঠে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

৪ বার এভারেস্ট শৃঙ্গে উঠে ভারতীয় অভিযাত্রী দল যে বিশু রেকর্ড স্থাপন করেছেন গধু তারই ভিত্তি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন।

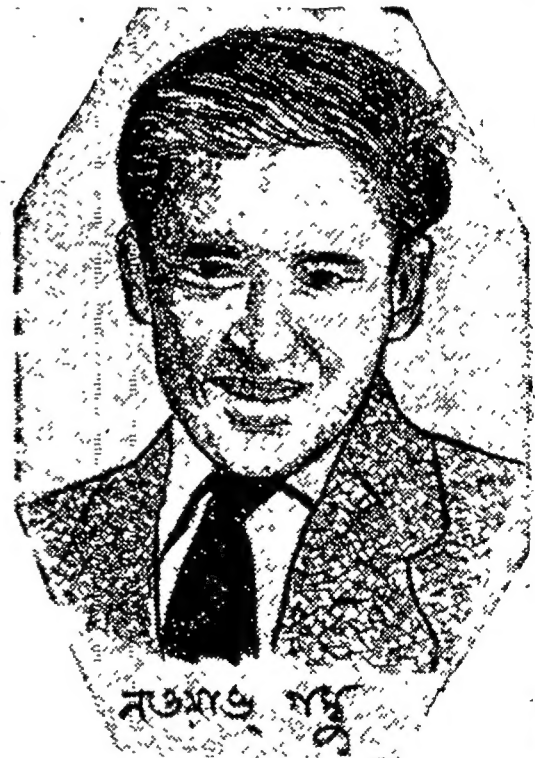
কিন্তু এ-গৌরব শুধু গধুর ব্যক্তিগতই নয়, তিনি ভারতের জন্যে নতুন গৌরব অর্জন করেছেন যা ভারতের পক্ষে এতদিন সম্ভব হয় নি। কারণ বিগেডিয়ার জ্ঞান গিংহের নেতৃত্বে ১৯৬০ সালে প্রথমবার এবং মেজর চাম্বালের নেতৃত্বে ১৯৬২ সালে দ্বিতীয়বার, ভারতের এভারেস্ট অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তাই ক্যাপ্টেন এ এম চীমার সঙ্গে সেদিন গধু যখন এভারেস্টের চূড়ায় উঠে ভাবতীয় ও নেপালী পতাকা উল্লোলন করে আসেন তখন তিনি ভারতের মর্যাদাকে অপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সত্যি বটে গধুর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়—প্রথম অভিযানেই তার প্রশংসা তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠদেশে যে রাষ্ট্রপতির দেওয়া 'পদ্মশ্রী'র অভিজ্ঞান লুপ্তিছে সে কিসের জন্যে? সে কি ১৯৬৩ সালে নরমান চাম্বেরেনকুর্প-এব নেতৃত্বে মাকিন অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে এভারেস্ট বিজয়ের স্বীকৃতি-স্মারক নয়? নেতা কোহলির দৌলতে গধু এভারেস্টের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয়কে যে আবার স্বাভাবিক নেবেন তাতে আর বিচিৎর কি?

একথাও সমান সত্যি যে হিমালয়ের সঙ্গে গধুর সংঘাত আজ নতুন নয়, অভিযানে অংশ গ্রহণ করার সংখ্যা তাঁর গামান্য নয়। ১৯৬৩ সালের সার্বিক এভারেস্ট অভিযান ছাড়াও পরের বছরেই নন্দা দেবী শীর্ষে (২৫,৬৪৫ ফুট) আরোহণ করেছিলেন। এবারকার অভিযানের প্রাথমিক পরীক্ষা হিসেবে গধুকে রাং-এর চুডামও (২২,০০০ ফুট) পৌঁছাতে হয়েছিল। গধুর গৌরবের কারণ আরো একজনো যে, তিনি 'এভারেস্ট পরিবারেরই' একজন; এভারেস্ট শীর্ষে প্রথম ভারতীয় তেনজিং নোরগে, দ্বিতীয় গধুর কাকা, তৃতীয়

অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য আঙ কানি তাঁরই কনিষ্ঠ সহোদর।

প্রিয়দর্শন, নওয়াঙ গধুকে দেখতে সত্যি সুন্দর। একজন ক্যামেরাম্যান তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, গধু একবার রাজী হলে হাজার চিত্র-পরিচালক ছুটে আসবেন। তাঁর কাছে তাদের ছবির নামকের ভূমিকা গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে। কিন্তু এ্যাডভেঞ্চার গধুব শিরায় শিরায়, পাহাড়-পর্বতের কোল ছেড়ে, কঠিন পাথরের বাস্তব ছেড়ে তিনি কি অলীক-অভিনয়ের মারাপুরীতে আসতে রাজী হবেন? গধু নিজে চতাই-উৎসাহ ডিঙাবেন, হাজার তরুণকে দেবেন পর্বত লঙ্ঘনের মন্বন্তর; তাই তো গধু হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষকতার কাজ বেছে নিয়েছেন।



গধুর সাক্ষ্যে আরো—একজনের হৃদয় আনন্দে মগ্ন নৃত্য করে উঠেছিল—তিনি হলেন সীতা। স্বামীব অন্তত পূর্ব সাংল্যেব সংবাদ পেয়ে সীতা সেদিন গধুর দ্বির আইস-এক্স (পর্বত আরোহণে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের কঠোর খানা আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। উঠেছিল ৪ বছরের গধু-তনয়া ওয়াঙদা, বছরের ভাই ফিন্জো। যে-কৃতিত্ব করেছেন, তার উত্তরাধিকার তো তাকে ক্ষুদ্রে গধুরা যে আগামী দিনে সে-বিষয় কি সন্দেহ আছে?

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হৃদয়সাদ মিত্র

(আগের সংখ্যায় প্রকাশিত এই রচনায় প্রথম পৃষ্ঠায় (৩২৭৭) তৃতীয় কলনের প্রথম অনুচ্ছেদের গুচনায় পড়তে হবে—টলস্টয়ের 'রিজারেকশান',—তারও আগে 'ডস্টয়ভেস্কি'র 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট',—ইত্যাদি।)

পাপ-পুণ্যের প্রাঙ্গণ পুরোপুরি উহা বাধতে গারাকো কোনো কোনো মনের পক্ষে সম্ভব হয়তো, কিন্তু সে-সব ঠিক কী বকব নন, তা জানি না। হঠাৎ প্রবচনটি নব পড়ে গেল—'বেজিস্ট গট ইডল'।

এ প্রবচনের নামে বোঝা সহজ নয়। জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়া এককম নির্দেশের ভাণ্ডার অনুধাবন বববে কে?

গাছীকীর কথা নব পড়লো। নব পড়লো টলস্টয়ের 'আদর্শ'।

সাধারণত আনন্দের মেজাজ থাকে অন্য-দুখী। আনন্দের অন্য চিন্তায়, অন্য আদর্শে, অন্য আচরণে অভ্যস্ত। সেইভাবেই জীবনের পথ চলি। কতো যে উৎপাত দেখা দেয় পথে পথে। বিপরীত মেজাজের ঠোকাঠুকি তো ঘটছেই। যেসব ঘটনার প্রত্যক্ষ কারণ ঠিক বোঝা যায় না, সেসবক অপ্রীতিকর ঘটনাও নাহে নাহে ঘটে থাকে। হাঁ, ঘটেই তো,—ঘটেই তো। কিন্তু কেন? কেন? কেন? কেন?

নব আনন্দের এ প্রশ্নের তেমন কোনো জবাব পায় না। অগত্যা নিজেব কাছে নিজেই হার মেনে বলে—'আমি তো ভ্রষ্টব্য কোনো অনারাই কবি নি, তবু এককম ঘটলো কেন, তা আমার জানা নেই; হবতো তা আনন্দের জানবার নয়। অতএব থাক্ থাক্,—যা হবার তাই হোক।' এ অবস্থায় টলস্টয়ের সেই গল্পটি নব পড়ে, —'দৈবের সভ্যত্ব' বটে, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করে থাকেন।

ভাঙিমির শহরের বণিকঘরক আইডান ভিসিটিক আন্সেনড সে-পল্লের নামক। বেশ সুদর্শন, কুতিবাক্স মানুষ ছিল সে। নিজেব একটা বাড়ি ছিল তার,—তা ছাড়া দুটি দোকান। বিয়েব আগে, নব খাবার কোঁক ছিল দুইই। হাসি-ঠাট্টা, গান, গল্প এবং হৈ-হামার দিকে টান ছিল তার স্বভাবের।

বিয়েব পবে নব সে পুরোপুরিই ছেড়ে দেয়। শাস্ত, হিসেবী ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। আর, সেই সময়েই তার জীবন জয়ন্তর এক দুর্যোগ

দেখা দেয়। টলস্টয়ের এ গল্প সেই দুর্যোগের গল্প।

নিশ্চিন্তে মেলা বসবার সময় সেটা। আন্সেনড সেই মেলায় বেবিযে যাবার আগে তার জী বনেছিল,—'আজ না গেলেই তামো হোতো।'।

—কিন্তু কেন? কেন বলো তো? —জিগেস করেছিল আন্সেনড।

—না, না, যেও না আজ।

—আহা, কেন বারণ করছো, গোটা জিনি?

—কাল বাত্রে জাবি বিজিবি এক স্বপ্ন দেখেছি তোমার সম্বন্ধে।

—কী স্বপ্ন?

—আমি দেখলুম শহর থেকে ফিরে এসেছ তুমি। তুমি টুপি শুলতেই দেখা গেল তোমার মাথার সমস্ত চুল একেবারে পেকে শাদা হয়ে গেছে।

হা-হা করে হেসে উঠেছিল আন্সেনড। বৌ করে কী স্বপ্ন দেখেছে, সেই চিন্তাতেই হাবতে যাওয়া পুরুষমানুষের কাজ নয়। তাকে যেতেই হলে। দরকারী কাজ তার। মেলায় কেনাবেচা জমবে। টুকটাকি উপহার আনা যাবে বৌয়ের জন্যে।

তাই হাগতে হাগতে জীকে বলেছে— 'তোমার ও স্বপ্ন তো সত্যিকার জুলঙ্গণ। শুভে ভব নেই। যুলে আসি আমি।'

পশরা গাছিয়ে নিয়ে মেলায় ব্যবসা করতে বেবিযে যায় আন্সেনড। সে যখন প্রায় মাঝামাঝি রাস্তা পেরিয়ে গেছে, সেই সময়ে তার গাঙ্গে দেখা হয়ে যায় চেনা আর এক ব্যবসায়ীর। বাত কাটাবার জন্যে ডাবা একই সবাইবাগায় আশ্রয় নেয়। একটু চা খেয়ে নিয়ে পাশাপাশি দুটি কানবাগ ডাবা শুবে পড়ে। পবদিন বুঝ ভোবে উঠে সরাইয়ের হিসেব চুকিয়ে নিয়ে আবার বেবিযে যায় আন্সেনড।

খুবই কুতি ছিল তার মনে। কোথাও কোনো দুর্যোগের আভাষ ছিল না। প্রথম সবাই থেকে আনো সাইল পঁচিশেক এগিয়ে নিয়ে আর এক সবাইনে চুকে গীটার বাজাতে বসেছিল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সেই সবাইয়ে একবান তিন-ঘোড়ার গাড়ি চুকেতে দেখা যায়। গাড়ির ঘণ্টা বাজছিল ক'খ ক'খ করে। পাড়িখান্য

খানবান সঙ্গে সঙ্গে সবকারী এক বমিগায়ে নামতে দেখা যায়,—তার পেছনে নেবে দু'দুই এক ছোড়া সৈন্য।

অফিসার এগিয়ে আসে আন্সেনডের কাছে। এসেই প্রশ্ন করতে করে—'তোমার কি—' তি কোথায়—কোথা থেকে এলে?—' নাহো—' কোথায় যেতে হবে তাকে।

হায়, হায় তখনো কিছুই বুঝতে পারেনি সে। গৌরবের শে স্বপ্ন দেখেছে—আজ্ঞা, একটু চা খাওয়া নক।

কিন্তু অফিসার তো এ-কোড়া সৈন্য নিয়ে তিন-ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আরোহণ করে চা খেতে আসেনি। সে জিগেস করে— 'কাল বাতটা তুমি কোথায় ক'টিয়ে নক? তুমি কি একলা ছিবে সে সবাইয়ে, নাহি না? আর একজন বণিক ছিল? তার ডাবা তো লোকটিকে তুমি দেখেছ কি? সে তোমার আগের তুমি যে সবাই থেকে বেটিয়ে এসে, তবু বসন্ত কী?

এইবার মেজাজ তার বো উঠেছে আন্সেনডের। বলেছে—'এতো না প্রশ্ন করছ কেন আমাকে? আমি কি গোঁ মা তার ও? অফিসার তখন পমিখিতিকি নুনে বসন্তের আন্সেনডের সেই সবাইটি খুব খনোয়ে দেখি সবাইয়ে। তাই এই সব প্রশ্ন।

তারপর সৈন্যনা এসেছে। নামকমতে জিনিপত্র আংগী শুরু হয়েছে। একটু ব্যাগ শুলতেই পেরিয়ে পড়েছে একখানা বড় জু ছোবা।

তাই দেখে হকচকিয়ে গেছে আন্সেনড। কিছুই বুঝতে পারেনি সে। দিত-বিত বচন সে ওবু এইটুকুই জানিয়েছে যে, সে ছোব তার নিজেব নয়। কিন্তু তার ব্যাগের ভেতরে সে ছোবা তলে এলোই বা কী তাহে? না গাড়ি তার কোনো কৈফিয়ত ছিল না,—খাঁচাবান কোনো পখই ছিল না দুখি। তাহতে তাহতে তচি স্বভাবের কুতি ঘুচে গেছে চিপকানের মতো।

তারপর সেই সৈন্যনা ভাবে দেখেছে। আদানতে যেতে হয়েছে তাকে। পড়ত খিচাও হয়েছে তার। এক বণিক গহবানক ঘুম করে তার বিশ হাজার রুপু আনো ব্যবসায় অভিযোগে তার ওপর মোকদ্দমের আদেশ হয়েছে।

ইতিমধ্যে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা হু

কিন্তু জিহ্ম তাঁর জী এসেছে জেলখানায় তার হকে দেখা কবতে। স্বামীর দুজির ঘনো। সম্রাটের কাছে আবেদন করেছে সে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। চুপি চুপি জী জিগেস করেছে—তোমার জো সত্যিই কোনো দোষ নেই?

সে-কথা শুনে চোখে জল এসেছে মাখনভেব। তাহলে তার জীও তাকে সন্দেহ করে। হায় হায়। হায় হায়। না, আর কারো কাছে কোনো আবেদনের দরকার নেই। একমাত্র ঈশ্বর আছেন। একমাত্র তিনিই সত্যপ্রদ। তিনিই বেধেন, তিনিই বেধবেন। নিজেব মনকে শক্ত কবে নিয়েছে আশ্রয়ভেব।

বেতের বা শুকোবার পরে সাইবিরিয়ার চালান দেওয়া হয়েছে তাকে। সেখানে কয়েদী-জীবন যাপন কবতে কবতেই শিখে নিয়েছে জুতো-ভৈবীর কাম। এদিকে সমস্ত চুল তাব শাদা হয়ে গেছে। জুতো ভৈবি করে সামান্য। বা দু-চার পয়সা ছোটো, তাই দিয়ে কিনেছে সস্তা-জীবনী। শান্ত, সমপিত্তি এই নিবপবাস কয়েদীটিকে জেলখানার কর্মচারীরাও পছন্দ করতে আবস্ত করে। অন্যান্য কয়েদীবাও মনে মনে তাকে সম্মান না জানিয়ে পাবে না।

কিন্তু বাড়ির শব্দ মেনে না সেখানে। আশ্রয়ভেব জানে না তার জী বেঁচে আছে কি নেই। তার ছেলেমেয়েবা কোথায়? কিছুই জানা যায় না। জানাবার উপায় নেই। শুধু সস্তা-জীবনী পাঠ, প্রার্থনায় যোগ দেওয়া, নিদিষ্ট কাজ করে যাওয়া আর ভগবানের কথা ভাবা—এই কাট কাজই তখন আশ্রয়ভেবের জীবন।

পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, প্রীতি-অপ্রীতি

ভাবনা কি আনবা ছাড়তে পারি? চলন্তের এই প্রসিদ্ধ গল্পটি তাই কখন কখন মনে পড়ে। ডস্টমেন্ডেস্কি, চলন্ত, টুপেনিভ, চেবড—কন-সাহিত্যেব অনেক উজ্জ্বল নাম মনে পড়ে একই সঙ্গে। মনে পড়ে গাছীজীব কথা। 'বেজিস্ট নট ইতুল'—'মলকে বাধা দিও না' প্রবচনটির মানে বুঝতে পারি ইতিমধ্যে। কিন্তু তবু সংশয় যায় না। মলকে সহজ মৃত্যুর মধ্য নিঃশেষিত হতে দেবার মতন সময় আছে কি আনাদের হাতে?

আশ্রয়ভেবের হাতে অকুরন্ত সেই সময় ছিল। আশ্চর্য ধৈর্য ছিল তার। বে ঈশ্বর সত্যপ্রদ, —মিনি সবই বেধেন,—তিনি সবই বেন। যাকে যা দেবাব, তাকে তিনিই তাই-ই দিচ্ছেন। আনরা 'বহ বাসনার ছড়াইতে চাই।' তিনি যুক্তি কবে বাঁচান। স্বাধীনতার সেই পানের কথাই বেন আশ্রয়ভেবের বেজাঝের মধ্যে বেজেছিল—'এ কৃপা কঠোর সজিত মোর জীবন ভরে।'

ঈশ্বরবিশ্বের বিখ্যাত উত্তরপাড়া-বজুতা মনে পড়ে—

'I looked at the jail that secluded me from men and it was no longer by its high walls that I was imprisoned; no it was Vasudeva who surrounded me.'

চলন্তের আশ্রয়ভেবও বেন এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিল। ইতিমধ্যে একদিন সেই জেলখানায় গমন একদল কয়েদী দেখা দেয়। যেদিন তাবা এসে পৌছোয় সেই সন্ধ্যাতেই পুরোনো কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ জনাতে জনাতে তাবা নিজেদের অপরাধের কথা বলতে বসে

যায়। তাদের মধ্য প্রায় ঘাট বছরের কথা, পাক দাঁড়িওয়ালা বজবুড চেহাবাব একজন বলে,— তাইসব, এবাব একটা শ্রেজগাড়িব বোড়া বলে নিয়ে সেই বোড়ার চড়ে আমি একটা তাড়াতাড়ি যেতে চেয়েছিলুম বলে ওরা আমাকে 'চোর' বলে পাকড়াও কবে। অথচ সেটা যার বোড়া, সে আমার বন্ধু। আমি বললুম, ওহে আমি চুরি করি নি, তবু ওরা আমাকে ছাড়লো না। বসে চালান করে দিলো এই সাইবিরিয়ায়,—অথচ অনেকদিন আগে, সত্যিই সাইবিরিয়ার আসবাব মতন কাজ করেছিলুম যখন, তখন আমার কিছুই হয় নি। কী মজা দেখো। আহা, আমি ভুল বলছি,—এর আগে সাইবিরিয়ায় এসেছি আমি; কিন্তু বেশিদিন থাকতে দেওয়া হয় নি সেবার। আশ্রয়ভেব সেখানে বসে বসেই শুনছিল সব কথা।

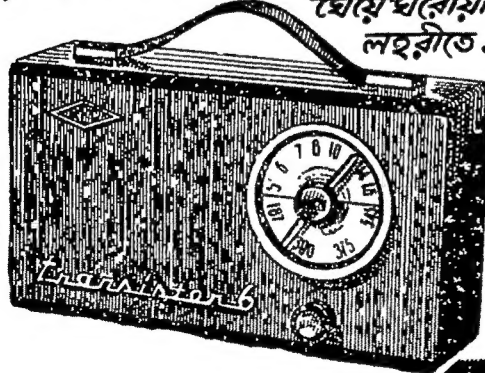
একজন সেই নতুন কয়েদীকে জিগেস করে—তুমি কোথাকার মানুষ, দেশ কোথায় তোমার। লোকটা বললে—ভাডিরি।

বলে, আমার নাম 'মাকার',—'সেমেনিক' বলেও আমাকে ডাকে কেউ কেউ। নিজের দেশের নাম শুনে আশ্রয়ভেব তাকে জিগেস করে,—সেমেনিক, তুমি কি ভাডিরিবের আশ্রয়ভেব চেনো?

—কেন চিনবো না? খুব চিনি। বড়োলোক ব্যবসাদার তাবা। তবে তাদের বাপ আমাদেরই মতন পাপী একজন,—সে আছে এই সাইবিরিয়ায়।

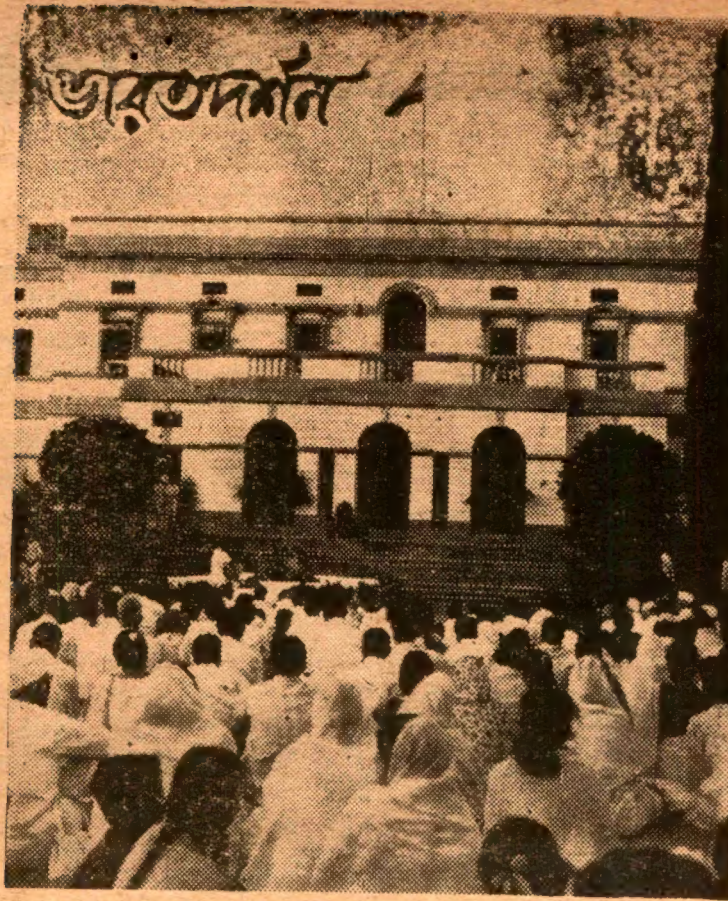
চলন্তের ঘাবাব দিতে দিতেই 'সেমেনিক' জিগেস কবে,—সে তো হোলো, দাদু, কিন্তু তুমি এখানে কতোদিন আছে? কি ঘটছিল, বলো।

সুখ ও সুস্বাদুত্বের নমুনা আপনাব ঘরে আনন্দময় কর
তুলারে রেডিও ইলেক্ট্রনিক মোঃ আর ই জি রেডিও
আর ই জি-র একটি রেডিও আপনাব ঘরে রাখুন, আপনাব এক
ঘোরে ঘরোয়া পরিবেশ এক মুহুর্তে পরি
লহরিতে হাধুর্যায় কর তুলারে...



আর ই জি মডেলগুলি একান্ত
নির্ভরশীল ও অক্ষি-আলো...
পৃথিবীর সব কন্টিনেন্টে মুহুর্তে
ধরা পড়ে...

৬ ট্রানজিস্টর মডেল-৬টি ৪ মূল্য-১৬৫ টকা
জানীয় কর অতিরিক্ত



নেহরু তিরোভাব বার্ষিকী উপলক্ষে তিনমূর্তি ভবনে এক স্মরণানুষ্ঠানে
বিরোগবিধুর জনতার একাংশ।

রাজধানী :

বিচ্ছেদের বেদনার সাতাশে মে আবার রাজধানী অভিভূত হয়ে পড়েছিল। শোকের শূন্যতা যেন জাতির মনকে এখনও আচ্ছন্ন করেই রেখেছে। 'দি লাইট হাজ গন আউট' এই আত্মঘোষণার পর দীর্ঘ একটি বছর কেটে গেছে। এই এক বছরে বিশ্বের পরিবর্তন ঘটেছে অনেকখানি। এই একটি বছর ভারত অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল, এমনও নয়। চলমান বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ তাল রেখেই এগিয়ে চলেছি আমরা সকলে। তথাপি একটা নিশ্চয় মাঝে মাঝে যেন আমরা আবিষ্ট হয়ে আছি। তাই আমাদের সকল কাজের মধ্যে অনুভব করছি একটা অপূরণীয় শূন্যতা।

যে শূন্যতা সহজে পূরণ হওয়ার নয়—জুড়ে পারে না। অর্ধশতাব্দীকাল ভারতের বেগানে যত ধ্বনি উঠেছে, সেসবই বায়ুতরঙ্গে ভেসে এসে আবার হেনেছে জওহর-চিহ্নে। মনের মাধুরী দিয়ে পঞ্চবনের সেই আকৃতিকে তখন স্মরে—আত্মপ্রত্যয়ের স্বরস্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত

করতে চেয়েছেন তিনি। দ্বিধা, সংকোচ অথবা সংশয়ের দোলা লেগে কোনদিন সে স্মরের তাল কাটে নি। লাহিত, নিপীড়িত, অপমানের ভারে অবনত মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে সে স্বরস্বাক্ষর।

দীর্ঘদিনের সেই পরম নির্ভর নিশ্চিত আশ্রয় থেকে হঠাৎ বিচ্যুত হয়ে প্রতিটি মানুষ পরমাত্মার বিরোগ-ব্যথার বিস্মল হয়ে পড়েছিল একবছর আগে, এই দিগ্ভ্রম। সেই আকস্মিক ভীষু আঘাতের যন্ত্রণার উপশম সহজ নয়। তাই শুচি-শুদ্ধচিত্তে বঙ্গস্রোতে প্রাণপ্রতিম প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে জন-চিত্ত বেদনার উম্মেলিত হয়ে ডুকে কঁদে উঠেছিল সাতাশে মে।

সারাটা রাত অগণিত নরনারী অপেক্ষা করেছিল তিনমূর্তি ভবনের সামনে। মানব-চিত্তের প্রধান তিনটি ধারার—রাজনীতি, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক জওহরের স্মৃতি-বিজড়িত এই তিনমূর্তি ভবন এখন পরিণত হয়েছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে। এই ভবনে এবং শান্তিবনের স্মরণ-অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডঃ

দর্শপালী রাধাকৃষ্ণ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীমতী ইলিরা গান্ধী, মন্ত্রিসভার অধিরাপের সদস্য এবং হাজার হাজার নরনারী মিলিত হয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। বেদনা-মথিতচিত্তে নেহরু-প্রদর্শিত পথে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার পৃথকও নিরুৎসাহ।

রামলীলা ময়দানের স্মরণ-সভার প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পরলোকগত নেতার স্মরে স্মর নিলিয়েই সকল বিভেদ-বুদ্ধি পরিহাস করে, আকস্মিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ভাষাগত বিরোধ তুলে গিয়ে নেহরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় জন্য প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সাম্যবাদের বিশ্বস্ত নামাবলী অঙ্গে ধারণ করে ভারতের মাটিতে অশান্তি জিরিয়ে রাখার ইচ্ছন জোপাচ্ছে নয়া চীন। একদিকে চীনের উত্তানী, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতে মদমত্ত পাকিস্তান সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে। চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণ-শঙ্কার উল্লেখ করেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্মরণ-সভাতে দেশবাসীর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

আজকের ভারত নেহরুর হাতেই গড়ে উঠেছে। এর উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিজ্ঞানের দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, বর্তমান ভারতের ভাল ও মন্দ দুই-ই নেহরুর সৃষ্টি। তিনি এর আগল রূপকার। নেহরু-উত্তর ভারতে কোন সমস্যাই নতুন করে সৃষ্টি হয় নি। কংগ্রেসের দলীয় কোম্পল থেকে স্বত্ব করে কচ্ছের সমস্যার কোনটাই নতুন নয়। এসব সমস্যাকে ধুয়েমুছে ফেলার নয়া পথে পা বাড়িয়েছিলেন তিনি জীবনের শেষদিকে। অভুক্ত, বঞ্চিত ও নির্বাসিত মানবস্বাধা হয়ে পড়ে দিশেহারা। সে কোন আশ্রানেই আর সাড়া দিতে পারে না। এই দুর্বলতা সমাজ-জীবন থেকে অপসারণের আহ্বান জানিয়ে-ছিলেন শ্রীনেহরু ভুবনেশ্বরের জাতীয় অধিবেশনে। জাতির দুর্ভাগ্য সেখানেই তিনি অনুভব হয়ে পড়লেন। নেহরুর উত্তর-সাধকদের তাঁর স্মৃতি-তর্পণের দিনে সে ইতিহাস ভুলবে চলবে না। করাচীর পর আবাদী হয়ে ডুক-নেশ্বর আগতে তিরিশ বছর ব্যয় করেছেন নেহরু। ভিত্তিটাই হল আগল। বনিয়াদ দুই থাকলে সৌখ-নির্মাণের বাকী কাজটা সহ সহজসাধ্য। নেহরুর আদর্শের সেই বনিয়াদ গড়ে উঠলেই জনকল্যাণ রাষ্ট্রের প্রকৃত ছবি ফুটে উঠবে।

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ঢাকা-গিয়ে মাইগ্রেশন মার্টিংকেট সংগ্রহের অসুবিধার কথা আমাদের অজানা নেই। পাকিস্তানী

গুপ্তচরদের চেকিয়ে রাখার অজুহাতে উদ্বাস্তদের পশ্চিম বাংলার মাটিতে বিনা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে ভারত সরকার কঠোর মনের পরিচয়ই দিয়েছেন। উদ্বাস্তদের সঙ্গে পাকিস্তানী এজেন্টদের প্রবেশের কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের দূরার সম্পূর্ণ রুদ্ধ। সেই রুদ্ধ-বারের ছিদ্রপথ দিয়েই পাচার হয়েছে আমাদের বিমানবাহিনীর তোলা কচ্ছরপাঙ্গনে ব্যবহৃত মাকিনী ট্যাকের ছবি। পাকিস্তান সেই ছবি ফলাও করে প্রচার করেছে আমা-বেরই বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন রাজ্যে। প্রমাণ করতে চেয়েছে ভারতই ঐ ট্যাক ব্যবহার করেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

যে-দেশের সামরিক বাহিনীর হাতে তোলা ছবি দুদিন যেতে-না-যেতেই শত্রুর হাতে গিয়ে পড়ে সে-দেশে শত্রুর এজেন্ট নিশ্চয়ই অসংখ্য এবং তারা প্রত্যেকটি গুচ্ছ-সুপূর্ণ বাঁচিয়েই জাল বিস্তার করে গুণ পেতে থাকে আছে। এরা কেউ সহজ পথে নিশ্চয়ই ভারতে প্রবেশ করে নি। উদ্বাস্তদের আগমনের পথ বন্ধ করে নিষেধাজ্ঞা জারী করে ভারত সরকার মানবিকতার আকুল আবেদনকেই উপেক্ষা করেছেন।

শত্রু বনিয়াদের অভাবে আমাদের অনেকের কাছে জনকল্যাণ রাষ্ট্রের আগল চেহারাটাই বরা পড়ে নি। আগাগোড়া তাই চলেছে মৌজামিদের কারবার। কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন পরিষদ ও নিখিল ভারত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান-গুলোর প্রতিনিধি সম্মেলনে তাই নবী শ্রীঅশোক সেন পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য অর্থনীতিবিদ ডঃ রাও-এর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। অস্বাভাবিক ব্ল্যাবক্টি ও অত্যধিক করভারে মানুষ নিপেষিত। জীবন-মাত্রা নির্বাহ করাই তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। কাজেই কল্যাণমূলক কাজে অর্থদান আর স্বাধারণ মানুষের কর, নয়। প্রকারান্তরে শ্রীঅশোক সেন এই কথাই সেদিন বলেছিলেন।

সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলে আজ এ প্রশ্ন উঠেতো না। শ্রীমতী ইলিরা গান্ধীকেও দুঃখ করে বলতে হতো না—স্বাধীনতার পূর্বে সমাজসেবীদের মধ্যে যে ভ্যাগের প্রবৃত্তি ছিল এখন আর তা দেখা যায় না।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের উদগাথা জওহরলালের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই পণ্যের বাজারে দেখা দিয়েছিল অরাজকতা। সাধারণ



শ্রীঅশোক সেন

মানুষ ভাতে নিঃশ্রম হয়েছে। সম্পদ গিয়ে ফলেছে নৃষ্টিসেম কালোবাজারী ও ধনিকের হাতে। ভোগবিলাসে মন যাদের প্রমত্ত তারা দরাজ হাতে দান করতে পারেন না। তা' ছাড়া জনসেবার, আত্মের পরিচর্যার ব্যয়ভার চিরকাল সাধারণ মানুষই বহন করে এসেছে।

নগাধিরাজ---নাম হিমালয়।

গুণ দুর্গমই নয়, সর্বাচ্চ। এভারেস্টের চুড়ায় পৌছেছে ভারতের অসীম আনন্দ। এই ভারতীয় অভিযাত্রী দলের এই সর্বাচ্চ গিরি-শিখর জয়ের কৃতিত্ব বিশ্বের পর্বতারোহীদের বাবতীয় জয়-গৌরবকে ম্লান করে দিয়েছে। চতুর্থবার জয়ের কৃতিত্ব এই যে, এর আগে অন্য কোনো অভিযাত্রী দলের এক সঙ্গে তিন জন এভারেস্টে যেতে পারেন নি। তা ছাড়া ভারতীয় পর্বতারোহীদের হতো অন্য কোনো দল মাত্র ৯ দিনের মধ্যে চার-চারবার এভারেস্ট জয়ের গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। চতুর্থবারের অভিযাত্রী দলের যে তিনজন ২৯শে মে ১৯৬৫ বেলা প্রায় ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় এভারেস্ট চুড়ায় জয়-পতাকা প্রোথিত করেন তাঁরা হচ্ছেন, শ্রী এইচ সি এস রাবাত, ক্যাপ্টেন এইচ এস আলুওরালিয়া এবং এক জন নেপালী সহকারী সর্দার কু.দোরজি।

ভারতীয় অভিযাত্রী দলের এই সাফল্যে আনন্দ জাপন করে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন যে, এই কৃতিত্ব অতুতপূর্ব, এতে

ভারতীয়রা পর্বতবোধ করবেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী এ জয়কে চমকিত করার হতো বিজয় বলে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সমস্ত ভারতীয় এই বিজয়বার্তার দত্তম প্রেরণা লাভ করবেন। ভারত যখন পরাধীন তখন আমাদের কবি গেয়েছিলেন—

‘দুর্গম গিরি, কান্তার নদ, দুত্তর পারাবার
লভিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হ'শিয়ার।’

এই কবিতার রূপকটুকু বাদ দিয়ে যদি এর সাধারণ অর্থটুকু গ্রহণ করি, তাহলে দেখবো দুর্গম গিরি লভন করার হতো শক্তির অভাব আমাদের নেই। এই শক্তি নিয়েই রক্ষা করবো আমরা স্বাধীনতা। উচ্চ শিখরকে জয় করার মধ্য দিয়েই মাথা উচু রাখার শক্তি আমরা দেখ সামাজিক বিপুল সাধনে বজায় রাখতে পারি।

ত্রিপুরা :

পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে ত্রিপুরা অতটা কঠোর হতে পারেন নি। তারা বিষয়টিকে বিচার করেছে ভিন্ন দৃষ্টিতে। স্বাধা প্রকৃত উদ্বাস্ত, পাকিস্তানের ছায়ানীতল গ্রামের নবতা কাটিয়ে চলে এসেছেন, তাঁদের সাপক্ষে গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন রাজ্য সরকার। নাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের কড়াকড়ি এখানে নেই। সর্বহারাদের প্রয়োজনবোধে পুনর্বাসনের সকল সুবিধাই করে দেওয়া হচ্ছে।

ছোট রাজ্য ত্রিপুরা যে সহৃদয়তার পরিচয় দিচ্ছে, পশ্চিম বাংলার কেন তা সম্ভব হচ্ছে না, এ প্রশ্ন উঠেছে অনেকের মনে। পশ্চিম বাংলার নেতাদের হতে সেখানে ঠাঁই নেই আর। নেতাদের একথা অবশ্যি সকলে স্বীকার করেন না। বিরোধীদের হতে পশ্চিম বাংলার কর্তব্যজিত্রা প্রধান খেকেই উদ্বাস্তদের ব্যাপারে স্পর্শকাতর মনের পরিচয় দিয়েছেন, তা' না হলে উদ্বাস্তদের নিয়ে রাজনৈতিক দাবার চাল বেঘালু চলেতে পারতো না। কোটি কোটি টাকা উল্লাস পুনর্বাসনের নামে অপব্যয় হতো না। দুর্জনোরা আরও বেশি বলেন। পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে বাঙাল খেদানোর একটা গোপন চক্রও নাকি এক-সময় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাই সব জিনিস-টাই ভালগোল পাকিয়ে একটা ভগাবিচড়িতে পরিণত হয়েছিল।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিংহের সম্ম-বোধের সংবাদে পশ্চিম বাংলার নেতাদের চিত্ত একটু বেদনাকাতর হলে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবেন বলেই আমরা মনে করি।

বহু ভারতীয় নাগরিক এখনও পাকিস্তানে নরণ-বন্যা ভোগ করছে। উদ্বাস্তদের ব্যাপারে

সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী

কন কন প্রেসবোর্ট প্রচার করে ভারত সরকার
যতটা তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন—পাকিস্তানী
দুশমন কর্তৃক অপহৃত ভারতীয় নাগরিকদের
উদ্ধারের ক্ষেত্রে সরকার যেন ঠিক সেই পরিনামেই

উদাসীন। ত্রিপুরার বেলোনিয়া মহকমার
শীমান্ত এলাকার শ্রীহরিমোহন সেনকে
পাকিস্তানী দূর্বৃত্তরা অপহরণ করে নিয়ে
গেছে মাস খানেক আগে। তাকে

উদ্ধারের কোন চেষ্টা হয়েছে
যায় নি।

রবার পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী পি এম



ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দল চতুর্থবার এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করে রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ছবিতে অভিযাত্রী দলটিকে একটি তুষার দেওয়াল দ্বন্দ্বন করে ওপরে উঠতে দেখা যাচ্ছে;



শ্রীশচন্দ্রলাল সিংহ

৪৮৮ মহম্মদ এসেছিলেন সম্প্রতি। তিনি
৪৮৮ গাছের পুষ্টি দেখে খুবই তুষ্ট হয়েছেন।
তার মতে ব্যাপকহারে রবারের চাষের
প্রশস্ত কেন্দ্র ত্রিপুরা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ
করে সেই কথাই তিনি জানিয়ে গেছেন।

১৯৬২ সালে বনবিভাগ রবারের চাষ
শুরু করেছিলেন। ষাট একর জমিতে চাষের
ফল চলেছে পুরোদমে। আসছে বছর আরও
৮৮ একর জমিতে চাষের প্রস্তাব রয়েছে।

নাগাভূমি :

অনন্ত সবার, পার্বত্য এলাকার মানুষ,
বিশেষ করে নাগাদের প্রতি পরলোকগত
প্রধানমন্ত্রীর দরদ ছিল অপরিণীত। তাঁর সেই
দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেই নাখাচাড়া দিয়ে
উঠেছিল নাগারা ফিজোর নেতৃত্বে। সাম্রাজ্য-
বাদের কুচক্রও তাদের কিছুটা চাঙ্গা করে
ভুলেছিল। ফিজোর অত্যাচারের হাত থেকে
শান্তিপূর্ণ নাগাদের বন-প্রাণ রক্ষার জন্য
নিয়োজিত হল ভারতীয় ফৌজ।
অবস্থা ফিরে এল আয়ত্তে, ফিজো পাড়ি
জমালেন গিয়ে পাকিস্তানে। সেখান থেকে
গিয়ে হাজির হলেন বিলাতে স্ট্রট সাহেবের
আত্মানার। নাগাভূমি আসারের কোল থেকে
নিচ্ছিন্ন হল, স্ট্রট হল স্বতন্ত্র অঙ্গরাজ্যের।
সাধারণ নির্বাচনের পর শ্রীশিল্পী আও পত্তন
করলেন জনপ্রিয় সরকার। ঠিক এই সময়টিতে
ভারতের ইশান কোণে ধুমকেন্দ্রের মত এসে
আবির্ভূত হলেন পাজী স্ট্রট। ভারত সরকার
তাঁর শান্তির বুলিতে মুগ্ধ হলেন। গঠিত হলো
শান্তি মিশন। আলোচনা শুরু হল শরতের
বর্ষাসূত প্রভাতে পর্যদন্ত বিদ্রোহী নাগাদের
সঙ্গে।

সেই শরতের প্রভাতী, আলোতে যাঁরা
আশার আলো দেখতে পেরেছিলেন--পেরে-
ছিলেন নাগাদের চিত্তশুদ্ধির পরিচয়।

তাঁদের দৃষ্টিশক্তি, বিবেক-বুদ্ধির ভারিক
আমরা সেদিন করতে পারি নি। আমাদের
সাধনাবাদী শুনে যাঁরা ভরন অবজার হাসি
হেসেছিলেন, নাগা আত্মীয় পরিষদের গোপন
বৈঠকের পর তাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে কি না
এখনও বলা শক্ত। নাগারা কিন্তু তাঁদের
আত্মারাতেই দিনের পর দিন নয়া নয়া দাবি
উত্থাপন করে চলেছে।

নাগা আত্মীয় পরিষদের অধিবেশনের
সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নি, কারণ অধিবেশনে
সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার ছিল না। অধি-
বেশনের শেষে মুখপাত্ররা যে তথ্য পুনর্নিবেশন
করেছেন--তাতে নতুন আশার আলোকপাত
তো দূরের কথা, ভারতের সংবিধানের



স্ট্রট

এজিয়ার মেনে নেবার মত আগ্রহও নেতাদের
মধ্যে দেখা যায় নি।

বিদ্রোহী নাগারা তাদের দাবিতে শুধু
অবিচলই নয়, তারা এখন ফিরে পেতে চায়
নেতা ফিজোকে। এবারের দাবি ঘোষণাও
বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দাবিটা তোলা হয়েছে
সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে। গ্রামাঞ্চলের
অধিবাসীরাই নাকি এখন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র
নাগা রাজ্যের দাবিদার। ফিজোই তাঁদের
অবিসংবাদী নেতা। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ
না করে কোন কথা বলতে বিদ্রোহীরা একে-
বারে নারাজ।

শোনা যাচ্ছে, ফিজোর ডাই ইয়ামায়
বিলাতে যাবেন ফিজোর সঙ্গে দেখা করতে।
ইয়ামায় ফিজোর পথের পথিক নন। বিদ্রো-
হীদের সঙ্গেও তাঁর দহরন-মহরন নেই। শান্তি
মিশনের সঙ্গে সম্পর্কটুকু ভিন্ন আর কোন
রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি, নেই। কাজেই
তাঁকে পাঠিয়ে কোন পক্ষের উপকার হবে
কি না, সন্দেহ।



ফিজো

ভারতীয় পাশপোর্টে ফিজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে যাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করেছে, তাঁদের
সম্পর্কে নতুন করে ভারতের সনদ নিশ্চয়ই
এসেছে। ফিজো নিজেই ভারতে আসতে
আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ভারত সরকার
বিদেশী পাজীর প্ররোচনায় না ভুলে বাস্তব
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরাসরি মূলে সরাসরি আঘাত
করতে না পারলে নাগাভূমি কাম্বোজের মতই
দৃষ্টান্তে পরিণত হবে।

নেহরুশ্রুত এশিয়ার আবহাওয়া পালটাচ্ছে
প্রতিদিন। আয়ব আশার বুক বেঁধে নাকালানি
করছে। ইন্দোনেশিয়ার প্রভাব বিস্তারিত হচ্ছে
তার আশ-পাশের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে। সেই
পরিবর্তিত পরিবেশে দরকার হলে ফিজোর
সঙ্গে সরাসরি কথা বলাও অনায়াস হবে না।
ফিজো বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে
তাঁর ছানকটুকু এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছেন।
তাঁর মতের পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়।

পাজাব :

মন্ত্রিসভার কলবর আপাতত 'আর'
বুজি পাবে না। কংগ্রেস হাইকমান্ডের একমুখ



প্রারম্ভিকক্ষেণ



ধোরি খনির ধ্বংসস্থল থেকে উদ্ধার করা এক হতভাগ্যের দশা-বিকৃত মৃতদেহের সম্মুখে হতবিসহুল জনতা।

শ্রীযুক্ত সদস্য পাঞ্জাব কংগ্রেসের নেতাদের বৈধ
ধরে লোভ সঞ্চার করতে উপদেশ দিয়ে
শাকি বলেছেন, মন্ত্রিসভার অবয়ব বৃদ্ধির
উপযুক্ত সময় এখনও আসে নি। শীঘ্রই পাকি-
তানী চব্বিশের রণচক্রের পর মন্ত্রিসভা নিয়ে
বেশি মাথা ঘামালে বিরোধী-গোষ্ঠীর সমা-
লোচনার পথই বেশি করে উন্মুক্ত করে দেওয়া
হবে।

এসব কথা বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী
শ্রীমাকিষেণও তাঁর প্রস্তাব কংগ্রেসের উত্থাপন-
মহলে পেশ করেন নি। সতবিরোধ যতই
থাকুক না কেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দরবারা সিংকে
একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে
সম্ভব নয়। তিনি ওয়াকিং কমিটির একজন
মাত্রের ব্যক্তি তো বটেই। কাজেই তাঁর সঙ্গে
প্রাথমিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে, তার

জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। সে পরিবেশ
কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকাননাজের পাঞ্জাব পরি-
দর্শনের পূর্বে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই
কম। উত্তরাঞ্চলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা-
আলোচনার জন্য তিনি শীঘ্রই পাঞ্জাবে
আসছেন।

এ ছাড়া দাশ কমিশন যাদের নাম উচ্চারণ
করেছেন, তাদের সমস্যাটাও কম নয়। আইনা-
নুগ কোন ব্যবস্থাই তাদের বাপারে অবলম্বন
করা হয় নি। হাইকমান্ডকে তাদের বিষয়ে
একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। সেই সিদ্ধান্ত
পূহীত না হলে শ্রীবৃন্দানের দাবিটা বানচাল
হয়ে যেতে পারে।

বিহার :

ধানবাদ থেকে ৬৩ মাইল দূরে হাকারিয়া
জেলার ধোরি করলাখনিতে এক গোচনীয়
দুর্ঘটনার ফলে তিন শতেরও বেশি
শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিক-কর্মচারী
নিহত হয়েছেন। এতবড় বর্মান্তিক দুর্ঘটনা
ভারতে ইতিপূর্বে ঘটে নি। গত বৃহস্পতিবার
সন্ধ্যারান্ত্রে শ্রমিকদের শিক্ত বদলের সময়
যাঁরা নীচে ছিলেন এবং যাঁরা নীচে যাঁরা
জন্য শ্রমিকের সমবেত হয়েছিলেন, সেই
হতভাগ্যদের কেউ আর জীবিত নেই।
পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সময় যে ভয়াবহ
ছত্রাক-আকতি মরণ-রোয়া আকাশ স্পর্শ
করে, ধোরি করলাখনির বিস্ফোরণ। ঘনৈশ
প্রত্যক্ষদর্শী তার সঙ্গে তুলনা করেছেন।
এই বিস্ফোরণ এত প্রচণ্ড হয়েছিল যে, আড়াই
বর্গমাইল এলাকা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বারম্বারে এই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ সম্পর্কে
আবহা বিস্তারিত আলোচনা করব।



প্রিয়জন হাকারিয়ার দুঃসহ বেদনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ধোরির শ্রমিক রমণী

অ বি স্ম র ণী য়

স্মৃতি

অহরহাল নেহরুর মৃত্যুর পর যতোই দিন যাচ্ছে, ততোই বেশি করে দুশ্চেষ্টা হয়ে উঠছে বিশ্বের দেশের ও জাতির জীবনে এবং সমগ্র বিশ্বে এই ভারতীয় জনগণের মহান সত্যনের স্মৃতি।

ভারত ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্ব-দুশ্চেষ্টা ও বণিষ্ঠ সহযোগিতাকে বিকশিত করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় দানের জন্যেই বিশেষ করে সোভিয়েত জনগণের কাছে নেহরুর নামটি এতো প্রিয়। ভারতকে আরও ভালোভাবে বুঝতে—বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে ভারতীয় জনগণের বিরাট দানের যথোপযুক্ত এক মূল্যায়ন করতে—তিনি আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

নেহরুর সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং সেই অমূল্য স্মৃতি-কথা, নতুন ভারত গঠনের তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস, আমাদের যুই দেশের অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বন্ধনকে শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট দান—এসব কথা আমাদের সোভিয়েত জনগণের কাছে বহুবার বলার সুযোগও আমার হয়েছে। তাঁর মৃত্যুহীন প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এখানে সেই কথাগুলিই আবার স্মরণ করছি।

নেহরু ছিলেন প্রথমত একজন অতি-বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর এই নেতৃত্বের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য অনান্য।

যথার্থ একজন দেশাভিমানী হিসেবে নিজের দেশের ও জনগণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সব সময়ে চিন্তা করতেন। ভারতের অর্থনৈতিক লুপ্তি ঘটানো, প্রশিক্ষণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের উন্নয়ন সাধন এবং তাঁর কৃষি-ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি তাঁর দেশের শিকা-সংস্কৃতির উন্নতির নিকেও বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে নেহরুর এই চেতনা ছিল তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনারই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মার্কস ও লেনিনের রচনাবলী যে তাঁর চেতনা ও উপদেষ্টককে বিকশিত করে তোলার ব্যাপারে বিশুবদ্ধভাবে প্রভাবিত করেছে, সে কথা নেহরু যেকোনো তাঁর 'ভারত সত্যনে' ও আত্মজীবনীতে বলেছেন। মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির ওপরে, বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধতাবাদীর ওপরে, সামাজিক অগ্রগতির অনিবার্যতার ওপরে তাঁর বেদুত-বিশ্বাস ছিল, কোটা এসেছিল এই মার্কসবাদের প্রভাবেই। নেহরুর মতাবলীতে তাই দেখি, ভারতীয়

সমাজের অগ্রগতির ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশকে যুক্ত করেছেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি বিশ্ব-সংস্কৃতির

ইয়েজগানি চলিশেষ

ইতিহাস থেকে তাঁর নিজের জাতীয় সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। নেহরুর রচনাবলীতে; আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে গণভাবের



নবীন ভারতের রূপকার

প্রথমভাগটির জগতবাসী যে দেশের জাতীয় স্মৃতি আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে খুব মূল্যবান আলোচনা আছে।

আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশে ঐতিহ্য ও নব-উদ্ভাবনের দ্বৈত ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ব্যাপারটির প্রতি নেহরু বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের বহু মহৎ সাহিত্য-রচনার মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক আধুনিক দেশী ও বিদেশী পবেষক শুধুই দেখেছেন জীবন-বিশ্ববৃত্ত, বর্বর মৌহাজিরতা, পাশিবি, বাস্তব ও বৈষয়িক বা-কিছু তাঁর থেকে পল্লব-প্রথমভাগ। এই হল দৃষ্টিকণীরা যাঁরা উদ্ভাটন করে নেহরু দেখিয়েছেন সেই সব রচনার মানবিক আবেদন, জীবন ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা ও পাশিবি অভিষেক আনন্দ। এই কথাটির ওপরে নেহরু বিশেষ ঝোর দিয়েছেন যে জীবন-বিশ্ব, বিশ্ব-বিশ্ব কোনো ভাবানন্দ ও মতানন্দ কয়েক মহাপুরুষের দ্বারা এমন সত্যের জীবন কখনও যাপন করতে পারে না।

কিন্তু তাই বলে নেহরুর এই মূল্যায়নের পেছনে সংস্কৃতি ও উগ্র জাতীয়তাবাদ মোটেই ছিল না। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি, আধুনিক ভাবধারাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা, কর্তমান জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে নবরূপে জগায়িত করতে না চাওয়া—এসবের তীব্র সমালোচনা নেহরু করেছেন। তিনি বার বার বলেছেন : এ হল ভারতকে বহিঃবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যে রক্ষণশীল গোঁড়া জাতীয়তাবাদীদের অত্যন্ত সংস্কৃতি এক অপপ্রয়াস। জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকণীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যে সব ভারতীয় যত্নশীল সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে নেহরুর এক বিশেষ স্থান আছে।

আমাদের দৃষ্টিকণী থেকে, ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর দ্বৈত সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নব-উদ্ভাবন সম্পর্কে নেহরুর দৃষ্টিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নতুন যুগের দাবি অনুযায়ী সত্যকার এক নব-উদ্ভাবন বলতে নেহরু সমগ্র আশেপাশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন, জরাজনিত ও বর্জ্যমানের অনুপযোগী সব কিছুকে পরিত্যাগ করা এবং বা-কিছু সামাজিক প্রগতিক ক্রান্তর ও আধুনিক চিন্তাকে দৃষ্ট করে তোলে ডাকেই গ্রহণ করা।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইউরোপ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিকণীকে বর্জন করার কাজে নেহরুর দৃষ্টি খুব মূল্যবান। তিনি দেখিয়েছেন : ইউরোপের

সম্প্রদে এইই ভারতের পুনরুজ্জীবন ঘটছে— এই মত কতোখানি সত্য। এবং সেই সঙ্গে তিনি এও দেখিয়েছেন যে এই ভারতীয় সংস্কৃতি যুগযুগ ধরে সাংস্কৃতিক ধারা থেকে পুষ্ট আহরণ করে সুরু হয়ে উঠেছে, ভারতের নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির ধারায় এসে মিশেছে অন্যান্য সাংস্কৃতিক ধারাও। সত্যকার জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই হল তাই: তা অন্যান্য সংস্কৃতির প্রাণবান সম্পদ-গুলিকে গ্রহণ করে, কিন্তু বিকশিত হয়ে ওঠে সেগুলিকে নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গীকরণ করে নিয়ে, নিজের গণজীবনের উৎস থেকে উৎসারিত তার নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করে নিয়ে।

এই জনতাই যে সংস্কৃতির মূল আধার ও উৎস—এ সম্বন্ধে জহরলাল সর্বাঙ্গী সচেতন থাকতেন, তবু সংস্কৃতির মূল্যায়নেই নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও। জনগণের জীবনের সঠিক হবার দিকে, তাদের স্বচ্ছ বস্তুি সংযোগ সর্বাঙ্গী বজায় রাখার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল সঙ্গী। বাস্তবিক পক্ষে, নেহরুর শক্তির উৎস ছিল দেশের এই জনসাধারণ।

ভীষণ অসামান্য জনপ্রিয়তার, আন্তর্জাতিক সর্বদা স্বচ্ছ হয়ে বড়ো কারণ হল নিজের জনগণের সঙ্গে তাঁর সেই ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র। তিনি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, তাদের অন্তরের চিন্তাকে, খুব ভালোভাবে বুঝতেন।

ভারত যখন স্বাধীন হল, তখন উপনিবেশবাদীরা দুই শতাব্দীব্যাপী শোষণের পর অনেক গুণি দারিদ্র্য আর অস্বচ্ছতার বোঝাকে দেশের মানুষের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহরু তাঁর সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন দেশের সাধারণ নেহনতী মানুষদের খুশি হারানো ঘোচাবার কাজটিকে, অস্বচ্ছতার আনন্দটিকে দূর করে দিয়ে দেশের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের কাজটিকে।

সাংস্কৃতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিনু-সংস্কৃতির সঙ্গে সবোচ্চ রাধার প্রয়াস, সব রকমের মৌড়ামির বিরুদ্ধে অভিযান, দেশের জনসাধারণের প্রাণপঙ্কির উৎস থেকেই সব সময়ে প্রেরণা আহরণ—নেহরুর এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটিই হল আধুনিক ভারতের চিন্তামারক কনীরূপের সকলেরই বিশেষভাবে লক্ষ্যীয় বিশিষ্টতা। বলা বাহুল্য, ভারতীয় জনগণের মহত্তম সন্তানদের একজন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। রবীন্দ্রনাথের সেই মানবিক সাংস্কৃতিক ভাবধারা ও বিনুমানবতাবোধ নেহরুকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। জহরলাল তাঁর রচনাবলীর নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর স্মৃতিভার প্রকাশ করা উল্লেখ করেছেন, স্বাক্ষরিত উক্তি থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এমন একজন প্রবল পুরুষ, যার

ধারা প্রভাবিত না হওয়াই অসম্ভব। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার সত্যকর্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণাকে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁদেরই অগ্রগণ্য হিসেবে আমরা নেহরুকে দেখি।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে, জনতার রাজ সম্পর্কে, উপনিবেশবাদী বিনেশী শাসকদের বধন বিধ্যা প্রচারের অন্ত ছিল না, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এসে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ব্যবস্থাকে ঐকান্তিক অভিসন্দন জানালেন। এদেশে এসে তাঁর 'এ জন্মের তীর্থ স্রবণ' সম্পূর্ণ হল বলে ঘোষণা করলেন: 'ওদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার ও নেবার আছে।' সোভিয়েত জনগণের প্রথম ও সবচেয়ে বড়ো বন্ধুদের মধ্যে তিনি একজন।

রবীন্দ্রনাথ যে ভারত-সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক-সহযোগিতার বীজ রপন করেছিলেন, তা আজ বহীকরে পরিণত এবং নেহরু হলেন সেই বৈজ্ঞানিক-সহযোগিতার প্রধান রূপকার।

জহরলালের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে কী গভীর প্রীতির মনোভাব পোষণ করতেন তা আমরা খুব ভালোভাবেই জানি। এই প্রসঙ্গে, সবার আগে বসে পড়ে—বট্টেশের জেলে বন্দী নেহরুকে উদ্দেশ্য করে লেখা সান্নাধ্যবাদীদের মুখপাত্রী এক বট্টেশ মহিলায় চিঠি, এবং নেহরুর হয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠির যে দৃষ্ট আর অভুলনীয় জবাব লিখেছিলেন, তার কথা।

রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন ভারত দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর স্বপ্নগুলিকে সত্যেরে রূপায়িত করার কাজে নেহরু রবীন্দ্রনাথের কথাগুলিকে মনে রেখেছিলেন যে ভারতের বহুজাতিক প্রকৃতি সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির এক সাধারণ ঐক্য ও অভিন্ন উদ্ভাবনিকার আছে, তার প্রত্যেকটি জাতি-অধিকাতির তবিত্যব একসূত্রে গাঁথা। সেই সঙ্গে তিনি এই বিভিন্ন জাতি-অধিকাতির নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির ওপরে, তাদের প্রত্যেকটির জাতীয় উৎসকে অগ্রাহ্য না করার ওপরে—বিশেষ জোর দিয়েছেন।

উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ও বুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নারক হিসেবে নেহরু যতাবতই বিনুশক্তির পক্ষে বিরাট শক্তি জুগিয়েছিলেন। পূর্ণ ও সর্বাঙ্গিক নিরস্ত্রীকরণ, উপনিবেশিক ব্যবস্থার অবগান, শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা সমস্ত বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা করা—এসবের পক্ষে তিনি ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা।

আমাদের দুই দেশের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা স্থাপনে তিনি যে কতোবড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা বলা বাহুল্য। ১৯২৭, ১৯৫৫ ও ১৯৬১ সালে তাঁর সোভিয়েত দেশ সফর দুই দেশের সেই বৈজ্ঞানিক সম্পর্কে পঞ্জিলী করে 'তোলার বিশেষ সহায়ক হয়েছিল—তবু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

সহযোগিতাই নয়, সাংস্কৃতিক সহযোগিতাই ক্ষেত্রেও। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে: ইরানিং ভারত-সফরে আগত প্রত্যেকটি সোভিয়েত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হতেন।

নেহরুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে একাধিকবার মিলিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এক প্রতিবারই তাঁর অসামান্য আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, তাঁর মানবিক চরিত্র-মার্ধ্য ও সঙ্গময়তা—এই সেই সঙ্গে, বিনু-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ ও প্রবণতাগুলি সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা—আমাকে মুগ্ধ ও বিম্মিত করেছে।

১৯৫৫ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশীয় দেশগুলির শান্তি-সম্মেলনে যোগদানকারী সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে আমি প্রথম জহরলালের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই। তারপর, ১৯৫৯ সালে, স্বাভাৱে অনুষ্ঠিত লেখকদের বিনু-কংগ্রেসে যোগদানের পর, দিল্লী এসে আরেকবার তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা হয়—সেবারে, বোলিগ পড়ে ও বেদি কেবু বাইয়েক আমাদের দলে ছিলেন।

সোভিয়েত ভারতবিদদের লেখা কতকগুলি বই, হিন্দী-রূপ অভিধান, গান্ধীজীর আন্তর্জাতিক রূপ অনুবাদ প্রভৃতি আমাদের কাছ থেকে উপহার পেয়ে তিনি গভীর আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। পলডয় ও কেবু বাইয়েক তাঁদের নিজস্ব লেখা দুটি উপন্যাস (ইংরজি অনুবাদ) তাঁকে দিলেন। উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে নেহরু বললেন, 'তরুণ বয়সে ডলভয়, চেষ্টা, গোষ্ঠি প্রভৃতির রচনা আমাকে গভীর প্রেরণা দিয়েছে। ইরানিং আমার সময় বড়ো কম, তবু আপনাদের বই দুটি আমি নিশ্চয় পড়ব।'

তারপর, নেহরুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ১৯৬৩ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে—অনুতসরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শান্তি-সম্মেলনে যোগদানের পর দিল্লী এসে। খুব ক্লান্ত ও অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি আমাদের সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলে আমরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করেছিলাম।

প্রতিবারই তাঁর সঙ্গে আমি হিন্দীতে কথা বলি। এবং তিনিও প্রতিবারই আনন্দ প্রকাশ করে বলেন যে, সোভিয়েত দেশে যে আজ এতো ব্যাপকভাবে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে তা দুই দেশের বৈজ্ঞানিক-সহযোগিতার ফলস্বরূপ।

তখন ডাবতেও পারি নি যে, জহরলালের সঙ্গে সেই হবে আমার শেষ দেখা। আমার কাছে নেহরু মৃত্যুহীন, তাঁর স্মৃতি অবিস্মরণীয়। তাঁর শান্ত কণ্ঠস্বর, উজ্জ্বল দৃষ্টি, আর প্রীতিপূর্ণ হাসি কখনও ভোলবার নয়।*

*লেখক চৌলশেফ হিন্দী ভাষাভিজ্ঞ বিশিষ্ট ভারতবর্ষ ও সোভিয়েত-ভারত সাংস্কৃতিক সমীক্ষার উপ-সম্পাদিত।)

পশ্চিম জার্মানী :

বুটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও তাঁর স্বামী ডিউক অব এডিনবরা প্রিন্স ফিলিপের দর্শনব্যাপী পশ্চিম জার্মানী সফর শেষ হয়েছে।

১৯০৯ সালের পর এই প্রথম বুটেনের কোন রাজা বা রাণী জার্মানী এলেন। এলিজাবেথের প্রপিতামহ স্যার এডওয়ার্ড কাহিলার দ্বিতীয় উইলহেলমের আশ্রয়ে শেষবারের মত জার্মানীতে এসেছিলেন ১৯০৯ সালে। তাঁরপর প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে বুটেনের যুদ্ধ থেকে সেই যে সম্পর্কের অবনতি শুরু হয়েছে, তার আর কোন উন্নতি হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের পর বিভক্ত জার্মানীর পশ্চিমাংশে নতুন করে পশ্চিম-নিয়ন্ত্রিত শাসন প্রতিষ্ঠার কালে অন্যান্য পশ্চিমী দেশের মত বুটেনের সঙ্গেও নতুন জার্মান শাসকদের সম্পর্ক উন্নত হয়েছে। কিন্তু শব্দ-পর্বায়ে সম্পর্কের উন্নতি হলেও দুই দেশের সাধারণ মানুষ পরস্পরের প্রতি সহজ হতে পারে নি। ইংরেজরা নাৎসী অভ্যুত্থানের কথা ভোলে নি—নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সহজাত যুগ্ম জার্মানদের প্রতি এখনও তাদের বিরূপ করে রেখেছে। অপরদিকে জার্মানরাও ইংরেজদের বড় সর্বস্বের শত্রু বলে মনে করেছে, এবং তাদের বহু দুর্গতির কারণ বলে মনে করেছে এই ইংরেজদের।

পশ্চিম জার্মানী অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছে বুটেনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের উন্নতির জন্য। ১৯৫৮ সালে পশ্চিম জার্মানীর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি থিওডোর হেস লণ্ডন সফর করেছিলেন। তখন থেকেই চেষ্টা হচ্ছে রাণী এলিজাবেথের পশ্চিম জার্মানী সফরের জন্য। কিন্তু বুটেনের কোন মন্ত্রিসভাই এ ব্যাপারে সন্মত হতে উঠতে পারছিলেন না। জার্মানরা তাই একরকম আশা ছেড়েই নিরস্ত হবার আগমনের। শেষ পর্যন্ত বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন উপযোগী হয়ে রাণীর এই ওভেজ্জা সফরের ব্যবস্থা করেছেন।

বুটেন রাজবংশের সঙ্গে জার্মানীর অতি ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। জার্মান হ্যানোভারবংশ থেকে বুটেনের বর্তমান রাজবংশের সূত্রপাত। ফিলিপের পূর্বপুরুষরাও জার্মানীর অধিবাসী। তাই দুজনেই জার্মানীতে এসেছেন নিজদের জাতীয়-স্বত্বের নথ্যে। ব্যাভেরিয়ার পুরোনো রাজপরিবারের বংশধরেরা প্রজাতান্ত্রিক জার্মানীতে নিজদের রাজত্ব ফিরে পাবার আশা আর করে না—তবু দু'দিনের জন্য তাদেরই বংশজাত অপর এক দেশের রাণীকে পেয়ে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল।



পশ্চিম জার্মানী সফরে রাণী এলিজাবেথ

যন বিবানবশ্যে এলিজাবেথ বিমান থেকে অবতরণ করার পর তাঁকে সম্বর্না জানান পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি হাইনরিখ লুবকে ও চ্যান্সেলার লডউইগ এরহার্ড। রাণী যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই সাধারণ মানুষ তাঁকে সাদর সম্বর্না জানিয়েছে।

এলিজাবেথ বুটেন ও জার্মানীর মধ্যে পরোনো দিনের বিবাহ তলে যেতে সবাইকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিগত বৎসর ভিত্তি অধ্যায় শেষ হয়েছে—এখন নতুন বৈদ্যুতিক সম্পর্ক গড়ে উঠুক। নিকট ভৱীতে জার্মানীর সঙ্গে বুটেনের বিবাহ ও বনোবালিয়া হলেও দুই দেশের মধ্যে পূর্বকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা এলিজাবেথ তলে ধরেন। নেপোলিয়ানকে পরাজিত করার জন্য কিভাবে বুটেন ও জার্মানী একত্র সংগ্রাম করেছে, এই প্রসঙ্গে তিনি তার উল্লেখ করেন। তা ছাড়া বুটেনের রাজবংশের সঙ্গে জার্মানীর যোগ ভো আছেই।

এলিজাবেথ তাঁর বিভিন্ন ভাষণে জার্মান একীকরণের দাবী সম্বর্নন করেন। জার্মানদের কাছে এটি একটি প্রধান বিষয়। এই প্রসঙ্গে রাণী এলিজাবেথের অসকোচ ঘোষণার নবাই বসি।

বুটেনের রাণী এলিজাবেথের পশ্চিম জার্মানী সফরের রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশি। জার্মানীর দিক থেকে বুটেনের রাণীর এই সফরের ফলে জার্মানীর রাজ্যের স্বাধীনতা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেল; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জার্মানীকে যে অবধাতির পক্ষে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, 'বীরে বীরে জার্মানী তার থেকে

নিজেকে তুলেছে। বুটেন কর্তৃক নতুন জার্মানীর পূর্ণ স্বীকৃতি ও জার্মান ঐক্যের প্রতি সম্বর্নন জাপন পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। তা ছাড়া সাধারণ ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন। বাঁবা-বাণিজ্যের প্রসারের দিক থেকেও এর গুরুত্ব আছে।

অপরদিকে বুটেনের লাভও কম নয়। ক্রান্তের বিরোধিতার ফলে বুটেন ইউরোপের বাজারে চুকতে পারছে না। পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্রান্তের হাতে। পশ্চিম জার্মানীর সম্বর্নন যদি বুটেন পার তবই ইউরোপের রাজনীতিতে বুটেনের সুবিধা হবে। ব্য গলের কর্তৃব প্রতিরোধ করার 'ব্যাপারে বুটেন ও পশ্চিম জার্মানী যদি একজোট হয়ে কাজ করতে পারে তবে উভয়েরই লাভ হবে। আর বাইরে থেকে থাকি বুজরাটও এতে খুশি হবে।

সুদান :

ছয় বৎসর সামরিক শাসনের পর সুদানেও নতুন নির্বাচন হয়েছে। আইনসভা 'ন্যাশনাল এসেমবলী'তে কোন দলই এককভাবে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি। তবে রক্ষণশীল মুসলিম দল উম্মা পার্টি দল চেয়ে বেশি আসন লাভ করেছে। আর দু'টি রক্ষণশীল দলের সহযোগিতায় উম্মা পার্টি কোয়ালিটি সরকার গঠন করার জন্য চেষ্টা করছে।



সাদিক আল মাহদি

এ চেয়ে বিস্ময়ের কথা, এই নির্বাচনে মুদানের শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি একটি আনন্দ লাভ করতে পারে নি। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী আল খাতিব আল খালিকার আমলে কমিউনিস্টদের প্রভাব খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। কমিউনিস্টদের চেঁচাতেই মুদান কল্লোর বিদ্রোহীদের একটি প্রধান ষাঁড়িতে পরিণত

হয়েছিল। বিদ্রোহীদের জন্য অস্ত্র ও রসদ প্রধানত মুদান থেকেই সরবরাহ করা হত। তাই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির বিপর্যয় রীতিমত বিস্ময়কর।

ক'দিন আগে রাজধানী খার্তুমে আর একটি সামরিক অভ্যুত্থানের চেঁচা হয়। অবশ্য এই চেঁচা ব্যর্থ হয়েছে। নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে কমিউনিস্টরা এই অভ্যুত্থানের চেঁচা করেছিল কিনা, তা জানা যায় নি।

বিজয়ী উম্মা পার্টির নেতা হলেন ২৯ বৎসর বয়স্ক সাদিক আল মাহদি। হজরত মহম্মদের বংশ বলে আল মাহদি বংশের খ্যাতি আছে মুদানে। তা ছাড়া সাদিকের প্রপিতামহ মহম্মদ আহমেদ ১৮৮৫ সালের বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। এই বিদ্রোহের কলেই মুদানের ৬৫ বৎসরের পরাধীনতার অবসান ঘটে।

সাদিক আল মাহদির সম্মুখে সরকার গঠন ছাড়াও বড় সমস্যা রয়েছে। মুদানের উত্তরাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদের বাস, আর দক্ষিণ দিকে রয়েছে সংখ্যালঘু নিগ্রো ও অন্যান্য আফ্রিকীয় সম্প্রদায়।—এই দুই অংশের মধ্যে রয়েছে ক্রাভরের বিরোধ। দক্ষিণাঞ্চলকে মুদান থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেঁচাও হয়েছে। নিগ্রোদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য সাদিক চেঁচা করেছেন। তাদের অকলের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার কথা তিনি ঘোষণা

করেছেন। নতুন মন্ত্রিসভার ১৫ জনের মধ্যে ৩ জন নিগ্রোকে নেয়া হবে বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তা ছাড়া সংবিধান পরিবর্তন করে এমন ব্যবস্থা করা হবে, যাতে রাষ্ট্রপতি হবেন আরবীয়, আর উপরাষ্ট্রপতি হবে একজন নিগ্রো। আপোষ নীমাংসার জন্য সাদিকের প্রস্তাব খুবই ন্যায্যসঙ্গত। দেখা যাক দু'পক্ষের মধ্যে নীমাংসা হয় কিনা।

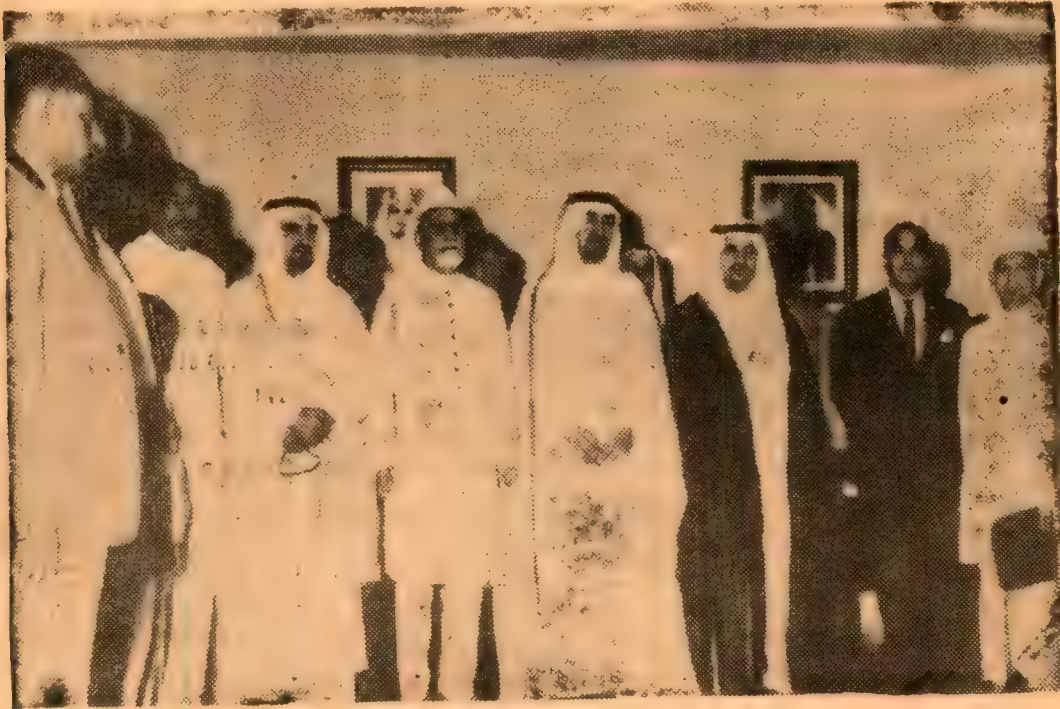
তবে নতুন সরকারের কোন পদ সাদিক আল মাহদি নিজে গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

সৌদি আরব :

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন এখন পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করছেন। তৈলসমৃদ্ধ কুয়েইত সফর শেষ করে তিনি সৌদি আরবে পৌঁছেছেন।

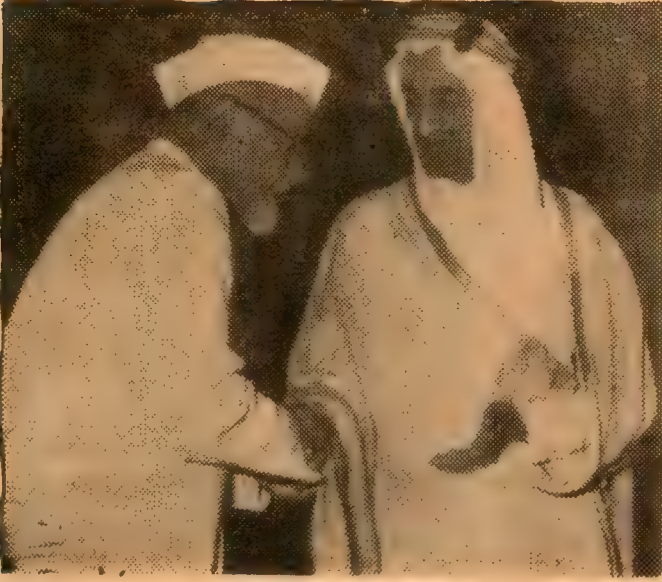
রিয়াদে বিমান থেকে অবতরণের পর উপরাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান সৌদি আরবের রাজা ফয়জল।

সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের যান্ত্রিক বৈতনিক সম্পর্ক রয়েছে। ডঃ জাকির হোসেনের এই সফরের কলে এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ



সৌদি আরবে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে জাকির হোসেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :



রাজা ফয়জলের সঙ্গে জাকির হোসেন

হবে। সর্বত্র উপরাষ্ট্রপতিকে বিপুল সমর্থনা জানানো হয়েছে।

পাকিস্তানের অপপ্রচার ও সম্প্রতি শেখ আবদুল্লাহর নষ্টামির পরিপ্রেক্ষিতে আরব দেশ-ভিত্তিতে ডঃ জাকির হোসেনের এই শুভেচ্ছা লক্ষ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ হোসেন ভারতের স্বনির্ভরপন্থতা, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের বক্তব্য, শেখ আবদুল্লাহর রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং অত্যন্ত সঠিকভাবে সকলের কাছে তুলে ধরেছেন।

মৌদি আরবের পর উপরাষ্ট্রপতি জর্ডান যাবেন। তারপর তিনি তুরস্ক ও গ্রীস যাবেন।

চীন :

চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি পরস্পরের বিরুদ্ধে বৃহত্তর বহুদা স্কক করে দিয়েছে? সংবাদ বেরিয়েছে, চীন উত্তর ভিয়েতনাম দীর্ঘমেয়াদে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছে। সৈন্য ছাড়াও রকেট ও অন্যান্য অস্ত্রের প্রচুর মজুত করা হয়েছে। পিকিং-ক্যানটন রেলপথে ১৫ দিনের জন্য প্যাসেঞ্জার-ট্রেন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রাতদিন এখানে সৈন্য-বোঝাই গাড়ি চলাচল করছে। এখনও কোন চীনা সৈন্য উত্তর ভিয়েতনামে প্রবেশ করেনি। তবে নির্দেশ পেলে যুদ্ধের মধ্যে যাতে তারা চুক্তি পাবে, মোত জন্ম তারা তৈরি হয়ে রয়েছে।

চীনা নেতাদের ধারণা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র উত্তর ভিয়েতনামের ওপর বোমাবর্ষণ করেই ক্ষান্ত হবে না, তারা চীনেও বোমা ফেলবে। চীনকে সায়ত্তা করতে না পারলে ভিয়েতনামে জ্বলিয়া হবে না, এই কথা ভেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে বোমাবর্ষণ করবে। আর যদি মার্কিন বোমা চীনে পড়ে, তবে চীনকেও তার পাচটা জবাব দিতে হবে।

অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও বক্তব্য, চীন ভিয়েতনামে হস্তক্ষেপ করার জন্য তৈরি হচ্ছে। আর যদি সত্যিই চীন সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভিয়েতনামযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে আক্রমণ করতে বাধ্য হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ভার সৈন্য সমাবেশ বাড়িয়ে চলেছে। বর্তমানে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ৫০,০০০ মার্কিন সৈন্য আছে, আরও ৫০,০০০ সৈন্য কাছাকাছি আছে—প্রয়োজন হলে যে কোন সময় ভিয়েতনামে নিয়ে আগা যাবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্তত দশ লক্ষ মার্কিন সৈন্য সমাবেশের জন্য বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করছে।

দু'পক্ষেই এই যে সমরায়োজন, এর পরিণতি কি? ভিয়েতনাম এখন উপলব্ধ মাত্র। এই রণক্ষেত্রে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম শক্তি পরীকার দিক কি সমাপ্ত?

রাষ্ট্রসভার সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাণ্ট রাষ্ট্রসভার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সার্ববাদ-বাণী উচ্চারণ করেছেন। মাইলে অনুষ্ঠিত জাতীয়তাবিক সংস্থা সম্প্রতি এক আলোচনা-চক্র প্রেরিত শুভেচ্ছা বাণীতে ইউ থাণ্ট বলেছেন, যেভাবে রাষ্ট্রসভা চলছে, তাতে শীর্ণগিরিই এই সংস্থা একটি শিশুপ ও নিষ্ক্রিয় বিতর্কসভায় পরিণত হবে। একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠানরূপে রাষ্ট্রসভা টিকবে কি না, তাই নিয়ে সশেষ দেখা দিয়েছে রাষ্ট্রসভার প্রধান কর্মসচিবের মনে।

ইউ থাণ্ট দুঃখ করে বলেছেন, রাষ্ট্র-সভার আদর্শের প্রতি এই সংস্থার প্রধান প্রধান সদস্যেরই কোন আনুগত্য নেই। তিনি বলেছেন, সাম্প্রতিক কয়েকটি বিরোধে দেখা গিয়েছে, রাষ্ট্রসভাকে ভিত্তিরে নিজেদের পৃথক কর্তৃত্বের ঘোরে কেউ কেউ বিরোধ সীমাসংর চেষ্টা করেছে। তাহলে রাষ্ট্রসভার প্রয়োজন কি?

নাম না করলেও ইউ থাণ্ট সাম্প্রতিক কয়েকটি বিরোধের কথা বলতে ভিয়েতনাম ও ডোমিনিকান রিপাবলিকের কথাই উল্লেখ করে নিশ্চয়ই। ইউ থাণ্ট কি আজ রাষ্ট্রসভা ভাঙবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করছেন?

ডোমিনিকান রিপাবলিক :

এক মাসের ওপর হল ডোমিনিকান রিপাবলিকে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু এখন



হুড থাণ্ট



ম্যাক জর্জ বাতি

কিন্তু তার বীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র, রাষ্ট্রসত্ত্ব—কারও প্রচেষ্টাই সফল হচ্ছে না।

• যে বিগেডিয়ার জেনারেল অ্যানটোনিও

ইমবার্ট ব্যারেরাশ একদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে কবচা গ্রহণ করেছিলেন, তিনিই আজ বীমাংসার সঙ্গে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কথাই আর তিনি শুনছেন না।

দেশের অবিকাংগে অকস্মে ইমবার্টের 'জাতীয় পুনর্গঠনের সরকারের' কর্তৃত্ব রয়েছে, একথা বলা হলেও, সৈন্যবাহিনীর অবিকাংগই বর্তমানে বিদ্রোহী নেতা 'সাংবিধানিক সরকারের' প্রধান কর্নেল জ্যানগিলকো ক্যামেনো দিনোর সঙ্গে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝেছে, ক্যামেনোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলাই দুজিনামের কাজ। ক্যামেনোর শক্তিকে অগ্রাহ্য করা যায় না—যার ভা ছাড়া একথাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিলম্ব হলেও বুঝেছে যে, ক্যামেনো জাতীয় অবিকাংগে অনুগামী কমিউনিস্ট বা ক্যাপিটালিস্ট নন।

ক্যামেনো ও ইমবার্টের অনুগামীদের একঘোটা করে একটি নিরপেক্ষতাবাদী কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে পারলেই ডোমিনিকানের সমস্যার সমাধান হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিনডন বি জনসনের প্রতিনিধি ম্যাক জর্জ বাতি এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। তিনিই অ্যানটোনিও ওজমানকে বুঝে বের করেন। ওজমান



ইমবার্ট

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জুয়ান বাকের অঙ্গিভাষ ছিলেন। বাতি ওজমানকে ওয়াশিংটন নিয়ে যান এবং সেখানে মার্কিন কর্তাদের সঙ্গে তাঁর বোলাখলি কথা হয়। ওজমানের হাতে মার্কিন স্বার্থ রক্ষিত হবে বলে মার্কিন কর্তারা আশ্বস্ত হন। যাবার পথে বাতি ওজমানকে নিয়ে পোর্টোরিকোর নেমে নির্ধারিত বাকের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। বাক ওজমানের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে সমর্থন করবেন বলে জানান। ক্যামেনোও সম্মত হন ওজমানের সরকারকে মেনে নিতে। কিন্তু গোলমাল বাধালেন ইমবার্ট।

ইমবার্ট বলছেন, ওজমান পুরোপুরি বাকের লোক, এবং ছদ্মবেশী কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টদের হাতেই যদি ডোমিনিকান রিপাবলিক তুলে দেবে, তবে ইয়াংকীরা সৈন্যসামন্ত নিয়ে এখানে এতো কেন?

ইমবার্ট এখন তাঁর অনুগত সৈন্যদের নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে চরম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

একজন বিশিষ্ট ল্যাটিন আমেরিকান নেতা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলেন, 'বাধকে ধাঁচ থেকে বের করেছ, এখন তাকে আবার বাঁচাও চোকাও।' কিন্তু ইমবার্ট এখন আর মার্কিন কর্তাদের কথা শুনতে রাজি নয়।

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“হে শিষ্যগণ! এই শূত্রে তোমাদের নিকট ধর্মব্যাপ্য্য করিব।” মহর্ষির এ বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্মের বিভিন্ন দিক, কার্যকারণ, জ্ঞান ও সম্ভার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জ্ঞাতের পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, জ্বালা ও আকাশাত্মক, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃসৈহর্য, মৃত্যু, জন্মান্তর, স্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভগ্নত উপেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় অনুদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২



শান্তিনিকেতনে বিশ্বশেখর শাস্ত্রীর সঙ্গে রামানন্দ

পরে সেই নাম জানা গেল। তিনি আমাদেরই গোবর। তাঁর গৌরবে আমাদের গোবর। তিনি ভারত-গৌরব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৫ সনের ৩১শে মে (১৭ই জ্যৈষ্ঠ) বাঁকুড়া শহরে তাঁর জন্ম। বাঁকুড়ায় কেটেছে তার বাল্য ও কৈশোর। কৈশোরের স্মৃতিভরা বাঁকুড়ার মাঠ-ঘাট, পথের লাল ধূলা, ওতুনিয়া পাহাড়, সেখানকার লোকজনের সুখ-দুঃখের কথা ছিল তাঁর আজীবন সঙ্গী। বাঁকুড়া লাভ করেছে চণ্ডীদাসের মতো চিরকালের কবিকে, বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র রায়ের মতো ভুবন-বিভরী সুপণ্ডিতকে তবু সেখানের লহনু সছল মানুষ নিরক্ষর, কুখার ক্ষাতর একথা রামানন্দ যখন শূরপ

করতেন, তখন তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠত। বাঁকুড়ায় যখন দৃষ্টিক-তখন তিনিই কলকাতার চাঁদা তুলেছেন অগম্য মানুষগুলিকে দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে।

এমন অভাবী ঘরেও রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। একমাত্র রামানন্দেরই আশ্রানে। বিশৃঙ্খলিত অর্ধাভাবে বিপন্ন, তবু বাঁকুড়ার মতো পল্লব দেশ তাঁকে আশ্রয় জানাতে বিধা করে নি। দীনের দান সে যে আরো বড় দান। জানি সে দান সামান্যই, তবু রামানন্দই প্রমাণ করেছিলেন, বাঁকুড়ার মতো দীন জেলাও রয়েছে কবির আদর্শের একেবারে পার্শ্ববর্তী। আর দেশ জেনেছিল বাঁকুড়ার আছে রামানন্দ।

এত বড়, এত বিরাট, দেশ-

বিদেশে যার খ্যাতির অস্ত নেই—তবু কথাবিত্তির বেশভূষায় এমন সাধারণ মানুষ সচরাচর এই পৃথিবী লাভ করে না। খাদ্যের তালিকায় পোস্ত-চচ্চি আর ডিম্বের বোন। অন্য কিছু হলে তা ছিল প্রয়োজনান্তিরিক্ত।

অথচ তিনি সাধারণ কর্মব্যাপ্ত। কবির তিনি শুধু অনুবাদী নন, কবিও তাঁকে দেখেন ওগোষ প্রকার চোখে। 'প্রবাদী'তে প্রকাশিত কবির বহু চিঠি দেখে-কথা প্রমাণ করে। যে কোনো প্রস্তাব, এমন কি আহিত্যসীতি সম্পর্কিত যে কোনো আন্দোলনের রামানন্দে মতামত কবি সাদরে গ্রহণ করতেন। ইংরেজশক্তি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কবির সঙ্গে ছিলেন নিতীক রামানন্দ। গীতাঞ্জলির অনুবাদের ক্ষেত্রেও কবি গ্রহণ করেছেন রসিক রামানন্দের মতামত।

সম্পাদক হিসেবে রামানন্দের মতো দ্বিতীয় কৃতিত্ব খুঁজে পাওয়া ভার। দেশকে পরানীমিতার শঙ্কল থেকে মুক্ত করার জন্যে তাঁর বেশী যেমন কুখার ছিল, তেমনি সাহিত্য বিষয়ে যৌশক্তি ছিল অসীম; আবার আত্মজাতিক সমস্যা, বিশ্ববৃত্তে স্বদেশের প্রতিভা কর্তব্য সম্পর্ক যখন তিনি নিতীকচিহ্নে সম্পাদকীয় রচনা করে চলেছেন, তখনই তিনি খুঁজে ফিরছেন চোখে দেখা দুপাশের মানুষগুলিকে, যারা অভাবে দৈন্যে পথ খুঁজে না পেরে অন্ধের মত পথ হারিয়েছেন।

আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু পথ কি খুঁজে পেয়েছি? হয়তো পথ সামনেই, কিন্তু চলার শক্তি কেন আমাদের শূন্য সে প্রশ্ন কি নিজেদের করেছি? একদা বিদেশী শাসনে স্বদেশেই ইংরেজশক্তির অত্যাচারে আমরা ছিলাম যেন প্রবাদী। সেই প্রবাদীরা স্বাধীন ভারতে যথার্থই যখন স্বদেশ-বাসী—তখন রামানন্দের স্বদেশবাসীরাই যে সভ্য হয়ে উঠেছে—তাঁর এই শত-বাধিক অনুশ্রমে আমরা যেন সপর্বৎ বলতে পারি।



কবে এবং কোথায় আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস? ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ ঘটনায় যুগান্তর এনেছিল বঙ্গের তথা ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রে, তখন থেকে ঘটনাবলীর আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে ইংরেজ কোম্পানির শাসকশ্রেণীকে বিভিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে কতো বাধাবিঘ্ন মুখোমুখি হতে হয়েছিল তার রাজ্যের সংহতি ও বিস্তারের পথে। তখন জাতীয়তাবাদী ভাবতাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, ভারত তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ স্বাধীনতা, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। গুপ্তযুদ্ধ বাধা সৃষ্টি তখন ছিল ব্যতিক্রম। প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানির শাসনে বাধা বিক্ষুব্ধ বা বিপর্যস্ত হয়েছে, তারা নিজে নিজে ভাড়াটে সৈন্যদল নিয়ে ইংরেজ প্রসারের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। সে কাহিনী অল্প-বিস্তর সবাই জানেন। সে কাহিনী ব্যর্থতার। তবু সে কাহিনীতে শুধু গুলি নেই, বীরত্বও আছে। কুইন্সের লাহায়ে সিরাজদ্দৌলাকে সরিয়ে যে মীরজাফর মুশিদাবাদের সিংহাসনে বসেছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত ইংরেজ আগুনের বন্ধনে অতিষ্ঠ হয়ে ওলন্দাজদের সঙ্গে যড়যন্ত্র করেছিলেন। উদ্দেশ্য ইংরেজ বিতাড়ন কিন্তু বিতাড়িত হলেন তিনি নিজেই। ইংরেজ আনুকূল্যে বাংলার নবাব হলেন মীরজাফর-জামাতা মীরকাশিম। কিন্তু ইংরেজ বণিক কোম্পানির ক্ষমতার দস্ত, অপবিত্রীকরণ প্রভোক্তা এবং প্রচণ্ড দুর্নীতি মীরকাশিমকে উন্মাদ করে তুললো।

এ কণ্টক উৎপাদিত করবার মানসে তিনি বহুপরিকর হলেন। শেষের দিকে অযোধ্যার নবাব সাজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর মুঘলসম্রাট শাহ আলম (অবশ্য নামে মাত্র) তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। উত্তর ভারতের এই সঙ্ঘবন্ধ প্রচেষ্টা ইংরেজ উৎসাদনের ব্যাপারে চব্বিশ বার্ষিক্য পর্যবসিত হল রক্তারেক রণক্ষেত্রে।

জনসাধারণ তখন কোথায়? একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তার মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হবে। মুষ্টিমেয় শ্রেণীবর্গ সৈনিক সঙ্গে নিয়ে পলাশীবিজয়ী কুইন্সের মুশিদাবাদে বীরদর্পে প্রবেশ করছেন, বাজপাখের দুধাও কাঁতা কাঁতা দাঁড়িয়েছে কত মানুষের দল। কুইন্সের হৃদয় কেঁপে উঠলো। যদি এরা লাঠি ও চিল হাতে নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ে--- তাঁদের ওপর, তবে তাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। কিন্তু না; ওই জনতা কোতুহলী জনতা। তারা সাহেব দেখে বাহবা দিতে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্ত-রাজগণ কিম্বা জমিদারগণও বিক্ষিপ্তভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বীরত্ব দেখিয়েছেন। লড়াই করেছে কোন কোন অঞ্চলে পিছিয়ে-পড়া জনগণও ইংরেজের বিরুদ্ধে তাদের গোষ্ঠীগত, অর্থনৈতিক বা ধর্মকেন্দ্রিক অভিযোগের প্রতিকাররূপে। ডঃ শ্রীচরণ চৌধুরী এদের নিয়ে দুটি মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের দুর্বলতা ছিল পদে পদে, সঙ্ঘবদ্ধ ও ভাবগত দেশপ্রেমতা নেই এ বাধা সৃষ্টির পশ্চাতে। একমাত্র ব্যতিক্রম ওয়াহাবি আন্দোলন। সুসম্বদ্ধ

উদ্দীপ্ত, সংকল্পে চূড় এই ওয়াহাবিগণ দাব-উল্-হারব ভাবতাকে আবাস দাব-উল্-ইসলামে পরিণত করতে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ঝুঁটান ইংরেজ শক্তিকে প্রতিরোধ করেছে। বাংলা থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাদের প্রধান বাঁটি সিতান পর্যন্ত এই বিপ্লব পরিচালনা করতে কী অদম্য সাহসিকতা, কী আশ্চর্য সংগঠন শক্তি, কী অসুত অনমনীয়তাই না তাবা দেখিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে ওয়াহাবিদের বিচারকাল ইংরেজ আদালতে এ সকল তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এতো ভাবতের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন নয়। ওয়াহাবিদের কাছে ঝুঁটান রাজশক্তি যেমন শক্ত, তেমনই শক্ত ভারতের হিন্দু ও শিখ। ভারতের মুজিকলেপ নয়, ইসলাম ধর্ম। প্রভু পুনঃস্থাপনরূপে মৃত্যুপণ আন্দোলন। (ডায়াল) ইংরেজ প্রতিরোধের ধারায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং ঘোর হুম সবচেয়ে বিতর্কমূলক ঘটনা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, যাকে সাধারণত আমবা সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয়। এ বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে আবার আলোচ্য বিষয়ে একাধি ল্যাগনার্ক বা অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক তথ্য। শুধু সিপাহীরা নয়, জনগণও বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল সিপাহীদের দ্বারা সৃষ্ট অব্যক্ততার পটভূমিকায়। এ যেন বিগত কালের সকল প্রতিরোধের সমষ্টিগত পরিণতি। কিন্তু একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলতে অস্বীকার্য নষ্ট, যদিও ডায়

মতও কোন কোন ঐতিহাসিক পোষণ করেন। এখানে এ বিতর্কের অবতারণা করার সুযোগ বা সময় নেই। আমি আমার ঐতিহাসিক বিবেক দিয়ে তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ লিখেছি এ সম্বন্ধে, উপর ঐতিহাসিকেরাও লিখেছেন। কোউলী পাঠক সেসব গ্রন্থ পড়ে দেখতে পারেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত পূর্বাকলে ভারতের জাতীয়তাবাদ ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ধ্যান-ধারণার ধীরে ধীরে কার্য লাভ করছিল। ভাবস্রোতে এ বিপ্লবের মহানায়ক রাজা রামমোহন। শুধু ভাবস্রোতে কেন, কর্মক্ষেত্রেও যে আবেদন-নিবেদন, দাবি-দাওয়া নিয়ে সংস্কারপন্থী আন্দোলন সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে চলছিল, তারও জনক রামমোহন। ইংরেজের শুভবুদ্ধিতে দৃষ্ট বিপ্লব, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য আইন-সম্মত আন্দোলন, বক্তৃতা, সম্মেলন, সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতের সমস্যা তুলে ধরা এবং ইংরেজ সরকারের কাছে প্রতিকার দাবি করা—এ নবজাগরণের এই ছিল বৈশিষ্ট্য। ইংরেজ কবলমুক্ত জাতীয় স্বাধীনতা এদের কাম্য ছিল না। জাতীয় কংগ্রেসও এক যুগে এ কথাই বলেছে।

এ আন্দোলন প্রধানত হিন্দুদের আন্দোলন। যে সীমিত রাজনৈতিক অধিকার দাবি করা হচ্ছিল তা পশ্চিমী পার্লামেন্টার প্রণয়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভায় থাকলে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব, যাদের নিয়ন্ত্রণ অধিকার দেয়া হবে শাসন কর্তৃপক্ষের উপর, বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে। সুতরাং ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর প্রভুত্ব এ আন্দোলনের লক্ষ্য—এ আশঙ্কা জাগলো ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের প্রধানদের মনে। এ আশঙ্কার মধ্যেই জন্মালো স্যার সৈয়দ আহমেদেব আলিগড় আন্দোলন। ভেদনীতির পরিপোষক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তাতে শক্তি

সঞ্চার করলে। হিন্দুবা করে, ক্রম-বর্ধমান রাজনৈতিক অধিকার দাবি, মুসলমানেরা তাব প্রতিবাদে তত মুখর হয়ে ওঠে এবং ইংরেজশাসনকে সমর্থন জানায়। হিন্দুব আন্দোলন ভাবিতে এক জাতি, এক প্রাণ, একতা স্থাপনের নিমিত্ত, মুসলমান বললে তা মোটেই তার কাম্য নয়, ভারতে জাতি নেই আছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্বার্থ। এবং হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী।

বহু গ্রন্থ পাঠে, সংখ্যাগত দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে, আজীবন ইতিহাস অনুশীলনে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে সত্য আমি লাভ করেছি তা মিথ্যাকভাবে পরিবেষণ করা আমার ধর্ম। এবং আমি বলবো, হিন্দু মুসলমান 'ভাট ভাই' ভেবে বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস যে পথ অবলম্বন করেছিল তা তুল পথ এবং সে-তুলের খেসারৎ আমরা বহুভাবে দিয়েছি। ভারতের স্বাধীনকরণে তা পূর্ণ হয়েছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ যা সত্য নয় তাকেই আন্দোলনের মধ্যে চোখ বুজে আঁকড়ে ধরেছিল, তাতে আন্দোলনটো শুধু দুর্বল হয়নি, কলও হয়েছে বিষবৎ। হিন্দু ও মুসলমান হাজার বছর-পাশা-পাশি ভারতে বাস করেও সামাজিক জীবনের সমগ্রতার স্বাধী এক্যের বন্ধন খসি করতে পারেননি। বঙ্ক-জোর সময় সময় প্রতিক্রমণীয় সত্তাব নিয়ে বাস করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ একটি নির্ভুর ঐতিহাসিক সত্য, যদিও বার বার আমরা জোর করে তা অস্বীকার করে যাচ্ছি। কিন্তু এই উপমহাদেশের মুসলমান তাকে প্রথম থেকেই বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছে।

সৈয়দ আহমেদের আন্দোলনে অতএব যৌক্তিকতা রয়েছে। এখানেই পাকিস্তানের বীজ উগ্ধ হল। মহম্মদ আলি জিন্না এ ভাষ্যধারার পূর্ণ পরিণতি লাভে। এমন কি যে খিলাফ নেতা মহম্মদ আলিকে গান্ধিজী তাঁর 'প্রিয় ভ্রাতা' বলে আলিঙ্গন করেছিলেন, তিনি তাঁর রক্ততা ও প্রবন্ধাদিতে

তাঁর মনোভাব এতটুকু গোপন করেননি। 'ভারতের তথাকথিত একোব বেদীমূলে মুসলমান কখনও আত্মহাতি দিয়ে শহীদ হতে চায় না।—ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে মহম্মদ আলির এই উক্তিই ছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রেরণাস্বরূপ।

সুতরাং স্রষ্টা থেকেই কংগ্রেসের ভাবরূপ প্রচণ্ড আভ্যন্তরীণ বিষম দ্বারা ব্যাহত হয়েছে। একথা সত্য, কংগ্রেস উদারপ্রাণ দেশপ্রেমিক মুসলমান নেতাদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সত্য যে, সম্প্রদায়গত মুসলিম মহানুভূতি বিভেদপন্থী মুশুয লীগ প্রভৃতি সংস্কারকে বেলে কয়েই আবর্তিত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান সত্য-প্রিয়দের এবং তাদের নেতা সীমান্ত গান্ধী মহান্ গফ্ফর খানকে স্মরণে রেখেও বলবো যে, মোটেব ওপর ভারতের মুসলিম সমাজ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চার করেনি। আমাদের নেতৃবর্গ আশা করেছিলেন যে, চুক্তির মাধ্যমে সকল আবদার মেনে নেবার পর সে সমাজ এগিয়ে এসে হিন্দুব লক্ষে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু তা হয়নি আমাদের জাতীয় আন্দোলনে।

আমি মনে করি যে, কংগ্রেস নেতাদের এ আলোচনার পেছনে ছুটে যাওয়া মাত্র এবং তা ব্যর্থ হবেই। এবং তা ব্যর্থ হবেছিল।

স্বাধীনতার ভাবরূপের বিবর্তনে ইতিহাসে আর একটি বড়ো কথা মনে রাখতে হবে। প্রথম বিশ্ব বছর ধরে কংগ্রেসের আন্দোলন ছিল সংস্কারপন্থী, নিরুপদ্রব এবং আপস-ধর্মী, অবশ্য ভারতের সামগ্রিক সত্তাকে ধ্যান করে একা ও জাতীয়তাবাদকে কংগ্রেসই ভাষা দিচ্ছিল। কিন্তু এ নবম পন্থাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে দেশে জন্ম নিচ্ছিল বিপ্লবাত্মক ভাব-ধারা, যেখানে আপস নেই। আছে দেশমাতৃকার বেদীমূলে সর্বস্ববিসর্জনের সংকল্প; যেখানে ইংরেজ সহ-যোগিতা নেই, আছে ভারতের মুক্তি-কল্পে ইংরেজ শাসনের অভিশাপকে

সমূলে উৎপাটিত করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এ ভাবরূপের প্রধান দার্শনিক অবদান ঘোষ। একে শক্তিশালী করেছে স্বদেশীয়গণের বিশ্বাসত্বেয়ী, 'লাল বাল এবং পাল' অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র পাল, লাল লজপৎ রায়, এবং বালগঙ্গাধর তিলক। স্বভাবতই বিপ্লুবাদের তিনটি প্রধান ঘাঁটি হল বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র। স্বদেশীয়গণের 'বঙ্গ-ভঙ্গ' রূপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শেষার্ধ্বে এ ভাবধারা বোম্বাই-ভিলারের সাহায্যে ইংবেজশাসনকে সন্ত্রস্ত করে নি এবং এই উপসম্বাদেশের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবের ভাবধারা কংগ্রেসের নিরুপস্থ। এবং নিষ্ক্রিয় আন্দোলনের ভাবধারার পাশাপাশি স্বস্বোক্তে প্রবহমান ছিল।

কংগ্রেস তখন গোখল, মেটা, সুব্রহ্মণ্য প্রমুখ নরমপন্থী দেশ-প্রেমিকদের নেতৃত্বে পরিচালিত। এ আপসহীন স্বাধিকারী সংগ্রাম আন্দোলনে প্রবাসী ভাবধারাকে অত্যন্ত গল্লেখ্য চোখে তাঁরা দেখতেন। গোখল একদা বলেছিলেন, 'বাঁচিল পাগল-আমাদের বাঁকে যে উদ্ভাদের দল বিচরণ করছে, তাবাঁচি শুধু ইংবেজকে এ দেশ থেকে তাড়াবাব স্বপ্ন দেখছে'। কংগ্রেসী ভাবধারার সঙ্গে কি লক্ষ্য, কি নীতিতে এই বিপ্লবী ভাবধারার মৌলিক তফাৎ ছিল। উত্তরের মত ও পথ আলাদা।

সুতরাং ভাবতে তিনটি ভাব-রূপ স্বাধীনতার ধ্যান-বারণায় গড়ে উঠলো বিংশ শতাব্দীতে। তিনটি বিভিন্ন দল বা সংগঠন তাদের কেন্দ্র করে প্রবহমান—কংগ্রেস, মুশ্লিম লীগ এবং সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সংস্থা বা বিপ্লবী দল। ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এ তিনটি ভাবধারা একটি চুক্তির মাধ্যমে কাছাকাছি এলো বা 'নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া' করে গিল। এটাই বিখ্যাত 'লখনউ প্যাক্ট বা চুক্তি'। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক অপূর্ব বিজয়-বার্তা ঘোষিত হল এই চুক্তির মাধ্যমে।

লখনউ প্যাক্টের গুরুত্ব ভারতের স্বাধীনতার ভাবরূপ বিবর্তনে নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য। কিন্তু তবুও এ চুক্তির বিশেষণে আমরা এমন স্থানে গিয়ে পৌঁছাবো যেখানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল্যে টানাটানি চলেছে। কংগ্রেস পরোক্ষে স্বীকার করলে যে মুশ্লিম সমাজ ভাবতে একটি ভিন্ন সমাজ এবং জাতীয় একোত্র মোহাই দিয়ে তার বিভেদ-মূলক দাবিগুলিকে আব অস্বীকার করা যায় না। ভাবতেও ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে যখন ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হবে, তখন মুসলমানদের জন্য ভিন্ন প্রতিনিধিত্ব এবং মুশ্লিম স্বার্থে রক্ষাকবচের বন্দোবস্ত করা হবে। এই পটভূমিকায় রচিত হল কংগ্রেস-মুশ্লিম লীগ যৌথ সংবিধান-যার লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, লক্ষ্য উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। ইংবেজ সরকার অবশ্য এ সংবিধানকে কোন আমলই দেয় নি। ১৯১৯ সালে তার নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রেখে মন্টেগু-চেসফোর্ড সংস্কারকে ভিত্তি করে সে দান করলো ভাবতকে ছিটেফোঁটা শাসনাধিকার প্রাদেশিক ডায়াকি বা যৈত শাসনের মাধ্যমে। কংগ্রেস অবশ্য শেষ পর্যন্ত গ্রহণ কবলে না ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন এবং গান্ধিজীব নেতৃত্বে ভাবত-ব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু কবলে। ইংবেজ সহযোগী নরমপন্থীরা সবে গেল কংগ্রেস থেকে, সরে গেল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রিয়াক্ষমতা ধাবা থেকে। কংগ্রেস গান্ধিজীব নেতৃত্বে পরিণত হল জনগণের সংস্থায়, জাগ্রত ভাবতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকস্বরূপ হল কংগ্রেস। গান্ধিজীব অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় রূপ পেল সেই ভাবরূপ, যার কাগজে কলমে স্বীকৃতি হয়েছিল লখনউ চুক্তিতে। আপসের মনোভাব সর্বদাই নিশ্চয় নিশ্চিন্দ নয়, কিন্তু মূল আদর্শে ও লক্ষ্যে যখন আপসের মনোভাব প্রকটিত হয়, তখন বিপর্যয় ঘটে। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা বারবার এ

বিপর্যয় দেখেছি। গান্ধিজীব নেতৃত্বে যে আন্দোলনের গুরুত্ব ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে অনস্বীকার্য, সে আন্দোলনেও আমরা বিভ্রান্তিকর অনেক কিছু দেখতে পাবো। সত্যসঙ্গ ঐতিহাসিকের কর্তব্য বড়ই অপ্রিয়। জাতিবৈষম্যজনকভাবে আখ্যাত গান্ধিজীব নেতৃত্ব ও কার্যধারার চুলচেরা বিশ্লেষণে আমাদের অগ্রি হতে হবে।

প্রথম পর্বে গান্ধিজীবকে আমরা দেখি কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের প্রদত্ত ইংরেজ-সহযোগ-কর্মসূচীর বালিষ্ট ধারক ও ব্রাহ্মকল্পে। পরবর্তী জীবনে তিনি ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়েও ইংবেজের উত্তরবুদ্ধি ও পর্ব বিশ্রাম হাবান নি। এ কারণেই বাধা হয় তাঁর চলার পথে সময়-সময় 'বিভ্রান্তিকর' নির্দেশ ও সামন্তস্বাধীন কার্যকলাপ দৃষ্ট হয়েছিল এবং একেই গান্ধিজীব অক্ষতত্ত্ব। দেবশক্তির বিকাশ বলে বর্ণনা কবে-ছেন। তদুপরি তিনি হিন্দু-মুশ্লিম মিলনের যে কর্মসূচীকে ভিত্তি করে আন্দোলন শুরু কবলেন, তা যেমন অবাস্তব, তেমনি ভবিষ্যতের পক্ষে শঙ্কাজনক। ভারতীয় মুসলমানগণ তুব্বত দেশে 'খলিফাকে' পুনঃ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ইংরেজের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নীচের আশ্রি ও সহস্রদ আলিব নেতৃত্বে, গান্ধিজীব তাঁর অহিংসা ও সত্যগ্রহ মন্ত্র নিয়ে তাঁদের পশ্চাতে দাঁড়ালেন। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে গান্ধিজীব অহিংস অসহযোগ কর্মসূচী সর্বপ্রথমে শিলাফা আন্দোলনে আদ্যোপ করা হয়েছিল, পাঞ্জাবের আলিওয়ানওলাবাগ হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সে কর্মসূচী পরে এলো। এবং এ মন্ত্রের বাদে গান্ধিজীব দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত হা-বোঝে বাঁধতে প্রয়াস পেলেন। ফলিতকর জন্য এক অশ্রুতপূর্ব একতানের স্রষ্টা বেছে উঠলো পুনঃসন্য ভাবতীয় বীণার তারে তারে, সে সুরের রাঙারে উঠল হল সমগ্র ভাবতভূখণ্ড। কিন্তু হঠাৎ গেল তার ছিঁড়ে, স্রষ্টা

গেল কেটে। হিন্দু-মুসলিম একা ভেঙে বান্ধা হয়ে গেল। ভবিষ্যতের পুঞ্জিতে রঙিনা শুধু একখাটি যে ভাবতের স্বাধীনতার জন্য নয়, মুসলমান আন্দোলন করবে মুসলিম অধিকারের জন্য। গান্ধীজী নিজে পরম জাতীয়তাবাদী হয়েও এ পথের নিশানা দিয়ে গেছেন স্বাধীনতা আর বিলাফ আন্দোলনকে এক সূত্রে ধরে গিয়ে। মহাত্মা এবং ত্যসক্ত পুরুষ হিসেবে গান্ধীজীর ওপর আমার শ্রদ্ধা কারো থেকে কম নয়। কিন্তু নির্মম ঐতিহাসিক কান্ডো বেলা পক্ষপাতিত্ব করে না। একেবারে মোহাট দিয়ে কার্যক্ষেত্রে গান্ধীজীও অস্বীকার করলেন ভারতের এক জাতি সূত্রকে। এবং শেষ পর্যন্ত একাও বজায়-রইলো না। বিপরীত আদর্শের ভিত্তিতে কখনও জাতীয় একা লাভ করা যায় না, তা যতটো কেন চুক্তি করে ওপাশ প্রকাশ করা হোক না।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন আমরা দেখেছি তার লক্ষ্য কি স্বরাজ? ১৯২০ সালে সেই প্রস্তাবটো গৃহীত হয়েছিল কংগ্রেসে, যদিও পরবর্তীকালে এর স্বরূপ প্রকটিত হয়েছে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। প্রকৃতপক্ষে মড়ির পেণ্ডুলানের মত স্বাধীনতার সংজ্ঞা গান্ধীজীর ম্যাসে ও কর্মে স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ স্বাধীনতা—এই দুই সীমারেখাকে বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছে। ১৯২৭ সালে মাত্রাজ কংগ্রেসে ‘পূর্ণ স্বরাজ’ প্রস্তাব গৃহীত হল। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে সে প্রস্তাব বাতিল করে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গান্ধীজী মতিলাল নেহরুকে নামনে রেখে নিজের অসামান্য ব্যক্তিত্বের জোরে জাতিকে গ্রহণ করালেন। অবশ্য এ প্রস্তাবের মেয়াদ দেয়া হল ১২ মাস। তারপর ১৯২৯ সালে তরুণ বামপন্থী কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালের নেতৃত্বে নাহোরে পূর্ণ স্বরাজ এবং ইংরেজ সম্পর্ক ছেদনের প্রস্তাব গৃহীত হল এবং এর ভিত্তিতে আন্দোলনের লব্ধময়

কর্তৃত্ব রইলো গান্ধীজীর। কিন্তু আন্দোলনের নোটিশ বা চরমপত্র দিতে গিয়ে গান্ধীজী ভাইসরয় / লর্ড আর্চার্ডসনকে এক ঐতিহাসিক লিপি পাঠালেন এগারো দফা দাবি পেশ করে, যা পেনে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসচী বাড়িল করবে। এই এগারো দফার মধ্যে অনেক কিছু অর্চিহিত দাবি রাখা হল, কিন্তু পূর্ণ স্বরাজের দাবি যেখানে অনুপস্থিত।

এখানেই শেষ নয়। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের গান্ধী-আর্চার্ডসন প্যাক্টের ভিত্তিতে আবার ইংরেজকে সহযোগিতার হাতবানি বাড়িয়ে দিয়ে জাতির নেতা গেল টেবিল চৌকি থেকে গেলেন এবং বার্ষিক ফিরে এলেন। ইংরেজের প্রধান মন্ত্রী রায়স্বে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক ঝোঁকোদের যে অংশে বহু হিন্দুসমাজকে বর্ণ হিন্দু এবং তপশ্বী হিন্দু—এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, তার প্রতিবাদে তিনি করলেন আমৃত্যু অনশন, তারপর পুণা চুক্তিতে তাঁর অনশন ভঙ্গ। এবং এুক্তি বেনে নিলেন রায়স্বে ম্যাকডোনাল্ড। পূর্ণ স্বাধিকারী কংগ্রেস গান্ধীজীর জয়গান করলে, কিন্তু এ সব তো ১৯৩৫ সালের সংস্কার আইনের পূর্বাভাসমাত্র, তার মধ্যে পূর্ণ স্বরাজের দাবি কোথায় স্বীকৃতি পেয়েছে?

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এবং হিটলারের আকস্মিক অভিযানে ইংরেজ প্রমুখ নিরপেক্ষের দারুণ বিপর্যয়। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, ইংরেজের এই চরম বিপদে জাতীয়তাবাদী ভাবতের প্রার্থনা ইংরেজের বিপন্যুক্তি ও গণতন্ত্রের জয়; স্বাধীনতার দাবি এখন মূলতুবী রইলো। অবশ্য পরে তিনি কংগ্রেসের মাধ্যমে ‘ভাবত ছাড়ো’ প্রস্তাবকে ভাষা দিলেন। পরবর্তীকালে এ প্রস্তাবকে কেলে করে যে আশ্চর্য জাতীয় অভ্যুত্থান ও বিপ্লবাত্মক কার্যাবলী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে তীব্র আঘাত হানলো, তাকে আবার করলেন অস্বীকার। স্মরণ্য স্বাধীনতার ভাবজ্ঞপের বিবর্তনে গান্ধীজীর যুগে সজ্ঞতির অভাব দেখে ঐতিহাসিক বড়ো বিবৃত বোধ

করেন। তখন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় কংগ্রেসের বামপন্থী নেতা ‘ভূভাষ-চন্দ্রের ওপর, যিনি কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বচ্ছ আদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন, হিংসা অহিংসাব নৈতিক দৃষ্ট্য বুচিয়ে মিলেন বাইরে এসে ঃ ঃপিয়ে পড়লেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজের পশ্চিমবঙ্গরূপে মিলিত হিন্দু-মুসলমানে গড়া ভাবতের মুক্তিকল্পে।

অবশ্য একথা সত্য, গান্ধীজী জাতীয় একেবারে ব্যাপাবে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। হিন্দু-মুসলিম মিলিত ভাবতের স্বাধীনতাটো তাঁর একমাত্র কান্য ছিল। তাঁর কার্যকারণে যে ‘জুটি’ ঐতিহাসিক শাবিকার করুন না কেন, তাঁর অসামান্য নেতৃত্ব, জ্বলন্ত দেশপ্রেম অপরিণীত সত্যানুগা এবং উদার দৃষ্টভঙ্গীকে সহজ স্বীকৃতি দিতে হবে। তিনি বলেছিলেন, ভাবতকে কেটে যদি পাকিস্তান গড়া হয়, তবে তা হবে তাঁর মৃতদেহের ওপর। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান—দুটি ভিন্ন বাষ্ট্র সৃষ্ট হল, এবং গান্ধীজীও বেঁচেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষী দেশপ্রেমিকদের অথও একাবছ ভাবতীয় জাতি গঠনের স্বপ্ন স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল। সে যুগের ভাবজ্ঞপের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী গান্ধীজী কেন অনিচ্ছাতও বেনে নিলেন এই ষিখণ্ডীকরণ? না যদি মানতেন, তবে আর কোন পথ কি তাঁর ধোলা ছিল?

এ প্রশ্নের জবাব সেবেন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক। (আগামীবারে সন্ধ্যা)

• বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শপে ভ: মজুমদার (৩-৮ এপ্রিল ১৯৬৫) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিগ্-দর্শনে বজ্রতা প্রদান করেন। উক্ত ইংরেজি বজ্রতার সারাংশের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হল। অনুবাদ করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমর্য সেন। —সম্পাদিত

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা :

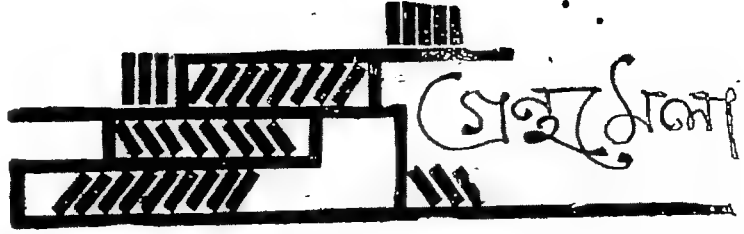
সম্পাদক : শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ।
৩১৪, ধারকপাখা ঠাকুর মেম,
কলকাতা-৭। দাম : এক টাকা।

এই পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধগুলি আকৃষ্ট করার মতই। হিরণ্যর বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি রয়েছে অক্ষরচন্দ্রের 'এষা' ও রবীন্দ্রনাথের 'সুবর্ণ' কাব্যগ্রন্থ দুটির শাণ্ডায়মূলক আলোচনা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'আধুনিক বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা' নিঃসন্দেহে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বচন। রবীন্দ্রনাথের বিপুলমানব চেতনাবিশাল পরিসীমাকে স্বল্প কথায় প্রকাশ করার ডঃ ভট্টাচার্যের চিন্তা-ভাবনাবিশাল ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া ডঃ শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ লাহিড়ী, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, বীরেন দেবনাথ, সত্যভূষণ সেন বিভিন্ন তথ্যের সমাবেশে আপন আপন প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ও শিবানী চট্টোপাধ্যায় পত্রিকার অন্যান্য বিভাগে অংশগ্রহণ করেছেন। ইংরেজী বিভাগটিতে SZABOLCSI BENEC রচিত এশিয়া ও মুনোপের পাবম্পরিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রচনাটি ছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধ উদ্ধৃতি-প্রবণ। রবীন্দ্রভারতীর মতো পত্রিকা বিষয়জনগলে অবশ্যই সমাদৃত হবে।

প্রজাপতির দংশন : আশা দেবী।

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ৫১১ এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম : আড়াই টাকা।

প্রাণ্ডা আশা দেবীর গবেষণা-গ্রন্থ পাঠ করলে মনে হবে, সাহিত্যের জটিল বিষয়ের প্রতি তাঁর অগাধ অধিকার। হয়তো এই কারণে লবু-প্রকৃতির হাস্য-পরিহাসপূর্ণ রচনা সৃষ্টিব অনুপ্রেরণা তাঁর পক্ষে লাভ করা তেমন সহজ নয়। কিন্তু তাঁর হাস্যরসে উজ্জ্বল একাধিক গ্রন্থ যাঁরা পাঠ করেছেন, একমাত্র তাঁরাই বলতে পাবেন হাসির কোন্ ক্ষণস্থায়ী সেট জটিল বিষয়ের তলায় বর্তমান।



এ যুগের জটিল সমস্যার মধ্যে সেট হাসি এখনো আমাদের মাঝে-মধ্যে অন্যান্য করে বলেই আমরা আজো হারিয়ে যাচ্ছি নি।

হাস্যরস পবিত্রকুটনে, মানুষ ও সমাজের অস্বাভাবিক দিকের উন্মোচনে ও ব্যঙ্গাত্মক পরিবেশ সৃষ্টনে একটা সুগভীর যন্ত্রণাও রচনা সৃষ্টির মূলে কাজ করে—একথা যেন আমরা ভুলে না যাচ্ছি।

'নমুনা' গল্পের বিশ্বনাথবাবু ছেঁয়, অবজ্ঞেব; অবশ্য সমাজে তাঁর দাপট অসীম। তিনিই আবার স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে আমাদের

জয়ন্তী সেন

হাসির সৃষ্টি করেছেন। 'বিশ্বনাথবাবু' জেনেছেন শুধু লক্ষ্মীই পয়সা দেন না—একালে সরস্বতীকে দিয়েও পরমানন্দে ব্যাক-মার্কেট করা যায়। ইচ্ছলে চাকরির ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে তিনি হাসিবেছেন জগৎকে কিং আরতি চাকরি পার নি—পেয়েছে বিশ্বনাথবাবুই শালী। এই ব্যঙ্গাত্মক গল্পে সমাজের মূল ধরে লেখিকা টান মেরেছেন। আবার 'প্রজাপতির দংশন' গল্পে ঘটুর মনোবাখা দূর হর বুলটিকে লাভ করে। এই প্রাপ্তি-যোগ সহজে হয় নি, তাকে অনেক চক্র দিতে হয়েছে। তবে এই গল্পের অনাহত হাসির মাধুর্য পাঠককে মুগ্ধ কবে দেবে।

সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে 'কি পাইনি' গল্পে হাসির উপাদানের সঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে জানার মধ্যে অজানা কাহিনী। সভাপতির চাঁদার টাকা কম পড়লে তাঁর ভাগ্যে মালা ছোটে না—এটা হাস্যমশাই না

ঘটলেও আগামী দিনে ঘটা অসম্ভব নয়। বাড়ির মালিকের ছেলের সঙ্গে সেই বাড়ির ভাড়াটের মেয়ের ধিয়ে ঘটনা কি স্বাভাবিক? অস্বাভাবিক, তবে স্বাভাবিক হয় যদি মহিলামহল ঠিক থাকেন। তখন 'গোবর্ধন-চবিতামৃতের গোবর্ধন নিক্রপায় বোধ করতে বাধ্য হন। অন্যান্য গল্পের মধ্যে 'সামান্য ভুল', 'বৃজর ধিরে', 'একটি রবীন্দ্র জয়ন্তী', 'ওভারবাই', 'পদ্ম সপ্তাহ', 'একটি ত্রৈত্যগুণী প্রেম' প্রভৃতি গল্প পড়তে হাসিভেঁদে দম আটকে যায়, সেটসঙ্গে কখনো বা অশ্রুও ঝরে। 'বাড়িরে দিয়ে যাও' গল্পটির মৌলিক লেখিকার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দান করে। চবিত্র বেচিড্রা ও যথার্থ শব্দ প্রয়োগে প্রজাপতির দংশনের মধ্যেও প্রতিজ্ঞা ঘটায় নি, বরং মাধুর্য বাড়িয়েছে।

অহল্যার রাজি : লেখক রতন-কুমার ঘোষ, প্রকাশক—বসুচৌধুরী, ৬৭ এ, মহাত্মা গান্ধী বোড, কলকাতা-৯। দাম : পাঁচ টাকা।

'অহল্যার রাজি' পুস্তকটি বর্তমান জনসাধারণ সমাজ-ব্যবস্থার কাহিনীপূর্ণ একটি পুস্তক। এই সমাজ-ব্যবস্থায় শান্তি, চাপা, নিতানী, জ্যোপদী, পুতুল, ক্ষান্তমণি, বেলা ও কুসুমিত মত কত অহল্যাকে যে পান্ডিত্যমুগ্ধি ধারণ কবতে বাধ্য করেছে এবং কত সৌম্য, চৌধুরী ও আনন্দ যে নিজেদের প্রবৃত্তি চবিতার্ষ করবার জন্য কত ছলনা ও কত প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ কবে তা পুস্তকে কুটিলে তোলা হয়েছে। অহল্যার জীবনের বেদনাময় কাহিনী উপন্যাসের প্রকার আকর্ষণ। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

DIRECTOR'S OFFICE

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩০/১২/৩৩



সি.সি.সি.সি.

আজ্ঞা করা যাইতেছে যে, যিনি এই আদেশের অধীনস্থ হইবেন তিনি

এই আদেশের অধীনস্থ হইবেন, যেহেতু এই আদেশের অধীনস্থ হইবেন

এই আদেশের অধীনস্থ হইবেন, যেহেতু এই আদেশের অধীনস্থ হইবেন

সি.সি.সি.সি.
—সি.সি.সি.সি.

একমাত্র একমাত্র

আমার দেব চৌধুরী

কালো আর ধলোর তফাৎ (অর্থাৎ বর্ণবৈষম্য) আমেরিকায় যথেষ্ট আছে—একথা আমরা বরাবর শুনে আসছি। কিন্তু বৃটেনেও এটা একটা মস্ত সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ বছরে গড়ে সত্তর হাজারের কাছাকাছি কালো মানুষ (immigrants) ইংলণ্ডে বসবাস করার জন্যে আসছে। তারা ইংবেল্জের ব্যবসা, চাকরী সব কিছুতে থাঁবা দিচ্ছে—এর পরে আর ক্ষুধা প্রেম থাকা কি সম্ভব?

এখনই বৃটেনে কালো মানুষের সংখ্যা প্রায় দশ লাখ—হিসেব ক'রে দেখা গেছে বছর পনের বাদে ১৯৮০ নাগাদ এই সংখ্যা ত্রিশ লাখের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। ব্যাপারটা সত্যিই ইংরেজের পক্ষে ভাববার ব্যাপার। এই বর্ণ বৈষম্য সম্বন্ধে একজন ওয়াকিবহাল সমাজতান্ত্রিক পরিষ্কার বলেছেন:

‘এটা এখন স্বীকার করাই ভাল যে আমাদের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ ঘটছে। যদি আর একটিও কালো লোক এদেশে না আসে তবুও যারা আছে তাদের সংখ্যা নগণ্য নয়। তাদের সঙ্গে আমাদের মিলেমিশে বাস করতেই হবে।’

অবশ্যই ‘এমন সহনশীল এবং সহানুভূতিবান সব ইংরেজই নয়, অয়ে মর্ষন হাত পড়ে তখন উদার হাত পোষণ করা একটু কষ্টকরই বটে। ইংরেজরা স্বদেশে বরাবরই উদার, গণতান্ত্রিক। কিন্তু যে মুহূর্তে সে এই ঘাঁপের বাইরে পা বাড়ালে সে তখন অন্য লোক।

বাচ্যে খাত বটে। সারা পৃথিবীতে ইউনিয়ন জ্যাক উড়েছে, কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণ শিক্ষিত লোক তার রোজ-গার, বাগান, কাউন্টি কাউন্সিল আর রাগবী ম্যাচ ছাড়া অন্য বিশেষ কিছুতে নজর দেয় না। এতদিন ইংলণ্ডে কালো-ধলোর তফাৎ ছিল না, ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনে যে কোন জাতের যে কোন রঙের লোকের সমান অধিকার ছিল। সারা পৃথিবীর গৃহত্যাগিত বিপুলসীরা এখানেই কোন না কোন সময়ে এসে আশ্রয় গ্রহণ ক'বেছে। আমাদের জাতীয় নেতারা এখানেই এসে সত্যিকারের স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছেন, তারপর স্বাধীনতার দাবি এনেছেন দেশে ফিরে। ধনী ঘরের ছেলের যে ঐদার্য থাকে ইংলণ্ডের তাই ছিল, কিন্তু আজ ইংলণ্ডে অবস্থা অন্য বকম। ঐদার্যের অবকাশ কম, বৃটিশসিংহ আজ আর অবণ্যের সমুটি নয়। ঐদার্য কমে এসেছে, স্বার্থবুদ্ধি জীবনের অত্যন্ত প্রাথমিক ব্যবহারেও প্রকট।

কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি: Bradford-এ ২৫০০০ ইংরেজ একটি পিটিশন পাঠিয়েছেন যে আগামী পাঁচ বছর যেন কোন বিদেশী (immigrant) এদেশে বসবাসের সুযোগ না পায়। লণ্ডনের Southall অঞ্চলের একটি সংস্থা যাতে শুধু গুঁতাঙ্গদেরই বাড়ি ভাড়া দেয়া হয় বা বাড়ি বিক্রি করা হয় তার জন্যে চেষ্টা ক'রছে। Southall অঞ্চলে ৬০০০ ভারতীয় এবং ২০০০ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান লোক থাকে। বছরখানেক আগে এখানে

গুঁতাঙ্গ বাসিন্দাদের একটি সভায় ঘোষণা করা হয় যে, শহরে আব যেন বিদেশী-দের বসবাসের সুযোগ দেয়া হয় না। এই সংস্থার সেক্রেটারী বলেন যে, ‘বর্ণবৈষম্য আমাদের নেই। তবে বহিরাগতেরা এখানে এসে যেভাবে থাকে তাতে এ অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচুতে নেমে যাচ্ছে। এটা আমরা চাই না। এখানকার গুলি এবং বাগানগুলো ময়লায় ভাঁবা তন্তিতে রেখেছে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ অনেক সময় তিনঘরের একটি বাড়িতে ২০ থেকে ৩০ জন লোক বাস করে। আমরা এখানকার পুনোনা বাসিন্দাদের কাছ থেকে কেবলমাত্র চিঠি পাচ্ছি—এই নোঙবাঁমি আব ভদ্রব্য জীবনযাত্রার সম্পর্কে। কিন্তু এমনও দেখা গেছে কালো মানুষেরা (coloured man) যাবা ভদ্র এবং শুভা—তারা গুঁতাঙ্গ প্রতিবেশীদের সঙ্গে অত্যন্ত হৃদয়তার সম্পর্ক রেখেছে। অবশ্য এরই মধ্যে মনে বাঁধতে হবে লণ্ডনের উত্তরপাড়ার Willesdon-এ কালো-ধলোর সম্পর্ক আদর্শস্থল। তবে আদর্শ-স্থল বললেও মনে রাখবেন ইংরেজের সামাজিকতা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—এমন কি কন্টিনেন্টাল জার্মান, ইটালীয়ান বা ফ্রান্সীদের চোখেও ইংরেজের সামাজিকতাবোধ প্রায় হাস্যকর। সারে অঞ্চলে একজন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অধ্যাপক কাজ কবতেন। ‘Good morning’ এবং ‘Good evening’ মার্কা সামাজিক ভদ্রতা যথেষ্ট পেয়েছিলেন—শেষে এত ভদ্রতা লম্বা ক'রতে না পেরে southall

অল্পে কম মাইনের চাকরী নিয়ে তিনি চলে এলেন। উপায় নেই। ইংরেজরা এতখানি আত্মকেন্দ্রিক এবং সংরক্ষণ-শীল তাদের সামাজিক জীবনে যে বিদেশীর সঙ্গে হৃদয়তা হওয়া সেখানে খুবই শক্ত। এমন কি বিভিন্ন অঞ্চলের ইংরেজদের মধ্যেও আন্তরিক সামাজিক সম্পর্ক খুব সহজ নয়। সেইজন্য ভারতীয়রা এদেশে এসে এঁই নিঃসঙ্গতায় যথেষ্ট ভোগেন।

অধিকাংশ যে কালো মানুষ এদেশে এসবাসের জন্যে আসছে তারা অশিক্ষিত এবং দরিদ্র। দেশে কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে তারা সমুদ্রতর জীবনের অপেক্ষে বিতোর হয়ে জাহাজ বা উড়ো-জাহাজে এদেশে চলে আসছে। এসে তারা কি দেখছে? শীতল আবহাওয়া, শীতল আভিষেকতা, বিদেশী ভাষা, অপরিচিত পরিবেশ, কঠিন দৃষ্টি। Southhall অঞ্চলের পাঞ্জাবী পাড়ার কথাটা বলা যাক। সাত বছর আগে গদ্য আগত একজন শিশু ভদ্রলোক তাঁর পূর্বতন ব্রিটিশ অফিসারের কাছে গেলেন চাকরীর জন্যে। অফিসারটি তাঁকে পাণ্ডিত্যের একটি ফ্যান্টাসীতে চাকরী দিলেন। সেই আরম্ভ হ'ল লাড়ি এবং পাণ্ডিত্য রাজ্য। এখন যদি এই পাড়ার আপনি বেড়াতে যান তাহলে দেখবেন হতভুলি গোনডামুখ ইংরেজ নেকোনে গুডা করছে

পুরাতন চিরনূতন মণিসমুদ্রা

সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ
বিরচিত—হত্যার প্যাচার নক্সা। বাংলা
উপন্যাসের প্রবর্তক প্যারীচাঁদ মিত্রের—
আলালের ঘরের হুলাল, পুণ্যকীর্তি
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—জ্ঞানবিশাস।

একত্রে ৩ টাকা মাত্র।

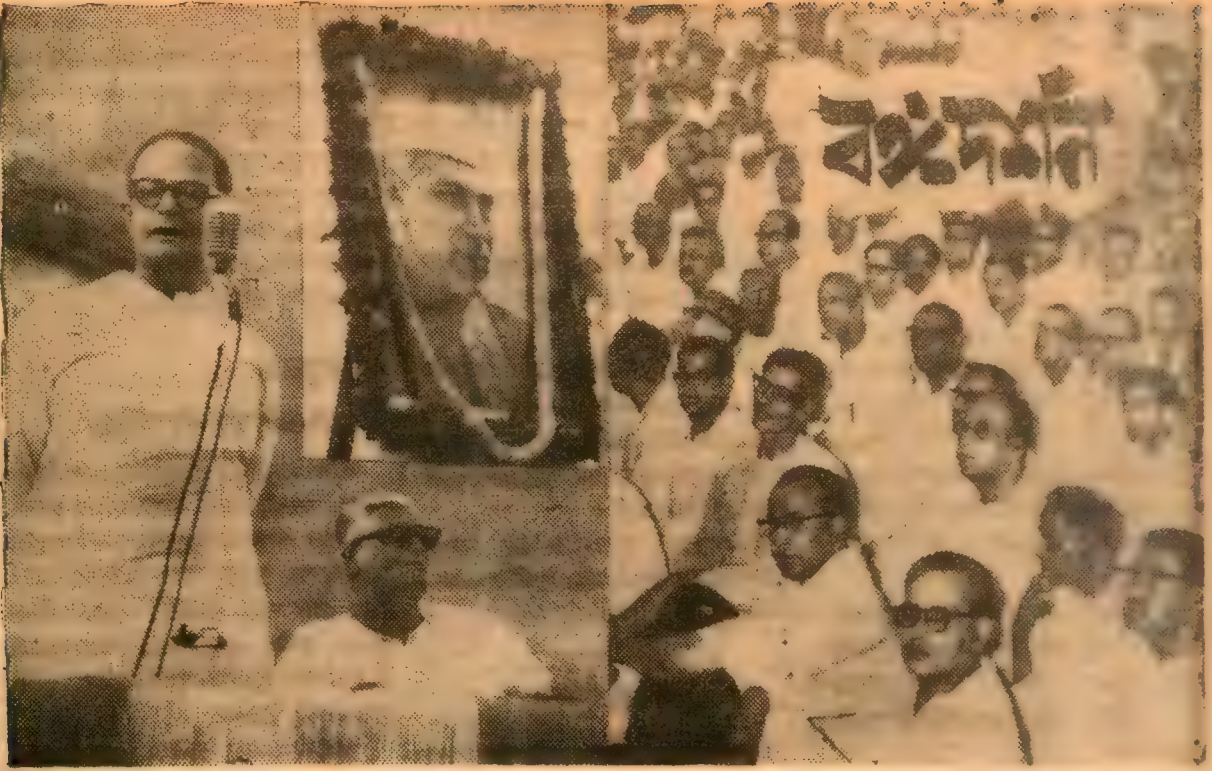
বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গঙ্গুলী ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

অন্তত তাব সমানসংখ্যক সর্দারজী
জীসহ বাছারে এসেছেন। একজন
ইংরেজের পক্ষে দৃশ্যটি শিচয় খুব
মনোরম নয়। আর সর্দারজীরা কি কাণ্ড
না করেছেন সেখানে—লণ্ডনের মাঝ-
খানেই একটি আন্তলুমিয়ানা বা জমুতসর
এনে বসিয়েছেন। রবিগারে তাঁরা
নিজেদের গুরমারে যান, ৩৮০০ সিটের
একটি সিনেমাহলে প্রতি রবিবারে
ভারতীয় ছবি দেখেন এবং স্বপ্ন দেখেন
কবে দেশে ফিরে পাড়াপড়শীদের
বিলেতের চাকায় ভোজ খাওয়াবেন।
কিন্তু উতিমধ্যে তাঁরা যে সব সমস্যার
মুখোমুখি হ'চ্ছেন সেগুলো কম নয়।
বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার
ব্যাপারে। Beaconsfield Junior
School-এর অধীক ছাত্র (৩০০
জন) শিশু। তাদের মুক্তি হচ্ছে স্কুলে
একটু আশ্রয় ইংরেজি বলছে বটে,
তার পরেই বাড়ি গিয়ে পাঞ্জাবী
পরিবেশে পড়ছে। ফলে তারা স্কুলে
কিছু শিখতে পারছে না—তাদের
জন্যে ইংরেজ ছেলেদের শিক্ষা যথেষ্ট
ব্যাহত হচ্ছে। ইংরেজ মাসি এসে স্কুলে
অভিযোগ করছেন যে তাঁর ছেলেকে
স্কুলের ক্লাসে কিছুই শেখানো হচ্ছে
না—পাঞ্জাবী বাবা এসে ব'লছেন তাঁর
লেডকা শুধু খেলাধুলোই শিখছে।
পাঞ্জাবী ছেলেরা স্কুলে যাবার আগে
ইংরেজি একটি কথাও শেখে না, ফলে
স্কুলে গিয়ে তাদের ভাষা শেখাটাই
প্রধান কাজ হয়ে পড়ে। তাই তাদের
জন্যে ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে যে, যদি
তাদের ক্লাসে আসার আগে কিছু
ইংবেজিতে তালিম দেয়া যায়। লণ্ডন
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রদের
বলা হ'য়েছিল তারা যদি এদের
কিছু ইংবেজি শেখান। ভারতীয়
ছাত্রদের কাছ থেকে জবাব এগেছে
যে তাঁরা এদেশে এসেছেন লেবাপড়া
করার জন্যে। চামাদের ইংরেজি
শিখিয়ে সময় নষ্ট করার মত সময়
আমাদের নেই। এই মনোযোগী বক্তৃত্ব

ছাত্রেরা যে কোন দেশেরই গৌরববশী
সন্দেহ নেই।

এই বহিরাগত ভারতীয়েরা সঙ্গের
অভাবে নিজেদের সমাজের মধ্যেই
থাকেন। তাঁরা যে দেশে এলেন সে
দেশের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের
সঙ্গে কোন পরিচয় ঘটান সুযোগ তাঁরা
পান না। ফলে বলাই বাহুল্য, এদেশে
সম্পর্কে তাঁদের স্মৃতি খুব মধুর নয়।
অবশ্য তার একটা কারণ এদের অশিক্ষা
এবং ভাষাগত অক্ষমতা—কিন্তু তা
ছাড়াও ইংরেজসমাজের অনিশ্চয় স্বভাব
এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। South-
hall-এর একটি শিক্ষিত ভারতীয়কে
যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল তিনি ব'ললেন
যে, 'এই যে লাখে লাখে কালো
লোক আসছে তাদের সঙ্গে ইংরেজ
প্রতিবেশীর বেলারেশা এবং সামাজিক
সম্পর্ক ক্রমশই বাড়বে সন্দেহ নেই।
—তবে এটাও সত্যি এদেশে তাদের
বসবাস করার অধিকার দিয়ে তারপর
তাদের বয়কট করাটা অসমর্থনীয়
অপরাধ। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে
এনে তারপর তার সঙ্গে কথা না বলা
মতই। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা
হল 'আপনি যদি বিশ্রাস করেন একদিন
ইংরেজ এবং এদেশের কালো লোকেরা
বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় বাস করবে তাহলে
আপনার মেয়ে যদি একজন ইংবেজকে
বিয়ে করে আপনি তাতে ঝুঁকি হবেন
কি?' হঠাৎ একটা বিবর্তিত আবেগের
ছায়া তাঁর মুখে ওপর নেমে এল।
আন্তে আন্তে ব'ললেন, 'এদেশে বাস
ক'রলেও নিজের culture-এর বাঁহরে
বিয়ে করাটা ভুল—এখনও সমাজ তার
জন্যে ভৈরি হয় নি।' এই হচ্ছে বর্ণ-
বৈষম্যের আর একদিক—শাদা মানুষ
কৃষ্ণকায়দের মত দুয়ে রেখেছে—কালো
মানুষটিও শাদা মানুষকে আরো দুয়ে
রাখান চেঁচা করছে। বুটেনে এই
সামাজিক সমস্যা আজ অত্যন্ত কঠিন
হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং যে গভর্নমেন্টই
হোক না কেন তাকে এই সমস্যার
সামনে দাঁড়াতে হবে। কেন না এই
সমস্যা প্রাত্যহিক এবং সুস্বপ্নসাধী।



ময়দানে নেহরু, স্মৃতি-সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ভাষণ দিচ্ছেন

দাম বাড়িল

প্রত্যেকে 'দাম বাড়িল'। সরকারী রেশনেও দাম পড়ল না চাল ও গমের মূল্যবৃদ্ধি। বাড়ে নি শুধু রোজগার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীরা ত্রিশ টাকা মাস্গী ভাতা চেয়েছিলেন। উত্তরে সরকার চোখ বাড়িয়ে দিয়েছেন। সরকারী কাছ করতে হলে চুঁ শব্দটি করা চলবে না। ভালো কথা। সরকার দেশের লোকের শক্তির পরিমাণ বোঝেন, হুতরাং শুল্ক বর্ধাণ হিটেরীর মতই আপত্তি জানিয়েছেন।

'চুঁ' শব্দোচ্চারণে কিছু কামিচ ধরের প্রয়োজন। পেটের ভাত ছোটোতে উন্নয়ন পরি-
শ্রমের পূর্ন ঐ শব্দের আঁচটুকু যে ফলসভানের সহ্যাতীত ব্যাপার, দেশের সরকার বিনা আর কে তা ভালো করে বুঝবেন। হুতরাং কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের চুগচাপ থাকতে বঁবে সরকার হুচিকিংসকের কাছই করেছেন।

কিন্তু অত্যন্ত পরিভাষণের বিষয় এই যে, দেশের সর্বত্র বাধ্যতাবাদ ও বাধ্যমূল্যবৃদ্ধিতে সরকারী-বেসরকারী সব মানুষের কণ্ঠেই একটি কীপ চিঁ চিঁ রব শোনা যাচ্ছে এবং যে ব্যাপারে সরকার প্রায় নিবিকার। চুঁ শব্দের চুঁটি টিপে ধরলেও কোনোরকম চোখ রাখানিভেই যে কুখ্যাত ননুসকণ্ঠে চিঁ চিঁ রব শুক হবে এমন

আশা-বুশামাত্র। সরকারও তা বোঝেন। অথচ এ ব্যাপারে সরকারী দাওরাই-এর কোনো সুব্যবস্থা হয় নি। কারণ-যন্ত্রণ দুই লোকে বলছে, একেত্রে সরকারের ট্যাং-কোঁ করার ক্ষমতা নেই; কেন না ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে সরকার নিজেই পাট্টা দাওরাই-এর আশঙ্কা করেন।

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ছোটো-বড়োদাররা পড়ীর মাতে টাক বোঝাই চাল পাচার করছেন। মুনাকালোভীর কালতু টাকা আনতে স্থানীয় অধিবাসীদের মুখের অন্ন ভিন-বেশে বাজার খুঁজতে অগত্য যাত্রা করছে, সরকার কাছো চপমা পরে সেমিক থেকে দুটি সরিয়ে যেকোছেন সাবধানে। সরকারী নিয়ন্ত্রিত উৎসাহিত ব্যাপারীরা কোনো কোনো জকলে দিনের আলোর কালোবাজার বসিয়েছেন। বেগরোয়া মূল্যবৃদ্ধির চাপে জনসাধারণ জাহি জাহি রব ছাড়লেও কোথাও জাণকর্ডার চিকিট পর্বত দেখা যাচ্ছে না।

জলপাইগুড়ির সংবাদে প্রকাশ, রাম মেটেলী ওগলাবাড়ী, জাতি, মাধবকাটা, লাটাওতি, চাগসা প্রভৃতি জকলে প্রকাশ্য বাজারে চালের দাম নেতু টাকা কে-জি এবং আটার মূল্য এক টাকা দু'আনা চলছে। অভিলোভীর পোকানে চালের মূল্য দু'টাকারও পৌছে গেছে। চালের দর চলিশ টাকার ঠঠলে

জোড়া বাংলায় দুতিন দেখা দিয়েছিল। জকল বিশেষে দু' টাকা কে-জি দুতিনের অবস্থাকেও ভিত্তিয়ে গেছে। কিন্তু আকস্মিক ভিত্তিতে মূল্যবৃদ্ধি ক'রে পশ্চিমবঙ্গে একম মূল্যবৃদ্ধির সুপরিকল্পিত চাউর প্রকাশ্য দুতিনের ঝামেলা এড়াতে পেরেছে; সুদৃষ্টি মহলের এই কৃতিত্ব কখন নয়।

জুয়ারের মেটেলী জকলে চাল-পরিবহিত অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ত্রিশ সম্ভাব্যিক চা-
শবিক যে হাটের ওপর নির্ভরশীল সেখানে যে নামে দু-দুটো হাটে চালের চিহ্ন দেখা যায় নি। ৯ই বের হাটে অবশ্য কিছু চালান আসে, তাও সাধারণের কুশা শুধু বাড়িয়েই দিয়েছে। পরিভাষণ থেকে সাতচলিশ টাকা বণ ধরে কখন আর চাল কিনতে পারেন।

বাঁকুড়ার অবস্থা জানিরে স্থানীয় সংবাদে বলা হয়েছে, জেলার চালের ওপর উপযুক্ত কর্তন চালু না থাকার মাতারাজি রান ও চাল পাচার হচ্ছে। পাশেই কথ'ম'র, জুগলী, মৌদলাপুরের অসিমূল্য চালের বাজার, হুতরাং ব্যাপারীর পক্ষে অধিক দূর চাল বহনের ব্যক্তিও নেই। সরকারী হাউও বাঁকুড়ার চালের টান দিয়েছে। উহুত এলাকা বিবেচনায় সরকার প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ উৎসর্গই জেলার বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা বহাল রেখেছেন। এদিকে বাজারে ধানের অভাবে চালকলগুলি

কাজ পাচ্ছে না, কাজ বন্ধ হওয়ার
প্রতিকার কারণে সমাগত। বর্ষার ঘনঘটা দেখা
দিলেই চালকলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।
এমতাবস্থায় বাঁকুড়ার জন্য শতকরা পাঁচ ভাগ
চাল যথেষ্ট হবে কি না তা ধীরভাবে বিবেচ্য।
বাঁকুড়াবাসীর আশঙ্কা, যাত্র পাঁচ শতাংশ তাঁদের
প্রয়োজনের তুলনায় নিভাস্তই অকিঞ্চিৎকর।

এদেশে দাম বেঁধে দিলেও দাম কমে না।
কলকাতার বাজারে বাঁধা দানে নিয়মিত মাছ
কেনেন, এমন সোভাগ্যবান ক্রেতা বাজার
সরকার এবং পুনিশী কর্তারা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি
আছেন বলে শোনা যায় না। অবাধ বাজারে,
সুতরাং, মূল্যমানের যে মা-বাপ থাকবে না
এটাই স্বাভাবিক। এই অবাধ বাজারকে সনাথ
করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টাও যথেষ্ট সড়ক
নয়।

অথচ এ বছর নাকি রাজ্যের ধান
উৎপাদনের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায়
সন্তোষজনক। কিন্তু সে সন্ততি বর্তমানে কেবল
মাত্র কালোবাজারীর আরামের গদি মোটা
করছে।

মুনাফা উত্তোলনের এই মগের মূলকে
আইন ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে কবে কে জানে।
আপাতত আগামী নির্বাচনের প্রাকাল পূর্ব
স্বিবিধানে উপবাস চালিয়ে যেতে হবে হয়ত।

সাতাশে মে

গত বছর সাতাশে মে ভারতের আকাশ-
মাটি অকস্মাৎ শোকে মুহমান হল। নেহরু
নেই! এতোবড় সত্য ঘটনা কিন্তু অদ্যাবধি

বিশ্বাস করতে মন চায় না। মনে হয়, আছে;
সে মানুষটা আমাদের মধ্যেই আছে। আছে
আমাদের ঘরে ঘরে, মনে মনে, অন্তরের একটি
আদরণীয় আসনে বসে আছেন ধ্যানগম্বীর
চিতাবিদ। অর্থাৎ আছে তাঁরই প্রেরণা, যা
আমাদের আগামী দিনের পাথেয়।

গত সাতাশে মে তাঁরই প্রথম মৃত্যুবাধিকী
পালন করলাম আমরা। মৃত্যুবাধিকী নয়,
নেহরু-স্মরণ দিবস।

ঐ দিন নেহরু তহবিলের জন্য সংগৃহীত
(এক সপ্তাহে) ১০ হাজার ১০১ টাকার একটি
তোড়া রাজধানীর নাপরিকল্পের তরফ থেকে
মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন কলকাতার সের
ডাঃ পি কে রায়চৌধুরী।

গত সংখ্যায় নেহরুজীর প্রতি আমরা
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছি। পুনর্বার আমাদের
প্রিয় নেতার প্রতি আনত শ্রদ্ধা জানাই।

সুপার হাইওয়ে

দমদম-যশোর রোডের সেই দুই পার্শ্বের
মশক-প্রণালী নদীর বিত্তমিকা লম্পর্ন করে
ভবিষ্যতে আর বৈদেশিক অভিজিদের রাজধানী
প্রবেশ করতে হবে না। শীঘ্রই চার সারিতে
গাড়ি ছুটে পারে এমনি শ'খানেক ফিটের চওড়া
সড়ক দমদম-কলকাতা সুপার হাইওয়ে যান
চলাচলের জন্য পুরোপুরি ব্যবস্থা করা যাবে।
বিগত ২৯শে মে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমেন কলকাতা-
দমদম সুপার হাইওয়ের আনুষ্ঠানিকভাবে
শুভ উদ্বোধন করলেন।

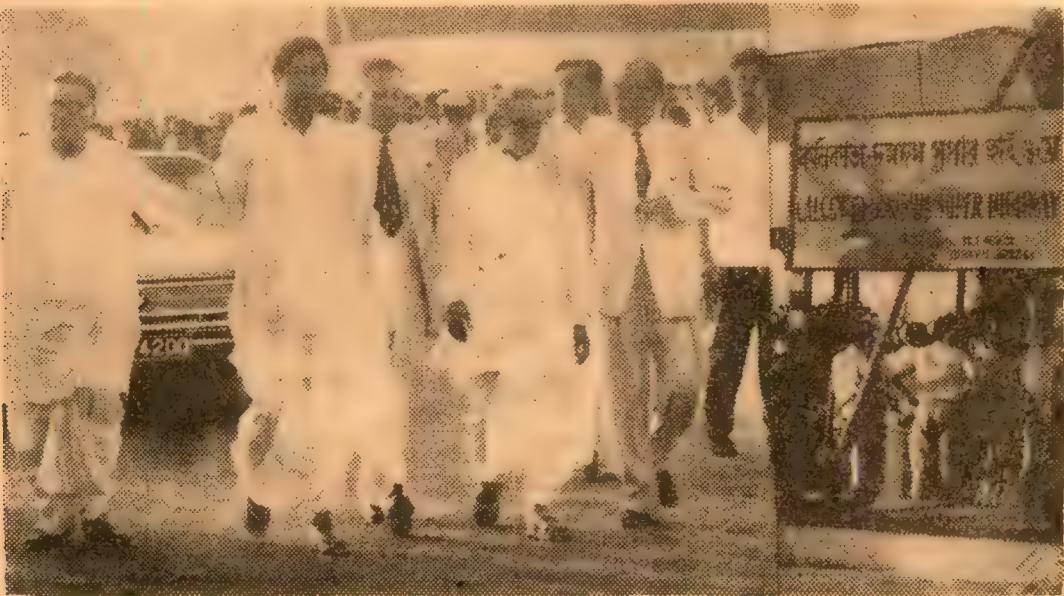
বেশি নয়, পাঁচ মাইল লম্বা, একশ কিলো
চওড়া এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ করতে খরচ
হবে মাত্র দেড় কোটি টাকা। জাতির
অগ্রগতির জন্য উন্নত ধরনের পথ নির্মাণ একান্ত
প্রয়োজন। আনন্দের সংবাদ, উন্নয়ন কমিশনার
জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮৫০০ মাইল
প্রথম শ্রেণীর সড়ক নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে তৃতী
পরিকল্পনার সমাপ্তিকালেই।

বীরভূম :

বেওয়ারিশ এবং বীরত্ব

বীর সবাই হতে পারেন না, কিন্তু বীরত্ব-
বৃষ্টিক অনেক মনেই আলা দরিয়ে রাখে।
অথচ হয়, সে আলা প্রশমনের পথ নেই। দেশে
আইন আছে, শৃঙ্খলা আছে, সর্বোপরি অন্যের
গায়ে ছোর আছে সমধিক। হত্যোদ্যম বীরত্ব
হেঁপো রুগীর মতো, অতএব, ঘরের কোণে
বসে হাঁপায়। পৃথিবীতে বীরত্ব প্রকাশের জুংসই
জায়গার বড় অভাব।

এই বীরবংশের মনস্তান পূরণের জন্য
বিদ্যুৎ রোমানরা একটি সর্বজনীন মজলিশী
ব্যবস্থার পত্তন করেছিল। স্বাভাবিক মনুষ্যের
স্টেডিয়াম। ক্ষুধার্ত গিংহের মুখে অসহায়
মরনারীকে জীবন্ত অবস্থায় ঠেলে দিয়ে তারা
মজা দেখত। ছোড়া জীতদাস-বলি দিয়ে কোনো
এক বিদেশী কুন্ডের নাকি মুগরা-কেরং গৃহপ্রবেশ
করতেন সেই জীতদাস রক্তে পা ধুয়ে। দ্বা
বাছল্য, এই বীর শিকারী কখনই হাতী-গজার,
বাঘ ভল্লুক সঙ্গে আনেন নি, বীরদের আর একটি



কলকাতা-দমদম সুপার হাইওয়ের উদ্বোধন

রূপ আরও চমকপ্রদ। জটিল ক্রীড়াসা-
মাসিক তাঁর কৃষ্টি বহু কবিতেন মানুষের বক্ষে।
ক্রীড়াসঙ্গমে দেওয়া বাঙালি ভাষার ওপর
তুলে দেওয়া হত। প্রভু ভবন বাগানে বসে
মল্লিক বাগিকে বসতেন। ক্রীড়ার চাপ দিতেই
শুধু ছুটত। ভাবার ওপর থেকে লাট-শিঙিয়া
ঘড়ির মত নোমন্ত ক্রীড়াসাটি লটপট করে
মাটিতে পড়লে শব্দতানেক বীরত্ব স্থিতি দাঁড়ের
বিষ চেনে শান্ত হ'ত। সামান্য পোনমান
করেছিল বলে নাকি জটিল। অগুহিণী তাঁর
সাজনার বাবালা থেকে ক্রীড়াসা-শিঙিকে
ুড়ে কেলে দিয়েছিলেন।

আমাদের মধ্যে এমন বীরের সংখ্যা অল্প
এর। বীর বমনীও অস্তিত্ব নেই। আকৃতিতে
এরা নিবীহ সামাজিক। প্রকৃতিতে এক-একটি
অভ্যাচারী নিবো। এদের মনের গুপ্ত প্রকোপে
বগবাস করে এক-একটি স্বভাবদোষী শরতান।
শরতান সবল হ'লে তার জন্য শৃঙ্খলের
প্রবোধন, দুর্বল হলে সামসিক হাসপাতাল,
শক খেবাগি।

এ হেন শরতান জন্মাবধি অভ্যাচারী।
অভ্যাচার এদের লেখা, ভাষার ক্রমেভব মতে
নিগ্রহানোদী নিউবোসিসের পেশেন্ট এরা।
আব এদের সঙ্গে আমাদের নিত্যদিনের সাংঘর্ষিক।

সিউডী (বাকইপাড়া), এ হেন জটিল
বীরপুরুষকে সম্প্রতি গারদে পুবেছে স্থানীয়
পুলিশ। সঙ্গে গাবদবাসিনী হয়েছেন অভিযুক্ত
ম্যাক্সিম দুই ডগিনী। সংবাদে প্রকাশ, এই
নিয়ে তৃতীয় দফা অকথ্য অভ্যাচারের ফলে
অপরাধীর জীবিয়োগে ঘটল। লোকটির তৃতীয়া-
শ্রীঃ অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সম্প্রতি জীব পুলিশী
তদন্ত চলছে। পুলিশী তদন্তে জানা গেছে,
প্রথমা পত্নী স্বামীকে অমানুষিক নির্ভাতনে
গৃহত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমানে তিনি
পিআরএমে স্বামী পবিত্রতা সর্বস্বত্ব স্বীকণ
যাপন করছেন। দ্বিতীয়া পত্নী ক্রমাৎ স্বামী
দিয়ে জীবন জালা জুড়িয়েছেন। তৃতীয়ার মৃত্যু
অবশেষে অভ্যাচারীর হাঙ্কতবাসের কারণ
হয়েছে

প্রাথমিকের মতবে বৌয়ের মতো বেওরাবিশ
জীব আর কে আছে। বৌটির বাঁধা ছাপল,
গোয়ালের গক কিংবা জোয়ালের বনদ? কিন্তু
এদের ওপ. অভ্যাচারে স্থব্র নেই। কেন না
এরা যন্ত্রণাকে ভাষায় রূপ দিতে পারে না।
মানুষের ওপর অভ্যাচারের স্বাদই আলাদা।
আর সে স্বাদ বাকি একবার আশ্রয় করে
মানুষের চামড়া ছিঁড়ে বক্তৃতা দেখে ফালা
আনশ পায়, তাহা বেওরাবিশ মানুষই বুঝে
নেই, শুধু-মানোযাব নয়।

সংবাদে প্রকাশ, সিউডী জেলের জেলার

স্বামী বাবেব চোটে অধস্তন ওয়ার্ডাবের চ.
মহর্ষের একটি শিঙির হাতই ভেঙে দিয়েছেন।
ওয়ার্ডাব-পুত্রের অপরাধ, সে বেশীভেদ না।
মেনে জেলার সাহেবের মাতৃপুত্রের সঙ্গে শিশু-
অমৃত বিবাহে প্রবৃত্ত হয়। বেচারী ওয়ার্ডাব।
হেলেক হাত তো গেছেই। জেলার সাহেবের
কোপানলে তার চাকসিটিও যেতে বসেছে।
জেলার বিক্রেতা অভিযোগের ডায়েরী প্রত্যা-
হাবে অস্বীকৃত হওয়ার বর্তমানে জেলার বাহাদুর
তাকে সাগশেও করেছেন। আর কনতার
নোংরা হাতে ওয়ার্ডাব-পুত্রের ভাঙ্গা হাতের
এরবে বিপোর্টিটিও নাকি গারের করা হয়েছে।
অন্ততপক্ষে অভিযোগকারী পিতার কাছে
দেওয়া হচ্ছে না।

ওয়ার্ডাব-পুত্র বেওরাবিশ নয়, কিন্তু পদস্থ
জেলার বাহাদুরের কাছে ও সব অমূল্য-বাবিশ
ছাড়া অন্য কিছু নয়। জেলার অবাধ অভ্যাচার
অন্যায়সেই চলতে পাকে। অধস্তনকে ওপর
বীর প্রকাশের সুযোগই যদি গ্রহণ করা না-
হয়, তবে জেলার মালিকের কাছে সেলেক্টেটের
লজ্জা বোঁওয়া বাকি কেন? এ সব ক্ষেত্রে
হীনন্যাতাই ক্রিয়াশীল থাকে। নিছক অপমানিত
মত্তা অধস্তনকে নিগৃহীত করে তুষ্টি পারশ
এ-ও এক সামসিক ব্যাধি। অস্বস্তা তো নয়।

মুর্শিদাবাদের এক সাম্প্রতিক বিপোর্টে
প্রকাশ, জঙ্গীপুত্র মহকুমার সাহায্যদপ্তর প্রানে
চোবাই মাল. মনেত জটিল চোব করা পড়লে
স্থানীয় বীরপুরুষরা মাটি বমন বর্ণা এবং শব্দল
দিকে লোকটাকে এমন প্রহাণ করে যে, গদগ
হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বেচারী
চিবদিনের জন্য অভ্যাচারী পৃথিবীর মাটি
থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

বাস্তায়-বসা চোর আর ধব-পোরা বৌ,
অধস্তনের পুত্র আর ক্রীড়াসঙ্গের বাক্সা, বিচ্ছিন্ন
মানুষ আর দাসের শিকার—এ সমস্ত বেওরাবিশ
জীবনের ওপর মানুষের অবদানিত বর্ববতা
সুযোগ পেলেই ঝাপিয়ে পড়ে। শতাব্দিক
বংশের গডাতা এ বোগের এ পর্বত কোনো
ওষুধ বাক করতে পারে নি। বর্ববতান চিকিৎসা
নেই। বর্ববকে বোধ হব গডাতগতের বাইরে
বনবালে বেধে এলেই একনায় অচিকিৎসা
হতে পারে।

মুর্শিদাবাদ :

ডিক্টেটরের প্রাসাদ

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বহরমপুর
বেল স্টেশনের পাশে প্রায় মাইলখানেক আয়গা
ছুড়ে বর্তমানে গড়ে উঠেছে প্রাসাদোপম বেশম
গবেষণাগার। বেশমশিল্পে মুর্শিদাবাদের
ইতিহাস রূপকথার গল্পের মতো

কৌতূহলোদ্দীপক। কেন্দ্রীয় সরকার সে
ইতিহাস প্রতি যথার্থ কতজ্ঞাবশতই নির্মাণ
করেছেন এই বুধ প্রভিষ্টানটি।

কিন্তু গাধু প্রচেষ্টাকে ক্ষুদ্র প্রশাসনিক
ব্যবস্থার আওতার না বাধতে পারলে উদ্দেশ্যই
ফার্থ হয়। আর বহরমপুর রেশম গবেষণাগারে
সেই সম্ভাবনাই বোধ হয় অস্পষ্ট অবয়ব গ্রহণ
করতে চলেছে।

শুভাগমন !

৪ঠা জুন !

স্বাধীনতা

অনির্ভা



সংগীত-সিঁরাটা-পরিচালনা

তপন সিংহ



প্রকাশনা

পার্থ স্মৃতিপ্রাধ্যায়

বাজবী বাল্যপ্রাধ্যায়

মিতা-মিতা-মিতা-কৃষ্ণা

সলিল দত্ত-বক্সিস ঘোষ প্রভৃতি

টিউ থিয়েটার্স (একজিবিটার্স) প্রাইভেট লিমিটেড

রূপবাণী - অগ্রণী - ভারতী

পদ্মশ্রী - মৃণালিনী

এবং অন্যান্য

প্রেমবাগারের বর্তমান ডিরেক্টর শ্রীকৃষ্ণ-
জাদী প্রভাষে বেশ গবেষণাগার প্রায়
ডিটেক্টেবল প্রাণে পণ্ডিত হয়েছেন।

এ সম্পর্কে বিস্তৃত অভিযোগ হাজির করেছেন
জাতীয় সংবাদ সাপ্তাহিক 'বঙ্গমত'-এর সংবাদ-
দাতা। এখানে তাঁর সংবাদ থেকে কতকাংশ
উদ্ধার করে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি
আকর্ষণ করছি। বঙ্গমত নিশ্চয়োজন; কেন
না এ জাতীয় ঘটনার ওপর একাধিক সময়
কোড প্রকাশ করে দেশীয় সংবাদপত্রসেবীরা
বর্তমানে প্রায়-তাঁদের শৃঙ্খলাভাণ্ডার সিংগেল করে
কেনেছেন।

বঙ্গমত-এর সংবাদে প্রকাশ:

শ্রীকৃষ্ণজাদী, বি-এসসি (কৃষি) এ এস
এস ও এস, আই এ আই আই, পি, এইচ ডি
(মাস্টার) এই ব্রহ্ম, প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র্য নিয়ে
আগুন পব সমস্ত অফিসে যেন যথেষ্টাচার,
বিত্তিকার, অনাচার, দুর্নীতির এক চক্র তৈরি
করেছেন। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে রয়েছে
মিথ্যা বিপোর্ট, বড়বন্দুলক প্রসিডিং, ডিপার্ট-
মেন্টাল শাস্তি আর গবেষণাগারের ভেতরে
সহকর্মীদের মধ্যে গোয়েন্দাবৃত্তি। ফলে এক-
দিকে যেমন প্রতিভাবান মেধাবী উন্নতিকারী
উচ্চশিক্ষিত কর্মীরা জরাজীর্ণ হতাশার ভেত্রে
পড়ছেন, অন্যদিকে জাতীয় সরকারের প্রায়
সকল লোক টাকা অপচয় হতে বসেছে।

যথেষ্ট কারণ থাকতেই (ভূতপূর্ব ডিরেক্টর
ডাঃ রায়চৌধুরী) যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয়
বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় অনুমোদন
করে দিয়েছিলেন-বিসার্চ স্টেশনের দারিদ্র্য

নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন
কোরে দেবার পিছনে তাঁর যে যত্নবৃত্তি
সক্রিয় হোয়ে উঠেছিল তাতে তাঁকে উগ্র
প্রাদেশিকতাবাদী বোলে অভিহিত কোরলে
এতটুকু অন্যায় হবে বোলে আমি মনে করি না।

কানিচার দিয়ে সাফাতে এবং গ্যাসপ্লান্ট
বসাতে তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ
করেছেন। কিন্তু একবার কি অসত্য যে বেসার্গ
কে সি পাল আর বেসার্গ প্রেসিগন কোম্পানী
দুটো কনদব দেওয়া সম্ভব বেসার্গ বেনসফিল্ড
এও সন্সকে শুধু কাছ দেওয়া হয়েছিল তাই
নয়-গড মেন্টের অনুমোদন দেবার এবং
পার্টের কাছ থেকে মাল পাবার আগেই শতকরা
আশীভাগ টাকা অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
চৌধুরীর ফাইলগুলো ডালডাবে বোর্ডে সেখানে
আরও অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে-এ
দৃঢ় বিশ্বাস আমার রয়েছে।

বিশ্বনাথ মণ্ডল মাঝে বহরমপুর সেসি-
কালচার ইনস্টিটিউটের একজন শিক্ষার্থী মাসে
খ্রিষ্ট টাকা কোরে ডাডা বাধ্য সরকারের
কাছে পেড়েন। শ্রীমণ্ডল বাধ্য সরকারের
কাছ থেকে ডাডা নেবার সঙ্গে কেন্দ্রীয় বেশর
গবেষণাগারে সাময়িক কর্মী হিসেবে ঢুকে
পড়েন। প্রায় এক বছর ১৯৬২ সালের নভেম্বর
পর্যন্ত তাঁর পারিশ্রমিক ডিরেক্টর ডাঃ কৃষ্ণজাদী
'দিয়ে' গেছেন। এমন কি ৭-২-৬৩ এবং
১৫-২-৬৩ তারিখে রাষ্ট্র সরকারের ট্রেনিং
ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী হিসেবে শ্রীমণ্ডল যখন
শিক্ষামূলক ভরণে ছিলেন তখনও কেন্দ্রীয়
গবেষণাগারের দৈনিক কর্মী হিসেবে তাঁর
পারিশ্রমিক 'মিলেছে'। অবশ্য ডাঃ কৃষ্ণজাদী
শ্রীমণ্ডলকে শেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছেন তাঁকে
বিসার্চ স্টেশনের স্বামী কর্মী হিসেবে নিয়োগ
কোরে। আর একজন মহিলাকেও অনুকূপ
অনুগ্রহ দেখান হয়েছিল। একই সঙ্গে তিনি
বিসার্চ স্টেশনের কর্মী এবং কান্ধী মহকুমার
একটা বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা হিসেবে মাইনে
পেরেছেন।

আটটা ইনক্রিমেন্ট দিয়ে বিসার্চ স্টেশনের
লাইব্রেরিয়ান পদটি তিনি পূরণ কোরেছেন
তাঁর পুরোনো কর্মস্থল বাঁচা নাকি ইনস্টিটিউটের
জটিল শ্রীবিএন সেনকে আনিরে। এই পদটির
জন্যে আরও বহু-যোগাভ্যাসের প্রার্থী ছিল।
এমন কি জিরাগজের একজন সত্যিকারের
যোগাভ্যাসের প্রার্থী আবৃত্তিক বেতনে কাজ
কোবতে চাইলেও তা সুপরিকল্পিতভাবে
অগ্রাহ্য করা হয়। সব চাইতে মজার ব্যাপার
হোল বেদিন সেনমশায় তাঁর বাঁচা চাকরী
থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ঠিক সেইদিনই তিনি
বহরমপুরের চাকরীতে এসে ঢুকেছেন। তা
ছাড়া, এস এস আর এ এবং জে এস আর এ'র
পদ দুটোতেও বাঁচা নাকি ইনস্টিটিউট থেকে
বেশি মাইনে দিয়ে লোক আনিরে বসান হয়েছে।
অন্যান্য শূন্য পদগুলোতেও ডাঃ কৃষ্ণজাদী

অবাস্তবী কর্মচারী নিয়োগের প্রবণতা দেখে
তাঁকে জাতীয় সংহতি রক্ষার একজন পৃষ্ঠপোষক
এমন অংশবাদ নিশ্চয় দেওয়া চলে না। ডিরেক্টর
সাহেবের অবসর কর্মচারীদের সঙ্গে ডিরেক্টরী
সেভা ইনস্টিটিউটে আসার সকার কোরেছে।
সব সময় মনে হয় যেন একটা বিত্তিকার
আবহাওয়া বিরাজ কোরেছে। শুধু কর্মচারীদের
সঙ্গে নয়, জনসাধারণের সঙ্গেও কোন কোন সময়
তাঁর ব্যবহার স্পর্শার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।
বহরমপুরের একটা প্রখ্যাতনামা ফটোগ্রাফী
কার্ম তাঁর বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু কোরেছেন।
ভূতপূর্ব ডিরেক্টর ডাঃ রায়চৌধুরীর আর মাই
মোঘ থাকুক, তিনি কর্মচারীদের মাইনে বাড়ানোর
জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন আর ডাঃ কৃষ্ণ-
জাদীর কাছ হোয়েছে মাইনে বাড়ানোর প্রস্তাবকে
নাকচ কোরে দিয়ে ওপর মহলেব কাছ থেকে
বাহাদুরী নেবার।

চব্বিশ পরগণা :

শুভামার ও বাব

পুলিশ সক্রিয় হ'লে দুর্ভুক্তকারী শুভা
দমনে যে কত স্বল্প সময় লাগে ও আইন
ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে কিছুমাত্র
বেগ পেতে হয় না, সম্প্রতি চব্বিশ পরগণা
পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক তৎপরতার সে
মাত্রা প্রমাণ করেছেন।

যাদবপুর গড়কা-নিবাসী তরুণ সমাজসেবী
শ্রীশক্তি সরকারের বাড়ীতে গত ২২শে মে গভীর
রাতে একদল গুণ্ডা চড়াও হয়েছিল। সঙ্গে
ছিল হাত বোমা ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র।
শ্রীসরকার তখন সারা মনে নিদ্রা যাচ্ছিলেন।
প্রতিবেশী জনৈক ভয়লোক বন্দুকের ঝাঁক
'আগুয়া' করলে দুর্ভুতবা সবে পড়ে। পুলিশী
তৎপরতা দুর্ভুতদের অনেকেই ধরা পড়েছে
বলে প্রকাশ।

অনেকের সন্দেহ, শ্রীসরকারের ওপর
এই অভ্যুত আক্রমণের সঙ্গে মেহোভেদীর
কয়েকজন মালিক মুনাকশিকারী চক্রেরও
যোগাযোগ থাকতে পারে। ইদানীংকালে
যাদবপুর-গড়কা এলাকার একদল বেপারী
সমাজবিরোধী ব্যক্তির বাঁচি তৈরি হয়েছে, তাঁদের
সঙ্গে নাকি আলোচ্য ঘটনার সবাসরি যুগোপ
বর্তমান। এ'বা নাকি এখন আশ্রিত পায়ে ক্ষমতা-
লীন কর্তব্যজ্ঞদের দোরে বর্ণা দিচ্ছেন।
সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের পরিণাম থেকে সুজ্ঞি পাওয়ার
জন্য। কিন্তু ঘটনা বাই হোক, চব্বিশ পরগণা
পুলিশ এ ব্যাপারে যে সতর্ক তৎপরতার পরিচয়
দেখেছেন, তাতে মনে হয়, সমাজবিরোধী
গুণ্ডাবাজিকে তাঁরা অচিরেই দমন করতে
পারবেন। ইতিমধ্যেই পুলিশ সাধারণের
মনে যে বিশ্বাস আগ্রত করতে পেরেছেন এবং
আশা করা যায়, তাঁদের কর্তব্যপরায়ণতার
ভবিষ্যতেও কোনোরকম পৈশ্চন্দ্র দেখা দেবে
না।

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বঙ্গমতীর পৃষ্ঠায়
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর
লাভ করে। রোমাঞ্চ ও বোমাঙ্কের সত্য
ঘটনায় বইটির আকোশ্য পূর্ণ।
রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়;
জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবন্ধনা;
ছন্দ ও প্রেমের লীলার চাক্ষু্যকর বইটি
চাক্ষু্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোম-
হর্ষক সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,

কলিকাতা-১১



দুখানি কালা হাত

রক্ত রায় চৌধুরী

অবশেষে ট্রেনটা গড়ল। এবং ধীরে অত্যন্ত ধীরে এক পা এক পা করে এগোল। প্যাটিকর্নের কানোচে কুশাশীচ্ছন্ন বোম্বুবে কান-মাথা চেকে বসেছিল লোকটা, ঠিক যেন একটা পৌটিলা। যে-কোন স্টেশনের প্যাটিকর্নে এককম দু-চাবজন লোক পড়ে থাকে। কে তাদের লক্ষ্য কবে, ? জ্ঞাতএব তাব দিকে নজব দেওয়া কেউ আবশ্যক বোধ করে নি। কিন্তু এখন ট্রেনটা গড়তে সেও গড়ল। এবং কি আশ্চর্য, তখন ট্রেনেব চেয়ে তাব গতিবেগ অনেক বেশি।

জানালাব ষাবে কুট-খানেক জায়গা যোগাড় করতে অনেক মাথা ঝাটাতে হবেছিল মৈত্রেয়ীকে। কুলীকে চারগুণ বকশিস্-এর লোভ শুধু নয়, তার প্রায় সবটাই আগাম দিলে তবে সে এই জায়গাটা পেয়েছে। সে-ও প্রায় ষণ্টাখানেক আগে। এখন এমন অবস্থা—এক ইঞ্চি গড়বার উপায় নেই। পাশুবর্তী লুপুত্র হিন্দুস্থানী রমণীটির মেদবাছল্য কিঞ্চিৎ বেশি। নাভিসূলের উর্ধ্ব-অধঃ অনেকটা অনাবৃত। কোলের শিশুটি স্তন্যপান করছে। স্নম্বের বেঞ্চে চারজনের জায়গায় আটজন বসেছে। একবার চোখ তুলেছিল মৈত্রেয়ী। শিক্ষিকার মতন স্থির গান্ধীর্ষপূর্ণ

দৃষ্টি। লোকগুলো অভয় এবং অসভ্য। চারজোড়া মানুষের আটজোড়া চোখ হিন্দুস্থানী রমণীব ওপর ন্যস্ত। মৈত্রেয়ীর করবার কিছু ছিল না। মৈত্রেয়ী বুঝতে পেয়েছিল, এইভাবে এই বারো ইঞ্চি জায়গার মধ্যে সমস্ত শরীরকে কুঁচকে বেধে পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ। উপায় নেই। একদিনের নোটিশে আসতে হলে এ দুর্ভোগ ভোগ করা ছাড়া গতাস্তর নেই।

ভেতরের দিকে চোখকে যখন আব রাখা গেল না, মৈত্রেয়ী তাকাল বাইরের দিকে। কোনকিছুর দিকেই নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য রেখে নয়, নিতান্ত অনির্দেশ্যভাবেই সে বাইরের দিকে চেয়েছিল। বাইরের কোন্ কোন্ বস্তু তার চোখে পড়েছে, তা বলা তার পক্ষে এখন সম্ভব নয়, অথচ এট এক ষণ্টা এইভাবেই কেটেছে। লোকটা যখন একলাফে প্যাটিকর্নের কোণ থেকে নেমে দৌড়ে এসে কোনো-মতে ট্রেনে উঠেছিল, তখন মৈত্রেয়ীর মনে হয়েছিল, নোংরা একটা চাদবে মেহ আবৃত করে এই লোকটাই এতক্ষণ চুপাট করে বসেছিল ভাদেবই কানবার উল্টোদিকের প্যাটিকর্নে। অথচ মৈত্রেয়ীর মনে হচ্ছে ষণ্টা-খানেক ধরেই লোকটা অমন করে

কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিল। উল্টো করলে ট্রেনটা যখন অত্যন্ত ভাঙে আস্তে প্যাটিকর্নে উঠ কবেছিল, তখন সে অনায়াসেই কোনো না কোনো একটা কানরাতে উঠে বসবার সুযোগ কবে নিতে পারত। লোকটা একা, তাব পুরুষমানুষ এবং ভাব সঙ্গে কোনো মালপত্র নেই।

সুতরাং মৈত্রেয়ী এ সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হল, লোকটা ট্রেনে বসে যেতে চায় নি, এমন কি ট্রেন থেমে থাকাকালীন যে ট্রেনে উঠতেও চায় নি। অথচ, যেই ট্রেনটা গড়েছে, লোকটাও যেন ততাত্ত জড়বৎ দেহটাকে স্প্রিং দেওয়া খেলনার মত মুহূর্তে সজীব এবং চঞ্চল হয়ে তুলেছে। কিন্তু কেন ? নিশ্চয় লোকটার কোন গোপন অভিসন্ধি আছে। না হলে এতক্ষণ লোকটা অমন কবে নিখিকারে বসে থাকবে কেন ? এবং এত কামরা থাকতে মৈত্রেয়ীর কামরাতেই বা ওঠবার চেষ্টা করবে কেন ?

একষণ্টা কম সময় নয়। এট একষণ্টা মৈত্রেয়ী কি কি ভেবেছিল, তা এখন আব মনে করতে পারছে না। অথচ শেষরাতে বাটোয় পৌঁছে প্রায় তিনঘণ্টা সে প্যাটিকর্নে বসেছিল। তাব প্রতিটি মুহূর্তক্ষে সে মনে করতে পারছে। সে

তিনঘণ্টা তার সময় চিহ্ন প্রকাশ
বিলুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে
ছিল—কেন্দ্র করে সে আগের
ট্রেনে উঠবে? স্টেশনের লোক-
সমাগম তাকে বিশেষ আকর্ষিত করে
ছিল। রিজার্ভেশন না থাকায় তার
চিন্তার অবধি ছিল না।

এতক্ষণ না হয় শূন্যদৃষ্টিতেই
বাঠরের দিকে চেয়েছিল মৈত্রেয়ী,
এবার তাতে বাধা পড়ল। জানালার
শিকের ভেতর দিয়ে দুটো কালো
হাত, আর তার বাইরে একটা মুখ—
বাঠরের প্রায় সমস্তটাই ঢেকে দিল।
খোঁচা খোঁচা দাড়ি। নোংরা বিবর্ণ
রুক্ষ চুল, কপালে একটা লম্বা কাটা
দাগ, গাল দুটো গর্তে ঢুকে গেছে,
গলার শিবাগুলো কুটে উঠেছে—
লোকটার দিকে বারকঁকেক তাঁকাতে
এসব চোখে পড়ল মৈত্রেয়ীর।
মৈত্রেয়ীর কঠিন দৃষ্টি আরো কঠিন
হল। লোকটার চোখ দুটো
অস্বাভাবিক লাল।

• মৈত্রেয়ী চোখ বন্ধ করল। ট্রেনের
ধরজায় ঘন-চার-পাঁচ আগে থেকেই
খুলছিল। এ লোকটা রাড়তি।
দরজার হাতল ধরবার অযোগ্য পায় নি,
না কি ইচ্ছে করেই ধরে নি—তাঁড়
হবে। লোকটা সময় থাকতে ট্রেনে
উঠবার ইচ্ছে প্রকাশ করে নি, অতঃপর
হাতল ধরবার অযোগ্য থাকলেও সে জা
নেন নি। মৈত্রেয়ীর মনে হল লোকটা
নে তাকেই বরতে চায়। লোকটা বোহ-
ম্য দেখেছে সে একা নেনেছে
শায়োনীতে। একা বাচ্ছেন আসার।

চোখ দুটো খুলল মৈত্রেয়ী।
দুটো কালো হাত ছটকট করছে।
হাত দুটোয় ধুলোকালি মাখা। শিরা-
গুলো যেন ছিঁড়ে পড়বে এমনভাবে
ফুলে উঠেছে। একটা আঙুলে
তারের একটা আংটি। এবং সেই দুটো
হাতের কঁক দিয়ে একটা মুখ। দাঁড়
টুক্টকে দুটো চোখ। আরেক খোলা
কঁক-করা মুখের ভেতর কয়েকটা
দাঁত দেখা যাচ্ছে। হলদে, কালোয়
আর সাধারণ বিচিত্র তার রূপ।

ট্রেনটা চলেছে। পতিবেগা বেছেছে।
লোকটার মাথার চুলগুলো উড়ছে।
কাঁধের কাছের চামড়াটাও ফরফর করে
উড়ছে।

হাত দুটো যেন বড় বেশি এগিয়ে
এসেছে। লোকটা একটা হাত
নিচের শিকের ভেতর দিয়ে গলিয়ে
একেবারে ওপরের শিকটা জাপটে
ধরল। মৈত্রেয়ী বলল মনে মনে,
তোমার মতলব বুঝতে পেরেছি।
ভালো চাও তো সাবধান হও।
সামান্য অসতর্ক হয়েছ কি বাস্তব
দিয়ে ফেলে দেব।

হিন্দুস্থানী রসদীটার বাচ্চাটা
কেন্দ্রে উঠল। তার না আর তাকে
সামান্যে পারছে না। এতগুলো
অপরিচিত মুখ, বাচ্চাটা তাকালে
আর কান্দে। আঁচলেব তলে শিকটার
মুখটা ঢেকে দিতেই তার কান্না
খামল। সাকনের বেঞ্চ বিড়ি, হরি-
য়েছে ঘন-তিনেক। পায়ের কাছে
দুখনা ডিবাখিণী বসে আছে।

এসব পন্থকের দেখা। চোখ
দুটো আপনা হতেই বন্ধ হয়ে এল
মৈত্রেয়ীর। হাতে টাকা থাকলে
তৃতীয় শ্রেণীটা সে পরের স্টেশনেই
বদল করত। কিন্তু উপায় নেই।
কলকাতায় দশটা সাড়ে পাঁচটা আপিস
কবে ভিড় দেখা ও ভিড়ে চলাকেরা
তার অভ্যাসগত। কিন্তু এরকম একটা
পরিস্থিতি তার প্রত্যাশিত ছিল না।
মাসের শেষে বলে হাতে টাকাও
বেশি ছিল না। অর্ধচ দুদিন আগেও
সে জেনেছিল ছুটি তার মঞ্জুর হবে
না।

বেশিক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকতে
পারল না মৈত্রেয়ী। চোখের ওপর
দুটো কালো হাত। লোকটা দুটো
হাতই কনুই থেকে ঢুকিয়ে দিয়েছে
ভেতরের দিকে। যে কোন মুহূর্তে
লোকটা মৈত্রেয়ীর পায়ে হাত দিতে
পারে। ছিনিয়ে নিতে পারে তার
গলার হারটা। কিংবা কানের
একটা দুল। কী চায় লোকটা।

চোখ দুটো কেন্দ্র নাগ্নিচে—নিচের
বন্ধ বেয়েছে। নিচের না হলে
চাটনিটা কখন চুপচুপ হবে কেন?
কেনই বা চোখটা সম্পূর্ণ খুলবে না?
এখন মনে হচ্ছে মৈত্রেয়ীর, এই
মুহূর্তে না এলেই হত। স্টিমার
বদলের হাঙ্গামাও বোধ হয় এর চেয়ে
ভালো ছিল।

ট্রেনের গতিবেগটা কমে এল
হঠাৎ। কিছু পরেই এসে থামল
একটা স্টেশনে। এবং সঙ্গে সঙ্গে
লোকটা—যারা খুলছিল, তাবাও
নেমে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মে। লোকটা
বার-দু-তিন তাকাল মৈত্রেয়ীর দিকে।
মৈত্রেয়ী দেখল, লোকটা হাতদুটো
নাড়ছে, যেমন করে ব্যায়াম করে
ভেমন করে। মৈত্রেয়ী ভাবল,
তোমার শক্তিমত্তা আমার জানা আছে।
তোমাদের আমি চিনি। সে মুখ
ফিরিয়ে দিল। এবং জানালার
কাঁচটা নামাতে উদ্যত হল।
লোকটা সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে দাঁড়াল।
একটা হাত জানালার ভেতর দিয়ে
ঢুকিয়ে বলল, বন্ধ করবেন না,
তাহলে যেতে পারব না।

লোকটার মুখে বাংলা শুনে অবাক
হল মৈত্রেয়ী। অবশ্য গলার স্বরটা
অস্বাভাবিক মতন। কিন্তু মৈত্রেয়ী
আজ প্রথম দিতে রাজী নর। বললে,
বড় খুলে আসছে।

—একটু কষ্ট করুন, আমি
বেগুনরাইতেই নেমে যাব। গতকাল
যাবার কথা ছিল, যেতে পারি নি—
বলে এবার হাত দুটো চোখাল
শিকের ভেতর। যেন অনিশ্চিত
করল তার নিষেধ। বললে, অনেক
কষ্টে আজকের ডিউটি অফ বন্ধিয়েছি
—যেতে আমাকে হবেই।

ওই ধুলোকালি মাখা নিন্দী মুখ,
তার বক্তব্য-চোখ, বিচিত্র রঙবেরঙের
দাঁত। আর সর্বোপরি দুখানি কালো
হাতের কদম্ব রূপটা একটা ঠাণ্ডা
শিরশিরে বাতাসের মত, বিচিত্র শীতল
একটা স্পর্শের মত মৈত্রেয়ীর মেরদণ্ডের
ভেতর শিরশিরিয়ে উঠল।

মৈত্রেয়ীর চোখটা আকাশটা
ফেটে পড়ল। গলার স্বরটায় কেঁপে
কেঁপে প্রকাশ পেলঃ যাবার যদি
এতই দরকার, এতক্ষণ প্যাটকর্মে
বসেছিল কেন?

লোকটার কুৎসিত মুখখানা
হাসিতে ভরে গেল। সে কি হাসির
রূপ। বললে, একবার ভেতরে
চুকলে বেগুনসবাইতে নামতে পারবো?
ঝাড়ি দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ছেড়ে
দেবে—মৈত্রেয়ী ভয়ে চোখ বন্ধ
করল।

পার্ববর্তী একজন অড়ানো হিন্দু-
স্থানীতে কি যেন জিজ্ঞেস করল।
লোকটা তার সঙ্গে কথা বলতে
লাগল।

মৈত্রেয়ী ঠিক বুঝতে পারল
না ওদের কথা। লোকটার কথার
মধ্যে 'বেমার', 'আঁখ' প্রভৃতি
কয়েকটা কথা থেকে একটা তাৎপর্য
হয়ত সে বার করতে পারত, কিন্তু
সেদিকে সে গেল না। মনে মনে
বলল, তোমাদের আমি চিনি, মেরেমানুষ
দেখলেই তোমাদের বেমার হয়, তোমাদের
আঁখিতে জ্বালা ধরে—তোমাদের আমি চিনি,
খুব চিনি। ট্রেনের হাতল ধরে
যারা খুলছিল, তাদেরই একজনের
পাঙ্গে লোকটা দুর্বোধ্য হিন্দুস্থানীতে
কথা বলতে শুরু করল।

ঠাণ্ডা বাতাসের একটা অবিরাম
প্রবাহ বেকেচুরে মৈত্রেয়ীর গায়ে
মাথায় এসে লাগছে। আকাশের
কিছু কিছু অংশ লোকটার মাথার
পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। মাঠেতে
বোধ হয় অড়হরের কেত। কিছুই
ঠিক দেখতে পাচ্ছে না মৈত্রেয়ী।
এই ভিড়, এই কোলাহল, এই বিরজি-
কর সহযাত্রী, সবকিছুকে মৈত্রেয়ী
ভুলে যেতে পারত, যদি জানালাটা
অবধি হত। জানালার ধারটার
শেষে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেও
তার ভালো লাগে—তাড়ো এখন
শাখা পড়ল। অনন্যোপায় হয়ে

চোখ বন্ধ করল মৈত্রেয়ী। পাবারাত
যুম হয় নি। এখন চোখ বুজলেও
যুম এল না চোখে। মাথার ভেতর
অজস্র চিন্তা। কিন্তু সমস্ত চিন্তাব
শীর্ষে দুখানি কালো হাত ভেসে
উঠছে। কদর্য দুটো হাত।

আঙুলের গিটগুলো সুস্পষ্ট। শিরা-
গুলো ভেসে উঠেছে। যেন ঐ
দুটো কালো হাত মৈত্রেয়ীর শ্বাস
রুদ্ধ করবার জন্যে ছটফট করছে।

অতএব চোখ খুলল মৈত্রেয়ী।
এবং চোখ দুটো গিয়ে পড়ল ছটফটে
দুটো কালো হাতের ওপর।
লোকটার ওষ্ঠাধর অবরুদ্ধ। কপালটা
কুঁচকে উঠেছে। চোখ দুটো আরও
ছোট হয়ে এসেছে। ট্রেনটা গতি
নিয়ন্ত্রে। হাওয়ায় উড়ছে লোকটার
চুলগুলো। আর এরই মধ্যে কিছু
ধুলো এসে পড়েছে মৈত্রেয়ীর গায়ে।
গায়ের চাদরটা দিয়ে নিজেকে ভাল
করে জড়িয়ে নিল মৈত্রেয়ী। তার-
পর আবার তার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল
লোকটার ওপর। লোকটার চোখ
দুটোও যেন তার হাতের মত ছটফটে
হয়ে উঠেছে। লোকটা যেন কি
খুঁজছে।

মৈত্রেয়ী ঠিক করল, সামনের
স্টেশনে ট্রেনটা থামলেই যেই লোকটা
নেমে দাঁড়াবে, সঙ্গে সঙ্গে কাচের
জানালাটা নামিয়ে দেবে সে। কোনো
আপত্তি শুনবে না, কোনো কৈফিয়তে

কান দেবে না। আপাতত চোখ
দুটো বন্ধ করল সে।

ট্রেনটার গতিবেগ বেশ বেড়েছে।
কাষরাটা দুলছে। পেছনে হেলান
দিয়ে অতি কষ্টে সেই দোলনটুকুর
স্পর্শ নেবার চেষ্টা করল মৈত্রেয়ী।
কিন্তু বন্ধ চোখের সামনেও দুটো
বীভৎস কালো হাতের ছায়া যেন
হিংস্র হয়ে ছটফট করে উঠল।
শিরাগুলো যেন ফেটে পড়তে চাইল।
আঙুলগুলো যেন কুঁকড়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজনের
বিচিত্র আর্তস্বরে আচমকা চোখ খুলল
মৈত্রেয়ী। জানালাটা অবধি। অপ-
স্ময়মান বাঁশঝাড়, উধাও নীলিয়া,
আর রৌদ্রস্নাত অড়হরের কেত।
দুখানি কালো হাতের সঙ্গে সঙ্গে
লাল চোখের মুখখানিও অপসৃত।

সবশুদ্ধ বোধ হয় মুহূর্তখানেক।
ব্যাপারটা বুঝতে পলকও লাগে নি
মৈত্রেয়ীর। লোকটা পড়ে গেছে।
অন্য লোকগুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
তারা অসহায়ভাবে খুঁকে দেখছে।
তাদের বিচিত্র মিলিত চিংকায়
মৈত্রেয়ী বুঝতে পারল, লোকটা
রেলওয়ের কামারমান, লোকটার
চোখের অস্থির কয়েছিল, লোকটা
বেগুনসরাটে ভাঁজারকে চোখ
দেখাতে যাচ্ছিল।

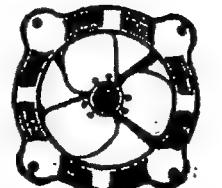
আর বিলম্ব করে নি মৈত্রেয়ী।
পরমুহূর্তেই সে লাফ দিয়ে উঠে চেনের
দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

সুশীতল আয়ামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিউল্যু

মার্কনী ফ্যান

নগদ মূল্যটা
৯টি কিস্তিতে দিন
মার্কনী ইলেকট্রিক করপো
(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৩০৪৮
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা
বইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে


অক্ষিতা

মুন্সীম রায়

অশ্রিত



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ওবা একে-একে নার্মল গাড়ি থেকে।

গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে তাকাতে লাগল ওরা। যাকে তাবা একটা প্রাসাদ বলে মনে করে রেখেছে, সেটা যে এখন আর প্রাসাদ নেই, তা স্পষ্ট দেখতে পেল তাবা। এটা একটা বিশাল বাড়ি বটে, কিন্তু এটা এখন নিছক ভাঙা বাড়ি অথবা, একে বলা যায় একটা বিরাট প্রাসাদের বঙ্গাল মাত্র।

অনেক উৎসাহ নিয়ে এসেছে তাবা অনেক দূর থেকে, কিন্তু এখানে এসে হাজির হয়ে তাবা সকলেই অচপবিস্তর খতমত খাচ্ছে। জীর্ণ হোক, দীর্ণ হোক, জনমানবহীন হোক--তবুও তাবা ঐ প্রাচীরের ভেতবে ঢুকতে পারছে না। যদিও, ফটক ঠিক কোন দিকটায় এখনো জাবা তার কোনো হদিশ পায় নি; কিন্তু ফটকের বিশেষ দরকাবও নেই। অল্প জাখগাখ ভেঙে গিয়েছে প্রাচীর, তার যে-কোনো ফাটল দিয়ে ভিতরে ঢুকে যাওয়া যায়।

দুবে কয়েকটা গাছ-গাছড়ার ওপর

দিবে ধোঁখা ছাড়তে-ছাড়তে চলে গেল ট্রেন--ভাষ্যমণ্ডহারবাবের দিক থেকে কলকাতার দিকে। এইবকম একটা ট্রেন থেকে সেহাংস্ত তাব আবিষ্কৃত নার্মিকাটিকে দ্বিতীয়বার দেখার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল বলে তার মনে পড়ছে।

মনোজ কোমবে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যেন মজা দেখছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল, 'কে আছ জোবান, হও আশুবান--'

সকলেরই এগোবার ইচ্ছা, কিন্তু তাব মধ্যে থেকে নীহাবই এগিয়ে এল সকলের প্রথমে। এবটা মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বীরবিক্রমে এতদূর এসে এখানে দাঁড়িয়ে খতমত খাওয়াটা তার কাছে বড়ই কাপুকষের কাজ বলে মনে হচ্ছিল, দু'পা এগিয়ে গিয়ে নীহাব আড়চোখে দিবাং দিকে একটু তাকিয়ে নিফেই বলল, 'চলে এসো। পুরুষমানুষেব অত ভখ পেলে চলে না। বী বেড। বী এ মান। আমরা চোবও নই, ডাকাতও নই--চলে এসো।'

নীহার প্রায় ঢুকে পড়েছিল, এমন

সময়ে মনোজ বলল, 'এই, একটু দাঁড়াও। লেডিজ ফার্স্ট, একে স্নেতে দাও আগে।'

দিবা যেন নিবিকার নিলিষ্ট, দিবা যেন নির্ভীকও। যে জাখগাটায় বেশ বড় হয়ে ভেঙে পড়েছে প্রাচীর, সেই জাখগাটাব ভাঙা ইট ভিঙিয়ে সে ভেতবে গেল, বলল, 'আমুন, আমুন-না আপনারা।'

সেহাংস্ত যেতে যেতে বলল, 'মা থাকে বরাতে। ট্রেসপাসের দায়ে যদি পড়তে হয়, না হয় পড়ব। দল বেঁধে ফার্টক খাটব তাহলে।'

মনোজ আশুগ দিল সকলকে, বলল, 'দূর, ট্রেসপাস।' বিপদে পড়লে একেবারে বেকুব সেজে যেতে হয়। কেউ এসে যদি চার্জ কবে, তখন তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, একেবারে না বুঝে এই অন্যায়টা করে ফেলেছি। বেকুবদেব কেউ বকে না, বক্রণা করে।'

বুকে যথেষ্ট বল সঞ্চবক'বে ওরা ভেতবে ঢুকে পড়েছে। ভেতবে এখন আপাছার ভিত ও অঙ্গল। মাঝে-মাঝে

কয়েকটা নৃত্যপাথরের মূর্তি হসানো।
মূর্তিগুলিকে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে
জতা। নৃত্যপাথর আধরণে মূর্তি-
গুলোর চেহারাও ঢাকা পড়ে
গিয়েছে।

ওরা ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো
দিক থেকে কোনো বাধা আসছে না।
আনুষের কথা দূরের, কোনো কাকপক্ষীও
বুঝি লক্ষ্য করছে না তাদের।
এঁতে ত্রিশ তাদের মনের দ্বিধা কমে
আসতে লাগল যেন, সন্ধ্যাও যেন
বেতে উঠতে লাগল সেই অনুগতে।

গলা ছেড়ে বধা বলতে লাগল
ওরা। একটু হাসাহাসিও করতে
লাগল।

হবেশ কোণে বধাব মধ্যে নেই।
গাছের একটা শব্দেও তাঁল কড়িয়ে
নিষে সে নিজের সঙ্গে পাখচালি করে
বেড়াচ্ছে। তারও যেন মন নেই
কাবও দিকে, তার দিকেও তেমনি
মন নেই কারও।

দিবা কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক
ঘুরে অবশেষে বলল, 'এখানে আমবা
কি জন্যে এলাম, তাই হয়তো আমরা
ভুলে গিয়েছি বলে মনে হচ্ছে যেন।
গাছ আর আগাছার মধ্যে পাখচালি
কবার জন্যেই বুঝি আমাদের এতসূরে
আগা ?'

'তা কেন, তা কেন।' দীপক বলল,
'আমরা এসেছি নারিকার সন্ধানে।
তাকে এবার খুঁজে বের করতে হবে।'
'তবে, চলুন সকলে ওদিকে যাই।'

কিন্তু সকলের চোখ পড়ল পিছনের
দিকে। হঠাৎ ভাল দিয়ে টেনে টেনে
মূর্তির গাথের নতা ছাড়াচ্ছে হরেশ।
বলছে, 'কী চমৎকার মূর্তি, তার কি
অবস্থা হয়ে আছে।'

একটা মূর্তির পা থেকে প্রায় সমস্ত
নতা নারিকের বোকেছে হবেশ।
আবরণহীন একটি নারিকমূর্তি বেরিয়ে
এসেছে সেই নতার ওস্তাদ থেকে।

- শীতের সকালের ঠাণ্ডা রোদ এসে
পড়েছে এই শেতুমূর্তির গায়ে—ভস্মভূত
- সুন্দর দেখাচ্ছে এই চেহারা।

দিবাও জাকাল মূর্তিটার দিকে।
তারও ভালো লাগল অবশ্যই, কিন্তু
কোনো মন্তব্য সে করল না। ওরা
হয়তো একটু ভাষাশা করার মতলব
করেছিল, কিন্তু নিঃসংকোচে দিবাকে
ঐদিকে তাকাতে দেখে ওরা থেমে
গেল।

কিন্তু কোনো কথা না বললে
তো নয়। মনোজ তাই কিছুক্ষণ চেয়ে
ঐদিকে চেয়ে দেখল, ঐ সৌন্দর্যে যেন
মুগ্ধ হয়েছে এইভাবে কিছুক্ষণ
চেয়ে রইল ঐদিকে, তারপর কপালের
ওপর হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে
দাঁড়িয়ে সকলকে শোনাবার জন্যেই
রেশ স্পষ্টভাবে বলল—

কোনু দেব আজি আনিলে দিবা
অমৃতসবল তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিবা বিভা।

হঠাৎ এখানে ঐ কথাটি ছত্র শুনে
কেউ চমকাল কি না লক্ষ্য করা
গেল না। কিন্তু বড় লাগলই লাইন-এর
আউড়ে দিয়েছে মনোজ, এজন্যে
মনে-মনে অনেকেই বুঝি তারিফ করল
তাকে।

ঐ মূর্তিটা তার গাথুরে চোখে
এমন প্রসন্ন দৃষ্টি বেলেন দাঁড়িয়ে আছে যে,
ঐ দু চোখে শতাই যেন দেখা যাচ্ছে
দিবা বিভা এবং ঐ মূর্তির সর্বত্র যে
শীতল শান্তি ছড়ানো আছে, তাও যেন
তার অনুভব করতে লাগল। এবং

তাদের এই অনুভূতি তাদের বেশ
আরামে দিতে লাগল।

দু'বার চোক গিলল দিবা। তাব
গলা কেমন কাঠ-কাঠ হয়ে উঠেছে।
তার চোখ-দুটোও যেন একটু বেশি
চকচক করে উঠেছে। হঠাৎ নতুন
করে চকচক করে ওঠে নি, হয়তো ঐ
রোদ এসে পড়ায় হঠাৎ এবটু চকচকে
দেখাচ্ছে।

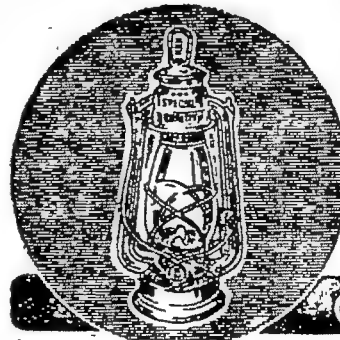
মনোজ অভিনয়ে দক্ষ। নানা
রকম নাটকে সে নেমেছে। অনেক
রকম ভূমিকার সঙ্গে তাই তাব
প্রচিয়। অনেক কবিতাও তাব
কণ্ঠস্থ। দক্ষ অভিনেতা গলায়
তার এই লাগল লাইন-ক'টির আবৃত্তি
তাই-ভালো লেগেছে সকলের।

সকলেই মনে-মনে তারিফ করেছে,
কিন্তু মন্তব্য কেউ করে নি। কিন্তু মন্তব্য
করল দিবা, বলল, 'চমৎকার। ভাব-
একবার বলুন তো, এতুনি যা বললেন।'

মনোজ উৎসাহ পেয়ে গেল, বলল,
'ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে গলা ধরে
গিয়েছে, সবটা দরদ দিয়ে বলতে পারব
না, তবু বলছি—' গলাটা একটু সায়
ক'রে নিয়ে মনোজ বলল—

কোনু দেব আজি আনিলে দিবা
অমৃতসবল তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিবা বিভা।

মনোজের আবৃত্তি শুনে, কেবল
যেন মুগ্ধ নয়, মগ্নমগ্ন হয়ে গিয়েছে দিবা।



কিয়ান

লন্ডন

সর্বোৎকৃষ্ট

গোবিন্দচন্দ্র দাস

ফোন-২২-৬৪৮০

২৩৬, ৩৩৩ চীনা বাজার ট্রাট, কলিকাতা-৯

লোও দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তাবনিমিত্ত একটা
মুতির মত অনড় হবে।

চাপা গলায় হরেশ বলল, 'এই
এই এই---'

সকলে একসঙ্গে তাকাল এই
ধানানের দিকে, দোতলায় বারান্দায়
এসে দাঁড়িয়েছে একটা মূর্তি—
অনড় অটল প্রস্তাবমূর্তির মত।

এখান থেকে, এত দূর থেকে, দেখা
যাচ্ছে এই মূর্তিটা অতি স্পষ্ট। মৃদু সূর্যের
আলোয় বড় বোলাঘোষ দেখাচ্ছে মূর্তিটা।

হবেশ চাপা গলায় আবার বলল,
'চোখ-চোখ। কী ভীষণ এক ছোড়া
চোখ, কী ভয়ংকর স্মৃতি।'

এ চোখ দেখে এর আগেও বুদ্ধি
অনেকে চমকে গিয়েছে। চমক লাগানোর
মতই চোখ বটে।

মনোজ বাধা দিয়ে উঠল, বলল,
'চুপ চুপ।'

ওরা সকলে আজ এখানে অতিথি,
ওরা আগন্তুক। দোতলায় বারান্দায় দিকে
মুগ্ধ করে তারা করজোড়ে নমস্কার
করল। ওরা আশা কবেছিল তারা
ভাদের এই নমস্কারের উত্তর পাবে।
কিন্তু আশ্চর্য, দেখেও যেন দেখল না
এদের, এদের নমস্কারের উত্তরে একটা
নমস্কারও জানাল না। সামান্য
মুগ্ধকু সৌজন্য ওরা প্রত্যাশা কবেছিল,
না পেয়ে হতাশ হয়ে গেল ওরা, একটু
ক্ষুণ্ণও বুদ্ধি হল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অনড়
মূর্তিটা নড়ে উঠল। কাঁধেব ওপরে
খাঁচলটা টেনে নিয়ে বারান্দা ত্যাগ করে
চলে গেল ভেতরে।

'অহংকার!' দিবা বুদ্ধি বিরজি
মাপতে পারল না, বলল, 'অভয়।'

সুহৃৎকর তব দিব্যদৃষ্টি আছে।
যেভাবে সে চিত্রিত করেছে এই চরিত্রটা
তার অন্য তাকে এখন যেন বিগুণভাবে
ভাবিত করতে হয়।

ওরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল
কিছুক্ষণ। ওরা কি-যেন ভাবল
কিছুক্ষণ। ওরা আশা করল, ভেতরে
গিয়ে কাটিকে খবর নিশ্চয় দিয়েছে

ওই মহিলাটি এতকবে, এখন কেউ-
না-কেউ এসে পড়বে, এবং তাদের
চার্জ করবে।

এই আশা এবং এই আশঙ্কা নিয়ে
চুপ করে ওরা অপেক্ষা করল
অনেকক্ষণ। কিন্তু কেউ এল না দেখে
একটু অশ্রুযুগ্ম বুদ্ধি হয়ে উঠল সকলে।

নীহার বলল, 'খুব হয়েছে। এবার
কিবে চলো, ফিরে চলো আপন-স্বরে।
এইরকম একটা গান আছে না,
গানটা এবার বড় গাইতে ইচ্ছে করছে
গলা ছেড়ে।'

নীহারের প্রস্তাব শুনে সবচেয়ে
বেশি বিরজি যে হল, সে দিবা।
সে বলল, 'ফিরে তো যাবই। এখানে
আমরা কেউই থাকতে আসি নি। কিন্তু
আবার আগে একটু দেখা করে যাব,
একটু আলাপও করব।'

স্বল্প হয়ে দাঁড়াল কিছুক্ষণ দিবা
মনোযোগপাণ্ডার। তার দাঁড়বার ভঙ্গির
মধ্যে রীতিমতভাবে ফুটে উঠেছে
যেন প্রতিজ্ঞা ও প্রতিহিংসা। খুবই
অপমান বোধ সে করেছে। যদি
তারা বিনা-অনুমতিতে এখানে ঢুকে
পড়ে কোনো অন্যায় করে থাকে
তাহলে তার জন্য তাদের কাছে
অবাবদিহি চাওয়া হোক। তা যদি
চাওয়া হত তাহলে তার একটা মানে
পাওয়া যেত। কিন্তু এভাবে উপেক্ষা
করে এতটা অবজ্ঞা প্রকাশ করার সবচেয়ে
বেশি সম্মত হয়েছে নিশ্চয় দিবা।
তা না হলে সে এমন কষ্টের মূর্তি নিয়ে
দাঁড়াল কেন।

দিবা বলল, 'আপনারা অপেক্ষা
করুন, আমি আসছি।'

বলেই সে হাঁটা দিল। আগাছা
মাড়িয়ে-মাড়িয়ে সে চলল।

ওরা বাধা দিল না, উৎসাহও দিল
না। ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে
লাগল—এ যাচ্ছে—দিবা। একবারও
ফিরে তাকাচ্ছে না সে। এখান থেকে
দালানটা কিছুটা দূরেই। ওখানে
গিবে পৌঁছতেও কিছুটা সময় তার
লাগবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে
গেল দিবা। সে ঢুকে পড়েছে এই
বাড়িটার মধ্যে। এতটুকু দিবা না
করে সে সোজা চলে গেল ভেতরে।

হরেশ বুদ্ধি একটু অবাক হয়েছে।
অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে
বলল, 'যতটা নরম মনে হয় তা বোধ
হয় নয়। এ ভীষণ মেয়ে একটা।
অচেনা-অজানা জায়গা। তুতুড়োবাড়ির
মত একটা বাড়ি। তেতবে বাব আছে,
না, ভান্সুক আছে জানা নেই—চট করে
চলে গেল ভেতরে? না, এ তো যেমন-
তেমন মেয়ে না হে। পূর্ব-অভিযানে
গেলে এ নিশ্চয় দলের লীডার হতে
পারবে।'

'তা তো পারবে। কিন্তু অতটা
বেগবোয়া হওয়া কি ঠিক? একটু
পরামর্শ করা নেই, একটু আলাপ-
আলোচনা করা নেই; আপনারা
অপেক্ষা করুন, আমি আসছি—এই
রকম একটা ঘোষণা করেই রওনা।
না, বা রে মেয়ে।' বেশ বিরজি হয়েছে
কথাগুলো বলল নীহার।

কিন্তু বিরজি হওয়ার এত
আছে কি? পুরুষদের পক্ষে যা
সম্ভব হল না, তা যদি একটা মেয়ের
পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে তার
অন্য তাকে তারিক করাট দরকার।
কিন্তু এখন তাবিক করার মত মেজাজ
নেই কারো। সকলেই একটা উৎকণ্ঠ
নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাচীরের ওপারে খিরখিরে জলের
ধারাটার পাশে যেমন দাঁড়িয়ে আছে
ভাদের গাড়িটা, একেবারে অনড় হয়ে,
ওরাও তেমনি প্রাচীরের এপাশে দাঁড়িয়ে
আছে নিশ্চল মূর্তিতে। আশেপাশে
লোকালয় নেই বলে রক্ষে, তা না হলে
ভাদের এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে
দেখে এখানে ভিড় অনেক যেত নিশ্চয়।

বাইরের কোনো ভিড় এখানে
অমলো না বটে, কিন্তু ওরা
পাঁচজনই একটা ভিড় সৃষ্টি করে
অডো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গঙ্গাধর শাস্ত্রী চট্টোপাধ্যায় শিবনাথ
ছিলেন :

‘মানুষ হইতে হইলে ও দেশ-
হিত করিতে হইলে তাঁহার মতো
পরিশ্রম করিতে হইবে। আত্মকাল
নেতা হইবার অনেক সোজা পথ
আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে নেতা
হওয়া যায়, বিখ্যাতও হওয়া যায়,
কিন্তু মানুষ হওয়া যায় না, প্রকৃত
দেশহিতও করা যায় না।’

এই ক’টি কথাই মধ্যে দিয়েই
বর্তমান ব্যক্তির দুর্বলতর স্নায়ুটিতে
হাত পড়েছে। স্বামিনন্দ চট্টোপাধ্যায়
ছিলেন তখনকার যুৎ-আন্দোলনের
একজন নেতা। কিন্তু সে আন্দোলনের
ধরণটা ছিল আলাদা। বর্তমান যুৎ-
আন্দোলন সংক্রান্ত নানান অসা-
মাজিক ব্যবহার সম্পর্কে যখন কথা
ওঠে, তখন কেউ না কেউ বলে
থাকেন—‘কোনো বাংলা দেশের আকাশে
একদিকে অনেকগুলি উজ্জ্বল তারা
দেখা গিয়েছিল, তাঁরাই’ ছিলেন
যুবকদের পথপ্রদর্শক; এখনকার
আকাশ সন্নিহিত, বাংলার তাই দুদিন।
পঞ্চাশ মহাপুরুষ আর জন্মাচ্ছে না,
শেষের দেশের ছেলেরা পথ-প্রদর্শক
হয়ে পড়েছে। কিন্তু স্বামিনন্দর জীবন-
বৃত্তান্ত পড়লে মনে হয় কথাটা সর্বংশে
সত্য নয়। বিধাতার প্রসাদে ক’টি
বিশেষ গুণের অধিকারী হয়ে জন্মালেই
সহাপুরুষ হওয়া যায় না।

এ গুণগুলিকে সফুরিত করে অন্য
মানুষের উপর নেতৃত্ব করবার যোগ্য রূপ
দিতে হয়। তাও যথেষ্ট নয়; জন-
সাধারণের চেতনের সামনে উপযুক্ত
আলোচ্য তুলে ধরে, কিভাবে ও
কোন পথে সাধনা করতে হবে তাঁর
নির্দেশ দিতে হয়। এইখানেই শেষ
নয়। নেতা যদি বা তৈরি হল,
যথেষ্ট আগ্রহশীল একটা সমা-
জেরও তো প্রয়োজন আছে, নইলে
নেতার হৃদয়ের কথাগুলি অরণ্যে
সোদন কববে।

স্বামিনন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর
সঙ্গগণ সেইরকম সমাজ তৈরির কাজে
নিজদের উৎসর্গ করেছিলেন। দুই
পুরুষ আগেকার সেই মনীষীরা দুর্ল-
ভৌম ছিলেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু
দেখকে শুধু স্বাধীন করতে চান নি
তাঁরা, দেশকে স্বাধীনতার যোগ্য করে
তুলতে চেয়েছিলেন। অধ্যবসায়ী,

গত্যাশ্রমী ও ত্যাগী হতে নিঃসন্দেহ
শিখিয়েছিলেন, সমাজকে সে শিক্ষা
দিতে চেয়েছিলেন।

সময়কালে হয়তো সেট স্বীকার
ফল দিত, কিন্তু স্বাধীন থেকে শিক্ষা
হঠাৎ কালের কেবে স্বাধীন হয়ে
গেল। কয়েকজন দেশপ্রেমিক কারা-
বরণ, সর্বস্বত্যাগ, এমন কি প্রাণদান
করলেও, সমাজকে এবং জনসাধারণকে
বিশেষ কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে
হল না। পড়ে-পাওয়া চোদ্দ-আনার
মতো, ধাবে ধারে একটু ভাতা একটা
স্বাধীনতা তারা পেয়ে গেল। মানুষ
তৈরি হবার অনুকূল আবহাওয়া
এ নয়।

কলে, মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমিকের
দিন গিয়ে, প্রাধান্যকারী রাজনৈতিক-
দের দিন এসেছে। স্বামিনন্দ চট্টো-
পাধ্যায়দের কৈশোর ও যৌবনের বড়
পরিচয়ের ও ত্যাগের সাধনা এখন
সেকলে হয়ে গেছে। চলাচলের
আর রাজনীতির ক্ষেত্রে ছাড়া নেতারা
কেউ কড়ি পায় না। মনীষীর বীজ
কোথাও লোকোনা থাকলেও, কেউ
সেখানে জল দেখ না।

তখনকার আবহাওয়া ছিল অন্য-
রকম। স্বামিনন্দ চট্টোপাধ্যায় জন্ম-
ছিলেন ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে, বুদ্ধিবৃত্তি
ও মননশক্তি সাধারণের চেয়ে তাঁর
কিছুটা উন্নতই ছিল। অল্প বয়সে
পিতৃহীন হয়েছিলেন, অনেকখানি
নিজের চেষ্টায় ও বৃদ্ধির সাহায্যে
পড়াশুনা করতে হয়েছিল। বাকুড়ার
প্রকৃতির বুকে ছোটবেলাটি আনন্দেই
কেটেছিল, আঠারো বছর বয়সে
কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষা
পাশ করে, সামান্য জলপানির উপর
নির্ভর করে কলেজে পড়বার জন্য
স্বামিনন্দ কলকাতায় এলেন।

তখন ১৮৮৩ খৃস্টাব্দ, কলকাতা
অতিশয় প্রাণচঞ্চল। সে চাকল্যের
সঙ্গে পরবর্তীকালের রাজনৈতিক
চাকল্যের একটা বড় তফাৎ ছিল।
তখন ছিল তৈরি করার যুগ, সমাজ
তৈরি, মানুষ তৈরির যুগ, পরে

এসেছিল ভাষার যুগ। এর পাঁচ বছর
আগেই শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কমল
গোস্বামী, রামকুমার বিদ্যাবতী ইত্যাদি
কয়েকজন ডেপুটি ও সত্যাশ্রমী সাধক,
আদর্শ স্বাক্ষর জন্য কেশব সেনের
নববিধান সমাজ ছেড়ে এসে সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
তখনকার বাংলার কথা বলতে গেলে
ব্রাহ্মসমাজের অবদানের কথা না
বললে চলে না। গতি কথা বলতে
গেলে, নতুন একটা ধর্ম প্রবর্তনের
ইচ্ছা রাজা রামমোহন ঝায়ের অঙ্গী
ছিল না। প্রচলিত শাবক ধর্মের
তিনি উপরকার অবরণ যুক্তিয়ে তাঁর
স্বাক্ষর সাধন করতে চেয়েছিলেন।
আর চেয়েছিলেন পুরোনো সমাজটাকে
কুসংস্কার মুক্ত করবে।

করতে চাইলেন এক, হয়ে গেল
অন্য। কিন্তু সেই অন্যটির প্রচণ্ড
উজ্জ্বল প্রবল রূপ দেখে
রামমোহন নিজেও সম্ভবত মুগ্ধ হয়ে
গিয়েছিলেন, সমস্ত বাংলা দেশ নতুন
প্রাণ পেয়েছিল। তাঁর জন্য সবাইকে
কিছু বাধ্যধর্মে দীক্ষা দিতে হয় নি;
যে নগ্ন সত্য ও উদার সম্মতির মন্ত্র
দিল ব্রাহ্মসমাজ, তার প্রতিজ্ঞা
দেখা দিল সারা ভারতে। এই নবীন
সমাজ নতুন একটা প্রাণের সাক্ষাৎ
জগালেও, এ কথা ভুললে চলবে
না যে, গতা ও গাম্য ব্রাহ্মসমাজের
নির্ভর একচেটিয়া অধিকার হয়ে
দাঁড়ায় নি। তখনকার যুবকদের আদর্শ
পুরুষদের মধ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর
ও সুহৃৎনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন।
সেইসঙ্গে ব্রাহ্ম আনন্দমোহন বসুও
নাম করতে হয়।

এঁরা ছাত্রদের গড়ে তুলবার
উদ্দেশ্যে স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হিন্দু স্কুলের
একটা গ্যালারি দেওয়া ঘরে তাঁর
অধিবেশন হত। এখানে ছেলেদের মন
প্রশস্ত করা হত, দেশকে ও দেশের
লোকদের বড় করে তুলবার অনুপ্রেরণা
দেওয়া হত।

মানুষ তৈরি কান্না জীবনেই
এই হয়নি। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে ইন্ডিয়ান
ম্যাসনাল কমফারেন্সের অধিবেশন
হল। বলা যেতে পারে যে এরই মধ্যে
উদ্বিগ্ন কংগ্রেসের বীজ লুকিয়ে
ছিল। ছাত্রদের ও তরুণদের মনে
জুনাতি ও স্বদেশপ্রেমের স্ফূর্তি উদার
সমাবেশের স্রষ্টা হতে লাগল। ঠিক
এইসময় তরুণ রামানন্দ ও কলকাতার
এসে পৌঁছেছেন। তখন শিক্ষার
নতুন আদর্শ নিয়ে সিটি স্কুল ও পবে
কলেজ প্রতিষ্ঠা হল। আগে প্রেসি-
ডেন্সি কলেজে ও শেষে সিটি কলেজে
পড়ে রামানন্দ বি-এ পাশ করেছিলেন।

তখনকার দিনে এসব অনুষ্ঠানে
ওষু পুঁথিপোড়া তৈরি হত না, সঙ্গে
সঙ্গে মনুষ্যত্বের মন্ত্র দেওয়া হত।
প্রতি বহিবার এখানে ছাত্রসমাজের
অধিবেশন হত। তার উদ্দেশ্য নৈতিক
ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। এসব শব্দ
উচ্চারণ করতে লোকে তখন ভয়
পেত না। ভালোকে ভালো বলবার
ও মন্দার নিন্দা করবার সংসাহল ছিল
নেতাদের। অগুণীল ও সাধনাম
বুগ সেটা, আন্দোলনের নয়। আন্দো-
লনের মধ্যে যে একটা কেন-দিয়ে-
না, কেন-দিয়ে-না তাব আছে, সে
ভাব তখন নেতাদের মনে ছিল না।
তাদের ছিল নিজেই প্রস্তুত হয়ে সব
অধিকার জয় করে নেব—এইরকম
একটা ভাব।

কলকাতায় এসেই রামানন্দ
শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রভাবে পড়েছিলেন।
অবশ্য কৈশোর থেকেই ব্রাহ্মধর্মের
প্রতি তাঁর হৃদয়ে একটা আকর্ষণ
ছিল। বাঁকুড়া জেলাতেও ব্রাহ্মসমিতি
ছিল, নিবানত সেখানে উপাসনা হত।
জেলা স্কুলের গণিত শিক্ষক কেদার-
মাধ কুলতী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের
সভ্য ও বাঁকুড়া সমাজের আচার্য।
খালক রামানন্দ বহু-বাহুব নিয়ে তাঁর
উপাসনা শুনে। যেতেন। কুলতী
বড় সুন্দর গুপ্ত বলতে পারতেন।
তাঁর মুখে গোনা বসিক্ত পরমহংসের
বিষয় একটি কাহিনী রামানন্দের বড়
ভালো লেগেছিল। বসিক্ত এক
হাতে গোনা আর এক হাতে মাটির
চেনা নিয়ে হাত বদল করতে করতে
বলতেন—মাটি গোনা, গোনা মাটি—
জায়গার এক সময় দুটোকেই গজার
কলে কেলে দিতেন। এসময় সব দৃষ্টান্ত
দিয়ে রামানন্দের মন তৈরি হয়েছিল।

নিজে স্কুলে পড়তে পড়তেই
বন্ধুদের সঙ্গে বাড়িতে একটি নির-
ক্ষরদের জন্য স্কুল করেছিলেন।
সিঁড়ির ধাপে কুশ বসত, উঁচু কাশের
ছাত্ররা উঁচু ধাপে আর নিচু কাশের
ছাত্ররা নিচে। বিদ্যাদান কবাব তাঁদের
উৎসাহ কত। সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও
প্রস্তুত হতেন। রমেশচন্দ্র দত্ত 'রাজ-
পুত জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মহারীষ্ট্র জীবন-
প্রভাত' ইত্যাদি গ্রন্থ শেষেই
তাঁদের স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র দিয়েছিল।
কলকাতায় এসেও ভালো লোকের
হাতে পড়লেন রামানন্দ; তাঁর শিক্ষক
মহাশয়দের মধ্যে ছিলেন জগদীশচন্দ্র
বসু ও হেরবচন্দ্র সেন, প্রচণ্ড পৌরুষের
মূর্তি দুজনেই। সত্যান্বেষী জগদীশ-
চন্দ্র একাগ্রচিত্তে সারা জীবন সাধনা
করে গেলেন, কোনো কষ্ট কোনো
ত্যাগ তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।
লোকভর ছিল না হেরব মৈত্রেয়,
যাকে উচিত বলে জানবেন, শত
টিটকিরির মধ্যেও তাকেই আশ্রয়
করে থাকবেন। এঁদের হাতে মানুষ
রামানন্দ অসাধারণ হবেন না তো কি
হবেন।

মানুষ হতে হলে প্রথমেই জগৎকে
প্রজ্ঞা করতে জানতে হয়, বিধাতার
স্রষ্টা এই পৃথিবীর একটা মঙ্গল উদ্দেশ্য
আছে বলে বিশ্বাস করতে হয়।
হেরবচন্দ্র সম্পর্কে এসব দিনের স্মৃতি
পরে রামানন্দ লিখেছিলেন :

'তিনি জুনাতির কঠোর ও
দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। প্রকৃতিতে মানুষে
এবং মানুষের বচিত ও স্রষ্টা
সমুদয় বস্তুতে, সাহিত্যে, চিত্রে,
স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, সৌন্দর্যের তিনি
চির অনুরাগী ও হৃদয়গ্রাহী ছিলেন।'

রামানন্দ যখন সিটি কলেজের
ছাত্র তখন উমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন
কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি ইতিহাস
পড়াতেন, রামানন্দ ইতিহাসের ছাত্র
ছিলেন না, ওষু তাঁর চরিত্রতত্ত্ব
মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর নিরলস কর্ম-
কুশলতা ও বাজে গল্পের প্রতি
বিস্ময়তা এই ছাত্রটির প্রজ্ঞা অর্জন
করেছিল। তাঁর উপাসনা শুনে
শ্রোতার মুগ্ধ হতেন। এই প্রসঙ্গে
রামানন্দ লিখেছিলেন :

'দত্ত মহাশয় বংগী ছিলেন

না, কবি-প্রতিভাও তাঁর ছিল
না। কিন্তু জ্ঞানযোগ, পুণ্য
কর্মযোগ ও মনল ভজিযোগে তিনি
পরব্রহ্মের সহিত এরূপ যুক্ত ছিলেন
যে তাঁহার উপাসনা ধর্মপিপাসুদের
সাতিশর হৃদয়গ্রাহী হইত।'

বাস্তবিক উমেশচন্দ্র দত্তও সাধারণ
মানুষ ছিলেন না। সে সময়কার
প্রতিকল পরিবেশেও তিনি বাংলা
দেশে উপযুক্ত নারীচরিত্র গঠনের
উদ্দেশ্যে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রবর্তন
করেছিলেন বলেও তাঁকে স্মরণ করা
উচিত।

শিবনাথ শাস্ত্রী সর্বদা রামানন্দ
বলেছিলেন : 'তাঁহার কথাতে শ্রোতার
মনে একটা ধাক্কা লাগিত, তাহার
চিন্তার দ্বার খুলিয়া যাইত, সে নতুন
কিছু শিখিয়া গৃহে ফিরিত।'

তখনকার দিনে সমাজসেবা,
শিক্ষাদান ও স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত
হওয়া একই কথা ছিল। দেখতে
তাঁরা অনেকে ছিলেন অমারিক, কিন্তু
অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হলে
আশুন হয়ে আসে উঠতেন।
তাঁদের সংগ্রাহকের অবধি ছিল না।
আদর্শের জন্য সর্বস্বত্যাগ তাঁরা
অনেকেই করেছিলেন। ১৯০৯-১০
খৃস্টাব্দে দেশে স্বদেশী আন্দোলন
অতিশয় প্রবল রূপ নিয়েছিল। বৃটিশ
সরকার নেতাদের দলে দলে নির্বাসন
দিতে লাগলেন। শেষে এমন দাঁড়াল
যে প্রতিবাদ সভায়ও সভাপতি পাওয়া
যায় না। আন্দোলনের নেতাদের এই
আশঙ্কা যে তাহলে সরকার শ্রেণীর
কবাবে। এর কাবণ তর নয়, সকলে
শ্রেণীর হলে আন্দোলন চালাবে-কে ?
এই সমস্রের কথা রামানন্দ লিখেছেন :

'বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের
পাওয়া গেল না বলিয়া ধর্মপ্রচারক
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের
প্রতিবাদ সভায় সভাপতি হইতে রাজি
হইলেন।'

তখন নেতা বলতে এই রকম
মানুষ বোঝাতো। এঁদের হাতে
রামানন্দের মতো আরো কত
সত্যান্বেষী সংগ্রাহী দেশপ্রেমিক তৈরি
হয়েছিলেন, যার জন্য আশঙ্কাল
লোকে বলে—সেবালের আকাশ
ভাস্করচিত ছিল, এখন রাঁও
ভাস্কর।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

১৬০৭ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ডে চতুর্থ অভিযান শুরু কবেছিল।

সমুদ্র শান্ত। যতদূর চোখ যায়, চোঁটগুলো মাথা দু'লিমে দু'লিমে চঞ্চল শিশু মত খেলা করছে। মাথার ওপরে বিপুল ধাতু আকাশ গভীর নীল। ভরভর করে গতির আনন্দে এ্যাসেনগান আর ইউনিয়ন ভেসে চলেছে গম্ভ্য-স্থানের দিকে। ঠিক নয় মাস পরে এ্যাসেনগান পৌঁছে গেল এন্ডেন দ্বীপে।

কিছু সাল এতেনেব বাজারে ঝিঁজি করল। কিছু কিনল। আবার ভেসে পড়ল সমুদ্রের বুকে। কিন্তু কিছুবুঁর গিৰেই হঠাৎ মধ্যরাত্রে জাহাজ তীব্র জোরে কেঁপে উঠল। কোথাও কিছু নেই। হেদিকে তাকাও মলীকুল অন্ধকার। ওপরে নীচে, ভাইনে বাঁয়ে কে যেন একেবারে ঘন কালি লেপে দিয়েছে। মনে হচ্ছে জাহাজ যেন কোম পাতালপৃথিবী অন্ধকারের দিকে একটু একটু করে প্রবেশ করেছে।

• যাকামে তারার দীপালি ছলছে।
• মেঘ নেই।

ঝড় নেই, বাতাস নেই। তবুও—

তবুও কেঁপে উঠল কেন জাহাজ। অধিনায়ক সার্পের মুখে দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্ন। এ কী! জাহাজের খোঁলে হড় হড় কবে জল উঠছে। আন একই একটু করে ডুবছে জাহাজ। প্রাণ বাঁচানোর জন্য কোন আধুনিক সবল্যাম নেই। চারদিকে অকূল সমুদ্র। হাহাকাহ করে উঠল নাবিকদের দল।

বাঁচাও—

বাঁচাও—বাঁচাও ক্যাপ্টেন।

সার্পে তো ভগবান নন। মানুষ। নাবিকদের মত তাঁরও জী-পুল আছে দু'দেশে। মুক পঙ্ক মানুষের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। জাহাজ আশ্বে আশ্বে ডুবছে। নাবিকদের আর্তনাদে, সমুদ্রের গর্জনে মনে হল জলের এই পৃথিবীর দিকে দিকে একটা মহাপ্রলয় শুরু হয়েছে। একবার শুধু সার্পে চিৎকার করে উঠলেন—দেখতে পাচ্ছ—ডুবো পাহাড়। ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটছে।

আর কার কথা কে শোনে।

কি হবে কারণ জেনে।

অকূল সমুদ্রে মানুষগুলো কে

কোথায় ভেসে গেল। আন কোনদিকি কেউ তাদের কোন খোঁজ পেল না। আব—

ইউনিয়ন কি করল? বৃষ্টিশব্দে এই চতুর্থ সমুদ্রযাত্রার মত-এত মর্মান্তিক বোধ হয় আর কোন যাত্রায় হয় নি।

ইউনিয়ন সমুদ্রের কাছাকাছি প্রিয়ামানে পৌঁছল। প্রিয়ামান বন্দর থেকে কিছু পরিমাণ আদা নিয়ে বণ্ডনা হলো স্বদেশের মাটির দিকে। কিন্তু কী আশ্চর্য। একেবারে বাডিন কাছে—ক্রান্স এসে সমুদ্রে ঝড় উঠল।

সে কী প্রচণ্ড ঝড়। আব বাতাসের মাতামাতি। ভাইনে বাঁয়ে জোং জোরে দুলতে লাগল। আর নীচের তলার জল এসে উঠে পড়ল। শেষ পর্যন্ত বহু মানুষের স্বপ্ন, বহু মানুষের সুতিমান আকাঙ্ক্ষা সেট ইউনিয়নকে সবুজ একেবারে গ্রাস কবে ফেলল।

তীব্র শোকাবহ পরিণতির ভেতরে চতুর্থবারেব অভিযান শেষ হ'য়ে গেল। ১৬০৮ খৃস্টাব্দে আবার প'য়েন অন্ডিয়ানের আরোহণ শুরু হলো। ইতিমধ্যে তৃতীয় অভিযানের একটি জাহাজ 'কনসেপ্ট' ফিরে এল নিরাপদে দেশে।

জাহাজ বোঝাট মশলা। ভারতবর্ষের উপকূলে উপকূলে যে সব সুগন্ধী মশলা জন্মায়—তার প্রচুর কদর ছিল বিদেশে।

কনসেন্টেব কম্পানি দেশে ফিরে এসে এক রোমাঞ্চকর বিবৃতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দুবপ্রাচ্যের সমুদ্রে ইংরেজের শত্রুতা ছড়িয়ে রয়েছে। একটা জাহাজ পেলোট এই ডাচ পর্্তুগীজদের দল তাদের জাহাজ আক্রমণ করে নব্বই লুট নেয়। আসাব মতে দুই বিদেশে যেসব অধিনায়করা ও শাখামানরা যাবে তারা শুধু নৌবিন্যাস পারদর্শী হলেই চলবে না—তাদের হাতে হবে নিপুণ গোড়া। তবে বিদেশে ব্যবসায় সার্থকতা আসবে।

তাই অভিজ্ঞতা সম্ভ্রান্ত শুনেছিলেন পঞ্চম সমুদ্রযাত্রার অধিনায়ক কম্পটন মিডলটন। তিনি নিপুণ সৈনিকদের ভেতর থেকে বেছে নিলেন তাঁর সহকারী নাথিক।

মিডলটন ছয় হাজার পাউণ্ড ব্যয় করে সব দিক থেকে দুবপ্রাচ্যের সমুদ্র-যাত্রার জন্য জৈরি যোগাড়লেন। তাঁর অভিযানসার্থকতার অসম্ভাব্য পেরেছিল।

দিন কাটে। মধ্যপ্রাচ্যে দুবপ্রাচ্যের দেশে-দেশে ইংরেজরা একটা একটা করে বাণিজ্যকে প্রশস্ত করে তোলে। কিন্তু ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত সরাসরি জাহাজ ব্যবসা তারা করতে পারে নি। তারা হয়তো কালেভদ্রে কোন একটা জাহাজ দিয়ে—এদেশের কোন উপকূলের বলবে এসেছে। আবার—

মশলা কি মসলিন নিয়ে দেশে চলে গিয়েছে। তাবা তখন শুধু 'ইউরোপীয় লণ্ডনগর' নামে বসে। তারা ইংবেজ জাতি কি তাদেরই দেশের ব্যবসায়ী সংস্থা 'ষ্টাট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' হিসেবে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু—

এইভাবে ডাচ, পর্্তুগীজ শত্রুদের মার খেয়ে খেয়ে নিভাস্ত দীন ব্যবসায়ীর মত ব্যবসা চালিয়ে যেতে তাদের মন উঠছিল না। অতএব—

অতএব ইংবেজ ব্যবসায়ীরা চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা মিটিং ডাকল। সেট

মহতী সভায় পাঠ করা হলো রাণী এলিজাবেথের সনদ—

Exclusive trade was granted to East India Company for 15 years by Queen Elizabeth was not expired till 1615.

১৬০০ খৃষ্টাব্দে যে সনদ দিয়েছিলেন রাণী, তা ১৬১৫ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

সেই সনদের প্রত্যেকটি স্তম্ভ নিয়ে সভায় আলোচনা হলো। ব্যবসায়ী সম্মুখের দাবি তুললো—শুধু আগামী ১৬১৫ পর্যন্ত নয়। আজীবন তাদের পূর্ব-ভারতীয় বাণিজ্যে কিংবা বিদেশে বাণিজ্য করতে দেওয়া হোক, সেটা সঙ্কে বিদেশে তাদের কোম্পানীর নামে জরি কিনতে অনুমতি দেওয়া হোক, সেওয়া হোক কুটি স্থাপন করার অনুমতি।

লণ্ডনের মাটিতে শত শত শতাব্দী পূর্বে কোথায় কবে কি সভা হয়েছিল, বাঙালীর বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত নিখোঁতে বগে ভাঙে উল্লেখ করতে হচ্ছে। তাব কাষ, এইসব ছোটখাটো সভার বক্তাদের প্রত্যেকটি দাবির ভেতবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাস নিঃশব্দে রচিত হয়ে চলেছিল।

সামুদ্রিক বাণিজ্যে, দুবপ্রাচ্যের উপকূলে বাণিজ্যে ডাচ পর্্তুগীজরা ইংরেজদের পূর্বসূরী। কিন্তু পর্্তুগালে কোন শহরে পর্্তুগীজ ব্যবসায়ীরা এঠরকম সভা কবেছে বলে কোথাও পাঠ নি—কোথাও শুনি নি। শুধু বাণিজ্য নয়, শুধু অর্থ-লোলুপতা নয়, পরবাস্য-লোলুপতাও তাদের রাজের ভেতরে বিষের মত ক্রিয়া করছিল। তা না হলে বাণিজ্য করতে এসে—জরি দখলের কথা কে ভাবে?

ইংবেজ ব্যবসায়ীদের এই সভার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল। তদানীন্তন-কালের শাসকবর্গ ব্যবসায়ীদের প্রত্যেকটি দাবিকে সমর্থন করেছিলেন।

Instead of 15 years, East India

Company was granted to trade for ever.

কিছু—

Granted. অনুমতি দিনেই তো হয় না। কৃতকার্যতার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এদিকে দুবপ্রাচ্যের দেশগুলোও ক্রমে ক্রমে হতেন হয়ে উঠছিল যে, বিদেশী ব্যবসায়ীরা বড় বেশি সুবিধা পাচ্ছে। এইজন্য—এইজন্য বাংলার সুবেদার ঘোষণা করেছিল—

The merchants who have not no license, are allowed to trade in the coast.

বাংলার সুবেদারের দেবাদেশি দাকিগাত্যের সুবেদারও এই সনদ দিকে দিকে ছড়ানি করে দিল—ব্যবসা করতে হলেই লাইসেন্স করতে হবে। পঞ্চম সমুদ্রযাত্রার অধিনায়ক কালিকটে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি দাকিগাত্যের মোগল শাসনকর্তাকে বললেন, বেশ লাইসেন্স করছি। কিন্তু বললে বললে ডাচ, পর্্তুগীজদের আপনারা বাণিজ্যে যে সুবিধা দিয়ে থাকেন—সেগুলো সব আমাদেরও দিতে হবে।

দিয়েছিলেন। তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল। মঞ্জুরী পাওয়া মাত্র তেল-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল পর্্তুগীজরা। অল্প আক্রোশে উন্মত্ত হয়ে উঠল ডাচরা। তারা রাজির অধিকারে এসে মিডলটনের সব জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিল। হয়তো মিডলটন অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পেয়ে সুখবপু দেখছিলেন। কিন্তু—

জুলন্ত জাহাজের ভেতবে, চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখার ভেতবে জেপে উঠেছিলেন শুধু মৃত্যুকে বরণ করার জন্যেই। খবর পৌঁছাল ইংল্যান্ডে। গভীর নৈরাশ্যের ছায়া নামল ইংরেজদের মনে। ভারতবর্ষে হয়তো বাণিজ্য করতে যাওয়া ঈশুরেরই অভিপ্রেত নয়। আরও কত ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করতে হবে, কত অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।

(ক্রমশঃ)



তুগলকাবাদ মর্গের ধ্বংসাবশেষ

দিল্লীতে তখন তৈরি হচ্ছিল নতুন মহানগর। গিয়াসুদ্দীন তুগলক ব্যস্ত ছিলেন দিল্লীর অনুরে আপন নামানুসারে এই মহানগর নির্মাণে—তুগলকাবাদ।

অটালিকা, মহানগর শুধু অর্ধতেই তৈরি হয় না। চাই লোকবল। এক কথায় বাদের বলা হয় মজুর। যুগ যুগ ধরে যারা শুধু অপরের প্রাসাদ তৈরিতেই কাটিয়েছে নিজেদের জীবন, সেই মজুরদল।

শাহান্শা গিয়াসুদ্দীন হুকুম দিলেন দিল্লীর কোন মজুর যেন বাদশার হুকুম ছাড়া অন্য কোন কাজে হাত না দেয়। প্রতিটি মজুরকে চাই বাদশার এই নতুন পরিকল্পনাকে রূপ দিতে। তাঁর মস্তকে রূপায়িত করতে হবে এ নতুন মহানগরে।

রাজদণ্ড হাতে দিলেন এ হুকুম।

হাকিমের দল ব্যস্ত হয়ে এ হুকুমকে চালু করল দিল্লীর চারিপাশে। মজুরের

দল আনা হল মীরাট নোরাদনগর আরও কতদূর থেকে। তাদের নামও আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বিলীন হয়ে গেছে।

কর এত সাহস যে, এগে দাঁড়ায় বাদশার হুকুম অমান্য করে?

তাই তো? কি করা যায়?

এদিকে দরিদ্র পথচারীর পিপাসা দূর করতে পীরশ্রেষ্ঠ নিজামুদ্দীন সাহেব

তো নয়। তারা খুব হতে পারে, বিবেকহীন তো নয়।

দিনে তারা টাকার গোলাব। রাতটা তাদের। দিনে বাদশার কাজ করে অর্থের বিনিময়ে। রাতে করে খাজা সাহেবের—হৃদয়ের বিনিময়ে। সেই হৃদয় আসমান পর্যন্ত ছুঁয়ে আসে যার প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা।

বাদশার চোখে খুলে দেওয়া চলে না। রাজা কর্ণে পশ্যতি। কান দিয়ে দেখে। মহানগর তৈরি হতে এত সময় লাগছে কেন? ধীরে ধীরে তাঁর কানে গেল সব কথা। দিনে কাজ করবে কি করে? রাতে যারা কাজ করে তারার আলোয়, দিনের ঝলমলে আলোতে শরীর তাদের ঝিমিয়ে আসে কেন? অনিচ্ছায়, অবসাদে।

রাজার হুকুম অমান্য?

নতুন হুকুম এলো। শাস্তি দিতে হবে মূর্খদেরকে। তারা জানুক রাজদণ্ড-

শ্রী বিবেকরঞ্জন শ্রীদাস

তখন শুরু করে দিয়েছেন আপন দীর্ঘিকা খননের কাজ। দরিদ্র মজুরের দল বিনা পারিশ্রমিকে তখন খাজা সাহেবের তালাব কাটাতে ব্যস্ত। তারা দরিদ্র হতে পারে, তারা দীন হতে পারে, তারা হীন তো নয়। তারা তো কারুর গোলাব নয়। বিবেকহীন তারা, হৃদয়হীন

বীর হাতে জীবনযাত্রার চাবিকাঠিও তাঁরই হাতের। এর চুলচেরা ব্যতিক্রম করলে নেকি কোনো ক্ষমা।

দশে দশে শ্রমিক বাদশার হুকুম অমান্য করে সন্ন্যাসী-ফকীরের পদ-প্রাপ্তে আশ্রয় নিল। চাই না তাদের জীবিকা-নির্বাহের অর্থ। যে খোদাভালা কিদে দিয়েছেন, সেটা মেটাবার ভারও তাঁরই। চাই শুধু খাজা সাহেবের দোয়া—আমীরাবানী। তারা চায় না অর্থ, চায় না বিত্ত। চায় শুধু ইন্সানিয়ারত, সহন্য, উজ্জ্বল—চার শুধু প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা। চার সভ্য-পন্থাগুলির আশ্রয়কণ্ঠ।

রাজসভা হাতে বাদশা রাগে কাঁপতে থাকেন। এত বড় সাহস! এতখানি শক্ত বে-ইজ্জতি? একজন সাধারণ ফকীরের এত শক্তি প্রতিপত্তি?

সিঁহাসনীন তুগলক সন্ন্যাসীকে আক্রমণ করার ভর দেখালেন।

অনৌকিক ঘটন ঘটে শুধু এই হিন্দুস্থানে। রাজধানী দিল্লীতে তার সেদিন ব্যতিক্রম ঘটে নি।

তীত শিষ্যবৃন্দ বেশ চমকন হয়ে উঠলো। ভীতি-বিস্ময় দিল্লীবাসী মোস্তাফিজের পায়ে পড়ে কাতর অনুরোধ জানায় এ-দরগা ছেড়ে যেতে।

গতিই তো বীর হুকুমে শত সহস্র সৈনিক মিনেবে নমস্ত দিল্লী শহর ধুলিমাং করে দিতে পারে, তাঁর মাঝে টেকা দিয়ে লাভ কি?

ফকীর বীর দ্বির। নির্বাক।

সকলকে অটল সত্যসন্ধানী সন্ন্যাসী হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দেহলি হনোজ দূর অস্থ'। দিল্লী এখনও অনেক দূর।

এদিকে সৈয়দো শাহানশা এগিয়ে আসছেন।

মজুরের দল দিবাংগিনী তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পয়গামেরের মুখের দিকে তাকিয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করছে। 'কি হবে হজুর? শুধু তো খাজা সাহেবকে নয়। শাহানশা'র কড়া হুকুমে একটা একটা করে মজুরের ফাঁসি হবে।' দিল্লীর বাদশার ফাঁসিকাঠের দড়ির দাম আছে—দাম নেই শুধু জনগণের প্রাণের। গুলোটের হুকুমের বে-ইজ্জতি? শাহানশা'র হুকুমের অকমাননা। একমাত্র শান্তি প্রাপ্তকণ্ঠ।

দিল্লীর দরিদ্র শ্রমিক-কুটারে সেদিন কান্নার রোজ পড়েছিল।

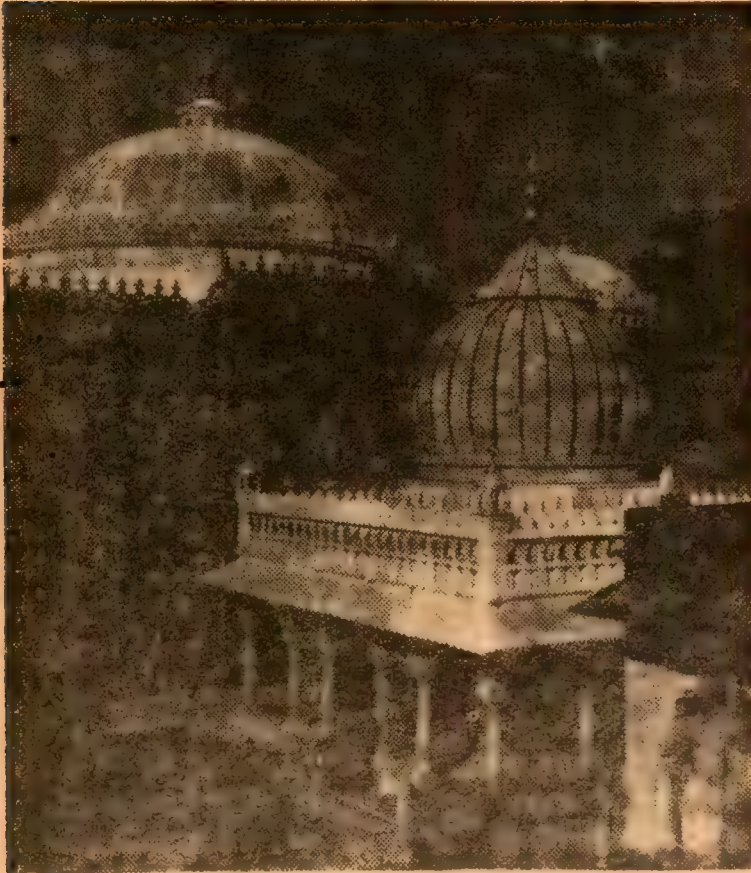
ভীত-চকিত মজুর দল আত্মনির্যাসে মুগ্ধিত করেছিল রাজধানীর আকাশ-বাতাস। তারা কি করবে? নিরস্ত্র সন্ন্যাসী খাজা সাহেব কি করে এ প্রতাপশালী গুলোটের অগণিত সেনানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন?

খাজা সাহেবের দ্বির ভাব। মুখে শুধু এই এক কথা, 'দেহলি হনোজ দূর অস্থ'। দেহলি এখনও দূরে।

সেদিন দিল্লীবাসী এ সন্ন্যাসীর শক্তিতে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। আপন চোখে তারা সেনা বিশৃঙ্খল করতে চাইছিল না, বিশৃঙ্খল হচ্ছিল না চোখের সামনের অনৌকিক ঘটনা। এ বিস্ময় শুধু সেদিনেরই নয়। এ বিস্ময় চিরন্তন, শাশ্বত। এ রহস্যের গভীর তমিশার আলোকপাত করার শক্তি আছে কার? কে দিতে পারে এ মৈব ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যা?

কিছু ঘটেছিল। হিন্দুস্থানের রাজধানী মহানগরী দিল্লীতেই ঘটেছিল এ ঘটনা।

কিসমতে অভিজ্ঞ দিল্লীবাসী সেদিন অবাক নয়নে দেখেছিল খাজা সাহেবের পদপ্রাপ্তে বসে শাহানশা'র কাছে দিল্লী গতি অনেক দূর। নমস্ত শাহানশা'র মাথায় প্রবেশকার ভেঙে পড়লো। তাঁর ব্যাতি, প্রতিপত্তি, নমগর্ভ শক্তি, সব



জামতে খানা

নিজামুদ্দিনের কবর

মুহুর্তে বন্যার ধুমার লুটিয়ে পড়লো।
শিখাঢল সববেত কণ্ঠে চৌচিরে উঠলো,
'দেহলি হনৌর দূর অস্থ'—দেহলি
এখনও অনেক দূর।

গাননে ঐ গৌরী ভাষা। সংস্কার-
ভাবে মৃতপ্রায়। আজও মুক্তিকামী হিন্দু-
মুসলিম তীর্থযাত্রী দূর-দূরান্ত থেকে এই
দীপশিখা লক্ষ্য করে ছুটে আসে। ছ'শ
বছর ধরে কত লক্ষ পথযাত্রীর জীবনে
এ প্রদীপ দিয়েছে পথনির্দেশ—তার
হিসাব কেউ রেখেছেন?

গািঙ বলল, 'আজও হজুর খাজা
সাহেবের দেহরক্ষার দিনে দিল্লীর কবির।
মিলে উর উদ্‌যাপনে এখানে সববেত
হন। তাঁদের ভক্তিপুত গল্পে,
মাজনে--প্রার্থনা-সঙ্গীতে কবির দল
দিল্লীর আকাশে-বাতাসে মিলিয়ে দেন
হৃদয়ের পবিত্র অশ্রু-অর্থ্য।

গািঙ সর্বপ্রথম নিরে গেল খাজা
সাহেবের সমাধিসন্ধিরে। মাথা নত করে
প্রণতি জানালার হিন্দুস্থানের অন্যতম
শ্রেষ্ঠ সাধককে। পরম সত্যের সন্ধান
আজীবন তপস্যা করে যারা মানুষের
কল্যাণে জীবনোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের
জীবনই তো সার্থক। এ সার্থক বিশ্বে
অজ্ঞানান্ধকারে যারা জেলেছেন জ্ঞানের
দীপশিখা, অজ্ঞতার ঘনঘোর তমিস্রার
মাঝে করেছেন আলোকসম্পাত—তাঁরাই
তো মহাপুরুষ। তাঁরাই তো যুগ যুগ
ধরে প্রণয়। খাজা সাহেবের উদ্দেশ্যে
খত কুনিশ পেশ করলাম। নতজানু হয়ে
হিন্দুস্থানের বোগীশ্রেষ্ঠকে জানালার
প্রণতি।

গািঙের হাত থেকে ধূপকাঠি,
মালা, ফুল নিয়ে পুণ্যারা পুজারীর
হাতে দিলাম।

তিনি আপন হাতে ধূপকাঠি
প্রজলিত করে কবরের ওপর মালা ও
ফুল রেখে দিলেন।

পুজারীকে বললাম, 'আমি একটু
কোরান শরীক আবৃত্তি করতে চাই।
আপা করি তোমার কোনো আপত্তি
দেই? আমি বীর ভৃত্য তাঁর কাছে
হিন্দু, মুসলিম, শিখ, উর্দু মত
এক।'



তুগলকাবাদের ধর্মসাবলম্ব পরিদর্শনে আজও দেশ-বিদেশের বহু লোক আসেন।
কয়েকদিন আগে ছাত্রদের একটি দলও এখানে এসেছিলেন।

বেশক! নিশ্চরই। পুজারী
আনন্দের সাথে বললেন, 'সে কি কথা?
এ সকলারা সবার। এখানে সবার
অধিকার সমান। এ বিষয়ে প্রশ্নই
ওঠে না।'

পরম পবিত্র কোরান শরীফের
চতুর্বিংশ অধ্যায় ছুরা নূর থেকে
বীরে বীরে আবৃত্তি করলাম:

'পরমেশ্বর দুয়লোক ভুলোকের
জ্যোতি। সেই জ্যোতি যেন তাকের
ওপর কাচাধারে রাখা দীপশিখা।
উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতন তার জ্বালা।
কল্যাণময় ভয়তুল তরুর তেল নিরে
এ দীপ প্রজ্বলিত—তা পূব বা পশ্চিম
দেশীর নয়। এই তেলকে অগ্নি
স্পর্শ না করলেও ইহা জ্যোতি-
দানে সমুদাত। জ্যোতির ওপর
জ্যোতি হয়। যাঁকে উজ্জ্বল করেন,
ইশুর আপন জ্যোতি দ্বারা পথপ্রদর্শন
করেন -- -'

এই দীপ সকল মানবাত্মার ভেতরেই
বিরাজমান। অন্তরের এ দীপ না
জ্বালালে শত আলোতেও অঁধার
ঘোচে না। বিশ্ববন্দিত ধীতাত্ত্বির
ক'টা ছত্রও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে
মবে এসে গেল,

'আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুট নাহি গাবে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
বেদ না কিছুট আলো।'
—মনে মনে নিজেকে বলা হবে
করলাম।

কত দরিদ্র বর্ষপ্রাণ ছুরা নূর
উজ্জ্বল। সন্তোষ এ পুণ্য দেউলের
পবিত্র ধূনি স্পর্শ করতে পারে না।
কত পুণ্যাত্মার পদধূলিতে পবিত্র
মহান তীর্থভূমি। কত দরবেশ
পাখির মত-সন্তোষ পরিভ্রমণ করে
এ দরবারে আপন জীবন পূর্ণভাবে
সমর্পণ করে গন্য হয়েছেন।

এখনও তাঁদের প্রভাতী আজানের
সুর তেলে বেড়াচ্ছে আমার চারি
পাশে। এ দরবার মাথা নত করে
ছেন দীন দরিদ্র দল। রাজবকুট
ভূমিতে রেখে মাথা নত করেছেন
হিন্দুস্থানের নৃপতিবৃন্দ। আমার যে
ধূনি স্পর্শ করলাম। যেহেতু পুণ্যারা
ছুরা নূর-দূরান্তে বসে এ পুণ্য দেউলের
ধূপ দেখেন, সেটাই মা-দেবী ধূপ-
ধের পক্ষ থেকে আর একবার কুনিশ
পেশ করলাম।

(ক্রমঃ)



। উপলংঘ্য ।

নীতিবিগহিত কাজকে যদি কুনীতি বোঝায়, সি-বি-আই রিপোর্ট প্রসঙ্গে যে আলোচনা স্বাভাবিকভাবে এখানে প্রকাশিত হয়েছে, তার থেকে যে কোনো পাঠকের মনে এ বোধাপাত করা স্বাভাবিক যে, উড়িয়া রাজ্যের দুই প্রতিভূ বিজু পট্টনায়ক এবং বীরেন মিত্র নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া-কলাপের সোঁষে দুষ্ট। গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশৃঙ্খলকে তাঁরা উপ-যুক্ত মর্ষাদা দিতে পারেন নি। স্বাধীনাগনের বিধিসম্মত যে অধিকার তাঁরা অর্জন করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্রমে উপবিষ্ট হয়ে সে অধিকার আইনসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা দূরের কথা, জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে তাঁরা ম্যাজিগত স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াসে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার যে করেছেন—আলোচিত বিষয়বস্তুতে তাঁর বহু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। এঁদের দুজনেই আজ অতীত দায়িত্ব থেকে মুক্ত, কারণ তাঁদের মুখ্যমন্ত্রীদের অধ্যায়ে যবনিকাপাত হয়েছে লোক-চক্ষে তাঁদের অভূতপূর্ব কীতি প্রকাশিত হবার পূর্বেই।

বানরের পিঠে ভাগ করবার একটি প্রবাদের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। উড়িষ্যার মন্ত্রিদের গদীতে আসীন হয়ে মিত্র-পট্টনায়কের ভাগা-ভাগির পালায় জনস্বার্থের দিকটায়

দাশ হয়ে উড়ে গেছে প্রবাদের পিঠের মতই। যেটুকু আছে সেটুকু আত্ম-স্বার্থ চরিতার্থতার গায়ে লোক-সেবানো প্রলেপের স্বার্থে। প্রীপট্টনায়ক তাঁর কলিঙ্গ শিল্প-জগতের বিস্তৃতির কাঠামো—পোজ করে নিয়েছেন তাঁর মন্ত্রিদের অবকাশে, প্রীমিত্র তাঁর প্রাণ্য বৃক্ষে নিয়েছেন 'উড়িয়া এজেন্টসের' মাধ্যমে। প্রীপট্টনায়ক লাভের সাগরে তরী ভাগিয়েছেন, প্রীমিত্র নিরাপদ চেউ বৃক্ষে সে তরীর হাল ধরেছেন। কিন্তু শুধু তরী ভাগালেই তো চলে না, দেখা দরকার টেরিটোরিয়াল রাইটস্ (Territorial Rights) নিয়ে ক্যাকডার মধ্যে পড়ছে কি না, সেই বিপদের ঝুঁকি যাতে না নিতে হয়, উভয় নায়কই প্রকাশ্য আলোর দাঁড় করিয়েছিলেন যাঁর যাঁর নিজের সহধর্মিণীকে। তাঁরা যেমন যেমন হাওয়ার নিশানা পেয়েছেন, উপযুক্ত মাঝির হাতে দাঁড় ধরিয়ে তাঁরা ঠিক লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছেছেন। উড়িয়া রাজ্যের লাভের বিপণি নিরাপদে স্থানান্তরিত হয়েছে প্রকাশ্য হাট থেকে বিশেষ বিশেষ চোরাগলিতে। কি-ভাবে—সি-বি-আই রিপোর্টের আলো-চনায় একাধিকবার তা' বিবৃত হয়েছে।

বলা দরকার সি-বি-আই রিপোর্ট মূলত বাক্য-বোঝায় তা কিন্তু অন্ধ-কারের গর্ভ থেকে আলোর নুড়ি

পায় নি। যেটুকু হয়েছে তা হচ্ছে পোস্টমর্টেম সার্জারীর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থা উড়িষ্যার এই দুই বুরজর নায়কের অপকীর্তির যে ব্যাপক খসড়া বাড়া করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সাব-কমিটি তার থেকে যতটুকু তার গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন তাই পেশ করেছেন। সাব-কমিটির সেই রিপোর্টকে কেন্দ্র করেই বর্তমান আলোচ্য রচিত হয়েছে। সুতরাং এতে যে অনেক খুঁটিনাটি, অনেক অশালীন (নীতিগহিত অর্থে) বক্তব্য, অনেক চতুর অভিসন্ধি এবং কার্যকলাপের উল্লেখ নেই তা' বরং নেওয়া যেতে পারে। সাতোড় নেই পাঁচোড় নেই এমনধারা আমাদের মতো সাধারণ ভারতীয় নাগরিকেরা হয়তো এতোশত খবরের ধোঁজ দেখে তান না। কিন্তু সে উদাসীনতার গুঁহ সেধেছেন দুর্ভাগ্যবশত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং নন্দজী। কথায় বলে ঠাকুর-ঘরে কে?—না, আমি কলা ঝাঁ নি। সি-বি-আই রিপোর্টের গায়ে গোপনতার গীল অঙ্কিত করতে গিয়ে নন্দজী অনবধানবশত হাটে হাঁড়ি ভেঙে বসে আছেন। লোকসভার সদস্য-দের এমন কি গোপনতা যা'তে প্রবেশাধিকার নেই? এমন কি চরিত্রহননের দূর্ঘটনা ঘটে গেল বঙ্গেশুর (তথা জগদীশুরো বা।) তাড়া-ছড়া করে তাঁর সাক্ষেদকে সাতুনা বাণী শোনাতে অস্থির হয়ে উঠলেন?

লোকসভার কার্য আর প্রিন্সের
চেষ্টার মত-কমিটির রিপোর্ট পেশ
হতে যত্ন সহকারে কেন্দ্রীয় কেটে-
বিত্ত হাঁ হাঁ করে সমস্ত চেঁচিয়ে
উঠে বোঝাতে চাইলেন—উড়িষ্যার
কেন্দ্রকারী কিছু হয়তো হয়েছে,
তবে এমন কিছু নয়। আর যা
হয়েছে তা প্রকাশযোগ্য নয়, কারণ
অন্য দেশবাসীর সামনে তার বিশদ-
বৃত্তান্ত তুলে ধরলে দেশের নৈতিক
বুদ্ধিবুদ্ধির বিপ্লব ঘটবে। আদর্শ,
অপরাধ আসবে। সবচেয়ে বড়ো
কথা সরকারী বিবেচনায় তা গোপনীয়
সুতরাং তাতে নাক গলানো ঠিক
হবে না। ভীষ্মের চাক্রে কাজের
মধ্যে একটি চিন পড়লো।
কলিকতা কেন্দ্রকারীর প্রকাশ হতে
কিছু বাঁকি বইলো না। ছড়িয়ে পড়ল
সবাই। আরও বড়াবড়ি বাঁধ
হয়ে উঠল। বড়কু ফাঁস হোল
তা নিয়ে আর কেন্দ্রকারী না বাড়িয়ে
কেজ বললেন—সত্যি নিখো কিছু
বলার আশাও নেই। যেসব
কথা প্রকাশ করেছে তা গোপনীয়
সুতরাং প্রতিবাদের মধ্যে নাক গলিয়ে
আর জন ঘোলা করতে রাজী নই।
আপাতত সি-বি-আই রিপোর্টের
উপর্যুক্ত এই 'হাঁ-না'য়ের মধ্যে জন্ম
খাচ্ছে।

স্বাক্ষর ব্যাপার হচ্ছে, নিজেকে
পায়ের তলায় মাটি আঁকছে
আদতে কিন্তু সরিয়েছেন দিল্লীর
কর্তৃপক্ষ। দেশ যে দুর্নীতির
প্রকোপে পড়ে দিন দিন জাহান্নামে
খাচ্ছে তা অস্বীকার করতে অসমর্থ
হয়ে তাঁদেরই বিন্দু প্রমাণকে
তাঁরা তার দিয়েছিলেন দেশের
দুর্নীতির একটি মূল্যায়ন করতে।
স্বাক্ষরিত তথ্য সংগ্রহ করে অনু-
গমনের যে ফলাফল শাসন কমিটি
প্রকাশ করলেন তাতে প্রশাসনিক
বিস্তৃতির মধ্যে দুর্নীতির এক ভয়াবহ
চিত্র কুটে উঠলো। এ রিপোর্টে
এক জায়গায় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল

যে, অতীতের দেশসেবক যারা আজ
রাজ্য শাসনের লাগাম হাতে পেয়ে-
ছেন, তাঁরা হঠাৎ-পাওয়া ঐশ্বর্যের
মধ্যে নিজেকে অপূর্ণ সাধকে আর
বেঁধে রাখতে পারছেন না। শাসন
কর্মতার উপহার পেয়ে তাঁরা আত্মহারা
হয়ে নিজেকে ধর পোছাতে
অনেকেই লেগেছেন। দেশসেবা
অন্য অর্থে আত্মসেবার দ্বারা
দাঁড়িয়েছে। সুতরাং কনতার অপ-
ব্যবহার না হয় তার এমন
প্রতিষেধক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন
যাতে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে
এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে।
বিজু পট্টনায়ক আর বীরেন মিত্রের
দুর্ভাগ্য, তাঁরা অজান্তে দুর্নীতি-বিরোধী
এ উদ্যোগের মূলে সাজানো খপ্পর
চাকির আর ময়র পান নি।

ইংরেজীতে বলে, 'Better late
than never'. অর্থাৎ একবারে
না হবার চেয়ে দেরিতে হওয়া
ভালো। উড়িষ্যার কেন্দ্রকারী
প্রকাশিত হয়ে আর কিছু না
হোক প্রশাসনিক ব্যবহার শৈথিল্য
কোথায় কিছুটা আমরা আঁচ করতে
পেরেছি। আঁচ করতে পেরেছি
কিভাবে কনতার মধ্যে অপব্যবহার
হয়, কিভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডারের
অপচয় হয়, কিভাবে নটের গুরু
প্রয়োজনীয় সরকারী কর্মচারী কনতার
পুতুলে পর্যাবৃত্ত হয় এবং কিভাবে
বেনামি সুবিধা বিতরণের নির্মূল ব্যবস্থা
সংগঠিত হয়। এই সি-বি-আই
রিপোর্টে প্রিন্সিপালদের ক্ষেত্রে আমরা
দেখছি বিজু পট্টনায়ক কিভাবে
নিজের স্বার্থে দুর্ভাগ্য হয়েও একজন
বেতনভুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে
তোরাজ করেছেন প্রশাসনিক সুবিধা
অর্জনের বিনিময়ে। কলিজ শিল্প
সাম্রাজ্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকারে অধি-
ষ্ঠিত করার জন্যে পট্টনায়ক-মিত্রের
সরকারী নিয়ম-কানুনকে চেলে সাজানোর
প্রয়াস আমরা দেখেছি। স্বার্থ দান
দিয়ে অর্থাৎ অগ্রিম টাকা সরকারী

তহবিল থেকে কিভাবে নিষ্কাশন হয়েছে
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভিত্তি দৃঢ় করতে
যে দুর্ভাগ্য আমরা পেরেছি।
বরবিলের দুর্ভাগ্যে প্রকটভাবে প্রকাশ
পেরেছে কলিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য
বিজু পট্টনায়ক কেন্দ্রে গিয়ে কিভাবে
উদ্বেগের করেছেন। উড়িষ্যার শিল্প
সংস্থার অধীনে বরবিলের হস্তান্তরের
আড়ালে প্রতিষ্ঠানটির মূল্যায়নের
ব্যাপারে কিভাবে কারচুপি হয়েছে
জেনেছি। উড়িষ্যার বহিঃ-সম্পদ
আহরণের স্বার্থে পট্টনায়কবংশই তাঁর
ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে আগলে
রেখেছিলেন তা আমরা দেখেছি।
অর্থাৎ দুর্ভাগ্যবশতের অবস্থায় তিনি
যতদিক থেকে পেরেছেন নিজের
কলিজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে কনতার
নিয়ন্ত্রিতভাবে তিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন।

উড়িষ্যার পদীতে বিজু পট্টনায়ক
তাঁর পার্শ্বচর বসী করেছিলেন সোম
বীরেন মিত্রকে। নিঃসন্দেহে অসম্ভব
এই একটি ক্ষেত্রে তিনি একজনের
পরোপকার করেছেন যদিও তা নিজেরই
স্বার্থে। তিনি ঐশ্বর্য আহরণের পরি-
কল্পনার বীরেন মিত্রবংশটিকে ন্যায্য
ভাগ দিয়েছিলেন কলিজ শিল্পপটের
সেলিং এক্জেন্ট হিসেবে 'উড়িষ্যা
এক্সপোর্টস' নিয়োগ করে। এই
লোকের মনে হতে পারে যে, বিজুবাবু
নিজের শেষ ঋণের একটি মুক্তি
খাড়া করার জন্যেই একজন বিন্দু
সহকারীকে অভিযুক্ত করে নিয়ে
ছিলেন। তাঁদের পক্ষে বড়াটা অনন্ত
নয়, কারণ কে না জানে ক্যান্সারে
পড়লে তাঁদের মাকী হয় যাতাল।
বিজু পট্টনায়কের মন্ত্রিষের অবসান
হলে, তার উত্তরাধিকারী হ'ল তাঁর
অতীত পার্শ্ব-মিত্র বীরেন মিত্র।
যদি নন্দজীর সদাচারের ধূমা না উঠে,
যদি কারাজ স্বর্গত মেহরজীর
সমর্থন নিয়ে কংগ্রেসের সাংগঠনিক
পরিবর্তনের উদ্যোগ না নিতেন, যদি
শাসন কমিটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দুর্নীতির
অলিগলির দিকে নীচ নজর না দিতেন

—তা হ'লে বীরেন মিত্রশায়ের
গাধের মস্তিষ্ক চিড় খেতো না। অবশ্য
এমন ছাড়াও ঈর্ষাপরায়ণ তাঁর কংগ্রেসী
সহকর্মীরাও তাঁদের দুজনের পতনের
জন্য কম দায়ী নয়। সে যা হোক
বীরেন মিত্র অথবা বিজু পট্টনায়ক
কউৎস এখন আর মস্তিষ্ক ন'ন। সুতরাং
সে অধ্যায়ের যবনিকা সম্ভবত এখানে
পড়েছে।

আজ সি-বি-আই অনুসন্ধানের
অবদান দার্শনিক হবে, যদি যদুচ্চ ক্ষমতার
অপব্যবহার, অধিক ও ব্যবসায়গত
সুবিধা বিতরণের সুযোগ এবং প্রশাসনিক
কর্মচারীদের ন্যূনতম নৈতিক দায়িত্ব
অবহেলার স্বাধীনতা প্রতিরোধের
স্বার্থে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার
সচেতনভাবে প্রতিশ্রুত আইন-
কানূনের প্রবর্তন করেন। শুধু আইন-
কানূনের প্রবর্তন হলেও চলবে না।

সেই আইন-কানূনের বাধ্যবাধকতা এবং
প্রয়োগের দিকেও সমান সজাগ দৃষ্টি
দেওয়া দরকার। নানাদিক থেকে
ব্যক্তিগত স্বার্থে স্ফীত এখনও বীরা
শাসনযন্ত্রের শিখরে বসে আছেন,
তাঁদের এ কারণেই আজ অস্থির হস্ত
নেই। সেইজন্যই যখন আজ প্রশ্ন
উঠেছে মস্তিষ্কে আধীন হত্যাকর্তাদের
নীতিবহির্ভূত কাজের তদারককে
আইনের সীমানায় নিয়ে আসার, তখন
যাউ উঠেছে ওজর-আপত্তির, যাউ
উঠেছে সম্মানহানির প্রশ্ন তুলে। কিন্তু
সি-বি-আই জনসাধারণের দৃষ্টি উন্নী-
তনের সহায়ক হওয়াতে, এ নৈতিক
বিমিশ্রিত প্রশ্ন বামাচাপা দেওয়া
হয়তো সম্ভব হবে না। ভবিষ্যতের
পট্টনায়ক-মিত্ররা জনস্বার্থ অবমাননার
পূর্বে অস্বস্তি চিন্তা ক'রবেন আশের
গোছানির সুহৃদের পরিণতিতে আবার

কোন কলেঙ্কারী দানা বাঁধবে কি না।
জনসাধারণ হয়তো এতোটা উদাসীনতার
অবস্থা সুযোগ দেবেন না যাতে দিনের
আবোয় পুকুর চুরি হ'তে পারে। লাভ
আমাদের—নাগরিকদের এঁটুকু।
সি-বি-আই কাগজে-কলমে হয়তো
গোপন থেকেই যাবে, কিন্তু প্রকাশ্যে
সি-বি-আই-এর মূল্য ন্যায্য স্বীকৃতি
যা পেয়েছে, তা' অনেকখানি।
উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, আলোচিত
সি-বি-আই রিপোর্ট কিন্তু ছবছ
অনুবাদ নয়। বলা যেতে পারে
ক্যাবিনেট গার-কমিটী-রিপোর্টের এটা
সহজ ভাবানুবাদ এবং বিশ্লেষণের
মিলিত এক আলোচনা।

—দিলীপ চৌধুরী

(সমাপ্ত)

অবসরের অবয়ব

বিশ্বনাথ কল্লান

শান্ত নির্জনতা যদি চেয়ে থাকি কখনও মরণও,
আমি নয়। অবসরে বিচিত্র রজনী
সুখিন কঠিন মনে হয়।
মননীতে নিরুবেগে প্রৌঢ়স জমে জমে ওঠে।

ঘনের শিখরে কোন স্বাদ নেই
স্বামরন পথে ঘটনা বিরল।
তার চেয়ে বেশ ভালো মিথ্যা মিলে
শহরের ট্রামে বাসে তপ্ত পেলবতা।

ছলনায় ঢেকে রাখা দীঘির আঁচলে
প্রবীণ ফগিল। তোমার শান্তির ফীলে
আর নিজেকে জড়াতে না কোনদিন,
ট্রেনের জানালা দিয়ে ফেলে গিঁট
একে একে অবসর পাখর পাহাড়
ছড়পিল ছটে চলে শহরের দিকে।

রমণীরা জাদু জানে

বরুণ মজুমদার

আমায় ডেকে না তবে হে প্রথম নন্দিত মোহিনী,
ভোরবেলা জাকরানি রঙের নেশার কথা তুলে
হেঁটে যাবে বাগানের প্রস্ফুটিত গোলাপের কাছে।
একটি রঙীন ফুল তুলে নেবো অন্য অভিসারে।

কাননের সব ফুল স্বরে গেলে বেলা অবসানে
আবার ফোটাতে আমি শুদ্ধতম আলোর বকুল।
সব আলো নিভে গেলে জীবনের স্বদ্বিষ্ট সীমায়
একটু প্রণয় চাই তবু এক অভিশপ্ত রমণীর কাছে।

রমণীরা দিতে পারে আমাদের সব কিছু ধন।
রমণীরা যাদু জানে। চোখের কোমল চাহনিতে
রাজার সমস্ত ধন চুরি করে নিতে পারে জেনে,
রমণীর কাছে যেতে সাহস ছিল না কোনকালে।

আজ জানি কিংবদন্তী হয়ে গেছে অজীভের স্মৃতি
আমার হারানো ধন খুঁজে পাই রমণীর কাছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর অনুরক্ত বহু শ্রীক্ষতিসাহসন সেন বলেছিলেন, 'আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে যেসব মহাপুরুষ চলিয়া যান তাঁহাদের স্থান আর পূর্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ গিয়াছেন তাঁহার আসন শূন্য থাকিবে। রামানন্দও চলিয়া গেলেন, তাঁহার আসনও শূন্য থাকিবে।'

এই উক্তি থেকেই রামানন্দবাবুর প্রেষ্ঠ্য আমরা বুঝতে পারি। অনেকের মুখে শোনা যায়, 'রামানন্দবাবু একজন উঁচু ধরণের সাংবাদিক ছিলেন।' এই উক্তি কিয়ৎপরিমাণ সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। সাংবাদিক হিসাবে তিনি বড় ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই সত্য, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন আরও অনেক বড়। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ, নিষ্ঠাকতা, স্বচ্ছ বুদ্ধি ও আদর্শপ্রবণতা তাঁর মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছিল, যার প্রভাব ও গৌরব আজ কেবলমাত্র বাঙালীই নয়, সমস্ত ভারতবাসীই অনুভব করে থাকেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এলাহাবাদের কায়দা পাঠশালার অধ্যক্ষরূপে। অধ্যাপনার বিষয়ে তিনি ছিলেন গনন্যসাধারণ। কলেজের শিক্ষক ও ছাত্ররা তাঁকে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন ও ভাল বাসতেন তার বিবরণ আমরা জানতে পারি উক্ত কলেজ থেকে তাঁর বিদায়কালীন ঘটনা থেকে। শ্রীশান্তা দেবী লিখেছেন, 'কলেজ

রামানন্দ বা বু

থেকে যেদিন তাঁকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়, তার কথা আজও মনে পড়ে। কলেজের সভা শেষ হওয়ার

এ বিশ্ব মনোশায্য

পর সমস্ত ছাত্ররা 'প্রিন্সিপাল' সাহেবকে বাড়ি পৌঁছে দিতে আসে। তখনকার দিনে মোড়ার গাড়ির চলন



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

দিল বেশি। ছেলেরা গাড়ির বোজ খুলে দিয়ে নিজেরা গাড়ি চালাতে চান্তে নিয়ে। এল। বিদায়ের সময় পায়ের উপর মাথা দিয়ে দুই হাঁটু ধরে এক-একজন ছেলে কতকণ যে পড়ে রইল তার ঠিক নেই।'

এরপর থেকেই রামানন্দবাবুর জীবনে পট পরিবর্তন—এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা দেখা যায়। অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত থাকার সময় থেকেই পত্রিকা প্রকাশন ও সম্পাদনার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। 'প্রবাসী' পত্রিকা আরম্ভ করার পূর্বে তিনি 'দাসী' ও প্রদীপ' নামক দুইটি পত্রিকার সম্পাদনা কার্য পরিচালনা করেছেন। কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এবার তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন।

তিনি যে একজন উচ্চ ধরণের সাহিত্যিক পদবাচ্য ব্যক্তি হবেন এ আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। সাধারণ লোক যেন তাঁর লেখা বোঝেন এই ছিল তাঁর লেখার উদ্দেশ্য। তিনি বলতেন, 'পৃথিবীর অধিকাংশ লোকসাহিত্যিক নহে। তাদের মনভুক্ত খাঁকা দুর্ভাগ্য মনে না করিতে চেষ্টা করাই কর্তব্য।' ইতালীর নবজাগরণের সৃষ্টা ব্যাংসিনির জীবনেও এই ধরণের আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়।

রামানন্দবাবুর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর স্বেচ্ছাচিন্তা ও শিক্ষামূলক। আজকের দিনে আমাদের শিক্ষণীয় যে কতক প্রকাশ ও প্রচার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তার অগ্রণী ছিলেন রামানন্দ।

এই শিল্পানুরাগ কেবলমাত্র শৈশবী-
ভূতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, তিনি
তাকে বাস্তব রূপ দেবার প্রভুত চেষ্টা
করেছিলেন, নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে
সিয়ে। সামান্যতম প্রকৃতপক্ষে
ধনী লোক ছিলেন না। তখনকার
দিনে আজকের মত মুদ্রণশিল্পেরও
উন্নতি হয় নি। তৎসত্ত্বেও, তিনি
সেই ব্যয়সাপেক্ষ কাজ গ্রহণ
করে কৃতকার্য হয়েছিলেন। সচি-
‘প্রবাসী’ প্রকাশ করে তিনি তার
মিদর্শন রেখে গেছেন। আদর্শনিষ্ঠ
ব্যক্তি ব্যতীত এ ধরনের কাজে অগ্রণী
হওয়া যায় না। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র-
নাথ ঠাকুরের রচনায় এর সাক্ষ্য-প্রমাণ
আমরা পেয়ে থাকি। প্রখ্যাত শিল্পী
ব্রজেননাথ বসু বলেছেন, ‘আমাদের
বর্তমান ভারতীয় চিত্রকলার নব-
জাগরণের মূলে তাঁর (সামান্যতমবাবুর)
উৎসাহ ও সাহায্য যে কতদিন শক্তি
সঞ্চয় করেছিল তা আজকে বিশেষ
করে উপলব্ধি করতে পারি।’

সামান্যতমবাবুর চরিত্রের আর
একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর
সংস্কারমুক্ত মন ও স্বচ্ছ বুদ্ধি। এই
বৈশিষ্ট্যের গুণেই তিনি সাংবাদিকতাকে
বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোন
বিষয়কে সম্পূর্ণ নিজের মত করে
না নিতে পারলে, স্পষ্টভাবে সহজ
করে বলা যায় না। কোন প্রশ্নের
সমস্ত দিক বিবেচনা করে মত প্রকাশ
করার জন্য প্রয়োজন বিচারশক্তি ও
বৈশেষণিক দৃষ্টিভঙ্গী। সেই দৃষ্টিভঙ্গী
সামান্যতমবাবুর সমগ্র রচনাকে প্রভাবিত
করেছিল। ঐতনীয়তাকালের কোন
কোন সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশনের
ক্ষেত্রে উচ্ছাস ও অহেতুক কাব্য-
বাহুল্য দেখতে পাওয়া যায়। কথার
আড়ম্বরে মূল বিষয়বস্তু বহু ক্ষেত্রে
ঢাকা পড়ে যায় এবং এটা সত্যিই
পরিভ্রাণের বিষয়।

সামান্যতমবাবুর দেশাত্মবোধের
মধ্যে কোন কাকি দেখা যায় না।
সত্যের নাম কেনার মোহ তাঁর কোন-
দিনই ছিল না। আত্মপ্রচারকে
ভিদি সবসময়েই ঘৃণা করতেন।
সেপের ও রাহিরের অপরাধ সবসময়
সম্মুখে চিত্তার ও উপায় নির্ধারণ
করবার এক অপারধের দৃঢ়তা ছিল
সামান্যতমবাবুর মধ্যে। পাদ্রীকী,
রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র
প্রভৃতি বিশুবিক্যাত ব্যক্তির বিভিন্ন
সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ
করতেন। রবীন্দ্রনাথ ‘সার’ উপাধি
পরিভ্রাণ করায় সমগ্র সামান্য-
তমবাবুর পরামর্শ নিয়েছিলেন। ‘বলে
নাও’-এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস কমিটি যখন
অভিযান শুরু করেন। সামান্য-
তমবাবু সক্রিয় প্রতিবাদ করে-
ছিলেন। এরকম আরও বহু ঘটনা
আছে যা দৃঢ়চেতা সামান্যতমবাবুর
বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় ও স্যার আন্তোনিওর
সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টিও এর একটি
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ‘প্রবাসী’র পঁচিশ

বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে
স্বর্গত জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছিলেন,
“...তুমি প্রকৃত মনুষ্য লাভ
করিয়াছ, ভয়কে জয় করিয়াছ, তেজস্বী
হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ।
শিষ্যের জন্য ইহা অপেক্ষা আমার
বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই নাই।
তোমার গৌরবে আমি নিজেকে
গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। সামান্য-
তমবাবুর জীবনে ইহা এক পূর্ণ
গৌরবের বিষয়।”

পূর্বে আমরা সামান্যতমবাবুর কর্ম-
বহুল জীবনের মাত্র কিয়দংশের সংক্ষিপ্ত
আলোচনা করলাম। কিন্তু এর পরও
একটা প্রশ্ন সবসময়েই থেকে যায়
যে, এই বাঁচি মনুষ্যটির কর্মপ্রণোদ
উৎস কোথায়? সেকি এই উল্লিখ-
গ্রাহ্য জগতের দেখা-শোনার মধ্যেই
বহু, না অন্য কোন অতিবিশিষ্ট-
লোকে তাঁর ফিটরণ ছিল? রবীন্দ্র-
নাথের মৃত্যুর পর তিনি লিখেছিলেন,
‘আকাঙ্ক্ষা ছিল কবির আগে আমার
মৃত্যু হবে। রবীন্দ্র-বিহীন জগতের
কল্পনা করণও করি নাই, তাহি
নাই রবীন্দ্র-বিহীন জগৎ দেখতে
হবে। চোখ কান বাই বলুক,
বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি নেই।
এখনো মনে হচ্ছে শান্তিনিকেতনে
গেলেই আমার তাঁর বারিকোর সেই
তুচ্ছ-তরু রূপ দেখতে পাব, যার
ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের অনুপম
বী বিচ্ছুরিত হ’ত। ‘জন্মন ধ্বনিছে
পথহারা পথনে’, যদিও বুদ্ধি বলছে
তিনি আছেন।’ এই সংক্ষিপ্ত একটি
উক্তি মধ্যস্থি যেন সামান্যতমবাবুকে
আমরা বুঝে পাই। একজন মনীষী
বলেছেন, ‘Great thoughts
come from the heart not
from the head.’ সামান্যতমবাবুর
সেই চিন্তকে যেন আমরা উপলব্ধি
করতে পারি, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও
ভাবনার উৎস যেন সুহৃদের
মধ্যে আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর
হয়।

সামান্য উপভাসের ব্যয়কর দীনেত্রসুন্দর স্নাতক গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—খানি প্রবন্ধ ছোটকটি
উপভাস, মূল্য ৩০ টাকা
২য় ভাগে—খানি রহস্য উপভাস
মূল্য ৩০

স্বাতীক-কাঁচ বঙ্গলাল বঙ্গোপাধ্যায়ের

রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী

পার্বনী, সুরসুন্দরী, কর্মদেবী, কুমার-
সত্ত্ব, নীতিসুন্দরী, কাকী-কাবেরী,
কবির জীবনী। ১খানি একত্রে ২০০।
স্বাতীকাত্তরকালীন সম্পাদিত

নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা

(নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও
পরীক্ষা নিরূপণ)
মূল্য এক টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গঙ্গুলী ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

চলি বেরজের—এ চালিদের দল খুবই সুখ্যাতি পেলেন—অনারাঙ্গেই তাঁরা দশ সপ্তাহ করে শো দেখাতে পারলেন, কিন্তু স্টিচার কার্ণার অন্যত্র যুঁকি থাকতে তা আর সম্ভব হল না। চালি তখন সপ্তাহে ছ' পাউণ্ড করে মাইনা পাচ্ছেন—কিন্তু এর থেকে একটি পেনীও বাঁচাতে পারেন না। সিডনের একজন কাজিন বোধ হয় সিডনের বাবার সঙ্গে ছাত্র কি একটা সম্পর্ক ছিল—এসে নিজের পরিচয় দিয়ে চালির সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি ছিলেন ধনী এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক। প্যারিসে থাকা কালীন তিনি চালিকে নানা আয়গায় ঘুরিয়ে ঘোরিয়েছিলেন—তিনি থাকতে খুবই আনন্দে সময় কেটেছিল প্যারিসে। স্টেজট্রাক বলতে যা বোঝায় এই কাজিনটি ছিলেন সেই জাতীয়। চালিদের দলে নিশে গিরে যাতে ব্যাক-স্টেজে আসতে পারেন এজন্য তিনি নিজের গৌক পর্বত কানিরে কেলেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে ইংলণ্ডে ফিরতে হোল এবং তাঁর বাবা-মা জোর করে তাঁকে কয়লার ব্যবসারে লাগিয়ে দেন এবং সেজন্য শেষ পর্বত তাঁকে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যেতে হয়।

প্যারিসে বাবার আগে চালি শুনেছিলেন যে, হেটীর ট্রপও ফলি বেরজের—এ শো দেখাতে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে হবে—মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিলেন চ্যাপলিন। প্যারিসে পৌঁছিয়ে প্রথম রাতেই ব্যাক-স্টেজে গিয়ে চালি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন।

কিন্তু একজন ব্যালে-গার্লের কাছে শুনেলেন যে, হেটীর দল এক সপ্তাহ আগেই বন্ধো অভিব্যুৎ রওনা হয়ে গেছে।

একদিন রাতে সেট ভাষাবিদ চালিকে এসে জানালো যে, এক প্রখ্যাত গঙ্গীতজ্ঞ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চান—চালি কি তাঁর

চালি চ্যাপলিন

বন্ধ-এ গিরে দেখা করবেন। এই আশ্রয়ে একটু বজা অনুভব করলেন চালি—এ ভ্রলোকের পাশে বসেছিলেন এক অপূর্ণ সুন্দরী মহিলা—রাশিয়ান ব্যালের একজন নর্তকী। ভ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল ভাষাবিদটি। তিনি বললেন যে, চালির পারফরেন্স তিনি খুবই উপভোগ করেছেন—তিনি যে আসলে এত অল্পবয়স্ক কিন্তু তা আগে বুঝতে পারেন নি এবং এখন দেখে একেবারে বিস্মিত হয়ে গিয়েছেন। চালি বাউ করে কৃতজ্ঞতা জানালেন ভ্রলোককে এবং আড়চোখে মাঝে মাঝে তাঁর গঙ্গিনীর দিকে নুটি দিচ্ছিলেন। ভ্রলোক চ্যাপলিনকে বললেন—মাচ-গান আপনা থেকেই তোমার বভাবের সঙ্গে নিশে রয়েছে—তাকে স্টেজে দেখলেই বোঝা যায় এসব তোমার সহজাত গুণাবলী।

এই উচ্ছৃগিত প্রশংসার আর কি উত্তর দেবেন—মিটি হাসি হাসলেন চ্যাপলিন এবং একবার ভাষাবিদের দিকে চেয়ে বাউ করলেন।

সঙ্গীতজ্ঞ ভ্রলোকটি এবার উঠে দাঁড়ালেন এবং হাত বাড়িয়ে দিলেন, চালিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ভ্রলোক চালির সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে বললেন—‘তুমি একজন সত্যিকার জাতশিল্পী।’

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবার পর চালি ভাষাবিদকে জিজ্ঞেস করলেন, এ সঙ্গের মহিলাটি কে?

‘তিনি একজন রাশিয়ান ব্যালে নর্তকী—ম্যাগনোমোজেন’—অত্যন্ত দী



এবং শক্ত একটা নাম। এখন আঁচালির মনে নেই।

‘ভ্রলোকটির নাম কি?’
‘ডে-বুগী—প্রখ্যাত কম্পোজার’—উত্তর দিল ভাষাবিদ।

চালি বললেন, তিনি এর আদর্শ এ নাম কখনও শোনে নি। এই বছরেই ম্যাডান স্টাফিনজাইলের সেই বিরাট কেছা এবং বিচারের বছর—স্বাধীনতার অপরাধে তাঁকে দায়রা গোপদ করা হয় এবং বিচারে রাই হয় ‘নই গিল্টি।’ এই বছরটি হচ্ছে কুখ্যাত যৌন-নৃত্য পথ পথ ডান্সের অবিকারের বছর। এই বছরেই আবার অবিশ্বাস্য রকম ভাবে ব্যক্তিগত ইনকাম ট্যাক্স বাড়িয়ে দেওয়া হয় পাউণ্ডে ছ'পেনী হিসাবে।

এই বছরেই ডে-বুগী ইংলণ্ডে তাঁর বিখ্যাত prelude to l'Après-midi d'un Faun নিয়ে এলেন—দর্শকেরা শুনে টটকারী দিল এবং হল ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিষাদাচ্ছন্ন মন নিয়ে চ্যাপলিনরা ইংলণ্ডে ফিরলেন। প্যারিস দেখার

পর পতি' তারি মিলি নাগে ইংলণ্ডে—সবকিছু' যেন একঘেরে এবং বৈচিত্র্যহীন মনে হয়—নিশেষত মিলবারে, যখন কোকান-পটি, হাট-বাজার সব বন্ধ থাকে। ইংলিস কেটে যার পর আবার পুনরায় নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে নিজেকে বন্দী রাখুকটা মানিয়ে নিয়েছেন চালি—এই সময়টার তাঁদের মনের সঙ্গে তিনি প্রাথমিক সাক্ষরে ঘেরিয়ে ছিলেন—লণ্ডন অক্সিন থেকে একটা রোমান্টিকর খবর এল। মিষ্টার কার্ণো চালিকে জানিয়েছেন যে, 'দি কুটল ম্যাচ'র দ্বিতীয় সিজনে তাঁকেই হারী ওয়েল্ডনের জায়গার পাঠ করতে হবে। চালি সনেপ্রাণে কুতূহল করলেন যে, এবার তাঁর ভাগ্যভরিকা উঠতির দিকে। এই-সময় তাঁর আদল অযোগ্য এসেছে। 'বডিও' 'সানিং বার্ডস' এবং অন্যান্য কেচেলে তিনি বম্বেট কৃত্তিকের পরিচয় দিয়েছেন, তবে সেসব কৃতিত্ব ছিল ছোটখাটের সাক্ষর ইতিহাস। 'দি কুটল ম্যাচ'—এ নামের তুনিকা লাগু এবং তাতে সাক্ষর সঙ্গ অতিনয় করতে একটা সত্যিকার এটিভুবেট হবে বই কি।

ঠিক হয়েছিল 'দি কুটল ম্যাচ' খেলা হবে অক্সফোর্ডে—এটি ছিল তখনকার দিনে লণ্ডনের সবচেয়ে সাক্ষর মিউজিক হল। চালিদের বলই ছিল এখানকার প্রধান আকর্ষণ এবং নায়ক হিসাবে তাঁর নামই প্রচারপত্রে বড় হরফে প্রথমে দেওয়া হবে। সত্যিই এ ব্যাপারটা ছিল চালির উন্নতির পক্ষে ওঠবার একটি প্রধান গোপান। অক্সফোর্ডে সাক্ষরলাভ করতে পারলে চ্যাপ-লিনের খ্যাতি যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং তখন তিনি লম্বা অঙ্কের মাইনে দাবি করতে পারবেন এবং এবং নিজের উচ্ছাসিত প্রদর্শনীকে সেসে নিজেই তৈরি করে নিতে

পারবেন, তা হাড়া আরও বানাবে নানা কিসক ঠিক করতে পারবেন—এইসব নানা ধরনের চিন্তায় চালির মন উৎকল হয়ে উঠল। আগে যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রী বিভিন্ন তুনিকার পাঠ করেছেন, তাঁরাই মন বলে থাকতে এক মধ্যাহ্নের তেতরট বই তৈরি হয়ে যাবে বলে করে নেওয়া হোল। নিজের রোনট অঙ্কে চালি বম্বেট চিন্তা করলেন।

হারী ওয়েল্ডন এই তুনিকার সাক্ষরির প্রাক্ষরশেট করা করতেন। চ্যাপলিন ঠিক করলেন তিনি কখনে চং-এ সংগ্রাম করবেন।

কিন্তু প্রথম সিজনের দিনই চালি অত্যন্ত কাল হয়ে পড়লেন সাক্ষরিকাইটিস জোগে। নানা রকমে চেষ্টা করতে লাগলেন গলা যাতে বলে না যার—কথাবর্তী চালালেন। কিন্তু কিসক করে, তেপার ইনহেল করলেন, গলা শুঁ করলেন কিন্তু তরানক কুচিচা এসে তাঁর হান্য-রস স্ফটিক কবতা এবং অভিনয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং প্রাণবন্ততা একেবারে নষ্ট করে দিল।

উষাধনের রাত্রিতে চালির প্রাণ-পথ চেষ্টা সন্তোষ অভিনয়ের সময় কর্ককরা তাঁর গলা তখনতে পাচ্ছিলেন না। শোর শেষে কার্ণো এলেন—তাঁর মুখে, চোখে বিরক্তি এবং হতাশার ভাব—তিনি তিরস্কারের জরে জানালেন কেউ চালির কথাও শুনে পাচ্ছিল না। চালি খারবার তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, পরের দিন তাঁর গলা ঠিক হয়ে যাবে। তা কিও হোল না—পরের দিন গলা আরও খারাপ হয়ে গেল, এমন কি এই ধরনের ভয়ও দেখা দিল যে, ভবিষ্যতে আর হয়তো তিনি কুটলর ফিরে পাবেন না। সুতরাং পরের রাতে তাঁর আওর-স্টাডীকেই তাঁর জায়গার অভিনয়

করতে হোল। এল কলে প্রথম মধ্যাহ্নের পরই শো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন মিষ্টার কার্ণো।

অক্সফোর্ডের প্রদর্শনী সম্বন্ধে চ্যাপলিনের বক্ত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন এবং আকাশ-কুহন কল্পনা এইভাবেই মূলস্ফূর্ত হোল। হতাশা এবং দুশ্চিন্তায় চালি প্রত্যন্ত মুষে পড়লেন যে, শেষ পর্যন্ত ইনকুয়েস্টার আক্রান্ত হয়ে বিছানা নিতে বাধ্য হলেন।

হেটার সঙ্গে প্রায় এক বছরের ওপর চালির দেখা হয় নি। কুতূহল ভোগার পর শরীফটাও দুর্বল, মনটাও বিষাক্ত—এই সময় কেন জানি না হেটার কথা খারবার মনে পড়তে লাগল চালির। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘুরতে ঘুরতে ক্যাম্পডরেলে হেটার বাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলেন—বাড়িটা দেখলেন খালি এবং 'টু লেটের' মাইন বোর্ড বুলছে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে চালি রাস্তার ঘুরতে লাগলেন। হঠাৎ অক্সফোর্ডের জেন করে একটি মানুষের মূর্তি কেন তাঁর দিকে এগিয়ে এল।

'চালি! তুমি এখানে কি করছ?'

আ রে। এ যে হেটা। তবু পরনে কাল মিলককীনের কোটি এবং নাথার গোল মিলককীনের হ্যাট। হেটার হয়ে চালি উত্তর দিলেন—'তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম।'

মিউ হেসে হেটা বললে—'তুমি বড়ই রোগা হয়ে গেছ।'

চালি তাকে জানালেন যে, কয়েক দিন আগেই ফু থেকে উঠেছেন।

এই সময়টার হেটার বরস বোধ হয় সত্যের, খুব জ্বলর এবং স্মার্ট দেখাচ্ছিল তাকে।

চালি জিজ্ঞেস করলেন—'কিন্তু তুমি এখন এখানে কি করছ?'

(ক্রমশঃ)

'In this sort of acting, where the transformation of the actor is incomplete, three devices can contribute to the alienation of the words and action of the person presenting them.

1. The adoption of a third person.

2. The adoption of the past tense.

3. The speaking of stage directions & comments.

উদাহরণ স্বরূপ ককেশিয়ান চক পারকেলের একটি দৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে,—যেখানে গুপ্তা temptation of goodness-এর ভাবটা অনুভব করছে—অর্থাৎ সে প্রলোভিত হচ্ছে পরিত্যক্ত শিশুটিকে তুলে নিতে, তাকে বাঁচাতে। এই সব দৃশ্যটিতে গুপ্তা মুকাভিনয় করে চলে এবং একজন পারক গার্ড পার্শন এবং পাষ্ট টেন্স-এ কর্তব্য করে যার গুপ্তা কি করছে। এইভাবেই ব্রুস্টারেন পদ্ধতি অনুসারে অভিনেতাকে মুক্ত করা হয় স্ট্যানিস-লাভস্কি নির্ধারিত style of identification পদ্ধতির অভিনয় থেকে।

'If an actor hears his role talked about in the third person and his deeds talked about in the past tense, he stands apart from the role and the deeds and renders them, not as self expression, but as history. When he uses the device in Chalk Circle, Brecht of course is radically 'alienating' Grusha's actions so that we do not lose ourselves in our compassion. He uses the third person, the past tense, the art of pantomime and a refined language as massed alienation effects.'

ব্রুস্টার কর্তৃক নাট্যরচনার ধারাকে ইউরোপে বলা হয় Narrative Realism। ন্যায়তরজিজম বা স্যাক্রিফিক্যালবাদ এবং সিমুলিজম বা স্যাক্রিফিক্যাল বাধামারি একটি স্থান নিয়ে রয়েছে। এই বর্ণনাত্মক কাহিনী-প্রধান (episodic)-বাস্তববাদ।

ব্রুস্টার ওদেশে এবং দেশে —Thornton—

স্বাভাবিক পদ্ধতিতে একটি ধরের স্টেজ-সোর্টিং করতে গেলে প্রতিউসার চান বাস্তবজীবনে যেভাবে ঘটটিকে আমরা দেখি ঠিক সেইভাবে মঞ্চে ধরের দৃশ্যটি সৃষ্টি করতে—একমাত্র ধরের চতুর্থ দেয়ালটিকে বাদ দিতে হয়।

এই ধরের দৃশ্যই আবার সিহনিস্টিক প্রণালী অনুরূপ প্রণয়ন করে। কারণ এখানে প্রতিউসার চান ধরের বিশেষ করে একটি ইচ্ছিতের ভেতর দিয়ে কৃষ্টি তুলতে—যেমন খাড়াভাবে দুটি কাঠদণ্ড ঝাঁড় করিয়ে দিয়ে দরজার suggestion দেওয়া হয়। এট পদ্ধতির আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই Thornton Wilder-এর নাটকগুলির কথা মনে হয়। এ ধরনের নাটকে প্রধানতই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাক্ষাতিক দৃশ্যসজ্জার দিকটা।

সাক্ষাতিকবাদীরা মনে করেন যে, রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভেতর দিয়েই থিয়েটারের ভবিষ্যতের ইতিহাস তৈরি হবে। ব্রুস্টার অবশ্য এঁদের সঙ্গে একমত নন। তাঁর ধারণা যে, সাক্ষাতিক পদ্ধতির ভেতর প্রকট হয়ে ওঠে প্রতিউসারের শিল্পকৌশল ও শিল্পচাতুর্য জাহির করে দেখানোর একটা প্রচেষ্টা। একটা চেয়ারকে মোটরগাড়ি হিসাবে প্রতিশ্রুত করতে গিয়ে আধিক ও আর্টিস্টিক ইকনমি হয় যথেষ্ট—কিন্তু দর্শক বেচারীদের কল্পনাশক্তির ওপর অত্যন্ত বেশি জুলুম করা হয়। এর থেকে সত্যিকার গাড়ি দেখানোটাই সবদিক দিয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক।

সান্টো ডি রিয়ালিস্ট ধরের দৃশ্য দেখতে গিয়ে photographic representation-ও করেন না, বা অন্তত মন সাক্ষাতের সাহায্যও নেয় না। বাস্তবদৃশ্যে কয়েকটি খুব বাছাই করা জিনিসের

সাহায্যেই তিনি মঞ্চসজ্জা কাঠকয়লা ধরের সমস্তটা না দেখিয়ে হরভে একটা দিকের দেওয়াল, দরজা এবং কিছু আসবাবপত্র সাজিয়ে দিলেন—অতি বাস্তবতাকেও পরিহার করা হোল—আবার সাক্ষাতিক কৌশলকেও প্রকট করে তোলা হোল না।

আগেই বলা হয়েছে যে বাস্তববাদী, illusionistic মঞ্চ-অভিনেতা এবং দর্শকের মধ্যে সব ব্যবধান দূর করে দিয়ে তাদের এক করে দিতে চায়। Illusion সৃষ্টির কলে দর্শক নিজেকে নাটকের পারোক্ষীয় সঙ্গে identify করে ফেলে—নাটকের লাসপেনের প্রভারে নিজের সম্রাৎ দর্শক হারিয়ে ফেলে। এদিক থিয়েটার চার ঠিক এর উল্টো—অর্থাৎ দর্শক থাকবে নিজের মধ্যে—মঞ্চের থেকে দূরে—মঞ্চচারিত্রের সঙ্গে নিজেকে identify করবে না, কাহিনীর ভেতর নিজেকে জড়িত হারার মত মগ্ন করে ফেলবে না। একেই বলা হয় ব্রুস্টারের theory of alienation—স্ট্যানিসলাভস্কি সিস্টেমের সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি।

একথাও আগে বলেছি alienation-কে কার্যকরী করে তোলবার জন্য ব্রুস্টার তাঁর প্রয়োগ-পদ্ধতিতে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেছেন—এর ফলে দর্শক নাট্যাভিনয়ের সময় নাটকীয় বিষয়বস্তুর চিন্তায় মগ্নে নিজের ব্যক্তিগতকে বিবীন করে দেয় না, উৎকণ্ঠার আয়তন হ্রাস বা করণ রূপের দ্বারা আপত্তি হয়ে আশ-হারি হয়ে ওঠে না। নাটকীয় তথ্যের দিকটাও এট বিচ্ছেদ-পদ্ধতি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

মাক্স কার্নেজ নাটকের শেষে বুঝা মহিলা সেই গানটিই আবহ

গীতে শুরু করেছেন, আরম্ভের সময় যে গান দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন। এভাবে নাটকের পরিণতিটা খুবই করুণ হয়ে উঠতে পারতো—কিন্তু ব্রেখ্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই সময় the harsh din of martial pipes cuts across the music at this point to neutralize the pathos and prevent the audience from dissolving into tears.

আরও একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় এই নাটকে। একদিকে পাচকটি গান ধরেছে—'A mighty fortress is our God' আর সেই সময়েই মাথার কারোজের বোঝা বেধে Kate বিবৃত মুকাতিনয় করে চলেছে এক চেষ্টা করছে একটি বৈয়াকরণ জুতো ও টুপি পরে নেবে। এইভাবেই বিচ্ছেদ-পদ্ধতিকে কার্যকরী করা হয়েছে।

ব্রেখ্ট বলেছেন যে, সত্যের ও সুনন্দ শব্দ-বিন্যাসের সাহায্যেও alienation সৃষ্টি করা যায়। এই কারণেই

প্রধানত ভাব্য হয়েও ব্রেখ্ট নিজের কাব্যিক প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেন নি। তাঁর সংলাপের কাব্যিক-গৌন্দর্যও পৃথকীকরণে সহায়তা করেছে।

ভাবাবেগকে alienate করতে যেমন কাব্যিক-সংলাপের ব্যবহার করেছেন, তেমনি দরকারমত সঙ্গীতেরও ব্যবহার করেছেন ব্রেখ্ট। সাধারণত থিয়েটারে যেভাবে সঙ্গীতের ব্যবহার হয়, which is simply to back-up the dialogue to heighten the mood, ব্রেখ্টের সঙ্গীত তাঁর বিপরীতধর্মী।

Orthodox theatrical music duplicates the text. It is stormy in stormy scenes, quiet in quiet scenes. It adds A to A. In a Brecht play, the music is supposed to add B to A. Thus A is alienated, and the texture of the work is enriched. Music can of course provide the sheerest alienation—through beauty, and on occasion the beauty can have a special, 'alienating' point.

একটি ভারি অর্থপ্রদর্শন জার্মান শব্দ দ্বারা ব্রেখ্টের নাটকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। শব্দটি হচ্ছে 'Versuche', এর অর্থ হচ্ছে 'প্রচেষ্টা' এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। ব্রেখ্টও চাইতেন যেন ঠিক এইভাবেই তাঁর কর্মধারার বিচার করা হয়। নাট্য-সাধনার ক্ষেত্রে ভেতর দিয়ে পরীক্ষা এবং নানানরকমের অবিকারের সাধনাত্মক তিনি নিজেকে সারাজীবন ব্যাপ্ত রেখেছিলেন। প্রত্যেকটি পরীক্ষা যেন নতুন পরীক্ষার দ্বার খুলে দিত—সাধ্যা করতো এক ধাপ থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে যেতে। রঙ্গক্ষেত্রে তিনি প্রধানতই ছিলেন Explorer, প্রথম থেকে শেষ অবধি মঞ্চ সংক্রান্ত

কোনো কিছুকেই তিনি বিচার না করে কখনও গ্রহণ করেন নি। নাটকের সনাতন আঙ্গিকের দিকটাকে তিনি আমূল পরিবর্তিত করে গেছেন নিজের রচনায়। তা ছাড়া নিজেকে বড় নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি এবং এইখানেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকারের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। সাধারণত পাণ্ডুলিপি তৈরি করে শেষের সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যকার মনে করেন যে, তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রযোজনা এবং মঞ্চ-প্রয়োগের সময় নাটকটি যেমন দাঁড়ায়, দর্শক কিভাবে তাকে গ্রহণ করে, এইসব দিকগুলোই ব্রেখ্টকে বেশি আকর্ষণ করতো। যে কারণে নাটকটি সেখা সেই উদ্দেশ্য কতোটা সকল হোল সেদিকেই তিনি বেশি মনন দিতেন।

ব্রেখ্ট বিশ্বাস করতেন, যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীর প্রভূত উন্নতিসাধন সম্ভব হয়েছে, তেমনি সমাজ-বিজ্ঞানের দ্বারাও জগতের বৃহৎ উন্নতি এবং সংস্কার হওয়া সম্ভব।

ব্রেখ্টের মতে সাধারণত প্রত্যেক সমাজেই একদল স্বার্থান্বেষী লোক থাকে—সমাজব্যবস্থার সংস্কারে যাদের স্বার্থে যা লাগতে পারে এবং তারাষ্ট সাধারণত সমাজব্যবস্থার পরিমার্জন এবং পরিবর্তনের বিরোধী হয়। বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির দৃষ্টিতে তারা কখনও সমাজ-ব্যবস্থার বিচার বা বিশ্লেষণ করে না। এদেরই বিরুদ্ধে ব্রেখ্টের অভিমান। কিভাবে এইসব দিকে মানুষের চোখ খুলে দেওয়া যায়, কিভাবে তাদের ভেতর একটা বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির মনোভাব জাগিয়ে তোলা যায়, যার ফলে বর্তমান জগতের সবরকম অব্যবস্থা সম্বন্ধে তারা সজাগ এবং সচেতন হয়ে উঠতে পারে, এই ছিল নাট্যকারের খেঁচের সাধনার বিষয়।

হাজারের অপরিহার্য গ্রন্থ
সঙ্গীতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালানো

—ইহাতে আছে—

এটি বঙ্গদেশে রচিত সঙ্গীতচন্দ্রের জীবনী—'সঙ্গীতচন্দ্র-জীবনী, কবীচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পালানো সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গীত-সাহিত্য সমালোচনা। সাধারনিক শিক্ষা পথ্যে কর্তব্য কৃতপণ্ডিত গ্রন্থরূপে নিবন্ধিত।

মূল্য এক টাকা।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃন্দ-সংহার কাব্য

নাম—দুই টাকা।

রঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

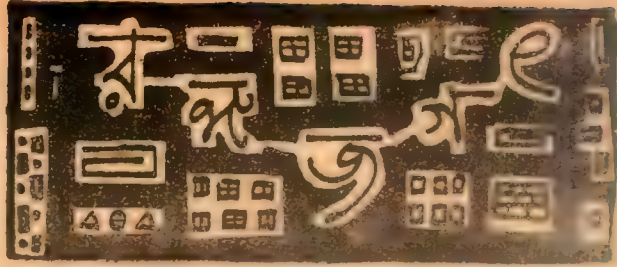
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,
ফলিকাতা-১২



‘এক অঙ্গে এত রূপ’ ছবিতে
মাধবী মুখার্জী

আন্তর্জাতিক উৎসবে ভারতীয় ছবি

মে-জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশে বহু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত সরকার ছবি পাঠাতে সুরু করেছেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি ছবির নাম প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত নামগুলি দেখে মনে হচ্ছে উৎসবের জন্য ছবি নির্বাচনে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। তবে কয়েক বছর পূর্বের তুলনায় অভিজ্ঞতা যে একেবারে লাভ হয় নি— সে কথা বলা যায় না। প্রত্যেক চলচ্চিত্র উৎসবের এক-একটি বিশেষ চরিত্র আছে। এই চরিত্র অনুযায়ী সেখানে বিভিন্ন দেশের লোক আসে। অধিকাংশ উৎসব চলচ্চিত্র পরিবেশকদের দখলে, সুতরাং ছবির উৎকর্ষ বিচার অপেক্ষা বেচাকেনাটা



উৎসবে কোনও বেশি হয়। চলচ্চিত্র-গুলির ব্যাপার এখন কিছু পরিমাণে স্থানীয় প্রতিযোগিতার পথে এসে পৌঁছেছে। গত বছর অনুষ্ঠিত কানেস এবং অন্যান্য কয়েকটি উৎসব সম্পর্কে গুরুতর সমালোচনা হয়েছে। এসব সমালোচনার ফলে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কিত কোনও কিছুই কেটেছে তা সত্ত্বেও উৎসবে বিভিন্ন দেশের ছবি প্রদর্শন আছে। বহু দেশের নতুন এসব উৎসব দেশে দেশে ভারত আদান-প্রদানের সহায়ক। এবার চোকাচোকা উৎসবে



—মাধবী মুখার্জী— বাংলা ‘দৃষ্টি-মন’ ছবিতে



রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'অতিথি'র একটি দৃশ্য পার্শ্ব মন্ডোপাধ্যায় ও বাসবী বন্দ্যোপাধ্যায়

'আরোহী' বালিনে 'কাপুরুষ' ও 'ইয়াদে' এবং মন্ডোতে যাচ্ছে 'দোস্তি'। মন্ডো উৎসবের জন্য কেন যে 'দোস্তি'র মত ছবি নির্বাচিত হলো বোঝা যাচ্ছে না। এরকম ছবি কায়রো, স্পেনে বা দক্ষিণ আমেরিকার কোন উৎসবে পাঠালে যে ফল পাওয়া যেতো—হয়তো মন্ডোয় সে ফল পাওয়া যাবে না। কারণ মোভিয়েট ইউনিয়ন চলচ্চিত্র শিল্পের কারিগরী দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত দেশ। মন্ডো উৎসবে যে ছবিগুলি আসে সেগুলিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এদিক থেকে 'দোস্তি'র মানবিক আবেদন থাকলেও কারিগরী দিক থেকে নিম্নমানের। সমাগত দেশগুলির প্রতিনিধিদের ভারতীয় ছবির মান সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি হবে—আসলে তা হবে ভুল ধারণা। কারণ ভারতীয় ছবির মান 'দোস্তি'র অনেক ওপরে। 'দোস্তি' ব্যবসায়ের দিক থেকে একটি সফল ছবি—কিন্তু শিল্পমানের দিক থেকে নয়। অবশ্য যদি রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার হয় তবে 'দোস্তি'ও একটা প্রাইম

নিরে আগতে পারে। মন্ডো চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে এরূপ ধারণা বিশ্বের সমালোচকদের হয়েছে। সে বছর জাপানের নির্বাক ছবি 'আইল্যাণ্ড'কে যথার্থভাবে গ্রাও প্রিন্স দিয়েও তারই সাপে 'ক্লিয়ার স্ট্রিট'র মত বোম্বাই মার্কা ছবিকে সেই পুরস্কারে অংশী করা হয়—তখনই মন্ডো উৎসবের মর্যাদা কিছুটা ছোট হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রে রাজনীতি ছবির শিল্পগুণকে ছাড়িয়ে গেলে তখন আর আশা করার কিছু থাকে না। গতবারও ফেলিনীর ৮৩ ছবির গ্রাও প্রিন্স নিয়ে মন্ডোতে কম গোলমাল হয় নি। কেবলমাত্র আইল্যাণ্ড শিল্প বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না, তার সঙ্গে আজিক গঠনের দিকটা বিচার করতে হয়।

এবারের আন্তর্জাতিক উৎসব-গুলিতে ভারতীয় ছবির সাফল্য এদেশের সকলেই কামনা করবেন। ভারত থেকে যে ছবিগুলি যাচ্ছে, তার মধ্যে 'ইয়াদে' একটি নতুন ধরণের ছবি; আর সম্রাটজি রায়ের ছবি দেখার আগ্রহ তো আজ সারা বিশ্বে।

•---সুজন

দ্বিতীয় আলোচনা

আইরিশ নাট্যকার গীন ও-কেসারী
ও-কেসারীর জীবনচিত্র

আইরিশ নাট্যকার গীন ও-কেসারীর জীবন অবলম্বনে বৃটেনে 'ইয়ং কালিডি' নামে একটি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। গীন ও-কেসারী তাঁর কোন নাটকের চিত্ররূপ দিতে অনুমতি দেন নি; কেবলমাত্র আত্মজীবনী 'নিরর হন মাই হাউস' থেকে বাল্যকালের অংশটুকুর চিত্ররূপ দিতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এই অংশের চিত্ররূপের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইয়ং কালিডি'।

বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার গীন ও-কেসারী একবছর পূর্ব নাট্য পেয়েছেন ৮৪ বছর বয়সে ১৯২৮ সাল থেকে ইংল্যান্ডের ডেভনে তিনি যেচ্ছা-নির্ধারিত হিসাবে বাস করেছিলেন। ১৯২৮ সালে ডাবলিনের এবি থিয়েটারে ডাবলিউ বি ইয়েটস ও-কেসারীর যুগ্ম-

বিবোবী নাটক 'দি সিরভার টাসি' মঞ্চ করতে অস্বীকার করে। প্রতিবাদে তিনি ডাবলিন থেকে চলে আসেন। টকিতে বসবাস করার সময় তিনি ছয় খণ্ডে 'মিরর ইন হাই হাউস' নামে আত্মজীবনী লেখেন। এখানে তিনি নিজেকে কাসিডি নামে অভিহিত করে প্রথম পুরুষের জবানীতে বর্ণনা করেছেন।

'ইয়ং কাসিডি'র চিত্রগ্রহণ অতি সুন্দর। ছবিটি প্রথমে শুরু করেছিলেন জনকোর্ড। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে জ্যাক কার্ডিফ পরিচালনা করতে এগিয়ে আসেন। তিনি ডাবলিনের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পরিবেশ নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং চরম অভাব-অভিযোগ থেকে ১৯১৬ সালে যে হাজারা স্ট্রাইট হয়েছিল তাকে বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থিত করেছেন।

এমব ঘটনার ও-কেসীর বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না, কিন্তু সে সময় তাঁরা যে চরম দারিদ্র্য ভোগ করেছিলেন তারই অভিজ্ঞতায় তিনি লিখেছিলেন জুনো 'এও দি পেকক' এবং 'দি পো এও দি স্টার্স'। তখন

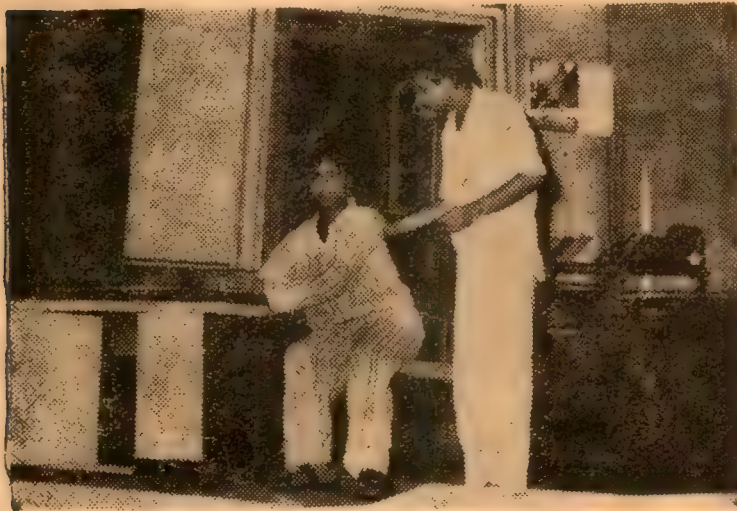


নিউ ইয়র্কের বডওয়ে দুটি কমেডি লভ (LUV)-এ এলি ওয়ালচ, এলেন আর্কিন, এ্যানিঅ্যাকসন

প্রয়োজন অনুরূপ খাদ্যাভাবে তাঁর শরীর ছিল শীর্ণ, ফ্যাকাশে এবং দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। কিন্তু ছবিতে তাঁর চরিত্রে রূপ দিয়েছে বড় টেলর। বেশ হুটপুটে অস্ট্রেলীয় যুবক। যদিও শরীরের দিক থেকে তিনি নাট্যকারের সত্যিকার চেহারার প্রকাশ

করেন নি। কিন্তু এই দুঃখী যুবক অস্ট্রেলিয় উচ্চ ন চমৎকার আয়ত্ত করেছেন।

ছবিতে উপভোগ করার মত ব্রহ্ম দৃশ্য আছে এবং অভিনয় সুন্দর ও সুপরিচালিত। বিশেষ উল্লেখ যঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁর সকলেই বৃষ্টি মধ্য ও চলচ্চিত্রে পরিচিত। মাইকেল রেভেলেড সেজেছেন তাঁরই বি ইয়েটল, এটির ইতিহাস রূপ দিয়েছেন লেড প্রেমের চরিত্রে। এবি থিয়েটারের এই দুই স্তর ও-কেসীর বিশেষ অনুরূপ এবং 'ন্যায়ে অব দি গানমান' 'জুনো এও দি পেকক,' 'দি পো এও দি স্টার্স' মঞ্চস্থ করেছেন। শেষের নাটকটি অভিনয়কালে প্রেক্ষাগৃহে হাজারা স্ট্রাইট হয়েছিল। ফ্লোরা বসম, ও-কেসীর শান্ত-নন্দ স্বভাব মায়েব তুলনায় এবং সিয়ান ফিলিপস্ অপূর্ণতায় দুর্বল বোনের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। জুনো ক্রিস্টি একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছেন—বাকি যানবাহন স্ট্রাইটের সময় হাজারার পর ও-কেসী কার্ডিফে



এ্যামেচার ইউনিট প্রযোজিত 'আলোকের এই ঋণা ধারার' নাটকের একটি দৃশ্যে অমর ভট্টাচার্য ও সত্যীকান্ত ঘোষ।

অভিনয় করেছেন নোরার চরিত্রে,
যে তরুণী কথিব্রিয়ান ও-কেসিকে
কই বার দিত এবং তাঁকে ভালবেসেছিল,
কিন্তু তিনি যখন চার্লিস ছেড়ে
চললেন তখন তাঁর সাথে বৃহত্তর
জগতের পথে এগিয়ে যেতে পারলে
না। ছবিটি সাধারণের প্রদর্শনের জন্য
আমরা মুক্তি অগেচ্ছারই জান।

নাট্যের কথা

এম্যাচার ইউনিট-এর নাট্যপ্রয়াস

‘এম্যাচার ইউনিট’-এর শিল্পী-
সদস্যরা গত ১১ই মে সন্ধ্যার দুটি
ভিন্ন রংয়ের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন।

অনুষ্ঠানে প্রথমপর্বে অভিনয়
করলেন তরুণ নাট্যকার সৌকেন
চট্টোপাধ্যায়ের মনস্তাত্ত্বিক নাটক
‘আলোকের এই রূপা ধারার’।
নাটকটির বক্তব্য কিছুটা প্রচ্ছন্ন তবে
শিল্পীদের সামগ্রিক অভিনয়ের বিচারে
একটি সকল প্রয়োজনা। অমর
ভট্টাচার্য ছিলেন এই নাটকের
পরিচালক।

দ্বিতীয় নাটক নাট্যকার জ্যোত
মল্লোপাধ্যায়ের ‘দৃষ্টি’ প্রেক্ষ-
কুলের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম
হয়েছে।

শ্রীশঙ্কু মল্লোপাধ্যায় যুগপৎ
দুটি পরিচালনা এবং দুই চরিত্র
অভিনয়ের দ্বারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ
করেন। নাটকের দ্বীচরিত্র দুটি
চিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং কুমারী কেকা
বিশেষ সংবেদনশীল অভিনয়ে সার্থক।

এ ছাড়া নাটক দুটির বিভিন্ন
চরিত্রে—শ্রীঅমর ভট্টাচার্য, হিমাংশু
মাগ, অসিত চৌধুরী, বিষ্ণু চট্টো-
পাধ্যায়, রবীন বর্মা, নৃপেন মুখো-
পাধ্যায়, রবি বোস, সুনীল সাহা,
সত্যীকান্ত ঘোষ, সনৎ রাণা, দিলীপ
বসু, অজিত সরকার, শিতাংশু সরকার,
অসিত ভট্টাচার্য ও রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ব্যবধি রূপদান করেন।



‘রাজা রামমোহন’ ছবিতে মিস্ জেনেথ হেরার চরিত্রে বনানী চৌধুরী

নাটকগুলির সঙ্গীত, নকশা, শু
আলোকসম্পাত যথাযথ।

চার্লস ডিকেন্স রূপে এম্মিলিন

ওই লগান্গ

ইউরোপে এ যুগের বিখ্যাত নট
এবং নাট্যকারদের মধ্যে একটা বিশেষ
স্থান অধিকার করে আছেন এম্মিলিন
উইলিয়াম্। ১৯৫৬ সালে স্ট্র্যাট-
ফোর্ড-আপন-এডনে তাঁকে শুধে নো
নাটকে ইয়োগোর ভূমিকার অভিনয় করতে
দেখি—মোটভলেন ম্যালিনীটি এবং
আপাতদৃষ্টিতে অন্যান্য চরিত্রে যে মনে
করছেন ‘অনেকট, অনেকট ইয়োগো’—
ইয়োগো চরিত্রের এ দুটি দিকই অতি
সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছিলেন মি:
উইলিয়াম্, তাঁর সে রংয়ের
অভিনয়ে।

ইংরাজী নাট্য-সাহিত্য এবং
নাট্য-মঞ্চের সঙ্গে আমাদের পরিচয়
আছে এম্মিলিন উইলিয়াম্‌য়ের ‘দি
কর্ন ইজ গ্রীন’ নাটকটির কথা তাঁরা
ভালভাবেই জানেন। ইংলণ্ডে নাটকটি
দুবছর ধরে অভিনীত হয়েছিল এবং

স্টার-অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসাবে
অভিনয় করেছিলেন এম্মিলিন নিজে
এবং জেইম্ সিভিল থর্নডাইক। আমে-
রিকাতে নাটকটি তিনবছর ধরে
মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং সেখানকার
অভিনয়ে প্রধানাংশে অভিনয় করেন
‘ফার্স্ট নেভী অফ্ দি আমেরিকান
সেটজ’, এথেল ব্যারিমোর।

বিগত দশ বছর ধরে মি: উই-
লিয়াম্ পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে
বেড়াচ্ছেন একক অভিনয় দেখাবার
জন্য—ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতে
তাঁর এই একক অভিনয় বিশেষ
জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

গত ১৫ এবং ১৬ই মে হিল্ট
হাইকুলের মধ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিলে
প্রয়োজনীয় এই একক অভিনয় দেখবার
সুযোগ হয়েছিল কলকাতার নাট্য
রসিক দর্শকদের। মি: উইলিয়াম্
চার্লস ডিকেন্সের রূপসজ্জার ডিকেন্সের
রচনার নানা জায়গা থেকে আবৃত্তি
করে শোনালেন। স্বয়ং ডিকেন্সও
শেষ বয়সে নিজের রচনা থেকে
আবৃত্তি করে শোনাতেন স্বদেশে
এবং আমেরিকাতে এবং এভাবে।

প্রচুর অর্থও রোজগার করেছিলেন তিনি।

আমাদের দেশে এ ধরনের নাটকীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অভিনব। শুধুমাত্র আবৃত্তির সাহায্যে ডিকেন্সের বিভিন্ন উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনাকে যে কতোটা জীবন্ত করে তোলা যায় দর্শকদের সামনে—তা অতি অসম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন এমলিন উইলিয়ামস এ দুদিন হিন্দী হাইস্কুল মঞ্চে। আর তা ছাড়া এই কথাটাও তিনি দর্শকদের প্রায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, নাটকীয় অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বড় কথা হোল ‘অভিনয়’—‘মঞ্চসজ্জা’ অথবা ‘আলোকসম্পাত’ নয়।

এই অভিনব অনুষ্ঠানটির আয়োজনের জন্য আমরা ব্রিটিশ কাউন্সিলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—দীপক

সংবাদ সংস্থা

দি সী চেঙ্গেস

অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং ‘টাইমো মেনস রসেস’-এর অভিনেতা হ্যারিসনের ২১ বছর বয়স্ক পুত্র কেরী স্মার্নেস্ট হেরিংয়ের ‘দি সী চেঙ্গেস’কে চিত্ররূপ দিচ্ছেন। কেরী জেনার কলেজে তৃতীয় বামিক শ্রেণীর ছাত্র। এই চিত্ররূপে এক ধনী যুবক ও তার বাস্তবীর শেষ মুহূর্তকে দেখান হবে। এবং ছবিটির প্রদর্শন কাল মাত্র ১৫ মিনিট। চিত্রগ্রহণ করবেন ফিল্ম প্রযোজক জন বর্লিং-এর পুত্র লারী বর্লিং। দুটি চরিত্রে অভিনয় করবে কেরী জের দুজন ছাত্র—ডেভিড কলিন্স এবং অ কিংসবোর্ড।

কমনওয়েলথ চলচ্চিত্র উৎসব

সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে যে কমনওয়েলথ শিল্প উৎসব অনুষ্ঠিত হবে সেট উৎসবকে উপলক্ষ করে লণ্ডনের ন্যাশনাল

ফিল্ম থিয়েটারে একটি কমনওয়েলথ চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

থিয়েটারের কণ্ট্রোলার জন হাণ্টলি বলেন, ‘কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে কেবল আগ্রহ নয়, যথেষ্ট প্রতিভাও রয়েছে। এখন জনসাধারণকে এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।’ তিনি উৎসবে ৩৫ মিলিমিটার অথবা ১৬ মিলিমিটারের সরকারী ও বেসরকারী সবরকম চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন বলে আশা করছেন। উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ওয়েস্ট এণ্ডের একটি সিনেমায় কমনওয়েলথ কাহিনী চিত্রগুলিও প্রদর্শিত হবে এবং টেমস নদীর দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত শেল থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হবে ‘আর্টস ইন দি কমনওয়েলথ’ সম্পর্কিত বিচিত্রানুষ্ঠান।

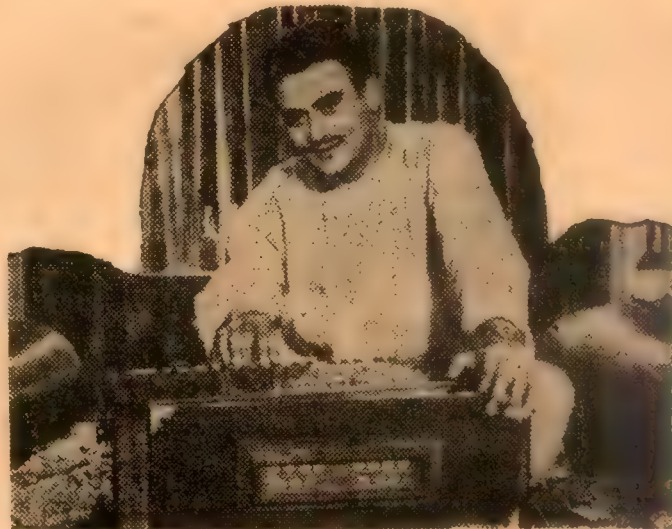
কমনওয়েলথ শিল্প উৎসব উপলক্ষে ওয়েলসে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে—এই উৎসবে প্রধানত কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশের ছোট ছোট ইণ্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম ইউনিটের ছবিগুলি প্রদর্শিত

হবে। প্রদীপ অভিজ্ঞ দলিনচিত্র নির্মাতা জন গ্রিয়ারসন এই উৎসবের পৃষ্ঠপোষক হবেন; উৎসবের লক্ষ্যই হবে দেশের বাইরে যেসব চিত্রের পরিচয় বিশেষ নেই, সেসব চিত্র প্রদর্শন করা। একজন ইণ্ডিপেন্ডেন্ট কমনওয়েলথ ডাইরেক্টরকে তাঁর প্রো চিত্রের জন্য পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে ২৫০ পাউণ্ড (৩,৩৩৩ টাকা)। উৎসবের ডাইরেক্টর হালি জোন্স আশা করেন কেবল বড় বড় সরকারী ফিল্ম সংগঠন নয়, ছোট ছোট বেসরকারী সংগঠনও উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ছবি পাঠাবেন। প্রায় ১৫০টি ছবি বাটরে থেকে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে পাঁচ মিনিটের ছোট ছবিও যেমন থাকবে তেমনই থাকবে কাহিনীচিত্র।

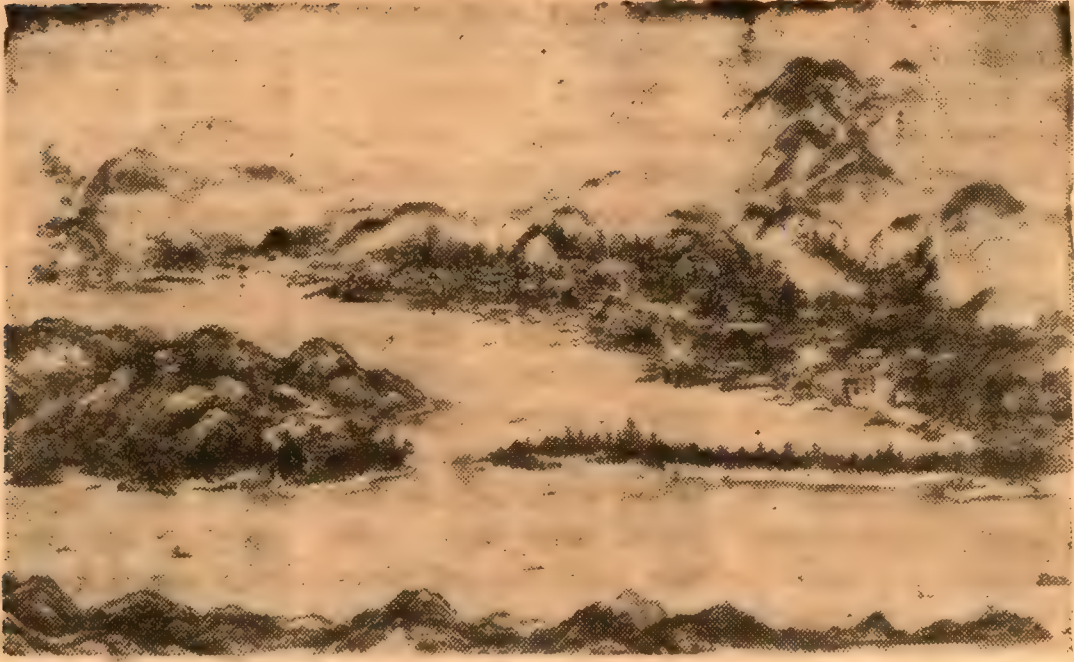
শিল্প উৎসবটি মধ্য সেপ্টেম্বর কাউকে অনুষ্ঠিত হবে।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জিত চলচ্চিত্র সংগঠিতের সন্ধ্যা

আগামী ২১শে জুন, সন্ধ্যায় মহাজাতি লদমে রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র



চিত্রক প্রযোজিত ‘সূর্যের আগুন’ ছবিতে কালী বানার্জী



জাপানের এক প্রাচীন শিল্পসম্পদ শিল্পী সেমুদ্র অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্য।

পূরকারে ভূষিত 'চাকলতা', 'আরোহী' কমিটির পক্ষে থেকে সঞ্চালিত করা এবং 'অনুপপূর্ণ' চলচ্চিত্রদ্বয়-সংশ্লিষ্ট হবে। এই উপলক্ষে ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠা অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের 'বেঙ্গল মোশান পিকচার এওয়ার্ড' অভিনেত্রীবৃন্দকেও সঞ্চালিত করা হবে।

সুডিও গার্ড

ও কে ?

শুভমঙ্গল আশঙ্ক

এক বাল্যার্জী প্রযোজিত রেশমী এন্টার প্রডাক্টের সহায়তায় ঘরোয়া ছবি 'ও কে ?' গুরুত্বপূর্ণ উত্তরা, পূর্ববী, উচ্চনা ও শব্দভাষার অন্যান্য চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

স্বাচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন—দিলীপ বসু। স্ক্রাইট করেছেন—ডি বালসারা। চিত্র চিত্রণে আছেন—বিকাশ রায়, নিলি চক্রবর্তী, গীতা দে, রাজলক্ষ্মী দেবী, আশা দেবী, মিহির ভট্টাচার্য, রেখা মল্লিক, শ্রীমান স্বপন, বুঝু গাঙ্গুলী, কামো, সুপদা দেব, ও নবদীপা শঙ্করনা ভট্ট।

বোদি

পূর্ণেলু রায়চৌধুরী প্রযোজিত পূর্ণেলু প্রোডাকশন্সের প্রথম দুবি 'বোদি'র চিত্রগ্রহণ কলকাতাতে এসিয়ার চলছে। স্বাচিত কাহিনী অবলম্বনে

বেঙ্গল কেমিক্যালের

পান্ডিউমড

তিল তৈল

আয়ুর্বেদমতে কাঁচা তিল তৈল কেবল মস্তিষ্ক ও শরীর শ্রিত্ত রাখে না - ইহা কেশদগ-মের সহায়তা করে - কেশকে উজ্জ্বল ও মন্থণ রাখে।



ছবিটি পরিচালনা করেছেন—মিলিওপ
বন্দু। স্ক্রুট্টের দায়িত্ব নিয়েছেন—
দ্বীন চ্যাটার্জী। চিত্র চিত্রণে
আছেন—সহ্যারানী, কালী ব্যানার্জী
অনুপকুমার, অসিতবরণ, বিকাশ
রায়, কমল নিজ, পাহাড়ী সান্যাল,
তরুণকুমার, রবি বোষ, কানু ব্যানার্জী,
জহর রায়, সুধেন দাস, নৃপতি
চ্যাটার্জী, মণি শ্রীবাসী, বুবু গাঙ্গুলী,
অশোক মুখার্জী, বনানী চৌধুরী,
মণিকা দেবী, রাজলক্ষী দেবী, রেণুকা
রায়, অনিল চ্যাটার্জী ও মিলি
চক্রবর্তী প্রমুখ।

২২ বঙ্গবন্ধু

বিষয়ক ভট্টাচার্য রচিত কাহিনী
অবলম্বনে সংস্কৃত চিত্রের প্রথম নিবেদন
'২২ বঙ্গবন্ধু' ছবির চিত্রগ্রহণ কাল-
কাটা নুভিটোন স্টুডিওতে জড়গতিতে
এগিয়ে চলেছে। ছবিটির চিত্র-
নাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন—
বিষয়ক ভট্টাচার্য ও অমর ব্যানার্জী।
ছবিটি পরিচালনা করেছেন 'দেবদত্ত'
হুম্মানবের ওস্তাদে একমল অভিজ্ঞ
কলাকুশলী। স্ক্রুট্টের দায়িত্ব নিয়ে-
ছেন—উষা খান্না (বোয়াই)। গান
লিখেছেন নুকুল দত্ত। চিত্রগ্রহণ,
সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন
মধ্যক্রমে—নৃপেন দাস, অমিয় মুখার্জী
ও বিজয় ব্যানার্জী।

চিত্র চিত্রণে আছেন—অনিল
চ্যাটার্জী, বিকাশ রায়, সবিতা
চ্যাটার্জী (বোয়াই) রাধাবোহন ভট্টাচার্য,
নীতিশ মুখার্জী, হরিশচন্দ্র মুখার্জী,
ডানু ব্যানার্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, বনু
মুখার্জী, সুধেন দাস, অশোক মুখার্জী,
পদ্মা দেবী, লীলাবতী দেবী, আরতি
দাস ও প্রতিমা চক্রবর্তী প্রমুখ।

জাপানের প্রাচীন শিল্পসম্পদ

আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে
আমেরিকা ও কানাডায় জাপানের
প্রাচীন শিল্পসম্পদের এক প্রাথমিক
প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
এই প্রদর্শনীতে এমন জিনিস থাকবে
যা জাতীয় সম্পদ বলে পরিগণিত।



হেইয়ান যুগে নির্মিত মূর্তি: করুণাময় বুদ্ধ

এতে থাকবে চিত্র, ভাস্কর্য, চিনা-
মাটির তৈরি জিনিস এবং প্রামাণিক
পুঁথিপত্র। এই প্রদর্শনী প্রথম আয়োজিত
হবে লস-এঞ্জেলেস থেকে।

এই প্রদর্শনীর ১২০টি প্রাচীন
শিল্পনির্দর্শন অণুকা যুগ থেকে
এডো যুগের, অর্থাৎ ৭ম থেকে ১৯শ
শতাব্দীর। প্রদর্শনীতে চিনামাটির
ও কাচের তৈরি জিনিস বেশি থাকবে,
কারণ আমেরিকায় এ বিষয়ে উৎসাহ
বেশি।

প্রদর্শনীতে দুটি অমূল্য সম্পদ
থাকবে। তার একটি মুরোমাচি যুগের
শিল্পী 'আসানোহাচিদাতে'

কায়তোর নিকটে প্রাকৃতিক বুদ্ধের
এক বিপুলকর চিত্র। এটি
জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।
দ্বিতীয়টি হেইয়ান যুগে নির্মিত 'করুণা-
কুশি নায়েইরি যো' (করুণাময় বুদ্ধ)
মূর্তি। এটি একটি
নানার গান্ধারি মন্দিরে রক্ষিত আছে।

এই ধরনের প্রাথমিক প্রদর্শনীর
আয়োজন অতীতেও করা হয়েছে।
১৯৫৩ সালে 'ওয়ারশিটন', ১৯৫৮ সালে
নিউ ইয়র্কে এবং ১৯৫৮ সালে প্যারিসে,
লণ্ডন, হেগ, রোমে একরকম জাপানী
প্রদর্শনী হয়েছিল।

খেলা খেলা



ক্রে ও লিস্টনের লড়াইয়ে প্রথম রাউন্ডেই এক মিনিটের মধ্যে লিস্টন-হারাশারী হন। ক্রে লিস্টনের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে উৎসাহ করে আবার লড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

বাংলা প্রহসন

লিস্টন যেন থেকে বিশৃঙ্খল
এবং প্রচারিত করা হ'ল--৬০ সেকেন্ডে
ক্যাসিয়াস ক্রে লিস্টনকে হারাশারী
করেছে ২৬শে মে'র বিশৃঙ্খল হেডিওয়েট
বক্সিং-এর লড়াই-এ। এ-ত' বক্সিং
নয়, মনে হয় প্রহসন অথবা ভোজ-
খাজি। এই লড়াই-এর কথা বলতে
৬ মাস আগেকার ঘটনা বাদ দিলে
চলবে না।

১৯৬৪-র নভেম্বর। আমেরিকার
বোস্টন শহরে অগণিত জনসমাগম
হয়েছে এবং প্রবল উত্তেজনার সারা
শহর সরগরম। সকলের মুখে এক
কথা কে জিতবে? ক্রে না লিস্টন?
জুজুতিবাক ক্রে বোস্টনের সাতার দল-
বল নিয়ে হন। করছেন--হাতে তাঁর
হুডিও কুকুরের গলার বগলেন। তলুক
মাচের তালে তালে গান করছেন এবং
তাঁর দলের লোকেরা তালে তাল
দিচ্ছে। সে এক অভিনব দৃশ্য।

টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে ক্রে
তলুক শিকারের অভিনয় করছেন--
তাঁর প্রতিদ্বন্দী সোনি লিস্টন যেন
মুতিনান তলুক।

ক্রে'র এই ছায়াবলি লিস্টনের
কানে আসছে। কিন্তু বেচারী মুখ
গোমড়া করে বসে আছে। নিয়মী-
বীচের পরাজয় তাকে স্বপ্ন করে
দিচ্ছে। অমানুষিক বেহনং করে

শ্রীঅমিতাভ

বেদবহল দেহটাকে সে শানিত করছে
দিনের পর দিন। ডাক্তার, কোচ
যে যা বলছে বেচারী অকরে
অকরে তা পালন করছে। পরাজয়ের
প্রতিশোধের জন্যে যে কোন ত্যাগ
স্বীকারে সে প্রস্তুত। বদ মেজাজী
লিস্টন আত্ম অন্য মানুষ। ব্যানেকারের
কথায় উঠছে, বলছে। অপেক্ষা
করার সময় আর নেই। সময় হ-হ
করে বেড়ে চলেছে।

তিরিশ আনি পার হই নি। লোকে
বলছে চমিশের বেশি ত' কম নয়।
বর যেমন শুভলগ্নের প্রতীক্ষা
সেজেগেজে বসে থাকে--লিস্টনও
তেমনি প্রতীক্ষা করছে ক্রে'র সঙ্গে
রিং-এর মধ্যে শুভদৃষ্টির জন্যে।
নিয়মীর পরাজয়ের প্রতিশোধ চাই।

কিন্তু হায়, বোস্টনের ধুমায়িত
উত্তেজনা নিতে গেল। লিস্টনের
প্রতীক্ষা ব্যর্থ হল। ক্রে হানিয়া
অপারেশনের জন্যে হাসপাতালে
ভর্তি হলেন এবং সেখানে বসে
সাংবাদিকদের কাছে লিস্টনের মুণ্ড-
পাত করলেন। বিশেষজ্ঞরা বললেন
ক্রে এবার লিস্টনকে চালে মাং করলেন
দুর্ভাগ্যের মুঠাঘাত আবার তাকে নক
আউট করল। ক্রে'র চেয়ে বেশি
শক্ত তার বয়স। ক্রে বাইশ বছরের
তরুণ--তার পক্ষে ৬ মাস বা ৬
বছর কিছুই আসে যায় না, যৌবন-
নূর তার বছরদিন প্রদীপ থাকবে।
কিন্তু লিস্টনের যৌবন-প্রদীপ আজ

নিখুঁত। সিয়ানীচের পরাজয়ের মা কয়েক তার মন ভেঙে গেল।
তার কাঁধ ভেঙেছিল—বোম্বার্ডার লড়াই কাঁধ হারত জুড়ে কিন্তু ভাঙা মনকে

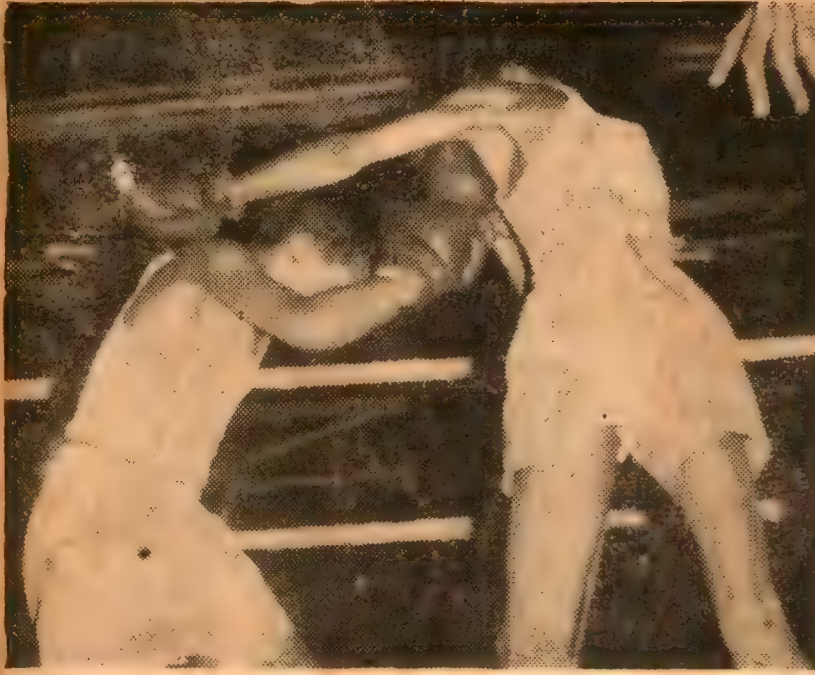


প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লীগে মহম্মদ আলী স্পোর্টিং এন্ড এমিরাতের খেলার একটি দৃশ্য।

জোড়া লাগাবার ভাবের বা দাঁড়িয়ে
কোথায়?

ও বাস পরে এই জিওরে মাঝ
কু-লিগটন লড়াই-এর ফরাসি টিম।
লিগটন মেন শহরে। টিমের নাম
বড় পতনার মত শুনো টিমের
ছিল এবার ততটা নয়। অপমানিত
দর্পকে টেমিডারি ভরে গেল। কক-
মকে প্রথমে দেখা দিলেন লিগটন।
টিমের সঙ্গে দর্পকরা অভ্যর্থনা
জানাল। পরে এলেন কু-টার
ভাগ্যে লুটল মিলিত অভ্যর্থনা—কিছু
লম্বা দূর কিছু ব্যয়। অতীতের
কিশু-চ্যাম্পিয়ন মো লুই, জিম ব্রডক
প্যাটার্নসন প্রভৃতিকে স্মি-এর ওপর
দেখা গেল। দর্পকরা টিমের নাম
ফেটে পড়ল বরন বেকারী ওয়ানকট
লড়াই শুরু করে দিলেন। একটি
শিবিরের চবক—কু চকিতে হানল
জান ও বা হাতের দুটি প্রচণ্ড শুলি
লিগটনের বাধায়। অপমানিত লিগটন
শুলি চালান কু-র অস্বস্তি চোখাল
লক্ষ্য করে, কিন্তু চকন কু-র শুলি
শুলি স্পর্শ করল বাত। বাস—এ
অবোধে কু চালানেন একটি
হাতের ছক—লিগটন জিটকে গেল
স্মি-এর ধারে, ভেঙে গিয়ে আর একটি
বাঁ হাতের ছক—সঙ্গে সঙ্গে লিগটন
পপাত ধরল। লিগটন বাত
হলেন বটে তবে সময় পার হয়ে
বাওয়ার কু লড়াই জিতে গেলেন।
২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার প্রাইজ হ'ল
১ মিনিটে। দর্পকরা চটে চীৎকার
করে উঠল 'দুর্ভাগ্যবান' কিন্তু
কে কার কথা শোনে—ততক্ষণ
বেলা ঋতম।

এইসঙ্গে বসি-এর প্রযোজনার
পেছনে কতটা যোগসাজশ, কতটা
প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের মনোভাব আছে,
তা বলা শক্ত। তবে এটা
নিবালোকের মত স্পষ্ট যে, সমস্তটি
পরমা - কার্যবাহী প্যাডিকন।
লিগটন বড় শুলি আফ্রিকান কক-
একথা প্রমাণ হল আজ সে অস্বস্তি।



জাতীয় স্কুল মন্ডিৎ প্রতিযোগিতার ফাইনালে এ মদ্রিয়েল (উড়িয়া) ও এম
বর্মণের (বাংলা) লড়াইয়ের দৃশ্য

একটা অপ্রাপ্ত লোককে বাড়া করে
কোটি ৪০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ
স্বীকৃতিমত ধাপ্পাবাজী। কে নিজেই
ডাঃ খতবের পর বলেছেন—আমি
জানতাম ১ম রাউন্ডেই তালুকটা
ফুপোকাৎ হবে। তবে এগর কথা
আগে বলি নি কারণ তাতে দর্শক-
লমাগন কম হতে পারে।' কে
এবার প্যাটার্সনকে হালুঘুড়ে আহ্বান
করেছেন।

আকর্ষণীয় ফুটবল

ময়দানের ফুটবল ক্রমেই রসবন
হয়ে উঠছে। খ্যাতিনামা দলগুলির
মধ্যে ইস্টবেঙ্গল এর মধ্যেই থাকে।
খেয়েছে। প্রথম ডিভিশনের নবাগত
দল গ্রীয়ার ড্র করে একটা পয়েন্ট
হিঁসিয়ে নিয়েছে। সেদিনের অর্থাৎ

২৪শে মে'র খেলায় ইস্টবেঙ্গলের প্রতি
ভাগ্য বিক্রপ ছিল—তা নাহলে সারাক্ষণ
চেপে খেলেও তারা গোল করতে
পারলে না। এ ধরনের বিপর্যয় অনেক
সময় শাপে বর হয় কারণ দলের
দোষ-ত্রুটিগুলি মেরামত করার সুযোগ
হয় এবং দুর্বল দল বলে বিপক্ষকে
তাচ্ছিল্য করার মনোভাব তিরোহিত
হয়। ইস্টবেঙ্গলের এই বাধা তার
দৃমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে দেবে।

মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৫শে মে হঠাৎ
কালবৈশাখীর আবির্ভাব। শুকনো
মাঠ হয়ে উঠল পিচ্ছিল ও কদমাক্ত।
মোহনবাগান ও বালীপ্রতিভার খেলায়
ফুটে উঠল চমকপ্রদ প্রতিযোগিতার
সুর। মোহনবাগান গোল দেয়—
পরক্ষণেই বালীপ্রতিভা দেয় শোঁধ।
দর্শকদের উল্লাস-ধ্বনিতে আকাশ ভেঙে

পড়ে। অরুণ দিলেন মোহনবাগানের
পক্ষে গোল, বালীপ্রতিভার নীলেশ
সরকার দিলেন শোঁধ। আবার
চলল দেওয়া-নেওয়ার পাল।
অশোক চ্যাটার্জী আর এক গোল
করে মোহনবাগানকে দিল এগিয়ে।
বিরতির আগেই বালীপ্রতিভা তা
দিল শোঁধ করে। কিন্তু বালীপ্রতিভা
শেষরক্ষা করতে পারলে না।
দ্বিতীয়ার্ধে ডি মওলের কোণাকৃপি
স্ট মোহনবাগানের জয়যাত্রাকে অক্ষুণ্ণ
রাখলে। বি-এন-আর ও মহেন্দ্রান
দলও এ পর্যন্ত ড্র অথবা হার স্বীকার
করে নি।

সমাচার দর্পণ

ফরাসী লন টেনিস প্রতিযোগিতায়
ভারতের রামনাথন কৃষ্ণাণ চতুর্থ
রাউন্ডে পরাজয় স্বীকার করেছেন।
ভারতের জয়দীপ মুখার্জীও চতুর্থ
রাউন্ডে রয় এমার্সনের সঙ্গে
তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত
হয়েছেন। ভারতের এই দুজন
খেলোয়াড়ের কাছ থেকে উইম্বলডেন
প্রতিযোগিতায় আরও উচ্চাঙ্গের
খেলা আমরা প্রত্যাশা করি।

আগামী শীতকালে ওয়েস্ট
ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের ভারতসফর
এখনও টাকা-পয়সার লেনদেনের
ব্যাপারে সক্রম সূতোয় খুলছে। টাল-
পয়সার টানাটানিতে সূতো হিঁসে
গিয়ে অগণিত ক্রিকেট-রসিকদের
যেন নিরাশ না হতে হয়।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গবতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বঙ্গবতী প্রেস হইতে প্রিন্টকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলাব বিজ্ঞানযুগলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পাবিাবিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহ সমাজ ধ্বংস কবিয়াছে যুনানী সভ্যতা। বাংলাব অজ্ঞতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নারক বাংলাব বালগোপালদেব কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কুতর্থা হইয়াছে।

প্রতি বিজ্ঞানরে এট গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারেব প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহবি এনি লিখিয়াছেন —

“...চমৎকাব বই। ঋষিদের প্রচাবিত হিন্দুধর্ম স্বৰ্ণকে স্পষ্ট ধাবণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও কিশোরীদের হাতে এই বকমের একখানি কবে বই শোভা পাক, এ আমাব বড় ইচ্ছে।”

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ‘প্রবাসী’র অভিমত—

“ধর্মের মূল ও সাব কথার সঙ্গে পবিচিত না হওয়াব সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহাব ফল ইমানী আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ কবিতেছি। এ সমব এইরূপ একখানি পুস্তকেব প্রয়োজনীয়তা আছে।”

স্বাধীনতার ইতিহাস

বিপ্লবী বাংলাব শৃঙ্খলমোচন অভিযানের প্রারম্ভে তরুণদের উদ্বুদ্ধিত কবিয়াছিল।

পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থরাজি

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাব স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বর্ণোজ্জ্বল প্রথম প্রামাণ্য বিবরণী

প্রতাপাদিত্য ২১

ভারতের স্বাধীনতার সহিত সম্পদ লুণ্ঠনের প্রথম জালিয়াৎ ও বাচপাড়ের কথা

জালিয়াৎ ক্লাইব ২১

মহারাজ নন্দকুমারের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-আলেখ্য

মহারাজ বন্দুকুমার ২১

রাজনৈতিক-গগনের দীপ্তসূত্র—পাক্ষাবকেশরী

লালা লাজপৎ রায়েব জীবনী

(ইংরাজীতে)

রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় মহাজীবনী। মূল্য ১০

ডক্টর গগ্গানন বোষাল এম, এস, জি প্রণীত

আমাব দেখা মেয়েবা

(রহস্য রোমান্সের স্বর্ণখনি)

রক্তনদীর ধারা’, ‘অপরাধ বিজ্ঞান’ ও ‘বিখ্যাত কাহিনী’ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যচন্দ্র। বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও বহু রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবা ন চায়। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্য বাংলা দেশে নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে স্পষ্ট প্রতিভাত হবোছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না ওঠা যায় না। বইয়ের আত্মোপাস্ত রুচিবাস উদ্বেগ অনিশ্চয়তা। উপস্থানের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মতিলাল গ্রন্থাবলী

ডাঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপস্থাস)

২। মনাষা (উপস্থাস)

৩। বিদ্যাংশিষা (১১খানি গল্প সমষ্টি)

৪। দাপশিখা (কবিতা সঙ্কলন)

৫। চাকবাক (নাটক)

উপস্থাস-সাম্রাজ্যের রক্তমুকুট,—সেই সর্বজনপ্রমোদন—অ-কৌশলি উপস্থাসিক—লক্ষপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান বঙ্গ—
—‘ভারতী’ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৫ম ভাগে :—বাবলা, মমতা, নিষংগ, অতঃপর, ১৯১৮
সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপস্থাস
প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডি-টোরিয়াল, আদর্শ মন
সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটিবে দাপ
যাত্রায়, কুলকাটা, দুঃখীবাস, পান-সুপারি। মূল্য ২১০ টাকা

বঙ্গমতা প্রাইভেট লিমিটেড

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থ আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর
'ভাগবতাগত' গ্রন্থের কবিতাসম্পন্ন বঙ্গভাবানুবাদ
এবং শ্রীগোবিন্দেব পিয়তম ভাগবতাগত
সমুদায় পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী।

উপাত্তে আছে দুইগানি অনুল্য গ্রন্থ
শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতাগতের অনুল্য
কবিতাসম্পন্ন

শ্রীমদ্ভাগবতায়ত

এবং

ভাগবতাগতের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভাষাতে ওষম বঙ্গভাবানুবাদ

"...শুনিলে ভাষাব ভক্তিয়াগেব পঠন।

আবিষ্ট হইল গোরচন্দ্র নাথায়ন।"

ইহা কৃত্তিবাসী বায়ামণ এবং বাসীধাম দাসের মণ্ডিতভাষ্যের
শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি গুরুত্বের অবস্থাপাঠ্য হউক, এই নিবেদন।
এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলায় প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও কণাশিল্পী—

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—১। অপরিচিতা, ২। বিগ্রহ, ৩। আত্ম-
সমর্পণ, ৪। ভাইবোন, ৫। জয়-পরাজয়, ৬। কবির
মানস-প্রতিমা উৎসর্গ।

সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী, খাল ৮ পেজী, ৩০০ পৃষ্ঠা সুরম্যা বাণাই
মূল্য তিন টাকা।

শাণ্ডিল্য-সূত্রম্

বঙ্গভাবানুবাদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের বিরচিত

শাণ্ডিল্য শতসূত্রীন ভাষ্য সহ

ভক্তিশাস্ত্রেব গ্রন্থ-মণি,

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপিপাসুদের প্রাণস্থত

মূল্য বার আনা মাত্র

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের

জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী

সংস্কৃত সাহিত্যের জ্যোতির্দীপ্ত নাট্যদ্বিজ, কালিদাস,
কঙ্কনাচাধ্য, শ্রীহর্ষদেব, বাণভট্ট, ভবভূতি, শূদ্রক, বাজ্রশেখর
প্রভৃতির সাহিত্যমণিত অমৃতধারা—বালভাকের বিভীষিকা,
মোহনসিংহ গল্পস্বপ্ন, ছোলায় বসন্ত, পিয়ের লোতীর
সম্মোচন, মৌলিবেবের বৌতুক-বৌতুক, স্বাধীন ভাবতের
গৌরবদীপ্তি, বাজপুত শৌণ্ডেব অলৌকিক প্রভা, তববারি
আশ্মলনে। বড়ায় সম্মেলন।

১ম খণ্ড—অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্জশী, নাগানন্দ,
শকুন্তল-বিজয়, বড়াবলী, প্রিন্সদর্শিকা, মদ্রাবাক্স, উত্তরচরিত।

২য় খণ্ড—দুর্জয়িতেনা, শোণিত-সোপান, ইত্যাকান্তের
পব সবল শমনতান, অলীক বার, বেডালের স্বর্গ, শেষ পাঠ,
বার্লিনের অকরোহ, দর্পণ, ইংবেজ-বর্জিত ভারতবর্ষ মহোৎসব
নাট্যের মজলিস, মা, জন্মদ, জ্যোৎস্না বাহে, স্বপ্নমণি,
শেষ পরী, দণ্ডা, আভিশপ্ত বাডী, ভাব ভুল ইমেজিল,
ভাগ্যলক্ষ্মী অন্ধ।

৩য় খণ্ড—মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রবোধচন্দ্রোদয়,
কপূর্বমঞ্জরী, চণ্ডকৌশিক, বিদ্যুৎশালভঙ্জিকা, মহাবীরচরিত।

প্রতি খণ্ড এক টাকা

জ্ঞানের অলকনন্দা ও ভক্তিমন্ডাকিনীর সম্মেলন

সর্বশাস্ত্রের সারসংকলন

গীতা-গ্রন্থাবলী

(পঞ্চবিংশতি গীতা সমগ্র)

মূল ও সরল বিস্তারিত বঙ্গভাবানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদগীতা
যেমন মহাভারতের সার—এই গীতাগুলি তেমন সর্বশাস্ত্রের
সান্নাৎসার পঞ্চবিংশতি গীতায় এই গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ। ইহা
ভাগীরথী ব্রজ, জ্ঞানীর সম্মেলন, যোগীর সিদ্ধি, ভক্তের
জপমালা, সংসারীর পাথের।

হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, ভুলসী, অবধূত, জীবমুক্তি,
বড়জ, হংস, মদ্রি, গীতাসার, পিত্ত, পৃথিবী, সপ্তমোকা
রান, পরাশর, গীতাসার, শাস্তি, শিব, ভগবতী, বোধ, গর্ভ
পাণ্ডব, উত্তর ও রাস।

মূল্য তিন টাকা।

সুচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৬৭
আজকের মানুষ	...	৬৮
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৬৯
অনুবোধ (কবিতা)	কাকুনকুস্তলা মুখোপাধ্যায়	৭০
বৈকালিক (কবিতা)	কাজী আবু জাকর সিদ্দিকী	৭০
ভারতদর্শন	...	৭৬
আন্তর্জাতিক	...	৭৩
বঙ্গদর্শন	...	৮০
অন্ধকারের নায়ক	সর্ষ কানুনগো	৮৩
সখাস্থান (গল্প)	প্রভাত দেবসরকার	৮৭

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাংলার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাংলার মিশ্রিত সমাজের দৃশ্যটিকে আলোকিত। শালক লক্ষ্যদায়ের দ্বারা নির্ধারিত বাস্তবিক মুকুন্দরাম গ্রন্থ ও বেদমাঝিই বাংলার ঐতিহাসিক কবি—ব্যক্তিগত দৃষ্টে কি করিয়া সর্বজনের দৃষ্টে হইতে পারে বাংলা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাংলার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বহুমান গ্রন্থে আছে—

- ১। মূল কাব্য, ২। বিবৃতিত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (কবি বাক্যমাত্র লিখিত), ৬। বিবৃতিত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নাহাররজন গুপ্তের প্রস্তাবনা

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমের চমকপ্রদ বিষয়বস্তু
কাহিনীর মধ্য দিয়ে যিশুখ্রীষ্ট গোপন-
সাহিত্যের শার্পস হোমনেয় বসত
বুদ্ধিদীপ্ত কিশোরী ঘরের আবির্ভাব।

বাংলার মিশ্র সাহিত্যে

ডাঃ নাহাররজনের দ্বারা প্রণীত

—ভেদবানি নির্দোষিত ঘটনা—

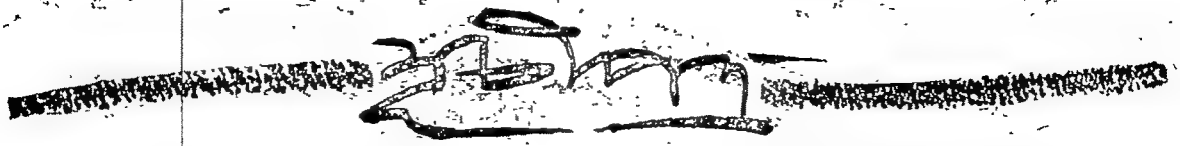
কালো ভ্রম, কয়েকটি দ্বন্দ্ব
কতকগুলো বস্তুগত মীমাংসা, পাত্রবৈশিষ্ট্য
লিখিত, পঞ্চমুখী দ্বন্দ্ব, যত্নপূর্ণতা,
দুঃখ, কালচক্র, কবিতা, পাণ্ডিত্য
চোখ, দর্প, অজুবিদ্য, প্রণাম জানায়

প্রতিষ্ঠান নাট্যরঙ্গ ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বসুগোপালচন্দ্র

শ্রীমণিলাল প্রস্তাবনা

৫৪ ভাগে—৬খানি মূল্য ৩০০ পৃঃ—



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভারতের স্বাধীনতার ভাবরূপের বিবর্তন	ডঃ রামশচন্দ্র মজুমদার	৯১
শিকার (কবিতা)	রবীন্দ্র ঙ্গ	৯৬
গ্রাম বাংলার কথা	পারুল ভট্টাচার্য	৯৭
অস্থিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশাল রায়	১০৪
বার্ণাক্সে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১০৮
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১১২
আধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বতা ভট্টাচার্য	১১৪
চার্লি চ্যাপলিন	আশোক সেন	১৮
রক্তকণ	...	১২০
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১২৬

রক্তকণের বিহারী ঙ্গ

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এস্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চশী, সিনাকিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সময়, জাতের বিভ্রম, পথের সন্ধান, স্বাধীন সাহস, স্বর্গ ও কৰ্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বালক কথামঞ্জা

দ্বাদশ গুপ্তের এস্থাবলী

৭ খানি বহু ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—মুদ্রহু এস্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের এস্থাবলী

সেহাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর এস্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বহু: যাহুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

২য় ভাগে—বাসুদেব, চোরেয় উপর বাটপাড়, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিলাসি, তরুণা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

এতি ভাগ আড়াই টাকা

কার্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের এস্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারী-লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বঙ্গবিরাগ, প্রেম-এবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সঙ্গর্গ, মায়াদেবী, মুমুক্ষে, শরৎকাল, দেবরাজী, রাউল বিংশতি, সাহের আশ্রয়, কবিতা ও সঙ্গীত।

মূল্য ৩ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংকলিত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিত্তাসুন্দর এস্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর

এস্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিকুপ্রিয়া, মহামায়াচর ও গুণিমাঙ্গল।

মূল্য—ছয় টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ ভায়র

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

এস্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেশরতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোহামী, পুজার মালা ও হাণী বঙ্গসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা



৭০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ
বৃহস্পতিবার, ২৭শে জুন, ১৯৭২

Price : 25 Paise
Thursday, 10th June, 1965

অসম্পূর্ণ ভাষা-প্রস্তাব

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভাষা-সমস্যা পর্যালোচনার ব্যাপারে কিছু দূর অগ্রগতি হয়েছেন, কিন্তু কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণতানুভব কবেছে তেবে অসম্পূর্ণতার কারণ নেই। মনে রাখতে হবে, গোড়া-কার গলদ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত না হলে শেষবাক্য হয় না। কমিটির এবাবের প্রস্তাবে অন্যান্য ভাষাগুলির ব্যাপারে কিছুটা সুবিচার করা হলেও হিন্দীর প্রতি অহেতুক গোঁড়ামি এখনো নিবারণিত হয় নি।

প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর যোগ্যতম বিবোধিতা 'কোটা সিস্টেম' রদ করা সম্ভব হয়েছে, তার পরিবর্তে ইংরেজি, হিন্দী ও অন্যান্য ভাষাগুলির মাধ্যমে সর্বভারতীয় পরীক্ষাদানের রীতি প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। আমরা সর্বভারতীয় পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষার পক্ষপাতী ছিলাম, কিন্তু উগ্র হিন্দী সমর্থকদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব না হওয়ায় আপাতত যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তা মঙ্গলের ভালো। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে কবে থেকে পরীক্ষা গৃহীত হবে, তা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দীভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা কোনোমতেই উচিত নয়।

সহজ ও সোজা কথা হচ্ছে এই যে, সংহতির স্বার্থে আমরা চোদ্দটি ভাষার সমানোষিকারের পক্ষপাতী; একমাত্র হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার কোনো কারণ নেই। যা হোক এবার কমিটির প্রস্তাবে তথাকথিত আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে জাতীয় ভাষা বলা হয়েছে।

আঞ্চলিক তথা জাতীয় ভাষাট স্ব স্ব রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার বাহন হবে, অবশ্য ইংরেজিকে পাততাড়ি গুটাতে হবে না। সেইসঙ্গে অ-হিন্দীভাষাভাষীদের হিন্দী ও হিন্দীভাষাভাষীদের অপব একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করতে হবে। এইভাবে যে ত্রিভাষিক সূত্রের সন্ধান করা হয়েছে, তার কলে হিন্দীকে ইংরেজি স্বলাভিষিক্ত করার ধীর বাসনাটি লক্ষ্য করার মতো। হিন্দী-ভাষাভাষীদের অপর কোনো ভারতীয় ভাষা শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে তা অকেজো গণ্য হলে সেই ভাষা শিক্ষা গ্রহণের তাৎপর্য ক্রমে শিথিল হওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়া তারা উক্ত ক্ষেত্রে সংস্কৃতকে গ্রহণ করে আটনকে স্বভাবতঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারবে।

এমত অবস্থায় অন্যান্য ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট তিনটি ভাষা

শিক্ষা গ্রহণের বাধ্যতা জ্বরদন্তিসূচক ও অগণতান্ত্রিক। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার এই যে, অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পারস্পরিক পত্রালাপে ইংরেজি কিংবা হিন্দী ব্যবহারের স্বাধীনতা অ-হিন্দী-ভাষাভাষী রাজ্যগুলির থাকবে।

সেক্ষেত্রে তাদের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের অধিকার নেই। কিন্তু হিন্দী-ভাষী রাজ্যগুলি ঐ ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত নিষেধের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সুযোগ পাবে। অধিকন্তু পল্লীমন্টে ১৪টি ভাষার সমান ব্যবহারের প্রস্তাব কমিটি গ্রহণ করতে পারেন নি। এই-সব কারণে কমিটির সিদ্ধান্ত এখনো অসম্পূর্ণ বলে আমরা মনে কবি। জাতীয় সংহতির স্বার্থে ১৪টি জাতীয় ভাষার সমান সুযোগ থাকা একান্ত কাম্য। শেষত হিন্দীর জন্যে অধিক অর্থ ব্যয়ের সুবিধা কবলেই ভাষা-সমস্যার সমাধান হবে না,—একথা আমরা যেন ভুলে না যাঠ।

সম্পাদক

আকাশ মন্ত্রী

‘অপূর্ব, অপূর্ব! আশা, চমৎকার!’ এই কথা ক’টিই তাঁদের মুখে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল যারা সেদিন টেলিভিশনের পাশে বসেছিলেন। তাঁদের চোখের সামনে যে এক অবিশ্বাস্য অনির্বচনীয় দৃশ্য, এই পৃথিবীর একটা স্বভাবসংগত মানুষ অন্য জগতে হাত-পা নেড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে, আলিঙ্গন করছে যেন নতুন জগতের পরিবেশকে।

যে-বৃত্তান্তরী বীর এ-সমস্যা সাধন করেছেন তিনিই তো এডওয়ার্ড এইচ হোয়াইট। মাক্সিম যুক্তরাষ্ট্রের মুখ রেখেছেন হোয়াইট, পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর নাম চির অক্ষর হয়ে থাকবে। পৃথিবীর বুক থেকে ১৫০ মাইল ওপরে মহাকাশের শূন্য নীলিমায় হোয়াইট বীরদর্পে পদচারণা করেছেন কুড়ি মিনিট ধরে, বৃত্তকে ভয় করেন নি তিনি, স্বদেশের সন্মতি তাঁকে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের অগ্রগতিককে অব্যাহত রাখতে হবে, চন্দ্রলোক যাত্রাকে স্বাধীন করতে হবে।

সত্যি বটে মহাশূন্যে এডওয়ার্ডেরই প্রথম পদক্ষেপ ঘটলো না, মাত্র ৭৫ দিন আগে—১৯শে মার্চ তারিখে রুশ মহাকাশচারী আলেক্সি লিওনভ মহাশূন্যে পায়ের ছাপ রেখে এসেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় অভিক্ষেপে তাই বলে মহাশূন্যে কিছুমাত্র অঙ্গস্থান করে নি, তাঁর অন্যেও নিস্তরঙ্গতার কার্পেট পাতা ছিলো।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার ইতিহাসে মহাকাশযাত্রা এক অবিশ্বাস্য ঘটনা, তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা হলো মহাশূন্যে দিশধুর মতো ভেসে থাকা। কিন্তু এডওয়ার্ড প্রায় অসীমলক্ষ্যে তা সম্পন্ন করেছেন, মহাকাশযাত্রা জেমিনী-৪ থেকে বেরিয়ে যাঁ পিয়ে পড়েছেন মহাশূন্যের অনন্ত গাগরে, কেবল একখানা স্বর্গরজ্জু তাঁর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছিলো। এডওয়ার্ড কিন্তু ৩৪ মহাশূন্যে বসেও দিশা মুহূর্তের মাংস স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদি ৪৯ রকমের রাজসিক খাবার খাচ্ছিলেন আর চার ঘণ্টা কবে বুঝেছিলেন!

অশ্রি হোয়াইটের ভয়ের কারণট বা কী থাকতে পারে এমন ওস্তাদ মাঝি থাকতে? জেমিনী-৪-এর হাল তো ধরা ছিলো জেমস ম্যাকডিভিটের হাতে, ২৫০০ ঘণ্টা জেট বিমান চালানোর রেকর্ড আছে তাঁর।

সত্যি ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি থেকে যখন দুই গডচবকে নিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিল তখন শতক মহাকাশবিজ্ঞানী রুদ্দ-নিস্বাসে টেলিভিশনে লক্ষ্য করছিলেন এই দুই মরণজরী বীরের শূন্যবিহারকে, প্রেসিডেন্ট জনসনও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স টেবিল ছেড়ে ছুটে এসেছিলেন তাঁর টেলিভিশন যন্ত্রটির সামনে দুই তরুণের মহাকাশযাত্রার শুভ কামনা করতে। প্রতি মুহূর্তে হুজিফটনের কন্ট্রোল স্টেশন থেকে নির্দেশ যাচ্ছিল মহাকাশচারীদের উদ্দেশে। লবাইয়ের মনে একটা ভয়, একটা ভাংকা, কী জানি কি হয়, ‘ঠাকুর, ওদের দেখো তুমি, সকলেরই মিলিত

প্রার্থনা। কিন্তু সকল সলোহ-সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে এডওয়ার্ড সেই পরম প্রাণিত কললাভ করেছেন, তিনি মানুষকে মহাকাশ-জয়ের পথে, চন্দ্রলোকে অভিযানের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

বলাই বাহুল্য, এডওয়ার্ড হোয়াইটের পূর্ব ইতিহাস প্রমাণ করে যে এ-কাজ তাঁর পক্ষে খুব শক্ত ছিল না। প্রথমত টেকসালে যখন তাঁর জন্ম, রক্তে তাঁর দুর্দমনীয় তেজ, মনে অটুট সাহসিকতা তো থাকবেই। এরপরে গোড়া থেকেই তিনি বিমানচালনায় উঁচুদরের শিক্ষালাভ শুরু করেছিলেন। নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত ওয়েস্ট পয়েন্ট মিনিটারী একাডেমির একজন কৃতী গ্র্যাজুয়েট এডওয়ার্ড। বিমানবাহিনীতে বোগ দিয়েও এডওয়ার্ড বিমানচালনায় আরো পাকাপোক্ত হয়ে ওঠেন। পশ্চিম জার্মানীতে জেট-জরীবাহিনীর সঙ্গে তিন বছর কাটাতে পর এডওয়ার্ড আবার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিমান বিদ্যায় এম-এস-সি পাশ করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার বিমানবাহিনীর বেস ক্যাম্পেই এডওয়ার্ড এয়ার ফোর্স টেস্ট পাইলটের ট্রেনিং নিয়েছিলেন। জেট বিমান চালনায় ২২০০ ঘণ্টা রেকর্ড নিয়ে এডওয়ার্ড ১৯৬২ সালে মহাকাশচারী হিগেবে বিশেষ ট্রেনিং নেবার যোগ্যতা অর্জন করেন।

বিমানচালনা ছাড়াও এডওয়ার্ড বিমান নির্মাণের ডিজাইন থেকে শুরু করে বিমানে সংবাদ আদান-প্রদান, চন্দ্রলোকে



এডওয়ার্ড হোয়াইট

অবতরণের জন্য এ্যাপোলো কর্মগুচীতে কন্ট্রোল সিস্টেম পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। ক্রীড়াঙ্গণেও এডওয়ার্ড অত্যন্ত জনপ্রিয়, দেশের কয়েকটা ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত রয়েছেন।

এডওয়ার্ডের সুখীপরিবারে আছেন তাঁর স্ত্রী প্যাট্রিসিয়া আর দুই ফুটবল্টে ছেলেমেয়ে এডওয়ার্ড ও বনি।

সাহিত্যে দেশ-দেশান্তর

হুমায়ুন মিল

টলস্টয়ের এ গল্প এবং এইরকম আরো সব গল্প পড়তে গেলেই আজকাল আরাম হ'ল পড়ে বাধাক্ষণের ছোটো একখানি ইংরেজ কবিতা। সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর সেই আলোচনার নাম 'কলিক'। মৃত্যু থেকে ১৯২৯-এ ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল সেই 'কলিক'। ডাঙে তিনি আরামের এই শতাব্দীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছর দশেক পরের অবস্থা সম্বন্ধে করে এক জায়গার মন্তব্য করেন যে, মানব-সভ্যতার আন্তর্জাতিকতারোহে যথার্থ আস্থা দেখা যায় স্বর্ষই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে। ছোটো বড়ো নানা দেশ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বিভোব হয়ে আছে। সব সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও আন্তর্জাতিকতারোহে বাড়ছে বই কি।

যুদ্ধকালে চার্চের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি লিখেছিলেন যে, গির্জায় গির্জায় একই ঈশুরের কাছে কতো যে বিপর্জিত প্রার্থনা বসিত হতো। জে. সি. স্কোয়ারের কবিতা উল্লেখ করে তিনি এই হাস্যকর অবস্থার ইঙ্গিত দেন—

God heard the embattled
nations shout
'Gott strafe England!' and
'God save the King!'—
God this, God that, and
God the other thing.
'Good God!' said God, 'I've
got my work cut out.'

টলস্টের যে সভ্যস্রষ্টা ঈশুরের কথা বলে গেছেন, আজ আমাদের এই আধুনিক কালের প্রবৃত্তি-বর্ধিতবুদ্ধিমত্তা, বিজ্ঞানবলী আর এক অগণ থেকে সেই ঈশুরকে কতোটুকুই বা দেখা যায়। আমরা ভবে ভবে আজ তাঁকে তাঁর ক্ষমমুতিতেই বেশি দেখছি বোধ হয়। তাঁর দক্ষিণ রূপ কি পক্ষপাতী হতে পারে? তাঁর ক্ষমমুতিই কি পক্ষপাতী? জানি না, জানি না। এসব অন্য বাস্তব কথা। আমরা আজ আমাদের মানবভাগ্যের জগতে। এই জগতের স্খা-তুষ্ণ-নারীভব দিয়ে ঈশুরের রূপ স্থান কববার খোনারী করণনা বড়ই অবাচ্চ। বুদ্ধিবিশীলী বাঁবা, তাঁরা হয়তো এই কথাই বলবেন। তাঁদের কথা তুচ্ছ নয়। তবু তো ভেতরের সব বলছে—

ওবে পারি
থেকে থেকে ভুলিস কেন স্মর
যদি নে কেন ডাকি—
বাঁধীছা বা প্রভাত ঘর কে বুঝা
জানিস সে তুই কি তা।

বাংলা দেশের স্বর্ষই আধুনিক জীবন কবিতা আজকাল যখন কথাক-কথায় 'ঈশুর' 'ঈশুর' বলে ডাক দেন, আর কটাক করেন, তখন একসঙ্গে টলস্টের আর জে. সি. স্কোয়ারের কথা মনে পড়ে। তবু স্বাধীনতার ঐশ্বর্য ছাড়াই আশ্রয় খোঁজে মন। পাখিকে মনে মনে ডাক দিয়ে থাকি। বলি—

সুখ বাতের অপনতলে
প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা,
জানিস সে তুই কি তা।

কবিতার গভীর রূপ-সংকেতের তাৎপর্য সম্বন্ধে মন হঠাৎ বেগ উন্মূখ হয়ে ওঠে। গল্পেকথারায়, উপন্যাসের স্রোতে টলস্টের তাঁর যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে বাহিত হতে দিয়ে-ছিলেন, সেইবকব আরো অনেকের বিভিন্ন উপলব্ধিই রূপায়িত হয়েছে কবিতায়। ইংরেজি সাহিত্যের বড়ো বড়ো কবিদের সম্বন্ধে হ্যাঙ্গলিটের আলোচনা মনে পড়ে। মন লাফিয়ে লাফিয়ে এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে এগিয়ে যায়। এ পতি ধারাবাহিক এবং উল্লসিত। বাংলা, ইংরেজি,—বিশেষ নানা সাহিত্যের কথা মনে আসে।

কয়েকজন ইংরেজ কবি বিষয়ে হ্যাঙ্গলিট তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তৃতার ভূমিকার উপসংহারে জগতেটা চাবটি ঐক্য কাব্যের উল্লেখ করেন। হোমর, বাইবেল, দাঙে আর ওশিয়ান। হোমরের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন মানুষের কর্মজগতের প্রাণোদীপনাই প্রধান, বাইবেলে আধ্যাত্মিক প্রত্যয় আর ঈশুর-প্রসঙ্গ,—দাঙের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির কপারণ, আর ওশিয়ানের মধ্যে প্রাণের ক্রমবিকাশ, ডাক-জগতের অকস্মিক অনুভূতিই প্রধান হয়ে উঠেছিল তিনি বিশ্বাস করতেন।

হোমরের জগৎটি ঠিক কী বকব, সে-কথা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন—সে যেন দিনের মতো উজ্জ্বল, নদীস্রোতের মতো শক্তিময়। হোমর তাঁর মনোজ্ঞিত গুণে, তাঁর যুক্তির ঘোরে বাহ্য জগতের নানা উপকরণ এবং মানুষের বিবিধ সামাজিক সম্পর্ক ছুঁয়েছেন, ধরেছেন। অনেক দেশ দেখেছেন, অনেক মানুষকে লক্ষ্য করেছেন তিনি। হোমরের কথা ভাবতে গিয়ে প্রসিদ্ধ সব প্রাচীন উপন্যাস মনে এসেছিল তাঁর—বীরের দল যুদ্ধে এগিয়েছে—তাঁরা সকলেই উটপাখির মতো দক্ষিণ, ইগলের মতো সদ্যস্রুত, ছাগলের মতো স্পিড, তরুণ বলীর্ষের মতো বন্যবড়। তাঁরা যে-মানেব মতো যৌবনসমৃদ্ধ,—মধ্যপ্রাচ্যের লুর্দেব মতো প্রথম সন্ধ্যাহরময়,—তাঁদের সর্বক্ষেত্রে উজ্জ্বল অজ্ঞতার, তাঁদের সমস্ত শরীরে আচ্ছন্ন রক্ত আর শুলোব।

হ্যাঙ্গলিট বলেছিলেন, বাইবেলের কবিতা কিন্তু প্রধানত করণনা, আর বিশৃঙ্খল আশ্রয়। সেখানে হোমরের মত রূপশোভা বা বর্ণোচ্ছলতা কুটিলে তোলাবার আশ্রয় নষ্ট নয়। হোমরের বর্ণবোধ বেগ নানা দেবতার সংঘর্ষবহনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত,—তিনি যেকোনো বিশৃঙ্খলতা, অসংগততা, প্রাচুর্য যুদ্ধে ছিলেন; বাইবেলের কবিতা সে-রকম নয়। তাঁতে বিচিত্রের বহনতা নয়, বহর ঐক্যই দ্বিষ্ট আলস আবেদন।

অন্য সেখানে সর্বরূপে মিহিড। যাদুভার নুটাইই ছাড়া। বাইবেলে মানুষের সঙ্গে জগবানের এই ঐকান্তিক যোগের চেতনা নষ্ট। জেকবের স্বপ্নে স্বর্গ থেকে সোনার সিঁড়ি নেবে এসেছে পৃথিবীর মাটিতে। কথের বুক লাগা দুনিয়ার তাঁমান মানব-সংসারের মনতা। হ্যাঙ্গলিট বলেছেন, বাইবেলে 'বুক অফ জব' অংশে এমন কবিতা আছে যা হোমরের তুলনায় আরো আবেগময়, আরো ভাবনিবিড়। ওল্ড টেস্টামেন্টে তরুকের স্বাধ ছিল অনন্যসাধারণ। হ্যাঙ্গলিট তাঁ বলে গেছেন।

দাঙেকে তিনি বলেছেন আধুনিক কবিদের পুরোটা। গবিক যুগের অসংখ্য থেকে, প্রাচীনতা থেকে সেই আমরা প্রধান বেরিয়ে এসেছি আধুনিকতার। অতীত এবং ভবিষ্যৎ

জীবন্তী তাঁব আপন কানে সেই জানা-অজানার
বন্ধিতে বাঁড়িয়ে,—নাহে গভীর বিষয় অনুভব
করেছেন। হ্যাঁজলিট বলেছেন যে,
লজ্জবত বাইবেল থেকেই দাঁতে তাঁব বিবাহ-
বোধটুকু পেয়ে থাকবেন। কিন্তু শুধু বিবাহই নয়,
বাইবেলের প্রথম এবং আকস্মিক সব ভবিষ্য-
বাণীর তাঁবতাও তাঁর কাব্যে লক্ষ্যিত হয়ে
গেছে। তাঁর প্রতিভা তো দেদীপ্যমান একটি
নির্ধারিত নয়, সে বেন প্রচণ্ড অঙ্গিগর্ভ এক
চুন্নীর উত্তাপ। সে তো শুধু রনবীরতা
লাগনের প্রবৃত্ত নয়—তাঁর অভিজ্ঞতার রূপ বেন
কঠিন, দুর্বোধ্য, দুর্ভেদ্য। যেখানে মৃত্যুর
লহাশূন্য, সেখানেও তাঁর নিম্ন স্বষ্টির বলতি
দেখা দিয়েছে,—সেখানকার শুষ্ক হাওয়ায় তাঁরই
মননের বিশেষ অনুভব করে গেছেন হ্যাঁজলিট।

আনি আঁচ টেলস্টারের গলপ থেকে জগতের

এই সব কবিপ্রকৃতি এবং কাব্যস্বরূপের লক্ষণ
গম্ভীর হ্যাঁজলিটের কথা ভাবতে চাই না।
এসব এখনই মনে এসে। জীবনের জ্বল-
দুঃখ ঘটনা-মুহুর্তনার মানে বুজতে গিয়ে পৃথিবীর
নানা যুগের নানা মানুষ কতো যে কবিতা
করে গেছেন। এ হয়তো সেই বিচিত্র
ইতিহাসেরই কিঞ্চিৎ স্মৃতিবিলাস। স্বীকৃতিার্থে
কবিতা বনে পড়ছে আবার—

জীবন-পবিত্র জ্বলি,
অভাধ্য স্বরূপ তার
অন্তের রহস্য-উৎস হতে
পেরেছে প্রকাশ
কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে
সন্ধান মেখে না তার।

বেন মৃত্যুর মুখোমুখি বাঁড়িয়েছি। মৃত্যুর
মুখোমুখি পৌছোবার আগে জীবনলভ্যকে

সম্পূর্ণ করে দেখা যায় না বোধ হয়। চলস্টারের
আয়নভ আর সেমেনিক দুজনেই দুদিক
থেকে সেই মৃত্যুর শেষ তীরে গিয়ে পৌছেছিল।
সেইখানে বাঁড়িয়ে বলা যায়—

দিনশেষে পবিসফট হয়ে ওঠে জ্বলি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজেব স্বাক্ষরে,
তারপর? তারপর কি হয়? মনুষ্যের
সেই শেষ উপলব্ধির তাৎপর্য কি? তারপর—
তার পরে মুছে কৈলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে;
কিছু বা যায় না বোঝা জ্বলনের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের
জীলা।

(ক্রমঃ)

অনুরোধ

কাকলকুসুমলা মুখোপাধ্যায়

আধুনিক এই যুগ চায় না তো তারে।

এরা বলে—কারখানা, অফিসের দিনে,

ট্রাফিক, বাস চলাচলে হয় অঙ্গবিধা।

পেন্টলুন, কাপড়ের পাড়

ভিজে যায় হতভাগা বরষার ধারে॥

কান সে অদেখা বনে—মেঘতার শুধু।

স্বর্ষার উৎসবে কোন ফুল-বনে—

মধুকর-মধুকরী, লমরা-লমরী

লুটেপুটে খায় বন-কুসুমের মধু॥

একালের শিক্ষার ষায়,

তবু বেন হলু নেই, হিংসা নেই বনে।

কোন সেট মাঠে আছি শ্যামলিমা ঢালা,

নবীন বানোয় দল এদের তরেই

শিরে ধরে আছে প্রীতি, অধাসার॥

তাদের সোনার ষান নিয়ে যায় বলে—

হারা তো ধারে না কোন “ডিক্রি” ষায়।

‘তার’ শুধু’ অশীতল চাঁদের আলোকে,

বসন্তের মধুমাখা মলয় সমীরে,

বরষার সেহরসে বেড়েছিল, তায়

আশা করে—তাদের উপহারটুকু

ভুগাবে না মূল্য রূপে বিদ্যার তলে॥

শুধু নাও, যেমনটি লুটে নেয় মধু,

কিরমুখী, বিদ্যাহীন মধুকর দল॥

বৈকালিক

কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী

পাতাবন্ধ কান্না ছিল পৌষের নিরপেক্ষ বাতালে;

নিস্তরঙ্গ হিমালীর সুহাসান দর্পণে

অবাধ্য বোদুর রেখা প্রতিফলিত হয়।

ডানা ভাঙা দাঁড়কাক আবার আসবে মেঘে মেঘে ভেসে

কুয়াশা ছড়ানো এই বিকালে—বুনো ঐশ্বর্য বয়ে

প্রতীক্ষারিত উত্তবে ঝড়

নিশ্চয় ঝরাতে চায় পাইনের পাতা,

তবু কোন এক মৌন অপমানে বাক রুদ্ধ—হঠাৎ বিস্ফ

অবশেষে

যখন নিমিট ঘণ্টা হিম হয়ে ধামবে,

দূরের শুকনো কোন গাছে

আমার ইচ্ছার দৃষ্ট ফেরাব:

পশ্চাতে কুয়াশা আব রৌদ্রে ঝঁতুর প্রবাসে

বিবাদ বেধেছে ঠিক—

যখন ঘাসের মুখে রৌদ্র

প্রথম চুম্বন করে,

যখন হিম-প্রবাহ রক্তের স্বাদ পায়, বৈকালিক

উরুভাঙ্গা মেঘে মেঘে হিংস্র আকাঙক্ষার,

যখন সমস্ত পাখি গৃহান্তরে ফিরে যায় খাদ্য তাম্র,

তখন রাজি।

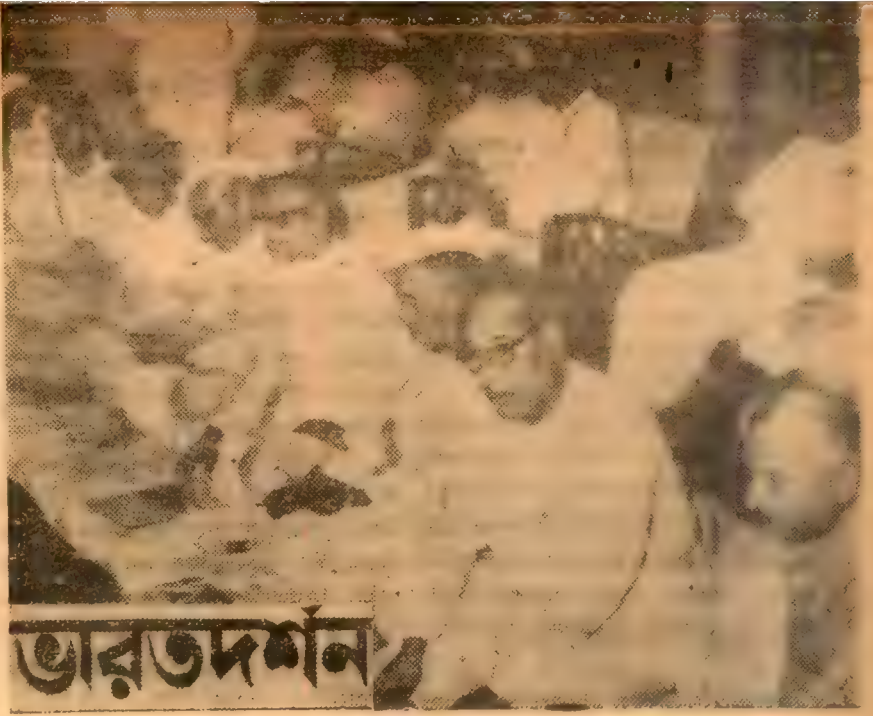
সব শেষে ইচ্ছা দৃষ্ট গাছ থেকে ঝরে যায়।

রাজধানী :

সুপ্রাচ্যালের মধ্যে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার পর তাদের ভবিষ্যতের কর্মপন্থা এমন ভঙ্গুরতার সঙ্গে নির্ধারণের নজীরনয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে খুবই বিরল। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী খাদ্যের ব্যাপারে উচ্চারণ করেছেন সাবধান-বাণী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে প্রচেষ্টা হয়েছে দেশের সীমান্ত অঞ্চলকে অসংহত ও অসুরক্ষিত করার উপায় উদ্ভাবনের। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে স্থির করা হয়েছে ভারতের সরকারী ভাষার সূত্র। এ ছাড়া, এ সম্মেলনেই করতে হয়েছে আলজিয়ার্স সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতির সাময়িক পুনর্বিন্যাস, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণের প্রস্তুতিপর্ব এবং কল্হ নিরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর চিঠির চুলচেরা নিচোঁর-বিশ্লেষণ।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতার দরুণই কক্সকোট ও বিয়ারবেটের বেসিক ভারতীয় ইন্দো-হাউস-এ গুটিয়ে আরামে বসে দিন কাটাতে পারছে। আশিদের রাষ্ট্রনায়কগণ সন্মত পেয়েছেন ভেবে-চিন্তে কাজ করার—অর্থাৎ বেশ আটঘাট বেঁধে নিয়ে পাকিস্তানী হানাদাশিনদের ঘেরে হটিয়ে দেবার। মহানুভব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীউইলসন জানিয়েছেন, পাকিস্তানি চায় এই জয়োগে ভারতের সঙ্গে লকল সমস্যার মূর্ত্তী বীবাংসা। কক্সকোটের কেন্দ্রকারীর সঙ্গে পাক-ভারত সমগ্র সমস্যার আলোচনাই পাকিস্তানের দাবী। পাকিস্তান এক চিলে কক্সকোট, কানীর ও কাছাড়ের প্রাণের পক্ষচেষ্টন করতে চাইছে।

বৃটেনের এতে সদিচ্ছা প্রকাশ স্বাভাবিক। বৃটেনের রাজনীতিতে লমান করে ফুটি ভাগ করে দেবার অজিলায় নিজের কাজ হাসিলের কৌশলটাই প্রাধান্য লাভ করেছে চিরকাল। শক্তির সাম্য বিধানের চাল চেলে বৃটিশ রাষ্ট্রধুরকরণ ইউরোপের মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছে বাঁক বার। সেই খেলাই ভার চলেছে এশিয়ার বাটতে, সেই দিন থেকে যেদিন এদেশে স্বক হল তার বিদায়ের পালা। তাই কানীরের নত কক্সকোটের ও বিয়ারবেটের বক অঞ্চল ভারতীয় সৈন্যের কবজায় আসার আভাষ পেয়েই শ্রীউইলসনের হৃদয়ঙ্গার উত্তেক হয়েছিল। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সদিচ্ছার বল্যায় এখন কল্হ প্রায় ভুখ ভুখ। উজ্জায়ের চেষ্টার নয়াদিল্লীতে রচিত হচ্ছে বৃটিশ প্রধান, মন্ত্রী চিঠির ভাষা ও মোকদ জবাব। উইলসন সাহেবকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান অক্ষয়পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে সরে না যাওয়া কল্হের সীমারেখা নিয়ে আলোচনার ম্যুই উঠতে পারে না। পাকিস্তান কি



ভারতদর্শন

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে সমবেত নেতৃবৃন্দ

মাক্কার আনন্দে উন্নতি হতে দু' বাহ তুলে : মুক্তকল্হ হয়ে বলকণ্ঠে বোধবা করছে এবারে সে 'চুক্তি বীবাংসা' না করে ছাড়বে না। কৌ-এন-লাইয়ের চেনাপিগি পেয়ে আয়ুধও তুলে বাছে বৃটিশ সিংহের ধাবার বাইরে বাওয়া খুব সহজ নয়।

কানুগিরে শিখা পেয়েও সে কিয়ার সফল প্রয়োগ কল্হে আনরা কেন করতে পারি নি? এ প্রশ্ন পীড়িত করে তুলেছে নাধারপের চিন্তকে। আনরা যে মোকদ জবাব বৃটেনের চিঠির জবাবে পাঠিয়েছি তাতে অহেতুক অনুকম্পা বৃটিশ ও মার্কিন শক্তির প্রতি প্রকাশিত না হলে জবাব হরতো একটা পাওয়া যাবে। তা না হলে এই পজিপোষ্ঠীর ভারসাম্য বিধানের চাপে পড়ে সবই পিষ্ট হবে।

কল্হের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আহ্বানের পরিণাম কনাতে এবং বাধ্যশস্য অপচয় বহু করতে পরামর্শ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে বাধ্যশস্যের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পরিবেশন করেছেন চাকলায়কর সংবাদ—কেজীর সরকার ওধান থেকে প্রতি মাসে ছ' লক্ষ টনের পরিবর্তে বাধ্যশস্য দিতে পারবেন চার লক্ষ বিশ হাজার টন। প্রধানমন্ত্রী বাধ্যশস্যের অভাব মোচনের নাইড: রব তুলেছিলেন নতুন কসল প্রাপ্তির প্রাকালে। নতুন কসল গোলাঘাট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার কল্হের সীমান্তে সংঘর্ষের মুক্তি তুলে খাওয়া কনাতে বলার দেশের বাধ্যশস্য সংশ্লিষ্ট একটা বিবাদিত সত্তাবনা দেখা দিয়েছে।

সরকারী তথ্য ও পরিসংখ্যানের ব্যাপারে মানুস মর্যাবই ছিল সশিষ্ট। তবে কি চাল ও গমের ফসল ও সরকারী ওধান সংগ্রহের কথা তখুই কাহিনী?

দেশের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যে-কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে দেশবাসী দিবা সুরকে না। সে সময় কি সত্যি সত্যি এসেছে? না এসে থাকলে পূর্বাঙ্কে বোধবার হান্না কালো-বাছারকে অনেক সময় অমধ্য খোলাবাছারের মুক্ত অদনে প্রবেশের ক্ষমোগ যেডনা হয়। বিপদের দিনে এরা লুটতরাজের লন্ডানই খোঁজে। ভারতের উত্তর সীমানা তল্হে চীনা সৈন্যের আক্রমণের দিনে কালোবাছারের দাপট কন ছিল না। সংলাপ বারি তখুইদিয়ে পায় নি কিছুই, তারাই সে দিন ললে ললে দুর্ভাগ্য নলে নাধ্যবত সামান্য সমল নিয়ে এগিয়ে এসেছিল সরকারের পিছনে। সরকার সেদিন দানগ্রহণে কতটুকু যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন সে কথা আর তুলবো না; কারণ একই কথার বার বার পুনরাবৃত্তি সঙ্কলের পক্ষেই পীড়াদায়ক।

আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য চাই অপরিণীত মনোবল ও অটুট স্বাস্থ্য। এ দায়িত্বের কথা সরকার যেন সর্বদা স্মরণ রাখেন। মানুসের স্বাস্থ্যরক্ষার ও মানসিক প্রশান্তির দায়িত্ব পুরোপুরি পালিত হলে কোনভর না ভাবনাই থাকবে না।—কর খাওয়ার সংঘর্ষে কেউ চকল হয়েও উঠবে না।

দুর্বল আরও দুর্বল হচ্ছে, উৎপীড়িতের ওপর উৎপীড়ন রেডুই চলছে। জবাব

কৃত্যচারে যাতাকালে নিশেধিত হয়ে শৃঙ্খল হয়ে আসছে। ধনবৈষম্য দেখা দিচ্ছে আরও প্রকটরূপে। ফলে পরীক্ষার ঘরে বাধ্য হয়ে উঠছে দুশৃংখল। সরকার নির্ধারিত বান্ধের চোখের জ্বলন হিসেবে নিরুৎসাহ কি? নিজে বোনাসের বিধানের তার পরিচয় পাওয়া যেতো। কালোটাকার মালিকের সমাজ আলো করে থাকতে পারতো না।

কালোটাকা এত চেষ্টা করেও সরকার মালোতে আনতে পারেন নি। মাত্র বাহার কোটি টাকা অর্থকার ভেদ করে বাইরে এসেছে। সরকারী হিসেবে কালোটাকার পরিমাপ হাজার কোটি টাকা। পোনা যাচ্ছে সরকার এখার কঠোর হবেন। সরকার বাহাদুর সুবিবেচক হলেই নির্ধারিতের হাত থেকে মুক্তির আশা করতে পারি।

বোনাসের বিধানের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোনাস দেবার বাধ্যবাধকতা ভিন্ন শৃঙ্খল-কারী কথা কিছু নেই। সরকারী হিসেবে মোড়াবে এ বিধানে লাভবান হবে পরভাষিত লোক কনী। প্রশ্ন বাহাদুরী বিরাট সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারীর কি হবে। আবারের লক্ষ্য-কল্যাণ রাষ্ট্রের অধিনায়কদের সে-চিন্তা দামা বাঁধবে কবে? বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ বতদিন তাঁরা করতে না পারছেন ততদিন যে ব্যবস্থাই ফলন না কেন, সকলের ছেলের পাতে উপযুক্ত পরিমাপ বাধ্য ও ভোগ্যপণ্য পড়বে না। স্বার্থভাড়া বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শিল্প লাভজনক হোক আর না-ই হোক কর্মীকে বেতনের চার শতাংশ অথবা চল্লিশ টাকার মধ্যে যে-অঙ্ক বড় দাঁড়ায়ে তা' দিতেই হবে। ফলে ছোট ছোট কারখানার মালিকদের একচোটা বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার হেরে গিয়ে খাঁপ বন্ধ করতে হবে অথবা লাভের অঙ্কের দিকে লক্ষ্য রেখেই নির্ধারণ করতে হবে পণ্যের বিক্রয়মূল্য। চাপটা গিরে পড়বে তখন কেতা সাধারণের হাড়ে।

বোনাসের হার নির্ণয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতির প্রশ্ন থাকার অনেককালে আবার বোনাসের পরিমাপটাও হুস ও পাবে। এতদিন ছিল মোট লভ্যাংশের ওপর বোনাস দেবার বিধি। কারণ মালিক ও শ্রমিকের মিলিত প্রচেষ্টার লাভের অর্থের দাবীদার হিসেবে বোনাস ছিল শ্রমিকের ন্যায্য পণ্য। এখন ডিপ্রিসিয়েশন, মূলধনের প্রতিদান ছাড়াও প্রত্যক্ষ কর, অংশীদার ও মালিকদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে যা' থাকবে তাই হবে উত্তম হিসেবে গণ্য। এছাড়া, শ্রমিকদের চতুর মালিকেরা যাতে বুদ্ধাকর্ষ বোঝাতে পারে তেমন ধারাও বোনাস বিন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে। অতীতের লোকসান পূরণ

না হওয়া পর্যন্ত বোনাস দেওয়া বঙ্গ কারবারীর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক কতদিন পর্যন্ত হবে তা' পরিষ্কার করে বলা নেই।

ভাষার প্রস্তুত একটা বীমাংনা এবারে ওয়াকিং কনিষ্ঠ করেছেন। হিন্দীর সাথে ইংরেজীও সরকারী ভাষা হিসেবে চালু থাকবে। কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা আঞ্চলিক ভাষাভেদে দেওয়া চলবে।

হিন্দী সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজীকে চালু রাখার পুরোনো নীতির সেরা বৃদ্ধি ও জিভা প্রচলনের কথাটা আরেকবার স্মরণে দেওয়া ভিন্ন নতুন কোনো কথা এতে অবশ্য নেই। তবু এতেই অনেক কাজ হবে। অহিন্দী-ভাষীদের ভাষার প্রস্তুত অবিশ্বাস ও সন্দেহ মোচনের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত অনেকখানি সহায়ক হবে।

আবারের মতে ভারতের বত বিশাল দেশে হিন্দীকেই রাজ্যসনে বসাতে হবে, এমন কিছু বাঁধাবি নিয়ম না থাকাই উচিত। ইংরেজীর ধাঁধা বর্তমান বিশ্বে অনর্থক।



শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

বিশেষী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বপরিগ্রহণের দেবার পক্ষে মুক্তি খুব একটা ভারমহ নর। ইংরেজের প্রতি আবারের অহেতুক মোহের মতই তার ভাষার প্রতিও রয়েছে আবারের অনাবশ্যক বাধ্য। বিকল্প ভাষা হিসেবে বাংলা ইংরেজী রাখার পক্ষপাতী তাঁরা আর এক বাপ এগিয়ে এলেই দেখতে পাবেন ভারতে এমন করেকটি আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে যেগুলি শক্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। তাদের হিন্দী ও ইংরেজীর পাশে স্থান করে দিলে ভাষার প্রস্তুত বিরোধের অভিন্নতা যেমন কমবে তেমন নিজের শক্তিতে এদের যে-কোন একটি ভাষা

জনচিতে অতি সহজে নিজের আসন করে নেবে। সকলের মানস-সম্মতি ভিন্ন একেবারে মাঝে হিন্দীকে চাপাবার চেষ্টার অপারিত আর বেশি করে জবাবি বাঁধবে।

তাস্মীর :

শেখ আবদুল্লাহকে উটকানিতে পাঠাবার পর কান্দীয়ে বতটা লক্ষ্যাকণ্ডের আশঙ্কা করা হয়েছিল সেরকম কিছুই বটে নি। ১৯৫৩ সালের শের-ই-কান্দীর এ ক' বছরের মধ্যেই বৌলুর হারিয়েছেন অনেকখানি। তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে টেনে বাহিরে কারাগারে নিক্ষেপের লক্ষ্যে প্রচণ্ড কিসকারণে ভূমণ্ড কেটে চৌচির হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এবারে বিকোভে সে প্রচণ্ডতা তো ছিলই না, এমন কি বিকোভে তেমন বিস্তারিত লাভ করতে পারেন নি।

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সরকার অবশ্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। শেখ আবদুল্লাহর আচরণও এর জন্য কম দারী নয়। এবারের বিকোভের প্রতি-প্রকৃতি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে শেখজী জেল থেকে বাহির পেয়েই পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে কান্দীয়ে যে চাকলোর স্ট্রি করেছিলেন তা জনচিতে গভীর রেখাপাত করতে পারেন নি। শেখ ও নীর্জা আফজল বেগকে আটকের পূর্বে গণভোটের উচ্চনীতিবাদেরও প্রেরণ করা হয়েছিল। শেখজীর এবং আফজল বেগের প্রতিপত্তি প্রবল হলে তখনই পোলবোগের স্ট্রি হতো।

আগুন কথা, বঙ্গসাম্প্রতিকাল সময় হাও পেয়েও আবদুল্লাহ সাধারণের মনে আবেদন স্ট্রি করার মত কোন কাজই করতে পারেন নি। কান্দীরীদের আন্তরিকতার পুরোনো বুদ্ধি আওড়ানো ভিন্ন কান্দীর সমস্যা সমাধানের কোন নয়া পরিকল্পনা বা প্রস্তাব তিনি দিতে পারেন নি। ফলে, তাঁর গর্জন ব্যর্থ হয়েছে—অল্প বলির প্রাচীরে বাঁকা খেয়ে হারিয়ে কেলেঙ্ক প্রতিবেশ।

শেখের মুক্তির দাবীতে সমগ্র হাও আন্দোলনের গতিবেগের ওপর এখন নির্ভর করবে 'কান্দীরীদের আন্তরিকতার' আন্দোলনের ভবিষ্যৎ। নেভারা নাকি এতদিনে উপলব্ধি করেছেন, কান্দীরে বিকোভের আঙুন হিংসার পথে আলিয়ে বাবা সম্ভব নয়। উগ্রপন্থীরা উন্মাদনার পথে যেতে চেয়েছিলেন। নোনালা বাহুদী ও পোলাব মহিউদ্দিন কেউ সে পথে আর যেতে চাইছেন না।

ঘটনা প্রবাহ কান্দীরের রাজনীতির গতিপথই পাল্টে দিয়েছে। কান্দীর দাতার

পরিষদের জরিপা দখল করতে চলেছে কাশ্মীর কংগ্রেস। প্রজাতন্ত্র দিবসে বার প্রথম পতন হয়েছে কাশ্মীরের নাট্যে তার বয়স পাঁচ বাস পূর্ণ হওয়ার আগেই সে দিবা দৌড়পাছু শুরু করে দিয়েছে। প্রাক্তন রাজস্বমন্ত্রী নীরকাশের পরিচর্যা সে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করেছে। বিধান সভার জাতীয় সম্মেলনের সদস্যগণ কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। সাধারণ কয়েকজন বঙ্গীপথী ভিয়া সবাই গিয়ে আইনসভার কংগ্রেসীদের ফলেবর বন্ধি করেছেন।

কাশ্মীরের ভূমি কংগ্রেসের পক্ষে কতটা চরম উদ্যোগীরা সে বিষয়ে কারো চাইতে কম অবহিত নন। তাঁরা জানেন, রাষ্ট্রাতি এর শাখাবাহু সর্বত্র বিস্তার সম্ভব নয়। কাশ্মীর উপত্যকাতে বোকাবিলা করতে হচ্ছে গণভোট ক্রণ্ট, পাকদরদী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এবং আওয়ামী আকশন কমিটির সঙ্গে। জরতে রয়েছে পণ্ডিত প্রেমনাথ ভোগার জনসমূহ। সাদিকের পথটা সুগর বলা যেতে পারে—সেখানে জনসভা অথবা কোন সংগ্রাম কমিটি তেমন পাড়া পায় নি।

রথদেখা ও কলা বেচার উভয় উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশ যাত্রার প্রাকালে গণভোট ক্রণ্ট ও ক্রণ্টের সহযোগীদের সর্বধনে শেষ আবদুল্লা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। ধর্ম-নিরপেক্ষতার বাহ্যিক বোলটা পর্যন্ত তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে পড়েছিল। ধর্মীয় মোদাদের মতই সেদিন আবদুল্লা কংগ্রেসের সংগঠনে নিবৃত্ত মুসলমানদের বয়স্কটের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তাঁর হাঁক-ডাক ও নর্তন-কর্পনে বিপরীত ফলই হয়েছে। শেষের প্রতি মানসিক দুর্বলতা হালে এ সকল ঘটনাই সহায়ক হয়েছে।

পাকিস্তানের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চীনের নিরাপত্তা আশ্রয়ে স্বাধীন কাশ্মীরের ধোঁয়াধের কথাটা বুঝ করে বলে ফেলেই আরও বেশি বিপদের হস্তি তিনি করেছেন। সাধারণ মানুষ পুরোপুরি নিঃসহায় না হলে নিরাপত্তা নিশ্চয় দিয়ে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারে না। তথাকথিত আজাদ কাশ্মীরের দৌলতে কাশ্মীরীরা কতটা আরামে আছেন তার কাহিনী অজানা নেই আজ কারো কাছেই।

ভারতের অপরাপর রাজ্যে কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইটা প্রচণ্ডতর থেকে 'তবে' উঠবার উপক্রম করছে যখন ঠিক সেইসময়ে কাশ্মীর রাজ্যের কংগ্রেসকর্মীরা আশার রাগ-রাগিণীতে ভরসার কথা শোনাচ্ছেন। জাতীয় সম্মেলনের যে ডাঙনের ফলে কাশ্মীরের জন এত খোলা হয়েছিল, সেই রাজনৈতিক ডাঙন প্রতিরোধ করে স্বয়ং ও সবল সংস্থা গড়ে তোলাই

নাকি কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য। খবই ভরসার কথা। যে-কাজ কামরাজ পরিকল্পনা করতে পারে নি, তা' সাদিকের সাহসিকতায় হফল হবে না, একথাও ভাববার কারণ নেই। সাদিকের অনরাগীরা মনে করেন, ধীরে ধীরে আকাশ পরিচ্ছন্ন হবেই এবং গোটা জাতীয় সম্মেলন একদিন রূপান্তরিত হবে কংগ্রেস সংস্থায়। বঙ্গী গোলাম মহম্মদের হোঁচ প্রায় কেটে এসেছে। শেষ আবদুল্লার গৌরবও অন্তিমিত প্রায়।

ক্ষমতার দলু ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের সংঘাত যেদিন প্রবল হয়ে উঠেছিল, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল জাতীয় সম্মেলনের পতন। মুসলীম কনফারেন্সকে ১৯৩৯ সালে যথেষ্টে নতুন নামে পরিবেশন করা হল জনসমক্ষে। হ'বছর পর ১৯৪৫ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সীমান্তপ্রাঙ্গী খান আবদুল গফফর খানের পরামর্শে যখন পেল তখনও জাতীয় সম্মেলনে



শেখ আবদুল্লা

দলীয় কোলটা পুরোমাত্রাডেই বজায় ছিল। পকাশ সালের গোড়ার দিকে অবস্থার ঘটেছিল আরও অবনতি। সাধারণ সালে বাঁধন ছিঁড়ে দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সাদিক গঠন করলেন গণতান্ত্রিক জাতীয় সম্মেলন। ষাট সালে সদল-বলে সাদিক আবার গিয়ে দলে ভিড়লেও মনের মালিন্য কেউ সেদিন কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এ কথা তবানীতন দলপতি বঙ্গী গোলাম মহম্মদ নিজেই স্বীকার করেছেন।

ঝোড়াতালির ধর এক বাপ্টায় ভেঙে চুরবার হল তেরটি সালে—হজরতবালের পবিত্র কেশ অপহরণের পর। বেশ কিছু দিন পর খ্রীষ্টি এম সাদিক ডাঙা ঘরের বোরা-

মত শুরু করলেন। আজ তিনি তাকে এক-রূপে রূপান্তরিত করে কংগ্রেস সংগঠনে পরিণত করতে চাইছেন। মনের মালিন্য এত দিনে দূর হয়ে থাকলে, নেতৃত্বানীয় ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিস্বার্থের উত্তেজিত পেরে থাকলে নিশ্চয় প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

বিবাহ :

ধোরী কয়লা খনির বিংশগণী অগ্নিকাণ্ডে নিহত শ্রমিকদের পরিবারবর্গের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সরকারের তরফ থেকে যথাসময়েই ঘোষণা করা হয়েছে। এই শোচনীয় দর্শনার পর এক পক্ষ কাল প্রায় কেটে গেল; কিন্তু এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা সঠিকভাবে ঘোষণা করা হলো না।

ধোরীর এই মর্মান্তিক দর্শনার অব্যবহিত পরেই জাপানের কয়লা খনিতে বিস্ফোরণের সংবাদ আসে। যে বিস্ফোরণের ফলে জাপান সশ্রিগভাবে চেলে সাজাতে হয়েছে। অথচ আমাদের নেতার বিবিসিমান, শৌক প্রকাশ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ভিয়া আর বেশিদূর এগোতে পারেন নি।

কয়লা খনির মালিক পক্ষ তো এ-বাপটার চরম ওদাগীয়া প্রদর্শন করেছেন। নিহত-দের সংখ্যা নির্ণয়ে, এমন কি, মৃতদেহ উদ্ধারের কাজে পর্যন্ত তাঁরা কোন সহযোগিতা করেন নি। খনির মালিক রামগড়ের রাজা কামাখ্যা নারায়ণ বারবার এই অগ্নিকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্তি কার্যকলাপ বলে বারবার ঘোষণা করছেন। অন্তর্ভুক্তিক কার্যকলাপের কোন প্রকার তথ্য তিনি পরিবেশন করতে পারেন নি। তাঁর গলাবাজিতে অবশ্য কোন কাজ হয় নি—দায়িত্বশীল কোন মহলেই তিনি আবল পান নি।

খনিগর্ভে বিপদের ঝুঁকি নিষেই সর্ব দেশের শ্রমিকদের কাজ করতে হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য সকল দেশেই উন্নত ধরনের ব্যবস্থা নি অবলম্বন করা হয়েছে। চিনাকি ভিন্ন ঘটনার পর নিরাপত্তার যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল, তা' এখন সকল কয়লা খনিতে কার্যকরী করা হয় নি।

ধোরী কয়লা খনিতে সীমিত ধর্মঘট চলার পর গত ২১শে মে কাজ শুরু হয়। সপ্তাহকাল পরেই ঘটে এই দর্শন। বিস্ফোরণ ঘটে সাধারণত খনিগর্ভের পৃষ্ঠভূত গাধ থেকে। পর্যাপ্তদিন দিন এক নাগাদ ধর্মঘটের পর মালিকপক্ষ কাজ চালু করার আগে ভাল করে পরীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন কি না তার কোন সঠিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় নি। দর্শনার দিল শিকট বদলের সময় সুপারভাইজারী স্টাকের

কেউ নিচে নেমে পরীক্ষা না করে সর্দারদের ওপর নাকি দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন।

শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দুর্ভটনা সম্পর্কে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের দাবি উঠেছে। বনি মালিকদের মুনাকা অর্জনটাই এদেশে প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রমিকদের জীবনের মূল্যবোধ তাদের কাছে কতখানি তার একটা হ্রাশ পাওয়া যাবে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা হলে। কিন্তু সমস্যার মূল কঠোরভাবে করতে যা পারলে সরকার তদন্তের পর যে-ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, বিত্তবান বনি-মালিকদের চিন্তের পরিবর্তন ঘটতে পারবেন না। মালিকের হাত থেকে মালিকানা সরকার কেড়ে নিতে না পারলে কোন সুরাহাই হবে না।

মধ্যপ্রদেশ :

সাপ্তাহিক কাল এ রাজ্যের মানসকে ধাক্কা লাগির জল ও বিদ্যুতের অভাবে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। মহা-খান্য সরকার বাহাদুরের বাহাদুরীতে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চলে জীবনযাত্রা বিদ্যুতের অভাবে অচল হয়ে পড়েছে। এই দাক্ষিণাত্যে বরফ ভেঁটানো শীতল পানীয় ও ঔষধিক পানীয় ঠাণ্ডা ছাওয়া আরও উপভোগের কথা হরভো সকলে চিন্তাও করে নি। কজির পথ বন্ধ হয়ে বাওয়ার হাজার হাজার পরিবারের গৃহের কর্তারা বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। কারখানার দরজা অনেকই বন্ধ করে দিয়েছেন। বীরা খোলা রেখেছেন তাঁরাও তিন 'শিকটের' বদলে কাছ করাচ্ছেন একটি শিকটে।

গান্ধীসাগরের জলাধারে টান পড়েছে—জল নেমেছে অনেক নিচে। ফলে প্রয়োজনমতো বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে না। সবার মুখে এককথা—কেন এমন হলো। সরকারপক্ষ সাফ উত্তর দিয়েছেন, বৃষ্টি নেই, কাজেই জলাভার হতে বাধ্য। চব্বল অঞ্চলে—বার, রাতলাসি ও উজ্জয়িনী জেলাতে মোটেই বৃষ্টি হয় নি। তাই গান্ধীসাগর শুকিয়ে উঠছে।

দুইজনেরা বলেন ভিন্ন কথা। বস্তির দোহাই দিয়ে যাঁরা রেহাই পেতে চাইছেন, তাঁদের ওদাসীনা এবং দুর্দৃষ্টির অভাবেই আজ মানুষকে দুর্গতি ভোগ করতে হচ্ছে। বন্যার জল দমকা বের করে না দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থাটা আঁধারের চিন্তা করে আঁধারের ইঞ্জিনিয়ারগণ করতে পারলে সঙ্কটকালে এমন ধারা জ্বলভকে আবোল-তাবোল করতে হতো না সরকারকে।

সরকারের কথায় মানুষ মোটেই আত্ম-স্বাধীন করতে পারছেন না। তাই তাঁরা

সরকারে কার্য নিৰ্ধারণের জন্য উপযুক্ত তদন্তের দাবি তুলেছেন।

ডুপাল, ইন্দোর, উজ্জয়িনী ও অপর কয়েকটি শহরে বিদ্যুতের অভাবে জল সরবরাহের সমস্যা দেখা দিয়েছে। শহরবাসীদের শহরের বাইরে থেকে জল টেনে আনার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এ ছাড়া যেসব শহরে সরবরাহ ব্যবস্থা তেমন নেই, তাদের ভাগ্য আরও মন্দ। শহরের ভেতরের রাস্তা সংখ্যক কুমোর সাধ্যও খুব সামান্যই ছিল। রোদের প্রখরতা হাল পেতে না পেতেই প্রতি দিন অপরাহ্নে নাগরিকদের গাগরি নিয়ে ঘেঁষতে হচ্ছে। জল সংগ্রহের জন্য নগরের বাইরে—গ্রামিকলে।

তিন হাজার টান প' গ্রামের সমস্যা আবার আলাদা। তরাই-উত্তরাইয়ের মতিকা-র মতিকাতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েও জলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি আবার বানী শুনিচ্ছেন রাজ্য সরকার। 'দু'শ' কোটি টাকা ব্যয় করে সরকার শহরে ককবন জলের ব্যবস্থা। শহর থেকে প্রয়োজনমতো সরবরাহ আসবে পরীক্ষার পরে মরে। চতুর্থ পরিকল্পনার এই বকম একটি জল-প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

শহরাকলে এখনও পথ দুশুপা। সরকারের ধান্য সংগ্রহ নীতি এবং সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থার কঠোর জন্মই জোরদার, মুনাকা লোভী ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীরা নিলে বাজারে অস্বাভাবিক হাট করতে সমর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় ধান্য ও কৃষিসহী শ্রীমন্ত্র-বিষয় পর্যন্ত রাজ্য সরকারের নীতির প্রশংসা করতে পারেন নি। তাঁর মতে সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় নি।

মাদ্রাজ :

ভারতের রাজনীতিতে উত্তেজনা মূলক আন্দোলনের আর নাকি কোন অবকাশই নেই। এই উপলব্ধির পূর্ব ভি-এম-কে উল্লাসনা স্বষ্টির পথ পরিত্যাগ করে ভোটের বাস্তবকেই একমাত্র সম্বল হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলপতি শ্রীআলাদোরাই এক সাক্ষাৎকারে এই মত ও পথের পরিবর্তন কথা স্বীকার করেছেন।

শ্রীআলাদোরাই বলেছেন, খুব সীমিত উদ্দেশ্যই উত্তেজনা ও উন্মত্ততার দ্বারা সিদ্ধ হতে পারে। তা' ছাড়া, ক্ষমতা বলে নলীয়ান শাসক দল কঠোর হতে প্রধান বিরোধী দল-গুলিকে পঙ্ক করে দেবার সুযোগ পায় এতে অনেক বেশি।

ধন-বিকোত্তের সক্রিয় পথ পরিহার করে কেবল পার্লামেন্টারী রাজনীতি অনুসরণ করলে দল হিসেবে ভি-এম-কে'র শক্তি কতটা হাল পাবে, সে ভাবনা নেতারা করেন নি, এমনও নয়। তাঁদের মতে প্রাথমিক ঝাটটা সামলাতে পারলে সাবালকদের মনোরঞ্জন করা দুকর হবে না। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থেই সরকারের পরিবর্তনের অনুকূলে ভোট দিতে বাধ্য হবে।

দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী এন আলাদোরাই এর মতুন 'ধর্মিস' আগামী আগস্টের নলীয় অধি-বেশনেই অনুমোদন করা হবে। সেই অধি-বেশনে নির্বাচনের একটা ধনড়া 'হ্যানিকেস্টো' বিবেচনার কথাও হচ্ছে।

আসাম :

আমেরিকার একটি শিল্পসংস্থার সহ-যোগিতায় এ রাজ্যে একটি পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা পুত্তনের সত্তাবনা দেখা দিয়েছে। ভারতীয় এক তরুণ ব্যবসায়ী আমেরিকার ডব্লিউ আই সি এ কেমিক্যাল কোম্পানীর সঙ্গে নাকি চুক্তিপত্র সম্পাদনও করে ফেলেছেন।

এই উদ্যোগী পুরুষটি আমেরিকার গিয়েছিলেন ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রশাসনিক বিদ্যা অর্জনের জন্য। সেই সময়ই তিনি তাঁর সহযোগীর সংস্পর্শে আসেন।

আমেরিকার কোম্পানীটি আপাতত ভিন্ন পন্থা উৎপাদনের ফরমুলাগুলো বাতলাবেন। তাঁরা একজন কেমিস্টকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দানের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ ছাড়া, ইঞ্জিনিয়ার, বাল বিজ্ঞেতা ও ক্যানেকারদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতেও তাঁরা সম্মত হয়েছেন।

প্রস্তাবিত কারখানার বু-প্রিণ্টও আসবে আমেরিকা থেকেই। বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানীতে আমেরিকার শিল্পসংস্থটির পেরায় থাকবে শতকরা পনের ভাগ। ইচ্ছে করলে পরে তাঁরা আরও দশ ভাগ উলারের মূল্যে কিনতে পারবেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে কারখানার বিনিয়োগ করা হবে চল্লিশ লক্ষ টাকা। কোম্পানীর প্রধান অংশীদার আসাম অর্থ কমিশনের কাছে ঋণের আবেদনও নাকি পেশ করেছেন। কিন্তু ব্যাকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের প্রচেষ্টাও করা হতে পারে।

প্রস্তাবিত কারখানার প্রথম দিকে উৎপন্ন হবে বিভিন্ন ধরনের রঙ, ছাপাখানার কালি, সুতীব্র ও কাগজের রঙ। কারখানা প্রতিষ্ঠা হবে সম্ভবত গৌহাটীতে। সরকারী উদ্যোগে আসামে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প গড়ে তোলার প্রস্তাব ছিল রাজ্য সরকারের। এ ব্যাপারে সরাসরীর প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত আসা যায় নি।

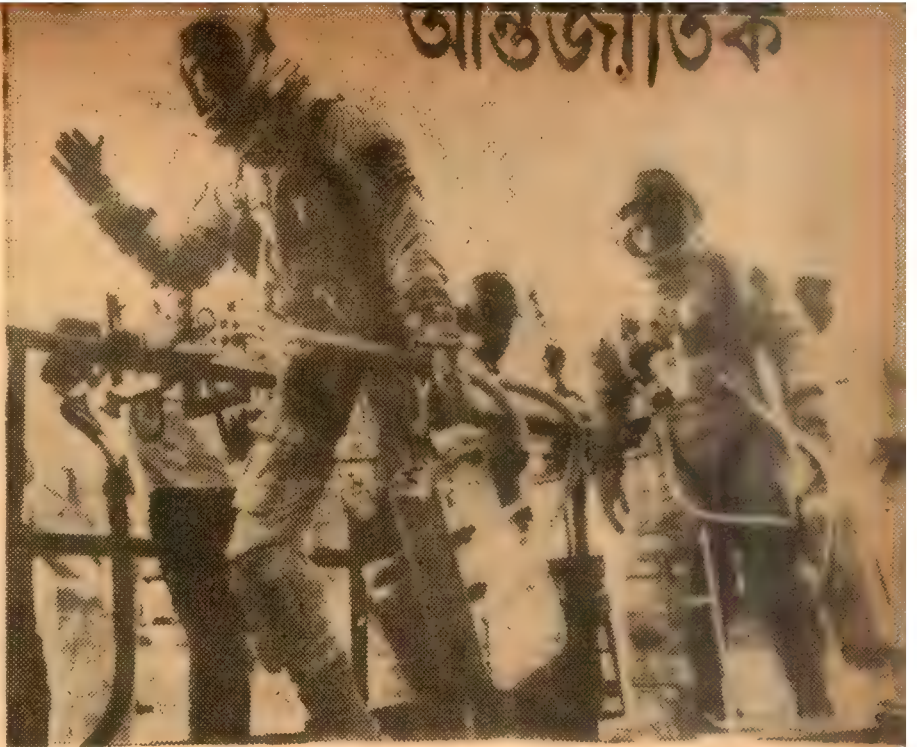
বেলজিয়াম :

ভাষা সমস্যা নিয়ে বিশ্বের যেসব দেশ বিব্রত, বেলজিয়াম তাদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে বেলজিয়ামের ভাষা-সমস্যা এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, অনেকের মনেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে: বেলজিয়াম এক থাকবে, না বিখণ্ডিত হবে?

গত সংগৃহে বেলজিয়ামের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভাষার প্রশ্ন এবারের নির্বাচনে প্রধান প্রশ্ন ছিল। ভাষা নিয়ে ভটিলাতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, নির্বাচনের পর বেশ ক'দিন পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত সেখানে কাদের নিয়ে সরকার গঠন করা হবে তা স্থির করা সম্ভব হয়নি।

বেলজিয়ামের উত্তরাংশ কৃষি-প্রধান ক্ষেত্রের অঞ্চল। এই অঞ্চলে যে ৫০ লক্ষ ফ্লেমিং বাস করে, তাদের ভাষা ফ্লেমিশ—ওলন্দাজ ভাষার একটি অপভ্রংশ। আর শিল্পসমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চলে যে ৪০ লক্ষ ওয়ালুন বাস করে, তাদের ভাষা হল ফরাসী। ১৮৩০ সাল থেকে বেলজিয়াম এক রাষ্ট্ররূপে পরিচালিত হলেও ভাষার দ্বারা বিভক্ত এই দুই অংশের মধ্যে পূর্ণ একীকরণ আজও হয়ে ওঠে নি। দুই অঞ্চলের মধ্যে মন কষাকষি, বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই আছে।

সোস্যালিস্ট পার্টি ও ক্রিস্টিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি এতদিন যুক্তভাবে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে বেলজিয়ামের শাসন চালাচ্ছিল। এইবার তারা ঠিক করে, সংবিধান সংশোধন করে দেশের উত্তরাঞ্চলের সরকারী ভাষা ফ্লেমিশ এবং দক্ষিণাঞ্চলের সরকারী ভাষা ফরাসী করা হবে। বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী সমগ্র রাষ্ট্রেই দ্বিভাষা ব্যবস্থা চলছে, অর্থাৎ ফ্লেমিশ ও ফরাসী, দুই-ই সরকারী ভাষা। প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনের ফলে উত্তরাঞ্চলের লোকেরদের সরকারী ভাষা বর্তমান দুই ভাষার পরিবর্তে কেবল একটি, অর্থাৎ তাদের নিজেদের



মহাকাশ যাত্রার প্রাক্কালে

ভাষা ফ্লেমিশ হবে সরকারী ভাষা, ঠিক অনুরূপভাবে দক্ষিণে হবে ফরাসী।

কিন্তু বেলজিয়ামের নির্বাচকমণ্ডলী কোয়ালিশন সরকারের এই ভাষা ফরমূলাকে অনুমোদন করে নি। বেলজিয়াম পার্লামেন্টের মোট সদস্য সংখ্যা ২১২। সংবিধান সংশোধনের জন্য অন্তত তার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। কোয়ালিশন পক্ষ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসন তো পায়ই নি, উপরন্তু আগের চেয়েও তারা এবার ৩৯টি আসন কম পেয়েছে।

কিন্তু বেলজিয়াম জনসাধারণ ভাষার প্রশ্নে যে ঠিক কি চায়, তাও

বোঝা যাচ্ছে না। 'পার্টি অব ফ্রিডম এন্ড প্রোগ্রেস' নামে যে দলটি এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আসন পেয়েছে, সে দল ভাষার ব্যাপারে উদারনৈতিক নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী। আবার ফ্লেমিশ ও ওয়ালুনদের চরমপন্থী দলগুলিও বেশ আসন লাভ করেছে—এরা দেশের দুই অংশকে বিভক্ত করে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করছে।

বিদ্যায়ী প্রধানমন্ত্রী থিও লেফেভরে পদত্যাগ করেছেন। ভাষা এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে দলগুলির মধ্যে কোনরূপ ঐক্যমত না হবার জন্য কোন পক্ষই সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করছে না। এ অবস্থায় কি হবে?

অনেকের আশঙ্কা পাঁচ বছর আগে যেমন বেলজিয়ামে ভয়ঙ্কর ভাষা-দাঙ্গা হয়েছিল, আবার তার পুনরাবৃত্তি হবে।

ইন্দোনেশিয়া :

মানয়োশিয়া বিরোধের ব্যাপারে কি সোয়েকার্নো একটু নরম হয়েছেন? 'মাকিলিঙো' পরিকল্পনার ভিত্তিতে



ইস্পানেশিয়া-মালয়েশিয়া বিরোধের
মীমাংসা : সত্তর বলে ইস্পানেশিয়ার
সরকারী মহল থেকে বলা হচ্ছে।

‘মাকিলিঙো’ পরিকল্পনা ১৯৬৩
মাসে প্রধান উপস্থাপিত হয়।
এই পরিকল্পনা অনুসারে মালয়,
কিলিপাইনস ও ইস্পানেশিয়া, এই
তিনটি রাষ্ট্র নিয়ে একটি ‘কনফেডা-
রেশন’ গঠন করা হবে। যে-
কোন প্রকার বৈদেশিক আক্রমণের
‘বিরুদ্ধে কনফেডারেশনের সকলে
একত্র সংগ্রাম করবে এবং নিজেদের
মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, বাতায়ত
প্রভৃতি বিষয়েও ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সহ-
যোগিতা থাকবে। কিন্তু এই পরি-
কল্পনা বাস্তবে রূপ গ্রহণ করে নি-
ইস্পানেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো
মালয়েশিয়া ‘স্বংসের’ ঐতিহাসিক
অভিযানে যেতে উঠেছেন।

গত সপ্তাহে ইস্পানেশীর পররাষ্ট্র

প্রভাব হতে ‘মাকিলিঙো’ স্থাপন সম্ভব
হয়, তবে তার পরিপ্রেক্ষিতে মাল-
য়েশিয়াকে সেনে নিতে ইস্পানেশিয়ার
আশঙ্কি হবে না।

মালয়েশিয়া বিরুদ্ধে জাপানী
প্রধানমন্ত্রী এমাকু মাতৌর প্রচেষ্টার
প্রতিও ইস্পানেশিয়ার সমর্থন আছে
বলে পত্রিকাটি বলেছে।

‘মাকিলিঙো’ পরিকল্পনার মধ্যে
প্রধান কথা হল—তিনটি রাষ্ট্রের
ভিন্নরূপ ও সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী
সামরিক ব্যবস্থা। মালয়েশিয়া বৃটেনের
সঙ্গে যুক্ত—এখানে শক্তিশালী বৃটিশ
সামরিক বাহিনী আছে। কিলিপাইনস মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর ইস্পা-
নেশিয়া এদের কারও নিয়ন্ত্রণেই নেই
ইন্দোনীশ চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বৃদ্ধির ফলে
ইস্পানেশিয়ার ইন্দোনেশিয়ান বিরোধিতার
মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থার
তিন রাষ্ট্রের যুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
কিভাবে গড়ে উঠবে?

যদি কোন ভাবে এই তিনটি
রাষ্ট্রকে একত্রিত করে একটি ‘কন-
ফেডারেশন’ বা এই জাতীর কোন
রাষ্ট্র সংস্থা স্থাপন করা যায়, তবে এই
অঞ্চলের একটি বড় বিরোধের নিষ্পত্তি
হয়। তাছাড়া তিনটি দেশের অধি-
বাসীদের মধ্যেও নানা দিক থেকে
মিল রয়েছে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে
তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার
স্বাধীনও রয়েছে অনেক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদম একটি
কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত
জানাবে। ইস্পানেশিয়ার সঙ্গে মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্র বিরোধ করতে চায় না, আবার
মালয়েশিয়ার যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের সঙ্গেও
তার বন্ধুত্ব সরকার। গত বাসে মার্কিন
কূটনীতিবিন এলসওয়ার্থ বাকার জাকার্তা
গিয়েছিলেন। সম্ভবত বাকারের সঙ্গে
ইস্পানেশিয়ার নেতাদের এ বিষয়ে
কিছু কথা হয়েছে।

বৃটেন ‘মাকিলিঙো’ ঘোর বিরোধী।
এই কনফেডারেশনে ইস্পানেশিয়ার
কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধি পাবে, এবং তার ফলে

সমগ্র অঞ্চলে বৃটেনের শিল্প ও
বাণিজ্যের ব্যর্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

অপর দিকে ইস্পানেশিয়ার
কমিউনিস্টরাও এই প্রভাবের বিরোধিতা
করবে। কিলিপাইনস ও মালয়েশিয়া



এসাকো সাতো

উভয়েই কমিউনিস্ট বিরোধী। এদের
যোগদানের ফলে কমিউনিস্ট প্রভাব
হ্রাস পাবে। মালয়েশিয়া বিরোধের
নিষ্পত্তিও কমিউনিস্টদের কাম্য নয়।
কারণ তা হলে সোয়েকার্নোর
কাছে তাদের দাম কমে যাবে।

সুতরাং ‘মাকিলিঙো’ পরিকল্পনার
মাধ্যমে মালয়েশিয়া বিরোধ নিষ্পত্তি
জন্য জাপান বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
প্ররাস শেষ পর্বন্ত কতটা সফল হবে,
বলা শক্ত।

আলজিরিয়া :

এ নামের শেষে আলজিরিয়ার
আল্জো-এশীয় রাষ্ট্রের প্রধানদের গুরুত্ব-
পূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয়
বাঙ্গু সম্মেলন বলে অভিহিত এই
সম্মেলনে নবজাগ্রত আল্জো-এশীয়
জনমতের প্রতিকলন হবে।

কিন্তু সম্মেলন-পূর্ব পরিস্থিতি যা
দাঁড়িয়েছে তাতে আলজিরিয়ার সম্মেলনে
আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে



সোয়েকার্নো

দপ্তরের মুখপাত্র ‘ইস্পানেশিয়া হেরাল্ড’
সমুদ্র করে, মালয়েশিয়া নিয়ে যে
বিরোধ তা সোয়েকার্নো ও টুঙ্গু আবদুল
রহমানের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত
বিরোধ নয়। মালয়েশিয়াকে অবলম্বন
করে যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত গড়ে
উঠেছে, তার বিরুদ্ধে ইস্পানেশিয়ার
অভিযোগ। যদি ১৯৬৩ মাসের



নাইরোবিতে কেনিয়ার বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে সর্দার স্বরণ সিং

এক বৃদ্ধি পাবে, না একো কাটল
ধরবে, সেই বিষয়েই প্রশ্ন দেখা
দিয়েছে। আফ্রো-এশীয় একা নষ্ট
করা অন্য চীন উঠে-পড়ে লেগেছে।
আফ্রিকার নবস্বাধীন দেশগুলিতে
প্রভাব বৃদ্ধি করাই আজ চীনের প্রধান
উদ্দেশ্য। চীনের নেতৃত্বে আফ্রো-
এশীয় রাজনীতি পরিচালিত হোক,
এই হল চীনের একান্ত ইচ্ছা।
চীনের নেতৃত্ব যারা মানবে না, তাদের
খান দিয়েই আফ্রো-এশীয় সম্মেলন
অনুষ্ঠানের জন্য চীন চেষ্টা করবে।

আপাতত সনগ্যা দেখা দিয়েছে
আলজিরার সম্মেলনে সোভিয়েট ইউ-
নিয়ন ও নারয়েশিয়ার যোগদান নিয়ে।
চীন এই সম্মেলনে সোভিয়েট ইউ-
নিয়নের যোগদানের ঘোর বিরোধী।
নারয়েশিয়ার যোগদানের বিরোধী
ইন্দোনেশিয়া। সম্মেলনের পূর্বে
উদ্যোক্তা রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রী
বঠকে স্থির হবে, এই দুটি রাষ্ট্রকে
সম্মেলনে আহ্বান করা হবে কি না।
রাব ও ইন্দোনেশিয়া ইতিমধ্যেই

হুকুম দিয়েছে, এদের ডাকা হলে
তারা সম্মেলনে যোগ দেবে না।
ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ
সুবাস্তিও এই বিষয়ে আলোচনার
জন্যই সম্প্রতি পিকিং গিয়েছিলেন।

আলজিরার সম্মেলনে যাতে
চীনের রাজনৈতিক বক্তব্য প্রাধান্য
পায় তার জন্য চীনের পক্ষ থেকে
ব্যাপক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলছে।
চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এই
উপলক্ষে ব্যাপকভাবে আফ্রিকা
সফর করেছেন। এই কাজে চীনের
প্রধান সহায় ইন্দোনেশিয়া ও
পাকিস্তান।

বিলম্বে হলেও ভারতও
আলজিরার সম্মেলন উপলক্ষে তার
কূটনৈতিক প্রয়াস জুড় করেছে।
পররাষ্ট্র দপ্তরের তিনজন মন্ত্রী বর্তমানে
আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর
করছেন, এবং চীনের অপপ্রচারের
জবাব দেবার চেষ্টা করছেন। প্রধান-
মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীও ১৫ জুন
কাররোতে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের

রাষ্ট্রপতি আবদুল গাফের নায়েফ
সঙ্গে কথা বলবেন।

চীনের পক্ষে সর্বত্র জোর প্রচার-
কার্য চললেও বিভিন্ন দেশে চীনের
বিভেদবুদ্ধক নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
দেখা দিচ্ছে। আফ্রিকার কয়েকটি
দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সম্প্রতি চীনের
আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন।

আফ্রিকা ও এশিয়ার মানুষ আজ
একো চরম—সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার
জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য।
যে আজ এই একোয় বিরুদ্ধে
যাবে তাকেই পথ পেতে হবে
দাঁড়াতে হবে।

ভিত্তিকতাম :

দক্ষিণ তিয়েনানমের অনেক
সঙ্কটের মধ্যে সম্প্রতি আবার এক
নতুন উপসর্গ এসে পড়েছে। প্রধান-
মন্ত্রী কুয়াং আভাত্তরীণ মন্ত্রী-হিয়েণ
এবং অর্থনৈতিক মন্ত্রী পান গিন্কে
বরগান করতে বহুপক্ষিকর হয়ে
ছিলেন, কিন্তু বাব সেখানেই গিয়ে

প্রধান কান্ কাঙ্ক্ষা। তিনি দুই নাকচ মস্ত্রীর পদত্যাগে অসম্মতিকে আইনসম্মত বলেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। ঘটনাটির এখানেই শেষ নয়। আগামী বর্ষার সমাগমে ভিয়েৎ কং গেরিলাদের আক্রমণ ব্যাপক এবং তীব্রতর হবে আশঙ্কা করছিলেন দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের বর্তমান কর্তৃপক্ষ এবং তাঁদের মন্ত্রণালয় মাকিন নীতিগতরা। কুয়াটের সঙ্গেই আছে যে, সেই সুযোগে আর একবার 'কু' (coup) করার চেষ্টায় স্থল এবং সৈন্যবাহিনীর কিছু কর্তা-ব্যক্তি এখন থেকে মতলব তাঁজ-ছিলেন। সুতরাং তাই সে সম্ভাবনা বহিত করার জন্য তাই বেশ কিছু উত্থাপন সামরিক এবং বেসরকারী কর্মচারীকে কারাবদ্ধ করা হয়েছে। আর সব মিলিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি জটিল বিশৃঙ্খলায় পর্ববসিত হয়েছে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে মাকিন রাষ্ট্রদূত ন্যাঙ্গওয়েল টেলরকে ইতিমধ্যে তিন-তিনবার স্বদেশযাত্রা স্বগিত রাখতে হয়েছে। কারণ অন্যদিকে স্থানীয় ক্যাথলিক নেতারাও প্রভাবের কলকাঠি নেড়ে রাজনৈতিক রণাঙ্গনে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁদের ধারণা দিয়েমের বৃত্তার পর থেকে কুয়াটী বুদ্ধভক্তদের তোরাজ করছেন অন্য ধর্মীয়দের স্বার্থ উপেক্ষা করে। এই তো গেল দেশের ভেতরের ব্যাপার।

অন্যদিকে মাকিন সমরসজ্জা দিন দিন বাড়তেই চলেছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মাকিন সৈন্য-সংখ্যা এক লক্ষের কোঠা ছাড়িয়ে যাবে তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী। যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌ-বাহিনী উদ্যত পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের কামান নিয়ে ভিয়েৎ কংদের খাঁটি ধ্বংসের অজুহাতে ক্রমাগত উত্তর ভিয়েৎনামের উপকূল খুঁচিয়ে চলছে। বোমাবর্ষণের তো বিরামই নেই। মাকিন সমর-নেতারা আগামী বর্ষার আগেই উত্তর ভিয়েৎ-

নামের এবং ভিয়েৎ কং অধিকৃত এলাকার পথঘাট এবং সেতু বিধ্বস্ত করতে বদ্ধপরিকর। বর্ষাপ্লাবিত পাহাড়ী জঙ্গল বাড়িয়ে মাকিন স্থল-বাহিনী যে ভিয়েৎনামের দুর্ভেদ্য অঞ্চলে বর্ষায় সুবিধে করতে পারবে না এবং সে দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই উত্তর ভিয়েৎনামের আক্রমণ যে উত্তরোত্তর বাড়বে সে বিষয়ে তাঁদের সন্দেহ নেই। অন্যদিকে রুশ এবং চীন সমরাজ্ঞের সরবরাহ ইতিমধ্যে আক্রমণের তীব্রতাকেও অনেকাংশে নিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলবে। উত্তর ভিয়েৎনাম ও ভিয়েৎ কং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দিন দিন যে সবল করে তুলছে তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে বিমান-বিশ্বংসী গোলাবর্ষণে মাকিন বোমারুদের পশ্চাদপসরণের দৃষ্টান্তে। মাকিন সমর কর্তৃপক্ষ স্বীকার করছেন যে, তাঁদের আক্রমণকারী বিমানবাহিনী উত্তরোত্তর ব্যাপক মিগ জেট বিমানের



কুয়াট

প্রতি-আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে। চীনের রণচক্রারও মনে হয় এই ইঙ্গিতই বহন করে যে ভিয়েৎনামের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মোকাবিলা আগামী বর্ষার দিনেই সম্ভবত নির্ধারিত হবে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ

বিপর্যয় যদি চলতে থাকে, তবে অপর ভবিষ্যতে বড়ো রকমের কিছু একটা পরিবর্তন আশা করা খুব হয়তো অযৌক্তিক হবে না।

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র :

মনে করুন অতলাত মহাসাগরের বুক থেকে দেড়শো নাইল উঁচুতে গীমাহীন মহাকাশে যুক্ত বিহঙ্গের মতো একটি রক্তমাংসের মানুষ ভেসে বেড়াচ্ছেন। গড়ে তাঁর মাত্র পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের ক্যামেরা। জেমিনি মহাকাশযানের সঙ্গে একটি নাইলন কর্ডের সম্পর্ক তাঁর। কুড়ি মিনিট তিনি মহাশূন্যে সাঁতার কাটছেন আর এই পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে কোটি কোটি উদগ্রীব মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় সেই রোমাঞ্চকর ভূমিকা প্রত্যক্ষ করছেন। চন্দ্রাভিবানের প্রস্তুতিকালে বিজ্ঞান মানুষের ক্ষমতার পরিমিকে কোন অসীমে নিয়ে যাচ্ছে তার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত নির্ধৃতভাবে পুনরাবিতীত হোল। ইতিপূর্বে মাত্র আড়াই-নাগ আগে রুশ মহাকাশচারী লিওনেড এ প্রচেটার প্রথম সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মাকিন নায়ক এডওয়ার্ড হোয়াইট আবার সে কৃতিত্বের পুনরাবৃত্তি করলেন।

এরা জুন জেমিনি রকেটে দুই মহাকাশচারী জেমস ম্যাকডিভিট এবং এডওয়ার্ড হোয়াইটকে শক্তিশালী টাইটান রকেট স্থাপিত করে মহাশূন্যের বলয়ে। ষণ্টায় লাড়ে সতেরো হাজার নাইল গতিতে জেমিনি আকাশ পরিক্রমা করে চলেছে এবং কিঞ্চিদধিক চারদিন এই পরিক্রমা সম্পন্ন করে জেমিনি এই পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে দুই মহাকাশচারীকে নিয়ে বিচিহ্ন অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জ্ঞান আহরণ করে। বলা বাহুল্য স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ব্যতিক্রম হলেও এরা পালানো খাওয়া-দাওয়া সেরেছেন, ঘুমিয়েছেন।

বেতরে পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ
রেখেছেন, মহাশূন্যের চলচ্চিত্র তুলে-
ছেন। এঁরা ফিরে এলে অনেক নতুন
তথ্য পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে
মহাশূন্যের সম্পর্কে।

ডোমিনিকান রিপাবলিক :

টাকার গণ্ডমে লোকের যে দৃষ্টি-
বিহীন হয় তার একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি
সেবা গেল ডোমিনিকান রিপাবলিকে।
সেবা গেল যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর বিরোধী
দুই দল যারা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে সক্রিয়-
ভাবে জড়িত তাদের উভয় পক্ষের
সামরিক অনেকখানি বহন করতে
সক্ষমতা সম্ভব। অবশ্য 'অরগানাই-
জেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ল' বা
ই-এ-এস-এর মাধ্যমে। এর জন্যে
মাটি লক উন্মোচনের প্রয়োজনীয় অর্থ-
চাওয়ার কিতাবে আসবে সে অবশ্য
ইন্য কথা। যুক্তরাষ্ট্র এর চেয়ে অনেক
বেশি অর্থব্যয় করেছে স্বাভাবিক
ডোমিনিকান রিপাবলিকের 'শান্তি'
ফিরিয়ে আনতে পাঠানো মার্কিন
সৈন্যবাহিনীর পেছনে। পূর্বে একটা
চটখা নিয়ে যদিও এই মার্কিন সৈন্য-
সেনা পাঠানো হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত
পরিস্থিতি এবং বিশ্বজনমতের চাপে
৩৪০০ মার্কিন সৈনিককে হাত গুটিয়ে
ঘরদেশে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে।
সে জায়গার বুজিল এবং অন্যান্য
দেশের সেনাদল (সংখ্যায় সতেরো
শো) ডোমিনিকান রিপাবলিকে হাজির
হয়েছে। অগ্রপশ্চাৎ না তেবে উচ্চ
মস্তকের এ-জাতীয় দুষ্ক্রিয়া মার্কিন
রাষ্ট্রপতি জনার্নের নীতিকে আন-
ধিকার তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন
হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই
স্বাভাবিক সৈন্য পাঠানো এবং অপসারণ
জনগণ-স্বাধীনতাকে বিবৃত অবস্থার মুখো-
মুখি নিয়ে এসেছে। তবু শেষ সানাল
সেবার জন্যে মার্কিন কর্তৃপক্ষ বিশ্বস্ত
চ্যাক ভজ বাণ্ডিকে রাষ্ট্রপতির সরাসরি
অভিনিধি হিসেবে দোত্যাগিত্তে



সমর্থকদের সমাবেশে ইমবার্ট

নিয়োগ করেছেন। বাণ্ডি তাঁর সহায়ক
খুঁজে পেরেছিলেন গুজরানোর নথ্য,
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বুদ্ধি ধোঁপে
টেকে নি। ইমবার্ট বা ক্যামেনো দুই
বিরোধী দলের কেউ তাঁকে পাতা
দেয় নি। ফলে বাণ্ডিকে ওয়াশিংটন
ফিরতে হয়েছে ব্যর্থমনোরথ হয়ে।
ইমবার্ট সম্পর্কে বলেছেন—আমেরিকান-
দের যোঝা দায়। আমাদের বিরুদ্ধেই
আমাদের দেশবাসীদের মৃত্যুযজ্ঞে
লেলিয়ে দিয়ে কোন মুখে যে আপোষ
করতে আসে বুঝি না। তবে মার্কিন
দিক থেকে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে,
তারা যোরতরভাবে ক্যামেনোর
বিরুদ্ধে, কারণ তাঁর কমিউনিস্ট অনু-
চরদের হাতে না ইনেক্ত জনকুড়ি
মার্কিন সেনাকে মৃত্যুবরণ করতে
হয়েছে আর শতাধিক আহত হয়ে
পড়েছে। গুজরানোর বিরুদ্ধে অনেক
অভিযোগ। যদি বা অন্যগুলি গওয়া
যায়, প্রায় সাড়ে সাত কোটি ডলারের
তহকুপের যে অভিযোগ তা কালন
করা মুশ্বিল। এ অবস্থার বাণ্ডিকে
তলপিতলপা গুটিয়ে ওয়াশিংটন
প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া উপায় কি?
ডোমিনিকান রিপাবলিকের আভা-

ভাবনা অবস্থার কোনো পরিকল্পনা
ইতিমধ্যে বিশেষ হয় নি। পৃথিবীর
রক্তক্ষয়ী অধ্যায় প্রলম্বিত হয়েই
চলছে।

পুস্তকতানে চিরনূতন মণিমাণ্ডল

সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী

গ্রন্থক ভাগে—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ
বিরচিত—হতোষ প্যাচার নক্সা বাংলা
উপন্যাসের প্রবর্তক প্যারীচাঁদ মিত্রের—
আলালের ঘরের দুলাল, পুণ্যকীর্তি
ইস্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—লাভবিলাস
একত্রে ৩ টাকা মাত্র।

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য : এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোম্যাকর
উপভোগ। ছাপা, বীথাই চমৎকার।

উপহার দিব্যর মত বই

দি বঙ্গবর্তী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২



সামাজিক শিশুদিবসে ভারতীয় ও সোভিয়েট জননীদেব সমাবেশের একাংশ

রাজধানী :

বিলকুল ভেজাল

ঢেঁর ভর, কোমরে দড়ি (বলা বাহুল্য এরা হিঁচকে চোর) ; জোড়োর বলে, হেসে মরি। যত্নিন এদেশে, ফটিক-গারদ খোঁড়াই কোয়ার করি।

বস্ত্রত এদেশে চোর ধরা ছাল আছে, কিন্তু জোড়োর আখ ভেজাল চালানোও সামান্য একটা ছিপের ব্যবহাও নেই। অবশ্য ভেজালের যে বহর সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনের দ্বারাদেশিক পরীক্ষকদের রিপোর্টে কীস হ'য়ে গেছে, তাতে স্পষ্টতই লোঝা যায় ব্যাপারটা আদৌ ছিপছিপে ছিপের কর্ম নয়। ছিপ সহ-বোপে বিপালবপু কই-কাতলা শিকার তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। স্তত্রাং ওদিক দিয়েও কেউ যাবেন না। এ বিষয়ে আপনি আসি না হলেও ভেজালনাৎ সত্ত্ব সবিশেষ নিশ্চিত। আর সেজন্যই পৌরসভার জনাকয়ক সদস্য বর্তমান ভেজাল নিরোধ আইনটির সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। কতিপয় সদস্য, যথা, শ্রীপদ্মা-মাল দাস ভেজালকারীদের ওপর প্রকাশ্যে বেকারখোঁজের; শ্রীমতেন সেন উপরোক্ত শয়তানদের ম্যাসপোটেট্রানিয়ে কীস দেওয়ার এবং শ্রীকুমার দত্ত এই বিষ প্রয়োগকারী স্বনী সম্প্রদায়ের সম্প্রতি বাছেয়াস্ত করণের প্রস্তাবও রেখেছেন। কিন্তু অরপো বোদন। এ সবত স্লেক পণ্ডত্রব। আইনের চাবুক নাচিয়ে জাতির হত্যাকারী এই শূণ্যস্ত-স্বনী সম্প্রদায়কে কোনো কমতাই মুনি সম্প্রদায়ে পরিণত করতে পারবে না। সে মুরোদও নেই কারও। শয়তানরা সে সংবাদ স্তত্রাংবেই জানে, আমরাও সে কথা স্তত্রাংবে

জেনেই 'মুক'। পৌরসভায় যাঁরা সম্প্রতি 'বাচাল' হয়েছেন, তাঁরাও জানেন, এসমস্ত বাগাভবর পরিষদীয় চাল ছাড়া অন্য কিছুই নয়, কেন না অতিলোভ আনাদের অরণকাল ঘরান্নিত করেছে। বর্তমানে ভেজালে খেয়েছে তিন কাল, ভবিষ্যতে ঐ ভেজালেই খাবে বাকি এক কাল। কেন না গোটা জাতিটা মুখ খুবড়ে পড়বে, পচন দেখা দেবে দূষিত শরীরের সর্বাদ্দে।

সে বাই হোক, তাঁর অন্য বাগাব্যথা নেই আপাতত। এখন মসনদই না ভৈঃ। টিকে থাকতে পারলে রাজা। দাঁটাতে গেলেই কমতা-চ্যুতির সাজ। অত ঝালোয় কে যায়। যাবেন না কেউই। আইনে যতই 'বলু আঁচিনি' থাক, আইনভঙ্গকারী 'ফক্সা পেরোর' ব্যবস্থা আপনি করে নেবে। চীৎকারে সভা-সমিতি লয় পাবে না। পত্র-পত্রিকায় কিছু কালি ও শ্রমের অপব্যয় হতে পারে। তা তাও পড়িয়ে বাবে। গরম লেখায় কিছু বিক্রি-বাটা বাড়বে হয়ত। (আর জনাত্তিকে বলে রাখা ভাল, গরম কাগজী নিবন্ধের আসল উদ্দেশ্যও এখানে। নচেৎ এও নিফল। ভেজালের কী মহিমা।)

কিন্তু ইতিহাস মহাওক্ষ। নিঃশব্দ নিদ্রায় এসমস্তই সংগ্রহ করবে ইতিহাস, পরিশ্রমী হিসাবরক্ষকের নতো।

আপাতত আমরা ভেজালের চিত্রটি পৌর-সভায় উপস্থাপিত উদ্ধৃতি অনুসারে যথায় যাজিয়ে মরি। এই চমকপ্রদ বিবরণ চম্ভা-ভিযানের চেয়ে কম বিসময়কর নয়। আমরা ওসমস্ত বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রার পিছিয়ে আছি বলে বিমর্ষ হওয়ার কারণ নেই। আমাদের নতো ভেজাল-বিস্তার দুনিয়ার দ্বিতীয় হৃদিত।

দুঃখের বিষয় এহেন আবিষ্কারের ওপর নোবেল প্রাইজ নেই। না থাক দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ইগনোবেল প্রাইজটি যে আমা-দেবই প্রাপ্য নিম্নোক্ত সংখ্যাতত্ত্ব তারই সাক্ষ্যবাহক :

১৯৬৩-৬৪র কতিত্ব

বিষয়	ভেজালের পরিমাণ
গম, বনস্পতি	শতকরা
পটল, পৌরাজ	একশ
চিনি, আইসক্রীম	ভাগ
এরাকট, নমু	

দুগ্ধ	শতকরা	৪১'০৯
মিষ্টান্ন	শতকরা	৮১'২৫
লজেন্স	শতকরা	৪৪'০৪
মাখন	শতকরা	৪৭'২৯

১৯৬২-৬৩র কতিত্ব

পরীক্ষিত নমুনা	ভেজালের হার	শতকরা হার
২১৯৪	৩৪৫	১৫'৭২

১৯৬৩-৬৪র কতিত্ব

১৬৫৬	২৫৪	১৫'৩৩
১৯৬৪-৬৫র কতিত্ব		
৭৬৯	২২৮	২৯'৩

নোট বা মলিন-মস্তাবেজ জাল করলেও আশঙ্কার কারণ ছিল না ততটা, যতটা শক্তিত্ব করেছে ভেজালের এই ব্যাপক প্রচেষ্টা। সমগ্র জাতির প্রাণশক্তি বিনাশের এই নিবিশেষ আরোজন বিগত মহাযুদ্ধকালে বর্বর নাৎসী হিটলারেরও স্বপ্নাতীত ছিল। গ্যাস প্রয়োগে নাৎসীরা হাজার হাজার ইহুদি জীবন বিনষ্ট করেছে নিবিশিচারে। অত্যাচারের প্রহেলিকা সৃষ্টি করেছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে; কিন্তু নারকীয় লোভের বশবর্তী হয়ে স্বজাতিকে প্রতিদিন কীণ শক্তি; হতবল এবং ঝড়ে ঝংশে পড় করে তোলার কৌশল গ্রহণ করে নি। তথাপি পাপ সইতে পারল না- ওদের কপাল। - ভারতীয় বুনাকশিকারীর গাল কিন্তু পাপ পঙ্কায় আকর্ষ ডুব দিয়ে বেশ তরে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রতরগীর হাল যদি শক্ত হাতে ধাক্কা, তবে ভেজালের হিসাব কীস হবার আগেই পেতানি আমরা ভেজাল মানুখ গ্রেপ্তারের জনবর্ধন সংখ্যার হিসাব। আগেই বলা হয়েছে, সে হিসাব দাখিল করার কমতা নেই কোনো শক্তির। স্তত্রাং এবার গাও। জোড়োর জয়গান গাও।

গোটা দেশ বিলকুল ভেজাল। আমাদের মন, আমাদের কমতা, আমাদের সদিচ্ছা সবত ভেজালের স্রোতে ধা ডালিয়েছে।

জুনি আদিই বা বাদ যাই কোন মুখে। বল
মা ভেঃ।

ঋষিবাক্য মাধার থাক।

বল, উত্তীর্ণত আগ্রহ, প্রাপ্য স্বপ্ন কর,
'ভেজালি'।

অত্যন্ত দুঃখের কথা, প্রকাশ্যে না হলেও
শতই দিন যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে বেন
এমনি ধারা এক গোপন দুর্ভাগ্যি শেকড়
বাড়িতে জরু করেছে। আর সেটাই আত্মবিক।

কুণ্ঠিততন বোগ রাতেই সংক্রামক।

আজও স্বপ্ন ধারা, এই সর্বগ্রামী বোগের
কবল থেকে তাঁদেরও মুক্তি নেই।

একভাবে নীবোগ ভাবতীয় শুধু একটি
মাত্র ক্ষীণ আশা পোষণ করতে পারেন,—
শরভানের হাতেই শরভানী একদিন নিশ্চিন্ত
হবে।

শিশুদিবস

বিপ্লবত পমলা জুন আন্তর্জাতিক
শিশুদিবস অনুষ্ঠানে ভারতীয় মহিলা জাতীয়
কেডারেশনের সভানেত্রী শ্রীমতী ষাওলওয়ালা
সোভিয়েট প্রতিনিধি সহ উপস্থিত মহিলাগণকে
সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে একত্রে শিশুদের জন্যে
জুসর ভবিষ্যৎ গড়ার সম্ভব গ্রহণের জন্য আহ্বান
দানিয়েছেন। শ্রীমতী ষাওলওয়ালা ভারতীয়
রাষ্ট্রভেদেই সম্ভব গ্রহণ করেছেন। ও জিনিসটা
আমরা সুযোগ পেলেই এবং প্রায়শই করে
একি। যদিও মনে মনে জানি, সম্ভবকে
কার্যে পরিণত করার পথে বাধা হিমালয়
প্রমাণ। পূর্ববর্তী আলোচনায় ভেজালের যে
তথ্য বিবৃত হয়েছে তা থেকেই প্রতীয়মান
হবে, ভাবতীয় শিশুর ভবিষ্যৎ কী পরিমাণ
কুহেলিকাচ্ছন্ন। শ্রীমতী ষাওলওয়ালা যেখানে ভেজাল
বিষয়টির ভবিষ্যৎ অঙ্কন দেখছে সেখানে
ঐচ্ছন্দ্য ভবিষ্যৎ রচনার সম্ভব যে কেবলমাত্র
কল্পনাকেন্দ্রী শ্রীমতী ষাওলওয়ালা অতঃপর
নিশ্চয়ই সেকথা তেবে দেখবেন এবং সম্ভব
লাভের প্রথম সোপানস্বরূপ তাঁর সংগঠনের
দায়িত্ব ভেজাল-বিবোধী আলোচনায় নেবে
পড়ায় যে শিশু-ভবিষ্যৎ বচনার প্রথম আরম্ভ
কার্য তাও উপলব্ধি করবেন। গারনেই
'চাচা নেহরু' জন্মদিন। সেই আগামী
জন্মদিনে শিশুর ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নিবাপত্রার
জন্য খান্যে ভেজাল বন্ধ করার ওপর সুচিন্তিত
চর্চা সূচী রাখতে পারেন ভাবতীয় মহিলা কেডারেশন।
কেডারেশন ভেজালকারী শরভানের অঙ্গরমহলে
আলোচন হাঙ্গির করতে চেষ্টা হলে সেকাজ
অনেকটা প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করতে পারে।
আমের মনে ছেলের স্বাস্থ্যের প্রশ্নটি গ্রবিত
করা। ভেজাল জিনিসটা তো লোক চিনে

সেহয় বিকল কবে না; ভেজালকারীর সম্মানও
ভেজাল রাষ্ট্রের প্রাণ থেকে মুক্ত নয়। যিনি
বংশভিত্তে ভেজাল মিশিয়ে গব্য মৃত আত্মা
করেন, ভেজাল চিনির স্বাদ তিনি নাও চিনতে
পারেন। বিপরীত ক্ষেত্রেও ঠিক একই সমস্যা।
এই ভয়াবহ চিত্রটি মায়েদের মনে একে দিতে
হবে। শিশু-কল্যাণের ক্ষেত্রে একাজের 'চপ
প্রচারি' অনবীকার্য।

শ্রীমতী ষাওলওয়ালা সমস্যাকে সরাসরি
ভিবেৎনানে তুলে নিয়ে গেছেন। বিশ্বশান্তির
প্রসঙ্গটি বিচলিত করেছে তাঁকে। কিন্তু
কয়েকটি বোমার চেয়ে চেব মাঝাক বিশ্ব-বোমা
যে প্রতিদিন 'ভীরই' আত্মনার বিস্তারিত
হচ্ছে। এ বোমা বন্ধের প্রয়োজন সর্বত্র।

সোভিয়েট প্রতিনিধি শ্রীমতী উইরলোভা
শিশু সম্পর্কে সোভিয়েট অনুষ্ঠান সেই আন্ত-
বাক্যেরই প্রতিধ্বনি সুনিয়েছেন:

যুগ্মে আছে শিশুর পিতা

সব শিশুরই সম্মানে।

তিনি বলেছেন, শিশুই আমাদের ভবিষ্যৎ,
মানবজাতির ভবিষ্যৎ। রুশ-ভারত মিত্র-
কূল একত্রে কাজ শুরু করার পক্ষে ভাবতীয়
মায়েরা যেন বিশেষ করে দেশের প্রতিটি
শিশুর মুখে জাতির ভবিষ্যৎ নামকের
প্রতিচ্ছবি দেখেন।

অবশ্য ভাবও আগে প্রয়োজন, জাতিকে
প্রকৃত সমৃদ্ধিশালী করার এবং নিঃস্বার্থভাবে
(জাতীয় স্বার্থ চিন্তা ব্যতিরেকে) সমগ্র জাতিকে
আন্তর্জাতিক ভালবাসার। এটুকু জাতীয়
চেতনায় উদ্ভূত হ'লে মায়েব কোলের সম্মানটিও
সেই জাতীয় চেতনায় উদ্ভাবিকার লাভ
করবে।

পিশাচের দাঁত

ভারতীয় ব্যবসায়ী পিশাচের এলো-
থেরডো কুণ্ঠিত বাঁভেব ভয়াবহ চেহারা দেখে
আতঙ্কিত হয়েছেন বহু রাষ্ট্র পশ্চিম জার্মানী।
এমন অকৃত জীব ভাবভের মাটিতে পয়দা
হ'ছে যেনে কৌতুহলের শেষ নেই সেখানে।
লজ্জা, লজ্জা। লজ্জার মাথা হেঁট হ'ল ভারত-
মাতার। অকাল কল্যাণ সম্মান বতদিন
নিষেব আঁচল ঢাকা থাকে, ততদিন সে-
গর্বে মায়েব বুক বাৎসল্যের জোয়ার। ছেলের
কদাচিৎ রূপটা চোখে পড়ে না। কিন্তু
পরে যখন তার কুশীতা দেখে আঁতকে ওঠে
বাইবেব পৃথিবী, দুঃখের বিষর ভবনও কি
অহ মায়েব চোখ কোটে? না, কুটি কুটি
করেও শেষ পর্যন্ত কোটে না। আর বিপদ
তো সেইখানেই।

সংবাদে প্রকাশ, কলকাতার জনৈক
অবৈধনী ব্যবসায়ীর মাস কয় আগে পশ্চিম

জার্মানীর এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অতি নির্ভর-
একখানি পত্রের ভাবভেব নীতিবাহী উদ্ভ
মাথা একেবারে কাদায় পোড়ানো ক'রে
দিয়েছে। এই অকাল কল্যাণ বোন বিশিষ্ট
বৃক্ষবৎ জাত অর্থাৎ তাঁর কলণীল পরিচয়
সংবাদপত্রের পুরে অপ্রকাশিত। (আমাদের
এই এক মহৎ গুণ, সবদিকী মহল
থেকে বেসবকারী অঙ্গরমহলে পর্যন্ত চাক-
চাক শুদ্ধ-শুদ্ধ। অপবাহীকে লোকচক্ষ
হাঙ্গির করায় এরা বোধকরি নিজেবাই লজ্জা
পাম। সেই যে কথায় বলে, কবলিত লাভ
নেই দেখুস্তি লাভ)। তা সে যাই হোক;
সংবাদপত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক নাম-
ধার সংগ্রহ করার সুযোগ ঘটে ওঠে না।
এক্ষেত্রেও বিশেষ কারণে এই অভিনব কল্যাণের
বিশিষ্ট পরিচয় সাবধানে সংগৃহ্য আছে।

যাক, যা বলছিলাম, কলকাতার এই
অবৈধনী ব্যবসায়ী পশ্চিম জার্মানীর এক
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে এমন একটি যন্ত্রের
সম্মান চেয়েছে যার উপর ভুলেই যন্ত্রটি
পাঠব ভেঙে চালের দানাব আকান পাঠব
কুঁচি প্রসব করতে থাকবে।

বলা বাহুল্য প্রত্যাবের মধ্যে ব্যবসায়ীর
প্রকাণ্ড উদব সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যাই
বলুন, পশ্চিম জার্মানীর মানুষ বেশ সভাভব্য।
তাঁরা এই গুণবিক্রের আসল কথা টেব পেলেন
ভালো মানুষের মতো পত্রটির উল্লখ করে
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পত্রযোগে জানিয়ে
চেয়েছেন, কলকাতার এই ব্যবসায়ী
করণের যন্ত্র নিয়ে ভারতবর্ষের কোন সেবা-
কার্যে নিয়োগ করবেন। অর্থাৎ সরকারের
মুখে চপকালি, ব্যবসায়ীর বাড়ি ভাঙে চাই।

কিন্তু তবু নেই। উত্তর একটা জংসই
দেওয়া যেতে পারে। আমবা জ্ঞানপানী।
ঐ যন্ত্রে ভারতের আজ যে একাত্তই প্রয়োজন
আমবা তা ভালো করেই জানি। সুতরাং
ব্যবসায়ীর নির্লজ্জতার আনন্দকও দামভাগ
আছে। অতএব ব্যাপারটা স্লেক চেপে নাও।
ব্যবসায়ীর নাম চাপতে পারি আর ভাবন্ত-
ব্যাপী এই মহৎ ব্যবসার, ভেজাল ব্যবসার
ট্রেড সিক্রেটই বা চাপব না কেন? তাছাড়া
দূর ভবিষ্যতে ষাণিক্ষেব ক্ষেত্রে আনবা যদি
দুনিয়ায় একহাত লড়তেই চাই তো যে ব্যবসা
আজ সার্বিক 'গুড উইল' তৈরি হবে, তার
'ট্রেড সিক্রেটটা' চেপে রাখাই সঙ্গীতীন।
সুতরাং পশ্চিম জার্মানীকে নিরুপেক্ষ উত্তর
দিতে পারি।

যথা বিহিত সম্মান পুরস্কার নিবেদন দিৎ,
অত্র পত্রে অগ্নিনিয়া সুরী ইউন যে, ভারতের
পাঠরে চালের ইভন্তত: কুটনবিবরণ ক্রমশই

সাপ্তাহিক বসুমতী

কাঁপিয়া কলিয়া উঠিতেছে। অশ্রু ভাবতী
ব্যবসারী দেশের মাঝে মাঝে কলিয়া মানসে
ও দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি ঘন্য বিন্দু
চিত্রায় কাতর হইয়া আপনাদের শব্দপাশ
হইয়াছিলেন।

সুখণ থাকিতে পারে যে, নেহরুজী
জীবিতকালে তাহাতে বিশিষ্ট বিদেশী নেতার
গুণাগুন উপলক্ষে ভাবতীর যে সমস্ত প্রত্যাশা
তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করে, এক
কণিকা চাউল তাহাতে সর্বশেষ উল্লেখ্য বস্তু
ছিল। সেই কণিকা পরিমাণ চাউলে জটিল
শিল্পী একাধিক শব্দ রচনা করে একটি
মিস্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আবও সুখণ থাকে যে, চাউল ভাঙিলে
প্রধান খাদ্য। সুতরাং চাউল সম্পর্কে আনা-
সেব আগ্রহও সমধিক। বর্তমানে ভাবতীর
চাউল ব্যবসায়িক চাউল নইয়া বিভিন্ন পর্ব-
বশা কাঁচা শিল্পী আছেন। আশা করা যায়,
চাউল এবং পাখির অর্থাৎ কণা এবং নীরস
অর্থাৎ জল এবং অল্পের সহায়তায় সর্বত্র
কাঁচা ভাবতীর এক অভিনব সৃষ্টির পথে
ইতিমধ্যেই উন্নয়নগত অগ্রগতির পরিচয়
প্রদান করেন। ভবিষ্যতে এতৎ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত
অভিগম্য সৃষ্টিই সম্ভবত উক্ত ব্যবসায়ীর
কর্মসিদ্ধি অভিপ্রায়।

অথবা তাঁহাকে আশা 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ'
জাতীয় কোনো খেতাব প্রদানেরই সিদ্ধান্ত
এ পর্যন্ত গ্রহণ করি নাই। —ইতি

পবিত্রের সার্থক বক্তব্য, উক্ত ব্যবসায়ীর
জন্য সরকারী কী পুস্তকাদি ব্যবস্থা করি
মাধ্যমে সে সংবাদ জানাব জন্য উদগ্র
কৌতুহল নিয়ে অপেক্ষা আছেন।

জগৎপাইগুড়ি :

কালো কল্যাণ

কল্যাণ কালো সর্বত্রই এবং শত বোতল
তার মলিনতা মোছবার নয়। কিন্তু চোখ থাকলে
'কালো কল্যাণ' শব্দ করা যায়। জল-
পাইগুড়ির কালো কল্যাণ শব্দ করা যায়
মাধ্যমে 'নাই' কিন্তু স্পষ্ট মহলেব।
সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় পত্রিকা এ বিষয়ে
একধিকবার সৃষ্টি আকর্ষণী সংবাদ প্রচারিত
হয়েছে যথারীতি। অথচ অশ্রু দূর্নীতির
কালো হাত প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থাই
করে নি। বর্তমানে এখানে কল্যাণ সজট
শব্দ যে পুষ্করের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মন্ডলে
শব্দ কাঠের বোরাই সৃষ্টি করেছে তাই নয়,
এবার সজট-কল্যাণী সম্প্রদায়ের পোটির

ভাঙে, চাঁদ দিয়েছে। কল্যাণ অর্থাৎ
বোঝানো পর্যন্ত বস্তু অর্থাৎ কাঁচা কল্যাণ
অর্থাৎ বোঝানো দৈনিক উৎপাদন বস্তু।

কল্যাণ 'সজট' কল্যাণ কল্যাণ পাট
হলে বোঝানো তাই বস্তু কল্যাণ-কল্যাণ বস্তু
করে 'হা কল্যাণ হা কল্যাণ' করে তা সহজেই
অনুমেয়। জব্বার আত্মত্বিক অর্থাৎ না
কথা দিলে ব্যবসায়ী তাই বোঝানো। এটি
বস্তু পড়ে না নিশ্চয়।

অথচ নিম্নলিখিত কল্যাণ ভক্তি ওচাগল
শানটি নাকি বস্তু নেই। কল্যাণ আপন
বস্তু বস্তু অর্থাৎ।

তবে সে কল্যাণ বা কল্যাণ? সর্বাধী
গুণে তো বাধ্য পড়ে। কল্যাণ পড়ে
নাকি ব্যবসায়ীর গুণে। বোঝা ন জানি,
সার্থক জনপাইগুড়ির কল্যাণ সংবাদ পঠন
কোথেকে।

পাওয়া যায়, যে-দণ্ডের কল্যাণ নাহিল,
সে-দণ্ডের কল্যাণ কল্যাণ হাউল সেসব
সংবাদ জানেন বৈকি। তবে কল্যাণ নেড়ে-
চেড়ে যদি সংবাদ সূত্রে কিছু কালো হ'লে গিয়ে
থাকে তবে, সব কথা জানানো দুরূহ। কালো
কিভাবে কীস লাগ কিভাবে চেরে সাংবাদিক।

তবু একটা অনুমান দরকার। কল্যাণ
সজট কালো, ওটা আরোপিত কল্যাণ সজট
হলে সে-বস্তু কল্যাণী এবং কল্যাণ।

জগৎপাই :

জগৎপাই জগৎপাই

হিস্তরী হৈ-চোটা বর্ষসংক্রান্ত হাতি-
বাজারে পরিণত হবে। হৈ-চো চাক-চোলের
জন্য তত নয়, বড়ো পাণ্ডা পাঞ্জি লোকের।
তাই বর্ষসংক্রান্ত বর্ষপাশ মানুষের পক্ষে ভাল
ভাল মান-প্রাপ্তিতে পূর্ণাঙ্গিন পেয়ে পূর্ণ-
প্রত্যাপন এক সমস্যা। কোথাও বর্ষ-প্রাপ্ত,
কোথাও ইচ্ছা-মান খুঁজে কেবলমাত্র পূর্ণা
সর্বল হবে কেবল আসতে হয়। তবু পূর্ণা-
পূর্ণাধীর্ষ অসম্ভব নেই। সর্বল পূর্ণা সজট
করতে গিয়ে দলচ্যুত অনেকে অগত্যা
কবেছেন, অনেকে হারিয়ে গেছেন চিরভবে।

অত্যাচারী ভাটা পড়ে নি পূর্ণাধীর্ষ।

ভাবকেবল সেই পবিত্র পূর্ণাধীর্ষ যেখানে
পূর্ণাধীর্ষ সজট শব্দার্থী প্রায় প্রতিযোগিতা
চলে। একদল আসেন ওভারকানা সম্প্রদায়
অপব দল আসেন ওভারকানা সম্প্রদায়
সংগ্রহে। একদল পূর্ণাধীর্ষ, অপব দল ইহ-
কালের কল্যাণ জগৎপাই মান। আব. সেই
জগৎপাই একদল পূর্ণাধীর্ষ সম্প্রদায় অভিবান
সজট করে সজট মনোবাসনা চরিতার্থের
অন্য।

এক সাপ্তাহিক সংবাদে জানা গেল,
দৈব ওষধ দেবকি অর্থাৎ দুর্ভোগ জটিল
যথার্থীকে (তারকেবল) দ্বাংবে শব্দার্থী)
নিভৃতস্থানে আশ্রয় করে অগত্যা প্রায় নিটরে
নেওয়ার প্রবল চেষ্টা কবলে সর্বল বর্ষপাশ
যুগ্মটি চাঁককা কবে লোক জট করে
ডোলে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা যথা এসেছিলেন
তাঁরা তারকেবল এসেচেনই লোক। কিন্তু
এতবড় একটি ঘটনা অবশেষে, নাটকীয়
সমাপ্তির প্রহসনে পরিণত হ'ল। ঘটনা
সম্পর্কে স্থানীয় সংবাদ সাপ্তাহিক 'পূর্ণাধীর্ষ'
বলেছেন :

'ঘটনা, পূর্ণাধীর্ষ: পূর্ণাধীর্ষ: কল্যাণ
কল্যাণ যনে গভীর সন্দেহে উদ্বেগ হয়েছেন।
এসেচেন লোকেরা যেসেটকে এবং একটি
অন্য পাগলকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক
করে রেখে পরদিন পুলিশে দেয়। পাগলের
কাঁচ নয়, নতুন অর্থাৎ লোকের কাঁচ
নয় এটা। বর্ষপাশ ব্যাপার সব কিছু ভাল
করে জানে এবং এখানে বাসের ব্যাপার কথা।
তাঁদের বিশৃঙ্খলিত এমন পাগল শান্তি
হাটা এ নাহিল, কল্যাণ আর্ক হব। তাছাড়া,
পাগলই যদি হয়ে থাকে তো আটকে রাখা
হল কেন? যেসেটকেই বা কেন বর্ষপাশ
থেকে নিয়ে যাওয়া হল? নিরর্থক যদি
যাওয়া হল তো সজট সজট কেন? স্থানীয়
জানাবো হল না? এই সবই সন্দেহকে বাড়িয়ে
দিয়েছে। এ বেন আসল অপরাধীকে আটক
করা এক বড় ব্যয়। ৩০৪০১৫০ টাকা
বেতনে বা ব্যয় ভবন-সংসারী পোষা আছে।
দক্ষিণপাড়ার কাঁচা পাণ্ডা পটুচির বড় বস্তু মরতো,
এ সন্দেহও জেগেছে।'

~~~~~

## সাপ্তাহিক বসুমতী

### আগামী আকর্ষণ

### নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

### সাপ্তাহিক উপন্যাস

### সুভাষ মনোপাধ্যায়ের

### নারদের ডায়েরি

~~~~~

স্থানীয় জনগণের এই সন্দেহ এবং তাঁরা
যাত্রীদের আতঙ্ক নিরসনের জন্য অবিলম্বে
সুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

হিস্তরী বর্ষসংক্রান্ত, জটিল চাউল
মতো শব্দ ও শীতল হবেনা কোনকালেই।
এখানে প্রকাশ্যে স্থানীয় সজট দুর্ভোগ
সহাবাসিন। সুতরাং পুলিশ ও নিরাপত্তা
বাহিনী ব্যবস্থা রাখা দরকার।



বেতার রহস্যের আড়ালে

স্বর্গকার কথা—হিটলাবের ভাগ্য-চক্রে সন্তবত বৃহস্পতি তখন তুঙ্গে। ইউরোপের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত তাঁর দুর্দম প্রতাপে ধরহবি কম্পমান। গোয়েরিং-গোয়েবলসের বোজ্ঞানামচায় রোজ রোজ অগণিত মানুষের প্রাণ হাতকের খাতে জমা পড়ে পাচার হচ্ছে কুখ্যাত মৃত্যুশিবিরে, গ্যাস-পুন্টে নয়তো বিষাক্ত জীবাপুর পখীক্ষা-নিরীক্ষায় গিনিপিগের পরি-বর্তে ঢালাও ব্যবহারের জন্যে। অটোমটিক রাইফেলবাহী এ এস সেনাবাহিনী বিস্তীর্ণ এলাকা ছুড়ে চম্বে বেড়াচ্ছে বিদ্রোহীদের ধোঁজে। দিন নেই, রাত নেই হিটলাবের হেড কোয়ার্টার রাইখস্ট্যাগে সাবা বিশেষ ছড়ানো গোয়েন্দাদের বিপোর্টেব বিশেষণ চলেছে, তাবে-বেতারে নির্দেশ যাচ্ছে আসছে, দুনিয়াব দুরাভাষ ট্যাপ হয়ে চলছে মিত্রশক্তিব গতিবিধি জানাব জন্যে। এই শতকের বিজ্ঞানকে হাতের মুঠোর নিষে নাৎসীদের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলেছে---

এমন দিনে—

রাইখস্ট্যাগের বেতার কেন্দ্রের ধনিতব ভোর চাবটে নাগাদ এক বিচিত্র সঙ্কেতের দুক্লহ ধাঁধাবি চিহ্নিত হয়ে উঠলো। বিপ বিপ বিপ- -বিপ বিপ- -এমনধা বা বত্রিশ সারি পাঁচ শব্দের সঙ্কেত তাকে নাজেহাল করে তুললে। এই জার্মানী বুক থেকে কে সেই অজ্ঞাতপরিচয় প্রেরক আব কাব উদ্দেশ্যে বা সাংকেতিক খবরের যান্ত্রিকতা? আশ্চর্যভাবে সংকেতের পুনরাবৃত্তি চলছে যেন এক উচ্চাঙ্গ গঙ্গীতের নিদিষ্ট স্কেলে?

একজনের ক্ষেত্রে মনিটরের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হোলো ছ'জনে। লবাই সেই চ্যানেলে কান লাগিয়ে বসে আছে। ক্রমশ পবিকাব হয়ে ফুটে উঠলো বিশেষ একটি কণ্ঠস্বর। ক্রমে তার সঙ্গে যোগ দিল দ্বিতীয় আর একটি কণ্ঠস্বর। তারপবে একটি। শেষে আসে একটি। অর্থাৎ যেখান থেকেই বেতার পরিচালনা হোক, বোঝা গেল প্রেরকের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের আবো কয়েকটি কেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রয়েছে এবং নিয়মিতভাবে সূনিয়ন্ত্রিত এক প্রথার সংবাদের নিত্য আদান-প্রদান চলছে।

সর্ব কামুনগো

কিন্তু কোথা থেকে কোথায় এ সংকেত কি তথ্য পাচার কবছে?

চললো তীব্র অনুসন্ধান। চললো মনিটরিং। এ পর্যন্ত বোঝা গেল বেতাবের দিকদর্শন থেকে যে, সংকেতের জটাজাল ছড়িয়ে রয়েছে ব্রাসেলস, প্যারিস, জুবিব এবং আবো নানান দেশে। আব এ জটাজাল বাঁধা হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে এবং সে ঘাঁটি সোভিয়েট রাশিয়ায়। নাৎসী কর্তৃপক্ষ বিচলিত হলেন যখন বুঝলেন যে, বালিনের ট্রান্সমিটারের বেতাববর্তা বিশেষভাবে জোরাল, স্মরণ্য জার্মানীর নাৎসী-অধ্যুষিত অঞ্চলেরই কোথাও একটি গোপন বেতাবকেন্দ্র নিঃসন্দেহে গোয়েন্দাগিরিতে নেমেছে সক্রিয়ভাবে। কিন্তু এন্স এন্স বাহিনীর সমস্ত অনু-সন্ধান ব্যর্থ হোল। জার্মান গোয়েন্দা বাহিনীকে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কে সেই অসাধারণ কর্তৃকর্ম। যে হিটলারের প্রতাপকে কলঙ্কময় কবে তুলছে?

শেষ পর্যন্ত যা হোক একটি সূত্র পাওয়া গেল। একটি ব্যক্তি ব দুটি নাম—কখনও কেন্ট, কখনও কোবো। কিন্তু কোথাও তাব আস্তানা?

ব্রাসেলসের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিটলাবের জার্মানীতে বিবাটি একটা কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন। বিখ্যাত আটলান্টিক প্রাচীর তৈরি কণ্ট্রাক্ট। কোম্পানীর নাম সিমেক্স। গাব ইউরোপ জুড়ে তাব শাখা-প্রশাখা। মার্সেলস, বোম, প্রাগ, ওসলো, স্টকহলম, প্যাবিস সর্বত্রই। কোম্পানীর চেয়ার-ম্যান সিনর ভিনসেন্ট সিবোবা উকণ্ডয়েদ মানুষ। কবিত্বকর্মা, বিচক্ষণ ব্যক্তি। জার্মানীর কর্তৃপক্ষ তখনকাব দিনে তাঁদের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে আবস্থ লোকেরচবিত্র এবং আনুগত্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হলে কখনও কাজে পাতা দিতেন না। স্মরণ্য সিবোবা সেদিন থেকে নিঃসন্দেহে ছিলেন রাইখস্ট্যাগের বিশ্বাসী লোক আব সেই সূত্রে সিমেক্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্ভর-যোগ্য। চেয়ারম্যানকে কাজে অগববত দেশ থেকে দেশান্তরে যাবে বেড়াতে হোত। আজ প্যাবিস, কাল বালিন, পরও ব্রাসেলস।

এই ব্রাসেলসেই এক দিন চেয়ারম্যান সিনর সিয়েবাকে দেখা গেল মলেনবিক্ অঞ্চলের একটি দোতলা প্রাসাদে টুক্ কবে চুকেই ভেতবে মিলিয়ে যেতে। দোতলাব একটি ঘবে ফ্ল্যাটের অধিকারিণী রিটা আর্নল্ড তখন বেডিও ট্রান্সমিটারের পাশে বসে কোনো সাঙ্কেতিক লিপি লিখে নিতে ব্যস্ত। সেই বালিনের দুরীধ্য সাংকেতিক লিপি। পাঁচ পাঁচ অক্ষর জোড়া শব্দ-লিপি, অন্যদিকে আবো দুটি লোক প্রাপ্ত সাংকেতিক লিপি বিশেষণে গমান

ব্যস্ত! এঁর একজন আস্তন দানিভত আর অন্যটা মাঠকেন মাকারভ। দুজনেই ক্ষণ গোয়েন্দা, একজন সেকণ্ড লেকটেন্যান্ট আর অন্যজন ফুটবল লেকটেন্যান্ট, সিনর সিয়েরাকে প্রত্য্য-ভিবাদন করে দুজনেই বলে উঠলেন— 'চীফ, প্রচুর চিঠিপত্র এসে এসে গেছে আপনাব। এট দিন—' মাকারভ একটি মোটা খান এট বলে এগিয়ে দিলে তাঁর দিকে। বলা বাহুল্য সিনর গিবরা আর অজ্ঞাতনামা কেণ্ট হচ্ছেন অভিন্ন এবং একই ব্যক্তি। সেট সিমেক্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান।

সাংকেতিক লিপিতে একটিতে দেখা গেল লেখা আছে—'কেব্র থেকে কেব্রের কাছে: রাসায়নিক যুদ্ধ উপ-করণের উৎপাদন ক্ষমতা ছেনে খবর পাঠান। কারখানাগুলিতে স্বয়ংস্বক কাজের ব্যবস্থা করুন। অন্য একটিতে ছিল—'ফ্রান্সে ফ্রেন্সেল ভন্ রান্ সেটের গতিবিধি জানান।'

এব জবাবে মাকারভ জানানো বেতাবে জানানো হয়েছে যে, বর্তমান বোমাবর্ষী বিমানের উৎপাদন চলছে দিনে ৯ থেকে ১০ খানার হারে।-- ক্রীটে অবস্থানরত সৈন্য দলকে ইস্টার্ন ফ্রন্টে পাঠানো হয়েছে-- নতুন মিশারিট বিমানে দুটো করে কামান আব দুটো করে মেশিনগান থাকছে। মেশিনগান পিছনের দিকে আর কামান ককপিঠের পাশে-- কোরো-- ইত্যাদি।

এমন ধারা হাজারো প্রিপোর্ট নাৎসী অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেতার যোগে জমাগত পৌঁছেছে মস্কোতে, অর্থাৎ অসহায়েব মতো বালিন আশ্রাণ চেষ্টায়ও কিছুতেই সফল হচ্ছে না প্রেরণের আত্মনা খুঁজে বার করতে। 'কোবো'--রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে ইনটেলিজেন্স দপ্তরের নিত্যানতুন ফাঁদের বিস্তার চললো। মনিটরিং ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। রাইক্সটাগ যে তিসিরে সে তিসিরে। গোয়েন্দাবাহিনী নজরহাল। শেষ পর্যন্ত ধুরধুর ট্যানারিং সাহেবকে

ভলব করা হোল। হিমলার ফ্যাবরের কাছে ধমক ধেমো নিত্যানতুন পথের কথা ভাবতে লাগলেন। এ রহস্য ফাঁস না করলেই নয়। কিন্তু কে করবে? কিভাবে?

১২ই নভেম্বর ১৯৪১-এর সন্ধ্যা-রাত্রিতে বেতার সংকেতের চ্যানেল কোন একটি সাংকেতিক সংবাদ দিতে দিতে মাঝপথে থেমে গেল। আশ্চর্য-ভাবে ঘেনস্তত্ব হয়ে গেল ট্রান্সমিটারের ফ্রিক্বেন্সি। নাৎসী কেন্দ্রীয় রেডিও টাওয়ার আবার বোকা বনে গেল। তারা 'জু'চের পর জু'চ টিপে, নানা-ভাবে ডায়াল ঘুরিয়েও ব্যর্থ হলো 'কোরো'র সংকেত অনুসরণে। কোরো চুপচাপ। হয় কোনো যান্ত্রিক গোল-যোগ হয়েছে, নয় কোরো আভাষ পেয়েছে যে, তার পেছনে কেউ নেগেছে? কারণ, নাৎসী গোয়েন্দাবাহিনী এ ক'দিন ধরে বেতার-প্রকল্পের গতি অনুসরণ করে দুবছের পরিধি কসিয়ে এনেছে, দুদিন দুরাতি অধীব হয়ে মনিটরিং বসে রইলো রেডিও নিয়ে কিন্তু 'কোরো'র কোনো সাড়া নেই। রাইলখানেকের পরিধি জুড়ে সাদা পোশাকে এন্স এন্স আর গোয়েন্দা-বাহিনী ছেনে বেখেছে অঞ্চলটা। আর একবার টু শব্দ বেরুলে 'কোরো'র আধোগোপনের পালা শেষ করে দিতে পারবে তারা। কিন্তু 'কোরো'র বুদ্ধি তাদের টেকা দিয়ে যাচ্ছে।

বালিনের সেট বিশেষ অঞ্চল মজুরের বিশেষ পোশাকে কয়েকজন ওয়ারম্যান হাতে যন্ত্রপাতি কাঁধে বৈদ্যুতিক তারের নোড়ক নিয়ে বাড়ি বাড়ি এসে বেড়াতে শুরু করলো-- ভাবটা যেন বেতারের বিকল কোনো স্বরেণ্টে বুঁজে বার করা। আসলে এরা সবাই গুপ্তচর এবং বক্ষীবাহিনীর লোক। 'কোরো'র মাটি--রহস্য উদ্ঘাটনে পথে নেমেছে। বালিনের কেন্দ্র থেকে 'কোবো'র কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেলেও বেলজিয়াম, হল্যান্ড আর ফ্রান্সের ব্যস্ততা কিন্তু বেতারে ইতিমধ্যে চতুর্ভুজ বেড়ে গেছে। নিবস্তব মস্কো-মুখি সাংকেতিকবর্তা অবাধে চালান

হয়ে চলেছে। নাৎসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির সাময়িক তথ্য নিয়ে চলতে থাকলো অনুসন্ধান।

ওদিকে মস্কো থেকে নির্দেশ এসেছে কোরোব কাছে। কেণ্টের সঙ্গে দেখা হবে নতুন কাজের প্রোগ্রাম করতে হবে রাইক্সটাগের নতুন পরি-কল্পনার ব্যুত ভেদের জন্যে। জানতে হবে প্যাবাস্ট বাহিনীর বিশদ বৃত্তান্ত বালিনের উইলহেলমসন স্ট্রীটের ১৮ নং বাড়িতে কুনকফ্ দম্পতি অপেক্ষা করলেন এক আগন্তুক অতিথির অভ্যর্থনার জন্যে। রহস্যের নামক কেণ্ট আসাব কথা মস্কোব নির্দেশ অনুযায়ী। কেণ্ট নিজের আত্মপরিচয় ব্যক্ত করতে সংকেত জানিয়ে বলবে--'উলেনস্কাই-গেল।' কথাটা আসলে এডাম কুনকফের লেখা সদ্যপ্রকাশিত এক উপন্যাসের নাম। ভঙ্গলোক আবার চিত্রপরিচালক। তাঁর গাঙ্গুতিক একটি ছবি গোয়েবল্-এর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছে। পেয়েছে প্রশংসার মেডেল। তাঁর সহ-ধর্মিণী মার্গারেট কুনকফ্ স্বনামধন্য মহিলা। তিনি মেইন ক্যাম্প আর গোয়েবল্গের বক্তৃতার অনেকগুলি অনুবাদ করেছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নাৎসী কর্তৃপক্ষের বিশৃঙ্খলভাজন।

রাত দশটার কেণ্ট এলেন। তারা ইউরোপ জুড়ে নাৎসী বিরোধী গোয়েন্দা বেতারসংকেতের যিনি মধ্যমণি। নিত্যানতুন সাংকেতিক পদ্ধতি, নিত্যানতুন রেডিও-সেট বিচিত্র ট্রান্সমিটার--এসব কেণ্টের অবদান। কেণ্ট সুদক্ষ যন্ত্রবিদ আর কোনো সাংবাদিক এট মর্মে গোপন গোয়েন্দা ব্যবস্থার মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহে এবং বিতরণে ভঙ্গলোক অধিতায়। কেণ্টের গুপ্তচর সাবা ইউরোপে ছড়িয়ে রয়েছে। এবং ছড়িয়ে রয়েছে ছদ্মনামে এবং ছদ্মবেশে নাৎসী এবং অধিকৃত অঞ্চলগুলির সরকারের বিশৃঙ্খলভাজন হয়ে, গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে। কেউ বিজ্ঞানী, কেউ অধ্যাপক, কেউ

স্ত্রিনীয়ার, কেউ মানিটর বেতারের, কেউ বা কেউবিটু নাৎসী সমরনায়কদের একান্ত অনুগত লোকের বা আদালী হয়ে। তাঁর কোম্পানী সিনেমাকোর আর শুধু নাৎসী কণ্ঠটি থেকেই বছরে কয়েক কোটি টাকা। অন্যদিকে সিনর ডিনসেন্ট সিয়েরা নাৎসী উচ্চহলের প্রিয় পাণ্ড এবং এক গুণেরই স্রষ্টা। ডেপ্টের ছদ্মনামে তিনি মস্তুর করিংকরা গোয়েন্দা।

যথাসময়ে কেণ্ট এবং কোরোব লাক্ষ্য হোলো। মন্থনা হোলো। মস্তোতে সাংকেতিক লিপি বেতাবে পাঠানো হোল এই মর্মে:

(ক) ট্রান্সমিটার ডেলিভারী সফল হয়েছে;

(খ) প্রাণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। চেক গুপ্ত-গেরিলাদের জন্য নতুন সাংকেতিক চ্যানেল ঠিক হয়ে গেছে;

(গ) আরো ট্রান্সমিটার প্রয়োজন কারণ প্রচুর ধ্বংস এসে জুপাকাব হয়ে উঠেছে;

(ঘ) কোরো নাৎসী প্রতিরক্ষার বেতাবেক্রে একজন বিশু-গুপ্তচরকে কাজে নিয়োগ করেছে। কোরো-কেণ্টের কাজ অবচ্ছিন্নভাবেই এগিয়ে চলেছে। প্রথম জার্মান বেতারক্রে সন্দেহে ছায়াপাতের দীর্ঘ ছায়া পরেও নাৎসী সামরিক কর্তৃপক্ষের চুল ছেঁড়ার অবস্থা। মৃধিবীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যর্থতা তাঁদের পক্ষে হজম করা কষ্টসাধ্য। ক্যানাবিলকে এই রহস্য উদ্ঘাটনের ভার দিয়েও কোনো সুরাহা তখনও হয় নি। যদিও প্রচুর নানা আভাস কর্তৃপক্ষের কানে এসেছিল কোবোর বেতারক্রেতার অবস্থান সম্পর্কে, তবুও কোনো হেঁচ তা নিয়ে করা হয় নি। কারণ কোথাও ভুলচুক থাকলে সাবধান হয়ে পাখী যাবে উড়ে।

কিন্তু অন্যদিক থেকে প্রচুর চতুর্কতা সত্ত্বেও কোবোর বেতার-রহস্য শেষ পর্যন্ত গোপন রইলো না। শুধু ধরে প্রথম ঘাঁটি ধরা পড়লো

বেলজিয়ারের ব্রাসেলসে। ডিসেম্বর ২০ তারিখের মধ্যরাতে স্তিমিত আলো আলিয়ে দুখানি বিরাট গাড়ি মলেনবিকের সেই ফ্লাটবাড়ির সদরে এসে থামলো। বিশেষদে রিতলবার হাতে পুলিশবাহিনী বাড়িটিকে ঘিরে ফেললো। বাড়িউলি সদর খুলে চোখে যেন সর্ধেকুল দেবতে সুরু করলো। রিতলবার নির্দিষ্ট কক্ষে আচমকা পুলিশের আক্রমণে দু'টি কার্যরত লোকের মৃত্যু হোলো আর দু'জন ধরা পড়লো ট্রান্সমিটার সেট শুদ্ধ। যে দু'জন ধরা পড়লো তাবা আর কেউ নয়—রুশ ফ্লাট লেকটেনাণ্ট মাইকেল ম্যাকারভ আব সেকেন্ড লেকটেনাণ্ট দানিলভ। অদৃশ্য গুপ্ত-বেতাব চক্রান্তের প্রথম ঘাঁটি ধরা পড়লো ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই ঘাঁটি থেকে সাংকেতিক যেসমস্ত লিপি নাৎসী বাহিনীর হস্তগত হল, তাতে সন্দেহ রইল না বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরদের মাধ্যমে জার্মান সামরিক শক্তির গোপনতম তথ্যাবলী নস্কোতে পাচাব হয়ে চলেছে নিয়মিতভাবে, দু'জন বন্দীকে পাঠানো হোলো রেডিও প্রতিরক্ষাদপ্তরে। সেখানে চরম অত্যাচারের সমুখীন হয়ে ম্যাকারভ-দানিলভ শেষ পর্যন্ত মুখ খুললো। তাদের উচ্চাবিত সূত্রে ধরে সুরু হোলো এক নতুন অভিযান নাৎসী গোয়েন্দা-বাহিনীর।

কেণ্ট এবং কোরো এই সম্ভাবনাটা যে আঁচ করেন নি তা নয়। মুহূর্তের মধ্যে বেতাব সংযোগের ব্যবস্থা থেকে ব্রাসেলসের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিলেন তাঁরা। আমস্টার্ডাম, প্যারিস, মার্সেলস এবং জেনেভার বেঙ্গলি অভিযাত্রার এ ব্যাপাবে সচল হয়ে উঠলো। রুশ আক্রমণের পেছনে নাৎসীবাহিনীর বিজুতভাবে প্রস্তুতির বর্ণনা বিচিত্রভাবে মস্তো পৌঁছুতে লাগলো। সংবাদ গেল নতুন নতুন মারপাঙ্গের, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির, সৈন্য চলাচলের, সমবোপকরণের এবং

সৈন্য গিরোণের পরিকল্পনা পক্ষ। হয়তো ব্রাসেলসের পক্ষে অন্য বেতারপ্রচারের গুপ্ত ঘাঁটি আবিষ্কার, জার্মান কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হত না কিন্তু ভাগাচক্রে তাদের এ ব্যাপারে অপ্রত্যাশিতভাবে সহায়ক হয়ে উঠলো জনৈক তরুণ ডকলোক। নাম হুগ্ট হাইলম্যান। করেন এ্যাকুয়ারি ইনস্টিটিউটে বেতার-সংকেতলিপি বিশ্লেষণের কাজে নিযুক্ত ছিল সে। আলটেনবার্জার স্ট্রীটের এক তরুণদের আড্ডায় তার ছিল নিয়মিত যাতায়াত। নিজের অজান্তেই হাইলম্যান বুঝতো সে এমন একটি দলেব মধ্যে এসে পড়েছে যারা মোটেই নাৎসী আদর্শের অনুরাগী নয়। তারা বন্ধুত্বের স্বযোগ নিয়ে গোপন তথ্য জেনে নেবার নিদন্তর প্ররাসী, হাইলম্যান এক অভুত রোমাঞ্চের স্বাদ পেলো তার নতুন ডনিকায়।

ইতিমধ্যে একটি দিনেমার বেতার-প্রেরক ঘাঁটি ধরা পড়লো। অন্যদিকে প্যারিসে মঁসিয়ে এবং নাদাম সোকল ধরা পড়লেন হাতেনাতে সাংকেতিক লিপির প্রমাণসহ। গোয়েন্দাদপ্তরের অনেক কথা বেকাঁস হয়ে গেল মৃত অপরাধীদের মুখ থেকে। লাবা উইমোপ ছুড়ে সম্পূর্ণ কোরো-কেণ্টের দলটিকে ধোঁও করার পরিকল্পনা হোল। হাইলম্যান সংবাদ জানতে পেবে তাব বন্ধুদের লাভবান করতে সচেষ্ট হল, হ্যারো-স্বলজ বরমেন নামে জনৈক ডকলোককে সে টেলিফোনে ডাকলো কিন্তু তাকে না পাড়বার অনুবোধ কলো যেন হ্যাবো কিরে এসেই হাইলম্যানকে টেলিকোনে যোগাযোগ করে। হাইলম্যানের সঙ্গে আব একজন তরুণ কর্পোরেল কাজ করতো। তাব কাজ ছিল মনিটরিং-এ গুপ্ত বেতাব-সাংকেতিক-লিপি ধবে বেঙ্গলি বিশ্লেষণ করা। হাইলম্যানের ডেস্কে যখন টেলিফোন বাজে, কর্পোরেল সেটা ধনে। কারণ কি কাজে মিনিট কয়েকের জন্যে গিষোলি বাইনে। টেলিফোন বাবে দিতেই অন্যদিক থেকে ভবাব এলো—‘আমি হ্যারো বচ্ছি।’ কিন্তু কয়েকদিন ধরে অজ্ঞাতপরিচয় কোবোর নাম অনবরত ধাঁড়িয়ে হওয়াব সে শুনলো—‘আনি বোবো বচ্ছি।’ শুনেই বিদ্যুৎপুষ্টের মতো চমকে উঠলো কর্পোরেল। বোমাকে শিউরে উঠে

কম্পিত স্বরে জবাব দিল—‘কে কোরো?’

গুরুগভীর স্বরে বিবস্ত্রিত আভাষ এলো টেলিফোনে—‘কি বললে? কোরো?’ আমাকে শুধু কোরো ডাকার অনুমতি কে দিল তোমার?’

কর্পোরেলের হাতে রিসিভারটা যেন কাঁপতে লাগলো। কোনোরকমে বললো—‘কোরো, হ্যাঁ কোরো, হের কোরো—’ মগিরে কোরো—

কিন্তু অন্যদিকের কণ্ঠস্বর তখন নীরব হয়ে গেছে। উত্তেজনার কর্পোরেল কি করবে ভেবে পেল না। কোবোর সঙ্গে টেলিফোনে লে কথা বলেছে। কি আশ্চর্য। যে কোরো সারা জার্মানীতে একটি রহস্যে আবৃত, যে কোবোর পেছনে নাৎসী গোয়েন্দাবাহিনী নায়েহাল, রেডিও সিস্টেমের সনিটবেরা হত্যাক, সামরিকদপ্তরের বর্তাব্যক্তিরা অসহায়—

সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো তার মেজবের কাছে। বললে—‘বিশ্বাস বন্ধন নেজর ঘটনাচক্রে এইমাত্র কোরো সঙ্গে টেলিফোনে কথা হোবেছে।’ সময় নষ্ট করবার অবকাশ নেই। মুহূর্তের মধ্যে টেলিফোনের সূত্র ধরে অনুসন্ধান শুরু হলো। যে কোরো সারা ইউরোপ জুড়ে বেতার-সংকেতের বন্যা বইয়ে চলেছে সেট কোবোর সূত্র পাওয়া গেছে। সেট সূত্র ধরে খুঁজতে খুঁজতে ১৯৪২ সালের ৩১শে আগস্ট বক্ষীবাহিনীর লোক গিয়ে তলব দিল হারো সুলজ-বয়সেনকে। হারো সামরিক বিমান-দপ্তরের ফার্স্ট লেকটোনেন্ট এবং নাৎসী ট্রুমহলের বিশৃঙ্খলিত লোক। অপ্রস্তুত সুলজ-বয়সেন যখন অপেক্ষমাণ সাদা পোশাকে বক্ষীবাহিনীর সম্মুখীন হলেন, তখনও একবার ভাবেন নি—এই তাঁর শেষ স্বাধীন মুহূর্ত।

হিটলারের কাছে রিপোর্ট জানানো হোল, বেতার গোয়েন্দাগিরির কাছে শত্রুপক্ষের হয়ে যারা কাজ করছে তাদের অধিকাংশই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোক। সৈন্যবিভাগে সশস্ত্রের অতীত এমন সব ব্যক্তি, নামকরা অধ্যাপক, শিল্পী, লেখক, সাংবাদিক, উচ্চপদস্থ নাৎসী সরকারী কর্মচারী, ঔজ্জ্বল্যের, ব্যবসায়ী এবং উচ্চমর্যাদিত

প্রতিষ্ঠিত সব লোক ধরা পড়ছে। ক্রমশ গুপ্তচরদের ধরার জন্যে জার্মান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স মন্ত্রকোরে কোরো-কেণ্টের ব্যবহৃত চ্যান্যালে তুল সংবাদ পাঠাতে শুরু করলে কিছুটা ফল পাওয়া গেল। নাৎসী অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে এই সংবাদের ভিত্তিতে ক্রমশ গুপ্তচর প্যারামুটে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়তে লাগলো। কিন্তু বেতারগুপ্তচরবৃত্তিকে সম্পূর্ণ নীরব করতে শুধু সমর্থ হোল না জার্মান কর্তৃপক্ষ। স্বাধীনতা সংবাদ-সংকেতে অব্যাহতভাবে মন্ত্রকোর দিকে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ গোপন গুরুত্বপূর্ণ খবর পাচার হয়েই চললো। ৮৪ জন মিত্রপক্ষের গোয়েন্দা ধরা পড়া সম্ভবও।

এই চুবাশিনকে পর পর ডেকে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরের কোনো এককালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোল। আভিড হানীক, হস্ট হাইল্যান, হ্যান্স কপি, হোহান গ্রাদনক, কার্ট জুমাচার, এলসা স্টুবে—পর পর কোনো পুর্দার পেছনে সারি দিয়ে একের পর এক মৃত্যুকে স্বগণ করলো নীরবে, নির্ভরে। ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারীতে এভাবে হত্যা করা হোল আরো ষাটজনকে। কিন্তু বিচিত্র সাংকেতিক-গোয়েন্দাগিরির তাতেও অবসান হোল না। চলতে থাকলো গোয়েন্দার লক্ষ্যে গোয়েন্দাগিরি। সশস্ত্রবল ধরপাকড় চলতে থাকলো। হিটলারের কাছে দৈনিক রিপোর্ট সুপাকার হয়ে জ্ঞানে উঠলো কিন্তু মন্ত্রকোর বেতার-সংকেত শুদ্ধ হোল না।

উজ্জনখানিক বেতার প্রেরক বন্ধ ধরা পড়ছে। লোকজন ধরা পড়ছে। তবু হামেশা মনিটর চ্যান্যালে শুনছে—‘কেণ্ট টু লেন্ডাল’—‘কেণ্ট টু লেন্ডাল’ জুইয়ারল্যাণ্ডের দুর্গম বরফঢাকা পার্বত্য অঞ্চলে গন্তব্যত খুব জোরালো এক ট্রান্সমিটার কেণ্টের লহার হয়েছে। কোরো পর্ব যদি বা শেষ হয়েছে, কেণ্ট পর্বের কোনো সঠিক হদিস পাওয়া যায় নি। একটি সূত্র ধরে কেণ্টের খবর যতটুকু বা এলো তা অনবিকৃত জালস থেকে, যেখানে নাৎসী গোয়েন্দাদের যাঁটি দুর্বল। কিন্তু কেণ্ট অনেক বেশি শুরুর। জার্মান আমিস্টিস কনিশনের প্রাইভেট

কাম্পার্টমেন্ট বসে কেণ্ট নিজের কাছে যখন মশগুল তখন জার্মান গোয়েন্দাবা আশেপাশেই হনো হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কেণ্ট ধরা পড়লেন সেখানেই। স্পেশাল পুনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোল বালিনে। বিচার চললো। দুশটায় এক টিন সিগারেট স্বচ্ছন্দে উড়িয়ে ফেললেন কেণ্ট। সব শেষে বীর স্মির গলায় বললেন—‘আমি, রাশিয়ান অফিসার। জার্মানীর বিরুদ্ধে আমার গুপ্তচরবৃত্তির কাজ জানে কেবল আমার মাতৃভূমির স্বার্থে, আমি শুধু আজীবনের মতো কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে চলেছি। আমাকে গুলী করে মারলে আমার সামান্য আপশোষেও কাবণ থাকবে না।’ কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের ইঙ্গিত রেখে দিলেন সামরিক বিচারালয়।

ইতিমধ্যে অতীত হয়ে গেল পাঁচটি বঙ্গবাদ্যক সপ্তাহ। অটল রইলেন বটে কেণ্ট। কিন্তু তাঁর বৈধ এবং সহ্যের বাঁধ চুরমার হয়ে গেল তাঁর প্রেমিকা মার্গারেট বার্তাকে তাঁর সামনে নিয়ে না এসে পাশের ঘরে নিরন্তর প্রণয়ণ, অত্যাচার, ভয় প্রদর্শনের সম্মুখীন করতে। শেষ পর্যন্ত বার্তাকে তাঁর ঘরে আনা হোল, প্রেমিকাকে বন্ধনগু করে কুপিয়ে কেঁদে উঠলেন কেণ্ট। চীৎকার করে বললেন—‘বার্তাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের সব বলবো।’ কি জানো তোমরা স্বাধীন-সনের কথা, কি জানো জিম, রডো, জুসি অথবা সিসিব কথা? সব বলবো যদি বার্তাকে মুক্তি দাও। নতজানু হয়ে ভিক্ষে করলেন কেণ্ট। গোয়েন্দার আব হিমলার কেণ্টের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এতোদিনের সযত্নে, সন্দোপনে গড়ে ওঠা বেতার-সংকেতের ইউরোপ-জোড়া জটিল নাৎসী সেনাবাহিনীর হাতে কিতাও নে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল? কেণ্ট আর বার্তা প্রাণতিকা পেলেন বটে করেফট গুপ্ত বেতারকেন্দ্রের লক্ষ্যে বাতলে দিয়ে, কিন্তু পাঁচ সারির সাংকেতিক শব্দবহ বিচিত্র জুরনিপি নিশ্চয় হোল না, কেণ্ট ধরা পড়লেন, কোরো, মৃত্যুবরণ কবলেন, কিন্তু নিশ্চয় নায়কদের স্থান পূরণে নতুন কোরো, কেণ্ট-কোরো অব্যাহত চালিয়ে গেবে নাৎসী-বিরোধী মৃত্যুপণ আন্দোলনের অনিবার্ণ ধারা।

হাথাজুনি

প্রজ্ঞা দেবদাস



ব্যাপাবে ক্ষেপুমানাব পাণ্ডুয়াজি
সুৰ্য্যোদয়ের মত। কেউ আগবাব
আগেই ক্ষেপুমানা এসে অনিবে
বসে টিষ্ টিষ্ করেন, তারপর গাড়ি-
জুড়ি আব পোষাকের ভিত্তি লাগবাব
আগেই হারিয়ে বান। মাকেও কতদিন
বলেছি, ক্ষেপুমানাটা কি বল দিকি,
সবখানে ঠিক নেমস্তায় যাবেন, কেউ
অভ্যর্থনা করুক নাহি করুক। আর
এমনভাবে যাবেন বলবার নয়, দেখে
লজ্জা করে।

নিজের মায়া নয়, তাই যা হয়তো
বেশি কিছু বলতেন না। কেবল বলতেন,
তাতে তোর লজ্জা কি। নেমস্তায় ক'রে
বলেই তো যায়।

ওঁর চেয়ে অনেকে বাবা বিহীন
নিঃসঙ্গ সর্ব্বখানে যায়, খুবই সপ্রতিভ।
অমন চোবের মত তাদেব মনে হয় না।
ভাব হ'তো কোনদিন না কেউ পাও
থেকে ক্ষেপুমানাকে হাত ধরে তুলে
দেয়। আবার জ্ঞানে কখনো ক্ষেপু-
মানাকে কোন নেমস্তায় বাড়িতে
অভ্যর্থিত হতে দেখি নি। কর্মবাজির
কর্তাব্যজির বা ছেলে-ছোকরা কেউ
বলে নি, আসুন আসুন। বসুন
নেমস্তায় বাড়ির মুখপাত্র হিসাবে পান-
সিগারেট কি চা কেউ সহাস্যে কি
গঞ্ছাব তাঁব সামনে বাড়িয়ে ধরে নি।
কতদিন লক্ষ্য করেছি উনিই বয়ঃ
কুণ্ঠিত হাতটা বাড়িয়ে ধরে থপ করে
একটা চায়েব পেয়ালা তুলে নিয়ে
মাথা নিচু করে' নিজেবে আডাল ক'রে
চায় চুমুক দিচ্ছেন পাঁঠাব মাংসে
দোকানের সামনে হঠাৎ ফালতু এব
টুকরো হাড় ছুঁড়ে দিলে কেওয়ারি-
কুকুরটা যেমন আড়ালে গিয়ে হাড়টা
নিয়ে করে তেশনি আর কি।

[আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ

এ' সেদিনও দেখেছি কোন
নেমস্তায় বাড়িতে কি আত্মীয়-স্বজনেন
কাজে-কর্মে ক্ষেপুমানা ঠিক চোবের
মত এসে আসবে বসতেন, তারপর
চুপি চুপি খেয়ে-দেয়ে কখন যে চলে
যেতেন কেউ টেবই পেত না। কাজেব
বাড়িতে নিমন্ত্রিত ক্ষেপুমানাব আসা-
যাওয়া নিবে অবশ্য কাবো কোন
মাথাব্যথা ছিল না। তবু ক্ষেপুমানা
দুব নেমস্তায় বাড়িতেই আসতেন, নেমস্তায়
সন্ধ্যা ক'বে সবাব অলক্ষ্যে চলে যেতেন।
অনেক সময় আমাব কেমন-কেমন মনে
হত; নেমস্তায় বাড়িতে হঠাৎ দেখি
একটা চেযাবে দলছাড়া হ'য়ে ক্ষেপু-
মানা মুখ বুজিয়ে তীর্থেব কাকের
মত বসে আছেন,—গায়ে আধ ময়লা
পাঞ্জাবী, পরনে সদ্য কাচা মিলেব
ধুতি, পায়ে বোধ হয় স্যাণ্ডেল-চাটী বহু
পুর্ব্বনো। আশেপাশে নিমন্ত্রিতদেব
কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমনি
একটা ভাবহত কি লোভী ব্যক্তি যেন।
দেখে খুব কষ্ট হ'তো, খুব রাগও

হ'তো—কি দবকার এমনিভাবে নেমস্তায়
রক্ষা করতে আসাব, কেউ যখন
আপ্যায়ন কবে না কি ঋতিব কবে
না তখন আসা কেন? লজ্জা কবে না?
আমাব কিন্তু অনেকদিন লজ্জা কবেছে
ক্ষেপুমানাকে চোবের মত নেমস্তায়
বাড়ির আসবে বসে থাকতে দেখে।
লজ্জা চাকতে কতদিন দুব থেকে
দেখেই 'জুই কবে' মরে গেছি; কত-
দিন আমাব বিবেকের কামড়ে কাছে
এগিয়ে এসে তাঁব পাশে বসে সবাইকে
দেখিয়ে দেখিয়ে আত্মীয়তা কবেছি,
যেন বলতে চেযেছি লোকটি অলীক
নয়, সাজপোষাক হাবভাব যাই হোক।
আত্মীয়তা সূত্র নেহাৎ ফীণ নয়।
একা একা তবু যা হোক ক্ষেপুমানা
অপেক্ষা কব'তে পাবতেন, কিন্তু আসাদের
মত কেউ যেচে পড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা
কবলে কি আলাপ ক'রলে, বড় অপ্রস্তুত
হ'য়ে পড়তেন। ভাবি লজ্জা পেতেন।
তখন আমাব কতদিন নিজেদের
মধ্যে আলোচনা ক'রেছি, নেমস্তায়

না থাকলে ক্ষেপুসীমা সম্পর্কে এত কথা বলতুম না—নেমন্তর বাড়িতে বা সামাজিক ক্রিয়া-কর্মে তাঁকে উপস্থিত দেখে 'কুহু' বা ব্যথিত হতুম না। তখন ক্ষেপুসীমা বলে 'কেউ আমাব চোখের সামনে কক্ষণার পায়ে হ'য়ে উন্নয় হতোও না। অমন কত তো আছেন জগৎ-সংসারে তাঁদের কে দেখছে, খেয়াল করছে, কি তাঁদের দিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? আর সব ক্রিয়া-কর্ম সামাজিক ব্যাপারেই তো দেখি, মুষ্টিবের কয়েকজনেরই খাতির কেবল, বাকি সব ইতর জন।]

সংসারে প্রবেশ করে 'দারিদ্র্য' বাড়ি নিয়ে পাঁচজনের সংস্পর্শে এসে পাঁচটা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বুঝেছি, নিজেই না দেখিয়ে দিলে কেউই দেখে না, ভালমানুষ কি লাধুর মত নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে চোরের মতই মনে হয়। ক্ষেপুসীমার দোষ কিছু নেই। সাধারণ সংসারীদের ও ছাড়া উপায় নেই।

অনেকদিন অনেকখানে গিয়ে একলা একলা অপেক্ষা করতে করতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, দূর-র আর কখনো কেবল সামাজিকতার খাতিরে কোথাও যাব না।

মাকেও বলেছি, তুমি আমাকে নেমন্তর রক্ষা করতে বলো না। আমার ভাল লাগে না এ সব।

মা অবাক হয়ে বলেছিলেন, ভাল লাগার কি আছে?—যদি বাবি, একটা কিছু দিবি, চলে আদিবি। লংগার করচিস লোক-লৌকিকতা করবি না?

দিনে দিনে বুঝেছি এ নামেই মত গোলমাল। আবার নেমন্তর চিঠিতে 'কুপারই উল্লেখ থাকে বেশি-ক'রে।

সামাজিকতা রক্ষা করার ব্যাপারে ধীরে ধীরে একটা যুক্তি ছিল, তিনি বলতেন, এমনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে রোজ দেখা হয় না, ন'মাসে হ'মাসে হঠাৎ কোন কাজে-কর্মে দেখা হয় মন্দ কি।

কিন্তু সে দেখা-শাফাতের চেহারাটা

আজকাল যে কি হয়েছে মা তো জানেন না। তিনি কোথাও যান না বাবা মারা যাবার পর। দেখেন নি তো আজকালকার সামাজিকতার হাঁচি। নেমন্তর বাড়ি না সমাবর্তন উৎসব; হাতে হাতে উপহারের প্যাকেট নিয়ে বদতে গেলে ছড়োছড়ি। এক এক জায়গায় লাইন পড়তে দেখেছি।

যতদূর মনে আছে আমাদের কালে (মানে আমরা যখন ছোট ছিলাম) এমনটা ছিল না। কেউ উপহার দিলে কি না দিলে তা নিয়ে খাতাকলম নিয়ে কোন নেমন্তর বাড়িতে কেউ হিসেব করতে বসতো না। কেমন যেন একটা নির্লজ্জতা প্রকাশ পায় চোখের ওপর দাঁড়িয়ে এই হিসেব দেওয়াটা—আপনার নাম? ঠিকানা?—

পাত-পাড়ার ডাক পড়তেই লাইন দিয়ে ভিড়ের মধ্যে পা ফেলেছি। পিছনে রেকর্ডের সামান্য মাইক্রোফোনে চতুর্ভুজ হ'য়ে বিয়ে বাড়িটার কানে যেন তালার ধরিয়ে দিয়েছে। যাদের কান আছে তারা বুঝতে পারছে। রং-এ রং-এ কেমন একটা কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব হয়ে আছে বিয়ে বাড়িটা।

পংজিতে খেতে বসে উপহারের বোড়কটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। উপহারটা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে পংজিতে এগে বসলেই হতো। এখন এটাকে সামলাই কি করে—পাশে রাখা যায় না, কেন না যে চেয়ারটাতে বসেছি নিজেকেই তাতে আঁটতে পারছি না। উপহারটা চেপে বসা যায় না, তা হলে এমন পাট-পুট করে বাঁধা মোড়কটা চিলে হয়ে যায়। আবার এই সামান্য জিনিসটা লবার দর্শনীয় করে' পংজি-ভোজন শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ করি। মুস্কিল এমনি হ'বে আগে ভাবতে পারি নি। বীণা তখন ঠিকই বলেছিল ও সব জায়গায় কিছু দেবার দরকার নেই, কত বড় বড় লোক আসবে, তোমাদের কেউ পাত্তাই

দেবে না, লক্ষ্যই করবে না। খেতে চলে এসো চুপ করে।

বীণার কথাটা খুব ভাল মনে গ্রহণ করি নি। বড় বেন তাচ্ছিল্যের ভাব গরীব-গেরস্ত ভক্তলোক বলে। গতিই হ'লেও বীণার কথাটা মানি নি। তাকে দেখিয়ে, দেখিয়ে বইটা একটা ভাল কাগজে বুড়ে লাল কিতে দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। নিজের মনে বিশাল ছিল, মোড়ক খুলে উপহারের বস্তাটি হস্তগত হ'লে নবদম্পতি নিশ্চয়ই আনন্দিত হবে। নিশ্চয়ই এ বইয়ের লেখক উভয়েরই পরিচিত, প্রিয়ও।

বুঝে ফিরে এসে বীণা জিজ্ঞেস করলে, তা হলে বই দেওয়ারই ঠিক করলে?

গভীর হ'য়ে বললাম, দেখতেই পাচ্ছ।

পরিপাটি করে বাঁটা বাঁধতে বাঁধতে চোখ না তুলেই বুঝতে পাবলাম বীণা আমার উপহারের অকিঞ্চিৎকর-তায় হাসছে। যেন ওটা একটা দেবারই জিনিস নয়। লোক-লৌকিকতায় বা সামাজিকতায়।

সেই এক কথাই বীণা বললে, তার চেয়ে শুধু হাতে যাও, চুপি চুপি খেয়ে-দেয়ে চলে এস, কেউ জানতেও পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কিঞ্চিৎ হয়ে উঠি, তোমার অত কথায় কাজ কি? কি করবো না করবো তোমার পরামর্শ তো চাই নি।

বোধ হয় বীণা হেসেই বলেছিল; না তাই বলছি, দেবার মত যখন কিছু নেই তখন কিছু না-ই দিলে। দরকার কি?

ধাম। ধাম। ধাম। বীণাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলাম। খুব বাগ হয়েছিল নিজের স্রীও তুচ্ছ করছে উপহারটাকে।

নেমন্তর বাড়িতে পৌঁছে বীণার কথাটা হাড়ে হাড়ে সত্য বলে মনে হয়েছিল। যেমন মাইকে রেকর্ড বাজানার তেমন লোকজনের, তেমনি গাড়ি-জুড়ির, খয়না-গাঁটির-পোষাক-

আলাপের বাড়িবাড়ি। কে বলে
মধ্যবিত্ত হবে যাচ্ছে কি মনমত হয়ে
আছে? এতটুকুটো লেশ নেই
অকিঞ্চনের। আর তেমনি উপটোকনের
সমাহার। দর-র ওর মধ্যে এটা কি
মানাবে?

বেশ বিখ্যাত পড়েছিলুম। উপটোকন-
কাজাদের পঞ্জি থেকে মুখ নুকিরে
করে এসেছিলুম।

হঠাৎ চোখটা ভুত দেখে যেন
চমকে উঠলো। আগরে এত তাঁদের
জালোর। মধ্যও ছায়া দেখলুম আর
সেই স্বরূপ ছায়ায় যেন ক্ষেপুমামাকে
হলে থাকতে দেখলুম। ঠিক সেট-ডিকি,
সেই ভাব, তেমনি চোব-চোব, লজ্জুক-
হাজুক, সংকোচ।

বই-এর প্যাকেটটা মধ্যাস্তব আড়াল
ফরে আসবের ঐদিকটার এগিরে
পেলুম। ক্ষেপুমামা কোথা থেকে
আসবেন, নেমস্তন্ন স্বাবাব বয়স তো
তাঁর পেরিয়ে গেছে; তা ছাড়া এখানে
কি সম্বন্ধে আসবেন ভাবতে পাবলুম
না। শুনেছিলুম ক্ষেপুমামা আব সে
ক্ষেপুমামা নেই। এখন তিনি অনেক
ব্যস্ত মানুষ।

তবু বাব বার লোকটিকে দেখে
সেই ক্ষেপুমামার কথা মনে হ'তে
লাগল। অতি আশ্চর্য লোকটির
আকর্ষণে যেন তাঁর পাশে গিয়ে
বসেছিলুম। অপরিচিত লোকটি
আমাকে দেখে যেন হলে আত্মীয়তা
করতে চাইলে, মুখ ঘুরিয়ে নিম্ন।
বড় ইচ্ছে হল এ সমস্ত কর্মবাড়ির
কেউ এসে যেন আমার সঙ্গে নিতান্ত
একটি-দুটি কথা বলেন। ক্ষেপুমামার
মৃত্যু দেখতে এই লোকটি যেন বোঝে
আমি এখানে রবাহত নই।

কিন্তু কাউকে তেমনি ডেকে
আলাপ করবার মত পেলুম না। এত
আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে মানুষ নিজেকে
কত অপরিচিত ভাবতে পারে এখানে
মা এলে বোঝা যায় না। নিজেকে
ক্ষেপুমামার স্থান অধিকার করতে হবে
কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি। আবার

প্রতিজ্ঞা ক'ন, খুব ঘনিষ্ঠ এবং
ঘরোয়া ছাড়া আর কোথাও নিয়ম
বন্ধ করতে আসবো না। লজ্জার
এক শেষ।

পঞ্জি-ভোজন শেষ হতে অব-
শ্যায় জনের মত আমরা সব পুনঃ
আগরে এসে জড় হলাম। এদিক-ওদিক
চেষ্টে দেখলুম, সেই লোকটি কোথাও
নেই। দেখেছিলুম, পঞ্জিতে লোকটি
একটু আড়াল পেয়ে বসেছিল, কিন্তু
রসনার তৃপ্তিসাধনের ব্যাপারে একটুও
আড়ষ্টতা ছিল না, বরং দু-তিনটি পদ
অপেক্ষাতে পুনঃ প্রার্থনা করেছিল।
মনে হয়েছে লোকটি আমার চেয়ে
আত্মীয়তার ক্ষীণ সূত্র-ঘরে' নেমস্তন্ন
বাড়িতে এসেছে। নিজের কাজ সেরে
বেশ গা আড়াল দিয়েছে। বুদ্ধিমান।

ভাবছি, আমিও গা আড়াল দেব
কি না। কীপাবও পরামর্শ তাই ছিল।
আসল কাজ তো সেরে ফেলেছি।
দেব-কি দেব-না করে' উপহারটা
দেওয়াই হয় নি। এখন মনে হচ্ছে
তখন ভিড় দেখে উপটোকনের লাইনে
পা না বাড়িয়ে ভালই করেছি।
এখনো নিঃশ্রিতরা উপহার সহ
যা আসছে খবরের কাগজের বন্যার
রিপোর্টকে হার মানায়—অবান্তিত,
অদমিত, অদর্শন।

হঠাৎ একটা হৈ-হৈ উঠলো
আগরের মুখে। কে জানে সদর-রাস্তায়
কোন নিঃশ্রিত ব্যক্তি রবাহতদের
কাউকে গাড়ি-চাপা দিলেন কি না।
রাস্তায় আজকাল এমনই ভিড়, তার
উপর এই সব উপলক্ষ, বিয়ে, শোভা-
যাত্রা, সার্বজনীন লোগেই, আছে।

না, আমার অনুমান ঠিক নয়।
আগরের মুখে গাড়ি ঠিক একটা
এসেছে, কিন্তু তার তলার কেউ
পড়ে নি, বরং তার আশেপাশে লোক
জড় হয়েছে গাড়ি-চড়া লোকটিকে
নামিয়ে নিয়ে আত্মর্থনা করতে। বব
নয়, কেন না বিয়ে অনেক আগেই
চুকে গিয়েছে বর-কনে বাসরে উঠে

গেছে—সানাই ধামান ফাঁকে ফাঁকে
সেখানে। সঙ্গীতচর্চা দু-এক কলি
যেন দম আটকে এদিক-ওদিক ছুটে
আসছে। বিয়ের বগু সম্বোধ্য রাষ্ট্রেই
ছিল।

কৌবব ব্যাহব মধ্যে মৃত্যু-ভয়-
ভীত জয়ধ্বজ মত মুখটা দুব থেকে
বাড়িয়ে দিয়ে আগন্তুককে দেখবার
চেষ্টা করলুম। বরের মতই দর্শনীয়।
ভক্তলোক বৃদ্ধ, কিন্তু গাজগোজ চুচি
সম্মত এবং মূল্যবান। বিশিষ্টও।

আমি আড়ালে থাকলুম না। গায়ের
সব এলুম ভিড় ঠেলে। ভক্তিতে
মামাকে একটা প্রণামও যেন করে
ফেললুম।

ক্ষেপুমামা সহাস্যে বললেন, কি
রে খোকা। কেমন আছিস?

লজ্জার, গর্বে, এবং আত্মীয়তায়
গদগদ হয়ে বললুম, ভাল। আপনি?

ক্ষেপুমামা উত্তরই দিলেন না।
জীবনের পরিপূর্ণ উপভোগ্যতার তাঁর
সারা দেহ যেন উদ্ভাসিত। ইজের

ছাত্রদের অপরিহার্য গ্রন্থ
সঙ্গীতচর্চা চট্টোপাধ্যায়ের

পালানো

—ইহাতে আছে—

এই বঙ্গবচন রচিত সঙ্গীতচর্চায় প্রকীর্ণ
'সঙ্গীতচর্চা, কবীন্দ্র বসন্তকামের
পালানো সমালোচনা' এবং সমালোচক-
সেই চন্দ্রনাথ বসন্তকামের সঙ্গীত-সাহিত্য সম-
লোচনা। সাধারণ শিক্ষা পূর্ব কল্পিত
কল্পিত গ্রন্থে নির্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

মহাকবি হেমচন্দ্র বসন্তকামের

বঙ্গ-সংহার কাব্য

মাম—হই টাকা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

গহসূচন্দ্রের মত তাঁর শরীরে গহসূচন্দ্রের মত হালি নিঃশব্দে উৎসারিত। বেশ অভিজ্ঞ হ'য়ে পড়েছি, ক্ষেপুয়াকে হঠাৎ দেখে।

ক্ষেপুয়ামা আসরে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে খেয়েচিস?

আমি উত্তর দেবার আগেই কর্ম-কর্তাদের একজন পাশ থেকে বললেন, হ্যাঁ ওদের খাওয়া হয়ে গেছে।

ক্ষেপুয়ামা হেসে বললেন, তা হলে তো কাজ চুকেই গেছে একরকম। বাড়ি যাবি তো এবার?

বড় লজ্জা পেলুম, কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির পক্ষে কাজটা যেন অন্যায়।

ক্ষেপুয়ামা বললেন, একটু অপেক্ষা কর, আমি ফিরে আসি ভূপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে—আসবার জন্যে অনেক ক'রে বলেছিলেন। আজকাল কোথাও যাবার সময়ই পাই না।

বোধ হয় ভূপেনবাবুর এক ছেলেই বললেন, বাবা সামনেই ঘরেই আছেন, অনেকবার আপনার খোঁজ করেছিলেন।

ক্ষেপুয়ামা পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলেন। যেন নেমন্তর বাড়িতে তাঁর খোঁজ না ক'রে কোন উপায় নেই।

কিন্তু আমার অবস্থা—এখন কল্প। ক্ষেপুয়ামার সঙ্গে ফিরতে হবে। উনি তো এই এলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে কখন ফিরবেন কে জানে। চিরকাল দেখেছি ওঁর এই খাওয়ার ওপর লোভ। খাওয়ার জন্যেই সব নেমন্তর বাড়ি আসতেন।

কিন্তু না, ক্ষেপুয়ামার গতিই অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

তিনি শাস্তারীক ঘণ্টা নাড়া ছেড়ে দিয়ে এখন ব্যবসার ঘণ্টা বাজছেন, গাড়ি চাড়াচ্ছে। বাড়ি নিশ্চয়ই করেছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ক্ষেপুয়ামা ফিরে এলেন। ক্ষেপুয়ামা আজকাল কারো নেমন্তর বাড়িতে পংক্তিতে বসে

থান না। খুব পেড়াপিড়ি করলে আলাদা আসনে বসে গৃহস্থালীকে বাধিত করতে একটি সদেশ কি এক চামচ দই 'টেস্ট' করে' দেখেন। গহা হয় না, কি সবাব সঙ্গে বসে খেতে ইচ্ছে করে না, ক্ষেপুয়ামা বললেন না। ক্ষেপুয়ামার কথা চুপ করে শুনতে লাগলুম।

ক্ষেপুয়ামা বললেন, ভূপেনবাবু আমায় অনেক ক'রে বললে। খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি, ওপরমহলে ষোড়াকেরা আছে। আজকালকার দিন, বলা যায় না কখন কার দ্বারা কি উপকার হয়। আমি খাতির রেখেছি—আজ একটা জড়োয়ার গয়না গেল, কাল পাঁচটা উত্থল হয়ে আসবে।

এও এক পরিবর্তন ক্ষেপুয়ামার। খুব চালাক হয়েছেন, সংসারের ছিলেবটা বুঝতে পেরেছেন। অথচ মা বলতেন, ক্ষেপুটা ক্ষেপা। একটু বুদ্ধি নেই নিজের ভালোটা বোঝবার। সংসারের কি হাল করে রেখেছে। শাস্তারী করে বলে কি এতট দৈন্য?

সে-সময় আমরা সব চাকরিতে ঢুকে বা পাঠ ক্ষেপুয়ামা দশ-পনের বছর ছেলে-ঠেঙিয়ে তার সিকিও পেতেন না।

ক্ষেপুয়ামার দৈন্যের কথা উঠলে মা বলতেন, ক্ষেপুকে তোর বাবা কতদিন তাঁর আপিসে চাকরি দিতে চেয়েছিল, কিছুতেই রাজি হয় নি। ক্ষেপা আর সাথে বলে!

ভাগ্যে বাবার কথা শোনেন নি ক্ষেপুয়ামা। তা হলে অবস্থাটা সেট আগের মতই থাকতো, আমাকে নিজের গাড়িতে কবে বাড়ি পৌছে দিতে পারতেন না। ভাবছি মানুষের কি আশ্চর্য অবস্থান্তর হয়।

ক্ষেপুয়ামা বললেন, মাকে নিয়ে একদিন আসিস আমার বাড়ি, লোক গার্ডেনস। দিদিকে অনেকদিন দেখি নি রে।

মিছিগিছি বললুম, না কাল আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।

ক্ষেপুয়ামা দুঃখ করলেন, আজকাল খোঁজ-খবর কারো নেওয়া হয় না রে।

বাড়ির কাছাকাছি একটা মোড়ে গাড়ি থামাতে বললুম, বাকি পথটা হেঁটেই যাব। ক্ষেপুয়ামা আমাদের দাঁত বার করা পৈতৃকবাড়িটা নাষ্ট বা দেখলেন।

গাড়ির দরজাটা ঠেলে বন্ধ করতে গিয়ে আমার হাতের বইটা ক্ষেপুয়ামার নজরে পড়ল। জিজ্ঞেস করলেন, তোর হাতে ওটা কি রে?

তাড়াতাড়ি লুকতে লুকতে বললুম বই।

ক্ষেপুয়ামা তবু ছাড়েন না, কি বই? গ্রন্থের।

ক্ষেপুয়ামা বললেন, আজকাল আর বই-টাই পড়বার সময় হয় না। দে না তোর বইটা পড়ে দেখব আজকাল কেমন সব লিখেছে। ফেরৎ পাঠি তাগি নি।

যেন এই জুরোগই বুঝছিলুম, বললুম, না না, ফেরৎ দিতে হবে না আপনি নিন। আপনাকে উপহার দিলুম।

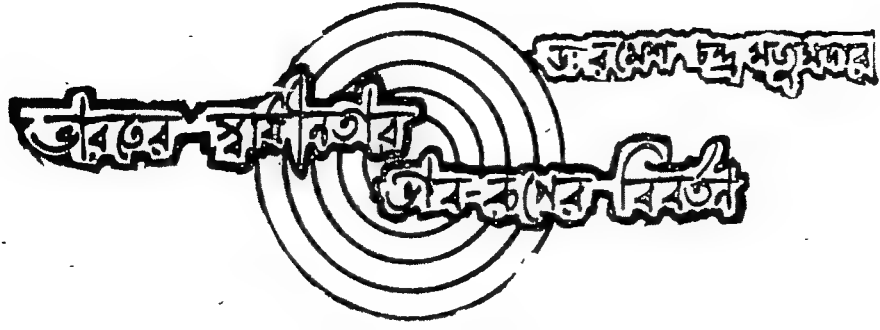
ক্ষেপুয়ামা বইটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বললেন, তুই খুব চালাক, জানিস বই নিয়ে কেউ ফেরৎ দেয় না, তাই দিয়ে দিলি।

অপ্রস্তুত হ'য়ে বললুম, না না, আপনাকে দেব বলেই—

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ক্ষেপুয়ামা বললেন, একদিন মাকে নিয়ে আসি।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম কার জিনিস কাকে দিলুম আর যে-জিনিস দিলুম তার মর্যাদা বর্তমান গ্রহীতা কতখানি দেবেন?

নাকি বড়লোক হয়েছেন বলেই ক্ষেপুয়ামাকে নিজের বইটা দিয়ে খোঁসামোদ করলুম? এক সময় অনেক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছি, সেসব কথা কি ওঁর মনে আছে? থাকলে লজ্জার একশেষ।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর্ব)

স্বাধীনতায়ুগের গতি ও প্রকৃতির পারাবর্তনের ধারা

স্বাধীনতার ভাবরূপের বিবর্তনের কথাপ্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিবোধ আন্দোলনের গতি এবং প্রকৃতিরও আংশিক আলোচনা করা হয়েছে। ইংরেজ কোম্পানী বাণিজ্য কবতে এসে এদেশে যেভাবে সাম্রাজ্য গড়তে শুরু কবেছিল, তাতে পদে পদে বাধা-ষে না এসেছে তা নয় এবং সে বাধা-দান যুদ্ধ বা শস্ত্র প্রতিবোধের রূপ নিয়েই এসেছে। ষাঁবা বিক্ষিপ্তভাবে ইংরেজ বাজ্যবিস্তারকে প্রতিবোধ করেছিল, তাঁদের সবার অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজ্য হাবানোর বা সুবিধে লোপের বিপুল শক্তি। মুঘল শাহজাদা আলি গওহর (পরে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম) তিনবার ব্যর্থ অভিযান করেছিলেন বিহার ও বাংলার অভ্যন্তরে। সেখানে ইংরেজদের সর্বময় প্রভুত্ব বিলোপ এবং মুঘলপ্রভাব স্থাপন তাঁর কাম্য ছিল।

শীরজাকরের প্রচেষ্টা বোধ হয় ওলন্দাজদের সঙ্গে মৌখিক যড়যন্ত্রের বাইরে আর কোন কার্যকর রূপ নেয় নি। শীরকাশিমের ব্যাপক প্রচেষ্টা—কাটোয়া, ঘেরিয়া এবং উথুরানালার যুদ্ধ এবং সর্বশেষে বঙ্গারের যুদ্ধ এ ব্যর্থ প্রতিরোধের ইতিহাসে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য।

তা ছাড়া রয়েছে মহারাজা নন্দ-কুমার এবং বারানসীর রাজা চৈত সিং-এর সমবেত প্রচেষ্টার ইতিহাস। বাংলার, প্রধানত রাঢ়দেশের বিভিন্ন সামন্ত

নৃপতিদের একক বা সময় সময় সম্মিলিত বাধাদানের কাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক নয়। বর্তমানের রাজ্যের অংশ এ প্রতিবোধ কাহিনীতে উল্লেখ্য।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও ইংরেজের বিধু কম ছিল না। সব-চেয়ে ভয়ঙ্কর হয়েছিল দক্ষিণে হায়দর আলি, নিজাম ও মাধাঠাদেব সম্মিলিত প্রয়াস, শেষ পর্যন্ত ইংরেজের কুট-বুদ্ধিতে যা ব্যর্থ হয়েছিল। কাবুলের রাজা জামান শাহ (ভারতে বারবার অভিযানকারী আহমেদ শাহ দুররাণীর পৌত্র) ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতে অযোধ্যার নবাব ওয়াজির আলি এবং দক্ষিণে টিপু সুলতানকেও সাহায্যদানের প্রয়াস করেছিলেন তাঁদের অনুপ্রাণে, ভারতের অর্ধস্বাধীন আবেগ করেকজন নৃপতি সে মিত্র-শক্তিকে সাহায্য কবতে প্রস্তুত ছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ নিশ্চয় পবনব স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসের অন্তর্গত ঘটনা, কোন কোন ক্ষেত্রে বীরদের পরাকাষ্ঠাও আমরা দেখতে পাবো। এবং একই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার দৃষ্টান্তও কয়েকটি আছে। সবারই লক্ষ্য 'ইংরেজকে হটাঁও।' কিন্তু ইংরেজ বিদেশী, ভারতের স্বাধীনতা হরণ সে করেছে, সমগ্র জাতির সে পরম শত্রু—এ বোধের উন্মেষ তখন হয়েছিল কি? ভারতবর্ষ তো তখন একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র, কোথায় বা স্বদেশ, কোথায় বা বিদেশ। জাতীয় সত্তা তখন তো অনুভবের বাইরে। তাই বিদেশীকে বাধাদানের কাহিনীও সব নয়। সমগ্র ভারতে হানাহানি, কাঁড়াকাড়ির

যে ধুম লেগেছিল, ইংরেজ তার বুদ্ধি-বলে, উন্নততর সামরিক জ্ঞানের বলে এ কাঁড়াকাড়িতে মোটা অংশ লাভ করলে। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ কবছেন ভারতীয় নৃপতি বা রাজপুরুষেরা, নিজেরাও পরস্পর কম সাধামারি কাঁটাকাটি কবেন নি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজের সাহায্য কামনা এবং সাহায্যদান একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে। বিশপ হীবার ১৮২৪ সালে তাঁর উত্তর ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন,—‘হিন্দুস্থানের (উত্তর ভারতের) লোকেরা ইংরেজকে যেমন বিদেশী মনে করে, তেমনি মনে করে বাঙালীকে বিদেশী এবং বাংলা দেশেও হিন্দুস্থানের লোকেরা ঠিক তাই। বাঙালীর কাছে বিদেশী ইংরেজের চাংতেও বেশি ঘৃণ্য বিদেশী মারাঠা।--- ভারতবর্ষ যেখানে নেই, তাব বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রীতি দূরের কথা যখন তীব্র ঘৃণার সম্পর্ক, তখন ইংরেজকে বিদেশী আখ্যা দেয়া অসমীচীন।’

তাঁই মনে হয়, আধুনিক যুগের জাতীয়তাবাদে স্বদেশী-বিদেশী বৈ তারতম্য রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ও-যুগের ঘটনাবলী বিচার করতে গেলে আমাদের ভুল হবে। স্মরণ্য ওই যুগের যুদ্ধ, শস্ত্র প্রতিরোধ এবং ঋণ ঋণ বিদ্রোহের কাহিনীগুলিকে ভারতের জাতীয় সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া যায় না। এবং ১৮৫৭ সালের তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ শুধু সিপাহী বিদ্রোহের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও জাতীয়-তাবাদী ভারতের প্রথম স্বাধীনতাস্থ

কর, যদিও এ সম্বন্ধে বহু বিতর্ক হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। এ সম্বন্ধে আপনাদের সংপ্রণীত গ্রন্থ এবং বিপ্লবীত সিদ্ধান্তপূর্ণ অন্যান্য গ্রন্থপাঠের অনুরোধ আশা করি। শুধু একটি মাত্র ইঙ্গিত দিচ্ছি। ১৮৫৭ সালে বেঙ্গল ন্যাশনালিস্টের বিদ্রোহী সিপাহীরা যদিও ভারতীয় জাতির মুক্তিকল্পেই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল, তবে তারা ও ঘটনার মাত্র আট বছর আগে ১৮৪৯ সালে লর্ড ডানলোপের সাম্রাজ্যবাদ নীতির রূপায়ণে, পাঞ্জাবের শিখদের স্বাধীনতা হরণে এতো উৎসাহ ও কার্যতৎপরতা দেখিয়েছিল কোন মুক্তিযোদ্ধা?

ওই যুগের বিখ্যাত ওয়াহাবি আন্দোলনের কথা আবার তুলছি, কিন্তু ও আন্দোলন তো মুগ্ধ জাতীয় আন্দোলন, তারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতার কথা ওতে বিদ্যমান নেই। আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করা উচিত, ঘটনাটি ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। মারাঠা বিপ্লবী বাহাদুর বনবস্তু ফাডকে সম্রাসবাদী কার্যকলাপে মারা ইংরেজ রাজত্বে বিষ ফেট কবেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তাঁর পশ্চাতে অবশ্য ইংবেজি শিক্ষিত লোকেরা দাঁড়ায় নি, তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে ছিল নিম্নবর্ণের মারাঠা সাম্রাজ্যবাদী। ইংরেজ শাসনের শোষণাত্মক নৃশংসারের জ্বালায়, অসহায় দেশবাসীর সর্বস্ব লুণ্ঠনের বেদনায় এই মারাঠা বিপ্লবী বীর এক ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা করেছিলেন। ফাডকে যে পথ অবলম্বন কবেছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের বিপ্লবীরা সে পথেই পথিক। ভারতের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ বা বিপ্লব-আন্দোলনের প্রথম দিশারী বাহাদুর বনবস্তু ফাডকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চাপেকর বাতায়ন ফাডকে এই ভিত্তিই বহন করেছিলেন।

এবার বাংলা দেশে আসি, আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের

মুতিকাগারে। ইংরেজি শিক্ষা এবং রামমোহন রায়ের কথা একেত্রে সর্বাত্মক সম্বন্ধীয়। ১৮২৩ সালে ইংরেজ সরকারের মুদ্রায়ন্ত্রের আইনের বলে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা যেভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে প্রায় এককভাবে রামমোহন লড়াই করেছিলেন। এখানেই জন নিল ইংরেজ শাসননীতির বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের সেই বিচিত্র ধারাটি, যাকে বলা হয় কনস্টিটিশনাল এ্যাসোসিয়েশন বা শাসন সংক্রান্ত অন্যান্যের তীব্র প্রতিবাদে এবং রাজনৈতিক অধিকার দাবিতে নিরপেক্ষ আন্দোলন। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যখন লণ্ডনে গোল টেবিল চেষ্টাকে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় আর ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে, তখন গ্রিকিন সাহেব মন্তব্য করেছিলেন যে, শতবর্ষ পূর্বে রামমোহনের মহান প্রয়াসের জুফল এতদিনে পরিস্ফুট হল।

রামমোহনের পরে এবং কংগ্রেস সৃষ্টি (১৮৮৫) পূর্ব পর্যন্ত ভারতের উন্নত অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন সমাজসভা ও সমিতির কথা এ প্রসঙ্গ সম্বন্ধীয়। সম্বন্ধীয় কলকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপ। ১৮৫৩ সালের বৃটিশ পার্লামেন্টে যখন ভারতীয় চাটার্ড অফ সংশোধনের আলোচনা চলছিল, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন একটি বিস্তারিত আবেদন পাঠিয়ে- শুধু ভারতের শাসন ব্যবস্থায় নানাবিধ সংস্কার দাবি কবে নি, পার্লামেন্টের প্রথম অরজন্ডামেন্ট দাবি কবেছিল।

এ যুগে সর্বচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতীয় সভার (Indian Association) কথা। কলকাতায় এই সভার উদ্যোগে দুটি জাতীয় কনফারেন্স সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং সে আন্দোলনের

কর্মসূচী নির্ধারিত হয়েছিল, কংগ্রেস অধিবেশনের প্রথম বিশ বছরের ইতিহাসে এর চাইতে বেশিদূর ভারতের জাতীয়তাবাদ অগ্রসর হয় নি। এ জাতির বা জাতীয়তাবাদের জনক যদি কেউ থাকেন তবে তিনি সুবেজনাথ। এবং এ জাতীয়তাবাদকে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি দান করে স্বাধীন বিবেকানন্দ অপূর্ব প্রাণসম্পদে বলিষ্ঠ ও কর্মচঞ্চল করে তোলেন। আমরা সন্দেহ এসব তথ্য নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছিল আমাদের বর্তমান কংগ্রেসী সরকারের দ্বিমুখিত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস প্রণয়নের ব্যাপারে জাতীয় সরকার আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রাক-কংগ্রেস যুগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রকৃত এবং নিরুপেক্ষ (কনস্টিটিশনাল) আন্দোলনের ধারা সম্বন্ধে এবং কংগ্রেসের বাইরে থেকেও যেসব মহান দেশপ্রেমিক আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের নেতৃবর্গের সম্যক জ্ঞানের অভাব দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।

কংগ্রেস বিপ্লবীদল এবং ভারতের জাতীয় সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপে পূর্বেই বলা হয়েছে। ভারতের বাইরে এদেশের বিপ্লবীরা ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য যে ব্যাপক আয়োজন করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায়, তাব চাকল্যকর কাহিনী এদেশে আর অজানা নেই, তবুও এর গুরুত্ব বোধ হয় আজও আমরা উপলব্ধি কবতে পারি নি। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আমেরিকার গদর পার্টি কথা। ক্যালিফোর্নিয়াতে গদর নেতাদের যে বিচার হয়েছিল তাতে অনেক আশ্চর্য ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যখন আমি গিয়েছিলাম, এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনেছি। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ গদর পার্টির হয়ে আপোনে প্রচারকার্য চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বিপ্লবী চক্রবর্তী

চক্রবর্তীর লিখিত জবানাবতে তা জেনে আমি আমার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস-গ্রন্থে (ইংবেজিতে) লিপিবদ্ধ কবেছিলাম। এবং আরও লিখেছিলাম যে, যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রচলিত এ ধারণার কোন প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু আজ জেনেছি রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ কবে বলেছিলেন যে, গদগ পোর্টব সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, চন্দ্রকান্তের গণবাদ ভুল।

‘গেভারিক জাহাজের’ কাহিনী এবং বাংলাব বিপ্লবীদের ইংরেজের বিরুদ্ধে জার্মানীর সাহায্যে সমরারোহণ কেমন করে ব্যর্থ হল—সে কাহিনী অল্পবিস্তর সবার জানা আছে।

এদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজীর অকিস্মরণীয় দুটি দান—নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধ (পাসিভ রেজিস্ট্যান্স) এবং ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের অধিনায়কত্ব। অহিংস সত্যগ্রহ, নীতির অনুশীলন ও প্রয়োগের ব্যাপারে গান্ধীজী খোবো, টলস্টয় এবং উমার্সনের কাছে ঐক্য স্বীকার করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি অল্পবিস্তর বোধের কথা উল্লেখ করেন নি। স্বদেশী যুগে অরবিন্দ প্রথম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের গতি ও প্রকৃতির ভাব সম্প্রসারণ করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন রচনার এবং বহুভঙ্গ রদ আন্দোলনে ভারতের পূর্বাঞ্চলে আরম্ভ তার সার্থক প্রয়োগ দেখেছি। ভারতজোড়া গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম স্তর রয়েছে তিলক ও দ্রাণি বৈশাখের হোমরুল আন্দোলনে। তবুও স্বীকার করতে হবে যে, গান্ধীজীই এ-সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রযোজক বা প্রয়োগশিল্পী।

এ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের অভ্যন্তরে ইংরেজের বিরুদ্ধে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন এবং বাইবে থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ‘দিল্লী চলো’ অভিযান—এ দুটিই অত্যন্ত কাছের এবং গুরুত্বপূর্ণ

গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী। লক্ষণীয় এই যে, সশস্ত্র বা নিঃশস্ত্র প্রতিবোধ, হিংসার পথ বা অহিংসার পথ—এসবের নৈতিক চুলচেরা বিচার এখানে একেবারে অবাস্তব হয়ে গেছে, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠেছে। আরও স্মরণীয়

যে গান্ধীজী ‘ভারত ছাড়ো’ সংগ্রামের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধ হোক বা সশস্ত্র আন্দোলনই হোক—সবই তো শেষ পর্যন্ত ইংবেজ সবকিছু দমন করেছিল, আপাতদৃষ্টিতে সবই ব্যর্থ হয়েছিল। তবুও কেন ইংবেজ এদেশ



সোদিন।

আর
আজ

কিং আর প্রেমার বন্দন

ফেমে অজন্তার রূপবতীরাই

যেন নেমে এসেছেন আজ

নগরে, গ্রামে ও

রূপের এই মূর্তিকাহিনীতে

একটি ভুলনাহীন নাম—

ফেমিলার
প্রা

সোদিন্যের ভিত তৈরীতে

ফেমিলার জুড়ি নেই।

ফেমিলার হাউস—কলিকাতা-৩

কেন চলে গেল? ১৯৪৭-এ কেন স্বাধীনতা দান করলে? এ কি গান্ধিজী ব আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ— যেমন এদেশে আজও অনেকের ধারণা আছে? তবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির তারিখটা আবও পিছিয়ে দিতে হবে না কি? বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন তো গান্ধিজীর আন্দোলন নয়, একথা তিনি নিজেই বলেছেন, যদিও কংগ্রেসের এ প্রস্তাব গ্রহণ তাঁরই নির্দেশে বা নেতৃত্বে। কংগ্রেস থেকে গান্ধিজী বেবিয়ে এসেছিলেন ১৯৩৪ সালে, একটি জুস্পট বিবৃতি দিয়ে। তার তেবো বছর পরে ভারত পেলো স্বাধীনতা।

উত্তিমধ্যে দারুণ যুদ্ধ চলেছে সমগ্র বিশ্বে। জাপান অত্যন্ত আক্রমণ করে ইংরেজের দুর্ভেদ্য নৌ-ব্যাট সিঙ্গাপুর দখল করেছে, তালের ঘবের মত ভেঙে পড়ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য, বুদ্ধদেশকে ধাঁট করে ভারত অভিযানে জাপান প্রস্তুত। তবুও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ও ক্রনায়ক চাচিল ভারতের সুচ্যুত ভূমিও ভাবত-বাসীর হাতে দিতে রাজী নন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হুভারডেল্ট, যিনি মিত্রপক্ষের প্রধান অবলম্বন,—তিনি বারবার চাচিলকে বলছেন ভারতকে ভাবতীয়দের হাতেই লম্পণ করতে অন্তত পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ জয়ের ঋতিয়ে, তবুও চাচিল তাঁব লংকল্লেপ দৃঢ়। 'সহায়ীনা ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী আমি হয়েছি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বিলিয়ে দিতে নয়'—এই তাঁর দৃঢ় জুস্পট ঘোষণা।

ভাবপর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সামরিক নির্বাচনে হেরে গেল চাচিলের রক্ষণশীল দল, এলো লেবার পার্টি ভোটে জিতে, এ্যাটলি হলেন প্রধান-মন্ত্রী। অবিস্বাস্যরূপে অল্প সময়ের মধ্যে নানা খুঁটিনাটি আলোচনা করে পার্লামেন্টে দস্তুরসত্তা আইন কবে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হল। শুষ্ক হল দুটি স্বাধীন রাজ্যের—ভারত

ও পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। এ্যাটলি তাঁর এক বিবৃতিতে বললেন,—'ভারতকে শাসনা-ধীনে রাখা এখন ইংলণ্ডের সাধ্যাতীত, তাই ভারতের শুভেচ্ছা বজায় রেখে আপসে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল'।

১৯৪৮ সালে কলকাতার একটি মাসিক কাগজে আমি লিখেছিলাম গান্ধিজী এবং কংগ্রেস আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং হিটলার, আর নেতাজী এবং আজাদ হিন্দ কোঙ্গ— ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ইতিহাসে এ তিনটি সমান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একদা ১৮৫৭ সালে ইংরেজ বাহিনীর সিপাহীদের একাংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু ভারতের জাতীয় জাগরণ এবং গণ-অভ্যুত্থানের পট-ভূমিকা সেখানে ছিল না, তদুপরি ইংরেজ তখন বিশ্ব সবচাইতে পবা-ক্রমশালী জাতি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে ইংরেজ শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেও পরাজয়ের চেয়ে বেশি দুর্ভিত্তে পড়েছিল, তাব জগৎজোড়া সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দিয়েছিলেন হিটলার। তারপর বৃটিশ অনুগত যুদ্ধবন্দী ভাবতীয় সৈন্যদের অপূর্ণ বিদ্রোহ ও ইংরেজের বিরুদ্ধে নেতাজীর নেতৃত্বে বিশ্ব-রণাঙ্গনে যুদ্ধ এবং তার প্রভাবে ভারতের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যের ক্ষত-স্বরূপ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে আলোড়ন ও ইংরেজ-বিরোধী কার্হ-কলাপ যাব বলিষ্ঠ প্রকাশ রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভীর বিদ্রোহ—এসকল ঘটনা অত্যন্ত অস্বস্তিকর এবং এসকলের পটভূমিতে রয়েছে গান্ধিজীর অসামান্য অধি-নায়কত্ব ভারতের গণ-জাগরণ এবং ইংরেজ-বিরোধী সংঘর্ষে দেশপ্রেমিকদের আত্মবিসর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণ প্রকাশ। এসব কাবণেই ইংরেজের হাত থেকে এসেছে স্বাধীনতা আমাদের এই ভারত ভূখণ্ডে, যদিও বুদ্ধিব খেলাতে এ ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও ইংরেজ আমাদের ওপর অনেক কুটিল চাল দিয়েছে।

ডবিষ্যতে আবও অনেক অজানা তথ্যের আবিষ্কার যখন হবে, তখন পূর্বোপরি জ্ঞানা যাবে এ শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের তাৎপর্যময় কাহিনী। এবং সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করবেন অনাগত-কালের সত্যসন্ধ ঐতিহাসিক।

ভারতের রাজনৈতিক অধিকার দাবিতে বৃটিশ মনোভাব

ইংরেজরা কী চোখে দেখতো আমাদের প্রাচীন এই দেশের সভ্যতাকে এবং তৎকালীন জাতীয়তাবাদী ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দাবিদাওয়া-গুলিকে? সমগ্র ইংবেজ সমাজকে একছাঁচে ফেলে যদি আমরা এর জবাব খুঁজি, তবে একটু বিলম্বিত আসবে। একথা সত্য যে, সর্বদেশে, সর্বকালে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ থাকে, এখানেও মোটামুটি-ভাবে তার ব্যতিক্রম আশা করতে পারি নে। তবুও ভারতের রাজনৈতিক অধিকার দাবিতে বৃটিশ মনোভাবের শ্রেণী বিভাগ আছে।

প্রথমত শাসক সম্প্রদায়। এখানে স্বভাবতই দেখবো একটা তীব্র গুরু-মন্যতা নিয়ে ইংরেজ চলাফেরা করেছে। কোম্পানীর শাসনকালে এই যুগন্ত, তামসিকতায় আচ্ছন্ন জাতির বিশেষ করে হিন্দুদের অনেক ভাল ভাল বিশেষণে ভূষিত হতে হয়েছে। গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস বললেন, হিন্দুরা কুকুর হাতী আর বানর থেকে আলাদা কোন প্রাণী নয়, বিশেষ করে বাঙালীরা। এসব অবশ্য তিনি প্রকাশ্যে বলেন নি, তাঁর গোপন ডায়েরিতে লিখেছেন। এমন কি যে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক সঙ্ঘর্ষে আমার উচ্চ-ধারণা রয়েছে তিনিও গোপন পত্রে তাঁর তীব্র ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেছেন ভারত সঙ্ঘর্ষে। এলেনবরা তো খোলা-খুলিই বললেন, এদেশের মানুষের ওপর আবার দয়া-মায়ী দেখানো কি, ইংবেজ জয় করেছে এদেশ তরবার দিয়ে,

শাসন করবে তরবারি ধুয়ে, রাববেও
এ শাসন বজায় ওই তরবারির ছোবে।
প্রতিপদে শুধু ভারতবাসী হবার
অপবাধে অপমান সহ্যেতে হত শ্রেষ্ঠ
রাজপুরুষদের হাতে। শাসনের নিম্ন-
স্তরে সাহেবরা ছিলেন আর একমাত্র
বাড়া। কাল আদমদের চেয়ারে
বসা নিষেধ, যদি কোন শ্রেণীবর্গ
ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, এক শ্রেণীতে
সাহেব-মাদ্রীদদের সঙ্গে টেনে সটানবে
যাতায়াত নিষেধ, সাহেবরা যে রাস্তার
চলে সে রাস্তায় নেটিভ চলতে পারবে
না। রামমোহন রায়ের মত লোক
পাল্কী চড়ে ভাগলপুরের রাজপথে যেতে
যেতে কত বড়ো অপমান ও ঔদ্ধত্যের
লক্ষ্যবিন্দু হয়েছিলেন, সে তো অবিদিত
কাহিনী।

তারপর ভারতের জাতীয়তাবাদের
উদ্দেশ্য এবং প্রধানত কংগ্রেসের
মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকারের নিমিত্ত
নবম জাতিগুলির সূচনা। শাসক
গণসমূহের ক্ষোভ রহিত হলে নেটিভ-
দের এই স্পর্ধা সেবে। হিন্দুর ওপরই
এত রাগ ও ঘৃণা। সর্বস্বেরি ছিলেন
বিলাতে রক্ষণশীল দলের একজন
বড়ো নেতা, একদা ছিলেন ভারত-
বাসী রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার, তারপর
প্রধানমন্ত্রী। তিনি বললেন, 'হটেন-
ট আর হিন্দু স্বায়ত্তশাসনে সমান
অধোগ্য। নেটিভদের ইংরেজি শিক্ষার
অযোগ্য কবে দিলে সেকলে সাহেব
ভারতে ইংরেজ শাসনে এক বড়ো
বিপদ সৃষ্টি কবে গেছেন—এই ছিল
পরবর্তী শাসক সম্প্রদায়ের ধারণা।
সেকলেও একমুখ একটা সাবধানবাণী
উচ্চারণ কবেছিলেন। এলফিনস্টোন
সাহেব বলেছেন যে, এম মাধ্যমে
ভারতে ইংরেজ শাসনের 'রিটার্ন
টিকেট' কাটা হয়ে গেছে, মনোরোও সে
সুরেই কথা বলতেন। 'ভাটসরয়
কার্জন তো ভারত-বিদ্বেষে ও ঘৃণা
প্রকাশে অনন্য পুরুষ। তিনি 'মৃত-
প্রায়' কংগ্রেসের মৃত্যু ও মনোহর
অন্যবিদ্যার স্বপ্নে বিভোর হয়ে

থাকতেন। শিষ্টো সাহেবও একই
পন্থের পথিক। আর একজন ছিলেন
ভারতসচিব হ্যামিলটন।

হ্যামিলটন বলেছিলেন যে, এই
যে (বাঙালী) বাবুর দল—উকীলবা
এবং ছাত্রবৃন্দ বড়ো বড়ো কথা বলছে
এবং লাক্ষ্যাক্ষি করছে, এতে আমাদের
ভয় পাবার কিছু নেই। পাঠান, শিখ
প্রভৃতি, সামরিক জাতিগুলি আমাদের
হাতে আমাদের ভয় কি? হোমরুল
আন্দোলন পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকবর্গের
আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন
সমক্ষে এই ছিল মনোভাব।

অবশ্য ব্যতিক্রমও ছিল। লর্ড
রিপন এবং মাদ্রাজ গভর্নর ট্রেভে-
লিয়ন এ মনোভাবের ব্যতিক্রম দেখিয়ে
গেছেন। সে কারণে লর্ড রিপনের তাঁর
স্বদেশবাসীর হাতে কব মূর্ত্তোগ
ভুগতে হয় নি।

সাধারণত আমাদের ধারণা যে,
ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল ভারতের
রাজনৈতিক অধিকার দাবিকে 'চিরকাল
প্রতিরোধ করেছে এবং উদারনৈতিক
দল সহানুভূতি দেখিয়েছে। কথাটা
ঐতিহাসিক সত্য নয়। উদারনৈতিক

দলের সহানুভূতি মৌখিক ছিল,
মনোভাবে এবং কার্যক্ষেত্রে ভারতের
ব্যাপারে ও-দলকে রক্ষণশীল দল
গেকে আলাদা করে দেখা গন্ত। ববং
রক্ষণশীল দল মনে মুখে এক ছিল।
আমাদের দেশের শাসন সংস্কারে
উদারনৈতিক দল অরশ্য এগিয়ে
এসেছেন এবং বিভিন্ন সংস্কার আইন
তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট
বিশিষ্ট করেছেন।

'১৯০৯, ১৯১৯'-এর সংস্কার
আইন করার বেলাই দেখা গেছে
তাদের আসল রূপ। ভদ্রপরি কিছু
শাসন সংস্কারের মাধ্যমে বহু রক্ষা-
কবচের কণ্টকে আবৃত কবে যখনই
কোন অধিকার দেয়া হয়েছে ভারত-
বাসীকে, তখনই দেখা গেছে যে অনেক
দেরি হয়ে গেছে, জাগ্রত জাতীয়তা-
বাসী ভারতের দাবি আশ্রয় অনেক
বেশি। ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিসে
লর্ডস্ট যেন একটি পেট খুলতো;
তাতে লেখা আছে 'Too Late.' অর্থাৎ
ভারতীয় নেতৃবর্গের অর্থও বিশ্বাস
ছিল উদারনৈতিক ইংরেজের ওভ-
বুদ্ধির ওপর। এর অযোগ্য সময়মতো

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অধীন

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - আগপুর

বেঙ্গলোয়াড়া - মীনপু - গোহাটী

দিয়ে পাবলৈ এই বিদেশী শাসনও কল্যাণময় ৰূপ নিলে হয়তো এনেদৰে আঁৰও কিছুকাল থাকতে পাবতো।

কতো প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অপলাপ করেছে ইংৰেজ শাসন। ১৮৩৩ সালে ঘোষণা হল চাট্টাৰ আইন মতে— যোগ্যতানুসারে ভাৰতবাসী ভাৰ দেশে সকল চাকৰিৰ দৰজা খোলা পাবে। ১৯৫৮ সালে ৰাণীৰ ঘোষণাৰ আৰম্ভ হুপটে করে— ভাৰতবাসীৰ উচ্চতম চাকৰিতে ন্যায্য অধিকাৰ ঘোষিত হল। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰে দেখেছি এৰ উল্টোটি।

এদেশৰ যিহা কেসৰকাৰী ইংৰেজপ্ৰাণী, তাদেৰ অত্যাচাৰ-ও অবিচাৰ তো প্ৰবাদে দাঁড়িয়েছিল এবং শাসক সম্প্ৰদায় ছিল তাদেৰ পশ্চাতে।

আছিল কথা, সাম্ৰাজ্যবাদী ইংৰেজ শাসন শোষণৰ মধ্য দিয়ে এদেশৰ কল্যাণকে এদেশৰ সমৃদ্ধিৰ হুপকাটে অনাবালে বানি দিয়েছে। আৰ ভেদনীতিৰ পৰিপোষণে ৰাজ-নৈতিক চেতনায় উৰুছ হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে সুপ্ৰসন্ন সমাজেৰ অবিদ্বেষ ও আশংকাকে পুৰোপুৰি কাজে লাগিয়েছে। গোপন দলিলপত্ৰ সব আজ প্ৰকাশিত হয়ে পড়েছে; এসব কথা আজ আমাৰ লবিস্তাৰে জানি।

ইংলেণ্ডৰ জনসাধাৰণ ভাৰতেৰ প্ৰশ্নে ছিল সম্পূৰ্ণ উদাসীন এবং অজ্ঞ। ভাৰত সম্বন্ধে তাদেৰ জ্ঞান-ভাৰণাও ছিল অবিদ্যাৱাক্ষে

আজগুণি। দীৰ্ঘকাল অন্তত ১৮০৯ পৰ্যন্ত এদেশে জেমস মিল সাহেবেৰ ভাৰতবৰ্ষেৰ ইতিহাস পড়ানো হত। আশ্চৰ্যেৰ বিষয় এই যে, এতবড়ো মনীষীব্যক্তিও তাঁৰ ইতিহাস-প্ৰশ্নে হিন্দু-মতাতা সম্বন্ধে কি কুংসিত মন্তব্যই না করেছেন।

এ প্ৰসঙ্গে ইংলেণ্ডেৰ বিদগ্ধসমাজে ব্ৰিটি, ব্ৰাডলা, ডিগবি, ব্ৰাণ্ট, টমসন প্ৰমুখ ভাৰতপ্ৰদৰ্শী মনীষীদেৰ কথা আমাদেৰ প্ৰজাৰ সঙ্গে মনে ৰাখতে হবে। এঁৰা নিভিকভাবে সমালোচনা করেছেন শাসক সম্প্ৰদায়ৰ অন্যাৰ ও অবিচাৰেৰ, ভাৰতেৰ সমস্যা-সহানু-ভূতিৰ সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করেছেন এবং বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরেছেন ভাৰতকথা ইংলেণ্ডেৰ জনসমাজে।

বিংশ শতাব্দীৰ তৃতীয় দশকে উদারনৈতিক দলকে হটিয়ে শ্ৰমিক দল বা লেবাৰ পাৰ্টী জন্মে এলো ইংলেণ্ডেৰ ৰাজনীতি নিয়ন্ত্ৰণে। ৰক্ষণ-শীল দল অবশ্য তাৰ প্ৰাধান্য অক্ষুণ্ণই রেখেছে এবং তাৰ ভাৰতবিষয়ে একই ধাৰায় প্ৰবাহিত। আমাদেৰ বিশ্বাস, লেবাৰ পাৰ্টী দল হিসেবে সবচেয়ে বেশি উদাৰ এবং সহানুভূতিশীল, ভাৰতে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বা স্বায়ত্তশাসন দেবাৰ ব্যাপাৰে। অবশ্য যতদিন বিৰোধী দল হিসেবে রয়েছেন এৰ সদস্যৰা, তখন কথাটা অত্যন্ত সত্য। কিন্তু ভোটে পাৰ্লামেণ্টে সংখ্যাধিকা লাভ করে যখন তাঁৰা

সৰকাৰ গঠন কৰেছেন- তখন যেন কথাৰ ও কাজে কেমন একটা অমিল দেখা গেছে। প্ৰথম শ্ৰমিক প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰামজে ম্যাকডোনাল্ড—এব শ্ৰেষ্ঠ উপাধাৰণ। তিনি বলেছিলেন একদা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিসেবে,—ভাৰতবৰ্ষ ইংলেণ্ডেৰ কাজে কোন দলীয় সমস্যা নয়। অৰ্থাৎ ভাৰত সম্বন্ধে ৰক্ষণশীলেৰ বে মনোভাব, লেবাৰেৰও সেই মনোভাব।

১৯৩৫ সালেৰ ভাৰত শাসন আইন বিচাৰ কৰলে ম্যাকডোনাল্ডেৰ তথা সৰকাৰী লেবাৰ পাৰ্টীৰ মনোভাব যে উদারনৈতিক মনোভাবেৰ একটি মাজিত সংস্কৰণ মাত্ৰ, তা বেশ বোঝা বাবে। অবশ্য ১৯৪৭ সালে ভাৰত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করেছে লেবাৰ পাৰ্টীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এ্যাটলি উদ্যোগে ও তৎপৰতায়। কিন্তু সেই চিহ্নস্তন কুটনীতিৰ সুক্ষ্ম খেলায় ইংৰেজৰ মৰ্যাদা যথাসম্ভব বজাৰ রেখেছেন এ্যাটলি। কেন আপাতদৃষ্টিতে ইংৰেজৰ এ ঔদাৰ্যেৰ বিকাশ, তাৰ কাৰণ জানা যাবে যখন অনাবিকৃত তথ্যসমূহ আমাদেৰ গোচৰে আসবে।

একটা কথা উপসংহাৰে আবাৰ বলতে হবে। বিজয়ী সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তি যুগে যুগে বিজিত মানুষেৰ বা জাতিৰ সঙ্গে যে ব্যবহাৰ কৰেছে, ইংৰেজ তাৰ চেয়ে খাপৰ কিছু করে নি ভাৰতৰ্থে। বৰং বলবো ইংৰেজৰ সাম্ৰাজ্যবাদ অন্যান্য সাম্ৰাজ্যবাদেৰ তুলনায় ভয় ও সহনশীল।

■ সমাপ্ত ■

শিকার

স্বৰ্গীয় গুহ

যুগে যুগে সেই চিত্তা শিকাৰীৰ ভয়ে
একটি হাতীৰ দাঁত কুড়িয়ে পেয়েছি বনেৰ ভিতৰে
তাই নিজে নিমিত্ত অসুখৰ আশা;
এবাৰ লভিব ৰাজ্য, উপস্থিত ৰমণীৰ প্ৰেমভাষ্যোবাণ
সপৰ্বে উন্নীত যুগ সমুদ্ৰ সমান,
ইশ্বৰেৰ দাদ?

চাই না কৰুণা দৰা, অলৌকিক ধৰণ
তিনখণ্ড যাদুযন্ত্ৰ হাতেৰ ভিতৰ।
প্ৰাজপতি ভবত এসো, যুধিষ্ঠিৰ নকুল সহদেব
পাৰ্থসাবথী এসো, কিশা ধৃত মহাদেব।
ক্ৰপদ-নন্দনী বাজি?
বাতি

প্রয়াসবাহুসী কথ্য

প্রয়াসবাহুসী—ডুমুরদহ

প্রয়াসবাহুসী থেকে ডুমুরদহ।
পদ্মাবতী কি করে পদীপিসী হন,
এর চেয়ে তার ভাল উদাহরণ বোধ
করি আর নেই। শব্দকোষে আছে—

‘প্রয়াসবাহুসী হুদাং যাস্যো, সরস্বত্যাস্তথোত্তরে
তদক্ষিপ প্রয়াগন্ত, গজাতো যমুনা গতা।’

প্রয়াসবাহুসীর দক্ষিণে সরস্বতীর
উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ। এখানে যমুনা
গঙ্গা হইতে পৃথক হইয়াছেন। ইহাষ্ট
অজুবেনী ত্রিবেণী।

এই প্রয়াসবাহুসী বা দুমনোদহের
উল্লেখ অনেক স্থানে পাওয়া যায়।
শ্রীচৈতন্যদেবের পরিজ্ঞান বর্ণনা করতে
গিয়ে গোবিন্দদাস এই দুমনোদহের
উল্লেখ করেছেন। এই দহের ঘাটে
বহাশ্রুত স্থান করেছিলেন বলেও জানা
যায়।

পূর্বকালে গঙ্গা কিছুটা বাঁকাভাবে
এসে অর্ধচক্রাকারে স্থানটিকে বেষ্টিত
করে বয়ে গিয়েছিল বলে দূর থেকে
গ্রামবাসিনিকে একটি দ্বীপের মত দেখাতো।
তাঁই কেউ কেউ স্থানটিকে ডুমুরদ্বীপ
বলেও বর্ণনা করেছেন। দিগ্‌বিজয়-
প্রকাশ গ্রন্থে পাওয়া যায়—

‘অহিপালো নাহেশে চ রাজ্যত্যাগ। চ
পশ্চিমে,
ত্রিবেণী সন্নিধানশ্চ চক্রদ্বীপস্য সন্নিবে।
ডুমুরদ্বীপ মধ্যে চ বসতি কৃতবান মুদা ॥’

অর্থাৎ কিনা অহিপাল নাহেশ
রাজ্য পরিত্যাগ করে ত্রিবেণী এবং
চক্রদ্বীপের নিকটবর্তী ডুমুরদ্বীপ মধ্যে
বসতি করেছিলেন।

এই অহিপাল রাজা মহিপালের
চাট ছিলেন এবং পরে তিনি নিজেও

গুপ্তগ্রামের রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন
বলে জানা যায়।

চক্রদ্বীপ অর্ধে চাকদহ। আর
চক্রদ্বীপ যদি চাকদহ হতে পারে,
পরবর্তীকালে ডুমুরদ্বীপেরও তবে
ডুমুরদহ হতে বাধা নেই।

ব্যাঙেন-কাটোয়া লাইনের ব্যাঙেন
হতে চতুর্থ স্টেশন ‘ডুমুরদহ’। দূরত্ব
প্রায় ১৫ কিলোমিটার। স্টেশনটি
সুবিধের নয়। কাঠকাটা রোডের
দু-দু শূন্য ‘শেড’হীন পুয়াটকরম। মাথার
ওপরে সূর্য এবং পারের নিচে লাল

পারুল ভট্টাচার্য

কাঁকরা। উভয়ের তাপই অসহ্য।
গ্রীষ্ম-বর্ষার যাত্রী-সাধারণের অশেষ
দুর্গতি হয় অনুমান করা গেল।

এগারজন সদস্য নিয়ে সম্প্রতি

গঠিত হয়েছে ডুমুরদহ গ্রামসভা।
প্রায় তিনহাজার লোকের বাস এখানে।
সর্বপেশার সর্ব জাতির লোকই আছে।
তবে কৃষিজীবী মহিষ্যের সংখ্যা
বেশি। ব্রাহ্মণকুলকে বাদ দিলে
মহিষ্য-প্রধান এলাকাই বলা যায়
ডুমুরদহকে। গোয়ালি এবং জাদি-
বাসীও আছে কিছু কিছু।

চাষের জমি ডুমুরদহের মাল নয়।
প্রধান ফসল ধান-পাট ছাড়াও কিছু
রবিবালের চাষও আছে। তবে সে
খুব বেশি উল্লেখ করবার মত নয়।
কয়েক হাজার বিঘে চরের জমি ডুমুর-
দহের গঙ্গার। জড়িল ধান, পাট,
সরষে, কলাই, উচ্ছে, তরমুজ, কাঁকড়া,
পটল প্রভৃতির অল্প ফলন এখানে।
চেঁটা করলে এবং বড় পেলে সে
ফলন আরও বাড়তে পারে বলেই মনে
হয়। মা ভাগীরথী ক্রমাগত পশ্চিম



ডুমুরদহ রেলস্টেশন। গেটহীন লেভেল ক্রসিংটি যাত্রী-সাধারণের পথ
চলাচলের পক্ষে একটি বিশেষ বিপদ বিপদের কুক্ষিমন্বরূপ

কুণ্ডে সরতে সরতে চলে গেছেন বহুবরে।
বেতে বেতেও এই দাঁত উঁকি চরভূমি-
গুলি দিয়ে গেছেন গ্রামবাসীদের,
জাঁর আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু দুঃখের
বিষয় আশীর্বাদ ক্রমেই অভিধানে
পরিণত হ'তে চলেছে। চরের
মাটির মালিকানা নিয়ে নিত্য ফাটাকাটি,
খপড়া বেগে আছে ভুমুরদহে। যে
বর্ষন পাঁচছে খানিকটা দখল করে
বুনে দিচ্ছে সরষে, কলাই, পাট কিংবা
মুনো। অর্থাৎ কাগজপত্র, মলিল-
মস্তাবেজের চেয়ে, চরের জমির
মালিকানায় গোয়ের জোরে ওপরেই
যেন বেশি ভরসা করতে চাইছে
ভুমুরদহবাসী। সরকারী ভূমিরাজস্ব
নিভাগও বড় কম দারী নন এর জন্য।
ভাঁদের দিক থেকেও উপযুক্ত অনুদান
করে যথাযথ মালিক নিরীচন ব্যাপারে
মগেই গাফিলতি আছে। যে বর্ষন
মাছে তাকেই চেক-পরচা কেটে
দিচ্ছেন তাঁরা। একই জমির জন্য
একই সময় দুই মালিককে একই
ধরনের চেক দিয়েছেন এমন নজিরও
আছে। চরের জমি এমন লোকের
হাতে গিরেও পড়ছে যারা আদৌ
চাষী নয়। ফলাফল যা হচ্ছে তাকে
আদৌ ভাব বলা যায় না। চাষবাসে
বিশ্ব হচ্ছে প্রচুর। নানা মালিকের নানা
মতের বিপাকে পড়ে জমির সেবা-পাট
হচ্ছে না ঠিকমত। ফলে ফসলের
ফলন যা হতে পারতো, তার চেয়ে
অনেক কম হচ্ছে।

শাক-সবজী, তরিতরকারি এবং
বনবিষয়ের প্রায় সবটাই ভুমুরদহবাসীকে
বাড়ির থেকে আমদানী করতে হয়।
অথচ শাক-সবজী এবং বনবিষয়ের
উৎপাদনে চরের জমি আদর্শ বললেও
চলে। কাজেই গ্রামবাসীরই আর্থের
প্রয়োজনে চরভূমির মালিকানা বিব্রাট
ব্যাসস্তব শীঘ্র মিটিয়ে কেনে উপযুক্ত
ফলন উৎপাদনের কাজে হাত লাগানো
দরকার।

জলকট ভুমুরদহে প্রচুর। কি
আবাদী জমিতে সেচের কিংবা সুন-

শান নিত্যব্যবহারের প্রয়োজনীয় জল।
আবাদী জমিতে সেচের প্রয়োজনে
একটি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে
ভুমুরদহে। চালু এখনো হয় নি, তবে
শীঘ্রই হবে বলে আশা করছেন
গ্রামবাসী।

কিন্তু আপাতত বেটা অসহ্য
হয়েছে, সেটা হল সুন-পান নিত্য
জনের অভাব। প্রথমত জনসংখ্যার
অনুপাতে নলকূপের সংখ্যা ভুমুরদহে
কম। দ্বিতীয়ত বেগুলি আছে,
সেগুলির অবস্থাও খারাপ—সব সময়েই
অচল হয়ে থাকে। তখনো বানু-
ভতি নলকূপগুলিতে জল পাওয়া
যায় না অনেক সময়েই।

এরজন্য মানুষ যত না দারী
পরিবেশ দারী তার চাইতে বেশি।
ভুমুরদহের ঠিক কোলবাহিনী গলা
এখন সরে গেছে অনেক দূরে। সামনে
পড়ে আছে ধু-ধু বিতীর্ণ চর। গ্রামের
তাবৎ দীর্ঘ, পুকুর এবং নলকূপের
জলও গঙ্গাগর্ভের আকর্ষণে অনুগামী
হয়েছে তারই। ফলে শুধু নলকূপ
কেন ভুমুরদহের পুকুর এবং দীর্ঘগুলি
প'স্ত শীতের হাওয়া বইতে না বইতে
তকোতে আরও করে এবং চৈত্র মাসের
শেষে আর একবিশুও জল থাকে না
কারো বুকে। দারুণ জলাভাব
এখানকার নিত্য সমস্যা। ফলে
মহামারী যদি কখনও দেখা দেয়,
তাকে দমন করাও হবে ওঠে আর
এক কঠিন সমস্যা।

এককালের গঙ্গাবিবোর্ড ভুমুরদহ
আজ ক্রমেই শুকিয়ে উঠতে
চলেছে। 'আছবীতীরে তুলাকাতর'
গ্রামবাসী বসে আছেন সরকারী
মালিকগোর আশায়। কখনও যদি
গঙ্গাগর্ভের চেয়েও গভীর করে
নলকূপ বসানো সম্ভব হয় তাকেই
তাঁদের এই বিষম জনকষ্টের উপশম
হটবে।

রাস্তাঘাটগুলি ভুমুরদহের আর
এক সমস্যা। কোন এক গ্রাম-

পথের পৌলশে মুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ
লিখেছিলেন—

'প্রায় ছাড়া ও রাঙা মাটির পথ
আমার নন ভুলায় রে।'

কিন্তু পথের মাটিটি যদি রাঙা না
হয়ে কিষ্কিৎ কালচে, অর্থাৎ কিনা এঁঠেল
হয় এবং কোন এক সাহসাদরের ভরা
বাসরে সেই পথে চলবার মৌজাগা
ঘটে কারও, তবে শুধু নন কেন
স্বনাম এবং পিতৃনাম উভয়ই ভুলে
যাবার ঘোরতর আশংকা আছে বলেই
আবার ধারণা।

অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে
ভুমুরদহে। নানা কারণে জনসংখ্যায়ও
প্রচুর। প্রথমেই উল্লেখ করা যাক—
ভুমুরদহ প্রবাল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যা-
লয়টির। ভুমুরদহ ছাড়াও আশ-
পাশের অনেক গ্রামের এবং ত্রিবেণী,
নিত্যানন্দপুর, নয়াগরিট, গোপালপুর
প্রভৃতি বহু দূর দূর গ্রামের ছাত্র-
ছাত্রীরাও পড়তে আসেন এখানে।
শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বেশির ভাগই
বহিরাগত।

এ ছাড়াও ঠাকুর প্রীতীশীতা-
রাম দাস ওঁকারনাথ প্রতিষ্ঠিত রামাশ্রম
এবং প্রীতীউত্তমানন্দ গিরী মহারাজ
স্থাপিত উত্তমাশ্রমের আকর্ষণেও বহু
লোকসমাগম হয় এখানে। পার্শ্ব-
বর্তী গ্রাম সিংজেকামালপুরের হাট
এবং আমাচি নামে উত্তমাশ্রমের রথ-
যাত্রা উপলক্ষেও লোকের ভিড় বড়
কম হয় না।

এহেন গ্রামের রাস্তাঘাটগুলি
যে অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়া দরকার,
সে বিষয়ে মতবৈধ নেই কারও।
গোনা গেল, প্রবাল উচ্চ বিদ্যালয়
সংলগ্ন রাস্তাটি যার দৈর্ঘ্য আড়াই
মাইল এবং যেটি রামাশ্রম ও উত্তমা-
শ্রমের সামনে দাদপুর-গাজীপুর হয়ে
সোজা চলে গেছে সিংজার হাটের
দিকে, সেই রাস্তাটিকে পাকা করবার
একটি পরিকল্পনা প্রায় বছর তিনেক

জীর্ণে গ্রামবাসী দিয়েছিলেন সরকারী পথ এবং পরিবহন বিভাগকে। আজও তার কোন উত্তর আসে নি। এই রাস্তাটির একটু ক্ষুদ্র ইতিহাসও আছে। একদা এই পথটি গ্রামবাসীরা স্বহস্তে প্রস্তুত করেছিলেন। খুড়ি-কোদাল হাতে নিয়ে, মাথায় করে মাটি বয়ে রাস্তাটি যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ আজও জীবিত আছেন। স্বহস্তে নিমিত কাঁচা পথটিকে পাকা দেখে যাবার তাঁদের ঘড় ইচ্ছা। আবেদন-নিবেদনও বড় কম হয় নি। কিন্তু ফল কিছু হয় নি। এখনও বর্ষাকালে ডুমুরদহ কদম-গনুয়ে পরিণত হয়। আপাতত একহাঁটু ধুলো ছোট ছোট ধূপি ছাওয়ায় উড়ে-উড়ে প্রায় আকাশ-গঙ্গারী ধুলিজালে আচ্ছন্ন করে রেখেছে গ্রামবাসীকে।

প্রধানমন্ত্রীর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা ১৯৪৬-এ। ডুমুরদহবাসী শ্রীপাঁচগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের দানে এবং উত্তমাপ্রমের অকুণ্ঠ আর্থিক সহযোগিতার বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উত্তমাপ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীবিজ্ঞানানন্দ মহারাজ। পূর্বাধ্যক্ষ শ্রীধুবানন্দ মহারাজের স্মরণেই নামকরণ হয়েছে বিদ্যালয়টির। ১৯৫৫ সনে সহ-শিক্ষার অধিকার লাভ করেছে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে মোট সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো। ছাত্রী ৯৪ জন; বাদবাকী সবই ছাত্র।

উচ্চতর মাধ্যমিক মান (বহু-ধনী) লাভ করলেও বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা এখনও ভাল নয়। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান আছে, কিন্তু গবেষণাগার এখনও তৈরি হয় নি। পরীক্ষার ফলাফল ভাল।

দূরবস্থা ডুমুরদহ আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয়টির। ছাত্র এবং ছাত্রী মিলিয়ে সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো, শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন



নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ও ধারনাথের আবাসবাড়ি

সাতজন। ঘর মাত্র দু'খানি, তাও খুব বড় নয়।

প্রায় একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের সমান এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এবং সাতজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দু'খানি মাত্র মাঝারি ঘরের ভিতর ভরে দিলে যা হয়, তাই হচ্ছে। লেখাপড়া যেমন তেমন, তাদের তুমুল গওগোল থামাতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের প্রাণান্ত। আশপাশে রৌদ্রতপ্ত ধূ-ধূ মাঠ। সুবিধেবদ একটা গাছতলাও নেই, যেখানে এই পলায়নপর কলরবধ্বংস শিশুপালের কিছুটা অংশকেও স্থানান্তরিত করা যায়।

কিমাশচর্য এই যে, যেখানে এতগুলি ছাত্রছাত্রী এবং তিনজন মহিলা শিক্ষয়িত্রী, সেখানে একটি বাথরুম, পাখানা বা একটি জল-কলের পর্যন্ত বন্দোবস্ত নেই। শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই বহিরাগত, তাঁদের অস্থবিধার কথা বলাই বাহুল্য। শোনা গেল ১২ হাজার টাকা খরচ করে উত্তমাপ্রমের কর্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করে দিয়েছিলেন একদা। তারপর সমর্পণ করে দিয়েছেন শিক্ষাবিভাগের হাতে। প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে তিন, সাড়ে তিন শো ছাত্রছাত্রী গভাই শ্রাবার বিষয়। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের গাফিলতিতে সমস্ত ব্যাপারটাই অব্যবহার্য পরিণত হয়েছে। গো-শালা পদ্ধতিতে আর যাই হোক, শিক্ষাদান যে হয় না এটা তাঁদের বুঝতে পারা উচিত।

ডুমুরদহ উত্তমাপ্রমের নাম দেশ-জোড়া। শ্রীমৎ স্বামী উত্তমানন্দ গিরী মহারাজ এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নীলকান্ত সিংহরায়। জাতিতে রাজপুত, ক্ষেত্রী। শোনা যায়, হলদিঘাটের বুড়ের সময় তাঁর পূর্বপুরুষ রাজপুতানা ত্যাগ করে চলে আসেন বাংলায়। বাংলা দেশে তখন বারভুঞার আমল। চাঁদ রায়, কেমার রায়, প্রতাপাদিত্য, দিশা ঝাঁ, প্রভৃতি মুঘল-বিরোধী রাজাদের রাজত্ব। তেমনই-কোন এক শক্তিমান রাজার অধীনে আশ্রয় নেন তাঁরা। পরে তারকেশ্বরের নিকটবর্তী কোটালপুর গ্রামে বসবাস করেছিলেন।

প্রথম জীবনে গৃহী ছিলেন উত্তমানন্দজী। পরবর্তীকালে এক বাঙালী সাধকের কাছে দীক্ষা নিয়ে পুরোপুরি সন্ন্যাস গ্রহণ করে

ভুবনেশ্বর এই নিবিড় অরণ্যচ্ছাদিত পদাতিরে এসে আনুমানিক ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমান আশ্রমের সুত্রপাত করেন তিনি। ধর্মের আদর্শে এঁরা কাশীর শ্রবণেশ্বর মঠের অনুগামী, বেদান্তে বিশুদী। বিখ্যাত বেদান্তবাদী এবং প্রচারক উমেশ গিরী রামগিরীর পন্থানুসরণকারী। কিন্তু ধর্মচর্চা ছাড়াও সমাজসেবার কাজেও এঁদের দান বড় কম নয়। আশ্রমের গ্রন্থাগারটিও চমৎকার। নাম মহিমানন্দ পাঠাগার। বহু দুষ্প্রাপ্য ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষিত আছে এখানে। উৎসাহী ব্যক্তি প্রয়োজন বোধ করলে আশ্রমে এসে পঠন-পাঠন করতে পারেন।

শিষ্য এবং ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি-স্বত্ব এবং বাগান-বাগিচাই আশ্রমের প্রধান আয়। এ ছাড়াও সমাগত দর্শক, শিষ্য এবং ভক্তদের প্রণামীর অর্থও আগে কিছু কিছু। ভুবনেশ্বর মূল আশ্রমটি ছাড়াও কয়েকটি শাখা আশ্রমও আছে এঁদের। বাঁকুড়া জেলার কাপিষ্টা গ্রামের কঁড়ো পাহাড়ে ভূপোবন আশ্রম, ক্ষীরপাই গ্রামে একটি আশ্রম এবং মগরার আনন্দময়ী আশ্রমটিও এঁদের পরিচালনাধীন।



শ্রীউত্তমানন্দ গিরী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত উত্তমাশ্রম

গঙ্গার ঠিক কোলটি বেঁধে আর একটি আশ্রম আছে ভুবনেশ্বরে। নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ প্রতিষ্ঠিত রানাস্রম।

ভারতবর্ষ অধ্যাপকদের দেশ। ব্যবহারিক জীবনের জড়তা-মুক্ততাকে অতিক্রম করে আপন পথখানি ঈশ্বরের পানে প্রসারিত করার দেশ। তাই বরনই এখানে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, বয়ে গেছে নাস্তিক আর জড়বাদের জোয়ার, তখনই যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটেছে একজন মহাপুরুষের। আপন অন্ত-আলোক-ধারায় সব অন্ধকার খুঁয়ে দিয়ে জাতিকে নতুন পথ দেখিয়েছেন তাঁরা, দিয়েছেন শাশ্বত সত্যের ইশারা। দ্বিতীয় দ্বন্দ্বকক্ষ-প্রতিদ এই সাধকের মধ্যে আবারও আমরা সেইরকম আর এক যুগ-পুরুষের সাক্ষাৎ পাই। একদা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে হরিনামের মহাপ্লাবনে শান্তিপুর ভুবুড়ু নদে ভেসে যার হয়েছিল। আজ আবার বহুদিন পরে তেমনই দেশ জুড়ে সেই কলি কলুষহারী মহামন্ত্রের হঠরোল তুলেছেন এই সাধক। অন্ধ, অজ্ঞ, উন্মার্গগামী জাতির সমুখে

নেলে ধরেছেন এক মহা পহার ইশারা।

ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের পূর্বপ্রাণের নাম ছিল শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পিতা প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়, মাতা মাল্যবতী দেবী। ভুবনেশ্বরে তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান এবং শৈশব-কৈশোর-যৌবনের লীলাভূমি। ১২৯৮ সালের ৬ই ফাল্গুন কেওটার মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। বিবাহ করেছিলেন, সন্তানাদিও আছে। একশ বছর বয়সে ত্রিবেণীর ঘাটে দিগমুখে নিবাসী শ্রীদামোদরী দেবের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ছগলী-বালী চৌলে সর্বাশ্রয় অধ্যয়নের পর ১৩৪৩ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ঠাকুর এবং নতুন নামকরণ হয়—শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ। কঠোর বঁধাশ্রমী এই মহাপুরুষ, তারপর হতেই নাম এবং বঁধাশ্রম ধর্মের পুনরুদ্ধার-কল্পে কয়েকবার সমগ্র ভারত পরিব্রমণ করেছেন তিনি।

ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ আছে তাঁর। দেবদান, আধিনারী, জয়গুরু, দি নামার (ইংরাজীতে) এবং পরমানন্দ নামে একখানি হিন্দী পত্রিকাও প্রকাশিত হয় তাঁরই তত্ত্বাবধানে। তুলসীদাসের রামচরিত নামক প্রভৃতি ঐশ্বর্যময় গ্রন্থেরও অনুবাদ করেছেন তিনি। দেশের পুরাতন দেবমন্দির এবং বিগ্রহগুলির উদ্ধার ও সংরক্ষণেও তাঁর দান অসীম।

গঙ্গার তীরে পঞ্চবটীর ছায়া-সুশীতল নিভৃতিতে রানাস্রম এক অপূর্ব শান্তির স্থান। সংসার-তাপদগ্ধ মানুষ তার অনেক তৃষ্ণার শান্তি খুঁজে পায় এখানে।

শ্রীব্রহ্মচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভাতা—ভুবনেশ্বরে তিনি কৃতী সন্তান। একাধারে সুলেখক, কবি ও সাধক। ঠাকুরের একমাত্র পুত্র শ্রীরঘুনাথ কাব্য ব্যাকরণভীর্ণ সুপণ্ডিত ও দেবদান পত্রিকার সম্পাদক।

রাধারমণ সঙ্গিলন সত্বে এখানকার

এক প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে এর প্রথম প্রতিষ্ঠা। ডুমুরদহ এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের উন্নয়নমূলক নানা পরিকল্পনা নিয়ে প্রথম সুদ্রপাত হয় এই প্রতিষ্ঠানটির। প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীউমানন্দ মহারাজ, রাজেন্দ্র রায়বন্দ্যোপাধ্যায়, হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই ডুমুরদহের কৃতি গুণ্ডান ছিলেন এবং নানাপ্রকার জনহিতকর কাজে ভীষন উৎসর্গ করে গেছেন। রাধারমণ সন্মিলন সভায় ডুমুরদহ এবং তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির উন্নতি বিষানে সক্রিয় এবং সচেষ্ট ছিলেন, আজও সেই পুরাতন আদর্শেই আত্মবান আছেন এঁরা। গ্রামোন্নয়নের সবরকম বিভাগে রাধারমণ সন্মিলনের দান আজও বড় কম নয়। নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে এঁদের। গ্রন্থসংগ্রহ প্রায় দেড় হাজার এবং বহু দুর্লভ গ্রন্থও সংগ্রহে আছে। বর্তমান পরিচালনায় আছেন শ্রীপুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীপুরজয় রায়-বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেলাখুলার এদিকের মধ্যে ডুমুরদহের একটি বিশেষ খ্যাতি আছে। উদ্যোক্তা এই রাধারমণ সন্মিলনী সমিতি। এঁদের রাজেন্দ্রকুমার শীলডের খেলা খেলতে হাওড়া থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত নানা দলের আগমন ঘটে এখানে। আশা করি ১৯২০-২১ থেকে এই শীল্ডটির খেলা আরম্ভ হয়েছে। তারও পূর্বে ছিল রাধারমণ শীল্ড। সেটি বর্তমানে এঁদের কাছে নেই। বহুদিন পূর্বেই সেটি এঁরা চুঁচুড়া টাউন ক্লাবকে দান করে দিয়েছেন।

রাধারমণ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। ডুমুরদহের প্রাচীন জমিদার রায়বন্দ্যোপাধ্যায়দের গৃহদেবতা কৃষ্ণদেবতার বিগ্রহই রাধারমণ নামে পরিচিত। এই রাধারমণ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ



ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে টালির চালা আচ্ছাদিত ঐ ক্ষুদ্রাকার ঘর দুখানাই ডুমুরদহ আশুতোষ প্রাথমিক বিদ্যালয়

কিংবদন্তী আছে। শোনা যায় ইনি সন্ন্যাসীর ঠাকুর। একদা এক সন্ন্যাসী এই বিগ্রহ নিয়ে গঙ্গাতীরে এসে বসবাস করতে থাকেন। তৎকালীন জমিদার রায় রত্নেশ্বরের স্ত্রী আনন্দময়ী দেবী প্রত্যহ প্রভাতে এই বিগ্রহকে প্রণাম করতে যেতেন। একদা কোন কার্য উপলক্ষে কিছুদিন বাইরে যাবার প্রয়োজন হয় সন্ন্যাসীর। আনন্দময়ী দেবীর ওপরে তিনি বিগ্রহের সেবার ভার দিয়ে যান। কাজ শেষ হলে কিরে এলেন সন্ন্যাসী। ক্রমে তাঁর যাবার সময় হল। বিগ্রহ তুলতে গিয়ে অবাক হলেন তিনি। ক্ষুদ্র বিগ্রহ যেন বিশুদ্ধতার ভাবে পরিণত হয়েছে। সন্ন্যাসীর একার পক্ষে সে ভার উত্তোলন করা তো সম্ভব হইত না, ক্রমে সমস্ত গ্রামবাসী এসে একত্র চোঁটা করেও বিগ্রহকে এক তিলও সরাতে সমর্থ হলেন না। লোকমুখে সংবাদ পেয়ে আনন্দময়ী দেবী এলেন এবং সচকিত সকলের চোখের সামনে কোলের শিশুর মত বিগ্রহ তুলে নিলেন বুকে। মুগ্ধ সন্ন্যাসী ঈশ্বরের অতিপ্রায় বৃত্তিতে পারলেন, বিগ্রহ আনন্দময়ী দেবীর

হস্তে সমর্পণ করে প্রস্থান করলেন তিনি। আনন্দময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত রাধারমণের সেই পুরাতন মন্দির আজও আছে। সম্প্রতি শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওজারনাথের আদেশে এক নৃত্য মন্দির নির্মিত হচ্ছে রাধারমণের। শোনা গেল একটি দুর্গামণ্ডপ এবং শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হবে ঠাকুরেরই নির্দেশে।

ডুমুরদহ সাম্প্রতিক সম্বন্ধে ডুমুরদহেরই আর একটি সবপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। গ্রামোন্নয়নের সংকল্প নিয়েই ভিত্তি স্থাপন এরও। কিছু কিছু কাজও করছেন এঁরা। এরই মধ্যে গ্রামের এখানে-ওখানে লেগেছে এঁদের কর্মোদ্যমের ছাপ।

ডুমুরদহের রায়বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কথা না বললে ডুমুরদহের ইতিহাসের অর্ধেকটাট বাকী রয়ে যাবে। রায়বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ এখানকার প্রাচীন জমিদার বংশ। এই বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা রায় রত্নেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন জমিদার গিরিধর চৌধুরীর কন্যা আনন্দময়ী দেবীকে বিবাহ করে এখানেই বসবাস করেছিলেন।

বিহার মসনদে তখন শাহানশা আলমগীর। রতেশ্বর কানুনগো রাজা দর্পনারায়ণের অধীনে প্রধান মহারাজ কাজ করতেন। নানা কারণে তাঁকে শাহী দরবারে সম্রাটের সংস্পর্শে আসতে হ'য়েছিল। শাহানশা আলমগীর তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ কার্যক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হন। এবং 'বাবু', 'মজুমদার', 'রায়' প্রভৃতি নানা উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেন। প্রচুর ধন-মত্ন এবং কিছু ভূসম্পত্তি দিয়ে-ছিলেন বলে জানা যায়। ক্রমে রাজা দর্পনারায়ণ বৃদ্ধ এবং অশক্ত হয়ে পড়লে রাজকর্মের সমস্ত দায়িত্বই রতেশ্বরের পর এসে পড়ল। রাজার খাস পাঠাও তিনি ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারতেন।

এইসময় একবার নবাব মুশিদকুলী খাঁ এক মিথ্যা হিসাবপত্রে রাজা দর্পনারায়ণের পাঠা ব্যবহার ক'রতে চেয়ে রতেশ্বরকে অনুরোধ জানান। কিন্তু বৃদ্ধ প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রতেশ্বর রাজী হলেন না।

অনুরোধ, উপরোধ ও শত প্রলোভন যখন ব্যর্থ হল, তখন ক্রুদ্ধ নবাব তাঁকে কারাক্ষ কর রেখে দিলেন। সাতদিন প্রায়োপবেশনের পর সেই-খানেই মৃত্যুবরণ করেন রতেশ্বর। তাঁর পত্নী আনন্দময়ীও কীতিমান পুরুষের যোগ্যতম সহধর্মিণী ছিলেন। সাধবী, ভজিনী এবং অত্যন্ত তেজ-স্বিনী এই মহিলা সম্পর্কেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে এখানে।

নবাবের নির্ধাতন রতেশ্বরের মৃত্যু এবং ভজিতে সন্তুষ্ট করে আনন্দময়ীর রাধারাণী প্রাপ্তির ঘটনা দুইটি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পরীগাথা কাব্যে উল্লেখ করে গেছেন—

‘যবে শত প্রলোভনে হইল ব্যর্থ
নবাব মর্মহীন,
করিয়া বন্দী আঁধার কক্ষে
দীর্ঘ গণ্ড দিন,
রাখিলেন তাঁরে, নাখিলেন তিনি
তাঁর যে ধর্মমত
নড়িল না তিল, না দিলেন তবু
মিথ্যা দস্তখৎ।’

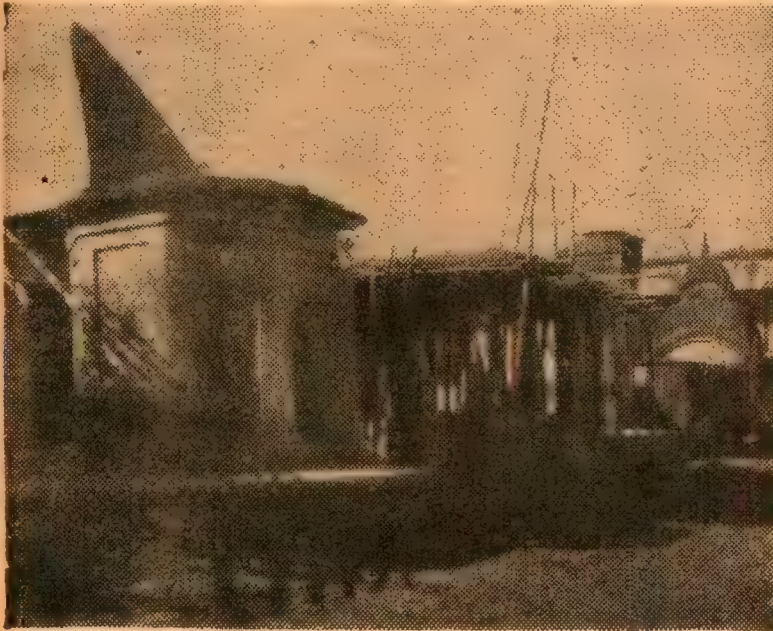
‘বিখ্যার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়
এ মম্ব বাঁহার ইষ্ট
ভজিরূপিণী পত্নী বাঁহার
ভজিতে করি তুষ্ট
করিয়া বন্দী বিশু-বিধাতা
ভজির ভগবান,
রেখেছেন ওই মন্দির-মাঝে
এখনও বর্তমান।
সেই পুণ্য হাতের গঠিত এ ভূমি
সে পুণ্য হাতের অর্ধ
রতেশ্বর সাধনাক্ষেত্রে
আনন্দময়ীর স্বর্গ।’

রায়বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে বহু কৃতি স্মরণ্য পুরুষ অনুগ্রহণ করেছেন। রাজেন্দ্র রায়বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বর্তমানে এই বংশে আর একজন কৃতি পুরুষ আছেন সুলেখক শ্রীপুরুষ রায়-বন্দ্যোপাধ্যায়, এ ছাড়াও আরও একটি বিখ্যাত নাম উল্লেখ করা যেতে পারে ডুমুরদহ প্রসঙ্গে। বিখ্যাত খেলোয়াড় ও মৃষ্টিযোদ্ধা শ্রীবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ও এই ডুমুরদহের সন্তান।

আর এক প্রসিদ্ধি ছিল ডুমুর-দহের—ডাকাতে ডুমুরদহ বলে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর স্মরণ্য কাব্যে লিখেছেন—

‘ডাকাতে ডুমুরদহ এবে ভয় নাষ্ট
খালের উপরে সেতু নবীন সরাই।’

ডুমুরদহবাসীর লজ্জিত হবার কিছু নেই। তৎকালীন জমিদারদের অধিকাংশই ছিলেন ডাকাতি। দিনে রাজগী, রাতে ডাকাতি। জমিদারী রক্ষার এ এক অঙ্গবিশেষ ছিল বললেও চলে। এবং এর ব্যতিক্রমও বে ছিল না এমনও নয়। আত্মরক্ষা এবং সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনে তৎকালীন জমিদারদের প্রায় সকলকেই লাঠিয়াল রাখতে হত এবং এইসব লাঠিয়াল সর্দারদের বেশির ভাগই ছিল কুখ্যাত দস্যু। ডুমুরদহের কেনারাম গোপ বা কেনা সর্দার এমনই এক কুখ্যাত।



ডুমুরদহের রায়বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্রাচীন গৃহবিগ্রহ শ্রীরাধারাম-জীউর নিম্নমিমাণ নতুন মন্দির

জাঠেল দস্যু। পুলিশ তাকে ধরতে
পারলেও জেল কর্তৃপক্ষ তাকে আটকে
রাখতে পারেন নি। ছগলীর জেল
ভেঙে উধাও হ'য়েছিল সে।

ডুমুদহের বিশেষ ডাকাতও এমন
কোন এক ডাকাত জমিদার কিনা
দাঠিক করে তা জানা যায় না।
ডুমুদহের জমিদার বংশের নাম-
তালিকায় বিশেষুদ নামধারী কোন
ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না।
হতে পারে তিনি হয়তো ছদ্মনাম
ব্যবহার করতেন। কেউ কেউ
তাকে বিশুনাথ বাগদী বলেও উল্লেখ
করেছেন। তাও অসম্ভব নয়।
লাঠিবাঁজী এবং দস্যুবৃত্তিতে বাগদী
জাতি চিরকালই দক্ষ।

কর্মে ভাকাত হলেও আচরণে
বিস্তৃত ভাকাত ছিলেন প্রায় সম্ভাষণের
ইংলণ্ডীয় নাইটদেরই মত। শোনা যায়
আগে পত্র দিয়ে তিনি ভাকাত কবিতা
যেতেন। নাবী এবং শিশুর শব্দে
হস্তক্ষেপের ব্যাপারে তাঁর ছিল কঠোর
নিষেধ। সে নিষেধ যদি কেউ
অমান্য করতো তবে তাঁর শাস্তিও
হতো কঠোরতর। লুণ্ঠিত সম্পদ
আপন বিলাসবাসনে ব্যয় করতেন
না তিনি। ধনী ধন লুণ্ঠন করে
দরিদ্রদের মধ্যে অকাতবে বিলিয়ে
দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এক
কথায় বাংলার রবীন্দ্র ।

অনুমান ১৮১৮ খৃস্টাব্দে কোন একসময় কোন এক ডাকাতিসূত্রে তিনি ধরা পড়েন এবং ছগনী জেলে তাঁর কাঁসী হয়।

ডুবুদহের কেশব বায় এবং
শুশান বায়ও ছিলেন দুর্ধর্ষ ডাকাতি।
নৌকাযোগে ডাকাতি তাঁরাই ছিলেন
আবিষ্কৃত। এই দুই দস্যুর ভয়ে
জল-স্থলের মানুষ ধরহবি, কাঁপতো।

কিন্তু এহেন দুর্ঘটনা ডাক্তাররাও
 • একবার বেদম জ্বল হয়েছিল বহু
 কিংবদন্তীর নায়ক বিশ্বাত শক্তিশ্বর
 • আশানন্দ টেকীর হাতে।

আশানন্দ তখন গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে গোমস্তার চাকরী করতেন। শোনা যায় একবার বহু টাকা সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে হুগলী থেকে তিনি গুপ্তিপাড়ায় যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে ডুমুরদহের এক দীঘির ধারে বসে সেবে নিচ্ছিলেন মধ্যাহ্নের আহার। এমন সময় হঠাৎ দেখেন দুর্ব্ব্ব চেহাবাব দুই লাঠিয়াল তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আশানন্দ তাদের ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললে— ডুমুরদহে কিসের ভয় আন না? উত্তরে মৃদু হেসে আশানন্দ তাদের লাঠি দুটি কেড়ে নিলেন এবং দুই লাঠিয়ালকে দুই বগলদাবা করে গুপ্তিপাড়ায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। লোহার কড়ির মত তাঁর বিপুল দুই বাহুর চাপে লাঠিয়াল দুজন ততক্ষণে অস্তায় হয়ে গেছে। চোখেমুখে জল দিয়ে তাদের চেতনা ফিবিয়ে আবার ডুমুরদহে ফিরে পাঠিয়ে দেন আশানন্দ। অবশ্যই বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রসাদাদি খাইয়ে।

কিন্তু এ সবই হ'ল গল্প-কথা।
কিছু সত্য কিছু মিথ্যায় জড়ানো।
মানুষের কম্পলোককে যা আনন্দ
দিয়েছে চিৎকাল। এখন আসা
যাক বাস্তবের কথায়। একদা
ডুমুরদহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র
তাঁর পল্লীগীতা কাব্যে লিখেছিলেন—
একদিন বটে ছিল এ পল্লী

শাস্তির-লীলা বিলাসকুঞ্জ
সম্পদ সুখস্বৰ্গ
ষষ্ঠেব ভীষ্ম দৰ্শ।

আজকের 'ডুমুদহে' না আছে
ডাকাত না আছে জমিদার; না
আছে সেই অতীত সম্পদ স্নানস্বর্গের
কোন লেশমাত্র। অন্তর্গত সমৃদ্ধির
স্মৃতিচিহ্নমাত্র বহন কবে দাঁড়িয়ে
আছে প্রকাণ্ড জমিদারবাড়ি।
প্রাচীনত্বের ছাপ তাব সর্বদে।
জরায় জীর্ণ হবোছে মন্দিরগুলি,
দনস্পত্তির শিকড়ে বিভক্ত তাদেরও

অজ-প্রভাঙ্গ। একদিন এৰ শ্রী ছিল,
 সুখ ছিল, শান্তি ছিল। শ্রান্তি
 এবং অধ্যাত্মি দুইটি ছিল সমভাবে।
 তাবপর মহাকাল এসে হাত বাড়ালে
 কালের পাণ্ডনা পুরো ববে দিলে
 হাতে যা রইলো ডুমুদহেব ত
 শুধুটি বিগতের ভগ্নাংশমাত্র।

তথাপি ইতিহাস নব নব নীতির
জীবনের যতি নেই। হীন্দু
চলেছে অধ্যাত্ত, অধিষ্ঠিত গতিতে।
আজকের ডুমুরদহে নূতন ইতিহাস
রচিত হচ্ছে গুপ্তাবিধানের পদস্পর্শে,
রাশিধর্মের নিভূতে, বিদ্যালয়, গ্রামপায়
আর হয়তো বা এ আশ, জ্ঞান, বটু
তেতুলের ছায়ায় ঢাকা এ বুলিকীর্তি
পল্লীপ্রাঙ্গণের একপ্রান্তে লুকিয়ে
থাকা কোন এক ঝড়ো কুন্ডির
একান্ত অস্ত্রাতে গড়ে উঠছে অগাধ
কোন নূতন যুগের নবনব সত্রপাত।

(আলোকচিত্র লেখিকা বর্ডন গ্রহীত)

রোমাঞ্চ উপন্যাসের দাহুকর

✓দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
প্রশ্নাবলী

১ম ভাগে—এখানি সুবৃহৎ ডাটেকাঠ

উপস্থাপন, মূল্য ৩০ টি

২য় ভাগে—খানি বহু উপভাগ ।

युग्य अ।०

জাতীয়-কবি রক্তমাংস বঙ্গোপাখ্যানে

ରଞ୍ଜିତ-ପ୍ରାଣୀ

পদ্মিনী, সুব্রহ্মলয়ী, কৰ্মদেবী, দুৰ্গ-
 স্তম্ভ, মীত্ৰকুন্তলাঙ্গি, সাধী-বাবো,
 কবির জীবনী । ৭মামি এড্রে ২০০ ৷

ଆମାକାନ୍ତ ଉତ୍କଳକାବନ ଗଙ୍ଗାଦିତ

বাড়ীজ্ঞান-এদৌপকা

(ନାହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାମ୍ବା ମୋଟା ଜିର୍ଣ୍ଣ ଓ

मन्त्रधारि निरुद्धः)

मुन्ना एक डोका

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,

कानिकाता-१२

অন্ধ জিহ্বা

জুস্টিন গায়



অসিন্দে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তারি সন্ধ্যার একটা জায়গায় তাই।
সে এসে পৌঁছেছে এ বিষয়ে তাদের
কোনো সন্দেহ নেই। ওদের
আলোচনার মধ্যে লক্ষ্য ছিল মাত্র দুটি
প্রাণী, সে দুজন হচ্ছে দিবা ও সুহাস্ত।
কেন, নাটক লিখতে হলে তার
নায়িকা জোগাড় করতে হবে এমন
একটা বনবাদাড় থেকে? কেন, নায়িকা
কি পাওয়া যায় না হাতের কাছে,
নাগালের মধ্যে। দেখার চোখ থাকে
চাই। তেমন চোখ থাকলে একেবারে
পাশের মানুষটির মধ্যে থেকেও পরম-
বস্ত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে। তেমন-
ভাবে যদি আবিষ্কার করত তাদের
সুহাস্ত, তাহলে সেই বেহালার
দায়বাহাদুর রোড থেকে এমন বাহাদুর
সেজে তাদের আসতে হত না এতদূর।
আর, দ্বিতীয়টি—এ দিবা দেবীটি?
মুখে বং মেখে মস্তে উঠে একটু-আধটু
ফটিনটি কবা আর চোখের আর ভুরুর
একটু ভঙ্গি কবা যার কাজ, সে কি না—

‘ইয়েস’, দীপক বলল, ‘ঠিক
কথা। নিজেদেরই গাল না দিয়ে
গাবছি নে। মহিলাটি ভীষণ মহিলা।

আমাদের মতন স্মার্ট ইনটেলিজেন্ট
আর শার্প পাঁচটি ইয়ংল্যানকে একেবারে
নাচিয়ে ছাড়ল, একেবারে, ইয়ে,
বঁদব-নাচ।’

‘তা ঠিক।’ মনোজ বলল, ‘গায়ে
লাগছিল যখন ঠাণ্ডা হাওয়া, তখন
গাড়িটার মধ্যে গায়ে গা লাগিয়ে আঁট
হয়ে থাকার সময় আমরা কিন্তু বুঝেই
পানি নি যে, কান অঙ্গুলিনির্দেশে
আমরা চলছি। তখন হয়তো এ
আমেজটা অনুভব করছিলাম, আর
মনে-মনে আবৃত্তি কবছিলাম—’

‘কি কি?’ জিজ্ঞাসা কবে উঠল
দীপক।

‘আবৃত্তি কবছিলাম—অমৃতসরস
তোবার পবন। আর, আর—’

আলোচনাটা একটু সবল হয়ে ওঠার
ওদের মন বুঝি একটু হালকা হয়েছে।
সকলে নড়ে-চড়ে এমনভাবে দাঁড়াল যে,
মনোজের মুখটা যেন সোজাসুজি দেখা
যায়।

মনোজ একটু হেসে বলল, ‘আর,
আড়-চোখে এ চোখের দিকে চেয়ে
হয়তো বিগলিত হয়ে উঠছিলাম, আর

মনে-মনে বলছিলাম—তোমার নয়নে
দিবা বিভা।’

কথা তো হচ্ছে দিবাকে নিয়েই।
কিন্তু ব্যাপার কি দিবার? সে গিয়ে
চুকল এ বিবরে, কিন্তু বেরোবার যে অঁর
নাম করে না? এরা এভাবে এখানে
দাঁড়িয়ে থাকবে আর কতক্ষণ?

মেয়েটাকে নিয়ে তাই অনেক
রহস্য করতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা
ক্রমেই একটা ভীষণ রহস্য হয়ে উঠছে
যেন। এই প্রকাশ্য দিনের আলোর
এ রহস্যজনক বাড়িটার মধ্যে মেয়েটা
খুন হবে গেল না তো? সুহাস্তর
এই ‘অচিনপূর্বী’র সবই তো তাদের
কাছে অচেনা। ভিতরে কি আছে,
বা না আছে সবই তাদের কাছে
অজ্ঞাত।

তাদের কিছুক্ষণ আগেই উৎকণ্ঠা
এবার দুশ্চিন্তায় দাঁড়িয়ে গেল।

নীহার কিছুক্ষণ থেকেই একটু
ছটফট করছে। এবার সে বলেই
ফেলল, ‘এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।
আমি এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি।’

অকস্মিক তাকাল নীহারের মর্শের।

দিকে। নীহারের মুখে ব্যস্ততার ছাপ স্পষ্ট দেখা গেল।

দীপক বলল, 'আমিও তাই বলি। একজনের অন্তত যাওয়া দরকার। নীহার যখন আমাদের পাঠলট, তখন ও-ই থাক'।

দীপকের মুখের দিকে আড়-চোখে তাকান নীহার, একটু হেসে বলল, 'গাড়ি যারা চালায় লোকে তাদের বলে গাড়োয়ান, তুমি যে আমাকে সম্মান আনিতে নতুন আখ্যা দিলে এজন্যে ধন্যবাদ। যাঠ হোক, আমি যাচ্ছি—'

নীহার রওনা হল। আগাছান ওপর পায়ের মজবুত চাপ দিয়ে দিয়ে সে এগিয়ে লাগল। নীহার কিছুটা এগিয়েছে, অমনি দোতলার বারান্দায় আবর্তিত হল দুটি মূর্তি—দুটি নারী-মূর্তি।

চমকে তাকান ওরা। চোখের রোদ আড়াল করে ভালো করে চেয়ে দেখার চেষ্টা করল। দেখতে গেল, একটি মূর্তি দিবার, অন্যটি—

তেনহাংগুর দুই নারিকা ওরা। বেশ ভালো করেই বুঝতে পারা গেল।

ইশারা করছে দিবা। ইশারা করে থাকছে ওদের সকলকে। ইশারাটা ভালো করে বুঝে নিয়ে যখন ওরা নিশ্চিত হল যে, সত্যিই ওদের থাকছে তখন ওদের মনের মধ্যে মুখি এসে গেল উন্নাস আর আনন্দ।

নীহার একটু এগিয়ে আছে। ওরা চারজন এগিয়ে গিয়ে সজ নিল তার। তারপর একসঙ্গে যাত্রা করল অচিনপুরীর অঙ্গরমহলের উদ্দেশ্যে।

ওরা যাত্রা করল। আমরা এবার এখান থেকে বিদায় নিতে পারতাম। বিদায় নিতে পারতাম এইজন্যে যে, অনেকদিন ধরে জল্পনা-কল্পনা করে তারা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে, সে উদ্দেশ্যে এবার তাদের সফল হয়েছে। তারা দর্শন পেয়েছে

তাদের নায়িকার। তারা অধিকার পেয়ে গিয়েছে সেই নায়িকার সম্মুখে যাবারও। সুতরাং তাদেরও কাজ সমাপ্ত, আমাদেরও কাজের ইতি এখানেই।

আমরা চলে আসব বলে স্থির করেছি, এমন সময়ে হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দে আকাশ উচ্চকিত হবে বেজে উঠল ছটসল্। বাঁশির শাণিত শব্দে দিগন্তকে দুভাগ করে দিয়ে তীরবেগে ছুটে গেল একটা ট্রেন।

চমকে উঠে থমকে দাঁড়ানাম একটু। দেখতে পেলাম, পাঁচটি পুরুষ-মূর্তি ঐ বারান্দার ওপরে এসে দাঁড়াল। ওরা কোনো ইশারা করল না আমাদের। কিন্তু ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে ওভাবে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে আমরা বিস্মিত হলাম।

চলেই আমরা আসতাম। কিন্তু চলে আসতে পারা গেল না। ওদের কি হল, তা জানার আগ্রহ হল খুব।

আমাদের কাজের ইতি হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল আমাদের। হয়তো হয়েছিল ইতি। কিন্তু ইতির পবেও থাকে পুনশ্চ।

সুতরাং ওদের ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত করার পরও, পুনশ্চ অনুসরণ করতে হল ওদের।

সব বিধা জলাঞ্জলি দিয়ে, যাবতীয় আগাছার বাধা অগ্রাহ্য করে ধীরে-

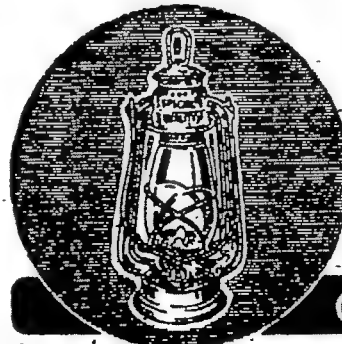
ধীরে এগিয়ে গিয়ে আমরা অশ্রু সন্তর্পণে আর অতি সাবধানে প্রবেশ করলাম ঐ অচিনপুরীতে।

বাইরে এখন প্রবল আনন্দ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। কিন্তু ঐ পুরীটির অন্দরে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরই দেখি ক্রমে ক্রমে আসছে আলো, ক্রমশঃ ক্রমে উঠছে অন্ধকার। ভিতরটা নির্জন আর নীরব। ভিতরটা অন্ধকার। বিরাট ঘবটির দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি আলমারি ও মেঝেব মাঝখানে পাথরের মূর্তি বসানো। অন্ধকারে মূর্তিটার চেহারা ভালো করে দেখা গেল না। জানি নে, কিসের শব্দ হল। হয়তো অচেনা পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠেছে চামচিকে।

ডান দিকে প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি কয়েক বাপ উঠেই দুদিকে দুভাগ হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যাচ্ছি, এমন সময়ে আর্তনাদের মত কবে বেজে 'উঠল' একটা গলা—'কে, কে, কে?'

উত্তর না দিয়ে ধীরে-ধীরে ওপরে এসে দাঁড়াতেই একজন বৃদ্ধা এগিয়ে এল, বলল, 'কে?'

তার মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে রওলাম কিছুক্ষণ। এই জনহীন প্রাসাদের প্রেতিনী বলে মনে হল একে। শরীর শিউরে উঠল।



কিষান
লন্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস এণ্ড কো

ফোন-২২-৬৫৮০

২৬৬, ৩৬৬ চীনা বাজার স্ট্রিট, কলিকাতা-২

আবার সে জিজ্ঞাসা করল,
'কে গো? কে তুমি?'
উত্তর দিল না।

আমাকে এভাবে নিকটর দেখে
সে হয়তো ভয় পেয়ে গিয়ে থাকবে।
অট্টহাস্য করতে গিয়ে হঠাৎ আত্ননাদ
করে উঠল বুড়িটা।

পাশের একটা ঘর থেকে কে
যেন বলে উঠল, 'কি হল রে? কি
হল তোমার মহাশয়।'

বুড়িটা বলল, 'কে এসেছে
দেখ। কানা, না, বোবা, না,
বোম্বটে—কিছু জারি নে। কথার
উত্তর দিচ্ছে না কিছুতে।'

তাকে প্রবোধ দেবার মত করে
ভিতর থেকে আওয়াজ এল, 'কেউ না,
কেউ না। চুপ কবো।'

ওপবে বারান্দার ওয়া পায়চারি
করছে বিচ্ছিন্নভাবে।

দিবা বুঝি এতক্ষণ কথা বলছিল
স্নেহাংগুর নারিকার সঙ্গে। ঘর
থেকে বারান্দার বেরিয়ে এল সে
বিমর্ষ আঁচ বিম্ব মুখে। বলল,
'একটু আগে আন্দাজে যা বলেছি
তাঁই ঠিক—পাখর, পাখর।'

স্নেহাংগুর মুখের দিকে তাকাল
সকলে। তার মুখের দিকে তাকাবার
কারণ এই যে, যার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে,
সে স্নেহাংগুরই নারিকা, এবং তার
নারিকা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব যেন
স্নেহাংগুরই একার।

কিন্তু ভারী মজাব ব্যাপার তো।
প্রাসাদতুল্য এই বাড়িটার বাসিন্দা
নেই আর কেউ। ওরা মাত্র দুজন
নাকি বাস কবে এখানে—স্নেহাংগুর
এ নারিকা আর তার সঙ্গী ঐ বৃদ্ধাটী।

এই বিরাট বাড়িটার মধ্যে বুঝি
স্বচ্ছবলিদী হইতে আছে ওবা
দুজন। কিন্তু ওরা কান? এবং ওরা
কেনই বা এখানে?

দিবার চোখ-দুটোও যেন পাখর
হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নেও যা ভাবে নি,
এখানে এসে সেই অসম্ভব একটা
পরিবেশের মধ্যে পড়তে হয়েছে তাদের।

দিবা তার সঙ্গীদের ছেড়ে দিয়ে
একা গিয়ে বসেছে স্নেহাংগুর
নারিকাকে নিয়ে। দক্ষিণ-কোণের
ঘর উঁচু পালঙ্কের ওপর বসেছে সে
ঐ মেয়েটিকে নিয়ে। ধীরে-ধীরে সে
তাকে প্রশ্ন করছে নানারকম, কিন্তু
একটা কথারও উত্তর দিচ্ছে না সে।
কেবল অপরক চোখে চেয়ে বসে
আছে চুপ কবে।

তার হাতটা দিবা নিজের
হাতের মধ্যে গিল। কবুতবের গায়েব
মত নরম হাতটি যেন কাঁপছে। অনেক
দিন হয়তো এমন স্পর্শ পাব নি মেয়েটা।

দিবা বলল, 'মেয়েদের জীবনটা
বেশ মজার, তাই না? তারা কোনো
কথা খুলে বলে না, তাই কতজন
তাদের নিয়ে কত মজার গল্প বানায়।
কত নাটক লেখে, কত উপন্যাস
লেখে। তারি মজা লাগে এতে
আমার। আমার মজা নেগেছিল,
তাঁই তোমাকে দেখাব এমন আগ্রহ
হয়েছিল আমার। তাই তাই এত কষ্ট
কবে এত দূরে আসা।'

একটু থেমে দিবা বলল, 'তবে
খুলে বলি। তুমি কিছুই জান না,
কিন্তু তোমাকে নিয়ে নাটক তৈরি
হয়ে গিয়েছে একটা। সে নাটকে
তোমার নাম কি দেওয়া হয়েছে
জান?—কুমরা। আরও মজা কি
জান?—সে নাটকে কুমরার তনিকার
অভিনয় করেছে আমি।'

অপরক চোখে চেয়েই আছে
মেয়েটি, কথা বলছে না, কথা
বলতে বুঝি পারছে না সে।

দিবা বলল, 'নাটকে তো তোমার
নাম হয়েছে কুমরা। তোমার আসল
নামটা কি তাঁই?'

হাতে একটু চাপ দিয়ে দিবা
আবার বলল, 'বলোই-না। কি নাম
তাঁই তোমার?'

ঠোঁট-দুটো কেঁপে উঠল একটু,
অস্বুটে কি যেন বলল। বুঝতে না
পেরে দিবা আবার বলল, 'কি বললে?
কি নাম?'

'ইন্দ্রি।' বেশ স্পষ্ট করেই সে বলল
এবার নিজের নামটা।

তারপর একটু থেমে নিয়ে ইন্দ্রি।
জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বলব, না আপনি
বলব আপনাকে।'

'তুমি বলবে। আমিও প্রথম
থেকেই তুমি বলছি।'

একটু মুনি হাসল ইন্দ্রি।, তারপর
বলল, 'আর, তোমার নাম? তোমার
নামটা কি এবার বলো।'

দিবা বলল, 'আমার নাম দিবা—
দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এটা
আমাব শব্দের নাম, স্নেহের নাম
নয়।'

কিছু বুঝতে না পেরে ইন্দ্রি।
বলল, 'স্নেহ শব্দ—ওসব আবার কি?
কিছু বুঝলাম না।'

দিবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে
বলল, 'শব্দ নাটকে অভিনয় করি
আমি। ও-নামটা আমার সেই অভিনয়
নেত্রীর নাম। কিন্তু অন্য-একটা
নাম আমার আছে, সেটা আমার
নিজের নাম।'

'কি সেটা?'

দরজার দিকে একটু চেয়ে,
একটু চাপা গলাতেই বুঝি বলল
দিবা, বলল, 'সে নাম রেণুকা।'

দুজন দুজনের নাম শোনারাজে
দুজনের মধ্যে যেন সব পরিচয় হয়ে
গেল। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বসে অন্তরঙ্গ-
ভাবে দুজনে গল্প করতে লাগল।
সব কথা জানাল দিবা। কেন তাদের
এখানে আসা, কে কে এসেছে তারা
একসঙ্গে। কিভাবে তাকে নিয়ে
হঠাৎ একটা নাটক লিখে ফেলা হল।
কিভাবে সে এসে যোগ দিল সেই
নাটকে অভিনয় করার জন্যে। এবং,
কথা যখন বলতে আরম্ভ করল তারা,
তখন আর কিছু রেখে-চেকে নয়,
সব কথা খোলসা করেই সে বলে
ফেলল ইন্দ্রিকে—কি জন্যে তাকে
হতে হয়েছে অভিনেত্রী, সে
কথাও।

কথাটা শুনে ইন্দ্রি। এতটুকু

সমবেদনাও জানাল না। নিজের বেদনা নিয়েই সে বিবুত, সুতরাং অন্যের বেদনায় সে আর যোগ দিতেই পারল না।

একমনে সে শুনে যেতে লাগল দিবার কথা।

এবা এখানে বসে কথা বলছে। তাদের সঙ্গে এসে কখন যে যোগ দিয়েছে মহামায়া, সেদিকে তাদের কোনো লক্ষ্যই ছিল না। মহামায়া এসে বসে পড়েছে মেঝেয়। বসে-বসে গল্প শুনেছে ওদের।

আর, যাদের স্রোতী-বেশে এসেছে দিবা, সেই পুরুপাণ্ডব যুব-যুগে দেখে বেড়াচ্ছে ওদিকে এই বাড়িটার চারধার।

সবট কেমন অবাস্তব আর অগস্তব মনে হচ্ছে তাদের। সবট কেমন অস্তিত্ব আর আশ্চর্য। এ যে দূরে রেল লাইন। এই যে এদিকে ঝিঝিঝিরে অপ্রশস্ত জলের ধারা। আশে-পাশে কোনো লোকালয় নেই, চারদিক ফাঁকা। অনেক দূরে-দূরে, গাছের ফাঁকে-ফাঁকে কয়েকটি কুঁড়েঘরের মাথা দেখা যাচ্ছে মাত্র।

অনেক দাপট এককালে নিশ্চয় ছিল এই বাড়িটার। অনেক ঐশ্বর্যও নিশ্চয়ই এর ছিল। কিন্তু এখন কেমন নির্জীব আর নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে সমস্তই।

‘এই তো নাটক হে।’ দীপক বলল সেনহাংসকে, ‘এই তো জীবন-নাট্য। এই জীবননাট্যের মাঝখানে রক্তস্রবের সমাজীর মত বসে আছেন তোমার নায়িকা। যার নাম দিয়েছ তুমি কুল্লরা। চলো, যাও। তোমার ফুলবাব সঙ্গে একটু উৎকল হয়ে কথা বলে আসি। আমাদের শরের নামে ছেড়ে দিয়ে তোমার দ্বিতীয়া নায়িকা যে একেবারে নেপথ্যনায়িকা হয়ে গঠিলেন। ব্যাপার কি হে?’

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আক্ষেপ করে উঠল নীহার, ‘একেই বলে মেঘে। এদের চরিত্রই বিচিত্র জিনিস। যাকে

বলে চিত্রবিচিত্র। আর্ট আছে, কিন্তু হার্ট নেই।’

দীপক হাসল, বলল, ‘বক্তব্যটা একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলো নীহার।’

কিন্তু আর পরিষ্কার করে বলার ইচ্ছে তার নেই। ‘যেটুকু বলেছে, সেটুকুই তার বক্তব্য। তবু, সে বলল, ‘ওরা হৃদয়হীন প্রতিমাবিশেষ।’

যবেন মধ্যে যে কথা হচ্ছে তাও এ হৃদয়হীনতা নিয়েই।

মহামায়া বলল, ‘নিষ্ঠুর ওরা। ওরা সব পারে। যাকে এত পছন্দ করে বিয়ে করলি, তাকে বৌ করে ঘরে রাখলি নে কেন। তোর চোখ তো পাথরের নয়, তবে কেন তুই ভুল করলি দেখতে? তুই করবি ভুল, আব শান্তি পাবে অন্যে? এ কোন দেশের রীতি, এ কোন দেশের আটন?’

ইন্দিরার সর্বনাশ যে কবে গিচ্ছে, তার কথা আনন্দ। সে একটা গুণ্ডা, সে একটা বদমায়েস। কিন্তু তুই তো গুণ্ডা-বদমায়েস নোস, তুই একজন শিকারী, ভালো ঘরের ছেলে তুই, যেমন-তেমন মানুষ নোস তুই, তুই বীরশাহী ব রাজকুমার। যাবে নিয়ে গেলি তুই রাজবাণী করে ঘরে রাখবাব জন্যে তাকে তুই—

বাধা দিয়ে উঠল ইন্দিরা, বলল, ‘চপ। চপ চপ, চপ কবো তুমি। তুমি। ওসব কথা থাক, অন্য কথা বলো।’

কিন্তু আজ অন্য আব কি কথা বলাব আছে। দুঃখের কাহিনী শোনার লোক তো পাওযাই দায়, আজ বর্ষন বরাত-জোরে জুটেছে তেমন শ্রোতা, তখন মহামায়া যেন সব কথা বলে ফেলে হালকা হয়ে যেতে চায়।

(ক্রমশঃ)

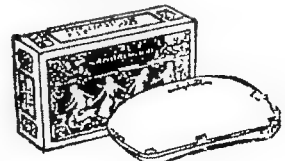
জ্ঞানের আনন্দ...

বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রস্তুত

স্যাণ্ডোনেউড

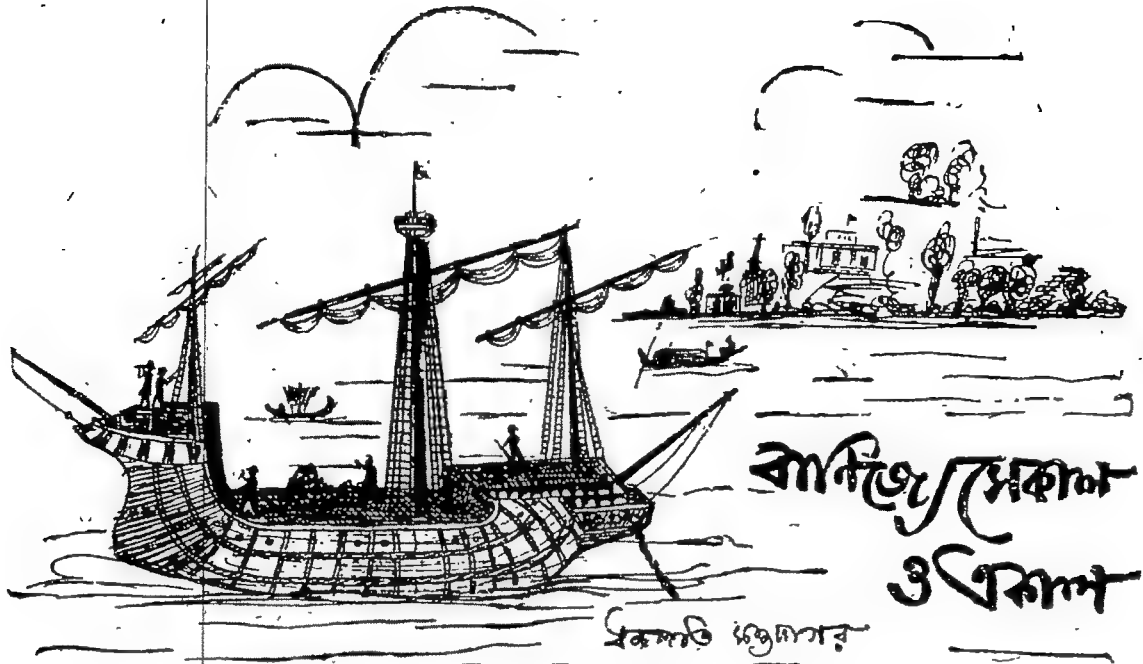
সোপ

আমের পর এই
সাবানের মধুর চন্দন-গন্ধ
আপনাকে সারাদিন
সজীব ও প্রফুল্ল রাখবে।



বেঙ্গল
কেমিক্যাল

সহকারী : বাথিং
স্যান্ড



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ চতুর্বিংশ অধ্যায় ॥

শুধু অকস্মিকে মনে করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক। মানুষের ধর্ম নয়। ঈশ্বরের দেবের তো নয়ই। ওদের স্বভাবের ভেতরে আছে প্রচণ্ড ক্ষেপ আর অপরিণীত বৈধ। এই অনমনীয় দৃঢ়তা—এই তীব্র ও কঠোর শ্রম-শক্তির জন্য ওরা পৃথিবীর মানচিত্রের একটি ক্ষুদ্রতম, স্থাপত্যগত, হয়েও দুনিয়াতে বহুকাল প্রভাব করেছে।

শুধু পক্ষমতি অভিযানের ব্যর্থতা তাদের নিরাশ করে নি। স্পেনের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যুদ্ধের অশান্তি, তার বিপদ আশুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর আর সর্বগ্রাসী।

যুদ্ধে ইংল্যান্ড হটে আসছিল। প্রতিদিন লোকসংখ্যা হ্রাসিত। দেশের সেই ষোড়শ বিপদের ভেতরেও ষষ্ঠাবাবের সমুদ্র অভিযান শুরু হলো। এবারেরও অধিনায়ক হেনরী মিডলটন। এবার আর ভাবতবর্ষের দিকে নয়—শুধু পৃথিবীর সর্বত্র বাণিজ্যকে প্রসারিত করার জন্যই তাঁরা সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন।

৮০,১৬০ পাউণ্ড পরিমাণ টাকা তাঁরা 'দা তুলে ষষ্ঠ অভিযানের খরচ জোগালেন। কিছু পরিমাণে উল্লের পোষাক, আর সীসের তৈরি জিনিস নিয়ে জাহাজ রওনা হলো। কিন্তু—

লোহিত সমুদ্রে আসতে না আসতে পর্তুগীজ জলদস্যুরা তাঁদের অনুসরণ করল। চারদিকে উদ্ভাল সমুদ্র। অন্ধকার রাত্রি। তিন-দিক থেকে তিনটি জাহাজ তাঁদের আক্রমণ করেছিল। অধিনায়ক হেনরী মিডলটন ছিলেন বীর। তিনি আক্রান্ত হলেন। কিন্তু তাঁত হলেন না।

সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করলেন মিডলটন। কিন্তু নিজেই অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন। সমস্ত জিনিস—সমস্ত সম্পত্তি ও সেই বিশাল জাহাজ পর্তুগীজরা আগুন লাগিয়ে একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে গেল।

বিশাল সমুদ্রে একটা কুটোব মত ভেসে চলেছেন হেনরী। একবার শেষবারের মত মনে পড়ল বহু—

বহুদূবে অনুভূতির কথা, স্বজাতির স্বপ্নের কথা। কিন্তু হঠাৎ অনেক—অনেক দূর-দিগন্তে একটা আলোর রেখা তাঁর নজরে পড়ল। চারদিকের অন্ধকারের ভেতরে আগুনের ফুলের মত মনে হল সেই আলো। তরতর করে সেই আলো এগিয়ে আসছে—এগিয়ে আসছে অতি দ্রুত।

—কে কোথায় আছ। বাঁচাও—বাঁচাও—

জাহাজ থেকে ছোট নৌকো নামিয়ে নেওয়া হলো। সেই নৌকোর মাঝে তুললেন মিডলটনকে। আশ্চর্য। জাহাজটা—মোগলদের জাহাজ। বহুদূব দেশ থেকে বাণিজ্য করতে চলেছিল দূর দেশে। সেই জাহাজে করে দক্ষিণাত্যে এসেছিলেন হেনরী। (স্থানীয়) মোগল শাসনকর্তাকে অনুরোধ করে দক্ষিণাত্যে বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিলেন। একেবারে একক চেষ্টায় কিছুদিন ব্যবসাও করেছিলেন। কিন্তু—

শেষ পর্যন্ত মোগলবাও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কবেছিল। তাঁর বিবক্তিতে দেশ ছাড়লেন তিনি। এসে উপস্থিত হলেন মুম্বায়ায়। মুম্বায়ায় বেশ তৎপরতার সঙ্গে কিছুকাল ব্যবসা কবলেন। কিন্তু একক চেষ্টায় ব্যবসা আর কতদিন চালানো যায়? তিনি একদিন স্বদেশে যাত্রা কবলেন। কিন্তু—

নমুনের ভেতরে কঠিন পাথরে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ ডুবি হয়ে গেল। হেনরী মিডলটনের মত ইংল্যান্ডের বীর সন্তান কোন দূরে অজানা সমুদ্রে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

অভিযানের পর্ব অভিযান। কুস্তি নেই, ছেদ নেই।

আবার আবোজ্ঞন হলো সপ্তম-ধাবেন সমুদ্রযাত্রার। শুধু সপ্তম-বার কেন, অষ্টম, নবম, দশম—ছারে বারে ওরা বহু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পুর বিদেশে গিয়েছে।

সপ্তম অভিযানের জাহাজ ছিল গাদ্দ একটা। একটা একক নিঃসঙ্গ জাহাজ। কিন্তু তার আশা ছিল আকাশ-ছোঁয়া। সে মনস্ত কবেছিল ধুঁথিরা প্রদক্ষিণ—করবে। আর ভারতবর্ষের করমণ্ডল উপকূলে একটা কুঠি স্থাপন করবে। কিন্তু—

সেখানেও সেই এক বিপদ। ভাচবা প্রবলভাবে বাধা দিয়েছিল। মসলীপটমে বেশ জমিয়ে ব্যবসা করছিল। কিন্তু সেখানেও নিঃশব্দ সদস্যভাবে শত্রুর আবির্ভাব হয়েছিল। স্থানীয় শাসনকর্তাও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এবারের অধিনায়ক কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে গেলেন না। সেই মোগল সুবেদারের পুত্রকে বন্দী করলেন। পুত্রের জন্য যখন সুবেদার ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর কাছে এলেন, তখন সেই ইংবেজ ব্যবসায়ী বললেন, বেশ আবার ব্যবসার, আবার জাহাজের যে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতিপূরণ করে

দিন, তারপর আপনার পুত্রকে নিয়ে যান।

মোগল সুবেদার অনেক ভেবে আপত্তি করলেন না। দিল্লীর বাদশা এইসব বিদেশী ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট সমর্থন করেন। শুধু শুধু তাঁর বিরাগভাজন হয়ে কি হবে? অষ্টম অভিযানে ইংল্যান্ডের লর্ড হেনরী স্পষ্ট বলেছিলেন :

I do not support this East India Company, trading in East Indies, India etc...

কিন্তু বাজার জম্বিকিতেও ব্যবসায়ীদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে যায় নি। তারা আবার দূরদেশে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল। নবম সমুদ্র-যাত্রায় তারা করমণ্ডলে এসে কুঠিও স্থাপিত কবেছিল। আর দশম অভিযানে কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি কবেছিল ইংরেজরা। এবার তারা দুটি বড় বড় অর্ধবয়ান নিয়ে বিদেশে বণ্ডনা হয়েছিল। এইবারের অধিনায়ক টমাস বেস্টের নাম কিন্তু ইংবেজদের ভারতবর্ষে এসে বাণিজ্য করার ইতিহাসে লেখার মত জ্বলজ্বল কববে।

টমাস বেস্টই বোধ হয় প্রথম ইংরেজ ব্যবসায়ীদের যিনি মোগল দরবারে উপস্থিত হয়ে দাবী করেছিলেন, ভারতবর্ষে ইংবেজদের তরফ থেকেও একটা রাষ্ট্রদূত থাকবেন। তাঁর দাবীকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তদানীন্তনকালের মোগলসম্রাট।

একাদশ অভিযানের উদ্দেশ্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ইংরেজদের একতাবোধ, স্বজাতিপ্রীতি যে কত গভীর এবং কত নিবিড় তা প্রতীয়মান হয় একাদশ অভিযানের উদ্দেশ্যে ভেতবে।

A single ship was sent in this eleventh voyage to bring the adventurers.

নিজের দেশের বাণিজ্যকে প্রসারিত করতে যেবে দূরদেশে, কোন অজানা দ্বীপে, কি নাম-না-জানা

বন্দরে যা বাহিয়ে গেছে, নাকি অশুভ আশ্রয়ের দৃষ্টি বিশাল ও অনন্ত সমুদ্রের দিকে তানিয়ে দিয়ে দেখেছে, কবে—কবে কোন শাস্ত্রলের দীর্ঘ দেখা দেখা দেবে আকাশের গায়ে, কবে আসবে কোন জাহাজ যে তাকে উদ্ধার কবতে পারবে! আর—

দ্বাদশ অভিযান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষের বার্ষিকীর সঙ্গে জড়িত মিলবার্ট শিয়ারের Oriental Commerce in East Indies, China গ্রন্থের বক্তব্য অনুসারে, এই দ্বাদশ অভিযান—শেষতম সমুদ্রযাত্রা। এই অভিযানে শুধু Robert Shirely নামে এক ইংরেজ বাজপ্রতিনিধিকে বচন করে নিয়ে গিয়েছিল।

টমাস বেস্টের প্রস্তাবিত সেই ইংবেজদূত হিসেবে নবাবী মারজিত এসেছিলেন ভারতবর্ষে। কিন্তু মারজি খুব উদ্বেগবোধ্য কিছু উন্নতি করেছেন বলে কোথাও পাওয়া যায় না। আবার—

আবার ইংবেজ মস্তিষ্ক ক্লান্ত হতে উঠল নতুন চিন্তা, নতুন সমস্যা। এভাবে সুদূরপ্রাচ্যে আন কতদিন—কতদিন ব্যবসা চলবে। প্রথমত উত্তর সমুদ্রে ঝড়ের মত, প্রতিকূল আবহাওয়ায় নত আবে এক শত্রু আন, পর্তুগীজ-ভাট ভলদস্যু। তারা জাতিগত অন্ধকার সমুদ্রে শকুনের মত তীব্র সন্ধানীদৃষ্টি জালিয়ে নৃত্যে নেড়ান—কোথায়—কোথায় আছে ইংবেজদের জাহাজ। তৃতীয়ত ভারতবর্ষ বা দূরপ্রাচ্যে তাদের ব্যবসায় জিনিসের আমদানী-বিক্রয় এবং টাকাকড়ি পাওনাব অস্বাভাবিক দীর্ঘদূরত্ব।

ইংল্যান্ড থেকে জাহাজ বণ্ডনা হলো। ফিবে আসতে আসতে প্রায় তিন বছর ধাক্কা। যদি বা নিরাপদে ফিবে আসে, তারপর তার পণ্যবাহী সেক্সনকান (ইংল্যান্ড) বাজারে দীর্ঘদিনের সর্বোচ্চ (১৮ থেকে ২৪ মাস) ধার দেওয়া হয়। সেই ধারণা প্রায়ই নিয়মিত আদায়

হয় না। একটা সমুদ্রযাত্রার ফসলের লাভ ঘরে তুলতে তুলতে প্রায় ছয়-সাত বছর কেটে যায়। অতএব—

অতএব কি লাভ এইরকম ব্যবসার? উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। তাহলে হবে। ব্যবসায়ীরা স্থির করলেন তাঁদের একটা যৌথ সংস্থা গড়ে তোলা হোক। তাঁদের শেয়ারের টাকার চলবে এই ব্যবসা। যৌথ অর্থাৎ শুধু ইংরেজ ব্যবসায়ীদের ভেতরে লীমাইজ থাকবে না তার মালিকানা। এখানে দু-প্রাচ্যে বাণিজ্যে ইচ্ছুক ডাচ ব্যবসায়ী চলে। করলে আসতে পারবে, আসতে পারবে পতঙ্গীজও। কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা পরিকল্পনা একটুও কার্যকর হয় নি।

হতে পারে না। মিলনের উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ নয়, যেখানে জুল ব্যবসায়ীর লাভের অঙ্কটাই বড় কথা—সেইখানে যার স্বার্থে আঘাত লাগবে, সেই শত্রু হয়ে যাবে। এটা নিয়ম।

নগুনে বসে একসঙ্গে ভোজ বেঁচে বেঁচে সার দিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের উপকূলে এসে যেই কোন দেশীয় রাজা ছাত্তানি দিয়ে ভেঁকেছে, বলেছে, এস ওকে কুকুঁবের মত তাড়িয়ে দেওয়া থাক। তখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেই বিদেশী বণিকদের দল আর একটি বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীকে খবং করার জন্য। বহুদিন—বহুকাল ধরে দেশীয় শাসনকর্তারা বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিয়ে বানর-নাচ নাচিয়েছিলেন। কিন্তু—

পরে মূল্য—অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। তার প্রথম সূচনা শুরু হয়েছিল ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে। আবার ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রত্যাব এসেছিল, স্যার টমাস রো'কে ইংরেজদের তরফ থেকে রাজদূত নির্বাচিত করা হোক।

To be the Ambassador to the Great Mogul or King of India.

টমাস রো যাত্রা করলেন সার্চের এক ভরদুপুরে। সেদিন ছিল ১৬ই মার্চ। জাহাজের নাম 'বায়ন'। ক্যাপ্টেন

ছিলেন নিউপোর্ট। এবারের যাত্রায় ইশবরের শুভদৃষ্টি ছিল। ঠিক নয় মাস—নয় মাস পর টমাস রো এলেন ভারতবর্ষে।

জানুয়ারী মাস। ভারতবর্ষে তখন প্রচণ্ড শীত নেমেছে। বতসুর তাকানো বায়, দিমীর আকাশের দিকে দিকে কুয়াশায় বিপুল ব্যস্ত আকাশ। আর বাতাসে যেন তুহিন স্নেহের শীতলতা। কিন্তু—

দিমীর মোগল দরবারে অল্পত এক উচ্চতাব স্রোত বয়ে যাচ্ছে। উজীর, আমীর ওমরাহ সব—সব ব্যস্ত তত্ব। সম্রাটের মুখে চিন্তার ছায়া। কি বলবে—কি বলতে চায় বিদেশী রাজদূত। নিশ্চয়ই কিছু বক্তব্য আছে—যার জন্য বারোবারে অনুরোধ করে এটা সভার আয়োজন করিয়েছেন।

On 24th of the January, Sir Thomas Roe has a audience of the Mogul. ইতিহাসে সেই দিনটির ইতিবৃত্ত হয়তো নেহাৎ আরো পাঁচটা খবরের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু এটা সভার—এটা টমাস রো'কে কিছু বলতে দেওয়ার সুযোগের বহু দূরপ্রসারী পরিণাম আছে।

কি বলেছিলেন টমাস রো সেই রাজন্যবর্গদের সভায়?

He stated the injuries the English had sustained from the arbitrary, conduct of the Governors of Surat and proposed the renewing the articles of PHIRMAUND (ফরমান) or treaty between the Mogul and English nation.

টমাস রো বিচক্ষণ আব দুরদর্শী লোক ছিলেন। তিনি একেবারে গোঁড়া আঘাত করলেন। ইতিপূর্বে সুরাটের ও দক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ইংরেজদের সঙ্গে অশোভন ও শত্রুতামূলক ব্যবহার করেছিলেন। সেই ক্ষতির কথাও তুললেন। আরও বললেন—বললেন—যে, ইংরেজদের ব্যবসার ক্ষেত্র সর্ত পূর্ববর্তী সম্রাটের দিয়েছিলেন—তার কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হবে।

তাহলে আরো—আরো পোলাখুগি বলতে হয়। কি ছিল সেইসব সর্ত?

(ক) ইংরেজদের ব্যবসা সংক্রান্ত কর্ম প্রচেষ্টাকে সহানুভূতির চোখে দেখতে হবে।

(খ) বন্দরে সাধারণত যে চার্জ দিয়ে পণ্যব্রব্য আমদানী-রপ্তানী হয়—সেই চার্জই ইংরেজরাও দেবে—

ইত্যাদি আরো বহু বহু বিচিত্রতর সর্ত ছিল। কি ছিল—সেই আলোচনার খুব লাভ নেই। স্যার টমাস রো কেমন করে তাকে পরিমার্জিত করেছিলেন—কেমন করে ব্যবসার নামে ধীরে ধীরে দেশের হৃদয়ের ভেতরে একটি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত আমূল বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন—তার ইতিহাস যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি চিত্তাকর্ষক।

টমাস রো'র প্রস্তাবের অনুলিপি নিয়ে উদ্ভূত হলো।

(১) যে সমস্ত উপচৌকন মোগলসম্রাটের নামে ইংরেজরা নিয়ে আসবে, তা বন্দরে সম্রাটের কোন বন্দর-করচাষী খুলতে পারবে না।

(২) বন্দরে পৌছানোর পরও ছয় দিন পর্যন্ত নির্ধারিত শুল্ক চার্জ করা হবে না। ছয়দিনের পর নির্দিষ্ট শুল্ক দিতে বাধ্য থাকবে।

(৩) যে সমস্ত পণ্যব্রব্য ইংরেজরা জন্ম করবে—তা বন্দরে বহন করার কথা ট্রান্সপোর্ট করার কোন ধরত ইংরেজরা দিতে বাধ্য নয়—

(৪) ইংরেজদের জাহাজ বন্দরে থাকবার ও টুকটাক মেবামতী কাছের জন্য এবং নির্দিষ্ট দিনেরও বেশি জাহাজ বন্দরে থাকলে চার্জ দিতে বাধ্য থাকবে না ইংরেজরা।

আরো আছে। তালিকা দীর্ঘতর করে লাভ নেই। ইংরেজদের বাণিজ্যের ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবুও টমাস রো'র কর্মদক্ষতা, তাঁর কার্যপ্রণালীর সঙ্গে ভারতবর্ষের পরাধীনতার বন্ধনের ইতিহাস প্রজ্ঞাপ্রাভভাবে জড়িয়ে আছে।

টমাস বো ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে মোগল দরবারে অনারারী আসন পেয়েছিলেন। কিছুদিন পরেই ইংলণ্ডের রাজা তাঁকে বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড বৃত্তি দিলেন। এই বৃত্তিদান তাঁকে মর্যাদা দেওয়ায় ইংবেজরা খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল। টমাস বো ভাবতের জন-জীবনের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তভাবে মিশে গিয়েছিলেন। তিনিই ভাবতবর্ষে ইংবেজদের প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করেছিলেন।

টমাস বো ভারতবর্ষে ইংবেজদের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি রিপোর্টও পেশ করেছিলেন। সেই রিপোর্টে বলেছিলেন—

(A) All the Eastern parts of India could be supplied with clothes, but those articles could only be procured by the exchange of China goods, spice and money.

পূর্ব ভারতবর্ষের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বিলেত থেকে বস্ত্র রপ্তানী করা যায়। কিন্তু বস্ত্রের বদলে মশলা, চীনা জিনিস আর টাকা পাওয়া যেতে পারে। আরো দীর্ঘ—আবও বিস্তারিত সেই রিপোর্ট। স্যার টমাস বোর অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ সেই বিবরণ পেয়ে ইংবেজ সওদাগরদের খুবই স্তুতি দেওয়া হয়েছিল। তারা হিঙগ উৎসাহে ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রসারিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু—

বিলেতের পার্লামেন্ট বড় সাংসাহিক বস্তু। জাতির জীবনের দর্পণ, অতি সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে কোন কাজের খোঁজ রাখে তাই। পার্লামেন্টের বাইবে ইংবেজরা কিছু কবেছে বলে জানা যায় নি। সেই পার্লামেন্টে আপত্তি খাড়া উঠল। প্রথমত They exporting the treasure of kingdom. এই দুর্বদেশে বাণিজ্য করতে গিয়ে রাজ্যের সম্পত্তিকে বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত The decay of mariners by their employment. বাইরে বিদেশে বাণিজ্য করতে যারা

যায় তাদের অনেক—অনেক বেশি সংখ্যায় নাবিককে নিয়োগ করতে হয়। বিদেশী বাণিজ্যে এত বেশি নাবিক দেশ থেকে দূরে চলে যায় যে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু—

কোন আপত্তিতেই ইংল্যান্ডের সওদাগরদের উৎসাহকে স্তিমিত করতে পারে নি। দিনের পর দিন পার হয়ে গেছে; কেটে গেছে মাসের পর মাস। তাই ধীরে ধীরে গভীর করে শক্তি সঞ্চয় কবেছে, সরকারী সাহায্য না নিয়ে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চেষ্টায় আবার সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে।

১৭১০ খৃষ্টাব্দে দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইংবেজদের কুঠি গড়ে উঠেছে। ইংবেজরা বাংলায় এই কলকাতায়, ছগলীতে, কাশিমবাজারে, বাজমহলে, পাটনায়, মালদহে, ঢাকায় পূর্ণ উদ্যমে বাণিজ্য করছে।

বাংলার জন-জীবনের সঙ্গে ধীরে ধীরে ইংবেজরা মিশেছে। বাংলায় গ্রাম দেশের কবিগানের আসবে, মন্দিরে, মসজিদে, বাজনীতিব বঙ্গমঞ্চে ইংবেজেরা বীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু কবেছে। সেসব ইতিহাস বাণিজ্যের একাল ও সেকালের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু—

সেই কথা,—ইতিহাসের সেই অমোঘ সত্যবাণী—

‘বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে পোহালো শর্ববী।’

যারা একদিন সঙ্গে জিনিস ওজন কববার তুলনায় নিয়ে জিনিস কেনাবেচা কবতে এসে দেশের সিংহাসনে রাজদণ্ড নিয়ে বসল। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে। তাই একদিন হাউস অফ কমন্সে শোনা গেল একটি দৃষ্ট কণ্ঠস্বরঃ

East India Company has raised and preserved an empire unprece-

dent in the history of the world. I do not believe the history of the world, has ever produced the parallel, a system by which a population of fifty millions of native subjects are governed, while the officers of the company by whom the Government is conducted does not exceed 1600..

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ লর্ড কাসলারএগ (Lord Castlereagh) বলেছিলেন হাউস অফ কমন্সেঃ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দুর্বদেশে গিয়ে এমন অভূতপূর্বভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে—আগি নির্ভর করি না, পৃথিবীর আর কোথাও এমন ঘটনা ঘটেছে কি না যে, পঞ্চাশ বিলিয়ন দেশীয় মানুষকে শাসন করছে মাত্র ১৬০০ ইংবেজ অফিসার—

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, যুগে যুগে শ্রেষ্ঠীদের প্রভুত্ব। প্রাচীন সিংহাসনের বড় কাতন মানুষ নবীন শ্রেষ্ঠী! আজ পর্যন্ত মৃত মৃত মৃত্যুকী পূর্বের সেই ট্যান্ডিশিয়ান অন্যায্যত রয়েছে। দার্শনিক প্লেটোর মতবাদ অনুযায়ী philosophers are rulers হয় নি, কখনো। মার্কস এংএলেন গান্ধীর সমস্ত মতবাদ, তাঁদের মত জীবনের চিত্তাধারার বঙ্গ ‘ভনগণের রাজ্য’ Government of the people by the people for the people—এই আদর্শের সম্পূর্ণ ধুলোয় করে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ধনপতি ব্যবসারীরা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য থেকে দেখে শাসনচক্রকে তাদের স্তুতিমিত ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। এই ইতিহাস মান আর কারও অজানা নয়! কিন্তু কেমন করে—

কেনন করে—এক বিশেষী দীর্ঘ প্রার্থীর মত বাংলায় বঙ্গের জাহাজ ভিড়িয়ে বাণিজ্য করতে এসে বাংলায় সিংহাসনে এসে জাঁকিয়ে বসল—বাংলার কোন কোন বঙ্গের কিভাবে তারা ব্যবসা করতো, সেই নিত্য ইতিহাস এর পরে বলবো। (চলবে)



আত্মানুসন্ধান : শ্রীশুশীলকুমার ঘোষাল। মূল্যজোড়, (২৪ নং বেল ফটক পূর্বে) শ্যামনগর পোঃ (২৪ পরগনা), দাম : ২.৫০ পয়সা।

হিন্দু ধর্ম কি?—এ ধর্ম একালে ক'জনই বা রাখেন। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বাংলা ভাষায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, তারপর সেই পথে যে ভাটার সৃষ্টি হয়েছে, আজো তার বিরাম নেই। অষ্ট বিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের ধারমর্ম জ্ঞাত হবার জন্যে যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির এগিয়ে এসেছেন। এঁদের মধ্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি টি এস এলিঅটের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এইসব কারণে অভাবভর্তি হিন্দুধর্মের অসাম্প্রদায়িকতা লক্ষ্যে দ্বিমত হবার কারণ নেই। হিন্দুধর্ম বিশৃঙ্খলবোধের কাছে যা নিবেদন করে—তা হচ্ছে, আত্মানুসন্ধান অর্থাৎ নিজেকে জানানো। যারা হিন্দুধর্মকে পুতুল পুজার সার মনে করে তারা হিন্দুধর্মের কিছুই জানে না, একথা অনায়াসে বলা যায়। এই ধর্ম সর্বজনীন তবু এর মূল তত্ত্ব আত্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীশুশীলকুমার ঘোষাল সেই উপলক্ষের দ্বারা হিন্দুধর্মের মূল মর্মকেই উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর সহায়ক হয়েছে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, স্মৃতি, দর্শন ও তন্ত্রের দুর্লভ গ্রন্থাঙ্গি। সেই কারণে এই ধর্মের মূল্যবান গ্রন্থ প্রত্যেকের নিকট সমাদরে গৃহীত হওয়া একান্ত কর্তব্য। এই গ্রন্থ গ্রন্থন ও সংকলনে শ্রীজীব ন্যায়-ভীর্ষেব যে মন্তব্য প্রকাশিত লাভ করেছেন—তাঁর অবিদ্বত উদ্ধৃতি

গ্রন্থটিকে অসমীকৃত মানব-চেতনাব কাছে আনো বেশি অপরিহার্য করে তুলেছে। এ ছাড়া গ্রন্থটি দাম ও স্থলভ। অবশ্য মূলগ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্যে এইরকম হওয়াই উচিত।

কৃত-মঙ্গল : কাজী নজরুল ইসলাম। গ্রন্থলোক, কলকাতা স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। দাম : তিন টাকা।

‘আমি যেটুকু দান করেছি তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে; কিন্তু আমি জানি আমাকে

জয়ন্তী সেন

পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি, আমার দেবাব ক্ষুধা আজো মেটেনি।’

‘বিংশ-শতাব্দীর অসন্তবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তুর্ধ-বাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।’

‘আমার মম ‘Beauty is truth, truth beauty.’

‘আমি সকল দেশের সকল মানুষের।’

কবি নজরুলের বিদ্রোহী সজ্জা থেকে খনিত উপযুক্ত বাণীগুলির তাৎপর্য বিচার করলে স্বীকৃত হবে, হয়তো কোনোটাই মিথ্যা নয়; এবং তাঁর কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তুলনা তার নেই, তবু এটাও সত্য ‘আমার দেবাব ক্ষুধা আজো মেটেনি’—এই বাণী আজ রোগজীর্ণ কবিচিন্তে যে মুক তরঙ্গাঘাত সৃষ্টি করেছে, তাতে তাঁর প্রিয় পাঠকেরাই সবচেয়ে বেশি ব্যথিত, বেদনাহত।

‘কৃত-মঙ্গল’ গ্রন্থটির বিজ্ঞা প্রবন্ধে

নজরুলের কবিরচনা, ব্যক্তিচেতনায় গাঢ় মঙ্গলচিন্তা ও দেশকালানুভূতি অথবা মানবতার জয়গান সোচ্চারে বিবোধিত হয়েছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ‘কালান্তর’ প্রবন্ধ গ্রন্থেব সঙ্গে এই গ্রন্থের সামুদ্রিক সাধন সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের শেষ আবেদন ও ঘোষণা যেমন ‘মত্যতার সংকটে’ উচ্চারিত হয়েছে তেমনি মানবকল্যাণের ও সংবৃদ্ধির কথা নজরুল শুনিয়েছেন আমার পথ, ধর্মকেতুর পথ, মন্দির ও মসজিদ, হিন্দু-মুসলমান, প্রতিভাষণ প্রভৃতি প্রবন্ধে। এক যুগে আরো পরাধীনতার বেদনা বুকে নিয়ে নজরুল বলেছেন, ‘সর্বপ্রথম, ধর্মকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়’। সাম্প্রদায়িকতার হীনবুদ্ধিব বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন, ‘সেই রক্ত আমি তেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আঁড়ি এ-মন্দির মসজিদ ডাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের গরু-তলে লইয়া আসিবেন।’

নজরুলের কথা এই স্বাধীন ভারতেও কত সত্যি, ‘আমাদের বিদ্রোহ যারা দেশ জয় করেছে তাদের উপর নয়, আমাদের বিদ্রোহ দেশ-দ্রোহীদের উপর।’

যা হোক বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত নজরুলের তেরটি প্রবন্ধের বস্তু্য এই লাবণ্য জয়গায় পরিস্ফুট করা অসম্ভব ব্যাপার। নজরুলকে উপলক্ষের ব্যাপারে প্রবন্ধগুলিকে একত্রীকরণের জন্য প্রকাশক নিঃসন্দেহে ধন্যবাদেব যোগ্য। তবু বলা দরকার, গ্রন্থটিতে একটি ভূমিকা থাকা প্রয়োজন ছিল, যে ভূমিকায় দেশের পটভূমিকা ও প্রবন্ধ রচনাকাল বিধৃত থাকতো। অবশ্য কয়েকটি প্রবন্ধে রচনাকাল আছে। এছাড়া প্রবন্ধগুলিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারতো। নজরুলের সম্পাদকীয় কৃতিত্বে প্রকাশিত গ্রন্থের ব্যবহারে যে ওজস্বিতা ফুটে উঠেছে একালের কিছু পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিলে ভাষার ক্ষেত্রে নজরুলের আরেক

কৃতিত্বকে উপাটিত করা যেতে পারতো। অবশ্য যথার্থ পাঠককে এসব দেখিয়ে দিতে হয় না। খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ দেখে আমাদেরও মনে বিদ্রোহের অুর সঞ্চারিত হয়।

ধনিষ্ঠা : সম্পাদক : প্রণব ঘোষ, সহযোগী সম্পাদিকা : মধুছন্দা সেনগুপ্ত। ৫এ, মতিলাল নেহরু রোড, কলকাতা-২৯। দাম : ৩০ পয়সা।

‘ধনিষ্ঠা’র এ সংখ্যাটি হোল দ্বিতীয় সংকলন। এর প্রধান উপজীব্য হচ্ছে গল্প, কবিতা, আলোচনা-শীর্ষক প্রবন্ধ, ইংরেজী কাব্য পরিভ্রমণ ও গ্রন্থ পরিচয়। মিহির সিংহ রবীন্দ্রোৎসব পালনের যুক্তি-দৃঢ়ত পথ নির্ণয় করেছেন। প্রণব ঘোষের গল্পে সামাজিক চেহারাটা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রজত সেনের গল্পটি সমরসেট মম-এর ছায়া অবলম্বনে লিখিত হলেও এমন লার্ক ভাবানুবাদ গচরাচর লাভ করা যায় না। প্রতিটি চরিত্রে স্বদেশী, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তার আলোকে তারা সর্বজনীন। এ ছাড়া ‘ধনিষ্ঠা’র পিনাকেশ সরকার, শংকর দে, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুনায় চক্রবর্তীর কবিতাগুলি সহজবোধ্য, সুখপাঠ্য। দিলীপকুমার সেনের আলোচনায় ও অলক চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে মননশীলতার স্বাক্ষর রয়েছে। এ পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু হোক।

ছোটগল্প : নবনিরীক্ষা :

অশোকব্রজেন সেনগুপ্ত ক র্ত্ত ক প্রকাশিত। ৮, অটল সরকার রোড,

নৈহাটি, ২৪ পরগনা। দাম : ১’০০ পয়সা।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তাকে এবং তৎসম্পর্কিত আলোচনাকে কেন্দ্র করে ইতোপূর্বে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। দুঃখের ব্যাপার, পত্রিকাগুলি ধোপে টেকে নি। পত্রিকাগুলি না টিকলেও সেই আলোচনাব্যবহার করে নি, ধাবাও বন্ধ হয় নি। বিশেষত আ নিক মননজাত গল্প-গুলি স্বক্বে প্রতীক্ষিত হবার যে দাবি নিয়ে অগ্রসরমান তা নানা বাধা-বিষের মধ্যেও উপেক্ষিত নয়। শুধু তার চংটুকু বিসর্জিত হলেই তার হৃদয়-স্পন্দন সহজেই সাধারণ পাঠকের অন্তর্ভুক্ত হবে। উপর্যুক্ত পত্রিকাটির প্রথম সংকলনে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় গল্প লিখেছেন সমবেশ বসু। দেবেশ বায়ের গল্পটিও অবশ্য উল্লেখ্য। জনৈক লেখকের ছোটগল্পের আলোচনা কবেছেন নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পত্রিকাটি যদি এই দিয়েই দায় সারতো তাহলে ‘নবনিরীক্ষা’ নিশ্চয়ই একটা নামুলি পত্রিকা ছাড়া আর কিছু হোত না। কিন্তু গরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা সেই নামুলিরানার অতুলনীয় ব্যতিক্রম। তিনি পত্রিকাটির অন্যান্য সমস্ত রচনার যে আলোচনা কবেছেন—তা ‘নবনিরীক্ষা’র নতুন পথের একান্ত সহায়ক বলে আমি বা মনে কবি। তবে শেষ পর্যন্ত পরিচালকদের এই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, পত্রিকাটি বিশেষ কারো অস্বাভাবিক না হয়ে—যথার্থ প্রতিভার আবিষ্কার করবে।

রোশনাই : সম্পাদিকা : গীতা দাশ। এ-১৩২ কলকাতা স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। দাম : ৭৫ পয়সা।

বাংলা দেশে কিশোর-মাসিকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো পত্রিকাকে ‘কিশোর’ উপযোগী বলে ঘোষণা করা হলেও দেখা যায়, তাতে যা থাকে তা তাদের পক্ষে সহজে পরিপাক করা কঠিন। বাস্তব-ক্ষেত্রে ‘রোশনাই’ যথার্থই কিশোরদের মনের মতোই।

এতে যাঁরা লিখছেন, তাঁরা কিশোর-দের মনের মতন লেখক, যেমন শিবরাম চক্রবর্তী, মনোজিৎ বসু, ধীরেন্দ্রনাথ ধর, কাতিকচন্দ্র দাশগুপ্ত আরো অনেকেই। কিন্তু রোশনাই-এ লিখতে গিয়ে তাঁরা যেন নতুন করে ভেঁরি-তাই ‘নিজের ভূত নিজে দেখা’র গল্প বলেছেন শিবরাম; হালিও নয়, ভীষ্ম রোমহর্ষক।। শিশুর দেশের রূপকথায় ধীরেন্দ্রনাথ ধর চোরকে দিলেন অর্ধেক রাহা আর রাজকন্যা। সুনির্মল বসুর কবিতা কে না পড়েছে। কিন্তু তিনি কি ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন? তা নইলে হিলীভাষার কেরামতি অমনভাবে কবিতায় কি লিখে যেতে পারতেন। ‘আজব বটে’ সত্যি। এ ছাড়া বোশনাই-এ আছে মহাভারতের গল্প, দশমিক পদ্ধতির হিসেব, শার্লক হোমসের গল্প, ‘চাইনীজ কালি’ থেকে শুরু করে ‘রাফুসে গাছ’, অনেক খেলার কথা, ‘হাসি-কান্না, দাঁধা আব গ্রাহকদের রচনার জন্য ‘তোমাদের পাতা।’ পাতায় পাতায় এমন ছবি যে—তার রঙ আর রেখায় চোখ জুড়িয়ে যায়। আচ্ছা, ছবি শেখানোর জন্য একটা পাতা কি সম্পাদিকা নির্দিষ্ট করতে পারেন না? তা’ করলে রোশনাই হবে আরো লোভনীয়।

আদি মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস



মহাশেখতা ভূঁইচাষ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চরিত্রাঙ্কন

পুলানীর মাঠে পেশবাকে বাইশ লাখ টাকা দিবে, তাবপর ভাস্করকে মেবে নবাব ভেবেছিলেন বর্গীদের হাত থেকে বুকি নিভািব পেলেন। ইংবেকদের ওপব চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে হয়ত ভেবেছিলেন ফিরিঙ্গী বণিকদের একটু জ্বল কবলেন। হয়ত আশা করেছিলেন বর্গীরা যদি আর না আসে তা'হলে ছিন্নভিন্ন বর্ষমান, বাঁকুড়া, নেদিনীপুর, বীরভূম, মুন্সিাবাদ, নবদ্বীপ, সর্বত্র ধীরে ধীরে শান্তি প্রতিষ্ঠা কববেন। কিন্তু তাঁর হিসেবে আগাগোড়াই তুল হয়েছিল। বর্গীরা অত সহজে চলে যাবে বলে আসে নি। তাবা এসেছিল বাংলার পববর্তী ইতিহাসের ওপব কবাল প্রভাব কেলবে বলে। এদিকে জাগীরধারী পশ্চিমে বদকে কবেক শো বছরের মত ক্ষতিগ্রস্ত ক্রবে বলে, বাংলার বাণিজ্যকে ধ্বংস কববে বলে। ফিরিঙ্গী বণিক আর খৃষ্টিয়ান ধর্মী কমতাকাশীদের স্পর্ধা গগনচুম্বী কবে তুলবে বলেই যেন তারা বাংলার বুক থেকে স্বশান্তির শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিতে চাইল। রাজার রাজার এ মুছে, উলুখড়, বাংলার সাধারণ মানুষের প্রাণ যে গেছে এ-

কথাও যেমন সত্যি, তেমনি এ-ও সত্যি, যে তাদের ইতিহাসই রয়ে যায় আড়ালে, অজানতে অথচ তা'দের রক্তের ভেতর দিয়েই ইতিহাসের ধারা বয়। তাই, বর্গীর আক্রমণে নবাবদের চৌধুর সামনে, আরো বহু-তনের চৌধুর সামনে, বাংলার ভাগ্য ভেঙে-চরে আর এ-নতুন ভাগ্যের জন্যে অসহায়ের মত প্রস্তুত হতে লাগল। আবারমানিক গ্রাম আর মুন্সিাবাদের মানুষরা সেই ভাগ্যের হাতেরই পুতুল, অজানতে তারা নিজেদের ভাগ্য নিছেরা গড়তে লাগল।

মুন্সিাবাদের কাছে, নগণ্য গ্রামবহরম-পুনের অনতিদূরে। সোনকরার মাঠে ভাস্কর পণ্ডিত আর তাঁর বাইশ সর্দারের রক্ত বইল ঠিকই, কিন্তু তাতে কোন সমাধানই হয় না। আবার বর্গী এল।

আবার আগবেন বলে রঘুজী ভৌগলে অযোগ্য বৃদ্ধছিলেন। ভাস্করের মৃত্যু তাঁর মনে ছালা বেধে গেছে। আরো চটেছেন তিনি শাহজাদীর প্রতিনিধি শাহজাদীর ওপর। শাহজাদী পুনরায় আছেন, তাই তাঁর সঙ্গে নবাব টাকা দেবার রফা করলেই সব হয়ে গেবে।

কেন, তিনি বেরারের ভৌগলে, তাঁর পরীয়ে শিবাজীর বক্ত নেই?

তিনি যখন অযোগ্য বৃদ্ধছিলেন, তখন অযোগ্য এল। আলীবর্দীর সেনাপতি, দুর্ধর্ষ বীর আকবাল মুস্তাফা ধী বিদ্রোহীর পতাকা তুললেন। রঘুজীকে আনয়ণ জানালেন। তাবপর চৌধুর হাজার অশুরোহী নিয়ে যাত্রা কয়েক উড়িয়ার।

তখন তাঁর পাটনাতেও আকবালরা বিদ্রোহী; তাই নবাব তাড়াতাড়ি মুন্সিাবাদে ফিরতে চাইলেন। আবার চলল যুদ্ধ। মত না যুদ্ধ, তাব চেয়ে অনেক, অনেক বেশি লুণ্ঠন; হত্যা, সন্ত্রাস। বর্ষমান, বীরভূম, নেদিনী-পুর, কাটোয়া আর মুন্সিাবাদের অকাপ আতঁনাদে ভরে গেল। রাজাদের যুদ্ধে আবার উলুখাড়াদের মরতে হল, অক্ষয়, অগণন।

তখনও আবারমানিক গ্রাম ছাত আর ধর্ম নিয়ে কলহ করতে ব্যস্ত।

আটচানায় এবার বড় উঠল রানাই বাগদীকে নিয়ে। বড় আচার্যের বোন পাতানী পিসী দুপুরবেলা মাখায় ভিজে গামছা চাপিয়ে মুখোটিবাড়ি এলেন। এ কম বছর ধরে এত বড়খাপটা গিয়েছে, তাইব্বি নির্দোষে

নির্মালিনে দিয়েছেন অটচালিখ সন্মোহন
নিচাবে, তাতে যেন মনে কোন দাগই
কাটে নি ওঁদের।

‘বউ, তোমার ভাষের বোনঝি পৌরীর
অন্যে পাত্র ঠিক কবলায়। ওঁকে পত্র কবা।’

বিশালাক্ষী অর্থাৎ হয়ে বললেন, ‘আম’ব
বউদির বোনঝি? কেন, আমি পত্র করতে
হাব কেন?’

‘পাত্র যে তোমার চেনা গো।
তা ছাড়া একথা সবাই জানে। তোমার
বউঠানবা তোমার কথা রান্য করেন, তাই
তোমাকে বলা।’

‘পাত্রটি কে, ঠাকুরঝি?’

‘দুলাল, আমাদের নিমলির ববা।’

‘দুলাল, নির্মলার বর?’

‘হ্যা, আকাশ থেকে পড়লে যে।
কুলীনের মেয়েব বব ছোট। কি সহজ না
কি? তাতে এই ডারিডোলেব দিন, সন্ধ্যা নেই,
শেষবর নেই। এদেশেব মানুষ ওদেশে
ভেসে বেড়াচ্ছে, এমন সময়ে কলরকা যাতে
হয় তাই কবাই ত’ ভাব।’

‘নির্মলাকে তোমাদের একবার মনে
পড়ল না, ঠাকুরঝি?’

‘তোমার কথাই বড় ঠেস থাকে বউ।
নির্মলা আমাব ভাইঝি। তাকে মনে পড়বে
না কেন? কিন্তু তাকে ত’ ওবা ঘরে
নেবে না। একবার ডাকাতে ছুঁয়েছে, যবর্ত
সেয়ে। ওতেই ও নষ্ট হয়েছ।’

‘ছি ঠাকুরঝি, তুমিও জান আমিও জানি
কদীবা ওব হাবগাছা ছিঁড়ে নিষেছিল বউ
আর কিছু কবে নি। নরপতি মিশ্র যদি
অমন কবে বোধ না কবত তা’হলে কেউ
জানতেও পেত না।’

‘বউ, নরপতির বা কি দোষ সেবে বল?
ওর বোন পূর্ণিমাতে দাদা জিতে তন্তু ঘি
ফলে দিতে বলেছিলেন। হতভাগী সেই
ভয়ে আত্মহতী হয়ে জুড়োল। সে
জুড়োল, কিন্তু নরপতির বুকেব জ্বালা কি
নিভেছিল?’

বিশালাক্ষীও তা জানেন।

‘সেখ, নির্মলার ভাগ্যে যা ছিল তাই
হল। প্রথম চার বছর আমবা সবাই বড়
কষ্ট পেয়েছিলাম। সন্ধ্যাকে আমিও
কম গালাগালি কবি নি। কিন্তু কি আর
হবে বল। নির্মলাব যা হবার তা হয়েছ,
এখন দুলালের সংসারটা ত’ দেখতে হয়।
ওর দিদি আমাদেরই বড় প্রবেছে। তা’
ওদের মনটা বড় বলতে হবে। নিমলির কথা
মনে বেধে কোন বকম মঙ্গ ব্যাভাব কবে নি।’

‘হ্যা, বড়ই সহ্য। তা ওব দিদি এ
সেয়েব সন্ধান পেলেন কি করে?’

‘সে অনেক কথা বউ। তবে এটি
জেনে বেধ মেয়ে এখন তোমার দাদা-মউঠান-
দেব কাছেই আছে জানতে পেরে কে যেন
গিবে গেছে এসেছে। তা ছাড়া, সবাই
জানে তোমার দাদা, মেয়ের মেশোমণায়
গৌরীব বিয়েতে অনেক সেবেন-ধোবেন,
ছেলেপুলে নেই তা।’

‘নিমলিও যে ওখানেই আছে, তা কি
তুমি ভুলে গেলে ঠাকুরঝি?’

‘ওখানে আছে ত’ কি হয়েছে? সে
তাব স্বামীর কাছে এখন সবামাষুয়ের সান্নিধ্য
বই ত’ নয়।’

‘তোমরা সব পার। কিন্তু আমার হাত
দিবে এমন ছোট কাজ হবে না। আমার
দাদার টাকার ভগসা যদি করে থাক তা’হলে
বলি আমি দাদাকে লিখে দিচ্ছি তিনি যেন
এ বিয়েতে কানাকড়িট না দেন। মেয়ে-
মানুষ হয়ে জন্মেছে বলে নিমলিও ওপর
এমন অবিচার, গৌরীকে আবার তাদেব
হাতেই বেচা, না না, আমি তা হতে দেব
না। দুলাল এখন চায় বিয়ে কবে পিঠটান
দিক। আর সববে-অসময়ে গিয়ে আমার
দাদার কাছ থেকে খরচা নিক কেন?’

‘তবে কি বলতে চাগ, দুলাল ঐ নষ্ট
মেয়েকে নিয়ে ঘর কববে?’

‘আনন্দীবা না, বিশালাক্ষীব বড় সতীন
ঠিকবে উঠলেন।

‘মানুষের মত মানুষ হলে তাই কবত।’

‘ভাল রে ভাল, মূলমানবের বিধান।’

‘তাবা তোমাদের চেয়ে মনুষ্যত্ব রাখে
দিদি। কথায় কথায় যবেব মেয়ে বউকে
পথে বেব কবে না। তা ছাড়া, আমি
এমন অনায়া কথা বলি নি যে তুমি অমন
জ্বক কথাটা বললে।’

‘রুক কথ। কোথায় বললান, ছোট?’

‘বলেছ যা বলবার যথেষ্ট বলেছ।’

বিশালাক্ষী এতদিন এ-সংসারের সকলের
নীচতা, সজীর্ঘতা, স্বার্থপরতা যেন হানিমুখে
সহ্য করেছেন। সব সহ্য কবেছেন একদিকে
চেয়ে। তাঁর বড়ছেলে, তাঁর গোপাল,
তাঁর আনন্দীরামের জীবনটা একটু সু-সহ
কববেন বলে। কিন্তু ফুলেশুবারি নিষ্ঠুর
ব্যবহারে, মানুষ হতে হবে বলে যেদিন থেকে
আনন্দীরাম বাড়ি ছেড়ে বেরোলেন, আর
কিবলেন না, আব সংবাদ যেন না, সেদিন থেকে
বিশালাক্ষীব অতল, অপার ধৈর্য যেন-একটু
একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

তিনি বললেন, ‘দুলাল যদি মানুষ হত,
তা’হলে সে নিমলিকে প্রাণচিহ্নিত কবিয়ে গ্রহণ
কবত। আমার দাদা লিখেছেন আপৎকালে
এমন কত হচ্ছে। কিন্তু তা সে করল কই?’

পাতানী পিসী শিশুস ফেনে বললেন, ‘
তোমার কথা আমি বুঝি। কিন্তু কুলীনের
মেয়ে, আমাদের উঁচু জাতের মেয়েদের
জীবনের দাম কি বল? কানাকড়িও না।’
‘জানি।’

একথা বলতে গিয়ে বিশালাক্ষী শ্রুত-
পদ্যের মত মুখ আনচ্ছ হল, তিনি আবার
সলতে পাকিতে লাগলেন। দুপুরে উঠানে
গাছের ছায়ায় বসে, শ্রব-বোবনা, অপকপ
রূপসী বিশালাক্ষী এমন কবেই সলতেই
পাকান, শিকে বোনের, তাঁর গোপালের সংসার
বাড়িবাড়ি কবেন, নানদের মেয়েদের আনন্দীর
ছোটবউ কুলমালিকে সেলাই শেখান। তাঁর
মেয়েব মত চুল, গভীর কালো চোখ, কাপড়ের
লাগা অঁচল দেখে দেখে আনন্দীরাম ছোট
বেলা হুটে এসে তাঁকে ঘড়িয়ে ধবডেন।
বলতেন, ‘ছোট, তোমায় ঠাকুর ঠাকুর
দেখাচ্ছে। ঠিক যেন পটের ঠাকুর।’

এখনো তাঁর রূপ দেখে সবাই যেন নতুন
করে অর্থাৎ হল।

পাতানী পিসী আন্তে বললেন, ‘নাও
তকলি আন, তুলো আন, পৈতে কাটি।
বউ, শোন, তুমি যা বল আমি সব বুঝি।
কিন্তু মেয়েদের জীবন যে শুধু কঁাদতে আগা।
নিমলিকে ছুঁয়েছে, তাই এত কথা বলছ?
তবে শোন, ঐ নিমলিবা মামী, এগারো বছরের
মেয়ে, মানাশুভ্রের চরিত্র দোষ, তাব কাছে
পান চেয়েছিল লুকিয়ে। তাই শাস্তী তাকে
ষাটে নিয়ে গিয়ে জলে বুঝ ডুবিয়ে মেরেছিল
গো, আমাদের স্বচক্ষে দেখা।’

‘না গো।’

যোমটার ভেতব কুলমালা যেন শিউয়ে উঠল।
সে একপাশে, দুবে বলে সন্দেহের ছাঁচ তৈরি
করছিল নকশ দিয়ে।

‘ঠাকুরঝি, ও-সব কথা বাধ। জীবন্তে
যখন চিন্তায় তোলে তখন আমবা একমুখে উলু
দিই, আর মুখে ভয়ে কাঁপি। কিন্তু সে
অনেক ভাল বোন, কুলীন হবে মেয়েমানুষ
বাঁচলে বত দুঃখ, তার চেয়ে ভাল।’ আনন্দীর
না বললেন।

আনন্দীর পিসী বললেন, ‘নাও দেবি
পাতানী, ছেঁড়া কথা বাধ। আমাদের
উঁচু ঘরে যত মেয়ে বউ শূভ্রবাড়িব কাঁটা
আব বাপেরবাড়ির লাগি খেয়ে মবে তার
লেখাঝোখা আছে? আমাদের ছোটবউ বড়-
মানুষের বোন, এ সংসারের রানী, ওদের
কত বড় হবে যাতায়াত ছিল, ওর মুখে এমন
কথা শোভা পায়।’

‘তোমার মুখেও এমন কথাই শোভা পায়।
বিশালাক্ষী অসম্পষ্ট হয়ে বললেন, ‘হাবিটাকে
ওরা নুড়ো জ্বলে গায়ে-ছেঁকা-দিয়েছিল তবু

ত'ওকে নাগান সেই চাঁদ্রাবের বাড়ি। কোলে ছেনে, ও ক'য় ক'দিন ম'নীনা, আমি গেলে পবে আব কিয়া না, আপনি আশায় পাঠাবেন না। তা মেবে বলে তুমি একটু মমতা কবলে না।'

তাঁব নিজে ননন এবাব ঠিকবে উঠলেন। ব'নো, 'তুমি কি বুঝে ছোটবট? যখন বেধে নে আছ, তখন দেখানে বাধি। আবার ননের ছাঁদা তুমি কি বুঝে? ছাঁদাই আসতেন না, কত ক'টা পাবে ববে তাঁকে আনতে হত। তবে ত' হাবির ওপর ওব টান হল। হাবির খোকাটি ব'নন হল, তখন শুষের ববে। পিয়ে তাংবের ভাত খাবে না কেন? বাপেবাড়িও না, মা'মা'বাড়ি পড়ে থাক। তা নানা নেই, নানা'তো ভাই নেই, কাদের ভবসার থাকবে শুনি?'

এতবড় অকৃতজ্ঞতা তাঁব ছোট মেবে বাহি গ'হা কবতে পাবন না। এক সে স্বভাবে ব'ববে, তাব ওপর বিশালাকীকে বড়ই ভাল-বাসে। সে শুনল, 'এতবড় কথটা কেনন করে বললে যা? ছোট ম'নী আছেন বলে আমবা কোন ক'ই জানি নি। দিকিকে এবাব ধরবগত করতে বে জিনিসগুলো দিলে, তা কে দিল? ম'নীনা ত' ঠিকই বলেছেন। সেবা এগে তাব বব তাকে হাতখানা মুচড়ে দেয় নি? ওবা ত' অননিষি বটেই।'

'চুপ কব বাধি।'

মা-মেয়ের এ কলহে বিশালাকী চট কবে কোন ক'থা বললেন না।

'চুপ কব কেন? এবাব ম'নাকে দিয়ে কিসেব পত্তব করাছ? আমি জানি না? আমি দিকির সতীন কিছুতে হব না।'

রাধি এবাব কেঁদে কেঁদল।

'রাধি! যদে যা। বড়দের ম'থ্য মসে ক'থা বলিস্ তোব ত' বড় আশ'ধা হযেছে? বউমা, তুমি খেয়ে কাপড়চোপড়গুলো তোমা। রাধিকে বল গিবে আমার ম'শারিটা সেদে রাখুক।'

রাবির মা তাঁব গোপন ক'থা ক'সি হযে যাওবাতে যেন বড়ই অপ্রতিভ হযে গেলেন। এখন বিশালাকী কি বলেন তাই শুনবানজন্য চেয়ে বইলেন।

বিশালাকী কিছুই বললেন না। এইসব আর্থসর্বস্ব অল্পবুদ্ধি লোকদের নিয়ে তাঁকে সংসার করতে হয়। আনন্দী'র ম'মা, এ সংসারে পুরুষ-অভিভাবক হিসেবে আছেন বটে, কিন্তু তিনি আহা, নিদ্রা, স্বাদ্রার গান তাঁদা, এবং অবসর সময়ে নিজের বোন এবং বোনের এই ননদের সঙ্গে কিভাবে আনন্দীবাসকে বিশালাকীর কবলনুজ ক'বা যাব তা নিয়ে সতেন্দ্রে আলোচনা করে থাকেন। অবশ্যই

বিশালাকীর কানেব বাইবে। স্বাভাবিক আদায়তশীল, মূনিম-মাহিলা'র খাটানো, এসব তিনি ক'মই কবেন। প্রথম বর্গীর হাঙ্গারায় একটি গেকরাধারী, নামও তার বৈরাগী, সে এসে পড়েছিল এ বাড়িতে। বৈরাগী আব স্ববকণ্ঠেব বাড়ির সেই দবজ অনাথ পাগল নামে লোকটি এবা দুজনই বিশালাকীর সবক'ম কাজে সাহায্য কবে।

'তোমাদের নিয়ে যে কতদিন জুজুতে হবে তাই ভাবি।' বিশালাকী না বলে পারলেন না।

তাঁব সতীন ও ঠাকুরঝি ম'খ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। এতদিন তাঁবা যথেষ্ট অবুজ আদায় ও অশান্তি কবতেন, সতীন ত' ক'খার ক'খার গলায় দড়ি দিতে যেতেন, বিশালাকী সবই সহ্য কবতেন। ইদানিং ও'র সহ্যওণ কনেকে, অতএব এ'রা ও'কে ম'ন্য করতে শিখছেন।

'দাদা যে বেতে বলেন, আমি যে বাই না, সেকি তোমাদের জন্যে?'

পাতানী পিসীও ভেবে পেলেন না কোন দিন, এ গ্রামের বউ হযে আসবাব পন থেকে বিশালাকীকে এমন কবে খেঁয়চাত হতে দেখেছেন কি না।

'এখানে আছি, না হলে গোপালের ক'ট হ'র বলে। গোপালের স্বখশান্তি হ'বে, সে দুই বউ নিয়ে সংসার কববে, তা দেখে তবে আমি নিচিন্ত হব।'

আনন্দীর মা চিবদিনই বেক'গ ক'থা বলে থাকেন। তিনি হঠাৎ বললেন, 'আব তোমার কানাই ক'বে আসবে সে-আশা যে রাখ, সে ক'থাটাও বল? চড়কের বেনার ছেলে হাবালে তা কি ক'বে পাওয়া যাব?'

এই ক'থাটি বিশালাকী কখনো উজারন করেন না। এই ক'থাটি তাঁব ম'নে গাথা থাকে। সেই কবে, চড়কের আগে, শ্মশানভূমির মাঠে তাঁর ছেলেকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল মাহিলা'র ক'থে বসিতে, আব তাকে ক'বে পান নি। এখনো পাঞ্জনের ঢাক শুনলে তাঁব বুকের ডেডর মা পড়ে। ই'য়া, সতীনের ক'থা ঠিক। এ গ্রামে পড়ে থাকবাব একটা কাবপ হ'ছে সেই অসম্ভব আশা। যদি কখনো কানাই ক'রে আসে। কিন্তু তাই ত' একমাত্র ন'য। তিনি যে আনন্দীবাসকেও ভালবাসেন। তিনি যে জানেন আনন্দীবাস এ ক'য় বছরে ক'ত অগিগাহ কানাইয়ের খোঁজ করেছেন, কানাইকে ডোলেন নি, আনন্দীবাসকে তিনি কেনন করে এদের হাতে ছেড়ে যাবেন?

'সে আমি বুঝ দিদি, তুমি ক'থা বাড়িও না।'

বিশালাকীর ম'খ দেখে পাতানী পিসী বুঝলেন

সতীনের ক'থাটি বুকে গেগেছে। তাঁব ভাব লাগন না। যা হোক, দুটো ক'থা হ'বে, সমরটা কাটবে ভাল, সেজন্যেই না এসে-ছিলেন? তা ছাড়া দুলালের দিদি যে এসে কবে বিশালাকীকে ধরতে বলেছিলেন, এখন সে ক'থাটাও বা ডোলেন কেনন করে? হঠাৎ তাঁব একটা ক'থা মনে পড়ল।

'ও মা, আসল ক'থাটাই বলতে ভুলে গিয়েছি, বাগদী পাড়ায় যে মজার পনর বে। কানাই তাঁব বউ পানীকে নিয়ে এসেছে বলেছে ম'মা! দটি নিধান যেন তবে ওকে নিয়ে ব'ব কববে। নইলে ছাত ছাড়বে, তবু বউ ছাড়বে না। আজ বিকেলেই বুঝি আট-চালায় সমাজ বসে, মাই, দাদা বলেছিলেন পান সেখে রাখতে।'

'বামাই এ-ক'থা বলেছে? বাগদী-পাড়ার কানাই?'

'ই'য়া গো ই'য়া, সম'ব এখন অন্যরকম, দেশে উল্টো বাতাস বইছে, বাগদীবা-রুক ক'থা বলবে তাতে আশ'চ'র কি? তা ছাড়া ওদের বুঁবে এখন সবসময় একক'থা। কটু-বেঁচু যদি সোনার দামে কিনে ধোতে হয়, চামচাং হাবিয়ে চুবি-ভা'কাতি কবতে হয়, তা'হলে ক'থাবা'তা রুক হ'বে তাঁব আব দোষ কি?'

'বামাই বলেছে।'

বিশালাকী আবার বললেন।

কুবোচ্ছে না, তাঁব বিস্ময় যেন ক'বো'গত চাইছে না, এতদিন যে-ক'থা তিনি ক'প'গ শোনেন নি, আজ সেই ক'থা শুনলেন। মা'দা দেশে একটু পুরুষ বলেছে? জী যদি নির্দোষী হ'য়ে থাকে তবে তাকে সে ত্যাগ করবে না। সে পুরুষ হ'যত নিচু ছাত, বাগদী, তবু ত' সে এ-ক'থা বলেছে।

'পারী বড় সুন্দরী, তাই না গো পাতানী?'

বিশালাকীর ননন উৎসুক আগ্রহে প্রশ্ন কবলেন। বাগদী কেওট পাড়ার প্রায় সবাইকেই চেনেন। তবে পারীর মুখটা মনে পড়ছে না।

'ই'য়া, রূপ আছে, দিকি গড়ন, এক পিঠ চুল, ভারী হাসকুটে মেয়ে। ক'খার ক'খার হাসি।'

'ক'তারা কি বলছেন?'

'বলছেন কিছুতে এ অধর্ম হতে দেওয়া হবে না।'

'পারী কোথায়?'

'আব বল কেন? পাতানী পিসী এখন কপালে যা মারলেন। বললেন, 'বামাই বাগদী এমন লেঠেল, মেজাজে চাববী ক'বে, ও'র বউ-এ'র অভাব? তা ও পারীকে ছাড়বে

মা। এদিকে পানীকে এনে যে ঘরে ঢুলবে সে ভয়সাপ পায় নি। তাই ঐ নিশ্চিন্তমনে বসে একবারটা ঘর ভুলে বউকে বোধহয় পানীর অবস্থাও ত' ভাল নয়। বে কোন লগবে নতিবড়িকে ডাকতে হবে।

নতিবড়ি অত্যন্ত পাড়ার খাত্তী। সে বড়বনেও প্রসব করায়।

'সর্বনাশ! বিশালাক্ষী কাতর হয়ে ফললেন, 'বনে যে ওকে বাধে-ধানে।'

'সেই কথা ভাবছ বউ? আনি ভাবছি এমন কলস নিয়ে ওকে বাধে খেলেই ভাল।'

তান সতীন বললেন।

পাতানী গিলী বললেন, 'ও মা, তোমরা বলছ কি! বাগদীদেব বকমসকন যদি দেখতে তারা ত' দলে দলে পানীর ঘর পাহারা দিচ্ছে। নতিবড়ির নতিও তাদের সঙ্গ আছে, তাই ডাকলে পবে বডিকে যেতেই হবে, উপায় কি? জঙ্গলে যেন সেলা বসেছে মা। এখন শুধা বলছে আবার বগী এলে আমরা জঙ্গলেই থাকব।'

'পানী কি বলে?'

পানীর ঘন কোঁবড়া চল, হাতে কাচ ও রূপোর চুড়ি। কানে লাল প্রবালের লবঙ্গ কুল আঁসি হাসি চোখ মনে করে বিশালাক্ষীর এখনো কষ্ট হচ্ছে।

'সে নাকি বলেছে সমাজ যদি ভাল বিবেনা করে তবেই হবে কিংবা? যদি তাতে পতিত করে তবে ঘরে গিয়ে 'পাড়াপুঙ্জ' সকলকে পতিত কবব কেন? আবার এদিকে লড়াই-এব সমস। বাবাই একবার সেখানে যাচ্ছে, এক ঘাব এখানে আসছে।'

'দেখ, সমাজ কি বলে! এখন কিপদের সময়। দেশের বুকে লঙ্কাকাণ্ড হচ্ছে। গ্রামকে গ্রাম উজাড়, এখন কি আর এসব নিয়ে কটোকটি করা উচিত?'

'জ' বেটাছেলেদের কাজ বেটাছেলেদের কাজক। পাতানী পিসী অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন।

বিশালাক্ষী বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'বেটা-ছেলেদের কাজ শুধু মেয়েদের পতিত করা, ডাঙ্গি করা, ঘোষ ধরা, শান্তি দেওয়া, মেয়েদের আগলে রাখা, সামলে রাখা, সেটা তাদের কাজ নয়?'

পাতানী পিসীর ঈর্ষা যেন এবার কেটে পড়ল। তিনি বললেন 'ওলো, যত বড়-মানুষের বোন হ'ল না কেন, যত বিদ্যে থাক, অঙ্গার মত রূপ থাক, মেয়েমানুষের ভাগ্য উলটে দেওয়া চাটখানি কথা নয়। এই ত' শুনেই পাই রাজা বায়পুর্নভ তাঁক পাঁচশানের হাঁড়ী মেয়েকে বারো বছরেকট করে বিয়ে দিতে চেয়েছিল, নাটোবের বাণী বিববা মেয়েকে একাদশাতে জল দিতে চেয়েছিল, তা বিধেয় কি পেল? নদের বাবা কেটচয় অননি

কড় বড় পতিত ডেকে সব বিধেয় উলটে দিলে না? টাকা থাকলেই বুঝি হরকে নরা করা যায়?'

'টাকার ঘনো নয়, যাব প্রাণ কাঁদে সেই পথ খোঁজে ঠাকুরকি।'

'তুই দেখছি গ্রামে ভাঙন আনবি। সেই জন্যই বোধহয় তখন চিতগাই হ'ল নি। এখন সকলের সব বিবান, বর্বের পাঁতি সব উলটে দিতে চান? পাতানী পিসী চোঁচিয়ে উঠলেন।

'উলটে দিতে চাই কি না জানি না।

তবে হরকে নয় আমিই কবতে চেয়েছিলাম। দাদাকে লিখেছিলাম তোমাদের নিম্নলিখ ববকে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে নিম্নলিখ প্রাশ্চিত্ত কবিয়ে গ্রহণ কবতে। লিখেছিলাম দবকার ছহন সেজন্যে না হয় কিছু খবচপত্র কববেন, মেফটা স্ত্রী হক। কিন্তু সে পত্রের উত্তরও দাদা দেন নি। এখন দেখছি দুলাল সেখানে গিয়েছিল, আর তাতে উলটো কল ফলেছে। সেখানে গিয়ে সে নিশ্চয় বউঠানের বোনবিকে দেখে এসেছে, আর তা' থেকেই এই বিয়ের কথা উঠেছে।'

পাতানী পিসী 'বনিয় মেয়ে!' বলে খবখবিয়ে উঠান থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিশালাক্ষী সলডেব গোছা নিম্নে বরে এলেন।

'এ যে বড় সাহসের কাজ মা। কেন করতে গেলে? কুল আস্তে বলল। কুল এ-বাড়িতে আশ্রিতা, অনাধার মতই থাকে। বগীর হাঙ্গামার তার বাপ-ভাই সবাই নিহত

হকর পব থেকে তাঁর বাবার আশ্রয় নেই। স্বামীর মন তার বড়সতীন ফুলেশ্বরীকে দিয়ে স্থানীয় কানায় চলা, সেখানেও কুল প্রেমের আসন পাব নি। স্বামীর কাছে পেয়েছে সেহ ককণা, সমতা। বিশালাক্ষীর কাছে পেয়েছে আশ্রয়। তাঁকে সে বড়ই ভালবাসে, ইমানী, আনন্দীবার দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ থাকবার জন্যে বিশালাক্ষী আব কুল দুঃখে, উবেগে, চিন্তায়, মা-মেহয়ার মতই কাটছে এসেছেন।

'সাহসের কাজ তা জানি মা। তু ভাবলাম নিম্নলিখ যদি এতে স্ত্রী হয়।'

'তোমার কোন বিপদ হবে না ত?'

'তোমার মুখে একথা কেন মা? বিপদ আর কি হবে? বিপদ দেখছি নির্ভাবই হয়। ওব স্বামী ওর গামনে দিয়ে আরেকজনকে বিয়ে করলে ওর মনে কষ্ট হবে। থাকগে, যা হবে তা হবে। এখন এস, তোমার চুল বেঁধে দিই।'

এমন সময়ে দূরে কাঁসর বাজল, বণ্টা বাজল।

'তাড়াতাড়ি ঠাকুরের শেতল দিয়ে কর্তায়া সব আটচালার যাচ্ছেন। আহা, জঙ্গলে ঘরে পানীর বুকের মধ্যে না জানি কি হচ্ছে।'

বিশালাক্ষী অশ্রুতে বললেন, 'যেপে যখন এই ডাকডোল, তখনো এঁরা সবাই করছেন! মানুষ যে মরে গেল, সমাজটা আছে কোথায়?'

(ক্রমশঃ)

আর আই সি-র

আধুনিক ডিজাইন-এর

সুন্দর ছাপা শাড়ীগুলো দেখেছন?

দাম ১০-২৫ টাকা থেকে.....

আমাদের যে-কোন দোকান থেকে কিনুন:

৩৭, ধর্মাতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

২৫, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট কলিকাতা-১৬

২৩, গাড়িয়াহাট রোড, (গোল পাক), কলিকাতা-১১

বেনাচিটি ও চন্দ্রীদাস রোড মার্কেট, দুর্গাপুর

রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ

(ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠান)

২৫, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

চালি চ্যাপলিন

(পূৰ্ণ-প্রকাশিতের পর)

একজন শুক্ল সজ্জা দেখা
করতে গিয়েছিলেন—এখন আমার
ভাইয়ের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি—
আসবে নাকি আমার সঙ্গে?

পথে হেঁচা জানালো তাই
বোন আমেরিকান লকপতি
জ্যাক জে গোল্ডকে দিয়ে
করে নিজে গিয়ে বাসা বেঁধেছে—
হেঁচাও পবেৰ দিন সকালে
লণ্ডন ছেড়ে নিজে রওনা
হচ্ছে।

ওদেব বাড়িতে এসে কিছু
হেঁচা চালাচলন—চ্যাপলিনের
মোটাই ভাল লাগছিল না। ভাইয়ের
সঙ্গে হেঁচা নাচতে শুরু করল এবং
ভয়ানক ছোঁকাই করতে লাগল। তাই
কথাবার্তা এবং আচার-আচরণে
একটা উগ্র উচ্ছ্বসিতা লক্ষ্য
করলেন চালি। মনে হোল হেঁচাও
যেন অত্যন্ত সাধারণ স্তরের মেয়েদের
মত হয়ে গেছে। ভেতবে ভেতরে
চালি অনুভব করলেন যে, হেঁচার
প্রতি তাঁর অনুভূতি। যেন একটু কমে
এসেছে। মনটা স্বভাবতই একটু
বিষণ্ন হয়ে গেল। নিজেকে নিজে
জিজ্ঞেস করলেন—যদি সম্ভব হোত
তাহলে কি এখন তিনি হেঁচাকে
বিয়ে করতে বাজী হতেন? কিন্তু
দেখলেন কাউকে বিয়ে করবার
ইচ্ছাট এখন নেই।

কার্নো আবার চ্যাপলিনকে
মারিং বার্ডসে অভিনয় করতে লাগিয়ে
দিলেন। আর মজা এই যে, এক
মাসের মধ্যেই তাঁর গলা সম্পূর্ণ সুস্থ
এবং কণ্ঠস্বর আগের মত হয়ে গেল।
'দি ফুটবল ম্যাচ' করতে গিয়ে যে
খাঙ্কা খেয়েছিলেন, তা চ্যাপলিনকে
যেন একেবারে বসিয়ে দিয়েছিল—
তাঁই ও ব্যাপারটা সহজে মনে আনতে



চাইতেন না। তবু মাথের মাঝে মনে
হোত ওয়েল্ডনের বদলী হয়ে পাঁচ
করবার যোগ্যতা হয়তো তখনও
তাঁর হয় নি। আৰ এসবের পেছনে
উঁকি দিতো সেট করেস্টারসের
অসাক্ষ্যের কাহিনী। নিজের
আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে ফিরে না
আসাতে প্রত্যেক স্কেচ-এ নামবার
আগে চ্যাপলিন বেশ নার্ভাস ফিল
করতেন।

এবং চ্যাপলিনের কনট্রাক্টের
সময় শেষ হয়ে এল—কার্নোকে
জানানো দরকার যে, এবার তাঁর
মাইনা বাড়িতে হবে। কার্নো
স্বভাব ছিল যে, দরকার হলে, বাকে
তিনি পছন্দ করেন না—তাঁর সঙ্গে
বেশ নৈরাশ্যজনক এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার
করতে পাবতেন। কিন্তু বেহেতু
চ্যাপলিনকে তিনি ভালবাসতেন
সেজন্য তাঁর ঐ নির্মম দিকটার সঙ্গে
চ্যাপলিনের কখনও পরিচয় ঘটে নি।
মাই হোক নতুন কনট্রাক্টের ব্যাপার
নিয়ে তিনি তো কার্নোর সামনে গিয়ে
দাঁড়ালেন। মৈরাস্যময়ভাবে মৃদু
হেসে কার্নো বললেন—'তাহলে, তুমি
চাও যে, তোমার মাইনা আরও বাড়িয়ে

দেব। কিন্তু অক্সফোর্ড মিউজিক হলে'র
সেই বিশ্রী ঘটনার পূর্ব আশাদের কাছে
চারদিক থেকে খালি নালিশই আসছে।
অনেকে এমনও বলছে এ দল ঠিক
আপু টু দি মার্ক নয়।

'তা যদি হয়! তাব জন্য
আমাকে তো দোষ দেওয়া চলে
না।'—বললেন চালি।

'কিন্তু তাই তো তাই বলছে'—
দ্বিবদ্বীতে চালির নিকে তাকিয়ে
রইলেন কার্নো।

'তাদের নালিশটা কি নিয়ে?'—
জিজ্ঞেস করলেন চালি।

কैसे গলাটা পরিষ্কার কবে নিলেন
কার্নো এবং যেখান দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ
কবে বললেন—'তাঁরা বলে তুমি ঠিক
উপযুক্ত নও।'

এ উত্তর শুনে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা
খেলেন চালি এবং মনে মনে খুব
চটেও উঠলেন। কিন্তু বাইরে সে-
ভাবে না দেখিয়ে শাস্তভাবে জবাব দিলেন:
'তাঁই নাকি! কিন্তু অনেকে আন্তে
যারা অন্যভাবে ভাবে। তাদের মধ্যে
কেউ কেউ আমি এখানে যা রোজগার
করি তার থেকে বেশি দিয়ে আমাকে
চাকরী দিতে রাজী।'

কথাটা অবশ্য সত্যি ছিল না
মোটাই—অন্য কোন জায়গা থেকে
কোন অফার চালি তখনও পর্যন্ত
পান নি।

মাই হোক কার্নো অনেক রকমে
চালিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে
শো ভাল হচ্ছে না এবং কমেডিয়ান
হিসাবে চালি নাম করতে পারেন নি—
চালি কিন্তু নিজের গৌ ছাড়লেন না।
তিনি সোজা জবাব দিয়ে দিলেন যদি
কার্নোর মনে হয় যে, তাঁকে দিয়ে কাজ
চলবে না, তবে তাঁর কনট্রাক্ট রিনিউ
না করলেই হয়—তবে তাঁকে রাবতে
হলে বেশি মাইনা দিতে হবে। সে
সময় তিনি সপ্তাহে মাইনা পাঁচ পাউণ্ড
করে পাচ্ছিলেন—দাবি জানালেন যে,
নতুন কনট্রাক্টে ছ'পাউণ্ড করে দিতে
হবে। চালিকে বিস্মিত করে দিয়ে
কার্নো কিন্তু তাঁর দাবি মেনে নিলেন—

আর তা ছাড়া আবার তিনি কার্ণোর পেটোরায় হয়ে পড়লেন।

কার্ণোর আমেরিকান কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন অলফ্ রিভিং—তিনি এসময় ইংলণ্ডে এলেন। শুধু বোনা গেল তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর কমেডিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান টেটসে। অলফোর্ড মিউজিক হলের অগাকনোর পর থেকেই আমেরিকা পরিভ্রমণের চিন্তাটা চালির মাথায় বৈছিল। শুধু যে এটা একটা উদ্ভেজনা এবং এ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপার সে কথা ভেবে নয়—নতুন আশা নিয়ে নতুন-ভাবে অভিনয় শুরু করতে পারবেন নতুন অর্গতে, এই চিন্তাটিই তখন মনে এসেছিল।

ভাগ্যবশত চালিরা সেটসময় বাসিংহায়ে খুব সাক্ষ্যের সঙ্গে কোটং বলে একটি স্ক্রু বন্ধ করছিলেন—এর লিডিং কমেডিয়ান ছিলেন চ্যাপলিন। কিস্টার রিভিং এটা শো দেখে একবারে মুগ্ধ হয়ে পেলেন। তিনি কার্ণোকে তার করে জানানেন যে, টেটসে নিজে যাবার জন্য যে কমেডিয়ানকে তিনি খুঁজছিলেন, তাকে পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কার্ণোর আবার নিজস্ব এক পরিকল্পনা ছিল। করেক সস্তাই নানা বিরা-বন্দুর মধ্যে কাটল। শেষ পর্যন্ত কার্ণো এক স্ক্রু নাছাউ করে থের করলেন। এর নাম হোল 'নিউ-উজ্'। এটা ছিল সিক্রেট সোনাট্ট সঙ্কীর্ণ একটি বারলেসেক।

রিভিং এবং চালির এই স্ক্রেচটি মোটেই ভাল লাগে নি—অর্ধহীন বোকানিতে তারা একটি অভ্যস্ত বাজে মজা—এই তাঁদের মনে হয়েছিল। কার্ণোর কিন্তু অন্যরকম ধারণা—তাঁর মত ছিল যে, সারা আমেরিকার বহু সিক্রেট সোনাট্ট ছড়িয়ে আছে। এ নিয়ে একটা মজা করতে পারলে ওখানকার দর্শকরা খুব নেবে। চালিও হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁকেই

'নিউ-উজ্'র নারক মনোনীত করা হোল আমেরিকা নিয়ে যাবার জন্য।

ইউনাইটেড স্টেটসে যাবার সুযোগই চ্যাপলিন খুঁজছিলেন। ইংলণ্ডে আর তাঁর বিশেষ ভবিষ্যৎ নেই মনে হচ্ছিল বিন্যাসিকাও ভেবন কিছু হয় নি। এরপর যদি মিউজিক হল কমেডিয়ান হিসাবে অসকল হন, তাহলে গৃহভৃত্য জাতীয় নীচত্বের চাকরী ছাড়া কাজ জুটবে না। টেটসে আর কিছু না হলেও তার থেকে ভাল চাকরী জুটবে নিশ্চয়।

জাহাজ ছাড়বার আগের রাতে চালি লণ্ডনের ওয়েস্ট এণ্ডের সর্বত্র ঘুরে বেড়ালেন। নাখে নাখে লেস্টার ভোরার, কভেন্টি গিল্ট, বন এবং পিকাডেলীতে দাঁড়িয়ে রইলেন—মনে মনে ভাবছেন শেখবাকের মত এ জায়গাগুলো বন-প্রাণ নিয়ে সেবে নিউ। ভেতরে ভেতরে টিক করে কেনেছেন যে, আমেরিকাতে গিয়ে স্বাধীনভাবে থাকবার বন্দোবস্ত করবেন। রাত দুটো (ইংরাজী বতে সকাল দুটো) অবধি এইভাবে রাতার রাতার ঘুরে বেড়ালেন বিবাদাচ্ছন্ন মনে। পরিভ্রান্ত পথগুলোর একটা নিজস্ব কানাময় সৌন্দর্য আছে—মনে হতে লাগল চালির।

প্রবাসে বেতে হলে আত্মীয়-পরিজনদের থেকে বিনায় নেবার পালাটা বড়ই অবস্থিকর লাগতো চালির। মনে হোত এতে করে বিচ্ছেদের দুঃখটা আনও তীব্র হয়ে উঠবে। সকাল ছ'টার বিছানা থেকে উঠলেন—সিডনেকে আর জাগালেন না। চেবিলের ওপর একটা নোট রেখে গেলেন—'আমেরিকা চললাম। তোমাকে নিয়মতাবধি সব খবরাখবর দেব। ভালবাসা নিও—চালি।'

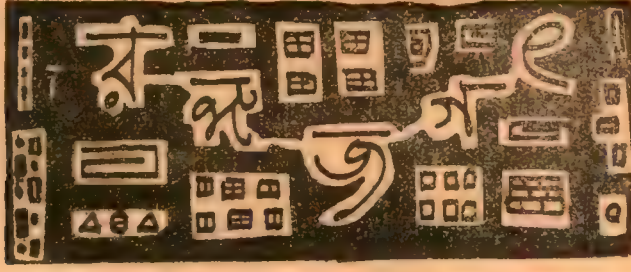
বারদিন বিক্রী আবহাওয়ার মধ্যে সমুদ্রের বুকে কাটাতে হোল চালিশের। জাহাজ চলেছে কুইবেকের দিকে। কুইবেক হচ্ছে ক্যানাডার কুইবি

প্রদেশের একটি শহর ও রাজধানী। ক্যানাডার ঘর নিয়ে নিউকাউণ্ডলাও (ক্যানাডার আর একটি শহর) দিবে বর্ষন জাহাজ চলেছে তখন চারদিক কুরাণার ভরা। এরপর জাহাজ টোরোন্টোর (ক্যানাডার অণ্টারিওর রাজধানী) এসে থামল। নতুন দেশে যাচ্ছেন ভাবতেই চালির মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল। টোরোন্টো থেকে ট্রেন বরে এক ঘণ্টার সকাল দশটার চালিরা নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছলেন। স্ট্রিটকার থেকে টাউন্স ডোয়ারে বর্ষন নামলেন—মনটা কেবল খুশি হয়ে গেল।

রাতা এবং পেত্বেস্টে ধনবের কাগজের পাতাগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল—বাতাসের বাতায় সেগুলো নাখে নাখে এদিক থেকে ওদিকে উড়ে যাচ্ছিল। বৃত্তওয়েকে (নিউ ইয়র্কের নারজায়া রাতা—ওখানকার বিখ্যাত থিয়েটার-গুলো এই রাতাতেই অবস্থিত) মনে হচ্ছিল কর্কস, আনুখানু—যেন সফা ঘুর ভেঙেছে, এমন একজন নোঙরা বেশবাসধারী নারী সবেমাত্র বিছানা থেকে উঠেছেন। প্রত্যেক রাতার কোণার কোণার উচ্চ-উচ্চ চেঁচাতে বসে লোকেরা জুতো পরিকার করচ্ছিল—এ দৃশ্য ভারি বিকী লাগেছিল চালির।

এই তাহলে নিউ ইয়র্ক। এডভেঞ্চারের আবাসভূমি, লোককে তাক লাগিয়ে দেবার জায়গা, সানান্য একটু ভয়াবহও বটে। প্যারিসকে এর থেকে অনেক বেশি ভাল লেগেছিল চালির। যদিও কন্যাণী ভাষা তিনি জানতেন না, তবুও প্যারিসের রাস্তার ধারের কাকে এবং পাবুগুলো যেন সর্বত্র তাঁকে স্বাগত জানাতো। নিউ ইয়র্ক মূলত বড় ব্যবসার জায়গা। গগনচুম্বী স্কাইস্কেপারগুলো দেখে চালির মনে হচ্ছিল এরা যেন ঔদ্ধত্যের প্রতীক—সাধারণ লোকের স্বকর্ম-ধের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেলুন বারগুলোতে বসবার জায়গা নেই—জনসাধারণের জন্য খাবারের দোকানগুলোতে পর্যন্ত খুব আরামদায়ক বন্দোবস্ত নেই—যদিও সেগুলো এমনি বেশ পরিকার-পরিচ্ছন্ন।

(কন্যস)



কবি নজরুলের গানগুলি কি বিস্মৃতির পথে?

গত ২৫শে মে বিজোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিনে বেদনাক্লান্ত হয়ে বাঙালীরা স্মৃতি-বিস্মৃত কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। মলে মলে তরুণ-তরুণী সেদিন অগুরু পুষ্প উপহারে কবিকে অন্তরের প্রীতি জানিয়েছে।

দেশের মানুষের এত ভালবাসা নিয়েও কবির স্মৃতি আজ হারিয়ে যাবার পথে। যে কবি বিশ বছরের মধ্যে প্রায় ৪ হাজার গান রচনা করেছিলেন, আজ তার মধ্যে প্রায় তিনশত গান বিস্মৃত। এই গানগুলি আর হয়তো সহজে উদ্ধার করা যাবে না। কবির দেওয়া গানের সুর অনেক ক্ষেত্রে বিস্মৃত হয়েছে। পংগীতের বেচাকেনার বাজারে আজ কে সেই সুর শুধু করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে? গ্রামোফোন কোম্পানীতে কবির রচিত গান ও সুরের রেকর্ডের সংখ্যা অগণিত; কালক্রমে তারও কিছু কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। কবির নিজ কণ্ঠের আবৃত্তির রেকর্ড দুটি আজ আর গ্রামোফোন কোম্পানীতে পুঁজে পাওয়া যায় না। দেশের মানুষের এত ভালবাসা সত্ত্বেও যে কবির জীবিত-কালের মধ্যে তাঁর স্মৃতি বিস্মৃতির পথে যাচ্ছে—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

তুনেছি সোভিয়েট ইউনিয়নে জাতীয় কবিদের স্মৃতি ও স্মৃতি রক্ষার এমন ব্যবস্থা আছে যে—ছোটিকালের খেলার লাঠিমাটি পর্যন্ত সমস্তে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যম শূন্য দিয়ে সরকারি কবি ও শিল্পীদের স্মৃতিকে

রক্ষা করতে সচেষ্ট। এই চেতনা বলিষ্ঠ জাতীয়বোধ থেকে উদ্ভূত হয়। আমরা জাতীয়তার বড়াই করি, অপরের দেশপ্রেমকে চ্যালেঞ্জ করার স্পর্ধা প্রকাশ করি, কিন্তু জাতীয় কবিকে সম্মান দিতে জানি না, কবির স্মৃতিকে

রক্ষা করার মত শক্তি ও সাহস নেই। নজরুল কথা আমাদের জাতীয় সরকারের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যেতে হয় জাতীয় কবির প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য। প্রতি বছর ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে মন্ত্রীদের সফর পর্যন্ত শত শত সংবাদ ও তথ্যচিত্র নিমিত্ত হয়, অথচ কবির জন্মদিনের অনুষ্ঠান সংবাদচিত্রের বিষয় হয় না।

এখনো সময় আছে, কবির সহযোগীরা অনেকে জীবিত আছেন। তাঁদের জীবিতকালেই কবির লুপ্ত গান ও কবিতা উদ্ধার করা এবং সমস্তে রক্ষা করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এ বিষয়ে জনসাধারণের যেকোন আগ্রহ আছে সরকারের সেরূপ আগ্রহ থাকলে তবেই সম্ভব হতে পারে। —সুজন



‘সুখোজো পরিবার’ ও ‘মামাবিনী সেন’ ছবির নায়িকা সুলতা চৌধুরী

নাট্যের ২২৮

হাসি

বিশ্বরূপা থিয়েটারের নতুন নাটক 'হাসি'র কাহিনী রচনা, সম্পাদনা ও পরিচালনা করেছেন শ্রীদক্ষিণেশ্বর সরকার। শ্রীসরকার এতাবৎকাল নাটক প্রযোজনা করেছেন, এবার তিনি প্রযোজনা থেকে কাহিনী রচনা এবং পরিচালনার গুরুদায়িত্ব একটি সম্পাদন করেছেন।

'হাসি' নাটকের মূল চরিত্রে রাধা। রাধাকে নিয়েই নাটকীয় গংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত জজের বাড়িতে রাধা বধ্যমণি। জজ লতাপ্রিয় রাধার বিয়েতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে চাইলে দ্বিতীয়পক্ষের জী লতার সাথে প্রথম দৃশ্য শুরু হয়। লতা কুটিল চরিত্রের; সে রাধাকে এবং লতাপ্রিয়ের প্রথমপক্ষের সম্মান কল্যাণকে

সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায়। সদানন্দের এতে সম্পূর্ণ আপত্তি। এই আপত্তিকে প্রতিহত করতে লতা প্রথম আঘাত করলে। রাধার আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিয়ে। রাধা এবং প্রতিবেশীরা এই প্রথম জানলো রাধা সদানন্দের কন্যা নয়। সেই আঘাত গানলে নেবার আগেই দ্বিতীয় আক্রমণ এলো—জোর করে রাধার সাথে কল্যাণের বিয়ে দেওয়া।

এই কুটিল চক্রান্তের পরিণতিতে রাধা এবং কল্যাণের জীবনে সর্বনাশ ঘটলো এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সদানন্দের বাড়িতে বিবাদের কালো ছায়া নেমে এলো। কল্যাণ ভাজারীর ছাত্র— সে ভালবাসে দীপ্তিকে, অথচ আজ অনিচ্ছায় তাকে এমন একজনকে শ্রীরূপে মন্ত্র পড়ে বরণ করতে হচ্ছে—যাকে সে এতদিন জেনে এসেছে যেমন হিংসবে। কুলশায়ার রাতে সে বেরিয়ে যায়। এদিকে মানসিক ভারসাম্য ও দুঃস্থারা রাধার জীবনে



বিশ্বরূপার নতুন নাটক 'হাসি'র একটি দৃশ্য তৃপ্ত মিত্র ও অরুণ মদ্যাজ

নেমে এলো গভীর অন্ধকার। মেঘের পরে রোদ ওঠে; রাধার জীবনে সে-রোদের আলো কতদূর লেগেছিল জানা যায় নি; তবে সম্ভবতঃ বা বনস্তাপে একদিন কল্যাণ ফিরে এসেছিল।

শরৎ-সাহিত্যের লোকচরিত্রে ছায়ার নাটকটির চরিত্রগুলি এবং মেজাজ গড়ে উঠেছে। যারা শরৎ-সাহিত্যের সাথে পরিচিত তাদের কাছে চরিত্রগুলি পরিচিত মনে হবে। কালোপযোগী কোন বলিষ্ঠ বক্তব্যকে তুলে ধরা অপেক্ষা এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রগুলি প্রধান হয়ে উঠেছে। এই চরিত্রগুলিকে নিয়ে নিরন্তর ভাড়াগড়ার খেলা। মানুষের আয়তনের বাইরে ভাগ্যচক্রে এই চরিত্রগুলির জীবনের গতিপথ বাঁধা।

চরিত্র রূপায়ণে বাঁরা নড়ে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের প্রায় সকলেই শিল্পীর ব্যক্তিগত ও অভিনয়-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। অতরাং চরিত্রগুলি কৃত্রিম বা স্বাভাবিক

সে প্রশ্ন অপেক্ষা একসঙ্গে এঁদের অভিনয় দেখতে পাওয়া দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এঁদের মধ্যে কালী ব্যানার্জী গাধক অভিনয় করেছেন অবলরভোগী জজ লতাপ্রিয়ের চরিত্রে; এক সদানন্দ নিঃস্বার্থ চরিত্রে প্রবীণের ভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য পিতামাতার প্রতি একান্ত অনুগত জ্যোতি পুত্রের চরিত্রে অমিত দে এবং ঝৈয়ালী, পরোপকারী ও সরলপ্রাণ অন্নানের চরিত্রে হরুণ মুখার্জি। সমগ্র নাটকের বিকাশ ঘটেছে যাকে নিয়ে গেই রাধার চরিত্রে রূপ দিয়েছেন তৃপ্তি মিত্র। তিনি তরুণীর চপল হাগিতে, ভাগ্যবিড়ম্বিতার কাণ্ডায়, স্বামী-পরিভ্রাতার বেদনায় এবং অন্ধের রূপায় দর্শকমনকে স্পর্শ করেছেন। এই একটিনায়ে চরিত্রে নাট্যকার পঞ্চ রসের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, (অমৃত-লালের তিলাগুলির কথা মনে হয়।) কুটিল চরিত্রে জজ গৃহিণী লতার ভূমিকায় রেবা রায়চৌধুরীর অভিনয়

সাপ্তাহিক বসন্ত

কবিতা, আধুনিক তরুণীর চরিত্রে কণিকা মজুমদার ও গ্রাম্য পিসির চরিত্রে টিরা চক্রবর্তী যথার্থ এবং অন্যান্য চরিত্রে কৃষ্ণা রায়, সুজাতা চ্যাটার্জি, গোপাল চ্যাটার্জি, বলাই মুখার্জি, নির্মল ঘোষ, কান্তি দত্ত, দীপক এমিকারী প্রমুখ অভিনয় করেছেন।

নাটকটি আগাগোড়া ব্যবসারী দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়া হলেও—বিশেষ প্রাণসম্পন্ন নিক হলে—যুগায়মান মনের উপযুক্ত ব্যবহার। যুগায়মান মনের উপযুক্ত সুযোগ গ্রহণে নাটকের প্রতিবেশ কত বাড়িতে পারে এবং নাটককে কত উপভোগ্যও করা যায় 'হাসি' তার একটি দৃষ্টান্ত।

কুশীলব

টিরার দরবারীয় 'কুশীলব' নাটক

সম্প্রতি মুক্তযজ্ঞন নকে অভিনীত হয়েছে। নাটকটির রচনা ও পরিচালনা করেছেন শ্রীভবেন্দ্র ভট্টাচার্য।

একটি নৌবীন নাটকের মনকে কেন্দ্র করে তিনজন এ্যামেচার ক্লাবের অভিনেত্রীর জীবন, ভাগ্য ও বেদনাকে উপস্থিত করা হয়েছে এই নাটকে। এই তিনজন—জয়ন্তী, আলতা ও নীতা। এরাও আর দশজন নারীর মত প্রিয়া ও মা হয়ে নারীর মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু সংসারের তার গামলাতে জয়ন্তীকে ঘরে গন্তান রেখে ক্লাবে ক্লাবে ঘিরেতার করতে হয়; সেই টাকায় সংসার চলে। অকর্মণ্য স্বামী মদ বেয়ে টাকা ওড়ায়। আলতার স্বামী নিজে অন্তরালে থেকে স্ত্রীকে অভিনয় ও স্টাফ করার পথে এগিয়ে

দেয়। নীতার উপযুক্ত ভাইয়ের ত্যাক্স পর তাকেই সংসারের বোঝা বইতে হয়। এই তিনজন নারীর বেদনাময় জীবন ও দুই অপদার্থ স্বামীর দায়িত্ববোধহীনতা এবং নাটকের মনের কয়েকজন প্রাণবন্ত যুবকের নিঃস্বার্থপরতার ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটকটি সমাজের একটি চিত্র উপস্থিত করেছে।

বাংলা দেশে যারা নাটক করে তাদের মধ্যে দু'ধরনের মানুষ আছে। একদল নাটক করে কোন আদর্শকে সামনে রেখে, আর একদল কেবল মনের জন্য অভিনয় করে। মেয়েদের মধ্যে এই দুই দল ছাড়াও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা হিসাবে এ-পথে অনেকে আসেন। এই নাটকে শেষোক্তদের পক্ষেই বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনয়জনবোধ্য। তবে নাটকটির সংলাপ ও নাট্যশৈলী রচনার আরো সতর্কতার প্রয়োজন আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অতি নাটকীয়তা বিশ্বাস্য পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা হয়েছে।

অভিনয়ে জয়ন্তীর ভূমিকায় মঞ্জুলা মুখার্জি, আলাদাক্রমে প্রতিমা চক্রবর্তী এবং নীতার চরিত্রে রাণু রায় প্রাণসম্পন্ন। পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে ভবেন্দ্র ভট্টাচার্য (মণিক দত্ত), জয়ন্ত ভট্টাচার্য (কপু) রণজিৎ দত্ত, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল, ভট্টাচার্য, সমর রায়, দীপু চক্রবর্তী, অসীম গুহ, চন্দন গোস্বামী, দেবী চ্যাটার্জি প্রমুখ যথার্থ অভিনয় করেছেন।

সংবাদ বসন্ত

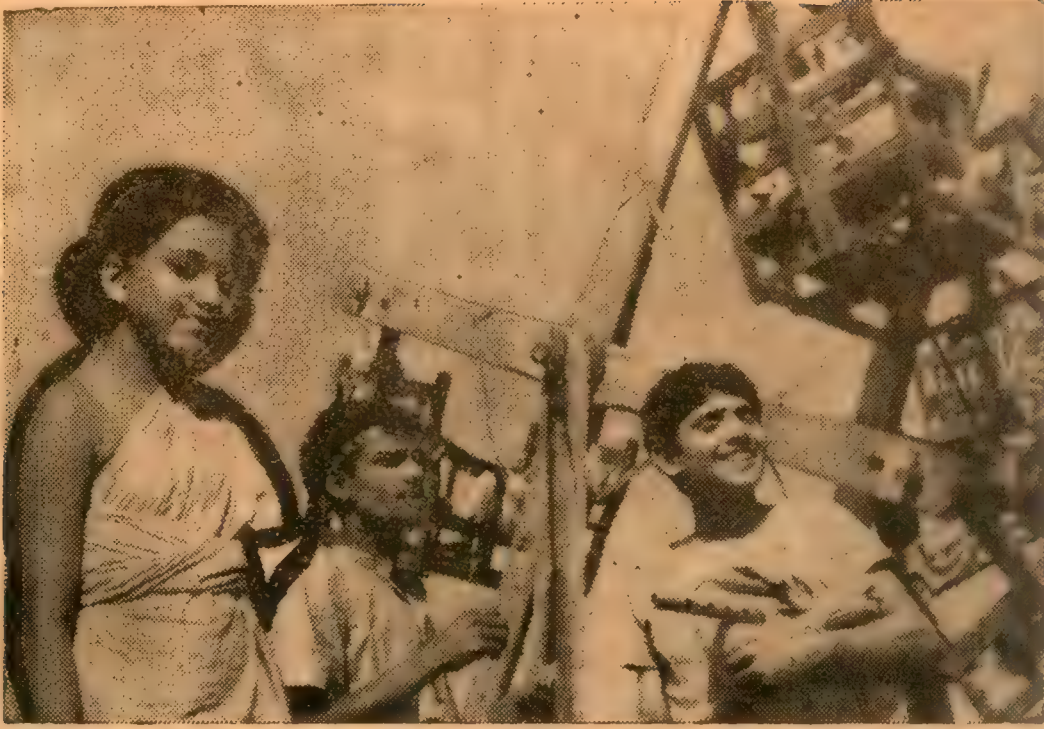
বৃটিশ চলচ্চিত্র অ্যাকাডেমির

পু. আর

বৃটিশ চলচ্চিত্র অ্যাকাডেমির ১৯৬৪ সালে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছে 'ডাঃ স্ট্রেঞ্জলভ'। ছবিটির শিল্প-নির্দেশক কেন অ্যাডাম শ্রেষ্ঠ বৃটিশ শিল্প পরিচালকের সম্মানলাভ করেছেন। এই ছবিটি রাষ্ট্রসভার পুরস্কারও লাভ করেছে।



অসীম ভট্টাচার্য প্রযোজিত 'দোলনা' চিত্রের নায়িকা তনুজা



‘হবীন্দ্রনাথের ‘অতিথি’র চিত্ররূপে বাসবী নন্দী ও পদ্ম মন্ডাজি’

পেটার ও’টুল ও রিচার্ড বাটন অভিনীত ‘বেকেট’ চিত্রটি রঙিন পোষাকের ডিজাইন, রঙিন শিল্প-পরিচালনা এবং ব্রিটিশ সিনেমাটোগ্রাফিক দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় পুরস্কার লাভ করেছে।

‘দি পাম্পকিন ইস্টার’ চিত্রটির চিত্রনাট্য সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়েছে (লেখক হেরল্ড পিটার)।

সর্বশ্রেষ্ঠ বিদেশী অভিনেত্রী হিসাবে পুরস্কার লাভ করেছেন অ্যান ব্যানক্রফট। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ অভিনেতা বিবেচিত হয়েছেন রিচার্ড এ্যাটেনবরো। আজ হেপবার্ন এবার নিয়ে তিনবার শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ অভিনেত্রী বিবেচিত হলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ বিদেশী অভিনেতা বিবেচিত হয়েছেন মারিলো মাস্ট্রইয়ানি। তিনি দ্বিতীয়বার এই সম্মান লাভ করলেন।

প্রমোদকরমুক্ত ‘হামারা ঘর’

খাজা আহমেদ আব্বাসের ‘হামারা ঘর’ ছবিটিকে মধ্যপ্রদেশ সরকার

প্রমোদকর থেকে মুক্তি দিয়েছেন। চেকোস্লোভাকিয়ার গটওরান্ডভ চলচ্চিত্রে উৎসবে ‘হামারা ঘর’ পুরস্কার লাভ করেছে। স্পেনে গিজের্ডো উৎসবে ছবিটি প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ লাভ করেছে। এই ছবি ভারী নাগরিকদের মনে জাতীয় সংহতির প্রেরণাদায়ক।

স্মৃতি ও শ্রবণ

বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা শ্রীবলরাজ সাহানীর পুত্র শ্রীপরীক্ষিৎ শীঘ্রই চিত্রে পরিচালকরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। শ্রীপরীক্ষিৎ পরিচালিত প্রথম ছবির চিত্রনাট্য লিখিত হবে পাঞ্জাবী উপন্যাস ‘পকিরাপানি’ অবলম্বনে। রাজেন্দ্র ভাটিয়া ছবিটির প্রযোজক। শ্রীপরীক্ষিৎ কিছুকাল সোভিয়েট ইউনিয়নে চলচ্চিত্রে সম্পর্ক শিক্ষালাভ করেছে।

মুক্ত অঙ্গনে অভিনয় করা

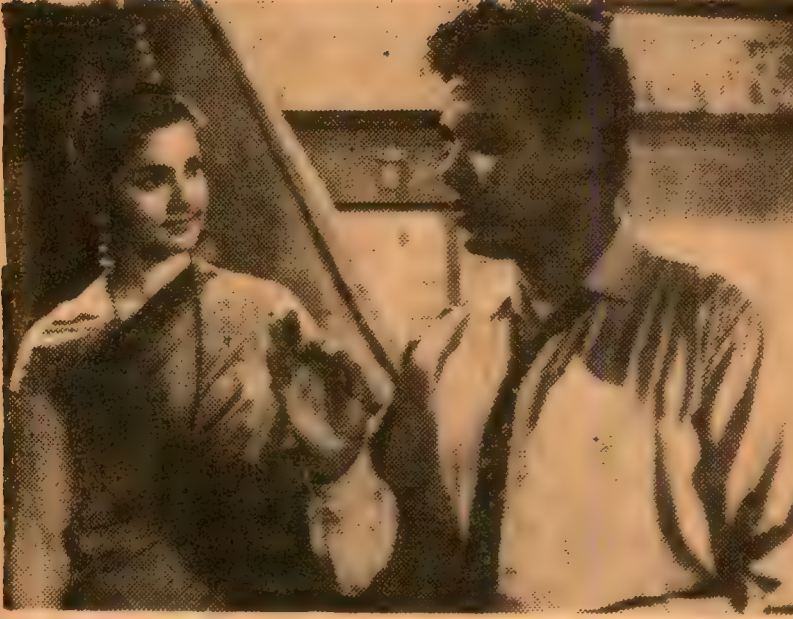
গত কয়েক বছর ধরে শৌভনিক

কলকাতা
চমকিত
মিনার্ভায়
কল্লোল
অভিনয়ে

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার

রবিবার ও দুটি দিন ৩ ও ৬

সন্ধ্যাবেলাে চলিতেছে



‘ও-কে?’ ছবির একটি দৃশ্যে তরুণকুমার ও লিলি চক্রবর্তী

নাট্য সংস্থা ভবানীপুরে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ পরিচালিত করছিলেন। শৌভনিক সংস্থা নিয়মিত এখানে নাটক অভিনয় করতেন। সম্প্রতি আদালতের এক আদেশবলে বাড়ির মালিক শৌভনিক সংস্থাকে উচ্ছেদ করে মঞ্চে দখল গ্রহণ করে। ফলে এখানে নাটক অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়।

বাঙালী চলচ্চিত্র ও নাট্যদর্শক সম্মেলন সফল করে তোলার আবেদন

বেঙ্গল মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েট কমিটির উদ্যোগে আগামী ২০শে, ২১শে ও ২২শে জুন কলকাতায় মহাজাতি মদনে তৃতীয় বার্ষিক ‘বাঙালী চলচ্চিত্র নাট্যদর্শক সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। আরও আনন্দিত হলাম এই জন্য যে, গত ২৬শে মার্চ প্রচার দপ্তরের মন্ত্রী

শ্রীবিজয় সিং নাহারের নিকট যৌনাবেদনসর্বস্ব হিন্দী চিত্র প্রতিরোধের দাবিগুলি ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে মর্শকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মেলনে আলোচনা করবেন।

এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে এবং সর্বতোভাবে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক ও শিল্পী এক আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন।



‘বিশ্বরূপায় ‘হাসি’ নাটকে সত্যাপ্রসন্ন চরিত্রে কালী বসুনাথ

লোকশিল্পী : দীপ্ত মোড়ল

পাঁচ গতি ভরা নদী ধলেশ্বরী—ভরা
তার যৌবন—ছোট ছোট চোট চেলন
করে। দুপারে কাশের ফলে ভোরের
সোনালি রোদ আলপনা আঁকে।
চাহক-ডাহকী ডাকে—মিষ্টি গানের সুর
ছড়িয়ে পড়ে আকাশে-বাতাসে। আর
সেই কাশবনের ধারে ছোট একটি
কাঁড়িতে বাস করতেন দীন মোড়ল।
গায়ের নাম আবদুল্লাহ—বিক্রমপুর
জেলার ছোট একটি গ্রাম। দীনের পেশা
ছিল নাছুর। তাই সারাদিন তাঁকে
ধলেশ্বরীর বুকে নৌকার নৌকায় দিন
কাটাতে হত।

দীন জেলে—মাছ ধরাই তাঁর কাজ,
কিন্তু সে যে একজন সরসী লোকশিল্পী
সে কথা কখনোই বা জানে?

সারাদিন দিন নৌকো বেয়ে
চলতেন আর তারই কাঁকে কাঁকে মনের
আনন্দে গান বাঁধতেন। এ গানে আছে
আবেগ—মনের স্বতঃস্ফূর্ততা।

লোকসংগীতে অনুরাগ আমার
শালিকাল থেকেই ছিল। তাই বারবার
ছুটে যেতাম ধলেশ্বরীর পারে দীনুর গান
শোনবার জন্য। একদিন সকালে ঘুম
ভাঙতেই শুনি দীনু তাঁর সঙ্গী-সাথীদের
নিরে নৌকো চড়া থেকে ঠেলতে ঠেলতে
ঘদীতে ভাসিয়ে গান গেয়ে চলেছেন—

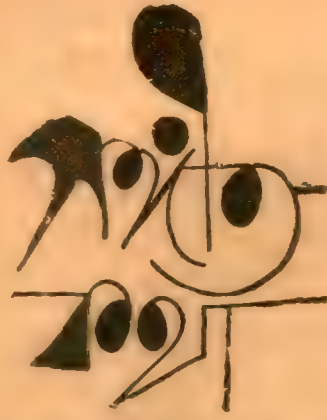
নাও ছাড়িয়া দে ভাই রে

নাও ছাড়িয়া

তরতরায় চলুক রে নাও

মাঝ দইয়া দিয়া ॥

হায়! হায়! মাঝ দইয়া দিয়া।



দীনু ও তার সঙ্গীদের নৌকা বীর
গতিতে ধলেশ্বরীর বুকে ছুটে চলেত,
আর মাঝে মাঝে বৈঠার শব্দ শোনা
যেত ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্। শান্ত নদীর
ছোট ছোট চেউয়ে প্রভাতের সোনালি
রোদ আলপনা আঁকত আর তারই
মাঝে দীনু ও তাঁর সঙ্গীদের গান ভেসে
আসত—

শুন শুন করে সোনার গাঁও,

(মাঝিরে) কোন্ বা দ্যাশে বাইয়া নাও

নাও।

আমি নাকেদি ব্যাসর তরে খুইল্য

দিনু রে,

অবলার ঘাটে লাগাও নাও ॥

সারাদিন ধরে ডিঙি নৌকায়
জাল হাতে করে বসে থাকতে হত
দীনু ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের। কোন
সময় জালে ভালই মাছ ধরা পড়ত—জাবার

কোন সময় একেবারেই না। তবু
তাঁদের বৈষ্য হাঙ্গলে চলত না।

নৌকায় আহারাদিও করতে হত
দীনুদের।

এইভাবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল
হত। সূর্য ক্রমশ চলে পড়ত পশ্চিমে।
সাদা সাদা তুলোই বেবে গোছলির হাঙা
আলো। চেউ-ভাঙা ধলেশ্বরীর বুকে
সোনার সোনাকি জলন্ত স্বিকসিক
স্বিকসিক। সন্ধ্যার কুন্ডার সিন্দুর
পাখীরা আর তারি মাঝে কোরার পালা
দীনুদেরও। দীনু ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা
বৈঠার ডালে ডাল বেবে নবের আনন্দে
গান গেয়ে ফিরতেন ঘরে—

জয় দেলো রামের না তাঁর

গোপাল আইছে ঘরে,

ধান দুবা বরণ কুলা,

দে পলুইর কপালে।

বেই দেবতার দরায় গোপাল

কিনা আইল ঘরে,

সেই দেবতা 'পবন ঠাকুর'

পেয়ার বাই তারে ॥

এই ধরণের অনেক গানই দীনু
গাইতেন। দীনুর বত একজন নিরাকর
জেলের কাছে যেসব গান ছিল তা
এক-একটি রত্নবিশেষ। এসব গান বাংলার
লোকসংগীতের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করবে
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দীনুর
মৃত আমাদের দেশের গায়ের চাষী,
জেলে, তাঁতী, মাঝি, কায়ার, কুমার
বাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কাছেই বিরাজ
করছে বাঁটি অবিকৃত লোকসংগীত-
গুলো। তাই আমাদের কর্তব্য হল,
বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে এঁদেরই
কাছ থেকে এতদূর গান সংগ্রহ করে
বাংলার লোকসংগীতের ভাণ্ডারকে
পুষ্ট করা। আর সেইসঙ্গে দীনুর বত
লোকশিল্পীদের উপযুক্ত সম্মান দিয়ে
আমাদের সকলের সামনে তুলে ধরা
কর্তব্য। আজো যেসব শিল্পী অবহেলিত
হয়ে রয়েছেন—তাঁদেরকেই আমাদের
বত শিক্তদের সমাজের মাঝে হাত ধরে
ঠেলে তুলতে হবে। —বুদ্ধদেব রায়





ইস্টবেংগল ও ইস্টার্ন রেল দলের খেলার একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত

অর্থ স্টেডিয়াম কথা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেডিয়াম নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান ও বর্তমান আই-এফ-এর সভাপতি শ্রীজতুল্য ঘোষ ঘোষণা করেছেন যে, এলেনবরা মাঠে একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিভাগ ২৫ একর জমি এই স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য ছাড়তে রাজী হয়েছেন, তবে আগেকার নির্বাচিত স্থান থেকে এটা অন্যত্র।

কমিটি রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে জমি দখল করতে অনুরোধ করেছেন এবং স্টেডিয়াম নির্মাণের তার একটি বেসরকারী সংস্থার ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সভাপতির ঘোষণায় স্টেডিয়ামের আয়তনের আভাষ পাওয়া যায়। প্রায় ৭৫০০০ দর্শকের বসবার উপযোগী এই স্টেডিয়ামে ফুটবল, হকি ও অন্যান্য খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হবে। সবকিছু যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী নিখুঁতভাবে চলে, তবে এর নির্মাণকার্য ৪৫ বছরের মধ্যে শেষ হতে পারে।

কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের কাছে এই ঘোষণা অনেক আশার, অনেক গভাবনার বাণী নিয়ে এসেছে।

অদৃষ্টের পরিহাস যে, মহানগরী কলকাতার অবিভূত কেনার ময়দানে কি প্রাক-স্বাধীনতা যুগে কি স্বাধীনতা লাভের পর বহু আকাক্ষিত স্টেডিয়াম গড়ে ওঠে নি। অথচ এই কলকাতায় ক্রীড়াপাগল দর্শকরা দিনের পর দিন কি নিগ্রহ সহ্য করেছে এবং সারা ভারতের খেলাধুলার উন্নতিকল্পে যে অর্থ-ক্লবির প্রয়োজন তা অকাতরে যোগান দিয়েছে। প্রতি বড় বড় খেলার টিকিটের কালোবাজারী এবং অগণিত

ত্রিঅমিতাভ

দর্শকের মাঠের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে জলে অধীর প্রতীক্ষা বাংলার ক্রীড়া-পরিচালকদের হৃদয় একটুও টলাতে পারে নি—তারা স্টেডিয়াম তৈরির ব্যাপারে বরাবরই টালবাহানা করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে ময়দানে স্টেডিয়াম তৈরির উপযুক্ত একটুকরো জমি সংগ্রহ করা খুব শক্ত হত না। আকস্মিক অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও প্রতিরক্ষা বিভাগ স্টেডিয়ামের জন্য জমি ছাড়তে রাজী হয়েছেন। তাহলে ১৫ বছর আগে এই জমিটুকু পেতে বিশেষ

বেগ পেতে হত না। তা ছাড়া দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের বিভিন্ন শহরে বহু স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে। কোন কোন শহরে একাধিক স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে। গিয়েন্ট, লোহা, টাকাপয়সা কোন কিছুই বাচতি পড়ে নি। কিন্তু কলকাতায় যেখানে স্টেডিয়ামের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেখানেই যত বাধা, যত গওগোল। তাই সন্দেহ হয় স্বার্থের কুটিল চক্রান্ত এতদিন কলকাতার ময়দানে স্টেডিয়ামকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। বর্তমানে স্টেডিয়াম কমিটির পদক্ষেপ যদিও যথেষ্ট বলিষ্ঠতার ও দৃঢ়তার পরিচায়ক, তবুও ক্রীড়া-মোদীদের তরফ থেকে আমাদের অনুরোধ—যেন যুদ্ধকালীন তৎপরতার মতন স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চালান হয়।

সম্রাটের দর্পণ

অল ইণ্ডিয়া কুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক নির্বাচন শেষ হয়েছে। শিমলাতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেচু দত্তরায় মহাশয় সবকিছু সামলে নিয়ে আবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। পঞ্চজ গুপ্ত মহাশয় একমুখ নিচে ডাইস-প্রোডেন্ট হয়ে রইলেন। দস্ত-জয় গাটিজা বজায় থাকলেই হল।



জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য।

জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতায়
বাংলা দল বিজয়ী হয়েছে। গত ৩০শে
মে কলকাতার আর্মেনিয়ান কলেজে
১৪টি ফাইনালের মধ্যে ৯টিতে জিতে
বাংলা টিম চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে।
প্রত্যেকটি ফাইনালই তীব্র প্রতিযোগিতা-

মূলক হয় এবং সমস্ত অনুষ্ঠানটি বিশেষ
চিত্তাকর্ষক হয়।

লীগ খেলার ঘাত-প্রতিঘাত

প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগের
একটানা জয়ের পালা অনেকেরই মাদ্র
হয়েছে। পরাজয় না হলেও পরেণ্ট

ভাগাভাগি শুরু হয়েছে। পর্বতপাল
ইস্টবেঙ্গল দ্বারা খেয়েছে নবাবত
গ্রীয়ারের কাছে। তারপর জুজ-
টেলিগ্রাফ দল বি-এন-আর দলকে
অগ্রগতি বোধ করল ২৭শে মে ইস্টবেঙ্গল
মার্চে। জুজটেলিগ্রাফ কলকাতা



ইস্টার্ন-রেল ও ইণ্টারবেঙ্গল দলের খেলার আর একটি দৃশ্য

দলের 'Dark horse'। অতীতে অনেক বাধা বাধা টিমকে এট দল দায়িত্ব করেছে। এট খেলার তারা তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে শক্তিশালী বি-এন-রেল দলের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে। জর্জটেলিগ্রাফ দলের খেলা মনে হয় এরা অনেক টিমকেই বেগ দেবে এবং অনেক অবতন ঘটাবে। টেলিগ্রাফ দলের ফরোয়ার্ড আর একটু চটপটে ও সুযোগ-সম্মানী হলে বি-এন-আর-এর বিরুদ্ধে খেলায় তাদের ভাগ্যে বিজয়মুকুট জুটত।

এবার বলতে হয় মহমেদান দলের কথা। এদের ভিকট্রি প্যারেড ফুটবল বালীপ্রতিভা। এলা জুন

মঙ্গলবার মহমেদান মাঠে এট খেলার পরিসমাপ্তি হ'ল গোলশূন্য ড্র'তে। মহমেদান দল বহু সুযোগ পেয়েও 'বালীর বাঁধ' ভাঙতে পারল না। একটানা চারটি খেলায় জিতে এট ধরনের পয়েন্ট হারানো কম আপশোষের কথা নয়।

মোহনবাগানের বিজয় অভিযান এখনও অব্যাহত। কিছুটা দক্ষতা। কিছুটা ভাগ্য জোরে মোহনবাগান এ-পর্বত কেটে বেরিয়ে চলেছে। ইস্ট-বেঙ্গল দল ইস্টার্ন-রেল দলের কাছে ১ পয়েন্ট হারিয়ে মোহনবাগানের বেশ সুবিধা করে দিয়েছে। তবে লীগের পথ বহু দীর্ঘ এবং উত্থান-পতন সমাকুল। তাই আমরা আরও নাটকীয় ঘটনার দ্বাভ-প্রতিবাতের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ভারত-সফর বানচাল

গত সপ্তাহে আমরা যে সম্বোধন আভাষ দিয়েছিলাম তা আজ সত্যো পরিণত হয়েছে। আগামী শীতকালে বিশ্ণু চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ভারত-সফর বাতিল হয়েছে। বৈদেশিক-মুদ্রা সঙ্কটের জন্য তাঁর এসে তরী ডুবে গেল। ভারতীয় ক্রিকেট কোল্টস দলের ইংলও সফরের ব্যাপারে দুর্নামের ভাগী হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর বাতিল হওয়ায় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মুখে চপকালি পড়ল। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসরে ভারতের কলেক পাওয়া শক্ত হবে। স্বাধীনতার পর এবং এখনও বৈদেশিক-মুদ্রার যে পরিমাণ অপব্যয় হয়েছে এবং হচ্ছে, তার সকল সংবাদ যদি প্রকাশ হত, তাহলে সর্বভারতীয় স্বার্থ ও সুনাম-জড়িত এষ্ট ক্রিকেট-সফরকে মুদ্রা-সঙ্কটের অজুহাতে বানচাল করা যে খুবই অন্যায হয়েছে—তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হত। এখনও যদি সময় থাকে—এ অন্যাযের সংশোধন করা হোক।

ক্রিকেট প্রসঙ্গে ইংলও ও নিউজিল্যান্ড দলের প্রথম টেস্টের কথা উল্লেখ করতে হয়। ভারত ও পাকিস্তান সফরের পর ক্রীড়া নিউজিল্যান্ড দল ইংলও'র বিরুদ্ধে চমকপ্রদ কিছু করবে এ কেউই আশা করে নি। প্রথম ইনিংসের বিপর্যয়ের পর নিউজিল্যান্ড দল যে ইনিংস পরাজয় রক্ষা করেছেন সেটাই যথেষ্ট। ইংলও এট টেস্টে ৯ উইকেটে জয়ী হয়েছে। ইংলও প্রথম ইনিংসে রান করে ৪৩৫—এই রানসংখ্যার মধ্যে ব্যারিস্টারের ১৩৭ ও কাউন্সিলের ৮৫ রান উল্লেখযোগ্য। নিউজিল্যান্ড দল ১ম ইনিংসে করে ১১৬ এবং কলো অন করে ২য় ইনিংসে তোলে ৪১৩ রান। ইংলও ২য় ইনিংসে ১ উইকেটের বিনিময়ে রান করে ৯৬। ২য় টেস্টে নিউজিল্যান্ডের কাছ থেকে আরও উচ্চাঙ্গের খেলা প্রত্যাশা করি।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গবন্ধু (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপনিবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বঙ্গবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক সন্নিহিত ও প্রকাশিত।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৩১
আজকের মানুষ	...	১৩২
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৩৩
মহা-পা মাছি	ডব্লিউ বি ইয়েটস্	১৩৫
নারদের ডায়েরি	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১৩৬
অরুণোদয় (কবিতা)	মুকুন্দরঞ্জন সাহাচার্য	১৩৭
ব্রহ্মমেলা	জয়ন্তী সেন	১৩৮
ভারতদর্শন	...	১৩৯
আন্তর্জাতিক	...	১৪৪
বিবরণপূরের বাঁশী (গল্প)	মিথিলেশ মোহান্ত	১৪৭
বঙ্গদর্শ	...	১৫১
অপরূপ নেহারলু-শিকাগো	এস. কে. গ্রীনবার্গ	১৫৫

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান
ভক্তিবঙ্গের কোমলভরত, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা
সদশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্রামপ্রভুর প্রাণাপ ও শিকাগো

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণভাবের জন্ম যে
উৎকর্ষ, এই 'প্রাণাপে' তাহার অভিব্যক্তি।
শ্রীমদ্রামপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিকাগো'
ছোকই তাহার একমাত্র রচনা। শ্রী
কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যরূপে
এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস
বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য
ভক্তিরিতম্বিত।

তুলসীদাস
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রী লোচনদাস
বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংগীত।

আত্মতত্ত্ব
বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম ব্যঙ্গরূপ।
মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রিয়ানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-
সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসম্বাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিখ্যাত চন্দ্রিকা প্রণীত
সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার সুযোগ্য শিষ্য
পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত
পদ্যরূপে।

পাশুপত-দলন

মুন্নিমাস বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর
বিরচিত প্রেমভক্তিব লহরী-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপদ্মন, শ্রীশ্রীশঙ্কর-বন্দনা, মায়সংকীর্তন,
চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর
শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তির
চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরণিত।

মূল্য : ৩ টাকা।

প্রখ্যাত কথামিথী

শ্রীমদ্রামপ্রভুর মুখোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩ টাকা

গিরীন্দ্রমোহন দেবীর

গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

বিগতকালের বরেন্দ্র সাহিত্যজ্ঞ

জৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

ফোকলা দিগধর, পাপের পরিণাম

উমরুচরিত।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

ভূত না মানুষ, কঙ্কাবতী, মজার গল্প

মুক্তামালা।

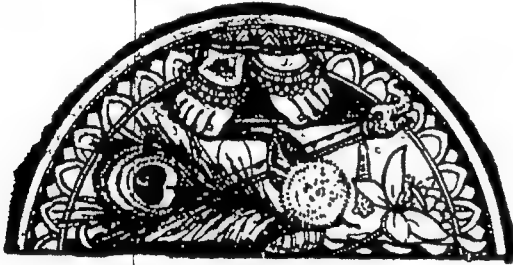
মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সমস্ত সময় এক (কবিতা)	আশিষ সাত্তাল	১৫৮
দিল্লী থেকে	বৈবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৫৯
আধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৬১
বার্ণাজ্যে সকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৬৬
হাঙ্গ-কান্নার মাঠ (কবিতা)	বীরেশ্বর বসু	১৬৮
সবার অলঙ্কার	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়	১৬৯
অদ্বিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মুশোল রায়	১৭৬
চার্লি চ্যাপলিন	অশোক সেন	১৭৯
রক্তজগৎ	...	১৮২
রক্তমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিমালি	১৮৮
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৯০



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেজনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মঙ্গলকামী
প্রেমের অলঙ্কার
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাপ্রাণ আর নাই
চিত্রলেখক—সুশোভন—সম্বোধন সংস্করণ
মূল্য পনের টাকা

বে জ্ঞান-সুখের সর্বতোমুখী প্রতিভার
কিরণচ্ছটায় ভারত-মহিমা চির-ভাস্বর—
সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও
মনোহার অবতার—সাহিত্য-ভগবানিষ্ঠ—
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাশ্যনমালা, বেগের মেঘে, মেঘদূত
বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা
সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধ-
মালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধ-
এই জাতীয় সাহিত্য-স্বরস্বী মাত্র ১।।০
রাজি, মোহিনী।

নীলাচলে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরানন্দ ও প্রফুল্ল
শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত
॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥
মূল্য দুই টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২



৭০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ
বৃহস্পতিবার, ২রা আষাঢ়, ১৩৭২

Price : 25 Paise
Thursday, 17th June, 1965

এ শুধু বৃথা ছলনা

রাজপথে রক্তের চিহ্ন এখনো শুকোয় নি। নেতাজীব মূর্তি স্থাপনের পবিত্র মাটিতে ছোপ লেগে বয়েছে সে রক্তের। অদূরে শহীদবেদী—তারই সম্মুখে শহীদ হলেন ছয়জন,—অন্ন, বস্ত্র বা ভাষার জন্যে এঁরা কেউ শহীদ নন, কলকাতার যানবাহন সমস্যায় সরকারী অক্ষমতার কারণে কিনু গোয়ালার ক'জন কনিষ্ঠ কেরানীর হৃদয়-বিসারক অপমৃত্যু।

অথচ সমস্যা সমাধানের জন্যে বছরের পব বছর সরকারী প্রচেষ্টার কথা শোনা যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ রেল, চক্রবেড়ে রেলের কতো কথা, কতো-মুকম পরিভাষাই না শুনাছি। এবং আমাদের রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে মন বন দিল্লী গমনাগমনের সংবাদে আমরা আশা করেছিলাম একটা কিছু হবে। কিন্তু কী হয়েছে, কী হবে? সেগব সংবাদ ধীরে ধীরে চাপা পড়েছে; আবার কলকাতায় গাড়ি চাপা পড়ার সংবাদই খবরের কাগজের স্তম্ভে ক্রমাগত বিস্তৃততর স্থান দখল করেছে। তবু কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়ে নি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যে পরিমাণ করের বোঝা বয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনতিবিলম্বে যান-বাহন সমস্যা সমাধানের দাবি উপস্থিত করতে পারে।

কলকাতায় ৩-এ বাস রুটে বিরীচ দুর্ঘটনার পর যে আলোচনা, প্রাথমিক

তদন্ত প্রভৃতি হয়ে গেল, তা গলাধঃকরণ করে চুপচাপ বসে থাকলে সমস্যার সমাধান কোনেদিনই হবে না। ছয়টি লোকের প্রাণ-মৃত্যুর গগন-বিদারী হায্যকার দিল্লী দববারের নিদ্রভঙ্গ করতে পেরেছে কি না জানি না, তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যেভাবেই হোক এই সমস্যা স্বীকার করে নিয়ে এই মুহূর্তেই কাজে নামতে হবে। নচেৎ এই নগরী ষে-নাগরিকদের কাছে প্রতি মুহূর্তেই চলাফেরার বিভীষিকা হবে দাঁড়াবে।

এই বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় আছে যদি পূর্বীর্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তা কে করবে এবং আমাদের কথার বা কে শুনেবে? প্রায় এক বছর আগে ৩-এ রুটের চরম দুরবস্থার কথা আমরা সম্পাদকীয় মারফৎ জানিয়েছিলাম এবং 'দৈনিক বঙ্গমতী'তে যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল চিঠিপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য, তারপর ঐ রুটে দায়গাবা কয়েকখানি অধিক গাড়ি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু গোড়াকার গলদ দূর করা হয় নি, তাই দারুণ বিপর্যয়কে স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন দূর করতে পারেন নি। বর্তমানে কলকাতা ট্রামওয়েজ কোং-ও যানবাহন সমস্যায়

নতুন নতুন গছটি ফুটি করে নিরীকারে সরকারের কাছে জনস্বার্থ-বিরোধী অযোগ্য গ্রহণ কবছেন। জানি না এই অবস্থায় চলবে, না সরকার সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ কববেন? পাদানিতে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ কবার যে আইনের কথা উঠেছে তা প্রয়োগ করার পূর্বে চাকুরে, ছাত্র, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। নচেৎ রাজ্যটাই 'নিষ্ক্রিয়' হয়ে যাবে। আশ একথাও ঠিক, কটা গতানুগতিক লোকসানের খাতায় স্টেট বাস বাড়ালেই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হবে না। বিভিন্ন আপিস, আদালত, ইন্সকুল, কলেজ, কারখানাগুলিকে যতদূর সম্ভব শহরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত ছুড়িয়ে ফেলা দরকার, সেটগঞ্জে চাই সরকারী প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত গাড়ি; যত্নে ঐ আপিস আদালত ইত্যাদির গাড়ির সমীকরণ। এখানেই দরকার সক্রিয় সরকারী সাহায্য। রাতারাতি চক্রবেড় তৈরিব পর সকালে ঘুম ভাঙলে তা চড়ে বাজার কবতে যাবো—শুনলে মনে হবে আজ এ শুধু বৃথা ছলনা।

সম্পাদকীয়

আজকের মন্ত্রণ

বিখ্যাত লোকেদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে, কিম্বা কতগুলো বৈশিষ্ট্য একটা লোককে বিখ্যাত কবে তোলে, অন্য লোক থেকে অনন্য করে তোলে। লিস্টার বোল্ড পিয়ারসনও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু কানাডা প্রধানমন্ত্রীর পদলাভই তাঁকে বিশিষ্ট করে নি, যা খ্যাতি এনে দেয় নি ঐতর্য্য। সে খ্যাতি তাঁর আজ আসে নি, এসেছে আজ থেকে কম করে ২৫ বছর আগে। লিস্টার পিয়ারসনের নাম বিশ্বজনের মুখে মুখে ফিরেছে সেদিন—যেদিন শান্তির জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। জুয়েল-সফট বিশ্ব-সংঘর্ষে পরিণত হতে পারতো, যদি না পিয়ারসন মধ্যস্থতা করতেন সংযুক্ত আরব ও ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের বিরোধে। মানুষে মানুষে মেত্রী রচনার কামনায় মধ্যস্থতা করার অসীম ক্ষমতা ও কৌশলই পিয়ারসনের বৈশিষ্ট্য।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছাত্র পিয়ারসন, বৈদেশিক সম্পর্ক-দপ্তর নিয়ে তিনি অনেকদিন মনোনিবেশ চালিয়েছেন। ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করে পিয়ারসন সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। আজকের প্রধানমন্ত্রীকেও সেদিন এখানে-ওখানে ভাগ্য অন্বেষণ করতে হয়েছিল। শিক্ষা লম্বা করে তাঁকে প্রথমে সৈনিকবৃত্তি নিতে হয়েছিল। পৃথিবীতে তখন প্রথম মহাযুদ্ধের দামাধা বাজছে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পিয়ারসনের কাজ পেতে দেয়ি হলো না, যদিও একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে—যা তাঁর মনঃপুত ছিল না। সে-কাজ ছেড়ে শিক্ষকতা গিলেন পিয়ারসন, এখানে পড়াশুনো করার প্রচুর সুযোগ। তারপরেই তাঁর ডাক এলো কানাডার বৈদেশিক দপ্তরে।

কিন্তু এ দপ্তরে এসেই যে পিয়ারসন উল্কাব গতিতে খ্যাতির শীর্ষদেশে পৌঁছেছেন তা নয়। তাঁকে উঠতে হয়েছে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বিরুদ্ধমতাবলম্বীকে দিয়েও নিজের মত স্বীকার করিয়ে নেওয়াতে পিয়ারসন কতখানি চিত্তবিস্তার, তার প্রমাণ দিতে দেয়ি করলেন না তিনি। তিনি বিদেশে গিয়ে শুধু কানাডার কথাই বলেন নি, বলেছেন বিশ্বমানবিকতার, বিশ্বশান্তির। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই পিয়ারসন বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের মন জয় কবেছিলেন। এইজন্যেই পিয়ারসনকে পাঠাতে লাগলেন কানাডা সরকার এক দেশ থেকে অন্য দেশে—কখনো রাষ্ট্রদূত হরে, কখনো বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিনিধি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়—১৯৪১ সালে তিনি প্রথম বৈদেশিক সম্পর্কদপ্তরের সহকারী সচিব সেফ্টোবীর পদ লাভ করেন। তারপর থেকেই রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিয়ে ইয়োরোপের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে দেখা গিয়েছে পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে পিয়ারসনকে।

বাস্তবিক আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন যত খণ্ডা এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, তার অনেকগুলিতেই পিয়ারসনের মস্তিষ্ক রয়েছে, রয়েছে তাঁর হাতের ছাপ। হেগ-এ আন্তর্জাতিক আইনকে বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে যেখন পিয়ারসন গিয়েছেন, তেমনি গানফ্রান্সিসকোর সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন—যে সম্মেলনে রাষ্ট্র জয়লাভ কবেছিল আনুষ্ঠানিকভাবে। রাষ্ট্রসংঘের গ্রাণ ও পুনর্বাসন সংস্থা অধিবেশনে কানাডার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন পিয়ারসনই। তিনিই আবাব সামরিক ছোট ন্যাটো-চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেছিলেন কানাডার পক্ষ থেকে।

কিন্তু তাই বলে, অর্থাৎ ন্যাটো-জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়েও কানাডা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কথায় সাঁয় দেয় না এবং না দেবার প্রধান কারণই পিয়ারসনের ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের তাঁর স্বকীয় ভঙ্গী। এবং এ শুধু আজকের দক্ষিণ ডিয়েনাম বা ডমিনিকান বিপাবলিকের প্রসংগ নয়। ইতিপূর্বে লরেন্সের মন্ত্রিসভায় যখন পিয়ারসন দেশের পবরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখন থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কয়েকটি মূল বিষয়ে মতানৈক্য ছিল, পিয়ারসন আপোম করতে রাজী হন নি। কিন্তু যদিও রক্ষণশীল দলের ডিফেনসকার সরকারকে পরাজিত করে পিয়ারসনের



লিস্টার বোল্ড পিয়ারসন

উদারনৈতিক দল সরকার গঠন করেছেন—তবুও মার্কিন পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর নতুন সরকার রক্ষণশীল দলের চেয়েও বেশি নির্ভরশীল। কিন্তু সে পিয়ারসনের পররাষ্ট্রনীতিব একটা দিক মাত্র। আসলে পিয়ারসন মূল সমস্যা, যা সমগ্র বিশ্বকে যুদ্ধের মুখোমুখি করেছে—সেই ডিয়েনাম সম্পর্কে ভারতীয় মতবাদের অনুগামী। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের প্রস্তাব ডিয়েনামে আক্রোশীয় শান্তিবাহিনী রাখা প্রসঙ্গে—পিয়ারসনও মেনে নিয়েছেন। কানাডা নিশ্চয়ই এই ৬৬ বছরের প্রবীণ রাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্যে গবিত।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হৃদয়সাদ মিত্র

রুশ-সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গে একজন লিখেছিলেন যে গল্প-উপন্যাসই সে-সাহিত্যের প্রধান শাখা। গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়েই সে-দেশের জনসবাজে নেতৃত্বের দায়ী ছড়িয়েছে। বড়ো বড়ো এইসব উপন্যাসিক দেখা দেবার আগে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন সাহিত্য থেকে রাশিয়াকে সাহিত্যপাঠের কুশা মেটাতে হয়েছে। ফ্রান্স, ইটালি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের সাহিত্য ছিল সে-দেশের প্রিয় পাঠের বিষয়। টলস্টয় দেখা দেবার আগেই দেশে বড়ো কবি ছিলেন বটে, —পুশকিন ছিলেন, লারমণ্টভ ছিলেন। তাঁরাও গদ্য লিখেছেন কিছু কিছু। নাট্যপ্রতিভা ছিল পুশকিনের। ককেশাস পাছাড়ের পটভূমি অবলম্বন করে লারমণ্টভ তাঁর উপন্যাস লিখেছিলেন—‘হার ইংরেজি নাম ‘এ হিরো অফ আওয়ার টাইম’।

বোমাণ্টিক ছিলেন দুজনেই। দুজনেরই মৃত্যু হয়েছিল হৃদয়যুক্ত। সে একালের কথা নয়। টলস্টয় অনুগ্রহণ করেন ১৮২৮ খৃস্টাব্দে। এরা দারো আগেকার মানুষ। টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি আর টলস্টয়—এই তিনজনকে নিয়েই রুশ উপন্যাসের প্রথম ঐশ্বর্য-যুগের গৌরবের দিন গেছে। পুশকিন আর লারমণ্টভের বোমাণ্টিক ভঙ্গির পরে বাস্তবজীবনের দিকে আরো আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে দেখেছেন নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-৫২)।

গোগোল যখন ন’ বছরের বালক, সেই সময়ে আইভান সেরগেভিচ টুর্গেনিভ (১৮১৮-৮৩) অনুগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর আগে কিরোডোর মিখাইলোভিচ ডস্টয়েভস্কি (১৮২১-৮১) লোকান্তরিত হন। কাউন্ট লিও টলস্টয়ের (১৮২৮-১৯১০) মৃত্যুর

আগেই মারা গেছেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো আন্টন পাভলোভিচ চেখভ (১৮৬০-১৯০৪)। এঁরা সকলেই বিপ্লবের আগের যুগের মানুষ। বিপ্লব দেখে যান নি এঁরা। চেখভের চেয়ে বছর মাত্র-আট ছোটো ছিলেন ম্যাক্সিম গর্কি। রুশ-বিপ্লবের প্রায় বিশ বছর পরে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। ‘ম্যাক্সিম গর্কি’ তাঁর ছদ্মনাম। গর্কির আসল নাম ছিল আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পিয়েশকভ (১৮৬৮-১৯৩৬)।

পুশকিন যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র অষ্টত্রিশ। ক্রিয়োলভ নামে এক পশু-পক্ষীর গল্প-লেখকের নাম শুনেছি। তিনি ছিলেন পুশকিনের সমসাময়িক। পুশকিনের মৃত্যুর সাত বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। সেটা রুশ-সাহিত্যের ইতিহাসের গৌণ খবর। ক্রিয়োলভ একটি নাম মাত্র। সে-নাম একালের সাহিত্য-পাঠকের নজরে নেই বললেই চলে।

আমাদের নজরে পৃথিবীর কতো-টুকুই বা ধরে? নিজের দেশে, নিজের কালে পরিচিত পত্র-পত্রিকায়, গভা-গম্বীজিতে বা আলাপ-আলোচনায় আমরা দু-পাঁচজন অজ্ঞানরত সাহিত্যিকের কাছাকাছি থাকতে পাই। সেইটুকুর ওপর নির্ভর করেই কতো উচ্চ মধ্য-নিম্ন কণ্ঠের তর্কবিতর্ক চলতে থাকে। এদিকে কতো বড়ো কাল, কতো বিচিত্র জগৎ পড়ে থাকে আমাদের নজরের বাইরে। আজ সেই কথা মনে এলো। মনে হোলো, মানুষ অকারণে মাকে মাঝে জীবন সহজে শেষকথা বলবার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। ‘হী’-কে ‘না’-করা এবং প্রোতকে সীমাস্ত মনে করা মানুষের চিরকালের বিষয়। সেই মানব-স্বভাবের

সংশোধনের জন্যেই দস্তেব পত্রিকা আছে, বাচালেরও মৃত্যু আছে।

থাক্ থাক্ এসব প্রসঙ্গ। আমি ক্রিয়োলভের লেখা পড়ি নি। পুশকিনের অনেক কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়েছি। তাতে জনপদীর কথা ছিল, ভোরের নক্ষত্রের কথা ছিল। পুশকিন মানব-জীবনের বহুনের যন্ত্রণাব কথাও লিখে গেছেন, আবার মুক্তিও তাঁর গভীর বিশ্বাসও জানিয়ে গেছেন। তাঁকে কেউ কেউ খাঁটি রুশ দাস্তব-দৃষ্টির মানুষ বলেছেন। বেউ কেউ বলেছেন, তাঁর মধ্যে বায়বী ভাবের ছিটেকোঁটাও নেই। আবার কেউ কেউ দেখিয়েছেন যে চাইল্ড হায়ন্ডের সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত এক কাব্যোপন্যাসের বায়কের খুবই মিল ছিল।

পুশকিন বোমাণ্টিক কি না, সে-তর্ক পণ্ডিতরা করুন। আমি আদ্য হঠাৎ অনেকদিন পরে তাঁর সেই জীবন-খসড়া সম্পর্কিত, কবিতাটির অনুভূতিতে এসে দাঁড়ান। বাংলায় অনুবাদ করলে সেটি এইরকম দাঁড়াবে—

অনেক সময়ে তারি বোঝা চাপলেও
জীবনের গাড়ির চাল থাকে বেশ সহজ,
স্বচ্ছন্দ।

সময় কোচোয়ান,—তার মাথাটা ধুসর,
কিন্তু বেশ ফিটফাট, সতর্কও নিঃসর
আসনে।

সকালে পাড়িতে উঠি হালকা মনে,—
যাত্রা শুরু হয়।
বিশ্বাস ধোয়ায় নগ্নাং,—আরাম হাবান
মানি, তাই
চোঁচিয়ে তরুণ করি,—সামনে চড়া
জোরেই হাঁকাও।

পুণ্য বিশ্বস্ত দ্যাখে বেপরোয়া বেগের
ভক্তকে।

শুকুনিতে ভগুপ্রায়। সাবধান হতেই
হয় তাই।

হাগে-ফোড়ে-যন্ত্রণায় চলতে হয়—
সামনে চলো মূঢ়।

গাড়ি চলে তখনো তো—
ধানাতে ধৌদলে

সামান্য ঋক্ষেপও নেই।

লক্ষ্যায় অভ্যস্ত সেই চলে

ক্রমশঃ বিশ্বিতে থাকি।

অন্ধকার রাত্রির বাড়িতে

পৌছোনোই লক্ষ্য, তাই

বুড়ো সেইসময়-কোচোয়ান

হাঁকার জীবনগাড়ি সামনের আঁধারে।

পুশকিন করাসী পড়েছিলেন। ইউ-
রোপে বোমাণ্টিক হাওয়া ছিল তখন।
ছেলেবেলায় তাঁর বাবার জমিদারিতে
যাশ কবাব সময় অনেক ছড়া গান
উপকথা রূপকথা শুনেছিলেন পুশকিন।
করাসী প্রভাব তাঁর মধ্যে নিশ্চয় বর্তে-
ছিল। বাসবন সম্বন্ধে তাঁর নিশ্চয় আগ্রহ
ছিল। আবার একথাও মনেতে হয় যে,
তাঁর সেই প্রসিদ্ধ কাব্যোপন্যাস Evge-
nie Onegin-এর নায়িকা টাটিয়ানা-
কে তিনি কশ নারীসত্তার প্রতিভা
হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। নায়ক
Evgenie নায়িকা টাটিয়ানার প্রণয়
প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন যে, রূপ-
বোবনের পরাকাষ্ঠা গ্রহণ করবার মন
ছিল না তাঁর,—সুতরাং বিবাহ সে-
অবস্থায় যন্ত্রণার সামিল মাত্র, অতএব
কাজ নেই, থাক্ থাক্।

শুধু তাই নয়, সেই বিবাহের দুর্ঘোণ
থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই নায়িকার
বোন ওল্গার দিকে ঝাঁকবার ভাব
করেছিলেন নায়ক। সেই পরিস্থিতিতে
পড়েই ওল্গার প্রণয়ীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র
মেনে নিতে হয়—এবং সেই ষড়যন্ত্রের
বছর-দুয়েক পবে,—টাটিয়ানার তখন
বিয়ে হয়ে গেছে,—টাটিয়ানার প্রতি
গভীর ভালোবাসায় আবার জড়িয়ে

হাবুডুবু খেতে হয় নায়ককে। চিঠি
লিখতে হয় গভীর প্রেমোচ্ছাসের
আবেগে। একদিন কাদতে কাদতে
নায়ক সামনে এসে দাঁড়ান নায়িকার।
আর, সেই অবস্থায় টাটিয়ানাও নিজের
একই রকম প্রণয়দাহ স্বীকার করেন
বটে, কিন্তু উভয়ের ভালোর জন্যই
চিরকালের মতন ছাড়াছাড়ির পরামর্শ
দেন।

একজন বলেছেন,—একেও তো
রোমাণ্টিক সংঘটন বলা যেতে পারে,—
তাই নয় কি? আর, পুশকিনের এ-
কাব্য যেন তাঁর নিজেরই ভবিষ্যতের
ভবিষ্যদ্বাণী। নিজের শ্যাঙ্কিকার
স্বামীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র লড়াতে হবোছিল
তাকে। তাতেই প্রাণ হারিয়েছিলেন।

পুশকিনের জীবন-শকটের সময়-
কোচোয়ানকে এইসব কথা-প্রসঙ্গেই
আজ আমার হঠাৎ মনে পড়লো।
পাঁশকুড়ো থেকে আট-দশ মাইল
দূরে তমলুকের বাস্তার এই টল্যা গ্রামের
ইস্কুলে এমেলি জ্যেষ্ঠের প্রচণ্ড দুর্গবে।
খাঁ খাঁ মাঠ জলছে। প্রচণ্ড পুকুর
সুকিয়ে গেছে। মেথির বেড়ায় কুল
দুলছে ঝং ঝং হাওয়ায়। বিশাল এক
বটগাছের ছায়া পড়েছে মাটিতে।
ভাবছি এ-অবস্থায় কোন্ কবিতা আমার
কাছে বেশি সত্য—‘স্বর্ঘ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখি’—নাকি ‘কল্পনাব’,
‘বৈশাখ’—নাকি পুশকিনের লাইন—
‘দুর্গুর বিশ্বস্ত দ্যাখে বেপরোয়া বেগের
ভক্তকে’?

আমরা শান্ত মাটির কোলে দিন
কাটাও। আমাদের জীবনে বেপরোয়া
বেগ কোথায়? আজকাল কেউ কেউ
বলেন শুনে পাঠ, একালের নব-
যৌবন নাকি বেপরোয়া, সুরীয়া, উগ্রবিশ্ব।
তাই কি? জানি না। জানি না।
টলস্টায়কে দেখি পুশকিনের দেশেরই
অন্যকালের,—কিন্তু একই সত্য-
স্বভাবের মানুষ হিসেবে ডটমডেজ-
কিকে দেখি, গকিকে দেখি। রূপ-
প্রকৃতির অকুট্রিম স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব কবি

এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে। জীবনে প্রবল
আবেগ ছিল এঁদের প্রত্যেকের। প্রবল
খড়ের পাখি এঁরা। সৌখীন মজদুরীতে
এঁদের গভীর অনাস্থা। এঁরা হাতে-
কলমে কাজ করেছেন। জীবনকে
মুখস্থ পাঠের মতো মেনে নেন নি,
হাঁটিবার পথ-বিপথ হিসেবে ধরেছেন,
ছেড়েছেন, তুলেছেন, কেলেছেন,
হারিয়েছেন এবং পেয়েছেনও। একজন
সমালোচকের কথা মনে পড়ছে।
তিনি লিখেছিলেন যে, রুশীয় পুরুষের
প্রকৃতিতে কতকটা দায়হারা বায়রনীয়
আবেগের উপাদান আছে,—কতকটা
অস্থিরচিন্তা—যার সঙ্গে তুলনা করলে
হ্যামলেটকেও মনে হবে কঠিন
সংকল্পের মানুষ।

কথাটা আমার মনে জেগে আছে।
পুশকিনের জীবন-শকট আর সময়-
কোচোয়ানের ছবি ভাবতে ভাবতে
আজ তাই রবীন্দ্রনাথের ‘এ প্রাণ
রাতের বেলগাড়ি’ মনে পড়লো।
দুজনে দুই দেশের, দুইকালের কবি।
দুজনেই জীবনকে গাড়ির রূপকে
অনুভব করেছেন। কিন্তু পুশকিনের
গাড়ি সকালে ছেড়ে দুপুরেই যাত্রীকে
বিশ্বস্ত করে, সময়-কোচোয়ানকেও
বুড়িয়ে যেতে বাধ্য করেছে। অন্ধকার
বাড়িটার দিকে শেষ পর্যন্ত মনের নজর
আছে বটে, কিন্তু সে কেবল ‘ক্ষুণ্ণ
ঝিমুনির স্বপ্ন দিয়ে অবগাদের নিম্নলিখিত
দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চালককে নিত্য
সজাগ বলে অনুভব করেছেন।
গাড়িটা যন্ত্র বটে,—তবু আমরা অন্য
মেজাজের মানুষ,—আমরা জানি ‘অতি
নিশ্চিত তার গতি।’

পুশকিনের সঙ্গে টলস্টায়ের তুলনা
করবার মতন তথ্যজ্ঞান আমাব নেই,—
আমার পাঠক-পাঠিকা আমাকে মার্জনা
করবেন,—তবু মনে হয়, টলস্টায়ের
মধ্যে রুশীয় পুরুষ-প্রকৃতির বায়রনীয়
মেজাজ থাকলেও পবিশেষে তিনি
নিশ্চিত চালকের উপলব্ধিতে পৌছো-
য়েছেন। জীবনের সকাল দুপুর বিবেক

লম্বা-পা মাছি

ভল্লিউ বি ইয়েট্‌স্‌ (১৮৬৭-১৯৫৯)

ঐ সভ্যতা না হতেও পারে নিমজ্জিত,

তার মহা রণ নিজেই বিনাশ পায়,

রোখো কুকুরটা, ও-চাঁটুঘোড়াটাকে

দিক দড়া দিয়ে বাঁধো দূর-খুঁটিটার।

আমাদের প্রভু নিজাব তাঁবুর মধ্যে

সেখানে অনেক মানচিত্রই পাতা,

তাঁব চোখ নয় নিবন্ধ কিছুতেই,

ছাতের তালুতে নিঃশব্দ তাঁর মাথা।

ধারাস্রোতের ওপরে লম্বা-পা ফেলা মাছির মতো

তাঁর মন নড়ে নিঃশব্দের 'পরে।

উচ্চ প্রাঙ্গণ পুড়ে পুড়ে হয় ছাট

এবং লোকেরা সে-মুখ স্মরণ করে,

মড়বেনই যদি অতি বীরে নড়া চাই

এখানের এই নির্জনতাকে ধরে।

মহিলাটি ভাবে, একাংশ নারী, তিনাংশ একশিক্ত

যা দেখে না চেয়ে কেউ; তার পদতলে

তোবড়ানো ভাঙা কাঁসা

পথে তুলে আনা, তারি ওপরে সে চলে।

ধারাস্রোতের ওপরে লম্বা-পা ফেলা মাছির মতো

তার মন নড়ে নিঃশব্দের 'পরে।

ঐ মেয়েগুলি দেখতেও পারে পরিণত যৌবনে

আদি আদমকে তাদের কল্পনায়;

পোপের ভজ্ঞালয়ের দুয়ার এঁটে

শিশুদের বেন বাইরেতে রাখা যায়।

ওখানের ঐ তারায় পড়েছে হেলে

মাইকেল এঙ্কেলো।

মুখিক যেমন নিখর শব্দ করে

তেনমি শব্দে নড়ে ওঠে তাঁর হাতখানি এনোমেলো।

ধারাস্রোতের ওপরে লম্বা-পা ফেলা মাছির মতো

তাঁর মন নড়ে নিঃশব্দের 'পরে।

অনুবাদ : দুর্গাদাল সরকার

● [কবির জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই অনুবাদটি প্রত্যাশ্বরূপে প্রকাশিত হোল ।]

লম্বা—সব বেলা, সব পর্ব পার হয়ে হয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই অনিশ্চিতকে চিনেছিলেন, মনে ছিলেন।

জ্যেষ্ঠের শুকনো জলাশয়ের নিচে ফেটে-বাওয়া ঐ মাটির আঁকি-মুঁকি দেখতে দেখতে যা মনে হয়, তাই লিখছি। এসব যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তা আমার মোটেই দাবি নয়। আমাকে আপনারা তুল বুঝবেন না। একজন মব্যবক আমাকে বলেছিলেন, 'মশাই, টলস্টয় নীতিবাগীশ প্রাচীন মানুষ, —তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বা গান্ধীর হয়তো কিছু কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়,—তা যাক। আমাদের আরো

কাছাকাছি যদি কাউকে চান, তাহলে রুশ-সাহিত্যের বড়ো বড়ো নামের মধ্যে ডস্টয়েভস্কির নামটা বরং ভেবে দেখতে পারেন।'

আমি বললুম, 'কেন?'

তিনি বললেন, 'ডস্টয়েভস্কি দুঃখী, তিনিই সত্যিকার দুঃখী।'

আমি বললুম, 'তার মানে?'

তিনি বললেন, 'জানেন না বোদ্-লেয়র আর ডস্টয়েভস্কি জন্মেছিলেন একই বছরে—১৮২১ খৃস্টাব্দে? বিশ শতক শুরু হবার আগেই উনিশ শতকের চেনা আবহাওয়ার মধ্যে এঁরা দুজনে একত্রে বিশ-শতক প্রক্ষিপ্ত হতে দিয়েছিলেন, এঁদের রচনায়।'

বুদ্ধদেব বঙ্গুর লেখা ডস্টয়েভস্কির ওপর একটি ভূমিকা মনে পড়লে তাঁব কথা শুনে। মনে এলো আঁজের জিদ্, টমাস ম্যান এবং আরো কয়েকটি নাম। কিন্তু এবার স্বস্ত্যটি পরিকল্প করে বলতে হবে। নানা কথার ঘাত-প্রতিঘাত এড়িয়ে চলতে হবে মনকে। ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে বোদ্লেয়সকেও আমার এঁই দিনলিপিতে অকারণে একযোগে বেশি মিশিয়ে ফেলা টিক হবে না। ডস্টয়েভস্কি কীবকম দুঃখী ছিলেন, প্রধানত সেই কথাটা ভেবে দেখা দরকার। বোদ্লেয়সের দুঃখ সম্বন্ধে আগেই অনেক কথা লিখেছি। (ক্রমঃ)



নারদের জয়রি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নারদের পায়ে জুড়জুড়ি দেওয়া ছিল। কি রকম? না, বুঝা তাঁকে শাপ দিয়ে বলেছিলেন—ভয়ানকোকে শুভে নুত ন ভবেদ্ব ভ্রমতঃ পদম্।

অর্থাৎ, নারদ সবসময় পায়ের ওপর থাকতেন। বুঝা যদি কাঁপিয়া না করে তাঁর শাপে আর একটি পা দিয়ে রাখতেন, তাহলে নারদ ভোলা পায়ের ওপর পা দিয়ে থাকতে পারতেন। বোচা নারদ।

তবু শাপে বর হল নারদের। এমন পায়ে জুঁ দিয়ে স্বর্গমর্ত্যে ঘুরে বেড়ানো জা নইলে সম্ভব হত কি করে।

সুতরাং সর্বঘণ্টে নারদ। শিবের বিরে; ঘটকালি কয়েছেন নারদ। বামনের পৈতে; লর্দারি করে বেড়াচ্ছেন নারদ। ধ্রুবের উপায়া; কানে মন্ত্র দিচ্ছেন নারদ। দক্ষের মর্পনাশ, তাতেও নারদ। শিশুপালের অত্যাচাৰে জগৎ অতিষ্ঠ; নারদ সেখানে পবিত্রাণের উপায় বাৎলাচ্ছেন। নারদ ছাড়া পুৰাণ নেই।

কেমন দেখতে নারদকে? মাথার চুল যেন শণের নড়া; পরিণে স্বর্গচীর; হাতে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু আর অতি বিচিত্র কচ্ছপীবাণ।

সেই নারদ একদিন গেলেন আচার্য জনকুমারের কাছে। গিয়ে বললেন, 'ভক্তমশাই, আমাকে তালিম দিন।'

জনকুমার বললেন, 'আগে বলো, ভোলাব ভদ্রের দৌড় কতদূর? যে পর্যন্ত তাই জানো, আমি তারপর থেকে দেখাব।'

বেশ লম্বা এক কিস্কিন্ধি ধিলে দেখা গেল নারদ নেহাৎ কম যান না। চতুর্বেদ, ঐতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, তুতনিদ্যা, ধনুর্বেদ—সবই তাঁর দখলে। উপরন্তু তিনি জানেন গাপের বিষ ধাড়তে, গন্ধ-দ্রব্য ভৈরি করতে, নাচতে গাইতে ধাড়াতে।

শুনটুনে জনকুমার বললেন, 'এ সমস্তই তো নিছক মাঝ। যে পর্যন্ত নামের দৌড়, সেট পর্যন্ত তুমি স্বাধীন।'

নারদ জানতে চাইলেন, 'নামের চেয়ে বড় কিছু আছে কি?'

উত্তরে জনকুমার বললেন, 'নিশ্চয় আছে। নামের চেয়ে বড় হল কথা। কথা না থাকলে কিছুই জানানো যেত না। জল নাট আকাশ বাতাস মানুষ পশু পাখি পোকামাকড় গাছপালা জন্তু-জগত ন্যায়-অন্যায় ভাল-সম্মত-অসম্মত—সমস্তই কথার জানানো হয়।'

নারদ জানতে চাইলেন কথার চেয়ে বড় কিছু আছে কি না। এইভাবে দুজনের মণ্ডলিজবাব চলতে লাগল।

জনকুমার মোটের ওপর যা বললেন তা এই:

কথার চেয়ে বড় মন। হাতের মুঠোয় যেমন দুটো আঙ্গুরী ধরা থাকে, তেমনি নাম আর কথা—এ দুটোকে ধারণ করে মন। মন দিয়ে আমরা একটা বিষয় স্থির করি, তারপর সেট বিষয়টা বাগে আনি।

মনের চেয়ে বড় সংকল্প। প্রথমে মন সংকল্প করে, তারপর ধারণার আদে, তারপর মুখ নাড়ে, তারপর শব্দ বার হয়।

সংকল্পেব চেয়ে বড় চিন্ত। কারণ, মানুষ আগে সচেতন হয়; তারপর সংকল্প করে।

চিন্তের চেয়ে বড় ধ্যান।

ধ্যানের চেয়ে বড় বিজ্ঞান।

অবিশেষ জানার নামট বিজ্ঞান।

বল জিনিসটা বিজ্ঞানের চেয়েও বড়। অনেক জানে শোনে এমন একশোজন লোককে একজন বলবাব

লোক পটিকে দিতে পারে। জোর থাকলে তবেই মানুষ উঠে ঠাড়াতে পারে।

কাছে যেতে পারে, দেখতে শুনতে পারে, ধারণা আনতে পারে, হাতে কলমে বিশেষভাবে জানতে পারে।

বলের চেয়ে বড় অজ্ঞ। দশ দিন দশ রাত্তির কেউ যদি না খেয়ে বেঁচে থাকে, তাহলেও সে না পার দেখতে, না পার শুনতে, না পার কাজ করতে, না পার বুঝতে, না পার জানতে।

জল অয়ের চেয়েও বড়। যদি তেমন তালমত বৃষ্টি না হয়, কসল ডাল হবে না। তাল কসল হবে না

ভেবে দুখে প্রাণ কাঁদবে। আবার তেমন তালমত বৃষ্টি হলে তাল কসল হবে ভেবে প্রাণে আনন্দ হবে।

জলের চেয়ে বড় তেজ। বাতাসে ভ্রম করে সূর্যের তেজ আকাশকে ভাতিয়ে তোলে। লোকে তবন বলে, এত যখন তাত, বৃষ্টি না হয়ে যায় না।

তারপর জুড়জুড় করে মেঘ ডাকে।

বিদ্যুৎ চমকায়। এসব দেখেওনে লোকে বলে, 'বৃষ্টি হল ব'লে।'

তেজের চেয়ে বড় আকাশ। সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, অগ্নি—এবা সবই আকাশে থাকে। আকাশ নানে আবাঁধা খোলা আন্তানা। অকাশ আছে ব'লেই আমবা আঁওয়াছ কদমতে পাঁবি, আমরা শুনতে পাঁই, আমবা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

আকাশের চেয়ে বড় স্মৃতি। মানুষ যদি মনে ক'রে রাখতে না পারত, তাহলে অনেক এক জায়গায় জড় হলেও কারো কথা কারো কানে চুকত না—কে কী বলছে ধরতে পারত না। কোনো কিছু জানাট সম্ভব হত না।

স্মৃতির চেয়ে বড় আশা। আশা মানুষকে উঠে দেয়, উৎসাহ যোগায়। যা পাঁই নি, তা পেতে চাই—এই পেতে চাওরার নানট হল আশা। মানুষ যা কিছু জানে, যা কিছু করে—তার সবটাই কিছু একটা। পাবার জন্যে, অভাব মোচনের জন্যে।

জীবন আশার চেয়েও বড়। জীবনট লবকিছুর গোছায়। লবচকের নাভিতে

যেমন শলাকার পর্ব শলাকা গাঁথা থাকে, তেমনি সমস্ত কিছুই জীবনের সঙ্গে লেগে থাকে। জীবন না থাকলে নাম থেকে আশা অবধি কোনোটাও থাকে না।

এতদূর শিখে নারদ বললেন, 'আমি গতাক্ষেপে বিশেষরূপে জানতে চাই।'

তার উত্তরে সনৎকুমার, বললেন, 'যখন কেউ সবিশেষ জানে, তখনই সে সত্য বলে। সবিশেষ জানতে হলে কিন্তু বোঁজ-খবর নেবার ঠেছে থাকা চাই। মনে মনে তোলাপাড়া করলে তবেই বিশেষভাবে জানা যায়। মনে মনে তোলাপাড়া করবার ঠেছেটা থাকা চাই। চান থাকলে তবেই মনস্থ হয়। চান হয় যদি নিষ্ঠা থাকে। নিষ্ঠা আসে যদি একাগ্রতা থাকে। অর্থলভ হলে তবেই কর্তব্য কাজে এগোনো যায়। যা ভুনা তাই অর্থ। অল্পে অর্থ নেই। ভুনাই অর্থ।'

সনৎকুমার ব'লে চললেন, 'সেই ভুনা যাতে কেউ আর কিছু দেখে না, আর কিছু শোনে না, আর কিছু জানে না। যে ভুনা সেই অমৃত। আর যাতে আর কিছু দেখে, আর কিছু শোনে, আর

কিছু জানে—তাট অল্প। যে অল্প সে নশ্বর।'

এমন যীর সহবত, অশাস্ত্রীয় লোকজনদের হাতে সেই নাবদের কী হাল হয়েছে দেখুন—

কাম্পে বাণী মেনকা চক্ষু জলে ভাসে। নখে নখ বাঁধায়ে নাবদ মূনি হাসে। কোললে পবমানন্দ নারদের টেকী। আকশলী পোষা মোণা পড়ে মেকামেকী। পাখা নাহি তবু টেকী উড়িয়া বেড়ায়। কোণেব বহুড়ী লয়ে কোললে জড়ায়। সেই টেকী চড়ে মূনি কান্দে বীণাযন্ত্র। দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কমলের মন্ত্র।

নারদকে টোঁকতে চড়ানোন পেছনে রীতিমত দুষ্টবুদ্ধি আছে। টেকির জ্বাদে ঘুরিয়ে বলা হল, নারদের বাহন এমন একটা কিছু যা একট জায়গায় থেকে কেবল তাল ঠোঁকে। যা সমানে পাড়ি দেয় কিন্তু এক কদম পথও অতিক্রম করে না। যা বিস্তর চলে বটে, কিন্তু একচুলও যায় না।

কৌদল বাধানোর ব্যাপারটাও তাই। নারদকে ছোট করার জন্যেই রটানো হয়েছে। নারদ সত্যিকার খবর দিয়ে খালাস। সে খবরে কাবো ল্যাজে যদি পা পড়ে, তো নারদ নাচার।

অরুণোদয়

একুলরঞ্জন সাহারার

এখানে গভীর জল। জীবন সমুদ্র হতে পারে:

আঙ্গিক সন্ধানে পৃষ্ঠীভূত হৃদয়েতে জ্বালা। জলে

লকাল সন্ধ্যার দুঃখ সমস্ত কোভের দীপানলে।

স্রষ্টব কলঙ্ক অন্ধকারে ফেবে—কড় অনাচারে।

মানুষের ধ্যানভাঙা জীবনের কিছু তোলাপাড়,

অচিরে আকৃষ্ট হয়। মেঘময় আকাশের রঙ

কখনো অধের। সপ্তরঙা রামধনুকের চঙ্ক

এখানে কিছুই নেই। আছে সংগ্রামের পারাপার।

জব এতে সব বয়ে যেতে হয়। আঙ্গিক সন্ধানে—

আশার আলোকে ফটে ওঠে যদি, কোনো প্রতিশ্রুতি,

প্রীতির পুলক মনে, কিছুকাল অর্থ অনুভূতি।

অনুবক্ত হোক বা না হোক, তবু মনে গর্ব আনে।

আমার স্বপ্নের ধ্যান এখানেই ভাঙে। অন্ধকাবে

যদিও ঝিল্লির মুগ্ধতানে গান; দস্ত প্রশান্ত,

কুপায় শাসন মানে, সুরে ওঠে বিবাহের গীত—

গুণিতে পূর্ণতা জানে কিংবা প্রবঞ্চিত নিবিকাবে।

সমুদ্র আপন লয়ে প্রবাহিত। জীবনসংগ্রামে

আমার বাঁচার কিছ অর্থ আছে—আমাদের গ্রাম।



সংগ্রামী বাংলা : সম্পাদনা :
প্রশীষকুমার মুখোপাধ্যায় ও
অজয়কুমার বসু । বিপ্লবী বাবীজ-
কুমার ঘোষ স্মৃতিরক্ষা সমিতি,
১৬৯, পূর্ব সিংধি বোড, কলিকাতা-৩০।
দাম : এক টাকা ।

বিপ্লবী বাবীজকুমার ঘোষের
১৬তম জন্ম-জয়ন্তী সংখ্যারূপে
প্রকাশিত 'সংগ্রামী বাংলা' শুধু মারুলী
মামুরকার দ্বারিষে প্রকাশিত হয়নি,
সম্পাদকবর্গ কঠোর কর্তব্যের দ্বারা
অনুপ্রাণিত হয়ে পত্রিকাটিকে
একালের যুবকদের নিকট অপরিহার্য
করে তুলেছেন। আইন ও সমাজ-
কল্যাণ বিষয়ক মহী শ্রীঅশোক
সেনের বাণীটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-
যোগ্য। তিনি বলেছেন : 'Lives of
great patriots like Barindra
Kumar Ghosh will inspire
our youth for ever.' পশ্চিম-
বঙ্গের যুধায়ন্ত্রী বলেছেন : 'তাহাদের
সেই ত্যাগবীর্য আত্মবিলোপকারী দেশ-
সেবার আদর্শ স্বাধীন দেশের যুবচিতে
ষদি সংক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইলে
আমাদের দেশকে অজয় গৌরবের
আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে।'।
ধলা বাহন্য, এই উদ্দেশ্য যদি মনে রাখা
শক্তব হয়—তা হলে স্বাধীন ভারত
সোনার ভাবত হয়ে দাঁড়াবে। এই
কারণে বিপ্লবীদের জীবনধারা, পরাধীন
ভারতের বিপ্লবকাহিনী জানা প্রয়োজন।
এই ডেজালের যুগ নতুন সমাজ
গঠনেও চাই বিপ্লব।

'সংগ্রামী বাংলা'য় কিছু কিছু
অসম্পূর্ণ রচনা (যেমন, 'ভারতের
স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলা সাহিত্যের
ভূমিকা') থাকলেও 'বিয়ান্ত্রিশের

বাংলা,' ইতিহাসের দলিল'
'পরিশিষ্ট—(ক)' উল্লেখযোগ্য ও
তথ্যপূর্ণ।

গ্রামীণ : সম্পাদক : ভগবতকুমার
রায়। 'ছাপাঘর', পো:—বরাকর
(বর্ধমান)। দাম : ত্রিশ পয়সা।

বর্তমান বাংলায় সমগ্র সাহিত্য-
পত্রিকাগুলি কলকাতা-কেন্দ্রিক।
উপরন্তু নানা সাহিত্যচক্র কলকাতাতেই
স্বল্পাধু বা দীর্ঘায়ু হয়। কলকাতার
বাইরে বাংলা সাহিত্য ও তার রসিক-
চক্র দুর্যোগবাহী মান পেয়ে থাকেন।
এ অবস্থা নিশ্চয়ই ভালো নয়। বাংলা
সাহিত্যের প্রসার গ্রামবাংলার বুকে

জয়ন্তী সেন

ছড়িয়ে পড়ুক, এটাই আমাদের কাম্য।
'বাজলক্ষ্মী সাহিত্য চক্র'র 'গ্রামীণ'
(ববীজসংখ্যা) সেই কামনা সিদ্ধির
সহায়ক। প্রতিটি রচনার মধ্যেই যে
মূল্যবান আছে, একথা আমরা বলি
না, তবে প্রত্যেকের মধ্যে সত্যতার
স্বাক্ষর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।
পত্রিকাটিতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ,
মহিলা বিভাগ, কিশোরদের আলস
অনেক কিছুই আছে; তবু যা নেই
তা হচ্ছে গ্রামবাংলার খবর, অকালিক
সংবাদ এবং দুপাখ্য ছড়া, কিছদন্তী
ইত্যাদি। এসবও আমরা চাই।
সম্পাদক মহাশয় লেখকদের অনু-
প্রাণিত করতে পাবলে তাঁরই পত্রি-
কাটিকে একটি নতুন রূপ দিতে
পাববেন। এ সংখ্যার লেখকদের
মধ্যে মুগাক্ষশেখর দত্ত, শ্যামাপদ
চট্টোপাধ্যায়, বীণা রায়, অশোক সেন

অবিশা সেন, পপি চ্যাটার্জী, কঞ্চণা
সেন, রঞ্জিত মণ্ডল, বাসুদেব দাসের
লেখা ভালোই লেগেছে।

দুর্গাপুর ইম্পাত দর্পণ :
দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার জন-
সংযোগ অফিসার, শ্রী বি কে বসু
কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত। (২য়
খণ্ড : ৫ম সংখ্যা : মে '৬৫)

'দুর্গাপুর ইম্পাত দর্পণ' কারখানা-
জীবনের সমাচারমূলক পত্রিকা। এটি
প্রচারবর্ষী হওয়ায়, স্বভাবতই বিনা
মূল্যে প্রদান করা হয়। কর্মীজীবনের
গুরুত্ব দিক আলোচনা ও তাৎকালিক
ক্ষেত্রে সবকথা প্রকাশ করা একালে
শুধু প্রচারের ধর্মই বহন করে না,
বরং জাতীয় জীবনের প্রগতিব চিহ্নই
অধিক বহন করে। 'দর্পণে' প্রকাশিত
জেনারেল ম্যানেজারের বাণীটি প্রথাগত
নয়, এতে তিনি বলেছেন দেশের
সীমান্ত-সমস্যার দিনে অধিক
উৎপাদনের কথা। তাঁর এই বাণীতে
শ্রমিকের কল্যাণের কথাও উচ্চারিত
হওয়া উচিত ছিল। শ্রমিকবাই দেশের
সম্পদ। শ্রমিক-জীবনের উন্নতি হলে
দেশও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হবে, একথা
আমরা যেন ভুলে না যাই। 'দর্পণে'
'দুই শতাব্দীর সাক্ষীতে' সত্যীশবাবুর
দীর্ঘায়ুলাভের কথা বলতে গিয়ে তাঁর
গোদুগ্ধ পানের যে খবরটি দেওয়া
হয়েছে একালে তা কখনের ভাগ্যে
ছোটে। কারখানার অন্যান্য জাতব্য
সংবাদের মধ্যে 'উৎপাদন ব্যয় হালে'
দুর্গাপুরের কৃতিত্ব, 'মেধাবী ছাত্রদের
বৃত্তির ব্যবস্থা', 'দুর্গাপুর কর্মী-সমবায়
সমিতি', 'পুশার রায়' তথ্যপূর্ণ।
বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে রচনাটি
পুরাতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে
স্বলিখিত দুর্গাপুর ইম্পাত নগরী জুড়ে
যে সংস্কৃতির অনুষ্ঠান হয়, তার পরিচয়
কর্মীদের জীবনে নতুন উদ্দীপনার
স্রষ্টা করবে। অফিসারদের নিযুক্ত ও
পদোন্নতির সংবাদের সঙ্গে কর্মীদের
যোগ্যতাসূচক পুরস্কার দান সম্পর্কিত
খবরও থাকা উচিত ছিল।

রাজধানী :

নির্বাচনের তাগত নবায়নী ক'দিন থেকে বুনে চলেছে কেমন বেন একটা অপূর্ণ। নারিক, অবিনায়ক থেকে শুরু করে ছোট ও নাথারি প্রায় পূর্ণ দেউহানীর ব্যক্তিরই মাইনে। বিবহ-বিবহা বধুর মত সে অকার্ষণে অতীতের স্মৃতিচারণ করে বিচরণ করছে এক কল্পনারাজ্যে। মাঝে মাঝে বাইরের ঘটনাবলীর স্মৃতি ঝাঁক লেগে কণিকের জন্য ছিন্ন হয়ে যায় অপূর্ণ। নারিক নিছকপের অপরিষ্কৃত আওয়াজ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে রাজধানীর কত মাতায়ন ভেদ করে।

অব্যক্ত ব্যথার আচ্ছন্নচিত্তে এদিক-ওদিক তাকাতেই মনে পড়ছে আনন্দোহা, ফরাকাবান আর রাজকোটের নরাতিক কাহিনী--নানুদের এককালের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জাতীয় কংগ্রেসের এই তিনটি কেন্দ্রে পরাজয়ের বেদনাদায়ক কাহিনী। ১৯৬৩ সালের কথা। অওহর-জাল নেহরু তখন কংগ্রেসের একচ্ছত্র অবিনায়ক। এই পরাজয়ের পর শুরু হয়েছিল আত্মনুসন্ধান ও আত্মতত্ত্বের পাল। তার জন্য রচিত হল কামরাজ পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের সকলের জন্য 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক নান' বহীনের মধ্যে তা' নিয়ে পড়ে গেল কাড়াকাড়ি।

সেই আত্মবলিনানের হিড়িকে নীরা গদি ছেড়ে বেরিয়ে এসেই গলাবাজি শুরু করেছিলেন তাঁদের প্রধান শ্রী এস কে পাতিল এখন রেলমন্ত্রী। মোরারজী-ভাই নাকি এখনও বহিনভার আপে-পাশে বুঝে বেড়াচ্ছেন উপবৃত্ত আসনের গছানো। কেউ আবার বলছেন, 'সব ছুটা হযার।'

বসাম্পি শ্রীঅতুল্য বোম্বকেও সে-দিনের সকল সানলাতে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল দক্ষিণ ভারত অভিযানে। দক্ষিণের দাক্ষিণ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি বলেই পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণের নিমিত্ত কণ্ঠ তুলতে পাওয়া যাচ্ছে রাজধানীর রাজনীতিতে।

সেদিনের সন্ডে খাঁপিয়ে পড়ে সব চাইতে বেশি ঠেকেছেন বরী গোলাব মহম্মদ। তাঁর ভাগ্য আর হরভো প্রসন্ন মা-ও হতে পারে। শ্রীবিজু পট্টনায়ক বুজ্জমান ব্যক্তি। পদত্যাগের পর থেকেই তিনি শ্রীপাতিদের বত প্রকাশ্যে না হলও মীরবে পথ ঝুঁকছিলেন। পাঞ্জাবের খাপটা হাওরা চারদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে



ভারতদর্শন

বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে

পড়ায় পট্টনায়ক কিছুটা শীতিল হয়ে পড়েছিলেন। সে ঝাঙাও প্রায় কাটিয়ে এসেছেন। সি-বি-আই রিপোর্ট এবং কেন্দ্রীয় বহিনভার মায় তাঁর পক্ষে না গেলেও তাঁর ও তাঁর মনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মতুন করে তদন্তের প্রয়োজন বোঝান অস্বীকার করে বলেছেন স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার।

কংগ্রেস সভাপতি এখনও উদ্ভিয়ার। আবির্জনা পরিকার করে, প্রয়োজন হলে আগাছা বাছাই করে কংগ্রেসকে গৌরবের আসনে পুনরার প্রতিষ্ঠার জন্য রচিত

তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনাকে রূপ দেবার দারিষও মাত্য রয়েছে তাঁরই ওপরে। উদ্ভিয়ার থেকে পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে মহীশূর পর্যন্ত পরিকল্পনার কোথাও কিছু ভেদন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ভাই কংগ্রেস সভাপতি বেরিয়ে পড়েছেন মিলনের বাণী নিয়ে। তাতে নিরাপ হরেন্দ্রে উদ্ভিয়ার কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হল। ভঃ হরেক্ক বহভাব পড়েছেন বিপদে। তাঁর অনুপায়ীরা শ্রীকামরাজের কাছে কামনা সিদ্ধির সভাধনার কোন ইঙ্গিত না পেয়ে হল ছেড়ে দেবার হুক দিচ্ছে। কামরাজ সকলের কামনা সিদ্ধ করতে পারেন নি বলেই কেবলে সেদিন ঘটলো এমন বিপর্যয়।



শ্রীকামরাজ নাদার

কাঙারী হয়ে বেরিন ভারত-ভাবনার সকল দারিষ গ্রহণ করেছিলেন গ্রিক তার একটি বছর পুতির দিনে--আই জুন শান্তি ও বৈজ্ঞানিক বাণী নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনালাবাহাদুর শাস্ত্রী। কামরাজ পরিকল্পনার মতই অলস বনে ছবি ভেসে উঠেছিল প্রধান-মন্ত্রীর এক বছরের বাহাদুরীর কথা। সেপালেক্ত সঙ্গে দ্ব্যভাষ্যপূর্ণ পরিবেশ বহি, লক্ষ্যবাসী ও প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যার একটা কনসালো রাশিরার সঙ্গে সভায় বজায় রাখার ব্যাপারে স্ট্রটেনৈতিক কাজে ভারতের সাকল্যের কথা

যেমন বনছেন একদল—তেনি আরেকদল নেতৃত্বাধীন। এই তীব্র বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতির ফলে মূল নিয়মকে বলাচলন, নেতৃত্বের ক্রিয়াকর্ম-বিমুক্ততা ভাঙার প্রচেষ্টা হঠাৎ করেই দক্ষিণ দিকের দাবানলের, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কান্টনীর পরিস্থিতি, দক্ষিণ হচ্ছে দক্ষিণের এবং স্বাধীনতার পথ অব্যাহত হচ্ছে ধসে পড়লে।

কায়দা ও আটোয়ারা অভিনয়শিল্পের কাহিনী শুনে সুবর্ণায়ন করে হাই তুলে নিয়মের বিরুদ্ধে। তার করে সব উঠেই শ্রীলঙ্কাবাসীরা হঠাৎ বাধ্যবদ্ধ। এর বেশি তো মূর্খের কথা এর কাহিনীকাহিনীও অক্ষিও কেউ আসতে পারেন না।

শ্রীলঙ্কাবাসীরা কান্টনীর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়েছিলেন শ্রীমন্ত-কোর্তা গিয়ে দিয়ে। কাজেই নেতৃ-নানাবলি একদল নেতৃত্ব-না-নেতৃত্বই খুলে কেনা যেমন নতুন নতুন, তেনি নেতৃ-নতুন নতুন ব্যক্তি-গণের নিশ্চিন্ততা নেতা ভারতকে যেখানে যেখানে নিয়ন্ত্রণ, সেখান থেকে রাজস্বাধীনতার কোন পরিকল্পনা সম্ভব নয়। তা হাঁড়, নেতৃ-নানাবলি অপর কোন নেতার কাছের বিচার চলতে পারে না।

সুওহরলাল ছিলেন মহাশয় গান্ধীর নান্দ-পুত্র। গান্ধীজীর সদাঙ্গপ্রত দৃষ্টি ও সেহসনে দুই নেতৃ-নেতৃত্ব ভারতের গভীরে শিকড় ছড়িয়ে যেমন দিয়েছিলেন, তেনি শাখা-বাছ বিচার করে সে নেতৃত্বের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল লাল বিশ্বে। নেতৃ-প্রতিভার প্রভাব প্রতিটি স্বকর্মীর আশ্রয় স্বরূপও সেদিন বঙ্গ পড়েছিল। নেতৃত্বের ক্রিয়াকর্মবিমুক্ততার প্রসূই একই হঠাৎ উঠতে পারেন না। এ প্রসূ ভারতীয় জাতির জাদু পেয়েছে অনেকদিন আগে। কান্টনের একাংশ হানাদারদের কবলে ছেড়ে দেওয়া, চীনের ভারত আক্রমণ, ভারত প্রসূ নিজেদের কাছে হানাদারি এবং কয়েক রান থেকে স্বাধীনতা যা কিছু সামনে জগদল পাথরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ হঠাৎ করে—সবই সেদিনের হঠাৎ। কাজেই তাঁ'নিরে এই বৃহৎ স্ফুটিকারণ কতক অকারণ ও অহেতুক।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বের গ্রহণের পর শ্রীশ্রী বৃহৎ পেয়েছিলেন পতঙ্গীর সঙ্গে পারস্পরিক আর্থের যোকাবিলা করা প্রয়োজন সকলের আগে। এ কাজের সাক্ষ্যের ওপর অনেকটা নির্ভর করে দেশের পররাষ্ট্র সম্পর্কে সঠিক ও স্বাধীন পুনর্বিন্যাস। এই উপলব্ধি চীনের সম্পর্কে চিন্তার পরিবর্তন এনেছিল। প্রধানমন্ত্রী কয়েকবার বলেছেন, চীনের পুনরায় আক্রমণের ঝুঁকি মাধ্যম নিয়ে ও তার জবাবদিহি সফল করে চিরকাল বসে থাকা যায় না। বীমাংগার চেষ্টাও

তিনি করেছেন। চতুর চীন যে চেষ্টা বানচান করে দিয়েছে। ভারতকে কোণঠাসা করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই লাক্ষীমী সিরিটো ও ন্যাটোর অবশেষে পারি-জাতের সঙ্গে পর্বত গাঁটছড়া বাঁধতে দিবা করে নি।

আবার আশার কথা জন্মেছেন আরব প্রজাতন্ত্রের প্রধান শ্রীমন্তের। তিনি ভারতের অবস্থার বন্ধ। ভারত চিরকালই আরবের কাছের কাছ নিয়ন্ত্রণে চলছে। সুওহরলাল উচ্চারণে দিনে নেতৃ নেতৃত্ব ভারত আরবের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নাসেরের পক্ষে ভারতের স্বার্থে আলজিরার শত্রুর সঙ্গে জো-এন-সাইরের বৈঠকের প্রচলন বৃহৎ স্বাভাবিক।

শ্রীমন্তের প্রচেষ্টা ভারতের কোন প্রতি-ক্রিয়া এখনও জানা যায় নি। জানা সম্ভবও নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ভেবে-চিন্তে এগোতে হবে। যে-দেশ বড় ভাই রাশিয়ার বৃহৎ

পরিচর্য ভারত পার নি। ভারতকে নিপদে ফেলার অকৃত্রিম চেষ্টা চলছে চীনে। চীন-ভারত সীমান্তের সীমাংসার যদিছা থাকলে কয়েক ব্যাপারে নিজের স্বাধীনতার বর্ণনাকে গোপন করে এমন নির্জলা মিথ্যা প্রচার পাকিস্তানের পক্ষে চীন চালাতে পারতো না। আজ চীনের প্ররোচনার আলজিরার সপ্তদশের প্রাচীরে পাকিস্তান সারা পাক-ভারত সীমান্তে অশান্তি জ্বিগের রাখতে চাইছে। ভারতের সঙ্গে বিরোধ-সীমাংসার প্রস্তাবটো চীন আলজিরার সপ্তদশের দিকে দৃষ্টি দেবেই করেছে। এতে আফ্রিকার শান্তির বৃদ্ধি আশঙ্ক্যের পথটা অনেক পরিষ্কার হবে।

কবল :

পথের দু'দিকের প্রাচীরগায়ে নিজের নির্বাচনের বেদনাদারক্রান্ত স্মৃতিচিহ্ন এবং অত্যন্ত গোড়া দু-চারজন কমিউনিস্ট কর্মীর বুধে কংগ্রেসের প্রভাব বিস্তারের মানুষী অভিযোগ ভিন্ন কেবলের সমাজকীবনের কোন জ্বরেই আর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। জনপ্রিয় সক্রিয়-মণ্ডলী-পোড়িত গণতান্ত্রিক শাসন কাজেবের কথাও আজ আর তেমন শোভা পাচ্ছে না। রাষ্ট্রপতির শাসনে সাধারণ মানুষ বেশ বহাল তবিরেই দিন কাটাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির শাসন এ রাজ্যে নতুন নয়। বেশ আট বছরের মধ্যে চারবার কেবলে রাষ্ট্র-পতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। ন'নাস হল কেবলের মানুষ রাষ্ট্রপতির শাসনে নিবিড়েই জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সরকারের স্বাধীনবিনয় সম্পর্কে অনিশ্চয়তাই বোধহয় জনচিত্তকে একেবারে বিকল করে তুলেছে।

গণমনের এই বিকারের জন্যই 'রাষ্ট্র-পতির শাসন' অবসানের আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে নি। কান্টনের বক্তা বাবির নেতৃত্ব তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়াতেও আন্দোলন কিছুটা পতিত হারে পড়েছিল। নতুন করে গতিবের হঠাৎ প্রচলন চলছে বিরোধী নেতাদের মধ্যে। একমাত্র বাধ্যতাবের পরিস্থিতিকে কাছে লাগানো ছাড়া আর কোন পথ তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। দীর্ঘ সময় রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল থাকার রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে নিজস্বতা।

আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে জগব করে তোলার জন্য প্রশাসনকে দুর্নীতি বৃদ্ধ করার আশুপ দিয়েছেন রাজ্যপাল শ্রী এ পি জেন। কেবলের জটিল সমস্যাগুলোর ছট তাড়াভাতি ছাড়াবার প্ররোচনা 'ইউনিয়ন ক্যাবিনেট কমিটি' নিয়োগের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে রাজ্যপালের



শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পাণ্ডিত

জাতি হানতে চাইছে প্রতিনিয়ত, জাকার্তায় সেদিনও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ছড়িয়েছে বিদ্রোহ, আলজিরার রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর কাছের অগত্যা—ভারতের সঙ্গে বীমাংসার সারস্বতিকতা একটি বাচাই করে, স্থানিয়ে দেখা প্রয়োজন।

আর প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী আলী সাবরী অনেক আশা নিয়ে চীন স্বাক্ষরালে বসে। শক্তিবর্ধনের প্রচেষ্টা তুলে ধরেছিলেন। চীনের কাছ থেকে কোন সাড়া তিনি সেদিন পান নি। চীনের নীতি নাসেরের স্বাক্ষর নয়। নিজের সর্ব থেকে চীন কোনদিন একতরফ নাড়েনি। সে নীতির পরিবর্তন চীন করে থাকলে বীমাংসা সম্ভব নয়।

কিন্তু চীনের স্বতন্ত্রতা পরিবর্তনের কোন

স্বাভাবিকতা। বৈষয়িক উন্নতির আশা ফল
হয়েছে সাধারণের মনে।

এ পরিষিতিতে বিনা প্রতীতিতে নতুন
আন্দোলনের আহ্বান দিয়ে প্রতিকূল গোষ্ঠে
আপিরে পড়ে হঠকারিতার পরিচর দেওয়ার
চাইতে নীরব থাকাই অনেক ভাল মনে করতেন।
কিন্তু বিচারের সূত্রে বর্তমান শাসনে এসেছে যে-
কল সমস্যা—সমস্যাধনের চেষ্টা চলছে সর্বত্র।
প্রাথমিক শৈল্পিক অনেকটা কেটে গেছে।
রাজনীতিকদের প্রভাববৃত্ত প্রাণদের কাঠামোতে
অধিকারদের আর রাজধানীর কর্তব্যভিদের
কর্তৃপালন বনবন আদেশ আর নির্দেশের মাঝে
পৌছাতে হচ্ছে না। রাষ্ট্রপতির শাসন ক্ষম
তার থেকে এ পর্যন্ত দু'নীতির দ্বায়ে অভিবৃত্ত
হয়েছেন দু'হাজার সরকারী কর্মচারী। তাঁদের
মধ্যে ৬৫জন চাকরীও হারিয়েছেন। নিবিড়
রাজ্য আদায়ের কাজও চলছে। মণ কোটি
টাকা বাকী পড়েছিল। নির্বাচনের আগে তা'
আদায় হগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন
জনপ্রতিনিধি পরিচালিত সরকার। নির্বাচনের
মুখে বর্তমান সরকারকে বাধ্য হয়েই নীরব
থাকতে হয়েছিল।

প্রশংসায়ের চাপ সৃষ্টি করে যাঁরা নিজের
কাছ ওছিরে নিতেন তাঁরাই অস্বত্তিভোগ
করছেন সবচেয়ে বেশি। আর সুকিনে
পড়েছেন হোটেলের বালিক ও টাল্লির পরি-
চালকেরা। স্বাধীনতা রাজধানী এখন জন-
বিরল। বহাকরণের প্রধান প্রবেশদার—“সভাপ্রা-
র্থক” প্রতিদিনের বিকোভসুড। ছোট বড়
মেস্তারী এখন মিথিষ্ক ও নিজির। সরকার
রাজস্ব এ-এ-এ’য়ের অনেককেই বেকার
রাষ্ট্রবনের সুবিধা বহুধা থেকে অব্যাহতি দিয়ে
কেনা উন্নয়ন পরিষদের সদস্য নিয়োগ করেছেন।
রাজধানীর হোটেল ও টাল্লির পরিচালকেরা
স্বাদের বাটতি মেটাবার পথ এখনও করে নিতে
পারে নি।

বাণ্য পরিস্থিতি ঝড়ের পূর্বাভাসই বহন করে চলেছে। খেলা নভেম্বরে প্রবর্তিত আংশিক বেশনের বাকীটা পূরণ করতে হচ্ছে খেলা জারির থেকে। এই খেলাবাজারে এখন পকেট হালি করতেও পূর্বাভাস বাণ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কেরলে উৎপন্ন চালের দান হঠাৎ বিমোছন সরকার প্রতি কিনো ৭০ থেকে পাঁচভর পরমা। খেলাবাজারে হিঙন দ্বারা দিতে হচ্ছে। জিবাজুর, কোচিন ও খেলাবাজারের অনেক কেন্দ্রেই চাল বিক্রি হচ্ছে ৮ টাকা করে।

এই মূল্যবন্ধির বোঁক থেকে উদ্ধৃত্ত এলাকাও
মুক্ত নয়। পানবাট থেকে রাতারাতি চাল
পাচার হচ্ছে বাটতি সকলে। সবে সবে
পানবাটের বাজার হচ্ছে গরম। উদ্বাসনের

মানবভাঙা ডিতে চাকিলের অভাবেই নাকি
স্বটি হয়ে থাকে কৃত্রিম অভাব। ধান-চালের
অস্বাভাবিক বুনানুসন্ধিতে বাজরা ও মোটা
দানার পোষ্য দান গেছে অনেক বেড়ে।
বাংলা দেশের বড় মধ্যাডোজী ঐ সাজের
মানুষের কাছে নাই এমন দশাপা হয় উঠছে।

কালোবাচ্চার দমন করে খাদ্যের অসুখজনক
বণ্টনের কোন ব্যবস্থা না করতে পারলে
খ্রীষ্টান জনটিতে যে-আগুন করে নিরেছিসেব
তা' বেশিদিন জ্বালান যাওয়া সম্ভব হবে না।
খ্রীষ্টানপ্রাণ ও তাঁর সহযোগীরা সেই অগ্নিগত
দিনের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

ଉତ୍ତରାଟ :

এ-রাজ্যের হাতুড়া পয়সা থেকে সরকারী
ভাষার স্বীকৃতি লাভ করেছে। হাতুড়াকে
হরীদ্বার আলন ঘিরে সহাকরণের সকল কাজে
ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সরকার।
চাকুরীর আবেশনপত্র, ছুটির পরামর্শ এবং
এ-জাতীর চিঠিপত্রে ওজরটি ভাষাই এখন
ব্যবহৃত হচ্ছে। সরকারী বিভিন্ন শিপনপত্রে
ওজরটিকেই শিকার বাহন করার সিদ্ধান্ত
করা হয়েছে।

সরকারী আকির্ষে গুজরাতি সাহিত্যের
প্রকাশের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন বোধ করছেন
নেভার। এতে নাকি গুজরাতি ভাষার
ব্যুৎপত্তি অর্জনের সুখা যাবে বেড়ে এবং
ভাষার সঙ্গে কর্মচারীদের সংযোগ বৃদ্ধি ডায়া
ব্যবহারের পক্ষে হবে অত্যন্ত সহায়ক।

গুজরাতি যাদের মাতৃভাষা, তাঁদের চিপিথের পসড়া গ্রন্থন এবং সরকারী নথিপত্রে বোটি নিতে হচ্ছে গুজরাতি ভাষাতেই। এ-কাজ করতে গিয়ে কঠিন শব্দ চয়ন না করে মবল ও সহজ ভাষা যাতে প্রারাগ করা সম্ভব হয় সেই দিকে অফিসারদের নজর রাখতে বলা হয়েছে।

গুরুগি বাক জানেন না, তাঁরা অজ্ঞতার
অবস্থাতে দাঁড়ি এড়াতে পারবেন না। তাঁদের
এই ভাষা শিখে নিতে হবে। শিক্ষাও পরীক্ষার
বসতে হবে। বিভাগীয় পরীক্ষা পূর্বত গুরুগি
ব্যবহারের বিষয় বিবেচিত হচ্ছে অভিজ্ঞতালব্ধ।

স্বাক্ষরপত্র কবীদের সভায় স্বাক্ষরী
 শ্রীযুক্ত রায়সহায় জনগণের ভাষায় সরকারী
 কাজ চালিয়ে প্রতিজ্ঞা পালনে সরকারকে
 সর্বতোভাবে সাহায্য করতে অনুৰোধ
 জানিয়েছেন। গুজরাটী ভাষায় নিজস্ব
 বাচনতরী রয়েছে। ভাষার সেই সাবলীল
 গতির নিকট লক্ষ্য রেখে চলতে পারলে কোন
 অসুবিধার সন্নিহিত হবে না বলে শ্রীরেহড়া
 আশ্বাস দিয়েছেন।

দেশীয় রাজ্যগুলোতে বরাবরই স্থানীয়
ভাষার রাজকূর্ষ পরিচালিত হতো। গুজরাটে
দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা কম ছিল না। পরি-

ভাষার কোম অন্তর্বিধা হলে রাজস্বসংগ্রহে ব্যবহৃত নথিপত্রের পূর্তায় পূর্তায় তার সমস্যাটা পাওয়া বাবে। আগল কথা, ইংরেজীভাষীরা আশির দশ আশীভাষীর রসায়নাদি খেলে বকিত হওয়ার আশঙ্কাই নষ্টচিত্র হয়ে উঠেছে কি না সেইদিকে নজর দিতে হবে সুধারসীকে। আশীভাষীর বেড়াফাল তেল করতে পারলেই ভাষার কাজ চাল করা সহজ হবে।

কচ্ছের রানে এখনও বান ডাকে নি। জোড়ার
চলে পাবনের পরিবর্তে বড়ো হাড়ার বাগীর
মোটকু জল অসহিল ভাও নেমে গেছে।
অপর্যাপ্ত বছর যে বাসের সাক্ষ্যসাক্ষি
কচ্ছের রানে বুক হয় সবসের জনকহিল।
কঠোর সভ্যকে প্রাণ করার জন্যই যোগ্য
প্রকৃতি এবার একট মচকি ছেলে যাবে
দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টি প্রাণসম্পন্ন সবুজগাভার
ফলে জামানের অগ্রগামী সৈন্যদল অস-
মরণ না করলে এই পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে

সারা দেশ কল্লোলের
ডাকে সাড়া দিয়েছে।

লিটল থিয়েটার গ্রুপের
প্রযোজনায় উৎপল দত্ত

তাপসসেন সুরেশ দত্ত ও
হেমাক বিশ্বাস মহাক্ষম

পরিচালনা মঞ্চ ও আলো
এবং সংগীত—

মি না ভা খিয়ে টা রে
বহু স্পতিবার ও শনিবার

সাড়ে ছ'টায় রবিবার
 জিন ১৩ সাড়ে ছ'টায়

क षो ण । प्र ति टि

অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা

জানিয়ে চলেছে।

পাকিস্তানী মুখবন্দাদের পাঞ্জা থেকে ভারতের সবটা জমিই উদ্ধার করে দেরে কিরতে পারতো। আমাদের নেতারা অথবা বিলাতের ক্ষুণ্ণনৈতিকরা সাক্ষী পাইবার সুযোগ বাতে না পান তার জন্যই বোধ হয় প্রকৃতি কচ্ছের স্বপ্নাক্ষনের তপ্ত বালুকায়া বারি সিকনে বিরত হয়েছেন।

দুরারে যখন মোতাস্যেন রয়েছে শঙ্ক-সৈন্য, তখনও আনাদের মতের, পথের অনৈক্যের অভাব ঘটছে না। সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় হবে তা নিয়ে বিবাদ চলছে।

বিধানসভার নির্দলীয় সদস্য শ্রীবাণুভাই বৈদ্য ভবনগরের রাজপরিবারের সম্ভ্রান্ত-বিধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্যালয় ভবনগরে করার মতের পরিবর্তন করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি মুখ্য-মন্ত্রীর কাছে বলেছেন সৌরাষ্ট্রের জনমনে ভিত্তিতা বৃদ্ধি না করে সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যালয় স্থাপন করে পরলোকগত মহারাজার মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করলে সব নিকটই রক্ষা পেতে পারে।

বিহার :

পাইকারী হারে বিহারের চিকিৎসক-কর্মচারীরা কাছ থেকে চাকুরীতে ইতকান চিঠি মতন সবসময় ছুটি করেছে। সারা রাজ্যে ব্যাপক হারে চিকিৎসা-সঙ্কটের সত্তাবনার আনেকে ভীত হয়ে পড়েছেন।

চাকুরীতে ইতকানদের এই ঘটনা চিকিৎসক-সমাজের প্রতি রাজ্যসরকারের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের জন্যই ঘটেছে। দীর্ঘকাল চিকিৎসকগণ এই নিয়ে আলোচন করেছেন। তাঁদের প্রধান দাবি হল, প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের চাকুরীর অবস্থা ও বেতনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে তাদের বেতনের হার পরিবর্তন। তা ছাড়া, একই দেশে দুই সরকারের চাকুরীতে নিযুক্ত কর্মচারীর বেতনও বৈষম্য থাকতে পারে না। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে নিযুক্ত চিকিৎসকদের বেতন বেড়েছে তিন-তিনটি দফায়। দ্বিতীয়-দফায় বেতন তাদের বেড়েছে ১৯৬৪ সালে। বিহার সরকারের অন্তঃসারিন্যু আশুসবাপীতে তাই এখন আর চিকিৎসকগণ আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না।

১৯৬০ সালের কথা। সেকালের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রী বি সি প্যাটেল সেদিন দরমাস গুলার

জানিয়েছিলেন, পরবর্তী বিধানসভার অধিবেশনে ঘোষিত হবে চিকিৎসকদের পেটের চিন্তা নিবারণের একটি পরিকল্পনামূলক সিদ্ধান্ত। শেষ পর্যন্ত নির্ভর করা হল 'বেতন পরিবর্তন ও পরিষদন কমিটির' ওপর। চার বছর কেটে গেল কমিটির সুপারিশের চূড়ান্ত রূপ নিতে। সুপারিশের পরে প্রায় বছর ধরে এলো। দু'বাসের বেশি চিকিৎসক-সমাজের আলোচন, বিহারের বাতাসে ছুটি হয়েছে চাকুরীয়ার। কিন্তু সরকার নির্বাক।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আসফা আলী সাহেব এত হৈ-হুল্লার পর, চিকিৎসকদের কাজকে 'হেস্টি এ্যাকশন' আখ্যা দিয়ে জুর কোন মুক্তি জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেন নি। স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর চিকিৎসকের পদ বোর্ড দু'হাজার তিন শ' তার মধ্যে মাত্র ১৭৯০টি পদে লোক নিযুক্ত রয়েছেন। এঁদের একশ' চল্লিশ জন বিদেশে এবং দেড় হাজার কাজে ইতাকার আবেদন পেশ করেছেন। সরকারের মতের পরিবর্তন না হলে অথবা চিকিৎসক-সমাজ আরও কিছুদিন ত্যাগস্বীকারে সন্তত হয়েই

সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু আগামী আকর্ষণ নবরঙ্গনাথ মিত্রের সাপ্তাহিক উপন্যাস

ইতাকাপত্র প্রভাত্যাহার না করলে পরলা

জুলাই সারা রাজ্যের হাসপাতাল অচল হয়ে পড়বে।

কংগ্রেস এখন ছোটানাপপুরের উত্তর ভূমিতে রাজনৈতিক হলকর্ষণের দ্বারা আদিবাসীদের চিত্তজয়ের চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণভদ্র মহারাজের নিজের জেনা হাজারীবাগে বিহারের রাজনৈতিক সম্মেলন তারই পায়তারা নাজ। হাজারীবাগের একটা বিরাট অকলের মালিক ছিলেন রামগড়ের রাজাবাহাদুর কামাক্যানারায়ণ সিংহ ও তাঁর পরিবারবর্গ।

১৯৫০ সালে রাজাবাহাদুরকে পরাজিত করে গিরিডি থেকে নির্বাচিত হয়ে রাজস্ব-মন্ত্রী হয়েছিলেন শ্রীসহায়। শ্রী সিংহ আবার শ্রীসহায়কে হারিয়েছিলেন বাকরাগাঁও কেন্দ্রে। তা ছাড়া আরও তিনটি কেন্দ্রে থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৫৭ সালে কিন্তু গিরিডিতে শ্রীসহায় শ্রীসিংহের কাছে হেরে

গিয়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। কংগ্রেসের ভেতরে কোমল ও গিরিডির পরাজয় রাজনীতির পুরোভাগের আসন থেকে ঠেঁসে নামিয়ে দিয়েছিল শ্রীসহায়কে। ১৯৬২ সালে পাটনা থেকে নির্বাচিত হয়ে তিনি এবে বসেছেন মনপতির আসনে।

হাজারীবাগ কেবল শ্রীসহায়ের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটায় নি। গেল তিন-তিনটি সাধারণ নির্বাচনে অনেক ক্ষম-কতি স্বীকার করতে হয়েছে কংগ্রেসকে এ জেলাতে। এইজন্যই আদিবাসীদের সভায় উপস্থিত হতে হয়েছিল শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এবং শ্রীমতী ইন্দ্রিা গাছীর মত নেত্রীস্থানীয়াদের।

গেল পঁচিশ বছর ধরে কেসিয়ে ভোলু হয়েছি পার্বত্য অকলের আদিবাসীদের। রোষটা তাদের কংগ্রেসের ওপরই বেশি। কংগ্রেস-ঝাড়খণ্ড মিলনের পরও আদিবাসী নেতারা পাহাড়িয়ারদের সে-চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে পারেন নি। সিংহ, হাজারীবাগ, রাঁচি ও গাঁওতাল পরগনার এইজন্যই কংগ্রেস জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি।

১৯৫২ সালে শ্রীজগদীশ সিং দাবি তুলেছিলেন স্বায়ত্তশাসিত আদিবাসী রাজ্যের। এটা স্লোগানেই ঝাড়খণ্ড পাট জিতেছিল। ৩২ জন সদস্য নিয়ে তারা গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল প্রধান বিরোধী দল। রামগড়ের রাজার জনতা পাট পেয়েছিল মাত্র এগারটি আসন।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে দুটি আসন হারিয়েছিল ঝাড়খণ্ড। জনতা পাট এ নির্বাচনে আগের বিপণ ক্ষমতা লাভ করলেও ঝাড়খণ্ডই ছিল প্রধান বিরোধী দল। ১৯৬৭ সালে হঠাৎ বিহারের রাজনৈতিক পটের পরিবর্তন ঘটলো। রামগড়ের রাজা গিরে যোগ দিলেন স্বতন্ত্র দলে এবং বিহার বিধানসভায় তাঁর দলই গ্রহণ করলো বিরোধী গোষ্ঠির নেতৃত্ব।

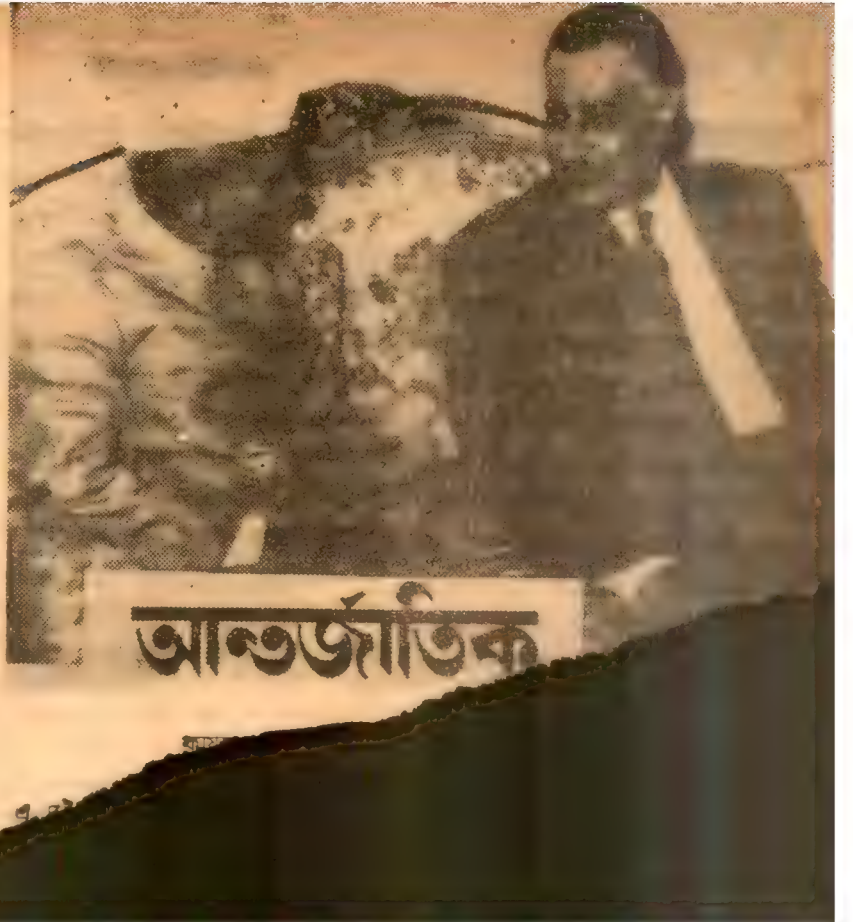
রাজা কামাক্যানারায়ণ সিংহ স্বতন্ত্র দল থেকে বিভাজিত। কংগ্রেসে প্রবেশের চেষ্টাও তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। স্বতন্ত্র দলের বীমা সবরোভায় সন্তত হয়েছেন তাঁদের নিতে অবশিষ্ট কংগ্রেসের আপত্তি নেই; কিন্তু রাজার জন্য কোন আসন দিতে মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেসের পরি-পরিচালকমণ্ডলী রাজী নন।

রাজা কামাক্যানারায়ণ চিরকালই তাঁর রাজকীর ঠাঁট বজায় রেখেছেন। স্বতন্ত্র দলে যোগ দিয়েও তিনি তাঁর জনতা দলের নির্বাচনী প্রতীক পরিত্যাগ করেন নি। আগামী নির্বাচনে কামাক্যানারায়ণ ও জগদীশ সিংহের সম্ভাব্য মিত্রাণী কংগ্রেসের নেতাদের কেনেছে মতন ভাবনা। তাই আজ ছোটানাপপুরের দিকে বৃষ্টি নিবন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন কংগ্রেসের কর্মী-ব্যক্তিবর্গ।

মধ্যপ্রাচ্য :

ডাঃ মোঃ উপাধিপতি ডঃ আকির হোসেনের মধ্যপ্রাচ্য সফর শেষ হতে না হতে, প্রধানমন্ত্রী শাহীজী রওনা হয়েছেন কানাডায়, যারপথে আরব নেতা নাসেরের সঙ্গে স্বল্প সময়ের সাক্ষাৎপর্ব নেবে। আগামী আফ্রো-এশীয় গেমেনন নিয়ে কূটনৈতিক বোগাবোগ এবং জল্পনা-কল্পনার আরব দুনিয়া যখন সারা বিশ্বের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার সন্ধিক্ষেপে এ দুই রাষ্ট্র-প্রধানের সফর যে সময়ানুগ এবং ফলাবাহী হয়েছে তা বলা বাহুল্য।

বিশেষত পাকিস্তান যখন মুসলিম জাত্বের শ্লোগান তুলে মধ্যপ্রাচ্যে ভারত-বিরোধী মনোভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যমূলক হীন চক্রান্তে লিপ্ত, তখন সে সভাবনা বুলিমাৎ করার বোগ্য লমরোপযোগী তুন্দিকায় ডঃ হোসেন স্তুতি হলেন।



मान्यताप्राप्त कलाकर्म

କାଳାଜା :

ভিরেৎনানেন্দ্র নন্দকরী সংঘ
 সারথক একটি বিশৃঙ্খলে পরিণত
 হতে পারে, এমন ভয়াবহ সম্ভাবনা বৃহৎ
 শক্তিগুলির সমস্ত যোগাণ্ড ও মারণাস্ত্র
 প্রদর্শনীর মাধ্যমে যখন স্পষ্টতঃ প্রকাশ
 পরিগ্রহ করেছে, তখন সমাজ উদ্বিগ্ন
 হুটি সহ-অবস্থানে বিশৃঙ্খলী রাষ্ট্র
 ভারত ও কানাডা পরস্পরের মত-
 বিনিময়ের সুযোগের অবতারণা করনো,
 তা' অভিনন্দনযোগ্য। কানাডা অবস্থান-
 তে ও ন্যূন, বাস্তবনৈতিক কারণেও
 ১৯৫৮

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর আত্মজাতিক
 ঐতিহাসিক পটভূমিকায় একটি বিশেষ
 স্থান যে আছে, তা'ও অনস্বীকার্য।
 সুতরাং শাস্ত্রীজীর বানাডা গম্ব,
 পিরগিনের সঙ্গে বৃত্তবিত্তি, ডিরেংনার
 প্রসঙ্গে আলোচনা আগায় কমনওয়েলথ
 প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের পটভূমিকিতে
 বটেই গুরুত্ব বহন করে। শাস্ত্রীজী
 পিরগিনের বর্তমান সাক্ষাৎকার শুধু
 দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতাকে
 দৃঢ়তর করার স্বার্থে বিবেচনা করলে
 মূল গুরুত্বকে অস্বীকার করাট হলে।
 এট মনোপদযোগী সাক্ষাৎকার অনেক
 বেশি মূল্যবান এবং তার প্রভাব
 অল্প ভবিষ্যতে অনেকখানি স্মরণ-
 রাখা করা অসম্ভব।

মরোয়া বৈঠকের আয়োজন। ইতিপূর্বে
আফ্রো-এশীয় একাধিক রাষ্ট্র চীন-ভারত
বিরোধের একটি সম্মানজনক নীরাংগার
জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু গরাক
প্রায়গ স্বার্থ হয়েছে চীনের অধেভুফ
নষ্ট এবং উক্ত মনোভাবের জন্য
ভারত আত্মমর্দাদ। সম্পর্কে গরাক
সচেষ্টন এবং কোন অসম্মানজনক
নীরাংগার পক্ষপাতী কখনো হয়ে না
অতরাং আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রজোটের শক্তি
শালী এবং প্রত্যাবলানী করবার নাগের
বদি চীনের অসহযোগী মনোভাবকে
মুক্তিগত আন্দোলনের পর্যায়ে আনতে
শকর হ'ন, তবে হয়তো অপর ভবিষ্যকে
চীন-ভারত বিরোধের একটি সমাধান
থাবে পাওয়া মুকুর হবে না।

માર્કિત ચક્રવાદે :

১২-কর্তা ভিষ্ণুনাথ এবং ভোগিনিবাসী
স্বামী বহিষ্কৃত মন

সাপ্তাহিক মনোভাষী



জনসন

এদের আইনগত অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে
দলগে হবে কেন যে তোমরা বুজ, তোমাদের
সব তোমরা করে নাও। যদি শ্রুতকার
আমেরিকানদের সমান জুগোপ এবং
নাগরিকদের অধিকার ব্যাপকভাবে নিগ্রোদের
দেওয়া না যায়, যদি তাঁদের সম্পর্কে পৃথক অস্তিত্বের
মনোভাষী আইনের মোহাই বর্ণবৈষম্য থেকে উদ্ধৃত
এই গভীর সমস্যার সমাধান আনতে পারবে না।
তিনি নাকিন নাগরিকদের কাছে তাই
আবেদন করেছেন---বনের অর্গল ঝুলে
নিগ্রোদের সমান নাগরিক হিসেবে গণ্য
করতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিগ্রো-
সমাজের সর্বাঙ্গীণ অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে
প্রেসিডেন্ট জনসন একটি উচ্চপার্থ্যের সম্মেলন
স্বায়ী হাউসে আহ্বান করবেন জানিয়েছেন,
যাতে ইতিহাসের একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের পূর্ণ
অবসান সম্ভব হয়।

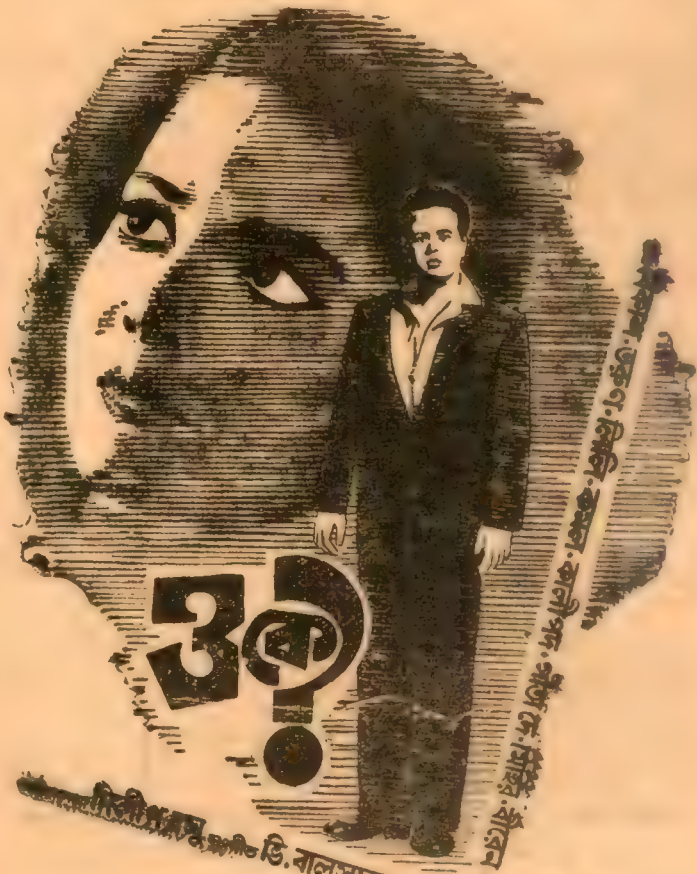
কিন্তু প্রেসিডেন্ট জনসনের উভেছা
শাকলে কি হবে, শ্রুতকার নাকিন বর্ণবৈষম্যীদের
পৃথক চক্রান্ত রাষ্ট্রশক্তির পরোয়ানাকে বেপেরোয়া-
ভাবে জমাগতই লগ্ধন করে চলেছে। কয়েক-
দিন আগে বোগালুনা অঞ্চলের নির্বাচিত প্রধান
নিগ্রো শেরিফ্বর--ওনীল মুর এবং জীভ রজার্গ--
সরকারী গাড়িতে টহল দেবার সময় শ্রুতকার
গুপ্তঘাতকের গুলীবর্ষণের সম্মুখীন হন। মুর
ঘটনাস্থলে মারা যান। আহত হয়ে রজার্গ রেডিও
দ্বারা পুলিশের দপ্তরে ঘটনাটির সংবাদ দেন।
এক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের সক্রিয় চেষ্টায় আততায়ী
বোম্বালুসার জনৈক ল্যাবরেটরী-কনী আর্দেগে

রে ব্যাকএলভিন্ ধরা পড়ে। ব্যাকএলভিন্
বর্ণবৈষম্যী শ্রুতকার গুপ্ত-সমিতির যে সদস্য, তা'
বলা বাহুল্য। গভর্নর ব্যাকইথেন নিগ্রো-
বিরোধী চক্রান্তের সঙ্গে নিপু আততায়ীদের
সম্মানের জন্য ২৫০০০ ডলার পুরস্কার ঘোষণা
করেছেন এবং এর একটা সমাধান করতে
বন্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন। বিদেশে নাকিন

রাষ্ট্রনীতি তুলন বিবেচ আর নিকোভেল
প্রতিনিয়তই সম্মুখীন হচ্ছে, স্বরাষ্ট্রের
অভ্যন্তরে বর্ণবৈষম্যের এই নারকীয় প্রভাবকে
ধ্বংস করতে না পারলে হু কোটি নিগ্রো নাকিন
নাগরিক স্বরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তিকে যে-
কোনো বৃহত্তে এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন
করতে যে পারে, সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট জনসন
অন্তত অবহিত বোঝা যাচ্ছে।

রহস্য উদ্ঘাটন শুক্রবার ১৮ই জুন।

কেন্দ্রীয় এন্টারপ্রাইজের-৫৪



প্রযোজনা এস. ক্যানজা

সি সহস্রমিকার : রাজলক্ষী - রেখা মল্লিক - কানো - মাঃ স্বপন - শকুন্তলা ভট্টা ।।

• নৃত্য : মধুমতী (বহে) •

উত্তরা - পূর্ববা - উজ্জ্বলা - আলোছায়া
নেত্র - পারিজাত - মায়াপুরী - যোগমায়া - রূপালী
শ্রীমা - কল্যাণী এবং অন্যান্য

কেনিয়া :

কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি জোমো কেনিয়া রাষ্ট্রপতি কনসেলর প্রধানমন্ত্রী সন্মেলনে, উপ-রাষ্ট্রপতি ওজিকা ওজিকাকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রায় নির্বাচিত করেও শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছেন। ওজিকার মধ্যে বুটেন এবং বাকিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতা অনেক বেশি কার্যকরী এবং আন্তরিক। কারণ, বুটেন অথবা যুক্তরাষ্ট্র কেনিয়াটা তাদের স্বার্থপ্রণোদিত কার্যকলাপে লিপ্ত এবং প্রকৃতপক্ষে দেশের উন্নয়ন চায় না। এ-প্রসঙ্গ আজ বিশেষভাবে জোমো কেনিয়াটাকে বিচলিত করেছে, রূপ থেকে জাহাজডাতি অস্ত্রশস্ত্রের প্রতীকিত মুহূর্তটির সন্ধিক্ষণে। বলা বাহুল্য, এ-সামরিক সহযোগিতা ওজিকার উদ্যোগেই সংগঠিত হয়েছিল, কিন্তু যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কেনিয়াটা রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষপাতী, এ-জাতীয় পররাষ্ট্রের সহযোগিতা তার পরিপন্থী। তাই শেষ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি কেনিয়াটা রূপ ফর্জ পক্ষে জানিয়েছেন সামরিক সাহায্য কিরিয়ে নিয়ে যেতে। বিশেষ করে কেনিয়ার এমন গুহব উঠেছিল যে, ওজিকা আসলে কেনিয়াটা সরকারের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানেরই প্ররোচনা করছেন এবং রূপ সাহায্য এনেই তা কার্যকরী হবে।

ওজিকা যদিও নিঃসন্দেহে জোমো কেনিয়াটার আত্মভাঙন, ভবু সভবত এমন একটি ভবিষ্যৎ সভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। তিনি বলেছেন—তার জাতীয় স্বার্থের



টম বোরা, ওজিকার সঙ্গে জোমো কেনিয়াটা

কোনো নতুনদিকে প্রসার দিতে তিনি প্রস্তুত ন'ন। কেনিয়া একজন প্রভুকে সরিয়ে আরেকজনকে স্থান অধিকারের সুযোগ দিতে প্রস্তুত নয়। এককথায়—'Communism is as bad as imperialism' অর্থাৎ সাম্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ এ দুয়ের কোনোটিই যৌগম্য নয়। জোমো কেনিয়াটার এই নীতীক দৃষ্টিভঙ্গী কেনিয়ার সভ্যতার মঙ্গল আনতে পারবে, অবশ্য যদি তিনি না এক দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে আর এক দুর্বলতার শিকার না হ'ন। বিশেষত যে কেন্দ্রে বুটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতরক সুযোগ সন্ধানী দৃষ্টি তীব্র আগ্রহ নিয়ে কেনিয়ার দিকে নিবদ্ধ।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র :

প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার (Palestine liberation organisation) সাম্প্রতিক কার্যে সন্মেলনে সংযুক্ত আরব যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নাসেরের ভাষণ সমবেত চারণ প্রতিনিধিকে বিস্মিত করেছে। ইস্ত্রায়েলের সঙ্গে সীমান্তবর্তী আরব দেশগুলির বিরোধ আজকের নয়। জর্ডান নদীর জল নিয়ে এ বিরোধ এক নতুন পর্বারে রূপ নিয়েছে এবং অশেষ সিরিয়া সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এর অবিলম্বে একটা হেতুনেত্র পক্ষপাতী। কিন্তু নাসের হৃদয়ের বিবেচনার বলেছেন যে, ইস্ত্রায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার বোগ্যতা আরব দেশগুলি এখনও অর্জন করেনি। নাসেরের বক্তে ইস্ত্রায়েল যদি আক্রমণের উদ্যোগ নেয়, তাকে বাধা দেওয়া এককথা, আর সিরিয়া যদি আক্রমণের উদ্যোগ করে—সে হচ্ছে অন্য। সিরিয়ার সামরিক সামর্থ্য যদি এত বোগ্যই হোতো তাহ'লে ইরেনে ৫০,০০০ ইজিপ্তীয় সৈন্যকে বাঁচি আগলে ধাক্কাতে হ'ত না। সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বে রাষ্ট্রপতি নাসেরের এ উক্তি যথেষ্ট ভাঙ্গপর্বপূর্ণ। সহন-শীলতার সীমা অতিক্রম করে সংঘর্ষের অত্যন্তপরি কার্যত এক রক্তকরী সংগ্রামের যে অবতারণা করবে, তাতে ভবু যে সুযোগ দেওয়া হবে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে হস্তক্ষেপের, সে দৃষ্টান্ত কোরিয়া অথবা ভিয়েতনামে প্রত্যক্ষভাবেই তো দেখা যাচ্ছে। সিরিয়ার মনোবৃত্ত না হওয়ার সন্মেলনের সমাপ্ত প্রতিনিধিরা ক্ষুণ্ণ হলেনও, নাসেরের সাবধানবাণী যে উপযুক্ত সময়েই উচ্চারিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

বিশ্ব-সাহিত্যে বঙ্গমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

কবি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বসূচী।
- আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।
- আনন্দমঠে—কবি বঙ্কিম ও কবি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্জনশক্তিকর সাধনে

ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাতুক

দাম—তিন টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৯৬, বিপ্লববিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১৪



আমার নাম অম্বু। দীপা ভাকত অম্বু বলে। অম্বু অর্থে অ-ম্বু নয়। অম্বা, একথাও ভেবে থাকতে পারে দীপা যে, আমি অর্থাৎ আমার সাহচর্য তার কাছে বিরক্তিকর না অ-ম্বুধকর ছিল। কিংবা অম্বু অর্থে দীপা বোঝাত যে আমি সদা-সর্বদা এক অম্বুধচিত্ত জীবন। স্পষ্ট মনে পড়ে, ছুটিতে বোড়িং থেকে বাড়ি ফেরার সময় বিষণ্ণপুর স্টেশানের নিবিড়-নির্জন প্রান্তরকে কণকালীন সুখরতার ভরিয়ে টেন এলে দাঁড়ালে আমি ভীষণ উৎকল হয়ে উঠতাম। চারিদিকে পরম আনন্দে তাকিয়ে দেখতাম। সেট পলাশের চুড়ায় তেমনি শাদা বকগুলি রয়েছে। অম্বব গাছের পাতাগুলি নাচছে উড়ো বাতাসের স্রোতে। বর্গাচরণের

চারের কেতুলী আবার খটখট শব্দ তুলেছে। আর--- নিশ্চয়ই--- টেন থেকে নামবার সময় ভাবতাম-- পরর গাড়ির ছুইয়ের ভেতর মুখ লুকিয়ে থেকে কেটচরণ গাড়োয়ানকে দীপা বলছে-- 'কেটকা, বোলো না, বোলো না আমি এসেছি।'

প্রতিবারই দীপা স্টেশানে আসত। মনে পড়ে, সেট আশ্চর্য বিগত দিনের ছবিগুলি-- সেই কৈশোরের চপল দিন-গুলিতেও দীপা আমাকে নিশ্চয় ও নির্বোধ একটা জড়-জীবন বলে ধরে নিয়েছিল।

কিন্তু-- যদি দীপা আমাকে অচল জড় একটা জীবন বলে সেই আশ্চর্য কণ থেকে বুণা করতে পারত, যদি অবহেলা করতে পারত গাড়ীর বুণায়-- হরতো তাহলে---

দীপাকে বলতাম-- জাগতিক নিয়মে এবং প্রাকৃতিক আনুকূল্যে পুরুষ নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান বলে গর্ব করে থাকে, কারণ সে যোগ্যতম, অহঙ্কার তার জন্মগত গৌরব-- কারণ, এইসব কথা নিয়ে দীপা আমাকে বিরক্ত করতে চাইত-- কিন্তু সঙ্গ ছাড়ত না। আরও বলতাম-- স্থূলবুদ্ধির ব্যাপারে মেয়েদের কোনও কোনও প্রতিভার উদাহরণ পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু সূক্ষ্ম চেতনার কর্মকণ্ঠস্বয় মেয়েদের যোগ্যতার কোন প্রমাণ নেই।

বলা বাহুল্য দীপা আমার উক্তিগ্রে রাগ করত না। শুনে হাসত, আর সেট হাসির শব্দ এবং সেই হাসির মহরী মনে হত যেন বুদ্ধিমতীর হাসি-- মনে হত সঙ্গে-সঙ্গেই আমি যা যা বলেছি সব ঠোঁটের মাঝে কথা, তুল কথা--

চিলেকোঠার ছাদ থেকে বিষম-
পুরের বিকেলবেলাকার টেনের
কালো কালো ধোঁয়া উড়ে যেতে
দেখতাম। - - - চিলেকোঠার ছাদে উঠে
প্রায়ই একলা দো-জমির মাঠ ভেঙে
ধাবলা করজা আর কয়েতবেল খোপের
মাথার ওপর একঝাঁক পাখীর কলরব
শুনতে শুনে কেমন বিভোর হয়ে
যেতাম একসময়ে। মনে আছে সেট
পর্যয়ে দীপা এসে ডাকত—‘এই, নিচে
চল, বড়দি খেলতে ডাকছে।’

বলতাম—‘যান না।’

‘দাপমা খেলব, আর না?’

‘না।’ বেশ সেই কয়েতবেলের
খোপের ভেতর দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতাম
দীপার ওপর বিরক্ত হয়ে।

দীপা ছাড়ত না—‘বেশ ত, আজ
আমার দলে থাকবি আর।’

‘না বলছি। বিরক্ত করিস
না—না।’

‘অস্বস্তি কোথাকার।’—বলে দীপা
দুন্দান শব্দ করে চলে যেত। তার
ধানিক পকেট নিচের উঠানে বড়দি,
ছোড়দি (যেছরি মাতা গিয়েছিল)
রাঙামাটী আর সোবিন্দা লবাইকার
দাপমা খেলার চীৎকার আর হল্লার
শব্দ শুনতে পাওয়া যেত। আর
তখনও—উঠান থেকে খেলতে খেলতে
ওপর দিকে ডাকিয়ে দীপা ডাকত—
‘এই অস্বস্তি আর, আর না। কেমন
হল।’

বাড়ির গামনে প্রকাণ্ড কয়েকটা
তেঁতুলগাছ ছিল। গ্রীষ্মের দিনে সেই
প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ থেকে ভাতি-
মুপুরে কতদিন তেঁতুল পড়তে দেখেছি।
শোঁ শোঁ, একটা বাতাসের দোলন
পাক ধেয়ে ধেয়ে ঘুরে বেড়াত আর
তেঁতুলগাছগুলোর ধার ঘেঁষে পাকভাতি
ঘোলাটে জলের ডোবাতে টুকটুক শব্দ
হত। যেন হারাদিন ধরে কোনও
দুরন্ত ছেলে অদৃশ্য হাতে পাখর চিল
ছুঁড়ে শব্দ করে চলেছে। ভাতি-মুপুর-
বেলা দীপা তেঁতুল কুড়োতে যেত।

আমাকে দরজার কাছে এসে প্রথমে
ডাকত এই—‘স্বকু আর, তেঁতুল খাবি?’
‘কোথায়?’

‘মরে চুকে জানালা দিয়ে অটুল
বাড়িরে দেখাত তখন। বলতাম—‘না।
না স্বকুবে।’

‘দূর—জানভেট পারবে না।’

‘তেঁতুল খাব না অস্বস্তি করে।’

দীপা হেসে উঠত।—‘দূর স্বকু
কথা। আর।’

‘উই।’ দীপা আর দাঁড়াত না।

জানালা দিয়ে ধানিক পায়ে দীপাকে
দেখতে পেতাম। তেঁতুলতলার। একলা
প্রচণ্ড নোদের তেতর কোমর ভেঙে
হাঁসের মুখের মতন হাতের তুলে-
নামিয়ে তেঁতুল কুড়োচ্ছে।

ডাকতাম—‘দীপু-উ- - - দীপু-উ-উ- - -
পানিরে আর। ওখানে তুত আছে।’

দীপা যে ডাকে সাড়া দিত না।

‘দীপু- - - তেঁতুল খায় না অস্বস্তি
করে।’

দীপা কিনেও তাকাত না। আরও,

আরও ভোরে ডাকতাম—‘দীপু চলে
আয়- - - তেঁতুল রাগ না- - - অস্বস্তি করে
- - - ওখানে তুত ঘুরে বেড়ায়- - -।’

আরও বয়স বাড়লে, পরে, দীপা
সেইসব গল্পের কথা, সেইসব দুরন্ত
ছবিগুলি সকলের মাননে পরিবেশন
করেছিল। তারপর হাসতে হাসতে
বিত্তী এক প্রুয়ের শব্দ আমাকে
বলেছিল—‘এখনও তোম অস্বস্তি সায়ল
না- - - অস্বস্তি কোথাকার।’

আমার নাম ছবেলু অথচ দীপা
সর্বসমক্ষে আমাকে ‘অস্বস্তি’ বলে
ডাকে। আমার গামনে একদিন ধরা
পড়ে গিয়ে বকুনি খেয়েছিল। ছোড়দির
পড়ার ঘরে তখন বড়ী বলাটি ভরা
উপন্যাসটা চক্চক করছে। আমার
চোখ পড়েছিল সেট উপন্যাসে।
ছোড়দি তখন নিচে এবং নিচে
থেকে আরম্ভাণ ছাড়িয়ে কয়েততলার
মোটা ওড়ির ওপর বসে হরডো—।

আমি আর দীপা পড়াশোনার গল্প
করছি। মা বইখানা হাতে তুলে
বলল—‘এটা কার?’

বললাম—‘ছোড়দির- - - কবের বই।’

চট করে দীপা বলল—‘না বড়মা,
চক্রবর্তীদের সন্ধ্যা এসেছিল- - - তার
দিদির বই- - - কেলে গেছে।’

কিন্তু সে, কথার মা বিশ্বাস করল
মা বোব হয়। একবার তীব্র চোখে
চাটল দীপার দিকে। দীপা তখনও
শুই করে বলল—‘হাতী বড়মা- - - বিশ্বাস
করো- - - রুবুর বই নয়- - - রুবু ওসব
পড়তে জানে না- - -’

মা একটু কঠিন স্বরে বলল—
‘তুই ধাম।’

বইখানা হাতে নিয়ে আর কোনও
কথা না বলে মা চলে গেল। কিন্তু
দীপা যে প্রচণ্ড রাগে জলে উঠেছিল
তা বোঝা গেল—মা চোকাঠ না
পেরোতেই।

হঠাৎ দীপা আমার গালে
আচনকায় একটা চড় মেরে দিল।

‘উঃ- - - মারলি কেন?’ রাগতস্বরে
বললাম।

‘মারব। বেশ করব। উঃ, সত্যি-
বাদী সুমিষ্টির। সব সময় সত্যি বললেই
ভাল ছেলে হওয়া যায় না। মা তোমার
মাথাটা ধোয়েছে। তুই গাধা- - -
বান্দর- - - অস্বস্তি কোথাকার।’

পরক্ষণে আমার কাছে অভিযোগ
করেছিলেন দীপার মাকে। দীপা
লাকব বকুনি খেয়েছিল। মাথা নিচু
করে শুনছিল। অবশ্য কান্দে নি।
মা বলেছিল তারপর—‘ওসব মার ছবেলু
- - - ওকে তুই অস্বস্তি বলিস কেন?’

সে উত্তর দীপা দেয় নি। কিন্তু
আমি যে সত্যিকথা বলে তুল করে
ছিলাম এবং সবসময় সত্যিকথা বলার
বশ্যে যে কোনও বাহাদুরী নেই সেখোঁষ
পেলায় বড়দি, ছোড়দির কাছে। দীপা
জানিয়েছিল। ওহা কেমন আমাকে
তকাৎ আর খিচির করতে শুরু
করেছিল। - - -

হরডো সেই আমার স্ববোধ

ছিল। হয়তো--বিষণুপুরের মির্জান কাশবনের চপল হাওয়ার উদ্দান-প্রমত্ত সোতে ভেসে যাওয়ার--খিড়কির পেছনে করেতবেলতলার শুঁড়ির ওপর বসে আবিছা অন্ধকারে দীপাকে কোনও মধুর কথা বলার--কিন্তু পারি নি। কারণ--

সেবার, শীতকাল তখন। ঈশ্বরের শরীকার পড়াশোনার তাজা নেই। কলেজের ছাত্র। কলেজ ছাড়িয়ে ঘাবার পথে। নবাবের উৎসবের জন্য না। চিঠি লিখেছিলো। বড়দিকে মেয়ে-হোস্টেল থেকে সঙ্গে নিয়ে বিষণুপুরের ট্রেন থেকে নেমে নিস্তেজ যোদ্ধার ঘেঁষে একই গরুরগাড়ির ভেতর আমি, বড়দি আর দীপা ফিরছি। লাড়ি চালাচ্ছে কেউচরণদা। শেষ বিকেলের স্নিগ্ধরা দিন কুস্ত সূর্যের ক্ষীণ গৌরবকে বিস্তার দিচ্ছে চারিদিকে থেকে। ছুঁছু করতে করতে বিষণুপুরের মুন-মোন প্রান্তরের সাময়িক সুবর্ণতা ভেঙে কিকেলের ট্রেন ফিরে গেল। করঞ্জা আর আম, কাশবন, করেতবেল আর দু-চারটে কুচ্ছতার ঘাবার ওপর কতকগুলো পাখীর কিচিরনিচির কলরব শুনেতে পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসের বদু স্রোতে নীতের আমেজ।

বড়দি বলল--'রুণু কেমন আছে রে ?'
দীপা বলল--'ভাল।'

'ওবু শুধু মায়ের এমন জেদ--
কোমও মানে হয় না--ওবু শুধু
রুণুটাকে নষ্ট করে দিল।'--

আমার তখন মনে পড়ল
ছোড়দির কথা। আহা বেচারী।
কিন্তু তারপরেই কেমন যেন মনে হল,
না ভালই করেছে। ছোড়দি যে
এরপর মায়ের শাসনের, দুষ্টির বাইরে
গিয়ে আরও উচ্ছল হয়ে যাবে না, কে
বলতে পারে ? না হলে মার বেঁধে,
দিলি বেয়েও কেন খিড়কির পেছন
দিকে করেতবেল আর আকস্মিক বোপ
ছাড়িয়ে, কাশবনের আড়ালে গোবিন্দ-

দায় সঙ্গে মিলত ? আর গোবিন্দদা
যে শিছু ছাড়বে কেউ বলতে পারে ?
তার চেয়ে বিয়ে দিয়ে ভালই করবে
না। আসছে কাঙনেই নাকি ?--

কিন্তু আমি থাকার জন্যে বড়দি এবং
দীপার কথা ছাড়া ছাড়া প্রচ্ছন্নভাবে
ও ভাবার চলতে লাগল। গোবিন্দদা
আর ছোড়দির যোগাযোগ এবং মিলনের
গল্প যে আমি চিলেকোঠার ছাদ
থেকে লক্ষ্য করে নাকে শুনিয়েছিলাম,
সেই ঘটতার জন্য দীপা আমার ক্ষমা
করতে চায় না। না বড়দি।

শীতকাল। লক্ষ্যেবেলা ওপরতলার
ঘর অনেকদিন পরে সুবর্ণ হল।
বড়দি, ছোড়দি আর দীপা একত্র
হয়ে আমাকে বিচ্ছিন্ন ও দূরে দূরে
রাখল। একটা ঘণ্টার প্রভেদ। আমার
সেই প্রথম যেন রাগ হল। একটা
যন্ত্রণা জাগল সমগ্র চেতনায়। সমস্ত
ইন্দ্রিয়, স্নায়ুতন্ত্রে যেন দড় উঠল
সহসা। সন্ধ্যার ঈষৎ পরে দীপাকে
ডেকে চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে গিয়ে
বললাম--'তুই আমাকে ভালবাসিস ?'
'না।'

'আমি জানি তুই আমাকে ভাল-
বাসিস দীপু,--কিন্তু আমার ভীষণ
ভয় করে।'

'আমি তোকে ঘৃণা করি।'

জানি, দীপার অনেক রাগ, অনেক
ঘৃণা, অনেক জ্বালা জমে আছে।
আমার অপমানের, অন্যদের সীমা
নেই। কিন্তু সেদিন, সেই মুহূর্তে যেন
সমগ্র পৃথিবী আমার শক্তি, আমার
বাহুবল হয়ে উঠল। দীপাকে অকস্মাৎ
জড়িয়ে ধরলাম।

দীপা জ্বলে উঠল যেন। বলল--
'ছি, তোর লজ্জা করে না ? তুই না
ভাল ছেলে!'

'না, আমি ভাল ছেলে হতে
চাই না দীপু--'

'কেন, কেন চাস না ? আজ বুঝি
বুধতে পেরেছিল তুই পুরুষমানুষ--
তোর শরীরে কাহনা আছে, কামনার
জন্যে যন্ত্রণা আছে--সেই যন্ত্রণার
জন্যে আজ ভালবাসা জাগল ?'
নিজেকে ছাড়িয়ে নিল দীপা।

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম

শিখনিকটে উপস্থিত হলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সন্মোক্ষণ করিয়া
বলিলেন--'হে শিখন। এই মুহূর্তে তোমাদের নিকট ধর্মব্যাখ্যা করিব।'
মহর্ষির এ বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারক
দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ,
জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশাত্মক, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃসৈহর্ষ্য, মুক্তি, জন্মান্তর,
ভ্রম ও প্রমাদ--মহর্ষি কণাদ ধর্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাস্তব
ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় অনুদিত

মূল্য দুই টাকা।

বিশ্বমতি প্রাইভেট লিমিটেড

১০০, বিপিনবিহারী গাছলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

‘না দীপা। শোন--আমি তোকে ভালবাসতে চেয়েছিলাম--তোকে ভালবাসি। তোকে বিয়ে করতে আমি--’

‘বিয়ে?’--দীপা হেসে উঠল অস্বস্ত শব্দে, অস্বস্ত ব্যঙ্গ করে--‘তুই জিন্দারের ছেলে, আমি তোরের রাধুনীর মেয়ে। তোর বিদ্যা, সম্মানবোধ, তোর ভবিষ্যৎ জীবন কত বড় হচ্ছে পারে। আর আমি সামান্য রাধুনীর মেয়ে। না অন্যথা যেখানে যাক যাক, অন্যই একটা শৈল্পিক দায়িত্ব আছে। না হলে কবে কোন চাষার গলায়--বিয়ে?’--

বললাম--‘বিশ্বাস কর দীপা, ওকথা না বনেছে এতদিন।’ না বলেছিল দীপার সঙ্গে যদিও মেলা-মেলা আর মোড়া পার না। এতদিন ছোট ছিল, এতদিন কোনও ব্যবধান রাখি নি,

এখন বড় হয়েছ--দীপাকে কোন সময়ে শালীনতার বা অধিকারের বাইরে প্রশ্ন দিও না--এগব মায়ের কথা দীপা--’

‘চুপ কর’,--দীপা প্রায় চীৎকার করে উঠল--‘কোনটা বড়মার কথা, কোনটা তোর কথা তার কোনও ব্যবধান আজ আর রাখি নি তুই। তুই একটা কাপুরুষ--হীন--তুই ক্ষণের জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছিল--পারবি--পারবি তুই ভাল ছেলে হয়ে একজন পাষণ্ডের মিষ্টর পাছায় জীবন কাটাতে?--ক্ষণের চেহারাটা দেখেছিল একবার? অথবা?’

কক্ষকণ্ঠে বললাম--‘দীপা কমা কর--দীপা আমার ভালবাসতে শেখা মতন করে--আমার অবহেলা করিস না এমন করে--’

হায়! সুবেশু ডাবল। থাকে না দিবস, থাকে না রাত্রি। এখন শীতকাল। ম্যানাটোহিরামের ভেতর সুান গছ্যার অধিকার। অধিকার ভেদ করে আলো অলে উঠল। সুবেশু নিশ্বাস ফেলল গাঢ়। বাইরে, পাহাড়ের ধর অস্তিত্ব অদৃশ্য। অনন্ত তত্ত্বতা। আর জোনাকী। হায়, হায়! দিন থাকে না। দিন চলে যায়। বিবর্তনের প্রচলিত এই ধারা যদি বাছবলে ধানিয়ে রাখা যায়। যদি এখন এই বিষণ্ণ গছ্যার সুানমুহূর্তে ফিরে পাওয়া যায় একটি প্রমত্ত-উদ্দাম ধারা। জীবন--জীবন। দুঃখে সুখে মিথ্যায় ছলনায়--সুখায়--ভালবাসায়। যায় না?--

‘কোথায় গেলে--?’

ত্রীর ডাকে কাছে গিয়ে দাঁড়াল সুবেশু।--‘কিছু বলছ?’

‘আমার কাছে বসো একটু।’

‘সব সময়ই ত’ তোমার কাছে বসে রয়েছি?’

‘হাতটা একটু দাও।’

প্রবল বিতৃষ্ণায়, সুখার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল সুবেশু। শীর্ণ, কঙ্কালের একটা ক্ষীণ অস্তিত্ব মাত্র। অসহ্য--

অসহ্য জালা। জীবন চাট--সুখে দুঃখে মিথ্যায় ছলনায়।--বিষণ্ণপুর--বিষণ্ণপুরের এককালি আকাশ, এককালক রোদ, একসোত বাতাস। অস্থির এক উত্তেজনায় সুবেশু হাতটা ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।--

‘তুমি রাগ করেছ?’

‘না।’--সুবেশুর গলায় স্বর গাঢ়।

‘কিছু ধেরেছ?’

‘না।’

‘কেন খাও নি?’

‘খাব।’

‘আমি ভাল হয়ে যাব তুমি দেখো--আমি আবার ঘুরে বেড়াতে পারব। তখন তুমি আমি আমরা দুজন অনেক ঘুরে বেড়াব--অনেক দূর--’

‘চুপ করো।’ (তোমার অস্থির কোনদিন পারবে না।)

সুবেশু বাইরে বেরিয়ে এল। আহা, কি সুখ বাতাস। কি নির্জন তত্ত্বতা। কি একি? তার এত কষ্ট হচ্ছে কেন বুকের ভেতর। তীষণ--তীষণ যন্ত্রণা। তীব্র--তীব্র দংশন--একি? সে যে সুখ সুখের হতে চেয়েছিল? সম্পন্ন সুখী এক ছন্দোময় জীবন--কিন্তু একি হল? অসহ্য তীব্র যন্ত্রণা বুকের ভেতর। অধিকার সামনে, পেছনে--চারিদিকে। কি নির্ভর ভয়?--অধিকারে, ভয়ে, যন্ত্রণার মধ্যে ক্রমে ক্রমে অবশ অসাড় হয়ে যেতে লাগিল সুবেশুর শরীর। সুবেশু বলে পড়ল--ওয়ে পড়ল। আঃ--আঃ তীব্র জালা।

তারপর কিছুক্ষণ।--তত্ক্ষণ সুবেশু বুঝ ধীর শান্ত শব্দের একটি স্বপ্নের রেলগাড়ির গতিমান অস্তিত্ব শুনতে পেল। যেন ছুটে চলেছে বুকের ভেতর। যেন কালো কালো একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সেট রেলগাড়ি কেবলি ধলছে--‘বিষণ্ণপুর--বিষণ্ণপুর--বিষণ্ণপুর--’

প্রাচীনতম বংশোদ্ভূত সন্তান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য ২ টাকা

‘অনুলা গ্রন্থ হয়েছে’--স্বামী অপরানন্দ।
‘বইখানি নতুন বরণেরই হয়েছে।’
--স্বামী সত্যানন্দ।
‘বইখানি যেখানেই পড়ব, বিষয়বস্তু অসত্য ও অসুলভীয়। একখানি গ্রন্থে এত বহু-মূল্য বস্তুর পরিচয় পাবেন আর হয় কই।’
--স্বামী তত্ত্ববুদ্ধানন্দ।

নতুন উপন্যাস--নতুন সৃষ্টি
কর্তব্যের সময়ের সময়। ও
জাহান সত্যানন্দ

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

সবুজ মূল করে কিন্তু মানুষের মন যদি
পরিবে থাকে, তবে ডুন ডালিতে বিলাস
হয় না মূল্য ১১০ টাক

বনামধ্যস্ত কথোপকথন

বিভাভবন বংশোদ্ভূতায়ের

গ্রন্থাবলী

বঙ্গদর্শন পত্রিকার (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড),
দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য--৩৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
বাণেশ্বরবাহারী গার্লস স্কুল,
কলিকাতা--১২

রাজধানী :

জল জল

আকাশ নাটি রোদে পুড়ছিল।
গরম বাতাসে শরীর বনসে গেছে, উজ্জ্বল
রোদে ঝলসিত হয়েছে আকাশের নীল
ভায়না। এমন সময় বৃষ্টি নামল। কিন্তু
হার, তবু ভরিল না চিহ্ন। আরও
আরও, আরও জল দাও! তৃষার্ত কণ্ঠের
শাব্দনা আর ফাট-ধরা নাটির চীৎকার
মেঘনোকের দরবারে পৌঁছাবার আগেই
পথিক মেঘ উবাও হয়ে গেল।

না হ'য়েই বা উপায় কি? পশ্চিম-
বঙ্গের রাজধানী শহর কলকাতা বরুণ-
দেবের অত্যাধিকার জন্য সামান্যতন
আয়োজন রাখে নি। ইট-কাঠি লোহা-
লতড় পিচ-কংক্রিটের উন্নয়নমূলক
মেঘদূত এখানে তিষ্ঠাতে পারে না।
কিছুদিন আগেও শহরের অপরমহলে
ছিল জলধরের যথার্থ আপ্যায়নের
অন্য তৃণশুল্ল, বৃক্ষলতাদি সবুজ
আলন পাতা আজ বন কেটে বসন্তের
হিড়িক। কলকাতার পিচ গড়িয়ে
গড়িয়ে শহরতলীর বুকে কালসিতে
কেলে দিয়েছে। গাছ নেই, গাছগাছালির
আকর্ষণ নেই, মেঘ নেই। তাই
জল নেই। আর শুধু কি আকাশের
জল, জল নেই কর্পোরেশনের কলও।
কলকাতা উর্ধ্বমুখে নিরুধু। শহরবাসী
জলের জন্য টাঙ্গ বরাবরই দিচ্ছে।
কিন্তু জলাভাবের দরুণ এ বছর এক
টাকা নালতি জল কিনতে হ'ল
জালহাউসী কোয়ারে।

বাংলা দেশের চাষ-আবাদেরও
যে সঙ্কটজনক চেহারা। তাতে নিরুধু
উপবাসের আয়োজনই পাকা হতে
চলেছে। ধান-পাটে এবার চরম
হাহাকার। ফসলী জমি রোদ-ফাটা
হ'য়ে চৌচির হ'চ্ছে। ড্যাম ব্যারেজ
ক্যানাল লোকমুখে এখন 'ড্যামও'
হ'ল। এগুলির দক্ষিণ্য সর্বত্র তো
পৌঁছায়ই না। যাও বা পৌঁছায় তাও
তৃষ্ণার জল নয়, প্রয়োজনের পরিপূরক
নয়। যখন জলের জন্য আকাশ-মাটি
ধনী-নালা পুকুর-ডোবা হাহাকার

বর্ষা দর্শন



রাজভবনের নিকট মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত ৩-এ রুটের বাসখান।

করছে, তখন সরকারী চৌবাচ্চায় জল
আটক থাকে। বর্ষায় রিসার্ভার উপচে
পড়লেই একমাত্র ক্ষেত-খানার ভাসিয়ে
আটক জল ছাড়া পায়। অথচ নজা
এই, ক্যানাল করের করকরে খাজনাটি
আদায় করতে সরকারী আমলাবর্গ
এতোটুকু তুলসান্তি প্রকাশ করেন না।

উদাহরণ স্বরূপ এবার বর্ধমান
জামালপুর থানার আবুজহাট
ও পাড়াতল অঞ্চলের বিস্তৃত মোজা-
গুলির কথাই বরুন। অনেক জমিতে
ক্যানালের জল পৌঁছে না দিয়েই
দামোদর ক্যানাল কর আদায়ের
নোটিশ জারী করা হয়েছে। শুধু নোটিশ
নয়, আপত্তি সত্ত্বেও একেবারে
সার্টিফিকেট নোটিশ ইজ্জা করতেও
কসুর করেন নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
সুতরাং প্রতিনিধিদল গেছেন স্টেচ-
মস্তীর দরবারে। সেচমন্ত্রী অবশ্য সক্ষে
সক্ষে এ-ব্যাপারে বর্ধমানের অতিরিক্ত
জেলা-শাসকের ওপর সরেজমিন তদন্তের
নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রকৃতির আনন্দসমারা থেকে
ইদানীং ঐতু বিবর্তনের প্রকোপে
বঞ্চিত হ'তে চলেছে অজ্ঞান অফল্য

বাংলা দেশ। জলের ব্যাপারে সরকারী
জমা-খরচ তাই আরও বেশি সচেতন
ও সতর্ক হওয়া আবশ্যিক। প্রয়োজনের
জল সময়মত ও সর্বত্র ঢেলে না দিলে
ফসলী জমির সম্ভাবহার করব কী করে।
করের দিকে কড়া নজর পরে দিলেও
চলবে, কেন না সরকারী পাণ্ডনার পাট-
পয়সা কীকি দিয়ে (কীকি ধরার বহি
সমিচ্ছা থাকে) এক পা পানাবার উপায়
নেই। কিন্তু ক্যানালের কাণা সব-
মত ভরতি না করলে সারা দেশটাই যে
কানা হ'রে বসে থাকবে সে চেতনার
অতঃপর বিশেষ প্রয়োজন আছে।

যদি না বাবে বরষা তবু তরল
সাবার একটা কর্ণব্যাপী আয়োজন জে
করতেই হবে। আর সে আয়োজনে
নোটিশ গুলন আমলাতন্ত্রের দাপটটা
যাতে বড় কথা হয়ে না দাঁড়ায় এবং
'করে'র ওপর কাঁচি যাতে অগ্রাধিকার
পায়, নজর রাখতে হবে সেদিকেও।

এদিকে মহানগরীর জলকষ্ট
দূরীকরণে কর্পোরেশনকে আরও একটু
কষ্ট করতে হবে। কলের জল
সুতোর মতো সফ হ'তে চলেছে যখন
খয়ের দানব অশ্রুতার বাড়ছে ৩৩

ক'রে। দুঃখের বিষয় টায়ের বেলায় বে-আক্কেল অঙ্ক চাপিয়ে নাগরিকবৃন্দের ওপর আক্কেল-মেলানী আদায়ের জুলুমবাজি করতে পৌর লংগা যতদূর তৎপর নগর-জীবনের জ্বিধা বৃদ্ধিতে তেমনি উদ্যোগী তাঁদের কঙ্গিনকালেও দেখা গেল না। দেখাবে কে। কাজের বেলায় কর্পোরেশনে কড়া রেশন। এই বিচিত্র লংগাটি গৃহস্থবাড়ি ভাঙেন একদিনে, কিন্তু গৃহহীনে এক জীবনেও একটা মতুন বাড়ির পু্যান মঞ্জুর করিয়ে আনতে পারেন কি-না গলেহ। ওরা রাজপথের নোরা জল গাক করতে মস্তাই কাবার করান, কিন্তু পানায় জল সরকারের মস্তাই জুরাহা করতে তাঁদেরই তনুত সাব-কমিটির কেবলমাত্র লংগাবৃদ্ধি করতে হয়। কাজ-নীতি চেয়ে রাজনীতির আকর্ষণই জুরেন বানান্ডী রোডের এ লাল বাড়িকে বোম্বাল করেছে। পানীয় জলের চেয়ে সেখানে দলীয় জলবিরি প্রাধান্য। স্ত্রীতব কাজের নামে কদলী প্রদর্শনেই কর্পোরেশন বরং সিদ্ধহস্ত।

দুঃখের কথাই কি শেষ আছে? কর্পোরেশনী অপদারিতা চাকতে সরকারী পর্ষায়েও এবার নতুন ক'মে চাক-তোল বেজে উঠেছে। আবার তদন্ত কমিটির বুড়ো তুলে সাধারণের চোখ বোয়াবার ব্যবস্থা। আবার তদন্ত কমিটি। জল মস্তাই সম্পর্কে শ্রী জে এন তালুকদারের তদন্ত এখন ধামাচাপা পড়ল। যদিও ব্যাপারটার বয়স বেশি নয়। তালুকদার তদন্তের জন্মকাল ১৯৬২। কিন্তু সরকারী স্মৃতিতে অতবড় ব্যাপারটা যে এতো শীঘ্র মুছে যাবে অয়ং তালুকদারমশাই সেটা আশা করিতে পারলে বৃথা মাথা না ধামিয়ে কর্পোরেশনের মতোই উপসংহারে একটি বিরাট অশ্বাভিষ প্রদর করিয়ে ছাড়তেন। কিন্তু তা হয় নি। বরং একটি গোটা অশুরই জন্ম হয়েছিল, এবং তার হেয়ারবণ্ড সাধারণে কান ঝাড়া ক'রেই শুনেছিলেন। জল

সরবরাহ ব্যবস্থার অনেক কেলেকারীই ফাঁদ হয়ে গেছিল তদন্ত রিপোর্টে। মস্তবস্ত সে কারণেই তালুকদারের অশু মস্তুরারী হওয়ার সাহস হয় নি কারণ। এখন 'বোস কমিটি' বসিয়ে পুনশ্চ প্রহসন। অবশ্য 'বোস কমিটি'ও যে হোস পাঠিয়ে শুকনো কলকাতা জলমগ্ন করে দেবেন না একথাই মনে মনে জেনে রাখা ভাল। নচেৎ দ্বিতীয় বরীচিকার পেছনে মনোবলের অপচর করতে হবে আবারও।

বানি এবং বুনি, জলের ব্যাপার জলের মতোই সহজ নয়। তাই বলে জলমনে কর্পোরেশন এবং সরকার দুগপং আমাদের জনানুয়ে জুলিয়ে দাবেন এটা বা কেমন কথা।

কিন্তু কথা বাড়িয়েও লাভ নেই। এতো কথা প্রায় কথকতার পর্ষায়ে উপস্থিত। এখন আড়ই হোক, কালি হোক, —দোহাই, কিছু কাজ হোক।

পেন্সন প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পেন্সন পরিকল্পনাটি মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হল। কুড়ি থেকে দেড়শ' টাকা পেন্সনের ক্রমিক উন্নয়ন হার। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্যীয়। ভারত সরকারের পেন্সন প্রকল্পে কর্মচারিবৃন্দকে পিতৃমাতৃহীন ক'রে একেবারে গলায় কাছা তুলে দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ তখন পিতামাতার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিল। অর্থাৎ এদেশে বুড়ো বাপ-মাকেও পেন্সনভোগীর পরিবারভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। ভারত সরকারের মতো পশ্চিমবঙ্গ যে নিজেকে স্বয়ম্ভু ঘোষণা করে নি এজন্য মন্ত্রিসভাকে ধন্যবাদ। 'এ্যানিমল ওয়ার্ল্ডে' একমাত্র মানুষের কেজেই বুড়ো বয়সেও বাপ-মা বজায় থাকে। পশ্চিমবঙ্গ অমানুষিক প্রস্তাব পরিহার ক'রে মনুষ্যোচিত কাজই করেছে।

দুর্ঘটনা ও দুর্ভিক্ষ

পশ্চিমবঙ্গের একটি মারাত্মক বানবাহন

দুর্ঘটনা রাজধানীর বানবাহন সমস্যাকে নতুন করে সবার চোখে তুলে ধরেছে। সম্প্রতি ৩-এ বাস ও পুলিশ সাইকেলের জীব দুর্ঘটনায় অকস্মাৎ আমরা (সরকারীমহল পর্যন্ত) ভাবিত হ'য়ে পড়লাম, এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নিঃসন্দেহ। কিন্তু অবস্থাগতিক মনে হচ্ছে এই দুর্ভাবনার স্বাস্থ্যোদ্ধারের চোটে শেষ পর্যন্ত নাগরিকবৃন্দের শাসকট অস্তিত্বেই সুলভ সমাধান খুঁজে। তাই-ই হয়ে আসছে। আমাদের আয়েসী রগজে কদাচ বিকল্প ব্যবস্থার প্রকল্প গজিয়ে ওঠে নি। যেটুকু করিবকরী ব্যক্তির করে থাকেন তা হ'ল চাল ব্যবস্থা রদ ক'রে (বদ-বদল নয়) পোনের চিকিৎসায় বিষকোঁড়ার ব্যবস্থা পাকা করা। পাকা মাথা না-হলে অবশ্যই এট ক'রে অপরিপক্ব কানুন চাপান যার না প্রজা-সাধারণের ওপর। দুর্ভাগ্যে এদেশে বোধ হয় তাও হয়। রাজ্য-বাদশার দেশ এটা। শুভুড়ির নল দাঁতে চেপে দাঁড়ি বিচানো সিদ্ধান্ত একটা নিলেই হল। তাতে সর্বসাধারণের যদি দাঁতকপাটিও লাগে তো লাগুক, ছকুম করার মালিক অনায়াসেই ঠাণ্ডাঘরের কপাট বন্ধ ক'রে ব'লে থাকতে পারবেন। দেশটা মহান্ন তুঘলকের, সাধারণ লোকের নয়।

দুর্ঘটনার দুশ্চিন্তা এড়াতে অতএব দু দিনেই সিদ্ধান্ত তৈরি হয়ে গেল। টাম-বাসের পাদানিতে আর দাঁড়িয়ে যাওয়া চলবে না। চিরকাল শুনে আগুছি, বসতে গেলে লোকে শুতেই চায়, নয়। সিদ্ধান্ত শুনে খটকা লাগল, তবে কি ইদানীং মানুষজন সব তিত্তিবির হয়ে বসতে গেলেও দাঁড়াতে চাইছে। তখন অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে দেখলাম। কৈ না, আমাদের রাজ্যনা তো সে সুরে বাজল না। আমরা দেখলাম, সারবন্দী অপেক্ষমাণ মানুষের সামনে সারবন্দী টাম, বাস, নিদেনপক্ষে টাক্সীও না থাকায় শোয়া-বসা-দাঁড়ানোর দুশ্চিন্তা শিকের ডুবে বাড়ীরা ওঁতোজাঁতি

হটগোল এবং ঝুনোঝুলি করছেন। পাদানিতে এক মানুষের একটি পা চকিতে গলিয়ে দেবার মতো জারগা থাকবে আমরা বললাম, সোভাগ্য বলতে হবে, খালি বাস মিলে গেল। মচেং নিরানব্বইটা বাস ছেড়ে বাড়ি পৌঁছতে নির্ধাৎ নটা বাজত। বহুদিন মটা বাজিয়েও বাড়ি ফেরেন এমন বহু যাত্রী আজও সুখে ঘরকন্না করছেন। কিন্তু আর নয়। এবার নয়া সিদ্ধান্ত ধারটা বাজিয়ে ছাড়বে। পাদানি ধর্জন বানে ট্রান ও বাস পিছু পনের-জন যাত্রী বরবাদ। এরা ট্রান, বাস স্টপে কালি পোকার মত একের ঝাড়ে অপরে অস্বা হবেন। সে এক মজার দৃশ্য। সিদ্ধান্তকারী বাবুরা তখন বড় গাড়িতে যে দৃশ্য দেখতে দেখতেই মৌজ করে ঘরে ফিরবেন। এখনও যারা কনুই বাগিয়ে রাতারাতি বাড়ি করেন, টুইশানি গারতে যান অথবা দোগরা অফিসে হাজিরা দিয়ে দ্বিতীয় দফা পেটের ভাতের যোগাড়ে কাজে বসেন। তখন তাঁরা রাতভোর পথেই বসে থাকেন। পথে বসানোর পলিটিক্যাল চাল এর আগেও বহু দেখেছি, এবার একেবারে চান্দস করে চোখ জুড়াব।

সরকার বিকল্প ব্যবস্থার ধার-কাছও কখনো মড়ান না।

ব্যবসায়ী মেয়েদের রোজগার বন্ধ করার সিদ্ধান্তও হয়েছে, বিকল্প ব্যবস্থা হয় নি। ফেরীওয়াল উচ্ছেদ হয়েছে, বিকল্প ব্যবস্থা হয় নি। রিক্সাওয়ালার ভাত বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণে পরিকল্পনা হচ্ছিল, হয় নি বিকল্প ব্যবস্থার আয়োজন। পাদানি পরিষ্কারের মংলব করা হয়েছে, করা হয় নি বিকল্প প্রকল্প।

বাস বিকল হবে কিন্তু সংখ্যার বাড়বে না। ট্রান কোম্পানী জাতীয়-করণের দুঃস্বপ্ন দেখছেন। সুতরাং ট্রানও বাড়ছে না। প্রাইভেট বাসের মতুন করে প্রচলন স্টেট ট্রান্স-



জীপ দুর্ঘটনায় নিহত পদূলিশের ডেপুটি কমিশনারের মৃতদেহ নিয়ে শোকযাত্রা

পোর্টের মুখে চুপকালি দেবে, সুতরাং সে-গুড়েও বালি।

বেচারী যাত্রীসাধারণ। প্রায় বাঁচাতে সরকার তাদের যে মনেপ্রাণে মারবার ব্যবস্থা করতে চলেছেন, হাঁড়ি বন্ধ করে তাঁরা এবার তারট থাকা সামলান। অফিসের পর উপরি না খেটে সংসার টানা বর্তমানে অনেক সংসারীর পক্ষেই অসম্ভব। তাঁদের কি হবে? পায়ে হেঁটে এসব করতে হলে পায়ের লড়াই ছিঁড়বে, ঘরে শিল-নড়ার শব্দ উচ্চতর হবে না।

সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিকল্প ব্যবস্থার জন্য সরকার যদি কথঞ্চিৎ চিন্তিত হন, তবে অনেক ভয়াবহ চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবেন সাধারণ নাগরিকবৃন্দ।

চাক্ষুশ পরগনা :

ব্রাহ্ম-বলয়

এই সেদিন যাদবপুর-গড়কা ; মাত্র দিন কয়েক আগে বেনবরিয়া-কামার-হাটি এবং অতি সম্প্রতি যাদবপুরে উপর্যুপরি গুণ্ডামীর সংবাদে মনে হল আমরা মগের মুলুকের বাগিন্দা। এবং এ মুলুকের এলাকাও ক্রমশ প্রসারমান। সর্বাধুনিক সংবাদ, বিগত ১০৪ খ্রুন পুলিশ কাঁচড়াপাড়ার সমাজ-বিদ্রোহী কার্বে লিপ্ত ৭৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এতোদিন শহর-গাঁ উজাড় হচ্ছিল ঠগ বেছে। এখন বেশ টের পাচ্ছি, ঠগের সঙ্গে মগের মুলুকও কায়ম করেছে আমরা।

যাদবপুর-গড়কার সংবাদে আনিয়ে-

নিরপরাধের প্রাণনাশের পূর্ণাঙ্গ গুণাঙ্গী
নিফল হলেও ঘটনাটি ছিল ভয়াবহ।
বেলঘরিয়া-কাহারহাটির নবগত এস-
আই নিরাপদ দাসের প্রাণনাশের
প্রচেষ্টায় সাক্ষ্যলাভ করেছে স্থানীয়
মুঃসাহসী গুণাঙ্গী। আর সাম্প্রতিক
সংবাদে প্রকাশ, যাদবপুরের এক বাড়ি
থেকে যথাক্রমে কুড়ি ও গভীর বছরের
দুই যুবতী বোন তাদের পুরুষ-বন্ধুর
গড়ে সকালে বেড়াতে বেরিয়ে রাত
লাড়ে দশটায় গৃহপ্রত্যাপন করলে
অভিভাবকগণ উষা-সহকারে বেয়ে
ঘট্টকে অভিযান করেন। এতোবড়
অপমান সেরাজে মুখ বুজে সহ্য করলেও
ধীর রবীন্দ্র পরদিন বদলা দিনে
'মুন্সন' পিতৃ-পিতৃবোয় গুণাঙ্গী চান-
চানটি গুণাঙ্গী বুক গড়ে নিয়ে তারা
কেন-কিন্তু পিতৃকুলের গুণাঙ্গী চড়াও
হল। হামলা, সাধারণ হিসেবে লীনা
হারিয়ে কেনবে স্থানীয় পুলিশ এসে
প্রত্যাপন করে গিরে গেল নর-নারী
গুণাঙ্গীকে।

গুণাঙ্গীর প্রতি পুলিশের অবিরত
প্রত্যাপন মর্মান্তিক কুল বেলঘরিয়া-
কাহারহাটি থানার নতুন এস-আই
নিরাপদ দাসের গুণাঙ্গী গুণাঙ্গী
একটি নির্বন হত্যাকাণ্ড।
এতদকালে বহুকাল যাবৎ এসের রাজস্ব
হুট্ট করেছে স্থানীয় গুণাঙ্গী। কিন্তু
সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশ ছিল
কর্ণধর অপারগ, এই অক্ষমতা, কিম্বা
শায়া কথায় নিষ্ক্রিয়তা রোজ দিন
জুড়ে বৃদ্ধি করেছে জনসাধারণের দুর্গতি।
পুলিশের গায়ে হাত পড়ে নি। কিন্তু
বেদিন খুনির হাতে কর্তব্যপূরণ
অফিসার নিরাপদ দাস প্রাণ হারালেন,
এদিন বেলঘরিয়া-কাহারহাটি থানা
চূপ করে থাকা আর নিরাপদ মনে
করে নি। প্রেষণার করেছে 'শ' দুয়েক
লোককে। কিন্তু এতোদিনের গাফি-
লতির জবাব কি? জনসাধারণের সঙ্গে
পুলিশের দূর গভীর সে জবাবও
দিলেছে : অভিযোগে পুলিশ-গুণা

যোগসাজসের চাকলাকর গোপন তথ্য
ফাঁস হয়ে গেছে। অবশ্য চাকলাকর
কারণ ছিল না। পুলিশের সঙ্গে যোগা-
যোগ না থাকলে গুণাঙ্গী যে এতোদূর
মুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারে না সাধা-
রণে তা বোঝেন। তবু চাকলাকর,
কেস না, open secret এখন
প্রকাশ্যে বেকাঁস। কিন্তু এ গল্পের
উপসংহার পূর্বের প্রথম পাতা আরও
চমকপ্রদ। কথায় বলে, বড় গাছেই
বড় লাগে, বেলঘরিয়ার ব্যাপারে
দেখলাম, নটেগাছটি নুড়োল।
অনেক হাবিলদারকে গুণাঙ্গীদের সঙ্গে
যোগসাজসের অপরাধে শাস্তিমূলক-
ভাবে অন্যায় বদলি করা হয়েছে।
কিন্তু এতেই কি ঘটনার উত্তি, গ্রহণের
পরিণতি? সামান্য হাবিলদার সাহায্য
করলে যে দেশে অরাজকতা অবধে
চলতে পারে, সে দেশে হোমরা-চোমরা
পুলিশকর্তার প্রয়োজন কি? এই
বিরাট গুণাঙ্গী যদি অভিজ্ঞ হাবিল-
দারের জন্যই এ অকলে কার্যে
স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়ে থাকে বলে
ধরে নিতে হয়, তবে সে তথ্যই
নিঃসন্দেহে উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত অফি-
সারদের অপদারিত্ব প্রমাণ করে।
কিন্তু অফিসার লোককে অতটা অপদারি
তারা অনুচিত বলেই মনে করি। আর
তাহলে জন-ডো ঘুলিয়েছে অনেক
গভীরে। মহাশয় ব্যক্তিরা নটেগাছ
মুড়িয়ে গল্পের উত্তি করবেন, একেমন
কথা। গল্পেই হয় যে, হৃদয়হতভনের
জন্য তদন্তকমিশন বসবে নাকি?

আমরা আনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান
ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক-সকতার
যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি
নিজেই এই দুইকন্ডের চিকিৎসা
শুধু করলে অনেক গোপন কাহিনী
হয়ত প্রকাশ হয়ে পড়বে। এ বিষয়ে
তাঁর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ আমরা আশা
করি।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ
করে কারখানা, কুল অকলে ঈদানীং
গুণাঙ্গী ও সনাতনবিরোধী প্রবণ

মানুষের অভিজ্ঞ ভয়াবহ আধিপত্য
বিস্তার করেছে। গুণাঙ্গী বেড়ে তৈরি
হচ্ছে এক-একটি দ্রোণ-বলয়। আই-জির
দৃষ্টি সে কারণেই এদিকে যথার্থ গুরুত্বের
গড়েই নিবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

মফস্বল এবং শহরতলী, প্রয়োজন-
বোধে কলিকাতা মহানগরীর বিশেষ
বিশেষ থানা থেকে যদি স্বল্প মেয়াদে
দেয় ব্যবধানে কর্মচারীদের বদলী
মাধ্যমে একস্থান থেকে অপর স্থানে
অপসারিত করা হয়, তাহলে পুলিশ-
গুণাঙ্গী আধিপত্য গড়ে উঠায় বাধা
পড়তে পারে। এজাতীয় ব্যবস্থার
অবশ্যই হরত প্রশাসনিক অসুবিধা
দেখা দেবে, কিন্তু দুইচক্র দমনে প্রত্য-
বিত অবস্থা অনেক অসুবিধা হুট্ট করবে
বলেই অনুমান। আই-জি কি ভেবে
দেখবেন?

আর ভেবে দেখতে বলি উত্তি
বয়সের ছেলে-মেয়ের অভিভাবকবৃন্দ-
কেও। যাদবপুরের ব্রহ্ম-বিলাসিনী
পিতৃকুলের গুণাঙ্গী হামলাকারিণী দুই
বোনের ঘটনা যদি অভিভাবকবৃন্দের
জ্ঞানচকু উন্মীলনে মহায়ত্ন না করে
তবে পুলিশ ভেঁকে ধর সামান্য
সর্বদা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

অথবা যে কোন কারণেই হোক
(কারণগুলি অল্পবিস্তর অনেকেই
সামান্য মাথা ঘামালে আবিষ্কার করতে
পারবেন) উত্তি বয়সের ছেলে-মেয়েকে
অভিভাবকগণ যথোচিতভাবে 'কন্ট্রোল'
করেন না। কিন্তু অতিরিক্ত 'হাউ'
উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়াবাড়িতে পরিণত হতে
চলেছে যা প্রাথমিক অবস্থায় কালো-
বাজারী কন্ট্রোলক্রমের হাওয়ার বহি-
র্ভূত। ঘরের মানুষকে মুঃশাসন করে
পরের হাতে শাসিত হতে ছেড়ে দেওয়া
আগে যদি আমরা শিকার শাসকে
শৈথিল্যের ভাগ কিছু কমিয়ে দিই
তবে নিজের এবং দেশের উন্নয়ন মুখ
রক্ষা হয়। মুখ রাখতে যদি ছেলে-
মেয়ের মনে সামান্য দুঃখ দিতে হয়
তবে তাই হোক। গুণে লাভ বই
লোকসান নেই।



পল্পপ নেহারলু-শিকাগো

প্রজ্ঞা. ডো. গ্রীসবার্গ

শিকাগো (কেউ কেউ উচ্চারণ করেন চিকাগো) আমেরিকার অন্যতম প্রধান শহরই শুধু নয়, এটি শিকা ও সংস্কৃতিরও অন্যতম পীঠস্থান।

শিকাগো গিয়েছি আমি দুবার। একবার ওয়াশিংটন থেকে ওকলাহোমা যাওয়ার পথে; আর একবার লস-এঞ্জেলস থেকে ওয়াশিংটনে আসার পথে। প্রথমবার শিকাগোতে ছিলাম মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তবে দ্বিতীয়বার সেখানে থাকার মেয়াদ ছিল বেশ কিছুদিন।

প্রথমবার যখন শিকাগো যাই তখন অগস্ট মাস। বেশ গরম। তবে যেদিন ওয়াশিংটন ছাড়লাম সেদিন টিপ্টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। অফিস অব এডুকেশন থেকে মিস প্যাট্রিসিয়া সিরিন্স আমাদের সি-অফ করতে এসেছিলেন। ইউনিয়ন স্টেশানে অবস্থানে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিল তার পাশের পেডের কতকগুলো ডাঙা জায়গা থেকে জল ঝরছিল। মিস সিরিন্স আমার কামরার কাছে তাঁর জুন্সের ছাতাটা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন। পেডের কাঁক থেকে ঝরা রূপোলি জলের ধারা তাঁর ছাতার গায়ে আল-পনা কাটছিল। অনেক সময় বৃষ্টির কথা মনে হলে মিস সিরিন্সের জুন্সের ছাতাটির কথা মনে পড়ে।

ট্রেনে উঠেছিলাম বিকেল পাঁচটায় শিকাগোর ডিয়ারবোর্ন স্টেশানে পৌঁছলাম পরের দিন সকাল আটটা তিরিশ মিনিটে। স্টেশানে সেলফ

লকারের ব্যবস্থা আছে। আমাদের গুপ্তের উনিশজনের সকলেই লকারে জিনিসপত্রের রেখে ছুটল বিখ্যাত মিউজিয়াম অব সায়েন্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দেখতে।

মিউজিয়ামটি শিকাগো ইউনি-ভার্সিটির কাছেই। আমেরিকার শিল্প ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির নানা বিস্ময়কর নমুনা রয়েছে মিউজিয়ামটির মধ্যে। বিভিন্ন বিষয়ক মডেলের এমন সংগ্রহ এর আগে আমার চোখে পড়ে নি। এইসব মডেলের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কোন মাইনের মডেলটি। মডেলটি বলতে গেলে একটি সত্যকার ছোটোখাটো মাইন-ই। লিফটে করে নিচে নেমে গিয়ে করলা কাটা, গাড়ি করে করলা আনা, সেকটির নানা ব্যবস্থা ইত্যাদি সব দেখতে পেলাম।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েও এক-বার টু মারলাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল বলে কারো সঙ্গে দেখা হল না। তাই মিশিগান লেকের কাছে গিয়ে বসলাম। চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। লেকের নীল জলে অসংখ্য রঙিন বোটের সঙ্গে হাঁসের দল পাল্লা দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। অনেকে সাঁতার কাটছে। কেউ কেউ তীরের বালু-ভূমিতে শুয়ে সানবাথ নিচ্ছে। আমি বসে বসে পপি করন খেতে লাগলাম। মিশিগান লেকের মধ্যে তার তীরবর্তী কাঙ্ক্ষিতপারগুলির প্রতিবিম্ব জড়াজড়ি করে ইম্প্রেশনিস্ট আর্টিস্টের ছবির গ্যালারী গড়ে তুলেছে। তীরে নানা

বৈশেষ লোক জিক করে আছে। অনেকজন বসেছিলেন। হঠাৎ বক্সিং দিকে ডাকিয়ে দেখি চারটে বেঞ্চে গিয়েছে। তাকাতাড়ি একটা ক্যান নিয়ে ছুটলান স্টেশানে, কেন না ওকলাহোমার ট্রেন হাজিরে গরম্যা ছুটায় সময়।

স্টেশানে পৌঁছে তার ভিতরেকৈ একটা কফি শপে আকটারনুন কফি খেতে ঢুকলাম। কফি শপটিতে তারা কাজ করছে তাদের অধিকাংশই মহিলা ও নিগ্রো। শিকাগোতে নিগ্রোর সংখ্যা খুবই বেশি। সত্যিকার আন্তর্জাতিক শহর বলতে যা বোঝায় শিকাগো তাই। অল্পক্ষণের পাশ্চি-চয়েই শিকাগোকে আমার ভালো লাগল।

দ্বিতীয়বার যখন জানুয়ারির মাঝামাঝি এক শীতের সকালে শিকাগোর ডিয়ারবোর্ন স্টেশানে এসে নামলাম, তখন তার মূর্তি লেখলে ভর করে। আমার সঙ্গে এসেছেন মিস্টার ব্যানার্জী। বাইরে বিজুয়ার্ড বা প্রচণ্ড তুষারের ঝড় বইছিলো। স্টেশান থেকে বেরুনো এক দাক্ষণ ব্যাপার। ঝড়ের এতো জোর যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এইবার ভালো করে বুঝতে পারলাম শিকাগোকে কেন উইণ্ডি সিটি বলে। যে বিরাট মিশিগান লেকের ঠাণ্ডা বাতাস গ্রীষ্মের সময় শিকাগোর বুকে আশ্রয়দায়কতার স্রষ্টা করে--তাই শীতের সময় তুষারের ঝড় হয়ে ভরংকরতাকে ডেকে আনে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে একটা

ক্যাব ডেকে মিস্টার বানার্জী ও আমি ভাতে উঠে বসলাম। আমাদের গন্তব্যস্থান ৮২৬ সাউথ ওয়াশ অ্যাভিনিউতে অবস্থিত ওয়াই. এম. সি. এর হোটেল। হোটেল গিট বুক করা ছিল। শিকাগোর বোর্ড অব এডুকেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস্টার এক. বি. ব্যাককেগের সঙ্গে লসএঞ্জেলস থেকে টেলিফোনে আনার কথা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন যে, আমাদের হয়ে তিনি ওয়াই. এম. সি. এ-তে গিট বুক করে রাখবেন।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ওয়াই. এম. সি. এ-তে পৌঁছে গেলাম। এগারো তলার একটি ঘরে আমাদের হুজুরের আশ্রয় মিলল। ওয়াই. এম. সি. এ. হোটেলটি বিরাট। এতে জী, পুরুষ অথবা পরিবারের জন্যে দু-হাজারটি ঘর আছে। তা ছাড়া ক্যাফেটেরিয়া, গিকট শপ, টেলার শপ ইত্যাদির ব্যবস্থাও স্থলর।

বিকলে বেরলান কিছু লেখার কাগজ কিনতে। প্রচণ্ড তুষারের ঝড় জ্বলও চলছে। ওয়াশ অ্যাভিনিউ ঘরে এগোনাম। হঠাৎ ঝড়ে আমার টুপিটা উড়ে গেল। আমি ছুটলাম টুপিটার পেছনে পেছনে। টুপিটা আমি উপহার পেয়েছি একজন মেক্সিকান বন্ধুর কাছ থেকে। একে তো এটি উপহারের জিনিস, তার ওপর এটি দেখতেও চমৎকার ও আমার বিশেষ পছন্দসই। তাই এটিকে হারাতে আমি রাজী নই। আমি যত ছুটি, টুপিটা ততই উড়ে যায়। একবার হাত লাগিয়েও ওটাকে ধাতে পারলাম না। হঠাৎ দেখলাম আমার কিছুদূরে একটা কাগজ উড়ে যাচ্ছে। পাশের রাস্তা থেকে একটা মোটর ঘেঁষে আসতেই কাগজটা আমার সামনে পড়ল। তারপর ঝড়ের হমকে কাগজটা উড়ে গেল অন্যদিকে। মোটরটাও ছুটল কাগজটাকে দক্ষ্য করে। তারপর মোটরের আরোহী

কাগজটাকে ঘরে 'হেলপ শিকাগো কুইন' ডাস্টবিনে কেলে দিয়ে চলে গেল। এইসব পরিচ্ছন্নতার আদর্শ অনুকরণযোগ্য।

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। টুপিটাও কিছুটা দূরে পাখির মতো জিরোচ্ছিল। যেই ধরতে যাব অবনি টুপিটা আবার উড়ে গেল। হঠাৎ একটা দোকান থেকে একজন নিগ্রো মহিলা বেরিয়ে এলেন। টুপিটা তাঁর গায়ে গিরে পড়তেই তিনি সেটাকে ধরে ফেললেন। তারপর আমি এগিয়ে যেতেই বললেন, 'এটুপি কি আপনার?' আমি বললাম 'হাঁ'। টুপিটা ঝড়ে উড়ে গেছে।

—'এই নিন আপনার টুপি। এভাবে ছুটবেন না। এতে অ্যালার্জেন্ট হতে পারে।'

টুপিটা হাতে নিয়ে দেখলাম তার চমৎকার পালকটি কোথায় পড়ে গেছে। বনটা খারাপ হয়ে গেল। তাই আর না এগিয়ে হোটেল ফেরবার পথ ধরলাম। কিছুদূর এগিয়ে দেখি একটি ছোট্ট বাড়ির দোকান খোলা রয়েছে। আমার রিস্টওয়াচটি লসএঞ্জেলসে সারিয়েছিলাম। গাত ডলার খরচ করে। যে দোকান থেকে সারিয়েছিলাম সেটি বেশ বড় জুরেলারির দোকান এবং দোকানের কর্তৃপক্ষ আমাকে দুবছরের গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন দুপুরে লসএঞ্জেলস ছেড়ে আসব সেদিন সকালে বাড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ছুটেছিলাম দোকানে। সেখানে গিয়ে শুনেছিলাম দোকানের জিনিষপত্রের পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছিল বলে দোকান বন্ধ হতে দেরি হবে। আমার দেখি করার উপায় ছিল না। তাই কুণ্ণ মনেই লসএঞ্জেলস ছাড়তে হয়েছিল। একটা ট্রাভেলওয়াচ দিয়ে কোনো মতে কাছ চালিয়ে নিছি। কিন্তু রাস্তাঘাটে বড়ো অসুবিধে হয়। অনেক ইতস্তত করে দোকানটিতে ঢুকলাম।

দোকানের কাউন্টার থেকে অনেকটা পিছনে একজন লোক বসে একটি বাড়ি সারিয়েছিল। আমি ঢুকতেই সে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমি কোনো সাহায্য করতে পারি কি?'

আমি বললাম, 'হাঁ'। দেখুন এই বাড়িটা লসএঞ্জেলসে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি একটি দোকান থেকে গাত ডলার খরচ করে সারিয়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে চলে আসার দিন সকালে বাড়িটা আবার খারাপ হয়ে গেল। দোকানে গিয়ে শুনেলাম দোকান সেদিক দেরি করে খুলবে। কিন্তু দুপুরে ট্রেন ধরার জন্যে আমার দেরি করার উপায় ছিল না। আমার কাছে গ্যারান্টি পেপার আছে, কিন্তু—'

—'আচ্ছা, দেখি আপনার বাড়িটা।'

হঠাৎ দেখি একটা বাতুনিনিমিত হাত কাউন্টারের কাছে এল। আমি বাড়িটা সেই হাতে দিতেই হাতটি ঘুরে লোকটির কাছে চলে গেল। বুঝলাম, বিদ্যুতের সাহায্যে হাতটি চালিত হচ্ছে।

লোকটি বাড়িটি খুলে দেখে বললে, 'হাঁ, বাড়িটি খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যে সারানো হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। একটা স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি পাশের চেয়ারটার বসুন।'

আমি ওভারকোটটা খুলে চেয়ারটার বসলাম। একটু পরে লোকটি জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি এখানে কোথায় উঠেছেন?'

—'এই পাশের ওয়াই. এম. সি. এ. হোটেল।'

—'আপনি কি ভারতীয়?'

—'হাঁ'। কিন্তু আপনি আলাদা করলেন কি করে?'

—'খানিকটা আপনার কথা শুনে আর খানিকটা আপনার চেহারা দেখে। ভারতীয়েরা একটু ইমোশনাল হয়। এই নিন আপনার বাড়ি।'

সেই বাতুনিনিমিত হাতটি কাউন্টারের কাছে আসতে বাড়িটি খুলে নিয়ে হাতে পরতে পরতে বললাম, 'কত দিতে হবে?'

—আপনাকে কিছুই আর দিতে হবে না। আপনি একবার তো এই বাড়ির জন্যে এই দেশেই সাত ডলার খরচ করেছেন। আশা করি বেশ কিছুদিন এই বাড়ি আর বেগড়াবে না।’

ঠিক এইসময় একজন মহিলা ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে সে বললে, ‘এই ভদ্রলোক ভারতীয়। তুমি তো ভারতবর্ষে গিয়েছিলে। তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে একে জিজ্ঞাসা করতে পার।’

ভদ্রমহিলা হাতের দস্তানা খুলতে খুলতে বললেন, ‘আপনি কোথায় থাকেন?’

—‘কলকাতা।’

—‘আমি বোম্বাইতে দু’দিন ছিলাম হুংকং বাস্তার পথে। বোম্বাইতে আমার কয়েকজন ভারতীয় বন্ধু আছে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাস্য করি ভারতীয় মেয়েরা অত কাঁদে কেন?’

—‘আপনার একথা মনে হল কেন বলুন তো?’

—‘আমি শুনেছি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে স্ত্রী কান্নাকাটি করে স্বামীর মন জয় করে। একথা কি ঠিক?’

আমি এতোকণে লোকটির ‘ইমোশানাল’ কথাটির অর্থ খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিলাম। আমি বললাম, ‘স্বামী-স্ত্রীর রাগবিরাগ সব দেশেই আছে। তবে দেশের ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার প্রকাশের ভঙ্গি আলাদা হতে বাধ্য। এদেশে কি কোনো স্ত্রী কাঁদে না?’

আর একজন বরিদ্ধার চোকাতে প্রশংসা ছেদ পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

পরের দিন বোর্ড অব এডুকেশনের অফিসে উষ্টর ফিলিপ লিউসের সঙ্গে দেখা করলাম। উষ্টর লিউস বোর্ড অব এডুকেশনের ব্যুরো অব রিসার্চ, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্পেশাল প্রজেক্টের ডিরেক্টর এবং টেলিভিশন সম্পর্কে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে কুজ

লাকিট টেলিভিশনের উপযোগিতা নিয়ে অনেককণ আলোচনা হল। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র দিল্লীতেই কুজড লাকিট টেলিভিশন আছে। কলকাতাতে খুব শীঘ্রই টেলিভিশন ইন্সটলেশনের গন্তাবনা আছে। ভারতে টেলিভিশন বসানোর বিশেষ অন্তরায় হচ্ছে তার উচ্চ মূল্য। একটি টেলিভিশন স্টেশন থেকে একশো মাইলের বেশি দূরে ব্রডকাস্ট করা যায় না। তাই একটি বড় জারগায় ব্রডকাস্ট করতে হলে করবার জন্যে অনেক গাব-স্টেশনের দরকার হয় আর সেই হিসাবে খরচও অনেক পড়ে। সেইজন্যে ইলিনয়তে এনোপেন থেকে ব্রডকাস্ট করে বেশি জারগাকে কভার করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি করে ব্রডকাস্ট করবার কথা চিন্তা করছেন।

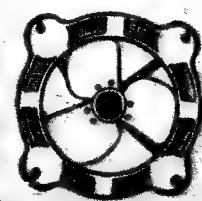
শিক্ষার ক্ষেত্রে শিকাগো বিশেষ অগ্রগর। এখানকার বোর্ড অব এডুকেশনের কর্তৃপক্ষীনে রয়েছে ৪৭৮টি এলিমেন্টারী স্কুল, ৫৪টি লেকগারী স্কুল, ৪৪টি কমিউনিটি স্কুল ও ৯টি জুনিয়র কলেজ। আমেরিকার সাধারণত এলিমেন্টারী ও লেকগারী হাইস্কুলের শিক্ষকদের স্যালারি স্যাজিয়ুলের কোনো তফাৎ নেই। শিক্ষকেরা তাঁদের জীবন সাধারণত অরাজত করেন এলিমেন্টারী স্কুলে। তারপর তাঁরা যান লেকগারী

স্কুলে এবং সেখান থেকে কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে। ব্যাচিলর ডিগ্রী আছে এমন একজন এলিমেন্টারী টিচার স্কুলেতে প্রথম বছরে প্রতিমাসে ৫২৫ ডলার মাইনে পান। সেইভাবে একজন মাস্টার্স ডিগ্রীধারী প্রথম বছরে প্রতিমাসে পান ৫৬০ ডলার। উষ্টর লিউস ডিগ্রীধারী হলে তিনি আরজত করেন ৬১০ ডলার মাইনেতে। আমেরিকার মধ্যে শিকাগোতে শিক্ষকদের অবস্থা খুবই ভালো এবং সেইজন্যে এখানে শিক্ষার মানও বিশেষ উঁচু।

ব্যুরো অব ভিসুয়াল এডুকেশনের ডিরেক্টর মিস্টার ফিউজিয়ানার আমাকে নিয়ে পেন্সেল সাউথ কেডজি অ্যাভিনিউতে তাঁর ব্যুরো দেখাতে। এই ব্যুরোর বিশেষ কাজ স্কুলের প্রয়োজনানুসারে ফিল্ম বদলাই করা। এখানে সাতটি ফিল্মের টাইটেলের সংখ্যা ২,২০০ এবং প্রিন্টের সংখ্যা ১৮,০০০। আমি ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাস্য করলাম, ‘আচ্ছা, আপনার ব্যুরো হচ্ছে ভিসুয়াল এডুকেশনের, তবে এখানে তো সাতটি ফিল্মের সংখ্যাই বেশি, আর সাতটি ফিল্ম তো শুধু ভিসুয়াল নয়, তা অডিও ভিসুয়াল।’

—‘আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রথমে যখন এটা খোলা হয় তখন

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যাক্স



মার্কনী ফ্যান

নগদ মূল্যে
৯টি কিঃমিতে দিন
মার্কনী ইলেকট্রিক কর্পো
(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৫-১০৪৮

৪বিহার বাসীত প্রত্যাহ দকাল ১০টা
হইতে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে



সমস্ত সময় এক

আশিস সান্যাল

সমস্ত সময় শুধু মৃত্যুভয়। মনে হয়, সর্বশেষ যাত্রা শুরু হবে

মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে অনাগত নবীন শৈশবে।
দিকে দিকে প্রতিশ্রুতি। নিরুপায় প্রতিভাত প্রতিটি
প্রান্তরে
সূর্যের অস্তিত্ব দৃশ্য। মেঘের নতুন ছিন্ন সর্বত্র শব্দে
অভিশাপ উচ্চারিত। অবিশ্বাস প্রসারিত শব্দহীন
প্রতিটি কিংকর্কে।

অথচ স্থলর তবু উদ্ভাসিত বুকের পাখরে। সকালের
প্রতিটি প্রান্তরে
অকুরান শব্দরিত লবুকে শ্যামলে। প্রত্যেক প্রহরে
মেঘের সজল বৃষ্টি। নীল শক্তি নিভাভিরা শুকনর
প্রতিটি স্থলরী

হেঁটে যায় অভিশাপে। নুপুরে বিজল শব্দ
বাঁচার নির্ভর মনে, ভেসে যায় দুঃখ থেকে দূরের সন্নীরে।

জীবনে মৃত্যুর চেয়ে সত্য কিছু নেই। তবু হায়,
মৃত্যুর নিকটে

ফিরে যেতে কেবা চায়? কে হায় নিভুতে
ভুলে যেতে যায় প্রেম? ভালোবাসা? কিংবা তা
আশ্বাসিত বুধ--
কেবা চায় ভুলে যেতে, দান্তিক সান্যালের তার অনুগত
সহস্র কিংকর্ক?

তবু সব ভুলে যেতে হয়? প্রথম রৌদ্রের খেলা ---
অথবা প্রথম নীল মেঘে নিয়ে পাখির উড়ান প্রহর
ভুলে যেতে হয় ক্রমে। কেন না, নির্ভর এই বিপন্ন সময়
রাখে না গোপনে কিছু শাশ্বত কুটিলে।
সকালের ভালোবাসা দুর্গম দুপুরে, দুপুরের ভালোবাসা
নিজন সন্ধ্যার

ভুলে যেতে হয় ক্রমে। মনে হয়, সর্বশেষ যাত্রা শুরু হবে
তাই যেন নির্ধারিত, মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে মৃত্যুর উৎসবে।

এটাতে ডিস্ক্রিয়াল মেটিসিয়ালিট থাকত।
এখন এখানে অডিও-ডিস্ক্রিয়াল মেটি-
সিয়ালিট বেশি। তবে পুরনো নামটা
হয়ে গেছে।

একই বিল্ডিং-এর মধ্যে ওয়াশ-
বার্ন ট্রেড স্কুল। এখানে রন্ধন, গৃহ-
নির্মাণ, ছুতোরের কাজ, দজির কাজ,
ইলেকট্রিকের কাজ ইত্যাদি নানা
বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ধরনের
ট্রেড স্কুলের উপযোগিতা অনস্বী-
কার্য। মিস্টার ফিটজওয়াটার আমাকে
বিভিন্ন বিভাগে নিয়ে গেলেন।
রন্ধনবিভাগের যিনি শিক্ষক তিনি
একজন ইতালীয়ান। এখন অবশ্য
আমেরিকার নাগরিক। তাঁর ছাত্রেরা
কেকের বাড়িঘর, আসবাবপত্র ইত্যাদি
ঝানিয়েছে। খাবার তৈরির দিকে
এদেশে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।
হোমস্কিনমিক্স মেয়েদের একটি
অন্যতম প্রিয় সাবজেক্ট এবং এতে
ভারা শেলাই, রন্ধন, গৃহ-সজ্জাকরণ
ইত্যাদি বিশেষ করে শেখে। শুভ
হোম শুভ নেপালের অপরিহার্য
ইউনিট, একথা তারা ভালো করেই
জানেন। আর একটি জিনিস আমে-
রিকার বিশেষ করে ডোম খাচ্ছে

সেটি হচ্ছে বিউটি শপ। এই শপে
মেয়েরা তাদের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যে
নানা পরিচর্যা করে। বিশেষ করে
চুলের নানা বিন্যাসের দিকে তাদের
নজর খুবই বেশি। একটি কথা এই
প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি। আমেরিকায়
যেখানে শিক্ষার জন্যে ব্যয় হয় ২,০০০
কোটি ডলার সেখানে কসমেটিকসের
ব্যয় খরচ ৫২৪'৮ কোটি ডলার।
এই কসমেটিকসের মধ্যে রয়েছে
বার্বার শপ, বিউটি পার্লার ও বাথ।

মিস্টার ফিটজওয়াটার ইতালীয়ান
রন্ধন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে
দিলেন। তিনি বললেন, 'ভারতীয়দের
রান্নার মশলার পরিমাণ খুবই বেশি।
অবশ্য আমরা ইতালীয়ানদেরা কিছুটা
মশলা ভালোবাসি। আচ্ছা, রন্ধন
শেখানোর কোনো স্কুল আপনার
আছে?'

আমি বললাম, 'মেয়েরা স্কুলে
রন্ধনপদ্ধতি শিখতে পারে। হোম
স্কিনমিক্স এখন তাদের খুব প্রিয়
বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

—'দুঃখজনক জবাব তৈরির ব্যাপারে
ভারতের তুলনা হয় না। আপনার
সংগোষ্ঠাকে স্বপ্নের সুখা বলেই হবে

হয়। আমার জানাশোনা বেউ ভারতে
গেলেই আমি সংগোষ্ঠা আনতে
বলি।'

—'এখানে তৈরির চেষ্টা করেন
না কেন?'

—'চেষ্টা একবার করেছিল
নিউ ইয়র্কের এক ভারতীয় কারিগরকে
দিয়ে। কিন্তু জমল না।'

—'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা
করব।'

—'বলুন।'

—'আপনারা অত লম্বা লম্বা টুপি
পড়েন কেন?'

—'কুদের এই টুপি পরিচ্ছন্ন-
তার প্রতীক। তা ছাড়া এইরকম
লম্বা টুপি থাকলে তাদের চিনতেও
অবিধে হয়। এর আর একটা দিকও
আছে। আঙনের কাছে তাদের কাজ
করতে হয় বলে লম্বা টুপিতে বেশি
বাতাস ঢোকবার জায়গা থাকায় মাথা
তেমন গরম হয় না।'

শিক্ষকটি আমাকে কিছু কুকি
ট্রেস্ট করতে দিলেন। লাফের সময়
হয়ে গিয়েছে বলে সেখানে আর
বেশিকণ দাঁড়ালি না।

(কথন-)

শুধু হিন্দুস্থানের নয়। সমগ্র বিশ্বের মুসলিম নরনারীর কাছে এ পবিত্র দেউল একটি বিশেষ পীঠস্থান। শুধু মুসলিম কেন? প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাই যার ধর্ম এ মক্কায়া তাঁদেরও পীঠস্থান। দিল্লীর এ পবিত্রতম জায়গাটিকুর সেহপনশ পেয়েছেন কি?

শুধু আপন তপস্যাতেই নয়। হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া ছিলেন হজরত হুসেনের বংশধর। হজরত হুসেন ছিলেন হজরত নব্বুদের পৌত্র।

তখনও সাহাজানাবাদ হয় নি। মতন রাজধানী তুর্গলকাবাদের বেশ শানিকটা দূরে। ফার ফ্রু দি ম্যাডিং ফ্রাউড—নিরাল। যখন জঙ্গলে এ ককীরের আস্তানা। মরিত্রদের পরম শত্রু। প্রতিদিন মরিত্রদের অন্নগৃহস্থানের শব্দোবন্ত ছিল। রাজা ব্যত রাজ্য জয়ে। প্রজাদের দিকে তাকবার ক্ষুরসং কোথায়?

কে দেখছে দরিদ্র দিল্লীবাসীর ঘুবে উঠছে কি না দু'ঠো অন্ন? উপাস দুটো চোখে বন-ভোজনো দৃষ্টিতে ষাজাগাহের শিয়াদের বলেছিলেন—এ মক্কাবার পাশ দিয়ে বেন কোন পথচারী অভুজ না বার। রাজার সাহায্য ছাড়াই সেদিন এখানে লজর খোলা হয়েছিল, কোন পথচারীকে অভুজ যেতে দেওয়া হবে না।

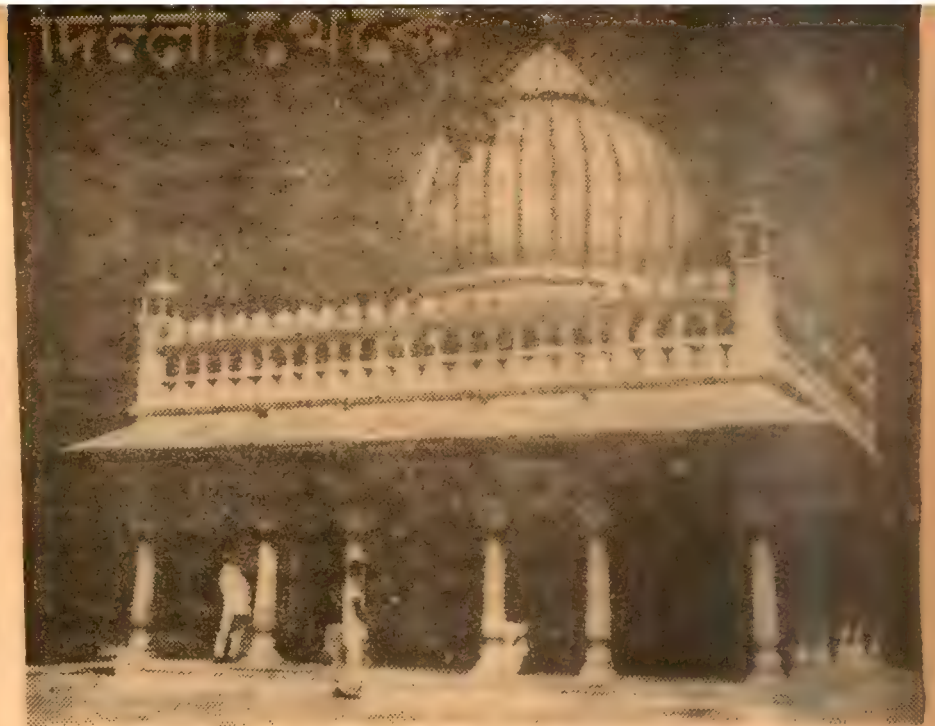
শিষ্যরা সংগ্রহ করতেন রসদ। নিজে থেকেই বেন চলে আসত সেনপিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

আর ষাজাগাহের নিজে?

প্রায় প্রতিদিনই তিনি ব্রত উদ্ভারপন করতেন। হজরত বিশৃঙ্গ হত মা। অবিশৃঙ্গেরই কথা। হিমালয়ে বহু সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে এসেছি—বীরা দুবালে একদিন কিংবা তারও কম সাধারণ কলবুল বেঁধে থাকেন। হজরত সাহেব বেঁতেন সাধারণ কল ও কুচিং-ফদাচিং সাবান্য একটু যবের ছাতু।

একটা দুটো নয়।

হজরত সাহেবের জীবনকালে



হজরত নিজামুদ্দিনের সমাধি।

শাত-শাতজন নৃপতি দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁদের নাম লিখিত রয়েছে—সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন, বলুদ্দিন কাইকো-বাদ, জালালুদ্দিন খিলজী, সুলতান আলটিদ্দিন খিলজী, কুতুব-উদ্দিন মুবারক, খুসরো বান আর গিয়াসুদ্দিন তুর্গলক।

এঁদের অনেকেই এ বোগীর পদধাতে আপন রাজমুকুট বেধে

শ্রী হিন্দুস্তান ভ্রমণ

নিজেদের ধন্য বনে করেছেন। বীরা তাঁকে সূফী বলে অস্তর দিয়ে ভক্তি করতে পারেন নি তাঁরাও ভয় করেছেন, এ ককীরের জনপ্রিয়তার জন্য। বিরানবই বছরে হজরত সাহেব শুধু আপন হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে দিল্লীতে বে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, শত নৃপতির রাজভাণ্ডার চোনেও সেটি সত্ত্বপন হয় নি।

বাঙলির গল্পটুকু এখনও শেষ হয় নি। বাঙলি নানেন্ট পুকু

এর প্রকৃত নামটা বলতে ভুলে যাচ্ছিনার। বাঙলির প্রকৃত নামটা ছিল 'চশমা মিলকুশা'—হাট বিজয়েসিং ফাউন্টেন। আজকাল বিদেশীদের কাছে এর একটা নতুন নাম হয়েছে—জাম্বিং ওয়েল।

এ পুকুরের জলে স্নান করলে নানা অস্থি নারে বার। সেটা শুধু এ পুকুর সত্ত্বই নয়। অনেক পুণ্যতীর্থে দেখা গেছে জলাশয়ের বিষ্ণুর। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নীলিকাতে স্নান করে বহু মোকের দুঃখোপা ব্যাধি গেয়েছে, আরি নিজের চোখে দেখেছি।

বর্তমান বিজ্ঞানের দিনে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও বেশিরকম। বিজ্ঞানের ছাত্ররা বলেন—'এ চশমা মিলকুশার জলের রাসায়নিক গুণের জন্য নোকেরা ব্যাবিস্ত হন।' 'বিক্স অব দি সান্ফিউরিব্ রিসোর্সে ইন্ দি বকি বেভুন্ নিয়ার এ্যানাউট্ দি পণ্ড।' ফারিসদের কথা হেছে মিলুন্ বিজ্ঞানের ছাত্ররাও বকন বলেন তখন এ বিষ্ণুর না বেনে উপায় নেই। শুধু তাই নয়।

পবিত্র কোরান শরীফে রয়েছে
জয়তুন গাছের তেজের প্রদীপের
ধ্বনি, যে তেল অগ্নি স্পর্শ ছাড়াও
জ্যোতির্ময়।

দিল্লীর এ চণ্ডা দিল্লীকুশা সম্বন্ধে
একটা কাহিনী দিল্লীতে জনসাধারণের
মুখে মুখে চলে আসছে। ইতিহাসের
পৃষ্ঠাতেও দেখলাম সে কাহিনী
লিপিবদ্ধ রয়েছে।

যখন হজরত নিজামুদ্দিন আউ-
লিয়ার নির্দেশে দিল্লীর শ্রমিক দল
এ দীঘিকা খননে বাস্তু, গিয়াসুদ্দিন
তুগলক হুকুম দিলেন—কোনো যজুর
নতুন রাজধানীর মহানগরী তৈরির
কাজ ছেড়ে অন্য কাজ নিতে পারবে
না। শ্রমিক দল তখন ঠিক করলো
দিনে রাজার, রাতে ফকিরের কাজ
করবে। তখন গিয়াসুদ্দিনের হুকুম
হলো রাজ্যের কোনো অংশ থেকে
যেন কোনো লোক এ দরবেশের
প্রয়োজনের জন্য কোনো তেল সরবরাহ
না করে। তেল না পেলে আলো

জ্বলবে না। আলো না জ্বলে
এ দীঘিকা খননের কাজ আপনা-
আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে।

আপন উপস্থিতবুদ্ধির প্রখরতায়
সম্রাট উন্নতিত হয়ে রাজ্যের চারি-
দিকে এ হুকুম চালু করে দিলেন।

সত্যিই তো। দিনে যারা
রাজার কাজ করে, রাতে আলো না
পেলে তারা কি করে পুকুর কাটবে?
চাঁদের আলো আর মাসের
কদিন জুটবে?

শ্রমিক দল চিন্তিত হয়ে পড়লো।
শিষ্য দল ব্যাকুল।

বীরে বীরে কথাটা যোগীর
কানেও পৌঁছুলো।

পাশে চিন্তিত-ব্যাকুল মনে
দাঁড়িয়েছিলেন প্রিয় শিষ্য হজরত
মাক্দুস নাসিরুদ্দিন। তাঁকে কাছে
ডেকে নিজামুদ্দিন সাহেব সম্মুখে
বললেন—‘তোদের জলপাত্র আছে?
ফলগী, ঘড়া, কঁজো? নিয়ে আর তো’

জলপাত্র আনা হল।

খাজাসাহেব বললেন—‘যা তবে
নিরে আর এ জল।’

অর্ধখনিজ জলাশয় থেকে জল
ভরে আনা হল।

খাজা সাহেব বললেন—‘যা
এবার এ জল দিয়ে জ্বালা বাতি।’

সে কি কথা? জল দিয়ে বাতি
জ্বলে?

কার সাধ্য এর প্রতিবাদ করে?
জ্বলেছিল।

দিল্লীর শ্রমিক দল অবাক-বিস্ময়ে
এ দৃশ্যের সাক্ষী।

একাধিক ইতিহাসের অথরিটিকে
জিজ্ঞাসা করে জেনেছি এ কাহিনীর
মাথারখ্যা। তাঁরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা
খুলে দেখিয়েছেন এ কাহিনী সত্য।
আজ হয়তো এ জলে বাতি জ্বলবে
না। সেদিন জ্বলেছিল। জ্বালাতে
জানা চাই। শক্তি চাই—আলো
জ্বালার শক্তি চাই—আলো জ্বালার,
আলো দেখার।



তাম্র সান্নিধ্য

ধারাবাহিক উপন্যাস



মহাশেবতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ পূর্বভাগ ॥

নাব মখন ইংবেজ ফ্যাক্টবদের
অবধ বাণিজ্যসভে বাধা দিবে টাকা
চাইলেন, তখন সত্যিই তিনি বড় বিপন্ন।
তিনি বিপন্ন, ইংবেজ ফ্যাক্টবাবি বিপন্ন,
তাই বুঝেই যেন কাশিমবাজারের
ইংবেজ কুঠি। গৌমস্তা জগৎপতি আচার্য
লুকোন টাকা নিয়ে ফবাসডাঙায় পালিয়ে
গেলেন। নতুন জীবন গড়বেন, আবার
ফবাসীদের সাহায্যে ব্যবসা করবেন।
ওবা বড় আবাদী জাত। ওদেব শেষাতে
হবে আদাম হাবাম হ্যায়। ফস্টার
কাশিমবাজারের কুঠির সায়েব তাঁকে
আরাম কবতে দেখলেই বলত, 'আরাম
হারাম হ্যায়। তোমরা, বাঙালীরা
খালি গা গড়িয়ে আরাম কবতে জান।
তাই তো তোমাদের দেশে এসে সবাই
কান মলে ব্যবসা করে।'

'তোমরা ব্যবসা কর বলেই ত'
সায়েব, আমরা দুটো অন্ন পাচ্ছি।'
জগৎপতি হেসে হেসে বলতেন।

'আ বে এ ত' চাকরীর অন্ন। এতে কি
আরো কোন সুবিধে হবে বলে মনে
কর ?'

'তা সায়েব, তোমরাও ত' ফ্যাক্টব
সায়েবদের কর্তাদের চাকুরে।'

'সে ত' নিজেদের লাভের জন্যে।
তোমরা, যারা লেখাপড়া শেখ তারা শুধু
আবাস খোজ বলেই ত' মুশিদাবাদে
চকে এসে গুজবাতী, সুরতী, আফগান,
ইরানী, মারোয়াড়ী, কাশ্মীরী সবাই
আদানুণ বেয়ে ব্যবসা কবে আর পেট-
কাপড়ে রামচাঁদী টাকা বেঁধে দেশে
নিয়ে যায়। ব্যবসা করতে হলে
পরিশ্রম করতে জানা চাই।'

জগৎপতি হাসতেন। পরিশ্রম তিনিও
করতেন, তবে সায়েব সবসময়ে দেখতে
পেত না। তিনি সায়েবের টাকা নিয়ে
তাঁতিদের দানদেবার সময়ে টাকা
সরাতেন। সায়েবদের মাল বিক্রি
থেকে দস্তরি নিতেন। আবাস মাঝে
মাঝে ডাল মাল গড়িয়ে নিয়ে চুপি চুপি

'বাই গৌ, কালী দর্শন কবে আসি' বলে
ফরাসী সায়েবের কুঠিতে গিয়ে বেচে
আসতেন। তখনই দেখেছেন, ফবাসী
সায়েবরা বড় আবাদী। ওরা ফবাস
ডাঙাব গুদাম থেকে দামী মদ আনিয়ে
খায়, গোলপড়লে সূনি কবে, দশ টাকা
ভরির তামাক ছাড়া খায় না। সেইজন্যেই
ওদের ব্যবসায় তেমন উন্নতি নেই।

অথচ সায়েবরা আবাসের সময়ে
আবাস করে, অন্য সময়ে ভুতের মত
খাটে। জগৎপতি এবার টাকার পেট
নিয়ে নৌকো চড়ে পালিতে পালিতে
ভাবলেন ফবাসডাঙায় গিয়ে ফবাসী
সায়েবদের বুঝিয়ে দিতে হবে ইংবেজদের
ব্যবসার উন্নতি কিসে হচ্ছে। ওরা যদি
তঁার কথা শোনে তাহলে ওদের গড়েই
ব্যবসা করবেন। নইলে ওদের মোটা
দস্তরি দিয়ে ওদের এলাকায় থেকে
নিজেই ব্যবসা করবেন। একটা কথা
ফস্টার ঠিকই বলত, ব্যবসা ছাড়া টাকা
হয় না। হতে পারে না। যার বৃত্তি

সেই ব্যবসা করছে। এই যে গণেশ শেঠ - ফতেচাঁদ হাসতে হাসতে পরফরাঙ্ক খাঁ-ব সর্বনাশ করলেন, আলীবর্দীকে সিংহাসনে বসালেন, আবার এখন হয়ত আলীবর্দী সর্বনাশের কথাও মাঝে মাঝে ভাবেন, ইংরেজদের সঙ্গে গলাগলি করেন। এত প্রতিপত্তি তাঁর কিসের জোরে?

এ টাকার জোরে। উনি কাপড় বা শেরি নিয়ে নয়, টাকা নিয়ে ব্যবসা করেন। টাকাই তাঁর মাল, টাকাই তাঁর শব। রথীন্দ্রহারখী যে বিপদে পড়ে তাকেই উনি টাকা ধার দেন, সুদে ষাটান।

জগৎপতিও ব্যবসা করবেন।

তাই তাঁর মনে হল আলীবর্দীর নিজামত এবার ডুবতে বসেছে। সময় থাকতেই পালানো দরকার নিজামত যদি ডুবুডুব না হয় তাহলে কি এমন করে নবাব এসে ইংরেজদের গলায় শাঙল দিয়ে টাকা বের করতেন?

পালাতে যদি হয় তাহলে একলা পালাবেন কেন? অনেক কুকাঙ্ক্ষের মধু কুটনী যদি গয়লানীকে সঙ্গে নিলেন, আর নিলেন সদির বোনখী অতসীকে। জগৎপতি এতদিনে এটি বুঝেছেন যেবাম-মতে সদি ভাল হবে, অন্য সময়ে অতসীকে নিয়ে সময় সুখে কাটবে।

নৌকো কবে পালাতে পালাতে দ্বীপপুরের ঘাটে নৌকো থামিয়ে তিনি মাসী-বোনখীকে কাপড় কিনে দিলেন, ছোড়া রুইমাছ কিনলেন। নৌকোয় উঠে বললেন, 'সদি, ভাল করে রাঁধ। জাত যাবে সে ভয় করিস নি। জাত গেলে আবার জাত হবে। তা ছাড়া কথায় বলে নৌকোয়, গঙ্গার বুকে কোন দোষ নেই। ভাল কবে রাঁধ।'

একবারও তাঁর মনে হল না দী জলেশ্বরী, মেয়ে ফলেশ্বরী, ভাই ইদীপতি, বোন নিদুলী, সকলকে কতখানি বিপদে ফেলে যাচ্ছেন।

মাণিক যেতে দেন নি, জামাই আনন্দী-রামের সঙ্গে কত দুর্ব্যবহার করেছেন। এমন কি দৌহিত্র বিশুনাথকে নিজের সম্পত্তি দেবেন বলে মেয়েকে দস্ততরে বনেছেন, 'তোমার শশুরবাড়ির সম্পত্তিতে আমি তুচ্ছজ্ঞান করি রে বুনি। শশুর-বাড়ির কথা তুই ভুলে যা।'

'ঠাকুর, বউ-মেয়ের কি ব্যবস্থা করে এলে?'

সদির কথা শুনে তিনি ভারি চটে গেলেন। বললেন, 'তোমার ভাত কি রে সদি? তারা দুটো মেয়ে-ছেলে বই ত' নয়, আমার ভাই-এর সংসারে থাকতে হয় থাকবে। নয়তো মেয়ে শশুরবাড়ি যাবে। বছরে দু'খানা ক'রে গ'ড়ে কাপড় আর দু'বেলা দু'মুঠো ভাত বেনন করে হয় জুটে যাবে।'

তাঁর কথায়-বার্তায় টাকার গবন, টাকার প্রভাপ, তা দেখে সদি একেবারে মিঠিয়ে গেল।

ফিসফিস করে অতসীকে বলল, 'তুই যেয়ে এই কাপড়টা ফেলে দিয়ে বেশ যত্ন করে কর্তার পা দুখানা টিপে দে। আমি বরঞ্চ রান্নাবান্না করি। ও মাঝিদাদা, ছোড়ার হাতে দাঁড়টা দিয়ে এদিকে এস। বাগাব জোগাড় কোথায় করব?'

মাঝি গভয়ে বলল, 'সে কি সদি তুই বামুনকে হাতের ভাত খাওয়াবি? পাপ হবে না?'

'হ'লে উনি বুঝেরে। ওনার জাত যদি উনি সেবে-জলে দিতে চায়, তাতে আমারই বা কি, তোমারই বা কি, মাঝিদাদা?'

মাঝি বিরক্ত হয়ে বলল, 'সে কথা সত্যি বটে। কথ্যবার্তা আমি সবই শুনেছি। উনি পরিবারকে ভাসিয়ে পালাচ্ছেন, সঙ্গে ইদিকে টাকা, উদিকে তুমি আর তোমার বোনখী। তা সবই যখন ভেসে গেল তখন আর কর্তার জাতটাই বা থাকে কেন? এ নতুন জিজ্ঞাস, গামনে গয়ানীর বাজাব। শুধাম হতে আব: যা সামগ্রী দরকার কিনে নিও। তবে আমাকে আর কিছু করতে বল না বাবু।'

জগৎপতি বেবিয়ে এসে বললেন, 'আ রে গণেশ, তোমার মুখে যে এখন টেড়াটেড়া কথা শুনি? ফুরান করবার সময় ত' এত কথা বলিস নি?'

মাঝিও চোখ গরম ক'বে বললে, 'কর্তা, এ বর্গীর হাস্যাতা লেগেছে থেকে মাঝিয়া বা আর ধর্মজ্ঞান নেই। যে পারছে সেই পালাচ্ছে, আর মাঝিমান্নারা তাদের কাছ থেকে গলায় গামছা দিয়ে টাকা নিচ্ছে। তা' আমাকে আপনি তেমন জুমুলি পাও নি। যেমন কথা দিয়েছ তেমন পৌছে দেব, কিন্তু এ যদি গয়লানীকে আমার সঙ্গে ছেনালী করতে বাবণ কর। আমার রাগ বড় জেরাদা ঠাকুর। আগে এতটা বুঝি নি যে, তুমি এমন অর্থ কবে পালাচ্ছ।'

জগৎপতি কি বলতে গিয়ে চুপ কবে গেলেন। খালি মৃদুভাবে বললেন, 'তুই বেটা নিম্মস নরকে মাঝি। গঙ্গার বুকে বামুনকে অপমান করলি?'

সময়টা যে খাবাপ কর্তা, যদি বছবে ছ'মাস টাকা টাকা শাকসবজী কিনে খেতে হয়, তা হলে গরীব মানুষের কথা একটু ক্লক-চড়া হবে বই কি। তা ছাড়া তোমাদের বামুনাই দেখে কর্তাঠাকুর আমরা গরীব মানুষ ছোট জাত, আমাদের আশ্পর্ধা এখন চড়চাড়া বাড়াচ্ছে।'

জগৎপতি সদির চিবুক ধরে বললেন, 'ওব কথা কানে নিল না। গণেশকে চটালে পবে মেয়ে-বুকে বসতে পারের, ছোট জাত। এখন আমাদের পালানো দরকার। ও দুটো কথা বললে কি তোমার গায়ে ফোকা পড়ল? নে, ফবাসভাঙায় গিয়েও তোকে পইছে, বাড়িটি, নানানিধি গয়না দেব। নৌকো তরতরিয়ে চল।

শুধু যে জগৎপতি পালাজের

তাই নয়, এখন অনেকেরই মনে হতে লাগল এ নিরীক্ষণের আধু বেশি দিন নয়। সবচেয়ে চিন্তার কারণ হল নবাবের বয়স বাড়ছে। এদিকে বয়স বাড়ছে, ওদিকে ধৈর্য কমছে। অথচ এখনই তাঁর ধৈর্য দবকাব ছিল।

একসময়ে তাঁর ধৈর্য ছিল অপরিণীত। সেই কবে আলমগীরের ছেলে মহম্মদ আজমের পিলখানার তাব নিয়ে থাকতেন, চোখের সামনে ছিল একটি মাত্র লক্ষ্য, ওপরে উঠতে হবে।

তখনই দিল্লীর মোগল শাহীর গোড়ায় ঘূর্ণ ধবে গিয়েছে। আলমগীর দাক্ষিণাত্যে, সবত্র বিশৃঙ্খলা, দাক্ষিণাত্যে আলমগীর তাকিবে থাকেন ১৬৮৬ দিকে। বাংলা থেকে মুশিদকুলি খাঁজনা পাঠাবে তবে তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীকে মাইনে দেবেন, অন্তঃপুরে বেগম আর বাদশাহাদীদের উপবাসে কাটে, তাঁদের দুঃখ লাঘব কববেন। বসে বসে আলমগীর

অপেক্ষা করেন, আবার একমনে, এক সঙ্কল্পে, 'মোগল সাম্রাজ্যের বনেদ ফাটাতে থাকেন যা দিয়ে দিয়ে। ওদিকে সেকেন্দর মোগলের মুকুট-রতন প্রপিতামহ আকবরের কীটদষ্ট কঙ্কাল যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ করে।

সেই থেকে নবাবের যাত্রা শুরু। সেদিন তিনি ছিলেন মির্জা মহম্মদ। তারপর ওয়ালাহাঙ্গী রিসালার এলেন, একদিন কটকে এসে মুশিদকুলির জামাই সুলতানউদ্দীনের প্রধান হিতৈষী হয়ে বসলেন। অসীম ধৈর্যে, বাংলার সিংহাসনে একদিন শূণ্ডরের জায়গায় জামাইকে বসালেন। আবার, সুলতানউদ্দীনের ছেলে সরকারজকে নিজেই নবাব করে, নিজেই সরিয়ে, সেই সিংহাসনে পা রাখলেন, যে সিংহাসন, সবাই বলে, এখনো কাঁদে। কার জন্যে কাঁদে কে জানে, তবে তার পাথরের গা বেয়ে জল পড়ে।

কই, এতদিনে ত' তাঁর ধৈর্য এতটুকু হারায় নি। এখন যেন ধৈর্য সহজে হারায়, এখন যেন বড় বেশি

জ্যোতিষে বিশ্বাস। সবাই বলতে লাগল ওঁর যা যা উন্নতি হয়েছে সবাই ত' ভাগ্যের দরায়, তাই, যেকোন ভাগ্যানুযায়ী মতই উনি জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন।

জগৎশেষ, মীরজাফর, সবাই অবাক হয়ে গেলেন। কি হল, এতদিনে যেন উনি ভেঙে পড়ছেন, নইলে রাজা জানকীরামের সঙ্গে এত গলায় গলায় কেন? জানকীরামের হাতে না কি এক অদ্ভুত জ্যোতিষী আছেন, যিনি সব বলে দিতে পারেন। সেই জন্যেই কি? কিছুই জানা গেল না, শুধু মুশিদাবাদের রাজপ্রাসাদের সেই প্রশস্ত ঘরে আলো জ্বলতে থাকল। সে আলোর কথা শুনে জগৎশেষ মুচকি হাসলেন। বললেন, 'ও আলোর রহস্য আমার জানা আছে। যেসব নবাব প্রজাদের ঘন পেতে চান, তাঁরাই ভাগ করেন যেন আলো জ্বলে রাত জেগে কতই দেশের কথা ভাবছেন। আসলে দেখ গে, নবাব বোধ হয় ঠিক সময় মতই বিশ্বাসে

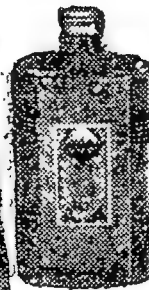
৫০৮



চুল পাকছে?

চুল পড়ছে??

চুল রক্ষা হচ্ছে???



বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যাথারাইডিন

হেয়ার অয়েল

মেথোই দেখুন না ...

বরষ আপনায় থাই হোক না কেন, এর ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা রাখে-চুল হয়ে উঠে পরিপুষ্ট-চিকনতা ও কমলীরতা বাড়ে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • দাদরা • চিত্র

গেছেন। বিশ্রাম না করলে ঐ
দ্রোহের শরীফ চিকিত কি?

কিন্তু গতি-গতিই নবাবের চোখে
বুন ছিল কি?

অনেক রাত অবধি ছোটবরের
দরজার পর্দায় দুটো ছায়া দোলে।
মুখোমুখি বসে ছায়ার কথা বলে।
নিচুগলায়, এড নিচুগলায়, যে দরজার
সামনে বসে যে প্রহরী থিমোয়, তারও
মনে হয় বাতাল ফিসফিস করছে।

‘কি বলেছিল, তোমার জ্যোতিষী
কি বলেছিল?’

একটি ছায়া নিরুত্তর।

‘সে কি জানত এমন হঠাৎ
জানতে হবে যে আমি একলা?’

‘বলেছিল।’

‘এ একলা থাকার বুঝি শেষ
নেই।’

‘এখনো এ দ্বন্দ্বোৎসাহন আছে,
প্রাণ আপনার কথায় প্রাণ দেবে।’

‘প্রাণ দেবে?’

ছায়া যেন ভয় পেয়ে গিয়েছে।
প্রাণ কে চায়। অনেক প্রাণ ত’
এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল, এখনো
হৃত্যুর শেষ নেই, আরো প্রাণ নিয়ে
কি হবে?’

‘প্রাণ দেবার কথা ত’ আমি
যিনি নি।’

এখনো ছায়ার হৃদয়ে অবিশ্বাস।
প্রাণ যারা দেয় তারা মানুষের জন্যে
দেয় কি? যে যখন সিংহাসনে
বসে, তার জন্যেই তখন সবাই প্রাণ
দিতে চায়। কিন্তু অবহেলে, স্বেচ্ছায়
ভালবেসে কে বা প্রাণ দিতে এগিয়ে
আসে। তবে সৈন্যদের আর সেনা-
পতিদের জমি, সোনা, প্রতীপত্তি
বারবার হাতে তুলে দিতে হয় কেন?

‘বড় কঠিন, বড় কঠিন, কারকে
আপন করা যায় না।’

তারপর বিরতি।

ছায়া দুটি কখন যেন সরে যায়।
কখন যেন বাসার এসে পর্দা সরায়,
আলো নেভায়। দূরে, কোথায়
যেন ঝাঁচায় পাখীগুলো ডাকতে থাকে।

বারান্নায় ঝটঝট শব্দ, শাঙ্গীরা পাহারা
বদল করে।

তারপর গভীর, গভীর নিঃশব্দতা
প্রশস্ত শয্যায় নিদ্রাহীন ছায়া। শান্তি
নেই, কোথাও শান্তি নেই। চিন্তার
পোকাবা মহাবতজ্ঞের ইতিহাসের
পাতাগুলো কুরকুর করে কাটছে।

একদিকে বিদ্রোহী আকগান নেতারা,
অন্যদিকে ভগ্নপতি মীরজাকর বার-
বার ছলেবলে বিদ্রোহ জানাতে চায়।
এদিকে রাজসাহীর রাজা রাসকান্ত,
দিনাজপুরের রাজা, মদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র
বিশুদ্ধ, মালভাগারীর ওপর আবোয়াব
ধাৰ্য করা হয়েছে।

কিন্তু ওঁদের জমিদারী ত’ গঙ্গার
পূবে, বগীয়া ত’ ওঁদের তেমন ক্ষতি
করে নি। আর, রাজ্যের প্রয়োজনে
আবোয়াব ধাৰ্য করা কি এই প্রথম?
মুশিদকুলি করে নি? - অস্ত্রাউদ্ধীন
করে নি? কিন্তু ওঁদের কথাই বা
মনে আসে কেন? মুশিদকুলি
কাটরার মসজিদে যত শক্তিতেই
শুবে থাকুক না কেন, হিন্দু জমি-
দারদের ও কথায় কথায় ‘বৈকুণ্ঠ’
দেখাত। কালুরায় আর ‘অন্য জমী-
দারদের অভিযানের যদি শক্তি থাকত
তবে ওর পোকায়-কাটা হাড় ক’খানা
যন্ত্রণায় ছটফট করবার কথা।

এদিকে এই ফিরিঙ্গী বণিকরা।
ওরা ফবাসী, ডাচ, পর্তুগীজ, আর্মেনী
আলিমান বেগেদের সঙ্গে বিনিবনাও
করবে না। বাণিজ্য করতে এসেছে,
কেবলই গড় বানাতে চায়, বাণিজ্য
করতে এসেছে, ওদিকে সৈন্য বাড়তে
চায়, বাণিজ্য করতে এসেছে, কেবলই
পাটনা আর কাশিমবাজার থেকে
বন্দুক, কামান জোগাড় করতে চায়।

আর তাদের কাছেই এখন
পালাতে চায় সবাই। কাশিমবাজারের
ঐ বাঙালী গোমস্তা আজ গিয়েছে,
কাল আরো কে কে যাবে তার ঠিক
নেই। মুশিদাবাদের সব টাকাঙালী
ব্যবসায়ীরা কি এরপরও থাকবে

বগীদের হাত থেকে আমরা নিরাপদ?
ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা।

বগীদের হাত থেকে কেউ নিরা-
পদ নয়। ওরা নরকের সৈন্য, ওরা
সর্বত্র আছে।

বিছানায় ছায়া নড়ল, পাশ ফিরল
নিদ্রাহীন, নিদ্রাহীন ছায়া। ওরা
এসে বাংলাকে ছারখারে দিল। চাষীর
চাম্ নেই, তাঁড়ির সুতো নেই,
কুমোরের চাক ঘোরে না, গল্পে গল্পে
ব্যাপারীরা কলরব করে না, মহাবত-
জ্ঞের মহান কীর্তির ইতিহাসের
পাতা কারা যেন কুবেকুরে কাটছে।
এ কারা অজ্ঞ কেটে ফেলছে। ঐ
অজ্ঞ দিয়ে হয়ত তাবা চুকে পড়বে
যারা মহাবতজ্ঞ আলীবর্দী খাঁর নাম
সিংহাসন থেকে টেনে নানায়ে। পরক-
রাজকে যে নামিয়েছিল তাকে
তিনি চেনেন। সূানের শেষে, বড়
আয়নায় বোঝ একবার কবে তার
গড়ে তাঁর দেখা হয়। মহাবত-
জ্ঞকে যাবা নামাতে চায়, অদৃষ্টের
সেই অদৃশ্য শক্তিরে কি তিনি চেনেন?
কোথায় লুকিয়ে আছে তারা?
বগীদের নিষ্ঠুর মুখে? বারওয়েলদের
কলকাতার কাউন্সিলে? বাংলার
লক্ষ লক্ষ মানুষের হাহাকারের মধ্যে?
না কাছে, খুব কাছে, এত কাছে যে
চোখে পড়ে না? না তাঁর স্বপ্নের
কারণ হবে যে সে-ও সেই একই
ব্যক্তি, যার সঙ্গে প্রভাতের দর্পণে
সূন্যাস্তে তাঁর দেখা হবে?

ছায়া ঘুমোয় না। ছায়া মনে
মনে শক্তি গুণ্য করে। এক অশাসিত
শক্তিপূর্ণ, সচ্ছল সাম্রাজ্য দিয়ে যেতে
হবে দৌহিড়ের হাতে। তারপর
খোঁসবাগে, মায়ের সমাধির পায়ে
কাছে শুয়ে চেনে ঘুম দেওয়া যাবে।
নিশ্চিন্ত, সুন্দর ঘুম।

শান্তি। সচ্ছল, সুন্দর সাম্রাজ্য।
এক্ষণে শুনে যেদিনীপুণে গঙ্গাজল-
জনপদে, ভূমিপতি মায়ের আদিবাসী

লোড় চাষীদের প্রধান অধিকার হয়ে গেল।

‘আপনি কি বলছেন মহাশয়, এতেই আমাদের শান্তি আসবে?’

ভূমিপতি রায়েব ডান হাত, তাঁর প্রধান কর্মচারী, আর্থিক প্রশাসকের আনন্দীরাম অধিকার হয়ে গেলেন। বললেন, ‘তোমরা বড় নিমকহারাম। ইনি তোমাদের পালক, তোমাদের রাজা। তোমাদের ইনি বীজধান, হাল-লাঙল, চামের বলদ সব এনে এমনি এমনি দিচ্ছেন। চাষীরা চাষ কবলে দেশে শান্তি আসবে না?’

‘না।’

বৃদ্ধ দৃঢ় স্ববে বলল, ‘তুমি ঠাকুর, রাজার মতই ভাল লোক। তাই তাই এতেই শান্তি আসবে। কেমন কবে আসবে বল? আমরা কি জাতচাষী? আমরা যে লোড়, শিকার আমাদের জাতবর্ষ ছিল। বীরমুণ্ডা আমাদের প্রধান ছিল, নরবার-পর তাকেই আমরা দেবতা বলে পূজা করি। আজ লোড়দের ওপর, আমাদের মত এমন অনেক আদি-জাতের ওপর ভূমিপতি বায়, কৃষক শ্রমিতি রাজত্ব করে। কিন্তু আমরা মন থেকে মনে নিতে পারি না ঠাকুর, আমরা জানি বীরমুণ্ডা আবার একদিন হাতীর পিঠে চড়ে আসবে। বলবে হো লোড় জাতের মরদস্তলো, তোদের বক্ত কি এই দেড়শো বছরে ঘুমিয়ে গেছে? তোদের মনে নেই, ওরা আমাদের জাতব্যবসা শিকার করবার দখল কেড়ে নেয়? আমাদের লবণ তৈবির আড়িয়া সরকারে খাণ্ড কবে নেয়? ওঠ, তাঁর নে, ধনুক নে, আমি এখন মানুষ দেখে নেই। তাই আমার শরীবে এখন লবণ হাতীর বল। আমাকে ওরা কিছু করতে পারবে না। চল, আমরা-এ. আড়িয়া (নিশান) ওঠা, এ-এ. নীপুবে, এ-এ. বীন্দ্র, আমরা-এ. জাতবা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে

ছিল, আর যাবা এসেছে তারা ত’ বাইরের মানুষ রে। দেখতে পাল না ওরা এখন আমাদের দেবতাদের পূজা করে, আমাদের সিনি, বোরো, বুড়াইচণ্ডীর থানে এসে মাথা কোটে? দেখিস নি আমাদের ধর্মঠাকুরকে এখন ওরা মাটির ঘোড়া মাটির হাতী দেয়? ওদের মাথতে মাথতে নিয়ে যা দক্ষিণে। সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দে। এ দেশে আমরা থাকব, আমরা কালো মানুষরা, হ্যাঁ, আমাদের দখল লক্ষ বছরের, ওরা ত’ সেদিন এসেছে। হ্যাঁ ঠাকুর, বীরমুণ্ডা বেদিন উক দেবে, সেদিনই আমাদের যেতে হবে। তখন ভূমিপতি রায়েব চাম্বাস কে করবে? কে রাজার গোলায় মাথায় করে বান বয়ে দেবে?’

এ কথা শুনে আনন্দীরাম যেন অধিকার হয়ে গেলেন। কতদিন ধরে এদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, পাঠান, মোগল এসেছে তিনি জানেন না। কিন্তু এতদিনেও তারা, এমন করে মিলে গিয়েও এদের মন পায় নি?

বীরমুণ্ডা আসবে তবে তিনি মনের অস্বস্তি চেপে নেয়ে জিগোস করলেন।

‘নিশ্চয়। এখনই ত গোদ-পিরাসাল আর ঝাঝিও, দিকে দিয়ে বীরমুণ্ডার পূজা হচ্ছে।’

‘তা সে যবে আসবে তবে আসবে। এখন চাষ কবলি ত’?’

‘তা করব। তবে চাষী চাষ কবলে তাব অর্থ কোথায়? আমরা বলব ত’ ঐ রাজার গড়খানার চেয়েও বেশি। আমি ত’ জন্মকাল চাষী অর্থ দেখি নি। সেই কোমবে তান, হাতে লাঙল, অজন্মায় রাজাব দোটে ভিখারী, আর অন্যসময়ে কোনসময়ে প্রাণ ধরে রাখা।’

না। গড়খানার প্রানের বুঁয় আদিবাসী চাষী রায় দিয়ে নিল বাংলায় যারা লাঙল ঠেলে তাদের অর্থ সহজে হবাব নয়। আনন্দীরামের চিন্তা হয় সবাই, সব চাষী কি এককথই তাই? তা যদি হবে, তবে এখানে ভূমিপতি, ওখানে নবাব, অর্থের রাজ্য গড়বে কি করে? (ক্রমশঃ)

মনমাজানো সুগন্ধি

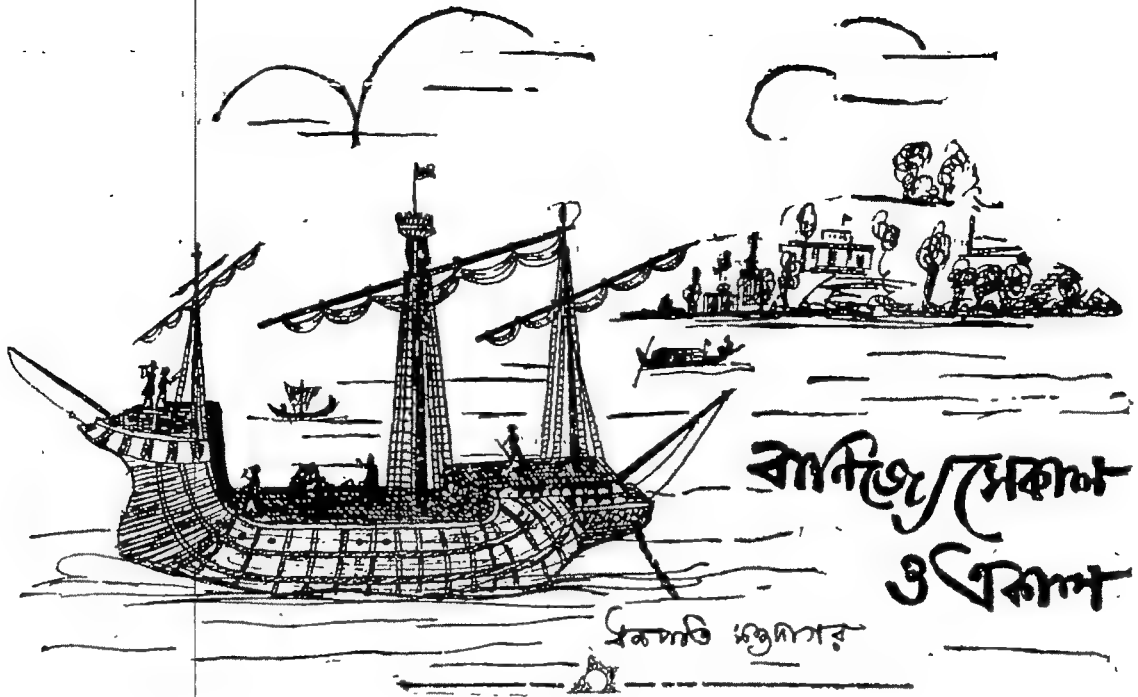
প্রিয়াম মধুর স্নিগ্ধ গন্ধ শরীরের গ্লানি দূর করে মনে আনন্দের দোলা-আপনাকে করে তোলে সজীব আর প্রফুল্ল।

প্রিয়া সেন্ট

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী





(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ একচত্বারিংশ প্রবাহ ॥

এবারে এই বাঙালীর মাটি, বাংলার সমুদ্র উপকূল কেমন করে ইংরেজদের বাণিজ্যের লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল, কেমন করে গঞ্জে গঞ্জে, বন্দরে বন্দরে, এক-একটি করে কুঠি গড়ে উঠেছিল—সেই বিচিত্র ও বিস্ময়কর ইতিহাস বলবো।

কতদূরে সেই শ্বেতদ্বীপ। এই শ্বেতদ্বীপ থেকে যে পণ্যতরী বাংলার মাটি প্রথম স্পর্শ কবেছিল, সেদিন বাঙালীরা বিগ্ৰাস কবেছিল, শুধু বৃষ্টি মসলিন আর মশলার খোঁজে এত দূর দেশের দখিড় প্রার্থীরা এসেছে তাদের দেশে! কিজ—

মশলার স্ফুগ্ধে তারা ভুলে যায় নি তাদের অন্তরের কুটিলতম সেই দৃষ্টি-লঙ্ঘি। শুধু ব্যবসা নয়—উপনিবেশ—উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের বণিকের ছদ্মবেশের আড়ালে ছিল উপনিবেশ-শিকারীর হিংস্র মূর্তি। তাই—

তাই তারা গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনার দেশে এসে একবারও তাদের বিপুল ও

অপার সৌন্দর্যের দিকে তাকায় নি; কখনো শোনে নি বাংলার গণমানুষের হৃৎস্পন্দন। শুধু এক লক্ষ্য—এক উদ্দেশ্য—গড়তে হবে কুঠি, গড়তে হবে দুর্গ, স্থাপিত করতে হবে উপনিবেশ। আর—

সময়। ষাট বলে কাল—মহাকাল। এই কাল—এইসময়ও তাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। পলাশীর মাঠে দেশের স্বাধীনতার সূর্য সকল জ্বালা নিয়ে একবার জ্বলে উঠেই, গভীর কলঙ্কের বেদনাব ভেতবে চিরকালের মত ডুবে গিয়েছিল।

অনৈকো, বিচ্ছিন্ন, অগতর্ক আর মাৎস্য ন্যায়ের বোর অন্ধকারে আছন্ন দেশ। দিকে দিকে দুঃখ-দুর্দিনের পুঞ্জীভূত অমানিশা। মহাশূন্যানের অন্ধকাবে প্রেতের মত এসে দাঁড়িয়েছিল মুষ্টিমেয় এই বিদেশী বণিকের দল। বণিক নয়—লুণ্ঠক।

সে যাই হোক। বাংলা দেশের এই কলকাতার মাটিতে ইংরেজরা প্রথম এসেছিলো আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন শো বছর আগে।

In the year, 1633, English visited Bengal. President of company's factory at Surat obtained phirmaund from Mughal dated 24th February for liberty of trade in province of Bengal, ---

মোগল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে বসে দেশের দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনে ছিলেন। তিনি ফরমান দিয়েছিলেন বাংলা দেশে অবাধ বাণিজ্যের। ইংরেজ বণিকরা আজ হুগলী, কাল কলকাতায়, কাল ডায়মণ্ডহারবারে ব্যবসা করতে লাগল। কাশিমবাজারে, বালেশ্বরে, পাটনায় তারা কুঠি গড়ে তুলল। কুঠি অর্থে জিনিস কিনে মজুত করে রাখার জায়গা। আবার এইখান থেকেই তারা তাদের পণ্য বিক্রি করে দিত মহাজনের কাছে। এই কুঠিয় ভেতরেই থাকতো তাদের আশ্রয়স্থান আর অন্য অশ্রয়স্থান।

এক-একটা করে দিন পার হয়ে যেতে লাগল। বড় চতুর আর

এই ইংরেজ। তারা বাংলার ছবেদার থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন একেবারে দিল্লীর সম্রাটকে পর্যন্ত উপঢৌকন দিয়ে দিয়ে খুশি করে রাখতো। এই উপঢৌকনের ফল পেত আস্ত আস্তে। কথায় বলে সবুরে মোড়ায় ফলে। এই ধৈর্য বস্তুটি ইংবেজদের চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। চুপ করে বৈধ ধরে বসে থাকতো।

ইংরেজরা কলকাতায় আসার দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর বাংলা দেশের সমস্ত নদীতে তাদের বজরা চালানোর অবাধ অনুমতি পেয়েছিল। শুধু কলকাতাকে বেষ্টিত করে গাবা বাংলায় ব্যবসাকে প্রসারিত করার জন্যই কোম্পানী কলকাতাকে একটি আলাদা সম্পূর্ণ পৃথক কনস্টিটুয়েন্সী করেছিল। কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ইংবেজ অধ্যুষিত হয়ে উঠেছিল এবং তাদের বাণিজ্যবেষ্টিত হিসেবে ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পুরানো কালের এক জীর্ণ ও মলিন দলিলে পাওয়া যাচ্ছে—

Fulta is remarkable for being the centre of trade of English—সিরাজদৌল। যখন কলকাতার ওপর আক্রমণ চালানেন, যখন বুঝতে পেরেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী ইংবেজের সন্ধি-মস্তিষ্কে কলকাতাকে নিয়েই কূটনীতি ধুমায়িত হয়ে উঠছে, তখন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কলকাতায় ইংবেজদের বাণিজ্য প্রচেষ্টার ওপর চরম আঘাত হেনেছিলেন। এইসময় ইংবেজরা ফলতায় কুঠি নির্মাণ করেছিল। ধীরে ধীরে একটা বাজারও গড়ে তুলেছিল।

ফলতার পর বরানগর। চুচুড়ার কুঠির শাখা হিসেবে বরানগরে একটি কুঠি নির্মাণ করেছিল। এখানে ঘাঙালী গওদাগররা আসতো তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে—নিয়ে আসতো নীল, পিসগুড়স্ আর বজের বিপুল পরিমাণ।

ধাকী বাজারের কুঠিতেও একসময় ঘাঙালী গওদাগররা তাদের পণ্য বিক্রি করতে পাবলে খুশি হতো। দূর দূর গ্রাম থেকে চাষীরা আসতো নীল নিয়ে, আসত আদা নিয়ে। বহু বহিরাগত লোক আসতো বলেই একটি স্থায়ী বাজার গড়ে উঠেছিল।

ইংবেজদের চুচুড়ার বাণিজ্য-ক্ষেত্রের ওপর নবাবের আক্রোশ অত্যন্ত বেশি ছিল। বাবেবারে নবাব সৈন্যরা চুচুড়ার কুঠির ওপর মস্ত হাতীর মত ক্রোধ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো। তাই তারা চুচুড়া থেকে কুঠি সরিয়ে নিয়ে কলকাতায় এসে জাঁকিয়ে বসেছিল।

আর প্রাচীনকালের বাংলায় বাণিজ্যের ইতিবৃত্তে ডায়মণ্ডহারবার বন্দরের কথা নিশ্চয়ই বলতে হয়—এই সেই ডায়মণ্ডহারবার, যেখানে আদিপন্থ প্রসারিত বিশাল জনবাসি ছ-ছ বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে, যেখানে দূর সমুদ্রগামী জাহাজ প্রথমে মাটির স্পর্শ হারিয়ে কেলে অকূল দরিয়ায় ডালে। সেকালের প্রতিটি ইংল্যান্ডগামী জাহাজ এইখানে একবার

ধাতাব হিসেবে লেখা হতো—লেখা হতো বাংলার কোন কোন জেলা থেকে কি কি কেনা হয়েছে। সেকালের একটি জাহাজ যতটা মাল নিতে পারতো তান চলেও বেশি পণ্য থাকলে সেই কুঠিতে দেওলো জমা থাকতো। তাবপর ধীরে-দুর্ধে স্থলপথে সেই পণ্যসম্ভারকে কলকাতার কুঠিতে ফেরত পঠাত। আবার যখন ইংল্যান্ড থেকে তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে এদেশে আসতো—তখন এই ডায়মণ্ডহারবারে শোহাজ খানতো আর কুঠির খাতাব শালির আঁচড় পড়তো : কি কি জিনিষ ই ল্যান্ড থেকে এল। এই ডায়মণ্ডহারবারের কুঠিই তাদের clearing house ছিল।

ডায়মণ্ডহারবারের জন্যই বলবাতায় ঘাঙালীর বাণিজ্য ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ঘাঙালী গওদাগরদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল কলকাতায় এসে কেনন করে তাদের জিনিষ বিক্রি করা যায়। ইংবেজরা তখন (১৬৯৮) খৃস্টাব্দে সূতনুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছে।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নানপুৰ

বেঙ্গলপুৰ - জীনগর - গোহাটী

In the year 1698 Nabab granted Nishan for settlement in Chutanutte, Govindapur and Calcutta.

ইংরেজরা কলকাতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি পেয়েই এক-একটা করে গৌণ নির্মাণ করতে লাগল। মনেব মত করে গড়তে লাগল শহর কলকাতা। এই সময় তারা খুব চড়া দামে জিনিস কিনতো। বাঙালী ব্যবসায়ীদের লাভের অঙ্ক থাকতো বেশ মোটা। তাই সমস্ত ব্যবসায়ীরা লক্ষ্য ছিল যেমন করে হোক কলকাতায় তাদের পণ্যসস্তার আশ্রয় কবাব।

দেখতে দেখতে কেটে গেল চার বছর। এসে পড়ল ১৭০২ সন। কলকাতায় গড়ে উঠল ফোর্ট উইলিয়ম। আর সূতানুটিতে, বালেশ্বরে, ফার্মিষাবাদে, ঢাকায়, ছগলীতে, আলদহে, রাজমহলে আর পাটনায় গড়ে উঠল ইংরেজদের কুঠি অর্থাৎ বাণিজ্যকেন্দ্র।

পার হয়ে গেল—কেটে গেল আরও পাঁচ বছর। বোম্বাই বংশের প্রথম শক্তিশালী শত্রুটি আউরঙ্গজেবের

মৃত্যু হলো। দেশজুড়ে অন্ধ হলো অরাজকতা। দিকে দিকে দুর্দিন আর দুর্ভোগের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠল। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যারা শুধু দুহাতে টাকা রোজগার কবতে এসেছিল তারা এই সুযোগ ছাড়ল না।

Auranjeb died in the February of 1707. He was the last able monarch of of Mughal dynasty. His absence actually paved the way of extensive control of trade in Bengal by English.

আরও আট বছর পর একটা অন্তত ঘটনার কথা পাওয়া যায় পুরানো ইতিহাসে। এক, দুই পাউণ্ড নয় ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের এক প্রেজেন্টেশন অর্থাৎ উপঢৌকন নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি রওনা হলো দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাটের কাছে।

Presentation of nearly 30,000. includes clock, glassware, toys, woollens

silk. They submitted a petition, seeking permission for trade all other provinces except Bengal.

শুধু প্রীতির আতিশয্যে নয়! নিছকই নিজেদের স্বার্থে। ঠিক তারপরের বছর ১৭১৬ সালের জানুয়ারী মাসেই ইংরেজদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছিল।

অন্যান্য প্রদেশে বাণিজ্য করার যত চেষ্টাই করুক তবুও—

Bengal with the adjacent provinces, for exceeds the other presidencies in population, wealth, and rich production for commerce and is the centre of attraction of British power in the East.

বঙ্গদেশ। গোনার দেশ। বাংলার লোকসংখ্যা, বাংলার প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক সম্পদ অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশি। তাই মূলত তারতবর্ষে—ইংরেজদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল এই বাংলা দেশে।

(ক্রমঃ)

হাসি-কান্নার মাঠ

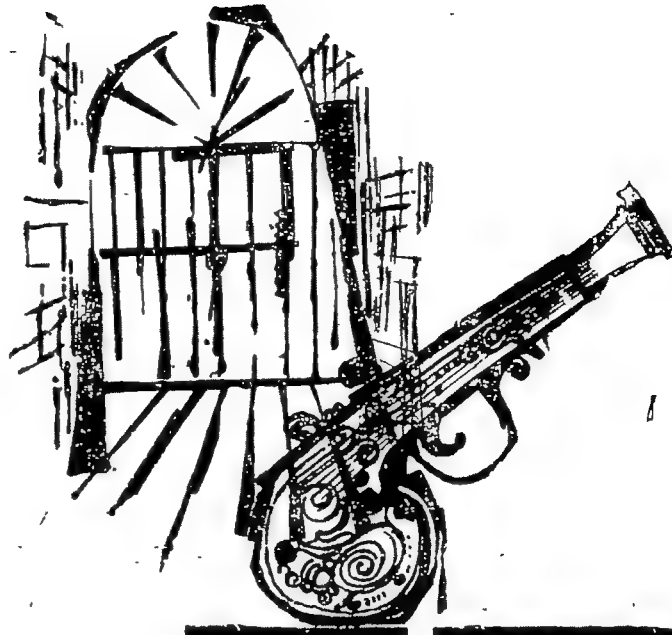
বারেখর বনু

দাঁড়াও সাব্বী,
খানাপু তোমার রথ।
এবারে প্রস্তুত আমি ক্ষ অকালিন,
আর একবার দেখে যাও এই নগরজন!

অনেক বক্তের কান্না জীবন্ত সমাধি—
ভিক্ষে যানে নোনা গন্ধ মাটির কাঁপুলি
হাসি ও কান্নার মাঠে সবাই জোয়ার
উথান-পতন হবে এতে কি বিস্ময়!

চালাও চালাও রথ উজ্জ্বল আকাশে।
শূন্যে শূন্যে মহাশূন্যে দুর্গম প্রান্তরে
কিংবা অন্য কোন দেশে
যেখানেতে পৃথিবীর
সাদা কালো নীল জল গেল্লমা ও মেটে,
উজ্জ্বল একান্ত্রধ্বনি একটি প্রবাহ।

[বাংলা দেশের বিপুনের ইতিহাস
স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পঞ্চাশ বৎসর
জুড়ে বিস্তৃত। বাস্তবিক ক্ষেত্রে
এ-ইতিহাস একাধিক গুপ্ত সনিতির
কর্ম-ইতিহাস। কোন একক ব্যক্তির পক্ষে
তাঁর দলের ইতিহাসই সবটুকু জানা
নেই। সমগ্র দলগুলোর সম্পূর্ণ ইতিহাস
তাঁই যে-কোন একজন বিপুবীর পক্ষেও
লেখা অসম্ভব। এ ইতিহাস সংঘটিত
হয়েছে জনসাধারণের অজ্ঞাতে। কেবল
ঘটনাগুলো ঘটেছে লোকচক্ষুর কাছে।
এর ক্রমবিকাশ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের প্রতি
মুহূর্তে ব্যাপ্ত। ইহা প্রাণপুষ্ট হয়েছে
বহু মহত্ব কবীর শ্রেষ্ঠতম কর্মলব্ধে
অনবদ্য অর্থে। ইতিহাস সৃষ্টির কর্ম-
শালার কর্মীরা পরস্পর পবনস্বের
গোপন কর্ম অপ্রয়োজনে-জানতেন না।
যতটা জানতেন তাও তাঁরা মস্তগুপ্তি
রক্ষার নিয়মে নিজেদের কাছে গোপন
রাখতেই অভ্যস্ত ছিলেন।



সবার অনক্ষে হুগো ক্রিমার রক্ষিত-স্বাধীনতা

এখন দেশ যেভাবেই হোক স্বাধীন
হয়েছে। অতীত-বিপুনের সঠিক
ইতিহাস রচিত হওয়া এখন জাতির
প্রয়োজন। কিন্তু নিজেদের স্মৃতি থেকে,
সম্মুখে নানা ঘটনা উদ্ধার করে যাঁরা
ইতিহাস বলতে পারেন তাঁদের অনেকে
আজ ইহজগতে নেই। আমাদের
চতুর্দিকে এখনো যাঁরা আছেন, কালের
ধরানুসারে, তাঁরাও ক্রমে ক্রমে হারিয়ে
যাবেন। কিন্তু এ বিষয়ে অবহিত
হবার সময় এখনো আছে। এখনো
বাংলার বিপুব-ইতিহাস লিখিত হবার
সুযোগ একেবারে বিনষ্ট হয় নি।
নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখতে
হলে প্রত্যেকটি অতীত দলের সুযোগ্য
কর্মীদের একত্রিত হতে হবে। তাঁদের
চোঁচ নানাদিক থেকে বহু তথ্য এখনো
সংগৃহীত হতে পারে। কিন্তু কেবল
তাঁদের উদ্যমেই এ কাজ সম্ভব নয়,
যেখোঁ উদ্যোগ প্রয়োজন।

জানি না বিপুবী নেতারা একত্রিত
হয়ে কোনদিন এ চেষ্টা করতে পারবেন
কি না। কাবণ, রাজনীতিক ও ব্যক্তিক
নানা স্বার্থে অনেকে তাঁদের পূর্ব সন্তাকেও
হয়তো ধুঁছে পাবেন না। অপর

স্বদেশপ্রেম ও বিপুবীসত্তা ব্যতীত কেহ
বিপুবের স্বার্থে ইতিহাস রচনায় সার্থক
হবেন না বললে হয়তো তুল বলা হবে
না। অধিকন্তু এও জানি না দেশবাসী
অর্থ ও উৎসাহ দিয়ে তাঁদের উদ্যোগকে
সাহায্য করবেন কি না। কিন্তু এখনই
কাজ শুরু না করলে ক্রমশঃ এমন একদিন
সহজেই আসবে, যখন প্রত্যক্ষদর্শী
বিপুবীদের অস্তিত্ব থাকবে না। এবং
স্বভাবতই বিপুবের কর্মকাণ্ড তবিঘাতে
'ইতিহাসের' স্তর থেকে 'রূপকথা'র
স্তরে চলে যাবে।

আমার দৃষ্টি সামান্য। ক্ষমতা
অপ্রচুর। আমি যতটুকু জানি বা
জানতে পারি তাই কিছুটা বন্ধু-বান্ধবদের
সহযোগিতায় 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র
পৃষ্ঠায় লেখার চেষ্টা করবো। আমার
রচনায় বাংলা বিপুবীদের কর্ম-
ইতিহাসের মাধ্যমে বিভিন্ন দলগুলোর
অনুপ-বিস্তার কথা থাকবে। স্বভাবতই
আমি যে-দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তাই
অজ্ঞাত ঘটনা সম্পর্কে অধিক আলোকপাত
করতে পারব। আমি প্রধানত ব্যক্তি
ও ঘটনা অবলম্বনেই বিপুবের কথা

লিখবো। ইতিপূর্বে এ-চেষ্টা আমি
'বিপুবী বাংলা' পত্রের মাধ্যমে শুরু
করেছিলাম।

যেসব বীরবান ব্যক্তি সবার অনক্ষে
মহৎ কর্ম-কাহিনী রচনা করে গেছেন,
তাঁদের পুণ্যকথা শুনে তাঁদের গাধন-
তীর্থেব পানে যদি আলকের তরুণ-
তরুণীরা শ্রদ্ধায় ফিরে তাকায তাহলেই
আমার শ্রম সার্থক হবে। দেশের
স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস যাঁরা রচনা
করে গেছেন, তাঁদের জীবনে 'ভীবন-
লাভ' না কবলে নব স্বাধীনতা দফা
করান ক্ষমতা আজকের তরুণ-তরুণীদের
আয়ত্তে আসবে না। এই মত্যা বৃদ্ধবার
সময় সমাগত।]

হুগো ক্রিমার

১৯১৪ সন।

ভারতীয় বিপুবীরা ইংরাজ-জার্মান
মহাযুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা স্থির
করলেন। 'জার্মান-মডেল' তাবই নাম।
কিন্তু ইংরাজের বিরুদ্ধে জার্মানি সাহায্য
নিতে হলে নিজেদেরও প্রস্তুত হতে

হবে। উক্ত ভাষাতে রাসবিহারী বসু এবং বাংলা দেশে মতীন মুখার্জীর বিপ্লব-প্রস্তুতি, ইতিহাস-বিখ্যাত। বিপ্লবীর ধর্ম হলো শূন্যের মধ্যেও বস্তুকে ধুঁজে বার করা, 'নার' মধ্যেও 'হাঁ'-কে খুঁজি করা।

বাংলার বিপ্লবী দলগুলি সাধারণত কাছের দুটি পার্টিতে পরিচিত ছিল। সমগ্র বাংলার জেলায় জেলায় এককালে যেসব বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল তাদের দলসমাবেশে 'মুগাস্তব পার্টি' নামে পরিচিত হয়। ডাঃ ভূপেন দত্ত (তৎকালীন অধ্যক্ষ ডক্টর নন) সম্পাদিত তৎকালীন 'মুগাস্তব' পত্রিকার নামানুসাবেই পুলিশ প্রথমে এই দলসমাবেশের উক্ত নামকরণ করে।

মহা কলকাতায় হরিশ শিকদার ও বিপ্লবী গোপাল মহাশয়ের 'আত্মোন্নতি দল' স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চললেও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে মুগাস্তবের সঙ্গে মিলিত হত। হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'মুক্তিগণ' (পরিশেষে পরিচিত বেঙ্গল ডনাস্টিয়ার্স এবং শ্রীসংঘ) পূর্বে 'আত্মোন্নতি' এবং 'পূর্বাপর' 'মুগাস্তব'-এর সঙ্গে সম্ভাব ও সহযোগিতা রেখে কাজ করেছে।

এই মুগাস্তব পার্টি ব্যতীত অপর সুবৃহৎ দলটির নাম ছিল 'অনুশীলন সমিতি'। এর প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল বাংলার সর্বত্র সগোববে বর্তমান। --সবগুলি দলেরই বাংলার বাইরেও অধ্যক্ষ পাখা-প্রশাখা বিস্তারলাভ করেছিল।

১৯১৪ সনেরই এক নিশীথে বউবাজারস্থ ছাতাওয়াল গলির এক আড্ডায় মুগাস্তব, আত্মোন্নতি ও মুক্তিগণের নেতৃবৃন্দ সমবেত হলেন। এরা হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কলকাতাস্থ প্রতিনিধি শ্রীশচন্দ্র পাল প্রদত্ত একটি প্রস্তাব আলোচনা করবেন।

শ্রীশচন্দ্র পাল জনৈক দুর্ধর্ম কর্মনেতা। তাঁর বাড়ি ছিল ঢাকা জিলার মূলবর্গ গ্রামে, কিন্তু বৈপ্লবিক কর্মস্থল ছিল প্রধানত কলকাতায়।

উল্লিখিত গোপন বৈঠকে সমবেত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে শ্রীশ পাল যে প্রস্তাব শোনালেন তার মর্মকথা হলো:

বড়া কোম্পানীর কেরানি বউবাজারের 'হাবু ভাই'য়ের (শ্রীশ মিত্র) কাছে সংবাদ পাওয়া গেছে যে, এ বড়া কোম্পানীর জন্য বহু অস্ত্রশস্ত্র কাস্টমস হাউসে এসেছে। এ অস্ত্রগুলোর মধ্যে তিব্বতেব দলদাঁট নামের চাহিদা মত এসেছে পকাশটি মাউজার পিস্তল, পকাশটি অতিরিক্ত স্প্রিং এবং পিস্তলের এমন ধারার পকাশটি খাপ খাচ্ছে সাহায্যে পিস্তলগুলোকে রাইফেল-এর মত বড় করে ব্যবহার করা চলে। এ খাপগুলোই একাধারে বন্দুকের কুঁদা মত মাউজার পিস্তলের কুঁদা ও খাপের কাজ চালিয়ে থাকে। এ ছাড়া এসেছে পকাশ হাজার কাতুজ। --শ্রীশবাবু মতে একেই বলা হয় সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ গ্রহণ না করলে যে ভুল হবে তা আর শোধরান যাবে না।

উক্ত আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন নরেন ভট্টাচার্য (প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়), নরেন ঘোষচৌধুরী, অনুকূল মুখার্জী, হরিদাস দত্ত, আত্মতোষ রায় (পাবনা), শ্রীশ মিত্র (হাবুভাই), স্বর্গেন দাস (চাবগাছ গ্রাম, কুমিল্লা), অরেশ চক্রবর্তী (বরিশাল), জগৎ এবং মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র ছাত্র বিমানচন্দ্র (কলকাতা)। কিন্তু দিনেদুপুরে কলকাতার রাজপথে কিভাবে যে এই দুঃসাহসিক কাজ হাসিল করা সম্ভব—তা এদের অনেকেই ধারণা করতে পারলেন না। উপস্থিত বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম নরেন ভট্টাচার্য ও নরেন ঘোষচৌধুরী এ প্রচেষ্টার চিন্তাকে পাগলামী মনে করে সভাস্থল ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু জাব সকলে সেদিন শ্রীশ পাল মহাশয়ের বাড়ি ময় মূর্তির মধ্যে যেন দুর্ধর্ম যৌবনের এক সার্থক রূপশিখা দেখতে পেলেন। তাই তাঁরা সকল কর্ম-দায়িত্ব শ্রীশচন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত

করে বুশি হলেন। এভাবে বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসে এত বড় দুঃসাহসিক যাকশনের (কাজ) সফল রূপনা কেউ করেন নি। --উনিশ শ' চোদ্দ সাল—এই বৎসরই বুশি পৃথিবীর নির্ধারিত দেশগুলোয় বিপ্লবের জয়স্বজা উড়িয়ে দেবার শুভকাল। --

শ্রীশচন্দ্রকে আজ বাংলা দেশে কেউ চেনে না। বাঙালী বিপ্লবীদের কাছেও তিনি সে যুগেও তেমন করে পরিচিত ছিলেন না। কারণ এই ব্যক্তি সে যুগে সবার অদৃশ্যে ছোটবড় সকল কাজে নিপুণ থাকতেন। গুপ্ত-সমিতি গোপন নেতাক্ষেপেই তাঁর কর্মবহুল জীবন বহুদিন হল শেষ হয়ে গেছে। --

শ্রীশচন্দ্রকে সর্বপ্রথম এক দুঃসহ কর্মে সার্থক বিপ্লবীরূপে নিপুণ হতে দেখা যায় ১৯০৮ সনের ৯ই নভেম্বরের ভয়ঙ্কর এক লগ্নে।

১৯০৮ সনের এপ্রিল মাসে মজঃফরপুরের ঘটনা ঘটে গেছে। প্রকুর চাকী পুলিশের হাতে ধরা পড়তেই নিজেব পিস্তলের গুলীতে নিজেবকে নিঃশেষ করে বাংলার শহীদ-অগ্রদূতের আপনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু এত তরুণ বীরকে প্রেস্তার করেছে যে পুলিশ কর্মচারী তাকে তো শাস্তি পেতেই হবে। বিপ্লবী শ্রীশ পাল উক্ত পুলিশ কর্মচারী নন্দলাল ব্যানার্জীকে ছেড়ে দিলেন না। বিপ্লব-সংস্কার কঠিন শাস্তি বিপ্লব-ইতিহাসে স্বাক্ষরিত হল। শ্রীশচন্দ্র নন্দলালকে কলকাতার সাব-পেণ্টাইন লেনে গুলীর আঘাতে ধুলোর লুপ্তিত করলেন। পুলিশ নন্দলাল বিপ্লবীর বিচাবে মৃত্যুদণ্ড লাভ করে দেশদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

শ্রীশবাবুকে কেউ ধবতে পারল না। পুলিশ তো দূরের কথা, বিপ্লবী দলের দু-চারজন ছাড়া কে বা কারা যে এই কাজটি করেছেন, তা অপর বিপ্লবীদের কাছেও অজানা রয়ে গেল।

দাপ্তরিক বসমতী

এই শীশচন্দ্রই হেমচন্দ্রের নৃত্তি-গণ্য দলের কলকাতাস্থ প্রতিনিধি-রূপে ১৯১৪ সালে গংগোপনে বহুৎ বসজিলায় চকল হয়ে কলকাতার যুকে অপেক্ষা করছিলেন।—প্রাপ্তি স্বীকার সমাগত হল। সত্যিই হরিদাস দত্ত রডা শত্রু সংগ্রহ-কর্মে তাঁর গড়ে যুক্ত হলেন। কী কুশল কর্মকমতার পরিচয় এই দুটি বিপ্লবী এবং আত্মোন্নতি দলের হাবু মিঞা আজ থেকে একাদ বৎসর পূর্বে বিপ্লবীর ইতিহাসে স্বাক্ষরিত করে গেছেন, তা মানবী ক্রমশ জানতে পারবো।

॥ দুই ॥

রডা-শত্রু সংগ্রহের পরিকল্পনা শীশচন্দ্রের মাধ্যমে এসে গেছে। এ পরিকল্পনাকে রূপ দেবার কর্মে বহু-রূপে গড়ে জুটিয়েছেন তিনি কতিপয় বেরোয়া যুবক। তাঁদের মধ্যে—

‘জীবন নৃত্য পায়ের ভূতা,

চিত্ত ভাবনাহীন।’

যতীন মুখার্জী, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, হরিশ শিকদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমর্থনে শ্রীশবাবু যে অকটিন কাজে বৃত্তী হলেন, তার ভাল-মন্দের দায়িত্বও তিনি নিজের হাতেই তুলে নিলেন। তাঁর কর্মসাধী-রূপে বিপিনবাবুর বহু অনুকূল মুখার্জী এগিয়ে এলেন।

যটনার পূর্ব দিন (২৫, ৮, ১৪)

শ্রীশবাবু ও অনুকূলবাবুতে স্থির হলো যে, কাজের জন্য অনুকূলবাবু একখানা গরুরগাড়ি যোগাড় করে দেবেন, আর শ্রীশবাবু যোগাড় করবেন গাড়ির গাড়োয়ান। এ ছাড়া এও স্থির হলো যে, ‘রডা কোম্পানী’র মালগুলো কাফটনগ হাউস থেকে রডা আপিসে আনা হলে সে মাল গুদামে তুলবার ফাঁকে ঐ কাজে ভারপ্রাপ্ত ‘রডা’র কর্মচারী হাবু মিঞা (শ্রীশ মিঞা) মাউজার পিস্তল ও কার্তুজের বাস্তবগুলো বিপ্লবীদের গাড়িতে তুলে দিয়ে সরে

পড়বেন এবং হরিদাস দত্ত গাড়ি-বোঝাই মাল নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেবেন।

রডা কোম্পানীর মাল কিভাবে সরান হবে, তার পরিকল্পনাটি ‘দাল লেনে’ হাবু মিঞার গৃহেই গৃহীত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুধু অনুকূলবাবু ও তাঁর সহকর্মী হাবু মিঞা এবং শ্রীশবাবু ও তাঁর সহকর্মী হরিদাস দত্ত এবং খগেন দাস।

পরিকল্পনা গৃহীত হতেই শ্রীশবাবু হরিদাস দত্তকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে চলে এলেন মার্কার্স কোয়ারার পশ্চিম দিকের নারোয়াড়ী হোস্টেলে।

প্রভুদয়াল হিন্মৎসিংকা তখন কলকাতা ছাত্র এবং উক্ত নারোয়াড়ী ছাত্র-নিবাসের বোর্ডার। বিপ্লবী দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী প্রভুদয়ালজীর ওপর একটি গুরুতর কাজের ভার দিলেন শ্রীশবাবু। হরিদাস দত্ত রাতটা কাটাবেন তাঁর কাছে এবং পরের দিন প্রভাতে হরিদাসবাবুকে ঐ হিন্মৎসিংকানী গাড়োয়ানের সঙ্গে সাজিয়ে তাঁকে পাঠাতে হবে যথা-নির্দেশিত স্থানে।

পরের দিন ছাব্বিশে আগস্ট। হিন্মৎসিংকাজীর বিশ্বস্ত এক কৌশল-কারের হস্তে হরিদাসবাবুকে অর্পণ



শ্রীহরিদাস দত্ত।

কথা হল। মাপিত মহাশয় নির্বম হতে দত্তবাহাশয়ের চুলগুলি খুব ছোট ছোট করে কেটে দিল। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের বাথার সঙ্গে দত্তবাহাশয়ের বাথার কোন ভেদ রইল না। তারপর তাঁর গায়ে উঠলো কালো রঙের ফতুরা, গলার কালো ফিতের আশ্রয়ে আঁট করে লাগানো হলো একটি পেতলের ধুকধুকি, আর পরনে রইল ময়লা আটহাতি একখানা কোরা ধুতি। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের এই রূপগচ্ছায় হরিদাসবাবু অপরাধ হয়ে উঠলেন। মলঙ্গা লেনে অনুকূলবাবুর গাড়িবানা পাওয়া গেল। দত্তবাহাশয় গরুর লেজ মুচড়ে গাড়ি ছাঁকিয়ে রাস্তায় নামতেই বোঝা গেল যে এই মানুষটি কেবল কিতাব আওড়ে 'বিপ্লবী' হননি, এঁর শিক্ষা ও দীক্ষা হাতেকলমেই হয়েছিল।

সেই যুগেও হরিদাস দত্তের মত বুসাহসী কবী পথেঘাটে পাওয়া যেতো না। কিন্তু গোপনকর্তার কর্তব্যরূপে কঠিন হতে পরব মৈশূন্যে জনাকীর্ণ কলকাতার গায়ে তিনি বর্ষন ওটা চালিয়ে বাচ্ছিলেন শুধর তাঁর নিজস্ব সাহস ও দক্ষতা ছাড়া আরো কিছু সম্বল ছিল। সে সম্বল হলো একটি অটুট প্রত্যয়, যে প্রত্যয় ছিল পার্শ্বসারথির প্রতি পার্বেষ।

পূর্ব পরিকল্পনা মত শ্রীশবাবু হরিদাস দত্তের গাড়ি সম্মুখে পায়ে হেঁটে বাচ্ছিলেন। ঝগেন দাসের ওপর নির্দেশ ছিল গোপলে ঐ গাড়িকে অনুসরণ করার। বখানময়ে ডাল-হাউসি কোয়ারে শ্রীশ পাল, ঝগেন দাস এবং গাড়ি সহ হরিদাস দত্ত উপস্থিত হলেন। গাড়িতে ছিল শুধু একটি শাবল। বিপ্লবীরা তিনজনেই অবশ্য গোপনে সঙ্গে রেখেছিলেন গুলীভরা রিভলভার। এঁরা স্থির করে নিয়েছিলেন যে, অতকিতে পুলিশের হাতে যদি পড়ে বান তবে বুদ্ধ করে দরতে হবে। তা ছাড়া এও স্থির ছিল যে, মাল উদ্ধার করে পালার কালে

যদি পুলিশ আক্রমণ করে তবে হরিদাস দত্ত প্রথমেই গুলী করবেন না। শ্রীশবাবু ও ঝগেনবাবু পর পর গুলী চালাতে থাকবেন। সেই কালকে গাড়ির চালক হরিদাস দত্ত নুষ্ঠিত মালের বাস ভেঙে দুটি মাউজার পিস্তলে গুলী ভরে শ্রীশবাবুদের হাতে তুলে দেবেন। তাঁদের হাতে মাউজার গর্জাতে থাকার অবশ্যে দ্বিতীয় দফার গুলী ভরে তিনি নিজেও মাউজার চালাতে আরম্ভ করবেন। এইভাবে তাঁরা তিনজনে অকণ্ঠ কার্তুজ ও সেরা পিস্তলের অধিকারী হয়ে সেদিনকার ডাল-হাউসি কোয়ারে দত্তের হোলি রচনা করে বরণকে বলবেন 'তুঁহ' মন শ্যাম সনান'। সেট দুর্বার বুদ্ধে, অগহা আত্মবাহনে, প্রচুর রক্তক্ষরণে যে নব-যৌবনের জন্মলাভ হবে সে যৌবনই একদিন ভারতবর্ষকে নিশ্চর স্বাধীন করবে। শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত ও ঝগেন দাসের বিদেহীস্বাক্ষর চরম তৃপ্তি ও পূর্ণ সার্থকতা যে সে পরিণতি লাভেরই চতুঃসীমার। বুড়ার মাঝে জীবনের উপলব্ধি এতাকেই তাঁদেরকে সেদিন শক্তিশাল পথ চলার আহ্বান গুহিরেছিল। তাঁদের শব্দক্ষেপে তাই কিছুমাত্র হৃদ্য:পতন বটে নি।

৥ তিন ৥

আবাহের আলোচ্যকালে 'রতা' কোম্পানী অবস্থিত ছিল ড্যানসিটার রো-তে—ডালহাউসি কোয়ারের দক্ষিণ দিকে। 'কার্টবস'-এর অবস্থান হলো ডালহাউসি কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে। উত্তর অট্টালিকার মধ্যে দুইখ পাখানা।

হরিদাস দত্তের গাড়ি দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে রতা কোম্পানীর মাল-সরকার শ্রীশ মিত্র (হাবুবাবু) কোম্পানীর তরফ থেকে গাভাবানা গাড়ি সহ কার্টবস হাউসে মাল আনতে যাবার প্রস্তুতি করছেন। ছর-খানা গাড়ি রতার দরজার দাওয়ায়ানরা নিয়ে এখেছে, গন্তব্য শকট তখনো

সেখানে পৌছয়নি-দেবে হস্তদত্ত হয়ে ওটাকে তড়া দিয়ে আনবার জন্য হাবুবাবু স্বয়ং ছুটলেন। পূর্ব নির্দেশ মত হরিদাস দত্ত ষষ্ঠ গাড়ির অনেক পেছনে তাঁর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে-ছিলেন। হাবুবাবু হরিদাস দত্তের গাড়ির কাছে এসে কপট ক্রোধে হাঁক দিলেন: 'ইয়ে উলুকা পাঠ্যা, জলদি কেঁও আরে নেহি?'

গাড়োয়ান বেন ভাবাচাকা বেয়ে গেল। উত্তর দিল: 'হজুর, বেহেরবানি।'---

গাভাবানা গাড়ি সহ কার্টবস হাউসে পৌছে হাবুবাবু যথারীতি মাল খালাস করলেন। পু্যান মত পশ্চাতের গাড়িটার মাউজার পিস্তল, পিস্তলের কার্তুজ, স্প্রিং, বাপ ইত্যাদি মাউজার পিস্তলের যাবতীয় সরঞ্জাম গমেন্ট বাস্তুগুলো তোলা হল। বোঝাট গন্তব্য শকট রতা কোম্পানীর দিকে রওনা হয়ে গেল। সকলের পেছনে রইল হরিদাস দত্তের গাড়ি। ড্যানসিটার রো-র সম্মুখে এসে পূর্ণাঙ্গী ছ'খানা গাড়িই হাবুবাবু সঙ্গে রতা কোম্পানীর উদ্দেশে গলির মধ্যে ঢুকে গেল। এবং হাবুবাবুর ইচ্ছিতে হরিদাস দত্ত মহাশয় সোজা পূর্বদিকে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। তাঁর গাড়ির দু'পাশে ইতি-মধ্যে শ্রীশ পাল ও ঝগেন দাস বকীর মত চলা শুরু করে দিরেছেন। গাড়ি ব্যাণ্ড: কোম্পানী ও বর্তমান কারেন্সি আপিসের সম্মুখী রাস্তায় (ব্যাঙ্কে লেন—বর্তমানে মিশন রো) ঢুকতেই হাবুবাবু এসে শ্রীশ পালদের সঙ্গে বড় হলেন। মিশন রো হয়ে গাড়িটা ব্রিটিশ প্রভিয়ান স্ট্রীট অতিক্রম করে, বেন্টিক স্ট্রীট পার হয়ে, টাঁদনি চকের পাশ দিয়ে মলঙ্গা লেন-এ পৌছে গেল।

মলঙ্গা লেনে অনুকূলবাবুর গৃহের কাছে একটি ধোলা জামগা ছিল। সেখানে শুপীকৃত মোহালকড় জীব অবস্থায় মজুদ ছিল। কয়েকটি ওড়িয়া শ্রমজীবী সেখানে বাগ মরত।

গাড়ি থেকে লম্বা হাত নারান হল। মাল নামিয়েই হরিদাস দত্ত শ্রীশবাবুর নির্দেশে সরে পড়লেন। অনুকূলবাবুর সহকারী কালিদাস বসু তাঁর বাড়ির ঘোড়ার গাড়িতে দক্ষায় দক্ষায় ঐ মাল জেলপাড়ায় তুজঙ্গ ঘরের গৃহে নিয়ে গেলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় এগারটি বাজ্ঞ এনে রডা কোম্পানী-মালী বাজ্ঞ থেকে ২১,২০০টি বুলেট ঐ বাজ্ঞগুলোর তত্ত্বা হকো। মাল ভাঙি বাজ্ঞগুলো আপাতত থাকলো তুজঙ্গ-ঘাবুরই গৃহে। বাকি ২৮,৮০০টি বুলেট এবং সমগ্র মাউজার পিস্তল বৃহত্তে নেভারা সবগুলো দলের মধ্যে বেঁটে দিবেছিলেন। বাংলার বিপুবীলের পিরায় পিরায় সহসা বিপুল আশা ও প্রচুর প্রত্যাশা-সোভানা সফলিত হয়ে গেল। তরুণ বিপুবীলের ধনুকে টকার অন্তিত হয়েছ—পর বৃজ করবার আদেশ করন আসবে!—

শ্রীশ পাল প্রবুধ কর্মনেতারা জানতেন যে, রডা কোম্পানীর কর্তারা মাল না-মৌজানর সংবাদ পেতেই লক্ষ্যপ্রথম সন্দেহ করবেন হাবু মিঞকে। কাজেই বেশির ভ্রাকশান হল সেদিনই বিকল পাঁচটার দাজিলিং বেলে হাবুবাবুকে নিয়ে শ্রীশচন্দ্র মংপুর জুওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে নিলেন দুটি মাউজার পিস্তল ও কুঁহাকার বুলেট।

মংপুর জেলার কুড়িগাঁব মহকুমার অন্তর্গত নাগেশ্বরী থানার হেবচন্দ্র ঘোষের অধীণ শ্রীশবাবুদের একটি গোপন আড্ডা ছিল। সেই আড্ডার আকস্মিক প্রধান ডাঃ জ্বেরন বর্ধনের কাছে হাবুবাবু সহ শ্রীশচন্দ্র উপস্থিত হলেন। হাবুবাবু জ্বেরন বর্ধনের বাবা সুবীর-মিত্ররূপে নাগেশ্বরীতেই থেকে গেলেন। বৃহত্ত বিলম্ব না করে শ্রীশ-পাল কলকাতার ফিরে এলেন।

॥ চার ॥

এদিকে দু-সাত দিন পার হই

গেছে হাবুবাবু আপিসে আসছেন না, কোন সংবাদও পাঠাচ্ছেন না। 'রডা'র কর্তৃপক্ষ শৌক নিয়ে দেখেন যে কাস্টমস হাউস থেকে কিছু মালও তাঁদের হেপাজতে আসে নি। তৎ-কর্ণাৎ কাস্টমস হাউসে বন্ধ করা হলো। উত্তরে 'রডা'র সাহেবরা জানতে পারলেন যে, তাঁদের মাল-সরকার শ্রীশ মিঞ (হাবু মিঞ) গনজ মালট ২৬শে আগস্ট বধ্যাসঘরে খানাল করে নিয়ে গেছেন। সাহেব-জুবাদের মাথার টনক মড়ে গেল। পুলিশের কণ্ঠে আর্ড জুর। টেপাটি প্রবুধ সানুজারকীরা সক্রিয় হয়ে ওন-লেন যে মিম-সাতের পূর্বে নাকি গাড়ি-বোম্বাট মাল দিবা-বিগ্রহয়ে অন্তর্ধান হয়েছে। ডরে ও আশঙ্কার সাহেবপাড়ার চোখে ধুন নেই। বিপুবীলের হাতের মুঠোর এতো আধুনিক মারণ-অস্ত্র। তাও আবার এই বিশ্ববুদ্ধের সূচনার। সেদিনই সারা কলকাতার ঢোল মহযোগে জামানো হল যে, যারা নিজের গৃহে মন্তুন ডাড়াটে নিয়েছে তারা যেন অনতিবিলম্বে সেগর ডাড়াটের সঙ্গে সঙ্কিত বিশদ বিবরণ নিজ নিজ এলাকার থানার পেশ করে।

বিপুবীরা এতে প্রমাদ গণলেন। কারণ তখনো ২১,২০০টি কার্তুজ একান্ত নিরাপদ স্থানে রাখা যায় নি। কয়েকদিনের মধ্যে বড়বাজার অঞ্চলে বাঁশতলার জটনক মারো-হাড়ীর বাড়িতে একটা গুদান তৈরি করা হয়। তুজঙ্গবাবুর গৃহ থেকে অতি সতর্পণে বাজ্ঞতরা মাল (২১,২০০টি বুলেট) স্থান থেকে বানাতরে বার-তিনেক সরিয়ে অবশেষে বাঁশ-তলার গুদানঘরে এনে রাখা হয়। কিছু ইতিমধ্যে জোড়াবাগান থানা কিছু সন্নিহান হয়ে ওঠে। থানা থেকে আলি হোসেন নামক এক পাঞ্জাবী কনস্টেবলকে নিযুক্ত করা হয় গুদানঘরটির উপর নজর রাখার জন্যে। বিপুবীরা এ সংবাদ না

জানলেও বড়বাজারের ঐ আড়াল সম্পর্কে সূক্ষ্ম থেকেই তাঁরা ভাবিত ছিলেন। একদিন সকালবেলা শ্রীশ-বাবু অকারণেই ঢকল হয়ে উঠলেন। হরিদাস দত্তকে ডেকে বললেন যে, তিনি যেন বিশেষ সতর্ক থেকে বাঁশ-তলার গুদানে এখুনি যান এবং দারো-রানিকে বলে আসেন যে দুপুরেই গুদানঘর খালি করে দেওয়া হবে।

হরিদাসবাবু সেদিনই প্রাতে ৯টার সময় বাঁশতলার বাড়িতে পৌঁছলেন। বাড়ির মালিক ছিলেন এক খিদিয়া মারোয়াদী মহিলা। দারোয়ানটির নাম ছিল শুকদেও। আলি হোসেন তখন বারে-কাছে ছিল না। বাঁশতলার বেতে একটা দুরে কোথাও গেছে। বাড়িতে চুকেই শুকদেওকে হরিদাস-বাবু তাঁর বড়ব্যা পোনায়েন। কারণ তখনো তিনি বোঝেন নি যে, ইত্যবস্থায় গাধা শুকদেও আলি হোসেনের মত কোন ধরনেরও অচিত প্রলোভন-জালে জড়িয়ে যেতে পারে। শুকদেও বলল—'জেরায়া ঠিক বাঁশতলার বাড়ি নাটজিকো (গৃহকর্ত্তী) আশঙ্ক মেনার মেতা হ'।—

আদত উদ্দেশ্যে বহুটা বাবুটিকে আলি হোসেন ফিরে আসা পর্যন্ত আটকে রাখা।

হরিদাসবাবুর মনে একটা ঝটকা লাগলো। তিনি দু-এক পা করে সদর দরজার কাছে এগিয়ে এলেন। দুর্ভাগ্যবশত ঝিক কোঁ মূহুর্তে আলি হোসেনও এসে উপস্থিত। শুকদেও নির্ভয়ের মত খেপে কনস্টেবলকে বলল: 'ওরে বাবু আ গর'।

আলি হোসেন হরিদাসবাবুর কাছে এসে বলল, 'ধানায় চলুন।'

হরিদাসবাবুর আপত্তি করার উপায় ছিল না। ধলিপথে কয়েক পা এগুতেই হরিদাসবাবু দেখলেন যে, একটি বাড়ির সমুখের বাড়ি ঘেরা-মতের জন্য বাড়ির তল পড়ে আছে। ইত্যাৎ দত্তনশায়ের মাথায় একটি বুদ্ধি এসে গেল। জুতোর বাসি চুকেছে



স্বর্গত কালিদাস বসু

হলেন তিনি একটু আনত হলেন এবং একমুঠো বালি তুলে নিলেন। কঁক বুকে আলি হোসেনের চোখে মুহূর্তে সেই বালি ছুঁড়ে দিয়েই তিনি দৌড় দিলেন। বিহীন আলি চোখ রগড়াতে লাগল এবং প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল—‘ডাকু ভাগতা হ্যায়।’

বড়বাজারের নত জায়গায় প্রাতে ৯টা-১০টার সময় ‘ডাকু ভাগতা হ্যায়’ শব্দে তুললে যেকোন পল্লারমান ব্যক্তি যে জনসমুদ্রের বেটনিতে আবদ্ধ হবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। সুতরাং খানিকটা দূরে যেতেই হরিদাসবাবু ধরা পড়লেন। জোড়াবাগান খানায় দস্তখশায়কে আসতে হল—‘ভদ্রবশে’ নয় ‘ডাকু’রূপে। খানাদারের আদেশের গীয়া নেই। টপ স্পীডে প্রমোশন এবার কে অটিকায়?—হাওয়ার খবর ছড়িয়ে গেল। মুহূর্তে টেগার্ট-লোম্যান-ম্যাকলিমোর জোড়াবাগান খানায় এসে উপস্থিত। টেগার্ট তখন ‘আই-বি’র পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, লোম্যান

ছিলেন ‘এস-বি’র ডেপুটি কমিশনার এবং ম্যাকলিমোর ছিলেন ‘কলিকাতা পুলিশ’র ডেপুটি কমিশনার।

খানায় এসেই ‘ডাকু’ হরিদাস দস্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে টেগার্ট বলে উঠলেন—

‘Hallo Royal Bengal Tiger, now you are bagged!’ ---

তারপর বিরাট বাহিনী পরিবেষ্টিত বন্দী দস্তমহাশয় সহ পুলিশ-কর্তারা বাঁশতলার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। শুদামহাশয়ের তাল ভেঙে বিজয়ীর গর্বে ভেতরে ঢুকলেন কর্তারা। একটি বাক্স খুলতেই সাহেবদের জিতে জল এসে গেছে। পুলকে আশ্বহারা হয়ে ভাবছেন তাঁরা—যাক বড় সহজে রডা কোম্পানীর সমস্ত নাল উদ্ধার হয়ে গেল!—কিন্তু দুর্ভাগ্য পুলিশের, দুর্ভাগ্য ইংরাজের, দুর্ভাগ্য ‘রডা’ কোম্পানীর মহাজনদের যে, পর পর সবগুলো বাক্স ভেঙেই দেখা গেল—

একটি মাউজার পিস্তলও নেই, অধিক ২৮,৮০০ বুলেটও উধাও। কেবলনায়ে ২১,২০০টি বুলেট পড়ে আছে।---

॥ পাঁচ ॥

হাবু নিজ উধাও হয়েছেন খবর পেয়েই পুলিশ প্রথমে একটি নামের কিস্তি ভেরি করে ফেলল। তার মধ্যে খুঁজে খুঁজে চোকাতে লাগল তাদেরই নাম—যাদের হাবু নিজের গড়ে যোগাবোগ থাকা সম্ভব। অধিকন্তু কালবিলম্ব মা করে অনুকূল মুখার্জী, কালিদাস বসু, গিরীন্দ্র ব্যানার্জী, নরেন ব্যানার্জী, ভুজঙ্গ ধর, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, সত্যীশ দে, উপেন সেন, প্রভুদয়াল হিরঙ্গিকা ও আন্তোয় নামকে প্রেরণ করে পুলিশ কিছুটা স্বস্তি বোধ করল। শ্রীশ পাল অবশ্য অক্ষত দেহে গা ঢাকা দিতে পেরেছিলেন।

এদিকে হরিদাস দস্ত ধরা পড়তেই পুলিশের আরো সন্ধান হলো। নালপত্রও কিছুটা হাতে এসেছে, সুতরাং হরিদাসবাবু ও মৃত অপরাধীদের জড়িয়ে একটি রোমাঞ্চকর ঘটনার নামলা সাজাতে টেগার্টগোষ্ঠীর বেগ পেতে হলো না।

দীর্ঘ সাত মাস ধরে ‘রডা-আর্মস কন্সপিরেসি’ নামক নামলা চলার পর হরিদাস দস্ত, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর ও নরেন ব্যানার্জী ব্যতীত অপরাধ সকলে মুক্তি পেলেন। হরিদাসবাবু, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর ও নরেন ব্যানার্জীর দু’ বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড হলো। হরিদাসবাবুর ছেপাজতে বুলেট পাওয়া গেছে অভিযোগে ‘আর্মস ম্যাগেইন’ তাঁর ভাগ্যে আরো দু’ বছরের মেয়াদ জুটে গেল। দীর্ঘ চার বছর তিনি প্রেসিডেন্সি জেলের চুরাশিশ-ডিগ্রি ও জাল-ডিগ্রিতে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর জীবন কাটান। কয়েদকাল শেষ হতেই তাঁকে আবার জেলগেট থেকেই ‘তিন আইনে’ স্টেটপ্রিজনার

কবে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে
বন্দী রাখা হয়। ---

বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসে 'রডা'র
অগ্রহরণ এক বিস্ময়কর ব্যাপার
ও বুনয়, এর ঐতিহাসিক ও নৈপুণিক
সুসঙ্গত ও অসাধারণ। 'রডা'র অঙ্গে
সজ্জিত হয়েছে বাংলার বিপ্লবীরা
বহুক্ষেত্রে তাঁদের বিপ্লবী-সংগ্রামকে
প্রচণ্ডতর করতে পেরেছেন এবং অব-
শ্যাদগত জাতিকে অরুণ-উষার পদধ্বনি
শুনিয়েছেন। বালেশ্বরে বুড়ীলামের
তীবে বিপ্লবনেতা বাঘা যতীন ও তাঁর
দুইয় সতীধবল এ অস্ত্র নিয়েই যুদ্ধ
করেছিলেন।

॥ ছয় ॥

হরিদাস দত্ত ধরা পড়বার পর
কুড়িগ্রাম মহকুমা আর নিরাপদ স্থান
হইল না। কাবণ হরিদাসবাবু বহুকাল
মাগেশ্বরী থানাকে কেন্দ্র করে কুড়ি-
গ্রামে গুপ্তসমিতির কাজ করেছেন।
শ্রীশ পাল তাই ওধানকার আঞ্চলিক
নেতা ডাক্তার সুরেন বর্ধনকে আনায়েন,
হাবু মিঞাকে আসামে এক নিরাপদ
শেন্টারে পাঠিয়ে দেবার জন্যে।
উদ্দেশ্য ছিল আসাম জলিয়ার পার
হয়ে মহাচীনে অনুপ্রবেশ করা।---

সুযোগ বুঝে একদা এই ভয়মুক্ত
ত্রুণ বিশ্বপথিকেরই পদছন্দে তুহার-
কুটি জলিয়ার-এর বন্ধুর পথ অতিক্রম
করছিলেন অদূর চীনে পৌঁছবার
আশায়। কিন্তু সহসা আসাম-জলিয়ার
রাইকেল-বাহিনীর হাঁক এল :- 'Who
comes there?' --- 'Halt!' ---

আসন্ন মৃত্যুর কথা হাবু মিঞার
অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তিনি তো
পথিক। ভাবতেও বন্ধন-মুক্তির বাণী
কণ্ঠে নিয়ে পথে-পথে পথচলাই তো
তাঁর বৃত্ত। তিনি ধামবেন-কাব ছকুমে?
তাঁর প্রাণদেবতার আদেশ তিনি কান
পেতে শুনেছেন—চলো, চলো। দূরে,
আরো দূরে, আলোকতীর্থেই মুক্তি-
বিধৌত অঙ্গনে।।---

'দ্রাম'---শব্দে স্তম্ভ প্রাপ্তর ভেদ

কবে আসাম রাইকেলের প্রাণঘাতী
গুলী ছুটে এল। হাবু মিঞার রক্তাক্ত
দেহ কর্কশ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল।
কোথায় সে ভূমি, কোথায় সে তীর্থ
কেউ জানে না। মৃত্যুহীন শহীদে
রক্তধারা কোন্ ধূলিতলে সিক্ত করে
জীবনের জয়গান গেয়েছিল তা বাঙালী
জানেন না, ভাবভবাসী জানেন না, বিশ্বের
কোন মানুষই জানেন না। তবু এই
অজ্ঞাত তীর্থে পৃথিবীর-বিপ্লবকাসীদের
আন্তরিক শ্রদ্ধা অদৃশ্য তরঙ্গদোলায়
নীলবে নিরন্তর ধাওয়া করবে।---

হাওড়া জেলার 'রসপু' গ্রাম এখমো
আছে; সে-গ্রামে যে মৃত্যুহীন বিশ্ব-
পথিক হাবু মিঞার জন্মস্থান তা
অন্তত দেশবাসীর জানা উচিত। কিন্তু
তা-আমরা জানতে চাই কি?---

রডা-অভিযানের চিন্তা ও কর্ম-
নায়ক শ্রীশচন্দ্র পাল, ১৯১৬ সনের
প্রথম দিকে ধরা পড়ে 'তিন আইনে'
বন্দী হলেন। স্টেট প্রিন্সিপালরূপে নানা
জেলে ঘুরিয়ে শেষটার তাঁকে হাজারি-
বাগ সেন্ট্রাল জেলে অপরাপব রাজ-
বন্দীদের সঙ্গে রাখা হয়েছিল। ১৯১৯
সনের শেষভাগে তিনি মুক্তি পান।
সবার অলক্ষ্যে এই বীর নেতা যে
কর্মকীর্তি রেখে গেছেন তা বিপ্লবীর
ইতিহাসকে ধন্য করেছে। কিন্তু
অজ্ঞাতবাসের দারুণ দুঃখকষ্টে
শ্রীশচন্দ্রের দেহ ভেঙে-গিয়েছিল।
তাই 'আসিসিটের' পর তিনি
ভগ্নস্বাস্থ্যে লোকসমাজে ফিবে এলেন।
স্বাস্থ্য-ক্রমশ সারানোর বাইবে যেতে
লাগল। অথচ শব্দাশায়িত থেকেও
তিনি বন্ধুদের বিপ্লবকার্যে পরামর্শ
দিতেন। বিপ্লববাহিনী ধারক এই
দুর্ভয় পুরুষ সবার অজ্ঞাতে বেঙ্গল
ডলফিটার্স-এর পূর্বাপর প্রত্যেকটি
কর্মপ্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবে
গেছেন। আবার সবার অজ্ঞাতে এই
নিকামধর্মী কর্মী আদর্শমণ্ডল সার্থক
নেতার মতোই ১৯৩৯ সনে বিদেহী
শহীদকুলের সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দে
দেহরক্ষাও করেছেন।

শ্রীশচন্দ্র পালের নাম বাঙালী
জানেন না। বাংলার বিপ্লবীরাও তাঁকে
জেমন কবে মনে রাখতে পারেন নি।
কারণ, তিনি ছিলেন প্রাণপ্রচাব-বিরোধী-
সংবাদপত্রের কলাম অথবা ফটো-
গ্রাকারের ক্যামেরা তাঁর কাছে ছিল
অবাস্তব বস্তু। তাঁর মৃত্যুতেও তাঁর
তপ্ত অগ্রাধার নি, সন্নানের অর্ঘ্য বচিত
ইয় নি, শোকসঙ্গীত গীত হয় নি,
তাঁর মত নিকাম সাধকের পক্ষে
গৌরবের কথা, কিন্তু জাতিব এত
লজ্জার সীমা নেই।

রডা-যড়যন্ত্রেব সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে
যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে
শুধু হরিদাস দত্ত ব্যতীত অপর সকলেই
লোকান্তরিত হয়েছেন। লোকান্তরিত-
দের পুণ্য নাম হলো শ্রীশচন্দ্র পাল,
হাবু মিঞা, ঋগেন দাস, ও অনুকল
খাজী। তাঁরা জীবনের শেষ বস্তু-
বিলু মিষে সংগ্রামী বাংলাকে অক্ষয়-
বীর্থে স্মরণ করে নেবে গেছেন।

দেশ আজ স্বাধীন ও মুক্ত। কিন্তু
জীবনের কোন ক্ষেত্রেই বুদ্ধি মুক্তি
আমরা পাই নি। যতনাল মুক্তি স্বাধ-
আমরা ব্যক্তিক ও ছাতীর সত্যায় না
পাব, ততকাল সংগ্রামের বাণী জি-
কামীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে থাকবে।
এ সংগ্রামকে জাতিব আত্মগানি ও
আত্মদৌর্বল্য বিনাশে অরুণক করতে
হলে মুক্তির অগ্রদূতরূপে ইতিহাসে
ধাৰা আবর্তিত হয়েছিলেন তাঁদের
স্মরণ রাখতে হবে। দূতর তপস্যায়
সিদ্ধ এই বিপ্লবীদের জীবনে ম্যাটি-
মিনির যে-বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছিল
তার মর্ম আজকের ভাবতীকে
উপলব্ধি করতে হবে :

'Your country should
be your Temple. God at
the summit, a people of
equals at the base.' (তোমার
দেশ তোমার মন্দির, ঈশ্বর
চুড়ায় থাকুন ভগবান, তার ভিত হোক
সমানস্বার্থী জনতা)।

অক্ষিতা

দ্বিতীয় ভাগ



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হালকা হবে যাচ্ছে মহামায়া।
ক্রমে-ক্রমে হালকা হবে যাচ্ছে সে।
স্বাভাবিক ঘটনা পরিষ্কার হবে বলার
জন্যে সে যেন ব্যাকুল। সকলের কাছে
তো সব কথা এমন অকপটভাবে বলা
চলে না। নিজে একেবারে নিষ্কলুষ
সিঁপাণ ও সমতাময়ীরূপে চিত্রিত করে
এই হতভাগ্য মেয়েটির কাহিনী তো
সকলের কাছে বলা চলে না। কিন্তু আজ
সে বার কাছে এত দরদ দিয়ে ও আবেগ
দিয়ে এত কথা বলছে, তার কাছে
অবশ্যই বলা চলে। কেন না, আজ সে
যা শুনেবে তাই তাব কাছে নতুন, তাই
স্বাভাবিক আছে পুরোপুরি বিশ্বাস্য।

করে কিভাবে একটা বোয়েটে-
গোছেন লোক ইন্দ্রিয়ার জীবনকে
অভিশপ্ত করে দিল, তার পবে নতুন
আশ্বাসের মত কিভাবে এসে
দেখা দিল বীরপুরুষের মত একটা
শিকারী—সব কাহিনী বলতে লাগল
মহা য়।

এমন রূপকথার গল্প শুনেছে;
এই রকম কৌতুহল নিয়ে ইন্দ্রিয়ার

মতই অর্পলক চোখে মহামায়ার দিকে
চেয়ে সে বসে-বসে শুনেছে সব কাহিনী।
দুঃসময় যখন আসে তখন তা
নাকি আসে ঝাঁক বেঁধে। এই প্রাসাদে
পঞ্চপালের মত এসে দেখা দিল দুঃসময়।
তাদের পাখার ঝাপটেই বৃষ্টি একে-
একে নিড়ে যেতে লাগল সব আলো।
অল্পদিনের মধ্যে শশানপুরী হয়ে
উঠল বাড়িটা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মহামায়া, বলল,
'আমাকে নিল না মুখপোড়া ঐ মন।
আমাকে ফেলে বেখে গেল।'

বীরশাহী থেকে ফিরে এল
ইন্দ্রিয়ার, কিন্তু ফিরে, এল সে কোথায়?
ফিরে এল একটা শশানে। যে দু-চার
জন তখনও ছিল, তারাও গেল একে-
একে।

'তারা আর খোঁজ নেয় না?'
আন্তে জিজ্ঞাসা করল দিবা।

'কাবা?' শ্রোয় দিয়ে মহামায়া
বলল, 'ঐ রাজাবাহাদুরেরা? বয়েই
গেছে তাদের। তারা মানুষ না, তারা
পাখার।'

এটা এখন একটা প্রেতপুরী
মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বাড়িতে
অমন মড়ক লাগায় সকলে ভয় পেয়ে
গিয়েছে, এর দ্বিতীয়ানা আর কেউ
মাড়ায় না। মহামায়া বলল, 'দুটিমাত্র
প্রাণী আমরা। জ্বোতজ্বি কিছু আছে,
এই কাশীপুরে কিছু আছে, লাইনের
ওপারে সংগ্রামপুরে কিছু আছে,
উত্তিতেও আছে। সেসব জায়গা থেকে
কিছু-কিছু জোগাড় করে আনি—'

এবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল দিবা।
দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। ওর সঙ্গী
দের কথা মনে হল। বলল, 'ওরা বৃষ্টি
ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরে? ওদের এবার
ডাকা যাক।'

কথাটা শুনেই কুন্ডি চমকে
উঠল ইন্দ্রিয়ার। যেন শিউবেই উঠল
সে। বলল, 'কাদের ডাকবেন?'

কারো মুখোমুখি হতে চায় না
ইন্দ্রিয়ার। নিজেই নিয়ে ও নিজের
দুর্ভাগ্য নিয়ে সে থাকতে চান নিভুতে
ও নেপথ্যে।

কিন্তু দিবা তার সঙ্গীদের এখানে

জেকে আনতে চায় নি। সে তাদের কেবলমাত্র ডাকতে চেয়েছে। বেলা হয়ে এসেছে অনেক; শীতের বেলা, তাই তেমন টের পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু বেলা হয়েছে অনেকটাই। এবার তারা যাবে।

যারা যাবে, তারা যাবেই। তাদের ধরে রাখা যাবে না কখনোই। এটা ঈশ্বরের জীবনের অভিজ্ঞতা। এবাও যদি যাবে, তবে থাক--

‘কিন্তু’ ঈশ্বরীরা অপলক চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আলাপ যখন হল, তখন আবার আসবেন তো?’

দিবার হাতটা হাতের মধ্যে গিয়ে বলল, ‘সত্যি আসবেন। এলে বেশ ভালো লাগবে।’

বিদায় নিল তারা। ঈশ্বরীরা বলল, ‘মহামায়া, একে একটু পৌছে দিয়ে এস গোট পর্যন্ত।’

আগে-আগে চলল মহামায়া, পিছনে-পিছনে দিবা।

হাতে এসে দিবা ডাকল, ‘এই এই এই! আসুন! ন্যাচারাল সিনারি দুনিয়াতে অনেক পাবেন। চলে আসুন।’

হাতের কিনারে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে ওরা প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে তুমুল তর্ক করছিল। দিবার গলা শুনে ফিরে তাকাল। হয়তো কিছু প্রত্যাশা নিয়েই ফিরে তাকিয়েছিল, কিন্তু বৃথাই সে প্রত্যাশা। দিবার সঙ্গে আর কেউ নেই, আছে স্বাভাবিক তার দাসী।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে নীহার বলল, ‘আমবা বলদ। চিনির বলদ আমবা।’

নীহারের এ উজ্জ্বল কারণ কি, হঠাৎ বোঝা গেল না। কিন্তু মনোজ্ঞ বলল অন্য কথা, বলল, ‘আমার ধারণা ছিল, আমবা নদীর পুতুল, ঐ রোদে এককণ দাঁড়িয়ে বুঝি অনেকটা গলে গিয়েছি।’

‘অত বিগলিত ভঙ্গিতে কথা

বলতে হবে না মনোজ্ঞ, স্টিয়ারিং-এ একটি পাক দিতে দিতে নীহার বলল, ‘নদীর পুতুল’ হচ্ছে নদী দিয়ে তৈরি করা জিনিষ—তার দাম আছে। কিন্তু চিনির বলদ হচ্ছে অন্য ব্যাপার, চিনি দিয়ে তৈরি করা চতুর্দ পদ জীব নয়, চিনি বয়ে বেড়ায় যারা, কিন্তু চিনি চেখে দেখা যাদের বরাতে ঘটে না—’

তাকে বাধা দিতে হল না। গাড়ির সামনে একটা চতুর্দ পদ জীব পড়ায় সঙ্গেসঙ্গে বুক বঁকতে গিয়ে নীহারের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

আর সকলে কোনো কথা বলছে না। তার মনমরা হয়ে গিয়েছে ‘কি মা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এমন কি চিহ্নও কোনো কথা বলছে না— তার এমন চুপচাপ থাকার তবু কিছু জানে বোঝা যাচ্ছে, অচিনপুরীর সেই কন্যাটির কথা হয়তো সে একমনে ভাবছে। মেয়েটার দুঃখে হয়তো অভিভূত হয়ে আছে সে।

কিন্তু নীহার কথা বলবেই, তির-তির করতে-করতে ছুটে চলেছে তাদের ক্ষুদে গাড়িটা, তাব স্টিয়ারিং নাড়াচাড়া করছে সে, আর কথা বলে চলেছে, বলছে, ‘চেখে দেখার কথা বাদ দাও। ওসব ঠাট্টা-রসিকতা থাক। কিন্তু চোখে দেখাও কি কারণ? যার জন্য ছুটে এলাম এতটা

রাস্তা, তার সঙ্গে বাক্যানিাপও না-হয় না হল, কিন্তু, ঐয়ে—’

দিবা পিছন থেকে বলল, ‘অত ব্যস্ত হবার হয়েছে কি? এই তো প্রথম আলাপ হল। আবার আসা যাবে।’

‘বয়ে গেছে। আবার আসতে হলে আপনারা দুজনে আসবেন, আপনি ও সোহাগু।’

গাড়ি চলেছে ধরমুখো। কেউ আর কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ পরে দিবা বলল, ‘সবুরে মেওয়া ফলে।’

একবার হর্ন টিপে রাস্তা সাক্ষ করে নিয়ে নীহার বলল, ‘তা ফলে বটে। কিন্তু বেশি সবুর করবে মেওয়া আবার শুকিয়েও যায়।’

নীহারের এই মন্তব্য শুনে অটোহাস্য করে উঠল সকলে একসঙ্গে। কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না দিবা।

হাসি থেমে গেলে, গলা সাক্ষ করে নিয়ে সোহাগু বলল, ‘তাহলে এবার শুনি কথাসুলো। কি কথা হল এককণ আপনারদের।’

‘অনেক কথা, অনেক কথা, অনেক কথা’, দিবা বলল, ‘সে একটা মহাভারত, সে একটা রামায়ণ। এখানে বসে সব কথা শুদ্ধিয়ে বলা যাবে না। চলুন একদিন



কিয়ার

লন্ডন

মর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস কোকঃ

ফোন-২২-৬৫৮০

২৩৬, ৩৩৩ চীনা বাজার স্ট্রীট কলিকাতা-২

দললে মোমিনপুরে। লেখানে
জমাট হয়ে বসে বলব সব কথা।
নাটকের পুট পেয়ে যাবেন। তিনটে
নাটক লিখতে পারবেন।

নীহার ওদিক থেকে বলল,
'তা বোধ হয় পারা যাবে। যাকে
জুড়েছি তাকে নিয়ে তো হবে একটা।

'সে আবার কে?'

'ওই যে দাসীটা।'

'ওঃ মহামায়া? মহামায়াকে
নিয়ে?' দিবা অশ্চর্য হয়ে বলল।

'ওর নাম বুঝি মহামায়া? জুন্দের
মায়। নাটকও জুন্দের হবে। তোমরা
সব বুড়ি-বুড়ি বলছ ওকে? বয়স
হয়তো হয়েছে, কিন্তু বুড়িও নয়।

একটা মহিলাকে আগলে থাকতে
পারে যে, অত বড় প্রকাণ্ড একটা
বাড়িতে সে না পাবে কি হে?'

নীহার বলতে লাগল যে, থাকার
মধ্যে তার আছে চোখ, আর আছে
মুখ, সেইসঙ্গে তার যদি থাকত কলম
তাহলে ইয়ে করে দিত সে একেবারে।

অক্ষুটে দিবা জিজ্ঞেস করল,
'কিয়ে?'

নীহার বলল, 'হ্যাঁওক। নাটকে-
নাটকে উপন্যাসে-উপন্যাসে একে-
ধারে বন্যা ছুটিয়ে দিতাম।
এই এমন এক-একটা ক্যারেক্টার
মাঠে মারা যাচ্ছে কেবল যোগ্য লেখকের
জভাবে।'

নীহারের মন্তব্য আর কাব্যে
গায়ে তেমন লাগছে না, যেমন লাগছে
সুহাংগুর গায়ে। কিন্তু লোকটা
যে ঠাণ্ডা-প্রকৃতির, তাই এর কোনো
উত্তর সে দিল না।

কিন্তু মহামায়াকে নিয়ে অনেক-
ক্ষণ মশগুল হয়ে রইল নীহার।
তার চেহারাও মধ্যে সে এমন কি
দেখেছে তাও নিজের জানে। তার
মন্তব্য হচ্ছে, ও চেহারা যেমন-তেমন
মেয়ের হয় না; শেষ বয়সেই এই,
ওরও তো একটা প্রথম বয়স ছিল—

বাধা দিয়ে দিবা বলল, 'ও কথা
থাক। অন্য কথা বলুন।'

অন্য কথা? একটু ভেবে
নিল নীহার, 'তাহলে শোনা যাক
সুহাংগুর নায়িকার কথা।'

'সে কথা মোমিনপুরে হবে।'

'তবে তো মিটেই গেল। বেশ
আপনার কথা শুনি তবে একটু।'

'আমার আবার কি কথা?'

'অভিনয় করছেন কবে থেকে।
অভিনয় করছেন কেন। এতে কত
ঝুঁকি নিতে হয় জীবনে।'

মনে-মনে হাসল দিবা, তার
পর বলল, 'তাহলে আগে আপনি
বলুন, আপনি দমকলে কাজ করেন
কেন—এতেও তো কত ঝুঁকি। কত-
জন কত অ্যাকসিডেন্টে পড়ে, কত-
জনের জীবন নষ্ট হয়ে যায়।'

'তা যায়। কিন্তু ওটা আমার
জীবিকা।'

'অভিনয়ও আমার জীবিকা।'

'আপনি তো সেল্‌স্‌ গার্ল-এর
কাজ করেন চোরদীর একটা
দোকানে।'

কথটা শুনে দিবা একা নয়,
গাড়িগুরু সকলেই চমকে উঠল।
নীহার এত খবর পেল কোথেকে?
কোথায় থাকে, কি কবে, কোথায়
যায়, কেন যায়—সে সন্ধ্যা কোতুল
থাকা মন্তব্যে কেউ বার কিনারা করতে
পারে নি, নীহার তার কিনারা পেল
কি করে?

শুধু হয়ে থাকার পর দিবা বলল,
'ওতে কুলোয় না।'

'বাঁধে কথা। একটা মানুষের
এতই চাহিদা?'

হঠাৎ বাধা দিয়ে উঠল মনোজ,
বলল, 'বড় ব্যক্তিগত ব্যাপার এসে
যাচ্ছে। আর, বলো-তো, আমরা
নেমে যাউ, তুমি ওকে নিয়ে একা
যাও গল্প করতে-করতে।'

নীহার হেসে উঠল, বলল, 'রাগ
না, যেন লক্ষ্মী। এ ব্যবস্থায়
উনি যদি রাজী থাকেন, আমার
কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু
তোমাদের এমনভায়ে পথে বসিয়ে যাব।

ভাতেও মন তেমন সাম দিচ্ছে না।
তবে চলো, আর কথা না। কথা
সব মুলতুবী। কথা সব মোমিন-
পুরের জন্য তোলা থাক।'

খড়িবেড়িয়া পেরিয়ে এসেছে
ওরা। একে-একে ভাসা, পৈলান,
ঠাকুরপুকুরও পার হয়ে এল। আর
দূর নয়। এবার তারা এসে গিয়েছে
বেহালার কাছেই। প্রাণে খুশি
পুলক এসে গেছে এবার।

মনোজ আবৃত্তি করল কবিতা,
নীহার গাড়ি চালাচ্ছে, মাঝে-মাঝে
কলকব্জা একটু-আধটু তিকটাক কবে
নিয়চ্ছে, তাই তাকে উদ্দেশ্য করে
মনোজ বলল—

ধন্য তোমারে হে-বা-কমিন্দ্রি-
চন্দ্রপদ্মে, মগন্ধার।
লও কিবে তব স্বপ্নমুদ্রা
লও কিবে তব পুরস্কার।

এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য
হাত বাড়িয়ে দিয়ে নীহার বলল, কি
পুরস্কার দেবে দাও।'

মনোজ হেসে বলল, 'তোমাকে
রাজসিদ্ধি বলেছি, এইটেই তোমার
মস্ত পুরস্কার। এর চেয়ে বেশি আবার
কি চাও।'

আজ সকালে এ কাশীপুরে
মহরমুতি দেখে যে কয় ছত্র মনোজ
আবৃত্তি করেছিল, নীহারের উদ্দেশ্যে
এ ছত্র কয়টি বলার পর কবিতাটির
সেই শেষাংশ সে বলল—

আনন্দময়ী সুবর্তি তোমার
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা,
অমৃতসরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিবা বিভা।

শুধু হয়ে শুনছিল দিবা, বলল,
'বা, আপনি তো জুন্দের আবৃত্তি করতে
পাবেন। কবিতাটি কিন্তু ভারি সুন্দর।'

'জানেন বুঝি এটা? কি কবিতা
বলুন তো?'

দিবা বলল, 'পতিতা।'
নীহার চমকে উঠল যেন, বলল,
'কি?'

দিবা আবার বলল, 'পতিতা।'
(জমকঃ)

চালি চ্যাম্পিন

* * * লস্কর সেন



ফাট থার্ড স্ট্রীটের একটি
বাড়ির পেছন দিকের একটি ঘর
গলি ভাড়া নিলেন। এই
জায়গাটিতেই এখন বিখ্যাত
টাইমস্ পত্রিকার বাড়ি। সমস্ত
জায়গাটা এবং তার পরিবেশটা
নিরানন্দ, নীরস এবং নোংরা মনে
হোত চালিব— তিনি যেন
প্রেমসিক হয়ে উঠতে লাগলেন
এবং লগুন ও সেখানকার ছোট
ফুটিটিতে ফিরে যাবার জন্য
মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এ-বাড়ির
বেসমেন্ট-এ (বাড়ির সবচেয়ে নিচে
মাটির তলার ঘর) কাপড় পরিষ্কার এবং
ইপ্তি করার একটি প্রতিষ্ঠান ছিল।
সুতরাং সপ্তাহ-ভোর কাপড় কাচার
একটা সাবান-স্টীম-ইত্যাদি মেশানো
বোঁদা গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসতো
ওপরের দিকে—তাবি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ
করতেন চালি এই দুর্গন্ধের দরুণ।
যদি একলা লাগতো। সন্ধ্যাবেলায়
শুভওয়েতে ভিড়ের ভেতর দিয়ে
হাঁটিতে হাঁটিতে কিন্তু আত্মবিশ্বাস ফিরে
আসতো। চারদিকে রং-বেরং-এবং
বিজলীবাতি জ্বলছে—উঁচু-উঁচু স্কাই-
স্কেপাস, নানা ধরনের আলোকসজ্জা,
বিজ্ঞাপন দেবার কত চমকপ্রদ ধরন।
লব দেখে-শুনে চালিবও প্রাণে
আশা-আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে লাগল—
উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, জীবনে
মুঃসাহসিক অভিযানের পথ বেছে
না নিলে সত্যিকার বড় হতে পারবেন
না। আমেরিকার আসল রূপটা যেন
এইবার চালির কাছে স্পষ্টভাবে দেখা
দিল। বড় আশা, বড় আকাঙ্ক্ষা
নিষে এগিয়ে চলতে হবে—এই হচ্ছে
আমেরিকার মর্মবাহী, মনে মনে ভাবলেন
চালি। আব এও স্থির করে ফেললেন
যে, এখানেই বাসা বাঁধতে হবে।

বুড়ওয়েতে গথাই যেন শো-
বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত। এখানে সব
জায়গাতেই দেখা যায় অভিনেতা,
ভেডেভিলিয়ান, সার্কাসের দল এবং
প্রমোদ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নানা
ধরনের লোকদের—এদের ভিড়ে
গিঃগিঃ কবে রাস্তা, হোটেল,
বেস্তোরা এবং ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলো।
বিয়েটার এবং শো-বিজনেস নিয়েই
এদের সবকিছু কথাবার্তা। বিয়েটারের
মালিকদের নাম এদের মুখে মুখে।

প্রতিদিনের কাগজে একটি পুরো
পাতা নিয়ে বিয়েটার বিষয়ক বিবরণী
দেওয়া হোত। পাবলি উইলিয়ামের
সারকিটে ছ'সপ্তাহ ধরে চালিবা
শো করবেন এই ঠিক হয়েছিল।
এছাড়া তখন পর্যন্ত আব তাঁদের কোন
বুকিং ছিল না। সুতরাং শো
ভালভাবে উৎসাহের ওপবই নির্ভর
করছিল কতদিন চালির। আমেরিকাতে
থাকবেন। প্রদর্শনী ভাল না হলে
ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর
থাকবে না।

একটা বিহার্সাল-রুম নিয়ে এক
সপ্তাহ ধরে 'দি-উ-উজ'-এর মহলা করা
হল। বিখ্যাত ড্রপার লেনের কুউন বুদ্ধ

ইউএসসিকেল ওয়াকার এই দলে ছিলেন।
তাঁর বয়স তখন সত্তর ছাড়িয়ে গেছে,
তাঁর গলাব স্বব ছিল গুরুগম্ভীর এবং
অনুবর্ণনপূর্ণ—কিন্তু বিহার্সালে দেখা
গেল ডিক্শন্ অস্বস্তি তাঁর একেবারেই
কোনো ধারণা নেই—অথচ দর্শকদের
কাছে নক্সাটির কাহিনী বৃত্তিয দেবার
দাবিদ্ব তাঁরই বোলটিব। তাঁর সংলাপে
এই লাইনটি ছিল—'The fun will
be furious, ad libitum.' Ad
Libitum তিনি কিছুতেই উচ্চারণ
করতে পারতেন না—প্রধান ব্যক্তে
বলেছিলেন 'Ablib-blum' শেষ
পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করিও কিছুতেই
শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারতেন না,
বলতেন, 'Ablibum.'

আমেরিকাতে কার্ণোব ছিল প্রচুর
নামডাক। সেইজন্যই গালিদের
নক্সাকে প্রোগ্রামের একেবারে সবার
ওপরে স্থান দেওয়া হোল যদিও
এ নক্সাটি সম্বন্ধে চালি অত্যন্ত বিরূপ
ছিলেন, তবুও প্রাণপণ চেষ্টা করলেন
যাতে প্রদর্শনীটি সাধামত ভাব কবে
তোলা যায়। একটা মাত্র আশা—
অর্থাৎ কার্ণো যা বলেছিলেন—অর্থাৎ
নক্সাটি হয়তো আমেরিকানদের ঠিক
মনের মত হবে।

আমেরিকান শিল্পীরা টাইংসের
ধাবে দাঁড়িয়ে শো দেখছিলেন। কিন্তু
কোন ঠাট্টাব কথাতেই লক্ষ্যকরা
হাসে না। সাবা প্রেক্ষাগৃহে একটা
বিদ্রী নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।
চালিরা কোনবকমে পুে কবে চললেন
—উইংসে অপেক্ষাকৃত আমেরিকান
শিল্পীদের মুখভাব ক্রমশ গোনডা
হয়ে উঠতে লাগল এবং প্রথম অঙ্ক
শেষ হবার আগেই তাঁরা সেটভ ছেড়ে
বেবিয়ে গেলেন।

স্কেচটা ছিল অত্যন্ত বোকা ধরণের
এবং একঘেয়ে—আগেই চালি ক নোকে
বলেছিলেন এটা দিয়ে প্রদর্শনীর
উদ্বোধন না করতে। অথচ এব
থেকে অনেক ভাল ভাল নক্সা তাঁদের
সঙ্গে ছিল, যেমন—স্কেটিং, দি ড্যাণ্ডি
থিবস্, দি পোস্ট অফিস ও ইন্সটার

পার্কিনস্ এম. পি. এর যে কোন একটি মঞ্চ করলে আমেরিকান দর্শকদের খুশি কবে দেওয়া যেত। কিন্তু কার্নো তাঁক কথা শোনেন নি—নিজের একগুয়েমি বজায় রেখেছিলেন।

বিদেশোন্মোদিত দেখাতে গিয়ে অসাক্ষ্য অর্জন করাটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মাতের পর ভাত নিষেধ প্রাণহীন দর্শকদের সামনে হাসির নজ্জা কবা—অচ্চ: কেউ হাসছে না—এ যে একটা কি তির্যক অতিষ্ঠতা, একথা বলে বেঁধানো যায় না। চালিরা অপরাধীর মত স্টেজে এসে চুকতেন এবং স্টেজ-ভেতরে শোঁয়ের শেষে বেরিয়ে যেতেন। হুঁসপাহ বরো এই অপমান এবং গুলি সহ্য করতে হয়েছিল চালিদের দলকে। অন্যান্য দলের লোকেরা তাঁদের এড়িয়ে চলেতেন এমনভাবে, যেন চালিরা সব পুণের রূপ। উৎসাহের বাক্যে বরন পুর আগের গিয়ে তাঁরা দাঁড়াতে তখন তাঁদের হতাশাপূর্ণ এবং মনমরা ভাব দেখে মনে হোজ তাঁরা যেম নৃত্যদণ্ডে দণ্ডিত আশারী—সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে এরার সবাইকে গুলী করা হবে।

চালি এই সময়টায় খুবই একলা একলা এবং বিষণ্ণ রোম করতেন। তবে মনের ভাব যে, তিনি একলা একটি বরো থাকতেন। দলের কেউসঙ্গে থাকলে আরও মুক্তি হোত—প্রদর্শনীর অসাক্ষ্যের অপমানটাই তখন নিজেদের মধ্যে একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে কাঁড়াতো। দিনের রেলথ গাছে গাঙ্গি দেওয়া লম্বা রাস্তা ধরে অক্লান্ত হেঁটে চলতেন। চালি উদ্দেশ্যহীনভাবে—কখনও কখনও হয়তো ঢুকে পড়তেন, জু বা কোনো পার্ক, কোনো একোয়ানিয়াম বা কোন মিউজিয়ামে। প্রদর্শনীর অসাক্ষ্যের পর চালির মনে হোত নিউ ইয়র্ক একটি অত্যন্ত ভয়াবহ শহর—এর বাড়িগুলো অত্যন্ত উঁচু, এখানকার সব বয়সের প্রতিক্রিয়া এবং সেই প্রতিক্রিয়াটাকে কাটিয়ে যাওয়া হবে

উঠে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এতিনিউব বিবাটাকায় বাড়িগুলো দেখে চ্যাপলিনের মনে হোত এগুলো আসলে বাড়ি নয়, আমেরিকানদের বিরাট সাম্রাজ্যের এবং ঐশ্বর্যের স্মারক চিহ্ন হিসাবে এদের তৈরি কবা হয়েছে। প্রচুর অর্থ ব্যয় কবে বেশর গগনচুম্বী অটালিকা এবং ফাসনকল দেখানোর প্রতিষ্ঠা আমেরিকানরা করেছেন—তা যেন চালিকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিত যে, এ সবক পবিত্রক্ষেত্রে তিনি কত ক্ষুদ্র, পরিচয়হীন এবং অসাক্ষ্য।

অনেক সময় চালি দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে চলে স্নান ডিস্ট্রিক্টে পিঁকে যেতেন—বাবার সময় দেখেজো ম্যাডিসন স্কোয়ারের পার্কের বেয়ে বসে বসেছে জরাজীর্ণ কিছুতাক্তি বৃদ্ধের দল—তাদের মুখে হতাশার চিহ্ন, বয়সের ভাবে মাথা নুয়ে পড়েছে, দুই নিজেদের পায়ে ওপর নিবন্ধ এবং চ্যাপলিন খাঁড় এতিনিউ এবং লেকও এতিনিউর দিকে পা চালিয়েতেন। এখানে যে বীভৎস দারিদ্র্যের ছবি চালি দেখেছেন তার ভয়াবহ রূপ বর্ণনা কবা যায় না। ভরে এসে আয়গা থেকে আবার ছুটে পালিয়ে আসতেন বড়বেবেতে চালি চ্যাপলিন।

চালি চ্যাপলিন বলেছেন যে, আমেরিকানরা হচ্ছে চিরজাশারাদী, কর্মজগৎ এবং অকৃত্রিম প্রচেষ্টার বিশৃঙ্খল। ওদের মত হচ্ছে যে কাজে লাগবে হোটা মত তাড়াতাড়ি পার করে নেবে—মুনাকা হয় ভাল, না হয় অন্য কাজে মন দেবে। ওদের চরিত্রের এই দিকটা চালির বড় ভাল লাগল। এই ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের দলের বিরাট অসাক্ষ্যের কথাটাও যেন তিনি ভুলে গেলেন। মনটা অনেক হালকা ও সহজ হয়ে গেল। তা ছাড়া দেখলেন আমেরিকাকে আরও অনেকদিকে অনেক সুযোগ আছে। শো-নিজনেসেই যে সেপে থাকতে হবে তারই বা কি মানে

আছে। এদিকে সাক্ষ্য না পেলে অন্য কোন কাজে ঢুকে পড়লেই হবে। ক্রমে ক্রমে তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে লাগল। চালি ঠিক কবে ফেললেন যাই ঘটুক, তিনি আমেরিকাতেই বসবাস করবেন।

প্রদর্শনীর অসাক্ষ্যের ব্যাপারটা যাতে মনে প্রভাব না করতে পারে, এমন মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন চালি—ঠিক করলেন লেখাপড়া কবে নিজেই শিক্ষিত কবে তুলতে হবে—এই উদ্দেশ্যে পুনরো বইয়েব দোকান ঘুরে ঘুরে এই বইগুলো কিনে ফেললেন চ্যাপলিন—কেনগের রেটোরিক একটি ইংরাজী ব্যাকরণ ও একটি ল্যাটিন-ইংরাজী অভিধান। মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করলেন যে, এ বইগুলো ভালভাবে আয়ত্ত করে নিতে হবে। এ সংকল্প কিন্তু টিকলো না—একবার বইয়ে চোখ বুলিয়েই সেগুলো টাংকের তলায় বেধে দিলেন। এবং ক্রমে এগুলোর কথা ভুলে গেলেন। দ্বিতীয়বার যখন স্টেটসো আসেন তখনই আবার এ বইগুলো তাঁক চোখে পড়েছিল।

চালিদের শো ফেল করলেও স্বাভাবিকভাবে তিনি খুব ভাল নোটসেস পেয়েছিল। 'ভ্যারাইটি'র মাসিক গাইডস লিখলেন—এই লেখক একজন ইংরেজ অভিনেতা আমেরিকানদের মনোহরণ করতে পেরেছেন—তিনি চালি চ্যাপলিন।

এরপর একটি এজেন্ট এসে দেখা করে চালিদের দলকে কুড়ি সপ্তাহের জন্য পশ্চিম আমেরিকায় টুর করে শো দেখানোর জন্য স্থি করে গেলেন। তরানক একটা সাক্ষ্য না পেলেও এই সফরটা মোটামুটি ভালই হোল। এদিকটার জিনিসপত্রের দামও ছিল কম। খাওয়া-পাওয়ার ব্যয় অনেক সস্তা হওয়াতে দলের প্রত্যেকেই অল্প অর্ধেক মাইনার টাকা বাঁচাতে পারছিল। চালির আয় ছিল এইসময়

সপ্তাহে পঁচাত্তর ডলার। এর থেকে প্রকাশ ডলার তিনি নিয়মিতভাবে ব্যাংকে অর্ন্ত স্যানিটারিটোনে জমা দিয়ে আসতেন।

যত পশ্চিমের দিকে যেতে লাগলেন ততই বেন মনটা হালকা হয়ে আসতে লাগল। এখানকার শহরগুলো যেন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। শেষ পর্যন্ত চালিরা ক্যানিফোনিয়া এসে পৌঁছলেন। সুবালোকস্মিত এ শহরটিকে মনে হতে লাগল স্বর্গভূমি-চারদিকে আঙুরের ক্ষেত, কমলা লেবুর কুণ্ড এবং প্যাসিফিকের কোস্ট শরীরের হাজার হাজার মাইল ধরে পারিপার্শ্বের সাক্ষি। এরপর চালিরা এলেন স্যানজোয়ানসিকোতে। এখানে খুব ভাল খাবার-দাবার পাওয়া যেত এবং সস্তা দানে। চালিরা এখানে এসেছিলেন ১৯১০ সালে। চালিরা ১৯০৬ সালের বিরাট ভূমিকম্পের পর এ শহর আবার সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি হয়েছে। পাহাড়ে রাজ্যভ্রমণে দু-এক জায়গায় তখনও কাটলের চিহ্ন আছে। তবে স্বাস্থ্যের আর কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না এই নতুন-গড়ে উঠা শহরে। সব জায়গা বেন তাকতকে, জব্ববকে। চালির ছোট্ট হোটেলটিও তারি স্থান ছিল এখানে।

চালিরা এখানে এসে প্রদর্শনী করলেন। এর মালিক ছিলেন গিল্ড গ্রাউম্যান ও তাঁর বাবা। এঁরা খুব নিতকে এবং আনন্দে লোক ছিলেন। এইখানেই একটি পোস্টারে সর্বপ্রথম চালির নাম প্রকাশ করা হয় একলা—কার্নো যন্ত্রে কোন কথা ভাঙে ছিল না। দর্শকদের দেখেও প্রাণটা ধুশিতে তরে উঠতো। আগেই বলা হয়েছে ‘সি-ইউ-ইজ’ নক্সাটি ছিল অত্যন্ত বাজে এবং একঘেয়ে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক শো’তে প্রেক্ষাগৃহ লোকে ভর্তি থাকতো এবং শো’য়ের সময় দর্শকদের ভেতর হাসির জ্বলোড় উঠতো। বহুদিন বাদে চালি আবার নতুন উত্তরণে এবং আবার আলো

দেখতে পেলেন এই স্যানজোয়ানসিকোতে এসে। গ্রাউম্যান চালিকে বললেন—‘যদি কর্নোও কার্নোর দল ছেড়ে দেও, সোজা এখানে ফিরে আসবে। একসঙ্গে আমরা নতুন শো বক্স করবো।’

লস এঞ্জেলসের অভিজ্ঞতা হোল এর বিপরীত। এ শহরটা এ সময় ছিল অত্যন্ত গরম এবং নোংরা। বেশ কষ্ট হয়েছিল এখানে থাকতে চালিদের। এখানকার লোকেরাও যেন কেমন প্রাণহীন, রক্তশূন্য ফ্যাকালে চেহারার। এখানকার আবহাওয়া স্যানজোয়ানসিকোর থেকে গরম কিন্তু সেখানকার নতুন ছিন্নছিন্ন, ভাঙা প্রাণবন্ততাব এখানে ছিল না।

পশ্চিমের সফর শেষ করে আবার চালিদের মনটা নিউ ইয়র্কে ফিরে এলো। ঠিক করা হোল এবার ইংলণ্ডে ফিরতে হবে। কিন্তু বিস্টার উইলিয়াম মারিস এনে নতুন জি করলেন ফট সেকেন্ড স্ট্রীটে (নিউ ইয়র্ক সিটি) তাঁর বিরোধী চালিদের রেপারটারারে সব নক্সাগুলো বক্স করতে হবে ‘ছ’ সপ্তাহের জন্য। চালিরা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন—‘এ নাইট ইন এ্যান ইংলিশ নিউজিক হল’ দিয়ে—এ নক্সাটি বিপুল সাফল্য লাভ করল।

একদিন দুটি বুক সময় কাটানোর জন্য কোনও উপায় না পড়ে গেলে উইলিয়াম মারিসের ‘আমেরিকান নিউজিক হল’-এ ঢুকে পড়লেন চালিদের শো দেখতে। এর মধ্যে একজন শো দেখতে দেখতে বললেন—‘যদি কর্নোও কেউকেটা হতে পারি তা হলে এ ছোকরার সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেলবো। বুকটি চালির এ্যাকটিং দেখেই শুকখা বলেছিলেন।

চালি তখন ‘এ নাইট ইন এ্যান ইংলিশ নিউজিক হল’-এ এক মাসালের উদ্বোধন অভিনয় করছিলেন। এই সময় এই বুক তি ডব্লিউ গ্রিফিথের বাণিজ্যিক ক্যামেরাতে মুক্তি এলোটা হিসাবে কাজ করছিলেন। মাইনা পেডেল সপ্তাহে

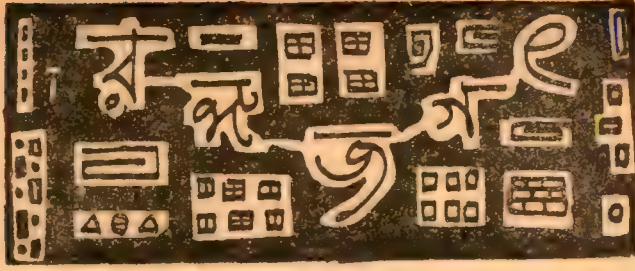
পাঁচ ডলার। এটি বুকের নাম ব্যাক সেনেট এবং ইনিই পরে ‘কিসেটার’ ফিল্ম ক্যামেরার প্রতিষ্ঠা করেন।

‘ছ’ সপ্তাহ উইলিয়াম মারিসের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে খুব সফলতার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে অভিনয় করবার পর মুলিভ্যান ও কনসিডাটন ক্যামেরা কুড়ি সপ্তাহ সফরের জন্য চুক্তি করলেন চালিদের দলের সঙ্গে।

এই সফরের শেষে চালির মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। সফর শেষ হতে আর তিন সপ্তাহ বাকি—স্যানজোয়ানসিকো, স্যানডিয়েগো, ডারপার ফল্ট লেক সিটি এবং সেখান থেকে ইংলণ্ডে ফেরা। স্যানজোয়ানসিকো ছাড়বার আগের দিন চালি পারে হেঁটে মার্কিট স্ট্রীটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—হঠাৎ একটা ছোট্ট মোকামের সামনে এসে পড়লেন, মোকামের জানালার পর্দা লাগানো। সামনে সাইনবোর্ড লেখা—‘এখানে হাত দেবে এবং তাগের সাহায্যে ভাণ্ডা গণনা করা হয়—চার্লি এক ডলার।’

একটু ইতস্তত করে চার্লি মারিস তেতরে ঢুকে পড়লেন। তেতরের একটা ঘর থেকে একজন স্থলান্তি মহিলা বেরিয়ে এসেন—মহিলার বয়স আন্দাজ চব্বিশ, কি চিরকো-ছিলেন দেখেই বোঝা গেল। আহা—পর্দা না খেঁচ করেই উঠে এসেছেন। একটা টেবিলের দিকে দেখিয়ে দিলেন বসবার জন্য। সামনের দিকেই দরজা। চালির দিকে না চেয়েই মহিলা তাঁকে বলতে অনুরোধ করলেন। এক প্যাকেট ভাঙ দিয়ে বললেন—‘ভালটা সাফল্য করে তিনবার কেটে আবার দিলে রাবুন তাগপার হাডের তেলো ওপর দিকে করে টেবিলের ওপর রাবুন।’

(কমপ্লি)



এবার 'সুবর্ণরেখা'

শোনা যাচ্ছে ঐত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' ছবির মুক্তি আগম। তিনটি ছবি বাংলা দেশে রাহুগ্রাসে পড়েছিল। তার মধ্য একটি মুক্তিলাভ করেছে এবং একটি বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার ঘোষ-কবলিত হয়ে দু'সপ্তাহ পরে প্রেক্ষাগৃহ থেকে নিষায় নিয়েছে, এবার 'সুবর্ণরেখা' মুক্তি পাচ্ছে। বারান সাহার 'ভৈরব নদীর পারে' এখনো বাস্তবশীল হয়ে আছে। হরভো গোটিও মুক্তি পাবে। তার কাগধ এট তিনটি ছবি বিশ্ব-বিখ্যাত সনাতনচর্য সাদৌলের প্রশংসা লাভ করেছে। সুতরাং নিজেরা বুঝতে না পারলেও সাদৌলের প্রশংসায় কোন পরিবেশকের যদি দৃষ্টমুক্তি ঘটে থাকে, তবে তা বাংলা চলচ্চিত্রের গৌভাগ্যের কথা। 'সুবর্ণরেখা' আমার দেখার গৌভাগ্য হয় নি। তবে ঐত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র-চেতনা সম্পর্কে যে ধারণা আছে এবং তাঁর চিত্রপ্রাপ্ত ছবিগুলির কথা মনে

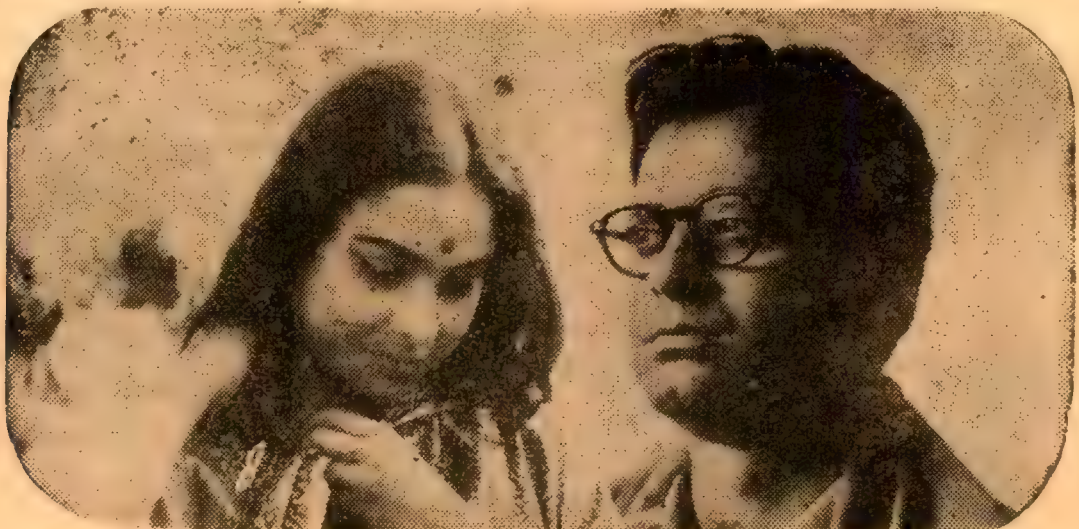
হলে অনুমান করা ভুল হবে না যে, 'সুবর্ণরেখা' দশটা সাধারণ ছবির অনেক উর্ধ্ব স্থান পাবার যোগ্য।

বাংলা দেশের চলচ্চিত্র-জগতে ব্যবসায়ী মনোভাবের প্রাবল্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এতদিন বাংলা ছবি যে নিজস্ব শিল্পধারা রচনা করে আসছিল—আর বৃদ্ধি তা রচনা করা সম্ভব হবে না। যারা চলচ্চিত্রে নতুন চিন্তাধারা প্রয়োগ করতে চান, অথবা চলচ্চিত্রকে সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিকশিত করতে চান, এ ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী ও তাঁদের দালালরা তখনই গোরগোল তোলেন। গতজিৎ রায়ের নূত বিশ্ব-বিখ্যাত পরিচালকও এঁদের কাপুরুষোচিত আক্রমণ থেকে রেহাই পান না। একপ আক্রমণের দরুণ এখন কোন প্রযোজকের পক্ষে বলিষ্ঠ দৃষ্টি-ভঙ্গীসম্পন্ন সমাজ-সচেতন কোন কাহিনী নিয়ে চিত্র নির্মাণ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। হয় বোরাচীরের পথে টেনে নামাবে, নয় চলচ্চিত্র-জগৎ থেকে

বিদায় নিতে বাধ্য করবে। এট হয়েছে অবস্থা। ঐত্বিক ঘটকের 'বগলার বজ-দশন' ছবিটিও অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কোন পরিচালকের একটি ছবি মুক্তি না পেলে পরবর্তী ছবি নিষিদ্ধ হওয়া কঠিন। তার ওপর পরিচালকের টিকে থাকা নির্ভর করে। ঐত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি 'নাগরিক' মুক্তিলাভ করতে পারে নি; আর কখনো পারবেও না। 'অয্যমিক', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' এবং 'কোনল গাছার' মুক্তিলাভ করেছে। প্রত্যেকটি ছবিতেই তাঁর উজ্জ্বল চলচ্চিত্র দৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্মতার পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু ব্যবসায়িক দিক থেকে সবকয়টি সার্থক হতে পারে নি। এইখানে হয়েছে বিপদ।

প্রায় এক অচল অবস্থার মধ্যে ঐত্বিক ঘটককে পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউটে চাকরী নিয়ে চলে যেতে হয়েছে। যাবার আগে তিনি একটি ডোজপূরী ছবিতেও হাত লাগিয়েছিলেন। ভারত সরকার শ্রীষটকের মত লোককে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে কাজ দিয়ে যোগ্য বিবেচনার কাজ করেছেন। এখানে স্বাধীন-ভাবে ছবি করতে না পারলেও বহু চলচ্চিত্র-শিক্ষার্থী তাঁর কাছে সমাজ-সচেতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বাস্তবনিষ্ঠ জ্ঞানলাভ করবে।

সুজগ



ঐত্বিক ঘটক পরিচালিত 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে দু'টি চরিত্রে মাধবী মদ্যাজী ও অভি ভট্টাচার্য

চিত্র আলোচনা

অতিথি

মিউথিয়েটার্স (একজিবিটার) : তপন সিংহ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'অতিথি'র চিত্ররূপ দেবার জল্পনা-কল্পনা চলছিল অনেক দিন থেকে। শেষ পর্যন্ত তপন সিংহ এই কল্পনাকে রূপায়িত করলেন। রবীন্দ্রনাথের যে কল্পনা ভাষায় এতদিন বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ ছিল, আজ তা দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে পর্দায় প্রতিফলিত হয়েছে। পর্দায় আমরা দেখতে পেলাম মুক্তপ্রাণ বিহঙ্গের মত এক তরুণকে, যে শাসন বা গৃহের কোন বন্ধনেই ধরা দিতে চায় না। আপন বাঁশীর স্বরে আপনি বিনোদিত হয়ে প্রকৃতির কোলে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, অবাধে ঘুরে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে। জ্বলরের পথে তার পথচলা। এভাবে চলার নেশায় সে এসে ঠেকেছিল এক জমিদারের বজরায়, সেখান থেকে জমিদারের বাড়িতে। কিন্তু জমিদার যেদিন চাইলেন, জামাই করে তাকে আত্মীয়তায়

বাঁধতে, সেদিনই সে ছুটে পালালো—মজনার পথে।

তপন সিংহ ছবিটিকে সকল শ্রেণীর দর্শকের মনোরঞ্জন দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত করেছেন। তাই এখানে যেমন মূল গল্পের উদাসীন নায়কের বাঁধনহারা চরিত্রের নাট্য আছে, তার সঙ্গে আছে পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গতা, প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোরম উপভোগ্যতা এবং সঙ্গীত, নৃত্য ও কৌতুকরসের বহুমুখতা। ছবিটি ছোট-বড় সকলের ভাল লাগবে। 'কাবুলিওয়ানার' মত একটি জনপ্রিয় চিত্রের গৌরব লাভ করবে আশা করা যায়।

'অতিথি'র চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনার দায়িত্ব একটি বহন করেছেন তপন সিংহ। তারাপদ যে প্রকৃতি প্রেমিক, প্রকৃতিকে নিয়ে তার অগ্ন রচনা করেছে—সে পরিচয় প্রথমেই পাওয়া গেল ছোট ভাই কর্তৃক তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বনের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার। মাটিটারের সঙ্গে কথায় বা নায়েব আদেশ পালনে এবং কলগী নিয়ে জল ভরতে বোঝা গেল তারাপদ নন্দ, শান্ত, পাড়ার লোকে তাকে ভাল



মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত 'দিনান্তের আলো' ছবিতে সুমি জ সান্যাল।

ছেলে বলেই জানে। পাড়ার মেয়েরা তার বাঁশীতে মুগ্ধ, সম্পর্কিত বোধিত। তাকে সুপুর্বে 'তাস খেলবার আহ্বান' জানালে সে রাজী হয় না। এ থেকে তারাপদের চরিত্রটি দর্শকদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই তারাপদ ব্যাভাগান শুনে মুগ্ধ হয়ে ব্যাভার দলে ভিড়ে গেল। কিছুদিন পরে তাকে দেখা গেল এক কসরৎ দেখাবার দলে বাঁশী বাজাতে। মেলায় গিয়ে মেলায় রকমারী ভাসানায় সে মুগ্ধ। তীর্থ-করা জমিদারের বজরা তাকে আকর্ষণ করলো, সে বজরায় গিয়ে উঠলো এবং এখানেই স্থান পেল। নতুন নতুন গাঁ অতিক্রম করে ভেলে চলার এই ক'দিন তার কাছে আকর্ষণের। এখানে আবার তারাপদের মনের ছবি পাওয়া গেল; নদী-পাড়ের পা-বাঁধা অবস্থায় ঘোড়টিকে দেখে যখন চাক মজা করছে, তারাপদের বন তখন বন্ধনের ব্যাধায় ভরে উঠেছে। সে গাঁতরে গিয়ে ঘোড়ার বাঁধন বুলে দিল।

চাক জমিদারকন্যা। নিঃসঙ্গ ও বাঁধাধরা জীবনের চাকুর কাছে এই দুঃখ, বেপরোয়া উদাসীন তারাপদ একটি বিগায়। কিশোরী চাকুর মনে তারাপদের প্রতি আগ্রহ নদীপথের ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে উঠলো। বাস্তব



মণাল সেন পরিচালিত 'আকাশ-বৃন্দা' চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপরূপা দাশগুপ্ত।



‘দোলনা’ ছবিতে আরতি মজুমদার ও শ্রদ্ধা দাস।

পৌছে সে চাইল তারাপদ একান্তভাবে তাদের বাড়ির হয়ে। থাকুক, তাই খেলার মত। তাই বালিশবা গোন-বথিকে ডেকে সে একটি নতুন খবর শোনাতে গিয়ে যখন জানিলো যে, তারাপদ গোনমণিদের বাড়িতে গিয়েছে। সে তখন নিজেকে পরাজিত মনে করে রাগে ফেটে পড়লো। নিজের পুতুল ছুঁড়ে—অতিথিগে বংবো গোনমণি তার পুতুল চুরি করেছে।

কিছুদিন পরে দেখা গেল চাকর নিজে গল্পকে গাচেন হয়ে উঠেছে। তার স্বভাবেরও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে তারাপদের জামায় কাপড়ে, দিব্যাচাঁচার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

এমন সময় একদিন ছোট্ট বোড়ার গানার বুঝুমির শব্দে সে যেন মুজির ডাক শুনলো। প্রাচীর-মোঁট বাড়ির বন্ধন থেকে ছুটে চললো আবার কোন অজানার পথে—মুজলোকে।

চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক এখানে অতীত দিনের সমাজজীবনের পট-ভূমিকায় কাহিনীকে প্রকাশ করেছেন। গাজ-সম্ভায় সে পটভূমি প্রায় পরি-স্ফুট। মূল গল্পের বর্ণনায় মধ্যে

গীরাবন্ধ না থেকে তিনি প্রয়োজন মত ঘটনা ও দৃশ্য সংযোজন করেছেন। বক্তব্য স্পষ্ট করে তোলার দিক থেকে তা সহায়ক হয়েছে। মূল গল্পটি প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরিচালক এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশকে যথাযথ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর মেলার দৃশ্যটি বড়ই দুর্বল। বরঞ্চ এট দৃশ্যটিকে বর্ণোচ্ছল করে শেষের নদীর বুকে নৌকার মারি এবং তার ওপর বাইজী নাচ ও বিভিন্ন গানের আসর না দেখালে ছবির শিল্পমূল্যের দিক থেকে ভাল হতো। নদীর ওপর বাইজী নাচ ইত্যাদি গাজানো ঘটনা মনে হয়। এ ছাড়া বোড়ার পেছনে ছুটে নদীপাড়ে আগার মধ্যেই তো কাহিনীর শেষ এবং বক্তব্য ফুটে ওঠে। এখানেই তো তারাপদ আবার প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গেল। বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আরো কিছু কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা ছবিটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

পরিচালক তপন গিংহ গঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বটুকু নিজেকে করে-ছেন। আবহসঙ্গীত সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত ও এবং তার জন্য উপযুক্ত সুর চয়ন প্রশংসনীয়। কিন্তু তারাপদের বাঁশীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয় নি।

পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গীতের অসঙ্গতি ছবির বাস্তববোধকে ক্ষুণ্ণ করে। অতীতে তো দূরের কথা আজকের দিনেও পল্লীগানে কোন গ্রাম্য তরুণের বাঁশীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর শোনা আশা করা যায় না; যতটা না কোন পল্লীসঙ্গীত অথবা তঞ্জিমূলক গানের সুর শোনা স্বাভাবিক।

‘অতিথি’তে অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেক নতুন মুখ চোখে পড়ে। তারা ছবির উপভোগ্য-তায় সহায়ক হয়েছে। তারাপদের চরিত্রে পার্শ্বনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সুদর্শন এবং অভিনয়ে গাঠক। চাকর

চরিত্রে বাগবী ব্যানার্জীর এখানে
দ্বিতীয়বার চিত্রাভিনয়। কিশোরীর
চাপল্য, মান-অভিমান এবং জমিদার-
বাড়ির একমাত্র আদুরে কন্যার
চরিত্রকে সে দক্ষ শিল্পীর মত
সার্থকভাবে প্রকাশ করেছে। সোনা-
খণি রূপে নিভা মুখার্জী সকলের দৃষ্টি
আকর্ষণ করেছে। তার মুখে সংলাপ
প্রয়োগে পরিচালক অতীত সমাজ-
জীবনের একটা বেদনাময় দিক তুলে
ঝুয়েছেন এবং এইসঙ্গে মাস্টারের কথার
মধ্যে দিয়ে জাত্যাভিনয়ীদের একটু
চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন।
অন্যান্য চরিত্রে সলিল দত্ত, শ্রীতা
সিংহ, নমিতা বিশ্বাস, গৌরেন মুখার্জী,
মন্ডিন ঘোষ, অজিতেশ ব্যানার্জী,
মসরাজ চক্রবর্তী, বিনয় লাহিড়ী কৃষ্ণা
বোস, দীপালি মুখার্জী প্রমুখ আরো
অনেকে যথাযথভাবে অভিনয় করেছেন।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের চিত্রগ্রহণ
ও সুবোধ রায়ের সম্পাদনার কাজ
প্রশংসনীয়। তপন সিংহের স্টুডিও
ছবিগুলির মধ্যে 'অতিথি' বাংলার
চলচ্চিত্রে ভাঙারে একটি অনন্যসাধারণ
সংযোজন।

অরোরার সংবাদচিত্র:

রবীন্দ্রজয়ন্তী

এবারে ২৫শে বৈশাখ শহরে উদ্-

ঘাপিত রবীন্দ্র অনু-অমর্তী অনুষ্ঠানের
এক সংবাদচিত্র কলকাতার বিভিন্ন
সিনেমায় দেখান হচ্ছে। এই সংবাদ-
চিত্রটি নির্মাণ করেছে অরোরা ফিল্ম
কর্পোরেশন। এই ছবিতে একনজরে
২৫শে বৈশাখ সকালে ঠাকুরবাড়িতে
দর্শনার্থীদের ভিড়, সকালের অনুষ্ঠান
রবীন্দ্রমেলায় উদ্বোধন, বঙ্গসংস্কৃতি
সম্মেলনে ছোটদের অনুষ্ঠান এবং
নির্মায়মাণ রবীন্দ্র সরণীর সম্মুখে
শিল্পী-সাহিত্যিক সমাবেশ ও পথের
ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রহ্লাঞ্জলির
দৃশ্য দেখা যায়। ছবিতে নাট্যকার
বল্লভ রায় থেকে গত্যজিৎ রায়,
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুরচিত্রা সিত্ত
প্রমুখ খ্যাতশিল্পীদের দেখা যায়। এই
সংবাদচিত্র অরোরার একটি উদ্দেশ্য-
যোগ্য প্রচেষ্টা। সংবাদ চিত্রের ক্ষেত্রে
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন যদি এভাবে
অগ্রসর হন, তবে সংবাদচিত্রের ক্ষেত্রে
তা হবে এক নতুন সংযোজন। কারণ
বর্তমানে সংবাদচিত্র সরকারের এক-
চেটিয়া ব্যাপার এবং তাতে অনেক
সময় জনসাধারণের স্বার্থ ও উৎসাহের
দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না।

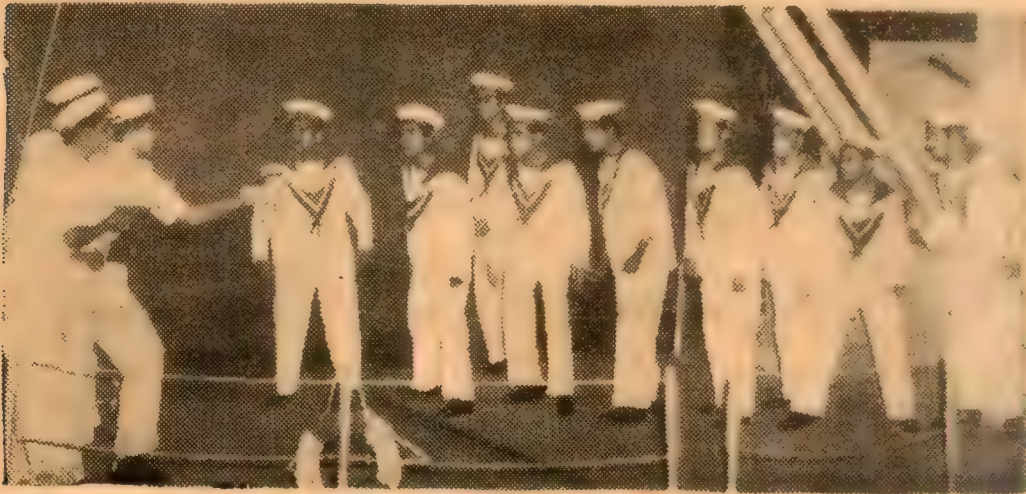


'রং বদলায়' ছবিতে বিকাশ রায়

স্টুডিও গ্রুপ

নাট্যক

গত্যজিৎ রায় তাঁর নতুন ছবি
'নায়ক'-এর প্রাথমিক কাজ শেষ করে
এনেছেন। সম্ভবত আগামী '১০ই
জুলাই থেকে চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু
হবে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন
উত্তমকুমার। নাট্যকার চরিত্রে এখনো
শিল্পী বাছাই হয় নি। জানা গেল



মিনার্ভা 'করমলা' নাটকের একটি দৃশ্য



মলদাভিয়ায় এক গ্রীষ্মকালীন শিবিরে মস্কা ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটির বহুজাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসব

শ্রীরায়ে একটি নতুন মুখের সন্ধান
করেছেন। 'নায়ক'-এর কাহিনী ও
চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীরায়ে নিজে।

সংবাদ সম্মেলনা

ক. ন. চ. চিত্র ৩৫সং

বুটেনের রিচার্ড লেস্টার পরি-
চালিত 'দি ন্যাক' এবার কানস চল-
চ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার লাভ
করেছে। বিদেশ জুরী পুরস্কার পেয়েছে
জাপানের মাৎসাকি কোবায়াসি পরি-
চালিত 'কাওয়ারাজেন'। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
ও অভিনেত্রীর সম্মানলাভ করেছেন
বহাজ্রমে আমেরিকার টেরেন্স স্ট্যান্স
এবং হামায়া এগার। এই দুজন 'দি
কালেক্টর' ছবিতে অভিনয় করে এই
সম্মান পেলেন। শ্রেষ্ঠ পরিচালনার
পুরস্কার পেয়েছেন কমানিয়ার 'দি
৬২৪ হাংগার' ছবির পরিচালক
'দাউউ বিউলি'।

ভারতে টেলিভিশন

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর দিল্লী কেন্দ্র
হতে বিকাল ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত এক
মণ্টা টেলিভিশন কর্মসূচী গ্রহণ করা
হয়েছে। দিল্লী ছাড়া নীরাট এবং
ফরিদাবাদে এই প্রোগ্রাম দেখা যাবে।
যত্বনানে দিল্লীতে ছয় ম' টেলিভিশন
সেট আছে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রিদপ্তর
আশা করছেন আগামী তিন মাসের
মধ্যে এই সংখ্যা ৩ হাজারে
পৌছবে। জাপান থেকে এক কিস্তি
টেলিভিশন সেট দিল্লীতে এসে
পৌছচ্ছে। জানা গেল টেলিভিশনে
উৎসাহ দেবার জন্য এই সেটগুলি
প্রতিটি ১ হাজার টাকা দানে বিক্রয়
করা হবে।

অভিনেতা নীতীশ মুখার্জীর

জীবনাবসান

বাংলা নক ও চলচ্চিত্র অভিনেতা
শ্রীনীতীশ মুখার্জী গত ১০ই জুন নাগি:

হোমে মারা গেছেন। তিনি কিছুকাল
যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর
বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তিনি স্ত্রী
তিনপুত্র, বৃদ্ধা মাতা ও বহু বন্ধুবান্ধব
সঙ্গে গেছেন।

পরশমণি (১৯৩৭) ছবিতে তাঁর
প্রথম অভিনয়। তারপর থেকে তিনি
প্রায় ৭০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন।
এ ছাড়া নাট্যাচার্য শিশির তাদুড়ীর
সঙ্গে এবং কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে
তিনি অভিনয় করেছেন। মাঝে
অপেশাদার সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁকে
মঞ্চে দেখা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য
যোগ্য যে, ন্যাশ্বিন গর্কার 'মার'
নাট্যরূপে মলিনাদেবীর সঙ্গে তিনি
লিটল থিয়েটারের চরিত্রে অভিনয়
করেছিলেন। ভারতে 'মার' নাট্যরূপের
এইটি ছিল প্রথম অভিনয়।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলা নক ও চিত্র-
জগৎ একজন, কৃতী শিল্পীকে
হারালো।

লোকশিল্পী শামু ঘড়াগী

পল্লীবাংলার এক অমূল্য সম্পদ হন মুখে মুখে প্রচলিত মননাতানো গানগুলি। এ গানগুলি আমাদের পল্লী মা-ভাই-বোনদেরই রচনা। এ গান তাঁরা নিজেরাই মনের আনন্দে গেয়ে থাকেন। তাই এ গান তাঁদের দৈনন্দিন কাজের গাধী।

পেশাদারী গান কৃষিপ্রধান বাংলা দেশের লোকসংগীতগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান। শ্রমজীবীদের শ্রান্তি অপনোদনের অবলম্বন হিসেবে এই পেশাদারী গানগুলোর সার্থকতা আছে। এই পেশাদারী গানগুলোর মধ্যে গোপ-খেলানো গান, ছাত-পেটানোর গান, গো-চারপের গান, গাড়ি-চালানোর গান এবং কামার তাইদের গান উল্লেখযোগ্য। শামু ঘড়াগীও একজন কামার। সারাদিন তিনি ছোট খড়ের ছাউনি-তোলা ঘরের এককোণে বসে তপ্ত লোহা পিটিয়ে ছুরি, কাঁচি, কোদালী, বাটালি ও অন্যান্য ছোটখাট লোহার জিনিস তৈরী করেন। কাজ শুধু কাজ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শামু ঘড়াগী তার নিজের কাজেই ব্যস্ত। শামুর এই একঘেয়েমী কাজের মাঝে গানই তাকে সদাসর্বদা প্রাণবন্ত করে রাখে। শামু কাজ করে যায় সারাদিন ধরে, আর তারই কাঁকে হাতুড়ি পেটানোর ছন্দে গান গেয়ে চলে। তার গানে আছে স্বতঃস্ফূর্ততা। আর আছে প্রাণ। দৈনন্দিন কাজেরই একটা ছন্দ ছবি পাওয়া যায় শামুর গান-গুলি থেকে, যেমন—

ঠুক ঠাক ঠুক ঠাক

সারাদিন খাটি মোরা

হাতুড়ি চালাই মোরা

লোহা পিটি লাখে লাখ ॥

লোহা কেটে গড়ি মোরা

ছুরি কাঁচি বাটালি

হাতুড়ি খোঁড়া আর

কাতে কোদালি ॥

—ইত্যাদি।



হতে পারে কামার—শহরের বাবুদের মত শামু শিক্ষিত নাও হতে পারে—তবু শামু যে ছোট কাজ করে না তারই বলিষ্ঠ সংকল্পের সুর পাওয়া যায় তারই গাওয়া একটি গানে—

‘আমরা কামার গড়িয়ে কুড়ালি কুড়ালি নয় বিশ্বকর্মান হাতের বাটালি।’

দিনরাত কঠোর পরিশ্রমের পর চিন্তা-বিনোদনের জন্য মনটাকে একটু হালকা করার জন্যই শামুর কণ্ঠে হালকা চটুলস্বরের গান মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। যেমন—

চাঁদবদনী তুইলো আমার

জীবন-মরণকাটি,

তোরে না দেখলে পরে

মরি লো দন ফাটি ॥

তুই লো আমার রসগোলা

মণ্ডা মিঠাই ছানা,

শীতের কাঁধা তুই লো আমার

রইদের মিশরিপানা ॥

—ইত্যাদি।



শামু ঘড়াগী

শামু যে একজন ভাল শ্রুতধারী গীতশিল্পী কে সে খবর রাখে? যে একজন কামার—ছুরি, কাঁচি, বাটালি তৈরি করাই তার কাজ এই কথাটি সকলের জানা।

হাওড়া জেলার শাহপুর থানার অন্তর্গত একটি ছোট জায়গায় শামুর কুঁড়েঘর।

শামুর মত আরও অনেক কামার, কুমার রয়েছে বার্না শামুর মত সংগীত-প্রতিভার অধিকারী। নিছক কামার, কুমার বলে ছোট না করে তাদের মধ্য থেকে এই পেশাদারী গানগুলিকে সংগ্রহ করে লোকসংগীতের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করা এবং এইসব শিল্পীদের পরিচিতি সবার সামনে তুলে ধরাই আমাদের কর্তব্য।

পেশাদারী গান ব্যাপকভাবে সংগৃহীত হয় নি আমাদের দেশে। তাই পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে এইসব শিল্পীদের খোঁজ নিয়ে তাদের কাছ থেকে এই ধরনের পেশাদারী গান সংগ্রহ করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। --বুদ্ধদেব রায়।

১৯৪৬

সালের এই ঐতিহাসিক

নৌবিজ্ঞানের আশ্চর্য নাট্যরূপ দিয়াছেন ক্রীউপল মত এক তাঁর সুবিখ্যাত লিটল থিয়েটার গ্রুপ। গত করক সপ্তাহ ধরিতা মিনার্ভা থিয়েটারে “কলোজ” নামে যে নাটকটির অভিনয় দর্শকদের মধ্যে যুগপৎ বিস্ময়, চাঞ্চল্য এবং হৃৎকতা সৃষ্টি করিতেছে, অসামান্য জনপ্রিয়তার ঘারা ঘারা বার বার অভিনয়িত হইতেছে সেই “কলোজ” নৌবিজ্ঞানেরই নাটকীয় প্রতিধ্বনি, কিন্তু সার্থক প্রতিধ্বনি। বহি আধুনিক বাস্তবের স্রবমকে ক্রীউপল মতকে “দুর্দান্ত শিল্পী” আখ্যা দেই তবে নিশ্চয় উহা বিজয় করবার অস্ত্র নয়, কিন্তু তাঁর অসামান্য হৃদয়মণীর প্রতিভার বেগমান, বলিষ্ঠ ও মজাজ রূপ প্রকাশের জন্ত—

—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক, দৈনিক বঙ্গমতী

কলোজ মিনার্ভার প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৯

রবিবার ও দুটির দিন ৩ ও ৬ টায়

সম্পর্কিতবে চলিতেছে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দেশ

পেগারী মণ্ডে রবীন্দ্রনাথের
অভিনয়

শেখরীয়ারকে ইউরোপ-আমেরিকা-য় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে স্বীকার করা হয়। শুধু নৌখিক একটা দাবি জানিয়েই ওসব দেশের লোকেরা চুপ করে বসে থাকে না এবং শুধু জুল, ফলেজের গভীর মধ্যেই তাঁর রচনাকে পাঠ্য হিসাবে আটকে রেখে দেওয়া হয় না। পাশ্চাত্যের নাট্যসুরাগীরা একথা বেশ ভালভাবেই জানেন যে, বঙ্কর না হলে নাটকের সম্পূর্ণতা আসে না। বঁরা বলে করেন মকাভিনয় ব্যতিরেকেই mental performance-এর সাহায্যে নাটক বুঝে নেন, তাঁরা সত্যিকার নাট্যবিদ নন। স্বরলিপি পড়ে যেমন গানের রস বোঝা যায় না, তেমনি নাটকের লিখিত অংশ বা manuscript পড়ে নাটক উপভোগ সম্ভব নয়। কথাটা বলে—A Nation is known by its stage. ইংরাজ জাতির শিক্কা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য গুণাবলীর দিকটা বুঝতে হলে ওদের স্টেজ এবং স্টেজ-এর একটা দেখা দরকার—আমাদের দেশের ইংরেজ মার্কেটাইল অফিসের সাহেবদের মেবে ইংরেজ-চারিত্র্য সহজে কোনো ধারণা হয় না।

শেখরীয়ারকে শুধু নৌখিক প্রহ্লা দেখিয়েই ইংরেজেরা চুপ করে বসে থাকে না—ভিন্ন দেশ থেকে যারা দৃষ্টান্তে যান, কোনও না কোনও পেশাদারী নকে যে-কোনও সময়ে শেখরীয়ারের নাটকের অভিনয় দেখে আসতে পারবেন। তা ছাড়া স্টুডেন্টফোর্ড আপন-এড—এ শেখরীয়ারের বেনেডিয়াল থিয়েটার তো আছেই।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা এদেশের

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে গর্ব করি এবং সাক্ষাতিক নাট্যকার হিসাবে তাঁকে বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। অথচ ভাদুতীযুগের অবসানে কলকাতার পেশাদারী নকগুলিতে কখনও রবীন্দ্রনাথের অভিনয় হতে দেখি না। পেশাদারী নক বলতে আমি মিনার্ভা, স্টার, বিশ্বরূপা, বঙ্কমহলকেই বুঝি—অর্থাৎ যারা প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করেন। শৌভনিককে বাদ দিলাম দুটি কারণে। প্রথমত এটি ওপন্‌ এরার থিয়েটার (অর্থাৎ অন্য জাতের নক) এবং দ্বিতীয়ত দু-একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়া এঁদের অভিনয়ে ঠিক পেশাদারী পারফেকশন অত্‌ এ্যাকটিং দেখা যায় না।

সংস্কৃতিবান বিদেশীরা যখন এ-দেশে আসেন, ইচ্ছা প্রকাশ করলেও কলকাতার কোনো পেশাদারী নকে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখতে পান না। এ থেকে তাঁরা বুঝে নেন—রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের আসল প্রহ্লা কতটুকু! প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখে কবির ছবি টাঙিয়ে এবং সামনে কিছু ফুল রেখে, স্টা করে বক্তৃতা আয়োজন করে—‘রবীন্দ্রনাথ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার’ বলে দাবি জানিয়েই আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের প্রহ্লা পরাকাষ্ঠা দেখাই—আর রাতের পর রাত নকর করি ‘উলকা’ এবং ‘তাপসী’ এবং ‘কুশা’ ও ‘সেতু’ জাতীয় নাটক (?)।

If a nation is known by its stage, তাহলে আমরা যে কোন স্তরে এসে পঁড়িয়েছি তা লম্বাউ অনুমো।

অথচ এমন অবস্থা তো চিরনাল

ছিল না। অর্ধশুশ্রূষার সময় থেকে শিশিরকুমার অবধি রবীন্দ্রনাথকে তো এমনভাবে কখনও পেশাদারী নক থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় নি। অর্ধশুশ্রূষার, অমর দত্ত প্রভৃতি কালের অভিনেতারা এবং পরবর্তী যুগে শিশিরকুমার, তিসকড়ি চক্রবর্তী, রাধিকানন্দ, দুর্গাদাস, অহীন্দ্র সখাট পেশাদারী নকে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় করেছেন।

গাল, তারিখ দিয়ে পেশাদারী নকে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের একটি রোজনামচার চুপক দিচ্ছি:

১৮৮৬ সালের ৩রা জুলাই
ন্যাশনাল থিয়েটারে সর্বপ্রথম পেশাদারী নকে রবীন্দ্রনাথের ‘বৌঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসের নাট্যরূপ ‘রাজা বসন্ত রায়’ নকর হয়—নাট্যরূপ পেন ওবাংকারি ন্যানেজার কেদার চৌধুরী।

চারিত্র্যলিপি ছিল এইরকম:
বসন্ত রায়—রাধামাধব কর
উদয়—মহেন্দ্র বোস
প্রতাপ—মতি জ্বর
অনঙ্গমোহন—পূর্ণ ঘোষ
বিভা—হরিমতি (এই ভূমিকায় অভিনয়ের পর সবাই তাকে ডাকতো ‘বিভা-হরি’ বলে।)

সুরমা—ছোটরাণী
রাণী—ভবতারিণী
মঙ্গলা—লক্ষ্মী
রামচন্দ্র—নীলমাধব চক্রবর্তী
রমাইতীড়—নাট্যচার্য অর্ধশু-
শেখর মুখার্জী।

এমারেল্ড থিয়েটারে ১৮৯০ সালের ৭ই জুন রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা ও রাণী’ বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করা হয় ১৫ রাত্রির জন্য। মহেন্দ্র বোস কুমার সেনের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। বিক্রম চরিত্রে মতিলাল অগ্রে অভিনয়ও উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। তা ছাড়া পণ্ডিত হরিভূষণের দেবদত্ত, চুণীলাল মিত্রের শঙ্কর, কিরণশর্মা রাণী এবং বিষাদকুমারের ইলা দর্শকদের ভাল লেগেছিল।

১৮৯৫ সালে এমারেল্ড ‘রাজা বসন্ত

সম্মানিত কলেজ

স্বামী নাকি বিভাগে হয়। সাক্ষর-ভূমিকায় পূর্ণ ঘোষ এবং জুজু ও বিভাগ চরিত্রে কুস্তম ও অকুমারী ভাল অভিনয় করেন।

১৯০৪ সালের ২৭শে নভেম্বর কুমিল্লায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের নাট্যরূপে মঞ্চস্থ করেন। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম:

মহেন্দ্র—অমরেন্দ্র
বেহারী—অনোমোহন গোস্বামী
বিমোচিনী—কুমার
আশা—সুখী
আমৃতা—অমরেন্দ্রনাথ
স্বামী—সুখী

১৯১৪ সালের ১৩ই জুন স্টারে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তি' গল্পের নাট্যরূপে মঞ্চস্থ হয়। গল্পটির অবলম্বনে নাট্যকাটি লেখেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যকার নাম হয় অভিনয়িনী। প্রধান কায়দা অভিনয়ের ভূমিকালিপি ছিল:

হিলাল—সুখী
সুখী—অমরেন্দ্রনাথ
কামলাল—কামলাল
শান্তি—অমরেন্দ্রনাথ
চন্দা—কুমার
স্বামী—অমরেন্দ্রনাথ
আশা—সুখী

বিভিন্ন অভিনয়ের কায়দা থেকে স্বামী অমরেন্দ্রনাথ হিলালের ভূমিকায় মাঝে মাঝে থাকেন।

১৯১৪ সালের ৩১শে অক্টোবর স্টারে রবীন্দ্রনাথের 'দিলি' প্রদর্শনের এডাপ্টেশন 'অকলস স্বামী' নাট্যকাটি মঞ্চস্থ হয়—কামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যরূপ দেন। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম:

অমরেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ
সুখী—কামলাল চন্দ্রনাথ
কামলাল—কুমার
মধু ভাট—সুখী
স্বামী—অমরেন্দ্রনাথ

অমরেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ
ইন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ
(হীরা)

হরিশ ভাট—অমরেন্দ্রনাথ
সুখী—অমরেন্দ্রনাথ

সুখী—অমরেন্দ্রনাথ
আশা—অমরেন্দ্রনাথ
স্বামী—অমরেন্দ্রনাথ

১৯১৫ সালে বেঙ্গল টেলেফোন মিউজিয়াম তাঁর 'বেঙ্গল টেলিফোন' থিয়েটারের অভিনয় শুরু করেন। এ সালেই এখানে 'স্বামী ও স্বামী' মঞ্চস্থ হয়।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে উপেন বিজয়ের কর্তৃত্বাধীনে বিনোদ্য রবীন্দ্রনাথের কোতুকন্যা 'বন্দীকরণ' মঞ্চস্থ হয়। প্রধান চরিত্রে স্বামীকায়দার অভিনয় হয়েছিল অমরেন্দ্রনাথ।

১৯২৫ সালের ১৮ই জুলাই আর্ট থিয়েটার স্টারে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার গভীর' অভিনয় শুরু করেন। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম:

স্বামী—অমরেন্দ্রনাথ
চন্দা—অমরেন্দ্রনাথ
অকলস—অমরেন্দ্রনাথ
গুরু—অমরেন্দ্রনাথ
বিমোচিনী—অমরেন্দ্রনাথ
স্বামী—অমরেন্দ্রনাথ
সুখী—অমরেন্দ্রনাথ
সুখী—অমরেন্দ্রনাথ
সুখী—অমরেন্দ্রনাথ
সুখী—অমরেন্দ্রনাথ

'চিরকুমার গভীর' সেই সালে মঞ্চস্থের মধ্যে প্রচুর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং বছরদিন অবধি চলেছিল। এট নাট্যকাটি প্রথমে শিশির-কুমারকে দেওয়া হয়, কিন্তু অকলসের ভূমিকায় অভিনয় করার মত যোগ্য নট তখন তাঁর দলে ছিল না—অর্থাৎ একই সঙ্গে ভাল অভিনয় এবং ভাল গান গাইতে পারেন এমন একজন স্বামী প্রার্থী অভিনেতা। অকলস নাট্যকাটি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। সীতারামের সুপে শিশিরনাথ করেন স্বামী অমরেন্দ্রনাথ

তিনকড়িবাঁকে নিয়ে 'চিরকুমার গভীর' অভিনয় করেন। সে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শিশিরবাঁকু হেঁসে হয়েছিল অমরেন্দ্রনাথ আর তিনকড়িবাঁকু অকলসের যে রূপ নিয়েছিলেন তাঁরও ভুলনা হয় না।

১৯২৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর আর্ট থিয়েটার কবির 'পূর্ণবোধ' নাটকের অভিনয় আরম্ভ করেন। তিনকড়িবাঁকু ভাট। স্বামীবাঁকু মজিন, কুমার কুমারের অভিনয়, সুখীবাঁকু এবং নীহারবাঁকু হিলাল ভূমিকায় রূপসার করেন।

১৯২৬ সালের ২৬শে জুন নাট্যমণ্ডির শিশিরকুমারের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'বিদর্ভ' নাটকের মত উদ্বোধন হয়।

এর অনেক আগেই অমরেন্দ্রনাথ অমরেন্দ্রনাথ শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইউনিভার্সিটি টেলিফোন টেলেফোন 'বৈকুণ্ঠের স্বামী' কেন্দ্রের তিনকড়িবাঁকু তাঁর অভিনয় দেখে স্বামী রবীন্দ্রনাথ পছন্দ উচ্চ প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'বৈকুণ্ঠের স্বামী' এমন অনিশ্চয় অভিনয় এক আশাঙ্কর বাড়িতে গগন অমরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারোই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেন্দ্রের আশাঙ্কর স্বামী পাওয়া। একলা এ পায়ে আশাঙ্কর বশ ছিল।'

স্বামী আশাঙ্কর 'বিসর্জনের' স্বামী কিয়ে আশাঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ নিজের অনেকবার 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করেছেন—নিজে ভূমিকা নিয়েছেন হয় রূপসার, না হয় অমরেন্দ্রনাথ।

নাট্যমণ্ডির এ নাটকের প্রধান কায়দা ভূমিকালিপি ছিল এইরকম:

স্বামী—শিশিরকুমার
স্বামী—অনোমোহন চন্দ্রনাথ
স্বামী—অমরেন্দ্রনাথ
অমরেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ
অমরেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ
অমরেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ
অমরেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ



তথ্যমাধুলা

মেহনবাগান ও স্পোর্টস ইউনিয়ন দলের লীগ খেলার একটি দৃশ্য।

বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্কট

সর্বভারতীয় ক্রীড়াঙ্গণের আজ সত্যি দুদিন উপস্থিত। বিশু-ক্রীড়াঙ্গণে ভারতের উন্নত শির আজ নত হবার উপক্রম, মান-মর্যাদা হতে চলেছে ভুলুগ্ঠিত। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে দুটি পূর্বপরিষ্কৃতিত ক্রিকেট-সফর বাতিল হবার ফলে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বিশু-ক্রিকেটের দরবারে বিশৃঙ্খল এবং আস্থা হারাতে বসেছে। বৈদেশিক মুদ্রার জন্য ভারতীয় কোন্টস দলের ইংলও-সফর বাতিল হবার আঘাত সামলে ওঠার আগেই অর্ধদণ্ডের কাছ থেকে এল চরম আঘাত। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের আবেদন মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্ধদণ্ডের মঞ্জুর না করার ফলে বিশৃঙ্খলী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের ভারত-সফরের বহুদিন পূর্বে রচিত পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে গেল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে বোধহয় ইতিপূর্বে এতরূপ অপ্রস্তুত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় নি। দেশের লোকের কাছে মান-সম্মান ত' গেলই, বিদেশের আসরেও মুখ দেখানো মুশ্কিল হয়ে উঠল। পরপর এই দুটি ঘটনার ফলে এরপর ভবিষ্যতে ভারত-সফরের জন্য কোন বিদেশী দলকে আমাদের দেশে আনা অথবা আমাদের ভারতীয়

দলের বিদেশ সফর করা সহজে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে এই ভারত-সফরের গুরুত্ব কম ছিল না। কারণ ইংলও দলের সঙ্গে দ্বিবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার প্রাকালে এখানকার খেলাগুলির মাধ্যমে তারা প্রস্তুত হয়ে নিত। কোন দলের বিদেশ সফরের পরিকল্পনা থাকলে অনেকদিন পূর্বেই সফরসূচী রচিত হয় এবং প্রায় শেষ সময়ে সফর বাতিল করা হলে সেই দল অন্য কোন নতুন সফরের ব্যবস্থা করে উঠতে পারে না সম্মাভাবে।

শ্রীআমিতাভ

আমন্ত্রিত অতিথির আমন্ত্রণ বাতিল করে দিলে তারা নিশ্চয়ই অপমানিত বোধ করবে এবং সেই দেশের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক তিষ্ঠ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য অনেক। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মতে বর্তমানে ক্রিকেটের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় বিলাসিতারই গামিল। সত্যি ভাবতে দুঃখ লাগে যে, চোরাপথে চালাও বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়ের পথ রোধ করা যাচ্ছে না। কিন্তু যেখানে দেশের, জাতির মান-সম্মানের

প্রশ্ন জড়িত, সেখানে অর্ধদণ্ডের এই ধরনের অদ্ভুত নীতি—এই কঠোর মনোভাব কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

সংক্রামক ব্যাধি

আকাশে বেষ নেই, বৃষ্টির জন্য লোকে অধীর হয়ে উঠেছে। হঠাৎ শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে বিনা মেঘে বৃষ্টি। ইট, পাথর, বোতল আর কুতোর অবিশ্রাম বর্ষণ। ১৯৬৫-৬ প্রথম বিস্কোড। ইস্টবেঙ্গল ও রাজস্থান দলের খেলার শেষদৃশ্য। ইস্টবেঙ্গল এক গোলে হারছে। রাজস্থান বাহাদুর গোল করলেন। রেফারী অফ সাইডের জন্য গোল নাকচ করলেন। সমর্থকদের ঝৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, মাঠের মধ্যে তাঁরা বাংলা গোলা



রন ক্লার্ক

বষণ শুরু করে দিলেন। উদ্দেশ্য খেলা বন্ধ করে দেওয়া—যাতে খেলাটি আবার অনুষ্ঠিত হয়।

সকলেই জানেন যে, কলকাতা কুটবল ময়দানের সবুজ গ্যালারীর মর্শকরা চিরকালই অবুধ। কিন্তু ক্লাবের কিছু সভ্যকেও নাকি এই মর্শকর নথ্যে জড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। কিন্তু সব জিনিসটাই একটু ওভারডোজ হয়ে গেল। পুলিশ এবং মর্শকদের খণ্ডযুদ্ধ জমে উঠল। কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া হল, কিন্তু পাগলা ছাওয়া কাঁদুনে গ্যাসকে উড়িয়ে দিল।

অশ্বারোহী পুলিশবাহিনী, পদাতিক পুলিশবাহিনীর সাহায্যার্থে এগিয়ে এল। ছেঁচিখাট খণ্ডযুদ্ধটির অবসানে দেখা গেল আহতদের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত।

এর আগে আমরা বছবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছি এই সমস্ত অর্ধেলোয়াড়ী মনোভাবের জন্য। রেকার্ডের জটিল হয়েছে, অতএব আইনকে নিজেদের হাতে নিয়ে গণগোলের সৃষ্টি করতে হবে—এই আচরণকে কোন স্তব্ধ নজিরের লোকই সমর্থন করতে পারেন না। আমাদের বিশ্বাস

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বহু সভ্যই মৌদনের এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দুঃখিত। অনেকে হয়ত বলবেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে এমন শান্তি দেওয়া হোক, যাতে ভবিষ্যতে আর কোন ক্লাব এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাবার সাহস না পায়। আমাদের আই-এফ-এ-এ সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেছেন, হয় কলকাতার লীগ বন্ধ করে দেওয়া হোক, নয়ত ইস্টবেঙ্গলকে সাসপেন্ড করা হোক। আই-এফ-এ-এ সভাপতি মহাশয় বিদেশের কুটবল আসরের স্বরাধ্বর কতদূর রাখেন জানি না,



মোহনবাগান ও মহামেডান দলের চারিটি খেলার একটি উত্তেজনাময় মুহূর্ত

হবে রাখলে বেশি হয় দিল্লীতে বসে এই ধরনের চরম শাস্তি দেবার মতামত জানাতেেন না। স্পেন, পেরু, আর্জেন্টিনা এবং ব্রজিলের মাঠে গওগোলের রূপ আরও ভয়াবহ, তাই বলে সেখানে লীগ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে না, অথবা তদন্ত না করে একটি ঐতিহ্যশালী দলকে সাঙ্গপেও করার মতামত ব্যক্ত করা হচ্ছে না। অতুল্যাবুর একথা তুললে চলবে না যে, ফুটবল পরিচালক সংস্থা হিসাবে তাঁর আই-এফ-এ-র দায়িত্বও কম নয়।

যাঁরা ইস্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি গ্রহণের কথা চিন্তা করছেন তাঁদের যুক্তির কিছুটা জোর আছে মতায়, তবে একথাও তুললে চলবে না যে, এই ঘটনাকে কোন ক্রাফকে জব্দ করার জন্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা ঠিক হবে না। ইতিমধ্যে সভ্যতার অসভ্যতার জন্য একটি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ক্লাবকে খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা খুব স্তম্ভ হতে পারে মনে হয় না।

ময়দান ফুটবল

কলকাতা ফুটবল লীগে সব দল কটিং এগিয়ে চলেছে, শুধু খেমে হয়েছে ইস্টবেঙ্গল দল। গত মঙ্গলবার আই-এফ-এর সাব-কমিটির সভায় বহু তর্ক-বিতর্কের পর দুটি পয়েন্ট রাজস্থান দলকেই দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইস্টবেঙ্গল এবং রাজস্থান দলের পরিত্যক্ত খেলাটিতে রাজস্থান দল একগোলে অগ্রগামী ছিল। আই-এফ-এর এই সভায় ইস্টবেঙ্গল দলকে গাতিদিনের মধ্যে কখনও দর্শনার মির্শে দেওয়া হয়েছে

যে, কেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না?

মহামেডান দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান দল একটা বিরাট বাধা অতিক্রম করেছে। এইদিন মোহনবাগান দল গতাই উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে। পরবর্তী খেলায় স্পোর্টিং দলের বিপক্ষে মোহনবাগান দলের খেলা



দুলাল মন্ডল

দর্শকদের হতাশ করে; খেলা শেষ হবার কয়েক সেকেন্ড পূর্বে পেনাল্টি থেকে একটিমাত্র গোল করে মোহনবাগান কোনক্রমে দুটি পয়েন্ট সংগ্রহ করে। বি-এন-আর দল একটি খেলায় গ্রীয়ারকে ১-০ গোলে পরাজিত করে, কিন্তু উয়ার্ডার সঙ্গে

খেলা অসীমাসংগতিভাবে শেষ করতে বাধ্য হয়। মহামেডান স্পোর্টিং দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে বাচি ময়দানে কিছুটা বিস্ময়ের স্রষ্টা করেছে। আশা করা যায় যে, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ময়দানে ঐগুন্সের অপ্রীতিকর ঘটনাটির যথাযোগ্য সমাধান হবে এবং ইস্টবেঙ্গল দলকেও আবার নতুন উদ্যম নিয়ে লীগ-মুখে অবতীর্ণ হতে আমরা দেখতে পাব।

সম্পাদক দর্পণ

অস্ট্রেলিয়ার দুবপামার দৌড়বীর রন ক্লার্ক নিজের প্রতিষ্ঠিত ৫০০০ মিটার এবং তিন মাইলের বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। ২৮ বৎসর বয়স্ক ক্লার্ক ১৩ মিঃ ২৫.৮ সেকেন্ডে ৫০০০ মিটারের দূরত্ব অতিক্রম করেছেন এবং সেইসঙ্গে তিন মাইল অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছে মাত্র ১৩ মিঃ ০.৪ সেকেন্ডে।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে বিশ্ব একাদশের সঙ্গে ইংলণ্ড দলের দুটি প্রদর্শনী খেলা অনুষ্ঠিত হবে। অস্ট্রেলিয়ার নরমান ও-নীল এবং চালি গ্রীফিথ এই দলে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হয়েছে ও-নীলকে নিয়ে। তিনি বলেছেন, গ্রীফিথের পক্ষে অথবা বিপক্ষে তিনি কোন খেলাতেই অংশ গ্রহণ করবেন না।

রাইও-ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ব্রজিল দল ৫-০ গোলে বেলজিয়ামকে পরাজিত করেছে। দলের পক্ষে পরপর তিনটি গোল একাই দেন বর্তমান বিশ্বের স্রেষ্ঠ ফুটবলার পেলে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গবন্ধু (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী পাণ্ডা, ন্যাটসিং কলিকাতা-১২

বঙ্গবন্ধু প্রেস হাউসে প্রিন্টিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্য পরিচালিত ও প্রকাশিত।

হুদুদ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৯৫
আজকের মানুষ	...	১৯৬
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৯৭
ভারতদর্শন	...	১৯৯
আন্তর্জাতিক	...	২০৩
বাণিজ্যে সকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	২০৬
খাজুরাহো (কবিতা)	বেণু গঙ্গোপাধ্যায়	২০৭
আধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাস্বতা ভট্টাচার্য	২০৮
বঙ্গদর্শন	...	২১২
বাসস্তোপে (অনুবাদ গল্প)	গোপাল ভোমিক	২১৭

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বঙ্গাঙ্গার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বঙ্গাঙ্গার নিপুণত সমাজের রূপই আলেখ্য। শাসক সমাজদ্বয়ের দ্বারা নির্ধ্যাতিত ব্যক্তিত্ব মুকুন্দরাম চণ্ডী ও বেদনার্কিষ্ট বঙ্গাঙ্গার প্রতিমিতি কবি—ব্যক্তির হৃৎকি কি করিয়া সর্বজননের হৃৎকি হইতে পারে বঙ্গাঙ্গা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বশ্রেষ্ঠ দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বঙ্গাঙ্গার সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান প্রভেদে আছে—

- ১। মূল কাব্য, ২। অবিহৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি,
- ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (কবি বাক্যচল লিপিত), ৬। বিহৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নাহাররজন গুপ্তের

গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো জমরের চমকপ্রদ বিষয়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী বোম্বের সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত হৃদয়ীণ কীর্তি হাঘের আবির্ভাব।

বাংলার দ্বিতীয় সাহিত্যে

ডাঃ নাহাররজনের দ্বান অনুবাদ

—তেরখানি নির্ধারিত হচনা—

কালো জমর, করছে চ্যা মরছে, বক্তহীরা বক্তবুখী মীরা, পল্লবের পিলাচ, পল্লবুখী হীরা, বক্তবেরুয়া, গুম, কালচক, কবর, পাখবের চোখ, লর্ণ, অজুবীর, এশাম জানাই

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও অধীন সাহিত্যিক

ঐজবিলাল বঙ্কোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি হচনা ৩০০ পৃঃ—



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জাল-জোচ্চ রি-ঠগবার্জির সেকাল আর একাল অদ্রীশ বধন		২২১
ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক কাষকলাপ	নারেন ভট্টাচার্য	২২৪
অপকুপ নেহারলু-শিকাগো	এস. কে. গ্রীনবার্গ	২২৪
নিদর্শ (কবিতা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩১
অস্থিতীয়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মুশাল রায়	২৩২
গ্রাম বাংলার কথা	পারুল ভট্টাচার্য	২৩৬
চক্রাহত (গল্প)	ছুগাদাস ভট্ট	২৪১
চক্রালোকে যাত্রার উদ্যোগপর্ব	চক্রণ চট্টোপাধ্যায়	২৪৩
চার্লি চ্যাপলিন	অশোক সেন	২৪৫
রক্তজগৎ	...	২৪৭
রক্তমঞ্চ—ওদশে এবং এদশে	শিমালি	২৪২
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	২৫৪

বক্তৃতাগণের বিমর্ষী শুভ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী নির্বাসিতের আত্মকথা, উদলকলী, সিনাকিন, অনন্ডানন্দের পুত্র, বর্তমান সমতা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, বাধীন মাতৃব, বন ও কণ্ঠ। মূল্য—আড়াই টাকা বালক কথামঞ্জা জগদাশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী ১ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—ব্রহ্মবৎ গ্রন্থাবলী। মূল্য তিন টাকা আধুনিক কথা-সাহিত্যিক বিভাতভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী বেঙ্গাচার্যী, আশা, মহাকবি, সন্তপদী। মূল্য—৩ টাকা	রসরাজ অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী ১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, বাহুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক। ২য় ভাগে—খাসদখল, চোরেব উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক। ৩য় ভাগে—বিবাহ বিলাতি, তরুণালা, প্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক এতি ভাগ আড়াই টাকা কাব্য-সাহিত্যিক বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারী-লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গব্রহ্মরী, নিসর্গ-সঙ্গীত, মায়াদেবী, ধুমকেতু, শব্দকাল, দেববাণী, বাউল বিংশতি, সাবের আলম, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩ টাকা	নয়জন কবিয় বুল্যাবান সংকৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ : বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন। বিজ্ঞানসুন্দর গ্রন্থাবলী মূল্য—পাঁচ টাকা প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা যোশেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী ২য় ভাগে—সীতা, বিজুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমাফলন মূল্য দুই টাকা উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ ভাস্কর শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ইভীর ভাষা—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন ধোঁয়াবী, পুজার মালা ও যাদী বঙ্গব্রহ্মরী। মূল্য—এক টাকা
--	--	---

বসুমতা গ্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২



৭০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন, ১৩৭২

Price : 25 Paise
Thursday, 24th June, 1965

ট্রামওয়েজ কোম্পানীর খামখেয়ালী

ট্রাম বা বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে কিংবা হ্যান্ডেল ধরে আপিসে মানুষ যায়, কারণ এভাবে না গেলে আপিসে যাওয়া যায় না। কলকাতার পুলিশ, বাস ও ট্রাম কত পক্ষ স্বেচ্ছা ম্যাপারটা কদিন ধরে দেখে এখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন। পুলিশপক্ষ এ কথাটা ভালোভাবেই বুঝেছেন যে, কেবলমাত্র কয়েকটি সীমিত অঞ্চলে জোর করে পাদানির যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া ক্ষণিকের গ্রহসমনাম। কথায় বলে, 'ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার হোসাই'। অতিরিক্ত গাড়ির ব্যবস্থা, বিভিন্ন আপিস খোলার সময়ের পরিবর্তন না করলে, যাত্রীরা পাদানিতে যাবেই। কেন না, আপিস যখন কোনো অজুহাত শুনতে রাজি নয়, তখন মৃত্যুকে হাতে নিয়ে কলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমরা যাত্রীদের পাদানিতে কিংবা কলে যাওয়া-আসার সমর্থন করি না। বরং আমাদের বিবেকে অনেকটা রয়েছে বাস বা ট্রাম কত পক্ষের বিরুদ্ধে। স্ট্রেট ট্রান্সপোর্টের কথা আমরা গত সপ্তাহে বলছি, কিন্তু কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর চরম অব্যবস্থার কথা বলা হয় নি। এই কোম্পানী পুরোপুরি মালিকানাধীন নিয়ে যাত্রীদের যাতায়াতে উত্তরোত্তর দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। জানি না, এই মালিকানাধীন তাঁরা কতদিন ভোগ করবেন। তবে তাঁরা যাবার আগে কয়েকটা কঙ্কালসার ট্রাম আর বিক্ষুব্ধ কর্মচারী ছাড়া কিছুই রেখে যাবেন না। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার কথা এখনো তাঁরা ভাবেন

না; তা ভাবলে তারা কখনোই ট্রামের পথ অসম্প্রসারিত অবস্থায় রাখতেন না। বেহালার তথাকথিত ট্রাম ডিপোটি শূন্য ট্রামযাত্রীদের পক্ষেই নয়, ডায়মন্ডহারবার রোডের বাবতীর যাত্রীদের যে অসুবিধার সৃষ্টি করে, তার প্রতি-বিধান করা আজো সম্ভব হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিদারুণ ওদাসীনা ছাড়া ট্রাম কত পক্ষ কি কারণে যদিচ্ছা কাণ্ড ঘটতে পারেন?

সারা কলকাতার ট্রামগুলি এখন যারা একটু লক্ষ্য করেন, তাঁরা ভালোভাবেই জানেন যে, এই সব ট্রামগুলি যেন অতীত আমলের; শূন্য জোড়াতালি দিয়ে ও গিডফেকটিভ কারের লেবেল ঝুলিয়ে তাঁরা মামুলি কতবোর পসরা খুলে নিজেদের পকেট ভর্তি করেন। পকেট ভর্তি করাটাই বড় কথা, নচেৎ দুপুরবেলায় যখন আপিসযাত্রীদের ভিড় থাকে না, তখন অতো ভিড় থাকার কোনো কারণ নেই। এ ভিড় থাকার কারণ এই যে, তখন গোণাগুণিত ক'টি ট্রাম চালায়ে অধিক মুনাকা করা হয়। শূন্য কি তাই, উক্ত সময় কম কর্মচারীর প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানীর ব্যয়ও কম হয়। ট্রাম কোম্পানীর অন্যান্য কৃতিত্বগুলিও লক্ষণীয়;—যেমন গাড়ি চড়াইতে তার ছিঁড়ে পড়া নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, ট্রাম লাইন বহু স্থানে বিপজ্জনক, উপরন্তু অনেক যাত্রীকে ট্রাম ধরার জন্যে গ্রীষ্ম ও বর্ষার শেড়ের অভাবে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়। তবে, এই অবস্থায় ট্রামে মানুষ আসা-যাওয়া করে; এবং একান্ত নিরুপায় না হলে এই অবস্থা কে মেনে

নিতে চার? শূন্য সরকারের শূন্য পরিবারে ট্রামওয়েজ কোম্পানীর খামখেয়ালীপনা বতর্দিন থাকবে, ততদিন কলকাতার যাত্রীদের সুখের আশা দুঃশামার। তাছাড়া প্রতি মৃত্যুতেই দুঃখটিনাই হবে তাদের সহযাত্রী।

অবশ্য দুঃখটিনা শূন্য এই কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ নয়—এখানের দুঃখটিনার একটা কারণ না হয় বুঝি। কিন্তু উত্তরবঙ্গে প্রায় একপক্ষ-কালের মধ্যে পর পর তিনটি দুঃখটিনা আমাদের রাস্তাজীবনে কোন্ বিপদের সূচনা করছে, তা কে জানে? ট্রাম-বাসের মতো জেন ও রেলের দুঃখটিনা একই পর্ষায়ে পড়ে না। এসবের মধ্য বিরাট ছন্দ কারণ লিহিত থাকাই স্বাভাবিক। অতিরিক্ত গরম, অনভিজ্ঞ পাইলট, অন্যতম কারণও হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে শূন্য প্রকাশ করা হোলও কোনো কারণ অনু-সন্ধান করা হয় নি। একমাত্র তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে এ অনুসন্ধান সম্ভব হতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা আগেও লিখেছি, কিন্তু লিখলেই বা কে শোনে—সবাই যে এখন পত্রি-কল্পনার ব্যস্ত।

সম্পাদকীয়

অন্ধ্রের মানুষ

উদীয়মান নক্ষত্র ওই লোকটির ওপর কড়া নজর রেখো—১৯৬১ সালে ফরাসী সামরিক গোয়েন্দা তথ্যনিপিত্র এক জায়গায় ওই ক'টি কথা লেখা ছিল। ফরাসী সরকার তাঁকে কাবু করতে পারেন নি, বরং সরকারকেই শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে হয়েছিল, তবে বর্ণনাটা নির্ভুল হয়েছিল। গোপন ফাইলে বর্ণিত লোকটি আর কেউ নন, উনিই স্বয়ং কর্নেল হ্যারি বুমেদিয়েন। রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট বেন বেল্লাকে গদীচ্যুত করে বুমেদিয়েন গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন—যিনি সেই স্বল্পভাবী হ্যান্সগোছের কর্নেল বুমেদিয়েন।

আজ আলজিরিয়ার আকাশে ত্রাতার তুমিকায় আবির্ভূত হয়েছেন বুমেদিয়েন, নতুন বিপ্লবী পরিষদের তিনিই হলেন প্রধান, সেক্রেটারী জেনারেল, সামরিক অভ্যুত্থান তো তাঁরই নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছে। অশান্ত আফ্রিকার বুকে অবস্থিত এই দেশটি 'তৃতীয় বিশ্ব'র তারৎ ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে, বুমেদিয়েন তাকে কোন পথে চালনা করেন বিশ্ববাসী তাই দেখার জন্যে আজ উদগ্রীব।

অথচ এ লোকটি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন শিক্ষকতা দিয়ে। অনেকে মনে করেছিলেন শিক্ষকতাকেই তিনি জীবনের আদর্শ করে নেবেন। তাঁর উপযুক্ত কাছই তিনি বেছে নিয়েছেন—নিরীহ জীবনযাপনের আদর্শ। কারণ তিনি যে টিউনিশের জিতোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, পবিত্র কোরানে বিশেষ পাঠ নিয়েছিলেন। কারোয় আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন। ফলে বুমেদিয়েনের মধ্যে একটা ধর্মভাব, ধ্যানীচরিত্র গড়ে উঠেছিল। কথা তিনি কমই বলতেন, খানিকটা লাজুক, মুখচোরা প্রকৃতিরও ছিলেন, পাঁচজনের সামনে আত্মতে চাইতেন না। ১৯২৫ সালে পূর্ব আলজিরিয়ার পেল্‌মায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বুমেদিয়েন, হয়তো নিস্তরঙ্গ জীবন তাঁর কেটে যেত এখানেই। কিন্তু ফরাসী সরকার তাঁকে নিরীহ জীবনযাপন করতে দিল কৈ?

আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম তখন হুজু হয়ে গিয়েছে ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে। দেশের যুবকেরা দলে দলে নাম নিয়েছে গেরিলা বাহিনীতে। স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না বুমেদিয়েনও, পাঠশালার পাচন ছেড়ে বেয়নেট হাতে নিলেন বুমেদিয়েন। রক্তে যে তাঁর বিদ্রোহের আঙন তা কে জানতো তখন। ১৯৫৪ সালে আলজিরীয় বিদ্রোহীরা অরেন্স পর্বতে যে আক্রমণ চালিয়েছিল তার কৃতিত্ব বুমেদিয়েনেরই প্রাপ্য। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে প্রথম উইলিয়ার (অফল) প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

বুমেদিয়েনের প্রকৃত নাম মহম্মদ বুবারোরা। গেরিলা বাহিনীতে তাঁর পদোন্নতি যেমন দ্রুত তেমনি তাঁর খ্যাতিও

ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। অবশ্যন সৈনিকেরা তাঁর ভয়ে গদগত, আবার তাঁর নির্দেশ পালনেও সদাই প্রস্তুত। ১৯৬০ সালে সমগ্র আলজিরীয় মুক্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্স-এর তিনি প্রধান হন, কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে তাঁকে ওই পদ থেকে অপসারণ করা হয়। এর পরেই তিনি বেন বেল্লার বিপ্লবী দলে যোগ দেন।

কিন্তু বেন বেল্লার সঙ্গে ট্রেনসেনেট বুমেদিয়েন-এর প্রথম লক্ষ্যাত্মক ঘটলো না, তাঁদের প্রথম দেখা হয়েছিল কারবোতে। সেখানেই বেন বেল্লার সংস্পর্শে এসে বিপ্লবের প্রথম মহানাদ করেন বুমেদিয়েন। কিন্তু তাঁর শিক্ষাটা বোম্ব হয় বেন বেল্লার শিক্ষা থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র ধরণের। সমাজতান্ত্রিক দেশ চেকোশ্লোভাকিয়াতেও তিনি কিছু হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

অথচ বেন বেল্লার জন্যে একদিন বুমেদিয়েন কী না করেছেন। ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর বুমেদিয়েনই তো তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। বেন বেল্লার ক্ষমতালাভের পথে প্রধান সহায়ই তো ছিলেন বুমেদিয়েন। আলজিরিয়ার প্রবাসী সরকার যখন বেন বেল্লার বিরুদ্ধে শক্ততা করছিল তখন বুমেদিয়েনই তাঁর ৪৫ হাজার অনুগত সৈন্য নিয়ে



বেন বেল্লার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি পেরেছিলেন। প্রেসিডেন্ট বেন বেল্লা তাঁকে রাষ্ট্রের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন।

আলজিরিয়ার দিকে চেয়ে আছে সমগ্র আফ্রিকা, আরব দুনিয়া এবং এশিয়া; লাতিন আমেরিকার কাছেও সে প্রচার স্থল। কর্নেল বুমেদিয়েন যদি বেন বেল্লা-বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটাবে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়েছেন বলে মনে করে থাকেন তবে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে তিনি কী পণ্য অবলম্বন করেন, সমগ্র জগৎ রাজীরা আগ্রহ নিয়ে তাই লক্ষ্য করবে।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হৃদয়সান্নিধ্য

উনিশ শতাব্দীর দশকের শেষদিকে একজন লিখেছিলেন যে, আজকের দুনিয়ার ডক্টর-ডেস্কটিকই সবচেয়ে বড়ো সেই একক ব্যক্তির বীর প্রভাব অনুভব করা যাচ্ছে ব্যাপকভাবে। ক্রমেয়ারের মোহভঙ্গ, জেলার নির্যাতন দুই-ই ছিল তার মধ্যে। সেই ডক্টরিক, সেই ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড-ই লিখেছিলেন—ভিলার মন, আর পেরিক্লিসের আগেকার কোনো গ্রীক শিল্পীর হাত,—এই দুইয়ের সহযোগিতায় গলগথার পাথর কেটে যদি একটি মূর্তি গড়া যেতো, আর তার নাম দেওয়া হতো 'হেলেনার পতন', তাহলে ডক্টরডেস্কটিক লেখার সপেণে তারই তুলনা চলতে পারতো। তিনিই বলেছিলেন যে, ডক্টরডেস্কটিক 'রাদার্স' কার্মাকডের সত্যিই তুলনা হয় না। বড়ো বড়ো কল-কারখানায় শহরে অসংখ্য ঘেসব মানুষের ভিড়,—ডক্টরডেস্কটিক সাহিত্যে আমরা যেন তাদেরই আশা-বাণী দেখতে পাই।

এই ডক্টর ফোর্ডই লিখেছিলেন যে, ডক্টরডেস্কটিক প্রতিভার সপেণে ইমপ্রেশনিষ্টদের কলাকৌশলের সমবায় থেকেই ভবিষ্যতের মহৎ শিল্পের আবির্ভাব ঘটেবে।

ডক্টরডেস্কটিক প্রশংসায় অনেকই এইরকম উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু শব্দই কি বিবাদের মানুষ ছিলেন তিনি? ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্টের কথাসমূহে একজনের আলোচনায় দেখেছিলাম—গরিব ছাত্র রাসকলনিকভ নিজের মমান্তিক যে খনটা করে ফেলেছিল, সে কি কোনোরকম ইহার তাকুনায়,—প্রতিহিংসার বশে,—ডাকাতের অভিপ্রায়ে? রাসকলনিকভ বরং অন্য কণ্ঠস্বর ভুগছিল। অশ্রুত এক আত্মনরাগ ছিল তার,—একরকম অহমিকাই বলা যায়। সেই অহমিকাই তার মধ্যে অশ্রুত এক জ্বালা হয়ে উঠেছিল। সেই জ্বালাতেই সে সেই খনটা করে ফেলে। আর, নিজের প্রণয়নী,—সোনিয়ার কাছে জীবন সম্বন্ধে তার সেই অশ্রুত অভিযোগের ব্যাপার আর হত্যাকাণ্ডের খবর—দুই-ই সে স্বীকার করে। সোনিয়াও তো বড় ঘরের মেয়ে ছিল না, সেও সমাজের নিচুস্তরের মানুষ। যেমন রাসকলনিকভ, তেমনি সোনিয়া,—দুটি-ই তুচ্ছ মানুষ,—খুবই সাধারণ,—কেউই চোখে পড়বার মতন নয়। কিন্তু অসাধারণ হয়ে উঠেছে তারাই। সেটা ডক্টরডেস্কটিকই দৃষ্টিগোপ্য!

কিন্তু তারপর? সোনিয়ার ভালোবাসার গুণেই রাসকলনিকভ তার অপরাধ স্বীকার করে। পদাশ্রয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে সে। নিজের হয়। সাইবেরিয়ায় বেতে হয়।

সোনিয়াও সাইবেরিয়ায় যায়। ভালোবাসা এগিয়ে নিয়ে বিবাদের মূর্তির পথ দেখিয়ে দেয়। সোনিয়াই রাসকলনিকভের পরিগ্রাণ! ডক্টরডেস্কটিক এই পরিগ্রাণ-সংকেত কি শব্দই দুঃখবাদ? ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্টের এই ব্যাখ্যা কি অস্বীকার করা যায়?

একথা ঠিকই যে মানুষের অশ্রুকার কোনো কোনো প্রবৃত্তির ওপর তার কলামের জোর পড়েছিল। খুন জখম রাজাজানি বলাংকার ভ্রো মিকে নয়। সমসারে এসব আছেই। ডক্টরডেস্কটিক মানবভাষার এসব অশ্রুকার দিক ভুলে থাকেন নি বা এসব নেই' বলাতে চান নি। খুবই সাধারণ সব স্ত্রী-পুরুষের জীবন কুটিলে ভুলেছেন তিনি,—শেখিয়েছেন অনেক হীন প্রবৃত্তির খাত-প্রতিখাত। কিন্তু তার মনে এ নয় যে, তিনি মানুষের উচ্চ সম্ভাবনার আশা হারিয়েছিলেন। মানুষের গভীর অবেগের উৎসাহে ঠিক ঠিক যা দেবার সামর্থ্য ছিল তার। 'রাদার্স' কার্মাকড কাহিনীতেও তিনি তাই-ই করে গেছেন।

সাহিত্যের ধারায়, মানুষের মনের গভীরে অনুসন্ধান, দৃষ্টিক্ষেপ সব বসে, সব মেলে ঠিক একভাবে ঘটে না। বোদলেয়র, ডক্টরডেস্কটিক-দৃষ্টিতে, দু'দেশে একই কালে জন্মগ্রহণ করে এই মনোভূমি নিরীকার সমর্থমতা দেখিয়ে গেছেন। বটে। এদের সপেণে আমেরিকার এডগার আলান শোর নামও এই একই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। কেউ কেউ তা করেছেন। ডক্টর ফোর্ড যেমন বলেছিলেন, কতকটা সেই রকম বিশ্লেষণের মেজাজে—এবং আর একটু, কিন্তুভাবে বলতে গিয়ে কেউ-কেউ এও জানিয়েছেন যে, উনিশ শতকে এই ডক্টরডেস্কটিক, শো, বোদলেয়র প্রভৃতির লেখার মনোবিশ্লেষণের দিকে যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল,—বা ঠিক বাইরের বাস্তবতা চর্চা নয়,—ভেতরকার কল্পনানীকা বলা যায় বাক্য, সেই মনোভাষাই জের চলেছে বিশ শতকের হারমান হেস, গ্রান্সিয়া দেলেন্সা, ই-এম-ফর্টার প্রভৃতির নৈতিক সমস্যা পর্যা-লোচনার মধ্যে। এডিস হোয়াটর্ন, থর্নটন ওয়াইল্ডার, আলবার্টো মোরাভিয়া প্রভৃতি খুবই আধুনিক কালের পরিচিত নামগুলিও এই ধারাতেই স্বরণ করা হয়। সে-সব নামের তালিকার সব নাম হয়তো সব পাঠকের কাছে সমান পরিচিত নয়। কিন্তু সেটা গোপ। এখানে আসল কথাটা এই যে, ডক্টরডেস্কটিক বা বোদলেয়র বা গো উনিশ শতকে যে অস্বস্তিক-স্বীকার প্রবর্তনা ঘটিয়ে গেছেন, আমাদের এই

বর্তমান শতকের নানা দেশের নানা লেখক লেখিকার মধ্যে তারই নানামুখী জের চলেছে। কিন্তু আরম্ভেরও আরম্ভ আরম্ভ বোদলেয়র আর ডক্টরডেস্কটিক জন্মকালে দুটি রেখে বৃদ্ধদেববাবু, সেই পূর্ব-ইতিহাসটুকু স্বরণ করেছেন। তিনিও পুশকিনের নাম করেছেন—ফরাসী অনুবাদের মাধ্যমে বিনি বামন পড়েছিলেন। ইংল্যান্ডে তখন স্কটের উপন্যাস ছিল। শেলির প্রাথমিক আনবাস্ট্রাও বেরিয়েছে। বোদলেয়র আর ডক্টরডেস্কটিক জন্মকাল থেকে ক্রমশ শতাব্দীর আরো ভেতরে এগিয়ে গেলে, জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে ক্রমশ গোটেই মৃত্যু, ক্রমশ রোমান্টিক দৃষ্টির প্রাধান্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ ঘুরে ঘুরে—ইংল্যান্ডে থ্যাচারের উপন্যাস, টেনিসনের কাব্য—জির্জারিরর আমলের পদ্য-শ্রুত শাস্ত পরিচিত মুখী-ভারের পরিগ্রাণে প্রবেশ করা যায়। ইতিমধ্যে রাশিয়ার উপন্যাসের আশ্চর্য জোয়ার দেখা দিয়েছে। সেই জোয়ারের প্রসঙ্গ তুলেই অস্বাভাবিক করেছেন বৃদ্ধদেববাবু। কী মধ্যে এ-সিদ্ধান্ত সম্ভব হোলো? একটি মাত্র শতকের মধ্যে—মাত্র উনিশ শতকেই একেবারে পুশকিন থেকে চেষ্টা পর্বত এসে যাওয়া গেল কোন্ বৃদ্ধকে? একা গোটেই কলামে সারা জর্মানি কোন কোন জেগে উঠেছিল, কেবলমাত্র একটি শতকেই—পূর্ব-ঐতিহ্যের দায়দান রাশিয়ার জেমনি পাশ্চাত্য জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসবার সপেণে সপেণ পরমাশ্চর্য এই মজলীকমতার ঐশ্বর্যে হতবাক করে দিয়েছে অনুগ্রহণীর মন। রাশিয়ার লেখকদের এই কণের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি—পুশকিন আর লেরমোন্ট খণী ছিলেন বামনদের কাছে; গোসোল ছিলেন হফম্যানের কাছে;—ডক্টরডেস্কটিক ছিলেন ডিকেন্সের, আর ফরাসী সাহিত্যের মহৎ লেখকদের কাছে। কিন্তু এদের কণ-প্রত্যর্পণই রূপ নিয়েছিল বৃদ্ধদেববাবু সৃষ্টিতে। ডক্টরডেস্কটিক সেই বৃহৎ সৃষ্টির আবদনই বৃদ্ধদেববাবু, বিশেষভাবে উপভোগ করেছেন।

ডক্টরডেস্কটিক রচনার মনস্তত্ত্ববীকার যে বিশেষ মেজাজের দিকটি আমকেই লক্ষ্য করেছেন,—পাপ, হিংসা, নিরামি আঘাত-প্রত্যঘাতের সেই অশ্রুকারে লক্ষ্য রেখে বৃদ্ধদেববাবু বলেছেন যে, পাপ আর কলঙ্কের মধ্য দিয়েই স্বর্গের রাস্তা চলে গেছে ডক্টরডেস্কটিক সাহিত্যলোকে। বোদলেয়রের সপেণ এই দিক থেকেও তার সাদৃশ্য অনুভব করেছেন তিনি।

ম্যাস ম্যানের নাম করেছেন হঠাৎ। বলেছেন, —বোদ্‌লেয়র আর ডস্টরভেস্কি,—এঁদের হৃদয়ের মধ্যে কেউই অন্য জনের লেখা পড়েন নি বটে, কিন্তু নিজের নিজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে দুজনেই এক সত্য পৌঁছেছিলেন। সেই সত্যটি কী? সে হোলো আধুনিক মানব-মনের আত্মবোধ। বিশ শতকের সাহিত্য-প্রবাহে ‘আধুনিকতা’ ধারণাটাই নাকি তাঁদের সৃষ্টি। বলেছেন—নোটেস্‌ স্তম্ভ আন্দার গ্রাউন্ড পড়লে মনে হয় বোদ্‌লেয়রের জগৎটাই যেন সেন্ট পিটার্সবার্গে ভুলে বসানো হয়েছে। বুদ্ধদেবাবাবুর আলোচনার টমাস ম্যানের মতবা দেখা দিয়েছে এই জারগার। আধুনিকতার গভীর বিবাদ যে ঠিক কেন্‌ জারগার, তার একটু ইশারাও দেখা দিয়েছে এই প্রসঙ্গে।

কিন্তু সেজন্যে বুদ্ধদেবাবাবুর ঐ ভূমিকাটির অনুসরণ স্বাধীন যেকোনো টমাস ম্যানের দেশ-কাল এবং মনোভূমির পরিচয়কে সংক্ষেপে স্মরণ করা দরকার। বোদ্‌লেয়র এবং ডস্টরভেস্কির অনেক পরে জন্মেছিলেন তিনি।

১৮৭৫ খৃস্টাব্দে জার্মানির উত্তরাংশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে প্রাসিথ লুব্‌ক শহরে তাঁর জন্ম হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। কিন্তু মধ্যবিত্ত স্তরের প্রচলিত মান-মর্যাদাবোধের তিনি ছিলেন গভীর বিরোধী। গোড়ামি তাঁর ঘাটে সইতো না। আর, তাঁর বাপ-মা দুটি মানদ্ব ছিলেন পরস্পরের বিপরীত প্রকৃতির।

ম্যান বখন নবদ্বক, সেই সময়ে তিনি এক পত্রিকার কাজে লেগে যান। তাতে গদ্য-পদ্য

বিভিন্ন রচনার সমালোচনা ছাপা হতো। পত্রিকাটির আয় কলম্বারী ছিল বটে,—কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে ম্যান একাই সে-পত্রিকার প্রধান লেখক হয়ে ওঠেন। তারপর একবার ইটালি ঘুরে আসেন।

সে বোধ হয় গত শতকের শেষ দিকের ঘটনা। ইতিমধ্যে কিছু গল্প লিখে ফেলে-ছিলেন তিনি। লুব্‌কের এক অভিজাত বংশের জীবনকথা ফুটিয়ে তোলবার জন্যে বিশাল এক উপন্যাসের পরিকল্পনা এই সময়েই তাঁর মাথায় আসে। এক অভিজাত পরিবারের ক্ষয় এবং বিনাশই তাঁর সেই ‘বাজেনরুক্স’-এর উপজীব্য। সে-ই ডাকে বিখ্যাত করে তেলে: শূদ্র গল্প-উপন্যাসই নয়, টমাস ম্যান ইতিমধ্যে কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন। ১৯০০-এ বেরোর ‘টোনিও ক্রোগার’। ১৯১১-তে বেরোর ‘ডেনিসে মৃত্যু’ নামে আর এক উপন্যাস। যারা তাঁর ‘দি ম্যাজিক মাউন্টেন’ পড়েন নি, তারা নিশ্চয় বলবেন ‘বাজেনরুক্স’, ‘টোনিও ক্রোগার’ আর ‘ডেথ ইন ডেনিস’—এই তিনটির লেখক যিনি, তাঁর শক্তিমত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। ‘দি ম্যাজিক মাউন্টেন’ আরো পরের রচনা।

ম্যান তাঁর এই শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘দি ম্যাজিক মাউন্টেন’ লিখতে আরম্ভ করেন ১৯১২-তে। বারো বছর ঘরে লেখা চলতে থাকে। আমি জানি না টমাস ম্যান আমাদের বিশ্ব-সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় একজন দুঃস্থ লেখক কিনা, কিন্তু লেখকদের মধ্যে তিনি যে ছিলেন বিশেষভাবে একজন দার্শনিক মেজাজের মানদ্ব, সে-বিষয়ে মতান্তর ঘটবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তাঁর গল্প-উপন্যাসে তাঁর বিচিত্র অধ্যয়নের কতো যে ছায়া পড়েছে। ফ্রয়েড, ইয়ং, গ্যেটে, নীটশে এবং আরো কতো যে মনীষীর প্রতিধ্বনি শোনা যায় তাঁর বর্ণনায়, সংলাপে, বিশ্লেষণে, আলোচনায়! যেমন তাঁর বাপ-মার বিপরীত প্রকৃতিতে, তেমনি তাঁর পারিবারিক প্রতিবেশের সঙ্গে নিজের শিল্প-সত্তার ঘাত-প্রতিঘাতে, বৈপরীত্য-ই ছিল বিশেষ ম্বাদ। একদিকে লুব্‌ক শহরে তাঁর গৃহজীবন, অন্যদিকে সারা দুনিয়ার আকর্ষণ,—একদিকে তাঁর আপন ভূমি জার্মানি, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বিচিত্রতার আকর্ষণ,—একদিকে অভ্যস্ত অভিজাত্য, অন্যদিকে খেরাল-খুশি ম্যাকি ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে,—সুন্দর স্বাস্থ্য একদিকে, আর সেই সঙ্গে রোগের প্রতি অদ্ভুত একরকম টানও,—এই ছিল ম্যানের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব।

তাঁর উপন্যাসে এই সব বিপরীতের অভ্যক্তি দেখা গেছে। ‘দি ম্যাজিক মাউন্টেনে’ সেটেমারিনি আর ন্যাফটা তারই উদাহরণ। ইটালি আর গ্রীসের সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে-সব এখানে অবান্তর। ডস্টরভেস্কি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের দিকে ফেরা দরকার অতঃপর। (রবিশ)



ভাষ্যদর্শন



বিদেশে: সাংবাদিক সম্মেলনে

রাজধানী:

প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী যে-দিন সাগর পাড়ি দিলেন তার পরদিন থেকেই নয়াদিল্লীর দৃষ্টি পড়লো পশ্চিমের দিকে। কায়রো থেকে অটোয়া হয়ে এখন নয়াদিল্লীর মননশীল রাজনীতিকদের নজর নিবন্ধ হয়েছে লণ্ডনের মালবরো হাউসে। বিশ্বের একুশটি রাষ্ট্রের প্রধানেরা মিলিত হয়েছেন সেখানে কমনওয়েলথ সম্মেলনে।

বৃটিশ কমনওয়েলথ পুরানো সংগঠন। যে পাঁচটি রাষ্ট্র নিয়ে এর পত্তন হয়েছিল তাদের মনের মিল, স্বার্থের মিল ও আচার-আচরণের মিল ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে খসে পড়া যে-সকল দেশ স্বাধীন হল তাদের নিয়ে সৃষ্টি আজকের নিরাটাকায় কমনওয়েলথের। এদের মধ্যে 'কমন' স্বার্থ যেমন নেই, তেমনি নেই মিল অন্য কোন দিক দিয়েই। আচার-আচরণ প্রভেদের আলাদা, বেশভূষা বিভিন্ন। রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গিরও বৈপরীত্যের অভাব নেই।

বৈচিত্র্যের মধ্যে একের স্থান করেছি আমরা চিরকাল। আমাদের সংস্কৃতি ও সাধনায় রয়েছে তার চিরন্তন ছাপ। কাজেই রাজধানীতে বসে কমনওয়েলথের বর্তমান ও আগামী দিনের চিত্র আঁকার অসাধ্য সাধন করব না।

রাজধানীর মানুষ আজ সব চাইতে বিরত

চীন ও পাকিস্তানকে নিয়ে। পাকিস্তান কমনওয়েলথেরই সদস্য। আমাদের প্রধান মন্ত্রীর মতই সাদর সম্ভাষণ পেয়েছেন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আব্দুল বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী প্রীউইলসনের কাছে। শোনা যাচ্ছে উইলসন সাহেবের দূতীয়ালী সার্থক হবে—কচ্ছের মীমাংসার আশা প্রবল হয়ে উঠেছে।

কচ্ছের রান থেকে পাকিস্তানী সৈন্যের অপসারণই ছিল ভারতের প্রধান দাবি। পাকিস্তান এ ছাড়াও কচ্ছের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল পাক-ভারত অপর সকল বিরোধ। পাকিস্তানের মতিগতি ফিরে থাকলে মীমাংসার পথে ভারত কোনদিনই বাধা দেবে না। কিন্তু পাকিস্তানের মতলব স্বয়ং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীও বুঝতে পেরেছেন কি-না বলা শক্ত। মুখে যাই বলুক, পাকিস্তান তার জন্মের পর থেকেই ভারতের অনিষ্ট সাধনের নীতিতে অবিচল রয়েছে। কমনওয়েলথ সম্মেলন ও আলজিয়ার্স বৈঠকের দিকে লক্ষ্য রেখেই পাকিস্তান ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের মুহূর্তে আব্দুল আবার সৈন্যচালনা করেছেন কচ্ছের রান অঞ্চলে।

কচ্ছের প্রামাণিক মানচিত্র বৃটিশ সরকারের কাছে নেই এমনও নয়। উইলসন সাহেব মধ্যস্থ হয়ে সেই মানচিত্রখানা খুলে আব্দুলের সামনে ধরলেই মীমাংসা হতে পারে। কিন্তু

তা হবার নয়। এ কথা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীও জানেন।

পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে-মিশে চলার চেহারা ভারত বরাবরই করে এসেছে। ঢাকা, করাচী, কলকাতা ও নয়াদিল্লীতে বৈঠকের পর বৈঠক বসেছে। পাকিস্তান একটা অভ্যাস তুলে দু'দিন পর সরে পড়েছে। এবারেও তার পুনরাবৃত্তি ভিন্ন আশা কিছু হবে বলে কেউ আশা করেন না। পাকিস্তান বেদখল জমিতে দখল দেবার পাত্র নয়।

তা ছাড়া ভারতের বন্ধু বৃটেন ও আমেরিকার আন্তরিকতার প্রশ্ন উঠেছে ভারতবাসীর মনে।

পশ্চিমী শক্তির হস্তচুম্বিত ভারতের নিরাপত্তার আশায় যারা আশঙ্কিত হয়েছিলেন কচ্ছের পর লে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব শুনে তারাও বিমূঢ় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছেন। পাকিস্তান একটার পর একটা—আকার তুলছে আর পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলো তাকে সমর্থন করছে এক্ষেপণ। অটোয়াতে কানভার প্রধান মন্ত্রী প্রীপমার্সন কচ্ছের প্রশংসা নিয়ে তুললেন ও যত বিবৃতিতে বিশ্বাসি কোন উল্লেখ করেন নি। কমনওয়েলথের অংশীদার হিসেবে বাধ্যবাধকতা যতই থাকুক না কেন, ন্যায় ও সত্য কথা মা বললে—আক্রমণকারীর কার্যকলাপের নিষেধ না করলে কন্ডেব ফালি ধরতে বাধ্য। একবার ফালি ধরলে কমনওয়েলথের রাজধানী হিম হবে চিরতরে।

নভেম্বর ২২ তারিখ: আমেরিকা প্রাচ্যের প্রধান গণতান্ত্রিক দেশের শত্রুর পথ পরিষ্কার করে দিতে বিনা শিথিল। চীন-ভারত সীমান্ত রীমাংসা স্বল্পভাব্যেতে হওকহ কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। নাসেরের প্রস্তাবে পর্যন্ত বটাদিল্লী আমেরিকায় হয় নি। চীনের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে রক্ষার জন্যই আমেরিকা শক্তিকোট সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তান আমেরিকার অস্ত্র পেয়েছে কমিউনিস্ট প্রসারের প্রতিরোধের জন্য। সেই অস্ত্র বসায়ান পাকিস্তান আজ আক্রমণ করেছে ভারতের দৃষ্ট। আমেরিকা সেক্ষেত্রে নীরব দর্শক। আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কগণ সেদিন পাকিস্তানের হাতে অস্ত্র দেবার সময় বার বার ভারতকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমেরিকার অস্ত্র ভারতের ওপর পাকিস্তান প্রয়োগ করলে আমেরিকা উড়ে এসে ভারতকে সাহায্য করবে। আজ আমেরিকা নীরব দর্শক। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য লজ্জিত নয়। কচ্ছের ব্যাপারে পাকিস্তানের পাশে তাকে দেখা যাচ্ছে। সোজা-সুজি আমেরিকা ভারতকে জানিয়েছে, ভারত যেন পাকিস্তানের অন্যত্র পাট্টা আক্রমণ না চালায়।

আজ তারা চাপ দিচ্ছে লে থেকে ভারতীয় সৈন্য অপসারণের। কাম্বীরের লাদাক চীনের আঘাত আঁত কাছে। আকসাই চীন গ্রাসের পর লাদাকের উপর রয়েছে তার প্রলুব্ধ দৃষ্টি। চীনের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য লে অঞ্চলের সড়কটির যোগাযোগব্যবস্থা সুরক্ষিত থাকা অত্যাাবশ্যক। পাক-বাহিনী বরাবর হানা দিচ্ছে এই সড়কের ওপর। পাকিস্তানের এই হামলা বন্ধ করার চেষ্টা হতেই আমেরিকার পক্ষ থেকে উঠেছে আপত্তি।

আমেরিকা জানে ভারতীয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থার বিষয় সৃষ্টিই পাকিস্তানের প্রধান লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সড়কটি দাবি করছে। এ সড়কের দখল পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ লাদাক আক্রমণে চীনকে সহায়তা করা। পাকিস্তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য জনসন সাহেব চীনের পথ পরিষ্কার করতেও দেখা যাচ্ছে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। তিনি পাকিস্তানের মুরব্বি হিসেবে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করে কান্ড হন নি। হুমকি দিয়েছেন, পাকিস্তানের দাবি না মানলে নিরাপত্তা পরিষদে প্রদগ্ধ যখন উঠবে তখন তিনি পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করবেন।

আমেরিকার পরম সুহৃদ যারা এবং আমেরিকার আশ্বাসে যারা ভরসা পেতেন, তাঁরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়েছেন।

রাজধানীর বিজ্ঞ রাজনীতিকের দল কিন্তু এতে একটুও বিচলিত হন নি। কাম্বীর, গোয়া ও কচ্ছ কোথাও মার্কিন মননের বৈষম্য নেই। গোয়ার ব্যাপারে আমেরিকা পোঁসা প্রকাশ করতে একটুও কসর করে নি। কাম্বীর

ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ জেনেও স্বম্ভিত পরিষদে কাম্বীর প্রসঙ্গে আমেরিকার সাহায্য ভারত পায় নি। কাজেই লেগে সড়ক নিয়ে আমেরিকার মনোভাবের কোন পরিবর্তন প্রাজেয়া দেখতে পাচ্ছেন না।

ভারত বৌদীন স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমেছিল সেদিন আমেরিকা ও আয়ালান্ডের মত দেশ ও দেশের নেতৃবৃন্দ ছিল ভারতের আদর্শ। তখন থেকেই মার্কিন মুল্লুকের সঙ্গে আমাদের অনেকের মনের মিল ঘটেছিল। সে মিলনের ছেদ কোন পক্ষেরই অভিপ্রত নয়। ভারতের এই অকৃত্রিম বন্ধু হারালে আমেরিকার বর্তমান সংগ্রামী শক্তিও দুর্বল হতে বাধ্য। পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের স্বারা আমেরিকা ভারতকে সন্দ্বিষ্ট করে তুলছে মাত্র।

শুধু আমেরিকাকে তার পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্য আক্রমণ করে লাভ নেই। আমাদের মনের মুল্লুকে যে ছায়া পড়ে তা বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে বাস্তবকে এড়িয়ে চলাই হয়েছে এখন আমাদের চারিগিক বৈশিষ্ট্য। আমরা বেশি করে কুঁকে পড়ছি সেইদিকে। কি করে, কি বাইরে, সর্বত্র চলেছে এই রীতি। তার ফলে বিশ্বের নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে আমরা তাল রাখতে পারছি নে। পারছি না বলেই নিজেদের অসহায় বোধ করছি এবং পরনির্ভরতা আমাদের পেয়ে বসছে। ঠাতাকে তাই বাচাই করি আমার প্রতি তার কার্পণ্যের কথা বিবেচনা করে।

শাস্ত্রীজীর বিদেশ সঙ্করের কথা বলছিলাম। নয়াদিল্লীর ধারবা গেল বছর মার্চ-বরো হাউসে পাকিস্তানকে পাক-ভারত ঘরোয়া বিরোধের বিষয় উন্মোচনের সুযোগ দিয়ে শ্রীকুমারচাট্টা বেরুপ অবাচীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবার আর তা হতে পারবে না। এবারের সম্মেলনে ভিয়েননামে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তুলে শ্রীশাস্ত্রী ও শ্রীউইলসন নেতৃবৃন্দ যোগ্যতা প্রদর্শন করেছেন। কমনওয়েলথে উভয়েই নতুন।

ভিয়েননামে কমনওয়েলথ শান্তি মিশনের প্রস্তাব তুলে শ্রীশাস্ত্রী অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধানের প্রশংসা অর্জন করেছেন। যে-দিনটি রাজ্য প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে আসেন নি তার দৃজনই কমিউনিস্ট চীনের অন্তর। কেনিয়ার মত অবাধ্য ভিন্ন। জনসন সাহেব পর্যন্ত প্রস্তাব শুনে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। প্রচা ভূমির ব্যাপারে তার পরামর্শদাতাদের পাকিস্তান-প্রীতি হ্রাস না পেলে প্রেসিডেন্ট জনসনের আশা পূরণ হবে না। পাকিস্তান চীনের চর। সে জানে, চীন মিশনকে পাত্তা দেবে না। চীনের প্রতিনিধি হিসাবেই আরব কমনওয়েলথ সম্মেলনে কাজ করছে। প্রস্তাবের বিরোধিতা সেই কথাটাই প্রমাণ করে। আশা করি, এর পর আমেরিকার মতের পরিবর্তন হবে।

উত্তর প্রদেশ :

লক্ষী শহর এখনও অত্যন্ত উত্তপ্ত। শ্রীমতী কৃপালনী দিল্লী থেকে রিভহমেন্টে ফিরেছেন বলেই অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের ধারণা। মিলনের কোন সূত্র না পেয়ে উত্তর পক্ষই হয়ে উঠেছে আরও বেশি মারমুখো। এখন চলেছে কর্ম নিক্ষেপের পালা। পরস্পর পরস্পরের পক্ষে ও বিপক্ষে সুবিধামত বিবৃতি প্রচার করে স্থানীয় সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা ভরে তুলছেন।

মণ্ডিসভায় শ্রীজেন্দা সিং-এর প্রবেশে শ্রীকামরাজের সমর্থন ছিল না। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার বিপদের কথা জেনেও শ্রীমতী কৃপালনী কেন এমন কাজ করলেন? পণ্ডিতেরা বলেন, খুঁটির জোর ছিল। সমর্থন ছিল এ রাজ্যের জবরদস্ত মানুষ শ্রীচন্দ্রতান গুপ্তের। কংগ্রেস হাইকমান্ড তাতে সন্তুষ্ট নয়। এই দামাল মেয়েকে দাবিয়ে রাখতে না পেয়ে হাই-কমান্ডের কেউ কেউ বরাবরই তাঁর ওপর ভীষণ নারাজ।

শ্রীমতীর যুঁচি অকাটা। শ্রীজেন্দা সিং জিন্দগিতোর সংগ্রাম করছেন আর দশজন দেশপ্রেমিকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

কংগ্রেস ড্যাগের আগে তিনি এ সংগঠনের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। শ্রীমতী কৃপালনীও মাঝে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন। পরলোকগত খাদ্যমন্ত্রী (কেন্দ্রীয়) রফি আহমেদ কিদোয়াই এক সময় দলত্যাগ করে গিয়ে গঠন করেছিলেন প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল। ভুবনেশ্বরের অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার আকুল আহবান জানাবার পর দলে দলে এসে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কর্মী ও কর্তাব্যক্তিরা যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসে। সমাজতন্ত্রী দল ছেড়ে এসেই শ্রী পি. ভি. জি. রাজু শিক্ষামন্ত্রীর আসন পেয়েছেন অম্ব রাজো। কংগ্রেসের কোলে স্থান পাওয়ার পর ঝাড়খণ্ড দলের দু'জন বিহার



শ্রীমতী সচেন্দ্রা কৃপালনী

মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছেন। এ রাজ্যেও মন্ত্রীর অভাব নেই। শ্রীগোবিন্দ সহায় মন্ত্রী হয়েছিলেন কংগ্রেসে ফিরে এসে। কাজেই আজ জেন্দা সিংকে নিয়ে জেদ করে লাভ নেই। তাঁর বিরুদ্ধে সন্নিবিধা গ্রহণের অভিযোগ অনর্থক—ছাইচাপা দলীয় কোন্দলের নগ্নমূর্তি আবার প্রকাশ্য পথে টেনে আনা ছাড়া আর কোন ব্যক্তি থাকতে পারে না। এমনি ধরনের ব্যক্তির অবতারণা করেছেন শ্রীহরগোবিন্দ সিং, শ্রীমুজাফ্ফর হাসান, চৌধুরী গিরিধারীলাল, ডাঃ সীতারাম, শ্রীবানারসী দাস প্রমুখ মন্ত্রীরা।

মন্ত্রিসভার বিরোধী গোষ্ঠীর অধিনায়ক উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ সহায় এ ব্যক্তির সারবত্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। বিশেষ করে তাঁকে ও জেন্দা সিংকে এক পাল্লায় ওজন করাটা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারছেন না। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এ’রা সব অজ্ঞ। কোন খবরই রাখেন না। তার উদাহরণ, আমি কংগ্রেসে ফিরে এসেছি ১৯৫৬ সালের নবমাসে। আমাকে ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস টিকেট দেওয়া হয়েছিল। মন্ত্রী হয়েছিলাম ১৯৬১ সালে। অতএব আমার ব্যাপারে কোন নীতিগত চুলচেরা বিচারের প্রয়োজন উঠতে পারে না।

জেন্দা সিং-এর ব্যাপারটা বিলকুল আলাদা। বিরোধী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে তিনি এসেছেন আইনসভায়। কংগ্রেস সভাপতির সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁকে কংগ্রেসে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এবং এক্ষেত্রে মন্ত্রীর আসনে বসবার পূর্বে প্রয়োজন কংগ্রেস সভাপতির অনুমতি।

ব্যক্তির মারপ্যাচ চলছে উত্তর পক্ষের। বীরা এ দুপক্ষের কেউ নয় তাঁরা ভেবে পাচ্ছেন না, গোবিন্দ সহায় এবং জেন্দা সিং-এর মধ্যে তফাৎ কতখানি। কংগ্রেস সভাপতির অনুমতির প্রয়োজনই বা কেন? সংগঠনের সভাপতি হিসাবে তাঁর দায়িত্ব বিরাট। গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে সাফাই করার কাজে তিনি নেমেছেন। সে কাজে জেন্দা সিং প্রতিবন্ধক হলে নিশ্চয়ই তিনি প্রতিকারের নির্দেশ দেবেন। দলীয় স্বার্থে এবং সংগঠনের কাজের সন্নিবিধার জন্য সর্বত্রই দলপতির নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন কংগ্রেসের নেতৃত্বই ভারত গণতন্ত্রের আলো প্রাচ্যভূমিতে জ্বালিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। কোন কারণে সে প্রদীপ নিভে গেলে উত্তরপন্থীরা কংগ্রেসকেই দায়ী করবে।

সুখের বিষয়, শ্রীমতী কৃপালনী সমালোচনার উদ্দেশ্যে কেউ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। শ্রীনওরাল কিশোরের উত্তির উল্লেখ তিনি করেন, নিশ্চয়, অপবাদ ও সমালোচনার তিনি স্বাক্ষর কিছ্ মনে করেন না। এসব তাঁর প্যা সুহা হয়ে গেছে। খবরই স্বাভাবিক। শ্রীগুরুজের কটকাকীর্ণ আসনে বসে তাকে

নিষ্কটক করার যত চেষ্টা তিনি করছেন—বিবদমান দলের বিরোধ মিটমাটের প্রয়াস যত তিনি করছেন বিক্ষুব্ধপক্ষের তত বিরাগভাজন হচ্ছেন। শেষরক্ষা হয়তো তিনি করতে পারবেন না; কিন্তু প্রচেষ্টার প্রশংসাপত্র এককালে তাঁকে দিতেই হবে।

উড়িষ্যার মত উত্তর প্রদেশেও সরজমিনে কংগ্রেস সভাপতির জরীপ করার সমস্যা এসেছে। তিনি একবার এ রাজ্যে সফর করলেই হয়তো বৃষ্টিতে পারবেন বিক্ষোভটা কোথায় এবং তার আসল কারণের সঙ্গে জনচিত্তের সংযোগই বা কতখানি? সাধারণ মানুষ সেই দিনের অপেক্ষাতেই আছে।

বিহার :

বিহারের গ্রামাঞ্চলে দূর্ভিক্ষের কালোছায়া ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুতগতিতে। অর্ধহার ও অনাহারে দিন কাটছে, দিন-মজুর আর ভূমিহীন চাষীর। উভয়েই বেকার। সামান্য তৈজসপত্র বা ছিল উদরের জ্বালায় সব বিক্রি করে এখন গাছের পাতা ও শাকসব্জী সিদ্ধ করে খেতে



শ্রীগুরুজানন্দ

সুস্থ করেছে। কালও খবর এসেছে শূন্য কাঁচ পাটপাতা সিদ্ধ খেয়ে আছে অনেক পরিবার।

অথচ এ বছর বিহারের ধানের গোলা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছিল অস্বাভাবিক ভাল ফলনের জন্য। রবিশস্যও ফলেছিল আশাতিরিক্ত। ধান কাটার পর চালের দাম গিয়েছিল পড়ে। এমন অসম্ভব ফলনের পর পড়তি বাজার স্বাভাবিক মনে করেই বেশ কিছুটা পরিমাণ ধান চাষী করলো হাতছাড়া। তারপরই সুদ্র হলো কালোবাজারের কালো-মাণিকদের ভোল্টিক। ধান ও চালের দাম সুদ্র করলো বাড়তে। আজ পাটনা শহরে সরু চালের মশ ৪৫ টাকা। বাকী বা মাকার নামে বিক্রি হয় তা কোথাও চল্লিশ টাকা মণের

কম পাওয়া যায় না। গ্রামের অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে ব্যবসায়ীদের অণুগলিহেতু বাজার-দর স্থির হচ্ছে।

গেল খারিফ ও রবিশস্যের মরসুমে খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়েছে ৭০ থেকে ৭৫ লক্ষ টন। এ হিসেব পরিবেশন করেছেন সরকার নিজেই। তবু কেন এমন হল?—‘জিজ্ঞাসে সর্বজন’। উত্তর আমাদের জাতীয় সরকার ঠিক ঠিক দিয়েছেন এমন সন্ধান তাদের নেই। আমরা যতটা জানি সরকারের খোয়ালখুশিই এর জন্য দায়ী। আটঘাট না বেঁধেই তিন লক্ষ টন চাল তুলে ‘বাফার স্টক’ করতে নেমে পড়লেন রাজ্য সরকার। ধানের সর্বনিম্ন একটা দামও ধার্য হল। এপ্রিলের শেষ অবধি মাত্র ০৪ হাজার টন চাল সংগ্রহ করতেই সরকারী দপ্তর খানা নাজেহাল হয়ে পড়লো।

সরকার মিলের ওপর লোভি ব্যবস্থা চালু করতেই মিলমালিকেরা ধান-চালের স্বাভাবিক কারবারের পথটাই দিল বন্ধ করে। সব চলে গেল চোরাবাজারে এবং জোতদারদের গোপন গোলায়। এ খেলায় তারা সিদ্ধহস্ত। গেল ক’টা বছরেই হাত পাকিয়েছে। রবিশস্য তোলার মুখেই বাজারে ধান-চালের অভাব হল সুদ্র। চাপ পড়লো গিয়ে গমের ওপর। আজ দেশী গমের মশ বিয়াল্লিশ টাকা। তাও দোকানীর দয়া ভিন্ন নতুন খন্ডের পল্ল না।

খাদ্যসমস্যার দায় এড়াতে গিয়ে সরকার প্রথম যে-চাল চলেছিলেন তা বানচাল করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুত্রঙ্গানন্দ। নেপাল হয়ে চীনে চাল চালানোর যে-বিবরণ সরকার দিয়েছিলেন তা চটকদার সন্দেহ নেই; কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেন নি। এবারে আবার নয়া ব্যক্তির অবতারণা করেছেন বাবু কৃষ্ণবল্লভ সহায়। বাবুদের ব্যক্তির বহর অনস্বীকার্য। কিন্তু খাপ কম বলে খোপে টেকে না মোটেই। এবারের ব্যক্তির সার কথা হল—চাষের খরচ অনুপাতে উৎপাদন হয় নি। চাষে যে-পরিমাণ টাকা খেটেছিল তা’ না পাওয়াতেই দাম বেশি চড়েছে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে চতুর্থ পরি-ক্ষপনার বিস্তারিত অর্থনীতিবিদের কথাও বলেছেন। কিন্তু মানুষ এতো বোকা নয়। ঠিক সেই কথাটাই কতরা বৃষ্টিও বৃষ্টিতে চায় না।

বিহারের চাষের লাভালাভের প্রশ্ন আজকের দিনের বিচারের কথা নয়। আজ সরকারকে ভাবতে হবে বরষার পর গ্রামাঞ্চল হবে দুর্গম। ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। সে দায়িত্ব দিনের পর দিন উপেক্ষা করলে মানুষ বেশি দিন সহ্য করবে না।

অধিক ফলাও অ্যান্ডালনের কথাই বাজ। সেখানে কথার ভাল ভাল চাব ছাড়া আর কিছু আজ পর্যন্ত হলো না। সম্ভাব্য পদ্ধতি এখনও সোজা হয়ে পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারছে না। সংগঠন তার বড় দুর্বল। চুরি, দূর্নীতি, দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ আবার অষ্টোপাসের

জুড়ি জুড়ি ধরেছে তার কাঁধ সেহকে। সম-
সারের প্রায় নাভিস্থান উঠেছে।

অধিকাংশ জমি অনুর্বর। ছোট ছোট
খণ্ডে তা বিভক্ত, সেচের উন্নত ধরনের ব্যবস্থা
কই, এমন কি চাষীর জীবনের নিরাপত্তার
দিকেও সম্যক নজর নেই সরকারের। প্রায়
প্রতি বছর বন্যায় ভেঙ্গে বাচ্ছে চাষীর চাল
থেকে চুলো পর্যন্ত। আগুনে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে
গ্রামের পর গ্রাম। সারা বছরের মেহনতের
ফসল, গরু-মোষ সবই এমনি করে বিনাশ
হচ্ছে। এই সর্বনাশ নীরবে দাঁড়িয়ে দেখে
আসছেন আমাদের জাতীয় সরকার; আর
আমাদের মুখের বুলি কেড়ে নিয়ে বার্তালিখে
চলেছেন একটার পর একটা বার্তা। এ চিরদিন
চলতে পারে না। এখানে নাকি একদল
বিশেষজ্ঞ গ্রামে গিয়ে 'স্যানডন সার্ভিস' করছেন।

সুখের কথা। সরকারের টনক কিছটা
মজ্জা। পুরোপুরি স্থানীয় কাজ চালাবার
ব্যবস্থা না হলেও কিছটা তথ্য সংগ্রহের
কক্সা করা হয়েছে। হাত আসুক।

পাড়চেরী :

এই কুর রাজ্যে খাদ্য-সমস্যা দেখা দিয়েছে
বিরটীকারে। ধান ও চালের দাম বেড়ে চলেছে
দিনের পর দিন। অখাবিত ও দরিদ্রের সমাজে
উঠেছে হাহাকার বহ্নি। ভাগ্যের এমনি পরি-
হাস, সত্যিকারের অভাবের দিনে—গেল বছর
যখন সারা দেশে দেখা দিয়েছিল খাদ্যসঙ্কট
তখন রাজ্য সরকার দক্ষতার পরিচয় দিয়ে-
ছিলেন। সাধারণ জনের ভাত ভরসা পেয়েছিল
অনেকখানি নিতর করেছিল নিশংকচিত্তে
সরকারী ব্যবস্থাপনার ওপর।

এবারে কলস কাটার সময় থেকে সতর্ক
হলে এমন কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হতে পারতো
না। জোতদার আর মজ্জদার মিলে ফসল-
কাটার পর পাঁচ মাস বেতে-না-বেতেই বাজার
দরদর করে তুলেছে।

সরকার আবার বাধা-নিষেধের বেড়া জাল
সৃষ্টি করে মনোনিশ্চয়কারীদের ব্যুহ রচনার
পথটা দিয়েছেন পরিষ্কার করে। দক্ষিণ
আরেকটা থেকে বাধা-বিশিষ্ট অভিন্ন করে বে-
চাল আসছে ভান মূল্য দিতে হচ্ছে অনেক
বিশ।

ধানের দাম সরকার বেধে দিয়েছেন প্রতি
কুইন্টাল ৩৬ থেকে ৪১ টাকা, খোলা বাজারে
ধান বিক্রি হচ্ছে প্রতি কুইন্টাল পঁয়তাল্লিশ থেকে
বাহার টাকা। লিঙ্গ চালের নির্মাল্যত মূল্য
প্রতি লিটার ছাপান পরসা। খোলা বাজারে
বিক্রি হচ্ছে আশী পরসা করে। আতপ চালের
দাম ঢের বেশি।

খান-চাল বছরের একদ দিনে আর কোন-
দিন নাকি এ রাজ্যে এমন অধিকার্য হই নি।
আমাদের ধারণা সরকারী নিয়ন্ত্রণে ক্রম-কমে
ওঠে কালোবাজার। কংগ্রেসের কমেডিটির
অর্থে নিয়ন্ত্রণাবদ্ধ পণ্যের সূক্ষ্ম বণ্টনের

ব্যবস্থা ঘটলেই মনোনিশ্চয়কারীদের দল চারদিক
থেকে চেপে ধরে চলার নিবিচারে শোষণ।

বাজারের এই অরাজকতা সরকারের অগোচর
নয়। সরকার মনোনিশ্চয়কারীদের শাসনত্যা
করার হুমকী দিয়েছেন প্রতিনিয়ত। অনুরোধের
পালা-বাবসারীদের শত্রুবাঁকি উদ্বেকের আবে-
দনের পর্যায় শেষ হয়েছে অনেক আগেই।
গোলাজাত ও গুদামজাত অতিরিক্ত শস্যের
সঠিক পরিমাণ ঘোষণার সরকারী আবেদন ব্যর্থ
হয়েছে। সরকার এতটা গলাবাঁজির পরও
কিন্তু উপায় শস্যের পরিমাপের ব্যবস্থা এবং
উন্নত শস্য সংগ্রহের কোন পরিমাণ ঘোষণা
করেন নি।

নিজের জালে ধরা পড়ার ভয় রয়েছে
সরকারী মহলে। পাড়চেরীর চারজন মন্ত্রী
এ রাজ্যের প্রথম সারির মন্ত্রীদের। রাজ্যের
অন্যতম বড় ভূমালিকারী হলেন মুখ্যমন্ত্রী
শ্রী চি. ভেঙ্কটস্বামী রোডিরায়। তিনি এক
হাজার কন্ডা ধান বিশেষ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
বিক্রির জন্য। আর বেশির আর এগোতে
পারেন নি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে নিজের
গোষ্ঠীকে—ভূমালিকারী সমাজকে বিরূপ করে
তোলার ভয় থাকে। সরকার জানেন, কৃত্রিম
অভাব সৃষ্টির কারসাজিতে এবার সরকার
আগে টেকা দিয়েছেন উপাদকদের দল।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভেঙ্কটস্বামী এ কথা স্বীকার
করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পর্যাপ্ত ধান ও চাল
মজ্জত রয়েছে উপাদকদের গোলায় এবং এই
মূল্যবিক্রির কৌকটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম। জন-
কল্যাণে উপসাহী উপাদকগণ এগিয়ে এসেই এ
অবস্থার প্রশমন হবে।'

তাই এই আবেদনে ফলেছে আরও বিপরীত
ফল। ব্যবসারী ও জোতদারদের সরকারের
সদিচ্ছার দৌড় সময়ে নিজেই এবং সেই সূত্রে
মূল্যের লাগামটাও দিয়েছে ছেড়ে। দাম বেড়ে
চলেছে দ্রুতগতিতে। গৃহস্থ বাড়ি বাড়ি হস্তরান
হচ্ছে দোকান থেকে দোকানে।

বেসামরিক সরবরাহ দপ্তর সৃষ্টি হয়েছে
সম্প্রতি। খাদ্য করপোরেশন খাদ্যশস্য সংগ্রহের
দায়িত্বভার গ্রহণের পক্ষ কারাইকাল যোল হাজার
কন্ডা চাল সংগ্রহ করেছে এ পর্যন্ত। সিভিল
সাপ্লাই সিস্টেমের উপাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ
স্থাপনের চেষ্টাও করছে। কোন ফল হচ্ছে না।
বিজ্ঞানীর কড়া মনে করেন, সরকার দাম বাড়িয়ে
পারে এমন ধারণা জোতদারদের মধ্যে হয়েছে।
ফলে, তারা উন্নত ফসল ছাড়ছে না।

সরকার দক্ষর দক্ষর ইস্তাহার দেবার সঙ্গে
জানিয়েছেন, চাল, চিনি, আটা, ময়দা ও সূজি
কেনবার জন্য পারিবারিক পরিচয়পত্র বিতরণ
করা হবে। বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে—পরি-
চয়পত্র কোন পরিবারই পায় নি। পরিবারের
তালিকা প্রণয়নের ভার পড়েছে মিউনিসি-
পালিটির ওপর। মিউনিসিপালিটির আটটি
কার্ডিনাল মধ্যে কেবল কংগ্রেসের প্রভাবমুখ

কমিউনিষ্ট প্রভাবিত কার্ডিনাল মনোনিশ্চয়কারী
পেভের তালিকা সরকার পেয়েছেন।

চিনি উপপাদন করে এখানকার কলগলো।
লাইসেন্স বিতরণের ট্রাট এবং উপযুক্ত পরিমাণ
সরবরাহের অভাবে চিনি সকলের ঘরে যায় না।
সূজি ও ময়দার অবস্থা একই। পাওয়া যাচ্ছে
কেবল গম। দামও অপেক্ষাকৃত সস্তা।

দুখের বাজারও চড়েছে।

গুজরাট :

পাকিস্তানের আক্রমণ ঠেকাতে সীমান্ত
এলাকার যখন হিমসিম খাচ্ছে ভারতীয় সৈন্য-
বাহিনী, পাক-চীন ও ব্রিটিশ আমেরিকার কুট-
নৈতিক দাবার চালে যখন রাষ্ট্রনায়কগণ বিব্রত
ঠিক সেই সময়ে কছ নিয়ে গদিহার রাজার দল
ও তাঁদের অনুগ্রহভাজনরা সূত্র করেছেন কছ
আলাদা রাজ্য গঠনের কুছসাধন।

এর অবতারণা হয়েছিল রাজ্যসভায়।
কছের কংগ্রেসী সদস্য ডাঃ মহাপাতরায় মেহতা
বাজেট অধিবেশনে সীমান্ত পরিপ্রতিষ্ঠা আলো-
চনাকালে এ কছের বীজ ছড়িয়েছিলেন।
স্বতন্ত্র দলের লোকসভার সদস্য মহারাজকুমার
হিম্মতসিংজী একই সূত্র তুলেছিলেন।

তাঁদের কথায় সৈদন কেউ কোন গুরুত্ব
আরোপ না করলেও আজ সেই কছের সূত্র
প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গুজরাটের আনাচে-কানাচে।
রাজ্যের রাজনৈতিকমহলেও নাড়া-চাড়া পড়ে
গিয়েছে। কংগ্রেস, স্বতন্ত্র দল ও জনতা
পরিষদ আর চুপচাপ বসে থাকতে পারছে না।

জনতা পরিষদের নেতা শ্রীইন্দ্রলাল বাজিক
কছবাসীর মনোভাব জানার জন্য কছ পরি-
দর্শনে যাচ্ছেন। গুজরাট স্বতন্ত্র দলের চেয়ার-
ম্যান শ্রীভাইলালভাই প্যাটেল কছকে আলাদা
রাজ্যে পরিণত করার ঘোর বিরোধী। কিন্তু
স্থানীয় নেতারা ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে উঠতে
পারছেন না। সেখানে মহারাজকুমার হিম্মত-
সিংজীর প্রভাব বেশি। তিনি বার বার কছের
একটা কিছ স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছেন।

কছের মহারাও মহোদয়ের প্রাতার মতে
কছের সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কছ
অত্যন্ত অনুন্নত এলাকা। গুজরাট হল
ঘাটতি রাজ্য। কাজেই কছের প্রশাসনিক কাজ
গুজরাটের সঙ্গে চলতে পারে না। সৌরাস্ট্র ও
গুজরাট থেকে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলটুকুর
সংস্কৃতিও স্বতন্ত্র। এ অঞ্চলকে বিচার করতে
হবে ব্রিটিশ ও মণিপুরের সঙ্গে।

দেখা যাচ্ছে, কছের নিজস্ব প্রতিনিধি
যারা তারা সকলেই রাজপ্রত্যাভার ভাবনার
প্রভাবিত। কংগ্রেস থেকে সূত্র করে রাজাদের
সংগঠন স্বতন্ত্র দল একই সূত্র তুলে গুজরাট
গুলজার করে তুলেছেন। বাইরে শত্রু যখন
অবরোধ করে বসে থাকে তখন অঙ্গরমহলের
কছের কাহিনী ভারতে নতুন নয়। ইতিহাস
থেকে মানব শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
কছের কতৃদের সেই কথাটা যেন বিস্মরণ
না হয়।

বুটেনঃ

১৭ই জুন থেকে এখানে শুরু হয়েছে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন। বে-অর্থের একদিন জীকজমক করে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ, তা আজ একান্তভাবেই অনুপস্থিত। সেজন্যেই প্রশ্ন উঠেছে এ-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা কতখানি? প্রয়োজনীয়তা থাকুক না থাকুক, তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ-পরিবারের সদস্যসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে (অসুখী পরিবারের কি কলেবরবৃদ্ধি হয় না?), এ বছরে সদস্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ৩টি রাষ্ট্র কমনওয়েলথ ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ কমনওয়েলথ বিরোধী হাজারো সমালোচনা সত্ত্বেও আজ সংস্থাটি পৃথিবীর ৭৫ কোটি বা এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছে। এবারকার সম্মেলনে উপস্থিত থাকছেন ২১টি দেশের প্রতিনিধি, তাদের মধ্যে ১৭ জন রাষ্ট্রপ্রধান বাকী ৪ জন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সিনিয়র বা প্রবীণ মন্ত্রী। আর যোগদানকারী নতুন ৩টি রাষ্ট্র হলো জাম্বিয়া, গাম্বিয়া ও মাল্টা।

বছরের মাথায় একবার করে দেখাসাক্ষাৎ যদি আগেকার দিনের ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সম্মেলনের উদ্দেশ্য থেকে থাকে তবে বলতেই হবে যে সে 'সুদিন' আর নেই। পৃথিবী আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, কমনওয়েলথভূক্ত রাষ্ট্রগুলিরও দারিদ্র্য রয়েছে পৃথিবীকে সংকটমুক্ত করার। কমনওয়েলথ সম্মেলন সে-দারিদ্র্য কতখানি পালনে সক্ষম হবে প্রশ্নটা আজ তা নয়, জরুরী প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু কয়েকটি মূল সমস্যার সংগে কমনওয়েলথভূক্ত রাষ্ট্রও জড়িত রয়েছে সেহেতু তাদের সমাধানে কমনওয়েলথ-এর মধ্যে একমত প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এখানেও অবশ্য সেই একই প্রশ্ন থেকে যায় সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মৈত্রীকে পৌঁছানো সম্ভব হবে কি? কিন্তু চেষ্টা করতে বাধ্য কোথায়?

২১টি রাষ্ট্র। এর মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রয়েছে, প্রজাতন্ত্র রয়েছে, এমন কি প্রজন্ম বৈরতন্ত্র পর্যন্ত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন, রাষ্ট্রপতি রয়েছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীও আছেন। গত বছর সম্মেলনে একটি অতি-পরিচিত মুখ অনুপস্থিত ছিল, মনে হচ্ছিল সম্মেলনের অর্থেক গুরুত্ব এবং মাধ্যমই তাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে-মুখ ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীও নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়ে কাজের চাপে দক্ষিণে অংশ নিতে পারেন নি, টি. টি. কৃষ্ণামাচারী এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সেবার। এবার মাল্‌বেরো হাউসে যে-প্রিয়দর্শিনীকে দেখা যাচ্ছে না তিনি হলেন সিংহলের শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক। গত কয়েকটি কমনওয়েলথ সম্মেলনে তিনি বিশ্বের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে তাঁর দল পরাজিত হওয়ায় শ্রীমতী বন্দরনায়ককে প্রধানমন্ত্রীর গদী ছাড়তে



লন্ডনে শাস্ত্রীজী

হয়েছে মিঃ ডাডেল সেনানায়কের হাতে। কিন্তু দেশে কাজের চাপ থাকার মিঃ সেনানায়কও উপস্থিত থাকতে পারছেন না।

তবে সম্মেলন নিশ্চয়ই দৃজন নতুন মুখ পেয়ে অনেক বাধা ভুলতে পারছে। সে-মুখ দুটি আর কারোই নয়; একজন সম্মেলনের স্বয়ং চেয়ারম্যান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড উইলসনের অপরজন নেহরুর উত্তরসারক শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী। প্রাথমিক দল ক্ষমতার আসার মিঃ উইলসনও অনিবার্যভাবে মাল্‌বেরো হাউসে সম্মেলন উদ্বোধন করার সুযোগ পেয়েছেন।

এবারকার সম্মেলনের সামনে যে-সমস্যাগুলি প্রধান হিসেবে দেখা দিয়েছে তা হলো দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং ভিয়েতনাম। এ-ছাড়াও রয়েছে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, বুটেনে আগত কমনওয়েলথভূক্ত দেশগুলির অধিবাসীদের সমস্যা তো রয়েছেই। দক্ষিণ রোডেশিয়াকে নিয়ে আভা যে-সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা ১৯৬১ সালের সম্মেলনকে মনে করিয়ে দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়েও কমনওয়েলথ সম্মেলনকে অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার জঘন্য বর্ণ-বিস্তেবনীতি বা 'অ্যাপারথৈড' অনুরণন করার ফলে কমনওয়েলথভূক্ত দেশগুলি বিশেষত আফ্রোশিয়ার দেশগুলি কমনওয়েলথ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বহিষ্কারের দাবি জানায় এবং চাপের ফলে সে দাবি গৃহীতও হয়। দক্ষিণ রোডেশিয়ারও আজ প্রায় একই কাণ্ড ঘটে চলেছে। এখানকার বর্ণবিষেধী প্রধানমন্ত্রী বিচিত্র অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে এক সংখ্যালঘু সরকার কার্যে করেছেন। অর্থাৎ ৪০ লক্ষ সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীর ওপর এখানে সংখ্যালঘু ২ লক্ষ শ্বেতাঙ্গের সরকার

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতন্ত্র এখানে অনুপস্থিত কৃষ্ণাঙ্গদের প্রাথমিক অধিকারগুলিও অস্বীকৃত। হাজার হাজার নিগ্রো কারান্তরালে নিষ্কপ্ত, কৃষ্ণাঙ্গদের রাজনৈতিক দল বে-আইনী ঘোষিত। বিচিত্র এখানকার সংবিধান কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার মেনে নেয় নি। প্রধানমন্ত্রী আয়ান স্মিথ এ-সংবিধানের জোরেই দেশশাসন করতে চান এবং স্বাধীনতা পেতে চান। তিনি এ-হুমকীও ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে রেখেছেন যে, বুটেনে ডালের ডালের স্বাধীনতা না দিলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের তোয়াক্কা না রেখেই একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। পূর্বদন রক্ষণশীল সরকার অনেক টালবাহানা করছেন রোডেশিয়ার নিয়ে, প্রাথমিক দল তখন এ-সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বনের সুপারিশ করেছে। কিন্তু এখন ক্ষমতা পেয়ে সেই প্রাথমিক সরকারকেই তোষণ-নীতি অবলম্বন করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আফ্রোশিয়ার রাষ্ট্রগুলি এ-ব্যাপারে এককণ্ঠ। তারা হয় আয়ান স্মিথকে দিয়ে অগণতান্ত্রিক সংবিধান বাতিল করিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করাবে গণতান্ত্রিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন দক্ষিণ রোডেশিয়াকে কমনওয়েলথ থেকে বহিষ্কারের দাবি তুলবে। দক্ষিণ আফ্রিকা না থাকলেও আয়ান স্মিথের অবশ্য সম্মেলনে মদ্রুদ্বির অভাব নেই। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট মেলিস ডো ইতিমধ্যেই বায়না ধরেছেন যে, রোডেশিয়ার প্রসঙ্গ সম্মেলনে তোলা ঠিক হবে না। কিন্তু জগ্ৰত আফ্রোশিয়ার সিংহনাদের মধ্যে মেলিসের কণ্ঠ ভুবে যাবে। মিঃ উইলসনকে একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত নিতেই হবে বলে মনে হয় এ-ব্যাপারে।

ভিয়েতনাম নিয়েও কঠোর সমস্যার পড়েছে সম্মেলন। কারণ এর প্রধান শত্রিক যুক্তি এ-পর্ষন্ত ভিয়েতনামের প্রশ্নে মার্কিন নীতিকেই সমর্থন করে এসেছে পুরোপূর্বের রাষ্ট্র। আফ্রোশীয় রাষ্ট্রগুলিতে নয় প্রমিত দলের মধ্যেও কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানের জন্যে একটা কমন্ওয়েলথ মিশন গঠনের প্রস্তাব হয়েছে সম্মেলনে যে-মিশনের নেতৃত্বে থাকবে যুক্তি এ-র কাজ হবে ভিয়েতনাম সমস্যার সঙ্গে জড়িত দেশগুলিতে মিশনের সদস্যরা (অর্থাৎ যুক্তি ছাড়া থানা, ট্রিনিদাদ, নাইজেরিয়া ও সিংহলের প্রতিনিধি) যাবেন নেতৃত্বদেয় বোঝাবার জন্যে। কিন্তু মিশনের সাক্ষ্য সম্পর্কে ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ প্রথমত আফ্রিকার কয়েকটি রাষ্ট্র মিশনে যুক্তি নেতৃত্ব মানতে রাজী নয়। দ্বিতীয়ত যে বিভিন্ন ওপর মিশন প্রতিষ্ঠিত তাও যথার্থ শত্রু নয় বলে বহু সদস্যরাষ্ট্র মনে করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম মিশনকে অভ্যর্থনার জন্য তৈরি থাকার কথা ঘোষণা করলেও চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া একে বিদ্বেষ করতে ছাড়ে নি। এর প্রধান কারণ অবশ্য ভারতের প্রধান-মন্ত্রী শাস্ত্রী বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, উত্তর কোরিয়াতে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ করার আগে বিভিন্ন রাজধানীতে মিশন পাঠানো অর্থহীন। শাস্ত্রীজী একথাও বলেছেন যে, ভিয়েত কং প্রতিনিধিদের আলোচনা বৈঠক না ডাকা হলে চল আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ধানার প্রেসিডেন্ট নতুন একথাও বলেছেন যে, আমেরিকাকে শত্রু বোমাবর্ষণই বন্ধ করতে হবে না, অস্ট্রেলিয়াকে তার সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং নিউজিল্যান্ডকে সৈন্য প্রেরণ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু মিশনের কার্যক্রমে এসব কিছুই উল্লেখ নেই। একই কমন্ওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যেখানে এত বিভেদ সেখানে মিশনের সাক্ষ্য সম্পর্কে সংশয় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক বৈকি।

যুক্তি নেতৃত্বের সাক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য অনুসরণ করে। এ-সংক্রান্ত দুজন রাষ্ট্রনায়ককে সম্মানজনক (অনারারী) ডক্টর অফ ল উপাধিতে ভূষিত করে বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্ব ঐতিহ্য বৃদ্ধি করেছে। উপাধিপ্রাপ্ত নেত্রী দুজন হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি ম্রি কেম্বের কোডা।

আলজিরিয়া :

একটা আকস্মিক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেল আলজিরিয়ায়, প্রেসিডেন্ট আহুমেদ বেন বেল্লা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। আলজিরিয়ার শাসনভার গ্রহণ করেছেন উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্নেল হোয়ারি বুমদিয়েনের নেতৃত্বে গঠিত নতুন বিপ্লবী পরিষদ। শনিবার দুপুর রায়ে যখন সমস্ত দেশ যুদ্ধে অচেতন ছিল, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বেন বেল্লা যখন তাঁর

ফ্রান্সকলিন ডি রুজভেল্ট এডিনিউম্ব জাতি জিলা-প্রাসাদে নিদ্রামগ্ন ছিলেন, তখন সামরিক বাহিনীর লোকেরা গিয়ে বেন বেল্লাকে ঘুম ভাঙান এবং বন্দী করেন। রাজধানী আল-জিরাসের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সামরিক বাহিনী দখল করে নেয় এবং বেতারকেন্দ্রটিও নিজেদের দখলে আনে। সমস্ত ব্যাপারটি এত দ্রুত সংঘটিত হয়েছে যে, তার মধ্যে কোন খুঁজ ছিল না এবং সবচেয়ে বড় কথা অভ্যুত্থানটিতে এক বিন্দু রক্তপাত ঘটে নি বলে বিপ্লবী পরিষদ দাবি করেছেন। নতুন সরকার এখনো গঠিত হয় নি, তবে বেন বেল্লা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুতেল্লা বিপ্লবী পরিষদেরও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন। নতুন সরকারের নেতৃত্ব যে কর্নেল বুমদিয়েনই (আজকের মনুষ্য দেখুন) করবেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আলজিরিয়ায় এ অভ্যুত্থানের হঠাৎ কোন প্রয়োজন হলো তার প্রকৃত কারণ এখনো বোঝা যাচ্ছে না। তবে প্রেসিডেন্ট বেন বেল্লায় বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের অভিযোগের এক লম্বা ফিরিস্তি তৈরী করা হয়েছে বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ থেকে। বেন বেল্লাকে বাঁচৎস স্বেচ্ছাচারী নায়ক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, নিজের স্বার্থে তিনি দেশকে উচ্চের পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবী পরিষদ অরাজকতা, জনসাধারণের অর্থের অপব্যবহার এবং ক্ষমতালিপ্সুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। বেন বেল্লা নিজেকে 'জাতীয় বিশ্বের' নেতা প্রতিপন্ন করার জন্যে দেশের স্বার্থকেও



কমন্ওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে
যোগদানকারী প্রধানমন্ত্রিসমূহ

বিসর্জন দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যও বেন বেলাকে দায়ী করা হয়।

বেন বেলায় ভবিষ্যৎ কি কেউ বলতে পারছে না। তাকে বন্দী করে একটা মিলিটারী ব্যারাকে রাখা হয়েছে। বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সৈরাচারী এবং রাজদ্রোহীদের যে-শাসিত ইতিহাস এতদিন দিয়ে এসেছে প্রেসিডেন্ট বেন বেলাকেও তার সম্মুখীন হতে হবে। সামরিক আদালত নিশ্চয়ই তাঁর বিচার হবে এবং তাঁর কপালে কি জুটেবে তা সহজেই অনুমেয়। মাত্র ৩ বছর আগে কমতার এসেছিলেন বেন বেলা। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ান মুক্তিবাহিনী যে-সংগ্রাম পরিচালনা করেছে বেন বেলা তারই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, যে দল তিনি গঠন করেছিলেন তার বিশ্বস্ত সঙ্গী ও অনুচরদের নিয়ে আজ তাঁদেরই সামনে তিনি আসামীর কাণ্ডগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন।

বিপ্লবী পরিষদের লক্ষ্য কি বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তাঁরা দেশে (authentic brand of socialism) সত্যিকারের সমাজতন্ত্র কয়েম করতে চান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্যে একথাও বলেছেন যে, দেশের সমাজ-তন্ত্র ও প্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য এ অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে। আফ্রিকা ও আরব রাষ্ট্র-সমূহের একা ও সংহতি অক্ষুর রাখাই হবে মতুন বিপ্লবী পরিষদের প্রধান লক্ষ্য। দেশের রাজনৈতিক দারিদ্র্য দূর করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলজিরিয়ান মর্যাদা করা হবে নতুন বিপ্লবী পরিষদের কর্মপন্থা।

কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে, সামরিক অভ্যুত্থানটি এমন সময় ঘটানো হয়েছে, যখন তার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। মাত্র কয়েকদিন আগেও প্রেসিডেন্ট বেন বেলা এক জনসভায় বলেছিলেন যে, দেশের মধ্যে কোন অন্তর্বির্বাদ নেই। কোন দলাদলি নেই। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে যে একটা বিরোধ দান্য বোধে উঠেছিল তা ব্রহ্ম প্রকাশ পাচ্ছে। আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে বেন বেলায় সংগে কয়েকজন নেতার মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল এবং সম্প্রতি ফেরহাৎ আব্বাস প্রভৃতি কয়েকজন বিরোধী দলের নেতাকে মৃত্যু দিয়েও বেন বেলা বিরোধীদের রুদ্র করেছিলেন।

কিন্তু তার চেয়েও যেটা উল্লেখনীয় তা হলো বিদেশীরা এ-অভ্যুত্থানে প্রথমে একেবারে হতভাক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এর প্রধান কারণ হলো মাত্র ১০ দিন বাদে যেখানে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন হতে চলেছে—আফ্রাসীয় সংহতি সম্মেলন—তার অভ্যন্তরে যদি এ ধরনের টাটু পর্ব্বারের গোলাযোগ থাকে, তবে এখানে সম্মেলন আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কিনা সে-সম্পর্কে সহজেই সন্দেহের উদ্রেক হয়। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে কর্নেল বুমোদিয়ন এবং পররাষ্ট্র-

মন্ত্রী বৃত্তান্তিকা দৃষ্টিতেই বলেছেন যে, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী সম্মেলন এখানে হবেই। ২৪শে জুন থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্ব্বারের সম্মেলন এবং ২৯শে জুলাই থেকে রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের প্রোগ্রাম অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু বতাই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক না কেন, নতুন কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে এ-বিরাট পরিবর্তনের সংগে নিজস্বের খাপ খাইয়ে নিতে বিদেশী অতিথিদের একটু সময় লাগবে বৈকি। ব্রহ্মদেশের প্রতিনিধিরা তো সম্মেলনে যাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। চীনা প্রতিনিধিদল আলজিরিয়ার পথে বাতায় করে বিমানের অভ্যুত্থানের কথা জানতে পেরে কারো ফিরে এসেছেন। কাজেই প্রশ্ন উঠেছে সম্মেলন একেবারে বাতিল না করে দিয়ে কিছুদিন পেছিয়ে দেওয়া যায় কি না। বাতিল করার প্রশ্ন ওঠে না এ-জন্যে যে বিপ্লবী পরিষদের সেক্রেটারী জেনারেল বুমোদিয়ন বলেছেন যে, নতুন সরকার কোন আদর্শগত পরিবর্তন আনবে না—সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন



বেন বেলা

তার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী, থাকবে তেমন বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষতা ও আরব, আফ্রিকা ও এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক অক্ষুর থাকবে। সেক্ষেত্রেই নতুন সরকারকে সোভিয়েট রাশিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র থেকে সুরক্ষা করে ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা দান করেছে।

সে-ই হোক, একথা স্বীকার করার উপায় নেই যে, সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে একটা রাষ্ট্র বৈদেশিক শান্তিতে টিকে থাকতে পারে না। ৪৫ বছর বয়স্ক অকৃতকার বেন বেলা বহুদিন ধরে আলজিরীয় জনগণের বীর ছিলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বেন বেলাকে ঘিরে স্বদেশে এবং বিদেশে যে image গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের দিনগুলির সময় থেকে তা মানুষের মন থেকে রাতারাতি মূছে ফেলা সম্ভব নয়। বেন বেলায় অনুগামী

সংখ্যাও দেশে কিছু কম আছে মনে করা যায় নেই। বিপ্লবী পরিষদ শূন্য জনসমক্ষে তাঁর মন্ব দিকটা তুলে ধরলেই লোক ভুলবে বলে মনে হয় না। বেন বেলায় দোষত্রুটি ফালন করে, দেশকে উন্নত অবস্থায় নিয়ে যেতে না পারলে নতুন সরকারের জনসমর্থন পেতে কষ্ট হবে। তারও আগে চাই অবশ্য অসামরিক সরকারের প্রতিষ্ঠা।

পশ্চিম জার্মানী:

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গল সম্প্রতি দু'দিনের সফরে এখানে এসেছিলেন। চ্যান্সেলর ডঃ এরহাডের সঙ্গে তাঁর যে সাড়ে তিন-ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক হয় তাতে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়। এ-বিষয়ে দুই নেতা একমত হয়েছেন যে, এ-বছরের শেষে কমন মার্কেটভুক্ত সদস্যদের একটা শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সে-সম্মেলনে সদস্যদের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সংহতি স্থাপন করা যায় কি না তাই প্রধানত আলোচিত হবে।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যের ব্যাপারে কমন মার্কেটভুক্ত দেশগুলি মোটামুটি একই সুরে একই পথে চলেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে রাজনৈতিক একসাধন কতখানি সম্ভব হবে সে-বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে। বিশেষত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি জাতীয়তার উর্ধ্বে উঠে একটা Supranational State গঠন করা বাবে বলে প্রেসিডেন্ট দ্য গল মনে করেন না। মাত্র কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্টের সরকারী প্রাসাদ এলিসিয়ান প্যালেসে প্রেসিডেন্ট দ্য গল ফরাসী ডেপুটিদের কাছে বলেছিলেন যে, ফ্রান্স বা ইতালী তার স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে ও-ধরণের রাষ্ট্র গঠনে রাজী হবে না। একটু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাক এট কে চার? ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির একটা কনফেডারেশন হয়তো বা সম্ভব কিন্তু সুপ্রা-ন্যাশনাল স্টেট কিছুতেই নয় বলে চার্লস দ্য গল মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু কমন মার্কেটের ব্যাপারে দ্য গলের একমত হতে বাধে নি পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে। ঠিক হয়েছে যে, আগামী ৩০শে জুন যে কুর্নিচীর বিধির মেমোরান্ডাম যুক্তরাজ্যকে আরো বাড়তে হবে। কৃষি-সাহায্যের ব্যাপারে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার আর বাড়ানোর ব্যাপারেও একমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কমন মার্কেট সদস্যদের মধ্যে বাণিজ্য, শুল্ক ইত্যাদি বিষয় একযোগে বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারেও উভয় নেতা একমত হয়েছেন। এমন কি পশ্চিম জার্মানী যে অভিযোগ করে আসছিল হা'ম আর্থিক দারিদ্র্যের ব্যাপারে তাকেই এতদিন বেশি ভার বহন করতে হয়েছে বলে এবং তার কৃষিকর্মীরা কম সুবিধে ভোগ করে বলে সে-ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও বোধ আলোচনার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

২ শিচকারিণে প্রবাহ ২

বাঙালীর পণ্যসম্ভার সুন্দর উদ্ভব ইউরোপের দেশে দেশে চলে যেত। কলকাতা থেকে বাংলার মসলিন, বাংলার সিল্কের শূতো, বাংলার তুলো প্রথমে যেত ইংরেজদের প্রধান শহর লন্ডনে। লন্ডন থেকে আবার ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়তো। যেসব জাহাজ কলকাতার বন্দর থেকে ইংল্যান্ডে যেত—সেইসব জাহাজ আবার ইউরোপীয় জিনিস বোকাই হয়ে এই দেশে আসতো। আবার—

আবার ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পুরানো

দলিলে পাওয়া যায় যে, Cargo exported to other parts of Europe under the dominion of Foreign Europe, Comprising Denmark, Humbergh, Lisbon, Madaria and Cadiz.

বাংলার পণ্য চলে যেত ডেনমার্ক, হামবুর্গে, লিসবনে, মাডারিয়া আর কাদিজ। যেত সুন্দর আমেরিকার দেশে দেশে। নীচে ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসার ইতিহাস সম্বলিত একটি অতি প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হলো, সন ১৮০৫

খ্রিস্টাব্দে বাংলা দেশের এই কলকাতা বন্দর থেকে তিক কি কি জিনিস ইউরোপে রপ্তানী হয়েছিল।

জিনিসের নাম	মূল্য
নীল	— সিক্রা টাকা: ৪৫,২৩,১২৪
চিনি	— " ৫৪,৪৭৮
সিল্কের শূতো	— " ৭,৮৭,১০৬
তুলো	— " ১,১৮,৯১২
হাতীর দাঁত	— " ৯,২৭৮
গদের আঠা	— " ২৪,১৬০
লাক্ষা	— " ২,৭৫০

আর আমদানী হয়েছিল এই ১৮০৫ সনেই

নিম্নলিখিত জিনিসগুলি।

জিনিসের নাম	মূল্য
বই	— সিক্রা টাকা: ৯০,৬৫৬
জুতো	— " ৫৪,৭০৬
লোহার	
জিনিসপত্র	— " ১,৩৯,১৪৪
তামার জিনিস	— " ১০৬
আয়নার কাঁচ,	
চশমার কাঁচ	— " ২,৭৯,৫৭৫
অলংকার	— " ২৮,৬০০
মদ্য ও স্পিরিট	— " ৭,৮৭,২৬৫

আরও আছে—আছে অনেক বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ তথ্য। এই বাংলার বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রের ইংরেজ অফিসাররা বিলেতের ব্যবসায়ীর কাছে এদেশে বিক্রির জন্যে যে জিনিস চেয়ে পাঠাতো, তার একটা বিবরণ নীচে দেওয়া হলো। কিন্তু—

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল। এই সব আমদানী-রপ্তানীর হিসাব

!!!!!!!!!!!!

কল্লোল

মিনার্ভা থিয়েটারে কল্লোলের অবিস্মাণ জনপ্রিয়তা প্রতিদিন প্রতি অভিনয় নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে চলেছে প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬।

রবিবার ৩টা ও ৬।৪টা

কিন্তু সম্পূর্ণ ভালিকা নয়.....শব্দ বাংলায়
মাণিক্যের সঙ্গে যেটুকু উল্লেখযোগ্য, সেটুকুই
দেওয়া হচ্ছে। যেমন, আমরা ইতিহাসে
কড়েছি, রাত জেগে সেই ইতিহাস মনোমুগ্ধ
করেছি। কি সেই ইতিহাস?

বাংলার তাঁতীদের জীবনে মমানিতক
জাতিশাপের বিষ ঢেলেছিল শব্দর সাগরপাতের
বন্দুসম্ভার। বিলেতের ম্যান্ডেস্তার একেবারে
শব্দস করে দিয়েছিল আমাদের দেশের শব্দ
শতাব্দী পূর্বের প্রাচীন শিল্প। জাহাজ-
বোঝাই বিদেশী পণ্য ভারতের বন্দর ভরে
ভুলতো। দক্ষিণ দেশের অর্থসম্পদ চলে যেত
ইংল্যান্ডে। ম্যান্ডেস্তার সেই বিলেতী বন্দ
জর করে কাঙালী তার নিজের সঙ্গের
কালক্রুর ছায়া ডেকে আনতো। বে বিলেতী
কাপড় আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পকে বিলুপ্ত
করে দিয়েছিল—সেই বিলেতী কাপড় কি কি
আমাদের আসতো—স্বভাবতই তা জানতে ইচ্ছে
করে। নীচে তাই বিলেতী বস্ত্রের একটি
বিবরণের হিসেব দেওয়া হলো।

১০টি ক্যানভাস লেডীজ কোট।

১২টি পুরুষের কবজত কোট।

২ খণ্ড সুশারফাইন কমলা রঙের কাপড়।

১ খণ্ড সুশারফাইন নীল রঙের কাপড়।

১ খণ্ড ফরাসী দেশের তৈরি ধূসর কাপড়।

১ খণ্ড সবুজ রঙের বিলিয়াড টেবিল-
টাকা কাপড়।

২ ডজন বড় সুশারফাইন উল্লের বেড
কভার।

৮টি সুদৃশ্য বেজ সাইজ কাপেট।

২টি সুদৃশ্য কাপেট।

৪৪টি ক্যানভাস—মেয়েদের ব্যবহারের
কোমর।

মোমিন্দারী

৪ ডজন পুরুষের সিল্ক হোজ।

৩ ডজন ক্যানভাসের সিল্ক হোজ।

৩ ডজন লেডীজ সিল্ক হোজ।

২টি লেডীজ (শোভাস)।

২টি পুরুষের ব্যবহারযোগ্য

আগেই বলা হয়েছে, এই ভালিকা সম্পূর্ণ
নয়। শব্দ কি মোমিন্দারী? আসবাবপত্র, সুগন্ধি
দ্রব্য, কাঁচের তৈরি জিনিসপত্র, চাকু, কাঁচি,
ভাস, আয়না, ইত্যাদি বিলাসিতার সামগ্রীই
বোশ আসতো।

এই সমস্ত বিলেতী জিনিস জাহাজ বোঝাই
হয়ে বন্দরে আশা ঝাড় আমদানীকারী মহাজন
তার গদ্যমে কিম্বা সোকায়ে জিনিসগুলি
তোলে। এখানে থেকে বড়ো বিক্রি করতে
তার ক্রেতাদের কতক।

কিন্তু সেই মহাজন তার গদ্যমে থেকেই
মাল হোল সেলক বিক্রি করে দিত।

বিলেত থেকে শব্দ কাপড় নয়,
১৮০৬ কিছ, কইও আমদানী হয়েছিল। কই-
গুজোর নাম দেখলে বুঝতে পারা যায়, ব্রিটিশ
তার সংস্কৃতিকে, সভ্যতাকে কেন্দ্র করে

আমাদের দেশে প্রচুরের চেষ্টা করতো।

১৫০টি বাইবেল, মরোক্কো বাইড।

৪০টি বাইবেল রজাল বাইড।

২টি জনসন্স ডিরেনারী বাইড।

৪০টি বুকাল জোয়েন্টিক অর্ডারিন।

৬০টি রিস বার্নিস নভেল (মরোক্কো
বাইড)।

১০০টি হাটস এনসাইক্রোপিডিয়া।

২টি ডন কুইজেন্ট।

৬০টি সেক্সপীয়ার ওয়াকস।

এই বাংলা দেশ সেকালে ব্যবসা করতো

ডেনমার্কের সঙ্গে, ব্যবসা করতো লিসবন,

হামবুর্গ পৃথিবীর আরও অন্যান্য দেশে
গত।

উল্ল...

রস্তানী	আমদানী
পিসগড়স	(বাংলার বন্দর থেকে)
নীল	গ্লাণ্ড
আরও বড়ো	কাঁচ
অন্যান্য জিনিস	লোহা আর ইস্পাত
	কাঁচ
	ভাষার তৈরি জিনিস

লিসবন

রস্তানী	আমদানী
পিসগড়স	লিসবনের মাল
নীল	ম্যাডারির মাল
বড়ো জিনিস	আরও অন্যান্য জিনিস
	লিসবনের তৈরি
	ক্যান্স

হামবুর্গ

রস্তানী	আমদানী
মার্কেটাইল	অন্যান্য জিনিসপত্র
কমোডিটস	
পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই বাংলা দেশের	
বিভিন্ন বন্দর থেকে নিম্নলিখিত পণ্য	
বছরে রস্তানীর জিনিসের মূল্য দেওয়া হলো।	

রস্তানী	
১৮০২	— সিল্পা টাকা ৩০,৪১,৫৮০
১৮০৩	— " ২২,৯১,৫৭২
১৮০৪	— " ৪২,৯১,৫৮১
১৮০৫	— " ২২,০৫,৫৫০
১৮০৬	— " ১৮,৭৩,০২০

সিল্পা টাকা ১০০—৮৬ টাকা, ৩ আনা, ৪
পাইয়ের সমান।

(৮৬ ৫ ৮ পাই)

(রসগড়া)

খাজু রাহো

বেশ গম্ভ্যাপাখ্যার

জীবিত প্রদীপ জেনেছে ধ্যান করে আঝে খাজু রাহো।
কালের মুকুটি ভুলে কত যুগ হয়ে গেছে পার।
আজো তাঁর পৃথিবীকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘাশে ঘাশে।
ক্রোধ মেলে চেয়ে দেখি অতীতের সৌন্দর্য সম্ভার।
ক্লেষ ছন্দোরথ ছবি, ছবি নয়, প্রাণের প্রবাহ।
পাখ্যাপী অহল্যা চোখে আজো কত অনুরাগ মাখা।
প্রাণিতভর্তকা কারা কবে পদ কটকে বিক্ষত।

পাখ্যাপের কারো দোষ জীবনের রঙ রূপ আকা।
এক, না সহস্র শিল্পী, কি যে নাম, ভুলে গেছি সব।
কীর্তি রে ছুঁলি নি আজো, তাই হেথা আঁস দলে দলে
প্রস্তার। মিশেছে কবে কালক্রোমে সবংশেতে হবে।
অবলুপ্ত কত কীর্তি, তবু কালক্রয়ী এরা চলে।
আজো বহু সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলে মন্দির চহর
যমুদ, মনুদ, গদ্যলি প্রাণ পার চেতনা শিহরে।

আদি মানিক

দৈনিক উপন্যাস



মহাশেহতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ছেচলিশ ॥

মেদিনীপুরের ছোট জমিদার ভূমিপতি রায় চাঁদ ছিলেন তাঁর প্রজারা যুবকোত্তরে থাকুক। সেইজন্যই প্রতিবেশী জমিদারের কাছ থেকে বাণী লক্ষ কাহনকড়ি ধার করে তিনি ঝণীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আর নিজের যা মজিৎ ছিল সবকিছু দিয়ে, প্রজাদের বীজ, হাল, লাঙল, বলদ দিয়ে বলেছিলেন চমৎকার করতে। এমন লোকের কাছে চাষা করতেন আনন্দী-রামের নিজেও আনন্দ হয়েছিল। তিনি একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন 'জমি আপনার বংশাবলী চরিত্র লিখে যাব রায়মশাই। তাতে প্রজাদের জন্যে আপনার এই চেষ্টার কথা লেখা থাকবে।'

ভূমিপতি হেসে বলেছিলেন 'বাবা, তুমি আমার ছেলে হয়ে থাক। তোমার মত আমাকে কেউ ভালবাসে না।'

কিন্তু ভূমিপতি রায়ের চেষ্টাতেও বাংলার চাষীদের দুঃখ যুচল না। মেদিনীপুরের চাষীদের দুঃখ যুচবে

কি করে, সেই কবে থেকে উড়িয়া আর মেদিনীপুর হল বাইরের শত্রুর মাওয়া আসার পথ। বর্গীর হাঙ্গামাও মিটল না, তাছাড়া অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অজন্না, দুর্ভিক্ষ, একদিকে বর্গীর খাজনা, অন্যদিকে নবাবকে খাজনা দিতে দিতে চাষীরা যেন জেরবার হয়ে পড়ল।

ঠিক একই কারণে আলীবর্দীর যে এত ইচ্ছে ছিল, বাংলার সাধারণ মানুষ বানিকটা শাস্তি পাক, তাও মিথ্যে হয়ে গেল।

হয়তো এ সময়ে বারা জুখশাস্তি চেয়েছে, তাদের সকলের ইচ্ছেই বিফল হয়ে যায়, এই ছিল তগবানের ইচ্ছে।

চারিদিকে যখন এই গোলমাল, তখন ওদিকে আঁধারমানিক গ্রামের লোকরা কিন্তু আটচালার বিচারে বসে গিয়েছে। বিচার হবে। বিচার চাই, বাগদীর ছেলে রামাই-এর এতবড় আশ্রয়। যে তার বউকে অন্য পুরুষ নষ্ট করেছে তবু সে বউকে ছাড়বে না? ধর ছাড়বে তবু বউকে ছাড়বে না?

'বউটাকেও ধরে নিয়ে আয়।'

ব্রাহ্মণরা গর্জে উঠলেন। সব-

চেয়ে বেশি গর্জালেন বড় আচার্য। তাঁর মেয়ে নির্মলাকে ত্যাগ করতে হয়েছে, বর্গী ছুঁয়েছিল বলে, সে কথাটা তিনি ভুলতে পারেন নি।

হাসতে হাসতে একজন বললেন 'ওর বউকে এখন জঙ্গলে রেখেছে। বাগদীরেটা পাহারা দেয়।'

'কেন, পাহারা দেয় কেন?'

'ও যে আজকালের মধ্যে--'

পারী যে মা হবে সে-কথাটি দ্বিতীয় জন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন।

'আরে ছি ছি, রাম বল।'

'হ্যা গো, সত্যি কথা।'

'গ্রামের বুকে এই অনাচার?'

ব্রাহ্মণরা আবার গর্জে উঠলেন।

'কিসের অনাচার ঠাকুর? জঙ্গল কারো নয়, আমরা জন্মকাল থেকে জানি, ওর ওপর কারো মালিকানা নেই।'

বাগদীদের মধ্যে বাছাইকরা জোয়ান ছেলেরা এসে দাঁড়াল। রামাই তাদের সঙ্গে ছিল।

'কে বলল মালিকানা নেই?' বড় আচার্য আবার গর্জে উঠলেন।

'কার মালিকানা আছে, খিয়ে দিন?'

বড়ো বাচস্পতি হেসে বললেন 'তোদের আবার বোঝাব কি? জগতে যত ভুঁই আছে, সবই কারো না কারো।'

'ও জলল কারো নয়। ওটি আচার্য ঠাকুরের পূর্বপুরুষ সকলের জন্যে দান করেছিলেন।'

নরপতি মিশ্রের গলা শুনে সবাই চমকে উঠল।

'নরপতি যে, বস, বস।'

'না না, দাঁড়িয়ে দেখি বিচারটা কেমন হয়।'

'বিচার আবার কি? ঐ বউকে রামাই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিক, ত্যাগ করুক।'

'দি ত্যাগ না করে?'

'তাহলে লেঠেন দিয়ে বাগলী-গাভার সবাইকে তুলে দেব।'

'আমি পারীকে ছাড়তে পারব না।'

'কি বললি?'

রামাই-এর উদ্ধত জবাব শুনে শুধু দাঁধারমানিকের বামুনরা নয়, সমস্ত বাংলা দেশের বামুন সমাজই যেন চমকে উঠেছিল সেদিন। সমাজ বলছে, তু বউকে ত্যাগ করবে না, নিচু জাতের মানুষ রামাই আজ এ কি কথা বলল? এমন আশ্চর্য যদি বাগলীদের হয়, তাহলে আর সমাজ রেখে লাভ কি? নবরীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হাজার হাজার বাঙ্গাল রেখে সমাজের বিধি-বিধান তৈরি করেন। বাংলা দেশের সর্বত্রই ত' বামুনরা সমাজ চালান।

রামাই-এর কথা শুনে বড় আচার্য শেষ অবধি হেসে উঠলেন। বউকে ছাড়বে না। মেয়েদের জীবনের আবার দাম আছে না কি? মেয়েদের জন্যে ধর্ম ছাড়তে চায় এমন বোকামও কি বাংলা দেশে আর একটি আছে?

'দেখ রামাই, নেহাৎ যদি ছাড়তে কষ্ট হয়, তবে তোদের ঘরে ত' শেরাল-দার। বিষটিষ থাকে, একটু ঝাইয়ে দি গে যা। সব বামেলা মিটে যাক।'

বড় আচার্য হাসতে হাসতেই বললেন।

'তাঁ ডাল, তাঁ ডাল,' অন্যরা মাথা নাড়লেন।

সত্যি বলতে কি এতকণে সবাই যেন নিশ্চিত হলেন। সমাজের হাতে এখন কত কাজ। রামাই-এর বউকে নিয়ে সময় নষ্ট করা কি চলে? একটু বিষ দিলেই সব হাদ্দামা চুকে যায়। বিষটিষের খবর ত' বামুন-কায়েতদেরও রাখতে হয়। তাঁদের ঘরে কোন কেলেকারী হলে ঐ বাগলী পাড়াতেই খবর দিতে হয়। বিষ খাইয়ে, অথবা বেঁচে বাধ্য করার ফলে কয়েক বছর বাদে বাদেই বিধবা, কুতীনকুমারী টি-একটি সারা যান, এ সবাই জানে।

'পারীকে বুন করতে বলছেন?'

নরপতি মিশ্রকে দেখে সবাই যেন চমকে উঠলেন। কেন, নর-পতির গলায় সর এমন কক্ষ কেন? সে না একদিন বড় আচার্যের মেয়েকে দোষ দিয়ে গ্রামছাড়া করেছিল? আজ কি সে কথা তার মনে নেই?

নরপতি সকলের মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

'পারীকে আপনারা কমা করুন আচার্যকাকা, ওদের বেঁচে দিন।'

'নরপতি! তুমি বাঙ্গালের ছেলে হয়ে এই কথা বলছ?'

'ওদের মাপ করুন।'

'মাপ করব?'

'আমি হাতজোড় করছি।'

'তোর হাতজোড় করা কে দেখতে চায়? এইখানে, এই আটচালায় দাঁড়িয়ে আমি একদিন তোর কাছে কমা চাই নি?' বলি নি, আমার মেয়েকে কমা কর? তুই আমার কথা রেবে-ছিলি?'

'আমি সে কথা তুলতে পারি নি আচার্যকাকা, বিশ্বাস করুন, আমার বুক জলে মাছে।'

'আজ তোর কথায় আমি বাগলী-বউকে কমা করব? তোর ক্ষমতা আছে, আমার নির্মলাকে আমার বুক ফিরিয়ে এনে দিতে পারিস?'

'কিরে আসবার দরজা যে আমার। রাখি নি আচার্যকাকা, দরজা থাকলে আমি তাকে মাথায় করে নিয়ে আসতাম।'

'তুই তও। তুই মিথ্যাবাদী।'

'না না। আমি ভুল দিই নি। বাদী নই। আমি বড়, বহাদুর। আমার বোনকে আপনি পতিত করতে চেষ্টা ছিলেন, জিভে তপ্ত ঘি ঢেলে দিতে চেয়েছিলেন, সেই ভরে আমার বোন আত্মহত্যা করে। আমি আক্রোশে অন্ধ হয়েছিলাম, তটি আপনার মেয়েকে অমন করে শাস্তি দিই।'

নরপতি মিশ্র সকলের দিকে চায়। বলে 'আনন্দীরাম আমার কাছে গিয়ে মিনতি করেছিল, আমি তখন রাগে, হিংসায় অন্ধ। আমি কারো কথা শুনি নি। কিন্তু নির্মলা যখন চলে গেল গ্রাম ছেড়ে, আমি পাশে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম।'

বিশ্বাস করছে গ্রামের পাঁচজন, আমার মনে হয়েছিল ওর কালোমুখ দেখলে আমার আনন্দ হবে। তখন ত' আমি মানুষ নই, আমি চণ্ডাল, হ্যাঁ তিক্‌ঘেন চণ্ডাল হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু নির্মলা যখন আমার দিকে চাইল, তখন আমি কি দেখলাম, আমি কি দেখলাম।'

নরপতি হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। তারপরই গলা নাশিয়ে নেয়। সকলের সামনে এগিয়ে গিয়ে উঠ, অস্থির চাহনিতে এক একজনকে বরষা করে বলে 'দেখলাম নির্মলার চোখ দিয়ে আমার পুঁি আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার পুঁি যেন বলছে দাদা, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, তুমি আমার বাঁচতে পারতে দাদা, তুমিই আমার ঠাড়িয়ে দিলে?'

নরপতি চোঁচিয়ে বলে 'তখনই আমার বুকে আঙিন জলে উঠল। অন্যায়, অন্যায় করেছি আমার সবাই। আচার্যকাকা পুঁিকে বিনাধোষে দোষী করে অন্যায় করেছ। আমি তোমার মেয়েকে দোষ দিয়ে অন্যায় করেছি। আমি এমনই পশু হয়েছিলাম, যে আনন্দীরাম আমার বোঝাতে এসেছিল, তার বউ-এর নামেও কলঙ্ক দিলাম। কলঙ্ক দিলাম স্বরকণ্ঠের নামে।'

সবাই আশ্চর্য, চুপ করে শোনে।

'তাঁ বলি আচার্যকাকা, আর অন্যায় কোর না। আমার পুঁি আর ফিরবে না। তোমার নির্মলা ত' তবু প্রাণে বেঁচে আছে। আর অন্যায়

কোর না। রামাট যদি তার বউকে নিয়ে থাকতে চায়, ওকে থাকতে দাও।

একবার উত্তরে বড় আচার্য কি বলতেন, আধারমাণিক গ্রামের সমাজ কেমন করে তাদের বিস্ময় জানাত তা আর জানা গেল না।

তার আগেই জঙ্গলের দিক থেকে একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই ভুটে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ধালি হয়ে গেল আটচালা। আর সঙ্গে সঙ্গে নরীজিক সংবাদটাও জানা হয়ে গেল।

পারী নেই। সবাই তাকে কি বিধান দেবে নেন নেন তা সে জানত। 'মরতে দাও, আমাকে মরতে দাও,' একবার সে রামাটকে কতবার বলেছে। কিন্তু স্বামীরা খেঁচ দিকে চেয়ে আবার সে কখন হেসে বলেছে 'না গো, আমি মরব না। তুমি যখন তবু আমাকেই চাও, আমি মরব না।'

তা ছাড়া অন্যগত সন্তানের জন্যও তার অগাধ মমতা। লোকে যাঁট বলুক, সে জানত স্বামী তাকে নিরুদ্বল বলেই জানত।

কিন্তু শেষ সময়ে সে যেন আর মনের জোর রাখতে পারে নি। তার জন্যে তার স্বামী পতিত হবে, বাগদী-পাড়ার কলঙ্ক হবে, এ যেন তার আর লম্বা হল না।

তাই সে বিলববাসিনীর দহে ঝাঁপ দিল। বিলববাসিনীও মহা শূশান-তলায় মাঠে জ্বল, জঙ্গলের গহনে শেষ।

তারই কালো জলে ঝাঁপ দিয়ে পারী সব সমস্যা মিটিয়ে রেখে গেল। রামাটকে ধর্ম ছাড়তে হল না, আধার-মাণিক গ্রামের সমাজপতিদের নর্যাদা যেমন ছিল তেমনই রইল। একজন উচ্চত বাগদীপুরুষ যে তাঁদের উপেক্ষা জানিয়ে ধর্ম ফেলে দিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল, তার সে অহংকার বিধো হয়ে গেল।

সবাই স্বস্তির নিশ্বাস কেলে বাঁচল।

পারীর নিশ্বাস শরীরটি আশ্চর্য ওচি জ্বলর দেখাল, যাটির সুতির বত।

'কষ্ট পায় নি, বেশি কষ্ট পায় নি দাদাঠাকুর।' রামাট আঙে আঙে বলল।

গ্রামের উঁচু জাতের মধ্যে একমাত্র বিশালাক্ষী চোখের জল ফেললেন। বললেন 'শেষ অবধি সাহস রাখতে পারলি না হতভাগী?'

পারীর চিতার আঙুন দেখতে দেখতে শুধু নরপতি নিজ হাতের লাঠি ঠুকে মাথার কক চুল নাচিয়ে বলে উঠল 'অন্যায়, এ বড় অন্যায় হয়ে গেল রামাট, এবার আমরা সবাই মরব।'

রামাট অনেককণ অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিতার আঙুন দেখল। তারপর তার আরীররা বর্ষন কুন্ডরে বলল 'আর কি দেখবি রামাট? চল, এতটুকু মদ খেয়ে দুখ ভুলবি চল।'

তখনই নড়েচড়ে, বেন দুখ থেকে জেগে উঠল রামাট।

'তোরা সামনে জীবন পড়ে আছে রামাট, এখনো তুই নেজানতের চাকর। পুরুষমানুষ, কাজেকর্মে শোক ভুলবি।'

রামাট তখন, একমাত্র তখনই বলল 'না : আর কাজ করব না।'

'কি করবি?'

'ভিনদেশে যাব। গীর্জের গিরে জাত দেব।'

'জাত দিবি।'

'হ্যাঁ জাত দেব। চিতার আঙুন দেখতে দেখতে আমার বুকে ভেতরটা চমকান। আমি পষ্ট জাননান পারী আমার এই কথাই বলছে।'

'কি কথা বলছে?'

'যে জাতের, যে ধর্মের এমন শাসন, যার ভয়ে আমি মরলাম, মহা-নাশী হলো, তারে তুমি ছেড়ে যাও।'

হ্যাঁ, ঠিক এই কথাই বলল রামাট। ধর্ম যদি তাকে কথার কথার কোল-ছাড়া করতে চায়, তবে সে-ও তেমন ধর্মকে ছাড়তে পারে।

নিজামতের মেওয়া লাঠি, মাথার ফেটা, পোতলের শুকনো সব ফেলে রেখে একা রামাট বাগদী চলে গেল, বলে গেল 'সব গলে পড়ে গেছে যে, খুঁকখুঁক করছে, তাইতো আমার পারী আর থাকবে না।'

একা নিরাকর রামাট বাগদী জানিয়ে দিয়ে গেল ওদিকে যতই কৃচ্ছ্রের সভার বসে ভারতচন্দ্র কাব্য লিখুন, পশ্চিমে, বিলেতের বাজারে বেংগল সিল্কের বাজার বড় হতে থাকুক, ব্যাঙেলের গীর্জের মনে ফাদার আন্তোনিও বাংলা দেশের বিপর্ষর দেখে ডায়েরীর পাতা ভরিয়ে ফেলুক, আর এদিকে জগৎপতি, জগৎশেষ, মীরজাকর, বারওয়েলরা টাকা, আরো টাকার স্বপ্ন দেখুক, আসলে সর্বত্র পট ধরে গেছে, সর্বত্র।

জানতে পেরে রামাট বাগদী পালাতে লাগল, কোথায় গেলে সে শান্তি পাবে তা না ভেবেই পালাতে লাগল।

ততদিনে আধারমাণিক গ্রামের আর এক নির্ধতিত মেয়ে নির্মলা জীবনেও নতুন দিগন্ত দেখা দিয়েছে।

বিশালাক্ষীর দাদা শিবকালী গাঙ্গুলীর বাড়িতে সে বেড়াতে ছিল তাকে ঠিক আশ্রিত বলা যায় না। বিশালাক্ষী শিবকালী গাঙ্গুলীর বড়ই প্রিয়, তাই নির্মলাকে বগী ছুঁয়েছে জেনেও প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিয়ে তিনি নির্ভয়ে রেখেছিলেন।

শিবকালীর দুই বউ অবশ্য নির্মলাকে স্নানজরে দেখেন নি। তাঁরা তাকে কাজকর্মে হাত দিতে দেন নি, কাছেও ডাকতেন না।

হঠাৎ একদিন এ বাড়িতে তার স্বামী মুনান এসেছে জেনে সে অবাধ হয়ে যায়। শিবকালীর প্রথম জীহ বোনকে গৌরী এ বাড়িতেই থাকে। সে-ই এসে খবর দিল। বলল 'মোসো-বশারের বোন ওঁকে পাঠিয়েছেন। মোসোবশার ওঁকে বুঝিয়ে জুজিয়ে ডোমাকে নেওয়াবেন।'

বিশালাক্ষী এখনো তার কথা এত ভাবেন জেনে নির্মলা অবাধ হয়ে গেল।

কিন্তু শিবকালী গাঙ্গুলী এদরে এসে বললেন 'ছেলেটা নেহাৎ'

অমানুষ। নির্মলাকে নেবার কথা ত' বলল না। ভাবে বুঝলাম গৌরীকে বিয়ে করতে চায়।'

তার স্ত্রী একথা শুনে খুশি হলেন।

'এমন অমানুষের হাতে গৌরীকে দেব না।'

স্ত্রী দুঃখিত হলেন। তারপর ধরধর করে বললেন 'নির্মলাকে যতদিন এখানে রাখবে ততদিন গৌরীর বিয়ে হওয়া কঠিন। ওর জন্যে আমাদের নানা বদনাম রটেছে।'

নির্মলা তখন বাইরে, গাছতলায় ঘলে টেকোর তুলো পিঁজছিল। সে মনে মনে ভাবছিল কই, স্বামী এলেন, তাকে নিতে চাইলেন না, তাতে ত' কই দুঃখ হচ্ছে না? স্বামীকেও ত' সে বলতে গেলে চেনে না। পাঁচ বছরে বিয়ে হয়েছিল, আর ত' দেখে নি।

এখন তার মাঝে মাঝেই কাশীশ্বরের কথা মনে হয়। গ্রাম থেকে সে-ই তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। গ্রামে থাকতে সে নির্মলার বাড়িতেও আসত, কত গল্প করত উঠোনে দাঁড়িয়ে।

সবাই বলত ও অরকণ্ট আর আদালীরামের চেলা। ওর কথা স্মৃতি-চাড়া। ও ছেলে ডাকাত বললেও হয়।

নির্মলা তা মানত না। পরে সেট কাশীদাদা তার কত উপকার করল। 'কবার ত' সে বিল্ববাসিনীর মাল্লারে শূজে দিতে গিয়ে কাশীশ্বরের হাত ধরে বাড়ি ফিরেছিল। খুব ছোটবেলা, তবু মনে পড়ে।

হঠাৎ সে চোখ তুলল।

বিড়কীর বাগানের এ পাশটা নির্জন, নিরিবি। বেড়ার ওপারে একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। নির্মলা চোরে বয়েসে অনেক বড়। কিন্তু কি সুন্দরী, আর তেমনি লাজগোজ।

'এই শোন।'

নির্মলা মস্তমস্তের মত এগিয়ে গেল

'তোমার নামট ত' নির্মলা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকেই আমি খুঁজছি। এস, এদিকে এস।'

মেয়েটি কাছে ডেকে নিয়ে তার কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, 'তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি তাঁদের গ্রামের মানুষ গো। তোমায় নিতে এসেছিলেন সেদিন, তা শিবকালী গাঙ্গুলী তাকে বড়ই অপমান করেছেন।'

'আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?'

হ্যাঁ গো। তুমি আজ বিকেলে এদিকে এস, এই বিকেল-সাঁঝের মাঝ সময়ে। এই ত' বাগানটা পেরোলেই নদীতে নৌকো বাঁধা। কাককে যেন বল না।'

'বলব না কেন?'

'বলবে কি গো। এঁরাও চান না, কেউই চান না তোমাদের দুটিতে ভাব হয়। তাই ত' আমাকে মূলানঠাকুর বললেন লুকিয়ে তোমায় নিয়ে যেতে।'

নির্মলার শুধু মনে হল তাকে যদি স্বামী ফিরে নেন, তাহলে হয়ত শিবকালী গাঙ্গুলী একটু স্বস্তি পান।

'বেশ তাই যাব।'

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় নদীতে, নৌকায় যে ছিল সে কোনোকালেও নির্মলার ওডাকাতকী নয়। নির্মলা নৌকায় উঠবার আগে বোঝে নি সে আবার কোন সর্বনাশের যোতে ভাসতে চলেছে। যখন বুঝল, তখন নৌকো তরতর করে এগিয়ে চলেছে কল-কাতার দিকে। তারই স্বামীর চেষ্টায় এটি ঘটল। এরপর আর নির্মলার কলঙ্কে কারো আশ্রয় নেই।

শিবকালী আর বিশালাক্ষী, দুই ভাই-বোন চুপ করে রইলেন।

মহা ধুমধামে নির্মলার বরের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে হয়ে গেল।

সবাই জানল যাতে যাতে নৌকো নিয়ে যাত্রা মেয়ে জোঁগাড় করে, বাঁদী-হাটে বেচে, নির্মলা তাদের সঙ্গেই চলে গিয়েছে।

(কম্পঃ)

একটি
সহস্রাব্দ
কল্পিত



মুর্খের
তর্কিন

চিত্রনাট্য : ভগ্ন লিহে
কাহিনী : সমরেশ বসু
পরিচালনা : বল্লাই সেন
সঙ্গীত : কালীপ্রসন্ন সেন

প্রযোজনা : অরুণমতী দেবী, কালী কামাখ্যা,
বিকাশ রায়, রাধামোহন, রাবি ঘোষ, দিলীপ
রায়, অশোক চৌধুরী, সন্মিতা সান্যাল,
অজয় গাঙ্গুলী

পরিবেশক : চিত্রাঙ্গী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্স

২৫শে জুন হইতে
মিনার-বিজলী-চবিঘর
ও অন্তর্ভুক্ত।



রাষ্ট্র সরকারী কর্মচারীদের মিছিলের একাংশ

রাজধানী ২

বড় কুখ্যাত' কথা ৭

‘রাজ্যের সমগ্র জনগণের আস্থা-
রের পক্ষে মাথোঁস খাওয়া এই রাজ্যে
উৎসাহ হর না। রাষ্ট্রের সরকারের
ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়।’

—মুখ্যমন্ত্রী।

সুখলা সুফলা শস্যশ্যামলা
বাংলা দেশ আজ ইতিহাস। হালের
ইতিকথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উপ-
রোক্ত উক্তি। অতিথি নিমন্ত্রণ আদেশ
লণ্ডন না করে, ‘বাংলাদেশের ব্যাপারে
আমাদের খুবই কঠিন সমস্যা রয়েছে’—
মুখ্যমন্ত্রীর এই সতর্কবাণী শ্রবণ রেখে
বাংলাদেশের মৎসপরোনাঙ্কি অপচয় বন্ধ করা
প্রত্যেকের নাগরিক কর্তব্য। এমন
কি খাঁরা ভিনদেশী নাগরিক, খামকা
তঁরাও খাবার উজাড় ক’রে বিদেশী
খাবার ফেলে ছড়িয়ে থান না। কেনই
না খাবেন, বিদেশে এলে ওজন বাড়তে
পারে, কিন্তু উপরের মাথা বৃদ্ধি পায়
ব’লে তো শুনি নি। ভেতো বাড়ালীর

মতো ভেতো আপানী এক ভেতো
নেপালীদের কথাই বকুন, কলকাতায়
আপ ও নেপালী কূটনৈতিক মিশন
যথাক্রমে মাসিক চাল নেন গড়ে ৫৬
কুইণ্টাল ও ১৬ কুইণ্টাল।

কিন্তু পাকিস্তানী মিশন কি এতট
কুখ্যাত যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী স্তপম
থেকে তাঁদের সাপ্তাহিক চাল ও গম
সংগ্রহ গড়ে যথাক্রমে ৮৫ ও ৩১ মণের
নিচে নামে না? নাকি তাঁদের মস্তুরে
এগারশ’র বেশি কর্মচারী কর্মরত
আছেন, বাঁদের আহ্বারের জন্য এই
এলাহি যোগান না দিলেই নয়। মিশনের
কর্মচারী সংখ্যা কম ক’রে হাজার-
খানেক ধরলেই বা অত চাল-গমে
পাক মিশন কী খাদ্য পাক করেন।
সংবাদে প্রকাশ, মিশন কর্মচারীদের
স্বতন্ত্র পারিবারিক রেশন কার্ডও আছে।
তবে?

এ ‘তবে’র জবাব মেনে নি কোনো-
মিরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষায় চিহ্নি-
চাপাটি চালাচালি করেছেন। পাকি-

স্থানী নিশন এই পরিমাণ চাল সংগ্রহে
কিছুনাও বেচাল দেখান নি, এতোটুকু
মিস্ত্রিতও ধোঁষ করে নি কখনো।

এই মর্মে সংবাদ প্রকাশের পর বড়
বিস্ময় আপে, তবে কি এই অসম্ভব
কুখ্যার পেছনে ভিন্নতর কোনো গুহা
বহস্য আছে!

বেহিসেব এ হিসেবের জবাব
একটাই, হ’ লাগে, জানতি পার না।

জানি না—জানি একটা কথা
অম্পট নেই আজ, বড় কুখ্যাত ওরা।
কুৎসিপিসার মাথা ওদের গরন;
তাই নরম ভারতের সৌভাত্ত ঠেলে
ওরা যায় চীনা ডাগনের উৎসাহের
সান্নিধ্য খুঁজতে। ভারত, গীমাঙে
গুলী ছোঁড়ে, কামান লাগে, নাকিনী
মটার ছোটায়। এতো গেল তুনি-
শিকারের বাহা, জনি বুতুকুর নেশা।
অন্যদিকে আবার পিত্ত গরন হলোই
মস্তিকে বিকাত। পুনঃ বাংলায় নিরীহ
সংখ্যালব্ধদের ওপর আঁখ গরন।
কুখা বাড়লে এমনটাই হয়।

কিন্তু এই ইতিহাস অপ্রত্যাশিত অধিকার যোগানদার একমাত্র ভারত ছাড়া অন্যত্র দূরত। আর এসব কথা ভেবেই বুদ্ধি থাকলে পাকিস্তান ডায়েরি কট্টোল করবে। সুবুদ্ধি উদয় হ'লে ভাবতবর্ষও খোজবর নেবে। হাজার হোক, পাশের ঘরে এমন 'খাঁই খাঁই' সর্বনেশে ব্যাপার। বিশেষত ভাবত ভাঙার ঘরন অসম্পূর্ণ হাতা অথবা দ্রোপদীর ছাঁড়ি নেই।

বিত্তীয় লোভ

কালোবাজার নয়, পাকিস্তানে ভালো বাজার পেয়ে গেছেন ভারতের কিছু সবুজ ব্যবসায়ী। স্থলপথ জলপথ উভয়তই জোর চোরাচালান চলছে। পাকিস্তানে সরষের তেল পাঁচ থেকে ছ' টাকা পের দামে অনারাসে বিক্রাচ্ছে।

বাপ বহিন ভেটয়া, ভেলে যাক পবোয়া নেই, ব্যাপারীর হাতে চাই টাকা। টাকার জন্য মান-ইজ্জত যায় দেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত বিক্রিয়ে দিতে ব্যাপারীর জাত কস্মিনকালে পরাঙ্মুখ হয় নি। টাকার জন্য রাজ্য রাজ্যপাট শূন্য হাতে তুলে দিয়েছে। ওরা

গর্বকালেই মনুষ্যসমাজের বেকার বিশেষ। লোভ বিতীষণে বিবেকহীন। নারকীর স্বার্থান্বেষণে অধম পিশাচ।

স্বং আই-জির বিপোর্টে প্রকাশ, ফলফাতা থেকে সিটমার ভাতি তেল যায় কবিসমগ্রে বেনামদার জেতার নামে। কিন্তু নে নামমাত্র। পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তানে তেলের টিন বদল ক'বে জলের টিন ঠাঙ্গা হয়। করিমগঞ্জ গোহাটিতে তেলের বদলে জলভাতি টিন নিরাপদে দামিবে বাধতে আসাম সরকারের কিছু প্রভাবশালী কর্মচারীও নাকি সহায়তা কবে থাকেন।

জলপথের কারবার বেশ হিসেবী হাল ছড়িয়েছে। স্থলপথে ফলাও কারবারেও সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতা সহজে অনুমেয়। নদীয়া, শিদিয়াবাদ ও আগামেব করিমগঞ্জ লীমানা বরাবর এ কারবার ফুলে ফেঁপে উঠছে।

মুন্সীগঞ্জী এই দেশদ্রোহী কাব্বারের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। সুখবর। কিন্তু দেশদ্রোহীদের প্রাপ্য শাস্তি দেওয়া যায় সম্ভবত এমন আইন হাতের কাছে পাওয়া যাবে না। অথচ আইন চাই। কুকুর অনুযায়ী মুণ্ডব প্রয়োজন। টাকার লোভে যে কোনো মুহূর্তে গোটা দেশটাকেই রাতারাতি বেচে দিলেও এদের অর্ধলিপ্সা প্রশমিত হয় না। সুতরাং এদের সেই লোককে চিরদিনের জন্য নির্মূল করতে হবে।

এই অতলস্পর্শী স্বার্থান্বেষণে অবলোপের জন্য প্রকাশ্য কোত্তলের বিধান প্রয়োজন। লোভ প্রাপ্য পাপে মৃত্যু। মৃত্যুই এদের পরিস্ফুট করবে। নচেৎ যতকাল শাসিত ততকাল আশ্রিত কৃচ্ছ্রী দৃশ্য ব্যবসায়ীদের উন্মাদনাকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

আর এই নবপশুদের খাঁচায় না পুরে যারা পকেটে টাকা পোরেন এবং স্বাধীন দেশদ্রোহী বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত রাখেন, তাঁদেরও কঠোরতম শাস্তির লক্ষ্যবিন্দু করা সরকার।

লম্বু পাপে গুরু দণ্ডের বিধান দিয়ে যারা বাহবা আদায়ে ব্যস্ত, তাঁদের কাছে অনুরোধ, দু-একটা শাস্তি ফরমুলা তাঁরাই বাতলে দিন—অচিন্তনীয় কিছু একটা হবে ব'লেই বিশ্রাস। কাজে কীকি দেওয়ার অপবাধে যেখানে ক্ষমতাসীন দলের 'ছটপ'প্রাপ্ত সদস্য বেত্রাঘাতের বিধান দেন, যে দেশে নিতীষণদেব জন্য অনারাসেই ইলেকট্রিক চাবুকের ব্যবস্থা চলতে পারে। আর সে চাবুক অমৃত্যু আশ্বাসিত হ'লেও খুব বেশি ক্ষতি হয় না বোধ হয়।

একথা কিছুতেই ভোলা যায় না যে, ভীষণ লোভ তবু সহ্য হয়, বিতীষণ লোভ বাধ্যক। কাজে কীকি পুষ্টি নেওয়ার পন্থা আছে: গোটা দেশটা শক্ত হাতে কীকে পড়লে সে ক্ষতি অপূরণীয়।

সরকারী তেল

অবস্থা বেগতিকে রাজ্যসরকারি স্বং এবার ডাল সহ স্বপ্নে সৈন্য ব্যবহারেও নামছেন। দিল্লীতেই হবে রেশন শপ ও অনুমোদিত স্বী দোকান। ফলত নাভিমূল থেকে পাদমূল তৈলাজকরণের জন্য সাধারণের ভাঙারে অপরাধ তৈলভাঙারে হয়ত টান পড়বে এবং ডালজাত শাদ্যও সহজপ্রাপ্যতা কিছু কমবে, কিন্তু তাতে অনুবিধা এমন কিছু হবে বলে তো মনে হয় না। বং সরকার যদি নিয়মিত থাকে ও রেশন শপে নোটিশ খুলিয়ে যদি বাবদার টিপে টিপে মূল্য বৃদ্ধি করা না হয় তবে সরকারী তেল মানদণ্ডে বরদীরা। বিশেষত নিত্যদিনের অভাবে অভ্যস্ত নাধারণ মানুষের ইদানীং কিছুতেই কপালে হাত পড়ে না। তেল বিনা বাদাম তেল চলছে, রেশনড। তেলেও বেশ চলে যাবে।

বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য রাজ্য সরকারের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি। সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে রাজ্যের বাইরে তেল রপ্তানী নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো। আইনকে বলবৎ করার জন্য যে স্বকাব্যী কর্মচারিবৃন্দ যুক্তি ও শাস্তি পেয়ে গন্তর্ক চোখে ষোরাফেরায় নিযুক্ত আছেন, আইনের প্রযুক্তি তাঁদের হাতে। সুতরাং তাঁদের মধ্যে যে কক্ষেজন বামকরজীড়ায় সুনাম অর্জন কবেছেন ও করছেন, এসব ব্যাপারে আগে তাঁদের একটু ত্বকাত্তে রাখা প্রয়োজন—গোলমালের আশঙ্কায় উৎসবের দিনে পুলিশ যেমন গুণাগুণীকে কড়া পাহারায় রাখেন।

বৈষম্যের বোঝা

সম্প্রতি সারা ভাঙে রাজ্য সরকারী কর্মচারী প্রতিনিধিবর্গের দুদিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল শহর কলকাতার বুকে। অনুষ্ঠান শেষে দলে

দলে রাজ্য সরকারী কর্মিগণ জমায়েত হয়েছিলেন অনুমোদনের পাদদেশে। এঁদের দাবি ছিল হরেক রকম এবং প্রায় বস্তাপচা। বহুকাল যাবৎ পঃ বঃ সরকারী কর্মচারিগণ একই দাবি-দাওয়া নিয়ে মিছিল, মিটিং করে আসছেন। দবই ভস্মে দি। কিন্তু এবার পশ্চিমবঙ্গ আর একক নন, সাবা ভারতের কর্মচারী প্রতিনিধিগণ কণ্ঠ মিলিয়েছেন একই আওয়াজে। যদিও সে সমস্ত দাবিই বহু উচ্চারিত এবং আজও অনাদায়ী। অথচ একটিও অনুচিত দাবি উপাধিত হয় নি কর্মিবৃন্দের তরফ থেকে।

তঁাবা চেয়েছেন সাধারণ কর্মী মানুষের মৌলিক অধিকার অর্থাৎ কর্মী সমিতি বজায় রেখে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অর্জন করতে, যে অধিকার ভোগ করেন এবং বহুলাংশে সরকারী সহায়তাও পেয়ে থাকেন বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে শ্রমিককর্মী চাকুরিজীবীরা।

তঁাবা মাহিনা বৃদ্ধির দাবিকে মুখ্য না ক'বে বলতে চেয়েছেন, বাজার মূল্যের ক্রমবৃদ্ধি দ্রোণ করা হোক।

তঁারা যে পরিমাণ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছেন প্রয়োজনেও তুলনায় তা যৎসামান্য। বিশেষতঃ ক্রমবর্ধমান জীবনমূল্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশেই বসিত মাহিনা, বোনাস বা মহার্ঘ ভাতাব দক্ষণ প্রতিদিন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রকৃত মাহিনা ক্রমতঃ হ্রাস করেছে। রাজ্যসরকারের ক্ষমতায় নাকি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে জীব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য যখন বছরে দু'বার আর বৃদ্ধির ঘোষণা অনিয়মে কেন্দ্র বাহবা নেন, তখন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যম বস্তাপাত হয়। সরকারী নির্দেশে বোনাস ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও মাহিনা বৃদ্ধি হয়। দুঃস্থপু দেখেন

রাজ্য সরকারী কর্মিবৃন্দ। লোকের হাতে দু'পয়সা এলেই বাজার আবো চড়তে থাকে। ফলত অর্থমূল্য কমে গিয়ে রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের স্বল্প প্রকৃত আয় আরও কমে আসে। অথচ এঁদের ওপর বৈষম্যচর্চিত্র এষ্ট বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কেউ কোনো চিন্তা করেন না। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের রাজস্ব লুটে নিয়ে যাবেন, কিন্তু রাজ্য কর্মীদের জন্য দু'পয়সা রাজ্যের হাতে ফেরৎ পাঠাবেন না, এ এক মজার ব্যাপার। একই ভাবতীয় রাজ্যে একই মূল্যমানের আওতায় একই কেন্দ্রীয় স্ববন্দারীরা দাপটে বাস ক'রে সরকারসৃষ্ট বৈষম্যের নির্যাতন সহ্য করবেন শুধু রাজ্য সরকারী কর্মচারিগণ। এষ্ট অপূর্ব বিষম-বণ্টননীতির ভাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা আজ জীবনমৃত, মিয়মাণ। এঁদের দাবি একাধেই বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারেরই দাবি। এ দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় অর্থ, ভারত যুক্তরাজ্যে সরকারী পর্ষায়ে বৈষম্য (আধিক) বজায় রাখার ষড়যন্ত্র।

চাকরির স্বাধীনতা, পেন্সন এবং সিনিয়রিটি অনুগারে ক্রমোন্নতির নির্মল্লাট ব্যবস্থা ব্যতীত রাজ্যসরকারের চাকরিতে দ্বিতীয় কোনো আকর্ষণ ছিল না। দেশপ্রেমের আকর্ষণে কেউ বোধ হয় চাকরি করতে যান না। সরকারী চাকরিও এক ধরণের সক্রিয় দেশসেবা স্বতন্ত্রভাবে সে কথাও কোনো চাকুরে মনে করেন না। চাকরির ক্ষেত্রে কে দুবেলা পেটের ভাত সংগ্রহের জন্য শ্রমবিক্রয়ক্ষেত্রের একটি দেনা-পাওনার স্থান ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পাবে না মানুষ। না পারলে সেটা অপরাধও নয়। সুতরাং নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই সরকারী চাকুরেরাও যান দশটা-পাঁচটা চাকরি করতে।

কিন্তু মাহিনাপত্র দু'বের কথা, অধুনা চাকরির স্বাধীনতা কিম্বা নিশ্চিত-

ভাবে সিনিয়রিটির সিঁড়ি দিয়ে ওপর-তলায় প্রমোশন পাওয়ার আশাও স্বপ্ননাও পর্যবসিত হয়েছে। ছাঁটাই অব্যাহত আছে। প্রমোশনের বালিষ্ট নেই বছরের পর বছর। এবং অস্থায়ী চাকুরে চাকরির স্বাধীনতা সম্পর্কে হতাশ। তাহলে রাজ্য সরকারী কর্মীদের জন্য কী পড়ে আছে? বস্তাপচা এ কথাও জবাব হ'ল,—চোখাঙানী। অতি সাধারণ সুস্থ নাগরিকদের ন্যায় বেঁচে থাকার মতো সার্ভিস কন্ট্রোল ও বেতনহার দাবি করতে গিয়ে সরকারী রক্তচক্ষুর স্ক্রলিঙ্গ অনুভব করেছেন তঁাবা। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, সাবা ভাবত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মরদান সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছেন জটনক বরখাস্ত কর্মচারী এবং প্রতিনিধি বৈঠকের রিপোর্টও সভাস্থলে উপস্থাপিত করান হয় বরখাস্ত কর্মচারীর দ্বারা।

সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সরকারের এষ্ট বিমাতুল্লভ ব্যবহার এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বেতনগত ও অন্যান্য সুবিধা-সুযোগ ও পার্থক্য রচনা, সরকারী কর্মে অস্বস্তি আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সমগ্র সরকারী কর্মিগণের মধ্যে বৈষম্য রচনা ক'রে ভারত সরকার আধিক ক্ষেত্রে অসম বণ্টনের নিন্দনীয় নীতিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য রাজ্যসরকারকে দেখিয়ে দিয়েই কেন্দ্রীয় দায়িত্বের ইতি। কিন্তু দায়িত্ব ঋণাসিটাই। তো মুখ্য বিষয় নয়, ভারতবর্ষে জাতীয় আয়ের যতদূর সম্ভব সমবণ্টনের নীতি ভারত সরকারেরই গ্রহণ করা উচিত। রাজ্যসরকারের আড়াল দিয়ে পালিয়ে গেলেই রাজ্য-ব্যাপী সমস্যা লঙ্ঘায় মুখ লুকোবে না। বরং প্রতি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের আয়-ব্যয়ের অঙ্কে আকাশ-পাতাল ফাঁক দেখা দেবে। একই কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত দেশে একই মূল্যমানের

আওতায় সরকারী কর্মচারীদের আয়ে এই আত্যন্তিক পার্থক্য অনভিপ্রত। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির অসুবিধা দূরীকরণের সর্বপ্রকার সহায়তা করতে পারেন ও এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সর্বভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য একই বেতনহার চালুর সম্ভাব্য সব ক'টি উপায় বিবেচনা করতে পারেন।

বিভিন্ন রাজ্যে প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মতনভাবে বেতনহার গঠন করা যায়। কেন্দ্রীয় কর্মচারিগণ বিভিন্ন রাজ্যে বদলির সময় সে রাজ্যের মূল্যমানের অনুপাতে বিশেষ দুর্বল্য ভাতার সুবিধা পেতে পারেন, যেমন মফস্বল থেকে শহরে বদলি হ'লে কর্মচারিগণ বিশেষ সিটি ব্যালান্স পেয়ে থাকেন।

অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনহারে সমতা স্থাপন না করলে এবং একই রাজ্যে একই মূল্যমানে একটি সম্প্রদায় ক্রমাগত স্থিতিশীল বেতনহারে পড়ে থাকলে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি হলে (আশুচর্য বিষয় সরকারী নির্দেশেই এই আয়বৃদ্ধি ঘটে থাকে) হাট বাজারে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তার মোকাবিলা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা করবেন কোন যাদুবিদ্যার বলে একথা অতঃপর স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী হ'ন, অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী হ'ন, তাঁদের প্রযোজন আত্যন্তিক-ভাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় বেশি, এমন কথা নিশ্চয় কেউ ভাবেন না। কিন্তু তাব উল্টোটাটা বা ভাবেন কে। এই অসংখ্য রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা প্রতি বছর উৎসবসুখী মূল্যমানের নিষ্পেষণ গহ্ব ক'রে চিরকাল মুখ বুজে সরকারিভাবে সেবা বিতরণ করে যাবেন, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কয়েক হাজারের কাছে সরকার পক্ষ এতদূর পরার্থপর হ'য়ে ওঠার দাবি রাখেন কেমন করে?

রাজ্য সরকারী কর্মচারিগণ আজ চরম আর্থিক গলটের সম্মুখীন এবং সে প্রসঙ্গ সহৃদয় সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচিত হওয়া উচিত। নচেৎ বোঝাটুকু রাজ্য সরকারী কর্মীদের ওপর চাপিয়ে অধিককাল কেন্দ্র-রাজ্যেব-প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্যহেতু মজা শারমারি চললে একশ্রেণী সরকারী কর্মচারী অশেষ দুর্গতির মধ্যে অন্যান্য বেতনহার সামনে রেখে বাঁচবাব জন্য বিকল্প পন্থা সন্ধান করতে বাধ্য হবেন, যে অবস্থা সরকার দেশ ও কর্মীদের কারও মঙ্গলজনক নয়।

পেট মানিঙ্গ লা

পেট বাঁচাতে অফিস হাজিরা খাতায় নিয়মিত লেট বাঁচাতে হয় ছাপোয়া কেরাণীকুলকে। আর এ কারণেই তাঁরা প্রতিদিন বছরের অসাধ্য সাধন ক'বে যাচ্ছেন-যা অবশ্য ফলাও খবর হিসেবে খবর কাগজের পাতা কখনই অনন্তত করে না।

ট্রাম-বাসে ভিল ধাবণের জায়গা না থাকলেও কোন এক যাদুমন্ত্রবলে নারী ও পুরুষ নিবিশেষে চাকুরে মানুষ সেট আপাত অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে মাছি-মশাব মতো ফাঁক-ফোকর খুঁজে ঠিকই স্থান পূরণ করে আনছিলেন। মাঝে পড়ে বাধ সাধন এ্যান্ড্রিডেণ্টের হিড়িক। রাজ্যের ভালোমঙ্গ যারা ভাবছেন, ভাবিত হলেন তাঁরা। মানুষজনকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু কী ক'রে। সহজ উপায়, পাদানি বন্ধ ক'রে। ধাক্কা লাগলে-পাদানির মানুষের পিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। স্তব্ধতা 'পাদানি বন্ধ'।

কিন্তু তাও-কি হয়। লেটের খাতায় লাল কালির ডয়। কে কাব কথা শুনবে। বাস-ট্রেন্ডানো কেরাণীর আবেদন 'ক অফিসবাব গ্রাহ্য করবেন? বাস বাড়ানোর আবেদনে কি স্টেট ট্রান্সপোর্ট গাড়া দেবেন? অধিক ট্রামেব অন্য লেটে হবেন কি ট্রাম কোম্পানী।

না। না। না।

তবে? এই সর্বাঙ্গিক 'না'কে কি 'হা' করার দায়িত্ব শুধু কুৎসিপাগায় কাতর হাঁ-করা কেরাণীকুলের। অসম্ভব আন্দার। তা আর সম্ভব হ'ল না। মাথার ওপর মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে আগের মতোই তাঁরা ঝুলছেন ঝুলবেন, এমনি ক'রেই ঝুলতে হবে। শুধু ট্রাম-বাসে নয়, সমস্ত বর্তমান-ভবিষ্যতের অন্ধকারে অসহায় মানুষ ঝুলবে। শ্ব ক'রে নয়; সহ্য ক'রে থাকতেই এঁরা অভ্যস্ত, সহ্য ক'রেই থাকবেন।

আব এট সমস্ত সহনশীলতার মূলে যে কথা,—কোনোগতিক বেঁচে থাকা—ঠিক সেই কাবণেই 'পাদানি বন্ধ' শ্লোগান প্রহসনেই পরিণত হবে। হয়েছে।

মাঝে পড়ে এই শত শত ঝুলন্ত মানুষকে তাদের দোলারমান অবস্থার কথা একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হ'ল যায়। এ-ও এক কাহিনী এবং চমকপ্রদ কাহিনী।

মুর্শিদাবাদ :

বরাত যান্ন সঙ্গে

ফারাক্কানী নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎদপ্তরের ফারাক্কানী উপসমিতির সভা উপলক্ষে বাজ্যমন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ কে এল রাও ফারাক্কানী গিয়েছিলেন। সঙ্গে গিয়েছিলেন লোকসভা সদস্য সর্বশ্রী রঘুনাথ সিং, সতীশ সামন্ত আর পি রায়, জে পি মণ্ডল, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং ত্রিদিব চৌধুরী, কিন্তু সঙ্গী হিসেবে এঁরা টক-স্টাল-মিটি। কেউ কড়া, কেউ মিঠে। তবেআব এক গঙ্গী গা ঢাকা দিয়ে মন্ত্রী মহোদয়দের অনুসরণ করেছিল, বড় মশুর সঙ্গী—স্বয়ং ববাত।

মন্ত্রীমণ্ডল কাক্সের ফাঁকে বৈকালিক বিরামের সময় এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এঁরা ফারাক্কানী বাঁধ প্রকল্পেব জন্য জমি খুঁজে দরবাব করতে এসেছিলেন। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেসী এম পি শ্রীমতী রেণুকা রায় ও এম এল এ শ্রী আবুল হোসেন।

প্রতিনিধি দল ঝাঙা না এনে ঝুড়ি এনেছিলেন। পাঁচ শ' লিচু ভাতি পাঁচ-শাতটি ঝুড়ি। মন্ত্রী আপ্যায়নে মুনিদাবাদ-মালদহের এষ্ট ঘটাপটা দেখে অনেকট বিস্মিত। রাজ্যে এ-জাতীয় লিচু বর ঝুড়ি প্রতি দশটাকা। কলকাতার আঁটিসার বড় লিচুর শ' চাব থেকে ছ' টাকা।

তা বেশ করেছেন তাঁরা, লিচু দিয়ে কাজ কিছু এগোলে পাটকিরি ক্ষতি নেই। তা ছাড়া কয়েক বছর আগেও জমিদার পদার্পণ করলে প্রজাদের তো নজরানা গড়ে নিয়েই দরবার করতে যেতে হ'ত। ও আর এমন বেশি কি। ওটা স্বভাবদোষ।

প্রসঙ্গত তাঁর মনে পড়ল—'সত্য মা যায় ম'লে'। মন্ত্রী মহোদয় শেষ পর্বস্ত লিচু ব'ড়ি গড়ে এনেছিলেন কি না, সংবাদে তার উল্লেখ নেই। তবে উপস্থিত সাধারণের সেসময় নিশ্চয় সেই কথাটিও মনে পড়েছিল। সত্য বলে, বরাত যায় গড়ে।

বর্ধমান :

অস্বাস্থ্যকেন্দ্র

বাংলা দেশের হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হ্রদ্যপরিচয়ে এক-একটি অস্বাস্থ্যের আড্ডাঘলে পরিণত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে 'সাপ্তাহিক'র সংখ্যা পূরণ আমরা একাধিকবার করেছি। বর্তমান সংখ্যায় স্থানীয় সংবাদ সাপ্তাহিক 'বর্ধমানের ডাক' পত্রের তৌজন্যে নিম্নোক্ত সংবাদটি উপস্থিত করা হ'ল। বিচারশীল পাঠকবর্গ এই সংবাদ-কবিকা থেকে দেশের হাসপাতালের হালচাল আর একবার হৃদয়ঙ্গম করবেন।

স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই। বড় ধুমকাতুরে বিভাগ। চোখ ঢেকে কান ঢেকে বুড়ি ঠাকুমাটি যেন। ওখানে চাক পড়িয়ে চক্ষুর্দণ্ডের চাকনা খোলা

যাবে না। সে পণ্ড্রমণ্ড আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

শুধু ভয় হয়, ডাক্তার-বদলি ও আরোগ্য নিকেতনেই যদি রোগের বাস্তবজিটে কায়ম হয়ে যায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে নিরায়নের আশা বড় একটা থাকবে না। তাই হাসপাতালের চিত্র মার্ক-মধ্যে চিত্রিত হওয়ার দাবি রাখি। বর্ধমানের 'ডাক' প্রকাশ :

'পশ্চিম বাংলার অন্যতম বৃহত্তম হাসপাতাল বর্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতাল বহু যশস্বী অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্ম-বেশ্য। প্রতিদিন বর্ধমান ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলার শত শত রোগী এই হাসপাতালটিকে চিকিৎসা ও রোগ-মুক্তির ভরণাস্থল মনে করে। কিন্তু হাসপাতালে অব্যবস্থা, উদ্যোগী ও দুর্নীতি প্রায়শ সঙ্কট সৃষ্টি করে। এই হাসপাতালের পরিধি ও চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে বিধ্বস্তের এবং আরও ক্ষুণ্ণিত করা যেমন অত্যাশঙ্ক-উহার অব্যবস্থা এবং দুর্নীতি দূর করার প্রয়োজনীয়তাও কিছুমাত্র কম জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ নহে।

ডি-এম-ও ডাঃ লাহা বদলি হইয়াছেন। ডাঃ লাহা আগিয়াই আর-এম-ও প্রভৃতি কর্তৃস্থানীয় অন্যান্য ডাক্তারদের স্বধন হঠকারিতার সহিত বন্ধিত কব্রিয়া পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা নিজে করায়ত্ত করেন এবং উহাকে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত স্বার্থ-সিদ্ধির উপায়ে পরিণত করেন, তখন আমরা তাহার প্রতিবাদ কব্রিয়াছিলাম। সি-এম ও ডাঃ দাশগুপ্ত এই শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ, ডি-এম-ও'র দ্রুত বদলির জন্য উদ্যোগী হওয়ার আমরা তাঁহার কার্যের তারিফ করি। কিন্তু স্বয়ং সি-এম-ও ডাঃ দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে স্বধন ক্রটি ও দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপের অভিযোগ উঠিয়াছে, আমরা তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। প্রকাশ, জেলা স্বাস্থ্যবিভাগের প্রধান অধিকর্তা ডাঃ এস-আর দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে

বিবিধ-দুর্নীতির অভিযোগসম্বলিত একখানি পত্র পঃ বঃ সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগের সচিব শ্রী বি আর গুপ্তের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

ডাঃ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে বর্ধমান জেলার স্বাস্থ্যবিভাগের দুই বছরের ইতিহাস চরম অব্যবস্থা ও দুর্নীতি রাজত্বের ইতিহাস। তিনি স্বাস্থ্য-বিভাগের উচ্চতম দৈনন্দিনের অধিকারী হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল তাঁহার ক্রটি দুর্নীতিপূর্ণ কার্যগুলি এক ইচ্ছাকৃত প্রভাবে তিনি চাকিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, সেখানেই আমাদের আপত্তি। তিনি মন্ত্রী, উপস্থিত সরকারী অফিসার ও কংগ্রেসী পাণ্ডাদের তুষ্টিসাধনের জন্য দৌড়ানোড়ি না কব্রিয়া যদি জেলাব অচল স্বাস্থ্যবেদ্যগুলি গলত করিতে যত্নবান হইতেন—আমরা ধুশি হইতাম।

তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রে, (১) মেডিকেল ফিটনেশ সার্টিফিকেটের জন্য (হেডক্লার্কের মাধ্যমে) ডবল ফি (৩২৯ টাকা) নিয়মিত দাবি করা ও আদায় করার অভিযোগ আছে। (২) ১৯৬৩ সালের নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে হাসপাতালের জি-ডি-ও পদের প্রার্থীদের নিকট হইতে (হেড ক্লার্কের মাধ্যমে) ৫০৯ টাকা কব্রিয়া আদায় করা হয়। কোন ক্ষেত্রে গোলযোগ হইলে অবৈধভাবে চাপা দেওয়া হয়। (৩) তাঁহার অনিয়মিত ও দুর্নীতির কাজে অসহযোগিতা করার সহকারী সি-এম-ও প্রভৃতি বেশ কয়েকজন মেডিকেল অফিসার ও কর্ম-চারীকে তিনি দ্রুত বদলির ব্যবস্থা করেন। (৪) জেলা স্বাস্থ্যবিভাগের একাধিক মোটরগাড়ি তিনি নিজে নিয়মিত ও বন্ধুবান্ধবদের কাজে, প্রমোদ ভ্রমণে ও উর্ব্বতন অফিসারদের সম্ভোগ বিধান ব্যবহার করেন।

স্বপ্ন

(হাঙ্গেরীয় ছোট গল্প)

মূল লেখক : ইষ্টভান জাবো

অনুবাদ : গোপাল ভৌমিক

পথটা এবুপ উদ্‌গামী ও সঙ্কীর্ণ ছিল, তাদের একজনের পিছনে আর একজন এইভাবে চলতে হচ্ছিল। পথের ডানদিকে ছিল অন্ধুব গাছের সারি এবং অপর দিকে ছিল ফলবাগানের লোহার তালের বেড়া। ফেবিয়ান পিতার পিছনে পিছনে হেঁটে চলেছিল এবং তাকে বৃষ্টির শব্দগত গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হচ্ছিল। কিন্তু তার মনে মনে ছিল শহরে যাবার সাজে আটটা বাস ধরার তাড়া। সে মাঝে মাঝেই হাত বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছিল—তখনও বাস নটে পৌঁছাতে আরও ৭ মিনিট লাগবে কথা।

তবু বাবাকে তাড়া লাগানোর সাহস তার ছিল না বলে সে ধীর গতিতেই চলেছিল। যদি সে সাহস করে তাড়াতাড়ি চলাব তাগিদ দিত, তাহলে বৃষ্টি নিশ্চয়ই তার তাড়ার হেতু জানতে চাইতেন। হয়তো তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করে বসতেন। এ ঝুঁকি নেবার সাহস ফেবিয়ানের ছিল না এবং সে নীরবে পথ চলাই শ্রেয় মনে করেছিল। মনে মনে সে কিছুটা বিবস্ত্র হলেও বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে তার উপায় ছিল না।

বিশেষ করে এই গরমে ও ধুলোয় এবং এত শব্দগত চাব মাইল পায়ে হেঁটে শহরে যাবার ইচ্ছা আদৌ তার ছিল না। হয়তো চলতে চলতে পিতাপুত্রের কথা বলার সুযোগ ছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে বাড়িতে এরূপ কথা বলার যথেষ্ট সুযোগ তারা পেয়েছিল এবং তাদের কাছে গৃহস্থ আছে এরূপ সব কথাই হয়তো তাদের শেষ হয়ে গেছিল। বস্তৃত বাড়িতে ফেবিয়ানই কথা বলেছিল বেশি। তার পিতা মাঝে মাঝে এক আখটা কথা বলতেন এবং বাকি সময় গম্ভীরভাবে পুত্রের কথা শুনতেন। তিনি যে তার কথা মন দিয়ে শুনতেন সে বিষয়েও ফেবিয়ানের নিশ্চয়তা ছিল না। এখনও এক সাথে শহরে হেঁটে যেতে হলে ফেবিয়ানকে এই একপাক্ষিক আলোচনাই চালিয়ে যেতে হবে। সে সম্ভাবনা হাঁটার চেষ্টা বেশি কষ্টসাধ্য এবং গরম ও ধুলোর চেয়ে বেশি বিরক্তিকর বলে মনে হল তার কাছে। দুজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হতো হবে না—হবে দ্বন্দ্ববৃষ্টি। তা ছাড়া কখনও কখনও তার মনে হত যে, তার পিতা কথা বলতে চান না এবং সে কথা না বললে তিনি বেশি খুশি হন। বৃষ্টি যেভাবে পুত্রের দৃষ্টি এড়াতে চাইতেন এবং বদমেজাজী নীরবতা ও গম্ভীর দৃষ্টি বজায় রেখে চলতেন তাতে ফেবিয়ানের মনে হত যে, তার বৃদ্ধাপেক্ষ শহরে বাসের ফলে তার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে এবং সে যে কথা বলে শক্তির অপচয় করে তা তার পিতার অনুমোদন পায় নি।

ফেবিয়ান দিবানন্দ দেখতে ভালবাসত এবং কখনও কখনও সে ভাবত যে সে ভুত

দেখতে পায়। সে এখন মনে মনে ভাবত যে, পিতার যে মনোভাব সে ধরে নিয়েছে সেটা হয়তো আসলে এ তাঁর মনোভাব নয়। বৃষ্টির চিন্তাধারা কল্পনিক সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেয়ে বেশি সবল ও সুস্থ ছিল। কিন্তু মূর্খে যদি এ কথা সে বদন্ত তাহলে তার পিতা বুঝতেন না এবং তাকে নিয়ে উপহাস করতেন। তা হলে বৃষ্টি এত বৃদ্ধত্বভেদে এবং অসন্তুষ্ট কেন? ফেবিয়ান ভাল বুঝেই তাঁর সংগে আলোচনা আবন্ড করত কিংবা আলোচনা চালানোর চেষ্টা করত। বাড়িতে এসে বাড়ির আবহাওয়া মধুর ও সুন্দর করে তুলতেই সে চাইত, প্রমাণ করতে চাইত যে সে বিদেশী হয়ে যায় নি। কিংবা বাড়ির সংগে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় নি.... তাকি তিনি



তার বাবা যেভাবে ধীরে ধীরে পথ বেয়ে উপভোগ্য ন্যাশিওনাল মনে মনে সেই দৃশ্যের কথা সে ভাবল। তিনি দ্রুত পায়ে চলছিলেন না, বরং চলার গতি ধলা করে দিয়েছিলেন, কেন না পাহাড় বেয়ে নীচে নাবার ব্যাপারে এই ছিল বুদ্ধিমানের মত কাজ। মাঝে মাঝে বড়ো মানুষের মত তার পা কাঁপছিল, অসুস্থত-ভাবে পা ছুটি এমন বাইরের দিকে বেঁকে যাচ্ছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল যে হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছিল; প্রকৃতপক্ষে তার ৬৮ বৎসর বয়সের পক্ষে এই পা ফেলার ভঙ্গাই ছিল ঠিক। তার দেহ কিন্তু বেঁকে যায় নি—কেবিরান শিশুবয়স থেকে তার বাবাকে যেভাবে দেখে এসেছিল তেমনি সে সামনে তাকিয়ে দেখল যে তার সম্মুখে হেঁটে যাচ্ছেন একটি দীর্ঘকায় স্বচ্ছদেহ মানুষ। তার পাকা চুলগুলা মাথাটা তিনি স্বচ্ছন্দে এদিকে ওদিকে ফেরাচ্ছিলেন এবং অভ্যাসমত সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিলেন—আঙুরের ক্ষেত, ফলের বাগান, বস্তুদের শস্যের ক্ষেত প্রভৃতি। পরে যাতে সব কিছুর পুনরাবৃত্তি তিনি করতে পারেন সেজন্য প্রতিটি ক্ষুর জিনিসই তিনি মনেযোগ দিয়ে দেখছিলেন এবং মনের ভাড়ারে সে স্মৃতি জমিয়ে রাখছিলেন। একটি ফলের গাছের পক্ষেও তার পূর্ববেক্ষণশীল অনু-সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না—সঙ্গে সঙ্গে তিনি উৎপন্ন ফলের উৎকর্ষ ও পরিমাণ আঁচ করে নিচ্ছিলেন। তাকে দেখেই বোঝা যেত যে তিনি যেখানেই যান সেখানেই কৃষকদের পক্ষে অর্থবহ সব জিনিসের রহসাই তার সম্ধানী চোখের কাছে ধরা পড়ে। না, তার ভাবভঙ্গিতে তাড়ার চিহ্নমাত্র ছিল না। আর তাদ্যা থাকার কোন হেতুও তো ছিল না! তার ভো ধারণা ছিল না যে তার পশ্চাদবর্তী পুত্রটি কত অর্থবহ ও উদ্ভিনন হয়ে উঠেছিল, এই সামান্য পঞ্চকু আসতে আসতে সে যতবার তার হাতবাড়ি দেখছিল এবং তার বাবার পায়ের গতি বাড়ানোর জন্য তার মনে মনে কত কামনা ছিল। পুত্রের মনের আজ্ঞাবাজে কণপনাবিল্যসের শব্দও তিনি রাখতেন না। সহজ সাভাবিক জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল এবং তিনি সারা জীবন যা করে আসাচ্ছিলেন তখনও তাই করছিলেন—তার

এরইদকের চোখে পড়ার মত সব জিনিস তিনি খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

বাবাকে মুখে ভাগদা না দিয়ে শুধু চোখের ভাগদা দিয়ে সে ভালই করবেছিল একথা ভেবে হঠাৎ ফেবিয়ান খুশি হয়ে উঠল। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে দেখল যে তখনও হাতে এক মিনিট সময় আছে, অদূরে রাজপথের রেখাও চোখে পড়ছে অথচ বাস থামার কোন চিহ্নই নেই। তারা ঠিক সময়েই স্টপে গিয়ে পৌঁছাবে। একথাও তার মনে পড়ল যে পাড়াগায়ের এই সব বাস সাধারণত অস্বচ্ছন্দ ১০।১৫ মিনিট দেরিতে আসে। এখন সে নিশ্চিন্ত ও অস্বচ্ছন্দ হয়ে বেন পিতার অনুকরণ করছে এমনইভাবে তার সাবানী ও স্বচ্ছন্দ গাড়ির ধীর পদক্ষেপ অনুসরণ করে চলল। এমন কি সে আপন মনে হাসল এবং শান্ত স্নেহের দৃষ্টিতে ডাকল পদচারণাগুলি বস্ত্রের দিকে। তার নিজের মনের স্বচ্ছন্দ কমে যাওয়ার তার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল এবং গত কয়েকদিন ধরে সে যেসব অস্বচ্ছন্দ কল্পনা করবেছিল সেগুলিকে হেসে উড়িয়ে দিল। তাদের পিতা-পুত্রের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না; যদি কিছু থেকে থাকে তার জন্য দায়ী তাব নিজের কল্পনাবিলাস—যা তাঁতে টেনে নামিয়েছিল অল্প গতিপথে এবং উইচিকিরে পর্বত বলে তুলে ধরেছিল তাব সামনে। ফেবিয়ান আপন মনে ভাবল : “নিজেব উপবাস্যাম কিছটা অধিকার থাকা উচিত। সব কিছুর মধ্যেই আমার সমস্যা চোখে পড়ে আব সমস্যা না থাকলেও কল্পনায় আমি তা সৃষ্টি করে নেই। এতো পাগলের মত কান্ড!”

উচ্চ সঙ্কীর্ণ পথটি বিস্তারিত হয়ে বায়ে বেকে গেছিল এবং শেষ পর্যন্ত এসে মিশেছিল রাজপথে। বহুক্ষণ ধরে বাপের পিছনে পিছনে যে ফেবিয়ান হেঁটে আসছিল সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বাবার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। তাব সামনে দশ গজ দূরে একটা মালার পারে সাইন বোর্ড ঝোলানো বাস স্টপটা। তার পিতা এতক্ষণ যেমন ধীর গতিতে হাঁটিছিলেন তেমনই ধীর গতিতে অথচ সূচকর পায়ে বাস স্টপটাকে অবজ্ঞা করে ৬ কিলোমিটার দূরবর্তী শহরের দিকে হেঁটে চললেন। ফেবিয়ান বাস স্টপে থেমে পড়ল। কয়েক সেকেন্ড পবে বৃষ্টি বৃষ্টিতে পাবলেন যে তিনি একা একা এগিয়ে চলেছেন। তিনি প্রথম ভাবলেন যে ফেবিয়ান হয়তো সিগারেট খানোব জন্য কিংবা জুতার ফিতা বাঁধার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিল—কিন্তু তার পরও কিছুটা হেঁটে যখন তিনি ফিরে তাকালেন তখন দেখলেন যে ফেবিয়ান বাস স্টপের শায়া খামটির কাছে প্রফুল্ল মনে হাসছে, তার পিছনে হাত দুটি বেখে সে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল যে দেখে মনে হয় তার হেঁটে শহরে যাবার ইচ্ছা নেই। কাজেই বৃষ্টি দাঁড়িয়ে পড়ে সন্নিধ্য

দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন : “ব্যাপারটা কি?”

ফেবিয়ান হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল : “আমরা বাসের জন্য অপেক্ষা করব। আব কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস এসে পড়বে।”

তার পিতা ভীতিপূর্ণ চোখে তার দিকে তাকালেন। তাব চোখের যে স্থানানী শীতল দৃষ্টির সঙ্গে ফেবিয়ান এত পরিচিত ছিল আবর সে সেই দৃষ্টি দেখতে পেল তাঁর চোখে।

“তুমি কি এইজন্যই থেমেছিলে? তুমি তহলে বাসে যেতে চাও?”

ফেবিয়ান হেসে বলল : “আমি একা নই—তুমিও।”

তার পিতার হাসার ইচ্ছা দেখা গেল না—তাঁর মুখটা বেকে গেল—শীর্ণ মুখে ফুটে উঠল রাগের চিহ্ন। পিতা-পুত্রের মধ্যে ব্যবধান ছিল পাঁচ ছয় পায়ের—বৃষ্টি দাঁড়িয়েছিলেন রাজপথের মাঝখানে।

ফেবিয়ান তাঁকে লক্ষ্য করে বলল : “এস বাবা, এখানে এসে দাঁড়াও। আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।”

“আমি নিশ্চয়ই ওখানে অপেক্ষা করব না। আমার এখনও শহরে হেঁটে যাবার মত ক্ষমতা আছে।”

পুত্রের বাক্যে বাস দেখা যায় কিনা ঘুরে ফেবিয়ান সেটা দেখার চেষ্টা করল এবং তারপর বলল : “এতদূর হেঁটে যাবার মধ্যে কোন ব্যক্তি নেই। আমরা অল্প সময়েই শহরে পৌঁছে যাব।”

তার পিতা ঘৃণার সঙ্গে তাকে অনুকরণ করে বললেন : “অল্প সময়েই? অল্প সময়ে সেখানে পৌঁছানোর তোমার দবকারটা কি? তোমার নিজেব পা কি আর তোমাকে বহিতে পারছে না?”

“না, তা পারছে না” ফেবিয়ান বলল। তার মনের আনন্দ উবে গেছিল এবং সেই অপ্রীতি-কর কল্পনা এসে তার মন জুড়ে বসেছিল। “বাসটা তো আমাদের ব্যবহারের জন্যই। তুমি কি কখনও বাসে চেপে শহরে বাও নি?”

“না, কখনও না এবং ভাব্যতেও আমি গেসে চাও না।”

“তোমার দেখি হাঁটাব শখ মেটে নি? ৬৪ বৎসব ধরে হেঁটেও তোমার শখ মিটল না।”

“অল্প পথ হাঁটতে যে ডব পাশ মে কমে যেতে পারে। আমি এখনও হাঁটতে পারি।”

অবিস্বাসের দৃষ্টিতে রাজপথের মাঝখানে দাঁড়ায়মান একগুয়ে বৃষ্টির দিকে চেয়ে ফেবিয়ান ভাবল : “উপায় নেই।” তার বাবা যেন কালো একগুয়েমি দিয়ে তৈরি একটি জীবন্ত মূর্তি—তাঁর চোখে জ্বলন্ত গৌড়-সূচক দৃষ্টি। তাঁকে নিষেধ কি করবে ফেবিয়ান তা বুঝে উঠতে পারছিল না—প্রভাবে হাল ছেড়ে দেওয়া চলে না বলে নিছক কতবোর খাতির সে তাঁর সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছিল।

“বেশ, তুমি কি বিশ্বাস করো না যে বাসে যাওয়ার সহজ ব্যাপার? তুমি মেনে শোকারে পৌঁছাতে পৌঁছাতে এত পরিপ্রান্ত হয়ে পড়বে যে তখন তোমার বসাব ইচ্ছা হবে। কিন্তু আমাদের কাজ তো বহুরে, শহরে যাবার পথে নয়। বাসে যখন যেতে পার, তখন হেঁটে পরিপ্রান্ত হয়ে লাভ নেই।”

“অতীতে পায় হেঁটে শহরে যেতে যখন আমার কষ্ট হয় নি তখন এখনও...”

“হাঁ, আমি জানি এখনও কষ্ট হবে না। তাই তো তুমি বলতে চাও?” ফেবিয়ান হঠাৎব সঙ্গে বলল। শিক্ছু আমি তো কতবার তোমাকে অনুবোধ করে বলতে শুনিয়ে যে তোমার শক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তোমার পক্ষে যেটা ভাল, আমি শুধু তাই করতেই চাই।”

“আমার ভাল মন্দ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবে কাজ নেই। যার যে পথে যাবার ইচ্ছা সে সে পথেই যাবে।” তিনি না নড়েচড়ে একথানেই গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পঁচিশ বছর কয়েক হবার আগে পর্যন্ত তুমিও পায় হেঁটে গিয়েই শ্রুতি হতে। তখন তুমি বাড়তে



উৎসবে
অনুষ্ঠানে, নিত্যপ্রয়োজনে
**বেঙ্গল
কেমিক্যালের**
উৎকৃষ্ট
রোজ ওয়াটার
(গোলাপজল)
ব্যবহার করুন



কলিকাতা
বোম্বাই • কামপুর • দিল্লী

শাস্তাহিক বঙ্গমতী

করতে। কিন্তু এখন হাটটা তোমার ভাল লাগে না।”

“দবকাব না হলে আমি হাট না—আমি তো আর পাগল হই নি।” তাব পিতা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেনঃ “তুমি দেখি একেবারে যুবক প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছ—একেবারে খাঁটি ভঙ্গলোক।”

আকস্মিক হতাশায় ফেবিয়ানের মুখে উত্তর জোগালো না; বৃন্দেব কথার তাঁর বেন গলা আটকিয়ে গেল। তারা কঠোর নীরবতায় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর হঠাৎ শহরের দিক থেকে একটা বড় লরি ছুটে আসতে দেখার তাব বাবাকে ভাড়াভাড়ি পথের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াতে হল। আকস্মিক আতঙ্কে ফেবিয়ান তাব বাবা কোনদিকে সরে দাঁড়ান তা দেখার চেষ্টা করল এবং তার ক্রম-ধর্ম্মান বাগ নীবে কমে গেল।

বৃন্দেব আনন্দায় সরে এসেছিলেন বাস স্টপের দিকে মৃদু গোলমুদ্রা করে—স্পষ্টতই বাস ধরাব জন্য নয়—লবিটির গতিপথের বাইরে যাবার জন্য; দ্রুত ধাবমান লরিটি এমন-ধলোর ঝড় ছুঁয়েছিল যে তাব মধ্যে পিতাপুত্র পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিল না। যাই হোক, লরিটি দ্রুত বেগে চলে গেল।

ফেবিয়ান মৃদু থেকে ধুলো বের করে দেবার জন্য ধূম্র ফেলল এবং চোখ থেকে ধুলো মুছে বললঃ “দেখলে তো, শহরে হেঁটে গেলে এমনই অজ্ঞান ধুলো আমাদের খেতে হবে। মন্ত্র করে পেনি বাচানোর জন্য এই ধুলো খাবার কি কোন মান আছে?”

তার পিতা সর্বিদমে বললেনঃ “মন্ত্র কবেক পেনি।”

“অম্মা কবি এতে তোমার আপত্তি নেই। সমান্য তো ভাড়া।”

“এক কত তাতে আমার কিছু যায় আসে না।”

“আমিই ভাড়া দেব—তোমার ভাড়াটাও দেব।”

“আমার ভাড়া তোমাকে দিতে হবে না।”

ফেবিয়ান দীর্ঘবাস ফেলল। তার মনে পড়ল গত কয়েকদিনের ভয়ের কথা। তাব জীবন মনে হল যে সে অস্তিত্ববিহীন ভূতব

সঙ্গে লড়াই করছিল না। তাদের দুজনের মধ্যে সত্যই বিরোধ ছিল এবং সে যদি এখন একা বাসে যায় তাহলে বাবার সঙ্গে তার বিরোধ আরও বেড়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে যে নতুন আচার আচরণের অভিযোগ ছিল তার তালিকা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং পরস্পরের সম্পর্কে আর উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে না। তবু সে মনে মনে একথাও জানত যে বাস পেলে সে বাস সে ছেড়েও দেবে না। সে ভাবলঃ “দুঃখের কথা হলেও, আমরা দুজনে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলছি।”

ইতিমধ্যে ধুলোটা মিলিয়ে গেছিল এবং গ্রামের মাঠগুলি আবার চোখে পড়ছিল—চোখের ডানদিকে সেগুঁড়ি হাড়িয়ে ছিল। ফেবিয়ান আবার চেষ্টা করল। সে মনে মনে বুঝল এই হবে তার শেষ চেষ্টা।

“এতে আমাদের অনেক সময় বাঁচবে। ওই সামান্য অর্থের ভুলনার সময় অনেক বেশি দামী।”

তার পিতা উত্তর দেবার ধারণা ধারলেন না। তিনি পুত্রের মাথার উপর দিয়ে শহরের দিকে তাঁব দৃষ্টি ফেরালেন।

ফেবিয়ান বললঃ “বাবা, এতে অন্যায় কিছু নেই। সহজে একটা কাজ করতে চাওরাটা অন্যায় নয়।”

“তুমি তো বাবার সবই সহজে করতে চাও।”

পুত্র তিক্তভাবে হেসে বললঃ “অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে এটা হল ভুললোকদের কাজ কবাব রীতি—এই না। যাক, একবারের জন্য তুমিও না হয় তাই করলে—সামান্য পয়সার বিনিময়ে ভুললোক হলে।”

বৃন্দেব ব্যাগ্জন জবাব দিলেনঃ “মূল্যটা যে খুবই কম, সেবিধেই প্রশংসা নেই।”

এমন সময় তাদের পরিচিতা একটা নাবী বিরাট একটা কল্যা-নির্ঘে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়িয়ে বাস্তা দিয়ে তাদের দিকে এল। সে বললঃ “খাক, আমি যে সময়ে এসে পড়েছি সেও আমার ভাগ। হ্যালো, তোমরাও বাসের জন্য অপেক্ষা করছ—তাই না? আমাকে সারা পথ দৌড়ে আসতে হয়েছে—এমন অবস্থায় বাস আসতে দোরি করলে খুশিই হতে হয়—অবশ্য অন্য সময় হলে আবার বিরক্তি লাগে... শহবে চললে নাকি?”

ফেবিয়ান বললঃ “কোথায় এক প্লাস ভাল বিবার পাওয়া যায় তাই এখন আমার দরকার।”

“এই গবমে ওই হল একমাত্র পানীয়। আমিও কোথাও না কোথাও এক প্লাস বিয়ার খাবো। আপনিও আসছেন না কি?” নারীটি এই শেবোক্ত প্রশ্ন কবল বৃন্দেব।

জবাব দিল ফেবিয়ানঃ “ওঁনি আমাকে বাস স্টপে উঠিয়ে দিতে এসেছেন।”

তখনও হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়েটি মাথা নাড়ল। তারা তিনজনেই বাস স্টপে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে অদূরে পথের বাকি দেখা গেল হলদে রঙের বিরাট ব্যসটা। সেটা হলে দূলে অথচ

দ্রুত গতিতে এগিয়ে এল—তার কাঁচের জানালাগুলি রোদে ঝকঝক করছিল। বাসের বিরাট লেহটা প্রায় গোটা রাস্তা জুড়ে ছিল।

ফেবিয়ান আড় চোখে বাবার দিকে তাকাল—বৃন্দেব চোখে ফেরানো ছিল অন্যদিকে—অগ্রসর-মান বাস সম্বন্ধে তাঁর কোন সচেতনতা ছিল না; পাথরের মূর্তির মত তাঁর মুখ ও চোখের ভাব উদাসীন। এই গর্বিত নিশ্চলতা ফেবিয়ানের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করল—তার ইচ্ছা হল বাবার হাত ধরে শেষ বারের মত সে তাঁব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বিরাট ব্যসটা এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল—সেই নাবীটি জোরে ও হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলতে বলতে প্রথম বাসে ঢুকে পড়ল। ফেবিয়ানও ভাড়াভাড়ি ফিসফিস করে বাবাকে বললঃ “স্বামী গ্রীনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহের সামনে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।”

বৃন্দেব তখনও অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন—তবু তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন বলে মনে হল। ফেবিয়ান বাসে উঠল, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এবং এঞ্জিন শব্দ করে উঠল। বাস বাহা স্বেদ করল এবং শীঘ্রই পথ ধরে ছুটেতে আরম্ভ করল।

নিজের জন্য একটা ভাল বঁসাব জাবগা বেছে নেবার আগে ফেবিয়ান বাসের পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সে দেখতে পেল না কিছুই, কেন না বাসের পিছনে একটা দুর্ভেদ্য ধূলি-ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তবু সে ভাবল যে এই ধূলি-ঝড় ভয় না পেয়ে বৃন্দেব শহর অভিমুখে বাহা করবেন, এই অনিশ্চয় ধূলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলবেন তিনি; হয়তো বাধ্য হয়ে তাঁকে চোখ বুজতে হবে, শ্বাস প্রশ্বাসেও তাঁব কষ্ট হবে। এ অবস্থায়ও তিনি এগিয়ে আসবেন শহরের দিকে। হয়তো ধূলোব মুড়পাত করতে করতে তিনি পথ হাটবেন শহরের দিকে।

সেই সর্বব্যাপী ধূলোব দিকে না তাকিয়ে ফেবিয়ান থাকতে পারেনি না—কেন যেন তার মনে হচ্ছিল যে “বৃন্দেব চোখে মুখে ও ফুসফুসে যে ধূলি ঢুকছিল সেই ধূলি-ঝড় সৃষ্টির জন্য দায়ী সে নিজে। তার মনে মনে ইচ্ছা ছিল একবার সেই সমুদ্রগাভীর বৃন্দেব মূর্তি দেখে কিন্তু ক'ডাঙ্কর এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে বাহা সৃষ্টি করল।

“কতদূর যাবে, যুবক?”

“গ্রীন পর্যন্ত।”

সে তখন ভাড়ার অঙ্ক বলল। ভাড়াটা পেয়ে সে ফেবিয়ানকে ধন্যবাদ দিল ও খুচরা পয়সা ফিরিয়ে দিল।

ফেবিয়ান প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় একটা সীটে বাসে পড়ল। কিন্তু বাড়িতে ফেরার পথ থেকে বার-বার তার মূখে যে কথাটি শোনা যেত, সেই কথাটাই সে বার-বার মূখে বিড়বিড় করতে লাগলঃ “ভরুকর! ভরুকর!.....”

প্রবীণ রসোপন্যাসিক

শ্রী অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের

অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী

খানি বড় উপন্যাস ও খানি

নির্বাচিত গল্প, মূল্য তিন টাকা।

চন্দ্রমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,

কলিকাতা-১৩



সেন্সাল আর একাল

[জাল-জুয়াচুরি-প্রভাবনাও যে সস্তা আর্ট, তার প্রমাণ মেলে কুখ্যাত জুয়াচুরি বা প্রতারণার কেস ঘটিলে। এদিক দিয়ে তারা নিছক নকলনিবন্ধ নয়, সৃষ্টিশীল আর্টিস্ট এবং প্রতিভাধর। সভ্যতা এগিয়েছে, বিজ্ঞান এগিয়েছে—সেইসঙ্গে নিত্য-নতুন পথে প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে প্রতারকদের। ধীরে ধীরে এ-জাতীয় বিকৃত প্রকাশ না ঘটলে হয়ত তখন স্বকীয় বুদ্ধিমত্তার সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু মানুষ যত সভ্য হোক, আদিম রিপুব কবল থেকে আজও তার রেহাই নেই। তাই যুগে যুগে এই দৃষ্টি-কান্নারী কত কিস্করকরভাবে যে সমাজকে উত্তাপ করে গেছে, কত চমকপ্রদ পন্থায় যে নিরীহ নাগরিকদের সর্বস্ব অপহরণ করেছে—তারই কিছ, কিছ, কাহিনী বলার চেষ্টা করা হবে এই বিভাগে।]

জাল টাকা

সকালের ইউরোপে

ইংরেজিতে Counterfeit Coin শব্দটির সাধারণ অর্থ হল মৌক টাকা—সে টাকা কাগজের নোটও হতে পারে, সোনার পোয়ও হতে পারে। মূল্য-নকলের ইংরেজি ইতিহাস হাতড়ে ক্রোনাস সাম্রাজ্য পর্যন্ত অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। অবশ্য মূল্য জালিয়াতদের দৃষ্টিতে যে তর আগের ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন মূল্য সংগ্রহ করার ঐতিহ্য ছিল বহু রোমকেস। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তারা পুরোনো গ্রীসের ভাস্কর্য, বিশেষ করে মূল্য, কিনত। সূচকুর বোমক জালিয়াতরা তাই শব্দ চলতি মূল্য নয়, এই প্রাচীন মূল্যবো মৌক সংস্করণ বাজারে ছাড়তে শুরু করল।

বোমক মৌক মূল্য ওপরে পুরু রূপের স্তর থাকত—মাথায়ানে তামার টুকরো। জাল মূল্য বাত সহজে তাঁর করা না যায়, তাই কতৃপক মূল্যের কিনারায় খাঁজ কাটার ব্যবস্থা করলেন। আজকাল বোমক ও দেশের শিলিং আর্থ ড্রাউন আর এসেলের সিকি আর্থালি টাকার দেখা যায়। কিন্তু অচিরেই এই খাঁজকাটা

আম্রাশ বরন

বিদ্যেতেও পাবদশী হয়ে উঠল—দুর্ভাগ্যবান জালিয়াতরা। অতি সহজে, উকো ঘষে, তারা মূল্য-শিল্পের এই জটিলতাটুকুও হুবহু নকল করে ফেলল।

অন্যরাসে অর্থকর এই আর্টে সেযুগের কটনবাও পিছিয়ে বইল না। পেটাই তামার মূল্যের রূপো অথবা সোনার স্তর লাগানোর শিল্পে তারাও এমন তুখড় হয়ে উঠল যে, শেষকালে কড়া আইনজারী করা হল মধ্যযুগে। রাজমূল্য নকল করা মানেই নিদারুণ রাজ-প্রোহিতা। শাস্তি—যাটস্তু তেলে ডুবিয়ে মৃত্যু।

জালিয়াত-শিল্পেরাঙ্গি বেকার

জালিয়াতি অনেক রকমের আছে। কিন্তু মূল্য জালের মত সংক্রামক জালিয়াতি বিশেষ দেখা যায় নি। উনিবিংশ শতাব্দীতে বেকার নামে এক জার্মান জালিয়াত খোদাই করে বিভিন্ন মূল্যের প্রায় ৩০০ ছাঁচ তৈরি করল। অধিকাংশ মূল্যই রোমকযুগীয়। প্রতিটি ছাঁচ রীতিমত কুশলতার নিদর্শন রইল। বেকারেরা মৌক মূল্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রতিটি মূল্য সে খাঁচি সোনা দিয়ে বানাজ। ফলে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি ধরা পড়ত না। আসল-নকলের প্রভেদ বার করাতে বিশেষজ্ঞরাও হিমশিম খেত। দক্ষতার

পূরস্কার সব শিল্পীর ভাগ্যই জোটে বেকারও বাদ গেল না। আগ্রহী স গ্রাহকদের দৌলতে বেশ দূ পয়সা জমিয়ে ফেলল সে।

বেকারের সোয়ানাপনার অনেক চমকপ্রদ গল্প শোনা যায়। নতুন মূল্যের চকচকে ছন্দবেশ পাবিয়ে পুরোনো কবা দরকার। বেকারের মাথাব এল একটি অভিনয় পন্থা। ছোট্ট একটা বাজের খানিকটা লোহাকুচি দিয়ে ভরে মৌক মূল্যগুলো তার সঙ্গে মিশিয়ে দিত বেকার। তারপর, বাজটা পুরু দিয়ে আঁত গাড়ির স্থিতিরের সঙ্গে। লোহাকুচি থেকে ওকেনবাক যাওয়ার পব লোহাকুচির ভেতর থেকে মূল্যগুলি তুলে নেয়ার পব তাদের সদ্য প্রস্তুত বলে চেনাই যেত না। তার শিল্পকীর্তিতে বাজার যখন ছেঁবে গেল, তখন বেকার ছাঁচ থেকে সীসেব মূল্য বানাতে লাগল। যেসব সংগ্রাহক তার মিউজিয়ামে বোমক মূল্য সোৎসাহে কিনেছিল, সেবার তাদের কাছেই এই সীসের মূল্য বিক্রি করে আরও কিছ, অর্থ লুটে নিলে।

নেই-আইনের যুগ

১৬৬২ সালে মৌক মূল্য তৈরি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হল। কিন্তু সস্তদশ আব অষ্টাদশ শতাব্দীতে তত নোটো বাজার ছেঁবে গেল। কেন-না, সোনার স্টক থাকুক আর না থাকুক, বে কোনো বাড়ি কাগজের টাকা বাজারে ছাড়তে শব্দ কবলে তা দখল করার জন্যে দেশে কোনো আইন ছিল না। তা ছাড়া, আরও একটি উল্লেখ্য প্রথা ছিল। সেযুগে বাজারে নোট ছাড়বার আঁকুর শব্দ ব্যাক অফ ইংল্যান্ড নয়, সব ব্যাংকেই ছিল। কাজেই আসল-নকল ধবতে না পেয়ে ব্যাংকগুলোও প্রতারিত হতে লাগল। এ ওপর, আসল নোটও মাঝে মাঝে এমন ফাড়ে-তাই ভাবে ছাপা হত যে জাল নোট শিল্পীদের পক্ষে লোভ সম্বরণ করা বিলক্ষণ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে জালিয়াত দেব এহেন সুবর্ণযুগেবও অবসান ঘটল। ব্যাংক চার্টার আইন সৃষ্টি হল এবং যত সোনা, তত নোট ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড বানাতো ছাড়বে—এইভাবেই নোট নিয়ন্ত্রণ শব্দ হল।

ভারতের মৌক মূল্য

ভারতবর্ষেও এক শ্রেণীর অনাথ ব্যক্তির জাল টাকা বানানোর ব্যবসা ছিল। মেগডা আমলে এবং তারও আগে বোহর বা বর্ণমূল্য নকলা যে হত না, এমন কথা নিশ্চিত বদ্ব বলা যায় না। তবে ব্রিটিশ আমলে ১৯০০ সালেই এদিকে সরকার বাহাদুরের বিশেষ নজর পড়ে। মৌক মূল্যের ফলাও কারবার দেখে কতৃপক্ষের

নক নড়ে। একবছরের মধ্যেই ১৯০১ সালে আদেশজারী হল। প্রতিটি ট্রেজারীকে জাল টাকার হিসেব রাখতে হবে এবং ০ মাস অন্তর মিস্ট্রি মাস্টার আর কাবোবসী অফিসে বিবৃতি পাঠাতে হবে।

জাল টাকার দেশ তখন ছেড়ে গেছে। জালিয়াতদের মধ্যে কয়েকজন এমনই দক্ষ কাবগর ছিল যে তাদের শিল্পসৃষ্টিকে মেক বলে চেনাই যেত না। সাধারণ মানুষ তো বটেই, সবকাবী কর্মচারীরাও যখন জাল টাকার ক্ষয়বাহার দিশেহারা হয়ে উঠল, তখন ভারত সরকার উঠে পড়ে লাগলেন। মেক মুদ্রার উৎসে আবিস্কারের জন্যে তদানীন্তন ডাইরেক্টর অব ফ্রিন্যান্স ইন্টেলিজেন্স সার হ্যাবল্ড স্ট্রাটকে স্পেশাল অফিসারের পদে নিয়োগ করা হল।

সস্তা রূপো

সে যুগে মেক মুদ্রা বাজারে ছাড়ার মূল করণটি কিন্তু বাস্তবিকই কোভলোম্পীক। সারা পৃথিবীতে রূপোর উৎপাদন তখন দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি হলেই মূল্য হ্রাস হবেই। রূপোর দামও হ্রাস করে পড়তে লাগল। ১৮৮২ সালে ১০০ তেলা খাঁটি রূপোর দাম ছিল ১২০ টাকা। ১৮ বছর পরে সেই ১০০ তেলাবই দাম দাঁড়ালো ৬৮ টাকা থেকে ৭০ টাকা। রূপো সস্তা হতেই ধর্ম্মর জালিয়াতরা এমন সুযোগ ছাড়তে পারলে না। এর আগে মেক মুদ্রাও রূপোব খাদ মেশানো হত। কিন্তু রূপোব দামই যখন নেমে গেল, তখন আর খাদ মিশানোর কামেলার দরকাই রইল না। খাঁটি রূপো দিয়ে টাকা জাল করলেই তো পাবিকার পঁচিশ টাকা লুভ থেকে যায়। অর্থাৎ ৭০ টাকা দিয়ে ১০০ তেলা রূপো কিনে ১০০টি টাকা বানাতে, খুব জোর আরও ৫ টাকা খরচ হত। তাহলে মোট ৭৫ টাকা খরচ কবলে খাঁটি রূপোর ১০০ টাকা তৈরি হয়ে থাকে। লাভ থাকছে ২৫ টাকা। কাজেই এনে লাভজনক ব্যবসারে শব্দ মার্কামারা জালিয়াৎ কেন, দেশের বহু সেকরা আব কামারও নেমে পড়ল। সরকার বাহাদুর তখন সজাগ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু পিন্যাল কেডে বিশেষ ধরা জড়ে দেওয়া সত্ত্বেও সস্তার রূপোর টাকা তৈরির ব্যবসা অপ্রতিহত রইল।

প্রথমদিকে এরাই খাঁটি রূপোর উৎকৃষ্ট পেটাই টাকা বাজারে চালু করে। পেপাদার মুদ্রা জালিয়াতদের নিকৃষ্ট ঢালাই টাকার সঙ্গে এই টাকার বিপুল প্রভেদ ছিল। খাঁটি রূপো দিয়ে অভিনব জালিয়াতি শব্দ হওয়ার আগে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে টিন, সীসে, সস্তার সঙ্গে তারা মিশিয়ে ঢালাই মুদ্রা তৈরি হত। ফাদমাটি, গ্র্যানিট পাউডার, পসলিন ইন্টার গাউডো বা প্যাস্টার অব প্যারিসের ছাঁচে গলিত আদমাকু ঢেলে ঢালাই টাকা হত। কিন্তু

রূপোর ওপর প্রচণ্ড চাপ দিয়ে পেটাই মুদ্রার সৃষ্টি। পেটাই মুদ্রার ছাঁচ তৈরি হত ইস্পাত, তামা পেতল বা গান-মেটাল দিয়ে। তামা বা পেতলের ছাঁচ বড় একটা পাওয়া যেত না। বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রার ছাঁচ বোম্বাইয়ের খোলা বাজারেও কিনতে পাওয়া যেত। কলকাতা, মাদ্রাজ, কাঁকিনাডার সেকরারাও হরেকরকম ছাঁচ তৈরি করত। লোহা আর ইস্পাতের ছাঁচে দেশ ছেড়ে গেল।

মুদ্রাজালিয়াতদের প্রেরণা বিভাগ

সেকালের মুদ্রাজালিয়াতরা বংশপরম্পরায় জালিয়াতি করে রুটি রোজগার করত। বেকন, বিজাপুরের চুপারবন্দ। বহু পুরুষ ধরে ভারতবর্ষে নিকৃষ্ট মুদ্রা চালানোর জন্যে এরাই দারী। গুজরাতে 'বটরীরা' কারিগররাও চুপারবন্দ-এর মত পুরুষানুক্রমে লোক ঠিকিয়েছে। এ ছাড়াও আছে, বাংলার 'কিচুক', মাদ্রাজের 'কেপমারী', আর ফতেপুরের 'অম্বা' সম্প্রদায়। বিভিন্ন প্রদেশে নকল টাকা চালিয়ে এরাই সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে। এরা রূপোর টাকার জার্মান সিলভারের খাদ মিশাতে। মুদ্রাশিল্পে এদের নিপুণতা দেখে অনেক বিশেষজ্ঞেরও তাক লেগে যেত। নিরাপত্তার খাতিরে এদের ছাঁচ তৈরির প্রণালী কোনো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। রেলওয়ে স্টেশন জাল টাকা চালানোর সবচাইতে নিরাপদ স্থান ছিল। ১৯১১ সালের শেষের তিন মাসের রিপোর্ট খতিয়ে দেখলেই জানা যায়, শব্দ এই তিন মাসেই বিভিন্ন রেলওয়ে থেকে মোট ১০৮১১টি মেক টাকা উদ্ধার করা হয়েছিল।

বাংলার মেক মুদ্রা

বাংলা দেশে জাল টাকার সবচাইতে বেশি উৎপাদন হতো। ১৯০৮-১০ সালে শব্দ বাংলা দেশেই বছরে ৪০,০০০ জাল টাকা পাওয়া যেত। অর্থাৎ, সারা ভারতবর্ষে যত জাল টাকা বাজারে চালু ছিল, তার এক তৃতীয়াংশের ক্ষেত্র ছিল এই বাংলা দেশ। বিশেষ করে ১৯০৮-৯ সালে নকল মুদ্রার কলকাতা ছেড়ে গেল। এখন অবস্থা অবস্থা অন্য রকম।

সেযুগে কিন্তু এই কলকাতা জালিয়াতদের স্বর্গভূমি ছিল। বাজার ক্যাপে হামেশাই ঢালাই জাল টাকা মিলত।

১৯১১ সালের মে মাসে সাহেবগঞ্জ থেকে কলকাতার আসার পথে পণ্ডাজন মারওয়াড়ী 'বটরীরা' জালিয়াৎ ধরা পড়ে। ১৯০৬-৭ সালে জলখরের একদল পাজাবী আগ্রাতে 'মুর্শিদাবাদী' টাকা তৈরি করার অপরাধে মোহী সবাস্ত হওয়ার পর কলকাতাও চলে আসে এবং হ্যারিসন রোড ও আশপাশে ডেরা নেয়। অন্যতকাল পরেই নকল মুদ্রার লাভজনক ব্যবসা ক্ষেত্রে বসে তারা। সরকারী মুদ্রার বদলে এরা তৈরি করত 'চারইয়ারী', 'মুর্শিদাবাদী', 'মজা', 'মদিনা', 'ফামচন্দর', 'পণ্ডালা' আর 'আকবরী' মুদ্রা। খাঁটি

রূপো আর জার্মান সিলভার—এই দুই ধাতু দিয়ে তারা দুরকম মুদ্রা বানাত। ধর্ম্মবাসী হিন্দু-মুসলমানরা এই টাকার মালা তৈরি করে গলার ধারণ করত। ইরানী আর কাবুলি-ওয়ালারা অল্প জনসাধারণের কাছে পুণ্যভূমির মুদ্রা হিসেবে জার্মান সিলভারের মুদ্রা বিক্রি করত। পরগম্ভবের নামাঙ্কিত মুদ্রা দেখে ধর্ম্মভীরু মুসলমানরা অবিশ্বাসও করতে পারত না। ১৯০৭ সালে কলকাতা পুলিশ এইরকম একটা পাজাবী দলকে আদালতে হাজির করে। কিন্তু হাইকোর্ট থেকে তারা বেকসুর খালাস পায় এই কারণে যে, এ মুদ্রা নাকি নেহাৎই Sham curiosity টাকা যখন ট্রেজারীতে জমা পড়ে নি, তখন তা প্রতারণার আওতার আসতে পারে না।

১৯০০ সালে হাওড়া থেকে হারদ্রাবাদ যাওয়ার সময়ে চারজন চুপারবন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেহতল্লাশি করে তাদের কাছে ১০০০ টাকা পাওয়া যায়। আসল টাকা—নকল নয়। বলাবাহুল্য, কলকাতার নকল টাকা চালিয়েই এতগুলি আসল টাকা রোজগার করে তারা দেশে ফিরছিল।

শীতকালীন অভিযান

গুজরাতে 'বটরীরা' সম্প্রদায়ের শাখা বাংলার 'কিচুক' সম্প্রদায় বসবাস করত বাংলার নর্দান ফ্রন্টিয়ারে। প্রতি বছর শীতকালে এদের অভিযান শব্দ হত। ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়ে সারা বাংলা চষ ফেলত। এই সময়ে ফতেপুর জেলার 'অম্বা'রাও বৌয়ের পড়ত। ব্রাহ্মণ, বোণী আর ফকিরের হুম্মবোশে সমগ্র উত্তরপ্রদেশ আর পশ্চিম বাংলার নিরীহ জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে বেড়াত। মাদ্রাজের 'কেপমারী'রাও পিছিয়ে থাকবার পাত্র ছিল না। লুটেপুটে বিন্দব অর্থ রোজগারের সংকল্প নিয়ে তারাও নিরামিত বাংলা সফরে আসত। সংকেপে, গোড়ভূমি সারা ভারতের জালিয়াতদের বৃহত্তম ব্যবসাক্ষেত্র ছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের নাম কলকাতা বা বাংলা দেশ থেকে মুছে গেলেও 'কেপমারী' সম্প্রদায়ের নাম আজও মাঝে মাঝে শোনা যায়। তবে এদের আদিভূমি যে মাদ্রাজ, তা অনেকেই জানেন না। 'কেপমারী'দের যে চাইরা ছাঁচ তৈরি করত আর তারা টাকা নিত, এরা কলকাতার কলেজ স্ট্রীট আর বটবাজারে হাটুড়ে ডাক্তার, অর্থ নিবাসময়কারী চিকিৎসক হিসেবে স্থায়ীভাবে বসবাস শব্দ করে দেয় এবং পুশার থাকুক আর না থাকুক, ধোঁকার ঠাট বজায় রেখে তলে তলে আসল কারবার চালাতে থাকে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এরাই ঢালাই মুদ্রার জালিয়াৎ হিসেবে পরিচিত ছিল।

এইভাবেই, জমিদার-অধ্যুষিত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত বাংলা দেশে যুগ-যুগ ধরে বহু প্রতারক এসেছে এবং আস্তানা গেড়েছে এবং কালক্রমে তারাও বাঙালী প্রতারক হিসেবে ক্রখ্যাত হয়েছে। (ক্রমশঃ)

ভারত প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষামূলক

ইংরাজরাই এদেশে প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণা শুরুর করেন। প্রথম ইংরাজ যিনি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করেছিলেন, স্বহস্তে দেনাগরী ও বাংলা হরফ নির্মাণ করেছিলেন এবং কয়েকটি লেখনমালায় অনুবাদ করেছিলেন—তিনি হচ্ছেন চার্লস উইলকিন্স। তবে ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে শুরুর হয়েছিল ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়াম জেমস কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে। জেমস তাঁর শক্তিশালী ও মনোবাহিতার জন্মবাদের দ্বারা—জগতের মনীষীদের নিকট সংস্কৃতভাষার রহস্যভাষার উন্মোচন করে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, ভারতীয় ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায়গুলি পুনরুদ্ধারও তাঁর অবদান বড় কম নয়। এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে তাঁর পঠিত নিবন্ধাবলীই তার প্রমাণ। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জেমসের অকালমৃত্যু ঘটলে এশিয়াটিক সোসাইটির দায়িত্বভার হেনরী কোলব্রুকের ওপর ন্যস্ত হয়। ভারতের মর্ম, দর্শন, ভাষা, সাহিত্য, আইন, গণিত, জ্যোতিষ—এমন কোন বিষয় নেই যার ওপর রচনার কোলব্রুক অসামান্য পাণ্ডিত্যের নিদর্শন রেখে যান নি। প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর কাজকর্ম অবশ্য বড়ই সীমাবদ্ধ ছিল; দিল্লীস্টেজে উৎকীর্ণ বিশাল-হ্রদের শিলালিপিগুলি অনুবাদ ভিন্ন আর তেমন কিছু কাজ করেন নি। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক ইংলণ্ডে চলে যাবার পর এশিয়াটিক সোসাইটির দায়িত্বভার হেরেস হোম্যান উইলকিন্সের হাতে এসে পড়ে। মেঘদূতের অনুবাদ, সংস্কৃত অভিধান, হিন্দু নাট্যশালা, কাম্বোজের হিন্দু ইতিহাস ইত্যাদি রচনা উইলকিন্সকে অমর করেছে। উইলকিন্স প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপ শুরুর করেন ১৮৩০ সালে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পর। আকর্ষণীয়তার বিভিন্ন অঙ্গে প্রাপ্ত মূর্তি ও অপরূপ নিদর্শনের ওপরেই তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল। উইলকিন্স স্বদেশে ফিরে গেলে প্রাচ্যবিদ্যার সমস্ত দায়দায়িত্ব ডঃ মিলের ক্ষেত্রে ন্যস্ত হয়। তাঁর তিনজন পুত্রস্বরূপ মত তিনিও নিপুণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর নিকট আমরা কয়েকটি লেখমালার অনুবাদের জন্য ঋণী। কিন্তু তিনি বেশদিন ভাবতে অকথন করেন নি, ১৮৩৭ সালেই তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান।

এরপর আমরা এমন কয়েকজন মানুষের নাম করব যারা সংস্কৃতজ্ঞ না হলেও ভাবতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ডঃ বুকাননের নাম করতে হয়। তিনি ছিলেন মহাদেশের কৃষি-পরিদর্শক কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তাঁর

আকর্ষণ ছিল বেশি। তিনিই প্রথম গয়া, বরগাঁও, কাশি প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ নিদর্শনগুলির প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশের স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভেয়ার পদে নিযুক্ত হন এবং শাহাবাদ, ভাঙ্গলপুর, গোরখপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, রংপুর, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অনুসন্ধান চালান। এই অনুসন্ধানের ফল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু বুকাননকে তাঁর কৃতিত্ব থেকে সুপরি-কল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সনট নামক জনৈক অনুসন্ধিৎসু সলসেদ ধাঁপের কানহেরী গৃহের একটি সচিত্র বিবরণ প্রস্তুত করেন, এবং তা প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। ওই একই সময়ে আরবকাইন এলিফাটা গৃহগুলির সচিত্র বিবরণ প্রস্তুত করেন। পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ

নরেন ভট্টাচার্য

ছিল কর্নেল সাইকস কর্তৃক বিজাপুরের প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ প্রকাশ। সাইকসের কৃতিত্ব অবশ্য সম্পাদনার, কেন না বিবরণগুলি লিখেছিলেন মিডোজ টেসর এবং জেমস ফার্দুসন, হবি একেছিলেন হট ও কামিং এবং আলোকচিত্রী ছিলেন লক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইলোরার স্থাপত্যশিল্পের প্রাথমিক পরিচয় দেওয়ার কৃতিত্ব কর্নেল সাইকসের। দক্ষিণ ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের চিত্রাঙ্কন যিনি সর্বপ্রথম করেছিলেন তাঁর নাম টমাস ড্যানিয়েল। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল মহাবলিপুত্রের সপ্তপ্যাগোডা। ড্যানিয়েলের উত্তরাধিকারী ছিলেন কর্নেল কলিন ম্যাকোজ। পাণ্ডুলিপি ও লেখমালা সংগ্রহে তিনি বিশেষরূপ প্রতিভা পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের চিত্রাবলী দশটি অতিক্রম করে সংকলিত হয়েছিল যদিও দূর্বর্ণ্যগ্রন্থে সেগুলি প্রকাশিত হয় নি। তিনি কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে ৮৩৭৬টি তামিল লেখমালা সংগ্রহ করেছিলেন। অনুবদপভাবে উত্তর ভারতের প্রত্নতত্ত্ব যার দ্বারা প্রচুর উপকৃত হয়েছে তিনি হচ্ছেন মেজর মাঘম কিটো। ১৮৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বিহার প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন এবং সেই সূত্রে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করেন। কিটোর আবিষ্কারসমূহ প্রধানত মন্দির, স্থাপত্য ও লেখমালার ক্ষেত্রেই—সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের দ্বারা ফেরুয়ারী তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর শেষ ভাষণ দেন যার বিষয়-

বস্তু ছিল সারনাথের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। তিঁয়ে Illustrations of Indian Architecture এই শিরোনামে একটি চিত্রসংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। প্রাচীন নিদর্শনসমূহের প্রতি কিটোর আকর্ষণ তাঁকে জেমস প্রিন্সেপের শ্রমপত্র করে তুলেছিল যিনি তাঁকে খণ্ডিগবিতে পাঠিয়েছিলেন একটি শিল্পলেখ্য নকল করার জন্য এবং সেই সূত্রেই মৌলির বিখ্যাত অশোক-লিপি আবিষ্কৃত হয়।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ডঃ মিল স্বদেশে ফিরে গেলে তাঁর উত্তরাধিকারী হন জেমস প্রিন্সেপ, যার নাম ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক আকাশে নক্ষত্রের অঙ্করে লেখা আছে। মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় প্রত্নতত্ত্বের স্বাক্ষরে শাপিল ও ও রলিনসনের যে অবদান, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে প্রিন্সেপের অবদান কোন অংশে কম নয়। পূর্ববর্তী প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিকট যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, অর্থৎ পাঠোদ্ধারের সমস্যা, তা সমাধান করার সূত্র প্রিন্সেপই আবিষ্কার করেছিলেন। প্রিন্সেপের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ব্যাক্ট্রীয় গ্রীক মূর্তির অজ্ঞাত লিপির পাঠোদ্ধার এবং পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলির পাঠোদ্ধার এবং অনুবাদ। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখে তাঁর অকাল-মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাঁর এই স্বল্পকালীন জীবনে তিনি অজস্র লেখমালার পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ করেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে তাঁর যে কতখানি অবদান তা বোঝা যাবে যদি তাঁর Essays on Indian Antiquities গ্রন্থখানি পাঠ করা যায়। এডওয়ার্ড টমাস সম্পাদিত এই গ্রন্থটির ভূমিকায় প্রিন্সেপের প্রতিভা সর্বথেষ্ট তাঁর বন্ধু হিউ ফলকোনার যা বলেছেন : 'Of his intellectual character the most prominent feature was enthusiasm—One of the prime elements of genius ; a burning irrepressible enthusiasm, to which nothing could set bounds, and which communicated itself to whatever came before him --- To this enthusiasm was fortunately united a habitude of order. and power of generalization; which enabled him to grasp and comprehend the greatest variety of details. His powers of perception were impressed with genius—they were clear, vigorous and instantaneous.'

প্রেসেপের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উত্তর ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন জেমস ফারগুসন, এডওয়ার্ড টমাস ও আলেকজান্ডার কানিংহাম; দক্ষিণভারতে সাব ওয়াল্টার ইলিয়ট এবং পশ্চিমভারতে কর্নেল মিডোজ টেলর, ডঃ স্টিভেনসন এবং ডঃ ভাউ দাজী। ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ওপর জেমস ফারগুসনের অধিকারের তুলনা সেখানে ছিল না। এডওয়ার্ড টমাস মদ্রাস, লেখমালা ও অপব্যাপার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে ভাবত-ইতিহাসের একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। তাঁর অল্প রচনা প্রত্নতাত্ত্বিক জগৎ সমৃদ্ধ হয়েছে। কর্নেল মিডোজ যে কাজ দক্ষিণ ভারতে শুরু করেছিলেন তা সম্পূর্ণ হয়েছিল সার ওয়াল্টার ইলিয়টের হাতে। ইলিয়ট ৫১৫টি লেখমালা সংগ্রহ করেছিলেন। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব তাঁর প্রধান অবদান হচ্ছে এই লেখমালা ও পণ্ডিত ভিত্তি করে নর্মদা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজবংশগুলির ধারাবাহিক বৃত্তান্ত প্রণয়ন। পশ্চিম ভারতে কর্নেল মিডোজ টেলর এবং ডঃ স্টিভেনসন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছেন। টেলরের কাজ ছিল অবশ্য কিছুটা নৃতত্ত্বময়ী। প্রাগৈতিহাসিক অবশেষগুলির প্রতিই ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। ডঃ স্টিভেনসনের নিকট আমরা পশ্চিমভারতের অল্প লেখমালার অনুবাদের জন্য ঋণী; তিনি দক্ষিণ ভাষাতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের ওপরেও বহুখণ্ড আলোকপাত করেছেন। স্টিভেনসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ ভাউ দাজী বার কাজ প্রত্নতাত্ত্বিক জগতে খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রেসেপের শেষ সহযোগী হচ্ছেন আলেকজান্ডার কানিংহাম। এই কানিংহামই হচ্ছেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে নবমুগের প্রবর্তক। ব্যক্তিগত জীবনে কানিংহাম ছিলেন প্রেসেপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রত্নতাত্ত্বিক জগতে তিনি ধীরে ধীরে মূলধন সংগ্রহ করেছেন তারপর একদিন সাম্রাজ্যের চরম সীমায় পৌঁছেছেন। ১৮৬১ সাল থেকেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ওপর সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এবং ওই বছরেই কানিংহাম নতুন করে ভারতের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার পদে নিযুক্ত হলেন।

এই প্রসঙ্গে লর্ড ক্যানিং-এর নিকট কানিংহাম যে স্মারকলিপি পেশ করেন এবং তার প্রত্যন্তরে লর্ড ক্যানিং যে ঘোষণাপত্র জারী করেন তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ সরকার যাতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে নজর দেন এই উদ্দেশ্যে কানিংহাম তদানীন্তন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে তিনি অভিযোগ করেন যে, ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নি। তিনি খলসি, হারিয়ার, মধুরা, সংকিশা, বিল্লী,

কনৌজ, কৌশাম্বী, এলাহাবাদ, বাজুরাহো, বারানসী, জৌনপুর, ফৈজাবাদ, প্রাবস্তী, কপিলবাস্তু, কুশীনগর, বৈশালী, পাটনা, রাজ-গৃহ প্রভৃতি স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্ভাবনার কথা তাঁর স্মারকলিপিতে তুলে ধরেন। এ ছাড়া তিনি নিজের পরিকল্পনার কথাও পেশ করেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে, তাঁর অনুসন্ধান সম্ভব শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি করতে চান। কানিংহামের এই স্মারকলিপির প্রত্যন্তরে লর্ড ক্যানিং একটি ঘোষণাপত্র জারী করেন। এই ঘোষণাপত্রে তিনি-প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে সরকারের অবহেলার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। কানিংহামকে তিনি এই বিষয়ে সকল দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁর বেতন স্থির হয় মাসে ৪৫০, টাকা এবং অনুসন্ধান চলাকালীন অপরাপর ব্যয়নির্বাহের জন্য আরও ২৫০, টাকা। একধাণে তিনি ঘোষণা করেন যে, কাজের ক্ষেত্রে কানিংহামের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, এবং সরকার যখন-তখন তাঁর কাজে নাক গলাবেন না। দীর্ঘকাল কানিংহাম আর্কিওলজিক্যাল পরিচালনার প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ অতীতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সে কৃতিত্বের বিবরণ পরবর্তী রচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার থেকে উন্নীত হয়ে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার পদে নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি ১৮৬১-৬৫র প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দুটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ডিরেক্টর জেনারেল হিসাবে তিনি তাঁর রিপোর্টের তৃতীয়, পঞ্চম, নবম থেকে একাদশ, চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ এবং বিংশ থেকে ষাটশ খণ্ড রচনা করেন। চতুর্থ, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম, ষাটশ, দ্বয়োদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, দ্বয়োবিংশ ও ত্রয়োবিংশ খণ্ডগুলি তাঁর সহকারীদের দ্বারা রচিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত কানিংহাম যে সকল লেখমালার সম্ভান পেয়েছিলেন তা থেকে বাছাই করে তিনি Inscriptions of Asoka নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি Corpus Inscriptionum Indicarum সিরিজের প্রথম খণ্ডরূপে পরিচিত হয় এবং এই গ্রন্থটির সংশোধিত সংস্করণ বার করেন ই. হুলজ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। গুলজেনগুলি প্রকাশ করেন জে. এফ. ফ্রাট, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে Corpus-এর তৃতীয় খণ্ডে, নাম-দেন Inscriptions of the Early Gupta kings and their successors। Corpus সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় লেটন কসোর লণ্ডা-

ননায়; চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ডি. ডি. মিষাশীর সম্পাদনায় ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে।

প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপের আদিদৃশ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন লেখমালা Journal of the Bengal Asiatic Society, Asiatic Researches, Journal of the Royal Asiatic Society, Madras Journal of Literature and Science, Numismatic chronicle প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হয়। ওয়াল্টার ইলিয়টের Carnataka Des a Inscriptions (অপ্রকাশিত দু'খণ্ড) এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লন্ডনের Royal Asiatic Society-র গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহীশূর সরকার ১৫০টি লেখমালার একটি আলোকচিত্র সংকলন প্রকাশ করেন এবং পবৎসর ষিয়েরডোর হোপ ৬৪টি আলোকচিত্রের একটি সংকলন প্রকাশ করেন, নাম দেন Inscriptions of Dharwar and Mysore। এইসব সংকলনগুলির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ ইন্ডিয়া অফিসের চেম্বার, Pali, Sanscrit and Old Canarese Inscriptions—এই শিরোনামের স্রীমৈ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রাইস Mysore Inscriptions প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি Inscriptions of Sravana Belgola এবং Epigraphia Carnatica-র কয়েকটি খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হুলজ (E. Hultzsch) South Indian Inscription-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। এ পর্যন্ত এই সিরিজের তেরটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই মাদ্রাজ সরকার প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপের রিপোর্ট প্রকাশ করছিলেন, Annual Report on South Indian Epigraphy, এ নামে। এই কাজ ১৯২১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তা ছাড়া বেসরকারী প্রচেষ্টাও যে পাশাপাশি চলেনি তা নয়। এই প্রসঙ্গে রাজশাহীর কয়েক অনুসন্ধান সমিতির Inscriptions of Bengal-এর উল্লেখ করা যেতে পারে, তা ছাড়া নাহারের জৈন লেখনগ্রন্থ, ভট্টাচার্যের কামরূপশাসনাবলী, শ্রীনিবাসচরণের Inscriptions in the Telungana Districts, গাদগের Important Inscriptions of the Baroda State ইত্যাদি গ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কানিংহামের উত্তরাধিকারী বার্জেস Epigraphia Indica প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত পত্রিকার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, এবং আজ পর্যন্ত তার প্রকাশ অব্যাহত আছে।



পরপ নেহারলু-শিকাগো

প্রজ্ঞা : ড. হীরাবাগ

পরের দিন টেবিলে ডিপার্টমেন্টের মিসেস ম্যারী লী আমাকে ড্রাইভ করে নিয়ে গেলেন ৩৬০ ওয়েস্ট হিলের বাড়ি এলিমেন্টারি স্কুলে। মিসেস লীর বরষ সন্তরের কাছাকাছি। ছেলেপুলে নাতিশীর্ণ অলেকগুলি। তাস খেলায় তার ভীষণ নেশা। অনেক প্রতিযোগিতায় রিজ খেলেন। এতো বরষ, কিন্তু তিনি নবীনতার প্রচণ্ড উৎসাহী এবং আধুনিক ছবিভার একজন ডক্ট পাঠিকা। যখন শুনলেন আমি আধুনিক কবিতা লিখি তখন নিজে থেকেই বললেন, আমি তোমাকে স্কুল দেখতে নিয়ে যাব। তবে শর্ত হচ্ছে তোমাকে তোমার কবিতা অনুবাদ কবে শোনাতে হবে।

বাড়ি স্কুলে পৌঁছতে মিনিট পাঁচশের বেশি লাগল না। স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন না। তাই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল মিসেস গর্ডন আমাকে নিয়ে ক্লাসগুলি ঘুরে ঘুরে দেখালেন। বাড়ি স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের শতকরা, নিরানন্দইজনই নিগো। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই স্কুলের একটি নিজস্ব ক্রোকড স্যাকটি টিভি স্টুডিও আছে। আমি গ্রেড টুর একটি গণিতের প্রোগ্রাম দেখলাম। বিদ্যালয়টি পঠন-পাঠনের মান খুবই উঁচু। বিল্ডিংটিও চমৎকার।

এর পর গেলাম শিকাগো টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (নর্থ)-এ। এর নতুন হোলগোনা বিল্ডিংটি দেখলে চোখ কেমনো যায় না। এর অডিও-ভিসুয়াল সেকশনের ল্যাবরেটরি ল্যাব-রেটরির সরঞ্জাম বিস্ময়কর। ভাইস-প্রিন্সিপাল আমাকে কলেজ দেখাছিলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, আপনারা অডিও-ভিসুয়াল এডের ব্যবহার করা যখন এমন করে প্রতি লেসনই কি প্রোগ্রাম করে পড়ান?

—না, দেখুন, প্রতি লেসন প্রোগ্রাম করতে বহু সময় লাগে এবং তাতে বহু স্মিতারও প্রয়োজন হয়। লেসন প্রোগ্রাম করতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন? ভালো শিক্ষকদের মধ্যে যারা অডিও-ভিসুয়াল এডের ব্যবহার বিশেষভাবে সমর্থন করেন তারাও ভাবেন, প্রতিদিন এসব এড ছাড়াই তো পড়ানো, এখন

আর অত খেটে কি হবে? তা ছাড়া একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কোর্স শেষ করার তাগিদও আছে।

—সত্যি, অডিও-ভিসুয়াল এড ব্যবহার না করার কারণ দুটি আপনি ঠিকই ধরেছেন। এড ব্যবহারে যে শিক্ষকের পরিচয় কমে অথচ শিক্ষণীয় বিষয়টি মনোহর হয়ে উঠে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কমিউনিকেশনের প্রসেস সহজ ও সুষ্ঠু হয় এবং সেইসঙ্গে তাদের সন্তুষ্টিরও উন্নতি ঘটে এই কথাটা বিশেষ করে বোঝানো দরকার। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

—আমারও তাই মনে হয়।

কলেজের ক্যাসেটরুমতে লরগের সময় জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডক্টর বেজামিন সি, উইলিসের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি একাধিকবার ভারতবর্ষে এসেছেন। কলকাতা দেখবার সুযোগও তার হয়েছে। তিনি আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে অভ্যন্তর আগ্রহের সঙ্গে শোঁক্খবর নিলেন।

লরগের পর মিসেস ম্যারী লী আমাকে হোটেল পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

পরের দিন বোর্ড অব এডুকেশনের মিস্টার রাইল্ডস্ট্রাব আমাকে নিয়ে গেলেন রাইট জুনিয়র কলেজে। এবোলেন চালনার অগ্রদূত রাইট স্মৃতিস্ময়ের নাম অনুসারেই এই কলেজের নামকরণ করা হয়েছে। এই কলেজের টেলিভিশন বিভাগ বিখ্যাত। এই বিভাগের প্রধান মিস্টার হাইমেন এম, চসো বললেন, ডবলিউ টি টি ডবলিউ-চ্যানেল ১১-এ আমাদের লেসন রেকর্ড করা হয়। ঘরে বসে টিভিতে লেসন দেখে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের পরীক্ষা দিয়ে রেজিউ পেতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ের জন্যে কোন কোন জায়গার ছাত্রেরা যাতে নিজেরা পরীক্ষা করতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হয়।

আমি বললাম, তাহলে আপনার এই বিভাগটি একেবারে রেগুলায় টিভি কলেজ।

—তা আপনি বলতে পারেন।

—আচ্ছা, টিভি লেসন দেখে ছাত্রদের কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে তারা কি টিভি টিচারকে জ্ঞানতে পারে?

—নিশ্চয়ই। এই দেখুন ছাত্রদের কাছ

থেকে কত চিঠি এসেছে। এ ছাড়া টেলিফোনে অনেকবার তো আছেই।

—টিভি কলেজের ব্যাপারে সাধারণের উৎসাহ কেমন?

—খুবই। এনরোলমেন্টের সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে যে আমরা তার সঙ্গে তাল দিয়ে পারছি না।

—আপনাদের স্টুডিও কোথায়?

—মিউজিয়াম অব সায়েন্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বিল্ডিং-এ। ডবলিউ টি টি ডবলিউ হচ্ছে কমার্শিয়াল স্টেশন। আমরা টাকা দিয়ে এর ১১ নম্বর চ্যানেলটা ব্যবহার করি।

মিস্টার চসো আমাকে অডিটোরিয়ামে নিয়ে গেলেন টিভি লেসন দেখানোর জন্যে। টিভিতে ব্যালোজ পড়ানো হচ্ছে। এইখানে দেখলাম একসঙ্গে অনেকগুলি ছাত্রছাত্রী যাতে দেখতে পায় সেই উদ্দেশ্যে টিভির ছবিকে বড় করে দেখানোর জন্যে পিছন থেকে একটি পর্দার ওপরে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় পর্দায় প্রতিফলিত করে ছবিকে বড় করা না গেলে একাধিক টিভি সেট ব্যবহার করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমিও টিভি দেখতে বসে গেলাম। লেসন শেষ হয়ে গেলে মিস্টার চসো জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলেন?

আমি বললাম, ভালোই। কিন্তু লেসনের মধ্যে শিক্ষক বলতে গেলে একেবারেই উপস্থিত হয়েছেন। শিক্ষককে আরো ইনভলভড করা দরকার নয় কি? তা না হলে তো শিক্ষণ ব্যাপারটা একটা নীরস, স্ট্যাটিক ও প্রাথমিক পদ্ধতি হয়ে দাঁড়াবে। অডিও-ভিসুয়াল এড শিক্ষককে রিএঙ্গে করতে না, তাকে ভো স্যাম্পলমেন্ট করবে। আপনার কি মনে হয়?

—আপনি তো ঠিকই বলেছেন।

কলেজের লাইব্রেরিটি আমাব খুবই ভালো লাগল। সাধারণ বইয়ের লাইব্রেরির সঙ্গে অডিও-ভিসুয়াল এডের লাইব্রেরি মিলেমিলে একটি সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা অডিও-ভিসুয়াল এডের সঙ্গে পরিচয়ের বেশি সুযোগ পায় এবং সে সম্বন্ধে সহজেই আগ্রহী হয়ে ওঠে। লাইব্রেরিতে

গাথাহিক বসমতী

স্বইক্সোফর্মের সংগ্রহটি বিশেষভাবে দৃষ্ট আকর্ষণ করে। সেসবগুলিই 'হ্যামলেট', 'ওথেলো' প্রভৃতি নাটকগুলির অভিনয়ের ছবিগুলি সংগ্রহ করে যে স্টাডিজ কিট তৈরী করা হয়েছে তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমন শিক্ষণীয়। বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রী কর্তৃক অভিনীত নাটকগুলির ছবিসমূহে নতুন করে জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে অনুভব করতে লাগলাম।

পরের দিন মিসেস নীর সঙ্গে গেলাম লেন টেকনিক্যাল হাই স্কুল, নিকোলাস সেন হাই স্কুল ও অলেকজান্ডার গ্রেহাম বেল এলিমেন্টারি স্কুলে। আমেরিকাতে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। লেন হাই স্কুলের চমৎকার ল্যাবগেয়েজ ল্যাবরেটরিটি দেখতে গিয়ে শুধুলাম সেখানে পোলিশ, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, জার্মান ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। থবর নিয়ে ছানলাম যে, ল্যাটিন ও স্প্যানিশ ভাষার প্রতি মাথাবনের আগ্রহ করে গিয়ে জার্মান ও রাশিয়ান ভাষার প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বেল এলিমেন্টারি স্কুলে ঢুকতেই দেখলাম একটি ছাত্র কুকুরের চেন ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। শীঘ্রই জানতে পারলাম যে এখন নর্মাল ছাত্রদের সঙ্গেই ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ্টদের একই ক্লাসে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে হ্যান্ডিক্যাপ্টরা যেমন নর্মালদের সঙ্গে মিশে নর্মাল হবার চেষ্টা করে তেমন নর্মালরা তাদের হতাশাগ্রস্ত সহপাঠীদের বিষয়ে সমতা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে। প্রিন্সিপাল মিস প্রুইট আমাকে একটি ক্লাসে ছেলেক্সের সামনে

কিছু বলতে বললেন। ক্লাসে ঢুকে দেখি সেখানকার বোর্ডে ভারতের মানচিত্র আটকানো রয়েছে। শিক্ষয়িত্রী বললেন, 'ছেলেক্সেরদের বলা হয়েছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে যা পারবে সংগ্রহ করে আনতে। এই দেখুন কেউ এনেছে মুদ্রা, কেউ তালমহলের ছবি, কেউ শাড়ির টুকরো আর ঐ দেখুন—'

দেখলাম একটি মেয়ে একটি চমৎকার হাড়ির দাঁতের মালা পরে এসেছে। বেদিন বা পড়ানো হয় সেদিন সে সম্পর্কে জিনিস সংগ্রহ করে আনা এখানকার নিয়ম। এতে বিজ্ঞের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং একে অপরের জিনিস দেখবার সুযোগ পেরে প্রত্যেক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে লাভবান হয়। আমি লক্ষ্য করছি যখন যারা আমাকে তাঁদের গৃহে নিমন্ত্রণ করেছেন তখন তারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁদের প্রাণিত ও আগ্রহ দেখাবার জন্যে ভারতীয় দ্রব্যের সংগ্রহ বথালম্ভব সামনে সাজিয়ে রেখেছেন।

এর পর আমার পুরো একটি দিন কাটল কতকগুলি অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার দেখে। এখানকার অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টারগুলি অনেক ক্ষেত্রেই কমিউনিটি সেন্টারের সংগে যুক্ত এবং তাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইমিগ্র্যান্টের সংখ্যাই বেশি। জুলিয়া ল্যাথপ সোস্যাল ক্লাবের সংগে যুক্ত অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টারে গিয়ে দেখি একজন সুদীর্ঘ শিক্ষিকা সাত-আটজন বৃদ্ধাকে অক্ষর পরিচয় করানোর ব্যাপারে খেঁবের পরীক্ষা দিচ্ছেন। সকলেই যুগ্মের সমর এসেছিলেন ইংরেজির বিভিন্ন দেশ থেকে। কারো কারো ছেলেরা এখন লেখাপড়া শিখে

বয়েখাওয়া করেছে। এই বয়সেও তাদের শিক্ষাগোষ্ঠের আগ্রহ বিস্ময়কর। আমি শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা কেমন শিখছে?'

—'ভালো নয়। তবে এদের আগ্রহের অম্লত নেই। এখন এদের যদি আমরা শেখাতে পারি তবে সেটা তো আমাদেরই ব্যর্থতা।'

কথাটা আমার খুবই ভাল লাগল। এখানে আমি কখনও ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে কোন শিক্ষককে বলতে শুনিনি, 'তোমার কিছু হবে না, তোমার মাথার গোবর পোরা' কিংবা 'তোমার বাবা বা মাদা কত ভাল ছেলে ছিলেন, তুমি বংশের নাম ডেবালি।' ছেলেকে শিক্ষিত করে তোলা শিক্ষকের দায়িত্ব। বিভিন্ন ছাত্রের মেধা তারতম্য তো আছেই, কিন্তু সেই তারতম্য মেনে নিরে সঠিক পদ্ধতিতে ছাত্রকে শিক্ষিত করে তোলাতেই শিক্ষকের কৃতিত্ব এবং বলতে গেলে এতে তাঁর নিজেরই এক গুরুতর পরীক্ষা। শিক্ষা এখানে সামাজিক সমস্যা এবং তার সমাধানে সমগ্র জাতি একান্তভাবে তৎপর।

একদিন মিস্টার ম্যাককেগ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা প্রেসের ট্রেনিং-এব ডিবেন্ট মিস্টার জেনেফ ডিকম্যানের সংগে অলাপ করিয়ে দিলেন। মিস্টার ডিকম্যান চমৎকার লোক। তাঁর নিজের একটি ছোট প্লেন ছিল। তিনি নিজে ড্রাইভ করে প্লেনে পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন। কিছুদিন আগে আফ্রিকার কড়ের মধ্যে পড়ে তাঁর প্লেনটি নষ্ট হয়ে যায়। তিনি একজন নিগ্রো মহিলার চেষ্টার কোনমতে প্রাণ বেঁচে গেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আবার প্লেন কিনবেন নাকি?'

—একটু হেসে মিস্টার ডিকম্যান উত্তর দিলেন, 'সেইজন্যেই তো মন দিয়ে এখন চাকরি করছি। ব্যাপার কি জানেন? একবার পৃথিবীর ভরক যে সাড়া দিয়েছে তাকে মাঝে মাঝে সব ফেলে বেরতেই হবে।'

তাঁর কথাগুলি আমার খুব ভাল লাগল। তিনি আমাকে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা প্রেসে নিয়ে গিয়ে তাঁর কিস্তির কর্মপন্থা দেখালেন। মিস্টার ডিকম্যান এখন ব্রিটানিকা প্রেস থেকে যেসব এডুকেশনাল মেটেরিয়াল বের হয় সেগুলির ব্যবহারের বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় ওয়াকশপ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেন। ব্রিটানিকা প্রেস সোস্যাল স্টাডিজ সম্পর্কে কতকগুলি বই ছেপেছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কেও তাঁদের একটি বই আছে। মিস্টার ডিকম্যান আমাকে সোস্যাল স্টাডিজ সেকশনে নিয়ে গিয়ে ঐ বইটি দেখতে দিলেন। বইটি হাতে নিয়ে আমি কিস্তি হতবাক হয়ে গেলাম। বইটি লিখেছেন রাও উপাধিধারী একজন ভারতীয়। এঁর নাম 'এলিফ্যান্ট বয়'। হলিউডের কল্যাণে বহু জনপ্রিয় এলিফ্যান্ট বয় সাবুর কাহিনীর এ আর এক রূপ। ভারতবর্ষকে যে স্বল্পসংখ্যক আমেরিকান গভীরভাবে

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - বাগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীলঙ্কা - গোহাটী

শাস্তাহিক বঙ্গমতী

জানার চেষ্টা করে তাদের কথা আলাদা, কিন্তু সাধারণভাবে আমেরিকানদেরা ভারতবর্ষ কেন, অন্য প্রায় কোন দেশ সম্বন্ধেই বিশেষ কিছুই জানেন না। বর্তমানে একমাত্র রাশিয়ার বিষয়েই তাদের আগ্রহ দেখা যায়। আমি কোন কোন আমেরিকানকে বলতে শুনছি, 'আমাদের ইন্সটিটিউট ও অর্থ আছে। আমরাই সর্বত্র গিডারশিপ দেব। অন্য দেশের কাছ থেকে শেখবার বিশেষ কি আছে?' আমরা মনে হয় একজন ভারতীয় ছাত্র একজন আমেরিকান ছাত্রের চেয়ে বাইরের পৃথিবীর খবর বেশি রাখে। আমরা অন্যান্য দেশের উন্নতির কথা জেনে নিজেদের আরও উন্নতিবিধান করতে চাই বলে হয়ত এটি ঘটে থাকে।

আমি মিস্টার ডিকম্যানকে বললাম, 'দেখুন, যে দেশের সভ্যতার ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের চেয়েও পুরনো তার সোস্যাল স্ট্যাডিজ নিশ্চয়ই এলিফ্যান্ট বয় হতে পারে না। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমেরিকানদের ধারণা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শূন্য নব, অনেক ক্ষেত্রেই তা মারাত্মক রকমের প্রান্তিক পূর্ণ। ভারতবর্ষ বলতে তারা বোঝে হয় ডাক্তারহাল, না হয় ব্লু-স্ট্রাটকানো দেওয়ালের চালাকবেব সামনে শীর্ষ শিশুর পাল। তারা ভাবে ভারতবর্ষ হচ্ছে হাতী, বাঘ আর সাপের দেশ।

একজন আমেরিকান আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ভারতবর্ষে কি মোটর, রেলগাড়ি ইত্যাদি আছে? শুনছি হাতীই ওখানে বাতারাতেব একমাত্র উপায়।'

আর একজনের প্রশ্ন ছিল, 'আপনাদের কি স্নেক চার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন আছে?' আরও কত উদাহরণ দেব? যে জাতি পাঁচ হাজার বছর পৃথিবীর এত উত্থানপতনের মধ্য আজও বেঁচে থেকে নব নব ভাবে নিজেকে বিকশিত করে চলেছে, যাব-ইতিহাস লেখা আছে অজন্তা, ইলোরা, অশোকস্তম্ভ, কোনারক, মাদুরা, বেকুড়, সোমনাথপুর, বৃন্দাবন, খজুরাহো প্রভৃতির গারে, যার আয়াকে প্রকাশ করছে রামায়ণ, গীতা, মহাভারত, উপনিষদ থেকে শূন্য করে কত সাহিত্য, যেখানে জন্ম নিয়েছেন কুরু, বৃদ্ধ, শঙ্করাচার্য, কবীর প্রমুখ মহাপুরুষ—তার সোস্যাল স্ট্যাডিজ নিশ্চয়ই এলিফ্যান্ট বয় হতে পারে না।

মিস্টার ডিকম্যান বললেন, 'অনেক সময় চেষ্টা করবে আমরা মেরিটরিয়াল সংগ্রহ করতে পারি না। আজ সোস্যাল স্ট্যাডিজ ডিপার্ট-মেন্টের যিনি চার্জে আছেন তাকে আমাদের সঙ্গে লাগু খেতে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলে ভাল হবে।'

সোস্যাল স্ট্যাডিজ ডিপার্টমেন্টের চার্জে আছেন একজন মহিলা। তাঁর সহকারী একজন জাপানী। দুজনেই লাগু খেতে এলেন। আমি ভ্রমহিলাকে 'এলিফ্যান্ট বয়' সম্পর্কে

আমার প্রতিক্রিয়ার কথা জানলাম। তিনি আমার বক্তব্য গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনেন। বললেন, 'আমাদের অসম্পূর্ণতার জন্যে আমরা দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন? অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর চেষ্টা করেও আমরা ঠিক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না। আপনি যদি ভারতবর্ষ সম্পর্কে মেরিটরিয়াল পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করেন তবে শুবই ভাল হয়। কি বলেন মিস্টার ডিকম্যান?'

—তা হলে তো শুবই ভাল হয়। আশা করি এতে আপনাদের কোন আপত্তি হবে না। আমি বললাম, না, আমি যদি আপনাদের কোন সাহায্য আসতে পারি তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।'

লাগের পর মিস্টার ডিকম্যান আমাকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা কিম্বদন্তি নিয়ে গেলেন। শিক্ষাপ্রদ কিম্বদন্তির এমন সর্বাঙ্গীণ প্রয়াসকে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করতে হয়। মিস্টার ডিকম্যান ব্রিটানিকার 'জানাল উইসডম'-এর এক কপি আমাকে দিলেন। এমন সুন্দর পত্রিকা আমি শুব কমই দেখেছি। এর ছবিগুলির তুলনা হয় না।

এর পর মিস্টার ডিকম্যানের সঙ্গে গেলাম ব্রিটানিয়া অ্যাকাডেমি কর অ্যাডাল্টস দেখতে। বয়স্ক-শিক্ষার এই কেন্দ্রটিতে সমস্ত শিক্ষার্নীতিই প্রোগ্রামড মেরিটরিয়ালের উপর নির্ভরশীল। এদিক দিয়ে এর বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। আমেরিকার মধ্যে এইরকম স্কুল আর একটিও নেই।

মিস্টার ডিকম্যান আমাকে হোটলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

তুহারকড়ের প্রতাপ বেশ একটু কমে যেতে একদিন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। প্রথমে দেখা করলাম ডিপার্টমেন্ট অব ওরিয়েন্টাল ল্যাংগুয়েজের অ্যাড সিভিলিজে-শনের চেয়ারম্যান ডক্টর রেমন্ড এ. বার্ডম্যানের সঙ্গে। বানিকঞ্চ আলোচনা-আলোচনার পর তিনি আমাকে সংস্কৃতের অধ্যাপক জর্জ ভি. ব্রিস্কটের কাছে যেতে বললেন। ব্রিস্কটের কাছে দেখে একজন টিপি ক্যাল ভারতীয় সংস্কৃত পাণ্ডিত বলে মনে হয়। আসলে তিনি রাশিয়ান। তাঁর কাছে শুনলাম বাংলা বিভাগের প্রফেসর এডওয়ার্ড সি ডিমক বাংলা গবেষণার সূত্রে ভারতবর্ষে রفتهছেন। একটি সেমিনারের সূত্রে সংস্কৃত ও ভাবতর্কী অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক জে. এ. বি. ডন বুর্টেনিনও ভারতবর্ষে গিয়েছেন। এঁরা দুজনেই সাউথ এশিয়া ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড এরিয়া সেন্টারের কো-ডাইরেক্টর। মিস্টার বুর্টেনিন আমাকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন যে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে তিনি একটি সেমিনারে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু হঠাৎ ভারতে যেতে হওয়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না। আমি শুনছিলাম এখানে

অমদাশঙ্কর রায়ের ছেলে পুণ্যশ্রোক রায় আছেন। তিনি বাংলা বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর। জার্মানি থেকে দর্শনে ডক্টরেট করে বাংলা ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

পুণ্যশ্রোক রায়কে তাঁর ঘবেই পেলাম। তিনি টাইপ করছিলেন। আমি দবজার নক করতেই বললেন, 'কাম ইন।'

ঘরে ঢুকেই মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। রিসার্চের সুন্দর পরিবেশ। মিস্টার রায়ের সঙ্গে পরিচয় অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্তরংগতায় পৌঁছিল। তিনি বললেন, 'লাইভে আজ আপনি আমার গেস্ট। বলুন কি খাবেন? আচ্ছা, দাঁড়ান দেখি স্ট্রী কি তৈরি করেছেন।' ফোনে স্ট্রীকে আমার কথা জানিয়ে বললেন, 'আমি ঠুকে নিয়ে যাচ্ছি। ভাবনার কিছু নেই। এতো শর্ট নোটিশ বাঙালী খাবার হয় না। যা তৈরি করেছে উনি তাই খাবেন।' ফোন নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'আপনার ভাগ্য খারাপ। বাঙালী খানা এখন হওয়া সম্ভবপর নয়। যাই হোক আমরা যা খাব আপনিও তাই খাবেন।'

আমি বললাম, 'আপনি কিছু ভাববেন না। এবার বলুন এখন কি গবেষণা করছেন?'

—এই মেশিন টিবেটান ল্যাংগুয়েজ শিখছি। এই সূত্রে ভারতবর্ষে শীঘ্রই একবার যাব।'

—রিসার্চের সুবিধে এখানে কেমন?'

—শুব। ভালো একটা রিসার্চের লিভম করতে পারলে কখনও টাকার অভাব হয় না।'

—আপনারা কি আর ভারতবর্ষে ফিরতে চান না?'

—ফিরতে তো চাই। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করলে একটা উত্তরও পাই না।'

এ অভিযোগ আমি অনেকের মুখে শুনছি। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে বিদেশে এসেছেন বলেই অনেকে যে পদ ও অর্থের দাবী করেন তা যুক্তিসংগত না হওয়ায় এ দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানই তাদের বিষয়ে একটা স্বাভাবিক ঔদাসীন্য বোধ করে। আমি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি দর্শনের ছাত্র, বাংলা ভাষাতত্ত্বে উৎসাহী হলে কি করে?'

—এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলতে পারেন। ভাষাতত্ত্বে কিছু পেপার লেখার পর শিকাগোতে দরখাস্ত করলাম। চাকরি হয়ে গেল। এখানকার কতৃপক্ষ দেখলেন না ভাষাতত্ত্বে আমার ডিগ্রী আছে কিনা। আমার গবেষণার মানই এঁরা বিচার করলেন। ভারতবর্ষে এ চাকরি আমি পেতাম না।'

আমি তাঁর কথায় সায় দিলাম। এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শীরা পড়ান তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ডক্টরেট ডিগ্রী আছে। কিন্তু এঁদের উন্নতি নির্ভর করে গবেষণার ওপর।

দাপ্তরিক বসন্ত

আমাদের দেশেও ডিগ্রীর চেয়ে গবেষণার ওপর দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

মিস্টার রায় এবার বললেন, চলুন, এখানে আসি কথা নয়। ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে ফিরে লাগু খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

আমরা স্কুলের কাছে দাঁড়ালাম। মিস্টার রায়ের ছেলে স্কুলের ছুটি হাতে বেরিয়ে এল। ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। বয়স বছর পাঁচ-ছয় হবে। গরম জামাপাট টুপি দস্তানার বেচারীর প্রায় আপাদমস্তক ঢাকা থাকে সবেও সে শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

মিসেস রায় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের স্যাঁতুইট, জুট স্যালাভ ইত্যাদি খেতে দিয়ে বললেন, আপনাকে বাঙালী খাবার খাওয়াতে পারলাম না বলে কিছু মনে করবেন না। শিকাগো আপনার কেন্দ্র পাগছে।

আমি বললাম, ভালোই। আপনার দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে না?

—সব সময় করে। আমি তো শুঁকে সব সময় বলছি।

মিস্টার রায় বললেন, আমিও চেষ্টা করছি। কিন্তু তেমন একটা কাজ পাচ্ছি না।

কথায় কথায় জানলাম মিসেস রায় ভবানী-পুত্রের মেয়ে। আমি মিস্টার রায়কে বললাম, আপনার কোর্টলিটি চমৎকার। যেমন বড়ো তেমন সাজানো।

মিস্টার রায় বললেন, এগুলো ইউনি-ভার্সিটি প্রফেসরদের জন্যে তৈরি। বাইরে এল এর ভাড়া হত আড়াইশ তিনশ ডলার। আমাদের দিতে হয় একশর কিছু বেশি। ভালো কথা, আপনি এখানে কি বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন বলুন? আপনি তো এ দেশে অভিজ্ঞ ভিসুয়াল এডুকেশন ও ড্রামেটিক স্পেশলাইজ করেছেন। আপনার নাটকের ওপর কই আছে এবং দেশে আপনি নাটো অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যান। আপনি এখানে ক্লাসের বিষয়ে বক্তৃতা দিন। কি বিষয়ে বলবেন? এই শব্দ দু'টি ইন্টার অ্যাকশন অব থিয়েটার অ্যান্ড প্রাকটিস ইন মডার্ন বেন্গালি ড্রামা বর্ষি বিষয় হয়।

আমি বললাম, বিষয়টি তো ভালোই।

—বেশ, ঠিক আছে। আমি ভাবলে বিষয়টি দিয়ে দিচ্ছি। পরশুদিন কোনো অসুবিধে আছে?

—না। আজ্ঞা সম্প্রতি কি কেউ বাংলা থেকে এখানে এসেছেন?

—গতকাল ইকুনিমিট অফিস মন্ত চল গেলেন। বুদ্ধদেব বসু কদিন পরে আসবেন। এখন আসছেন কবি সুশীল দত্তের স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্ত। উনি এখানে সংগীত শেখান। বর্তমানে ভারতীয় সংগীতের ওপর কতকগুলি বক্তৃতা দিচ্ছেন। ঠিক বক্তৃতা এখানে খুবই

—বাংলা পঠনপাঠনের উল্লাহ এখানে কেমন?

—করেকজন তো বাংলার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। যেমন ডিমক ও বুটোনিন। এদের বাংলা-অন্ত প্রাণ। ডিমকের চেষ্টায় এখানে বাংলা বিভাগের বিশেষ উন্নতি ঘটেছে। এ দেশের ছাত্রছাত্রীরা বাংলার তেমন উৎসাহ দেখায় না। দু-এক বছর পড়েই অন্য বিষয়ে চলে যায়। ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও খুব কম। এরা বাংলা শিখবে কেন বলুন তো? বাংলা শিখে ইকুনিমিট গেন কি আছে? তবে প্রাচ্য সাহিত্যপ্রীতি যে নেই তা নয়। যেমন ধরুন ডেভিড কফ। উনি তো বাংলার নবজাগরণ নিয়ে গবেষণা করছেন। অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন। আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আলাপ আছে? নবজাগরণ তো আপনার তার এক গবেষণার বিষয়।

—তা ঠিক। উনিবংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে ডেভিড কফের একটি পুস্তিকা ইউনাইটেড স্টেটস ইনফর্মেশন সার্ভিসেস থেকে বেরিয়েছিল। পুস্তিকাটি আমি দেখেছি। এটি খুবই অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

—হ্যাঁ, উনি অনেক মেরিটরিয়াল জোগাড় করতে পারেন নি। বাই হোক, পত্র দু'তো আসছেন। শুঁকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলব।

লাগুর পরে মিস্টার রায় আমাকে লাইব্রেরি দেখাতে নিয়ে গেলেন। লাইব্রেরিতে বাংলা পুস্তকের সংগ্রহ মূল নয়। তবে আধুনিক গ্রন্থের সম্পত্তা বিশেষভাবে দৃষ্ট আকর্ষণ করে। বিভিন্ন বিবর্তনশীল যুগের আমার মনে হয়েছে এসব জায়গায় বাংলা ভাষার গবেষণার ওপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সাহিত্যের পঠনপাঠন খুবই সীমাবদ্ধ এবং যেটুকু বা হয় তাও প্রাচীন ও মধ্য যুগপ্রায়ী। মিস্টার রায় আমাকে বেসম্মটে বইয়ের তাক-গুলির কাছে নিয়ে গেলেন। তাকগুলিতে সাজানো বইগুলি নেড়েচড়ে দেখলাম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রতিনিধিত্বমণীয় বই-ই এখানে নেই। বুদ্ধদেব যারা যোগাযোগ করতে পারে তাদের বই-ই এখানে আসে। তবে প্রাচীন সাহিত্যের সংগ্রহটি ভালো।

মিস্টার রায়ের সঙ্গে ওপরে এলাম। উনি বললেন, লাইব্রেরিতে অনেক দেশী কাগজ আছে। আপনি এখানে বসে পড়তে পারেন। আমাকে এবার বিদায় নিতে হবে। আমার একটা ক্লাস আছে। পরশু তো নিশ্চয়ই দেখা হবে।

মিস্টার রায় চলে গেলে অনেককণ বাংলা কাগজ পড়লাম। এর কিছু আগে খুলনা ও কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার খবর এ-দেশের কাগজগুলিতে সামান্য একটু বেরিয়েছিল। কলকাতা থেকে নিয়মিত চিঠি পাচ্ছিলাম

গিললাম। বাংলা সংবাদপত্রগুলিকে এতদূর কোনোদিনই মনে হয় নি।

ফস্টার হলের একটি ঘরে বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। আমি বর্তমান নাট্যশালায় সূত্রে বিশেষ করে নবনাট্য আন্দোলন, কাব্যনাটক নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা ইত্যাদির উল্লেখ করলাম। নবনাট্য আন্দোলনের প্রসঙ্গে স্বভাবতই বিজ্ঞান ভূট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, ঞালাদ চৌধুরী প্রমুখের কথা এল। বক্তৃতার শেষে অনেকেই আগ্রহ-সহকারে খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন করলেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যেসব আধুনিক নাটকের উল্লেখ করলেন এদের কোনো ইংরেজী অনুবাদ আছে?

আমাকে না' বলতে হল। আমি বিশেষ করে অনুভব করেছি যে, বাংলা গল্প কবিতা নাটক প্রভৃতিতে অনেক অনুবাদ হওয়া দরকার। কোথাও হয়তো বাংলা কবিতা সম্পর্কে বলছি। যেই কেউ উৎসাহী হয়ে কোনো অনুবাদ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে আমি আমাকে নোতন সূচকভাবে ঘাড় নাড়তে হয়েছে। নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিশাল্যের অন্যতম উপায় হল অপরকে সে বিষয়ে উৎসাহী করে তোলা। এইজন্যেই স্মৃষ্ট পরিমাপ অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমাদের নজর দেওয়া উচিত।

বক্তৃতা হয়ে গেলে মিস্টার রায় আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে তাঁর রিসার্চ পেপারের কয়েকটি রিপ্রিন্ট দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, শিকাগোতে কি কি দেখলেন?

আমি মোটামুটিভাবে বা বা দেখেছি বলতে বললেন, শিকাগোয় নাইটক্লাব অবশ্যই দেখবেন। আমেরিকার নৃত্য, সংগীত ও সাহিত্যের গেছলেন এর একটা বিশেষ সাক্ষর ভূমিকা আছে।

—আমি অন্তর্য কয়েকটি নাইটক্লাব দেখেছি। এখানেও দু-একটি দেখার চেষ্টা করব।

—আমার ক্লাস আছে। আমি উঠছি। কক্ষকে খবর দিয়েছি। উনি আপনার সঙ্গে আজই দেখা করতে আসবেন।

ডেভিড কফের সঙ্গে আড়াইটে নাগাদ দেখা হল। যেমন সূত্রে চেহারা তেমনই সুন্দর মেজাজ। হাসিখুশি সোফটিকে মৃদুতাই ভালো লাগল। কফ বললেন, কি দুর্ভাগ্য বলুন তো। আপনি এতদিন এখানে এসেছেন আজই আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা হল। বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে আপনার কইটি সব সময়েই আমার টেবিলে আছে। একদিন আপনার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ হলে খুব খুশি হব।

আমি বললাম, বাংলার নবজাগরণ আমার অত্যন্ত ফেভারিট সাবজেক্ট। এ বিষয়ে আপনাব জিজ্ঞাসা, পরিগ্রহ ও উৎসাহ আমাকে

গাভীর কনুই

আলোচনার সুযোগ পেলে খুবই আনন্দের জ্ঞান হয়।

—আজকেই আলোচনা করা যেত। কিন্তু ক্যানার কি জানেন? আজ আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। বলুন কবে আমার বাসায় যাবেন?

ঠিক হল কদিন পরে ঠিক বাসার একসঙ্গে রেকফার্ট খাব। কিন্তু দৃষ্টান্তবশত প্রচণ্ড ভূবাবড়ের জন্যে ঠিক বাসার যাওয়া হয় নি।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে কাছেই মিউজিয়াম অব সায়েন্স আর্ট ইন্ডাস্ট্রি বিল্ডিং-এ সিঁচ চানলে ১১-র স্ট্রিটও দেখতে দেখতে পেলাম। একটি নিউ ম্যাথ ও একটি সোস্যাল স্ট্যাডিসের প্রোডাকশন দেখলাম। জেন্সন হয়ে বাবার পরেই সিঁচ টিচারের কাছে টেলিফোনে প্রণয় আসতে লাগল। বুকলান সিঁচ এখনে সত্যিকারের শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়েছে। নিউ ম্যাথ হচ্ছে নতুনভাবে পরিবেশিত নতুন বিষয়বস্তুসমৃদ্ধ ম্যাথমেটিক্স। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আমেরিকাকে নতুন করে তার শিক্ষা, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে উৎসাহী করেছে।

পরদিনেও বেশ ভূষারের বড় বইছিল। অব, আমি শিকাগোর জগৎবিখ্যাত ল্যাবরেটরি স্কুল দেখতে গেলাম। একদিন বুললত গোপিনী একজন দার্শনিক প্রফেসর, দুজন নাভাল পিকার ও বারোটি ছাত্র নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ১৮২৬ খৃস্টাব্দে এক শীতের দিনে যে স্কুল খুলেছিলেন, তার প্রভাব যে পরবর্তী বৃদ্ধ প্রায় প্রতিটি আমেরিকান স্কুলে অনুভূত হবে একথা সেদিন কেউ কল্পনা করতেও পারে নি। এই বুললত গোপিনী ব্যক্তিটি হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত জন ডিউই আর এই স্কুলটি হচ্ছে বহুপ্রতিষ্ঠা ল্যাবরেটরি স্কুল। এই স্কুল শব্দে একটা পরীক্ষা নয়, এটা একটা বিপ্লব। অন্যান্য স্কুলে এখন কঠোর শাসনাবলি প্রযুক্ত হতে, ডিউই তখন ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রীদের একটা স্বাধীন আবহাওয়ার স্রাবতে উৎসাহ দিতেন। অন্য স্কুলের ছাত্রেরা সেক্ষেত্রে যত্নসহ করে কোনো বিষয় শিখত, ডিউই-এর ছাত্রেরা হাতেকলমে সে বিষয়ে সত্যকর জ্ঞানসন্ধান করত। সবসময়েই কোনো বিষয়ে অগ্রগতির জগো বা জোটে ডিউই-এর অগোষ্ঠ্য তার ছাত্র নতুন কিছু শেখান। শীঘ্রই তিনি প্রচুর বিজ্ঞান সমালোচনা ও সেই সঙ্গে নিম্নর লক্ষ্য হতে উৎসাহিত। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে তিনি শিকাগো ছেড়ে কলম্বিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারি ল্যাব স্কুলে কিন্তু আমেরিকার সমস্তের উত্তেজনাশীল শিক্ষাপ্রচেষ্টার নিদর্শনস্বরূপ এখানে রয়ে গেল। এর সঙ্গে ১৯০৩ খৃস্টাব্দে একটি হাইস্কুল ও ১৯২৩ খৃস্টাব্দে একটি নার্সারি স্কুল হয়েছে।

তাইন হল স্কুল হোস্টেস মিসেস বার্টন রিভিনের সঙ্গে তার ১০৪ নম্বর করে দেখা

করলাম। এতো আকর্ষণীয় মহিলা আমি আত্মজিজ্ঞাসেতে বেশি জেঁপে নি। তিনি আমাকে বিভিন্ন ক্লাসরুমে নিয়ে গেলেন। ক্লাসরুমে যেটা প্রথমেই নজরে পড়ে সেটা হচ্ছে চিত্রচিত্রিত রুটিনবিধি শিক্ষকশাসনের কঠোরতমর শ্বাসপ্রশ্বাসকারী আবহাওয়ার পরিবেশে একটা স্বচ্ছন্দ স্বাধীন পরিবেশ। ছাত্রছাত্রীরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে কেউ ছবি আঁকে, কেউ পড়ছে, কেউ অঙ্ক করছে। শিক্ষিকা নিশ্চিন্তভাবে ক্লাসে বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলার সূত্রটি ধরে আছেন। প্রত্যেক ক্লাসরুমে সশেপ একটি করে ল্যাবরেটরি। তাতে নানা একুরেশনামালা মোটরিয়াল। ক্লাসরুমে মসোই একটি স্ট্রোটো-থ্যাটো লাইব্রেরি। মিসেস রিভিনের সাদা হয়েছিল। তিনি বারে বারে রুমালো নাক ঝাড়ছিলেন। আমার আসার কথা না থাকলে হয়তো তিনি আজ আসতেনই না। মিসেস রিভিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে সাধারণত কারা পড়ে?

তিনি উত্তর দিলেন, শিকাগো বিদ্যালয়ের সঙ্গে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ছেলেমেসেরাই এখানে পড়ে বেশি। এইসব ছাত্রছাত্রী কোয়ালিটি খুবই ভালো। এদের গড় আইকিউ ১০০। জিটান কি এখানে খব বেশি। বছরে ৫০০ থেকে ৬০০ ডলার।

—ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের সংখ্যা কেমন?

—বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫৭১ এবং শিক্ষকশিক্ষিকার সংখ্যা ২৫৫। শিক্ষকশিক্ষিকার কোয়ালিটির তুলনা হয় না। এদের অধিকাংশেরই বয়স অল্প। ক্লাসের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ২৫ বা ৩০-এর বেশি করতে দেওয়া হয় না, কেন না সেখা গেছে একজন শিক্ষকের পক্ষে ২৫১০০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী হলে তার পক্ষে সকলের প্রতি ঠিকমতো নজর দেওয়া মন্থিল হতে পড়ে।

মিসেস রিভিন অডিও-ভিসুয়াল সেকশনে নিয়ে গেলেন। এখানে শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী অডিও-ভিসুয়াল এন্ড থেটার করে দেওয়া হয়। শিক্ষকেরা নিজেরাও এন্ড থেটার করেন। অডিও-ভিসুয়াল এন্ড থেটার এই রকম নির্দিষ্ট অঙ্ক ব্যাপক ব্যবহার এই প্রধান বিশেষ করে চোখে পড়ল।

একটি ক্লাস থেকে কতকগুলি ছাত্র বেরুচ্ছিল। মিসেস রিভিন একটি ছাত্রের হাত চেপে ধরে আমাকে বললেন, 'আমার ছেলে। প্রচণ্ড এইটে পড়ে।' তারপর ডাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় বাসে?'

সে উত্তর দিলে, 'কেন্নেট।'

মিসেস রিভিন তার হাত ছেড়ে দিতে সে চলে গেল। আমি বললাম, 'ভালো ছেলে।'

মিসেস রিভিন একটা হাসলেন। লম্বা সন্ধ্যা এসে গেল। আমি বললাম, 'আমি আপনাকে কন্ট সেব না। আমি এবার হোটোলে ফিরব।'

মিসেস রিভিন বললেন, 'না, না, এতে আর কন্ট কি? একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

—কখন?

—বেরে! অব একুরেশনের মিসেস রিভিনকে আমি নাকি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পেয়ে আসতে পারেন?

—হ্যাঁ, তার সম্ভাবনা আছে।

—তাহলে খুব ভালো হলে। আগে থেকে আপনাকে ডায়ালো জেনারেল রইল।

হোটোলে ফিরে গেছি। মিস্টার বানার্জী আমার সঙ্গে লাক্স খারেন বলে অপেক্ষা করছেন। এ করদিন রুটিনেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম তাই একসঙ্গে লাক্স খাওয়া বা বেরনো হয় নি। লাক্স খেতে খেতে মিস্টার বানার্জী বললেন, 'ভরেনার বেশ ইপ্সিত করছে। চলুন আজ কিছু সাইটসিং করি যাক।'

লাঙ্কের পরে প্রথমেই সেলাম পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব্যক্তিহ্যাক ফাউন্টেন দেখতে। কিন্তু প্রচণ্ড শীতের জল জমে যাওয়ার কারণে স্তব্ধ। কাছেই মিশগান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জগৎবিখ্যাত আর্ট ইনস্টিটিউট। এর গেটের দ্বারে বহুপরিচিত সিংহমূর্তি। পাশেই ইনস্টিটিউটের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে।

ইনস্টিটিউটে ঢুকে প্রায় ছবি, কালি, ডান্ডব ইত্যাদির সংগ্রহ দেখে চোখ লজ্জিত গেল। এমন অসংখ্যাতিক সংগ্রহ আমেরিকাতো বেশি নেই। রবেন, ড্যান টিক, রেনরাডট, টানার প্রমথ থেকে শুরু করে ইম্প্রেশানিস্ট রেনোর ও মোনেট এবং পোঁক ইম্প্রেশানিস্ট সিউরট, সেজেন, গগা প্রমথের বিন্দুসকল ছবির সংগ্রহ দেখে প্রচুর ছবি পেলাম। মোর্টন উইং-এ গিয়ে দেখার সুযোগ ঘটল পিকাসো ও হেনরি মুরের চিত্রাবলী। আমার কেবল মনে হচ্ছিল স্বর্গীয় বিবেকানন্দের স্মৃতি এই ইনস্টিটিউটের ছবি কেন কোথায় দেখছি। আমি মিস্টার বানার্জীকে বললাম, 'সিংহমূর্তি ওয়ালা গেটের দ্বার ইনস্টিটিউটের ছবি বিবেকানন্দের স্মৃতি আমার চোখে পড়ছে মনে হচ্ছে। এখানকার পাল্‌মেণ্ট অব রিলিজিয়ান হয় নি তো?'

তিনি বললেন, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। দুজনে অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। কেউই কিছু বলতে পারে না। শেষে একজন বৃদ্ধ গার্ডকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, এখানকার একটি হলোই পাল্‌মেণ্ট অব রিলিজিয়ান বসেছিল।'

আমি বললাম, 'হলটি একটু দেখতে পারি কি?'

সে আমাদের তালাবন্দ একটি হলোর কাছে নিয়ে এসে বলল, 'এই সেই হল। এখানে এখন কোনো কোনো সময় বক্তৃতা, ফিকশনো ইত্যাদি হয়। আমি দৃষ্টান্ত এর চারি দর কাছে সে এখন নেই। তাই হলটি এখন খোলা থাকে না।'

দরজার ফাঁক দিয়ে অন্ধকার ঘরে তেমনি দৃষ্টি পেল না। শব্দ মনে হল বিবেকানন্দ



জন জে, শেড অ্যাকোরিয়ারিয়াম

বে হলে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে হলটি তো ছবিতে বেশ বড় দেখোঁছি। এ কি সত্যিই সেই হল!

আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে দু'জনে গেলাম মিশিগান লেকের কাছে অ্যাডলার প্ল্যানেটোরিয়াম, শেড অ্যাকোরিয়ারিয়াম, ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম ও সোলজার ফিল্ড দেখতে। প্ল্যানেটোরিয়ামে কৃত্রিম আকাশ সৃষ্টিকারী স্প্রটলি জার্মানি থেকে আনা হয়েছিল। এই ধরনের প্রথম যে দুটি স্প্রটলি জার্মানিতে তৈরি হয় এটি তাদের একটি। মিউজিয়ামটিতে গ্রীস, ব্যাবিলন ও মিশরের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ বিশেষভাবে মনে দাগ কাটে। মিউজিয়ামের মেন গেট দিয়ে ঢুকে ন্যানালি ফিল্ড হলের মধ্যে দুটি আফ্রিকার হাতী, আফ্রিকার কোনো জাতের কতকগুলি লোকের সিংহশিকারের তিনটি ব্রোঞ্জমূর্তি এবং মাংসভোজী ও তৃণভোজী দুটি ডাইনোসরের মূর্তি মনে রাখবার মতো।

শেড অ্যাকোরিয়ারিয়ামের মতো বহু অ্যাকোরিয়ারিয়াম পৃথিবীতে আর কোনো আছে কিনা সন্দেহ। বিল্ডিংটি অষ্টাগোনাল এবং ৩০ ফুট টেরাস ছাড়া এর ব্যাস ৩০০ ফুট। রোটান্ডার সামনে একটি ঘড়ি বুলছে যার নম্বরের জায়গায় রয়েছে নানা জলজ জীব। অ্যাকোরিয়ারিয়ামটির বাড়িটি তৈরি হয়েছিল ১৯২৯ খৃস্টাব্দে। এটি তৈরি করতে ব্যয় গড়েছিল ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। প্রতি বছর এর সংরক্ষণের জন্যে ব্যয় হয় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। জলজীবনের মাছ, মেরুদণ্ড-বিহীন প্রাণী, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখির নানা নিদর্শন এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। সব মহাদেশ থেকে মিষ্টজলের জীবদের নমুনা এবং অ্যাটলান্টিক

ও প্যাসিফিক মহাসাগরের লবণজলের জীবদের নিদর্শন দেখতে পেলাম। এখানকার নমুনার সংখ্যা ১০,০০০ এবং বিভিন্ন স্পিসিজের সংখ্যা ২৫০।

অ্যাকোরিয়ারিয়ামের সব কিছই ইলেকট্রিক চলে। শব্দ স্টীম দিয়ে বিল্ডিংটি গরম করা হয়। সব কিছুরই ড্রপলিকেট আছে যাতে একটি ব্যবস্থার অসুবিধা হলে অন্যটির দ্বারা অ্যাকোরিয়ারিয়াম চালু রাখা সম্ভবপর হয়। অ্যাকোরিয়ারিয়ামের ডাইরেটরের প্ল্যান অনুযায়ী বিখ্যাত পুন্ড্রিয়ান কোম্পানি নিদর্শন সংগ্রহের

জন্যে 'নটিলাস' নামে একটি রেলরোড কার তৈরি করে দিয়েছেন।

ফেব্রুয়ারি পথে মিস্টার ব্যানাজী বললেন, 'ওয়াই, এম, সি, এ-তে বড় খরচ পড়ছে। আশে-পাশে অনেক হোটেল দেখেছি। চলুন না একবার চেষ্টা করে দেখি কোনটিতে কোনো সিট পাওয়া যায় কিনা।'

আমি বললাম, 'ওয়াশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পশ্চিমদিকটা নটোরিয়াস বলে মনে হয়। মিসেস লী আমাকে সন্ধ্যার পর ওদিকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। দেখেন নি কি সব স্ট্রিপটিজ ছবি আর বিজ্ঞাপন, 'ডু ইউ ওয়ান্ট এ ড্যান্সিং পার্টনার', 'নো শেড, নো কভার' প্রভৃতি। আমার মনে হয় রায়হতে না গিয়ে সকালে গেলেই ভালো হবে।'

মিস্টার ব্যানাজী একটু হেসে বললেন, 'আপনি বড় ভীত। এখন তো সব সন্ধ্যা। এখন গেলে কি হবে?'

তার কথামতো দুটো হোটেলে চেষ্টা করলাম। সিট নেই। হোটেলের পরিবেশ মোটেই ভালো লাগল না। কেমন একটা আনক্যানি ফিলিং বোধ করতে লাগলাম। এবার একটি হোটেলে ঢুকে ম্যানেজারের রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। ময়লা স্টুট-পরা দুটি লোক কথা বলছিল। মিস্টার ব্যানাজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'একিউজ মি। কোনো ডবল সিটের রুম খালি আছে?'

কথা শুনিতে একজন উত্তর দিলে, 'না, তবে কাল খালি হবে। কাল খোঁজ নিজে পারেন।'



অ্যাডলার প্ল্যানেটোরিয়াম

সাম্প্রতিক বসন্ত

আটাচড বাথ হবে তো? ডেলি রেট ৭৩?

—না, আটাচড বাথ হবে না। ডেলি রেট পাঁচ ডলার।

বেরিয়ে আসার সময় দেখি একটা ঘরের গরুর লেখা আছে 'অনলি হাজব্যান্ডস আর অ্যালাউড ইন দি লেডিস রুমস।' আমি লেখাটির দিকে মিস্টার ব্যানাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। উনি বললেন, 'ব্যাপার ভালো মনে হচ্ছে না। সন্তান দরকার নেই। আমাদের হোটেলই ভালো।'

সেদিন রাতিতে হঠাৎ পরশের হোটেল থেকে একটি হিন্দী গানের সুর ভেসে এল। মিস্টার ব্যানাজী বললেন, 'কখনো ভারতবাসী বা ভারতপ্রেমিক হিন্দী রেকর্ড বা টেপ রেকর্ড শালাচ্ছে। সত্যিই শিকাগো দেহমেনে ইস্টার্ন-ন্যাশনাল সিটি।'

পরের দিনও আবহাওয়া মোটামুটি ভালোই থাকল। মিস্টার ব্যানাজী প্রস্তাব করলেন, 'শিকাগোতে তো অনেক মানবজন দেখা হল, চলুন আজ বিখ্যাত ব্রুকফিল্ড জুর জীবজন্তু দেখে আসি।'

রু. বার্ড কোড লাইনসের বাসে জুড়ে শোঁকতে ঘণ্টা দুই লাগল। ব্রুকফিল্ড সত্যিই বড়ো, তবে প্যান ডিরাগোর জুর মতো নয়। প্যান ডিরাগো জুড়ে সিংহ, বাঘ, তাজ্জ প্রভৃতিকে ষাঁচা ছাড়া স্বাভাবিক পরিবেশে রাখা হয়েছে। এখানে তারা ঝাঁটার কণী। বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আফ্রিকার কীরগা, শিম্পানজী, সিংহ, হাতী ও রাটেল স্নেক আর ভারতের হাতী ও রয়াল বেঙ্গল টাইগার। আফ্রিকা ও ভারতের হাতী উভয়ের প্রায় সমান সমান, তবে আফ্রিকার হাতীর দাঁত

ও কান বেশি বড়ো। রয়াল বেঙ্গল টাইগারের ডুলনা সে নিজেই। ডিলেশন জুড়ি সুন্দর। তবে এখন বরফে ঢাকা বলে রম্য করা আছে। কাগজে ফোরকাস্ট ছিল 'বিকলে বৃষ্টি হবে।' ঠিক চারটেই সময় বৃষ্টি নামল। আমরা ফেরবার বাস ধরলাম।

পরের দিন মিস্টার ব্যানাজীর শরীর খারাপ হল বলে আমি একাই বেড়ালাম। শিকাগোয় ব্রেক বিল্ডিং মার্কেটলাইন মার্চ প্রভৃতি দেখে অ্যাডলার প্রানোটেরিয়ামের কাছে গিয়ে বসলাম। মিসিগান লেকের জল জমে গিয়েছিল। এখন অনেক গলে গিয়েছে। দূরে ইলিনয় ইউনিভার্সিটির একটি বিজ্ঞানীয় বিজ্ঞান লেকের ওপর অনেকখানি নৈম এসেছে। আরো দূরে প্রুভেনসিয়াল বিল্ডিং, ওয়াই, এম, সি, এ, হোটেল ইত্যাদির চূড়ার খোলাটে রোদের উৎসব। লেকের ওপর কতগুলো পাখি খেলে বেড়াচ্ছে। ফেন জানি মিসিগান লেককে আমার প্রথম দেখেই খুব ভালো লেগেছে। কাল শিকাগো ছেড়ে চলে বাব। তাই হয়তো এই লেকের আকর্ষণে আমার মন আমাক এখানে টেনে এনেছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। হঠাৎ কলকাতার কথা বড়ো বেশি করে মনে পড়ল। পকেট থেকে একটি পিকচার পোস্টকার্ড বার করে একজন বার নাম করব না তাকে লিখতে লাগলাম, 'এই মহাভারত বর্ষ কিজালা কর তোমার কি হতে ইচ্ছে করছে, তবে আমি বলব, 'আমার এই মিসিগান লেক হয়ে জীবনের উজ্জ্বল মৃত্যুর বরক গলিয়ে গলিয়ে এ পাখির কাকের মতো আমাদের পুরুনো দিনগুলোকে বকে নিয়ে উড়াল হতে ইচ্ছে করছে।'

পরের দিন আমার ভূবার কড় উঠল।

মিস্টার ডেবিড কফের বাসায় ব্রেকফাস্ট খাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উনি ফেনে জন্মলেন যে, পথে ভূবার পড়ায় মোটর চালানো নিরাপদ নয় বলে উনি হোটেল এসে আমাকে ও'র বাসায় মিষ্টি খেতে পারবেন না। অনেক কষ্টে একটি ক্যাব সংগ্রহ করে মিস্টার ব্যানাজী ও আমি বিকেলে যথাসময়ে ওয়াশিংটনের ট্রেন ধরতে স্টেশনে উপস্থিত হলাম। সেখানে মাল-পত্র বোঝা ছিল বলে একজন পোর্টার বা রেড ক্যাপের সাহায্য নিলাম। রেড ক্যাপ আমাদের মালপত্রের ট্রেন তুলে দিলে। তাকে তার চাকরি দিলে সে একটু ইতস্তত করে বললে, 'আপনারা যে ভারতীয় তা তো লাগেজের লেবেল দেখেই বুঝছি।' একটা কথা বলব?

আমি বললাম, 'বলুন।'

—আমি ভারতীয় মহিলা জন্মি। একটা ভারতীয় মহিলা সেবেন।

আমি তাকে একটি সিঁকি দিতে সে বললে, 'আপনি এর সমশরিমাণ মহিলা আমার চাকরি থেকে কেটে নিন।'

আমি বললাম, 'না। এটা আপনাকে আমি উপহার দিলাম। মনে করুন এটি এক ভারতীয় যশ্বর উপহার।'

সে পকেট থেকে একটি খাতা বার করে বললে, 'আপনার নাম-ঠিকানা এতে লিখে দিন।'

আমি নাম-ঠিকানা লিখে দিতে সে খাতাটা বন্ধ করে পকেটে রেখে বললে, 'আপনার উপহারের কথা আমি কোনোদিন ভুলব না।'

আমিও বললাম, 'আপনার ভারতপ্রীতির আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

বিসর্গে

ব্রাহ্মসাম্য গদ্য

বিসর্গে যে কামা দোলে.....কায় কামা...

অলঙ্কা আকাশে.....বিন্দু বিন্দু ব্যথা কায়.....

মোনি নীল.....লক্ষ যুগ.....জন্মট স্তম্ভতা.....

এখানে এখনো আমি অলঙ্কা বিকলপ পাখী

স্বপ্নবরা তারার আকাশে কবিতার বিকলপ-স্তবক

কলঙ্কী পাপড়ী খসা নক্ষত্রের বিকলপ

কুড়িয়ে কবিতা লিখি

নিভে আসা পাদপ্রদীপের স্তিমিত আলোয়।

ভীরু ছায়া দোলে

সন্তর্পণে হাত মেলে অন্ধকার

সমস্ত ভাবনা ক্রমে ভয় ভয় হিম হয়ে আসে।

ভরল কুহেলীকরা ভাসিলা যুগের এক গাঢ় নীরবতা....

নির্গেট আকাশ—

কোথায় অলঙ্কারী পদার্থীভূত অজস্র ভাবনা.....

বিন্দু বিন্দু ব্যথা ক্রমে হেঁয়ালী নির্মল নীলে—

লক্ষ যুগ নিয়ে আসে আদিম স্তম্ভতা!

দূর্বোধ তারার স্তম্ভতা.....জন্মজন্ম শিলেট আকাশে

.....কবিতার অন্তরকার

অনুস্থায়ী লিপি কার.....কে লিখেছে অজস্র ভাবনা

কে এঁকেছে মনের দূর্বোধ ছবি.....

গোপন কথার চিহ্ন.....

.....ভীরু বৃক.....নক্ষত্র আগর।

বিসর্গে যে কামা দোলে.....সায়রাত অক্ষুণ্ণ গহ্বর

কে যেন ব্যথিয়ে ওঠে.....চাপ চাপ বৃকের বন্দনা

অর্ন্ত হতে চার।

হৃদয়ক অন্ধকারে লভয়ে চমকে ভাবি,

এ আমার চিরন্তন আদিম বিবেচী মন।

অনিহা

মুশীম রায়



অনিহা

(পূর্ব-প্রকাশিত: পর)

বড় মজার ব্যাপার বলেই মনে হল বাকি।
মেয়েটা কেবল অভিনয়ই করে না, মেয়েটা
কাঁবতা-টবিতাও ভবে পড়ে।

এ কথা নিয়ে আরও কথা হয়তো হত। কিন্তু
কথা বলার সময় আর নেই, তারা শখের-বাজার
পেরিয়ে এসেছে অনেকক্ষণ, এবার বাড়িবার
এলাকাও প্রায় পার হয়ে এল। এ তো এসে
গেল বেহালা।

রাসবাহাদুর রোডের মোড়ে এসে থামল
ব্রাহ্মভাট্টী-দল। দম নিয়ে বাঁচল বেন কুঁড়ে
গাড়িটা। একে-একে নামল সকলেই। দিবাও
নেমে দাঁড়াল।

বিকালের পড়ন্ত রোদ এদিক-ওদিকের
বাড়ির কার্নিশে উঠে দাঁড়িয়ে আছে। সে
রোদের দিকে কেউ তাকাল না, সকলে তাকাল
রাস্তার দিকে। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে
দৌড়ে আসছে।

দিবা-বলল, 'আমি তবে আসি?'

'আসি মানে? যাবেন কি তবে?' বলল
নীহার।

'বাস্-এ যাব।'

'তা হয় না।' নীহার বলল, 'উঠে পড়ুন।
লোঁছে দিয়ে আসছি। এখনো আছে পেটল।'
একটু ঝুলোঝুলি হয়তো হত, কিন্তু
পাড়ার ছেলের ভিড় দেখে দিবা উঠে পড়ল
গাড়িতে। নীহার স্টার্ট দিল। কারও কাছ
থেকে বিদায় নেবার, বা অন্তত হাত তুলে
নমস্কার জানাবার সময় পর্যন্ত পেল না দিবা।
হুশ করে হাওয়া হয়ে গেল হাওয়াগাড়িটা।
অবাক হয়ে রাস্তার দাঁড়িয়ে রইল মনোহর

সেনহাশ, হরেশ আর দীপক। নীহারের
কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে তারা। সত্যি,
একটা কাণ্ড শেষ পর্যন্ত ও সে করে বসবেই
—এ বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই।

যে নীহার এতক্ষণ এত কথা বলেছে সেই
নীহার এখন একেবারে চুপ। একমনে সে
চালাচ্ছে গাড়িটা। গাড়িতে তার যে কোনো
সঙ্গী আছে, তা যেন সে জানেই না।

মোমিনপুর একবালপুর পার হয়ে খিদির-
পুরের রিক্সে উঠে এল তারা। তার পর রেস্-
কোর্সের পাশ দিয়ে ছুটল এসপ্লানেন্ডের দিকে।
রাস্তা ফাঁকা পেয়ে বেশ স্পীড দিয়েছে নীহার।

পিছন থেকে দিবা বলল, 'ও কি, করছেন
কি? আমাকে নিয়ে কোথায় পালাচ্ছেন নাকি?'
নীহার হেসে বলল, 'পালাতে ভীষণ ইচ্ছে
করছে। কিন্তু পালিয়েও তো নিস্তার নেই।
ধরা পড়ে যেতেই হয়। তাই ভর হচ্ছে।'

'তাই বাকি? বেশ ভীতু তো আপনি।'
'আপনি যদি একটু অতর সেন, তবে চেষ্টা
দেখি।'

নীহারের কথাটা দিবার কানে ধাক্কা দিয়ে
হাওয়ার হারিয়ে গেল।

দিবা বলল, 'ওর মধ্যে বীর্য নেই।'
'তবে বীর্য কিসে?'

'বীর্য হচ্ছে — ভ্রমভাবে আমাকে
এসপ্লানেন্ডে নামিয়ে দেওয়ার।'

'ওতে বীর্য হতে পারে, কিন্তু ভ্রম হতে
পারে না। ভ্রম হচ্ছে—একেকবারে আপনায়
বাড়ির মোরগোড়ার নামিয়ে দেওয়ার।'

বেশ হুশকলিই তো হল। দিবা যেন

একটু প্রমাদ গণল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে
বলল, 'ওখানে যে আমার একটু কাজ আছে।'

বেশ তো আমারই-বা তাক্সি কি। সেয়ে
নি কাজ।' নীহার কথাটা বলল দিবাকে
একটু পরশ করে দেখার জন্যেই অবশ্য, এবং
দিবা কি উত্তর দেয় তা শোনার জন্যে গাড়ির
স্পীডও কমিয়ে দিল।

কিন্তু কোনো উত্তর দিল না দিবা।
এসপ্লানেন্ডে এসে গাড়ি থামল নীহার।

দিবা ধীরে-ধীরে নামল, এক পা এগিয়ে
নীহারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্কার।
অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আবার দেখা হবে।
শিগগিরই একদিন বাব মোমিনপুরে।'

উত্তর দিল না নীহার। একটা হাত
কপালে ঠেকিয়ে কেবল প্রতি নমস্কার করল
দিবাকে।

রাস্তা পার হয়ে দিবা অন্য ফুটপাথ
ধরল।

এতক্ষণ এত সপ্রতিভ ভাবে কথা বলে,
এতক্ষণ এতটা বদ্বন্দ্বির দৌড় দেখিয়ে হঠাৎ এখন
কেমন যেন বোকা হয়ে গেল নীহার।

কিন্তু বোকা হয়ে যেতে তার বড় আপত্তি।
আর কোনো দিকে না চেরে সে স্মুরেন ব্যানার্জি
রোড ধরে চলল মোলার দিকে। সেখানে
গিয়ে সে অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল।

রাস্তার আলো যথেষ্ট নয়। কিন্তু সেই
অস্পষ্ট আলোতেই সে নজর রাখার চেষ্টা করল।
গাড়িটা একটু অন্ধকারে রেখে নীহার দাঁড়িয়ে
রইল রাস্তার মোড়ে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। প্রত্যেকটি

বাস-এর দিকে দাঁড়ি রাখল সে, প্রত্যেকটি ঘ্রাসের দিকে। সারা দিন গাড়ি চালিয়ে সে প্রান্ত, তারপর এতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তার খুবই ক্লান্তিকর লাগছে। কিন্তু তার কেমন জেদ চেপে গিয়েছে। সে দাঁড়িয়েই রইল।

দিবা কোনো দিকে না চোরে নিশ্চিন্ত মনে ধীরে-ধীরে চলেছে। বড় রাস্তা থেকে সে ঢুকল গলিতে। গলিটা একটু আঁকাবাঁকা, ঘু-একটা বাক নিয়ে সে এসে দাঁড়াল একটা দরজার কাছে। কড়া নাড়ল।

নীহার এসেছে পিছন-পিছন, বলল, 'নমস্কার! বাড়ি পর্বন্ত পৌঁছে দেব বল-ছিলাম। পৌঁছে দিলাম। আজ আসি।'

হঠাৎ এই গলা শুনে চমকে তাকাল দিবা। কিন্তু চমকটা গোপন করার চেষ্টা করে সে ঘুরে বাড়িরে বলল, 'অশেষ ধন্যবাদ।'

নীহার আর দাঁড়াল না। সে সেখান থেকে সোজা চলে এসে তার গাড়িটা নিয়ে চলে গেল। সে মনে মনে দিশিঙ্গরের আনন্দ বোধ করতে করতে ফিরে গেল।

অচিনপুত্রীর সেই নারিকা আবিষ্কার করা এমন আর কি কঠিন কাজ, তার চেয়ে বড়দের আবিষ্কার যে নীহার করতে পেরেছে, এবং তা তার একার চেষ্টায়, তার কাছে এটা একটা দ্রুত গৌরব।

এই গৌরবের আনন্দ নীহার একা-একাই ভোগ করতে লাগল কয়েকদিন ধরে। কাউকে সে কিছু বলে না। সেদিন কত দূর পর্বন্ত দিবাকে সে পৌঁছে দিয়ে এল, আর কি-কি কথা তার হল-সেইসব বিবরণ নিয়ে আলোচনা করতে নীহার একেবারেই রাজি না। নীহারের এই নিশ্চিন্ত ভাব দেখে সকলেই কিছুটা আশ্চর্য হয়েছে। এবং অনেকেই সন্দেহ করছে যে, নীহারের অত বাড়বাড়ির জবাব নীহার নিশ্চরই পেয়েছে, নিশ্চরই মেয়েটার কাছ থেকে কড়া কথা সে শুনেছে কিন্তু।

দিন ভো কেটে গেল অনেকগুলি। দিবা আসছে কবে মোহিনপুত্র? অচিনপুত্রীর ফুল্লরার গল্প সে কবে এসে বলবে? কি-কি কথা হল তার সঙ্গে দিবার, এ একটা ভ্রমপ্রাসাদের নেপথ্যে থাকা সত্ত্বেও সে যে একটা নাটকের নায়িকা হয়ে গিয়েছে, এ খবর জেনে মেয়েটা বলল কি কি? সব কথা এসে বলে থাক দিবা। তাদের মনের ভার দিয়ে থাক একটু, হাল্কা করে।

ফুল্লরার কথা এরা ভাবছে বটে, কিন্তু আসলে তাদের বত ভাবনা এ দিবা নিয়েই। ফুল্লরার গল্প শোনার জন্যে ব্যাকুলতা তারা দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে তারা ব্যাকুল দিবার জন্যেই। এই মেয়েটার ওপর তাদের কেমন-কেন একটা টান হয়ে গিয়েছে। সকলের সঙ্গে সমানভাবে ও সহজভাবে মিশবার আশা আজ আছে মেয়েটার।

দিবা অবশ্য ফুল্লরার কথা ভাবছে

বাস্তবিকই ফুল্লরার জন্যেই ফুল্লরাকে ভাবে। এই চরিত্রটি অভিনয় করেছে সে। হার রে চরিত্র। মেয়েটাকে এভাবে ভেবে নিতে এতটুকু বাধল না নাট্যকারের। এমন একটা বিবাদ নিয়ে কতটা বিলাসই করেছেন এ নাট্যকার।

গভীর রাতে ফুল্লরার মুখ ভেসে ওঠে দিবার চোখের সামনে। নিজস্ব এ প্রাসাদ-পুত্রীতেও নেমেছে অন্ধকার। ওটা যেন ঠিক প্রাসাদ আর নেই, ওটা একটা প্রেতপুত্রী। সেখানে এখন কেমন নিজস্ব ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে এ ফুল্লরা—এ ইন্দ্রা? কি করছে এখন মহামারা?

দিবার ইচ্ছে হচ্ছে, সে ছুটে গিয়ে উদ্ভার করে জানবে এ মেয়েটাকে। সত্যি, সে যদি পুরুষ হত, তাহলে—

না, না, না। বিশ্বাস নেই। পুরুষ হলে হরতো এমনভাবে সে ভাবভেই পারত না। পুরুষ হলে হরতো সে হত এ হীরামাল, কিংবা বীরশাহীর শিকারী সেই সন্নিদার সন্নিদ। তার চেয়ে এই বেশ আছে, এই ভালো আছে।

একটা তন্দ্রা এসেছিল তার চোখে, তন্দ্রার মধ্যে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল এ বিরাট প্রাসাদের স্তম্ভ সিঁড়ি দিয়ে কে-কেন গাড়িরে পড়ে যাচ্ছে। চীৎকার করে উঠল দিবা, 'মহামারা, মহামারা, ইন্দ্রা ইন্দ্রা!'

পাশের বিছানা থেকে অনারজন ডাক দিল, 'এই, এই। এই রেশু, রেশুকা, হল কি। স্বপ্ন দেখছ নাকি?'

পাশ ফিরে শব্দে রেশুকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'উঃ!'

না, সত্যি সে ভাবতে পারে না। ভাবতে পারে না এ মেয়েটির কথা। যতই চেষ্টা করে না-ভাববার, ততই ভাবনা এসে ভর করে তার মনের মধ্যে।

ঠিকই। ঠিক আঁচই করেছে ওরা। ওরা নমস্কার জানি। ঠিকই ওরা করেছে। সেও

একজন পতিতা, আর আচিনপুত্রীর মেয়েটিও একজন পতিতা।

ধন্য তোমারে ছে নাট্যকার
চরণপদ্মে নমস্কার।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কাজকর্ম সেরে তৈরি হয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে দিবা—না, আর দিবা নয়, এবার আমরা ওর আসল নামটাই উল্লেখ করব—সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে রেশুকা বলল, 'বৌদি, আমি বেরছি। একটু, লক্ষ্য রাখো লক্ষ্যটি।'

আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে রামাধর থেকে মলিনা বেরিয়ে আসছিল, পাঁচ-বছর আর সাত-বছরের তার ছেলে-দুটি কি-কেন বামনা ধরল, তাদের একটু সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল মলিনা, বলল, 'ভাগ্যল বললে, তা না হলে বুঝি লক্ষ্যই রাখতাম না।'

রেশুকা হাসল, বলল, 'কথা বলার উপায় নেই। কথা বললেই ফৌশ করে ওঠো কেন?'

'স্বভাব। স্বভাব।' মলিনা বলল, 'কিন্তু আজকে আর কোথাও যাওয়া নেই তো?'

না। বিকেলেই ফিরব।

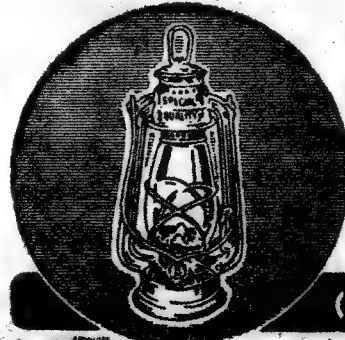
দোকান থেকেই বাড়ি? শুভদীপার করেই ছুটি। বেশ।

দু-জনে একটু বাসি-ভাটা করল পাশ-পাশি দাঁড়িয়ে, মলিনা, ওর মুখের দিকে চোরে বলল, 'মুখখানা যা সুন্দর হচ্ছে দিন-কেন্দিন, আমি পুরুষ মানুষ হলে কী যে কান্ড হারে যেত এতদিন।'

রেশুকা বলল, 'তোমার মুখ দেখে আমারও ঠিক এ কথাই মনে হচ্ছে বৌদি। কিন্তু ভাগ্যে বুঝি এ জন্মে আর মিটেবে না আমারও কারোই সাথ।'

এদের দু-জনের সাথ বুঝি পূর্ণ হবার কথা না। কিন্তু এমন সাথ তো জগৎপরে আরও বহু মানুষের মনে; তাদের সাথই কি পূর্ণ হয়েছে?

কিন্তু ওসব কথা নিয়ে ব্যগড়া করার সময় এখন নয়। দোকান গুলবে সকাল আটটার।



কিষাণ
লগ্নন
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস ঐকো

ফোন-২২-৬৫৮০

২৬৬, ৩৬ টানা বাজার ট্রাট, কলিকাতা-২

কিন্তু সাত সাতটা বেজে গিয়েছে। রিক্স মন-মত গিরে পৌঁছানো চাই সেখানে।

লিন্ডসে স্ট্রীটে একটা মন্ত সোকানো 'সেল্‌স্‌' নাম—এর কাজ করে রেগুকা। রেগুকার মত আরও কয়েকটি মেয়ে আছে সেখানে। একটু, চটপটে হওয়া চাই, একটু, স্মার্ট হওয়া চাই, কথাবার্তা বলতে জানা চাই, ছিমছাম থাকা চাই, ও সেইসঙ্গে চাই চেহারার একটু, জোলুস। রেগুকার এসব আছে। লেখাপড়া বেশ শিখতে পারে নি, তাই অন্য কোনো কাজের যোগ্যতা তার নেই। কিন্তু এ কাজে যোগ্যতা তার আছে।

যোগ্যতা যেমন তার আছে, তেমনি ঝুঁকিও আছে এ কাজে। কখনো মালিকের, কখনো-বা মালিকপুত্রের উপদ্রবও আছে। কারণ মনে কেমনো রকম সাধ জেগে উঠলে তা পূরণ করার জন্যে চাপও সহ্য করতে হয়। অব্যাহত, তেমন শোঁখিন বা চৌকশ খরিসন্দারও মাঝে-মাঝে জীবন উৎসাহী হয়ে ওঠে।

ইলেকট্রিক গাড়িদের দোকান। নানারকম বিদ্যুতিক কাণ্ডকারখানা নিয়ে তাদের কাজ। রেডিও, রেফ্রিজারেটর, ট্রানজিস্টর তো আছেই, তার সঙ্গে আছে পাখা—নানা ধরনের ফ্যান; এবং অন্যান্য পণ্য।

এইসব পণ্যের মধ্যে জীবন্ত পণ্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সেল্‌স্‌ গার্লদের।

কাজটা মন্দ না। অনেক রকম মানুষ দেখা যায়। অনেক রকম চেহারা, অনেক রকম লোভ, অনেক রকম লালসা। তেমন যোগ্যতা যদি থাকত রেগুকার, তাহলে এসব সকলের দাবি সে একে রাখতে পারত।

ওরা বিবিধ পণ্যের মধ্যে পণ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা নিয়ে প্রায়ই তাই তার সঙ্গে রসিকতা করে কলিনা। সে রসিকতার হাসিমুখেই কোমর ঘের রেগুকা।

কথা বার না, মালিকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে না পারলে কখন হয়তো বরখাস্ত হয়ে যাবে কাজ থেকে। এইজন্যেই রেগুকা নতুন আর-একটা জীবিকারও ব্যবস্থা রেখেছে। সে খবর আমরা রাখি।

বিক্রমে ঘরে ফিরে এল রেগুকা। এন্টালির কামডেন্ট রোডে। ঘরে ফিরেই সে কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

সিঁড়িতে পারের শব্দ পেয়ে নিচের ঘরের মধ্য থেকে মালিনা সাড়া মিল, বলল, 'কে? রেগু, নাকি?'

কিন্তু গলাটা রেগুকা বাকি শুনেতে পার নি, তাই কোনো উত্তর দিল না।

কনডেন্ট রোডে দিনের পর দিন কেটে চলেছে এইভাবে। মোমিনপুরের কথা মনে হয়। কিন্তু ওদিকে আজ পর্যন্ত খাওয়া হয়ে উঠল না। আর, যেতে যেন তেমন গরজও বোধ করছে না সে।

কিন্তু মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে নীহারের

কথা। আশ্চর্য মানব বটে। সব সময় সে জেগে উঠে করে বসে আছে। এমন কি তার বাড়িটাও দেখে গিয়েছে সে। কে বলতে পারে, হয়তো একদিন হঠাৎ সে হাজির হবে এখানে।

অথচ ওদের কথা অত ভাবে না রেগুকা। বতটা ভাবে এ মেয়েটোর কথা—এ ফুল্লরার কথা, সেই ইলিরার কথা। আশ্চর্য মানুষের জীবন বটে তার।

মেয়েটাকে নিয়ে মালিনার সঙ্গে তার অনেক কথা হয়েছে। সেই গল্প শুনে মেয়েটাকে দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়েছে মালিনার।

সেদিন সম্মতাবলী দুজনে নিচের বারান্দার বসে গল্প করছিল এইসব ব্যাপার নিয়েই। বোহালার সেই দলের মানুষদের নিয়েও কথা হল অনেক। কথাগুলো মালিনা শুনেছে, আর তার কেমন আশ্চর্য লাগছে। অভ্যস্ত পুরুষ নিয়ে হাল্লা করতে-করতে সে যে গেল, তাতে তার ভয় করল না।

রেগুকা হাসল, বলল, 'ভয় কি? ওদের বুকের পাটা নেই। পুরুষদের ভয় করলেই তারা পেয়ে বসে, তাদের পরোয়া না করলেই তারা বেকুব হয়ে যায়। উসখুস করে, কিন্তু উপদ্রব করতে পারে না।'

'তা হবে।' মালিনা বলল, 'হরেক রকম মানুষ তুমি দেখছ। তুমিই ভালো বুকবে। কিন্তু আমরা ঘরকুশো জীব, আমাদের চলতে হয় একটু ভয়ে-ভয়েই।'

'ওসব বাজে কথা অন্যকে বোলা। তুমি একটুও ভয় করে চলো না!'

'ভয় করি নে, বলো কি?' মালিনা বাধা দিয়ে বলল, 'উনি বাড়িতে ঢাকা মাত্র ততক্ষণ হয়ে থাকি। নুশ থেকে চুপ—সবাকি পুরো নজর রাখতে হয় না? ভোরে উঠেই বেরিয়ে যান টিউশনিতে, ফিরে এসেই মুখে কিছু গুলে দৌড় দেন ইস্কুলে। বিকালে আবার টিউশনি। তাই, ততক্ষণ থাকি—'

একটু থেমে মালিনা একটু হাসল, তার পর বলল, 'একটা মানুষ নিয়েই হিমশিম খাছি। তুমি এত মানুষ সামাল দাও কি করে? সদাগরি দোকানে কর সওদাগরি, কত মানুষ আসে-যায় সেখানে; তার পর আছে নাটক—'

'কৌশলটা কি জান বোদি?'' রেগুকা হেসে বলল, 'কখনো কোনো একজনের সঙ্গে একা থাকবে না। কয়েকটা পুরুষ যখন একত্র থাকবে, তখন তার মধ্যে গিরে বসবে। ওদের প্রভাবের মনে এমন ধারণা এনে দেবে যেন তাকেই তোমার পছন্দ। তাহলেই প্রভাবকে তোমার পাহারাদার হয়ে দাঁড়াবে। কেউ তোমার চুলের ডগাটি পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না। এই-ভাবেই তো কাটাচ্ছি দিন। দেখা যাক, কতদিন চলে এভাবে।'

একটু থেমে রেগুকা বলল, 'কিন্তু এ নীহার বসে ছেলোটা কেমন যেন উন্মোচী হয়ে

উঠেছে। সেদিন খাওয়া করোঁয়ান এই বাড়ি পর্যন্ত।'

'কি চার ও?'

'কে জানে! আর কি চার জানি নে। কিন্তু তার জমতে যে চার—তা তো স্পষ্টই বুঝতে পারছি। কিন্তু ওকে নিয়েও আমার কেন যেন খুব চিন্তা হয়। ও কাজ করে দমকলে। এত চটপটে আর এত ছটফটে, হঠাৎ আবার কোনো অ্যাকসিডেন্ট করে না বসে!'

রেগুকার কথা শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মালিনা। হয়তো একটু, সমবেদনাই জানাল রেগুকার। কিন্তু কিসের এই সমবেদনা?

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল তারা। অন্ধকার বারান্দার বসে আছে তারা। রাতাঘরে কড়াইতে ডাল ফুটছে। ঘরে আলো জ্বললে মালিনার ছেলেদুটি খাড়া-বই মেকের ছাড়িয়ে নিয়ে পড়ানোর নাম করে কলহ করছে।

এখান থেকে মালিনা তাদের একটা বন্ধ দিল।

রেগুকা বলল, 'ওকে দেখলেই আমার কেমন বেচারি বলে মনে হয়। আর, ও জানেও না যে, আমি বিবাহিতা; ও জানে না যে, আমার স্বামী আছে। জীবিকার জন্যে আমি ছোটোছোটো করি, আমার জীবনটা তাই ওদের কাছে কেমন সস্তা হয়ে গিয়েছে।'

বারিক লেনের বাড়িটার কথা মনে পড়ে আসে। মনে পড়ে সেই ভরষা কাণ্ডটার কথাও। দমকলের পাগলা-ঘণ্টার আওয়াজ এখনো যেন বেজে চলেছে তার কানের মধ্যে। দেখতে-দেখতে কী ভরষার সর্বনাশ হয়ে গেল! সব গেল—সব গেল। সব উহা হয়ে গেল! রেগুকাও যেত নিচেরই উহা হয়ে, কিন্তু যেহেতু গেল সে। কে তাকে উদ্ধার করল?

কে উদ্ধার করল তাকে? সফলভাবে তার নাম মনে-মনে মাত্র উচ্চারণ করল রেগুকা। তাকে মৃত্যুর মধ্যে থেকে যে লুফে তুলে নিয়ে এল তার কাছে সমস্তা জীবন সে ঋণী। সে ঋণ সে শোধ করে চলেছে।

কিন্তু বারিক লেনের সেই বিরাট প্রাসাদ ভুল্য বাড়িটার কথা মনে হওয়া মাত্র আর-একটা প্রাসাদভূলা বাড়ির কথা আজকাল তার কেবলই মনে পড়ে বছে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে উল্লেখ্য দৃষ্টি চোখের কথা, যে-চোখে দীপ্ত আছে, কিন্তু দৃষ্টি নেই। সেই ভীষণ নিঃসংগতা থেকে তাকে উদ্ধার করে আনবার কি কেউ নেই এই দুনিয়ায়?

নীহার তো এত উৎসাহী, নীহারের তো এত উন্মোচন; নীহারের কাজই তো হচ্ছে বিপদের মুখ থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। ও পারে না এ কাজটা করতে? আলোর পিছনে এভাবে ঘুরে-ঘুরে না বোঁড়িয়ে ওকে আলোর পিছনে একটু খাওয়া করতে দেখালে কেমন হয়। আগুন নিয়ে খেলা করছে

বীহা, আগুন নিয়েই ত সংগ্রাম করবে।
তাই ফাঁকে ও যাক-না একটু, ওই সংগ্রামপুরে।
চলো বোর্ডিং, চলো একদিন ওই সংগ্রাম-
পুরে। আর কেউ না—আমরা দুজন।
বেলেঘাটা স্টেশন থেকে ডায়মন্ডহারবারের ট্রেনে
উঠব। সটান চলে যাব।

রেশ্দের কাছ থেকে ইন্দিয়ার গল্প শুন-
লেন মলিনার মনে কৌতুহল জন্মেই আছে,
রেশ্দের এই প্রস্তাব শুনেন মলিনা উৎসাহ
সেখাল, বলল, 'সত্যি, গেলে হয় একদিন।'

মলিনার মনে কেবল যে কৌতুহলই জন্মে
আছে, এমন নয়; তার মনে জন্মে আছে
কল্পনাও। তাই বলল, সে যাবেই। কোথাও
মাওয়া হয় না কখনো, এই উপলক্ষে একদিন
জ্বব, বেরনো যাবে বাড়ি থেকে। কিন্তু একটা
ছুটির দিন দেখে বেতে হবে, যাতে বাড়িতে
থাকতে পারে মিষ্ট, আর পিষ্টের বাবা।

যা কথা হল তদনুযায়ী কাজ করার জন্যে
রেশ্দের ব্যবস্থার সীমা নেই। একদিন সে
তৈরি হয়ে নিল। মলিনাকে নিয়ে বের হল
কমন্ডেন্ট রোড থেকে।

ওরা বেরিয়ে গিয়েছে, তার কিছুক্ষণ বাসেই
হুজুমার কড়া নাড়ল কে বেন।

শব্দ শুনেন উঠে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল
অপরেণ। একজন অচেনা লোক সামনে
দাঁড়িয়ে, তার আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে
অপরেণ জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চান?'

নীহার এসেছে। নীহার বলল, 'এটা
দিবা দেবীর বাড়ি না? তিনি কি আছেন?
অপরেণের দৃষ্টি ছেলে মিষ্ট, আর পিষ্ট,
জন্মে তাদের বাবার পিছনে দাঁড়াল। তাদের
একটু সরে দাঁড়াতে বলল অপরেণ বলল, 'একটু
আগে বেরিয়ে গেলেন তিনি।'

ইশ, অপের জন্যে তাহলে দেখা হল
না। নীহার আপশোস করে বলল।

কিছু খবর দেবার থাকলে বলে বেতে
পারেন। তিনি ফিরে এলে বলতে পারব।

নীহার একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল,
খলবেন—বেহালা থেকে এসেছিলাম। ওর
একদিন হাবার কথা ছিল মোয়িনপুরে। না
মাওয়ার চিন্তা হল—কোনো অসুখবিসুখ করল
কিনা। তাই খবর নিতে এসেছিলাম।

'আপনার নাম কি বলব?'

'আমার নাম? আমার নাম নীহার বসু।'

অপরেণ শুনছে এ নাম। অপরেণ
শুনছে এর কথা। বলল, 'ও, আপনি?
আপনি বুঝি কাজ করেন ফারার রিগেডে?'

আশ্চর্য ও হল, সেইসঙ্গে আহ্লাদে গদগদ
হয়ে গেল নীহার, তার সম্বন্ধে তা হলে দিবা
একবারে উদাসীন নয়? এ লক্ষণটা তো
কল্প না।

'আপনি ওর কে হন?' জিজ্ঞাসা করল
নীহার।

'আমি?' অপরেণ বলল, 'আমি ওর

কলি না। এককালে ছিলাম ওর দান্দ্যায়নশায়।'

'আপনার হারী উনি ভবে?'

অপরেণ একটু, ভ্রাতা করল, বলল,
'আসুন। একটু, বিপ্রাণ করে বান। এত দূর
থেকে এসেছেন।'

নীহারের আপত্তি নেই। ভিতরে গিয়ে
বারান্দার মোড়া পেতে বসল দুজন।

মাস্টারি করে অপরেণ। মাস্টারি-জীবন
তার অনেক দিন হয়ে গেল। একটু, সাদামাটা
টাইপের মানুষ সে। একটু, বৃষ্টি সরলই।

অপরেণ গল্প করতে লাগল। রেশ্দের
উপর তার মমতা খুবই। রেশ্দের কণ্ট তার
নিজেরই কণ্টের সমান। অপরেণ বলল, 'ওর
জীবনটা একটা ট্রাজেডি।'

উৎসুক হয়ে উঠল নীহার, কৌতুহলী
হয়ে উঠল সে। কোনো প্রশ্ন না করে সে
তাকাল অপরেণের দিকে।

সেই 'পতিতা' কবিতা আবৃত্তির কথা
থেকে কথা আরম্ভ হয়ে গেল। যার নাম
রেশ্দের, তার আর-একটা নাম হয়ে গেল দিবা।
বারিক লেনের বাড়ির কথা হল। আশ্চর্যের
কথা হল। সেই আগুন থেকে আশ্চর্যভাবে
যে তাকে বাঁচিয়েছিল তার কথা হল।

কোনো আশ্রয় ছিল না মেরেটার। যে
তাকে রক্ষা করেছিল, সেই হল তার রক্ষক,
সেই বিবাহ করল রেশ্দেরকে। রেশ্দের জীবন
ভরসায় ভরে গেল।

বেশ সুখে কাটাছিল দিন। দুটি বছর
বেশ সুখে কেটে গেল। তার পর এল
বিপদ, বিনা-নোটিশে। 'আপনারা দমকলের
লোক, এসব বিপদের মধ্যে আপনাদের
পড়তেই হয়।'

দু বছর বাসে বেলেঘাটার ঘটে গেল এক
কাণ্ড। আগুন লেগেছিল সেখানে। ফায়ার-
রিগেড গিয়েছিল, সেখানে যার সেই দমকলের
লোকের সঙ্গে দমকলকর্মী মনোরঞ্জনও।

চমকে তাকাল নীহার, বলল, 'তার পর?'

'আগুন নেভাতে গিয়ে, কয়েকজনকে
উদ্ধার করতে গিয়ে দুখটনা ঘটল মনোরঞ্জনের
—সে পড়ে বলসে গেল।'

'কি বেন নাম বললেন তার? নীহার
জিজ্ঞাসা করল।

অপরেণ বলল, 'মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।'

এ নাম বেন শুনছে নীহার। তার বেন
বেশ মনে হচ্ছে এ নাম তার চেনা। তাদের
অনেক সহকর্মী এখনো বেন মাঝে-মাঝে
উল্লেখ করে এই নাম।

নীহার বলল, 'দিবা দেবী তার স্ত্রী?
তিনি দিবা দেবীর স্বামী? তিনি এখন
কোথায়?'

'তিনি শয্যাশায়ী। অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছেন
একবারে। আছেন এখানেই।'

'আশ্চর্য কাণ্ড তো বলতে হবে। এত-
দিন কথাটা এমন ভাবে চেপে রেখে দিয়েছেন

তিনি? কথাটা এমনভাবে চেপে রাখার সম্ভ-
ব হয় না কোনো।'

কিন্তু মনে হয় কি না হয়, সে কথা নিয়ে
তর্ক করা বৃথা। তর্ক তাই আর করা হল
না। কিন্তু অপরেণ বলল, 'বড় অভিমাত্রী
মেয়ে ও। এতটুকু কাল থেকে ওকে চিনি।
ওর বাবা সামান্য কাজ করতেন। অভিমাত্রীও
বটে, অহংকারীও। কেউ ওকে করুণা করে,
এটা বুঝি ওর ইচ্ছে নয়। তাই নিজের কথা
প্রকাশ করতে চায় না। কত কষ্ট করে আর
কত কষ্ট নিয়ে টাকা সোজগার করে, সবই
তো জানেন আপনারা।'

নীহার বলল, 'কিন্তু আজ গেলেন
কোথায়? আজ তো ছুটির দিন।'

কোথায় গিয়েছে তা জানার পর নীহার
যেন চিন্তিত হয়ে উঠল, ব্যস্ত হয়ে উঠল।
উঠে দাঁড়াল সে, বলল, 'খাই।'

অপরেণও উঠে দাঁড়াল, বলল, 'সেখানে
বেহালায় চললেন বুঝি?'

'উহু।' নীহার বলল, 'এটা চিন্তার
বিষয় হল, দুশ্চিন্তারই বিষয়। মার দুঃখ
মহিলার ওভাবে ওখানে মাওয়া ঠিক হল না।
কেন? জায়গাটা ভালো না বুঝি?'

'জায়গা ভালো।' নীহার বলল, 'কিন্তু
ওখানকার দাসীটা নাকি ভীষণ জীর্ষ। মনোর-
জার নাম, তার জীবনের ট্রাজেডির মতো নাকি
আছে ও—ওই মহামায়া।'

আর কোনো কথা বলল না নীহার,
অপরেণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে চলে
এল বেলেঘাটা স্টেশনে। খোঁজ করে জানল,
ডায়মন্ডহারবারের পরের ট্রেন ছাড়বে আর কটা
বাদে।

॥ সমাপ্ত ॥

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনসুজ বীরেনবর্মা

শ্রীমদ-জ্যোৎস্না—চার্লস-স্পিটস ইলুভার—

অমন্যাসাহিত্য প্রতিভার অধঃস্থ

চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাসিঁদ্বী—সর্বস্বত্বের

অনন্ত নিবন্ধ—বিশ্বসাহিত্যগৌরব উপ-

ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলসিঃ

বারনাবি রজ, চার্লস-চিচ। সাহিত্য

অগতির এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১০ টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট

কলিকাতা-১২

* প্রবাসী কথা

উপর্যুক্ত গল্প এবং পরিবহনের অভাবে
বহুক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় কত গ্রাম যে আজও কত-
খানি অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে তার কতকটা
আন্দাজ পাওয়া যাবে গ্রাম এক্তিমারপুর-বাসনা
দেখলে।

গ্রাম এগার বর্গ মাইলের ওপর পাঁচটি গ্রাম-
সভা নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলটির জনসংখ্যা প্রায়
হাজার দশেক। কিন্তু গ্রাম-বাস, ট্রাক্স-রিক্সা
অধ্যুষিত জনপদবাসীর পক্ষে অনুমান করতে
গেলেও কিঞ্চিৎ রিবম খাবার আশঙ্কা আছে যে,
এই দশ হাজার লোকের চলাচলের জন্য একমাত্র
দুই দশ পদযুক্ত কিংবা গরুরগাড়ি ছাড়া আর
কোন যানবাহনের আনা-গোনা নেই এদিকে।
এর পথের অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, বছরের
অধো বৈশ কটা মাসই গ্রামবাসীদের প্রায় বন্দী
আবস্থায় গ্রামেই কাটাতে হয়। কারণ এক-
কোমর কদা ভেঙে পথ চলার ক্ষমতা বেশি
শ্রমবহুল থাকে না। আর গরুরগাড়ির ঢাকা
চলে গেলে দেখতে মোর দিগে ঐতর্য্য হয়,
লম্বানে নিস্তা নিস্তা গো-যান চালানও খুব
সহজসাধ্য নয়।

নিকটতম রেলস্টেশন গ্রাম থেকে প্রায় ছয়
মাইল। নিকটতম বাসস্টে থেকেও মাইল পাঁচেক
দূরত্ব। এই গ্রামখানি কিন্তু মোটেই যেমন-
ইতম একটি জনপদ মাত্র নয়। ঐতিহাসিক
প্রাচীন এর যত থাক বা না থাক, ব্যবহারিক
দৃষ্ট্যে একে তুচ্ছ করা যায় না মোটেই।

লোকালর থেকে লুয়ে, প্রায় এক শতাব্দী
পেছিয়ে থাকা পরিবহনব্যবস্থা সত্ত্বেও সুস্থ
সংগঠন-চিন্তা এবং বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় গুণে
স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পীর একটি সূত্র, রূপের
আভাস এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে বলেই আমার
বিশ্বাস।

এক্টিয়ারপুর নাম কিছু বিচিত্র।
কিসের এক্টিয়ার, কার এক্টিয়ার, কেন কবে
থেকে সূত্রপাত হলো এক্টিয়ারের—তা কিন্তু
সঠিক করে জানাবার কোন উপায় আজ আর
নেই। কেউ কেউ বলে থাকেন পাশ দিয়েই
চলে গেছে গ্রিবেণী-গুপ্তিপাড়া রোড (গ্রিবেণী-
মুন্সিঙ্গাবাদ রোডও বলে থাকেন কেউ কেউ)।
ঐ পথ দিয়েই একদা বর্গী আসতো দেশে।
ধাবন্ত ঘোড়ার ধুরে ধুরে ধুরো উড়িয়ে
জলন্ত মশালের মুখে জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রাম
জনপদ নগর পত্তন দলে দলে হাজারে হাজারে
আসতো তারা। মূর্তিমান অভিষেকের মত রক্ত
মূত্য়া আর হত্যার বিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়ে
বেত চারিদিকে। সেই বর্গী আক্রমণের মুখে
হয়তো একদা বর্গীদেরই অধিকারে চলে গিয়ে-

ছিল এই গ্রাম। তারপর নবাব আলিরদৌর
চেফটার বর্গী হলো বিভাড়িত, পুনরায় নবাবের
এক্টিয়ারে ফিরে এলো গ্রামখানি। নামকরণ
হলো নতুন করে এক্টিয়ারপুর।

কিন্তু এসবই কল্পনা করা গল্প কথা।
হয়তো আর নয়তো দিয়ে কটকিত। তাই
একথা এখন থাক।

বাঁ-বাঁ চৈতন্যপুরে যখন এক্টিয়ার-
পুরের পথে নামলুম, তখন ভাবি নি এমন ভাল-
ভাঙা ক্রোশের পার্শ্বার পড়ে যাবো। শেনা বার

পারুল ভট্টাচার্য

পূর্বকালে গ্রামবাসী পথ চলতেন সদ্যভাঙা
একটি গাছের ডাল হাতে নিয়ে। তাজা ডাল
যখন শূন্যে উঠতো, তখনই পুরো হতো
এক ক্রোশ, কিন্তু সে কথাও তো গল্প কথা।
সেকালও বিগত হয়েছে বহুকাল আগে। তাই
ওকথাও এখন থাক।

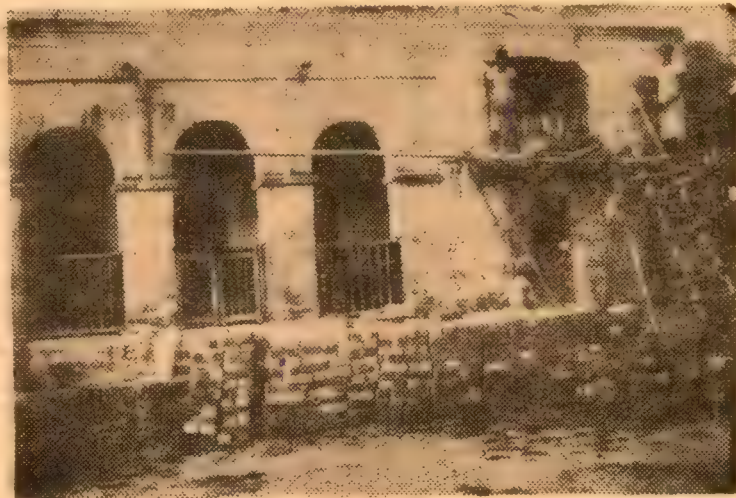
রাস্তার ধারে ডাংগুলি খেলারত একটি
বালককে ভেঁকে জিজ্ঞেস করা গেল তাই
এক্টিয়ারপুর কত দূর। গ্রাম দিগন্তছোঁয়া
গোটা দুই তালগাছের মাথা বয়্যার আড়ল
দেখিয়ে সে কালে দুই—হোবা।

বহুকাল ডাঙার ধারে গুলি তার লবেঘার
লাকাতে সুর করেছিল। এখন তার অনোবেগ
আকর্ষণ করা শিবেরও অসাধ্য।

স্বক্বে কন্যা, হাতে হাটের পাট্টা। হাট-
কেন্দ্রতা এক পথিককে ভেঁকে আবারও জিজ্ঞেস

করলুম ঐ একই কথা। তিনি বললেন, বেশি
দূর নয়, এই পুরাতন পথ। শুকালুম পোয়াই
যখন মলছেন লের কিংবা মল যখন নয়, তখন
অবশ্যই খুব বেশি দূর হয়ে না। আশিগশে
জুতো ছাতা শাড়ি সমলে এনে পড়লুম
সেই আ-দিগন্ত ধু-ধু ধানক্ষেতের আল
মাত্র জরসা করে। কিন্তু তারপর যখন সেই
শোয়ালেটেক পথ হটিতে হটিতে গায়ে ফরলো
কালঘাম, শ্বাস-প্রশ্বাস হলো দুততর, মাথার
মধ্যে সব ভালগোল পাকিয়ে চোখের সামনে
নাচতে লাগলো আপসা ছায়াবাদী, তখনই
হঠাৎই যেন মনে হলো মাথার ওপরে সেই
নিষ্করূপ স্বর্ষের অয়িরাম অয়িকরণের নিচে
সেই শূন্য তত্ত্ব ভূবাদীর্ণ মাঠের আটকাটা
আলে আলে কি এক রাক্ষসী তুকা যেন
নিঃশব্দে হুঁ করে রয়েছে। তন্ময়পুরেও
কি এক অজানা আতঙ্কে গা যেন হুমহুম করে
উঠলো আমার। কিন্তু এমন ভূবাদীর্ণ রিত
রূপে হবার কথা নয় এক্টিয়ারপুরের। বিগত
বৎসরে ১১টি গভীর নলকূপ রয়েছে এখানে।
এতদিনে ধরণীভেদী জলের খায়র ভেসে যাবার
কথা এক্টিয়ারপুরের। ঐ বৃক্ষময় মাটির
বৃক্ক আলো করে দেখা দেবার কথা গুরু গুরু
সবুজের স্বপ্ন।

কিন্তু স্বর্ভাগ্য তা হয় নি। নলকূপ রয়েছে
বটে কিন্তু চালু হয় নি, কারণ এখন পর্যন্ত
বিদ্যুৎ আসে নি এইলব অঞ্চলে। কানায়সোরে
শোনা যাচ্ছে নাকি আসবে শীঘ্রই। তোডজোড়ের



এক্টিয়ারপুরের একমাত্র চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী



এক্টিয়ারপূর আশ্রম

আজানও পাওয়া যাচ্ছে কিছু কিছু। চাষী অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছে। সরকারী কর্মকর্তারা বলছেন হবে হবে। চাষী বলছে, হবে হবে সে আর কবে গো—।

রাস্তাঘাট আর এক অভিশাপ এক্টিয়ারপূরের কিন্তু বিশেষত এই যে রাস্তা যে এখানে নেই এমন নয়। পাশ দিয়েই চলে গেছে বিখ্যাত দ্বিবেশী-গুপ্তিপাড়ার রোড। মরাবী আমলের প্রকাণ্ড চওড়া অতি চমৎকার রাস্তা। কেবলমাত্র সংস্কারের অভাবেই এমন চমৎকার রাস্তাটির অবস্থাও আজ অতি শোচনীয়। বড় বড় গর্তে ভরা, স্থানে স্থানে চরের জমির সঙ্গে প্রায় একাকারই হয়ে গেছে পথের নিশানা। কোথাও কোথাও এমনই অবস্থা যে পথে হাঁটার চেয়ে বিশেষ অর্থাৎ কিনা ধানক্ষেতের আলো হাঁটাই বোধ হয় বেশি পছন্দ করবেন পথচারী। বহু পুরাতন, বহুতর শ্রুতিবিজড়িত পথটির দুর্দশা বর্তমানে জনসাধারণেরও অশেষ দুর্দশার কারণ হয়ে উঠছে দিন দিন।

আরও একটি দীর্ঘ এবং ভায়াভায়াবোয়া পথ আছে এখানে। জীয়াট থেকে বাবলা মাসনা নাবালা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়ে মহী-পালপুর হয়ে একেবারে ইনছড়া পর্যন্ত। এটিও পথ হিসাবে প্রাচীন এবং সুবিধাজনক। একে কেবলমাত্র আবিষ্কারের অভাবেই পথচারীর ভীতি উল্লেখের কারণ হয়েছে টিক আহ আজ-কাল।

কৃষিপ্রধান অঞ্চল এক্টিয়ারপূর। আবাদীজমির পরিমাণও এখানে অনেক। প্রধান ফসল ধান পাট। কিন্তু আলু পেরাজ এবং রবিফলের উৎপাদনও অল্প নয়। এইসব ফসলপাতি আমদানী-রপ্তানির ব্যাপারেও একটু

ডাল রাস্তাঘাটের দরকার হয় মানুষের। অভাবে অশেষ দুর্গতি।

এক্টিয়ারপূরের সবচেয়ে কাছাকাছির হাট কোকরোপাচিন্দা, আর নিজা। দু'য়র মাইল পিঠেক, পথ দুর্দশ। উল্টো দিকের মগরায়-গজ, বা পাণ্ডুরায় হাটের দু'য়র অনেক, পথও দুর্গমতম। ফলে শূদ্র পায়ে চলাচল নয়, কৃষিজাত দ্রব্য আমদানী-রপ্তানির ব্যাপারেও অশেষ দুর্গতি পোষাতে হচ্ছে এক্টিয়ারপূরের চাষীকে।

গ্রামের একেবারে একান্ত নদী বললে ভুল হবে, নদীর বিকল্প নাম : কানানদী। গ্রাম-বাসীর সঙ্গে কানানদীর ব্যবহার কিন্তু প্রায় কানা দানবেরই মতো। এগাশ-ওপাশ মজে গেছে। ডলভুমিও সমতল প্রায়। জল এখন বন্ধজল। মশা-মাছ, শোকা-মাকড়ের আকর। সংক্রামক রোগের বিস্তারভূমি। আবার বর্ষাকালে ঐ সামান্য জলই উথলে উঠে বেশ করেক-শত একর জমির ফসল ডোবায়। অথচ নদীটির বিস্তার এবং দৈর্ঘ্য নিতান্ত কম নয়। সামান্য খানিকটা কাটিয়ে-কুটিয়ে পার্ববর্তী নদী বেহুলায় সঙ্গে এর মৃৎটিকে যদি জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে বন্ধজল উপচে উঠে বছর বছর এই ফসল নষ্ট হওয়ার দুর্ভাবনাটি যায় চিরতরে। সেতের জলের সমস্যাটিও যে কতকটা সহজ না হয় এমন নয়। বিশেষ করে আলু পেরাজ এবং রবিফলের চাষ খুবই উপকৃত হবে এতে। ব্যয় সংসামান্য বাড়িয়ে সংযোগের মাঝে ছোট একটি স্লুইস গেট বসিয়ে দেবার পরিকল্পনা যদি নেন কর্তৃপক্ষ, তাহলে তো আরও চমৎকার। বৃগপৎ মাছচাষ এবং ধানচাষের একটি পাকাপাকি সুবন্দোবস্ত হতে পারবে বলেই মনে হয় এখন।

লিফ্ট ইরিগেশন এক পত্তীম নলকূশ এই বিবিধ পত্তীমর মধ্যে প্রথমোক্তই বেশি পছন্দ করে চাষী। কারণ জলের সঙ্গে সঙ্গে নদীর পলি এবং মাটির কিছু ছোঁয়াচও এসে-এ পার জমি। ফসল ভাল হয় তার ফলে। তাই দেখানোই কাছাকাছির নদী কিংবা খাল আছে, সেখানেই ভুলে জল দেবার ব্যবস্থা করাই ভাল। অন্যতমক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে গভীর নলকূশ স্থাপনা করে তারপর তাকে অচল অবস্থায় ফেলে রাখার চেয়ে যে ভালই—এবিধের বোধ হয় যিমত প্রকাশ করবেন না কেউ।

বহু গোয়ালার বাস এক্টিয়ারপূরে। একমাত্র চাবাছাড়া গ্রামেই প্রায় দুই শতাধিক পরিবার বাস করে। চাবাছাড়ার ছানার চালান বিখ্যাত। দৈনিক গড়ে বৈ প্রায় দেড় থেকে দুশো মশ ছানার বালতিতে করে যায় খামার-গাছি স্টেশনের প্রাটকর্ম, তার সবই প্রায় চাবাছাড়ার। স্টেশন থেকে ট্রেন, ট্রেন থেকে হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষমাণ উড়ে ভারীর কাঁধে চড়ে দু'য়র থেকে দু'রাস্তারে কলকাতার বাজারে বাজারে চলে যায় ঐ ছানা। এবং অন্যতরিলম্বে ছোট বড় নানা দোকানের শো-কেসে শো-কেসে দেখা দেয় সপেশ রসগোল্লা লেডীগেনার রসনা-লোভন শোভন আকৃতিতে।

কিন্তু এতেও একটি মন্ত কিন্তুর সুযোগ হলেই ইদানীং। না, আইন করে ছানার ব্যবসা উঠিয়ে দেওয়ার সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলছি না। গ্রামাঞ্চলে পশু-চিকিৎসার একান্ত অভাব এবং তৎসংক্রান্ত অসুবিধাও আমার বক্তব্য নয় এখন। এখন দু'ধ কিংবা ছানার গোড়ার কথা যে গরু কিংবা মহিষ, তাদেরই কথা একটু বলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

একদা প্রাক-স্বাধীন যুগে জমিদারীপ্রথার অন্তর্ভুক্ত ছিল দেশের ভূ-সম্পত্তি। দেশে তখন জনসংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম ছিল। পতিত জমি বনজঙ্গল ঘাসপাতারও অভাব ছিল না কিছু। তথাপি এসব সত্ত্বও, জমিদারী পালনের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য হিসাবেই প্রতি গ্রামের একপ্রান্তে খানিকটা সেতের জমি এবং গো-ভাগাড় ছেড়ে দিতেন প্রায় সব জমিদারই। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল গ্রামবাসীর গরু-মহিষই সেখানে চরতো। ফলে গ্রামাঞ্চলে গো-পালনের রেওয়াজও ছিল খুব বেশি। খোল বিচালী নৃণ ভূমি কিনে খাওয়াতে অসমর্থ নিতান্ত বিপুলমান মানুষও একটি-দুটি গরু পুস্কতেন শূদ্রমাত্র ওই চরাণী জমির ভরসায়। গ্রামাঞ্চলের দু'ধের সমস্যাটিও তাই এত প্রবল হয়ে দেখা দেয় নি কোনোদিন।

আজকে অবস্থা পাল্টাচ্ছে। জমিদারীপ্রথার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গো-চরভূমির পদ্ধতিটিরও ঘটেছে লোপ। অতিজনতার আধিক-ভারজন্য গ্রামে আজ বর্ধিত জমি

নেই ফলশ্রুতিও চলে। মানব নিজের জীবিত-
কৃত্যের দ্বারা লক্ষ্য কিংবা উদ্দেশ্যের
পাছ লাগিয়ে দিয়েছে। ফলে গ্রামের গরু-
মহিষ আজ আর বিচরণের স্থান পায় না
কোথাও। সংকীর্ণ গোয়ালের চার-দেওয়ালের
ঝরার মধ্যে দিবারাত্র খোঁটার আটকানো আবদ্ধ
জানোয়ারের স্বাস্থ্যও তাই মোটে ভাল নয়।
ছাড় বের করা শীর্ণ পঞ্জর-সর্বস্ব পশুগুলিকে
দেখলে মারাই হয় বেশি। স্বভাবতই দুধের
পরিমাণও এদের কম। স্বল্প দুধে দুর্মূল্য
গো-খাদ্যের ব্যয় পুষিয়ে উঠতে পারে না
গোয়াল। একফোঁটা দুধও বিক্রি করলে তাই
ভার চলে না। গ্রামাঞ্চলের দুধ তাই চড়ার
থেকে চড়া দামে ছানা হয়ে চলে যায় কলকাতায়।
আর প্রয়োজনে গ্রামের মানুষ সংগ্রহ করতে
পারে না একফোঁটা শিশুর খাদ্য, অথবা রোগীর
পথ্য।

অত্যধিক খাদ্যসংকটের এই দুর্দিনে মানবের
উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমত
নেই কারও। তথাপি একথা ঠিক যে, দুধের
উৎপাদনটাও একেবারে নষ্ট হয়ে গেলেও
চলেবে না। তাই মনে হয় বড় বড় ডেরারী
পরিকল্পনার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের
অনেক কিছুটা কম করে গ্রামে গ্রামে প্রতি অঞ্চল
পঞ্চায়েতের অধীনে কয়েক একর জমি যদি
ছেড়ে দেওয়া যায়। বছরে গোটা দুই তিন
সেচ (গভীর নলকৃপ যখন চালুই হচ্ছে) আর

কিছু বাসের বীজও যদি ছাড়িয়ে দেওয়া যায়
এ জমিতে তাহলে হয়তো এই বিবম দুধ
সমস্যার সমাধান খানিকটা সহজ হয়। ঘরে
ঘরে গো-পালনের রেওয়াজ আবার ফিরে আসে।
গ্রামের শিশু তার দুধের অধিকার ফিরে পায়
আবার।

আর সেই সঙ্গেই অধুনা অবলুপ্ত একটি
গ্রাম্য পেশারও পুনরুদ্ধার হতে পারে আবার।
একদা গ্রামাঞ্চলের অনেক মানুষের জীবিকা
সংস্থান হতো গরু চরানো রাখালের বৃত্তিতে।
আজ গরু নেই। জমি নেই, গো-চারণের
বৃত্তিও নেই সেই সঙ্গে। গোষ্ঠের রাখাল আজ
কিংবদন্তী। গৃহ প্রত্যগত গো-পালের পুর
খুলিতে আজ আর ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না
গোধূলির আকাশ। ছারান্ধর সমস্যার বিষয়তা
উদ্ভব করে বাজল না মেঠো সুরের রাখালিয়া
বাঁশী।

চিকিৎসা ব্যবস্থাও মোটেই সুবিধের নয়
এখানকার। গোটা অঞ্চলটার মধ্যে একটি মাত্র
চারিটে ব্লক ডিসপেন্সারী। বাসনা সুখদায়ী
অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামেরই এক
সুসন্তান প্রিনেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দানে ও
উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বর্তমানে
এটি জেলা বোর্ডের হাতে আছে। বহু পুরাতন
ভবন গৃহটির কিছু সংস্কারের কাজও চলছে
সেখা গেল। কিন্তু তথাপি একথা ঠিক যে,
এত লোকের বাসভূমি এত বড় অঞ্চলটার তাবৎ

রোগ-বাতির উপশম এই একটি মাত্র অবৈতনিক
চিকিৎসা কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে হওয়া সম্ভব নয়।
হচ্ছেও তাই। রোগ এবং চিকিৎসা ব্যাপারে
অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে গ্রামবাসীকে।
শোচনীয় দুর্ঘটনা যে ঘটছে না এমনও নয়।
এই তো সেদিনের ঘটনা, বাবলা গ্রামের সহস্রাব
বাউরীর প্রসব বেদনাতুরা স্ত্রীকে গরুরগাড়ি
করে নিয়ে যেতে হাছিল সবচেয়ে নিকটবর্তী
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। গাড়ির ঝাঁকুনি এবং অতিরিক্ত
বিলম্ব মধ্য পথেই মৃত্যু ঘটলো তার।

সাপে কাটা রোগী সম্বন্ধেও ওই একই
কথা। সময়ে ঠিক মতো বাধন-ছাদন পড়লো
তো রক্ষে। নইলে চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছতে
পৌঁছতেই প্রাণান্ত রোগীর।

প্রসঙ্গত আরও একটি কথা উল্লেখ না
করে পারা গেল না। সাম্প্রতিক পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনার পরিবার পরিকল্পনা ন্যাক
অগ্রাধিকার পেয়েছে। বিশেষ করে নতুনতর
এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষের দশ
পাঁচটি জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে হুগলী
তাদের মধ্যে অন্যতম। বেশ কয়েক লক্ষ
টাকা ব্যয়ে হুগলী জেলায় সুর্য হয়েছে
পরিবার পরিকল্পনার এক রীতিমতো
অভিযান।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে হুগলী
জেলারই এইসব গ্রামাঞ্চলে এতসব উদ্যোগের
আভাষমাত্রও দেখ গেল না। জিজ্ঞাসা করলে
গ্রামবাসী অবাক হন। কিছু শিখা কিছু বা
সন্দেহের সঙ্গে বলেন ওঃ ওসব-ওসব তো
শহরে হয়। বড়লোকেরা করে। আমাদের
এখানে ওসব কি—

শহরাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনার প্রচার ও
প্রসারের প্রয়োজন নেই এমন কথা বলি না।
কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজন বোধ করি গ্রামাঞ্চলেই।
কারণ স্থান বিচারে শূন্য বাংলা দেশটাই নয়,
সমগ্র ভারতবর্ষই গ্রাম প্রধান দেশ। আর তাই
যে কোন পরিকল্পনারই আওতা থেকে
গ্রামাঞ্চলই যদি বাদ পড়ে যায়, তাহলে সমস্ত
পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ হয়ে গেল বলতে হবে।
কারণ দেশের তিন ভাগ মানুষই বাদ পড়ে
গেল তার সুযোগ সুবিধা থেকে। আর তা
ছাড়াও দারিদ্র, অস্বাস্থ্য এবং জীবিকা হীনতার
প্রকোপ গ্রামে যেতো বেশি শহরে ততো নয়।
তাই ক্ষেত্র বিচারে সম্ভাবনীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনও
গ্রামেই খুব বেশি।

প্রাথমিক বিদ্যালয় এখানে অনেকগুলি।
জুনিয়র হাই স্কুল মাত্র একটি, এবং হাই স্কুল
নেই। হওয়া দরকার। কত যে দরকার তা
বোঝে হবে যু. যু. গ্রামের দাছ বা শ্রাবণের
অকোষ বর্ণণ উপেক্ষা করে, এক হাটু কাদা
ভেঙে বই বগলে ছেলেমেয়ের দলকে নিতা প্রায়
৭ থেকে ৮ মাইল পথ হাটতে দেখলে।
সবচেয়ে নিকটতম হাই স্কুলটির দূরত্ব এখান
থেকে প্রায় ৮ মাইল।

প্রকৃতপক্ষে এখানকার বহু মেধাবী ছাত্র

সেরা জিনিস অথচ কম দাম ! জুতা ও তাঁতের কাপড়

আর আই সি-র

মে-কোন বোকান থেকে কিনুন:

৩৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

২৫, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

২৩, গাড়িয়হাট রোড, (গোল পার্ক), কলিকাতা-১১

বেনাচারিট ও চন্দ্রদাস রোড মাকেট, দুর্গাপুর

রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ

(ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠান)

২৫, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩



একটি গ্রামের একটি রাস্তার কাজ হচ্ছে স্টেট রিলিফের মাধ্যমে

গ্রামেই উচ্চ শিক্ষার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু মাত্র এই ভয়ানক পথ কণ্ঠের জন্য। কেবল মাত্র শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যই নয়। আরক্ষা ব্যবস্থারও শোচনীয় অবস্থা এখানে। একেই তো সামগ্রিকভাবেই গ্রামাঞ্চলের পুষ্টিশীল ব্যবস্থাটাই যথেষ্ট দুর্ভাগ্যবশত এখনও। সেই গ্রামাঞ্চল কালীন সেপাই দারোগা আর সাব-ইন্সপেক্টর নিরে কর্মচারীর সংখ্যা আজ থেকে চারশ বৎসর আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। এবং বর্তমান যুগে আরক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে দুটি বস্তু অর্থাৎ টেলিফোন, এবং দ্রুততম কোনো যান অর্থাৎ জীপ গাড়ি বা মোটর সাইকেল নেই পাড়ারগিরে থানায়। এদিকে ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যার তাড়ার এবং ক্রমশ প্রসারিত কলকারখানায় আর্থিকের ক্ষতিয়াণে অপরাধ এবং অপরাধীর সংখ্যাও নিতাই বেড়ে চলেছে পল্লী অঞ্চলে। চুরি ডাকাতি হিনতাই তো আছেই। খুন জখম মারপিটও বাড়ি কম নয়। অথচ প্রয়োজনে খবর পাবার, এবং পেয়ে তড়াতাড়ি দৌড়ে আসবার কোনো উপায় পুষ্টিশীল নেই। অনেক সময় ঘটনাস্থলে হাজির হতে তাঁদের চাবিশ ঘণ্টাও কেটে যায়। এবং পুষ্টিশীল এই দুটি মারাত্মক দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে অপরাধীরাও। আজকাল প্রায়শই তারা উন্নততম আধুনিক আর্নেস্টো সজ্জিত হয়ে এবং জীপ কিংবা লরী সহযোগে ডাকাতি করতে আসে। সতর্ক গ্রামবাসী যথা সময়ে থানায় খবর পাঠাতে সক্ষম হলেও সাইকেল আরোহী পুষ্টিশীল বাহিনীর অকুশলে পৌঁছবার পূর্বেই কাজ সমাধা করে হাওয়া হয়ে যায় দুর্বল দল।

এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল বাসনা গ্রামের গ্রীনিবারগন্ড কোলের বাড়িতে। গম্ভীয়া-ঘাটের কিছুর পরে ডাকাতি পড়ে দেখানো।

স্বরং গৃহস্থামী নিহত হন তাদের হাতে। যতো শীঘ্রলম্ভব; আন্দাজ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই থানায় খবর পাঠিয়ে দিলো গ্রামবাসী। কিন্তু পুষ্টিশীল এলো পরদিন বেলা দুটো নাগাদ।। কলা বাহুল্য অপরাধীরা ধরা পড়ে নি। এবং পড়বেও না কখনও।

উত্তর স্বাধীন ভারতবর্ষে গ্রামকে বাঁচাও, গ্রামকে বাঁচাও একটা ধুরো শোনা যায় সর্বত্রই, আজ বহুকাল ধরে। কিন্তু গ্রামবাসীর ধন-প্রাণ রক্ষা করবার যে মামুলী বন্দোবস্তটুকু সেটুকুও করা সম্ভব হয় নি আজ পর্যন্ত। শহরে রাতচৌকী আছে, বাট কনস্টবল আছে। প্রায় প্রত্যেক পাড়ার থানা এবং থানায় থানায়

গাড়ি টেলিফোন প্রভৃতি আছে। কিন্তু গ্রামে এখনও পর্যন্ত সে নয় টাকা মাইনের হাটু জিরাজিরে চৌকীদার ছাড়া আর কিছুর নেই। ফলে চুরি কিংবা ডাকাতি হয় আজ, পুষ্টিশীল আসে পরশু, এবং ঘটনাস্থলের স্রাপ একে, গৃহস্থামীকে সাবধান করে ঘুমোবার নির্দেশ দিয়ে তাঁরা চলে যান। হতবস্ত্র করে পাওয়া বা অপরাধী ধরা পড়ার সবটাই নির্ভর করে কতিপয় ব্যক্তির বরাত জোরের ওপর। সত্য সেলুকাস—

গ্রাম কিংবা শহর, স্থান বাই হোক। স্থানীয় এলাকার উন্নতি ও সংগঠন স্থানীয় অধিবাসীদের দানে আর উদ্যোগে যতটা সম্ভব; এতটা বোধ করি আর কিছুরেই নয়। এই কথাটি পরিষ্কার বোঝা যাবে গ্রাম একতিয়ার-পূর-বাসনা দেখলে। সরকারী সাহায্যের খুব বেশি পরোয়া না করে এখানকার অধিবাসীরা নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন গ্রাম সংস্কারে। ফলে রাস্তাঘাটের এত অসুবিধা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এবিবিধ বিড়ম্বনা সত্ত্বেও স্তম্ভ গ্রামবাসীর সর্বত্র যে একটি প্রী ও সমৃদ্ধির ছাপ কুটে উঠেছে এক নজরেই সেটি দৃষ্টি এড়াতে না পারাও। অনেক অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু প্রায়শ অবহেলিত বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি পড়েছে গ্রামবাসীর। উদাহরণ স্বরূপ মহেন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়টির কথাই ধরা যাক।

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার কল্পে অনেক চেষ্টা করেছেন এবং করছেন সরকার। গ্রামে গ্রামে হরিবল্লভের মতো ছড়িয়ে দেওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিই তার প্রমাণ।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দারিদ্র কেবলমাত্র এই ককম কতকগুলি বিদ্যালয়



মহেন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার কথা দিয়েই শেষ হয়ে যায় কি না এবিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করবার আছে। প্রাথমিক শিক্ষকেরা দারিদ্র্য বা তাঁদের বেতনের স্বল্পতা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করবো না। আমি এখন সম্পূর্ণ অন্য একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহগুলির কথাই কথা থাক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত নিচু টিন কিংবা টালী চালে ঢাকা, দাঁত বার করা দেওয়াল এবং অপরিচ্ছন্ন মেঝের ওপর ভ্যাপসা ঘরমুখো অন্ধকারে বসে শিশুদের পড়াশুনা করতে হয়। সত্য কথা বলতে কি গ্রামাঞ্চলের এইসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশির ভাগেরই বাইরের চেহারা দেখলে সৈটকে বিদ্যালয় বলে যা মনে করে জন্ম নিশেবের আখড়া মনে হওয়াই সম্ভবপর। শিশু প্রকৃতির জীব। প্রকৃতপক্ষে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে নিত্য নতুন সিলেবাসের বোঝা বা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংযোগ্যতার চেয়েও শিশু মনের জুড়িতকর জনকুল পরিবেশ রচনা করাই সর্বপ্রথম করণীয়। খেলা মেলা প্রিয়, সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্নতা পুরাসী শিশুমন যে ওই নেংড়া ভ্যাপসা আবহ অন্ধকারের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে হুঁপিয়ে উঠতে চাইবে তাতে আর আশ্চর্য কি। জাতির শৈশব যে লাগিত হলে ওই পরিবেশে একথা ভাবলেই মন বিদ্রোহ করে। মনে হয় তার মূর্খ এমন অসুস্থ অববেষ্টনীর মধ্যে, তার ভবিষ্যৎ খুব একটা সুস্থ উজ্জ্বল প্রাপকৃত হয়ে উঠবে না নিশ্চয়ই।

সুখের কথা বাসনাবাসী সচেতন হয়েছেন র বিষয়ে। তুচ্ছ একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঝে তার পরিবেশ রচনার প্রতি তাকিয়া প্রকাশ করেন নি তারা। মহেন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভরনখান দেখলে সহসাই একটি উচ্চ বিদ্যালয় বলেই ভ্রম হওয়া সম্ভব। অত্যন্ত খোলামেলা পরিবেশে মৈথো প্রস্বে যথেষ্ট আরতনসম্পন্ন সুন্দর সুসজ্জিত স্কুলবাড়িটি গ্রামের ভবিষ্যৎ গঠনে গ্রামবাসীর একান্ত শূভেচ্ছার প্রতীক যেন।

আদিম কালে পাথর পুজার এবং বৃক পুজার রীতি ছিল মানবলগ্ন্যে। আজও সে রীতি যে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি তার প্রমাণ পাওয়া যাবে বাংলার গ্রামাঞ্চলে স্থান করলে। বাসনার বিশালাকীও তেমনই এক প্রান্তরময়ী দেবী। মূর্তি বলে কিছু নেই। এক ষষ্ঠ সিন্দুর চর্চিত শিলা। জাগ্রত বলে নাম ডাক আছে। জনসাধারণের ভক্তি এবং পূজাও পেয়ে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে।

গ্রামের একেবারে এক প্রান্তে প্রান্তরের কোলাটি ঘেসে গোপবামী শ্যামসুন্দর বাবাজীর ছায়াসিন্ধু সিংহপ্রসন্ন। খুব বেশি দিনের নয়। মাত্র দশ পয়সার বৎসরের পুরাতন। কিন্তু পরিবেশটি ভারী মনোরম। আজমেরি বিগ্রহ অছেন রথাকৃক, গোপাল, সুভদ্রা, কলরায়, কৃষ্ণ ইত্যাদি। রথযাত্রা এবং দোহবারা উপলক্ষে

আজমের মেলার ধুমধাম এদিকে প্রসিদ্ধ। বিচারির ঘেরাটোপে ঢাকা ছোট রথখানিও এক পাশে রাখা আছে দেখা গেল।

স্থানীয় কোলে পরিবারের অনেক দান এবং উদ্যোগের চিহ্ন দেখা গেল গ্রামের সর্বত্র। ব্যবহারিক অর্থে এরা সম্পদশালী। কিন্তু তার সঙ্গে হৃদয়ের ঐশ্বর্যও বৃদ্ধ হয়েছে সমভাবে তার প্রমাণ পাওয়া গেল জনহিতকর নানা কর্মোদ্যোগের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় যোগাযোগ দেখে।

একদা ভারতীয় সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা, নগরীর কোলাহল এড়ানো ভূপোবন লাগিত সভ্যতা। সেদিন গ্রামীণ সমাজের রীতিনীতি আচার আবেষ্টনই নিয়ন্ত্রিত করেছে সমগ্র জাতির গতি প্রকৃতিকে।

তারপর গত হয়েছে বহুকাল। বিচারের সংকীর্ণতা আচারের বন্ধ মনে পরিণত হয়ে আঁকিল করে তুলেছে গ্রামীণ সাংস্কৃতিকে। এবং তার পরও দিন গেছে, কালক্রোত এগিয়ে গেছে অনেকখানি। আজ আবার এতদিন পরে পুরাতন সংস্কারের জীর্ণ স্ফাট বন্ধন পশ্চী কাটিয়ে বৃদ্ধি আগছে গ্রাম। নব চেতনা নবীনতর কর্মোদ্যোগ নিয়ে উদ্ভাস হচ্ছে সুখী স্থানীয় স্বতন্ত্র এক বলিষ্ঠ গ্রামসমাজ। একাতিয়ারপুত্রের মাটিতে বার সম্ভাবনার সূত্রটি হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।

জাতীতের কোনো গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অধ্যায় হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না একাতিয়ারপুত্রে। কিন্তু তার ভবিষ্যতের

ইতিহাস রচিত হচ্ছে ঐ বিদ্যালয়ের নিভৃত, গ্রাম প্রান্তের কুটির প্রাণ্ণে, একান্ত অজ্ঞাতে। যে ইতিহাস মুছে যাবে না কোনোদিন। মহাকালের চরণ স্বাক্ষরের অন্তরালেও বেঁচে থাকবে বার অক্ষর অক্ষরপ্রণী।

দিন যখন শেষ হলো, প্রায়শ্চন্দ্র সন্ধ্যার ঘরমুখো চলতে চলতে মনে পড়ে গেলো উদ্ভূত একতিয়ার কথাটির বাংলা অর্থ অধিকার। একতিয়ারপুত্র কথাটির বাংলা দাঁড়াচ্ছে তাহলে অধিকারপুত্র। অধিকারপুত্র? হঠাৎ কোথায় যেন চমক লাগলো একটা। অধিকারপুত্র, বাঃ। মনের দিগন্তে একটি বহু দরজা যেন খুলে গেল হঠাৎ। অধিকারপুত্র বাসনা বার বাঃ। রং বদলাচ্ছে ঐ পথঘাট, এই মাঠ মাটির। নাম রেখেছে কে গো। কোন কবি কোর দার্শনিক। কোন সে বাউল কিংবা বৈরাগী? বাসনা থেকে অধিকার? না অধিকার থেকে বাসনা? কে জানে কে জানে।

সেই কালো কাঁচা কোমল অন্ধকারে, সেই ঠান্ডা মেঠো পথের নরম খুলো মাড়ির পাখি চলতে চলতে হঠাৎই কেমন যেন বড় আকাশের হলো। হায় একতিয়ারপুত্র কেন হলো না অধিকারপুত্র। তাহলে তো পথচলা কোনো গ্রাম বাউলের মতো আমিও বাঁধতে পারতুম নাম—

বাসনার বস্তুরে মন
অধিকারে অনুরাগ
জনম গেল মিছে ভ্রমসে-

মহাবি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম

শিভগণ নিকটে উপস্থিত হলে মহাবি কণাদ তাঁহাদের বোধোদন করিয়া বলিলেন,—“হে শিভগণ এই পুত্রে তোমাদের নিকট বর্ষব্যাপ্য করিব।” মহাবি কণাদ নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। বর্ষের বিভিন্ন দিক, কার্যকাণ্ড, ত্র্যায় ও সত্তার পার্থক্য ও তৎপরের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, ত্র্যায় ও আকাশাত্মক, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃসূত্র, ব্যক্তি, জন্মাত্মক, ভ্রম ও প্রমাদ—মহাবি কণাদ বর্ষব্যাপ্য মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যাক্ত করিয়াছেন।

বর্গত উপেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় অনুদিত

মূল্য দুই টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৯৬০ বিংশবিহারী বাহাদুরী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

বেশ দিনেরবেলায় ওই দূর পাহাড়গুলো কেমন নীলের পেখম পরা মনে হয়। সাদা চাপচাপ মেঘ যেন তার গায়ে মাথার মুখ ছোঁয়াছে। অথচ এখন এই প্রথম রাতে ফিনিকি দেওয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে সেইসব পাহাড়ই কি মোলারেম স্তম্ভতা। ঠান্ডা প্রলেপের মত মেজাজ দিয়ে ঢেকে কেউ তাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে.....

এইভাবে নিজে নিজে মনের কাছে মুখখানি তুলে ধরল হিরণ। যেন নিজেই নিজের কাছে জবাবদিহি করে চলেছে। ফিনিকি জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ চারিধার অথচ কেমন যেন অশ্ব মানুষের মত আত্মগহ্বরে ডুবে যেতে হচ্ছে। চেতনার কন্দরে যে স্নায়ুগুলি এতক্ষণ অনুভূতি ছড়াচ্ছিল, সচেতন চোখে যেসব কার্যকারণগুলি ঘরা পড়াছিল, বেশ কিছুক্ষণ এই চন্দ্রাত্তপের মিহি মোলারেম এবং রূপোলী শব্দে তার সবটুকুকে মনন করেছে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে হিরণকে দেখে রোমাণ্ড হল মনীষার। উভয় উভয়কে দেখতে দেখতে চাঁদের আলোয় সাতার দিতে থাকল। গায়ের চামড়ায় প্রতিটি লোমকূপে শব্দ-জ্যোৎস্না অনুপ্রবেশ করেছে। নিশ্বাসের ওঠা-নামার মালারশ্রেণি এই জ্যোৎস্নার মাদকতা। অজস্র গাছের গাঢ় জটলা থেকে কখন মাঠে নেমে এসেছিল। কখন হিজল বন পার হয়েছিল।

লক্ষ্যবিন্দু চার কোররের সামনে যেখানে ঠোঁটভাঙা বাড়িকাক বসে থাকে, এখন জ্যোৎস্নার মধ্যে গাছের গাঢ় ছায়ার ডুবে আছে.....

এসব দিকে চোখ মেল না ওদের। গাছ পাতা বোপঝাড়ে যখন ঝি-ঝি ডাকছে। ফণিস্রু কাটার বোপের ওপর জোনাকী উড়ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে রূপোলী সমুদ্রের মত এই আদিগন্ত জ্যোৎস্নাকে দেখতে পেরেছিল হিরণ।

মনীষার কানে কানে বলেছিল—বোঝাপড়াটা এখানে নয়, চল ওই জ্যোৎস্নায় গিয়ে নামি।

সেই থেকে হেঁটে চলেছিল ওরা। এত দিনের না-কলা কথাগুলো যেন বলতে হল না। উভয়ে উভয়ের হাতের মতোয় হাত গুঁজে বুঝতে পারল, এ দুটি হাত পরস্পরের কাছেই আগ্রয় পেতে চাইছে। জামার কলারে জোনাকী বসেছিল হিরণের। তাই মনের সামনে এসে চোখ তুলল মনীষা। কি মনে করে ওর লাল ঠোঁটটির দিকে তাকাল হিরণ; কমলালেবুর

রসালো কোয়ার মত মনে হল। মনীষা জামা হাতের আঙুল দিয়ে জামার কলারে চোকা দিল, ছিটকে পড়ল জোনাকীটি।

—শুধুমাত্র এইজন্যে আমার বৃকের কারণ এনে?

—নইলে আর কি চেয়েছিলে?

—কি জানি, কি বলতে চাইছি.....

একটুকুরো কৃয়াসার মত ধীর ধোঁয়ান্ন মধ্যে এসে দাঁড়াল ওরা, জ্যোৎস্না এখানে কুহেলিকার জাল.....। সব বোকা-না-খোয়া, পাওয়া-না-পাওয়ার মত দোলায়মান...কিন্তু এ অনুভব এমন ছিল না। চাঁদের আলোকে এমন নেশা ছড়ানো মনে হয় নি। এ আলো আরো পাঁচটা দিনের মত অথচ এই অজানা সেশে এই আদিগন্ত মাঠের মধ্যে একে কত বেশি নতুন মনে হচ্ছে।

—এর আগে আমি বহুদিন ভেবেছি এই মাঠটুকুতদ্র পর্যন্ত গিয়েছে...দেখে আসলি



চন্দ্রাত্তপ জ্বালান্য ডট্-

—তা হলে আম নি কেন? এসেই তো পারত।

—পারতাম। স্কুলের মেয়েরাও মাঝে মাঝে কলহ, চেনা না দাঁড়ানি, এই মতটা কত বড় একদিন পরখ করে আসি.....তবু আসা হই নি।

কাছিমের পিঠের মত উঁচু-নিচু এই মত। হুপোলী ধারার ঘাসফুল দুলছে। নিখর স্তম্ভভাষা হিম হয়ে আছে চারিদিক। শব্দ মাঝে মাঝে চাপচাপ মেঘের মত খোঁসার খেঁসে আসছে.....

মনীষা শব্দ একবার বলে—এইভাবে হাটতে হাটতে আমরা কতদূরে এসে পৌঁছেছি।

—ঠিক তাই। ডেমার স্কুলের আলো স্ট্রীট লাইটের আলো আকাশের তারার মতই মিউমিট করছে এখন.....

—কি করে আমরা এতদূরে এলাম?

—আমরা হাটতে হাটতে এসেছি।

—এত হাটলাম অথচ ক্লান্ত হলাম না কেন?

এর উত্তরে হেসে উঠল হিরণ। এমন জ্যোৎস্না জীবনে আরো কতদিন উঠেছে। এই ক্লান্তা শ্বশিকাকে ঘিরে ঘিরে চাঁদের রেশ বই-ফুলের সিন্ধুতা ছাড়িয়েছে। তবু আজকের সাথে তারা যেন কত আলাদা। যন আজ শরীরের মধ্যে থাকে নি। প্রত্যক বোধ অপ্রত্যক অনুভূতির মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে। হাত পা শরীর সবই চরমান অথচ যন যেন হিম হয়ে গেছে.....এই জ্যোৎস্না, এই মত এই আলোয় মধ্যে বৃষ্টি, অনুভবকে আলাদাভাবে চিনতে পারা যাচ্ছে না।

—তোমার এত ভাল লাগবে বলেই এই মাঠের মধ্যে নিয়ে এলাম। কলকাতা শহরের সেই জিহ্বা মধ্যে একটুকরো আকাশের দিকে তাকিয়ে কতবার তোমাকে বলতে শুনিয়েছি—এ আকাশে জ্যোৎস্না মানায় না।

—আজ বৃষ্টি তাই রান্নানসই জ্যোৎস্না দেখাতে এসেছে?

মুখ তুলে সিঁকি করে হাসে মনীষা এবং বলে—আমারও প্রায় ছিল। সাধের মধ্যে জ্যোৎস্না দেখেছি, কলাপাতার শিঁহলিরে নামতে দেখেছি—

—কিন্তু এই মঠজোড়া স্তম্ভভাষা মধ্যে দেখ নি এই তো.....কিন্তু আরো একটা জিনিস তাকিয়ে দেখেছ?

—কি?

—পাহাড় আমাদের কত কাছে এসেছে?

—ও তুমি দেখার আগেই আমি দেখেছি।

—এই আলোর দুজনের জোখই এক পরম স্তম্ভভাষা বজ্র আসে। মীল...নীল পাহাড়...রাস্তিতে রূপোলী স্তম্ভভাষা। চারপাশের লতা-গায়ে ফণমনসা ক্যাকটাসে একাকার।...কিন্তু কি আশ্চর্য! এতকণ বৃষ নিকটেই চোখ পড়ে নি, কখন থেকে সারি সারি রস চিহ্ন শব্দ

হয়েছে। মাঝে ভাঙা মাল্লারের মত চুপ বালি-খসা ঘর। ফাঁকফোকর দিগে লতাগায়ে মূখ মোলায়ে, হিরণ পরিষ্কার দেখতে পেল কলা-পাতার মতই চকচকে পাতার ভর্তি গুটিকরেক গাছ অল্পদূরেই দাঁড়িয়ে। তার পাশ থেকে ভাঙা গন্ধুহ...

সবদিকে তাকিয়ে মনীষা বলে—হুঁমুহি, এটা হচ্ছে কুঠিরাগলের কবরখানা। এখানে আসার পর থেকেই এই কবরখানার কথা শুনিয়েছি...

—তাহলে তো আমাদের ভয় পাওয়া উচিত...অথচ চাঁদের আলো কবরখানা থেকেও ভয় তাড়িয়েছে।

মনীষাকে প্রায় টানতে টানতেই এগিয়ে চলে হিরণ। মঠ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার বিরাট পাইনের জঙ্গল শব্দ হল। মাঝে মাঝে কাউগাছ এবং অজস্র কবর। কোনটা শব্দপাথরে বাধানো। কিছু আবার ভাঙা গহ্বরের মত.....শূন্যতা হা হা করছে। হিরণ মনে মনে একটি কথা বহুবার ভেবেছে যে, গভীর দুঃখ অনেক সময় মানুষকে এমন নাড়া দেয় যা বহু বোনের দিকে নিয়ে চলে। ভরও এক ধরনের অনুভূতি...হয়ত এর মধ্যে থেকেও তার কাব্যপ্রিয়মন নতুন কিছুর সম্ভান পেতে পারে...

পায় পায় এগিয়ে চলে দুজনে। প্রথম থেকেই মনীষা কেমন আড়ম্ব হরে পড়েছিল। যেন মন চাইছে না তবু যেতে হচ্ছে। নিতান্ত ঘেরিয়ে যখন পড়েছে.....

চারিদিকে তখনতপের মত অজস্র ইট-পাথর। কোথাও রস চিহ্ন অটুট আছে, কোথাও ভঙ্গ অকস্মাতা তুলুটিত। পাইনের লম্বা লম্বা ছায়া দুলে উঠছে। কটকট শব্দ কি একটা ভেঙে উঠল। নির্জন কবরূমি শিউরে উঠল যেন সেই শব্দ। কিছু পূর্বে পাইনের ছায়াফুলি গড়তে দেখে জ্যোৎস্নাকে অসংখ্য কবরের মধ্যে রোমাণ্ডকর মনে হয়েছিল। এখন এই শব্দ আরো রোমাণ্ডকর মনে হল।

উদ্ভ্রান্ত প্রান্তর ছাপিয়ে মত হাওয়া উঠে আসছে। প্রথমে শনশন শব্দ। কাউরের কাক দিগে পাইনের বৃক্কর কাছে এসেই পূমের কেশে উঠল। হিরণের মনে হল এ হাওয়ার গান—তবু সেই গানে কারা যেন একনাগাড়ি বিলাপ করে চলেছে। তার চোখের মধ্যে মনের মধ্যে নির্জন শ্বশিকের মত অচেনা অনুভব টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। মনীষার মুখে কথা নেই। অথচ চারিদিকের সম্মুখ গাছপাটার আওরের মত চাঁদের আলো টলটল করছে। অল্প দূরের কাউরের ডালে নাম-না-জানা পাখী এসে বসেছিল। হঠাৎ উড়ে হাওয়া মঠই মঠ মঠ পাতাগুলো কেশে উঠল। পাতার ডগার ডগার জমেওটা জ্যোৎস্না এক-বার ধর ধর করে কেশে উঠেই শিথল হয়ে গেল। অথচ বৃক্কর মধ্যে এমন হয়। হাওয়ার বেগ আরো বাড়ছে। পাইন কা

হেসে হেসে পড়েছে, হাওয়ার কারা খিচি খানিতে ছাড়িয়ে পড়েছে...

—কেমন লাগছে মনীষা? বলতে গিয়ে নিজের গলাই নিজের কাছে অচেনা শোনাল। স্পষ্ট বৃক্ক হিরণ গলা কাঁপছে। এমন ফুটে ফুটে জোছনায় এমন অরণ্যরূপ হয়ত জীবেরে আসবে না অথচ গলা কাঁপছে কেন? শিথ দাঁড়ায় মধ্যে হিমশীতল স্রোত.....

মনীষা এবার হাত ধরে টান দেয়।—ফিরে চলো। ছাড়তে এখন অনেক রাত।

ওরা অরণ্যভূমি থেকে আবার মাঠের মধ্যে নেমে আসে। কিন্তু এ কোথায় নেমে এল ওরা। দূরের সেই স্ট্রীট লাইটের আলো, মনীষার স্কুল বিল্ডিং-এর আলো সবই নিশিচহ্ন। আমরা দিক ভুল করি নি তো, ভাবনাটি দুজনেরই মনের মধ্যে লাক দিগে উঠল, কখন চাপিসাড়ে পাহাড়ের শিরে এসে দাঁড়ালো। চাঁদের আলোর আর মোলায়েম মনে হচ্ছে না। লতাগায়ে, কাঁটার, ক্যাকটাসে ধূসর অন্ধকার কুরাসার পাকে ধরা। পাইনের রূপন একটানা শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে নির্জনতার নন্দন হয়ত। ছেলেবেলার শোনা রাক্ষসের গণ্ডে মত আকাশ-পাতাল সেই বিরাট স্মৃতিষ বেল পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে.....

বেশ কিছুকণ পর ওরা বৃক্কতে পারল যে, ওরা পরস্পরের হাত ধরে ছুটে চলেছে। সামনে সেই মঠ। বে মাঠে কিছুকণ আগে জ্যোৎস্নাকে দুঃখকেনিভ মনে হয়েছিল, এখনো তার রূপোলী ভাব ছুটে এসে আহ্বান জানালো। ওরা হৃদয় পেতে সেই অনুভূতির স্পর্শ পেতে চাইলো অথচ পারের নিচ থেকে মাটি সরে গেলে যেমন হয়, এমন একটি জন্মবহ শূন্যতা এসে গ্রাস করছে। দারুণ ধূসর চন্দ্রলোককে আলো বলে প্রম হচ্ছে এবং পাইনের রূপনের যেন একটানা রেশ। ওরা এই চন্দ্রলোককে চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছে না। এ আলো বড়ই তীর এবং তীক্ষ্ণ বলে মনে হচ্ছে। জোরালো সার্চলাইটের নিচে মনে যেমন স্বামতে থাকে, সেইমত স্বামতে থাকল দুজনে। কপালে গালে মটরের দানায় মত ঘাসের বিলু ফুটে উঠল। নিম্বাস-প্রবাসে যে এমন ঘড়বড় শব্দ ওঠে এ বেশ তাদের জানা ছিল না। প্রচণ্ড ত্বকার কষ্ট তাল, শ্বিকরে উঠেছে, কানে মাথায় হক্কর খেরেছে অথচ ঘাসের নরম ডগার শিশিরের শব্দ...চাঁদ ও বরফের তুলনা। আকাশের কোল ছুঁয়ে প্রহর ধানিত হল একসময় হাওয়ার একটানা শব্দ। তথাপি স্ট্রীট লাইট চোখে এল না। দিগন্তপ্রসারী গভীর নির্জনতা কিছ.....মনীষার স্কুল বিল্ডিং-এর আলো নিচে গেছে হয়ত এতকণ.....

এক অকস্মাতা ওদের মনে হয় এই গভীর রাতে লগ্নন সঙ্গ করে কয়র যেন তাদের পূজতে বেরিয়েছে।

চন্দ্রলোকে যাত্রার উদ্যোগপর্ব

ভরুণ চট্টোপাধ্যায়

হোয়াইট ও ম্যাকডাউল, লিওনফ ও সল্যারে ফের রেকর্ডে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মহাকাশবিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায় আমেরিকা আজ যে সোভিয়েটের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে সেটা আর কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। মহাশূন্য-পাথ থেকে মহাশূন্যে বার হয়ে কুড়ি মিনিট পরিভ্রমণ লিওনফ ও হোয়াইট দুজনেই করেছেন। কিন্তু ভসখদ-২ সেক্ষেত্রে একদিন মহাশূন্যে ছিল সেক্ষেত্রে জের্মিনি-৪ চারদিন (৯৭ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট) মহাশূন্যে থেকে তার ৬২ বার ভূ-প্রদক্ষিণে ১৬০৯৬৪ মাইল রাস্তা পার হয়। সুতরাং বলা যায় যে, হোয়াইট এবং ম্যাকডাউল একই যাত্রার তিনটি পরীক্ষা করে নিলেন যার একটি হচ্ছে তাঁদের জাহাজ থেকে মহাশূন্যে বার হওয়া, আর একটি হল দীর্ঘকাল মহাশূন্যে থেকে শরীরের উপর তার প্রভাব পরীক্ষা করা এবং শেষেরটি একই জাহাজে একাধিক যাত্রীর মহাকাশ পরিভ্রমণ। শেষের পরীক্ষাটিতে সোভিয়েটের তিনজন মহাকাশচারী কোমারফ, ইয়োগোরফ এবং ফিওফিসস্তফ সাফল্যলাভ করেছিলেন ১৯৬৪ সালের ১০ই অক্টোবর। দীর্ঘকাল মহাশূন্যে থাকার ফলাফল সোভিয়েট পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হয়েছিল ১৯৬৩ সালের জুন মাসে যখন ভস্ক-৫ মহাকাশযানে বাইকভস্কি ১১৯ ঘণ্টার ৮১ বার ভূ-প্রদক্ষিণ করে ৩০ লক্ষ কিলোমিটার অর্থাৎ ২০৬২৫০০ মাইল অতিক্রম করেন। আরো একটি পরীক্ষা যেটা সোভিয়েট মহাকাশচারীরা করেছেন এবং আমেরিকানরা করেন নি তা হচ্ছে

মহাকাশযাত্রার বিশেষ সাজপোষাক না পরে মহাকাশ পরিভ্রমণ। ভসখদ-১ জাহাজের তিনজন যাত্রী পোষাক না পরে মহাশূন্যে ঘুরে আসেন।

কিছুদিন আগে একজন মার্কিন মহাকাশ-যাত্রী (গ্রিসম) মহাশূন্য পরিভ্রমণের সময়ে নিজে তাঁর জাহাজের কক্ষপথ পরিবর্তন করেন। সোভিয়েট পক্ষ থেকে মানবসমত সেই পরীক্ষা করা না হলেও, একটি 'কজমস' উপগ্রহের কক্ষপথ সেইভাবে পরিবর্তন করা হয় বেশ কিছু আগে। ব্যাপারটার মধ্যে রহস্যজনক কিছু নেই। উপগ্রহের বেগ বাড়িয়ে দিলে তার কক্ষপথ বৃহত্তর হয় এবং সেক্ষেত্রে ১১.২ কিলোমিটার বেগ হলেই সে পৃথিবীর এলাকা ছাড়িয়ে অন্য গ্রহের দিকে চলতে থাকবে। আর বেগ সেক্ষেত্রে সাত কিলোমিটারের চেয়ে কমলেই তার কক্ষপথ ছোট হয়ে আসবে অর্থাৎ সে পৃথিবীর কাছে আসতে থাকবে। মহাকাশে ভ্রাম্যমাণ জাহাজে নতুন রকেট ইঞ্জিন চালু করে বেগ বাড়িয়ে কক্ষপথ বৃহত্তর করা হয় এবং উল্টো রকেট চালিয়ে গতিবেগ কমিয়ে কক্ষপথ সংকুচিত করা হয়।

মানবের মহাশূন্যে প্রথম পদক্ষেপ এবং মহাশূন্যে কক্ষ পরিবর্তন, এই দুটি ব্যাপারের চন্দ্রলোকে যাত্রার দিক থেকে তাৎপর্য কী?

এটা মনে রাখতে হবে যে, মহাশূন্যবিজ্ঞানের অভিযান চলেছে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে, ধাপে ধাপে। মহাশূন্য বিজ্ঞানের পথে এ পর্যন্ত বা কিছু ঘটেছে তার কোনটি খেলালখুশিমত

করা হয় নি। একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এখনো পর্যন্ত প্রত্যেকটি সোভিয়েটেই 'সর্বপ্রথম' পৌঁছবার সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং আমেরিকা পুনরাবিস্তার করেছে। সোভিয়েটের পরিকল্পনার ভিত্তি প্রথমে বৈজ্ঞানিক এবং পরোক্ষমূলক মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা কমসভালিন সিরলকভস্কির চিন্তা-ধারা ও উপদেশের উপরই গড়ে উঠেছে। মানব যাত্রী হিসেবে মহাকাশবিজ্ঞানের অভিযানে আজ পর্যন্ত যে প্রধান ক্রোশচিহ্নগুলি পার হয়ে এসেছে সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যেতে পারে।

গাগারিন তার ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে ৪৬ হাজার কিঃ মিঃ পরিভ্রমণ সারাক্ষণ বেল্ট দিয়ে আসনে বাঁধা ছিলেন।

টিটফের ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে ৭ লক্ষ কিলোমিটার রাস্তার তিনটি কিছুটা নড়াচড়া করতে পেরেছিলেন।

নিকোলায়েফ ১৫ ঘণ্টার ৬৪ বার ভূ-প্রদক্ষিণে ২৬৪০০০০ কিলোমিটার এবং গপোভিচ ৭১ ঘণ্টার ৪৮ বার ভূ-প্রদক্ষিণে ১৯৪০০০০ কিলোমিটার পার হন। এইভাবে তাঁরা প্রথম কাজ ও বিশ্রাম, ঘুমানো ও জাগার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘকাল ভারশূন্য অবস্থার শরীরের উপর প্রভাব পরীক্ষা করেন। বাইকভস্কি সেই পরীক্ষাই করেন ১১৯ ঘণ্টা ধরে। তাঁর অতিক্রান্ত পথ পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের ১০ গুণ।

দুনিয়ার প্রথম মহাকাশচারী হিসেবে



হোয়াইট (বামে) ও ম্যাকডাউল



লিওনফ (বাঁদিক) ও বেল্যায়েক

চালন্তিনা তেরেশকোভা ৭১ ঘণ্টার ৪৮ বার চু-প্রদাঁকিণে ২০ লক্ষ কিলোমিটার অভিন্ন করে প্রমাণ করেন যে, মেরেনের দরীয়েও দীর্ঘকাল ভারশূন্য অবস্থা কোন ক্রটি করতে পারে না।

এঁরা সবাই 'ভসখদ' মডেলের মহাশূন্য-বানের যাত্রী ছিলেন। তারপর এল 'ভসখদ' মডেলের জাহাজ যার গঠন অনেক বেশি জটিল এবং আরও বড় যাতে একাধিক যাত্রী একসঙ্গে যাত্রা করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা ভসখদ মহাশূন্যবানের যাত্রীদের মহাশূন্যের পোষাক পরান্ন করার হয় না। দ্বিতীয়ত ভসখদ ভস্কটকের চেয়ে অনেক বেশি উপরে শূন্য পারে কল চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহে যাত্রার উপযোগী।

ভসখদ (১)-এর যাত্রী কোমারক, ইরেনোভরক ও ফিওক্সিস্ক মহাশূন্যের সরেজমিনে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

সবশেষে ভসখদ-২-এর যাত্রী লিওনফ

মহাশূন্যে বার হয়ে ২০ মিনিট চলাফেরা করে জাহাজে ফিরে যান।

মার্কিন মহাকাশচারীরা সোভিয়েট মহাকাশচারীদের অনুগমন করে তাদের সঙ্গে সমস্তর পৌঁছেছেন যদিও মহাশূন্যে নিকোলায়েফ ও পপোভিচ এবং বাইকভস্ক ও তেরেশকোভার জাহাজগুলির যেমন শব্দ কাছাকাছি পুরুপরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও টেলিফোনে কথাবার্তা হয়েছিল তেমন ব্যাপার মার্কিন মহাকাশচারীরা এখনো করতে পারেন নি। যদিও অদূর ভবিষ্যতে তাঁরাও সে কাজ পারবেন সন্দেহ নেই। এ কাজ তাঁদের করতে হবে কারণ চাঁদ বা গ্রহান্তরে যাবার সময় সম্ভবত সকলের নিরাপত্তার জন্য পর পর একাধিক মহাশূন্যবান যাত্রা করবে। কোন জাহাজে যদি দু'ঘণ্টা খটে তখন যাত্রীরা সেটি ছেড়ে অন্যটিতে গিয়ে উঠবেন মহাশূন্যে 'হেটে' দিয়ে। লিওনফ ও হোরাইট তারই মহড়া দিলেন। তাছাড়া জাহাজ থেকে বার হয়ে মহাশূন্যে বিচরণ করার আরো তাৎপর্য আছে।

চাঁদে এবং গ্রহান্তরে যাবার জন্য মানুষকে মহাশূন্যে বহু ঋতু এবং খাদ্য ও ইন্ধন সংভরণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। মহাশূন্যে গিয়ে তাকে জাহাজ থেকে বেরিয়ে সেই নির্মাণকার্য করতে হবে। তারপর কোনো জাহাজ উল্কার আঘাতে বা অন্য কোনো কারণে জখম হলে বাইরে বেরিয়ে সেই জখম জায়গা মেরামত করতে বা আর্থবিক জেনারেটরের সাহায্যে ওয়েল্ড করতে হবে। মহাশূন্যের ঘোর অন্ধকারে লেসার যন্ত্র তাঁদের আলো জোগাবে। কলকাতায় যখন গ্যাগারিন আসেন তখন সোভিয়েটের অন্যতম মহাকাশ পরিভ্রমী বিজ্ঞানী জেনারেল কামানিনের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পেরেছিলাম যে, পৃথিবী থেকে সোজা চাঁদে না গিয়ে মার্কপথে কোনো 'স্টেশনে' নেমে সেখান থেকে আবার যাত্রা করাই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ, যেমনভাবে ১৯৬১ সালে শূন্যে রকেট পাঠানো হয়েছিল। লিওনফ ও হোরাইটের কৃতিত্ব সেইদিকে প্রথম পদক্ষেপ। তাছাড়া চাঁদেও আবহমণ্ডল নেই বলে ঐ মহাশূন্যের মত বারশূন্য অবস্থায় সেখানেও যোরাফেরা ও কাজকর্ম করতে হবে।

প্রথমবার মহাশূন্যে বার হবার সময় লিওনফ ও হোরাইটকে বিশেষ ধরণের নমনীয় নলের দ্বারা জাহাজের সঙ্গে যুক্ত রাখা হয়েছিল এবং সেই নলের মধ্যে দিয়েই প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ইত্যাদি তাঁরা পান। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সেই 'নাড়ীর' আর প্রয়োজন হবে না। শিশু যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে নাড়ী নিয়েই আসে। তারপর নাড়ী কেটে দেওয়া হয়। মহাকাশচারণার সাবালকত্ব লাভ হলেই নাড়ীর আর প্রয়োজন থাকবে না। নাড়ী-বিহীন অবস্থায় মহাশূন্যের অসীমে নিরুদ্দেশ হবার কোন ভয় নেই। লিওনফ ও হোরাইটের ঐ নলের যোগাযোগ ছিঁড়ে গেলেও তাঁরা একইভাবে জাহাজে ফিরে যেতে পারতেন যেমন ভাবে ফিরেছেন সঙ্গের রকেট পিস্তল জাহাজের উল্টো দিকে ছুঁড়ে। 'পৃথিবীর বাইরে' নামে এক কল্পকাহিনীতে সিয়লক-ভস্কির কল্পিত যাত্রী বেভাবে তাঁর জাহাজ থেকে বেরিয়ে যাত্রা বোর্ডে (এবং কিছুকণ নাড়ীছেঁড়া অবস্থায়) আবার রকেটপিস্তলের সাহায্যে জাহাজে ফিরে গেছেন লিওনফ ও হোরাইট হুবহু তার নকল করেছেন। মাত্র নিজেরা মহাব্যোমবানের উপগ্রহ হয়ে গিয়ে।

কল্পপথ পরিবর্তনের তাৎপর্য হচ্ছে এইখানে যে, চাঁদে যাবার সময় বহুদূর থেকে বার বার কল্পপথ পরিবর্তন করতে করতে ক্রমশ চাঁদের কাছে যেতে হবে, বিভিন্ন কল্পপথ থেকে দূরবীণ দিয়ে চাঁদের জমি পর্যবেক্ষণ করে নামবার জায়গা ঠিক করতে হবে। এমনও হতে পারে যে, নিরাপদে নামবার মত জায়গা না পেয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। তখন আবার কল্পপথ বদলে চাঁদ থেকে পৃথিবীর দিকে ফিরতে হবে।

চ্যাপলিন

জন্মদিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চ্যাপলিনের আজন্মকাল সঙ্গ করলেন। তারপরে নিজে কিছুকণ ধরে পরীক্ষা করলেন মহিলা। তারপর হাত দেখলেন। বললেন—‘আপনি এখন এক দীর্ঘ ভ্রমণের কথা চিন্তা করছেন। তার মানে আপনাকে এখন স্টেটস ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু অল্পদিনের ভেতরেই আবার এদেশে আপনাকে ফিরে আসতে হবে। তখন নতুন ব্যবসায়ের চুকবেন। এখন যা করছেন তার থেকে একটু অন্য ধরণের ব্যবসা।’

এরপর মহিলা যেন সবকিছু জালিয়ে ফেললেন একটু উত্তেজিত করে বললেন—‘অবশ্য নতুন যে ব্যবসা করবেন, এরনকার কাজের থেকে তার লগ্নে খুব বেশি ভরসা থাকবে না। তবে সামান্য ভরসা থাকবে বই কি। এই নতুন ব্যবসারে আপনার প্রচুর অর্থ রোজগার হবে এবং বিরাট কণ ও লাফলা আসবে। আপনার ভবিষ্যৎ একেবারে সোনা দিয়ে মোড়া।’

চ্যাপলিন হাতটা নিয়ে আবার কিছুকণ পরীক্ষা করে নিজে বললেন—‘আপনার তিনবার বিয়ে হবে। প্রথম দুই বিয়ে টিকবে না। কিন্তু শেষ বিয়েটি খুব সুখের হবে—এই বিয়েতে তিনটি সন্তান হবে, (এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তুল হয়েছিল।)

মহিলা আবার হাত নিয়ে পরীক্ষা করে মন্তব্য করলেন—‘হ্যাঁ, আপনার বিরাট ভাগ্য, আপনার হাত হচ্ছে অর্থ রোজগারের হাত।’ এরপর তিনি চ্যাপলিন ‘মুখ’ নিয়ে পরীক্ষা-পরীক্ষা শুরু করলেন। ‘বিরাণি বহন



বয়সে বুদ্ধিমান নিউমোনিয়ার আপনি মারা যাবেন। অনুগ্রহ করে আমার ফিল্ম ‘একটি ভ্রমার’ এবার আমাকে দিন আর কোন প্রশ্ন আছে?’—মহিলা চোখ তুলে তাকালেন।

চ্যাপলিন হেসে আনালেন যে, তাঁর আর কোন প্রশ্ন নেই এবং মহিলার প্রাপ্য নিটিয়ে বেরিয়ে এলেন। স্টেটস ছেড়ে চলে আসতে হবে বলে চ্যাপলিন খুব বেশি আপসেট হয়ে পড়েন নি। কারণ তখন তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে, আবার এদেশে ফিরে আসবেন। করে আসবেন, কিভাবে আসবেন সেসব অবশ্য চিন্তা করেন নি। যাঁর হোক—লগ্নে ফিরবার সম্ভাবনার মনটা উৎকল হয়ে উঠলো। আবার নিজেকে সেট ছোট ক্যুটিটার গিয়ে উঠবেন, তাবতেই আবার বোর করছিলেন চ্যাপলিন। প্রবাসে এলে দেশের সব-কিছুকে যেন অনেক বেশি ভাল বলে মনে হতে থাকে।

সিডনের কাছ থেকে অনেকদিন কোন চিঠি পান নি চ্যাপলিন। তাঁর ঘেঁ চিঠিতে সিডনে বিবেছিলেন,

মামামশায় এসে তাঁদের কান্টো বসে ছেন। চ্যাপলিন বসন্তের পের্জলে নিজের এসে স্টেটসে দেখা করলেন। সিডনে আনালেন ঐ ক্যুটিটা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি নিজে করেছেন এবং বিজ্ঞান বোড়ে বউ নিয়ে আসবানপত্র নিয়ে মাজানো কামস-এ আছেন। একটা প্রভুত আশ্বাস পেলেন চ্যাপলিন। তাঁদের সেই সুন্দর ক্যুটিটা নেই।

তিনি আজ সত্যিই গৃহহারা। তাবতেও খুব কষ্ট হচ্ছিল চ্যাপলিনের। বিজ্ঞান বোডেরই একটা বাড়ির এক শেফের কাশলা ভাড়া নিলেন চ্যাপলিন। এত ধীরে ধীরে লগ্নে ফিরে আসার কথা যে, মনে মনে ঠিক করে ফেললেন যে তাড়াতাড়ি লগ্নে আবার আমেরিকায় ফিরে যাবেন।

সিডনে এখন বিবাহিত। তা ছাড়া প্রত্যেকদিন সন্তোষেরা তিনি কাছে বেরিয়ে যান স্ত্রীরা; তাঁর লগ্নে চ্যাপলিন প্রায় দেখাই হয় না। মহিলার দুই ভাই নিজে মাকে দেখতে গেলেন। দিনটা তাঁদের লগ্নে মোটেই ভাল ছিল না। কারণ মার শরীর সেদিন বেশ অসুস্থ। মা সেদিন সন্ধ্যা উপভোজের আচরণ শুরু করতে তাঁকে একটি প্যাডেলকনে আটকে রাখা হয়েছিল। মার আগেই লগ্নে ফিরে গিয়েছিল চ্যাপলিনের। সিডনে একলাই গিয়ে মার লগ্নে দেখা করলেন। চ্যাপলিন মাইল হোল না যেতে, তাই তিনি বাইরে অপেক্ষা করলেন। সিডনে যখন ফিরে এলেন তাঁকে খুব আপসেট দেখাচ্ছিল। মাকে লাকি শক ট্রিকের কটা হয়েছিল তুমার-শীতল জলে স্নান করিয়ে। এর ফলে ঠাণ্ডার তাঁর মার খুব নীল হয়ে গিয়েছিল।

চ্যাপলিন দুভাই ঠিক করলেন এবার থেকে মাকে কোন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে রাখবেন। এখন তাঁদের এই বাড়তি ঝগড়া করবার মত আর্থিক মাঝব হয়েছে। ইংলণ্ডের বিবাহিত কনভেনিয়ান ‘ড্যান লেনো উন্মত্ত অবস্থার যে প্রতিষ্ঠানে ছিলেন সেখানেই মারের থাকবার ব্যবস্থা করা হোল।

এবার লগনে ফিরে নিজেকে বেশ অভ্যস্ত পরিচয়হীন, অপাংক্ত্যে এবং নামহীন বলে মনে হতে লাগল চম্পলিনের। এ পরিবেশ ছেড়ে আগের ছোট্ট ফ্ল্যাটে ফিরে গেলেও হয় তো এ মনোভাবের খানিকটা পরিবর্তন হোত। অবশ্য বিষণ্ণভাবটা লক্ষ্যপূর্ণভাবে চ্যাপলিনকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। আসলে প্রবাসে, গফরে কাটিয়ে আসবার পর আবার সেই পরিচিত ইংলণ্ডে ফিরে আসা—পরিচিত রীতিনীতি এবং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ফিরে আসাতে মনটাও ক্রমশ ধীরে ধীরে প্রকুর হয়ে উঠছিল। এসময়ে ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকাল, এবারের গ্রীষ্মটা ছিল ভারি চমৎকার। আবহাওয়াটা বেশ একটা রোমান্টিক মধুরতার ভরা। এ ধরনের প্রাণমাতানো মাধুর্যভরা গ্রীষ্ম চালি অন্যত্র কোথাও দেখেন নি।

চালিদের বস মিষ্টির কার্নো আমন্ত্রণ জানালেন যে, ট্যাগস রীপে গিয়ে সপ্তাহটা তাঁর হাউসবোটে কাটিয়ে আসতে। সেখানে গিয়ে চ্যাপলিন দেখেন যে এলাহী কাণ্ডকারখানা করা হয়েছে। ধরে ধরে ক্র্যাশগনি প্যানেলিং, অতিথিদের জন্য স্টেটক্রমস। রাতে বোটটির চারদিক নানাধরণের আলোর মালায় সাজানো হোত। চ্যাপলিনের মনে হোত যেন এক মায়াপুরীতে এসে বাস করছেন। সন্ধ্যাবেলাটা ভারি সুন্দর লাগতো চালিদের—ডিনার সেরে সবাই এসে ওপরের ডেকে বসতেন। মাথার ওপর ঝুলতো নানা ধরণের আলোর মালা—এখানেই কফি এনে দিত। কফি ও সিগারেটের সঙ্গে নানাধরণের খোসগলেপ সময় কেটে যেত। ইংলণ্ডের এইসব চার্ম চালি জীবনে কখনও ভুলে যেতে পারেন নি।

চালিদের আমেরিকা গফরের দলটিকে আবার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হোল—চোদ্দ সপ্তাহের জন্য তাঁরা লগনের হল'গুলোতে পুঁ করে বেড়াতে

লাগলেন। শো খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করল। খুব ভালভাবেই মর্শকণ্ড পেয়েছিলেন চালিরা। এসব সন্তোষে বারবার কিছু স্টেটসে ফিরে যাবার কথাটা মনে হচ্ছিল চ্যাপলিনের। ইংলণ্ডের প্রতি ভালবাসা তাঁর এতটুকু করে নি, কারণ একথা বুঝছিলেন যে, এদেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অতীতের অসাকল্যের ব্যাপারগুলো যেন তাঁর মনের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছিল। বারবার ভয় হচ্ছিল আবার না অতিসাধারণের পর্যায়ে এসে দাঁড়াতে হয়। সুতরাং খবর খবর পেলেন, তাঁদের দলটিকে আর একটি আমেরিকা টুরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে—তখন মনে মনে খুবই উৎকল হয়ে উঠলেন।

এক রবিবারে সিডনে এবং চালি গিয়ে মাকে দেখে এলেন। মায়ের স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে। এর পর সিডনে প্রাদেশিক গফরে বেরোনার আগে সবাই মিলে একসঙ্গে একদিন লাপার খেলেন। লগুন ছাড়বার আগের রাতে মনটা ক্লিষ্ট আবেগপূর্ণ। কোনকিছুই যেন পরিষ্কারভাবে ভাবতে পারছেন না, একটা বেদনা এবং তিক্ততা এসে যেন চালির দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। গুয়েস্ট এণ্ডের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন চ্যাপলিন। নিজের নিজেকে বললেন, এই শেষবারের মত এখানকার রাস্তা-গুলো একবার দেখে নিই। আমেরিকায় এসে চালির প্রথম ছোট ছোট থিয়েটারগুলোতে শো করতে লাগলেন। এসব থিয়েটার ছিল শিকাগো এবং ফিলাডেলফিয়ার শহরতলীতে এবং অন্যান্য ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউনে।

অন্যান্য বারের মত এবারও চালি একলা থাকবারই ব্যবস্থা করলেন। আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল—নিজেকে ঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে মানসিক দিক থেকে। অনেক কিছু জানতে হবে তাঁকে। কিন্তু এই জ্ঞানলাভের জন্য শুধু জ্ঞানের পিপা-

সার খাটতি তিনি উদ্বৃত্ত হন নি। চালি একথা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, জগতে মূর্খের কোথাও কোন স্থান নেই। সময় পেলেই চ্যাপলিন পুরনো বইয়ের দোকানে গিয়ে সময় কাটাতেন।

এইসময় চ্যাপলিন নিজের মানসিক সংগঠনে যেসব বই থেকে খুব সাহায্য পেয়েছিলেন সেগুলো হচ্ছে—

(1) Robert Ingersoll's—Essays and Lectures.

(2) Emerson's—Essays.

(3) Schopenhauer's—The world as will and Idea. ছোট্টম্যানের Leaves of Grass পড়েছিলেন—ভাল লাগে নি।

ফিলাডেলফিয়াতে থিয়েটারে একদিন এক টেলিগ্রাম এসে হাজির—তোমাদের দলে চ্যাফিন বা ঐ ধরনের নামের যদি কোন অভিনেতা থাকে তাকে Kessel and Bauman 24 Longacre Building Broadway-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবে।

যোগাযোগের ফল দাঁড়াল এই—কিস্টোন ফিল্ম কম্পানীর একজন স্বত্বাধিকারী মিঃ চার্লস কেমেল চ্যাপলিনকে বললেন যে, ফরটি সেকেন্ড স্ট্রীটে আমেরিকান মিউজিক হলে ম্যাক সেনেট চালিকে মাতালের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছেন। সেনেটের কথা শুনেই কেমেল চালিকে ফোর্ড স্টারলিং-এর জায়গায় ছবিতে অভিনয় করবার জন্য চাকরী দিতে রাজী। চুক্তিপত্রের মত ছিল সপ্তাহে তিনটি ছবিতে অভিনয় করতে হবে মাইনা সপ্তাহে ১৫০ ডলার। চালি জানালেন সপ্তাহে ২০০ ডলারের কমে তিনি কাজ করতে রাজী নন। পরে চিঠিতে তাঁকে জানানো হোল এক বছরের চুক্তি হবে প্রথম তিন মাসে সপ্তাহে ১৫০ ডলার দেওয়া হবে, পরের নয় মাস ১৭৫ ডলার হিসাবে। এত টাকা এর আগে কখনও কেউ চ্যাপলিনকে অফার করেন নি। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চালি এই ছবির কাজে যোগ দিলেন। (ক্রমশঃ)



‘বনানীকন্যা’ ছবিতে নৃত্যশিল্পী ভারতী রায়



‘এই করেছ তাল’ ছবিতে নবাগতা
সর্বাঙ্গী চক্রবর্তী



‘ও-কে?’ ছবিতে শবুতলা ভট্ট



একজন প্রযোজকের বক্তব্য

কথাপ্রসঙ্গে একজন চিত্র-প্রযোজক তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি সর্বভারতীয় এক কংগ্রেসনেতার সহযোগী ছিলেন মাদ্রাজ বাবার পথে। কথাপ্রসঙ্গে নেতা বলছিলেন, চলচ্চিত্রের জন্য সরকারের অর্থব্যয়ের কোন অর্থ হয় না। চলচ্চিত্র দেশের যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করেছে। চিত্র-প্রযোজক বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন—স্বাধীনতা সংগ্রামে ও জাতিগঠনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা কম উল্লেখযোগ্য নয়। ইচ্ছা করলেও কেউ তাকে ছোট করতে পারবে না। আজ সর্বভারতীয় ভাষা-বিনিময়ের জন্য একটা ভাষার কথা উঠেছে: একদা গান্ধীজী হিন্দুস্থানী ভাষার কথা বলেছিলেন। “কিন্তু তা শুধুও আঞ্চলিক ভাষা বনান হিন্দীর মরামারি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। মাঝখান থেকে ইংরেজী দু’পক্ষের আস্থাভাজন হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র হিন্দী-উর্দুর সাথে আঞ্চলিক ভাষা মিশিয়ে এমন এক ভাষা চন্দ্র করছে—যা নামে হিন্দী হলেও—আসলে হিন্দী নয়। এভাবে একটা কমন ভাষা গড়ে তোলার ব্যাপারে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। তার পরে তিনি বললেন—দেশ থেকে জাতিভেদ ও হিংসার বিতাড়ন করার বিষয়ে চলচ্চিত্রের ভূমিকা সৌরবময়। ‘অছ-বকন্যা’ থেকে বহু ছবিতে বিশেষ ভাবপ্রবণতার মধ্য দিয়ে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত জাগিয়ে তোলা হয়েছে। জমিদারী প্রথার আজ অবসান হয়েছে, এই জমিদারী প্রথার কল্যাণকর দিকগুলির বিষয়ে চলচ্চিত্র সব সময় দর্শকদের সতর্ক করেছে। ফিউডাল মনোভাবের নানা দিকের মূখোশ খুলে ধরেছে। দেশে যখন জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন হচ্ছিল এবং সে আন্দোলন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাথে মিশে বাচ্ছিল তখন চলচ্চিত্রের এই ভূমিকাকে ছোট করবেন কি করে? মদ্যপান, জুয়া ইত্যাদির কুফল সম্পর্কে চলচ্চিত্র দর্শকদের সচেতন করার চেষ্টা করেছে।

প্রযোজক আরো বললেন, দেশ স্বাধীন হবার পরে দেশের মুক্তি-সংগ্রামীদের জ্ঞান ও সংগ্রামকে চলচ্চিত্র কি তুলে ধরে নি? আন্দোলন, কাসীরানী, ‘৩২, কুদিরাম, বাঘা যতীন, চট্টগ্রাম অস্তাগার লুটন ইত্যাদি ছবি দেশের যুবসম্প্রদায়ের সামনে তাঁদের অগ্রজদের গৌরবময় ভূমিকাকে প্রকাশ করেছে। দেশ ও জাতির প্রতি যুব-সম্প্রদায়ের কর্তব্যের আহ্বান জানিয়েছে। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা থেকে প্রমিত-মালিক বিরোধ পর্যন্ত সব সমস্যা চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত।

তারপরে প্রযোজক স্বীকার করলেন—দেশের যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য চলচ্চিত্রের ভূমিকা যে নেই এমন নয়। কিন্তু এই ভূমিকার দেশের সরকারের কিছটা দায়িত্ব রয়েছে। ‘সংগম’-এর মত ছবি কি সরকারের দ্বারা উৎসাহিত নয়? আর দেশের চিত্র-সাংবাদিকরা যখন ‘সংগম’ আর ‘চারুলতা’কে রাজকাপূর আর সত্যজিৎ রায়কে একই বন্ধনীর মধ্যে রেখে পুরস্কার দেন তখন যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য কেবলমাত্র চলচ্চিত্রকে কি দোষ দেওয়া যায়? এ ছাড়া ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের ঐক্য ভূমিকাটি উপেক্ষণীয় হতে পারে না। মার্কিন ক্রাইম পিকচারের ব্যাপারে তারা যে উদারতা দেখান সেটা কি ডেমোক্রেসির অপব্যবহার নয়? তার সংগে পাল্লা দিতে গিয়েই তো ভারতীয় ছবির আজকের সঙ্কট।

তার পরে সর্বভারতীয় নেতার সদর বাদিও নরম হয়েছিল, কিন্তু চলচ্চিত্রকে অভিলাপ দিতে তিনি তখনো ছাড়েন নি।

—সুজেন।



অর্পিতা সেন পরিচালিত 'স্বাভাবিক' ছবিতে লিলি চক্রবর্তী

লিলি চক্রবর্তী

জীবনের অজস্রতার মতো ছবিতেও অজস্রতার প্রয়োজন রয়েছে যথেষ্ট।

জনতা-দৃশ্য অজস্রতার অঙ্গীভূত। কোন নায়িকার পোশাক, কথাবার্তা, চালচলনে দেশ, সমাজ, কাল প্রভৃতি বস্তুটা প্রকাশ করে—তার চেয়ে অনেক বেশি প্রকাশ করে একটিমাত্র জনতা-দৃশ্য। নায়ক-নায়িকা বা অন্যান্য শিল্পীকে নির্দেশ দিয়ে সূক্ষ্মমতো অভিনয় করানো যায়, কিন্তু একটি জনতাকে নির্দেশ দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। পরিচালককে জনতাকে একত্রে, সূক্ষ্মভাবে দাঁড় করিয়ে শট নিতে হিস্টারিস খেয়ে যেতে হবে। যারা যাক, কোন শিল্পী ট্রেন থেকে নামছে—এমন একটা দৃশ্য নিতে আগে থেকে অনেক ব্যবস্থা করে প্রস্তুত হতে হবে। যে প্ল্যাটফর্মে স্টাডিং হবে, সে স্টেশন মাস্টারের অনুমতি, ট্রেনের গার্ডের অনুমতি নিয়ে ভবে স্টাডিং নিতে হবে। ছাড়াও জনতার দৃশ্য সংযোজন করতে হলে সিন্দূরসংখ্যক শিল্পীকে চুকিয়ে দিতে হবে, তারা যেন সত্যি সত্যি জনতার মতো ট্রেন থেকে নামতে পারে। যদি নির্দেশিত শিল্পী না থাকে তা হলে সাধারণ জনতা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ছবির স্বাভাবিক নষ্ট করে দেবে।

কিন্তু সত্যি যদি স্বাভাবিক করেই জনতার দৃশ্য নেওয়া হয় তবে একাধিক ক্যামেরা রেখে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন কোণ থেকে জনতার দৃশ্য গ্রহণ না করলে স্বাভাবিক কেই আসবে না।

কেন বৃন্দ, শোভাযাত্রা, রাজদরবার,

ভোজসভা, ধর্মসভা, প্রমিক সমাবেশ প্রভৃতির দৃশ্য গ্রহণ করতে হলে হাজার হাজার এক্সট্রা নিতে হয়। তাদের বিভিন্ন রকমের পোশাক পরাতে হয়। ভাষা অভ্যাস করতে হয়। এজন্য কত যে টাকা খরচ হয় তা জানলে অবাক হতে হয়। সোরাব মোদীর টেকনিকলার ছবি খাঁসি কি রাণীর যুদ্ধ-দৃশ্যে অজস্র এক্সট্রা ব্যবহার করার ফলে ছয় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল।

এক্সট্রাদের আট ঘণ্টার সিম্ফটের কাজে মাথাপিছ দশ টাকা করে দেওয়ার কথা। এ ছাড়া পোশাক, সাজ-সরঞ্জাম, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির খরচ তো রয়েছে। এক্সট্রাদের মাঝে-মাঝে পোশাক বদল করতে হয়, তার খরচ; যদি আউটডোর স্টাডিং হয় তা হলে খাওয়া, বাতায়ত প্রভৃতির খরচ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বিরাট টাকার ব্যাপার। সবচেয়ে বেশি ও বড় জনতা দেখানো হয়েছে সোরাব মোদীর 'সেকান্দার' ছবিতে। দু' মিনিটের একটি যুদ্ধ-দৃশ্যে তিন হাজার লোকের একটি জনতা প্রদর্শিত হয়েছে। কোলাপুর্নে হয়েছিল এই ছবির স্টাডিং। কিন্তু অত্যন্ত কম খরচ লেগেছিল, কারণ প্রতিজন এক্সট্রা-পিছ দিতে হয়েছিল মাত্র ছয় আনা। কিন্তু সোরাব মোদীর অপর ছবি খাঁসি কি রাণীর খরচ কত বেশি পড়েছিল সেটা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। মেহবুবের 'আন' ছবিতে দু' হাজার এক্সট্রার জন্য প্রতিদিন খরচ পড়ত ২৫ হাজার টাকা।

জনতা-দৃশ্যে নিয়োজিত টাকা ও প্রম

দুই-ই পণ্ড করে দেওয়া যায় যদি কোন

এক্সট্রা নির্দেশমত অভিনয় না করে। অভিজ্ঞ পরিচালক সোরাব মোদী বলেন, জনতা-দৃশ্যে সঠিক আবেদন ফোটোনের জন্য আমি নয়-দশজন অ্যাসিস্টেন্টদের পোশাক পরিয়ে এক্সট্রাদের মধ্যে নামিয়ে দিই। আর এক্সট্রাদের নির্দেশ দিই আমার অ্যাসিস্টেন্টদের অনুকরণ করতে। সোরাব মোদী মনে করেন সাধারণ জনতাকে নির্দেশ দেওয়া বিপজ্জনক। কেন না জনসাধারণ অপেক্ষেই অস্থির হয়ে ওঠে।

জনতা-দৃশ্যে সামান্য ভুল বা অন্যমনস্কতা গোটা ছবিকে নষ্ট করে দিতে পারে। এজন্য পরিচালক থেকে সহকারী সবাইকে সতর্ক থাকতে হয়। একবার একটি ধর্ম-মূলক ছবিতে ঈশ্বর ও অসুরের যুদ্ধ দেখানোর দৃশ্য পাঁচদিন ধরে তুলে শেষে মাত্র একটি ভুলের জন্য বাদ দিতে হয়েছিল। ভুলটি ছিল দুজন এক্সট্রা সাদা ক্যানভাসের জুতো পরেছিল। আরেকটি ধর্মমূলক ছবিতে একজন এক্সট্রা একটা সোলার হ্যাট পরে গোটা ছবিটাকে নষ্ট করে ফেলেছিল। একটা ঐতিহাসিক ছবিতে একজন সিগারেট খেয়েছিল বলে ছবিটির বিস্তার আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। ভুলের জন্য একটি ছবি নষ্ট হতে পারে এমন নিজেরও আছে। একবার একটি ধর্মমূলক ছবিতে নাচের দৃশ্যে একজন আধুনিক কারদার ভুল বোঝেছিল। এতে ছবিটি নষ্ট হয়। সংগে সংগে মেকআপম্যানের চাকরি যায়। চোদ্দশত সালের একটি কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত ছবিতে জনসাধারণের দৃশ্যে হঠাৎ বাইরের একজন লোক সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিল বলে সব পরিভ্রম পণ্ড হয়ে যায়। পরিচালকের দোষে একবার একটি ছবি নষ্ট হয়। দেবী-দের নৃত্য-দৃশ্যে পরিচালক, বিশবার টেক করার পর ফাইনাল টেক করতে গিয়ে নিজেই আচকান ও গল্ফটুপি পরে ছবিতে উঠে গিয়েছিলেন।

এক্সট্রা ব্যবহার করে বিনি পরসা বাঁচিয়েছিলেন তিনি হুগেন চন্দ্রলেখার প্রযোজক-পরিচালক এস. এল. ভাসান। 'চন্দ্রলেখা'-র সার্কাস-দৃশ্যে যে জনতা দেখা যায় তা সত্যিকার জনতা। ভাসান জনতাকে বিনি পরসার সার্কাস দেখতে দিয়েছিলেন। সবাই যখন সার্কাস দেখতে মত্ত ছিল, সে সময়ে তিনি নিজের কাজ হাসিল করে নিয়েছিলেন। জনতা ভাসানকে কৃতজ্ঞতা জানায়, ভাসানও মনে মনে জনতাকে কৃতজ্ঞতা জানান। কেন না তাদের একটি পরসাপ দিতে হয় নি।

বিমল রায় 'মহামতী' ছবিতে ভাসানের পন্থাতি অনুসরণ করে টাকা বাঁচিয়েছেন। নৈনিতালে এ ছবির স্টাডিং হয়েছিল। ওখানকার একটি মেসার দৃশ্য বিনি পরসার ভুলতে তিনি ঢোল শিটিয়ে দেন যে, মেসার দিলীপকুমার এক ভোজের আয়োজন করেছেন, গ্রামবাসী যেন ভাল পোশাক পরে আসেন।

সংবাদ প্রবাহ

নির্ধারিত দিনে মেলাতে প্রচুর লোক হাজির, তারা মেলাতে নিজের কাজে ব্যস্ত, এদিকে বিমল রায়ও নিজের কাজ করে নিলেন।

আবার কেউ কেউ অন্য পন্থাও গ্রহণ করেন। যেমন উপল দত্ত 'সুমতাঙার গান' ছবিতে টেক্সমাকো কারখানার শ্রমিকদের দৃষ্টান্তেছিলেন, তারপর স্বার্থে ছবিটি তোলা হচ্ছে। এতে বিনা পারিশ্রমিকে, এমন কি কাজ কামাই করে শ্রমিকেরা মিছিলের দৃশ্যে যোগ দেয়। মৃণাল সেন তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ' ছবিতে মেলায় দৃশ্যে একটা স্বাভাবিক মেলায় জনতার সহযোগিতা পেয়েছিলেন ছবির কাহিনী বৃদ্ধিরে। মানস যদি বৃদ্ধিতে পারবে, ছবিতে মহৎ বক্তব্য ও তাদের ব্যস্ততা জীবনের কথা রয়েছে তখন বিনা পারিশ্রমিকে সহযোগিতা করতে স্বেচ্ছা করে না।

জনতা-দৃশ্যে প্রধান প্রধান শিল্পীদের অভিনয় করতে হলে বেশ চালাকি করতে হয়। জনতা ছবির কি অবস্থা হচ্ছে না হচ্ছে সেকথা না ভেবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চারপাশে থাকে। এই অবস্থায় শিল্পীরা বা পরিচালক যদি জনতার ওপর চটে ওঠেন তবে পরবর্তী ফল কি হবে সেটা অনুমান করা যায়। তখন ছবি কল্ল রঞ্জে পালাতে হবে। এ রকম অবস্থায় কোন কোন শিল্পী বিরক্ত হয়ে যান। কিন্তু দিলীপকুমার ও দেবানন্দ দর্শকদের সঙ্গে এমন মিশতে পারেন যে, হাসি-ঠাট্টার তাদের মাতিয়ে রেখে তাদের দিয়েই জনতার দৃশ্যের কাজ হাসিল করে নিতে পারেন।

পুরানো দিনের চলচ্চিত্র উৎসব ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে পুরানো দিনের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন হচ্ছে। কয়েকটি পর্বে বিভক্ত এই ছবিগুলি দেখানো হবে। এই উপলক্ষে ঘটোগ্রাফ, প্রচার-পত্র ও প্রাচীর-পত্রের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হবে।

ছবি বিশ্বাসের মৃত্যু-বার্ষিকী

১১ই জুন সম্মার টালিগঞ্জ পরলোক-গত অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের বাসভবনে তাঁর তৃতীয় বার্ষিক স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শিল্পী গদানন্দ্রাণী বহু ব্যক্তি উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

সুমিতা সান্যালের বিবাহ

এক সংবাদে প্রকাশ, চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী সুমিতা সান্যালের সঙ্গে চিত্র-সম্পাদক শ্রীসুবোধ রায়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। সুইনহো স্ট্রীটে বিবাহ অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পাণ্ডপাত্রীর বন্ধুবর্গ উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানান।

বিশ্বরূপা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা-দিবস

বিশ্বরূপা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিক উৎসব বর্ষাষ আড়ম্বরের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই থিয়েটারের দশম বর্ষের জয়-যাত্রার স্মারক হিসাবে গত ১২ই জুন সম্মার

বিশিষ্ট কবি, নাট্যোদ্যোক্তা ও সংবাদিক-গণ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়েছিল শ্রীমতী সান্যাল। এবার বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য, শ্রীমন্তোষ সিংহ ও অভিনেত্রী শ্রীমতী সরস্বতীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীমন্তোষ সিংহ দৃষ্টান্ত শিল্পীদের সাহায্যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনুষ্ঠান অন্তে বিশ্বরূপার 'হাসি' নাটক অভিনীত হয়।

মস্কা চলচ্চিত্র উৎসব

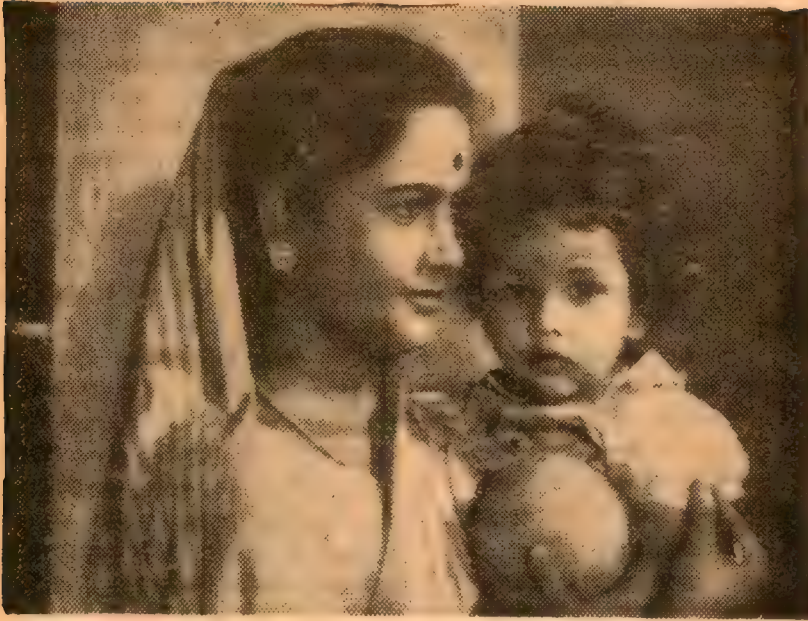
মস্কা চলচ্চিত্র উৎসবের প্রস্তুতি পুরোদমে সুরু হয়েছে। জুলাই মাসের পাঁচ তারিখ থেকে কুড়ি তারিখ পর্যন্ত এই উৎসব চলাবে। তখন ক্রেমলিন প্রাসাদে এবং সিনেমা-গুলিতে বিভিন্ন দেশের পতাকা উড়ান থাকবে। এ পর্যন্ত ৫০টি দেশ উৎসবে যোগদানের সম্মতি জানিয়েছে। উৎসব উপলক্ষে দুইদিনের আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা থাকবে। আলোচনার বিষয় সিনেমা ও দর্শক। বিদেশী প্রতিনিধিদের মস্কা পরিদর্শন এবং মস্কিন্স স্টুডিও দেখাবার ব্যবস্থা করা হবে। উৎসব উপলক্ষে এক চলচ্চিত্র বাজার খোলা হবে। তখন ছবির বেচাকেনা হবে।

চিত্রাভিনেতা মতিলালের জীবনাবসান

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা মতিলাল গত ১৭ই জুন এক হাসপাতালে করোনার প্রস্রাব রোগে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে



উৎসবের প্রযোজিত 'গৃহস্থ' ছবিতে সৃষ্টি সেন। পরিচালনা-সুবোধ সিং



‘দিনান্তের আলো’ ছবিতে রিনা দাস ও একটি শিশু।

তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। ১৯৩৪ সালে তিনি প্রথম চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর শেষ ছবি ‘ছোট ছোট বাতে’। এই ছবিটির প্রযোজক ছিলেন তিনি। তাঁর অভিনীত প্রায় ৭০টি ছবির মধ্যে ‘পরদেশী’, ‘শাদী’, ‘কতানা’, ‘মিঃ সম্পদ’, ‘এক থি লেডকী’, ‘সুবদাস’ উল্লেখযোগ্য।

গদ্য। রূপাংশে আছেন শ্রাবণী বসু, পদ্মা দেবী, রবি ঘোষ, সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য।

বনানী কন্যা

নবগঠিত মেলোডি ইন্টারন্যাশনালের প্রথম ছবি ‘বনানী কন্যা’র চিত্রগ্রহণের কাজ রমা-প্রসাদ চক্রবর্তীর পরিচালনায় দ্রুতগতিতে

অগ্রসর হচ্ছে। সম্প্রতি হাজারীবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন লিলি চক্রবর্তী, তরুণকুমার, অসীম-কুমার, শ্বিজ, ভাওয়াল, আরতি দাস, অপর্ণা দেবী, কবিতা, শ্রাবণী চ্যাটার্জি, ভারতী রায়। ছবিটির প্রযোজক কমল ঠাকুর। সঙ্গ দিচ্ছেন চিন্ময় লাহিড়ী।

কাল তুমি আলেয়া

দেবেশ ঘোষের প্রযোজনায় আশুতোষ মুখার্জি লিখিত কাহিনী ‘কাল তুমি আলেয়া’ চিত্ররূপ লাভ করছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন শচীন মুখার্জি। ছবির নায়ক নায়িকার চরিত্রে মৃণু দেবেন উত্তমকুমার ও সর্পিয়া চৌধুরী।

বিচিনান্দন

গত ২২শে ও ২৩শে মে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে ক্যালকাটা মেলোডি ট্রাস্টের বার্ষিক সংগীত সম্মেলন দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল ওস্তাদ দবীর খানের সংগীত ও ওস্তাদ বাহাদুর খানের যন্ত্রসংগীত পরিবেশন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ছিল বুদ্ধদেব রায় ও সহশিল্পী বৃন্দের লোকসংগীত পরিবেশন এবং হিমাংশু বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের সমবেত যন্ত্রসংগীত।

সুডিও গার

গৃহ সম্মানে

পরিচালক চিত্ত বসুর নতুন ছবি ‘গৃহ সম্মানে’-র কাজ শীঘ্র আরম্ভ হবে। প্যারা-ভাইস পিকচার্স এই ছবিটির প্রযোজক। সম্ভাব্য শিল্পী-তালিকায় থাকছে দিলীপ মুখার্জি, অঞ্জনা ভৌমিক, সম্মারাদী, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, রেণুকা রায়, লিলি চক্রবর্তী। অমল মুখার্জি সংগীত পরিচালনা করবেন। পরিচালক চিত্ত বসু তাঁর সহকারী এবং অন্যান্য টেকনিসিয়ান ইত্যাদি বাছাই করার কাজ করে ফেলেছেন।

মোলগোবিন্দের কড়চা

স্বগত বিহ্বিত বন্দোপাধ্যায়ের ‘মোলগোবিন্দের কড়চা’র চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হয়েছে প্রদীপ পিকচার্স। ছবিটি প্রযোজনা করছেন লাল পাথর-এর প্রযোজক সুভাষ-কল্লন বসু। পরিচালনা করছেন প্রদীপ দাস-



সম্মো প্রেসডিশন ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের এক সাপ্তা-আসর। এই আসরে রয়েছে সূর্য্যন, কিতুবা, ইটোবানেশিয়া, পেরু, ও কাজকাপ্তানের ছাত্রগণ।



আন্তর্জাতিক লোকসংগীত ক্লাবের তিনজন সদস্য।

নাট্যবন্দু

নাট্যম্-এর নীলদর্পণ

বাংলা নাটকের ইতিহাস দীর্ঘদিনের নয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রারম্ভিক কালের অন্যতম নাটক। কলকাতার নাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর প্রথম ব্যবসায়িক প্রদর্শনী 'নীলদর্পণ' অভিনয়। আজ থেকে বিরানব্বই বছর আগে ১৮৭২ সালে প্রথম অভিনয় ঐতিহাসিক রজনী অভিনয় সম্পদেই গেল। 'নীলদর্পণ' বাস্তব নাটকের প্রতীক। ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় ব্যবসার নামে গোটা বাংলাদেশে যে স্বেচ্ছাচারের রাজত্ব পত্তন করেছিল তারই সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে নীল-কুঠি সাহেবদের অকথ্য অভ্যাস আর গ্রাম বাংলার হাহাকার-ক্লদনের বাস্তব রূপ নীলদর্পণে। অধুনা বাংলা নবনাট্য আন্দোলনে তাই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' পুরাতনী নয়। গত ২৪শে মে 'রঙমহল' মধ্যে 'নাট্যম্' নাট্য সংস্থা কর্তৃক 'নীলদর্পণ' অভিনয় একদিক দিয়ে যেমন নবনাট্য আন্দোলনের খোরাক যুগিয়েছে, তেমনি দৃষ্টিসাহসের পরিচয়। বহু আলোচিত নাটকের মণ্ড-সাম্বল্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ প্রশ্ন জাগে।

'নাট্যম্'-এর এটি তৃতীয় অবদান। অপেশাদার সংস্থা হিসাবে 'নাট্যম্' নাট্য-মোদীদের অপরিচিত নয়। দলগত অভিনয়ে এই সংস্থার শিল্পবৃন্দ 'নীলদর্পণ'-এ উত্তীর্ণ।

ব্যক্তিগত অভিনয়ে বিশেষ করে ক্ষেত্রমণির ভূমিকায় গায়ত্রী চক্রবর্তী, পদী ময়রাণীর ভূমিকায় লীলাবতী দেবী (করালী), নবীন-মাধবের ভূমিকায় রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ প্রশংসার দাবি করে।

আন্তর্জাতিক লোকসংগীতের জনপ্রিয়তা ইউরোপে বিশেষত পশ্চিম জার্মানীতে আজ সংগীতের নেশা বহুকাল কেটে গেছে এবং বীটলদের কালোয়াতি যাব যাব করছে। পশ্চিম জার্মানীর যুবমহলকে এখন পেয়ে বসেছে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত, ইন্ডিশ ও ইহুদী গান, রাশিয়ার প্রেমগাথা, ফরাসী ও জার্মান উদ্দীপনাময় সংগীত ও মার্কিনী থ্রুস্ট উপদেশাবলী লোকসংগীতের আসরে

আজকাল ভীড় দেখেই বোকা যায় যে এসব গান খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পাড়ার পাড়ায় লোকসংগীত গাইয়েদের ক্লাব গড়ে উঠছে ও তাদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলেছে এসব গানে নতুন আমদানি করা নিয়ে। এসব ক্লাবের মধ্যে সবচেয়ে নাম করেছে ২৪ বছরের মাইক ব্লাটের পরিচালনায় 'হামবুর্গ ফোক সিংগারস্ ক্লাব'। ইতিমধ্যেই সিনেমা ও টেলিভিশন থেকে এদের ডাক এসেছে। এদের গানের রেকর্ড এখন বাজারে যথেষ্ট বিক্রি হচ্ছে। মাইক ব্লাটের দলে নামকরা গাইয়েদের মধ্যে আছে হাম-বুর্গের সিবিলা কিনাস্ট ও প্যারিসের আলেন জার্ড।



একডেমী অব ফাইন আর্ট ভবনে বুদ্ধদেব রায় ও বহু শিল্পীগণ লোকসংগীত পরিবেশন করেন।

বঙ্গদেশ ওদেশে এবং দেশে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দশক অতীতকালে তুমিকা বদলে শিশিরকুমার গোস্বামিহস্তে এবং নরেশবাবু রত্নপতির হাতে।

অভিনয় এবং প্রযোজনা উভয় দিক থেকেই 'বিশ্বজন' বাংলা পেশাদারী স্টেজের একটি ল্যাণ্ডমার্ক। এই নাটকেই শিশিরবাবু সর্বপ্রথম মুক্ত লাইটের ব্যবহার করলেন বাংলা স্টেজে। ১৯২৬ সালের ২০শে জুলাই আর্টি থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের 'শোভাবোধ' মঞ্চস্থ করেন। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :

মিঃ নন্দী—রাধিকানন্দ
মণীশ—অহীন্দ্র
মিঃ নাহিড়ী—কুমার কনকজ
নেলী—নীহার
হুকুমাদী—হুশীলা
চাকরবান্দা—মরহতী

১৯২৭-এর ১০^শ সেপ্টেম্বর আর্টি থিয়েটার কবির 'পরিচয়' নাটকে অভিনয় করেন—তিনকড়িাবাবুর মনস্কর কর্মীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিল। ১৯২৭-এর অক্টোবরে নাট্যমন্ডিরে 'শেখরক্ষা' মঞ্চস্থ হয়—নিচে চরিত্রালিপি দেওয়া হল :

চন্দ্রদা—শিশিরবাবু
বিনোদ—রবি রায়
গদাট—শৈলেন চৌধুরী
শিবচরণ—মনোরঞ্জন চৌধুরী
নিবারণ—যোগেশ চৌধুরী
ললিত—রাধিকানন্দ
ক্যান্ডমণি—চাকরবান্দা
কমলমুখী—কমলামিনী
চন্দ্রমতী—প্রভা

শেখ দুশো মক এবং অভিনয় দ্বিগুণের সমস্ত ব্যবস্থান হুচিয়ে দিয়ে থিয়েটারিক্যাল ইন্টিমেসীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিশিরকুমার এই 'শেখরক্ষা'য়।

২২রাজ্য ১৯২৮-এ (১৩৩৪-এর আশ্বিন) স্টার থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের প্রায়শচিত্রের অভিনয় করেন। এ অভিনয়ের প্রধান আকর্ষণ ছিল মনস্কর বৈরাগীর পাঠ—বরিশালের বিখ্যাত নাট্যমুদ্রা দাস সেজেছিলেন মনস্কর বৈরাগী, এই সময়ই মিঃ থিয়েটারে 'নটর পূজা' মঞ্চস্থ হয়।

১৯২৯-এর ২৪শে ডিসেম্বর 'তপতী'র উদ্ভব উদযাপন হয় নাট্যমন্ডিরে। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :

বিজয়মদন—শিশিরকুমার
নরেশ—জীবন গাঙ্গুলী
মতেশ্বর—রবি রায়
দেবদত্ত—যোগেশ চৌধুরী
সুমিত্রা—প্রভা
বিপাশা—কমলাবতী

শিল্পপ্ৰসিক মর্শবের উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন 'তপতী' অভিনয়ের।

এইসময়ে বিখ্যাত অভিনেতা রাধিকানন্দের সম্প্রদায় নিউ এশীয়রা মঞ্চে 'চিত্রাঙ্গদা'র অভিনয় করেন (পৌষ ১৩৩৫)।

১৯৩৩ সালে নাট্যমন্ডির এক স্টারের বিলিভ শিল্পীদের প্রয়াসে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' মঞ্চস্থ হয়। নব-নাট্যমন্ডিরে শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ করেন ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। শিশিরকুমার সেজেছিলেন মনস্কর, কমলাবতী—কুম, শৈলেন চৌধুরী বিপ্রদাস, কানু মনোপাধ্যায় নবীন এবং রাণীবালা—মতিরা মা। অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'নবনাট্যমন্ডিরে যোগাযোগ দেখতে আনন্দিত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন অসম্পূর্ণতার অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না—তৎসত্ত্বেও যদি মতোদের

মনস্কট না হয়ে থাকে তবে যে অন্য নাট্যমন্ডিরক শ্রীযুক্ত শিশির তালুকদার লোক সেওয়া যায় না।'

১৯৩৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর নাট্যমন্ডিরে 'গোরা' মঞ্চস্থ হয়। ভূমিকালিপি ছিল :

আনন্দমণী—রাজলক্ষী
বরদাঙ্গলদী—মনোরমা
অচরিতা—শান্তি গুপ্তা
পরেশ—অহীন্দ্র চৌধুরী
পানুবা—নরেশ মিত্র
গোরা—ভূপেন রায়
মহিম—রবি রায়
বিনয়—জহর গাঙ্গুলী
ললিতা—চাকরবান্দা।

রবীন্দ্রনাথের যুগে শিশিরকুমার 'চিত্রকুমার মতা', 'শেখ রক্ষা' প্রতিষ্ঠা রিভাইভ করেছিলেন। ওদেশে যেমন শৈল্পীয়ারের নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করতে না পারলে রত্ন মঞ্চাভিনেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায় না। আমাদের দেশেও এই ধরনের একটা ট্র্যাডিশন এতদিনে গড়ে ওঠা উচিত ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের অভিনয় করে না পারলে না পারলে কোনও নাট্য অভিনেতা বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন না।

পেশাদারী নাট্যমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির অভিনয় হওয়া সবদিক দিয়েই বাঞ্ছনীয়। কারণ সত্যিকার ভাল নাটক বলতে যা বোঝা যায় তা এদেশে এক রবীন্দ্রনাথই রচনা করেছেন। অহেতুক ঘটনার সমাবেশে নাটকে নাটকীয়তাপূর্ণ জমকালো প্রদর্শনী করবার প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করুনও করেন নি। তাই বলে তাঁর নাটকে বাহ্যিক ঘটনাবলীকে পরিবর্তন করা হয়েছে এ অভিযোগেরও কোন জায় নেই। রবীন্দ্র-পূর্ব নাট্য-রচয়িতাদের নাটকে যে অনাবশ্যক বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের প্রাবল্য দেখা যায়, কবি তাঁর পরিপোষণ ও পরিমার্জন করেছেন নিজের রচনায়।

রবীন্দ্র-পূর্ব বা রবীন্দ্রোত্তর নাট্য

সামাজিক কলহ

কারেরা নাটকের চরিত্রের অন্তর্ভূতের দিকটায় কখনও বিশেষ নজর দেন নি। অথচ মানুষের জীবনে এই অন্তর্ভূতের একটি বিশেষ স্থান আছে এবং এইজন্যই এই দিকটির ওপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোর দিয়েছেন তাঁর নাট্য রচনায়। অন্তর্ভূতের চরম পরিস্ফুটনেই হ্যাননেট জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্য-চরিত্র। অন্তর্ভূতের বিরাট প্রাবল্যেই ইউগেন্স সর্বশ্রেষ্ঠীর দর্শকদের কাছে এত গ্লির এবং মর্মস্পর্শী। আর সেই একই কারণে রূপগতি এবং জরসিংহ মহৎ এবং বিরাট চরিত্র।

সংলাপ স্বভূতের রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়। শব্দচরম অন্তর ওপরেই সংলাপের মৌল্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভাষা হচ্ছে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। একে কবি, তার বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ। প্রত্যাং যে কোনও রচনার শব্দ, বাহ্য প্রভৃতির ব্যবহারে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। রচনায় ভাব এবং ভাবের এমন চমৎকার সংগতি-পূর্ণ ব্যবহার, এমন অদর্শ সংযোগ, মৌল্যবোধের পর এক রবীন্দ্র-নাট্য দেখা যায়। অনেক সময়ে অনেক শক্তিশালী নাট্যকারও শব্দ-সম্পদের দারিদ্র্য হেতু ঠিক যথার্থ স্থানে যথার্থ ভাবে অল্পক্ষেপে পরিস্ফুট করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাষার স্বাভা—বাণীর স্বরপূর্ণ। প্রগাঢ় অনুভূতিতে ভাবধারাকেও স্বল্প কথায় ব্যক্ত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ। সংলাপে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের কার্যকারিতা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রবল। এই সব কারণেই রবীন্দ্র-নাট্যের সংলাপের এমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের দেশের অন্য কোনোও নাট্যকারের রচনার বুঁজে পাওয়া যায় না।

সুতরাং পেশাদারী মতো রবীন্দ্র-নাট্যের নিত্যনির্মিত অভিনয় বাস্তব হতে পারে থিয়েটারের মালিকদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এর ফলে অভিনেতারও তাঁদের অভিনয়ের চরম উৎকর্ষ দেখাতে পারবেন, দর্শকদের

করবার দিকটাও পরিপুষ্ট হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রসমন্দের মানটাও অনেকটা তুলে ধরা হবে।

আমাদের রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরাও এ বিষয়ে তৎপর হতে পারেন। এখানে নাট্য-শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও আছে—এঁদের একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে এঁরাও নিয়মিতভাবে এঁদের স্বামী মতো রবীন্দ্র-নাট্যের অভিনয়ের আয়োজন করতে পারেন।

পেশাদারী মতো রবীন্দ্র-নাট্য মঞ্চ করার প্রথম এবং প্রধান অসুবিধা বোধ হয় এই যে, সাধারণ দর্শকের এ নাটক নিতে চাইবেন না এবং তাতে মালিকদের আর্থিক ক্ষতি হবে। কিন্তু এ অসুবিধা তো চিরকালই ছিল। শিশিরযুগেও দেখেছি দর্শক যেভাবে মনে মনে আলমগীর, মাজাহান, রঘুবীর, প্রভৃতি দেখতে এনে হাজির হয়েছে, সেভাবে তপতী বা স্বোগাযোগ দেখতে আসে নি। কিন্তু সেজন্য তো শিশিরকুমার রবীন্দ্র-নাট্যকে তাঁর মক থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। বারবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের নাটক মঞ্চ করে দর্শকদের শিল্পরুচির উন্নতি করতে। আজকের দিনে যে সব পেশাদারী মতো আজো বই হাজার, দু' হাজার রাত্রি চলছে, তাঁরা কি পারেন না একটু বুঁকি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাল ভাল মহৎ এবং গাংকৈতিক নাটকগুলি মঞ্চ করতে। থিয়েটারটা কি শুধু একটা ব্যবসার ব্যাপার? দেশের কৃষ্টি, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে কি এর নাকীর সম্বন্ধ নেই?

আমি তাছাড়া সাধারণ দর্শককে চানবার মতো বহু নাটক কবিগুরু রচনা করেছেন। ডাকঘর নাটক যদি পেশাদারী মতো চালানো হয় তবে কি সে নাটক দর্শক নেবে না? উত্তরোপে এ নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয়।

যদিও এ নাটকের অন্তর্নিহিত বাণী গ্রহণ করবার মত mental make-up উত্তরোপীয় দর্শকদের

মস্তিষ্ক। কারণ তা যদি হতো তাহলে ইউরো-আমেরিকার দর্শক ইউজিন ও'নীলের Beyond the Horizon এবং হাউপটম্যানের Hannele-ও লাভের গ্রহণ করতো—কিন্তু তা তারা পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ডাকঘরকে নিতে পেরেছে। সুতরাং আমাদের দেশে তো এ নাটককে দর্শক অন্তর থেকেই নেবে বলে মনে হয়।

কিন্তুকি আগে প্রীযুক্ত মজোব সেনগুপ্ত এবং বঙ্গবন্ধু প্রীযুক্ত মজোব বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় দিল্লীতে 'নাট্য পূজা' নৃত্যনাট্যটি অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। এ নাটকের করেকটি রিহার্সালে আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। মুখ হয়ে গিয়েছিলাম এঁদের দলের সামগ্রিক অভিনয় দেখে এবং বিশেষভাবে রাণী লোকেশ্বীর ভূমিকার প্রীমতী বিনতা রায়ের মনোবন্দন। বারবার মনে মনে ইচ্ছা এ ধরনের নাটক যদি পেশাদারী মতো অভিনীত হয়, সাধারণ থিয়েটারের দর্শকরা এসে দেখে যেতে পারেন, যে মঞ্চের রূপ আসলে কি ধরনের হওয়া উচিত।

রাশিয়াতে গিয়ে যদি চের্ভভের নাটকের অভিনয় না দেখতে পারি, ইংলণ্ডের স্টেজ থেকে যদি শেক্সপীয়ারকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, আমেরিকায় যদি ও'নীলের নাটক মঞ্চ না হয়, নরওয়ে এবং সুইডেনে যদি উইগেন এবং গিউবার্গকে বাদ দিয়ে শুধু অভিনয় ব্যবসা চালানো হয়, সেটা যেমন লজ্জার ব্যাপার, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে থিয়েটার চালানো ব্যাপারটাও তার থেকে কম দুঃখজনক নয়। দেশের শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র শক্তিশালী International Playwright-কে বাদ দিয়ে দেশের অনেক উন্নতি সাধন করবে—এ চিন্তাটাও বাস্তবতা হতে পারবে না।

কলকাতার পেশাদারী মতো মালিকদের কাছে এঁদের একমাত্র অনুরোধ, যেন এ বিষয়ে উদাস্য পরিচালনা করে ব্যাপারটা ভালভাবে



এক মাইল দৌড়ে নতুন বিশ্বরেকর্ড করছেন ফ্রান্সের মাইকেল জ্যাক

টেনিসের স্বপ্নরাজ্য
প্রায় শতবর্ষ আগেকার কথা, পাঁচজন
মহা ইংরেজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেদিনের



জয়দীপ মুখার্জী

টেনিস ক্লাবটি বর্তমানে বিশ্ব টেনিসের মক্কা, টেনিস খেলোয়াড়দের স্বপ্নরাজ্য। ১৮৩৯ সালে ইংল্যান্ডের উইমবলডেন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত টেনিস ক্লাবের প্রতিটি কোর্টে, সবুজ ঘাসের বৃকে ছড়িয়ে রয়েছে কত মধুর স্বপ্নময় স্মৃতি, কত অজানা রোমাঞ্চকর ইতিহাসের টুকরো, কত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব—পরাজয়ের বেদনাস্রু—বিজয়ের উল্লাস।

দীর্ঘ ১৬ বছরের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে টেনিস-জগতে প্রেরণের আসনে প্রতিষ্ঠিত আজ উইমবলডেন, অবশ্য প্রেরণের এই মর্যাদা সে অনেকদিন আগেই লাভ করেছে। ১৯৬৫

শ্রীআমতান্ত

সালের উইমবলডেনের আসর প্রস্তুত, অপেক্ষায় শূন্য আনুষ্ঠানিক যবনিকা উত্তোলনের; দেশ-দেশান্তরের টেনিস নায়ক-নায়িকার দলও সমবেত হয়েছে এই টেনিস পাঠস্থানে।

প্রতিবারের মত এবারও খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। পুরুষদের বিভাগে প্রেরণের আসন লাভ করেছেন গতবারের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন এবং মহিলা বিভাগে গতবারের বিজয়িনী ব্রিজলের মারিয়া বুনো। পুরুষদের বিভাগে দ্বিতীয় স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টোনে এবং মহিলা বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ।

বর্তমান বিশ্বের দুই টেনিস তারকা ১৯৬৩র বিজয়ী আমেরিকার চাক ম্যাকিনলে এবং স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানার অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে এবারের প্রতিযোগিতার জোলুস কিছুটা ক্ষুণ্ণ করবে। ব্যবসায়িক কার্য ম্যাকিন-লেকে এবং পারিবারিক কারণ সান্তানাকে এবারের আসর থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছে। ভারত থেকে কেউ-ই এবার বাছাই তালিকার স্থান লাভ করতে পারে নি।

ভারত থেকে উইমবলডেনে অংশগ্রহণ করবেন রমানাথন কৃষ্ণণ, জয়দীপ মুখার্জী, প্রেমজিৎ লাল, নরেশকুমার ও শিব মিত্র। আটশ বছরে, খেলোয়াড়ী-জীবনের প্রান্ত সীমার কৃষ্ণণ একটি শেষ চেষ্টা করবেন উইমবলডেনকে লক্ষ্য করে। ভারতের অন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে আশা করা যায় জয়দীপ মুখার্জী গতবারের চেয়ে আরও একটু উঁচুতে সক্ষম হবেন। গতবারের বিজয়ী রয় এমার্সন এবারও বিজয়ী হবেন বলে মনে হচ্ছে। তবে মহিলাদের বিভাগে মারিয়া বুনোকে যথেষ্ট প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে মার্গারেট স্মিথের কাছ থেকে। অবশ্য প্রতি-বছরই করেকটি অপ্রত্যাশিত ফলাফল ঘটানোই হল উইমবলডেনের বৈশিষ্ট্য; দেখা যাক এবার কি বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ময়দানী ফুটবল

শেষ পর্যন্ত জর্জ টেলিগ্রাফ দল এক

দাপ্তরিক দলমতী

পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল গভবারের লীগ বিজয়ী মোহনবাগানের কাছ থেকে। লীগের নবম খেলায় এবার প্রথম পয়েন্ট অপচয় করল মোহনবাগান। মোহনবাগানের পশ্চাতে ঠিক এক পয়েন্টের ব্যবধানে থেকে অগ্রসর হচ্ছে বি. এন. রেল দল। মোহনবাগান লীগের দশম খেলায় ২-০ গোলে রাজস্থান দলকে পরাজিত করেছে। পর পর দুটি খেলায় বিজয়ী মহা-মেডান স্পোর্টিং একটি খেলায় পরাজিত করেছে কালীঘাটকে ২-০ গোলে এবং জর্জ টোলগ্রাফকে ২-০ গোলে। বি. এন. রেল-দল ২-০ গোলে হাওড়া ইউনিয়ন দলকে পরাজিত করে। লীগের প্রধান দলগুলির খেলার ফলন এবার একেবারেই আশানুরূপ হচ্ছে না।

এই দলগুলির খেলার ধারা দেখে মনে হচ্ছে যে, ছোট দলগুলির পক্ষে বড় দলগুলির কাছ থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়া কষ্টসাধ্য হবে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে বড় দলগুলির পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা নিজের দায়িত্ব এড়াতেই ব্যস্ত থাকেন এবং ফলে সুন্দর সুন্দর গোলের সুযোগের অপচয় হবার ফলে তাদের মূল্যবান পয়েন্ট হারাতে হচ্ছে।

আই. এফ. এর সাব-কমিটীর কাছে ইস্ট-বেঙ্গল দল সাত দিন পরে কারণ দর্শাতে না গেলে আরও কয়েকদিন সময় প্রার্থনা করে। কিন্তু সাব-কমিটী সে আবেদন মঞ্জুর করে নি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, এখন ইস্টবেঙ্গল সাব-কমিটীর আবেদন না

মঞ্জুর করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'আই. এফ. এর' গভার্নিং বডি'র কাছে আবেদন জানাবার এবং আরও কিছুদিন সময় প্রার্থনা করবে।

* * *

শুভ প্রচেষ্টা

বাংলা দেশের তরুণ হকি খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের জন্য হকি যাদুকের ধ্যানচাঁদ কলকাতায় এসেছেন। ধ্যানচাঁদের এই শিক্ষাদান পর্ব দশদিন স্থায়ী হবে। ইভেন উলসনের শিক্ষাশিবিরে আছে কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ষাটজন ছাত্র। মহিলা হকি সংসদার মাঠে মহিলা হকি খেলোয়াড়দেরও ধ্যানচাঁদ কয়েকদিন শিক্ষা দেবেন। বাংলা দেশের তিনটি জেলা ধ্যানচাঁদ সফর করবেন। নদীয়া, হুগলী



টাইমবলডেন বিজয়-উদযানে ঘটে চ্যাম্পিয়ান রহু এয়ারল ও মরিয়ম বুনো।



মোহনবাগান ও রাজস্থানের খেলার মোহনবাগানের অশোক চ্যাটার্জীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন রাজস্থানের একজন খেলোয়াড়ী

এক ২৪ পরগনার ধ্যানচাঁদ একদিন করে অবস্থান করবেন। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ যে-কোন হকি খেলোয়াড়ের সৌভাগ্যের বিষয়। যদিও অত্যন্ত অল্পদিন স্থায়ী হবে এই শিক্ষাশিবির, তবুও আশা করা যায় যে, এতেই আমাদের তরুণেরা যথেষ্ট শিক্ষা পাবে।

সমাচার দর্শন

ফ্রান্সের মাইকেল জ্যাজি এক মাইল দৌড়ে মনু বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ৩ মিঃ ৫০.৫ সেকেন্ডে তিনি এক মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করেন। পূর্বের ৩ মিঃ ৫৪.১ সেকেন্ডে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন নিউজিল্যান্ডের দৌড়বীর পিটার স্নেল। ২৯ বছর বয়স্ক মাইকেল জ্যাজি টোকিও অলিম্পিকে ৫০০০ মিটারে চতুর্থ স্থান দখল করেন। বর্তমানে ২০০০ মিটার এবং ৩০০০



রমানাথন কৃষ্ণ

মিটারের বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী হলেন মাইকেল জ্যাজি।

গ্রীষ্মকালীন স্কুল ক্রিকেটের ১৯৬৫ সালের বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে পাক ইনস্টিটিউশন। গতবারের রানার্স পাক স্কুল গতবারের বিজয়ী তীর্থপতি স্কুলদলকে ৭০ রানে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রতিযোগিতা সদ্য হয় ১৯৬৩ সালে এবং তীর্থপতি দল তিনবার ফাইনালে উন্নীত হয়ে একবার বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত উইন্ডসর থেকে চিঙ্গ উইক মারাথন রেসে এবার বিজয়ী হয়েছেন জাপানের দূরপাল্লার দৌড়বীর সিগমাৎসু। তিনি এই মারাথন রেস ২ ঘণ্টা ১২ মিনিটে দৌড়ে পূর্বের বিশ্বরেকর্ড ভগ্ন করেছেন। ইথিওপিয়ার আবে বিকিলের বিশ্বরেকর্ডটি ছিল ২ ঘণ্টা ১২ মিঃ ১১.২ সেকেন্ডের।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে খ্রীস্টাব্দে গৃহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২৫৯
আজকের মানুষ	...	২৬০
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	২৬১
স্বথন ঝাঁরবে পাতা (অনুবাদ কবিতা)	সুবীরকান্ত গুপ্ত	২৬২
জন্মের প্রার্থনা (কবিতা)	সুনীথ মজুমদার	২৬২
নারীদের ভাষারি	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	২৬৩
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	২৬৬
ভারতদর্শন	...	২৬৭
আন্তর্জাতিক	...	২৭২
পশ্চিম জার্মানী থেকে	শান্তিশেখর	২৭৮
কাঁচখণ্ড (গল্প)	দেবী ভট্টাচার্য	২৮১
বুদ্ধদর্শন	...	২৮৪
বার্ষিক্যে সকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	২৮৭

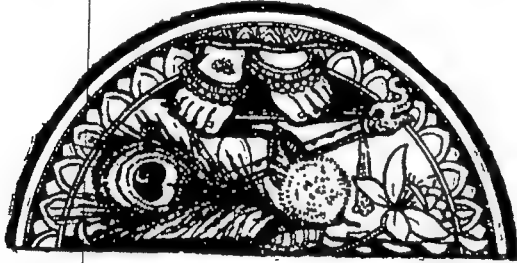
বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান ভক্তিজগতের কৌস্তভবত্ত, ভগবন্তজগৎগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদস্য মহাপবিত্রে ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়। বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী শ্রীমদভ্যুতপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক		প্রখ্যাত কথোপকথন শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের রামপদ গ্রন্থাবলী ৩২২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩ টাকা	
শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানের জ্ঞান যে উৎকর্ষ, এই 'প্রলাপে' তাহার অভিব্যক্তি। শ্রীমদভ্যুতপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক' শ্লোকই তাহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর স্থললিখিত পঞ্চানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলাবিত।		শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার সুযোগ্য শিষ্য পবন বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের স্থললিখিত পঞ্চানুবাদ।	
নরোত্তম বিলাস বৈষ্ণবগণের পবন উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।		পাশগু-দলন মুন্সিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহরী-সীমা।	
তুলসীসার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।		ভক্তিতত্ত্বসার হাটপত্তন, শ্রীশ্রীশ্রী-বন্দনা, নামসংকীর্ণন চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।	
আত্মতত্ত্ব বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ। মনঃশিক্ষা		মূল্য : ৩ টাকা।	
শ্রীপ্রিয়ানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব- সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।		শ্রীলোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ১ম ভাগে— কোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম, ডগরচরিত। মূল্য এক টাকা ২য় ভাগে— ভূত ন্যায়মুখ, কঙ্কাবতী, মন্ডার গঙ্গা, মুক্তামালা। মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা	

ব্রহ্মমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬. বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হুইদু

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
দিক্কা থেকে	বাবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২৮২
সবার অলঙ্কার	ভূপলকিশোর রক্ষিত রায়	২৯১
অধারমাণক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাস্বতা ভট্টাচার্য	২৯৫
তোমার প্রেম (কবিতা)	করুণাসিন্ধু দে	২৯৮
নিবিড়ভূত (কবিতা)	বেণু দত্তরায়	২৯৮
মুম নেই (কবিতা)	কাজী আমনউদ্দিন আহমদ	২৯৮
অমকো-এশীয় দেশগুলির বিভিন্ন সমস্যা	তরুণ চট্টোপাধ্যায়	২৯৯
বাংলা সাহিত্যের নতুন বলয়	সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০১
স্নায়ুবাবু (অনুবাদ গল্প)	অমিতা রায়	৩০৩
পাঠকমন	...	৩০৫
চার্লি চ্যাপলিন	আশাক সেন	৩০৬
রক্তজগৎ	...	৩০৯
রক্তমঞ্চ—গুদাম এবং এদাম	শিমালি	৩১৫
খেলাধুলা	অমিতাভ	৩১৮



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু রিচিত

ভক্তির মল্লিকানী

প্রেমের অলঙ্কার

জ্ঞানের আকাশপর্জি

বঙ্গসাহিত্যে একজন মহাপ্রাণ আর মোহি

চিত্রসমূহ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ

মূল্য পনের টাকা

যে জ্ঞান-সুখের সর্বতোমুখী প্রতিভার
কিরণচ্ছটার ভারত-মহিমা চির-ভাবর—
সেই সাহিত্যজগৎজ্যোতি—প্রতিভা ও
মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্বিনিষ্ঠ—
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেপের মেসে, মেঘদূত
বান্দ্যাকির জয়, ভারত-মহিলা, বান্দ্যাকি
সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধ-
মালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধ-
এই জাতীয় সাহিত্য-করস্বী মাত্র ১।।০
রাশি, যোগ্যহীন।

নীলাচলে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রকুল

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত

১১ দ্বিতীয় সংস্করণ ১১

মূল্য দুই টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বাগিনাবহারী গাভুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২



৭০ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা—মূল্য ২৫ পাঃ
বৃহস্পতিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৭২

Price : 25 Pa-e
Thursday, 1st July. 1965

নতুন বাংলার রূপকার

নতুন বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র গুপ্তের আজ জন্মদিন। পরলা জুলাই-এর জন্মদিনটিকেই শব্দ উপলব্ধি কবে নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের প্রতিটি দিনে বিধানচন্দ্রের নাম বাঙালীর মানসপটে অঙ্কিত থাকবে।

ভারতের স্বাধীনতাগ্রামে যাঁরা জীবন যৌন ও প্রদীপ্ত প্রতিভা দান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিধানচন্দ্রের নামও ইতিহাসের পাতায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তবু, ইতিহাসের পাতায় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে বাংলার দুর্ভাগ্যের কাহিনী নিঃসন্দেহে উল্লিখিত হবে। কেন না, যে বাংলা আমরা লাভ করেছি, তা হল ভয় এবং হিমমূল মানুষ্যের বেদনাতুর্তে ভবপূর। সেই শিঙিত, লাঞ্ছিত বাংলাকে পরিপূর্ণতা দান করা প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। তবু, বিধানচন্দ্র সেই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। -সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজকে সহজভাবে গ্রহণ করে আশায় যে অলোকবর্তিকা তিনি জেতলে গেছেন তুম্বারা ভাগ্যহত বাঙালী পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বাংলায় ঐতিহ্যকে বাঙালীর সম্মুখে উন্মোচিত কবে তিনি আমাদের নব-জীবন দান করেছেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে যে সংগ্রাম সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় ছিল, তা হচ্ছে বেকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দৈন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সমগ্র বিশ্বেরই আর একদিক। বিধানচন্দ্র পশ্চিমবাংলায় কণ্ঠধার-রূপে—কী কৃষি, কী শিল্প, কী উপনগরী স্থাপন, এমন কী যানবাহনের সুদৃঢ় পরিচালনার ব্যাপারেও নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন

করেছিলেন। আমাদের দেশে পরিকল্পনা কথাটি আসল কর্মের চেয়ে অধিক ব্যয়হৃত ছিল। এই দিক দিয়ে, বলা যেতে পারে, বিধানচন্দ্র ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরাজের মানুষ। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে, দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী, কল্যাণী, বজ্র স্টেডিয়াম, বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন প্রভৃতি।

এই যে কল্যাণময় প্রতিষ্ঠা-এর মধ্য দিয়ে তরুণ বাঙালী সমাজ নিজের প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ করেছে। কায়িক শ্রমে বীরত্বের বলে যে বাঙালীর দুর্নাম ছিল, বিধানচন্দ্র সেই দুর্নামের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন।

তবু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, তিনি আজ সশরীরে আমাদের মধ্যে নেই। এই পরলা জুলাই-এ তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিন এক হয়ে আছে।

আমরা কিন্তু প্রতিকূলেই বিধানচন্দ্রের কল্যাণকর্ষণ অনুভব করছি। আরো অনুভব করছি, যে কাজ তিনি অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন, সেই কাজ সমাপ্ত করার ভার আমাদের ওপরেই অর্পিত রয়েছে। লবণ হুদে যে নতুন জনপদ গড়ে ডোলায় জন্যে তিনি উন্মুখ ছিলেন, তা আজো ব্যপারিত হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া লবণ হুদের জমি বিক্রির ব্যাপারে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহ-বিস্ত বাঙালীর পক্ষে দুঃখজনক। সেখানে জমির দর এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাতে তারা সমতার জমি ক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পায়। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আশ্চর্য্যজনক এবং যার জন্যে বিধানচন্দ্র কেন্দ্রীয়

সরকারের সঙ্গে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন—তা হচ্ছে কলকাতায় বিশেষ ধরনের স্টেশন স্থাপন। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন চক্রবেড় রেল স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন; তবুও জাতি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টার স্টেশন উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হবেই।

বিধানচন্দ্র গ্রামাঞ্চলের অবর্ণনীয় দুঃখের কথা কোনোদিনই ভুলতে পারতেন না। তাই তিনি চেয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে লক্ষ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে এবং নদীমাতৃক বাংলাদেশের হৃদয়কে সেতুর বন্ধনে বেঁধে দিতে। উত্তর-বঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের জন্যে চেয়েছিলেন ফরাকা বাঁধ। সেই -খ ঠাঁটির হলে বাংলায় কৃষিক্ষেত্র হবে সৌন্দর্যমণ্ডিত, নতুন লিপনিকেন্দ্র উঠবে গড়ে এ. বাংলা-দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণতা লাভ করবে। কিন্তু ফরাকা বাঁধ কবে নির্মিত হবে, তা কে জানে?

আমরা চাই, কর্মের মধ্য দিয়ে বাংলা-দেশের যুবশক্তি বিধানচন্দ্রের মহৎ সত্যকে এগিয়ে নিয়ে চলুক। তাঁর ব্যক্তিগত বীরত্ব, সৌকুমার্য, বৈজ্ঞানিক চিন্তা তাদের চিত্তের চিরস্থায়ী সম্পদ হোক।

সম্পাদক

আমেরিকান মাস্টার

নামে কি কাকব মাদু থাকে? এম জবাবে বলতে হয়, থাকে নয় শুধু, আছে। এবং খাঁর নামের মধ্যে সে যাদু ছড়িয়ে রয়েছে তিনি কোনো রাজনৈতিক নেতা নন, নন কোনো জাগরুতা, তিনি একজন অভিনেতা। চার্লি চ্যাপলিন সে নাম, বা শুধু চ্যাপলিন কিম্বা আরো সংক্ষেপে চার্লি।

রাজনৈতিক নেতারা যদি পৃথিবীকে শিবির-বিভক্ত করে থাকেন চার্লি তবে তার সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। পূর্ব-পশ্চিম দুই দুনিয়ারই তিনি অবিসম্বাদী 'নেতা'। দুই শিবিরের কোটি কোটি মানুষের তিনি 'হিরো'। রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা শোনার জন্যে, তাঁকে দেখার জন্যে যদি লক্ষ লক্ষের 'ভিড়' হয়, চার্লি'ব ছায়াটুকু দেখার জন্যে, তাঁর অভিনয় দেখার জন্যে কোটি জনতা ছোট্ট সিনেমা হলের দিকে। তাঁর নামে যদি যাদু না থাকে তবে এমন করে উল্লাসের মতো ছোট্ট কেন মানুষগুলো?

অথচ চার্লি প্রচলিত অর্থে ছবি'ব নামক নন। যে অর্থে গ্রেগরী পেক বা হারল্ড বার্গার্ট, ডব্লিউস স্কেম্পার বা বার্লো ব্র্যাডো, লব্লেস আলভারস কিম্বা রক হাডসনকে বুঝি কিম্বা বুঝি অশোককুমার, উত্তম-কুমারকে। আপাতদৃষ্টিতে চার্লি ক্লাউন বা তাঁড়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন, কিন্তু মূল ভৌতিক বিসর্জন দিবে। তিনি হাস্যরসিক, দর্শকমনে আনন্দ সঞ্চার করাই যেন তাঁর বৃত্ত। হাস্যরস ও কৌতুক পরিবেশন করতে চার্লি'ব ব্যাতি, কিন্তু শুধু কমেডিয়ানই তিনি নন। তিনি একজন উচ্চদেবের জেস্টার। এবং এদিক দিয়ে তিনি এ-যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ জেস্টার। কিন্তু কেবল তাঁড়ানি করা বা নিছক হাস্যরস পরিবেশন করাই চার্লি'র উদ্দেশ্য নয়। শাপিত অস্ত্রের মতো ধাবালো তাঁ'ব হাস্যরসে, তাঁ'ব জেস্ট-এ লুকিয়ে রয়েছে গভীর বেদনা, কঠোর প্রাণ। সমাজ-সচেতন চার্লি'র প্রতিটি ছবিতে তাই দেখা যায় ক্লিকি বুর্জোয়া সমাজ, তাঁ'ব বীভীনতা, তাঁ'ব ধ্যান-ধারণার ওপর তাঁ'ব ক্রোধ। এবং বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে-অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন, তা তাঁকে বাইরে থেকে আহবান করতে হয় নি, নিজে'ব জীবন দিয়েই তা পেতে হয়েছে, বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার যুগকাঠে তাঁকে বান হতে হয়েছিল। তাই এত সহজে এত স্বচ্ছন্দে তিনি তাঁ'ব ছবিতে তুলে ধরতে পেরেছেন হালকা হাসি'ব মাধ্যমে, কিন্তু তাঁ'ব সে-হাসি সে কৌতুকের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে গভীর বেদনা, মহান ক্ষোভ। কি 'মডার্ন টাইমস' কি 'লাইফ লাইট', 'গোল্ড রাশ' হোক আর 'মিগিয়ে ভার্দে' হোক, একই মূল সুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে চার্লি'র প্রতিটি ছবিতে।

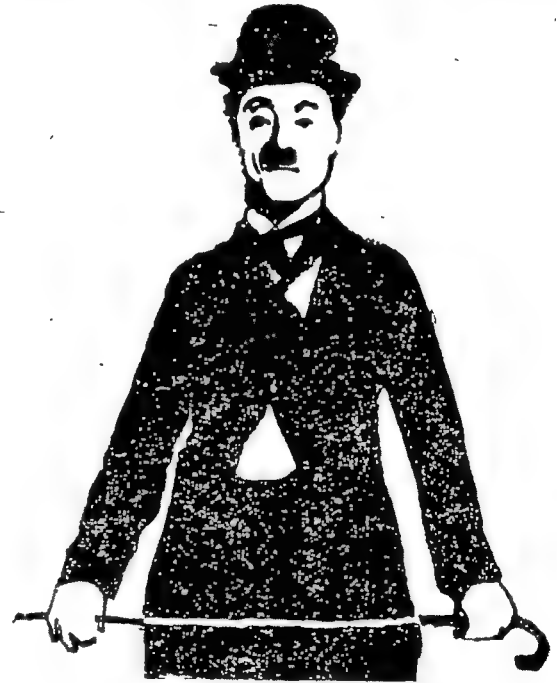
সেদিক দিয়ে চার্লিকে স্বীকার করে নিতে হয় একজন বিসময়কর প্রতিভা মনে। অথচ এ-প্রতিভা'ব উন্মেষ হবে একটা ভাবতেও পারে নি কেউ। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে চার্লি'ব জন্ম, খাওয়া জুটতো না অনেক বেলা। কিন্তু ঝাঁক শিল্পী হতে হবে উত্তমজীবনে, নিপীড়িত মানবতাব জয়গান যাকে গাইতে হবে নেকী মতাতাব দুখের বনে—তিনি কেন পবাক্ষ মানবেন দাবিগ্রহণ কাছে, বন্ধনাব কাছে? তিনি ভুলে থাকলেন সঙ্গীত নিয়ে, অপূর্ব কণ্ঠে'ব অধিকারিণী মা'র কাছে চার্লি'ব সঙ্গীতশিক্ষা চলতে লাগলো। তাহপার ছায়াছবি মাত্র ৮ বছর বয়সে।

তারপর ১৯১৪ সালে চেকিং লিভিং' নির্ধারিত ছবিতে চার্লি'ব অভিনয় দেখে দর্শকবৃন্দ বিসময়-বিস্ময় হলো, স্বাগত জানালো নতুন প্রতিভাকে। এরপর থেকে প্রতিটি ছবিতেই চার্লি নতুন নতুন বিস্ময়ের স্রষ্টা করতে থাকলেন, চার্লি'ব ব্যাতি সমগ্র পেরিয়ে গেল। ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা পাড়ি জবালেন চার্লি। কিশোরী, এসমী, মিউচুয়াল ইত্যাদি কয়েকটি ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ছবি কবলেন চার্লি, হাজার হাজার দর্শক ভেঙে পড়লো সিনেমা হলে যেখানে চার্লি'ব অভিনয় প্রত্যক্ষ করা যায়। এরপর অভিনেতা চার্লিকে নিজেই প্রযোজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেল, শুধু তাই নয় পরিচালক, চিত্রনাট্য রচয়িতা, সংলাপ রচয়িতা এমন কি সঙ্গীত পরিচালক হিসেবেও। 'মডার্ন টাইমস' 'দি গ্রেট ডিক্টেটর', 'কোট জেস্টার', 'লাইফ লাইট', 'গোল্ড রাশ', 'মিগিয়ে ভার্দে' ইত্যাদি প্রত্যেকটি ছবিতেই চার্লি অপর অভিনয় ব্যতী বহন করে এনেছেন।

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে তিনি যেভাবে ব্যঙ্গ করেছেন এম টি দাব কোন পরিচালক-অভিনেতার সাহায্য হবে কি না জানি নে। কিন্তু ভবৎ স্বীকার কবতেই হবে যে, তাঁ'ব হাস্যরস নির্দোষ নিশাপ, সে-হাস্যরসে'ব মধ্যে একটা ককণ রস আয়োগোপন করে রয়েছে, বেদনাশ্রু রয়েছে, শ্রেণ ও বিস্তপ, কিন্তু কাককে তা আঘাত করে না, শুধু চাবিধে তোলে, গভীর সমস্যার ফেনে দেখে বুদ্ধিজীবী দর্শককে। তাই চার্লি'ব কোন শক নেই, তাঁ'র মতবাদের সঙ্গে একমত না হয়েও চার্লিকে ভালোবাসে সকলেই।

কিন্তু চার্লিকে আমেরিকা ত্যাগ করতে হয়েছিল কুখ্যাত ম্যাকাথিসমের শিকার হয়ে। দীর্ঘদিন হনিউডে—আমেরিকার থাকার পথেও চার্লি আমেরিকার নাগরিকত্ব নেন নি। বিতাড়িত চার্লি ফিবে এলেন ইংল্যান্ডে, গেলেন যাদুভূমি সুইজারল্যান্ডে, ইতালী-ফ্রান্সে। ছবি কবলেন। আরো খ্যাতির উচ্চতম শিখরে পৌঁছলেন চার্লি।

ব্যক্তিগত জীবনে চার্লি একজন নির্ভরশীল, সহৃদয় বন্ধু। প্রচুর অর্থ বোজগার করেছেন তিনি কিন্তু বোজগাবটা কোনদিন লালসা হতে পারে নি তাঁ'র কাছে। দর্শকদের নিছক আনন্দ দেবার জন্যে, তাদের সময় কাটানোর সাহায্য করার জন্যে চার্লি ছবি করেন নি, প্রতিটি ছবি তাঁ'ব গভীর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, মানবিকতাব দর্শন প্রতিটি ছবি'র মূল উপাদান। আনন্দের মধ্য দিয়েই তিনি বাঁচতে চান, একার আনন্দ, দুনিয়া মুক্ত করার আনন্দই তাঁ'র কাম্য। আনন্দের সুহৃতেই তিনি বিদে করেছেন,



চার্লি চ্যাপলিন

বিলম্বে, লিটা গ্রে, পলট গডার্ডকে। আনন্দের সঞ্চারই তা'র গঞ্জে বিচ্ছেদ ঘটতে হয়েছে। চার্লি'ব চতুর্থ স্ত্রী উমা ওনৌল বিখ্যাত মার্কিন নাট্যকাব্য ইন্ডিয়ান ডনৌলে'ব কন্যা।

সুদীর্ঘ ৫০ বছর ধরে অভিনয় করে চলেছেন চার্লি, ক্লান্তি কখনো তাঁ'র কাছে নতুন। পৃথিবীতে যতদিন বন্ধনা থাকবে, অনায়াস-অবিচা'ব থাকবে ততদিন চার্লি থাকবেন না, তিনি বাইরের পালিশ-করা সমাজে'ব যুগধবা চিত্রে তুলে ধরবেনই। বাঁধা-ধবা কোনো নিয়মের মধ্য দিয়ে তিনি ছবি কবলেন না; কোনো জ্যান্তিক হকের মধ্যেও তাঁকে আবদ্ধ করা যাবে না। তাঁ'ব শিল্পবীতি এক এবং অবিচল; সেটা হলো: 'নিখিল বিশেষ উদ্দেশ্যে একখানা সুলিখিত প্রেমপত্র'। গোটা দুনিয়া'ব প্রেমে যিনি পড়েছেন সঙ্গীততা তো তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। ৭৬ বছর বয়সেও তাই চার্লি আজো দুনিয়ার মানবের জনপ্রিয় নায়ক।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

—হৃদয়সাদ মিত্র—

বোদ্‌লেয়রের সঙ্গে ডস্টয়েভ্‌স্কির মতাবের এই মিল ছিল শোনা যায় যে, আধুনিক মানবের গভীর ব্যক্তিমনের অনুভূতি আর তার গৃঢ় আচরণের বর্ণনা—এই বিশেষ দিকটিতে এঁদের দুজনেরই আগ্রহ ছিল। ডস্টয়েভ্‌স্কির নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড—এবং নায়ক যে আসলে এইরকম আধুনিককালের ব্যক্তিমনেবই নিগূঢ় মেকাজ এবং ভঙ্গি,—স্বাধীন মানব স্বাধীনতা আন্দোলনের এককম গোপন এবং আত্মগত আবেগজন, টমাস ম্যানের সেই মন্তব্য স্মরণ করেছেন বুদ্ধদেব কন্দু। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিবর্তে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা যায় না যেখানে, সেখানে অগত্যা এই গোপনতাই অবলম্বন হয়ে ওঠে। ডস্টয়েভ্‌স্কির নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড—এবং নায়ক এইরকম তীক্ষ্ণ চেতনার মান্দুস। সে বেন অন্ধকারে নেমে গেছে। বেন পাতালের আড়ালে লুকিয়েছে। সেখান থেকে তার স্বীকারোক্তি শোনা যায়।

পাপ তাপ জ্ঞান-ক্লেশের অভিজ্ঞতা আছে দুজনেবই বচনায। এই বিষাদের সবটা বোধ হয় ঠিক স্বাধীনতার বাধা-জ্ঞানিত মন্তব্য নয়। কোনো সমাজই মানুষকে বা-খুঁশি তাই করার স্বাধীনতা দিতে পারে না। আইন মানতেই হয় মানুষকে। তীক্ষ্ণ প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়। সেটাই নিয়ম, সেটাই সদ্‌স্বতা। কিন্তু প্রকাশ্যে বেপরোয়া হবার সুযোগ নেই, অতএব গোপনে উচ্ছ্বল হতে হবে—এরই নাম এই আধুনিক বিবাদ বুদ্ধি? সোজা কথায় একে কেউ কেউ যদি বিকৃতি বলতে চান, তাহলে তাতেই বা আশঙ্কি ফরার কারণ কোথায়? বোদ্‌লেয়রের ইন্টি-মেট জার্নালস থেকে আর ডস্টয়েভ্‌স্কির কারমাজফস থেকে পাশাপাশি দুটি উক্তি তুলে দেখিয়েছেন বুদ্ধদেববাবু—দুজনেই এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, মানুষের মন একই সঙ্গে ভগবান আর শয়তান, উভয়েরই পদতলে নিবদিত।

টমাস ম্যানের মধ্যও মন্তব্যের কথা আছে। চ্যাপেনহাবারের দৃষ্টবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে তাঁর রচনার। তিনি এ জগতে সৌন্দর্যের

পাশেই দেখেছেন পচনের রূপ। হায় রে, শবের ওপর ফুলের শোভা! হয়তো বোদ্‌লেয়র, ডস্টয়েভ্‌স্কি ইত্যাদি লেখকরা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সাহিত্যের ধারায় যে দৃষ্টি, বিকৃতি এবং গোপন উচ্ছ্বলতার মেজাজ এনেছিলেন, তারই ডেউ ছুঁয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরের মনোব মাটি। হয়তো মানুষের জগদ্ব্যাপী মানচিত্রে এ এক মন্তব্যের হাওয়া। কিছু কিছু মনে এরকম হাওয়া হয়তো সব দেশে সব কালেই দেখা দেবে। বোদ্‌লেয়র-ডস্টয়েভ্‌স্কির আগও হয়তো এ হাওয়া খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য হবে না।

শুধু আন্ডারগ্রাউন্ড অক্সান-অর্থাস সমাজ-জীবনের প্রকাশ্য ক্ষেত্রের নিচে আত্ম-গোপন করাটাই কি দুঃখের? সোজা-সোজা প্রচলিত ভাব্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা সম্ভব না হওয়াটাই কি দুঃখের? সামঞ্জস্য যে দুঃখসাধ্য, সে তো ঠিক কথাই। প্রবৃত্তিকে বাধতে হয়, রুদ্ধতে হয়; শাসন করতে হয়। তাতে বিষাদ কেন? সভ্যতা, সমাজবিবেক, ব্যক্তিবিবেক—এবা তো নিজেদের কাজ করবেই। মানুষের মনে শয়তান আর ভগবান হয়তো সত্যিই পাশাপাশি বিদ্যমান। তাকেও অসম্ভব বলি না। কিন্তু প্রবৃত্তির লাগাম খুলে দেবার স্বাধীনতাই কি স্বাধীনতা? আধুনিক বিবাদ কি এই স্বাধীনতারই অভাববোধ শুধু?

বিশ্লেষণ করে, মন্তব্য তুলে তুলে বোদ্‌লেয়র আর ডস্টয়েভ্‌স্কির মেজাজের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন বুদ্ধদেববাবু। চেতনা থেকেই ক্লান্তির জন্ম,—মন ক্রমশ দেখতে দেখতে শূন্যতে শূন্যতে পেতে পেতে বৃদ্ধিয়ে যায়,—শ্রান্ত হয়—দুজনেই—একই ভাবে এ অনুভূতির কথা লিখে গেছেন। অভ্যস্ত নীতি-ধর্মের চাপে ভুগতে ভুগতে চার্লসেই ডস্টয়েভ্‌স্কি নিজেকে ভেবেছিলেন স্ত্রীত বৃদ্ধ। মাত্র তিরিশেই বোদ্‌লেয়র ভেবেছিলেন—আমার আরও প্রাতি মিনিট যদি তিন মিনিট ধরা যায়, তাহলে ইতিমধ্যেই আমার বয়স কি নশ্বই হয় নি?

জীবন সম্বন্ধে এই প্রান্তিবোধ বড়োই দুঃখের ব্যাপার। একথা ঠিকই যে ডস্টয়েভ্‌স্কি

তাঁর জীবনে অনেক মন্তব্য দেখেছিলেন বোদ্‌লেয়র শূন্যছিলেন মার্কিন লেখক এডগার অ্যালান পো'র জীবদর্শন। দুঃখের প্রবলতা এঁরা প্রত্যেকেই। ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা মিলেছিল এই দুঃখবাদে। তাই মন হয়, এ দুঃখকে কেবল বিশেষ জাতিগত বা দেশগত ব্যাপার বলা ঠিক হবে না। এ বোধ হয় বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভাব। এ এই ভিন দেশের ভিন বিশ্বাত লেখকের সোজা।

কিছু কিছু পাবিপার্মিক আত্মবোধ চাপ তবু হয়তো মানতেই হয়। ডস্টয়েভ্‌স্কির তাঁর মন্তব্যের অভিজ্ঞতাগুলি তারই উদাহরণ। তাকে প্রাশদ-সাজা শূন্যে হলেছিল। রাজদ্রোহে অভিযুক্ত এই মানুষটি বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাকে মরতে হতো। নিতান্ত দৈন্যে বেঁচে গিয়েছিলেন। সে যে কী নিদারুণ অভিজ্ঞতা, তা অনুমান করলেও ভয় হয়। এরকম পাবিপার্মিকতার ফলে মানুষের মন-মেজাজে ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, দুঃখবাদের পাকা রঙ ধবে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই ধরনের নিদারুণ পারিপার্মিকতা কি ধবা যায়? টমাস ম্যানের কি হয়েছিল? শবের পচন আর ফুলের সুবাস একই বগে তাঁর নাকে লাগলো কেন?

এঁদের সঙ্গে আমাদের বাংলা দেশের আরো একালের কবি বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে আমি কখনো কখনো মিলিয়ে দেখাব চেষ্টা করছি। ডস্টয়েভ্‌স্কি আর বোদ্‌লেয়রের এই দুঃখবাদের নির্যাস যদি এই হয় যে, বেঁচে থাকা মানেই পাপ করা, আর পাপের পাবিপার্মিকতা পুনর্জন্ম, তাহলে বতীন্দ্রনাথকে কতকটা এক গোত্রেরই লেখক বলতে হবে। তিনি অবিধা কথায় কথায় 'পাপ' বলেন নি। নিজেকে তিনি 'কয়েদী' বলেছেন। বলেছেন যে, মানুষ বড়োই মন্দ। সংস্কার, প্রবৃত্তি, আপ্ত-বাক্যের কন্দী আমরা। আমরা ঘনি গাছে ঘুবাঁহ। আমাদের প্রাণ একদিকে,—আব সেই প্রাণের বেগেই একদিন হঠাৎ পড়ে গিয়ে বৃকের যে হাড়টা ভেঙে গির্বাঁহ, সে-জায়গায় 'ভেড়ার হাড়' বসিয়ে দেওয়া হয়েছে

ব্যস্তাহিক বসন্তমতী

ফুলেই ভেড়াব হাড়ের সন্তান মানুষের হাড়ের
খটখটি চলছে অন্যদিকে। এই বিরোধ-চেতনাই
বতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি। আমাদের অস্তিত্বের এই
স্বাদই তাঁর কবিতার প্রধান কথা। মানুষ
ঘরেছে, ফিরছে, উঠছে, বসছে—কতোই না
জীবিত! কিন্তু—বাহিরে প্রাপ্তি ভিতরে
প্রাপ্তি না থাকাই তার ধাক্কা।

বোদ্‌লেসের মধ্যস্থতাবে তাঁর মন খুলে
ধবংছিলেন তাঁর পাঠকের সামনে। সাহিত্যের
আদর্শগত পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে ইচ্ছে
করে যে, সেও ন্যাচালালিজম। নিজের
ভেতরকার বিরোধ তিনি তাঁর সাহিত্যে
উন্মাদিত করেছিলেন। নিজের কালের
কালিমার আচ্ছন্ন সেই মন পাঠকরা দেখুক,
চিনুক, অনুভব করুক—এই ছিল তাঁর আগ্রহ।
ডক্টরেডস্ক্রিকরও সেইরকম উদ্দেশ্য ছিল বোধ
হব,—উদ্দেশ্য কথটা জুড়িটা সংগত সীমার
মধ্যে ধর্তব্য—পুরোপুরিই সজ্ঞান না হতে
পারে,—শিল্পসৃষ্টির কাজে বক্তব্য প্রকাশের
উদ্দেশ্যবোধ যতোটা স্বীকার্য ততোটাই।
তিনিও ডি-কুইন্সি আর এডগার অ্যালান
পো'র কাছ থেকে তাঁর মেজাজ আর ভাষা
দুই-ই কতকটা আয়ত্ত করেছিলেন বলে শোনা

আমাদের বতীন্দ্রনাথও কি এঁদের লেখা
থেকে অস্তত কিছু পবিমানেও প্রভাবিত
হয়েছিলেন? বোদ্‌লেসের আর ডক্টরেডস্ক্রিকর,
—এডগার অ্যালান পো'র আর টমাস ম্যানেব—
এবং এইরকম আরো কোনো কোনো পাপ-তাপ-
গ্লানি-বন্দনের লেখকের,—জীবনকে দৃষ্টিপন
আর মরীচিকা মনে করবার মেজাজ ছিল
যাঁদের সেইরকম কবিদেরই কতকটা সমধর্মী
মনে হয় বতীন্দ্রনাথকে। ডি-কুইন্সি-র আফিমের
ঝোঁক বর্তেছিল বোদ্‌লেসের মেজাজে।
বতীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন 'সুন্দের ঝোঁক'।
নিজেকে তিনি উদ্ভ্রান্ত বলে চিনেছিলেন।
সেই উদ্ভ্রান্ত মধ্যে দেখেছিলেন—আলো-
আধারের গরাদে বসানো অপার বিশ্বকারা।

তাই তাঁর দৃষ্টিত হয়েছিলেন তিনি!
আমাদের জীবনে সত্যিই কোনো স্বাধীনতা
নেই—এই দুরদৃষ্টের দৃষ্টির কথাটাই এঁদের
প্রত্যেকের বক্তব্য। আধুনিক মনের এই দৃষ্টি-
বাদের দিকটি ভাবতে গেলেই মনে পড়ে
বতীন্দ্রনাথের অভিযোগ, ভগবানের বিরুদ্ধে
অভিযোগ। তিনি জিগোস করছিলেন—
'পাকাইতে কাঁচা হাত—কোন অধিকারে
আমারে সৃষ্টি করিলে অগম্য?' বলেছিলেন—

জীবনে মরণে কর্মে ও জ্ঞানে
খাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন
কাটে না আমার মিন;
নাহি যবে প্রয়োজন,
আমার মাথায় আকাশের মেঘ
করিবে না গবজন।
সুখি প্রয়োজন বাহবে পবন,
প্রয়োজনে হবে বৃষ্টি,
আপনারে ঘিরে প্রতি মূহুতে
গড়িব আপন সৃষ্টি।
হবে পুনঃ হবে সাধ,
প্রাণ ভরে কেঁদে ধূরে মূছে দেহ
নিজে-গড়া অপরাধ।

সত্যিই, এদিক থেকে দেখলে দৃষ্টিত
হওয়া ছাড়া মানুষের উপাধাতব নেই। আমরা
পরাধীন। এ অবস্থায় যাঁরা পড়েছেন তাঁরা
তো বলবেনই—

আনন্দ নহে নহে
কিছু দৃষ্টি নিছক দৃষ্টি—
দৃষ্টির ফেরি বহে!



যখন করিবে পাতা

খলিশ পুরেরিনি

যখন করিবে পাতা আসিবে যে জান
খুঁজিতে সমাধিক্ষেত্রে মোর কুশখানি।
দেখিবে রক্তে সেখা এক কোণে আসি,
ফুটেছে অদূরে কত না কুসুমরাশি।
ফুটেছে যে ফুলদল মোর সেহ পরে
ফুলে নিও তোমার সোনালী কেশ তরে।
অলিখিত কাব্য মোর ছিল ভাবনার...
মোর প্রেমবাণী—বাহা বলি নি তোমায়।

অনুবাদক: সুবীরকান্ত গুপ্ত

জন্মের প্রার্থনা

জুনীথ মজুমদার

স্বপ্ন দাও, জন্ম দাও, হে পৃথিবী আনন্দ নিবঁরে
মগ্ন করে চিরকাল। উন্মাদিত পবিত্র আলোক
শুধু ব্যর্থ ভেসে যাবে? সুন্দরের প্রাবিত প্রহরে
বিষম আমাকে দাও বিশ্বাসের সরল নির্মোহ।

স্বপ্ন দাও, জন্ম দাও, হে পৃথিবী বিমুখ বিস্ময়ে
চিরকাল শাস্তি পাব, জন্ম নেব সৃষ্টির নিভঁরে।



এখন আর মাটির বেহালা নয়, লেহা-
লজ্জা-ইট-কাঠের শানবাখানো বেহালা।
ফলকাতার ভাষা চলচিঠিই গেছে বদলে।

খাচ্ছিলাম ৭৬ নং বাসে। মোমিনপুরের
মোড়ি থেকে বন্ধন উঠলাম রাস্তার পা পাতা
ঘাচ্ছিল না এত রোদ। যেটুকু ছায়া তার
লবটাই গুটিয়ে ছোট হয়ে গিয়ে যার যার
পায়ের তলায় সঁধিয়ে বসে আছে। মাঝে
মাঝে আগুনের হুকুর মত উড়ো হাওয়া এসে
পায়সজ্জারদের গায়ে ছাঁকা দিবে যাচ্ছে।

ট্রামের লাইন কখন পেরিয়ে এলাম।
রাস্তার দুপাশে এখনও বে-কে সেই। কালো-
কালো রাস্তাটা রোদ পড়ে এমন টলমল টলমল
করছে যে, দেশে মনে হবে যেন রাস্তা জুড়ে
লোহা চুরানো হয়েছে। একটি মেনে দেয়াল
বেঁধে বেঁধে ছায়া খুঁজতে খুঁজতে চলছিল।
তাব নুসর মুখটি ছাড়া দেখে চোখ জুড়োবাব
মত তেমন কিছুই আর এ পর্যন্ত নজরে এল
না।

অথচ ছেলেবেলায় ডোবাপুকুর গাছ-
গাছালি ঘাসদুন্দুয়া পাখিপাখালি দেখব বলে
দল বেঁধে মিড-ডে টীকটে বেহালায় ট্রামে
উঠে জানলা দখল করে বসার জন্যে কী
কাড়াকাড়িই না পড়ে যেত।

বড়শে গেল, ঠাকুরপুকুর গেল, তারপর
বেলসাপদুরও পেরোতে হল—তবে গিয়ে দেখা
দিল আকাশ-ছোঁবা দরাজ মাঠ। কালীঘাট-
ফলতা লাইট রেলওয়ের বাতিল-হওয়া পূর্বনো
রাস্তার বৃক্বে হাড়পাঞ্জির খসানো স্মৃতিটো
আজ কোথাও ঘাস-চাপা, কোথাও সাবলন্দী
কারখানায় দেয়াল-চাপা পড়ছে। হলুদিয়ার
নামডাক হওয়ার পর থেকেই এ কপলে রাস্তার

দুপাশে জমির নর হু হু করে বেড়ে গেছে।
খোলা মাঠ হটতে হটতে দুদিন বাদে ডাকঘ-
হারবাব ইন্তক তাব আর টীক দেখা যাবে
বলে মনে হয় না।

বাজার হাট পেরোবার পর মাঠের মাথা-
খানে মুখে হঠাৎ বেন আগুনের ফুলকি এসে
লাগল। চেয়ে দেখি চশমাটা ভেজা ভেজা।
হ্যাঁ, জলই তো পড়ছে। শিলাবৃষ্টি নাকি।
হাত বাড়িয়ে দেখলাম শিলাবৃষ্টি নয়। রাস্তার
দুপাশে তন্ত মাটি জলেব ফোঁটাগুলো পড়তে
দিচ্ছে না। হুন্ হুন্ শব্দে শব্দে শব্দে
নিচ্ছে। খানিকটা যেতেই আব বৃষ্টি নেই।
মাটি ঝটখটে শুকনো। আবার যে-কে সেই
গনুগনে রোদ।

বাসের মধ্যে তেমন ভিড় নেই। দু-তিন
জন ছাড়া আর সবাই দিব্যি বসে পায়ের
ওপর পা দিয়ে চলছে। তার কারণ, একে
ছুটির দিন—তার ভরদুপুর। সামনের সিটে
একজন যোপদুপুর পাকলা-পাকলাবীপবা
ছোকরা। বছর তিরিশ বয়স। পারে হাওয়াই
চম্পল। হাতে এক বাজ কপতবুর ক্ষীরের
মিঠাই। দেখে মনে হয়, খাওয়াদাওয়ার পর
এক ঘুম দিয়ে পরিপাটি করে চলে আঁচড়ে
বউ জানতে শব্দবর্ষা চলেছে। ডানদিকের
লম্বা সিট্টাতে বসে এক শুনশুনে বড়ি।
উঠেছে আমতলা থেকে। বড়ির কোলের
ওপর আঘাতি একটা বস্তা, পায়ের কাছে
একটা শেটীলা। দুটোই যে বেশ ভারী,
দোস্তব উম্মি রোড স্টপে বড়ি নামবার
সময় বোকা গেল। তখন এও বোকা গেল,
বড়ির সঙ্গে যাচ্ছে তার সতেবো-অঠারো বছর
বয়সের এক নাত। ছেলোট কাড়া হাত-পা
হয়েই নেমে যাচ্ছিল, কিন্তু বাসের যাত্রীদের
ধমক খেয়ে অগত্যা একটা পুঁটলি তাকে হাতে

নিতে হল। তার হাটবার রকম তেখে মত
হল মোট বইতে তার ইচ্ছতে খুব নাথছে।

যেতে যেতে দেখলাম শুকনো নখনজুলািতে
কালভাটের নীচে ছায়ার মধ্যে বসে জন দুই
মুটে গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে।
আবেক জয়গায় বাঁশের সাঁকোর তলায় নিরি-
বিলিতে কুলো কোলে করে বসে এতজন লোক
বিড়ি বাঁধছে।

আমি বাব নুরপুর। মজা-দেওয়া
ছোকরার শব্দবর্ষাটি কোথায় জানবাব
আগেই সরষের মোড়ে আমাকে নেমে পড়তে
হল।

তেন্দায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে
ছিল। নেমেই একটা ডাব ধেবে নিলাম।
দু-চারজনকে ডাব কেটে দেবার পর ডাবওয়ালার
আম করবার কিছু থাকল না। এমন অসময়ে
খশ্মের থাকার কথাও নয়। বেচবা ডাবের
কাটা মূণ্ডগুলো নিয়ে দাঁ দিতে পেন্সিগ
বাড়বার মত করে অনর্থক সমানে চলতে
লাগল।

মোড়ের মাথায় দু-চারটে চা-শববতের
দোকান। সঙ্গে পানিবিড়ি। এমন সময়—
যে মেঘটাকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে
চলে এসেছিলাম সেই মেঘটা হাঁপাতে হাঁপাতে
সরষের মোড়ে এসে আমাদের ধবে ফেলল।
আবার এক পশলা কুন্টি। হলেও, হাকে বয়ে
কানা মেঘ। এক চোখে রোদ, আরেক চোখে
বৃষ্টি। বৃষ্টি বজতে ছটাক পানি। দেখতে
দেখতে দেউলে।

চারের দোকানের ঘে ছেলে দুটো মোড়ের
ওপর দাঁড়িয়ে কচুপাতায় তিন ছুঁড়িছিল,
রক্তবরপরের বাসে নুরপুর রোডে মোড় ঘুরে
দাঁড়াতেই তারা দুহাতে দুহাতে সরষের গেলাম
বাগিয়ে ধরে শরবত-বজ্জা টমড়া শরবত বলে

হাঁকিতে শব্দ কবে দিল। সাত পরশা বচ করে রং-করা জল খাওয়ার মত শৌখীন জওয়াব সে বাসে একজনও পাওয়া গেল না। হাস চলেতে আরম্ভ কবতেই ছেলেদুটো প্রায় মার্কাসের লোকদের মত দু'হাতে দুটো গেলাস একটুও না চল্কে লাফিয়ে নেমে গেল।

এ রাস্তার এই নতুন আসাছি। কামার-পোলের পুল পেরিয়ে বাস ডাইনে ঘুরল। মাথেরহাটে তাকিয়ে দেখবার মত সুন্দর ইস্কুল-বাড়ি। দু'পাশে খালি মাঠের পব মাঠ। বন-জঙ্গল কোপঝাড়ের বালাই নেই। খানিক অন্তর অন্তর ছোট ছোট গ্রাম। মানখন্ড, কুলটিকারি, মহেশ্বরী, ভবানীপুর। গাছ বলতে তাল, নাবকোল, খেজুর। আর সেই সঙ্গে বাবলার ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু ফণিমনসা। স্বত দু'র দৃষ্টি বার কেবল ক্ষেতের জাল। হাট-বাব নয় বলে দেওয়ানতলাহাটে টিম টিম করছে শব্দ দুটো একটা দোকান। দু'বে বাঁদিকে চিমনির খোঁয়া। ইটখোলা না ধানকল ঠিক ঠাহর করা গেল না। তারপর দু'গাংপূর পেরিয়ে দু'বপূরের ঘাট।

এই নুবপূর? দোকানপাট গদ্যম আড় কিছই তো নেই। এপার পা দিলাম এই প্রথম। ওপার থেকে কতবার দেখেছি। হুগলীতে এসে পড়েছে রূপনাবারণ। মেদিনী-পূর, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা—এই তিন জেলাব সম্পদ। ধানচাল চোবাচালানের ছিল মোক্ষম জায়গা। রাস্তার লোক জনিত, এখনে বেমন বজ্র আটুনি তেমন ফস্কা গেরো।

ওপারে গে'ওখালি। লগ্নে নদী পেছোতে এখন লাগে পাঁচ থেকে সাত মিনিট। যে জাহাজটা মারগঙ্গায় দাঁড়িয়ে হুড়মুড় হুড়মুড় করে মাটি কাটছে, তার সুমুখ বরাবর এসে ডেউয়ের চোটপাটে লগ্নটা দোল খেতে খেতে গেল। লগ্নে বসে একজন গল্প করছিল। এই তো কিছুদিন আগে মাকনদীতে এসে লগ্নের চাবা খুলে গেল। নদীর এ জায়গাটার যেমনি টন, তেমন ডেউ। লগ্নে ততক্ষণে বেশ সোর-গোস উঠে গেছে। কিন্তু ফেরিঘাটের নৌকো-গুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দূর থেকে মজা দেখছে। বাতীরের হাঁকহাঁকি ডাকাডাকিতে তাদের স্রুক্ষেপ নেই। লগ্নে হয়ে অবধি ফেরি-নৌকোর আর কদর নেই যে। লোকে এখন বদখুদ লগ্নে চড়ে কত সুখ। এদিকে লগ্নের

অবস্থা তখন মোচার খোলার মত। অনবরত পাম্প করে করে জল ছেঁচা হচ্ছে। ডেউয়ের ব্যাপ্তায় লগ্নের খোলে কেবলি জল উঠছে। বাতীরী সবাই তখন জেরে জেরে যে বার ইন্টনাম জপ করতে লগ্নে গেছে। যাই হোক, অনেক হাঁকডাকের পর একটা ফেরিনৌকো এসে দয়া করে লগ্নটা কতক লগ্নি ফেলে নিয়ে গেল। তারপর লগ্নি মেয়ে মেয়ে লগ্নি কোনো-রকমে ডাঙার ভিড়ল। গল্পটা যখন বলা হচ্ছে তখন আমরা মারগঙ্গায়। মোটরের ভটব ভটর আওয়াজটা কানে ভাল ঠেকছিল না। চাকা খুলে যাবে না তো? ওপারে ফেরিনৌকোর মাঝিগুলো অনেক মাথামাথি করেছিল। ভাড়া কম। বলেছিল দশ মিনিটে পেঁপে দেবে। দেখতে দেখতে ঘাটে পেঁপেই বাওয়া আর আপশোস করার সময় পাওয়া গেল না।

রিস্তার করে বাসের ডেরার পেঁপেই দেখি এইমাত্র তেরোপেখার একটা বাস ছেড়ে চলে গেছে। নরখাটের বাস আছে বটে একটা, তাও ঢের দেরি ছাড়তে। সুতরাং মহিষামল অবধি সাইকেলারিয়ারি অর্গাভব গতি।

গে'ওখালির এখন সেই উড়নচন্ড লক্ষ্মী-ছাড়া ভাব আর নেই। দোকানপাট বরবাড়ি ইস্কুলকাছারি নিয়ে খানিকটা স্থিতি হয়ে বসেছে। খালে থে থে করছে জল। পাশ দিবে নাক বরাবর পিচঢালা রাস্তা। জায়গার জায়গার নোঙর-করা খড়ের নৌকো। খালি নৌকো কোথাও পাড়ের গারে কাং হয়ে রয়েছে। বর্ষা এসে পড়ার আগে ফুটোফাটা নারানোর কাজ চলেছে।

তিনটে বিজ্ঞা পান্না দিয়ে চলেছে। আমাদেবটা সকলের আগে। খানিক দূর বাবার পর যে রিস্তাটা বাঁই বাঁই শব্দে আমাদেবটাকে পেছনে ফেলে দিল, তাব নাম দেখলাম 'রোড কিং'। বাংলার রাস্তার রাজা। পেছনেব রিস্তাটা ধরি-ধরি করে আমাদের রিস্তার পাশে এসে গেল। আরেকটু এগোলেই পেছনে লেখা নামটা দেখতে পাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আর এগোবার সাধ্য হল না।

রাজ্যচক্রে এসে দেখি নাকের সামনে রাস্তার মাঝখান জুড়ে একটা মাটিব ঢালাঘর। তাকে বেড়ি দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে অল্প একটু মার্ত-রাস্তা স্থিতিশীলত পাকা রাস্তাটাকে জুড়ে দিচ্ছে। শুনলাম ও-ঘরটাকে ঠাকুরঘর বলে

দাঁব করে কারা যেন সরকারের সঙ্গে বছর কয়েক ধরে মামলা চালাচ্ছে। সত্যি সেসকাল, কী বিচিত্র দেশ-ই বটে।

মহিষামলে পেঁপেই একটুও দাঁড়াতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে তেরোপেখার বাস এসে গেল। পূর্ব গদি-আটা এমন খোলামেলা সাজানোগোছানো বাস বাংলাদেশে একটা ছাড়া দুটো আছে কিনা সন্দেহ। অনেকক্ষণ গাড়ি-মাসি করে শেষ পর্যন্ত বাস ছাড়ল। সামনে সিঁথে রাস্তা হলুদিয়ার গেছে। বাঁদিকে মাঠের মধ্যে টিবি'র পর টিবি হয়ে খোয়া জমে রয়েছে। দু'বে থেকে তাদের কলো কলো টিলার মত দেখাচ্ছে।

বাস ডানদিকে বাঁক নিতেই দেখি আকাশে সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে। বৌদিকে সমুদ্রের মোহানা, সেইদিকেই বেশিরকম মেঘের ঘনঘটা। বেলা চাবটে নাগাদ প্রায় সম্ভ্যে হওয়ার মত অশ্বকার ঘনিষে এল। দু'পাশে দেখে মনে হল বেশ নাগাল জমি। বর্ষার ফি বছরই বোহর জলভাসি হয়।

তেরোপেখার এপারে এসে বাসও ডেরার ফিরল, জলও এল একেবারে তেড়েফুড়ে। এতক্ষণে নজবে এল—অমন বাহারে বাস, কিন্তু কাঁচগুলো তেমন অস্ত নয়। তেতরে বসেও প্রায় ভিজে একসা হওয়ার দশা। আর কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! জলের দস্যকার ফেটা-গুলো যেন দু'রমুশ হাতে করে সমানে বাসেব ছাদ পেটাচ্ছে। মাঝে মাঝে একেকটা দমকা হাওয়ার বাতীসুখ বাসটা বননন্ বননন্ করে নড়ে উঠছে। কড়ু কড়ু কড়ু—কড়াং। এবার আব শব্দ বিন্দু চমকানো নয়, শব্দ ফাঁকা আওয়াজ নয়—করছপটে কোথাও সজোরে বাজ পড়ল। জানলা দিয়ে ঘাড কাং করে দেখবাব চেষ্টা করলাম ধবেকাছে কোনো উঁচু গাছ আছ কিনা। বৃষ্টির কুমাশর কিছই দেখা গেল না।

বাসের ভেতর বিভিন্ন ধোঁয়ার একটি ঘণ্টা দম আটকে বসে থাকতে হল। রাস্তার কাদার পা দিখেই দেখি চারিদিকে চকচক ঝকঝক করছে ধুলোমোছা আকণ্ঠ সবুজ। ততক্ষণে আমাকাপড়ের ভিজে জায়গাগুলো গারে লেপটে গিয়ে বেশ ঠান্ডা মালুম হচ্ছিল।

সামনেই তরতরিয়ে বয়ে চলেছে হলুদি নদী। নদীর জলে বেশ একটা ওম ভাব! নৌকা প্রায় ডুব ডুব। বেশ কয়েক খেপের

লগ্নরাত্রী একবারে পার হচ্ছে। প্রায়-জলের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল কয়েক কাক সোনাখড়কে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ো-জাহাজের কুচকাওয়াজ দেখাবার মত করে উড়ে গেল এক কাক কুচো কুচো পাখি।

আমাদের নৌকোটা সব ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় একদল ছোকরা পড়েব দিকে ডাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'স্বারে দেখে দেখে, বড় বড় আর্টিস্ট!' ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সত্যিই তাই—কলকাতা থেকে আসছে বড় বড় গাইবে বাজাবে। মৃদুগদুলো চেনাই তো বটে।

হাত নেড়ে বললাম, 'স্বাবে, কী খবর? সব ভাল তো?' বলতেই এ নৌকোর আমার খাতির বেড়ে গেল।

তাবপর ওপারে তেরোপেখ্যার ডাকবাংলোয় পা ধুয়ে, এক গোলস গরম চারে চটপট গলা ভিজিয়ে নিয়ে এক বাসেই আমরা এসে নামলাম নন্দীগ্রামে।

খানা যুব-উৎসবেব আজ শেষ দিন। একে নামী নামী লোক বসবে কইবে, গাইবে বাজাবে, তার বাতভর যাত্রা। দূর দূর গ্রাম থেকেও হাজারে হাজারে লোক আজ এখানে জেতে পড়বাব কথা। এক ঘণ্টার মূলধারের বৃষ্টি সভাস্থলের সাজসজ্জাগুলো খুইয়ে তো দিয়েইছে, কিছুটা শুইয়েও দিবে গেছে। উদ্যোক্তাদের তো মাথায় হাত দেবাব অবস্থা।

ইস্কুলবাড়ির হাতাষ জলকাদাব ম্যেই চায়নামোব আলোর সভা যখন আরম্ভ হল, দেখা গেল মাঠে আব তিল-খামশে জারগা নেই। মাঠের আনাচে-কানাচে কুপী জুড়ালিবে উবু হয়ে বসেছে চীনেবাদাম, পানিবাড়ি, চা-জনখাবারের ছোট ছোট দোকান। এক পাশে এক কাটা-কাপড়ওয়ালাও গ্যাসবাতি জুড়ালিয়ে সওয়া নিষে বসে গেছে। বেশ একটা ছোটখাট মেলা-মহুবেব চেহারা।

রাত দেড়টা পর্যন্ত চলল পূর্ণ দায়সর গাউল, নির্মল চৌধুরীর পল্লীগীতি আর আলিস্ খাঁর স্ববোধ। একটু একটু শুনিছি আর ডুপাল পাণ্ডার সঙ্গে গল্প করছি।

পর্যনো দিনের গল্প।

তখন বছর সতেরো বঁবেল। কলেজে পড়ি। সম্ভবত কৌকে কাঁথি বোড স্টেশনে ট্রেনে উঠতে যাব পেছন থেকে থপ্ কবে ধরে ফেলল। সাদা পোষাকের একদল পুলিশ।

খানিকটা হাটিয়ে নীষে গিয়ে একটা ধরে তুলল। ভল্লাসির ব্যাপারে তখনও তাদের একটা হচ্ছে-হবে ভাব।

আমি কেবল ভাবছি, একটু ফাঁক পেলেই যা থাকে কুলকপালে বলে ছুট দেব। ফাঁক একটা পেয়েও গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক কবে লাফিয়ে দে ছুট। পুলিশও ছুটেতে লাগল পেছন পেছন। তখন আমার জোয়ান বয়েস। সেইসঙ্গে মনে আদর্শেব আগুন। ধরতে পাবত না যদি ওরা 'ডাকাত, ডাকাত' বলে না চেঁচাত! একে অন্ধকার, তাব ওপর রাস্তা জুড়ে যাচ্ছিল একসার খড়বোকাই গাড়ি। আব চলোছিল একদল সাঁওতাল। দেখলাম অবস্থা বেগতিক।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কাপড়ের তলা থেকে রিভলবারটা বার করে নিলাম। হেঁকে বললাম, 'সামনে আসবে মরবে। ওদেব মনে ভয় ধবিবে দেবাব জন্যে রিভলবারের ঘোড়া টিপে ফাঁকা আওয়াজ করতে চাইলাম। কোনো আওয়াজই হল না। সর্বনাশ! কাড়ুজ-গুলো ভেজা। রিভলবারটা নলাব দিকে ছুড়ে ফেলে দিতেই মাথায় লাঠিব একটা বাড়ি এসে পড়ল।'

এমন সময় এল খাওয়ার ডাক। রাত দুটোয় খেয়ে উঠে যখন ভাবছি ভোব পাঁচটার ঘুম ভাঙবে কিনা, ঠিক সেই সময় এল যাত্রা দেখতে বাওয়ার সনিবন্ধ নেমন্তন্ন। সারা মাঠে গিজ গিজ করছে লোক। হাবমোনিয়াম, ক্লাবিওনেট, খন্ডাল সহযোগে শব্দ হল নাচ। কাঠ-কাঠ হাত-পা দেখেই বোকা যাব ছেলেটাকে জোর কবে ধরে মেয়ে সাজানো হচ্ছে। সব স্ত্রীভূমিকাই তাই। অভিনয়, গানের গলা, সাজসজ্জা—কিছুই বলবাব মত নষ। তা সত্ত্বেও ভোব বাত অবধি একজন দর্শকও নাকি জারগা ছেড়ে নড়ে নি। দুটি দৃশ্য দেখাব পরই বিছানায় লম্বা হয়েছিলাম। যাত্রার চিব্বারে মিনিটে মিনিটে চমকেছি। উঠেছিও ঠিক পাঁচটার। তবে ঘুমিয়েছি যে কখন, অনেক চেষ্টা করেও ঠিক মনে করতে পারলাম না।

একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, যাত্রার কী ছিল? সে বলল, যাত্রার ছিল দিল্লীব অত্যাচারী নবাবদের বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের একযোগে উঠে দাঁড়াবাব কথা।

এ যাত্রা জমে ওঠার পেছনে কি আশঙ্কো বাঙালীর মনের কোণে কোনো সট ইশারার নিশানা পাওয়া যাচ্ছে? কে জানে।

যে বাস্তা দিয়ে এসেছিলাম, সেই বাস্তা দিয়েই ফিরলাম।

গেঁগুখালি যাওয়ার রাস্তায় সাংকেল-রিস্কার শেয়ারে একজন সংগী ছুটে গেল। বাড়ি তাঁব নন্দীগ্রাম ছাড়িয়ে চাবও আট মাইল। তিন ভাই। সন্দেবন আবদে দু-শো বিবেব ওপর জমি। ভাইরা পাল করে চাব দেখেন।

বললেন : এদিকে মশাই, কেতে কাজ করার লোক পাওয়া যাব না। শহাগুলো সব টেনে নিচ্ছে। মজুরি চায় কী? একেকজন যেন লবাবপদুব।

বলতে বলতে বিজ্ঞাওয়ালাকে ডেক জিজ্ঞেস করেন, 'রোজ হয় কত?'

—চার থেকে পাঁচ।

—পড়েছিস কত দূর?

—বাবা মবে গেল আব পড়া হয় কোথায়?

—সিনেমা দেখিস?

—বাব, সত্যি বলছি। হস্তায় দুটোর বেশি নষ। একটুকু-বাসা দেখেনে, স্যার? দেখবেন। ফস্টোকেলাস বই।

ছাত্রদের অপবিহার্য গ্রন্থ
গল্পীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালানো

—ইহাতে যাচ্ছে—

ঋষি বসন্তচন্দ্র বচিত গল্পীচন্দ্রেব জীবনী—
'গল্পীচন্দ্র-স্মৃতি, কবীচন্দ্র বসন্তচন্দ্রেব
পালানো সমালোচনা' এবং 'বালোচক-
শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসন্ত গল্পীচন্দ্র-সাহিত্য সমা-
লোচনা। বাধ্যনিক শিক্ষা পঞ্চ কব্জিক
ক্রতপঠন গ্রন্থরূপে নিব্বাচিত।

দ্বিতীয় এক টাক

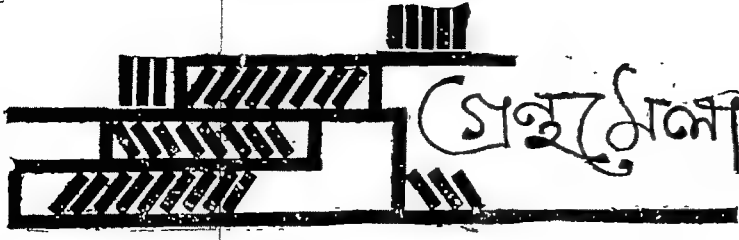
মহাকবি হেমচন্দ্র বসন্তোপাধ্যায়ের

ব্রহ্ম-সংহার কাব্য

দ্বিতীয়—দুই টাকা

বসন্তমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২



ফড় জ্ঞানে অরথ্যকে : সুভাষ সমাজদার।
কন্টেম্পোরারী পাবলিশার্স প্রায় লিঃ, কলি-
কাতা-৯। দাম : তিন টাকা।

সুভাষ সমাজদারের নাম বাংলা পাঠকের
মিকট আজ অপরিচিত নয়। এটি তাঁর তৃতীয়
গ্রন্থ। দর্শনের বিষয়বস্তু যে সাহিত্যের উপা-
দান হতে পারে—এই উপন্যাসটি তার প্রকৃষ্ট
নিদর্শন। সোপেনহাওয়ারের উইল টু 'লিভ'
এই গড় তত্ত্বটি এই উপন্যাসে প্রতিপাদন
করতে চেয়েছেন লেখক।

বর্তমান গ্রন্থটি আধুনিক যুগের শিক্ষিতা
নারীর একটি নিখুঁত চিত্রায়ণ। অর্থাৎ
শিক্ষিতা নারী, কিন্তু কুণ্ঠিত। তাই পিচ্-
গৃহে সে অবহেলিতা ও লাঞ্ছিত। এমন কি
শিক্ষিত সংস্কারমূলক বুদ্ধক সন্তোষকে নিয়ে
সে যে স্বপ্নসৌখ গড়ে তুলেছিল—তাও গেল
ভেঙে। সোপেনহাওয়ার যে বলেছেন, ইয়ুথ
টাইমস্‌ বিউটিফুল ও একটা আকর্ষণ আছে
বুদ্ধকদের কাছে। সেটা তার জীবনে কি
ব্যর্থতার পর্বে বসিত হল? প্রকৃতির যে
জগৎময়ী রূপ প্রত্যেকটি জীবের রক্তের মধ্যে
বিবেক মধ্যে ক্রিয়া করছে। তারই অন্ধ দুর্বার
ভাঙনার মেরুদুর্বল ভালবাসছে। যাব ফলে
হচ্ছে নতুন সৃষ্টি। সেখান থেকে আবার কি
শক্তি? তাকে নামতে হল জীবনযুদ্ধে। মৃত্যু-
সেবিকা হিসেবে পরিচিতিলাভ ঘটল গ্রামবালায়
হিন্দু মূল মানবের সঙ্গে। সে বিশেষভাবে
উপলব্ধি করল সোপেনহাওয়ারের উইল
টু 'লিভ' তত্ত্বটি। নিঃসঙ্গ জীবন কত যে
বুড়ি-সহ সেটাও মর্মে মর্মে অনুভব করল।
শেষে এই সমস্যাসম্মূল মানসিক স্বপ্নের যথার্থ
সমাধান হল অর্থাৎ ও সন্তোষের যথার্থ
মিলনে।

এই উপন্যাসে লেখকের অসামান্য বর্ণনা-
নৈপুণ্যে প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন্ত হয়ে
উঠেছে। লেখকের ভাষাও মৃদুচীলতার
পরিচ্ছন্ন। এমন কি বইটির ছাপা বাঁধাই ও
মলাটে সুন্দরটি প্রকাশিত।

নারিন পাস্তেরনাকের কবিতা : অনুবাদ :
নরিকতা ভরদ্বাজ। বৈতালিক প্রকাশনী, ৪৭,
লিটন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৪। দাম : চার টাকা।

মুদ্রার কাব্যসাহিত্যে কবি পাস্তেরনাকের
নামটি উল্লেখ্য জ্যোতিষের মতো বিরাজ
করবে। তাঁর মতো সমালোচিত কবির
সংখ্যা রাশিয়ার নগণ্য, আবার তাঁর কাব্য
সেখানে যেভাবে অভিনন্দিত হয়েছে তার
সার্থক তুলনা খুব কমই মেলে। অবশ্য
পাস্তেরনাকের উপন্যাস 'ডাঃ জিভাগোই' বা
কিছু বিতর্কের মূল কারণ। কিন্তু নবল
কমিটি উক্ত উপন্যাসের জন্যে পাস্তেরনাকে
পুরস্কার দান করেন নি, তাঁকে পুরস্কার দান
করা হয়েছিল এই উপন্যাসের অবশিষ্টাংশে
গ্রন্থিত বিশটি কবিতার জন্যে। আর এই

জন্মস্মৃতি

কবিতাগুলির রচনাকাল ছিল—১৯৪৬-৫২।

এর বহু আগে থেকেই পাস্তেরনাকের কবি-
খ্যাতি প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম কাব্য-
গ্রন্থ বের হয়েছিল ১৯১২-র কাছাকাছি। আর
তাঁর মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা হচ্ছে বারোটি
(ডাঃ জিভাগোর কবিতা সহ)। বাংলাদেশে
পাস্তেরনাকের কিছু কবিতা ডাঃ জিভাগো থেকে
অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর অন্য
কাব্যগ্রন্থগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নি।
বর্তমান অনুবাদক সেই অসম্পূর্ণ কাজের অনু-
প্রেরণায় পাস্তেরনাকের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ থেকে
কাব্যচয়ন করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।
অনুবাদক একজন কবি; সুতরাং তাঁর অনু-
বাদের কৃতিত্ব মূল ভাব অক্ষুর থেকেছে, ছন্দ
বিঘ্নান্দসারী এবং কাব্যবাজনা আমাদের এক
নতুন জগতে পৌঁছে দেবে। বলা বাহুল্য,
পাস্তেরনাকের মতো মহৎ কবির কাব্যানুবাদে
মহৎ মাধুর্য ও অপৌকিক শক্তি প্রয়োজন—
সেই মাধুর্য ও শক্তি অনুবাদিত অনেক
কবিতার উপস্থিত রয়েছে। তবে আমাদের
মতে, অনুবাদক বিষয়-বিভাজনে যে স্বাধীনতা
গ্রহণ করেছেন, তা না করলেই ভাল হোত।
ভাঙে কবির ভাবনা-সাধন প্রগতিতত্ত্ব লক্ষ্য
করা সহজতর হোত। বিষয়-বিভাজন ভালো,
কিন্তু অনেক সময় তা অসুবিধারও সৃষ্টি করে।
যা হোক, বহু আলোচিত কবি পাস্তেরনাকের
শেষ জীবনের একটি কবিতার একাংশ উদ্ধৃত
করাছি—যার সাহায্যে তাঁর মন ও মনের
সামিধাে আসা সম্ভব হবে। 'শীতের সব'
কবিতার পঙ্ক্তিগুলি আধ্যাতিকতারই ন্যায়বৃত্ত :

শীতের সব দুয়ে ময়,
কোপন স্বভাব দুইই—নতুন পুরানো :
আমাদের প্রয়োজন : অনন্তকে সুস্থির
প্রত্যয়
নিরে সে দাঁড়িয়ে থাকবে আমাদের
মাঝখানে
ক্রিসমাস বৃক্ষে মতন।

এ সময়েই লেখা—কোনো তীর অভ্যাসে
বা হঠাৎ বিদ্রোহ ঘটিয়ে পৌঁছতে পারব না
আমরা অভীশিত উল্ফুল জীবনে।' সুদূর
থেকে শেষ পর্যন্ত পাস্তেরনাকের কাব্যসাধনা
বুঝতে এই অনুবাদগ্রন্থটি পাঠ করা একান্তই
দরকার। শ্রীভরদ্বাজ ও অনুবাদের নিষ্ঠার
প্রশংসিত হবেন।

অন্বকার উপবন : অসমী বসু। নতুন লেখা,
৫৭ মহাশা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯।
দাম : দু টাকা।

বাংলা সাহিত্যের কাব্য বিভাগ একালে
এমন জাবগার এসে পৌঁছেছে যখন তুল ছন্দ
বা লম্বিত ব্যাকরণ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় না।
একবারেই যারা কাঁচা, তাদের কথা আলাদা।
অসমী বসুর কবিতার দক্ষতার স্পর্শ আছে,
মামুলি চিন্তার গাঁড় থেকে বের হবার একটা
গভীর আকৃতিও তাঁর কাব্যভাবনার অনুরাগিত।
'অন্বকার উপবন'-এ নামক কবিতাটিতেই তিনি
বলেছেন :

গোপনে গোপনে
অন্বকারে চোখ মেলে সম্মুখের অন্বকার
এই উপবনে

বিপুল রক্তের ধান
কোথাও দেখছি আমি, শব্দেবও গভীরে
তার সমুদ্রের মণি।

কাব্যগ্রন্থটিতে মোট একত্রিশটি কবিতা
সংকলিত হয়েছে—অনেক কবিতার জীবনের
ম্লান অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর যেমন বর্তমান, তেমনি
কোনো কোনো কবিতা বোমার্টিটক মনোভাবে
কল্পনাপ্রবী। তবে অধিকাংশ কবিতা পড়ে
আনন্দ পাওয়া যায়।

কিংবদন্তি : দিলীপ ভট্টাচার্য। পি ২১, সাহিত্য
পরিষদ স্ট্রীট, কলি-৬। দাম : ৩২ পয়সা।

আমাদের কথা বল হয়েছিল, 'কিংবদন্তি'
আপাতত সংকলনগ্রন্থ, তবে ভবিষ্যৎ শ্রেণীসিকের
প্রথম পদক্ষেপ।' আমরাও স্বাগত জানাই।
বিজ্ঞানচর্চা সত্যেন্দ্রনাথের অভীশা সম্বন্ধে এই
সংখ্যার আলোচনা করবে নবীন্দ্রনাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায়। কালিদাস সেনের প্রবন্ধে কোনো
নতুনকথা নেই। স্বাধীনতা গুপ্তের প্রবন্ধ
বীরগণনা কাব্য : দেশ-কাল-এ নতুন তথ্য
প্রদানের চেষ্টা লক্ষ করা গেল। মোটের উপর
প্রবন্ধটি ভালোই। 'কিংবদন্তি'র গল্প ও কবিতার
মান আরো উচ্চতর হওয়া দরকার। বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্যের কবি হিসেবে
খ্যাতিমান তবে এখানে তাদের দুর্বোধ্য মনে
হোল।



জাংবাদিক সম্মেলনে এডারেস্ট অভিবাদীদল

রাজধানী

২০শে জুন এডারেস্ট বিজয়ীরা দিল্লী ফিরে এলে সমগ্র রাজধানী তাঁদের বীরের সম্বর্ধনা জানায়। দিল্লীর অসহ্য গরম অগ্রাহ্য করে বহু সহস্র মানুষ এসেছিল পালাম বিমানঘাটিতে এঁদের অভিনন্দন জানাতে।

দশ দিনের মধ্যে পর পর চারবার বিশ্বের পর্বত পর্বতশিখর এডারেস্ট চূড়ার আরোহণ করে ভারতীয় অভিবাদী দল পর্বতারোহণে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ভারতবাসী অভিবাদীদের এই সাফল্য কতটা উল্লসিত হয়েছে, কতটা গর্ববোধ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল দিল্লীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে। দেশের সরকারও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। কাঠমাণ্ডু থেকে অভিবাদীদের দিল্লী আসার পূর্বক্ষেপে রাষ্ট্রপতি এঁদের বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছেন। অভিবাদী দলের নেতা লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার মোহন সিং কোহলি, এবং শ্রীনওয়াং গোস্বামী ও শ্রীসোনাম গিরাথসোকে রাষ্ট্রপতি পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অন্যান্যদের তিনি দিয়েছেন পদ্মশ্রী।

পর্বতারোহণে ভারতীয়দের এই প্রচেষ্টার প্রতি সরকারের এইরূপ উৎসাহ প্রদর্শন নিশ্চয়ই নতুন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

এত সম্বর্ধনার মধ্যেও অভিবাদী দল ভুলে যান নি ভারতে পর্বতারোহণ অভিযানের নেতাদের। পালাম বিমানঘাটি থেকে তাঁরা প্রথম গিয়েছেন শান্তিবনে নেহরু সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য দিতে। জওহরলাল নেহরু ভারতে পর্বতারোহণ প্রচেষ্টার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই উপলক্ষে অভিবাদী দল গরলোকগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অবদানের

কথাও প্রাথমিক সঙ্গের স্মরণ করেন। এঁদের দু'জনের চেষ্টাতেই দার্জিলিং-এ হিমালয় পর্বতারোহণ শিক্ষা কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে।

অভিবাদীরা শান্তিবন থেকে যান মেজর জন ডিয়ার্সের সমাধিক্ষেত্রে। ডিয়ার্স ছিলেন শ্রীমতীর ভারতীয় এডারেস্ট অভিবাদী দলের নেতা।

দিল্লীর সম্বর্ধনা চলবে সস্তাহখানেক ধরে। তারপর অভিবাদী দল ভারতের অন্যান্য শহরে যাবেন। নানা জায়গা থেকে তাঁদের আমন্ত্রণ এসেছে। কাশ্মীরের মন্ত্রী শ্রী এ এম তাবিক তো পালাম বিমানঘাটিতে নামবার সঙ্গে সংগেই তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কাশ্মীর শাবার জন্য।

উত্তর প্রদেশ:

উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী কোম্পানি মোটানোর জন্য শ্রীমোরারজী দেশাই-এর দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে।

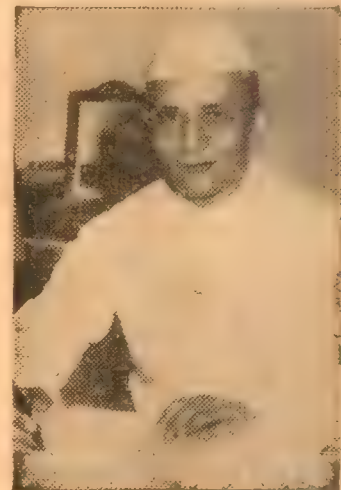
কংগ্রেস হাই কমান্ডের নিষ্পত্তি প্রতিনিধিরূপে মোরারজী ভাই লক্ষ্মী আসেন নি। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিও তিনি নন। নিজেই গরজ করে তিনি এসেছিলেন দু'পক্ষের বিবাদ মিটাতে। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয় নি। শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস সাংগঠনিক দল মোরারজীর এই দৌত্যকাৰ্যকে বিশেষ ভাল চোখে দেখে নি।

শ্রীমোরারজী দেশাই-এর দৌত্য ব্যর্থ হবার কারণ, শ্রীদেশাই নাকি শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্তের সমর্থক। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর দল তাঁকে নিরপেক্ষ

সালিশরূপে স্বীকার করতে পারে নি। এম চেয়েও বড় কথা, দুই বিবাদমান পক্ষের মধ্যে একের কোন ভিত্তিই নেই অন্য একের ধারণা।

মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিসভা-বিরোধী সাংগঠনিক দলের মধ্যে একের সূত্র হিসাবে এবার শ্রীদেশাই প্রস্তাব করেছিলেন, শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে ফিরিয়ে আনা হোক, এবং শ্রীগুপ্তের নেতৃত্বে উভয় পক্ষের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হোক।

কামরাজ পরিকল্পনায় যখন ১৯৫৩-৫৪ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে ১৯৫৩-৫৪ প্রধানত শ্রীদেশাই-এর চেষ্টা, ১৯৫৩-৫৪



শ্রীমোরারজী দেশাই

মাননীয় প্রা. মূপে শ্রীমতী সূচেতা কৃপালনিকে উৎসাহ প্রদানের মধ্যস্থতা করতে কংগ্রেস হাই কমান্ড স্বীকৃত হন। শ্রীদেশাই তখন আশা করছিলেন, দ্বিতীয় রাজনীতিতে তিনি সূচেতার সমর্থন পাবেন। কিন্তু শ্রীমতী সূচেতা শেষ পর্যন্ত শ্রীদেশাই-এর বদলে অতুল্য ঘোষ-সঞ্জীব রেন্ডারী দিকেই বেশি ঝুঁকিয়েছেন। এর ফলে মোরারজী বেশ বিরক্ত সূচেতার ওপর।

এদিকে আবার শ্রীমতী সূচেতা কৃপালনীর মদ্রাসী শ্রীগুপ্তও সূচেতা-বানারসী দাস গোষ্ঠীর প্রমথমান প্রভাবে চিন্তিত। এই অবস্থায় কংগ্রেস হাই কমান্ডের কাছ থেকে যদি মধ্যস্থতার পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান আসে, তবে শ্রীগুপ্ত খুশিই হবেন।

কিন্তু মোরারজীর এই ফরমালা কমলাপতি-আলগুদার গোষ্ঠীর সমর্থন পায় নি। তাঁরা আজ চন্দ্রভানু সূচেতা, বানারসী দাস সবাইকেই সরতে চায়।

কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ নিয়েও উভয় পক্ষের মধ্যে চরম খেয়োখোরি চলেছে। যে সব কংগ্রেসীরা, এই দু'পক্ষের কোন দিকেই নয়, তারা পড়েছে সবচেয়ে মশকিলে। তাদের



শ্রীকমলাপতি দ্বিপাঠী

পক্ষ থেকে শ্রীকমলাজের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে, তিনি শীগগির একবার উত্তর প্রদেশে আসুন-কংগ্রেসকে এ রাজ্যে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন।

মহাশূর:

গত সপ্তাহে বাগালোরে বিভিন্ন রাজ্যের ভিজিলায়ন্স কমিশনারদের এক সম্মেলন বসেছিল। সরকারী স্তরে ব্যাপকভাবে

দুনীতি দমন অভিযান শুরু এবং রাজ্যে রাজ্যে ভিজিলায়ন্স কমিশনার নিয়োগের পর এইরূপ সম্মেলন এই প্রথম।

কেন্দ্রীয় ভিজিলায়ন্স কমিশনার শ্রীনিবাস শ্রীনিবাস রাও ঠিকই বলেছেন, প্রত্যেকটি রাজ্যের ভিজিলায়ন্স কমিশন পৃথক ও স্বতন্ত্র হলেও সকলেরই সমস্যা একরূপ। সুতরাং এঁদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা একান্ত আবশ্যিক।

সম্মেলনের উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে মহাশূরের রাজ্যপাল শ্রী ভি ভি গিরি কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন। দুনীতি প্রসঙ্গ নিয়ে দেশে যেভাবে হেঁচকি করা হচ্ছে, শ্রীগিরি তার বিরোধী। তিনি মনে করেন, বতটা বলা হচ্ছে আসলে ততটা দুনীতি দেশে নেই। সরকারের সর্বস্তরে দুনীতি, রাতদিন যদি এ কথা বলা হয় তবে সং অফিসাররাও দুনীতিপরায়ণ হয়ে পড়বেন। শ্রীগিরির এই অভিমতের সঙ্গ হয়তো অধিকাংশই একমত হবেন না, তবু শ্রীগিরির ন্যায় সম্মানিত ও প্রবীণ দেশনেতার মতকে উড়িয়ে দেয়াও যায় না। তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই নিশ্চয়ই এই কথা বলেছেন।

শ্রীগিরি আরও একটি কথা বলেছেন, যা অনেককেই চিন্তিত করে তুলবে। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্মসীমা বৃদ্ধির জন্যই দুনীতিতে ঝেঁড়ে। এ যে প্রায় স্বতন্ত্র পার্টির মত কথা! পুরোনো প্রমিক-নেতা শ্রীগিরির মুখ থেকে এমন কথা বের হবে, এ কেউ ভাবতে পারে নি।

আসল কথা হল, সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসারে নতুন নতুন শিল্প ও ব্যবসা সম্প্রসারণ করলেই হয় না, নতুন সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হয়। এই মূল্যবোধের অভাবেই আজ দুনীতির প্রসার ঘটছে।

শ্রীনিবাস রাও ভিজিলায়ন্স কমিশনারদের কাজের বিভিন্ন অসুবিধা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, অসাধু মন্ত্রী ও আইনসভা সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবন করতে না পারলে দুনীতি দমন অভিযান ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ভিজিলায়ন্স কমিশনারদের এই প্রথম সম্মেলনে মোটামুটি একটা হতাশার ভাবই দেখা গেল। যেভাবে ভিজিলায়ন্স কমিশনার নিয়োগ করা হয়, এবং যেভাবে তাঁদের কাজ করতে হয়, তাতে শাসন বিভাগ থেকে স্বাভাবিক রক্ষা করা শক্ত। অথচ, শাসনবিভাগের লোকদের বিরুদ্ধেই তাঁদের প্রধানত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

কেরল:

ভারতের মধ্যে কেরলে একরূপ প্রতিকূল ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। সেজুও, এই রাজ্য খাদ্যে ঘাটতি। মোট প্রয়োজনের অর্ধেকও এখন

উৎপন্ন হয় না। তাই কেরলকে নিভর করতে হয় বাইরের আমদানীর ওপর।

গত বঙ্গবন্ধুর শেষ দিকে সরকার প্রায় পূর্ণাঙ্গ রেশনিং চালু করেন সমগ্র রাজ্যে। রেশনিং ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক দিনে ৬ আউন্স চাল ও ৬ আউন্স গম পাবে। স্বাভাবিকভাবেই এই সামান্য চাল ও গমে কারও চলে না। সবাইকেই খোলাবাজার থেকে কিনতে হয়। আর খোলা বাজারে দাম যিগুপেরও বেশি।

তাই আজ রাজ্যের সকল রাজনৈতিক দল দাবি তুলেছে, অবিলম্বে চালের পরিমাণ ৬ আউন্স থেকে বাড়িয়ে ৮ আউন্স করা হোক। এই দাবির ভিত্তিতে সকল বামপন্থী দলের সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দুই কমিউনিষ্ট পার্টিই একমত হয়েছে। কংগ্রেসও পিছিয়ে নেই। কুইলনে সম্প্রতি কংগ্রেসের সভার বলা হয়েছে, অবিলম্বে চালের পরিমাণ না বাড়ালে রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দেবে।

কেরলের রাজ্যপাল শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বলেছেন, কেরলের খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য শীগগিরই কিছু করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন। অন্তত প্রধান



শ্রী ভি ভি গিরি

মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী রাজ্যের চাল ও গমের বরাহ্য কমিটী দিয়া হবে বলে যে আশংকার কথা প্রকাশ করেছেন, কেরলের ক্ষেত্রে এই বরাহ্য হাস হবে না বলেই শ্রীজৈন বিশ্বাস করেন।

কেরলের খাদ্য পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঝোঁষ এখানে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গের রাজ্যপাল ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের বিস্মৃত আলোচনা হয়েছে।

কেবল চালের পরিমাণই নয়, কেরলবাসীর

অপরিসীম দারিদ্র্য সংকটকে পত্নীরত্ন করেছে। অধিকাংশ মনুষ্যের হাতে আত্ম খাদ্য ভরনের পরসা নেই।

আলাপ:

এক সপ্তাহ ধরে পটালকর কমিশন বিভিন্ন দলের মতামত গ্রহণ করে ফিরে গেছেন। জুলাই মাসে এসে কমিশন সরেজমিনে জরিপ করে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চেষ্টা করবেন।

এ রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে নেহরু-পরিকল্পনার অনুযায়ী স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থাপনার বিষয়াদি বিচার-বিশ্লেষণ করে সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য গঠন করা হয়েছে পটালকর কমিশন। আসামের বর্তমান সামগ্রিক স্বরূপটিকে বাঁচিয়ে রেখে পার্বত্য জেলায় সর্বাধিক স্বায়ত্ত শাসনের সুপারিশ কমিশনের করার কথা।

কমিশন শিলং এবং খাসি-জয়ন্তিয়া জেলার একটি মহকুমা ছাড়া কোথাও ঘান নি। গোঁহাটীতে বসে রাজনৈতিক দল-গুলোর মতামত গ্রহণ করেছেন। জুলাই মাসে সকল পার্বত্য এলাকা সফরের কর্মসূচী কমিশনের আছে।

বিচিত্র এ দেশ! কাজেই পার্বত্য এলাকার ভাগ্য নিয়ে মতের বৈধম্য হতে বাধ্য। স্মারকলিপি যে কটি কমিশনের হাতে এসেছে তার প্রত্যেকটিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মত ও দাবি।

সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলন এবং আসাম সরকারের স্মারকলিপিতে মিলের চাইতে গরমিল বেশি। নেহরু-পরিকল্পনা স্বীকার করে নিয়েও দু'জন দু'রকম ব্যক্তির অবতারণা করেছেন। পরিকল্পনার রূপকার পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নিজে বা কিছু বলেছেন পরিকল্পনা রচনাকালে তা নিয়েই মতভেদ চলেছে এখন।

স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্য গঠনের পাল্টা পরিকল্পনাই দিয়ে গেছেন পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহরু। এ নিয়ে তিনি দফায় দফায় নেতাদের সঙ্গে আলোচনাও করে গেছেন এবং কয়েকটি চিঠিও তিনি পার্বত্য অঞ্চলের নেতাদের এ বিষয়ে তখন লিখে-ছিলেন। পটালকর কমিশনকে সে-সব তথ্যও সরবরাহ করা হয়েছে।

সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলন স্বতন্ত্র-রাজ্যের দাবিটা একেবারে ত্যাগ না করলেও নেহরু-পরিকল্পনাকে পরীক্ষামূলকভাবে মেনে নিতে তখন সম্মত হয়েছিলেন। পটালকর কমিশনের কাছেও তারা একেই সমস্যা সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে স্বীকার করেছেন। আসামের ঐক্যের প্রয়োজনও তাঁরা অপর সকলের মতই মেনে নিচ্ছেন। এক রাজ্যপালই থাকবে। আইনসভাও হবে

একটি। হাইকোর্টের এভিয়ারও থাকবে। কিন্তু পার্বত্য এলাকার স্বার্থের ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক কমিটীকে উপেক্ষা করে কোন সিদ্ধান্ত সরকার নিতে পারবেন না। তাঁদের মতে প্রশাসনিক কাঠামো এবং তার সংগঠনগুলো ঠিক রেখেও পূর্ণ 'অটোনমি' প্রদানের কথাই গ্রীনেহরু বলেছিলেন। সংগঠনের কোন পরিবর্তন না করে প্রশাসনিক স্বাধিকারের দাবি তাঁরা পেশ করেছেন কমিশনের কাছে।

মন্ত্রিসভার বোঁধ দায়িত্বও তাঁরা অস্বীকার করছেন না। কিন্তু মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে মত নিতে হবে পার্বত্য এলাকার নেতাদের। মুখ্যমন্ত্রী খুশিমাফিক কাজ করতে পারবেন না—পার্বত্য অঞ্চল থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্যদের অভিমত তাঁকে মেনে নিতে হবে। ছ ছাড়া, ভৌগোলিক আয়তনের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবি তাঁরা তুলেছেন। মোট কথা, পাহাড়ের সঙ্গে দমতল এলাকার একটা কীর্ষি বোগসুত্র রক্ষা

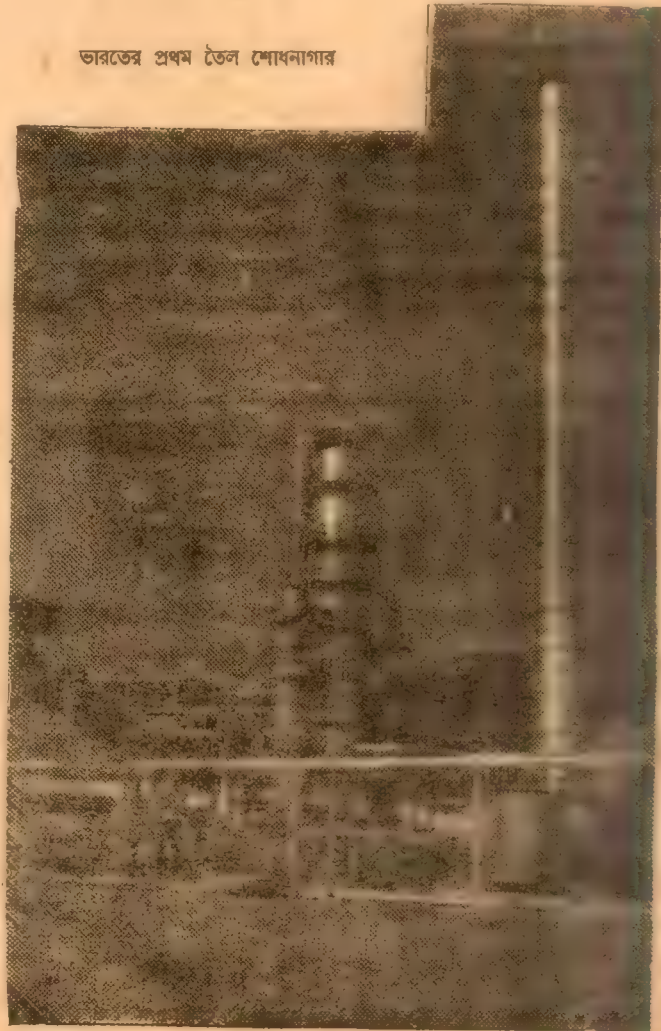
করে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কাজের প্রসংগই সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলন তুলেছেন

আসাম সরকার অতটা ছেড়ে দিতে নারাজ। সরকার মন্ত্রিসভার বোঁধ দায়িত্ব ছাড়াও মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী সাংবিধানিক অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন। পার্বত্য এলাকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই করবেন কিন্তু তাঁদের পরামর্শ গ্রহণেই বাধ্যবাধকতা সরকার মেনে নিতে চাইছেন না।

সরকার সকল ব্যাপারেই পার্বত্য জেলা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করতে সম্মত আছেন। নেতাদের পরামর্শ গ্রহণেও কোন আপত্তি নেই: —তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেই রাজ্যের বাজেটও প্রণয়ন করা হবে। কিন্তু জেলা পরিষদকে অডিট রিপোর্ট পেশ করতে হবে আইন সভার সামনে।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সঙ্গে সরকারের মতের মিল রয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস পার্বত্য অঞ্চলের জন্য একজন কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব

ভারতের প্রথম তেল শোধনাগার



করেছেন। কমিশনার জেলা পরিষদের কার্যাদি পরীক্ষা করবেন এবং নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

কংগ্রেস অনুমোদিত হিল পিপলস কনভেনশন সরকার ও প্রদেশ কংগ্রেসের সংগে একমত হলেও বিধান পরিষদ গঠনের দাবি উত্থাপন করেছেন। আসামে এখন বিধানসভা নেই। এ ছাড়া, প্রতি জেলা থেকে অন্তত একজন প্রতিনিধি প্রেরণের দাবি তারা করেছেন।

পটেশ্বর কমিশনকে তার এস্তিমারের মধ্যে থেকেই বিভিন্ন মতের মধ্য পথ খুঁজে বের করতে হবে। এবং সেইটাই হবে কমিশনের আসল সুপারিশ।

এদিকে মিজোরা নীরব। তাদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কমিশন সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করলে এবং সে পথে সরকার পার্বত্যভূমিকে টেলে সাঙ্কালে মিজোরা হয়তো শেষ পর্যন্ত আর কোন আপত্তি তুলবে না। জেলা পরিষদের হাতে ক্ষমতা থাকবে অনেকখানি কাজেই জেলা পরিষদের কর্তৃক মিজোরা নিশ্চয়ই হারাতে চাইবে না।

কমিউনিস্ট, আর-সি-পি-আই, এস-এস-পি ও পি-এস পি-র প্রাধান্য পাহাড়ের মানুষের মধ্যে খুবই কম। এসব দলের স্মারক-লিপিতে প্রশাসনিক খুঁটিনাটির প্রশ্ন নেই। কমিউনিস্ট পার্টি রাজ্য পর্ষায়ে ক্ষমতা অর্জনের হ্রাস করে জেলা অথবা আঞ্চলিক পরিষদকে ঢালাও অধিকার দেবার প্রস্তাব করেছেন। পার্বত্য-ভূমির একক রূপটোও এ দলের কল্পনার মাইরে। প্রতিটি জেলার আর্থিক সংস্থান, ভাষা, সংস্কৃতি, আচার ও আচরণের বৈশিষ্ট্য রক্ষা প্রত্যেককে আলাদা করে দেখার জটিল প্রশ্ন এরা তুলেছেন।

প্রগতিপন্থী অপর বাম পন্থের রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সংগে প্রায় একমত বলা যেতে পারে। কেউ কেউ আবার জেলা পরিষদকে কংগ্রেসের মত অতটা ক্ষমতা দেওয়ার বিরোধী। তারা একা ও সংহতির মামুলী কথাটাই বেশি করে বলেছেন।

সকলে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ না করলে একা টিকে থাকতে পারে না—এই কথাটি মেনে নিয়ে বিভিন্ন দল আরও কাছে আসতে পারলেই পটেশ্বর কমিশনের কাজটা হবে সহজ। পার্বত্য এলাকার নেতা থেকে সূত্র করে সকলের কাছে সাধারণ মানুষ এর বেশি কিছু চায় না।

* * *

১৯৬২ সালে স্থাপিত হয়েছিল ভারতের প্রথম সরকারী তেল শোধনাগার গোহাটিতে। গেল বছর শিলিগুড়ি পর্যন্ত আড়াই শ' পাইপ লাইন পন্থনের পর অল্প ব্যয়ে ও কম দামে শোধনাগারের সামগ্রী চালনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ভারতের তেল-শিল্পে সেদিন নতুন ইতিহাসের পাতা হলেছে। শোধনাগার তার শোধন-ক্ষমতার সাক্ষ্য এর মধ্যেই দিয়েছে—সাত লক্ষ টন তেল শোধনের ক্ষমতা অর্জন করেছে। এগার লক্ষ টন তেল শোধনের ভাবনা এখন কর্তাদের মাথায় এসেছে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই কাজ চলেছে।

শিক্ষানবীশদের শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গোহাটী শোধনাগারের শ্রীবৃন্দে পেট্রোল ও গ্যাস সুলভ হলেই তা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারবে। কর্তব্যবৃন্দের সৈদিকে যেন লক্ষ্য থাকে।

গুজরাট:

খাদ্যের দিক থেকে গুজরাট ঘাটতি অণ্ডল হওয়া সত্ত্বেও, খাদ্যের অবস্থা এখানে মোটামুটি ভাল।

সংকটের কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করার অবস্থা খারাপ হতে পারে নি।

সরকার মিল থেকে শতকরা ৬০ ভাগ চাল লেভী করেছেন, এবং এই চাল ন্যায্য মূল্যের দোকান ও সমবায় বিপণির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহ করা এই চালের অভাব হয় নি বলে খোলাবাজারেও চালের দাম বাড়তে পারে নি।

মূল্যবৃদ্ধি না হলেও, রাজ্য সরকার আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব গ্রহণ করেন নি। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী ডি সি শিবদেবী দিল্লী ছুটেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করতে রাজ্য থেকে অন্যান্য খাদ্য রপ্তানী বন্ধের নিয়ন্ত্রণ আদেশ যেন অব্যাহত থাকে।

* * *

রাজ্যের কংগ্রেসী কৌন্দল আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মহম্মদাবাদে রাজ্য কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সরকারী দল বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করেন, তারই জের টানা হচ্ছে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবরাজ মেহতাকে বৃটেনে হাই কমিশনার করে নিবাসন দিয়েও উপদলীয় কলহের নিপাত্ত করা যায় নি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমলবন্তরায় মেহতা ও প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান শ্রীহিড়বনদাস প্যাটেলের নৈকট্যে পরিচালিত সরকারী দলের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন প্রাক্তন দুজন মন্ত্রী শ্রীরসিকলাল পারেশ ও শ্রীরত্নতানী আদানীর গোষ্ঠী। সরকারী দলের আসল নেতা

বিশ্ব-সাহিত্যে বঙ্গমতীর অমর অবদান

শ্রী অরবিন্দের

ANANDAMATH

কবি বাকিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর হংরাজী ভবুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বসূরী।
- আনন্দমঠে—‘বঙ্গমাতার মন্দির’ গল্পের পুত্র-প্রকাশ।
- আনন্দমঠে—কবি বাকিম ও কবি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্দিরের অর্ন্ততাত্ত্বিক সাধন

ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১০৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



শ্রীরসিকলাল পারেশ

শ্রীমোহনজী দেশাই। মোহনজীরা মনোহর
চলছে পার্শ্ব-আদানীদের শরীর লড়াই।

শ্রীমসকল পার্শ্ব মনোহর সংবাদপত্রে
প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে শ্রীমোহনজী দেশাই-এর
সমালোচনা করেছেন।

শ্রীপারেশ্বর চট্টার কারণ আছে। দ্বন্দ্বী
ধাকাকালে শ্রীপারেশ্বর দ্বন্দ্বীতির আগ্রহ গ্রহণ
করেছেন বলে পদাধিকার পক্ষ থেকে কয়েকটি
গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। একটি
অভিযোগ, শ্রীপারেশ্বর যখন সৌরভের মধ্য-
মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি সৌরভের একজন
প্রাক্তন নৃপতি বাড়ি অত্যধিক মূল্যে
সরকারের পক্ষ থেকে কিনেছিলেন। অপর
একটি অভিযোগ, ১৯৬১ সালে শ্রীপারেশ্বর
ইউরোপ থেকে প্রত্যাগমনের সময় কাস্টমসকে
ফাঁকি দিয়েছেন।

শ্রীপারেশ্বর এই দু'টি অভিযোগই অস্বী-
কার করেছেন, এবং রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের
'গ্ল্যাক্সেল' করার জন্য সরকারী উপদল এই
পথ গ্রহণ করেছে বলে তিনি পাণ্ডা অভি-
যোগ করেছেন। একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যু-
নালের সাহায্যে এই দু'টি অভিযোগের বিচার
করার জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন।

বর্তমান মন্ত্রিসভা দলের কার্যকলাপের
ফলে কংগ্রেসে গুজরাট অত্যন্ত দুর্বল ও
অপ্রিয় হয়ে পড়ছে বলে শ্রীপারেশ্বর মনে
করেন। আহমেদাবাদ কর্পোরেশনের সাম্প্র-
তিক নির্বাচনে কংগ্রেসের চরম বিপর্যয়ের
কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখনও সাবধান
না হলে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে সমগ্র
গুজরাটে আহমেদাবাদের ঘটনার পুনরাবৃত্তি
ঘটবে।

শ্রীপারেশ্বর ইতিমধ্যে দিল্লীতে গিয়ে
শ্রীকামরাজ, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীমূল-
জারিলাল নন্দের সঙ্গে গুজরাট কংগ্রেসের
অবস্থা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে
এসেছেন।

পাঞ্জাব:

সদার প্রতাপ সিং কায়েরীর মৃত্যুর পর
পাঞ্জাবের অবস্থার উন্নতি হবে বলে ঝায়া
আশা করেছিলেন, তাজা সম্পর্ক হতাল
হয়েছেন।

পাঞ্জাব কংগ্রেসের দলদলি এতটুকু
কমে নি, বরং ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে। মন্ত্রি-
সভা দলের সঙ্গে মন্ত্রিসভা-বিরোধী
সাংগঠনিক দলের অন্তর্বিরোধ আজ প্রকাশ্য
স্বভাবের রূপ গ্রহণ করেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের
সভাপতি শ্রীভগবত দয়াল শর্মা ও সাধারণ
সম্পাদক শ্রীহংসরাজ শর্মা সংবাদপত্রে বিবৃতি
দিয়ে মধ্যমন্ত্রী শ্রীরামকিশোরের বিরোধিতা
করেছেন। শ্রীরামকিশোর পাণ্ডা বিবৃতিতে
রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করেছেন।



শ্রীরামকিশোর

কংগ্রেসের হাই কমান্ড এই প্রকাশ্য বিবৃতি-
বৃক্ষে রীতিমত বিচলিত বোধ করছেন।



শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী টি
ম্যানিয়েন দু'পক্ষের কাছেই চিঠি লিখে



শ্রী টি ম্যানিয়েন

এরূপ বিবৃতি কথ করার জন্য অনুরোধ
করেছেন।

শ্রীভগবতদয়াল তাঁর বিবৃতিতে বেশ
কড়া কথা বলেছেন। তিনি বলেন, মন্ত্রি-
কিশোর মন্ত্রিসভার ওপর রাজ্যের কংগ্রেসের
কোন আস্থা নেই। হাই কমান্ডের সন্তোষ
না পেলে শ্রীরামকিশোরের পক্ষে একমন্ত্রি
মধ্যমন্ত্রী থাকা সম্ভব হবে না। কংগ্রেস
পরিষদ দলের সভা ডেকে আত্মসমালোচনা
গ্রহণের জন্য শ্রীরামকিশোরের নির্দিষ্ট প্রদেশ
কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীহংসরাজ শর্মা পাণ্ডার
উদ্বোধন করেছেন, শ্রীভগবতদয়াল এই
চালের গ্রহণ করার জন্য শ্রীরামকিশোরকে
আহ্বান জানান।

এবার ভগবতদয়াল বা হংসরাজের
বিবৃতিতে কেবলমাত্র রামকিশোরের অবস্থার
সমালোচনা আছে, মন্ত্রিসভা দলের অপর
দু'জন নেতা সদার দরবারা সিং বা শ্রীপ্রবোধ
চন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ তাঁরা করেন নি।
হঠাৎ তাঁরা এই দু'জনকে সমালোচনা থেকে
বাকি দিলেন কেন, এই নিয়ে নামানুসৃত জল্পনা-
কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। তবে কি দরবারা
সিং ও প্রবোধ চন্দ্রের দল রামকিশোরের ওপর
থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করেছে? তলে
উল্টে কি সাংগঠনিক দলের সঙ্গে এদের কোন
আঁতাত হয়েছে?

এ কথা কে না জানে, কায়েরীর অপসারণের
পরদিন থেকেই এই তিনজন নেতা—রাম-
কিশোর, দরবারা সিং, প্রবোধ চন্দ্রের মধ্যে
অন্তর্বিদ্বেষ শুরু হয়েছে। মন্ত্রিসভার কি
করে নিজেদের সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়,
এই ছিল এতদিন সকলেরই একমাত্র চেষ্টা।
শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, নতুন মন্ত্রীদের বে
তালিকা হাই কমান্ড অনুমোদন করেছেন,
তাতে রামকিশোরেরই জায়গা হয়েছে। এ
অবস্থায় দরবারা সিং ও প্রবোধ চন্দ্রের ক্রয়
হওয়া মোটেই অব্যাবহিক নয়।

নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে বাঁদের নেতা হয়েছে,
তাদের মধ্যে কারুরো উপদলের দু'জন
বিশিষ্ট নেতা—সদার দরবারা সিং ও সদার
আজমের সিং রয়েছেন। এর ফলে রাম-
কিশোর কায়েরীপন্থীদের সমর্থন পাবেন বলে
ঝায়া ভেবেছিলেন, কায়েরীপন্থীদের নির্মূল্য
প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নতুন চালের তাঁদের
সেই ধারাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।

একদিকে মন্ত্রিসভাদল বনাম কংগ্রেস
সাংগঠনিক দল, এবং অপরদিকে মন্ত্রিসভার
মধ্যে রামকিশোর, দরবারা সিং, প্রবোধ চন্দ্র
ও নতুন কায়েরীপন্থী দল, এদের মধ্যে যে
বিরোধ, কংগ্রেস হাই কমান্ড কিতাবে তার
সমাধান করেন, দেখা যাক।



আন্তর্জাতিক

নেগুইন ভ্যান থিউ-এর সঙ্গে শলা-পরামর্শরত দঃ ভিয়েতনামের নতুন প্রধানমন্ত্রী নেগুইন কাও কাই।

আলজিরিয়া:

আলজিরিয়ার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর পর দেশ ক'দিন কেটে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত দু'টি বড় প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়া যায় নি। প্রথম, বেন বেল্লাকে অপসারণ করা হল কেন? দ্বিতীয়, নতুন সরকারের রাজনৈতিক চরিত্র কি?

বেন বেল্লা অভ্যুত্থানী, তিনি শাসনের ব্যর্থতা, দেশকে তিনি অধ্যুপত্যের পথে নিয়ে গেছেন, তিনি সর্বপ্রকার আর্থিক দুর্গতির জন্য দায়ী, সমস্ত ক্ষমতা তিনি একা কক্ষগত করেছিলেন, এসব অভিযোগ বিপ্লবী পরিষদের দৃষ্টি থেকে আনা হয়েছে। এসব কোন নতুন কথা নয়। যাকেই ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা হয়, তার বিরুদ্ধেই এইরকম অভিযোগ আনা হয়।

বিপ্লবী পরিষদের প্রধান ও সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক হুয়ারি বুমেদিয়ান বেন বেল্লার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন। বেন বেল্লার ক্ষমতা দখলের তিনিই ছিলেন প্রধান সহায়ক এবং বেন বেল্লার সকল কাজের প্রতি ছিল তাঁর অকণ্ঠ সমর্থন। দু'জনের মধ্যে কখনও রাজনৈতিক মত-পার্থক্য হয়েছে বলে শোনা যায় নি। তবে বুমেদিয়ান বেন বেল্লাকে সরালেন কেন? এ সম্পর্কে নানা কথা শোনা যাচ্ছে।

যেসব পুরনো শত্রুদের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, অথবা যারা বিদেশে নির্বাসিত জীবন বাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন, বেন বেল্লা সম্প্রতি তাঁদের সম্পর্কে নরম মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের আবার ফিরিয়ে আনবার জন্য



বেন বেল্লা

চেষ্টা করেছেন। বিদ্রোহী নেতা হোসেন আইত আহমেদের মৃত্যুও শবু করা হয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ফরহাত আব্বাস ও আরও পাঁচজন নেতাকে সাহারার অন্তরীণ শিবির থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বুমেদিয়ান ও অন্যান্য সমরনায়করা বেন বেল্লার এই নরম মনোভাব বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাই তাঁরা স্বয়ং বেন বেল্লাকেই সরিয়ে দিলেন।

ইদানিং নাকি বেন বেল্লার সঙ্গে সৈন্য-বাহিনীর অফিসারদের প্রায়ই কলহ হত। আলজিরিয়ার রাজনীতিতে সৈন্যবাহিনীর প্রভাব বেন বেল্লার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল।

আর একটি সংবাদে জানা যায়, বেন বেল্লা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল আজিজ বুতেফ্লিকাকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরাবার কথা চিন্তা করছিলেন। বুতেফ্লিকা বুমেদিয়ানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই কারণেই বুমেদিয়ান বেন বেল্লার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন।

এমন সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে যে, বেন বেল্লা সোভিয়েট সমর্থক হবার জন্য চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর পরামর্শে চীন-অনুগামী বুমেদিয়ান বেন বেল্লাকে সরিয়েছেন। চৌ-এর সাম্প্রতিক আলজিরিয়া সফরের সময় নাকি বেন বেল্লা চৌ-এন-লাইকে পরিকার বলেছেন; আলজিরিয়ার আসন্ন আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে



মুহাম্মদরান

তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নকে আমন্ত্রণের পক্ষপাতী। এতেই চটে গিয়ে চো-এন-লাই সামরিক অভ্যুত্থানের চক্রান্ত করেছেন।

আসলে কেন যে বেন বেয়ার অপসারণ ও সামরিক অভ্যুত্থান হল, তা এখনও পরিষ্কার করে জানা যাচ্ছে না। নিছক ব্যক্তিগত ক্ষমতার হাশু নয়, রাজনৈতিক কারণ নিশ্চয়ই আছে এর পেছনে। ক্রমশ তা প্রকাশ পাবে।

নতুন বিপ্লবী সরকারের চরিত্রে নিয়েও মানাক্রপ মত শোনা যাচ্ছে। বুনেদিয়ান পিকিং ও নক্সোতে শিক্ষালাভ করেছেন, সুতরাং এই সরকার আরও বেশি বামপন্থী হবে এবং চীন-রপ্তা ঘেঁষা হবে। চীন যেভাবে তড়িঘড়ি মতন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাতে এমন ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আবার বিপরীত দিকে, মাকিনমহলও বেন বেয়ার অপসারণে উল্লসিত, তাঁদের ধারণা বুনেদিয়ান তাঁদের দিকেই ঝুঁকবেন। ইতালীয় কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'ইউনিটা'র নতুন সরকারকে প্রতিক্রিয়াশীল ও কমিউনিষ্ট বিরোধী বলে অভিহিত করা হয়েছে। আফ্রিকার প্রগতিশীল রাষ্ট্রনেতারা কেউ-ই বুনেদিয়ানকে স্বীকার করতে রাজী হন নি। আফ্রিকার সবচেয়ে বড় চীন-সমর্থক তানজানিয়ার রাষ্ট্রপতি নিয়েই তো রীতিমত স্কন্ধ হয়েছেন, চো-এন-লাই বুনেদিয়ানকে স্বীকার করার জন্য।

অবশ্য সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি শাব্বুল গামেল নাগের আলজিরিয়ার অভ্যুত্থানকে 'মহান বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর উপরাষ্ট্রপতিকে পাঠিয়েছেন বুনেদিয়ানের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য।

ষোট কথা, আলজিরিয়ার নতুন সরকার যে কোন দিকে ঝুঁকবে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। বুনেদিয়ান বোটারটি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও, তাঁর মত স্বর্ণপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে পুরোপুরি চীন বা সোভিয়েটের সঙ্গে থাকা সম্ভব হবে কি না বলা শক্ত। আবার একেবারে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকেও তিনি হয়তো যাবেন না। সম্ভবত নাসের-পন্থার অনুসরণই তিনি করবেন।

অবশেষে ঘোষণা করা হয়েছে, আলজিরিয়ারে আহৃত আফ্রো-এশীয় শীর্ষ সম্মেলন আপাতত বন্ধ থাকবে। আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এই আলজিরিয়ারেই পুনরায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

আলজিরিয়ার সামরিক অভ্যুত্থানের পর ভারত, যানা, কেনিয়া, জাপান প্রভৃতি দাবি জানিয়েছে, সম্মেলন আপাতত বন্ধ রাখা হোক। ২৯শে জুন সম্মেলন বন্সার কথা। মাত্র এক দিনের মধ্যে আফ্রিকা ও এশিয়ার

বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে নতুন সরকারের ক্ষমতা নৈতিক চরিত্রে কেনে স্বীকৃতির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই অবস্থার জোর করে সম্মেলনের অনুষ্ঠান করলে অবিকার্য রাষ্ট্রই অনুপস্থিত থাকবে এবং সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তা ছাড়া আলজিরিয়ার অবস্থা অশান্ত। বেন বেয়ার সমর্থকরা প্রতিদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। এর মধ্যে সম্মেলন হবে কি করে।

আলজিরিয়ার নতুন সরকার অবশ্য বলেছেন, নির্দিষ্ট দিনেই সম্মেলন হবে। এ তাদের কাছে অনেকটা বর্মান্বিত প্রশ্ন। আমন্ত্রণ জানিয়ে যদি সম্মেলন না করতে পারে তা হলে তা অনুষ্ঠানের বিষয় হবে। তাই আলজিরিয়ার মনোভাব বোঝা সহজ।

কিন্তু আশ্চর্য, চীন, পাকিস্তান ও ইন্দো-নেশিয়ার ব্যাপার। তারা জিদ ধরেছিল, সম্মেলন ২৯শেই হবে।

লওনে কমনওয়েলথ সম্মেলনে আগত আফ্রো-এশীয় প্রধানমন্ত্রীরা প্রায় সবাই একমত



আফ্রো-এশীয় শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের পর ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী ও ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সম্মেলনকক্ষ ত্যাগ করে যাচ্ছেন।

হয়ে প্রস্তাব করেছিলেন, সম্মেলন বন্ধ রাখতে হবে।

শেষ পর্যন্ত আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতাদের
৫৫তম সম্মেলন বঙ্গ রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গৃহীত
হয়েছে। ২৬শে জুন অলিম্পিয়াম ১৫টি
দেশের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সম্মেলন প্রস্ততি
অনুষ্ঠিত সভায় সম্মেলন বঙ্গ রাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ
করা হয়।

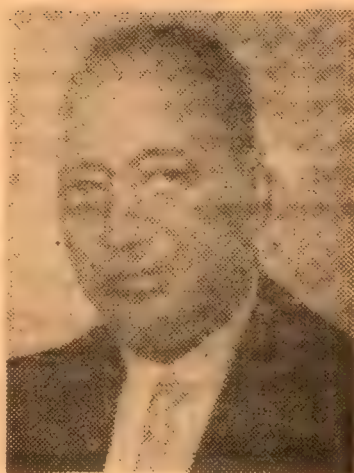
शुद्धानः

শেখ পর্বত মহম্মদ আহমেদ মজহব জ্বদানের
প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হয়েছেন। উম্মা
পাটি ও ন্যাশনাল ইউনিয়ন পাটির কোয়া-
লিশন সরকারের প্রধানরূপে এবার মজহব
জ্বদানের শাসন পরিচালনা করবেন।

বটনার অধুত বোপাযোগ। ১৯৫৮ সালে এই দু'টি দলই একত্রেটি হয়ে স্থির করেছিল তাদের কোয়ানিশন মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হবেন মহম্মদ আহমেদ বজ্জহব। কিন্তু বজ্জহবের পক্ষে সেদিন আর প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হয় নি। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রার সঙ্গে সঙ্গেই ইব্রাহিম আবুদের নেতৃত্বে স্বদানে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল। গত বৎসর সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং আইনসভার জন্য নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। নির্বাচনের পর বজ্জহবকেই করা হল প্রধানমন্ত্রী। ৭ বৎসর আগে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, তা এতদিনে কার্যকরী হল।

মজলিস উম্মা পাটিৰ সদস্য। সুদান
ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীতে উম্মা পাটিৰ সদস্য
হল ৮৫ জন, আৰু ন্যাশনাল ইউনিয়ন পাটিৰ
সদস্য সংখ্যা ৫৬। উম্মা পাটিৰ অসিল নেভা
দায়িক আল্ হাদি'ৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীৰূপেই
মজলিস প্ৰধানমন্ত্ৰী হইয়েছেন।

৫৫ বৎসর বয়স বজ্জব উনারনৈতিক চিন্তাধারার নানুষ। তিনি বীর স্বরূপ বটে। সাদিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধ ব্যাপারেই মতের মিল হওয়া শক্ত। সাদিক আরব ঐক্যের পরিবর্তে আফ্রিকার স্বাধীনতাতে মুগ্ধনিমগ্ন ছোট বন্ধনের শৃঙ্খলাভী। তিনি মনে করেন, শেষ পর্যন্ত আফ্রিকার মুগ্ধরান ও বৃষ্টিান বর্ষাবলীদেব মনো কনতার নড়াই স্বক হব। স্বতরাং আফ্রিকার মুগ্ধনিমগ্ন রাষ্ট্রগুলির মনো সংহতি পড়ে তোলা প্রয়োজন। এই কারণে তিনি আরব ঐক্য পছন্দ করেন না, নাসেরের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক রাখতে চান না। তাঁর মতে জাতীয়তা নয়, ধর্মই হবে আফ্রিকার আপাদী মনের স্বাধীনতার নিয়ামক। বজ্জব কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং নাসেরের অনুসারী। প্রধানমন্ত্রী হবার পরই তিনি বলেছেন, সংখ্যক



মহম্মদ আহমেদ মজহুব

জীবন প্রজাতিদের সঙ্গে মশার্কের উন্নতির জন্য
তিনি চেষ্টা করবেন।

বর্ষাহতার পরিবর্তে প্রগতিশীল চিন্তাধারা
অনুসরণ করে বহুদূর যদি কাঁচ করার
চেষ্টা করেন, তবে ন্যাশনাল ইউনিয়ন
পার্টির ইসরাইল আভ্যাহরি ও অন্যান্যদের
সমর্থন তিনি পাবেন এ কাজে। কিন্তু তাঁর
নিজের মনের প্রভাবশালী স্বামী বলিল ও নাপ-
মু।। তাঁকে এ পথে যেতে দেবেন কি না বলা
শক্ত।

উম্মা পাটি বন্ধপণীশ দল, দলের নেতা জনপ্রিয় সাদিক আল হাফিড অক্সফোর্ডে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ধৰ্মাচ্ছ। তবু মহম্মদের ন্যায় উদার-নৈতিক নেতাকে প্রধানমন্ত্রী করতে হয়েছে, ক্যাশনাল ইউনিয়ন পাটির ন্যায় প্রগতিশীল দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে হয়েছে।

সুদানে আজ বিগতবৃষ্ণের অঙ্ককারি অশ্বারের
অকস্মিত বটে নতুন সংস্কারের সম্ভাবনা দেখা
যাচ্ছে। অশ্বা নবজীবনের নেতৃত্বের ওপর এর
অনেকখানি নির্ভর করছে। সুদানের নতুন
বুদ্ধিজীবী ধর্মী এ ব্যাপারে নবজীবনের প্রধান
সমর্থক হবে।

দক্ষিণ কোরিয়াঃ

গত ২২শে জুন টোকিওতে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। তা ছাড়া জাপান দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নের জন্য ৮০ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য করবে বলেও এই চুক্তিতে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর কোরিয়ার
মধ্যে ছাপানের আর কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয়

নি। অর্থাৎ কাহিকিহি এই বটি দেশের মধ্যে
কূটনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্ক একান্ত আবশ্যক।
এদিক থেকে দীর্ঘদিনের একটি প্রয়োজন
মোটানো হয়েছে এই চঞ্জির দ্বারা।

কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে জাপান
ও দক্ষিণ কোরিয়া দুই দেশেই চুক্তির বিরুদ্ধে
ব্যাপক বিকোভ শুরু হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে ২২শে
জুন, চুক্তি স্বাক্ষরের দিনই কয়েক সহস্র মানুষ
বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্রসনাক এই
বিক্ষোভের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। সিওলে
বরাবরই যে কোন আলোচনায় ছাত্ররাই অগ্রণী।
বিক্ষোভকারীদের কথায়, এই চুক্তিতে কোরিয়ার
স্বাধীন রক্ষিত হয় নি। জাপানের কাছ থেকে
কোরিয়ার যা প্রাপ্ত তা আদায় না করেই এই
চুক্তি করার সরকারের বিক্ষেপে ছাত্ররা বিক্ষোভ
প্রকাশ করেছে। পরদিন সিওলের রাজপথে
এক হাজারেরও বেশি ছাত্রী বিক্ষোভে যোগ
দেয়। বিক্ষোভ এত তীব্র আকার ধারণ করে
যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের কাছে পুলিশ ছাত্রী-
দের ওপর কাঁপুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। শহরের
বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে কয়েকটি
ছোটোখাটো সংঘর্ষও হয়।

কেবল ছাত্ররাই নয়, বিরোধী প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই এই চুক্তির বিরোধিতা করেছে। ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর ৬০ জন বিরোধী সদস্য এ্যাসেম্বলী ভবনে অনশন ও অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন।

উত্তর কোরিয়া সিওলের এই বিকোঙে
 খুব খুশি, তারা বিকোঙাকারীদের অভিনন্দন
 জানিয়েছে। অপরদিকে দাকিন যুক্তরাষ্ট্র এই
 চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আনন্দ প্রকাশ করেছে,
 এবং আপানও দক্ষিণ - কোরিয়া সরকারকে
 এর জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে।

একই সঙ্গে টেকিওতে সোয়ানিষ্ট ও
কনিউনিষ্ট পার্টিগুলির নেতৃত্বে চুক্তির বিরুদ্ধে
বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। তাদের স্বাধীনতা, ক্রেন-
বার দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করার
করে উত্তর কোরিয়ার দাবিকে অগ্রাহ্য করা
হয়েছে, এবং এতে করে দুই কোরিয়ার ঐক্য
বাহিত হবে।

ବଡ଼େଇ ୫

কবনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন শেষ হয়েছে। কবনওয়েলথের ২১টি দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা সববেত হয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্ন ও নিবেদকে কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

संक्षिप्त त्वादिप्रमाणानि यथा कथनोत्तरावली



প্রায় তেড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। দক্ষিণ রোডেশিয়া আইয়ান সিাথ পরিচালিত সংখ্যা-লব্ধ শেবতাপ শাসনের প্রতি বৃটিশ সরকারের সমর্থন না থাকলেও তাদের বিকল্পে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও বৃটিশ সরকার প্রস্তুত নন। এতে এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতারা ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, আইয়ান সিাথকে এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে দেয়া হবে না, টাইলসন সরকারের এই প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট নয়। অবিলম্বে নতুন সংবিধান রচনার জন্য দক্ষিণ রোডেশিয়ায় সম্মেলন ডাকতে হবে এবং 'এক জনের এক ভোট' এই নীতির ভিত্তিতে নতুন সরকার গঠন করতে হবে। বন্দী আফ্রিকীয় নেতাদের মুক্তি দিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দেবার প্ররোচনা দিতে হবে। আইয়ান সিাথরা যদি এই সম্মেলনে আসতে রাজী না হন, তবে বৃটিশ সরকারকে বলপ্রয়োগ পর্যন্ত করতে হবে। আফ্রিকার নেতারা আরও দাবি করেছিলেন, তিন মাস বা ছ'মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে।

সময় নির্দিষ্ট করে দিতে রাজী না হলেও শেষ পর্যন্ত হ্যারল্ড উইলসন আফ্রিকীয় নেতাদের দাবি অনেকটা মেনেছেন। সম্মেলন শেষে প্রকাশিত যুক্ত উদ্ভাহারে ঘোষণা করা হয়েছে,

বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আইয়ান সিাথের বর্তমান আলোচনা ব্যর্থ হলে নতুন সংবিধান রচনার জন্য সম্মেলন ডাকা হবে এবং দক্ষিণ রোডেশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রবর্তন করা হবে। এই বক্তব্য সকলেই মেনে নিয়েছেন একমাত্র ব্যতিক্রম তানজানিয়ার নিয়েরে। তিনি প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ইস্তাহারের



আইয়ান সিাথ

সঙ্গে তিনি একমত নন। তিনি বলেন, কঠোর মনোভাব গ্রহণের পক্ষেপাত।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে শান্তি প্রত্যাপন উদ্দেশ্যে শান্তিমিশন গঠনের পদিকল্পনা বেশ দ্রুত মাঠে মারা গেল। উইলসনের নেতৃত্বে পাঁচজন কমনওয়েলথ প্রধানকে নিয়ে গঠিত শান্তিমিশন যুদ্ধ-বন্ধের উপায় উদ্ভাবনের জন্য সায়গন, হ্যানয়, মস্কো, পিকিং ও ওয়াশিংটন সফর করবে বলে যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত কমনওয়েলথের রাষ্ট্রনেতারা তা একরকম মেনে নিলেও মস্কো ও পিকিং এই মিশনকে স্বাগত জানাতে অস্বীকার করেছে। সম্ভবত হ্যানয় থেকেও একই উত্তর আসবে।

এদের বক্তব্য বৃটেন ভিয়েতনামের ব্যাপারে মার্কিন নীতির সমর্থক। এ সম্বন্ধে বৃটেনের নেতৃত্বে গঠিত শান্তিমিশন কোন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারবে না। উইলসনের পরিবর্তে ক্যানাডার লিটার প্রিয়ার্সনকে শান্তিমিশনের নেতা করার প্রস্তাবেও অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয় নি।

হ্যারল্ড উইলসন অবশ্য এখনও একেবারে আশা ছাড়েন নি। ভবিষ্যতে সুযোগ এলেই তাঁরা কাজ শুরু করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া তাঁরা যে ভিয়েতনাম

সমস্যার সমাধান চান, এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সে কথা প্রমাণ হল। বৃটেন এবং কমনওয়েলথের আরও কেউ কেউ উত্তর ডিরেংনামের মার্কিন বোমাবর্ষণ সমর্থন করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার ২০০ সৈন্য এখনও দক্ষিণ ডিরেংনামের বৃদ্ধ করছে। এই অবস্থার কমনওয়েলথের গণকে শান্তির ভূমিকা পালন করা খুবই শক্ত।

এবার কমনওয়েলথ সম্মেলনে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট স্থাপন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ক্যানাডার প্রবীণ কূটনীতিক আরনল্ড সিং কমনওয়েলথের প্রধান সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এই প্রথম কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিলেন। প্রভাবার স্বাস্থ্যের কারণে তিনি যান নি। তাঁর পরিবর্তে শ্রী টি টি কৃষ্ণাচারী ও শ্রীমতী ইশিরা গান্ধী গিয়েছিলেন। এবার প্রথম গিয়েই শ্রীশাস্ত্রী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং আলোচনার প্রভাব বিস্তার করেছেন।

দক্ষিণ ডিরেংনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও

রোডেশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রবর্তন ছাড়াও চীনের শান্তি-বিরোধী নীতির প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

দক্ষিণ ডিরেংনামঃ

রোমান ক্যাথলিকদের চাপে শেষ পর্যন্ত ডাঃ কান হুয়া কুয়াডকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে হল। তিনি পদত্যাগ করে সামরিক অফিসারদের আশ্রয় করেছেন দেশের শাসনভার গ্রহণ করার জন্য।

প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নেদার জেনারেল নেওইন তান খিট-এর নেতৃত্বে ১০ জন সামরিক অফিসারকে নিয়ে গঠিত একটি 'ডিরেক্টরি' বা 'ন্যাশনাল লিডারশিপ কমিটি' দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

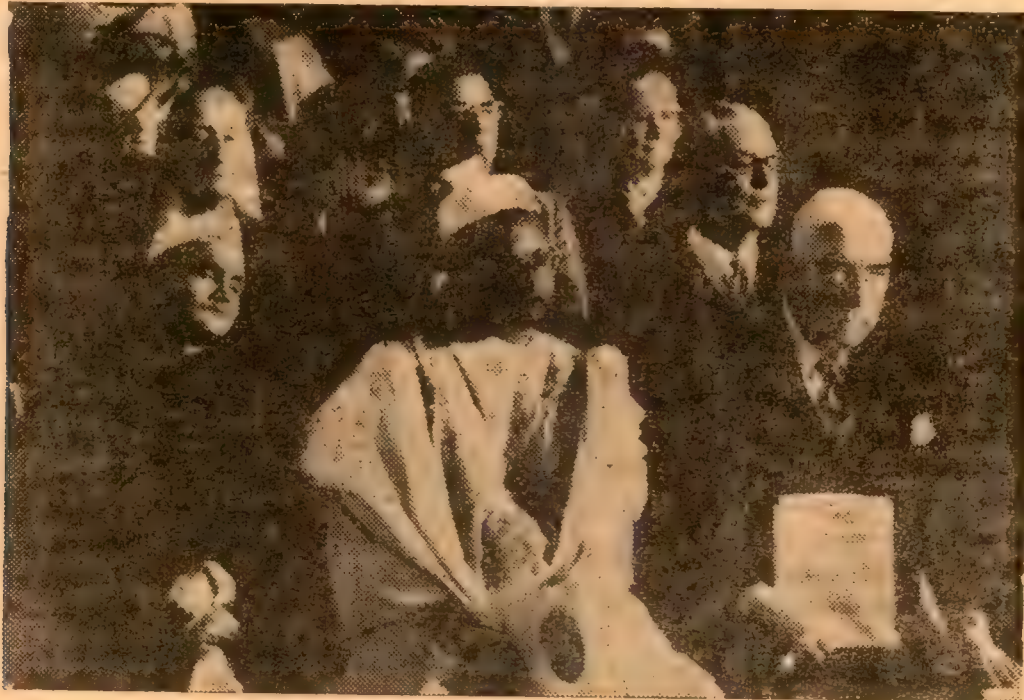
এই নিয়ে দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে দেশবার সরকার পরিবর্তন হল। কান হুয়া কুয়াডের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেওঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের আশা পূর্ণ হয় নি। অতিক্রান্ত সরকার পরিবর্তনের ঐতিহ্য ছাড়তে দক্ষিণ ডিরেংনাম রাজি নয়।

এবার দক্ষিণ ডিরেংনামের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, ৩৫ বৎসর বয়স্ক ডক্টর বৈমানিক এয়ার ডাইস বার্নাল নেওইন কাও কাই। নেওইন কাও কাই-এর মন্ত্রিসভার ১৬ জন মন্ত্রীর মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায় ও অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়েছে।

নেওইন কাও কাই প্রধানমন্ত্রী হয়েই কড়া কড়া কথা বলেছেন। চোরাবাজারীদের গুলী করে হত্যা করবেন বলে তিনি শাসিয়েছেন। যেভাবেই হোক, স্বাধীনতার দাবি তিনি কবাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। ডিরেংনামের বৃদ্ধের ব্যয় সংক্ৰান্তের জন্য ধনীদেব কাই থেকে আরও বেশি করে কর আদায় করার কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন।

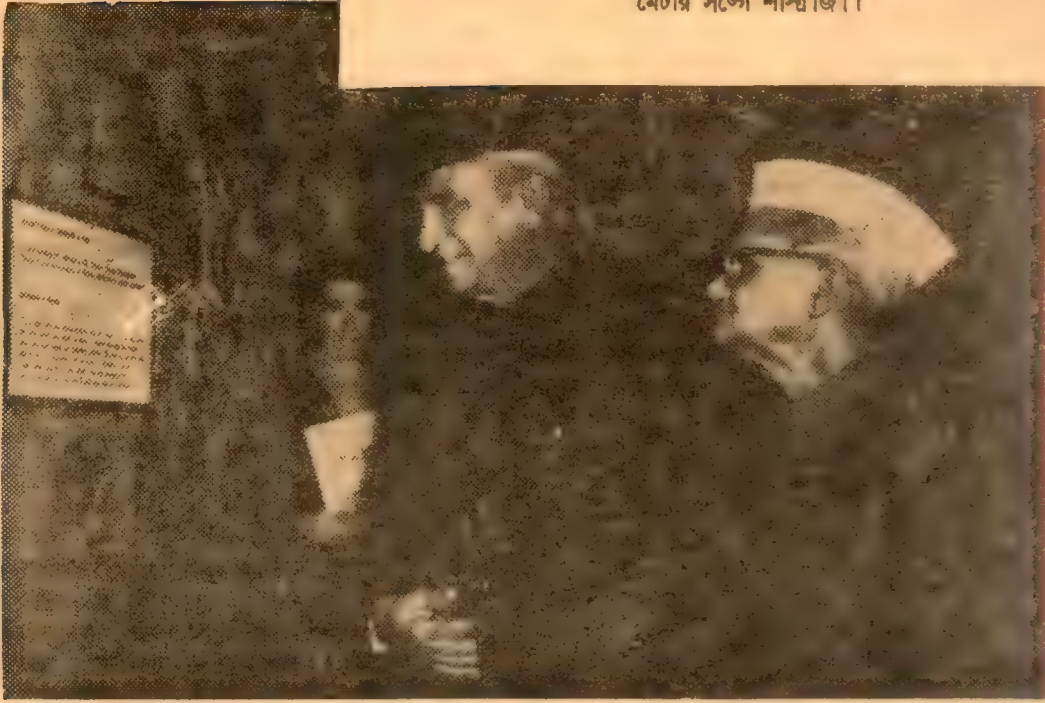
তিনি যে কোন কিছুতেই ভয় পান না সে কথা প্রমাণ করার জন্য নেওইন কাও কাই বলেছেন, দক্ষিণ ডিরেংনামের প্রধানমন্ত্রীর পদ নেয়ার অব্যবহিত হল মৃত্যুর আশঙ্কণ গ্রহণ করা। তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত নন। তিনি তাঁর জীকে বলেই রেখেছেন, 'আবার অন্য একটা কফিন কিনে রেখো।'

দক্ষিণ ডিরেংনাম রাজনীতির প্রধান দুই পক্ষ রোমান ক্যাথলিক ও বৌদ্ধ ধর্মসংঘ নতুন



বৃটিশ পার্লামেন্টের ৭০০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানকারী কমনওয়েলথের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শাস্ত্রীজী।

লন্ডনে নেহরু স্মৃতি প্রদর্শনীতে ভারতীয় হাইকমিশনার জীবরাজ
মেটার সঙ্গে শাস্ত্রীজী।



বিক্রয়ের প্রতি কি মনোভাব গ্রহণ করবে মাকিন কর্তারা কিন্তু নেওইন কাও কাই-এর গ্রহণের পক্ষে কাই-এর বয়স ৩ অভিজ্ঞতা, এখনও তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে তারা মনোনিয়নে খুশি হন নি। কাই মাকিন-বিরোধী দুই-ই খুব কম। তা ছাড়া কাই মাকিন বনই নেওইন কাও কাইকে কিছুটা সময় দেবে বলেই পরিচিত। মাকিন কর্তাদের মতে দক্ষিণ আবেগপ্রবণ। এমন লোককে দিয়ে শাসন বা নেই মনে হয়। ভিয়েতনামের মত দেশে প্রধানমন্ত্রীর পদ বৃদ্ধ, কোনটাই হয় না।



বিশ্বের বৃহত্তম যাত্রীবাহী বিমান 'এ-এন-২২'; প্যারিসের আন্তর্জাতিক বিমান প্রদর্শনীতে এই সোভিয়েট বিমানটি সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ৮০,০০০ কিলোগ্রাম ভার বহনক্ষম এই বিমান ৭২০ জন যাত্রী নিয়ে উড়তে পারে। পূর্ণ ভার নিয়ে বিমানটি না থেমে ৫,০০০ কিলোমিটার ও ৪৫ টন ভার নিয়ে একাদিক্রমে ১১ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিতে পারে।



পশ্চিম জার্মানী থেকে

‘কিরেল সস্তাহ’—একটি টিউজেনাময় নৌকা-উৎসব। এই উৎসব প্যলতোলা জাহাজ
‘উল্ডজামারস’।

যুদ্ধ থেকে সৃষ্টির পথে

বিশ বছর আগের কথা ভারতেও আজ জার্মানরা শিউরে উঠে। সাত কোটি জার্মানদের একটি মাত্র মানুষ ও তার সাকরদরা কী দুর্যোগের মধ্যেই না ঠেলে দিয়েছিল। চল্লিশ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে নিহত হয়েছে, চল্লিশ লক্ষের বেশি স্ত্রী, পুরুষ, শিশু নিরাপদ স্থানে পলায়নের সময় অথবা বিমান আক্রমণে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। দুই কোটি জার্মান গৃহহারা। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ আহত। অসংখ্য স্ত্রী স্বামীহারা, অসংখ্য শিশু সৈদীন পিতৃমাতৃহীন। যুদ্ধের শেষের দিকে শহর ও গ্রামের উপর লক্ষ লক্ষ টন আগুন বর্ষিত হয়েছে। যে সময় জার্মান পাল্লামেন্টের গৃহের নিচে নির্মিত নিরাপদ আশ্রয়ে বসে হিটলার তার উদ্ভূত পোড়ামটি

হুকুমনামা জার করছিল তখন আর জার্মানীর ছিল কি।

বিশ বছর আগে একটি নরদানব সমস্ত জার্মানীর বৃকের উপর পৃথিবীর অভিশাপ ডেকে এনেছিল। বিশ বছরের মধ্যে কি জার্মানরা সেকথা ভুলতে পারে? আজ কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর এক শ্রেণীর রাষ্ট্রনায়ক ফ্যাসিজমের

শান্তিশেখর

পরাজয়কে ‘পরাজিতের বৃকে বিজ়েতার নিষ্ঠুর পদাঘাত’ বলে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছেন। জার্মান জনগণের নৈতিক সমর্থনে মিত্রশক্তি সৈদীন ফ্যাসিজমকে পরাজিত করতে না পারলে জার্মানীর জীবনে আরো যে সর্বনাশ ঘটতো এবং সমস্ত জগতের অকল্যাণ হতো একথা পশ্চিম জার্মানীর কোন কোন রাষ্ট্রনেতা

বৃকেতে পারছেন না, অথবা ইচ্ছাকৃত ভুল বৃকাচ্ছেন। ফ্যাসিজমের পরাজয়ের পরে মিত্রশক্তি জার্মানী ভাগ করে চলে এলে ভাল হতো না, কারণ ফ্যাসিস্টরা তখন রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করতো, অথবা মিত্রশক্তির সমর্থিত সরকারকে বানচাল করে দিত। একথা তো আজকের ঘটনা দেখলেও বৃকা যায়। আজো কি ফ্যাসিস্টরা পশ্চিম জার্মানীর জনগণকে বিদ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে না?

কর্মক্ষেত্রে নারীর স্থান

যুদ্ধের পরে জার্মানী এক মহাশ্মশানের রূপ-ধারণ করেছিল। চারিদিকে ক্ষুধা, হাহাকার, শোক, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা। সৈদীন সক্ষম পুরুষ বড় একটা চোখে পড়তো না। বোমাবিধ্বস্ত জার্মানীর ধ্বংসস্থাপ অপসারণের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল নারীদের। খাদ্য উৎপাদন থেকে কলকারখানায় এলো নারীরা। তখন থেকে জার্মানীতে পুরুষ শ্রমিকের অভাব চলছে। কতৃপক্ষের মতে পশ্চিম জার্মানীতে শ্রমিকের অভাব মেটাতে ১৯৭৫ সালের পূর্বে পারা যাবে না। বর্তমানে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত নারীর সংখ্যা শতকরা ৩৫ এবং এই হিসাবে শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে পশ্চিম জার্মানীতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা সর্বাধিক।

যুদ্ধজনিত কারণে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, কৈশোরের চণ্ডল দিনগুলি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা প্রস্তুত হয় কাজের জন্য। কাজের ক্ষেত্রে এখন আর কোন তারতম্য নেই। পুরুষেরা যে কাজ করতো মেয়েরা এখন সেই কাজ করছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪ সালে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা শতকরা ৭৭ ভাগ বেড়েছে। সরকারী কর্ম-চারীদের মধ্যে একমাত্র ডাক ও রেল বিভাগ ছাড়া এক-তৃতীয়াংশ হল নারী। বস্ত্রশিল্প, খুচরো ব্যবসায়, গবেষণাগার, ওষুধের দোকান, ব্যাংক, বাঁমা কোম্পানী, স্ট্রাডেল এজেন্সীতে মেয়েরা বড় বড় পদগুলিতে কাজ করে। স্বাস্থ্য ও সমাজ-কল্যাণ বিভাগে শতকরা ৫৬.৮ ভাগ মেয়ে কর্মচারী। মেয়েরা ছাড়া পশ্চিম জার্মানীর চাষবাস প্রায় অচল। চাষের কাজে শতকরা ৫৫ ভাগ নারী কর্মী রয়েছে। সমীক্ষার জানা গেছে পশ্চিম জার্মানীর প্রতি তৃতীয় মেয়ে কোন না কোন কাজ করে।

ফ্যাসনের চেউ

মেয়েদের সামাজিক এই চিত্র দেখে মনে করলে ভুল হবে তারা সাজগোজ ভুলে গেছে। রূপচর্চা মেয়েদের সহজাত ব্যাপার। মৈসিন ঘরে বসেও একবার আয়নার মুখ দেখতে তারা ভুলে না। মধ্যাহ্নের বিরতির সময় একটু টয়লেট না করলে চলে না। নিভা নতুন পোষাকের বাহার আর তার চাহিদা মেটাতে এখানেও অন্যান্য দেশের মত গুল্মাগরদের সকাল-সন্ধ্যা নিদ্-ছুটে যায়। আজ বা ফ্যাসান কাল তা বাঙাল। স্ত্রতরা নিভা

নতুন ফ্যাসান চাই। তৈরি করতে হয় নতুন টংয়ের নতুন রং-এর পোষাক। এখানেও প্যারিস বা অন্যান্য দেশের মত ফ্যাসানপারেড হয়, সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়। এমনি একটি প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। সুন্দরীদের ভীড়ে সেখানে ঠাই পাওয়া কঠিন। নানা রঙের পোষাক-পরা মেয়েদের গায়ের সৃগন্ধিতে প্রদর্শনী কক্ষ একরকমের মাদকতামস হয়ে উঠেছিল। দেশ-বিদেশের ওস্তাদ কারিগরদের তৈরি পোষাক পরে দেখালো পনেরজন সুন্দরী। এরা ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও পশ্চিম জার্মানীর কারিগরদের সংগে মডেল হিসাবে এসেছে। কভরকমের পোষাক, কোনটা সাম্যাসজার, কোনটা অফিস কারখানার, কোনটা বাড়িতে পরায়। পশ্চিম জার্মানীর একটি রাসায়নিক কারখানায় 'ড্রেলন' নামে কৃত্রিম সূতো তৈরি হচ্ছে। তারই কাপড়ে এসব পোষাক। প্রদর্শনীতে এসব পোষাক জাহির করেছেন রোমের এসিলিও শ্বেবার্থ, প্যারিসের পিরের কার্ডিন, নিনা রিচি, পঃ বালিনের হাইজ ওয়েস্টারগার্ড, মিউনিকের বেসিরেকের সুইডেনের মারিসা। এরা সবাই ডাক সাইটে সুন্দরী।

স্বয়ংক্রিয় দোকান

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কথা আমরা জানি কিন্তু স্বয়ংক্রিয় দোকানটা যে কি জিনিষ সেটা জ্ঞাপতে পারা মুশ্কিল। পশ্চিম জার্মানীর হাইসকাদেনে একটি স্বয়ংক্রিয় দোকান বা সুপার মার্কেট হয়েছে। গ্রাহকের যাবতীয় ঈচ্ছা এখানে একটি জটিল বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় পূরণ করা হয়, আবার সেই যন্ত্রেই বিল তৈরি থেকে পরিসা আদায় করা, রেজকি ফেরৎ, রসিদ দেওয়া সবই হয়ে থাকে।

এখানে প্রত্যেকটি কেনাকাটার ধাপ ছোট একটি বৈদ্যুতিক কেনাকাটা যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। যাকে এড়িয়ে কেউ দোকানে ঢুকতে বা বার হতে পারে না। দোকানে ঢুকেই যন্ত্রেরকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের একটি ফিতে ধরে টানতে হয় ও তারপর একটি ছুঁনিদরজা পেরিয়ে জিনিষপত্র কেনাকাটা ঘরে পৌঁছাতে হয়। জিনিষ পছন্দ হলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে ফিতেটাকে ঠেলে দিলে খরিশ্বর দোকানের জানলার নিচে একটা চাবি টেপে আর সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের দাম চলে যায় ক্যাশ অফিসে। চাবিটায় আরেকবার চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের ভিতর থেকে জিনিষটা বেরিয়ে আসে ও দোকানের খলিতে বাঁধা হয়ে যায়। কেনাকাটা সেরে যন্ত্রেরকে তার হাতের ফিতেটাকে 'চিন্তাশীল' ক্যাশযন্ত্রে লাগিয়ে নগদ দামটা যন্ত্রে ফেলে দিতে হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তার রেজকি এবং রসিদ চলে আসে এবং তাঁর বেরিয়ে আসার জন্য দরজা খুলে যায়।



ছবিতে দেখা যাচ্ছে সুইডেনের ডিজাইনার কাতিয়ার তৈরি উল্লুস রং-এর আলসে বোনো ড্রেলন এইচ বি ৫৫৫ পোষাক-পরা সুন্দরী মারিসাকে।

এমন কেউ বদা থাকে যারা না জেনে দোকানের জিনিষ পকেটে ঢোকায় বা পরসা না দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাদের পকে এই দোকান থেকে বেরুনো মুশ্কিল। কারণ দরজা খুলবে না। এককম 'ভুলো মনের' লোকদের সাহায্য করার জন্য দোকানে একজন কর্মচারী আছেন।

সুপার মার্কেটে সুবিধা অনেক। কর্মচারী রাখতে হয় না বলে চম্বিশ ঘণ্টা খোলা রাখা যায়। প্রথম বসাতে মালিকের অনেক খরচ হয়, কিন্তু এই খরচ পূরণিয়ে যায়, কারণ একজন মাত্র কর্মচারী, স্বয়ংক্রিয় বন্দ দেখা-শোনার জন্য দুজন মাত্র কর্মচারী রাখলেই চলে। তবে জার্মানীর মত দেশে এরূপ যন্ত্র মার্কেট যত সুবিধার আমাদের দেশে

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীত

মূল্য : এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপকৃত রোমাস্ক উপভাস। চাপা বাঁধাই স্বেচ্ছায়।

উপহার দিবার মত বই

ডি কমুমতী এন্ড কোম্পানি লিমিটেড

১০০, বিপিনবিহারী গঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২

ভেদন হবে না। তার কারণ আমাদের দেশে বেকার-সমস্যা তীব্র—স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দোকানে অনেকগুলি গরীব লোকের চাকরী গেলে—ভাদের সমস্যার সমাধান কোথায়?

উত্তেজক ছবি দেখার বিপদ

এখানকার পুষ্টি বিশেষজ্ঞগণ সরকারের কাছে স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভাল জলখাবার সরবরাহ করার সুপারিশ করেছেন। এই ব্যাপারে তারা ফ্রাঙ্কফুর্টের নিকটে ওবের-স্টেডটেনের একটি বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের সহজপাচ্য খাদ্য জোগান হয় যাতে খনিজপদার্থ ও ভিটামিন প্রচুর থাকে কিন্তু লবণের পরিমাণ কম থাকে। এখানকার বিজ্ঞানীরা জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য দায়ী করছেন খাদ্যে পুষ্টির অভাবকে। তাঁদের মতে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন উপযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন, তেমনি খেলাধুলা ও ব্যায়ামেও উৎসাহ দেওয়া উচিত। জনসাধারণকে তারা অনুরোধ করেছেন ছেলেমেয়েরা যেন বেশি উত্তেজনাকর ফিল্ম বা টেলিভিশন না দেখে।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একরকম রোগ দেখা দিয়েছে। যাকে বলে টেলিভিশন রোগ, অর্থাৎ অতিরিক্ত ও

উত্তেজক টেলিভিশন ও ফিল্ম দেখার জন্য নানারকম ব্যাধি। খুনজখম, রাহাজানি, বৌন-প্রসঙ্গ প্রভৃতি ছবি দেখার ফলে কৈশোরেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে মৃগী, স্নায়ুদৌর্বল্য, হাঁপানি, কালকের ব্যাথা, মানসিক রোগ দেখা দিতে সুরু করেছে। অনেকের বাকশক্তি লোপ পাচ্ছে। অনেকের কম্পনশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। এমন কি কারো কারো মধ্যে জড়তার ভাব দেখা যাচ্ছে। এসব দেখেশুনে ভাবছি আমাদের দেশের কথা। আমাদের দেশে বৈ-ভাবে ক্রাইম ছবি ও ছবিতে যৌনতা বাড়ছে এবং ম্যাটিনীতে ছেলেরা দেখছে তার ফলাফল সম্পর্কে রাষ্ট্রনেতা ও অভিভাবকদের ভেবে দেখা উচিত।

নবদম্পতিকে সাহায্য

পশ্চিম জার্মানীর সরকার নবদম্পতিদের আর্থিক সাহায্যের একটা পরিকল্পনা করেছেন। ১৯৫০ সাল থেকে রাষ্ট্র নবদম্পতিদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছেন। যারা বিয়ে করবে তারা পরস্পর যত্নভাবে সৌভিৎ ব্যাঞ্চে টাকা জমাবে। ছয় বছর পরে তারা সেই টাকা তুলবে, তার সঙ্গে পাবে সুদ এবং ২০ ভাগ প্রিমিয়াম। তার উপর যত টাকা জমিয়েছিল তার ষ্টিগুণ টাকা সরকার তাদের কণ হিসাবে দেবে। সুদ খুবই কম। চার বছরের মধ্যে এই কণ শোধ করতে হয়।

তবে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেলে ছয় বছর অপেক্ষা করতে হয় না। দু-বছর পরেও কণ পাওয়া যায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে যত্নভাবে ছাড়া এককভাবেও টাকা জমাবার সুবিধা রয়েছে। তারপরে যদি পার্টনার ঠিক হয় তখন ঋণের সুবিধা দুজনে যত্নভাবে লাভ করবে।

দু-টি উৎসব

‘কিয়েল সপ্তাহ’ পশ্চিম জার্মানীর এক নামকরা উৎসব। ২০শে থেকে ২৭শে জুন এই উৎসব চলেবে। সপ্তাহভোর চলেবে বাইচ-খেলা। আর পালতোলা জাহাজের প্রদর্শনী। সব চেয়ে বড় পালতোলা জাহাজ আসবে স্পেন থেকে। দুই মাস্তুলের জাহাজ আসবে চিলি আর সুইডেন থেকে। ফ্রান্স থেকেও একটা জাহাজ আসবে। বিভিন্ন দেশ থেকে এরকম তেইশখানা জাহাজ এই উৎসবে যোগ দেবে। এই বাহিনীর মধ্যমণি হবে পশ্চিম জার্মানীর ট্রেনিং জাহাজ ‘গক’ফক’। এছাড়া থাকবে অসংখ্য পালতোলা নৌকা। এবার এই উৎসব খুব জমবে।

পশ্চিম জার্মানীর বন-এ বিথোফেন উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ই থেকে ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। এই উৎসবে বিথোফেনের অপেরা ‘ফিলেলিও’ তাঁর ‘নবম সিম্ফোনী’ এবং ‘মিসা সোলেমিনিস’ অনর্দিত হবে।



স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিগত খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। খাওয়ার ঘরের ব্যবস্থা ও সংস্থা লক্ষ্য করুন।



...ততক্ষণে পায়রাটা ধরে ফেলেছে শীতামশু। একবার মাত্র কিম ধরে উঠে মাথাটা ছেড়ে গেল। দু'হাত দিয়ে টেবিলের উপর কি যেন আঁকড়ে ধরল। প্রথমে মনে পড়ল, আজ কি শীতামশু সকালে চা খায় নি। বীণা কি আজও সেটের শিশিটা খোলা রেখে গেছে।

মাথার কিম ধরা ব্যাথাটা—ততক্ষণে সারা পরীয়ে শিরায় শিরায় জ্বালা ধরিয়ে এখন ডান হাতের পাঁচ আঙুলের মাথার এসে জ্বলছে। এক মুহূর্তের জন্য বোকা কনে গেল শীতামশু। বন্দুগার্ট হাতটা এক সমর মুখে ঠেকাল—নাক-মুখ-চোখ-ঠোঁট-খুঁতানিতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বুকল মাত্র তিনদিন আগে দাড়িকামান হয়েছিল—অথচ জ্বালাটা। হঠাৎ আনমনা হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতামশুর বসতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু ঠিক খাটের কোন পাশটার দাঁড়িয়ে আছে ঠা'র করতে না পারায়—তার ভয় হল—মাথার কিম ধরা ব্যাথাটা বস্ত্র বন্দুগাদায়ক।

ওঁকি—অত রক্ত কেন—অত রক্ত কোথা থেকে এল ওমা। বীণা চমকে ঘরে ঢুকল।

শীতামশুর একটু কিম্বা এসেছিল। ওঁ—রক্ত! কই! কোথায়—কার!

কোথায় আবার তোমার মুখে চোখে কপালে গলে।

আমার—না আমার রক্ত কোথায়—বীণা

কামলে পড়ল—এই তো এই তো তোমার হাতের—আঙুলে—ইস্ আঙুলগুলো কাটলে কি করে!

কে—আমি—না—না—জানো বীণা আমার মাথার বস্ত্র লেগেছে। দেব আমার মাথাটা যন্ত্রণা করছে—এই যে এগাশে।

বীণা এগিয়ে যায় টেবিলের দিকে—একি তুমি আমনাটা ভেঙেছ?

আমনা না তো। আমনা কোথায় পাবো?

বীণা তুমি আজ সেট দাও নি—তোমার শাড়িতে। গম্ব পাচ্ছি না যে। তোমার ও সেটটা নষ্ট হয়ে গেছে। ওটতে আর গম্ব নেই।

বীণা ফিরে এগিয়ে যায় শীতামশুর দিকে—তুমি টেবিলে গিয়েছিলে কেন—সেটের জন্য?

শীতামশু একটু অবাক হয়ে রইল। তারপর বিনীত অপরাধীর মত বলল—না আমি বাজুর কোণটা ধরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে বাই। হাতটা টেবিলে—

বীণা ধপ করে খাটে বসে পড়ল। এক মুহূর্তে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ শীতামশুর দিকে। ঠোঁট কামড়ে কি যেন কঠিন শপথ বিড়বিড় করল। বিছানার বসেই খাটের উপর বালিশ বিছানা গুটিয়ে গোছাতে বসল। শীতামশু সরে বসল জড়সড় হয়ে। বালিশের ওয়াড় পরাতে পরাতে বলল—আম্মা সত্যি কথা

বলত, তুমি কি আজকাল সন্দেহ করছ আমাকে—

শীতামশু বোকায় মত হাঁ হয়ে রইল। মুখটা বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে রইল। বাহ—কেন—হিঃ।

বীণার গলা আরও গম্ভীর হয়ে গেল।—তবে তুমি আজকাল টেবিলের ধারে যাও কেন? আমি সেট মেখেছি কিনা—সেজেছি কিনা—এই সব পরখ কর কেন?

শীতামশুর বিবর্ণ মলিন মুখ স্পির হয়েই রইল। বীণার হাত চকতেই থাকল। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। অনেকক্ষণ!

বিছানা তোলা হয়ে গেলে খাট থেকে নেমে চুলগুলো বুলে আঁট করে বেঁধে নিল। তারপর আলনা থেকে কাপড়টা টেনে নিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল সম্মুখে।

শীতামশু ফোঁস করে জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

কাপড় ছেড়ে দরজা খুলে বোরেরে গেল। একটা ছোট পান্ডার ভাঙা কাঁচের টুকরো গুলো কুড়িয়ে নিয়ে গেল। এক একটা টুকরো তুলছে টুং টুং করে শব্দ হচ্ছে। শীতামশু শূরে শূরেই কান পেতেছিল। টুকরোগুলোকে শব্দ অনুসরণ করে পুপল—বড় ছোট মিলিয়ে একত্রিশটা। একত্রিশটা টুকরো হয়েছে।

এক বই তিন করে করে একত্রিশ পদ্য

হৃদয় গুপ্তে শীতাম্বর তার গালে-মুখে-
চাঁটে-কপালে হাত বুলতে লাগল। রক্ত-
ছোপ শুকিয়ে শব্দ হয়ে আছে। হাত বুলিয়ে
বুলিয়ে এক সময় ডলতে আরম্ভ করল।
আঙুলের মাথাগুলো চিনচিন করে উঠল।
শীতাম্বর কাতর হয়ে পাশ ফিরে শূল। মাথাটা
আবার বন্ধন করে উঠল।

মেঝালের পাশে মাথাগুঁজে শীতাম্বর এক
কোঠা চোখের জল ফেলবে। কার জন্যে?
শীতাম্বর-তোমার নিজের জন্য? বাঁগার জন্যেই
কি? তোমার রক্তাক্ত ব্যথার জন্য? কাদিতে
কাদিতে শীতাম্বর বুক হালকা হয়ে এল। এ
পৃথিবীকে, নিজের ব্যর্থতাকে, বাঁগাকে স্বেচ্ছা-
জীবনের দীনতাকে সব সহনীয় মনে হল।
জন আবার গোড়ার এক থেকে সরু করে
একটিশ পর্যন্ত গুপ্তে আরম্ভ করল।
ভিরিশের কোঠা শেষ হতে না হতে শীতাম্বর
আবিষ্কার করল। বাঁগার বরস আঁক একটিল।
রক্ত আবিষ্কারও যখন কোন মূহুর্তে পুরোন
হয়ে এল। কোনও এক সন্দের কলপ তন্ময়
শীতাম্বরকে শান্তি দিয়েছিল।

বাঁগা সেই মূহুর্তে ঢুকল ঘরে। সন্ধ্যার
এক কাপ চায়ের স্বপ্ন অলসেদন নিয়ে
শীতাম্বর জানল না—আহা তখনও ভোলে নি
বাঁগার ভিজে হাতের স্পর্শ। শীতাম্বর
পরীক্ষা শিরশির করে উঠল।

মানুষের স্পর্শে কতটা ব্যথা থাকতে পারে
—তাহানিতেও—শীতাম্বর জানল না।

চায়ের কাপ শেষ হতে না হতেই ভয়
জন্ম করে ঢুকল দেবেশ। শীতাম্বর, কান-মনের
অনুভবের ভীরতায় বুকল। দেবেশ সোজা
অগ্নিস থেকেই আসছে ওর পরশে প্যাঁচসুট।
এক অত্যন্ত শব্দের দৃঢ়তা শীতাম্বরকে এক
মূহুর্তের জন্য কপট উজ্জ্বল করে তুলল।
অনেক মূহুর্তের পর গভীর গলায় ডাকল।

দেবেশ নাকি—আরে আর আর—সোজা
অগ্নিস থেকেই বাকি।

কিন্তু কেন? প্রমদাসের বা হেলিন্স
অসম্মা উঃ বোরিয়োই সেই পাঁচটার—আরে
তোমার মুখে রক্ত কেন? কি হয়েছে—পড়ে
আহিস—কেটে গেছে? কি করে?

শীতাম্বর বড় সুন্দর হাসল। আমার
হুগে রক্ত। না—আমার মুখে কটে নি। পাঁচটা
আঙুল উঁচু করে দেখাল—আমার আঙুল-
গুলো কেটে গেছে। পাঁচটা আঙুল।

হঠাৎ করে বাঁগার পায়ের শব্দ পাওয়া
গেল। প্রস্তুত হয়ে ঢুকে চায়ের কাপটা নিয়ে
জ্বরিরে যেতে—থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরে
জিজ্ঞাসা করলো—ঠাকুরপো চা খাবে?

দেবেশ উচ্চকিত হয়ে উঠল—তা খাবে
কতই; কিন্তু কি হয়েছে কল্যাণ তো—ওর?

বাঁগা আর দাঁড়াল না। দৃঢ় গভীর
স্বরকে বোরিয়ে গেল। দেবেশ খাটের উপর
শীতাম্বর কাছে এগিয়ে গেল। শীতাম্বর

গভীরভাবে ওর গায়ের গন্ধ থেকে নিশ্বাস
নিল।

শীতাম্বর কি ব্যাপার বলতো তাদের
মধ্যে?

একটা সিগারেট দে তো দেবেশ। তুই
একেবারে চিহ্নিত হয়ে রয়েছিস।

হাতটাকে কাছে টেনে একটা সিগারেট
খরিয়ে দা আঙুলের মধ্যে গুঁজে দিল।

আর এক পেরালা চা নিয়ে বাঁগা ঘরে
ঢুকল। খাটের একপাশে কাপটি রেখে বাঁগা
জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল শীতাম্বর দিকে।
শীতাম্বর গরম চায়ের ঘোঁরা গন্ধ অনুভব
করল। বাঁগার গাম্ভীর্য কল্পনা করল।
তারপর এক অসীম বিরতি আর ব্যর্থতার
বীর্ষ্যবাস ওর গলায় আটকে শীতাম্বর কাশতে
আরম্ভ করল।

আজ্ঞা বোদি—ও বেচারাকে একটু
স্বাস্থ্য করে দাও নি—রক্তট মখে—কেটে-
কুটে—

না ঠাকুরপো তুমি আর বলো না। তুমি
একটা ছোরা এনে দাও। ও আমার খুন
করুক। আমি আর চাই না।

তুই দেখ—ওই দেখ—দেবেশ বাধা দিল—
জমনি কেটে পড়লে—

না তুমি দেখ ঠাকুরপো—আমিও একটা
মানুষ। কি আশ্চর্য! ও আজকাল নাক
টেনে শোকে আমি সেট মেখেছি কিনা।
সেজোঁহ কিনা—টোঁবল হুয়ে হুয়ে পরশ
করে।

দেবেশ অবাক হল। তাই নাকি?
শীতাম্বর দিকে তাকাল।

শান-বোকার মত ফ্যাকাশে মুখে বসে
রয়েছে—

সিগারেটটা শূন্য শূন্যে আঙুল ছুয়েছে
—শীতাম্বর লক্ষ্য নেই। বোম নেই। তাত্তা-
তাত্তি সিগারেটটা ফেলে দেয়।

এই শীতাম্বর! কি ব্যাপার—এ সব
কি? হিঃ তুই তোর স্ত্রীকে সন্দেহ করিস।

তোমার জন্যে কোরা সারাদিন খেটেখুটে
ঘরে এসে আবার এত পরিশ্রম—তারপর তুই
—তুই তো একটা শিশুরও অধম—তুই কি
একটা অমানুষ। তুই না লেখাপড়া শিখেছিস।
তোমার একটা কনসেন্স নেই। হিঃ হিঃ।

শীতাম্বর অবসন্ন হয়ে শুনছিল। শুনতে
শুনতে তিনবার চমকাল।

শিশু। — অমানুষ। — কনসেন্স।

তিনটে শব্দ বিভ্রিড় করে উচ্চারণ
করলো।

কোতে আরোপে খানিক স্তম্ভ হয়ে থেকে
একপা একপা করে রাসাঘরে চলে গেল বাঁগা।

সৈনিক কানখাড়া করে থেকে—এক সময়
শীতাম্বর হাসলো—বেশ বয়োহীন দেবেশ—
শিশু—অমানুষ—বিবেক—আমি যদি শিশুই
না হব, বিবেকই যদি আমার থাকবে—তাহলে

কল দেবেশ—তুই আমার ঠকাতে পারাতিস
তুই—তুই—হ্যাঁ তুই—আমার বন্ধু।

শীতাম্বর। গভীর স্বর গলায় চোঁচিয়ে
উঠল দেবেশ।

হিঃ—এক খিকারেই ছোট করে আনল—
শীতাম্বর মুখ।

শীতাম্বর আবার শ্বাস স্তম্ভ হয়ে
বইল।

খীর কম্পিত পায়ের—বাঁগা ঘরে ঢুকল।

ঠাকুরপো তুমি চা খেলে না। দাও ওটা
মুড়িরে গেছে—কাপটা নিয়ে বোরিয়ে গেল।
কেন দুই বন্ধুর অন্তরের শিকারের বাতাস
থেকে বোরিয়ে নিশ্বাস নিল।

শীতাম্বর কোমল স্নিগ্ধ আর করুণকণ্ঠে
ডাক দিল—দেবেশ—দেবেশ কদুখ ব্যথিত মুখে
চেরেছিল—দেবেশ আমার পাঁচ আঙুলে রক্ত—
আমার হাত রক্তাক্ত—আমার গালে মুখে কপালে
রক্ত—আমি টুকরো টুকরো করে গুঁড়িয়ে
ফেললাম—দেবেশ আমার সব গেছে—আমার
অভীভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব সব গেছে—তবু
তোদের মারা হল না। আমাকে ঠকাতে।
তোরা আমাকে ঠকিয়ে গেলি—এই বারবার
দুবার। দুবারই তোরা আমাকে ঠকালি।
প্রথমবার বিশ্বাস করেছিলাম হাত পায়ের
আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয়
আমার উপর বিরূপ।

আমি একজনের অনুগ্রহ কৃপা আর
করুণার বোঁচে আছি। কিন্তু তুই জানিস
দেবেশ তা কথা ছিল না—তুই আমার বন্ধু—
আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। দেবেশ
তুই আমার গালাগাল দিয়ে যা—অথচ তুই
জানিস না থাকে সবচেয়ে বিশ্বাস করি—করতে
বাধা—তাকে আজ এই মূহুর্ত থেকে আমি
ভয় করবো—আমার পাঁচ আঙুলের রক্ত আমি
মুছবো না—মুছতে দেব না।

আমি বাঁগাকে বিশ্বাস করি—ভালবাসি
না—প্রাণ্য করি সত্যি! স্ত্রী হিসেবে সে
ত্যাগী মহিমময়ী—কিন্তু ভালবাসি না ভাল-
বাসা যায় না।

আর বল আজ থেকে—আমি ওকে ছোট
করে নেব—হীন করে আমার সমস্ত ব্যথার
বিষের কোটের পরে ওকে তিলেতিলে পিষে
মারব।

দেবেশ!—উত্তেজনার আবেগে দেবেশের
হাত ধরে ফেলেছে শীতাম্বর, রক্তাক্ত পাঁচ
আঙুলের মধ্যে। দেবেশের হাত কাঁপছিল।

দেবেশ, আমার ছেলে কই? তোরা
বললি প্রথম সন্তান নষ্ট হয় গেছে। দ্বিতীয়
সন্তান—

দেবেশ—আমার দ্বিতীয় সন্তান হয়েছিল
একটা ছেলে। দেবেশ তোমার হাত কাঁপছে
কেন? তুই ভয় পেয়েছিস। হিঃ—আমি
বাঁগাকে সন্দেহ করি নি। আমি কৃতজ্ঞ আমি
বিনীত, আমার স্ত্রী করুণাময়ী, রোজ আমার
পাশে শূন্য করে করুণা করে আমার হলনা করে

গেছেন। আমি কৃতজ্ঞ দেবেশ।—ওই চৌবেলে আমার দ্বিতীয় সন্তানের একটা ছবি ছিল সেটা নাকি খুব সুন্দর ফটোফটো ছেলের ছবি। প্রিয় সুন্দর সেটা কি পৃথিবীর মূখ কোনদিন দেখেছিল। তবে, তবে তুই বল, আমার হাতে রক্ত কেন? আমার হাত গাল মূখ—তুই দেখ রক্তাক্ত—

দেবেশ আহত, স্তম্ভ কিছটা বা বিমূঢ়।
: আমি আজ একপা একপা করে খাটের বাজ, ধরে চৌবেলের ধারে গেলিলাম। আমার বুকে বন্দগা আমার পিষে ফেলাছিল। আমার ছোট ছেলের ছবি বুকে নিয়ে পিষে আমি আদর করছিলাম। আমার মনে হল—ছবির উপরের কাঁচটা কেন? অনাবশ্যক। ওটা আমাকে আর আমার খোকর মাঝখানে আড়াল করে রেখেছি। দেবেশ সে বন্দগা তুই বুঝবি না।

আমি কাঁচটা ভেঙে ফেললাম। ভেঙে মড়োমড়ো করে ফেললাম। আমার হাত রক্তাক্ত হয়ে গেল—বন্দগার চাঁৎকার করতে গেলাম।

অথচ আমাকে একথা শুনতে হল। দেবেশ আমাকে তোরা ঠকালি। এখন শেষে আমিই নাকি আমার স্ত্রীকে সন্দেহ করি। দেবেশ হাতখানা ছাড়িয়ে বিছানাটা ছেড়ে আসতে আসতে উঠে দাঁড়াল।

খোঁচা খোঁচা চুল দাড়ির আড়ালে—শীতাংশু এক আহত পশুর মত বসে ছিল। সেদিক চেয়ে দেবেশের মায়া হতে গিরে ক্রোধে দুপা এগিয়ে দেবেশ দাঁড়িয়ে পড়ল। প্যাটের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে—দেবেশ মূখটাকে বিকৃত করল—দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল।

: শীতাংশু, তুই যা বললি—তুই বৌদির বিরুদ্ধে একটা অন্যায় অভিযোগ করছিস।

দেবেশ মনে মনে আবার আওড়াল—শিশু, অমানুষ, বিবেক। আওড়াল কিন্তু বলল না। শানিকঙ্কন চুপ করে থেকে—দুপ করে বলে উঠল—কেন?

: তুই জানিস—এ সময়ে তাদের সংসারে—আর একজন অপারতের। তাছাড়া—বৌদির দিকটাই—তুই একটু ভেবে দেখ—সারাদিন চাকরীবাকরী—এই সংসার—তুই—এরপর—

শীতাংশু, সাড়া দিল না। গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেলল। মাথাটা নীচু করে ভাবল যেন কি।

: তাহলে আমি এতদিন—
: এতদিন তোমার বোকা উঁচিৎ ছিল। তোমার একটা বিবেক—

শীতাংশু শিশুর মত সরল করুণ কণ্ঠে বলে উঠল।

: বীণা তবে, এতদিন—এতদিন আমাকে দয়া করেছিল—আমাকে বললেই হত—আমি তাহলেই সেরকম কোন সুযোগ দিতাম না।

দেবেশ স্তম্ভ হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

সরলতা আর করুণার সেই পাশবমূখ উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। অনেককণ পর্বন্ত ঘর নিস্তম্ভ। দেবেশ অবৈধ হয়ে জুতোর মাথাটা ঠুকঠুক শব্দ করতে লাগল মেঝেতে।

: আচ্ছা দেবেশ—তাহলে সেটা গেল কোথায়? যে এসেছিল—শীতাংশুর গলা জুর গম্ভীর।

দেবেশের জুতো ঠোকা বন্ধ হল। এবার ঢোক গিলে দেবেশ আর এক পা এগিয়ে গেল।

: সে আসে নি—তার আসবার আগেই—
: নষ্ট করে ফেলা হয়েছে—উন্মূখ গলার বলে উঠল শীতাংশু।

দেবেশ ধমকে গেল।
শীতাংশু ধমক দিয়ে উঠল—দুটোই—দু—দুবোরাই।

দেবেশ চমকে উঠে—জুতো ঠুকে ফেলল। হঠাৎ দরজার কাছে বনকন করে শব্দ হল।

কখন যে বীণা এসে দাঁড়িয়েছিল। হাতে ছিল গরম চায়ের কাপ। সেটা মাটিতে পড়ে গেল। দেবেশ ছুটে গেল। গরম চা সারা প্যারে ছড়িয়ে পড়েছে। বন্দগার ডুকরে উঠলো বীণা। স্তম্ভ ব্যাখিত আর ক্রান্ত হয়ে বসে রইল শীতাংশু।

বীণাকে তুলে আনল দেবেশ। খাটের এক পাশে বাসিয়ে দিল।

ভাঙা কাপড়িসের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে ফেলতে গেল।

শীতাংশু, বীণার পারে হাত রাখল। সন্তপণে আল্লাজ করে শিরশির স্পর্শে পারে হাত রাখল। বন্দগার কাতরে উঠল বীণা। মাথা নীচু করে স্ত্রীর পারে ফুঁ দিচ্ছিল শীতাংশু।

: আমার কপালে আজ আর চা নেই বৌদি। আজ অভিযাণ লেগেছে—কিন্তু—

সেই কুন্ড ব্যাখিত পরিবেশ যা শীতাংশু তার অসহায় অম্ভতা দিয়ে গড়ে তুলেছিল—তা ভেঙে দিল বীণা। এখনও সে পরশর

করে কাঁপছে। মূখ তুলে তাকাতো পারছে না। না শীতাংশুর দিকে না দেবেশের। শীতাংশু ওর স্বামী ওর পারে ফুঁ দিচ্ছে। বীণা সহ্য করতে পারছে না। অথচ প্যারিরে নেবার—এই সেবাস্পর্শ থেকে ধীরে ধীরে আসবার সম্মত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে। বন্দগার কাতরোক্তি করতেও এই মূহুর্তে বীণা লজ্জা পাচ্ছে।

অথচ শীতাংশু আর বীণার দ্বিতীরক্ণে দেবেশ কি পরপুরুষ?

দেবেশ একদম্ভে সেইদিকে চেয়ে দেখেছিল।

রক্তাক্ত মূখ—না কামানো এক মূখ চুল-দাড়ির বোঝা নিয়ে অবোধ অন্ধ শীতাংশু তিক একটা বন্য জন্তুর মত শিকারের দিকে মগ্ন ছিল। খল সর্পিণীর মত আপ্যাত অসহায় ভঙ্গীতে কশা সাপটাজিল বীণা। এই ঘরে আর এই মূহুর্তে থাকা যায় না। এই ঘর, এই এক অন্ধ আর এক বন্দ্যার যোগদান এক অরণ্যে পরিণত হয়ে গেছে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। এই বন্য পরিবেশ আর নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না।

দেবেশ একপা একপা করে দরজার দিকে এগোচ্ছিল। শীতাংশু পারের শব্দে অনুভব করল দেবেশ চলে যাচ্ছে।

ঘাড় না তুলেই বলল।
: দেবেশ—মাল্টিস—হা, আর শোন—এই কালকে আসার সময় একটা আরনা নিয়ে আসিস তো।

: আরনা? দেবেশ ধমকে গেল। কেন তোর আরনা কি হবে?

: আরনাটা আমি ভেঙে ফেলোছি দেবেশ। আমি জানতাম না। তোরা বলেছিলি ওটা আমার ছোট ছেলের কটো।

আমি ভেঙে কটোটা খুঁজিলাম।

বলেই কথা অবসমাপ্ত রেখেই হাশেরের মত ফুঁসে ফুঁসে ফুঁ দিচ্ছিল বীণার পারে শব্দের সেই জ্বলন্ত-ব-দেহ। দেবেশের ভয়ে গারের রক্ত হিম হয়ে বাজিল। ওর পা আর চলছিল না।

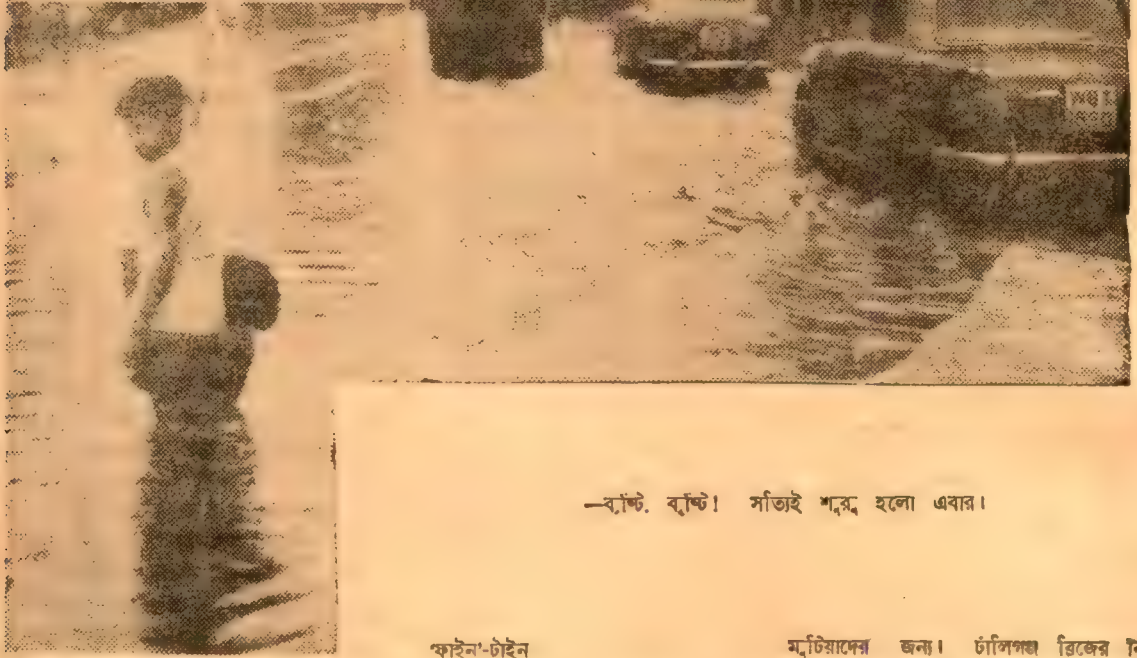
সিঁড়ির মূখে অন্ধকারে দেবেশ দাঁড়িয়ে পড়ল।

নবজাগরণ
এনোছে
নোঁ বাড্রোহর
নাটক
থিয়েটার
জনজীবনে

কল্লোল

বৃহস্পতি ও শনিবার ৬টাটায়
প্রবাস ও ছুটির দিন ৩ ও ৬টাটায়
সিনাক্ষর কোন : ৫৫৪৪৮৯

বন্দর্শন



—বৃষ্টি, বৃষ্টি! সত্যিই শুরু হলো এবার।

প্রতিধানী:

বৃষ্টি বৃষ্টি!

অসহনীয় গরমের পর কলকাতার উত্তপ্ত পিচ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি শুষে নিলে এবং আকাশে মেঘের ওড়নায় সুবাসিত চাকা পড়লে কতিপয় নাগরিকের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হয়েছিল:

—বৃষ্টি, বৃষ্টি! এই শুরু হল এবার। প্যাচ প্যাচ শহরটা ডুবল এক কোমর কাদাজলে!

—আরে রাখুন মশায় কাদাজল! আয় বাবা, বৃষ্টি আয়! পথ-ঘাট, নদ-মা-ড্রেন, শাট-ময়দান ভুবিয়ে বৃষ্টি আয়! ট্রামের লাইন, বাসের চাকা, ট্যাক্সির মডগার্ড, শাইভেট কারের পাদানি ভুবিয়ে আয়! আয়, শুরু আয়!

—বথার্থ বলেছেন স্যার!

আম বৃষ্টি কেপে

কাদা জল মেপে!

মহিষের মাথা

যেন কলকাতা

জেগে রয় জলে

হুক পেট তলে।

—ঘা বলেছেন দাদা!

হোক কাদা কাদা!

চায়ে দিয়ে আদ

শরদুই হ্যাঁজো

অফিস কাছারি? হ্যাঁ!

টাম বাস বন্ধ

মেই প্লেট বন্ধ,

‘ফাইন’-টাইন

(বা)

পাদানি আইন

বিলকুল বানচাল।

এ-ও যা

ও-ও তা

সব, সবই কপাল!

বৃষ্টির উচ্ছ্বাস শূনে হৃষ্ট মনে বাড়ি ফিরছিলাম। আমার আড়িপাতা কান হঠাৎ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। শুনলাম, গলির মোড়ে বাম করে খইনি ডলতে ডলতে কোচ-ওয়ান, গাড়ওয়ান, টেলাওয়ান এবং রিকসা-ওয়ানদের মজলিস বসেছে। কিন্তু ওদের দেশওয়ালি ভাষা উদ্ধার করা আমার পক্ষে যেমন কঠিন আপনাদের পক্ষে তার মর্যোদ্ধার তেমন শক্ত হবে। তাই তার মর্মার্থ:

—এ্যান্ডিনে আকাশ মুখ তুলে চাইল।

—এখনো মুখ তোলে নি, সবে হাই তুলছে।

—তুলুক! এ হাই দেখেই শহরের হাই সার্কেলে হিজ্জা উঠেছে।

—সাঁচ বাত! গাড়ির চাকা বন্ধ! ঠান্ডা ঘরের মেনিন বন্ধ! দামী সেমিজ-কামিজ তালো বন্ধ!

—অউর, পুলিশের ডিম্ব বন্ধ!

—কেও!

—কিডনা বড়া বড়া রাস্তা বন্ধ, আতি বিলকুল সব পানি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! বহুত মেহেরবানি!

বাস্তাবিক। ভাবলাম। সবই কপাল।

কপাল খুলল এবার ওদের। এই সংগে কিছবা মহানুভূতি অনুভব করলাম, কাকা

মুটিয়াদের জন্য। টালিগঞ্জ ব্রিজের নিচে জলমগ্ন রাস্তায় যাত্রী পারাপার করে ওরাও কিছা কামাতো, নতুন ব্রিজ খোলার সে কপাল পড়ল।

গ্যান্টো-ইনটেস্টিনাল

একটা অসুখের নাম। শহর কলকাতার এ নাম সাকুল্যে কতজন জানেন জানা নেই। তবে অল্পবিস্তর এ রোগে সবাই ভুগছেন।

রোগের কারণ শহরে দ্রুত শিল্পায়ন। এককালে পুকুর-ডোবার জল নোংরা হ’ত কিছা অশিক্ষিত অনালোকপ্রাপ্ত গ্রামবাসীর দূষিত বিছানাচাদর এ’টোকাটায়ে। ম্যাজিক ল’ঠন, সরকারী প্রচার, বেসরকারী প্রভাবে ম্যাজিকের মতো সে রোগ এখন নিরাময়ের পথে। কিন্তু আপদ এখন গ্রামছাড়া শহরাভিযান শুরু করেছে। কলকারখানার দূষিত জল পানীয় জল দূষিত করছে অনবরত। বিশেষজ্ঞগণ তাই বিশেষ বিবেচনার পর চার-দফা বয়েত সাজিয়ে দিয়েছেন:

(১) জল দূষিতকরণে যথাযথ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ চালু করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন। (২) উভয়ই এতৎ-বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠন করা। (৩) জনস্বাস্থ্য এজিনীরিয়ার শাখার উন্নয়নের দ্বারা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংখ্যাতথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা। (৪) নিয়মিত গবেষণা।

আমাদের সৌভাগ্য, এদেশে জ্ঞানী-গুণী ও বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। কিন্তু তাদের পরিশ্রমলব্ধ পরামর্শকে সর্বথা স্বেচ্ছাভাবে গ্রহণ করা হয় না।

কিন্তু বর্তমান বিষয়টির গুরুত্ব সর্বস্তরে সম্যক উপলব্ধি করার সবিশেষ প্রয়োজন।

সাপ্তাহিক বঙ্গদর্শন

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হলে ভবিষ্যতের অল্পগতি ব্যাহত করবে এই সমস্যা।

সুতরাং সাবধান। বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আমাদের এখনই সাবধান হতে হবে। শহর কলকাতায় লক্ষ লক্ষ মানুষের রোজগারি আনাগোনা। সুতরাং এ বিষয়ে লক্ষ্য না রাখলে সমগ্র বিপদের সূত্রপাত হতে পারে—যার পরিণাম ভয়াবহ।

ডাঃ বিধানচন্দ্র

কড়ি বিপদের দিনে তিনি আমাদের সংগে ছিলেন।

গৃহহারা পশুপাণ্ডারের ভাইবেলরা দৃশ্যমনের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য, মানসস্তম্ভ ধরে রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ভাসিয়ে দিয়েছে ভখন। কত অভাব কত অভিজোগ কত বিক্ষোভ কত মিছিল কত গ্রেপ্তার কত গুলী—এই সময় কড়ি-খাণ্ডার উজ্জনে-তুফানে লৌহমানব বিধানচন্দ্র অবিচলিত দৃঢ়তার স্বাস্থ্য-তরঙ্গের হাল ধরে রেখেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ স্বাস্থ্যের পল্লবচ্ছায়ার নিশ্চিত নীড়ে বসবাস করেছি আমরা। যেমন নেহরু-ভারত, সেদিন তেমন ছিল বিধান-বাংলা। নেহরু-বিধানের ভারত যেন আমাদের নাবালকে পরিণত

করেছিল। কড়ি স্বপ্নদিনের ব্যবধানে পর পর আমরা তাঁদের দুজনকেই হারালোম।

বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের ভালোমন্দের গুরুদায়িত্ব এমনই গুরুত্বের সংগে গ্রহণ করেছিলেন যে, ভাবলে অবাক হই, আজ বিধানচন্দ্র বলতে পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রীকেই বুঝি। সেই বিশ্বজোড়া খ্যাতির অলংকারে বিভূষিত ডাক্তার বি. সি. রায়ের প্রতিভা শাসক বিধানচন্দ্রের দিনালিপি দীর্ঘতবে যেন বা কিছুটা পুরাতন গরিমার ইতিহাসে পর্ববাসিত হয়েছিল। এ যেমন দুঃখের, তেমনই গর্বেরও যুগে। একই মানুষের মধ্যে দুই বিজাতীয় প্রতিভা এমন করে যুগপৎ বসবাস করতে সচরাচর দেখা যায় না।

বিধানচন্দ্রের পূণ্য জন্মদিবস এবং ডাঃ বি. সি. রায়ের পূণ্য আবির্ভাব দিবস বাংলার এক গর্বিত শূন্যদিন। এই পূণ্য দিনের স্মরণে আমরা একই আধারে দুই প্রতিভার প্রতি আমাদের সপ্রাণ প্রণতি রাখলাম।

সম্প্রদায় সংবাহ

বাংলাদেশে সম্প্রদায় নামক একটি বিচিত্র সুস্বাদু মিন্টোন প্রস্তুত হইত। ইহা রসাত কিশু রসিক ছিল না। দুঃখজাত খাঁটি ছানার প্রস্তুত (মাকে মাটি ভাতীয় ভেজালে

দ্রুত), স্বর্ণ প্রদানত পুত্র একে আশ্রয় বিচিত্র। গোলাকার, চোটা, চৌকোণা, একে আতা আল তালশাস প্রভৃতি কলবিধেয়ে আকৃতিতেও নরম ও কড়া পাকে এই মিন্টোন জিহবার পরিতৃপ্তি ও নরনের আরাধ উৎপাদনে সক্ষম ছিল। কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গে দুঃখ সংকট দেখা বাইলে দুঃখজনক উচ্চ চরিত্র উৎপাদন আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কলিকাতা শহরে কেবলমাত্র সম্প্রদায় বিক্রয় করেন, এমন বৃহৎ সম্প্রদায় কারখানা ইহার ফলে বন্ধ হইয়া যায়।

সর্বাপেক্ষা পরিত্রপের বিষয়, সম্প্রদায় বন্ধ হইল বলিয়া দুঃখের যোগান বাড়িল ভাবিয়া কণ্ঠবাসী বন্ধন শিশু-দুঃখের সংকট হইতে পরিচয় লাভ করিবেন এই মর্মে প্রজা সম্প্রদায়-কম্পনা কাঁদিয়া কণ্ঠিত দুঃখিনী ভাড়াইবার তোড়জোড় করিতেছিলেন, তখন দুঃখের (সরকারী) মূল্য বাড়িবে বলিয়া সম্প্রদায় প্রকাশিত হইলে সম্প্রদায়ই এবং লম্বা দুঃখ-বিহীন ধরে সর্বপ্রকার আনন্দ ভরসার ইতি হইল।

তোমরা, বাহারা আজ সম্প্রদায়ের স্বাদ হইতে বঞ্চিত, তোমরা শুনিয়া দুঃখিত হইবে যে, সম্প্রদায় আপনাকে শহীদ করিয়াও দুঃখের মূল্য কমাইতে পারে নাই।

(১৯৭৫-এর শিশু পাঠ হইতে উৎকলিত)

উত্তরবঙ্গ:

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

একবৃদ্ধি অভিযোগ ঘটিতে হয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে। অথচ এমনটি হইত না, যদি বিদ্যালয়ের সংগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক তফাৎকৃত কতৃপক্ষ একই তালিতে দেখতেন। যেমন-তেমন করে বিদ্যালয় ভবন খাড়া করা যায়, জনকয়েক শিক্ষক ও একজন কেরানীই একটি মফস্বলের বিদ্যালয় অনুরাসে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। কেন না ব্যাপারটা আঞ্চলিক। কাছপটের কিছুনাথক ছাত্র-ছাত্রীকে সুশিক্ষাদান, পরীক্ষা গ্রহণ ও সময় মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ—কল্য লায়িত্ব যতম। যদিচ বাংলাদেশে বিদ্যালয়ানে ভর কোন এক কুক্ষেপে সৃষ্টি হয়ে থাকবে। বিদ্যালয়ের ব্যাপারও তাই বেশ প্যাচল হয়ে উঠেছে। প্যাচের মূলে ম্যানেজিং কমিটি। দলদল, কাড়াকাড়ির ফিকে সুশিক্ষার স্বপ্ন দিব্যমানে পাখা মেলেছে। না হলে শিক্ষার সুস্ব স্বাবহাওয়া সৃষ্টি করে একটি বিদ্যালয়কে সুস্বভাবে পরিচালিত করা এমন কিছু হাতী-ঘোড়া ব্যাপার নয়। কিন্তু সে যাক, এ প্রশ্ন বারানতের আলোচ্য। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাহিনী।

শুনতেই বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গ বহরও বিরাট, অনস্বীকার্য, কিন্তু তাই কল কোনো



বিধানচন্দ্র

ক্যাপারেই এখনো বাতাবাড়ির চিহ্নমাত্র পাবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের দুই অংশে আব-
জাইলটাক ফাঁকা জমি। কিন্তু দুই অংশের
যোগাযোগের জন্য মাত্র একটি টেলিফোনের
ব্যবস্থা। কংগ্রেসার রেজিস্টারেরও ফোন নেই,
পিওন আছে। অথচ টেলিফোনের একান্ত
অভাব দুরীকরণের জন্য দুরন্ত ভাড়া কোথাও
পরিমার্জিত হয় না। অভিযোগ অধ্যাপকদেরও।
কম্পান থেকে তাদের গৃহের দুরূহ অনেক,
কিন্তু যোগাযোগের দুরূহ কমিয়ে আনার
জন্য টেলিফোন ব্যবস্থায় অব্যবস্থা অব্যাহতই
আছে।

অধ্যাপকবৃন্দও সংখ্যায় 'সিলম'। বাংলা
ও বাণিজ্য বিভাগে সাকুল্যে দু'জন মাত্র। বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের পক্ষে জনাদুই অধ্যাপক ক'জন
ছাত্রছাত্রীর মহড়া নিতে পারেন। পারেন না
পারেন ছাত্র পারাপারের গুরুদায়িত্ব তাদের
লক্ষ্যক্ষেপেই চাপিয়ে রাখা হয়েছে (অধ্যাপনা
করতে পারেন এমন কিছু তাঁর হাতের অভাব
নেই কিন্তু এদেশে)। তবুও যারা আছেন,
পালাই পালাই করছেন তারিফ। সংবাদে
প্রকাশ, কোরানিকুলের অবস্থা নাকি আরও
শোনাঁয়। এরা মাইনে পান কত'পক্ষের
খোয়ালখুশি মত। অবশ্য নেকনজরে পড়লে
(এদেশে যা হয়ে থাকে) আর 'স্কলে' নয়,
শোলা মই' মাড়িয়ে মাইনের অন্ধ স্ফীত
হয়। কত'পক্ষ জানেন, এই কারণেই কর্মরত
কোরানিকুলের কোনো আইনের স্কল বেঁধে রাখা
হয় নি কি না।

এসব খবর স্থানীয় সংবাদ সাপ্তাহিক
ইতিমধ্যে ফাঁস করে দিয়েছেন। এখন এ
বিষয়ে কত'পক্ষের নজর নড়লে হয়ত কিছুটা
দুরূহা হতে পারে।

কিন্তু তাতেই কি স্বেচ্ছা হবে? বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ব্যাপারটাই যখন বৃহৎ তখন আরও
কয়েকটা ব্যবস্থা অবিলম্বে করা না হলে
অসুবিধার সুরূহা সম্পূর্ণ হবে না।

শিলিগুড়ি থেকে যে সমস্ত কর্মচারী
এবং ছাত্রছাত্রী দু'বেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাতারা
করেন, তাঁদের জন্য যানবাহনের সুব্যবস্থা
বিশ্ববিদ্যালয়ই করতে পারেন। লোকসান
নেই। গোটা দুয়েক বাস চলু করে সুবিধা-
ভোগীদের কাছে ন্যায্য ভাড়া আদায় করলে
বিশ্ববিদ্যালয়ের অসুবিধা কোথায়! অথচ
যাত্রীদের সুবিধা। এটুকু কত'পক্ষ সহৃদয়তার
সঙ্গেই বিবেচনা করতে পারেন। ভেবে দেখতে
পারেন, পরিবারবর্গ নিয়ে যে সমুদয় কর্মচারী
ও অধ্যাপকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে
বসবাস শুরু করেছেন তাঁদের চিকিৎসার জন্য
ছোট একটি হাসপাতাল স্থাপন করা সম্ভব
হয় কিনা। এ ব্যাপারে সরকারী সাহায্য
আদায় করে হয়ত অবিলম্বে কাজ আরম্ভ হতে
পারে।

দিন দিন এ অঞ্চলে জনবসতি বাড়বে।

কিন্তু হাসপাতালের জন্য তাঁদের যদি শিলি-
গুড়ির মূখ চেয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে
সেটা দুঃখের কথা। বর্তমানে পাঁচ-ছটি
শয্যাযুক্ত নার্সিংহোম সদৃশ একটি চিকিৎসালয়
স্থাপন বহুজনহিতের প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
আশা করি কত'পক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে
আকৃষ্ট হবে।

নদীয়াঃ

ইহা কি সত্য?

সংবাদে প্রকাশ, নবম্বীপ ডেবরীপাড়ার
সাধারণের বাতারাডের পথের ওপর জনৈক
রেলকর্মী শ্রীরাধেশ্যাম পাল নাকি ইচ্ছামত
বলতবাটি নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। স্থানীয়
জনসাধারণ কমিশনারকে বিষয়টি জানিয়েও
তাঁর তরফ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পান নি।
অতঃপর পৌরকত'পক্ষের নিকট অভিযোগ
করা হলে পৌরকর্মীরা অনুসন্ধানে জানতে
পারেন, পালমশায় বহু বে-আইনী কাজকারবার
করেছেন তাঁর নতুন বাড়ি তাঁরই ব্যাপারে।
কিন্তু বে-আইনি বুক ফুলিয়ে করবেন বলেই
পালমশায় প্রস্তুত। এবং আশ্চর্য, পৌর-
কর্মীগণের অনুসন্ধান সত্ত্বেও কোনো অজ্ঞাত
কারণে পৌরকত'পক্ষও আজ পর্যন্ত পাল-
মশায়ের অবৈধ গৃহনির্মাণে এতোটুকু বিচলিত
বোধ করছেন না। অবিচলিতভাবেই পাল-

আগামী সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হবে

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

নতুন পটভূমিকায় রচিত

ধারাবাহিক উপন্যাস

'উপছাত্রা'

মশায়ের প্রাসাদ উঠছে জনসাধারণের সাধারণ
বাতারাডের রাস্তার ওপর।

পালমশায়ের প্রতাপের নেপথ্য কারণ
রহস্যবৃত্ত। চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও
আইন চোখ ফিরিয়ে আছে। এও কি সত্য?
যদি সত্যই হয়, তবে এদেশে সত্যাসত্যের
সংজ্ঞা কি নতুন করে তৈরি করতে হবে।

বর্ধমানঃ

প্রাপ্য মেডিকেল বিল তাঁর এবং গাশ
কারণে দেওয়ার জন্য পাওনা মাইনার টাকা
কেটে-নেওয়া কোন দেশী আইন জানি না,
শুনছি কালনা মহকুমার জাতীয় ম্যালেরিয়া
নির্মূল প্রকল্পের কর্মীদের মেডিকেল বিল
পেতে এইভাবেই দণ্ড দিতে হচ্ছে।

প্রকাশ, মার্চ মাসে মাইনা প্রদানের সময়
ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর এবং সার্বিকলেক্স
ওয়ার্কারদের প্রাপ্য মাইনার বরাদ্দে ১৫ ও
১৬ টাকা করে কেটে নেওয়া হয়। যারা টাকা
প্রদানে অনিচ্ছুক, রেহাই তীরাও পান নি।

এতোদিন জানতাম দেশের দুরূহ মাল্টার
মশায়রাই সত্যিন্দ্রায়ী পুরো মাসের বেতন
পান না। বহুক্ষেত্রে এ্যাকুইটালস রোলে
তাঁদের দিয়ে ষত টাকা সহি করিয়ে নেওয়া
হয়, কার্ষক্ষেত্রে প্রতিমাসেই তার একটি মোটা
অংশ স্কুল কত'পক্ষ কেটে রেখে তাঁদের
মাইনা দেন। বলা বাহুল্য, এই টাকা কে
এবং কারা নেন ও কি জন্যে নেওয়া হয় তা
অনেকেই জানেন না। প্রতিমাসে মাল্টার
মেরে হয় হেডমাস্টার নয় সেক্রেটারী না হলে
দলবল সমস্ত ম্যানেজিং কমিটী এইভাবে
অবৈধ নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করে নেন। এ
নিম্নে প্রতিবাদ হলে নানা ছুতোর চাকরি
বার-দুর্ভাগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকার। তথাপি এই
নিম্নেই বাংলাদেশের বহু কুখ্যাত স্কুলে
মাল্টার মশায়রা দিনের পর দিন মূখ বৃদ্ধি
চাকরি করে আসছেন।

কালনার ম্যালেরিয়া নির্মূলকারী কর্মীগণ
সেই জাতীয় লোডের শিকার হয়েছেন।

কলকাতার কোনো কোনো অফিসে কর্মি-
গণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভিনব রীতিতে মাইনা
কর্তন হয়ে থাকে, যদিও সেজন্য কত'পক্ষ
সরাসরি দায়ী নন। এই কাটাকুটির ধারাটা
ভিন্নরূপ।

অফিস কর্মীদের মধ্যে মাইনা বণ্টন করতে
গিয়ে দেখা গেল সহকর্মীদের কাশ শট।
এই শট ক্যাশের দায়িত্ব কত'পক্ষ নিতে বাধ্য
নন, কেন না ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে টাকা গুণে
সেকশনে সেকশনে তা বিলি হয়েছে। টাকা
এখন কর্মীদের হাতে। তাঁরাই সে টাকা
সহকর্মীগণের মধ্যে বণ্টন করতে বসে কাশ
শট করে ফেললেন। কে দায়ী?

পরের মাসে দেখা গেল, সহকর্মীদের
পুরো মাইনা থেকে স্তর অনুযায়ী মাইনা-
কর্তন শুরু হয়ে গেছে। শট কাশ মেক-
আপ হচ্ছে। প্রশ্ন করার উপায় নেই। যা
কাটবে শিরোধার্য। অর্থাৎ মাইনা বণ্টনের
বেহেতু কত'পক্ষ কোনো সুব্যবস্থা করেন নি
অতএব দণ্ড দাও। নির্বিবাদে দণ্ড আদান-
প্রদান।

আর সকলেই মাইনার বে অংশ ছাড়েন
তা হল দশ পরসার রোভিন্দ স্ট্যাম্প। সূতরাং
পুরো মাইনা কেউই পান না।

স্ট্যাম্পের ব্যাপারে বক্তব্য কিছুই নেই।
কারণ ও পয়সা সরকারীভাবে ধার্য, সরকারী
তহবিলে স্তৃপীকৃত।

কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রমলম্ব অর্থ
কর্তনের এই বিবিধ উপায় কি বন্ধ করা
যায় না?

কালনার ঘটনা তো উৎকোচ গ্রহণের ঘটনা।
ম্যালেরিয়া নির্মূল প্রকল্পের অফিসে এমন
ঘৃণের কারবার চলে কী করে?



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১. প্রিভাইট প্রবাহ

শব্দ, ইউরোপ নর।

বাঙালীর বাণিজ্য প্রসারিত ছিল আট-
লান্টিকের ওপরে আমেরিকা মহাদেশ পর্যন্ত।
বাণিজ্যের এই বিস্তৃতির মূলেও ইংরেজ
কলকারী।

A treaty of amity, commerce
and navigation was concluded
between Britain and U. S. A. at
17th Nov. 1794 of which the
following extracts—

Article XIII, His Majesty con-
sents that the vessels belonging
to the citizens of U. S. of America
shall be admitted and hospitably
received in all the seaports and
harbours of Bengal...

ইংরেজ-অধিকৃত বঙ্গের বন্দরে আমে-
রিকার পণ্যেরা জাহাজ ঘুরতে লাগল।
আর মালদহ-মুর্শিদাবাদের সিল্ক, মসলিন,
কশোরের চিনি, ঢাকার জুতার শাড়ি, নদীয়া-
করিদপুরের নীল জাহাজ বোকাই হয়ে উঠল
ও বিশাল সমুদ্রের ডেই ফেটে কেটে চলে গেল
শুধুরীর দূরতম প্রান্তে—আর এক গেলারো! ১৮০৫ সালে শব্দ, বাংলাদেশ নির্বাসিত
জিনিস বস্তানি

	(সিকা টাকায়)
ইপল বড়তল	... ৪৭,৬০,১০২
নীল	... ২,১০,৮৯০
চিনি	... ৬৯,২৬১
তুলো	... ৪৮,৫৯২
অন্যান্য দ্রব্য	... ১০,০৫১

ইংরেজ বাণিজ্য করতে এসেছিল। এসে-
ছিল সসঙ্কেতে, দূরদেশের এক দরিদ্রতম
প্রাধিকার মত। কিন্তু তাদের সংস্পর্শে এসে
বাংলার বাণিজ্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল, পুষ্টি হয়ে
উঠেছিল ধীরে ধীরে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। ঢাকা, ময়মন-
সিং, বরিশাল, এই জল-বাংলার দেশের
দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরে সবুজের অপূর্ণ
সমারোহ দেখা যেত। বতস্বর চোখ বার
নীবার ধানময়রী স্নাতনে স্নাতা সেলাতো।
প্রাচীন-ভাটের গারেই এসে পড়তো ধান পাকার
মরশুম। দূর থেকে মনে হতো, মাঠের পর
মাঠে এক ঘন সোনার স্তূপ সাজিয়ে রেখেছে।
এই যে হিরণ্যশীর ধানময়, তার আড়ালে
বহু মানুষের নিরবচ্ছিন্ন পেশীসম্মেলনের
ইতিহাস যেমন আছে, তেমনি আছে লক্ষ
লক্ষ গৃহপালিত পশুর মূক ও নীরব সহ-
যোগিতার অবদান। কিন্তু—

কিন্তু কৃষকের, গৃহস্থের মোখ, গরু
বখন মরে যেত, তখন তাদের মালিকরা গরুর
কিছুক্ষণ বকে চাপড়াতো। কিন্তু এই কর্ম-
ময় সংসারে মানব কতকণ শোকে আর মৃত্যু
নিরে বসে থাকে—ধাকতে গারে। তারা

ফুলে চিত—এমনকি তাদের সেই মরা মোখ
কি ধরুর এর মাঠের বাতলে, মনে
উঠতো। আর আমদানি রপ্যার রপ্ত শক্তির

রোমাক উপত্যকের বাজার দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—এখান জুবুহু ডিটেকটিভ
উপন্যাস, মূল্য ৩০ টাকা
৩য় ভাগে—এখান রহস্য উপন্যাস।
মূল্য ৩০।

জাতীয়-কবি মজলুম বন্দোপাধ্যায়ের

রত্নলাল-গ্রন্থাবলী

পরিচয়, প্রবন্ধাবলী, কর্মদেবী, কুমার-
সত্ত্ব, নীতিবুদ্ধি, কাকী-কাবেবী,
কবির কীর্তি। এখান একত্রে ২০০।
গ্রন্থাক্রমে তর্কপকান সম্পাদিত

নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা

(নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও
পরিচয় নিরূপণ)
মূল্য এক টাকা

বসুমতা গ্রাইভেট লিমিটেড

১৮৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১৭

কাল। তারা সাঁড়াশীর মত লম্বা ঠোট দিয়ে
ঠেকের ঠেকের মরা জন্তুর নাড়ী-ভাঁড়ি ছিঁড়ে
ছিঁড়ে খেত। তারপর একসময় অভবড়
দেহটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। শব্দ
কমাহীন সূর্যের আলোর তাদের বড় বড়
হাড় দাঁত মেলে হাসতো। তাদের হাড়,
তাদের সিং দিয়ে অনেক জিনিস তৈরি করা
হয়—তৈরি করা যায়, তা সেকালের বাঙালীরা
জানতো। কিন্তু ইংরেজদের সামিথে এসে
এই গরু-মোষের হাড় ও সিং-এর ব্যবসা বেশ
জমে উঠেছিল। ১৮০৭ সনে এই বঙ্গদেশ
থেকেই রপ্তানি হয়েছিল বাড়ি আর মোষের
হাড়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হিসেবে
লিখছে—

Buffalo and bull or ox horns
of sicca rupees, 47,63122 has
been manufactured.

৪৭,৬৩,১০২ সিকা টাকার সিং কেটে-
কুটে উৎপাদন করেছিল নানা দ্রব্য। শব্দ, মোষ-
গরুর সিং নয়। নীলের চাষও ইংরেজ-সঙ্গে খুব
চমত হয়েছিল। বাঙালীর বাণিজ্যের সমৃদ্ধি
নীলকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

নীল একরকমের রঙ। এই রঙ তৈরি
হতো ছোট ছোট গাছের পাতা থেকে।
নীলের বিজ্ঞানসম্মত নাম টিন্ডিকটোরিয়া।
তুলা ও আঁঠুর অরণ্যে জন্মাতো হাজারে
হাজারে। নীল বহু রকমের হতো। প্রকৃত

নীল, বেগুনী মেশানো নীল, ভল্লভ নীল,
ইত্যাদি। সত্যিকারের ভাল নীলের কতকগুলো
গুণ ছিল, যেমন খুব হালকা, জলে ভাসবে।
যদি জ্বলন্ত করলার ওপরে ছুঁড়ে ফেলা যায়
তা হলে নীলাভ খোঁয় চারিদিক ভরে উঠবে।

নীলের গাছ থেকে তার পাতা, তার কাণ্ড
তুলে নিয়ে রোদে শুকিয়ে মেড়ে কেকের মত
প্রস্তুত করা হতো। এই কেকগুলির রঙ
হতো ঘন নীল। তাতে এতটুকু শাদার আভাস
থাকত না।

ঠিক কবে—কোন সূত্র অতীতে যে
নীলের চাষ আর এই শিল্প শব্দ হয়েছিল
তা সঠিক কেউ বলতে পারে না। সুপ্রাচীন-
কালের গ্রন্থে পাওয়া যায়—আমাদের অতীত
পুরুরোহিণী এই রঙের অস্তিত্ব জানতেন। তাঁরা
নীলকে বলতেন ইন্ডিকাম।

প্রাচীন সমাজবিজ্ঞানী হাকলটস সাহেবের
গ্রন্থে পাওয়া যায়, ১৫৮২ সালে, তাকে তাঁর
দেশের (বেলজিয়াম) রাজা নির্দেশ দিয়েছিলেন,
ভারতবর্ষ থেকে জেনে এস—

If the Anile that coloureth,
blue be a natural commodity of
India, and if it were compounded
on herb, then please bring the
seed or root with the order of
sowing.

শব্দ নীলের বীজ কি শিকড় আনলে
চলবে না; জানতে হবে কেমন করে নীল
বুনতে হয়। কিন্তু—

সে যাই হোক! বহু সুপ্রাচীন কাল
থেকেই ইংরেজদের বাণিজ্যের প্রধান উপাদানই
ছিল নীল।

In early period, English trade
was flourished by Indigo only.

এক আগ্রা থেকেই লক্ষ লক্ষ বেল নীল
দূরদেশে রপ্তানী হয়ে যেত। প্রাচীন ইতি-
হাসকার লিখছেন,

Company's trade in Indigo
was carried on for more than a
century with considerable success.

দীর্ঘ এক শতাব্দীরও ওপরে ইংরেজদের
বাণিজ্য খুব কৃতিত্বের সঙ্গে চলছিল।

আগ্রা থেকে বাংলায় এল নীল। ইস্ট
ইন্ডিয়া কোম্পানীর পুরানো রেকর্ডে পাওয়া
যায়—

In 1799 the East India
Company entered into a contract
with an enterprising resident of
Calcutta at a very encouraging
price.

এই চুক্তির সূত্র ধরেই বাংলার নীলের
ব্যবসার প্রচলন হয়েছিল—বাংলাদেশের দিকে
দিকে নীলের চাষ শব্দ হয়েছিল। ধীরে
ধীরে বাংলার এই নীল হয়ে উঠল—

The article of Indigo now
bears a distinguished rank in the
list of Asiatic produce.

সমস্ত এশিয়া মহাদেশের ভেতর থেকে
সমুদ্রপারের দেশে যেসব দ্রব্য পণ্য হিসেবে
যায়, তার মধ্যে হলো নীল সর্বপ্রধান।

ইউরোপে বাংলার নীলের বাৎসরিক
চাহিদার পরিমাণ ছিল ওজনে ত্রিশ লক্ষ
পাউন্ড; আরও পরে ধীরে ধীরে চাঞ্জল
লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত হয়েছিল। এক বাংলা-
দেশ একাই ইংল্যান্ডের সারা বছরের চাহিদা
মেটাতে পারতো, কিন্তু বাংলার ইউরোপীয়
সওদাগররা বললেন নীল চাষীদের। বললেন—
তোমরা আরও—আরও ভাল নীল জন্মাও—
সেই নীল যেন গুণের দিক থেকে অন্য আরও
সব নীলকে ছাড়িয়ে যায়।

এমন নীল তৈরি করতে হবে যেন ইউ-
রোপের বাজারে সেই নীল সব থেকে সেরা
ও সম্ভা দরের নীল হয়। দেশের দিকে
দিকে সেই প্রস্তুতিও শব্দ হয়।

(কম্বলঃ)

মহাশ কগাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম

শিষ্টগণ নিকটে উপস্থিত হলে মহাশ কগাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া
বিলেন,—“হে শিষ্টগণ এই পুস্তকে তোমাদের নিকট ধর্মব্যাখ্যা করিব।”
মহাশর এ ব্যাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্মের বিভিন্ন দিক, কার্যকাণ্ড,
দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ,
জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশাত্মান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃসূত্র, মুক্তি, জন্মান্তর,
ভ্রম ও প্রমাদ—মহাশ কগাদ ধর্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী
ব্যক্ত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ উপেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় অনুদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী বাহুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

এর পর গাইড দেখানে নিয়ে গেল সেখানে
মহু নৃপতি রয়েছেন শায়িত। পাখুস্ অব
লোরি লীজ্ বাট্ টু দি গ্রেভ্। ধন প্রতিপত্তি
ঐশ্বর্য মোহ শেষ হলে সবাই শরণ নিয়ে
থাকেন যে অন্তিম শয্যায়। তাঁরা নিয়েছেন
যোগীর পদপ্রান্তে।

“বিস্মিল্লা রহমান রহিম” অপূর্ব মধুর
কণ্ঠে মৃদু হলো। কেন জানি না, ফকিরের
মাধুর্যমণ্ডিত কণ্ঠ আমার মন হরণ করল।
ছুটে গেলাম সামান্য কয়েকটি মূদ্রা হাতে তুলে
দিতে। কবরের দিকে আগুনে দেখিয়ে রোষ-
কষায়িত নেত্র বুলল, শরম হয় না এ কটা
পয়সা দিতে এসেছি। জীবনটা কি? এতগুলো
সাহান শার কবরে বসেও তোর অল্প কটা
টাকার মোহ গেল না?

হতবাক নয়নে তাকিয়ে থাকি।

নকল ধাতুর মূদ্রাগুলো ফকির ছুঁড়ে ফেলে
দিল।

গাইড্ বলল, হুজুর ও পাগল। এখানেই
থাকে। নিজেই ওগুলো কুড়িয়ে নেবে। লাইন
কাটিয়ে ভিতরে গেলাম। সারিবদ্ধ ফকিরের
মল বসেছে পরপারের সম্মল সংগ্রহ করতে।
এ জীবনে যারা গেল শূধু লাঞ্ছনা গঞ্জনা, তারা
পরবর্তী জীবনের আশায় দিন কাটাচ্ছে।

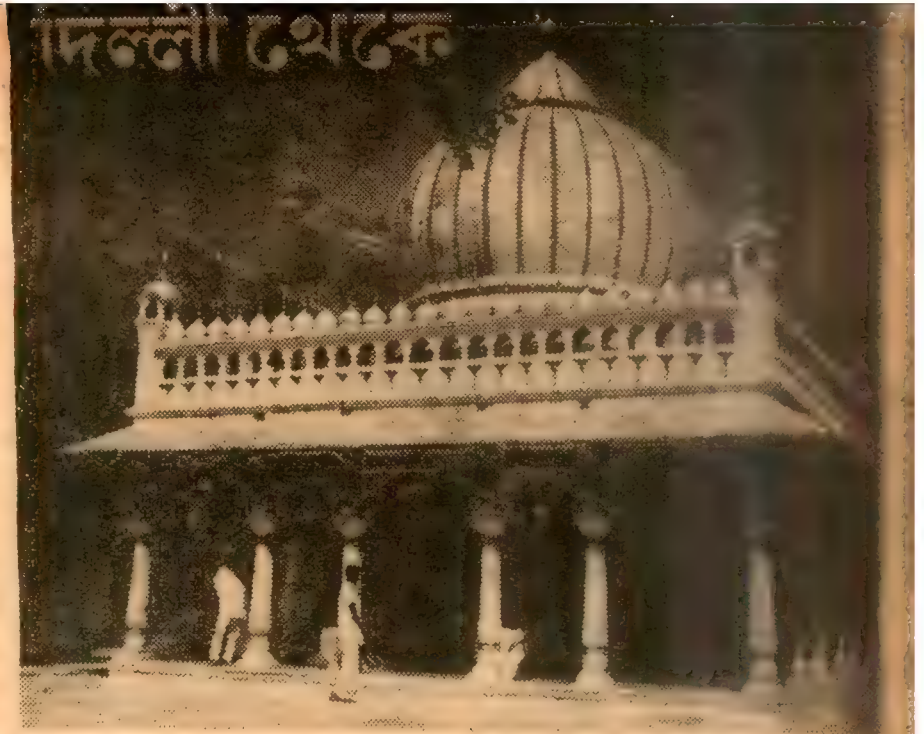
গোলাপ ফুলে ভরা একটা কবর দেখিয়ে
গাইড্ বলল, “হুজুর এ শেষ শয্যা হল খাজা
সাহেবের সর্বাঙ্গ শিষ্য আমীর খসরুর।”

দিল্লীর সাহিত্য জগতের দিকপালদের
ভিতর যারা বসিত আজও আমীর খসরু
তাদের রাজা। সাহিত্য জগতে তিনি টুট-ই-
হিন্দ নামে পরিচিত। দর্শনে মহাপণ্ডিত,
ভক্তিতে অস্বীকার্য আমীর শূধু পরগণার
প্রিয়পাত্রই ছিলেন না। তিনি বর্তমান উর্দু
সাহিত্যের জনক। হিন্দী সাহিত্যের তিনি
আদি কবি। হিন্দুস্থানী ভাষার তিনি
প্রবর্তক। ফারসী ভাষার তাঁর ছিল অগাধ
পাণ্ডিত্য। ফারসী সাহিত্য জগতে ভারতীয়
কোন কবির নাম স্মরণ করলে সর্বপ্রথম যে
নামটি মনে পড়বে সেটি হবে আমীর খসরু।

খসরুর যুগে ফারসী আরবীই ছিল দিল্লীর
রাজকীয় ভাষা। জনসাধারণের কথাবার্তা
চলতো দুর্বল উর্দুতে। সেই জনগণের
ভাষাকে অসাধারণ রূপ দিলেন জনমানসের কবি
আমীর খসরু আপন কবিতার মাধ্যমে। তাঁর
ফরলেন গজল, নাজম, রুবাই।

বাদশাহী দরবারই ছিল সাহিত্যলোচনার
একমাত্র প্ল্যাটফর্ম। দিল্লীর সাহিত্য ছিল
বাদশাহী দরবারে বিদগ্ধ গুদী মহলের সংকীর্ণ
গাঙীতে আবদ্ধ। খসরু একাধিক বাদশার
অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। নিগ্রহ পেয়েছিলেন
তার চেয়ে অনেক বেশি।

নিগ্রহ, অবহেলা, জীবন সংগ্রামে মানসিক
বেদনা যেন ভারতীয় কবি জীবনের অপরিহার্য
অঙ্গ। বাস্তবিক জীবন থেকে শূধু করে
কবি জয়দেবের জীবনে সেই একই দৃশ্য।
আধুনিক কবি মাইকেল থেকে শূধু করে
সুকান্তের জীবনে একই অভিনয়।



হজরত নিজামুদ্দীনের সমাধি

ফারসী মনোপালির হাত থেকে সাহিত্যকে
মুক্ত করে সাথে সাথে ভাবার আমেজটুকু
অব্যাহত রেখে খসরু ভারতের জনসাধারণকে
উপহার দিয়েছেন সরল মৃত্তা হিন্দ। দিল্লীর
পূর্ণ কুটার থেকে ধনী হর্ম্য আজ ধনিত
যে মধুছন্দ সেই আধুনিক উর্দুর যিনি জন্মদাতা
সেই হিন্দুস্থানের আদি কবির জন্ম হোক।

শৈশবে পিতৃহারা খসরু মোলানা
সামুদ্দীনের আশ্রিত। শিশুর লেখাপড়ার
মোটাই মনোযোগ ছিল না। বসে বসে শূধু
আপন মনে তিনি ছড়া গাইতেন। দিল্লীতে
রেওরাজ ছিল কাঠের স্লেটে লেখার। কখনও
বা শিশু কবি আপনতোলা মনে সেই স্লেটে

প্রীতিবেকরণ ডটচাপ

লিখে ফেলতেন সেই ছড়া। চুপি চুপি। ভয়
ছিল মনে। কে জানে লোকেরা কিভাবে নেবে
এ নতুন লেখা। আপন স্মৃতিতে শিশু আপনি
আত্মহারা।

মোলানা শিশু শিষ্যকে সর্বদা আড়াল করে
রাখতেন। দিল্লীর কায়দা অনুযায়ী সর্বত্রই
তিনি শিষ্যকে সাথে নিয়ে যেতেন। দিল্লীর
সাহিত্য জগতের সেদিনের ভাস্বর আজীজ
সাহেব। দরাজ দিল্। উদার মন। বিদগ্ধ
সাহিত্যানুরাগীদের উপস্থিতিতে তাঁর বাসভবন
সর্বদাই সরগরম।

খসরুকে নিয়ে আজীজ সাহেবের বাসভবনে
একদিন হাজির হলেন মোলানা। সেদিনের
সাহিত্য সভার ফারসী আবৃত্তি কিছুতেই
শিশু কবিকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। খসরু
আপন মনে গুন গুন করে গান গাইছিলেন।

স্বপ্নভরা চোখ দুটো উদাসভাবে ছিল বিভোর।
চিৎর তার হারিয়েছিল মেঘের মাঝখানে। তাঁটি
দুটো নড়ছিল। সভার কেউ এতকল তাকে
লক্ষ্য করে নি। আজীজ সাহেব প্রথম দৃষ্টিতেই
বালককে সেদিন বকে জড়িয়েছিলেন। কাছে
টেনে বললেন কি মস্তর আওড়াছো বাছা?।

মোলানা করজোড়ে নিবেদন করলেন,
“হুজুর ছেলটা ভারী চমক। হুজুরমন্ড চুপ
করে বসতে পারে না। ওর অপরাধ নিও না।
ছোকরা আমার কবিতা লেখে। কি শক্-
বে আদবী।”

আজীজ সাহেব হেসে বললেন সত্যিই জে
কি যে আদবী! শায়ের লিখবে শহরে কসে
রাজার হুকুম ছাড়া? শোনাও তো দেখি
তোমার কবিতা।

বালক কবি সর্বপ্রথম কবির সভায় পরি-
বেশন করলেন আপন রচনা—চারটি রুবাই।
আজীজ সাহেব আলিঙ্গনে জানালেন
স্নেহাশীর্ষাব্দ। দিল্লীর সাহিত্য ইতিহাসের
পৃষ্ঠায় লিখিত হল একটি নতুন নাম—আব্দুল
হুসেন আমীর খসরু।

তখন দিল্লীর রাজকবি কিংলু খাঁ আমীর
ধীরে ধীরে তাঁর সাথে পরিচিত হলেন। কিংলু
খানের কাছে দূর দেশের কবিরা ছুটে আসতেন।
আসতেন মিশর থেকে, শ্যাম, ইরাক, বাগদাদ
থেকে। কেউ বা খ্রাসান তুর্কীস্থান থেকে।
খান সাহেব তাঁদের খাতির করতেন পরমাশ্রীর
মতন। দিবা বায়না চলত সাহিত্য চর্চা।
অতিথি দিয়ে যেতেন প্রাণ ঢেলে তাঁর সাহিত্য-
সম্ভার, নিয়ে যেতেন খান সাহেবের দেওর
ঐশ্বর্যরাশি। তারই সপ্নে বিদায় বেঘনাতলা
দুটি অঙ্গসজ্জল —

কিছু খান আমীরের প্রথম সাহিত্যিক চেষ্টা। প্রেমিক মন। দেশ বিদেশের কবির ইয়াসমে খান সাহেবের কবি দরবার খান সন্তরম্ব মাতক আমীর প্রাণ মন ছেলে তখন কবির বিকাশের পাঠ্যভাসে রত। পরিবেশটা যেন খসরুর জন্যই তৈরি। বিলম্বিত গল্পে ওস্তাদ যেন তবলচকে ইসারা দিলেন, ধরো এবার।

ভারতবর্ষের সাহিত্যের পুণ্যভূমি বাংলার শ্যামলিন মাটি। দিল্লীর সকল সাহিত্যসেবী সে পুণ্যভূমিকে যুগ যুগ ধরে জানিয়েছে প্রণতি। আমীর কসরু বেশ কিছুদিন বাংলার কাটিয়েছেন।

আমীরের বাংলায় আসার পিছনে একটা ককার ঘটনা আছে। একদিন বাদশা কলহনের পুত্র যুগরা খান বিখ্যাত কবিরের নিয়ে সাহিত্য সভা বসিয়েছেন। সবার কবিতা আবৃত্তির পর এসো আমীরের পালা। আমীরের কবিতার স্তম্ভর অলো বাক্য যেন নেচে উঠলো। হৃদিতে কবির মন ভরপুর। আচ্ছন্ন কবি সভার সঙ্গে আপন রক্তের আপন ভাবে গেলেন। রাজপুত্র যুগরা খান প্রতিভার প্রণামী নিয়ে উঠলেন—এক খালা মোহর। বিনীতভাবে কবি সে দান গ্রহণ করলেন। এদিকে মনিব খান সাহেব চটে উঠে কি? আমার অধীনে কাজ করে আমি যেতে থাকতে রাজ অনুগ্রহ? রূপে কাপতে কাপতে খান সাহেব সভা পরিভ্রাম করলেন। লক্ষ্যের আমীরের মশা কটো গেল। বারবার তিনি গরুর করছ কমা প্রার্থনা করলেন। রাজ অনুগ্রহ পরে ত্রৈল তিনি গরুর পলভলে আশ্রয় চাইলেন। খান সাহেব অঁল। আমীরকে রাজপুত্র কথভাবে আশ্বিন করলেন।

চির বিদ্রোহী বাংলা কখনও কসরু পায়ে জমা নত করে নি। দাস মোগল পাতন সব যুগের সন্ধানই তাই আপন পুত্রদের বাংলা জবাবদারের ভার দিতেন। বলবন পাঠালেন পুত্র যুগরা খানকে বাংলা দেখানোর ভার দিয়ে।

যুগরা খান নদী, জলভরা মাঠ দেখে পাগল। কসরুকে খবর পাঠালেন, “কবিতা লিখবে কবি? কবিতা লিখতে চাও তো এসো। গাছপালা আকাশ বাতাসের সাথে পাখীর গান নদীর কলতান যেখানে দিবানিশি কবিতা গাইছে। বিখ্যাত কবিতা এই বাংলা দেশ।

বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাজাদা মুহাম্মদ কাওয়ান আমীরের কবিতার বিশেষ অনুরাগী স্নেহভার ছিলেন। তিনি তখন মূলতরনের গভীর। কবি বাংলা থেকে গেলেন মূলতরনে।

পরম আনন্দে কবি দিন কাটান। দেখতে দেখতে দিন গেল। গেল মাস। গেল বছর। এক দুই তিন করে পাঁচ। ধীর শান্ত মূলতরন ধনানী চকল হয়ে উঠলো কেন? এসেছে কসরু। তাতার দস্যু তৈমুর। লাহোর গেছে। হীপালপুর গেছে। তারপরই মূলতরন।

সাজাদা জিতলেন। দস্যু পালালো।

কসরুর পালায় নি। সৈন্য দুনিয়ার হুসনিয় সলাল লক্ষ্যের অপমানে মশা নত করেছিল। সৈন্য দুর্ধ অবমাননা মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকেছিল। সৈন্য ইতিহাস কলঙ্ক বোকা মাখায় করে চির লাহিত হয়েছিল। পরাজিত দস্যু প্রাণনারত সাজাদাকে আশ্রয় করল। সাজাদা প্রাণ দিলেন। কবি মান দিলেন। দস্যু দিল্লীর প্রেস্টে কবি আমীর কসরুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করল। দীর্ঘ দু বছর শৃঙ্খলে কাটলো। তারপর আবার দিল্লী।

সুলতানহারা বাদশা কবিকে আশ্বিন করলেন। তখন আমীর খসরু মুহাম্মদ সন্তরমে কবিতা রচনা করেন পুণ্ডরীর সাহিত্যে সে কবিতা চির অক্ষর হয়ে কবিকে অক্ষর করে রেখেছে। সভার সৈন্য চোখের জলের বান ঢেকেছিল। হিন্দুস্থানের সাহান শা বাদশা সে কবিতা শুনে মুহূর্ত গিরোছিলেন।

গিরাসুদীন তুলাকের সাথে কবি শ্বিতীর-বার বাংলায় আসেন। বাংলা কবির ভালো লাগত। দিল্লীর ডাক যে বারবার ডাকে টেনে নিচ্ছে। এবারের ডাক বড় করুণ। সবাই বেদনাবিদুর নেই। গরুদের নিজামুদ্দীন আউলিয়া এ জগতে নেই। আমীর শ্বিতীর-বার পিতৃহারা হল। খোদাতালার পরই যোগীর আমীরকে ভাল বানতেন। মৃত্যুর করেকদিন গরুর নিজামুদ্দীন আউলিয়া সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, হারো আমীরকে দেখাও না কেন? কোথায় গেল বন্ড তো? আমি শীঘ্রিগই বেহেস্তে যাচ্ছি। খোলা-ডালকে সেলাম করব গিরে। খোলা কলহনে হারো আউলিয়া দুনিয়া থেকে ঘুরে এলি। বলি আমার জন্য কি আলি শুনি?

পরম উল্লস বদনে আউলিয়া বললেন, জানিস তোরা তখন আমি কি বলব?

শিখরে দল বলে উঠলো, “খোসবাই কল!”

গরু বললেন, “হলো না। বলব, হুজুর তোমার জন্য দুনিয়ার এক মহান কবি নিয়ে এসেছি, বার দিল্ শফটিকের মতন স্বচ্ছ। নাম তার আমীর খসরু।

সেইটাই জীবনের শেষ প্রার্থনা। স্তম্ভ শিমামুদ্দীন শুনলো, নিজামুদ্দীন প্রাণনার পর বললেন, “হে খোদাতালা তুমি আমার প্রিয় আমীরকে সর্বদা আড়াল করে দাঁড়াও।”

এদিকে কবি তখন বাংলা দেশের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য-রাশি তাঁকে শিশুর মতন মুগ্ধ করে। আকাশের মেঘের কাঁকে, মাটির সবুজ তৃণভূমি, নদীর খল খল হাসিতে কোন অদ্ভুত শক্তি খেলে দেখার?

দিল্লীবাসী কবির তারিফ করে। তাঁকে হাতীর ওজনের সমান মণি মন্তো দেয়। চারিদিক ছিরে স্তুতি করে। ভারতে যে মন মানে না। কেউ সে সে না দেখা শক্তি সন্ধান দিতে পারছে না। বিস্ময়োভা এই যে কবি

পাতা আছে কেউ যে পারছে না দিতে তার হিসাব নিকাশ। সবই তো পেলাম। তবুও কিছই যে পেলাম না। কোথায় সেই অদ্ভুত শক্তি? কোথায় সেই বলকর? সেই না দেখা খেলোয়াড় বিস্ময়োভা কান পেতে শুনে সবাইকে নিয়ে তানুমেতীর খেল খেলছে? হৃদয় যে খুলেও খোলে না। প্রভু, গরু, খাল্য সাহেব মেহেরবানী করো, কৃপা করো। বলো বলে দাও এসব কেমন করে হল?

স্তম্ভ ধরিত্রী। রাজকবি আমীর প্রায়শই নেই। কুটীরে গভীর নিদ্রামগ্ন রাতে খালা সাহেব শান্ত করেন কবিকে। তাঁর কুবল ভোলানো মৃদু হাসিতেই কবির সান্ত্বনা। তাঁর পরশেই প্রেম সিগুন। লজনের যে একই প্রণ। পরীর হুটো। মন হুটো যে এক হয়ে গেছে।

এ কাহিনী দিল্লীর কে না জানে?

মদমন্ত বাদশা জালালুদ্দীন খিলজী নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কুটীরে যাবেন। সম্রাটসী কিছুতেই রাজাকে তাঁর কুটীরে ঢুকতে দেবেন না। কসরু যে এগরোজন বাদশার সভা কবি ছিলেন জালালুদ্দীন তাঁদের চতুর্থ। বাদশা কবিকে ডাকলেন। “শোনো কবি আমি ত্রিক করছি বিনা অনুমতিতেই খাজার ওখানে যাব। খালা কেন এ কথা টের না পান।”

কবি বিশদে পড়লেন। একদিকে রাজসভা। অপর প্রান্তে জীবনের সাধনার মন দরিদ্র কবির।

কবি গরুদেরকে সব কথা খুলে বললেন। গরুদের কুটীরের বাইরে চলে গেলেন।

রাজবাড়ীতে কবির ডাক পড়লো। এ খবর কসরু হাফা আর যে কেউ জানেন না।

সবাই তত্পর।

কবি বাদশাকে বললেন, “জাহাপনা তুমি হুটে হলে জান বাবে। গরুদের হুটে হলে বিবেকবোধ হবে। তোমার যেটা শিশু তুমি এখন নিতে পারো।”

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দেহভাসের খবর পেয়ে কবি বাংলা থেকে হুটে এলেন। দিবা-যামিনী কবর পাশে শিশুর মতন কোঁদে কাটলেন। আউলিয়া তাঁর কথা ব্রেকছিলেন। খোদার কাছে পৌঁছেই শিখা আমীরকে পেপ করতে পেরেছিলেন। গরুদ্বিরহেই দিল্লীর সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বপ্রথম কবি আমীর খসরুর মৃত্যু হয়।

গোলাপটা হাত থেকে পড়ে গেল। খুপে গাশে চারিদিক মোহিত। এই তো সৈন্যের জিন্দা। আরে কেটে গেছে শব্দ কটা বছর— এক দুই করে সাত শ বছর।



মোহর ওলেন্ড্রুশ্য

ভূপেন্দ্রাবিশ্বের রক্ষিত রায়

বেতার।

প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত-জার্মান যুদ্ধমন্ড

যেকোন বৃহৎ সফল কাজ দেখে আমরা বিস্ময়ে মগ্ন হই। বারী সাফল্যের মুকুট পরে বরণীয় হন তাঁদেরকে নিয়ে স্বভাবতই গৌরববোধ করি। এ বৃহৎ ভাল কথা। কিন্তু এই সফল কর্মটি যে বিজয় একটি ঘটনা নয়, ইহা যে আরো বহু অভীত কর্ম থেকে জন্ম নিয়েছে এবং সেসব কর্মে যে বহু ব্যর্থতার ইতিহাসও থাকতে বাধ্য তার খোঁজ আমরা করি না। বরণীয় কর্মীর পশ্চাতে অলক্ষ্যে যে বহু কর্মভ্রাসের অস্তিত্ব থেকে বার জাও আমরা জানতে চাই না।

“Failure is the pillar of success” কথাটি আমাদের মূৰ্খত্ব আছে কটে, কিন্তু ভার তাৎপর্য আমরা ভুলে বাই। অথচ বিপ্লবীরা তা ভুলেন না। “কাজ কর, কলের অপেক্ষা কোরো না”—গীতার এই বাক্যমর্ম বিপ্লবীদের পক্ষে ছিল অন্তরঙ্গ বাণী। কাজেই প্রাক-স্বাধীনতা যুগে পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল জুড়ে বিপ্লবীদের কাজ ছিল কেবল অনন্ডচিত্তে সর্বভাগী হয়ে স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টায় নিবৃত্ত থাকা। এই কর্মপথে বহু ভুলত্রুটি এসেছে, বহু ব্যর্থতা দেখা গেছে। কিন্তু সেই ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতাবোঝা কাজেই যে ‘সফল’ কর্মের দ্বার খুলে দেয়, এ বিশ্বাস ছিল কর্মীদের। ফলে কর্মীদের বিশ্বাস জরী হয়েছে। সেই জয়ের স্বাক্ষর লিখিত রয়েছে কানাই-কুদিরামের পদযাত্রা থেকে আজাদ-হিন্দফৌজের পথযাত্রা বোপে।

আমাদের বক্তৃত হবে যে, ইতিহাস চলে তার নিজস্ব পথে। তার পথচর্চা একটি ঘটনার নয়। ঘটনাপরম্পরায় বিরচিত থাকে তার মহাপথ। মজবুতপরের কুদিরাম থেকে

জাজিলন্ত লেবভমার্ঠের ভবানী পর্যন্ত নামী-অনামী শাহিদকূলের প্রচ-ভ্রম কর্মকীর্তি, রডা-অস্ত-সংগ্রহ, গোহাটি ও কন-তাবাজার সংঘর্ষ, বালাসোর যুদ্ধ, চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন, জালালাবাদ যুদ্ধ, রাইচাল বিল্ডিংস-এর অলিম্পিক যুদ্ধ, গভর্নর জ্যাকসন ও এন্ডার্সন আক্রমণ, মৌদীনীপুর ও কুমিল্লার পর পর চারটি ম্যাজিস্ট্রেট নিধন, আজাদ-হিন্দফৌজ গঠন, সেই বাহিনী কর্তৃক আন্দামানে স্বাধীন ভারতীয় সরকার স্থাপন এবং ইচ্ছাশ্রমে স্বাধীনতা-পতাকা উত্তোলন—এসব কণ্ঠস্বরো বিজয় ঘটনা নয়। অর্ধ শতাব্দীব্যাপী বিপ্লব-প্রবাহের এরা ছোটবড় তরঙ্গশীর্ষ। বাংলা তথা ভারতীয় বিপ্লবের দেখা ও অদেখা তরঙ্গদোলায় চরম তরঙ্গশীর্ষরূপেই আজাদ-হিন্দফৌজের প্রকাশ। বিস্ময়ে ও প্রজ্ঞার এই মূর্তি বাহিনীর কীর্তিকাহিনী লক্ষ্য করার কালে সেই কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। বিপ্লবের প্রত্যেকটি ঘটনাকে (ক্লব বা বৃহৎ) দেখবার ও গড়বার দৃষ্টি ও রীতি না জানলে ইতিহাস বোঝা যায় না, লেখা তো দূরের কথা।

পূর্বেই বলিছি যে, ১৯১৪ সাল ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। পৃথিবীর প্রথম মহা-সমর ভারতের মূর্তিকামনার গভীর প্রেরণা দেয়। এই যুদ্ধে বিপ্লবের গতি বিশৃঙ্খল এক সম্ভাবনার পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে বিপ্লবীদের উদ্যোগ-আয়োজনের কিছটা প্রকাশ নান্য ঘটনার মাধ্যমে মাঝে মাঝে দেশবাসী জানতে পেরেছে। যদিও সে জানাজাতি অতি সামান্য। সবার অলক্ষ্যে যে-বিপ্লববাহি ধুমারিত ছিল তার উপরিপ বিস্ময়বিষ্কারিত নেত্র দেখলো ইংরেজ, দেখলো ভারতবর্ষ বড়িবালাসের তীরেই প্রথম।

বালাসোর-যুদ্ধ নিশ্চয়ই হঠাৎ ঘটে-বাওরা এক ঘটনা নয়। এর পটভূমিকা না জানলে এ-যুদ্ধের গুরুত্বের বীর্য বোঝা পেলোও তাঁদের সাফল্য কোন্ পথে সাধক হলো তা বোঝা যাবে না।

বিপ্লবীরা জানতেন যে, পটভূমিকের যুদ্ধের আত্মদানেই ইংরেজ তাজিত হবে না। তাঁরা জানতেন যে, ইংরেজের শক্তিশাল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য তাঁদের চাই। সে সাহায্য বৃটিশের পক্ষে কখন মারাত্মক হতে পারে তাও তাঁদের জ্ঞান ছিল। কিন্তু সুবোধ গ্রহণের শক্তি তো সত্ত্ব করত হবে? তাঁরা জানতেন যে, সেই শক্তি রয়েছে সংঘ-সংগঠনের মধ্যে। তাই মন নিলেন তাঁরা তাঁদের সংগঠন বিপ্লবের করার দিকে। সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে থাকবে তাঁদের সংস্থা। সর্বভারতীয় সামরিক-উত্থান ঘটবার পূর্বসূরী পর্বত তা খোঁজ কেউ পাবে না...

বিপ্লবীদের প্রস্তুতি এভাবেই চলছিল।

১৯১৪ সাল মহাযুদ্ধের সূচনার সুবোধ সীতা এসে গেল। ভারতীয় বিপ্লবীদের অনেকে ছাত্ররূপে এবং পণ্যাতক বা নির্বাসিতরূপে ইউরোপে ও আমেরিকায় বাস করতেন। তাঁরা দেখলেন—সমর সমাগত। জার্মানি ইংরেজের শত্রু, অতএব সে ভারতের মিত্র—এ কটনীতি গ্রহণ করে তাঁরা বালি’নে ‘ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ’ প্রতিষ্ঠিত করলেন। ‘ভারতীয় লীগ’ কাজ হলো স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-রূপে জার্মানির সঙ্গে কটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং কণ্ঠস্বরূপ জার্মানির কাছ থেকে অর্থ, অস্ত্রসম্পদ ও অন্যান্য সাহায্য গ্রহণ করা।

১৯০৬ সাল থেকেই বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা মধ্য ও দূর প্রান্তে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষের মূর্তি

কমী প্রচার করে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবাত্মক কাজে বিদেশের সহায়তা ও সাহায্য পাওয়ার রাজনীতিক দাবীর কথাও তাঁরা স্পষ্ট করে বলে গেছেন। ইংরেজের কঠিন উপশোধন নানাভাবে বিদেশেও তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁদের উদ্যম ও কর্মচেষ্টা ছিল তুলনাহীন। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় বিপ্লবীরা বিদেশে খ্যাতির সঙ্গে এই চেষ্টা করে এসেছেন। এই মহৎ কর্মের উদ্যোক্তাদের কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা হবে। কারণ, সবার অলঙ্কো, মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হয়ে, বহু দুঃখে ও লাঞ্ছনায় বারী স্বাধীনতার বাণী ভোলেন নি—বারী ত্যাগ-বরণে দীপ্ত হয়ে বিপদসংকুল পথে কাজ করে গেছেন—তাঁদেরকে স্মরণ করার মধ্যেই জাতির বেঁচে থাকার মন্ত্র।

প্রথমত ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে আমরা জাপান, মিশর, তুরস্ক, কাবুল, লন্ডন, প্যারী, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, সানফ্রানসিসকো প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী-চক্রবর্তী পাই—শ্যামজি কৃষ্ণ বর্ম (রাজপুতানা), মাদাম কামা (বোম্বাই), সর্দার সিজী রাধা (কাঞ্চীপুর), বীরেন চট্টোপাধ্যায় (হরদ্বারপ্রবাসী বাঙালী—মরোক্কোয় ছোট ভাই), বীরেন সাত্তারকর (বোম্বাই), ভবেন্দ্রনাথ (যুক্তপ্রদেশ), ভারত দাস (বাংলা), রামচন্দ্র (পাঞ্জাব), হরদয়াল (পাঞ্জাব), রুকমিণী (যুক্তপ্রদেশ), ভূপেন দত্ত (বাংলা—দামা বিবেকানন্দের ছোট ভাই), সুধীন বসু (বাংলা), হীরা আম্বাল (বিহার), পাণ্ডুরং কান্‌কোজি, যশোবন্ত দাস (বাংলা), অপর নন্দকর (বাংলা) এবং আরো অনেকে।

অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে (অর্থাৎ ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত) এবং তৎপরে স্বাধীনভাষান্তর কাল পর্যন্ত বারী বিদেশী কতিপয় রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীনতাকামী ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে সাধক করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম—বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিষ্ণু দ্ব্যতনকর (মহারাষ্ট্র), বীরেন সরকার (বাংলা), অজিত সিং (পাঞ্জাব), প্রমথ দত্ত (বাংলা), ডাঃ ভূপেন দত্ত, পাণ্ডুরং কান্‌কোজি, রুকমিণী, খানচাঁদ বর্মা (যুক্তপ্রদেশ), রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ (যুক্তপ্রদেশ), লাল লজপৎ মুখার্জী (পাঞ্জাব), শিবপ্রসাদ গুপ্ত (যুক্তপ্রদেশ), দায়র আলি খাঁ (যুক্তপ্রদেশ), হরীকেশ চট্টো (পাঞ্জাব), ডাঃ হাফিজ (যুক্তপ্রদেশ), হের-দ্বজী ফারশাপ (বোম্বাই), ভারত দাস (বাংলা), রুকমিণী (পাঞ্জাব), হেরু বসু (বাংলা), নন্দকর (বোম্বাই), বীরেন দাস-গুপ্ত (বাংলা), চম্বা (মাদ্রাজ), রাসবিহারী বসু (বাংলা), মনোমোহন রায় (বাংলা), হেমেন্দ্র-কিশোর রায় (বাংলা), কনসোপাল মুখার্জী (বাংলা), শৈলেন ঘোষ (বাংলা), সুরেন কল (বাংলা), আবদুল ওয়াহেদ (বিহার), ডাঃ

নন্দকর (যুক্তপ্রদেশ), চন্দ্রকর (পাঞ্জাব) (ব্রিটানিয়া), রামচন্দ্র, ভূপেন সিং (পাঞ্জাব), হরদয়াল (পাঞ্জাব), সর্দার ওমরাও সিং (পাঞ্জাব), অরুণী মুখার্জী (বাংলা)।

[বাংলার বিপ্লববাদ—পৃঃ ২৪৪, ২৪৫] এবার জার্মান-ভারত-যুক্তযন্ত্রের কথা আসা যাক। বিদেশে নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের চেষ্টার জার্মান-সরকার অবশেষে ভারতে বিপ্লব ঘটানোর কাজে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সহায় করতে রাজি হলেন। এদিকে ভারতবর্ষেও বিপ্লবীরা রাসবিহারী বসু ও বর্তমান মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত করার অয়োজনে তৎপর হয়েছেন। সারা উত্তর ভারতে, বিশেষ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে, রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে প্রচারণা ও সংগঠনকার্য করে যাচ্ছিলেন বাহিন্যবাহী বাঙালী-অবাসীরা। বাংলার বিপ্লবীরা বর্তমান মুখার্জীর নেতৃত্বে সমস্ত ঘাটি আগলে আছেন জার্মান-অস্ত্রবাহী-জাহাজের অপেক্ষায়। অস্ত্র পাওয়া মাত্র ভারতবর্ষের তা বিলি হয়ে যাবে একই লক্ষ্যে সশস্ত্র-বিদ্রোহ করার জন্যে। বিপ্লবীরা ভাবা করছে জার্মানদের যে, সামান্য কয়েক হাজার সৈন্যকে ব্রিটিশদের দেশের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাচ্ছে 'শেরায়েল, কুমীরের ছানা' দেখানোর মত। আদর্শে তাদের অধিকাংশ সেনাবাহিনী-ই চলে গেছে ভারতের বাইরে মহামুহুরের নানা প্রাপণে। কাজেই স্বল্প আঘাতে বহু পতন ঘটাবার এই সুযোগ। তাই সানলে শত্রুর দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছেন বীরের দল। মৃত্যুর ভয় বিদূরিত মহামুহুরের আহবানে। অতীতপূর্ব সে অপেক্ষা। বাংলা তথা ভারতের তরুণ শত্রুর ধনুক টপ্পার। লক্ষ্যভেদের হুকুমের প্রত্যশায় সে কি একান্ত আকণ্ঠন!...

কিন্তু ইতিহাস-দেবতার পথ বড়ই জটিল। জাতিকে বহু ত্যাগ ও দক্ষ কর্মের পথে চলতে হবে আরো অনেক কাল। কাজেই ব্যর্থ হলো ষড়যন্ত্র।...

ঘরে-বাইরে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে অস্ত্র-বাহী জাহাজ 'ম্যাক্সারিক' ভারতবর্ষের কুলে ভিড়তে পারল না। জাহাজ উপকূলে ধরা পড়ল সেই জাহাজ। অপর জাহাজ 'অ্যান্‌লুই'ও ভারতে পৌঁছাতে পারেনি।... ক্রমে সংবাদটি প্রচারিত হল। এদিকে বাংলা ও ভারতে বারী প্রহর গুণে গুণে নানা ঘাটি আগলে অপেক্ষা করাছিলেন, তারা হতাশ হলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারি (১৯১৫) ভারতীয় সশস্ত্র-উদ্বোধন-দিবস ভারতবাসীর বিশ্বাস-ঘাতকতারই আর আলোকের মুখ দেখলো না। ব্যাপক ধরপাকড় ও তল্লাশির ফলে সব অয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এক পাঞ্জাববৈ দ্ব্যজ্ঞার শিখ প্রেরণ হলেন। বাংলার কথা বলাই অব্যবহৃত।...

রাসবিহারী বাংলার ফিরে এলেন। তাঁকে

বাজে পালান। বহু সস্ত্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু সবাইকে কাঁক দিয়ে তিনি তাঁর আরম্ভ কর্ম সাধকতার রূপে সপায় করার সংকল্পে ঠিক, এন, ঠাকুর' এই ছদ্মনামে পালায়ে গেলেন লাগানে। এই ঐতিহাসিক পলায়নের তারিখ হল ১২ই মে, ১৯১৫ সাল।...

বর্তমানের কীর্তিকাহিনী যথাস্থানে বলা হবে।...

গদর পার্টির অবস্থান

প্রকৃত বিপ্লবী হরদয়াল আমেরিকার অবস্থান কালে একখানা কাগজ চালাতেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'গদর' — অর্থাৎ বিদ্রোহ। ব্রিটিশের শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার কথা বলে যাওয়াই ছিল সে-কাগজের উদ্দেশ্য। দিনের পর দিন কাগজ-খানা বিদ্রোহের বাণী প্রচার করছিল। 'ইংরেজি গদর' কাগজের লেখাগুলো হিন্দি, উর্দু ও গুরুমুখী ভাষায় তর্জমা করে আমেরিকা ও ইউরোপে অবস্থিত এশিয়ান আশ্রয়স্থল প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে একে ভারতে দেশীয় সৈন্যদের হাতে নির্যাসিত পৌঁছে দেওয়া হত।

হরদয়ালজীর পার্শ্বে, দেশপ্রেম, ভরস্ব্য হীনতা ও নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার স্পন্দিতা তাঁকে ভারত-জার্মান-যুক্তযন্ত্রের পুরোভাগে স্থান দিয়েছিল। বিদ্রোহের কাজ করার জন্যে পূর্ব থেকেই যে সংস্থা গঠিত হয় তার নামও 'গদর'। গদর-দলের অন্যতম প্রেরণ কর্মী ছিলেন রামচন্দ্র ও বরকতুল্লাহ। জার্মান যুদ্ধ সুরু হতেই বহু ভারতীয় উচ্চ দলের সভ্য হতে লাগলেন।

১৯১৪ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশের প্ররোচনায় মার্কিন-সরকার হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করে জামিনে মুক্তি দেয়। হরদয়াল মুক্তির সুযোগ নিয়ে সুইজারল্যান্ডে চলে আসেন। চলে এসেই জার্মান-গভর্নমেন্টের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। সুরেন কল, ভারত দাস, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীরা তখন বার্লিনকে কেন্দ্র করে বিপ্লবের কাজ করে যাচ্ছেন। তখন 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাকশন' স্থাপিত হয়েছে। এই পার্টি জার্মান-রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সে-সময়েই তৎপর হয়ে উঠেছে।

* * *

১৯১০ সাল থেকেই ক্যানাডা-প্রবাসী শিখদের ও অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয়। তার কারণ হলো ক্যানাডার 'এমিগ্রেশন'-আইন। ক্যানাডার সে সময় হাজার চারেক পাঞ্জাবী প্রমিক বাস করতেন। তাঁরা সকলেই নতুন চাল-বস্ত্র এই আইনে নিষিদ্ধ অঙ্গবিধার পড়ে গেছেন। ...গদরপার্টির গুরু শিখ তথা পাঞ্জাবীদের

এই অসম্ভাব্য ও অসুবিধা বিদ্রোহের কারণে লাগতে দেয়া হলো না।...

ঠিক এই সময়েই আর একটি ব্যাপার ঘটে যায়। সিংগাপুরের ব্যবসায়ী গুরুদীপ সিং ১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল জাপানী জাহাজ 'কোমাগাটামারু' ভাড়া করে বাহ্যত ব্যবসায়ের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে শ্রমজীবী শিখদের নিয়ে হংকং থেকে ক্যানাডার যাত্রা করেন। কিন্তু ভিতরের উদ্দেশ্য ছিল 'এমিগ্রেশন'-আইনকে চ্যালেঞ্জ করা।

জাহাজে যাত্রী ছিলেন ৩৭২ জন। ইয়াকোহামা ও মাথের অন্যান্য বন্দরে জাহাজটি পৌঁছতেই ভারতীয় বিপ্লবীকর্মীরা জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে 'গদর'-পত্রিকা ছড়িয়ে দিতে থাকেন। বন্দরে-বন্দরে বিপ্লবের মন্ত্র তাদের কানে আসতে থাকে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বিপ্লবের 'বাণী' তাদের মর্মে প্রবেশ করে নি।

মে-মাসের শেষ ভাগে 'কোমাগাটামারু' চ্যাকোবারে এসে পৌঁছল। ক্যানাডার কতৃপক্ষ শিখদের জাহাজ থেকে নামতে দিলেন না। বাধ্য হয়ে জাহাজটি ৩৭২ জন যাত্রী নিয়ে ফিরে চলল। স্বভাবতই যাত্রীদল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন ক্যানাডার আচরণে। বহু আশায় যথাসর্বস্ব বিক্রয় করে তারা ঘর ছেড়ে দূর ক্যানাডার ভাগ্যবৈধন্যে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত ও সম্বলহীন অবস্থায় কুকুরের মত ভাড়িয়ে দিল তাদেরকে ক্যানাডা-সরকার। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, বৃটিশের প্রজা এই ভারতীয়দের নিশ্চরই রক্ষা করবে বৃটিশ-রাজ। ক্যানাডার জাতিবিরোধী এ-আইনের কবলে তাদের পড়তে হবে না। কিন্তু কার্যত বৃটিশ-সিংহ খাবা গুটিয়ে রইল। রুন্ট ও ব্যর্থ এই মানুষগুলোর 'অম্মে' তখন গদর-পার্টির বিদ্রোহবাণী মন্ত্রের মত কাজ করল। তাই দেহে বড়ুজ, চিত্তেও তাই। অপমান ও জাহান্নার প্রতিশোধ নেবার উপায় কি? তারা গোপনাসে বিদ্রোহাঙ্গক কাগজপত্রের পড়তে লাগলেন। ঠাড়া হরফগুলো এখন যেন বোমার মত ফেটে পড়তে চায়!... মনে হয়—

"নূতন জাগরা শিখ

নূতন উষার সূর্যের পানে চাহে নির্গমিখ॥"
ক্রমে জাহাজখানা হংকং বন্দরে এলো। কিন্তু সেখানেও কাউকে নামতে দেওয়া হলো না। খাদ্যের অভাবে যাত্রীরা মরীয়া হয়ে উঠেছেন। গুরুদীপ সিং সে-কথা হংকং-এর কতৃপক্ষকে জানালেন। কিন্তু বৃটিশ-মৃত তাদের নামতে দেওয়া তো দূরের কথা, খাদ্য-চর্যা পর্যন্ত জাহাজে তুলতে দিলেন না! অবস্থা চরম সঙ্কটজনক হতে লাগল। শেষটায় ভারত-গভর্নমেন্টের নির্দেশে কিছু খাদ্য সরবরাহ করে যাত্রীবাহী জাহাজটিকে কলকাতার দিকে রওনা করে দেওয়া হল।...

যাত্রীরা ইতিমধ্যে মনের দিক থেকে বৃটিশ-বিরোধী হয়ে গেছেন। বিদ্রোহী

ভূমিকার নাথবার জন্যে তারা উদগ্রীব। তারা অনেকেই ভারতে ফিরতে রাজি ছিলেন না। হংকং বা সিংগাপুরে নাথবার জন্যে তারা আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার তা হতে দেবে না। কাজেই আরোহীদের উত্তেজনার শেষ নেই।...

১৯১৪ সালেরই ২৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতার দক্ষিণে বজ্রবজ্র পোতাশ্রয়ে 'কোমাগাটামারু' এসে পৌঁছয়। সরকার পূর্ব থেকেই একটি ট্রেন বজ্রবজ্র দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই গাড়িতে যাত্রীদের তুলে সরাসরি তাদের পাজাবে পাঠিয়ে দেওয়া। এতগুলো ক্ষিপ্ত মানুষকে যুদ্ধের দুর্দিনে অস্ত্রত বাংলায় খালি মাঠে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না বলেই এ-আয়োজন।...



গদর-পার্টির নেতা

কিন্তু শিখযাত্রীদল জাহাজ থেকে নেমেই পায়ে হেঁটে কলকাতার দিকে রওনা হলেন। অসং বৃটিশের ব্যবস্থার ট্রেনে তারা উঠবেন না।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার ফ্রেডারিক ও ২৪-পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডেনামন্ড পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রীদের বাধা দেন। সংঘর্ষ সূর্য হয়ে যায়। শিখদের অনেকের কাছে আমেরিকান পিস্তল ছিল। উভয় পক্ষে সন্ত্রাসে গুলীবর্ষণ চললো স্বভাবতই পুলিশের রাইফেলের কাছে যাত্রীর পিস্তল হেরে গেল। শিখরা ইতিমধ্যে প্রাণ দিচ্ছেন আতীর জন। আহত হয়েছেন বহু। ইংরেজের স্যার ফ্রেডারিক ও মিঃ হান্সফরি-কে আহত করেছে বিদ্রোহীর বুলেট। মৃত্যু ঘটেছে তাদেরই অস্ত্র আর একজনের। নাম তাঁর মিঃ মোয়েস।...

তিনশত বাহাদুর জন যাত্রীর মধ্যে যাত্রী জনকে ট্রেনে চাপিয়ে পাজাব পাঠান গেল।

কিন্তু তারা গেলেন। কিন্তু আহত অবস্থায় ধরা পড়লেন। বাকি সবাই পলাতক হলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যে তাদের অনেকে ধরা পড়লো গুরুদীপ সিং ও তাঁর ২৮ জন সঙ্গী শেষ অবধি ধরা পড়েন নি।...

কোমাগাটামারু সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারেই গুরুদীপ সিং-এর নেতৃত্ব ও সুদক্ষ পরিচালনা বিশেষ প্রশংসনীয়।

* * *

কোমাগাটামারু-সংঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। এর পূর্বে বিপ্লবের ইতিহাসে প্রচুর। সমস্ত ব্যাপারটির পেছনে গদর-পার্টির কলকাঠি সচল ছিল বলেই জাহাজের সাধারণ মানুষগুলো বিদ্রোহী ভূমিকার একটি ঐতিহাসিক সংঘর্ষের নায়ক হবার সুযোগ পেলে।...

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লীগ' ভারত-জর্মান যুদ্ধবন্দের রূপদানে তৎপর। গদর-পার্টি ভারতে ও ভারতের বাইরে তার সবটুকু আয়োজন নিয়ে কাঁপিয়ে পড়েছে এই লীগ-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ-পরিকল্পনায়। কোমাগাটামারু যাত্রীদের নিধনে সারা পাজাব ক্ষেপে গেছে। খেপে গেছে বাংলা ও বিপ্লবী-ভারত।...

২৯শে অক্টোবর (১৯১৪) 'টোসামারু' নামে অপর একটি জাহাজ আমেরিকা, বেলিনা, চীন, সাংহাই, হংকং ঘুরে বহু ভারতীয় নিয়ে কলকাতার এসেছে। আরোহীদের অধিকাংশ শিখ। এদের সঙ্গে বিপ্লবী কর্মীও ছিলেন অনেক। তা ছাড়া এই সময়েই 'এস্-এস্-সালামির' জাহাজে শিখযাত্রীদের সঙ্গেও কিছু দায়িত্বশীল দুর্ধর্ষ বিপ্লবী আসেন। এসব বিপ্লবীরা অনায়াসে উত্তর ভারতে চলে যান। রাসবিহারীর নেতৃত্ব সকলের মত 'গদর'-দলেও মেনে নেওয়ার ভারতবর্ষের বিপ্লবযাত্রার দুই কূল কানার কানায় ভরে উঠেছিল। দেশে ও বিদেশে বিপ্লবের নায়কগণ রাসবিহারীর মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন সর্বভারতীয় বিপ্লবের মহানায়ককে। উত্তর ভারতে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শচীন সান্যাল প্রমুখ বাঙালী বিপ্লবী ছাড়া মহারাম্রী, উত্তর ভারত, পাজাব ও দক্ষিণ প্রান্তের পিহলে, বিনায়ক রাও, কাপ্পে, দামোদর স্বরূপ, প্রতাপ সিং, আউখবিহারী, বালমকুল, বাচ্চা সিং, কর্তার সিং প্রমুখ কর্মসঙ্গীরা। তারা সেনাবাহিনীগুলোর মধ্যে বিপ্লবের বীজ বুনো বাচ্ছিলেন। কোমাগাটামারু-সংঘটনার পাজাবী-রেজিমেন্টে বিদ্রোহের আগুন ধর্মায়িত হচ্ছিল। যথাসময়ে সৈন্যরা বিদ্রোহে অবশ্যই যোগ দেবেন বলে বিপ্লবের নেতারা আশ্বাস পেয়েছিলেন। গদর-পার্টি রাসবিহারীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়াতে বিদেশেও বিপ্লবের প্রস্তুতি জোর কদমে এগিয়ে চলল। এ আমেরিকান-ই গদর-দলের ৭২টি শাখা বর্তমান ছিল। পার্টির কর্মীরা দলে দলে বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে ভারত অভিমুখে ধাওয়া করলেন।

“আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাত্তাতি।”

অনেকে এসে পৌঁছলেন স্বদেশে। অনেক
পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বন্দী হলেন।
অনেকের দেশের মাটিতে নাবারও সুযোগ
হলো না। কিন্তু বিপ্লবের প্রস্তুতি এগিয়ে
চলল।.....

পূর্বেই বলেছি যে, বিধাতার ইচ্ছা ছিল
অন্য রূপ। বিপ্লবীরা ব্যর্থ হলেন। মন্ড-
গুপ্তের অভাবে ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে
১৯শে ফেব্রুয়ারির (১৯১৫) ভারতীয় সশস্ত্র-
উত্থান’ বে আলোকের মূখ দেখতে পেল না
তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে,
সফলতার বিপ্লব রচনার মানসে রাসবিহারীর
অন্তর্ধানের কথা।.....

বলছিলাম বটে, বিপ্লবীরা ব্যর্থ হলেন।
কিন্তু বিপ্লব’ ভাতে ব্যর্থ হয় নি। পাকিস্তান
ও বাংলা সৈনিক বড়ো কাছাকাছি এসে নিজে-
দের বক্ষ্যোপিত-ধারা একটি খাতে বইয়ে
দিয়েছিল, একটি সংকল্প নিয়ে। সে অমূল্য
অবদান কি ব্যর্থ হবার?.....

সুদীর্ঘ সাধনা, সীমাহীন দুঃখবরণ,
অপরিমিত ধৈর্য ও প্রত্যয় এক আপাতহীন
বৈশ্বিক কর্ম-রচনার প্রথম বিশ্ববৃক্ষের পর
থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত বাংলা তথা
ভারতের বিপ্লবচেষ্টার ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়ে
উঠেছে। তথাপি স্মৃতির ভগ্নাঙ্গ সে কি
আনিবে না দিন? “স্মরণ কি হবে না কেনা?”
স্মরণ কি বিপ্লব ভারতের জন্মের সাক্ষ্য হয়ে
উঠবে না?.....

মহাজাতির মহাকাব্যের কামনা-ই তো মহান
কাব্যের ভবিষ্যদ্বাণী!...তাই ঐতিহাসিক
প্রয়োজনে ভারতীয় বৈশ্বিক-ঐতিহ্যে শতাব্দী
মুভাবচক্র দ্বিতীয় মহাবৃক্ষের সুযোগ সন্ধ্যা
গ্রহণ করলেন।

১৯৪১ সনের ১৭ই জানুয়ারি বন্দী
অবস্থায়ই পুলিশের চোখে খুলি দিয়ে সুভাষ-
চন্দ্র গালিয়ে গেলেন বালিনে। নতুন করে
থড়ে তুললেন তিনি অধিকতর সাংগঠনিক-
ক্ষমতার, শক্তিতে ও নৈপুণ্যে ইন্দো-জার্মান-
যুগবস্তুর বনিয়াদ। ১৯৪১ সনের ২রা
নভেম্বর বালিনেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো
‘আজাদ-হিন্দ-ফৌজ’।.....

এদিকে রাসবিহারী বসুও চূপ করে
রইলেন না। জাপান-সরকারের সহযোগিতায়
ভারতীয় বন্দী-সৈন্যদের মৃত্ত করে সংগঠিত
করলেন তিনি ইতিহাসবিপ্রভূত স্বাধীনতা
লাগি। তিনিই ডেকে আনলেন নেতাজী সুভাষ-
চন্দ্রকে। সেপে দিলেন তাঁর হাতে স্বাধীনতা
লাগের’ সর্বনেতৃত্ব। বিপ্লবী মহানায়ক
শরিত্ত হলেন মহান জননায়কের বৈশ্বিক-
নেতৃত্বের আবির্ভাব। রাসবিহারীর এই
জমতা-সমপণ এক অকৃতপূর্ব ঐতিহাসিক
জটনা। এ যেন ‘অসুস্থ’ শক্তিকে স্তম্ভ করার

সংকল্পে মহাতাপস বর্ষাচি নিজের আশি-
দিয়ে-গড়া বজ্রখানি তুলে দিলেন দেবরাজ
ইন্দের শৌর্যদীপ্ত হস্তে!.....

দিব্য-শক্তিতে সংগঠিত হলো ‘আজাদ-
হিন্দ-ফৌজ’ ‘আজাদ-হিন্দ-হুকুমতের’ অধীনে।
বিপ্লব সাক্ষ্যকতায় এগিয়ে চলল বর্মার
উপকূলে, ভারত সীমান্তের রণাঙ্গনে, লাল-
কেন্দ্রার অভিমুখে।.....

বাংলাদেশের মূখ

পূর্বেই বলেছি দেশে ও বিদেশে বিদ্রোহ
দমনে পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের
ইউনিভার্সাল এমপ্লয়মেন্ট কলকাতার
পুলিশ চু মারল। এটি বিপ্লবীদের এক
গোপন আভা। কলকাতার বিপ্লবী নেতা
হরিকৃষ্ণ চক্রবর্তী মহোদয়ের ‘হ্যারি এন্ড
সন্স’ ডালানী হয়ে গেছে। ওখান থেকেই
এ গোপন অস্ত্রতানার টিকানা পুলিশের
হাতে এসেছে। তারপর কাপড়িপোদার বে
গৃহে বতীন্দ্রনাথ মুখার্জি সতীর্থদের সঙ্গে
বাস করতেন তা-ও পুলিশ খোঁজ করেছে।
কিন্তু কাউকে ধরতে পারে নি।...

বতীন্দ্রনাথও ভবিষ্যতের সফলতার বিপ্লব-
সম্ভাবনার জন্যে পালিয়ে অপেক্ষা করতে
পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না।
তিনি দেখলেন যে, বিপ্লব আপাত ব্যর্থ
হয়েছে। বিরতি যতক্ষণ সকলের অজান্তে
সংঘটিত হয়ে সকলেই অজান্তে ফেসে গেছে।
জাতির সম্মুখে তুলে ধরার মত আশ্রয় ও
প্রত্যয় কিছু রেখে না গেলে এই ব্যর্থতার
দেশ অবসন্ন হয়ে পড়বে, মৃত্তিসংগ্রামের
সম্ভাবনাও পিছিয়ে যাবে। এ ব্যর্থতার
মূলে দলের কতকগুলো লোকেরই দুর্বলতা ও
নীচ বিশ্বাসঘাতকতা বর্তমান। তাকে অতিক্রম
করে এমন বালিস্ত কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করা
দরকার যার আলোর সকল নৈরাশ্যবাদ দূর
হয়ে যাবে। কাজেই মৃত্তাহীনের ঠৈরব-গীত
শোনাতে হবে আগামী দিনের সংগ্রামী তরুণ
ভারতকে।...

বতীন্দ্রনাথকে কেউ খামোচে পারলেন না।
...তিনি সর্ববরণ্য নেতা। তিনি শক্তির
পূরুষ। অশ্বকরে তাঁর মত নেতাই তো পথ
দেখাবেন। তাঁকে পথ বাতলে দেবার স্পর্ধা
করো হতে পারে না। ভব, একটি প্রিয়জনের
সে-স্পর্ধা হয়েছিল। তাতে বিজড়িত ছিল
বন্ধু ও নেতাকে দুর্ধর্ষনে আরো কাছে পাবার
আকৃতি। ‘বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি’ নামক
গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন শতাব্দী-
ধারীর সাবধান-বাণীর উত্তরে গলাতক বতীন্দ্র-
নাথ বলেছিলেন : “খালি প্রাণটুকু বাঁচিয়ে
রাখার জন্য কি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াব?
আজ আমরা নিজের পরিচয় দিয়ে যাব।”...
এই উক্তি তাঁর পক্ষেই সন্দেহ, যার জ্যোতি
ভঙ্গীও দূর থেকে কানে-কানে বাণী পেঁচছে
যেন প্রাচীর বীরাঙ্গনায়ই মত—‘সেখো, যেন
শনেতে না হয় সিরে গিরিবাস’।...

চিরাগত রায়, নীরেন দাসগুপ্ত, মনোমজুমদার
ও জ্যোতিষ পাল সহ বতীন্দ্রনাথ বড়িওয়ালার
ডীরে গোবিন্দপুর গাঁয়ে এসেছেন। তখন
ভিন্ন মাস+ ভিন্ন নদী পার হলেন। বনের
দিকে পথ চলেতেই গায়ের লোকদের সন্দেহ
হলো। কারণ, দেশে দেশে, শহরে গ্রামে পুলিশ
চোল সহযোগে জানিয়ে দিয়েছে যে, কতক
গুলো জার্মান ও দেশী ডাকাত গুরে বেড়াচ্ছে
শুধু গোপনে গৃহস্থদের টাকাপসসা লুণ্ঠনার
জন্যে। অবশ্য তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে
সরকার বিস্তর পুরস্কার দেবেন।...

গ্রামের লোকেরা বতীন্দ্রনাথদের পেছন
নিল। তাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে বিপ্লবীরা
অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে,
অহেতুক আতঙ্ক নিয়ে তাদের ভিড় করা উচিত
নয়। ভিড়ের মধ্যে পুলিশের লোকও এসে
গেছে। তারা জনভরক উল্কানি দেওয়ার তারা
বিপ্লবীদের পশ্চাতে ধাওয়া করল। ব্যর্থ হয়ে
বিপ্লবীরা গুলী ছুঁড়লেন। ধারপাশে
তখন আর কেউ রইল না। ‘চাষখন্দের কাছে
সাঁতের আবার নদী পার হতে হল। পশু
বীর বসলেন একটি উইরের চিঁবির পাশে।
কুখার ও ভাঙনার সবার দেহ প্রান্ত।...
তারপর কি করে পরীবারীর অবোধ জনতা
এবং পুলিশবাহিনী কড়ক দুর্দিক থেকে
খোঁজও হয়ে ১৯১৫ সনের ২ই সেপ্টেম্বর
বীরপ্রভু বতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও তাঁর সুযোগ্য
সতীর্থচতুষ্টয় সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন
তা’ ইতিহাসপ্রখ্যাত হয়ে আছে। সেখানে
পশু বীরের অসুখ শৌর্য প্রদর্শন এবং বতীন্দ্র-
চিরাগতের মৃত্যুবরণ বিপ্লবী-ভারতকে
বিস্ময়ানন্দে মূগ্ধ করে দিয়েছিল।...

বালাসোয়ের মূখে পাঁচটি ‘মুউজার’
পিঁপড়ালি বিপ্লবনেতা বতীন্দ্রনাথের বীরমুখে
ও তাঁর তরুণ শিষ্য চিরাগত-মনোমজুমদার-নীরেন-
জ্যোতিষের অসহ্য সাধনার কী দুর্জয় শক্তি
ধারণ করে ঘটার পর ঘটা ইংরেজের শত শত
রাইফেল-এর প্রত্যন্তর প্রচণ্ডতম আঘাতে দিয়ে
বাঁজিল তার সংবাদ ভারতবাসী সৈনিক জেনে-
ছিল। এই ষড়যন্ত্রে অশিনস্বাক্ষরে জাতির
শৌর্যময় এক ঐতিহ্য রচিত হল। পশ্চাতে
পড়ে রইল তাদের কলঙ্কবাতী, যাদের বিশ্বাস-
ঘাতকতার ‘বিপ্লব’ সৈনিক সাক্ষ্য হতে পারে
নি। ভারতবর্ষের যৌবন এহেন অপরূপ
সাহসিকতার আশ্রয়প্রভার ফিরে গেল। অকুণ্ঠ
এই আশ্বদানের আলোকশিখা থেকেই আপন
আলোকবর্তিকা জেলে নিয়ে বিপ্লবী তার
ভবিষ্যতের পথ চলছেন। এবং দিনের পর
দিন অজস্র বাধা ও ব্যর্থতাকে পারে দাঁত
করে এগিয়ে এসেছেন বিপ্লবপন্থীরা চট্টগ্রাম-
রাইটার্স-মৌদীনীপুর সঘর্ষের কাল থেকে
‘আজাদ-হিন্দ-ফৌজের’ মূখে। অশ্রুতাপ্যের
বন্দুর পথের বাতীদলের উত্তর-সূরী হলেন
ইন্দ্রজিত মুখার্জি। বিপ্লব-নেতৃত্বের
সাক্ষ্যকতায় পরিণত হল নেতাজীর নেতৃত্ব।...

আদি মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস



মহাশিবতা ভট্টাচার্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর্ব]

৪ সাতচাল্লিশ

নির্মলাকে শিবকালী গান্ধুলী নিশ্চিন্ত আগ্রহ থেকে যখন বর্ধমানের কুটনী প্রোচা নৌকায় তুলে নিয়ে চলে গেল, নির্মলার স্বামী দুলালেব চেষ্টাতেই যখন এটি সম্ভব হল, তখনও শিবকালী গান্ধুলী বিশ্বাস করলেন না নির্মলা দূর্চারিয়া।

তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'আমি বলছি, তোমার বোনকে গৌরীকে বিয়ে করে আমার কাছ থেকে কলন্দী গ্রাম দূরানা যৌতুক নেবে মলে-দুলালে এই কাজ কবিয়েছে।'

'কিছু ছি, মানুষ কি তা পারে?'

'পাবে, বাংলাদেশে কুলীন বামুন সব পারে গিম্মী। তাদের কোন নিষ্ঠুর কাজ ফরতেই আটকায় না। যাক গে, আমার মন শুড় অস্থির হয়েছে, আমি আধারমাণিক যাব।'

শিবকালী গান্ধুলী বললেন, 'ওকে দেখবার জন্যে আমার মনটা বড় অস্থির হয়েছে।'

'তুমি বোনের বাড়ি যাবে, এতে দোষ হবে না ত?'

'বিশলেব বাড়ি আমি হাজরবার মেতে পারি। নেহাৎ ওর সাদা কাপড় পরা চেহারা চোখে সইতে পারি না তাই যাই না। এখন বেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোমরা দু'জন যদি বল তবেই যাব।'

শিবকালী গান্ধুলী শব্দ ধনী নন, ধার্মিক, বিবেচক। দুই বউ-এর পরামর্শ ছাড়া কাজ করেন না।

বড়বউ বড়ই উদ্বিগ্ন হলেন।

ছোট বউ বললেন, 'বোন আর বোন, সাতা, ঠাকুরবি যেন ওর সব।'

বড়বউ হঠাৎ মূখ তুলে বললেন, 'দেখ ছুটি, তোকে আমিই এনেছিলাম, তুই আমার অনেক পরে এসেছিস। ওদের ভাইয়ে-বোনে কি সম্পর্ক তা তুই কি কবে জানাবি? বিশালাক্ষী ওঁব প্রাণ, তা জানিস?'

স্বামীকে বললেন, 'এস, ঘরে এস।'

শিবকালী গান্ধুলী কি যেন ভাবছিলেন, কে জানে। হয়তো নিজের কথাই ভাবছিলেন, তাঁর উত্থানের ইতিহাস যেন বাংলাদেশের একটা বিশেষ অধ্যায়েরই ইতিহাস।

বড় সং রান্নাঘরবেশে ছিলে। রাণী ভবানীর কাছারীর বৃদ্ধ দেওয়ান তাকে পথ থেকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেন। তারপর তিনি নাটোরের বড়নগর-কাছাবীতে ক্রমে সর্বসর্বা হয়ে ওঠেন। তাঁর মার বড় দুঃখ ছিল, 'হাতে রাস্তা কড় ডিম অন্য গয়না পরতে পেলাম না।'

সে-কথাটি তাঁর মনে গাঁথা ছিল। তিনি মনে সতেরো বছরের ছেলে, পুজোর সময়

স্বরং নাটোরেশ্বরী জিগেস করছিলেন, শিবকালীর কি চাই।

শিবকালী সবিনয়ে বলেছিলেন আমার কিছু চাই না। তবে আমার মায়ের রাস্তা কড় পরে অরুচি হয়েছে, তিনি একজোড়া সোনার বালা পরলে আমার মনে শান্তি হয়।'

সে-কথা শুনে রাণী ভবানী কিন্নর হেসে বলেছিলেন, 'তোমার মা যিনি, তাঁর এমব বুদ্ধি কেন হল? বড়নগরের অট্টালিকায় বসে হবিষ্য করবার চেয়ে কুঁড়ে ঘরে গাভা কড় পবে থাকে যে মেয়েমানুষের অনেক ঢাল গো। তা বাক, তোমার মা-কে আমি সোনার বালা পরাব।'

শিবকালী গান্ধুলী যেন সে-সব কথাই ভাবছিলেন। তাঁর উন্নতির ইতিহাস আরো কতজনের উন্নতির ইতিহাসের মত তা কে জানে। নাটোরেশ্বরীর বড়নগরের প্রাসাদের ঘবে শুল্লো তাঁরা যখন বৈশাখের একাদশীতে ছটফট কবতেন, তখন অধ্বংসেশ্বরীর বুকখানা কি ফেটে যেত না? নইলে একদিন মেন বলেছিলেন, 'অধ্বংসেশ্বরী, নাটোরেশ্বরী এ ডাক শুনে আমার আর আনন্দ হয় না। বাংলাদেশে মেয়েমানুষের যা ভাগ্য, তা দেখে সব হয় না আবার কিরে এসে জন্ম নিই।'

মালা ঘোরাতে ঘোরাতে আবার বলেছিলেন, 'কি করে জন্ম নিতে পারি, যদি এমন

সাপ্তাহিক বসন্ত

কিন্তু কোন দৈবস্ত্র বলে দেয়... বাংলাদেশে এমন একদিন আসবে, যখন রাড়ী হলো চিতার তুলে জীবন্তে পোড়াবে না, যখন কচি রাড়ী একাদশী' দিনে মা-জল দে জল দে বলে কেঁদে বুক ফাটাবে না। তা সে আশা দুঃখাশা মাত্র।

শিবকালী যখন তাঁর কাঁধ-ছেড়ে এদিকে মবাব নিজামতে চলে এলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'যাও, তোমার উম্মতি হবে, এটাই চাই। তবে বলি, যে উম্মতির ভবসার আমাকে এ বরসে অসাধু আমলাদের হাতে ফেলে রেখে যাবে, সে উম্মতি কি এখানে থেকে হত না? থাক গে, তোমার মা-বোনব দুষ্ট মোচাতে চও বলসে, তাই আর বাধা দিলাম না।'

একথাটির মধ্যে নাটোরেশ্বরবাব আর এক ক্ষোভ, আর এক মনোবেদনা লুকিয়েছিল। তাঁর দত্তক ছেলে রামকৃষ্ণ কৈশোব থেকেই শ্যামাভক্ত।

'বরস হলে স্বভাব শান্ত হবে,' শিবকালী মৃদুস্বরে বলছিলেন।

'না না, আমাব ছেলে মায়ের দুঃখ, বোনের দুঃখ ফিরে দেখে না, সে তার কালী-মাকে নিয়ে উন্মত্ত। মা-কালী-জগন্ময়নীর, তাঁর অনেক সন্তান। আমার যে এ দুটি-বই আর নেই। তারা বিধবা, ছেলোটা পাপল, মা কি নিয়ে বাঁচে বল? অথর্বস্বের রাজঘরে কি সূয়া আছে, মায়ের বুক জড়িয়ে দিতে পারে, তা কে জানতে চার বল? তাই ত'মাকে বলি, তোমার কোটি সন্তান আছে মা, আমাব একটি, তাকেই নিলে? রাজার সন্তান, লক্ষ লক্ষ প্রজাব দায়িত্ব নিতে হবে, সেখ গে যাও, রত্নজবা ফুলের গাছের দিকে চেয়ে মরা-পরা-প্রভাসাদি গান গাইছে। কুমারহট্টের প্রসাদ সেন কি সর্বনাশা গান বাঁধলে বাবা, আমার ঘরের সুবশান্তি এ গানে হবে নিল।'

আধখানা বাংলা, আর লক্ষকোটি প্রজার ঝিয়েছে ভারে ক্লান্ত, তেজস্বিনী, অভিময়িনী রাণী ভবানীর দিকে তাকিয়ে শিবকালী গাঙ্গুলীর মনে বড় কষ্ট হয়েছিল।

'আপনার আশ্রয় ছেড়ে যেতে আমাব বুক কেটে যাবে মা। কিন্তু বাবা বিগত, বড়মা সত্যি হয়েছেন, ছোটমা, আমার নিজের মার কেলে আমার ছোট বোন, আমার একসংসার। এদের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমাকে অন্য আশ্রয় সন্ধান করতে হচ্ছে।'

বাণী ভবানী দেহ রাখলে নাটোর রাজ্যের আর ভবিষ্যৎ নেই, একথা শিবকালী সোদিন কাঁদতে বলেন নি।

তারপরে সবই হল একে একে। বিষয়, কৈবল্য, সম্মান। শূন্য হল না ছেলেমেয়ে, আর বোন বিশালাক্ষীর সখ্যে আনন্দী-জন্মের দিকে চেয়ে শিবকালী দত্তক নিতে রাজী হলেন না।

একদিন তাঁর জীবন শূন্যই ছিল। কিন্তু বিশালাক্ষীর কথার বোদিন নির্ধাতিতা নির্মল্য

এসে তাঁর কাছে বঁড়াল, সোদিনই সেন দুঃখ শিবকালীর অন্তরের সুখার গোপন উৎস বলে দিল কে।

নির্মলাকে কতই আশ্রয় করে তিনি বললেন, 'কেমন করে এমন মালা ছিল ভাসালে তোরা বাবা? কে তোকে কলঙ্ক দিয়েছে মা?'

নির্মলাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তিনি পুজোর কাজে ছেড়ে নিলেন। একদিন হেসে বললেন, 'আমার কাছে আঁক শেখ' মা। তোকে হিসেবপত্তর বুকিয়ে দিই। তুই আবার শুদের বুকিয়ে দিবি।'

তখন তাঁর দুই স্ত্রী মনে করেছেন এ হল পুর্ন ভীমরাতির লক্ষণ।

সেই নির্মলা যখন এমন করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তখন তাঁর মনটা হঠাৎ বিশালাক্ষীর জন্যে হু হু করে কেঁদে উঠল।

তাঁর বড়বউ বললেন, 'যাও, আধারমাণিক যাও। ঠাকুরাণিকে দেখলে তোমার মন শান্ত হবে।'

শিবকালী হঠাৎ হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখ, তোমাদের দুজনের কাছে হয়তো কত সময়ে কত দোষ করেছি... মনে রেখ না।'

বড়বউ অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার কি শরীর খারাপ করছে?'

কেন?'

না, তোমার মতো এমন উল্টো-পালটা কথা?'

কেন জানি না এমন কথাটা মনে এল।

আধারমাণিক যাবার জন্যে শিবকালী যখন প্রস্তুত হলেন, তখন বড়বউও এসে পালকীতে উঠলেন।

সে কি, তুমি বাব না কি?'

হ্যাঁ গো, হাতে করে মানুষ করেছি, হতভাগী আনন্দীর ছোটবউ-এর ছেলে হতে একটা স্ববর দিল না এমন পাষণী! তুমি ওর তত্ত্ব করতে বাছ, আমি যাঁছি স্বগড়া করতে।'

স্বগড়া করতে বাছ তো পালকীর কোণে ওগলো কি?'

কুম্ববউয়ের ছেলে হয়েছে, ওর কাপড়, গলাব হার, ছেলের গলার হার, হাতের বালা, মাথার পট্টে, ঠাকুরাণির জন্যে এ পেটীয়া।'

'পেটীয়া, পেটীয়া কিসের?'

'আর-কিসের! জাঁতিবর থেকে সুতো আনাগাম। তোমার বোনের যে দেশছাড়া শখ গো, সুতো দিয়ে কেমন নকশা তোলে কাপড়ে।'

অবাক করলে বড়বউ, 'এই বরসে নকশা তোলা কাপড় পরবার শখ?'

শিবকালী একটু হাসলেন। বললেন, 'বলেই হত, আমাকে একলা ছেড়ে দিতে চাও না? সময়মত ব্যবস্থা করে আসতাম।'

'কিসের ব্যবস্থা?'

'ঘরদোরের।'

কেন, আমাকে কি চিরতরে নিয়ে যাবে না কি?'

'শর, আমিই চিরতরে যাঁছি!'

বড়বউ গালে ডামাকের গুল টিপে দিয়ে বললেন, 'শুভ সোচ্চা নয় গো, আমি আঁছি ছুটি আছে, দুজনে সঙ্গে যাব।'

'আচ্ছা, যেতে চাইছ কেন?'

'আর কেন, দেখতে যাঁছি নির্মলার আর বোনটোন যদি থাকে, তবে তাদেরই কলঙ্কে নয় সতীন করে ঘরে আনব। তোমার চেহারা যে দকে গেল পা। নির্মলার শোক ভুলতে পারছ না।'

শিবকালী একটু হাসলেন। বড়বউও তবে নির্মলাকে ডালবেসেছেন।

দেখো বড়বউ, ডাকে ফিরে গেলে আর অমরবাদা কোর না। তাকে আমি মা বলেছি।'

'আমিও কলব। নাও, পালকী ভুলতে বল।'

আধারমাণিক গ্রামে এসে শিবকালীর কড়কট, নদের সংসারে এসে কেবলই হাসিঠাট্টা-রসরস নিয়ে রইলেন। কুম্বমালার গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'রাসার নুন-ঝাল ঠিকমত দিও মা। আমার জোয়াদা রাগ, মামীশাশুড়ী হই।'

কুম্বমালা তাঁর দেওয়া শাড়ি গয়না পরছিল। সে হাঁ করে চেয়ে রইল। ইনিই বিশালাক্ষীর বড়ভাগ, সোনার বাটাস পান খান?

বিশালাক্ষীর হাতে সুতোয় পেটীয়া দিয়ে বললেন, 'এমন নকশা তুলবি বিশা, যেন ঝালুচরী হাব মানে।'

'এই বরসে বেরাড়া শখ!'

বিশালাক্ষী মৃদু হেসে ভাজের পায়ের ধুলো নিলেন। একসময়ে মানুষ করেছেন, মা বললেও হয়।

দাদার সামনে যাবার আগে... বড়বউ মনে করিয়ে দিলেন। অনেকদিন আগে নন্দ-ভাজে কথা হয়েছিল শিবকালীর মনে দুঃখ হয়, তাই বিশালাক্ষী সাদা ধান পরবেন না।

অগত্যা বিশালাক্ষী ভাল-শান্তিপুত্রী করলোপেড়ে কাপড় পরলেন। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন, 'কেটে ফেললে হাদামা মিটে যার বউতান। তবে বড়বউ বলে আমি চুল কেটে ফেললে-সে আমার দুঃখ দেখবে না।'

আনন্দী যে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে বিশ্ব।'

বলতে বলতে বড়বউ-এর বুক ফেটে নিশ্বাস উঠে এল। বিশালাক্ষীও পদ্মের মত মৃদু। এই বরসেই পাথরের প্রতিমার মত গম্ভীর সৌন্দর্য। দেখলে তাঁর বুক কেটে যায়। কে ভালবাসে না? বিশালাক্ষীকে পথের কুকুরটাও ভালবাসে।

দাদার কাছে যাই! বিশালাক্ষী চলে গিয়েছেন।

শিবকালী গাঙ্গুলী তাঁকে নির্মলার সম্পর্কে সব কথাই বললেন। বললেন, 'তোরা বউঠান ছাড়বে না, সঙ্গে এল। আমি নির্বাত জানি ওর স্বামীই এই কাজ করলে। আমিও বলেছি গৌরীকে ওর সঙ্গে কিষে দিলে কাণ-কড়ি বোঁতুক করব না।'

বিশালাক্ষী যেন শিউরে উঠলেন। বললেন, 'সম্পত্তির লোভে এমন কাজ করবে? বলেন কি দাদা। মানুষ এমন কাজ করতে পারে?'

'পারে বিশা, লোভে পারে।'

'কিসের লোভ দাদা?'

'আমি গোবীকে বা বোঁতুক করব তার লোভ।'

'এমন হয়?'

'হ্যাঁ রে হয়। বাংলাদেশের কুলীনবান্দন পরে না এমন কাজ নেই। দেখলি না হাসতে হাসতে তোরা মত সোনার প্রতিমাকে বন্ধের হাতে...'

শিবকালীর গলা রুদ্ধ হল।

'আপনি আপনাব কতকা করেছিলেন দাদা।' বলতে বলতে বিশালাক্ষীর মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। স্বামী বরসে বৃদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি বিশালাক্ষীকে সম্মান করতেন, আনন্দ্যর মত সম্মানকে রেখে গেলেন। না, দাদাব ওপর তাঁর কোন অভিমান নেই।

'ওবে, নির্মলাকে আমি খুঁজতে যেতে চাই।'

'খুঁজে গেলে কি করবেন?'

'যেই ফাঁবিষে আনব। নইলে বাপ-মেয়ে কাশীবাসী হব।'

এ-কথাটি বলে শিবকালী হাসলেন। বললেন, 'তোকে কাছে পাই না। আনন্দ্যী অমাব সম্পত্তি নিলে না, নির্মলা যখন আমাব কাছে আসে, তখন কি জানি ওব ওপব এমন মায়া পড়বে? আব, মায়া পড়বার কথাও বলি না বিশা, শব্দ বলি আমার কাছে সে আগ্রহের আশায় গেল, কিন্তু সেখান থেকেও সর্বনাশ হল?'

'নির্মলার ভাগ্য।' বলে বিশালাক্ষী নিশ্বাস ফেললেন। এখনো পারা বাগদিনীর দৃষ্টি তাঁর বৃকে লেগে আছে। সে আব এক অভাগিনী।

'মেয়েদের জীবনে শব্দ দৃষ্টি দাদা।' বিশালাক্ষী মৃদুস্বরে বললেন। অন্য যে-কোন লোক, শিবকালীর মত বৃদ্ধ পুরুষ, নির্মলার জন্যে উতলা হলে হয়ত তাব অন্য অর্থ হত। বিশালাক্ষী তা তাঁর বড়পুত্রবধূর বাবা জগৎপতির মত লোকের কথাও জানেন। কিন্তু শিবকালী গাঙ্গুলীর চাবিয়ে কলঙ্ক নেই একথা তাঁর মত আর কে জানে?

'কোথায় তাকে খুঁজবেন দাদা?'

'দেখি।'

'আপনাব বরস হয়েছে।'

'ওবে, আমি কি আর যাব? টাকা ফেললে লোক আসবে।'

'সে যাবেন এখন। বর্ষা এলে নদীপথে যাওয়াব সুবিধে হবে। এখন আপনাকে যেতে দিচ্ছি না।'

'যাব কি বে, তোব কাছে একমাস থাকব বলেই এলাম।'

'একমাস থাকবেন।'

'হ্যাঁ বে, তাই তা' হচ্ছে। তা বিশা, আনন্দ্যী আসবে কবে? ওর সম্পত্তি ওর হাতে তুলে দিয়ে যে আমি বাঁচি।'

'দাদা, আপনি তা সবই জানেন। ঐ বড়-বউ বাছার মনে দৃষ্টি দিয়ে চলে গেল। তাই তা' ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে মোদিনীপুত্রে গেল।'

'তা ভাল করেছে। বেটাছেলের তেজ থাকা ভাল। চিঠি দেয়?'

'কখনো সখনো।'

'কেনন করে আর দেবে বল। দেশের অকম্বা যা হল, কোন লোকটা চিঠিপত্র নিয়ে আসাযাওয়া করতে পারে।'

দাদা এসেছেন, যেন অনেকদিন बादে বিশালাক্ষী হিমালয়ের কোলে আশ্রয় পেলেন, এমনই নিশ্চিন্ত বোধ হল। মাহিম্মারদেব ডেকে জেলেপাড়ার পাঠালেন, বললেন, 'বড়-দাঁঘিতে জাল ফেলতে হবে।'

সেই গেব্দাধারী ও পাগল, এবা দুজন তাঁর মস্ত সহায়। তাদের দৃষ্টি-মিষ্টামের খোঁজে পাঠালেন। তারপর একবাটি তেল নিয়ে বড়ভাজেব চুলে মাখতে বসলেন।

'তোরা বড়বউ-এর এখন হাড়ির হাল। ডোরমর দুর্গতি, তা জানিস?'' অড়ভাজ চোখ বৃক্ষে বললেন।

'কেন?'

'কাকার বাড়ি হাঁড়ি ঠেলেতে হচ্ছে।'

না বউঠান, ওর কাকা এখানে এসেছিলেন একবার। বড়বউকে উঁচন বস্ত ভালবাসেন।'

'তুই তোব বউ-নাড়িকে আনিরে নে না। সে নাকি আসবাব জন্যে ছটফট কবছে।'

'আর সেখে আনব না বউঠান। যদি সেখে আসে, নরম হবে থাকে, তবেই যাব, নইলে

আমাব বডছেলে বাগ কববে। ও নলে ফু-বউকে আব আমবা ডাকতে যাব না।'

'ওলো, এখন সেখেই আসবে। মূলেশববী তা আর একেশববী নেই। এই যে কুন্দবউটি হয়েছে, আব একটি নাতি হয়েছে, এখন সে নিজে থেকেই নবম হয়ে থাকবে জানবে এতদিনে ভাগীদার এসেছে। কই কোথায় যাস?'

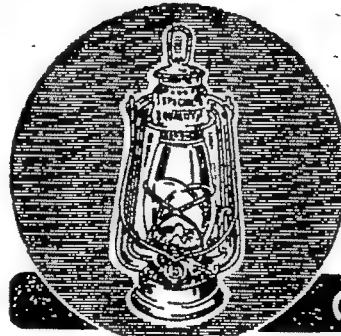
'তোমাব শাড়িতে নকশা তুলতে যাই। তুমি নেবে এসে রামাবামা দেখ না কেন! আমি এখন আরাম কবি।'

বড়বউঠান বিশালাক্ষীর গা টিঙ্গে বললেন, 'না রে, তুই তা' বাবো মাসই হেসেলে। আমি কুটুম হবে সে-কাজ করতে গেলে নিশ্চই হবে, তাই দেখ না তোরা বডসতীন তো। ননদ, দুজনে আজ হে'সেলে যাচ্ছেন।'

বিশালাক্ষী সংসার থেকে ছুট নিয়ে, যেন কদিনেব জন্যে দাদার আদবে যোন, বউঠানেব আদরেব ননদ হয়ে গেলেন।

সুতোব বিন্দি বেতেব ঝাল নিয়ে দাদার কাছে বসে বসে শব্দ গল্পই শুনতে লাগলেন। শিবকালী গাঙ্গুলীর অন্তরের কোথায় যেন অমনি আরেকটি চিত্রাবচিত্র গল্প-ভরা ঝাল থাকে। বিশালাক্ষী টুপ কবে সেটিব টোপব খুলে নিলেন। শিবকালী গাঙ্গুলী গোড়দেশ, বস্ত্রদণ, সখ জ্যাবগার বড় বড় বাজ-পবিবাবেব উতান-পত্তনের গল্প জানেন।

এতদিন পবে মনের মতন শ্রোতা পেয়ে তিনি যেন ভুলেই গেলেন ওদিকে, বাজ-ধানীতে, নবধাঁপে তাঁর কত কাজ পড়ে আছে। ভুলেই গেলেন। নির্মলাকে উতান কববেন বলে কথা দিয়েছেন। আধাবমাণিশ গ্রামে, বিশালাক্ষীর বাড়িতে বসে বসে তিনি জানলা দিয়ে দেখতে লাগলেন প্রাচীন শ্মশানতলার মাঠের ওপবে, দেবদেউলের শ্যাভো-ঢাকা চুড়োব, গ্রামশেষেব জঙ্গলেব ওপর দিব কালো মেঘের সাজ, বর্ষা আসছে।



কিষাণ
লঠন
অবোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোঃ

ফোন-২২-৬৫৮০

২৩৬, ৩৩৩ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সাপ্তাহিক বসুমতী

পুরনো পালঙ্কে, গায়ের ওপর বিশা-
লাক্ষীর হাতে সেলাই-করা পুরনো কাঁথা টেনে
নিরে বসে পিলসুজের আলোর বিশালাক্ষীকে
গল্প বলতে লাগলেন। দেখে মনেই হল না
এই শিবকালী গাঙ্গুলী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের
বাড়ির অষ্টমী পুজোর বিশেষ নৈমন্ত্য পান।
ষট্টি বছর বারদালের মেলায় শিবনিবাসে তাঁর
ডাক পড়ে। মনেই হল না বাড়িতে ইনি
নিত্য সোনার না হক, রূপোর খালার ডাক
খান।

এখন জামিরের ছেড়ে তাঁর গায়ে কতুয়া,
বালাপোষ ছেড়ে গায়ে কাঁথা। 'কঠিলবীচি
গোড়া তেলনুন দিয়ে মেখে দিস বিশু', এই
তাঁর ফরমাস। এখন বলে বসে তিনি কত
গল্পই বলতে লাগলেন বিশালাক্ষীকে।
মহাটোরেশ্বরীর শাল ছেলে রামকৃষ্ণের গল্প,
সাতদুর্গা-একিকিরার খাঁ-ভাদুড়ীদের পড়নের
গল্প, রূপ খাঁর তিনুশা পাঠান সেপাই
হলোছিল কোন পথে শত্রু আসে দেখে নেব।'

রূপ খাঁর বোন সর্বমঙ্গলা প্রাতঃহস্তা
মহাটোরেশ্বরীর রামকৃষ্ণের সঙ্গে কেমন করে

বেবাহিক সম্পর্ক পাততে গেলেন সেই গল্প।
রূপ খাঁর আশ্চর্যরূপ মৃত্যুতেও অক্ষুন্ন ছিল,
আব তাই দেখে না কি রামকৃষ্ণের রায় বক্তৃতে
পেরেছিলেন বরেন্দ্রভূমির অনেক জমিদারীকে
খরসে দিয়ে এই যে নাটোরের রাজ্য বড়
করছেন, এ ঘোষণা টিকবে না।

কখনো তাঁর নিজের গল্পই করতে
লাগলেন। 'বুঝলি বিশু, বড়মা আমার হাতে
সংসার রেখে যখন সতী হলেন, তখন আমার
বরস সামান্য। পথে খিদে পেত, নিত্য
পুকুরপাড় বসে চিড়ে ভিজিয়ে শেতাম।
শীতকালে মা এমনি একখানা কাঁথা আমার
কাঁখে গেরো দিয়ে বেঁধে দিতেন। তখন তুই
একমাসের মেয়ে, উঠানে তাকে শূইয়ে মা
আর তোর এই বড়বউঠান মূড়ি ডাকত।'

এ-গল্প সে-গল্প করতেন বসে বসে। সেই
গল্প শুনতে শুনতে বিশালাক্ষী বড়বউঠানের
কাপড়ে রঙিন সুড়োর কঁটা নকশাই যে
তুললেন, চিড়েফুল, লবঙ্গফুল, মৌরীলতা।
জালসুড়োর এই এতটুকু টুকু মাছ, পাখি,
হাঁসের মধ্যে স-নালপান্না দেখতে দেখতে
শাড়ি বেন ঝলমল করতে লাগল।

বিশালাক্ষীর সূঁচে শেষ ফোঁড়িটি দেওয়া
হল, এদিকে বর্ষা ঝামলা। যেদিন থেকে দেশে
বর্ষা, সেদিন থেকে হয় অভিবৃষ্টি, নয়
অনাবৃষ্টি। এ-বছর বর্ষা মুখ দেখিয়েই
শুকিয়ে গেল, চাষীরা বললে 'আহা, রাজনা
দেব কিসে?'

ওদিকে শিবকালী গাঙ্গুলী বড়বউকে
নিরে পাল্কা চড়ে রওনা হলেন। যাবার
সময় বললেন, 'বিশু, নিম্নলার খোঁজ আমি
করাব নিশ্চয়। তুই ভাবিস না। আর শোন,
আনন্দীকে আসতে চিঠি লিখে দে। আমার
মা আছে তাই নাড়াচাড়া করে দিন কাটুক।
দেখ ওব বাপকে আমি কথা দিয়েছিলাম
তোকে আর ওকে দেখব।'

ভোর শাড়ি ছাটির সামনে পরব বিশু
ছাটি হিঁসের মরবে।' বড়বউ হাসতে হাসতে
গিরে পাল্কাতে উঠলেন।

তিনদশ ঘণ্টা না যেতেই সর্বনাশের
খবর এল।

(চমক)

তোমার প্রেম

করুণাসিন্ধু দে

তোমার প্রেমে যখন খুঁশি ফকির সাজ্য
সকাল হতেই ম্বারে ম্বারে বলা
বে আমারে মুকুটবিহীন করলো রাজ্য
তার হৃদয়ে অনেক ছলাকলা
কী কোঁতকে ফোটাতে সে ঘন রক্তে
তোমার প্রেমে যখন খুঁশি হারিয়ে যাওয়া
খামখেয়ালি গানের কালি ধরে
অনন্তকাল, তপ্তদহন, জ্বলা!
তোমার প্রেমে যখন খুঁশি হারিয়ে যাওয়া
অনুভবের অন্ধকারে খেলা বাওয়া
একল ওকল দুকল ঢলে পড়ে;
নুপূরধারী বকের মাঝে যখন পাওয়া
তখন ফেরা শূন্য হাতে ঘরে।

নিবিড়তর

বেণু দত্তরায়

কিছুই দিলে না। অন্ধ তেপান্তর।
এ-পারে ও-পারে শব্দ খাঁ-খাঁ করে চড়কভাঙার চর।
গল্গল বেলেমাটি
দুকে দিলে না, হৃদয় অঁধে গলিত সোনার
গাম্বত তার চোখের আলোর গাঁত
ছুগছে জীবন মন্দার সম্প্রতি।

হাবনেব এই বেতা ও কেনার পক্ষে
দুটপাখ ভালো। বলো না কিসের জন্তে
মো বাঁধার সোনালি আলোর ফেরা?
হায়রে নাকাল ডুবুরী, পাঞ্জর-ছেঁড়া
কটা মৃত্যুর দাসকে এই জীবনের পরমায়
জ্বলন্ত ব্রহ্ম বাজার অন্ধ স্নায়।

ঘুম নেই

জয়ী আমিনউদ্দিন আহমদ

সমস্ত চেতনা আমার
জ্বালিত অবসন্নতার বিলুপ্ত হলে
আমি অন্ধকারে একা পড়ে থাকি
মাদিগন্ত মাঠের মতো,—রাতির বকে।
মাদিগন্ত তখন অজস্র তারা
জানাকীর মতো কিকিমিকি জ্বলে
চকচকে কোন শব্দ নেই,—চারদিক
নিস্তব্ধ-নিবন্ধ
অথচ কী আশ্চর্য! আমার নয়নে
নেই শব্দ, ঘুম।

দব ঘুম শেষ হয়ে গেছে
আব কোনদিন ঘুমেব না
ঘুমের বার্থ প্রবাসে সারারাত জেগে
এখন দেখব শব্দ রাতির সোপান অভিসার
ভারপর একদিন সব দেখা শেষ করে
নিরন্তাপ হৃদয়ে শূন্য মিলিয়ে যাব
যাব আমি ঘুমের বহুর অভিসারে
নিঃশব্দে—রূপসী ঐ রাতির মতো—।
তখন থাকবে শব্দ মঠভরে হাওয়ার বিলাপ।

প্রথম মহাব্যবস্থার অবসানের পর বৃটিশ ইতিহাসবেত্তা আচার্য টেলার, গল্‌গুইন প্রণীত বৃটিশ নীতি ও রাজনীতি-সম্পর্কিত এক পুস্তকের পর্যালোচনায় এক আসন্নরাজ সিংগাপুর নিরবচ্ছিন্ন বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাব্যবস্থার পর সেই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশরাজ তার করেরকটি সমুদ্রে ভাসমান বিক্ষিপ্ত তৃণ-শব্দ আঁকড়ে ধরে রাষ্ট্রবান জন্য ভারত মহাসাগরের বৃকে কতকগুলি ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলিয়া শাসিত স্বীপে মার্কিন সার্বিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার পবিত্রকল্পনা করেছেন যাতে একটি ঘাঁটির শিকল দিয়ে আফ্রো-এশিয়াকে ঘিরে রাখা যায়। হালে ভিয়েগো গার্সিয়া স্বীপে সেই পরিকল্পনার উপ-

কল্পনিকা সূত্র দিয়ে গিয়েছে যা শব্দ যে বৃটিশকে সাহায্য করবে তাই নয়, ভূমধ্য সাগরে মোভারেন মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর ও প্রশান্ত মহাসাগরে ইন্দোচীন উপকূলে বুদ্ধমান সন্তান নৌবহরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে। আজকের দিনে আফ্রো-এশিয়ার ইংল-মার্কিন প্রভাব প্রতিপত্তি কল্পনা রাখার এবং জগৎ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে, অমৃতবাজার পত্রিকা সন্তব্য করেছেন যে, আসন্ন আলজিরিয়া সম্মেলনের মধ্যেই যে ভিয়েগো গার্সিয়ার ব্যাপারটা ঘটি, এটা ভালই হয়েছে, কারণ এর ফলে সম্মেলনের দৃষ্টি আফ্রো-এশিয়ার এই বিপদের দিকে আকৃষ্ট হবে।

আফ্রিকার সংহতি আন্দোলন প্রধানত দ্বিতীয় মহাব্যবস্থার একটি পরিণাম যদিও এই সংহতির অন্ধুরোপায় হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে। আজ এশিয়া আর আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকায়।

আফ্রিকার সংহতি আন্দোলনের উপনিবেশবাদ বিরোধী চরিত্র সর্বপ্রথম দানা ধরে ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে, যদিও তার কিছু আগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনকে আমবা বান্দুং-এর পূর্বসূরী বলতে পারি। বান্দুং-এর পরে কায়বা, কানার্ক, মোশী, তিউনিস প্রভৃতি আফ্রিকার রাজধানীতে আফ্রিকার জাতিগুলি পার পার সম্মিলিত হয়েছে। প্রতিটি নতুন সম্মেলনে দেখা গিয়েছে কতকগুলি নতুন জাতীয় পাতাকা। একদিকে চলেছে সম্মেলন অন্য দিকে চলেছে আফ্রিকার বিভিন্ন পরাধীন দেশে মুক্তিসংগ্রাম, কোথাও সহিংস, কোথাও বা অহিংস। যুগনির্ভীত জনগণ যেখানে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়েছে সেখানেই দেখা গিয়েছে যে ইংবাজের হাতে শিক্ষিত সিপাহীরা যেমন সিপাহী-বিদ্রোহ করতেন, তাদেরই শিক্ষিত নৌ-সেনানীরা যেমন বোম্বাই-এ নৌবিদ্রোহ করে-

আফ্রিকা-এশিয়া দৈন্যগুলির বিভিন্ন সমস্যা

তব্বন চট্টোপাধ্যায়

ছিল, ঠিক তেমনি উপনিবেশভোগীদের শিক্ষিত স্থানীয় সেনা ও সেনানীরাই বিপ্লবের মেরুদণ্ড রূপান্তরিত হয়েছে (মিশর, আলজিরিয়া, ব্রুন্স, কঙ্গো, ভিয়েনাম, মালি ইত্যাদি)। ঘানার বন্দী দেশভক্তরা কারাশ্রমচারের অন্তরালে গোপনে গোপনে যেমন "স্যাডো ক্যাবিনেট" তৈরি করেছিলেন, তেমনি মিশর ও ব্রুন্সে "স্যাডো ক্যাবিনেট" গড়া হয়েছিল সৈন্যদের ছাউনির মধ্যে।

আজ সম্মেলনে আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতিগুলির আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে, সদ্য স্বাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রাখা, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় করা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার কর্তব্য বন্ধকণ্ডে ঘোষিত হয়।

আম্বিস আবাবা সম্মেলনে যে ৮টি নতুন জাতি যোগ দেয় তাদের মধ্যে ক্যামেরুন, গিনি ও টোগোল্যান্ড সদ্য স্বাধীন হয়েছিল এবং নাইজিরিয়া, মালি, সোমালিয়া, মাদাগাস্কার ও সিয়েরা লিওনের স্বাধীনতা লাভের তারিখ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। আলজিরিয়ার অস্থায়ী সরকারও সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আগেকার ও হালের উপনিবেশবাদীদের কণ্ঠস্বের (প্রধানত দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ বোরেন্ডশিয়ান), আলজিরিয়া ও অ্যাংগোলায় গণহত্যা, সাহারার ফরাসী পরমাণবিক পরীক্ষা ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ইত্যাদি আফ্রিকার জাতিগুলির স্বার্থের পরিপন্থী বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন এবং প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

আফ্রিকার সংহতি আন্দোলন যত ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে ততই আফ্রিকা ও এশিয়ার জাতিগুলির রাজনৈতিক চেতনার রূপরেখা পরিষ্কার হয়ে আসছে। একটি উদাহরণ দিই। বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি ব্যবহার করা হবে কি না, আজ সম্মেলনে তাই নিয়ে

তর্কবিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু মোশী সম্মেলনে 'সাম্রাজ্য বা দে ন' অস্তিত্ব সকলেই এক বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন। বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদবিরোধ সংগ্রামে আফ্রিকার জাতিগুলির ভূমিকা মোশী সম্মেলনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কতকগুলি বেসরকারি আন্দোলন মোশী সম্মেলনে আফ্রিকার জাতিগুলির একতা ও সংহতির দিকটি যেমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল তেমনি আন্দোলনের ভিতরকার কিছু কিছু অশুভ লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছিল। নিম্নোক্ত আলোচনা ডাঃ হেস্টিংস বান্দা (বিনি সোনিম ঘোষণা করেছেন যে টাংকা বিনিময়ে বিনি চীনের বান্দা বনে যেতে বাজী হন নি) আমন্ত্রিত হয়েও মোশী সম্মেলনে যোগ দেন 'নি কমিউনিস্ট জুজুর' জিগির তুবে। আগেকার ১৮টি ফরাসী উপনিবেশের ১৪টি নিয়ে যে আফ্রো-মালাগাসি রাজ্যগুলি খড়া করা হয়েছে, তারাও মোশীতে উপস্থিত ছিল না। এই রাজ্যগুলি ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এগুলির বান্ধব-বন্ধুদের মাঝে ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষিত-দীক্ষিত ফরাসী উপনিবেশবাদীদের প্রতি বন্ধুত্বাবাদ নেতারা। তাঁরাই আজ আলজিরিয়া সম্মেলনে মালয়েশিয়ার যোগদানের পক্ষপাতী। এই ধরনের মিতমিত নয়া উপনিবেশবাদীদেরই সুবিধা কল্প দেয়। মোশী সম্মেলনের সময় কেনিয়ার অবস্থা স্বাধীন হয় নি। কিন্তু আজ স্বাধীন হয়েও কেনিয়ার কণ্ঠস্বর আফ্রিকার সংহতির পক্ষে বেসরকারি বলেই মনে হচ্ছে।

আফ্রিকার সংহতি আন্দোলনের মধ্যে কোনো কোনো জায়গায় আন একটি অবাঞ্ছিত ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটি হচ্ছে সেই উৎকট স্বাদেশিকতা, বা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব জাতিমাত্রকেই শত্রু বলে মনে করে। এই ধরনের মনোভাবের অভিযোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মধ্য প্রাচ্যে। এই উৎকট শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ববিশেষ আফ্রিকার আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উপকরণে রূপান্তরিত হবে।

যে অষ্টকের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দূনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে দুর্বল করে দিয়ে পরাধীন জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করে, তার নেতা ছিল শ্বেতাঙ্গ বংশ জাতি। তারপর শ্বেতাঙ্গ মহামুখ্য ফ্যাসি-বাদকে পরাজিত করে নিপীড়িত জাতি-গুলির স্বাধীনতা সংগ্রামকে অতীতপূর্ব মনোযোগ দেবার ব্যাপারে যাদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বড়, তারাও এই শ্বেতাঙ্গ বংশ জাতি। তাছাড়া প্রত্যেকটি শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে একটি প্রগতিশীল অংশ আছে যারা পরাধীন জাতির বন্ধু। সুতরাং নিষ্ক শ্বেতাঙ্গ বিশ্বের আফ্রিকার আন্দোলনের মধ্য সংখ্যা কমিয়ে দেব মাত্র। এই প্রসঙ্গে আফ্রিকার সম্মেলনে সোভিয়েটের বোগদান নিয়ে যে তর্কবিতর্ক উঠেছে সেটাও ভাববার বিষয়। আমাদের মনে আছে যে এক সময়ে নেহরুজী এই ধরনের সম্মেলনে সোভিয়েটের বোগদানের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন (কারণ যে দেশের প্রশাসন কেন্দ্র ও প্রধান নেতৃবৃন্দ ইউনাইটেড, সে দেশকে তিনি ইউ-রোপীয় বলেছিলেন) এবং তখন চীন সোভিয়েটের বোগদান সমর্থন করেছিল। আজ ভারত ও চীনের অভিমত ঠিক উল্টা হয়ে গিয়েছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। আগে ভারত ও চীন দুজনেই সোভিয়েট দেশকে বিপ্লবকারী বলে মনে করত। আজ দুজনের কেউই সোভিয়েটের বর্তমান নীতিকে খুব একটা বৈশ্ববিক বলে মনে করে না (যে কোন স্থানীয় বৃদ্ধ এমন কি মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব পাবনাগণিক মহাসম্মেলন রূপ নিতে পারে, সোভিয়েটের এই মত থেকেই চীন মনে করে যে, আফ্রিকার

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংহতি এই মত প্রচলিত করে দিবে)। সুতরাং এই দুটি দেশের সমাজ ব্যবস্থার বিপরীত চরিত্রের জন্য আগেও যেমন সোভিয়েটের বোগদান সম্পর্কে দুই দেশের মত ছিল দুর্বল আঙ্গু-ঠিক সোভিয়েট সম্পর্কে ধারণা বদলানোর দরুন তাদের মতও উল্টে গিয়েছে।

উপনিবেশবাদের পরোক্ষ উপস্থিতি

আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির সামনে সবকাব গঠন করাটা প্রধান সমস্যা নয়। প্রধান সমস্যা হচ্ছে আগেকার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও সম্পর্কগুলি নিশ্চিহ্ন করে নতুন ভিত্তি উপর তাদের দেশীয় ও বৈদেশিক নীতি বচনা করা। কিন্তু আগেকার বৈদেশী শাসকরা এমন কতকগুলি বিভেদের মালমশলা রেখে গিয়েছে, তার বিভিন্ন দেশ ও জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধি বিঘ্নিত করেছে। পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে রাখবার জন্য তারা দেশে দেশে উপজাতীয় দলপতিদের ঘৃণা দিয়েছে, দেশীয় ধনী সম্প্রদায়কে ইউরোপীয় কাষবার তালিম দিয়েছে, যাতে বড় বড় সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে তারা দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখদর্শনা থেকে দূরে থাকে। দুটি দেশের মধ্যে সীমান্ত অনির্ধারিত রেখে, দেশবিভক্ত করে তাবা সদাসর্বদা ঝগড়ার খোঁচা রেখে গিয়েছে। যেমন ধরুন সুদানকে দুভাগ করে এবং উত্তরভাগে উপজাতীয় দলপতি ও ধনীদের গদিতে বসিয়ে তারা উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিরোধ জ্বালা দিয়ে রেখেছে। নাইজেরিয়ার ঘাড় ফেঁদা ব্যাল ব্যবস্থা চাপিয়ে উত্তরের সামন্ত দলপতিদের দক্ষিণের বিরুদ্ধে উল্ফানি দিয়েছে। ইউগান্ডাতেও এই ফেঁদা ব্যাল ব্যবস্থা দৌলতে অন্তর্বিরোধের আর শেষ নেই, যার ফলে দেশের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। কেনিয়াতে লুও এবং কিকুয়ু উপজাতি দুটিকে মাশাই-দের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিবে রাখা হয়েছে। উত্তর কেনিয়ার যেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী সোমালী সেখানে এক গণভোটের মাধ্যমে সেখানকার সোমালীবাসিন্দাদের সোমালিয়ার সঙ্গে যোগ দেবার ইচ্ছার প্রমাণ খাড়া করে কেনিয়া ও সোমালিয়ার মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষের রাস্তা খুলে দিয়েছে। আমাদের এশিয়ার কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও ভাবতকে শিখা বিভক্ত করে এবং সীমান্ত বিরোধের বহু খোঁচা রেখে দিয়ে সেই বিরোধের কঁক দিয়ে উপনিবেশবাদীরা আবার এশিয়ার ফিরে আসবার স্বপ্ন দেখে।

আফ্রিকার সংহতি আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে দাবিয়ে দেওয়া যাবে না বলে উপনিবেশ-বাদীরা পর্বেদে সেই আন্দোলনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে আসছে গোড়া থেকেই। আমাদের মনে আছে আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটলহেল। তাবপর আন্দোলনের গতিরূপ করার জন্য নানা কল-

কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। একটি কৌশল হচ্ছে, যেসব দেশের সমাজে এখনো সম্পর্কভাবে শ্রেণী বিভাগ হয় নি সেই সব দেশে বহু-পার্টি ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া। যেখানে সমস্ত মানুষ এক হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত-বাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবে নেমেছে সেখানে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বহু-পার্টি ব্যবস্থা চাপিয়ে দিলে দেশের একতাব ক্ষতি হয়। এই জন্যই থানা, মালি, সংঘব্দ আরব প্রজাতন্ত্র, ত্রুস্ত ইত্যাদি দেশ বহু-পার্টি ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যের আব একটি ব্যাপার হচ্ছে মাধ্যমিক প্রশাসন ব্যবস্থা যার ফলে ব্যক্তিগত বিবর্ত একটা অংশ চলে যাব বহু মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মোটা মাইনে দিতে। যেমন ধরুন নাইজেরিয়ার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে কম। কিন্তু তার ২০০ জন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, গভর্নর জেনারেল, গভর্নর ও কর্মচারীদের মাইনে বাবদ বৃদ্ধির তুলনায় চারগুণ খরচ হয়। আর এই সব উপরতলার বাজপুর্ব্ব নিজেদের একটা আলাদা আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণী বলে মনে করতে শেখেন, জনগণের সঙ্গে যার কোথাও কোন সংস্পর্শ নেই। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডাকোর মতে এই শ্রেণী দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে উপনিবেশবাদকে চেয়েও বড় শত্রু। রাষ্ট্রপতি সেকুতুরে বলেছেন যে, “এই ধরনের এক নতুন বুর্জোয়া শ্রেণী তৈরি হতে আমরা-দেব না কাষ স্বভাবতই এই শ্রেণী হচ্ছে উপনিবেশবাদের বন্ধু।” রাষ্ট্রপতি নক্রুমা অত্যধিক বেতন না দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

বৈশ্ববিক রাষ্ট্রনেতাদের হত্যা করা দৃষ্টান্তও বিবল নয়। লুমুম্বা, বন্দবনারক ও সিলভানুস অলিম্পিককে হত্যা করা হয়েছে, সোয়েকার্নো ও নক্রুমাকে বার বার হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে।

উপনিবেশবাদীরা সুবিধা পেলে সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে নিজেদের অধিপত্য কয়েক করার চেষ্টাও যে করে, তার প্রমাণ হচ্ছে কঙ্গো, ভিয়েতনাম ও জার্মানিকা।

আফ্রিকা-এশিয়ার দেশগুলির সামনে আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলির সঙ্গে তাবা সমান অধিকারের ভিত্তিতে বাণিজ্য করবে নাকি “সাহায্যের” মার্কামা বাণের বোঝা বাড়াবে। টাকা দিয়ে উৎসাহিত খাদ্যশস্য কেনা, বৈদেশিক মূলধন আমদানি করে আনা উচিত কি না এই সব প্রশ্নও তাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

আফ্রিকার দেশগুলি পুরানো ও নতুন ধারণার যোড়ফেরের মধ্যে দিয়ে জুল্লাস্তি থেকে ঠেকে শিখে এগিয়ে চলেছে মুক্তির দিকে। অন্তর্স্বপ্ন, বিবাদ বিসম্বাদ সে পথে থাকবেই কারণ সেগুলি হচ্ছে পুরাতন ভিত্তি ও নতুন কঠামোর অন্তর্স্বপ্ন। তবে সেই সব বাধা জয় করে তারা যে আরাধ্য লক্ষ্যে উদ্ভূত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোগাঙ্গ ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আত্মোপাস্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবন্ধনা; ছন্দ ও প্রেমের লীলার চাক্ষু্যকর বইটি চাক্ষু্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোম-হর্ষক সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৩৬, বিপিনবিহারী রাস্তা, কলিকাতা-১২

কলিকাতা-১২

গল্প-উপন্যাসের বিবরণ ও আঙ্গিকে যে বিপর্যয় বদল চোখে পড়ে বিদেশী সঙ্গীতের আমাদের সঙ্গীতেরও তার চেউ এসে লেগেছে। এখনকার দিনের গল্প-উপন্যাস সংক্ষেপে সাহসী, পরীক্ষানিরীক্ষার দুঃসাহসী, আঙ্গিকে সময় সময় অদ্ভুতপূর্ব এবং বিষয়নির্বাচনে দৃঢ়। সমস্যাটির মধ্যে প্রতিভার এমন চমৎকারিত্ব নিয়ে বর্তমান বাংলাসাহিত্য বিচলন-শীল যে, তার গদ্যপদ্য একমুখে বলে শেষ করা যায় না।

বাংলা গল্প-উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে শ্রীনরেন্দ্র মিত্র নতুন প্রবর্তিত নিবে দেখা দিয়েছেন। তাঁর রচনার কংকাল বাস্তবতা। সেই শক্ত কঠামোর ওপরে তিনি রোমান্টিক-সিদ্ধান্তের মায়া এমনভাবে বিস্তার করেন যে, সমগ্র সাহিত্যব্যাপ্তি হতে একটি অব্যাহত জীবন্য বিচ্ছুরিত হতে থাকে। প্রথমে তিনি গল্পের ব্যঙ্গের হিসাবেই হাজির হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে উপন্যাসের বিস্তৃতি ও জটিলতায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন। গল্পের বিন্দু হতে উপন্যাসের ঘোরালো বৃত্ত।

গল্প তিনি অনেক লিখেছেন আর আমি মনে করতে পারছি না কোন গল্প তাঁর ওরার নি। মনে পড়ে তার 'রস' 'হেড-মিস্ট্রেস' 'অবতরণিকা'। মনে পড়ে 'ভয়' 'সত্যার' 'ঐক্য'। এ ধরনের অল্প গল্পের আভাস জেলেছেন তিনি, আমাদের জীবন উপলব্ধি নতুন রোমাণ্ড পেয়েছে তাদের জামিধ্যে।

নরেন্দ্রবাবুর গল্প-উপন্যাসের পাবিত্রিক্ত বিবেচনায় কয়েকটি জ্ঞান কথা মনে রাখা দরকার। 'স্বাধীন', 'দুর্ভিক্ষ', 'হাঙ্গা', 'বাস্তব-চ্যুতি', 'জমিদারীপ্রথার সূর্যাস্ত', 'কালো-বাজারের ভরৎকর তাঁবু', 'এগুলির পর চেনা শৃঙ্খলী আর চেনা নেই। এর সঙ্গে যোগ করা চাই মার্কস ও ক্রেন্ডেলের বুদ্ধির বিদ্রুতে সমাজজীবনের নতুন জন্ম। এদেশে শিক্ষিত ও অভাবী স্তরের সংখ্যা বেড়েছে, তাই বারংবার ঐক্যের ছিঁড়ে তারাও পুরুষের পাশাপাশি আহার ঘাম পারে ফেলার স্বকমাবিতে নেমেছে অজকাল।

তাঁর বেশির ভাগ লেখা মতো তিনি বিস্তারিত শিক্ষিত ছেলেমেয়েকে স্থান দিচ্ছেন। কোলকাতার বা শহরভলীতে তারা থাকে। চাকরি করে, হোটেলটি ব্যবসা করে, বা পাড়িয়ে থাকে। কলকাতার সুবাদে কাছে আসে হৃদয়-সুবাদে কাছে থাকতে চায়। কালকাতাকে ঘিরে জীবনের যে চেউ ওঠে-পড়ে তার নাগবদোলায় তাবা নাচে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রেও নরেন্দ্রবাবু বিবরণে নিষ্ঠা রেখেছেন, নির্বাচনে আনুগত্য রেখেছেন, শৃঙ্খল বিন্যাসের আঙ্গিক প্রয়োজনে তিনি বিস্তৃত, বিশ্লেষণকারী ও প্রশস্ত-ক্যানভাস। উপন্যাসে স্বভাবতই গল্পের ভুলনার তিনি প্যানেলারামি। 'চেনামহল' 'দুর্ভিক্ষ' হতে আশ্রিত করে 'সেতুবন্ধন' পর্যন্ত পায়ে পায়ে ছেঁটে এসে তাঁর উপন্যাসজীবন একটি

বাংলা সাহিত্যের নতুন বদল

সুখেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবর্তন চোখে পড়ে! কাহিনীর জমিতে মনস্কতার শিল্প ক্রমেই তাঁর বেশি ফুটেছে।

নরেন্দ্র মিত্র মূলত প্রণয়ের শিল্পী। নরনারীর আকর্ষণের জোয়ার-ভাটের নাড়ী-জ্ঞান তাঁর প্রচুর আর ভাবি আলতো করে তাকে তিনি প্রকাশ করতে জানেন। প্রেম-প্রণয় নিয়ে লিখে থাকেন অথচ কি রাখব্যো আর কি ঢাকব্যো এই সংশয়ে তরুণীকে আততায়ী জলের হাতে কখনো তিনি মাঝে মধ্যে দেন নি। 'চেনামহল' মনে রেখেই বলছি। 'সেতুবন্ধন' মনে রেখেও বলছি। প্রণয়ী মরছে বলে তো আর গল্প মরছে না। প্রণয় মরছে না।

বিস্তৃত তাঁর রচনার একটি বিশেষ আকর্ষণ তার পবিত্রতা। পবিত্রতা কথ্যটি কি সেকলে? কিন্তু রচনা তাঁর মগজপ্রধান নয়, হৃদয়গাঢ়। খুব ভাল অর্থে তিনি সেন্টেমেন্টের সার্থক কবি। মনোবিজ্ঞানী তাঁর চতুর সংজ্ঞা নিয়ে ভুরু কৌটকালে না হয় আরও কথা যোগ করা যেতে পারে। বলা যেতে পারে ইমোশন তাব আলোছায়ার যে-জেরাচিহ্ন তাঁর কবছে হৃদয়ের পথে নরেন্দ্রবাবু তার নিচুর্ল ঠিকানা জানেন। মোপাসাঁর ভুলনার ভাবি বচনা বৈচিত্র্যে সংবত হলেও তাঁরই মত তিনি নিশ্চুত। হৃদয় ব্যাপাবে তিনি আপননা টানেন সরু সরু আঁজিতে। বাস্তবের মেন্দুদণ্ডে দৃঢ় তাঁর শিল্পের রোমান্টিক প্রকৃতি জীবনের ঘোমটাবৃত মুখে এমন তাঁর আলো ফেলে যে পাবিত্র্য মনে হয় মূর্ষের আবরণ পাতলা, আর তার ভিতর হতে অপরূপ মূর্ষশ্রী বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তাঁর একটি দুটি গল্প আর একটি দুটি উপন্যাসের প্রসঙ্গে কবে বক্তব্যকে বিশদ কবতে ইচ্ছে থাকে। মনে পড়ে তার বিখ্যাত গল্প 'রস'।

'রস' গল্পের নামকনারিকা কৈতাবের জবানে পাণ্ডিত নয়। তা বলে জীবনের ইশ্কুলে একেবারে পড়ে নি কে বলবে। মোডার্ন প্রথমে ভেবেছিল ফলবানু হলেই বাকি তাব সব হয়। তার মনেব আর শবীরের রস সন্তাব জটিলজালেব সূত্রে সূত্রে সঙ্গারিত হোক মোডার্নকে। আর কিছু সে চায় না। কিন্তু চাই না ভাবা এক। সত্যিই যদি আর কিছুর দাবী না থাকতো জীবনে জীবনের গণিত মোজা ঠেকতো আমাদের। মোডার্ন টের

পর্বেছিল। গাছের বস ভাল জ্বাল দিতে পায়ে যে, মাঝখাতুন মোডার্নকে একটু বড় সন্তা তাকে হারিয়ে খোঁড়া হবে বসে আছে। তাব যৌবন নেই কিন্তু সেই গদ্যপদ্যটি আয়ে বোটির সহযোগিতা উঠিয়ে নিলে মোডার্নকে সুনাম নষ্ট হয়। পুরুষ কি নারী চার না কীর্তি?

'হেডমিস্ট্রেস' গল্প অভিমান স্বামীর নতুন কবে আত্মসমর্পণের গল্প। হৃদয়বলীকে জগতেব ঈশ্বরী হতে দেখলে স্বামীর বাগ দুখ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কোন সময়ের মীন উৎকর্ষ হৃদয়েব অভিজ্ঞান হাজির করে আবার, যদি মনে পড়ে যাব আশ্লেষে তাকে যেমন পেয়েছে আসলে সে তাই। দিনের রুঢ় আলো অবশ্যই গুঢ় চরমতে যা দেখেছি যা জেনেছি তা চশমায় ভুলে দিচ্ছি হয়ে রইলো চিবিদন।

এই ধরনের গল্পের ফোকাসে জীবনের যে অভাবনীয়কে উল্খাটিত কখন লোক তাকে সাধারণ অবস্থার অভাবনীর বচে আমরা চিনতেই পারি না। তুচ্ছ বৃটিনাবি ওপোর রসরহস্যের আলো ফেলতে জানেন তিনি, নিজের ছেলেব মুখে বিম্বরূপ দর্শন তখন, নিজের কন্যাকে গিবিবাজেব কন্যা বলে মনে হয়। আর কে বলবে এই উন্নত দৃষ্টিই সত্যদৃষ্টি নয়।

নব্বের মিত্রের উপন্যাসশিল্প কায় কলার বর্ষিতকিবন হয়েছে, ঘটনার রেখা ধীরে ধীরে বাসনাব ইতিহাস ঠিকই। শশাঙ্ক ও মন্দিরা প্রবৃত্তির জটিল অনবধানে স্বনিগড়ে পথ হাবিবেছে। সমাজের অনুমোদিত পথ ছেড়ে মৃত্যুভয়ের শিরশিরানি শবীরে নিয়ে ইচ্ছা-অশুচি প্রবৃত্তিসিদ্ধ জমিতে দাঁড়িয়ে সান্নিধ্যের নিষিদ্ধ উচ্চতা চেতনার বেঁধে নিতে চেষ্টাছে দুজনে। এই স্বদুল্লভ হতে যে বহিষ্কান্ড তার আঁচ মিহিরকে কি না লেগে পাবে? জীবন নীতিশাসিত বোধ্য গণিত না। নিপট ভালমানুষ স্বামী বলেই স্ত্রী যে মনের মানুষ্যেব গলাব লুকিয়ে মালা পরাবে না এমন কোন কথা নেই।

কিন্তু এ জাতের ঘটনা বদলম্বল সাহিত্যসৃষ্টির কৌক স্বাভাবিক এ আদ এই কাবনে যে এর মধ্যে হৃদয় বস্তুটি এ কেমন দাহ্য পদার্থে ভরপূর্ব ত: ষ্টুটি দেখানো চলে। কিভাবে দেখাবেন লেখক!

গল্প-গুয়ারি 'আইরিন' এ'কেছেন যে কৌশলে
ভেদমতাবে না রবীন্দ্রনাথের কায়দায়।

বলা বাহুল্য নরেন্দ্র মিত্র পিছনের দিনের
এই দুই মহারথীর উদ্ভাবিত পন্থাকে
অতিক্রম করে বিশ্লেষণ ও বিবৃতির এক
নতুন সমন্বয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন আর বাংলা
উপন্যাসের অনুরাগী পাঠকদের একটি
অপ্রত্যাশিত সূত্রে চমকিত করেছেন। ঘটনার
কোনক ক্রম করেন নি তিনি। ছোটখাট
জাপাততুচ্ছ ঘটনার মনোযোগী বিন্যাসে পাঠকের
প্রতীতি তিনি সহজেই রোজগার করেছেন।
তারই সূত্রে মন্দিরকে ইচ্ছাপীড়িত
ও বেগবতী মৌখিকেরে কেন না সে নারী
বিশেষক্রে সে পূর্ববের চেয়ে অনেক বেশি
জৈব। মনস্কতার স্থিতি তার প্রবৃত্তিচালিত
সংস্কপকে তাই দুর্বল করে নি। এই দুর্বলতা
শশাঙ্কের আছে আর মানতেই হবে এ ধরনের
সংশয় মনোহরণ। সারাজীবন রত্নের আরাতি
করে যে শশাঙ্ক, যে আতিথেয়তার মান রাখে
মা, খাতিবের আসনে বসে চুরি লোভে যে
হাত বাড়ায় সে যে রত্নের নিয়ে এতভাবে
নিষ্ঠকে মনে মনে চাবকা, উচিত অনুচিতের
নাগরদোলায় এমন ওঠে নামে এ দেখে কার
না আনন্দ হয়। শশাঙ্কের মধ্যে শব্দ দেহ-
মন্দের মাতলামি নেই বিশুদ্ধ চিন্তার মূর্তি
আছে। এমন বিমুক্ত ধ্যান এমন বৈরাগ্যপন্থী
আসক্তি সত্য দুর্বল। শশাঙ্কের রত্নের
বিশ্লেষণ প্রাকসম্রাট আলেকজান্ডারের প্রিন্স
উক্তি মনে করায় : পৃথিবীতে দুটি কাজ
আমাকে বলে আমি অমর নই—একটি ধর্ম,
অপরটি জনসন্নিহিত। এই ধর্মের মোহনীয়
উক্তি বা স্বগতোক্তি শশাঙ্ক কতবার করেছে।
যে রত্নে মন্দির মিহিরকে না বলে শশাঙ্কের
কাজে পালিয়ে এসেছিলো, সে ব্যতী শশাঙ্ক
একা একা নিজের ঘবে কি ভাবছিল? "সারা
জীবন আমি শব্দ একটি বিশাল মোহবাতি
হয়ে জ্বলছি। আমার জীবনপাত্র শব্দ
রত্নের আরতিপাত্র"। এই কথার সূত্রে একটি
উন্নত ধরনের খেদ আছে নিছক ইন্দ্রিয়সেবার
সুখী মানুষের যে খেদ থাকার কথা নয়।

আলডুস হাক্সলির গল্প-উপন্যাসের অসংখ্য
মাত্রকের মত শশাঙ্কও জ্ঞানপাপী। জ্ঞান-
পাপী কথাটির চেনা ব্যঙ্গনা বিদ্রূপ। একেত্রে
বিদ্রূপ একটুও কিন্তু লক্ষ্য নয়। বস্তু এই
শশাঙ্ক ধর্মের মানুষ স্রোতে ভাসছে ঠিকই,
সে স্রোত জীবনের বিহীন জলের শরীর।
কিন্তু এই জলে শশাঙ্করা ডুববে ভাসবে ভব
একবারে যে ডুববে বাবে না তাই কারণ তাদের
একটি বন্ধাকবচ আছে। সেটি তাদের আত্ম-
মচেতনতা। আধুনিক মানুষ জটিলতার
দুর্যোগ্য ব্যাধি ভুগছে। কিন্তু যেহেতু
চেতনের চর্চা এ যুগের অবধারিত অভ্যাসে
দাঁড়িয়ে গেছে এ যুগে যারা মনস্ক তাঁরা
যড়ের রাতেও নক্ষত্র দেখতে পান। নরেন্দ্র
মিত্র 'সুখসাক্ষী'র মধ্যে স্থানে স্থানে ঘটনাকে

গটভূমি করে আলোচিত চিন্তাকে যে এতখানি
জমি ছেড়ে দিয়েছেন এতে কথাটি প্রমাণ হয়
না কি?

নরেন্দ্র মিত্র 'সুখসাক্ষী'র মধ্যে একথাও
প্রমাণ করেছেন তাঁর রচনার মনস্তাত্ত্বিক ষ্টোক
একটি সত্যবস্তু আর চরিত্রের অভাবিত
সম্ভাবনাকে তিনি বাহিরে টেনে আনতে
পারেন। মন্দিরার ব্যাধিত প্রেম তার জীবন-
পরিস্থিতির নিষ্ঠুর দেয়ালে মাথা ফুটেছে
কতদিন। শশাঙ্কের সংশ্লিষ্ট প্রতিভার
পাশে মন্দিরার প্রাপবেগ সময় সময় বেশি
তাঁর মনে হলেও তার মধ্যে এমন একটি
অকপটতা এমন একটি আন্তরিকতা আছে
যে, শেষ পর্যন্ত সে আমাদের জিতে নেয়।
মন্দির আদালতে সকলকে তাক্সব করে দিয়ে
যে মিথ্যার মালা তাঁর কবলে নীতির বিচারে
তার জন্য সে বিস্তৃত হলেও সাহিত্যের বিচারে
সে সার্থক। এ পরিস্থিতিতে এ ধরনের
মিথ্যাভাষণের জন্য একটি মেরের নির্মিততে
মজ্জা লাগে। মানবচরিত্র নিজেকে নিষ্ঠুর
প্রমাণ করে আপন বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করে না।
অনেক দ্রুতি, অনেক মিথ্যা, অনেক পাপ ও
বিপ্রান্তির মধ্য দিয়েও নিজেকে সে জানান
দেয়। সাহিত্যপ্রসঙ্গে এ কথা অবশ্য বস্তু-
পচা হয়ে গেছে যে, ওথেলোও উৎকৃষ্ট
ইয়োগাও উৎকৃষ্ট। নীতিতে চরিত্র ব্যক্ত নয়
বুনিয়তেও নয়, তার ধন্য প্রকাশ তার
আত্মপ্রকাশের আর্গিকে বাব ইয়াজী নাম
স্টাইল। নরেন্দ্র মিত্রের চরিত্রগুলি স্টাইলের
ইশারার দামী নয় কি?

'সুখসাক্ষী' নামের মধ্যেই স্নেহপীড়িত
মানবজীবনের আলোক-অভিসার দ্যোতিত
হয়েছে। উপন্যাসটির সমাপ্তিতেও আকাশের
সুকৃতির পরপার হতে সূর্যের আসন্নতা নির্গত
হচ্ছে দেখতে পাই। মন্দির ভাবছে আদালতে
গিয়ে এবার আমি সত্য বলবো। আমার
মিথ্যা বিশ্বাস করেছে আমার সত্য
বিশ্বাস করবে না?

বস্তুতে তা হরতো করে না। ভাল তাঁর
মন্দের টানাপোড়েন জীবনের তাঁতে আজও
পরিচিত বয়ন। কিন্তু আমাদের চিত্তের
কন্দরে প্রান্তির একটি ক্রান্তি মরে মরে
দেখা দেয়। প্রবৃত্তির বিচিত্র হাতছানিত
আমরা অন্তরের আলোকে ক্রান্তি করি, নিজ-
নতন জালে জড়াই, সরলকে জটিল করি
বার বার। এই তামস উপাসনা কিন্তু বিশুদ্ধ
নয়। কারণ সন্তানের সুখ সাক্ষী থাকেন সব-
কিছুর। সেই আশ্চর্য বিনি নিছক প্রাকৃতিক
নন, যিনি চৈতন্যের দ্ব্যতম উদ্ভাস হয়ে
আমাদের উদ্ভেলিত বারিধির বৃকে বিচ্ছুরিত
হন, যিনি কানে কানে আবাস দেন সমগ্র
জগতি একদিন সূর্যের বিপুল বন্যা হয়ে দেখা
দেবে। এর পরও কে বলবে নরেন্দ্র মিত্রের
রচনার মূলবেদনা মনুষ্যত্বের বেদনা নয়?

নরেন্দ্রবাবুর রচনার একটি আকর্ষণ তাঁর
চরিত্রগুলির পরিচ্ছন্ন ও শাণিত রেপারটি।
এমন বাকপটু কুশলিব আমরা বেশি দেখি
না। বুদ্ধিবল্লীকৃত রোদ হৃদয়সকলকে বৈদগ্ধ্য
গাঢ় করে হাজির করে আমাদের কাছে।

তাঁর রচনার জীবনে লিরিক প্রবল। সুকুমার
মূলিতে আঁকতে ভালবাসেন বলে আর মোটা
ব্রাশ তাঁর অপছন্দ বলে নরনারীর হৃদয়হস্যকে
গানের মত করে উচ্চারণ করেছেন তিনি।
হৃদয়ব্যাধিত নরনারীর কথা বলতে গিয়ে
একটুও যে এ্যানাটমি দেখান নি এ তাঁর
শিল্পের মহৎ জিত। কেননা এটি তাঁর
স্বাভাবিক ফাঁদ ছিল। তিনি উত্তম শিল্প-
বুদ্ধির মর্জিতে আমাদের হৃদয়ের উঠানে খুব
দূর হতে অবসর সূর্যের আলো ফেলেছেন।
অবসর বসিছে কারণ তাঁর শিল্পব্যঙ্গনার মহৎ
হৃদয়ের একটি বিষয়তা আছে। কনরাডের
লেখার সংগে অন্য মিল না থাকলেও এই
মিলটি তাঁর আছে যে, জীবনকে তিনিও
রহস্যের দ্যোতনা মনে করেন আর মানবতার
বেদনায় তিনিও ব্যাধিত।

এই বেদনা যে কী প্রধান তাঁর সাহিত্যে
'সুখসাক্ষী' উপন্যাসটি পড়লেই জানা যাবে।
এই উপন্যাসের চরিত্র সুকুমার জগতজীবনের
অসংখ্য বিচ্ছেদের ওপোর মনে মনে কেবল
সেতু বঁধতে চাইছে। শব্দ কি মনে মনে?
তার ভাবুকতার আকাশে মাঝে মাঝে যে
অপরূপ ইন্দ্রধনু ওঠে শ্যামলীও তা চোখে
পড়েছে, শব্দ-বাক্তির ক্ষিতীশও তার অন্তিম
অস্বীকার করতে পারে নি। শ্যামলী তাই
ভরসা রেখেছে তার প্রচ্ছন্দ ভাই ও বাবার
উপায় সুকুমারই করবে একদিন, ক্ষিতীশও
বলেছে সুকুমারকে তার সমস্ত অসামর্থ্য স্বেচ্ছা
সে বড় মনে কবে। মানুষ মানুষে গোষ্ঠীতে
গোষ্ঠীতে সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের ধর্মে ধর্মে
জাতিতে জাতিতে কবে মিল হবে, কি কবলে
হবে, এই ভাবনায় সুকুমার অহরহ ভারাক্রান্ত-
অন্তর।

আমি বলতে চাই লেখকেরও এই চর্চা।
লেখকেরও এই ধ্যান। এইজন্য এখনকার
দিনে তাঁর রচনা আর নিছক কাহিনী বিন্যাস
নয়, সুখসাক্ষীর মোহেরক নয় শব্দ। তার
মধ্যে উজ্জ্বল চিন্তার অভিব্যক্তি সূত্র হয়েছে।
এই বিশেষ আবর্তনে তিনি অভিজ্ঞতামূলে
মজান। আর চরিত্রের বিন্দুর সংকেতে তিনি
যে বৃক্কের ইশারা করেন উৎকৃষ্ট সাহিত্যের
পক্ষে এ কি অবধারিত নয়? এ ব্যাপ্যের
কবি ইয়েটস প্রিনধানবোধ্য নিশ্চয় :

'O chestnut-tree, great-rooted
blossomer,
Are you the leaf, the blossom or
the bole?
O body sawyed to music, O
brightening glance
How can we know the dancer
from the dance?



দা হলে গোয়েবাব এখানেও ক্লাসের পরীক্ষার ফেল করবেন বলে শাসিয়েছেন।

এই তিনটি ভদ্রমহিলা কেবল-মাত্র ছেলে, নাতি বা ভাইপোর খাতিরেই রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করছেন কিনা তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আপাতত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 'হ' শহরের স্টেশনের প্রায়টর্কমে ডোরবেলার তাঁরা তিনজনে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে অধীরভাবে বুথারেস্ট-গামী মেল ট্রেনে অপেক্ষা করছেন। গোয়েবাব অবশ্যই তাঁদের সঙ্গে আছেন। অবশ্য এরকম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উৎসবে বীরা অংশ গ্রহণ করতে চান তাঁরা যে প্রাতঃকালেই উঠে তার তোড়জোড় করবেন, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! ওঁরা যে গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছেন, সেটা আটটা বাজতে বেশ মিনিটে বুথারেস্টের উত্তর স্টেশনে পৌঁছবে। গোয়েবাব প্রচণ্ড অর্ধেক হয়ে উঠেছেন। ছুব, কুচকে ভারি চলে বললেন : দিদা, গাড়ি আসছে না কেন? আর বলাই—গাড়ি। —আসবে শাদুমণি এক্ষুণি আসবে।

দিদা নাজকে চুমু খেয়ে মাথার টুপিটা ঠিক করে ঘসিয়ে দিলেন। গোয়েবাব পূর্বপন একটা সুন্দর মেরিনার স্যুট। মাথায় স্ট্র-চ্যাট। তার ফিভেব ওপর ফবাসী ভাষায় লেখা-অপ্রতিরোধ্য। মিৎসা পিসি আবার সেই অপ্রতিরোধ্য ফিভেব সঙ্গে ট্রেনে টিকিটটা পিন দিয়ে আটকে দিয়েছে। পূর্ব-মানুষদের যে এমনি করে টিকিট রাখতে হয় কিনা।

—দেখছিছ! মে রি নে ল স্যুটটা কেমন মানিয়েছে। দিদা বললেন।

—মা, তোমাকে কতবার না বলছি যে মেরিনেল স্যুট বলে না।

—তবে কি বলে?

—মেরিনাল।

—আঃ। তোবা যা খুশি তাই বল না। আমি

হুঃ—দুঃখনেই সমান গাট। গোয়েবাব ফোড়ন কাটলেন। আসলে মেরিনেল-ও বটে না, মেরিনাল-ও না।

—তবে কি বলে রে, কি দ্বন্দ্ব?

মিৎসা পিসি মূর্চক হলে যিজেন্স করলেন।

—মেরিনাল।

—দেখোছ! সবাই কি নার তোর মডল অত পড়াশোনা করেছে রে?

দিদা বললেন। বলেই আবার নাড়কে চুমু খেয়ে টুপি ঠিক করে দিলেন।

কিন্তু ভাষাতত্ত্ব আলোচনার জন্যে আর সময় পাওয়া গেল না। ট্রেন এসে গেছে—বেশিক্ষণ দাঁড়াতে না।

গাড়ি একেবারে বোকাই। একটা কাঁবার কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে ছিল। তারা কাছাকাছি একটা স্টেশনে নেমে যাবে। তারা অনেক চেষ্টাচারিত্র কবে মহিলাদের উঠিয়ে নিয়ে ইসবার জারগা কবে দিল। গাড়ি ছেড়ে দিল। দিদা বুককে ক্রুশ অঁকলেন। সব পব নিচিন্ত হয়ে বসে একটা সিগারেট ধবলেন। গোয়েবাব কামরায় ঢুকতে চাইতে না। তিনি অন্যান্য পূর্বমানুষদের মাংগ করিভোরে দাঁড়িয়ে বইলেন।

—এই, এই বাচ্চা, জান্না দিয়ে হুপ বাড়তে নেই।

সেই ছেলেদের মধ্যে একজন গোয়েবাবে ভেতর দিকে টেনে আনতে গেল।

বাচ্চা তৎক্ষণাৎ তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে খিঁচিয়ে উঠল।

—তোব কি বে মুখপোড়া?

মুখপোড়াকে ধমক দিয়ে গোয়েবাব আবার দুহাত দিয়ে জানলার ওপরে পেভলের রঙটা ধবে কুলতে কুলতে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিলেন। মুখপোড়া বোধহয় শাবাব বিহু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার হুপ দিয়ে বথা বেবোবাব আগেই বাচ্চা খালি খাটা ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে পরিগ্রাহ চেঁচাতে সুরু করল।

—মামণি! দিদা! পিসি!

—কি হল? কি হল?

ভদ্রমহিলাবা তিনজনেই লাঞ্জে উঠলেন।

—থামাও! থামাও! গোয়েবাব চিৎকার করে পা ঠুকতে লাগলেন—আমি টুপি উড় পেছে। থামাও।

আর ঠিক সেই সময়েই এসে নাজির হলেন টিকিট-চেকার। আগের স্টেশনে তারা ধার উঠেছে—তাদের টিকিট দেখতে এসেছেন।

ভদ্রমহিলাবা তাঁদের তিনজনার টিকিট দেখলেন। আর গোয়েবাবের টিকিট? সে তো টুপির ফিভেব সঙ্গে আটকানো ছিল। টুপিটাই যদি উড়ে যায় তাহলে কি আশঙ্কিতে আর টিকিট রেখে যাবে? কিন্তু টিকিট তো কেনা হয়েছে।

—দিদি কবে বলাই। তুমি নিয়ে কেটেছি। মিৎসা পিসি বললেন।

টিকিট-চেকারের মাথার ওপর বথা ঢুকতে না। টিকিট না দেখালে পল্ট স্টেশনে

মামণি, দিদা আর মিৎসা পিসি গোয়েবাবকে কথা দিয়েছেন যে, ১০ই মে রোববার জুলাই তাকে বুথারেস্টে নিয়ে যাবেন। তা

যেমন জানি তেমন বলব। আমাদের সময়েই তো প্রথম ছোট ছেলেদের মেরিনেল স্যুট উঠল। আমরা বরাবরই মেরিনেল বলি।

গোয়েবাবুকে টেন থেকে নামিয়ে দেবে। এই ন্যাকি অইন। যদি কোন খাটী বিনা টিকটে টেনে উঠে তখনই না জানার তাহলে তার সাড়ে সাত লেই ভরিমানা হয় আব চেকার যে কোন চেকশনে তাকে নামিয়ে দিতে পারেন।

—তা আমরা জানাই নি ন্যাকি? মামণি চাঁচিরে উঠলেন।

—টুপি যদি উড়ে যায়, সেটা কি ছেলের মোম? দিদা চটে গেলেন।

—ও জানলা দিয়ে মাথা বাড়াল কেন? আমি তো তখনই বারণ করেছিলুম—মুখ-পোড়া ভরে ভরে বলল।

—তা দিয়ে তোমার কি দরকার? ভূমি কেন আমাদের কথার কথা কলছ? মিংসা পিসি মুখপোড়াক বকে উঠলেন।

—দেখুন, কাজের কথার আমুন—চেকার বললেন—একটা টিকিটের দাম দিয়ে দিন।

—আবাব দেব? কেন, একবার বে টিকিট একটোই, সে কি দাম না দিয়ে?

—দেখছিঁস, দুইটুপি করার কি ফল? মামণি এবার অইবই হয়ে গোয়েবাবুর হাতে এক চড় মারলেন।

—কর কি, কর কি বোমা! মাথা খাবাপ হয়েছে ন্যাকি? জান না ও কি অভিমানী! দিদা বললেন।

কলেই দিদা গোয়েবাবুর আর এক হাত ধরে তাকে মামণির কাছ থেকে টেনে আনতে গেলেন। আর ঠিক সেই সময়ই হেলেন্দুলে চলতে চলতে গাড়ীটা হঠাৎ একটা মোড় ঘুরল। দিদা টানছেন একদিকে, গাড়ীটা ঘুরছে আর একদিকে। গোয়েবাবু দুই টানের স্বলে মাথাকর্ষণের কেন্দ্র থেকে একটু ছটকে গেলেন আর কামরার দরজার হাতলে নাকটা গেল ঘষে। তারপরেই হিউমাউ।

শেষকালে আর গভ্যতর না দেখে ভদ্র-মহিলারা মনস্থির করে ফেললেন। টিকিটের দাম দিতেই হল। চেকার তার বই থেকে টিকিট দিলেন একখানা।

বড় নখের গোড়া ঐ টুপিটা। এখন খালি মাথার গোয়েবাবু বুথারেস্টে বান কি করে। আজ যে আবাব সব মোকাম বন্দ। কিন্তু এসব কথা কহা কলবে। বাবা দিদার চেয়ে না—তাবাই কলবে। দিদার যে গোয়েবাবুর জন্যে কত ভাবনা আর কত দুঃখ-দুঃখিত সে কথা বারা দিদার চেয়ে তারা জানে। দিদা কি শব্দ একটা শব্দ-হ্যাট মাথায় দিয়ে নাড়কে নিয়ে যাচ্ছেন। বুন্টি পড়লে ঠাড়া লাগবে না? খীরভাবে হাতব্যাগ খুলে দিদা একটা বেরে টুপি বার করলেন। সেই অপ্রত্যাশিত হাপ মারা।

—আব নাক ব্যথা করছে—বাদুমণি? দিদা জিজ্ঞেস করলেন।

—না।

—দিদাটা কি করে ব্যবহ?

—মরুক না।

—আর কাছে আর। দিদা চুন্মুখে সারিয়ে দেবে।

দিদা বাদুমণির নাকের ডগায় চুন্মুখে টুপি পরিয়ে দিলেন।

—আহা, বেরে টুপিটা যেন আরো মানিয়েছে।

দিদা নাতির গরম খুন্মুখ দিলেন—পাছে নজর লাগে। তাব পরে আবার চুন্মুখ খেলেন।

—কোন ভিনিসটা ওকে মানার না তাই বল।

মিংসা পিসি-ও খুন্মুখ দিলেন। মিংসা পিসিও চুন্মুখ খেলেন।

—ওর কথা আর বোলো না। দিন দিন যে কি হচ্ছে তা জানি না। নতুন টুপিটা গেল। দুইবার টিকিট করতে হল।

মামণি খুব রাগের ভাব করলেন।

—আহা! বাহা আমার বেঁচে থাক। অমন কত টুপি হবে। দিদা বললেন।

মামণি বললেন : মামণিকে চুন্মুখ খাবে না?

—করে গেছে। গোয়েবাবু মুখ টিপে হেসে বললেন।

—ও মা, এইবকম—মামণি বললেন—ঠিক আছে। বলেই দুই হাত দিয়ে চোখ ঢেকে কামরার ভাব করতে লাগলেন।

—গোয়েবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন : হয়েছে হয়েছে—আর চুন্মুখ করতে হবে না।

—হয়েছে তো? কাকে ঠকতে যাওয়া। দিদা বিজয়গর্বে উল্লসিত।

মামণিও হাসতে হাসতে হাতব্যাগ থেকে কি একটা বার করলেন।

—বে আমাকে চুন্মুখ খাবে—এই বেষ—চকোলেট।

মামণি গোয়েবাবুকে চুন্মুখ খেলেন। গোয়েবাবু মামণিকে চুন্মুখ খেলেন। তারপরে চকোলেটটা হাতে নিয়ে আবার করিডোরে বেরিয়ে গেলেন।

—ও বাদুমণি, আবার যেন জানলা দিবে বুন্টিস নি। কি বুন্টিমান ছেলে তা বলা যায় না। দিদা বললেন।

—ভীষণ বুন্টিমান বুন্টি করে বলছি। মিংসা পিসি বোগ করলেন।

গোয়েবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে চকোলেট খেতে লাগলেন। মহিলারাও এদিকে এটা সেটা গল্প জুড়ে দিলেন। গাড়ি এখন ক্রিভনার কাছাকাছি এসেছে।

—মামণি দেখ তো, ছেলোটা বাইরে কি করছে। মামণি দিদাকে বললেন।

দিদা উঠে ঠুক ঠুক করে বাইরে যেরোলেন।

—গোয়ে। বাদুমণি। গোয়ে। গোয়ে। গোয়ের পাভা নেই।

—ও মা আমার কি হবে! ছেলে নেই। ছেলোটা বুন্টি হারিয়ে গেল গো।

ভেতর থেকে দুই মহিলা সাঁ কবে বেরিয়ে এলেন।

—ওগো, ছেলোটা বুন্টি গাড়ি থেকে পড়ে গেল গো। আমি যে মরে যাব গো।

হঠাৎ যেন টেনের আওরাজ্জ ছাপিয়ে করিডোবের এক প্রান্তের বে ছোট খুপরিটার একজনের বেশি লোক ঢুকতে পারে না, সেখান থেকে কি আওরাজ্জ শোনা গেল।

—গোয়ে। মায়ের বাছা! এখানে আছিঁস?

—হ্যাঁ।

—দেখছে। দিদা বললেন—বেরিয়ে আর। কি ভরই না দেখিয়েছিল।

—পারছি না। ভেতরে গোয়ে হাচিফ-পাচিফ করছে।

—কেন রে? বুকে ব্যথা করছে?

—না। খুলছে না।

—তাল্লা লেগে গেছে। দিদা বাইরে থেকে চেষ্টা কবে খুলতে পারলেন না।

—দরজা খুলছে না। গোয়ের প্রচণ্ড চিৎকার।

—ওমা আমার কি হবে! ওর ভেতরে থাকলে যে ছেলোটার শব্দীয় খারাপ হবে।

শেষকালে টিকিট-চেকাব আবার এলেন। মহিলাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বন্দীকে মুক্তি দিলেন। ভৎকণাং তিন মহিলা খাপিয়ে পড়ে এক-সঙ্গে গোয়েবাবুকে চুন্মুখ খেতে সুরু করলেন। কতদিন যেন যেখেন নি! শেষকালে দিদা করিডোরে একটা স্যুটকেস পেতে বসে পড়লেন। আব যাতে বাদুমণির কোন বিপদ না হয়। বাদুমণি এদিক-ওদিক পারচারী করতে লাগলেন। কবিডোরের এক কোণে ওটা কি বলেছে—তার আবার একটা হাতল! আর যার কোথায়। স্যুটকেসের ওপর দাঁড়িয়ে হাতলটা ধরে হেঁচকা টান।

—চুপ-করে বোস বাদুমণি। কিছ ভাঙিস নি। দিদা বললেন।

গাড়ি তখন পেরিশ ছাড়িয়ে বৃক্তেয়া-র দিকে ছুটে চলেছে। কিন্তু হঠাৎ একটা হুইলশ শোনা গেল, তারপর পাগলা ঘণ্টা, আরো তিনবার হুইলশ, একটা বিরাত্ ঝাঁকুনি। টেন থেমে গেল।

—কি হল? কি হল? সব বাটারী ভাঙ পেয়ে কেউ জানলার কেউ দরজার কেউ সিঁড়ির ওপরে বুকে পড়ল।

—গোয়ে। বাদুমণি। গোয়ে।

মিংসা পিসি ডাকতে ডাকতে কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন।

গোয়ে করিডোরে। গাড়ি থামল কেন?

কে যেন অ্যালার্ম চেন টেনেছে। কোন গাড়ি থেকে? সেটা তো বলা কিছ শক্ত নয়। যে গাড়ি থেকে টেনেছে তাব অ্যালার্ম চেনের সূতো ছিঁড়ে সিসের বকটা কলবে। টিকিট-চেকাব আর গাড় সব কামরার ঢুকে দেখতে লাগলেন।

শ্রীভূষণাধিকারী হাকিম রায় -ইরা
আমাদের (১৩৭২) সাম্প্রতিক বসুমতীতে
সবার অলঙ্কার নামে যে ইতিহাস ও রূপ
যুগের অধ্যায়টি লিখেছেন, তার জন্য
আমার মত প্রাক্তন বিপ্লবীদের কাছে অশেষ
ধন্যবাদের পাত্র। পুস্তক হিসেবে তাঁর ও
পাঠকদের গোচরে যা নিজে জানি, এখন
কয়েকটি কথা, আনতে চাই।



১৯১৪ সালের এক বৈকালে কলেজ
থেকে বইখাতা হাতে বাড়ি ফিরছিলাম,
ডিক্সন লেনে বটতলার বিপিনদার (বিপিন
বহারী গাঙ্গুলীর) সংগে দেখা-আলোচনা
করলেন, বিপ্লবী সহচর বসন্ত ও জগৎকে
নিরে-তখনই জেলেপাড়া লেন ও হিদরাম
ব্যানার্জি লেনের মোড়ে তখনই যেতে, গাড়ি
কবে মাউজার পিস্তল ও কাতুজ আসছে,
নিজেদের কুলীর মত ভাবী মালগুলি বসে
নিরে ভুজগদার (ভুজগদত্ত ধর) বাড়িতে
নিরে গিয়ে রাত্রের মধ্যে বাসগদলি খুলে পিস্তল
ও কাতুজগুলি বার করে কতকগুলি স্ট্রীল
ট্রাককে ভর্তি করতে হবে। জামা ছেড়ে খালি
গয়ে, খালি পায়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে
বসন্ত ও জগৎকে নিয়ে তখনই
বিপিনদার নির্দেশ মত জেলেপাড়া লেনের
মোড়ে গেলাম-মাল ভর্তি গাড়ি এসে গেল,
সেগুলি আমরা বসে নিয়ে সরু গলির মধ্যে
ভুজগদার বাড়িতে সিঁড়ির নীচে একটা ছোট
ঘরে বাসগদলি খুলে ফেললাম। পঞ্চাশটি
মাউজার পিস্তল বেবুল ও কাতুজ পেলম
(পঞ্চাশ হাজার নয়) পঞ্চাশ হাজার বাউন্ড
অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ। বসন্ত থাকত
সারপেনটাইল লেনে, ইস্ট লাইব্রেরী সভা,
রাতে যখন মাউজার পিস্তলগুলি আলোর
থাকবাক করতে লাগল, আমাদের সে কি আনন্দ,
বসন্ত পিস্তলগুলির নাম দিল 'থোকা'। এক
একটি স্ট্রীপে দশটি কাতুজ লাগান, এই
দশটি নিয়ে এক রাউন্ড। পিস্তলগুলি
অটোম্যাটিক, গুলি ভরতে স্ট্রীপটি রেখে
চাপ দিলেই দশটি কাতুজ ফায়ারিং-এব জন্য
প্রস্তুত থাকে-এক একটি ফায়ার করলে
খোল আপনা থেকেই পড়ে যায় ও পরেরটি
সে স্থানে উপস্থিত হয়। এমনিভাবে লোভ
করা ও ফায়ার করা দ্রুত সম্ভব। কাঠের
খোলাটি পিছনে লাগিয়ে পিস্তলগুলি কাঁখে

রেখে রাইফেলরূপে ব্যবহার করা যায়। প্রায়
দেড় মাইল রেঞ্জে কাজ চলে, দুঃখস্বপ্নের জন্য
বেজ ঠিক করার ব্যবস্থা লাগান। বাজ খোলা
ট্রাককে ভর্তি করা, প্যাকিং-এর কাজ, অয়েল
কাগজ, উড উল, সমস্ত পোড়ানো জল ঢেলে
পাল্পার করা, যাতে পুলিশ সার্চ করতে
এলে কিছু না পায়, এ সমস্ত কাজ ভুজগদার
বসন্ত, জগৎ ও আমি করলাম। ভুজগদার
সহোদর ভাই ফিল কিছু সাহায্য করে, সে
এখনও সেই জেলেপাড়া লেনের বাড়িতে
থাকে। জগৎ গুলি ডিক্সন লেনে থাকত,
রুডা কেসে পুলিশ তাকে জড়তে পারে নি,
বসন্তের নাম জানতে পারে নি। গভীর রাতে
কাজ শেষ করে আমরা যে যার বাড়ি ফিরলাম।
বিপিনদার সংগে বৈকালে দেখা হবার পূর্বে
মাউজার পিস্তল সংগ্রহ সম্বন্ধে আমরা কিছুই
জানতে পারি নি, ভুজগদার বাড়িতে মালগুলি
ট্রাককে ভর্তি করে রাতে চলে আসার পর কি
হল, তাও জানতে পারি নি-শুধু শুনোছিলাম
হুগাল্ডব, অনুশীলন আদি বিভিন্ন বিপ্লবী
দলের বিভিন্ন স্থানে মালগুলি পরদিন
সকালেই পাঠিয়ে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, যাতে
পুলিশ কোনও মাল হস্তগত করতে না
পারে। অনুসন্ধানসা ছিল আমাদের পক্ষে
নিষিদ্ধ।

কয়েকদিন পরে আমরা ডিক্সন লেনের
বাড়িতে ভোরবারি থেকে সার্চ হল ও আমাকে
লালবাজার লক-আপে নিয়ে গেল। দেখি
আমার ও ভুজগদার প্রিয় বন্ধু শ্রীজ্যোতিষ
বিশ্বাসকেও লক-আপে নিয়ে গেছে। দেখি
প্রভুরালজীও লক-আপে, বাড়ি থেকে পাঠান
কিছু ফল খাচ্ছিলেন, আমাকেও কিছু ভাগ
দিলেন, সে সহৃদয়তা আজও ভুলতে পারি নি।

কয়েকদিন পরে আইস্ট্যাটিকেশন। সন্ধ্যা
প্যারেডে আমরা নিয়ে দাঁড়ি করছি দিলে।
মাল নামাবার সময় হিলাম খালি গা খালি পা,
চোখে চশমা ছিল না। সন্ধ্যা প্যারেডে
লোকের সাক্ষিতে যখন দাঁড়ান, গায়ে
সিলেক্ট পাল্লাবী, চোখে সোনাল চশমা,
আমাকে সন্ধ্যা কবতে পারল না। তার
কয়েকদিন পরে ডিসচার্জ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

ভূষণবাবু যে লিখেছেন, "রুডা যুগের
সংগে প্রত্যক্ষভাবে যারা জড়িত ছিলেন,
তাঁদের মধ্যে শুধু হরিদাস দত্ত ব্যতীত অপর
সকলেই লোকান্তরিত হয়েছেন" এ কথা সঠিক
নয়। যদি মাল নামান ইত্যাদি ক'ন প্রত্যক্ষ
সংযোগ হবে, তবে তাদের মধ্যে ডাক্তার বসন্ত
দাস এখনও পূর্ণবয়সে সশরীরে ডাক্তারী
করছেন ও লেখক এখনও জীবিত। জগৎ
গুলি ছিলেন ডিক্সন লেনের কার সেনের
ভাগিনা, তিনি জীবিত নেই।

শ্রীশ মিত্র, অনুকূল মুখার্জি চেলো,
আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁর বিবরণ পাবে
কোনও সংবাদ পাই নি। তাঁর স্মৃতিতে
আমাদের সঙ্গ্রহ নমস্কার জানাই।

শ্রীশ পাল, ওষুধ নরেন, সবক'নিত্যিক
বিপ্লবী ছিলেন। শুধু পুলিশ অফিসার
নন্দ ব্যানার্জিকে সারপেনটাইন লেনে হত্যা
করেন নি, আগরপাড়ায় যে মূর্তি মিত্র
আমাদের বিপ্লবী নেতা বিপিনদার ধরিয়ে
দিয়েছিল, তাকেও গুলি করে মেরেছিল
তার বাপির দরজায়।

বিপ্লবী শ্রীহরিদাস দত্ত মহাশয় আজও
আমাদের মধ্যে আছেন, এ আমাদের পরম
সৌভাগ্য। তাঁকেও আমার সঙ্গ্রহ নমস্কার।

ভূষণবাবুর লেখার শেষাংশে মহামানব
ম্যাজিনার উক্তিটি আমার এত ভাল লেগেছে,
এখানে পুনরায় না লিখে পারলাম না, এজন্য
তাঁকে আমার নমস্কার জানাই।

"তোমার দেশ তোমার মন্দির, ত'র চড়ার
থাকুক ভগবান, তার ভিত্তি হোক আমামুখী
জনতা।"

আত্মোন্নতি বিপ্লবী সমিতির প্রবন্ধ কমিটি

সত্যিশ

১৩ই ফরভাইস লেন

কলিকতা-১৪

কোন কামরায় অ্যালবার্ট চেন টেনেছে কে
কলতে পারে? কি আশ্চর্য! যে কামরা
থেকে মেরিনার টপি উড়ে গিয়েছিল, ঠিক
সেইখানেই। টানল কে? দিদা তো কামরায়
ভেতরে যাদুঘরকে কোলে নিয়ে ঘুরে
অটেনা। কে টেনেছে কে জানে।

শেহকালে আবার ট্রেন ছাড়ল। কয়েক

মিনিট লেট কবে পৌঁছল বুদ্ধাবস্টে। সবাই
নামল। মামণি, দিদা আব মিংসা পিসিও
গোয়েবাবুকে নিয়ে নামলেন। দিদা আব
গোয়েবাবু মাথার টপটি ঠিক করে দিলেন।
শুধু দিলেন যাতে নজর না লাগে। জিজ্ঞেস
করলেন নাক ব্যথা করছে কিনা। তারপর
মিষ্টি করে একটা চমু খেলেন।

হেলতে দুলতে বেরিয়ে তিন মলা আব
গোয়েবাবু ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন

—বুলেভার্ডে চল, গাড়োয়ান, নলভার্ডে
চল।

শুল রুম্যানিয়ান থেকে অনুবাদ

জমিদার রায়



আগেই বলা হয়েছে যে, কিস্টোন কমিডি ফিল্ম কম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী চার্লিস কেসেলের কাছ থেকে চ্যাপলিন জানতে পাবলেন যে, মিস্টার ম্যাক সেনেট ফব্টি সেকেন্ড শ্রীটে আমেরিকান মিউজিক হলে এক মাতালেব ভূমিকায় চার্লিসকে অভিনয় করতে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন এবং বিশ্বাস্ত হান্যকৌতুকাভিনেতা ফোর্ড স্ট্যারলিং-এর জায়গায় তাঁকে ছবিতে কাজে লাগাতে চান। চার্লিসও অনেকদিন থেকে মনে মনে ইচ্ছা হচ্ছিল যে ছবিতে কাজ করেন। ছবি বিষয়ে কিছু জানেন না বলেই এতকাল এদিকে এগোন নি।

মিস্টার কেসেল জিজ্ঞেস করলেন যে, চার্লিস এ পর্যন্ত কোন কিস্টোনের কমিক ছবি দেখেছেন কিনা। চার্লিস তাঁর আসল মনোব কথটা চেপে গেলেন—এদের ছবি তিনি আগে কখনোই দেখেছেন এবং দেশে তাঁর ধাবা হয়েছে ছবিগুলো সত্যন্ত বিকৃতরূচির—বিস্তারিত এবং লক্ষ্যবস্তু করে দর্শকদের সমস্ত আনন্দ দেবার চেষ্টা হয়েছে এইসব ছবিতে।

কিন্তু একটা জিনিস কিস্টোন কম্পানীর কমিডিগুলোর ছিল, সে হচ্ছে তাদের বাজার নামডাক এবং পারফরম্যান্স জ্বাল। এদের সঙ্গে কিছুদিন থাকতে পারলে ভেড়িভলে ফিবে এলো কিম্বদ্ব্যাপী খ্যাতি নিয়ে ফেরা হবে—এই কথাটাই তখন চার্লিস মনে হচ্ছিল। তাহাড়া একটা মধুর পরিবেশের ভেতর সম্পূর্ণ নতুন জীবন সূঁ করা হবে। বেশ ভাল টাকাতেই এদের সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করা হয়ে গেল।

লন্স এজেন্সেসে এসে একটি ছোট হোটেলের ঘর ভাড়া নিলেন চার্লিস। এডেনডেলের গাড়িতেই উঠে বসলেন—কারণ এখানেই কিস্টোন স্টুডিও। অনেকক্ষণ স্টুডিওর বাইরেই অপেক্ষা করলেন। লন্ডনের সময় অধ্যয়ন ছেলেমেয়ের দল মেক-আপ সমেত

বাইরে চলে যান এবং উল্টো দিকের একটি জেনারেল স্টোরে গিয়ে কেউ স্যাণ্ডউইচ তৈরি, কেউ হট ডগ খেয়ে লাগু সারকে লাগল। চার্লিস তখনও ঠিক করতে পারছেন না কি করবেন। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরনের shyness মনটা আচ্ছন্ন করে ফেলল। ঠিক ছুটা দূরে গিয়ে এক কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইলেন—আখড়াটা এভাবে অপেক্ষা করবার পর ঠিক করলেন হোটেল ফিরে যাবেন। মনে মনে চার্লিস অনুভব করলেন যে, স্টুডিওর ভেতর গিয়ে এই সব লোকের সামনা-সামনি হওয়ার সাহস তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। আরও দুদিন ঠিক এই একই ব্যাপার ঘটল। তৃতীয় দিনে ম্যাক সেনেট ফোন করে জানতে চাইলেন চার্লিস কেন স্টুডিওতে যাচ্ছেন না। চার্লিস সুবিধামত একটা অজুহাত দেখালেন। সেনেট তাঁকে তখনই স্টুডিওতে চলে আসতে বললেন এবং চার্লিস সেদিন সাহসভরে দেখান গিবে হাজির হলেন ও ম্যাক সেনেটের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। সেনেট তাঁকে অন্যান্য অভিনেতাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। দু-এক জায়গায় ছবি তোলা হচ্ছিল—টুকরো টুকরোভাবে ছবি তোলার রীতি দেখে চার্লিস তো চমক্খিত—এভাবে যে ছবি তোলার কাজ হয় এ ধারণা চ্যাপলিনের ছিল না। একটি সেটে ম্যাবেল নরমাণ্ড কাজ করছিলেন, অপর একটিতে ফোর্ড স্ট্যারলিং। সেনেট ফোর্ড স্ট্যারলিং-এর সঙ্গে চার্লিস আলাপ করিয়ে দিলেন। কিস্টোন কম্পানী ছেড়ে ইউনিভার্সলে গিয়ে ফোর্ড নিজের কম্পানীর শক্তন করবেন এই ছিল কথা এবং ফোর্ডের জায়গাতেই চ্যাপলিনকে কাজ করবার জন্য নেওয়া হয়েছিল।

সেনেট এরপর চ্যাপলিনকে একবারে নিয়ে গিয়ে তাঁদের কাজের ধারাটা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন যে, তাঁদের সিনারিও করবার দরকার হয় না—যে কোন একটা আইডিয়া নিয়ে কাজ সূঁ হয়—তারপর পরে পরে স্বাভাবিকভাবে কতকগুলো ঘটনা ঘটতে থাকে—এরই ওপর ভিত্তি করে ছবি তুলে নেওয়া হয়। কমিডি-

মানের ব্যক্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় না।

কাজের ধারাটা চালির ভুলই লাগল। কিন্তু ব্যক্তিকে খবর করার ব্যাপারটার তাঁর জ্ঞান মত। যদিও ছবি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না, কিন্তু একথা চালি তখন থেকেই বুঝতেন যে, অভিনেতার পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা হোল তাব ব্যক্তির ব্যাপারটা।

সেদিন নানা সেটে ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতে লাগলেন চ্যাপলিন। তাঁর মনে হোল সব জায়গাতেই সবাই ফোর্ড স্টারলিং-এর অভিনয়-ধারাটা অনুকরণ করবার চেষ্টা করছে। আর একটা ব্যাপারে তিনি খুব আশ্চর্য বোধ করলেন। তিনি দেখলেন ফোর্ডের অভিনয়-রীতির সঙ্গে তাঁর অভিনয়রীতির কিছুমাত্র মিল নেই। সেনেটও তো তাঁর অভিনয় দেখেছেন এবং এমিকটা নিন্দা বুরোছেন। সেনেট কি চান-ফোর্ডের জায়গায় এসে চ্যাপলিন ফোর্ডের ধারায় অভিনয় করবেন? সেটা তো কোনবকমেই সম্ভব নয়। কিন্তু স্টুডিওতে যে সব ছবি তৈরি হচ্ছে, তা সরই যেন ফোর্ডের অভিনয়ের উপযোগী করেই লেখা। এমন কি রস্কা আরবাক্লও ফোর্ডের স্টাইলেরই অনুকরণ করে অভিনয় করে চলেছেন—দেখলেন চালি।

এভাবে বেশ করেদিন স্টুডিওর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কাটল। কিন্তু কাজ করবার জন্য ডাক পড়ে না। দু-একবার হয়তো সেনেটের সঙ্গে দেখা হয়—কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি এত ব্যস্ত যে কথা বলার সুবিধা হবে না।

শনিবার সেনেটের সঙ্গে কথা হোল। তিনি মধুরভাবে হেসে বললেন—সামনের অফিসে গিয়ে তোমার চেক্টে নিয়ে নাও।

চালি জিজ্ঞাস কবলেন, কবে থেকে তিনি কাজ সুরু করবেন। সেনেট এ প্রশ্ন গায়েই মাখলেন না। বললেন—এ নিয়ে ব্যস্ত ছেয়েয়া না—ঠিক সময়েই তোমাকে ডাকা হবে।

অবশেষে একদিন ডাক পড়ল। সেনেট ও ম্যাবেল নরম্যান্ড ফোর্ড স্টারলিং-এর দলকে নিয়ে দু'বে লোকেশন সূটিং-এ গোল্লিলেন। ফিফটার হেনরী লারম্যান ছিলেন কিস্টোন কম্পানীতে সেনেটের পরেই একজন নামজাদা ডিরেক্টর। তিনি এবার নতুন ছবি তুলবেন—ভায়ে চালিকে খবরের কাগজে রিপোর্টারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। লারম্যান ছিলেন বেশ দাম্ভিক জাতীয় লোক—কয়েকটি মেকানিক্যাল নেচারের কমিডি ছবি তুলে তিনি সে সময় বেশ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন—এই সাফল্য বিস্তর ভুল্লোক সব সময়েই আশ্রয়-সচেতন। লারম্যান স্পষ্ট ভাষায় বলতেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে অভিনেতা চান না—ফিল্ম কাটিং এবং মেকানিক্যাল ইফেক্টের সাহায্যেই তিনি হাস্যরসের সৃষ্টি করবেন।

ছবির কোন কাহিনী নেই—প্রিন্ট প্রেস

সম্মুখে ডুকুমেন্টারী ধরনের ছায়াচিত্র তোলা হবে এবং তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে হাস্যকর কয়েকটি ঘটনা। চ্যাপলিন দেখলেন লারম্যান কি করবেন ভেবে ঠিক কবতে পারছেন না। চালি এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য উদ্বোধন হয়ে উঠলেন। শব্দ, নিজের বিষয়ে নয়, অন্যের ব্যাপারেও লারম্যানকে সাজেশন দিতে সুরু করলেন। এইখানেই হল তাঁর ভুল। এর ফলে লারম্যান ভেতবে ভেতবে তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে উঠলেন। ছবিটি তোলবার সময় চালি নিজস্ব চিন্তাধারা অনুসারে অনেক কিছু কলাকৌশল দেখিয়েছিলেন—তিনিদিন লাগল ছবিটি তুলতে। কিন্তু তৈরি ছবি দেখে চালি একেবারে হতাশ হয়ে গেলেন। যেসব জায়গায় তিনি নিজের ইচ্ছামত অভিনয়কৌশল দেখিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন, সেসব জায়গা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা দেখে চালি কিরকম হতাশ হয়ে গেলেন—এরা এভাবে ছবিটা এডিট করে নষ্ট করল কেন? বহু বছর বাদে লারম্যান স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা কবই ওভাবে ছবিটা ছেটে দিয়েছিলেন। কারণ আর কিছু নয়—চালির প্রতি ঈর্ষা।

লারম্যানের সঙ্গে কাজ শেষ হয়ে গেল আর সেনেটও লোকেশন সূটিং থেকে ফিরে এলেন। এবার একটি সেটে কাজ সুরু কবলেন ফোর্ড স্টারলিং, আর একটিতে আরবাক্ল। অন্য একটি সেটে প্রস্তুত করা হল। চালির কোন কাজ না থাকায় তিনি এমন একটা জায়গা বেছে দাঁড়িয়েছিলেন যেতে

সহজেই সেনেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করত পারেন। নতুন সেটটি ছিল ফেটেল লব্ধি—সেনেট ম্যাবেলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটটি দেখছিলেন—তারপর চল্লি দিল্লি চেয়ে বললেন—যে কোন ধরনের এন্ট্রি কমিডি মেক-আপ নিয়ে চলে এ।

কি মেক-আপ নেবেন চালি—তখন পর্যন্ত কোন ধারণাই নেই। পুরাকার প্রেস রিপোর্টারের রূপসম্মতি চ্যাপলিনের বিশেষ পছন্দ হয় নি। সাজপোশাক ব্যবহার ঘটে দিকে যেতে যেতে চালি চিন্তা করে ঠিক করে নিলেন যে চললে প্যান্ট, অত্যন্ত বড় সাইজের স্ট্র, একটা ছড়ি এবং ডার্বি হ্যাট ব্যবহার করতে হবে। দেখতে হবে যাতে সব কিছুব ভেতরেই একটা লক্ষ্যের বৈপরীত্য সবার নজরে আসে। ষাট প্যান্ট হবে ব্যাগী, কিন্তু কোটা এবং টাই, টুপিটা ছোট, কিন্তু জুতো স্মিট আকর্ষণীয়। বয়সটা কত হবে? হঠাৎ মনে পড়ে গেল চালি যে সেনেট প্রথমে ছবি অভিনয় দেখবার সময় ধারণা কবছিলেন যে, তিনি বয়সটা আরও বেশি। সেইজন্য ছোট গৌত্র লাগিয়ে বয়সটা বাড়িয়ে ছিলেন—অতএব এতে করে মুখের ভাবভঙ্গী প্রকাশ করবার কোনও অসুবিধা হবে না। বিরাট চি দাঁড়ায় সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই তখন পর্যন্ত চ্যাপলিনের ছিল না। কিন্তু যাব-আপ নিয়ে তৈরি হতেই সেনেট থেকে সুরু কবে উপস্থিত সবাই হেসে দুটোপুটি।

দিনের শেষে চ্যাপলিন যখন ড্রাইংরুমে গেলেন, ফোর্ড স্টারলিং এবং বসে

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নোতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীমঙ্গল - গোহাটী

সারবাক্য তখন সেখানে বসে বসে আপ-
সুলভেন। এরা দুজনেই চাণ্ডির রূপসম্মতা
এবং অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।
কিন্তু একথাও চাণ্ডিলিন বুঝতে পারছিলেন
যে, দুজনেরই ডেভর একটা অন্তর্ভুক্ত
চলেছে।

সেই সময় অনুসারে ছবিটি হয়েছিল
একটা সুদীর্ঘ—প্রায় পঁচাত্তর ফুট লম্বা।
পরে সেনেট ও লারম্যান পরামর্শ সূত্রে
করলেন যে সম্পূর্ণ ছবিটি দেখানো হবে
কিনা? কারণ সে সময়ে হাসির নক্সা কচিং
কদাচিং দশ ফুট ছাড়িয়ে যেত। চাণ্ডি
বললেন, ছবিটা যদি দশ ফুটের আরোম্বই
দিতে পারে তাহলে সেটা কতটা দীর্ঘ সে
প্রশ্ন কি ওঠে? এই মতটাই মনে নেওয়া
হলে শেষ পর্যন্ত এবং অংশহানি না করে
সম্পূর্ণ ছবিটিই দেখানো হোল। এই দুপ-
সম্মতা থেকেই উদ্ভূত হোল চাণ্ডির ট্রাম্প
চরিত্রটি—তিনিও তখনই ঠিক করে ফেললেন
এরপর সব ছবিতেই তিনি এই একই রূপ-
সম্মতার অভিনয় করবেন।

সেনেটকে পরিচালক হিসাবে চ্যাপ-
লিনের বড় ভাল লাগতো তাঁর ডিরেকসনে
সেট-এ ছবির কাজ হয়ে যেত অত্যন্ত সহজ
এবং স্বতন্ত্রমতভাবে। কেউই কি করবেন
সে বিষয়ে খুব নিশ্চিত না থাকতে (এমন
কি পরিচালকও আগে থেকে জ্ঞান করে
কাজ সুস্থ করতেন না), চ্যাপলিনের মনে
হোত তিনিও এদের কারোর থেকে ছবি
বিষয়ে কিছু কম জানেন না। এর ফলে তাঁর
আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেল। তিনি নিশ্চিত
মনে সেনেটকে অনেক কিছু সাজেশনস
দিতেন এবং সেনেটও বিনামূল্যে তা গ্রহণ
করতেন। এর থেকে চাণ্ডির মনে দুটি বিশ্বাস
হল যে, তিনি নিজেও একজন সজ্ঞানশীল
এবং ইচ্ছা করলে ছায়াছবির কাহিনীও তিনি
নিজেই রচনা করতে পারেন। চাণ্ডি বলেছেন
যে, তাঁর মনে এই বিশ্রুটি আত্মবিশ্বাস এনে
দেবার মূলে ছিলেন ম্যাক সেনেট। সেনেট
যদি ছবি তোলার সময় তাঁর ভাষণাগুনিকে
ওভাবে না গ্রহণ করতেন তাহলে তিনি
হুয়েতেই পারতেন না যে, এসব বিষয়ে

স্বাধীনভাবে চিন্তা করার তাঁর ক্ষমতা
আছে। যাই হোক সেনেটকে তো বুঝি করা
গেল—কিন্তু সেটাই তো শেষ কথা নয়।
দর্শক কিভাবে ছবিটা নেত্র ভারই ওপর সব
কিছু নির্ভর করছে।

সেনেট যে ছবিটির পরিচালনা করে-
ছিলেন তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল ‘ম্যাবেলস
স্ট্রেন্স প্রোডাকশন্স’। এবার ছবিটি জনসাধা-
রণের কাছে দেখানোর বন্দোবস্ত হোল।
শিখাসম্মত চিত্রে দর্শকদের মাঝে বসে
চ্যাপলিন ছবিটি দেখলেন। পদ্যার ফোর্ড
স্ট্যারলিং-এর ছবি ফুটে উঠলেই দর্শকেরা
উত্তেজিত এবং উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল
এবং প্রাণভাবে হাসছিল। চ্যাপলিনের
আবির্ভাবে দর্শকমহলে কোনই সাদা জাগল
না। হোটেল লবীতে তিনি যে সব মজা-
দার, হাস্যকর ব্যাপারের অবতারণা করে-
ছিলেন তা দেখেও বিশেষ কেউ হাসল না।
কিন্তু ছবিটি খানিকটা এগিয়ে যেতেই
আন্তে আন্তে দর্শকেরা চাণ্ডিকে নিতে
সুস্থ করল—প্রথমে অল্প হাসি, তারপর
প্রাণখোলা হাসি এবং শেষের দিকে দুবার
হাসির হুয়েল উঠল। এর থেকে চাণ্ডির
মনে হোল দর্শক যে একেবারেই নতুন
অভিনেতাকে নিতে পারে না তা নয়।

দর্শকমতটা সর্বদেবেই। এবং সর্ব-
কালেই একটা অত্যন্ত জটিল এবং চিন্তা
করবার মত ব্যাপার। চাণ্ডি বলেছেন বটে যে
দর্শকেরা নতুনকে নিতে পারেন, তবে এই
নেওয়াটা বড় কঠিন ব্যাপার। একটা সত্য
কাহিনী বলি। কিছুকাল আগে আমার এক
বন্ধু তাঁর নিজস্ব নাট্যসম্মতা নিয়ে বিহারের
একটি বাঙালী-প্রধান শহরে অভিনয়
করতে গিয়েছিলেন। এঁরা তিনিটি নাটক
অভিনয় করেছিলেন—তার মধ্যে দুটি
ইরোজী নাটকের অনুসরণে লেখা এবং
পূর্বে এ নাটক আর কোথাও অভিনয় হয়
নি। সুতরাং ও দুটি নাটককে বিহার-
প্রবাসী বাঙালী দর্শক বেশ ভালভাবেই
গ্রহণ করলো। মুন্সি বাঘল তৃতীয়
নাটকটি নিয়ে—এটি শ্বিজেস্ট্রালের
ঐতিহাসিক নাটক সাজাহান। বন্ধুকে
বললাম, এসব বহুবীর মগ্গম্গ নাটক
অভিনয় করবার ভেতর কি কোন সার্থকতা
আছে। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে,
পুরানো বইকে নতুনভাবে প্রডিউস করে
দেখানোর ভেতর অবশ্যই একটা কৃতিত্ব
আছে। আরভিও বেভাবে হ্যামলেট চরিত্রের
রূপায়ণ করতেন বা সমগ্র নাটকটি বেভাবে
মগ্গম্গ করতেন, ফরাসি রবার্টসন বা গিল-
গুড বা অলিভিয়ার বা স্কেফিল্ড সেভাবে
নিশ্চয় অভিনয় করেন নি—তা হলে তো
একই জিনিসের রোপাটিন হোত। আসি
আর কি বলব, চুপ করে সেলাম। এই
নাটকটির আশ্রয় অভিনয়ের দিন আমি তো

দর্শকদের... মাঝে মাঝে আছে। অভিনয়ের
মাঝে মাঝে এবং বিরতির সময় দর্শকদের
মন্তব্য সব কানে আসতে লাগল—আরে
হ্যা, হ্যা, আওরগঞ্জের অত ত্যাডাতি কথ
বলে—সে করেছিল বটে বছর তিনেক আগে
আমাদের বেচাদা—এক লাইন বলে নির্মল
লাহিড়ী মত, তো পরের লাইন শুনে মনে
হবে ছবি বিশ্বাস, কখনও হাটে দুগাদাস
ব্যানার্জির স্টাইলে, আবার কখনও মহেশ্বর
গুপ্তের ভঙ্গীতে।

পাশের ছেলেটি বলে উঠল—আর
পচাদা মাইবি করেছিল বশোবন্তের পাট—
মনে ইচ্ছা বেন সরখ দেবী নিজেই মেল-
রোলে অভিনয় কবছেন।

আব একজন বললে—আর আমাদের
নির্মলদা—যখন হাত-পা-বোঁকরে অটোবক্স
মুনির মত চিৎকার করে উঠেছিলেন—
ঈশ্বরের মুখে ভস্মবাশি ছড়িয়ে দেও—
ছড়িয়ে দেও—ছড়িয়ে দেও.....। তিনবার
তিনবকমভাবে ‘ছড়িয়ে দেও’ বলেছিলেন—
প্রথমবার অহীন্দ্রবাবুর মত, দ্বিতীয়বার
নরেশ মিত্রের স্টাইলে, আর তৃতীয়বার
নির্মলেন্দু লাহিড়ীর ‘সিবাঙ্গের’ ধরণে।

পাশের থেকে আরেকজন আবার বলে
উঠল—আরে, কত লোক এই জায়গাটার
এনকোর দিরেছিল মনে আছে?’

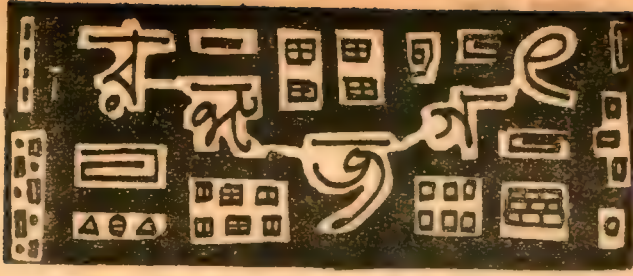
মনে মনে ভাবলাম এই এনকোরের তাগিদে
আরও কতবার না জানি ‘ছড়িয়ে দেওকে’ ওঁদের
নির্মলদা আরও কতরকমে বিগত যুগের
কত অভিনেতার কণ্ঠস্বরের অনুকরণেই
আবৃত্তি করেছেন কে জানে। ইন্টারভেলের
সময় এঁদের গোলমালে বিরক্ত হয়ে এক
মহিলা ভীষণ ধমক দিয়ে বললেন—অন্য
অভিনেতার গলা অনুকরণ করলেই অভিনয়
হয় না। কি ভাবে চোখ এবং হাতের কাজ
দেখাচ্ছেন এঁরা এবং চরিত্র রূপায়ণ করছেন
অভিনয়ের সময় সেটা ভালভাবে বুঝে দেখ-
বার চেষ্টা করুন।

কিন্তু এরা দলে ভারী। চিৎকার করে
মহিলাকে ধামিয়ে দিলে। অভিনয় শেষ
হবার পর বাড়ি ফেরবার পথে
বন্ধুদ্বয়কে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম।
তিনি জবাব দিলেন, একশো দর্শকের মধ্যে
নিরানব্বই জন পচাদা-বেচাদা প্রশ্নীর বিকৃত
রুচিসম্পন্ন দর্শকের জন্য আমরা অভিনয়
করি না, আমাদের অভিনয়শীল বোঁদে
রয়েছে এই শতকরা একজন রুচিসম্পন্ন
দর্শকদের জন্যই। এরাই নতুনকে নিতে
পারে, এরাই থিয়েটারকে সত্যিকার ভাল-
বাসে এবং ঠিকভাবে বুঝতে পারে। সব
দর্শকই যদি পচাদা-বেচাদার মত হোত
তাহলে থিয়েটার জিনিসটা বহুদিনই লিঙ্গ
চিসাবে অবলুপ্ত হয়ে যেত।

(ক্রেমশঃ)

প্রবীণ রসোপন্যাসিক
ঔষমমুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ১খানি
নিব্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।

বহুমুখতা প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১০



আঞ্চলিক চলচ্চিত্র সমস্যায় সঙ্কারণতার বিপদ

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত বাঙালী চলচ্চিত্র ও নাট্যদর্শক সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে ইংল্যান্ডের ন্যায় এদেশে চলচ্চিত্র-দর্শক ও প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের কাছ থেকে টিকেট প্রতি তিন পরস্যা হিসাবে লেভী ধার্য করে সেই অর্থ বাঙালী চিত্র-প্রযোজকদের সাহায্য দেবার দাবি করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আঞ্চলিক ছবির সংকট প্রসঙ্গে আমরা প্রস্তাব করে-ছিলাম ভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানীকৃত (প্রধানত ইংরেজী ও হিন্দী) ছবির টিকেট-প্রতি তিন পরস্যা লেভী ধার্য করা হোক, এবং সেই অর্থ আঞ্চলিক চলচ্চিত্র উন্নয়নে

ব্যয় করা হোক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিরোজিত চলচ্চিত্র তদন্ত কমিশনের নিকট এরূপ প্রস্তাব করা হয়েছিল। দূর্তাগের বিষয় সেই কমিশনের রায় এখনও প্রকাশ করা হয় নি। হবে কিনা তা একমাত্র মন্তিসতাই জানেন।

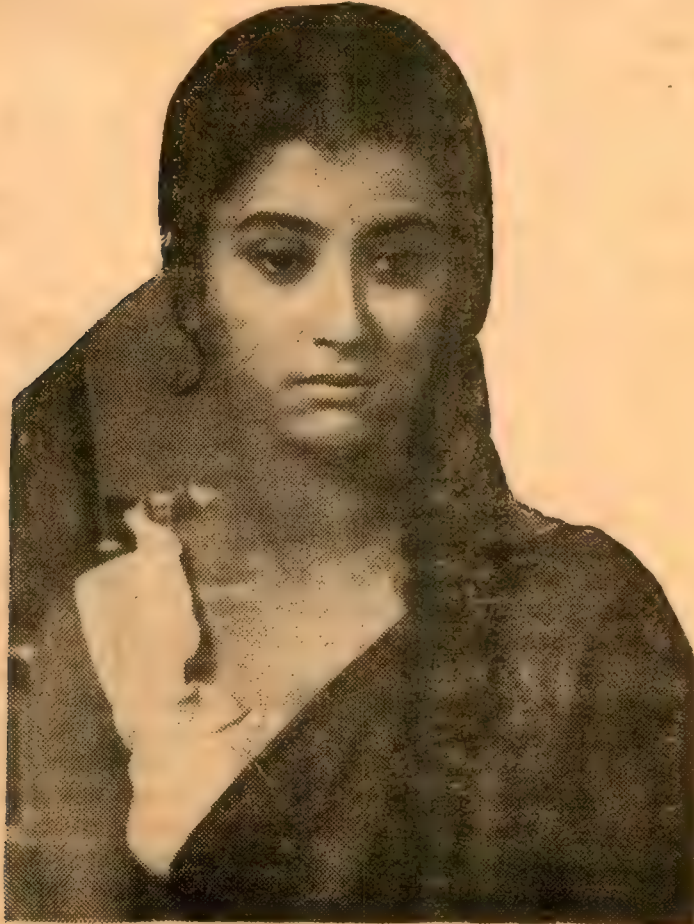
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সংকট কেবল বাংলা ছবির নয়। প্রতিটি আঞ্চলিক ছবিই আজ গভীর সংকটের মধ্যে। তুলনামূলক-ভাবে তামিল ও তেলুগু ছবির আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল। তার কারণ, এই দুই ভাষার ছবির দর্শকসংখ্যা বেশি এবং দক্ষিণ ভারতে হিন্দীর প্রতি বিরূপ মনোভাব।



রাজদ্রোহী' ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক

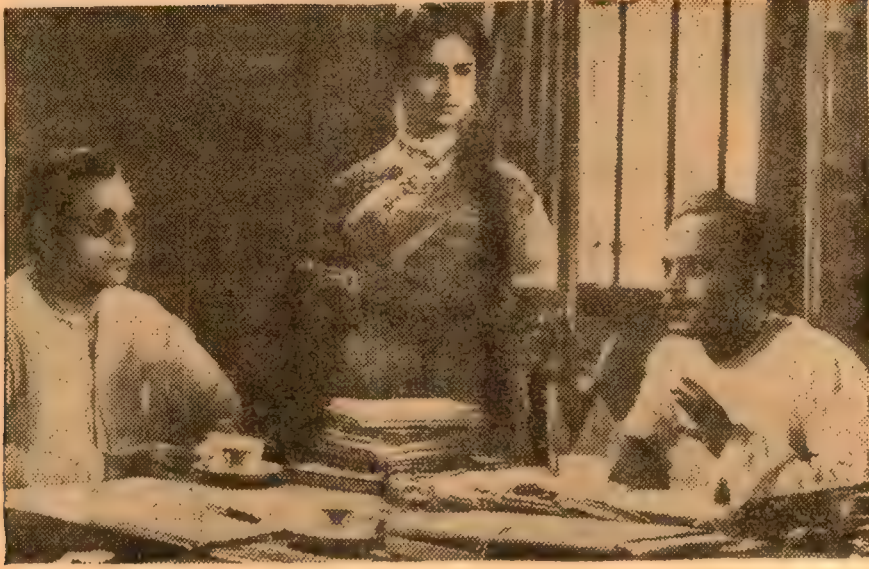
কিন্তু মারাঠী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, অসমীয়া, বাংলা প্রভৃতি আঞ্চলিক ছবি হিন্দীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার মাথা ভুলে দড়িতে পারছে না। সুতরাং অন্যান্য আঞ্চলিক ছবি থেকে বাংলা ছবিকে আলাদা করে দেখলে সমস্যার সমাধান তেজ হবেনই না, উপরন্তু সংকীর্ণতা দেখে এরূপ দাবি জনসমর্থন লাভ করবে না। তাই প্রত্যেক রাজ্যে ভিন্ন রাজ্য ও বিদেশ থেকে আমদানি করা ছবির ওপর লেভী ধার্য করে তা আঞ্চলিক ছবির উন্নয়নে ব্যয় করার দাবিই যুক্তিসঙ্গত। এরূপ দাবি প্রত্যেক রাজ্যের সমর্থন লাভের যোগ্য এবং এতে আঞ্চলিক ছবি বাচার সুযোগ লাভ করবে। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন, আঞ্চলিক ছবির বিকাশ না হলে সর্বভারতীয় ছবির বিকাশ হতে পারে না।

সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বাঙালী চলচ্চিত্র ও নাট্যদর্শকদের মধ্যে বিষয়টি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যখন সকল ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ঐক্য ও ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন বেশি করে অনুভব করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখন বিষয়টি কেবলমাত্র বাঙালী-দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা অভ্যস্ত সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক ও প্রতিভীক্শা-শীল। আলোচনা করলে দেখা যাবে বাঙালী, ওড়িয়া, অসমীয়া, কানড়া, মারাঠী প্রভৃতি প্রত্যেকটি জাতির দর্শকদের মনোভাব ও সমস্যা একই। সুতরাং প্রত্যেক জাতির দর্শক একই স্বেপে বসে আঞ্চলিক চলচ্চিত্র ও নাটকের সমস্যা আলোচনা করতে বাধ্য কোথায়? বরঞ্চ এতে ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে চলচ্চিত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্ভব। ঢালাওভাবে সবারকমের হিন্দী ছবির বিরুদ্ধে জেহাদী মনোভাব দেখালে দর্শকরা বিভ্রান্ত হয়; এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেই প্রকারান্তরে সাহায্য করা হয়।



'আকাশ-কুসুম' ছবির নায়িকা অপর্ণা দাশগুপ্তা

—ম.জন।



শাই সেন পরিচালিত 'সুদের আগুন' ছবিতে অজয় গাঙ্গুলী, সুমিতা সান্যাল, রবি ঘোষ, অরুণমতী গুহঠাকুরতা

চিত্র আলোচনা

ও কে?

(রেশমী এন্টারপ্রাইজ : দিলীপ বসু)

সামাজিক কাহিনীচিত্রের তুলনায় অপরাধ কাহিনীচিত্রে প্রযোজক ও পরিচালকের দায়িত্ব অনেক বেশি। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, স্বার্থান্ধতা ইত্যাদি নিয়েই সাধারণত অপরাধচিত্র স্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত করে। সুতরাং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছাড়া অপরাধ কাহিনীচিত্র সার্থক করে তোলা সম্ভব হয় না। অপরাধ কাহিনীচিত্রে ক্যামেরার বাহাদুরীর এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে।

‘ও কে?’ ছবিটি অপরাধমূলক কাহিনীচিত্র। কিন্তু ছবির গঠনকৌশল ও কাহিনী দুর্বল। রহস্যময় এক সমাজবিরোধী ক্রান্তি ও একটি চক্রকে পদ্য বার বার দেখিয়ে—তারপরের কাহিনী ‘বাদশা’ ছবির অনুরূপভাবে অগ্রসর হয়েছে। এখানে ছেলেটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অগত্যা হয়েছিল; তারপরে এক ক্রিমিন্যাল তাকে মারতে গিয়ে নিজের জীবনের অতীত স্মৃতি মনে করে বাৎসল্যে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং নিজে ছেলেটিকে লালন-পালন করে। ছেলেটিকে অপহরণ করার যে মূল কাণ্ডারী—শেষ পর্যায়ে জানা গেল সে গৃহস্বামীর নিকট আত্মীয় সুজিতের বন্ধু ভাই—শঙ্কর। পরিচালক—শঙ্করের

মুখটা না দেখিয়ে সর্বক্ষণ ও কে? এই প্রশ্ন জাগিয়ে রেখেছেন। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে প্রশ্ন থেকে যায় শঙ্কর কেন এই জিঘাংসার পথে গেল; কি তার স্বার্থ? কেনই বা সুজিত প্রাথমিক পর্যায়ে শঙ্করের প্রস্তাব দ্বাদর কাছে জানায় নি। ছবিতে অসঙ্গতির অভাব নেই।

ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনার দায়িত্ব একাই বহন করেছেন দিলীপ বসু। চিত্রনির্মাণ পদ্ধতিতে তিনি বোম্বাই ক্রাইম পিকচার্সের অনুসারী। সেই রীতি অনুযায়ী—ক্যাবারে নর্তকী, ক্রিমিন্যালস্‌ডেন, নারীবিলাস, মদ এবং অপ্রাসঙ্গিক গান ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কমল মিত্র, গীতা দে, লিলি চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, কালিদাস চক্রবর্তী, শ্রীমান স্বপন, মণি শ্রীমানী শকুন্তলা ডাউ, আশা দেবী, রেখা মল্লিক প্রমুখ। ঐতি চরিত্রে অভিনয় করেছেন তরুণ-কুমার। অভিনয়ক্ষেত্রে এরা সকলেই পরিচালকের নির্দেশ সার্থকভাবে পালন করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ভি. বালসারা।

‘ওয়ার এন্ড পীস’-এর নায়িকা লুডমিলা সাবেলায়েভা

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে রাশিয়ার দিক থেকে বিশেষ আকর্ষণীয় ছবি ‘ওয়ার এন্ড পীস’ প্রদর্শিত হবে। লিও টলস্টয়ের চিরায়ত সাহিত্যের চিত্ররূপ ইতিপূর্বে ইউরোপে হয়ে গেছে। এবার সোভিয়েট ইউনিয়নের অভিনেতা-প্রযোজক সেগেই বন্দরচুক চিত্ররূপ দিয়েছেন। সেগেই বন্দরচুক লেনিন

পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁর অনন্যসাধারণ শিল্প-প্রতিভার জন্য।

‘ওয়ার এন্ড পীস’-এর নাট্যশা রোস্তোভার চরিত্রের জন্য বন্দরচুক প্রায় তিন হাজার অভিনয়েচ্ছুক মেয়েদের থেকে লুডমিলা সাবেলায়েভাকে বাছাই করেছেন। এই বাছাই-এর কাজটা ভয়ানক কঠিন। টলস্টয়ের নাট্যশাঙ্কে বলরুমে, শিকারে, রাশিয়ান নাচে...বহু স্থানে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু তার চেহারার স্পষ্ট বর্ণনা কি দিয়েছেন? উপন্যাস পড়ে নাট্যশাঙ্কে মনে হয় কাব্যশ্রীমণ্ডিত, অক্ষরন্ত জীবনময়, সরল, উদারহৃদয় এবং নিঃস্বার্থ এক অভিজাত তরুণী। উপন্যাসের একটি জরুরি নাট্যশা সম্পর্কে আছে—কালো চোখ...বড় মুখ...খুব সুখী...কৃশ তরুণী। এই বর্ণনাকে অবলম্বন করে নাট্যশার অনুসন্ধান চলতে থাকে; এবং শেষ পর্যন্ত বন্দরচুক লুডমিলা সাবেলায়েভাকে মনোনীত করেছেন নাট্যশা চরিত্রের জন্য। লুডমিলা সাবেলায়েভা তিন বছর পূর্বে লেনিনগ্রাড ব্র্যালে স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে নাট্যশার মত এক চরিত্রে অভিনয় করার জন্য যে তার ডাক পড়বে একথা সেও ভাবতে পারে নি। কিন্তু তার চেহারাই তাকে সুযোগ দিয়েছে এতবড় একটি চরিত্রে অভিনয়ের। এক সাক্ষাৎকারে লুডমিলা বলেছে : স্কুলে ‘ওয়ার এন্ড পীস’ সম্পর্কে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম এবং তাতে নাট্যশার চরিত্র ব্যাখ্যা করেছিলাম। আজকের প্রত্যেক তরুণীর মধ্যে নাট্যশাঙ্কে খুঁজে পাবেন, আমরা নিজেরা কিন্তু সেকথা স্বীকার করি না; আমরা কথায় ও কাজে সরলতাকে আঁড়াল করতে চাই।



পশ্চিম জার্মানীর মৃত্যুগগন নাট্যাভিনয়ের দৃশ্য

আমি অবাক হয়ে ভাবি কেন? সরল হওয়াই তো ভাল। টলস্টয়ের যেমন জীবনে সরলতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন আমাদের তাই দেওয়া উচিত।

এই কথাগুলি থেকে বোঝা যায় বঙ্গবর্তী কন লুডমিলাকে নাট্যশা চরিত্রের জন্য মনোনিবেশ করেছেন। টলস্টয়ের নায়িকার সাথে তার অন্তরের বোঝা আছে; তেমনি তার শিশুর মত স্বতঃস্ফূর্ততা, তার বিস্ময়-ভরা গোল গোল চোখ দুটি, জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা, মানুষের প্রতি সম্মান বা কিছ্ মমতাময় ও ভাল তার প্রতি আস্থা—তার মধ্যে টলস্টয়ের নাট্যশাকে ফুটিয়ে তুলেছে।

আশা করা যায়, 'ওয়ার এন্ড পীস' ছবিতে লুডমিলার অভিনয়ে দর্শকরা টলস্টয়ের মানসিকনা নাট্যশাকে প্রত্যক্ষ করবে।

করে 'গিরিশ পুরস্কার' পেয়েছে নবদরবারী সংস্থা (নাটকের নাম বেহাগ)। এবং দ্বিতীয় স্থানার্ভিষিক্ত হয়ে 'রসরাজ অমৃতলাল পুরস্কার'টি লাভ করেছে নটলীলা সংস্থা (নাটকের নাম জীবনরংগ)। এই প্রতিযোগিতার প্রেক্ষা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়ে 'তারাসুন্দরী পুরস্কার'টি লাভ করলেন প্রতিমা গাল (বেহাগ নাটকের নায়িকা)।

গত ১৯শে জুন বিশ্বরূপা থিয়েটারে একাধিক গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ৭০টি আবেদনকারী নাট্যসংস্থার মধ্যে ১৮টি নাট্যসংস্থা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু প্রতিযোগিতায় ফলাফল নৈরাশ্যজনক, কেননা ১৯টি পুরস্কারের মধ্যে মাত্র তিনটি প্রদান করা হয়।

আমিনার চরিত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করে কুমারী রীতা গোস্বামী বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছেন।

প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বাঙালীদের দ্বারা আয়োজিত সুসজ্জিত নাটক কাগুনরপ্পের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'সব্বে বড়া রূপাইয়া' এবং তৃতীয় স্থানার্ভিকারী শ্রীকরণ মৈত্রের 'বৃন্দবৃন্দ' নাটকে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেছেন শ্রীমতী কম্পনা চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি পরিচালনা করে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান লাভ করেছেন শ্রী বি. কে. সেন।

শ্রেষ্ঠ কাহিনী—শ্রী পি. কে. ঠাকুর।

এ ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন সর্বশ্রী বিজন বসু, শ্যামল চৌধুরী ও সবিজ্ঞ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যবিশ্ব রচনা

গিরিশ পুরস্কার নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত পঞ্চম বার্ষিক পুরস্কার গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় এবার প্রথম স্থান অধিকার

প্রবাসী বাঙালীর কৃতিত্ব

ভিলাই-এ সর্বভারতীয় ভাষার নাট্য প্রতিযোগিতায় ১৯৬৫ সালের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছে অ্যাংল স্টীলস থ্রেনিসদের দ্বারা আয়োজিত বাংলা নাটক 'মহেশ'। নাটকটিতে গফুরের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান লাভ করেছেন শ্রীহীরক রায় এবং মঞ্চসজ্জার জন্য প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তা ছাড়া

মৃত্যুগগনে বাৎসরিক রঙ্গাভিনয়ের আয়োজন

প্রত্যেক বছরে হ্যানোভারের অভিজাত 'গল্পী হেরেনহাউসেনের বৃক্ষমাল্যশোভিত উদ্যানের মৃত্যুগগনে নৃত্য-গীত-নাটকের আসর বসে। এ বছরও হ্যানোভার স্টেট থিয়েটারের তরফ থেকে মৃত্যুগগনে অভিনয়ের জন্য পশ্চিম জার্মানীর প্রখ্যাত নাট্যসংস্থাসমূহ থেকে বিখ্যাত কণ্ঠনীদের নিয়োজিত করা

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

য়েছে। এ বছরে নতুন যেসব নাটক মঞ্চস্থ করা হবে তার মধ্যে রয়েছে ফ্রিডরিশ শীলারের “শুন কার্লেস” ও লোপে দ্য ভেগাসের “শুন লোকোস দ্য ভালেসিয়া”। গত কয়েক বছর ধরে প্রচুত সাফল্যলাভ করায় সেক্স-পীরারের “দি য়েরী ওয়াইভস অফ উইন্ডসর” অভিনয় করার আয়োজন করা হয়েছে। অপরদিকে রংগাভিনয়ের জন্য রাখা হয়েছে সেক্সপীরার “জান্টিস প্রহসন” বা “কমোডি অফ এরারস্”। সংগীতানুগাীদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় কনসার্ট। এ বছরের মৃত্যুগান অনুষ্ঠানে গত বছরে হেন্ডেলের সাফল্যমণ্ডিত দৃশ্যময় সলোপম্বার নাটক “সুসান্না” ছাড়াও হেন্ডেলের মিলনাথক গীতিনাট্য “আশিস ও পালটিয়া” ও আধুনিক বলিষ্ঠ সংগীত পরিবেশন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিঁড়ির মত মঞ্চে নাটকের আসর

সোয়েবিশ-হলে পশ্চিম জার্মানীর একটি ছোট মধ্যযুগীয় জনপদ। এখানকার বাসিন্দার সংখ্যা মাত্র বিশ হাজার। এই ক্ষুদ্র জনপদটি

লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত এবং অপর এক কারণে বিখ্যাত। প্রতি গ্রীষ্মে এখানকার মৃত্ত মঞ্চে অভিনয়ের আসর বসে। মৃত্তাঙ্গন অভিনয়ে এই জনপদের প্রসিদ্ধি বহুকালের। গত চল্লিশ বছর ধরে এখানকার সিঁড়ির মত মঞ্চে জার্মানীর খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেই প্রায় অভিনয় করে গেছেন। পশ্চিম জার্মানীতে বর্তমানে মৃত্তাঙ্গনের সংখ্যা একশতের কিছু বেশি।

সোয়েবিশ-হলে এইরকম উৎসব অনুষ্ঠান বেশ কয়েকশত বৎসর ধরেই চলে আসছে। মধ্যযুগে লবণ প্রস্তুতকারকরা তাদের “স্বৈত স্বর্ণ” বেচাকেনা করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবসাকেন্দ্রে মিলিত হত। ব্যবসা শেষে সূর্য হত তাদের চিরাচরিত উৎসব ও নৃত্যানুষ্ঠান। আজও নগরস্বারে টকটকে লাল পোষাক পরিহিত লবণ প্রস্তুতকারকদের নৃত্য দেখতে দেশবিশেষ থেকে দর্শক সমাগম হয়।

তবে বর্তমানে প্রধান আকর্ষণের মধ্যে পড়ে সিঁড়ির মত মৃত্ত মঞ্চে গ্রীষ্মকালীন নাটকভিনয়। এ বছরের মরণময় সূর্য হবে

২৬শে জুন। উৎসব সূর্য হবে হুগো ফন হফমানস্বালের “য়েডেরমান” (প্রত্যেকটি লোক) নাটকের অভিনয়ে। একুশে আগস্ট পর্যন্ত স্থায়ী এই উৎসবে থিয়েটারি মল-নিয়ন্ত্রকের “জোয়ান অফ আর্কের বিচার” এবং শীলারের “ওয়ালেসটাইন” নাটক দুটিও অভিনীত হবে।

সংবাদ বঙ্গমা

মস্কা চলচ্চিত্র উৎসবের অঙ্গ

খাসম মস্কা চলচ্চিত্র উৎসবের পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার জন্য যে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রযোজক সেগেই গেরাসিমভ। ইনি সোভিয়েট ইউনিয়নের পিপলস আর্টিস্ট সম্মানে ভূষিত। বিচারকদের মধ্যে থাকবেন এম. জেগান (রুমানিয়া), এল. ফিওরাবিস্তি (ইতালী), কিরাসিতো উসিহারা (জাপান), চলচ্চিত্রভিনেত্রী মেরিনা ভ্যাডি (ফ্রান্স), রাজকাপুর (ভারত)।

স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি হয়েছেন রোমান কারম্যান। ইনি প্রামাণিক চিত্রের ক্ষেত্রে বিখ্যাত লেনিন পুরস্কার লাভ করেছেন।

মস্কা উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য ভারতের শ্রীদিলীপকুমার এবং প্রযোজক শ্রীবিমল রায় বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। সোভেন্সপোর্ট ফিল্মস থেকে শ্রী কে. এস. মোদী এবং শ্রীগোবর্ধন দাস আগরওয়ালকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে।

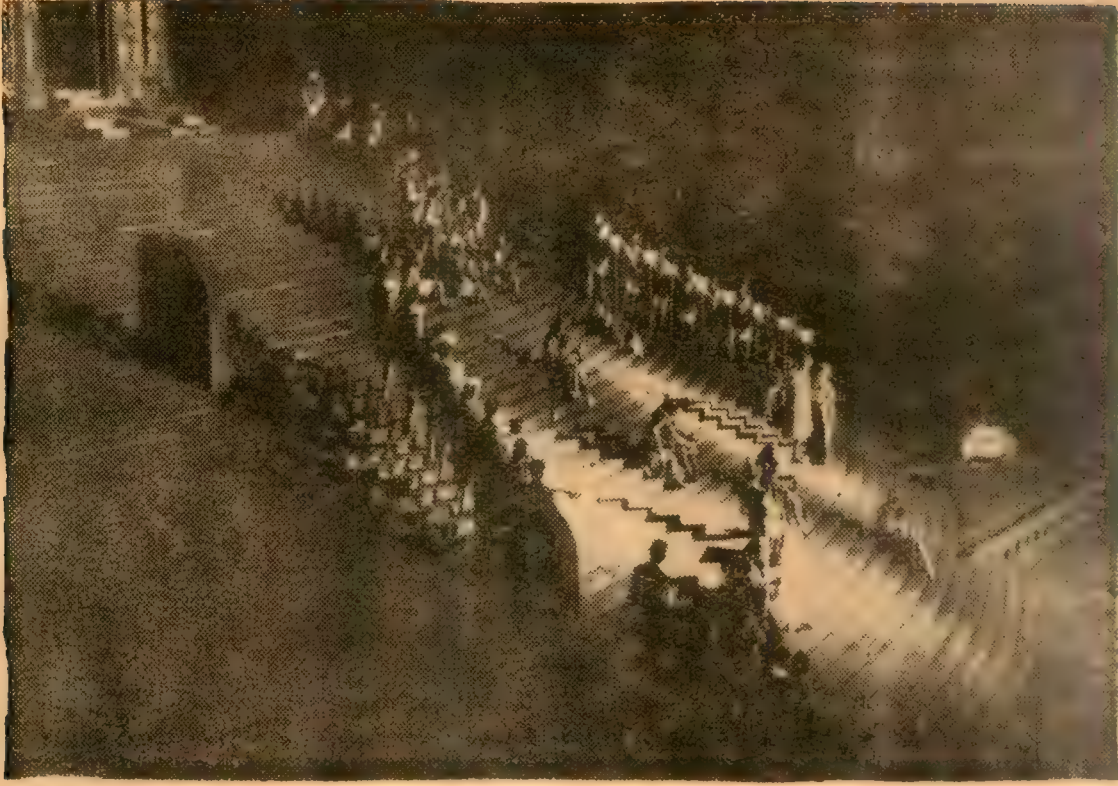
মস্কা উৎসবে কয়েকটি ছবি

মস্কা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতার জন্য বিভিন্ন দেশের ছবি আসতে সূর্য করেছে। ইতিমধ্যে এসে গেছে : দি এসা-সিনেশন (চেকোস্লোভাকিয়া), দি হোয়াইট ষ্টারাল (রুমানিয়া), দি এডভান্সার অব ওয়ানার হল্ট (গণতান্ত্রিক জার্মানী), টরেন্ট আওয়ার্স (হাঙ্গেরী), ভুলা (বুলগেরিয়া), আংকল টমস্ কেবিন (ফেডারেল জার্মানী), দোমিস্ত (ভারত), ম্যারেজ-ইতালিয়ান স্টাইল (ইতালী), দি স্কাই এবভ (ফ্রান্স), দি ব্ল্যাক উইন্ড (মেক্সিকো), হ্যান্ড ইন হ্যান্ড (জাপান)। উৎসব সূর্য হবে ওই জুলাই থেকে। উৎসবের আদর্শ-বাণী : চলচ্চিত্রে মানবতাবোধের জন্য, জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব ও শান্তির জন্য।



সেগেই কদরভক পরিচালিত “ওয়ার এন্ড পীস” ছবির নায়িকা লুডমিলা সাক্সেরায়েভা।

এই ছবি এবার মস্কা উৎসবের আকর্ষণ।



মহাবঙ্গীর ধারায় মৃত্যুগন মঞ্চে অভিনয়

কবি নজরুল জন্ম-জয়ন্তী উৎসব

প্রতি বছরের মত এবারও ১৯শে ও ২০শে জুন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নজরুল জন্ম-জয়ন্তী কমিটির উদ্যোগে কবি নজরুল ইসলামের জন্ম-জয়ন্তী উৎসব হয়েছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন দৈনিক বঙ্গবন্ধুর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র।

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু জয়ন্তী উৎসব উদ্বোধন করেন। কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলা সাহিত্যে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন সাহিত্যিক শ্রীতারকেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, ভারতীয় ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅজিত বসু। ২০শে তারিখে সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

দুইদিনব্যাপী কবি নজরুল রচিত গণগীতের এক আকর্ষণীয় আসর বসে।

বাংলার খ্যাতনামা গায়করা একে একে এসে গান গেয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সঙ্গীত করেন চরণ-গায়ক শ্রীসত্যেন্দ্র বসু মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনে শ্রীবৃন্দদেব রায় ও সম্প্রদায়। তার পরে গেয়ে গেলেন শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ব্যারিস্টার শ্রীস্বাধন গুপ্তের কণ্ঠে 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানটি দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সর্বশ্রী সিম্বেশ্বর

মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, সৌম্য কবিম নিমিতা গাঙ্গুলী, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রবীণ সুরশিল্পী বিখ্যাত রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন চক্রবর্তী, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সান্দা গুপ্ত, পামলাল ভট্টাচার্য অপারেশন, শ্রী, ধীরেন বসু, কবি-রচিত জনপ্রিয় গানগুলি গেয়ে শোনালেন।

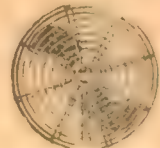
সুশাতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলুক্র



মার্কনা ফ্যান
বগদ মূল্যে
১টি কিংস্টতে দিন

মার্কনা ইলেকট্রিক কর্পোরেশন
(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ৩৫-৩০৪৮





একজন প্রখ্যাত চেক মুকাজিনতা—অভিনয় দৃশ্য

শ্রীমতী নাথ ও কবিপদ শ্রীকাজী
অনিরুদ্ধের পরিচালনায় কবির কয়েকটি
বিখ্যাত গান গীটারে বাজানো হয়। এই
উপভোগ্য অনুষ্ঠানে কণ্ঠসম্পন্ন অংশ গ্রহণ
করেন কবির কনিষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী কল্যাণী
কাজী। এককভাবে গীটার বাজায় কিশোর
শিল্পী শ্রীঅভিজিৎ নাথ।

কবির রচনা পাঠ করেন যশমতী
কবিপদ শ্রীকাজী সবাসাচী ও শ্রীশম্ভু মিত্র।
শ্রীমতী ইন্দ্রিমা দেবী ও শ্রীপ্রদীপ ঘোষ,
শ্রীমতী শূভা সেন, শ্রীমতী তপতী মুখো-
পাধ্যায় ও সন্দীপ্তা গুপ্তা, শ্রীসবিতারত

দত্ত, শ্রীআব্দুল কাশেম রহিমুদ্দিন ও শ্রীমতী
বালাী বন্দ্যোপাধ্যায়ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ
করেন।

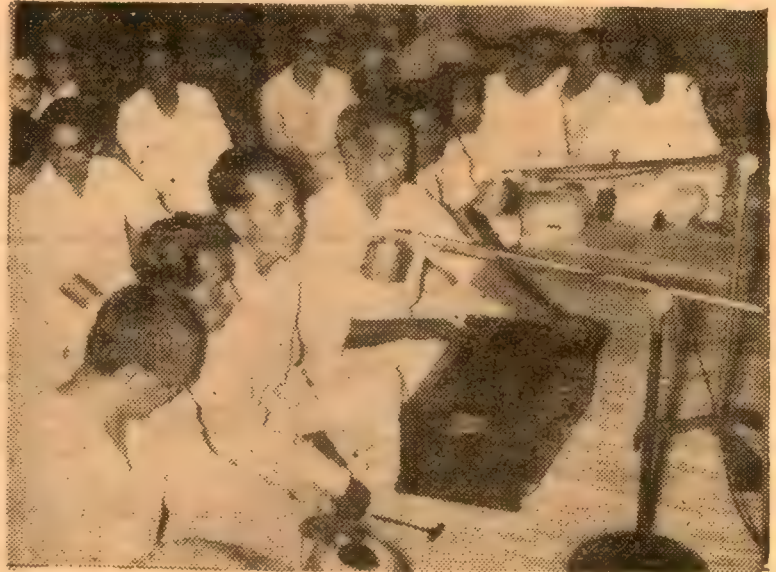
এবারের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল
কবির জন্মস্থান চুরুলিয়া থেকে আগত লেটো
গানের সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। বাল্যকালে কবি
লেটো দলের জন্য গান রচনা করেছিলেন।
গোলাম কাজী ও অম্ব গায়ক মকবুল হোসেন
ও সম্প্রদায় দীর্ঘদিন পূর্বে কবি-রচিত লেটো
গান গেয়ে শোনালেন।

বাঙালী চলচ্চিত্র ও নাট্যমঞ্চ সম্মেলন

গত ২০শে জুন মহাজাতি সদনে বর্ধমান
কিনোবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅমল্যভূষণ সেনের
সভাপতিত্বে বাংলা চলচ্চিত্র ও নাট্যমঞ্চ
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির
সভাপতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিকৃত
রুচির ছবি নির্মাণ বন্ধ করার ব্যাপারে নাগরিক-
দের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেন। ২১শে জুনের
অনুষ্ঠানে বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির শ্রীজ্যোতিষ-
চন্দ্র ঘোষ, শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ প্রমুখ বক্তৃতা
করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন মাজিউ
রুচির চিত্র নির্মাণে সরকারের উৎসাহদানের
প্রয়োজন আছে।

অনুষ্ঠানে বেঙ্গল মোশান পিকচারস
এন্ড রিটার্ড কমিটির পক্ষ থেকে 'চারুলতা' ও
'অনুষ্ঠাপ ছন্দ', 'আরোহী' অতিথি ছবি
শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন
করা হয়।

সম্মেলনে শ্রীভূপেন্দ্র আদিত্য কয়েকটি
প্রস্তাব উত্থাপন করেন।



ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটির অনুষ্ঠানে বর্ধমান থেকে
আগত দল লেটো গান করছেন।

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে
শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্সপিরে—
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

প্রতিভাবান্ধী কথোপকথন—সর্বস্বত্বের
বন্য নিষেধ—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপ-
ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলস :
ধারনাধি বন্ধ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য
ভগ্নতের এই পৃথ্যপ্রভা মাত্র ১১০ টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

আমেরিকান থিয়েটার :

ঐতিহাসিক এবং কাল বিভাগের দিক থেকে আমেরিকান থিয়েটারকে চারটি পিরিয়ডে ফেলা যায় : (১) উপনিবেশিক সময়কাল অবস্থা (২) রেনালিউশন থেকে সিভিল ওয়ারের সময় অবধি (৩) সিভিল ওয়ারের সময় থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত (৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আধুনিক কাল।

আমেরিকা যখন ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল সে সময়টার থিয়েটারের ইতিহাস বেশ অগুণ কথ্যেই সেরে নেওয়া যায়। লোকসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ভাগ ছিল দুঃসাহসিক কর্মপ্রয়াসী এবং সমাজপরিভ্রমের দল-নতুন দেশ আমেরিকায় এরা এসেছিল ভাগ্য অন্বেষণে। তখন সবাই ব্যস্ত ছিল। যে যার বসতি ঠিক করতে এবং কিভাবে জীবিকা অর্জন করবে তার উপায় অন্বেষণ করতে। তখন ওখানকার আদিম অধিবাসীরা নতুন আগন্তুকদের সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিরূপ মনোভাব মনে মনে পোষণ করতো। তাদের থেকে আত্মরক্ষার কথাও চিন্তা করতে হতো। সুতরাং প্রথমে যে সব ইউরোপের অধিবাসীরা আমেরিকাতে বসবাস করতে এসেছিলেন তাদের না ছিল অপরাধ সময়, অথবা কোনো শিল্পানুরাগ বা নাট্য-শিল্প সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ। অথচ নাট্য-শিল্প গড়ে তুলতে গেলে দরকার হয় প্রচুর সময় দিয়ে একাগ্রতার সঙ্গে রংগমঞ্চকে অরুগনাইজ করা। ইউরোপাগত লোকদের তখন খাওয়া, থাকা এবং জীবিকাজনের দাম্পত্যেই বেশির ভাগ সময় কেটে যেত। সুতরাং কলোনিয়ালিজমের পর এক শতাব্দী প্রায় কেটে গেল থিয়েটারবিহীনভাবে অর্থাৎ এই সময়টার আমেরিকায় কোন থিয়েটার বা থিয়েট্রিকেল এ্যাক্টিভিটি দেখা যায় নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকায় জনসংখ্যা দাঁড়ালো তিরিশ লক্ষে। এখানে ওখানে শহরের পসন্দ হতে সুরু হয়েছে। সামাজিক অবস্থাও একটা পরিকল্পিত আকার নিতে আরম্ভ করেছে, দেশে সর্বোৎকর্ষিত মঙ্গল এবং প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে।

এক্ষেত্রে শহুরে মানুষের হাতে পরসা, অবসর এবং কিছুটা সফিস্টিকেশন্ থাকলে যা হয়ে থাকে তাই ঘটল। চাহিদা দেখা দিল নুপরিচালিত আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানের। ফলে কর্মতৎপর এবং উদ্যমী লোকেরা জনগণের চাহিদা মেটাবার জন্য রংগমঞ্চের প্রতিষ্ঠার মন দিলেন, যাতে করে থিয়েটার চালিয়ে তারাও দু'পরসা রোজগার করতে পারেন। যে সব অভিনয় এ সব মঞ্চে হোত বোল্টন এবং ফিলাডেলফিয়াতেই বেশির ভাগ থিয়েটার বাড়িগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—তখনও পর্যন্ত নিউইয়র্ক আমেরিকান মেরপলিস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তার বেশির ভাগই ছিল ধার করা। হয় ভিজিটিং কম্পানি ইংল্যান্ড থেকে এসে অভিনয় করে যেত, না হয় ইংলিশ স্টেজের অনুকরণে

বঙ্গমঞ্চ ও দেশে এবং বিদেশে শিল্প

নেটিভরা লন্ডনে অভিনীত নাটকের অভিনয় করতো।

আমেরিকান থিয়েটার সম্বন্ধে প্রথমেই একটা কথা মনে রাখা দরকার। গীর্জা বা রাজসভা বা শাসক সম্প্রদায়ের থেকে অনুপ্রেরণা পেরে এখানকার থিয়েটার গড়ে ওঠে নি। এখানকার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পিছনে আগাগোড়াই রয়েছে ব্যবসাদারী মনোভাব। সুতরাং আমেরিকান থিয়েটারকে মূলত চালিয়ে নিচ্ছেন একজাতীয় ব্যবসায়ী—যাদের বলা যেতে পারে “থিয়েটার-ব্যবসায়ী”। অভিনয়কে শিল্প হিসাবে ভালবাসেন এমন কিছু কিছু লোক বা গোষ্ঠী যে মঞ্চের উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে এগিয়ে আসেন নি সে কথা বলছি না—তবে তুলনার এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। আমেরিকান থিয়েটারে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আধিপত্যটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাই

প্রফিট-মোটভ নিয়েই এখানে প্রায়শত থিয়েটার চালানো হোত।

অবশ্য ইউরোপের অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশেও আজকাল ব্যবসাদারদের থিয়েটার পরিচালনার ব্যাপারে একটা সক্রিয় অংশ নিতে দেখা যায়। কিন্তু ওসব দেশে এই প্রভাব এসেছে অনেক পরে—একটা বিশেষ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে—কিন্তু মার্কিনী থিয়েটারের সুরুই কন্মার্সিয়াল থিয়েটার হিসাবে। এটা খারাপ কি ভাল তা বলছি না—শুধু বোঝাতে চাইছি যে, এখানে অভিনয়কে কলা হিসাবে প্রাধান্য না দিয়ে, অর্থ উপার্জনের উপায় হিসাবেই গ্রহণ করেছেন থিয়েটার-ব্যবসায়ীরা। এমন অভিনেতা বা নাট্যকারও দেখা যায় অর্থের দিকেই যাদের প্রধান লক্ষ্য, আবার এমন প্রডিউসার দেখা যায় যিনি মনে প্রাণে অত্যন্ত উচ্চ আদর্শবাদী। এ



শিকাগো সিভিক ওপেরা হাউস



লিট ইয়র্ক সিটির সেন্ট্রাল পার্কে শেরপারীরের নাটকের অভিনয়।

নব কথার অবতারণা করছি শুধু নয় এই কারণে যে কে কিভাবে এবং কি কারণে থিয়েটার চালাচ্ছেন তারই উপর নির্ভর করে থিয়েটারের আকৃতি এবং প্রকৃতি গড়ে ওঠে। আধুনিক রূপমণ্ডের ইতিহাস হাতড়ালে দেখা যায় প্রায় সব দেশেই—এমন কি আমেরিকাতেও নাট্যকার এবং অভিনেতাদের দ্বারা দুই-দারিদ্রের সংগে সংগ্রাম করে চলতে হয়েছে এবং বর্তমানেও করতে হচ্ছে। এদের মধ্যে দু' চারজন অবশ্য প্রচুর বিত্ত, যশ এবং খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু তারা হচ্ছেন এক্সেসপেন্সের দলে। এছাড়া বেশির ভাগই পড়েন বঙ্কিমের শ্রেণীতে। তা সত্ত্বেও কিন্তু নাট্যকার বা অভিনেতার অভাব দেখা যায় না। শত বছর, কণ্টের মধ্যেও তারা থিয়েটারের সংগে বৃদ্ধ হয়ে থাকতে চান। হয়তো এদের মনে অন্য সব চিন্তাকে ছাপিয়ে ওঠে অভিনয়ের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা বিকাশ করবার ইচ্ছা, অথবা বলা যতে পারে এরা সবাই এক বিশেষ ব্যাধিতে ভুগছেন যার নাম দেওয়া যেতে পারে এক ধরনের পাগলামি বা স্টেজ-ফিভার।

আমেরিকার মধ্য-ব্যবসায়ী প্রবোজক কিন্তু এই স্টেজ-ফিভার আক্রান্তদের শ্রেণীতে পড়েন না। তিনি হয়তো মঞ্চকে সত্যিকার ভাল-মাসেন, নাট্যসাহিত্যের প্রকৃত বোধ্য সমালোচক,

অভিনয়, কন্সটিটিউশন, লাইটিং প্রভৃতির বিশেষজ্ঞ—কিন্তু এসবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি থিয়েটারে আসেন না। মঞ্চ ব্যবসারে টাকা খাটিয়ে প্রচুর টাকা রোজগার করবেন এই আশা নিয়েই তিনি মঞ্চের সংগে যুক্ত হন। কোনও কোনও সময়ে হয়তো তিনি নাট্য-পরিচালনার কাজও করেন, অথবা অভিনয়ে যোগ দেন—সেক্ষেত্রে তিনি উপরি কাজ করেন। কিন্তু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে টাকা খাটিয়ে লাভ করা—সে নিজের টাকাই হোক বা অন্যের থেকে ধার নেওয়া টাকাই হোক। লাভ না করতে পারলে তাঁর চলে না—কারণ লোকসান হতে থাকলে থিয়েটার বন্ধ করে দিতে হয় বাধ্য হয়ে। সুতরাং শুধু আটের দিকটা ভাবলেই তাঁর চলে না—প্রডাক্সনের সব খরচ তাঁকেই যোগাতে হয়। সবার মাইনা থেকে সুদ করে মিসিনারি অভ-প্রডাক্সনের সমস্ত টাকা তাঁকেই দিতে হয়। কেননাদিকে কতটা টাকা ঢালবেন এসব তিনিই ঠিক করেন। তাহলেই দেখা যাচ্ছে আমেরিকাতে থিয়েটারের প্রডাক্সন ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে নিভর করছে ব্যবসায়ীদের ভেবে চিন্তে ঠিক করা মতামতের ওপর—আবার এই মতামতও ঠিক হচ্ছে আর্থিক লাভের খতিয়ানের হিসাবের মাগকাঠিতে। দর্শকের দল তো আর এসব কথা ভেবে দেখেন না—নাটক মণ্ডল্য হবার

পেছনে যে সব শক্তি কাজ করছে তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথাও নেই। সুতরাং “ব্যবসায়ী-প্রবোজিত-নাটক” এবং “দর্শক-ব্যবসায়ী-নাটক” দেখতে চান এই দুইয়ের মধ্যে ঠিক সম্ভব হাটিয়ে তোলা একটা সমস্যার মত হয়ে দাঁড়ায়।

রেভোলিউশনের সময় অর্থাৎ আমেরিকাতে যা কিছু থিয়েটার ছিল তার কর্ণধারক ছিলেন ব্যবসায়ীরা। স্বাধীনতা লাভের পর সুদ হল আমেরিকান থিয়েটারের বিস্তৃতি, বৃদ্ধি এবং প্রসার। এটা চলল প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের সময় অবধি। এই সময়কার থিয়েটারের এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মূলেও রয়েছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণ। চ্যুতগতিতে দেশের বিত্ত এবং সম্পদ-বিস্তৃতিতে নতুন নতুন শহরের পত্তন হতে সুদ করল—লোকসংখ্যাও বাড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে। এ বিষয়ে বিখ্যাত আমেরিকান নাট্যকার এবং নাট্যসমালোচক Elmer Rice লিখেছেন:

“The west-ward movement of the populace, the Loniciana Purchase, the annexation of Texas; and the California Gold Rush added vast areas to the nation and created new cities remote from the Eastern seaboard, eager to welcome theatrical touring companies and able to pay for them.”

স্বাধীনতা অর্জনের পর আমেরিকানদের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনও দেখা দিল। নতুন স্বাধীন দেশের ন্যায়িক হিসাবে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে এই ইচ্ছাটা হোল যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত তারাও শিল্প, কলা সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট অর্বাহিত এবং এ সবের চর্চায় অন্যান্য দেশের থেকে তারাও পিছিয়ে থাকবে না এবং এই কথাটা প্রমাণ করে দিতে হবে। সাধারণের লেখাপড়ার মানটাও ক্রমশ উন্নতির দিকেই যাচ্ছিল এবং আমেরিকান সাহিত্যও গড়ে উঠতে লাগল—কিন্তু তখনও পর্বত নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ কাজ হচ্ছিল না।

অথচ আমেরিকার সর্বত্র রঙ্গালয় তৈরি করা হতে লাগল—শুধু সু-প্রতিষ্ঠিত পূর্ব আমেরিকার শহরগুলোতেই নয়—জরাজীর্ণ এবং বন্য পশ্চিমের যে সব জায়গাতে লোকের বসতি ছিল সেখানেও। আজকের দিনে সেই সব পুরানো শহর অনেক সময়েই জনমানবের বসতি শুদ্য পরিভ্রান্ত অবস্থার পড়ে রয়েছে দেখা যায়—কিন্তু পুরানো থিয়েটার বাড়ি-গুলো এখনও নষ্ট হয়ে যায় নি। সেন্ট্রাল সিটি, কলোরাডোতে পুরানো থিয়েটার-বাড়িটিতে গ্রীষ্মকালে এখনও নাট্যমঞ্চসমূহ হয়ে থাকে।

কড় কড় শহরে কয়েকটি বীথিধরা নাটক

এক প্রথম গড়ে উঠে—এখন পরিচালনার
কার্য নিতন একক—ম্যানেজারের দল।
জার্সার ম্যানহ্যাটনে এই জাতীয় পরিচালক
লেন্সের ওরালেন্ বা অগাস্টিন ড্যালীর যে
সব থিয়েটার-বাড়ি ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম
ভাগেও সেগুলো অভিনয় করার জন্য ব্যবহার
করা হয়েছে।

এই সময় ইংলিশ স্টেজের সেরা সেরা
অভিনেতারা আমেরিকাতে অভিনয় করতে
আসতেন এবং তাদের অনেকেই এদেশেও খুব
জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। আমেরিকাতেও ক্রমশ
স্টার একাক্টর তৈরি হয়ে উঠতে লাগল—বেমণ
বিখ্যাত এডুইন ব্রুথ এবং এডুইন
ফররেষ্ট। সময় সময় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা
দেখা দিত ইংরেজ এবং আমেরিকান অভিনেতা-
দের মধ্যে ঘোঁষা অভিনয়ের সময়। দশকদের
মধ্যে দুই দল হয়ে যেত—একদল ইংরাজ
ইংরাজ অভিনেতাদের প্রশংসা পুষ্টমুখ, অন্য
দল দেশীয় অভিনেতাদের পুষ্টপোষক।
তখনকার দিনে এডুইন ফররেষ্ট এবং
বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা চার্লস ম্যাকরেডীর
রেমার্কি ব্যাপারটা একটা রাজনৈতিক মতের
গিরে পৌঁছেছিল। এর পরিণতি হয়েছিল
অত্যন্ত ভয়াবহ। এ বিষয়ে সে সময়ে
প্রকাশিত একটি লেখা থেকে তুলে দিচ্ছি:

‘The question became not only
a national but a social one. It was
the rich against the poor—the
aristocracy against the people;

and this hatred of wealth and
privilege is increasing all over the
world, and ready to burst out
whenever there is the slightest
occasion.’

রাস্তায় রাস্তায় ‘ল্যাকার্ড’ টাংগানো
হয়েছিল এইভাবে:

Workmen shall Americans
or English rule in this city?

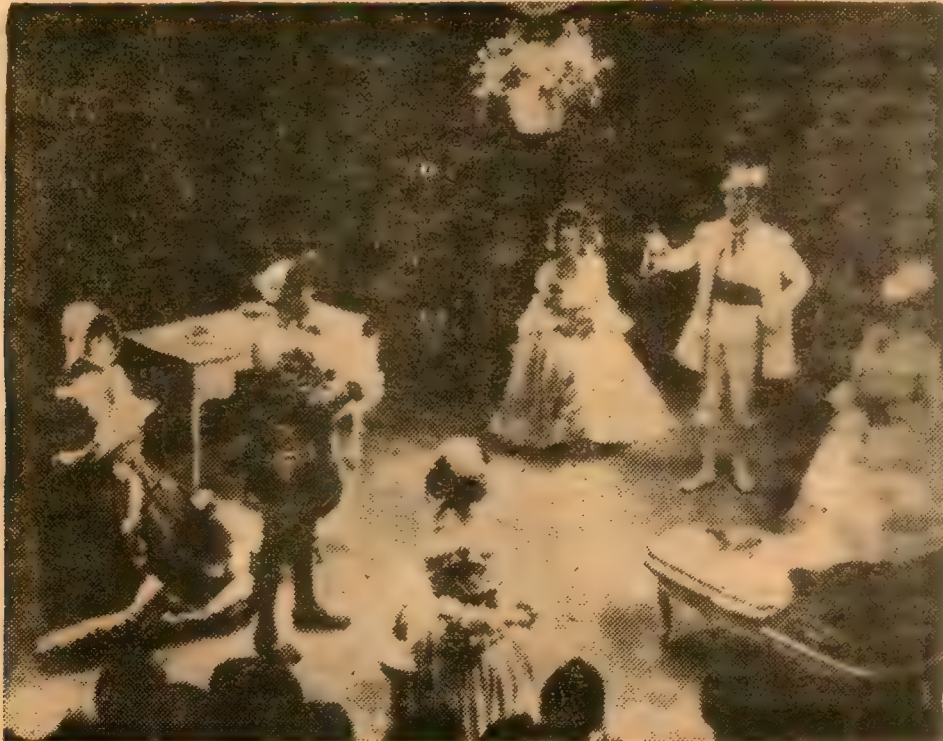
১৮৪৯ সালের ১০ই মে গ্র্যান্টের প্লেস
ওপেরা হাউসে ম্যাকরেডীর ‘ম্যাকবেথ’ মঞ্চস্থ
করবার কথা। কিন্তু এ সব গোলমালের
আভাস পেয়ে তিনি শো বন্ধ করে দেবেন ঠিক
করলেন। কিন্তু উপরওয়ালাদের থেকে তাঁকে
অনুরোধ করা হোল অভিনয় চালিয়ে যেতে।
থিয়েটার বাড়িটি পুলিশের দল দিয়ে ঘিরে
ফেলা হোল—কিন্তু কুড়ি হাজার জনতার
আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখা তো সহজ কথা
নয়। শেষে সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিতে
হোল—জনতা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে প্রতিবাদ
জানালে, সৈন্যরা জনতার উপর গুলী চালাতে
আরম্ভ করলে। বাইশ জন হত এবং বহু
লোক আহত হল এই গুলীবির্ষপের ফলে।
বাধ্য হয়ে প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে হোল।
ম্যাকরেডী ছদ্মবেশ ধারণ করে পোছনের দরজা
দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

এই সময়কার আমেরিকান স্টেজের নাটক
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই। সাধারণ-
ভাবে এইটুকুই বলা যায় যে, আমেরিকান
থিয়েটার এই সময় ইংলিশ স্টেজেরই পদানত-

সরণ করে চলেছিল। দেশীয় স্টার অভিনেতারা
বা ইংল্যান্ডের ব্রুথ অভিনেতারা যখন সফরে
আসতেন—সেইসময়ের নাটক নিয়েই
অভিনয় করা হতো। সে সময় কিছু কিছু
কাব্যনাট্য লেখবার প্রচেষ্টা হয়েছে অতীত
দিনের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে, বা উদার হৃদয়
বর্বর চরিত্রকে নামক করে—আর ছিল কিছু
রোমান্টিক মেলাড্রামা এবং স্থূল রসিকতা-
পূর্ণ কমেডি। এসব নাট্যপ্রচেষ্টার ভেতর
সত্যিকার কোন সাহিত্যিক মূল্য না
থাকার দরুন কিছুকালের ভেতরই
ওসব নাটক বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে
গেছে। তখনকার আমেরিকান স্টেজের বর্ণনা
এক কথায় এইভাবে বলা চলে—থিয়েটার খুব
দ্রুতভালে গড়ে উঠেছে—কিন্তু সত্যিকার
নাটক লেখা হয় নি একটিও। আরও একটা
ব্যাপার লক্ষণীয়—এইসময়ের আমেরিকার
সত্যিকার অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের, যথা
মেলভিল, কুপার, অার্লিং, এমার্সন, থোরো,
হর্সন প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটেছে, অথচ এমন
একজন নাট্যকারও আসেন নি যার রচনাকে
ভাল সাহিত্য বা ভাল নাটক আখ্যা দেওয়া
স্বাভাবিক। এ বিষয়ে Elmer Rice
लिখেছেন:

‘The dramatic awakening in
America was to come, but even
when it did it was thirty years
later than in Europe.’

(ক্রমশঃ)



জালাস এরিনা থিয়েটার



বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় গ্রীকো রোমান প্রথম ফিনল্যান্ডের টপিও ও জাপানের মুনেন্দ্রার লড়াই-এর একটি দৃশ্য।

টেনিস কোর্টের লগ্নে

উইমবলডেনের পুরাতন ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখলেন গতবারের বিজয়ী রয় এমার্সন সেন্টার কোর্টে প্রথম খেলার মাধ্যমে ৭১তম প্রতিযোগিতার উন্মোচন করে। কুইন্সল্যান্ডের ২৯ বৎসর বয়স্ক এমার্সন গত বছর এই সেন্টার কোর্টেই জয় করেছিলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত উইমবলডেনের সম্মান। এবারের আসরে এমার্সন তাঁর স্বাস্থ্য সুদৃঢ় করলেন ভেনেজুয়েলা চ্যাম্পিয়ান আইও পিমেটলকে পরাজিত করে। উন্মোচনী উৎসবকে

প্রীতিমিত্ত

অনেকাংশে পণ্ড করে দেয় বেরাসিক বৃষ্টি। ফলে প্রথমদিনের অনুষ্ঠানসূচীর কিছুটা থেকে যায় অসমাপ্ত। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও আধুনিক টেনিস তীর্থ উইমবলডেনের অগ্নে এইদিন সমবেত হয়েছিলেন অষ্টাদশ সহস্র দর্শক।

বর্ণবৈষম্য নীতিকে এখনও অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা অনেক উদারপন্থী দেশেরই বিরাগভাজন। সোভিয়েট রাশিয়ার খেলোয়াড়েরা গতবার উইমবলডেনে অফ্রিকা আফ্রিকার খেলোয়াড়দের সপেক্ষে



খ্যানচাঁদকে বিভিন্ন ক্লাবের স্মারক ব্যাজ উপহার দিচ্ছেন কলকাতার মেয়র পি কে রায়চৌধুরী।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে অসম্মত হওয়ার এক অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এবার উইমবলডেনের উদ্যোক্তাদের অনুরোধে সোভিয়েট রাশিয়ার খেলোয়াড়েরা এই বিষয়ে তাদের মত পরিবর্তনে সম্মত হয়। কর্মদর্শন এবং শ্রুতিভাষা বিনিময়ের পর রাশিয়ার পয়লা নম্বর খেলোয়াড় টমাস লেজাস, দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাকমিলানকে পরাজিত করেন।

প্রথম দিনের খেলায় কিংবদন্তি বিস্ময়ের সপ্তর হয় ফ্রাঙ্ক ফ্রোলিংয়ের পরাজয়ে। বৃটেনের সেরা খেলোয়াড় মাইক স্যাংস্টারের কাছে পরাজিত হয়ে বিদায় নেন ফ্রোলিং। অবশ্য পরবর্তী রাউন্ডে স্যাংস্টারের পরাজয় একেবারে এমার্সনের কাছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিদ্রোহী টেনিস খেলোয়াড় এবং বর্তমানে ইতালীতে বসবাসকারী খেলোয়াড় মার্টিন মুলিগ্যান এবার প্রতিযোগিতার Dark horse ১৯৬২ সালের উইমবলডেন রানার্স মুলিগ্যান এবার বাছাই তালিকায় স্থান পান নি, কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডেই ধরাশায়ী করেছেন বাছাই সাত নম্বর খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার রোচেকে।

উইমবলডেনে প্রেরিত ভারতের টেনিস শাহিনীর দুজন বিদায় নিয়েছেন। ভারতের অনেক আশা ছিল জয়দীপের ওপর; কিন্তু তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ড্রাইসডেলের কাছে পরাজিত হয়েছেন, ভারতের শিব মিশ্রও পরাজিত হয়েছেন। কৃষ্ণাণ এবং প্রেমজিৎ প্রথম রাউন্ডের বাধা অতিক্রম করেছেন। এখন দেখা যাক কতদূর তারা অগ্রসর হন।

উইমবলডেনের আসরে মহিলাদের প্রতিযোগিতা সুরু করেন চ্যাম্পিয়ান মারিয়া য়ুনো। মহিলাদের প্রথমদিনের খেলায় কোন অপ্রত্যাশিত ফলাফল হয় নি। বৃটেনের ক্রিস্টিন ট্রুম্যানের উইমবলডেন ভাগ্য বড় খারাপ। ১৯৬১ সালের রানার্স ট্রুম্যান পরের বছরগুলিতে একেবারেই সুবিধে করতে পারেন নি। গতবার আহত হয়ে উইমবলডেনে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হন নি। এবার বাছাই তালিকায় স্থান না পেলেও তিনি মারিয়া য়ুনো আর মার্গারেট স্মিথদের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিনী। দ্বিতীয় রাউন্ডে ট্রুম্যান পরাজিত করেছেন আমেরিকার কে. গ্রাবনারকে।

আবহাওয়া বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি, অনুষ্ঠানের পথে। সৃষ্টি, এলোমেলো বাতাস এবং ভেজা ঘাসের কোর্ট খেলোয়াড়দের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করছে।

লর্ডস টেস্ট

লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ড সাত উইকেটে বিজয়ী হয়েছে। পরাজিত নিউজিল্যান্ড দল অবশ্য শেষদিকে আশ্রয় চেষ্টা করেছে পরাজয় রোধ করার। কিন্তু ইংল্যান্ড দলের দুই মহারথী কলিন কাউড্রে এবং টেড ডেব্রটারের অনবদ্য ব্যাটিং ইংল্যান্ড দলকে জয়ের



মার্টিন মুলিগ্যান

পথে এগিয়ে দিয়েছে। নিউজিল্যান্ড দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় ইংল্যান্ডের মিডিয়াম ফাস্ট বোলার রামসে প্রাধান্য বিস্তার করেন। ২১ বন্সের বরফ রামসে মাত্র ২৫ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট সংগ্রহ করেন। নিউজিল্যান্ড দলের প্রথম ইনিংসের

রানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পোলার্ডের ৫৬ রান এবং টেলারের ৫১ রান।

ইংল্যান্ড দল প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করেন ৩০৭ রান। কলিন কাউড্রে শতরান কবর কৃতিত্ব অর্জন করেন। কাউড্রে ব্যক্তিগত রান হয় ১১৯ এবং টেড ডেব্রটারের ৬২ রান।

বিত্তীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ড দল যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে খেলা শুরু করে। পোলার্ড ৫৫ রান, সিনক্লার ৭২ রান এবং ডাউলিং ৬৬ রান সংগ্রহ করে দলের রান সংখ্যাকে ৩৪৭ রানের কোঠায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করেন।

ইংল্যান্ড দল যখন বিত্তীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে তখন হাতে তাদের সময়ও যথেষ্ট এবং জয়ের জন্য প্রয়োজন মাত্র ২১৫ রান। ইংল্যান্ড দলের জয়লাভ কতকটা নিশ্চিত বলে মনে হয়। বয়কট সংগ্রহ করেন ৭৬ রান এবং ডেক্সটার অপরাজিত থাকেন ৮০ রানে; এই দমরে-প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহীত হয়েছে। ইংল্যান্ড দলের রান সংখ্যা ৩ উইকেটে ২১৮ রান, সুতরাং সাত উইকেটের ব্যবধানে জয়। নিউজিল্যান্ড দলের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা ইংল্যান্ড দলকে প্রস্তুত হয়ে নেবার সুযোগ দেবে, কারণ আগামী বছর ইংল্যান্ডকে শক্তি পরীক্ষার অবতীর্ণ হতে হবে বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে।

ময়দান ফুটবল

ময়দান ফুটবলের বর্তমানে হিরো হলেন ইস্টার্ন রেলদলের প্রদীপ ব্যানার্জী। রোম অলিম্পিকের ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক প্রদীপ ব্যানার্জী তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনের প্রান্তসীমায় যে অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্যের নজীর রাখছেন ময়দানে তার তুলনা হয় না। ইস্টার্ন রেলদলের এক একটি খেলা শেষ হচ্ছে আর প্রদীপের ক্রীড়াধারারও বেন দিনে দিনে উন্নতি হচ্ছে। তাঁর খেলা দেখে মনে হচ্ছে আমরা আবার বেন সেই তরুণ প্রদীপ ব্যানার্জীর খেলা প্রত্যক্ষ করছি। বাটার বিপক্ষে প্রদীপ ব্যানার্জী মরশুমের প্রথম হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

লীগের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বি. এন. রেলকে সরাসরি ২-০ গোলে পরাজিত করার পর মোহনবাগান এরিয়ান্সকে ১-০ গোলে পরাস্ত করে, উয়ড়ীকে ধরাশায়ী করেছে ৩-০ গোলের ব্যবধানে। বি. এন. রেল-দলের সঙ্গে খেলার পর থেকে কাজল মুখার্জীর খেলার উন্নতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আর মোহনবাগান দলের রক্ষণভাগের স্তম্ভ হলেন দুর্ভেদ্য জার্নেল সিং।

বি. এন. রেলদল পর পর দুটি খেলা জু করার ফলে দুটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছে। এরিয়ান্সের সঙ্গে জু করার পর, রাজস্থানের সঙ্গে কোনক্রমে পরাজয় রোধ করেছে বি. এন. রেল। রাজস্থান দল প্রথমে গোল করে অগ্রসর থেকে, শেষ পর্যন্ত খেলা জু করে।

খেলার মাঠে অশোভন আচরণ করার জন্য আই. এফ. এর সাব-কমিটি কালীঘাট দলের আর জানা এবং মহামেডান দলের মুস্তাক আমেদকে কয়েকদিনের জন্য সাসপেন্ড করেন। খেলার মাঠে অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয়



কলিন কাউয়ে

আজকাল খুব বেশিই দেখা যাচ্ছে, ময়দানের আসরে। বি. এন. রেল এবং মোহনবাগান দলের খেলার বি. এন. রেলের গোলরক্ষক দীপক দাস যে আচরণ মাঠে করেছেন, তাতে তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। খেলার মাঠে এই ধরনের ঘটনা যদি কঠোর হস্তে দমন করা না হয়, তবে আমাদের ময়দান ফুটবলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রসঙ্গে

ইস্টবেঙ্গলের লীগের ঘটনাটির সমাধান এখনও হল না। সমস্ত ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করে মনে হচ্ছে ব্যাপারটি এখন বাক্য পথে চলেছে। আই. এফ. এর গভার্নিং বডি'র কাছে ইস্টবেঙ্গল দল যে আবেদন করেছিলেন—আই. এফ. এর সাব-কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তা মঞ্জুর হয় নি। আই. এফ. এর সহ-সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ইস্টবেঙ্গল দলের এই আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। এই সভায় আলোচনার পর স্থির হয় যে, আই. এফ. এর সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় কলকাতার এলে তাঁর সঙ্গে আলোচনান্তে আই. এফ. এ. এই বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করবে।

সমাচার দর্পণ

আমেরিকার স্কুল শিক্ষক হ্যারল্ড কনোলী হ্যামার গ্লোয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। তিনি ২৩০ ফুট ৯ ইঞ্চি দূরে হ্যামার নিক্ষেপ করে নতুন রেকর্ডটি করেন। অবশ্য তাঁর পূর্বের রেকর্ড এবং এই নতুন রেকর্ড দুইটিই আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদনের অপেক্ষায়।

পূর্ব জার্মানীর ফ্রাঙ্ক ওরেগার্ড ২২০ গজ সম্তরণে দু'মিনিটের বাধা ভেঙে দিয়েছেন। পুরাতন রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার গুব উইন্ডলের ২ মিঃ ১.১ সেকেন্ডের এবং ফ্রাঙ্কের নতুন রেকর্ডটি হল ১ মিঃ ৫.১ সেকেন্ডের। ফ্রাঙ্ক টোকিও অলিম্পিকে ৪০০ মিটারে রৌপ্যপদক লাভ করেন।

ফ্রান্সের দূরপাল্লার দৌড়বীর মাইকেল জ্যাজ আর একটি নতুন বিশ্বরেকর্ড করেছেন। একটি প্রতিযোগিতার আসরে দু'মাইল দৌড়ে অস্ট্রেলিয়ার রন ক্রাককে পরাজিত করে তিনি ৮ মিঃ ২২.৬ সেকেন্ডের নতুন বিশ্বরেকর্ড করলেন।

কলকাতার তরুণ হকি খেলোয়াড়দের কয়েকদিন শিক্ষাদানের পর ধ্যানচাঁদ কলকাতা ত্যাগ করেছেন। বিগত দিনের দিকপাল খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদকে একটি নাগরিক সম্বর্ধনা জানান হয় সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল হলে।

দার্জিলিং জেলা টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিভাগে জয়ী হয়েছেন কলকাতার দিলীপ মুখার্জী এবং মহিলাদের বিভাগে কলকাতার রূপা মুখার্জী।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গবতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পৃষ্ঠা ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বঙ্গবতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মদ্রিত ও প্রকাশিত।



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৩৫০
আজকের মানুষ	...	৩৫৪
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ শির	৩৫৫
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	৩৫৬
ভারতদর্শন	...	৩৫৭
আন্তর্জাতিক	...	৩৬০
উপলক্ষ্য (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নরেন্দ্রনাথ শির	৩৬৫
দুরাতন কমনওয়েলথের নতুন সীমান্ত	সঞ্জয় সেন	৩৬৭
ছলনা (গল্প)	নীলাঞ্জন	৩৬৯
অবসর্গ (কবিতা)	অরবিন্দ ভট্টাচার্য	৩৭২
বঙ্গদর্শন	...	৩৭৩
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	৩৮৮

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষাস্বার্থীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
৥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ বছরশ্রমে পর্যাপ্ত ফল অবশ্যস্বার্থী ০০০
উপেক্ষনাথ সুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা যা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অধিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাংলা—৩.৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১.০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

য হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)

সত্তা-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

(ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য,
বীরভদ্রা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক,
বুদ্ধো শালিকের ঘাড়ে ঘোঁ,
একেই কি বলে সভ্যতা ?

মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কঙ্ককুমারী নাটক,
শমিষ্ঠা নাটক, ভিলোত্তমা-সংঘ
কাব্য, বজ্রভদ্রা কাব্য, চতুর্বিমলা
কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য,
মায়ার কানন, হেক্টর বধ ।

মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—

দামোদর সুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১.৫০

২য় খণ্ড ২.১০

৩য় খণ্ড ১.০০

৪র্থ খণ্ড ২.২০

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রামবাংলার কথা	পারুল ভট্টাচার্য	৩৫০
সবার অলঙ্কার	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়	৩৫৩
অধিরমণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৩৫৮
আমার হৃদয়ের (কবিতা)	দীপ্তি পাল	৩৬০
মুক্তির সে উপকথা (কবিতা)	মদন চৌধুরী	৩৬০
কেস (গল্প)	কার্তিক ভট্টাচার্য	৩৬১
মনোনিষ্ঠা (কবিতা)	পূর্ণেন্দ্রবিকাশ ভট্টাচার্য	৩৬৩
ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলা	নরেন ভট্টাচার্য	৩৬৪
চার্লি চ্যাপলিন	অশোক সেন	৩৬৭
স্বপ্নজগৎ	...	৩৭১
স্বপ্নজগৎ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	৩৭৭
শঠিকল্পন	...	৩৮০
বেলাঘালা	শ্রীঅমিতাভ	৩৮১

কাব্যকঙ্কণ চণ্ডী

মুহুম্মরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কাব্যকঙ্কণ মুহুম্মরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। 'তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুন্দর আলেখ্য, শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ম্মিত বাস্তব মুহুম্মরাম চক্র ও বেদনারিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনির্ম্মিত কবি—ব্যক্তিগত দুঃখ কীরিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুহুম্মরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

- ১। মূল কাব্য, ২। অবিহৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কাব্যকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (কবি বাকিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিহৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মুদ্রা সাড়ে চার টাকা।

নাহাররজন গুপ্তের

গ্রন্থাবলী

মুদ্রা সাড়ে তিন টাকা।

কালো ভ্রমের চমকপ্রদ বিষয়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনাটি আমাদের আবির্ভাব।

বাংলার মিশ্রী সাহিত্যে

ডাঃ নাহাররজনের দ্বান ওপূর্ব

—তেরখানি গীতিকাচিত রচনা—

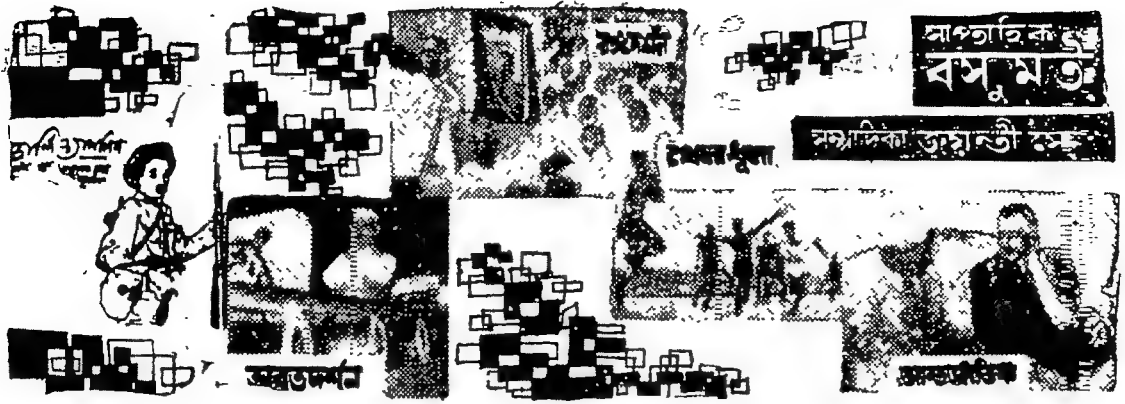
কালো ভ্রম, কয়েক মাসের, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদেহের পিণ্ডাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুরা, শ্রম, কাশচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অন্ধুরী, এণাম জানাই।

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

অমরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্মরণাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩০ পৃঃ—৩



৭০ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২০শে জুলাই, ১৩৭২

Price : 25 Paise
Thursday, 8th July, 1965

কচ্ছ-চুক্তির সত্য

ভারত ও পাকিস্তান এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি বিবাক্ষ করুক—এ আমাদের কামনা। সেই কারণে কচ্ছ-চুক্তি ও কচ্ছ থেকে পাক-ভারত ফোজ অপসারণে আমাদের সমর্থন সর্বদাই রয়েছে। তবু যে চুক্তি উভয় পক্ষ গ্রহণ করেছে সেই চুক্তি রক্ষার জন্য ভারতের প্রচেষ্টাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী চিরকালই শান্তির সপক্ষে, তাই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তাঁর পক্ষে আনন্দ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। এতদুসত্ত্বেও আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যে সরল্য নিয়ে শান্তির আশার শ্রীশাস্ত্রী এগিয়ে এসেছেন সেই শান্তির মূখ্য পাকিস্তান কতটা রক্ষা কবেন? কচ্ছ যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পর্কে শাস্ত্রীজী যে বেতার ভাষণ দিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যায়—পাকিস্তান চাপ দিয়ে বেশ কিছুটা সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। দিং-সুয়াই সড়কে পাক পুলিশের টহলদারীর অধিকারের কথা উল্লেখ করে শাস্ত্রীজী বলেছেন যে, স্থিতিাবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আংশিক ব্যবস্থা হিসেবে ভাবতকে ওতে রাজী হতে হয়েছে। চুক্তি-সন্দেহায়ী ঐ অঞ্চলে পাকিস্তানের টহল দেওয়ার সম্ভাব্য অধিকারের কথাও তিনি স্বীকার করেছেন।

কচ্ছ-চুক্তিতে বিরাট একটা সমাধান হয়ে গেছে ভেবে চপ করে থাকে আমাদের পক্ষে

বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পাকিস্তান সাময়িকভাবে একটা স্থিতিাবস্থার আংশিক ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে, তার বেশি এক পা-ও অগ্রসর হয় নি। বিশেষত কচ্ছের যে-এলাকা এখন জলময়, সেই এলাকা আবার যখন জেগে উঠবে তখন চুক্তিকে খুলিসাং কবে পাকিস্তান পুনরায় হামলা সূচি করবে না, একথা কে বলতে পারে? পাকিস্তানের বহুদিনের ব্যবহারে কেবলমাত্র একথাটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা দুই বাস্তবের চুক্তির মর্যাদা কোনদিন রক্ষা করে না। তা ছাড়া রপনীরীতিতে পাকিস্তান কখনো সত্যের আশ্রয় নেয় না, এই ব্যাপার কচ্ছ আমেরিকান অস্ত্র ব্যবহারের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

কচ্ছ-চুক্তির সংবাদে জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সূচি হয়েছে সেটা উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষত কচ্ছ-চুক্তির অব্যবহিত পরেই বেলোনিয়া ও লাটিটিলায় পাক গুলীবর্ষণের সংবাদ ভারতবাসীদের বিস্মিত করেছে। কেন না পাকিস্তান যদি সত্যিই শান্তির পক্ষপাতী হত, তা হলে ঐ গুলীবর্ষণের দ্বারা শত্রুতামূলক আচরণ ভারতের বিরুদ্ধে কখনোই অনুষ্ঠিত হত না।

সত্যে বলা হয়েছে, যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির দুই মাসের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে যখন অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে

তিন সদস্যবিশিষ্ট এক আন্তর্জাতিক ট্রাই-বুনাল নিয়োগ করা হবে।

সুতরাং কচ্ছ যুদ্ধ-বিরতি পাকিস্তানের পক্ষে একেবারেই সাময়িক বলা উচিত নয়। মতৈক্য স্থাপন তা একমাত্র ভারতের পক্ষেই সম্ভব নয়; পাকিস্তান সূচির পা থেকে ভারত কারণে-অকারণে তাদের মনস্তাত্ত্বিক সাধন করে এসেছে; ফলে আজ পর্যন্ত এমন কোন নজির নেই যার সাহায্যে বলা যেতে পারে যে, ভারতের কণামাত্র উপকার হয়েছে। ব্যাং ভারত যা লাভ করেছে, তা হচ্ছে একটির পত্র একটি সমস্যা। এতো ঠকেও আমাদের চিন্তা হয় নি। কচ্ছ-চুক্তির লাভ হজম করে পাকিস্তান পুনরায় বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে, দেশের স্বার্থে সেই জ্ঞানটুকু আমরা কেন বিস্মৃত না হই। চুক্তি ভাল, শান্তিও ভাল, কিন্তু সত্যতা দুই পক্ষের সমান থাকা চাই; সেই সত্যতা কি পাকিস্তানের আছে?

সম্পাদক

আজকের মানুষ

গাঁহিতে গাঁহিতে পাকেন এবং বাছাতে বাছাতে যদি বায়েন হয়, তবে সাংবাদিকতা করতে করতে সংবাদ হতেই বা দোষ কোথায়। হাতবক্ষে তাই জে হয়েছেন কান্নাই, হাঙ্গেরীর নতুন প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকতা দিয়েই তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, আশ্চর্য তিনি নিজেই সংবাদপত্রের প্রধান-সংবাদ।

অবশ্য এতে আর পাঁচজনই বিস্মিত হলেও কান্নাইয়ের বিস্ময়ের অবকাশ ছিল না। কারণ এ-ধরনের দায়িত্ব তাঁর চওড়া ঘাড়ে এই প্রথম পড়লো না, কর্তব্যের আহ্বান এর আগেও বহুবার এসেছে এবং বলাই বাহুল্য, কান্নাই হাসি-ভরা মুখ নিয়ে প্রতিবারই এগিয়ে এসেছেন তাঁর দায়িত্ব পালনের চাগিদে।

কিন্তু পোড়ায় সক্রিয় রাজনীতি বোধ হয় কান্নাইয়ের ক্ষেত্র ছিল না। হাঙ্গেরীর তিনি প্রথম সক্রিয় বুদ্ধিজীবী। সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পর্কে তিনি বহু বই লিখেছেন। আর লিখেছেন রাজনৈতিক ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অবস্থা থেকেই তাঁর লেখা শুরু, কিংবা ভাষা ও আগে থেকে। কিন্তু চিন্তার স্বকীয়তা ও বৌলিকতার তাঁর সৃষ্টির পোড়া থেকেই। এ-নিজস্বতাই তাঁকে এনে দিয়েছে সাংবাদিকতার কাজ, সম্পাদনার দায়িত্ব। হাঙ্গেরীর বহু সংবাদপত্রের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন, বহু সম্পাদকীয় দপ্তর তাঁর উপস্থিতিতে উজ্জ্বল ছিল, তাঁর লেখনীর দ্বারা পৃষ্ঠ-সমৃদ্ধ হয়েছিল।

কিন্তু বস্তুকে বাদ দিয়ে বহুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা কেনন কবে সম্ভব? আর সংবাদপত্রের বস্তু নানাই তো জনগণ,—ভাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা। কান্নাইকে তাই তালির নিতে হয়েছিল ছাত্র-জীবনেই। বাম-পন্থী যুব আন্দোলনে যোগ দিয়ে সাংগঠনিক প্রতিভার আশ্রয় রাখলেন কান্নাই। রাজনীতি তাঁকে এতখানি আকর্ষণ করেছিল যে, তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রবেশ বোগদান করে বসলেন, যদিও সে-পার্টি হাঙ্গেরীতে তখন কে-আইনী। কল অবশ্য শ্রম হাতে হাতেই পেলেন, শ্রম পড়লেন কান্নাই, কারাবাস হলো তাঁর। কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্য? এরপরেই তো তিনি বেগিয়ে আবার সম্পাদকীয় দপ্তর জাঁকিয়ে কসলেন—এবার লোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দৈনিক সংবাদপত্র 'নেগডাতা'র।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন অলে উঠেছে, উজ্জ্বল নাস্তীদেহ মুটেব তলায় এলো হাঙ্গেরীও। কলম ধরতে দেয় নি তাঁকে নাগসীরা। আশ-খোশ করত হয়েছিল তাঁকে, কিন্তু শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি প্রজিবোধ

আন্দোলন পড়ে তুলছিলেন। এ-কালের পূর্বসূর পেতেও তাঁর মেরি হলো না। বুজির পর হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট পার্টির বৈরী কমিটিতে স্থান পেলে কান্নাই এবং কিছুদিনের জন্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সেক্রেটারী অব টেট হিসেবেও কাজ করলেন।

কিন্তু এরপরেই আবার ডাক এলো সংবাদপত্র অফিস থেকে—'জীবিত-সাপের' প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব নিলেন কান্নাই। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সপক্ষে জনমত গঠন করার জন্যে এমন শক্তিশালী কলম আব কার? কিন্তু সে-কাজও বেশিদিন করতে পাবলেন না, কান্নাইকে নিতে হলো সরকারের পররাষ্ট্রদপ্তরের ভার, ভারপূর সাংস্কৃতিকদপ্তরের। হাঙ্গেরীর সংস্কৃতি, তার লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যে জনপ্রিয়তার পেছনে কান্নাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য।

গিয়ুলা কান্নাইয়ের ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্রবোধ তাঁকে অনেক বহু এনে দিয়েছে। বিদ্যারী প্রধানমন্ত্রী ছানোল কাদারের দৃষ্টিও তিনি আকর্ষণ করে-ছিলেন তাঁর কাছের বধ্য দিয়ে, সংগঠনের মাধ্যমে। ১৯৫৬ সালের অভ্যু-ধানের পূর্ব দশে যখন একটা বিরাট ওলোট-পালট হয়ে গেলো, যখন পার্টি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো, তখন কান্নাই এগিয়ে এসেছিলেন অন্যান্য



গিয়ুলা কান্নাই

নেতৃবৃন্দের হাত ধরে দেশে পুনর্গঠনের কাজে। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর গদীলাভে আকস্মিকতা নেই। এ-পেছনে যে রয়েছে দু'যুগের সংগ্রামের ইতিহাস, নিষ্ঠাব ইতিহাস, স্বদেশপ্রেমের ইতিহাস। নন তাঁর চিহ্ন উন্মুক্ত, পোড়ানি, সঙ্গীর্ণতা তাঁকে শৃঙ্খল পবাতে পাবে নি। তাই স্ট্যাগিনবাদে কাজেও তিনি বাধা বিকোন নি। এই স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের মানবিক ওপব হাঙ্গেরী ভরসা করতে পাবে নিঃসংশয়।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হৃদয়সাদ মিত্র

ডক্টরেন্ডাটিক আর বোদলেয়র,—দু'দেশের দুই সাহিত্যিকের দু'ধেবাদের কথা থেকে স্বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতার প্রসঙ্গে পৌঁছে যাওয়াটা মোটেই আকস্মিক নয়। এঁদের তিনজনের মধ্যেই 'দুঃখানুভূতির সাদৃশ্য' আছে। তবে, হয়তো, আরো সূক্ষ্মভাবে দেখলে,—আরো বিশ্লেষণের দিকে এগিয়ে গেলে স্বতীন্দ্রনাথকে অন্য দু'জনের তিক্ত সমগোত্র কবি বলে নাও মনে হতে পারে। সময়েক দিক থেকে স্বতীন্দ্রনাথ প্রথমোক্তদের অনেক পরের আমলের মানুষ তো বটেই, তাছাড়া তাঁর দেশও আলাদা, তাঁর মনের গঠনও অন্যরকম। তিনি ইউরোপের নন,—ভাবতবর্ষেরই কবি,—একালের বাংলা কবিতার স্মরণীয় স্রষ্টাদেরই একজন।

সাহিত্যের দেশে দেশে এই ব্যবধান আছেই। বাংলার স্বতীন্দ্রনাথের 'ঘুমের জৌক' 'উই-কুইসি', না পো, না বোদলেয়র,—তঁকে কোন্‌ সূত্র থেকে বড়োঁছিল, সেটা গবেষণার বিষয়। তাঁর দুঃখের প্রকৃতি যাই হোক, তন্ত্রাংশে কবিত্বের স্রোত প্রবাহিত হতে দেবার প্রেষণা বাংলা মঙ্গলকরোয়ারই কতকটা একচেটিয়া অধিকারের সামগ্রী। স্বতীন্দ্রনাথ আমাদের একালের কবি হলেও সেই মধ্যযুগের লক্ষণে আগ্রস্র নোয়ার সংগত কোনো কারণ অনুভব করেছিলেন। কিংবা 'স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ' হয়তো এই ধরনের রীতি উৎসাহ করবার আরো নিকট কাণ বললে অন্যায় হবে না। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে স্বপ্ন-প্রয়াণ ছাপা হয়। তার নামও 'স্বপ্ন', লিপিতেও 'স্বপ্ন-ভাব'। সেখানকার মূল কথাই ছিল—সচেতনে চেতন। ঘুমন্তে জাগা!—সকলি বিচির স্বপনের কাণ্ড। গোড়া নাই আগা! সেখানে কল্পনা-কুমারী কবির মনোবিশেষ সারথি। সেই রথ চলেছে মহা-ঘূমে! তার লক্ষ্য মনোজগৎ। একে একে নন্দনপুর, বিলাসপুর, বিদ্যাপুরে এগিয়ে গেছে সে রথ।

ডক্টরেন্ডাটিক, বোদলেয়র,—কিংবা আমাদের আরো একালের বাঙালী কবি স্বতীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর নাম মনে আসাটা কিন্তু সকলে ভালো চোখে দেখবেন না। আমি তা জানি। আমি জানি, অনেকে হয়তো এও দেখাতে পারেন যে, স্বতীন্দ্রনাথ 'স্বিজেন্দ্রনাথের কবিতা' মোটেই পড়েন নি। তা নিয়ে তর্ক করা আমাব লক্ষ্য নয়। 'স্বিজেন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে' এইসঙ্গে কিছু

কিছু কথা আসছে এই জন্যে যে, তিনিও বিদ্যাপ, ভর, কল্পনা ইত্যাদির রূপ সেখানকার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আধুনিক বিদ্যাপ-বোধ,—যা বোদলেয়র বা ডক্টরেন্ডাটিক বা স্বতীন্দ্রনাথের মধ্যে অনুভব করা যায়, তা তাঁর কবিতার কোথাও ছিল না। 'স্বপ্ন-প্রয়াণের' চতুর্থ সর্গে কবি-চরিত্রটি পূর্ব-কথিত সেই কল্পনা-কুমারীর নেতৃত্বে কল্পনাবিলাসপুর থেকে বিদ্যাপুরে পৌঁছেছেন। সেই বিদ্যাপুরের মধ্যেই এক অরণ্য,—নাম তার বিদ্যাপুর। সেখানে 'কবি' অনেকরকম 'খেয়াল' দেখেছেন। একালের স্বতীন্দ্রনাথও ঘূমের বোকে খেয়াল দেখেছিলেন। আরো অতীতের বোদলেয়রও খেয়াল দেখেছিলেন। কিন্তু 'স্বিজেন্দ্রনাথের কবি'-র খেয়াল-দেখা অন্যরকম। তাঁকে বিদ্যাপুরে আধি-ব্যাধি এসে ধরেছে,—তার তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেছে রাজা হাহাহাহ, গম্বীরেই কারে। তামসিক জড়তা সেখানে বিচারক। তার বিচারে তাঁকে রসাতলে ঝেঁতে হয়েছে—

কুপসি-কাপসি বন-আবডলে,
হাপসি বদন সব উর্কি দেয়,

ভর-দিয়া ডালে।

কিন্তু-আকার,
অতি চমকব,

প্রকাশ পাইয়া উঠে, জোনাক-মশালে।

মানুষ কি জানোয়ার বদ্বা ভায়,
দুই ভাই দেখা-দিল সমুদ্রে,

কিন্তু-কিমাকার।

ওষ্ঠ-মাস ঠেল'

দস্ত আছে মেলি';

চির্মসিরা অঙ্গুলিতে বর নখর।

এসব দৃশ্য যে ভয়ানক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কি সত্যিকার স্বাধীনতা-হীনতার দুঃখের ছবি? এ কি নৈরাশ্যের রূপ? এ কি একালের অবসাদের শূন্যতা?

আধি-ব্যাধি সেকালেও ছিল, একালেও আছে। 'স্বিজেন্দ্রনাথ' কিন্তু মানব-জীবনের আধি-ব্যাধিকে সেভাবে দেখেন নি যেভাবে বোদলেয়র বা স্বতীন্দ্রনাথ দেখেছেন। 'স্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ' দেখা গেছে—

উল্কা-হস্তে আধি দিল দবশন,

আর্চাম্বিতে কবির নরনে করি'

আলো-বরিষণ।

ছটিল মস্তক,
অতি ভয়ানক,
চাহনি মরম-ভেদী,

রক্ত শোষণ।

আধি-দৈত্য আইল কপক পথে
পালাবার উদ্যোগ করিল কবি

পরের ভর।

'উঠ চল' বলি

দৈত্য মহাবলী

ধীরল কবির হাত, লৌহ-দলা ভবে।

এই আধি-ব্যাধি এসে, ভয়ানক এক পদ্বিধে কবিকে পাতালে টেনে লিখে গেছে। সেখানে রসাতলপাতি ভয়ানক-রক্তে ঘাড়ে তাঁকে সমর্পণ করা হয়েছে। তিনি 'পুরোহিত' ডেকে চামুন্ডা দেবীর সামনে কবিকে বলিদানের আবেশ দিয়েছেন।

থাক, থাক! 'স্বপ্নপ্রয়াণ' বাংলা সাহিত্যের অনেক কবির অনেক প্রশংসিত চিহ্ন বটে, কিন্তু 'স্বিজেন্দ্রনাথের একজন্য আমাদের আধুনিক ভয়ও নয়, সন্দেহও নয়। এ তাঁর নিজস্ব ভাব-বিভোরতা। ১৮০৯ সালের পৌষের 'বঙ্গদর্শনে' সত্যীশচন্দ্র রায় তাঁর সমালোচনায় লিখেছিলেন—এ 'একাদশি কবিতার স্বাধি'। এতে তিনি দেখিয়েছেন—'একটি মথুর রতিন জ্যোতি'। এখানকার 'চিত্র' এবং 'ভাবার মনোহারিত' ভর নেবে পড়েছিল। প্রতিদিনের কথাবার্তা-ব কলো ভাবার ওপর 'স্বিজেন্দ্রনাথের দখল' আছে দুঃখ করেছিলেন তিনি। আব লিখেছিলেন—'যে অধ্যাত্মজীবনের বিবর্তিত স্বপ্নপ্রয়াণ দেখা যায়—তাছাড়া কবি কাব্য লিখবার মানস বাঁধবা খুঁজিয়া বাহির করেন নাই—অতঃপর হইতই তাহার মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন।'

'স্বিজেন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিগত হৃদয়, স্বাভাবিক স্বপ্ন-বিভোরতার উৎস' হয়ে, অভ্যুতপ সত্যীশচন্দ্র আরো এমনি গন্তব্য করেন। আমাদের একালের দুঃখানুভবের ভাবনাসূত্রে আজ তাঁর সেই কথাগুলি 'ভাবার দেখে' নিলুম। ১৯৬৪-তে ১ ক্রি. ১৩।১১। শ্রীযুক্ত পদ্মিনীবিহারী সেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-কাব্যের চমৎকার এক সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। সত্যীশচন্দ্রের ঐ সমালোচনা এবং 'চিত্র'মায় চক্রবর্তীকে লেখা পত্রাংশ,—তাছাড়া প্রিন্সিপাল সেনের 'প্রায়-পূর্ণাঙ্গলিতে প্রকৃতি স্বপ্ন-প্রয়াণ-সমালোচনার পুনর্মুদ্রণ,—ইহা শানাই



সারেঙ বৌ : শহীদুল্লা কায়সার। পূর্ব-
বাঙ্গা, ২৯, বি, কে, গাজুলী লেন, ঢাকা-২।
দাম : সাড়ে তিন টাকা।

বাংলা সাহিত্যের পাঠক লব্ধি সন্মুখের
অসম্ভাব্য বড় একটা শাস্ত্র না। আর যেটুকু
পায়, তাতে থাকে না সংগ্রামী মানুষের
সংবাদ। অবশ্য বিদ্বৎ সঙ্গীতের একালের
কবিতা সংকলনে 'দেখা থেকে' কবিতাটিতে
সারেঙ জীবনের গভীর আলোচনা একদা
পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছিল। এরপর আরও
পেলাস শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেঙ বৌ'।
এই উপন্যাসেব দু'কোটিতে দুই দিগন্ত
বিধৃত। একদিকে অকল সমুদ্রে ভাসমান
সারেঙের জীবন, অন্যদিকে সারেঙের মাটির
ঘর, ঘরপা ও কন্যা। সারেঙের নাম কদম।
মহাসাগরের অঁখে জলে সওদাগরী রুতুন্দা
ছাড়াই তার কাজ। একমাস, দু'মাস নয়,
বছরেক পর বছর। সেই জাহাজে থেকে কদম-
হাস্ত জীবনে 'সে সমুদ্র' দেখে মৃত্যু হয়।
আবার জাহাজে বখান আগুন লাগে তখন তার
সাহস দেখে বিস্মিত হয় নাবিকদল। অন্য
জাহাজে আগুন লাগলে উদ্ধারের কাজে তার
সাহস কেড়ে যায় চতুর্ভুজ। জাহাজের মধ্যে
কদম মানুষেরও আসল পরিচয় লাত করে।
হিক সাহেবেব চবিবের বৈপরীত্য তাকে
অবাক কবে দেয়। আবার প্রলোভনের
সম্মুখীন হয়ে কদমকে বিপর্যস্ত হতে হয়;
সামান্য বোজগাবেব সারেঙ হঠাৎ সে লোভের
বশীভূত হতে পারে না। তাই বন্দরে জাহাজ
ভিড়লেও বেআইনী মালা পাচাব করতে সে
রাজী হব না। তবুও তাকে বিপদে পড়তে
হয়। অন্য প্রলোভনের মাঝখানে তাব মনে
পড়ে ঘাব ফেলে ত্রৈখে আসা সারেঙ-বৌ
নবিভূনের সরল মন্থনানি, অপাপবিদ্ধ দৃষ্টি।
তবু উপবিওয়ালাদের চোখে সে সারেঙ ছাড়া
অন্যকিছু নয়। অথচ তাদের চেয়ে সংগ্রামী

কদম কতো মহৎ। এই উপন্যাসে কদমই হচ্ছে
দরিদ্রপ্রণয়ী প্রতিনিধি।

কদমের স্ত্রী নবিভূনকে কদম নিয়ম মতো
টাকা পাঠাতে পারে নি। অভাবের শেষ নেই।
চৌধুরীবাড়িতে সে কাজ করে, সেখানে
আছে ছোটচৌধুরী। এদিকে অর্থ দিতে
চায় হীনমতি লুন্ডর শেখ। শেখের আছে
কুটনী বড়ি, নাম তার গুজাবড়ি। শেখ ও
গুজাবড়ির চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়।
কিন্তু যে পটভূমিকার তারা উপস্থিত, সেখানে

অসম্পত্তি সেন

নবিভূনের সংগ্রাম মহনীয় হয়ে উঠেছে। কেন
না লুন্ডর শেখের শয়তানী আর লালসার
সম্মুখে সে ছিল এক ফুলকি আগুন। তাই
অনাহারেও সে বিহ্বস্ত হয় নি।

উপন্যাসটিতে শেষ পর্যন্ত যে সংগ্রামের
কাহিনী, তা বাংলা সাহিত্যকে নতুন শক্তি
দান করেছে। এই সপ্তে একথাও স্বীকার
করতে হবে, এমন আন্তর্জাতিক চিন্তাসম্মুখ
কাহিনী কদমিচ আমদের ভাগ্যে জোটে।
মানুষের ভালবাসা, প্রেম ও সত্যতা যদি সত্য
হয়, তাহলে 'সারেঙ বৌ' উপন্যাসের নিপাতিত
মানুষগুলিও চিরকালের সত্য রূপে পাঠকদের
হৃদয় জয় করবে। মাঝমন্ডলের রক্তের ছড়া,
আন্তর্জাতিক শব্দের নিপুণ ব্যবহার গ্রন্থটির
আকর্ষণ শিগ্গর বান্ধি করেছে।

রাষ্ট্র : সম্পাদক : নির্মল বসু। ১৫৬,
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড, ব্রক এন, রুম নং ৮,
কলিকাতা-৬। দাম : এক টাকা (প্রতি
সংখ্যা)। বার্ষিক : চার টাকা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার একমাত্র ত্রৈমাসিক
বাংলা পত্র রাষ্ট্রের চতুর্থ বর্ষীয় তৃতীয় ও
চতুর্থ সংখ্যাটি চিন্তাশীল রাজনৈতিক রচনার
স্বারা সমৃদ্ধ। শ্রীপরমলচন্দ্র ঘোষের 'সর্ব-
ভারতীয় সংহতির সমস্যা' হীরেন্দ্রনাথ মুখো-

পাধ্যায়ের একটি 'রচনার পরিপূরক' রচনা
কলা বেতে পারে। অবশ্য সংহতির সমস্যার
বিভিন্ন থাকবেই এবং তা থেকেই আমরা সত্যে
উপনীত হব। শ্রীঘোষের মূল্যবান প্রবন্ধটি
অন্য ভারতীয় ভাষাতে অনূদিত হওয়া
উচিত। অন্যান্য রচনার মধ্যে অশোক
মুস্তাফির 'বিদেশী দৃষ্টিতে সত্যাবলম্ব',
সুপ্রভকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জাতীয় পরি-
কল্পনার গ্রাম পঞ্চায়তের ভূমিকা', বিমলেন্দু
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গদ্যভাষ্যের বিবর্তন',
ডঃ অক্ষরকুমার ঘোষালের 'উত্তরপ্রদেশের
ঘটনার ভিত্তিতে আইনসভা বনাম আমলাত',
অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের অনূদিত জন
স্ট্রাইট মিলের 'প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার'
শব্দ উল্লেখযোগ্যই নয়, পাঠকসাধারণের কাছে
শিক্ষণীয় বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য এতদুপ
বচিতে হলে এই বাজনারীভঞ্জন রক্ষা করাকে
উপেক্ষা করা চলে না। সেই কারণে রাষ্ট্রের
মতো পত্রিকা শব্দ কলেক্ট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ছাত্র-অধ্যাপকদেরই অবলম্বন নয়, সাধারণ
মানুষের কাছেও আশ্বিনিতরতার জন্যে একান্ত
প্রয়োজনীয়। 'পুস্তকভাণ্ডার', 'আলোচনা', 'সংবাদ',
প্রভৃতি বিভাগগুলি অন্যর দৃষ্টান্ত।

সচিত্র শ্রীমতী : প্রধান সম্পাদিকা :
শ্রীমতী আভা চট্টোপাধ্যায়। ২৯, ওয়ার্ডারলু
স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম : ১.৫০ পঃ।

অজস্র সাময়িক পত্রিকা ভিড়ে 'সচিত্র
শ্রীমতী'র তৃতীয় বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত
এই বিশেষ বৈশাখী সংখ্যাটি বিশেষভাবে
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনোরম প্রচ্ছদপট,
বাঁধাই এবং অঙ্গসজ্জা, সর্বত্র একটি পরি-
শীলিত সূর্যচরিত্র ছাপ। উল্লেখযোগ্য এর
রচনাবলীও। প্রবীণ-নবীন লেখকের সম্মিলন
অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মিহিব আচার্যের
উপন্যাসটি সুখপাঠ্য, তবে এটিকে বড় গল্প
কলাই সঙ্গত। ভবানী মুখোপাধ্যায়,
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রভাত দেবসরকার, শিববাম
চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, গোতম গুহ ও
অমলেন্দু শূরের রচনা ভালো লাগবে।
কবিতা লিখেছেন সুশীল রায়, দুর্গাদাস
সরকার, সুদীপ বসু, বিশ্বনাথ কল্লল, মল্লয়
বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা পাল, সুসিত রায় এবং
আরো অনেকে। তরুণ কবিদের মধ্যে শান্তনু
দাস ও মনোবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা দুটি
মনে আশা জাগায়। সচিত্র শ্রীমতী স্বীয়
বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিলাভ
করুক, এই কামনা করবো।

সাম্প্রতিক এবং প্রমথনাথ শিশীর দুটি প্রবন্ধের
অনুসরণ পুনর্মুদ্রণ এবং আরো নানা তথ্য
মনোনিবেশ করে পুনর্নিবন্ধ একালের পাঠকের
কাজে স্বিকল্পনাধর্মের এই 'স্বপ্নপ্রয়াণ'
পরিবেশন কবেছেন। আমি এই নতুন
স্বপ্নের থেকেই সত্যচরিত্রের সেই মন্ডলটি
দেখে নিলাম। দেখলাম তিনি লিখে গেছেন—
স্বপ্নপ্রয়াণে ব্যক্তিগত সংস্কারে ঘূর্ণা নাই—

ইহার স্বপ্নদৃষ্ট দল, একের পর আরেকটি,
স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে—এগুলির উপর
মানুষের কতকটা আকারপ্রকার দেওয়া হইয়াছে
মাত্র—হৃদয়ের গভীর করুণা, শোক, সন্দেহ
প্রভৃতির বিচিত্র কুটিল আবর্ত ইহার মধ্যে
দেখা যায় না—এ কার্যে ব্যক্তির ইন্দ্রজাল
নাই।

সত্যচরিত্রের ব্যবহৃত এই 'ব্যক্তির
ইন্দ্রজাল' কথাটা হঠাৎ মনের মধ্যে একই
প্রসঙ্গের অন্য উদাহরণ জাগিয়ে তুলছে।
স্বিকল্পনাধর্মের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের বিবাদপূর্ণ
পরিভ্রমণ করে এবার সেই পথেই এগিয়ে
যাওয়া যাক।

(হুমায়ূন)



ভারত দর্শন

কচ্ছের বৃদ্ধের বীর সেনানীদের সন্মান

রাজধানী :

ও শান্তি

সর্বনাশে সম্মুখীন চরম তাজতি পড়িতঃ।

কচ্ছ রানামণ্ডে সামরিক 'রান' দেওয়ার পর আমরা এবার যথেষ্ট শান্তিভেদের সংগে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করেছি। বীরা এই শান্তিচুক্তি আদৌ স্থায়ী হবে কিনা এ বিষয়ে বিক্ষুব্ধ মতামত প্রকাশ করেন, তাঁরা প্রকৃতির নিয়মের রাজ্যে বসবাস করেন বলে বর্তমান লেখক বিশ্বাসী নন। স্থায়ী ব্যাপার (বিশেষত শান্তি প্রসঙ্গে) নিত্যন্তই অলীক কল্পনা। বরং পৃথিবীর ইতিহাসে ও শব্দের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী নাস্তি-কেই আলিঙ্গন করেছে। সুতরাং স্থায়ী-শান্তির কল্পনার কোন ভিত্তি নেই। শান্তিচুক্তি মাত্রই সাময়িক। এ সম্বন্ধ প্রাকৃতিক সত্য মেনে নেওয়াই উচিত। পুরোপুরি বৃদ্ধ প্রাপ্ত না হলে কিংবা বয়সের শরণ না নিলে কদাচ ও কতুর সাক্ষাৎ ঘটে কষ্টও মানুষের ইতিবৃত্তে কোনোও প্রমাণ নেই। তদ্রূপ শান্তি স্বস্ত্যয়ন হয়, রক্ষাকবচ ধারণ করেন অনেকে। আমরাও চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করছিঃ বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ।

এরপর পাকিস্তানের সংগে দয় কবাক্ষি ও মাক-লডালিডি অস্তে যদি মীমাংসায় উপনীত না হতে পারি, তবে তিনজন সদস্য নিয়ে একটি বড় আদালত বসবে। কনকর ণিপটে ভাগের গুরুভার ধার্মিক শৃঙ্গালে গ্রহণ করবে। নাবালকের সম্পত্তি যেমন অভিভাবকে বেঁটে দেন।

ও শান্তি! আমরা, অর্থাৎ হিন্দী-পাক ভাই-ভাই দিল্লীতে বসে যে চুক্তিতে স্বাক্ষর রাখলাম সে চুক্তিতে তাক্ষণিকভাবে যুদ্ধ বন্ধ হল, কিন্তু বাণঘৃদ্ধের ঘ্যানঘ্যানানি অব্যাহতই রইল।

দুই শিশুরাষ্ট্রে (পাকিস্তান বড় তড়াতাড়ি

বুড়িয়ে গেছে) নিশ্চিতরূপে বর্তমানে বালক বয়সে পদার্পণ করেছে। কিন্তু শিশুরাষ্ট্রের নাবালক অন্তর অস্বীকৃত না হওয়ার আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিক কৌশলের ফয়সালা করতে সাবালক সারোব-সুবোরো সহানুভূতির সংগে এগিয়ে এসেছেন। উইলসন সারোবকে ধন্যবাদ।

উত্তরত আমরা যা ছেড়েছি ও যা পেরিয়েছি তা তুলানতে ওজন করার বস্তু নয়, ফিতে ফেলে জরীপ করার বিষয়। জরীপের সময় ইঞ্চিটক অথবা বিগতখানেক জমি চিরকালই এদিক-ওদিক হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত এই চুক্তিতে ছটাকখানেক জমির হেরফের নয়, চুক্তি-বন্ধনের সময় পাক পক্ষে ভারতীয় এলাকাভূক্ত ৩,৫০০ বর্গমাইল জমির ওপর দাবি বজায় রাখা হয়েছে।

এই তিন হাজার পচিশত বর্গমাইলই হবে দুই দেশের স্বাধীন মীমাংসার পথে গৌরার চৈনিক প্রাচীর। ফলত চুক্তির পরেও ট্রাই-বুনাল (বেলা বাহুল্য বিদেশী) বসবে। সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে কোনো বিরোধের অস্তিত্ব নেই বলে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যে যত হস্তম বক্রম করেছে, ঐ ৩,৫০০ বর্গমাইলের বিরোধে তার পণ্ডিতপ্রাপ্ত ঘটিরে অস্তিত্বহীন বিরোধকেই রক্তমাংসে স্বীকার করিয়ে ছাড়ল। প্রাকস্বাধীন ভারতের অঙ্গাচ্ছেদে যে শ্বেতাঙ্গ করুণ ছুরিকা সক্রিয় ছিল, সেই শ্বেত মধ্যস্থতায় নিপন্ন অশ্রুসবরণ চুক্তিতে পাকিস্তান ভারতীয় এলাকার ওপর তার দাবি ট্রাইবুনালতক অব্যাহতই রাখতে পেরেছে। এর দ্বারা পাক পক্ষে উল্লাসের যথেষ্ট কারণ আছে।

ভারতের দাবিও অমান্য করা হয় নি, ১লা জানুয়ারীর অবস্থায় সৈন্যপসরণের চুক্তি মানা হয়েছে। কিন্তু তন্ম্বারাও ভারত যে লাভবান হয়েছে এমন কথা বলা সঙ্গত হবে না। পরলো জানুয়ারীর পর আক্রমণকারী

পাকিস্তান যেসব অঞ্চল দখল করেছে সে সমস্ত ছাড়তে হবে তাকে। কজরকোট ছাড়লেও কিন্তু পাকিস্তানী টহলদারী সেখানে অব্যাহতই থাকছে। ভারতীয় এলাকার ভেতর দিয়ে নির্মিত পাক সড়ক সুবাই ডিং-এ পাক সৈন্যরা টহল দেবেন। এদিকে ছাদবেত ও করিমসাহীতে থাকবে ভারতীয় সীমান্ত পুলিশ এবং কচ্ছের রান এলাকার অসামরিক প্রশাসনিক কর্তৃত্বও থাকবে ভারতের হাতে। কিন্তু এ-সমস্তই আপাতত কবন্ধা।

কারণ ২৪০ অক্ষরেখা বরাবর দুই রাষ্ট্রের সীমানা চিহ্নিতকরণের পাক দাবি সামনে রেখে উপরোক্ত ব্যবস্থা পাকা হয় না। আর তাই ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা।

সুতরাং এই চুক্তিকে চূড়ান্ত ফয়সালা বলে ধরে নেওয়া যায় না।

চুক্তির দ্বারা সামরিক খাতে বাকবাক্য হাস করার যে সম্ভাবনার আমরা উৎসাহিত বোধ করছি এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতি তাঁর সাম্প্রতিক মাদ্রাজ সফরকালীন ভাষণে যে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন, আমাদের আভ্যন্তরীণ স্বার্থ-রক্ষার তার বাধ্যবাধ্য তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যখন সীমান্ত বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেখা যাবে। কিন্তু তেমন নিখুঁত অবস্থা কি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? পাকিস্তানকে ঠান্ডা করতে হলে কাস্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধান, উত্তর দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও তদীয় সম্পত্তির বিনিময় এবং যে যে ক্ষেত্রে পাকিস্তান যখনই কোনো দাবি উত্থাপন করবে তখনই সে দাবি মিটিয়ে দিতে হবে। নচেৎ স্থায়ী শান্তিপ্ৰতিষ্ঠা যে গোলভরা কথা মাত্র পাকিস্তান তা বুক ফুলিয়েই সমাধিরে দেবে।

তা ছাড়া কচ্ছ চুক্তিতে অপরাপর সীমান্ত-বিরোধ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ না থাকায় অন্যতর গোলমাল বাধলে আবার কিছু ছেড়ে দিয়ে বাহিঃশক্তির বিচারালয়ে বাদী হতে দাঁড়াতে হবে আমাদের। তা এমনভাবে

সাপ্তাহিক বসুমতী

ভেঁড়ে দেবে যদি শান্তি বজ্র খাবে তবে
কামাদের নাশ কোটি টাকা প্রতিরক্ষা ব্যয়
কমিয়ে পারিকল্পনাধাতে ব্যয়বৃদ্ধি করা সম্ভব
হবে।

মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণে চীনের সঙ্গেও
একটা বোকাপড়ার কথা আছে।

নিজেরেরটুকু না বুইয়ে ঘোল আনা বুকে
নিতে পারলে শান্তি ছাড়া অশান্তি কেই-বা
চায়। ভারত যৎপরোনাস্তি অশান্তি এড়িয়েই
চলেতে চায়। কিন্তু চাই বললেই কি পাওয়া
যায়। পাওয়া যখন কঠিন এবং দেওয়া যখন
সহজ তখন কিছ' দিয়েছেই ব্যবস্থা করতে
হবে।

শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সেই ব্যবস্থাই
কায়ম হবে। যদি এরপরও, পাক-ভারত
বিরোধ ঠাইবান্যালেই যায় তবে পাকিস্তান
কি কিছ' না নিয়েই ফিরবে। চুক্তির রকম-
নকম দেখে সে বিশ্বাসই দৃঢ় হয়।

বাই হোক আপাতত শান্তি।

ও শান্তি!

রুশ সাহায্য : ফরাঙ্কা

ফরাঙ্কার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বদেশ
জুড়ে যে হতাশা নেমে এসেছিল সম্প্রতি সেচ
ও বিদ্যামন্ত্রী ডঃ কে. এল. রাও তাঁর
সোভিয়েট সফরান্তে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে
তার অবসান হল। (বর্তমান সংখ্যা বণ্ণাংশন
যখন প্রেসে যায় তখনও এই শব্দসংবাদ আমা-
দের হাতে আসে নি)। প্রকাশ, সোভিয়েট ইউ-
নিয়নের সহায়তার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনা-
কালেই মোটামুটিভাবে ফরাঙ্কার কাজ নিষ্পন্ন
করা যাবে বলে ডঃ রাও আশান্বিত।

নদীর মধ্যবর্তী বাঁধটি সোভিয়েট
সাহায্যেই নির্মিত হবে। এই প্রান্তীয়

বাঁধের কাজ ইতিমধ্যে ত্বরান্বিত করারও
নির্দেশ দেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যামন্ত্রী পর্বতকে
এজন্য যোগান দিতে হবে বাড়তি বিদ্যুৎ।

আশার কথা আরও শোনা যাচ্ছে এই যে,
হয়ত ফরাঙ্কার বিদ্যুৎ উৎপাদনও সম্ভবপর
হবে। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা ফরাঙ্কার ন্যায়
প্রকল্পেও বিদ্যুৎ উৎপাদন যে সম্ভব সে
সম্পর্কে একটি নক্সাও ডঃ কে. এল. রাওকে
দেখিয়েছেন। ফরাঙ্কা ব্যতীত অন্যান্য ঋতেও
উপযুক্ত সোভিয়েট সহযোগিতার আশ্বাস
ডঃ রাও-এর সঙ্গে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ প্রেরণ
করেছেন।

সোভিয়েটের প্রতি বণ্ণবাসী চিরকালই
প্রজ্ঞাশীল। বাংলার ফরাঙ্কা প্রকল্পে সোভিয়েট
সহযোগিতা সে প্রজ্ঞা বৃদ্ধিতে উল্লেখ্য অংশ
গ্রহণ করবে। ইতিপূর্বেও ভারতের প্রতি



শ্রীউৎপল বারবারা

সোভিয়েট জনগণ তাঁদের আন্তরিক প্রীতি ও
আশ্বাস জানিয়েছেন, বর্তমানে সোভিয়েট
সহযোগিতা বাংলার যে উপকারে আপন শক্তি
নিবৃত্ত করতে মনস্থ করেছেন, তন্মুখা পশ্চিম-
বঙ্গ সোভিয়েট সরকারকে ও রুশ ভাইবোন-
দের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি
জানায়।

শ্রীউৎপল বারবারা

ফ্লাইং অফিসার শ্রীউৎপল বারবারার
ক্যামেরায় বিয়ারবেটে পাকিস্তান কর্তৃক ধাবহত
মার্কিন প্যাটন ট্যাঙ্কের ছবি ধরা পড়লে
পাকিস্তানের সূর্য বদলে গেছে এবং মার্কিনী
বন্দুকের চেহারাও আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে
ধরা পড়েছিল। শ্রীবারবারা সেই দিন জাতির
চোখে ষথার্থ 'হিরো' হয়েছিলেন। নিজের
জীবন বিপন্ন করে এই ছবি সংগ্রহের জন্য

তাঁকে ভারত সরকার বীরচক্র সম্মানে ভূষিত
করেছেন। ভারতবাসীও এই বীরভাইকে
আলিঙ্গন জানিয়েছে।

কচ্ছের রান অঞ্চলে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য
মহাবীরচক্র লাভ করেছেন, বিমান পর্ববেক্ষক
মেজর সুশীলকুমার মাথুর।

ত্রিগোড়িয়ার পহলাজানিকে দেওয়া হয়েছে
বিশিষ্ট সেবাপদক। প্রথম প্রেণীর সেবাপদক
মঞ্জুর হয়েছে ত্রিগোড়িয়ার ভি. কে. বাই-এর
নামে।

শ্রীবারবারাসহ আর ষাঁরা শ্ব শ্ব বীরত্বের
জন্য বীরচক্র লাভ করলেন তাঁরা ষথাক্রমে,
মেজর আর. কে. বালি, লেঃ অর্জন সিং এবং
হাবিলদার গোপীনাথ দিবে।

পরলোকগত মেজর বি. এস. রণধাওয়া
এবং ক্যাপ্টেন রণবীর ও সিপাহী বৃদ্ধ সিংকে
ষথাক্রমে মহাবীর ও বীরচক্র প্রদানে সম্মতি-
দান করেছেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি।

আসাম :

নয়া অস্ত্র

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি. পি. চাঁলিহা
অসুস্থতার সুযোগ সদ্ব্যবহার করার জন্য
মন্ত্রিসভা বিরোধীদল আবার উঠে পড়ে
লেগেছেন। প্রকাশ, মন্ত্রিসভার পোর্টফোলিও
রদবদলের চেষ্টাচরিত্রও চলেছে সমতালে।
কিন্তু শ্রীচাঁলিহার অসুস্থতাকে উপলক্ষ
করলেও ক্ষমতালোভী চক্রান্তের চরিত্র অভিজ্ঞ
মহলে অস্পষ্ট নেই।

শ্রীচাঁলিহার অসুস্থতার জিগির তুলে বলা
হচ্ছে রাজ্যমুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে ছ'ঘণ্টা দায়িত্বপূর্ণ
পোর্টফোলিও ধরে রাখা অনুচিত।

আরও শোনা যাচ্ছে, রাজ্যকংগ্রেসের মধ্যে
নতুন করে দল গড়াগড়ি সূত্র হতে পারে।
চাঁলিহা-ফকরুদ্দিনের প্রগতিশীল চিন্তাধারার
বিরুদ্ধবাদী একটি নতুন জোট পাকিস্তানী



ডঃ রাও



শ্রীচাঁলিহা

অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে চালিহা-ফকরুদ্দিনের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ অভিযান শুরু করেছে।

গোহাটি ডেইলী পত্রিকার প্রকাশ, ১০জন মুশলিম এম-এল-এ (কং) এই বলে অভিযোগ করেন যে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী বিভাগের নামে আসলে বর্তমান রাজ্যসরকার ভারতীয় মুশলিমদের উত্তর করছেন। তারা এবিষয়ে সরকারী অপদার্থতার অভিযোগ করে রাজ্য অর্থমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীমৈনুল হক চৌধুরীর পদত্যাগ দাবি করেছেন। অন্যথায় এই ১০জন কংগ্রেসী এম-এল-এ পদত্যাগ করবেন এই হুমকিও দোঁপিয়েছেন বলে প্রকাশ।

সংবাদটি সর্বৈবভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এর দ্বারা আমদুল্লাহী অপপ্রচারের প্রতি-ধ্বনি করা হয়েছে—সংবাদ প্রকাশের পর এই মর্মে এক সংবাদিক বৈঠকে বিবৃতি দিয়েছেন রাজ্য শিল্পমন্ত্রী শ্রী কে, পি, হিরাঠী। অবশ্য ঐ সংবাদের সত্ত্বে যে সংবাদপত্রের কোনো সংযোগ নেই সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যখন দেখা যায় স্থানীয় পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য উক্ত ১০জন এম-এল-এর কার্যকলাপকে সরাসরি জাতীয়তা-বিরোধী বলে নিন্দাবাদ করেন।

রাজ্য অর্থমন্ত্রী ব্যাপারটাকে ভুল বোঝা-বুঝির স্তরে সীমিত করে বলেছেন যে, ১০জন এম-এল-এর পদত্যাগ বিষয়ক হুমকির সত্ত্বে সাধারণ ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সম্পর্ক নেই। শ্রীআমেদ ক্যাবিনেট অথবা ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি ব্যবহারজনিত কোনও মতানৈক্যের অস্তিত্বও অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু বিতর্কের অবসান হয় নি তাতেও। প্রথম মধ্যমন্ত্রী (শ্রীচালিহা একে ক্ষমতাসীন

করেন) শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীও ব্যাপারটি সুনজরে দেখেন নি। গোহাটি আইনজীবী সঙ্ঘের সভায় তাঁরই সভাপতিত্বে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার প্রধান বক্তব্য হল, ঐ ১০জন এম-এল-এর কার্যকলাপে জাতীয়তাবিরোধী চক্রান্তের লক্ষণ সুস্পষ্ট। অনুরূপ ধারণা প্রকাশ করেছেন শ্রীদেবেশ্বর শর্মাও। যদিও শ্রীশর্মাকে মনিসভাবিরোধী জোটের একজন অগ্রগণ্য নেতা বলেই সকলে জানেন। এবং ঐ সংবাদও কারও অজ্ঞাত নেই যে, শ্রীশর্মাকে সরিয়েই শ্রীচালিহা ফকরুদ্দিন সাহেবের হাতে তাঁর পোর্টফোলিও তুলে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ-কারীদের জন্তু করে রাজ্যে যে নতুনভাবে একটি ক্ষমতাসম্পন্ন জোটের কার্যকলাপ শুরু হয়েছে এবং এবিষয়ে উচ্চতর মহলে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেসী হোমরা-চোমরাদের পরস্পরবিরোধী উক্তিপ্রত্যুত্তিই তার প্রমাণ। সুতরাং অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, শ্রীআমেদ যা-ই বলুন, রাজ্য ক্যাবিনেটে ও ক্ষমতাসীন দলে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তগুলির সপক্ষে সম্পূর্ণ মতৈক্য নেই।

পাঞ্জাব :

আকালি আন্দোলন

পাঞ্জাবী সূদ্রা আন্দোলনে পাণ্ডা পান নি মাস্টার তারা সিং। কিন্তু হলে কি হয় তাঁর মাস্টারি করার শখ এখনো মোটে নি পুরো-পূরি। এবার তিনি গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন শেখ আবদুল্লাহর সত্ত্বে। শেখ সাহেব এখন আপন কর্মফলে অন্তরীণ। মাস্টার তারা সিং সেই সূযোগে নতুন কল্যাণ সৃষ্টির জন্য তাঁর হাছেন।

প্রকাশ-আকালি নেতা মাস্টার তারা সিং পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীর জড়িয়ে একটা কন-ফেডারেশন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছেন। পাঞ্জাবী সূদ্রা ধোপে টেকে নি। সুতরাং তারা সিং বুঝেছেন একা রামে দোঁড় জমবে না। কন-ফেডারেশনের ক্যাপারে দোসর সুগ্রীব শেখ সাহেবের 'সাপোর্ট' সম্বধান করছেন তাই আকালি নেতা।

এই অভিনব পরিকল্পনা নাকি নতুন দিল্লীতে উদয় হয়েছিল। তারা সিং যখন চিকিৎসার জন্য সেখানে, তখনই নয়া সড়কে তথুভের ব্যবস্থার কল্পনা তাঁকে পুনশ্চ চাওয়া করে তুলেছে।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, এই ব্যাপারে মাস্টার মশাই শেখ আবদুল্লাহর একান্ত অনু-গামিনী শ্রীমতী মদুল্লা সরভাই-এর সত্ত্বে স্বাক্ষরিত করে এসেছেন।

পরিকল্পনার নাকি বিভীষণের লক্ষ্য



মাস্টার তারা সিং

ভাগও হয়ে গেছে। প্রকাশ, পাঞ্জাব কাশ্মীর কনফেডারেশন গড়ে তুলতে পারলে সেই স্বর্গরাজ্যে হিন্দু-মুশলিম ও শিখ সম্প্রদায়ের সমানুপাতিক জনসংখ্যা রাখা হবে এবং অকালি-শেখ দল মহানন্দে রাজত্ব করবেন।

এই মহৎ চিন্তার যতই মাথা পরম হোক, জানা গেল, এজন্যই নাকি স্থানীয় 'সমস্ত গ্রুপের' সত্ত্বে আকালিদল বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে মনস্ত্ব করেছে। মাস্টারমশাই সমস্ত দলের সকলের একবাক্যে সার্বিক সমর্থন আশা করেন না। সেজন্য তিনি নাকি তাঁদেরই শূদ্র দলে টানবেন যাঁরা ঘরশরীরে একে তাঁর সাক্ষরদী করতে পরামুদ্ব হবেন না।

হোমশিখা নাসিক পত্রিকা

প্রতি মাসে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ—তাছাড়া গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি—আবার জন বেকলেসের 'ওয়েস্ট টু দি প্যাসিফিক'-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ—পশ্চিমে প্রসারিত মহাসাগর। (জৈষ্ঠ) প্রকাশিত হইয়াছে মনোজ্ঞ বস্তু তদ্বিত ছোটগল্প সংকলন 'দুয় স্বত দুয় রাগ' এবং কালীপ্রসাদ বসু অনুদিত 'সহজ মানুষ, মহৎ প্রাণ' (A Simple honourable Man) হোমশিখা বার্ষিক সভাক মূল্য ৫ পাঠাগার ও বিদ্যায়তনের জন্য হোম-শিখা প্রকাশনীর একটাকা 'সর্বজের দশখানি' বিভিন্ন গ্রন্থ একত্রে সাত টাকা মাত্র। তালিকার জন্য লিখুন।

হোমশিখা কার্যালয়
কুশনগর, নদীয়া



শ্রীফকরুদ্দিন আলি



সানজানসিকোয় রাষ্ট্রসভার বিংশবর্ষ প্রতিদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে
ইউ থাণ্টের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি জনসন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

সানজানসিকো শহরে ২৬শে জুন তারিখে রাষ্ট্রসভার তার বিংশবর্ষ-পূর্তি দিবস উদ্‌যাপন করেছে। বিশ বৎসর পূর্বে এই দিনে এই সানজানসিকো শহরেই রাষ্ট্রসভার জন্ম হয়।

শহরবাগী রাষ্ট্রসভার মিশেী অতিথিদের প্রতি সানর সম্মাননা জ্ঞাপন করেছে। সমস্ত শহর এদিন জ্বলর করে সাজানো হয়েছিল। গাড়িতে, বাড়ির চুড়ায় সর্বত্র রাষ্ট্রসভার মীল ও সাদা রঙের পতাকা উড়েছিল। সানজানসিকোর নেয়র জন এফ শেলী নিজে এসেছিলেন বিমানবলারে রাষ্ট্রসভার সাধারণ পরিষদের বর্তমান সভাপতি আদোল কোরাইগন-স্যাকে, সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানানোতে।

এই উপলক্ষে অপেরা হাউসে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিনডন বি জনসন রাষ্ট্রসভার উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি তাঁদের আস্থা ঘোষণা করেন। বিশ্বশান্তি রক্ষায় সকল জাতি মিলিতভাবে চেষ্টা করে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কিন্তু এই সম্মানীয় দিবসের অনুষ্ঠানে

রাষ্ট্রসভার আর্থিক সংকট সমাধান অথবা ডিয়েৎনাম সংকটের অবসানের প্রশ্নে জনসন নতুন কোন কথা বলবেন বলে খাঁরা আশা করেছিলেন, তাঁরা হতাশ হয়েছেন। জনসনের বক্তৃতা নিতান্তই নামূলি ধরনের হয়েছে।

দেখতে দেখতে রাষ্ট্রসভার বিশ বৎসর অতিক্রম করল, এ নিশ্চয়ই গৌরবের কথা। প্রাক্তন 'লীগ অব নেশনস'-এর বিশ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করেছিল এবং লীগের পক্ষপ্রাপ্তি ঘটেছিল। রাষ্ট্রসভার ভাণ্ডে লীগের অনুরূপ পরিণতি ঘটে নি। বরং বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা, অন্যতম জাতির উন্নয়নের আয়োজন এবং বিভিন্ন লব্ধ যুদ্ধের প্রসার-রোধে রাষ্ট্রসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তবু সানজানসিকো শহরে রাষ্ট্রসভার বিংশবর্ষ-পূর্তি উৎসবে সবচেয়ে প্রতিনিধিদের মনে এই প্রশ্নই বারো বারে দেখা দিয়েছে: যে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা কি সফল হয়েছে?

রাষ্ট্রসভা প্রতিষ্ঠার সময় সংকল্প করা হয়েছিল, অন্তত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিজয়ী শক্তিগুলি একযোগে বিশ্বশান্তি রক্ষায় অন্য কাজ করবে? কিন্তু আজ কক্ষো বা ডিয়েৎনাম ডোমিনিকান রিপাবলিক বা ইয়েমেন, কোন

প্রশ্নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন একসাথে কাজ করতে পারছেন না।

কক্ষোয় রাষ্ট্রসভার বাহিনীর ব্যয়ের দাবি বহনে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ফ্রান্স রাজী হয় নি। হয়তো ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছুই দাবি করা নেবে না।

চীন রাষ্ট্রসভার বাইরে। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বোগসাকসে চীন আজ রাষ্ট্রসভার ভিত্তি চ্যালেঞ্জ করেছে। পাল্টা রাষ্ট্রসভা পঠনের ছকটি তারা দিয়েছে।

যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রসভার ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী, সেও রাষ্ট্রসভাকে ভিত্তি করে কাজ করে। ডিয়েৎনাম আর ডোমিনিকান রিপাবলিকের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রসভার কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে এককভাবে কাজ করেছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রসভার অস্তিত্ব থাকবে কি করে?

ডিয়েৎনাম যুদ্ধের যদি আশু মীমাংসা সম্ভব না হয়, তবে রাষ্ট্রসভার পরিপতিও যে লীগ অব নেশনসের মত হবে না, একথা কে জোর করে বলতে পারে?

এত সমস্যাও কিন্তু রাষ্ট্রসভাকে ধ্বংস হতে দেয়া চলবে না। অনেকেই রাষ্ট্রসভার নির্দেশ মানে নি, অনেকেই তাকে অগ্রাহ্য করে কাজ করেছে। তবু রাষ্ট্রসভা আছে বলেই আজও বড়রকমের কোন যুদ্ধ শুরু হয় নি। আজই হোক আর কালই হোক, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথে নিজেদের সব বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার পথ সবাইকে গ্রহণ করতেই হবে। আর রাষ্ট্রসভাই হবে এ কাজের সাধন। স্বভাবাং শত বাধার সম্মুখীন হলেও রাষ্ট্রসভাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

দক্ষিণ ডিয়েৎনাম :

দক্ষিণ ডিয়েৎনামের নতুন সরকার দেশের সকল যুবকের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে।

প্রতিরক্ষাদপ্তর থেকে ২০ হতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত বয়সের সকল যুবকের কাছে সামরিক চাকুরী গ্রহণের জন্য কন্য পাঠানো হয়েছে। চীনা বংশোদ্ভূত ডিয়েৎনাম নাগরিকদের ক্ষেত্রেও এই নির্দেশ প্রযোজ্য। যদি কেউ এই নির্দেশ অমান্য করার চেষ্টা করে, তবে সামরিক আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নেওইন কাও-কাই প্রধানমন্ত্রী হবার পর যে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, বাধ্যতামূলকভাবে সকল যুবকের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা শেষ হবার আগেই দক্ষিণ ডিয়েৎনাম সরকার ডিয়েৎনাম কং গেরিলাদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ শুরু করতে চায়। মনে হয় এ তারই প্রস্তুতি



ডঃ ভিয়েৎনামের সামরিক পরিষদের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নেগুইন কং কাই (মাকখনে)

ভিয়েৎ কং গোরিলাদের সাহায্য করছে, এই অভিযোগে সাংগনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। কাই সরকার ভাল-ভাবেই এবার অভিযানে নামবার আয়োজন করছে দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু ভিয়েৎ কং-এর বিরুদ্ধে অভিযান বিশেষ সফল হচ্ছে বলে মনে হয় না। ২৯শে জুন তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ছত্রীবাহিনী যুক্তভাবে মধ্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎ কং গোরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল। মার্কিন ছত্রী-বাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এলিস টাইলিয়ামস ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম

বাহিনীর অধিনায়ক সাব-ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডু কুওক ডং এই অভিযানের নেতৃত্ব করেছিলেন। সাড়ে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে এই অভিযান চালিয়ে তাঁরা একজন গোরিলাকেও ধরতে পারেন নি। জঙ্গলের অভ্যন্তরে কোথায় যে তারা লুকিয়ে আছে, তা তাঁরা খুঁজে বের করতে পারেন নি।

এদিকে কিন্তু নতুন নতুন জায়গা ভিয়েৎ কংদের দখলে চলে যাচ্ছে। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, খা মন জেলার সদরদপ্তর ফু বন তারা দখল করে ফেলেছে।

ভিয়েৎনামের যুদ্ধে কিছুতেই সুবিধা করতে না পেরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন মরীয়া

হয়ে উত্তর ভিয়েৎনামের রাজধানী হ্যানয়ে বোমাবর্ষণের কথা ভাবছে। গত মাসে হ্যানয়ের মাত্র ১২৫ মাইল দূরে সোমুয়াত বোমাবর্ষণ বোধ হয় তারই প্রসঙ্গ। এই সমস্যা বিচলিত হয়ে বুটেনের প্রাক্তন পবিত্রনন্দা প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কাজ থেকে বিরত থাকবার জন্য নানাবিধ অনুরোধ জানিয়েছেন। নিউ ডাক্সিটায়ন মার্কিনদের একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গর্ডন ওয়াকার বলেন, হ্যানয়ে বোমাবর্ষণ করলে তার চেয়ে বড় ভুল আর কিছু হবে না। গর্ডন ওয়াকার সম্পূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান-বাসীরাগতাবে সফল করেছেন ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সাধনায়



দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন ছত্রীবাহিনী গোরিলাদের সন্ধান দিচ্ছে

বের করার উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যদি তেবে থাকে যে, হ্যানরে বোমাবর্ষণ করলেই উত্তর ভিয়েতনাম আলোচনার বসতে রাজী হবে, তবে তা ভুল।

উত্তর ভিয়েতনামের সামরিক বাঁটিতে বোমাবর্ষণের ফলেই বিশ্ব জনসত্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যের তীব্র নিন্দা করেছে। এর পর যদি আবার হ্যানরে বোমা ফেলা হয়, তবে তা আরও অনেক বেশি নিন্দার বিষয় হবে। হ্যানর আক্রমণের পর চীন নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্মীদের মাথায় যদি এই ভুত চুক থাকে, তবে

ওলী চালাতে হয়েছে এবং এর কলে প্রায় ত্রিশ জন নিহত হয়েছে। বোমের বন্দরও ওলীবর্ষণ হয়েছে।

আলজিরিয়ার রাজনীতিতে প্রভাবশালী সংগঠন শ্রমিক লীগ ফেডারেশন এখন পর্যন্ত বুমেদিয়ান সরকারকে সমর্থন করে নি।

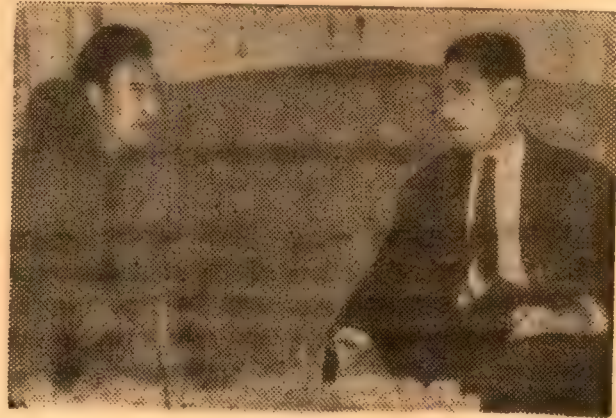
কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বিদেশেও বুমেদিয়ানের বিরোধিতা তীব্রতর হয়েছে। জো-এন-লাই ও তাঁর চীন বুমেদিয়ানকে সমর্থন করলেও, কিউবার ফাইডেল কাস্ট্রো বুমেদিয়ানের তীব্র সমালোচনা করেছেন। কাস্ট্রো বুমেদিয়ানকে দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়া

আক্রো-এশীয় রাষ্ট্রপোষ্ঠীর কাছেও আলজিরিয়া ছোট হয়ে গেছে।

বুমেদিয়ান বুঝতে পারছেন, এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে একা দেশ শাসন করা অসম্ভব। তাই তিনি চেষ্টা করছেন, বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। ইতিমধ্যেই তিনি বেন বেল্লা-বিরোধী হুজর নেতা ফারহাত আব্বাস ও রাবা বিতাভের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছেন। এরা কেউ প্রধানমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলে তিনি পেছন থেকে সৈন্যবাহিনীর জোরে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবেন, এই তাঁর ইচ্ছা।



গভর্ন ওয়াকার



আবদুল হাকিম আমেরের সঙ্গে আলোচনায় বুমেদিয়ান

মেজাবেই ছোক তাকে ডাড়াতে হবে। না হলে লম্বা বিপদ।

আলজিরিয়া :

বিরোধের নায়ক হুয়ারি বুমেদিয়ানের বিরুদ্ধে নানা স্থানে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। আহমেদ বেন বেল্লা বেচ্ছাচারী একনায়ক হলেও সাধারণ আলজিরীয়দের মধ্যে তাঁর একটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। এই জনপ্রিয়তা হুয়ারি বুমেদিয়ান বা আবদুল আজিজ ব্তেকিলা কিংবা অন্য কোন বিরোধী নেতার নেই।

সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান চমক কেটে যাবার পর, রাজধানী আলজিরিয়া ও দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এখন বেন বেল্লা সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। বিক্ষোভকারীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে : 'বেন বেল্লার হুজি চাই,' 'খুদী বুমেদিয়ান নিপাত থাক।'

আলজিরিয়ায় প্রধানত ছাত্ররা এই বিক্ষোভ পরিচালনা করছে। ওয়ানের গ্রামাঞ্চলে বিক্ষোভ এত ব্যাপক হয়েছে যে, সেখানে কয়েক রাউও

শীল, মানুষ্যবাদের দালাল প্রতীতি দব বাছাই করা বিশেষণে অভিহিত করেছেন। সিনির সেকু টুরও বুমেদিয়ানের বিরুদ্ধে কটকট বর্ষণ করেছেন। যে নাসের আলজিরিয়ার সামরিক অভ্যুত্থানকে 'মহান বিপ্লব' বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তিনিও এখন বুমেদিয়ান-বৃত্তেকিলা গোষ্ঠীর ওপর বাত্পা হয়েছেন শোনা যাচ্ছে। বেন বেল্লাকে কারাগারে আশ্রয় দানের প্রস্তাব করে নাসের তাঁর উপরাষ্ট্রপতি আবদুল হাকিম আমেরকে আলজিরিয়া পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বুমেদিয়ান রাজী হন নি বেন বেল্লাকে ছেড়ে দিতে। এতেই নাসের চটেছেন।

বেন বেল্লাকে বেরে ফেলা হয়েছে বলে সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সর্বত্র তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অবশ্য এখন গোনা যাচ্ছে, বেন বেল্লাকে সাহায্যের বন্দীনিবিরে আটকে রাখা হয়েছে।

নির্দিষ্ট তারিখে আলজিরিয়ায় আক্রো-এশীয় সম্মেলন না হওয়াতেও আলজিরীয় জনসাধারণের মধ্যে বুমেদিয়ান সরকারের মর্মান্বাহানি ঘটছে।

ফ্রান্স :

দ্য গলের ভাণ্ডা নিতান্তই ভাল বলতে হবে। আগামী ভিশেষর মাসে ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যে নতুন নির্বাচন হবে তাতে বর্তমান রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কোন প্রকৃত প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না।

এতদিন কথা ছিল, মার্সেই শহরের মেয়র সমাজতন্ত্রী গাকন দিকেরে দ্য গলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। দিকেরে এই মর্মে ঘোষণাও করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দিকেরের একটি বড় সত্ত ছিল। এই সত্তটি হল এই যে, দ্য গল-বিরোধী সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি মিলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গঠন করতে হবে। এই সম্মিলিত শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই তিনি দ্য গলের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়বেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্য গলের বিরুদ্ধে এই সামগ্রিক ঐক্যসাধন সম্ভব হয় নি। পক্ষপাল পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে, ফ্রান্সের প্রধান

মাণ্ডাহিক বসুমতী



দ্য গল

প্রধান দলগুলির মধ্যে ঐক্যপ্রচেষ্টা কার্যভার পূর্ণবিস্তৃত হয়েছে। এর পরেই দিকেরে আলিরে হয়েছে, তিনি আর রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না।

দিকেরে দ্য গলের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পারলে কিংবা বন্ধ শক্ত। হকতো তিনি পরাজিতই হতেন। তবু দিকেরে একজন শক্তিশালী প্রার্থী ছিলেন, তাঁর জনপ্রিয়তাও ছিল। কিন্তু এখন তাঁদের নাম প্রার্থীরূপে শোনা যাচ্ছে, তাঁরা কেউ উল্লেখযোগ্য নয়। কর্তব্যে তিনজন প্রার্থীর নাম রয়েছে। এঁরা হলেন—দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন জা-মুই ত্রিভিন্ন-ভিন্নানুকো, সেনেটের রক্ষণশীল সদস্য পিয়ারে মারসিনহোচি, আর নির্ভীক অজ্ঞাতকুলশীল আদ্রে' কর্বে। এঁরা কেউই দ্য গলের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

এখন আসলে পিনেকে দ্য গলের বিরুদ্ধে বাঁড় করাবার অন্য চেষ্টা চলছে। পিনে পূর্বে দ্য গল বহিঃভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। অর্থমন্ত্রী রূপে পিনে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তিনি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু পিনে রাজী হচ্ছেন না বাঁড়াতে।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ৭৪ বৎসর বয়স্ক দ্য গল প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আরও ৭ বৎসরের জন্য ক্যান্সার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। এর ফলে দ্য গলের একক কর্তৃত্বের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাবে। দ্য গল শারীরিক কারণে শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেন না বলে বাঁরা ভাবছেন, তাঁদের ধারণা ঠিক নয় বলেই অধিকাংশের বিশ্বাস।

অবশ্য গাল্ডন দিকেরে এখনও তাঁর ঐক্যপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্যান্সার দল সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দলের সমন্বয়ে একটি যুক্ত কেন্দ্রের পঠনের জন্য তিনি তাঁর প্রয়াস অব্যাহত রাখবেন বলে ঘোষণা করেছেন। শেষ বৃহত্তরও যদি এই কেন্দ্রের পঠিত হয়, তবে তিনি কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্বে নির্বাচনে বাঁড়াবেন।

গত সপ্তাহে বাকিন বৃজরাট্টের উপ-রাষ্ট্রপতি হবার্ট বোরোনিও হামকের সঙ্গে এক-রকম করতে গেলে হঠাৎই প্যারিসে ক্যান্সার রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গলের সাক্ষাৎকার ঘটবে।

আগের থেকে পরিকল্পনা করে উভয় রাষ্ট্রের এই দুই কেন্দ্র সাক্ষাৎকার ব্যবস্থা হয় নি। কোন নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনাও হয় নি। এই আলো-



হবার্ট হামকে

চনার ফলস্বরূপ কোন নির্দিষ্ট সাক্ষাৎ বা আলাপের প্রশ্নও ওঠে না।

হামকের প্যারিস আসবার কোন কথা ছিল না। বাকিন মহাকাশবিজ্ঞানী জিন বাক-ডিভিট ও এড হোরাইটের সংবর্ধনার ওয়াশিংটনে আরোক্ষিত এক অনুষ্ঠানে বাকিন বৃজরাট্টের রাষ্ট্রপতি লিগডন বি জনসন মহাকাশবিজ্ঞানী দু'জনকে প্যারিস বিমান-প্রদর্শনীতে যোগ দেবার জন্য বলেন। তিনদিনের মধ্যে তাঁদের প্যারিস যেতে হবে। জনসন এঁদের সঙ্গে উপরাষ্ট্রপতি হামকেকেও যেতে বলেন।

হামকে এই উপলক্ষে প্যারিস আসছেন উল্লেখ্য দ্য গল তাঁকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার জন্য। আশি মিনিট ধরে হবার্ট ও দ্য গলের মধ্যে হৃদয়তাপূর্ণ আলোচনা চলে। আলোচনার সময় ক্যান্সার বাকিন রাষ্ট্রপতি চার্লস বোরোনিও উপস্থিত ছিলেন।

দ্য গল বাকিন নীতির একজন উগ্র সমালোচক। তিনি হবার্টের কাছে ডিরেণ্ডানি ও জোমিনিকান রিপাবলিক প্রসঙ্গে বাকিন নীতির সমালোচনা করেন। হবার্টও এই সূযোগে দ্য গলের কাছে বাকিন নীতির ব্যাখ্যা করেন। কেউ কারও সমালোচনা বা স্বাধীন দ্বারা প্রভাবিত না হলেও, এই আলোচনার ফলে উভয়েই মতিমান হয়েছেন। দু'জনের পক্ষেই অগতির মনোভাব ভুল করে জানা সম্ভব হয়েছে। হামকের সঙ্গে আলোচনা করেও দ্য গল বৃশি হয়েছেন। হামকেকে তাঁর ভাব লেগেছে।

দ্য গল দীর্ঘদিন কোন উচ্চপদে বাকিন রাষ্ট্রনীতিকের সঙ্গে দেখা করেন নি। সুতরাং হামকের সঙ্গে তাঁর এই আলোচনা সেদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের ধারণা, জনসনের সঙ্গে একবার দ্য গলের সাক্ষাৎ হলে অনেক বিষয় আরও পরিষ্কার হবে এবং বাকিন-করানী সম্পর্কের উন্নতি হবে।

প্যাকিস্তান :

রাষ্ট্রপতি আব্দুল হা ওয়াহাবুল্লাহ দিকেরেই। তবে তিনি কোন ও আলমজিয়ার থেকে যেসব বীরের বেশে প্রত্যাগমন করবেন বলে



আব্দুল হা



চৌ-সোয়েকার্নো বৈঠক...

ভেবেছিলেন, তা হয় নি। একেবারে হতাশ হয়ে
শান্তি হাতে তিনি ফিরেছেন। এমন কি
কারো নিম্নবর্ণের নাসের, সোয়েকার্নো ও
চৌ-এন-লাই-এর একত্র আলোচনার ফলেও
তাঁর পক্ষে উন্নতি হবার মত কিছু ঘটে নি।

গভারের কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মে-
ননে আয়ুব ভাটকে বেশ কোণঠাসা করে-
ছিলেন। সম্মেলন শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইতাহারে
কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের
উপর আয়ুব-ভট্টের পক্ষে এক মন্তব্য কটনৈতিক
অবস্থায় বর্ণিত হয়েছিল। এখানেও তাই
তিনি আশা করেছিলেন, কমনওয়েলথ প্রধান-
মন্ত্রী সম্মেলনকে তিনি ভারত-বিরোধী প্রচারের
কাছে ব্যবহার করবেন। কিন্তু ভারতের প্রধান
মন্ত্রী শ্রীমন্তলালা প্রসাদ শাস্ত্রীর কঠোর বক্তব্যের
জন্য আয়ুব ভবিষ্যৎ করে উঠতে পারেন নি।
প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ
আলোচিত হয় নি। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হারল্ড
উইলসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কচ্ছের মান অঞ্চল
নির্দেশে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তাতে পাকি-
স্তান লাভবান হলেও শাস কমনওয়েলথ
প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে এবার আয়ুব নোটেই ভবিষ্যৎ
করে উঠতে পারেন নি।

আয়ুবের বড় আশা ছিল, চৌ-এন-লাই
ও সোয়েকার্নোর সহযোগিতায় আলজিরার
আব্দো-এশীয় সম্মেলনেও তিনি ভারত-বিরোধী
প্রচারে সাক্ষ্য অর্জন করবেন। সম্মেলন যাচ্ছে

জুনেই হয় তার জন্য তিনি আগ্রহ চেষ্টা করে-
ছেন। কিন্তু হারা। সম্মেলন হল না। তাই
আয়ুবকে একেবারেই শূন্য হাতে ফিরতে
হয়েছে।

ডোমিনিকান রিপাবলিক :

গ্যাণ্টো ডোমিনিকোতে এখনও দুই বিব-
মান পক্ষের মধ্যে ছোটোখাটো সংঘর্ষ চলছে।
আজও ডোমিনিকান রিপাবলিকে গৃহযুদ্ধের
অবস্থান হল না।

বিক্রোহী নেতা কর্নেল ফ্রান্সিসকো
ক্যামেনো দিনের 'সাংবিধানিক সরকার'
ও সামরিক দলের নেতা জেনারেল এ্যানটোনিও
ইমবার্ট ব্যারেবালের 'জাতীয় পুনর্গঠনের সর-
কার' মধ্যে একটা মীমাংসার জন্য 'মাকিন
রাষ্ট্র সমিতি' বা অরগানাইজেশন অব অ্যান-
রিকান স্টেটস'-এর (সংক্ষেপে ও-এ-এস) চেষ্টা
এখন পর্যন্ত সফল হয় নি।

ও-এ-এস প্রস্তাব করেছে, ক্যামেনো ও
ইমবার্ট, উভয়ের সরকার তুলে দিয়ে তার জায়গায়
সম্পূর্ণ একটি নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক সরকার
প্রতিষ্ঠা করা হোক। অতি লম্বা দেশে নতুন
নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং বর্তমান না
নির্বাচন হয় ততদিন এই সরকার অস্থায়ীভাবে
কাজ করবে।

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এই ও-এ-এস পরি- না বনেই বনে হয়।

কল্পনার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। মাকিন
যুক্তরাষ্ট্র এখন দুই পক্ষের ওপরেই চাপ দিচ্ছে;
এই পরিকল্পনা মেনে নিয়ে অস্থায়ীকরণ গৃহ-
যুদ্ধের অবস্থান ঘটানোর জন্য। ক্যামেনোর
বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান জোরদার করে চাপ
দেয়া হচ্ছে। মাকিন আশ্রিত ইমবার্টের
বিরুদ্ধে তো আর সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা
যায় না, তাই ইমবার্টের ওপর অর্থনৈতিক চাপ
দেয়া হচ্ছে। ইমবার্টের সৈন্যদলের বেতন
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র দেয়। মাকিন কর্তারা ঘোষণা
করেছেন, ও-এ-এস পরিকল্পনা না মানলে
সৈন্যদের বেতন বন্ধ করে দেয়া হবে।

ক্যামেনো নোটিশটিভাবে ও-এ-এসের
প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। তবে তিনি বলছেন;
নতুন অস্থায়ী সরকার গঠিত হবার পর তার
হাতে তাঁর সমর্থকরা অস্ত্র সমর্পণ করবে, ও-এ-এস
শান্তিবাহিনীর কাছে তারা অস্ত্র দেবে না।

কিন্তু ইমবার্ট কিছুতেই এই প্রস্তাবে রাজী
হচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য, তাঁর 'জাতীয় পুনর্গঠনের
সরকারকেই' নির্বাচন পর্যন্ত অস্থায়ী সরকার
রূপে মেনে নেয়া হোক। কিন্তু ও-এ-এস বা
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে রাজী নয়। ক্যামেনোর
পক্ষে রাজী হবার তো কোন কথাই ওঠে না।
ইমবার্টের নেতৃত্বে লম্বা জাতির একা আত্ম
আর সম্ভব নয়।

ও-এ-এস প্রস্তাব না মানলে ইমবার্টের
সৈন্যদের বেতন দেয়া মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বন্ধ
করে দেবে, কেবলমাত্র এই ছন্দ দিয়েই
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কাজ করছে। মাকিন যুক্ত-
রাষ্ট্র আরও বলেছে, এই প্রস্তাব অনুযায়ী
উভর পক্ষের সম্মতিতে নতুন অস্থায়ী সরকার
গঠিত হলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তার হাতে ডোমি-
নিকান রিপাবলিকের উন্নয়নের জন্য ১০
কোটি ডলার অর্থ সাহায্য দেবে।

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা এখন স্বাভা-
বলি ডুব মরার মত। ইমবার্ট মাকিন
সমর্থনের জোরেই ক্ষমতায় বসেছেন। মাকিন
সৈন্যবাহিনীই তাঁর প্রধান সহায়। আর আজ
তিনিই বেঁকে বসেছেন। মাকিনী চাপেও
আর তিনি গদী ছাড়তে রাজী নন।

তবে ইমবার্টের সৈন্যদলের বেতন যদি
বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ইমবার্টের পক্ষে নতি
স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে

উপহাস

নব্বেন্দুলাল চৌধুরী

১১

সেই যে সকাল থেকে বৃষ্টি নেমেছে, বেলা দশটা বাজতে চলল, তা খামবার আর লক্ষণ নেই। কিন্তু না খামলেও বিজ্ঞান এক-বার বেরোবার চেষ্টা করে দেখবে। নইলে সে অফিস কামাই করে না।

ইরা আব রুট, বার, বার বলছে, আজ রেনি-ডে করে দাও দাদা। আজ আর গিরে হরকার নেই অফিসে।

বৃষ্টি হলেই ওদের আনন্দ। স্কুল-কলেজ বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতে পারে। বৃষ্টি দেখলে আনন্দ বিজ্ঞানেরও হয়। কিন্তু অফিস কামাই করা বড় একটা হয়ে ওঠে না। পরিবারের দাবি সে যেমন স্বীকার করে নিয়েছে, অফিসের পদগোবিন্দও তাকে তেমনি মনন করতে হয়।

পারে বরাতের জুতো, গায়ের গুয়াটারপ্ৰফ এঁটে বিজ্ঞান এসে দোরের সামনে দাঁড়াল।

রুট, বলল, 'দাদা, তোমাকে সোলজারের মত দেখাচ্ছে।'

বিজ্ঞান হেসে বলল, 'সোলজার কিরে, জেনারেল বস।'

ছোট ভাইবোনদুটি তার খুব ভক্ত। ওদের কাছে সে একবারে হিরো। ওদের কৃতজ্ঞতা ভক্তি-প্রশংসা যেন আর শেষ নেই। ভাইবোন দুটি নয় বিজ্ঞানের, তিনটি। মায় মাস তিনেক আগে বড় বোনের সে বিয়ে দিয়েছে। মীরা এখন 'স্বপ্নব্যাড়িতে। বাড়ির সবাইকে একসঙ্গে দেখলেই বোনের কথা তার মনে পড়ে যায়। তিন মাস আগেও সে দোরের কাছে যেখানে এসে দাঁড়াত সেই জায়গাটুকু এখন খালি পড়ে আছে। তা থাকলেও চেষ্টাচেষ্টা করে তার ভালো জায়গার বিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান। ছেলে ইঞ্জি-

নিয়ার। বাড়ির অবস্থা ভাল। নিজেরা বাড়ি কবেছে বাদবপুরে।

মা বলেন, 'বিজ্ঞান, তোর জন্যেই খুব অমন ভাল ঘবে পড়তে পারল। নইলে ও'র সাধ্য ছিল না।'

ও'র মানে বাবার। মাসের চোখে বাবার মর্বাদা কোনদিনই খুব উঠতে নয়। বিজ্ঞান চাকরিতে ঢোকবার পর সে মর্বাদা আরও নেমে গেছে। বেলাওরে অফিসের রিটার্ডেরাশীটি এখন বাড়িতে প্রায় নন-এনিটিটি, আছেন কি নেই বোঝা যায় না। তিনি অবশ্য নিজেকে জাহির করবার জন্যে সব সময়েই চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু তাঁর কোন কথাই আজকাল আর ধরবে না। বাবা বিজ্ঞানকে ভালবাসেন খুবই কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতার ভাবও আছে। তারি ধরণধারণ দেখে বিজ্ঞান মাঝে মাঝে কৌতুক বোধ করে। বাবা যেন সিংহাসনচ্যুত সম্রাট। উপায় কি! খুবরাজকে একদিন রাজত্ব ছেড়ে দিতে হয়।

বিভূতিবাবু বাড়িতে ছিলেন না। কিন্তু বিজ্ঞান বেরোবার আগেই এসে হাজির হলেন। খালি পা। পরনের খাটো খুঁটি হাটুরও ওপরে উঠেছে। গায়ের আধময়লা গেঞ্জি। মাথায় পুরোনো ছাতা।

ঘরে ঢুকে ছাতাটা বন্ধ করলেন বিভূতি-বাবু। সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে উঠলেন সুরমা। 'এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় বেরিয়ে-ছিলে বোঁটা তো? নিশ্চয়ই বিড়ি কিনতে?'

যেন স্কুলের ছেলেকে ধমকাতেন সুরমা। 'বেরিয়েছি কি এখন? কোন একটা কাজ যদি তাদাতাড়ি সেয়ে আসতে পার। পাববে কি করে? যেখানে যাকে দেখবে দাঁড় করিয়ে গল্প করবে। দুনিয়ার আর তো কোন কাজকর্ম নেই।'

বিভূতিবাবু দার্শনিকের উচ্চ আসন থেকে যেন একটি সাধারণ সূত্র আনতে কবলে, 'কাজ তো জীবনভরবেই কবলাম—'

সুরমা বললেন, 'হ্যাঁ, খুব কাজ কবে। তোমার কাজের নমুনাও আনি জীবনভরবে দেখে আসছি।'

ঠিক এই সময় দাম্পত্যকলহ বৃদ্ধ করবার ইচ্ছা বিভূতিবাবুর ছিল না। তিনি স্ত্রীর কথার জবাব না দিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। একটু হেসে বললেন, 'আপনি বেরোচ্ছি। বৃষ্টি?'

বিজ্ঞান বলল, 'হ্যাঁ বাবা।' 'যা বৃষ্টি। রাস্তায় কাদা বীরপাড়। তো একেবারে ডুবে রয়েছে। যা-কি করে বাসটাস কি চলাছে?'

বিজ্ঞান বলল, 'দাঁপি এগিয়ে—' 'ওঘাটারপ্রকৃতি বৃষ্টি নতুন কিনালি কত দাম নিল?'

দামের কথাটা ইচ্ছা কবে বাবাকে শোনাল না বিজ্ঞান। শুনে উনি খুঁচি হবেন না

বিভূতিবাবু বললেন, 'কেবল হলের মত টাকা খরচ করছি। আগেরটার মত এটাও তো হারিয়ে আসবি। তারপর 'ব্রশ-চার্জ' টাকা খরচ করে আবার কিনবি এক। দস্তার-মস্তার একটা ছাতা যদি কিনে নিস বেশ কাজ চলে যায়।'

সুরমা ছেলের পক্ষ নিলেন, 'হিম ছাতা ব্যবহার কর বলে বিজ্ঞান তোমার ত দাদার কলে ছাতা খুঁড়ি দিয়ে চলবে তার কোন মানে আছে নাকি? সবই কি তোমার পছন্দ? মত হবে? তোমার পছন্দের বা নমন্য দেখি—'

বিভূতিবাবু হেসে বিড়ি ধরলেন। তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ছাতাটা একেবারে খারাপ জিনিস নয়, বুদ্ধলে?—ই ভাঙে

হাতের আড়ালে পথে আমি ছাড়া আরও একজন লোকের মাথা বেঁচেছে। ভুললোক আমাবেরই পাতার। ভিজতে ভিজতে বাচ্ছিলেন। আমি বললাম, আসুন মশাই, দুজনে মিলে ভিজ। ভুললোক শব্দ শুনিল। ভিকে তার বাড়ির দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। তোমার ওই ওয়াটারপ্রুফের আছে এমন উদারতা? পারে সে কাউকে এমন করে আশ্রয় দিতে? কিছুতেই না। পারেও না, পারতে চারও না। সে শব্দ নিজেই বাঁচাতে জানে।

বিজ্ঞান তাড়াতাড়ি রাস্তার নামে পড়ল। প্রাচ্যমহিমার কীর্তন বাবা একবার শব্দ করলে আর সহজে থাকবে না। ছাতর মত ওয়াটারপ্রুফটাও যে আশ্চর্য এদেশের, বিদেশের নয়, তা ওঁকে বোঝানো শক্ত। তা ছাড়া একজনের ছাতর তলার আর একজন আশ্রয় নিক তা ভেবে বিজ্ঞান চায় না। তাই চার বর্ষের দিনে প্রত্যেকেরই একটা করে ওয়াটারপ্রুফ থাকুক।

কয়েক পা এগুতে না এগুতেই পিছন থেকে বিজ্ঞান ডাক শুনতে লেল, দাদা, ও দাদা। দাঁড়াও না একটু।

মুখ ফিরিয়ে বিজ্ঞান দেখল ছোট বোন ইরা মাথা আঁচল ভুলে দিয়ে পিছনে পিছনে আসছে।

বিজ্ঞান স্মিতমুখে বলল, কি রে, তুই এবার ভিজতে ভিজতে এলি যে?

ইরা বলল, একটা কথা মনে পড়ে গেল দাদা। তাই বলতে এলাম।

কী কথা?

তোমার অফিস বসবে কি-না স্বাভাবিক-সের বাড়ি থেকে একবার ফোন করে জেনে নাও না। যদি না বসে তা হলে সোজা বাড়ি চলে এস। খবরদার স্বাভাবিক সঙ্গে কিন্তু গল্প করতে বসে বেরো না।

বিজ্ঞান বলল, আচ্ছা হিংসুটি হয়েছি।

হুঁ, তাই তো। তোমার সব মন আশ্চর্য ওই প্রিন্স মুখার্জি সেনের গোলাপী রঙের স্নাভটার মধ্যে পড়ে আছে। তা কি আর আমি জানি নে?

বিজ্ঞান প্রতিবাদ করল না। একটু হেসে বলল, তুই অনেক কিছু জানিস দেখি।

ইরা বলল, জানিই তো। দাদা, পার তো স্বাভাবিককে ধরে নিয়ে এস।

বিজ্ঞান বলল, আচ্ছা, তুই এখন যা। বেড়াতে ভিজে গেছিস, গিয়ে বকুনি খাবি বাবাব কাছে।

খেলাম তো খেলাম। আমি এখন বকুনি-প্রুফ হয়ে গেছি।

বিজ্ঞান বলল, ফাজিল কোথাকার। কেন তোরও তো ওয়াটারপ্রুফ আছে। তাই পরে বেরুগেই পারাতিস।

ওরে বাবা। তাহলে বাবার চোখ থেকে স্নান স্নানবর্ণ হত। দাদা, তোমার সেওয়া

ওয়াটারপ্রুফটা নেহাতই ওয়াটারপ্রুফ। ফারাব-প্রুফ তো আর নয়।

বিজ্ঞান বলল, আচ্ছা ফাজিল হয়েছি। যা এবার বাড়ি যা।

ইরা বলল, আজ্ঞা। আমার কথাটা মনে থাকুক কেন দাদা। স্বাভাবিককে ধরে নিয়ে আসা চাই। ওদের বাড়িতে তুমিও যাও, আমরাও যাই। ওরা কিন্তু তেমন কেউ আসেন না।

বিজ্ঞান অপ্রসন্ন হয়ে বলল, থাক। সামাজিকতার অত হিসেব তোর না রাখলেও চলবে। যা এবার বাড়ি চলে যা।

বাবাব আগে আর একটি ভীর ছুড়ে গেল ইরা। বাবা, ওঁদের একটু নিশাও সহ্য হয় না। এত দূর।

বিজ্ঞান বলল, তুই অনেক দূর এসে পড়ে-ছি। এবার ফের।

খাড়া ইয়ার তিরা কোন্ পড়ে ইরা।

স্কুল থেকে সব কলেজে ঢুকেছে। ও এখন যৌবনবয়সের টলমল টলমল। বিজ্ঞান নিজেই মনেই হাসল।

বাড়ির সামনে ছোট একটু মাঠের মত।

তার চারদিকে লন। অশিশু বাড়িটাকে

একটা স্বীকৃতি মত মনে হয় এখন। বাড়ির

সামনে দুটি নারকেলের গাছ জীর্ণ বাড়িটির

সৌন্দর্য বাড়ির দিয়েছে। ভিতরটা তত

সুন্দর না হলেও দূর থেকে তাইব ওই

ভাড়াটে একতলা বাড়িটিকে ভালোই দেখায়।

অনেকদিন ধবে আছে। তাই ভাড়া এখনও

সস্তা। পণ্ডা ছিল। বাড়িওয়ালা আরও

দশ বাড়িরেছেন। দুটি গাছে যা নারকেল

হয় বাড়িওয়ালার লোক এসে পেড়ে নিয়ে

যায়। কিন্তু ভাল-পাতাসমত নারকেল-

গাছদুটির সৌন্দর্য অটুই থাকে। তার

ভাড়া দিতে হয় না।

সামনেই বড় একটা নালা। নোরা

কলা জলের স্রোত বয়ে চলেছে। এই

পরপ্রণালীও এখন স্রোত। এ নালা

ভিত্তিরেও পার হতে পারে বিজ্ঞান। কতদিন

অমনি করে পার হয়েছিল। কিন্তু আজ আর

এই জলকাদার মধ্যে সে বড়কি নিল না। একটি

তালগাছের গুড়ি ফেলে এপারে ওপারে যে

সেতু বাঁধা হয়েছে- তার ওপর দিয়েই পা

টিপে টিপে পার হবে কয়েক পা

এগোতেই চোখে পড়ল একটি কদম গাছ,

সেই ময়লা জলের নালাটার ওপর বড়কি

পড়েছে। বিজ্ঞান আর একটু ভালো কবে

লক্ষ্য করে দেখল গাছটিকে। পথের পাশে

একান্তই বাড়ির কাছের এই গাছটিকে সব দিন

চোখে পড়ে না। অন্যমনস্কভাবে চলে যায়

বিজ্ঞান। কিন্তু আজ পড়ল। আগেও

সবকি মনে পড়েছে। কোন কোন বাব এই

গাছ থেকেই কদমফুল পেড়ে নিয়ে দিয়েছে

স্বাভাবিক। ওর বাবা-মা সামনে থাকলে

স্বাভাবিক হতে আর দিতে পারেন নি।

ওঁদের কারো হাতই দিয়েছে। কি দিয়েছে ওর ছোট ভাইকে।

বিজ্ঞান একটু থেমে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে

দেখল আজকের ফুলগুলি বেশ উঁচু ভালো

রয়েছে। হাতের নাগালে আর পাওয়া যাবে

না। ধবেকছে কোন আকস্মিককিসি কিছু

নেই। হঠাৎ বাবার হাতে ছাতার কথা

তার মনে পড়ল। ওয়াটারপ্রুফের বদলে

ছাতাটা থাকলে হয়তো — কিন্তু সেই

ছাতা দিয়েও উঁচু ভালোর কদমফুল পাড়া

যেত না। আর খানিকটা দূরে নালা

ওপারে লাল রঙের কয়েকটি ক্যানী ফটে

রয়েছে। বালায় বলা যায় কলাবতী। ও

তো আর উঁচু গাছের ফুল নয়। তবু ও

ফুলও সংগ্রহ করা কিল্লনের পক্ষে এখন

কঠিন। আবার নালাটা পার হতে হয়। জল-

কাদা কোপকাড়ের ভিতর দিয়ে ওখানে গিয়ে

হাজির হতে হয়। অত দৌর করা যায় না।

তাছাড়া ওইটুকু কষ্ট স্বীকার করতেও মন

যেন এখন রাজী নয়। অকস্মে অমানিতেই

যথেষ্ট বেলা হয়ে গেছে। গিয়ে পৌঁছতে

পারবে কি না কে জানে। এগিয়ে এগোতে

আরও দু-চারজন পথচারীকে চোখে পড়ল।

তাবাও হাঁটুর কাপড় ভুলে কাদা ভাঙতে

ভাঙতে এগিয়ে চলেছেন। ভাগ্য ভালো কেউ

পরিচিত নয়। তাহলে এই দুঃখের বর্ষার

তাবা নিশ্চয়ই আরো ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা

করতেন। ফাউল ওয়েদার নিয়ে স্টেট ট্রান্স-

পোর্টের অব্যবস্থা নিয়ে সেই যে আলাপ শব্দ

হত তা আব ধামতে চাইত না।

ইরা ঠিকই বলেছে। স্বাভাবিক বড়-একটা

বিজ্ঞানের বাড়িতে আসে না। আসুক তা

বিজ্ঞানও তেমন চায় না। এলেই তো তাদের

দাবিদা আব অগোছালো ধরনের চোখে পড়বে।

তবু সামনের ঘরখানাকে স্বাসাধ্য সাজিয়ে-

গুঁছিয়ে রাখবার চেষ্টা করে বিজ্ঞান। রেডিয়ে-

সোফাসেট, বুক সোলফগুলি সবই তাব ওই

ঘরে। স্বাভাবিক কাঁচ কখনো আসে ওই ঘরে

কসেই তাদের কথাবার্তা হয়। তবু ভিতরেও

কি দু-একদিন যায় নি স্বাভাবিক? না গিয়েও

কি তাদের ভিতরের অবস্থাটা টের পার নি?

জাতের তফাৎ নেই। দুজনেই করেছে।

আর্থিক-অবস্থায় কিছু বৈষম্য আছে, কিন্তু

তাও দুর্ভাগ্য নয়। কিন্তু রাচিত সংস্কৃতি-

গত পার্থক্যটা স্বাভাবিক নিশ্চয়ই অনুভব

করে। বিজ্ঞানের সঙ্গে হয়তো করে না।

কিন্তু তার বাবা-মার সঙ্গে তাদের ধরণধর

কায়দাকানুনের সঙ্গে নিশ্চয়ই করে থাকে।

রাস্তার মোড়ে তিনতলার স্নাট বাড়িটার

সামনে এসে বিজ্ঞান একবার দাঁড়াল। যাবে

কি যাবে না এক মুহূর্ত ভেবে নিল। তারপর

হঠাৎ ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে

লাগল। যেন শব্দ অরুণী একটা ফোন

করবার জন্যেই সোমেরের স্নাটে আছে বিজ্ঞান।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক ক্রয় ও বিক্রয়

নতুন সিস্টেম

ভূতপূর্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যের ২১টি বাই
আফ্রিকার মধ্যে কমনওয়েলথ আছে
যাদের মধ্যে ব্রুটন, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও
নিউজিল্যান্ডে শ্বেতাঙ্গের বাস। এশিয়ায়
ভারত, পাকিস্তান, সিংহল ও মালয়েশিয়া
কমনওয়েলথ বাই। আফ্রিকায় বানা (পোল
কোম্বি), নাইজিবিয়া, সিম্বাভোয়ান, গাম্বিয়া,
স্বাযিয়া, মালি, কেনিয়া, উগান্ডা ও তান-
জানিয়া কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত। ভূমধ্য-
সাগরে রয়েছে সাইপ্রাস ও মাল্টা, ক্যারিবিয়ান
অঞ্চলে জামাইকা ও ত্রিনিদাদ। এই
স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি ছাড়াও ব্রুটন, অস্ট্রেলিয়া
ও নিউজিল্যান্ডের যেসব শাসিত রাষ্ট্র কমন-
ওয়েলথে রাখা হইয়াছে সেগুলি হোল:

আফ্রিকায়— বোডেশিয়া, বাসুটোল্যান্ড,
বেচুানালাণ্ড, লোথাল্যান্ড ও সেন্ট
হেলেনা এবং অ্যাসেনশন দ্বীপ। এগুলির
মোট ১১৫১৬২২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা
৬০ লক্ষ লোকের বাস, যাদের ওপর কর্তৃত্ব করে
কয়েক হাজার শ্বেতাঙ্গ বণিক ও বণিক।

এশিয়ায়— এডেন ও দক্ষিণ আরব
কোম্বিশন যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ১৭টি
জলভানসাহী (ওমান, মুকাত, বাহরিন,
কাতার ইত্যাদি)। ভাৰত-মহাসাগরে রয়েছে
মরিশাস ও সিচেলিস যেখানে ইঙ্গ-মার্কিন
সামরিক বাহিনী পাড়ার চেষ্টা হচ্ছে প্রশান্ত
মহাসাগরে ৭১ নৌবহরের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরে
৬৪ নৌবহরের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইংল্যান্ড-শাসিত রাষ্ট্র হচ্ছে
মালদ্বীপ (এখানে গেবিনা যুদ্ধ চলছে) হংকং
ও মালদ্বীপ।

ওশিয়ানিয়ায়— ফিজি, টংগা, গিলবার্ট,
এলিস, পিটকেয়ার্ন ও নিউ হেব্রাইডস।
এই দ্বীপগুলি বৃটিশ শাসনের অধীন এবং
শেখরাটতে ক্রান্তান্তর কিছু অধিকার আছে।
এগুলির প্রত্যেকটি ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক বাহিনী।

নতুন গোলার্ধ— স্বাধীনশাসিত বৃটিশ
গিয়ানা ও হুভার্স (বেলিজ)।

অন্তর্লান্দিক ও ক্যারিবিয়ান—
আণ্টিলিয়া, বাহামা বার্বাডোস, বার্বুডা,
জার্মিন, গ্রেনোডা, ডোমিনিকা, টর্ক, কাইম্যান

কেম্যান, মণ্টসেরাট, সেন্ট জর্জিয়া, সেন্ট
ভিন্সেন্ট এবং সেন্ট ক্রিস নেভিয়ার অ'জিয়া,
এই দ্বীপগুলি যার কিছু কিছু মিলিয়ে মাল-
য়েশিয়ার মত একটি কোম্বিশন গঠন করা
হয়েছে। ককল্যাণ্ড দ্বীপের মালিকানা নিয়ে
আফ্রিকানিয়ার সঙ্গে ব্রুটনের বিবোধ রয়েছে।

এই হচ্ছে আজকের কমনওয়েলথ—যার
সঙ্গে আজ 'ব্রুটিশ' শব্দটি আর লেখা হয়
না। ভিসবেরলী প্রথম 'সাম্রাজ্য' শব্দটি
ব্যবহার করেছিলেন যখন তিনি রক্ষণশীল
সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ে 'প্রিন্সেস লীগ' গঠন
করেন। সেই লীগই ১৯৬০ সালে ব্রুটিশ
কমনওয়েলথ থেকে 'ব্রুটিশ' শব্দটি বাদ দেবার
কথা ঘোষণা করেন।

কমনওয়েলথ শব্দটি যখন প্রথম নথিপত্র
মতাবলীতে চালু হয় তখন সবে গণতান্ত্রিক
বিপ্লবের পূর্ব ব্রুটিশ প্রজাতন্ত্রে বাসিত হয়েছে।
সেইসময়ে কমনওয়েলথ মানে সাম্রাজ্য বোঝাত
না এবং শব্দটির মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক
উপকরণ ছিল। তাই প্রগতিশীল ব্রুটিশ কবি
উইলিয়াম ববিস তাঁর সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার
নাম বেছেছিলেন 'দি বসনওয়েলথ'।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রুটিশ সাম্রাজ্য
পৃথিবীর দুই গোলাধার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে
এবং শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ-সীতাঙ্গ নিবিশেষে সাম্রা-
জ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি দেশই 'উপনিবেশ'
নামে অভিহিত হয়। তাই তখনকার প্রধান-
মন্ত্রীদের সম্মেলনগুলিকে প্রথমে 'উপনিবেশিক
সম্মেলন' ও পরে 'সাম্রাজ্যিক সম্মেলন' বলা
হোত। ব্রুটিশ তখন ছিল সর্বস্বাধীন।

দুটি মহাযুদ্ধের পরিণাম

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কণ বিপ্লব যখন
দুনিয়ার এক-ষষ্ঠাংশে পুঁজিবাদের হাত থেকে
ছিনিয়ে নিল তখনই স্বক হোল পুঁজিবাদের
সাধারণ সংকট। সেই সংকটের জুযোগ নিয়ে
শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত উপনিবেশগুলি ১৯২৬ সালে
নিজেদের ডোমিনিয়ন হিসেবে স্বাধীনতা
আদায় করে নেয়। তখন শিকম-ডুলে-রাধা
কমনওয়েলথ শব্দটি আবার এনে পাঁতে দেওয়া
হয়, যার মধ্যে বহুল সংখ্যক স্বাধীন ডোমিনিয়ন
এবং পরাধীন দেশগুলি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদে বশীকরণে
ক্যানিবিদের পরামর্শ সাম্রাজ্যবাদের
ভাগে বিপর্যয় ডেকে আনে এ পুঁজিবাদের
সাধারণ সংকট আরো ঘনিয়ে তোলে। সেই
অবস্থার জুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-শাসিত
জাতিগুলি মুক্তিগ্রামে নেন বাসে এবং
যেসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জোর
দুর্বল হয়ে গিয়েছিল সেখানেই স্বাধীনতা-
যুদ্ধ জয়যুক্ত হয়। দেশগুলির কেউ-কেউ
সবায়ন সমাজতন্ত্রের স্বাক্ষর পাচ্ছে, কেউ কেউ
পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে থেকে স্বাধীনতা
পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করতে থাকে।
ব্রুটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ায় তাই
শাসিত অধিকাংশ দেশকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা
দানের বিনিময়ে নিজেদের অর্থনৈতিক অধিকার
ও জুযোগ-সুবিধা ক্রায়েম রাখবার চেষ্টা করে।
আজকের কমনওয়েলথ হচ্ছে সেই ব্যবস্থারই
পরিপ্রকাশ। মিঃ অ্যাটলী অবশ্য ১৯৪৯ সালে
সম্ভাব্য করেছিলেন যে, 'সাম্রাজ্য ও 'কমন-
ওয়েলথ' এই দুটি শব্দের অর্থ-দল করা
যায় অর্থাৎ দুটির অর্থ প্রায় একই। টাইমস
পত্রিকাও ১৯৫২ সালে লিখেছিল যে কমন-
ওয়েলথ শব্দটি সাম্রাজ্য শব্দের তুলনায়
'শ্রুতিমধুর'। দক্ষিণ আফ্রিকার ভাবিবিধেই
সবকায় আয়বলাণ্ড ও বৃহৎ কমনওয়েলথ থেকে
বাব হয়ে গেলেও প্রথম দুটির ব্রুটনের সঙ্গে
ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। আর রোডেিয়া সবকায়
কমনওয়েলথে থেকেও এবার কমনওয়েলথ
সম্মেলনের নির্দেশের পরোয়া না করে সেখান-
কার কাক্সি জাতির ওপর মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গের
অত্যাচার ক্রায়েম রাখবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

কমনওয়েলথের যোগসূত্র

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ব্রুটিশ সাম্রাজ্যের
যা আয়তন ছিল আজকের কমনওয়েলথের
আয়তন প্রায় তাই থাকলেও তার প্রত্যক্ষ
উপনিবেশগুলির মোট আয়তন ১৯৯৫৪০০০
বর্গ কিলোমিটার থেকে সংকুচিত হতে হতে
২৭০০০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং মোট লোক-
সংখ্যা ৪১৯৩৬০০০০ থেকে ১৫৫০০০০০০
গিয়ে চেকেছে।

কিন্তু পুস্তক-ব্রুটিশবাদের নাম নতুন

স্বাধীন ডোমিনিয়নগুলির প্রধান যোগসূত্র কী? সেই যোগসূত্রে সাম্রাজ্যের আমলে যা ছিল কমনওয়েলথের আমলেও ঠিক তাই আছে। সেই যোগসূত্র হচ্ছে বৃটিশ 'মহাজনী মূলধন' (বৃহৎ ব্যাংকের মূলধন ও একচেটিয়া শিল্প মূলধনের মিলন) যার কবন ছড়িয়ে রয়েছে গোটা 'স্টালিং এলাকার' যেখানে বৃটিশ পুঁজি অন্যান্য বিদেশী পুঁজির চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা পায়। অবশ্য আজ স্টালিং রাজ্যভাঙেও নাকিন ও পশ্চিম জার্মান মহাজনী মূলধন, বৃটিশ মহাজনী মূলধনকে কিছু কিছু বাধা দিতে আরম্ভ করেছে (তবু ভারতে বৃটিশ মহাজনী মূলধন এখনো সর্বোৎকৃষ্ট)। যাই হোক ডোমিনিয়নগুলিতে লম্বী বৃটিশ মহাজনী মূলধন ও মূল্যবাহী আগলে রাখার জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বৃটেনকে সামরিক বাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন রাখতে হয়েছে। সেইজন্যই ১৯৬৪ সালের মে দিবসের এক সভায় মিঃ উইলসন সাইপ্রাসে 'বৃহত্তম ট্যাংক'

পাঠাবার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন এবং তার ঠিক ১২ দিন পরে পার্লামেন্ট এডেনে উপনিবেশিক যুদ্ধের সমর্থন করতে গিয়ে তিনি জানান যে, সুরক্ষার পূর্বদিকে ৭২০০০ বৃটিশ সৈন্য বাধা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৫০ হাজার আছে মালয়েশিয়ায়। এই বছরের বৃটিশ বাজেট অধিবেশনে জানা গিয়েছে, যে ডোমিনিয়নগুলিতে 'সামরিক' ও 'সামরিক' ঋণে মোট যে ৫০ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ধরত করা হয়েছে (তার মধ্যে ৪০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হয়েছে সামরিক ঋণে) তার ফলে দেশের মোট আর্থ-ব্যয়ের মধ্যে ঋণভিত্তি পড়েছে ৭৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু বিশেষ মূলধন রপ্তানী ও তার রক্ষার সামরিক কার্যকলাপ কি সাম্রাজ্যবাদের শাসন নীতি নয়? টোরি ও 'লেবার' সরকারী পন্থিতে আনাপোনা করে, এ আসে ও, যায়, ও আসে এ যায়। কিন্তু 'সুরক্ষার পূর্ব দিকে' স্বাধীনতার, তৈল-সমৃদ্ধ অঞ্চলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন ও রবারের দেশগুলিতে, লোনা-হীরা-ম্যাংগানিজের দেশ বৃটিশ গির্দানায়, বৃটিশ বিদ্যুৎ পবরাষ্ট্র-নীতির মহাজনী মূলধন রপ্তানী নীতির—যে দলই ক্ষমতায় থাকুক,—কোনই পরিবর্তন হয় না। সেই রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৫৯-৬০ সালে ছিল ৫৭৬০০,০০০ পাউণ্ড এবং ১৯৬২-৬৩ সালে ৫৯৫০০০০০ পাউণ্ড এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে ৬৫৭০০০০০ পাউণ্ড। এবং বৃটিশ প্রতিরক্ষা সচিব মিঃ হিলি বলেছেন, 'বৃটিশ সৈন্য যখন বোনিও (ফ্রান্সাই) বা মধ্যপ্রাচ্যে লড়াই করে তখন তারা শুধু বৃটেনের হয়েই লড়ে না, অন্য যারা এইসব অঞ্চলে স্থায়ী কামিনা করে তাদের হয়ে লড়ে।'

অতঃপর সেই অন্যান্য যখন অন্য ছায়ারায় লড়াই করে বৃটেনের পক্ষেও তাদের সমর্থন করা ছাড়া উপায় নেই। যেমন ভিয়েতনামে। আবার ভিয়েতনামে যারা যুদ্ধ আমদানী করেছে তারাও ফ্রান্সাইতে বৃটিশের যুদ্ধ সমর্থন করে। দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যাওয়া, রোডেশিয়া ও পর্তুগীজ অ্যাঙ্গোলার সঙ্গে তার বহিষ্ঠ যোগাযোগ এবং ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের দ্বারা বৃটিশ কামিনী স্বার্থের ক্ষতির পরও লেবার পার্টির পবরাষ্ট্রনীতির চরিত্রের মূলত কোন পরিবর্তন হয় নি। তাই কখনো আক্রমণের জন্য বৃটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হীপকে বাঁচি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, এডেন ও উত্তর বোনিওতে চলছে উপনিবেশিক যুদ্ধ, বৃটিশ গির্দানায় সমর্থন করা হচ্ছে জগতের প্রগতিশীল পার্টির বিরুদ্ধে বার্নহার্ডের প্রতিক্রিয়াশীল ওলটকে।

বৃটেনের পৌড়া রক্ষণশীলরা আজকের কমনওয়েলথকে 'একটা প্রকাণ্ড পরিহাস' বলে মনে করলেও (টাইমস-এর ২-৪-৬৪ তারিখের মন্তব্য) বুদ্ধিমান টোবির কমনওয়েলথকে 'প্রবীণ ও নবীন, ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির যোগসূত্র' বলে বর্ণনা করেছেন।

কমনওয়েলথ যখন যে অবস্থায় থাকে তখনকার কমনওয়েলথ সম্মেলন সেই অবস্থার রাজনৈতিক প্রতিকলন। আজকের দিনের কমনওয়েলথ সম্মেলনের একটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, আজকের সম্মেলনে আর আগেকার

১৯৬৩-৬৪ সালের সম্মেলনের তুলনায়

প্রকাশকদের প্রতি নিবেদন

পুস্তক প্রকাশকগণের প্রতি আমাদের গভিনয় নিবেদন এই যে, সাপ্তাহিক বঙ্গমতীতে সমালোচনার জন্যে যারা পুস্তক প্রেরণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক অতঃপর নিম্নলিখিত ঠিকানায় পুঁখানি করে পুস্তক প্রেরণ করবেন।

সম্পাদিকা, সাপ্তাহিক বঙ্গমতী,
১, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২০।

১৯৬৩-৬৪ সালের সম্মেলনের তুলনায়

দিনের সাম্রাজ্যিক সম্মেলনের মত শ্রেষ্ঠাঙ্ক প্রভু জাতিগুলির সংযোগবর্তিতা নেই। এতদ্ব্যতীত কমনওয়েলথ সম্মেলনে আফ্রিকা-এশীয় আর ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের প্রধানমন্ত্রীদের সংযোগবর্তিতা ছিলেন এবং সেইজন্য ব্রোডেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য-সুপ্ত বিজ্ঞাপিত কিছুটা প্রতিকলিত হয়েছে, ভিয়েতনামে পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা দাবি অন্তত সুবে স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার সময় সময় রাণী তাঁর বাণীতে কমনওয়েলথের 'সমস্ত সদস্যদের মিলেমিশে পরামর্শ করে কাজ করার' যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি সর্বক্ষেত্রে পালন করা হচ্ছে? বিদেশ থেকে বৃটেন আমদানী পণ্যের ওপর শতকরা ৫ ভাগ বাড়তি ট্যাক্স যখন বসানো হয়েছে তখন কি কমনওয়েলথের অন্য ভাগীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছিল? 'ব্যাংক রেট' যখন শতকরা ৭ ভাগ বাড়ানো হয় তখন কি বৃটিশ সরকার অন্য অংশীদারদের পরামর্শ নিয়েছিলেন?

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সজলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য ১ টাকার

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরনেরই হয়েছে।"

—স্বামী সদাশিবানন্দ।

"বইখানি বেশিভে জ্ঞান, বিমরবস্ত অমূল্য ও অমূল্য। একখানি গ্রন্থে এত মহা-মূল্য রত্নের সম্মিলন পূর্বে আর হয় হয়।"

—স্বামী তত্বজ্ঞানদাসী।

নতুন উপন্যাস—নতুন জুটি

বর্তমান সময়ের সমস্যা ও

তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মামুল্য গ্রন্থ কতর কিন্তু মানুষের ঘন যদি পবিত্র থাকে; তবে তুল তাকিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১।০০ টাক

স্বনামধন্য কথাসিঙ্গী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

কল্যাণী প্রবাসী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড),
সৈয়দুল ও বসন্ত। মূল্য—০.৫০

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
রিপনবিহারী স্কুলস্ট্রীট,

কলিকাতা—১২



সাপ্তাহিক বসুদত্তী

ছবি-ধাতুদ্রব্য ইত্যাদি সপ্তমের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। তবে তখন অল্প মূল্যে যে সমস্ত জিনিস আমাদের কাছে থেকে নিয়েছেন আজ তার দাম অনেক বেশি, এ বিষয়ে কোন দন্দেদ্ব নেই। নানাকথা মনে হল আমার। সে সব কি এখনো তার কাছে আছে? বিক্রি করে দিয়েছেন? যদি তিনি মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় তার উত্তরাধিকারীদের কাছে আছে সে সব।

আমার ক্রোতঃ হল এত বেশি হল যে, আমি তার তিকানায় পাড় দিলাম। এত দূরের পথ! তবে, পেটের পুরুর কাছে ছোট একটা গ্রামে থেঁকি করে পেলাম তার বাড়ি। ভাবা যায় না এই বাড়ির ভেতরে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ছবি, কঠখোদাই, ইত্যাদি কুটিরও রয়েছে। এখন জরাজীর্ণ ভান্দাশ। আমি ডাকঘরে খেঁজিবর করে জানলাম ভুললো একজনও জীবিত এবং এখানেই আছেন। এতদূরে আসা তাহলে সার্থক হল। এখন দেখা বাক পরবর্তী অধ্যায়।

দরজায় কড়া নাড়তেই একজন বৃদ্ধা খুলে দিলেন দরজা। আমি পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম বাড়ির কতী আছেন কি না। তিনি হালিস্থ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমাকে একটা প্রসঙ্গ করতে বলে ভিতরে চলে গেলেন। কিসকিস কথা কানে এল। তারপরই উচ্চ পুরুষকণ্ঠ কানে এল—কি বললে, কলকাতা থেকে এসেছেন? বাইরে দাঁড় করিয়ে প্রবেশ কেন?

এবার বৃদ্ধা ফিরে এসে আমার ভিতরে গিয়ে বসতে বললেন। অত্যন্ত সাধারণ আসবাব-পত্র। দেখলাম একজন ভুললো দাঁড়িয়ে আছেন। বসতে হলেও প্রহে এখানে বসতে। ঘেমেরক আভিজ্ঞতা থাকলেও বহু ব্যবহারে জরাজীর্ণ। চোখে চশমা।—এই যে আলদুন। কি সোভান্দা আমার। কেউ আসে না এ বাড়ি, জানেন, অসচ আমি লোকজন কত জলবাসি। এক পাও এগোলেন না তিনি। অনেক চোখে তাকিয়ে রইলাম আমি।—অনেক দিন বসে জগলে কান্ন করেছি, হৃৎকণ্ড ছিলাম, আজ বৃদ্ধ হয়ে পড়ছি। বসুন। এবার আমার বৃদ্ধে অসুবিধে হল না যে ভুললো অর্থ হয়ে গিয়েছেন।

ছোটবেলা থেকেই কোন অর্থলোক দেখলে আমি অশান্তি বোধ করি। মন ব্যাথা হয়ে যায়। তিনি অবশ্য চিন্তা করায় অবকাশ দিলেন না, আনন্দে চিকার করে উঠলেন।—আমার পুরা সোভান্দা যে আপনি এসেছেন। আপনারা পুরোন খন্ডেরক ভোলেন নি, এতে আমি গর্বিত। তবে একটা কথা দুরূহের সঙ্গে বলছি, এখন পেনসনের ওপত্র কোনোরকমে দিন কাটাই, নতুন কিছু নিতে প্রায় না কিছু।

সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যা, তাঁর ধারণা ভুল, কোন কিছু বিক্রি করতে আসি নি আমি।

তিনি একজন বিখ্যাত সংগ্রাহক এবং আমাদের পুরোন খন্ডের তাই এখানে বসে এলাম, দেখা না করে যাওয়াটা বুদ্ধিবৃত্ত মনে হল না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভারা লক্ষ্য করলাম। তাঁর সর্বস্ব আনন্দে কেঁপে উঠল। মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। পেছন ফিরে স্থায়ী উদ্দেশ্যে বললেন—দুনু, ইনি কি বলছেন। এবার আমার দিকে ফিরলেন—সত্যি আমার কি সোভান্দা। শ্রুতমাত্র এই বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচিত হতে, আপনার মত বিখ্যাত ব্যক্তির। এখানে এসেছেন, ভাবলেও আনন্দ হয়। তবে আপনারক আঙ্গ আমার সংগ্রহ দেখাব। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে দীর্ঘ পটাস বহুর হবে আমি যে সব জিনিস সংগ্রহ করেছি, সব দেখাব। এবার স্থায়ী উদ্দেশ্যে হাঁক দিলেন—আমার আলমারির চাবিটা দাও তে।

একটি অশ্রুত ঘটনা চোখে পড়ল আমার। ওর স্থায়ী—বিনি এতকাল হাসিমুখে, অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন, কেঁপে উঠলেন। আমার দিকে তাকিয়ে ইসবারা কি বেন বলতে চাইলেন। আমি কিছু বুঝতে না শেরে বিমূঢ় হয়ে চেরে রইলাম। তিনি স্বামীর দিকে ফিরে বললেন—দেখ ওর হয়ত এখন হাতে তেমন সময় নেই, অন্য কোন কাজ থাকতে পারে। এবার আমার দিকে ফিরলেন—আপনি তো হোটলে উঠেছেন, খেতে দেয় হয়ে যাবে। আজ আর খেতে বলব না। কাল ভোরে আমার মেয়ে আসবে, সেই সব জানে শোনে কোথায় চাবি, কোথায় কি। করুণভাবে তিনি আমার দিকে তাকালেন। এবার পরিষ্কার বুঝলাম তিনি চান না আমি এই সময় এই সব সংগ্রহ দেখি। আমি হঠাৎ বান্ধ হয়ে উঠলাম—হ্যাঁ, আমার তে। মনেই ছিল না, এক ভুললোককে কথা দিয়েছি, তিনি এসে বসে থাকবেন। পরে এক সময় হাতে সময় নিয়ে আসব, অনেককাল ধরে আপনার সংগ্রহ দেখব।

—তা বটে, তা বটে। আপনারা শহর থেকে এসেছেন, কত লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে, বেরালই থাকে না। বুড়ো হয়েছি। তবে অমাব জনোও দু-তিন ঘণ্টা সময় দিতে হবে কিছু। এতদিনে একজন বৃদ্ধা বোধাকে হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দেয়া যায় না।

—নিশ্চয় আসব। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বাইরে এলাম। তার স্থায়ী বাইরের দরজা পর্বত এলেন। ফিসফিস করে বললেন আমায়—আমার মেয়ে যদি হোটলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যায়, রাগ কববেন কি? পুরুষ জরুরী কাজ রয়েছে, এখন সব বলা যাবে না।

—নিশ্চয়, রাগ কবব কেন। বরঞ্চ কথা বলার একজন লোক পাব। বিদায় জানিয়ে চলে এলাম।

হোটলে বসে খবরের কাগজ পড়ছি

বেরা এসে জানাল একজন মহিলা দেখা করতে চান। বললাম পাঠিয়ে দিতে। একজন প্রোচা মহিলা এলেন কিছু পরে। দেখেই মনে হয় অনেক বড় বয়ে গিয়েছে এর ওপর দিয়ে। অপ্রস্তুত ভাঙ্গি তাঁর। বসতে বললাম।

—আমি তাঁর হয়ে নিচ্ছি, তাবপর বেরাব আপনার সঙ্গে। তিনি মাথা নিচু করলেন, কি বেন কলতে চাইলেন, পারলেন না। তাঁর দিকে তাকলাম। তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে বললেন এবার—মা আমার পাঠিয়ে দিলেন। আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি। আপনি গেলেই বাবা সব দেখাতে চাইবেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গর এত কম—সামান্যে নিলেন তিনি—আপনাকে সব খোলাখুলি বলাই ভাল। আপনি জানেন কি কতিন সময় পার হতে হচ্ছে আমাদের। আমার বিশ্বাস আপনি বুঝবেন সব।

বৃদ্ধ আক্লত হতেই বাবা সম্পূর্ণ অর্থ হয়ে গেলেন। আগে থেকেই দৃষ্টি কমে আসছিল। নানা দুর্ঘটনতা, অভাবে কাটছিল আমাদের।—প্রথম মহাবৃদ্ধের সৈনিক ছিলেন তিনি—এবারও সত্ত্ব বহু বয়েস হলেও তিনি আবার বেতে চাইলেন বৃদ্ধে। কিন্তু কে তাঁকে কাজ দেবে। বখন শরুনেনাবা এগিয়ে আসছে তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। অসহায়ভাবে চোখের জল ফেলতেন। ভাঙাবরা বলতেন তাঁর অর্থের কারণ সেটাও। তিনি প্রচুর হাট্টেন, শিকারে যেতেন—তাবপর অর্থ হয়ে যাবার পর মন জড়িয়ে রইল ওই এক চিন্তা—তার সংগ্রহ। ওরই মধ্যে ডুবে রইলেন। প্রতিদিন সব সামনে নিয়ে বসে থাকতেন, চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না—শ্রুত পটাস পক ঘণ্টা বসে বসে হাত দিয়ে অনুভব করতেন। তারা তাঁর দীর্ঘদিনের বৃদ্ধ। আর কিছু তাঁর ভাল লাগে না। কোথায় কি জিনিস পাওয়া যায়, কোথায় কি নিলাম হচ্ছে সব তাঁকে পড়ে শোনাতে হয়।

সবচেয়ে করুণ ব্যাপার হচ্ছে, বৃদ্ধের অবস্থা বাবা জানেন না কিছু। তাঁর মাসিক পেনসনের টাকার আমাদের একদিনও চলে না। তাছাড়া আমাদের আবে পোষা ছিল। আমার বোনের স্বামী বৃদ্ধে মারা যায়, তার চাবিটি ছেলেমেয়ে আমাদের কাছে ছিল। সংসারের সব বাড়তি খরচ কামড়ে দিলাম আমরা, তবু দুবেলা খাবার জোটে না। এরপর আমরা চেরা টেবিল ইত্যাদি আসবাবপত্র বিক্রি করতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু সে সব কতই আর হবে। বাবা তাব বৈশির ভাগ টাকাই সংগ্রহের পেছনে খরচ করেছেন, অন্য কিছু তেমন কেনা হয় নি। এরপর আমরা সমস্যায় পড়লাম। তাঁর সংগ্রহ রাখার না উপায় করে থাকব। তাঁকে জানাই নি কিছু। কি লাভ। কিভাবে খাবারপাথর বোগাড় করতে হয় তাঁর ধারণা

নেই। পৃথিবীর চেহারা কিভাবে বদলেছে সে খবরও রাখেন না। আমরাও জানাই নি।

মনশির কবে ফেললাম আমরা। একটি মূল্যবান ছবি বিক্রি করলাম প্রচুর দামে। ভালোমত এক বছর নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। ভিনমাসও কাটল না। খুব টেনেটেনে চালা-ছিলাম, তবু এই অবস্থা। এরপর আর একটি, তারপর আর একটি। সব কটির ভাল দাম পেলাম না, কিন্তু দরমত অভাবের মধ্যে চিন্তা করবার কদবং পেলাম না। ঠকলাম অনেকের কাছেই। তবু হাতে কিছু টাকা থাকার রোজকার খাবার চিন্তা কমল।

আপনাকে দেখে মা তাই খুব ভয় পেয়ে গেছিলেন। তখন যদি আলমারি খোলা যেত, আমরা ধবা পড়ে যেতাম। কারণ আপনি তো জানেন না কিছুই। তিনি হাত দিয়ে অনুভব করে বলেন কোনটি কি ছবি। যে সব ছবি আমরা বিক্রি করেছি, ঠিক সেই আপের কার্ডবোর্ড কেটে ওখানে বেছেছি। তিনি ধরতে পারেন নি। সেগুলোয় হাত বুলায় গুণে দেখে তিনি এত আনন্দ পান যে, বলার নয়। এখানকার কাউকে তিনি ওসব দেখাতে চান না। মূল্য বুঝবে না বলে। তিনি ঐ সব ছবি এত ভালোবাসেন যে, যদি শোনেন সে সব নেই তাহলে পাগল হয়ে যাবেন। আমি আপনাকে অনুবোধ জানাব তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে না দিতে। তাঁর বিশ্বাস ভাঙবেন না। যদি জনতে পারেন ওসব আমরা বিক্রি করেছি তাহলে তার বাঁচবেন না। আমরা হয়ত সত্যিই তাঁর ওপর অবিচার করেছি। কিন্তু আর কি করতে পারতাম। আমাদের তো বাঁচতে হবে। নিশ্চিন্ত ছবির চেয়ে খিদে জ্বালা অনেক বেশি। এতদিন ধরে দৈনিক তিনচারঘণ্টা ওইসব কার্ডবোর্ডে হাত বুলায়ে, নাড়াচাড়া করে কাটান। আপনার মত অভিজ্ঞ লোককে সব দেখাতে পারবেন এ তাঁর কাছে কম আনন্দের কথা নয়। তবে আমাদের অনুবোধ, এই প্রতারণার ব্যাপারে আপনাকেও অংশ গ্রহণ করতে হবে।

এ অনুবোধ বেকত করুন, কত আন্তরিক আমি বোঝাতে পারব না। আমি দীর্ঘদিন ধরে খরিসদাবদের সঙ্গে কারবার করেছি, নানা-রকম লোক দেখেছি, অনেক করুণ অবস্থার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তবে এর আগে কোন ঘটনা এমনভাবে হৃদয় স্পর্শ করে নি। আমি কথা দিলাম তাঁর কথামত কাজ করব।

তাঁর সঙ্গে বণ্ডনা হলো। পথে যেতে যেতে শুনলাম কত অল্পদামে এঁরা মূল্যবান ছবি বিক্রি করেছেন। এমন অনেক ছবি ছিল যা সহজলভ্য নয়, কতগুলি তো অমূল্য। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনলাম, ভদ্রলোক অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন—আসুন, আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আমার পদশব্দের প্রতীক করছিলেন উদ্গ্রীবভাবে।

তাঁর ভীষণ অনুভূতি দিয়ে আমার পদশব্দ বুঝতে পেরেছেন।

—আপনি এসেছেন, উনি আপনাব জন্যেই অপেক্ষা করছেন। বৃদ্ধা তাঁর মেয়েব দিকে তাকিয়ে স্বেচ্ছা নিশ্বাস ফেলছেন। টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ। পাশের চেয়ারে বসলাম আমি।

—তাইলে আমরা আরম্ভ করি। অনেক জিনিস রয়েছে দেখবার কিন্তু সময় কম। এই দেখুন, প্রথমটাই ফরাসীদেশের শিক। কয়েক হাজার টাকা স্বচ করে আনিছিলো। খুব মূল্যবান ছবি সব কটি। আপনি নিশ্চয় দেখলেই বুঝতে পারবেন। তিনি এগিয়ে দিলেন আমার দিকে—বিদেশি ছবি দ্বিধেই আরম্ভ করা যাক।

খুব সাবধানে তিনি একটি ফাঁকা কার্ড-বোর্ড বার করলেন এবং আমার চোখের ওপর মেলে ধরলেন। তার অঙ্ক চোখেও যেন দৃষ্টি কুটে উঠবে এমন আশ্রয় তাঁর। বিশ্বাস করা যায় না যে, তিনি দেখতে পান না।

—ওর চেয়ে ভাল ছবি খুব কমই দেখা যায়। কি সুন্দর কাজ দেখুন। বহু ছবি দেখেছি আমি, এর তুলনা পাই নি। এবার তিনি শিল্পীর নাম দেখাবার জন্যে বোর্ডটি উল্টে ধরলেন। আমি কুঁক পড়লাম অদৃশ্য লেখা পড়ার জন্যে।

—এই ছবি, অনেক রাজা, জমিদারের হাত ঘুরে আমার কাছে এসেছে। গর্বের হাসি হাসলেন তিনি।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেলোম আমি। চুপ করে রইলাম। মূখ্য ভূতাই চোখে পড়ল ওর স্ত্রী ও মেয়ে আমাব মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম তাতাতাডি—সত্যি, না বলেছেন, এমন ছবি বাখাব ভাগ্য কখনের হয় ?

—এ আর কি দেখছেন, এ ততো সবে সুরু। আমাদের দেশের কি অসুখ শল্য-সম্ভাব ছিল দেখলে বিস্মিত হত হয়। আপনারা হয়ত অনেক দেখেছেন তবু এই সব দেখেছেন কিনা জানি না। এটা মূল-শল্য, বাবরের সময়কার। সব খুঁটি-টি বলে আপনাকে বিবৃত করতে চাই না। অকবর-জাহাঙ্গীর-শাহজাহান, প্রত্যেকেব সন্মার মূর্তি আছে আমার কাছে। তাদের আঙ্গুর হাঁকিও আছে। অনেক অতীত ইতিহাসকে আমি বন্দী করে রেখেছি।

তিন ঘণ্টার প্রায় একশ'র তত ফাঁকা কার্ডবোর্ড তিনি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। প্রতিটির গুণাগুণ, শিল্পীর নাম, সময়, বলে গেলেন। আমি তুলে নিলাম, কুঁক পড়লাম, সার দিলাম, প্রশংসা করলাম।

দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি ছবিতে এত খেমে গেলেন। হাত বোলাত লাগলে, স্পর্শ কুঁক উঠল—কি হল, এটা তো নক্ষত্রের মন্দির, কঠিনোদাই, তবে এমন কেন? আমি ছাড়া তো আর কেউ হাত দেয় না অত—তাতাতাডি তাঁর হাত থেকে তুলে নিলাম বোর্ডটা।

মহাশয় কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হলে মহাশয় কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে শিষ্যগণ এই শূন্যে তোমাদের নিকট বর্ণব্যাপ্য্য কতিং মহাশয় এ বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। বর্ণের বিভিন্ন দিক, কার্যকারণ, জ্ঞান ও সত্যের পার্থক্য ও গুণের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর গুণ, জল, বায়ু, জ্বা ও আকাশাত্মক, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্বর্ষ, যুক্তি, জন্ম-মৃত্যু, ভ্রম ও প্রমাদ—মহাশয় কণাদ বর্ণকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের সীমী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্ণত উপেক্ষনাথ যুগোপাধ্যায় অনুদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক বসুদত্তী

—হ্যাঁ, এই তো, এই তো মন্দিরের ছবি, তবে পেছল হয়ে গিয়েছে একটু।

—ঠিক, ঠিক, তাই আমার কেমন মনে হয়েছিল, হাসলেন তিনি।

—খেলার থাকে না। জ্ঞানেন, পঁচিশ বছরের ওপর আমি সিগারেট খাই নি, বেড়াই নি, বই কিনি নি, থিয়েটার দেখি নি—সব কথ্য রেখেছি, নিজেকে নানাভাবে ব্যস্তিত রেখেছি। আমার যত্নবশত এইসবের পেছনে স্থান করেছি। আজ আমি আপনাকে দেখাতে পেরে শান্তি পাচ্ছি। আপনার মত বোম্বা সহজে পাওয়া যায় না। একটা কথা, আমি মারা যাবার পর এইসবকিছু আপনি নিয়ে যাবেন, আপনার কাছে থাকলে আমার আত্মা শান্তি পাবে। তবে যতদিন বেঁচে আছি, সমস্ত পৃথিবীর বিনামূল্যেও এসব আমি হাত-ছাড়া করতে পারব না। আপনি যদি এসব বিক্রি করে প্রচুর টাকা পান তাতেও আমার আপত্তি নেই, তবে এখন এর একখানিও ছাড়তে পারব না। পরম আদরে তিনি হাত বোলালেন কাউবোডের ওপর। এ দৃশ্য সহ্য করা কঠিন। তাকিয়ে দেখলাম, তার স্ত্রী ও কন্যা গোপনে চোখে ভুল মুছেছেন। এবার সব আলমারিতে ভুলে রাখার পর আমি স্বান্ত্রি পেলাম। এবার প্রোচা মহিলাটি চা নিয়ে এলেন।

বৃন্দ ভদ্রলোক এখনো ক্লান্ত হন নি। উপরন্তু তাঁর বেন বয়েস কমে গিয়েছে।

কিন্তু কত পরিপ্রসে, কোন কৌশলে তিনি ছবি যোগাড় করেছেন, সেই কাহিনীই বলে যেতে লাগলেন। কবেকটি ছবি আর একবার করে দেখানোর জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর মেয়ে বামা দিল—ওঁর হাতে বেশি সময় নেই, ফিরে যেতে হবে আজই।

এবার ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন—আপনি আসার কি যে আনন্দ পেলাম বোঝাতে পারব না। এই শেষ বয়সে এমন সুযোগ যে পাব ভাবতে পারি নি। আমার উইলে, সবকিছু আপনার প্রতিষ্ঠানের হাতেই তুলে দেব। তবে একটা প্রার্থনা আমার আছে, এই সব কিছুর একটা তালিকা আপনি তৈরি করবেন। আমার কথা দিন। সেই তালিকা পুস্তিকার্টাই হবে আমার স্মরণচিহ্ন।

দুজন মহিলার দিকে তাকালাম আমি। তাঁরা তখন অপ্রসবের জন্যে প্রাপণ চেষ্টা করছেন। আমি সেই অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করলাম। তিনি আবেগে কাঁপছেন ধ্বংস করে। আমার হাত মুঠোয় নিয়ে চাপ দিলেন। অন্তরের সবটুকু কৃতজ্ঞতা করে পড়ল।

মহিলা দুজন বাইরের দরজা পর্যন্ত এলেন। কোন কথা বললেন না তাঁরা। দেখলাম দুজনের চোখ দিয়েই জলের ধারা নেমেছে। আমি নিজের অবস্থার নিজেই বিপন্ন। ব্যবসারী মানুষ, সম্ভার ভাল ছবি

কিনতে এসেছিলেন। এমনি কপাল যে, আমি সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে পড়লাম। আমার জ্ঞানায়ণও অংশ গ্রহণ কবলাম। একজন বৃন্দকে শ্রুতি করার জন্যে হলনা। মিছে কথা বলার জন্যে লজ্জিত হবার চাইতে শ্রুতিই হল।

বাইরের রাস্তায় পা দিতেই ওপরে জানালা খোলার শব্দ পেলাম। তাকালাম ওপরে। যদিও বৃন্দ ভদ্রলোক আমার দেখতে পাচ্ছেন না, তবে তিনি জ্ঞানেন, এপথেই আমি যাব। জানালা থেকে অনেকটা কঁকু পড়েছেন তিনি, তাঁর মেয়ে তাকে ধরে আছেন। হাত নাড়িয়ে বললেন এবার—গিয়ে কিন্তু চিঠি দেবেন একটা। আপনার বাবা শ্রুত হোক। নমস্কার।

—নিশ্চয় লিখব। আপনার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। নমস্কার।

দ্রুত ছেঁটে চলে এলাম আমি। প্রতি মুহূর্তে তাঁর কথা মনে পড়তে থাকল। তাঁর হাসি, আগ্রহ, দৃষ্টিহীন চোখের অসহায় আকুলতা। মনে হয় সংগ্রাহকেরা কত সুখী! আর উনি এখনো সুখী যেহেতু উনি অন্ধ।

ভদ্রলোক বলা শেষ করলেন। আর এক জংশন স্টেশনে এসে ট্রেন ধামল

Stefan Zweig-এর 'The Invisible Collection' অনুসরণে।

অবসর্প

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কোথাও আমাকে এককোটা ওরা দেবে না

নির্জনতা।

কবেরি পাখে বৃথা মাথা খুঁড়ি, আকাশে

উধাও হ'তে

দেবে না মনের পুষ্পকল্পে—ঘাস ছ'য়ে

কোনমতে

যতই জড়াই ওদাসীন্য, ওরা ঠিক নীববতা

খান খান করে কেটে এগুবেই বিশৃঙ্খল উঁচিরে

ধরে—

আমাকে নেবেই ফিরিয়ে আমার জীবনের

খেলাঘরে।

পালাবে কোথায়—অরুণোদয়ে সময়ের বোড়

দিয়ে

ঘেরাও করেছে ওরা সাবধানী। মাদুরা বা

মালাবার

বেখানেই বাই, সাথে সাথে ওরা যাবেই

ঠিকানা নিয়ে

অবশেষে কোন চির-পরিচিত আশ্রয়ে ফিরবার।

আমার বুকের পাজিরে রেখেছে আশার

স্বাদুদখানার

প্রেরণার গুদী ছাড়িয়ে—আমাকে বন্দী রাজার

মত

মাথা উঁচু করে চলেতে হবেই বাঁচার উদ্দেশ্যে

জন্মের মিস্ত্রীর রাস্তায়, ঢেকে বৈরাগ্যের স্তম্ভ।

বঙ্গদর্শন



নাহেশের রথ

হাজধানী:

রথযাত্রা

---এবার ভাল করে রথও দেখান না, ফলাও বেড়া হল না। শ্যালদার বেলার জন্ম-জন্মাট বাপু অন্যত সম্ভব নি। তাপ্পর এই নিষ্ঠা। আর হবে নি? চতুর্দিকে কেবল অনাচ্ছিন্ন, ছিটছিটা ব্যাপার।

স্টিকর্তাই জানেন, সামান্য পমারিনী চতুর্দিকের ঐ নাবিক অনাস্থ্যের সংবাদ আপন দিনলিপিতে উদ্ধার করে রাখেন কিনা। কিন্তু বেশ বুঝলাম, তাঁর বিক্ষোভে প্রত্যয়ের অভাব ছিল না। অনাস্থ্যের চেউ বতসুরই ভেঙে পড়ুক, তার কলি কলি থাকা বুদ্ধির কটীর-গীমায় এসেও আঘাত হেনেছে। বস্তির জন্যই হোক, আর নমুনাষ্ট কানুনের জন্যই হোক এবারের রথের বেলা জবে নি। শিরালদা জো থাকুক।

ওপু বেলা নর, রথও প্রায় অদৃশ্য। অথচ ময়ূরগতি বানরাহনের তালিকার রথের ওপর কোথাও নিষেধাজ্ঞা নেই।

গলি ও হাক বড় রাতায় কিছু কিছু উৎসাহী

বালকিয়া রথের রশি ধরে টানাটানি করেছিল আর সেইসঙ্গে পঞ্চচারীদের পকেটেও শিত-হাতের টান পড়েছিল।

ছোট ছোট ফুটকুটে বেরের হাতে প্রসাদ কণিকামাত্র বাতাসার শুঁড়ে নিয়ে গবে সিপারেটে আঙুন নিতে শিখেছে এমন কিছু বৃত্ত বালকই বোম্ব হয বর্ধাভাবে 'রথ দেখা, কলা দেখা'র বারাক্ষক বচনটি এষাত্রাঙ্কও রক্ষা করে গেল। পঞ্চচারীর হাতে বাতাসার শুঁড়ে শুঁড়ে নিয়ে ছেনে-বেরেরা বেশ কিছু রোজগার করেছে। চাঁদার হার বেড়েছে কিছুকাল, সম্প্রতি চাঁদার প্রকারভেদও লগ্ন হতে চলল। জন্মাস্ট্রী ও অন্যান্য পার্বনীতে (স্বাধীনতা-দিবসে ও নেতাজী জন্মদিবসে ক্যাপ বিক্রয় সমেত) এই শিত-ব্যবসারীদের উপভ্রম অনেকই লক্ষ্য করে থাকবেন। চাঁদা বর্তমানে ছপ্পাবেনী ব্যবসার স্থান গ্রহণ করেছে, যাকে (ভরবেশী হওয়ার গুণে) মহলা ভিক্ষাবৃত্তি বলা সন্দেহ নর।

বাই হোক রথের রশি ধরে কস্যাবান্য কিছু রোজগার করল ভ্রমণতানরা।

২০ টেনে ও কলা বেচে বাড়ি ফিরবে

নিশ্চিত অভিভাবকপন যে এই শিত-ব্যবসারের কানাকড়ি ভাগও পান নি, তা কলি বাহন্য।

যাক বাংলার একটা ব্যবসারী ভবিষ্যৎ যে অনিগলিতে অনারানে ভৈরি হচ্ছে একথা ভেবে আবার কি উৎস্র হতে পারি।

জাবার পচাই

ইতিপূর্বে ওদার-গাটা চালের ব্বর এই বঙ্গদর্শনের পাতায় ছাপতে হয়েছিল। পুনরায় লেক ওদানে পাঁচ হাজার বণ চালের হাজার তিনেক বণ জলে গেল। অপচরের ব্বর মেখে লপেহ হর, মেখে কি সত্যই চালের অনটন? না হলে চনচনে ভাঙারে টন-টন চাল পচে-গলে গোবরে পরিণত হর কেনন করে। না কি, দাবের চাল যেহেতু ব্যবসাবীর ধরে লক্ষ্যী এবং ওদাবের চাল সরকারী আমদার কাইলে বস্তার হিসেব, একনাই কি বঙ্গদেশে এ জাতীয় বীভৎস অবস্থাপনা?

আমাদের এই অল্পত বঙ্গদর্শনে ব্যবসার একটি জিনিসই লক্ষ্যীয়, এসেলে পৌরী সেনের টাকা এবং প্রকুর সেনের সম্পত্তির একট

সাপ্তাহিক বসুমতী

দর-কদর (বলা বাহুল্য, 'প্রফুল্ল সেন' ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ 'সরকারী' অর্থে ব্যবহৃত)।

বাদ্য নিয়ে ঝামঝামালী মজা-নারার অনুরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্র দুল্লভ। গুদামরক্ষকরা সন্দেহ হয়, আনিকোরা তাঁদের দেশের আমদানি কিনা। কলকাতা শহর ও আশেপাশে যেখানেই যে জল জমে এ সংবাদ তাঁদের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। তত্রাচ ৩০টি গুদামের ১৪টি ধীরে ধীরে জনমগ্ন হল আর গুদাম হস্তাবধায়করা দিবি চক্রানন বিকসিত করে সেদৃশ্য বসে বসে দেখলেন? সত্য সেলুকস—না: গুটা পুরোনো কথা।

কাঁচা মেথের গুদাম কাঁচা চালে ঠাসবার দর করিৎকর। লোকগুলির উর্বর মস্তিষ্কে একবারও এই সাধারণ কথাটি চুকল না যে, বর্ষার ব্যাপারটা সর্বভাবে কেঁচে যেতে পারে? সোজা উত্তর, সাধারণের দুর্ভাবনার জন্য এদেশে সরকারী ভাবনা নেই। সুতরাং এমনটাই হবে, এমনই হয়ে আসছে।

কৈফিয়ৎ ততবে বা তদন্ত দসিরেও এখানে

অফিসরকুলকে হস্তদত্ত করার নিয়ম নেই কারণ অফিস মূলকে সব কাজ ফাইলে করে তাই তদন্তে কাহিল করে না ওপরতলার চাকুরেকে। জবাব তলব হতে কনিষ্ঠ কেরারি চাকরি নিয়ে টানটানি স্বর হয়। অতঃপর পাঠ্য কেটে মস্ত পাঠের বাস্তি শোধরালেই দেবী-পূজার দায়িত্ব শেষ। হাই পোস্টের উপরীত তখন একবার ডাইকিনিং-এ কাচিয়ে নিলেই ঝড়ারের নিশ্চিতি। অথচ কে জানে, এতো বড় বড় কাণ্ডের পেছনে কালো আঁধারে কত কী-ই না ঘটে যায়। দুর্ঘটনার ক্ষত শুকালে চোখে পড়ে হয়ত, পাশ কাচিয়ে সরে-ধাক। অক্ষত পুরুতবশায়ের দরদালানে উজ্জ্বল ঘটনার সমাবেশ হয়েছে।

এমনই হয়ে আসছে, হবেও। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রসঙ্গত মনে পড়ল। এবং বঙ্গলাস, বিচিত্র দেশ এদেশ নয়। বিবস্ত্র আশাদের স্বদেশ। লাঘলজ্জা বড় কম, বড় কম।

ফরাতার কথা

না, ফরাতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী

মস্ত্রা মস্ত্র করবেন না। চতুর্থ কেন্দ্রীয় এস্টিমেটে কোনোরূপ বায়-বরাধের ব্যবস্থা হবে না ফরাতা প্রকল্পের জন্য। আর হবেই বা কেন; প্রকল্পটা পশ্চিমবঙ্গের। উত্তরে পিঠ পেতে দাঁড়িয়ে একচক্ষু হরিণ পূবে নজর দেবে কেমন করে। অতএব ডাঃ কে এল বাও তাঁর নজর খাটো কবেছেন। চোখ মটকে দোষের ভাগ অর্ধশতকের ঘাড়ে চাপিয়ে গা-চাকা দিতে চাইছেন এখন। অথচ মাত্র ১৯৬৩ সালে ইনিই প্রায় চাঁদ ঘরে দিতে চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গকে। টাকার জন্য কী আছে, প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ এসেছিল তাঁর কাছ থেকেই।

ডাঃ রাও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সহজ বিশৃঙ্খল পশ্চিমবঙ্গের হাতে মই একটা যোগান দিরে-ছিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে জানতেন বোধ হয় কার্যকালে মই কেড়ে নেওয়া এমন কি শক্ত।

বিশেষজ্ঞের উপদেশ অগ্রাহ্য করে মাঝ নদীতে কাজ শুরু করতে তিনি দেন নি। ব্যারাজ তৈরি হচ্ছিল নদীতীর থেকে, যার পরিষ্কার অর্থ, অতিরিক্ত কুড়ি কোটি ঘন কট মাটি কাটার জন্য



এবারের কৃষকের মেগার কেনা-বেচা

সাপ্তাহিক বঙ্গবর্ত

অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রয়োজনীয়তা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজন, কিন্তু ডাঃ রাও সে দাবিও বাড়ে নেননি। দায় যখন বন্ধের, উপায় তখন ডক-বঙ্গকেই করতে হবে। কিন্তু বড় অসময়ে এ প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছে, যার দাবিও এড়াতে চাইলেও যে দাবিও এড়িয়ে যেতে চায় না ডাঃ রাওকে। টেকনিসিয়ান সুপারিশকে টেকা সেওয়ার যথার্থ অন্যতর কারণ সাধারণের বোধগম্য হবে কি না বলা মুশকিল, তবে মন্ত্রিসভার মতবন্ধি বাঁদের হাতে, তাঁরা বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে অবজ্ঞা করতেই অভ্যস্ত। অবশ্য এমন অবস্থাকারিতার স্মৃত্ত সুযোগ অবিস্মৃতায়ে সুয়োরাণীর সংসারেই লভ্য। ভাই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় টেকা ভরুপে বঙ্গবাসী বিস্মিত ঘন, ব্যতিব্যস্ত।

বিস্মিত জামরা তখনও হব না, যখন জানছি, জামা ব্যারেক্টের ভারপ্রাপ্ত দপ্তরের অজ্ঞতা বিনা বিতর্কে (পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে) বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট অগ্রাহ্য করলেও কেন্দ্রীয় কর্তারা নীরবই আছেন এবং থাকবেন। ১৯৬৫-৬৬র জন্য ছাব্বিশ কোটির বলে কৃষ্টি কোটি কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পাওয়া যাবে। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিম-বঙ্গের ন্যূনতম প্রয়োজন একশত কোটি টাকার কতটুকু কেন্দ্রের কাছে লভ্য তাঁর হাশিম এখনো পাওয়া যাচ্ছে না।

মধ্যমস্তী নাকি পরিকল্পনা করিশনের ডেসুটি চেয়ারম্যানের কাছে এ বিষয়ে দরবার করবেন। কিন্তু তাতে কি বারবারের মতই ঘটাপ হতে হবে না?

দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী লঙ্ঘননে এ বিষয়ে কোনো আলোচনাই হল না। গোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার করাকার জন্য অতিরিক্ত বিদেশী মুদ্রা মন্ত্রণ করবেন না বলেই জানিয়ে দিয়েছেন। তবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আসবে কেন? কাজ কি না-পথেই বন্ধ হবে। তার থেকে বাস্তবনীতে কাজ শুরু হলে কতি ছিল কি? কতি না থাক পশ্চিমবঙ্গের কিছু লভ্য ছিল, পোড়া কপালে, অত সুখ-সইবে কেন।

সম্প্রতি পোট কমিশনারের চেয়ারম্যান শ্রী বি বি ঘোষ বলেছেন, করাকার জলে কলকাতা শহরের নাব্যতা বাড়বে কি বাড়বে না সে-প্রশ্ন পরিষে রাখলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতর লাভ, মাদার জোয়ার-ভাটার তীব্রতা এর দ্বারা হ্রাস পাবে। ফলত বঙ্গের কাছের-সর-হুজি পাবে শতকরা প্রকাশ ভাগ। আর সব থেকে বড় লাভ এই যে, বহির্ভূত কাজ ও বহির্ভূত লাভের কড়িতেই করাকার লক্ষ্যকৃত টাকা উঠে আসবে। অর্থাৎ এতোবড় একটা

মস্তাবনা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাঁটের কড়ি এখন আঁটোশাঁটা থাকলে অল্প মনে লগ্নেই উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক।

লগ্নেই দেখাও দিয়েছে। শ্রীঅশোক বেহতা কি লগ্নেই ভজন করবেন?

কেন্দ্রীয় কর

কেন্দ্রীয় করের বোঝা স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গকেই বহন করতে হবে। কেন্দ্র-না রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্রের হাত মতই লগ্না হোক, পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য অর্বাদনে কেন্দ্রের হাত সর্বদাই ঝাটো। এটা আজকের অভিজ্ঞতা নয়, উত্তরস্বাধীনতা কালের ভাগ্যনিধি।

এবারও চতুর্থ যোজনায় পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র তার প্রতিশ্রুত অর্থ বরাদ্দ করতে অক্ষমতা জানিয়ে বাঁটতি অর্থ পশ্চিমবঙ্গের কবতারপীড়িত জনসাধারণের গলা টিপে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ যখন এসেছে, গলায় হাত তখন পড়বেই, কিন্তু প্রশ্ন হল এই নির্দেশ হাতটি কার, পশ্চিমবঙ্গের না কেন্দ্রীয় সরকারের। মুখিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের দুইপোষা শিশুও জানবে, কিয় নায়ার গোসাই এই কেন্দ্রীয় সরকার।

জানা গেছে চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্র সরকারকে প্রতিশ্রুত ৪৪৩ কোটি টাকা দেবেন না, দেবেন ৩২৩ কোটি

টাকা। অর্থাৎ ১৭৫ কোটির কার্যনির্বাহী রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ২৯৫ অর্থাৎ অতিরিক্ত ১২০ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হবে।

বেহেতু নোট ছাপলেই টাকা হয় না সেজন্য এই অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহের জন্য আদায়ের বোঝা চাপের জনসাধারণের ঘাড়ে এবং সৌভাগ্যত বেহেতু পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সঙ্গে উইজাতীয় জীবনকিছুবারে সাধুনা নেই, সেজন্য এই নতুন বোঝাও তাঁরা অক্লেশে বহন করবেন বলেই জাজির ডাঙা-নিয়ন্তারা সুবিবেচকের মত বাস্তবায়ন করছেন।

মুখ্যমন্ত্রীও এই রায় পিরোয়ার করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। পরিকল্পনা হ্যাঁটিকাটের কোনো প্রস্তাব তাঁর দেইর এখন কোন ঝাড়ে কর বৃদ্ধি লভ্য মুখ্যচিফ-সেটাই।

অথচ পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য প্রদেশের ৫৫ লক্ষ পেটের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে প্রতিদিন। ফলত নিজের পেটে টান তার অমনিতেই আছে। তাঁর ওপর কেন্দ্রীয় পীড়ন। অতঃপর যদি ৪৫ লক্ষ পূর্ব পাকিস্তানী উদ্বাস্তু সংখ্যাও বরা হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের ওপর কী পরিস্থিতি (৯৫ লক্ষ বাড়তি মানুষের) চাপ কষ্ট হয়েছে তা সহজেই অনুমোদন।

বাংলা দেশ কেটেকটে বাঁধান যাচ্ছে চার্লস লক্ষ উদ্বাস্তু বিধিবারতা চাপিয়ে দিয়ে এবং ভিন্ন রাজ্যের ৫৫ লক্ষ বড় বড় উল্লের সুরাহা করার দায়িত্ব দিয়ে স্বাধীন ভারত সাজ

বেঙ্গল কেমিক্যালের

পাকিস্টিউমড

তিল তৈল

আয়ুর্বেদমতে কাঁচা তিল তৈল কেবল মস্তিষ্ক ও শরীর শক্ত রাখে না - ইহা কেশোদগ-মের সহায়তা করে - কেশকে উজ্জ্বল ও মৃদু রাখে।



কলহের ওপর পা তুলে নবাবী নাগরার উচ্চ উপাচ্ছেন। এখিকে হতভাগ্য বঙ্গসভার জরাজীর্ণ 'স্যাট্রিকাইস'-এর নামাবলী গায়ে জড়িয়ে কর পীড়নের ব্যাখ্যা কেঁপে য়েছে।

এরপর বাংলার ক্ষীণকণ্ঠে গোটা 'বাহবা' শব্দও উচ্চারণের ভাগদ নেই। আমাদের ওপর সবকন্ঠের অভ্যাচারের একটিনাজ বিস্মিত জবাবই আমরা জানি,--বাঃ।

স্টুডেন্টস হেলথ হেল

সুদূর দিল্লীর একটি সংস্কারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সাহায্য করেন। কিন্তু স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানকে (স্টুডেন্টস হেলথ হোম) সাহায্যে বঞ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থহীন কাজ করতে চলেছেন।--নিনেট সভায় এই বক্তির অবতারণা করেন ডাঃ রবীন্দ্রনাথ বসু। হাজিরাওয়া সরকারের কাছে এবারকাল স্টুডেন্টস হেলথ হোম সম্প্রদানান্তি করে আসছিলেন। হেলথ হোম অত্যন্ত আর্থিকভাবে দুরবস্থায় পড়ে উঠেছে বলে অকস্মিক বিশ্ববিদ্যালয় বৃকি সচেতন হয়ে উঠলেন।

চতুর্দিকের অসহায় নিচেরে অবস্থা বাধ্য সরকারের প্রশ্ন নিতাই নথি। আর তাই সাহায্য বন্ধের প্রস্তাব নিশ্চয়ই অগত্যাের দিকে বধ্য রেখেই তৈরি হয়ে থাকবে। দুঃখের বিষয় যেটা দেশটা এমন করে অগত্যা-সচেতন নয়। ভ্রষ্টা এখানেই। সরকার প্রতি প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত হলে ব্যাপারটা আভ্যন্তরীণ হয়ে পড়ে। কিন্তু এ যে বিরাট বীজ আর প্রচণ্ড বাক্য।

কলকাতার অগত্যাের স্রোত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপলব্ধিতে দিগন্ত? রয়েছে চন্দ্র, তাও আবার হয়।

এর মধ্যে ব্যাপার আছে। আগাগোড়া নয়, আগাগোড়া একটা ভাবনা এখনো আছে।

হাজিরাওয়া সরকারের যে বার্ষিক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স পক্ষই তাঁদের সমর্থ করে তুলে নিলেন না, হেলথ হোম সে বোঝাই বইছিলেন। এই সমস্ত সভাটা সমস্তভাবে স্বীকার করার মধ্যে পৌঁছান ছিল একমাত্র ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র বোমের। হেলথ হোমই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন, এ সমস্ত স্বীকৃতি একমাত্র জ্ঞানচন্দ্রের কণ্ঠেই নির্দিষ্ট বোধিত হতে পেরেছিল। ডাঃ বোম প্রকৃতপক্ষে হাজিরাওয়া ছিলেন। একাধিক ক্ষেত্রে সে পতি-চর তাঁর আমলের শিক্ষক ও হাজিরাওয়া পেয়েছেন।

বোঝা গেল, হাজিরাওয়া নয়, বর্তমান কর্তৃপক্ষ অর্ধদরনী। তাও আবার বাধ্যতামূলক হাজিরা টাকার দরদ। এখনই কি সোকে

বীরভূম

নতুন নজর

জমিদারী নিয়ে এখন সরকারই জমিদার হয়ে বসেছেন। কিন্তু জমিদারী গেলেও নারেন্দ্র বোম হয় রয়েই গেল। নামকরণে শুধু যা একটু হেরকের হয়েছে। জমিদারের নামের প্রচার ভিটেমাটি বেহাত করে এককালে নিজেই নারেন্দ্র হয়ে বসেছে। বর্তমানে সে মোড়াখা বরাতে বটে উঠবে না, তবে জমিদারীর বনলে জটিলিকা তৈরির সুযোগ এসেছে। তহশীলদারের হাতে। হনকি দিয়ে মাঠ কাটাতে এরাও যে কি পরিমাণ নারেন্দ্র ঐতিহ্যের সুপটু বাহক হয়ে উঠেছেন, তারই একটি কলক-চিত্র সম্প্রতি শিউড়ী খানার গঙ্গাভিরা গ্রামনিবাসী ব্রীজনাথপুর ভট্টাচার্যের নিকট পাওয়া গেল।

ব্রীজনাথচার্যের বন্যবাদ, তিনি বীরভূমের গরীব অজ্ঞাচারীদের সর্বনাশা চিত্রটি বখাসমত তুলে বসেছেন। ব্রীজনাথচার্যের অভিযোগের মতাত্মা পীকারজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, এ-না বি প্রতিটি সং ব্যক্তিই উপাধন করবেন। আমরা আশা করব এ-ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে নির্দীপ্ত সাধারণ কৃষক পরিবারকে রক্ষা করবেন।

ব্রীজনাথচার্যের অভিযোগ নিচে অবিকৃতভাবে উদ্ধার করা হল:

নরেন্দ্রাঙ্গী ক্যানেলের বকেসুর ব্রাক-এর জলকর আদায়ের অবিনাশপুরের রেভিনিউ অফিসের তহশীলদারের বেহাচারিতা ও দুর্নীতি এই অকস্মে গরীব চাষীদের মধ্যে ব্যাপক বিকোভ হুটী করিয়াছে। এই বিকোভের মূলে বেশব ঘটনার সমস্ত পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে:

সরকারের মোট এলাকাই প্রায় ৫০।৬০ একর জমি বাহা-কিছুদিন পূর্বে পতিত ভাঙা ছিল, এখন সেগুলি আবাদী জমিতে পরিণত হইয়াছে এবং প্রায় ৩।৪ বৎসর ধরিয়া জলকরের অর্ধেক টাকারাজ লইয়া নিজে আশ্রাণ করিতেছেন এবং অদ্যাবধি সেই সমস্ত জমি পতিত ভাঙা রেকর্ড রাখিতেছেন। অথচ বিস্ময়জনক ভাণ্ডা গেল, স্থানীয় পেট্রোলারগণ তাঁহাদের উপযুক্ত মণিগত তহশীলদার অফিসে খবর দিয়াছেন। এই জমি হইতেছে জোমাইপুর মৌজার পতিত বড় ভাঙা, ভবানন্দপুর মৌজার ১১ নাগ পতিত ভাঙা ও গদাধরপুর মৌজার পতিত বড় ভাঙা।

অনি হস্তান্তর হইলে প্রকৃত জমির দখলীকার স্বত্বাধার করিয়া তাহার নাম বার্ষিক করিতে চাহিলে বা বাহার উপর অন্যায়ভাবে জলকরের

মোটামুটি নেতরা হইয়াছে তিনি প্রকৃত মালিকের নামে জলকর আদায় করিবার ও তাহার নাম বাহ দিবার জন্য আবেদন জানাইলে তাহার কোন প্রতিকার হয় না। নজরানা দিলে তবে তাহা কার্যকরী হয়। এই ব্যাপারে গরীব চাষিগণ মায়া পড়িতেছে।

প্রকাশ, উক্ত তহশীলদার কর্তৃক গরীব চাষীদের নিকট জলকর আদায়ের সময় বেশি পরিমাণ টাকা লইয়া অল্প পরিমাণ টাকার চেক দেওয়ার অভিযোগও রহিয়াছে। জানা গেল, চাষিগণ প্রতিবাদ করিলে তিনি তাহাদিগকে ভৎসনাও করেন। এইভাবে ক্যানেল কর বাকী রাখিয়া এবং উপযুক্ত চেক থাকা সত্ত্বেও অনেকের নামে বাকী জলকরের জন্য এই বৎসর বহু বিষয়া সার্টিকিফিকেট করিয়াছেন। গরীব অজ্ঞাচারিগণ উপযুক্ত চেক লইয়া তাঁহার অফিসে হাজির হইয়াও কোন কল হয় নাই। আবার অনেককে একথাও নাকি বলা হইয়াছে 'এসময় ঠিক করিতে হইলে টাকা, হাঙ্গ, মুরগীর প্রয়োজন'। এইভাবে গরীব চাষিগণের নিকট টাকা, হাঙ্গ, মুরগী আদায় করা হয় বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে। তহশীল অফিসে অশিক্ষিত চাষিগণ জলকর দিতে গিয়া তাঁহার নিকট যে অত্যাচারিতা ব্যবহার পায় তাহাও এই ডিকোভের অন্যতর কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বর্ধমান

বালভাগ্য বর্ধ

মানুষ কোথাও ম্বে নেই। না কলকাতায় না কলকাতায়। কলকাতায় মানবহনের অস্বস্তি হুনিদিত। বর্ধমানে সম্প্রতি বাগভাগ্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মোধানকার স্থানীয় সামাজিক পরিচালক বলা হয়েছে : বলে হাজিরাওয়া গঙ্গা-ডেয়ার ন্যায় বাতাসিত করছেন এবং এই রকমের মূগেও বাতাসের গতিবেগ গড়ে মাত্র ১৪ মাইল। এতদসত্ত্বেও কি হাজিরাওয়ারের সঙ্গে কোতুক করবার জন্য বাগভাগ্য বৃদ্ধির লিচ্ছা গৃহীত হয়েছে?

মোনাথুলির কথা ছেড়ে দিলেও ১ম জুলাই থেকে অকস্মাৎ ভাঙা বৃদ্ধির প্রস্তাব নাগরিকের ওপর অন্যায় জুলুমাজি বলেই নাগরিকের মনে করেন। কিন্তু কোন আবেদন-নিবেদনেই আভ্যন্তরীণ সরকার অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (আপন স্বাধীনসিদ্ধির ব্যাপারে) তিলমাত্র বিলম্বিত হয় না। বর্ধমান জেলা বাস-মালিক সমিতি (বি ডি বি এ) ইতিমধ্যেই আকস্মিক পরিবর্তন সংস্কারে (আর টি এ) দিয়ে জেলার সর্বত্র বাগভাগ্য বৃদ্ধির প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন। এ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এই যে,--আর টি এ প্রস্তাব হাতে আসতে না আসতেই

সাপ্তাহিক বসন্ত

তা মন্থর করেন, তাঁরা কি একবারও যে প্রস্তাবের মাধ্যমে বিচার করে দেখেছেন?

গাড়ির তেল ও যন্ত্রাংশের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে একথা যেমন সত্য, তেমনি অন্যতর সত্য হল, বাসে অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যাত্রীসংখ্যা। তন্মাত্র বাসভাড়া বৃদ্ধি কি একান্তই অপরিহার্য ছিল। ইদানীং ভারতবর্ষের মানুষজন ফালতু মুনাফার পেছনে অন্ধের নতো দৌড়-ঝাঁপ শুরু করেছে। বর্ধমানের বাস-মালিক সত্তের গায়েও যে সে হাওয়া লাগে নি, এমন প্রমাণ কাগজে-কলমে দেখিয়ে দেবেন কি স্বাক্ষরিক পরিবহন সংস্থা?

বর্ধমানের মনসাকলনিবাসী (গনসী ধান) শ্রীপবিত্রকুমার রায় নামে জনৈক নাগরিক তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবে আবেদন জানিয়েছেন, 'অপ্রত্যক্ষ করের ওজুতাবে জনসাধারণের মতিস্থান উঠছে, কিন্তু এতোদিন যখন বাসভাড়া বৃদ্ধি করবার প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুভব করেন নি, তখন এই সমস্যাগঙ্ঘল পরিস্থিতিতে বাসভাড়া বৃদ্ধি না করে জনসাধারণের সহিত যখন প্রচারিত 'কৃচ্ছসাধন' করে তাঁদের ক্তজ্ঞতা-ভাজন হওয়াই সনীচীন বলে মনে করি। আশা করি কর্তৃপক্ষ বাস ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেবেন।'

শ্রীরায়কে সবিনয়ে জানাই, 'কৃচ্ছসাধন' শব্দটি বর্তমানে তার পূর্ব-গৌরব হারিয়েছে। যৎকালে ঐ মহান উপদেশের কদর ছিল, তখন ও-বসন্তও মহার্ঘ ছিল। মহাজন ব্যক্তি ব্যতীত এতবড় বৃত্ত উদ্‌ঘাপনের আর কারও ওপর চালাও নির্দেশ জারি হত না। দুর্ভাগ্যত সাধারণতরে ও-বস্তুর ইদানীং সাধারণীকরণ হয়েছে। সে কারণে অথবা কৃচ্ছসাধন কেবলবাত্র সাধারণেরই একমাত্র করণীয় বিষয়। মহাজন ব্যক্তির কোন দৃষ্টে কৃচ্ছসাধন করবেন? ওটা সাধারণেরই বর্তমান ললাটলিপি।

আর শ্রীরায় নিশ্চয় স্বীকার করবেন, যারা বড় বড় বাস মালিক, যাদের পরিবহন সংস্থায় হরদর যাতায়াত আছে, তাঁদের গারেও মহাজনী হাওয়া লেগেছে। তাই 'কৃচ্ছসাধনের' আহ্বান তাঁদের কাছে অবমাননাকর বোধ হতে পারে। শ্রীরায় যদি খেচ্ছায় মানহানি কেসে জড়াতে চান তো দুর্ভোগ ভুগুন। আমরা মশাই মহাজন ব্যক্তির সাধারণীকরণের প্রস্তাব রেখে আর হাস্যাস্পদ হতে চাই না।

মুশিদাবাদ:

আবাদ সমস্যা

চাষাবাদের সমস্যা এদেশে আজও প্রকৃতি-নির্ভর। কিন্তু একই দুঃখের পুনরাবৃত্তি বর্তমান

আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। জনাভাবে শুধু মুশিদাবাদ কেন, দেশের সর্বত্র আবাদযোগ্য জমি হাাহাকার করেছে। সরকারী বাঁধে খালে জল ধরে নি। এসব পুরানো তথ্য।

নতুন সমস্যা পাটবীজ নিয়ে। প্রকাশ, মুশিদাবাদের জন্য সরকারী কৃষিদপ্তরে পাটবীজ 'বাড়ত'। আবারের জলেও যদি কিছু চাষাবাদের সুযোগ ঘটে, তবু আলোচ্য জেলা সে সুযোগ গ্রহণে অপারগ হবে পাটবীজের অভাবজনিত অবাধবশত। নিরস্তিত বুলো আবশ্যকীয় দ্রব্য পাওয়া না গেলেও অবশ্য কেউ হতাশ হন না। হাত বাড়ালেই কালোবাজার। কিন্তু দুর্ভাগ্য এবার দিকচক্রবাল আঁধার করে নেবে। সেখানে কালোবাজারও কানা। পাটবীজ মালিক কালো-বাজারেও অগ্ণ্য। ইতিপূর্বে বহু কৃষিজীবী সরকারী বীজের অভাবে পাঁচ টাকা কে-জি জাপানী বীজ কিনে জমিতে কেলেছেন, এবার পাঁচটেও অক্লান। অতি কালোবাজারী কসরতে বীজের চেহারা যদিবা চাকস হয়, তবে দরদার গিয়ে দাঁড়ায় কে জি প্রতি মশ টাকা। কিন্তু এমনভাবে টাকার হরির লঠ দেওয়া কৃষকভাইদের পক্ষে সর্বধা সম্ভব নহা। তাঁরা কৃষি-দপ্তরের মঞ্চ চেয়ে আজও অপেক্ষমাণ। এখনও উপবস্ত পরিমাণ বীজ হাতে পেলেন তাঁরা শতকরা দশভাগ পাট কলাতে পারেন। সরকারী নজরে গড়িমসি দেখা দিলে হয়ত সে সুযোগও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আবারের বর্ষপে হয়ত বিত্তক শীর্ণ পাট শিথ কিছুটা সতেজ হতে পারে। কিন্তু তৎকর্ত সেই পাটচারা হবে নিস্তেজ, বার কলে যে জমি গড়ে ১৫ মণ পাট উৎপন্ন করে সেখানে পাওয়া যাবে হয়ত দুই থেকে তিন মণ। সুতরাং ইতিমধ্যে রোপিত পাটচারার ওপরও যথেষ্ট ভরসা রাখার কারণ নেই।

পাট ব্যতীত এ সময় দ্বিতীয় ফসল আউস ধান। এ বছর সেই আউস নিয়েও হা-হতাশ। সাধারণ কলনের এক তৃতীয়াংশও তৈরি হবে কি না সন্দেহ।

এই তো গেল ভাগীরথীর পূর্বতীরের বিনর্ষ পাঁচালি। পশ্চিমতীরের রাঢ় অঞ্চলের অবস্থাও সুবিধের নয়। রাঢ়ের কসল আমন ধান। জানা গেল, আমনও মণ মণ খানারে ভোলায় স্বপ্নও এবার ভেঙে গেছে। আবারে জল চাললেও অথবা নহুয়াসী সেচ ভাল জল ছাড়লেও আবারেই বান বপনের কাজ শুরু করা সম্ভব নয়।

স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের ডালিকা দেখে স্বভাবতই বনে হয়, কপাল এবার ভালো করেই পুড়েছে। এখন পোড়া তণ্ডু কপালে যদি কৃষিপথর অবরূপ করে মনোহরী বীজ

সরবরাহের দ্বারা কিছু জলপটি দেওয়ার ব্যবস্থা না করেন, তবে যা শুকাতে যে পরিমাণ সম্ভব নেবে, তাতে (স্থানীয় সংবাদে বলা হচ্ছে) স্থানীয় কৃষকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে।

আশা করি, ভারপ্রাপ্ত দপ্তর এ বিষয়ে কিছু ফিরিয়ে থাকবেন না। সুবাহার একটা অল্প বশোবস্ত নিশ্চয় তাঁরা করবেন, অথবা করছেন।

বারশ বেকার

সাতারাত বারশ বেকার সৃষ্টি করে মণীন্দ্র মিল ও বি, টি, মিলের মালিক মিলের ফটক বন্ধ করে দিলেন। শ্রমিক-মালিকের মতবিরোধ যখন মীমাংসার পথ ধরেছে, ত্রিক তখনই কাণ্ডটা ঘটল।

স্থানীয় সংবাদ সাপ্তাহিক জনমতে প্রকাশ:

"মণীন্দ্র মিলের শ্রমিকদের নির্দিষ্ট তারিখে শেয়ারত দিতে রাজী হওয়ার এবং আগামী চার মাসের মধ্যে নতুন স্কীম কার্যকরী করে সমস্ত বেকার শ্রমিকদের পুনরায় কাজ দেবার অথবা উৎপাদন শুরুর কমে বাড়ার যার মিল চালু করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার এই জরু থেকে চুক্তি অনুযায়ী মণীন্দ্র মিলে আংশিকভাবে এবং বি, টি, মিলে পূর্ণত কাজ আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু ১০ই জুন থেকে দুই এলই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।"

ইউনিয়ন পক্ষের বক্তব্য: মালিক শ্রীশ্যামালাল চৌধুরী বি, টি, মিলের একটি বিরোধীরা বিষয়ে একতরফা ব্যবস্থা গ্রহণ করার পুনরায় বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। অল্পচ বিরোধী সম্পর্কে বিগত ৪টা জুলাই অন্যতর কমপন্স গৃহীত হয়। কিন্তু মালিকের মনোমত হল না। শ্রীচৌধুরী চুক্তি ভেঙে স্বেচ্ছাচারের আশ্রয় নিলে ইউনিয়ন বাধ্য দান করলেন। বেগাতক দেখে শ্রীচৌধুরী নাকি সেজ্ঞনাই ১০ই জুন কলকাতা পাড়ি দিলেন। গভীর রাতের অন্ধকারে।

বন্ধ হল মিল ফটক। বন্ধ হল শ্রমিকের মজুরী। পরদিন সকালে দুই মিলের বারশ শ্রমিক জানলেন তাঁরা পুনরায় বেকার।

মিলমালিকের মিল নিয়ে এই ঠাট্টা বার-শত পরিবারের মূখের অঙ্গ কেড়ে নিতে পারল এমন অশুভ হঠকারিতার সঙ্গে এ বোধ স্বকর্ণেও বিশ্বাস্য সংবাদ বলে মনে হয় না। অথচ ঘটনা যদি তাই-ই হয়, তবে মালিক-মুখাপেক্ষী শ্রমিক জীবন যে আজও কয়েক শতক পিছিয়ে আছে তা বলাই বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তর এই খেয়ালখুশির রাজহাে একটু নজর দিন, বারশ পরিবারের বাড়ী-জাত বস্ত্রের এই অভিনব পন্থা অবিলম্বে বন্ধ করুন—সাধারণ মানবিক চেতনার সচেতন মনকে রাগেই সে অত্যাচারে পুড়েছে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

।। চতুর্ভাষিক প্রবাহ ।।

এই বাঙালীর নীল প্রস্তুতের সাধনা কোন অসম্ভব হলো।

পৃথিবীর সব থেকে সেরা নীল প্রস্তুত করল বাঙালী। শুধু কোয়ালিটিতেই অন্যান্য দেশকে ছাড়িয়ে গেল না—পরিমাণও সকলের চেয়ে তার মাথা উঁচু হয়ে উঠল।

হিসাব করে দেখা গেল, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড নীল খরচ করে। একলা বাংলা দেশ থেকেই তা সেই পরিমাণ নীল সরবরাহ হতে পারে। ওরিয়েন্টাল কমার্সের পাতায় নীলকে বেঙ্গল করে বাণিজ্যের সেই অভ্যস্ত কৃতিত্বের কথা সোনার লেখার মত অনস্বয় করছে—

Only Bengal could supply the whole amount of nil, consumed by the world.

পৃথিবীর কোন কোন দেশে বাংলা দেশের নীল রপ্তানি হয়েছিল তার একটা হিসাব নিচে দেওয়া হলো।

ডেনমার্ক	—৩৮,১৬২	পাউণ্ড
রাশিয়া	—২,৯৬,৮৭০	"
সুইডেন	—৪৬,১১৮	"
পোল্যান্ড	—৮,৫৪২	"
জার্মানি	—২০,৮০,০০০	"

ওপরের এই রপ্তানির হিসাব শুধু ১৭৯৯-১৮০০ সালের।

মানুষের এককনের রঙ। ইংরেজরা এই উদ্ভিদের শিকড় এনেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে। এই গাছের থেকে কমলা রঙ প্রস্তুত করল বাঙালীরা। এই গাছের শিকড় খুব দীর্ঘ এবং চিকন। তাড়লেই দেখা যায় চমৎকার কমলা রঙ জ্বলজ্বল করছে। ধরে ধরে বাঙালীর গৃহস্থবধূরা এই রঙ তৈরি করার কাজ করতে লাগল। প্রায় একটি কুটিরশিল্পে পরিণত হল এই রঙ প্রস্তুতের কাজ।

আজও একটি ভরসাপূর্ণ পণ্যরূপে। শুধু বাংলা দেশ থেকেই ১৮০১ সালে ১০,৩৬১ পাউণ্ড আফ্রিকা ইংল্যান্ডে রপ্তানি হয়েছিল। ইউরোপের দেশে দেশে ওয়শ তৈরিতে আফ্রিকার তখন খুব চাহিদা। চীনে তো কোন পরিবারে আফ্রিকা ছাড়া চলতো না। বিহারে গছার ধারের পলি নাচিতে আফ্রিকার চাষ হতো। এই আফ্রিকা বাংলা দেশ থেকে দূর প্রাচ্যে আর পূর্ব প্রাচ্যের স্রোতায়, নালয় আর বোনিওতে রপ্তানি হতো। শুধু ১৮০৫ সালে বাংলা দেশ থেকেই ৫৬,৬৬,৮৮৮ সিকা টাকার আফ্রিকা রপ্তানি হয়েছিল।

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, বঙ্গ বয়নের এবং নানারকমের বস্ত্র প্রস্তুতে বাঙালীর কৃতিত্ব অসামান্য এবং অভূতপূর্ব। বাঙালীর বাণিজ্যের প্রাচীন ইতিবৃত্তে আছে—

Cloths are manufactured in

Innumerable quantities in almost all the parts of Bengal and are distinguished by the various names, according to the fabrics and the places, where manufactured.

বাংলা দেশের জেলায় জেলায় প্রচুর পরিমাণে কাপড় প্রস্তুত হতো। সেইসব বস্ত্রের বিভিন্ন নাম ছিল। নামকরণ করা হতো যে গুতো দিয়ে তৈরি সেই গুতো কিম্বা জায়গার নামানুসারে। যেমন—

পাকতা তৈরি হতো পাটিনায়, চটগ্রামে, নালদহে, কররাবাদে।

নলবল তৈরি হত এলাহাবাদে, কররাবাদে, শান্তিপুরে, গাজীপুরে, মেদনীপুরে।

তালিকা সম্পূর্ণ করতে গেলে দীর্ঘ হয়ে পড়বে প্রবন্ধ। তবে, বঙ্গ বাঙালীর বাণিজ্যে সেকালে প্রধান পণ্যরূপে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলা দেশ থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গণায় তো বেতই, সুদূর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশে দেশেও রপ্তানি হতো।

১৮০০ সালে ইংল্যান্ডে রপ্তানি হয়েছিল নীল রঙের কাপড় চার হাজার সিকা টাকার, কোটক কাপড়ও গিয়েছিল ছয় হাজার সিকা টাকার আর কাপেট রপ্তানি হয়েছিল সাত্বে তিন হাজার সিকা টাকার।

সাধারণভাবে আমরা জানি, মদ বুঝি ইউরোপেই প্রথম তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সুদূর কালের সেই বিস্মৃত অতীতের প্রাচীন শিল্পের

সাপ্তাহিক বসুদত্তা

সর্বত্র সোমরসের উল্লেখ দেখা যায়। সোমরসের আর এক নাম ছিল বাকস্বী। এই বাকস্বী স্বল্প বহাদেব পান করতেন, পান করতেন অন্যান্য দেবদেবীরা। বর্তমানের বিভিন্ন ঐশ্বর্য ও যোগ্যতায় সোমরস ব্যবহার করতেন।

ভারতের আদিকাব্য শুধু নয়, মহাকাব্য রামায়ণের কাহিনীতেও পৌরাণিককালের সেই ভাষ্যভরণে মনের প্রচলনের উল্লেখ আছে। রামায়ণের এক কাহিনী আছে, কিংবদন্তি মণিটের আশ্রমে এলে বশিষ্ঠ উক্কট নদ্য নিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করেছিলেন।

শুধু রামায়ণ নয়। মহাভারতেও ইতস্তত অনেক বৃত্তান্ত আছে। মহাভারতে বন্যপান শরীত লেখা আছে—

ভারতান্য বানবান্যঃ স্ব্যাপানম্ বর্ণ্যতে।

উভৌ মন্বয়ৌ কীবৌ উভৌ চন্দ্রচচিতৌ
উভৌ পদকং কলিনৌ বৃষ্টৌ নো কেবলান্নৌ।

ক্রীক ও অর্জুন উভয়েই মদ্য ও আশ্বপানে
রক্তকু উভয়েই চন্দ্রচচিত আর মনের প্রভাবে
কালী করণের প্রলাপ করছেন।

মহাভারতের মোক্ষৈকবংশ কবন হয়েছিল।

ভাষ্যভরণের বহুত্ব—বাকস্বী মদিরঃ পীষা

বশোন্মাদিত চেতনাঃ।

অজানতামি বা ন্যোনাঃ চতুঃপদ্যকং বহিঃ ॥

মদের প্রভাবে তাঁর পরস্পর চিনতে না
পেলে, বৃদ্ধ করে স্বপ্ন হয়েছিল। কালীকিয়াস-
ভাষ্যও আছে—

পীষা, পীষা, জুঃ কীষা পশাতধরনীতলে।

উষায় চ পুনঃ পীষা পুনর্জন্ম ন বিদাতে।

বাও বদ—বারে বারে বাও, যদি পাড়ে বাও,
ভাষ্যের বাট থেকে উঠে পাড়িয়ে আবার বাও।
আবার বলে আর পুনর্জন্ম হবে না।

যেদ্রুপ বতাবীতে বৈকুণ্ঠবর্ষের বন্যার
গর্ভিত হয়ে গিয়েছিল দেশ, সেইসব শাক্ত-
বৈষ্ণব অভ্যর্থনা হয়েছিল। বৈকুণ্ঠবর্ষের ভেতরে
কত কুছুখাওয়া আছে, কত বৈষ্ণব আছে,
শাক্তবর্ষে ক্রিঃ কত পতিবাণে ভোগবাসনা
উচ্চারিত। এই শাক্তবর্ষের প্রভাবেই অতীত-
কালের ঝংলায় সুরার প্রচলন হয়েছিল বলে
বলে।

ঐতিহাসিকভাবে কলা যায়, বাংলা দেশে
মদের ব্যবহার এই কারণেই বাণিজ্যের
ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেয়েছিল।
প্রাচীনকালের সেই বাকস্বীর ইতিবৃত্ত বলছে,—
Large quantities of this spirit are
manufactured in Bengal, some of
which is not inferior to the
Jamaica and Rum of England.

ইসলামের বানের চেয়ে বাংলার মদ
কোন অংশে কম নয়। বাংলা দেশে মদ তৈরির
প্রধান উপাদান হচ্ছে গুড়। গুড়ের সঙ্গে জল
মিশিয়ে গিটবে আল দেওয়া হয়। এই গুড় আর
জলের যে নির্বাণ বেরোয়, তাকেই রিকাইন
করে নিলে তৈরি হয় মদ। এই মদ খেতে খুব
সুখাপু, জলের মত স্বচ্ছ তাঁর রঙ।

বাংলা দেশের 'স্মারক এন্ড কোম্পানী' নামে
একটা কোম্পানী বছরে ১০,০০০,০০০
গ্যালন মদ পিট্রি ও রান তৈরি করত।
১৯০৫ সালে ১,৩৬,১৫৩ টাকা পিট্রি
মিশনে বন্দারী করা হয়েছিল। বাংলা দেশ
থেকেই প্রচুর মদ ফ্রেন্সে গিয়েছিল।
যেত পশ্চিম ভারতীয় দীপসমূহ, যেত মালয়ে
জাভা আর বোর্নিওতে। একদিন এই দেশে
মদের ব্যবসা প্রচুর সম্বলিত করেছিল।

বাতাবীর আর একটি প্রাচীনতম ব্যবসা—
সিল্ক বা কোণের কাপড়ের ব্যবসা। সিল্কের
আদি ইতিহাস আরোচনা করতে হলে পায়ে
পায়ে চলে যেতে হবে কেই সুব কুরাঙ্গের
সুন্দর অতীতে। মহাকাব্য হোমার তাঁর মহাকাব্য
'ইলিড' রচনা করেছেন, কিন্তু তিনি জানতেন
না পৃথিবীতে সিল্কের অস্তিত্ব। গ্রীসের সের্ত
বিজ্ঞানী হেরোডোটাস তাঁর সঙ্গে অনেক অভি-
যাত্র মিশরীয় এবং পারসিকের মধ্যে আসাপ
ছিল, কিন্তু তাঁরও অজ্ঞাত ছিল এই বিজ্ঞানের
পথ—সিল্ক।

ভারতের এল বৃষ্টপূর্ব মদ ৩৫০। এইসময়
জগতের আদিমতম বিজ্ঞানগুরু গ্রীসের
অভ্যর্থনা করতেন। সিল্কের ইতিহাসে লেখা
আছে—

The most ancient naturalist,
Aristotle gives the account of
silkworm. He describes it as a
worm, that it passes through
several transformations in the
course of six months...

কোনকালের পোকা থেকে যে সিল্ক উপস্থাপ
হয়, সেই সময়ের কথা গ্রীসের সের্ত প্রথম
পৃথিবীবাসীকে জানিয়েছিলেন।

জ্যোতির্বিদ্যার গ্রীসের বিখ্যাত ভূগোল-
বিদ। ভূগোলশাস্ত্রে তাঁর অবদান সর্বজন-
বিদিত এবং অতুল্য। জ্যোতির্বিদ্যাকে
অগণ্টার সাহিত্যেছিলেন পৃথিবী পৃষ্ঠে।
সময়টা ছিল মদ ১৪ বৃষ্টপূর্ব। তাঁর জন্মের
সময়টি অগণ্টার আগে ছিল, মদ প্রায়
দেশের একটা ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত রচনা
করে গিয়েছেন। তিনিই প্রথম গ্রীসের
ভূগোল লিখেছিলেন। ইউরোপের মানুষকে
তিনিই জানিয়েছিলেন।

আশ্চর্য একরকমের পাছ জন্ম। এই পাছ
বেশমণ্ডল হয়। পাতার কাঁকে কাঁকে
থাকে সেই কাঁট। এই কাঁট থেকে এক আশ্চর্য
সুন্দর সিল্ক তৈরি করে ওদেশের লোক।
সেই বস্ত্র একবারে অসাধারণ বিস্তারিত
গোষ্ঠাগাবতী বৃষ্টবের মহিলারাই পরতে পারেন—

That the use of it was restric-
ted to a few women of the greatest
fortune, that its price was...we
are not informed, but it must
have been extremely high....

সিল্কের অস্তিত্ব জানতেন, জানতেন
না আর কিছু। আরোচনা শতাব্দীতে এটি আদি-
মিহানের মহিলা প্রাণীরা করতেন,—আবার
একটা কথা ছিল—

—কি?

—একটা সিল্কের গাটিন জাইব।

সিল্কের গাটিন। সম্রাটের প্রাণে ছিল
ছায়া নামের। প্রাণাধিক প্রিয় মহিলা। কিন্তু
কেনন করে—কেনন করে তাঁর প্রাণনা
পুরণ করবেন। তাঁর রাজ্যে এই সিল্কের
অস্তিত্ব নেই। কিন্তু শ্রম করে 'বা' বলতে
পারবেন না। বলবেন—আছে আছে—ভোগ্য
বহুল্যের সোনার অলঙ্কার বাসিন্দে নিতে
পারি রানী। কিন্তু সোনার মুক্ত্যও সিল্কের
গাটিন নিতে পারবেন না—কোথা থেকে
দেব—কোথার পাখো—

(কল্পনা)

ছাত্রদের অপরিসংখ্য প্রশ্ন
বতীব্রত চেষ্টাশীল্যের

পালানো

—ইহাতে আছে—

এমি বক্রিভূত রচিত সন্ন্যাসীদের কীর্তী—
'কীর্তী-বক্র', কীর্তী বক্রনাথের
পালানো বক্রনাথের এবং বক্রনাথের
কীর্তী বক্রনাথের বক্রনাথের বক্রনাথের
বক্রনাথের বক্রনাথের বক্রনাথের
বক্রনাথের বক্রনাথের বক্রনাথের

বক্র এক টাক

বক্রকীর্তী বক্রনাথের বক্রনাথের

বক্র-সংহার কাব্য

বক্র—কীর্তী টাক

বক্রতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৯৬, বিপিনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

* ঐতিহাসিক কথা

নিত্যানন্দপুর

পূর্বে বেহুলা, দক্ষিণে কুলিত প্রবাহিনী। মাঝখানে প্রায় কোণ ঘেঁষেই ক্ষুদ্রায়তন কিন্তু অতি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নয়নাভিরাম এক ভূমিখণ্ড নিত্যানন্দপুর। পাঁচশো বছর আগে বার খ্যাতি কিছ ছিল না বললেও চলে। অধিবাসী বলতে কয়েক ঘর জেলে, কিছ কুমার, আর এখানকার প্রাচীনতম অধিবাসী চন্ডাল পরিবার। কিছ চাষবাস, প্রয়োজনে লাঠিয়ালী এবং সময়ে সময়ে দস্যুবৃত্তিই ছিল যাদের জীবিকা। কুম্ভকার এবং মৎস্যজীবীরা বলাই বাহুল্য তাদের জাতব্যবসাতেই লিপ্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে নিত্যানন্দপুরের আদিবাসী এই চন্ডালরাই। আজও এদের ঘরে কালীপূজো হয়, বার বরস প্রায় সাতশো বছরের কাছাকাছি। আকারে-প্রকারে ইনি ডাকতেকালী, অনুমান করা যেতে পারে দস্যুজীবনের নিরাপত্তা রক্ষার্থেই স্থাপনা এবং পুজোর প্রচলন করা হয়েছিল এর।

নিত্যানন্দপুর নামকরণ নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ বলেন সুরধুনীর দুই তীরে বৈকুণ্ঠ প্রচারকালে স্বয়ং নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পদার্পণ করেছিলেন এখানে। সংকীর্তন সহযোগে বাসও করেছিলেন ত্রি-মারি। সেই সৌভাগ্যকে স্মরণীয় করে রাখতেই স্বয়ং শ্রীরঘুনাথ দাস গোম্বামী স্থানটির

নামকরণ করেন নিত্যানন্দপুর। তার পূর্বে সমগ্র স্থানটিই ছিল সরকার সাতগাঁও-এর অন্তর্গত। বৃহত্তর সন্তগ্রামের একটি অংশ-বিশেষ।

অপর মত : এই বেহুলাই নাকি সেই বেহু-লার প্রবাহিনী। মৃত পতির গলিত দেহ কোলে নিয়ে গংগাজলে ডাসতে ডাসতে বার মোহনার এসে নেতা ধোপানীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন চাঁদবেনের পুত্রবধু সায়বনের কি সতীকুলরাণী বেহুলা। নেতা ধোপানী

শারদ ভট্টাচার্য

সেই সুরলোকের রজকিনী, ছশ্মবেশিনী মনসা সহচরী, জ্যান্ত ছেলে মেরে রেখে সারাদিন কাপড় কাচতো যে, তারপর সন্ধ্যাবেলা সেই ছেলেকে আবার জীবিত করে বুক নিয়ে ফিরে যেতো আপন ঘরে। গংগা ও বেহু-লার এই সংগমস্থলের কাছাকাছিই কোথাও নাকি বাস ছিল তার।

উপর-উক্ত দুটি মতের কোনটিরই প্রামাণ্য ইতিহাস কিছ নেই। শ্বিতীয়টি তো প্রায় রূপকথারই সামিল। প্রথমটির প্রমাণ কিছ না পাওয়া গেলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ আচন্ডালে কোল দেবার রত নিয়ে ধর্মপ্রচারে নেমে ছিলেন যিনি, সেই মহা-প্রভুর পক্ষে অনুমত এবং অবহেলিত মানব-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এই অঞ্চলটিতে নবধর্মের

আলোক-স্রাবন বইয়ে দেবার ইচ্ছা জেগে থাকা স্বাভাবিক। বিশেষত পাশের গ্রাম রঘুনাথ-পুর। সম্ভবত মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্ব ছয় গোম্বামীর অন্যতম গোম্বামী শ্রীরঘুনাথ দাসের নামানুসারেই বার নামকরণ হয়ে থাকবে। একইসঙ্গে নিত্যানন্দপুর এবং রঘুনাথপুরের একেবারে গারে গারে অব-স্থান গভীর অর্থবহ। শ্রীরঘুনাথ দাস এবং মহাপ্রভু নিত্যানন্দের একত্র অবস্থানের স্মৃতিবাহক বলে অনুমান করলে আশ্চর্য হবার কিছ নেই নিশ্চয়ই।

কিন্তু তারপরেও, অর্থাৎ নিত্যানন্দ মহা-প্রভুর আগমনের পরেও বহুকাল পর্যন্ত প্রায়-পরিত্যক্ত এলাকা রূপেই পড়ে রইল এই নিত্যানন্দপুর। জগলাকার্ণ : এই বিশাল ভূখণ্ডে প্রথম একটি সদৃ-সংস্কৃত জনপদ পুস্তনের গৌরব বার, তিনি হলেন এখানকারই ভট্টাচার্য বংশের এক পূর্বপুরুষ, নাম রামশংকর ভট্টাচার্য। রিবেণী সমিহিত বান্দাপাড়ার বিখ্যাত উদ্ভ-সাধক এবং পণ্ডিত শ্রীচন্দ্রশেখর বাচস্পতির পৌত্র তৎকালীন অন্যতম প্রেষ্ঠ জ্যোতিষ এবং ন্যায়-শাস্ত্রী গদাধর ন্যায়রত্নের পুত্র। শংকর নিজেও নামকরা পণ্ডিত ছিলেন এবং সাংসারিক বিষয়বস্তুখণ্ড তাঁর ছিল যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে নিত্যানন্দপুর এবং তৎসমিহিত জমিদারী ভট্টাচার্যদের স্ব-অর্থ-ক্ৰীত সম্পত্তি নয়। নবাব সরকার থেকে নিষ্কর রক্ষারূপে এই সম্পত্তি প্রাপ্তির একটি প্রাচীন এবং কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস আছে।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদে তখন নবাব সরকার খাঁ। সেই সময়েই একদিন, এক সূর্যোদয় পূর্ববর্তী ব্রাহ্ম মূহুর্তে পূণ্যভূমি রিবেণীর ঘাটে আবক্ষ গংগাজলে দাঁড়িয়ে ইষ্টস্তব করছিলেন বান্দাপাড়ার পণ্ডিত এবং সাধক চন্দ্রশেখর বাচস্পতি। পাশ দিয়েই ভেসে যাচ্ছিল নবাবী বজরা। শূন্য ঘাটে অপর কোন লোকজন না দেখে স্তবপাঠরত চন্দ্রশেখরকেই ডেকে প্রশ্ন করলো নবাবের কোন এক অনুচর : ঠাকুর আজ কি তিথি ?

অন্যমনস্ক চন্দ্রশেখর উত্তর দিলেন : আজ পূর্ণিমা।

পলকে প্রলয় ঘটলো। গবাক পক্ষে স্বয়ং নবাব শুনলেন সেই উত্তর। প্রকৃতপক্ষে সেদিন ছিল অমাবস্যা। শিখাসু-হযারী ব্রাহ্ম সামান্য তিথির সংবাদটাও রাখে না।



শ্রীরামশংকর প্রতিষ্ঠিত চন্ডীমন্ডপের একদৃশ

এ অপরাধ অস্বাক্ষরীয় বলে মনে হলো তাঁর কাছে। প্রথম করে হুকুম দিলেন, প্রাণকে আটক করো।

সচ্যকিত হলেন চন্দ্রশেখর। না জ্ঞান কোন খেলালে ছিলেন তিনি। ভুল বলেছেন। মিথ্যা উচ্চারণ করেছে আজন্ম সত্যসেবী জিহবা। পূর্ণ দৃষ্টিতে পূর্বাকাশ গানে চাইলেন একবার। দিক দিগন্ত হিরণ্য বর্ণে রঞ্জিত করে দেখা দিচ্ছেন জ্বাক্ষুস্ম সঙ্কাশ তিমির বিদারী মিহির। ঘুমভাঙা পাখী-দের গীতি কলরবে ভরে গিয়েছে আকাশ। দৃষ্টি সরিয়ে আর একবার গগন্যর পানে চাইলেন তিনি। কল-কলসনা সরু ক্রেতাম্বিনী ভাগীরথী, নিম্ন প্রবাহিতা অনন্ত আনন্দে সিদ্ধ সগম পানে। দৃঢ় হলেন চন্দ্রশেখর। করাগুণি সশ্বেতে নিবারণ করলেন নবাবী সাম্রাজ্যের। নিবেদন করলেন তাঁর অশ্রু স্পর্শ করতে। ঘোষণা করলেন উচ্চারণ স্বপ্ন করেছেন তখন পঞ্জিকার হিসেব যাই হোক আকাশে আজ পূর্ণ চন্দ্রের উদয় মূর্তি। নিরমর্তাত্মিক প্রকৃতিতেও দেখা দেবে অনিরমের ক্ষয়টন। তারপর সেই প্রথম প্রত্যক্ষ জ্ঞানে, সুবর্ণালয়ের সেই শান্ত মুহূর্তে, সিন্ধু বসন, সিন্ধু দেশে গগ্যত্ররঞ্জিত সিন্ধু সেই বালুকা-রাশির উপরে পদ্মাসনে ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন চন্দ্রশেখর। চারপাশে ঘিরে রইল নবাবের শাসন প্রহরী। গগন্যর দুই তীর তখন ভরে গিয়েছে অগণিত উৎসুক নর-নারীর ভিড়ে।

সম্মোহিত হলো। দিক দিগন্ত ছারাবধ করে হস্ত গেলেন দেব দিনকর। আর পূর্বচালের প্রান্তস্থান আলোকিত করে ধীরে ধীরে যেন ধরণীর কোল ফুড়ে আবির্ভূত হলো পূর্ণ প্রভা পূর্ণ তিমির পূর্ণলোক পূর্ণচন্দ্র। অপেক্ষমাণ জনতার উল্লসিত জয় জয় ধ্বনিতে ভরে গেল আকাশ। সম্মোহিত নবাব স্বয়ং নেমে এলেন বজরা থেকে। জানু পেতে বসলেন গগ্যাত্রীর সেই ভিজে বালুকার উপরে। মাথা নত করে জানালেন অভিনন্দন। পরিশেষে নবাবী পাজার উপরে স্বহস্ত লিখিত এক ফারমান দিয়ে গেলেন, নবাবী আমতাবলের সবচেয়ে তেজস্বী ঘোড়ার এক নিম্বাসের দৌড় যতদূর; বংশানুক্রমে চন্দ্রশেখরের অধিকারভূক্ত এলাকাও ততদূর। সাধক রাজপের জমিদারীর কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন আগ্রহও তাই দেখান নি চন্দ্রশেখর। যজন-সাজন, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা নিয়েই দিন কাটতো তাঁর। অবশিষ্ট সময় পশুপক্ষির আশ্রয়ে শান্তি সাধনায়।

প্রথম এ সম্বন্ধে অবহিত হলেন শংকর। চন্দ্রশেখরের পোষা। কুশাগ্রবৃদ্ধি তীক্ষ্ণধী হুবা। বাংলায় তখন আলিবর্দীর কাল। দূর মহারাজ্য থেকে হানা দিয়েছে বর্গীর দল। গ্রাম-নগর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, জনপদ পত্তন রতস্রোতে ভাসিয়ে উন্মাদ কল্লর মত প্রতিদিন

নিকট থেকে নিকটবর্তী হচ্ছে তারা। চিন্তিত হলেন শংকর। বাম্পাড়াড়র একেবারে উপর দিয়েই চলে গিয়েছে গ্রিবেশী-সুর্শিদবাদ রোড। বর্গীর আসার রাজপথ। এই পথ দিয়েই আসবে বর্গী। এবং বাম্পাড়া রক্ষা পাবে না তাদের আক্রমণের হাত থেকে। অধিক চিন্তা করলেন না শংকর। কাল বিলম্ব না করে বাম্পাড়াড়র বাস ওঠালেন তিনি। পিতা পরিজন এবং খুব সম্ভব অতিবৃদ্ধ চন্দ্রশেখরকেও সঙ্গে নিয়েই বাম্পাড়াড় ত্যাগ করে চলে এলেন কুন্তি-বেহুলা নদী তীরবর্তী প্রায় প্রাকৃতিক পরিখা বেষ্টিত অতি সুরক্ষিত স্থান এই নিত্যানন্দপুরে। বন কাটালেন, বসত করলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন অলঙ্কৃত সুউচ্চ যুগ্ম শিবমন্দির। ভোগঘর, নহবৎখানা সহ প্রকাণ্ড চণ্ডীমন্ডপ, উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত চার মহলা বিশাল অট্টালিকা। অরুণময় নির্জন ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হলো একটি সুন্দর সুসংস্কৃত জনপদ।

চন্দ্রশেখর প্রসঙ্গে এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রিবেশীর জগন্নাথ তর্কপণ্ডানের জ্যেষ্ঠ পিতামহ বিখ্যাত চন্দ্রশেখর বাচস্পতিই যে বাম্পাড়াড়র চন্দ্রশেখর বাচস্পতি এমন ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে কোথাও কোথাও। কিন্তু এটি ভুল। জগন্নাথ তর্কপণ্ডানের জ্যেষ্ঠ পিতামহ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ঠাকুরমা বিনি তিনি চন্দ্রশেখর বিদ্যা-বাচস্পতি। তাঁর উপাধি ব্যাকরণে। তাঁর বসবাসও ছিল মূল গ্রিবেশীতেই এবং আজও তাঁর বংশধররা বসবাস করেন সেইখানেই।

বাম্পাড়াড়র চন্দ্রশেখর বাচস্পতি উপাধি-ধারী। তিনি খ্যাত ছিলেন তন্ত্রে। সিদ্ধ-তন্ত্র-সাধকও ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাধন এবং সিদ্ধপীঠ পশুপক্ষির আসনটি ভ্রামদশায় হলেও আজও টিকে আছে

বাম্পাড়াড়র, এবং ভট্টাচার্য বংশের একটি শাখা আজও বলবল করছেন কল্যাণে। তাঁর পুত্র গদাধর। জ্যোতিষ এবং ন্যায়শাস্ত্র অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন তিনি। শোনা যায় জ্যোতিষেরই কোন এক বিজ্ঞ নিরে একদা জগন্নাথ তর্কপণ্ডানের সঙ্গে কিছু মনো-মালিন্য ঘটে তাঁর। প্রথম জগন্নাথ অভিশাপ দেন ভট্টাচার্য বংশে জ্যোতিষের চর্চা থাকবে না। যদি কেউ জ্যোতিষ চর্চা করেন তবে অকাল মরণ হবে তাঁর। পরবর্তীকালে এই বংশে আর কেউ কখনও জ্যোতিষ চর্চা করেছেন বলে শোনা যায় নি।

যাই হোক যুগ্ম চন্দ্রশেখর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাশ্রিত অবসানকালেই এত কথার অবতারণা করতে হলো। তৎকালীন গ্রিবেশী তথা যুগ্ম সমাজের দুই বিখ্যাত পণ্ডিত এক দিকপাল গ্রাম। কিছুটা সমসাময়িকও বটে। কিন্তু কোনক্রমেই এক কিংবা অভিন্ন নন।

চন্দ্রশেখর কিংবা রাজশঙ্করের স্মৃতিচিহ্ন সর্বত্রই বহন করে আজও টিকে আছে কিছু ভাস্কর্য, কিছু সঙ্কত, একলা বিশাল ভট্টাচার্য বাড়ি। গ্রাম চার শতকের অধিক পুরাতন প্রকাণ্ড চণ্ডীমন্ডপ। বংশানুক্রমিক সুর্শা-শুজার গীতি আজও সেখানে অক্লান্ত আছে। প্রথমত কালীপূজাও হয়ে থাকে প্রতি বছর।

আর আছে গ্রামের একেবারে এক প্রান্তে ইশানের বেশ খেঁচ, আকাশের পারে মাথা তুলে, বেহুলায় জলে স্নান কোলা বন্ধবে জেজ্ঞা সুউচ্চ দুই শিবমন্দির। এই আশ, জাম, কট, তেঁতুলের ছায়ার ঢাকা, কচ্ছপা আর কসাড়ের কোপে কোপে ঘেরা অতি সমধারণ গ্রাম প্রান্তের নিভান্ত বিশেষত্বহীনতার মধ্যেও যারা মানুষকে টানে, মুগ্ধতার বিস্ময়-অঙ্গন এঁকে দেয় তার চোখে।

প্রতিষ্ঠাতার নামশঙ্কর ভট্টাচার্য। শিল্পী



নিত্যানন্দপুরে প্রবেশের দ্বিতীয় পথে বাঁকের সড়ক



অবহেলিত শিবমন্দির (ভূমুদ্রবহ-নিত্যানন্দপুর অঞ্চল)

শ্রীচিন্তামণি দে। প্রতিষ্ঠাকাল অনুমান ১৭০০ শকাব্দ।

চতুষ্কোণ চৌচালা পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির। সর্বাঙ্গের অলঙ্করণে শতাব্দীর বিস্ময়। শিল্পীর স্বপ্ন অক্ষর হয়ে আছে মূর্তিপেদের সৌন্দর্য-স্বাক্ষরে। পোড়ামাটির অলঙ্করণ-শিল্পের এমন সুন্দর নিদর্শন বাংলার মন্দির শিল্পে আজ আর খুব বেশি নেই বললেও চলে। মূর্তিময় যে কর্ণাট মন্দির মহাকালের অশ্রুত অক্রমণ উপেক্ষা করেও টিকে আছে নিত্যানন্দপুরের শিবমন্দির দুটি ভাদের অন্যতম। অজল্লা-ইলোরার গৃহা শিল্প নয়, নয় দক্ষিণ ভারতের প্রস্তুত ভাস্কর্য। তথাপি বাঙালী মূর্তিশিল্পীর দক্ষ হাতও যে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কিছু কম নিপুণ ছিল না, তারই অক্ষর প্রমাণ উৎকর্ণী পাওয়া যাবে মন্দির গায়ে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও যে সৌন্দর্য এতটুকু স্থান হয় নি।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে হিন্দু দেবমন্দিরের অলঙ্করণের মধ্যে একই ক্ষেত্রে প্রায় অগাণ্ণভাবেই স্থান পেয়েছে

ইসলামী জাফরী ও কলকার কাজ। নানা ভাঙাতে উপবিষ্ট এবং দণ্ডায়মান বৃক্ষমূর্তি এবং দেবদেবী ও ঘটনা সম্মিলিত হিন্দু অলঙ্করণেরাতি। খুব সম্ভব বাংলার শিল্পী মহলে এমন একটি সময় এসেছিল, যখন অদ্যত শিল্পের ক্ষেত্রে সকল রকম জাতি, ধর্ম এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার সেরা বস্তুটি আহরণ করে নেবার একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। শিল্প বা ধর্মের ক্ষেত্রে এই উদারতা বলাই বাহুল্য আজকের যুগেও প্রায়শই অনুপস্থিত।

মধ্যে কিছুকাল যাবৎ মন্দির দুটি জীর্ণ, অলঙ্করণগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত এবং দেবতা পূজারাহিত হয়েছিলেন। গ্রামবাসীর সম্মিলিত উদ্যোগে এবং দানে গত ১৯৬০ সনে প্রায় দু-হাজার টাকা ব্যয়ে মন্দির দুটি সংস্কার এবং অমূল্য অলঙ্করণগুলির সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। দেবতাও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সেবাপূজাও পাচ্ছেন এখন নিয়মিত। সরকারী প্ররতত্ত্ব বিভাগের মূখ না চেয়ে বাংলার মন্দির তথা মূর্তিশিল্পের এই

অমূল্য নিদর্শন দুটিকে রক্ষা করতে গ্রাম-বাসীরা নিজেরাই যে উদ্যোগী হয়েছেন এজন্য তাদের ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ যে কেবল হুজুমে পড়ে একটিবার মাত্র সংস্কার করিয়েই ক্ষান্ত হন নি তারা। বছর বছর নিয়মিত করিয়ে যাচ্ছেন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরি-বর্ধন এবং মেরামতির কাজ।

অবহেলিত দেব-দেউল বাংলার যে এমন কত আছে তার আর ইয়ত্তা নেই। উৎসবে, আনন্দে, পূজার পার্বণে একদা যেখানে প্রাণা, ভক্তি, প্রীতি, বিশ্বাসের স্রাবন বইতো—প্রভাতের মণ্ডলবাদ্য, আর সন্ধ্যার শঙ্খ-ধ্বনিতে মুখরিত হতো মন্দির প্রাঙ্গণ। আজ সেখানে দিনান্তের মৃৎ প্রদীপটিও জ্বলে না। নিশান্তের শূন্যতারা তার শেষ কিরণটুকু নিক্ষেপ করে আপন করুণ প্রগতিখানি নিবেদন করে দিয়ে যায়, অধুনা উপেক্ষিত নির্জনবাস বাসিত দেবতার পদমূলে। বন্য পদ্প সুরভিত একাকী অরণ্য প্রান্তে প্রকৃতিদেবী স্বহস্তে মাজান পূজার ডাল। অযাচিত বিহগ কলম্বরে বাজে সাঁঝ-সকালের শান্তি-সংগীত। দেবতাহীন দেবালয়, আর পূজা-হীন দেব প্রতিমা,—এর চেয়ে করুণ, এর চেয়ে বেদনাসঞ্চারী বোধ করি আর কিছু নেই। মানুষের হৃদয়ের চরম আকৃতি, আর পরম বাসনা নিয়ে একদা যাদের প্রকাশ—আজ সামান্য হলেও তাদের কিছু কিছু সংস্কার এবং সেবার প্রয়োজন আছে মানুষেরই আশ্বাস ভূমি বিধানে।

(আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত)

রোমান-রত্ন গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডাক্তর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমান ও রোমানের সত্য ঘটনায় বইটির আত্মোপাত্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবন্ধনা; ছলনা ও প্রেমের লীলার চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোম হর্ষক সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৩৬, বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রিট,

কলিকাতা-১২



বিহার এল জুম্মা

ভূপেন্দ্রবিশ্বকোষের স্মৃতিস্তম্ভ

[কর্তার]

আরো খণ্ডব্দ

বহু বালিকা কণ্ঠে জড়াও পথে গেলে মৃত্যুরে।

—নজরুল ইসলাম

এক জুড়ে ব্যাপক ধরপাকড় চলেছে।
২. বহু কর্মী আটক হয়েছেন। বহু রয়েছেন
পলাতক। বাল্যসেবক-স্বামী একটি শিক্ষা দিয়ে
গেছে। সে-শিক্ষার বাণী হলোঃ “সিংহাশিতা,
পিঞ্জরাবদ্ধ হোয়ো না। হাতে অস্ত্র থাকলে,
পালাবার পথ রুদ্ধ হলে সম্মুখবন্দে আত্ম-
দান করো।”

এ শিক্ষা বড় সাধারণ শিক্ষা নয়। এর
মূল্য প্রচুর। বীরভোগ্য বসুন্ধরা। বীরের
অন্তর যদি আত্মহত্যার সংকল্পে শূন্য
থাকে তবে তাঁদের আদেশে জাতির দুর্ভাগ্য
ঘটে যায়। সবল জাতিতে পৃথিবীর কোন
শক্তি পদানত করে রাখতে পারে না।

১৯১৭ সাল। গোহাটী শহরে অনেক
পলাতক বিপ্লবী গোপনে বাস করছেন। তাঁরা
অনুশীলন সমিতির দুরন্তের দল। তাঁদের
আন্তরিক একদিন পুলিশে ঘেরাও করে।
বিপ্লবীরা লড়াই শুরু করেন। লড়াইয়ের
ফাঁকে সবাই পালিয়ে যান।... পলাতকেরা
‘নবগ্রহ’ পাহাড়ের দিকে কোথাও একত্র হন।
পুলিশ টের পায়। সদলবলে ৯ই জানুয়ারী
পুলিশবাহিনী তাঁদের পুনরায় ঘেরাও করে।
তখন রাতের অন্ধকার। বিপ্লবীরা যুদ্ধ
শুরু করেন। জনকয়েক পালিয়ে যেতে
পারেন। নীলনী ঘোষ প্রমুখ আহত
অবস্থায় ধরা পড়েন। গোহাটীর খণ্ডব্দে
পুলিশের পক্ষে তিরিশজন আহত হয়।
বিপ্লবীরা ছিলেন গুটি দশেক।...

এই বছরই সিরাজগঞ্জে ‘তেনজিয়া’
গ্রামেও গোবিন্দ কর ও নিকুজবিহারী পাল
বহুকণ ধরে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করেন।
গোবিন্দ করের দেহ সাতটি স্থানে গুলীবিদ্ধ
হয়। পুলিশ পক্ষের বহুজন আহত অবস্থায়
গোঙাতে থাকে। গোবিন্দবাবু ও নিকুজবাবু
স্বীপান্তরিত হন। গোবিন্দ কর কারাদণ্ড
শেষ করে এসে পুনরায় ‘কাকোরী-যড়মল্ল-
মামলা’র যাবজ্জীবন স্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত
হয়েছিলেন।

১৯১৮ সালের ১৫ই জুন। ঢাকা
কলতাবাজারের একটি গৃহস্থারে আবার
বিপ্লবীর পিস্তল গর্জে ওঠে। নীলনী



শ্রীঅরবিন্দ

বাগ্‌টি গোহাটী খণ্ডব্দের পলাতক বিপ্লবী।
তাঁর এবং তারণী মজুমদার হারিচৈতন্যবাবুর
আশ্রয়ে আছেন সংগোপনে। পুলিশ টের পায়।
গোয়েন্দাবিভাগের উচ্চ কর্মচারী বসন্ত
মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐ আস্তানায় পুলিশ
হামলা করে। বিপ্লবীরা বাঘের মত কাঁপিয়ে
পড়েন পুলিশের উপর। দুরন্ত সংগ্রাম চলে
অনেকক্ষণ। দুর্জয় বীর নীলনী-বাগ্‌টি ও
তারণী মজুমদার শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।
হারিচৈতন্যবাবু ধরা পড়েন ও দণ্ডিত হন।
পুলিশ পক্ষের অনেকে এবং বসন্ত মুখো-
পাধ্যায় স্বয়ং গুরুতর আঘাত পান।

অতঃপর ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২১ সাল
পর্যন্ত বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড স্তিমিত হয়ে
আসে। - তার কারণ রাজনীতিক জগতে
যুদ্ধোত্তর অবস্থার পরিবর্তন ও গণতন্ত্রের
নতুনতর যুদ্ধ-টেকনিকের আমদানি। মহা-
যুদ্ধের বিরতির পর ‘মন্টেগু-চেমসফোর্ড-
সংস্কার’ রূপে একটি মাকাল কম ধরনের
ইংরেজ ভারতবাসীকে উপঢৌকন দিলে
কংগ্রেসের নরম-পন্থী দল দেশনেতা সুরেন
বাঁড়ুজের নেতৃত্বে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে
হাত মেলান। এদিকে ‘রাউলট্-এ্যাক্ট’,
Iddian Unrest গ্রন্থে লোকমান্য তিলককে
‘evil genius’ বলে গালি দেওয়া ও
অন্যান্য কুৎসা প্রচারের জন্যে উহার লেখক
ভ্যালেন্টাইন চিরলের বিরুদ্ধে তিলক কর্তৃক
বিলেতে মানহানি মকদ্দমা আনয়ন, জালিন-
ওয়ালাবাগে বৃটিশ বর্বরতা, ঐ কারণে রবীন্দ্র-
নাথের ‘স্মার’ উপাধি বর্জন এবং গান্ধীজীর
সত্যগ্রহ আন্দোলনের আহ্বান সমগ্র ভারতে
আবার বৃটিশ-বিরোধী গণ-চেতনা গড়ে ওঠার
সাহায্য করছিল।

সত্যগ্রহ শুরু করবার পূর্বে গান্ধীজী

করোছিলেন ইংরেজের বিপক্ষে ভাষ্য
করা করে তার কাছ থেকে কিছু আদায়
করে নিতে। তাই তিনি ইংরেজের যুদ্ধ-উদ্যমে
সাহায্য করার জন্যে ভারতীয়-সেনা-সংগ্রহে
লেগে যান। এই সময়ই (১৯১৮ সনে)
বাংলা দেশে এক জনসভায় তিনি বিপ্লবীদের
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রবোদন করেন। কিন্তু
যুদ্ধোত্তর কালে তাঁর সহায়তা দানের প্রত্যুত্তরে
বিজয়ী ব্রিটিশ যখন ভারতকে 'রাউল্যাট্‌ আইন্স'
ও 'জালিনওয়ালাবাগ-মাসাকর' উপহার দিল,
তখন গান্ধীজীরা চৈতন্য হল।

গান্ধীজী অপূর্ণ শক্তিতে সত্যপ্রহ
আন্দোলন শুরু করলেন। 'বিদ্রোহপূর্ণ' এমন
আসমুদ্রাহিমাচল ভারতবর্ষ আলোকচণ্ডলে হয়ে
উঠল। বাংলা দেশে দেশবন্ধু রবীন্দ্র
গান্ধীজীকে অসীম সমর্থন দান করে। ফলে
আন্দোলন প্রাণবন্ত্য প্রচণ্ডতর হয়ে দেখা
দেয়।

গান্ধীজী ক্রমশ বুঝলেন যে, বাংলাকে
তাঁর চাই। 'নাঙলীর ইয়েশান' সত্যীত
হলান আন্দোলনই সফল হতে পারে না।
আরো বুঝলেন যে, বাংলা তথা ভারতের
বিপ্লবীদেরকে তাঁর কর্মপথে না গেলে প্রকৃত
স্বাধীনতার অবদান থেকে তিনি বঞ্চিত থাকবেন।
অধিকন্তু বাংলার বিপ্লবীদের বাতিল করে
তিনি 'নাঙলীর মন' জয় করতে পারবেন না।...

এদিকে আটক বিপ্লবী-বন্দীরাও জেল-
খানা বা অন্তরীপ থেকে ফিরে এসেছেন।
তারাও দেখলেন যে বিপ্লবের প্রস্তুতি করতেও
সময় ও সুরক্ষার প্রয়োজন। গান্ধীজীর
'সহিংসা'-র তাঁদের কিংবা নেই। তাঁরা
লোকম্যান্য ভিলককে বোঝেন। 'স্বাধীনতা
যে কোন উপায়ে অর্জন' তাকে বরণ করে
নিতে তাঁরা রাজি আছেন। কাজেই তাঁরা
শিখর বুঝলেন যে, গান্ধীজীর আন্দোলন
অবকট্ট করা হতো অসম্ভবতর, সে-আন্দোলনের
সম্পূর্ণ সুরোপা নেওয়াই বরং যুক্তিসংগত।
'হ্যা' ছাড়া গান্ধীজী এখন সশস্ত্র-বিপ্লবের
বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরেন: 'Had India'
Sword, I would have asked
her to draw it. But she
had no Sword—I ask her
to adopt Non-Violent Non-
'Co-operation.'

তিনি আরও পরিষ্কার করে আবেদন
করেন:

'Non-Violence may be
accepted as Creed or Policy.
I am out to destroy this
'Satanic Government.'

সুতরাং এসব উক্তি পর দেশবন্ধুর
অন্তরিক আত্মনে বাংলার বিপ্লবীরা

অহিংস-যুদ্ধকে রাজনীতিক কট্টনীতি হিসেবে
গ্রহণ করলেন। ফলে তাঁদের কর্ম-কংগ্রেস-
সংস্থা সংগঠনে বিশেষ করে নিযুক্ত হল।
কিন্তু তাঁদের সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন ভাঙে
ফলান হলো না। বিপ্লবীদের নেতৃস্থানীয়রা
ন্যূনতর কর্মপন্থাতি সর্বস্বত্বকরণে গ্রহণ
করলেও তরুণ দল সুযোগ বুঝলেই ব্রিটিশ-
শক্তিকে আঘাত দিতে বিধাবোধ করেন নি।
স্বাধীনতার এধারার বিদ্রোহ আমরা
১৯২৩ সালে দেখি সর্বোচ্চ মাত্রায় নেতৃত্বে
শীখারীটেলা পোল্ট আপিসে হানা দেবার
দুঃসাহসী কর্মে।

তদনপর ১৯২৪ সালে দেখি স্যার চার্লস্
টেগার্ট জমে 'ডে' সাহসের উপব আক্রমণ।



মহাত্মা গান্ধীজীর তিলক

টেগার্ট তৎকালে ছিলেন কলকাতার দূর্বর্ষ
পুলিশ কমিশনার। অতি বৃদ্ধমান ও সূক্ষ্ম
ব্রিটিশ কর্মচারী। ইংরেজের অতবড় মিত্র
এবং বিপ্লববাদের অত বড় সক্রিয় শত্রু বড়
একটা দেখা যায় না।

গোপীনাথ সাহা একটি তরুণ। দুর্জয়
শক্তির উপানক এই বীর ১২ই জানুয়ারির
(১৯২৪) সকালবেলায় চোরগাঁতে আশ্রয়স্বত
হাতে উপস্থিত। টেগার্ট মনে করে যাকে
তিনি গুলী করলেন তিনি টেগার্ট নন।
মি: ডে ব্রিটিশের হয়ে জজদানে প্রায়শচিত্ত
করলেন। বিপ্লবের শত্রু টেগার্ট অক্রান্ত
রইলেন। গোপীনাথের ফাঁস হল।

গোপীনাথের মৃত্যুতে ব্যর্থতার দুঃখ
আছে। কিন্তু গোপীনাথের ফাঁসি আছে

একটি তাৎপর্ষ্য। তখন বাংলার কংগ্রেস
বিপ্লবীদের হাতে এসে গেছে। তা'ছাড়া
ব্রিটিশ পদব্র্ণ দেশবন্ধু সিদ্ধাস্ত হৃদয় নিয়ে
কংগ্রেস কর্মীদের শীর্ষে এসে আছেন। তাই
কর্মীদের চেষ্টা কার্য হলো না। সিরাজগঞ্জ
প্রাদেশিক-কংগ্রেস-সম্মেলন পথ ও মতের
অমিল স্বাক্ষর সঙ্কেত গোপীনাথের আত্মবিলয়ন
ও বীরত্বের প্রশংসা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ
করেন। জনদ্রুপ প্রস্তাব কংগ্রেস-শাসিত
কলকাতা কংগ্রেসশালেনেও নেওয়া হয়। এতে
বিপ্লবীদের বীর চরিত্র প্রকাশ্যে প্রশংসা লাভ
করে। দেশবাসী খুশি হয়, কিন্তু ইংরেজ
ভীষণ চটে যায়। ততোধিক চটে যান
মহাত্মা গান্ধী। তিনি দেখলেন যে হিংসে
বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। কোথায় তাঁর অহিংসা-
মন্ত্র গ্রাস করবে সহিংস-মতকে—না সহিংস-
পন্থই গিলে ফেলতে চাচ্ছে অহিংসার বাণীকে।
গান্ধীজী ক্রিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁকে তুষ্ট
করার জন্যে অবশেষে কর্পোরেশান তাঁদের
প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

১৯২৫ সনের ৯ই আগস্ট বাংলার বাইরে
একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। শচীন সান্যাল,
যোগেন চক্রবর্তী প্রমুখের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে
বিপ্লবী-সংস্থা সঙ্গঠিত হয়ে উঠছিল। এই
সংস্থার কর্মীরা কাকেরী রেল স্টেশানে ট্রেন
আটক করে গার্ডের সিঁদুক ভেঙে রেল-
কোম্পানির টাকা বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁরা
সংখ্যায় ছিলেন মাত্র দশজন। দুঃসাহসী এই
কাজ দেশবাসীর বিস্ময় উদ্বেক করে।
ভারতীয় বিপ্লব-শক্তির ক্ষণে ক্ষণে এরূপ
ক্ষুদ্র ইংরেজকে চমকে দেয়। এর মামলার
সাজেন লাহিড়ী, রামপ্রসাদ, আসফাউল্লাহ,
ঠাকুর রোসন সিং প্রমুখ তরুণ বীরদের
ফাঁসি হয়। এ মামলারই পলাতক বিপ্লবী
চন্দ্রশেখর আজাদ ১৯৩১ সনের ২৭শে
ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের এ্যালেক্সেড্রা প্যাকে
পুলিশ কতৃক আক্রান্ত হলে বীরের সৌন্দর্যে
সংশয় সংগ্রাম করে মৃত্যুকে বরণ করেন।

১৯২৬ সনের ২৮শে মে। বিপ্লবীদের
বীর, নৈপুণ্য এবং দৃঢ় কল্পরঞ্জিত একটি
দিম। আলিপুর সেশনাল জেলে তাঁরা কয়েকজন
বন্দী। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার সীতন্ত
অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদমঙ্গল চৌধুরী তাঁদের
অনাতম।

রায়বাহাদুর জুপেন চ্যাটার্জি আই-বি
পুলিশের পদস্থ অফিসার। তিনি প্রায়ই
জেলে ঢোকে বিপ্লবীদের মধ্যে মনের দিক
থেকে বারি একটু 'কচিকচি' তাঁদের মনোবল
ভাঙবার চেষ্টায়। তিনি বহুক্ষণ ধরে জেল-
খানার থাকেন, বিপ্লবীদের সবার সঙ্গে
মিশতে চান, তাঁদের দুর্বল বলে ভাবেন
তাঁদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ডাকিয়ে এনে
আপিস ঘরে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। মিশ্র
কথায় ও নানা প্রলোভন দেখিয়ে ছেলেদের
কাছ থেকে স্বীকার্য্য আদায় করে

সাপ্তাহিক বসুমতী

রায় বাহাদুরের নাক সুনাম ছিল বড়কর্তাদের কাছে।

বন্দী বিপ্লবীদের হাতের কাছে অস্ত্র নেই। তারা সবলহীন হয়েদী। কিন্তু বুদ্ধি ও সংকল্পে তাদের হারিয়ে দেওয়া মুশ্কিল। তারা প্রয়োজন বোধ করলেন যে, এই বাহাদুর অফিসারটিকে ইহখাম থেকে সরাতে হবে। সরালেন-ও। জেলের অভ্যন্তরে ভূপেন চ্যাটার্জি 'ডাঃ ডাঃ'-র ঘরে ভবলীলা সাংগ করলেন।...হলস্থল পড়ে গেল জেলখানায় এবং পুঁলিশের দ'তরে।...দশজন বিপ্লবী-বন্দীর বিরুদ্ধে বিচার শুরু হলো। এই মামলায় সাধারণ করেদীদের মধ্যে দু-একজন দ্বারা ঘটনা ঘটতে দেখেছিল তারা বহু প্রলোভন ও নিষেধন সত্ত্বেও সাক্ষী হয় নি, এমন কি ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার বারী দুরে ডিউটিতে ছিলেন তাঁদের দিবেও পুঁলিশ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে পারে নি। কিন্তু তাতে অটকলো না। কতগুলো বাইরের করেদী ও দু'জন ফিরিগাঁ করেদীর মিথ্যা সাক্ষ্যের ব'বে সকলের শাস্তি হয়ে গেল। হাইকোর্টে অনন্ত চক্রবর্তী, রাখাল ও ধুবেশের ব্যবস্জীবন স্বেপা-ন্তর হলো; অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ফাঁসির আদেশ পেলেন। বাকি পাঁচ-জনকে এ মামলায় সাজা দেওয়া গেল না।...

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'সাইমন কমিশন' বর্জন' আন্দোলনের শোভাযাত্রার পাঞ্জাবে পাঞ্জাবকেশরী লজপৎ রায় পুঁলিশের লাঠির আঘাতে আহত হন। আঘাত বৃকে লাগে এবং মৃত্যুর আলিঙ্গনে তিনি মৃত্যু-ছাঁনের গোরব লাভ করেন। বিপ্লবীরা এই মহান নেতার এই অপমৃত্যুর জন্যে দায়ী স্যা'ডাস্ট্রকে-ও মৃত্যুদণ্ড দিলেন। গুলীর আঘাতে সাহেব সূত্থের পৃথিবী ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ প্রসঙ্গে ভগৎ সিং-এর বিরুদ্ধে

গেফতারী পরোয়ানা বেরুলো। ভগৎ সিং পলাতক।...

১৯২৯ সালের একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা হলো ভগৎ সিং ও বটুকেস্বর দত্তের দিল্লীর স্যাসেমুরি হাউসে 'পাবলিক সেক্টি বিল' পাশ হবার কালে পর পর দু'টি বোমা নিক্ষেপ।



দেশবন্দু

এই বোমা তাঁরা নিক্ষেপ করেছিলেন কাউকে মারবার জন্যে নয়। ও ছিল প্রতিবাদ-বস্ত্র। বিপ্লবী-ভারত পৃথিবীর সম্মুখে আইনসভার পরিসরেই নতুন করে ঘোষণা করলেন যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের আইন ও শাসন তাঁরা মানেন না।... অস্ত্র নিক্ষেপ করে তাই পরিশান্তচিত্তে দুইটি বীর দাঁড়িয়ে রইলেন। পালাবার চেষ্টা করলেন না। সাইমন সাহেব

তখন বিশিষ্ট দ্রষ্টারূপে গাল্যারিতে উপস্থিত ছিলেন।...

এ বৎসর আর একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটলো। সে হলো তরুণ তাপস বতীন দাসের অনশনে আত্মদান। তারতের 'জেরেন্স ম্যাক্সুইন' জেলবন্দীদের প্রতি 'মানুষের ব্যবহার' দাবী করে লাহোর জেলে ৬০ দিন নিরব্দ উপবাস অব্ন্তে ১৩ই সেপ্টেম্বর মৃত্যু বরণ করেন। এ মৃত্যু তো সাধারণ স্মনাহারে মৃত্যু নয়। এবে চিরজীবী হবার দুঃসহ তপস্যা। এ তপস্যার প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি তিলে-তিলে জীবন দান করে। দান সম্পূর্ণ করে তিনি হলেন জীবিতেশ্বর।

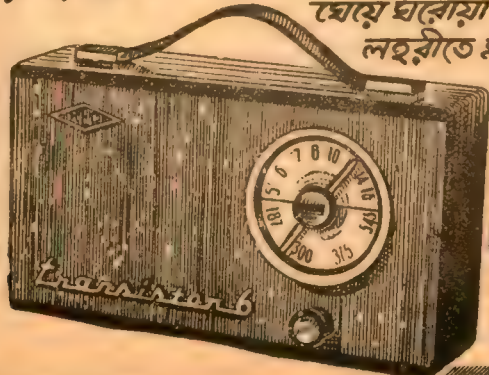
বতীন দাসের মৃতদেহ কলকাতায় থানা হল। মহামৃত্যুর রাজকীয় শোভাযাত্রা সেদিন হাওড়া থেকে কেওড়াভারার শ্মশানঘাটে পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী সজল চোখে দেখেছে। আর বারী রক্তের বিনাময়ে রক্ত-উৎসব রচনায় উদ্ভূত তাঁদের চোখে কিন্তু জল ছিল না। তাঁদের বৃক্সের কথা হাজার হাজার ইস্তাহারে প্রকাশো সেদিন ছড়ান হয় জনতার মধ্যে। ইস্তাহারের দীর্ঘ লেখা দেখেছিলামঃ 'রক্ত আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা!!'...

১৯৩০ সনের ৭ই অক্টোবর ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সূত্থদেবের ফাঁসির হুকুম দিলেন লাহোর বড়বস্ত্র মামলা-র (ডুতীর) স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল। দেশব্যাপী অসন্তোষ দেখা দিল। এ বিচার কেউ মেনে নিল না। গান্ধীজী জনতার নাড়ী ভালই বৃক্সতেন। তাই ভগৎ সিং-দের ফাঁসি বন্ধ করার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পাঞ্জাবীরা 'মার্শাল রেস্ট'। কাজেই অহিংসার বার্তা এখানে মন বকে বসতে হয়।

ইতিহাস জানে যে, এই মহাত্মা গান্ধী

জ্বর ও স্নায়ুত্বের কক্ষরে আপনায় ঘর আনন্দযুথর করে
তুলবে রেডিও ইকুইপমেন্ট কোং আর ই সি রেডিও...

আর ই সি-র একটি রেডিও আপনায় ঘরে রাখুন, আপনায় এক
ছোয়ে ঘরোয়া পরিবেশ এক মুহূর্তে জ্বর ও
লহরীতে মাধুর্য্যময় করে তুলবে...



'আর ই সি' মডেলগুলি একান্ত
নির্ভরশীল ও শক্তিশালী...
পৃথিবীর সব স্টেশনই মুহূর্তে
ধরা পড়ে...

৬ ট্রানজিস্টরজ মিডিয়াম ও লো
মডেল-৬টি মূল্য-১৬৫ টাকায়
জানীয় কর অতিরিক্ত

সাপ্তাহিক বসুমতী



মতীন দাস

বীরগণ ফাঁসির মধ্যে আরোহণ করে একদিন গোপীনাথ সাহা'র আত্মত্যাগ ও বীরত্বের প্রশংসামূলক প্রস্তাব সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভা গ্রহণ করায় কিন্তু হয়ে উঠেছিলেন এবং কলকাতা কর্পোরেশনকে অনুগ্রহপূর্ণ গৃহীত প্রস্তাবটি নাকচ করে দিতে বাধ্য করেছিলেন। এ অপকর্ম ইংরেজের সাহা-ও ছিল না দেশবন্ধুর কর্পোরেশনকে দিয়ে করাবার। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তা মরালেন। বাক, আজ জনমতের চাপে সেই মহাত্মা-ই ভগৎ সিং-দের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের মহাদা দিতে বাধ্য হলেন, এবং গান্ধী-আরউইন্ চুক্তি-র মাধ্যমে কামনার এই বীরত্বের প্রাণরক্ষার সংকল্পে রাজদরবারে বিস্তার হাট্টিংসটি করলেন।...কিন্তু ভবী ভুলবার নয়।...

বিশ্ববীর ঐতিহ্য স্ফোরবে রক্ষা করলেন। জীবিত ভগৎ সিং থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী ভগৎ সিং লক্ষ গুণে শক্তি ধারণ করে ভারতীয় চিত্তে অমর হয়ে রইলেন। সুভাষচন্দ্র সে-সময় যে কোন বক্তৃতা মঞ্চ থেকেই উদাস-কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন : 'পদানত এই ভারতবর্ষ হাজার হাজার 'ভগৎ সিং' চাইছে। উত্তরে জনতার ধ্বনি শোনা গেছে : 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ্ !'...

[চতুর্থ]

এ'রা সন্তাসবাদী নন-এ'রা বিপ্লবী

আমার মনে আছে, কিছুদিন পূর্বে জনৈক প্রবীণ বিপ্লবীকে অভ্যর্থনা জানানোর কালে কোন এক প্রখ্যাত সাংবাদিক আবেগময়ী ভাষায় বাংলার বিপ্লববৃক্ষের প্রশস্তি জানান। ভ্রমের ক্রম আন্তরিক উত্তি আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু 'বিপ্লবী' ও 'বিপ্লববাদ'র পরিভাষারূপে 'টেরিষ্ট' ও 'টেরিষ্টজম্' শব্দ

দুইটি ব্যবহার করে তিনি আমার মতো অনেকেরই কর্ণদাহ সৃষ্টি করেছিলেন।

যারা অশিক্ষিত বা অধাশিক্ষিত তাদের কথা নয়—যারা শিক্ষিত ও সুশিক্ষিত তাদের মধ্যে কিছু লোকের মুখেই 'টেরিষ্ট' ও 'টেরিষ্টজম্' শব্দ দুটির অপপ্রয়োগ প্রায়ই শুনি। সাংবাদিকরাও কেহ কেহ বাংলা ভাষায় Revolutionary ও Revolution-এর তজমা 'সন্তাসবাদী' ও 'সন্তাসবাদ' করে থাকেন। এসব শিক্ষিতের দল নিচেরই বিপ্লবী ও সন্তাসবাদী অথবা বিপ্লববাদ ও সন্তাসবাদের মধ্যকার পার্থক্য ভাল করেই জানেন। কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে তাদের ভুল হয়।

বিপ্লবী শহিদদের স্মৃতিগান এ'রা করেন। সেসব উপলক্ষে অনেক গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের কণ্ঠে শহিদরা আপ্যায়িত হন 'টেরিষ্ট' আখ্যায়। এমন কি কোন কোন প্রাক্তন বিপ্লবীর লেখনীতেও 'বিপ্লবকার্যকে 'সন্তাসবাদী-কার্যকলাপ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ যাদের রাজনীতি-শাস্ত্রের পাঠ কিছুমাত্র আছে তারা 'বিপ্লব' ও 'সন্তাসবাদ'ের আকাশ-ভূমি তফাৎ অবশ্যই জানেন। কিন্তু তবু কেন এ'দের এ ভুল হয়? যাকে অন্তর দিয়ে প্রমত্ত করেন, তাইকেই কেন তাদের অভিনন্দিত করার কালে নিজের অজ্ঞাতসারে তারা গালি দিয়ে বসেন? এর মূলে আমাদের ভূত-পূর্বে প্রভু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রচার-সাম্রাজ্য।

বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রথম যেদিন বিপ্লবীদের রক্ত আবির্ভাব বিদ্যুৎশিখর মত চমক দিয়েছিল, সেদিন ভারতীয়া না বুকলেও ইংরেজ বুকেছিল যে উহা ভবিষ্যৎ বিপ্লব-সম্ভাবনার কঠিন সূচনা। বুকেছিল বলেই ধর্ম্মের বৃটিশ রাজনীতিকগণ 'প্রোপাগান্ডা' রূপ আধুনিক মহা অস্ত্র সাহায্য গ্রহণ করলেন। শুরুরেই তাই বিপ্লবীদের 'সন্তাসবাদী' রূপে আখ্যাত করে বিপ্লব-বাদকে ভারতবাসীর সমাজে অপারোক্ত্য করার চেষ্টার রতী হলেন। সাহেবদের কণ্ঠে প্রথম শুনলাম যে, ভারতীয় বিপ্লবীরা আদর্শে 'এনাকিস্ট'। তারপর তাদেরই কণ্ঠে 'এনাকিস্ট'রা 'নিহিলিস্ট' শব্দটির বদলে উচ্চারিত হলো 'টেরিষ্ট'। সাহেবদের কাগজে পড়লাম—'কাল্ট অব ভায়োলেন্স' এক ভয়াবহ বস্তু; টেরিষ্টজম্ কতগুলো বেকার যুবকের হতাশামূলক হিস্টরিয়া!...সাহেবরা আরও বলেন যে, জনগণের সমর্থনে পরিচালিত এবং আইন মাফিক প্রতিষ্ঠিত সরকারকে বেসব সন্তাসবাদী কেবল ভয় দেখিয়ে বিপন্ন করতে চায় এবং যারা দেশের শান্তিস্থিতি নষ্ট করার পথ নেয় তারা ভারতবাসীর শত্রু, তারা 'পাবলিক্ নুইসেন্স'। এক সাহেব ডাক্তার তো এসব বিপ্লবীদের রাঁচি রেখে মানাসিক চিকিৎসা করার উপদেশও দিয়েছিলেন। অবশ্য বৃটিশের সুখ-সাম্রাজ্যের সত্যি খাঁচা

কণ্টকস্বরূপে হাচ্ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে এরূপ অপপ্রচার করার অধিকার বৃটিশের স্বভাবতই আছে। অধিকন্তু এ-ও অনস্বীকার্য যে, ইংরেজের এসব অপপ্রচার-প্রবৃত্তিই প্রমাণ করে যে বাংলা তথা ভারতে তৎকালীন বিপ্লবকার্য কেবলমাত্র সন্তাস সৃষ্টির উপাদানই ছিল না, উহায় মধ্যে এমন কিছু-ও ছিল যা 'বিদেশী-রাজকে উৎখাত করার সম্ভাবনার বলিষ্ঠ।

ইংরেজ তাই অশ্রুত রাজনীতিজ্ঞান ও প্রচারকুশলতার শক্তি এক্ষেত্রে-ও প্রয়োগ করল। ইহা জানা কথা যে, মুষ্টিমেয় ইংরেজ কেবল অস্ত্র বা ধন বলে এই বিপুল ভারতবর্ষকে এতকাল ধরে পদানত রাখে নি। তাদের এই ভারত সাম্রাজ্যে অথচ আধিপত্য ছিল উৎকৃষ্ট-তর প্রোপাগান্ডার কৌশলে। ইংরেজ আমাদের বাপ-মা; ইংরেজ চোখের আড়াল হলে আমরা পরস্পর শুনোশুনী করে মরবো; খাট বছরোও চিরদিন না-বালক থাকার জন্যই ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন; সুখের মতই মহারানীর রাজ্য স্থির ইত্যাদি সুক্কু প্রচারকার্য কে কোথায় করেছে কেউ জানে না। কিন্তু এসব কথা আমাদের মগজে ঢুকে গিয়েছিল। ভারতবাসীর রক্তের বিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল যে—বৃটিশের পতন নেই, বৃটিশ-বিতার তুলনাহীন, বৃটিশের হাত ধরেই আমাদের 'হাটি-হাটি পা পা' করে চলা প্রশস্ত!...সুভাষ এ'হেন প্রচারবিশারদ ইংরেজই একান্তই ঘৈষ্যে ও নৈপুণ্যে বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে ভারতবাসীর কানের কাছে বারবার বলতে লাগল—এ'রা টেরিষ্ট, টেরিষ্ট, টেরিষ্ট। বিপথগামী বেকার এসব ভ্রম তরুণগোষ্ঠীকে আমরা পিতার মতো শাসন করব, দেশের রাজভত্ত বৃদ্ধিমানের দল একাজে আমাদের সহায় হও।...



গোপীনাথ সাহা

দাপ্তরিক বসুদত্ত

দাস্যসুখে সুখী ক্রীষকের কাছে এমন বেনাভোলেণ্ট অর্থারিটি-র যুক্তি অকঠা মনে হবে নিশ্চয়ই।...

বৃদ্ধিমান রাজভক্তের দল ইংরেজেরও অধিক নিষ্ঠার টেরিস্ট-দলনে এগিয়ে এলেন। স্বদেশী কাপড়গুলো প্রয়োজনে বিপ্লবীদের প্রশংসা করলেও ইংরেজের বুলি কণ্ঠে নিয়ে 'টেরিস্ট' ও 'টেরিজম' আখ্যায় বিপ্লবী ও বিপ্লববাদকে আখ্যাত করতে পেঁছিয়ে পড়েন নি। কংগ্রেস ও কংগ্রেসের বাইরে বড় বড় জাতীয়তাবাদী নেতাদের চিন্তা প্রাথমিক বিপ্লবীদের বরণ করে নিলেও ইংরেজের কাছে থেকেই নিজেদের অজ্ঞাতে তাঁরা ধার করে নিলেন 'টেরিস্ট' বুলিটি। তাই বিপ্লবীরা স্মৃতি-গানের কাছে এ-যুগেও তাঁরা যখন সংজ্ঞার অপপ্রয়োগ করেন তখন ইংরেজের প্রচারশক্তির গিডেলড-স্মাক্‌শানের তারিফ করি। জাতির চেতন্যে ইংরেজ এমনি তলগোল পাকিয়ে দিয়েছে যে, কোন কোন বাক্য পণ্ডিত বিপ্লবী পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে 'টেরিস্ট' আখ্যায় নিজেদিগকে বর্ণিত করতে স্মিধা করেন না।

বাংলার রাজনৈতিক-ইতিহাস গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা দেখি—সজ্ঞান-ইংরেজদের সজ্ঞান-প্রচারণা শিক্ষিত ভাবতীয়-দেব বিপ্লব-ধারণাকে গুলিয়ে দেবার সফল চেষ্টা করেছে তা বটেই, তাছাড়া আবার একটি শক্তি জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবচিন্তাকে ভারত-বর্ষের জমি থেকে নিশ্চিহ্ন করার আগ্রহে এ-ব্যাপারে ইংরেজের সহায়ক হইছিল। তার নাম ভারতীয় 'কমুনিজম'। সজ্ঞান-কমুনিষ্টরা 'ট্যাকটিস' রূপে ইংরেজদের প্রোপাগান্ডা গ্রহণ করেন। জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ও বিপ্লবীদের হেরে করবার আগ্রহে তাঁরাও সজ্ঞানে বাক্যধানে 'টেরিজম' ও 'টেরিস্ট' শব্দ দুটি চালু রাখলেন। ফলে বিপ্লবী-দলগুলি থেকে আগত কনভার্ট-কমুনিষ্টগণ কলাপাহাড়ী চঙ-এ বিপ্লবী কথুদেরকে 'টেরিস্ট' আখ্যায় অভিহিত করে আত্মশ্লাঘা বোধ করতে লাগলেন। সে যুগে আমরা তাই দেশবাসীর কণ্ঠে 'টেরিস্ট' ও 'টেরিজম' শব্দদ্বয়ের প্রচুর আমদানি লক্ষ্য করি। দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতসমাজ তখন বুদ্ধিও বুদ্ধলেন না যে, এ অপপ্রচার কী মাঝাক। বা' রীতিমত একটি (রাজনৈতিকমহলে) গালি, তাই ভূষণরূপে বিপ্লবীদের আগে গাণিয়ে স্মৃতিবাদের নমুনা এই দেশেই শোভা পাব। কারণ, মুন্সির পরও অল্পকাল পবায়ী ন জাতি রাজনৈতিক-জ্ঞানে বহুকাল অব্যাহত থেকে যায়।

টেবিস্টদের ধর্ম হল ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিপন্ন করা। আঘাতের উত্তরে আঘাত দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁদের দেশপ্রেম যথেষ্ট থাকলেও উচ্চতর কোন আদর্শ থাকে না। তাঁদের এমন কোন কার্যক্রম বা কার্যব্যবস্থাও থাকে না যা দিয়ে

যতমান শাসক ও শাসন-ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে গণ-প্রত্যাশার পূর্ণ নতুনতর কোন শাসনব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব।

কিন্তু বিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপের মধ্যেই নিহিত থাকে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-গঠনের বীজ। তাঁদের চিন্তা সদুদ্ব্যপ্রসারী। বাস্তবকে স্বীকার করেই বাস্তব-উদ্বেগের পটভূমে তাঁদের আদর্শবাদের যাত্রা। তাই তাঁরা তাঁদের কর্মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও কার্যক্রম এমনভাবে শৃঙ্খলিত থাকে যে অব্যাহত শাসনব্যবস্থাকে সারিয়ে বাহ্যিক শাসনব্যবস্থা সংগঠনে তাঁরা সফল হন।

'বিপ্লব' কি করে চিরন্তন, সে-কথাও আমাদের বুদ্ধিতে হবে। যা কিছু অন্যায় বা অসমতা তাকে ন্যায়ের গৌরবে এবং সাম্যের সৌন্দর্যে সম্পদশালী করার মত বিপ্লবের বাণীতেই অবস্থ। মানুষের ধর্ম হলো ভালো থেকে মন্দার স্তরে নেমে যাওয়া এবং মন্দ থেকে ভালর পথে ধাওয়া করা। ক্ষমতার অধিকারী ক্রমশ ক্ষমতার অপব্যবহার করবেই। কারণ, 'Power is the worst corrupter!' মানবের এই দুঃসমস্যা-ই রুদ্রের আশীর্বাদ রূপে শাসনদণ্ড হাতে 'বিপ্লব' দেখা দেয় সমাজে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিপ্লবী নবতর সম্ভাবনার স্বাক্ষর নিয়ে নতুনতর রাজ্য পত্তন করেন। এই ভাবে সৃষ্টি থেকে ধ্বংস এবং ধ্বংস থেকে সৃষ্টির আনা-গোনা অনাদিকাল থেকেই চক্রবৎ মানব-ইতিহাসে লিখিত হয়ে আসছে। বাংলা তথা ভারত-বর্ষের জাতীয়তাবাদী-বিপ্লব-সূচনার সেই সৃষ্টির মন্ত্র উচ্চারিত ছিল কিনা তা বুদ্ধিতে হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস মানব-ইতিহাসের বাইরে কিছু নয়। পরাধীনতার জ্বালা মুন্সিদের কতিপয় ব্যক্তিই শব্দেতে অনুভব করে থাকেন। সেই মুন্সিদের লোকের মধ্যে জন্মো নবপসংস্কারই চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করে দুঃস্বপ্ন সাহসে অনাড়ম্বর অনড় রাজ-শক্তিকে আঘাত দেন। সে-আঘাত আপাত-দৃষ্টিতে ব্যর্থ ব্যর্থ নিষ্ফল হব। কিন্তু এ বিদ্রোহের মূলে থাকে অক্ষয় আশাবাদ, অম্লান আদর্শ, সমৃদ্ধজ্বল আত্মবিশ্বাস পিপাসা, সুক্ষ্মতম আত্মমর্বাদজ্ঞান ও গভীর সংবেদন-শীল চিন্তা। এ বিদ্রোহ-ই ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চার করে বিবর্ত বিপ্লবে রূপ নেয়। 'বাংলায় বিপ্লববাদ' এ সত্যকে গভীর মানসে প্রত্যক্ষ করেই ধুমায়িত হতে থাকে উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে। বিপ্লবশক্তি ক্রমশ প্রচণ্ড সামর্থ্যে বহির্দীপ্ত হয়ে বিশ শতাব্দীর দীর্ঘ প'যতাল্লিশটি বৎসর ধরে ভারতবর্ষের আত্ম-শুদ্ধি ঘটাইছিল। তাই এর বস্ত-স্বাক্ষরকে ইতিহাস উপেক্ষা করে নি।...ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে।...

ভারতের বিপ্লবধর্মের মন্টা মনুষ্যমনস্বী

শ্রীঅরবিন্দ, ডব্লী নিবেদিতা, পি নর এন্ড তিলক। এর বাহক রাসবিহারী-বতীর মুখার্জি-পুলিন দাস-সুখ সেন প্রমুখ অধি-নারকবৃন্দ। এর চারণ বহুদূরীন প্রচুর চাকি-ক্ষুদ্রায়াম-কানাই থেকে শুরু করে ত্রিভুজা-বিনয় বসু-নির্মল সেন-দীনেশ-বাবল-প্রমোদ অনাথ-ভবানী-অনুফাক-উল্লা-বতীন দল-ভগ্ন সিং-উর্ধম সিং প্রমুখ শাহিনুল। এর উপাসক হেমচন্দ্র ঘোষ-বিপিনচন্দ্র গুপ্তা-নি-হরিকৃষ্ণ চক্রবর্তী-নরেন সেন প্রমুখ বিপ্লব-নেতা এবং বাংলা ও ভারতের অগ্রদূত বুদ্ধ-যুবতী। সৌন্দর্য্যবৎ এ বিপ্লবের গতি তাই প্রলয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল; সে প্রলয়ের প্রাণ ছিল নবসৃষ্টির ছিল বন্দনা। ভারতবর্ষের বিপ্লব-তাই সার্থকতম রূপ পেয়েছিল বিহ-ভারতে, বর্মার প্রান্তরে, আ-বু হিন্দু হুকুমতের পরিচালনায়। ভারতবর্ষের এই বিপ্লবকান্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব-ইতিহাসেও অনন্যসাধারণ। এর তুলনা এতেই।

ইতিহাসের সামান্য জ্ঞান যাঁদের আছে, রাজনৈতিক-চেতন্য যাঁদের একে-রে লোপ পায় নি—তাঁরাই মগল পাঁড়ের আশ্রয়নের মধ্যে খুঁজে পাবেন ক্ষুদ্রায়ামের অসুস্থ ভাব্য, আল্লির রাণী লক্ষ্মীবাই-এর রণযাত্রা পাবেন সুভাষচন্দ্রের 'ফার্সি-রাণী-বাহিনী'র পদযাত্রা, তাঁতীরা তোপী - তিতুমির - নানাসাহেবের বিদ্রোহ-স্পাহার পাবেন রাসবিহারী-বতীর-নাথ-সুখ সেনের বিদ্রোহ-আভাস, কানাই দত্ত-সন্তান বসুর স্বপ্নে পাবেন রামকৃষ্ণ-দ্বন্দ্ব-কৃষ্ণ-বিনয় বসু-মতি মল্লিক-কানাই ভট্টাচার্যের স্বীকৃতি। তাঁরা তাই নিভুল করে পাবেন সর্ব-ভারতীয় নানা বিপ্লব-প্রচেষ্টার মূলে নেতাজী'র আজাদ-হিন্দ ফৌজের আবির্ভাব-সম্ভাবনা। পৃথিবীর অপরাপর দেশের বিপ্লব-ইতিহাসের মত ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসের স্বরূপ-ও একই। এ সত্য না বুদ্ধলে, বিভ্রাবাদ যা বিপ্লবকে বোঝা যায় না। ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের বিপ্লবীগণ কোন মহুতেই 'সম্ভাববাদী' বা 'টেরিস্ট' ছিলেন না—কারণ টেরিজম-এ তাঁরা বিশ্বাসী হতে পারেন না। তাঁদের কার্যকলাপ বহু ক্ষেত্রে ইংরেজের প্রদে, 'সন্ত্রাস' সৃষ্টি হতে পারে, যেমন হুদু ক্ষেত্রে ভারতীয় নরনারীর জীবনে ব্যটিশপ্রভু-ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। ব্যটিশবাহে সন্ত্রাস-মূলক কাজে ব্যটিশ বাদি সম্ভাববাদী বা টেবিস্ট না হয়, তবে বিপ্লবীকে সন্ত্রাস-জনক কিছু কাজে তাঁরা টেবিস্ট হবেন কেন? 'End justifies means'—উদ্দেশ্য-ই উপায়কে সিদ্ধ করে। ইচ্ছা'লের বর্ণাঙ্গনে বা দিল্লীর কেল্লায় ছাত্র-প্রতাপকা উত্তোলিত হবার মূলে ছিল ভারত-বিপ্লব-সাধনা, 'টেরিজম' নয়। 'টেরিজম' কথাটি প্রয়োগ কবেছিল উদ্দেশ্যমূলকভাবে সন্ত্রাস-বাদী ইংরেজ, আমবা আজ-ও অথ' না বুদ্ধে তোতাপাখীর মত তা উচ্চারণ করি?...

আদি মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস



মহাশেবতা ভূমিচর্য

১ পূর্ব-প্রকাশিতের পর

৥ সাতচল্লিশ ৥

সে সর্বনাশের খবর সব'র গেল।
আখিরমাণিক গ্রাম থেকে দু'দশ কি তিন
মাইলের পথে শিবকালীর পাল্কী বগী'রা এসে
ঘিরল।

নিজ'ন প্রান্তর, শান্ত গ্রামাঞ্চল, পাল্কীর
আরোহী ধর্মগতপ্রাণ বাম্ব, আর তাঁর স্ত্রী।
আটজন, মাত্র আটজন পাইকপেয়াদা সঙ্গ
ছিল। এব চেয়ে বেশি রক্ষী শিবকালী
সঙ্গে আনেন নি। আনবেন কেন, তাঁর সঙ্গে
তা' ধনরত্ন ছিল না।

পাল্কী'ব গায়ে হেলান দিয়ে তিনি
ঝড়কউকে একটু অঙ্গাই বলছিলেন, 'দেখ
ঝড়কউ, বিহরসম্পত্তি'র মধ্যে আর কির য়েতে
ইচ্ছে হচ্ছে না। চল এখন থেকেই চল
যাই।'

'কোথায় যাবে?'

'কেন তাঁর? বিহর সেলাই করা
কাঁথা তা' গারেই আছে, গায়ে কাঁথা থাকবে,
তোমার কাপড়খানা খেরিমাটিতে ছুপিবে নেব।
পথের পাশে যে দোকানে চাইব, সেই আমাদেব
একখানা মাটি'ব সরা, দু'টি চাল দেবে, ফুটিয়ে
দেব।'

'চল, আমার আপত্তি কি?'

ঝড়কউ হঠাৎ হেসে বললেন, 'আমার বাবা

তা' আমাকে এমন জবীপোষ পাল্কী দেশে
কিরে দেন নি, শপের চালা, আর একবিষে
রক্তদ্র দেবেই দিয়েছিলেন। আমার না হয়
সোনার খাড়ু, শুলে ফেলে রক্তাকড় পরব,
একচালা চালভরলে খাব, আর কি ভর
পাই?'

'এখনও যে কাজ বাকী আছে বড়বউ।'

শিবকালী বাইরের দিকে চেয়ে দেখে-
ছিলেন কোন পথটি নব্বশীপে গেছে, কোনটি
জগন্নাথধামে, কোনটি বা বকেশ্বরের দিকে।
যে-পথ দিয়েই যান দেবতার আশ্রয় তাঁর ঠেকায়
কে। কিন্তু এখনো কাজ আছে, অনেক,
অনেক কাজ।

'কি কাজ গো?'

'নির্মলারক কিরিয়ে আনতে হবে, বিহর
সে হারানো ছেলে কানাইয়ের খোঁজ আনতে
হবে। বিষয়ের ভার বিহর বড়ছেলেকে
বাকিয়ে দিতে হবে।'

'তুমিও যেমন! যে হারিয়ে যার তাকে
কি পাওয়া যায়?'

'আমার সে দারিদ্র বড়বউ।'

'বেশ, আমি আর কথা বলব না।

তখনই তাঁদের মনে হরোঁছিল আশপাশের
গ্রাম যেন বহু বেশি নিস্তব্ধ। যেন কোথায়
বিপদ ঘনিয়ে উঠছে।

'কিছু আসছে না কি? সে'ব করেছে কি?'

বলতে না বলতে বগী'র দল এসে
গড়েছিল।

'ওরে, আমার নামতে দে, ওরে আমার
হাতে একখানা লাঠি দে।'

শিবকালীর কথা কেউ শোনে নি।
পদ্মাশিটি অশ্বারোহী বগী'র কাছে আটজন
পাইকপেয়াদা নিমেষে পরাস্ত হল। কিছুই
পেল না তারা, কিছুই না। শত্রু শিবকালীর
হাতে আটি, সোনার কবচ ও গলার হার,
সোনার নগাদানী, সোনার সিংহমুঠ বাঁধার
লাঠি।

'আমার ছুঁও না।'

চাঁকর করে শিবকালীর স্ত্রী গানের
প্রতিটি গহনা শুলে দূরে ফেলে দেন।

হাতের লোহার দিকে একজন লোলুপ
চোখে চাইতে লাগল দেখে তিনি গিবে স্বামীর
মাথা কোলে নেন ও হাতেব লোহা ছুঁড়ে ফেলে
দেন। বিশালাক্ষী ও গ্রামের আব সকলে যখন
ছুটে এলেন তখনো বড়বউ তেমনই বসে
আছেন, অবিচল।

এ দুঃসংবাদ নিমেষে সব'র গেল।

বগী'র উপদ্রবে এ-পর্যন্ত হয়তো লক্ষ
লক্ষ লোক মরেছে, কিন্তু শিবকালী গাঙ্গুলীর
তুল্য সম্ভ্রান্ত, প্রতিপত্তিশালী রাজপুত্র'ব আর
একটিও মরেন নি। শিবকালীকে সবাই

সম্মান করত, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ ও ফরাসী কুঠির সাম্রাজ্য।

রঘুজী ভোঁসলে-উড়িয়ার ছাউনীতে বসে মনোমগ্ন হয়ে বসলে, তেঁরা কি মুখ? রাজা জ্ঞানকী রাসের ছেলেকে নাগপুত্রে ধরে বন্দী করেছিলেন বলে তার বাপ এসে বাপবাপ বলে টাকা দিয়ে খালাস করে নিয়ে গেল। একে বন্দী করে আনলে পরে উত্তম টাকা আদায় হত। ও-সব বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘড়া ঘড়া টাকা থাকে, আমি জানি।

রঘুজী তাঁর নাম জ্ঞানবেন, শিবকালী এমন বিখ্যাত লোক ছিলেন না, তিনি শূনে-ছিলেন একজন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী বাঙালীকে বগাঁরা মেবে ফেলেছে।

তিনি খেদ করে বললেন, এখন থেকে যারা বাবে তাদের জ্ঞানকে দিতে হবে একজন ধনী মানুষ, একজন বড় ব্যবসায়ী এদের ছেলে নিদেনপক্ষে হিজলী, বাগীচক বা দিগ-দগরের মারাঠা কুঠিতে বন্দী করাই কঠব্য। এদের আটক রাখলে বারবার টাকা পাওয়া যায়।

নবাব নিজামউদ-দৌলতের এবং বাইরে এক-একজন এক-এক ভাবে ঘটনাটিকে গ্রহণ করলেন। ভদ্রলোক মাদ্রেই, ভাললোক মাদ্রেই, কি ধনী, কি দরিদ্র, দুঃখ গেলেন। কেন না শিবকালীর মত সদাচারী ধনী মানুষ সমাজে ঘটক বিশেষ। সবাইকে ছাড়া দিয়ে বাচাতেন, এখন আশ্রয়দাতা গাছটির চুড়ো ভাঙল।

যারা ছিদ্রবেশী, এবং শিবকালী নির্মলাকে আশ্রয় দেবার ফলে ষাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে-ছিলেন, তাঁরা নরক নসি গুঞ্জে বলতে লাগলেন, 'বাপু হে, এমন নামী মানুষটা বোনের বাড়ি থেকে ফিববার সময়ে অপঘাতে মোগল, তাহলে বিচার কবছ, তাব মধ্যে লিচর কোন পাপ ঢুকছিল। লইলে এমনটি হবার নয়। ও'র বা ধনজন ছিল, বা ধর্মকর্ম করতেন, তাতে পালকে শূনে মববেন, লাখ টাকার দানসাগরে শ্রাস্থ হবে। তা না হয়ে এখন এই পরিণাম হল, তাহলে লিচর ভগবান কোন পাপ দেখে ফেলেছিলেন।'

যে-সব অন্য জাতিব লোক মদ চোলাই কবত, গাঙ্গা চালান দিত বলে শিবকালী গাঙ্গুলী চেন্টায় বারবার শাস্তি পেয়েছে, তাঁর কাছে উপকার পায় নি, তারাও বলতে লাগল, 'হুঁ বাবা, ভাগড়ে গরু পড়লে শূর্গনি যেমন জানে, ভগবানও পাপের শবর আগে-ভাগে পেয়ে যায়।'

এদিকে বড়নগরে বসে নাটোবেশ্বরী একথা শূনে তৎক্ষণাৎ শবব নিতে পাঠালেন শিবকালী গাঙ্গুলীর পরিবারের কে কেমন আছেন। তিনি কোন সাহায্য করতে পাবেন কি না।

বরষে যতই কম ছোট হোক, সে আমাকে মা বলেছিল। আমার নিজের ছেলে আমাকে মা বলে ডাকে না। তার মা পাষাণী,

চুড়ুজী, জগৎজননী, মন্দিরে থাকেন। সে আমাকে মা বলে ডেকেছিল।' একথা বলে নাটোবেশ্বরী চোখ মুছলেন।

শিবনিবাসে বসে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর এখানে ফতেচাঁদ, ওদিকে বখশানের রাজা, উত্তরে দিনাজপুরের রাজা, এঁরা গোপনে বলতে লাগলেন, 'এ আর কিছই নয়, নবাবের কারসাজি। এ-দশে বগাঁর হাঙ্গামায় কোন নামী মুসলমানটা মরেছে, শূর্নি? বৈশ্বতে পাঁছ হিন্দুদের মধ্যে বারা বড় বড় তাদের আর থাকতে দেবে না।'

এমনি নানা কথা বাতাসে উড়তে লাগল। শিবকালী বড়বউ কিছই জানলেন না। তিনি বিশালাক্ষীকে বললেন, 'বিশু এসেছিছ? তোর নকশাতেলা কাপড় পরে আমি তোর দাদার সঙ্গে যাব, ব্যবস্থা করে দে।'

'বড়বউঠান, আমি কার কাছে বাঁড়ব?' বিশালাক্ষী কান্দতে কান্দতে বললেন। এখন, মতাব চৌদেলার বসেছেন বলে বড়-বউঠানকে কত প্রিয় মনে হচ্ছে, যেন ঢুলুভ একটি মানুষ, কেমন করে ও'কে হারাবেন বিশালাক্ষী?

'বিশু, আমি আমার কাজ করি, ভুই বাধা দিস না। তোর কিসেব ভাবনা। আনন্দীর মত ছেলে রইল, ওর সংসার জ্বলজ্বল করুক, তোর সুখ-ঐশ্বর্য হোক।'

'এখানেই, বউঠান?'

'এখানেই।' এখন দুজনেই দেখতে গেলেন এ মঠ, এ পথ কত সুন্দর। দূরে দূরে গ্রাম, দেবালয়, মাঠে গরু চবে। দিকে দিকে পথ, কোনটি নবশীপ, কোনটি জগন্নাথধাম, কোনটি বক্রেশ্বরে গেছে, প্রতিটি পথ দিয়েই দেবালয়ে পৌঁছনো যায়।

'তিনটি তীর্থপথের সংগম বড় পুণ্যস্থান। বিশু, তোর দাদা বলতেন।'

বড়বউঠান একথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে বিশালাক্ষীর কেন মনে হল তিনটি পথ যেন

তিনটি পুণ্য নদী। এখানে এসে তাদের জল অলসে হুলাহুলি, কোলাহুলি দোলা-দুলি করছে, অলসে তাঁর দাদা-উঠানকে স্বর্গে নিয়ে যাবে বলে?

'বিশু, বড় শূভ সময়।'

বড়বউঠানের কথা শূনে বিশালাক্ষী ওপরের দিকে চাইলেন। সতী বখশ হাসতে হাসতে সহমতা হন, তখনই সুসময়। সুসময়, সুসময় তাঁরা তৈরি করে নেন, কিন্তু তাঁর বউঠানকে শেষ কাজ করার এমন সংগ্রাম এখানে কে আছে?

'এসেছে, সুরকণ্ঠ এসেছে,' সবাই বলে উঠল।

সাঁজই সুরকণ্ঠ এসেছেন। 'এমন সময়ে আপনি আসবেন, এ ভগবানের হাত, নইলে এমন যোগাযোগ সম্ভবে না।'

বিশালাক্ষী আজ এতদিন পবে পাগল হয়েছেন, লোকলজ্জা কেলে দিয়েছেন, নইলে সুরকণ্ঠের সঙ্গে এমন মন্তকণ্ঠ কথা বললেন কি করে?

আপনি আমার বউঠানকে সঙ্গতি করান, উনি স্বর্গে যাচ্ছেন।'

বিশালাক্ষী আবার বললেন।

এখন কতই হুলাহুলি পড়ে গেল, আমের শাখা, তেল হলুদ, সিঁদুর আলতা, খইকড়ি ছড়াছড়ি গেল। ভারে ভারে চন্দনকণ্ঠ, ভারে ভারে ঘি। সারে সারে ঢাকবাদ্য, অথবা কত লোক আপনা থেকে এল।

বিশালাক্ষী বহুতর নকশাতোল কাপড় পরে শিবকালীর স্ত্রী চিতাব বসলেন। ডেকে বলে গেলেন, 'বিশু, তোর দাদা সেই হতভাগীর কথা মূখে নিয়ে মরেছেন, তাকে পবিস ত' ফিরিয়ে আনিস।'

বখশান হতে ইংরেজ কুঠিঠাল, নবাবের দারোগা নিমিষে ঘোড়া চড়ে এল।

'মা, আপনি কেন সতী হবেন?' তাদের প্রশ্নের উত্তরে শিবকালীর গৃহিণী সগর্বে



কিষান
লর্ডন
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস ঐকোঃ

ফোন-২২-৬৫৮০

২৬৬, ৩৩ টানা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

কলেন, 'আহা, আমার বড় শাশুড়ী, দিদি-
শাশুড়ী, বড় দাদাশাশুড়ী, এঁরা ছ' পুত্র
থরে এ বংশে সত্যী হচ্ছেন। আমি সত্যী হলে
এ বংশ অক্ষয় স্বর্গ পায়।

'বউঠান, কংশ বলতে আর রইল কে?'

বিশালাক্ষীর কাতর প্রশ্ন ঢাকঢোলের
যাদো চাপা পড়ল।

ধু-ধু করে চিতা জ্বলল। দশকরা
লগতে বলতে গেল, 'আহা, এমন সত্যী দেখলে
এ পাপ যুগে ধর্মে আস্থা ফিরে আসে গো।'

সন্ধ্যেরটি ভাবতে লাগল এমন-চমকপ্রদ
মৃত্যু, এমন বিশিষ্ট মানুষের মৃত্যু, এমন
চমকপ্রদভাবে সত্যী হওয়া, এর ফলে এ
ভয়ঙ্কর ঘটনার মহাক্স্ম আরো কীর্তিত হবে।
এদেশের মানুষ নিশ্চয় রাত পোহাতে না
পোহাতে এ স্থানে মন্দির গড়বে।

এ দুঃসংবাদের চিঠি পেয়ে আনন্দীর
মস্তক রঙনা হলেন।

আধাবমানিক এসে ভবে সব কথা জানতে
পারলেন। বিশালাক্ষী অবাক হয়ে দেখলেন
দশীশ্বর এখন বাগিচার পূর্ণ বৃক্ষ, তার
খ গম্ভীর, পোশাক পরিধান মল্লদের মত।

নির্মলার কথা বলে তিনি সদুঃখ

বললেন, 'কে তার খোঁজ এনে দেয় বল?'

'তার বাবা কিছু বলেন নি?'

'তার বাবা কি মেয়ের কথা ভাবেন কাশী?'

ওঁরা মনে করেন সে মরেছে।'

'হয়তো সত্যিই মরেছে।'

'মরে থাকলে ত' আমার মনে হয় তার
সৌভাগ্য। কিন্তু খবরটা ত' নেওড়া দরকার।'

'আমি যাব।'

কাশী ধীরে, দুচকুটে বলল, 'আপনি
বললেই আমি যেতে পারি।'

'কোথায় যাবে?'

'আপে তার স্বামীর কাছে যাব। তারপর
শ্বর নিয়ে যেখানে সে কুটনীর গেছে সেখানে
যাব। এখন, বর্গীর উপাভের ভয়ে মানুষ
যেখানে নিরাপদ মনে করে সেখানে পালায়।
এইভাবে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠছে, কলকাতা
ফরাসভাষা, ক্রমে বিধি-হচ্ছে।'

'তার সঙ্গে নির্মলার কি যোগাযোগ
যা?'

'যেখানে দেশ-এই প্রলয় কান্ড, নানা
জনের সর্বনাশ। তখন কারো কারো পৌষ-
মাস বই কি। বহু মানুষ এখন হাতে বুপোর
টাকা তারার পরসা দেখছে। টাকার সঙ্গে

সঙ্গে পাপও দেখা দিয়েছে বই কি।'

'এর চেয়ে যে সে হতভাগীর মৃত্যু ভাল
যা?'

'হ্যাঁ, মৃত্যুই ভাল।'

কাশীশ্বর এ-কথা বলে নিবানন্দ, ভীষণ
হাসল। আজ বহুদিন ধরে তার চোখে রাত
ঘুম নেই, দিনে মনে স্থিস্তি নেই। তার
মনে, তার চোখে এখন সর্বদা নির্মলার মুখ
ভাসে।

মনে মনে এ পাপ কববাব জন্যে কাশীশ্বর
সর্বদা অনুতাপে পোড়ে। নির্মলাকে উদ্ধার
করতে হবে বলে তার মন প্রফুল্ল হল।
নির্মলাকে দেখতে পাবে আশার তার বুক
চঞ্চল, কিন্তু নির্মলা যদি পার্পের পথে পা
দিয়ে থাকে, যদি পাপ করে থাকে?

কাশীশ্বর যখন এ-কথা ভাবছিল, তার
আগেই নির্মলা মবেছে। ফরাসভাষার সুরাটী
দাসবাবসারীর বাগানবাড়িতে তার নতুন-
জন্ম হয়েছে। ততদিনে তার নামে হয়েছে
নীলবাঈ।

(ক্রমশঃ)

আমার হৃদয়ের

দীপ্তি পাল

অনেক গোপন বস্ত্রপাশ ভুগোছ
বয়সের জলঝামুতে অকূল কামা তাই
তাই বাবাদিন-নিবিবিলা, কেউ নেই, এখন।
যখন এত নিঃসঙ্গ, শব্দ বাতাস, তখন
কে যেন মন্ত্র উচ্চারণ করে মহামৃত্যু, মৃত্যুঞ্জয়
(আমাদের মৃতআত্মাগুলি-গলে শুনতে চার
বাকী)।

আবার হৃদয়ের সব রং চিরদিনই বিশুদ্ধ,
অচ্চ দুবলত কড়ের মত সে গভীর গহন
দুঃচোখে চিন্তা-কোরে ধরে নাও, হয়তো নেবে

নত

জানি জানি সব ব্যর্থ, আমাকে জ্বালাবে।
তবু, কেন আসি—
নিভেজাল দীপ্তিময় হৃদয় কুড়িয়ে কুড়িয়ে?

মৃত্যুই চাই যদি পাই মন। তাই বাকি,
করুন হাওয়ার ছোঁয়া হারপো নিবিবিলা
গান গেরে।

মুক্তির সে উপকথা

মদন চৌধুরী

ওবে পাখী এখনো চঞ্চল।
চেয়ে দেখ মুক্তির কী নিদামুখ অভিল্লাষ
নিয়মে—
গরোছি দাঁড়িয়ে তোর ডানার আশ্রয়ে;
ওবে-শোন বেদনার মুহূর্তে আকাশ হৃদয়—
নিদামু মুখের তাপে সমস্ত সংসার,
তন্দ্রাহারা ঝড়িগাহ আপনাবে দগ্ধ করে—
বিছায়েছে স্নিগ্ধ এক ছায়ার অঞ্চল।

ওবে পাখী কাবে দিবি কীকি?
সমস্ত দিগন্ত জুড়ে রাখালের বাদ্যের বাঁশবা—
কে'দে কে'দে বস্ত্রপাশ জনপদ হুঁরে,
অবশেষে পেঁছে যাবে সীমাহীন নক্ষত্রের
দেখে।

যেখানে অনেক আলো প্রাণের গভীরে।
যে পাখী মুক্তির পসবা নিয়ে নেমে আর
দেখি—

মুক্তির সে উপকথা খানে যসে অঁকি।



মেজাজ খাটো হয়ে গেল তার। সুকুমার সে কথাব খেলাপ করতে পারে—এটা একেবারে অচিন্তনীয় ব্যাপার। সুকুমারের অডার ভো আর তার বউকে দিবে পূর্ণ হবার নয়। তাই বেশিক্ষণ জমল না সেখানে। বেঁচে পড়ল বাস্তব। নতুন বেসের মত আর একটাও মৃদু মাথার মধ্যে আসছে না। চৌবংগী পেরিয়ে শাখা-বাস্তব নামল।

এবার কব বাছে যাওয়া যায়—গাংখ। রাজ্যের গুরুত্ব কমপাল্লাবী স্টেভিংসের চার নাকি এগনি চাব, যে হুইল পাডলেই হল। অথচ গত ছ'মাসে চাবটেব বেশি পাবল সে গাঁথতে? তার মধ্যে আবার টাকা ভাঙতে হইছিল ভিনটেব। দুখানা সামলে নৈবেছে। কিন্তু শেষেরটা বে বড দাগা দিচ্ছে।

শংখকে কি গাঁথা বাবে—না খেলবে। আর গাঁথলেই বা কি—পেমেন্ট কবছ নাকি ভক্ষণ। নাঃ সুকুমারটার পেমেন্ট কববার কথা ছিল আছে। অনেকদিন পর যোগাযোগ কবছিল সুকুমারের সঙ্গে। দেখা যাচ্ছে—যত ঘনিষ্ঠতাই থাক এককালে—নয়মিত যোগাযোগ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাস্তবিক। সুকুমারের বউয়ের সেই কাক-লাসের মত চেহারা ফুটবলের মত হ'লছে—না দেখলে কি সে নিজেই বিশ্বাস কব।

পরিষ্কারি তাহলে ক্রমশই যোবালো হয়ে দাঁড়চ্ছে। জমা দেবার তারিখও ক্রমশ খাঁড়ার মত নাকের উপর এসে যাচ্ছে।

অবাক ব্যাপার। থামলো একটু। সুকুমারের বউ-এর ছবি ভাবতে ভাবতে সুকুমারের শালীষ জ্যাক্স ছবির সঙ্গে মোলাকাং বটেবে—কে জানতো। প্রথম ইতস্তত, তারপর দুজনই চিলে ফেলল দুজনকে।

—আবে।

—আবে।

—কেমন আছ?

—আপনি?

মেয়েটির সঙ্গে এককালে ঘনিষ্ঠতা হইছিল সুকুমারের বাড়িতে। দাঁড়ি মত এও বেশ মৃটিয়েছে দেখা যাচ্ছে। সুকুমারের কাছে থেকে হাসপাতাল সংক্রান্ত বি একটা ট্রেনিং নিচ্ছিল তখন। চাকরী কবে হি? যদি কবে গাঁথতে হবে কেস্টাকে। মেসেদে বেস্। তা হোক। গাঁথতে পবলে পেমেন্টের ব্যাপারে শংখের চাইতে নিশ্চয়ই সিকিওড। সেসে ভো ধতই হোক।

—কোথা থেকে?

—আপনি?

—ভূমি?

—চাকরী থেকে—

—চাকরী কবছ তাহলে।—বলে এবটু হে হে কবে হাসল সুখময়। আর এবটু সলস্ক মাথা নাড়ল মেয়েটি। বংটা কিণ্ডং ময়লা। কিন্তু চোখ দুটো আরবর্ণ্য।

সুকুমার বলত, তার শালীষ চোখ ছিল তার উপর। সুখময় তখন আমল দেয় নি।

ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই কথাটাই হঠাৎ বেন, কেন মনে হয়ে গেল আজ।

হুঁ, মেয়েটা চাকরী করে তাহলে। নাঃ তখন আমল দিলেই হত। ছমাস আগেকার সোনার দোকানের খাতা দেখার চাকরী কিম্বা এই ছমাসের বাঁমর দালালী ওরফে বেকারী—একটা চাকর-ওয়ারা মেয়ের মূল-খনের আদর্শ থেকে কি খুব বেশি ঝগাটের হত?

আজ সুখময় বেশি করে আমল দেওয়া সুরু করল। নীট ফল, উভয়ের প্রতি উভয়ের আমল দেওয়ার পালা জলক বেশ কিছুক্ষণ।

পুবানো চাল ভাতে বাড়তে কতক্ষণ। উদাম রান্ধায় হাটতে হাটতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে অনেক-ক্ষণ গল্প করল। লাইট হাউসের পাশ দিয়ে মোড় ঘুবল। একদিন সুকুমার সহ ওরা তিনজন লাইট হাউসে ছবি দেখেছিল। সে কথা মনে করিয়ে দিল সুখময়ের শালী। তার-পর মনে হল সুখময়ে, পাশ-ঘেঁষে-খাওয়া একজোড়া ফিরিঙ্গি-ফিরিঙ্গিলীর পানে টেরা করে চাইতেও লাগল মেয়েটা।

সামনে আমিনিবা। হায় আমিনিবা! মনটা করুণ হয়ে উঠল আমিনিবার স্মৃতিতে। গত ছমাসে একদিনও সে আসে নি আমিনিয়ার। নিয়মবাধা মাইনে শাবার বগে, প্রতিমাসে নিয়ম রেখে আমিনিয়ার আসা ছিল সুখময়ের পবন পরি-তোষ। আকর্ষণ ছিল আমিনিয়ার চাপ। হায় আমিনিয়ার চাপ।

পকেটে হাত দিল। নাঃ যা আছে তাতে আমিনিয়ার ঢোকা চল না। অথচ আমিনিয়ার গাঙ্গে ঝিটোও বেন বেজার চন্ট করে উঠল। সত্যি কথা বলতে কি জিভেও কেমন তরল পদার্থে আধিক্য অনুভব করল। টেরা করে শান্তি দিকে তাকাল। মনে মনে মডলব ভিজল একটা। তাবপর কারদা করে নিল্লস প্রস্তাব করে বসল তাকে।

—খেলো কেমন হয় বল তো—

কিণ্ড ইতস্তত করে বেশ সপ্রতিভ উত্তর দিল মেয়েটা।

—মাল কী। যখন বসায় হবে একসঙ্গে একটু।

এরকম চট করে রাজী হয়ে যাবে ভাবে নি সুখময়। তাহলে সুকুমার খাই করুক, তার উপর তার শালীর চোখ একে-বারে বার নি দেখা যাচ্ছে। নইলে তখন তো বেশ কষ্টই ছিল। অবশ্য তখন চাকরী কলত না। এখন তো আর সেদিন নেই।

আর কথা কি! ঢুকে পড়ল দৃজন। নিরিবিলি একটা কোণ খুঁজে নিল। আশা দৃঢ় হল, যে রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে মেয়েটা কথায় কথায় নিশ্চয়ই আমল প্রস্তাবটা এক-সময় বেশ আঁকিয়েই পাড়তে পারবে। আর

এসব কাজে একটু নিরিবিলি কোনই ভাল। হোক না টেবিলটা একটু ছায়া ছায়া কোলি-আঁধার।

প্রথমটা চুপচাপ রইল সুখময়। শান্তিও লজ্জা পাচ্ছে দেখে শেষে নিজেই লজ্জার মাথা খেল।

—তা হলে?

—বলুন।

—তুমিই বল।

—না না সে হয় না।

—কি অর্ডার করার ইচ্ছে মনে মনে বলেই ফেল না।

—আমার? না না আমার কোন ইচ্ছে-টিচ্ছে নেই। আপনি যা ভালবাসেন করে ফেলুন না অর্ডার।—মুচকি মুচকি সলজ্জ হাসি, শান্তির চোটে।

সুখময় ভাবল, তার খাওয়া সম্পর্কিত পুরানো দুর্বলতার ছিটেফোটা তো শান্তির অজানা ছিল না—তাই। আর এখন হয়তো পাটেছে স্বভাব। বিচি-নর। হাতে পয়সা থাকলে খাওয়ানোর ব্যাপারে দিলদরিয়া মেজাজ বেকালে স্ত্রীলোকের ধর্ম।

চাপের অর্ডার দেওয়া হল। সবেগ রুটি। সুরু হয়ে গেল ভোজনপর্ব। হাসতে হাসতে শান্তি বলল—চাপের উপর ভক্তি দেখছি এখনও আপনাকে সমান চেপে আছে। এবাব সলজ্জ হাসিব পালা সুখময়ের। কাব খাওয়ার কথা এখনও একটু আঁধা লজ্জা সে পার।

—আচ্ছা, কটা চাপ একসঙ্গে খেতে পারেন—খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করল শান্তি।

—তা বোধ হয় দুচারখানা পাবি। তবে আমি পারলেও, তোমার তো ঠিক চলবে না; কাজেই...

—আমি খেতে পারি না বলে আগনি খেলে আমার হিসেবে হতে বাবে কেন বলুন তো। ইচ্ছে থাকলে খেয়ে দেখুন না কটা পারেন।

—খাব?—বেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল সে। প্রেট খালি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

স্বর শ্রুনে তো শান্তি অবক।

—ইচ্ছে থাকলে খাবেন বৈ কি।

—ভরসা দিহে তা হলে।—আঙুল চুষতে চুষতে হাল্কা সুরে বলল সুখময়।

—এর মধ্যে ভবসা দেবার কি আছে। উঃ, মা গো, কি কথার ছবি হয়েছে আজ-কাল আপনায়।

নিশ্চিন্ত হাসিতে সুখময়ের চোখ দুটো নাচতে লাগল। একসঙ্গে দুটো অর্ডার দিল। পারলে বোধ হয় একসঙ্গে ছমাসের ক্ষতি পূরিয়ে নেবার জন্য ছটাই অর্ডার কবত।

—দেখবেন কিন্তু। আগের মত সহ্য করতে পারেন তো।

গোয়ালে গিলতে গিলতে একগাল আকর্ষণ হাসি ক্রান্ত করল সুখময়—সেকথার উত্তরে।

আর মাঝে মাঝে আড়চোখে শান্তির মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগল।

খাওয়ার পালা শেষ করে অতঃপর উঠে পড়বার পালা। কারণ শান্তি তো দেখা যাচ্ছে এর মধ্যেই উস্খুস্ সুরু করেছে খাওয়া শেষ কবে। না হয় রান্ধার চলতে চলতেই তোলা যাবে কথা। না হয় শেষ পর্যন্ত ওর ডেরা অবধিই যাবে।

কে কাকে উঠতে বলবে এটা নিয়েই শেষটা কাটল শানিকল্প। অকারণ কেমন একটা স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করল সুখময়। আর তার ভাবসাব দেখে শান্তিবও। উত্তরে উত্তরের দিকে ঘন ঘন তাকাতে তাকাতে হয়রান হয়ে উঠল। অবশেষে উতলা কণ্ঠে শান্তিই জিজ্ঞাসা করল—কি বমি বমি লাগছে নাকি?

—আরে না না। ওটা যাক এবার কি বল।

—বাস্য্য, আমার ভব ধরে উঠেছিল।

—হুঁ, তা হলে ওটা যাক।—পাংশু একখণ্ড হাসি সুখময়ের চোটে।

—ওঠাই তো উচিত—উঠে দাঁড়িয়ে মিস্ট একটু হাসল শান্তি।

একটু হেসে আবার বলল—নাকি, আরও খাওয়ার ইচ্ছে রাখেন। উঃ, পুরো এক ডেকা মাংস রান্না করে, বাড়িতে নিমন্ত্রণ কবে, একদিন খাইবে দেখতে ইচ্ছে করে আপনাকে।

এর পব আর বিলুপ্ত স্নায়বিক দুর্বলতা অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। সুখময় নিশ্চিন্ত।

বয় এসে হাজির। একটা ছোট রেকাবীতে মসলা আর এক টুকরো বিল। মসলা তুলে নিতে নিতে সুখময় চতুর কাণ্ডার বলল—তোমার চাকরীর খাওয়াটা যে এরকম অনি-শ্চিতভাবে খেতে হবে কে জানতো বল তো। তা বাই হোক, বেশ ভালই খেলাম।

শান্তি হুঁ কুচকে অশ্রুত নিরুত্তর হয়ে গেল। তারপর তেরহা করে চাইলে একটু। বুকটা ধড়াস করে উঠল সুখময়ের। বলেই ফেলল বুক ঠুকে—তা হলে বিলটা এবার?

মেয়েটা মুখের মধ্যে একটা দৃষ্টি করে ধপাস কবে আবার বসে পড়ল।

—আপনার ভাবসাব দেখে গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হ'ল—এরকমই একটা কিছু ঘটবে।

মুহূর্তের মধ্যে বৃকে নিল সুখময়, ঘটনাটা কি ঘটে গেছে। নাঃ এই বুক ঠুকে বলার পালাটা গোড়াতেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল। এখন ভাবছে বটে, কিন্তু দীর্ঘদিনের ব্যবধানে 'চাপের' গম্বুটা যে রকম সর্বনাশা চুষকের মত আকর্ষণ করছিল,—আগেরের কথা অত খতিয়ে দেখা সম্ভব ছিল নাকি। কিন্তু জট বে এখন তাকেই খুলতে হবে,

সাপ্তাহিক বসুমতী

সুখের সঙ্গে সে কথাটাও অনুমান করতে বিশেষ দেরি হ'ল না।

বয়টা দাঁড়িয়েছিল। বিলম্ব দেখে রেকাবী-শব্দে বিলটা টেবিলেব উপর রেখে পাশের টেবিলে গেল। বয়টাকে সরে যেতে দেখে শান্তির মধুর পাশে রং বদলাল। সে মৃদু পড়ল।

—চাকরী খাওয়া, চাকরী খাওয়া, কি সব বলছিলেন বলুন তো।

—কিন্তু বলি নি—সুখময়ের বলার চালাটা এবার গম্ভীর শোনাল।

—আমি তো জানি আপনি খাওয়াছেন—

—আমিও জানতাম ছুঁমি। —অন্যদিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত উত্তর করল সুখময়। হৃদয়তকাল আগের স্মারবিক দর্শনতা তার কেটে গেছে। এখন সে আমল দিত না, শুধুকার মেজাজে ফিরে গেল।

—বাক গে, বটমার মধ্যে কিছ্ আছে টায়ে?

শান্তিও শরীরে জ্বালা ধরছিল। রি রি করে। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল।

হুঁ। —সুখময়ে পড়লে বুদ্ধি খেলার ব্যাপারে সুখময়ের সুনাম আছে। —বেশ, তা হলে কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য বন্ধক রেখে বেতে হচ্ছে তোমার।

—উঃ, সাময়িক লোক তো আপনি। গলা বুলে আসছিল মেয়েটার।

—ভয় নেই, আশ ঘটায় মধ্যে বন্ধকী

খালাস করার মত পরস্যা বোগাড় করা খুব শক্ত নয়—বুদ্ধি।

উত্তরে কিছ্ একটা বলতে যাচ্ছিল শান্তি। কিন্তু সুখময় সুযোগ দিল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। তখনও তাব চেতনা প্রথম—যত তাড়াতাড়ি জট খুলতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি কেসের কথাটা পাড়বার সুযোগ হবে।

শান্তি কি বলবে তার জানা নেই। কিন্তু সে বাজী ধবতে পারে, আশ ঘটায় দু-চার মিনিট আগেই সে ফিরেছিল। মেয়েটার উপর যতটুকু ক্ষোভ ইতিমধ্যে জমিয়েছিল, তখন তার বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। উল্টে বেচারীর উপর কিস্তি সহানুভূতিই জাগ্রত হল। নাঃ যথেষ্ট অনায়াস করা হয়েছে তার উপর। বন্ধক হিসাবে যদি কোন মেয়েকে এরকম বসে থাকতে হয়—শুধু বিবেক পরস্যা না দিতে পারার দরুন—তবে আর বাকী থাকল কি।

টুক পড়ল। আর্মিনিয়ান হাঁপাতে হাঁপাতে। কোনদিকে তাকাল না। সরাসরি গিয়ে উপস্থিত হল সেই ছায়া ছায়া কোলভাধরের কোণটিতে। প্রায় না তাকিয়েই হাতটা বাড়িয়ে দিল।

—কৈ বিলটা দেখি। অন্যমনস্কতা কটে নি ভাল করে।

মেয়েটা বাড়ি ঘুরিয়ে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা ঘাড়।

অন্য চেররগলিতে আবার কারা এসে জটল এর মধ্যে।

একী! চোখে চোখ মিলতে চককে গেল সুখময়। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মেয়ের মৃদু।

—মাপ করবেন। বস্তু অপস্মৃত হয়ে গেল সুখময়।

অপরিচিত মেয়েটির মৃদু আবব প্রেটের দিকে ঘুরে গেল। সঙ্গে সংগীদরও। হুঁ, খোঁপাটাই মজিয়েছে। আর বোধ হ'ল কাপড়ের খটকাও।

কিন্তু গেল কোথায় শান্তি। মনের প্রসন্নতা আবার বিগড়ে উঠল। তবুতল করে খুঁজতে লাগল এক একটা করে টেবিল, আর চোখ কপালে উঠতে লাগল। হাওয়ায় মিলবে গেল নাকি সুখময়েব শালী। মানেজারের টেবিলেব সামনে এসে থামলো। মানেজার ঔৎসুক্যভরা চোখে বলল—বসুন না স্যার।

চিন্তিতভাবে বসে পড়ল সুখময় সামনের একটা টেবিলে। বয় এলো একজন। ভাবল চা খাবে আবার। চোখ তুলে অর্ডার কবতে গিবে আটকে গেল চোখ। সেই বয়টা। একটু থেমে অর্ডার দেবার আগেই বয়টা একটু হেসে বলল—মেসার, বিল দেখে চলা গিয়া সাব।

সেকথা বেন শুনতেই পার নি এমনি ভাব করে, কর্পোরেল রগদুটো টিপে ধরে গলার ম্বর চড়িয়ে বলল—চা লে আও।

সে অবাক হবে নাকি গাধা কেন ফস্ক যাবার জন্য শোক করবে কে তাকে বলে দেবে।

মোনালিসা

দ্বিতীয় পর্বাংশ

পর্শেদ্বিকাক্ষ ভট্টাচার্য

এখানে না, এখানে থেকে পাল।

এখনও তোব অলঙ্করণে হাসি

কোন পাড়ায়ত আগুন লগায়, জ্বালা

কোন বাড়িতে নাটক, সর্বনাশী?

না, তোর চোখে রৌবের হা হা,

শাস্তা দেখায় দূরে কীর্তিনাশ।

প্রসন্ন হও, আগুন, প্রণাম, স্নাহা।

মিনতি রাখো, আড়াল করো বাসা।

অরণ্যে বাওঃ জড়গৃহে অরহ

হায়না, বাঘ, সাপের কোলাহল

কুম্ভায়া; ঘাসে পলাশ গাছে

অনেক রাতে সোনামণিক জ্বলে।

এখানে মন হলদে ঘাসে মোড়া।

চাঁদের চোখে পিতামহীর হাসি।

পেঁচা ওড়ে, খোঁজে কঁকনঝোড়া;

কোথায় পাবে? যাবি গয়া কাশী।

না, না, পালা এবান থেকে পালা।

এখানে তোব অস্তমিত দিশা।

দা ভিগি তোর জ্বালায় লবেল-মালা।

কে হবে তোর প্রেমিক, মোনালিসা?

ভারত প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষামূলক

৪ দ্বিতীয়

১৮৬১-৭১

১৮৬২ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত যে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলছিল তার রিপোর্ট ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে সিমলা থেকে কানিংহাম কর্তৃক দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। গভর্নর জেনারেলকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে বর্ণিত পরিষ্কারণ অনুযায়ী কানিংহাম ১৮৬১ সালের ডিসেম্বর থেকে কাজ আরম্ভ করেন। এই চার বৎসরে মোট ১০৫টি স্থানে অনুসন্ধান চালানো হয়। এতগুলি স্থানেই নামের উল্লেখ পঠকদের পক্ষে বিরক্তিকর হলেও, তা না করে উপায় নেই। (কানিংহাম স্থানগুলির বা নাম লিখেছেন, আমি তাই উল্লেখ করছি; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কানিংহাম স্থানীয় নাম বজায় রেখেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যেখানে কানিংহাম স্থানটির Identification সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন নি, সেখানে তিনি প্রাচীন নামই ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কানিংহাম কাজ করেছিলেন শতাধিক বৎসর পূর্বে; কাজেই এতদিনে বহু স্থানের নাম ও সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে।)

আর্কিওজিকাল সার্ভেয়ার পদে থাকাকালীন প্রথম চার বছরে কানিংহাম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে অনুসন্ধান চালান : গয়া, বৃক্ষগয়া, বাকরোর, পূনাওয়া, কুর্কিহার, গিবিরেক, রাজগীর, বরগাঁও, বিহার, ঘোষ-রাওয়া, তিতরাওয়া, অরুসর, বরাবর, ধারাবত, বসার, কেশরীয়া, লোরির অর-নাঙ্গ, লোরির ক্ষ্মনগড়, পদরওনা, কাশিয়া, খুখুন্দো, কাহাও, হাখিয়া দ, ভিটরি, বারানসী, দিল্লী, মথুরা, খালিশ, মদাওয়ার, কাশীপুর, রামনগর, সোয়েন, অগ্রাজিথব, সুকিশা, কনোজ, কাকুপুর, দৌল্লিয়ারের, এলাহাবাদ, কোশাম, সুলতানপুর, ধোপাপপুর, অমোয়া, হাতিলা, লাহেট-মাহেট, ডাণ্ড, নিমসর, বারিধর, দেওয়াল, পরশুদাকোট বিলাই-খের, কাবর, ওহিন্দ, লাহের, ওরুন, তক্ষশিলা, হাসান-আবদাল, বার্গতি পিণ্ড, বলর, বাদবপুর, জওল, তাবনাওয়া, কুন্ডা, রাওলালপিণ্ড, মানিকাল, সখবাসিত, দিলাওয়ার, মঙ্গ, কটাল, মঙ্গলা, অসর, রন-শি, আবাকাপি, সরহিন্দ, যানেশ্বর, আমিন, পেহোয়া, সুখ, হাবিন্দাব, মোরখর, চতুর্ভূজ, বৈবাট, আশের, ধনধার, আঞ্জমীড়, চন্দ্রাবতী, ধামনার, খোলাভি, সাবঙ্গ-পুর, মহাময়দান, ঝাবকান, মায়ান, কুলহাবস, মনোদ, নলপুর, হিষাতগড়, গোমালিয়র, মুরাবাদ, কুটওয়ার, সুহানিয়া, বড়ী চান্দেবী খাজুরহো এবং মহাবা।

উপরি-উল্লিখিত প্রতিটি স্থানেই অল্প প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই নিদর্শনগুলি হচ্ছে প্রধানত লেখমালা, প্রাচীন মূর্তি, স্তূপ এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, স্তম্ভ, অনুসন্ধানের সমস্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব, সেইহেতু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। কানিংহাম গয়া থেকে অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। গয়া এবং পার্শ্ববর্তী বৃক্ষগয়া, এই দুটি প্রাচীন নগরে অল্প মন্দির, স্তূপ, লেখমালা ও মূর্তি পাওয়া গেছে। মন্দিরাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুপাদ মন্দির, গদাধর ও গরেশ্বরী দেবীর মন্দির, সুবর্মমন্দির, ব্রহ্মবোনি ইত্যাদি; বৃক্ষগয়ার মূল মন্দির ছাড়াও অমর-সিংহের মন্দির, বাঘেশ্বরী ও তারাদেবীর মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৃক্ষগয়ার প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কানিংহাম একটি বিশাল স্তূপ দেখেছিলেন। গয়া এবং

নরেন ভট্টাচার্য

বৃক্ষগয়ার যে সমস্ত লেখমালা পাওয়া গেছে সেগুলি মধ্যযুগীয় রাজাদের, বৃক্ষগয়ার কিছুটা পূর্বে বাকরোর নামক একটি গ্রামে কানিংহাম একটি ইন্সক্রিপশন ১৮টি দেখেছিলেন, যেটিকে স্থানীয় ভাষায় কার্ণি ১৮টি বলা হয় যেখান থেকে কানিংহামেরও ৭০ বছর আগে কিছু বৃক্ষমূর্তি আঁকিত লাক্ষ্য-নির্মিত সীল পাওয়া গেছে। গয়ার ১৪ মাইল পূর্বে পূনাওয়া গ্রামে প্রাপ্ত নিদর্শন-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিলোকনথের মন্দির এবং একটি ১৮টি দেখাচ্ছেন বৌদ্ধ দেবী বজ্রবাহারী একটি বিশাল মূর্তি পাওয়া গেছে। পূনাওয়ার তিন মাইল উত্তর-পূর্বে কুর্কিহার গ্রাম থেকে কানিংহামের পূর্বে মেজর ক্রিটো অনেক মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন। কানিংহাম কুর্কিহার থেকে কয়েকটি ছোট ছোট লেখমালা পেয়েছেন যেগুলি তাঁর মতে ৮০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। কুর্কিহারের ধামেশ্বরী দেবীর মন্দিরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। নিকটবর্তী গিবিরেক নামক পার্বত্য গ্রামটিকে কানিংহাম হিউয়েন-সাঙ বর্ণিত ইন্দ্রালিগুহাব সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। এখানকার গিহরওয়ার গুহাটি দেখে কানিংহাম এইব্দ ধারণা করেছিলেন। এখানে অনেকগুলি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অরাসন্য-কর্ষক।

বাজগহ, নালন্দা প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান-গুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কানিংহামের

পূর্বে এবং পরে বহুবার হয়েছে, কাজেই এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র করা যাবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন রাজগহ-বর্তমান রাজগীর ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ঠৈনিক পরিব্রাজকব্র রাজগহ ও নালন্দার যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সঙ্গে কানিংহাম প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষসমূহ মিলিয়ে দেখেছেন। রাজগীরের সাত মাইল উত্তরে বরগাঁও নামক স্থানে প্রাচীন নালন্দাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। অনুবুপভাবে বৈশালী, সারনাথ, সংকাল্যা, কনোজ, কোশাম্বী, প্রাবস্তী, পুষ্পলাবতী, তক্ষশিলা প্রভৃতি প্রাচীন স্থান-গুলিকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে। তা ছাড়া নগরহার শহরের কলিক-মঠ, মথুরার লুবিষ্ক ও কুন্দসুখ বিহার, কোশাম্বীর অশোক-স্তূপ সমন্বিত সংঘারাম, জেতবন বিহার ইত্যাদিও আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়েছে। বৌদ্ধ নিদর্শনের সংখ্যাই বেশি। প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নালন্দার প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর এবং ভাবার মূর্তি, ঘোষ-রাওয়ার প্রাপ্ত ধর্মদেবের মূর্তি, তিতরাওয়া ও বসারে প্রাপ্ত ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি, কুশী-নগরে প্রাপ্ত বুদ্ধের মূর্তিদ্বয়, কোশাম্বীর বৃক্ষমূর্তি প্রভৃতি। বৈশালী বা বসারে কানিংহাম একটি প্রমাণসাইজের বৃক্ষমূর্তি আবিষ্কার করেছিলেন। এ সকল নিদর্শন ছাড়াও অল্প বৌদ্ধ স্তূপ বা সেগুলির ধ্বংসাবশেষের কথা উল্লেখ করা বেতে পারি। উদাহরণস্বরূপ আমরা বৃক্ষগয়ার স্তূপ, নালন্দার স্তূপ যেখানে বুদ্ধের নখ ও কেশ রাখা ছিল বলে প্রকাশ, বসাব বা বৈশালীর ইন্সক্রিপশন স্তূপ, কেশরীয়ার বাল্লা-বেন-ক-দেওয়া, কাশিয়ার রমাতর কিলেব উপর নির্মিত স্তূপ, সামনথের ধামেক স্তূপ, মথুরা, মাদিপূর, অহিচ্ছর, কনোজ ও কোশাম্বীর স্তূপসমূহ, পেহোয়ারের কলিক স্তূপ, হাসান-আবদালে প্রাপ্ত একটি স্তূপের অবশেষ প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি।

রাজগহ বা রাজগীরের সোনভাঙার গহর একটি লেখমালা কানিংহাম কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে। নালন্দার নিকটস্থ কাপাটিয়া গ্রামে রাজা শ্রীশোপালদেবের রাজত্বের প্রথম বৎসরে রচিত একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। বিহাব দুর্গের একটি প্রস্তরস্তম্ভে গুপ্তবংশীয় রাজাদের দুটি লিপি পাওয়া গেছে, একটি কুমারগুপ্তের অপরাধি ক্ষমদ-গুপ্তের। ঘোষরাওয়া থেকে একটি বৌদ্ধ-লিপি পাওয়া গেছে যাতে কতকগুলি মৌর্য-ভাষার নাম উল্লিখিত আছে। অষ্টম

নবম শতকে রচিত এই লিপিটি মেজব কিস্টো কতৃক আবিষ্কৃত এবং ডঃ ব্যালাস্টাইন কতৃক অনূদিত হয়। ঘোষণাওয়ার অনতি দূরে তিতবায়ো গ্রামে একটি স্তম্ভে তিন লাইন উৎকীর্ণ একটি লিপি পাওয়া গেছে, কানিংহামের মতে বা খৃস্টীয় অষ্টম শতকে রচিত। তিতবায়োয় অনতি দূরে অবস্থিত অক্ষর গ্রামে মেজব কিস্টো একটি গুপ্তলেখ আবিষ্কার করেছিলেন যা অনূদিত হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দ্বারা। বরাবর পাহাড়ের কণ্ঠোপস্থিত গুহার বহির্দেশে একটি অশোকলিপি পাওয়া গেছে যাতে বলা হয়েছে যে সম্রাটের রাজত্বের ১১তম বৎসরে গুহাটি নির্মিত হয়েছিল। অনূদিত একটি লিপি যা অশোকের রাজত্বকালের দ্বাদশ বৎসরে রচিত সুদামাগুহার দ্বারদেশের পূর্বদিককার দেওয়ালে পাওয়া গেছে। লিপিটি অনুবাদ করেছিলেন প্রথমে চার্লস উইলকিন্স ও পরে জেমস প্রিন্সেপ, বরাবর পাহাড়ের বিশাল গুহার আবও একটি অশোকলিপি পাওয়া গেছে, যা সম্রাটের রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে রচিত। নাগাজুর্ন পাহাড়ের দুটি গুহার অশোকের গৌরবশরৎ লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। গোবখ-পুন্ডের ৪৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কাহাও গ্রামে একটি স্তম্ভলিপি পাওয়া গেছে। আজিমগড় ও বাবাগঙ্গীর মধ্যবর্তী হাথিয়া দ' গ্রামে একটি স্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ একটি মধ্য-যুগীয় লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। বাবাগঙ্গী এবং গাজীপুন্ডের মধ্যবর্তী ভিটরিতে গুপ্ত-সম্রাট স্কন্দগুপ্তের একটি বিখ্যাত লিপি পাওয়া গেছে। দিল্লীর ফিরুজ শাহ স্তম্ভের উপর প্রাপ্ত অশোকের অনুশাসনের কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মুসৌরীর নিকটস্থ খলিশ গ্রামেও একটি অশোকের অনুশাসন পাওয়া গেছে। প্রয়াগে পাওয়া গেছে অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের লিপি। কৌশাম্বীরে একটি স্তম্ভলিপি পাওয়া গেছে যাতে বিভিন্ন যুগের অনেকগুলি লেখমালা বর্তমান। দিল্লীর নিকটবর্তী লৌহস্তুপে উৎকীর্ণ একটি ছয় লাইনের লিপির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া মথুরার গুপ্তলিপি, অহিচ্ছ্র, দেওয়াল ও বারার প্রাপ্ত লিপিগমূহ; মানিক্যালের কনিষ্কলিপি; পেহোয়ার প্রাপ্ত রাজা ভোজদেবের লিপি; ওয়ান্দ, চন্দ্রাবতী, রানোড ও গোয়ালিরে প্রাপ্ত লিপিগমূহ; তক্ষশিলার তাকশাসন প্রভৃতির কথাও উল্লেখ করা চলতে পারে।

অপরাধের প্রত্যয়িতক নিবন্ধনের মধ্যে কয়েকটি স্তম্ভের কথা না উল্লেখ কবে পারা যায় না। বিহার নগরে দুটি গুপ্তলেখমালা সমেত একটি প্রস্তরস্তম্ভ; বাখরার ভীমসেন-কালাট, লৌরিসা-অর-নাজ এবং লৌরিসা নন্দনগড়ের স্তম্ভসমূহ; কাহাও স্তম্ভ; ভিটরি স্তম্ভ; দিল্লীর সন্ধিকটস্থ লৌহস্তম্ভ; সংকিশার হস্তীস্তম্ভ, ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্তম্ভগুলি ছাড়াও কয়েকটি গুহার কথাও বলা উচিত, যেগুলির মূল্য ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব অসীম। হুমেন রাজগীরের সন্তপাণি ও সোনভাডার গুহা; বরাবর পাহাড়ের লোমশ, কাঁচ, সুদামা, কণ্ঠোপস্থিত, নিগোহ ও বিশ্বামিত্র গুহা; নাগাজুর্ন পাহাড়ের গোপি-কা-কুস্তা, বাগিয়া-কা-কুস্তা এবং বদখি-কা-কুস্তা; দম্ভলোক পাহাড়ের মদন গুহা; বাজারিয়াব উত্তর-পশ্চিমে কাম্মারী-ঘর; এবং খামনার, গোয়ালির এবং কুম্বীরের গুহাগুলি কানিংহামের অনুসন্ধানের প্রথম দুটি রিপোর্টে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই অনুসন্ধান-কালে কানিংহাম অনেক বিশালাকার মাটির টিবি দেখেছিলেন যেগুলি খনন করলে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ পাবার সম্ভাবনা ছিল। কানিংহাম নিজে এই ধরনের কয়েকটি টিবি খনন করেছিলেন। এইসব টিবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুঁকিহারের সুগতগড়; জগদীশপুর্ এবং কেশরীয়ার টিবিগুলি; কাশিয়ার দৈবীস্থান ও রমাত্তর টিলা; খুখুন্দোব শিব-কা-টিলা; -হাথিয়া দ' এর সুবী-কা-টিলা; সংকিশার নিবি-কা-কাট; কনৌজের লালা মিশরের মহম্মা, ভাটপুর্নী মহম্মা ও মথদুম জহানিয়া; অখোয়ার মণি-পর্বত, কুবেরপর্বত ও সুত্রী পর্বত; মথুরার সং-টিলা ইত্যাদি।

কানিংহামের রিপোর্টে তৃতীয় খণ্ড ৮১৭০ খৃস্টাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৭১-৭২ খৃস্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক

কার্যকলাপের বিবরণ এই রিপোর্টের বিষয়-বস্তু। বর্তমান পর্যন্তে অনুসন্ধানকার্য চলছিল মথুরা, ভিটা, গেরো, লাটিয়া, অখণ্ড, বজার, মসার, আয়া, বৃন্দগয়া, প্রাণবোধি, গয়া, জোখিয়ান, রাজপুহ, গিরিমেক, কাপোটিকা মঠ, কিয়ল, বিরদাবন, জয়নগর, নোনগড় এবং ইন্দোপুটে। ১৮৬২-৬৩র অনুসন্ধানের সময় কানিংহাম মাত্র ছয়দিন মথুরায় ছিলেন। কিন্তু এবারে তিনি দীর্ঘকাল মথুরায় অনুসন্ধান চালান এবং কংকালী ও চৌবার টিলাস্বর খনন করেন। এই খনন কার্যে ফলে কুবাণ-বংশীয় রাজা কনিষ্ক হৃদ্বিষ্ক ৩ বাসুদেবের অনেকগুলি লেখমালা আবিষ্কৃত হয়। তা ছাড়া এই টিবিগুলি থেকে কানিংহাম অনেক ইন্দো-গ্রীক রাজাদের মূর্তি পান। মথুরার কাটরা টিবি থেকে কানিংহাম 'দুবেই মায়াদেবীর মূর্তি সমন্বিত একটি বৈদ্য বেলিং-এর অবশেষ, একটি গুপ্তলেখ ইত্যাদি পেয়েছিলেন। তা ছাড়া জেল, চৌবা ও চৌবাগি টিবিগুলি থেকেও তিনি অজয়াদিশর্ন সংগ্রহ করেন, বেশির ভাগই অবশ্য মূর্তি। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে কংকালী টিলায়। মথুরা থেকে অজয় স্তম্ভ পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে ছয়টি খুব বৃহদাকার; কানিংহামের সময়েই একটিকে কলকাতার যাদুঘরে আনা হয়েছিল। স্তম্ভগুলির অধিকাংশই কাব্যকাব্যপূর্ণ। কটরা টিবিতে দুটি বিরাট স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ কানিংহাম

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

গ্র্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কালিকাতা—৫০

নোতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাপপুর

বেঙ্গলহাডা - শ্রীনগর - গোহাটী

দেখাছিলেন। এ ছাড়া মথুরাতে আরও দুটি সিংহস্তম্ভ এবং মনুসম্মানকসম্মানিত দুটি বৃক্ষস্তম্ভ পাওয়া গেছে। একটি হস্তীসস্তম্ভও পাওয়া গেছে যার গোড়ায় রাজা হর্ষবংশের নাম লিখিত আছে। বৌদ্ধ বেলিং-ও মথুরাতে বেশ কিছু সংখ্যক পাওয়া গেছে। ১৮৭১-৭২-এর অনুসন্धानে বৃক্ষগয়াতেও স্তম্ভ ও বেলিং পাওয়া গেছে, বেগুলির কয়েকটিতে কিছু লেখমালা খোদিত আছে। বাবানসারী ৩৬ মাইল পূর্বে লাটিরা গ্রামেও একটি বৃক্ষ স্তম্ভ এই অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই স্তম্ভটির উপরে আটটি সিংহ বসানো আছে।

এই অনুসন্ধানে মথুরা এবং অপরায়র স্থান থেকে অজস্র মূর্তি পাওয়া গেছে, অবশ্য এখানে প্রত্যেকটির বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। চৌবার টি থেকে কানিংহাম একটি বিশাল স্তম্ভক আবিষ্কার করেন, চিবুক থেকে কপাল পর্যন্ত বার উচ্চতা ১৪ ইঞ্চি। কানিংহামের মতে এটি হরুত কোন বৃক্ষমূর্তির স্তম্ভকই হবে। কংকালী টিলা থেকেও কানিংহাম কয়েকটি বিশালাকার পূর্বব ও স্ত্রীমূর্তি পেয়েছিলেন। এখানেও একটি বৃক্ষাকার নারীস্তম্ভক পাওয়া গেছে। মথুরার স্তম্ভগুলিতে অজস্র স্ত্রী ও পুরুষমূর্তি টেকসই আছে। এ ছাড়া গাড়েয়ার প্রাপ্ত স্ত্রী, বিদ্ধ ও শিবের মূর্তি বিদ্ধর অবতার-

সমূহের মূর্তি, অশ্বারূঢ় একটি মনুষ্যমূর্তি এবং গাড়েয়ার মন্দিরে প্রাপ্ত রণশালের মূর্তিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অশ্বারূঢ় ও ঘোড়ার অনেক স্তম্ভক মূর্তিও পাওয়া গেছে। মথুরার আটটি জৈনমূর্তিও বিখ্যাত। প্রসঙ্গক্রমে গয়ায় প্রাপ্ত একটি বিশাল ইন্দুমূর্তির কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপবাসর উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহের কথা এভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। দিলদায়নগরের নিকট অশ্বারূঢ় নামক একটি গ্রামে কয়েকটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। লাক্ষী-সরাই রেল-স্টেশনের নিকট কিরদারন নামক গ্রামে একটি বিশাল স্তম্ভ, বৃক্ষমূর্তি ও লাক্ষার শীল পাওয়া গেছে। আর্যতে একটি অশোকস্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে। এলাহাবাদের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গাড়েয়া নামক স্থানে বেশ কিছু সংখ্যক লেখমালা এবং রাজা শংকরদেবের মূর্তি পাওয়া গেছে। এলাহাবাদের অনতিদূরে ভিটা গ্রামে পাথরের অসংখ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৮৭১-৭২-এর অনুসন্ধানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য হচ্ছে লেখমালা সংগ্রহ। মথুরা থেকে মোট ২৪টি লেখমালা পাওয়া গেছে, জেল-চাঁব থেকে সাতটি, কংকালীটিলা থেকে তেরটি এবং কাভা চাঁব থেকে চারটি। কুম্ভাবংশীর তিনজন রাজা এবং সমুদ্রপুত্রের লিপি থাকার দরুন এই লেখমালাগুলির গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিটা থেকে পাঁচটি বৌদ্ধলিপি পাওয়া গেছে। গাড়েয়া থেকে আবিষ্কৃত হয়ে ১৬টি লেখমালা বেগুলির মধ্যে দুটি গুপ্তলেখ, তিনটি জনৈক বৌদ্ধ, এবং বাকি এগারটি একটি মধ্যযুগীয় মন্দির থেকে পাওয়া গেছে। মথুরা থেকে আটটি লেখমালা পাওয়া গেছে বিভিন্ন জৈন মূর্তির গোড়ায়। শিবদায়নগর অনুসন্ধানে বৃক্ষগয়া থেকে নব্বি লেখমালা পাওয়া গেছে বেগুলির মধ্যে, কানিংহামের মতে, চারটি অশোক যুগের, দুটি গুপ্ত যুগের এবং অবশিষ্ট তিনটি কুম্ভাবংশীর লিখিত। রাজাওনা থেকে পাওয়া গেছে চারটি লেখমালা বেগুলি খোদিত ছিল মূর্তির দেহে; এবং বিরদাবন থেকে প্রাপ্ত চারটি শীলের উপরেও অঙ্কিত লেখমালা পাওয়া গেছে। তবে ঐতিহাসিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় মথুরার লিপিগুলি বেগুলি অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক ডাউসন এবং তাঁর অনূদিত ২৪টি লেখমালায় 'Text'-ই কানিংহাম তাঁর রিপোর্টে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লেখমালা যা বর্তমান রিপোর্টে স্থান পেয়েছে তা হচ্ছে কুম্ভাবংশীর রাজাদের ৩১টি লিপি। এগুলির মধ্যে চারটি উল্লেখযোগ্য লেখমালা পূর্বেই Asiatic Researches পরে প্রকাশিত হয়েছিল বেগুলির মধ্যে বৃক্ষ স্তম্ভলিপি এবং মথুরার ও দিনাজপুরের তাম্র-

শাসনশ্বর চার্লস উইলকিন্স কর্তৃক অনূদিত হয়েছিল; অপর একটি লিপি যা ঘোষারায় থেকে মেজর ক্রিটো আবিষ্কার করেছিলেন, ডা ব্র্যালাস্টাইন কর্তৃক অনূদিত হয়। এই ৩১টি লিপি হচ্ছে মথুরার তাম্রশাসন; বৃক্ষলের স্তম্ভলিপি; দিনাজপুরের নিকটস্থ আম-গাছির তাম্রশাসন; নালন্দায় একটি চতুর্ভুজা দেবীমূর্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ গোপালদেবের নামসহ একটি লিপি; গয়ায় বিষ্ণুপাদ মন্দির-চত্বরে একটি পাথরের উপর নারায়ণপালের নামাকিত লিপি; বিহারের বিগ্রহপালের লিপি; বৃক্ষগয়ায় মহীপালের নামাকিত লিপি; নালন্দা ও তিডবাওয়া মহীপালের নামাকিত লিপি; গয়ায় নম্রপাল ও বামগয়ায় মহেন্দ্রপালের লিপি; গুনেবিয়ার মহেন্দ্রপাল, বিহার নগরের রামপাল ও বিহার পাহাড় মদনপালের লিপি; জয়নগরে মদনপালের লিপি; গয়ায় গদমর মন্দিরে গোবিন্দপালের লিপি, এবং সূর্যমন্দিরে উৎকীর্ণ একটি লিপি, কানিংহামের মতে যা থেকে বৃক্ষের নির্বাণের তারিখ আন্দাজ করা হবে; বৃক্ষগয়ায় প্রাপ্ত একটি অসম্পূর্ণ লিপি এবং গয়ায় প্রাপ্ত একটি দুর্বোধ্য লিপি এবং ওই একই স্থানে প্রাপ্ত দশটি গোঁপ লেখমালা।

১৮৭১ খৃস্টাব্দের কানিংহাম প্রভৃতি বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হবার পর তিনি দুজন সহকারী বাহার অনুদিত পান, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন জি, ডি, বেগলার এবং অপরজন হচ্ছেন, এ, সি, এল, কাল্‌হিল। প্রথমজনকে তিনি দিল্লী এবং দ্বিতীয়জনকে আগ্রার অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, এবং তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল কানিংহামের রিপোর্টের চতুর্থ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। ১৮৭১-৭২-এর অনুসন্ধানের জন্য কানিংহাম তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশটিকে মনোনীত করেন। সমগ্র অঞ্চলটিকে তিনি তিনটি প্রায় সমান ভাগে ভাগ করেনঃ যমুনার উত্তর দিকের জেলাগুলি নিয়ে আগ্রা অঞ্চল; এবং ঐ রাস্তার পূর্বদিকের জেলাগুলি ইম্পোর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বা আজমগড় অঞ্চল; এবং ঐ রাস্তার পূর্বদিক জেলাগুলি নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বা বৃন্দেলখণ্ড অঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের দায়িত্ব কানিংহাম স্বয়ং গ্রহণ করেন, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বেগলার এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের, কাল্‌হিল। এই কার্যকলাপের বিবরণ পরবর্তী একটি অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। কানিংহামের চতুর্থ রিপোর্টে ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। দিল্লী এবং আগ্রা এই দুইটি প্রাচীন শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানই ছিল এই রিপোর্টের বিষয়বস্তু। মূলত মুসলিম যুগের নিদর্শনগুলিকে কেন্দ্র করেই এই অনুসন্ধানকার্য চলছিল। দিল্লীতে অনুসন্ধানকার্য চালিয়েছিলেন বেগলার, এবং আগ্রাতে কাল্‌হিলঃ

রোমান উপজাতির বাহুর

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিক্টেটিভ উপজ্ঞাস মূল্য ৩।০ টাকা

২য় ভাগে—৫খানি বহু উপজ্ঞাস মূল্য ২।০

জাতীয়-কবি রজনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রজনীলাল-গ্রন্থাবলী

পদ্মিনী, হরম্মদরী, কণ্ঠদেবী, কুমার-গম্বব, নীতিকুম্মাঞ্জাল, কাকী-কাবেরী, কবির জীবনী ৫খানি একত্রে ২.০০।

গ্রাম্যাকাঙ্ক্ষা তরুণকামের সম্পাদিত

নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা

(নাড়ী স্পন্দ জ্ঞান্য রোগ নির্ণয় ও পরমায়ু নির্ণয়)
মূল্য এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,
কলিকতা-১২



কিন্তু, সেকথা, থাক্। চার্লি যে বলেছেন-
দর্শকেরা: নতুনকে নিতে পারে? একথা-
ইউরোপ-আমেরিকার দর্শকদের পক্ষে যতটা-
সত্য, আমাদের দেশের পক্ষেও কি তাই?
কিন্তু কি কারণে এই ডফাটা হয়? খানিকটা-
বোধহয় জনসাধারণের শিক্ষার তারতম্য অনু-
সারে। গির্জাচন্দ্রকে কে নাকি বলেছিল—
মশায় ইউরোপের, তুলনায়, আমাদের স্বত্বগম্য-
অনেক নিরুশ্বত।

গির্জাচন্দ্র: জবাব: দেন—কোন ব্যাপারে-
আমরা উৎকৃষ্ট বলতে পার? রাজনীতির
ব্যাপারে, শিক্ষকতা, বিজ্ঞান, এমন কি খেলা-
ধুলার ব্যাপার, কোনও দিকটাতে ওদের সঙ্গে-
আমাদের তুলনা: চলে? তবে, একমাত্র-
থিয়েটারেরই বা অপরাধ কি?

আবার চার্লি: কথায় ফিরে আসি।
সেনেট, ছাড়াও, আরও, অন্যান্য অনেক-
ডিরেক্টরের, পরিচালনার চার্লিকে, কিস্টোন-
কোম্পানীতে, ছবির কাজ কবতে হয় এবং
প্রত্যেকেরই, সঙ্গে, তাঁর, কিছু, না কিছু,
গোলমাল: বাধে। চার্লি সেনেটকে
বললেন তিনি নিজেই নিজের ছবির কাহিনী
লিখবেন এবং পরিচালনার দায়িত্বও নিজের
ওপরে নেবেন। ম্যাক সেনেট এ প্রস্তাব কানে
তুললেন না। উপবন্তু মিস ম্যাবেল নরম্যান্ড
যে ছবিটি ডাইরেক্ট করছিলেন তাতে চার্লিকে
কাজে লাগিয়ে দিলেন। ম্যাবেল দেখতে
শুনতে খুব মিষ্টিজাতীয়, মোয়ে—কিন্তু ছবি
ডাইরেক্ট করবার ক্ষমতা তাঁর, কতটুকু ছিল সে-
বিষয়ে চার্লির, বখশ্চ: সন্দেহ। প্রথম দিনই
ম্যাবেলের সঙ্গে তাঁর গোলমাল: বাধল।

ম্যাবেল একটা দৃশ্যে নির্দেশ দিলেন যে,
চার্লি হোজ হাতে বাস্তব জল ছেঁতে থাকবেন
এবং ছবির ভিলেনের গাড়ি সে রাস্তায় এসে
স্কিড: করবে। এ দৃশ্যটিকে চার্লি ইমপ্রুভ
করতে, চাইলেন—তাঁর বক্তব্য ছিল তিনি
হোজটার উপর দাঁড়িয়ে থাকবেন, যাতে তাঁর
পায়ের চাপে জল ত্রেরিয়ে আসতে না পারে—

পরে জল ছেঁটার সময় নজরটা হাতে ছুঁদে
নেবেন এবং অন্যমনস্কভাবে হোজ থেকে
পাটা তুলে নেওয়াতে ভেঙে জলের ঝটা
এসে লাগবে তাঁর নিজেবই মধ্যে তারপা...
ম্যাবেল তাঁকে কথা শেষ না কবতে দিয়ে
বললেন—ওসবের সময় নেই—সকিছু তান-
তাড়ি কবতে হবে। তোমাকে না বলা হচ্ছে
তাই কব।

চার্লি অত্যন্ত চটে গিয়ে জবাব
দিলেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত—বা খুব
বলেই আমাকে তাই কবতে হবে—এ
আমাকে দিয়ে হবে না। আমাব মনে যে
আমাকে নির্দেশ দেবার কোনই যোগ্যতা
হোমাব নেই।

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বাইবে গিয়ে
একটু দূরে চার্লি বসে বইলেন। এই
সময় ম্যাবেলের বয়স বোধহয় ষাট কুড়ি—
ফুটফুটে মেয়ে, স্টুডিওর সব মনোহর
কবেছে; সবাই তাকে ভালবাসে। কেউ ব
তাকে এভাবে অগ্রাহ্য কবতে পারে বা কখন
কথা শুনিয়ে দিতে পারে? এ ছিল তাব ধারণার
অতীত। সম্পূর্ণ হতভম্ব হবে সে কিছুদ্ধা
ক্যামেরার পাশে চুপচাপ বসে বইত। তারপা
দলের সবাই গিয়ে ম্যাবেলের চাপ্পাশে ঘিট।
বসল এবং এদের সলাপবামশ: শুব্দ হোলা
পরে চার্লি ম্যাবেলের কাছ থেকেই শুনে
ছিলেন যে, ঐ দলের দু'একজন এট্টা চার্লি
কবে পিটুনী দিতে চাইছিল। কিন্তু ম্যাবেল
বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের ঠাণ্ডা কবে। এরপা
ম্যাবেলের একজন সহকারী চার্লিকে এ-
জিজ্ঞেস করল যে তিনি সত্যিই কাজ চালা-
যাবেন, না এইভাবে কাজের বাধা সৃষ্টি কবতে
থাকবেন। কোন জবাব না দিয়ে চার্লি উঠে
এগিয়ে এলেন ম্যাবেল যেখান বসে ছিল
সেই জায়গায়, এবং বললেন—আমি অত্যন্ত
দুঃখিত মিস ম্যাবেল...কিন্তু তুমি যেভাবে
ছবি তুলতে চাইছ তার ভেতব আমি কোন
মজার বা হাসির ব্যাপার দেখতে পাইছ না।
ম্যাবেল কোনবকম তর্ক না করে বললে—
বেশ, তুমি যদি আমার কথামত কাজ না করলে

সাম্প্রতিক বসুমতী

৯০ তবে কল্পপাণি গৃহীত্রে নিয়ে ফিরে যাওয়া থাক।

অব্যয় এতে করে সেদিনকার কাজের খুব ক্ষতি হয় নি। কারণ, সকল নটা থেকে সেদিন কাজ চলছিল এবং এই গোলমালটা সূর্য হরোঁছিল বিকেলের দিকে।

লোকেশন সৃষ্টি থেকে স্টুডিওতে ফিরে চ্যাপলিন গ্রীষ্ম-পেপেট তুলছেন, এমন সময় ফেডের বেগে ট্রেনিং-রুমে ঢুকলেন ম্যাক সেনেট, তাঁর দৃষ্টিতে ফললেন—তুমি ভেবেছ কি বলতে পার? চার্লি নোথতে গেলেন যে, ছবির ভালর জন্যই তিনি মিস্ নরম্যান্ডকে সম্প্রদায় দিতে যাওয়ারত এই গোলমালের সূর্য। কিন্তু কে কার কথা শোনে! সেনেট স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, পরিচালকের কথামত কাজ না করতে পার তা তোমাকে বেব করে দেওয়া হবে চম্পিয়ে যাই লেখা থাক না। অত্যন্ত শান্তি এবং গম্ভীর স্বরে চার্লি জবাব দিলেন—কিন্তু সেনেট এখানে আসবাব অংগেও আমি নিজের রোজগারেই নিজের খাওয়া-পরা চালিয়ে নিরেছি—সুতরাং আমাকে বরখাস্ত করবার ইচ্ছা হলে, বরখাস্তই করবেন—তার জন্য আমি প্রস্তুত। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার মতই আমারও একমাত্র চিন্তা কি করে ছবিটা সব দিক দিয়ে ভাল হয়।

আর কোন কথা না বলে থাকা দিয়ে দ্বন্দ্বাচা বন্ধ করে ম্যাক সেনেট বেরিয়ে গেলেন। অনেকেই ভেবেছিল এরপর চার্লির চাকরী থাকবে না। পরের দিন সকাল আটটায় কাজের জন্য প্রস্তুত হবার কথা। চার্লি তো জানেন না তাঁকে আর কাজ দেওয়া হবে কিনা। চুপচাপ ট্রেনিং-রুমে বসে রইলেন—এমন কি মেক-আপও নিলেন না। আটটা বাজতে বিনীত দশক আগে দরজার গোড়া থেকে মুখ বাড়িয়ে সেনেট ফললেন—চার্লি তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। চল ম্যাবেলের ট্রেনিং-রুমে। বলার ভাঙটা অত্যন্ত সহদয়তাপূর্ণ। চ্যাপলিন সেনেটের অনুসরণ করলেন। ম্যাবেলের ঘরে তখন কেউ ছিল না—সেনাকি প্রোজেকসন-রুমে রাসেলগুলা দেখছিল।

ম্যাক বললেন—শোন চার্লি, ম্যাবেল তোমাকে অত্যন্ত পছন্দ করে। শূদ্র ম্যাবেল কেন, আমরা সবাই তোমাকে ভালবাসি এবং মনে করি তুমি একজন সেবা জ্ঞাতর শিল্পী। আগের দিনের তুলনায় এই ধরনের বিপরীত এবং মধুর ব্যস্তরে চার্লির মনটাও নবম হয়ে এল। তিনি উত্তর দিলেন—মিস্ নরম্যান্ডের প্রতি আমারও যথেষ্ট প্রাণ্য আছে—কিন্তু তাব বয়স অল্প—আমাব মনে হয় ছবি পরিচালনা করবার যোগ্যতা এখনও তাব হয় নি।

চ্যাপলিনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে সেনেট বললেন—আমার অনুরোধ তোমার মনে যাই

হোক, বাইরে সেটা প্রকাশ না করে তুমি ম্যাবেলকে কাজ করতে সাহায্য কর।

চ্যাপলিন বললেন—আমি তো ঠিক তাই করতে চাইছিলাম।

সেনেট—হ্যাঁ, দুজনে মিলেমিশে কাজ কর।

চ্যাপলিন—আমাকে ছবি ডাইরেট করতে নিলে আর এসব গোলমালের অবতারণা হবে না।

সেনেট—কিন্তু ছবি রিলিজ করতে না পারলে পরসা দেবে কে?

চার্লি—আমাব নিজের ১৫০০ ডলার আছে সেটা ডিপোজিট রাখতে পারি।

ম্যাক—তোমার নিজস্ব কোন গল্প তৈরি আছে?

চার্লি—গল্পের জন্য ভাবনা কি। বত ইচ্ছা গল্প যোগাতে পারি।

ম্যাক—আচ্ছা, আগে ম্যাবেলের ছবিটা শেষ করে নাও, পরে দেখি কি করতে পারি।

অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণভাবে হ্যান্ডসেক করে সেনেট বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ বাদে ম্যাবেলের কাছে গিয়ে চার্লি ক্ষমা চেয়ে নিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় ম্যাক সেনেট এঁদের দুজনের ডিনারে নিয়ে গেলেন বাইরে। পরের দিন চার্লির সঙ্গে ম্যাবেল যে মধুর ব্যবহার সূর্য করলেন তা দেখে চার্লি তো অবাক। আব দলের লোকদের তো সব দেখেছেন চক্ৰবর্তী। এমন কি ম্যাবেল চার্লির কাছে এসে মাঝে মাঝে তাঁর সাজেস-সনশ এবং আইডিয়া শুনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে লাগলেন। অত্যন্ত আনন্দের মধ্যে দিয়েই ম্যাবেলের ছবিটি শেষ করা হোল। ম্যাক সেনেটের এই রাতরাতি অশ্রুত পরিবর্তনে চার্লি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ রহস্যের সমাধান হল কয়েক মাস বাদে—চার্লি জানতে পারলেন যে গোলমালের দিন বার্তে সেনেট ঠিক কবে ফেরাছিলেন যে সপ্তাহান্তে চার্লিকে বরখাস্ত করবেন। কিন্তু পরদিন সকালে নিউ ইয়র্ক অফিস থেকে টেলিফোন এল বত পার চ্যাপলিনেব ছবি পাঠাও—এখন বাজারে এ ছবির দুর্দান্ত চাহিদা। সাধারণত কিন্টোন কম্পানীর ছবিব কুড়িটি করে প্রিন্টের বরকার হত প্রদর্শনীর জন্য। ত্রিবিংশটি প্রিন্টের চাহিদা হলে বোকা যেত ছবি খুব ভাল রকমে উৎসাহে। চতুর্থ ছবিটির চাহিদা অনুসারে প্যারিসের শিট প্রিন্ট করা হয়েছিল—এবং আবও প্রিন্টের জন্য ক্রমাগত তাগিদ আসছিল। এইসব কারণেই টেলিগ্রাম পাবার পর ম্যাক সেনেটের এ আশ্চর্য পরিবর্তনটা সম্ভব হয়েছিল।

এরপর চার্লিকে তাঁর প্রথম ছবি পবি-চালনার ক্ষমতা দেওয়া হোল। প্রথমটার একটু, যেন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন চার্লি—যেন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেনেট

প্রথম দিনের কাজ দেখে সূচ্যাত করার পক্ষ আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। ছবিটির নামকরণ হয়েছিল 'কট ইন্ দি রেইন'। ছবিটি একটা ভয়ানক বকম কিছু না হলেও, হাসির খোরাক যুগিয়েছিল প্রচুর এবং পরসা দিয়েছিল যথেষ্ট। ছবিটির কাজ শেষ হতেই সেনেট চার্লিকে জিজ্ঞেস করলেন—পরের ছবি সূর্য কববার জন্য প্রস্তুত আছ তো? এরপর থেকে চার্লি নিজের ছবির কাহিনী নিজেই বচনা করতেন এবং নিজেই তা পরিচালনাও করতেন। চার্লিকে উৎসাহ দেবার জন্য ম্যাক সেনেট ছবি পিছ তাক পিচি ডলাব করে বোনাস দিতেন।

এখন থেকে যখন চার্লি দর্শকদের মধ্যে মিশে নিজেব ছবির প্রদর্শনী দেখতেন তখন অন্য রকমের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতেন। পর্দার তাঁর চেহারা ফুটে উঠতেই দর্শক উত্তেজিত হয়ে উঠত এবং আনন্দধ্বনি করতো। শুনতে বেশ ভালই লাগতো চ্যাপলিনের। বুঝতে পারতেন হাস্যবাস্তব নৈতা হিসাবে তিনি দর্শকদের মন জয় করে ফেলেছেন।

কিন্টোনে কাজ করবার সময় যেমন অনেক কিছু শিখতে পেরেছিলেন চার্লি, তেমনি ওরাও তাঁর কাছ থেকে অনেক জিনিস শেখবার সুযোগ পেয়েছিল। সে সমব ওরা টেকনিক মডেল বা স্টেজকন্সট্রাক্ট সম্বন্ধে কিছুই জানতো না। স্টেজের অভিজ্ঞতা থেকে এসব বিষয়ে চ্যাপলিন ছিলেন একেবারে পাকা। পোজ—কিন্টোনে এসবের প্রচলন তিনিই সূর্য করেছিলেন। স্বাভাবিক প্যান্টোমাইম সম্বন্ধেও ওদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত স্বল্প—মাইমিং-এর সূচ্যাতসূচ্য দিকগুলো এবং সাধকতা ও কার্যকারিতার দিকটাও ওরা চার্লির কাছ থেকেই শিখা করে।

একের পর এক ছবি বেব হয়, আর চারদিকে চার্লির জয় জয়কার। নিজের কাজ, ভাবধারা এবং টেকনিক সম্বন্ধে চার্লির তখন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস এসে গেছে। অবশ্য এর জন্য চ্যাপলিন মনে মনে বহু ধন্যবাদ জানিয়েছেন ম্যাক সেনেটকে। নিজের শক্তির প্রতি সেনেটের ছিল অসীম বিশ্বাস—এবং নিজের প্রতি এই সূর্য আত্মবিশ্বাসেব ভাবটা তিনি চ্যাপলিনের ভেতরেও জাগিয়ে তুলেছিলেন। স্টুডিওতে তাঁর সেই প্রথম দিনের মস্তব্যটি—আমরা সিনাবিও তৈরি করে কাজ করি না—যে কোন একটা ভাবকে অবলম্বন করে স্বাভাবিকভাবে সেটাকে ফুটিয়ে তুলি—চার্লির কম্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।

এই সময়ের একটা ঘটনা চার্লির মনে একটা গভীর রেখাপাত করেছিল। যে বিষয়ে চার্লি ভাবছিলেন সে কথাটাই যেন স্পষ্ট হয়ে গেল তাঁর কাছে। তখন তিনি দি নিউ জ্যানিটর' ছবিতে অভিনয় করছেন। এ বইতে একটি দৃশ্য ছিল যেখানে অফিস ম্যানেজার



*To my friend Sergei Eisenstein
with my sincere admiration
Charlie Chaplin
Hollywood Nov 18th 40*

হিস্তে স্বাক্ষরিত চার্লি চ্যাপলিনের একটি ছবি

চার্লিকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছেন। চার্লি তাঁর কাছে কাকূতি-মিনতি করছেন দয়াপরবশ হয়ে তিনি যেন তাঁকে চাকরী থেকে তাড়িয়ে না দেন। অনুনয়ের ভণ্ডারিতে প্যান-টোমাইম করে চার্লি দেখালেন তাঁর পরিবার ষড়্, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। একজন প্রাচীন অভিনেত্রী ডরথি ড্যাভেনপোর্ট রিহাসার্সালের সময় এ দৃশ্যের অভিনয় দেখছিলেন—অভিনয়ের সময় একবার তাঁর প্রতি চোখ পড়তে চার্লি দেখলেন মহিলা

কাদছেন। তিনি বললেন—আমি জানি তোমরা এ দৃশ্যে হাস্যরস সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছ, কিন্তু কেন জানি না এ দেখে আমার কান্না আসছে। তাঁর কথায় চার্লি বুঝতে পারলেন ভেতরে ভেতরে যা করবার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন, তা সফল হয়েছে। অর্থাৎ একই সঙ্গে কান্না এবং হাসির অদ্ভুত সংমিশ্রণে একটা নতুন রসের তিনি অবতারণা করতে পেরেছেন।

ভারতীয় অভিনেতাদের ভেতর এক

শিশিরকুমারই একবার দেখেছিলেন এই হাসিকান্নার ভাবটা একসঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে—রীতিমত নাটকের শেষ দৃশ্যে। বারি এ অভিনয় দেখেন নি তাঁদের কাঁদিয়ে বলা অসম্ভব কি অদ্ভুত মর্মস্পর্শী করে তুলেছিলেন এ দৃশ্যটিকে শিশিরকুমার, সত্যজিৎ রায় উইথ টিয়াসের সংযোগে এবং চন্দ্রশেখর।

চ্যাপলিন ছায়া-চিত্রজগতের সেরা হাস্যরসাত্মকতা—শ্রেষ্ঠ এই কারণে যে তিনি যখন লোককে হাসিয়েই ক্ষান্ত হন নি—যদি হাত তা হলে লরেল-হার্ডি বা হ্যান্স ও নরভের সমশ্রেণীতেই তাঁর স্থান হতো—সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাবতে সুরু করিয়েছেন, তাদের কাঁদিয়েছেন, জীবনের গভীর এবং কঠিন সমস্যাসমূহের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, মানুষ যাতে তাদের হাঁসি, দম্ভতা, নীচতাকে ছাড়িয়ে উঠে মহত্ত্বের হস্ত উঠতে পারে তার জন্য সারা জীবন তার বিশেষ ক্ষেত্রে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

যে কোনও একটি কিস্টোন কামড়ী ছবি তুলতে বোর্শির ভাগ ক্ষেত্রেই এক সপ্তাহের বোর্শি সময় লাগত না। এমন কি এক বিকেলের ভেতর চ্যাপলিন 'টোমাইম অফ্ লাভ' ছবিটি তুলেছিলেন—এটি ছিল আগাগোড়া হাসিতে ভরা। 'ডাফ এণ্ড ডাইনামাইট' ছবিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল—এটি তুলতে চ্যাপলিনের নয় দিন সময় লেগেছিল—খচর পড়েছিল আঠারশো ডলার। কিস্টোনের প্রত্যেক ছবির খরচ দায় করা ছিল হাজার ডলার। যেহেতু এ ছবিতে চার্লি বাজেটের বোর্শি খরচ করেছিলেন সে জন্য তাঁর প'চিশ ডলারের বোনাসের থেকে প্রাক্ষরে তিনি বঞ্চিত হন। ছবিটি টু-বিল্ডিং হিসাবে বাজারে ছাড়া হয় এবং এক বছরে এ ছবি থেকে একশো তিরিশ হাজার ডলারেরও বেশি আয় হয়।

এসময় এখানে যেসব ছবি তুলে চ্যাপলিন নাম করেন তার ভেতর 'টোমাইম অফ্ লাভ', 'ডাফ এণ্ড ডাইনামাইট', 'লার্মিং গ্যাস' এবং 'দি স্টেজ ড্যান্স' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

চার্লির সুপারিশে সিডনি পোয়েটস এসে কিস্টোনে যোগ দেন। প্রায় একজন, চ্যাপলিনকে দলে আনতে সক্ষম হবার সেনেটও খুব খুশি হন।

সিডনির কাছ থেকে জানতে পারলেন যে ইংল্যান্ডে তাঁর ছবি দেখার খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চ্যাপলিনের জীব থাকলে সিনেমা হল সবসময় ভরপুর হতো হয়ে থাকে।

এই সময়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। লোক ভেবেছিল দু'মাসের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু লক্ষ্যে পড়তেই দেখা গেল যুদ্ধ বাণীই সফল হোল—যুদ্ধ তের বছর ধরে। অনেকেই যুদ্ধের শেষ

হুশি হয়েছিল—জার্মানদের একটি ভালভাবে শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে। তবে যুদ্ধস্থল থেকে ক্যালিফোর্নিয়া ছিল এত দূরে, যে এখানকার লোকেরা এ যুদ্ধের ভয়াবহতা কতটা হৃদয়গম্য করছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল চ্যাপলিনের।

এই সময় ম্যাক সেনেট চ্যাপলিনের কাছে তাঁর কনট্রাক্ট রিনিউলের কথা তোলেন। কারণ পুরানো চুক্তিপত্র এসময় শেষ হয়ে এসেছিল। সেনেট চার্লিকে তাঁর টার্মস জানাতে বললেন। চার্লি বেশ বুঝতে পারছিলো তাঁর জনপ্রিয়তা এখন চরম শিখরে উঠেছে—কিন্তু যেভাবে এবং যে ধরনের ছবিতে বাজার মাং করে দেওয়া হচ্ছিল, তা যে আর বেশিদিন লোকের ভাল লাগবে না, সে যোগ্যও তাঁর ছিল—বেশ বুঝতে পারাচ্ছিলেন বড় জোর এক বছর এভাবে চলবে। সুতরাং ভাগ্যভারসা শীঘ্রবিদ্যুৎতে থাকাকালীনই জায়ের ঠিক করে মিতে হবে। গম্ভীরভাবে সেনেটকে জানিয়ে দিলেন যে, সপ্তাহে এক হাজার ডলার করে তাঁকে দিতে হবে। সেনেট তো শুনেন হতবাক। তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন, এত টাকা তো আমিও রোজগার করি না।

তা জানি—জবাব দিলেন চার্লি—কিন্তু বাকিদের সামনে যে সারো সারো লোক এসে কাঁড়ার সেট ম্যাক সেনেটের নাম দেখে লয়—ভারা দেখতে আসে চার্লি চ্যাপলিনকে।

হরতো তোমার কথাই ঠিক—বললেন সেনেট। কিন্তু তুলে যেও না আমাদের সংগঠনের সাহায্য পেছনে না থাকলে তুমি কোথায় মিলিয়ে যাবে। ফোর্ড স্টারলিং—এর কেন্দ্রটাই দেখ না। এখানে এতদিন কাজ করছি—কত নাম, জাক—কত পরমা রোজগার করল—ভাবলে নিজে স্বাধীনভাবে কাজ করলে আরও অনেক বেশি রোজগার করবে। কিন্তু তুমি কি হোল বলতে?

সত্যিই ফোর্ড স্টারলিং—এর তখন হুভারগের দিন—একটার পর একটা ছবি

ফ্রপ করছে। কিন্তু তার কারণটা এ ছিল না যে কিস্টোন কম্পানীর ব্যাংকিং-এর অভ্যন্তরে ফোর্ড এই দুর্বলতার পড়েছিলেন। আসলে চ্যাপলিনকে হাস্যরসিক হিসাবে ছবিতে দেখতে পাওয়ার পরে ফোর্ডের স্থূল রসিকতা—পূর্ণ ছবিগুলো দর্শকেরা মন থেকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না।

চার্লি কিন্তু সেনেটের কথায় এতটুকু না ঘাবড়িয়ে জবাব দিলেন—একটা কমিক ছবি তুলতে আমার শব্দ দরকার একটি পার্শ্ব, একজন শূন্যলম্বান এবং একটি সুন্দরী মেয়ে। এই অল্প চরিত্র নিয়েই চ্যাপলিন তাঁর বেশির ভাগ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছবিগুলো তুলেছিলেন।

সেনেট তাঁর কম্পানীর সঙ্গে অনেক পরামর্শ করে চ্যাপলিনকে বললেন—সোন চার্লি এ বছরের আর চার মাস মাত্র বাকী। আমরা নতুন চুক্তিপত্র এ বছরে তোমাকে সপ্তাহে পাঁচশো ডলার করে দেব। আসছে বছর থেকে সপ্তাহে সাতশো ডলার এবং তার পরের বছর থেকে তোমার মাইনে হবে সপ্তাহে পনেরশো ডলার করে।

চার্লি হেসে উত্তর দিলেন—টার্মসটা উল্টো দিলে আমি সানন্দে রাজী হব—অর্থাৎ প্রথম বছরে সপ্তাহে পনেরশো ডলার হায়ে, দ্বিতীয় বছরে সপ্তাহে সাতশো করে এবং তৃতীয় বছরে পাঁচশো।

ম্যাক বললেন—এ তোমার পাগলামো। কিস্টোন কম্পানীর সঙ্গে নতুন চুক্তিপত্রের ব্যাপারটা এইভাবেই খতম করে দিলেন চ্যাপলিন।

কিস্টোনে থাকবার দেয়াল আর মাত্র একমাস—জানি কোন কম্পানী থেকেও কোন অফার আসছে না। চার্লি ভেতরে ভেতরে যে একটু নাভাস হচ্ছিলেন না, তা নয়। বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, ম্যাক সেনেট সময়ের সাহায্য নিচ্ছেন। আসে একটা ছবি শেষ হবার পর সেনেট হাসিমুখে এসে পরের ছবি ত্যাগাত্মক শব্দ করবার জন্য ভাগ্যসা দিতেন। এবার দৃ-সপ্তাহ চার্লি কোন কাজ করছিলেন না—ভদ্রও সেনেট কিছু বলেন না। দেখা হলে অবশ্য মৌখিক ভঙ্গি বজায় রাখেন—কিন্তু কোন রকমের খনিষ্ঠতা করেন না।

একদিন ইউনিভার্সাল কম্পানী থেকে কার্ল লেমেল চ্যাপলিনকে ফোন করলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল যে ছবি তোলবার খরচ তাঁরা দেবেন এবং ছবির প্রত্যেক ফ্রেমের জন্য চার্লিকে বার সেন্ট হিসাবে মাইনে দেওয়া হবে। কিন্তু চার্লির দাবি সপ্তাহে হাজার ডলার মাইনে—এতে তারা রাজী হল না এবং ফলে এ কম্পানীর সঙ্গে কোন কাজও হলো না।

এই সময় জেমস রবিনসন নামে একটি ব্যবসায়িক সংস্থা আসাপ হলো। সে ছিল এখানে কম্পানীর রিসেপ্টিভিটি। সে

নতুন কনট্রাক্ট সুই করবার আগে দশ হাজার ডলারের বোনাস নিয়ে তারপর বারশো পঞ্চাশ ডলার সপ্তাহের মাইনের চুক্তিপত্র সুই করবেন। বোনাসের ব্যাপারটা চার্লির পক্ষেও ছিল নতুন খবর। দশ হাজার ডলারের বোনাসের চিন্তা এর আগে তাঁর মাথায় আসে নি। কিন্তু রবিনসনের মধ্যে কথাটা শোনবার পর জিনিসটা একটা ফিল্মসেন্সের মত হয়ে রইল তাঁর মনে।

রবিনসনকে সে রাতে জিনি ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন। তাকেই বেশির ভাগ সময় কথা বলতে দিলেন এবং নিজের শূন্য গেলেন। কথায় কথায় জানতে পারলেন এখানে কম্পানীর জর্জ কে, স্পুরের পার্টনার জি, এম, এন্ডারসনই রবিনসনকে চার্লির কাছে পাঠিয়েছেন—চার্লিকে সপ্তাহে বারশো-পঞ্চাশ ডলার করে মাইনে দিতে তারা রাজী—কিন্তু বোনাস সম্বন্ধে রাজী হবেন কিনা তা রবিনসন ঠিক বলতে পারল না।

চার্লি জবাব দিলেন—এদের নিয়ে এই হুমকি। বড় বড় অফার দিতে সবাই প্রস্তুত। কিন্তু প্রকৃত খানিকটা ক্যাস টাকার চালতে কেউ রাজী নয়।

একটু পরে রবিনসন স্যানজার্নালিস্টসকে এন্ডারসনকে টেলিফোন করতে উঠে গেল এবং কিছুক্ষণ বাকি ফিরে এসে বলল এই ব্যাপার নিয়েই কম্পানীর সঙ্গে মিষ্টার এন্ডারসনের আলোচনা চলছে এবং বোনাসের কথাটাও এক রকম ঠিক হয়ে গেছে—বরজের পরদিনই চ্যাপলিনকে বোনাসের দশ হাজার ডলার দিয়ে দেওয়া হবে।

কথাটা শুনেন নিজের সম্বন্ধে ধারণাটো যেন আরও উচ্চুতে উঠে গেল চার্লির। কিন্তু পরের দিন একটু হতাশ হয়ে গেলেন যখন রবিনসন এসে তাঁর হাতে ছপো ডলারের একটি চেক দিয়ে বলল যে মিষ্টার এন্ডারসন নিজেই লস-এঞ্জেলসে আসছেন এবং বোনাসের টাকাটা তিনিই এসে দেবেন।

মিষ্টার এন্ডারসনও কয়েকদিন বাদেই এলেন—তাঁর কথারবার্তার প্রচণ্ড উল্লাহ এবং আশার বাণী—কিন্তু কোথায় বোনাসের দশ হাজার ডলার। তিনি বললেন, তাঁর পার্টনার মিষ্টার স্পুর এ ব্যাপারটা ঠিক করবেন যখন তিনি চার্লিকে নিয়ে শিকাগোর হাজির হবেন।

মনে একটু সন্দেহ জাগল চার্লির—তবে ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ বাটালেন না। কিস্টোনে আরও দৃ-সপ্তাহ কাজ করবার কথা। এখানকার শেষ ছবি 'হিজ প্রি-হিস্টরিক পাষ্ট' শেষ করতে বেশ কষ্ট লাগাচ্ছিল—এমন ধরনের ব্যারলাদারী চিন্তা তখন মাথায় খেলছিল যে ছবিতে মনোনিবেশ করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত কোমোরকমে ছবিটি শেষ হোল।

(ক্রমশঃ)

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীশ্রী

মূল্য : এক টাকা

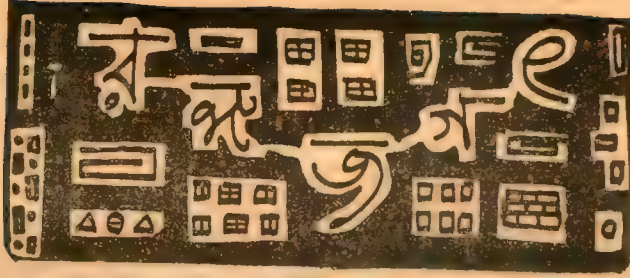
কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বীথি চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

দি বসুমতী ওঠিতে লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,

কলিকাতা-১২



সাম্রাজ্যের ওপা-এপার

ঢাকার 'মহানগর' ছবি দেখার জন্য এত বড় লাইন হয়েছিল যে, সে লাইন দেখে সেখানকার রাস্তানেতারা চমকে উঠেছিলেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টারদেরও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। একটা রুচিসম্পন্ন বাংলা ছবি দেখার জন্য এতবড় লাইন হতে পারে তা ভাবা যায় না। লাইনে পুরষের সংখ্যা নারীর সংখ্যাও কম ছিল না। এই খবরের ওপর খবর ছিল—লাইনে পুলিশ লাঠি চার্জ করেছিল। লাঠি খেয়েও ঢাকার বাঙালীরা 'মহানগর' দেখার সুযোগ ছাড়ে নি। শুধু কি ঢাকা? বরিশাল, চট্টগ্রাম মৈমনসিংহ থেকেও লোক এসেছিল 'মহানগর' দেখতে। এই সংবাদ পড়ে সেদিন আশ্চর্য হয়ে ভেবেছিলাম পূর্বে বাংলার বাঙালীদের হলো কি? দেশভাগের পরে ওরা যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে, ওদের সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত ধারণা দিয়ে বুঝতে পারছি না। ওরা বাংলাভাবার জন্য গুলী খায়, প্রাণ দেয়, 'মহানগর' দেখতে রাত জেগে লাইন দেয়—লাঠি খায়!

আর এপারে আমরা অকৃত্রিম বাঙালীরা? আমাদের এখানে তখন প্রায় ঢাকার মত বিরাত লাইন পড়েছিল 'সংগম' দেখার জন্য। 'সংগম'-এর একটা টিকিট কেনার জন্য এখানে কেউ কেউ ঘড়ি বা কলম বিক্রি করেছে। 'চা চা চা' দেখার লাইনে দাঁড়িয়ে মূর্ছা গেছে। কেউ হয়তো বলবেন, ওরা সবাই অবাঙালী। কিন্তু সে কথা বললে চলবে কেন? বাঙালী তরুণী থেকে মাথায় কাপড় দেওয়া গৃহিণীদের ভীড় কম ছিল বলে তো মনে হয় নি। পাড়ার পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'বাল রাধা' আর 'বুঢ়া মিল গিয়া'র অশালীন গানের লাইন যে মুখের বুলিতে পরিণত হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের কোন ছবি তো বাঙালীকে এত প্রভাবিত করে নি। এখানে তো 'মহানগর' দেখার লাইন হয় নি। একরকম ধুকতে ধুকতেই ছবিটি চলছিল।

আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করছি—সত্যজিৎ রায়ের ছবির দর্শকদের সংখ্যা বাঙালীর চেয়ে অবাঙালী কম নয়। কেবল সত্যজিৎ রায়ের নয়—ভাল বাংলা ছবি দেখতে গেলে প্রেক্ষাগৃহে বহু গুজরাটী, মারাঠী, শিক্ষিত বিহারী ও অশিক্ষার জের নরনারী চোখে পড়ে। বিশেষ করে গুজরাটীরা বাংলা ছবির নিয়মিত দর্শক। গুজরাটী যুবক দয়াভাই একটা বাংলা ছবি পরিচালনাও করেছিলেন এবং ছবিটি যথারীতি কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছিল।

তবু আমরা ঢালাওভাবে হিন্দী ছবিকে অভিশাপ দিই। কিন্তু নিজেদের রুচির কথা বলি না। পশ্চিমবঙ্গে বছরে যে ৩২.৩৪টি ছবি মুক্তিলাভ করে তার মধ্যে বড়জোর দশটি মাত্র দিলে বাকিগুলি তথাকথিত হিন্দীরই বার্থে অনুক্রম। একমাত্র গল্পের বুনরাদ কিছুটা স্বাভাবিক রকম করে।

—সুজন।

চিত্র আলোচনা

মেক্সিকোর সাতটি ছবি

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে গত ২৫শে জুন থেকে ১লা জুলাই পর্যন্ত প্রাচী সিনেমার মেক্সিকান ছবির উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবে বাছাই-করা সাতটি ছবি দেখানো হয়েছে।

পৃথিবীর চলচ্চিত্র মানচিত্রে প্রথম মেক্সিকোকে স্থান করে দিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র-রূপকার

সেগেই আইজেনস্টাইন। তিনি 'কোরে ভিভা মেক্সিকো' নামের একটি ছবি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ছবিটি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। সেই অর্ধসমাপ্ত ছবিতে আমরা মেক্সিকোর মানুষ, তাদের ঐতিহ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা রূপ দেখতে পেয়েছিলাম। বেশ কয়েক বছর পূর্বে সেই ছবিটি দেখেই আমরা মেক্সিকোর মানুষের সম্পর্কে জানবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। আইজেনস্টাইন বিশ্বের মানুষের কাছে যেমন মেক্সিকোর হৃদয়-দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন, তেমনি মেক্সিকোর জীবনোপলব্ধির আলোড়ন এনে দিয়েছিলেন। তার পর থেকে আইজেনস্টাইনের শিপ-রীতিতে



লালবি মুনাজা

মেক্সিকোতে কিছু কিছু ছবি তৈরি হয়। তখনকার দিনের ছবিগুলির মধ্যে 'নাইট অব দি ম্যাস', 'দ ওয়েড' (পল স্ট্রান্ড), 'দ ফরগটেন ভিলেজ' (জন স্টেইনব্যাক) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে ফারনানডো এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধের পরে লুই বুন্যয়েল মেক্সিকোর চলচ্চিত্র নতুন সাজে ও মেজাজে উপস্থিত করলেন। মেক্সিকোর চলচ্চিত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব জাতীয়-বিশ্ববের প্রাণোচ্ছ্বাসে উদ্দীপিত। প্রথম যুগে পেশাদারী শিল্পীর পরিবর্তে সাধারণ মানুষ ছবিতে অংশগ্রহণ করেছে, দেশের প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। তারপরে পেশাদারী পর্বের মেক্সিকোর চলচ্চিত্র শিল্প ব্যবসায়ীদের করতলগত হয়ে হলিউডের অনুকরণ করতে থাকে, তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য তখন 'আর্ট পিকচার'ের অপবাদ মাথায় নিয়ে দূরে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে।

এবার যে ছবিগুলি দেখানো হয়েছে এগুলি নবোদয়ী ছবির পর্বসূচী। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমার্শিয়াল ছবির মধ্যেও কিছুটা নতুন স্বাদ, জাতীয় চরিত্র প্রকাশের একটা বোঝা দেখা যায়। এই বোঝার জন্য ছবিগুলি উপভোগ্য। মেক্সিকোর প্রাকৃতিক দৃশ্য, লোকচরিত্র এবং চিন্তামারার কিছু কিছু পরিচয় এখানে মেলে।

পরিচালক গিলবার্টো গাজকন-এর দৃষ্টি

ছাব দেখা গেল। প্রথমটি 'দি লাকটার অব দি সিটি'তে তিনি ছেলেদের বিবাহের দ্বিতীয় প্রহরে অতিথি ও কুলে কুলে গন্ধ ঘেঁরে বেড়াবার মনোভাবের সমালোচনা করেছেন। একজন জীবনসঙ্গী অঁটিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে ঘর করলে, কুন্ডিত ফুলের মত একটা শিশুর জন্মের পরে সে ঘর কত সুন্দর ও সুখের হয়, সে ছিল তিনি উপস্থিত করেছেন। এই ছিল উপস্থিত করার জন্য তিনি অবলম্বন করেছেন এক জ্বর-দখল কলোনির সমস্যা ও সেরানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা। বাস্তবিকপক্ষে এই অংশ-টুকুতে তিনি 'লোরার ডেসখ'-এর মেজাজ চূড়ান্ত করে প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পরের অংশে এই মেজাজ থাকে নি, সে অংশ সোচ্চার। মিলবার্টে। গাফকন-এর দ্বিতীয় ছবি 'দ্য অব দি ডেকার্ট' আমেরিকান ওয়েস্টার্ন ছবির অনুকরণ। এখানে প্রেমিক নারক প্রকৃত ইত্যাকারীকে খুঁজে বার করে এবং তারই অশ্রুধারের জন্য নিজের অনর্থক করাদেহের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তার জেল-ভেঙে পালিয়ে যাওয়া ও শেরিকের কাছে ধরু পড়ে ফিরে আসার মধ্যে নানা ঘটনার দশকদের মনে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে; তাতে কল্ট-কল্পিত ঘটনার আধিক্য। প্রথম ছবিতে পরিচালক বাস্তবমুখী, এখানে কল্পনাপ্রয়ী।

ইসমাইল রুডরিজের 'দি হিয়েরো ব্রাদার্স' চিত্রটিতে ওয়েস্টার্ন ছবির অনুসরণী। হিংসা ও প্রতিশোধ প্রবৃত্তির পরিণতি অর্থহীন শেষ কোথায়? এই প্রশ্নকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে প্রাপ্তপ্রম ও মস্তুর প্রতি প্রাণবোধের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়েছে। চিত্রায়ণরীতিতে পরিচালক এখানে



‘এম্পটি স্টার’ ছবির একটি দৃশ্য

সুন্দরভাবে স্লাসব্যাক ব্যবহার করেছেন এবং ক্যামেরার ব্যবহারে মায়ের মানসিক অস্থিরতা ও প্রতিশোধের জ্বালায় দম্ব হবার দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে টাইটেল সঙ্গীতটির মূর মনকে অভিভূত করে রাখে।

সঙ্গীতমূখর ‘সিগিং মার্ভেরিকস্’-এর পরিচালক ভালেনটিন পির্মিসটিন উপভোগ্য রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন—তার এই হালকা মেজাজের ছবিতে। এখানে এক সুন্দরীর তিনজন পানিপ্ৰাণী। এই তিনজনের মধ্যে কে বেশি ভালবাসে এবং যে বেশি ভালবাসে তার গলার বরমালা দেবার জন্য এক পরীক্ষার আয়োজন করল। এই পরীক্ষার সুন্দরী অর্থ ও আভিজাত্যের পরিবর্তে পরিপ্রমী,

সং ও সাহসী একজন সাধারণ মানুষের গলার বরমালা মিল। মেরিকোর বহু লোক-সঙ্গীত, সুরাশ্রয়ী সঙ্গীত, বাড়ির লড়াই ও প্রাকৃতিক দৃশ্য এই বর্ণরঞ্জিত ছবিটি মনোরঞ্জক।

এমিলিও গোমেজ মারিরেল-এর দৃষ্টি ছবি দেখানো হয়েছে। দৃষ্টি ছবিই বাস্তবপ্রাপ্ত। প্রথমটি চলচ্চিত্র নায়িকার জীবনের শূন্যতা প্রকাশক ‘এম্পটি স্টার’। এখানে নায়িকা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, চায় অর্থ, নাম, যশ। তার জন্য ছেলেকে ছেড়ে এসেছে, মেরিকোর এসে বার ভালবাসা পেলে, তাকেও প্রতিবন্ধক মনে করে এড়িয়ে চলল। বিরেকে সে উন্নতির পথে অন্তরায় মনে করে। নাম-যশের জন্য সে বিবেক থেকে দেহ পর্যন্ত সব দিয়ে একদিন অর্থ ও যশের উচ্চ শিখরে উঠল। কিন্তু অনুভব করল জীবনে সব পেলেও কিছুই পার নি। নিজের বলল—একটা সংসার, সন্তানের জননী হওয়া এর চেয়ে বেশি সুখের। পৃথিবীর সর্বত্র চিত্র-তারকাদের জীবনে মানসিক সংঘাত ও পরিণতি একই। সকল ধনতান্ত্রিক দেশের তারকাদের জীবনের একটি প্রতিচ্ছবি। পরিচালক স্লাসব্যাকে সম্পূর্ণ কাহিনী উপস্থিত করেছেন। ছবির শব্দ, বিমানে যারা থেকে দৃষ্টিনায় তারকার মৃত্যু হয়। যারা এই তারকার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিল হাসপাতালে তাদের স্মৃতিচারণে কাহিনী রূপায়িত।

এমিলিওর দ্বিতীয় ছবি ‘সিমাট্রিও’তে শিশুদের নিয়ে কাহিনী গঠিত হলেও বয়স্কদের প্রতিও এর আবেদন রয়েছে। একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক তিন পুরুষকে শিকা দিয়েছেন। এখন তিনি প্রায় অন্ধ। কিন্তু নিষ্ঠুর সাথে কাজ চালিয়ে



সেরিকন ছবি ‘দ্য অব দি ডেকার্ট’-এর একটি দৃশ্য

যাচ্ছেন। ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণের দৃষ্ট ছাত্রদের মন জয় করার প্রয়াস; এই দৃষ্টির সংঘাতে কাহিনী হৃদয়স্পর্শী। ছবিতে নাটকের দৃশ্য গড়ে উঠেছে স্কুল পরিদর্শকের উপস্থিতিতে কেন্দ্র করে। একজন সংশ্লিষ্টকে গ্রামবাসীরা যে কত ভালবাসে এবং কিভাবে নিষ্ঠা ও ভালবাসার জোরে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া যায়, ছবিতে তা পরিস্ফুট।

এমিলিওর দৃষ্টি ছবিই রঙীন।

লুই ব্রুন্সেল-এর 'দি ক্রিমিন্যাল লাইফ অর আর্চিবল্ড ডে লা ক্রুজ' মৌলিকতার অন্য ছবিগুলির সুর ও রীতির ব্যতিক্রম। ব্রুন্সেল-এর বক্তব্য মনস্তত্ত্ব নিয়ে। নিঃসঙ্গতা ও অপরূপ বাসনা থেকে জীবনের জটিলতাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। এই অপরূপ বাসনায় সামাজিক পরিবেশের স্থান অনেকখানি। আর্চিবল্ডে ছোটকালে একটা মিউজিক বক্স পেয়েছিল। এক গল্প শোনার পর কয়েকটি ঘটনার ছোটকাল থেকে তার বিশ্বাস হয়েছিল এই বক্স তার ইচ্ছানুরূপ মৃত্যু ঘটাতে পারে। এই বিশ্বাস তার নিঃসঙ্গতার সুযোগে অবদমিত কামনার সাথে জড়িত হয়ে তার মনকে অপরাধী করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত মিউজিক বক্স নদীতে বিসর্জন দিয়ে এবং একজন নারীকে ভালবেসে জীবনসংগিনী লাভ করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সে অবদমিত মনের চাপ ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করে। ছবি এখানে গল্পের কাঠামোতে বন্দী নয়, চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষায় গল্প ও বক্তব্য প্রকাশিত। ব্রুন্সেল-এর পরিচালনা-শক্তির নিদর্শন এই ছবি।



হিরোরও গ্রান্স' ছবির একটি দৃশ্য



মৌলিকান ছবি 'সিগিং মাবেরিক্স'-এর একটি দৃশ্য

নাটকের কথা

শিল্পীতীরের 'বোমা'

গত ১৩ই জুন উত্তর কলকাতার আভিজাত্য নাট্যসংস্থা 'শিল্পীতীর' রসরাজ অমৃতলাল বসুর ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক 'বোমা'-র অভিনয় পরিবেশন করলেন রঙমহল নাট্যগৃহে।

বদিও সত্তর বছর আগেকার নাটক, তবুও এর বক্তব্য সম্পূর্ণ কালোপযোগী। নাটকের মূল বক্তব্যকে শিল্পীরা এদিনের অভিনয়ে

সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। নাটকটির পরিচালক সুনীল আচার্যের নির্দেশনায় স্বতন্ত্র শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অভিনীত চরিত্রটি সহজেই দর্শকমন জয় করে। এ ছাড়া সর্বশ্রী গোপাল পাল, বিশ্বনাথ পাল, সুপ্রিয় রায়, উত্তর দাস, চিত্রিতা মন্ডল ও রুনা ঘোষ অভিনীত চরিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। নাটক চলারাকালীন সমস্ত সময়েই দর্শকগণ হাসিতে নাট্যগৃহ ভরিয়ে রাখেন। এদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আর বাঁরা অভিনয়ের চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন তাঁরা হলেন, প্রাণী চট্টোপাধ্যায়, হৃষীকেশ ঠাকুর, বিদিশা চৌধুরী, অশোক মুখোপাধ্যায়, সুজাতা চট্টোপাধ্যায়, মন্টু গুপ্ত, শীলা রায়চৌধুরী, জলদ মজুমদার, লীলাবতী দেবী (করালী) প্রমুখ।

আবহসঙ্গীতে সুখীর সরকার সার্থক। আলোক নিয়ন্ত্রণের কাজ ভাল নয়।

সমগ্র অঙ্কনটির সম্পাদনা এবং ব্যবস্থাপনা করেন মধু গাঙ্গুলী এবং মণীন্দ্র দাস ও ভোলা ভট্টাচার্য।

কাজাক ভাষার বাংলা নাটক "করোল"-এর অভিনয়

কলকাতার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রীতিপল দত্ত কর্তৃক রচিত ও পরিচালিত "করোল" নাটকটি শীঘ্রই কাজাক ভাষায় অনূদিত হয়ে এখানকার মৃত্যুভার আউলজক ড্রামা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হতে চলেছে। এটাই হবে কাজাক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রথম ভারতীয় নাটক।

এখানকার নাট্য-সমালোচকরা - ভ্রমের করেছেন যে, ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে

ভারতীয় নৌবাহিনীর অভ্যুত্থান অবলম্বনে রচিত উৎপল দত্তের এই বীরসাম্রাজ্য নাটকটি তার নাটকীয় সংঘাত ও আবেগগত আবেদনের দিক থেকে সোভিয়েট নাট্যকার ভসেভোলোদ ভিসনেভস্কি রচিত ‘দি অপার্টিমিস্টিক ট্রাজেডি’র কথা মনে করিয়ে দেয়।

কিছুদিন আগে, ভারত সফরে আগত দুইজন সোভিয়েত লেখকের অন্যতম, কাজাক লেখক ও সাংবাদিক আনওয়ার আলিমজানফ কলকাতায় এসে এই নাটকটির অভিনয় দেখেন এবং তিনিই এই নাটকের পাণ্ডুলিপিটি সংগে করে এখানে নিয়ে আসেন।



বীরভূমের লোকগীতি

মহাসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাব-ভাবনার বেগন পরিবর্তন ঘটেছে তেমন রূপান্তর ঘটছে গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতির। বিভিন্ন রাজনৈতিক অভিঘাতে স্ফুলা স্ফুলা শ্যামলা বাংলার নিশ্চিন্ততার অবলোপ ঘটেছে। তার পরিবর্তে এসেছে সারা দেশব্যাপী এক অর্থনৈতিক অবরোধ ও অনিশ্চয়তা। এর সঙ্গে ভাল রেখে সামাজিকবিস্তি, বন্ধন, রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটছে। এই সংক্রান্তিকালে স্বভাবতই সংরক্ষণশীলতা থাকে না বরং চরিত্র-বদলের আকাঙ্ক্ষা প্রকট হয়ে পড়ে। কাজেই গ্রামবাংলার বহুকথিত লোকসংস্কৃতিকে এখন আর আগের প্রকৃতরূপে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষকরে আধুনিক সংস্কৃতির কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে।

বীরভূম পশ্চিমবাংলার বিহারসংলগ্ন একটি প্রান্ত প্রদেশ। ককনগর-চন্দননগর-কলকাতার আধুনিক সংস্কৃতির উত্তাল ঢেউ এর অভ্যন্তরে এখনো তেমন করে প্রবেশাধিকার পায় নি। তবে যুগচেতনা ও যুগবন্দগা স্ফাবিকভাবেই বীরভূমের গ্রামপ্রান্তিক নিস্তরঙ্গ জীবনেও অভিঘাত তুলেছে। তথ্যাপ আগের নিটোলতা না থাকলেও এ অঞ্চলে অনাধুনিক লোকসংস্কৃতির কিছু কিছু নিদর্শন মেলে।

লোকসংস্কৃতির প্রাচীন ধারাটি এখনো



শর্বেশ্বর সেন পরিচালিত ‘দুশান্ত শা’ ছবিতে বসন্ত চৌধুরী

লোকউৎসবের মধ্যে কিছুটা অবিকৃত রয়েছে। ক্রিয়াকলাপ ও গানে কিছু কিছু আধুনিকতার সংযোজন ঘটলেও মোটামুটি এখানে প্রাচীন সুরের কিছুটা পরশ মেলে। বিভিন্ন লোক-উৎসবকে কেন্দ্র করে লোকগীতি প্রচলিত। উৎসবের জন্যই এই গীতিগুলির উদ্ভব হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই গানগুলি একদিন কেউ রচনা করেছিলেন। আজ লেখকের পরিচয় মেলে না। এ গান আজ সর্বসাধারণের। বর্তমান আলোচনার বীরভূমে অধুনা-প্রচলিত লোকগীতির কয়েকটি ধারার পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি। বীরভূমে প্রচলিত লোকগীতির মধ্যে ঘেঁটু, জাত, ভাদু, আলকাপ, ভাঁজ, লোটে ও বোলান উল্লেখযোগ্য।

ঘেঁটুগান :—চৈত্রমাসে রাবিশস্য ঘরে এসেছে, নানাবিধ ফসলে গোলা উঠেছে ভরে। কুবকুল কিছুটা নিশ্চিন্ত অবসরে দিন কাটাচ্ছে। এ-সময় নিম্নাবিত, তথাকথিত নিচু শ্রেণীর লোক দলবেঁধে গান গেয়ে ঘরে ঘরে ফেরে। এ গানের নাম ঘেঁটু। গানের সঙ্গে থাকে ঢোল বা তব্লা।

ঘেঁটুগান

১

হায়রে—

ওধান ভেনো না ভেনো না বিনোদ কামিনী,
বন্দাবনে ধান ভানে বতকে গোপিনী॥ ধূয়া

হাঁড় চারটে বলেরে ভাই পূর্বে ছিলাম ভাল,
দু'বুড়িতে ধান সিজিরে আমারে করলেক
কালো।
ঢেঁকিতে বলেরে ভাই আমি নারদের হাতী,
দু'বুড়িতে ধান ভানে আমার লেজে মারে লাখী।
পোন্না দুটো বলেরে ভাই আমরা দু'টি ভাই
দু'বুড়িতে ধান ভানে আমরা গীত গাই॥

২

হায় গো (দাতা তোমারি) নন্দন।
তাহারে কাটিয়া মাংস করিব ভক্ষণ॥ ধূয়া
কাল থেকে করে আছি রত একাদশী (হায়রে)
আজ নিজের পুত্র বৃষকেতু করহে রন্ধন।
অধেক মাংস বোল কর অধেক অম্বল
(হায়রে)

কোথায় ছিল বৃষকেতু করিল ডোজন।
এইখানেতে আমার ঘেঁটু সাঙ্গ হয়ে গেল
(হায়রে)
আনন্দেতে বদন ভরে হরি হরি বলা॥

জাতগান :—জাত বলতে বেদেরের সাপ-
খেলানো বুঝায়। বেদেরা সাপ খেলবার সময়
জাতগান গায়। সঙ্গে বাজে ঢোলক বা
বিহম ঢাকী। আবার ভাদুমাংসে বগাপপ্তমী
সময় জাতগান গেয়ে মনসার বারি নিয়ে আসে।
এর সুর অনেকটা জারী গানের মত।

আধ্যাত্মিক কস্মতী

জাতগান

আধুনিক ভাদুগান

সন্দের ফেরারে ফেরারে ওরে গুণের ভাই
হেলা অবসানে হয়েছে মায়ের কোলে বাই ॥ ধূম্রা
শোন সাপিনী গোকুলেরই কথা
পশ্চম অবতারে কৃষ্ণ জন্ম হলেন কোথা।
জন্ম হলেন মধুপুরে দেবকীর উদরে
বৃন্দাবন ধূমে দিলেন গোকুল নগরে।

ভাদুগান ১—পশ্চিমবাংলার বিশেষ করে
পূর্বদিল্লী বাঁকুড়া বীরভূমে কুমারী মেয়েদের
মধ্যে এককালে ভাদুগান বিশেষ প্রচলিত ছিল।
সাপ্তাহিককালে উচ্চবর্ণের মধ্যে এ গানের
প্রচলন কমে গেছে। পঞ্চকোটের রাজার মেয়ে
ভাদুর স্মৃতিতে যে উৎসব চালু হয়েছিল,
কালের আবর্তনের ফলে ভাদুপুরব পশ্চিম-
বাংলার নিম্নশ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এক
জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। এখন অন্যত্র
এর প্রচলন কমে গেলেও বীরভূমের গ্রামে
ভাদু আপন মহিমা এখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছে।
আধুনিককালে জনজীবনের বিবিধ সমস্যা ও
সম্প্রতি সংঘটিত ঘটনা নিয়েও ভাদুগান করা
হয়। ভাদুমাসের প্রথমদিনে ভাদুপূজা করে
উৎসব শুরু হয়। সারা ভাদুমাসব্যাপী
এই উৎসব চলে। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর
মেয়েরা মাটির ভাদুরাণীর মূর্তি নিয়ে গান
চরতে করতে পাড়ার পাড়ায় ঘোরে।

ভাদুমাণি মা জননীগো বলি কিছ্ ভোটের
ব্যাপারে।

আমরা পড়েছিলাম ফাঁপরে ॥ ধূম্রা
কংগ্রেসের বলদ চিহ্ন গো, কম্যুনিষ্টের কান্টে
ছিলো

ভোট কাকে দি আর কাকে না দি
ভাদু বলগো বিচার করে।

আমরা সব পড়েছিলাম ফাঁপরে ॥

কংগ্রেস বলে আমার দেগো ভোট

রাখবো তোদের রাজ্য করে।

কমিউনিষ্ট বলে

তোমাদিকে জমি দিব কিছ্ করে।

ভাদু এবার আমরা কি করিব বল

আমাদের ভোট কাকে দি আর কাকে না দি গো

ভাদু বলগো বিচার করে ॥

আলকাপগান ১—আলকাপ গান বীরভূমের
নিম্নবিত্ত ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে
বহুল-প্রচলিত। সবসময়েই গাওয়া হয়ে
থাকে। একে 'ছাঁচুড়া' গানও বলা হয়। এই
গান নিয়ে দু'দলের মধ্যে মারো মারে প্রতি-
যোগিতাও হয়ে থাকে।

আলকাপগান

কি মজার ফুল ফুটেছে সই ॥ ধূম্রা

ইচ্ছা হয় যে তোর ঐ বাগানে মালী হয়ে রই।

তোর বাগানে আশপাশে
ঘেঁরে নিল দূর্ব্বা ঘাসে
কি করবে তোর লাঙল চাষে
ওতে জুড়ে দেগা মই ॥

ভাজুগান ১—ভাদু মাসে
তিথিতে ভাজুপূজা হয়ে থাকে।
থেকে ভাজুপূজা বিধেয়। যেখানে
হয়ে থাকে সেখানকার মাটি নিয়ে পরের দিন
সকালে ই'দুরের মাটির সঙ্গে মাসকলাই, ধান,
সরিষা, ছোলা মিশিয়ে কয়েকটি মাটির সরোতে
রাখা হয়। সন্ধ্যার সময় সকলে ভাজুতে
পুষ্পাজল দয়। নিম্নলিখিত মন্ত্রটি সন্মবেত-
ভাবে গান করে অঞ্জলি দেয়।

ভাজুর অঞ্জলি দেবার মন্ত্র

হাঁড়া জাগে তো জাগু ঘটের হাঁড়িগো ঠাকুর
কোনো ঘটে কোনো দেবী জাগে।

ধূপে ধূনেতে লেড়ো হে দক্ষিণে

সদাসর্ব শতদল বাক্যে

ভাজো এসেছ আপন দ্যাশ

ধূলার লুটিরে আপন কলশ ॥

সপ্তমীর দিন একাট বেদীর উপর
মানুষের মূর্তি একে মাটির সরাগুলি তল
চারপাশে রাখা হয়। মেয়েরা আনন্দে মেতে
উঠে মানারকম ছড়া কাটে। পুরুষরাও অনেক
সময় যোগ দেয় এবং মেয়েদের সঙ্গে ছড়া-
কাটার প্রতিযোগিতা হয়।



মিনার্ভার 'কলোম' নাটকের একটি মূহূর্ত। এই নাটকের অভিনয় মণ্ডলঙ্গা লক্ষ্মীর নির্দেশ করে।

মাস্টারহিক বসুমতী

ভালো বীরভূমের একটি লোকউৎসব।
সমাজের নিচুস্তরের মেয়েদের মধ্যে এর প্রচলন
রয়েছে। বিশেষ করে অন্যটা মেয়েরাই এই
উৎসব করে থাকে।

ভাজুগান

পার কর পার কর লাওরে বেলা পানে চেয়ে।
দাঁধ দৃশ্য নষ্ট হোল সময় গেলা বয়ে। ধূয়া
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা।
গ্রী-রাধিকাকে পার করিতে লিব কানের সোনা।
সোনা লাও শাড়ি লাও ডাও দিতে পারি।
এক হাঁটু জল থাকিতে পার হতে নারি। ১

ওসাধের মেলেনি লো সই।

সারাদিন ফুল বোঁচলাম

ফুলের কড়ি কই ॥ ধূয়া

একটি ফুলের জন্য কর অপমান

দুয়োরেতে বাসিন্ দেব ফুলেরই বাগান ॥

ফুল বোঁচলাম বেশ করিলাম করিনাক চুরি।

হাতের শব্দ বন্ধক দিয়ে দিব ফুলের কড়ি ॥

লোটেগান :- বীরভূমের মুসলমানসমাজে
লোটেগান বিশেষরূপে প্রচলিত। দুদলে
রেবারেঁষি করে গান করে। নমাজ, রোজা,
হানা (খাদ্য), কার্পাস (বস্ত্র) এবং নানা
পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বিষয় লোটেগানের
অন্তর্ভুক্ত।

লোটেগান

কোন দিনে তোর ভালবাসা আসবে নিতে।

আসবে নিতে গো শমনজারী করিতে ॥

গালিচা পেঁদা ফুল বিছানা

কোথারে তোর আমিরানা থাকবে পড়ে গো।



মুকোভিনয়ের ক্ষেত্রে চেকেশোভাকিয়ার দ্যা তি জগৎজোড়া। একজন মুকোভিনতাকে
জাভিনয়রত দেখা যাচ্ছে।

কোম্বা কোস্তা রসগোল্লা

আল্লা দিবেন রোজ দুবেলা

নিদানকালে দিবেন খোদা

দেখবি তখন খাবার বেলা ॥

বোলানগান :- বীরভূমে চৈত্রসংক্রান্তিতে

শিবের গাঙ্গনে বোলান গাওয়া হয়। বোলানের

দলে দশবারজন লোক থাকে। সংক্রান্তির
আগের রাত্রি থেকে সংক্রান্তির দিন বেলা ১২টা
পর্যন্ত বোলানগান হয়। সঙ্গে থাকে
পাখোয়াজ, নুপুড় ও মন্দিরা।

বোলানগান

আমার মদনমোহনে, সুখের বন্দাবনে,
কেনে আজি নাহি হেরি।

পাগলিনী বেশে, গোবিন্দ উদ্দেশে,

কেঁধে বেড়াই রাইকিশোরী ॥

কোথায় আমার প্রাণধন, পুরুষ রতন,

মনের মতন মদনমোহন,

অন্ধকার আজ সুখের বন্দাবনে,

প্রাণনাথ তোমা বিনে

বাজে বৃকে থেকে থেকে গো,

মুখখানি পড়িছে গো মনে ॥

আর কি কালশশী বাজাইবে বাঁশী

রাধা বলে কুঞ্জবনে।

আর কি বনফুলে,

মালা গেঁথে গলে পরাইব প্রাণধনে ॥

—শ্রীসন্তোষকুমার কুন্ডু

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বাল্মকিচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের ভ্রমর হংসরাজা ভদ্রবাদ

● আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বসূচী।

● আনন্দমঠে—‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রের পুত-প্রকাশ

● আনন্দমঠে—ঋষি বাল্মকি ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্ন্ততাকার সাধনে

ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

চন্দ্র সংশোধন

দোল গোবিন্দের কড়চার লেখক
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। গত সংখ্যায়
স্টুডিও ধবরে ভুলক্রমে বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-
পাধ্যায় ছাপা হয়েছে।

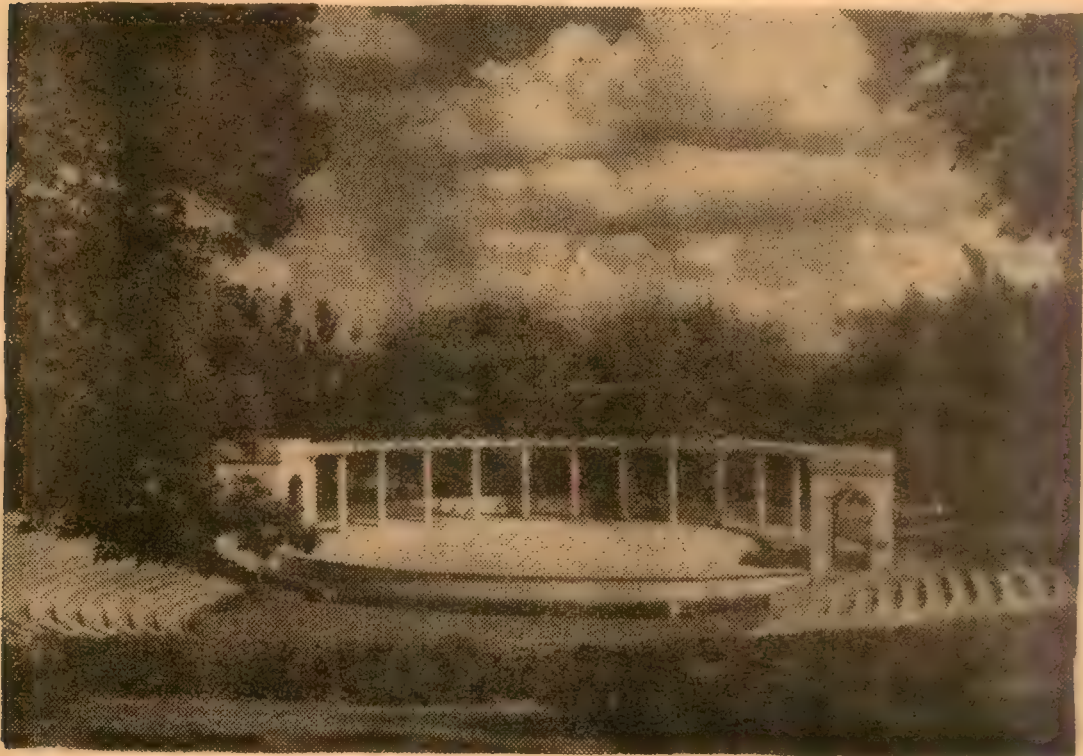
সভির ওয়ারের শেষ থেকে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে আমেরিকার যোগদান পর্যন্ত, মাকিনী থিয়েটারের ইতিহাস এত জটিলতায় ভরা যে, ভেবে কলকিনারা পাওয়া যায় না, কোথা থেকে বর্ণনা শুরু করা উচিত এবং কোন্ কোন্ ঘটনার ওপর জোর দেওয়া দরকার। যাই হোক, কোনো কিছু বলবার আগে তখনকার আমেরিকাতে যেসব সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিবর্তন দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার--তা না হলে ওদেশের থিয়েটারের বিস্তৃতি এবং উন্নতির আসল কারণগুলো বোঝা যাবে না। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক কার্যসম্পাদনা সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকাতে এই শিল্প-মালোনিয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় আরও কয়েক বছর বাদে। গৃহযুদ্ধের আগের সময়টার এই নতুন জাতটি তাদের বেশির ভাগ কর্মতৎপরতা এবং উৎসাহ ঢেলে দিয়েছিল নতুন নতুন অঞ্চলকে নিজেদের আয়ত্তে এনে, দেশের ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধিতে। তা ছাড়া দেশের নানাবিধের সম্পদ ও বিতণ্ডার পরিপূর্ণ এবং ব্যবহার আর বাণিজ্যের সম্প্র-সারণ এইসব দিকেই তখন দেশের লোকদের মূল বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল।

কিন্তু সাদার্ন কনফেডারেসীর পরাজয়ে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হল সুদৃঢ়ভাবে। দেশের ভেতরকার নিতানৈমিত্তিক গোলমাল এবং গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে অর্থ, বিত্ত, সম্পদ প্রভৃতির অপচয় বন্ধ হোল--শান্তি ও শৃঙ্খলায় ভরে উঠল জাতীয় জীবন এবং কয়েক বছরের ভেতরেই শ্রমশিল্পের এত উন্নতি হোল যে, এর পর যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর একটি সেরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার বলে সবাই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হোল।

আমেরিকাতে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনকৌশল ওপর তার বিরাট প্রভাব এবং প্রতি-ক্রিয়ার দিকটাও লক্ষ্য করে দেখবার মত ব্যাপার ছিল। দেশের সর্বত্র ঘেমন কলকারখানা, বনি, রেল-রাষ্ট্র প্রভৃতিতে ভরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে এসবকে দিকভাবে পরিচালনার জন্য দরকার হয়ে পড়ল জটিল সংগঠনের। একদিকে পুরানো শহরগুলো নানানভাবে

নানাদিকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা আমেরিকাতে বহু নতুন শহরের পত্তন হতে শুরু হোল। লোকসংখ্যাও তদানন্তরবে ক্ষীত হয়ে উঠল--এর দুটি কারণ, অভিবাসী-দের স্বতানস্বত্বের জন্য আর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং ইউরোপ থেকে বহু লোক আমেরিকাতে এসে বসতি স্থাপন করছিল। আমেরিকাতে এসময় প্রচুর শ্রমিকের দরকার আর ইউরোপে তখন চলছে আধিক সমস্যা এবং দুর্গতির কঠোর পেষণ। ফলে দলে দলে লোক আসতে লাগল মেডিটের্রেনিয়ান ক্যান্ট্রি থেকে, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, আয়ারল্যান্ড, রাশিয়ান, জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান এম্পায়ার থেকে। ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময়ই এভাবে ইউরোপ থেকে দলে দলে লোক আমেরিকাতে চলে আসাটা বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে আমেরিকাতে ইউরোপাগতের সংখ্যা বাড়িয়েই প্রায় পনের লক্ষের ওপর।

বিশ্বযুদ্ধ ওদেশে এবং এদেশে শিল্পায়ন



ইউনিভার্সিটি অফ আরকানসাসের মতোখানে শোলা থিয়েটার-গ্রীক এরিনা স্টাইলের রঙ্গমঞ্চ

গাপ্তাহিক বসুমতী



এখেল ব্যারিসোর—ফার্ট লেভি অড দি আমেরিকান স্টেজ—‘নান বাট দি লোনলি স্টার’
নাটকের একটি দৃশ্য

বহিরাগত এই নিপুল জনসংখ্যা আমেরিকাতে এসে শুভস্বাদ এখানকার সৌকসংখ্যার অকটাই খাডায় নি। আমেরিকার কৃষ্টি এবং সভ্যতার চেহারাটাও এরা বিশেষভাবে পাল্টে দিয়েছিল; এই আগভদের বেশির ভাগই ছিল বোঝন-আবেগ রসে ভরা উচ্ছল প্রাণবন্ত তরুণের দল, যুগসাহসিক অভিনয়ের যুগু ভাদের কোখে, মুখে—নতুন দেশের অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা বাধা-মিগতি কাটিয়ে তারা এসেছিল জীবনের জয়যাত্রা শুরু করতে। এখানকার অধিবাসী আমেরিকানদের রক্তধারাতেও তারা যেন নিজেদের উচ্চাষ প্রাণবোধ, আশ্রাণ প্রচেষ্টার প্ররাস এবং বিরাট আশাবাদের দিকটা সংযুক্ত করে দিল তাদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিবে গিয়ে। এভাবে তারা আমেরিকানদের শাতিগত বিপ্লব এবং সংস্কৃতির প্যাটার্নটাও বদলে দিল। প্রথম যারা আমেরিকাতে এসে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের তেতরেও চাচ, সুইডিস, ফ্রেন্স এবং স্প্যানিশ ছিল বটে, কিন্তু জনসংখ্যার বেশির ভাগ ছিল ইরাজ এবং সেইজন্যই এতাবৎ আমেরিকার শিকা-সংস্কৃতির কাছাকাছি ইরাজদের অনুকরণেই চলছিল। এই ইরাজি এইবার সম্পূর্ণ বদলে গেল।

নতুন দেশের শহরের পটন হতে লাগল। তেতে দেখা দিল আগন্তুক অধিবাসীদের নাত-বুকের শিকা-নীকা, শিকা-সংস্কৃতির বিশেষ-গুলির প্রভাব। এইভাবেই সেইন্ট গল এবং সিরোনিস ক্যান্টিনেডিয়ান; সিলওয়াকি

সেইন্ট লুই এবং সিরগিনাটিতে জার্মান; বোস্টন এবং প্রভিডেন্স-এ আইরিশ প্রভাব এসে পড়ল ওখানকার নাগরিকদের আদমি নাতুনির প্রভাব অনুসারে।

এই সময়ের নিউইয়র্কে ছিল ইউরোপের সর্বজাতির সমন্বয়—এমন কি দক্ষ এবং ধুর-প্রাচ্যের লোকেরাও দলে দলে এ শহরে এসে বসতি স্থাপন করেছিল।

এর ফলে রঙ্গমঞ্চে একটা বিরাট আলো-জ্বলের সৃষ্টি হোল। জার্মান এবং ইতালীয়ানরা হচ্ছে চিরকালই সংগীতপ্রিয় জাত—তাদের সভ্যতার ইতিহাস এবং ইতিহাসই গড়ে উঠেছে সংগীতের ওপর ভর করে। সুতরাং এই জাতীয় নাগরিকদের তরক থেকে দারুণ চাহিদা দেখা দিল ওপেরা এবং অন্য জাতীয় সংগীতপ্রধান প্রদর্শনী সম্বন্ধে। আর চাহিদা থাকলেই সে চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করতে হয়—সুতরাং ওপেরা এবং মিউজিক্যালস্ জাতীয় শৌভলি ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠতে লাগল।

বড় বড় শহরে বিদেশ থেকে আগতদের—তারা তখনও পোখানকার আমেরিকানদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেতে পারেন নি—জনসংখ্যা অনুসারে নিজেদের নাতুভাষায় নাট্য-প্রদর্শনীর চাহিদাও দেখা যেত এই সময়। সেই কারণেই তখন নিউ ইয়র্কে জার্মান, চাইনিজ, ইতালীয়ান এবং জুরিস থিয়েটার দেখানো হত বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে। নাতুভাষার নাথ্যনেই অভিনয় হোত। কবে কবে কখন

এই বিভিন্ন জাতির নাগরিকরা তাদের বিভিন্নজ গণিতার্থ করে আমেরিকাতেই নাতুভূমি হিসাবে অস্তর থেকে গ্রহণ করে নিল, তখন তাদের পূর্বকার নাতুভূমির শিকা-সংস্কৃতির বিশেষ-গুলি এসে মিশ্রিত হল সাধারণ আমেরিকান কালচারেল প্যাটার্নের সঙ্গে—আর এই মিশ্রণের ফলে আমেরিকান কালচারেল লেভেলটাও ক্ষুদ্রগতিতে ক্রমশ উর্ধ্বমুখে গাথিত হল।

নাগপ্রথা বিলুপ্তির পর নিখো-প্রভাবও এসে পড়ল আমেরিকান থিয়েটার এবং অন্যান্য শিল্পের ওপর। আমেরিকান কালচারের বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গেলে ধাপে ধাপে এইসব বিভিন্ন শ্রেণী এবং জাতের ঐতিহ্যের প্রক্ষেপণের চিত্র লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। অর্থাৎ নতুন আমেরিকান কালচারের সঙ্গে এইসব কালচার এমনভাবে এক হয়ে মিশে গেছে যে, আজকের আমেরিকান কালচার বলতে এই যুক্ত এবং মিশ্রিত কালচারকেই বোঝায়।

ডাচেলি বারলেন্ড এবং রিডিউয়ে; আইরিশ, জার্মান, নিখো, জুরিস এবং সুইডিস্ কমেডিয়ানরা নিজেদের আকলিক ভাষা এবং উচ্চারণপ্রণালীর ব্যবহারে দর্শকদের হাসানার চেষ্টা করতেন। এর ফলে নানা জাতীয় স্মিঙ্গলী পল, বাগবৈশিষ্ট্য, এবং উচ্চারণভঙ্গী; আমেরিকান শব্দসূচী এবং ভাষার অভিধানে নিজেদের স্থান করে নিল এবং আমেরিকান ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলল। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আমেরিকান নাটক এবং ছায়াচিত্র থেকে নানা জাতীয় আমেরিকানিজম আজকাল বৃষ্টিপাতের সংলাপ-সৃষ্টিতে সাদরে গৃহীত হচ্ছে। আর এইটে হওয়াই তো স্বাভাবিক। কালচার জিনিগটা তো কারও একচেটিয়া ব্যাপার নয়। বিভিন্ন কালচারের সঙ্গে আদান-প্রদানেই সামগ্রিক কালচার উন্নতির পথ যায়। তা না করতে পারলেই কালচারের অধোগতি শুরু হয় এবং ক্রমশ একদিন তার অবসানের সময় দেখা দেয়।

যাই হোক, একদিকে যেমন থিয়েটারের চাহিদা দেখা দিল, আবার উৎসাহী ব্যবসায়ীরও অভাব ছিল না, বরং ঐ চাহিদা মেটাবার জন্য থিয়েট্রিক্যাল এন্টারটেনমেন্টের বালোবস্ত করবেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুটি সংঘ বা সিণ্ডিকেট এ বিষয়ে কাজ কর-ছিলেন। একটর নাম সুবার্ট ব্রাদার্স ও অপরটির ছিল কু এও আরল্যান্ডার। আমেরিকার সর্বত্র তাঁরা থিয়েটারের চেইন সৃষ্টি করেছিলেন।

এখানে একটু ভৌগোলিক সত্যের অব-ভারণা করছি, যা একটা অত্যন্ত গভীর এবং অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করেছিল আমেরিকান থিয়েটারের সহজ-সুন্দর উন্নতি এবং বিবর্তনের পথে।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিউ ইয়র্ক ইউনাইটেড স্টেটসের সবচেয়ে অর্থশালী এবং কৃষ্টিসম্পন্ন শহর বলে প্রখ্যাত হয়ে উঠেছিল। যেমন লন্ডন, প্যারিস এবং ভিয়েনাতে ওসব দেশের থিয়েটার করতে ইচ্ছুক প্রতিভাসম্পন্ন লোকেরা এসে ভিড় করে--তেমনি আমেরিকার মশোলাতে উৎসুক জ্ঞানীওণী, নট-নটীরা এসে হাজির হোত নিউ ইয়র্কে। এইভাবে নিউ ইয়র্কেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল নতুন নাটক প্রডাকসনের একমাত্র জায়গা--সারা আমেরিকায় যা-কিছু অভিনব বা বৌলিক নাট্যপ্রচেষ্টা হোত, তারও সূরু হত এই নিউ ইয়র্কেই।

নিউ ইয়র্কের কাছাকাছি যেসব লোক থাকতো, তাদের পক্ষে এসে থিয়েটার দেখাটা খুব অসুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু মেট্রো-পলিটান এরিয়ার বাইরের অধিবাসীদের পক্ষে সম্ভব হত না অতদূর থেকে পয়সা খরচ করে এসে নিউ ইয়র্কের সব থিয়েটারগুলোতে অভিনয় দেখা--পয়সা খরচার দিকটা ছাড়াও অতদূর থেকে থিয়েটারপাড়ায় আসতে সময়ও লাগতো প্রচুর--এ যুগের মত তখন তো ফুছি করে যাবারও কোন ব্যবস্থা ছিল না।

এর ফলে থিয়েটারকেই সাময়িক করে ছানা জায়গার লোকদের মাঝে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন থিয়েটারের কর্তাব্যক্তিরা।

এইসব কারণেই সারা আমেরিকায়

রঙ্গালয়ের ছড়াছড়ি এবং নিউ ইয়র্ক শহরের প্রসিদ্ধি শুধু পু-প্রডাকসন সেণ্টার হিসাবেই নয়, দেশের সর্বত্র নাটক ডিস্ট্রিবিউট করবার জন্যও। কিভাবে এই ব্যাপারটা করা হোত পরে বিশদভাবে বলছি। উনবিংশ শতাব্দীর ঘুরতির খুব--নিউ ইয়র্কে তখন ছোট বড় চলিশটি পু-হাউস--আটশো থেকে পনেরশো লোক বসবার জায়গা এইসব থিয়েটারে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থিয়েটারের মালিকেরা সক্রিয়ভাবে নাটক প্রডাকসনে অংশ গ্রহণ করতেন। সময় সময় তাঁরাই হতেন ডিরেক্টর। আবার কখনো কখনো হতেন যুগ্ম নাট্যরচয়িতা।

সেইসময় এইসব প্রডিউসাররা খুব নাম করেছিলেন--ডেভিড বেলান্টো, চার্লস ক্রোম্যান, এ এইচ উডস, চার্লস ডিলিংহাম, জর্জ এম কোহেন, উইলিয়াম এ ব্যাডী--এঁদের নিজেদের রঙ্গমঞ্চ ছিল এবং সেখানে নিজেদের প্রডাকসনস করে সুবিধাও হোত, ভাল অর্থ রোজগারও করতেন এঁরা।

যে প্রথায় তখন প্রডাকসন হোত আজও তার ধারাটা প্রায় একরকমই আছে। প্রথমত অভিনয়ের দলকে সংগঠন করে নিয়ে নিউ ইয়র্কে বসে তাদের মহলা দেওয়ান হোত--তারপর কাছাকাছি কোন শহরে তাদের পাঠানো হোত এক সপ্তাহ বা দু' সপ্তাহ অভিনয় করবার

জন্য--এই অভিনয়ের পর তবে তারা এসে নিউ ইয়র্কের থিয়েটারে নাটক উপস্থাপন করতো।

প্রাথমিক সফরের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, অভিনেতার আগে বাইরে গিয়ে সর্শকদের সঙ্গে নতুন নাটকের অভিনয়ানু বণ্ড করে নেবেন। তা ছাড়া নাটকটি সম্বন্ধে ট্রেসর দর্শকের রি-এ্যাকসন জানা যাবে--দর্শকরা হল নাটকের টেক্সটও রিভাইজ করে নেওয়া হইল এবং কাস্টিং-এর অদল-বদল করে তবেই নিউ ইয়র্কে নাটকটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে সজ্জা করা হবে।

কোন নাটক নিউ ইয়র্ক স্টেজে সাফল্য লাভ করলে রাতের পর রাত তার অভিনয় হোত--সাফল্য বলতে এই বোঝাতো যে, সাপ্তাহিক আয়ের অঙ্ক, কস্ট অড প্রডাকসনকে ঢাপিয়ে উঠে লাভের অঙ্ক সৃষ্টি করবে। নাটক কতদিন ধরে চলবে তাও নির্ভর করতো এই আর্থিক সাফল্যের ওপর। আর্থিক-সফল নাটক সব সময় আর্টিস্টিক্যালি সফল হতো না। নিউ ইয়র্কে যে নাটক অনেকদিন ধরে চলতো, দলীয় কর্তারা পরে সে নাটককে সফরে পাঠাতেন।

সাধারণত যে নাটক খুব বেশি নাম করে ফেলতো, কর্তারা সে নাটকের জন্য একটি দ্বিতীয় দল সংগঠন করে ফেলতেন এবং এই দলটিকে শিকাগো, বোস্টন, প্যাসিফিক কোস্ট প্রভৃতি জায়গায় পাঠাতেন।

মূল দলটি নিউ ইয়র্কেই অভিনয় করতে থাকতো।

(ক্রমশঃ)



সাপ্তাহিক বসুমতীর 'পাঠকমন'-এর মাধ্যমে পত্রিকার রচনা প্রসঙ্গে দু' কথা বলতে এবং সবশেষে উক্ত বিষয় সম্পর্কে করেকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করতে চাই। ৬১-বর্ষের ৫২ সংখ্যা থেকে বর্তমান ৭০ বর্ষের ৩ সংখ্যা পর্যন্ত 'পাঠকমন' বিভাগটি বন্ধ কেন স্থগিত্য লাগে না। 'পাঠকমন' বন্ধ হয়ে গেছে এমন কথা মনে করা অবশ্য আমার অভিপ্রায় নয়—। প্রশ্ন হচ্ছে গত করেকটি সংখ্যা থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে 'সাপ্তাহিক বসুমতীর' কতকগুলি বিভাগ কেনেন যেন অনিয়মিত এবং মাঝে মাঝে নিছক পূর্ব-প্রতিভ্রুতি পালনের নামা-ভর হিসেবেই যেন তাদের পত্রিকার পাতায় দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ খুঁজে বের করা আমার মত পাঠকের উদ্দেশ্য নয়। পাঠক হিসেবে আমার মনে যে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা এই পত্রিকাকে ঘিরে জন্মে থাকে—তারই পরি-তৃপ্তির ভাবনাসূত্রে এসব কথা এসে যাচ্ছে মনেই উল্লেখ করছি। কাজেই এই বিভাগটিকে যদি নিয়মিত করা যায়—তাহলে এই বিভাগটি নিঃসন্দেহে পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ হবে পাঠকদের কাছে। পাঠককে বাদ দিয়ে পত্রিকা-র অস্তিত্ব কল্পনা করা অনেকটা অবাস্তব হবে। আশাকরি পাঠক-পাঠিকারাও আমার মধ্যে একমত হবেন।

এবার রচনা প্রসঙ্গে আমি করেকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করতে চাই—জানি না সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকারাও আমার সংগে একমত হবেন কি না। যেহেতু প্রস্তাব—সংক্রান্ত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয় জেনেই ভরসা পাচ্ছি। আগেই উল্লেখ করেছি যে, কতকগুলি বিভাগ কেনেন যেন অনিয়মিত এবং মাঝে মাঝে নিছক পূর্ব-প্রতিভ্রুতি পালনের নামান্তর হিসেবেই যেন তাদের পত্রিকার পাতায় দেখা যাচ্ছে। প্রস্তাব প্রসঙ্গে ফিরে আসি—

আমার প্রথম প্রস্তাব—নিয়মিত বিভাগ-গুলিকে অনিয়মিতের তত্ত্বকারে ফেলে রাখার চেষ্টা না করে বাত তাদের সংগে আমাদের দৈনন্দিন (সাপ্তাহিক) সাপ্তাহিকের সুযোগ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করলে—আমাদের মত সাধারণ পাঠক নিঃসন্দেহে খুশি হতে পারবেন। আর সেই খুশি করাটাই তো সাংখ্যিক রস-পরিবেশনের গৌরব এনে দেবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—নিয়মিত বিভাগগুলি অনিয়মিত হওয়ার পিছনে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশের সংখ্যাধিকাই প্রধানত দায়ী। কথাটা পাঠক-পাঠিকাদেরও ভেবে দেখতে অনুপ্রাণিত করছি। ধারাবাহিক রচনার সংখ্যা এতদিন ছিল পাঁচটি গত ৩ সংখ্যা থেকে হয়েছে ছয় এবং অচিরেই গিয়ে দাঁড়াবে সাত-এ। অন্তত বিজ্ঞাপন দেখে তাই মনে হচ্ছে। ধারাবাহিক রচনা যে পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ, এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু নিয়মিত বিভাগকে অতি-বিস্তৃত করে তার সংখ্যাধিক্য ঘটলে বিপদ

পাঠক মন

আছে। সুতরাং দ্বিতীয় প্রস্তাবের উপ-সংহার হচ্ছে—ধারাবাহিক রচনার সংখ্যাধিক্য ঘটতে না দিয়ে নিয়মিত বিভাগগুলিকে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করা।

আমার তৃতীয় প্রস্তাব হচ্ছে—অধ্যাপকের মারক এই শিরোনামা সংক্রান্ত। এই বিভাগের রচনা যে কেন অনিয়মিতভাবে প্রকাশ হচ্ছে জানি না। অথচ এটি পত্রিকার একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় অঙ্গ। সুতরাং এই প্রসঙ্গে আমার প্রস্তাব—যদি এই শিরোনামার রচনাকে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা না যায়—এবং রচনা সংগ্রহে যদি সত্য কোন বস্তু বা অসুবিধে থাকে তবে একে বন্ধ করে—কোন বিশেষী রচনার অনুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিশেষ করে বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করা যায় কি না ভেবে দেখার জন্য প্রস্তাব করছি। তাতে আমাদের মত সাধারণ পাঠক পচিশ নম্বা পরসার বিনিময়ে বিব সাহিত্যের অনেক উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প পড়ার দুলভ সুযোগের অধিকারী হবে।

আমার চতুর্থ ও সর্বশেষ প্রস্তাব হচ্ছে—সাহিত্য প্রসঙ্গে। অধ্যাপক উক্ত হরপ্রসাদ মিত্রের 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' উক্ত প্রসংগেরই রচনা। ৬১ বর্ষের ৪৮ সংখ্যার 'পাঠকমন'-এ আমি হরপ্রসাদবাবুর উক্ত রচনার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সুতরাং বর্তমানে এ প্রসঙ্গে আলোচনা অপ্রাসংগিক হবে। কথাটা হচ্ছে—সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কি শিক্ষা বিভাগে, কি সাহিত্য সৃষ্টিতে—সে হবে শিক্ষিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। জাতির সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বক্তৃৎপক ও পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার নিবেদন, আমার এই সর্বশেষ প্রস্তাবটি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। চিন্তা করবেন বর্তমান শিক্ষা-জগতের পরিপ্রেক্ষিতে। বিশেষ করে উক্ত শিক্ষার দিক থেকে আমি প্রস্তাবটিকে উপস্থিত করতে চাই—। আজ নানান কারণে উচ্চশিক্ষা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে বসেছে। আজ আমাদের জীবন নানান দিক থেকে বিপর্যস্ত। স্বাস্থ্য নেই, শান্তি নেই—সুযোগ নেই আমাদের মত দারিদ্র্য-পীড়িত দেশের উচ্চশিক্ষাভিলাষী যুব-জীবনে। তাই আমাদের জীবনে আজ প্রয়োজন আশার আলো। ব্যক্তিগতভাবে আমি—

শ্রদ্ধা আমি একা নই, আমার মত হাজার হাজার যুবক আছে—উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন ঘাসের মনে। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-তে 'বিশ্ববিদ্যালয়'র অধ্যাপকদের 'সাহিত্য বিধরক' রচনা যদি নিয়মিত প্রকাশ করা যায়—তাহলে পাঠক-পাঠিকারাই শ্রদ্ধা খুশি হবেন না—এই রচনাগুলিকে কেন্দ্র করে উচ্চশিক্ষা-ভিলাষী যুবসম্প্রদায় প্রভূত উপকৃত হবেন এবং সেই সংগে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দিতে পারবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

আশা করি আমার প্রস্তাবগুলি একই সংগে পত্রিকা বক্তৃৎপক ও পাঠক-পাঠিকার গভীরভাবে চিন্তা করে এর গদ্য-উপ-লব্ধির চেষ্টা করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। সেই ভরসায়ই পাঠকমনের জবানীতে উপস্থিত করলাম।

প্রত্যাপন রচনা, শ্রীমামশ্র, হৃদয়লী।

আমি আপনাদের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একজন আগ্রহী পাঠক। যদিও গ্রাহক হিসাবে পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়। সত্য কথা বলতে কি, আপনার পত্রিকাটি আমাকে বড়ই আনন্দ ও তৃপ্তি দেয়। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' নিঃসন্দেহে সংসাহিত্য পত্রিকার পর্যায়ে পড়ে। 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর', 'আজকের মানুষ', 'আন্তর্জাতিক', 'সৃজন-এর' 'রংগজগৎ' ইত্যাদি করেকটি বিষয় 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র মস্ত বড় অবদান। এগুলি পড়ে যেমন তৃপ্তি পাওয়া যায়, তেমনি জানা যায় আধুনিক জগতের নানা বিষয়; স্ব সাপ্তাহিক পত্রগুলির মধ্যে প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবে এই পত্রিকাটির বিপক্ষেও করেকটি কথা আছে। দেখুন, 'ভারতদর্শন'র মধ্যে কি বস্তুকেও দর্শন করা যায় না? পৃথক-ভাবে দর্শন করান কেন? এই দুটি বিভাগের আলোচনা একটু কম হলেও কিছ, কাজ হবে না। কারণ, দৈনিক পত্রিকাগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণেই সংবাদ পরিবেশন করা হয়। সুতরাং 'ভারতদর্শন' প্রতি প্রদেশের এবং 'বঙ্গদর্শন' প্রতি জেলার অবস্থা নাই বা জানালেন? আর সে রকম সংকটময় অবস্থা উপস্থিত হলে তা 'সম্পাদকীয়' বিভাগটির মধ্যে উল্লেখ করতে পারেন।

'রংগজগৎ' নিঃসন্দেহে বহু পাঠকের প্রিয়। সুতরাং এই বিভাগটি আরও একটু বাড়ান। 'খেলাধুলা' বিভাগটিও বড় সংক্টিপ্ত।

পরিশেষে, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' মারফৎ বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা সম্বন্ধে প্রায় অজানা হয়ে পড়েছে। প্রতিভা-শালী সাহিত্যিকের সমবেশ সাপ্তাহিক বসুমতীতে নিয়মিতভাবে রাখার জন্যে অনুপ্রাণিত করে আমার চিঠি শেষ করছি।

শ্রীশিশিরকুমার দীর্ঘাঙ্গী
গাহক নং ৬১৭,
অমরদহ, হাওড়া।

উইমবলডেনের আলো-ছায়া

বিশ্ব টেনিসের নব্বুনব্বনে টেনিসের ইতিহাসে প্রায় শেষ অঙ্কে উপস্থিত। অপ্রত্যাশিত ফলাফল বা ওলট-পালট হচ্ছে উইমবলডেনের আপন বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তেমন কোন মাজা লাগানো, অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর ফলাফলের আগমন ঘটে নি এখনও উইমবলডেনের সতেরোটি কোর্টের জন্যে। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে নব্বুনব্বনের উপস্থিতি এবং দ্বাদশবর্ষের কলে যে অগ্নি ছিল স্নিগ্ধ, সূর্যদেবের আবির্ভাবও তার বুকে উত্তাপের সঞ্চার করতে পারে নি। এখনও পর্যন্ত তেমন কোন নাটকীয় ঘটনার অভাবে ১৯৬৬-র উইমবলডেনের আসরটা কেমন যেন নীরস যাচ্ছে।

কেউ বোধ হয় 'ভাবতেই' পারে নি যে, পোর্ট এলিজাবেথের ড্রাইসডেল একের পর এক বাধাগুলি অতিক্রম করে, এতগুলি ধাপ উপরে একেবারে পৌঁছে যাবেন সেমি-ফাইনালে। দক্ষিণ আফ্রিকার ড্রাইসডেল অবশ্য নিজের উচ্চাঙ্গের তীড়াশৈলীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। চলার পথে তিনি নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন জার্মানীর ফুনকীকে দ্বিতীয় রাউন্ডে আর কোয়ার্টার ফাইনালে আমেরিকার ফল্লকে। উইমবলডেনের ইতিহাস হাতড়ালে দেখা যাবে যে, পনেরো বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার স্টারগেস সেমি-ফাইনালে উন্নীত হয়েছিলেন এবং চম্পিয়ন যুগের বয়স্ক ড্রাইসডেল হলেন দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকান বিনি সেমিফাইনালে খেলার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। বাছাই তালিকার স্থান না পাওয়া অনানী খেলোয়াড় ড্রাইসডেল প্রথম চারজনের মধ্যে স্থান পেয়ে হারো বনে গেলেন।

ভারতীয় টেনিসলয়ের শেষ আশা ছিল প্রেমজিৎ এবং প্রবীণ কৃষ্ণের ওপর। দুজনেই দ্বিতীয় রাউন্ড পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। কিন্তু সকলকে নিরাশ করলেন দুজনেই; কৃষ্ণ পরাজিত হলেন আমেরিকার র্যালস্টনের কাছে আর প্রেমজিৎ অস্ট্রেলিয়ার কেন রেচারের কাছে। পুরুষদের ডাবলস খেলা থেকেও এবার ভারতীয় খেলোয়াড়েরা বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

আমেরিকা এবার বিরাট একটি টেনিস-বাহিনী প্রেরণ করেছিল। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালের ধাপ অবধি অস্তিত্ব বজায় রেখে-ছিলেন মার্টিন রোসিন এক ফল। রোসিন পরাজিত হন স্কটল্যান্ডের খেলোয়াড় র্যালস্টনের কাছে এবং ফল্ল পরাজিত হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ড্রাইসডেলের কাছে। একমাত্র বাইশ বসর বয়স্ক র্যালস্টন সেমিফাইনালে এসে পরাজিত হলেন গভবারের বিজয়ী এমার্সনের কাছে।

মেক্সিকোর পয়লা নম্বর এবং বাছাই তালিকার স্থান পাওয়া খেলোয়াড় রাফেল ও-সুনার কাছ থেকে আরও আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু তার প্রথম পর্বের লড়াই



ইন্টরন্যাশনাল ও বাউন্সনের প্রথম ডিভিশন ক্রীড়া লীগ খেলার একটি দৃশ্য

আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা উদ্ভাসিত প্রশংসার দাবি রাখে। প্রায় দেড় ঘণ্টা যুদ্ধ করার পর রাফেল ও-সুনার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করেন গভবারের বিজিত অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টোলের কাছে।

পর পর দুটি কিরাট পরাজয় ঘটিয়ে ১৯৬০ সালের উইমবলডেনের আসর গরম করে দিয়েছিলেন জার্মানীর অনানী তরুণ খেলোয়াড় বুসার্ট। সেবছর প্রথম রাউন্ডে বুসার্ট ফল্ল করেছিলেন বাছাই তালিকার আট নম্বর বুটেনের সেবা খেলোয়াড় মাইক

প্রতিদ্বন্দ্বিতা

স্যান্সটারকে। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে এসে দিলেন একটা কিরাট ওলট-পালট করে। যাকেতাকে নয়, বাছাই তালিকার এক নম্বর খেলোয়াড় এবং সেবারের সন্তান বিজয়ী

অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সনের বিজয়ী হবার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিলেন, তাঁকে পরাস্ত করে। ১৯৬০ এবং ৬৪ সালের উইমবলডেন সেমি-ফাইনালিস্ট বুসার্ট এবার তালিকার স্থান পেলেন পঞ্চম; কিন্তু বেচারাকে চতুর্থ রাউন্ডেই ফিরিয়ে দিল আমেরিকার মার্টিন রোসিন।

গভবারের মত এবারও পুরুষদের সিংগলসের সম্মানের জন্য ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন দুই অস্ট্রেলিয়ান স্কট স্টোলে এবং রয় এমার্সন; গভবারের বিজিত এবং বিজয়ী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ফ্রেড স্টোলে ১৯৬০ এবং ১৯৬৪ সালের বিজিত খেলোয়াড়। ফাইনালে এবারও দুই অস্ট্রেলিয়ানের উপস্থিতি টেনিসে অস্ট্রেলিয়ার একচ্ছত্র প্রাধান্যের কথাই প্রমাণ করে দিচ্ছে। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সনকে অতিক্রম করার মত খেলোয়াড়কে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে উইমবলডেন এবারও এমার্সনের ভাগ্যে।

পুরুষদের বিভাগে ড্রাইসডেল যেমন মার করে দিয়েছেন, ঠিক মহিলাদের বিভাগে তেমন সকলকে চমৎকৃত করে এগিয়ে গিয়েছেন বাউন্সের সেবা মাইলা খেলোয়াড় ইয়ামান। গভবারের আঘাতের জন্য ট্রামানকে উইমবলডেনে দশবর্ষের ভ্রমণে ওঠতে হয়েছিল। ১৯৬০ সাল থেকেই ট্রামান ছিলেন উইমবলডেনে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভে বুটেনের যোগ্য দাবিদার। কিন্তু তখন থেকে তাঁর উইমবলডেন ভাগ্যটা বড়ই খারাপ ছিল। এবার উইমবলডেনে তাঁর প্রথম পর্বের লড়াই



রয় এমার্সন

পাণ্ডাহক বসুমতী

প্রসঙ্গ হযেছেন। লক্ষ্য এবার তাঁর বহু-
আকাঙ্ক্ষিত উইমবলডেন প্রেট।

মহিলাদের সেমিফাইনালে উন্নীত 'অন্য
তিনজন হলেন ১৯৬৩ সালের রানার্স'
আমেরিকার বিলি জিন মফিট, ১৯৬৩-র
চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ আর
১৯৫৯, ৬০ এবং ৬৪ উইমবলডেন বিজয়িনী
রেজিলের মারিয়া বুনো। মহিলাদের বিভাগে
এবছর যে কার ভাগ্যে উইমবলডেনের সম্মান
মাচছে তা বলা খুবই শক্ত। কারণ শক্তির
দিক থেকে কেউই কম যান না।

প্রতিযোগিতার সূর্যতে ছিলেন ৩২৪ জন
প্রতিযোগী, কিন্তু শক্তি পরীক্ষার বিদ্যার নিতে
নিতে টিকে আছেন শুধু রথী-মহারথীরা।
আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ১৯৬৫-র উইমবল-
ডেনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

ময়দানী ফুটবল

বর্ষার আকাশ ময়দানের বৃকে ঢেলে দিল
তার অজস্র করুণাধারা, সাথে সাথে বাদল
যায়, সুরু করে দিল রিমকিম একতারা,
অমনি ময়দানে খেলার তালে জাগল নতুন
ছন্দ। জ্যেষ্ঠের খোড়ো হাওয়ার আর কড়া
রোড়ে ফুটবল সুরু হয়েছিল উদ্দাম তালে।
গতির তীব্রতা আর আক্রমণের ক্ষিপ্ততা খেলার
মাঝে সৃষ্টি করত উদ্দামনা। কিন্তু বর্ষণসিক্ত
মাঠে খেলার তালে দেখা দিয়েছে মন্দাকান্ততা
ছন্দ। গতির চেয়ে এখন শক্তি, ক্ষিপ্ততার
চেয়ে এখন দৃঢ়তা খেলার ফলাফলকে নিয়ন্ত্রিত
করবে। হালকা সূরের চেয়ে গুরুগম্ভীর
আওয়াজ আজ খেলার মাঠে। এখন ধারের
চেয়ে ভারের প্রয়োজন বেশি।

ইস্টবেংগল দলকে আমরা স্বাগত জানাই।
গত ২৮শে জুন আবার তারা লীগের খেলাতে
যোগদান করার ফলে ক্রীড়ামোদীমহল খুবই
আনন্দিত হয়েছে। আশাকরা যায় যে লীগের
অবশিষ্ট খেলাগুলি ইস্টবেংগল কোনরূপ
স্বাধার সম্মুখীন না হয়েই শেষ করতে পারবে।
মাঠে যাতে ভবিষ্যতে আর কোন অপ্রীতিকর
পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় তার জন্য ইস্ট-
বেংগল ক্লাব-কর্তৃপক্ষ আন্তরিক চেষ্টা
করছেন, আমাদের অনুরোধ সভাকারের ক্রীড়া-
মোদী হিসাবে দলের সমর্থকেরা কর্তৃপক্ষের
জগে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। আবার
লীগের খেলা সুরু করেই ইস্টবেংগল বাটা
বলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে ৫-১
গোলের ব্যবধানে। এই খেলায় ইস্টবেংগল
দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় চন্দন ব্যানার্জী
বাটার মহম্মদ সাফির কানমলে সতাই খুবই
প্রশেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।
আই-এফ-এ-র সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই
ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আদেশ দিয়েছেন।
কিন্তু বি-এন-রেলের গোলেরক্ষক দীপক

ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল না দেখে আশ্চর্য
হতে হয়।

মোহনবাগান তাদের জয়যাত্রা অব্যাহত
রেখেছে। এই প্রসঙ্গে মোহনবাগানের পুরো-
ভাগের খেলোয়াড় কাজল মুখার্জীর কথা না
উল্লেখ করলে অন্যায় হবে, কারণ বর্তমানে
মোহনবাগানের জয়লাভের পথকে সুগম করে
দিয়ে কাজলের উচ্চপের ক্রীড়ানৈপুণ্যে।
যেভাবে কাজল বর্তমানে মোহনবাগানের পুরো-
ভাগের আক্রমণধারা রচনা করেছে, তা সতাই
অতুলনীয় এবং অনবদ্য। ইতিমধ্যে মোহন-
বাগান অংশগ্রহণ করেছে দুটি খেলায়।
একটিতে তারা পরাজিত করেছে বালী
প্রতিভাকে ২-০ গোলে এবং অন্যটিতে
গ্রায়ার দলকে ৪-০ গোলে।

মহামেডান দলের কাছে ২-০ গোলে
পরাজয় স্বীকার করে বি-এন-রেলদল লীগের
দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। কারণ
ইতিমধ্যে বি-এন-রেলদল অপচর করেছে

আর্টিট মূল্যবান পয়েন্ট। মহামেডান স্পোর্টিং
অপচর করেছে দুই পয়েন্ট আর ইস্টার্ন-রেল-
দল সাত পয়েন্ট।

এখানে বাটা এবং কালীঘাট দলের
অমীমাংসিত খেলাটির কথা উল্লেখ না করে
পারছি না। বিভিন্ন মহলের অভিযোগ
যে, এই খেলাটির ফলাফল নাকি পূর্বেই
নির্ধারিত করা ছিল। এই ধরনের গড়াপেটা
খেলা কলকাতার মাঠে নতুন নয়। প্রথম
ভিভিসনে অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য ছোট
দলগুলি এই পয়েন্ট ম্যানেজের জঘন্য ষড়যন্ত্রে
লিপ্ত হয়। ঘটাদিন পরন্তু এই ধরনের
ঘটনাকে আমরা বন্ধ করতে না পারব ততাদিন
সর্বোত্তমভাবে আমাদের ময়দানের ফুটবলের
উন্নতি সম্ভব হবে না।

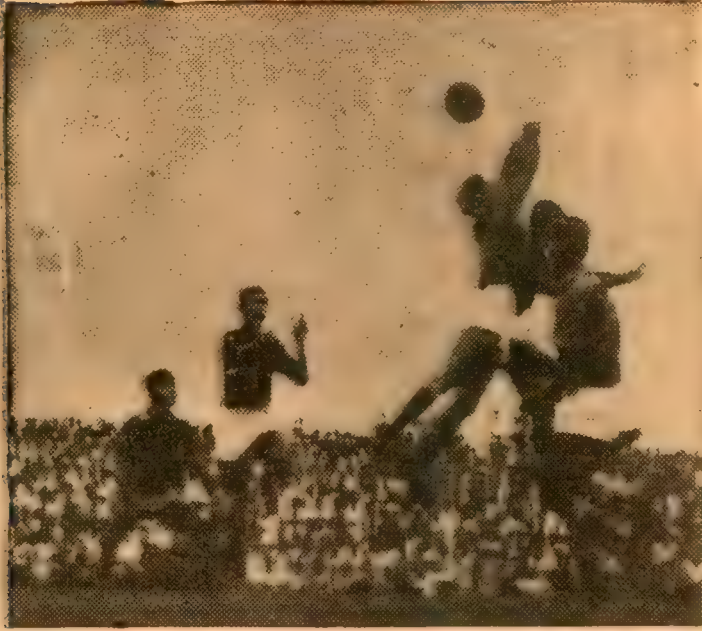
পর্বতের মূখিক প্রসব

অবশেষে অনেক হাঁকডাকের পর পর্বত
মূখিক প্রসব করল। ইস্টবেংগল-রাজস্থানের



বটেনের সেরা মহিলা টেনিস খেলোয়াড় ট্রান্স ও এয়েলা মর্টিমোর

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী



সাহেববাগান ও কালীঘাট দলের খেলায় দৃশ্য।

খেলোয়াড় ডেব্রটার লন্ডনের কাছে রেফারিতে এক মটর দুর্ঘটনায় আহত হন। এই দুর্ঘটনায় ডেব্রটার ডান পায়ে আঘাত পান। হাসপাতালে স্থানান্তরিত হবার পর সংবাদে প্রকাশ যে, তাঁর আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

পর্্তুগালের ওপোর্তোতে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় পর্্তুগালদল বিশ্বকাপ বিজয়ী ব্রাজিলদলের সঙ্গে খেলা অসমীমুখিতভাবে শেষ করেছে।

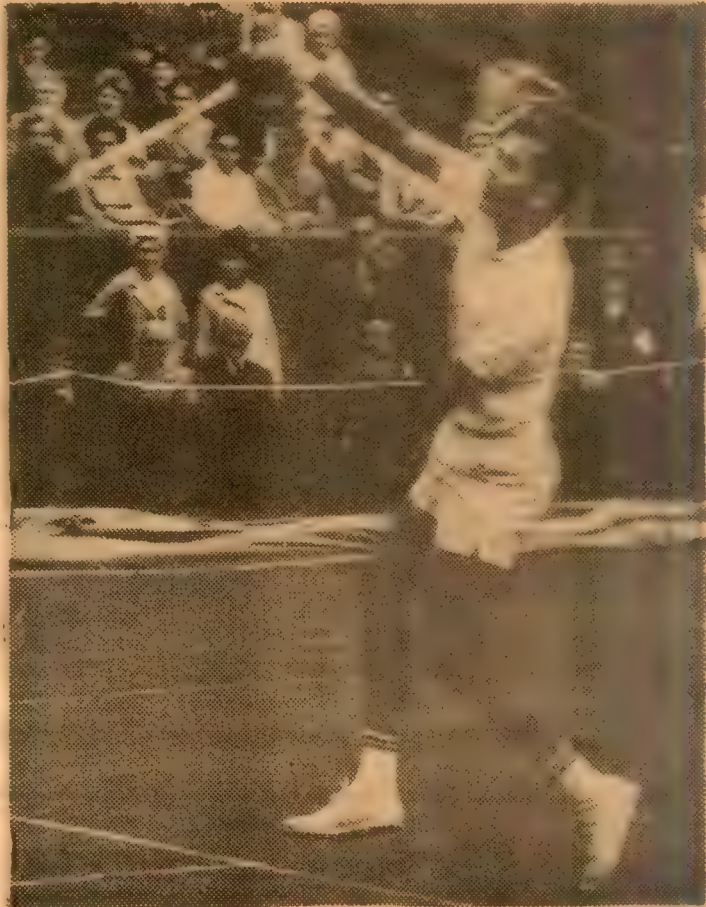
কুয়ালালামপুরের মাদেকা ফুটবল ক্লাব যোগিতায় যোগদানে সম্মত হয়েছে ব্রহ্ম, থাইল্যান্ড, হংকং, কোরিয়া এবং জাপান প্রমুখ পাঁচটি দেশ। ভারত অবশ্য মাদেকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতাকে আমন্ত্রণীয় করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপের ফুটবল দলকে আনার জন্য খুবই চেষ্টা চলছে।

লীগ খেলার অপ্রীতিকর ঘটনাটির পর দিল্লী থেকে আই-এফ-এ-র সভাপতির বাতী এল— হয় ইস্টবেঙ্গল দলকে সালপেণ্ড কর নয় তো লীগা খেলা বন্ধ কর। আই-এফ-এ-র সভ্য বলতে লাগল ঘন ঘন; দাপাদ্যাপি, মাতা-মাতির মাতা বৃন্দ হবার ফলে ব্যাপারটি আরও জটিল হয়ে উঠল। যে ঘটনাটির ওপর ফুটবল লীগের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাকে কেন্দ্র করে ছেলেখেলা চলতে লাগল।

ইস্টবেঙ্গলকে সাতদিনের মধ্যে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। ইস্টবেঙ্গল সাতদিন পর আরও কয়েকদিন সময় প্রার্থনা করল সাব-কমিটির কাছে, কিন্তু সাব-কমিটী সে প্রার্থনা মঞ্জুর করল না। তখন ইস্টবেঙ্গল আবেদন করল আই-এফ-এ-র গভার্নিং বডির কাছে, কিন্তু সেখানেও আবেদন হল নামঞ্জুর। এখন আমাদের প্রশ্ন যে ইস্টবেঙ্গলকে যখন কোন শাস্তি দেওয়া হল না, তখন তাদের আবেদন দ্বার নামঞ্জুর করে অবধা সময় নষ্ট করা হল কেন? এই ঘটনার অসমীমুখিত করতে গিয়ে আমাদের ফলকাতা ফুটবলের দুর্বল পরিচালনা এবং চরম খামখেয়ালীপনার পরিচয় দিলেন। সংবাদে প্রকাশ যে ইস্টবেঙ্গল-বাটার খেলায় খেলোয়াড়ের কানমলার ঘটনাটিকে নিয়ে আই-এফ-এ মাথা ঘামাচ্ছেন। একটি ঘটনায় যথেষ্ট কানমলা খাবার পর কানমলার ঘটনাটিকে নিয়ে তাঁরা কতদূর অগ্রসর হন দেখা যাক।

সমাচার দর্পণ

সংস্করণ এবং ইংল্যান্ডদেশের খ্যাতিমান ক্রিকেট



ক্রিকেট খেলা



উইমবলডেন বিজয়ের আনন্দে শূন্যে লাফ দিয়েছেন রয় এমার্সন, অন্যদিকে দাঁড়িয়ে বিজিত ফ্রেড স্টোলে

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মদ্রিত ও প্রকাশিত।

হুইচ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩৮৭
আজকের মানুস		৩৮৮
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৩৮৯
আমার ভাগ্যকে আমি (কবিতা)	কবিরাজ ইসলাম	৩৯০
নারদের ভারত	সুভাষ মদ্যোপাধ্যায়	৩৯১
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	৩৯২
ভারতদর্শন		৩৯৩
আন্তর্জাতিক		৩৯৪
উপছায়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৯৫
বাণিজ্য সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	৪০০
আধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৪০২



প্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেপ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্ডাকিনী

প্রেমের অলকনন্দা

জানের আকালগজা

বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই

চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্বোধন সংস্করণ

মূল্য পনের টাকা

যে জ্ঞান-স্বর্ষের সর্বভোম্বী প্রতিভার
কিরণচ্ছটার ভারত-মহিমা চিত্রভাসর—
সেই সাহিত্যজগদ্ব্যোতি—প্রতিভা ও
মনোবীর অবতার—সাহিত্য-তপস্বী—
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের নেয়ে, মেঘদূত
বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা
সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধ
মালা, শিকাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধ
এই জাতীয় সাহিত্য-জগতী বাজ ১১১
বাল্লি, মোহিনী।

নীলাচলে

প্রীকৃষ্ণচৈতন্য

প্রীপোরাজ ও প্রফুল্ল

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত

৥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

মূল্য দুই টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনাবহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

বঙ্গদর্শন	...	...	...	...	...	...	৪০৪
দিল্লী থেকে	...	...	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	...	...	...	৪০৯
সার পদার্থ (কবিতা)	...	...	সুনীল বসু	...	...	...	৪১০
ভেল্কীর খেলা (অনুবাদ-গল্প)	...	...	দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত	...	...	...	৪১১
শহর কলকাতা	...	...	শ্রীপদাভিক	...	...	...	৪১৪
নিজের সঙ্গে দেখা (গল্প)	...	...	মণি মৃধোপাধ্যায়	...	...	...	৪১৭
সবার জলফোঁ	...	...	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়	...	...	...	৪২২
চার্লি চ্যাপলিন	...	...	অশোক সেন	...	...	...	৪৩৩
রূপজগৎ	...	...	...	...	...	...	৪৩৭
রূপজগৎ—ওদেশে এবং এদেশে	...	...	শিলালি	...	...	...	৪৪২
খেলানুমা	...	...	শ্রীজামিতা	...	...	...	৪৪৪

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌতুহল, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা
সমগ্র মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমগ্র।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্রূপপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যমহোদয়ের শ্রীকৃষ্ণলীলার জন্ত যে
উৎকর্ষ, এই 'প্রলাপে' তাহার প্রতিফলিত।
শ্রীমদ্রূপপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক'
মোকর্ষে তাহার একমাত্র রচনা। শ্রীল
কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুশ্লীলিত পঞ্চাঙ্গবাদে
এই অমূল্য বাণীর লীলাসমিত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য
ভক্তিচরিতামৃত।

হুলভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস

বিবচিত্ত, বৈষ্ণবগণের সম্পূর্ণজিত।

আত্মভাব

বৈষ্ণব দর্শনের সুস্বতন্ত্র অঙ্গসংগ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রিয়ানন্দ দাস ঠাকুর বিবচিত্ত। বৈষ্ণব-
সিদ্ধান্ত সাধন-ভক্তনের নিগূঢ় স্বার্থসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত
সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার সুযোগ্য শিষ্য
পরম বৈষ্ণব শ্রীল ঞ্জলসের সুশ্লীলিত
পঞ্চাঙ্গবাদ।

পায়ণ্ড-দলন

মুস্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর
বিবচিত্ত প্রেমভক্তির লহরী-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপড়ন, শ্রীশ্রীশ্রী-বন্দনা, নামসংকীর্ণন
চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর
শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি
চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৩ টাকা।

প্রখ্যাত কথাসিরা

শ্রীমদ্রূপ মৃধোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৭ টাকা

শ্রীমদ্রূপমোহন দেবীর

গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

বিগতকালের বরণ্য সাহিত্যগ্রন্থ

তৈলোক্যনাথ মৃধোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

কোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম,

ভ্রমরচরিত।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

ভূত না বাহুস, কঙ্কাবতী, মজার গল্প,

মুক্তারাল।

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বনুমতী আইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২



সাপ্তাহিক বসুমতী



৭০ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ
বহুস্পতিবার, ৩০শে জুলাই, ১৩৭২

Price : 25 Paise
Thursday, 15th July, 1965

পণ্যের বাজার দর

যে সব মজুতদার ও সমাজবিরোধী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে তারা আত্ম-গোপন করেছিল এবার তারা আবির্ভূত হবে—এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকার কোনো কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যে তাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। অন্তত বাজারের কথা ভাবলে, সে কথা অস্বীকার করা কঠিন। আমাদের মধ্যমস্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জনদরদী; তাই দক্ষতকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এতোকাল তিনি যে সুকঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন, তা কি রাতারাতি বিলীন হয়ে গেল? জনসাধারণের শত্রু হিসেবে যারা চিহ্নিত হয়েছিল, তারা কোন মন্ত্রবলে সমস্ত বিপদের বালাই থেকে মুক্ত হয়ে বাজার দখলের প্রচ্ছন্ন অনুমতি লাভ করলো—তার কৈফিয়ৎ আদায় করার ইচ্ছা জনসাধারণের থাকলেও, তারাও বেন নিরুপায়। তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কথা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে; কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষের মধ্যে জিনিসপত্রের যে দাম ছিল, একাল তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। তবু এমনই আশ্চর্য ব্যাপার যে, কোথাও তেমন প্রতিবাদের ভাষা নেই এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিকার উচ্চারিত হয় না কোনোখানে। আমরা সরকারের মাথাপেকী হয়ে থাকলেও, সরকার আজ বাজারের দর ও জিনিসপত্রের নিয়ন্ত্রিত সরবরাহ বজায় রাখতে অক্ষম হয়েছেন। পল্লী অঞ্চলে চালের দর এখন প্রাতি কে-জিতে দেড় টাকা পর্যন্ত উঠেছে। আটা, গম, সূঁজি ধীরে ধীরে দুর্লভ হয়ে উঠছে। মাছের বাজারে লাইন দিলে কমপক্ষে সাড়ে চার টাকা কে-জিতে যে মাছ পাওয়া যায়, তা প্রায় অখাদ্য। মাছের

পরিবর্তে মাংস ও ডিম ক্রয়ের ক্ষমতা জনসাধারণের নাগালের বাইরে। দু' টাকা কে-জি দরের দুধ সহজলভ্য নয়, সন্দেশের কথা আপাতত শিকের কলঙ্ক। সরবের বাজার দর আগের তুলনায় অনেক কম, অথচ সরবের তেলের দাম প্রভাহ বেড়েই চলেছে; অধিকন্তু বাজার থেকে ঐ তেল উষাও হবার শেষ দশায় এসে পৌঁছেছে।

অন্ততপক্ষে বেঁচে থাকার জন্য বা দরকার এবং যে সব তরিতরকারী, সস্তা না হোক—এতোদিন নাগালের মধ্যে ছিল—সেই আলু, বেগুন, পটল, ঢেঁড়শ, বিভাও এখন বাজারের সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উঁচুদরের মর্যাদা লাভ করেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ সব তরিতরকারীর দাম দেড়গুণ থেকে দু'গুণ বেড়ে গেছে। কারণটা না কি—বৃষ্টি ও বাদলা। আমাদের বাংলা দেশে কি বিগত বছরগুলিতে বৃষ্টি-বাদলা হয় নি? আমরা জানি, ঐ সব বছরে বৃষ্টির সেহাই দিয়ে কখনো দাম বাড়ানো হয় নি। এমন কি, একথাটা সত্য যে, আরো বেশি সস্তার তরিতরকারী পাওয়া গেছে। আর ঐই সময়ে সরবরাহ বেশি থাকার স্বভাবতই দর থাকে কম। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তাই যে তরিতরকারীর দাম অন্যান্যভাবে একবার বেড়ে গেছে, সেই দর স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছবে কি না, তা আমাদের পক্ষে বলা দুসাহ্য। সরকার হয়তো অন্যান্য জিনিসপত্রের মতো বেশি দরের দামের তালিকা বাজার বাজারে কুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা

করবেন, তবু সরকারের কথা শুনবে কে? চাল ও মাছের নির্দিষ্ট দরের তালিকাটা আমাদের মনে আছে, কিন্তু আসল সময়ে তা আসার—বাজারে গেলেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। একমাত্র কঠোর মনোভাব ও চূড়ান্ত শাসিত স্বারা জনসাধারণকে ঐই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। দক্ষতকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়ার পর তাদের কালোমুঠো যে আরো শক্ত হবে, তা বলাই বাহুল্য। সরকারও সেখানে নিরুপায়।

এখনো সময় আছে, আর আমাদের অনুরোধ রয়েছে মধ্যমস্ত্রী শ্রীসেনের কাছে। তিনি প্রয়োজনবোধে খাদ্যবস্তুর ও ব্যবসায় পণ্যের বাজার সরকারী কন্ট্রোল আনুন এবং এক একটি সময়ে বিপণির মাধ্যমে ঐ সব পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করুন। জনসাধারণের কল্যাণেই গণতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষিত হয়, মাল কয়েকজনের স্বার্থসিদ্ধিতে নয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে এখন একমুঠো ভাত জুটলেই স্বার্থ কল্যাণ সাধিত হবে; তার অধিক তারাই বা কি চায়?

সম্পাদকীয়

আবদেল মান্নান

স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ক্ষমতা দখল করে নিজেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছেন বিশ্ব-ইতিহাসে এ নজীর অপ্রতুল নয়। ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আবদেল্লা আল সালালিও যে সে পথে এগুচ্ছেন না তাই বা কে বলবে?

ছোট দেশ ইয়েমেন, লোকসংখ্যা কলকাতার চেয়েও কম, ৫০ লক্ষের মত। কিন্তু গত লক্ষ ততই বোধ হয় এখানকার দুর্নীতি, অত্যাচার-অনাচারের সংখ্যা। জানতে পারি বাকী ছিল না যে, ইরানী শাসনব্যবস্থার জন্যই দেশের এ দুর্বস্থা, প্রজাপুঞ্জের দাসত্বলভ জীবনযাত্রা। কিন্তু তাহলে কি হবে, সে শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলবে কে?

তাই বলে এ-বদ্যাকে অনিদিষ্টকালের জন্যে চলতেই বা দেওয়া হবে কেন? কেন রাজনীতিকে ধর্মের নিগড় পরানো হবে?

ইরাককে ঈশ্বর বা আল্লা-প্রেরিত মানুষ বলে আর যেই মেনে নিক, সালালি তা মানতে রাজী নন। সালালি বাগদাদে ইতিহাস পড়েছেন, শব্দ পড়েছেন, রাজনীতি চর্চা করেছেন, হাজারো রকমের লোকের লালবে এসেছেন। পথ নিলেন তাই সালালি, দেশকে ইরানী শাসন থেকে মুক্ত করতে হবে, অত্যাচার-নিপীড়নের অবসান ঘটতে হবে।

সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে সালালি অল্প দিনের মধ্যেই পদোন্নতি লাভ করলেন, কয়েক পদে উন্নীত হলেন তিনি। কিন্তু কেবল আত্মীয়ভিত্তে হুজুর হবার পাত্র তো সালালি নন, তিনি সকল প্রাণের সম্বোধন বিধান করতে পারেন, তাই তিনি তৈরি হতে লাগলেন, স্বযোগের অপেক্ষায় রইলেন। ১৯৪৮ সালেই তাঁর কাছে প্রধান স্বযোগ ধরা দিল। কিন্তু দুই মাসের কয়েকজন অনুরাগী সহচর নিয়ে তিনি কার্গিলি করতে পারলেন না। ইরানি ইয়াহিরাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করার স্বপ্ন তাঁর ব্যর্থ হলো।

এ বছর এবং হত্যা-প্রচেষ্টার জন্যে সালালিকে শাস্তি অবশ্যই পেতে হয়েছিল, দীর্ঘ ৭ বছর তাঁকে হাজার নির্জন প্রকোষ্ঠে কারাবাস করতে হয়েছিল। কিন্তু মুজিল্লাভের পর নতুন ইরানের কী খেয়াল হলো, সালালিকে সেনাবাহিনীতে নিলেন। বড় ইরান হয়ে তো সালালিকে আরো উচুতে আসন দিলেন, সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ করলেন। ক্যাডার-ইন-চীফের পর তো নয়, সালালি সকল অভ্যর্থানের চাবি কাঠিটি পেয়ে গেলেন।

হাঙ্গাম ছিলেন ইয়েমেনের সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার। তিনি তাঁর বলবল নিয়ে ইরানি বদ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান চালানার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। মুজিবমান সালালি বদ্বরকে এ পরামর্শ দিলেন যে, হোভেইডা থেকে সেনাবাহিনী আনা হোক ইরানের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে। সালালির চানাকি ইরানি মদর ধরতে পারেন নি, হোভেইডা থেকে সেনাবাহিনী রাজধানীতে আনার হুকুম দেওয়া হলো। তিনি জো জানতেন না যে বহুদূর আল জাইফির পরি-চালনাধীন হোভেইডা সেনাবল সালালিরই অনুগত এবং রাজধানীতে এসে বদ্বরের বিরুদ্ধেই বশুক ধরবে। ইরানের প্রাসাদ দখল করতে বেগ পেতে হলো না। গনীচ্যত হলেন ইরানি বদ্বর প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসলেন সালালি, ইয়েমেনে নতুন সুধৌদয় হলো, ইরানী শাসনের অবসান হলো, ইয়েমেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলো। তখন সেপ্টেম্বর মাস, ১৯৬২ সাল।

কিন্তু প্রজাতন্ত্র হয়েই ইয়েমেনের নব্য নিউলো না, প্রধানমন্ত্রী সালালিও এখানকার হাজারো সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী করতে পারলেন না। না পারার লবণা কারণ ছিল। সন্ন্যাসিনী দু-শ বছরে স্ত্রী হয় নি। হাজার বছরের পুরোনো সন্ন্যাসী উপজাতির বিরোধ সাম্প্রদায়িক কোন্দল। এবং ইরানী মুশাসিনের স্বযোগেই যে এ সন্ন্যাসিনী মাথা তুলতে পেরেছিল সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

সালালি চেষ্টার কোনো ক্রটি করেন নি সন্ন্যাসিনী অনুধাবন করতে, তার নীবাংসা করতে। গত প্রায় তিন বছর ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপজাতির মধ্যে যে-বিরোধ এখানে চলে আসছে, তাকে শুধু বিরোধ না বলে গৃহযুদ্ধ বলাই ভালো। সালালি সে আশুন নেভাবার জন্যে বিরোধের স্বামী সমাধান নির্ণয়ের জন্যে ৯ জন সন্ন্যাসিণী একটা খানার শান্তি কমিটিও গঠন করে-ছিলেন। কিন্তু শান্তি পুনঃসংস্থাপনের প্রস্তুতি হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী আহমেদ নোয়ামেন পদত্যাগ করলে প্রেসিডেন্ট সালালিকেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাও নিতে হলো।

ব্যক্তিগতভাবে সালালি একজন জাতীয়তাবাদী অমিতভেজা পুরুষ। ইরানী শাসন থেকে এবং রাজতন্ত্র থেকে তিনি ইয়েমেনকে মুক্ত করেছেন, প্রগতিশীল আরব দুনিয়ার শরিক করেছেন তিনি দেশকে। সান্নাধ্যবাদের বিরুদ্ধে আত্মোন্মীয়া সংগ্রামে ইয়েমেনও রয়েছে অন্যান্য দেশের হাত ধরে।

ইয়েমেনের ওপর লুক দুটি রয়েছে সউদী আরব ও বৃটেনের। সালালি সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং সচেতন বলেই আরব দুনিয়ার নেতা প্রেসিডেন্ট



আবদেল্লা আল সালালি

নাসেরের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ বিভালী স্থাপন করেছেন। কিন্তু নাসেরও চান ইয়েমেন তার আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাসিণী নিয়ে ফেলুক, নইলে যে ইয়েমেনের হাত পড়বে না, আত্মোন্মীয়া সংগ্রামে বিপর্যয় হবে।

আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাসিণী যেটাতে না পেরেই কি প্রেসিডেন্ট সালালি খানার শান্তি কমিটির সঙ্গে পরামর্শ না করেই প্রধানমন্ত্রীর পদীও দখল করে নিলেন? প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী—দেশের উচ্চতম দুটি পদ ও দায়িত্ব একই হাতে ধাক্কায় ফেল কি জনসাধারণের পক্ষে ভাল হবে? অত্যধিক এবং প্রয়োজনাত্মিক ক্ষমতা এক হাতে নেবার ফলে সালালি স্বৈরাচারী হয়ে উঠবেন না তো? তা যদি হয় তো তবে ইরানী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর ঠাট্টাটোই অর্থহীন হয়ে পড়ে। ইয়েমেনের বিভিন্ন কাঁচা উত্তো পথে চলার জন্য নয়, সালালি কিন্তু ইয়েমেনকে প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতা, গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যে বিপুল করেছিলেন।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হুমায়ুন মিল

বাংলা কবিতার যতীক্ষনাধের সনকালীন, কিন্তু বরষে অনেক ছোটো স্কাক্ত ভট্টাচার্যেরও মুখ ছিল। তাঁর 'ধনপতি পাল' বস্তো এক জমিদার। ধনপতির জমিদারি দেশজোড়া। সেখানে সূর্য অস্ত যায় না। তাঁর কারখানা জমজমাট। ব্যাকে তাঁর আমানতী টাকার অঙ্ক কতো কে জানে। 'আরো টাকা চাই'— এই নেশাই তাঁকে পেয়ে বসেছে। সেটাই তাঁর অসুখ। সে-অসুখের চিকিৎসা করবে কে? ভাঙার, কবিরাজ সবাই হার মানলেন। ধনপতির স্খামান্য সারাবার ওষুধ কী যে, পরিশেষে তা তিনি নিজেই একদিন অনুভব করতে পারলেন, বললেন—'সব চেয়ে খেতে ভালো গরীবের রক্ত।'

হিজেরনাথ ঠাকুর এ-দুখোপের মানুষ ছিলেন না। এ রকম রূঢ় শারীরিক আঘাত তাঁর কবিতার কোথাও নেই। বিহারীলালেরও দুঃখের প্রকৃতি অন্য রকম। স্বভাবকবি গোবিন্দদাস কখনো কখনো এ রকম রাগে কোভে মন্ত্রণার অস্থির হয়েছেন বটে, কিন্তু বোধ হয় কখনোই ঠিক এতোটা নয়। স্কাক্ত ভট্টাচার্য যে এঁদের থেকে পৃথক যুগে পৃথক এক পৃথিবীর কবি হয়ে এসেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর দুঃখ গভীর নয়, বরং উগ্র অথবা তীব্র। তাঁকে যে দংশন-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল, সেটা ততো মানসিক নয় যতো শারীরিক। তাঁর সেইসব ছত্র হয়তো এই কারণেই এ-মুগে অনেকটা রাজনৈতিক বিক্ষোভের শোভাযাত্রী-দের কাজে লাগছে। আমার এ-কথা কটাক্ষ নয়। পাঠকরা ভুল বুঝবেন না।

ধলতে পারো ধনীর বাড়ি
তৈরি যারা করছে
হুড়েরেই তামা কেন
মাছির মত মরছে?
ধলতে পারো ধনীর মুখে
যোগায় বারো খাদ্য
ধনীর পায়ের ডালার তার
ধাক্কে কেন বাধ্য?

এসব সোজা কথা। এ ভারি জ্বালানী জিজ্ঞাসা। এ ভাবটা কবিতার গভীর ভাব নয়, বরং একে বলা বেতেপারে উত্তম ছড়া। সে উত্তাপেরও আবেদন আছে বই কি।

হিং টিং ছট প্রশু এসব
বাখার মতো কামড়ার।
বড়লোকের চাক তৈরি
গরিব লোকের চামড়ার।

মন একথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনোময় শরীরকে কুঞ্চিত করে,—হাতকে পিঠের ওপর চালিয়ে দেয়। আমরা গরিবরা নিজের নিজের পিঠে হাত বুনিরে পিঠকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি। 'কামড়ার'—এর সঙ্গে 'চামড়ার'—এর মিলটা ভারি যুগ্মই মনে হয়। ছড়ার এই অংশের কামড়টা কচ্ছপের কামড় বলে মনে হয়। মন জুড়ে থাকে, কান জুড়ে থাকে। এ-সংগীত হিজেরনাথের



যতীক্ষনাথ

বিবাদপুরের সংগীত নয়। 'বিবাদপুুরে' বড়লোক-গরিবলোকের ভেদবোধ ছিল না। সে বোধ গোবিন্দদাসে ছিল, যতীক্ষনাথেও ছিল কিছু কিছু। স্কাক্ত হয়তো যতীক্ষনাথের 'চামড়ার কারখানা' পড়েছিলেন। কিন্তু সেই 'চামড়ার কারখানা'তেও ধনী-নির্ধনের রাষ্ট্র-ভেদের ইঙ্গিত ছিল না। যতীক্ষনাথ তাঁর 'প্রাণের বন্ধু'কে ডেকে বলেছিলেন—

এতদিন হেথা বসি কিরি—কই, ছিল না জে
মোর জানা,
গোঁপনে এখানে খুলেছ বন্ধু, চামড়ার কারখানা।
বৃষ্টি শিশিরে নয়নের নীরে লোনা মিঠা
কই জলে,
দিন রাত শুধু কাঁচা চামড়ার শত প্রসাধন চলে।

বলেছিলেন—

প্রেমের প্রলেপ ঘষিয়া ঘষিয়া চক্চকে করে রাখা,
থেকে থেকে সেই আদম গন্ধ তবও পড়ে না ঢাকা।

পৃথিবী যে নিরুলকা সুলসরী নয়, এই কথাটাই বিশেষভাবে বলতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর 'দুঃখবাদী' কবিতাটিতে এই কথাই বেজে উঠেছিল। তিনি নিখেছিলেন—

বন্ধু লুকায়ে রাঙা বেব হালো পশ্চিমে

অসামান্য—

রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রহিল

বারান্দা।

বাদ্যে বাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,
যড়বৃত্ত-হলে ঘড়িপুর মেলে কান হতে বাৎসর্য
হলে বলে কলে দুর্বলে হেথা প্রবল

অত্যাচার।

এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কামা জো

চমৎকার।

প্রবল যে এ সংসারে দুর্বলের ওপর অত্যাচারে নিযুক্ত, এ-ধরনের তাঁর এইসব কবিতার অকথিত থাকে নি। 'বাদ্যে-বাদকে' কথাটির উচ্চারণগত ধ্বনিতে তাঁর অভিপ্রেত যে দৃশ্যটি কিংবদন্তি গৌণ হয়ে গিয়েছিল, স্কাক্ত বোধ হয় বড়লোকের চাকের চামড়ার জন্যে গরিবের পিঠের চামড়া ব্যবহারের তাক-লাগানো সম্ভাবনা দেখিয়ে দিয়ে বাংলা কবিতার দুঃখবাদের আধুনিক বিবর্তনের অন্তত একটি স্তর সূচিহিত করেছেন।

এসব দুঃখ কিন্তু বোহিতলালের নয়। তাঁরও দুঃখ ছিল। সে দুঃখের স্বরূপ স্বতন্ত্র। সমাজে দুঃখী আছে,—দুঃখীর দুঃখ আছে বলেই সমাজ স্বস্থ বঁচা, তাঁরা আত্মের সেবা করে মনুষ্য বিকাশের স্বযোগ পান,—এই ছিল বোহিতলালের বিশ্বাস। 'দুঃখের স্বরূপ' নামে একটি প্রবন্ধে তিনি এই কথাই লিখে গেছেন:

আজকাল বড়ো কষ্টে দিন যাচ্ছে আমাদের।
বোধ হয়, সারা পৃথিবীই ভুগছে। বাতাস চড়া।
আমের চেয়ে বায়ু বেশি। পরিবের চোখের
সামনে বড়োলোকের স্মৃতি-স্মরণের রাস্তা
জুলছে। সে রাস্তা দুই অর্ধাংশের নয়,—
একেকবারে বোঁধাযেঁষি নৈকট্যের জ্বালা। এ-
অবস্থার স্মৃতি এবং অভাববোধ যে খুবই যন্ত্রণা-
দায়ক হবে, তাতে সন্দেহ কিসের? তাই খাদ্য-
খাদ্য সম্পর্কটা সহজেই মনে ধরে যায়। কিন্তু
মানুষ যেখানে বড়োলোকের খাদ্যে পরিণত
হচ্ছে,—খনপতি পালেনা যেখানে বলছেন—
'সব চেয়ে খেতে ভালো পরিবের রক্ত', সেখানে
প্যান-প্যানে কান্না জাগিয়ে রাখাটা তুচ্ছ কাজ—
মোহিতলাল সেই কথাই লিখে গেছেন। তাঁর
সেই কথা আমরা বোধ হয় ভালো করে লক্ষ্য
করি নি—তিনি লিখেছেন—

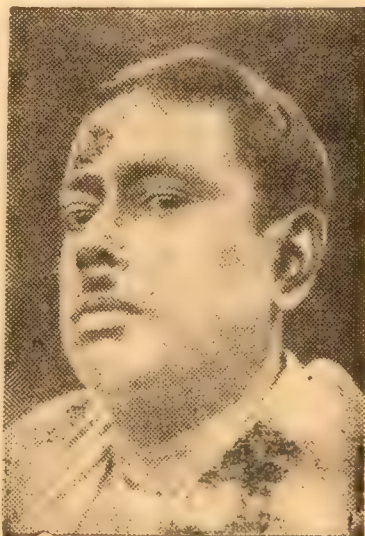
'যেখানে এই দুঃখ দুই করিবার চেষ্টার
পৌরুষ ও বীর্যের পরিচয় পাই সেইখানেই
আমরা শ্রদ্ধা প্রকাশ করি, দুঃখের দুঃখকে
প্রণয় করি না।'

শুধু তাই নয়,—তিনি বলেছেন যে, দারিদ্র্য-
দুঃখের বিষয়টাই তুচ্ছ। তাতে চিত্তশক্তির
দারিদ্র্য প্রকাশ পায় বলে তিনি মনে করতেন।
যেমন জঠরের ক্ষুধা, তেমনি কান্নাকর কান।
দুটি অভাববোধ—সবচেয়ে এক কথা।
মোহিতলাল লিখেছেন—

'যে দুঃখ দেহগত তাহা সার্বজনীন, অতএব
ভাড়াই পরম ও চরম দুঃখ,—এ যুক্তি অগ্রাহ্য।—
দুঃখের ব্যবহারিক প্রকটভূতি দেখিয়া তাহাকেই
চরম ও পরম সভ্য মনে করা একটি মহৎ ক্রম।'

'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী যে রে ভগবান
কাঁদে'—উক্তিটি তিনি ভালো চোখে দেখেন নি।
তাঁর সে-সব কথা আজকালকার চড়া-বাজারের
দুর্নীতি-ভাড়াই, কষ্ট-যাপিত আমাদের জন-
সাধারণের দিনরাত্রির কোনো প্রান্তেই সম্মানের

সঙ্গে স্মৃতি হবে না বলে আমার যিশু। তবু
সে-কথা কি ভুলতে পারি? তিনি লিখেছিলেন—
'যদি কেহ বৌদ্ধদ্যান অবস্থাতেই বলিতে
থাকে, আমার মধ্যে ভগবান বসিয়া বসিয়া
কাঁদিতোছে,—তবে তাহার কি রোগ হইয়াছে
আমরা বুঝিতে পারি। যে এই দুঃখকে
সাক্ষ্য সহজে জানে না, অথচ ইহাকেই
আইডিয়ালাইজ করিয়া, বাস্তবতার নামে



মোহিতলাল

পূজা করিবার ভাণ করে, সে এইরূপ
বাস্তব দুঃখ সহজে যেমন অজান, তেমনই,
দুঃখের যে বিরাট ভূতি ভোগেশ্বরের মধ্যেও
রাজপুত্রকে উদাসীন করিয়াছিল, সে ভূতি
কল্পনা করিবার শক্তিও তাহার নাই। যে
সত্যকার দুঃখ পাইয়াছে, বা দেখার মত
করিয়া তাহাকে দেখিয়াছে, সে দুঃখকে
লইয়া এরূপ ভাষা করা হবে না।'

একালের 'দুঃখবাদী'র মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে
মোহিতলালের এই মতব্য সকলেই যে একবাক্যে
মানতে পারবেন, তা নয়। কিন্তু এ দিকটি
দেখা দরকার। এ মতও এ-আলোচনায় বিচার
যোগ্য। এবং এই মতের কথা যখন মনে
এলোই, তখন এর সহযোগী বা আনুষঙ্গিক
আর-এক চিন্তার ইশারাও এখানে লিখে রাখা
যাক। আমরা প্রথম চৌবুরীর আলোচনার
সে-ইশারা অনেকবার পেরেছি। কথাটা এই
যে, আমরা আমাদের আধুনিক সা. তা.
যথার্থ স্পিরিটুয়ালিজমও বিশেষ পাই নি,
স্পিরিটুয়ালিজমও বিশেষ নয়। প্রথম চৌবুরী
বলেছিলেন যে, এ দুটি শব্দই আমরা বিচ্ছিন্ন
থেকে আনদানি করেছি। তাঁর নিজের সেই
কথাগুলি আমাদের একালের এই দুঃখবাদের
প্রসঙ্গেও ঠিক অবাস্তব নয়;—তিনি লেখেন—
'সংস্কৃত' 'আধ্যাত্মিক' শব্দ ইংরেজি spirituality-
র প্রতিশব্দ নয়। কিন্তু materialism-এর
ভরজমা করতে মোটেই পারি
নে। সাংসারিক অভ্যাসসমূহের প্রবৃত্তি
মানুষ মাত্রেরই অন্তরে আছে, সুতরাং
সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার অক্ষমতার
নাম spirituality নয়, আর ক্ষমতার নাম
materialism নয়। কারণ materialism
নামক দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে কর্মকণ্ঠতার
কোনও যোগাযোগ নেই; এবং spiri-
tuality নামক দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে
অকর্মণ্যতারও কোনও যোগাযোগ নেই।'
তাঁর এ-কথা অবিশ্যি বাংলা কবিতা
সহজে আনুষঙ্গিক কোনো মতব্য হিসেবে
উচ্চারিত হয় নি। 'পূর্ব ও পশ্চিম' নামে
একটি প্রবন্ধে ১৩৩৪ সালের শ্রাবণে এ মতব্য
প্রকাশিত হয়। আজ আর এক শ্রাবণ-সমাগমের
অঙ্ককারে বলে সে কথা আমার মনে এলো।
(জনশ্রী)

আমার ভাগ্যকে আমি

ফরিদুল ইসলাম

আমার ভাগ্যকে আমি শোয়ালাম তোমার পাশেই
চৌদ্দদিকে মধ্যরাতি এখন সে অচেতন ঘুম...
একদা-উজ্জ্বল-যুবা এই বলে শার্টের আঁতরণে
মুখ ঢেকে স্নিগ্ধমাণ : জীবন-যৌবন বন্ধ-বই।

চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে ক্রমাগত বসবাস করে
অন্ধকার আমাদের অনিবার্য স্বভাবে শায়িত,
স্বকীয় সমীপে পড়ে একদা-আলোর আলোজনে
আঁশকাণ্ড ঘটে গেছে :

উৎপাটিত সজ্জিত বাগান।

অতঃপর চারিদিক অন্ধকার অনাস্থ্যীয় মূর্ষে
কোথার রূপালি রেখা, প্রসারিত হাতের অভয়,
কে আমার কাছে আসবে, ভালোবাসবে,
আমাকে বাঁচবে

কে আছে এমন বন্ধু,
পৌঁছে দেবে প্রথম প্রত্যয়ে?

একদা-উজ্জ্বল-যুবা এই ভাবে শার্টের হাতের
কি যেন হাতডিলে ফেরে :

বন্ধ-বই জীবন-যৌবন?



হেলা দেখতে গিয়ে ফিরে এলাম।

পাড়ি চলছে। বোড়া চলছে। ভবে আর
রক কী। বোলা কী।

রাত্তা আটকে লোক বাঁড়িয়ে বাঁবে।
লোকের বাঁধার চোখ ঠেকে বাঁবে। আগে কী, পরে
কী। এর পরে কী, তার পরে কী। আগে থেকে
কিছু ঠাণ্ড হব না। এ জিনিস সে জিনিস
অবাক করবে। মজার মজার খেল হবে।
সেউকালেক হাততালি লাগাবে। হুং থাকবে,
চুং থাকবে। তাকে না বোলা।

তা না, কুতুং কুতুং করে পাড়ি বেরিয়ে
হাচ্ছে। এ নুড়ো থেকে শুড়ো বি বি করছে।
আড়াক-আবডান নেই, রাবডাক নেই। কোথার
কী, কোন্টার পর কোন্টা—দূর থেকে সব
ফিলকুন সাবনে ব'রে মেওয়া। তোলা বাছো
লাছো। ঠিকাস করে পরমা কেনো। আনি
কিনছি না, জিনিসগুলো বেন আনকিন
করছে। এমন একটা চপবোয় ভাব। বোলা
মোলাই নেই।

বাঁশ। টিন। টিন। বাঁশ। হয়ে দরে এই।
গেলাদার বোলা আর কোথায়? আগে
ছিল বোবাজারবুধো। তারপর নোলানি অবধি
আড়ি হয়ে থেকে বোড়ি বুরে এবার এটানিকে
ভর করেছে। সরতে সরতে কোথায় গিয়ে
ঠেকে কে জানে। এরপর রেললাইন পেরিয়ে
যা চলে যায়।

ভবানীপুরে যেমন কোথায় চড়কভাটা
—আর এখন কোথায় চড়কের বোলা বসছে।
টালিগঞ্জের বাসবাড়ির বোলা কিন্তু যেখানকার
গোথানেই আছে।

গেলাদার রথের বোলা ঠাই-নাড়া হয়ে
এবার একেবারেই জমল না। ফিরে এলাম।
কলকাতা এমন একটা জায়গা, যা কখনও
পুরনো হয় না। কিছু ভাল না লাগে জো রাত্তায়
রাত্তায় যোয়ো। এমন গলি আছে যেখানে
কোনোদিন কোনো বোটা লোক লোকা হয়ে
হেঁটে যায় নি।

এমন গাছ নেই যা কলকাতার পাওয়া

যাবে না। এমন পাখি নেই যা কলকাতার নেই।

এমন যে কলকাতা থাকে ভাল না বেশে
পাওয়া যায়?

ছেলেবেলার থাকব বলে প্রথম যখন
কলকাতায় এলাম তখন কিছু একেবারেই
ভাল লাগে নি। ছিলাম উত্তর বাংলার এক ছোট-
খাটো শহরে। শহর বলতে বড় গলি। বড়
পুকুর। দরাজ মাঠ। শীতের ভোরে বাসের
গায়ে জলনল করত শিশির। ভারের গায়ে
বুলত যেন ছোট ছোট রূপের নৌলিক।
সার্কাসের তাঁবু পড়লে তার চারপাশে ঘুরঘুর
করতাম। দুপুরে কুল চুরি করা, চিলিয়ে হেঁতুল
পাড়া। পড়তে বসলে বোড়ার পাড়িতে চোঁড়া
পেটোতে পেটোতে মাল নীল কাপড় ছড়িয়ে
বেত। 'অম্ম শেখ রজনী' সেখাটা দেখলেই
চোখে জল আসত। ইচ্ছে করলেই বাসের
ওপর শুয়ে মেয়ের গায়ে লেখতে পোতাম চিত্র-
বিচিত্র ছবি। সে শহরে নদী ছিল। নদীতে
নৌকো থাকত। আর সেই নদীর পূনের ওপর
দিয়ে হু চাকার চটনগুলো যখন বেত, বুকের
মধ্যে জড়জড় করে শব্দ হত। আনি তখন
ছোট। তবু সারা শহরটাই ছিল আমার
হাডের চেটোর মধ্যে।

এসে উঠলাম বাস নব্য কলকাতার এক
পলিতে। চারিদিকে গলা বাড়ানো বাড়ি
থাকায় আমাদের বাড়িটাতে রোদ পড়তে
পেঁত না। রোদ হাওয়া গায়ে ছোঁরাতে হলে
ছোট গলি ছেড়ে বড় গলিতে গিয়ে বাঁড়াতে
হত। যেখানে হাতে মাটি করবার মাটিটুকু
কেরিডোলা ভেঙে কিনতে হয়—আনি ভাবতাম
সে শহরে লোকে বাগ করে কেন?

তারপর আমার সঙ্গে ছাব করবে বলে
কলকাতা শহর আমাকে আঁতে আঁতে নানা-
রকম শব্দ শোনাতে লাগল। ভোর হলেই
কলে জল আনার শব্দ। এক জলেরই কত
রকম শব্দ। বালতিতে চৌবাচ্চায় পড়লে
এক রকম, বাসনে পড়লে এক রকম, খালি
যোথের পড়লে এক রকম। ঘোর হলে এক
রকম, আঁতে হলে আরেক রকম। হোস পাইপ

দিয়ে বেরোতে এক রকম, বাঁকুরি দিয়ে গড়তে
আরেক রকম। বুটের আঁড়োয় ধরে এক,
বাইরে আরেক।

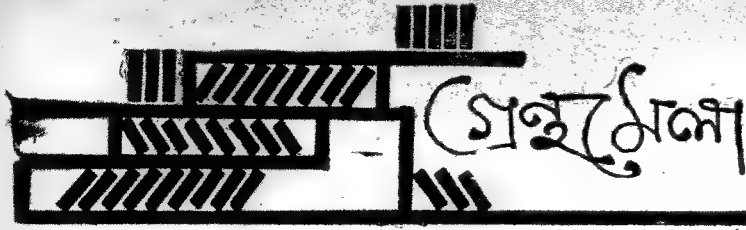
জনতে জনতে দেখতে দেখতে কখন
একদিন এই শহরটা আমার রক্তের মধ্যে মিশে
গেল। বাসের ভেতর পাড়িয়ে যেতে যেতে
জানলা দিয়ে রাত্তার জবু গোড়ালিটুকু দেখেই
এখন আনি সে রাত্তার সুখছবি মনে করতে
পারি।

বোলা থেকে মিরছি। পাড়ার সেই বকুল
পাছতলা দিয়ে।

এ রাত্তার গা দিয়েই পুরনো দিনগুলোর
কথা মনে পড়ে যায়। নব্য কলকাতা হাটবার
পর থেকেই আমায় এ পাড়ায়। এখানে, ঠিক
এইখানে ছিল ভানবীনি আর গোপবাহুর
মধ্যে আমাদের বোলা মাঠ। আশপাশে ছিল
অজস্র চৌবাচ্চাপুকুর। সব পুকুরই ছিল গোপবাহুর
দখলে। গাছে গাছে দড়ি বেঁধে তাতে তরোত
রাঙোয় কাপড়। বড় উঠলে সে এক সেববার
মত দৃশ্য হত।

এসব দিকে ছিল অনেক সাধারণ মানুষের
জমিভায়াগা। দু' বছর আগেও নব্বই বছরের
বুড়ো এক ছুতোয় নিম্নিলাঠি টুকে টুকে আমাদের
বাড়িতে আসত হাফে মনো থেকে। মজি
রকম বায়না করত। ছেলের বউয়ের সঙ্গে
বনে নি ব'লেই নাকি ছার এই ভিবিবির হাফা।
বুড়ো দূর করে বলত: বুঝলে বাবু, তোমাদের
ঐ লোক তোতেই ছিল আমার বাপকনে ডিটে।
বেচেবুচে দিয়ে চলে গেলাম যদিওপুরে। তখন
কে জানত এ মাটির এমন পোনার দর হবে।
দু' বছর আর বুড়ো আসে নি। শেষবার এসেছিল
শীতে বু'কতে বু'কতে। সেই বোধ হয় তার
জীবনের শেষ শীত।

বকুল পাছতলা দিয়ে এলেই পুরনো মুক-
গুলো মনে পড়ে। সেই বৃদ্ধ ভজলোক। কুট-
পাখে ছিল বাঁক আঁতানা। একটা ইজিচেয়ার
আর একটা ক্যাশিখাটা। এই তাঁর হাব-
অবাব সম্প্রতি। কোথায় গেল সে এসেছিল



সভা ভেঙে গেলে—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
মহিলা, ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০।
মূল্য : তিন টাকা।

একটির পর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ
করলেই কবিতার স্বাক্ষর মেলে না—যদি
ঐ সব গ্রন্থে পরিণতির সৃজনাত্মক চিন্তা
আমাদের নতুন জগতে নিয়ে যেতে না পারে।
একথা একবাক্যে স্বীকার করা যায় যে,
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে
পরিণতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর নিয়েই বারবার
প্রকাশিত হতে ভালবাসেন। এতে আমরা হই
অনন্দিত, বাংলা সাহিত্যের গতিও তীব্রতর
হয়।

‘সভা ভেঙে গেলে’—এই নামকরণের
নতুনই আমাদের চমক দিলেও, তার ভাব-
বাজনার চমৎকারিহই বড় কথা। সভা ভেঙে
গেলে পর কবি যদি তাঁর কাব্যপাঠে সুস্থ করে
ধাকেন, তাহলে আমরা বলব সত্যিকারের
কাব্যধর্মীতে প্রোভারাই ফিরে আসেন। রবীন্দ্র-
নাথের পর তার পরিচয় আমরা পেয়েছি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ধরনের কবিতা
লেখেন, সেরকম কবিতা আসল সভাতেও
সহজসাধ্য নয়। সেই কারণে তিনি অনায়াসে
ছলতে পারেন—

‘কেন আমি রবীন্দ্রনাথের মত মৃত হব
আমি
বাঁচতে চাই, পিতা!

প্রস্তর যুগের শিশু মানুষের মত
এক অবাধ বিস্ময়ে
বাঁচতে চাই চিরদিন
বিশ্বাসের ধর্মের অমর।’

তাঁর কবিতার মূল ধর্মও বিশ্বাসের দ্বারা
সঞ্জীবিত।

বর্তমান কাব্যগ্রন্থটিতে সব কবিতাই বাক
স্থল, নিপুণ ছন্দে আঁকিত। বলতে কী,
প্রতিটি কবিতার নতুন চেতনা, নব উপলব্ধির

জন্মস্টী সেন

আনন্দ, সাধারণের মধ্যে অসাধারণ মহিমার
আরোপ কম বিস্ময়কর নয়। ‘বৃষ্টি তুই
ভোরের অমল মহাশেবা’ এই বক্তব্যেরই প্রমাণ।
কবিতাটির অন্য মিল ও ছন্দের বিশেষ লক্ষ্য
করার মত। কবির বিচিত্র ভাবচিন্তা ছড়িয়ে
রয়েছে ‘জ্বর’, ‘পদ্মশংক জন্মদিনে’, ‘আশ্চর্য
প্রাসাদ’, ‘চোখের মন্তব্য’, ‘নীলমাণ’, ‘এক
হাজার বীশ্বর জন্ম’, ‘যুদ্ধের বিরুদ্ধে’ প্রভৃতি
কবিতায়। ‘মালদহের গম্ভীরা’ জাতীয় কবিতা
বাংলা কাব্যজগতে নতুন রীতি নিয়ে হাজির
হয়েছে। অবশ্য বীরেনবাবু যেখানেই প্রাকৃত
ছন্দের স্পর্শ লাভ করেন সেখানেই তাকে
মহনীর করে তোলেন, কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে ঐ
ছন্দের সঙ্গে কবির তির্যক দৃষ্টিও লক্ষণীয়।
‘মানুষের মাতৃভূমি’ কবিতার কবির বিশ্ববোধ,

আবার তারি কাছাকাছি সভা ভেঙে গেলে
কবিতার কবির তির্যক দৃষ্টির মধ্যে একটা
সমস্যা-ভাব ও আদর্শ পরিষ্কৃত হয়ে রয়েছে।
কিন্তু সভা ভেঙে গেলে পর কবিকে তাঁর
চিন্তা নিয়ে গেছে ‘কবির সভায়।’ যা হোক,
এসবের মধ্যেও কাব্যনাট্যাকৃতির কয়েকটি বড়
কবিতাও আমরা পেয়েছি—যা বীরেনবাবুর
অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে খুব বেশি নেই। সবচেয়ে
বড় কথা এই যে, ‘সভা ভেঙে গেলে’ আমাদের
গভীরতার দিকে নিয়ে গেছে; আমরা আনন্দিত
হয়েছি।

প্ৰসিদ্ধিকা — শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭/১১/৫৬, বিধান সরণি, কলিকাতা। মূল্য
৪০ পরস।

‘প্ৰসিদ্ধিকা’ ১৭শ বর্ষ ৪২শ সংখ্যাটি
শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সংখ্যারূপে প্রকাশিত
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ
কেশবচন্দ্র বসু লিখেছেন, ‘তাহার অভুলনীর
স্বদেশপ্রেম, নিষ্ঠাকতা এবং দেশমাতৃকার
সম্মান রক্ষণে জীবন দান বাংলার তরুণ
সমাজের আদর্শ হউক—’। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
‘শ্যামাপ্রসাদের কথা’ প্রবন্ধে শ্যামাপ্রসাদের
অনেক ব্যক্তিগত কথা বলেছেন—যা আমাদের
কাছে ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিল। শ্যামাশ্রমী
প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রসিদ্ধিশীল ও সংস্কারক
শ্যামাপ্রসাদের জীবনকথা আলোচনা করেছেন
‘শ্যামাপ্রসাদ স্মরণে’ প্রবন্ধে। অন্যান্য লেখক
দের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন বসু, নিত্যানারায়ণ
বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রভৃতির
শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কিত তথ্যবহুল রচনা উল্লেখ-
যোগ্য। এছাড়া শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতার উদ্ধৃতি
ও নানা ঘটনার ঐতিহাসিক আলোচনা বাংলার
যুবকদের নব প্রেরণা দান করবে।

ভাড়াটে বাড়িতে, একটি ঘর। সে ঘরে ছেলের
কুসাব। ঘরটার সঙ্গে বৃষ্টির শুষ্ক নান-বাওয়ার
লক্ষণ, থাকার লক্ষণ নয়। নীতি গ্রীষ্ম বর্ষ।
ঘরো মাস তাঁর কাঁট ফুটপাথে। মাঝে মাঝে
তাকে দাঁড় করিয়ে রাজনীতির কথা বলতেন।
একদিন দেখি জায়গাটা ফাঁকা। ডর করল।
পাশের পানের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতে
সে বলল ওরা নাকি অন্য জায়গায় বাড়ি
পেয়ে উঠে গেছেন। সে বাড়িতে ক’টা ঘর,
কী বৃত্তান্ত কিছুই আর আমি তাকে জিজ্ঞেস
করে উঠতে পারলাম না।

কোলে বৃষ্টির বাচ্চা নিয়ে ফুটপাথ গল
করোঁছল স্বামীপরিভাজ্য একটি মেয়ে। বাক
বাড়ি বাড়ি কাজ করতে পাঠিয়ে সেই বাচ্চা
ফুটপাথে হামা দিতে শিখল। তারপর দাঁড়াতেও
শিখল। তারপর আবার একদিন দেখলাম
ফুটপাথে মেয়েটি শুয়ে। তার কোলে, আবার
একটি টুকটুকে বাচ্চা। সেই বাচ্চা বসতে
শেখবার আগেই একদিন দেখি বকুলতলা খালি।
শুনলাম কার সঙ্গে নাকি ভাবভালবাগা হয়ে
ভাব ধরেই সংসার পেতেছে।

ক’বছর যেতে দেখি গাছতলায় আবার
একটা সংসার। বাচ্চা কোলে বছর বিশ বাইশের
একটি মেয়ে। এরও সেই বাড়িতে বাড়িতে
ঠিকের কাজ। ফুটপাথে মাঝে মাঝে একটা
রিজা দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুদিন পর এ মেয়েটিও
ফুটপাথে গুল। এরও কোলে নতুন বৃষ্টির বাচ্চা।
রাতিয়ে একদিন বৃষ্টি হওয়ার পর দেখি বাচ্চাটির
অস্থির করেছে। পরের দিন বাড়িবাড়ি। কিন্তু
তারপর দিন সকাল হতেই দেখলাম রাত্তির
ঝোড়ে ছোট ভিড়। বেশ চাকলা। কী ব্যাপার
জানতে গেলাম।

দেখি সেই রিজাটা দাঁড়িয়ে। বাচ্চাটা
একটা কাঁধার ওপর শোয়ানো। পলতের করে
তাকে মিহিরি জল ঝাওয়াচ্ছে—পাড়ার লোক
বাকি বলে—গাঁজাউলি বড়ি। বাচ্চার বাকি
সেখলাম না। বড় ছেলোটাকে ডোলাতে ডোলাতে
মুখে পাঁচকটি ভাজে দিচ্ছে একটা লোক।

এই হল রিজাওয়ালা। আঙু আঙু
জানতে পারলাম। বউটি পালিয়েছে। যারা
চিনত, কেউ তাকে দোষ দিল না। বলল,
স্বামীটা নেশাভাজ করে। যা পরশা পায়
ওড়ায়। বউয়ের ঘাড়ি থাকে। মেয়েটি অনেক

সহ্য করেছে। শেষ পর্বত আর না পেরে
বেদিকে দুটোখ ঝর চলে গেছে।

বাকলে ফিরে দেখি বকুলতলা খালি।
বাচ্চাটাকে হাসপাতালে পৌঁছানো হয়েছে।
আর রিজাওয়ালা তার ছেলোটাকে রিজার
বসিরে কোথায় যেন চলে গিয়েছে।

তারপর মাস কয়েক সে সব ভুলেই গিয়ে-
ছিলাম।

রথের দিন যখন মেলা থেকে ফিরছি,
হঠাৎ দেখি বকুল গাছতলায় একটা রিজা দাঁড়
করানো।

পাশে তাকাতেই দেখি একটা ছেঁড়া মাদ্যের
ওপর বাবু হয়ে বসে বেশ ভোঁকা আনায়ে
বিড়ি টানছে সেই রিজাওয়ালা। আর কলতলায়
তার ছেলোটাকে বসিয়ে গুলেছে ছুটিচি দিচ্ছে
গাঁজাউলি বড়ি।

বাচ্চাটা হাসপাতালেই থেকে গেছে, না
মারা গেছে—আশপাশের বেউই মঠিক বড়
বলতে পারলাম না।

তবে এটা ঠিকই, রিজাওয়ালা ফিরে
এলেও তার বউ কিছু আদায় করে নি।

ভেবে দেখলে 'বারাণসী' বা 'আলিগড়' দুটি শব্দই তো যথেষ্ট। তারও পরে যথাক্রমে 'হিন্দু' ও মুসলিম শব্দ দুটির উপরি যোগ বাছল্য। 'বারাণসী'র সঙ্গে যেমন হিন্দু-ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত, 'আলি' শব্দের সঙ্গে মুসলিম নামের স্মৃতিও তেমনি ওত-প্রোত। তজ্জাত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশেষের নাম চিহ্নিত-করণে সম্পূর্ণ বিশেষের সাম্প্রদায়িক উগ্রভাষি পরিলক্ষিত হয়।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই সুরাং হিন্দু-মুসলিম শব্দদুটি যুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক মনো-ভাবে পৃষ্ঠপোষণ করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা তাঁই সম্পূর্ণ বিশেষের উদ্দেশ্যে যে মানবতাবোধ চিরকল্যাণময় তাকেই জ্ঞাপিত করার মানসে শব্দ দুটিকে বাদ দিতে চেয়েছেন। এবং শ্রীচাগলা কেন, শুধু ভারতবাসী কেন, মুন্সীর যে-কোনো প্রগতিশীল মনো-ভাবাপন্ন শিক্ষিত মানুষই এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবেন।

অতিবড় মূর্খও এমন প্রশ্ন করেন না,—মানুষ না ওরা হিন্দু? এমন প্রশ্ন তোলা অনুচিত,—মানুষ না ওরা মুসলিম। কিন্তু একদল সুযোগসন্ধানী শানিকাল থেকে এতোবড় 'ক্যানালিসিটি' নিয়ে বুপে বুপে মাতামাতি হানাহানি করে এলেন। যেমন দক্ষিণ আমেরিকার আজও 'মানুষ না ওরা চালা আদমি' এই সঙ্কীর্ণ প্রশ্ন সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না।

পাবার কথাও নয়। মানুষকে টুকরো টুকরো করে সম্পূর্ণ ও গোষ্ঠীবদ্ধ করায় একদল হীনচক্রী অমানুষ অধমিক রাজনৈতিক সুযোগের অপব্যবহার করেন। আর তাঁই চলেছে কুচক্রী মানুষের কটকটালী। কতকগুলি অবান্তর ধ্যান-ধারণার দ্বারা মানুষ সম্পূর্ণরূপে উত্তেজিত করে বৃহত্তর বুক থেকে ক্ষুদ্র ছিনিয়ে নিয়ে হানাহানি কাটাকাটির ক্ষেত্র

ভারতদর্শন

প্রস্তুত করে রেখেছেন তাঁরা। সেই ক্ষেত্রে স্থানে-স্থানে যুগে-যুগে কমল বুনছেন ও তুলছেন কতিপয় স্বার্থ-বেবী কুটনীতিজ্ঞ। আর আমরা তাঁদের সিংহাসনের নিচে পিঠ পেতে নিশ্চিষ্ট হচ্ছি চিরকাল।

সাধারণ মানুষের সারল্যকে বিঘাজ করার জন্য সুযোগসন্ধানী-বর্তমানে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তৎপর হয়ে উঠেছেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ঐতিহ্য গেল বলে মিথ্যা রটনার দ্বারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উত্তেজিত করে ভারত-বিরোধী এবং ভারতীয় মুনিয়নের উদ্দেশ্য-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার দেশদ্রোহী চক্রান্তে সাধারণ জাতীয় চেতনাসম্পন্ন মুসলিম ভাইদেরও ঠেলে নামাতে চাচ্ছেন তাঁরা। দেশদ্রোহের এমন নিকৃষ্ট নজীর বিরল। বিরল এই কারণে যে, ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতের মহান আদর্শকে বানচাল করার জন্য এই সঙ্কীর্ণ হীনতাকে হাতিয়ার করা হয়েছে।

এই আত্মঘাতী আন্দোলনে যারা পৃষ্ঠপোষকতা করছেন তাঁরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা শত বিকারে বিভ্রত হবেন। কবার অযোগ্য তাঁদের আচরণ ভবিষ্যতে বর্তমানে সমভাবে ঘূর্ণি।

এদের কঠোর হস্তে দমন না করলে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের মহান আদর্শ কদমাজ হবে। সুখের বিষয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী এই নির্লজ্জ দেশদ্রোহিতাকে দৃঢ়হস্তে দমন করার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন। কেন না তাঁরা জানেন ভারতের আপামর শিক্ষিত জনসাধারণ এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় হস্তক্ষেপই প্রার্থনা করে।

শিক্ষামন্ত্রী নিজে জাতীয়তাবাদী মুসলমান। যথার্থ শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকাই তিনি গ্রহণ করেছেন। অশিক্ষিত

কুমতলবী সাম্প্রদায়িক মনোভুক্তি ভারতের বুক থেকে মুছে ফেলার সঙ্কল্প ভারতের মাটিতে সব চেয়ে গেরা শিক্ষা। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী সেই মহৎ শিক্ষার বাণী নিয়েই হাজির হয়েছেন। এজন্য মতলববাজরা তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মেতে উঠেছে।

শ্রীচাগলাকে মুসলমান বলে স্বীকার করতেও সাম্প্রদায়িক গোঁড়া-দের আজ গায়ে লাগে। তাঁরা কখনো শিক্ষামন্ত্রীকে মতিচৈদ্য চাগলাজ্ঞানী অনুমান, কখনো শিরা সম্পূর্ণরূপে জ্বলী নিপীড়ক বলে প্রচার শুরু করেছে। অর্থাৎ যে কোনো জিগিরে নিজেদের সঙ্কীর্ণ মলিন আয়নায় তাঁরা শিক্ষামন্ত্রীর উনার আদর্শবাদিতার সুর চোহারা দেখে ও দেখিয়ে আপন নীচতার গুণি তাঁর অঙ্গেও মাখাতে চেয়েছে। কিন্তু বহু পুরোনো এবং অশিক্ষিত রাজনৈতিক চাল এগুলি। সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় এই চাতুরীর দ্বারা অন্তত ভারতের মাটিতে আর জ্বালান যাবে না।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, ভারতের যারা ওনী সর্বজনস্বার্থের জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা, আজ তাঁরা একযোগে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন না কেন?

আজকের এই দুটো আবহাওয়ার নিজেদের যদি সরিয়ে রাখেন তাঁরা, যদি ঝড়টা শুধুমাত্র চাগলা সাহেবের ওপর দিয়েই বায়ে নিতে চান,

সরিনয় নিবেদন

স্থানান্তরিত 'ভারতদর্শন' সংকলিতকার প্রকাশিত হলো। —সম্পাদিকা

যদি বিপংকালে নিজের নিজের পিঠি বাঁচিয়ে উঠের মতো বালির মধ্যে খুঁ নুকোতে যান, তবে ভবিষ্যতে তাঁদের পলায়নী-চরিত্র কি চাপা থাকবে? সাধারণের কাছে জবাবদিহি করতেন হবে।



আন্তর্জাতিক

লর্ড রকওয়ের (মাঝখানে) নেতৃত্বে ডার্টমুথ
স্ট্রীটে ব্রিটিশ বাদপক্ষী প্রাথমিক নেতাদের
বিক্ষেপ প্রদর্শন।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম

উত্তর ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমাবর্ষণ ও ভিয়েত কং গেরিলা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। অপরদিকে ভিয়েত কং মুক্তি-বোম্বার্ডার আক্রমণের তীব্রতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ, উভয়পক্ষের দিক থেকেই ভিয়েতনাম পরিস্থিতি আরও ঘোরালাগে। হয়ে উঠছে। কিন্তু একই সঙ্গে জাভার এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে, যার থেকে অনেকের মনেই এই আশা দেখা দিয়েছে যে, ভিয়েতনাম সমস্যার মীমাংসা সুদূরপরাহত নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব ডিন রাস্ক সম্প্রতি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন, ভিয়েতনামে শান্তির কোন আশা নেই। বরং, আরও বিপদ ঘনিষ্ঠে আসছে। আগামী কয়েক মাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে খুব ধারাপ সময় যাবে। সর্বপ্রকারে ভিয়েতনাম যুদ্ধকে জোরদার করার জন্য রাস্ক মার্কিন নাগরিকদের কাছে আবেদন জানান।

হ্যানয় ও পিকিং-এর গোঁরাভূমির জন্যই ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। তারা কিছতেই আলোচনায় বসতে রাজী হচ্ছে না, এই হল রাস্কের বক্তব্য। উত্তর ভিয়েতনাম ও চীন হাতে আলোচনার বসে, তার উপযুক্ত পরিবেশ রচনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একবার উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করেছিল, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সাড়া না

পাওয়ার আবার বোমাবর্ষণ শুরু করা হয়েছে। অন্তত সাময়িকভাবেও আবার বোমাবর্ষণ বন্ধ করা হবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে রাস্ক কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে উত্তর ভিয়েতনামের ওপর বোমাবর্ষণ অব্যাহত রাখবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কদিন আগে থান হোয়া শহরে আবার ব্যাপক বোমাবর্ষণ হয়েছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিদ্রোহী ভিয়েত কং গেরিলাদের সঙ্গে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের সমর্থনপুষ্ট কাও কাই সরকার হত হেরে যাচ্ছে, ভত তাদের জিম চেপে যাচ্ছে। সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক সামরিক প্রদর্শিতা শুরু করেছে। ডেমিনিয়ান রিপাবলিকের অবস্থা এখন অনেকটা শান্ত। সেখান থেকে ১৪০০ মার্কিন ছত্রী সৈন্য আনা হচ্ছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য। নিউজিল্যান্ডের সৈন্যও আসছে।

এদিকে নতুন প্রধানমন্ত্রী নেগুইন কাও কাই-এর হাকডাকও কম নয়। তিনি নিজেকে হিটলারের আদর্শে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর কোন রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে হিটলারের আদর্শের অনুসরণের কথা এই প্রথম শোনা গেল। আর অদৃষ্টের কি পরিহাস, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিটলারকে পরাজিত করার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, সেই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই আজ দক্ষিণ ভিয়েতনামে নব-হিটলারবাদী নেগুইন কাও কাইকে সমর্থন করছে, এবং তাঁর শাসনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে, বহু সহস্রের প্রাণহানি ঘটছে ও সমগ্র বিশ্ব যুদ্ধের আশংকা সৃষ্টি করছে।

কাও কাই কেবলমাত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামকে বিদ্রোহীদের আক্রমণমুক্ত করার কথাই ঘোষণা করেন নি, তিনি উত্তর ভিয়েতনামকেও কমিউনিস্ট শাসনমুক্ত করবেন বলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন। এ অনেকটা চিয়াং কাই-শেক কতৃক মূল চীন ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করার সংকল্প গ্রহণের মত। এই কাজ সম্পন্ন করবার জন্য কাও কাই একটি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করবেন বলেও জানিয়েছেন।

কিন্তু এত সত্ত্বেও ভিয়েত কং গেরিলা বাহিনীর অগ্রগতি রোখা যাচ্ছে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা জয়লাভ করছে। আজ দক্ষিণ ভিয়েতনামের তিন-চতুর্থাংশ বিদ্রোহীদের হাতে। বর্বার পদক্ষেপে কমান্ডে ভিয়েত কং-এর আক্রমণ কমেই আরও বাড়বে। বিদ্রোহীদের হাত থেকে প্রতিটি গ্রাম পুনরুদ্ধার করবেন বলে নেগুইন কাও কাই যে ঘোষণা করেছেন, তা শূন্য আশ্বাসনে পর্ববসিত হবে বলেই অধিকাংশের ধারণা।

ভিয়েতনামে যুদ্ধ প্রসারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। সম্প্রতি



হ্যারল্ড ডেভিস

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সরকারী মন্থন 'প্রাভদার' সম্পাদকীয়তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধ প্রসারিত করার চেষ্টা করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্থনমুখী হতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন দীর্ঘকাল চাপ করে বসে থাকবে না। তারা উত্তর ভিয়েতনামকে আরও বেশি করে সাহায্য করবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক ও সোভিয়েট ইউনিয়নের আসল নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভও ১০ই জুলাই এক বক্তৃতায় সোভিয়েট জনগণকে যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন। অবস্থা দেখে মনে হয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি উত্তর ভিয়েতনামে সৈন্য প্রেরণ করে, তবে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না।

সুতরাং পরিস্থিতি বেরূপ দাঁড়িয়েছে, তাতে বিবদমান দুইপক্ষই সর্বাঙ্গিক থেকে তাদের সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এর মধ্যেই আবার উভয়পক্ষে শান্তির নতুন প্রয়াস দেখা যাচ্ছে।

কমনওয়েলথ শান্তি মিশনের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনার বসতে চীন ও উত্তর ভিয়েতনাম অস্বীকার করেছে। তারও পূর্বে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের ব্যক্তিগত দূত রূপে প্রাক্তন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাট্রিক গার্ডন-ওয়ার্ডার যখন হ্যানয় ও পিকিং যেতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তর ভিয়েতনাম ও চীনের কর্তারা তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, এবারে হ্যারল্ড উইলসনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি বৃটিশ মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় সারির মন্ত্রী হ্যারল্ড ডেভিস হ্যানয় গিয়ে উপস্থিত

হয়েছেন, এবং হ্যানয়ে উত্তর ভিয়েতনামের নেতাদের সঙ্গে ডেভিস বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। (এই প্রবন্ধ লিখবার সময় পর্যন্ত—১১ই জুলাই—ডেভিসের আলোচনার ফলাফল জানা যায় নি।)

ডেভিস বৃটিশ শ্রমিক দলের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন সদস্য এবং তিনি উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিনের ব্যক্তিগত বন্ধু। ডেভিস হো-চি-মিনকে কমনওয়েলথ শান্তি মিশনের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাবে সম্মত করতে পারবেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

হ্যানয়ে ডেভিসের আগমনের পূর্বে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। হাংগেরীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনাস পিটার হঠাৎ লন্ডন গিয়ে পৌঁছান, এবং তিনি উইলসনের সঙ্গে ভিয়েতনামের ব্যাপারে আলোচনা করেন। লন্ডন যাত্রার জন্য বুডাপেস্ট ত্যাগের পূর্বে পিটার বুডাপেস্টের চীনা দূতাবাসের কর্মচারীদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলেছেন। লন্ডনের সংবাদে প্রকাশ, চীন ও উত্তর ভিয়েতনাম সর্বাঙ্গীণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজী আছে, এই কথা উইলসনকে বলার জন্য পিটার লন্ডনে এসেছিলেন। উইলসন মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই আলোচনার ব্যবস্থা করুন, এই হল পিটারের প্রস্তাব।

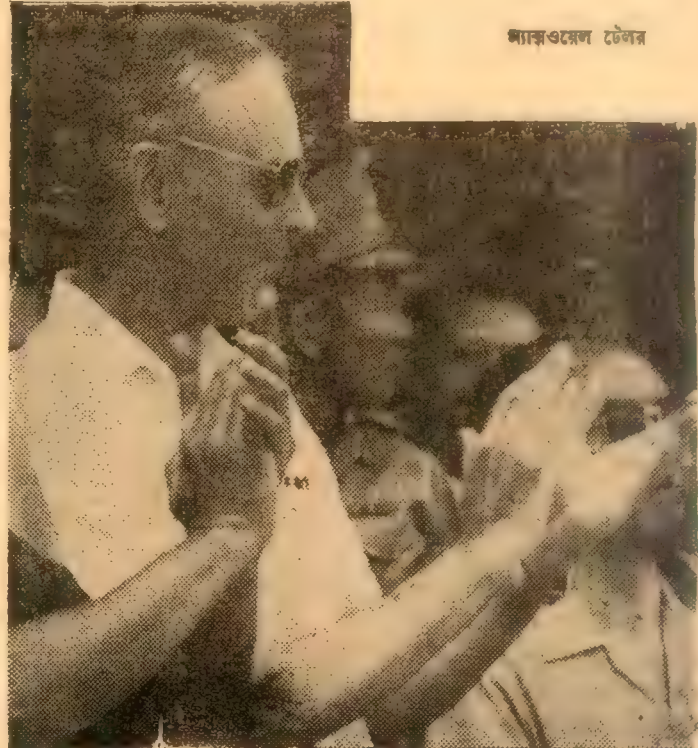
আনাস পিটারের লন্ডন আগমন, ও তারপরই হ্যারল্ড ডেভিসের হ্যানয় যাত্রা, এবং



হেনরী ক্যাবট লজ

হ্যানয়ে উত্তর ভিয়েতনামের নেতাদের সঙ্গে ডেভিসের দীর্ঘ আলোচনা ভিয়েতনামে শান্তির সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বোধ হয় নীতিবদলের পালা সূর্য হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জনারেল ম্যাকওয়েল টেলর পদত্যাগ করেছেন, এবং



ম্যাকওয়েল টেলর



হ্যাট-মিন

তার জায়গায় নতুন রাষ্ট্রদূতরূপে হেনরী ক্যাবট লজ নিযুক্ত হয়েছেন। হয়তো টেলের নিষেধ বাস্তবায়িত কারণে পদত্যাগ করেছেন, কিংবা হয়তো ওয়াশিংটনের কর্তাদের সঙ্গে তার মতভেদ হয়েছে, তবু মনে হয় সামরিক ব্যক্তির পরিবর্তে একজন রাজনৈতিককে সারগনে প্রেরণের অর্থ হল, মার্কিন রাষ্ট্র রাষ্ট্র হচ্ছে সামরিক পথে ভিয়েতনাম প্রশ্নের মীমাংসা হবে না, এর জন্য রাজনৈতিক সমাধান চাই।

বুটেন

হঠাৎ এই জুলাই ভোর রাতে কমন্স সভায় শ্রমিক দলের সরকারের পর পর তিনবার পরাজয় রীতিমত চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

মাত্র ৪ ভোটের ব্যবধানে হ্যারল্ড উইলসনের নয় মাসের শ্রমিক সরকার শাসন চালাচ্ছে, সুতরাং আকস্মিক কোন পরি-স্থিতিতে কমন্স সভায় ভোটে হেরে যাওয়া অসম্ভব নয়। এর পূর্বে আর একবার তাঁরা ভোটে হেরেছিলেন, এবং আরও একবার স্পীকারের ভোটে কোনমতে রক্ষা পেয়ে-ছিলেন। তবু এবারের ঘটনার নাটকীয়তা উল্লেখযোগ্য।

অর্থ বিলের ওপর কমন্স সভায় আলোচনা চলছিল। এপ্রিল মাসে যে বাজেট গৃহীত হয়েছে, ডাকেই আইনের রূপ দেবার জন্য অর্থ বিল আনা হয়েছে।

পর পর অনেকগুলি ধারা পাশ হবার পর দেখা গেল বিরোধী রক্ষণশীল দলের অনেক সদস্যই কমন্স সভা ত্যাগ করে গিয়েছেন। এই অবস্থায় ভোটাবিক্রের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে শ্রমিক দলের অনেকে বাড়ি চলে যান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায়, রক্ষণশীল দলের সদস্যরা ফিরে এসেছেন। তাঁরা বাড়ি চলে যান নি। কাছাকাছি জায়গায় বন্ধুদের বাড়ি গিয়েছেন শ্রমিক দলের সদস্যদের চোখে খুলো দেবার জন্য। ফিরে এসে তাঁরা যেই দেখলেন শ্রমিক দলের

অনেক সদস্য নেই, অমনি পেছনের সারির একজন সদস্য একটি সংশোধন প্রস্তাব আনলেন। এই সংশোধনী ১৪০-১৬৬ ভোটে গৃহীত হল। আরও দু'বার ভোটে নেয়া হল, একবার ১৪০-১৬৭ ও আর একবার ১৪০-১৬৬, এই হল ভোটের ফল। ১৩।১৪ ভোটের ব্যবধানে শ্রমিক সরকার পরাজিত হলেন। রক্ষণশীল দলের পক্ষ থেকে উন্নতিত ধর্ম উঠল : পদত্যাগ করা, পদত্যাগ করা।

উইলসন অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি পদত্যাগ করবেন না। কোন গুরুতর নীতির প্রশ্নে সরকারের পরাজয় ঘটে নি। তাছাড়া শ্রমিক দলের সদস্যদের হঠাৎ অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অকস্মাৎ এই ভোট গ্রহণ করা হয়েছে, সুতরাং এই ভোটের ফলকে তিনি তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে রায় বলে গ্রহণ করতে রাজী নন। তিনি এর জন্য আশ্বাসজ্ঞাপক কোন ভোটের সম্মুখীনও হবেন না।

সাংবিধানিক অবস্থা যাই হোক, এই ঘটনায় যে শ্রমিক দলের মর্মান্বিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং অপরদিকে রক্ষণশীল দলের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৃদ্ধির খেলায় রক্ষণশীল দলের মস্ত জয় হয়েছে।

উইলসন রীতিমত বিপাকে পড়েছেন। মাত্র ৪ ভোটের ওপর তিনি টিকে আছেন। সুতরাং যে কোন সময় ছিঁড়ে যেতে পারে, যারে যারে পরাজয় তারই প্রমাণ। ভিয়েতনাম নীতির প্রশ্নে তাঁর দলের সদস্যদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। লর্ড রকওয়েল নেতৃত্বে বিশিষ্ট বামপন্থী শ্রমিক নেতারা ডাউনিং স্ট্রীটে তাঁর সরকারী আবাসে এসে বিক্ষোভ প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর কমনওয়েলথ শান্তি মিশনও সফল হল না। দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রশ্নেও তিনি বৃটিশ জনমতকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারছেন না। ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাবও ধামাচাপা পড়েছে। এই অবস্থায় উইলসনের পক্ষে এই মুহূর্তে নতুন নির্বাচনের ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, যেভাবেই হোক জোড়াতালি দিয়ে তাঁকে এই ৪ ভোটের ব্যবধানে সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

যেচারা প্রিন্স ফিলিপ! রাজা নন, রাণীর স্বামী। রাণীর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দেহরক্ষীর মত ঘুরতে হয়। তবু মূখ ফুটে কোন মত প্রকাশের অধিকার তাঁর নেই—রাজকীয় রীতিতে বাধে। রাজা না হয়েও রাজার নিয়ম মানতে হবে!

সম্প্রতি ডিউক অব এডিনবরা প্রিন্স ফিলিপ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায় দক্ষিণ রোডেশিয়া সম্পর্কে এমন কতকগুলি মত প্রকাশ করেছেন, যা নিয়ে

দেশে ও বিদেশে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ফিলিপ বলেছেন, রক্তবন্যার ঝুঁকি না নিয়ে দক্ষিণ রোডেশিয়ার ব্যাপারে ধৈর্য ধরে অগ্রসর হওয়া উচিত। জোর করে সেখানে শান্তি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হবে।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার ব্যাপারে মাত্র কদিন পূর্বে লন্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, প্রিন্স ফিলিপের বক্তৃতা তার ঠিক বিপরীত। ফিলিপ যেন এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করার জন্যই কথাগুলি বলেছেন।

এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, বৃটিশ সরকারের গৃহীত কোন নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার ফিলিপের আছে কি না।

কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী জোমো কেনিয়াটা ফিলিপের মন্তব্যের তাঁর প্রতিবাদ করে হ্যারল্ড উইলসনের কাছে পত্র দিয়েছেন, এবং জানতে চেয়েছেন ফিলিপের বক্তব্য উইলসন সরকারের অনুমোদিত কি না। বুটেনের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রথা অনুযায়ী রাণী যা কিছু বলবেন সবই তদানীন্তন সরকারের মত বলে ধরা হবে। রাণীর স্বামীর ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

লন্ডনে প্রভাবশালী দৈনিক 'ডেইলি মেল', 'ডেইলি মিরর' প্রভৃতি ফিলিপের এই বক্তৃতার তাঁর নিন্দা করে বলেছে, রাজপরিবারের লোকদের পক্ষে কোন রাজনৈতিক প্রশ্নে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করা চলে না।

হিউ জেনকিনসের নেতৃত্বে কমন্স সভায় শ্রমিক দলের ৩০ জন সদস্য কমন্স সভায় ফিলিপের নিন্দাসূচক একটা প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিলেন। প্রস্তাবটি অবশ্য গৃহীত হয় নি।

ফিলিপের আচরণের সমর্থনেও কিছু কিছু কথা শোনা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, ফিলিপ



হ্যারল্ড উইলসন

রাজা বা রাণী নন, কেবলমাত্র রাজপরিবারের লোক বলেই তাঁর মত প্রকাশের অধিকার ক্ষেপে নেয়া যায় না। রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে যে সাংবিধানিক নিয়ম প্রযোজ্য, তাঁর স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা গণতন্ত্রসম্মত নয়।

সংবিধানের চুল-চেরা বিচারে সিদ্ধান্ত কি হবে, এই নিয়ে আপাতত পণ্ডিতেরা তর্ক করুন, তবে ফিলিপের পক্ষে এই মন্তব্য না করলেই ভাল হত। এতে করে অপ্রয়োজনীয় তত্ত্বতার সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া রাজপরিবারের অহেতুক বিলাসবাসনের জন্য বৃটেনের করদাতাদের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। রাজপরিবার (কেবলমাত্র রাজা বা রাণী নন) দেশের রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসেন বলেই এই অবস্থা চলছে, বৃটেনে রাজতন্ত্রের অবসান না ঘটে রাজতন্ত্র ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে। কিন্তু একবার যদি রাজপরিবারের লোকেরা রাজনৈতিক বিতর্ক ও বিতর্ক থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, তবে রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা শক্ত হবে। ফিলিপ নিশ্চয়ই ভুল করেও এই পথে চলার কথা ভাবছেন না।

পশ্চিম জার্মানী:

দু' মাসেরও কম সময় ব্যাকি আছে পশ্চিম জার্মানীর সাধারণ নির্বাচনের। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়নের লুডউইগ এরহার্ড, আর সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির উইলি ব্র্যান্ডের মধ্যে কে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন, এই নির্বাচনে তা স্থির হবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচন হয়েছে। গত সপ্তাহে সার রাজ্যের আইনসভার ৫০টি আসনের নির্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সকল রাজ্যের নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে।

সারের নির্বাচনকে উভয় পক্ষই চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার পূর্বে নিজেদের অবস্থা বুঝে নেবার উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। লুডউইগ এরহার্ড ও উইলি ব্র্যান্ড, উভয়েই কাদিন ধরে সার রাজ্যে ব্যাপকভাবে সফর করেছেন।

গত ১৬ বৎসর ধরে এরহার্ডের ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন ফ্রি ডেমোক্রাটদের সঙ্গে কোয়ালিশন করে শাসন চালাচ্ছিল। এবার তারা খুব আশা করছিল, তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে।

কিন্তু নির্বাচনের ফলে দেখা গেল, ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন সর্বাধিক আসন পেলেও (৪৩ শতাংশ) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি। ফ্রি ডেমোক্রাটদের সঙ্গে আবার তাদের কোয়ালিশন করতে হবে। অপরপক্ষে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি পূর্বেরকর আইনসভার শতকরা ৩২টি আসনের জয়গার এবার লাভ করেছে শতকরা ৪১টি আসন।

নির্বাচনের পর উভয় পক্ষই ঘোষণা করেছে, তারা সাফল্যলাভ করেছে এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব রূপে সার তাদের মনে আশ্বাস ভাব এনে দিয়েছে। 'বুডেস্টাগ' বা পশ্চিম জার্মানীর পার্লামেন্ট দখলের জন্য এখন লুডউইগ এরহার্ড ও উইলি ব্র্যান্ড উভয়েই উঠে পড়ে লাগবেন।

আলজিরিয়া:

বেন বেল্লাকে অপসারণ করে সামগ্রিক অভ্যুত্থান ঘটানোর পর অভ্যুত্থানের নায়ক কর্নেল হুয়ারি বুমদিয়ান দীর্ঘদিন কোন সরকার গঠন করতে পারেন নি। দেশে ও বিদেশে



প্রিন্স ফিলিপ

তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনার জন্যই তাঁর পক্ষে সরকার গঠনের কাজে হাত দেয়া সম্ভব হয় নি।

১০ই জুলাই বুমদিয়ান ২০ জন সদস্য বিশিষ্ট নতুন সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর বন্ধু আবদুল আজিজ বতোয়িকা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদেই আছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট অসামরিক ব্যক্তিও মন্ত্রিসভার স্থান পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে বেন বেল্লা বিরোধী রাজনৈতিক নেতা রাব, বিতাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হুয়ারি বুমদিয়ান বলেছেন, তিনি সামগ্রিক নেতারা শাসনক্ষমতা হাতে রাখতে চান না। আলজিরিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের' (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা সংক্ষেপে এফ-এল-এন) হাতেই চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে। কিভাবে বুমদিয়ান এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেন, দেখা যাক। এখন পর্যন্ত তো সব ক্ষমতা তাঁরই হাতে।

চৌ-এন-লই-এর দেখানুযায়ী ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আইদিতিও বুমদিয়ানকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু বুমদিয়ান দেশে কমিউনিস্টদের কোণঠাসা করতে বন্ধুপরিচর। ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে কমিউনিস্টদের সরানো হয়েছে। দেশের রাজনীতিতে বেন বেল্লার আমলের কমিউনিস্ট-পন্থীদের পরিবর্তে ঐসলামিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা প্রাধান্য লাভ করছে। বুমদিয়ান সরকার বেন বেল্লার তুলনায় অনেক বেশি দক্ষিণপন্থী হবে বলেই মনে হয়।

পাকিস্তান:

পাকিস্তান এবার ফরাক বাঁধ নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে। গত ২২রা জুলাই ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবে পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে, গংগার জলে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সংগত অংশ সম্পর্কে চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ফরাক বাঁধ নির্মাণ স্থগিত রাখার জন্য ভারত সরকারের ওপর চাপ দেয়া হোক।

সরকারী দলের প্রথম সারির নেতা আবদুল আলিম প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং আইনসভার সরকারী দলের নেতা শিল্প-মন্ত্রী আবদুল বাশিদ ও বিরোধী দলের নেতা আবদুল মালেক সহ বিভিন্ন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা করেন। একজন এমন কথাও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে ফরাক বাঁধ যেমন পূর্ব পাকিস্তানের কাছে ফরাক বাঁধ তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। ফরাক বাঁধ নির্মিত হলে পশ্চিম জল বন্ধ হয়ে যাবে।

পাকিস্তানের নেতা বেশ ভাল করেই জানেন ফরাক বাঁধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কোন ক্ষতি হবে না, বরং তাদের উপকার হবে। তবু নেহাৎ রাজনৈতিক কারণে তারা চোঁচাচ্ছেন। যে কোন বিষয় নিয়ে বিশেষ দরবারে ভারতকে অপদম্ব করাই তাঁদের কাজ।

ফরাক বাঁধ হলে ভাগীরথী দিয়ে মাত্র ৪০ হাজার কিউসেক জল বেশি যাবে। এই জল গেলে পশ্চিম জল এতটুকু কমবে না। বরং এই বাঁধের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। ফরাক বাঁধ পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে ক্ষতি নয়। লাভেরই কারণ হবে।

উপহাস

নব্ব্বদ্বাদশ শ্রী

২২

কলিংবেল টিপতেই ভিতর থেকে মৃদু পারের শব্দ শোনা গেল। সেই শব্দ শুনেই বিজন চিনতে পারল কে আসছে। দোর খুলে ঝাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাশিতাকে সামনে দেখতে পেল বিজন। তম্বী দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রী মেয়েটি। ডরা বর্ষার সঙ্গে ডরা যৌবন তাল রেখে চলেছে।

স্বাতীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে ওদের কুকুরটি। এসেই বিজনের পা শুকতে শব্দ করেছে। আদর পাবার ইচ্ছা। এ বাড়ির কুকুর এতদিনে বিজনের চেনা হয়ে গেছে। শব্দ চেনা নয়, রীতিমত ভাবই করে নিয়োছে বিজনের সঙ্গে। এ বাড়িতে এলেই দেখি তার ছাতের আদর চায়। আদরটুকু না পেলে কাছ থেকে নড়তে চায় না।

বিজন মাঝে মাঝে ওকে আদর করে। কিন্তু সেই আদরের সঙ্গে কেমন যেন একটু ভয় মেশানো থাকে। একটু বা অস্বস্তি।

আজও তার আদর করবার ভাণ দেখে স্বাতী হাসল। হেসে বলল, 'আপনার ভয় হোল না এখনো?'

বিজন হেসে বলল, 'না। কুকুরভাণ আমার মজাগত। আপনি বোধ হয় আমার ভয় দেখে হাসেন।'

স্বাতী বলল, 'আজকাল আর হাসি না। দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে। আসুন, ভিতরে আসুন।'

ভিতরে ঢুকে ওয়াটারপ্রুফটা খুলে রাখল বিজন। মনে মনে একটু হাসল, এখনো তারা দুজনে দুজনের কাছে আপনি। দু-বছরের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠতায়ও এই দু-বছরটুকু ঘুচাতে পারে নি। কুকুরটি যত কাছে এসেছে কুকুরের পালকা তত কাছে

আসে নি। অবশ্য সম্পর্কটা ঠিক এক জায়গার দাঁড়িয়ে নেই। কোন সম্পর্কই তা থাকে না। হয় ক্ষর পেতে থাকে না হয় তা বাড়ি। ক্রয়ের লক্ষণ বিজন এখনো টের পার নি।

স্বাতী সোকাটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন। জমকালো পোষাকটা কি গ্যারে জড়িয়েই রাখবেন নাকি? খুলবেন না ওটা? কী জবরজংই না দেখাচ্ছে।'

গ্যারের রেইনকোটটা খুলতে খুলতে বিজন হেসে বলল, 'ভালো লাগছে না বন্ধি দেখতে?'

স্বাতী মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি অবশ্য যা পরেন তাতেই ভালো দেখায়।'

বিজন খুশি হল। এর মধ্যে স্তুতি অবশ্য আছে। কিন্তু কথাটা অসত্যও তো নয়। গৌরবান্বিত দীর্ঘাঙ্গী রূপবান পুরুষ বিজন। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠীরা বলত, 'বিজন বোসের মত-চেহারা থাকলে আমরা বিশ্ব জয় করতে পারতাম।'

বিশ্বজয় তো দূরের কথা এ পর্যন্ত একটি নারীর হৃদয়ও জয় করতে পারে নি বিজন। মানে সময় আর সুযোগ পায় নি। পারিবারিক দায়িত্বের কথা তার মনে রাখতে হয়েছে, দায়িত্বের সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ের কথা মনে রাখতে হয়েছে, অন্য কারো হৃদয়ের দিকে স্থিরলক্ষ্য হয়ে থাকবার তার সময় ছিল না। তবু কি মেরেদের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হয় নি? সহপাঠী-দেব মধ্যকারো কারো সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গতা কি আর না হয়ে যায়? কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতা কী হাউসের বন্ধুত্বের মধ্যেই রয়ে গেছে। কিছুতেই সীমা ছাড়ায় নি। হয়তো শ্রিবা, অগ্রপঞ্চায়ে বিজ্ঞানাটা একটা বেশিমানায় আছে

বিজনের মধ্যে। বন্ধুরা তাকে ভীষণভাৱ অপবাদ দিয়েছে। সে কথাও একেবারে অসত্য নয়।

স্বাতী সামনের সোফাটার বসে বলল, 'আ এখনো রাখছেন। এত রাখতে ভালো-বাসেন। রান্নাঘরেই তার বেশি সময় কেটে যায়। বাবাও তেমন ভালোবাসেন বাজার করতে। দুম থেকে উঠেই বাজারে যাবার কথা ভাবেন। দুজনেই খুব ভোজননরসিক।'

'আর আপনি?'

স্বাতী বলল, 'আমি? আমাকে কি খুব খাইরে মেরে বলে মনে হয়?'

বিজন হেসে বলল, 'তা অবশ্য হয় না। বরং আপনাকে দেখে উল্টোটাই মনে হয়।'

'কী মনে হয় বলুন তো?'

বিজন হেসে বলল, ভয়ে বলব, কি নির্ভয়ে বলব? মনে হয় আপনি জল আর বায়ু ছাড়া আর কিছুই খান না।'

এবার স্বাতীর মুখখানা যেন একটু ভার ভার দেখাল, 'মানে আমি রোগা এই তো আপনার অভিযোগ? আমার বাবা মা যা বলেন আপনিও কি তাই বলেন? আমি বেশি করে খাই আর মোটামোটা হই। ভাবুন তো এতখানি হাইটের ওপর আরও যদি মেদ বাড়ানো কী বিস্তী দেখাবে। একেবারে বিপুলো মোদিনী হয়ে পড়ব না কি?'

বিজন হেসে বলল, 'আপনি বন্ধি সেই-জন্মেই নিস্তার গুজনে খাবারটাবার খান?'

স্বাতী বলল, 'কী যে বলেন। আপনার সবতাত্তেই ঠাটা।'

বিজন বলল, 'শুনুন, এবার একটা সিরিয়াস কথা বলি। আপনার বাবা কোথায়?'

স্বাতী ফের গলা নামিয়ে বলল, 'কী

শাপ্তাহিক বসুমতী

মাপার। আপনি তো আমার বাবার খোঁজ
কিছু একটা নেন না। আজ কী হল?

বিজন বলল, 'বটে। আজ কিছুই দরকারে
পড়ে নিচ্ছে। ভাবছি, যা জলবৃষ্টি, তাতে
টার্মিফার্মি যদি পাওয়া যেত তাহলে এক-
সঙ্গে মিলে—'

স্বাতী একটু হাসল, 'আপনি কিছুই সেরি
করে ফেলেছেন। বাবা আর-সুটখানেক আগে
আরো দুজন ভ্রমলোকের সঙ্গে মিলে বোরিয়ে
পড়েছেন। টার্মি-পেয়েছেন কিনা জানি নে।
আমার তো মনে হয় যে-কোন মূহুর্তে ফিরে
আসবেন। মা আর আমি দুজনেই অত করে
বললাম, আজ এই জলটলের মধ্যে যাওয়ার
দরকার নেই ভেতর। অফিসে একটা ফোন
করে দাও—'

বিজন বলল, 'একথা কি আমাকেও
বলছেন?'

স্বাতী বিজনের দিকে তাকাল। তারপর
একটু হেসে বলল, 'বললে কি আপনারা
চুপালেন?'

বিজন বলল, 'সেটা বলার ওপর নির্ভর করে।'

স্বাতী বলল, 'কী জানি। আপনারা বোধ
হয় ভাবেন, মেয়েদের কথা না শোনাই
আপনাদের পৌরুষ। তাতেই আপনাদের
কৃতিত্ব। বাবা-মাকে দেখে তো। মার কথা
বলার সময় কটা শোনেন?'

স্বাতীর মুখে তার বাবা-মার প্রসঙ্গ
বিজনের কাছে খুব শ্রুতিসুখকর লাগে না।
কিন্তু এখন কেন যেন তুলনায় ভালো লাগল।
নিজের কথা বলতে বলতে স্বাতী যে তার
বাবা-মার কথাটা পেড়ে বলল এর মধ্যে কি
প্রকৃত কোন ইঙ্গিত আছে?

এই বসবার ঘরেই ফোন। রেডিওর পাশে
ডাকের ওপর রাখা আছে।

বিজন বলল, 'তা হলে ফোনটা করি।'
করুন না।'

কি বলল?

স্বাতী হেসে বলল, 'বাঃ রে, আপনার
অফিসকে ফোনে আপনি কী বলবেন তা
আমি কী জানি।'

বিজন বলল, 'এই যে বললেন, অফিসে
যাবেন না বলে দিন, আবার এখনই বলছেন,
আমি কী জানি। নারীপ্রকৃতি এমনই বটে।'

স্বাতীর মা অমল্য ঘরে ঢুকলেন।
শুটোপা মাঝবয়সী মহিলা। পরনে নীল-
পেড়ে শাদা শাড়ি। গায়ে গয়না-গাটির প্রাচুর্য
নেই। শাখা আর চাড়ি। কানে শাদা পাখর
বসানো ফুল। দেখেই মনে হয় মার্জিতরুচি,
সুখী সজ্জল ঘরের গৃহিণী।

বিজনকে দেখে বললেন, 'এই যে। তুমি।
এই জলবৃষ্টির মধ্যে এলে কী করে।'

বিজন বলল, 'একটা ফোন করতে এলাম
হাসীমা।'

বেশ তো। কর না।'

অফিসে একটা ফোন করে বলে দেব

এই বৃষ্টিবাদের মধ্যে যেতে পারছি নে।
বাসটা চলছে কি না কে জানে।'

অমলা বললেন, 'দাঁও বলে। ঠুকে অত
করে বললাম, এই জলটলের মধ্যে দরকার নেই
গিয়ে। ঠান্ডা লাগিয়ে শেষে একটা কাণ্ড-
কারখানা বাঁধিয়ে বসবে। কিন্তু তা কি
শুধলেন। অফিসের নামে একেবারে এক পারে
খাড়া। কিছু নেই, জল নেই, কারো অনুরোধ-
উপরোধ শোনা নেই। যাকে বলে দারুণ এক-
গুয়ে। আরও যেমন ছিলেন এখনও তেমনি।
বরষা যে হচ্ছে সে খোঁজ নেই।'

বিজন হেসে বলল, 'তার মানে বরষা
হচ্ছে না।'

ফোনের কাছে এগিয়ে বিজন একটু ইত-
স্তত করল। একজন প্রাচীর জলোক এই জল-
বৃষ্টির মধ্যেও অফিসে চলে গেলেন আর সে
শুধু সমর্থ একটি বৃক্ক হয়ে জলের অস্থিলায়
যদি অফিস কামাই করে ব্যাপারটা কি ভালো
দেখাবে? তাতে এই দুটি নারীর সামনে তার
মর্বাদ্য কতখানি বাঁচবে একটু ভেবে দেখল
বিজন। কিন্তু পরক্ষণেই সে মনস্থির করে
ফেলল স্বাতীর বাবা দেশেবাবু, এই জল-
কাদার মধ্যে অফিসে গিয়ে বতাই বীরত্বের
পরিচয় দিন না বিজন আর এক পাও এখান
থেকে নড়বে না। এখানে বসে চা খাবে, গল্প
করবে তারপর ইরামা বলেছে স্বাতীকে নিয়ে
যাবে ভাদের বাড়িতে। ঠিক সোজা পথে নাও
যেতে পারে, ঠিক বাড়ি পর্যন্ত নাও পৌঁছতে
পারে কিছুই বলা যায় না।

নিশ্চিত সঙ্কল্প নিয়ে অফিসের নম্বরটা
ডায়াল করল বিজন।

'তালুকদার এন্ড সন্স?'

হ্যাঁ, তালুকদার এন্ড সন্সই কথা বলছে।
প্রথমে অফিসের ম্যানেজার মিঃ সেনা-
নবীশকে চাইল বিজন।

তিনিই ফোন ধরলেন।

বিজন নিজের পরিচয় দিয়ে বলল,
'আজ তো আর এখান থেকে বেরতে পারছি
নে মিঃ সেহানবীশ।'

কেন কী হয়েছে?'

'এদিকটা একেবারে জলে ডুবে আছে।
বাস-ট্রাম কিছু নেই। একটা রিক্সা পর্যন্ত
কোথাও দেখা যাচ্ছে না।'

মিঃ সেহানবীশ বললেন, 'কিন্তু মূলকলে
ফেললেন যে বিজনবাবু। ম্যানোজি ডিরেক্টর
অনেকক্ষণ এসেছেন। আর এসেই আপনার
খোঁজ করছেন। আপনাকে নাকি বিশেষ
দরকার। যেভাবে পারুন একটু কষ্ট করে না
হয় চলেই আসুন। না হয় আরও খানিকক্ষণ
দৌর করুন। জলটা সরে যাক। বাস-ট্রাম
চলতে থাকুক। ধরুন আশুখটা কি একঘণ্টার
মধ্যেও যদি এদিকে আসবার কোন ব্যবস্থা
না করতে পারেন আপনি কই-ডলি আর বরষা
একবার ফোন করবেন। আমরা এখান থেকে
গাড়িটার ব্যবস্থা করব।'

শুধু।'

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে বিজন গম্ভীর
হয়ে রইল।

অমলা ফের গিরে তার রানখরে ঢুকে-
ছিলেন।

স্বাতী বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে
বলল, 'কী হল?'

বিজন একটু হাসতে চেষ্টা করে বলল,
'না, কিছু হয় নি। মানে অফিসে যেতেই
হবে। করুণী দরকার। যদি সাতরে যেতে হয়
যেতে হবে।'

স্বাতী বলল, 'আহা, সাতরতে হবে না।
স্টেট বাস না চললেও প্রাইভেট বাস ঠিকই
পেরে যাবেন। বাবা তো ফেরেন নি।
নিশ্চয়ই এককণ শোঁছে গেছেন অফিসে।'

তারপর বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে
স্বাতী একটু হাসল, 'আসলে আজ আপনার
পালাবার মতলব ছিল। ধরা পড়ে গেছেন।
অফিসে যদি নাই যাবেন, কেন ফোন করতে
গেলেন মিছামিছ। নিঃশব্দে ডুব দিয়ে এক-
দিনের ক্যাঙ্ক্যাল লীভ নিয়ে নিলেই হত।'

বিজন উঠে দাঁড়িয়ে ওয়াটারপ্রুফটার দিকে
ফের হাত বাড়তে ব্যাছিল স্বাতী বাধা দিয়ে
বলল, 'দাঁড়ান। একটুশ উঠছেন যে। যেতে
হবে বলে কি সঙ্গে সঙ্গেই যেতে হবে
নাকি?'

'তবে?'

স্বাতী বলল, 'আর একটু বসুন। এক
কাপ কফি খেয়ে যান। কফি তো ভালবাসেন
আপনি। এই বৃষ্টির মধ্যে ভালোই লাগবে।'

স্বাতীর এই আপ্যায়নে খুশি হল বিজন।
এর স্মিত মুখে সৌহার্দ অফিসের করুণী
ভাগিদের কথা, অনিচ্ছার তার উৎসের কথা
ভুলিয়ে দিলে। বিজন ভাল জীবনে প্রেমের
তুলনা হয় না। তা অপূর্বতাকে পূর্বা
দেয়, জীবনের বহু তিষ্ঠ স্মরণে মাঝখানে
তোলে। কিন্তু প্রীতি আর কথুত্বও কম
নয়। তাও অনেক অভাব মিটতে পারে।
রিক্ত জীবনে অপ্রত্যাশিত সম্পদ এনে দেয়।

স্বাতী বলল, 'একটুটা যেন কোথায়
বেরিয়েছে। বাবা বেরিয়েবার সঙ্গে সঙ্গে সেও
উধাও। নইলে তাকেই পটাতাম। মেয়ে
আসত বাসটা চলছে কিনা, টার্মি একটা ঘরে
আনতে পারে কিনা কোনরকমে।'

বিজন বলল, 'ও সবার কিছু দরকার
নেই। আপনি ভাববেন না।'

স্বাতী হেসে বলল, 'এক কাপ করে কফি
কিন্তু দরকার আছে। শুধু আপনার একটু
জলো বলছি নে। বসুন একটু। বেশি দৌর
হবে না আমার।'

বিজনকে বসিয়ে রেখে স্বাতী ভিতরের
ঘরে ঢুকল।

জলি আদর পাবার জন্যে ফের বিজনের
কোলের কাছে এসে লেজ নাড়তে শুরু করেছে।

(জ্যোতি)



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চদশ অধ্যায়

সুশ্রীট অরিলিয়ানের মহিষী সিলেক্টর
জিউন না পাওয়ার জন্য যে বেদনা, যে উচ্চ
বীর্ষ্যাস আর চোখের জল—যেন ভাবীকালে
বাংলা দেশের রেশ ব্যবসার ইতিহাসে ঐতিহাসিক
অভিলাষ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

সুশ্রীট অরিলিয়ান। শত শত শতাব্দী পূর্বে
তিনি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই বিশ্বভিত্তি
আঁড়ালে হারিয়ে গেছেন। তারপর একে একে
দিন গেছে। রাস কেটেছে। অভিজ্ঞতা হয়ে
গিয়েছে বছরের পর বছর। বাংলা দেশের
রাজার অনেক—অনেক জল প্রবাহিত হয়ে
গিয়েছে। বদলে গিয়েছে পৃথিবীর মানচিত্র।

অনিবার্যভাবে বাংলা দেশের সিলেক্টর
বাণিজ্যেও বিপুল পরিবর্তন এসেছিল। এমন
হয়েছিল যে সেকালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর
ট্রেড রেকর্ডে লিখেছে—

‘প্রোডাকশন ওরাজ সো ইবেনা দ্যাট
ইউজ অক সিল্ক ইন এভরি ক্লাস অক
সোশাইটি, কন দি থ্রোন টু কটেজ ইজ
কন ইন বেঙ্গল।’

ব্রহ্মচরী ব্রিটিশ ব্যবসারীদের মাঝে কুটবুদ্ধি
প্রসারিত হয়ে উঠল। যদি ধরে ধরে সিল্ক তৈরি
হয়, তাদের ব্যবসাটা একচেটিয়া থাকবে না।
আর এই সিলেক্টর এত গৌরব, এত মর্যাদাও
থাকবে না। অতএব—

রেস্ট্রিকশন। রেশন উৎপাদনের ওপরে
আইন করা হলো। দেশের দিকে দিকে হুকুম
জারী হয়ে গেল—কম করে সিল্ক তৈরি করতে
হবে আর—

স্বল্প হলো বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে ধরে
ধরে তরানী। যেখানে সেখানে পেল অনেক—
অনেক সিল্ক স্তূপাকৃতি হয়ে আছে, সেখান
থেকে গাঁটকে গাঁট নিয়ে চলে গেল তাদের কুটির
গুদামে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে সিল্ক
ব্যবসারীদের বাড়িতে বাড়িতে হাহাকার পড়ে
গেল।

গাছের রেশমগুলির দিকে তাকিয়ে তারা
কত স্বপ্ন দেখেছে; কত বিস্ময় রাজি আঁখির
হয়ে উঠেছে—এই রেশম তাদের ধরে সম্পদ
আনবে, দুটো টাকার বুধ দেখবে, তাদের বোকে
গড়িয়ে দেবে রূপোর পৈঁছা (গয়না), ছেলের
বেয়েদের দেবে জারাকাপড়।

সেই সিল্ক—বুকের রঙে রাঙানো সেই
সম্পদ বিদেশীদের গুদামঘরের অন্ধকারে বাজেয়াপ্ত
হয়ে পড়ে থাকবে?

শুধু বাজেয়াপ্ত করে নি। শুধু অত্যাচার
করে নি। অনেক—অনেক পরিমাণ সিল্ক
গজার জলে নিক্ষেপ করতেও ইতস্তত করে নি।
এতটুকু বুক কাঁপে নি ওদের। নীচের হিসাবটা
লক্ষ্যীয়।

সরস নিক্ষেপিত রেশমের পরিমাণ

১৭৭৬ থেকে ১৭৮৫ বছরে ৩,৯২,৯১৮ পাউণ্ড
১৭৮৬ " ১৭৯০ " ৩,৯১,৪৭৬ "

সুশ্রীট আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যুয়াক্স



মার্কনী ফ্যান

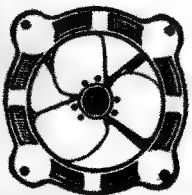
নগদ মূল্যে

৯টি কিস্তিতে দিন

মার্কনী ইলেকট্রিক কর্পোরেশন
(প্রাই) লিমিটেড

১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-০০৪৮



সাপ্তাহিক বসন্ত

আর যা নিক্ষেপ করল না তার কিছু কিছু পরিমাণ জাহাজ বোঝাই করে পাঠিয়ে দিল ইটালীতে। ইটালীয়ান অরগানজিন (সিলক) বাংলা দেশের রেশমের নভই নরম, স্বচ্ছ আর চিকন। আর---

ইউরোপের সারাংশে, বিশেষ করে ইটালীয়ান সিলকের খুব চাহিদা, তাই বাংলা দেশের রেশমের সঙ্গে ইটালীর রেশম বিশিয়ে তৈরি হতে লাগল এক ধরনের সিলক। কিন্তু বাংলার নাম মুছে গেল। অবলুপ্ত হয়ে গেল সেই নতুন ইতিহাস—একদিন বাংলার পল্লীর বহু সাধারণ অবহেলিত, আর দরিদ্র মানুষের স্বপ্ন এই রেশমের স্বর্ভোর পাকে পাকে পরম মনভার নত জড়ানো ছিল; আর প্রত্যেকটি—প্রত্যেকটি স্বর্ভোর আড়ালে আছে এই বাংলার নিরম মানুষের পেশীকালনের ইতিবৃত্ত।

সেই সিলকের নাম হলো—ইটালীয়ান সিলক। বেকল সিলক নয়।

এইখানেই শেষ নয়।

বাজেয়াপ্ত। গরুর জলে বিগর্জন। ইটালীতে পাঠিয়ে দিয়েও কান্ড হলো না। ভাবতে লাগল কেমন করে—কেমন করে লেজিসলেটিভ প্রোটেকশান দেওয়া যায় এই ব্যবসায়কে। অবশেষে কেমন করে মূল্যবান রেশমবিল্পের ব্যবসাকে আইনের বন্ধনে বেঁধে পঙ্গু করা যায়।

আইন তৈরি হলো।

যদি কোন ব্যক্তি, এই দেশের প্রজা হয়ে খিলা অনুমতিতে রেশম উৎপাদন করে, বিদেশের কোন ব্যবসায়ীকে রেশম বয়ন প্রণালী দেখায় তাহলে তার বাড়ি-ঘর স্বাবর-অস্বাবর ব্যবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তৎসহ দু'হাজার টাকা জরিমানা—অনাগারে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

রেশমের মত বাংলা দেশে চিনির ব্যবসার ইতিহাসও বিস্ময়কর।

চিনি। ঐতিহাসিকদের মতে চিনি বাংলা দেশের আদিকালের পণ্যসম্ভার। ঠিক কতদিন আগে—কোন পুরাকালে চিনির অদ্ভুত ষাঙালী আবিষ্কার করেছিল, সেই সাল-সন-তারিখের হিসাব কষতে বসলে জুদুর অতীতের ঘন কুয়াশার ভেতরে খেঁচি হারিয়ে কেলেতে হয়। সেই আদি-অন্তহীন দুর্ভেদ্য কুয়াশা ভেদ করে যতদূরে তাকানো যায় দেখা যাবে, পৃথিবীর কোথাও যখন কেউ জানে না এই নিষ্টর

অস্তিত্ব, তখন বাঙালী দিবা আঁধারোপণ করছে। আর মেড়ে রস বের করছে। সেই রস থেকে তৈরি করছে চিনি।

ঐতিহাসিকদের মতে পৃথিবীর পশ্চিম গোলাবর্ষের অধিবাসীরা চিনির কথা জানতে পেরেছিল আলেকজান্ডারের প্রাচ্য অভিযানের সূত্রে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ শতকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের এক দেশের দিগন্তবিসারী প্রান্তরে লুপাট নিয়ারমাসের এক সেনাপতি যের্বলেন, আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠে মানুষ সনান উঁচু উঁচু গাছ। গাছগুলোর কোমরের কাছে বেশ করে বাঁধা। অনেক লতাপাতার জড়ানো লম্বা লম্বা বাঁশের মত এ কী গাছ।

—কি নাম এই গাছের?

বিদেশী সেনাপতির প্রশ্ন শুনে হম্বাডো সেনিন জ্ঞাতা কি বোনিওর আদিবাসী বিস্মিত হয়েছিল। এত অপরিচিত হর যে গাছ তার নাম জানে না। এ কী রকম মানুষ রে বাবা।

ইতিহাসকার ইট্যাবো লিখছেন, সমস্ত পাশ্চাত্যের প্রতিনিধি স্বরূপ সেই সেনাপতিই প্রথম জানতে পেরেছিলেন আঁধারগাছের কথা। জানতে পেরেছিলেন, এই গাছের সমস্ত গুণের

ইতিবৃত্ত। বিস্ময়বোধ করেছিলেন, এত লম্বা এত মূল্যবান গাছ জন্মে এদেশে।

থিয়োক্রাস্টাস। নিয়ারমাসের প্রায় সম-সাময়িক আর একজন গ্রীসীর সমাজতত্ত্ববিদ তাঁর গ্রন্থে লিখেছিলেন চিনির কথা। স্পষ্ট করে বলেছিলেন চিনি তৈরি হয় প্রাচ্য দেশের এক ধরনের গাছ থেকে।

তুণ চিনি নয়। মধুর কথাও জানিয়েছিলেন। গাছে—বড় বড় গাছের ডালে বৌমাছিকা চাক বাঁধে। সেই চাক পুষ্ট হলে গুণের লোহি তাতে আঙুন ধরিয়ে দেয়। উড়ে যায় বৌমাছিকা। তারপর শূন্য চাক পিছে মধু বের করে ব্যবসায়ীরা।—কিন্তু—

কেমন করে—কেমন করে জুদুর গ্রীসের পণ্ডিত থিয়োক্রাস্টাস আঁধারগাছের কথা জানতে পেরেছিলেন সে কথা কোন ইতিহাসকার লেখেন নি।

বাংলার এই বিচিত্র পণ্যসম্ভারের অস্তিত্ব পৃথিবীর স্রগতা দেশের সমাজবিজ্ঞানী পণ্ডিত আর ইতিহাসকাররা খুঁটের জন্মের মত—বল পূর্বেই জানতে পেরেছিল।

(কবিতা)

ভারতের
আদিতম
কসাকান

চ্যবনপ্রাশ

আমুর্ভেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ মূতন ও পুরাতন সন্ধি কাশি, শ্বস্রভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যপ্রীত পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা গোখাই কানপুর



আধুনিক সাহিত্য

ধারাবাহিক উপন্যাস



মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্বে-প্রকাশিতের পর)

৯ আটচালি ৯

নির্মলাকে শিবকালী গাঙ্গুলী তার ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি হয়ত চেষ্টা করতেন, তার আগেই বর্গীদের হাতে তাঁর প্রাণ গেল।

নির্মলাকে খুঁজে আনিবার তার কাশীপুর নিয়েছিল। সে যখন বিশালাক্ষীকে বলেছিল, 'আমি ওকে খুঁজে আনব, আপনি আমার বিশাল করুন।'

তখন বিশালাক্ষী যেন বড় নিশ্চিত হয়েছিলেন। তাঁর হঠাৎ মনে পড়েছিল কাশীপুর তাঁর হারানো ছেলে কানাই-এর খেলার সাথী। ছেলের খেলার সাথী, সে যে ছেলেরই লম্বা। তাই তিনি বড় নিশ্চিত হয়ে বলেছিলেন, 'তাই এনে দিও কাশী।' ওকে নিয়ে না হয় আমি কাশীতে যাব, সেখানে রেখে আসব।'

'কেন, কাশীতে কেন?'

'আমার দাদা একসময়ে বড়নগরে কাজ করতেন কাশী। নাটোরেশ্বরী ওঁকে বড় পুঁহ করতেন। দাদার নাম করে বললে নির্মলাকে হয়ত উনি আশ্রয় দেবেন। কাশীতে ওঁর সাহায্যের ভরসায় অনেকগুলি অনাথা বিধবা থাকে, নির্মলাও থাকবে।'

তাদের একজন হয়ে।'

'আর কি উপায় আছে বাবা?'

বিশালাক্ষী চরকার শূভে কাটিতে কাটিতে হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন। ঝড়কির বোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়েছিল বাইরে হেমন্তের অপরাহ্ন, শস্যে সোনালী ক্ষেত, ধানচোরা পাখীদের অনবরত ডানা ঝাশ্বেট উড়ে বেড়ানো।

দূরে স্বপ্ন করছিল আধারনালিক গ্রামের বারোয়ারী আটচালার উঁচু নতুন খড়ছাওয়া সোনালী চুড়ো। চুড়োর অভিতে সার সার খড়ের সমুদ্র বনানো, চালার ছাউনিতে নতুন খড়ের কদর।

নাও নাও কানে আসছিল বুদোপাড়ার বউ-সেয়েসের ডাক, 'মা গো, ধান বাড়াবে? মা গো গোরাল কাড়াবে?'

'কি ভাবছেন' কাশীপুর তুলোর আঁশ হাতে জড়িয়ে দেখল।

'এ-ও দেখতে হল বাবা, বর্গীর কালে-কালে কতই দেখালে। কে জানিত এই আধারনালিক গ্রামে বুদোপাড়ার বউ-সেয়েসেরা দুটি ভাতের জন্যে অগাধ মাসে বাড়ি বাড়ি ধান ডানারীর কাজ চেষ্টা বেড়াবে? এখন সবই দেখতে হল। চাষবাসের দ্রবস্থা, মালিকজন সব সেশছাড়া। ভাগের চাষটুকুও করতে পেল না। বুদোপাড়ার মানুষরা বাঁচে কেমন করে...'

'তাই ভাবছিলেন?'

'না কাশীপুর।'

বিশালাক্ষী তাঁর স্মরণ, বিবণ দুটি চোখে চরকার দিকে নামিয়ে ধামলেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'নির্মলার কথা ভাবছিলাম।'

'কি ভাবছিলেন?'

'সেখ, এ পোড়াদেশে বিধবা অনাথার এখন হাড়ির হাল, ডোমের দুর্গতি, ওকে সে অবস্থার জীবন কাটাতে হবে মনে করলে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তেবে দেখলাম কি জান?'

'বলুন।'

'এদেশ কেন, উত্তরে-দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে, যেখানে বাও না কেন, ওর কপালে আর কোন সুখ হবার নয়। কুলীনের ঘরে, কুলীনের কটা; একবার ওকে বর্গী ছুঁয়েছে, আর একবার ওর স্বামী ওকে কুটনীর হাতে বেচেছে, বাঁচবার পথ ওর কোথায় বাবা?'

'পথ পেতে হবে।'

কাশীপুর অভ্যাসমত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ছোটবেলা থেকে এইটি তাঁর অভ্যাস যে কাজ যত কঠিন হোক, হার মানতে সে কখনো রাজী হয় না। তাই সে এখন মহাজে বলতে পারল, 'পথ পেতে হবে।'

'পথ যে নেই কাশী।'

'অন্যভাবে পথ নেই?'

‘না! এক পথ আছে, তার চেয়ে বড় ভাল।’
‘কোন পথ?’

‘ও যদি ধর্ম ছাড়ে, তবে বোধ হয় পথ পায়।’

কাশীশ্বর এ-কথাটি শুনে যেন এতটুকু আশ্চর্য হল না। সে শুধু বদ্বয়ে বলল, ‘নির্মলা তার আত্মীয়-পরিজন, তার স্বামী, সকলের কাছেই এখন মৃত। তাকে একমাত্র ভাল-মাসতেন আপনার দান, তিনিও নেই।’

বিশালাক্ষীর হাত কঁপে গেল। দাদার কথা মনে করলে এখন তাঁর বুকের ভেতর হা হা করে যেন শূন্যনভতার মাঠে চৈত্রেয় কক বাতাস বয়ে যায়। পুরনো দেউল, আশ্চর্য কারুকার্য-শোভিত ভাঙা প্রসাদ, পরিত্যক্ত হাট চালা, পতিত বাস্তবজনি, এর ভেতর দিয়ে চৈত্রেয় কক বাতাসের অবিরাম বয়ে চলা, অবিরাম কঁপে চলা যে বুক কি বেদনা জাগায়, চোখ থেকে কি ধূন কেড়ে নেয়, তা বিশালাক্ষীর মত আর কে জানে? এক চৈত্র মাসে তাঁর স্বামী গেলেন, আবার আর এক চৈত্র মাসে তাঁর ছেলে কানাইকে বেবেরা চুরি ক’রে নিয়ে গিয়েছিল, এ-প্রায়ে বর্ণীয়া এসেছিল সেও ‘ত’ সেই এক চৈত্র মাসে। বিশালাক্ষীর পৃথিবীতে চৈত্র মাস যেন বুরে বুরে আসবেই, ভুল হবে না কখনো। বিশালাক্ষী জানেন তাঁর বুকের নিচের এই বোঝাঝাটা বাড়তেই থাকবে, কমবে না কোন দিন, কমবে না আর।

‘শুনব।’

কাশীশ্বর তাঁর মনকে আবার ফিরিয়ে আনল। আস্তে বলল, ‘নির্মলা, ধর্ম ছেড়ে, মৃত্যু হলেও যদি স্মৃতি থাকে, তবে তাই থাকুক।’

‘স্মৃতি?’ বিশালাক্ষীকে নিষেধে যেন শূন্যতার হাজারটা হাত এসে জড়িয়ে ধরল। তিনি যেন বিশ্রাস করতে পারলেন না ধর্ম ছাড়লে স্মৃতি আসতে পারে, কোন পথে আসবে?

‘হ্যাঁ স্মৃতি। মন কোথায় থাকে, কে দেখতে যায়, মনের কথা ফেলে দিন। ওর সেহটাও যদি স্মৃতি থাকে, স্মৃতিতে থাকে, তাই থাকুক। জানি যদি ওকে উদ্ধার করতে পারি তবে জানবেন এখানে ফিরিয়ে আনব না।’

‘কোথায় নিয়ে যাবে?’

‘জানি না। দেখতে দেখতে এলাম, পৃথিবীটা অনেক বড়।’

কাশীশ্বর এতক্ষণে একটা উঁচু জায়গা পেয়ে, নিচু দেওয়ালে উঠে বসল। পা ঝুলিয়ে বসে আরাম পেল। গালে হাত রাখল। সে জানে। এখন এইসব বড় বড় কথা বলবার জন্যে হয়ত বকুনি খাবে।

‘কাশী, তুই এলি, আনন্দী এল না কেন?’

এই প্রশ্নটি বিশালাক্ষী কাশীশ্বরকে নিত্য করেন। প্রতিদিন ও জবাব দেয়, ‘আসবেন জান্না, আসবেন।’

আজ সে ব’লে বসল, ‘কি বললেন?’

‘আনন্দী এল না কেন?’

‘বুনোবউ ঘোরে ঘোরে ভিক্ষে চায় কেন?’

‘এটা কি আমার কথার জবাব হল যে?’

‘হল বড়ীয়া। জবাব ঐ এক জায়গায়।’

আনন্দীদাদাকে ভূমিপতি রায় আসতে দিতে চান না। বর্ণীর উৎপাতে তাঁর জমিদারী বার বার উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। তাই পাশের রাজা কৃষ্ণ নাহিতীর কাছ থেকে বায়ো লক্ষ কাহন কড়ি ধার ক’রে তিনি বর্ণীদের ধার শোধ করলেন। অথচ, তাঁর নিজের কাছেও তখন অনেক সোনা, কুবেরের ঐশ্বর্য।

বিশালাক্ষী অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলেন।

‘সেই সোনা দিয়ে ভূমিপতি রায় প্রজাদের ডেকে এনে বসত করালেন, হাল লাঠল আর বীজধান, সবই দিলেন। কিন্তু যা মনে করে দিলেন, তা হল না বড়ীয়া। সেই বর্ণী আবার এল। আবার চাহীয়া পালিয়ে গেল। এদিকে নবাব খাজনা চান, সেবার কড়ি নেই, কৃষ্ণ নাহিতী ফেরৎ চান তাঁর কাহনকড়ি, সেবার সজতি নেই। তাই ‘ত’ আনন্দীদাদা আটকে গেলেন ওখানে। বললেন এমন বিপদে অন্নদাতাকে ফেলে যেতে পারব না।’

‘সে যে কর্তব্যকে সবচেয়ে বড় বলে মানে।’ বিশালাক্ষীর মুখ গর্বে দীপ্ত হল। তাঁর বড় ছেলে, তাঁর গোপাল, কর্তব্যকে বড় বলে মানে, তাতে তাঁর মত গর্ব কার?

‘তাই বলি, ঐ বর্ণীর উৎপাত থেকে সকলের বিপদ হল। বুনোবউ-এর দংশন আর আনন্দীদাদার এ বিপদ, সবই ঐ বর্ণীরা ঘটালে।’

‘কাল বর্ণী এসেছিল। সমস্ত দেশের কপালে কালি লিখে দিল।’

বিশালাক্ষীর দীর্ঘনিশ্বাস হেনস্তের শান্ত বাতাসে আঁরাবর্ণিক গ্রামের আকাশ দিয়ে বয়ে গেল।

‘তাই ত’ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন আপনারদের দেখতে। বলে দিলেন যতদিন আপনার দরকার হয়, আপনার কাছে থাকতে।’

‘বনের ছেলে ববে এসেছিল ভাল হলেও তোঁর বাবা ‘ত’ নিশ্চিত হয়েছেন।’

‘বাবা ‘ত’ দাদার সঙ্গে অগ্ররীপ চলে গিয়েছেন।’

‘তা জানি। তাঁর সঙ্গে দেখাটা ‘ত’ হল।’ কাশীশ্বর একটু হাসল। তাঁর বাবা বাবার আগে দিবা দিয়ে গিয়েছেন তাঁর মুখ আর দেখবেন না।

তারপর হঠাৎ নিঃশব্দে পাখপাখালীর ডানার গাপটে উঠেনে কুপ ক’রে সন্ধ্যা নেমে এল। এমন সন্ধ্যার বিশালাক্ষীর মন আরো উল্লাস হয়ে যায়, কোথায় চলে যায়।

‘দেবতার শয়নে যাচ্ছেন।’ আকাশের একটু দু’টি তারার দিকে চেয়ে অক্ষুট বসলেন, প্রণাম করলেন।

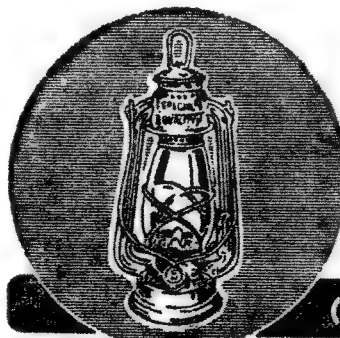
এখন হেবস্ত সন্ধ্যার শান্তি তাঁর মনকে যেন সন্ধ্যারতির ঘণ্টার শব্দে, ঠাকুরদের পোতল দেবার মন্ত্রের শব্দে কানায় কানায় ভরে দিল। এমন সন্ধ্যা বিশালাক্ষী কতদিন প্রবেশেছেন এই গোখিলি মুহূর্তে দেবতার শয়নে যান, উঠেন থেকে পাকা ধানের গন্ধ ওঠে, যব অড়হর আর পাকালকার তুপ মুনিস্বা ধরে জোলে।

‘কুন্দবউ, সন্ধ্যা দেখাও না।’

বিশালাক্ষী প্রায় অভ্যাগবস্ত বসলেন। পূবমুখো হয়ে প্রণাম জানালেন। পুরে তাঁদের ঠাকুরঘর। সে ঠাকুরঘরে এখনো তাঁর বস্ত্রের প্রপিতামহের ব্যবহার করা বড়ম, চাঁদর যত্ন ক’রে রাখা আছে। তিনি বড় ভক্ত রান্না ছিলেন। বর্ষমান বাবার পথে একটু মাঠে সন্ধ্যাবেলা তিনি দেখেছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণ একলা চলেছেন পূব-দক্ষিণের পথে। তাঁরে বলেছিলেন নীলাচল চলেছি। দেখানো গৌরার দেহ রাখবেন।

ওগো একটু পাঁজাও, বলতে না বলতেই সন্ধ্যার গো-চারপের মাঠে তাঁর পদধ্বনি মিলিয়ে গিয়েছিল। সেই কবিকের দিব্যদর্শনেই সংসারী মানুষটি বদলে গেলেন। হস্তিনাধি করতে করতে ঐ মাঠেই ভাষ্যসামিতে তিনি দেহ রাখেন।

(জরথস্ট্রা)



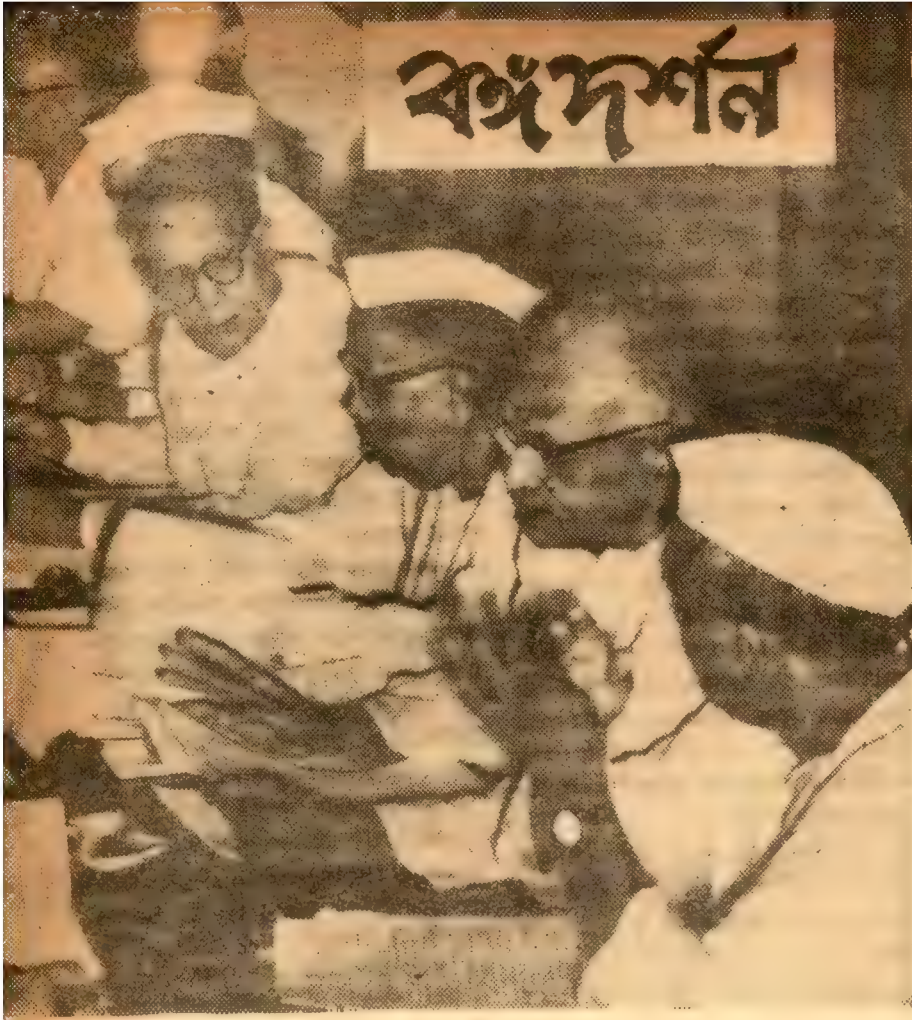
কিষ্কান
লঠন
সর্বোৎকৃষ্ট

(গৌর মোহন দাস ঐকোঃ)

ফোন-২২-৬৫৮০

২৩৬, ৩৩৩ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

বঙ্গদর্শন



পূর্বোক্তনীয় মধ্যমশ্রীসের বৈঠক

রাজধানী :

মুকোচুর্কি

বড় বজাদার নুকোচুরির খেলা
বেললেন অগৎ ব্যবসায়ীরা (খড়ি,
মহামান্য ব্যবসায়ীরা। কে জানে তাঁদের
বিক্রমে কুণ্ডিত গ্রেপ্তারী পরওয়ানা,
যা বর্তমানে প্রত্যাখ্যাত, না শেষে এরূপে
এসে পটাপট সত্যকথার ওপর ভারত-
রকার সেই প্রতাপশালী আইনটি চাপিয়ে
দেয়।) অবশ্য ভারতরক্ষা অধীন
প্রয়োগে সরকারী প্রতাপের প্রহসনটি বরা
পড়ে গেছে। সং ব্যক্তির ভয়-ভাবনা
যাই থাক, অগৎ ব্যক্তির দুর্ভাবনা যে ঘুচে
যাবে তাতে আর সন্দেহ কি। গত
সেপ্টেম্বরে কতিপয় মনস-কনের মালিক
এবং কয়েকজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে
ভারতরক্ষা অধিনের আওতার গ্রেপ্তারী
পরওয়ানা বার করেছিলেন বটে, কিন্তু

বর্তমানে তা বহুদূরত্রে লঘুক্রিয়ায়
পরিণত। শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ীচক্রের
কাছেই মাথা নোমালেন বাহাদুর সরকার।
তবে কি ছ'জন পলাতক ব্যবসায়ীর পাতা
না পেয়ে হাল ছেড়েছেন শাসনকর্তা।
এভেবড় দুর্বলতা স্বীকারে আমরা
লজ্জা পাই। তা ছাড়া যেটাও কোনো
যুক্তি নয়, হলে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা
মাধ্যম করে দিনের পর দিন বিরোধী
মন্ডলারা যে পা-চাকা দিয়ে আছেন,
বাঁদের কেউ কেউ প্রকাশ্য সভায় এসে
মদস্যপদ বজায় রেখেও গেলেন
(কর্পোরেশনে) অনেক আপে তাঁদের
ওপর থেকেই গ্রেপ্তারী পরওয়ানা
তুলে নেওয়া উচিত ছিল। সুতরাং
ব্যাপারটার মূলে অক্ষমতা নয়, অপদার্থতাই
আসল কারণ। অদৃশ্য শক্তির চাপই যে
পরওয়ানা প্রত্যাখ্যারের কলকাঠি নেড়েছে,
এ বিষয় সাধারণ বুদ্ধি অবিলম্বে ধাকবে।

এদিকে ব্যবসায়ীদের মহোৎসব জ্বর
হবে ভারান পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। অবশ্য
জ্বর হতে বাকি নেই, বলা উচিত, চরম
ও শেষ পর্যায়ে অবনত হবে।

সাম্প্রতিক বাজারদর কোন অর্থ-
নৈতিক ভিত্তিতে নির্বীত হচ্ছে, তার
হদিশ মেশের মাথাওয়ানা অর্থনীতি-
বিদরাও করে উঠতে পারবেন কি না
সন্দেহ। বাজারে এই চরম অরাজকতা
দেখে মন হয় বেন পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ওপরেই ননোপনি
অধিকার স্থাপন করে নিয়েছেন দুষ্ট-
ব্যবসায়ীচক্র। দেশবাসীর কুখার অন্ন
কেড়ে নেওয়ার জন্য জোঁটবদ্ধ হয়েছেন
কি তাঁরা? লোভ কি দিশাহারা হল।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ডায়ম ব্যারেজ,
বাঁধ পরিকল্পনার চাপ তো আছেই,
তার সঙ্গে আছে নতুন, নতুন কর-
ব্যবস্থা এবং লোভী ব্যবসায়ীর করকরে
নোটের প্রতি উদগ্র প্রলুব্ধতা।

হতবুদ্ধি জনসাধারণ ডুবছেন
ধুপের দারে, অনাহারে, অপ্রতুলতার,
অচিকিৎসায়, অস্বাস্থ্যে, অব্যবস্থায়।

পাখর গড়াচ্ছে। গড়ানোর সময়
লোমহর্ষ দৃশ্য। কিন্তু প্রত্যাঘাতে
যখন বিচূর্ণ হয় তখন সে বড় ভয়াবহ।
আমরা উন্নাদের মত ছুটছি। উন্নত্ততা
অস্বস্থতার লক্ষণ। আমাদের চিকিৎসার
দরকার এবং স্বচিকিৎসকের দরকার।
হতবুদ্ধি পশ্চিমবঙ্গ তারই অপেক্ষায়
এস্তা হরিণীর মতো আশ্রয় খুঁজছে।

রক্ষা-স্বার-নীতি

সরকারী রক্ষা-স্বার-নীতির ফলে
বৎসরাধিককাল কলকাতার কলেজদার
উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মুখের ওপর বহু
হয়েছে। কিন্তু দার রক্ষা করে দিয়েও
অভিলাষকে সমটাকে রুখতে পারেন
নি। অথচ সর্বত্র বহু রোখার এই
সমান্বক প্রমাদে ভুগছেন আমাদের
অভিলাষিক জাতীয় নেতৃবৃন্দ।

উল্লঙ্ঘন সময়ের নুর্বে কালো কাপড়
চাপা দিয়ে তাঁরা ভাবেন, লজ্জা নিবারণ
হল; কিন্তু হয়, বাস্তি তবন দৃশ্য-
অগতে চকুপীড়ার কারণ হয়েছে।
হা-হা করে উঠছে চতুর্দিক। জাতীয়

নেতৃত্ব তখন চোখ ফিরিয়ে আর একটি উন্নত সমস্যার মুখে কপড় চাপা দিতে ব্যস্ত।

এ শুধুমাত্র আজকের ঘটনা নয়, নগ্ন সমস্যার চোখ বেঁধে মুক্তি আনানের এ নজির পুরানো। তাই ইতিপূর্বেও অন্যান্য সমস্যা আলোচনাকালে 'বঙ্গদর্শন'ের পাতায় বলা হয়েছিল—বিকল্প ব্যবস্থার স্থিতি না করে চালু ব্যবস্থা রক্ষা করার অন্যতম দায়িত্ব দেশটা নাস্তানাবুদ হতে চলল। আবার সেইভাবেই আজকে শক্তিমত্তার ছাত্র তত্তি সমস্যার দিকে তাকিয়ে তারই পুনরুজ্জীবিত করছি, মশায়রা! ভালো যদি না করতে পারেন তবে কালোও ছকুমে খাঁরপ করেন কেন! দেশের মানুষের ভাগ্য কি আপনাদের খানকা খামখেয়ালি প্রস্তাব গ্রহণের উৎসাহে হালহীন নৌকার মত কেবলই লাট খাবে।

দুর্যোগ ছাড়া এ রাজ্যে রাজভোগ কারও কপালে নেই, জানা কথা। কিন্তু তাই বলে ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিলে কেমন লাগে।

'হাতে কিছুই তুলিয়া দিতে পারিব না, যাহা আছে কাড়িয়া লইব। প্রণু করিও না। মিছিল করিয়া মরদানে ঘাইও না। কলেজ-দুয়ারে একাধিক দিবস ধস্তাধস্তির পর অথবা গওদেশ অশুচীভূত করিও না। মানিয়া চল। সম্মুখে চলিবার রাস্তা না পাঠিলে হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া পড়, কিন্তু কদাচিৎ অবস্থান ধর্মঘট করিও না। জ্বন্দনে চীৎকারে কর্ণপাত করিবার মতো লক্ষণ আমরা নই। আবার প্রস্তাব গ্রহণ করি, তোমরা সুবোধ ষালকের মতো নিবিবাদে তাহাই মানিয়া লও।'

কলেজে কলেজে ছাত্রসংখ্যা হ্রাসমানের ফতোয়া জারি করার পেছনে ইউ-জি-সি'র যেন উপরোক্ত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

আজ যখন কলেজের ফটক খোঁচা মুহুর্তে মুহুর্তে প্রি-ই-সি-

ভাগিটি ও হাজার সেকেন্ডারী পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবকদের উপর সমস্যার মতো ধরে ফিরছেন তখন অবাক হয়ে ভাবতে হচ্ছে, স্কুল ক্যান্টিনাল পরীক্ষার সংবাদ প্রকাশের পর অবস্থাটা কেমন হবে। এর চেয়ে হরি ষোষের গোয়ালও কি ভাল ছিল না। যদি তাতে মরাতল মরাতলেই গিয়ে থাকে তবু তো ঠাই মিলত। এখন যে পা-ফেলার জমি নেই, অতল গভীর। এখন না কলেজ, না পাড়ার বক, বৈঠকখানা না কোনো কাজ-কর্ম। এত ছাত্রকুল বংশকুলের কপালে কোন তিলক আঁকবেন? (দেশের কথা না হয় বাদ দিলাম নেতাদের মুখ চেয়ে)।

এ সমস্ত প্রশ্ন অবশ্য ইউ-জি-সি যে না ভেবেছেন এমন নয়। তবু বিকল্প ব্যবস্থার একটা খন্ডা পর্যন্ত না করে তাঁরা ছকুম দিলেন, ছাত্র-হার না কমাতে গ্রাণ্ট দেওয়া হবে না কলেজগুলিকে। নিকুপার কলেজ কর্তৃপক্ষগণ অবশেষে নত-মস্তকে মেনে নিলেন সে বায়না। ফলত শত শত ছাত্র অন্ধকার ভবিষ্যতের সিংদরজায় থ' মেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নতুন সমস্যার কথা কেউ চিন্তাও করলেন না।

প্রস্তাবটি ছিল বহু। হরি ষোষের গোয়ালে ভবিষ্যৎ ভারত যথার্থ রূপ নিতে পারত না। কিন্তু শিক্ষালয়ের দার থেকে ছাত্র ছাঁটাই করে দেশে সেই অরিতিক্ত অব্যবস্থার শিকার ছাত্রসমাজ কী করবেন, ভবিষ্যৎ ভারত কী ভববুরের আভা-বানা হবে—এসব প্রশ্নের ফলপ্রসূ জবাব এই কয়েক বছরেও তৈরি হল না কেন?

সাধারণের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, তবে কি এগাবের নেপথ্য উদ্দেশ্য বৃহদাকারে শিক্ষা-সংকোচন? উত্তরে তৎক্ষণাৎ হাঁ, না, কোনোটিই বলা অসম্ভব। কেন না নেতারা প্রতি মুহুর্তেই বক্তৃতার গালগল্পে দেশের

লোককে ভুরি ভুরি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। স্মরণ: ধরে নেওয়া যায়, দেশবাসীকে শিক্ষিত করার জন্য বীদের অহোরাত্র বক্তৃতা মাজাতে হচ্ছে, তাঁরা 'লটকে লট' শিক্ষাগ্রহণে ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা-মন্দির থেকে হাট্টিয়েই বা দেখেন কেন? কিন্তু যেহেতু দিচ্ছেন অতএব বলতেই হবে, চূড়ান্ত অপদাৰ্থতা শিক্ষা সমস্যাকে যথার্থ করায়ত্ত করতে অক্ষম।

সিকট প্রথাও নয়, নতুন কলেজও নয়, প্রাইভেট পরীক্ষার যথেষ্ট সুযোগও নয় অথচ অন্যতর কোনো বিকল্প ব্যবস্থাও নয়। আমাদের এই নেতিবাচক শিক্ষা-নীতির মাঝে কাজে কাজেই লোকে গুতুর কোনো উদ্দেশ্যের গোপন রহস্যের কথাই ভাববে। আমাদের মতো অশিক্ষিত সাধারণকে ভিন্নপথে কিছু ভাববার মতো ব্যবস্থা তাই অচিরেই করা একান্ত প্রয়োজন।

দু-একটি ছাত্র-সংস্থা ইতিমধ্যেই জোরদার আন্দোলনের চিন্তা করছেন। বলা বাহুল্য, আন্দোলনে নামলে জনসাধারণের মহানতুতি তাঁরা পাবেনই। কেন না, শিক্ষা সমস্যার দ্বারা বঙ্গবাসী প্রায় প্রতিটি মধ্যবিত্ত পরিবারই প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত।

এমতাবস্থায় ছাত্র আন্দোলনের পরিণাম খুব কঠিন হতে পারে।

স্মরণ্য মনে রাখা উচিত, এ সমস্যার আশু সমাধান দেশের সামনে আজ অন্যতর বড়ো প্রশ্ন।

পূর্বাঞ্চলীয় স্বাধীনতার বৈঠক

বৈঠক করে এতোদিনে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি সিদ্ধান্ত নিলেন, আরও কতক রাজী নই। রাজ্যগুলি থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে কেন্দ্র রাজ্যপাতি করবেন আর দুহাতে টাকা গুণে ককির হবেন রাজ্যগুলি, এ যুক্তি যে অযৌক্তিক—অকল্যাণ পূর্বাঞ্চলীয় মুখ্যমন্ত্রী মশেয়নে বিভিন্ন রাজ্য ডা অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলেছেন। হয়ত পরিকল্পনা কাশিমের উদ্দেশ্যে এতোটা দুর্বিনয়

আশা করেন নি। কিন্তু বার বেতে রাতে অর্ধমৃতও একসময় কানকণ্ঠে প্রতিবাদ করে (অবশ্য মৃতের কথা স্বতন্ত্র)।

প্রতিবাদী রাজ্যগুলি আগামী নির্বাচনের কথা সুবুদ্ধির সঙ্গেই মনে রেখেছেন। শুধু যে কেন্দ্রীয় প্রস্তাবের (রাজ্যগুলিকে পরিকল্পনা স্থাপনের জন্য স্ব-স্ব রাজ্যের পল্লী অঞ্চল থেকে নয়া করে চাপ দিয়ে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে) স্থাপ্যে জনসাধারণের ওপর অতিরিক্ত করের ঘোষার চাপও, তাই নয়, করদারপীড়িত পুর্বল মানুষ হয়ত বা আগামী নির্বাচনে লোজ। মরণ-কামড় দিয়ে বসবেন। রাজ্য সরকার চতুষ্টয় অতএব অতখানি চুঁকি নিতে গররাজি।

আর কেন্দ্রেরই বা এ কেমন আক্কেল, দুহাত ভরে নেয়ার কুটুন, কিন্তু একমুঠো দিতে হলোই ওজর-আপত্তি হিসেব-নিকেশ এবং গণ্ডা পরামর্শদান।

রাজ্যগুলিকে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি, সেচ-পরিকল্পনার উপকৃত অঞ্চলে ওপর কর বৃদ্ধি এবং পল্লী অঞ্চলে আয় বৃদ্ধির ওপর নতুন আয়কর চাপা-বার যে 'সাধু' পরামর্শ কমিশন দিয়েছিলেন, সাম্প্রতিক বৈঠক তা প্রকারান্তরে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

এটুকুর প্রয়োজন ছিল। বেঙ্গল বা নেন, তার তুলনায় রাজ্য যা পান এবং যে বৈষম্যনীতির মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তাতে মুখ বন্ধ করে থাকলে উত্তরোত্তর চাপট বৃদ্ধি পেত। তাছাড়া কেন্দ্রের এই কৃপণতা উত্তর-স্বাধীনতা যুগে দুর্বোধ্য। ইংরেজ আমলে না হয় উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক প্রশাসনের প্রতি দেশের লোককে বিরাগ করে তোলা ও তদ্বারা দেশীয় মন্ত্রীদের প্রতি জনসাধারণকে দূষিত করা। কিন্তু আজও সেট এক চাতুরী কেন? আজ সকল রাজ্যই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা (কেরালার ক্ষমতাও বাট্টিপত্তির হাতে) রাজ্য সরকারের

হাত সাধারণের বিরূপতায় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কি স্বতন্ত্রভাবে কোনো মুনাফা তুলতে পারবেন। তা যদি সম্ভব নয়, তখন রাজ্যগুলিকে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গকে বেকায়দায় ফেলে কোন রাজনৈতিক কায়দা দেখাবেন তাঁরা তা-ও বুদ্ধির অগম্য।

সুতরাং পূর্বাঞ্চলীয় কঠোরতায় বরং কেন্দ্রের অপর চক্ষু উন্মীলিত হওয়া উচিত।

পশ্চিম দিনাজপুর :

কাইলে উপেক্ষিত

পূর্বাঞ্চলীয়সম্মিত কৃষিপ্রধান পশ্চিম দিনাজপুরে উন্নয়নমূলক কাজের প্রচুর অবকাশ থাকা সত্ত্বেও সরকারী কাইলে এ জেলার বিষয় শোচনীয়ভাবে কেন যে উপেক্ষিত হয়ে আছে, স্থানীয় অধিবাসীদের মনে সে প্রশ্ন আলোড়িত হচ্ছে। সরকার বহু স্থানে বহু কিছু করছেন, উপেক্ষিতা পশ্চিম দিনাজপুর আশেপাশে তাকিয়ে তা শুধু লক্ষ্যই করে যাচ্ছে, উন্নয়নমূলক কাজের ছিটে-ফোঁটাও লভ্য হচ্ছে না তার নিজের কপালে। অথচ পশ্চিম দিনাজপুরের সম্ভাবনা আছে প্রচুর। আবাদ করলে সোনা ফলবে এখানে।

স্থানীয় জনৈক সংবাদদাতা জলপাইগুড়ির 'জনমত' পত্রিকায় যে বিস্তৃত বিবরণ উপহার দিয়েছেন, নিচে তারই হুবহু নকল তুলে পশ্চিম দিনাজপুরের সমস্যাবলীর প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরাও। আশা করা যায় এই অবহেলিত অঞ্চলের প্রতি সরকারী দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে অনতিবিলম্বে :

'দেশবিভাগের সময় বাংলাদেশের যে যে জেলার অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, দিনাজপুর তাদের মধ্যে একটি। জেলার সদর ও পূর্বভাগ পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আর পশ্চিমভাগ এসেছে পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত অংশের নাম হয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর। জেলার সদর বালুরঘাট, মহকুমা রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর। এ জেলায়

আয়তন দুহাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৩ লক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গের জেলার সদর শহরগুলির মধ্যে সব চাইতে দূরবস্থা হচ্ছে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সদর বালুরঘাট শহরের। বস্তুত একে যথার্থভাবে শহর বলা যায় কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সরকারের অবহেলা এ জাতীয় দূরবস্থার মূল কারণ। জাতীয় সড়ক বাদে কোন পাকা রাস্তা শহরে নেই। সম্প্রতি ১০-টি রাস্তা ইট দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। বালুরঘাট সার্বিকনামা শহর। ধূলা-বালি জলাকাদায় অপরিচ্ছন্নতায় এ শহর অনেক সময়ই বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে, অথচ আমরা জানি সামান্য মাত্র সরকারী কৃপাদৃষ্টিতে শহরের প্রভূত উন্নতি হতে পারে। আত্মীয়ের বাকি বাঁধ নিয়ে শহরকে রক্ষা করা হয়েছে। নদী ও খাড়ির মুখে সুইংস গোট করা হয়েছে।

খাদ্যভ্রমের অল্প মূল্য এবং সহজপ্রাপ্তির যে জ্ঞান বালুরঘাটের ছিল, বর্তমানে তা অবলুপ্ত। চীনা আক্রমণের পর এখানে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যাচ্ছে এবং জিনিসপত্র সহজে পাওয়া যায় না।

এ জেলার অন্যতম মহকুমা রায়গঞ্জ। রায়গঞ্জের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সরকারী দৃষ্টি পড়ে নি। এই জেলায় কোন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নেই। রায়গঞ্জে একটি প্রাইভেট কলেজ আছে। কিন্তু সরকারী সাহায্য সময় মত না আসায় শিক্ষকদের দুর্গতি হয়। রায়গঞ্জে পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠার অনুমোদন করা হয়েছে, জমিও সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু কাজের বিশেষ অগ্রগতি হয় নি। এখানে একদা জেলার সদর স্থাপনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জমি সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং আজ দুবছর হ'ল কোটি কোটি টাকা খরচ করে বড় বড় ওষ্টালিকা স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কোন

সাপ্তাহিক বসুমতী

গরকারী অফিস সেখানে নেওয়া হয় নি।
এত এত টাকা ব্যয়ে এই 'ইলাহি
কারবার' করবার কোন প্রয়োজন
ছিল কি ?

বিহার থেকে প্রাপ্ত ইসলামপুর এ

জেলার আর একটি মহকুমা। এত-
দিন পর্যন্ত ইসলামপুরে উন্নয়নমূলক
কোন কাজ করা হয় নি। সম্প্রতি
রাস্তাঘাট এবং শহর পরিকল্পনার কিছু
কিছু উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। এই

মহকুমা হাসপাতালের পরিকল্পনা
নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা এখনো
কার্যে পরিণত হয় নি।
পশ্চিম দিনাজপুর কৃষিনির্ভর
জেলা। এখানে ধান ও পাট



ভারত সরকারের রপ্তানি-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে
সুলেখাও নিরলস প্রচেষ্টায় তার রপ্তানি-বাণিজ্যের কর্মসূচী দ্রুত
সম্পন্ন করছে। নিকট এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে
রপ্তানি করা হাড়াও সম্প্রতি সুলেখা আই.এস.আই মান-অনুযায়ী
প্রায় ৪,০২,০০০ বোতল ফাউন্টেন পেন-এর কালি (ভজন প্রায়
১৩০ টন) বর্মার রপ্তানি করেছে। এসবট উল্লেখ্য, বর্মী সরকার
এ ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী টেণ্ডার আহ্বান করেন এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র,
পশ্চিম জার্মানী, চীন প্রভৃতি বহুদেশ এতে যোগ দেয়।
এই পরিপ্রেক্ষিতে সুলেখার লক্ষ্য অসাধারণ বলতে হবে।
আধুনিক ল্যাবরেটরীতে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে উৎপাদনের
প্রতি ভরে খুঁটিনাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করে সুলেখা উৎকর্ষের মান
অক্ষর রেখে চলেছে। তার ফলেই বিগত এক দশকেরও উপর
ভারতে সুলেখা কালি সর্বাধিক বিক্রয়ের সৌকর্য বহন করে চলেছে।
রপ্তানি-বাণিজ্যও উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করে সুলেখা জাতীয়
আর্থনৈতিক ক্রমোন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে কৃতসংকল্প।

সুলেখা-র
রপ্তানি বাণিজ্য
দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে..



সুলেখা কালি র-ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক
জাউন, জারোসেট, রেড ও গ্রীণ রঙে পাওয়া
যায় :

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

সুলেখা পার্ক • কলিকাতা-৩২ • ভারত

জন্মায়। এখান থেকে বাটতি অঞ্চলে চাল, পাটান হয়। এই জেলাকে 'উত্তরবঙ্গের শস্যভাণ্ডার' বলা যায়। কিন্তু আরো বঙ্গা উৎপাদনের জন্য সরকার থেকে কোন ব্যাংক স্থাপন করা হয় নি। উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণভাবে ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়। অথচ পশ্চিম দিনাজপুরে বহু নদীনালা নীচি-পুরকিনী আছে। মহানন্দা, পুনর্ভবা, চাঁকন, আশ্রয়ী, নাগর, গাঁজার, প্রভৃতি নদী। এ ছাড়া প্রায় সর্বত্র বড় বড় দীঘি আছে। কিন্তু কোন সেচ-পরিচালনা গ্রহণ করা হয় নি। দীঘিগুলিতে বঙ্গা চাষের উপযুক্ত ব্যবস্থা করলে তবু এই জেলা নয়, পার্শ্ববর্তী অনেক জেলার বঙ্গের অভাব পূরণ করা যাবে। এখানে শিল্পের প্রসারেরও সম্ভাবনা আছে। গজারামপুরে তাঁত বসানো হয়েছে, অনুকূলভাবে অন্যত্রও এই শিল্পের প্রসার ঘটানো যেতে পারে। এ ছাড়া চটশিল্পের সম্ভাবনাও এখানে আছে। পশ্চিম দিনাজপুরে চালি এবং ইটের কারখানা করা যেতে পারে। সোনাপুর, গোল-পুকুরি প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর জমি আছে—উচ্চ। করলে এখানে উদ্বাস্ত বসানো যায়।

এই জেলার সর্বত্র রেলপথ নেই—কলে পরিবহনের জন্য 'বাসের' ওপর নির্ভর করতে হয়। সরকারী এবং বেসরকারী বাস আছে। আরও অধিকসংখ্যক বাস চালু না হলে বাটীদের দুর্ভোগের শেষ হবে না। বাস চলচলের জন্য রাস্তাঘাটের যথাসময়ে সংস্কার সাধন প্রয়োজন। এ জেলায় অনেকগুলি হাট আছে কিন্তু সেগুলি সুপরিচালিতভাবে বসানো হয় নি। অধিকাংশ হাট রাস্তার ওপরেই বসে, ফলে বাস চলচলের অসুবিধা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। পশ্চিম দিনাজপুরে লক্ষা, পিঁয়াজ, পটল ও বেগুন প্রচুর পরিমাণে হয় এবং উত্তরবঙ্গ ছাড়াও বাসামে সেগুলি সরবরাহ হয়।

পুরাকীর্তির বেশ পশ্চিম দিনাজ-পুর। এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। বানগড়, তপনদীঘি, মহী-পালদীঘি প্রভৃতি স্থান আজ পর্যন্ত উপেক্ষিত অবস্থায় আছে। উপযুক্ত অনুসন্ধানের ফলে বাংলার অতীত ইতিহাসের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

হাওড়া :

বিশীর্ণ দামোদর

দুরন্ত দামোদরের সেই ছটো-পাটি আর নেই। দুকূল ছাপিয়ে তার কলোচ্ছ্বাস আর শোনা যাবে না। নেই সেই রাণী লাল জলের পূবন। যে পূবনে ভেসে আসিত পলিমাটির আশ্রবাদ। দুকূল সোনা ধানের শিখ।

ডি-ভি-সি'র শেকল তাকে বেঁধেছে বিশীর্ণ হয়েছে বন্দী দামোদরের ছটো-পুট শরীর। 'দামোদর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।' সঙ্গে সঙ্গে লবণাক্ত হয়ে উঠল গঙ্গা ও রূপনারায়ণ। চর আগছে এখন গঙ্গা-রূপনারায়ণের শীর্ণ স্রোতের বুকে। দামোদর শুকিয়েছে। অভিমানে মাটির বুকে তাই আর ফসলের সে ফলন নেই। বর্ষ হয়েছে মাটির সেই উবার উর্বরতা। কৃষিকর্মী বাড়বাড়ন্ত শ্যামপুর অঞ্চল থেকে বিদায় নিয়েছেন। কোথায় সেই গীতাংশল ধানের হরিবরণ রূপ। সব যেন ডি-ভি-সি'র ঔদ্ধত্যে মুখলুকিয়েছে একসঙ্গে। অথচ ডি-ভি-সি'র প্রতি-শ্রুতি পূর্ণ হ'ল কৈ?

দুর্গাপুর থেকে ত্রিবেণী পাক্সা ৮৪ মাইল খাল হা-হা করছে। টল-টলে জলে তার প্রতিশ্রুতির স্রোত ভো বয় নি। নাব্যও হয় নি দামোদর। জলই নেই তার নাব্যতার প্রণু, টাক মাথায় চিক্কণী।

সেচ-ব্যবস্থায়ও অভিজ্ঞমহলের সন্দেহ।

হাওড়া জেলার অনন্তপুরে বঙ্গীয় প্রজাতির সম্মেলনের সভায় বক্তৃতা প্রদে

অবুনা লুপ্ত 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরতনরশি চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত মর্মে ডি-ভি-সি পরিচালনা মণ্ডলকে উল্লিখিত মনোভাব পোষণ করেন। তিনি মনে করেন ডি-ভি-সি পরিচালনা মণ্ডলে আজ সংশয়ের যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে। হাওড়া জেলায় নদী-নালা খালবিলের চারদিকে সহস্র জেলেদের বসবাস। পরিচালনার ফলে তাদের জীবনে নেমেছে সর্বনাশের বর্ষণ। গঙ্গা ও রূপনারায়ণের লবণাক্ত জলে ইলিশের আনাগোনা নেই। তাই নৌকা তৈরির ব্যস্ততা নেই তাদের, জল বোনার সর্ধিকতা আছে শুধুনা দামোদরের বুকে মতোই হাহাকার।

ডি-ভি-সি'র জন্য দামোদরের এক অঞ্চল জলশূন্য, তবে কি সঞ্চিত জল অন্য অংশে চালা হতে পারে? এই মর্মেও দান্য বেঁধেছে। ডি-ভি-সি নির্মাণের পরও ব্যতীকাজ জলমগ্ন হত, এখনও সেই ভয় অপসারিত হয় নি। স্বয়ং নেহরুজীও এই জলমগ্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে এতদঞ্চলের জননিকাশের সমস্যা তাঁকেও ভাবিত করে।

নিম্ন দামোদর অঞ্চলকে অতএব রাষ্ট্রপ্রাণ থেকে বাঁচাতে হলে সম্পূর্ণ-ভাবে ব্যাপারটির পুনর্বিচার প্রয়োজন

ভ্রম সংশোধন

সবার অলঙ্কার—পৃষ্ঠা ৩৫৬, তারিখ ২-৭-৬৫, বৃহস্পতিবার—প্রথম কলামের প্রথম পংক্তি—খীরগঞ্জ ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে—বসবে এই পায়ের শেষে নতুন প্যারারূপে। অর্থস ও পর্যটক হবে—কিন্তু ভবী ভুলবার নয়—এই পংক্তির পরে। —সম্পাদিকা

এবং সম্ভাব্য সমস্ত রকম সুব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অনস্বীকার্য, সমষ্টির জন্য কতিপয়ের অসুবিধা যদি হয়, তবু তাই প্রেয়। কিন্তু যদি সেই কতিপয়ের সুব্যবস্থাও একটু সঙ্গে সম্ভবপর হয়, তবে সে চেষ্টা করা প্রেয়তর। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিতই উপযুক্ত বিবেচনাতে এ বিষয়ে যথা-কর্তব্য স্থির করবেন, কর্তৃপক্ষের কাছে এটুকু আশা ও দাবি ক্ষাতগ্রস্ত অঞ্চল রাখেতে পারে।

ধারে ধারে উঠে পড়লাম। আমার খসরুর সমাধির অদূরে শায়িতা গুরুপ্রিয়া জাহান্ন-আরা। অন্তিম শয্যার আবরণ শূন্য সবুজ তুণ। মাথার ওপরে সীমাহীন আকাশ।

আমার দীর্ঘ নীরবতার গাইড কি ভাবছিল জানি না। তবে পরিপার্শ্বেরও একটা প্রভাব আছে। ধ্যান-গম্ভীর দেউলে গাইড ছাড়া আর বিতীয় লোকটি ছিল না। অদূরে করিডোরে বসে আছে অসংখ্য তিথারীর দল। পরমেশ্বরের এতবড় তীর্থক্ষেত্রে এসেও সেই আকাশের চিলটার মতন দৃষ্টিটুকু যাদের বড়ই মীচে। দেখে অবাক হয়েছিলাম একজন বংগবাসিনী তিথারিণীও এদের সাথে কখন এসে মিলে গেছেন।

গাইডও তার নন্ স্টপ বজ্রতার রেল-গাড়ি এতক্ষণ থামিয়েছিল। দেখলাম সেও নিথর নিঃশব্দ। পরিপার্শ্ব মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে জানে। তার হাত থেকে ফুলের তোড়াটা নিয়ে নতজানু হয়ে প্রাণভরা ভক্তি নিবেদন করলাম মোগল সাম্রাজ্যের জন্দুরী কবি-রাজকন্যার স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

গাইড হঠাৎ নীরবতা ভাঙলো।

অতান্ত আন্তরিকতার সাথে বলল, জানো হুজুর কি লেখা আছে এই সৌধফলকে? নিজেই আবৃত্তি করল—

হু-আল্ হাই-আল্ কিউম্
বযাএর সবজা ন গোশদ কমে মজারই-মরা
কে কবর পোষ-ই ঘরবান্ হামী*
গিয়া বস্ অস্ত*।
হামী* গিয়া বস্ অস্ত*।

আল্-ফকীরা আল্-ফানীয়া জাহান্ন-আরা মুরীদ-ই-খাজগান-ই-বিশতী বিন্-ত-ই-শাহ জাহান বাদশাহ্ শাজী আনারুল্লা বহরান্-হু সনে ১০৯২। এ তো কোরাখ শরীফের বাণীর প্রতিধ্বনি! এ তো সম্মাসিনীর কথা। এ যে মীরার গানের প্রতিধ্বনি।

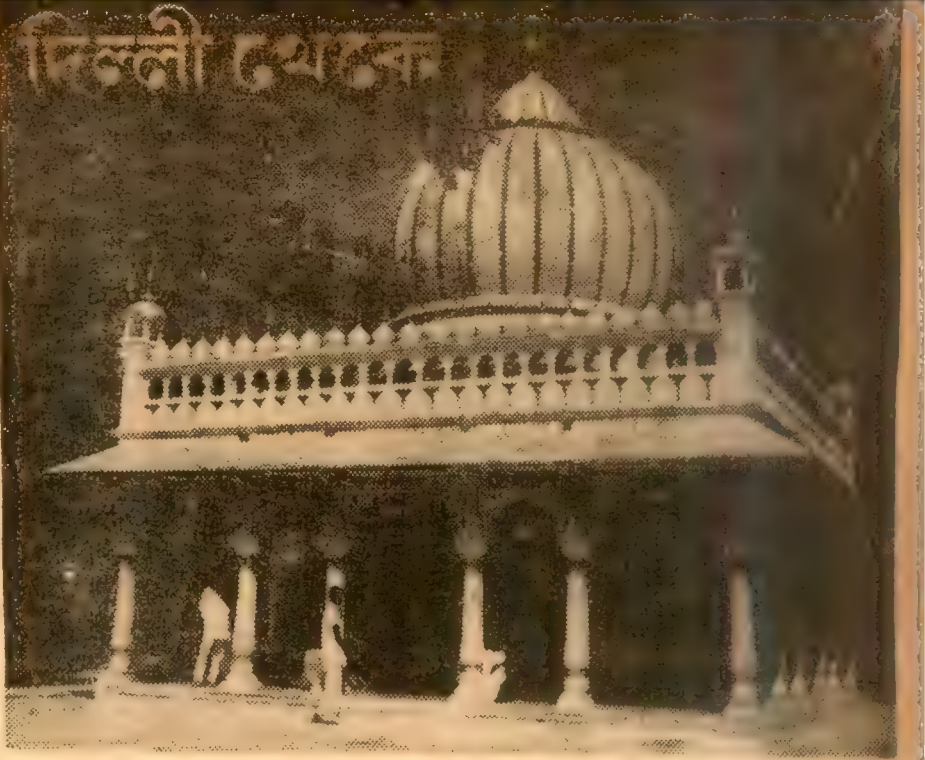
তিনিই জীবন্ত-আত্মসত্ত্ব।

আমার সমাধি তুণ ভিন্ন কোন বহুমূল্য আবরণে আবৃত করো না। দীন আত্মাদের গুণে এই সবুজ তুণই যথেষ্ট সমাধি-আবরণ। কেন এ অভিমান?

হিন্দুস্থানের আহিমাচল কুমারিকার সম্রাট শাহজাহান যে প্রিয় কন্যার অঙ্গুলি হেলনে পৃথিবীর বা কিছু করতে পারেন, করতে পারেন—কেন তাঁর এ যোগিনী বেশ? সম্রাট-দুর্হিতাই নই, প্রধান পরিচর যে চিন্তিত সাধুদের শিষ্য। কবি। ফকীরা। দীনা সম্মাসিনী।

সাথের গাইডটিও আমার সাথে সাথে নতজানু হয়ে অশ্রু-সজল-নয়নে প্রণতি জানাল দিল্লীর মীরাকে।

মীরার জীবন তোমাকে এতই মোহিত করেছিল কি?



হজরত নিজামুদ্দীনের সমাধি

দিল্লীর রাজপথে মুসলিম ফকীর মীরার ভজন গেয়ে একাধিকবার রাজকন্যার হাত থেকে পেয়েছে অকুপণ ভিক্ষা। দিল্লীর ইতিহাস এ কাহিনী সগৌরবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে।

এ অভিমানের উৎস কোথায়?

সে যুগের রাজকোষের পূর্ণ ভান্ডার বার হাতের মুঠোর, ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে সমগ্র হিন্দুস্থানে অশ্বিত্যীয়া সম্রাট-কন্যার এ অভিমান কেন?

কবির দল বার বদনায় ব্যস্ত, সম্রাট বার মুখের হাসিটুকুর জন্য পাগল—তাঁর এ অভিমান কেন?

পোড়া প্রেমই যে সব কিছু নিড়ে শেষ

প্রীতিবিরহের স্তোত্র

কবে নিল। একটি হৃদয়। দুটি চোখ। একটি দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতেই এ হৃদয় উজাড় হয়ে পেল। কেউ জানলো না। সে চোখ দুটোও নয়।

হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় সাড়া দিল না। সাতরাজার ধনে যে দর্শন কেনা যায় না রাজকন্যার প্রেমানলের বজ্রে তুমি সে সত্যটুকুর সন্ধান পেলে কি?

মৃত মানুসই একমাত্র শান্তির অধিকারী, এ তথ্যটুকু আবিষ্কার করলে কোন্ তপস্যার বলে?

প্রিয়-বিরহের অভিমান, তপ্তকাণ্ডন কোমল মুখখানার মেখে দিয়েছে যেন মৃদু লজ্জা। গোপন প্রেমের সরসরক্তরাগ-রঞ্জিত জাহান্ন-আরার রূপখানা দেখেছেন কেউ?

অর্থ যে পেয়েছে শূন্য সেই বলতে পারে

অর্থই অনর্থের মূল। কিন্তু প্রেম? যে হৃদয় জীবনে পায় নি প্রিয়সাধীর কোমল পরশ সে জীবনের দাম কতটুকু?

ভুবন-ভোলানো রূপ নিয়ে সর্বস্বতীর মানসকন্যা জাহান্ন-আরা বেগম সমস্ত জীবনে একটিমাত্র জীবনসাধীকে পাশে দাঁড়ি করতে ব্যর্থ হলো।

অদূরে সাইপ্রাসবীথির দিকে চোখ পড়ে। সেখানে সাধারণ বিহঙ্গকুলও একাকী জীবন কাটার না। আত্মকুঞ্জের নব-পরিবৃত শাখার বসে যে পাখিরা মন কেড়ে নেয় আকুল ডাকে, তারও একটা সাথী আছে। প্রাসাদের কোলের কপোতটিকে প্রতিদিন দেখা যায় কপোতের মৃদু বক্ষপাশে। পিয়াল তরুণিকে জড়িয়ে উঠেছে মাধবীলতা। সাথী নেই শূন্য একটি জীবনের—জাহান্ন-আরা বেগম পায় নি একটি জীবনসাথী।

পৃথিবীর ইতিহাসে যত বিশেষকন্যাই বৃত্ত করুক না কেন, একটি নারীজীবন কোনদিনই তোমাকে ক্ষমা করবে না মহানুভব সম্রাট আকবর! আইন লিপিবদ্ধ করার শক্তি তোমার ছিল না। যে আইনটুকু দিয়ে মোগল বাদশা বেগমের পাণিগ্রহণ বন্ধ করে কোমল জীবনে লোল বিধে গেছে, তার কাছে নেই কোন ক্ষমা।

রাজ্য জয়ের মন্ত উল্লাসে শূন্য সাম্রাজ্যের ম্বনই দেখেছে। তাই সে সাম্রাজ্য ভাঙবার পথে, বাধা দিতে খেলেছে এই চাতুরী। হৃদয় জয়ের কতটুকু ম্বাদ তুমি পেয়েছো?

শূন্য দুটি চোখ। ম্বনোজ্জ্বল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ নিজের অজানাতেই রাজকন্যার হৃদয়ডালি রিক্ত করে চলে গেল।

মার পদার্থ

হুমায়ূন

মার পদার্থ জেনে বসে আছি
প্রেম দেখে রূপ সব স্নেহ মাটি
ভেবে হলে খেলা কড়ি কানামাছি
আগুনে জ্বলবে শব্দে পাকিটি,
বসন্ত হলে বসন্ত কান
রূপের বাগানে কুসিত কড়াই
জগা মৃৎময় লাগে করিমানা
অসম্মত নের তুলে মটো মটো;

শব্দের মত শব্দ কে আরে
ঠম জোড়ের আশা ও ভরসা
জুর নিয়তির নিশ্চিত ছাঁচে
কোটি কপালের অন্ধ কি কঙ্ক
লাগিয়ে কাঁপিয়ে কিছই কি হয়
ভবভাষাবাদ, পড়লেন কাটা
চলন্ত স্টেনে, টাকা লাখ ছয়
এক মটো ছাই, আর কিছ নয়

মার পদার্থ জেনে বসে আছি
বাইরের সাথে বীন চাষাভুষে,
খানিক শব্দনের শব্দ কাছাকাছি
মুখেরা করে মিছে কানামায়ে।

হুমায়ূনের বিনিময়ে চেয়েছিল হুমর।
জগতবাসীর পরিবর্তে ভালবাসা। এ প্রেম তো
অপরিণত যোড়শীর ইঠাৎ-সজানো প্রেম নয়।
এ যে শব্দন্তলার প্রথম দর্শনের প্রেমমহুতি
—মাত্ এ্যাট্ ফল্ট্ সাইট্।

নব শ্যামল তপনল মৃদু বাতাসে হেল-
তুলে দুরাগত অতিথিকে যেন আদাব্ পেশ
করলে। শব্দ্য থেকে মৃদু গম্ব ভরা বাতাসে
জ্বলে এলো যেন কার মৃদু কণ্ঠ, 'একমাত্র
তুমিই হবে আমার সমাধি-আবরণ। যদি
তখনও কোন নিষ্ঠুর চরণাঘাতে সে তৃণ
লিগত হয় সে তৃণ আমার নবজন্ম নেবে।'

ফকীরা জাহান্-আরা ভূমি কি সত্যিই
বিশ্বাস করে বিধাতা পদদলিতদের কোলে
তুলে নেন?

মন প্রাণ শরীর অংশ করেছিল যে
স্বপ্নার পায়ে, সে তোমাকে গ্রহণ করে ধন্য হলো
স্ব কেন? আকাশে বাতাসে যেন শোনা যায়
তার চাপা ক্রন্দনধ্বনি। এ ধ্বনির ইতিগতটুকু
ধরায় শক্তি আছে কখনো? প্রেমে যে পড়ে
নি সে কি করে বুঝবে এর দহনজ্বালা?

একদিকে সঙ্গারী হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্য-
বিভব, প্রতাপ, শক্তি, অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত
মন-মাতানো যৌবন। সে যৌবনে লেগেছে
ক্ষীণ সমীরণের ছোঁয়া। অশোক, মাধবী,
আলমবউলের গম্ব-মদিরার মৃদু স্পর্শ।
কোকিলের কুহু ডাকে নববসন্তের আবির্ভাব
এই ছোট জীবনে কেন এ অকারণ চঞ্চলতা?
অপরদিকে শব্দ, শব্দ্য হুমর!

সমগ্র বিশ্বে একমাত্র সম্রাট-দুহিতাই
হুমায়ূন জেনেছিলেন এ শব্দের ভুবনে জীবনের

প্রকৃত সূক্ষের সম্মানে চাই না মন, চাই না
শান, চাই শব্দ একটি জিনিস। তার নাম
জান্-হুমর। যে হুমর এত কাছে থেকেও
বরা দেয় নি।

দীর্ঘ বিনিময়-রজনীতে তারকা-খচিত
আকাশের দিকে তাকিয়ে সম্রাটকন্যা জাহান্-
আরা সৈনিক বীর প্রতীকার প্রহর গুণছিলেন
সেটি ছিল শব্দ্য একটি অতি সাধারণ পুরুষ-
মন! সাধারণ হলেও যেন অসাধারণ। বরা-
ছোঁয়ার বাইরে—শব্দ্য তাঁর বন্ধকটিন, ধারালো
পোরোষে।

দিল্লীম্বর সম্রাট-দুহিতার সৈনিকদের
গোপন বেদনার কাহিনীটুকুই হয়ে থাক
বিশ্বের বিরহীনার চির সান্ন্য।

কে যেন দূর থেকে গান গেয়ে উঠলো,
“আমার হুমর তোমার আপন হাতে দেলাও।”
চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক অপরূপ
দৃশ্য। স্বর্ণালংকার ছেড়ে অপরূপ লাবণ্যজটিল
ফুলের অলংকারে সুসজ্জিতা একটি হাসি মৃদু
ইঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো। পাশে পড়ে
করবী, সবুজ অভসী, যুধিকা, চামেলীর
হার।

প্রথম দর্শনের প্রেম! এতদিনের মকুলিত
যৌবন, এতদিনের মত্তে লালিত সৌন্দর্য-
সম্ভার, একটি সবুজ-হৃদয় যেন অনায়াসে সদা-
প্রস্তুতি একটি গোলাপ, বীর পাদপদ্মে
জাহান্-আরা সঁপে দিলেন সম্পূর্ণভাবে তাঁর
অজানায় তিনি তখন কোন জগতে? মন
তাঁর তখন যেন মেঘের সঙ্গী। হূরে বহু
দূরে। প্রাণ মন দিয়ে নবাগত অতিথি তখন
গেয়ে চলেছেন হীরার ডলন।

রাজধানী দিল্লীর দেওয়ান্-ই-আদে
প্রতিদিনই হয়ে থাকে সঙ্গীতের আয়োজন।
দেশ বিদেশ থেকে আসেন গুপীমানী শিল্পি-
বৃন্দ। হিন্দুস্থানের শাহানুশা বাদশ্য
সঙ্গীতের গুপগাহী। তিনি তাঁদের জানাল
সামর সম্ভাষণ। মোগল সম্রাটদের সঙ্গীত-
প্রিয়তা প্রবাদবাক্যের মতন সর্বজন-পরিচিত।
শব্দ্যই কি শাহ-জাহান? সম্রাট আকবর থেকে
শব্দ্য করে বাহাদুর শাহ জাফর সাহেব সবাই
রূপাশনের প্রাপ্তি দূর করতেন সঙ্গীতের
মধুর লহরীতে। মনে পড়ে গোয়ালিরয়ের
সেই বিখ্যাত গায়কের সুর-মুছনা? যে
সঙ্গীতের আগুনই তাঁকে শেষ করে দিল।

আজকের এ গান কেন রাজকন্যার কাছে
প্রবেশ করলো? এ গান যে মরমে প্রবেশ
করে প্রাণ আকুল করে দিল। এ আগুন যে
তাঁর সমস্ত জীবন মধুর দহনে জ্বালালো।
কোথায় সুখ, গুরু, কান্ট অনূজ শুবরাজ
দারা বীর কাছে মৃহুতের জন্য প্রাণখুলে
দুটো মনের কথা বলে প্রাণ খুলে হাসি ছেড়ে
জীবনটা বাঁচে? শুবরাজ নিশ্চয়ই জানবেন
শিরশ্রাণ পরিহিত উজ্জ্বল গৌরিকান্ত
গায়কের নাম।

এ বিরাট প্রাসাদে এ গোপন কথাটুকু
জানবার একটা প্রাণীও আর নেই।

অদূরে যমুনার তরঙ্গমালা নেচে উঠলো
রাজপ্রাসাদের নহবতের তালে তালে।

সানাই-এর বাঁশীর তালে তালে নেচে
ওঠে প্রাসাদের সুন্দরীর দল। তাঁদের নশুর
নিঃক্ষেপ সমস্ত চাঁদনীচক চাকিত হয়ে ওঠে।

—সমগ্র—



ভেক্টর ভেক্টর

১৭/১১/৬৬

২/১২/৬৬

চরিত্র স্কয়ারের পার্কের একটা বেকির ওপর বসে আমি ও বেস্টেক স্মৃতি-দুঃখের গল্প করছিলাম। বেস্টেক ছিল একটা নাছির সার্কাসের মালিক। বেচারার রীতিমত মনোহর হয়ে গেখানে বসে কেবল বকবক করে যাচ্ছিল। হায়, নাছিরগুলোকে আর বাগে আনা যাবে না। এই তো কিছুদিন আগে তার পোষ মানানো নাছির অদ্ভুত কলাকৌশল দেখানো সার্কাস এক বৃহৎ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। এক দাতাল দর্শকের ব্যাপারটা কিছুতেই তার মস্তিষ্কে বোধগম্য হচ্ছিল না বলে সে চোঁচিয়ে উঠল, এয়াই, এটা একটা জুরাচ্চুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। মাতালটা ভেবেও দেখলো না তার অনুমান সত্য কি অসত্য। এবং এ ধারণার স্থবর্তী হয়ে সে কাচের বাস্কটাকে এক ঘূর্ণিতে ভেঙে দিল। ফলে সেই নেকহারার পোষ-মানানো নাছিরগুলো নিজেদের স্বাধীন অবস্থা বুঝে উড়ে যেতে আর বিশ্রুতা দ্বিধা করল না। নাছিরগুলোকেও আর কোনোদিন অতি ক্ষুদ্র কাগজের গাড়ি টানতে হল না। কেবলমাত্র একটা পুরুষ নাছির মৃতদেহ কাচের বাস্কের ভেলায় লেপেট রইল। এই নাছিরটিই বলতে গেলে, সমস্ত সার্কাসটার প্রাণস্বরূপ ছিল। এই নাছিরটিই একমাত্র প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিল বলে বেস্টেক তাকে যথার্থই ভালবাসতে শুরু করেছিল। আদর করে নাম দিয়েছিল সে—জাকি। জাকির মৃতদেহকে সে একটা আতস কাচ দিয়ে সজ্জাকরণ করেছিল। বলা বাহুল্য বেচারার একটা ঠ্যাংকে সে দেখতে পাচ্ছিল না।

অবিশ্যি সেটাই ছিল সমস্ত সার্কাসের আলগল গোপনীয় কথা। বেস্টেক সব নাছিরদেরই একটা করে ঠ্যাং ভুলে নিত। ফলে নাছিরগুলো খুব বেশি উঁচুতে হঠাৎ হঠাৎ নাকিয়ে ইচ্ছেমত খেলাটা নষ্ট করে দিতে পারত না। আর একটা নাছির, যার সব পাগুলো ভেঙে গেছিল সে-ই কেবল মৃত শিল্পীটির পাশাপাশি অহায়ভাবে শুয়েছিল। 'প্রথমে ভেবেছিলাম, দীর্ঘশ্বাস কেনল বেস্টেক, 'তাকে আমি আরোগ্য করতে পারবো। কিন্তু যেভাবে পিলি দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ল যে আমি শেষে নিরাশ হয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দিলাম।'

কিছুক্ষণ বেস্টেক পিলি আর জাকির পরস্পরের প্রতি ভালবাসার কাহিনী বর্ণনা করল। পিলি কিভাবে সমস্ত দলটাকে নিয়ে নাচত ফলে অন্যান্যরা তাকে কিরকর প্রশংসা করত ইত্যাদি ইত্যাদি।

'জীবনে আর কোনোদিন আমি এরকম বুদ্ধিমান প্রাণী দেখতে পাব না। কেন না দেখতেই তো পাচ্ছো এখনকার যুগের নাছিরগুলো একেবারেই গবেট। এরা নতুন কোনো কিছুই গ্রহণ করতে পারেনা। এই ভেসেদিন পালের এক দুঃস্থ বাড়ি গিয়ে এক বোতল নাছির ধরে নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু একটাও কাজের উপযোগী নয়। তারপর গেলাম পুলিশের হেড কোয়ার্টারে, অনাধ শিবদের আশ্রয় 'হ্যাপি হোমে', রিকর্ড স্কুলে, চিড়ি নাছির দোকানে, হোটেলগুলোতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বেরেঘের উচ্চ বিদ্যালয়ে, কারুশিল্প সমিতিতে,

কনডেপ্টগুলিতে এবং শানা রকম ব্যারাকে— কিন্তু হায়, সব জায়গার নাছিরগুলোই এক রকম। অবিশ্যি সবগুলিই যে একেবারে অপদার্ব ছিল তা নয়। এদের মধ্যে দু-তিনটিকে যথার্থই প্রতিভাবান বলা যেতে পারে। তারা কোনো অবস্থাতেই অলস নয়। কিন্তু প্রাণালীক জীবনযাপনে তারাও তেমন উৎসাহ দেখাল না। এই নয়া জমানার একটা নাছির জাকি কিয় পিলির মত হতে পারবে না। ভাষা দ্বিধা ওদের মূল্যায়ন হয় না। আমরা কেবল তাদের শ্রদ্ধা আর প্রশংসাই জানাতে পারি।'

আবার সেই নীরবতা এবং বিদ্যমান অনুভূতি আমাদের দুজনকেই আচ্ছন্ন করে রাখল। আমার চোখের সামনে যেন সেটে বেড়াতে লাগল সেই বিজয়ী নাছির সার্কাসের পরিভ্রম। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বোরাজিয়া, বোহিমিয়া পরিক্রমাকালে আমরা হালেকী থেকে বহিষ্কৃত হলাম। কেন না পুলিশের অভিযোগ ছিল যে, আমাদের নাছির সার্কাসটা স্লাভ জাতি সংযুক্তিকরণ প্রচারণার এক গোপনীয় প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়।

বোরাজিয়ার কিছু কিছু অংশে পাশ্চাত্য ভাদের যথাসম্ভব শক্তি দিয়ে জনসাধারণকে আমাদের সার্কাস দেখানো থেকে দূরে রেখেছে। হলস্টাইনে যখন আমি এক পাশ্চাত্যকে আমাদের এই সার্কাস দেখবার আমন্ত্রণ জানালাম, তিনি আমাকে বললেন, 'দ্যাখো, আমি তোমাদের এই খেলাকে অনুবোধন করতে পারি না। তোমরা যা করছো তাতে উত্তরবাসের আশীর্বাদ পাবে

সাপ্তাহিক বঙ্গমতা

জ্ঞান কেন না বাহিনীর কল্যাণে করা নিয়ম-বিকল্প। বোধহয় জানেন, নব্যযুগে এ্যানশুস নামে এক পাত্রী (ইতিহাসের পাত্রী তিনি এখন একজন প্রচ্ছন্ন অবতার বিশেষ) তাঁর মঠের খাতাতে লিখে গিয়েছেন যে, যেসব মাছি সন্ন্যাসীদের রক্তিতে কামড়ে বিরক্ত উৎপাদন করে থাকতে দায় না তারা শুধু একখাই প্রমাণ করে যে, ভগবানকে দিব্যরাত্রি বন্যবাদ জানানোর মত মহৎ কাজ সেন আসন্ন মুহূর্তের জন্যেও ভুলে না যাই।

আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি তাহলে মাছদের পবিত্র প্রাণী মনে করেন? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে একটা দানী কথা আমার কাছ থেকে জেনে নিন। আমাদের সার্কালে এই মাছদেরই পূর্বপুরুষেরা সেই গোল্লালঘরে শিশু যিস্তকে কামড়েছিল।'

সেইসময় ধর্মপ্রচারকটির সাথে আমার প্রবল বাকবিতণ্ডা হয় এবং আমি রেগে গিয়ে তার কানের ওপর একটা ঝুঁচি চানিয়ে দিই। শেষ পর্যন্ত সেই জায়গাটা আমাদের ছেড়ে আসতে হয়েছিল। কারণ সেই পাত্রীটি সমস্ত দেশকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল।

আমি স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করছিলাম। মেটেক নীরবতা ভেঙে আবার শুরু করল, 'যদি কোনো লোক ধৈর্যশীল এবং অমায়িক হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই মানুষের বোকামিকে ভাঙিয়ে খেতে পারবে। সব মানুষেরই কোনো না কোনো একটা বিশেষ বিষয়ের প্রতি ভিত্তিকা থাকা উচিত, তাহলেই সে তার জীবনযাত্রা করতে পারে। বিষয়টা যাই হোক না কেন। যেমন ধরো কেউ একটা বসে-থাকা হাঁস আঁকল, কিন্তু আহল বধা হচ্ছে যারা ছবিটার দর্শক তাদের যেন-তেন-প্রকারেণ উপায়ে বোঝানো যে ওটা মোটেই কোনো হাঁস নয় ওটা একটা জাগুয়ার। প্রথমটায় যদিও কেউ তা বিশ্বাস করবে না কিন্তু দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বারে এর গভ্যতা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। --- আসলে কি জানো, লোকেরা নির্বোধ।'

মেটেক তার দার্শনিক তত্ত্ব আউড়ে ফেলল। 'তোমার পরিকল্পনা' যতই বোকামি পূর্ণ নিব্বাসের হবে ততই চিন্তাশীল লোকেরা চাদের পকেট উজাড় করে তা দেখতে আসবে। তোমাকে সবসময়ই নতুন নতুন অভ্যাস চমকের কথা ভাবতে হবে তাহলেই কেহা কতে। 'কি বলো, এয়া?'

আমি বললাম, 'দ্যাখো, আমার মনে হয় পৃথিবীতে সব কম লোকই আছে যারা প্রকৃতই নিজস্ব বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়। যাদের বিশেষ কোনো চিন্তাবাদ আছে, হৃদয়ের বিষয়, যা এসব দেখতে আসে না। যারা আমাদের

এসব দেখতে আসে তাদের একটা বঙ্গব্দন ধারণা আছে যে, যা আমরা প্রচারপত্রে লিখি তাই দেখাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা তোমার কি মনে আছে বোধশব্দে গ্রামে আমরা একটা বাস্তুকে ধরেছিলাম? সেটাকে আমরা অস্ট্রেলিয়ার এক উচ্চ গিরিগিটি বলে চালিয়ে দিই নি কি? অথচ দ্যাখো, মূর্খ দর্শকেরা সব পকেট উজাড় করে তা দেখতে এসেছিল। কিংবা ধর সেই উচ্চ প্রচারণা? কি, না? ভারতবর্ষের ব্রিটিশ ভাইসরয় যে অজগর সাপের ফাঁসে শূন্যরুদ্ধ হয়ে মারা গেছিলেন সেই গরীমূপটিকে জীবন্ত দেখানো হচ্ছে। অথচ ব্যাপারটা কি? ওটা একেবারেই নিরুজীব, নিবিধ ব্যাপারটা কি? ওটা একেবারেই নিরুজীব, নিবিধ একটি সাধারণ সাপ। এই প্রচারের কলেই আমাদের বঙ্গ অফিসের কাছে লোকেরা টিকিটের জন্য মারামারি লাগিয়ে দিয়েছিল। অথবা মনে পড়ে সেই যে বাচ্চা জো ড্যানকে ওরাং-ওটাং-এর খোলস পরিয়ে বোনিও জঙ্গল থেকে গদ্য শ্রুত বলে চালিয়েছিলাম।'

'ওং, সেই ক্ষুদ্রে বঙ্গমণ্ডলীর কথা আর বলো না। খেলা শুরু হবার আগেই বাটা সর্বদা বিচলিত করত তার পাণ্ডনাগণ্ডা নিয়ে। প্রায়ই শাস্ত কড়ি জাউন না দিলে সে আর ওরাং-ওটাং-এর ভূমিকায় নামবে না। অথচ তুমি তো জানো আমি তার থাকা-বাড়ী ক্রি করে দিয়েছিলাম। এ ছাড়াও দর্শকেরা যেসব কলবুল তার খাঁচায় ছুড়ে মারত সেগুলোকেও সে বিক্রি করত একটা মূদীর বোকামি। এসব কারণে আমি কখনই তার বেশি মাইনে অনুমোদন করি নি। খেলা আরম্ভ হবার মধ্যখানেই ছোকরা ধৈর্য হারাতে। ফলে কিসের গান-ই না গাইতে বিভ্রিভ করে।

-----তুমি যাও উপরে
----আমি যাব নীচতে

আচ্ছা হা গানের ছিরি দ্যাখো। উচ্চ ভগবান, সর্বমুখ কি আভ্যন্তরীণ না রাখত হারামজাদা। যেন একটা পাপিলা গারদ। শুধু ওই ক্ষুদ্রে শয়তানটার জন্যেই টেবল নগরী আমাদের জন্যে নির্মিত হয়ে গেল। তবে কি, একটা ব্যাপারে কিন্তু আমরা সফল হয়েছিলাম। সেই যে কিং 'তৃতীয় রিচার্ডের' মমি বলে একতাল লোভনীয় শুকনো ডেড়ার মাংসপিণ্ড দেখিয়ে মূর্খগুলোকে আমরা বোঁকা দিলাম। আহাশব্দগুলোর এই বোঁকাবাজী ধরতে ছ'মাস সময় লাগল। ইত্যবসরে আমরা বেশ কামিয়ে নিয়েছিলাম। ওং, আমার মনে আছে তুমি ইতিহাসের প্রাজ্ঞ হংসদের মত কি অকৃতভায়েই না বলতে, ভ্রমবহিলা ও মহোদয়গণ, আপনাদের সামনে এখনকার এই অতীব নিরীহ লোকটাই একদা প্রেইতম ভয়ঙ্কর অত্যাচারীরূপে ইতিহাসে তার নামকে স্মরণীয় করে গেছে। এই লোকটি

এর জীবনকাল এমনভাবে মানুষহত্যা করেছিল যে রক্তশোত তার হাঁটু পর্যন্ত বয়ে গিয়েছিল। এই নীচ লোকটি হত্যা ছাড়াও অন্যায় নানাবিধ পাপকার্যে লিপ্ত ছিল। এমন কি পেত্রপীয়র নিকটে একসময় এই নোংরা দানবের রক্তত্যাগে মেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছিলেন। স্মরণীয় মহিলা ও মহোদয়গণ, বর্তমানে মমিতে পরিণত ইতিহাসের এই অমূল্য উপাদান আপনাদের পদতলে সেখানে পেরে আমি গর্ব বোধ করছি।'

---আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'তারপর ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার তৃতীয় রিচার্ডকে বাজেরাও করে নিয়ে গেল।'

'তা হোক। এ থেকে কি প্রমাণিত হবে না যে এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব? এমন। আমি রাজী নড়তেও রাজী যে পৃথিবী অর্বেক লোকই এই জয়াক্রী করে বেঁচে আছে। আজকাল এসব নির্ভর করে শুধু নতুন নতুন উদ্ভট জিনিস দেখিয়ে লোককে হতবাক করে দেওয়ার ওপর। লোকেরা কি চায় বলবে পারো? লেফ উত্তেজনা। এবং ভাবছি তাই আমি তাদের দেখাবো।'

'একটু ধানো তো। তুমি যেন কি বলছিলে? মানুষগুলোকে যে কোনো কিছু দেখালেই কেহা কতে। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি এসেছে। আচ্ছা, দর্শকদের একদম কিছু না দেখালেই বা কেমন হয়, এ'য়া?' হাতের ছড়ি দিয়ে মাটি ঘাঁটা বন্ধ করে আমি সোলাসে বলে উঠলাম।

'একদম কিছু না দেখানোটাই বা আমার কি রকম? না, না---অন্ততপক্ষে একটা ছোট পাখর হলেও তাদের দেখানো উচিত।' সেটেক বৃণ আপত্তি জানাল।

'উ'হঁ, একটা নুড়িও নয়। তুমি বহুত একত্রে। তোমার পুরোনো রীতি-পদ্ধতি ছাড়া তো এবার। আমি যা বলছি ঠিক তাই করতে হবে। আর সেটাই হবে আসল চমক। তুমি কি না বলছিলে? অন্ততপক্ষে একটা ছোট পাখর দেখানো হোক। না? সেসব তো পুরোনো পদ্ধতি। সেসব তো হচ্ছে করলেই বলা যায়, বহুগুণ যে পাখরটিকে আপনারা অতি সাধারণ ভাবছেন আসলে মোটেই ওটা ত নয়। এটা মঙ্গলগ্রহ থেকে ছিটকে আসা অনূয়া এক বৈজ্ঞানিক উপাদান। কিন্তু এসব বলতে কি খুব লাভ হবে বন্ধ! উঁ---হঁ। বরং যদি তারা কিছুই দেখতে না পায় তাহলে তারা আরো চমৎকৃত হবে। বিশেষ না হলে, দ্যাখো।'

আমি আমার হাতের ছড়ি দিয়ে মাটিতে এঁকে আমার পরিকল্পনা তাকে বোঝাতে লাগলাম বৈজ্ঞানিকদের মত। 'আমাদের মরটা হবে বুহৎ গোলাকৃতি। সেখানে কোনো

প্রাণীনা বা জানে কোনোরকম ক্রোধ থাকবে না। অর্থাৎ ভেতরটা হবে নিকব পিচ্চকালো অন্ধকারময়। আর দরজা থাকবে বাত দুলে। একটা চুকবার অন্যটা বেরিয়ে যাবার। দরজাগুলোর বুধে ভারী কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে। দরজার ওপরে আলুর বড় বড় হরকে এই কথাগুলো লিখে দেবো---

“পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ এক অবিস্মরণীয় বৃহত্ত। এ-সুযোগ হেলায় হারাবেন না। এটা মেখে আপনারা হতভাক হয়ে যাবেন। আঠারো বছরের অনূর্ধ্ব লোকদের প্রবেশ-অনুত্তর দেয়া হয় না। মহিলা ও ছোট ছেলেমেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র সৈন্য বিভাগের লোকের টিকিটের দামের ওপরে ৫০% সুবিধে দেয়া হবে।”

--তারপর ধর, দর্শকেরা শুধু এক-একজন করে ঢুকতে পারবে। আমি থাকব প্রবেশ-পারে দর্পনী আদায় করতে আর তুমি এই অন্ধকারে ধা ঢাকা দিয়ে বাপটি বেরে থাকবে। ঠিক যেই হতে কেউ ভেতরে ঢুকবে তৎক্ষণাৎ তুমি, লোকটি কিছু বুঝবার আগেই একহাতে প্যাণ্টলিন, অন্য হাতে হাড়ের কলার ধরে নিজস্বপন্থে পথ দিয়ে সজোরে ছুড়ে ফেল দেবে। অবশ্য এর জন্যে টিকিটের দাম আমরা বশান্তব করবো না। দ্যাখো না, এ খেলাটা কি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আমি বাজী রাখতে পারি যে, কেউ এ খেলার বিশুদ্ধাৎ মুগ্ধিত হবে না। আমরা যে এ বিষয়ে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করব তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। কেন না প্রত্যেক মানুষই হল কমবেশি হিংস্রক। আর সেই হিসেব বশবর্তী হয়েই তারা অন্যের কড়িটাই কান্দা করে। মেখে বাবা বেরিয়ে আসবে ঠিক তারাই অন্যান্যদের প্ররোচিত করবে এই ‘অনূর্ধ্ব খেলার’ সুযোগ না হারাতে। তাই হই হবে আমাদের আসল নিজাপন বা প্রচরক। ব্যাপারটা বুঝলে কি না, পুরোটা হই গিয়ে অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার।’

মেস্টেক তবু ইতস্তত করছিল। কিন্তু একেবারেই কিছু না দেখানো---সেটা-- সে তার বিবেকের সাথ পাচ্ছিল না। ‘আচ্ছা আহাঙ্কগুলোকে তাঁবুতে ঢুকিয়ে একটা করে চাকু বেরে আরো স্তম্ভিত করে দেওয়া হই চলে নর কি?’

বলা বাহুল্য আমি এর বিরুদ্ধে। কারণ এ-ব্যাপারটা তো আর অনেককণ করে চলতে পারে না। মানুষগুলো খেলাটা দেখবার জন্যে অধৈর্য হয়ে ভাঁতোভতি করতে থাকবে। আমার ভো মনে হয় পৃথিবীর কোনো মানুষকেই তার ইচ্ছার পূর্ণতা দেওয়া যায় না। আমরা

বিস্ময় তাদের দেখান বলে কথা বিরোধিতা রাখতে চেষ্টার কল্পন করা না। কিছু বেশি না কিছু কমও নয়। শুধু চমক। বলে আমরা জুগোচ্চরী করছি একথাও কেউ বলতে পারবে না।’

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত দিন এল। জারনাটা আমরা পছন্দ করলাম বেনেসভ নগরীতে। কেন না তার নিকটেই সৈন্যবিভাগের এক অস্থায়ী প্রকাণ্ড ডাউনি পড়েছিল। এবং লোকদেরও তাদের প্রতি এক উৎস্রুকা ছিল। আমাদের তাঁবু পড়ল তার কাছেই আর পোষ্টারে পোষ্টারে আমরা ছেলে কেলার শহরটা।

“এ এক অভাবনীয় সুযোগ। কেবলমাত্র বয়স্কদের জন্য। আহুন, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় বিষয় মেখে যান। বর্তমান বাঁচবেন এর কথা কোনদিন ভুলতে পারবেন না। যদি এ আপনারাঙ্গের আনন্দদানে অক্ষয় হয় তবে মূল্য কিরিয়ে দেওয়া হবে।’

টিকিটের দাম মাত্র কড়ি হেলার করলাম যাতে সবাই এটা দেখতে পারে। মুক্তি হলো আমাদের কল্পনাকেও লজ্জা দিয়ে পূর্ণবয়স্ক লোক, সৈন্যেরা, সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে সবাই বয়স্কদের সামনে লাইন দিয়ে টিকিটের জন্য বস্তুগতি শুরু করল। মজা হচ্ছে, চোদ, বোল বছরের ছেলেরাও যখন লাইনে এসে দাঁড়াল আমি বয়স জিজ্ঞেস করতেই পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ছোঁকাগুলো অবলীলাক্রমে মিথ্যা বলে চললো। কাকুর নাকি ছেচনিশ, কেউ ভিলা। অর্থাৎ চুকবার জন্য ওরা তখন উন্মাদ হয়ে গেছে।

ঠিক হ’টার সময় খেলা তো শুরু হয়। আমাদের প্রথম দর্শক এক প্রকাণ্ড ঘোমান। লোকটা সেই দুলে থেকে ভাঁতোভতি করছিল। ঠেলেঠেলে ধরে ঢুকতে না ঢুকতেই নিমেষে নিজস্বপন্থে পথের মাটির ওপর নিজেকে শুয়ে থাকতে দেখে লোকটা হতভম্ব হয়ে গেল। হারা প্রবল উৎসাহ আর উৎস্রুকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল আমি ওনতে পেলাম যে তাদের বলছে, ‘কি দেখলাম? অতুতপূর্ব। আমি হালক করে বলছি প্রত্যেকের একবার করে দেখা উচিত।’

মেস্টেককে বলতে ইচ্ছে হলো, দ্যাখো, মানুষের বনভুতু সপক্ষে আমার ধারণা কি নির্ভূত। পরবর্তী এক মণ্টার মধ্যে কয়েকশ লোক মেস্টেকের সুপ্রস্তুত বাজর সাহায্যে এই খেলা উপভোগ করলো। সত্যি বলতে কি, কেউ কেউ প্রথমে কিছু বুঝতে না পেরে তিনবার-চারবার করেও মেস্টেকের নম্রুত কলির সাহায্য নিয়েছে। আমি উত্তর করে দেখলাম লোকগুলির বুধে আনন্দ আর উত্তর সংকীর্ণ। আরো একটা মিনি

র আমার নর এতদার নি। দেখলাম অনেক তাদের বন্ধুদের এই সুযোগ সম্ভাবনার জন্যে বেরে বেরে আনছে।

কিন্তু হার মৃত্যু। শহরতলির সাধে ভগবানের খেলায় ভগবানই বোধ হয় জরী হজঃ তাই সাদে সাঙটার সময় সেখানকার ভিসিটু কমিশনার তাঁর বখোচিত গাড়ী নিয়ে আমাদের প্রবেশপথে এলেন।

‘তোমাদের পারমিটটা দেখি?’
‘দয়া করে ভেতরে আসুন।’ আমি বললাম বিনীতভাবে।

বানিকশণ একটা প্রাণ্ডিকর বস্তুগতি চলল মেস্টেক আর অফিসারের মধ্যে। ভিসিটু কমিশনারটি তাঁর পদবীনা সযত্নে বুদ খোঁপ সচেতন ছিলেন বলেই হয়ত বা মেস্টেকের হাতে নিজেকে বিনা বাধ্যতায় সর্পণ করতে রাখী হচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁর কপাল। অন্যান্য অসংখ্যদের পথ অনুসরণ করে তিনিও নিজস্বপন্থে ধারণ দিয়ে মজোরে এসে আছড়ে পড়লেন উন্মত্ত জনতার মাধ্যমানে।

পরের কথা হল এই যে, পুলিশরা এসে আমাদের তাঁবু সিল বেরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। একজন পদবীপালম্পর অফিসারকে শাস্তি অর্জননার মায়ে আমাদের কোট অভিবৃত্ত করা হল।

কয়েকখানার স্বপ্নানোভিত হরের একটা কাঠের তক্তার ওপর বসে মেস্টেক বিচলিত করে আমাকে বলতে শুরু করল, ‘আর আমার জীবনে আমি কখনও নং, স্ত্রী ও বিশ্বেশ্বরগণ ব্যবসার মধ্যে নেই ডাই। আর থেকে আমি তথাকথিত সগুণ ছেড়ে ধাপ্পাবাজী আর জুয়োচ্চরী ব্যবসাতে জীবনটা অতিবাহিত করব ঠিক করলাম।’

‘আসলে মানুষ কি চার?’ যে অপরোক্ত করল। তারপর ফিসফিস করে বলল নিজের মনেই, ‘কিছুই না। লোক কিছুই না।’

বল : Fair Play. Jaroslav Hasek. অনুবাদ : দিবোদ্র দাশগুপ্ত।

প্রথম রসোপন্যাসিক
অসমজ সুযোগাধ্যায়ের
অসমজ প্রহাবলা
৩খানি বড় উপন্যাস ও ১খানি
নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।
বহুমতী প্রাইভেট লামাটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

শহর কলকাতা



রবীন্দ্র কাননের একটি দৃশ্য

॥ রামবাগানের নানাকালের কথা ॥

যুগে যুগে যুগান্তর এসেছে মন্থর চালে। উষানান্তরে পতন, পতনান্তরে উষান, রামবাগান ঠিক এভাবেই রূপান্তরের উত্তরীয় ধারণ করেছে অনেকবার। আজ তাই রামবাগানে নেই প্রথম যুগের কোনো প্রতিধ্বনি। তদানীন্তন নিসর্গের কোনো স্মরণলিপিও আজ অনুপস্থিত। সেকালের মাঠে তৃণদলের দোল-যাত্রা, ভূস্বামী-ভবনের উত্তরে-দক্ষিণে নয়নাভিরাম বনবাঁধ, পূর্বে-পশ্চিমে মৃগাল-বিলসিত সরোবর—যা ছিল ভূস্বামী প্রধানদের সখের প্রতীকরূপে অনিন্দ্য, শিক্তজনের কাব্যের অনুকূলে উপভোগ্য এবং রসিকজনের ফাল-বিনোদনের পক্ষে অপরিহার্য—আজ তার লেশমাত্র ছায়াও বর্তমান মানচিত্রে অলীক। এখন সমগ্র অঞ্চল জুড়েই ঘন বসতির নিবীতি আক্রমণ। অতএব স্বাভাবিক কারণেই আজ এখানে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে নিবিচ্ছিন্ন সূর্যের পরিবেশ।

এখানে বসতি বিচ্ছিন্ন। এ-যুগ আদি-কালের কায়স্থ জমিদার শ্রেণীর অনাস্তিত্বের যুগ। কিন্তু তাদের ভবন-শ্রেণী বিনাশের করাল খসে বলিপ্রাপ্ত হয় নি আজও। স্বস্থানে সেগুলা দাঁড়িয়ে আছে একালেও। তবে প্রায়ই হতগ্রী। অশো ভাদের সূক্ষ্মাঙ্গের কোনো স্বাক্ষর নেই। কোনো কোনো মহলের কঙ্কাল-দার শরীর আজ প্রসাধন-প্রাভুল্যে ধানিকটা আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করলেও, বয়সের প্রকট প্রকাশ থেকে তারা মৃচ্ছ হতে পারে নি। আজকাল এ-সমস্ত ভবনের নিচের তলাতেই হীনস্বাস্থ্যে পতনলাভ করেছে ঘনাদৃত সমাজের বসতি। শোনা যায় : ভূস্বামী এবং বৈশ্যকুলের পরিচর্যার স্বপক্ষেই

পরম্পরার নিচের তলার অধিবাসী আজ তারা। তাদের পৃষ্ঠপোষকগণ আজ বিগত বলেই বিচিত্র বস্তির মাধ্যমে তারা স্বাবলম্বী হওয়ার ক্রান্তিহীন প্রবন্ধে ব্যস্ত। এ-বাস্ততার শেষ নেই, বিরাম নেই। ভগ্নস্বাস্থ্যে পরিগ্রমের কঠিন হাজতে তারা আসাম্ব্য-সকাল বন্দী। তবু চাহিদা-অনুপাতে প্রাপ্তিবোগ তাদের প্রতারণা করে প্রত্যহই। অথচ তারা বেঁচে আছে। বেঁচে থাকার সদিচ্ছাও তাদের প্রবল। কিন্তু বাঁচার মতো বাঁচতে পারছে না বলে তাদের মধ্যে অনেকেই কোনো স্বেচ্ছ মাদক-

শ্রীপদাভিক

দ্রব্যের শরণলাভ করে' প্রতি দিনান্তে একবার বেঁচে থেকেও মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

এই অবঃপতিতদের বিস্তৃত নীড়শ্রেণীর আশেপাশে আশ্ব-প্রতিষ্ঠিত কিছু আধুনিক বিস্তবান। জগৎ তাদের স্বতন্ত্র। নিচের তলার প্রতি যেমন দৃষ্টি-বৈরাগ্যের দম্ভবোধ তাদের অনুপমের, তেমনই ভূস্বামী-বংশীয় বর্তমান উত্তরপুরুষদের সঙ্গেও তাদের কোনো যোগসূত্রের উৎসাহে ভাটার টান প্রবল। এমন স্বাস্থ্য-পরামর্শ পরিবেশেও তারা তাদের নিবাসকে স্বাস্থ্যের অনুকূলে উন্নত করেছেন—স্বাসাধ্য। তা ছাড়া প্রাত্যহিক আচারেও তারা রচনা করেছেন ভিন্ন পরিমণ্ডল—যেখানে বর্তমান সাধারণের প্রবেশলাভ দুঃসাধ্য এবং আদি-বাসিন্দাদের কেউ সেখানে প্রবেশাধিকার পেলেও, রুচিগত পার্থক্য তাদের পীড়িত করে বিশেষভাবেই।

ঘোবনের নিষিদ্ধ হাটে যারা আপন লাভগোচর পসারিণী বংশপরম্পরায়—তাদের বসতিই বৈশিষ্ট্য-প্রধান রামবাগানে। সম্ভবত

শোনা যায় : এতদঞ্চলের আদি ভূস্বামীকুলে সেকালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন জন-কয়েক মৃচ্ছিমের কুলাঙ্গার। তখন অর্ধেক অপরিমেয়তাই নাকি স্বেচ্ছাচারিতার চরম উপসর্গ দান করেছিল তাঁদের জীবনে। তারা বিবাহিত সত্ত্বেও আপন অসুস্থ ঘোবনের গোপন শব্দ-স্বার তাগিদে মাঝে মাঝেই আহরণ করতেন যে-সমস্ত স্বর্গভ্রষ্টা মেনকা—বর্তমান রূপোপজীবীদের ধমনী জুড়ে জেগে আছে তাদেরই দূরন্ত শোণিতের জোয়ার। সভ্যতার চোখে তারা সত্যীহীন চিরন্তন। তাই সমাজ তাদের গ্রহণ করে না। অবশ্য সেজন্যে কোনো আক্ষেপও তাদের নেই। দিনে দিনে নিজেদের মধ্যেই তারা গড়ে তুলেছে স্বতন্ত্র সমাজ। সভ্যতা তাদের অস্বীকার করলেও, সভ্য জগতের এমন অনেক মহানায়ককেই তারা মারামর্শে মেখে রূপান্তরিত করে সহাস্য। তাদের মধ্যে আজকাল অনেকেই একাধিক বাড়ির স্বত্বাধিকারিণী। কিন্তু বিজ্ঞপ্রভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ গ্রহণ করছে আজ তাদের মধ্যেও কেউ কেউ। চেষ্টা করলে, জন-কয়েক শিল্পীর স্থান পাওয়াও এখানে দৃষ্টির হবে না—যারা রস বা আনন্দের আসরে সাদরেই বরণীয়া। সংগীত-সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা স্বগৃহে বসবাস করেন এখানেই।

সারা বাংলায় যখন নবাবী আমল, তখন এতদঞ্চল ছিল চিংপুদের অরুণ-সমীপবর্তী এক বিস্তৃত ভূখণ্ডরূপে পরিগণিত। এই ভূখণ্ডকে বসবাসের স্বপক্ষে উদ্ধার করেন কায়স্থ ভূস্বামীরাই। এখানে প্রথম এসে স্থায়ী মহল প্রতিষ্ঠা করেন মিত্র-বংশীয় জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের পূর্বপুরুষ। তারপর আসেন একযোগে ভূস্বামী এবং বাবসায়ী রাম মিত্রের প্রতিপত্তিশালী পরিবার। আর সম্ভবত রাম মিত্রের সমসাময়িককালেই অথবা কিছু পরে এখানে পদার্পণ ঘটে দত্তবংশের। দত্ত, মিত্র এবং মিত্র প্রত্যেকেই কায়স্থ ভূস্বামী তদানীন্তন যুগের। পরম্পর আত্মীয়তা-সত্ত্বেও তারা আবদ্ধ ছিলেন শোনা যায়। তাই সম্ভবত রামবাগানের তদানীন্তন ভূমিস্বত্ব বসবাসের প্রয়োজনে তাঁদের স্থায়ী নিবাস আত্মপ্রকাশ করে পাশাপাশি।

এই কায়স্থ ভূস্বামীদের মধ্যে দুর্গাচরণ মিত্র ছিলেন তদানীন্তন যুগের একজন নিষ্ঠাবান এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। মৃচ্ছিদাবাদের নবাব আলিবর্দী ছিলেন তাঁর বিশেষ সহৃদয় এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর দিল্লিশবরের সঙ্গেও। তাঁরই জমিদারী-সেরেস্ভার এসে মাত্র পাঁচ টাকা মাসোহারার বিনিময়ে খাতা লেখার কাজ গ্রহণ করেন সাধক রামপ্রসাদ। এই সেরেস্ভার বহাল থাকাকালীন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যে-কাহিনী শোনা যায়—তা নিছক কাহিনী নয়, ইতিহাস।

হালিশহরের বিশেষ এক দরিদ্র পরিবারে রামপ্রসাদের জন্ম। পরিবার-পোষণের তাগিদেই তিনি ঘোবনকালে এসে চাকুরী গ্রহণ করেন দুর্গাচরণ মিত্রের সেরেস্ভার। বেতন পাঁচ টাকা। সে-যুগে একটি দরিদ্র পরিবারের

না। অতএব পরিত্যক্ত মনে উক্ত বেতনেই তিনি খাজাজির অধীনে খাতা লেখার কাজে নিযুক্ত হন দুর্গাচরণ মিত্রের নির্দেশে।

কাজ চলে বখারীতি। নিরমিত খাতা লেখেন রামপ্রসাদ। মাসের শেষে বেতন নিয়ে একবার হালিশহরের বাড়িতে আসেন। তারপর দ্ব্যাসময়ে আবার উপস্থিত হন সেরেসতার। এভাবেই কেটে যায় একটি বছর। বছর শেষে হিসেবের খাতা যখন পরীক্ষা করতে সুরু করেন খাজাজি, তখন তিনি সন্মুখে লক্ষ্য করেন : রামপ্রসাদ যে-খাতাগুলি লিখেছেন— তার মধ্যে একটিতেও কোনো হিসেব লেখা নেই। প্রতি খাতাতেই রামপ্রসাদ লিখে রেখেছেন কেবল গান। সুতরাং স্বপ্নরোমান্টিস্ট চটে গিয়ে খাজাজি রামপ্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন দুর্গাচরণ মিত্রের কাছে।

মিত্রশায় স্থিরচিত্তে অভিযোগ প্রবণ করার পর কয়েকটি খাতায় রামপ্রসাদের লেখা গানগুলি মনযোগ সহকারে পাঠ করেন। প্রতিটি গানই অখ্যাত্যরসে সমৃদ্ধ। তিনি রামপ্রসাদকে কাছে ডাকেন। রামপ্রসাদ তাঁর সামনে এসেই পাইতে সুরু করেন তাঁর স্বরচিত গান। যেমন চান্না, তেমনই সুর। তাঁর কণ্ঠে যেন ভরা নদীতে প্রাণ-স্রোতের কমলাল। গান শুনতে শুনতেই অশ্রুপূর্ণ নয়নে সমাহিত হন মিত্রশায়। তারপর গান শ্রামতেই তিনি বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেন রামপ্রসাদকে এবং ডাক্তারে বলেন :



রামবাগানের দত্তবা



রায়দেব মিত্রের বাড়ি

—“রামপ্রসাদ, আমার সেরেসতার তোমার আর চাকুরী করা চলবে না। আজ থেকে তোমার ছুটি।”

মিত্রশায়ের কথা শুনাই চমকে ওঠেন রামপ্রসাদ এবং সান্দ্রনয়ে বলেন :

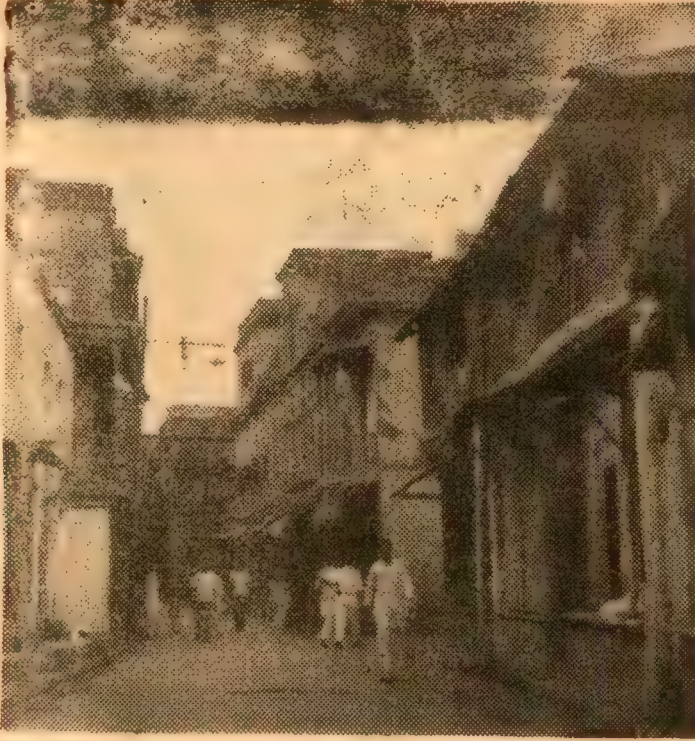
—“আমাকে দয়া করে চাকুরী থেকে ছাড়াবেন না, আমার পরীষ পরিবার মল্ল পড়বে।”

মিত্রশায় আবার বলেন :

—“ওহে রামপ্রসাদ, তোমার মতো একজন সিম্পল পুরুষ সাধককে আমার সেরেসতার চাকুরী করতে দিলে আমার যে নরকবাস হবে। তুমি ফিরে যাও তোমার সাধনক্ষেত্রে। আমার সেরেসতা থেকে যাসে যা পেতে, এবার থেকে নিরমিত ভূমি তার স্বিসৃষ্ট পাবে। তবে জ বেতন হিসেবে নয়, প্রশামী হিসেবে।”

রামপ্রসাদ ফিরে আসেন হালিশহরে। স্বপ্নকালেই তিনি সিম্প সাধকরূপে প্রতিপন্ন হন সরল বাঙালী। তারপর দুর্গাচরণ মিত্র সহ রামবাগানের কার্যস্থ জমিদারপ্রশ্নী ভক্তরূপে পরিগণিত হন রামপ্রসাদের।

রামবাগানের কার্যস্থ ভূস্বামীদের মধ্যে অন্ত্যন্ত বিলাসপ্রিয় এবং সৌখিন পুরুষ ছিলেন দরুল মিত্রের পূর্বপুরুষ রায় শিলা। এতদন্তলে একটি সুদৃশ্য বাগান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনিই। তাঁর নামেই বাগানের



রামবাগান অঞ্চলের বসতি-পরিবেশের দৃশ্য

স্বাক্ষরিত ঘটেছিল রামবাগান। পরবর্তীকালে এই 'রামবাগান' নামটিই স্থায়ী লাভ করে সমগ্র অঞ্চলে। অবশ্য কেউ কেউ অভিমত পোষণ করেন : যেহেতু রামপ্রসাদের সাধক-জীবনের প্রাথমিক পর্ব সূর্য হুয়েছিল এখানেই, ঠিক সেইহেতু তাঁরই স্মৃতি চিরকাল স্মরণ করার উদ্দেশ্যে এতদঞ্চলে 'রামবাগান' নামটির প্রচলন সূর্য করেন তদানীন্তন ভক্তসমাজ। তার এই অভিমতের স্বপক্ষে ঐতিহাসিকদের সমর্থন নেই বিশেষ।

রামবাগানের দত্তবংশও যুগের স্মরণ-ভীর্ণ উপেক্ষিত নন। ইতিহাসে তাঁদের ঐতিহ্যগত পরিচ্ছেদ বেশ খানিকটা প্রশস্ত। এই বংশেরই রসময় দত্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রারম্ভিক যুগে ছিলেন কোর্ট অব রিকোর্সেস্ট-এর একজন কীর্তিমান বিচারক। তাঁর সুযোগ্য তনয় গোবিন্দচন্দ্র দত্তও ছিলেন জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত। অবশ্য যোবনে তিনি দীক্ষালাভ করেন খৃষ্টধর্মে। তাঁরই ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন তদানীন্তন যুগের দুই প্রতীকীর্ণ কন্যা তরু দত্ত ও অরু দত্ত। পিতার সঙ্গী কৈশোরেই তাঁরা বিলেতে যান এবং সেখানেই উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষা। বাঙালী মহিলা-দের মধ্যে ইংরেজী ভাষার কবিতা রচনা করে দেশ-বিদেশে সর্বাঙ্গীন হন তাঁরাই প্রথম। তরু দত্ত ফরাসী ভাষায় একখানি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন—যা প্যারিসের প্রধান পাঠ্য-

গারে একালেও সম্মুখে রাখিত। দুরারোগ্য ব্যাধির ক্রমহীন আক্রমণে যদি স্বল্প বয়সেই তাঁদের দেহরক্ষা না হতো, তাহলে হয়তো সাহিত্য-জগতে তাঁদের অবদান এমন সীমিত হতো না। অবশ্য অবদান তাঁদের সীমিত হলেও অমূল্য—একথা স্মৃতিহীন চিত্তেই স্বীকার করবেন বিদ্যাসমাজ।

দত্তবংশের উজ্জ্বলতম রত্ন রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি রসময় দত্তের ছাতা পিতাম্বর দত্তের পৌত্র এবং পুত্র ইশানচন্দ্র দত্তের। তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের কোনো এক শুভদিন জন্মগ্রহণ করেন রামবাগানেই। যোবনে তিনি সিভিলিয়ানরূপে অলঙ্কৃত করেন একাধিক উচ্চতম পদ। চাকুরী জীবনে তিনি বেমার্যাদার অধিকারী ছিলেন, তাঁর পূর্বে সে-মর্যাদা অন্য কোনো বাঙালী বা ভারতীয়দের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া তদানীন্তন যুগে একাধারে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজসেবীরূপেও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ হরিহর শেঠ তাঁর স্মরণচিত্র গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

“রমেশচন্দ্র ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সিভিলিয়ান হইয়া এদেশে আসেন। তিনি একে একে বহুস্থানে ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরের কাজ করিয়া শেষে ডিভিশন্যাল কমিশনার পদে নিযুক্ত হন।

ইহার পূর্বে আর কোনো বাঙালী এই পদ প্রাপ্ত হন না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গভর্নমেন্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। সরকারী কার্যে অবসর গ্রহণ করিলেও তিনি পুনরায় লন্ডন ইউনিভার্সিটির ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তথা হইতে ফিরিয়া বরোদা রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। এ কার্যে তিনি যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। এ সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং 'বঙ্গ বিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'সমাজ' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।”

এই দত্ত ও মিত্রবংশীর কায়স্থ জমিদার এবং সুধীজনের সংস্পর্শ লাভেই একদা মর্যাদার চরমতম মঞ্চে অভিব্যক্তি ঘটেছিল রামবাগানের। তাছাড়া তখন দৃষ্টি-স্বপক্ষে তাঁর নৈসর্গিক দৃশ্যও ছিল সর্বিশেষ অভিরাম এবং উপভোগ্য। তবে বর্তমান যুগে সেন্সিগের কোনো চিত্র উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। বছরের পর বছর পরিবর্তনের বিচিত্র ঢেউ এসে রামবাগানের সার্বিক দৃশ্যে যে-পরিবেশ সৃষ্টি করেছে—তা বর্তমান নিবন্ধের প্রাথমিক পর্যায়েই দ্রষ্টব্য।

রামবাগানের পশ্চিমভাগেই রবীন্দ্র কানন বা বিভূষণ পাক। এ-পাক প্রথমত কোম্পানী-বাগানরূপেই পরিচিত ছিল জনসমাজে। রাম মিত্র রচিত রামবাগানের বহুকাল পরে কোম্পানী-বাগান বা বিভূষণ পাকের প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে এ-পাক উন্নয়নের প্রসাদ পেয়েছে প্রভূত। তার অব্যবহিত অংশে প্রতি বৎসর পক্ষকালব্যাপী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে রবীন্দ্রমেলায় উৎসব। সেইসঙ্গেই বর্তমানে তা নাম ধারণ করেছে 'রবীন্দ্র কানন'। কাননের উত্তরভাগে রবীন্দ্রনাথের একটি মর্মরমূর্তিও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে বছর তিনেক পূর্বে। এই মূর্তির সীমা থেকে দক্ষিণভাগ পর্যন্ত পাকের একাংশ নানাবিধ তরুলতার বেষ্ট সূশোভিত। মালীর প্রাত্যহিক যত্নে এ-অংশে প্রায় প্রতি ঋতুতেই লক্ষ্য করা যায়। বিচিত্র ফুলের বহুবর্ণ উদ্ভাস। যদিও সর্বিক চিত্র তাঁর বিশেষভাবেই ক্রিয়ম, তবু এই পাকের প্রতি দৃষ্টি রেখেই চিত্তকে অতীতের বিশাল নৈশঙ্কে ডাসিয়ে দিতে কোনো ক্লান্তিবোধ বে হয় না—তা অবশ্যই স্বীকার করবেন পুরাতত্ত্বে উৎসাহী রসিকজন।*

* অসুস্থ থাকার জন্যে শ্রীপদাতিক কয়েক সপ্তাহ 'শহর কলকাতা' লিখতে পারেন নি। তাঁর পথ-পর্যায়ের শহর কলকাতার পরিভ্রমণ-পুঁতির জন্য পরবর্তী অংশগুলি আগামী সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হবে। —সম্পাদিকা

লোকটি আপন মনে হেঁটে যাচ্ছিলো।
বালুতটের উপর দিয়ে, ক্রান্ত শ্লথ পায়ের।
সামনে প্রসারিত সমুদ্র একটানা ঢেউ ভাঙছে।
পশ্চাপটে বনকাউয়ের পাতায় অশান্ত বাতাস
শ্যর্বা প্রেমিকের হাতে ক্ষুধা বেহালার মত
ভাঙছে। অপবাহু এবং নিজের বলে কম্প্রতট
এখন মনোরম।

সমুদ্র, বনকাউয়ে বাতাসের বাজনা, আমার
পার্শ্ববর্তিনী নমিতার কপালে চূর্ণ অলকের
ধোলা, তার উড়ন্ত শাড়ির আঁচলায় বন্দী
অন্তঃস্বর্ষ অলংকার ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে
থেকে আমার মনে মায়ী ঘন হাচ্ছিলো বলে
আমার ইচ্ছে হাচ্ছিলো নমিতাকে একটা গান
গাইতে বলবো, রবি ঠাকুরের গান। তখনই
লোকটি আমাদের চেয়ে পড়লো। বালুতটের
উপর দিয়ে, ক্রান্ত শ্লথ পায়ের লোকটি হেঁটে
হাচ্ছিলো।

আমাদের ছাড়িয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ থেমে,
তারপর ক্রমপদবিন্যাস আমাদের দিকেই
এগিয়ে আসতে লাগলো। আমাদের দৃষ্ণকে
ঘিরে ঘনিয়ে-ওঠা পৃথিবীর দিকে লোকটিকে
অসময়ে এগিয়ে আসতে দেখে একটু বিরত
বোধ হাচ্ছিলো। ময়লা জামাকাপড়, দাড়ি-
গোঁক ভরা ক্রিট মুখের দিকে তাকিয়ে
তদুর্পা আমার মনে হঠাৎ, লোকটি নিশ্চিত
ভিক্রুক। এই অসময়ে বিবর্ত কববার জন্য
আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবলাম, একটি
পবসাও না দিয়ে ওকে রুঢ় কথায় ফিবিবে
দেবো।

লোকটি খুব বিলম্বিত পদক্ষেপে হেঁটে
আসিচ্ছিলো বলে আমার মনে হলো ওর এই
পদধারার আবম্ভাধন বহু অতীতে। আমি
নমিতার দিকে তাকিয়ে বললাম, দেখ,
লোকটাকে ঠিক ডাকাডেব মত মনে হচ্ছে না।
আমাদের এই ভালো-লাগা সময়টুকুর উপর
যেন হামলা করতে আসছে।

বাতাসের উজ্জ্বলতা থেকে শাড়ির
আঁচলকে সম্বৃত করতে করতে নমিতা বললো,
মনে হয় ভিক্রুক।

ঝুড়টাকে নষ্ট করে দিলো লোকটা।'
সমুদ্রের নীচে ডুবলেও ভূমি ভিখাবী
পাবে।'

নমিতাকে রীতিমত রুষ্ট মনে হলো
আমাব। ফলে লোকটির প্রতি অপ্রসন্নতা
আমার আরো বেড়ে গেলো। ইতিমধ্যে লোকটি
এসে একটু তফাতে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। তিকা-
বৃত্তিব প্রবণতা মানুষকে সোজা হয়ে দাঁড়তে
দেয় না, নিম্নাভিমুখী করে, অবনত করে
দেয়। আমি বৃঢ় গলায় কিছু বলবার উদ্যোগ
করতেই লোকটি ঈষৎ ডাঙা, ক্রান্তকণ্ঠে
বললো, 'আপনার কাছে দেয়াশলাই আছে
স্যার?'

সমস্ত ব্যাপারটাই আমার মানসিক
প্রস্থতিব বিপরীত হলো বলে আমি ক্ষণকালের
জন্য একটু অপ্রস্থত বোধ করলাম। তাবপর
পায়স্টের পকেট থেকে সূদৃশ্য দামী অমেরিকান
লাইটার তুলে তাব দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

লোকটি তাব পকেট হাতড়ে এক টুকরো
অর্ধদশ সিগারেট কুড়িয়ে এনে টোঁটের উপর

চেপে ধরলো। বার কয়েক চেন্টাধ আঁশ
সংবোগ কবে নিলো সিগারেটে।

'খন্যবাদ।' লাইটার ফিরিয়ে দিতে গিয়ে
সে একটুকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে
থেকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনার নাম বি
সুবিনয় চৌধুরী?'

আমি এবং নমিতা দু'জনেই চমকিত
হলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন আকস্মিক-
ভাবে গতি ফিবিবে নিচ্ছে। অনুমের
ভিখাবীটির মুখে আমার নাম শোনবার জন্য
আমি কিংবা নমিতা কেউ প্রস্থত ছিলাম
না।

'আপনিই তো এবার সাহিত্যের জন্য
সরকারী পুরস্কার পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমাকে কি করে
চিনলেন?' আমি অনেক চেন্টা করেও
লোকটিকে ভূমি বলতে পারলাম না।

'খবরের কাগজে আপনার ছবি বেরিয়ে-
ছিলো। তবে আমার চেনার সূত্র সেটা নয়।
আমি আপনাকে অন্যভাবে চিনি, অন্যভাবে—'

নিজের মনে
নিঃস্বার্থ



কিন্তু বলতে লোকটি অপরাহ্নের আকাশের দিকে তাকালো; যেখানে কয়েক টুকরো মেঘ সূর্যের আলো ধরে বাষ্পের জন্য শেষ লড়াই করছে। তার শেষ কথায় এবং কপালের ফুটনে কি এক অপরিণীত যন্ত্রণা ফুটে উঠলো। আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলাম। কেন জানি না একটা তিক্ত অনুভূতি আমার মধ্যে অল্প অল্প করে ঘোরার মত ছড়িয়ে পড়ছে। চোখে, বুকে আমি জ্বালা বোধ করছি।

‘কিন্তু আপনি, আপনার পরিচয়?’

এই সমুদ্রতীরবর্তী ক্রমশীঃমান আলোয় আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম, লোকটির চোখ জ্বলে উঠছে। দাড়ি-গোঁফের নীচে দুটি ঠোঁট পরিহাসে অশ্চর্য বক্র। লোকটি আমার কথায় জবাব না দিয়ে নিরাসক্ত গলায় বললো, ‘আমি জানি আপনারা অসুখে কয়েকদিন এখানে থাকবেন। আমার সঙ্গে আরো সেখা হবে।’ তারপর একটু থেমে গলায় অশ্রুত দৃঢ়তা এনে বললো, ‘হ্যাঁ, সেখা আমাদের হতেই হবে।’

আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে, এই একই ক্রান্ত ভঙ্গিতে লোকটি চলে গেলো। সন্ধ্যা সমাগত বলে লোকটিকে বেশিক্ষণ সেখা গেলো না। কিছু সময় পরে, চতুর্দিক বন্ধ অন্ধকারে সমাবৃত হয়ে গেলো, সবাকিছু নিরবস্ব হলে, এমন কি নমিতাও, তখনও আমি পুরনো চিঠির বাক্যের মত স্বাতন্ত্র্যে যেটে লোকটির পরিচয় কিংবা ঠিকানা কিছুই শোনা যায় না।

‘তুমি কি লোকটিকে চেনো?’ অকস্মাৎ নমিতার কণ্ঠস্বর আমার আলৌকিক মনে হলো। এই সমুদ্র, আকাশ, বনঝাউ এবং জন্মায় মতই নমিতার কণ্ঠস্বর যেন এক মহালক্ষ্মীর মুখে স্তম্ভ। কি সে মহালক্ষ্মী? আমি জানি না। যেন বিশাল এক অপরিচয়ের অন্ধকার ক্রমাগত তেলে উঠতে চাইছে। তার নীচে আলো। অশ্রুত, তীক্ষ্ণ, অনাস্বাদিতগর্বে আলো। সূর্য অপেক্ষা তেজোময়।

‘আমি বললাম, না, লোকটিকে আমি চিনি না। কখনো দেখি নি।’

‘আশ্চর্য!’

‘কি আশ্চর্য নমিতা?’

‘তোমাদের মিল!’

‘কিসের মিল নমু?’

‘তোমার সঙ্গে ঐ লোকটির চেহারার মিল।’

‘সে কি?’

‘দাড়ি-গোঁফের জন্য প্রথমটা আমার বুকে একটু অসুবিধা হচ্ছিলো। কিন্তু ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলাম ঠিক তোমার মত চোখ, তোমার মত নাক, তোমার মত মুখের রঙন।’

‘তা হতেও পারে। এক লক্ষ লোকের

মধ্যে দু’জনের চেহারার মিল এমন আর কি আশ্চর্য ব্যাপার।’ আমার অসম্ভব কণ্ঠস্বর আমার নিজের কানেই বাজলো। নমিতার চোখে ঐ ভিখারীকণ্ঠ লোকটির চেহারার সঙ্গে আমার মিল আবিষ্কার আমাকে ভিতরে ভিতরে প্রচুর অসম্ভব করেছিল। তা স্পষ্ট বোঝা গেলো। এই অসম্ভব প্রকাশকে চাণা দেবার জন্য অল্প একটু হেসে বললাম, ‘পড়ো নি, শেকস্পিয়ার থেকে সূর্য করে অনেকেই তো এই চেহারার মিল নিয়ে মজার গল্প কে’সেছেন? মনে হচ্ছে আমার হাতে শীগগিরই একটা বেশ জমাটি মজার গল্প এসে যাবে।’ ঘটনাটির মধ্যে আমি একটি ভরল ভাগ নিয়ে আসতে চাইলাম। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে একটা চাণা চাণা ভাব স্নেহই গেলো।

নমিতা বললো, ‘লোকটি কিন্তু তোমাকে বেশ ভালোবাসে চেনে।’

‘আমি পরিহাস-ভরল কণ্ঠে বললাম, ‘আশ্চর্য কি, বেরকম বিখ্যাত হয়ে পড়েছি।’ হাত বাড়িয়ে নমিতা আমার হাত নিজের মূঠোর মধ্যে নিলো। আমার মধ্যে একটি বিচিত্র ধরনের অসহায় ভাব কণ্ঠে উঠছিলো। নমিতা আমার হাত ধরতে তা যেন অনেকটা প্রশমিত হলো। অন্ধকার ক্রমাগত ঘন হয়ে উঠছে। হাতবাড়ির দিকে তাকিয়ে নমিতা বললো, ‘এখানে আর ভালো লাগছে না। চলো, আজ ফিরি।’

আমরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। দূরে হোটেলের আলোকোজ্জ্বল জানালাগুলি চোখে পড়ছে। আমি একটু ক্রান্তি বোধ করছিলাম। লাইটব জেলে সিগারেট ধরলাম।

ঈষৎ ভৎসনার স্বরে নমিতা বললো, ‘এখানে কিন্তু একঘণ্টা পার হয় নি।’

‘শিখর নমু, একটু লাইসেনস নিচ্ছি। ভীষণ ইচ্ছে করছে একটা সিগারেট খেতে।’

নমিতা নিঃশব্দে শাড়ির আঁচল গলায় জড়িয়ে লাগলো।

‘তুমি রাগ করলে নমিতা?’

অভিমানহত গলায় নমিতা বললো, ‘তুমি যদি আমার একটা কথাও শোন।’

‘আজ্ঞা ঠিক আছে, এই ফেলে দিলাম।’

নমিতা সিগারেট শূন্য আমার হাত চেপে ধরলো। তারপর হেসে বললো, ‘ব্যাপারটা ভাব করে তোমরা ছেলেরা অব্যাহত হও বলেই তো তোমাদের বকে-বকে আমাদের সূর্য। এবার খাও, কিন্তু একঘণ্টার আগে যেন আবার ফুলে যেও না।’

আমি বাঁ হাতের বেষ্টনীতে নমিতাকে করেছি টেনে আনলাম। এই গর্জমান সমুদ্র-তটের গাড়ি অন্ধকারে নমিতাকে আমার আশ্চর্য প্রাণিস্য লাগলো।

‘আমি জ্বালাভন। ছাড়ো দেখি।’ বলে নমিতা আমার দিকে আরো ঘন হয়ে এলো। বুকের উপর মাথা রাখলো পরম নিশ্চিন্তে।

আমি সূর্য। সোফার উপর অঙ্গুলি ভিগতে বসে নমিতার নিপুণ হাতের কণ্ঠ তৈরি দেখছিলাম। অব্যাহত জানালা দিয়ে প্রচুর সমুদ্রের হাওয়া আসছে ঘরে। পদাঙ্গুলি জানালার বন্ধন ছেড়ে পলাতক হতে চাইছে। সমুদ্র যেন হিমবাহ। উদার মস্তির ঢালাও আহ্বান তার জলরাশির অমের বিস্তারিত। মালিন্যমুক্তির নিরত মস্তোচ্চারণ চলেছে সমুদ্রে।

ইতিপূর্বে আমি অনেকবার সমুদ্রে আসতে চেয়েছি। প্রাত্যহিকতার অপমান থেকে পলাতক হয়ে সমুদ্রের কাছে এসে বসতে চেয়েছি। কিন্তু তখন আমার সঙ্গতি ছিল না। আমার প্রতিটি দিন ছিল ক্লান্ত, মৈন্য-পীড়িত। আজ আমি বাংলা দেশের খ্যাতনামা লেখকদের প্রথম সারিতে। আমার নামের ঘাদতে বাংলা দেশের অগণিত পাঠক মনোমুগ্ধ। সিনেমার দৌলতে আমার বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে। নমিতার মত শিক্ষিতা, সূর্যস্রী, স্ত্রী। সর্বোপরি ভারত সরকারের পুরস্কার, আমার এবারকার ললাটিকা। আমার খ্যাতি বাংলা দেশের সীমানা ছেড়ে ভারতময় হতে পেরেছে।

আমার বিগত কালের অন্ধকার দিন-পুঙ্খকৈ বিবরণ করে বাইরে টেনে আনতে চাই না। বৃক্ষ রসসম্পন্ন করে অগোচরে, মাটির আমি অনেক জ্বলছি, অনেক যন্ত্রণা ভোগে আলোকে, লোকচক্ষুর গোচরে। আমার এখন ফুলের দিন। আমি সেই অন্ধকার-অপমানিত দিনগুলিকে আর স্মরণ করতে চাই না। আমি অনেক জ্বলছি, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছি, অনেক অপমান সরেছি।

আজ আমি অনেক শান্ত হয়েছি। এখন আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই। তাই নমিতাকে নিয়ে সমুদ্র দেখতে এসেছি আমি। এতদিন কাজের চাপে সময় পাই নি। এবার নিজের ইচ্ছার সঙ্গে ডাক্তারের উপদেশ মত হয়েছে। লেখালেখি, সভাসমিতি, চিন্তা-ভাবনা কিছুদিনের জন্য বারণ। এখন আমি মনের দিক থেকে মৃত, ভারশূন্য। এখন আমি কিছু ভাববো না। হাসবো, বেড়াবে, নমিতার সঙ্গে গল্প করবো।

‘কি ভাবছো, বলো তো তুমি?’ নমিতা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো।

‘কই, কিছু না তো।’

‘কফিটা যে অনেকক্ষণ আগে দিয়েছি সে খেয়াল আছে।’

‘ওহো!’ আমি তড়াতাড়ি কফির পেয়লাটা টেনে নিলাম। নমিতা আবার বললো, ‘ডাক্তারের বারণটা বোধ হয় আর মাথায় নেই?’

‘সব শাসনকারী সুলতানা রিজিয়া চোখের উপর আছেন।’

‘হ্যাঁ, তুমি তো আমাকে তারি গ্রন্থ করো।’

গাথাহিক বসন্তমতী

“অগ্রাহ্য করে বাঁচি কি করে।”

হোটেলের বর এসে কক্ষের সরঞ্জাম গুঁছিয়ে নিয়ে গেলো। এই ঘরখানা সমুদ্রের খুব কাছাকাছি। তটভূমির উপর চেউয়ের অবিরাম আছড়ে পড়ার শব্দ কানে আসছে। বাতাস উজ্জ্বল।

আমি ডাকলাম, ‘নমু।’

নমিতা উঠে এসে আমার কাছে বসলো। কক্ষের উপর মাথা রেখে বললো, ‘তোমার কি জ্ঞান্টি লাগছে?’

‘না তো।’

‘তবে এমন চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে আছে কেন?’

‘হঠাৎ সেই লোকটার কথা মনে পড়লো।’

‘কোন লোকটা?’

‘সেই যে আজ সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে দেখা হলো।’

নমিতা উঠে জানালার কাছে যেতে যেতে বললো, ‘তুমি এখনো তাই নিয়ে ভাবছো।’

‘ঠিক ভাবছি বলা যায় না। হঠাৎ করে মনে এলো।’

‘তুমি মাকে চিঠি দিয়েছিলে?’ নমিতা অন্য প্রসঙ্গে কথা বললো।

‘না, এখনো দেওয়া হয় নি। কাল দিয়ে দেবো।’

‘এটা কিন্তু অন্যায় হলো। পেপীছেই খবর দিতে বলেছিলেন মা। আমরা এসেছি চারদিন হবে গেলো।’

‘নমু, আমার কি মনে হয় জানো, লোকটা ঠগ।’

‘তোমার লাইটায়ের কাছ থেকে একটু আগুন নেওয়া ছাড়া আর তো কোন ঠগের লক্ষণ দেখলাম না।’

‘বুঝতে পেরেছে, যে এখানে বিশেষ মূল্যবোধ হবে না।’

‘এ-সব থাক, তার চেয়ে বরং একটা গান শোন।’ জানালার কাছ থেকে সবে এসে নমিতা খাটের উপর আশপোয়া হয়ে বসলো।

‘কি গান গাইবো বলো?’

‘যা তোমার প্রাণ চায়।’

নমিতা ভালো গায়। গুর গলার একটা মনের পাখি আছে। কলকাতার গাইয়ে-এলো ওব কিছুর প্রতিপত্তিও আছে। আমি অনেকবার শুনে দেখেছি, নমিতার গান আমাকে বাইরে থেকে ভিতরে যেতে সাহায্য করে। সুবের মধ্যে যে মৃদু আছে গাইতে জানার গুণে নমিতা জা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারে। মানাসিক উন্মেষগকে অপসারিত করে গান সেখানে অমলতাকে প্রতিষ্ঠা করে। এইজন্য মানুষ গান শোনে, আহিত্য পড়ে, পর্বত সমিথানে যায়, সমুদ্রের তীরে আসে। এ-সব ব্যাপারে অবশ্য প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাও ঘটে। যেমন আজকে সন্ধ্যায় নমিতার এবং আমার ঘটলো।

লোকটাকে আমার খুবই রহস্যময় লাগলো, এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর। আমাকে যে সে সম্বন্ধরূপে চেনে এতে কোন অন্যথা নেই। কিন্তু কোন সূত্রে, কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, জীবনের কোন পর্বে? ও-কি আমার অশ্বকার দৃষ্টি দিনের কোন পরিচিত? যেহেতু সূত্রে দিনের উজ্জ্বলতার এসে দৃষ্টির দিন স্মৃতিতে বিবর্ণ হয়, সেইজন্যই কি আমার নিরালোক দিনের ঐ পরিচিত লোকটি আমার স্মৃতিতে বিবর্ণ? আমার চেহারার সঙ্গে লোকটির শারীরিক সাদৃশ্য যে নিকট তা তো নমিতার চোখেই ধরা পড়েছে। সব মিলিয়ে এই ব্যাপারটা আমার কাছে চাপা অস্বস্তির মত লাগছে। বিরত মুখের উপর মাছির মত ঘটনাটা উড়ে উড়ে এসে পড়েছে। আমি চেষ্টা করছি, তিক্ততা ব্যঞ্জে, কিন্তু তাড়াতাড়ি পারছি না।

অথচ আমি তাড়াতাড়ি চাই। পিছনের ভাঙচোরা দিনগুলি, কাতরচিত্রের দিনগুলি আবার আমার সামনে আসুক আমি তা চাই না। সার্থক হবে অসার্থকতাকে মনে রেখেছে। আজকে আমি সার্থক হয়েছি। অসত্যের অশ্বকার থেকে সত্যের আলোকে এসেছি। একদিন আমি নিমূল্য ছিলাম। আজ আমি সমগ্র জাতির মাথার উপর দিয়ে অপরিচীত মূল্যমানে ফুটে উঠেছি। অনেক ক্লিষ্ট রাত আমার বিনীত কেটেছে। অনিশ্চিত অস্তিত্বের বন্দনা আমাকে পশুর মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। আমি আশ্বকরের বিপুল কন্ডব থেকে আশ্ববিকাশের মাধুর্যে এসেছি। আজ আমি একটু শান্তিতে থাকবো, একটু সূত্রে থাকবো।

‘তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে?’ নমিতা জিজ্ঞাসা করলো।

আমি চমকে উঠলাম। নমিতা কখন গান আরম্ভ করেছে, কখন শেষ করেছে আমি কিছুই শুনতে পাই নি। ভীষণ অপরাধী আর লজ্জিত মনে হলো নিজেকে।

‘গানটা কেমন লাগলো তোমার?’

‘ভালো। বেশ ভালো।’ এই মিথোবাকু আমি এড়িয়ে পারলাম না। নমিতা উঠে জানালার কাছে অশ্বকার সমুদ্রের দিকে তাকাতে চলে গেলো। সম্ভবত আমার মুখ থেকে অন্যমনস্কতাবাক্যে ও আবিষ্কার করে নিয়ে গেলো।

দুর্লিঙ্গদের ওষ্ঠানো ভিত্তির পাশ দিয়ে আমি অঙ্গ অঙ্গ করে হাটীছিলাম। আজ আমি অপরাহ্নের সমুদ্রতটে একা একা এসেছি। শরীরটা একটু খারাপ বলে নমিতা আজ আমার সঙ্গে বেড়াব নি। আমি আসতে চাই নি। বলেছিলাম, ‘নমু, আজ না হয় আমি বেড়াতে নাই বা গেলাম। তোমার শরীর খারাপ।’

নমিতা আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলো,

‘শরীর এমন কিছু খারাপ নয়। তুমি যাও তো। ততক্ষণে আমি বরং একটু ঘুমিয়ে নি।’

আমিও বিশেষ আপত্তি না করে একা একাই বেরিয়ে পড়েছি। এ-কদিন প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হয়েছে, এই বাকি সেই লোকটির সঙ্গে আমার দেখা হলো। কারণ, সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল, দেখা আমাদের হতেই হবে। সুতরাং প্রতি মুহূর্তেই আমি আশংকা করেছি তার সঙ্গে আচম্বিত সাক্ষাৎকারের। কি একটা অজ্ঞেয় ভাষা সারাক্ষণ আমার বকের নীচে তাক্ষমুখ কাঁটার মত উঁচিয়ে আছে। নমিতার সামনে ঐ লোকটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোক এ আমি চাই না। সুতরাং একা বেরুতে পেরে আমার মনে হলো, লোকটির সঙ্গে আজ দেখা হয়ে গেলে আমি বাঁচি। গুর আমার মস্তে ঘনিষ্ঠ-ওঠা কুহকের জালটা আমি টান মেরে ছিঁড়ে দিতে চাই। এখানে এসেছি মনকে অবারণ করে দিতে। কিন্তু কিসের একটা দুর্বোধ্য বারম্বার বানান আমার উপর এটে কসে যাচ্ছে। এ অসহ্য। আমি এর খেবে মৃত্যু হতে চাই।

সেই বনঝড়ের প্রাচীরের কাছাকাছি এসে আমি বসলাম। সূর্য অস্ত গেছে; কিন্তু তার শরীর থেকে প্রকিস্ত রক্তের চিহ্ন এখনো আকাশের এখানে-ওখানে বর্তমান। কঠি পাখি ফিরছে বাসায়। দৃষ্ট-হারানো সমুদ্রের কাছাকাছি আকাশ জলে স্নান করতে নেমেছে। আলো ক্রমশই পরিপ্লান হয়ে আসছে।

আচম্বিতে আমার বকের রক্ত ছলাং ফরে উঠলো। হ্যাঁ, সেই লোকটিই। তেমন স্পষ্ট, ক্লান্ত পায়ে বিলাসিত লয়ে হেঁটে আসছে। তেমন অপরিচ্ছন্ন জামাকাপড়, দাড়ি-গোঁষে সমাচ্ছন্ন মুখ। তেমনি ভিবারীকল্প ঈষৎ অবনত হবে হাটা।

অশ্রুত একটা উত্তেজনা বোধ কবলাম সন্ধ্যা শরীরে। মনে হলো, আমার ধর্মনি-ভক্তিগুলিকে এই মুহূর্তে কে টান করে বেঁধে ফেললো। ফলত, বুঝতে পারলাম এই লোকটির জন্য অনন্যোপায় অপেক্ষা আমাকে ভিতরে ভিতরে কি পরিমাণ উত্তার শীর্ষে তুলে দিয়েছে।

লোকটি সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রথম দিনের মতই ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললো, ‘আমি আপনাকে একাই চেয়েছিলাম।’

‘আমি তাব দিকে তাকালাম। অপরিচ্ছন্ন দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত চেহারার মধ্যে তার চোখ দুটি অশ্চর্যভাবে দুর্মূল্য ঈশ্বরের মত জ্বলছে। আমার মনে হলো, সমস্ত শরীরকে বশীভূত করে সে চোখ দুটিকে শূদ্র বাঁচিয়ে রেখেছে। যেন গভীর এক অশ্বকারের মধ্য দিয়ে তাফে অবিরত হাটতে হচ্ছে; সুতরাং চোখ সর্বাপেক্ষা ক্লিষ্টাশীল এবং উজ্জ্বল। আমি তার আলোর

সাপ্তাহিক বঙ্গদর্শী

কিছুক্ষণ মত চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কেন?

এমন কিছু কথা আপনাকে আমি বলবো, যা শুধুমাত্র আপনার এবং আমার। চতুর্থ ব্যক্তির তাতে কোন অধিকার নেই।

আমার বৃক্কের নীচে পুনর্ব্যায় উদ্বেগ ঘন হয়ে উঠলো। লোকটা এমন কি কথা বলতে পারে, যা নীমিত্তার শোনা ঠিক হবে না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হলো, যা নীমিত্তার শোনা অনুচিত, তা যে লোকটা অনুগ্রহ করে নীমিত্তার সামনে বলে নি, এটাও কম ভাগ্যের কথা নয়। এই প্রথম লোকটার প্রতি আমার একটু ভিন্ন মনোভাব উঁকি দিলো। চোখ দিয়ে আমার পার্শ্ববর্তী জায়গা নির্দেশ করে বললাম, বঙ্গদর্শী।

লোকটি বললো। এই সময় তাকে আমি একটু ভালো করে লক্ষ্য করলাম। আয়নার নিজের অবয়ব যা দেখছি, তা বঙ্গদর্শী মনে পড়ে, তাতে লোকটি দেখতে অনেকটা আমারই মতো বলে প্রতীয়মান হলো। উচ্চতার দিক থেকেও সে আমারই সমসমান হবে। তবে সে আমার থেকে অনেক রূপ, কৃষ্ণ।

আমি সিগারেট কেস উন্মুক্ত করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে অল্প সময় ইতস্তত করে অবশেষে সিগারেট নিলো। আমি লাইটার জ্বলে তার সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। সিগারেট খেতে খেতে সে সমুদ্রের দিকে তাকালো। তাকে কিছু অনমনস্ক এবং আত্মগত মনে হলো আমার।

অন্য দিনের তুলনায় আজ বাতাস অধিক শীতল। পশ্চাতের বনঝড়ের ঝড়ের বেহালা দাঁজছে। সমুদ্রে ঢেউ প্রবল এবং গর্জন অধিকমানের সঞ্চার। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা রহস্যের ছলে মূর্ছা টিপে-হেসে ফেলাতে একটা দৈবতা ছড়িয়ে গেছে চতুর্দিকে। লোকটি তখন কথা বলবে, আমি তার জন্য আত্মস্ত আত্মহনক করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে হলো, এই লোকটির সঙ্গে কোথাও আমার এমন একটি বন্ধন আছে, যা স্বীকার করলে কল্যাণ, অস্বীকার করলে ততোধিক।

কিছু সময় নিঃশব্দ অতিবাহনের পর লোকটি কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো, আপনার জয়তীকে মনে পড়ে?

আমি আলোর চমকে উঠলাম। এমন প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই তৈরি ছিলাম না। একটি মাত্র প্রশ্নের টানে আমার বিগত কালের যন্ত্রণার দিন হু হু করে ছুটে আসতে লাগলো। আমি অস্বীকার করতে পারতাম। কিন্তু মনের কাছে সত্যের জোর লেগে না। আশ্চর্য একটা রূপ মানুষ আমার মধ্যে দর্শণ পায়, রূপ হতে দূরার ধরে দাঁড়ালো।

আমি বললাম, সে তো অনেকদিন আগে কেবলকে গেছে।

হ্যাঁ, সেটা আপনার দিক থেকে; কিন্তু

জয়তীর দিক থেকে নয়। আর তা ছাড়া এ-সংসারে এমন অনেক কিছু আছে, যা কখনই চুকেবুকে যায় না।

আমার হঠাৎ মনে হলো, এই লোকটির আমার সঙ্গে সাক্ষাতের পিছনে জয়তীর একটা যড়বস্ত্র আছে। আমার সূত্রের দিনের উপর সে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে সব তখনই করে ভেঙেচুরে দিতে চায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি জয়তী পাঠিয়েছে?

লোকটি একটু তীব্রকণ্ঠে বললো, জয়তী অত ছোট নয়, যে দীনতার কাছে মাথা নীচু করবে।

আমার ক্রোধ উদ্বেগ করবার পক্ষে কথাটা যথেষ্ট। লোকটা কি মনে না, সুবিনয় চৌধুরী বাংলা দেশের শীর্ষ মানবদের অন্যতম। 'অত্যন্ত বিদগ্ধজনবাও তাকে সম্মান করে কথা বলে।

আপনি কে বলুন তো?' গলার তীব্রতা আনবার চেষ্টা করে আমি নিষ্ফল হলো।

আমার পরিচয় এত অকিঞ্চিৎকর যে আপনি হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবেন। তার চাইতে আমার গল্পটা আপনাকে বলি। আমার গল্পের মধ্যেই আমার পরিচয় আছে।

একবার মনে হলো বলি, আপনার গল্পটা যে আমি শুনবই তার নিশ্চয়তা আপনাকে কে দিলো। আমার সময় অত্যন্ত মূল্যবান। কোথায় তার কি ঘটলো তা শুনবার মত খেঁচ বা মানসিকতা কোনটাই আমার নেই। কিন্তু নিঃশেষে অপেক্ষা করা ছাড়া আমি কিছুই বলতে পারলাম না। কি একটা অপ্রতিরোধ্য টান আমাকে লোকটির প্রতি উৎসুক করে রাখলো।

অশ্বকারে ডেউয়ের মাথার ফসকরাসের কণিকা জ্বলছে। দু'ব আকাশে কটি নক্ষত্র স্থির। পিছনে বনঝড়ের ঝড়ের বেহালা। সমুদ্র ক্রোধাশ্বিত। এই পরিপাশ্বের মধ্যে বালুতটে আমি এবং এই অশ্বকৃত অপরিচিত লোকটি। যার সঙ্গে আমি কি এক অজ্ঞাত বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছি। আমি অনুভব করলাম, আমার সমগ্র চৈতন্য এই লোকটির কথা শোনবার জন্য উদ্ভাব্য হয়ে আছে।

লোকটি অশ্বকারে ডেউ থেকে আস্তে আস্তে বললো, 'আমার গল্পটা একজন ব্যর্থ শিল্পীর গল্প। জীবনের সঙ্গে তার শিল্পী-সত্তার প্রত্যারণার গল্প। আমি তাকে একটি মুহূর্তের জন্যও কমা করতে পারি না।' লোকটির শেষ কথাটা একজন বৃটিশ বিচারকের মত শোনালো। আমার একবার ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বলি, কোন ব্যর্থ শিল্পীর ব্যর্থতার গল্প শোনবার জন্য আমার সামান্যতম আগ্রহ নেই। আমার এ-সব কিছুই ভালো লাগছে না। আমি এখন ছোট্টে ফিরে যাবো। নীমিত্তা সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু অশ্বকারের মধ্যে

প্রসারিত একটা অদৃশ্য হাত যেন আমারকে, আমার দুটি ঠোঁটকে কঠিন মূর্তির চেষ্টা করেছে। আমি কিছুই বলতে সক্ষম হলাম না।

লোকটি আবার বললো, যে জীবনের মধ্যে সে বাস করতো, সেখানে ক্রেশু অনটন ছিলো প্রাত্যহিক। তথাপি তার প্রতিজ্ঞা ছিলো, সমগ্র মানবিক সত্তার সে একজন বর্ধাৎ ভাষ্যকার হবে। যে সমস্ত প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ কারণগুলির জন্য জীবন প্রতি মুহূর্তে মার খাচ্ছে, মানুষ জীর্ণ হয়ে পড়ছে, সে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করবে, তার প্রতিকারের কথা ভাববে।

আমার বসতে ইচ্ছে হলো, এ-সব বড় বড় বক্তব্য কথা, আদর্শের ফাঁপানো বলির কথা শুনতে আমি এখানে বসে থাকবো না। আদর্শের সঙ্গে প্রচলিত জীবনের যে বিরোধ তাকে স্বপ্নে অতিক্রম করা যায়, বাস্তবে সে অনতিক্রমণীয়। কিন্তু অশ্বকৃত একটা অবসাদ আমাকে ক্রমাশ্বরে আচ্ছন্ন করে দিতে লাগলো।

লোকটি এবার জিজ্ঞাসা করলো, 'প্রেম, ভালোবাসা, সুখ এইসব কথার অর্থ কি? এগুলি কি সমান নিরপেক্ষ, সমষ্টির সম্প্রদায়?' তারপর একটু থেমে বললো, 'ব্যক্তিগত সুখ তো আত্মপ্রবণতারই নামান্তর।'

আমি হেসে উঠতে পারতাম। ব্যক্তিগত সুখ আত্মপ্রবণতা কিনা, এই মামুলি বলির বাঁধা সড়কে আমরা তো অনেকদিন থেকে স্বন্দাবীর মত হাট্টিছাটি করছি। এবং নিজেদের অবস্থার সপক্ষে কথাগুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করছি। আসলে এ-সমস্তই আমাকে আমার কাছে ময়লা কথা।

লোকটি আবার বললো, 'হ্যাঁ, সে বিশ্বাস করতো ব্যক্তিগত সুখ আত্মপ্রবণতাই। এই নিয়ে কল্পদের সঙ্গে সে অনেক তর্ক করেছে। তখন তার কথা এবং বিশ্বাসের মধ্যে এমন একটা শক্তি ছিলো, যার জোরে সে সুখের মত জ্বলতো। তখন তার প্রতিটি রচনা ছিলো তীব্র, তীক্ষ্ণ, বিদ্রোহিত। যে সমস্ত লোকেরা তার লেখা পড়তো তারা বলতো, হ্যাঁ, এই তো বৃক্কের ভাষ্যকে মুখে আনবার মত নিষ্ঠাবান সাহসী কলম। যেহেতু লেখা নিষ্ঠাবান, কলম সাহসী, সেইহেতু আর্থিক দীনতা ছিলো তার অপরিবর্তনীয়। অজান্তে প্রয়োজন তার ঘাড় খবে নাড়া দিতো। তাকে উদ্ভাসিত করে তুলতো। অশ্বকারে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতো। বিচিত্র সব অপমান এসে তার গায়ে লাগতো। অশ্বকারের কল্যাণ কঠিন চাবুক মেয়ে মেয়ে তাকে রক্তাক্ত করে দিতো। কিন্তু আবার যখন সে বিনিয় রাস্তে বাতির সামনে বৃক্কের বৃক্কের মমতা ঢেলে অভিজ্ঞতার অনল যন্ত্রণা থেকে তার চিরন্তন গুলিকে একটির পর একটি দাঁড় করতো, তখন সেই চিরন্তনবাই তাকে সাহস দিতো, আশারমীকাল সোজা হয়ে দাঁড়বার শক্তি

সাধারণিক বসুধা

দিতো। তার স্মৃতি চরিত্রের কাউকে শূন্য করতো না। জন্মলা দিতো। আবৃত স্বরূপকে প্রকাশ্য দিবালোকের মত মেলে ধরতো। তার চরিত্রের মত, তার পাঠকের মত সে নিজেও জন্মতো। কেন না, সে বিশ্বাস করতো জন্মে জন্মে নিজেকে ক্ষয় করে একমাত্র শিল্পীই বিপুল নির্মাণ করে। সকলের অগোচরে সভ্যতার অশ্বকার থেকে বশন ধরনের দানব উঠে আসে, তখন একমাত্র শিল্পীই বিবেকের ন্যায় সীমাস্তের প্রহরী। এই সমস্ত আগুনের টুকরোর মত কথা সেই মেঘোষ্টিকও সে বলেছিল। সম্ভবত, দম নেনার জন্য লোকটি একটু ধামলো।

আমার মনে হচ্ছে, আমি একটা উমানদের হাতের বেহালা হবে গেছি। সে নিরমকানুন সব বিসর্জন দিয়ে দুঃখের আক্রোশে আমার উপর ছড় টেনে যাচ্ছে। প্রতিটি ছড়ের টানে ছিটকে ছিটকে আসছে আমার অতীত দিনের ফলস্বরূপ। তার উত্তপ্ত ছাঁকা লাগছে আমার চোখে, বুকে, মস্তিষ্কে, হৃৎপিণ্ডে। লোকটা কে, কি চায়, আমার অতীত দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে সে কি করে টুকে রাখলো স্মৃতির পাতার। সব ক্রমশই জটিল খেতে জটিলতর হয়ে উঠছে আমার মস্তিষ্কে। অথচ আমি অসহায় হয়ে পড়ছি। এই লোকটার বিবম বক্তৃতার উপর পূর্ণচ্ছন্দ টেনে দিয়ে যে উঠে চলে যাবো, তেমন শক্তি আমার অন্যতম।

লোকটি পুনরায় আরম্ভ করলো, 'এই সব দিনগুলিতে' তার সামনে যে বিভিন্ন প্রলোভন আসতো না এমন নয়। সে নিজেও বিখ্যানে সামাজিক মানুস সেখানে এইসব প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়তো। আপাত সুখের অজস্র বাহ্যিক তাকে পরাজয়ের দিকে টানতো। তার সেই সব দুঃখের দিনগুলিতে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াতো। তার সাধ্য নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে, বুক দিয়ে পড়তো।

সে দুঃখের মাথা চেপে ধরে বলতো: আমি আর পারছি না। সব অসহ্য হয়ে উঠছে। মেয়েটি তার মাথায় হাত রেখে বলতো: তুমি স্নাত ভাবছো কেন। কামেলা-গুলি আমার উপর ফেলে দাও। তুমি শূন্য লেখ, লিখে যাও। অনেক মানুষের কথা তোমার হাত দিয়ে আসুক। অনেক মানুষের কল্যাণ হোক।

মেয়েটি হঠাৎ অনেক বড় কিছু বুদ্ধিতে না; কিন্তু এইটুকু বুদ্ধিতে সে একটা বিরাট সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। মেয়েটি একটা স্কুল মাস্টারী করে তার পশু সংসারকে চালাতো। টিউশনির টাকা বাঁচিয়ে সেই টাকা সে তুলে দিতো তার হাতে। তার কি নিজস্ব সাধ ছিলো না। ছিলো। ছোট সংসার। নিজের মমতা দিয়ে প্রভু তোলা প্রতিটি দিন, প্রতিটি সন্ধ্যা। সে শূন্য অপেক্ষা করছিলো। ওর দিন আসুক।

একটু শূন্য বসল হোক। অজস্র মানুষের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে, ভীতু কপ্প পায়ে ওর হাত ধরে সে গোরবের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু বা সেই মেয়েটি পেরেছিলো তা সে পারে নি। কোন এক দুঃখের মুহূর্তে আপাত সুখ তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো সত্যের শিল্প থেকে। একদল মানুষের হাতে ফিরির সামগ্রী হয়ে গেলো সে। শিল্পীর সত্য থেকে লোকসংসারের দক্ষ বাজিকর হয়ে দাঁড়ালো। এত বড় মৃত্যুকে সে স্বীকার করে নিলো।

লোকটি একটু ধামতই আমার মনে হলো, এতক্ষণ অজস্র কথার পাখর আমার উপর নির্মমভাবে বর্ষিত হচ্ছিল। আমার সর্বশেষ খেঁতলে গেছে, রক্তাক্ত হয়ে গেছে। ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ করছি সমস্ত শরীরে। মনে হচ্ছে, এই প্রবলতার মধ্যে আমার অস্তিত্ব কুটোর মত ভেঙ্গে যাবে। আমি কীদকণ্ঠে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলাম, 'এ-ছাড়া তার অন্য আর কি উপায় ছিলো?'

'উপায় একটাই ছিলো, সত্যের সপক্ষে থাকা।'

'অর্থাৎ ভিল ভিল করে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া। শিল্পীর কি ব্যক্তিগত জীবন বলে কোন কিছু নেই? একটা লোক দিনের পর দিন অজস্র যন্ত্রণা ভোগ করে বা রচনা করলো, তা শূন্য কীট মৃচ্ছিমের লোকের কাছে শূন্য প্রশংসাপত্র শেলো। কতকাল সে আর এমনি করে নিজের সংগে লড়াই করবে। সে-ও তো মানুষ। একটু সুখ চাওয়া কি সত্যের থেকে বিচ্যুত হওয়া?'

লোকটি রুচ ভরসনার স্বরে বললো, 'সে বলুক তো, নিজের আশ্রয় দিকে তাকিয়ে বলুক, বহু মানুষের অকস্মিক মধ্য সত্য আছে, না মৃচ্ছিমের মানুষের অকস্মিক মধ্য সত্য আছে?'

আমি এক-কথার কোন জবাব দিতে পারছি না। কে যেন আমার জিভ সবলে ভিতর দিকে টেনে ধরেছে। কানে আসছে সমুদ্রের অপ্রান্ত গর্জন। চোখে পড়ছে অসংখ্য ফসফ-রাসের চোখ। আমার মনে হচ্ছে, কয়েক লক্ষ বছর ধরে আমি এই সমুদ্রের তীব্র অশান্ত বাতাসের মধ্যে একটি নির্মম সত্যের জবাবদিহি করার জন্য ভয়ানক এক অপেক্ষা করছি। কেবল অপেক্ষা করছি। আমার হাত পাখর হয়ে গেছে, পা পাখর হয়ে গেছে। মস্তিষ্ক অসাড়, প্রস্তরীভূত।

লোকটি আবার বলতে শুরু করলো, 'মেয়েটি ক্রমশই বুদ্ধিতে পারাছিলো, তার ভালোবাসার কাছ থেকে মানুষটা অল্প অল্প করে সরে যাচ্ছে। মেয়েটি কি বাধা পাচ্ছিলো না? হ্যাঁ, তার বুক ভেঙে যাচ্ছিলো। কোন একাকীত্বের মুহূর্তে তাব চোখের জলে দৃশ্য গলে গলে পড়তো।' কিন্তু তার কানকে সে কোনদিন লোকসংসার সামনে নিয়ে আসে নি।

এস কিংবাস করতো, সেই মানুষটা সত্যের থেকে পলাতক হয়ে, বৈশিদিন থাকতে পারবে না। একদিন তাকে ক্ষিরে আসতে হবেই। কিন্তু মেয়েটি নিতান্তই মেয়ে তো। সুভরাং সে বুদ্ধিতে পারাছিলো না কত বড় একটা অলীক আশ্বাসকে সে বুদ্ধি চেপে রেখেছে। আসলে ইচ্ছা থাকলেও লোকটি আর মেয়েটির কাছে ফিরতে পারাছিলো না। নিজের মধ্যে যে আগুন সে নিভিয়ে ফেলেছে, মেয়েটির মধ্যে সে আগুন যে তখনো অনিবার্ণ। তার ভীতুতা তাকে বারবার প্রতিহত করছিলো।

লোকটি ধামলো। আমার চোখের সামনে আকাশ, অশ্বকার, মাটি, সমুদ্র ধরধর করে কাঁপতে লাগলো। কে যেন আমাকে অসীম শূন্যতার নির্মমভাবে নিক্ষেপ করলো। আমি দুঃখিত বাঁচিয়ে দিয়ে অবলম্বন চাইলাম। কিন্তু সব শূন্য, শূন্য।

লোকটি এবার অলৌকিক কণ্ঠে বললো, 'তার এই শিল্পীর সত্য থেকে বিচ্যুত হবার জন্য আগামীকালের মানুষ, সমর তাব বিচার করবে। কিন্তু জয়ন্তীর জীবন তো অনন্ত কাল প্রসারিত নয়। প্রতিদিন, প্রতিরাতি জন্মে জন্মে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষের জবাবদিহি আপনাকে করতে হবে।'

চোখের সামনে একটা প্রকাণ্ড বিস্ফোরণকে প্রত্যক্ষ করলাম আমি। পাগলের মত মাথা চেপে ধবে নিজেকে শ্মির রাখতে চাইলাম। আমি অনুভব করলাম, আমার পাশ থেকে লোকটি উঠে চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে মৃদু ফিরিয়ে সে বললো, আমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন না আপনি? আমার নাম সুবিনয় চৌধুরী। তবে বাড়ি-গাড়ি আর সবকারী খেতাব আমার নেই।

আমি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে চাইলাম। বিস্তহীন অখ্যাত সুবিনয় চৌধুরীকে একটু কাছে পেতে চাইলাম। কিন্তু সব শূন্য, সব শূন্য। সেই বিস্ত বাল্যতটে আমি একা। সমুদ্র রাগে ফুসছে। ঝড়ের পাতা বাতাস উচ্চতর পদার বাজছে। আমি অশ্বকারে, বালুর উপর দিয়ে প্রাণপণে হেরটেলের দিকে ছুটতে শুরু করলাম। আর নয়, আর এক দৃষ্টও এখানে নয়। এখনই নমিতাকে নিয়ে, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাতেই কলকাতার গাড়ি ধরবো।

হঠাৎ আমার পা ধমেনে গেলো। তাব সংগে যদি কলকাতায় দেখা হয়। তবে আমি কোথায় যাবো? বাংলা দেশের কোথায়? ভারতবর্ষের কোথায়? পৃথিবীর কোথায়? সেই গর্জমান সমুদ্রতটে, গভীর অশ্বকারে দুই অসহায় হাতে মৃদু ঢেকে আমি রিত বাল্যতটের উপর একজন অকৃতার্থ মানুষের ব্রত বসে পড়লাম।

নিজের কাছ থেকে আমি কোথায় পালাবো?



বিহার ওল্ড টেম্পল ভূতপুঞ্জবিশ্বাসের রক্তিত রায়

[পঞ্চম]

চট্টগ্রাম বিদ্রোহ

রক্ত এখনও দিতে হবে ঢের
দিতে হবে আরো প্রাণ,
মৃত্যুর তীরে জীবনের ধূলা ওঠাতে।”...

কর্ষাধিনায়ক সূর্য সেন

পল্লীগাঁবের ভাল ছেলে সূর্য সেন। ছাত্রও
জল। প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজে, পরে বহরম-
পুর কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন। ১৯১৮
সনে বি-এ পাশ করেন তিনি কলকাতা বিশ্ব-
বিদ্যালয় থেকে।

তখনকার দিনে ভাল ছেলেদের বাড়ী
বিপদ ছিল। গুরুত-সম্মিতর লোকেরা সং-
ও ডানপিটে ছেলেদের মাথায় ইংরেজ-বিবোধী
বিদ্রোহের বাণী ঢুকিয়ে দেবার জন্যে ঘুরে
বেড়াতে। ভাল ছেলে সূর্য সেন-ও বহরম-
পুর কলেজে পড়ার কালে তাঁরই এক অজানা
মুহুর্তে এককম একজন বিপ্লবী ছেলেধরার
খস্পরে পড়ে যান। তাঁর আর সংসারে ঢোকা
হলো না। ঢুকলেন একটি বিপ্লবী-
সংস্থায়।...

স্বপ্নভাবী ও মিষ্ট স্বভাবের সূর্য সেন
আপাতদৃষ্টিতে বড়ই সাধারণ মানুষটি
ছিলেন। পোষাকে পরিচ্ছদে, আহরণবিহারে,
কথাবারতায় বা আচারব্যবহারে তাঁর কিছু-
মাত্র বিশিষ্টতা ছিল না। বি-এ পাশ করেই
তিনি চট্টগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ে মাস্টারীর পদ
গ্রহণ করেন। মাস্টার সূর্য সেনের অন্তরে
যে বিবাত বিপ্লবী-নেতা ধীরে ধীরে জন্ম-
গ্রহণ করছিলেন তা কেউ জানতো না। সূর্য
সেনের কর্মতপস্যা শব্দ হলো। আশ্চ-
নিবোধিত কর্মী তিনি। তাঁর সারা চিত্ত

গেরদ্বা বরণের ছোপ। তিনি সম্যাসী।
কিন্তু সংসারবিরাগী নন।

সূর্য সেন অন্ধের মাস্টার। তিনি কথা
কম বলেন। তাঁর কোন দিকেই বাহ্য জলুস
নেই। অথচ রুমশ এই মাস্টারটির চতুর্পাশেই
ছাত্রের দল ভিড় করতে লাগল। কেন?...
ছাত্ররা তাঁর কাছাকাছি এসে গেলেই বুঝতে
পারে যে এই লোকটি অন্য জগতের মানুষ—
সাধারণ লোকদের থেকে একেবারেই আলাদা।
এঁর কণ্ঠ মধুর, অথচ ওজস্বী। এঁর সমগ্র
সত্তা মধুর, অথচ গুরুগম্ভীর। এঁর হৃদয়
মধুর, অথচ কঠোর কঠিন। এঁর পাশ্চাত্য
আছে। এঁর অধীত-বিদ্যায় এবং অপরকে
দান করা বিদ্যায় কিছুমাত্র ফাঁকি নেই।
এঁর মধ্যে অমিত বীর স্বকীয় গৌরবে
বর্তমান। এঁর তনুমন সকলের কল্যাণে
অর্পিত। ছাত্ররা তাই সূর্য সেনের কঠিন
আবরণ ভেদ করে তাঁর অন্তর্নিহিত সূর্য-
লোক পান করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

সূর্য সেন এই ছাত্র ও তরুণ দলকে কেন্দ্র
করে চট্টগ্রামে একটি আদর্শ বিপ্লবী-বাহিনী
গড়ার স্বপ্ন দেখেন। সাধী তাঁর নির্মল
সেন প্রমুখ।

কংগ্রেসের কাছে সূর্য সেন জনসাধারণের
কাছে এগিয়ে এলেন। মাস্টারী ও টুইসনির
মাধ্যমে তিনি কিশোর ও যুবকদেরকে কাছে
পেতে লাগলেন। পরাধীনতার জ্বালায় ক্ষিপ্ত
তাঁর মন। এই জ্বালাবোধ সকলের মধ্যে
সংক্রামিত না হলে মুক্তিফৌজ তৈর্য হইত না।
জাতিকে স্বাধীনতা বুদ্ধিতে টেনে নেওয়ার
স্বপ্নে সূর্য সেন বিভোর। ঠিক এমন সময়
গুরুজনদের কাছ থেকে বিয়ে করার জন্যে
প্রস্তুত হবার আদেশ এলো।

সূর্য সেন জীবনকে এড়িয়ে চলবার

পক্ষপাতী ছিলেন না। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত
করার জন্যেই জীবন-মানের রক্ত তিনি গ্রহণ
করেছিলেন। বিয়ে তিনি কবলেন। কিন্তু
বিবাহ তাঁর বশ্মনরূপে দেখা দিল না।
বশ্মন মাঝে ‘মুক্তি’-র স্বাদ লাভ করার শিক্ষা
তিনি পেয়েছেন।...

মাস্টারদাকে ছাত্ররা ভয় করে, ভালবাসে,
ভক্তির চোখে দেখে। মাস্টারদার কথা মন্ত
কাজ করতে পারা তাইব কাছে শ্লাঘার বস্তু।
অহিংস-কংগ্রেসের কাছে স্বেচ্ছাসেবকদল গড়া
হয়েছে। লোকে জানে এটা অহিংস-সম্মান-
দল। কিন্তু মাস্টারদা জানান—এরা সিংহ-
শাবকবাহিনী, আগামী দিনের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী-
ফৌজ।...

এদিকে জালিনওয়ালাবাহিনী নিবস্তু
জনতাকে ডাকার-ওড়াবাবের দল পশুর মন্ত
হত্যা করেছে। সেই বীভৎস অত্যাচারের
কাহিনী সারা দেশে বিপুল উত্তেজনা এনেছে।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রশান্তি বিনষ্ট হয়েছে।
তিনি প্রতিবাদে ‘স্মার’ উপাধি ত্যাগ করেছেন।
সারা ভারতবর্ষে বিক্ষোভ। চট্টগ্রাম জাতীয়-
বিদ্যালয়ের বালকেরাই-বা চুপ করে থাকবে
কেন? তাই মাস্টারদাকে ধবল তাদের
প্রতিবাদ-সভার সভাপতিত্ব করার জন্যে।

মাস্টারদা স্মিতহাস্যে আবেগ-কম্পিত-
কণ্ঠে উত্তর দিলেন—‘এত বড় অন্যায়, এত
বড় অপমান তোবা শূন্য সভা প্রতিবাদ
করেই ভুলে যাবে? প্রতিবাদ খুঁজি না?’...

এ মন্তব্যের অর্থ ছেলেবা অনেকের
বুঝলো না। দুঃচারজন হয়তো কিছু
বুঝলো।

সভাসমিতির ব্যবস্থা ভালই হয়েছে।
কিন্তু কার্যকালে মাস্টারদাকে কোথাও খুঁজে

পাওয়া গেল না। তিনি কর্মী। বক্তৃতা দেবার জন্যে তাঁর জন্ম হয় নি।

সভাপতিমতি বা প্রতিবাদের কঠোর ভাষা-বিন্যাসে কিছু ছেলের মন শান্ত হলো না। তারা মাস্টারদার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে।

...সূর্য সেনের গোপন বিপ্লববাদী-দল এদেরকে নিরেই ক্রমে দানা বাঁধতে লাগল।

১৯২১ সালে মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতেই বিপ্লবীরা এ আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করা স্থির করেছিলেন। মাস্টারদার-ও তাই বন্দীদের নিয়ে আন্দোলনের পুরোভাগে কাঁপিয়ে পড়লেন। ফলে বিপ্লবকর্মের প্রস্তুতির পক্ষে তাঁর 'রিসোর্সফুলনেস্' বেড়ে যেতে লাগল। এ বছরই শেষের দিকে গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এল। তাঁর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে জাতির হাতের মুঠোর 'স্বরাজ' তুলে দেবার প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেছে। গুরুত্রে তাঁর আন্দোলনকে এই প্রতিজ্ঞা যেমন তেজী করেছিল, বৎসরান্তে তেমনি সে-আন্দোলনকে প্রতিজ্ঞার ব্যর্থতা মিহিয়ে লিল। ১৯২২ সালে 'চোরচোরায় কর্মীদের অহিংসাবোধ অটুট না-থাকায় গান্ধীজী তাঁর আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। জাতির চিন্তা নৈরাশ্যে বিধুর হয়ে গেল।

চট্টগ্রামে সূর্য সেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মী অম্বিকা চক্রবর্তী ও নির্মল সেন প্রমুখ দলকে বিপ্লবমুখী করার কাজে লেগে গেলেন। যুগান্তরের নেতাদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বেড়ে গেল। দলবৃদ্ধিকল্পে এবং যথেষ্ট অশ্লীল সংগ্রহার্থে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ কোথা থেকে আসবে? দলের ছেলেরা নিজেদের বাড়িঘর থেকে ছলেবলে যা যোগাড় করে তাতে দৈনন্দিন চাহিদা হয়তো মেটে। কিন্তু তার পর?

টাকা চাই। মিলবে কি করে? বিপ্লবীরা পথ পাচ্ছেন না... তাঁদের গোপন বৈঠক ঘসেছে। কর্মীরা ডাকাতি করতে চান। সূর্য সেন বিশেষ ভাবিত। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি বললেন—করো। তবে দেশের লোকের নয়, সরকারের বা যে কোন বিদেশী ব্যক্তির তহবিল লাুটে নিতে পার!...

নেতার নির্দেশ কর্মীরা মেনে নিলেন। ১৯২৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর 'পাহাড়তলী ডাকাতি' সংঘটিত হতে দেখা যায় সূর্যবাবু-দের নেতৃত্বে। এ ডাকাতি করেন তাঁর দল রেল কোম্পানির ঘরে। ডাকাতির জের টানতে হলো সূর্যবাবুদের খুব বেশি। সূর্য সেন আবার নতুন করে বুঝলেন যে, ডাকাতি বিপ্লবী-দলকে এতই বিরত করে তোলে মামলামোকদ্দমা ও ধরপাকড়ের দৃষ্টান্তে যে, বিপ্লবের কাজ তাতে বিঘাত হয়।

এই সূত্রে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিং একত্রে ধরা পড়লেন। 'পাহাড়-

তলী ডাকাতি'র মামলা শুরুর হল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সুদক্ষ পরিচালনার মামলা ফাস হয়ে গেল। তিনি জনেই বেকসুর খালাস হলেন। আরম্ভ কর্ণে তাঁরা পুনরায় আত্ম-নিয়োগ করলেন।...

পূর্বেই বলছি যে, বিপ্লবী-নেতারা কংগ্রেসের নীতিকে 'পলিসি' রূপে গ্রহণ করে কংগ্রেসে ঢোকার পক্ষপাতী হন। এবং, বৃহত্তর সশস্ত্র-বিপ্লবের প্রস্তুতির সুযোগ কংগ্রেসী-আন্দোলন থেকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত তাঁরা নেন। কিন্তু তাঁদের তরুণ সহযোগী-দের বেশিদিন এ পন্থা সহ্য হলো না। গান্ধী-আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং তাঁদের নিজস্ব ধারণায় নিজেদের নেতাদের বিপ্লব-উদ্যমে গাফিলতি তাঁদেরকে চণ্ডল করে তোলে।



সূর্য সেন

ফলে তরুণ-বিপ্লবীদের বিদ্রোহ মাঝে মাঝে সশস্ত্র-ঘটনার সৃষ্টি করে। কলিকাতা শাখারীটোলা পোস্টঅগিসে হানা, টেগার্ট-জমে 'ডেসাহেবের নিধন, চট্টগ্রামের দারোগা প্রফুল্ল রায়ের হত্যা, মাণিকতলার বোমা আবিষ্কার, মাইজাপুরের দোকানে বোমা নিক্ষেপ, দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানা আবিষ্কার, কাকোরা রেল-স্টেশানে হামলা, আলিপুর সেশনাল জেলে ভূপেন চ্যাটার্জিকে হত্যা প্রভৃতি 'এ্যাকশন' সেই বিদ্রোহেরই যে পরিচয় তা-ও পূর্বেই বলা হয়েছে। বিপ্লবী নেতাদের অজ্ঞাতে এসব ঘটলে-ও পুলিশের সূক্ষ্ম বিচার করবার সুযোগ বা ইচ্ছা না থাকায় তাঁরাই সর্বশেষ ধৃত বা নজরবন্দী হতেন। ১৯২৪-২৫ সালের মধ্যে ছোটবড় সকল নেতাই ধরা পড়ে গেছেন। সূর্য সেন কিছুদিন পলাতক থাকলেও অবশেষে রাজবন্দী হলেন।...

১৯২৬ সাল ভারতবর্ষের রাজনীতিক-ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের ব্যবসায়িক সমাবেশ হচ্ছে। মূল সভাপতি মতিলাল নেহরু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক G. U. C. সুভাষচন্দ্র। এই সঙ্গে হচ্ছে সর্বভারতীয় যুব-কংগ্রেসের অধিবেশন। তার মূল সভাপতি নিরম্যান এবং অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান সুভাষ-চন্দ্র। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর একটি শাখা নারী-বাহিনীও গঠিত হয়েছিল। তার অধিনায়িকা ছিলেন লতিকা বসু।

১৯২৬ সালের মধ্যে বন্দীরা সবাই মুক্তি পেয়েছেন। বাংলার কংগ্রেস তাঁদেরই হাতের মুঠোয়। তাই কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়কবৃন্দরূপে নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী-দের দেখা গেল। বিপ্লবীরা দলে দলে এই বাহিনীতে ঢুকেছেন সৈনিকের কারদার কুচকাওয়াজ শিখে নেবার আশয়ে। তা'ছাড়া আড়াই হাজারের অধিক যুবক এই বাহিনীতে যোগ দেওয়ার বিপ্লবীদের দলবৃদ্ধির কাজেও বিশেষ সুবিধে হবার কথা।

স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী স্বভাবতই সামরিক রীতিতে কতকগুলো বিভাগে বিভক্ত ছিল। উল্লেখ্য দক্ষিণ কলিকাতা-বিভাগটি নিরম্যান-বর্তীতায়, সুশিক্ষায় এবং কর্তব্যনিষ্ঠায় বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। এর প্রাণ প্রতিষ্ঠার মেলের সভ্য গুরুত ও শহীদ যতীন দাসের অগ্রদূত অপর্যব।

কলিকাতা-কংগ্রেস-অধিবেশন বিপ্লবী ভারতের ইতিহাসে বিশেষ ভাবন্যপূর্ণ। প্রথমত এই কংগ্রেসেই বিপ্লবীদের প্রাতিদ্বন্দ্ব-রূপে সুভাষচন্দ্র 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দাবি করেন ভারতবর্ষের জন্যে। দ্বিতীয়ত এই কংগ্রেসের এই 'স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী'-ই হলো ১৯২১ সাল থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের পূর্বকাল পর্যন্ত বিপ্লবকান্ডের মূলধার। সুভাষচন্দ্রের পার্কসার্কাস ময়দানের কর্নেল লতিকা বসু পরিচালিত নারী-বাহিনীই আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল লক্ষ্মী পরিচালিত 'বাসি রাণী বাহিনী'র অগ্রদূত। সুভাষচন্দ্রের 'কলিকাতা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী' রূপ বাঁজেরই রূপকর্তার নেতৃত্বের দুর্জয় 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' রূপ মহা-মহীরূহ!...

কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হতেই 'স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী' ভেঙে গেল না। কারণ, সত্যি সুভাষচন্দ্র এবং বাংলার বিপ্লবীরা পার্কসার্কাস ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর ধারণা মত Philip's Circu's-এর মেলা বসান নি। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ব্রহ্মল ডলান্টার্স' সারা বাংলার ছড়িয়ে পড়ল। শহর-পল্লীর রাস্তাঘাটে সামরিক পোষাক পরিহিত যুবকদল সামরিক-কারদার নিরত পা



জীবন যোযাযা

মিলিয়ে চলছে। তাতে বাঙালীর রক্তে দোলা লাগল। তরুণের স্বপ্নে এলো আগল-ভাঙবার দু'বার বাসনা।

বেংগল ভলান্টিয়ারস্কে সারা বাংলায় শক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব সবগুলো বিপ্লবীদেরই অর্পণবিস্তার গ্রহণ করার এর প্রসার বিপুল উদ্যমে বর্ধিত পেতে লাগল। কিন্তু যারা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'গ্রুপ ইজমের' উদ্দেশ্যে একে গোটা বাংলার একটি 'মুভমেন্ট' রূপে দাঁড় করাতে গিয়ে সেদিন অসম্ভব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম হলেন—সত্য গুপ্ত, গণপন চক্রবর্তী, প্রভুল ভট্টাচার্য, জগদীশ চ্যাটার্জি, বিনোদ চক্রবর্তী, জ্যোতিষ জোয়ারদার, বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, ননী চৌধুরী, সৌরভ ঘোষ, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, প্রমুখ বীরবন্দ। এঁদের কেউ কেউ ফাঁসির মঞ্চে জীবন দান করে গেছেন। এঁদের প্রত্যেকের সংগঠন-কর্মতা ও বৈশিষ্ট্যবিক-কার্যে অবদান প্রথম শ্রেণীর।

এই সামরিক স্বেচ্ছাবাহিনী তথা 'বেংগল ভলান্টিয়ারস্' বাংলার তরুণ-মানসে অশ্রুত শৌর্যশক্তির ছায়া ফেলেছিল। সুভাষচন্দ্রের আসন ভারতের যুব-হৃদয়ে অশ্রুত সত্য স্থান পেল। অবশ্য যারা গান্ধীজীর অহিংসা-মন্ত্রে মগ্ন, অথবা যারা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে অক্ষম,—সেসব শিক্ষিতের দল এই স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে সেদিন যথেষ্ট ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিলেন। গান্ধীজী স্বয়ং পার্কসার্কাস ময়দানে মিলিটারি পোষাকে সজ্জিত হাজার হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক দেখে ভয় পেয়ে যান। তিনি বিজ্ঞ লোক বলেই সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বাহিনীর মধ্যে অহিংসা-মন্ত্রের বিরোধী ঘোর শত্রুকে মনে মনে আবিষ্কার করেন। তিনি অহিংসামন্ত্রের

কণি। 'স্বাধীনতা' থেকে 'অহিংসা' তাঁর কাছে বৃহত্তর বস্তু। হিংসায় দেশ স্বাধীন হলে তাঁর আদর্শের মৃত্যু ঘটে। অভাব সর্বজন সমক্ষে 'Childrens Pantomime', 'Philip's Circus' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে সুভাষচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টাকে হের করবার জন্যে গান্ধীজী রুঢ় রসিকতার আশ্রয় নেন। বাংলাদেশের সুভাষাবিরোধী কয়েকটি কাগজও 'পক্' J. O. C. 'খোকা ভগবান' ইত্যাদি মধুর বাক্যে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে সম্ভা রসিকতা সৃষ্টি করে নিজেদের দাসসুলভ অজ্ঞতার পরিচয় দেন!...

সূর্য সেন কদম বাড়িয়েই চলছেন। চট্টগ্রামে সামরিক স্বেচ্ছাবাহিনী পূর্ণ উদ্যমে গঠন করা শুরু হয়েছে। শহরে এবং গ্রামে গ্রামে তাঁর দল দিন দিন প্রসারিত হতে লাগল। ১৯৩০ সালের লবণ-সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়ে গেছে। বিপ্লবীদের যুবকসম্প্রদায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। প্রবাসেরাও দল সামলাবার জন্যে কিছু করার ভাবনা ভাবছেন। কিন্তু কার্যত তাঁরা এগুচ্ছেন না। বিপ্লবের প্রস্তুতি তাঁদের মতে অনেক পিছিয়ে আছে, কাজেই 'যা কিছু একটা করে নিঃশেষ হয়ে যাবার' আগ্রহ তাঁদের কম। কিন্তু চট্টগ্রামের কথা আলাদা। সূর্য সেনের দল সবার অলক্ষ্যে পূর্ণ প্রস্তুতির পথে এগিয়ে বাচ্ছে। একটা জেলা ধরে টান দেবার ক্ষমতা তাঁদের প্রায় আয়ত্তে।...তাঁরা স্থির করলেন কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে, যুগান্তরের প্রবীণদের পরামর্শ না নিয়ে যথাসময়ে বৃটিশের ওপর হানবেন তাঁরা চরম আঘাত। আগুন জ্বলে উঠবে চট্টগ্রাম জেলায়—তারপর সেই অশ্লিষ্টা থেকে শিখা জ্বলে নিয়ে অপর জেলা এবং অপর জেলাগুলো থেকে প্রদেশে-প্রদেশে বিপ্লববাহি জ্বলে দিক বিপ্লবীরা, যদি সত্যি তাঁরা কাজের কাজ করতে চান। মোটের ওপর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে চট্টগ্রাম কারো জন্যে অপেক্ষা করবে না। কারণ অপেক্ষা মানেই ব্যর্থতার মৃত্যু!...

ক্রমশ কাজ শুরু করে দেবার অবস্থা এসে গেল। অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় হয়েছে। বোমার কারখানাগুলোও বসে নেই। প্যারেড এবং অস্ত্রচালনা-শিক্ষাও ছেলেরা যথাসম্ভব পাচ্ছে। গোপন ঘাঁটি প্রচুর ঠিক করা আছে। নেতার আহ্বানে একটি অর্ধভাণ্ডার খোলা হয়েছে। সে-ভাণ্ডার কেবল দলের ছেলেরদের আপন গৃহ থেকে আনীত অথৈই থাকবে ভরা। ইতিমধ্যে ঐ ভাণ্ডারের সমুদ্র প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার কাছে এসে গেছে! প্রস্তুতির আর বাকি কি? চট্টগ্রামের তরুণ রক্তে লেগেছে 'সর্বনাশের নেশা'!...

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

১৮ই এপ্রিল। ১৯৩০ সাল। বাংলার বিপ্লব-জীবনের এক উজ্জ্বল দিন। চট্টগ্রাম শহর। রাত দশটার 'অস্ত্রাগার' আক্রমণের সময় নির্ধারিত হয়েছিল। ঐ দিনটি বেছে নেবার তাৎপর্য ছিল। আইরিশ বিপ্লবীদের 'ইস্টার-ব্রেনোহের' স্মৃতি ঐ দিবসের সঙ্গে জড়িত। সেদিন ছিল গুড্‌ফ্রাইডে!...

আইরিশ-বিপ্লবীদের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীরা মানসিক একাত্মতা বোধ করতেন। ভারতের 'টেরেন্স ম্যাকসুইনি' যতীন দাসকে আমরা দেখেছি। ভারতের 'ইস্টার-রাইজিং' চট্টগ্রাম-ব্রেনোহ এবার আমরা দেখবো। ভারত-আয়ারল্যান্ডের বিপ্লব-চেতনা একই প্রাণসূত্রে স্পন্দিত বলেই সুভাষচন্দ্র-ডি ভালেরা বন্ধু ছিল অমন স্বভাব ও সুন্দর।

ইতিপূর্বে জাতীয় সত্বেশের শেষ দিবসে (১৯৩০ সাল) বিপ্লবীদের একটি চরম বৈঠক সংগোপনে বসেছিল। সে বৈঠকেই স্থির হয়েছিল ব্রেনোহের তারিখ ও স্থান। আরো স্থির হয়েছিল যে—বিপ্লব-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন সূর্য সেন এবং গুয়ার কার্ডিনাল তথা অধিনায়ক-কমিটারি সভ্য হলেন নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অশ্বিনী চক্রবর্তী ও উপেন ভট্টাচার্য। বাহিনীর নাম স্থির হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্বস্ত প্রধান কর্মীদের অনেকে। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করেছিলেন যে, অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে 'পুলিশ আর্মার' আক্রান্ত হবে। নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে আক্রমণ করা হবে



রাসকৃষ্ণ বিশ্বাস

সাপ্তাহিক বসুমতী

রেলওয়ে আর্মারি'। অম্বিকা চক্রবর্তী'র নেতৃত্বে আক্রমণ করা হবে 'টেলিগ্রাম ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ'। তিনটি দল একই সময়ে সংগীদেবর সহ তিনটি মোটরে যথাস্থানে পেঁছে আক্রমণ চালাবেন। এই মোটর-বাহিনী ব্যতীত এক পদাতিক-বাহিনী—সংখ্যায় তিরিশ জন—পুলিশ-আর্মারির কাছে এক গুপ্ত স্থানে অপেক্ষা করবেন। সংকেত পেলেই আক্রমণকারী বিপ্লবীদের সাহায্যে তাঁরা ছুটে আসবেন। অপর আর একটি মোটরে সর্বাধিনায়ক রক্ষাদল সহ পুলিশ-আর্মারির কাছে সংগোপনে অপেক্ষা করবেন। সেই পূর্বনির্দেশিত স্থানটিই হবে সর্বাধিনায়কের 'হেড কোয়ার্টার'। বিপ্লবীদলগুলো নিজেদের কাজ সমাপ্ত করে সর্বাধিনায়কের দস্তরে ফিরে এসে রিপোর্ট করবেন, এটাও স্থির ছিল।

দুঃসাহসে বলীয়ান, দেশমুক্তির সূচনা সৃষ্টির নেশায় মত্ত, বিপ্লবের বহিঃশিখার ভাবনর, স্বজাতিপ্রেমের রসে ভরপুর বিদ্রোহী তরুণ দল সকল ফুটেই জয়ী হলেন। ১৮ই এপ্রিলের সেই রজনী জাতির ইতিহাসে সোনার অক্ষরে যে বসুমতী রচনা করছে তা ইতিহাস-প্রখ্যাত। এই অভিযান বাঙালীর দৃপ্ত পদযাত্রার ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেল। হালাসোরের পঞ্চবীরের আত্মা চট্টগ্রামের অজস্র ধীরবৃন্দের রক্তে কোন লগ্নে যেন আপন অম্লান রক্তধারা প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন! দেশবাসী বিস্ময়ে, পুলকে ও আত্মগরিমায় উজ্জল হয়ে সমস্তের শব্দ বলে উঠল : 'খন্ড চট্টগ্রাম'!...

পর্যায়ীন ভারতের মুক্তিকামী-ইচ্ছা চট্টগ্রামে, কর্ণফুলীর তীরে, প্রচণ্ড শক্তিতে ছুটিশের আত্মতরিতাকে সেদিন আঘাত দিল।



হরিগোপাল বল (চাণাচাণ)

সাহেবদের শ্রীপুরুষ দল বেঁধে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল কর্ণফুলী নদীর মোহনায়। তিনদিন কোন শাসনব্যবস্থা ছিল না শহরে। বিপ্লবীদের সঙ্গে লড়াইতে এসে দেশী ও বিলাতী কর্মচারীরা জীবন দিল কিছু, পালিয়ে গেল বহু। ম্যাজিস্ট্রেট উইলকিনসন মোটরে ছুটে এসেছিলেন বীর-বিক্রমে। বিদ্রোহীর গুলীতে তাঁর বডিগার্ড ঘায়েল হল, ড্রাইভার মারা গেল। সাহেব বৃশ্চিক করে মোটরের নিচে ঢুকে গিয়ে মড়ার মত পড়ে রইলেন। মোটরটি অজস্র গুলীর আঘাতে শতচ্ছিন্ন হলো। সাহেব অবশ্য বেঁচে গেলেন।

বিদ্রোহীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গুলী দখল করলেন। তারপর দুটি আর্মারিতেই আগুন লাগিয়ে দিলেন। আতঙ্কে ও বিস্ময়ে আঁধার নিশীথে শহরবাসী দেখল যে—লেলিহান শিখা উদ্‌ধ্ব আকাশে বিছিয়ে গেছে! সর্বগ্রাসী বহি তখন পুলিশ ও রেলওয়ে লাইনের দিক থেকে উৎসারিত হচ্ছিল!...

বিপ্লবীরা ইংরেজের 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামিয়ে ফেললেন। তার স্থানে উদ্ভীন হল জাতীয় পতাকা।

নির্দিষ্ট কাজ শেষ হতেই সকল ফুট থেকে কর্মীরা ফিরে এলেন হেড কোয়ার্টারে, অর্থাৎ পুলিশ লাইনের সেই নির্দিষ্ট স্থানে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ঘন ঘন উচ্চারিত হতে লাগল। সেই ধ্বনি শহর পার হয়ে কর্ণফুলীর শতসহস্র তরণে কেপে কেপে গেল, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে বনের নিভৃত নিরালার প্রতি-ধ্বনিত হয়ে চলল। চট্টগ্রামের বৃকে মৃত্যু-বিজয়ী বীরগণের জয়নাদ অভূতপূর্ব জীবনের সাড়া দিল।

বিপ্লবীরা সর্বাধিনায়কের সম্মুখে সামরিক রীতিতে লাইনবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। 'ইউনিয়ন রিপাবলিকান আর্মি' সগৌরবে সর্বাধিনায়ককে 'গার্ড-অব-অনার' জানিয়ে সম্মানিত হলেন।...

এদিকে ঠিক ৯-৪৫ মিনিটে এক দল, বিপ্লবী শহর থেকে ৪০ মাইল দূরে 'খুম' স্টেশানে কতগুলো 'ফিশ্-লেট' ভুলে একখানা মালগাড়িকে লাইনচ্যুত করে চট্টগ্রাম মেল ট্রেনটিকে আটক করার ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া ৩৪ মাইল দূরে 'লাঙল-কোটে' টেলিগ্রাফের তার কেটে ও স্থানে স্থানে লাইনের 'ফিশ্-লেট' সরিয়ে তারা চলাচল ও সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা নষ্ট করে রাখেন।

বিপ্লবীদল হেডকোয়ার্টারে একত্রিত হয়ে অতঃপর কি প্ল্যানে কাজ করা হবে তা আলোচনা করছেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিত-ভাবে অনতিদূরের 'ওয়াটার ওয়াক'স'-এর দিক থেকে অসংখ্য লুইস্ গানের গুলী আসতে লাগল। বিপ্লবীদের জানা ছিল না যে ওখানে একটি লুইস্ গান ছিল। গুলীর প্রত্যুত্তরে এঁরা-ও প্রচুর গুলীবর্ষণ করতে



লোকনাথ বল

লাগলেন।...সহসা সবাই দেখলেন যে অগ্নি-দগ্ধ অবস্থায় কে যেন আর্মারির দিক থেকে ছুটে আসছে। কিছুটা কাছে আসতেই চেনা গেল। সকলে চিৎকার করে উঠলেন—হিমায়েদ সেন বে! তাঁকে টেনে এনে মাটিতে চেপে ধরে তাঁর গারের আগুন নেভান হল। তারপর কোনো পরামর্শের অপেক্ষা না করে অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ তাঁকে মোটরে তুলে ছুটে চলে গেলেন শহরের দিকে কোন আত্মতরিতার চিৎকার জন্মে তাঁকে রেখে আসতে। তাঁদের সঙ্গে গেলেন জীবন ও আনন্দ।...

এদিকে গুলীবর্ষণ চলেছে উভয় তরফেই। বিদ্রোহীরা ভাবলেন যে, পুলিশ হয়তো রি-ইনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা করেছে। ভাবলেন, হয়তো তাঁদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে সামরিক-বাহিনীর সাহায্যে। সুখ সেন তখন আদেশ দিলেন আত্মগোপনের পথ দেখতে। শহরে বাওয়া ঠিক নয়। পাহাড়ের দিকে বাওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের মত নেতৃস্থানীয় সুদক্ষ সাধীরা যে ফিরে আসছেন না? হুঁ মটা কেটে গেছে—আর তো অপেক্ষা করা চলে না। হয়তো ওঁদের চারজনকে আটক করে ফেলেছে শত্রুরা। হ্যাঁ, হয়তো তা-ই। কাজেই সর্বাধিনায়ক হুকুম দিলেন যে, যথাসম্ভব অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে এগুতে হবে পাহাড়ের দিকে।...

দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের, দুর্ভাগ্য বিদ্রোহীদের। ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সহজ বৃশ্চিক ত্যাগ করে কঠিনতর বৃশ্চিক পথে এগিয়ে চললেন। কারণ কোন 'রি-ইনফোর্স-মেন্ট'-ই হয় নি। মুন্সিমেয় কর্মচারী একটি-মাত্র লুইস্ গান নিয়ে লড়াইছিল। তারা স্থির করতে পারছিল না যে পালাবে, না আত্ম-সমর্পণ করবে। সমস্ত শহর অরক্ষিত, তিন দিন পর্যন্ত বাইরের জগতের সঙ্গে চট্টগ্রামের কোন সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু ভাগ্যবিধাতার লিখন আলাদা!

দাপ্তরিক বসুমতী

তুল ধারণা করে বিদ্রোহীরা বহুতর ও তৎক্ষণাত্ অবস্থার বহনযোগ্য স্বল্পতর অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দুর্গম পর্বতের বন্ধুর গথে যাত্রা করলেন। পাহাড়-পথের সম্মান জানতেন অম্বিকা চক্রবর্তী। তিনি চললেন পথ দেখিয়ে। সহজতর যুদ্ধের সম্ভাবনা জাগ করে কঠিনতর যুদ্ধের বিপদে তরুণ ও কিশোর বীরদের এই পদযাত্রার পরিণতিই 'জালালাবাদ-ইতিহাস'। জালালাবাদ-যুদ্ধের অন্যতম অধিনায়ক লোকনাথ বলের বিবৃতির কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল।...

জালালাবাদ-যুদ্ধ

পাহাড়ের গায়ে বিদ্রোহীদের সমাবেশ সরকার পক্ষের অজানা রইল না। তাই 'ইস্টার্ন রাইফেলস বাহিনী' ও 'সুর্মাভেলী বাহিনী' সহ পুলিশ ও সরকারের বড়কর্তারা জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে ফেলার কল্পনা নিয়ে এগিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁদেরও অসুবিধা ছিল। তাঁরা জানতেন না কোন বিশেষ স্থানে বিদ্রোহীরা ওং পেতে আছেন। তাঁরা জানতেন না কেমন তাঁদের লোকবল এবং অস্ত্রবল।

জালালাবাদ-যুদ্ধে তাই সরকার পক্ষের হার হলো।

বিজয়ী বিপ্লবীদের অধিনায়ক লোকনাথ বলের লিখিত বিবরণের মূল্য খুব বেশি। তিনি লিখেছেন 'যুগান্তর' পত্রিকার স্বাধীনতা-সংখ্যায় ৫—

"বাইশে এপ্রিল প্রাতে দীর্ঘপথ পার হবার পর জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে আগ্রহ নিয়েছি। ১৮ই এপ্রিল (১৯৩০) অস্ত্রাগার দখল করার পর চট্টগ্রাম আমাদের আরম্ভে আসে। তারপর বিভিন্ন পাহাড়ে আমরা দিন কাটাই। এই ক'দিন আহার জোটে নি। পাহাড়ের ঘোলা জল এবং বুনো কাঁচা আম ছিল আমাদের পানীয় ও আহার। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ওঠার সময় অনেক গ্রাম-বাসী আমাদের দেখেছিল। কাজেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, পুলিশ এবার আমাদের ধুঁকে পাবে। দুর্ঘটনার জন্যে মনের দিক থেকে তাই আমরা ভয়ের ছিলাম। অবশ্য তিন দিন ধরে অভূত অবস্থার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা হয়েছে। দেহের দিক থেকে আমরা ক্লান্ত।...

কেলা অনুমান পাঁচটা। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের রক্ষীরা বিপদ-ধ্বনি যাকিয়েছেন। সবাই পাহাড়ের চূড়ার জড় হলাম। দেখলাম একদল সৈন্যবাহিনী সঙ্গী উঠিয়ে আমাদের পাহাড়ের দিকে ছুটে আসছে। আমরা মরিয়া হয়ে রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়িলাম। সৈন্যবাহিনী আমাদের নিশানার মধ্যে আসতেই গুলীবর্ষণের নির্দেশ দেওয়া হল। আমাদের গুলীবর্ষণ শব্দ হতেই সৈন্যরা পিছু হটে লাগল। কিছুটা দূরে তারা পেল একটি পাহাড়ি খাদ। সেখানে তখন জল ছিল না বললেই হয়। সেই খাদে

তুকে তারা পাটা জবাব দিতে শব্দ করল। প্রায় পনের মিনিট যুদ্ধ চলার পর আমরা হঠাৎ লাইস্‌গানের গুলীবর্ষণের আওয়াজ শুনলাম। গুলীবর্ষণ ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠল। আমার পাশে আমার ছোটভাই 'টেগরা' আহত হয়ে চলে পড়লেন। বলে গেলেন—দাদা! আমি চললাম। তোমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ কর।" দেখতে দেখতে হ্রিপদ্রা সেন, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্মল সেন, অর্ধেন্দু দস্তিদার, জিতেন দাশগুপ্ত, পদ্মিন ঘোষ, শশাঙ্ক সেন, মতি কানুনগো আহত হয়ে ধুলোয় গড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের রক্তে লাল হয়ে উঠল জালালাবাদের মাটি।... তখন অনুমান সাতটা। হঠাৎ সরকারী সৈন্যবাহিনীর দিক



প্রীতিলতা ওয়াদাদার

থেকে তিনবার হুইসেল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুলীবর্ষণের আওয়াজ থেমে গেল। আমরা লাইং ডাউন 'পজিশন্স' থেকে লাইফরে উঠে দেখলাম সৈন্যবাহিনী পলায়ন করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলীবর্ষণ পুনরায় শব্দ হলো। আমাদের 'বন্দেমাতরম' ও 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিক্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলল। উঃ, সে কি বিজয়োল্লাস! তিন দিনের অভূত, পথপ্রমে ক্লান্ত, তৃষ্ণার কাতর জনপণ্ডাশেক বিপ্লবী (তাঁদের অধিকাংশই ছিল পনের-ষোল বছরের কিশোর) দেশপ্রেমে উত্ত্বুদ্ধ এবং মৃত্যুশেখার মস্ত হরে দাঁড়িয়েছেন একদিকে—আর অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, রণবিদ্যার পারদর্শী, বহু যুদ্ধবিজয়ী বৃটিশের সৈন্যবাহিনী। তাই যে-মহতের জয়লাভ বিপ্লবীদের ইতিহাসে কম গৌরবের কথা নয়।...

পাহাড়ের গা বেয়ে কাগের বনিকা নেমে আসছে। সন্ধ্যা গাঢ়তর হয়ে এল। জালালাবাদের রণাঙ্গানে শায়িত শহীদবৃন্দ। সর্বাধিনায়কের আদেশে মৃত সৈনিকদের 'গার্ড-অব-অনার' দেওয়া হল। তারপর তাঁদের অঙ্গ থেকে অস্ত্রশস্ত্র অপসারিত করে অন্তহীন আকাশের নিচে কঠিন ধরণীর ধূলিশযায় বীরদের রেখে সমগ্র বাহিনী চোখের জলে বিদায় নিলেন স্থানান্তরে যাবার জন্যে। এই যুদ্ধে বীরা আত্মদান করেছিলেন তাঁদের নাম হলো—নরেশ রায়, হ্রিপদ্রা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল, মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লাল, জিতেন দাশগুপ্ত, মধু দত্ত, পদ্মিন ঘোষ, অর্ধেন্দু দস্তিদার। আহত অম্বিকা চক্রবর্তীকেও মৃত মনে করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে অন্যান্য আহতদের নিয়ে সর্বাধিনায়কের বাহিনী গভীর অন্ধকারে পাহাড়ের পথ ভেঙে দূরে সরে যেতে চাইলেন। কারণ প্রভাত হতেই ইংরেজের তিন-চারটি সামরিক ডিভিশন তাঁদের ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সুর্ষ সেন খবর পেয়েছেন যে, ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম সৈন্য ছেয়ে গেছে। তারা প্রত্যেক ইঞ্চি জমি রাইফেলের ডগা দিয়ে চষে ফেলবে।

বনাম্বকারে, দুর্গম-পথে ক্লান্ত পদক্ষেপে চলতে গিয়ে বাহিনীর একাংশ সহ সুর্ষ সেন ও নির্মল সেন, লোকনাথ বল ও বাহিনীর অপরাংশকে হারিয়ে ফেললেন। সর্বাধিনায়কের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন লোকনাথ বল।...

সুর্ষ সেন ও তাঁর বন্ধুগণ ভোরের দিকে একটি পাহাড়ের গৃহের আগ্রহ নিলেন। দূরে দেখা যায় জালালাবাদ। সেখানে শায়িত শহীদকুল—যারা রক্তাক্তে লিখে রেখেছেন মৃত্যুর বাণী। তাঁরা স্বাধীনতার অগ্রদূত। মৃত্যুকে বরণ করে ঐ কিশোরদল সর্বাধিনায়কের অগ্রজ হয়েছেন। তাঁরা জাতির নমস্কার।...

* * *

অম্বিকা চক্রবর্তীর চেতনা ঘিরে আসতেই মৃতদের দেহস্থত্প থেকে তিনি নিজেকে অতি কষ্টে বের করে আনলেন। তারপর আপ্রাণ চেষ্টায় পথ-চলা শব্দ করলেন ঘন অন্ধকার ঠেলেটুলে। পথ তাঁর কিছুটা জানা থাকার 'ফতেয়াবাদ' গ্রামের এক আগ্রহে তিনি এসে উঠলেন। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেও তিনি আজ নিঃসঙ্গ। কোথায় মাস্টারদা, নির্মল সেন, লোকনাথ বল? কোথায় গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং? কোথায় অন্য সব মৃত্যুপথস্রাবী সাথী? তিনি একা। এই ভূমণ্ডলে তাঁর সঙ্গী কেউ নেই। তিনি একা!!...

* * *

২০শে এপ্রিলের প্রভাত। সারা শহর মিলিটারি পাহারার চাপে অতিষ্ঠ। 'আম'ড' কার'গুলি দৈত্যের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত দিনের অপরাহ্নে যে বীরপুরুষেরা কতিপয় বিপ্লবীর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে পালিয়ে এসেছিল

ভারতীয় আজ উদ্দেশ্যের স্বার্থে নিরীহ নগর-
বাসীকে নির্বাসিত করেছে। ভারতের স্পেশাল
ফোর্সে আরো এক হাজার জঙ্গী পুরুষের
আবির্ভাব ঘটেছে। রেলের ইঞ্জিনে লাইসেন্স
হাসিলে মেইন লাইনে এবং শাখা লাইনগুলোয়
সৈনিকেরা চট্টগ্রাম জেলার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।
উদ্দেশ্য শূন্য জানান দেওয়া—“ওরা কেউ নয়।
আমরা আছি, এখনো আছি।”...

ইংরেজের সশস্ত্রবাহিনী বীরদর্পে এবার
জালালাবাদ পাহাড় চড়ে ফেলবে। এবার
ভারতের জয় নিশ্চিত। দলে দলে বাহিনীর
লোকেরা নানা পথে পাহাড়ে উঠতে লাগল।
পাহাড় যেন শ্মশান। গভরুলের ভীষণ যুদ্ধে
সতর পাহাড়ের কোথাও যেন প্রাণ নেই।
গরহীন বস্তুত্ব, কলরব নেই পাখির কণ্ঠে,
বনের পশু উধাও।

সেনাবাহিনীর বড় বড় কর্মচারীরা বুকলেন
যে, বিপ্লবীরা পালিয়েছে। কিন্তু তাদের
সম্মুখে পাহাড়ের ভূমিশস্যার শুরুর আছেন
হারটি বীর। তাদের মধ্যে একটি গুলীবিক্ষ
হলেও প্রাণ হারান নি। অর্ধশত দস্তিদারকে
জেল-হাসপাতালে পাঠান হল। সেখানেই
তিনি দেহরক্ষা করে অমর হলেন!...

ইংরেজ শত্রুকে ঘৃণা করলেও তার
বীরত্বকে শ্রদ্ধা করে। কারণ, ইংরেজ বীরের
জাত। মৃতের সঙ্গে লড়াই করে কাপুরুষ।
ইংরেজ কাপুরুষ নয়। কাজেই মৃত বীরদের
দেহগুলো পর পর সাজান হবার পর পুলিশ
তাদের ফটো তোলা, তাদের সনাক্ত করা প্রভৃতি
যাবতীয় কাজ শেষ করলে সামরিক কর্মচারী
ও সেনাবাহিনী চট্টগ্রামের বিদ্রোহী শহীদদের
সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানালেন!...
তৎপর চিতাশয্যায় প্রচুর পেট্রল ঢেলে আগুন
দিতেই সহস্রাধিক মেরু ধরণীর দাহ উদ্ভ-
ম্বী হল।—

“...তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক বাহার
জ্বলিয়াছে বিজয় করি দেশের আধার
প্ৰবর্তারকার মতো? জয় তব জয়!”...

জালালাবাদের শহীদবৃন্দ মৃত্যুহীন
আলোকে উদ্ভাসিত করে গেলেন পৃথিবীর
মুখ। বিশ্বের নির্বাসিতের দল এই আলোক-
শিখা থেকে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে পথ-
চলার সংকল্প গ্রহণে ধন্য হলো।

কালারগোল লড়াই

জালালাবাদ-বুদ্ধের রাতে পাহাড়-পথের
ঘনান্ধকারে মাস্টারদা-নির্মল সেনের দল থেকে
লোকনাথ বলের দল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বহু
দুঃখকষ্ট ভোগ করে শেষটায় তাঁদের মিলন
ঘটে ‘কোয়াপাড়া’ গ্রামে। এই গাঁয়ে পূর্বেই
মাস্টারদারা আগ্রস পেয়েছিলেন দলের অনন্য-

সাধারণ হৃদয়বান সাহসী কর্মী বিনয় সেনের
গৃহে। মায়ের গহনা বিক্রয় করে, বাসনপুস্তর
বন্ধক দিয়েও দিনের পর দিন এই পলাতক-
দলকে বিনয় সেন আহার দিয়েছেন, আশ্রয়
দিয়েছেন।...

বিপ্লবীরা নতুন কার্যক্রম স্থির করার
আগ্রহে আলোচনায় রত। মাস্টারদা বলছেন :
“আমরা এবার ‘একলা’ চলাই পথ। বৃহত্তর
ভারতে, এমন কি বহুং বাংলায়ও আমাদের
‘কর্মক্ষেত্র’ নয়। আমাদের স্বেচ্ছায় বেছে
নেওয়া কর্মস্থান চট্টগ্রামের সীমার। কিন্তু
প্রচণ্ডতম আঘাত এখন থেকেই বৃটিশের ওপর
আমরা হানবো বারে বারে। এ আঘাতের টেট
সুদূরবাসী সতীর্থদের বিপ্লবমুদ্র প্রাণে



ভারতবর্ষের দস্তিদার

নিশ্চয়ই সাজা আনবে। লাহোরে বতীন দাসের
অনশনে মৃত্যুবরণের যাতনা দুঃস্বপ্নে এই
চট্টলার বৃকে বলেও আমরা কত গভীর করে
অনুভব করছি। তেমনটি একটি জেলার
সসীম ক্ষেত্রে বিদ্রোহের বাণী বাংলা ও
ভারতের প্রাণবন্ত অংশে নিশ্চয় প্রেরণা
যোগাবে। আমি চট্টগ্রামে বসেই চট্টগ্রামের
তরুণ-শক্তির স্বপ্নকে রূপ দিতে গিয়ে আমার
শেষ শয্যা বিছিয়ে দেব। যদি ভোমাদের কেউ
এখানে থাকতে না পারে তবে বাইরে পালিয়ে
গিয়ে বিপ্লবকর্মের ক্ষেত্র রচনা করো।”

(চট্টগ্রাম অস্তাগার লন্ঠন—পৃঃ ১৫৬)

মাস্টারদার বিস্মততম সুদক্ষ সতীর্থ,
ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির প্রাণস্বরূপ
নির্মল সেন বলেন : “মনে রেখো, আমাদের
মধ্যে মরতে সকলেই পারে। কিন্তু বাঁচতে বা
বাঁচাতে পারে ক’জন? পলাতকজীবন আমাদের

শত্রু হয়েছে, অনন্ত কাজ পড়ে আছে
সম্মুখে। হৃদয়ের মধ্যে কোন কিছু করা
যাবে না। প্রস্তুতির প্রয়োজন। চাই স্বার্থ,
চাই সত্যকর্মে ও বিচকণ পদক্ষেপ।”

(চট্টগ্রাম অস্তাগার লন্ঠন)

তারপর দক্ষ কর্মী তরুণ মহেন্দ্র চৌধুরীর
পানে তাকিয়ে বললেন নির্মল সেন : “পারবে
যে-কাজ দেব তা করতে?”

মৃত্যুপাগল দুঃসাহসী মহেন্দ্রকে গঠন-
কাজে জড়িয়ে ফেলতে চান তাঁর নেতা।
মহেন্দ্র দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন : “পারব।”

(চট্টগ্রাম অস্তাগার লন্ঠন)

স্থির হলো পলাতক-জীবনে আগামী
র্যাকশানের জন্যে তৈরি হতে হলে এবং
পর পর র্যাকশান সাফল্যের সহিত করে
বেতে হলে একটি সুদক্ষ বিপ্লবী গোয়েন্দা-
বিভাগ থাকা আবশ্যিক। নেতাদের বিচারে এ
বিভাগের দায়িত্ব মহেন্দ্র চৌধুরী গ্রহণ করলে
নিশ্চিত থাকা যায়। মহেন্দ্রের সহকারী-
রূপে আরো তিনটি উপযুক্ত তরুণকে দেওয়া
হল। মহেন্দ্রের যোগাযোগ থাকবে শূন্য
মাস্টারদা ও নির্মল সেনের সঙ্গে, দলের
আর কারো সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক থাকবে না।
বলা বাহুল্য মহেন্দ্র চৌধুরী অপূর্ব দক্ষতার
তীর কতব্য পালন করে গেছেন। তাঁর
বিভাগটির সহায়তা ব্যতীত সর্বাধিনায়কের
কর্মকাণ্ড অপ্রতিহত হতে পারতো না।
মহেন্দ্র চৌধুরীর একাজের প্রধান সহায়ক
ছিলেন সতীনাথ সেন। সতীনাথবাবু আপাত-
দৃষ্টিতে ছিলেন মাস্টারদার গৃহীভক্ত। কিন্তু
গৃহ তীর কাছে কোন কালে বন্ধনরূপে
আসে নি। গৃহ ছিল তাঁর ‘ক্যামোফ্লাজ’।
কাজেই বে-সাহায্য তিনি এই ‘ক্যামোফ্লাজের’
আশ্রয়ে সেই দুর্দিনে বিপ্লব-কার্যে দিতে
পেরেছিলেন তা অতুলনীয়।...

* * *

নির্মল সেন মাস্টারদার কাছে একটি
প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন যে, মৃত্যুপাগল
ক’টি ভাইকে ছেড়ে দিতে হবে।

‘কেন?’

‘পাহাড়তলীর স্বেতাঙ্গপাড়া আক্রমণ
করার ইচ্ছা তাদের। এসব ফিরিঙ্গীরাই
পুলিশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সারা শহরে অকণ্ঠ্য
অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই আত্মপ্রত্যায়
লুপ্ত হবে এখন কোন প্রত্যায় না দিলে।’

(চট্টগ্রাম অস্তাগার লন্ঠন)

মাস্টারদা স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন : ‘যে
যজ্ঞ আরম্ভ করেছি তাকে অনিবার্ণ রাখতে
হলে এমনি প্রাণ-নিবেদনে যজ্ঞকুণ্ডের বহিকে
জাগিয়ে রাখতে হবে বই কি।’

(চট্টগ্রাম অস্তাগার লন্ঠন)

স্থির হলো রক্তকুমার, মনোরঞ্জন, দেবী

প্রসাদ, ফণীন্দ্র নন্দী, স্বদেশ রায় ও সুবোধ চৌধুরী এ-কাজের দায়িত্ব পাবেন।

* * *

ওই মে। শহরে শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের পাড়া পুলিশ, আই-বি ও সান্ধ্যদের খবর-দারীতে সচকিত। ছয়টি পলাতক বিপ্লবী সংগোপনে সে-পাড়া ঘুরে দেখলেন। কিন্তু কাজের সুবিধে না হওয়ার তারা রক্তের মা (চট্টগ্রাম-বিপ্লবীদের সাক্ষাৎ জননী) বিনোদিনী দেবীর কাছে চলে গেলেন একই মনের স্নেহ আশীর্বাদ মন্তব্য পূর্বে আহরণ করার জন্যে।

রক্তের বাড়ি নিকটেই। বাড়িতে ঢুকই রক্ত মায়' কাছে আশ্রয় করে বললেন : 'আমরা হ'জন এসেছি, তাড়াতাড়ি খেতে নাও।' মায়' পানে সবাই উপড় হয়ে প্রশাস করলেন। জননীর প্রাণ কামার আকুল। আশীর্বাদ করলেন তিনি। ছুটে গেলেন রায় ঘরে খাবার তৈরি করতে হবে!...

রক্ত তাঁর ছোট ভাইকে বাড়ির সম্মুখে হাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন পাহারা দেবার নির্দেশ দিয়ে। কিছুক্ষণ পর ভাতের ধালা সাজিয়ে মায়' তাঁর হাটি অভূক্ত সন্তানকে খেতে ডাকলেন। এমন সময় ছোট ভাই ছুটে এসে জানাল যে, পুলিশ আসছে।... ধালায় ভাত কেউ স্পর্শ করতে পারলেন না। ছজনই খিড়কি-পথে বেরিয়ে গেলেন। চিত্ত তাঁদের ভাবনাহীন। ভাই যাবার কালে রক্ত বলে যেতে পারলেন : 'মা, দুঃখ কোরো না। চট্টলার পথে পথে, গাঁয়ে গাঁয়ে তোমার মত আরো 'মা' আছেন বিপ্লবীদের ক্ষমার অমর দান করার জন্যে।...'

মায়' বন্ধুত্বা শতাব্দী-বিভক্ত হয়ে গেল। মায়' মর্মে আকুল রক্তনন্দিনী। কিন্তু চোখে একফোটা জল আসতে দিলেন না যদি তাতে পুত্রদের অকল্যাণ হয়!...

রক্তের গভীরারী, বিপ্লবীদের জননী বিনোদিনী দেবীকে আমরা দেখলাম। মমতার করুণ, কতব্যে কঠিন এই নারীর স্নেহছায়ে চট্টগ্রামের বহু কিশোর-তরুণ আপন জীবন-পাত্র রসোচ্ছল করে নিয়েছেন। তাই তাঁদের হৃত্য বর্ণবিভার সমৃদ্ধ। তাঁদের কর্ম প্রাণরসে নিটোল। তারা জীবন-মরণে অকিঞ্চন হতে পেরেছিলেন।...

বিপ্লবীরা ছুটে চলে এলেন নদীতীরে। লক্ষ্যভাগে পাড়ি দিলেন দ্বীপপ্রাণী কণ্ঠ-ফুলী। পুলিশ পেছন নিয়েছে। এলেন কালারপোল গাঁয়ে। পুলিশের 'ডাকাত'! 'ডাকাত' চিকারে গ্রামবাসী তাঁদের ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা করল। ডাকাত ধরতে পারলেই বিস্তর পুরস্কার-প্রাপ্তির লোভ আছে। বিপ্লবীরা গুলী ছুঁড়তে লাগলেন। বাধা দিতে এসে অনেকে প্রাণ হারাল। ইতি-মধ্যে একটি পুলের কাছে তিন দল পুলিশ ও গ্রামবাসীদের একটি দল পথ আগলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গেছে। বিদ্রোহীরা ছুটে ছুটে সে স্থানেই এসে গেলেন। বন্ধ হলো।

স্বল্পকালের জন্য হলো, তাঁরতর। শুবোয় চৌধুরী আহত অবস্থায় বন্দী হয়েছেন। ফণীন্দ্র নন্দীও পিজরাবন্দী। চট্টগ্রাম গেরিলা বিভাগের কতী কুখ্যাত আসানুজার দল, ডি-আই-জি ফার্মারের দল এবং কনল ডেলান্সিথের দল পুলিশ-শক্তিকে প্রচণ্ডতর করেছে। তারা এবার চারটি কিশোর বীরকে ধরবার জন্যে উন্নত। কিন্তু রক্ত, স্বদেশ, দেবীপ্রসাদ ও মনোরঞ্জন আধারের বৃকে কোষায় খেল উধাও হয়ে গেল। পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না!...

তখন রাত দুটো। পুলিশ ধারপাশের সবগুলো গ্রামই ঘেরাও করে রেখেছে। প্রভাতের অপেক্ষার তাদের প্রতীকা।... ইতি-মধ্যে ওয়া চারজন ছুটে ছুটে 'জুলা' গ্রামের এক মুসলমান গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে গৃহিণীকে সকাতে বললেন : 'মা, আমরা আজ তিন দিন কিছু খাই নি, দুটো পান্ডা-ভাত দেবে?'

বাংলার মেয়ের 'মা' ডাকিতে প্রশ্ন করে আনুচান, চোখে অসে জল ভরে! 'মুসলমান এই দয়াময়ী নারী আশ্রয়প্রার্থী বালকদের ঘরে নিয়ে বসলেন। উননে ভাত চাপিয়ে দিলেন। কিন্তু হায়রে নির্ভুর বিধাতা! নিরীতির এই কি নির্দেশ?...

কায়' কাছে, কোথা থেকে যেন খবর পেয়ে পুলিশ সরবে ঐ আশ্রয়স্থলে এসে গেল। উপায়ান্তর নেই। মুসলমান-গৃহস্থেরই পরামর্শে বিদ্রোহীরা বাড়ি থেকে সামান্য দূরের শব-বনে লুকিয়ে রইলেন। ক্ষমার অমর পুত্ররায় হাঁড়িতে পুড়ে গেল। মুসল-মানী মায়' চোখ দুটি-ও শুষ্ক রইল না!...

রাতি প্রভাত হতেই স্বল্প ঘন শব-বনে বিদ্রোহীদের দেখতে শেল পুলিশ। ডি-আই-জি মিঃ ফার্মারের বাহিনী তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। পুলিশ চৌকিরে বলল : 'সারেন-ডার!... উত্তরে বিপ্লবীদের আগুনগার গর্জ উঠল।... প্রবল সংঘর্ষ!... সপ্তরখীর দু'বার শক্তি 'চট্টলার অভিমুখকে পরিবর্তিত করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ত-স্বদেশ-দেবীপ্রসাদ-মনোরঞ্জন আহত হলেন। আহত অবস্থায়-ও তারা মাটিতে বৃকে রেখে গুলী ছুঁড়তে লাগলেন। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তারা বৃদ্ধ করে গেলেন। চারটি কিশোর বিদ্রোহীর আত্মদান সেই প্রভাতের পূর্বিকাশে সোনার লিপিতে লেখা রইল!... বিনোদিনী দেবী তখনো ভাবছিলেন, ও'রা তাঁর কাছে ফিরে যাবেন!...

সংগ্রামী ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে আর এক পা এগিয়ে দিল রক্তক্ষরা এই 'কালারপোল!'

ফরাসী-চন্দ্রনগরে চট্টলার কতিপয় বীর
সৈদীন জাফরখান অবস্থায় হিমাংশু সেনকে ভুলে গিয়ে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, মাখন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত মোটর যোগে

কড়ের মত বোরেরে গেলেন শহরের দিকে। পথ চেয়ে আর কাল গুণে এদিকে অপেক্ষা করছেন সর্বাধিনায়ক বিন্দুত বন্ধুদের জন্যে। কিন্তু তারা আর ফিরে আসতে পারলেন না। শহরের অবস্থা কঠিন। প্রতিপদে ধরা পড়ার আশংকা। তা'ছাড়া মাস্টারদা তাঁর বাহিনী নিয়ে কোষায় ছুটে বেড়াচ্ছেন জানবার উপায় নেই। হিমাংশুকে 'চন্দ্রনগর'র সুখেন্দু দমিতদারের হোপাকতে রেখে তারা গেলেন রক্তের বাসার। বিপ্লবী-জননী অভূক্ত সন্তানদের সম্মুখে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন!...

* * *
সারা চট্টগ্রাম পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দাপটে তোলপাড়। গণেশবাবু কুমিল্লার পথে হাটা দিলেন দুর্ভেদ্য অশ্বকরের পথে!...

২২শে এপ্রিল মাস্টারদা-নির্মল সেন-লোক-নাথ বল জালাবাবাদে বিজয়-নিশান উডীন করেছেন প্রচুর তরুণ-রক্তের ধারা বইয়ে। এদিকে অপর চারটি বিপ্লবী ফেণী-স্টেশানে আত্মরক্ষার সংগ্রাম রচনা করেছেন বিশ্ব বীরয়ে। ২২শে এপ্রিলই রাত আটটার 'ভাটিয়ারি' স্টেশানের স্টেশানমাস্টার চারটি বৃককে কুমিল্লার টিকিট ক্রয় করতে দেখে সন্দেহ করলেন। তিনি তাঁদের টিকিটের নম্বর-গুলো তার-যোগে জানিয়ে দিলেন সীতাকুণ্ড, ফেণী ও লাক্সামের রেলকর্তৃপক্ষকে নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করে।

ফেণীর দারোগা সদলবলে স্টেশানে উপস্থিত। গাড়ি স্টেশানে পৌঁছতেই দারোগার সংকেতে বৃক চারটিকে গাড়ি থেকে নামান হল। স্টেশানমাস্টারের ঘরে তাঁদের নিয়ে আসার পর দারোগা তাঁর সহকারীকে আদেশ দিলেন বৃকদের দেহতালাসী নিতে। বিপ্লবীরা প্রমাদ গম্বলেন। মুহূর্তে পিস্তল গর্জে উঠল। বিস্তর গুলীবর্ষণে পুলিশের কিছু লোক ধারেল হল, কিছু পালাল। গাড়ির প্যাসেঞ্জার ও স্টেশানের লোকজন পাগলের মত ছুটোছুটি করে সবটুকু একটা অশুভ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার বিপ্লবীরা সুযোগ পেলেন ঘনাক্ষরে গাঁয়ের পথে পালিয়ে যেতে।

ফেণীর এই সংঘর্ষের সংবাদ চট্টগ্রামে ডার-যোগে জানান হল। কিন্তু তখন কতারা সমগ্র শক্তির বিনিময়ে জালাবাবাদের বিদ্রোহী-বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছেন!...

* * *
অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, জীবন ও আনন্দ নির্বিঘ্নে কলকাতা পৌঁছে গেলেন। তাঁদের আশ্রয় দেবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলেন যুগান্তরের কর্তৃপক্ষ। এদিকে স্বর্ঘ সেন-ও এ সংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তিনি নির্মল সেনের সঙ্গে একমুখ হয়ে লোকনাথ বলকে পরামর্শ দিলেন কলকাতা পালিয়ে গিয়ে গণেশবাবুদের সঙ্গে মিলিত হতে। সর্বাধিনায়কের ধারণা যে, লোকনাথ বলের মত ব্যক্তি যার চেহারা চোখে পড়ার মত বীরদূত ও সুন্দর, যাকে

জেনে না এমন লোক চট্টগ্রাম শহরে বিরল—
তার পক্ষে পালিয়ে পালিয়ে ঘোরা বিপক্ষজনক।
অথচ এই সুদক্ষ কর্মী যদি অনন্ত সিং ও
গণেশ ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় মিলিত হতে
পারেন তবে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ (চট্টগ্রামের
বাইরে) সফলতর হতে পারবে।... সতীনাথ সেন
লোকনাথবাবকে কলকাতা পালিয়ে যাবার
ব্যাপারে যথা প্রয়োজন সাহায্য করলেন।

লোকনাথ বল নিজের যুদ্ধিঞ্চলে বিনা
কামেলায় কলকাতা এসে যুগান্তরের নেতাদের
সাহায্যে গণেশ ঘোষদের আত্মানার উপস্থিত
হুলেন।...

চন্দননগর। বাংলার বিপ্লবীদের বিভিন্ন
কার্যকলাপে ফরাসী-অধিকৃত এ শহরটি খ্যাত।
এই মূলিকণায় রোমান্টিক স্বপ্ন বিছানো।
যুগান্তর কর্তৃপক্ষ এখানেই একটি গৃহ ভাড়া
নিলেন দলের বিপ্লব কর্মী শশধর আচার্যের
নামে। অনাড়ম্বর ও অতি মধুর স্বভাবের
এই মানুষটি ইম্পাতের মত দৃঢ় ও বজ্রের মত
কঠিন তার কর্তব্যপালনে। শশধর ছিলেন
অবিবাহিত এবং রেলের কর্মচারী। কিন্তু
বিবাহিত লোক ছাড়া সেসময় কোথাও বাড়ি
ভাড়া পাওয়া যেত না। বাড়ি পেলেও
পুলিশের নজরে সে-বাড়ি পড়বেই। সুতরাং
ঘরেই একটি মহিলা কর্মীকে শশধরবাবুর
স্ত্রীর ভূমিকায় এ গৃহের ভার নিতে রাজী
করান হলো। তার নাম সুহাসিনী গাঙ্গুলী।
সুহাসিনী দেবী বাংলার রাজনৈতিক জীবনে
পরিচিতি। তিনি আজ ইহজগতে নেই।
কিন্তু এ মহিলা ছিলেন খাটি বিপ্লবিনী।
তার ভাগ্য, সাহস, নিষ্ঠা ও সারা জীবনের
হৃদয় কর্মতপস্যা বিপ্লবী তথা মানুষের
কাছে গৌরবের বস্তু।...

শশধরবাবু ও সুহাসিনী দেবী পরস্পরের
অজানিত। এবং ভবিষ্যৎ জীবনেও তারা
বিভিন্ন কর্মপথে পরস্পর অজানাই রয়ে
গেছেন। কিন্তু চন্দননগরের এ আশ্রয়কেন্দ্রকে
খিরে মাসের পর মাস তারা স্বামী-স্ত্রীর
ভূমিকা চমৎকার করে গেলেন। এ সম্ভব
হলো শব্দ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার এবং দলের
প্রতি আনুগত্যে তাদের কোন ফাঁকি ছিল না
কলে। তাদের ভূমিকা পাড়াপ্রতিবেশীর মনে
কোন সন্দেহ আসার অবকাশ দেয় নি।
প্রতিবেশীরা হয়তো শব্দ জেবেছে—গৃহের
ধরজা-জানালা সারাক্ষণ বন্ধ থাকে কেন?
কিন্তু তারা তো জানতো না যে চট্টগ্রামের
দুর্ধর বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং,
জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত এ গৃহেই
আশ্রিত।...

বেশ নিরাপদেই ও-আত্মানার তাঁরা বাস
করছিলেন।... শশধর প্রায়ই কলকাতা যাতায়াত
করেন। লোকে ভাবে—লোকটা কেন আপিসের
কোনানী হবে, রোজ 'ডেইলি-প্যাসেঞ্জার'
করে। আমরা জানি—তার যাতায়াত ছিল

যুগান্তর-দলের নেতাদের কাছে নানা
প্রয়োজনে।... এছাড়া সবাই ভাবতো, ডেইলি-
প্যাসেঞ্জার শশধরবাবুর পদনিসীন স্ত্রী ঘরে
বসে শাখামি'দর পরে হয়তো হেঁসেল
ঠেলেছেন। কাজেই, নিখুঁত এই সংসারটি নিয়ে
কারো অহেতুক মাথাব্যথা ছিল না।...

কিন্তু হঠাৎ ঘটে গেল এক অঘটন।
১৯৩০ সনের ২৮শে জুন। বিপ্লবী
অনন্তলাল সিংহ বেক্কার এসে ধরা দিলেন
১৩নং ইলিসিয়া' রোডে পুলিশের বড়-
কর্তাদের কাছে। পুলিশ বিস্মিত। দেশবাসী
স্তম্ভিত। কথা উঠেছে দুর্বল ব্যক্তিকে খিচাট
পরে বিচারের জন্য চট্টগ্রাম-জেলো পাঠান
হল।...

অনন্ত সিং কেন ধরা দিলেন? তার
কারণ বলবার পূর্বে তদানীন্তন আই-জি অব
পুলিশ, মিঃ লোমানের কাছে লিখিত
অনন্তবাবুর ইংরাজি পত্র ও তার অনুবাদ
(বাংলায়) এখানে দেওয়া হল।

(বাংলা অনুবাদ)

প্রিয় মিস্টার লোমান,

১৯৩০ সালের ২৮শে জুন আমি
আপনাকে দেখা দিব। আমি নিশ্চয় করিয়া
জানি যে তখন আমাকে গ্রেপ্তার করিবার
সুযোগ আপনি হারাইবেন না। তবে ইহার
জন্য আমি প্রস্তুত। জানিয়া রাখুন, ইহা
আমার আত্মসমর্পণ নহে। লোকে কখন
আত্মসমর্পণ Surrender করে? যখন সে
বাক্যই অসহায় ও আত্মরক্ষার পথ দেখিতে
পায় না তখনই তাহাকে নীতি স্বীকার করিতে

হয়।

আমি কি সত্যি এখন সহায়দার?
নিশ্চয়ই নহে। আমার আত্মরক্ষার জন্য আত্ম
আছে, প্রয়োজনে ব্যয় করিবার অর্থ আছে,
সাহায্য পাইবার বন্ধু আছে। বাংলার
বাহিরে এবং ভারতের ও বাহিরে পালিহা
থাকিবার আশ্রয় আছে। তা'ছাড়া আমি
এখনো সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবু আমি কেন
ধরা দিতেছি? আপনি মনে করিতে পারেন
যে, আমি অনুতপ্ত। না, কখনো না। আমি
বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি। তবে কি আমার
সর্বাধিনায়কের এই আদেশ? না। ইহা
আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতাপূর্ণ ব্যাপার। ইহা
মোপনীয়।

ভবদীর

বিপ্লবী

অনন্তলাল সিংহ

(Original Version)

Dear Mr. Lowman,

I shall meet you on 28th June,
1930. It is sure that you will
never miss that opportunity to
arrest me then and there. Yes, I
am also quite ready for it. Never
think it, please, that I am going to
'Surrender'. When does a person
Surrender? When he becomes
quite helpless and finds no other
means to protect him then and there
only he yields.

Am I helpless now? No, certainly

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নোতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - বাণপুৰ

বেঙ্গলুরু - শ্রীবনগর - গোহাটী

not. I have arms to protect me, ample money to spend in time of need, many helpers to help me and good many shelters in Bengal, Outside Bengal, as well as outside India to abscond.

Now I am absconding with my friends and we are quite safe. But still I am allowing my arrest and why? Do you think I am repentant for my action? No, never, not a bit sorry. Then is it a mandate on me by any authority? No. It is my personal matter and absolutely private.

I am,
Revolutionary
Ananta Lal Sinha.

আমরা চট্টগ্রামে ফিরে যাচ্ছি!...

চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন-মামলা বিশেষ আড়ম্বরে শুরু হয়েছে। বহু বিপ্লবী প্রোতার হয়েছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নির্ভাবনের সীমা নেই। মামলার আসামী করবার পূর্বে থানার ও হাজতে দলে দলে কিশোর, বালক ও তরুণদের নিতা ধরে আনা হচ্ছে। তাদের হাড়গোড় ভেঙে, অপমানের চূড়ান্ত করে, পিতামাতা-আত্মীয়স্বজনকে ধরধোর করে, বাড়িঘর-জিনিসপত্র লুটপাট করে পুলিশ ও ফিরিঙ্গী সম্প্রদায় চট্টগ্রামে এক নরক সৃষ্টি করে বসেছে। অত্যাচার ও প্রলোভনের খপ্পরে অনেকে পড়ে যাচ্ছে। এরা বালক ও কিশোর বয়সের ছেলে, এরা দেশ-প্রেমের আবেদনে, ভাবাবগে দলের মধ্যে ও দলের চতুষ্পাশ্বে এসে গেছে। এদের মনের বল সামান্য। এদের দীর্ঘদিনের শিক্ষা ও চিন্তা নেই। পুলিশ সেই সুযোগ নিয়ে রাজসাক্ষী এদের মধ্যে থেকেই তৈরি করছে, এদের মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করছে। ফলে 'অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন-মামলা' বিপ্লবীদের সম্মান এমনই ক্ষুণ্ণ করতে যাচ্ছে যে অত বড় বিদ্রোহের মূল্য কিছুমাত্র আর থাকছে না। দুতরাং অনন্ত সিং প্রমুখ পলাতক নেতারা প্রপঞ্চাকৃত নিরাপদ স্থানে বসে গভীর চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। মান্দারদা ও অন্যান্য বীর সহকর্মীরা অরণ্যপর্বতে দাঁড়িয়ে থেকে পুনঃপুনঃ বৃটিশের দণ্ডে আঘাত হানছেন—সেই অপ্রতিহত অভিযান অর্থ করে দেবে কি নেতৃত্বহীন বালক-বন্দীদের চট্টগ্রামের জেলে ও পুলিশের হাজতে বসে?... তা হতে পারে না। অনন্ত সিংকে যেতেই হবে চট্টগ্রাম-জেলে বালকবন্দিদের পাশে।

তাদের টেনে আনতে হবে পুলিশের কূটচর্য থেকে।...

তাই অনন্ত সিং ঐভাবে ধরা দিলেন।... চট্টগ্রাম জেলে তাঁর উপস্থিতি 'মিরাকল' সৃষ্টি করল। বারা পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিল তারা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সেসব উক্তি এই বলে প্রত্যাহার করল যে, পুলিশের নির্মম মারের চোটে পুলিশের শেখানো কথা-ই তারা পূর্বে বলেছিল।

জেলখানা ও হাজতগুলোর আবহাওয়া বদলে গেল। মামলার চেহারা অভিনব রূপ ধারণ করল। কিশোর ও বালক আসামীরা নেতার সান্নিধ্যে হত বীর ফিরে গেল।...

অনন্ত সিংহের গঠনশীল বিপ্লবী-নেতৃত্বের পরিচয় নতুন করে পেয়ে দেশবাসী মুগ্ধ হলো, শত্রুর চমক ভাঙলো।...

আবার চন্দননগর।...

সে এক অশুভ রজনী। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সাল। চন্দননগর গোন্দলপাড়ার



তারেকশ্বর সেনগুপ্ত

স্বভল গৃহের সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!— হতভাগ্য এই বাংলাদেশ। তাই বিপ্লবীদের বিনম্র আঁখিপাতে আজ নিখর নিদ্রার এই সমাবেশ! লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত, জীবন ঘোষাল—সবাই ঘুমুচ্ছেন! ঘুমুচ্ছেন শশধর আচার্য! ঘুমুচ্ছেন সুহাসিনী দেবী!...

এদিকে কোন এক অজ্ঞাতসূত্রে খবর পেয়ে কলকাতা থেকে দলবল নিয়ে ছুটে এসেছেন পুলিশ কমিশনার টেগার্ট, ডেপুটি কমিশনার ব্যাটলি ও ম্যাকেন্টি। আরো

এসেছেন ছোটবড় বহু কর্মচারী। এসেছে বিরাট ফৌজ। তৎক্ষণের মত ঢুকেছে পুলিশ ও সামন্তদল ফরাসীরা—চন্দননগরে। অনুরোধ নেয় নি পূর্বত ফরাসী সরকারে কাছ থেকে তাঁদের রাজ্যে প্রবেশ করার। সমর কই?...পরে অবশ্য ইংরেজ-ফরাসীতে এ নিয়ে ঢের বোঝাপড়া হয়েছিল।...

গোন্দলপাড়ার বাড়ি ঘেরাও করে টেগার্ট প্রমুখ বড়কর্তারা চোরের মত ঢুকলেন গৃহ-প্রাঙ্গণে। তারপর? তারপর ভারী বট্টের শব্দে জেগে গেলেন বিদ্রোহীরা। পেছনের দেয়াল টপকে লাফিয়ে পড়লেন সবাই পাশের পুকুর-পাড়ে। গর্জে উঠল বিপ্লবীর পিস্তল। কিছুক্ষণ চলল লড়াই। কিন্তু ঘেরাও-হয়ে-যাওয়া চারটি তরুণ কতক্ষণ লড়াইয়ে বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে? বন্দী হলেন সবাই। জীবন মোঘল পুলিশের গুলীতে নিহত হয়েছেন। তাঁর নিঃপ্রাণ আহত দেহ পুকুর থেকে তোলা হলো। বন্দী বীরপ্রসী শত্ৰুঘনস্বর্নানার চট্টগ্রাম জেলের পথে পা বাড়ালেন।.....

তারিণী মৃদাজীর শেষ রজনী

চট্টগ্রামে শ্বেত-বীরপদংগবেরা বিপ্লবীদের কাছে ধাক্কা খেয়ে নিরস্ত ও নিরীহ জন-সাধারণ এবং স্কুল-কলেজের বালকদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল তার সীমা নেই। তৎকালে এই অত্যাচারের প্রতীক রূপে পুলিশকর্তা মিঃ ক্রেগকে ধরে নেওয়া স্বাভাবিক ছিল।...

নেতা সুর্ষ সেন খবর পাঠিয়েছেন যে ১লা ডিসেম্বর (১৯৩০) মিঃ ক্রেগ চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা হয়ে চাঁদপুরের পথে কলকাতা যাচ্ছেন।...

পরলা ডিসেম্বর চট্টগ্রাম-মেল চাঁদপুর স্টেশনে দৈত্যের বেগে এসে ঢুকলো। দুর্দৃষ্টি কিশোর পূর্ব থেকেই সাধারণভাবে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিলেন। গাড়ি ঢুকতেই তাঁরা প্রথম শ্রেণীর কামরাগদুলো পরপর খুঁজতে গিয়ে দেখলেন একটি কামরায় বসে আছেন উচ্চপদস্থ এক অফিসার—অস্পষ্ট আলোর তাঁদের মনে হলো ও-বার্টি খাঁটি ইংরেজ, নিশ্চয় মিঃ ক্রেগ!... আর বিলম্ব নয়! কিশোরস্বর বাঘের মত বাঁপিয়ে পড়লেন সাহেবের উপর। রিভলভারের অব্যর্থ গুলী ব্যর্থ হবার নয়। অফিসারটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হলো!...

চতুর্দিকে হৈ হৈ শব্দ হয়ে গেছে। মুহূর্তে সারা চাঁদপুর শহর আতঙ্কিত কলরবে মুগ্ধ। পুলিশ ও রেল-কর্তৃপক্ষ ছুটে এল। কিন্তু সনাক্ত করল তারা—এয়ে রেলেরই পদস্থ কর্মচারী সুদর্শন তারিণী মৃদাজী বুলেটের আঘাতে মৃত! দেহ তাঁর রক্ত-খুলার লুপ্তিত!

এদিকে আততায়ীর খোঁজ নেই। পুলিশ

সাপ্তাহিক বসন্তমতা

হেনার মত ছোটখাট শত্রু করল। মোটের ও মাঝে-হাটে সশস্ত্র পুলিশ মারা চমকিয়ে-শহর ও শহর থেকে গিয়ে যাবার পথগুলো চুষে ফেলার কাজে ব্যস্ত হল।

* * *

কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দু'দিকে বোমপাড়া। তার পর খোলা মাঠ। মাঠের ওপারে অজানা গ্রাম। রাস্তার ঘনান্ধকারে বন্ধুর মত তাঁদের জড়িয়ে আছে। হোক না পথ অজানা, হোক গ্রামগুলো না-দেখা—ভয় কি? যারা দূরকে করেছে নিকট বন্ধু পরকে করেছে ভাই, তাদের কাছে সবাই তো আপন? নির্ভরে তাই পায়ে হেঁটে চলছেন রামকৃষ্ণ বিম্বাল ও কালীপদ চক্রবর্তী। তাঁদের কিছুমাত্র উত্তেজনা নেই। কোন বাদ্যমন্ডে বেন এই বিংশবিশদুরা নাতক ফেঁটোলা করার বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে গেছেন।...

সহসা বিদ্রোহীরা দেখলেন যে, সম্মানী-আলো ছড়িয়ে করেকটি মোটর ছুটে আসছে। হর্ন বেজে বাজে অনবরত। বিপুল রথ-সমভার। সম্মুখে খোলা মাঠ—সংগোপনে চলার পথ নেই। যে-পথে তারা চলছেন তার দু'পাশের জংলও ঘন নয়। তবু সেই বোম-মাড়ের আড়ালেই তারা গা-ঢাকা দিলেন। স্বাধা সে আত্মগোপন। পুলিশের সম্মানী-আলোয় আলোকিত ভূবন। থানা পড়লেন বৃদ্ধ-কিশোর।

রামকৃষ্ণ চট্টগ্রাম কলেজের বৃত্তিভোগী নাম-করা ছাত্র। বীরবে, দেশপ্রেমে, সাংগঠনিক চাৰ্বে আদর্শ বিপ্লবী ভরূণ। বোমা প্রস্তুত-কালে গুরুতর রক্তম আহত হওয়ার অসম্ভা-গার-লুঠনে অথবা জ্বালালাবাদ-বৃদ্ধে তাকে আমরা দেখি নি। দৈহিক অসুস্থতা থেকেও মানসিক বেদনা এতে তাঁর বেশ ছিল। আজ সার্থকতার পথে রামকৃষ্ণের যাত্রা। ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে রামকৃষ্ণ দীনেশ গুপ্তের পাশের সেনেই স্থান পেয়েছিলেন। দুটি সর্বভাগী লাথকের মধ্যে অভূতপূর্ব বন্দুকের গড়ে উঠেছিল ঐ ফাঁসির সেলেরই আবহাওয়ায়। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির পূর্বদিন আবৃত্তি করছেন রামকৃষ্ণ রোমনভরা গান্ধীর্বে:

যে ফুল না ফুটিতে ব্যরছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো থায়া,
জানি যে, জানি তাও হয় নি হারা।...

সরস মাধুর্বে দীনেশ উত্তর দিচ্ছেন
তাপসের কঠে:

আবার দিনে এই কথাটি

বলে যেন বাই—

যা দেখেছি, যা পেয়েছি,

তুলনা তার নাই।...

রামকৃষ্ণের সংগী বিপ্লবী কালীপদ চক্র-বর্তীও সে-রাতে একই সাথে ধরা যে পড়ে-ছিলেন তা বলছি। বয়স তাঁর খুবই অল্প থাকার ফাঁসি তাকে দেওয়া হল না। যাবজ্জীবন স্বাধীনতার সাজা দিয়ে কালীপদকে কয়েদ-খানার ঢাকিয়ে দেওয়া হল।

রামকৃষ্ণ ফাঁসির মধ্যে আরোহণ করলেন
১৯৩১ সালের জুলাই মাসে, দীনেশ গুপ্তের
ফাঁসির করেকদিন পরে।...

আসানুদ্রা নিধন

চট্টগ্রামের শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক ইঞ্চি
জমি পুলিশ ও পল্টনের পদভারে নিরস্ত পিষ্ট



মনোজেন সেন

হচ্ছে। মানুষকে ভীত ও মনুষ্যত্বহীন করে
তোলার টেকনিক পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্য-
বাদী শাসকদেরই সুন্দর জানা আছে।
বৃটিশের দেশী-বিলাতী কর্মচারীরা এ-বিদ্যায়
সবার উপরে। ভীত, সমস্ত চট্টগ্রামবাসী নিজ
গৃহে পরবাসী। তারা তাদেরই পথেঘাটে বৃকে
ভর দিয়ে হাটে। শিরদাঁড়া উঁচু করে চলবার
মানসিক শক্তি তাদের লুপ্ত হতে যাচ্ছে।...
এদিকে মাল্টারদা ও নির্মল সেন বিনিম
রজনী কাটাচ্ছেন সংগঠনের কার্যে। ইন্ডিয়ান
রিপাব্লিকান আর্মির কাজ এত ঝড়ঝঞ্ঝার
মধ্যেও ব্যাহত হচ্ছে না।

দেশী অফিসারদের মধ্যে আসানুদ্রা সাহেব
বড়ই বাড়বাড়ি শত্রু করে দিয়েছেন। ছাত্র,
বালক ও নিরীহ জনসাধারণের উপর অন্যায়
নানা নৃশংসতার চালিয়ে যেতে তিনি দক্ষ।
ইংরেজের আদর বতাই তাঁর ভাগ্যে জুটছে
দেশের লোকের উপর বর্বর অত্যাচারের মাত্রা
ততই তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

বিদ্রোহী ভরুদল আর তাকে কমা করতে
পারেন না, কারণ তিনি ক্রমশ হয়ে উঠছেন
বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের শুল্ক প্রতীক।...

তিনিগে অগাস্ট, ১৯৩১ সাল। চট্টগ্রাম
শহরের প্রধান খেলার মাঠে অসম্ভব ভিড়।
খেলার বিজয়ী দলকে পুরস্কার দেওয়া হবে।
বিরাট মধ্যে উপবিষ্ট জেলাশাসকেরা সকলেই।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিশ
সাহেব—ত্রিমূর্তি তিনটি উচ্চ আসনে বিরাজ
করছেন। সম্মুখে একান্ত বশম্বদ আসানুদ্রা।
তিনি অবশ্য গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষ কর্ম-
চারীরূপে পুরস্কৃত হয়ে 'শ্রী বাহাদুর' বনে
গেছেন।

খেলোয়াড়দের পুরস্কার দেওয়া হল।
সভার কাজ সমাপ্ত হতেই 'হিণ্ডু' 'হিণ্ডু' হুর্নে
ধ্বনিত দশ দিক কে'লে উঠলো। সাহেবরা
সভাপ্রাঙ্গণ পেরিয়ে মোটরে উঠছেন যা
উঠবেন। আসানুদ্রা খেঁচ অতিব্রজ করে বৃ-
চারজন অপেক্ষমাণ ব্যক্তির সঙ্গে সবেমাত্র
কথা বলা শত্রু করেছেন। তাঁর সমস্ত সৈ-
রক্ষীরা বৃক টান করে চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়িয়ে
আছে। এমন সময় একটি সুদর্শন চোন্দ-
পনের বছরের কিশোর এসে পাশে দাঁড়ালেন।
দৈবিশব্দর মত সরল ও সুন্দর মুখখানা তাঁর।
তাকে কারো সন্দেহ হতে পারে না।... কিম্ব?
কিম্বু এই বালকবীরই বনুকে টঙ্কার দিয়ে
বিশ্বের ভারসাম্য বিঘটিত করতে চাইলেন।...
সহসা সুকুমার শিশুর হাতে খেলার রজ্জু
যেন বিষধর ফণিনীর মত ফণা উদ্যত করল।
গোপন রিভলভার ফুঁলে উঠে বহুগুণতীর নবে
বাজল মৃত্যুডঙ্কা। পর পর চারটি গুলীর
আঘাতে দর্পী আসানুদ্রা হুলার গড়িয়ে
গুড়লেন রুধিরম্রাত হয়ে।...

ভারপরের ইতিহাস সাধারণ। অসংখ্য
পুলিশ ও পল্টন লহ সরকারের বৃক বৃক
কর্তাদের নকের ডগা ঘেঁষে বৈশিষ্ট্য ঐ
আসানুদ্রাকে হত্যাদণ্ড দিতে পারলেন সবার
অলঙ্কে, তাঁকে কর্ম সমাপ্ত হলে সবাই মিলে
পাকড়াও করা এক মামূলি ব্যাপার।

হরিপদ ভট্টাচার্য প্রেপ্তার হলেন তন্ম-
হুর্ভে। চরম নির্বাতন চলল তাঁর উপর।
সে নির্বাতনের কাহিনী আমরা চট্টগ্রাম অসম-
গার লুঠনে নামক পুস্তক থেকে জুলে দিচ্ছি।
কারণ অত্যাচারের এ একটি Typical
উদাহরণ। — সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ 'ভিলেন'-এর
পটভূমে কিশোর বিপ্লবীর ভগ্নদ্যুত-রূপ
এতে চমৎকার ফুটে উঠেছে। বাংলা তথা
ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাসে হরিপদ একা
নন। তাঁর সংগোহ বৃক-বৃবতীর সংখ্য
বিপ্লবীদের মধ্যে বৃক্টে।...

উল্লিখিত পুস্তকে আরছ : হরিপদ ভট্টা-
চার্যের প্রত্যেকটি নব্বের ভিতর দ্বিগুণ বৃচ
ফুটাইয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে স্বীকারান্ত
আদায়ের চেষ্টা হইল। তাহার কাছে স্বর্-
সেন, নির্মল সেন প্রমুখের বর্তমান ঠিকানা
ও তাহাদের ভাবী কর্মকাণ্ডের সংবাদ পাইবার
সীমাহীন আগ্রহের মধ্যেই পুলিশের পক্ষ
হইতে তাহার উপর নির্বাতন হইয়া উঠিল
অমানুষিক ও সীমাহীন। 'সুচ'-পর্ব শেষ
করিয়া এইবার বৈদ্যুতিক ব্যাটারির আগ্রহ
গ্রহণ করা হইল। দিনের পর দিন রক্তমারী
অত্যাচারের জলন্ত কঠোরে কিশোর বালক

হরিপদ দুঃসহ স্বাভাবিক সাহসী ছিলেন। কিন্তু দুঃসহ ফুটিয়া একটি কথা কহেন নাই। দরিদ্র-ধরের সম্ভ্রম, টোলের ছাত্র, অপরিণত বয়স্ক বালক হরিপদ কি অতুলনীয় আয়িক শক্তি-বলে নিপীড়নের চরম পরীক্ষার মধ্যেও নিজের আদর্শকে অক্ষান রাখিলেন! স্মরণকালের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল।... হরিপদের নিষাভীন এইখানেই শেষ হইল না। চট্টলার ভরণ ও ছাত্র-সমাজের রাজনৈতিক চেতনাকে সত্যের আঘাতে নিশ্চিহ্ন করিবার সরকারী পরিকল্পনা এই হরিপদকে পুরোভাগে রাখিয়াই কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা চলিল। চারি লাভাধিক পুলিশ ও মিলিটারির এক বাহিনী হরিপদকে সম্মুখে রাখিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উঠল দিয়া বেড়াইতে লাগিল। হাটে-ঘাটে চেঁচুরা পিটাইয়া ভিড় জমাইয়া সবার কাছে হরিপদকে বেদম প্রহার করা হইত। পুলিশের লোক তাহাকে আশেপাশে কর্তৃত্ব ধ্বনি দিতে—ইংরাজের জয় হউক, সূর্য সেনের দলের জয় হউক। হরিপদ দৃষ্ট-কণ্ঠে তাহার বিপরীত ধ্বনি দিয়া বলিতেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক! ইনক্লার জিন্দাবাদ! মাল্টারদার জয় হউক!... ধ্বনি ও প্রহার সংগে সংগে চলিত। এই জয়ধ্বনি দিবার সময় একদিন পুলিশের সঙ্গীদের খোঁচায় হরিপদর চোখের কোম বাঁহিয়া প্রচুর রক্ত পড়ে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হরিপদর চোখমুখ অস্বাভাবিকরূপে ফুলিয়া যায়। এইভাবে হরিপদকে সম্মুখে রাখিয়া বর্বরোচিত পীড়নের ইতিহাস রচিত করিয়া চলিল গ্রাম-গ্রামান্তরের পথে পথে ব্রিটিশের পুলিশ ও পল্টন।...

কিন্তু হরিপদ ভট্টাচার্য অটল। দেশপ্রেমে উদ্ভূত, কর্মভাপস এই কিশোর মৃত্যুর অন্তরে তখন অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। তার কাছে তুচ্ছ এই নিষাভীন। তুচ্ছ সর্ব-ভয়। ভয়ে কিছু নয়—

কোথা মিথ্যা রাজা,
কোথা রাজদণ্ড তার।
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের
কোথা অত্যাচার!...

হরিপদ ভট্টাচার্যের যথার্থ বিচার হল। বিচারে কীসির বদলে ব্যবস্থাবিন ধীপান্তরের আদেশ হল। কারণ, বয়স তারি অল্প।...

জালাত ডুর্নী

১৯০১ সনের ২৮শে অক্টোবর। ঢাকা স্বেচ্ছাপূর বোর্ডের পাশে একটি বিলাতী মদের দোকান। দোকানের সম্মুখে মোটর রেখে চাকার স্কেল হাকিম মিঃ ডুর্নী ঐ দোকানেই ঢুকছেন। এখানে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের সাহেব-সুবারা সর্বদা আসেন মদ কেনবার জন্যে। ভাল বিলাতী মদ অন্যত্র পাওয়া যায় না।...

উল্টো দিকে বিনোদ হালদাই-এর নাম-করা একাই-চিফ্টার দোকান। সেখানে খাবার খেয়ে দুটি যুবক। যুবকদের দৃষ্টি খাবারের

দিকে নয়। তাঁরা বারে বারে তাকাচ্ছেন মদের দোকানের দিকেই।... ডুর্নী সাহেব মদের দোকানে ঢুকতেই যুবক দুটি সন্তর্পণে বেরিয়ে এলেন।... একই পরেই মালপত্র কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ডুর্নী মোটরে উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় সহসা বিপ্লবীর রিভলভার গর্জে উঠল। দিনদুপুরে জনবহুল রাস্তায় এ ঘটনা ঘটতেই সারা শহরে হুলস্থূল পড়ে গেল। পুলিশ ও মিলিটারি মূহুর্তে ঘটনাস্থলে এসে শব্দ করে দিল তাড়বনতা। কিন্তু এই নাটকের নামকরণ—চট্টগ্রামের সরোজ গৃহ এবং যুগান্তরের নেত্রাখালিবাসী রমেন ভৌমিক ইত্যবসরে অদৃশ্য হয়ে গেছেন!... ডুর্নীসাহেব আহত হলেন। আহত ডুর্নী আর এদেশে রইলেন না। তাঁকে বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পুলিশ জানলো না যে, সরোজ গৃহ ও রমেন ভৌমিক এ কাজ করেছেন। কিন্তু তালাসী ও ধরপাকড় তাদের করতেই হবে। বহু তরুণকে পুলিশ-হাজতে নিয়ে আসা হল। মারপিট সমানে চলল। যুগান্তরের কর্মী ইন্দু বসুর গৃহেই ছিল পলাতকদের আশ্রয়। জালালাবাদ-যুদ্ধের পরই বিনোদ চৌধুরী ও সরোজ গৃহ এসে আগ্রয় গ্রহণ করেন ইন্দুবাবুদের নির্দেশিত আস্তানায়। যুগান্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় চট্টগ্রামের পলাতক বিপ্লবী বিনোদ চৌধুরী, সরোজ গৃহ

কেউ বুঝতো না। ভ্রমাজ্জাদিত স্থির প্রস্তুত-খণ্ডের নিচে যে আগুন চাপা আছে তা লোকে জানবে কি করে?... এলিসনের মৃত্যুদণ্ড

পূর্বেই বলেছি যে, সূর্য সেন ও নির্মল সেন চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে পালিয়ে থেকে চট্টগ্রামেই ইংরেজকে পুনঃ পুনঃ আঘাত হানা স্থির করলেও তাঁরা লোকনাথ বলকে পাঠিয়ে দিলেন গণেশ ঘোষদের সংগে মিলিত হয়ে যুগান্তরের সহযোগে কিছু করার জন্যে। ঠিক একই নীতি অনুসারে বিনোদ চৌধুরী-সরোজ গৃহ পালিয়ে চলে যান জালালাবাদ-যুদ্ধের পরই ঢাকা শহরে এবং বিনোদ দত্ত চলে আসেন শহর কুমিল্লায়।

কুমিল্লায় বিনোদ দত্তদের সংগঠন-কার্য পূর্ব থেকেই কিছুটা চলছিল স্থানীয় কলেজের দু-একটি ছাত্রের মাধ্যমে।... বিনোদ দত্ত দেখলেন যে, শহরের ছোটবড় সকলেই আতঙ্কে অস্থির। পুলিশের অত্যাচারে সকলেই জর্জরিত। অথচ তরুণদের প্রাণ চণ্ডল। তাদের নয়নকোণে বিদ্রোহ-বাহি। ওষ্ঠে প্রত্যলিখা।...

পুলিশের অত্যাচার কথাটি বলতেই তরুণদের মনে পড়ে একটি মূর্তি। এলিসন সাহেবের মূর্তি। মিঃ এলিসন হলেন সহকারী পুলিশ-সুপার। ব্রিটিশ-দম্ভের কুখ্যাত প্রতীক।

বন্ধুদের সংগে পরামর্শ হলো।... বিনোদ দত্ত সে-পরামর্শ সভায় স্থির করলেন যে, এলিসনকে গ্রহণ করতে হবে বিপ্লবীদের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড।...

এলিসনের গতিবিধি বিপ্লবীরা লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। সুযোগ এল একদিন। কোন একটি পথে সাহেবটি সাইকেলে নিয়মিত যাতায়াত করেন।... একদিন যথাসময়ে সেই পথে অপেক্ষা করছেন একটি সশস্ত্র তরুণ। সাইকেলে আসছেন মিঃ এলিসন। রিভলভারের নিশানায় আসতেই অব্যর্থ গুলীর আঘাতে ধরাশায়ী হলেন তিনি। দম্ভের ফনুস চূপসে গেছে। এলিসন নিহত।...

কুমিল্লা শহরের টনক নড়ে গেছে। পুলিশের তৎপরতার সীমা নেই। কিন্তু আততায়ী কে বা করায় তা অজ্ঞাতই রয়ে গেল।...

১৯০২ সনের ১৯শে জুলাই কুমিল্লার রাজপথে পুলিশ-সুপার মিঃ এলিসনকে মৃত্যুর অমোঘ আঘাতে দণ্ডিত করেছিলেন বিপ্লবী শৈলেশ রায়। কাজ হাসিল করেই শৈলেশ রায় কুমিল্লা রেল-স্টেশানে এসে চট্টগ্রাম-অতিমুখী ট্রেনখানায় চেপে বসলেন। জেরারগঞ্জ স্টেশানে পৌঁছে গ্রামের পথ ধরলেন তিনি। বহুকাল পুলিশ তো দূরের কথা, তাঁর দলের লোকও অনেকেই জানলো না যে কে এ-কাজ করলো, বা কোথায় সে উদ্যোগ হলো।



ত্রিপুরারজন সেনগুপ্ত

ও যুগান্তরেরই রমেন ভৌমিককে নিয়ে এসব ঝড়বৃষ্টির সূত্রপাত। ইন্দুবাবুদের কর্মপ্রসঙ্গে ঢাকা-বিপ্লবীদের বন্ধু তাঁতিবাজারের দেবেন্দ্রলাল বসাকের সাহায্যদান ছিল এক মূল্যবান বস্তু। দেবেন্দ্রবাবুর নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ ও মন্ত্রগদ্যপ্তির ধারণা ছিল তুলনাহীন। তাঁকে



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কিস্টোন ছেড়ে যেতে মনে মনে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কারণ চাৰ্লি গ্যাক সেনেট এবং ওখানকার অন্যান্য লোকদের বেশ অন্তর থেকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। যাবার সময় কারোকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন না চাৰ্লি—আসলে মনটা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই বিদায়ের ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ এবং কার্টখোটাভাবে সারলেন চ্যাপলিন। এক শনিবার রাতে নিজের ছবির কাটিং-এর ব্যাপারটা শেষ করে ফেললেন এবং তার পরের সোমবারেই মিস্টার এন্ডারসনের সঙ্গে স্যান-ফ্রান্সিস্কোর দিকে রওনা হলেন। স্টেশনে এন্ডারসনের সবুজ রং-এর মারসেডিজ গাড়িটি অপেক্ষা করছিল—দেখেই বোঝা যায় গাড়িটি একেবারে আনকোরা নতুন। পরে সেন্ট ফ্রান্সিস হোটেলে দুজনে লাগু খেলেন—তারপর সেখান থেকে নাইলস্-এর দিকে রওনা হলেন। নাইলসে এন্ডারসনের একটি ছোট স্টুডিও ছিল—এইখানেই তিনি তাঁর প্রভুকা বিলি ওয়েস্টার্নস্ ছবিগুলো এসালে কম্পানীর হয়ে তুলতেন। এগুলি ছিল সব রোমাণ্টিক ছবি। নাইলস্ ছিল স্যান-ফ্রান্সিস্কো থেকে মোটের এক ঘণ্টার পথ। ছোট শহর—জনসংখ্যা মাত্র চারশো। স্টুডিওটি ছিল একটি মাঠের মাঝে। ছাটো ফাচের—সামারে ভেতরে অসম্ভব গরম লাগবে। মনটা মুষড়ে গেল চ্যাপলিনের। তবে এন্ডারসন বললেন শিকাগোর স্টুডিওগুলো অনেক ভাল—কমোডি ছবির কাজের জন্য ওখানে

মানারকমের ঋণপাতি পাওয়া যায়। নাইলসে ও'রা এক ঘণ্টা থাকলেন—এন্ডারসনের কিছু কাজ ছিল—সে সব কাজ সারলেন, স্টাফের লোকদের কতব্যাকর্ম সম্বন্ধে দু-চারকথা বললেন এবং ফের চ্যাপলিনকে নিয়ে স্যান-ফ্রান্সিস্কোর পথে রওনা হলেন—সেখান থেকে দুজনে এবার শিকাগোর পথে পাড়ি দিলেন।

শুকবার ২৬শে জুন (১৯৬৬) স্টেটস-ম্যানে চ্যাপলিন-এর ইরাজমাস প্রাইজ পাওয়া সম্বন্ধে প্রথম পাতাভেই একটা কৌতূহলোদ্দীপক খবর প্রকাশিত হয়েছে দেখলাম। খবরটা এইভাবে দেওয়া হয়েছে:

‘আর্ট এ লাত—লেটার টু ওয়াল্ড’ চ্যাপলিন।’

আমসটারডাম জুন ২৪—নেদারল্যান্ডসের প্রিন্স বার্নার্ড আজ চাৰ্লি চ্যাপলিনকে এই বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর ট্র্যাম্পের রোলো বর্তমান শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ কাব্যিক ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছেন—রয়টারের সংবাদ। ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ অভিনেতাকে ইরাজমাস পুরস্কার (দশ হাজার পাউন্ড) দেওয়া হয় ইউরোপীয়ান কালচারের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদানের জন্য—প্রিন্স একথাও বলেন যে, তিনি নিজেও একজন চাৰ্লি ফান।

উত্তর চাৰ্লি জানান যে তিনি ভাবাবেগের দ্বারা উদ্ভূত হয়ে কাজ করেন—কোন বিশেষ ধাঁচে বেঁধে তিনি কখনও ছবি তোলেন নি। ছবি তৈরির ব্যাপারে জিওমেট্রিক কনস্ট্রাক্টর দিকেও তিনি কখনও নজর দেন নি। চাৰ্লি'র যৌবনে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ওয়াক অন্ড আর্ট বলতে তিনি কি বোঝেন। চাৰ্লি উত্তর দিয়েছিলেন—ওয়াক অন্ড আর্ট হচ্ছে খুব সূক্ষ্মরভাবে লেখা পৃথিবীর প্রতি একটি প্রেমপত্র। চাৰ্লি'র ধারণা ইরাজমাস বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর এই মতের সঙ্গে একমত হতেন।

যাক আবার আগের কথায় ফিরে আসি: এন্ডারসনের সঙ্গে চ্যাপলিন শিকাগোতে এসে পৌঁছলেন। স্টুডিও ম্যানেজার প্রচুর অভিনন্দন জানালেন—কিন্তু মিস্টার স্পার-এর দেখা নেই। ম্যানেজারের কাছ থেকে জানা গেল তিনি কি কাজে শিকাগোর বাইরে গেছেন এবং নতুন বছরের ছুটির পরে ফিরবেন। বৎসরের প্রথম দিনের আগে স্টুডিওতে কোন কাজ হবে না—সুতরাং স্পার না থাকায় ব্যাপারটাকে চাৰ্লি খুব বড় করে ধরলেন না। নিউ ইয়ার্স ইডো চাৰ্লি এন্ডারসন ও তাঁর

স্ট্রীট সঙ্গ স্ত্রীমণ্ডলের পরিবারে কাটানো। নিউ ইয়র্ক ডে-তে এডারসন ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেলেন—স্বাভাবিক কারণে চার্লিকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে গেলেন—স্পুর ফিরে এলে সব কিছু তিনি ঠিক করে দেবেন। দশ হাজার ডলারের বোনাসের ব্যাপারেও ভাবতে হবে না। স্ট্রীটেরাটা ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্ট এবং এক সময় নিশ্চয় এটাকে গোডাউন হিসাবে ব্যবহার করা হতো—মনে হল চ্যাপলিনের। বোদন সকালে চার্লি স্ট্রীটেরাটো গেলেন তখনও স্পুর আসেন নি। তাঁর কাজের সর্বশেষও এদের অফিসে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মনে হোল না। কিন্তু চার্লি বেন বন্ধুত্ব পারলেন অফিসের লোকেরা তাঁর সর্বশেষ যতটা অজ্ঞতা দেখাচ্ছে আসলে তারা তাঁর থেকে অনেক বেশি কিছু জানে—ইচ্ছে করেই কান কিছু প্রকাশ করতে চাইছে না। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন গোলমালে বলে মনে হতে লাগল চ্যাপলিনের।

তবুও এ নিয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামালেন না। তাঁর সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল যে একটা ভাল ছবি তুলতে পারলেই তাঁর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মানেজারকে চ্যাপলিন জিজ্ঞেস করলেন যে, স্ট্রীট থেকে সর্বশেষের সুযোগ-সুবিধা পাবেন কিনা।

সে উত্তর দিলে—নিশ্চয় পাবেন, এ বিষয়ে মিস্টার এডারসন তাদের সর্বশেষ আদেশ-নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

—তাহলে আমি এখনই কাজ শুরু করতে চাই—জানালেন চার্লি।

নিশ্চয়ই—আপনি দোতলায় সিনারিও ডিপার্টমেন্টে যান—মিস লুয়েলা পারসনস আপনাকে একটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেবেন।

অন্যের স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমি কাজ করি না—নিজেরটা নিজেই লিখি—তত্ত্বভাবে উত্তর দিলেন চ্যাপলিন। সব ব্যাপারেই এরা যেন কেমন অস্পষ্ট—পরিষ্কার করে কিছু জানাতে চায় না। বিশেষ করে স্পুর—এর এই অনুপস্থিতির ব্যাপারটা যেন ক্রমশ রহস্যজনক এবং অভ্যন্তরীণ বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে—তাই ইচ্ছে করেই এই ‘সুখসুখসুখ’—ভাবটা অবলম্বন করলেন চ্যাপলিন।

কাস্টিং-এর জন্য লোক পাঠিয়ে দিতে বললেন চার্লি। এর মধ্যে বেন টারপিন বলে একটা টেরা লোক ছিল—কম্পানীতে একে ঠিকমত কাজে লাগানো হচ্ছিল না। প্রথম থেকেই লোকটিকে চার্লির কেমন ভাল লেগে গেল—তাকে নিজের ছাবির জন্য তথ্যনি মনোনীত করে নিলেন। এবার একজন নায়িকার দরকার।

কয়েকজনকে ইন্টারভিউ করার পর মনে হোল একটা প্রার্থীকে দিয়ে কাজ চলতে পারে। মেরেটি দেখতে শুনতে বেশ সুন্দর, সেই সময়েই এই কম্পানীতে নতুন যোগ দিয়েছে। কিন্তু হয় ভগবান! চার্লি শত চেষ্টা

করেও মেরেটির থেকে কোন রি-অ্যাকশন পেলেন না অভিনয়ের সময়। এত প্রাণহীন মনে হোল যে তাকে বাদ দিয়ে দিতে হোল। বহু বছর বাদে গ্লোরিয়া সোমারসন চার্লিকে বলেছিলেন যে, তিনিই ছিলেন ঐ মেরেটি—অভিনয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে মনে তখন থেকেই পোষণ করতেন—কিন্তু স্ল্যাপটিক কমেডির প্রতি তাঁর ছিল দারুণ বিতর্ক, তাই ইচ্ছা করেই এভাবে সেদিন অসহযোগ করেছিলেন চার্লির সঙ্গে।

এখানে চার্লির প্রথম ছবি ‘হিজ নিউ বব’ প্রায় শেষ হয়ে এল। এদিকে দু’ সপ্তাহ হয়ে গেছে অল্প তখন পর্যন্ত মিস্টার স্পুরের দেখা নেই। মাইনে বা বোনাস কিছুই চার্লির হাতে আসে নি—বিরতি ভরা মুখে



এডনা পুরভিলেল

এদের অফিসে গিয়ে তিন কণ্ঠে চ্যাপলিন জিজ্ঞেস করলেন—‘কোথায় মিস্টার স্পুর?’

অফিসের সবাই কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছিল। কোনরকম সন্তোষজনক জবাব তারা দিতে পারলে না। অত্যন্ত ঘৃণাভরে চার্লি ফের বললেন—‘মিস্টার স্পুর কি এইভাবেই সব সময় তাঁর ব্যবসার ভারক করে থাকেন?’

কয়েক বছর বাদে চার্লি মিস্টার স্পুরের মুখ থেকেই এ সমস্যার সমাধান পেয়েছিলেন। যে সময় চার্লি ওদের ওখানে যোগ দেন, তখন পর্যন্ত মিস্টার স্পুর তাঁর নামই শোনেন নি। হঠাৎ যখন জানতে পারলেন যে, এডারসন চার্লির সঙ্গে চুক্তি করেছেন এক বছরের জন্য বারশো ডলার সাপ্তাহিক মাইনে এবং দশ হাজার ডলারের বোনাসসহ, তিনি অসহ্য রাগে প্রায় ক্ষেতে পড়েন—তখনই এডারসনকে টেলিগ্রাম করলেন তাঁর মাথা ধারাপ হচ্ছে গেছে কিনা জানতে চেষ্টা।

এরপর স্পুর আরও শুনলেন শ্রুতমাত্র জেস্টারলিসের সুপারিশে এডারসন চার্লির সঙ্গে পাকাপাকিভাবে কন্ট্রাক্ট করেছেন এবং সমস্ত ব্যাপারটা জুয়াড়ীর দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। এসব শুনে স্পুরের উৎকণ্ঠা আরও স্বেগবশে বেড়ে যায় এবং এই কারণেই তিনি শিকাগো থেকে অন্তর্ধান করেন। এর আগে তাঁর নিজস্ব যে সব ক্রিমিকস ছিল তাদের মধ্যে যারা সেরা তাদের মাইনে ছিল সপ্তাহে পঁচাত্তর ডলার। তাদের যে সব ছবি হোত তাতে কোনরকমে খরচাটা উঠে যেত।

স্পুর এরপর যখন শিকাগোয় ফিরলেন তখন তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা এসে অভিনন্দন জানাতে শুরু করলেন যে, চার্লির মত হালারসামান্যতাকে তাঁর কম্পানীতে পেয়েছেন বলে। তাছাড়া তাঁর বাইরে থাকাকালীন ফিল্ম একচেঁজে যা ঘটেছিল পরে এসে তা আবিষ্কার করলেন। চার্লি এখানে ছবি শুদ্ধ করার আগেই পঁয়ষাট কপি ছবি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। এরকম বিক্রী ছিল এদের ধারণারও অতীত। ছবি যখন শেষ হল একশো তিরিশটা প্রিন্ট বিক্রী হয়ে গেল এবং তখনও ক্রমাগত আরও প্রিন্টের জন্য অর্ডার আসছে। কম্পানীও সুযোগ বুঝে ছবির দাম বাড়িয়ে দিল—তের সেন্ট-এ ফুট থেকে পঁচিশ সেন্ট-এ ফুটে।

স্পুরের সঙ্গে দেখা হবার পর বেশ বিবর্তিত সঙ্গ চার্লি তাঁর মাইনে ও বোনাস দাবি করলেন। স্পুর চার্লির কাছে বারবার ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, তাঁর অফিসে তিনি এ বিষয়ে সমস্ত ইনস্ট্রাকশন্স দিয়ে গেছিলেন। তিনি নিজে কন্ট্রাক্ট দেখেন নি বটে, তবে তাঁর ধারণা ছিল অফিস এ বিষয়ে সব কিছু জানতো। এই আজব কাহিনীটি শুনে চার্লি আরও বিরক্ত হয়ে উঠলেন। স্পুরকে বললেন—‘শয়! আপনার ভয়টা কোথায়। ইচ্ছা করলে এখনও কন্ট্রাক্ট বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে—তাছাড়া আমার মনে হয় চুক্তির সর্ত আপনি আগেই ভুল করেছেন।’

স্পুর উত্তর দিলেন—‘এভাবে ব্যাপারটা দেখলে আমি সত্যিই দুঃখিত হব। আমাদের ফার্মের একটা সুনাম আছে—কন্ট্রাক্ট করলে আমরা কখনই তার কোন সর্ত ভুল করি না।’

চার্লি—‘এক্ষেত্রে সর্ত অনুযায়ী কাজ করা হয় নি।’

স্পুর—‘এখনই ব্যাপারটার বিবৃত করছি। চার্লি বিদ্রূপভরে জবাব দিলেন—‘বেশ তাই করুন—আমার তাড়া নেই।’

যে অল্প কয়েকদিন চার্লি শিকাগোতে ছিলেন স্পুর নানারকমে তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিতে ঠাড়া করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু চার্লি প্রথম থেকেই বিরক্ত হয়ে যাওয়াতে

শিকাগোতে কাজ করতে মোটেই ভাল লাগছিল না। তিনি স্পুরকে পরিস্কার বলে দিলেন তাঁর কাজ থেকে ভাল কাজ পেতে হলে তাঁকে ক্যালিফোর্নিয়া পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

স্পুরে জবাব দিলেন—তুমি যাতে নিশ্চিত এবং স্বচ্ছন্দ মনে কাজ করতে পার তার জন্য যা দরকার সবই করতে আমরা প্রস্তুত। আমার তো মনে হয় লাইনসে গিয়ে কাজ করতে তোমার ভাল লাগবে।

এ প্রস্তাব ভেতর থেকে খুব ভাল না লাগলেও চার্লিস এন্ডারসনকে স্পুরের থেকে অনেক বেশি পছন্দ হয়েছিল।

নাইলসে এসে চ্যাপলিন এন্ডারসনের এখানকার কর্মেডি কম্পানী থেকে লোক বাছাই করে নিয়ে ছবি তোলবার উদ্যোগ করলেন।

চার্লি আদেশ দিলেন একটি সুসজ্জিত ক্যামেরা তৈরি করতে। কারণ কি বিষয়ে ছবি তুলবেন এ নিয়ে আগে কিছু ঠিক না থাকলেও, একটি ক্যামেরা পেলেই চার্লিস রাখায় ছবির কাহিনী যেন আপনা থেকেই গিজিয়ে উঠতো। কিন্তু আর একটা মুশ্কিল ঝামেলা—নায়িকা সাজবার জন্য একজন যুবতী এবং সুন্দরী মহিলার দরকার—তাকে কোথায় পান।

চার্লি স্ট্রম বলে একজন জার্মান-আমেরিকান কাউবর এন্ডারসনের সঙ্গে কাজ করতো। সে জানালে যে হিল স্ট্রীটে টেটস্-ক্যাফেতে সে একটি সুন্দরী যুবতীকে আসতে দেখেছে। ব্যক্তিগতভাবে মেরেটের সঙ্গে তার পরিচয় নেই—তবে মেরেটের চেহারা তার মিলে—এ হোটেলের মালিকের কাছে গেলে হয়তো তার ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে।

টেটস্ ক্যাফের মালিক রিপটার টেট মেরেটকে ভালভাবেই জানতেন। সে ছিল নেভাডার লাডলকের অধিবাসী—বিবাহিত বোনের বাড়িতে থাকতো। তার নাম ছিল এডনা পুরভিয়ার্স। এর পরেই চার্লিরা মেরেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য এ্যাপার্টমেন্ট করলেন সেইন্ট ফ্রান্সিস্ হোটেলে। এডনাকে দেখে চার্লিস মনে হয়েছিল মেরেট শব্দ মিষ্টিই নয়, অপূর্ব সুন্দরী।

এখানে চার্লি যে নতুন ছবি তুলবেন তার নাম দিলেন 'হিজ নাইট আউট'—একজন রূপা আনন্দ করতে বেরিয়েছে এই নিয়েই ছবির সূত্র—কাজ করতে করতে বাকিটা আপনা থেকেই এসে যাবে এ বিষয়ে চার্লি নিশ্চিত ছিলেন।

ছবি যেদিন সূত্র হবে তার আগের দিন এন্ডারসনের দলের একজন চার্লিকে একটি সাপার পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন। অত্যন্ত সাধারণ পার্টি—খাদ্য এবং পানীয় হিসাবে ছিল বিয়ার এবং স্যাউইচেস। জন কুড়ি

ছিল নিমন্ত্রিত—তার ভেতর মিস পুরভিয়ার্সও ছিলেন। সাপারের পর কেউ কেউ তাস খেলতে বসল—বাকীরা গল্পগুজব করে কাটাচ্ছিল। কথায় কথায় হিনোটিজের কথা উঠল—চার্লি খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার হিনোটিক প্যাসার্স সম্বন্ধে। গর্বভরে এমন কথাও বললেন যে, যে ঘরে তাঁরা বসে-ছিলেন সেখানকার যে কাউকে বাট সেকেন্ডের ভেতর তিনি সম্পূর্ণভাবে সম্মোহিত করে দেবার ক্ষমতা রাখেন। এতটা জোরের সঙ্গে চার্লি একথা বলছিলেন যে এডনা বাবে দলের সবাই তাঁর কথা ক্রিয়াকর্ম করে ফেললো।

এডনা কিন্তু হেসে উঠে বললো—বত বাজে কথা। আমাকে হিনোটিজ করার ক্ষমতা কারোর নেই।

চার্লি—তুমি হচ্ছে সম্মোহিত হবার সবচেয়ে ভাল সাবজেক্ট। আমি বাজী ফেলতে পারি বাট সেকেন্ডের ভেতর তোমাকে সম্পূর্ণভাবে মূম পাড়িয়ে ফেলবো।

এডনা—বেশ বাজী ফেল আমিও রাজী। চার্লি—পরে শরীর খারাপ লাগলে আমাকে ঘোষ দিও না—অবশ্য এতে করে ভীষণ কিছু শরীরের ক্ষতি হবে না।

চার্লি চাইছিলেন এভাবে এডনাকে ডর দেখিয়ে সেবেন এবং আর সে সাহস করে সম্মোহিত হতে এগিয়ে আসবে না। কিন্তু এডনা এতটুকুও ডর পেল না।

অন্য একজন মহিলা তাকে নিরস্ত করতে চাইলেন, বললেন—এ ধরনের বোকা সাহস দেখিয়ে নিজের ক্ষতি করো না।

এডনা মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে শান্তভাবে বললো—আমার বাজীটা কিন্তু ঠিকই রইল।

বেশ তাই হোক—সবার থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াও—আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক।

মৃদু হেসে চার্লিস নির্দেশমত কাজ করল এডনা। এতক্ষণ ঘরের প্রত্যেকে কি ঘটে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন।

কেউ সময়টা নজরে রেখ তো—বললেন চার্লি।

মনে রেখ—বললে এডনা—বাট সেকেন্ডের ভেতর আমাকে মূম পাড়িয়ে দিতে হবে।

বাট সেকেন্ডের ভেতর তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে যাবে। টাইম-কিপার বললে—এবার আরম্ভ কর। দু-তিনবার নাটকে ভগ্নীতে হাত দুলিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন চার্লি—এডনার চোখের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে—মুখের সামনে এসে ফিসফিস করে বললেন—অজ্ঞান হয়ে যাবার ভাগ কর। তারপর আবার নাটকে ভগ্নীতে হাত দুলিয়ে বলতে লাগলেন—তোমার আর কোনো বোধশক্তি নেই—তুমি এবার সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে গেছ।

এরপর চার্লি একটু পেঁছিয়ে এলেন—

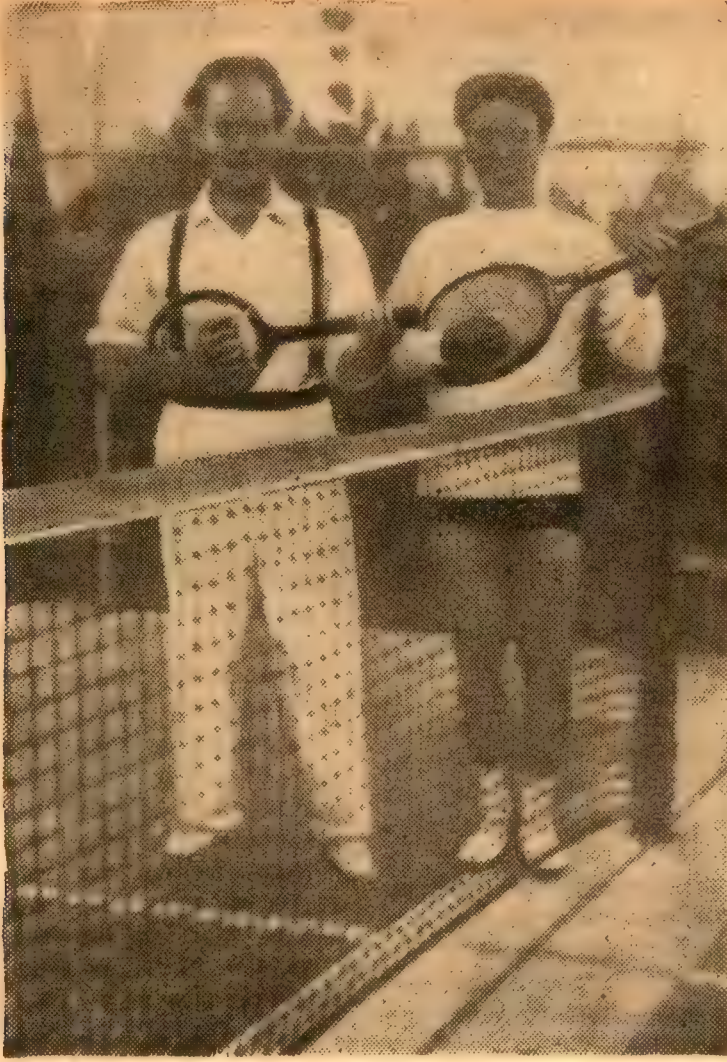
এডনা অশ্রুতভাবে দুলতে লাগলেন—কেন মনে হতে লাগল, তিনি সম্পূর্ণ সম্মোহিত হয়ে গেছেন। চার্লি চুপ করে এগিয়ে গিয়ে তার হাত দুটি বেশ শক্তভাবে ধরে ফেললেন। দু-একজন মহিলা ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। চার্লি গম্ভীরভাবে বললেন—কেউ এসে আমাদের সাহায্য কর একে কোঁচে শূইয়ে দিতে।

এডনার যখন জ্ঞান ফিরে এল—অর্থাৎ এই নকল অচেতনতাকে পরিহার করে সে যখন আবার স্বাভাবিকতার ভাবে ফিরে এল—প্রথমটায় এমন একটা বিহুসজার ভাগ করলে যে, দেখে কেউ কম্পনাও করতে পারলে না যে, সমস্ত ব্যাপারটাই সে অভিনয় করছে—তারপর বললে যে সে ভয়ানক ক্লান্ত এবং অবসন্ন বোধ করছে। এর ফলে চার্লিস কিন্তু তার প্রতি একটা প্রাধ্বা এবং স্নেহের ভাল এসে গেল। ইচ্ছে করলেই এডনা পেরিষ্টিক এবং বাজী জিততে পারতো। কিন্তু সেস অজ হিউমার থাকার দরুন চার্লিস সঙ্গে সহযোগিতা করে দুজনে এই মজার জোকটি উপভোগ করলে।

জীবনের শেষদিকে চ্যাপলিন আমেরিকা ত্যাগ করে সুইটজারল্যান্ডে বসবাস উত্থির নিয়ে এসেছেন। ক্যালিফোর্নিয়াতে যারা নিয়ে এসেছে। ক্যালিফোর্নিয়াতে যারা তাঁর কম্পানীতে কাজ করতো তাদের প্রত্যেককে চ্যাপলিন ভাল অঙ্কের বিদায়-পারিশ্রমিক এবং ভাল বোনাস দেবার বন্দোবস্ত করেন। সবশেষে আশি হাজার ডলার খরচ হয়েছিল এইসব পেমেন্ট দেবার দরুন।

এডনা পুরভিয়ার্সের বেলায় কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করেছিলেন চার্লি—এডনা অবশ্য চিরকাল চার্লিস সঙ্গেই কাজ করেছেন। এডনা বোনাসও পেয়েছিলেন এবং তাঁর মারা যাবার দিন অবধি চার্লিস চাকরিতেই বহর ছিলেন।

মসিসে ভাদুঁর কাসটিং-এর সময় চ্যাপলিনের মনে হয়েছিল এডনাকে দিয়ে এই ছবির নামকরা ভূমিকা ম্যাক্সমুসনের রোলটি করাবেন। যে সময়ের কথা বলাই তার আর কুড়ি বছর ধরে এডনার সঙ্গে চার্লিস দেখ হয় নি। যদিও এডনা চার্লিস পে-রোলেই ছিলেন, কিন্তু তাকে কোনো ছবিতে অভিনয়ের জন্য দরকার পড়ে নি। এই সময়টার সে স্টুডিওতে আসতো না। সপ্তাহে সপ্তাহে তার চেক তার নামেই অফিস থেকে পোস্টে চলে যেত। এতদিন বাদে মসিসে ভাদুঁতে অভিনয় করার জন্য ডাক পড়ায় সে খুবই বিস্মিত এবং উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। প্রথম সাক্ষাতের সময় ভাবের উচ্ছ্বাস এবং অবৈধ পরিহার করার জন্য অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে চার্লি কথা সূত্র করলেন—তোমাকে এতদিনে আবার কাজে দরকার পড়ল।



মাইজেনস্টাইন ও চ্যাপলিন

চার্লি লক্ষ্য করলেন তার ঠোঁটটা অল্প কেঁপে উঠল—কিন্তু সেও সামলে নিয়ে মদ্য হাসল।

এরপর চার্লি এডনার সঙ্গে ছবির কাজ নিয়ে উৎসাহভরে আলোচনা শুরু করলেন। সবটা শুন্যে এডনাও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল, বললে—গল্পটা শুন্যেই মনে হচ্ছে সত্যিই এটা একটা অদ্ভুত ছবি হবে। এডনার স্বভাবই ছিল এই ধরনের—চিরকালই সব বিষয়েই তার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা যেত।

এডনা চার্লির কাছে তার পার্টটি পড়লো—ভালই লাগল তার রিডিং। কিন্তু চরিত্র রূপায়নের ব্যাপারে দেখা গেল এই রোলার সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। চরিত্রটি ভেতর থেকে ইওরোপীয়ান সোফিস্টিকেশনের ভাবটা ছিল তা এডনার চরিত্রে কোনোদিনই ছিল না। চারদিন তাকে নিয়ে আশ্রয় চেষ্টা করার পর চ্যাপলিন

স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, এডনাকে দিয়ে এ পার্ট হবে না। এডনাও বেন রেহাই পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাচ্চল—সে যে চরিত্রটির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না এ কথা সেও বেশ ভালভাবেই বুঝেছিল। এরপর চ্যাপলিনের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। সুইটজারল্যান্ডে চলে যাবার পর চার্লি দু-একটি চিঠি পান এডনার কাছ থেকে।

একটি চিঠিতে এডনা লিখেছে—
প্রিয় চার্লি,

এই প্রথম এত বছর বাদে তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেবার সুযোগ পেলাম—এত বছর ধরে যে সহন্যতা, বন্ধুত্ব তুমি দেখিয়ে এসেছ, যেভাবে সর্বকালে আমাকে সাহায্য করেছ তার জন্য। জীবনের প্রথমদিকে যেসব বাধা, বিঘা, বিপদ আসে তাকে লোকে ঐ বয়সে প্রায় অগ্রাহ্য করেই চলে।

আমি জানি তোমার জীবনেও ওইসব অবস্থা এসেছে। এখন তোমার পানপাত্র সম্পূর্ণভাবে আনন্দরস দিয়ে ভরা—মনের মত স্বাধীন, সুন্দর সংসার...

এরপর এডনা শারীরিক অসুস্থতার দিকটা, ডাক্তার ও নার্সের বাবদ বিরাট খরচের অঙ্কটা নিয়ে সামান্য আলোচনা করার পর আবার ঠাট্টার সুরে লিখেছে—

একটা শোনা গল্পের কথা লিখছি। একটি লোককে রকেট-সিপে ভরে উদ্‌ঘাটন করে উৎসর্গ করা হয়—উদ্দেশ্য ছিল যে, কতটা ওপরে সে উঠতে পারে তাই দেখা। (তাকে বলা হয়েছিল যে, অলটিটিউডের অঙ্কটির পরিমাপ যন্ত্রের প্রতি যেন সে লক্ষ্য রাখে। সেও মনে মনে গুণতে লাগলো ২৫০০০, ৩০০০০, ১০০০০০, ৫০০০০০-----এতটা উৎসাহে উঠে সে আপন মনে আবৃত্তি করল 'জিসাস্ ক্রাইস্ট!' সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভ নরম গলায় কে যেন উত্তর দিলে 'ইয়েসসস—?'

চার্লি তোমাকে বারবার অনুরোধ করছি অদূর ভবিষ্যতে যেন তোমার খবর পাই। আর আবেদন জানাচ্ছি ফিরে আসতে, আসলে এই জায়গাটাই হচ্ছে তোমার সত্যিকার থাকবার জায়গা। ভালবাসা নিও।

তোমার সবচেয়ে সেরা এবং সত্যিকার গুণমুখভক্ত,

এডনা।

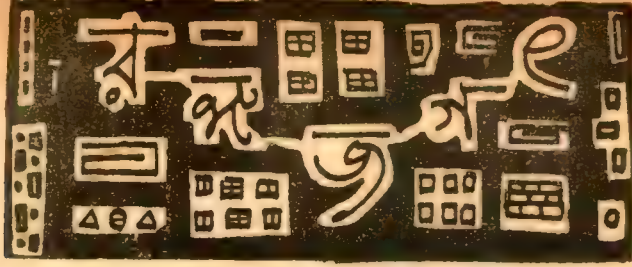
এডনা যে শেষ চিঠিটি চার্লিকে লেখেন তার তারিখ ছিল ১৩ই নভেম্বর ১৯৫৬ সাল। চিঠিটিতে তখন পর্যন্ত তাকে পে-রোলে রাখা হয়েছে বলে চার্লিকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তা ছাড়া নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা খানিকটা আছে—কিন্তু এ চিঠি পড়লেও প্রতি ছত্রে ছত্রে এডনার সেন্স অভ হিউমরের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই চিঠি চার্লি যখন পান তার কিছুদিন বাদেই এডনা মারা যায়।

যাক্ আবার আগের কথার ফিরে আসি। নাইলসে চার্লি চারটি হাসির ছবি তোলেন। স্টুডিওতে যন্ত্রপাতির অভাবে বড় কাজের অসুবিধা হচ্ছিল—চার্লি এডনার সেন্স নিয়ে প্রস্তাব করলেন যে, তিনি লস্‌এঞ্জেলসে গিয়ে কাজ করবেন—কারণ, সেখানে ছবি তুলবার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। এডনার লস্‌এঞ্জেলসে চার্লির জন্য একটি ছোট স্টুডিও ভাড়া নেবার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

চার্লির ছবির এখন দারুণ চাহিদা। এখানে কম্পানীর এসব ছবির ক্রয় প্রচুর টাকা লাভ করছিলেন। দু'রিলের ছবির জন্য একজবিটারদের থেকে খুব কম করে হলেও একদিনের জন্য পণ্যশ উল্লাহ করে ভাড়া নিচ্ছিলেন।

(ক্লসশঃ)



বার্লিন উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের সাফল্য

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায় জ্বরও প্রথম পরিচালকের পুরস্কার লাভ করেছেন। 'চারুলতা' ছবির সার্থক পরিচালনার জন্য তাঁর এই স্বীকৃতি লাভ। আন্তর্জাতিক রোমান ক্যাথলিক চলচ্চিত্র সম্পর্কিত অফিসও 'চারুলতা'কে পুরস্কার দিয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের এই আন্তর্জাতিক সম্মানলাভে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প গর্বিত। 'চারুলতা'র নির্মিতিতে যে সব টেকনিশিয়ান ও শিল্পী রয়েছেন, তাঁদের আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সত্যজিৎ রায় 'সিলভার বিয়ার' নিয়ে কলকাতার এসে পৌঁছেছেন। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি স্বাধাযোগ্য সম্মান লাভ করবেন—এই ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। 'চারুলতা'র মধ্যে যে শিল্প অন্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে রূপালি পর্দার রূপায়িত করা সহজ ব্যাপার ছিল না। তিনি সেই শিল্পকে কোথাও পুরোপুরি উন্মোচন করেন নি, বরং অর্ধাঙ্গদুর্ভাগে তাকে মানব-মনের জিজ্ঞাসার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। বার্লিন চলচ্চিত্রের উৎসবের বিচারকগণ 'চারুলতা'র উজ্জ্বলিত প্রশংসা করেই তাঁদের বক্তব্য শেষ করেন নি, তারা এমনও আশা করেছিলেন যে, এই ছবি একাধিক পুরস্কার লাভ করবে। সেখানে বিচারকদের মধ্যে চেয়ারম্যান ছিলেন জন গিলেট। তিনি যেদিন গ্রীষ্মের হাতে পুরস্কার দান করেন—সেদিন মৃতকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, 'চারুলতা'র জন্য একটি মাত্র পুরস্কার দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেন না, যে কোন একটি ছবির জন্য প্রথাগতভাবে একটি মাত্র পুরস্কার দানের রীতিই চালু রয়েছে। এই রীতি চালু না থাকলে একাধিক পুরস্কার দেওয়া সম্ভব হতো।

বিদেশের কাগজগুলিতে 'চারুলতা'র প্রশংসা ধ্বনিত হয়েছে। 'সানডে টাইমস', 'অবজারভার' প্রভৃতি কাগজের সমালোচনাগুলি 'চারুলতা' ছবির বিভিন্ন শিল্পকৃতিত্ব একের পর এক তুলে ধরেছে।

এতো প্রশংসা শোনার পর মনে হতে পারে, এই 'চারুলতা' ছবি কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রাথমিকভাবে যোগদানের কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয় নি কেন?

আমাদের মতে এ এক বিস্ময় ছাড়া আর কি? তবে সব ব্যাপারে যেমন কার্যকারণ

নিহিত থাকে, তেমনি কান উৎসব থেকে 'চারুলতা'কে বিসর্জন দেয়ার পেছনে একটা কারণ ছিল নিশ্চয়ই। যন্ত্র জানা গেছে, ব্যক্তিগত কারণেই 'চারুলতা' সেখানে ঠাই পায় নি। বার্লিন থেকে ফিরে এসে একজনের কাছ থেকে বা শোনা গেল, তাতে আমাদের প্রাপ্ত তথ্য সত্যে পরিণত হয়েছে বলা চলে।

গত বছর দিল্লীতে যে চলচ্চিত্র উৎসব

অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল লে ব্রেটকে। কিন্তু আমন্ত্রণের এই সিদ্ধান্ত পরে পরিবর্তিত হওয়ার মর্শিরে ব্রেট অপমানিত বোধ করেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন তিনি কান চলচ্চিত্র উৎসবে। এ উৎসবে প্রাথমিক যোগদানের অনুমতি দানের সর্বস্বত্ব ছিলেন মর্শিরে লে ব্রেট। তিনি 'চারুলতা' ছবিটিকে উৎসবের অযোগ্য বলে বিবেচনা করে বিচারকদের সামনে উপস্থিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন।

সবচেয়ে দৃশ্যের কথা, আন্তর্জাতিক উৎসবেও এই ধরনের ব্যাপার ঘটে। বা হোক বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের ঘটনাই প্রমাণ করলো একজনের রায় সর্বত্রই অনড় নয়। আমাদের দেশেও অবশ্য এ ধরনের ঘটনা ঘটে। উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমরাও শিক্ষালাভ করতে পারি। শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৃষ্টি, জিহ্বা, ক্রোধ ও মোহ যেন শিল্পজগৎকে দ্রষ্ট না করে।

—সুজন।



বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে 'চারুলতা' ছবির জন্য 'রৌপ্য তরঙ্গ' দ্বারা সম্মানিত পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও 'শেকস্পীর ওয়ালার' অভিনয়ে জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী মধুর জাফরে।



সিডনে পয়টার ও টনী কর্টিস স্টেনলি—ক্রামার-এর 'দি ডিফারেন্ট ওয়ানস' ছবিতে।

নিগ্রো অভিনেতা সিডনে পয়টার

সিডনে পয়টার মার্কিন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিগ্রো অভিনেতা। বলা যেতে পারে সিডনে পয়টার বর্তমান মার্কিন দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে একজন। ১৯৫০ সালের পর থেকে সিডনে যে ডজনখানেক ছবিতে অভিনয় করেছেন তাই তাঁকে এই খ্যাতি এনে দিয়েছে। এই ছবিগুলির মধ্যে 'ডিফারেন্ট ওয়ানস' ছবিতে তাঁর সমরণীয় অভিনয়ের জন্য তিনি অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন লাভ করেছিলেন। 'ডিফারেন্ট ওয়ানস' ছবিটি কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছিল। বর্ণবিশেষ-বিরোধী এত বড় শান্তিশালী ছবিটি যাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের আজো এক সাদা ও এক কালো—পলাতক দুই বন্দীর কথা মনে আছে।

নিউইয়র্কের 'এরাইজ ইন দি সান' নাটকে তাঁর অভিনয় দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে উক্ত নাটকটি বছরের সেরা নাটক ঘিবেচিত হয়।

দু' বছর পরে সিডনে পয়টার উক্ত নাটকের চিত্ররূপে অভিনয় করেন। নাটকটি সম্পর্কে সিডনে বলেছেন, এ নাটক শূন্য নিগ্রোদের কাহিনী নয়—মানুষের কাহিনী। যে কোন দেশে যে কোন মানুষের মধ্যে এ ঘটনা ঘটতে পারতো।

১৯২৮ সালে সিডনে পয়টার জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকান নিগ্রো থিয়েটারে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় হ্যারি বেলা-কোল্টে তাঁর সতীর্থ ছিলেন।

সিডনে পয়টারের প্রথম অভিনয় 'আনা লুকাষ্টা' নাটকে। তাঁর অভিনীত প্রথম ছবির নাম 'নো ওয়ে আউট'। দক্ষিণ আফ্রিকার চিত্রায়িত 'ক্লাই দি বিলাভেড কাম্প' ছবিতে সিডনে একজন দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ডার

ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'রেড বল এক্সপ্রেস' ছবিতে সিডনে এক গ্রাক ব্লাইভারের চরিত্রে রূপ দেন। তার পরবর্তী ছবি 'দি ব্ল্যাকবোর্ড জাংগল'-এ একটি ছাত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তারপরে অভিনয় করেন স্ট্যানলী ক্রামারের বিখ্যাত ছবি 'ডিফারেন্ট ওয়ানস'-এ। 'কার্জি এন্ড দি বেস' ছবিতে সিডনে আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেন। পরবর্তী সময়ে সিডনে 'এজ অব দি সিটি', 'সামথিং অব ভ্যালু' ছবিতে অভিনয় করেন। 'সামথিং অব ভ্যালু' ছবিটি আফ্রিকার মাউ মাউ আন্দোলনের পটভূমিকায় নির্মিত। এর পর আফ্রিকান স্বাধীনতা আন্দোলনের পট-ভূমিকায় গৃহীত ছবি 'মার্ক অব দি হক'-এ তিনি অভিনয় করেন। 'ব্যান্ড অব দি এঞ্জেলস' ছবিতে ক্লার্ক গেবেলের সঙ্গে সিডনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'প্যারিস হুজ' ছবিতে একজন সেক্সফোন বাজকের চরিত্রে সিডনে পরটার পল নিউম্যানের সঙ্গে অভিনয় করেন।

স্ট্যানলী ক্রামার প্রযোজিত হুবার্ট কনফিল্ড পরিচালিত 'প্রেশার পয়েন্ট' তাঁর অভিনীত আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। গত ১৫ বছরে হলিউডে বর্ণবিশেষ সমস্যা নিয়ে অনেক ছবি নির্মিত হয়েছে। তার মধ্যে স্ট্যানলী ক্রামারের 'হোম অব দি ব্রেড ডারিয়েল এফ ব্লান্ডকের 'পিপিক' জর্জ স্ট্রিভেনস-এর 'ইনট্রডার ইন দি ডাস্ট'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সময় নিগ্রো অভিনেতাদের অভিনয়-প্রতিভা চারিদিকে প্রসারিত হয়। পরিচালক স্ট্যানলী ক্রামার সিডনে পয়টার সম্পর্কে বলেন: 'অনুভূতি-প্রবল' চরিত্রের রূপায়ণে সিডনে অস্বাভাবিক এ প্রসঙ্গে আর একজন অভিনেতার নাম করা যেতে পারে, তিনি হলেন মার্লিন ব্রাডো। 'ডেজার্ট রোজ' ছবিতে অভিনয় করে তিনি মার্লিন উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেছেন।

সিডনে পয়টার সুন্দরী নর্তকী জরানিঅ হার্ডির সঙ্গে বিবাহিত। তাঁদের তিনকন্যা। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি নিউইয়র্কের শহরতলী মাউন্টভেরনন-এ বাস করেন। বই পড়া আর জাজ রেকর্ড সংগীত শোনা তাঁর ছবি। চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়া উদ্দেশ্য।

মস্কায় চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

আলেক্সি রোমানক

(রাষ্ট্রীয় সিনেমাটোগ্রাফ কমিটির সভাপতি)

৫ই জুলাই মস্কায় চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব শুরুর হচ্ছে। প্রতি এক বছর অন্তর—অর্থাৎ প্রতি দুই বছরে একবার—মস্কায় এই চলচ্চিত্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পূর্ববর্তী তিনটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৯, ১৯৬১ ও ১৯৬৩ সালে

সমাজজীবনে আজ সিনেমার ভূমিকা যে
কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ তা সকলেই বোঝেন।
নইসঙ্গে, সিনেমা আন্তর্জাতিক বোঝাবুঝির
মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের, খুব শক্তিশালী একটি
সাংস্কৃতিক মাধ্যম। কারণ, একটি জাতির
সামাজিক ও ব্যক্তি-মানুষের পরিচয় চলচ্চিত্রের
মধ্য দিয়ে সবচেয়ে প্রবলভাবে প্রকাশ করা যায়।
—এই দিক থেকেই আমরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-
উৎসবগুলিকে এতো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে
করি।

কিন্তু সিনেমা তার সেই মহৎ সাংস্কৃতিক
কাজকে চরিতার্থ করতে পারে একমাত্র আমাদের
কালের প্রধান প্রধান বিষয় ও ঘটনাবলীকে
স্থাপিত করার মধ্যে দিয়ে, মানবিক উপলব্ধি-
গুলিকে সত্যতার সঙ্গে প্রকাশিত করার মধ্যে
দিয়ে, যা-কিছু অশুভ সে-সবের মূখোশ
উন্মোচন করে কল্যাণের আদর্শগুলিকে
প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়ে। এই কর্তব্য
পালনের জন্যে সর্বদেশের চলচ্চিত্রশিল্পীদের
প্রায়সকলে সংহত করার, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ
সহযোগিতাকে প্রতিষ্ঠিত করার, একটি খুব
ভালো উপায় হল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-
মেলাগুলিকে সকলের সমাবেশ ঘটানো।



চলচ্চিত্র-উৎসবের বাণী

চলচ্চিত্র-শিল্পীদের সেই সাংস্কৃতিক
সহযোগিতা ও পারস্পরিক বোঝাবুঝিকে
মুঠতর করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে
বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন চলচ্চিত্র-
উৎসব। এইসব উৎসবে শৃঙ্খলিত
বিভিন্ন দেশের জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পীদের
প্রশ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলির পরিচয় লাভ করা যায়
তাই নয়; সেইসঙ্গে, শিল্পীরা ব্যক্তিগতভাবে
পারস্পরিক সংযোগকে ব্যাপকতর করার

মস্কোর রেভলিন প্রাসাদে চতুর্থ আন্তর্জাতিক মস্কো ফিল্ম উৎসবের উদ্বোধন
অনুষ্ঠানে ফরাসী অভিনেত্রী ম্যারিনা ভ্যাঁদা ভারতীয় অভিনেতা রাজকাপুরের সহিত
করমর্দন করছেন।

সুযোগ পান; আলোচনাচক্র, ফোরাম,
সিম্পোসিয়াম ইত্যাদিতে আন্তর্জাতিক
অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব-চলচ্চিত্র-
শিল্পের মানকে উন্নততর করে তোলার সুযোগ
ঘটে; এর ব্যবসায়িক দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ :
এক দেশের ছবি অন্য দেশে ব্যবসায়িক

ভিত্তিতে দেখানোর ব্যবস্থা হয় প্রধানত এইসব
আন্তর্জাতিক উৎসবগুলির মধ্যস্থতায়। এই
জন্যেই, সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতি-
নিখিয়া প্রায় প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক উৎসবেই
যোগদান করেন এবং আমরা নিজস্বের দেশে
প্রতি বছরেই একবার কিংবা দু'বার এক-একটি
দেশের চলচ্চিত্র-উৎসবের ব্যবস্থা করে থাকি।

সোভিয়েত সিনেমা-শিল্পীরা চলচ্চিত্র
নির্মানে যে আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হন
তা হল মানবতাবাদ, প্রগতি, গণতন্ত্র, বিশ্ব-
শান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী। মস্কো
চলচ্চিত্র-উৎসবের বাণী (‘মস্কো’ মস্কো
দিয়েই তার সেই আদর্শ প্রতিফলিত :
‘চলচ্চিত্র-শিল্পে মানবতাবাদের জন্য, সর্ব-
জাতির মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর জন্য’—এই
হল আমাদের চলচ্চিত্র-উৎসবের বাণী।

ইতিপূর্বে মস্কোর ষোল্লটি আন্ত-
র্জাতিক উৎসব হয়ে গেছে, তাতে প্রমাণিত
হয়েছে যে, এই বাণীটি বিশ্বের সর্বদেশের
প্রগতিশীল মানবতাবাদী গণতন্ত্রপ্রিয় সিনেমা-
নির্মাতাদের মনের কথা। এই মহৎ আদর্শের
পতাকার নিচে বিশ্ব-সিনেমা-শিল্পের প্রতি-
নিধিদের এই সমাবেশ ঘটে বলেই, মাত্র তিনটি
উৎসবের মধ্যে দিয়ে এই মস্কো-উৎসব ইতি-
মধ্যেই অন্যতম সর্বাধিক জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক
উৎসবে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে মস্কো-
চলচ্চিত্র-উৎসব পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিনিধি-



‘ওয়ার এন্ড পিস’-এর একটি দৃশ্যে লুডমিলা স্যাভেলোভা।

স্থানীয় ফিল্ম-উৎসবগুলির মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম মস্কা-উৎসবে ৪০টি দেশ যোগদান করেছিল। দ্বিতীয় উৎসবে (১৯৬১) যোগ দিয়েছিল ৫০টিরও বেশি দেশ। এবং ১৯৬৩ সালের তৃতীয় উৎসবে এই মেলায় সমাবেশ ঘটেছিল প্রায় ৬০টি দেশের।

অন্য কোনো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-মেলায় এতো বেশি দেশ কখনও যোগদান করে নি। মস্কা-উৎসবের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলঃ এতে আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলির ব্যাপক অংশ গ্রহণ।

গণতান্ত্রিক নিয়মকানুন

যেসব নিয়মকানুনের ভিত্তিতে মস্কা-উৎসব পরিচালিত হয়, সেগুলি সবদিক দিয়ে খুব গণতান্ত্রিক। সোভিয়েত গভর্নমেন্টের রাষ্ট্রীয় সিনেমাটোগ্রাফি কমিটি এই উৎসবের দায়িত্ব বহন করেন। এর জন্যে এই কমিটি একটি সংগঠক কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে থাকেন—অন্যান্য দেশের সংগে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জনসমিতিগুলির প্রতিনিধিরা; সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের পররাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক সংযোগ কমিটির প্রতিনিধিরা; নিখিল-সোভিয়েত সাংবাদিক ইউনিয়ন, লেখক ইউনিয়ন, চিত্রশিল্পী ইউনিয়ন ও চলচ্চিত্র-কর্মীদের ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা; মস্কা বিশ্ব-সোভিয়েতের (পৌরসভা) প্রতিনিধিরা;

‘ইন্টারিস্ক’ সংস্থার প্রতিনিধিরা; এবং অন্যান্য কৃতকগুলি নিখিল-সোভিয়েত ও অগণপ্রজাতন্ত্রের জনসংস্থার প্রতিনিধিরা।

উৎসবের নিয়ম অনুযায়ী, প্রত্যেকটি দেশ একটি করে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি এবং একটি করে ছন্দ দৈর্ঘ্যের ছবি (কাহিনী-চিত্র, ডকুমেন্টারি চিত্র, কার্টুন ও সর্বজনবোধ্য বিজ্ঞানচিত্র) পাঠাতে পারে এবং সেইসঙ্গে সরকারীভাবে তিনজনের একটি জাতীয় চলচ্চিত্র-প্রতিনিধিদলও পাঠাতে পারে। বিভিন্ন দেশ থেকে অগ্রগণ্য ও আস্থাভাজন সিনেমা-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে দৃষ্টি আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী (জুরি) গঠিত হয়—পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের ছবিগুলির জন্যে একটি এবং ছন্দ দৈর্ঘ্যের ছবিগুলির জন্যে একটি। এই জুরিতে থাকেন নানা দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক, প্রযোজক, সমালোচক, প্রভৃতি। একই ব্যক্তি একসঙ্গে দুটি জুরির সদস্য হতে পারেন না। যোগদানকারী দেশের সংখ্যা অনুসারে বিচারকমণ্ডলীর সদস্যসংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। জুরির সদস্যরাই তাঁদের সভাপতি নির্বাচন করেন। সদস্যরা প্রত্যেকটি ছবি দেখেন এবং প্রত্যেকটি ছবিকে বিষয় অনুযায়ী নম্বর দেন। মোট নম্বর অনুসারে, সর্বাঙ্গীণ সর্বশ্রেষ্ঠ ছবিকে “গ্র্যান্ড প্রিক্স” এবং আরও ১৬টি স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক দেওয়া হয়।

নবীন স্বাধীন দেশগুলিতে জাতীয়

চলচ্চিত্র-শিল্পের বিকাশ অসম্পাদিত হল ঘটতে শুরু হয়েছে। এগুলির পাশ্বে সিনেমাশিল্পে অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাটা অনেক ক্ষেত্রেই অসম প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়ায়। তাই, এই বছর (১৯৬৫) থেকে এই দেশগুলির জন্যে বিশেষ পুরস্কার (স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক) দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ পুরস্কারের নাম “জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে বিকাশশীল দেশগুলির শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য।”

কিন্তু “গ্র্যান্ড প্রিক্স” ও অন্যান্য ১৬টি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক ছাড়াও, বিভিন্ন সোভিয়েত জনসংস্থা তাদের নিজস্ব পুরস্কারও দিয়ে থাকে। যেমনঃ বিশ্বশান্তি-সংসদের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাখা সংসদ, নিখিল-সোভিয়েত লেখক সমিতি, সোভিয়েত ক্রীড়া সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদ, সোভিয়েত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কেন্দ্রীয় পরিষদ, সোভিয়েত গীতিকারদের কেন্দ্রীয় পরিষদ ইত্যাদি তাদের নিজ নিজ পুরস্কার ঘোষণা করে থাকে।

আলোচনাচক্র ও মতবিনিময়

মস্কা উৎসবের একটি খুব বড়ো বৈশিষ্ট্য হল—বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও মত-বিনিময়ের জন্যে আয়োজিত অনেকগুলি আলোচনাচক্র, ফোরাম, সিম্পোজিয়াম, ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে দিয়ে শিল্পীরা পরস্পরের চের বেশ কাছাকাছি আসেন, সত্যকার মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়।

সেইসঙ্গে, বিদেশের এইসব গৃহী অর্থাধিকার সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন ফিল্ম স্টুডিও, চলচ্চিত্র-শিল্পশিল্পকার ইনস্টিটিউট, অভিনয়-শিক্ষার্থীদের ইনস্টিটিউট, সিনেমা প্রদর্শন ব্যবস্থা ও তার ব্যবসায়িক দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা, ইত্যাদি দেখানো হয়—যাতে তারা শ্রদ্ধা সোভিয়েত সিনেমারই নয়, সোভিয়েত সাংস্কৃতিক জীবনের ও জনজীবনেরও এক সর্বাঙ্গীণ ও সত্য ধারণা নিয়ে দেশে ফিরতে পারেন।

এবারের এই মস্কা চলচ্চিত্র মেলায় যোগ দিতে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের জন্যেও অনুরূপ এক সফরসূচী তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ছবিগুলি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে ক্রেমলিনের কংগ্রেস প্রাসাদে—যেখানকার আসনসংখ্যা ৬,০০০। প্রতিযোগিতা-বাহির্ভূত ছবিগুলি দেখানো হবে মস্কোর কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর সিনেমাগৃহে। পরে পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি সর্বসাধারণের জন্যে অন্যান্য কৃতকগুলি শহরে দেখানো হবে। এবারের উৎসবে আরও বেশি সংখ্যক দেশ যোগদান করবে বলে আশা করা



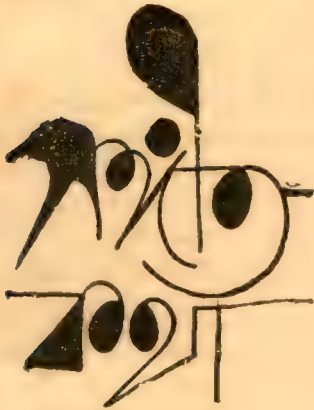
বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে ইসমাইল মার্চেন্ট ও শ্রীমতী শশীকান্ত

সুড়ি ও খাবার

মহরৎ-শংখবেলা।

পূত এই জুলাই রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে অগ্রগামীর পরিচালনায় অনুরাধা ফিল্মসের 'শংখবেলা' ছবির শূভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহরৎ অনুষ্ঠানে প্রথম দৃশ্য গ্রহণ হয় টপমকুমারকে নিয়ে। ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তমকুমার, রাধাবী মৃধাজী ও বসন্ত চৌধুরী।

'শংখবেলা'র কাহিনীকার সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।



লোকশিল্পী হরিদাস রায়

প্রকৃত লোকশিল্পীদের মধ্যে হরিদাস রায় একজন।

হরিদাসবাবু লোকসংগীতের সত্যিকারের দরদী। তিনি বাল্যকাল থেকেই প্রাচীন লোকগীতি সংগ্রহ করে তা প্রচার করে চলেছেন।

হরিদাসবাবু একাধারে গায়ক, ও একাধিক পরসিঙ্গীত যন্ত্রের বাদকও বটে। এছাড়াও তিনি বহু লোকসংগীত নিজেই রচনা করেছেন।

হরিদাসবাবুর জন্ম ঢাকা জেলার সোমভাগ গ্রামে। তাঁরা পিতা 'জানকীনাথ'ও একজন মৃদুগীতকারী লোকশিল্পী ছিলেন। বাল্যকালে হরিদাসবাবুর লোকসংগীতের প্রতি অনুরাগ জাগে তাঁর পিতা ও পিসীমার অনুপ্রেরণায়।

হরিদাসবাবু প্রায় বার বছর ধরে দেশছাড়া। ১৯৫০ সনে হরিদাসবাবু উদ্ভাসত্ব হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে বহু কষ্টে তাঁকে দিনপাত করতে হয়। অবশেষে হাওড়ায় একটি বস্তি-বাড়িতে পরিবারের ছটি প্রাপ্তিকে নিয়ে আশ্রয় নেন তিনি।

লোকসংগীত রচনা ও পুরোনো লোকগীতি সংগ্রহ করে গান গেয়ে হরিদাসবাবু জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু প্রকৃত লোক-

শিল্পীর কোন কদর নেই বলেই, হরিদাসবাবুর মত লোকশিল্পীকে প্রায় অনাহারেই দিন কাটাতে হচ্ছে।

হরিদাসবাবু সত্যিকারের গ্রামের শিল্পী, তাই তাঁর সংগীত রচনায় কোন কৃত্রিমতা নেই। বাউল দর্শনের উপর ভিত্তি করে তিনি বহু গান রচনা করেছেন। তাঁর একটি গানে দার্শনিকভাবে সূক্ষ্ম একটি ছবি ফুটে উঠেছে, যেমন—

আগবাজারে দোকান দিও না,
কেউ দাঁড়িতে ফের রাইখো না।
কটায় কটায় সই করিও
ধরা পইসে বাঁচবা না॥

আগবাজারে দোকান দিলে মন
ঠিক রাইখো দাঁড়ির ওজন,
নইলে লাভে মূলে সকল যাবে
বাঁধবে রে শমন,

যখন চিকরা পাকরা যতই কর
গ্রামজনে লাঠিড়বে না॥



লোকশিল্পী হরিদাস রায়

এ ছাড়া হরিদাসবাবুর দেহতত্ত্বের অনেক গান আছে। যেমন—

গুরু, কও আমার কাছে,
এই অপরাধ রঙিলা ঘর
দয়াল কে বানাইছে।

দিগে পাশে সাড়ে তিন হাত
মাঠ দুইটা খাম লাগাইছে॥

এই অপরাধ ঘর পঞ্চ রঙে রঙ করা,
সাড়ে তিন লক্ষ তারেরই বান্দ

বস্ত্রশটা জোড়া

দিন রজনী সেই ঘরবান,

কেবল হাওয়ার উপর খাড়া রইয়াছে॥

বাউল দেহতত্ত্ব ছাড়াও হরিদাসবাবুর ভাটিয়ালী ও চটকা জাতীয় রচনা আছে। তাঁর রচিত ভাটিয়ালী গানে সেই উদাসকরা সুরের গভীর আবেদন বিদ্যমান যেমন—

ভাটিয়াল মাঝিরে আরে ধীরে ধীরে বাও
ছপুছপাইয়া ঝড় টানিয়া কোন বা দ্যাশে যাও॥

হরিদাসবাবুর চটকা জাতীয় হালকা গানে, গ্রাম্যজীবনের হালকা-চটল অল্পট স্নেহ-সুখী চিত্র পরিস্ফুটিত। যেমন—

তোরা দেখিয়া যা আইসে
নাভিন জামাই দেখিযো বাড়ি
ঠসক ধইয়াছে।

বুড়িয়া কালে নৃপদ পায়
কি শৃঙ্গার দেখা যায়

নাকে নলক ব্যাসর কুলাইছে॥ ...ইত্যাদি

হরিদাসবাবুর এ ধরনের অনেকই রচনা আছে। শৃঙ্গার সংগীত রচয়িতা হিসেবেই নয়, হরিদাসবাবু একজন সুনিপুণ কলশিল্পী। খমক, দোতারা, একতারা প্রভৃতি অনেক যন্ত্রই তিনি বাজাতে পারেন। তিনি নিজেই এই-সব যন্ত্র বাজিয়ে গেয়ে থাকেন।

আজ হরিদাসবাবু বৃদ্ধি দৃশ্য অবস্থায় মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। লোকসংস্কৃতি রক্ষার্থে হরিদাসবাবুর মত শিল্পীদের আমাদের বাচান কর্তব্য। —বৃন্দদেব বারু

একালের
নির্ভীক
নাট্যসৃষ্টি
কল্লোল
বিশাল
মঞ্চসজায়
নতুন ধরনের
আলোকসম্পাতে
বলিষ্ঠ
অভিনয়ে
সমস্ত
দেশকে
চঞ্চল
করে
তুলেছে
মিনার্ভা
খিয়েটারে
ফোন ৫৫৪৮৮-৯
প্রত্যেক
বৃহস্পতিবার
শনিবার
এবং
রবিবার
নিয়মিত
চলেছে

বাক্সমঞ্চ ও দেশে এবং গল্পে

আমেরিকান থিয়েটারঃ

প্রাচুর্য রকন জনপ্রিয় নাটকের বেলায়
এক খেঁচে, হর-সাতটি পর্বত দল তৈরি করে
নিজের আয়গায় (একই সময়ে) পাঠানো হয়েছে
অভিনয় করবার জন্য। থিয়েটার ব্যাপারটাকে
সে এক জায়গায় বলে কতোটা বিস্তৃতি দেওয়া
হয় এর থেকেই তা পাঁচ করা যাবে। তবে
এক হিসাবে এটা অস্বাভাবিক—কারণ সারা
দেশের থিয়েটার বুডমেন্ট কনট্রোল্ড হোত এবং
এখনও হচ্ছে নিউ ইয়র্ক থেকে।

বুডওয়ার্দের চুক্তি শেষ হয়ে গেলে নিউ
ইয়র্কের থিয়েটারের দলগুলো কাছাকাছি
অন্যান্য শহর এবং শহরভলীর কয়েকটি
থিয়েটারে অভিনয় করতে যেতো। আপার ম্যান-
হ্যাটানে এই ধরনের দুটি থিয়েটার হাউস ছিল
—এর কর্তৃত্ব ছিলেন দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সিণ্ডিকেট।

বুডওয়ার্দের সাক্ষাৎজনকভাবে অভিনীত অনেক
পু-ই এখানে পরে নিয়ে আসা হোত। বিখ্যাত
নাট্যসমালোচক এবং নাট্যকার এলবার রাইস
বলেছেন যে, তাঁর বাল্যবয়সে এবং যৌবনে এই
দুটি হাউসেই তিনি বুডওয়ার্দের বিখ্যাত নাটক-
গুলি দেখতে যেতেন এবং এই সুযোগ পেয়ে
ছিলেন বলেই তখন থেকে নাটক সম্বন্ধে যে
জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন—তা
থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন ভবিষ্যৎ
জীবনে নাট্যরচনার।

টুরিং কোম্পানী ছাড়াও এসবর আরও
অনেক বাস্তবায়ন নাটকে দল ছিল। এরা চিরন্তন
জনপ্রিয় নাটকগুলোর অভিনয় করতো। এ-
সবের ভেতর অনেকগুলোই ছিল মানকরা
উপন্যাসের নাট্যরূপায়ণ, যথা—আইল
টব্‌ল কেবিল, ইস্টলিন, শোর একারস্‌, বেস হার,

দি ওল্ড হোমস্টেট ও মিলেস উইগস অব
ক্যাবেজ প্যাচ ইত্যাদি।

অনেক সময় বিখ্যাত অভিনেতাররা দীর্ঘ
জীবন ধরে একটি নাটকের একই চরিত্রে
অভিনয় করে কাটিয়েছেন, যেমন য়োশেফ
জেকারসন 'রিপ্‌ ভ্যান উইকিন'-এ, ডেভিড
ওয়ারফিল্ড 'দি মিউজিক মাস্টার'-এ, উইলিয়াম
জিলেট 'শারলক্‌ হোমস'-এ এবং জেনস্‌ ও'মিক্‌
(বিখ্যাত আমেরিকান নাট্যকার ইউজিন ও'মিক্‌
নিজের বাবা) 'দি কাউন্ট অড মন্টেক্স্টো'তে।

কয়েকটি সেন্সপীয়ারের নাটক অভিনয়
করবারও দল ছিল—সারা বছর এরা দেশের
নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতো, মাঝে
মাঝে নিউ ইয়র্কেও রঙ্গাভিনয় দেখাতে আসতো।
এইসব দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন—ই এইস
সদার্ন ও জুলিয়া মারলো এবং হবার্ট সি
ম্যানটেল।

টুরিং কোম্পানী ছাড়াও অনেক শহরে
স্থায়ী অভিনয় করবার দল থাকতো—এদের
বদলতো স্টক কোম্পানী। এইসব স্টক কোম্পানীর
দল বছর ভরে অভিনয় করতো—সাধারণত
তারা প্রতি সপ্তাহে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করতো।
এখানকার নটনটীরাও হোত স্থানীয়—অবশ্য দু-
এক সময় যে বাইরের নটনটী থাকতো না তা



নিউ ইয়র্কের জর্জমারকন একতরফী অভ. দলটি আর্টসের মেক-আপ রুমে ছাত্রছাত্রীরা প্রাকটিক্যাল ওরাক্‌ করছেন।

নর এদের ভেতর থেকেই আবার স্টার এ্যাক্টর
সৃষ্টি হোত। এই ধরনের অনেক স্টার পরে
মুড়ুওয়ে বা হলিউডে চলে যেত এবং সেখানে
গিয়ে খ্যাতি, বশ এবং অর্থ উপার্জনে সক্ষম
হোত।

কিন্তু এক হিসাবে এই স্থানীয় দলগুলো-
কেও নিউ ইয়র্ক থিয়েটারের শাখা-প্রশাখা
হিসাবেই বলা চলে। কারণ বেশির ভাগ
ক্ষেত্রেই এরা আগে মঞ্চ নিউ-ইয়র্ক স্টেজের
মঞ্চসকল নাটকগুলিই প্রতিরূপ করতো স্থানীয়
দর্শকদের জন্য।

এই ধরনের থিয়েটারের আয় ছিল প্রচুর।
কারণ স্থানীয় তারকা অভিনেতারাই ভাল রোলে
দাঁড়িতো এবং প্রবেশপত্রের মূল্যও খুব বেশি
ছিল না।

স্ট্যাণ্ডার্ড অভ প্রডাকসন অবশ্য খুব
উচ্চপরের ছিল না। অবশ্য মাঝে মাঝে সত্যিই
কুশ প্রডাকসনও যে না হোত তা নয়—দু-
এক সময় এইসব দলে প্রথম শ্রেণীর পরিচালক
থাকতেন—তাদের প্রডাকসনে দেখা যেত সত্যি-
কার প্রতিভার ছাপ।

সাধারণত এই স্টক কোম্পানীগুলো ছিল
অভিনেতাদের পক্ষে ট্রেনিং নেবার চমৎকার
জায়গা। এক সিজনে কুড়ি বা পঁচিশটি বিভিন্ন
রোলে অভিনয় করতে পারবার সুযোগ তো
কর কথা নয়, এতে অভিনয়শিল্পীর বহুমুখী
লক্ষণ হয় এবং অভিনয়শিল্পের কারিগরী
দিকটা সহজে আয়ত্তের ভেতর আসে।
ক্রমশ স্টক কোম্পানীর ভেতর দিয়ে অভিনয়
শেখার ব্যাপারটা একটা রীতির মত দাঁড়িয়ে
গিয়েছিল আমেরিকাতে। কিছুদিন আগে
পর্বত থিয়েটার এবং ছায়াছবির নামকরা
অভিনেতা, অভিনেত্রীদের বেশির ভাগই দেখা
যেত তাঁদের শিক্ষানবিশী সময়টা কোন না
কোন স্টক কোম্পানীতে অভিনয় করে কাটিয়ে-
ছেন।

অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের মঞ্চ-প্রদর্শনীরও
এ সময়ে প্রচলন ছিল—যথা, বারলেন্সক
(প্যারিডির সাহায্যে ঠাট্টা), ভার্ভেভিল (হাল্কা
গীতপ্রধান কমেডি) এবং জাকজমকপূর্ণ দৃশ্য-
প্রধান শো ইত্যাদি।

সমস্ত মিলিয়ে থিয়েটার জিনিসটা এই
সময় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সাধারণ
অবস্থার লোকেরাও নিয়মিতভাবে সপ্তাহে
একবার করে থিয়েটারে যেত। কলোনিয়-
লিজমের শেষ গ্রন্থিগুলোও বেন একে একে
মুলে যাচ্ছিল এবং আমেরিকান থিয়েটার
স্বয়ংক্রিয়, নিজস্ব সভ্যসম্পন্ন, অর্থকরী এবং



জ্যে মিলেলজিনার—আমেরিকার অন্যতম সেরা স্টক ডিভাইনার

আবশ্যকীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে
নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছিল।

এ পর্বত আমেরিকান থিয়েটারের বিস্তৃতি
এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিম্ফুটনের দিকটাই
আলোচনা করছি। ঠিক পাশাপাশি আমে-
রিকার নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনের দিকটার
বিষয় বর্ণনা করি নি।

আগেই বলেছি যে, সিভিল ওয়ারের আগে
অবধি যেসব আমেরিকান নাটক রচিত হয়েছে
তা এত নগণ্য শ্রেণীর যে—সেগুলিকে ঠিক
নাটক নাম দিয়ে আলোচনা করা চলে না।
কিন্তু এর পরেই সারা আমেরিকায় একটা
লক্ষণীয় একের ভাব প্রতিষ্ঠিত হল। এর
ফলে পৃথিবীর অন্যতম বিরাট শক্তিশালী
জাতি হিসাবে আমেরিকা স্বীকৃতি পেলে
অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে। মূল মাতৃ-
ভূমির কথা ভুলে বিভিন্ন শ্রেণীর আমেরিকানরা
আমেরিকাকেই নিজের দেশ বলে গর্ববোধ
করতে শিখল—আর এই কারণেই শিল্প এবং
সাহিত্যে তারা আমেরিকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-
গুলি ফুটিয়ে তুলতে শুরু করল। স্বভাবত
শক্তিশালী এবং অকৃত্রিম আমেরিকান নাট্য-
কারেরাও দেখা দিতে লাগলেন মার্কিন-রং-
জগতে। নিছক আমেরিকান মালমশলার ওপর
ভিত্তি করেই এরা নাট্যরচনার প্রবৃত্ত হলেন।
জাতীয় চরিত্রের দোষগুণ ভাবাবেগ ইত্যাদির
ওপর নির্ভর করে নাটকীয় চরিত্রগুলি সৃষ্ট
হতে লাগল।

সাহিত্যিকমূল্যে হয়তো এসব নাটকে
বিশেষ নেই—কিন্তু এদের বৈশিষ্ট্য অন্য
কারণে। আমেরিকান সোর্টিংস্. আমেরিকান

চরিত্র এবং আমেরিকান বাচনভঙ্গী এই প্রথম
দেখা গেল এইসব নাটকে।

ক্রমশ ১৮৯০ সালের মধ্যে একদল নাট্যকার
দেখা দিলেন—যারা তাঁদের পূর্বসূরীদের
রচনাধারা এবং রচনাশৈলীকে অনেক উন্নত,
মার্জিত এবং সুন্দরতর করে তুললেন নিজে-
দের রচনায়। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এইসব
নাট্যকারেরা যেসব রচনা করলেন সেগুলিই
আমেরিকান দৃশ্যমঞ্চে বেশি প্রাধান্য পেতে
লাগল—কারণ এইসব নাটকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য-
গুলিই জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটে উঠতো।

আজকের দিনের থিয়েটারদর্শক বা সমা-
লোচকের কাছে এসব আমেরিকান নাটককে
হয়তো জোর-করে-লেখা, স্থূল এবং অপরিপক্ব
রচনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটা
কথা এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার—বর্তমান
আমেরিকান মন্ডিজ বা টোলডিসনের যে
মাপকাঠিতে মূল্যমূল্য বিচার করা হয় এসব
নাটককে ঠিক সেভাবে বিচার করা কি ঠিক
হবে। একথাটা তো অস্বীকার করলে চলবে
না যে, আমেরিকান নাট্যসাহিত্যের তখন ছিল
ঠিক শৈশবকাল। ষাট বছর আগেকার
আমেরিকান নাট্যসাহিত্য আর আজকের
আমেরিকান নাট্যসাহিত্যের ভেতর সময়ের
ব্যবধানটাও তো কম নয়। আরও একটা
কথা—এ সময়ের অনেক নাট্যকার পরে আবার
হলিউডের চিত্রনাট্যলেখক হিসাবে প্রচুর
কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

যাই হোক একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়
যে, সে সময় আমেরিকাতে ঐ শ্রেণীর খ্যাতি
জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নাট্যকারদের জীবিত

সামাজিক বদলনী

এ হ'ল ইউজেন ও'নিল, এলমার ট্রাহস, টেনেস উইলিয়ামস, আর্থার মিলার প্রভৃতি জগৎব্যপক নাট্যকারদের আসার পথ কিছুতেই রূপ নেই না পরবর্তী সময়ে।

একথা অবশ্য ভাবলে বিস্ময় লাগে যে, যেসময় সারা ইউরোপে ড্রামাটিক রেনেসাঁ গুরু হয়ে গিয়েছে, সে সময় আমেরিকাতে ঐচ্ছন্দ্যের নাট্যকার ছাড়া বড় শিল্পীর আবির্ভাব হয় নি। অথচ এই একই সময় ভাল ঔপন্যাসিকের তো অভাব হয় নি যুক্তরাষ্ট্রে। কারণ এই সময়েই তো ঔপন্যাসিক হিসাবে দেখা দিয়েছেন—স্টিফেন ক্রেন, হেনরী জেমস, ইডিথ হোয়ারটন, এলেন প্যাসগো, উইলিয়াম ডিন হাওয়েল প্রভৃতি এবং সামাজিক চেতনা জাগাবার চেষ্টা করছেন জ্যাক লন্ডন, ফ্র্যাংক নারিস ও আপটন সিনক্লেয়ার।

অবশ্য কয়েকজন নাট্যকার ছিলেন যাদের লেখার সাহিত্যিক মূল্য কিছুটা আছে বলে ধাব করা হয়, যথা—পারসি ম্যাক, উইলিয়াম চন মডি, লাইন কাউফম্যান আনুসঙ্গ্যাকার এবং স্যামুয়েল মিল্টন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, অন্যদের তুলনায় এদের লেখা হয়তো কিছুটা ভাল—তা বলে এসব লেখার শাস্বত সৌন্দর্য এমন কিছু নেই যা এদের চিরন্তন সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করতে পারে।

সে সময়কার নাট্যরচনার বাঁরা বিশেষ নাম

রোমান উপস্থাপনের বাস্তব

দাঁলেত্রুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—খানি হুহুং ডিটেকটিভ
উপস্থাপন মূল্য ৩।০ টাকা

২য় ভাগে—খানি রক্ত উপস্থাপন
মূল্য ৩।০

জাতীয়-কাব ওতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রত্নলাল-গ্রন্থাবলী

শিল্পী, হুহুহুহু, কবিতা, কথার-
গল্প, নীতিতত্ত্বমাজলি, কাকী-কাবেরী,
কাবির জীবনী খানি একত্রে ২০০।

প্রাকাক্ত তরুণকান সম্পাদিত

নাড়াজান-প্রদাপকা

(নাড়ী শূণ্য বায়া রোগ নির্ণয় ও
পরামর্শ নিরূপণ)
মূল্য এক টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,

কলিকাতা-১২

করেছিলেন তাদের মধ্যে জর্জ এম. কোহেন
ও ডেভিড বেলান্ত্রো একই সংগে ছিলেন
নাট্যকার, অভিনেতা, প্রডিউসার ও থিয়েটারের
মালিক। সর্বাঙ্গিক দিক্রেই এ'রা ছিলেন খুব
জনপ্রিয়।

এ'দের থেকে ক্লাইভ ফিচ্ অবশ্য ছিলেন
অনেক বেশি মার্জিতরূচিসম্পন্ন লেখক। রুড-
ওয়েতে একসময়ে একই সংগে এ'র চারটি
নাটক হিট করেছিল।

আর একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় নাট্যকার
ছিলেন এডারী হপউড কলেকটি ফার্স,
যেমন—আপ' ইন ম্যাবেলস রুম, গেটিং
গাটিং গাটের, দি ডেমী ভারাজিন ও লেডিজ
নাইট বহু দিন ধরে অভিনীত হয়েছিল নিউ
ইয়র্কের রংগমঞ্চে—অনেক সময়ে এক-একটি
নাটক নিয়ে সাত-আটটি দল তৈরি করে
বিভিন্ন জায়গায় সফরে বের হত।

এই সময়ে অগাস্টাস টমাসও বেশ নাম
করেন। কুটুম মনস্তত্ত্বমূলক নাটক লিখে
(এ সময়টা ছিল প্রাক-ফ্রয়েডিয়ান যুগ) তিনি
সমালোচক এবং দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেন।
কিন্তু এ'র লেখা নাটকও আজকাল কেউ পড়ে
না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভের সময়
অবধি এই ছিল আমেরিকার নাট্যসাহিত্য এবং
নাট্যমঞ্চের অবস্থা। কয়েকজন নাট্যকার অবশ্য
আরও কিছুদিন নাটক লিখে চলেছিলেন,
যথা, ওয়েন ডেভিস। ইনি তিনশো নাটক
লিখেছিলেন—এ'র একটি নাটক 'দি ডিটুর'
পুলিটজার প্রাইজটি পেয়েছিল।

কিন্তু এসব নাট্যকার সম্পর্কভাবে রং-
জগৎ থেকে অপসারিত হয়ে গেলেন যুদ্ধোত্তর
কালের শক্তিশালী নতুন শ্রেণীর আমেরিকান
নাট্যকারদের অভ্যুত্থানে। এ'রাই নিয়ে এলেন
নাটকের ভেতর নতুন ভাবধারা এবং নতুন
টেকনিক—মার্কিন রংগমঞ্চে এ'রাই সৃষ্টি
করলেন এক বিরাট ধরনের বিপ্লব।

এই নতুন মডেম্‌স্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা
করবার আগে ইউরোপের নাট্যমঞ্চে উনবিংশ
শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর
আরম্ভে কি ঘটিছিল তা নিয়ে কিছুটা
আলোচনা করা দরকার। তারপরে আবার
আমেরিকান নাটকের আলোচনায় ফিরে আসা
যাবে।

ইউরোপে নাটকের নবজন্ম এবং

পুনরুত্থান:

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুটি বিখ্যাত
বিপ্লব ঘটে—ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল
রেভোলিউশন। এর ফলে ওয়েস্টার্ন ওরিয়েন্টের
সর্বক্ষেত্রে—যথা, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, জীবন-
দর্শন সম্পর্কীয়—বিরাট পরিবর্তন এবং
বিবর্তনের শুরুর হয়।

সারা উনবিংশ শতাব্দীকে আবার বৈপ্লবিক-
শতাব্দী এই নামে অভিহিত করা চলে। এই

শতাব্দীতে মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক,
আর্থিক এবং বুদ্ধিবাদী জীবনের দিকগুলিতে
অমূল্য পরিবর্তন দেখা দেয়।

বুদ্ধিবাদের বিতাড়নের পরই শুরুর হয়
নেপোলিয়নিক যুগের নানাধরনের উত্থান-
পতন। ১৮৪৮ সালের ব্যাস্ত এবং
বিক্ষিপ্ত আন্দোলন এবং আলোড়ন, জার্মানী
এবং ইটালীর একত্রীকরণ। এবং এইসবের
ফলে দেখা দেয় নতুন রাজনৈতিক-দর্শন এবং
মানাজাতীয় প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারও
ব্যবহার শুরুর হয় নব নব ক্ষেত্রে—নতুন ধরনের
সখ্যতা এবং স্বার্থরক্ষারও বিবিধ উপায়
আবিষ্কৃত হতে থাকে ব্যবহারিক জীবনের
সুখসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে। শিল্পের
মেকানাইজেশনের ফলে সমাজের কাঠামো
ষেভাবে রূপান্তরিত হোল তা এর আগে
কখনও কল্পনাতেও ভাবা যায় নি।

একদিক থেকে এই যুগটিকে যেমন রাজ-
নৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের যুগ বলা
যায়, তেমনি আবার নব-উপনিবেশিকতার
যুগও বলা চলে। শিল্পের পরিপূষ্টির জন্য
দরকার নতুন চাহিদার বাজার এবং নতুন
উৎস-স্থল, যেখান থেকে শিল্পের উপাদান বা
কাঁচামাল সহজলভ্য হয়। এইজন্যই এশিয়া
ও আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশ
স্থাপনের প্রয়োজন দেখা গেল—ঠিক এই
একই কারণে বোদ্ধশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে
আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের কারণ ঘটে-
ছিল।

ফ্যাক্টরী সিস্টেমের প্রবর্তনের ফলে দেখা
দিল প্রলিটারিয়েটের দল—সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি
হল নানাবিধ জটিল আর্থিক এবং সোসিও-
লজিক্যাল সমস্যা। কোথা থেকে এসে আবি-
র্ভূত হল থিওরিস্ট এবং রিফর্মারের দল।
শিল্পের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রেখে রসায়ন
ও পদার্থবিদ্যারও নতুনভাবে অনুশীলন শুরুর
হল—শুরু এই দুটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়,
একই কারণে নতুনভাবে চর্চা আরম্ভ হোল
অন্যান্য বিজ্ঞানের, যথা—জিওলাজি, এস্ট্রো-
নমি, বায়োলজি ইত্যাদি। এই ধরনের
পরিবর্তিত জীবনের মূল্যায়নে মানুষের
চিন্তাধারা, বিশ্বাস, সামাজিক প্রতিষ্ঠান,
জীবনের পরিবেশ সবের ভেতরই দ্রুত
রূপান্তর দেখা দিল।

যে দুটি মতবাদ এইসময় ইউরোপীয়
সামাজিক জীবনে সবচেয়ে বেশি সুদূরপ্রসারী
প্রভাব বিস্তার করেছিল তা হচ্ছে মার্কসীয়
দর্শন এবং ডারউইনবাদ। এর একটিকে বলা
হয় আর্থিক নিম্নত্ববাদ এবং অপরটির নাম
বিবর্তনবাদ। এই দুটি মতবাদই আজকের
মানুষের এত পরিচিত যে, এ সম্পর্কে
আলোচনা করবার কোন দরকার হয় না।
শুরু নাটক এবং থিয়েটারের ওপর এদের
প্রভাব সম্পর্কেই দু-চার কথা বলবার চেষ্টা
করব। (ক্রমশঃ)

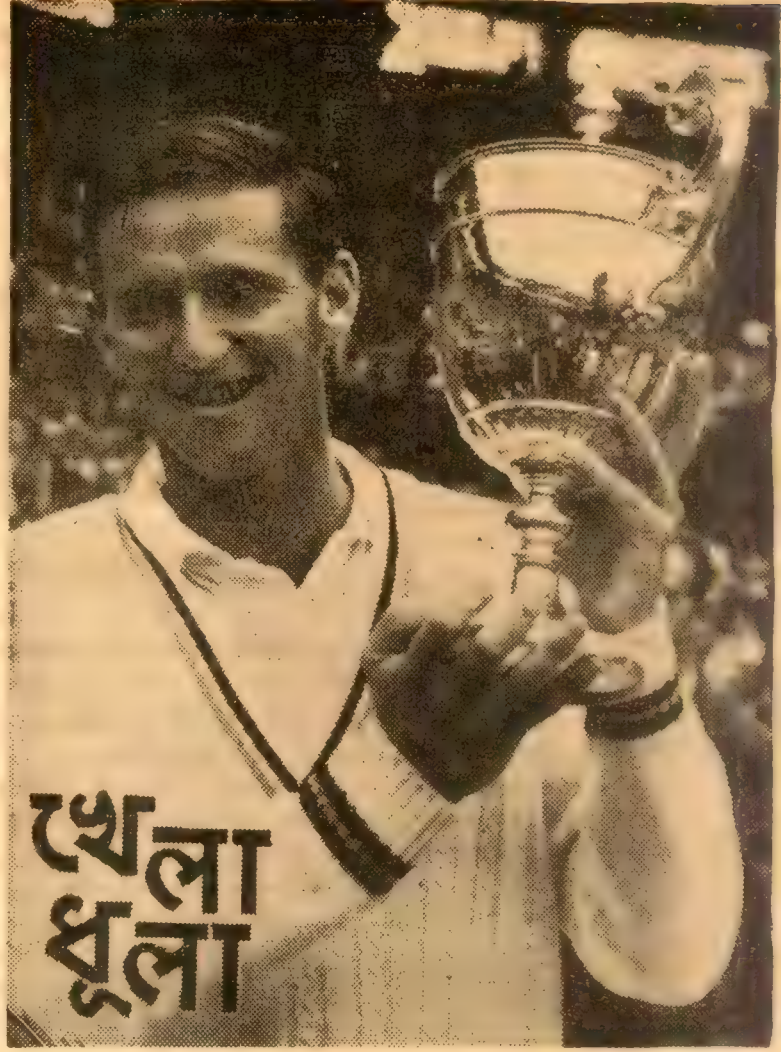
ময়দান নবরূপে চমক

কনকাতা ময়দানের প্রথম ভিভিসন লীগ এগিয়ে চলেছে ক্রতগতিতে, শাবী তার উৎসাহ, উত্তেজনা আর সর্ব্বকদের জল্পনা-কল্পনা। লীগের পুরোভাগে গভবাবের বিজয়ী মোহন-বাগান আর ঠিক তিন পরেরটির ব্যবধানে থেকে লমানতালে অগ্রসর হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। দুই মলেরই লক্ষ্য হল লীগ বিজয়ের সম্মান। এবার লীগের যুদ্ধে বি-এন-রেল ইতিনবোই রূপে ভঙ্গ দিয়েছে। কারণ, তারা অপচয় করেছে দশ পরেরটি। ইস্টার্ন-রেল এবং মহারাজান স্পোর্টিং প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছুটা আভাস দিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে সেই দুই প্রধান মোহন-বাগান এবং ইস্টবেঙ্গলকেই আমরা নাটকের শেষ অঙ্কে দেখতে পাব সম্মানের লড়াইয়ে।

বি-এন-রেল আর ইস্টবেঙ্গল দলের খেলাটি বোধ হয় এই মরশুমে লীগের অন্যতম স্মরণীয় খেলা। প্রথম থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এত উত্তেজনা এবং অনিশ্চয়তার ছোঁয়ায় খেলাটি হয়ে উঠেছিল সজীব এবং প্রাণবন্ত। এই খেলার ঠিক শেষ সময়ে অসীম মৌলিকের দেওয়া বিজয়গুচক গোলে যদিও ইস্টবেঙ্গল দল বিজয়ী হয়ে তাঁবুতে ফিরেছে, তবুও বি-এন-রেল দলের উদ্যমের প্রশংসা না করে পারা যায় না। একটি পরেরটি রেলদল প্রায় জিনিয়ে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছ থেকে।

খেলার প্রথম মিনিটেই ইস্টবেঙ্গলকে অগ্রগামী করলেন পি দে একটি সুন্দর গোল করে। দ্বিতীয়ার্ধের পনেরো মিনিটে রেলদলের শ্রাজ্জেনমোহনের একটি দর্শনীয় জোরাল স্ট পুরাস্ত করল ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক ধন্দরাজকে। এই গোলটির ঠিক চার মিনিট পরেই ইস্টবেঙ্গল লাভ করল একটি পেনাল্টি। কারণ নিষিদ্ধ লীমানার মধ্যে দাসচৌধুরীকে পেছন থেকে অবৈধভাবে বাধা দিয়েছিলেন বিমিত্র। অসীম মৌলিকের পেনাল্টি সটট আশ্চর্যভাবে প্রতিহত করলেন রেলদলের গোলরক্ষক দীপক দাস। প্রায় শেষ সময়ে পেনাল্টির এই সুবর্ণ সুযোগ অপচয়ের ফলে মনে হল যে খেলার ভাগ্য বোধ হয় নিশ্চিত ভ্রূয়ের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু ভাগ্যদেবীর নিষ্ঠুর পরিহাসে শেষ মুহূর্তে খেলার নোড় খুরে গেল। যে মৌলিকের পা থেকে পেনাল্টি লক্ষ্যবষ্ট হয়েছিল, সেই অসীম মৌলিকই—খেলার শেষ মিনিটে বিজয়গুচক গোল করে ইস্টবেঙ্গল দলকে জয়যুক্ত করলেন।

পরবর্তী খেলার ইস্টবেঙ্গল কোনক্রমে ১-০ গোলে এরিয়ান্স দলকে পরাজিত করে। এইদিন ইস্টবেঙ্গল দল তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারে নি। যদিও খেলাতে ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগের খেলোয়াড়রাই বেশির ভাগ সময়ে খেলার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর এরিয়ান্স দল নতি



খেলা ধূলা

টাইমবলডেন ট্রফি-সহ বিজয়ী রয় এমালন

খীকার করেছে। ইস্টবেঙ্গল দলের গোলটি করেন শম্ভু দাসচৌধুরী। লীগের একাদশ খেলাতেও ইস্টবেঙ্গল প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কালীঘাট দলকে পরাস্ত করে ২-১ গোলে। প্রথমার্ধের শেষে খেলার ফলাফল হয় ১-১। অসীম মৌলিক ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে প্রথম গোলটি করেন এবং কালীঘাটের পক্ষে গোলটি পরিশোধ

দ্বিতীয়ার্ধ

করে দেন পি দত্ত। দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্য একটি পেনাল্টির সুযোগ আসে, গোলরক্ষক ধন্দরাজ পেনাল্টি সটট নাবেন, কিন্তু গোল করতে পারেন না। অবশেষে শম্ভু দাসচৌধুরী একটি দর্শনীয় গোল করে দলকে জয়যুক্ত করেন।

গভবাবের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান দল তাদের জয়যাত্রার পথে পরাস্ত করেছে কালীঘাট দলকে ২-০ গোলে। এবং গুয়াড়ী দলকে ২-০ গোলে। কালীঘাটের বিপক্ষে মোহন-

বাগানের গোলরক্ষক কমল সরকার যেভাবে একটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করেছেন, তার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই বছরই বাটা দলের বিপক্ষে কমল সরকারের অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা এখনও ময়দানের ক্রীড়ানোদীরা বিস্তৃত হয় নি।

কালীঘাট দল ২-০ গোলে পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু শেষ সময় পর্যন্ত সন্ধান তালো তারা মোহনবাগানের রক্ষণভাগের ওপর চাপ দিয়েছে। লীগের সপ্তদশ খেলার ওয়াড়ী দল পরাজিত করতে অবশ্য মোহনবাগানের চেয়ে ল.প. অসুবিধাই হয় নি। রক্ষণাধিক ক্রীড়াধারা ওয়াড়ীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে গোলরক্ষক এস চ্যাটার্জীর দুর্বল ক্রীড়াধারা। জি কিকের থেকে জার্নেল যে গোলটি দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় গোলটি—নিভা বোম্বের সাধারণ সটট গুয়াড়ীর গোলরক্ষকের প্রতিহত করা উচিত ছিল।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

একমাত্র ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ছাড়া অন্য কোন দলের সম্বন্ধে তেমন কিছুই বলবার নেই। অবশ্য আর কয়েকটি খেলার পর লীগের নিচের তলার প্রথম ডিভিসন অন্তিম বজায় রাখবার জন্য যুদ্ধ শুরু হবে। এই উপলক্ষে নোংরানিও শুরু হবে হয়ত প্রতিবারের মত। তবে মীপ তালিকার নিচের দিকের অবস্থা সেখা মনে হচ্ছে এ বছর লীগে নবোদ্বীত গ্রীষ্ম-দলই বোধ হয় প্রথম ডিভিসনে খেলবার যোগ্যতা ছাড়াবে।

অস্ট্রেলিয়ার জয়জয়কার

টেনিস কোর্টে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ বছবার ঘটেছে। গতবারও উইমবলডেনের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার এই দুজনকেই খেলতে দেখা গিয়েছিল, এবারও তাই। ফলাফলও এক বিজয়ীর জয়মাল্য পড়ল রর এমার্সনের কপটে। জেড স্টোলে উপর্যুপরি তৃতীয়বার লাভ করলেন বিজিতের সন্মান। টেনিস কোর্টের বাইরে কিন্তু স্টোলে আর এমার্সন দুজনে দারুণ যুদ্ধ। সব জায়গাতেই এক সঙ্গে দেখা যায় টেনিস-জগতের এই দুই সেরা খেলোয়াড়কে। এমন কি উইমবলডেনে খেলার সময় দুই বছর মিলে একটা ক্যাট ভাড়া করে এক সঙ্গেই ছিলেন।



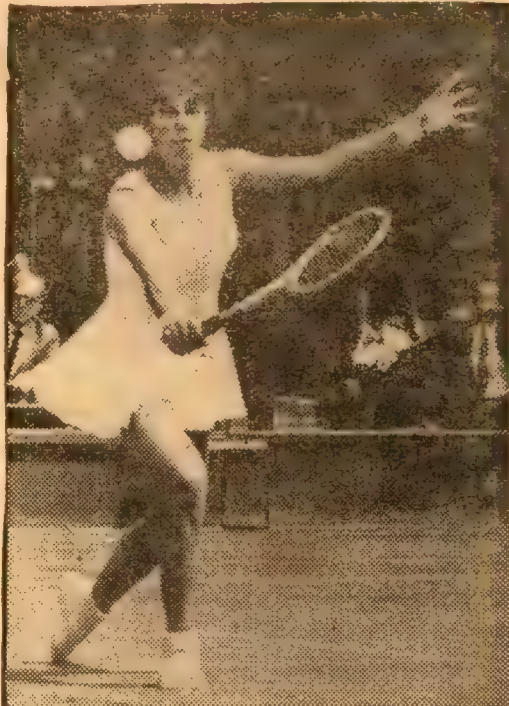
উইমবলডেন জেড-সহ মার্গারেট স্মিথ

গত শীতকালে ৮৫,০০০ শতালিং পণ্ডিতের লোভনীর প্রভাব প্রত্যাখ্যান করে, এমার্সন অপেশাদারকে আঁকড়ে ধরেছিলেন আবার উইমবলডেন জয় করবার আশায়।

১৯৬৫ সালের উইমবলডেন বিজয়ী হিসাবে যে অস্ট্রেলিয়ার রর এমার্সনের নাম পুনরায় দেখা হবে, এ বোধ হয় রর এমার্সনও নিশ্চিতভাবে জানতেন। পর পর দুবার

উইমবলডেন জয় সহজ নয়, ইতিপূর্বে এই মূলত সন্মান লাভ করেছেন—জেড পেরী, ডোনাল্ড বাউ, লুই হোড এবং রড লেভার।

বেচারি জেড স্টোলে ১৯৬৩ সালে ফাইনালে চাক ব্যকিনলের কাছে পরাজিত হতে হল এবং ১৯৬৪ এবং ৬৫ সালে প্রিয়বন্ধু এমার্সনের কাছে। ইতিপূর্বে ১৯৩৪ থেকে ৩৬ সাল পর্যন্ত তিনবছর রানার্স হয়েছিলেন জার্মানী



মারিগা বনো

ছাত্রদের অপরিহার্য গ্রন্থ
সম্প্রতিবচন স্টোপাধ্যায়ের

পালানো

—ইহাতে আছে—

এখি বঙ্গমত্রে রচিত সম্ভাব্যত্বের জীবনী—
'সম্ভাব্যত্ব-সুধা, কবীত্র রবীন্দ্রনাথের
পালানো সমালোচনা' এবং সমালোচক-
শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সম্ভাব্য-সাহিত্য সমা-
লোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত কর্তৃক
কৃতপঠন গ্রন্থরূপে নির্বাচিত।

মূল্য এক টাকা

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃদ্ধ-সংহার কাব্য

দাম—দুই টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লামটেড

১১৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২



ইস্টবেংগল ও এরিরপেলের খেলায় একটি দৃশ্য

জন ক্রাম। কেড স্টোলের বয়স হয়ে এসেছে। তিনি হয়ত ভাবছেন এই জীবনে উইমবলডেনে বিজয়ীর সম্মান হয়ত আর হল না।

এবারের পুরুষদের সিদ্ধলস কাইন্যাতে চমকেষণোয়া কোন কিছুই ঘটে নি। প্রথম থেকেই খেলার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এয়ার্লিন জয়ের দিকে অগ্রসর হন।

আকর্ষণীয় হয় বটে উইমবলডেনে মহিলাদের সিদ্ধলস কাইন্যাতে অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ ও ব্রুজিলের মারিয়া বুনের খেলায়। ১৯৬৩-র বিজয়িনী ২২ বৎসর বয়স্ক মার্গারেট গভবারের কাইন্যাতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বহু-পরিকর, আর অন্যদিকে সম্মান রক্ষার জন্য লড়াই করেন ১৯৫৯, ৬০, ৬৩র বিজয়িনী ব্রুজিলের মারিয়া বুনা। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর ৬-৪, ৭-৫ খেলায় মার্গারেটের জিত ছিল। মার্গারেটের

চ্যাম্পিয়ন হবার ফলে একটি নতুন নজীরের সৃষ্টি হল। পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন এয়ার্লিন এবং ইতিপূর্বে এক সঙ্গে দুই বিভাগে অস্ট্রেলিয়ানরা বিজয়ী হতে পারে নি। দুই বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার জয় টেনিস রাজ্যে অস্ট্রেলিয়ার একচ্ছত্র প্রাধান্যকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করল।

সমাচার দর্পণ

অস্ট্রেলিয়ায় তিন বছর আগে কুর্করের মাংসের জন্য মাত্র ২৬ অস্ট্রেলিয়ান গিনিতে কেনা যেটাটি কয়েক দিন আগে বেলবোর্নে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল হার্ডল রেসে বিজয়ী হয়েছে। বিজয়ী যেটাটি মালিককে এসে দিয়েছে ৩৩৬০ পাউন্ডের প্রথম পুরস্কার।

* * *

এটিছাড়াও আগামী পুরুষ এশিয়ান গেমসের

আসর বলবে। ডিসেম্বরের ৯ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত ব্যাককে এই প্রতিযোগিতা চলবে।

পনেরো জন স্কুলের ছাত্র সমন্বিত ভারতীয় স্কুল বৃষ্টিবৃদ্ধ দল সিংহল যাত্রা করবে আগামী ২৪শে জুলাই। সিংহলে কলম্বোতে একটি এবং কতিপিতে একটি করে প্রতিযোগিতায় তারা অংশ গ্রহণ করবে।

এবার জাতীয় কুর্টবল প্রতিযোগিতায় সম্ভাষ টুর্নিকি খেলা অনুষ্ঠিত হবে কুইলনে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে। দিল্লীর ডুরাও কাপের খেলা অনুষ্ঠিত হবে ডিসেম্বর মাসে এবং সর্বভারতীয় স্কুলের স্মরণ কাপ বা লিটল ডুরাওর খেলা অনুষ্ঠিত হবে দিল্লীতে নভেম্বর মাসে।

সাক্ষাৎকর্ম বসুমতী

একটি অবিস্মরণীয় জীবনের ইনিংসের অবসানে

মৃত্যুর সুনিপুণ শেখ বলটিতে একটি অবিস্মরণীয় জীবনের ইনিংসের অবসান হল। বিশ্ব-ক্রিকেটের বহু দর্দীপ্ত বোলারের দ্রুত বলকে যিনি উইলোদগের প্রচণ্ড আঘাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন, সেফুরী আর অপরাধিত মাথাকে সাধী করে যিনি বতবার প্যাভেলিয়ানে ফিরেছেন; মৃত্যুর সোজা বলে সেই ওয়াল্টার হ্যামওয়ের জীবনের উইকেট ভেঙে গেল, যমসের স্কোরবুকে তাঁর রান তখন মাত্র ৬২।

ক্রিকেট নিয়ে যদি কখনও কোন ইতিহাস রচিত হয় তবে ওয়াল্টার হ্যামও হবেন এক দ্বিগুণ্য স্মৃতি, তাঁর জীড়াকীতির সুবর্ণময় পূর্ণ নিয়ে রচিত হবে একটি বিরাট অধ্যায়। হ্যামওয়ের সমসাময়িক কালেই বিশ্ব-ক্রিকেটের অঙ্গনে আবির্ভাব ঘটেছিল সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের। দুই অবিস্মরণীয় পুরুষের আবির্ভাবের ফলে ক্রিকেটের অঙ্গন হয়ে উঠেছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী।

ডোভারের কেস্টে ১৯০৩ সালে ১৯শে জুন ওয়াল্টার হ্যামওয়ের জন্ম। কার্যপনক্ষে ওয়াল্টারের পিতাকে ইংলণ্ডের বাইরে কাটাতে তাই ছোটবেলায় পিতার সঙ্গে তিনিও কয়েক বছর অতিবাহিত করেছেন মাল্টা, চীন প্রভৃতি দেশে। বুঝ ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের ব্যাট হাতে নিয়েছিলেন হ্যামও। তাই বিদেশে থাকতেও ওয়াল্টার নিয়মিত ক্রিকেটের চর্চা করে গিয়েছেন।

বিদেশে কয়েক বছর কাটিয়ে তিনি এসেছেন ফিরলেন। ইংলণ্ডে ফিরে হ্যামওয়ের জন্মজীবন শুরু হল সারেনচেস্টার গ্রামের স্থলে। স্থলের একটি হাউসের খেলার পর বোঝা গেল যে বিরাট এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি। কারণ স্থলের সেই লায় স্কোর বুক সেদিন লেখা হয়েছিল, ওয়াল্টার হ্যামও ৩৬৫ রান অর্জন।

প্রথম শ্রেণীর খেলার আসরে হ্যামওয়ের আত্মপ্রকাশ ১৯২০ সালে গুস্টারসারার পক্ষে, যমস তাঁর তখন মাত্র সতের। এরপর গুস্টারসারার পক্ষে ১৯২৩ সালে যখন নিয়মিত খেলতে শুরু করলেন, তখন তিনি পুরোপুরি একজন পেশাদার খেলোয়াড়। যদিও হ্যামও শুরু করেছিলেন একজন অপেশাদার হিসাবে। এই ১৯২৩ সালে ক্রিকেট মরশুমে তিনি সংগ্রহ করলেন ১৩১৩ রান। তাঁর জীবনের প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক খেলা হল ওভালের মাঠে প্যারিস দলের পক্ষে জেন্টলম্যানের সঙ্গে প্রীতি ক্রিকেট খেলাটি।

১৯২৫ সালটা ওয়াল্টার হ্যামওয়ের জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মরশুম। এই মরশুমের শেষে দেখা গেল হ্যামও সংগ্রহ করেছেন মোট ১৮০০ রান। এই সময়ে তাঁর অভিজ্ঞতার দৃষ্টিও যথেষ্ট বেড়েছে এবং খেলোয়াড় হিসাবে

তখন তিনি পরিণত। এই মরশুমের শেষের দিকে ইংলণ্ড দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বাবে। নির্বাচকমণ্ডলী ইংলণ্ড দলের খেলোয়াড়দের নাম প্রকাশ করলেন। দেখা গেল গুস্টারসারার বইশ বৎসর বয়স উদয়মান



ওয়াল্টার হ্যামও

খেলোয়াড় ওয়াল্টার হ্যামও ইংলণ্ড দলের সঙ্গে চলেছেন ক্যারিবিয়ান সফরে। অবশ্য হ্যামওয়ের নির্বাচনে ইংলণ্ডের কেউই আশ্চর্য হয় নি, কারণ তখন ইংলণ্ডের ক্রিকেটের আগেরে তিনি প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম বেসরকারী টেস্টে হ্যামও রানের বন্যা বইয়ে দিলেন, সেফুরী নয় একেবারে ডাবল সেফুরী। ২৩৮ রানে অপরাধিত হ্যামও প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে উন্নত জীড়ানৈপুণ্য হ্যামওকে ব্যাতির পথে এগিয়ে দিল। সফরের শেষে তাঁর রানের গড় হল ৮৭।

এক-একটি করে বছর কাটিতে লাগল আর হ্যামওয়ের জীড়াকীতির বিকাশ ঘটতে লাগল। ১৯২৮ সালের সারা মরশুমে হ্যামও সংগ্রহ করলেন ২৮২৫ রান। এই সময় গুস্টারসারার এবং সারের একটি খেলার ফিল্ডার হিসাবে হ্যামওয়ের কীতির কথা উল্লেখ করছি। এই খেলায় হ্যামও একাই ধরেছিলেন দশটি ক্যাচ। অনেকের মতে ওয়াল্টার হ্যামওয়ের মত শিখ ফিল্ডার আজ পর্যন্ত বিশ্ব-ক্রিকেটে জন্মগ্রহণ করেনি।

হ্যামও ছিলেন ব্যাটসম্যান, বোলার আর উর্চুদের ফিল্ডার। বোলার হিসাবেও তাঁর ভূমিকা কোন অংশে কম ছিল না। তাঁর দখলে ছিল ৮৩টি টেস্ট উইকেট আর ফিল্ডার হিসাবে তিনি টেস্টে ধরেছেন ১০০টি ক্যাচ।

ভিজিয়ারাগ্রামের মহারাজার নেতৃত্বে একটি ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ড সফরে যায় ১৯৩৬ সালে। ভারতের বিপক্ষে তিনটি টেস্টই অংশ গ্রহণ করেন হ্যামও এবং ভারতের বিপক্ষে তাঁর রানের গড় হয় ১৯৪ রান। সেবার ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি সেফুরী হয়। দৃষ্টি

করার কৃতিত্ব হ্যামওয়ের। ওভালের টেস্টে একেবারে ডাবল সেফুরী ২১৭ রান আর, ম্যাকেস্টারের মাঠে ১৬৭ রান। ১৯৩৬-৩৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে করলেন অপরাধিত ২৩১ রান।

ওয়াল্টার হ্যামও ১৯৩৮ সালে আবার হলেন অপেশাদার খেলোয়াড়। সেবার অস্ট্রেলিয়া দল ইংলণ্ড সফরে আসছে। ইংলণ্ড দলের অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হল ৩৫ বৎসরের প্রবীণ খেলোয়াড় হ্যামওয়ের ওপর। অধিনায়কত্বের বিরাট দায়িত্ব, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক জীড়াকীতির ওপর বিশৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারল না। এর প্রমাণ পাওয়া গেল লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে। লর্ডসে সবচেয়ে দর্শকবৃন্দ এক নতুন হ্যামওকে খেলতে দেখে ছিল। ২৪০ রানের বিরাট ব্যক্তিগত রান সংখ্যা নিয়ে যখন তিনি প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন তখন সবচেয়ে দর্শকরা তাঁকে যেভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিল তাঁর তুলনা হয় না।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘন কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল ইংলণ্ডকে, যুদ্ধের রণ-দাম্যাস বেজে উঠল। সেই ডাকে গাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন হ্যামও। উইলোদগ হাতে নিয়ে এতদিন দেশের হয়ে ক্রিকেটের মাঠে যুদ্ধ করেছেন তিনি, এবার ব্যাট ছেড়ে হাতে তুলে নিলেন আগ্নেয়াস্ত্র। যুদ্ধের সময় হ্যামওকে দেখা গেল ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমানবহরের একজন অফিসার।

যুদ্ধের শেষে আবার তিনি যখন ক্রিকেট মাঠে ফিরে এলেন তখন তাঁর বয়স ৪০ অতিক্রম করেছে। ব্যাতির উচ্চশিখরে তিনি অবসর গ্রহণ করলে হয়ত ভাল করতেন। কিন্তু ক্রিকেট মাঠের হাতছানি আর দেশের প্রয়োজন তাঁকে পূর্বে অবসর গ্রহণ করতে দেয় নি। তখনও ইংলণ্ডের নেতৃত্বের ভার তাঁর কক্ষে। ১৯৪৭ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দল পরিচালনার পর হ্যামও ক্রিকেটের মাঠ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

টেস্ট খেলায় হ্যামও অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, নিউজিল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অংশ গ্রহণ করেন। টেস্টের আসরে হ্যামও করেছেন মোট ২২টি সেফুরী। আর প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁর সেফুরীর সংখ্যা হল ১৬৭টি। টেস্টে মোট সংগ্রহ করেছেন ৭২৪৯ রান এবং খেলোয়াড়ী জীবনে সংগৃহীত রানসংখ্যা হল তাঁর ৫০, ৪৯৩ রান। ১৯৩৩ থেকে ৩৯ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডে ব্যাটিং তালিকার শীর্ষে অবস্থান করেছেন তিনি।

ক্রিকেটের মাঠ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর হ্যামও দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে ১লা জুলাই মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। বিশ্ব-ক্রিকেটের অমর চরিত্র ওয়াল্টার হ্যামও আজ বিদায় নিয়েছেন; কিন্তু রেখে গেছেন সেফুরী, ডাবল সেফুরী আর রেকর্ডের গাঁথা মালাখানি আর সেই অমর নাম --- ওয়াল্টার হ্যামও।

সম্পাদিকা-জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপনিবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৪৫১
আজকের মানুষ	৪৫২
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	৪৫৩
ভারতদর্শন	৪৫৪
আন্তর্জাতিক	৪৫৫
আধারমানিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	৪৫৬
বঙ্গদর্শন	৪৫৭
গোধূলি বেলায় (অনুবাদ-গল্প)	৪৫৮
ভূষিত চাতকের কণ্ঠস্বর (কবিতা)	৪৫৯
শহর কলকাতা	৪৬০
মাণিক্যে সেকাল ও একাল	৪৬১
মনোভিস্মার (কবিতা)	৪৬২

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের স্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্রাটদের দ্বারা নির্ধ্যাতিত বাস্তব্য মুকুন্দরাম ঙ্খ ও বেদনারিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তিগত হুঃখ কি করিয়া সকলের হুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালার সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হুঃখই তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

- ১। মূল কাব্য, ২। সুবিবৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি,
- ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (কবি বহিঃমত লিখিত), ৬। বিবৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা।

নাহাররজন গুপ্তের গ্রন্থাবলি।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

কালো ভ্রমের চমকপ্রদ বিষয়বস্তুর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা সাহিত্যের শাসক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিশোরী রায়েব আবির্ভাব।

বাংলার মিত্রী সাহিত্যে

ডাঃ নাহাররজনের দ্বান ও পুর্ক

—তেরখানি নিকাচিত রচনা—

কালো ভ্রম, কবেরে ম্যা মবেরে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদেব পিশাচ, পক্ষমুখী হীরা, রক্তপেক্ষা, মৃদু, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অক্ষরী, প্রণাম জানাই

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

আবদুল বশীরাপাধ্যায়ের

মাণিক্য গ্রন্থাবলি

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩০ পৃঃ—

ইউনিয়ন

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
উপহাস্য (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৪৭৮
প্রথমমেলা	জয়ন্তী সেন	৪৮০
ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপ	সরেন ভট্টাচার্য	৪৮১
শহরে বর্ষা নামলো (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	৪৮৩
ভ্রম-বাংলার কথা	পারুল ভট্টাচার্য	৪৮৪
হৃদয়ের প্রাচুর্য নিয়ে (কবিতা)	বরদ্রা মজুমদার	৪৮৮
জন্মের জলক্ষে	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়	৪৮৯
হালি চ্যাপলিন	অশোক সেন	৪৯৬
কল্পলক্ষ্য	...	৪৯৯
কল্পলক্ষ্য—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	৫০৬
শত্রু-মন	...	৫০৭
বেলাসুন্দরী	শ্রীঅমিতাভ	৫০৯

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বোকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষাসুযোগীদের
ভাষা শিকার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
৷ বিদেশী ভাষার দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ৷
০০০ বছরজন্মে পর্যাপ্ত কল অবশ্যস্বাভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ বুদ্ধোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা যা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিকার অধিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—০.৫০ ৷ ইংরাজী হইতে উর্দু—১.০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

য হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

(প্রাপ্ত খণ্ড মূল্য আট টাকা)

সঙ্কট-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

(ডাকমাণ্ডুল স্তত্ত্ব)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য,
বীরসেনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক,
বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ,
একেই কি বলে সভ্যতা ?

মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—ককতুমারী নাটক,
শমিতা নাটক, তিলোত্তমা-সম্বৎ
কাব্য, ব্রজসেনা কাব্য, চতুর্দশপদী
কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য,
মারা কানন, হেক্টর বধ ।

মূল্য—দুই টাকা

—উপভাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর বুদ্ধোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১.৫০ ২য় খণ্ড ২.৫০

৩য় খণ্ড ১.০০ ৪র্থ খণ্ড ২.৫০

বন্ধুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১০৬, বাণেশ্বরবাহারী গাছুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



সাপ্তাহিক বসুমতী

CENTRAL
LIBRARY

UNIVERSITY

৭০ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা—মূল্য ২৫ পা
বৃহস্পতিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৩৭২

Price : 25 Paise
Thursday, 22nd July, 1965

পরীক্ষার ফলাফল

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর কলেজে কলেজে ছেলেরা 'হত্যা' দিতে সুরু করেছে। একমাত্র প্রথম বিভাগে যেসব ছাত্র উত্তীর্ণ হয়, কলেজে ভর্তির ব্যাপারে তাদের বিশেষ বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। প্রায় নিজেদের জোরেই তারা ভর্তি হতে পারে। এবারে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যালেও পরিমিতসংখ্যক আসনে কিছু ছাত্র ভর্তির সুযোগ লাভ করেছে।

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা মধ্যবিত্ত সমাজে খুব বেশি নয়। শ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যাই সেখানে বেশি। এইসব ছাত্র কি রকম দুঃস্থতার মধ্যে পড়াশুনা করে তা কারো অজানা থাকার কথা নয়। এরা পরীক্ষার পাশ করলেও পৃষ্ঠপোষকের অভাবে মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হতে পারে না। এমন কি এদের ঠাই কলেজে নেই বললেই চলে। বিশেষত তৃতীয় বিভাগে যারা উত্তীর্ণ, তারা বেন সমাজের বোকা-স্বরূপ বিরাজ করে। একালে শ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রকেই যখন কলেজে ভর্তির জন্যে হনো হতে হয়, তখন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের দশা সহজেই অনুমান করা যায়। কলেজে তারা অবাকৃত, বাড়িতে তারা লাঞ্ছিত, স্বভাবতই শেষ পর্যন্ত তাদের ঠাই হয় রকে এবং এদেরই আমরা রকবাজ ডিগ্রিতে ভূষিত করে নিজেদের ডিগ্রির বাড়ি করে থাকি।

স্বাধীন ভারতের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের, অধিকসংখ্যক যুবশক্তি এই কারণে আজ ফ্রস্টেড। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণের জন্য সরকারের

আমাদের সরকারের যেন সে ভাবনা একেবারেই নেই। তাই সমাজে যেমন ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, তেমনই একই সমাজে অর্থকরী ব্যক্তি ও অনর্থক মানুষের সুস্পষ্ট ভেদাভেদের লক্ষণটি ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বৈদেশে এই ধরণের ব্যাপার ঘটার সম্ভাবনা থাকে সেদেশে এক শ্রেণীর মানুষ অর্থনৈতিক ব্যপকার্যের বলি হবে এবং সামগ্রিক বিচারে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বাঁধা বুলি জাহায়ামে যাবে।

ছাত্রদের উত্তীর্ণ ও অন্তীর্ণের কথা বিবেচনা করে আজ নতুন কথা ভাবতে হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে এম-এ ও এম-এস-সি থেকে তৃতীয় শ্রেণীকে কাটা মেরে বিদায় করেছে। আমরা বলি, সে কাজ ভালই হয়েছে। কারণ যার কোনো আর্থিক মূল্য নেই, অস্বাধ নামের পাশে তার আর্থিক শোভা বৃদ্ধিতে কি লাভ হবে?

উচ্চ মাধ্যমিক বা প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা এম-এর তুল্য নয়। ভবৎও প্রথমোক্ত দুটি পরীক্ষার শ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েও যদি আর্থিক বা অন্য মূল্য বৃদ্ধি না পায়, তা হলে জীবন-জীবিকার প্রারম্ভে ঐ অবজ্ঞার, নিম্নিত ও মূল্যহীন সার্টিফিকেটে কি লাভ?

অবশ্য যারা আশাবাদী তাঁরা অন্য কথা বলবেন। সমাজে অধিকসংখ্যক যুবশক্তিকে তাঁরা এই অনগ্রসর ও দরিদ্র দেশের সম্পদ-স্বরূপ গণ্য করে নতুন পথে নিয়োজিত করতে বলবেন। কিন্তু মুখে বলা এক কথা, আর কাজে করা অন্য কথা। আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা ছাত্রদের ও দেশের

একথা আমরা জানি। কিন্তু করার ক্ষমতা হাতে রেখেও তিনি কতটুকুই বা অগ্রসর হতে পেরেছেন।

একালের স্বল্পমেধা ছাত্রদের জন্য প্রয়োজন বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল স্কুল-গুলি হাতে গোনা যায়। তা ছাড়া সেখানে ভর্তি হওয়াও দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কথা ছিল—বহুমুখী বিদ্যালয়ের সংগেই বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকবে। অর্ন্তম শ্রেণীর পর ছেলেদের প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা তারা লাভ করবে। কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবার উপযুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকরণে আমাদের সরকার যেন ইচ্ছুক নয়। অথবা তাদের সামনে কাজের চাপ এতো বেশি যে, এ ব্যাপারে বিশেষ করে ভাববার ক্ষতো তাদের সময় নেই। অথচ পশ্চিমের আধুনিক রাষ্ট্র ও জাপান প্রভৃতির উন্নতির গোড়ার বৃত্তি শিক্ষার জন্যে দেশের যুবশক্তিকে সুবোধ দেওয়া হয়েছিল। কলে সেরব দেশের উন্নতির সঙ্গে সেখানের মানুষ সামাজিকভাবে সুস্থ এবং সম্পদশালী। আর আমরা স্বাধীন দেশে বাস করে স্বাধীন দেশের মানুষগুলিকে পরাশ্রয়ী, পরজীবী, পরমুখাপেক্ষী করে তুলছি। এই অবস্থার অবগান না হলে দেশের সংকট বিভাবীক্য মূর্তি ধারণ করবে।

সম্পাদিকা

হো-চি-মিন

জাপান শান্তির দৃষ্টি এশিয়ার জগৎলাকীর্ণ একটি অঞ্চলের দিকে নিবন্ধ। সে অঞ্চল উত্তর ভিয়েতনাম। দূর্ধর্ষ গেরিলাবাহিনীর আক্রমণের সামনে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী নিয়েও বেখান থেকে ফরাসী উপনিবেশিক অধিকারকে পিছু হটতে হয়েছে। আজ তারই সংলগ্ন দক্ষিণ ভিয়েতনামে সে অধ্যায়েরই যে পুনরাবর্তি হচ্ছে এতে উত্তর ভিয়েতনামের সমর্থন এবং সাহায্যই মার্কিন রাজনীতিকের এক জটিল রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতিতে টেনে এনেছে। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম সত্ত্বেও উত্তর ভিয়েতনাম আজও অদম্য উদ্ভূত এবং স্বাধীনচেতা তা অনস্বীকার্য। এই উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন হো-চি-মিন। পুরুষ বৃদ্ধ, অগাধ বুদ্ধিমান। কমিউনিস্ট তো বটেই। সুতরাং বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে আজ হো-চি-মিনের প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ নয়, বরং ভাষ্যার্থেরও দাবিদার।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এক ফরাসী জাহাজের কালোনি হয়ে ইউরোপে পাড়ি দিচ্ছিলেন হো-চি-মিন। বিলেতে হোটেলের খানসামা হিসেবে কিছুদিন কাটিয়ে হো বান প্যারিসে। সেখানে সাম্যবাদী চিন্তাধারা ছাত্রাবস্থায় তাকে প্রভাবিত করে। প্রথম মহাসনরের শেষে তিনি বামপন্থী সাংবাদিকতার হাত পাক খেতে শুরু করেন। 'অজুং' নামে উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সাম্যবাদী ধ্যানধারণা প্রচারের জন্য একটি সাময়িকীও তিনি প্রকাশ করেন। নিজেই ছিলেন তার সম্পাদক। ১৯১৮ সালে দু-একখানি নাটকও লিখেছিলেন তিনি। প্যারিসে বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে আগত ছাত্রদের নিয়ে বুদ্ধিগণীবি আলোচনার যে কেন্দ্র গড়ে ওঠে, হো এতে ছিলেন অন্যতম কর্ণধার।

রাজনীতিতে সক্রিয় অংশীদার হওয়ার তাগিদে ১৯২৪ সালে হো-চি-মিন মস্কো যান, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে University of the Toies of the East মার্কসবাদের তত্ত্ব-বিশ্লেষণী জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। পঞ্চম কমিউনিস্ট কংগ্রেসে তাঁর প্রথম বক্তৃতা সমবেত কমিউনিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্ভীক বিশ্লেষণের জন্যে। তিনি বলেন যে, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ উৎপাতের সমস্যা যেখানে, সেখানে কারুর দৃষ্টি ঠিক পড়ছে না। ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করতে হলে সংগ্রাম শুরু করা দরকার উপনিবেশগুলিতে, যেখানে তাদের নিষে জঞ্জরিত মানুষের বন্ধ্যার শেষ নেই। এই আন্দোলনের সূত্রপাতে হো-চি-মিনের সংগে হাত মিলিয়ে

১৯২৭ সালে তাঁর শিক্ষাবিশারদ সমাধি হয় এক নতুন ভূমিকা নিয়ে। চীনের কমিউনিস্টরা এখন প্রকাশ্য মূর্তি-আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে গোপন কার্যকলাপের আশ্রয় নেয়, হো-চি-মিন তখন হয়ে দাঁড়ান চীন এবং মস্কোর মধ্যে সংযোগের বাহন। প্রায় ১০ বছর তিনি এই সংযোগের ভূমিকা চালিয়ে যান সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে। এর পরে তিনি তাঁর স্বদেশ ভিয়েতনামে ফিরে আসেন ১৯৪০ সালে। কাণ্ড বাঙের পার্বত্য গুহাকে কেন্দ্র করে এখানে শুরু হয় তাঁর নতুন কর্মকেন্দ্র। উদ্দেশ্য : ভিয়েতমিন মৃত অঞ্চল প্রাতিষ্ঠার স্বার্থে গোপন দল গঠন। যুদ্ধের ডামাডোল পূর্ব-এশিয়াকে তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পাঁচ বছর জুড়ে

প্রয়োজন হয় কটনীতির স্বার্থে তা-ও সহ্য। যুদ্ধের ২ লক্ষ চীনের জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনী এখন ভিয়েতনামে অভিবাসন চালায়, হো তখন অতিভ পাতেন ফরাসীদের সঙ্গে। তাঁর বিশ্বাসী গেরিলাধ্যক্ষ হয়ে গিয়ানের নেতৃত্বে গেরিলাবাহিনী এ ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট সহায়। চীনাাদের বিভাডন সম্ভব হলেও ফরাসীরা অধিকার সমর্পণে নারাজ। ১৯৪৬ সালে প্যারিসে গিয়েও ফরাসী সরকারকে স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রস্তাবে রাজী করাতে পারলেন না, নিঃসংকেচে হো-চি-মিন নামলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে। দীর্ঘ ৮ বছরের সংঘাত ও সংঘর্ষের পরে দিয়েন-বিয়েন-ফুতে ফরাসী অধিকারের বিরুদ্ধে ভিয়েতমিন গেরিলা যুদ্ধের অবসান হয়, ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী উত্তর ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে নতুন স্বাধীন সরকারের পতনে। আজ উত্তর ভিয়েতনাম শব্দ স্বাধীন নয়, আজ দক্ষিণ ভিয়েতনামের মূর্তি-যুদ্ধেরও তারা পথপ্রদর্শক।



হো-চি-মিন

জাপানী আধিপত্যের সময়ে তিনি গোপনে চীনের কমিউনিস্ট, কুরিয়ামিনাঙ এবং মার্কিন সামরিকবাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রেখে চালিয়ে যান তাঁর অমিতবিক্রম প্রস্তুতি। তাঁর লক্ষ্য একটি সক্ষম দূর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনী গঠন

হো-চি-মিনের প্রাতি সারা উত্তর ভিয়েতনাম বাসীদের প্রাণা অসীম, আস্থা অবিচল। তিনি জাতির পিতা হিসাবে পূজ্য। তাঁর প্রাতি দেশবাসীর আনুগত্য অবিভক্ত, অনুরাগ অতুলনীয়। ৭৫ বছরের বৃদ্ধ হো-চি-মিন

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হৃদয়সাদ মিত্র

‘স্পিরিচুয়াল’, ‘মেটাসিয়ারাল’ ইত্যাদি শব্দ এসে পড়লো কথার কথার। মানুষ বিশেষ বিশেষ অনুভূতি থেকে এক-একরকম তর্কে এসে পৌঁছোয়। আজকাল যেমন, আগেকার দিনেও ভেতন এইরকম তর্ক-বিতর্ক অনেক হয়েছে। তর্কের দরকার আছে বইকি। কিন্তু শব্দ তর্কে জিতে যাওয়াটাই সব নয়। হার-জিতের কথা আলাদা। আসল কথা, মন আরো গভীর সমর্থন চায়।

এক-একদিন কন্ঠের আশ্চর্য অনুভূতি জাগে মনে। স্বতন্ত্রমনাধের বা গোবিন্দ দাসের বা একালের সুকান্তর বা আর কোনো কবির লেখা পড়তে পড়তে ঠিক সেরকম অনুভূতিতে পৌঁছানো যায় কি না জানি না। একজন বা পান, অন্য কি ঠিক সেরকম,—ঠিক সেই রকমই বোধে বাস করবার সুযোগ পেতে পারেন? আমরা কি সবাই একইভাবে একই কবিতাকে দেখতে পারি? টাকাপয়সার অভাব-বোধও কি সকলকে একভাবে ভাবিত করে? সে-অভাবেও কেউ থাকেন কোমল, কেউ বা কঠোর। মন আমাদের নানাচারী। একালে সুকান্ত খুবই তীব্রভাবে দারিদ্র্যের কন্ঠের কথা বলেছেন। অতীতে মুহম্মদরামও তাঁর ফুল্লরাকে দিয়ে কপালে করাঘাত করিয়ে-ছিলেন—

শীরে দৌঁধ শূন্যপাণি কপালে আঘাত হানি করে
রামা দৈব সৌভাগ্য
বিধাতা আমারে দণ্ডী জীবন্ত স্বামীতে রাণ্ডী
কৈল দৈব দুঃখের ভাজন॥
ভালে করাঘাত হানি কান্দে ব্যাধ-নির্ভাম্বনী
নিশ্বাসে মলিন মুখ চান্দে।
হারুণ দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি
ঠেকান্দু সম্বল-চিন্তা ফাঁদে।

‘সম্বল-চিন্তা’র ফাঁদ বড়ো ভয়ানক। ফুল্লরা সেই ফাঁদে পড়েছিলেন। গোবিন্দ দাসও সেই ফাঁদেই। দুবেলার অম-বাজন পেলেই ফুল্লরার দুঃখ মূচতো। দেবীর কৃপায় ব্যাধ কালকেতু যখন গুলজরাটে রাজা হয়ে আসেন, তখন ফুল্লরার আর দুঃখ ছিল না। তখন—

বুলান মণ্ডল আদি প্রজা আসি যথাবিধি
নানা বস্ত্র দিয়া কৈল নতি।
হাঁট ঘাঁট গহ মাঠে নৃত্য-গীত গুলজরাটে
সবার সুস্থির হৈল মতি॥

কিন্তু সুস্থিরতা কতোকণের? সাধারণ

কখনোই সুস্থির হতে পারেন? জীবন ভারি অস্থির। চঞ্চলতাই তার স্বভাব। প্রাণ চঞ্চল। মন চঞ্চল। আমরা সব যুগে এবং সব দেশেই অঙ্গবিক্তর হটফট করে বেঁচে আছি।

মহর পঞ্চাশেক আগেকার ঘটনা। টাই-ট্যানিক জাহাজখানি ডুবে যাবার পরে সারা দুনিয়ার মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আমাদের দেশেও লেখকরা কিছু কিছু লিখে-ছিলেন সে-বিষয়ে। নবমবারের ‘বঙ্গদর্শন’ বেরুচ্ছে তখন। ‘মহম্মদার লাইব্রেরি’ থেকে প্রকাশিত সেই আমলের বঙ্গদর্শনে—১০১৯ সালের আষাঢ় সংখ্যায় সেই টাইট্যানিক-সংক্রান্ত ঘটনাটির উল্লেখ করে লেখা হয়—

‘মহম্মদার’ ভাবিরাছিল যে, সে আপনাদের অলৌকিক অধ্যবসার ও অসাধারণ বুদ্ধির জোরে নিঃসঙ্গ প্রতি-কূল শক্তিপূজকে করারত করিয়া জনে মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া তুলিবে। টাইট্যানিকের তিরোদানে, অগ্নিকের জন্য তার সে সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। আমরা এ পথে মৃত্যুকে জয় করিতে যাই নাই। আমরা যাহাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া জানি, তিনি যোগেশ্বর, তিনি মহাবৈরাগী, তিনি দ্বন্দ্বাতীত, মৃত্যু ও অমৃতের তার সমান-জ্ঞান, তপঃপ্রভাবে জীব-শিব তার ভিতরে এক হইয়া গিয়াছে।’

আজ অধঃশতাব্দিকাল পরের এই মহা-শূন্য-বিজয়ের যুগে বাস করে পুরোনো পত্রিকার এই মন্তব্য দেখতে দেখতে যুরোপ-আমেরিকার প্রতি এ দিকারের ভাঙটা বড়োই বোমানান মনে হচ্ছে। কল্লুবিজ্ঞানের চর্চা মোটেই উপেক্ষার বস্তু নয়। জগৎ নিয়মের অধীন,—সে-কথা আমাদের মনেতেই হবে। ‘যোগেশ্বর’, ‘মহাবৈরাগী’, ‘জীব-শিবের অমৃত উপলব্ধি’—এসব নিত্যমতই কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা শরীরের প্রতি উদাসীন থাকবো কেন? আমরা ‘সম্বল-চিন্তার’ ফাঁদে পড়লে অবশ্যই সেই ফাঁদ কেটে বেরবার চেষ্টা করবো। আমাদের কবির অশ্বশাই সম্বল-চিন্তার কন্ঠের কথা বলবেন। অতএব একালেও ফুল্লরার খেদের জায়গা আছে। এবং একথা স্বতঃসিদ্ধ যে একালের

কিন্তু আধুনিককালের বিষাদবোধ কি কেবল সেইটুকুই?

কল্লুসংসারের অভাববোধ অন্যান্য কালের মতন একালেরও সাহিত্যিকদের চিন্তনীর বিষয় বটে। আবার, পুরোনো দিনের জনৈক বেদনাবোধও স্বাভাবিক। কিন্তু এ যুগের নিজস্ব বেদনা বলতে যা আমরা বুঝে থাকি বা বোঝবার চেষ্টা করি, সে এ-যুগের কোনটিকেই বলা যায় না। তার কি কোনো সূত্রনির্দেশ করা যাবে? সে যুগে কি আমাদের একালের সাহিত্যিক চেতনার সুস্পষ্টভাবে ধরা দিচ্ছে?

আজ অশ্রুত কবকে রোদ আর চঞ্চল মেঘের খেলা চলছে বাইরে। বৃষ্টি কল্লু করবার শব্দে। বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে কণে কণে। মাঠের ঘাস ভিজ়ে সবুজ। তাতে রোদ জ্বলছে কোমল সতেজ। আমি জানি, মানুষের ভেতরকার গভীর সুখ-দুঃখের ছবি মোটেই এরকম স্পষ্ট নয়। প্রকৃতির দৃশ্য নয় মানুষের মন। তাতে কতো রেখার আঁক-বুঁকি। কোনো কোনো কবিতায় সেই গভীর মেজাজের ছায়া পড়ে। সে-সব ঠিক স্বতীন্দ্র-নাথ বা গোবিন্দ দাস বা সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মতন নয়। তাদের চও অনারকম। তাদের চাল আলাদা। আমি তাই বোদ্ধ-লেন্সকে মনে রেখে একালের নবীন দুঃখ-জন বাঙালী কবির লেখা পড়ছি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথা অনুভব করছি—

খুব বেশিদিন বাঁচবো না
আমি বাঁচতে চাই না
শস্য ফুটলে আমি নেবো
তার মূখ্য দৃশ্য...
নিজস্ব গৃহে প্রজা
বসিয়েছি প্রাণাশ্রমকার
কিছু কিছু নেবো কিছুদিন
বেশি বাঁচতে চাই না।

এ মোটেই ‘সম্বল-চিন্তার’ স্বপ্ন ফাঁদ নয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মনে যে বিষাদ বিধে আছে, তাতে স্পিরিচুয়ালিজম-মেটাসিয়ারালিজম বসিঁত তর্কের অবকাশ কতোটা, সে-কথা অবান্তর। তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটা পাঠকের অনুভূতিতে পৌঁছালেই যথার্থ হোলো বলে মনে নিতে আপত্তি হবে কেন? আমি সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট হই। এই আধুনিক বিষাদের চেষ্টা ছায়ে দেখাও চাই শব্দে।



মহাধর্মীতে শাস্ত্রীজী সকাশে গোয়ার মূখ্যমন্ত্রী শ্রীবান্দোদকর

মাজধানী:

গোয়া নিয়ে কাজকাতি

শাঙ্কল তাঁতি তাঁত বনে।

গোয়া নিয়ে এখন একটা ফয়সালা করতেই হবে এমন কোনও মাথার দিবি ছিল না। বরং দিবি থাকতে পারতেন গোয়াবাসীরা যেমন ছিলেন। কিন্তু না, ভাগ্যভাগি টানাটানির ম্যাপারটাই ধৈর্যহীন। তাই গোয়া কেন্দ্রিক সমস্যার কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ এখন বিশেষ দৃষ্টিচ্যুত।

শ্রীবান্দোদকরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনার সংবাদে মহাশূরে বিস্ফোরণ ঘটেছে। অশ্রুতেজ এতদূর উৎকীর্ণ যে, জনৈক সদস্য বাঙালোরে এ আই সি সি অধিবেশনই বানচাল করে দেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করে বসেছেন। ভাগ্য ভালো, তিনি অকংগ্রেসী। মহাশূরে বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা।

কিন্তু বিরোধী নেতা শ্রী এস শিবাপ্পার এই উম্মার নেপথ্যে রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় উত্তাপও যে ঘেঁষে তাপ সঞ্চার করেছে তাও অনস্বীকার্য। মূখ্যমন্ত্রী শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাও ছেড়ে কথা বলেন নি। পরাসরি পদত্যাগের হুমকী দিয়েছেন।

তবে মহাশূরে রাজ্য কংগ্রেসের কার্যক্রমী সমিতি এবং সংসদ সদস্যদের যুক্ত বৈঠকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা মেজাজের পরিচয় আছে। তাঁরা আরও কিছুকালের জন্য গোয়ার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন না ঘটানোরই পক্ষপাতী।

গোয়া সমস্যা সমাধানে বরং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দল, সরকার এবং গোয়াবাসীদের মনোভাবকে উপযুক্ত মর্যাদা দানের প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন তাঁরা। কিন্তু শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার উত্তেজনা হতবাক করেছে সকলকে।

প্রধানমন্ত্রী অবশেষে গোয়ার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত যে এখনই চূড়ান্ত হয় নি সেকথা জানিয়ে এবং রাজ্য মূখ্যমন্ত্রীর কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে উত্তাপে শীতল প্রলেপ দিতে চেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর তারবার্তার আম্বাস দিয়ে প্রাপককে বিচলিত না হতে বলা হয়েছে। গোয়ার ব্যাপারে এখন বাঙালোরেই

যাবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড এ সম্পর্কে মহাশূরে ও মহারাষ্ট্রের মূখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার বসবেন যেখানে উপস্থিত থাকবেন গোয়া কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের পরবর্তী বৈঠক বসার আগেই গোয়ার মূখ্যমন্ত্রী শ্রীবান্দোদকরও তাঁর দল ও অন্যান্য গোয়ান দলের সঙ্গে আলোচনা সমিতির সুযোগ পাবেন। আর যদি বাঙালোরেও গোয়ার নির্বাচনের সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়, তথাপি গোয়ার অধিবাসীদের কাছে মহাশূরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য মহাশূর অনায়াসেই প্রচারণা চালাতে পারবেন।

গোয়া নিয়ে কোনো রকম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাক বা না থাক ঘটনার যে কুশ্লীল রূপ প্রকাশ পেয়েছে তা যেমনি দুঃখজনক তেমনি লজ্জার বিষয়।

গোয়ার ভাগ্য গোয়ানদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত আর সেজন্যই নির্বাচনের বাদবন্দ্য। একবার নয়, উপযুক্ত পরিদূবার। গোয়ার মূখ্যমন্ত্রী শ্রীবান্দোদকর গতবারও গোয়ার মহারাষ্ট্র অন্তর্ভুক্তির শ্লোগান নিয়েই নির্বাচন জিতেছিলেন, যদিও মাত্র দুটি আসনে সংখ্যাগুরু ছিলেন তাঁরা। শ্রীবান্দোদকরের গোয়া গোমন্তক দল পেয়েছিলেন ১৪টি এবং স্বতন্ত্র গোয়ার সমর্থক রোমান ক্যাথলিক সংগঠন ইউনাইটেড গোয়ালস দল লাভ করেছিলেন ১২টি আসন। সবমোট ৩০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস লাভ করেছিলেন মাত্র ১টি আসন।



শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা

সাপ্তাহিক বসুমতী

উচ্চাচ শ্রীবাসোদকরর গোয়া গোমন্তক দলের অভীশা পূরণ হয় নি নেহরুজীর অসম্মতিতে। নেহরুজী রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে চটাতে চান নি, যদিচ রোমান ক্যাথলিকগণ গোয়া মুক্তি আন্দোলনে জাতীয়তাবিরোধী ভূমিকা ভিন্ন স্বাধীনতা শহীদের ভূমিকা বরণ করে নেন নি বিদেশী শাসকের রাজ্যে। সুতরাং রোমান ক্যাথলিকদের দাবি আঙ্গ রক্ষা করতেই হবে এমন কোনো নৈতিক যুক্তি নেই। অবশ্য রাজ-মর্জিততে নীতিধর্মের কতটুকুই বা অনুসৃত হয়। হলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী সৈনিক যে বাংলা দেশ সর্বস্ব সপে দিয়েছিল, স্বাধীন ভারতে তার-প্রতি এতো ক্ষতের নির্দয় মনোভাব আজকের নেতৃবর্গ প্রদর্শন করতে পারতেন কি? সুতরাং নেহরুজী সে প্রশ্ন নাড়েন নি। কিন্তু সংখ্যালঘু রোমান ক্যাথলিকদের বায়নায় গোয়াবাসীর স্বপ্ন ভগ্ন করার মধ্যেও গণ-তান্ত্রিক রাজনীতির যথার্থ অনুসরণ হয় না।

সম্ভবত শাস্ত্রীজী এসব কথা ভেবে দেখে-ছিলেন, আর তাই নির্বাচনের প্রশ্ন। এবার শহীদ বাদ সেধেছেন।

গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবাসোদকর গতবার দুই আসনের মেজরিটি সত্ত্বেও পুনর্বীর যে নির্বাচনের সম্মুখীন হতে রাজী আছেন তাতেই মনে হয় তিনি গোয়াবাসীর একান্ত দাবি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। এতদূর সহন-শীলতা সত্ত্বেও জ্বররদস্ত দাবি নিয়ে গোয়াকে একটা স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার মধ্যে কোনোরূমেই টেলে দেওয়া উচিত নয়।

গোয়ায় ফিরে নির্বাচনের দ্বারাই বোধহয় গোয়াবাসীর মনোভাবের মর্ষাদা যথার্থভাবে মণ্ডিত হতে পারে।

খাদ্য নিয়ে খবরদারী

খাদ্যনীতিকে কেন্দ্র করেও উত্তাপ সৃষ্টি হতে পারে কংগ্রেসের বাঙ্গালোরে অধি-



শ্রীসুদ্রক্ষণিয়ম

বেশনে। মহারাষ্ট্রের একচেটিয়া খাদ্যসংগ্রহ নীতিকে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুদ্রক্ষণিয়ম যে সর্ববৈভাবে সহ্য করবেন না এবং মহারাষ্ট্রের খাদ্যসংগ্রহনীতিকে কেন্দ্র করে টাটকা বিতর্কের তুফান উঠবে এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কম। শোনা যাচ্ছে, রাজ্য সরকারগুলি ষাতে একচেটিয়া খাদ্যসংগ্রহ-জাতীয় নীতি নির্ধারণে কেন্দ্রনিরপেক্ষ স্বাধীন সংকল্প গ্রহণ না করেন শ্রীসুদ্রক্ষণিয়ম সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট দাবি উত্থাপন করবেন। এদিকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসন্ত রাও নারেকও স্ব সংকল্পে অনমনীয়।

অবশ্য-বিভিন্ন রাজ্যের জোট তৈরি করে কেন্দ্রীয় খাদ্যনীতিকে আক্রমণ করা হবে না বলেও শ্রীনারেক জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই বিশেষ আগ্রহী। মনে হয়, আলোচনাকালে বিভিন্ন রাজ্যের বিতর্ক জোরালো আকার ধারণ করতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাব

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসন্ত রাও নারেক একচেটিয়া খাদ্যের ক্ষেত্রে ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণের স্বপক্ষে যে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী-দের বক্তব্যে তার প্রতি অসমর্থন নেই। বিশেষত বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসহায় স্পষ্টতই খাদ্য পরিস্থিতির অবনতির জন্য দায়ী করেছেন কেন্দ্রীয় খাদ্যনীতিকে। শ্রীনারেকের ন্যায় তিনিও মনে করেন, উৎপাদকদের বৌশ দামের নিশ্চয়তা এবং উৎপাদনশ কিলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দিলে কৃষকদের উৎপাদনে উৎসাহিত করা সম্ভব নয়। খাদ্যশস্যের ব্যবসায় থেকে ফাটকাবাজ উৎসাদনই সমস্যা সমাধানের পথ, এ বিষয় তিনিও নিঃসন্দেহ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এদিকে কণপাত করছেন না। ফলত দেশের খাদ্যসমস্যা আরও জটিল ও অবনতির পথে গড়িয়ে চলেছে।

শ্রীনারেক বিশ্বাস করেন, সারা বছর ন্যায্য মূল্য না পেলে কৃষকগণ ক্রমবর্ধমান মূল্যমানের সঙ্গে সমতা রেখে উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহী হবেন না এবং যে কারণেই তিনি সারা বছর সপাত মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের কৃষককুলকে। জওয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র ইতিমধ্যেই পাইকারী ব্যবসায়ীদের হাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং যারা এখনো মজুতদারির স্বপ্নে বিভোর, প্রয়োজন হলে মহারাষ্ট্র সরকার তাদের মজুত শস্য দখল করে নেবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীসুদ্রক্ষণিয়ম মহারাষ্ট্রের খাদ্যক্রম পরিকল্পনার প্রশংসা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পথ দেবেন বলেও ন্যাক শ্রীনারেককে জানিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বিধি রাজ্যে একাধিকবার বিধিব্য

বিবাহের

উপহারে

=জেনারেলের বই=

জেনারেল প্রিন্সার্স র‍্যাড পারিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত কয়েকখানি অনবদ্য গ্রন্থ

॥ স্বিডেন গসোপাধ্যায় ॥

চৈত্র দিনের করা পাতার পথে ... ৬.০০

দিনগুলি মোর কোথায় গেল ... ৬.০০

॥ অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী ॥

স্মৃতিভারে ... ৫.০০

॥ বোম্বাই বিশ্বনাথ ॥

ভারতীয় গল্প সংকলন ... ৫.০০

॥ ডঃ নবগোপাল দাস ॥

অনবদ্যুত্তিতা ... ৫.০০

তারা দুজন ... ২.০০

সাগর দোলায় চেত ... ৩.০০

॥ বাপী রায় ॥

হালি কামার দিন ... ৩.০০

॥ ননীমাধব চৌধুরী ॥

বাজনগর ... ৫.০০

॥ পরিমল গোম্বামী ॥

টোমের সেই লোকটি ... ২.০০

॥ জ্যোতির্ময়ী দেবী ॥

আরাবল্লীর আড়ালে ... ১.৫০

॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥

কলিকাতা-নোয়াখালী-বিহার ... ২.০০

বর্ষা ... ৩.০০ চৈতালী ... ৩.০০

॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥

শতাব্দীর অভিযান ... ২.৫০

বঙ্গনী ১.৫০ অরের ঠিকানা ... ২.৫০

শৃঙ্খল ২.৫০ বঙ্গর রজনী ... ১.৫০

॥ রামপদ মুখোপাধ্যায় ॥

দুঃস্বপ্ন ... ২.৫০

দুঃস্বপ্নের দ্বন্দ্ব ... ২.০০

মহানগরী ... ৪.০০

॥ প্রমথনাথ বিশী ॥

কোপবতী ... ৩.০০

গালি ও গল্প ... ১.৫০

মৌচাক চিল ... ২.৫০

॥ মোহিতলাল মজুমদার ॥

বিশ্ববরী ... ৫.০০

ছন্দ চতুর্দশী ... ৩.০০

॥ বিধুশেখর শাস্ত্রী ॥

বিবাহ-সঙ্গল ... ৩.০০

জেনারেল বুকস্

এ-৬৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

জন্যই চান, করেছেন) তিনিও মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে সত্যতা আছে বলেই স্বীকার করেন। তবে তিনি শ্রীসুভাষচন্দ্রের দূর্ভাবনার অংশীদারিত্বও গ্রহণ করেছেন। তিনি আশংকা প্রকাশ করেন যে, পাইকারী ব্যবসাদারদের খাদ্য নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে দেশের বাড়তি বিত্তরস্রোত শস্য (মোট উৎপাদনের ২৫।০০ শতাংশ) কিনে নিজে হবে এবং ২৭ কোটি লোকের খাদ্য যোগানোর বিপুল দায়িত্বও বহন করতে হবে সরকারকেই।

অবশ্য সাধারণের খাদ্য যোগান দেওয়ার দায়িত্ব সরকার কেমন করে এ্যাড়াবেন সে বিষয়ে মধ্যমস্তরীর তরফে কোনো স্পষ্টোক্তি সংবাদে প্রকাশিত হয় নি। মধ্যমস্তরী শ্রীসেন খাদ্য-শস্য রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের অসুবিধার কথাই বলেছেন। অথচ শ্রীনারায়ণের স্বাধীনতাও স্বীকার করেন নি। তাঁর বক্তব্য, সুতরাং, বিহার বা মহারাষ্ট্রের মতো সুস্পষ্ট বোধ হয় না।

যাই হোক এ বিতর্কের অবসান সম্ভবত বাঙ্গালারই হবে এবং সে ক্ষেত্রে বাগবিস্তারের সুযোগ যে পরিহার করা হবে না তা বলাই বাহুল্য।

কামরাজ কি থেকে গেলেন

আরও এক বছরের জন্য কংগ্রেস সভাপতি পদে শ্রীকামরাজকেই ধরে রাখা যায় কি-না কামরাজ সমর্থক গোষ্ঠী আগামী বাঙ্গালার ঐতিহ্যবাহিনী তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বলে প্রকাশ।

একই ব্যক্তির পক্ষে পর পর দুইবার কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার বিপক্ষে অবশ্য কংগ্রেসে একটি স্থায়ী প্রস্তাব বর্তমান। কামরাজ সমর্থক গোষ্ঠী এই প্রস্তাবটির প্রয়োজনীয় রদবদল করে শ্রীকামরাজকে পুনরায় নির্বাচিত করার পথে প্রস্তাব-গত বাধা অপসারিত করতে চান। কিন্তু খুব সহজে তা হবে না এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীকামরাজ যে দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হতে পারছেন না কংগ্রেসে দেশাইজাটের ভোড়জোড়ে সেরকমই আশংকা হয়। দেশাই জলের মনোনীত ব্যক্তি হলেন নাকি শ্রীমতী মিজলক্ষ্মী পাণ্ডিত অথবা শ্রীজগজীবন রায়।

কামরাজ পক্ষেও যে এ আই সি সি অধিবেশনের জন্য বেশ জোরের প্রস্তুতি চলছে কংগ্রেস সভাপতি কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করে অভিজ্ঞমহল সেই ধারণায় উপনীত হয়েছেন।

শোনা যাচ্ছে, শ্রীকামরাজ নাকি কর্মব্যস্ততার দরুণ এবছর তাঁর সোবিয়ট সফর বাতিল করে দিতে পারেন। বর্তমান বছরেই



শ্রীনারায়ণ

সোবিয়ট আমন্ত্রণ রক্ষা করবেন বলে পূর্বাঙ্কে সম্মত হলেও সম্ভবত তিনি সফরসূচী আগামী বছর নির্দিষ্ট করবেন। আর তা করলেও একমাত্র কংগ্রেস সভাপতিরূপেই তিনি সেখানে যাবেন বলে মনে হয়।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন ধারণা করা হয়ত অধোক্তিক নয় যে, শ্রীকামরাজ পুনর্নির্বাচন ব্যাপারে প্রায় নিঃসন্দেহী আছেন। তবে তিনি সবসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হওয়ারই পক্ষপাতী।

মোরারজী জেট কতদূর দল গড়তে পারেন, রাজনৈতিক মহলের দৃষ্টি এখন সেদিকেই নিবদ্ধ।

উত্তর প্রদেশ :

স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ



শ্রীকামরাজ

ব্যবস্থাতার উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিটমাটের স্তরে উন্নীত হয়েছে বলে সংবাদ দিয়েছেন ইউ-এন-আই।

হাইকমান্ডের নির্দেশে মাননীয়কে মান্য করার উপদেশ বার্ষিত হয়েছে এবং কংগ্রেস সংগঠন ও মন্ত্রিসভার সমতুল মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাংগঠনিক ব্যাপারের প্রশ্নে বলা হয়েছে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির নির্দেশই গ্রহণ করা উচিত, যেমন মন্ত্রিসভার ব্যাপারে আলোচনা করার দরকার মধ্যমস্তরীর সঙ্গে।

মন্ত্রিসভা-সমর্থক দলের দৃষ্টি নির্বাচন সম্পর্কীয় প্রস্তাবও মেনে নিয়েছেন রাজ্য কংগ্রেস কমিটি। প্রস্তাবানুসারে একান্তরীতি জেলা কমিটির মধ্যে যে বাহ্যিকটি এলাকার উত্তরপক্ষের উপদলীয় শক্তি সমতুল, সেখানে উত্তরপক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাচনপ্রার্থীদের আবেদনপত্র পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন। সম্ভবত অক্টোবরে নির্বাচন শুরু হয়ে শেষ হবে বর্তমান বছরের শেষদিকে।

তা ছাড়া স্থির হয়েছে, রাজ্য কংগ্রেস সদস্যপদ প্রার্থীদের দের চাঁদা ও আবেদনপত্র জমা রাখবেন ব্যাংকে।

বিবাদ অন্ততপক্ষে নির্বাচনের সময় যে কোনোরূপ বিষয়-বিপত্তি সৃষ্টি করবে না উত্তরপক্ষের মিটমাটে অন্তত স্টেটকু নিশ্চিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

বিহার :

বিহারী কংগ্রেস কেন্দ্রের বোকাপাড়ার নামের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন মধ্যমস্তরী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় নিজে। কংগ্রেস বা অন্যত্র সম্ভব করে তুলতে পারেন নি শ্রীসহায় সেই কঠিন কাজটি সুসমাপিত করলেন। বিহারের মন্ত্রিসভা-বিরোধী ও মন্ত্রিসভা-সমর্থক গোষ্ঠীর মধ্যে আবার ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অবশ্য এক্ষেত্রেও দুই অথবা অদূর ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারেন না। তবে কোনোক্ষেত্রেই তেমন গ্যারান্টি কি সম্ভব। তবে বিহার কংগ্রেসের ইতিহাসে এ ঘটনা সামান্য নয়। শ্রীসহায় নিজে তালিকাভুক্ত বৈঠকের বাইরে পাণ্ডিত বিনোদানন্দ কা-এর সঙ্গে স্বতন্ত্র বৈঠকে মিলিত হয়ে মিটমাটের পথ অনেক পরিষ্কার করে নিয়েছেন।

ফলত রাজ্য কংগ্রেস ও রাজ্য সরকারে কিছু কিছু রদবদল সুনিশ্চিত। ক্যাবিনেটে প্রবেশের জন্য যে দৃষ্টি নাস্ত, বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে তাঁদের দুজন হলেন, প্রাক্তন স্টেট মিনিস্টার শ্রীদারোগা রায় এবং শ্রী এল এন বা। প্রাক্তন উপমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণকান্ত সিংহকেও সম্ভবত বাদ দেওয়া হবে না। তবে তাঁর ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন।

কেন না বর্তমানে তিন লোকসভার সদস্য। পশ্চিম বা রাজ্যপাল পদের জন্যই অধিকতর ইচ্ছুক। কারণ সরে থাকার ফলে আগামী নির্বাচনে তাঁর বিজয় অভিযান সার্থক হতে পারে।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, এই বোঝাপড়া ঘরান্বিত করার মূলে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহের সংগে শ্রীসহায়ের বিরূপ সম্পর্ক অনেক বেশি কাজ করেছে। শ্রীসিংহই ছিলেন শ্রীসহায়ের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। তাঁর সংগে বিরূপতার জন্যই শ্রীসহায় তাড়াতাড়ি মন্ত্রিসভা-বিরোধী দলের সংগে হাত মিলিয়ে ফেলেন। প্রসংগত উল্লেখ্য একা গঠন সম্পর্কিত বৈঠকে শ্রীসিংহকে ঘর দেওয়া হয়েছিল।

বিশ্বক বিহার

রাজ্যব্যাপী অজন্মা ও অনাবৃষ্টি বিহারকে প্রায় দর্ভিক্ষ এলাকার পরিণত করেছে। মোটা চালের দামই উঠেছে পঞ্চাশ টাকা। বিশেষ সর্বনাশা অবস্থা দেখা দিয়েছে উত্তর বিহার ও কোশী অঞ্চলে। কোশী অঞ্চলে ছুটার ভাগ্য তো আগেই পড়েছিল বর্তমানে অন্যান্য শস্যও অনুরূপ অবস্থায় পতিত হয়েছে। এখন দরিদ্রসাধারণের খাদ্য বলতে বোঝায় পাট পাতা ও জংলা ফল। রাজ্যের অন্যত্রও ধান রোয়া হয় নি, তবে বৃষ্টি হলে এখন রোপণ কার্যের সময় আছে বলে আশা রাখা যায়। কিন্তু বর্তমানকে সামলে ওঠাই এখন সমস্যা।

খাদ্যাভাবে জিনিসপত্রের দাম গগনচুম্বী। তাত্ত পাত্তা গেলো সৌভাগ্য। না পাত্তা গেলোও বলবার কিছু নেই। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরও যদি সাহায্যের বাণী বিতরণ করেন তত্হাচ আতঙ্কিত বিহার রাজ্যে তার প্রতিক্রিয়া এমন কিছু সফল প্রসব করবে বলে মনে হয় না।

বিহার যে ঘাটীত এলাকা এবিষয়ে বিসম্বাদের অবকাশ নেই। কিন্তু এবছর অবস্থা চূড়ান্ত পর্বায় উপনীত। সরকারী সংখ্যাতত্ত্বে গত বছরের ঘাটীতর পরিমাণ ছিল তিন দশমিক পাঁচ লক্ষ টন। এবছর জানুয়ারী মাসে অবস্থা ছিল আশাব্যক্ত। ১৯৬০-৬১তে যখন উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৪ দশমিক তিপায় লক্ষ টন তখন এবছরের জানুয়ারী মাসে ধানের ফলন হয়েছিল ৪৮ দশমিক ১০ লক্ষ টন। তখন কে ভেবেছিল বছরের মাঝামাঝি গাছের পাতা চিবিয়ে জংলি ফল খেয়ে জীবনধারণ করতে হবে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় হল, গত দশ বছরে বিহার যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন করতে পারে নি এবছর সেই উৎস্ব ফলন দেওয়া সত্ত্বেও কোনো সফল পাত্তা গেল না।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং ঙ্ নাধারণ ভেবেছিলেন এবার ঘাটীতর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ঘাটীতর অঙ্ক গিয়ে দাঁড়িয়েছে এগার লক্ষ টনে।

কিন্তু কেন এমন হল। রাজ্য সরকার বলছেন, হবে না-ই বা কেন। তিন দশমিক পাঁচ লক্ষ টন ঘাটীতর হিসেব সেই মাধ্যমের আমলের, ১৯০৮ সালের। সে হিসেব বর্তমানে পাটে গেছে। যুক্তিয সাবস্তা এক কথায় উড়িয়ে দেওয়ার নয়। কিন্তু রাজ্য সরকার এক জায়গায় গিয়ে প্রচণ্ড হোঁচট খেয়েছেন। অধিক ফলন সত্ত্বেও বাজারে বিক্রয়যোগ্য চালের পরিমাণ কেন কম ছিল, এ প্রশ্নের কোনো মুখমত জবাব তাঁরা দিতে পারেন নি।



শ্রীকমলেন্দু সহায়

এক চমকপ্রদ সংবাদে পাত্তা গেল, পশ্চিম বিনোদানন্দ কা-এর মারফৎ। পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ, বিহারের চাল নাকি চীনে চোরগোস্তা রপ্তানি করেছে লোভী ব্যবসায়ীরা। মণ প্রতি সে চালের অতিরিজ্ত মুনাকা এসেছে বর্তমান দরদাম অনুযায়ী দেড়শ টাকা। চীন দেশ চাল কিনেছে মণ প্রতি দুশ টাকা দরে।

কিন্তু ম্বারভাঙ্গা মহারাজার ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকা (যা সমর্থক বলে সুবিদিত) তাই শূনে তড়িৎঘড়ি সাংবাদিক পাঠিয়েছিলেন নেপাল সীমান্তে। সাংবাদিক সফরে কিন্তু জানা গেল উপরোক্ত সংবাদ ডাহা ভিত্তিহীন। বরং নেপালের চালই না-কি রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে অনাহার প্রতিরোধ ও মূল্য কমানোর উদ্দেশ্যে অংশ গ্রহণ করেছে

সহায় সরকার সতরাং উক্ত সংকট পড়েছেন। একদিকে তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সরকারী লেভী এড়িয়ে রুইকাংলা চাউল ব্যবসায়ীরা মাল সরিয়ে ফেলেছেন ও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি, অন্যদিকে রাজ্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদীরা অবিরত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। সুতরাং সহায় সরকারকে পুনশ্চ খাদ্যবস্তুর ব্যাপারে স্টেট ট্রেষ্ট্রিং প্রবর্তনার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হয়েছে।

কিন্তু যে গরু ল্যাজে কাটা হয়েছে সে এখন মাছি তাড়াতে কেমন করে। তাঁর একবার ফসকে গেলে আবার কি তা জা বন্ধ করা যায়।

মহীশূর :

আসন্ন এ-আই-সি-সি অধিবেশন

প্রস্তাবিত এ-আই-সি-সি অধিবেশনের অনুষ্ঠান বাঙ্গালোরেই আয়োজিত হচ্ছে, তবে অধিবেশন সুসমাপিত হবে কিনা এতৎ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে অভিজ্ঞ ঘনিষ্ঠ-মহলে আলোচনা চলছে। মহীশূরের অর্থ-মন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ হেগদে নাকি কংগ্রেস সম্পাদককে এই মর্মে সতর্ক করেছেন যে, গোয়ার ভাগ্য নির্ণয় সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতিতে অধিবেশনের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়ত কঠিন হতে পারে।

মহীশূর বিধানসভার কাঁতিপন্ন সদস্য ইতিমধ্যেই রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র পেশ করে বসেছেন। এঁদের দ্বারা অধিবেশনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারে অমূলক নয়।

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনমোহন বসন্ত

শাব্দ-জ্যোৎস্না—চারিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—

অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধঃখর

চল্লস ভিক্টোর

ডাকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিষন্দী কথাশিল্পী—সর্বরসের

অনন্ত নিষ্কার—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ওপ-

ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—মিকোলাস মিকলবি :

বারনাব রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য

অগতের এই গুণ্যপ্রভা মাত্র ১০ টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লি :

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট

কলিকাতা-১২



হেলসিংকিতে বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদের একাংশ

ভিয়েতনাম:

ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হ্যানয়ে প্রেরিত ডেভিস মিশন ব্যর্থ হয়েছে। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের কমনওয়েলথ শান্তি মিশনের সঙ্গে চীন, উত্তর ভিয়েতনাম ও সোভিয়েট ইউনিয়ন কোনরূপ আলোচনা করতে অস্বীকার করার পর উইলসন তাঁর মন্ত্রিসভার সহকারীমন্ত্রী হ্যারল্ড ডেভিসকে হ্যানয় পাঠিয়েছিলেন।

হ্যারল্ড ডেভিস অনেক চেষ্টা করেও উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিন বা প্রধানমন্ত্রী ফাম-ভন-ডঙ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন নি। তাঁর সঙ্গে কেবল কমতাসীন ফাদারল্যান্ড ফ্রন্টের কয়েকজন নেতার আলোচনা হয়েছে। তাঁরা পরিষ্কার জ্ঞানিয়ে দিয়েছেন, ভিয়েতনামের ব্যাপারে তাঁরা বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারও সঙ্গে কোন আলোচনা করতে প্রস্তুত নন। আলোচনার পরিবর্তে তাঁরা ডেভিসকে মার্কিন বোমাবিক্ষেপিত জায়গাগুলি দেখাবার জন্যই বেশি ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন।

হ্যারল্ড উইলসন ১২ই জুলাই কমন্স-সভায় এক বিবৃতিতে ডেভিস মিশনের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। তবে তিনি

সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, শান্তি স্থাপনের জন্য বৃটিশ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কম্বোডিয়ার প্রশ্নে জেনেভা সম্মেলনের মত সম্মেলন আহ্বানের জন্য বৃটেন প্রস্তাব করেছে। কম্বোডিয়া সম্পর্কে আলোচনার সময় পরোক্ষভাবে ভিয়েতনামের বিষয়েও আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে বৃটেনের এই প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ মানবে কি না বলা শক্ত।

ভিয়েতনামের ব্যাপারে আলোচনা ও শান্তি স্থাপনের জন্য নানা দিক থেকেই চেষ্টা চলছে। কমনওয়েলথ শান্তি মিশনের আশা ব্যর্থ হলেও, এই মিশনের অন্যতম সদস্য ঘানার রাষ্ট্রপতি কোয়ামে এনক্রুমা ভিন্ন ভাবে তাঁর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ইতিমধ্যেই পিকিং ও হ্যানয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। শোনা যাচ্ছে, হো-চি-মিনের আমন্ত্রণে শীর্গিরিই তিনি অথবা তাঁর কোন প্রতিনিধি হ্যানয় যাচ্ছেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিনডন বি জনসনের প্রামাণ্য প্রতিনিধি অ্যাডেরাল হ্যারিমান গট সন্তোহে মস্কোর সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে শান্তির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও ভিয়েতনাম

যুদ্ধের বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে কোন আলোচনা বৈঠকের অনুষ্ঠান করা বাবে বলে মনে হয় না। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে আপোষ-আলোচনার জন্য অতান্ত ব্যগ্র হয়ে উঠলেও, চীন বা উত্তর ভিয়েতনাম এ ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়। তারা কোন আলোচনার বসতে চায় না।

সম্প্রতি হেলসিংকিতে বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। এই অধিবেশনে ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং অবিলম্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ করতে ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণ করতে বলা হয়েছে।

বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসে মার্কিন প্রতিনিধি চার্লস গড্ডনেট ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা করেন। গড্ডনেট তাঁর এই বক্তৃতার জন্য বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। কিন্তু গড্ডনেট যখন প্রস্তাব করেন, ভিয়েতনাম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল পিকিং, হ্যানয়, ওয়াশিংটন, লন্ডন, মস্কো ও ভিয়েত কং-দের কাছে পাঠানো হোক, তখন চীনা প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন।

সাপ্তাহিক বসুমতী

বুটেন ভিয়েতনামের ব্যাপারে মার্কিন নীতির সমর্থক, সুতরাং কমনওয়েলথ শান্তি মিশনের সঙ্গে কথা বলা হবে না। কিন্তু বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগতি কেন?

আসল কথা, উত্তর ভিয়েতনাম বা চীন আর কোনরূপ আলাপ-আলোচনা চায় না। দক্ষিণ ভিয়েতনামের তিন-চতুর্থাংশ এখন বিদ্রোহী ভিয়েত কং-দের দখলে। ভিয়েত কং অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ করে সুবিধা করে উঠতে পারছে না, দক্ষিণ ভিয়েতনামেও বিদ্রোহী গেরিলাদের সঙ্গে পেতে উঠছে না। সুতরাং পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহীদের তথা উত্তর ভিয়েতনাম ও তার মদ্রদ্বীপ চীনের অন্তর্ভুক্ত। এ অবস্থায় আপোষ করবে কেন? আপোষ করতে গেলেই হয়তো দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিন সমর্থনপুষ্ট শাসনকে মেনে নিতে হবে। আর যেমন যুদ্ধ চলছে, তাই যদি চলে তবে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র অঞ্চল কমিউনিস্টদের হাতে আসবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনঙ্গমায়ী দল সম্পূর্ণ পরাস্ত হতে পারে। এই আশাতেই উত্তর ভিয়েতনাম ও চীন আলোচনার সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছে।

ঠিক হয়তো আবার এই একই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার বন্ধু বুটেন আজ আলোচনায় বসার জন্য এত ব্যগ্র। কই, আগে তো তারা কখনও আলোচনার জন্য এত উৎসাহ দেখায় নি!

ভিয়েতনাম পরিস্থিতি যে বেশ খারাপ হয়েছে তা ম্যাকগোয়েল টেলরের পদত্যাগ ও নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতিরূপে হেনরী ক্যাবট লজের নিয়োগের মধ্য দিয়েই বোঝা যায়। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারা ও

নতুন রাষ্ট্রদূত লজ সাধারণ পেরিছেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ভিয়েত কং-দের বিরুদ্ধে অভিযানের দ্বারা কিছুটা পরিবর্তন করা হবে বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে সাধারণ আরও কয়েক হাজার মার্কিন সৈন্য এসে পৌঁছেছে।

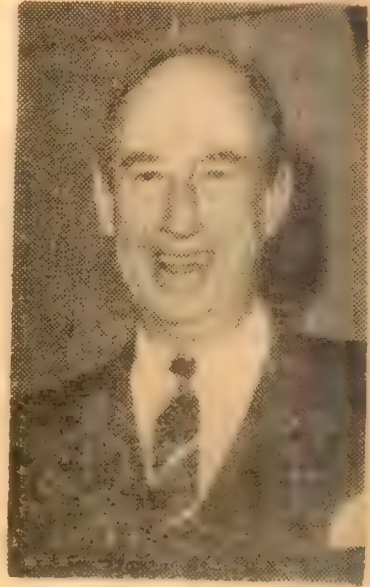
মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসনও বলেছেন, ভিয়েতনামের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। 'শীগগিরই অস্বাভাবিক ঘনিষ্ঠ আসবে', এমন কথা তিনি বলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের যুদ্ধকে আরও জোরদার করার কথা ভাবছে। বিদ্রোহীদের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও বিপরীত দিকে মার্কিন সামরিক প্রচেষ্টা বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সতর্কবাণীর ফলে অবস্থা খুবই খারাপ হতে দাঁড়িয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি আদলাই স্টিভেনসন অকস্মাৎ লন্ডনে মারা গিয়েছেন। আগের থেকে কোন অসুখ হয় নি, হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

স্টিভেনসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। ডেমোক্রাটিক পার্টিতে তাঁর স্থান ছিল অত্যন্ত উচ্চ। তিনি পর পর দু'বার রাষ্ট্রপতি পদের জন্য রিপাব্লিকান প্রার্থী আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। রাষ্ট্রসংঘে তিনি তাঁর বক্তৃতা ও আচরণের জন্য অন্যান্য দেশের কূটনীতিকদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। সব সময়ে সকলে তাঁর সঙ্গে একমত হন নি সত্য, তবু সবাই তাঁর বক্তৃতা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন।

স্টিভেনসনের মৃত্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে



স্টিভেনসন

রীতিমত শোকের ছায়া নেমেছে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। রাষ্ট্রপতি জনসন স্বয়ং শবানুগমন করেন। উপ-রাষ্ট্রপতি হুবার্ট হামফ্রে নিজে লন্ডন গিয়েছিলেন মৃতদেহ স্বদেশে নিয়ে আসার জন্য। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাশ্ট, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও বিশ্বের রাষ্ট্রনায়করা স্টিভেনসনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

কিন্তু এই শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি মৃত্যুর সামান্য পূর্বে স্টিভেনসনের কয়েকটি মন্তব্য নিয়ে সর্বত্র তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

লন্ডন গমনের পূর্বে স্টিভেনসন প্যারিসে এক ভোজসভায় বলেছেন, 'ডোমিনিকান রিপাব্লিকে মার্কিন নীতি আগাগোড়াই ভুল।' ডোমিনিকানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কোন মতেই দমর্থনযোগ্য নয়।

ডোমিনিকানে কিউবার মত কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে বলে মার্কিন কর্তারা যে কথা বলেছেন, স্টিভেনসন তা বিশ্বাস করেন না।

স্টিভেনসন আক্ষেপ করে বলেন, রাষ্ট্রসংঘে তিনি ডোমিনিকানে মার্কিন নীতির সমর্থনে বক্তৃতা করেছেন বটে, কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা নিয়ে বিশ্বাস করেন নি!

ডোমিনিকান সংস্কৃতির ছয় সপ্তাহ তাঁর জীবনের অত্যন্ত অস্বস্তিকর সময়। তাঁর নিজের ভাষায় : 'জীবনের কয়েকটি বৎসর ফুরিয়ে গেছে।'

বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মের স্বদেশে ক্ষত-বিক্ষত স্টিভেনসনের পরমায়ু শেষ হয়ে আসছিল, তিনি কি তা টের পেয়েছিলেন?



একটি ম্যাকনামারার সঙ্গে ক্যাবট লজ

না হলেও মৃত পূর্বকণ্ঠে এমন কথা তিনি বলেছেন কেন?

প্যারিসের রাজসভার জনসনের ভ্রাম্যমাণ কূটনৈতিক দূত অ্যাডেরান হ্যারিমানও উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্ট্রিভেনসনের এই সব মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং মার্কিন নীতির স্বপক্ষে কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু হ্যারিমান বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেন নি।

অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, ভিন্নতর্যাম ও ভৌম-নিকান রিপাব্লিকে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে, মার্কিন বৃত্তরশ্মির উচ্চতম পর্বত্রে আশ্রয়ন দৃঢ় হয়েছে। স্ট্রিভেনসনের এই 'মৃত্যুকালীন জ্ঞানবন্দী' ভরাই প্রমাণ।

* * *

প্যারিসে, ক্যান্টোনিয়া : মার্কিন মহাকাশযান স্যারিয়ার-৪ মঙ্গলগ্রহ থেকে যে ছবি পাঠাচ্ছে তাতে এই রহস্যময় গ্রহের কুহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে উঠছে। মঙ্গলগ্রহ থেকে তৃতীয় যে চিত্র পৃথিবীতে পৌঁছেছে তাতে আনেনরিগিরির জ্বালামুখের মতো ১২ মাইল ব্যাসের এক গহ্বর দেখা গেছে। ১৫ই জুলাই পর্যন্ত পৃথিবীতে যে ছ' খানা ছবি এসেছে তার প্রথম তিনখানায় আরো এক গ্রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ছবি-গুলোতে মঙ্গলগ্রহে যে ছায়া দেখা গেছে তা সূর্যের নয়, তার কারণ সূর্য তখন বিপরীত দিকে এবং প্রায় সোজাসুজি নীচের দিক থেকে কিরণ দিচ্ছিল (তখন মঙ্গলগ্রহের সময় মধ্যাহ্ন ১২টা)। তবে এই ছায়া কিসের?

স্যারিয়ার-৪ মহাকাশযান থেকে মঙ্গলগ্রহের বেসব বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আলোকচিত্র পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে, তা থেকে মঙ্গলগ্রহের প্রাথমিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল বেরূপ মনে করা হয়েছিল ঠিক সেরূপ নয়, তার চেয়ে অনেক পাতলা এবং পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের বেরূপ সাদৃশ্য আছে, চাঁদের সঙ্গে সাদৃশ্য তার চেয়ে অনেক বেশি। তবে জেট প্রোপালসান লেবরেটরীর বিজ্ঞানিগণ বলেন যে, তারা এখনো আশা করছেন, মঙ্গলগ্রহে কিছু জীবনের চিহ্ন তারা দেখতে পাবেন।

প্রথমে বেসব তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছিল, তা থেকে আভাস পাওয়া যায়, মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল হয়ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ন্যায় শতকরা এক থেকে দু' ভাগ ঘন এবং প্রধানত নাইট্রোজেন, সামান্য আর্গন, কার্বন-ডায়োক্সাইড এবং জলীয়বাষ্প নিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানীরা বলেন, এরূপ অবস্থার পৃথিবীতে জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, এরূপ কিছু জীবনের চিহ্ন মঙ্গলগ্রহে বিদ্যমান থাকতে পারে। কিন্তু এই জীবনের আকার

কিরূপ, বিজ্ঞানীদের তাই জিজ্ঞাস্য। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, মঙ্গলগ্রহে জীবাদ আছে, তবে সকলে এই বিষয়ে একমত নয়। আলিজেন ছাড়াও জীবাদ বাঁচতে পারে, অতএব মঙ্গলগ্রহে জীবনে সম্ভব না হলেও একেবারে প্রাণের অস্তিত্ব সেখানে নেই, একথা বিশ্বাস করা যায় না।

তিউনিসিয়া :

তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি হোসেন বরগুইবা চীনের বিরুদ্ধে কয়েকটি স্পষ্ট কথা বলেছেন।

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর এক টেলিভিশন কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে তিনি চীনকে বর্তমান যুগের 'নতুন সাদ্জাবাদ' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ভারত ও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া গ্রাস করার জন্য



হোসেন বরগুইবা

চীন আজ ব্যাপ্ত।' আদর্শের অন্তরালে চীন সর্বত্র তার ঔপনিবেশিক প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। এশিয়া ও আফ্রিকার কাছে প্রধান বিপদই হল চীন।

বরগুইবা এই টেলিভিশন সাক্ষাৎকার আরও বলেন যে, তিনি নভেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে যাবেন, বিশেষ করে চীনের মুখোশ খুলে দেবার জন্য। এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রনায়কদের তিনি সাবধান করে দেবেন চীনের চক্রান্ত সম্পর্কে।

আরব-ইজরায়েল বিবাদরব-নিষ্পত্তির করেছেন বলেই বরগুইবা রাতারাতি প্রতি-ক্রিয়াজীব হয়ে যান নি। বরগুইবা আরব জগতের একজন বিশিষ্ট নেতা। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে তিউনিসিয়ার মর্যাদার আসন রয়েছে। সম্প্রসারণবাদী চীনের বিরুদ্ধে

তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি বরগুইবার এই সতর্কবাণী তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আলজিয়ার্সে গত মাসে জোর করে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে গিয়ে চো-এন-লাই আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলির নিন্দ্য-ভাজন হয়েছেন। আরব জগৎ তথা আফ্রিকার অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক বরগুইবাও চীনের সমালোচনা করলেন। আফ্রিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই আজ চীন সম্পর্কে দ্রুত মোহমুগ্ধি ঘটছে।

ফ্রান্স :

ফ্রান্স কমন মার্কেটকে বরকট করেছে। গত সপ্তাহে ব্রাসেলসে যুরোপীয়ান ইকনমিক কমিটির (ই-ই-সি) অধিবেশনে ফরাসী প্রতিনিধিরা যোগ দেন নি। এরপর হঠাৎ আবার ই-ই-সি'র স্থায়ী ফরাসী প্রতিনিধি জঁ মার্ক-বোয়েগনারকে ব্রাসেলস থেকে প্যারিস ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

চার্লস দ্য গল কখনও কমন মার্কেটকে ভাল চোখে দেখেন নি। তবু তিনি একে মেনে আসছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি যোভাবে কমন মার্কেটের কর্মসীমা বিস্তৃত হচ্ছে, তাতে দ্য গল রীতিমত বিচলিত বোধ করছেন। যুরোপীয় একেবারে আদর্শের তিনি ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু ধীরে ধীরে কমন মার্কেট সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছে। কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির কৃষকদের জন্য অর্থসাহায্য দানের বিষয়ে ৩০শে জুনের মধ্যে ই-ই-সি'র নীতি নির্ধারণের কথা ছিল। কিন্তু ৩০শে জুনের মধ্যে ই-ই-সি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে নি। দ্য গলের ধারণা, কৃষকদের সাহায্য দানের বিষয়ে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ই-ই-সি'র কর্মপরিবদ ও স্ট্রাসবোর্গে অবস্থিত যুরোপীয় পার্লামেন্টের হাতে দেবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আর এই ব্যাপারে পশ্চিম জার্মানী ও ই-ই-সি'র জার্মান সভাপতি ওয়ালটার হলস্টাইনই প্রধান উদ্যোগী।

দ্য গল এইরূপ 'অতিজাতীয়তা' বা 'supra-nationality'-এর বিরোধী। তার বক্তব্য, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি বা মন্ত্রীরা বসে পারস্পরিক স্বার্থসম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তার পরিবর্তে ৬টি বা তারও বেশি যুরোপীয় রাষ্ট্রের স্থায়ী কর্মপরিবদ বা আইনসভা জাতীয় কিছু করা চলবে না।

কমন মার্কেটের অপর পাঁচটি রাষ্ট্র ফ্রান্সকে খুশি করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছে। ১৯৫৮ সালে কমন মার্কেটের প্রতিষ্ঠা ও ফ্রান্সের এই অর্থনৈতিক সমস্যার যোগদানের পর থেকে কমন মার্কেটের অন্য পাঁচটি দেশে ফ্রান্সের কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানী ২৫৩ পার-সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবু ফ্রান্স খুশি নয়। তার ভর, যুরোপীয় একেবারে ফলে পশ্চিম যুরোপে ফ্রান্সের আধিপত্য কমে যাবে এবং পশ্চিম জার্মানীর প্রাধান্য বাড়বে।

সাপ্তাহিক বসুমতী

আপাতত গ্রাসেলস থেকে ফরাসী প্রতি-
নিধি চলে এলেও এবং কোন ফরাসী
প্রতিনিধি কমন মার্কেটের কোন সভা-
দর্শিততে যোগ না দিলেও ফ্রান্স এখনও
কমন মার্কেট ত্যাগ করে নি। অনেকেই
হারবা, শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স কমন মার্কেট ত্যাগ
করবে না, তবে কূটনৈতিক চাপ দিয়ে কমন
মার্কেটভুক্ত রাষ্ট্রগুলির অধিকতর সংহতি-
সাধনের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করার জন্য ফ্রান্স
চেষ্টা করছে।

ইয়েমেন :

ইয়েমেনের প্রধানমন্ত্রী আহমেদ মুহাম্মদ
নোমান পদত্যাগ করেছেন। রাষ্ট্রপতি
আবদুল্লা সালালের সঙ্গে গুরুতর মতভেদের
বশত নোমান পদত্যাগ করেছেন।

তিন বৎসর পূর্বে ইয়েমেনের রাজা ইমাম
ইদরকে গদীচ্যুত করে সংযুক্ত আরব প্রজা-
তন্ত্রের সমর্থনে ইয়েমেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত
হয়। নাসের-সমর্থক সালাল ইয়েমেনের রাষ্ট্র-
পতি। সৌদি আরবের প্রত্যক্ষ সমর্থন এবং
যুটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ সমর্থন-
পুষ্ট ইমাম বদরের অনুগামীরা কখনও প্রজা-
তান্ত্রিক সরকারকে স্বীকার করে নি। দেশের
বিভিন্ন স্থানে প্রজাতন্ত্রের সমর্থকদের সঙ্গে
রাজার সমর্থকদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই
আছে। উপজাতীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইমাম
বদরের প্রভাব কম নয়।

আহমেদ মুহাম্মদ নোমান প্রধানমন্ত্রী হবার
পর থেকেই ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধের অবসানের
জন্য চেষ্টা করে আসছেন। তিনি নিজে
প্রজাতন্ত্রের সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলেছেন
এবং বিভিন্ন উপজাতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে
দল্মেলন করেছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি
রাজধানী সানা থেকে বিশ মাইল দূরে খামেরে
এক শান্তি সম্মেলন আহ্বান করেন। এই
সম্মেলন থেকে ১ জন সদস্যবিশিষ্ট এক
শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।

ইয়েমেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা যখন
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই সূর্য হল
সালাল-নোমান কলহ এবং পরিণতিতে
নোমানের পদত্যাগ। কিছুদিন ধরেই সালাল
নোমানকে সহ্য করতে পারছিলেন না।
নোমানের জনপ্রিয়তায় সালাল বিচলিত বোধ
করাছিলেন। খামেরে শান্তি কমিটির প্রাধান্য
নষ্ট করার জন্য হঠাৎ তিনি এক সর্বোচ্চ
সামরিক পবিষদ (সুপ্রীম আর্মড ফোর্সেস
কান্সিল) গঠন করেন। সকল ব্যাপারে
ইয়েমেনে এই পবিষদের সিদ্ধান্তই হবে
চূড়ান্ত। এ বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে
পৰামর্শ পর্যন্ত করেন নি। প্রধানমন্ত্রী
নোমান এতে আপত্তি করলে সালাল নিজে সৈন্য
পাঠিয়ে সানা বেতারকেন্দ্র থেকে এই
সামরিক পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা

করেন। এই ঘটনার ক্ষুব্ধ হয়ে নোমান পদ-
ত্যাগ করে কারো চলে যান। নোমান অবশ্য
তার পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতি সালালের কাছে
পাঠান নি, তিনি তা পাঠিয়েছেন নবগঠিত
খামের শান্তি কমিটির কাছে।

সালাল নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন এবং
নিজেই তার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। নতুন
মন্ত্রিসভায় ১৩ জনের মধ্যে ১১ জনই সামরিক
অফিসার।

খামেরে শান্তি কমিটি নোমানের পদত্যাগ-
পত্র গ্রহণ করে নি। কমিটির সদস্যরা
নোমানকে আবার প্রধানমন্ত্রীরূপে ফিরে
পেতে চান। কমিটি স্থির করেছে, আবদুল
রহমান ইরানির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল
কাব্রোর গিরে নোমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে
তাকে ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ করবে।
ইয়েমেনের জনসাধারণের ওপর শান্তি কমিটির
প্রভাব যথেষ্ট। অধিকাংশ উপজাতীয় আজ এই
কমিটির সঙ্গে। এই অবস্থায় সালালের
পক্ষে শান্তি কমিটিকে উপেক্ষা করা সহজ
হবে না।

কিন্তু কথা হল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র
ও ডাব রাষ্ট্রপতি আবদুল গামেল নাসের কি
করবেন? নাসের কাকে সমর্থন করবেন—
সালালকে, না নোমানকে? সালাল নাসেরের
সমর্থনে ইয়েমেনের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। অপর
দিকে নোমানও দীর্ঘদিনের পুরোনো বিপ্লবী,
কাব্রোতে তার সমর্থকের সংখ্যাও কম নয়।
ইয়েমেনে বর্তমানে যে ৫০,০০০ মিলরীর
সৈন্য আছে, নোমান তা কালবোষ ফেরা পাঠাতে
চান এবং ইমাম বদরের অনুগামীদের সঙ্গে।
তিন আপোষ-রফার জন্য চেষ্টা করছেন বলেই
যে নাসের তার ওপর চটে যাবেন, একথা মনে
করার কোন কারণ নেই। মিলরীর সৈন্য
অপসারণ ও গৃহযুদ্ধের অবসানের পথ যদি
ইয়েমেনের সরকার নাসেরের নেতৃত্বে মেনে চলে,
তবে নাসেরের এতে আপত্তি হবে কেন? আব
নোমান সালালের বিরুদ্ধে গেলেও, তিনি
নাসেরের বিরোধিতা করবেন না।

নোমানকে প্রধানমন্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেয়া
এবং প্রধানমন্ত্রীর কাজে হস্তক্ষেপ না করার
জন্য নাসের কি সালালকে রাজি করাতে
পারবেন?

গ্রীস :

গ্রীসে গুরুতর বকম রাজনৈতিক সংকট
দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জর্জ পাপিন্দ্রু
পদত্যাগ, কিন্তু পরে তার ক্ষমতা ত্যাগে
অস্বীকৃতি এবং সর্বশেষে রাজা কনস্ট্যান্টাইন
কর্তৃক নতুন প্রধানমন্ত্রীরূপে জর্জ এথেনি-
সিয়াদিস-নোভাসের নিয়োগে যে নাটকীয়
পরিণতির উদ্ভব হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে
সমগ্র গ্রীসে প্রায় গৃহযুদ্ধের মত অবস্থার
সৃষ্টি হয়েছে।

জর্জ পাপিন্দ্রু'র দল ইউনিয়ন অব ই
সেপ্টার পার্টি' প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল
হলেও, মোটামুটি উদারনৈতিক। পাপিন্দ্রু
নেতৃত্বে গ্রীসে কিছু কিছু ভাল কাজ হচ্ছিল।
পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও সোভিয়েট ইউ-
নিয়নের সঙ্গে গ্রীসের সম্পর্কে যথেষ্ট উন্নতি
হয়েছে। গ্রীক রাজনীতির একদল প্রি-
ক্সিমাল ও দক্ষিণপন্থী অংশের কাছে
পাপিন্দ্রু সরকারের এইসব নীতি পছন্দ
হচ্ছিল না। কিছুদিন ধরেই পাপিন্দ্রু'র
বিরুদ্ধে চলাচল করছিল। উচ্চপদস্থ কয়েক-
জন সামরিক অফিসারও এই চক্রান্তের সঙ্গে
যুক্ত বলে শোনা যাচ্ছিল। এইসব সংবাদ
পেয়ে পাপিন্দ্রু কয়েকজন সামরিক অফিসারকে
বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু
পাপিন্দ্রু এই কাজের বিরোধিতা করলেন
প্রতিবন্ধকমন্ত্রী গাবোফেলিয়াস। গাবোফেলিয়াস
সামরিক অফিসারদের সমর্থন করলেন। এতে
ক্ষুব্ধ হয়ে পাপিন্দ্রু গাবোফেলিয়াসের পদত্যাগ
দাবি করেন। কিন্তু গাবোফেলিয়াস পদত্যাগ
করতে অস্বীকার করলেন। এ অবস্থায়
গাবোফেলিয়াসকে মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়িত
করা ছাড়া পাপিন্দ্রু'র পক্ষে আর কোন পথ
খোলা রইল না। কিন্তু গাবোফেলিয়াসকে
পদচ্যুত করতে রাজী হলেন না রাজা কনস্টা-
নটাইন। তিনি পদচ্যুতির আদেশপত্রে স্বাক্ষর
দিতে অস্বীকার করলেন। এম পব স্বয়ং
পাপিন্দ্রুই প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেন।
পাপিন্দ্রু'র পেছনে তার মন্ত্রিসভা ও
ইউনিয়ন অব দি সেপ্টার পার্টি'র অধিকাংশের
সমর্থন ছিল। সুতরাং পাপিন্দ্রু ভেবেছিলেন,
তার পদত্যাগের হুমকীর পথ রাজা তার কথা
শুনবেন এবং গাবোফেলিয়াসকে পদচ্যুত
করবেন।

কিন্তু রাজা সে পথ দিয়েও গেলেন না।
তিনি পাপিন্দ্রু'র পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে, নতুন
মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য পার্লামেন্টে স্বীকার
জর্জ এথেনিসিয়াদিস-নোভাসকে আহ্বান
জানালেন। নোভাস রাজার আমন্ত্রণ গ্রহণ
করে সঙ্গে সঙ্গে ১১ জন সদস্যের এ
মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এইসব দেখে
পাপিন্দ্রু ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দাবিভার
ত্যাগে অস্বীকার করেন। কিন্তু রাজা জোর
করে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন এবং নতুন প্রধান-
মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা তাদের কার্যভার গ্রহণ
করেছেন। সৈন্যবাহিনীর প্রধানেরা রাজা ও
নতুন মন্ত্রিসভার পক্ষে থাকার এই কাজ করা
সহজ হয়েছে।

জনসাধারণ কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটি
মেনে নিতে রাজী হয় নি। রাজধানী এথেন্স
ও অন্যান্য শহরে পাপিন্দ্রু'র সমর্থকরা বিক্ষোভ
প্রদর্শন করেছে। কয়েকটি ভাষগায় পলিশের
সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ হয়েছে। শতাধিক
ব্যক্তিকে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আদি সাহিত্য

ধারাবাহিক উপন্যাস



মহাশেহতা ভূমিচর্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

উপপ্ৰকাশ

এখন বিশালাক্ষীর মনে হল বড় স্বপ্ন এই সন্ধ্যা, বড় স্বপ্ন এইসব গল্প-কথা, এমন হেমন্ত সন্ধ্যা যেন তিনি আঁব দেখেন নি।

বুকের নিচ থেকে কেন ভয় উঠে এল?

এখন মাঝে মাঝেই ভয় আসে, শুধুই মনে হয় মনেকদিন হয় গেল তিনি ভাব বয়ে চলেছেন, এ সংসারের ভার। অবজ্ঞা, স্বার্থপর মনন, নতুন, অসহ্য ছোট বউ কুল, বৃদ্ধ মাহিন্দার, দুনিয়া, বাতিব পুনো দাসী, বড় সতীনের দাদা, সেই বর্ণীতে যাব মাথা কাটিয়ে দেব সেই বৈরাগী স্ববর্ণীত বাঘের আশ্রিত পাগল, সকলের ভার টেনে টেনে তিনি যেন বড় ক্লান্ত হয়েছেন।

কবে আসবে আনন্দ? সংসারের ভার মবে? কবে আসবে তার বড় বউ ফুলেশ্বরী, শানন্দীর বুকে হাসি ফুটবে? তা'ব আগে যে ঠাঁর ছুটি নেই। কিন্তু দাদা চলে গেলেন। বড় ছুটি সতী হলেন, বিশালাক্ষীর যে এখন সব সময়ে বড় একলা একলা লাগে। সব ভার তিনি বইবেন কেমন করে?

‘যদি যবে পিড়ীর আল ছোট বউ, মছোবেলা ঘর অন্ধকার বাধতে নেই।’

বিশালাক্ষী তুলেছে পাঁজ, চরকা, সব দিয়ে

উঠে পড়লেন। বুকের ভেতর দিয়ে কেবলই বাতাস বয়ে যায়। বাতাস বয়ে যায়, বিশালাক্ষী জানেন সব স্বপ্ন তাঁ'ব হবে না। তাঁ'ব একেবারে নিছক ক'রে কোম স্বপ্নই হবে না। কানাই, তাঁ'র নিছক ছেলে তাকে আঁব ফিরে পাবেন না। আনন্দীকে স্বামী করে জীবনে বিতৃ ক'বে দিবে যেতে পারলেই তাঁ'ব সব হবে।

হঠাৎ চমক ভাঙল। কানীশ্বর চলে গিয়েছে, একা তিনি দাঁড়িয়ে, সন্ধ্যার উঠানে, মাথাব ওপর ঘন নিশ্বাসে গাছেব পাঁতা'ব বাতাস বইছে, হেমন্তের বাতাসে, গা শিউবে ওঠে।

তখন কেন পঁচা ডাকল, ‘নিম্ন নিম্ন?’ আর সঙ্গে সঙ্গে ‘কেন বিশালাক্ষীর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল? ‘ঠাকুর, গোপালকে ভাল বোঝ।’ তিনি অক্ষুট বলে উঠলেন।

ঠিক সেই সময়ে আঁহারমাণিক গ্রাম থেকে অনেক, অনেক দূরে মেদিনীপুরের দক্ষিণে, উপান্তে, ভূমিপতি রাঘবের শাল, গজাড, পিরামেব জলন-বেরা অসিয়ারী গজাডনের কাছারিতে যবে বলে অসহ্য আনন্দীরাম দেখছিলেন, ভূমিপতি রাঘবের ভাগ্যে কেমন দাউ দাউ ক'রে সর্বনাশের আগুন জলছে।

আগুন সত্যিই জলছিল।

বড় নরম মাটির দেশ বাংলাদেশ। বড় তাড়াতাড়ি একটি বংশের সর্বনাশেব ভিত্তিতে অন্য একটি বংশ উন্নতির দেউল গড়ে। আঁহার বড় তাড়াতাড়ি লোভ, মোহ, এঁবনি ধাবা কোন যোগেব ছিন্নপথ ধরে সর্বনাশ চুকে পড়ে সে দেউল ভাঙতে থাকে। তখন আঁবার, আরো কোন সুযোগ-সম্মানী এলে আনাচে-কানাচে যোরে, কখন এদের আঁয়গায় জেঁকে ফলবে, সেই সুযোগ খোঁজে।

ভূমিপতি রাঘবেব রাজত্বও, গজাডনের মাটিতে চার-পাঁচশো বছর হবার আগে এল। সর্বনাশের দিনে বাঁখনা বড় ভাঙল।

অবচ ভূমিপতি রাঘবের সর্বনাশ হবার অন্যো ঘটল না। তিনি অতিরিক্ত ভাল হতে গিয়েছিলেন। মেদিনীপুর উড়িষ্যার প্রজিবেশী বলে, চিবদিন রাইয়ের শক্ত রাঢ়ে চুকবার সময় মেদিনীপুরকে পথ হিসেবে ব্যবহার করেছে।

পাঠান, মোগল, একদিনের পর্তুগীজ, অন্য-দিনের বগ, সবাইকে হার মানিয়ে দিল ঝটলার দত্তন শক্ত বর্ণীবা। মেদিনীপুরে তাই কোন শান্তি রইল না। থাকা বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। ঝটীরা এঁব আর গেল মেদিনীপুরের পথে,

মহাশয় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কতবার গেলেন মেদিনীপুরের পথে, তাবপব বগীরা ত' আর গেলই না। উড়িয়া আর মেদিনীপুরের কত জায়গায় ঘাঁটি কবেই রয়ে গেল।

ভূমিপতি রায় তাই, যখন দেখলেন প্রজারা উৎসাহ হয়ে গেল, চাষের জমি গজাভজাফলে ঢেকে গেল, তখন তাঁর সাথ গেল তিনি অতিরিক্ত ভাল হবেন।

তিনি এখন আনন্দীরামকে ডেকে বললেন, 'বাবা, তুমি আমার জীবনী লিখতে চেয়েছিলে না?'

'হ্যাঁ।'

'তা দেখ, আমার কীতি লিখতে গেলে তুমি ত' এইসব কথা লিখতে, ভূমিপতি রায় কত মহৎ, সে প্রজাদের বসন্ত করাবার জন্যে ধনভাণ্ডার খুলে দিয়েছিল। কৃষ্ণ মাহিতীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ কাহনকড়ি ধার করে, বগীদেল ঋজনা দিয়েছিল, এই ত'।'

আনন্দীরাম সাধা নাড়লেন। যে ভূমিপতি বাবাকে তিনি দেখেছিলেন, নিরাসক্ত, নির্লোভ, সাত্ত্বিক বৃদ্ধ, তিনি এই ক'দিনেই ঘললে গিয়েছেন। ঢিলে চামড়া তুলে বেঁধে কেলেছেন, গাঁদাবশুক সাক ক'বে বাক্স ঠেসে তৈরি ক'বে রেখেছেন, ঘন ঘন স্রবাপানে শক্তি লক্ষ্য করছেন। এখন আর দেখলে ভাল হয় না এই ভূমিপতি বাবাই একদিন হিজলীর পূর্বাঙ্গী জলময়, দুর্বল লোভ ও চুড়া লুণ্ঠিয়া, এবং প্রতিবেশী কৃষ্ণ মাহিতীর সেনাগামকে দু'হাতে ঠেকিয়ে রাখতেন।

'আমি বলে যাই, তুমি শুনে রাখ, পরে লিখে বেধ, কুলে ঠাকুর?'

ভূমিপতি বাব হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসলেন। বৃদ্ধের মুখে অন্য সময়ে, এমন হাসি বড় অশ্লীল শোনাত, এখন শোনাল না। এখন অসমর্থ। বৃদ্ধের সময়ে, অশান্তির সময়ে, মানুষ স্বাভাবিক থাকে না। তাই ভূমিপতি অস্বাভাবিক হয়েছেন।

'আমার পতন হল অতি ভাল হতে গিয়ে। তুমি লিখে বেধ, ভূমিপতি রায় মহাহর্ষ, কেন না চারদিকে সবাই যখন বজ্জাতি করছে, যে যার কাছ গোছাচ্ছে, তখন সে হঠাৎ দেবতার মত ভাল হতে গেল। আবে ভাল ক'রে বজ্জাত মানুষই হতে পারলাম না, ভাল মানুষ হব কি করে? বাস্। জমি ঠিকে ডল হয়ে গেল। আজ, বুঝলে বাবা, যদি বেশ ভালমত খল মানুষ হতে পারতাম, তবে রাজ্যটা আমার থাকত। ভাল হতে গিয়ে সব জলাঞ্জলি দিলাম।'

আনন্দীরাম নিরুত্তর।

'এখন কৃষ্ণ মাহিতীকে বারোলাক্ষ কাহনকড়ি দিতে হবে। ওদিকে বগী বেটারা আমার এসে জালাচ্ছে। নবাব বলছে ঋজনা

না নিলে তুমি এবার গেল। এক-একবার মন বলছে যাই, বগীদেল কাছে ঋজনা দিয়ে মুচলেকা লিখে দিই, নবাবের শাসন মানব না। 'সেটা ভাল হবে।'

আনন্দীরাম এ কয়দিন ধরে বৃদ্ধকে সেই সর্বনাশ থেকেই-ঠেকিয়ে রেখেছেন।

'আহা, তুমি ত' ভাল কথাই বলছ যে। কিন্তু এখন আমার সর্বনাশের পালা, আল দিয়ে কি বান আটকানো যায় বে বাপু? এ হ'ল কংসাবতীর বান। যোর বর্ষার কংসাবতীতে বান আসে লেখ নি? আমার সর্বনাশ এখন তুমি কুলেই আসছে।'

এখন দু'বে থেকে শোনা গেল মাদলের বাজনা, তীব্র উল্লাস।

'যাদের জন্যে এত কলার, সেই লোভ প্রজারা কোনদিন আমাদের শাসন মেনে নেয় নি। ওরা বিশৃঙ্খল, কবত আমাদের বংশের দু'দিনে ওদের সেই বীরবুড়া দেবতা হয়ে ফিরে আগবে।'

'হানি।'

'বীরবুড়া দেবতা নয়, সে মানব। তাকে আমরা মেবেছিলাম, মেবে ঐ গজাভজাফলে কেলে দিয়েছিলাম, আমি নয় যে, আমার পূর্বপুরুষ।'

'শুনেছি।'

'তুমি ওরা বলেছিল বীরবুড়া দেবতা হয়ে গেল। এখন থেকে ওর হাতীতে চড়া মুতি হবে যবে লোভনা লকিবে পক্ষা কববে। যখন গোঁদাপিয়াশাল, চক্রকোনা, ঝাঝিও, মহিমাল, গজাভজা, সর্বত্র বীরবুড়ার মতি পুষ্টা হবে, তখন জানতে চবে লোভনা আমার চাঘবাস ছেঁতে জঙ্গলের দিকে ফিরে যাবে। ঠাকুর, শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ ওরা জঙ্গলে যাচ্ছে, ঐ ওরা আমার সেই আগেকার মত লবণের আভিহা কববে, লবণ জাল দেবে, শিকার খেলবে, জঙ্গলের গাছ কাঠি বেচবে, ওরা আমার বংশকে উচ্ছেদ করলে ঠাকুর, কৃষ্ণ মাহিতী নয়, বগীরা নয়, ওরা, আমার প্রজারা আমার শত্রু।'

দূরে মাদলের বাজনা, কাছে মাদলের বাজনা। পশ্চিমে কৃষ্ণ মাহিতীর পাইক সর্দাররা গজাভজা গ্রামের সীমান্তে আগুন জ্বলে তাপ পোহাচ্ছে। ওদিকে আরো দূরে হাতীর তীব্র, তীক্ষ্ণ চীৎকার, শেকলের ঝঞ্ঝা। মবাবের সৈন্য উড়িয়া যাবার পথে ওখানে কাছাকাছি বসিবেছে। কোন কোন উচ্চত ভূঁইয়া, জমিদার নবাবকে ঋজনা দেয় নি, বগীর আধিপত্য মেনে নিয়েছে, তাদের বিচার হবে।

ভূমিপতি রায় শ্রদ্ধাভাজিত গলায়, লাল চোখ কচলে বললেন, 'যা হোক, তুমি দঃ

কব না ঠাকুর। তোমাকে এ রাজ্য দিয়ে দেবেছিলাম, তা রাখা না থাক, তোমাকে আমি ধনবত্ত কিছু দেব। আর কিছু না দিতে পারি আমার ঠাকুরের সোনারপোর বাগন নিয়ে যেও। আমার অন্যো দুঃখ কর না। এ পোড়া মেদিনীপুরে কোন বংশটা আমাদের মত এতদিন রাজ্য করেছে সেই জরতোগ আর মালভোটিয়াব তর্কাতর্কির দিনে, মহাপ্রভুর সময়ের আগে থেকে আমরা রাজত্ব কবেছি। এখন বাবার সময় হয়েছে, যাচ্ছে।'

একটু থেমে বললেন, 'বড় যোশনাই মেলে যাচ্ছে যে, আমাকে তুলে ধর, দেখি।'

আনন্দীরাম ভূমিপতি রায়কে ডুলে ধরলেন। ভূমিপতি দেখতে লাগলেন তাঁর যিপনের দিনে, যে লোভনা, কৃষ্ণাদ আদিবাসীরা, কোনদিন তাঁদের আধিপত্য মেনে নেয় নি, লক্ষ্যবিক বহুবেও পৌনদেহ রাজা ভূঁইয়াদের মেনে নিতে পারে নি। শুধু সময় বু'ঝেছে, বিদ্রোহ কবেছে, ভাবা আজ, তাঁর যিপনের দিনে তাঁর জ্বলমহালে আগুন দিয়ে দূবে চলে যাচ্ছে। দেখতে গেলেন বিশাল ঝড়ের হাতীর পিঠে বীরবুড়ার মুতি। বললেন 'আমার সাধের জঙ্গল বড় জ্বল জ্বলছে যে, এসে দেখ।'

ভূমিপতি রায়ের রাজ্যে, মেদিনীপুরের দক্ষিণে, সে লোভ আদিবাসীদের বিদ্রোহের কথা কোথাও দেখা নেই।

লেখা থাকবার কথাও নয়। ও-সব আদিবাসীদের ত' বলতে গেলে লেখবার ডায়া নেই। তা না থাক। মানুষের তৈরি কাগজ, ভালপত্র পুঁথি, জগলীর তুলো, আব কুয়ার হট্টের বালি কাগজের চেয়ে অনেক অনেক বেশি টেকসই কলকে ও-সব কথা লেখা ছিল।

সে ফলক আদিবাসীদের মন। তাক বিশৃঙ্খল করত যোগল, পাঠান, ফজির, মাহিয়া, ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রকজির আর ঝগাইতদের অনেক অনেক আগে থেকে মেদিনীপুর, ছোট নাপপুর, উড়িয়ার বনভূমিতে তাদের অধিকার। সমুদ্রের জলে লবণ তৈরি করা আর জঙ্গলের কাঠ কেটে, পশুপাখী মেরে জীবিকা নির্বাহ করা তাদের অনুশ্রম। সে অধিকারে যারাই বাধা দেবে, যারাই তাদের বনা মাথাবর জীবন থেকে টেনে এনে চাঘবাসের কাছে লাগাবে তারাই তাদের শত্রু।

তাই তারা মাদল বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে বলল 'ভূমিপতি রায় আমাদের কেউ নয়। তার শাসন আমরা মানি না।'

'ক'ব শাসন মানিস?'

'বীরবুড়ার।'

আনন্দীরামের কাছে এক-কটিই বড় আশ্চর্য লেগেছিল। বীরবুড়া ত' সেই কবে মরে

গেছে। ভূমিপতি রায়েব পূর্বপুত্রের হাতে তার বৃকে গাদাবশুকের গুলী বিধেছিল। হাতীটা তার শরীর পিঠে নিয়ে চীৎকার করতে করতে জঙ্গলের ভেতরে পালিয়ে গিয়েছিল সে তো সেই কবেকার কথা।

‘বীরবুণ্ডা নেই। বীরবুণ্ডা মরে গেছে।’

লোড়দের কেউ সে-কথা কিশাস কবল না। মানুষ বীরবুণ্ডা মরে গিয়েছে বলেই ত’ বীরবুণ্ডা দেবতা হয়ে গেল। তাই ত’ তার হাতীর পিঠে চড়া মূর্তি এখনো লোড়রা পূজা করে। পোদাপিয়াশাল, শালবনী, ঝারিখণ্ড, শালকাটিয়া, হিঙ্গলী, সব জায়গায় জঙ্গলে জঙ্গলে হঠাৎ দেখা যায় সাব সাব হাতীর পিঠে চড়া বীরবুণ্ডার মূর্তি। দেখা যায় পুন্ড্রাব বেদী। তখনই বোঝা যায় লোড়রা জানতে পেরে গিয়েছে কোন না কোন কারণে তাদের শাসকরা এখন বিপন্ন। তাই তারা বিদ্রোহ কববার পথ খোঁজে, বীরবুণ্ডাকে পূজা দেয়। তারা কিশাস কবে একদিন যেসব মত বড় হাতীর পিঠে চড়ে কপালে চাঁদেব বুকট আর হাতে বর্শা নিয়ে, তীব্রধনুক নিয়ে বীরবুণ্ডা দাবার আসবে। তাব লোড় প্রজাদের চালনা কবে নিয়ে যাবে, স্বেচ্ছা শাসকদের, রাজা-চুইয়াদের জনপদ খসে ক’বে দিয়ে চলে যাবে দক্ষিণে। যেখানে শুষ্ক সমুদ্রের নীল জল, আব তীব্র ঘন বনভূমি।

আনন্দীরা বড় বিব্রত হয়ে পড়লেন। শিবকানীর মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি রাজ্যে কয়েকদিনের জন্যে আঁধারবাণিক গিয়েছিলেন। তাবপব আবার কানীশবকে পাঠিয়ে দিলেন। যে আশা কবে এখানে এসেছিলেন তার কিছুই ত’ হ’ল না। অবস্থা ফেরাবেন, ফুলেশ্বরীর বিশ্ব চিত্ত প্রসন্ন হবে, ছোট্টা বিশাখাকীকে শান্তি দেবেন, সব আশাতেই ছাই পড়ল।

ভূমিপতি রায় যখন বলেছিলেন ‘এই মাও, রাজ্য পড়।’ তখন এই বৃদ্ধ ভূম্যারী কথাকে মিছক দত্ত বলে মনে হয়নি। চোল-উগব দিয়ে কাছারীতে কাছারীতে লোক ভেকে হান-বলব। বীজধান, জমি বিলি কবতে বড় ভাল লেগেছিল। এমন কি, লুণ্ঠিদের ভেকে লবণের আড়িয়া জমা দেবেন বলে পলায়নের সুদূর দক্ষিণ সীমান্তে সমুদ্রের কিনার ঘরবি হেঁটে ধরে এসেছিলেন।

সবই বৃথা হল।

এদিকে কৃষ্ণ বাহিনীর পাইক সর্দার, ওদিকে নবাবের ছাউনি।

ভূমিপতি রায় বললেন, ‘আমার ইচ্ছে করছে, বর্গী ছাউনীতে গির মুচলেকা নিয়ে গিয়ে।’

‘এমন কথা চিন্তাতেও আনবেন না।’

‘চিন্তাতেও আনব না। কেন রে?’

‘তাতে আপনার সর্বশাস হবে।’

এমন কি তাঁরও। কিন্তু এখন কি সে কথা বৃদ্ধকে বলা যায়?

ভূমিপতি রায় কিন্তু বুঝেও বুঝতে চাই-লেন না। তিনি বললেন, ‘আমার রাজ্যে, আমার মন্দিরে সোনার বাতুলী দেবী ছিলেন। সে দেবীর সঙ্গে সোনার নৌকো ছিল। নৌকো মানে নৌকোপথে বাণিজ্য হবে, সেটি বুঝেছ?’

আনন্দী এ প্রশ্ন আপত্তিও তুলেছেন।

‘মোদিরীপুরের দক্ষিণে এসব জায়গায় একদিন বড় বড় পল্লভারগা ছিল যে। ল’কা, মণ্ড, হরিণের ছাল, লবণ, সুতী কাপড়, মাটির বাসন কেনাবেচাব বড় বড় হাট ছিল। না হলে, কি বাতুলীকে কেউ সোনার নৌকোর প্রতিষ্ঠা কবে?’

আনন্দীরাদের এখন, পলায়ন-জনপদের এই দুদিনে, বৃদ্ধ, রাজ্যহারা ভূমিপতি রায়েব শোলাটে চোখের দিকে চেয়ে মনে হল সত্যি, সব সত্যি। যে বাজ্যেব বিশ নাইলেব মর্যে সন্মুখ, বড় বড় নদী, সে বাজ্যেব লক্ষ্মী ত’ ভোতা, শালতি, বহব আব ভাও নৌকোভেই আসবে।

‘কৃষ্ণ বাহিনী সেই বাতুলী চুবি কবে নিয়ে গেল। চুবি কবে নিয়ে গেল, চোলগব দিয়ে হাট বসাল। মানুষ এমন নেবকহাবাম যে ওখানেই তাবা ভিত্তি জমাল, মানুষ বড় দুর্ভাগ্য, এই কথাটি তুমি তোমাব পু’থিতে লিখে বেধ। না, আনাব কথা নিয়ে পু’থি আব লিখবে না। তাই না?’

‘কেন বলল?’

‘আমি বুঝি, সব বুঝি। এই যে মানুষ, ভূমি ত’ আব তাদের স্বত্বাচ্ছাদ্য মণ্ড। লিখবে কেন, বল? যাব বোকাগিতে রাজ্য নষ্ট হয় তাকে নিয়ে কেউ পু’থি লেখে। দশবৎকে নিয়ে কেউ বাসায় লেখে? লিখবে কেন বল? দশবৎ বুর্ধের মত কৈকেয়ীকে বব দিয়ে কলে, তা হতেই মত পোলা বাধল। কিন্তু আনন্দী-বাব, পৃথিবীতে বুর্ধ মানুষকেই যে ছড়াছড়ি যে, পণ্ডপোল নিয়েই লগাব।’

ভূমিপতি রায় গলা তুলে হাসলেন। কিছুটা বেপবোবা মেঝাল তাঁকে, প্রান্য যুবকদের মত উরুতে ঝাপড় মেবে হাসলেন।

‘বুর্ধ, সবাই বুর্ধ। নবাব বুর্ধ, সে ভাবছে বর্গী খোলালে রাজ্য তার হবে। ইদিকে বর্গী খোলাতে খোলাতে তার যে চুল শণের মুড়ি হল, আরে আপনি যদি পোরের নিচে যাও, কঁাখে চেপে, কাকবে চড়ে, তবে তোমার রাজ্য যায় কে। সে রাজ্যের জন্যে তুমি যা ছাটে কর

কেন?’

‘মেশের শান্তি বাধবার চেষ্টা কবতে হবে না নশাব?’

‘চেষ্টা করে ত’ সব হবে। আমার যেমন হল। ওদিকে ও বোটা কৃষ্ণ বাহিনীও বোকা কম নয়। ও ভাবছে সোনার বাতুলী নিয়ে গেছে, পলায়ন নেবে, তাহলেই ও আবেক জন বর্ধবান্দেব রাজ্য হয়ে যাবে আব কি। এদিকে আনে না, আরি ওকে ছেড়ে দেব না। ওকে মজা দেখাব।’

‘মেখন, আমি আপনাকে ভাল কথা বলি।’

‘বল বল, দুটো ভাল কথা বল।’

ভূমিপতি রায় কাছে বেসে বললেন। যনযন জ্বা প্রগাণ্ড তাঁব মুখে পড়ে। কিন্তু, এখন আনন্দীরাব দেখলেন বৃদ্ধেব দুই চোখ স্থির স্বচ্ছ, তীব্র লংকলপ দুট।

‘অবুঝ হয়ে কোন লাভ নেই। চলুন, আমি আপনি দুজনে কালই নবাবের ছাউনীতে যাই। বৃত্তিই বলি, এই লক্ষ্যে পড়ে আসবা বর্গীব বাধনা দেবার জন্যে কৃষ্ণ বাহিনীকে কাছে কানকডি বার কবেছিলাম। চাষীদের বসত কবাবার জন্যে বাজ্যকোষেব সমগ্র ধন ব্যয় কবেছিলাম। লোড়রা বিদ্রোহী হবে, চাষবাস আলিয়ে দিয়ে চলে যাবে এ ত’ আসবা স্বপ্নেও ভাবিনি। সব বলে সময় চেয়ে নিল।’

‘সময় চাইব?’

‘তাঁই ত’ ঠিক বলে মনে হয়।’

‘সময় কি কেউ কাউকে দিতে পারে বাবা? সময় যাব কুবিয়ে এসেছে তাকে কি আলীবর্দী সময় দিতে পারে? আমাব বংশ নির্বংশ হবাব সময় এসেছে। সময় ত’ পেয়েছিলাম। সময় কি পাই নি? সেই, যখন মহাপ্রত্ন নীলাচলে যান, সেই যে সময়ে ছদ্ম-ভোগ আব মালমোটিষাব তীর্থযাত্রীদের নিয়ে হাদামা হয় সেই থেকেই ত’ সময় পেয়ে আসছি আসবা।’

‘সময় চাওয়া ছাড়া আব পথ যে নেই।’

ভূমিপতি রায় একটু হাসলেন। বললেন, ‘বড় ইচ্ছে ছিল, এ রাজ্য তোমার হাতে দিয়ে যাই। তোমার চিনতে আমি ভুল করি নি। ভাল কথা, তোমাব বাড়িতে কে কে আছেন?’

‘সবাই আছেন।’

‘কে কে?’

‘দুই মা, পিসীমা, পিসীমার মেয়েমা, মামা।’

‘তোমার কয় মামা?’

‘দুট।’

‘মজাদাদি?’

সাপ্তাহিক বসুমতী

‘দুটি।’

‘নউমা-রা আঁধারমাগিকে থাকেন?’

‘একজন।’

‘আর একজন কোথায় থাকেন?’

‘পিত্রানরে।’

‘শিবকালী গাঙ্গুলী তোমার আপন মামা?’

‘উনি ছোটমার দাদা। আমার বৈমাত্রি ছায়া।’

‘মিসাজ তোমার কাছে থাকেন?’

‘উনি আমার মায়েব চেয়ে অধিক।’

‘এত কথা এইঘনো জানতে চাইলাম, যে ডেবেছিলাম, তোমাকে এখানেই বসত কবাব। সেজন্যে নবাবের কাছে অনুমতি নিতাম।’

তিনি অথবা যেন কি ভাবলেন। তাবপব ধলধেগ, ‘স্বাল সকালেই বেরিয়ে পড়। তুমি ষোড়া চড়তে জান। নবাবকে দেবাব নজব, তাবপব হিসেব-নিকেশ সব ঠিক করা থাকবে ভীবেব কাছে। ভীমকে তুমি দেখেছ, সে আমার বড় অনুগত। তা ছাড়া বড় সাহসী। ও তোমার সঙ্গে যাবে।’

‘আপনি যাবেন না?’

‘আমি ভাবছি একটু আগেই বড়না হব। বয়স হয়েছে, ন’ ক্রোশ পথ যেতে সময় লাগবে। তোমাদের সঙ্গে সমান পান্না দিয়ে পেরে উঠব না।’

খুব ভোব ভোব আঁধার থাকতেই ভূমিপতি গায় বেবিষে গিয়েছিলেন।

চঠাৎ যৌবনের দিনের মত, বালীকে ডেকে বলেছিলেন, ‘দাও ত’ আমার পোষাকটা পবিষে দাও তা।’

পোষাক পবে, বড় ভাবী বশুকটা নিয়ে-ছিলেন।

বালীকে বলেছিলেন, ‘মালিকের সঙ্গে দেখা কবতে যাচ্ছি, তুমি লাঙ্গিয়ে দিলে এ হল একবকর মশ নয়।’

মাথায পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে বলেছিলেন, ‘আনন্দীবাম ছেলেটি বড় বিণ্ডাসী। ওকে দিয়ে তোমার গমনাঙ্কলোব ব্যবস্থা কবলে পাবতাম।’

‘ফিবে এসে ক’বো।’

‘হ্যাঁ, সেই ভাল।’

ভূমিপতি বায় বেবিষে গিয়েছিলেন। রাণী তাঁকে বিদায় দিয়ে সেই অন্ধকারেই প্রাসাদের ছাতে বসেছিলেন চৌকী পেতে। সঙ্গে ছিল তাঁর অনুগত দু’জন বাক্ষী। তাদের ঘলা ছিল ছাতে তাঁর বিনা অনুমতিতে কাউকে আসতে দেবে না। যাবার আগে স্বামীর ছাতে যেমন আংটি পবিষে দিয়েছিলেন, তাঁর হাতেও তাঁর ছোড়া আংটিটি ছিল।

‘সংবাদ পেলে তবে ব্যবহার কোবা।’

স্বামী বলেছিলেন। নবাব ছাউনী থেকে যদি দুঃসংবাদ আসে। যে নবাব ভূমিপতি বায়েব কোন আবেদনই গ্রাহ্য কবেন নি, ভখনও নয়। যদি স্বামী আত্মহত্যা কবেন, তবেই। আংটিতে তাঁর বিষ ছিল।

‘আত্মহত্যা বে মহাপাপ।’ রাণী বলেছিলেন।

‘কঙ্ক রাহিতীর লোক এসে দখল নেবে, নবাবের সেপাই এসে বেব ক’বে দেবে তা দেখে সইতে পারবে?’ পোষাক পবতে পবতে ভূমিপতি বায় জিপ্সাস কবেছিলেন।

তাঁর ছায়াব কিতে বেঁধে দিতে দিতে রাণী মাথা নেড়ে হেসেছিলেন।

তারপর, প্রাসাদের ছাতে বসে বসে তাঁর মনে হরেছিল ভূমিপতি বায়ের ষোড়ার ধুরেব শব্দটা যেন অন্যদিকে যাচ্ছে, বনের দিকে। ভূমিপতি বায়ের ষোড়া অন্যদিকেই গিয়েছিল।

দক্ষিণের দিকে, যেদিকে লোড় বিল্লোহীবা চলে গিয়েছিল। যে পথে শুধু আঙুন, পোড়া জঙ্গল, আব ইতস্তত হুড়ানো লাঙল, হাল, গরুর গাড়ির চাকা, বাঁশের মাঝাল। ওদের সভ্য কববাব কয়েক শো বছরেব চেষ্টা, ওদের চাহী বানাবাব কয়েক শো বছরেব চেষ্টাকে এমনি করেই তাবা ঠাটা কবে গিয়েছিল।

ভূমিপতি বায় দেখেছিলেন তাঁর অন্যতর শ্রেষ্ঠ পাল জঙ্গল দাউ দাউ ক’বে জলছে। সেই আঙুনের সামনে বীৰয়ুগাব বিশাল একটা মূর্তি। দেখেছিলেন লোড় মেঘেপুকষদেব উদ্দাম নাচ।

‘ফিবে আয়, ফিবে আয় তোবা।’ তিনি চীৎকার কবে উঠেছিলেন।

ওদিকে ফুলডিহাব কাছাকাছি নবাবের ছাউনীতে যখন আনন্দীবাম আব ভীম পৌছলেন, তখন সকাল গভিরে গিয়েছে।

বহু সৈন্য, ষোড়া, হাতী, লোকজন,

হইচই। কয়েকটি নাত্র কানাত পড়েছে। একটির সামনে সাত্র কয়েকজন শাহী কর্মী কোলে বসে আছে। মনে হল ওখানেই নবাব আছে।

কিন্তু নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর কাছ কি। উড়িয়াব শাসক, বেদিনীপুর ও হিজলীয়া ফৌজদার ফৌজের বর্তমান বয়ী শীবছাফব শাঁর কোন আমলাকে পেনেই ত’ তাঁর কাজ হয়।

তবু নবাবের সামনেই তাঁকে যেতে হল।

ভূমিপতি বায় বলেছিলেন, ‘এস, আমার দুজনে মিলে সেখি আমার ভাগ্য অস্তে যাবাও আগে কেমন বোশনাই কবে জলছে।’

লোড়বা যখন দিকে দিকে আঙুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

এই সব কথাই একে একে রাজা জ্ঞানকী-রামকে বলতে হল। অনেক প্রশ্ন, অনেক উত্তর। উড়িয়া বর্গীর অধিকাৰে। বেদিনী-পুর ও হিজলী প্রাজ্ঞ বর্গীর অধিকাৰেই থাকে। তবু নবাবের অনেক কথা জ্ঞানবাব ছিল। কেন ভূমিপতি বায়ের মত ছোট ছোট সামন্তবা রাজ্য বাধতে পারছেন না। কেন তাঁরা স্বাধীন শাসন চান, তবু চান, এই সব কথা। জ্ঞানকী-বাম আনন্দীবামকে দেখে বড়ই মত্ত হলেব। তিনি যেন আশা কবেন নি ভূমিপতি বায়ের মত নগণ্য এক সামন্ত রাজ্যাব প্রতিনিধি হয়ে আনন্দীবামের মত মানুষ আসবেন।

‘এ সব জঙ্গল যেবা ছোট ছোট রাজ্য, নবাব নিজামতে যত বাস হয় ততই মদল।’ জ্ঞানকীবাম বললেন।

‘ভূমিপতি বায় স্বাধীন শাসন চান।’

বর্গীর হাদামা দুব স্থান, প্রতিবেশী বাজ্যাব আক্রমণ অবধি এঁরা ঠেকেতে পাবেন না; মুহূর্তে স্বাধীনতা কোথাও যায়। এমন স্বাধী-নভায় লাভ কি?’

‘ভূমিপতি বায় অত কথা বোঝেন না। তিনি নিজের রাজ্যটুকু স্বাধীনভাবে শাসন কবতে চান।’



কিষাণ
লঠন
মরোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস ঞ্জকো:

ফোন-২২-৬৫৮০

২৩৬, ৩৬৩ চীনা বাজার ট্রাট, কলিকাতা-৯

‘এবা সবাই তাই চায়।’

বলে জানকীবাস বাইবেব দিকে চাইলেন।

উঁচু ভাঙাছুরি ওপৰ কানাত পড়েছে। চারপাশেব বন প্রান্তর, দূরে স্বর্ণবর্ণের খাল জল দেখা যায়।

‘এবা সবাই,’ কথাটি আনন্দীরামের মনে আশ্চর্য নাড়া দিল। এতদিন, এমন কি আজ সকাল পূর্বস্থ ভূমিপতি রায়কে বড় একলা বোধ হয়েছিল। তাঁব, যেন ভূমিপতি বাব প্রাচীন দিনের এক বিস্মৃত বীর, বিশাল বিশাল সব বাধা বিপত্তি একলা মুক্ত করছেন।

ভূমিপতি বাবের স্বাধীন শাসন করবার শাসনা, আদিবাসীদের, চাষের কাজে টেনে আনবার চেষ্টা, এ যেন তাঁর একলার, একান্ত একলাব বলে বোধ হতেছিল।

এখন মনে হল, না, সামন্ত, ভূমিপতি রায়ের সঙ্গে আবার অনেক আছেন, বহু ছোট সামন্ত, নগণ্য রাজা। আনন্দীরাম বুদ্ধিমান সভ্যতার মানুষ। অন্য সমাজের প্রতিনিধি, তাই তাঁদের চেনেন না। কিন্তু এই পাহাড় জঙ্গল ঘেঁষা আধা বৈদ্যুতিক, চন্দ্রবেধা, সরঃগদা, বশস্ত্রা, গড়চক্রবেড়িয়া, কত অসংখ্য কত রাজা আছেন। তাঁদের প্রজাদের অনেকেই আদিবাসী, বিচিত্র সব উপজাতি, জঙ্গল ঘেঁষা জনপদে তাঁদের দুর্গপ্রাসাদ। যা বন্ধা কববার ক্ষমতা নেই, সেই স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা কেন জীবন বিপন্ন করেন?

‘ভূমিপতি বাব বড় বিপন্ন হবে কৃষ্ণ সাহিত্যের কাছে ধ্বংস করেছিলেন। তাঁর নিজের বা সঙ্গতি ছিল তা দিয়ে তিনি প্রজাদের ফিবিয় এনে বসত কবতে চেয়েছিলেন।’

‘ভাবপব?’

প্রশ্নটি গোড়ায় মাঝে মাঝে শেখন থেকে এসে। নবাব নিয়ে শুনতে চান ভূমিপতি বাবের ভাগ্যে ভাবপব কি হল।

দেশকে

অনুপ্রাণিত করছে আজ

কলকাতার একটি চলতি নাটক দেশের

সীমানা ছাড়িয়েও তার জয়জয়কার

এই নিতীক জনচিত্তজয়ী নাটকটির নাম কল্লোল।

‘ভূমিপতি বাবের প্রজাদের মধ্যে অনেক জাতির মানুষ আছে, কিন্তু লোড়রা সংখ্যায় প্রধান।’

‘ভাবা কি শবব?’

‘ভাবা শবব নয়। শবববা ভিন্ন জাতি। তারা নল চালিয়ে পাখী বারে, সাপ ধরে, সাপ পোষে।’

‘জাতি কি?’

‘ভাবা বলে ভাবা জরায়ারের বংশধর। তাঁদের পূর্বপুরুষ জরায়ারীকৃষ্ণকে মেরেছিল। সেইজন্যে তারা শুদ্ধবাট ছেড়ে চলে এসেছে।’

‘তারপর?’

‘লোড়রা শববদের মত নয়, বা কাকবারা-দের মত বাবাব নয়। তারা এ-জঙ্গলের আদি বাসিন্দা। ভূমিপতি বাবের বংশের সঙ্গে তাঁদের অনেকদিনের বিবোধ।’

আনন্দীরাম ভেবে দেখলেন, যতই চেষ্টা করুন, তিনি কিছুতেই এঁদের বীববুগাব কথা বুঝিয়ে বলতে পারবেন না। সব কথা সবাইকে বোঝান যায় না।

‘ভাবপব?’

‘লোড়রা দলে দলে পঞ্জাবের রাজ্যের ক্ষেত-খামার নষ্ট কবে দিচ্ছে, জঙ্গলে আগুন দিচ্ছে। তারা চাষবাগ কববে না। রাজার শাসন মানবে না।’

‘তারাও স্বাধীন শাসন চায়?’

‘তারাও স্বাধীন শাসন চায়।’

‘আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তাই না?’

‘জাতি।’

চাবদিকে আগুন ধরিয়ে দিলে কি হয় তা নবাবের এখন আর বুঝতে বাকি নেই। উড়িয়ায় বর্গী। বিদ্রোহী শীব হবিবের সঙ্গে রথুগী তাঁগলেব ছেলে জানোজী যোগ দিয়েছে। উড়িয়ায় আগুন আর নিভল না।

এদিকে তিন-তিনটি দারিদ্রপূর্ণ পদের তার নিয়ে মীরজাকব ভবু বর্গীর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মীরজাকবকে শাসন করতে বাকে পাঠালেন, সেও তার সঙ্গেই যোগ দিল। শুধু তাই নয়, মীরজাকব না কি আলিবর্দীকে হত্যা কবে বাংলার সিংহাসনে বসতে চায়। মীরজাকব তাঁর মনিষ্ট আদার। তাই এদিকে অশান্তি আর এক আগুন।

ওদিকে বালেশ্বর থেকে ক্যাপ্টেন ফেলসাল কেবলই চিঠি লিখে। বড় বিপন্ন সে। বালেশ্বরে বুড়ীবালাই-এর ভীবে মাথাটা ছাউনী। বিদেশী বণিকদের বন্ধা কবতে পারছেন না, সে-ও তাঁর অক্ষমতা।

‘এখন ভূমি কি চাও?’

‘ভূমিপতি বাবকে ক্ষমা করুন। তাঁকে সময় দিতে বলুন কৃষ্ণ সাহিত্যকে। অক্ষম জনসাধারণের বহুরের মধ্যে সব ঋণ পোষ হয়ে যাবে।’

এ তিন বছর না হয় পঞ্জাবের নবাবের বাসে থাকুক।’

আনন্দীরাম আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘কিন্তু ভূমিপতি রায় তাঁর চিঠিতে যে আরো অনেক কথা বলছেন।’

‘কি বলছেন?’

‘তোমাকে রাজ্য দিতে বলছেন।’

‘আমাকে রাজ্য দিতে বলছেন?’

‘তাই ত’ লিখেছেন।’

‘পাগল হয়েছেন।’

‘তুমি রাজ্য চাও না?’

‘না।’

আনন্দীরামের মনে হল এই নির্লোভ বুদ্ধি সত্যনকে পেলে তাঁদের এককণা লাভ হত। বর্তমানে বাংলার নিরক্ষর হস্ত এইরকম লোকেরই বড় অভাব।

‘তোমার দেশ কোথায়?’

‘বর্ধমান, আধাবাসিক গ্রাম।’

‘গ্রামের নাম জানি। সে গ্রামের স্বরকণ্ঠ রায় বড় জ্যোতিষী। তা ছাড়া শিবকালী গাঙ্গুলী ঐ গ্রামের কাছেই—’

‘স্বরকণ্ঠ আমার আত্মীয়। ঈশ্বর শিবকালী গাঙ্গুলী আমার মাতুল।’

‘তাই বল। কিন্তু তুমি স্বগ্রাম ছেড়ে এত দূরে?’

‘ভাগ্য অনুযায়ী।’

‘ভাগ্য অনুযায়ী এ সামান্য রাজ্যে আশ্রয়ে কেন? তুমি ত’ যে কোন সময়ে ইচ্ছে কবলে নিরক্ষর কাক পেতে পাবতে বাবা। তোমার মাতুলের পবিচবই যথেষ্ট।’

‘আমি স্বচেষ্টায় কাক পেতে চেয়েছিলাম।’

এখন আনন্দীরাম আনন্দীরামের চোখে পড়ীর বিষণ্ণতা, দুঃখ দেখলেন। ‘হয়ত’ গভীর কোন বেদনায় দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন, সব কথা প্রকাশ করতে চান না।

‘এখন কি করবে?’

‘আমি ওঁর বাবায় চাই না মহাশয়। আপনাকে যা ভাল মনে কবন তাই করুন। রাণীমা আছেন। আমি তাঁকে সকল কথা জানাব। তাছাড়া ভূমিপতি রায় এখনই আসবেন। তাঁকে যা হয় বলবেন।’

ভূমিপতি বাব আর আসেন নি।

দক্ষিণে জঙ্গলের গহনে, লোড়দের ফিরিয়ে আনবার জন্যেও তিনি গিয়েছিলেন এটুকুই জানা গেল।

কিন্তু লোড়রা ফিরে আসবে না তা-ও তিনি জানতেন। লোড়রা বীববুগাব মূর্তি সামনে রেখে মদ্য বাজাচ্ছিল, গান গেয়ে গেয়ে নাচছিল; সকালের বাতাসে জঙ্গলের আগুন আকাশ পানে উঠছিল।

(কমপঃ)



হাফিজ বেরবোড়ির মাণিকগঞ্জ হাট সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে শ্রীগঙ্গাজারীলাল নন্দ অপর প্রান্তের পাকিস্তান সীমান্ত দেখছেন

রাজধানী :

রোল নয়, অপদৃষ্টি

আবহতার প্রচেষ্টা দণ্ডনীর অপরাধ। কেন না ওটা নিজের হাতে নিজেরই প্রাণ বিনাশের চেষ্টা। কিন্তু অপরাধ হয় না একাধিক মানুষকে অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়ে, কৃষাদ খাইয়ে তিল তিল মৃত্যুর পথে টেনে আনার ধুনী-প্রচেষ্টায়। অন্তত বহু জীবনের ওপর ধীর বিঘক্রিয়ার প্রয়োগ তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ না হওয়ায় মানুষ বারবার দণ্ডনীর বিধির গভী তেজালদানকারী ধুনীরা অনায়াসেই অভিক্রম করতে পারেন। ভাড়া আইনীই হোক বা বে-আইনীই হোক সবতুস্ট পিচ্ছিল পথে ফতে গলে পড়ার সংকেত স্বেচ্ছাবাহিত তাঁদের জন্য আছে। অর্থাৎ অত্যাচারিত আপন প্রাণ হরণের অধিকার আপনার নেই বটে, কিন্তু আপনার প্রাণ হরণের অধিকার সরকারী-বেসরকারী ক্ষেত্রে অনেকেই ভোগ করতে অভ্যস্ত। আইনের টেরা চোখে তাকে তাই প্রাণহনন বলার রেওয়াজ নেই।

তেজালদানকারীরা ধীর বিঘক্রিয়ায় দেশভুক্ত মানুষের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা ধরানিত করে জনস্বাস্থ্যে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রাণদান বাতায়ন

তাঁদের ওপর বেকারদাবোধে ঐশ্বর্য্যী পরোয়ানাও প্রত্যাশিত হতে পারে। কিন্তু যদি আঁমা যার, মূঃধের আঁমা, বাঁদ্যের আঁমা, সংসারের আঁমা, অকৃতকার্যতার আঁমা অথবা ধৈর্যের প্রদাহে উন্মত্ত কেউ গোপনে কড়িকাঠে দড়ি টাঙিয়েছে, রেলপথে গলা বাঁড়াবার ফিকিরে মাথ রাখ রাতে ঘুর ঘুর করছে কিবা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে তাহলেই লোকা কোর্ট-কাছারী পুলিশ-পেয়াদা।

কিন্তু অনাহার ও অখাদ্যজনিত অপদৃষ্টিতে দেশবাসী যখন সুবর্ণ সরকারী মহল অথবা বেসরকারী হোমরা-চোমরা কর্তৃপক্ষ তখন মনভোলানো আলোচনায় বাতেন; যার ভবিষ্যৎ ফল 'আলো' নয়, অন্ধকার; ধান্য নয়, 'চোনা'।

সম্প্রতি কলকাতা পৌরসভার বেসর ডাঃ পি কে রায়চৌধুরী পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণের আবেদন জানিয়ে এক পত্র রচনা করেছেন ও সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। এই 'চাকলাকর' পত্রটির নেপথ্যকাহিনী আরও চব্বপ্রদ।

পর পর দুদিন অনাহারে থাকার দরুণ শিশুভূষণ বে স্ট্রীটের পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩ জন বালিকা বিদ্যালয়ে অজ্ঞান হয়ে যার

বলে একটি চব্বপ্রদ তথ্য উদ্ঘাটন করে ইউ-সি-সি দলের টীপ হুইপ শ্রীমুকুর সর্বাধিকারী আরও জানান, ঐ বিদ্যালয়েরই আরও ২৫টি বালিকা অনিয়মিত খাদ্যের দরুণ বর্তমানে নিভািত দুর্বল। ব্যাধি নয়, অনাহার এবং কৃষাদ গ্রহণই এখানে রোগের মূল।

ইদুরকে ধন্যবাদ, ব্যাপারটা কুলে বটেছিল, নচেৎ বেসরের পত্র আর্থী বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ইতিপূর্বে কাল থেকেই লেপজোড়া প্রায় দুইতকের চেহারটা আঁদাদের চোখের সামনে মূঃধপের মতো চলাকো করছে; কোনো চিঠিপত্রে খিতিরে মলে নি।

ধন্যবাদ পৌরসভার মেডিক্যাল অফিসারকে। তিনি গত আনুয়ারী মাস থেকে হার্ট মাক অবধি শুণে ২৬১ জন ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন।

পরীক্ষার ৬১ জনই ঝাঝাভাবে অপদৃষ্টিজনিত রোগে ভুগছে। পত্র রচনার ষোড়শ্য এই তথ্যও কথকিং প্রেরণা জুগিয়েছে সপেক্ষ নেই।

মুদ্রাসম্প্রদায় সেন্দ

এবং ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুকুর চক্র সেনকে। তিনি দেশের নিদারুণ খাদ্য-জাবের চিত্রটি ভয়ভাযার প্রকট করে তুলেছেন।

হাফাকার ও হাঃ হাঃ-কর

রাজতবনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমন্দের উপস্থিতিতে আয়োজিত কেন্দ্রীয়জয়ের অভিনায়কদের বৈঠকে জনবোধের তালিকা তিনিই নির্ধারিত করে দেন।

তালিকার মীমাংসা ছিলে ডোনা এবং ভুট্টা ও চা ভিন্ন অন্য কোনো বিন্যাস ছিল না। যদিচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হরত স্বার্থী ধোয়ান করেন নি যে ডোনাও বর্তমানে একটি স্বার্থী বস্তু। অবশ্য জনবোধে ডোনা বাংলাদেশে স্বার্থীই অজ্ঞ।

মাননীয় অভিনেত্রী কি পরিচয় ডোনা ও ভুট্টা গ্রহণ করেছেন সংবাদে অবশ্য তার উল্লেখ নেই, তবে সম্ভবত মঙ্গলী এ রাজ্যে মঙ্গলপুত্রের রাজতবন এবং চোখের অব কর্মের উচ্চাটুকু হরতবন করতে পেরেছেন। (স্বার্থ থাকতে পারে, ইতিপূর্বে কলকাতা মহলে এসে মঙ্গলী পশ্চিম বঙ্গের অনেক রতীর মত বেজারি পরিভ্রমণ করে ব্যবসায়ীর চাকা গাড়িতে টেঁচেছিলেন এবং বিজনেস ম্যানসকেটের মীমাংসাকারীভাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন)।

কিন্তু সে বাই হোক, ডোনা ও ভুট্টার কোনোটিই অর্থাত্য না কুখ্যাত নয়। হরতঃ কর হয়, এডেও সেনের প্রকৃত ভিন্ন হরত উচ্চাটি হ'ল না।

অতীত মিছিল দেখে অনেক বহিরাগী বিস্মিতভাবে বলেছিলেন, আশ্চর্য। লোকগুলো কীট পাচ্ছে না তো হয়েছে কি, কেক খেলেই জেগে পায়। ভগবান না কলন, কেন্দ্রীয় সরকারের যদি অতঃপর এই বাধা হয় যে চালের মতো পশ্চিমবঙ্গবাসী পর্যাপ্ত পরিমাণে ডোনা চর্চা করতে থাকুন, তাহলে প্রকৃত সেন দ্বিতীয়ের প্রবাহ ওগবেন। ডোনা-হুতুও এখন লানিাদান।

একশত ষাট পরমার এক কেজি চাল, একশত পরমার আলু, একশ পঁচিশে উল্লে, একশত ও ততোধিক পরমার কাঁচা বেগুন, দুইশত পরমার পটল, চারশত পরমার কটাজিত বরফনীতল মসুরা, (সরকারী রেট ও মার্কেট ম্পর্কে স্বপু ও বাস্তবের সম্বন্ধ), দুইশত চল্লিশ পরমার চিনেবাদাম, এবং অর্ডাই শত পরমার ডোনা ও দুইশত পরমার ভুট্টা মেলে। বাকি বহু জিনিস পরমা ফেলেও মেলে না (যাখে ডোনাও অনুকূল মূল্যায়ন বস্তুতে উন্নীত ছিল)। স্বতরাং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমন্দেরালাল মন্দের মনান অটটই রেখেছেন।

এহেন অবস্থায় অপূর্ণজনিত বাধ্যতাক নিত্যন্তই সাধারণ ও প্রত্যাশিত ঘটনা। ঘটনাস্থল স্থল হওয়ার মতো এসেছে। অবশ্য মেরর চিঠি দিয়েছেন এবং মেররকেও অব্যাহত।

একদিকে বাণ্যের অন্য লেখকানী হাফাকার অন্যদিকে বাঁক-সম্মো থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া নোটের ভাড়া পকেটে নিয়ে গভীর রাত অবধি চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীট অকলের বাসে ঘোঁরোলে কুড়ির হাঃ হাঃ-কার, এই দুই চিত্রে দেখটা উল্লে পেল। কিন্তু পতনোন্মুখ দেশের মননপতনে অংশগ্রহণকারীরা বিবিধ রেস্তোরাঁ বাসে বাড়ানিতি করে যাচ্ছেন। কলকাতা মহলে এক এক রাতে কেমন করে যে এতো এতো টাকা ওড়ে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

বাজার মর খোঁজবে চুড়ে ভাঙে বাধারপ গরীব শ্রমীর কথা তো বর্তমানে নয়, উচ্চ মধ্যবিত্তেরও নাগালের বাইরে মেরর ঘোঁড়া দৌড়ছে। তবে ওরা কারা? মায়ের ফ্রেন-গৃহিণীর পাশ পকেটে ভাড়া ভাড়া একশ টাকার নোট থাকে—থাকে কাঁচের পাতে উল্লে রতীর মতো একছিতে রতীর হাসির কুড়িবাঁক বাঁকিয়ার হওয়ার জন্য। ওরা কারা? মায়ের অন্য প্রতিদিন পোশাক-পরিচ্ছদ এবং কানিচারের কাপন পালটার। তবে ওরা কারা? মায়ের মরে কোন কিছুই মূল্যায়ন নয়।

ওরা বাই হোক, ওরা আদর নয়। কেবলমাত্র ওরাও একই মেশে অনুগ্রহ করেন, তবে হরত একই মশানে, একই চুড়িতে পোড়েন না (ইলেকট্রিক চুড়ীর ব্যবস্থা আছে)। তা থাক। আমরা আপত্তি তুলতে বাই নি। আদর বুঝে ধোঁয়া-পরে বাঁচতে চেয়েছি। আদর একই ভঙ্গভানে বাঁধা ওজতে চাই। আমরা নিকার সুযোগ চাই এবং সংজ্ঞিতচেতনা বজার রাখার মতো সাহায্য অবসর পেতে পারি এমন আর্থিক-সামাজিক অবস্থার নিশ্চিত হতে চাই।

তা হবার নয়। বেশনিং এলাকায় লাইন দিয়ে এবং পাঁচ অক্ষিমে খেটে পেটের ভাত বোঁগড় করে শুধু প্রাণধারণের ব্যক্তিগত ব্যবস্থা যদি হরত, বেশনিং এলাকা বহির্ভূত অকলে তারও আশা-ভরসা নেই। চড়া বাসের বাজারে হানা দিয়ে একটি ব্যবসায়ীকে পুলিশ হেপাজতে টেনে নিয়ে গেলে, পরমহুর্ন্তে মাল-ভতি বাজার বন্ধুনি। পরমা ফেলেও তখন খাবারবস্ত্র মিলবে না। মানুষের মূখের অন্ন নিয়ে এই অবস্থা লুপট চলেছে। কাঁচা কাঁচো টাকার পাহাড় জমানর মেশার ব্যবসায়ীচক এখন উন্মাদ। শয়ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও নাচার হয়ে বরফের, বজুত আছে, মার নেই। বাজার আছে, কিন্তু ওপরভরায় নয়। মারির নিচে। এ ভাড়া প্রাণগনিক গোলমাল তো আছেই। সংবাদে প্রকাশ, উচ্চ জেলাভিত থেকে বাঁচিতি জেয়ার চাল আসা বহু হওয়ার এবং আংশিক

বেশনিং এলাকায় অনিয়মিত লগবরাহের ফলেও চরিশঃ পরগনা, হাওড়া, বৃন্দাবাদ, নদীয়া ও উত্তরবঙ্গের মারিতি জেলায় সাধারণের দুর্বস্থা চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করেছে। আরও প্রকাশ, চরিশঃ পরগণার মতোমপুর ডায়মণ্ড হারবার প্রতিষ্ঠা অকলে ষোড়ানিচারের বড় বড় ওদামে এবার জনসাধারণের হামলাও নাকি শুরু হয়ে গেছে। ফলত এতদকলে আবার খাদ্যবস্তু অদৃশ্য হতে শুরু করেছে।

হাসিকারার পশ্চিমবঙ্গীয় সংসারে এ দুটচক কি চলতেই থাকবে। ব্যবসায়ীকুল এখন বাহ্যতই সরকারী শাসনের বাইরে বাজারকে মূল্যবদ্ধ করেছে। সরকারের ক্ষমতা নেই তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে বৃদ্ধবার। বরং প্রোগ্রামী পরওয়ানা অব্যাহতের কারসাজিতে প্রত্যাখ্যান করে নেওয়ার দুর্বল পন্থাই এখন অগ্রায়।

তবে আমরা কোথায় বাচ্ছি অবশ্য আমাদের কোন অনাহার-অনিহার অহু রাজবে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সর্বশ্রমীর হাফাকারের বিনিময়ে এক শ্রমীর 'হাঃ হাঃ' কর আর কতকাল চলবে।

অন্যকর্তার মনন

মশুতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমন্দেরালাল মন্দের পশ্চিমবঙ্গীয় মীমাংসা অকল মফেরে যে দু-একটি কেন্দ্রীয় অভ্যর্থনা ও মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে তিনবিধার বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে পাকিস্তানী আপত্তি যে অযৌক্তিক একথা স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু বেকবাড়ির মতোই এক্ষেত্রেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনো মূল্যে বক্তব্য রেখে যান নি। পাকিস্তানের আপত্তিতে কেবলমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রপুটি এড়িয়ে গেছেন, যেমন বেকবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে সাধারণের বিক্ষুব্ধ মনোভাব লক্ষ্য করে প্রাসঙ্গিক কাইল তলব করেছেন তিনি। কিন্তু এর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর উৎসাহিত হওয়ার বিশেষ কোনো কারণ দেখা দেয় না। বরং পশ্চিমবঙ্গ জানে, তার স্ব স্ব সম্প্রসংখ্যক পপুলার বাইবিই এ পর্বত কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ রক্ষা করে এসেছেন। দক্ষিণ বেকবাড়ির ব্যাপারে স্বতরাং, এখনো পর্যন্ত নেহরু-নুন চুক্তির কোনো হেরফের হবে বলে ভারত সরকারের কোনো মন্য পরিকল্পনা নেই। যদিচ নেহরু-নুন চুক্তির সঙ্গে মীমাংসা নির্ধারণের মধ্যে বখেট বৈষম্য আছে বলে বেকবাড়ি হস্তান্তর প্রতিরোধ কমিটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্ট আকর্ষণের চেষ্টা করেন এবং প্রস্তাবিত হস্তান্তর কার্যকরী হলে প্রায় পাঁচ হাজার ভারতীয় ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলেও জানান, তথাপি এ বিষয়ে আশু কোনো সমাধানের সম্ভাবনার আশ্বাস শ্রীমন্দের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

কিন্তু একটি বিষয় কর্তৃক পরিহার হয়ে গেল যে, যদিও পাকিস্তানী আন্দোলকে কেন্দ্রীয় সরাস্ট্রদপ্তর তখনই অগ্রাহ্য করেন নি (এবং যেমনটা বোধ নির্মাণ কর্তৃক বর্ণিত আছে), শ্রীমন্ত পশ্চিমবঙ্গের মতকেই পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তানের আশ্রিত স্বার্থ কোনো কারণেই বৈধ নয়। বসন্ত, পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কাজে ভারত কখনো আশ্রিত হলে নি। তা ছাড়া পাকিস্তানী ডিট-মহল বাইহাওয়ার লোকদের বন্দী করা হচ্ছে বলে পাকিস্তানী অভিযোগও যে কোনো সারিভাষ্য নেই, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তা বচকেই দেখে গেছেন। অতঃপর তিনবিধার বোধ নির্মাণকারী ছক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে নন্দীর সফর পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে লাভবান হতে পারে। সীমান্ত রক্ষার জন্যই যে একটি বাঁধের বিশেষ প্রয়োজন আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁও স্বীকার করেছেন।

তবে নন্দীর সফরকে চূড়ান্তভাবে বা স্বীকৃত হয়েছে তা হল, সীমান্ত পুলিশের দায়িত্ব সরকারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতেই ন্যস্ত থাকবে। এ ব্যাপারে সফর প্রশাসনিক কর্তৃক স্বাধিকার হবেন কেন্দ্রীয় সরকার।

তবে বৈশ্বকল্পিত ব্যাপারটি যে পুনর্বিবেচনার দাবী আশ্রিত দিয়ে গেছেন তিনি এতেই এ সম্পর্কে নতুন করে অলপনা-কল্পনার ও একটি স্বাধীন আশ্রিত সন্তাননা করে গেল।

বৈশ্বকল্পিত রেলপথ

বাংলার পূর্বাংশ করে সর্বভারতীয় নেতারা এককালে বাংলা ও বাঙালীর ভূমী প্রশংসা করে যেতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশের সীমানা অতিক্রম করলেই বঙ্গ ভূগোলিত স্বদেশের প্রতি তাঁদের সেই আবেগ ও উজ্জ্বল নিয়মিতভাবেই প্রশমিত হ'ত। এ কি বাংলায় দুর্ভাগ্যবান সর্বভারতীয় রাজনীতি, বাঙালী তা স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি কখনো। আজও পশ্চিমবঙ্গে পূর্বাংশ করে নেতৃবৃন্দ অনেক আশ্রিত কথা শোনান, আশ্রিতের বাধী বিতরণ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যিনী পশ্চিমবঙ্গের বরাতে আবার বস্তু চাপা পড়ে যখন বিশিষ্ট নেতা দিল্লী ফিরে যান।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী কলকাতার বসে বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন, কলকাতার যানবাহন সমস্যা সমাধানের জন্য সার্কুলার রেলওয়ে বা বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণ করতাই হবে। এবং প্রয়োজন হলে তা চতুর্থ পরিকল্পনার বাইরেও করা হবে।

রাজ্য সরকার ও রাজ্য পুলিশ নানান উপায়ে যানবাহন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে গলদ-ঘর হয়ে পড়েছেন। একবার সার্কুলার রেলওয়ে

এই সমস্যার একটি কার্যকরী সমাধান হতে পারত। কিন্তু এ ব্যাপারে লাভান্দের প্রণুও মাথা তুলে বাঁড়িয়েছে বলেই শহরের এই প্রতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার পথ পাচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলই সার্কুলার রেলওয়ের প্রস্তাবটি যথেষ্ট লাভজনক নয় বলে বারবার প্রস্তাবের বিরোধিতাই করে এসেছেন। বর্তমানে অকস্মাৎ তিনি এমন গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন দেখে পশ্চিম-বঙ্গ, বিশেষত কলকাতাবাসীরা বৃগপং বিস্মিত ও বিচলিত বোধ করছেন।

উদ্বিগ্নবাহন বহন তো শ্রীপাতিলের উজ্জ্বল আশ্রিত কোনো গুরু দিতে পারেন।

আনবাই বা আশ্রিতের ঘটক করে মাথা নাড়ি কোন ভরসা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সর্ব-ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি-কৃপণতার কথা আমরা বিশ্বাস নই। পরন্তু শ্রীপাতিলের পূর্বতন ভূমিকার কথাও পশ্চিমবঙ্গের স্মরণে আছে।

সুতরাং আশ্রিতের বিশ্বাস নেই। বর্তমানে আশ্রিতের সমর্থনিত যানবাহনের ওপর বিশেষ আশ্রিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাটো কাপড় টেনেটেনেই পরতে হবে।

তবু আশ্রিত অটুট। পাতিল সাহেব যদি প্রতিশ্রুতি না তোলেন।

বীরভূম :

বি-ডি-ও হত্যাকাণ্ড

বীরভূম বোম্বেরের ২ নং আঞ্চলিক পরিষদ অবশেষে দীর্ঘদিনের কোমল একটি চূড়ান্ত প্রস্তাবে নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছেন। বিশেষ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রস্তাবে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট বি-ডি-ওকে স্থানান্তরিত করার দাবি সর্বাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রেরণ করেছেন আঞ্চলিক পরিষদ।

পঞ্চায়েতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বি-ডি-ওর বনোনিমিত্যের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানেও বৃদ্ধান্ত বিস্তার করেছে, অস্বাভাবিক দেখা দিল বীরভূমে।

অবিলম্বে এই বিষয়ে স্থিতিচার ও স্থিতিচার প্রয়োজন। অন্যান্য বি-ডি-ও এবং পঞ্চায়েতী কর্তৃপক্ষের নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে পানী উন্নয়নের সার্ব-পরিকল্পনার নতুন উপদর্শ দেখা দিতে পারে। বীরভূম বোম্বেরের ঘটনা এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ একথা বনে বাঁধাও সরকারি।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকের একটি সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তও পুনর্বিচারের দাবি রাখে। সিদ্ধান্তানুসারে এবার প্রতি বুকে একের বলে দুজন বুক

ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিয়োগ করা হবে। একজনের ওপর থাকবে কনিষ্ঠ উন্নয়নের তদারকী, অপরাধন হবেন সংশ্লিষ্ট সমস্যার প্রশাসক।

হৃদয়বলে সাহেব মোতাম্মেরের এই হিড়িকে স্থানীয় জনসাধারণ কিন্তু মোটেই উন্নয়িত নয়। হবেনই বা কেন। সার্কুলারের সংখ্যা বাড়লে প্রতি যোগ্য হিড়িকে তো আর দুকণা ডাল বেশি কটবে না। বরং কপারিসার সার্কুলারের জিপের চাকার ডাল যথেষ্ট বেশি কেত মাঠ-মরগানে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাই সম্ভব। আর সেই আশঙ্কাই করছেন গ্রামবাসীরা।

বীরভূমের স্থানীয় সংবাদ বাঁধা 'বীরভূম বাঁধা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধে বি-ডি-ও সংখ্যা বৃদ্ধিতে বিরক্তি প্রকাশ করে দেখা হয়েছে-- গ্রামে গ্রামে সরকারি বি-ডি-ও নাকি এক প্রকার অফিসার যে উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিরাছিলেন তাঁহাদের 'সাহেবী' চান্দকর এবং 'সাহেবী' বেকাজে ভারতের স্ত্রী নেতা ও প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত দেহবলী শেষ পর্যন্ত কুহু হইয়া বিরূপ যত্ন করা হইয়াছিল।

এদেশের গ্রামবাসীদের ক্ষেত্রে এই বি-ডি-ওর ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য। অর্থাৎ ইহাটাই গ্রামে সাধারণ মানুষের নিকট 'সাহেব' বলিয়া ডিতির স্বীকৃতিতেছেন। গ্রামে গ্রামে এই সব 'সাহেবদের' তো বটেই, জাহাঙ্গীর অনুগ্রহপূর্ণ দলিলদের দাপটেই সাধারণ মানুষ জীত যত্ন।

বি-ডি-ও বিবেক যদি এমনই বিশিষ্ট জিনিষ হয়, তবে সাধারণের অর্থ অপচয়ের আগে নিশ্চয় দুবার ভাবতে হবে। বি-ডি-ও মানে আর বাই হোক, যদি প্রত্যেকের কাঁচ লাগিয়ে এক জাতীয় দাপটপানী অফিসার হয়, তবে তাঁদের ওপর শাস্তি করি তদারকীর ভার অন্তত কিছুতেই অপিত হওয়া উচিত নয়। আর উন্নয়নের অর্থ যদি শাসিতের সঙ্গে আশ্রিত সম্পর্ক বজায় সাহেবী শাসন হয়, তবে তেমন প্রশংসনীয় বা কাজ কি। তাছাড়া গ্রাম মাঠতে বট জুতোর ভার সহ্যে কেন। যদি একজোড়া বুটের চাপেই গ্রামবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে থাকে, তবে জোড়া দুই জুট-বুট যে সে প্রাণ বিলকুল নির্গত করে ছাড়বে।

বরং ওরা যে বলছেন, ছেড়ে যে যা কেঁদে বাঁচি; চেপে বসবার আগে সরকারি বাহাদুর যে কীভাবে একটু কর্পাস কখন। নতুন পথ স্থিতির সমর পুরো ব্যাপারটির দৃষ্টপাত কখন।

মুদ্রাধিকার : ১

শশুর-জামাই-এর জমিদারী

ভূগবিনগোলা ধানার অন্তর্গত আখেরীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় নাকি মননির্বাচিত কমিটি গঠনের পরও শশুর-জামাই-এর সম্পত্তিই থেকে গেল। প্রাক্তন সম্পাদক শশুর ১৯১৩ ডোটে পরাজয় স্বরণ করে অন্তঃপর জামাই বাবাজীবনের স্বরণ নিয়েছেন। জামাতা হলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অবশ্য পুরোপুরি এখনো তিনি জামাতা-নির্ভর নয়, কর্মতার চাবিকাঠি যথেষ্ট কলকাঠি বেড়ে নির্বাচনের পরও নিজের হাতেই আঁকেছেন।

কতিপয় অভিভাবকের আবেদনক্রমে নতুন নির্বাচন অবৈধ এই মর্মে অভিযোগ শাওয়ার ডি আই অফিস এ বিষয়ে তদন্ত হা হওয়া পর্যন্ত পুরোনো কমিটিকেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কল শিক্ষকগণ গত পাঁচ মাস বেতন পান নি। ডি-আই অফিসে আবেদন করেও কল পান নি। অবশেষে ডি-এম-এর শরণাপন্ন হয়েছেন।

বিদ্যালয়ের এই অচলাবস্থা বহুক্ষেপে শরিকদের ওপর অনাহারের পরোয়ানা জারি করেছে।

এ শুধু মুদ্রাধিকারের ঘটনা নয়। এ চিত্রই দৃষ্টিনব্বকের বিদ্যালয়গুলির আলস জপ। বোঁজ নিলে সেখা বাবে নক্ষত্রের অধিকাংশ বিদ্যালয়ই দলাদলির পক্ষকুণ্ড, শিক্ষক নিষেধণের আড়ণ।

ভাবিলে অবাক লাগে, বহু বিদ্যালয়ে স্বস্বাধিকারী শিক্ষকগণ বিনা মাহিনায় পড়িয়ে যাচ্ছেন। এঁদের সংসার সম্ভবত ধরোয়া টাইশনের মারকতই চলে, না হলে এ-দেশের দুর্ভাগা চাষী সম্প্রদায়ের মতো এঁরাও মহাজনের ঋতায় বাঁধা থাকেন। শেষে এমন এক সময় আসে হয়ত যখন কর্তৃপক্ষের বিক্ষেপে মাহিনা দায়ের করতে হয় মধ্যশিক্ষা পর্বদে। তারপর হা-পিডোশ। বাস-প্রতি-বাদে পালি নাকি হলে ডি-আই-এর মজি মাকিক তদন্তের জন্য অপেক্ষা। ডি-আই-এর রিপোর্ট ডি-পি-আই ঘুরে মধ্যশিক্ষা পর্বদের ব্যাপিল কনিটির বড়ি ছুঁতে বছর কাবার।

আশ্চর্য ব্যবস্থা: বিচারালয় ৭৭এর ২, নাকি স্ট্রীটে। তদন্তকারী অফিসার বিভিন্ন জেলার ছড়াণো। মকদ্দমার কাগজপত্র রাইটার্স বিল্ডিং-এ পর্বদ কর্তৃক প্রেরিতব্য। সেখান থেকে কাগজপত্রের সংশ্লিষ্ট ডি-আই অফিস ও পরে ডি-আই-এর তদন্ত রিপোর্ট সবচেয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ডি-পি-আই-এর স্থাপালি

ক্যাডরে পর্যদ পুহে প্রত্যাভর্তন। এর মধ্যে যদি আবেদনকারী শিক্ষক পরলোকে পা বাঁড়ান তবে উপরি স্বকমারি। টাকা পেতে মানুষ বুড়িয়ে যায়। অথচ বাকেরা মাইনে এবং প্রতিডেটে ফাঁদের টাকা ছাড়া খুব কম ক্ষেত্রেই কোনোরূপ কতিপূরণের টাকা মাগটার মশারদের ডাণ্ডো জোটে। ন্যায্য মাইনের ওপর অটিক-ফানীর সময়ের জন্য কোনো ক্ষম ও প্রাপ্য হয় না। ব্যাকে রাখলে ক্ষমের ওপর ক্ষম সে টাকা হয়ত বাড়ত, এ ব্যবহার তা তো বাড়ই না বরং এক বছরের মূল্যমান বেড়ে সেই প্রাপ্য অর্থের মূল্য কমেই যায়। ন্যায্য টাকা পেতে এই হররানি শিক্ষক সম্প্রদায়কে মুখ বুজেই সহ্য করে আসতে হচ্ছে। এ ছাড়া কল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের অন্য উপায় নেই। কমপেন্স কেন রজু করেও একই অবস্থা। মধ্যশিক্ষা পর্বদের দু'হাত বাঁধা, নচেৎ এই গড়িমসি বহুল পরিমাণে কমে যেত। মধ্যশিক্ষা পর্বদ সাধ্যমত কেন বরানুদিত করেও পরমুখাপেকী। আর সেই অসহায়তার সমস্ত দুর্ভোগ ভোগেন শিক্ষক সম্প্রদায়।

পর্বদের নিষেধ তদন্তকারী অফিসার থাকলে এবং এতদ্বিষয়ে ডি-পি-আই-এর নির্দেশের অপেক্ষার কালহরণ করতে না হলে, পর্বদের হয়ত দু' বছরের বেশ তিন মাসে মাহিনা করা সম্ভব হত। শিক্ষকগণের কপাল মল। পর্বদ নিরুপায়।

কল ম্যানেজিং কমিটি মিলম্যানেজমেন্টের জন্যই বোঁজ হয় গঠিত হয়। বাতববরি করে নাও, দুদিন বৈত নয়, কমিটি কর্তাদের এই নরোভাবই সম্ভবত বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও দলাদলি নিবারণের পথে প্রধান বাধা। ছাত্র শিক্ষা-দানের থেকে পাল্টা দলকে শিক্ষাদানের জন্যই কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত। ম্যানেজিং কমিটির একটি সভা সেই দলাদলির স্বাক্ষর।

সুপরিচালিত বিদ্যালয় যে নেই এমন নয়, কিন্তু সুপরিচালিত বিদ্যালয় আছে সেটাই যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ। বহু ক্ষেত্রে দলাদলির আবেতে স্থানীয় ছাত্র ও অভিভাবকদেরও টানা হয়। সুশিক্ষার স্বাস্থ্য এর দ্বারা কতদূর বজায় থাকে সম্ভেদ, সুশিক্ষার পাঠ্যভাল করেই প্রদত্ত হয়।

এ সমস্যার সমাধান কোথায়। শিক্ষানুষ্ঠান এই স্থায়ী সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান বুঁজে পেলে শিক্ষাব্যবস্থার অনেক গলদই দূর হতে পারে।

জলপাইগুড়ি :

দর্জিক মহাসারী

ধুপগুড়ি অঞ্চলে বিপদ একা আসে নি। দর্জিকের হাত ধরে এসেছে মহাসারী। কলো

নয়, ডমবিহ এক নতুন রোগের মহামারী—অজ্রিক রোগ।

চাল পাওয়া যায় না। গেলেও চোয়া-বাঁজার আশুনা। দেড় টাকা কিলো। ফলে যথেষ্ট ভাঞ্চে যে অল্পবিশেষ এখনো টিকে আছে তা নেহাতই অদৃষ্টের কৃপা। নিরায় জনসাধারণ ক্ষুধিবৃত্তি করছেন কাঁঠাল, কচু সিদ্ধ, জলী শাক আর গমের ভাণি চিবিয়ে। বরাত খুলেছে শুধু মহাজনদের। জটনক মড়-ওয়ারী মহাজনের গদিতে দুইশত গরু বাঁধা পড়েছে। নেহাৎ হতভাগ্য মানুষ বাঁধা রাখার রেওয়াজ নেই, নচেৎ বর্তমান অবস্থায় তাও বাঁধা পড়ত। কেন না অধিকাংশের ঘরেই এখন একমাত্র সম্পদ খাওয়ার কুটুম অতুত মনুষ্যবিশেষ হাজির আছে।

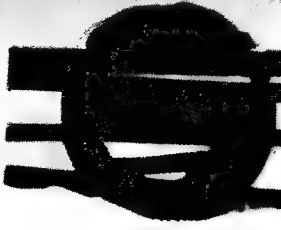
ক্ষেতের পাঁচ ঘরে ভোঁলার আগেই মহাজনের বাড়িবাড়ি গদিতে কুড়ি টাকা মণ দরবে বিক্রিয়ে যাচ্ছে। সর্বহারার কৃষককুল ধ্বংস দাঁয়ে দিশেহারা। অনেক চাষযোগ্য জমিও বিধে প্রতি একশত টাকা দরে ছাড়-কবলা লিখে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

অথচ ধুপগুড়ির জন্য দেশের মাথা মাথা লোকগুলির নীতাতপনিয়ন্ত্রিত আরামখানার কিছুকণের জন্য মজলিশি গুড়গুড়ি খেমেছে বলে সংবাদপত্রে কোনো সংবাদ নেই। অর্থাৎ এখানে যে কিছু একটা হচ্ছে তার কলে ভিটে-বাটি খুঁয়ে কৃষককুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে চললেন; সেজন্য মাথাব্যথা নেই কোথাও।

সম্প্রতি মাথা গরন হয়েছিল ডুমার্সের চাল জয়েচ্ জনসাধারণের মধ্যে। সংবাদে প্রকাশ, হাজার বড়কুল জনতার একটি দল জনৈক ইন্সপেক্টর সহ এক কনস্টেবলের ওপ। চড়াও হয়ে তাঁদের ডমবিহ দরবস্থার একা প্রাথমিক অভিযুক্তি প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু মানুষের অসন্তোষ হাতের কাছে পুলিশ পেলে তারই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথচ যে কোনো সাধারণ মানুষের মতো এসব ব্যাপারে পুলিশও নিরুপায়। সাধারণের মুখে আর যোগাবার দাবিও তাঁদের নয়। চাকরি তাঁদের শাঁখের করাড—বাঁয়ে সাধারণ মানুষ—ভাইনে সরকারী ছকুন, মাঝে বিকৃত তাঁরা। কিন্তু সব ঝড় তাঁদের গায়েই লাগে, ঝড় রোখার ব্যাটন-বলুক তাঁদের হাতেই ঝোলে বলে।

ধুপগুড়ির চরম অবস্থার প্রতি সরকার উদাসীন থাকলে রোগে পোকে দুভিক্ষে মহা-হারিতে সেখানে যদি অন্যতর এবং কঠিনতর দুর্ভিক্ষা ঘটে, তবেও হয়ত আর নতুন করে বিস্মিত হওয়ার কারণ ঘটবে না।



অসিড্যান কৃষ্ণাব

গোষ্ঠীলি বেলার

কিছুবেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে ওরা চারটি শিশু কিছুক্ষণ গল্প করে। চণ্ডা উন্ননের কিনার ঘেঁষে বসে তারা যখন বা মনে আসে তাই বকে যায়। গোষ্ঠীলির আলো তখন ঘুম-জড়ানো স্বপ্ন-ভরা চোখ দিয়ে যেন উঁকি মারে ঝাপসা হয়ে আসা জানলার ভেতর দিয়ে। অন্ধকারে নিস্তব্ধ ছায়ারা রঙ-বেরঙের গল্পের কুলি বয়ে এনে ঘোরাফেরা করে ঘরের কোণে কোণে।

যখন বা মনে আসে, তাই ওরা বলে। কিন্তু সবসময়ে আলো, উত্তাপ, ভালোবাসা আর আশার-ভরা গল্পই ওদের মনে বার বার ধরা দিয়েছে। আগামী সবকিছুই লম্বা ছুটির দিনের মত মধুময়। ফুলতোলা পদার ওপাশে জীবন যেন উন্মেষনায় লাফিয়ে লাফিয়ে গড়িয়ে চলে আলো থেকে আরও আলোর দিকে। ফিসফিস করে বলা তাদের সেইসব কথার অর্থ সবসময়ে নিজেরাই বুঝতে পারত না। গল্পের ছিলো না শব্দ, ছিলো না শেষ, এমন কি কোনো নিয়ম মতো ও এগোত যা।

চারটি শিশু একত্রে কথা বলে চললেও, কথার মাঝখানে কখনো এতটুকু জল্প পড়ত ঘটে নি। ওদের চোখের সামনে ছিল স্বর্গ থেকে করে-পড়া এক অপূর্ণ আলোর জগৎ, যেখানে প্রত্যেক শব্দের মানে স্পষ্ট, আর সত্যি, প্রতিটি গল্পের রূপ জ্বলজ্বলে জীবন্ত আর তাদের শেখটুকু আনন্দময়।

ওদের চারজনের মনের আদল একরকম মলে সেই আবছা সম্ভার আলোর চার বছরের সব চাইতে ছোটটির সঙ্গে বার বছরের সব চাইতে বড়টিকে কোনরকম তফাৎ করা যেত না। ওদের সকলেরই শীর্ণ লম্বা মুখ আর প্রকাণ্ড টানাটানা গভীর অনুভূতি-ভরা চোখ।

সেদিন সন্ধ্যায় এক অজানা রাজ্য থেকে একটি অচেনা হাত নেমে এসে যেন তাদের স্বর্গ থেকে বরা সেই আলোর দেশের ছুটি গল্প কাহিনীভরা আনন্দকে যাববার

নির্দয়ভাবে আঘাত দিয়ে গেল। ডাকের চিঠিতে স্বর এসেছে তাদের বাবা ইতালির মাটিতে পড়েছে—। তারপর থেকে কি যেন একটা লম্বা চণ্ডা বিশাল, নাম-মা-জানা একেবারে নতুন জিনিস, যাকে চিনতে পারা যায় না, বুঝতে পারা যায় না, তাদের চার-জনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই অশুভ প্রাণীটার মুখ, চোখ, চেহারা কেমন, তা কে জানে। একে ঠিক কোথাও মানিয়ে নেওয়া অসম্ভব। গীজার সামনে, রাস্তার উপরে যে সোরগোল-ভরা জীবন, সেখানে নয়। উন্ননের পাশে উক গোষ্ঠীলির আলোর নম, এমন কি গল্পের জগতেও নয়।

এই অশুভ জিনিসটা মোটেই আনন্দ-জনক নয়, আবার খুব দুঃখ দিতেও পারছে না ওদের। কারণ আসলে ওর মধ্যে জীবনের সাড়া নেই। চোখ না থাকতে ও দৃষ্টি দিয়ে জানাতে পারছে না ও কি এবং কেন, মুখ না থাকতে কথা দিয়ে বুঝিয়ে বলতেও পারছে না কিছু। যেন প্রকাণ্ড কালো অনড় একটা দেওয়াল, আর তার সামনে ওদের সকলের ভীতু মনের ভাবনাগুলো ঠেকে গেছে।

কিন্তু বাবা কখন ফিরে আসবে? টনটেক, সব চাইতে ছোটটি, অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। লরজকা, সব চাইতে বড়টি, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওকে ধাক্কা মারল—কি করে ফিরে আসবে, যখন সে মরেই গেছে—।

ওরা চারজন আবার কথা হারিয়ে চুপ করে গেল। সেই প্রকাণ্ড কালো দেওয়ালটার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারপরে কি আছে ওরা কেউ দেখতে পেল না।

‘আমিও যুদ্ধে যাব—’ মনের মতো কথাটি চট করে খিঁজে পেয়েছে এমন ভাব করে সাত বছরের মাতিশ বলে উঠল—। এ ছাড়া আর কিছুই তার বলার ছিল না।

‘ভূমি এখনও বড় ছোট—’ চার বছরের টনটেক ধমক দিয়ে উঠল—যে টনটেক এখনও মেয়েলী স্বর করে। সবচেয়ে রোগা, সবচেয়ে

দুর্বল মিলককে তার মায়ের শালটা জড়িয়ে যেন একটি পখ-চমা মানুষের পাইলির মত দেখাচ্ছে। ছায়া ছায়া অন্ধকারের মধ্যে যে তার হালকা নরম গলার বলল—

‘যুদ্ধ কিভাবে হয়,—বল মাতিশ, গল্পটা আমাদের বল—।’

মাতিশ বোঝালে—যুদ্ধটা কিরকম শব্দে। লোকেরা একে অন্যকে ছুরি বসিয়ে মেরে

সালফার গ্যাসোমাথা প্রাবান



গন্ধক মেরোপে বিশেষ উপকারী।
শেজা এই বাবান নিত্য ব্যবহারে,
বিশেষতঃ পরমের দিনে, বোম,
কোড়া, ফুলকানি, ঘামটি প্রভৃতি
চর্মরোগ নিবারণ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

সাপ্তাহিক বসুমতী

জলোয়ার দিয়ে ঢুকুরো ঢুকুরো করে কেটে ফেলে, আর বন্দকের গুলীতে মেরে ফেলে। মৃত ছুরি বসাতে পারো বা কেটে ফেলো ততই ভালো। কেউ তোমার কিছুরি বলবে না, কারণ তাই করতে হয়—। এই হাল যুদ্ধ—।

কিন্তু ওরা কেন একে অন্যকে ছুরি মারে বা কেটে ফেলে— মিলক। অবশ্যের মত বলে উঠল।

‘সম্মানের জন্যে—’ মাতিশ বলল। তখন ওরা সবাই আবার চুপ করে গেল।

এবারে অনেক দূরে ওদের কুয়াশার ঘোর-লাগা চোখের সামনে আলোর উল্লসিত প্রকাশ আরও একটা কিছুর বেন জ্বলজ্বল করে উঠছে। ওরা একটুও নড়ছে না, নিশ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেছে, গীর্জার আশীর্বাদ শব্দগুলির সময়ে যেমনটি হয়।

মাতিশ আবার তাড়াতাড়ি ওর ভাবনাকে ছাড়িয়ে তুলে নিল, হয়তো সে নিস্তরতা ভীষণ ভারী বোকার মত ওদের উপরে চেপে আছে, তাকে দূর করে দেবার জন্যেই—

‘আমিও যুদ্ধে যাব—শত্রুর বিরুদ্ধে—।’

‘শত্রু কেমন দেখতে, ওদের মাথার কি শিং আছে?’ — মিলক। মিষ্টি নিচু গলায় শব্দ আবার শোনা গেল।

‘নিশ্চয় আছে, তা নইলে ওরা শত্রু হোল কেমন করে,’ — টনচেক খুব গম্ভীর-ভাবে প্রায় ধমকের সুরে জোর দিয়ে বলল। তাতে মাতিশও যেন উত্তর দিতে গিয়ে সব ঘুরিয়ে ফেলল।

‘কিন্তু আমার মনে হয় না ওর শিং আছে—’ খেমে খেমে সে জানালো।

অনিচ্ছা সত্ত্বে সকলের বড় লজ্জকা বলেই ফেলল—শিং থাকবে কেমন করে, ওতো আমাদের মতই মানুষ।’

কিছুক্ষণ বামে আবার চিন্তা করে লজ্জক জানালো,—‘ওর কেবল আঙ্গা নেই—।’

টনচেক ভাবনার স্বাক্ষর অনেকক্ষণ তালিয়ে গিয়ে পরে প্রশ্ন করল—‘যুদ্ধে মানুষ পড়ে কি করে? পিছন দিকে চিং হয়ে, এমনি করে?’ — নিজেকে সে চিং হয়ে শুরুর পড়ার ধরণটা দেখিয়ে দিলো ওদের।

‘ওরা তখন মরতে মরতে একেবারে মেরে ফেলে—’ শব্দ গলায় মাতিশ ব্যকিয়ে দিলো।

‘বাবা আমার জন্যে একটা বন্দুক আমনবে বলেছিল—।’

কি করে বন্দুক আমনবে, যখন সে যুদ্ধে পড়ে গেছে—’ লজ্জকা খুব যুদ্ধ গলায় তাকে ধমক দিয়ে উঠল—।

‘আর ওরা বন্দাকে একেবারে মেরে ফেলেছে—?’

‘একেবারেই মেরে ফেলেছে।’

ছেলেমানুষী-ভরা বড় বড় চোখে নিস্তরতা আর দুঃখ যেন উপচে গড়িয়ে পড়ল অন্ধকারের দিকে—মন দিয়ে হৃদয় দিয়ে বা বোঝা যায় না এমন এক অজানা অসম্ভবের দিকে—।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির সামনে একটি বোঁকিতে ছেলেদের ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা বসে আছেন। চলেপড়া সূর্যের শেষ আলোটি জ্বলছে বাগানের ঘন পাতা-ভরা গাছের ডালে। একটি নিস্তরতা সন্ধ্যা শব্দ আশ্রয়ালের দিক থেকে গুমরেওটা একটি কল্লার কীপ শব্দ। হয়তো ওদের তরুণী মা গরু বাছুরদের দেখতে এখন আশ্রয়ালের দিকে গেছে।

বার্ষিকের ভারে লত ঘনিষ্ঠ মানুষ দুটি মুখ নিচু করে নিস্তরতা হয়ে হাত ধরে বসে আছে। এত কাছাকাছি তারা অনেক দিন আসে নি। শেষ বেলাত আকাশের উল্লসিততার দিকে তারা অপ্রত্যাশিত চোখে তাকিয়ে আছে কেউ কোন কথা বলছে না।

অনুবাদ : জয়ন্তী সেন

ভূষিত চাতকের কণ্ঠস্বর

অরূপ আকাশ

এখনো সরোবরে মাছেরা সব বেঁচে আছে,
এখনো পৃথিবীর
কুয়াশার আমরা পথ খুঁজে পাই; এখনো
মানুষের হৃদয়
সুগভীর আশ্বাসে ভরা, অরণ্যের নদীতে
নিজনে অন্ধকার রাতে

প্রেমের আকাশ নেমে আসে, পৃথিবীর পথ
হারিয়ে যায়।

আমরা এতোকাল জলোচ্ছ্বাসে বেঁচে আছি,
হাওয়ার হাওয়ার
সব একাকার হয়ে গেল। শরতের শস্যক্ষেয়
ময়াদী আলোর ভরে থাকে।

এখনো মাছরাঙা পৃথিবী সব নেমে আসে
পৃথিবীতে, এখনো ঘাসের ওপরে খেলা করে
সবুজ পতঙ্গেরা, উড়ে চলে যায়, আকাশের
দিকে মন রেখে

আমরা পার না তবু, এমনতর শরবতের মতো

অসহ্য আকাশ

আমাদের আকাশে এখনো জীবনানন্দ দাশের
প্রতিকৃতি দেখা যায়।

অথচ, পৃথিবীতে এখনো আদিম কামনারা
খেলা করে, সুন্দরের আর দেখা মেলে না।

আমরা সবাই পথ হারিয়ে ফেলছি; অর্বাচীন
পথিক শব্দ মেঘের জন্য এখন
ধ্রুবরেখার কথা ভুলে যাই—সরোবর আমাদের
হৃদয়ের দিগন্তে বিলীন।

সদীর কলোচ্ছ্বাসে এখন শব্দ ভূষিত চাতকের
কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

আলিপূরের বিগতকাল থেকে একালের কথা

কাব্য-জিজ্ঞাসার অনুরূপে শহর নাকি নিরন্তর। তাই কবিকুলের ভাবাবেবা শহর থেকে দূরে। অবশ্য শহরগুলোর সৌকর্যে কার্পণ্যের পদযাত্রা বিরামহীন—এমন উক্তি সত্যেরই অপলাপ। কারুকার্য তার অপেক্ষ। পথে, ফুটপাথে, হমারাজির বিপুল বিন্যাসে, আলোকমালার বহুবর্ণ তরঙ্গলীলার এবং নানা ভিড়ের সহস্র বাহার ব্যস্ততার প্রতিনিয়তই বা বিদ্যমান—তা চোখে ও চিত্তে বিস্ময় বা ভাব সমুদ্রে নিঃসন্দেহেই সহায়ক। তা ছাড়া এমন পরিবেশেরও আত্মবিকাশ আছে শহরে—যা নিজনে মানস-বাণিজ্যের পক্ষে বৈরাচারী নয়। পার্ক আছে, প্রশস্ত উদ্যান আছে এবং আছে নিরাস্তিত তরুলতার শ্যামল চিত্রাপণে বিস্তীর্ণ ময়দান। অতএব অভাব এমন কিছুই নেই। প্রায় সবই আছে—যা ভাবকের ভাবাবেবার পক্ষে অপ্রতুল বলা চলে না। তবু স্বভাব-কবিদের তা মানস-নন্দিত নয়। কারণ নগর-নিসর্গের সার্বিক সত্তা কৃত্রিম এবং কারুকার্য তার নিঃপ্রাণ পাথরের। এখানে রস নেই। তাই রসের তৃষ্ণা নিয়ে শহর থেকে দূরে আসাই স্বাভাবিক স্বভাব-কবিদের পক্ষে। কারণ দূরেই আছে মরুনাড়ার মাঠ, আছে মেঘলা দিনে কৃষ্ণকলিদের বিহীন শুক্লকর্ণের আলোখা। আর আছে গ্রাম, গ্রামের পাদদেশে পশুদীঘি—বেখানে কলসের স্বচ্ছ তনুতে আপন প্রতি-বিশ্বের উদ্ভাসে চমকে ওঠে দিনান্তের আলো। তারপর দীঘির ঘাটেই নেমে আসে শ্রোণী-ভারাক্রান্ত কালিদাসী সন্ধ্যা। ঘাট থেকে ঘরের উঠানে এবং উঠান থেকে ছাতিমতলার পথ ধরে নদীতীরে মিলিয়ে যায় তার নুপুর। আবার নদীর জলে মুখ ধুয়েই সূর্য ওঠে হাসতে হাসতে, বনে বনে সাড়া পড়ে গানের। পাতায় পাতায় পা ফেলে যায় আলাপচারী হাওয়া, হাওয়ার উৎসুক বুকেই আপনাকে নিঃশেষে দান করে বকুল। বনের একল-ওকুল দু'কুল ভেসে যায় বিশ্বহীন সৌরভে।.....এমন অকৃত্রিম স্বাদ, নিসর্গের এমন স্বকীয় পরিবেশনা শহরে দুর্লভ। তাই কবি বা ভাবপ্রবণদের তৃষ্ণা-নিরসনের পক্ষে শহর নয় সিংহকাম।

তবে এমন ধারণার সার্বিক প্রতিষ্ঠা নেই আলিপূরের ক্ষেত্রে। আলিপূর বসতি-বহুল। রাজা-মহারাজা, উত্তরাধিকারসূত্রে ধনকুবের এবং অপ্রতিষন্ধ্যী বৈশ্যকুলের রম্য-নিবাসের বিস্তার এখানে ব্যাপক। অথচ অনিয়ন্ত্রণের কোনো মদ্যযাতও নেই কোথাও। বিস্ত্র এবং প্রযত্নের বিনিময়েই প্রতিষ্ঠা বলে পরিবেশ তার কৃত্রিম—এ-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, প্রতি সরণীর ভবনপুঞ্জের আশেপাশে যে-উদ্যানরাজির প্রতিষ্ঠা ঘটে আজ থেকে প্রায় আড়াই শ' বৎসরের পঞ্চাশ-শত—পায়ে পায়ে তা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অগ্রসর



আলিপূর চিড়িয়াখানার একটি দৃশ্য

হয়ে বর্তমান পর্বে যে-ভঙ্গীতে বিকাশপ্রাপ্ত, তাতে কৃত্রিমতার কোনো স্বাক্ষর আর নেই। মনে হয়ঃ সমগ্র আলিপূর জুড়ে যেন এক স্বয়ংসিদ্ধা প্রকৃতির নিরুপবেগ পায়চারী। বনোপবনের মন্দির পরিবেষ্টনে যে-মহল-শ্রেণীর অধিষ্ঠান, পরিগ্রহণ তাদের ইট-পাথরে সম্পূর্ণ হলেও, আশ্রম-সদৃশ। এখানে পাখির গানে সূর্য ওঠে, সন্ধ্যা নামে, রাতি ঘুমায়। পাতাকরার শব্দে পাশ কাটিয়ে যায়

দ্রীপদাতিক

এক-একটি দিন। অতএব স্বভাব-কবিদের ভাবলোকে উধাও হওয়ার উপকরণ বে কিছু এখানেও বর্তমান—তা সহজেই অনুমেয়।

আলিপূরের চিড়িয়াখানা কেন সম্পূর্ণ একটি জগৎ। পরিবেশ তার পৌরাণিক কোনো তপোবনের সঙ্গে উপমের। এখানে প্রাণী-জগতের যাবতীয় প্রাণীর অধিবাস। প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রতি শ্রেণীর স্থল-চর ও জলচর জীব-জন্তুর সঙ্গে এখানে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদেশের দিবাচর ও নিশাচর জীবের সম্প্রদায় যেন ঘটেছে, তেমনি মেলা বসেছে পৃথিবীর সারা আকাশের বিচিত্র বিহঙ্গকুলের। সারা চিড়িয়াখানার কত রঙ, কত বৈচিত্র্য। প্রাণিকুলের প্রতি চোখ পেতে চিড়িয়াখানার পথ-পরিভ্রমণ আসন্ধ্যা-সকাল কেটে গেলেও কোনো ক্রান্তিকর অবস্থার সঙ্গে সন্দর্ভ ঘটে না। বরং বিস্ময় থেকে বিস্ময়ভর স্তরে উপনীত হয় উৎসাহের মাত্রা। এমন বহুৎ এবং বৈচিত্র্যময় চিড়িয়াখানা সারা ভারতবর্ষে সম্ভবত আর একটিও নেই।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যযুগে চিড়িয়াখানার প্রাথমিক উদ্বোধন ঘটে বেসরকারী-

ভাবে। এই বেসরকারী চিড়িয়াখানার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব শাহ ওয়াজীর আলি এবং চোরবাগানের রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক। তারপর উদ্যোক্তামহলে সংযোজন ঘটে আরও অনেক উৎসাহীদের। তাদেরই যৌথ যত্নে কলকাতার কোনো এক বিশেষ অংশে পত্তনলাভ করে বেসরকারী চিড়িয়াখানা। এভাবেই কিছুকাল অতি-ক্রান্তির পর ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে আলিপূরে একটি সুপারিকল্পিত চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন Dr. Fayrer C.S.I., তারপর Mr. L. Schwende এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও হর্টিকালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে ইংরেজ সরকার তার সার্বিক রূপায়ণে সক্ষম হন ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সন্তম এডওয়ার্ড যখন প্রিন্স অব ওয়েলসরূপে ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনিই এই চিড়িয়াখানার উদ্বোধন করেন সাড়ম্বরে। তখন থেকে আলিপূরেই দিনে দিনে সম্প্রসারণ ঘটে এই চিড়িয়াখানার এবং দিনে দিনে বিশিষ্ট থেকে আরও বিশিষ্টতর সোপান অতিক্রম করার ফলে বর্তমান পরিচ্ছেদে তা অনন্য।

চিড়িয়াখানার উপকণ্ঠেই যে-বিশাল কৃষি-খণ্ড চিরহরিৎ পরিবেশে বিনাস্ত—সেখানেই অবিস্মৃত একালের জ্যোতির পট্টাময় বা ন্যাশনাল লাইব্রেরী। বেলভেভিয়ারের এই লাইব্রেরী-ভবনই ইংরেজ আমলের লাটভবন। লাটভবন প্রতিষ্ঠার পূর্বে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে এখানেই ছিল মোগল দিল্লীশ্বর আজিম ওসমানের সাময়িক বিনাস। তারও আগে তা ছিল বণিক সাহেব স্ল্যাঙ্ক-ল্যান্ডের বাগানবাড়ি। স্ল্যাঙ্কল্যান্ডের এই বাগানবাড়িতে প্রিন্স আজিম ওসমানের

সাপ্তাহিক বসুমতী



আলিপূর কোর্ট

গাম্ভীর্য আখ্যাসকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পরেই তা প্রতিপন্ন হয় মীরজাফরের সম্পত্তি-রূপে। তারপর মীরজাফরের হাত থেকে হেস্টিংসের হাত, হেস্টিংসের হাত থেকে আরেক হাত এবং আরেক হাত থেকেও অন্য অনেক হাতে হস্তান্তর হওয়ার পর ইংরেজ সরকার তা ক্রয় করেন লর্ড ডালহৌসীর আমলে। সম্ভবত তখন থেকেই বেলভেডিয়ায় আত্মপ্রকাশ লাভ করে ভাইসরয়ের সাময়িক নিবাস বা লাটভবন। এ-সম্পর্কে পুরাতাত্ত্বিক হরিহর শেঠের গ্রন্থে উল্লেখ আছে: “বেলভেডিয়ায় প্রতিষ্ঠার বিষয় নিরাকরণ করা অতীব দূরূহ। কথিত আছে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্স আজিম ওসমান খ্যারা আরম্ভ হয়। উহা পূর্বে মিঃ ক্যাম্বল্যান্ডের বাগান-বাড়ি ছিল। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বেলভেডিয়ায় প্রথম নামোল্লেখ দেখা যায়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস মেজর টালকে এই বাড়ী বিক্রয় করেন। তৎপরে আরো কতিপয় হাত ফিরিয়া শেষে লর্ড ডালহৌসীর সময়ে রবার্ট প্রিন্সেপের নিকট হইতে গভর্নমেন্ট এই সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন।”

মীরজাফরের সম্পূর্ণ নাম: মীরজাফর আলি খাঁ। অনেকের অনুমান: জাফর আলির ‘আলি’-সূত্রেই ‘আলিপূর’ নামের পত্তন। তবে এ-সম্বন্ধে মতান্তরের অবকাশ আছে যথেষ্ট।

একালেও ‘হেস্টিংস-হাউস’ নামে স্বনাম-ধন্য বাড়িটিই ছিল মীরজাফরের নগর-নিকেতন। আর শোনা যায়: বেলভেডিয়ায় ছিল মীরজাফরের নবীন মহিষী মণি বেগমের মহল। মণি বেগম প্রথমত মীরজাফরের সঙ্গেই বসবাস করতেন হেস্টিংস-হাউস বা

তদানীন্তন নবাব-প্রাসাদে। একদিন বেলভেডিয়ায় হঠাৎ তাঁর ভিন্ন মহল আত্মপ্রকাশের কারণ নাকি হেস্টিংস। এ-সম্বন্ধে কেউ কেউ বলে থাকেন: একদিন নিমন্ত্রণ-সূত্রে হেস্টিংসের পদার্পণ ঘটে মীরজাফরের নগর-নিকেতনে। সেখানেই প্রোফ নবাবের পাশে অনবগুণ্ঠিতা মণি বেগমের সতেজ লাবণ্য দর্শন করেন হেস্টিংস। এবং বুঝতে পারেন: সে-নারী চান আরও কিছু নতুন স্বাদ, নতুন কোনো দৃঃসাহসিক আনন্দ! অতএব সেখানেই তিনি কৌশলে আলাপ করেন বেগমের সঙ্গে এবং স্বল্পকণ্ঠেই বেগমের বিজ্ঞাত

অন্তরে নিজের একটি নিহৃত আসন প্রতিষ্ঠা প্রয়াস পান।

তারপর থেকে প্রায়ই হেস্টিংসের আবির্ভাব সূত্র হয় মীরজাফরের ভবনে এবং মণি বেগমের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে থাকে নিয়মিত। এভাবে সাক্ষাতের ফলেই উভয় অন্তরের মধ্যে লোকনিন্দার ভয়ে যে সামান্যতম স্বেচ্ছা ছিল—তারও লয়প্রাপ্তি ঘটে নিঃশেষে। কিন্তু এখানেই সন্তুষ্টি নন হেস্টিংস। তিনি চান সম্পূর্ণ সম্ভাগ। নবাবমহলে তা সম্ভব নয়। বেগমকে কোনো উপায়ে বাইরে টেনে আনলেও লোকচক্ষে মুসলিম শরীরের খেলাপ হবে। সুতরাং বাধ্য হয়েই এবার তিনি মণি বেগমের কানে দেন এক অভিনব মন্ত্র:

বেগম আশ্চর্য হোলেন নবাবের কাছে। নিহৃত এবাদতের (প্রার্থনা) জন্য তাঁর একটি ভিন্ন মহলের প্রয়োজন। সেখানেই তিনি দাসদাসীর সঙ্গে বসবাস করবেন। নবাব সেখানে তাঁর সান্নিধ্য পাবেন কেবল নির্দিষ্ট দিনে।

প্রোফ নবাব নবীনা বেগমের প্রতি দর্পণ স্বভাবতই। সুতরাং তিনি বিনা বাকব্যয়েই স্বতন্ত্র মহল নির্মাণ করলেন বেলভেডিয়ায়। তারপর দাসদাসী সহ সেখানেই উঠে এলেন তাঁর বেগম।

সময় এগিয়ে চলে। একদিন নির্দিষ্ট দিনের কথা বিস্মৃত হয়ে কোনো এক অনির্দিষ্ট দিনেই মণি বেগমের মহলে উপস্থিত হন মীরজাফর। কিন্তু উপস্থিত হয়েই তিনি সবিম্বরে লক্ষ্য করেন হেস্টিংসের বাহুবন্ধনে বেগম তাঁর সাগ্নহেই সমর্পিত।



হেস্টিংস হাউস

নবাব ফিরে আসেন নতমুখে। হেস্টিংসই তখন নবাবের অধীশ্বর। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধাচরণের পক্ষে মীরজাফর যে গর্দভের মতোই নির্বোধ এবং অক্ষম—তা বলাই বাহুল্য। ডাচ-হুদুম নবাব ফিরে গেলেন তাঁর স্থায়ী নিবাসকেন্দ্র মুর্শিদাবাদে। তাঁর এই দুর্বল বা অসহায় মূহূর্তের সুযোগেই আলিপূরের সমস্ত সম্পত্তির স্বাধিকার লাভ করলেন হেস্টিংস স্বয়ং।

তারপর মণি বেগমের কী হলো? এ-প্রশ্নের কোনো সদত্তর নেই কোথাও। অবশ্য গল্প আছে অনেক। কিন্তু এ-সমস্ত গল্পের স্বপক্ষে কোনো মহলেরই সমর্থন খুব দৃঢ় নয় বলে বর্তমান নিবন্ধে তাদের উপস্থিতিরও প্রয়োজন নেই।

আলিপূরের সেই নবাব-প্রাসাদই আরও ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিয়ে নাম ধারণ করে হেস্টিংস-হাউস। হেস্টিংস এখানে সপরিবারে বসবাস করেছেন অনেককাল। তাঁরই কীর্তি এবং অপকীর্তির চূড়ান্ত স্মারকরূপে সে-মহল দাঁড়িয়ে আছে আজও। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে এখানেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মহিলাদের বি টি কলেজ এবং হোস্টেল। তা ছাড়া ডোমেষ্টিক সায়েন্স সংক্রান্ত বিহারীলাল কলেজেরও অবস্থিতি এখানেই।

আলিপূরেই অবস্থিত হটিকালচারাল বা উদ্যান-পালন সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্র। এ এক স্মরণীয় উপবন। এখানে পুষ্পখচিত বিচিত্র লতাজাল, ঘনপল্লবিত বহুবর্ণ উদ্ভিদ এবং বিবিধ ফসলের সুচারু বিন্যাসে ষে-পেলব-কান্তির অধিষ্ঠান—সত্যি তা বিরল-দৃষ্টান্ত শহর-কলকাতায়। এ-উদ্যানের বিবিধ দৃশ্য-মাজি পরম উপভোগ্য বলে এখানে দূর-দূরান্তবাসীদের অনেকেই আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় প্রত্যহ। সন্ধ্যা এবং উষাকালীন ভ্রমণের পক্ষে নগরবাসীদের অপরিহার্য এ-উদ্যান।

হটিকালচারাল সোসাইটির পক্ষে জেমস উইলিয়াম কেরী প্রতিষ্ঠা করেন উদ্যান-পালন সংক্রান্ত এই গবেষণাকেন্দ্র। সেইসূত্রে কেরী সাহেবের একটি মর্ম্মমর্তি সেকাল থেকেই এখানে অবস্থিত। এই উদ্যান বা উপবনের উন্নয়নকল্পে রাজা রাধাকান্ত দেব এবং প্রিন্স স্মারকানাথ ঠাকুরেরও সহায়তা ছিল প্রচুর। এ-সম্পর্কে হরিহর শেঠের গ্রন্থেই উল্লেখ আছে:

“...যাপিস্ট মিশনারী জেমস কেরীর উদ্যোগেই ইহা (হটিকালচারাল সোসাইটির উদ্যান) প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা স্মারকানাথ ঠাকুরের ও প্রিন্স স্মারকানাথ ঠাকুর প্রথম অবস্থায় ইহার উন্নতিকল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন।”

আলিপূরের হাওরা-অফিস থেকেই আবহাওয়ার সংবাদ পরিবেশিত হয় সারা কাছাকাছি। এ-অফিস নির্ভীক কাল-



হটিকালচার উদ্যানের একটি দৃশ্য

বিনোদনের একান্ত অনুকূল বলে এককালে এখানেই কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এখানে তখন তাঁর একমাত্র দোসর ছিলেন শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ।

রাজা-মহারাজাদের মধ্যে বর্ধমান মহারাজার উদ্ভূত প্রাসাদ অবস্থিত আলিপূরের পশ্চিম সীমান্তে। উদ্যানশোভিত বিশাল ভূখণ্ডের দক্ষিণভাগে তার নির্মিত অধিষ্ঠান। এককালে তার জৌলু্য ছিল যেমন নিদর্শনযোগ্য, তেমনই প্রভাবও ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বর্তমানে মহারাজার আদি প্রতাপের মহাপ্রস্থানের সঙ্গো সঙ্গো এই রাজবাটীরও জৌলু্য এবং প্রভাব প্রায় নিম্প্রভ। তা ছাড়া উদ্যানশোভিত বিশাল ভূখণ্ডের অংশবিশেষ আজ হস্তান্তরিত হওয়ায়, রাজবাটীর বিহীনশ্যেরও অংশগতন ঘটেছে স্বাভাবিক কারণে।

আদিগঙ্গার উপকূলেই আলিপূর সেন্ট্রাল জেল এবং জেলের অনতিদূরেই আলিপূর কোর্ট ও কুখ্যাত এ্যান্ডার্সনের দৃঢ় স্মৃতি-বিজড়িত উদ্ভূত অট্টালিকা। কোর্ট এবং জেলের দেয়ালে দেয়ালে আজও জেগে আছে অগ্নিশৃঙ্গের নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি। শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত বোমার মামলা ছাড়াও আরও অনেক ঐতিহাসিক মামলার কলঙ্কিত রায় ঘোষণা করেছে আলিপূর কোর্ট। এই কোর্ট থেকেই বিপ্লবীদের যে-সমস্ত অগ্নিপত্রের অন্যায় শাস্তিবিধান বিঘোষিত হয়—আলিপূর সেন্ট্রাল জেলে নির্বাতনের মর্ম্মান্তিক নৈবেদ্য গ্রহণ করেন তাঁরাই। কেউ কেউ তাঁরা এখানেই ফাঁসির রজ্জু পুষ্পহার-প্রতিম ধারণ করে সহস্রো উচ্চারণ করেন জীবনের জয়মন্ত্র। তা ছাড়া নেহরু, আজাদ, দেশবন্দু, সুভাষ প্রভৃতি সমগ্র প্রাণের কলঙ্কিত

অধিকাংশ সময় অতিক্রান্ত লাভ করে আলিপূর সেন্ট্রাল জেলেই।

একযোগে সেই কোর্ট এবং জেল অবিচার এবং নির্বচার-নির্বাতনের নিলম্ব প্রতীক-রূপে আজও দণ্ডারমান। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বিবর্তনের বিচিত্র মালা স্বকণ্ঠে ধারণ করেছে আলিপূর এবং সঙ্গো সঙ্গো জীবন-যাত্রাও তার নিয়ন্ত্রণলাভ করেছে জিম্মাখে। সেইসূত্রে আদি পরিবেশ থেকে বর্তমান পরি-মণ্ডলে উত্থান ঘটায় তার সার্বিক নিলম্ব আজ সম্পূর্ণ আধুনিক। তাই হয়তো আলিপূর অলঙ্কৃত এবং আলিপূর সেন্ট্রাল জেলের গতি-প্রকৃতিও আজ জয় করেছে প্রাচীন রীতির কখন-বিচ্যুত। কিন্তু ভবুও তাদের দেয়ালে দেয়ালে অগ্নিশৃঙ্গের নিঃশব্দ প্রতিধ্বনির কোনো বিরাম নেই। এ-প্রতিধ্বনি আধুনিক আলিপূর একালেও কান পেতে শোনে বলেই আজও তার বিস্মরণলাভে বঞ্চিত বিগতকালের রক্তাক্ত দিনগুলি।

প্রবীণ রসোপন্যাসিক

শ্রীঅসমঞ্জ মৃণোপাধ্যায়ের

অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী

৩খানি বড় উপন্যাস ও ১খানি

নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৯



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

। বস্তুত্বাবিশেষ প্রবাহ ।

শুধু বিরোক্তাটান নয়। শুধু নিরানুগ বাগ
হয়। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে
ইতিহাস লিখেছেন, ইরাটোস্থেনিস। শুধু বা
লিখেছেন, তিনিও আখগাছের কথা তাঁর
ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

লিখেছিলেন, 'অগার কেন, লাইক লার্জ
রীডন কটিও ইন ইতিহাস হইচ ওয়ার টু জুইট
ই কি টেস্ট বোব হোয়েন 'র' এটিও বলেন।

ভারতবর্ষের রাঠে-প্রান্তরে বে লম্বা লম্বা
আর লক লাঠির বস্ত অপরাধ আধিপাছ দেখা
বায় এবং তাঁর বাস যে অত্যন্ত মিষ্টি সেই মহলা
সগিরপারের ইতিহাসকারেরও অজ্ঞাত ছিল না।

পৃথিবীর তিন ভাগ জল। এক ভাগ
হল। এই জলেরও আবার সবটুকুই লবণাক্ত।
লবণ কষ্টের আদিকালের পণ্য। লবণের স্বাদ
প্রাঈগতিহাসিককালের মানুষ জানতো।
কিন্তু---

মিষ্টি। মানুষের বহু যুগের বিবর্তনের
অনেক---অনেক পরের ধাপে এসেছে এই
মিষ্টির মধুর অস্তিত্ব। যাক সে কথা---বাঁজা চিনি
বা মিষ্টির ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন,
তাঁরা বলবেন সেসব কথা---

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শালে ভারতবর্ষে হিউস, এক-
জন গ্রীসীয় বৈজ্ঞানিকও বলেছেন বিভিন্ন রকমের
ল্যাকারিনের কথা। এই ল্যাকারিন আজ
বছল প্রচলিত। কিন্তু ল্যাকারিনের মূল উৎস
কিছু চিনি। ভার্যাবোটস রোগাক্রান্ত রোগীকে
চিকিৎসকরা যখন চিনি খেতে নিষেধ করেন,
তখন চিনির বদলে এই ল্যাকারিন ব্যবহার
করতে বহন। তাঁরপর---

অনেক---অনেক পরে ৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন
কালের ঐতিহাসিক প্লিনিও উল্লেখ করেছেন
চিনির কথা। তিনি বলেছেন, সুদূর আরব
ও ভারতবর্ষ থেকে এসেছে এই বিচিত্র মিষ্টি
পদার্থ। চিনিকে কখনো তিনি বলেছেন
মধু, কখনো বলেছেন ল্যাকারন। যা থেকে
হয়েছে ল্যাকারিন।

প্লিনির ঠিক আটমটি বছর পরে এরিসার
তাঁর 'পেরিপ্লাস অফ রেড সী' গ্রন্থে বলেছেন---
'ল্যাকারন আর হারি অবটোও ক্রম রিডস;
গ্রোন ইন ইতিহাস এ্যাণ্ড ইন জাম পার্টস অফ
অফ দি রেড সী।'---

ভারতবর্ষে প্রচুর জন্মান এমন এক ধরণের
লম্বা লম্বা গাছ থেকে চিনি উৎসন্ন হয়, একথা

। বস্তু-সাহিত্যে বস্তুমতার অমর অবদান

ঐ অরবিন্দের

ANANDAMATH

কবি বস্তুমতেশ্বর তমর আনন্দমতেশ্বর তমর ২২রাজা ও সুবাদ

- আনন্দমতেশ্বর—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গায়
- আনন্দমতেশ্বর—'বস্তুমাতরম' মন্তব্যের পুত্র প্রকাশ।
- আনন্দমতেশ্বর—কবি বস্তুম ও কবি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমতেশ্বর এই মহামতেশ্বর অর্জনতাকীর লাহনে

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা

বস্তুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৯৬৬ বিপিনাবহারী গাছুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১১

সাপ্তাহিক বসুমতী

সেই সুদূর অতীতকালের বহু বৈজ্ঞানিক বহু ইতিহাসবিদ বলেছেন। কিন্তু—

একজনও বলেন নি। বলতে পাবেন নি, আখগাছ থেকে চিনি উৎসন্ন করা প্রণালী। পুষ্করীরাশীর সে কথা জানতে বহুদিন—বহুদিন লেগেছিল। কিন্তু—

সেই আদিকালের বাংলায় তখন যবে যবে চিনির বহুল প্রচলন। যে কোন গৃহস্থ যেমন ধান বোনে, পাট বোনে—তেরনি করতো আখের চাষ। মাঠে আখের চাষ লাগিয়ে দিবে তাবা স্বপ্ন দেখতো, একদিন লক্ষলক্ষ করে দিগন্ত পর্যন্ত সব্বের তব্ব বইয়ে দেবে এই নবীন, সব্ব আখতরু।

প্রাচীন ঐতিহাসিকরা (এদেশীয়) বহু গবেষণা করেছেন, আখচাষের সময় দিকপথে—ঠিক করে কখন থেকে শুরু হয়েছিল এই এই আখচাষ কি চিনির প্রচলন এই বাংলায়। কিন্তু তারও আদিমতন ইতিহাসেব একেবারে সুদূরতম প্রান্তে গিয়েও কোন সূত্র ধরে পান নি। শুধু বলেছেন—

সুগার ওয়াজ মোন ইন বেঙ্গল ক্রম টাইম ইনবোঝিয়া। দেবার ইজ স্কোয়াবলি দি ডিস্ট্রিক্ট ইন বেঙ্গল হবার কেন ডার নট প্রভিউল এ্যাণ্ড ক্লারিস—

বেনাবস, বিহার, বংপু, বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর। চিনির ব্যবসাব ইতিহাসে এই কয়টি আখ্যায় নাম বিখ্যাত। বেনাবস জয়। বিহার, বংপু, বর্ধমান, বীরভূম, একদিন বৃহত্তর সেই বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বীরভূম, বংপু, বর্ধমানের মাঠে-প্রান্তরে একদিন বহুল পনিমাণে ইক্ষুর চাষ হতো।

বীরভূম-বর্ধমানের ধুধু অনুর্বর মাঠের মাটি। কিন্তু ইক্ষু জন্মাতো প্রচুর। মাঠে মাঠে বাতালে দোল খেত দীঘল ইক্ষুতরু। শুধু তাই নয়। এত বিপুল পনিমাণে হতো যে, তার কোন সাপকোপ ছিল না। ইক্ষু

উৎপন্নের যেমন কোন হিসাব ছিল না, তেমন ছিল না শুষ্ক ও চিনির ব্যবহারের সাপকাঠি। মোটের ওপর, প্রকৃতির এই অকুপণ সৌহেব দান—বাংলায় অব্যবহিত এত প্রান্তরে অপরিপূর্ণ ফসল তখনও ব্যবসাব উপাদান হতে পাবে নি, কোন সুনিয়ন্ত্রিত শিল্পরূপে পরিণত হয় নি।

‘নো লিবিটস অক দি গ্রোথ এ্যাণ্ড দি ইউজ এ্যাণ্ড ন্যাচারলি ইট বিকোয়ার্ড এ ভেন্ট’—

শুধু বাংলায় নয়। ভারতের অনেক প্রদেশেই এই ইক্ষু এত বেশি উৎপন্ন হতো যে, একটা সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়েছিল। এই সময় ইউরোপ থেকে বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেন থেকে এসেছিল উৎসাহ। চিৎকালের ব্যবসায়ী বটিন মন্ডিকে ধার্মিক হয়েছিল কটল দুবলিড। বাংলায় এই অপরিপূর্ণ সম্পদকে ব্যবসাব প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। তাবা দেখল, ইক্ষু এমন জিনিস—যে মাঠ থেকে শুরু করে একেবারে চিনির হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ‘স্টেপ’-ই বাজার-পণ্য হিসাবে বিক্রি হওয়ার মত। যেমন আখ, আখ প্রচব বিক্রি হতে পারে। তাবপর রস—রসও বিক্রি হতে পারে, হতে পারে, তার থেকে পাটালী শুষ্ক। শুষ্ক থেকে চিনি—

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বাংলায় দিকে দিকে চিনির ব্যবসা কি রকম ছিল তাব কিছু আভাস পাওয়া যায় সেকালের কলকাতার চিনি-ব্যবসায়ীদের পতর্নবোর্ডের কাছে লিখিত একটি পত্রে।

—‘বহুদিন থেকেই চিনি এদেশের সব প্রধান একটি পণ্যসত্তাব। বাংলার চিনি বাজারে, মালাবার উপকূল, বোম্বেতে, সুবাটে এবং পাকিস্তান সাগরের উপকূলবর্তী দেশে দেশে রপ্তানি হতো। কলকাতা, মহানুভব সবকারের অধীনে আগাব পর থেকেই প্রায় ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫০,০০০ হাজার মণ ইক্ষু এক বছরে রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানিতে ৬০,০০,০০০ টাকা টাকা দেশের লাভ হয়েছে। কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিতভাবে

চাষের অভাবে কোন বছর ইক্ষু উৎপাদন পরিমাণ খুব বেশি হয়, কোনবার খুব কম হয়। তাব ফলে লাভের অঙ্ক কখনো কমে, কখনো বেড়ে যায়।

শুধু তাই নয়। যে পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হয়, তাও পণ্য হিসেবে পাওয়া যায় না। চাষী-গৃহস্থবা যথেষ্ট খরচ করে। এই খরচেই কোন হিসেব নেই। তাদের নিষ্প্রিয় কন্যার জন্য কোন আইন নেই। মাঠে মাঠে ফসলের পরিমাণও নিভব করে চাষীদের ইচ্ছাব ওপরে। আখবা চিনি-ব্যবসায়ীবা, মহানুভব সবকারের কাছে প্রার্থনা কবিতোছি ইক্ষু চাষ ও চিনি-ব্যবসায়কে সবকারী আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যোক।

আমরা সবকারকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিতেছি।’

এই চিঠির ফল হয়েছিল। সবকারের মনোবোপ এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। কার্যকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। কেমন করে জরিকে উর্বর করা যায়, কেমন করে সাদা সিঁপড়া—ইক্ষুর পত্রকে ভাঙানো যায়,—সেই সব চেষ্টা তারা করেছিল। তাবপরে—

তারপরে সবাসরিভাবে বিদেশী সবকার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ইক্ষু কিনতে শুরু করল। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে চাষীদের দান দিতে আরম্ভ করল। জাহী হলো হাজার বক আইন, হাজার রকম বিলিব্যবহা।

নদীয়ার বেবুইক এ্যাণ্ড কোম্পানী ইক্ষু পেয়েবের মত আদিকার কবল। গ্রামে গ্রামে চাষীদের কাছে বিক্রি কবতে শুরু কবল সেই মত। গৃহস্থবা চাষীবাও টাকা পেবে, তাদের পরিষরের ফলের পুরস্কার রূপালী মুদ্রা পেবে যিগুণ উৎসাহে চাষ করতে আবিস্ত কবল।

বাংলায় ইক্ষু-ব্যবসায়ে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হলো।

(ক্রমঃ)

মনোভিস্মার

স্মৃতিভিক্ষার নাম

হৃদয়ের আবরণে পোশাকী বাহ্যিক বস্ত্র থাকে
তারা সব কথা কয়, তারা রস মনের খাঁচার।
তারা সব কথা বলে মৃদু কবিতায়।

হৃদয়ের মত চাঁদ—আসে জানি নব সূর্য-রথে।

স্মৃতিভিক্ষার নাম

জীবনের ডাক শুনি;

তোমার আমার আশ্রয় বাধা।

নির্মম মৃত্যুর ছায়া, মানবের সংগ্রামের দায়।

বিবর্ণ মলিন রাত খরা দিতে আশ্রয় না কি

চায়?

স্মৃতিভিক্ষার নাম

চোখুয়া

২ তিন

নব্বিনাথ চিত্র

একটু বাদেই তামটে রঙের পানীয়ে ভা
সোনালী বর্জব দেওয়া দুটি শাদা সুগোল
কাপ সেশটার টেবিলের শোভা বাড়াল। স্বাতী
ঠিক সামনে বসল না, বিজনের পাশেও নয়।
লম্বা সোফাটার জানদিকে যে ছোট একটি
একক আসন আছে স্বাতী এসে তাতেই
বসল। মা বাড়িতে আছেন বলে হয়তো এই
সংকোচ। বাড়ির বাইরে এতখানি সংকোচ
আজকাল আব করে না স্বাতী। পার্ক স্ট্রীটে
ফ্রেন্ড ক্লাসে বাতায়তেব পথে বাসে-ট্রামে
কখনো কখনো ট্যাকসিতেও পায় বসেছে।
ছোঁয়াছুরি লাগলে কুণ্ঠিত হয় নি। ফেরার
পথে রেন্টেবস্টে পদা ঢাকা কোবনে সামনা-
সামনি বসে চা খেয়েছে, গল্প কবেছে। গণ্ডাব
ধাওঁও বেরিয়েছে কোন কোন সম্মুখ। প্রাণিতর
সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্বাতীর সঙ্গে তার
সুপ্রতিষ্ঠিত। আব একটু এগিয়ে হাতখানা
ধরলেই এখন হয়। মুখ ফুটে বলতে
পারলেই হয় 'চল আমাব হবে।'

সেইটুকু আজও বলা হয় নি। বে ঘরে
স্বাতীকে বিজনে নিয়ে যাবে সেই ঘরখানা
এখনও মনের মত করে সাজানো হয় নি
বিজনের। তেমন একখানা বাড়তি ঘরই বা
ছুকাখায়। নামেই গোটা বাড়ি। বাসযোগ্য
ঘর মাত্র দুখানা। আব আছে রাস্তাবর,
ভাড়ার ঘর। তাব কোন ঘরেই নতুন বউকে
নিরে ওঠা যায় না। স্বাতীর মত মেয়েকে
নিরে তো নয়ই।

'কফি কেমন হয়েছে?'

স্বাতী জিজ্ঞাসা করল।

বিজনে একটু চমকে উঠে বলল, 'ভালো।
কফি ভালো।'

স্বাতী মৃদু হেসে বলল, 'সার্টিফিকেটটা
জোর করে আদায় করে নিলাম।'

প্রজাব করে কেন?'

প্রজাব করে ছাড়া কি। আপনি নিজের
থেকে তো আব বলেন নি।'

বিজনে বলল, 'সবই বুঝি মূখে বলতে
৩৩

চোখে চোখ পড়তেই স্বাতী চোখ নামিয়ে
নিল। সকালে আর কাজল পবে নি স্বাতী।
কিন্তু ওর এই লজ্জাটুকুই যেন কাজল হয়ে
উঠেছে। কালো চোখেও ওই দৃষ্টি আজ
মেঘকমল দিনটির সঙ্গে মিশে রয়েছে।

জোর করেই স্বেচ্ছাসন থেকে নিজেকে
টেনে তুলল বিজনে। অফিস থেকে জরুরী
তলব এসেছে। বসে বসে শ্রুত কাজল
চেখের দৃষ্টি দেখলেও চলবে না, কাজল-
কালো মেঘ দেখলেও চলবে না। অফিসে
আজ বেরোতেই হবে বিজনেকে।

কিন্তু কেন? এত জোর তাগিদ কিসের
জন্য?

দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিল স্বাতী। সঙ্গে
সঙ্গে এসেছে ওদের কুকুরটি। ছোট
স্প্যানিয়েল। কিন্তু দেখতে মোটেই নিবীহ
নয়। আজ একটু মরীষা হয়েছে ওর মাথাব
হাত রাখল বিজনে। হাত বুলাল।

স্বাতী হেসে বলল, 'বাবা। এতদিনে
আপনাব ভয় ভাঙল। দেখলে তো কামড়ায়
না। আসলে আপনি বড় ভীরু।'

বিজনে স্মিতমুখে অপরাধ স্বীকার করে
বলল 'তা ঠিক।'

স্বাতী কী বুদ্ধি কে জানে। লজ্জিত
হয়ে বলল, 'আহা।'

দু-তিনটে সিঁড়ি নেমে আসবার পর
আর একটু মধুর অনুনয় কথেক ফোঁটা বৃষ্টির
মতই যেন কবে পড়ল, 'আবার আসবেন।'

ফিরে তাকাল বিজনে। নামতে নামতে
ফেন একটু উদ্‌বুদ্ধি হল, 'কেবল আমিই
আনব? তুমি যাবে না?'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত সময় নিল
স্বাতী। আর একবার পলক পড়ল চোখের।
জবাব দিল, 'অসম্ভব হবে বলল, 'যাবে।'

আর কিছু শুনবার দরকাব নেই বিজনের।
আর কিছু দেখবারই বা কী দরকাব।

বিজনে নেমে এল রাস্তায়। বত জল-
কাদাই থাক, পথ এখন আর দুর্গম বলে মনে
হচ্ছে না বিজনের। সে সমস্ত স্থিতি আর
সংকোচকে জয় করেছে। কিছুই আর তার
পক্ষে দুঃসাহ্য নয়।

তুমি অবশ্য স্বাতীকে আজ এই প্রথমই
বলল না বিজনে। এর আগেও বলেছে। যেন
কৌতুকে খেলাজলে, কি নিতান্তই অসাবধানে
বেরিয়ে এসেছে কথাটা।

যে শুনছে সে শ্রুত মনে নিচ্ছে।
কোন আপত্তি কবে নি। বিশ্বাস্ত বিজনে
আবার যখন আপনিতে ফিরে এসেছে তখনও
স্বাতীর মুখ থেকে কোন প্রতিবাদ শোনা
যায় নি।

কিন্তু আজকের ওই বে দুটি অক্ষরের
যাব শব্দটুকু তা যেন সব অনিশ্চয়তাকে দূর
করে দিয়েছে। এই 'যাব' স্বার্থতাহীন,
স্বিধাহীন। এই যাব মানে 'তোমার সঙ্গে
যাব; তোমার ঘরে যাব। আর এখন ওখানে
ঘরে বেড়াব না।'

এই কথাটুকু আরো অনেক আগেই
আদায় করতে পারত বিজনে। নিজের স্বেচ্ছা-
দুর্বলতার জন্যই পারে নি। মেয়েরা নিজেরা
দুর্বল। এইজন্যই সখল পুতুষের শত্রু বাহুর
আশ্রয় তাবা চায়। পুতুষের ক্ষীণতা দীনতাকে
ওরা সবচেয়ে বেশি ভয় করে। পুতুষের
সামর্থ্যই ওদের পরম সম্বল।

জল ভেঙে ভেঙে বড় রাস্তাব মোড়ে এসে
বিজনে পৌঁছল। বাস স্টপে আরো অর্ধেক
অপেক্ষা করছে। বেরোবার তাগিদ তার শ্রুত
একায়ই নয়।

স্টেটবাস বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু

গাণ্ঠাহিক বসুমতী

প্রাইভেট বাসগাড়ি একটি দ্রুতি করে চলছে। সোজা পথে নয়, ঘুর পথে। ভিড়ের জন্যে প্রথম বাসটি ছেড়ে দিতে হল। দ্বিতীয় বাসটিতেও জায়গা ছিল না। তবু বিচিত্র ফলাকোশেলে বিজন তার মধ্যে নিজের দেহটাকে জালিয়ে দিল।

শ্যামবাজার থেকে স্টেটবাস পাওয়া গেল। সেখানেও টোলেটের প্রতিযোগিতা। সারীরিক সত্তা বজায় রাখবার জন্য বাসত বিজন, অন্য কোন কিছু ভাববার সুযোগ পেল না। না স্বাতন্ত্র্য কথা, না অফিসের কথা।

বিবেকানন্দ রোড পার হবার পর বিজন একটা বেঞ্চে একটু বসবার জায়গা পেল।

পাশে এক অপরিচিত ভদ্রলোক আর একজন সহযাত্রী সংগে কথা বলতে বলতে চলেছেন।

কী দাদা, এই দুর্বোাগেও বোরিয়েছেন?

আরে ভাই না বেরোলে কি উপায় আছে? গরের চাকরি। কিন্তু বউ আব ছেলেমেয়ে-দুটি নিজের। সেই হয়েছে জ্ঞান।

মাকবরসী দুই বন্ধু হেসে উঠলেন।

আকাশের মেঘের মত বিজনের মনেও একখানি আশঙ্কার মেঘ থম-থম করছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাকে আজ অমন করে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? কোনদিন তো এভাবে ডাকেন না। ম্যানেজার আছেন, একউনট্যান্ট আছেন ডাকতে হলে তাঁদেরই ডাকেন। আজ বেছে বেছে তারই কেন খোঁজ-খবর করছেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা কিছু উপদেশ-নির্দেশ পাঠান সবই ডিপার্টমেন্টাল ইনচার্জদের মাধ্যমে। বিজনের মত ক্ষুদ্রে অফিসারদের এমন সরাসরি ডাক কদাচিৎ আসে।

বাস থেকে নেমে বিপরীত নিয়ে ভাবতে ভাবতে বিজন অফিসের দিকে এগিয়ে লাগল।

ম্যাগো লেনে অফিস। ঢুকবার মুখে ভারেরান অনারিদের মতই সেলাম জানাল। অ্যাটেন্ড্যান্স আজ বেশ কম। হলঘরের অনেকগুলি চেয়ারই আজ খালি পড়ে আছে দেখতে পেল বিজন।

কিন্তু যারা এসেছে তাদের মুখও কেন বেশ গমগমে। বাইরের দুর্বোাগ কি এই অফিসেও লেগেছে? লগাই সম্ভব। কেউ ভিজে জামা গয়ে দিয়ে রয়েছে, কেউ লম্বা-সংকোচ না রেখে খুলে ফেলেছে জামা।

ডেসপ্যাচার প্রভাতবাবু পাঞ্জাবির ভিজে আস্তিন গাঢ়িয়ে চেয়ারে চেপে বসেছেন। বেঁটে প্রোড়-ভদ্রলোক। বিজনের দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করে এলেন ঘাই?'

বিজন বলল, 'আপনি যেভাবে এলেন।'

প্রভাতবাবু বললেন, 'আমি তো মশাই শীতবে এসেছি। কিন্তু আপনি কি সত্যি জানেন?'

সব সময় রসিকতা শুনবার জন্য কি তার জবাব দেবার জন্য মানুষের মন তৈরি থাকে না। বিজন কোন কথা না বলে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল।

অফিসার গ্রেডে প্রমোশন পেলেও বিজন আলাদা ঘর পায় নি। তবে সেক্রেটারিও টেবিল পেয়েছে। সহকারী পেয়েছে দুজন। এই মর্শাদা কম নয়। নিজের কর্মক্ষেত্রে যে মশ-আধিপত্য পায় মানুষ তাতেই গৌরব বোধ করে। স্কুলের ক্লাস প্রমোশনের মত কর্মক্ষেত্রেও এই উদ্ভারোহণটুকু না হলে তার চলে না। সামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য সহকর্মীদের মধ্যে পরোক্ষে প্রত্যক্ষে যে রেবারেই চলে বিজন তা দেখে অবাক হয়ে যায়। সব সময় বিজন যে নিজেকে নিলিপ্ত রাখতে পারত তা নয়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক জড়িয়ে পড়তে হয়। পরে সে জট খোলা সহজ হয় না।

বেরাযা এসে টেবিল মুছে দিল। কাঁচের কাগজচাপা দুটি বকবক করতে লাগল।

কারেন্ট ফাইলগুলি ব্যাক থেকে নামিয়ে আনল বেরায়া।

কাজ শব্দ করবার আগে বিজন ডাবল সরাসরি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে গিয়ে ঢুকবে নাকি তিনি আর একবার ডেকে পাঠান কি না তাব জন্য অপেক্ষা করবে।

কিন্তু কয়েক মিনিট যেতে না যেতে ম্যানেজার মঃ সেহানবীশই তাকে খবর দিলেন।

বিজন সংগে সংগে উঠে গিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকল। এই প্রোড় ভদ্রলোককে অনারিদের বেশ প্রসন্নই দেখতে পার বিজন, কিন্তু আজ যেন কী হয়েছে তাঁর। আজ তিনি বাইরের মেঘলা আকাশের মতই মুখখানা গম্ভীর করে বসে আছেন।

ঘরে আর কেউ ছিল না। বিজনকে দেখে একটু বেন হাসলেন ম্যানেজার। বিজন বেশ মুগ্ধতে পারল হাসিটি সহজ স্বাভাবিক নয়। জোর করা হাসি। সৌজন্যের কাছে ধর করা হাসি।

ম্যানেজার বললেন, 'আপনি তাহলে পৌঁছলেন এসে। শুব জলকাদা হয়েছে রাস্তায়। ভাই না?'

বিজন বলল, 'হ্যাঁ। আমি ডেবোজিলাম আজ ছাটি নেব। কিন্তু আপনি যেভাবে ডেকে পাঠালেন—'

ম্যানেজার বললেন, 'হ্যাঁ, নিতান্তই বাধ্য হয়ে আপনাকে এই কন্টাক্ট দিতে হল বিজনবাবু।'

ফর্মালিটির এই ঘটনা অশুদ্ধ সংস্কৃত বয়ে আনছে।

সব বুদ্ধিতে পেরেও বিজন নিজেকে কোন কথা বলল না। কোন কৌতুহল প্রকাশ করল না। ম্যানেজার কী বলেন তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজাটা একটু খোলা ছিল। ম্যানেজার নিজে উঠে গিয়ে সেটা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। তারপর ফের এসে নিজের চেয়ারটিতে বসে চুপ করে রইলেন।

এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা যেন বিজনের সহ্য হচ্ছিল না।

বে দুঃসংবাদ আছে ও'ব ধানিতে মঃ সেহানবীশ তা বের করে দিলেই পাবেন। বলবার জন্যই যখন ডেকে এনেছেন যত অপপ্রীতিকরই হোক কথাটা তিনি বলেই ফেলুন। অনর্থক এই চাপাচাপির কী মানে হয়।

একটু বামে ম্যানেজার বললেন, 'আপনি জানেন ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ছেলে দুঃসংবাদ, নিজে এবার অডিটের ভার নিয়েছেন।'

বিজন সব জানে। সুরথবাবু আব আই পাশ করে এসেছেন। তিনিই এখন সব দেখা-শোনা করছেন। বাপও আস্তে আস্তে যুবক ছেলেব হাতে সব ছেড়ে দিচ্ছেন। তাই তো স্বাভাবিক।

ফের একটুকাল চুপ করে থেকে ম্যানেজার বললেন, 'অডিটের বিপোর্ট আপনাদের ফেভাবে যার নি বিজনবাবু।'

বিজন চমকে উঠে বলল, 'তার মানে?'

অবশ্য আপনি একা নন। একাব বৃদ্ধিতে এসব হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনিও যে এ ধরনের ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন আমার ধারণা ছিল না। চাকরিতে ধীরে ধীরে আপনার উন্নতি হচ্ছিল। আবও হত কিন্তু আপনি কারো কারো কুপবাসমর্শে পড়ে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলেন। বৃদ্ধিম্যানের কাজ করেন নি বিজনবাবু।'

বিজন অস্বস্তিকরে বলল, 'আপনি কী বলছেন, আমি ঠিক—'

আমি কী বলছি আপনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। এসব কথা আমার নিজের বলবার ইচ্ছা ছিল না। এসব অপপ্রীতিকর ব্যাপারের মধ্যে কে আর ইচ্ছে করে যেতে চায় বলুন। কিন্তু ও'রা নিজেরা এসব ফেস করতে চান না। আর আমিও তো এখানে চাকরি করতেই এসেছি। কর্তার ইচ্ছা আমাকেও মেনে চলতে হয়।'

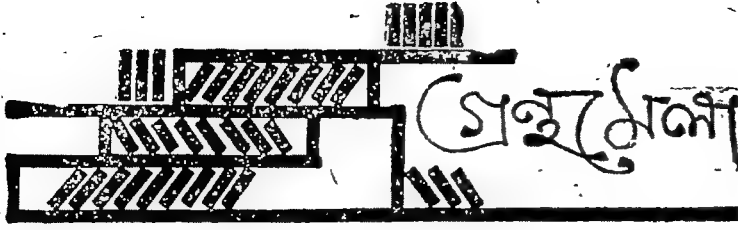
হঠাৎ কোন এল। বিসিভারটা তুলে নিয়ে একটু কথা বললেন ম্যানেজার। তাবপর বিসিভারটা রেখে দিয়ে বললেন, 'সুখবাবু, ডাকছেন। না না আপনাকে নয়, আমাকেই ডেকে পাঠিয়েছেন। আজ্ঞা, আপনি বরং এখন যান। আপনাব সীটে গিয়ে বসুন। তারপর সেখা যাক কী হয়।'

ম্যানেজারের ইচ্ছাতে বিজন উঠে দাঁড়াল। তারপর নিঃশব্দে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কি খুলতে কি বন্ধ করতে এ দরজায় কোন শব্দ হয় না।

শব্দ যা হতে লাগল তা অন্য জায়গায়।

বিজনের বুদ্ধির মাধ্যম। (ক্লেশঃ)



প্রথম-দর্শন : (তৃতীয় ভাগ)—স্বামী
নিত্যস্বানন্দ। জেনারেল প্রিন্টার্স স্যামু
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১০। মূল্য : পাঁচ টাকা।

প্রথম-দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে কি
আছে, তা আমরা জানি না। তবে তৃতীয়
ভাগের ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'পূর্বের দুই
ভাগের মত ইহাতেও আছে শ্রীরামকৃষ্ণপরিবারের
—ঠাকুর, মা, স্বামীজী প্রভৃতির বাণী ও
জীবনের সম্পর্শ'। আর উপনিষদ, গীতা,
বাইবেল, কোরাণ, শরিফ আদি শাস্ত্রের
শ্রীরামকৃষ্ণতাবস্মত ব্যাখ্যা। সেই কারণে
বলা যেতে পারে, প্রথম-দর্শনে ভাবের পোনা-
পানিক চুটি বের করা অসম্ভব নয়, কিন্তু
ধর্মের ক্ষেত্রে এ চুটি নগণ্য। প্রথম-দর্শনের
বিশ্বগাথিকা ম্যাদাম কলভের জীবনে স্বামী
বিবেকানন্দ, 'ফ্রাইস্ট ও মেরী মেকডেলনী',
'শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশ', 'শ্রীশ্রীমা ও আমজেন্দ',
'নবাবদান ব্রাহ্মসমাজে প্রথম' শীর্ষক অধ্যায়-
গুলি সাংসারিক মানুষদের জ্ঞানচক্র উন্মীলন
করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। তাছাড়া উপবোধ
গ্রন্থটিতে আমরা যা লাভ করি, তা হচ্ছে—
শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের অনেক নতুন কথা এবং
প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের নব মূল্যায়ন। যে কোনো
ধর্মের যে কোনো জিজ্ঞাসু প্রথম-দর্শন পড়ে
একটা অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি লাভ করবেন।
এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ হলেও আমাদের দৃষ্টি
আজো আচ্ছন্ন। তাই আত্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে
বিশ্ববোধের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে প্রথম-
দর্শন যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে মনে করি।

করে দেখ : প্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।
জেনারেল প্রিন্টার্স স্যামু পাবলিশার্স প্রাঃ
লিঃ। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১০।
মূল্য : দুই টাকা।

বাংলা দেশে বাংলা ভাষার বিজ্ঞানের গ্রন্থ
খুব বেশি বের হয় না। সংখ্যার কম প্রকাশিত
হলেও যে কপি বের হয়েছে সেগুলি
উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা ভাষার যারা বিজ্ঞানের
বিষয় আলোচনা করেন, তাদের মধ্যে গোপাল-
চন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম প্রথমেই সঙ্গো উল্লেখযোগ্য।
তারই প্রচেষ্টায় আজো বের হয় 'জ্ঞান ও
বিজ্ঞান' নামক পত্রিকা। এ পত্রিকায় তিনি
কিশোরদের উপযোগী অনেক প্রবন্ধ
লিখেছেন। প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞানচর্চা সত্যেন্দ্র-
নাথ বসু কর্তৃক সাদরে সম্বোধিত হয়েছিল।
এমন কি, এ সব প্রবন্ধ পড়ে ছেলেরা অতি
দক্ষতার সঙ্গে অনেক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে
সমর্থ হয়েছে। সেই সব মূল্যবান প্রবন্ধ

নিরে বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত
হয়েছে। প্রবন্ধের সঙ্গে রয়েছে নিজের দেশে
শেখার মত উপযুক্ত অনেক ছবি। 'গাছের
পাতায় ফটোগ্রাফী', 'দেশলাই বন্দুক',
'কাগজের চলন্ত মাস', 'পিস্তল ধনুক',
'দুর্গারমান সপ' প্রভৃতি ৫৭টি প্রবন্ধ পেলে
যে কোনো কিশোর বইটি লুক্ক নেবে—একথা
সহজেই বলা যায়। তাছাড়া প্রাথমিকভাবে
বিজ্ঞান বিষয়ে তাদের যে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে,
তা তাদের পরবর্তীকালে নামজাদা বৈজ্ঞানিক
করেও তুলবে। আমরা আশা করি, দ্বিতীয়
সংস্করণের এই বইটি বাংলা দেশের ছেলে-
মেয়েদের হাতে হাতে ঘুরবে। এবং তারা
নিজের হাতে বিজ্ঞানের জিনিস তৈরি করে
নতুন বাংলা গড়ে তুলবে।

আইনের বিচার : শ্রীজগন্নাথ সাহা, প্রকাশকঃ
ডি লাইট বুক কোং, কলিকাতা-৬। মূল্য :
দুটাকা।

বইটি আইনের আওতার নির্ব্যত
মানুষের অপ্রসঙ্গল কাহিনী। বারটি ছোট

জয়ন্তী সেন

গল্পের মাধ্যমে লেখক এই একটি কথাই
বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, আইনের পাঁচ সত্য-
মিথ্যা বাচাইবে শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর
পূর্বেই বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকেই বহুবাহ
মুখ খুঁজে পড়তে হয়। ট্রাজেডী সেই-
খানেই। লেখক নিপুণভাবে অকৃত্রিম আন্ত-
রিকতার সঙ্গে সেই কাহিনীই লিপিবদ্ধ
করেছেন। দুঃখীবাস, অমলেন্দু, শোভাবাদী,
প্রতিভার বেদনাবিধুর কাহিনীগুলির জন্মেই
আইনের বিচার। প্রশ্ন জাগে, বিচারের জন্য
যদি আইন, তবে আইনের বিচার নয় কেন?
লেখকের বাস্তবদৃষ্টি প্রশংসনীয়, প্রকাশ-
পারিপাট্যও সুন্দর। তবে গল্পগুলি সাধ-
ভাষায় লিখিত না হয়ে কথ্যভাষায় লিখিত
হলে আরও বেশি আকর্ষণীয় হতো। আশা
করা যায়, নিবানন্দ সারল্যে লেখক প্রথম
আবিষ্কারেই যথেষ্ট সাক্ষ্যলাভ করতে
পারবেন।

আমার স্বপ্নের মূখ : উৎপল চক্রবর্তী।
মিলাল, ১২ বাক্স চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২। মূল্য : দেড় টাকা।

জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতার অংশ-
বিশেষ উদ্ধৃতিব পর কবির নিজের কবিতা-
গুলি উদ্ধারিত। প্রথম কবিতা হচ্ছে, 'আমার

স্বপ্নের মূখ'। বলা বাহুল্য কবিতাটি
বৈদ্যনাথদাস; ভাবে নয়, স্বভাবে। যেমন—

"পৃথিবীর সব আলো সব গান শেষ হলে
পর" ইত্যাদি। দ্বিতীয় কবিতা 'স্বপ্নের
শব্দে সুন্দর। বর্তমান বাট দশকের বাংলা
কবিতাকে ঈশ্বর পেয়ে বসেছেন, সুতরাং
কবিকে দোষ দেওয়া নিরর্থক। এসব সত্ত্বও
উৎপলবাবু বেশ কিছু ভালো কবিতাও
লিখেছেন। 'জানি সুখ আছে', 'বৈবকের
গান' প্রভৃতি। আমরা আশা করি, কবির
পরবর্তী গ্রন্থে স্বকীয়তার পরিচয় লাভ করবে।

গাম্ভার : সম্পাদক : কল্যাণরত চক্রবর্তী।
অজয় রায়, ১৪ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগর-
তলা। মূল্য : পঞ্চাশ পয়সা।

'গাম্ভার' সংকলনের প্রথম আবিষ্কারেই
একটা বিশেষ মনোভাব ও বাংলা সাহিত্যের
বাবতীয় শাখার সঙ্গে বিদেশী সাহিত্যেরও
নব-মূল্যায়নের প্রচেষ্টা দেখে খুশি হওয়ার
কারণ আছে। অশোক দাশগুপ্তের প্রবন্ধ
এলিঅটের সৃষ্টি সম্পর্কিত; সর্বত্রই একমত
হওয়া যায় না, তবুও সুলিখিত। ভীষ্মদেব
ভট্টাচার্য তিনজন বাংলা ঔপন্যাসিকের
সাহিত্য তথা সাহিত্যধর্মের বিচার করে
সংসাহস দেখিয়েছেন। অন্যান্য যারা লিখে-
ছেন তাঁদের মধ্যে অনুপম মজুমদার, মাদিক
ধর, কান্তিক লাহিড়ী, ঋতেন চক্রবর্তী, গৌতম
রায়, শূভতোষ গুপ্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চতুষ্কোণ : সম্পাদক : শিবপ্রসাদ
চক্রবর্তী। ১২০, আচার্য জগদীশ বসু রোড,
কলিকাতা-১৪। দাম : একটাকা।

মননশীল মাসিক পত্রিকা হিসেবে
'চতুষ্কোণ' কেবলমাত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই রক্ষা
করেছে না, পাঠকরাও, তার কাছ থেকে সত্য-
কথের কিছু পাবে। এই পত্রিকার জ্যেষ্ঠ
সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ
উচ্চমানের। সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'আর'
সমন্য', নৃপেন্দ্র গোস্বামী' সমাজ ও
সংস্কৃতমূলক 'আর' ও সেমিটিক', সুনীল
চক্রবর্তীর 'বাড়ের মূলমামনী বিয়ের গান'
গবেষণামূলক প্রবন্ধের পর্যায়ে পড়ে। 'ধীরেন্দ্র-
নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সম্মোহন প্রসঙ্গ' শীর্ষক
চিঠিটি পড়লে দৈনন্দিন জীবনের অতি
পরিচিত ঘটনার কার্য কারণের সঙ্গে পরিচিত
হওয়া যায়। পাঠকদের অনেক কৌতুহল
এই চিঠির সাহায্যে নিবৃত্ত হবে। এই সংখ্যায়
যুম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য জানা
যাবে। গিবীন চক্রবর্তীর 'বিশ্বভূতকীর্তি'
রামানন্দ' সংবাদগুণে অনেক অজ্ঞাত তথ্য
দান করেছে। কিন্তু এই প্রবন্ধের সঙ্গে
রামানন্দের একটি ছবি দিলে ভালই হত।
আচার্য রজেন্দ্রনাথ শীলের ধারাবাহিক প্রবন্ধ
অনুবাদ করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত।
ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্পর্কে এই ধরনের
পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা অন্যতম দুর্লভ। এ সংখ্যায়
পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন মানবেন্দ্র পাল।
অন্যান্য বিভাগগুলি প্রশংসনীয়। এ সংখ্যা
কবিতা বাদ গেল কেন?

ভারত প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষামণ্ডল

১৮৭২-৭৮

১৮৭২-৭৩ খৃস্টাব্দে কানিংহাম পাঞ্জাব ও তার সমীহিত অঞ্চলসমূহে যে অনুসন্ধান চালান তার রিপোর্ট কলকাতা থেকে ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নানান দিক থেকে এই অনুসন্ধানটি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। প্রথমত এই অনুসন্ধানের ফলে শাবাজগরই থেকে একটি অনুশাসন পাওয়া গেছে যা সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে; তাই সমকালীন কয়েকজন গ্রীক রাজার নাম সহ এই লিপিতে অনেকাংশে খলিশ লিপির অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, এই অনুসন্ধানের পাওয়া গেছে অজস্র ইন্দো-গ্রীক স্থাপত্যের নিদর্শন, যা পবিত্রকালে গম্ভীর-শিল্প নামে চিহ্নিত হইবে। তৃতীয়ত, এই অনুসন্ধানের ইউসুফজাই, তক্ষশিলা, কুতান-ওয়ালা, মূলতান, পঠানকোট প্রভৃতি স্থান থেকে অজস্র প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। চতুর্থত, বিখ্যাত হরম্পার ধূসোবর্ণের এই অনুসন্ধানের ফলেই কানিংহাম কর্তৃক দৃষ্ট ও পরীক্ষিত হয়।

অশোকের শাবাজগরই লেখমালা ছাড়াও এই অনুসন্ধানের আরও বহু লেখমালা পাওয়া গিয়াছে। শাবাজগরই-র নিকটস্থ জমালগরই-তে একটি মূর্তির পাদদেশে ক্ষোদিত একটি লিপি পাওয়া গেছে। তা ছাড়া ইউসুফজাই জেলাতে আরও সাতটি লেখমালা পাওয়া গিয়াছে যথাক্রমে জেদা, ওহিন্দ, পজতর, সান্দো এবং সারি-বাহলোল থেকে। শাখেরী বা তক্ষশিলার ভাস্কর্য্যের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিছি। মাইরা গ্রামে, কর্নেল রবার্টসন একটি লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন যা একটি প্রস্তম্বেব তিনিদিকে বসিত। সোবকোটে কয়েকটি ইটের উপর ক্ষোদিত লিপি পাওয়া গেছে। তুখারের পর্বতগাত্রে পাঁচটি লেখমালা পাওয়া গেছে। হিসাব স্তম্ভে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। কাংবায় একটি শাক্ত শিলালিপি কানিংহাম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এ ছাড়া কনহিয়ারা, চাবি ও কিরাগ্রামেও কয়েকটি লেখমালা আবিষ্কৃত হইবে।

এই অনুসন্ধান রাণীঘাট, জমালগরই, তখত-ই-বাহি, খরকাই, সাওবালে-ধেব, নোগ্রাম, শাখেরি প্রভৃতি স্থানের ধূসোবর্ণের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। এই অনুসন্ধানের প্রাপ্ত মূর্তির সংখ্যা অজস্র; সেগুলির একটি বিন্তত তালিকা কানিংহাম স্মার্ট রিপোর্টের পৰিশিষ্টে দিয়েছেন, কয়েকটি

বিখ্যাত নিদর্শনের মধ্যে তখত-ই-বাহি-র বৃহদাকার মূর্তি, সারি-বাহলোলের বিখ্যাত বৃক্ষমূর্তিগুলি এবং মূলতানের সুবৃক্ষমূর্তির কথা উল্লেখ করা চলতে পারে। মূর্তি ছাড়া বৌদ্ধস্তূপ পাওয়া গেছে তখত-ই-বাহি, সারি-বাহলোল জমালগরই, তক্ষশিলা, মানিক্যাল প্রভৃতি স্থানে।

১৮৭১-৭২ খৃস্টাব্দের শীতকালে কানিংহামের সহকারী কার্লাইল আগ্রা থেকে রাজপুতানা অভিমুখে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য বাটা করেন। তিনি প্রথমে

নরেন ভট্টাচার্য

মৃতপুত্রসিদ্ধীর পার্বত্য অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্য চালান যেখানে তিনি বের এবং সতমা অঞ্চলের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পরীক্ষা করেন, এবং তেলতপুর্বে একটি অশ্রুত আদিবাসীদের দুর্গ এবং সমাধি আবিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি বায়ানা এবং পার্শ্ববর্তী বিজয়মন্দরগড় দুর্গে যান যেখানে তিনি ৪২৮ সংবতের লেখ-যুক্ত একটি স্তম্ভ আবিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি প্রাচীন মাচারি নগরে যান যেখানে তিনি আরও একটি প্রাগৈতিহাসিক সমাধি ও কয়েকটি লেখমালা

আবিষ্কার করেন। এখানে তিনি একটি প্রাচীন মন্দিরও আবিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি বৈরাটে যান এবং সেখানে একটি অশোকের অনুশাসন আবিষ্কার করেন। অনুশাসনটি অবশ্য অসম্পূর্ণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। সেওসাতে কার্লাইল কয়েকটি স্তূপ আবিষ্কার করেন। তারপর তিনি নইনেব প্রাচীন মীনাদুর্গ পরিদর্শন করেন। পার্শ্ববর্তী চাটমু, বাঘের এবং খোডা থেকে তিনি কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের গোলা-কৃতি প্রস্তরচক্র আবিষ্কার করেন। খোডায় তিনি দুটি প্রাচীন মন্দিরের নক্সা এঁকে নেন, এবং বিশালপুরে বিশালদেবের মন্দিরে তিনি পৃথিবী রাজার একটি তারিখ সমন্বিত দিলা-লিপি খুঁজে পান। এই মন্দিরটি এবং গোকর্ণের গৃহামন্দিরের চিত্র তিনি অঙ্কন করিয়াছিলেন।

১৮৭২ খৃস্টাব্দে তিনি চিত্তোরে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান। চিত্তোরের ১২ মাইল উত্তর-পূর্বে কারকোট নামক প্রাচীন স্থানে তিনি কিছু মুদ্রা আবিষ্কার করেন। সেগুলিতে উৎকীর্ণ লিপি, কানিংহাম যা পাঠ করিয়াছিলেন, "মহাক্ষিকার-শিব-জনপদমঃ"। এরপর কার্লাইল তম্বাবতী নামক স্থানে গমন করেন যেখানে তিনি বৃন্দ থেকে ৩০ মাইল উত্তরে। এখানে তিনি

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঐশ্বর্য

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটা

ঐতিহাসিক বসুন্ধরী

ঐতিহাসিক তত্ত্বনয়ী আবিষ্কার করেন।
মুদ্রাগুলি বিভিন্ন যুগের এবং সব কটিতেই
‘অলবান’ কথাটি লেখা আছে, যা থেকে
কানিংহাম অনুমান করেছেন যে পুরাণবর্ণিত
মল্যবান নামে স্থানটি বর্তমান স্থানটির সঙ্গে
অভিন্ন। কলংইল অল্পপর বিজলীতে
অনুসন্ধানকার্য চালান এবং সেখানকার
কয়েকটি মন্দিরের নক্সা এঁকে নিয়ে আগ্রায়
প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৭০ খৃস্টাব্দে এই
কর্মকলাপের রিপোর্ট ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে
লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

১৮৭১-৭২ খৃস্টাব্দে কানিংহামের
সহকারী বেগলার বুদ্ধেলখণ্ড এবং মালবে
প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান, এবং ১৮৭০-
৭৪ সালে অনুসন্ধান চলে মধ্যপ্রদেশে। এই
অনুসন্ধানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল
খজুরাহের মন্দিরগুলির আলোকচিত্র গ্রহণ।
তা ছাড়া পথারি এবং উদয়পুরের উৎকৃষ্ট
মন্দিরগুলির আলোকচিত্রও গ্রহণ করা হয়ে-
ছিল। মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশে বেগলার
অনুসন্ধান চালান এবং পশ্চিমাংশের দারিহ
কানিংহাম স্বয়ং গ্রহণ করেন। বেগলার তারি
এলাকা থেকে অল্প লেখমালা আবিষ্কার
করেন বেগলি ৬০০ থেকে ১৪০০
খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত। এইগুলির মধ্যে
কয়েকটি থেকে কলচুরিদের সম্বন্ধে অনেক
তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে কানিংহাম
জানিয়েছেন। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত এই লেখ-
মালার অনুবাদ হয় নি। বেগলাবের একটি
উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে রাজা শশাঙ্কের
একটি পাথরে ক্ষোদিত সীল; এটি শোণ
নদীর তীরে রোটার্স দুর্গে পাওয়া গেছে।
শিবপুর থেকে প্রাপ্ত একটি লিপিতে
কানিংহাম শিবপুর এবং শিবদুর্গের উল্লেখ
করেছেন। আরও একটি লিপিতে তিনি
চোড়গণের উল্লেখ দেখেছেন। তা ছাড়া
কয়েকটি লিপিতে হর্ষগুপ্ত, শিবগুপ্ত প্রমুখ
মুদ্রিত উপাধিধারী নরপতির সাক্ষ্য পাওয়া
গেছে বরা সম্প্রদায় জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্ব-
বাসনে উল্লিখিত শিবগুপ্ত, ভবগুপ্ত প্রভৃতির
সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। বেগলারের
রিপোর্টও ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে কলকাতা থেকে
প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৭২-৭০, খৃস্টাব্দে বেগলার বণ-
শেষে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান এবং তার
রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে কলকাতা
থেকে। এই রিপোর্টে পাটনা, গয়া, মুগের,
ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগনা, মানচুয়,
সিহুয়, বীরভূম, বাঁকুড়া, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান
এবং হুগলীর বিবরণ আছে। কলাই
যাহল্যা, তখনকার বগদেশ আয়তনের দিক
থেকে এখনকার মত হতভাগ্য ছিল না।
বেগলার পাটনার মুসলিম নিদর্শনসমূহ
বর্ণনাক্ষেপ করেছিলেন। পাটনা থেকে তিনি
দশ তিলাদকে এবং সেখান থেকে কলার

পাহাড়। এ ছাড়া তিনি ধারাবত, কৌয়া-
গেল, জারু, মিরাপুর, গুজরার, বাথনি পাহাড়,
ইসলামপুর, বাকরোর, সেওনগর, ওগারি,
দাপথ, বিহার, পাবাপুরী, চণ্ডীমেঠ,
বরগাঁও, শিলাও, রাজগাঁও, মোকামা, মারি,
ভাবনগঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে অনুসন্ধান
চালান। অবশ্য এইসব স্থানগুলি পূর্বেই
কানিংহাম কর্তৃক পরিদৃষ্ট হয়েছিল। তা ছাড়া
তিনি ভাগলপুর, মন্দার প্রভৃতি অঞ্চলে
পরিভ্রমণ করেছিলেন। এ সকল স্থান থেকে
তিনি অনেক বাংলা লেখমালা সংগ্রহ করে-
ছিলেন। অতঃপর তিনি বর্তমান বগে
পদার্ণ করেন এবং বীরভূম জেলার বিভিন্ন
অংশ পর্যবেক্ষণ করেন। সিউড়ির নিকটস্থ
বকেশ্বর পাঠ সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত বিবরণ
দিয়েছেন। তখনকার সিউড়ি-রাণীগঞ্জ
সড়কের উপর অল্প নদীর পূর্বপারে পাণ্ডু-
রাজার চিহ্নের উল্লেখ তিনি করেছেন। বরাকর
থেকে তিনি কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ
আবিষ্কার করেন। বরাকরের সাত মাইল
উত্তরে কল্যাণেশ্বরী বা দেবীস্থানে তিনি
দেবীর মূর্তি, মন্দির ও একটি বাংলা লেখ
লক্ষ্য করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি
আসেন আল্লা, পান্ডা থেকে কাতরান, সেখান
থেকে চোগাওগড়। শেখোড স্থানে তিনি
কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের উল্লেখ করেছেন।
সেখান থেকে তিনি বহাভ্রমে বিলোজা, তুয়ী,
ভাভিনোর, আলোবার, দায়িক, ভেলকুপি,
পায়, পাচের, খেলাই চণ্ডী, ছোব্রা, বলরাম-
পুর, বুয়াম, দুলাই, ইছাগড় প্রভৃতি স্থানে
অনুসন্ধানকার্য চালান। এইসকল স্থানে
তিনি অল্প মন্দির ও মূর্তি দেখেছেন,
বৌদ্ধ ভাগই দুর্গামূর্তি; অবশ্য শিবলিঙ্গ
ও জৈনমূর্তিও কিছু কিছু আছে। সুইস্যা
গ্রামে তিনি মনসা, শিব, বিষ্ণু এবং সিংহারচা
পার্বতীমূর্তি দেখেন। চণ্ডীদাসের ছাতনাকে
বেগলার নির্দিষ্ট করেছেন বাঁকুড়া থেকে ১৪
মাইল দূরে, পুরাতন গ্রাউন্ড বোড়ের উপর।
বাঁকুড়ার দুর্গামাইল দক্ষিণ-পূর্বে দারকেশ্বর
নদীর তীরে একতলবৈব মন্দিরটি বেগলারের
দৃষ্টি এড়ায় নি। বাঁকুড়া ১২ মাইল দূরে
বহুলারা গ্রামের একটি মন্দিরের কথা তিনি
উল্লেখ করেছেন; মন্দিরটি সিংহেশ্বর দেবের
নামে উৎসর্গ করা; ইনি অবশ্য লিঙ্গরূপেই
পূজিত হন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামটি
আজও পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে সমৃদ্ধ।
বেগলার বিষ্ণুপুরে বোলাটি মন্দিরের বিশদ
বিবরণ দিয়েছেন। হুগলী জেলা সম্বন্ধে
বেলগার আমাকে হতাশ করেছেন, কেন না
এটি আমার নিজের জেলা এবং বেগলার শৃঙ্খ-
হুগলীর নামটুকু উল্লেখ করা ভিন্ন আর
কিছুই করেন নি।

১৮৭০ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যে
কানিংহাম যে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান মধ্য-
প্রদেশে চালান, তার রিপোর্ট ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে

প্রকাশিত হয়। এই অনুসন্ধানে অল্প লেখ-
মালা পাওয়া গেছে যেমন ভেরাঘাট থেকে দ্বাদশী
অলহনা দেবীর লিপি, রূপনাথের অশোক
লিপি, ভারহুত থেকে প্রাপ্ত বাল্লালদেবের
লিপি, ভুডার স্তম্ভলিপি, বৃদ্ধগুপ্তের এয়ান-
স্তম্ভলিপি, ভাডকের চণ্ডীদেবীর মন্দির,
উৎকীর্ণ লিপি, ভেরাঘাটের ৬৪ বৌগিনীর
মূর্তিসমূহে অঙ্কিত লিপি; গোপালপুরের
চৌদী রাজাদের লিপি, বলভীর ধ্বংসের
লিপি, সিংহগড়ের প্রতীহার রাজা গজসিংহের
লিপি, গজকর্ণদেবের ক্ষুদ্রলিপি ও তেওয়ার
লিপি, কয়েকটি গুপ্তসংস্কৃত-সম্বলিত লিপি,
কাশী থেকে প্রাপ্ত রাজা কশ্যপের লিপি,
খোর ভারশালন, কারি-ভলই থেকে চৌ-
কেশীর রাজা লক্ষ্মণের লিপি, তেয়ার থেকে
প্রাপ্ত রাজা নরসিংহদেবের লিপি, পট্টনী
দেবীর মূর্তির দেহে অঙ্কিত লিপি, রাজা
সর্বনাথের লিপিসমূহ, হুন্ডির বিজয়সিংহ
দেবের লিপি, ভাডকের গুহালিপিসমূহ,
ইত্যাদি। লেখমালা ছাড়াও অনেক মূর্তি
এই অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে, যেমন কারি-
ভলই থেকে অষ্টলিঙ্গ, মংসা, কুম্ ও বরাহ
অবতারের মূর্তি; খো এবং মজলির বরাহ
অবতারের মূর্তি; মাইহারের সারদা দেবীর
মূর্তি; পিখোরার পট্টনী দেবীর মূর্তি, বাহ-
ল্লবের বিশাল জৈনমূর্তি; ভেরাঘাটের ৬৪
বৌগিনীর মূর্তি ও গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী
নদীত্রয়ের মূর্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ
যোগ্য। এই অনুসন্ধানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ
হল এলাহাবাদ ও জম্মলপুরের মধ্যবর্তী
স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে সমৃদ্ধ ভারহুতের
আবরণ উন্মোচন। ভারহুত ছাড়াও লাল
পাহাড়, শঙ্করগড়, উচহর, ভেরাঘাট, ভাডক
প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান চলেছিল।

১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৮৬-৮৭তে কানিং-
হাম বুদ্ধেলখণ্ড এবং মালবে অনুসন্ধানকার্য
চালান এবং তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়
১৮৮০ খৃস্টাব্দে। এই অনুসন্ধানের ফলে
মৌর্যযুগের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং
গুপ্তযুগের অল্প শিল্পনিদর্শন আবিষ্কৃত
হয়। তা ছাড়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখ-
মালাও এই অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ কনৌজরাজ ভোজদেবের শিলা-
লিপিও কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা পাওয়া
গেছে দেওগড় থেকে। ওই একই স্থান থেকে
প্রাপ্ত চান্দেলবংশীয় কীর্তিবর্মণের লিপিও
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুসন্ধানে কয়েকটি
উল্লেখযোগ্য মূর্তিও পাওয়া গেছে, যেগুলির
মধ্যে পাঁচটি অতিকায় মূর্তির কথা অবশ্যই
বলা প্রয়োজন; এখানে প্রাপ্ত বিষ্ণু ও বরাহ-
অবতারের মূর্তিও, বেসনগর থেকে প্রাপ্ত দুটি
নারীমূর্তি এবং খাজুরাহের অতিকায় হনুমান
মূর্তি। তা ছাড়া কোশামে প্রাপ্ত হরপার্বতীর
মূর্তি এবং ভিটোর প্রতীক মূর্তিগুলিও
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান অনুসন্ধান

শহরে বসে নামলো

শহরী নাম

শহরে নামলো বসী,
আমাদের কলকাতা শহরে :
এদিকে-ওদিকে জল,
ভাঙা আর দেখা যায় নাকো;
চারিদিকে স্রোত বয়,
নদী না কি! হঠাৎ কী হ'ল,
জাঘাড়ে ধারা নেমে
করে দিল সব এককার।

ঘাস ঘাস চলে নাকো,
থেকে গেছে সব পর পর;
মিছিল বেন বা পথে :
খানিকটা জলে ভুবে গেছে
ধাকীটা ভুলেছে মাথা—
ভেতরেতে নানা মানুষের
ভিড়, যেন খাঁচা-ভরা
নানা জীব, আর কোলাহল।

এক হাতে জুতো আর
অন্য হাতে ছাতাখানা বসে,
জাভে কি রেহাই মেলে,
কাক-ভেড়া চলছে তবুও;
গুতোগুতি, ঠেলাঠেলি,
মাকে মাকে লাগছে হোট;
উচু নীচু ভাঙাচুরো,
হোক না সে শহরের পথ।

কমকম জল করে আকাশে
বিরাম নেই তার;
জলে-ভেড়া, কাদা মাথা,
ধরেছি কী অপরূপ রূপ!
এ চার আমার পানে,
আমি ওর পানে চেরে দেখি :
বিহীন মনের কথা
একটু কি মনে পড়ে যায়।

আমরা সবাই বন্ধ।
না না নর, প্রিয়হারা না;
হারারে ফেলছি সত্তা,
যে-সত্তার মানব মানব।
এ এক সচল যন্ত্র,
অনুভূতি হরতো বা আছে
কিছু তাই নিয়ে ভোগ করি
এই যুগের কল্যাণ।

প্রধানত কোশাম, ভিটা, গাড়ায়া, খাজুরহো, ভীলসা, বেসনগর, সীচী, এরান, দেওগড় প্রভৃতি স্থানেই নীমাবদ্ধ ছিল।

কানিংহামের রিপোর্টের একাদশ খণ্ড ১৮৮০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। গবেষণ প্রবেশগুলিতে তিনি ১৮৭৫-৭৬ এবং ১৮৭৭-৭৮-এ যে অনুসন্ধানকার্য চালিয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে এই রিপোর্ট রচিত হয়েছে। এই রিপোর্টে নিম্নলিখিত লেখ-মালাগুলি স্থান পেয়েছে : বিলসরের কুমার-গুপ্তের স্তম্ভলিপি; প্রাক্তীয় অতিকায় বৃদ্ধ-মূর্তিতে ক্ষোদিত লিপি; চণ্ডীমোতে প্রাপ্ত রামপালদেবের লিপি; এবং সরনাথের নিকটে প্রাপ্ত রাজা মহীপালদেবের লিপি। তা ছাড়া মুসলিম যুগের অনেক লিপির উল্লেখ এই রিপোর্টে আছে। লেখমালা ছাড়া এই অনু-সন্ধানের ঘোষাওরা থেকে কিছু প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। কানিংহামের দ্বাদশ রিপোর্টে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের কথা বলা আছে। কানিংহামের সহকারী কার্ল হিল এগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। গঙ্গার তীরে অনুপ শহরের আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তিনি ক্ষুদ্রগুপ্তের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কার করেছিলেন যাতে গুপ্তসংবৎ ১৪৬-এর উল্লেখ আছে। কার্ল হিলের দ্বিতীয় আবিষ্কার হচ্ছে

গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমির সঠিক নিশানা। তা ছাড়া তিনি ইন্দোরের কুম্বনগুর, আহির-পুর ও বিন্দ্যাপুর চিবি থেকেও অনেক নিদর্শন সংগ্রহ করেন। কানিংহামের অপর সহকারী বেগলার ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত ছাতিগড় এবং কটকের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলিতে অনুসন্ধানকার্য চালিয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশে এতকাল অনাবিস্কৃত চাম্পেরী, তুরতুরিয়া এবং রাণিপুরে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। তা ছাড়া তিনি খড়গিরি, উদয়গিরি, খোলি (যেখানে বিখ্যাত অশোকলিপি আবিষ্কৃত হয়ে-ছিল); মর পাহাড়ের গুহাসমূহ ইত্যাদি পর্য-বেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর এইসব কার্যকলাপের বিবরণ কানিংহামের রিপোর্টের ত্রয়োদশ খণ্ডের বিষয়বস্তু।

১৮৭৮-৭৯ খৃস্টাব্দে কানিংহাম পাঞ্জাব অঞ্চলে পুনরায় অনুসন্ধান চালান। তাঁর অন্যতম সহকারী বেগলারকে তিনি বাঘনবাল, মালোট এবং কেটোর বিভিন্ন মন্দির পর্যবেক্ষণ করিয়ে আলি মসজিদের দিকে পাঠিয়ে দেন বৌদ্ধ নিদর্শন সংগ্রহ করার জন্য। কানিংহাম নিজের মনিফ্যালের দক্ষিণাংশে পর্যবেক্ষণ সূত্র করেন, সে স্থানগুলি পূর্বে জেনারেল কোর্ট পরিদর্শন করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি

শাহেরী বা তক্ষিলায় হাজির হন। অতঃপর তিনি চান পর্যন্তমালায় ভিতর দিয়ে সিন্ধু-তীরে কালাবাহ নামক স্থানে উপস্থিত হন, যেখানে তিনি মারি নামক একটি পার্বত্য দুর্গ পরীক্ষা করেন। সেখান থেকে তিনি সিন্ধু-পার হরে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন এবং কয়েকটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিদর্শন করেন। পুনরায় সিন্ধু অতিক্রম করে তিনি রোকারিতে আসেন যেখানে তিনি একটি প্রাচীন স্তূপ এবং অজয় বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করেন। সেখান থেকে তিনি কিলার নদীর তীরে ভেরা এবং ভিবি এবং চিনার নদীর তীরে সোহ-ভরা নামে স্থানগুলি পরিদর্শনের পর শিয়ালকোট এবং পরশুর হরে বাঘ-বচ নদীর তীরে কয়েকটি প্রাচীন চিবি খনন করেন। অতঃপর বিপাশা নদী পার হরে তিনি সুলতানপুর, নকোদর এবং নুরমহল পর্যবেক্ষণ করেন। সেখান থেকে তিনি আম্বালার পূর্বে সঘোর নামক একটি প্রাচীন নগরে যান। এই স্থানেরই কিছুটা দক্ষিণে টোপরা নামক স্থান থেকে সুলতান ফিরুজ শাহ একটি অশোকস্তম্ভ ভুলে নিয়ে দিল্লীতে স্থাপন করেন। সেখান থেকে কানিং-হাম ধানেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেন। কানিংহামের চতুর্দশ রিপোর্ট এখানেই সমাপ্ত হয়েছে।

সাপ্তাহিক বসুমতী

কলন আবার পাঁচ বিঘে জমি, তার তিন বিঘে তের কাঠা পড়েছে খালের এপারে আর বান-ধাকী ওপারে। চাষ করতে হলে বুকে বেতে হবে নশ নাইল। কারণ সরকারী সেতু ছাড়া পারাপারের ব্যবস্থা নেই আর। যেগুলির কথকিং উপশন হলেই তারা বাঁচে। আর খালের খাতে বাইরে দেওয়া করেক হাজার আবাদী জমির সভাব্য কলন, সে না হয় কর-কলের বাতল বলেই ভুগে দেওয়া গেল।

মোট ছটি লিক্‌ ইরিগেশন এবং গোটা দুই গভীর নলকূপ চালু করবার পরিকল্পনা আছে এই ভূমুদয়-নিত্যানন্দপুরে। দুটি গভীর নলকূপ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। পড়ে আছে যথারীতি বিদ্যুৎ অভাবে। একটি নাল লিক্‌ ইরিগেশন বগানো সম্ভব হয়েছে বেহলার গর্তে। চলমান বহু তোলা জল চলে দেওয়া হচ্ছে আবাদী জমিতে। কিন্তু ওই আ-দিগন্ত শুকো ভাঙার আঁকাকাটা পিপাসার মুখে ওই ফ-কোঁটা জল বাশ হয়ে উড়ে যায়। মাটি আর মানুষ তাই যেন আজ একই সঙ্গে জানাচ্ছে প্রাণনা। জল চাই জল। আরও জল। তবেই ফলবে ফসল। ভরবে নরায়। শান্ত হবে দেশ-জোড়া ক্ষুধিত মানুষের বুক-জোড়া বুড়কার হাহাকার।

রাস্তা-ঘাট এবং শুল্ক-ব্যবহার বড়ই অসুবিধা নিত্যানন্দপুরের। রাস্তা-ঘাটের অবস্থা তো এমনই শোচনীয় যে, বিশ শতকের এই রকেটীয় গতিশীলতার যুগেও এতগুলি অধিবাসী সহ এত বড় একটা এলাকা প্রায় গরুর গাড়ির যুগে পড়ে রয়েছে বললেও চলে। উদাহরণ স্বরূপ সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-কালনা-কাটোয়া রোড পার হয়ে নিত্যানন্দপুর গ্রামে প্রবেশ করবার একমাত্র পথ বেহলার সেতুটির দখাই বলা থাক। গ্রামেরই অধিবাসী স্থগীয় শ্রীবিনোদচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দানে এবং সরকারী উদ্যোগে প্রথমে একটি কাঠের সেতু নির্মিত হয়েছিল এখানে। পরে সেই সেতুটি ভেঙে ফেলে প্রায় বছর নশেক আগে অনুমান প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় এই কংক্রীটের সেতু। কিন্তু কার্যকরে দেখা গেল পুরনো সেই কাঠের সেতুর চেয়ে খুব যে একটা কার্যকরী হয়েছে তা নয়। এক সেতু ভাঙা এবং অপর সেতু নির্মাণ—এই সব মিলিয়ে কল্যাণ প্রায় পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর হাজার বত টাকাটাই সমারি লাভ করেছে বেহলার জনে। কারণ বেশির চেয়ে বেশি ফুট পাঁচেক নাল চওড়া এই সেতুটির ওপর দিয়ে মানুষের পা আর বাইসাইকেল ছাড়া অপর কোন যানবাহন চলতে পারবে না কোন-দিন। এত খরচ-খরচা এবং আড়তর করে যেটি প্রস্তুত হয় সেটি একটি পথের মতো নয়।



নিত্যানন্দপুর প্রবেশের প্রধান পথ (কংক্রীটের পারোচনা নেই)

এই বিতীর্ণ এলাকায় যাবতীয় কৃষিজাত দ্রব্য এবং জীবনযাপনের নিত্য-প্রয়োজনীয় অপরা-পর মালপত্র আমদানী-রপ্তানির ব্যাপারে কি অবর্ণনীয় দুর্ভোগ যে ভুগতে হয় গ্রামবাসীকে—চোখে না দেখলে তার সম্যক ধারণা করা অসম্ভব। গরুর গাড়ির ঢাকা বলে সেই গাড়ি নাধায় করে পার করে তারপরে সেই ঢাকা আবার পরিয়ে গাড়ি বোঝাই দিয়ে তবেই যাত্রা করা সম্ভব হয় গন্তব্যের দিকে। পথ চলার এ-হেন অস্বস্তিবস্ত বোধ করি একমাত্র নিত্য-নন্দপুরেই দেখতে পাবেন আপনি। হিমের ঘর পারের হেঁটে বাড়ি আসে, নরপাপুর রোগীকে বাঁশের ঝাটলি চড়িয়ে পাকা রাস্তার ধরে নিয়ে গিয়ে তবেই তুলতে হয় এ্যাঙ্কলেন্স। পথ এবং পরিবহনের এ-হেন কষ্ট বোধ করি গ্রামের মানুষ বলেই বুধ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে আজও। দেশের দূর-দূর্বে গ্রামবাসীও মহান জ্ঞানীদার। উপর্যুপরি করতারাে বহিত দ্রব্যাবল্য তাদেরও দিতে হয়। নানা রকম করতাদের বাঁতার চেপে তাদের রসরসও বড় কন শোষণ করা হচ্ছে না। অথচ সরকারী প্রচারপত্র কিংবা নেতৃবর্গের বক্তৃতাকে 'গ্রাম বাঁচাও'-এর বড়বুলি বত চড়া গলাতেই শোনা যাক না কেন, প্রকৃত-পক্ষে গ্রামকে বাঁচাবার চেষ্টা যে কতখানি করা হয়েছে তার সভ্য রূপ উদ্ঘাটিত হবে পল্লী-বাংলার এইসব পথ-ঘাট, স্বাস্থ্যবেজ, বিদ্যালয় প্রভৃতি দিকে পড়িয়ে দেখলেই হবে।

পাত করলেই। গ্রামের মানুষ দাবি করতে জানে না। কিত্রোহের ধুরো তুলতেও জানে না। সরকার দর্য করে যা দেন গ্রামবাসী বলা হয়ে তাই নাথায় করে নেয়। তাই কি?

শোনা গেল উল্লিখিত সেতুটি কিছুটা বন্ধ করবার আবেদন নিয়ে কিছু লেখালেখি এবং উদ্বৃত্তনয়নে কিছু দরবারও করেছিলেন গ্রাম-বাসী। কিন্তু সেতু নির্মাণের নামে গ্রামবাসীর সঙ্গে এমন একটা নির্ভেজাল পরিমাণ কেব করলেন কর্তৃপক্ষ, সে বুড়াত যেন বোঝা যায় নি, তেননই লেখালেখি এবং ইঁটামাটির পরেও তাঁদের এই নিরুত্তর শুদ্ধতাও এক নন-বুজির অগোচর রহস্যই হয়ে রইলো আজও।

তুল, কলেন্সের অধ-সুবিধা রাস্তা-ঘাটের অধ-সুবিধার ওপরই অনেকটা নির্ভরশীল। কাছপিঠের মধ্য কলেক বাগাটতে। ব্রীপোপাল ক্যানালী বহাবিদ্যালয়। নিকটবর্তী হাই স্কুল ভূমুদয়ে। গ্রুপান, উচ্চ বিদ্যালয়। বদিও ধেরী একাদশ মান বছরখানেক এবং সহশিক্ষার অধিকারও প্রাপ্ত। তথাপি রাস্তার দুর্গমতা ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যার্জনের স্ফূর্তি ভাটা ফটি করছে একথা নিঃসন্দেহে। শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকাদের দুর্গতির কথা তো উহাই থাক।

এদিককার একটি মাত্র বুনিনাদী শিকার— নিত্যানন্দপুর নিম্ন বুনিনাদী বিদ্যালয়। গ্রাম-বাসীর উদ্যোগে ও দানে এবং সরকারী সাহায্যে প্রায় ১২০০ মন ছাত্রীরা হয় এবং।

সাপ্তাহিক বসুমতী

শ্রমের নতুন বাড়ি ও খোলাসেলা পরিবেশ
এখানেই মন খুশি হয়। অনুমান করা যেতে
পারে শিশুদের তৃপ্তি এবং শিক্ষা-বিধানের
উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে সমর্থ হয়েছে
বিদ্যালয়টি। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবাস-
স্থল তৈরি হয় নি এখনও। এটি একটি মস্ত
অসুবিধা। বিশেষত নিত্যানন্দপুরের রাজা-
ঘাটের যা অবস্থা। তাতে করে অন্তত বর্ষাকালে
গাইরে থেকে আনাগোনা করা খুবই কষ্টকর।

প্রায় হাজারখানেক তপশীল অধিবাসী নিয়ে
গ্রাম ঝোড়ো-বাবলাপাড়া। প্রাথমিক বিদ্যালয়
মাত্র একটি। কিন্তু অভিযোগ তা নিয়ে
নয়। বিদ্যালয়টি কীভাবে চলে, কেনন তার
কাজকর্ম—অনুশাসন করবার বিষয় বোধ হয়
সেইটাই। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে
অনেক রকম বিশৃঙ্খলার সংবাদই অবগত
আছেন জনসাধারণ। কিন্তু একই বিদ্যালয়ের
একই শ্রেণীতে বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে ভিন্ন
ভিন্ন পাঠ্য পুস্তক এমন দৃশ্য বোধ করি একমাত্র
ঝোড়ো প্রাথমিক বিদ্যালয়েই দেখতে পাওয়া
যাবে। কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ—চালাতে না
পারলে বিদ্যালয় তাঁরা তুলে দিন। কিন্তু
শিক্ষাবিস্তারের নামে গ্রামবাসীর সঙ্গে এ-হেন
ভাষাগার অবসান হওয়াই মঙ্গল।

নিত্যানন্দপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির অবস্থাও
খুশি হবার মত নয়। স্থানীয় অধিবাসী
শ্রীশ্রীপদ বোথালের দানে এবং সরকারী উদ্যোগে
একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটি। চিকিৎসা-
ব্যবস্থা-বঞ্চিত নিত্যানন্দপুরবাসী স্বস্তির নিশ্বাস
ফেলেছিল বনে মনে। কিন্তু তারপরেই যত
দিন গিয়েছে পরিচালন-ব্যবস্থায় গুরুতর
বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এখানে। সম্প্রতি তো
এর প্রায় অর্ধেক কার্যক্রমই বন্ধ হয়ে রয়েছে
বললেও চলে। কিছুকাল আগে পুরুষদের
ওয়ার্ডটি ভেঙে ফেলা হ'য়েছে। কিন্তু পুন-
র্গঠনের কোন প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না আর।
কলে যথেষ্ট কষ্ট এবং অসুবিধা ভোগ করতে
হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসীদের। কাছাকাছি এবং
দূরবর্তী জনক হাসপাতাল বলতে চুঁচুড়া ইনাম-
বাড়া হাসপাতাল। প্রথমত সেখানে স্থান
পাওয়াই দুরূহ। তারপরেও রয়ে যায় আর্থিক
অনটনের কথা। গরীবের পক্ষে অতদূরে
(প্রায় দশ মাইল) গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে আসা
এক গফট।

কর্মচারীর সংখ্যা, উপযুক্ত ঔষধপত্র বা
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যাপারেও যথেষ্ট
দুর্ব্যবস্থিত নয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। ডাক্তার মাত্র
একজন। আউটডোরের বিপুল ভিড় (কারণ
মানে মাত্র শুধু ভুরুরদহ-নিত্যানন্দপুর, বহু দূর
দূর গ্রাম থেকেও আসে রোগী ও রোগিণীরা
হল) নামের মহিলা ইনস্পেক্টর প্রাথমিক

সেবাশোনা করে তারপরেও আবার বিদ্যা-
নন্দ স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কাজটিও সমাধা করতে
হয় তাঁকেই। নার্স, আয়া, মিডওয়াইক বা
অপর্যাপ্ত কর্মচারীর সংখ্যাও বৎসামান্য।
একজন ছুটি নিলে তার স্থান পূরণে অপরলোক
পাওয়া সম্ভব হয় না কখনই। যদিও মহিলা
ইনডোর আছে এবং প্রসূতি বারনাস, কিন্তু প্রসবে
একটু যেনন-তেমন কিছু হলেই রোগিণীকে
পাঠাতে হয় চুঁচুড়া। কারণ সামান্য একটু ছোট-
খাটো অপারেশন করবার মতও যন্ত্রপাতির
অভাব এখানে। অথচ এই যেকোনরকম
যানবাহন-বঞ্চিত এলাকা থেকে গীড়িত রোগী
বা রোগিণীকে দূরবর্তী কোন হাসপাতালে
স্থানান্তরিত করবার কি দুর্তোগ তা একমাত্র
অনুভব করতে পারবেন ভুক্তভোগীরাই।

হিসেবের তুলনায় রোগীর সংখ্যা এতটাই
বেশি যে, বরাদ্দ ঔষধ অনেক সময় মাসের
মাঝামাঝিই ফুরিয়ে যায়। ডাক্তারী শাস্ত্রের
লালজল বেঁচে থাক। তারই কল্যাণে চিকিৎসা
চালিয়ে যান ভারপ্রাপ্তরা (চিকিৎসকগণ মার্জনা
করবেন এটা আপনারা স্বেচ্ছায় করছেন এমন
কথা বলছি না, কর্তব্যে বাধ্য হচ্ছেন উর্ধ্বতন
কর্তৃপক্ষের অব্যবহার ফলে)।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাধাবস্থা আর একটু
উন্নত করা দরকার। দারিদ্র্য এবং অর্ধাহারে
কিষ্ট বাংলা দেশে অধিকাংশ রোগই আসে
অপুষ্ট এবং দুর্বলতা থেকে। তাই উপযুক্ত
ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধাব পরিচালনা পুষ্টির
পথ্যেরও সংযোগ ঘটানো দরকার। তবেই
রোগ নির্মূল হবে, নইলে কেবলমাত্র চাপা
পড়বে তাও কিছুদিনের জন্যে।

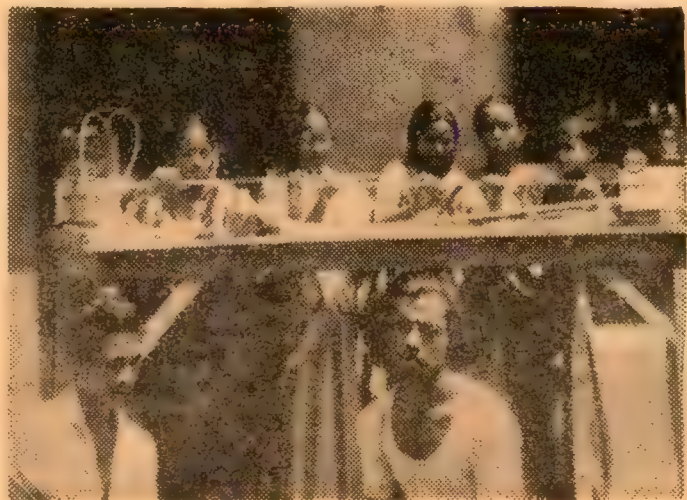
যে জাতীয় স্বাধার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিত্তি-

কালীন রোগীদের দেওয়া হয় তাতে করে পেট
হয়তো ভরে, কিন্তু শরীরের ক্ষয় ভরানো
সম্ভব হয় কি না সন্দেহ। আমরা কর্তৃপক্ষকে
অনুরোধ করি এ বিষয়ে তাঁরা যেন একটু
দৃষ্টিপাত করেন।

গ্রামাচার গ্রামের মধ্যে মাত্র একটাই।
নিত্যানন্দপুর ইয়ংমেনস্ এসোসিয়েশন লাইব্রেরী।
নিঃসন্দেহে ভাল এবং যে কোন গ্রামেরই
পর্ব করবার মত গ্রামাচার এটি। আকারে-
প্রকারে খুব স্বচ্ছন্দ না হলেও পুস্তকের সংখ্যা
প্রায় এক হাজার। নানী লেখকদের দাবী
বই। এবং কিছু দুপ্পা পুস্তকেরও মূল্যবান
সংরক্ষণ আছে এখানে। গ্রাহকসংখ্যা
বর্তমানে প্রায় একশতের কাছাকাছি। নির্দিষ্ট
সময় এবং নিয়মিতভাবে বই-এর লেনদেন
হয়ে থাকে। গ্রাহককলও তাই সন্তোষ।

গ্রামাচার পরিচালনা ছাড়া আরও নানা
কার্যকলাপ আছে এসোসিয়েশনের। খেলাধুলা
যার মধ্যে প্রধান। প্রায় বিধা-কয়েক জমির ওপর
নিজস্ব খেলার মাঠ আছে এদের। বছর বছর
প্রতিযোগিতামূলক বে খেলা হয়, ছগলী এবং
হাওড়া জেলার বহু নামকরা টিনই আসে
তাতে অংশ গ্রহণ করতে। এছাড়াও লোক-
শিল্পের প্রচার এবং প্রসারকল্পে এঁদের পরি-
চালিত প্রতি বাৎসরিক যাত্রা প্রতিযোগিতার
কথাও উল্লেখযোগ্য।

আরও একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান আছে
এখানে। নিত্যানন্দপুর মহিলা সমিতি।
সম্ভবত বলাগড় ধানার সবচেয়ে প্রাচীন এবং
সর্বাধিক সক্রিয় মহিলা প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্য ও
সামাজিক বোধ জাগ্রত করা এবং সর্বোপরি অবসর-
কালে পানী অকলের নিরক্ষর মেয়েদের আকর্ষণ



নিত্যানন্দপুর আঙ্গলে সমবায়

সাম্প্রতিক বসুমতী

শিকাগো এবং তাদের দিগে কিছু কিছু কাজ করিয়ে অল্পবিস্তর উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেওয়াও লক্ষ্য ছিল এদের। সম্প্রদিকা শ্রীমতী রেবা ভট্টাচার্য নমুন্য, শান্ত মৃতি ভদ্রমহিলা। প্রায় কিংবদন্তি কবিতার সেই বিখ্যাত নাকড়গাটির মতই অক্ষয় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন। নানা মূর্খোৎসবিকারের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে ভণ্ড যে চিকিৎসাই রেখেছেন তাই নয়, অবচল লক্ষ্যে এগিয়েও নিয়ে চলেছেন আপন অতীতের পারনে। সম্প্রতি এই মহিলা সমিতিরই সঙ্গে সঙ্গে একটি সমবায় সমিতিরও পত্তন করেছেন এরা। ইনজেকশনের অ্যাম্পুল তৈরি করা শেখানো হয় এখানে। উর্ধ্ব সংখ্যায় চার, নানুভব পরিপ্রবেশে বৈনিক এক থেকে দেড় টাকা উপার্জন করতে পারেন মেয়েরা এর থেকে।

সমিতির ভবনটি সমিতির নিজস্ব। কিন্তু তার চেয়েও উল্লেখ এবং প্রশংসারোগ্য হলো এই যে, এইসব মর্যাদা নির্মাণের প্রয়োজনে অথবা সংলগ্ন জমি ক্রয় করার প্রয়োজনে এখনও পর্যন্ত কোনরকম সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন নি এরা। যা করেছেন সবই সমস্যাদের চেটো-মত, দান ও পরিপ্রবেশ।

কিন্তু একথা কেবলমাত্র নিত্যানন্দপুর মহিলা সমিতি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়। গ্রামের বা কিছু সংগঠন এবং উন্নয়নমূলক কাজ-কর্ম সর্বত্র, সকল ক্ষেত্রেই সরকারী কৃপা কটাকের চেয়ে আপন আপন যেকোনো উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেই এরা অভ্যস্ত। শ্রম, সময়, অর্থ, কিংবা প্রচেষ্টা সবই যা প্রয়োজন হয়, গ্রাম-বাসী এগিয়ে আসেন দ্বিধাহীন উৎসাহে।

প্রসঙ্গত গ্রামেরই এক সুসন্তান শ্রীতারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রামোন্নয়নের সকল শাখাতেই তাঁর দান অনেক এবং ছড়িয়েও আছে সর্বত্র।

গ্রামের কৃষি সমবায় সমিতির কাজ ভাল, উদ্দেশ্যও ভাল। বাধীনতার এই সতের বছর পরেও দান-বাঁওমা গরীব চাষী তার সারা বছরের শ্রমের ফসলের অনেকটাই তুলে দিতে বাধ্য হয় মহাজনের গোলায়। উপায়হীন সেই কৃষককুলকে সরকারী ঋণ-দানের ব্যবস্থা করে দিয়ে এবং সময়ে বীজ সার প্রভৃতি বণ্টনের ব্যবস্থা করে জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন এরা।

ধান, পাট, পেঁয়াজ, বিচালি এবং কিছু অরুণ্ডনী ফল-পাকড়ের সঙ্গে সঙ্গে ছানার নানও এ অঞ্চলের উৎপন্ন এবং রপ্তানি জব্য হিসেবে করা যেতে পারে। সংলগ্ন গ্রাম নারিচাঁও গোয়ালদেব বৃহৎ বসতি আছে। বৃহৎ একটা ছানার চালান প্রত্যহই এখান থেকে রওনা হয় কলকাতার পানে।

হাট বলতে এখানে মাত্র একটি। ডাক-পোপালপুরের হাট, যদিও আশে-পাশে প্রড়ে-ওঠা মিল ক্যান্ট্রী সংলগ্ন প্রাচীনকালী বাজারগুলির কল্যাণে এর পুরনো প্রয়োজনীয়তা কতকটা হ্রাস পেয়েছে, তথাপি মাটির তৈজস-পত্র কাঁচা শাক-সবজী, বাঁশের খুড়ি, টাইকা মাছ বা আরও পাঁচটা হাটের জিনিসের দরকারে এই হাটটির ওপরে আজও নির্ভর করে গ্রামের মানুষ। সাননেই খোয়াবাট, কেনাকাটা মেয়ে কুড়ি পার হয়ে চলে দাবার সোজা রাস্তা। ওপাশে না কুল না বৃহৎ রথখানি, বরল নেহাৎ কম নয়, পুরনো মানুষ এখনও স্মরণ করে ১৯১৭ সনে রথ করালেন সারলাপ্রসাদ আর ১৯২০ সনে চালু হলো ব্যাঙেল-কাটোয়া রেল লাইনে। আপাতত যরের বেরাটোপে মোড়া আছে রথটি। আবার বালেশ নগরের দিনে অনুভূতিতে প্রকাশ হন লাক্ষ্মী। রথচ বাবনং দুটো, গুনকর্ণা ন বিদ্যতে। জনসমূহ উত্তাল হয় ক্রমশই। গোপালপুরের রথের বেলো অনেকদিনের পুরনো।

পোস্ট-অফিস নিত্যানন্দপুরে নেই। মা থাক। আপাতত স্থানীয় রেল-স্টেশনটির একটু উন্নতি হলোই বাড়ী-সাধারণ বাঁচে। যে স্টেশন থেকে কেবলমাত্র মাসিক টিকিটই বিক্রি হয় প্রায় একশত। তার মধ্যে পাঁচ মাত-খানা যে প্রথম শ্রেণীর নেই এমনও নয়। সেই স্টেশনে আবার মরি কিছু না হোক অন্তত

গুটিফরমটি একটু চিঁচু আর রৌর-বুট্টে যাক বাঁচাবার মতো একটা আচ্ছাদন অবশ্যই আপা করা যেতে পারে। কিন্তু বেশ বিভাগের অপদ্রব পাথর যেমনই অনড় তেমনই অমড়। কোণ কোণি টাকার কবকাণ্ডের মধ্যে এই তুচ্ছ প্রয়োজনটুকুর পানে দৃষ্টিপাত করবার সময়ই বেশি করি তাঁদের নেই।

গোপালপুরের পাল পরিবারের নামডাক আছে সাপের ওড়া বা বিষবৈদ্য হিসাবে। যদিও সাপ এবং মানুষ পৃথিবীর আদিমভব প্রতিবেশী, তথাপি নসে-নাগে বসত চর না। আর তাই সর্পদংশনে মৃত্যু মানুষের এক প্রাচীনতম বিপত্তি।

ওড়া-বিদ্যা বা সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ঝাড়ুক করে আরোগ্য করে তোলার পদ্ধতিও বেশি করি মানবসমাজের এক প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতি।

প্রসঙ্গত এই সাপের ওড়া বা সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা-সংক্রান্ত দু-একটি বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

এখনও পর্যন্ত প্রতি বৎসরই বাংলা দেশে সর্পদংশনে মৃত্যুর হার একটা আতঙ্কজনক সংখ্যা। যদিও প্রায় প্রত্যেকটি ছোট-বড় হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সর্পবিষের সিরাম চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে। তথাপি কতকটা পথের দুরূহে, কতকটা পরিবহনের অসুবিধার এবং কতক বা গ্রামবাসীর কুসংস্কারপ্রসূত



অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতি সর্বাপেক্ষা বহন করে এমন অনেক ধনসম্পন্ন জটালিকাই দাঁড়িয়ে আছে নিত্যানন্দপুরে

সাম্প্রতিক বসুমত

এক মনোভাবের কারণে বসুমতের যোগীকে লিপ্যন্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না কিছুতেই। আর সম্ভব যেখানে হচ্ছে সেখানেও রোগীর আরোগ্য হচ্ছে যেন না। নিঃসংশয়ও হওয়া যাচ্ছে না সর্বক্ষেত্রে। কারণ বাংলা দেশের সবচেয়ে পুরনো এবং দারুণ। সর্ববিধ চিকিৎসাক্ষেত্রের হিসাবেই দেখা যাচ্ছে উপযুক্ত চিকিৎসা হওয়ার পরেও এখনও পর্বত সর্পদংশনে মৃত্যুর সংখ্যা গড়ে প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। কিছু বেশি হওয়া সম্ভব কিন্তু কম নয়। অর্থাৎ সিরাস প্রয়োগের পরও যথেষ্ট স্ক্রল পাওয়া যাচ্ছে না সর্বক্ষেত্রে।

কোনো কোনো মহলের হতে প্রকাশ নে, পূর্বে করাগী সরকার যে সিরাস প্রস্তুত এবং সরবরাহ করতেন, বর্তমানে ব্যবহৃত দেশী সিরাসের চেয়ে সেটি ছিল নাকি বেশি উপকারী। কিন্তু বর্তমানে বিদেশী মৃত্যুর হ্রাস-কম্পে সেটি আমদানী করা বন্ধ করেছেন ভারত সরকার।

এই যেখানে অবস্থা, অর্থাৎ দিবারাত্রির যে কোনো সময়েই যেখানে সর্পাঘাত হতে পারে, সেখানে সরবরাহ প্রয়োজনের প্রাপ্তি রক্ষার জাগ্রদে নিরাত্তর হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়েই পড়বে সেই বাকের, তাঁরাই হলেন সেই বহু কিংবদন্তীর নায়ক ভিক্টোরিয়ার সাপের ওরা।

কল যে একেবারে হয় না তাও নয়। এই বিজ্ঞান, বিশেষ শতকে বলতে এবং তখনও কেবল তখনই হলেও ওরার বাড়ুককে আরোগ্য প্রদান করা সর্পদংশন এখন অনেক বাড়িয়ে দেবে।

কিন্তু একে বোঝা বসে চানাবার বা নিবিধ সাপকে বিষধ বলে বাহাদুরী নেবার মুক্তিও থাকে না সর্বক্ষেত্রে। কারণ অনেক সময়ই দংশনের পর সাপ বলা পড়েছে এবং দেখা গেছে যে কোনো তীব্র বিষধ সাপ, আর তার পরেও আরোগ্য হয়েছে মানুষ। কাজেই ওরা বিদ্যার সবটাই ছোঁচুরি এমন কথা জোর করে বলা যাচ্ছে না কিছুতেই।

অবশ্যই তীক্ষ্ণ চোখে একটু লক্ষ্য হবে দেখা যদি তার তাহলেই বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, বাড়ুক বা বিড় বিড় মরোচারপটা এঁদের বাইরের ভক্ত মাত্র। ওরা-চিকিৎসার প্রকৃত রহস্য লুকিয়ে আছে সেইসব বন্য লতা-পাতা ওষধির মধ্যে—নাকি কান, চোখের পাতা এবং প্রয়োজন হলে কখনও কখনও পারের চামড়া চিরেও চলে দেওয়া হয় তার রস। অনুমান করতে দোষ নেই ওই সব অরণ্যজাত বিচিত্রগন্ধ এবং বিচিত্র-বর্ণন লতাপাতার মধ্যেই হয়তো আছে এমন কোনো অর্ঘ্য বিঘনানিনী শক্তি—যুক্ত সাপের বিষও পরাস্ত মানতে বাধ্য হয় তার প্রভাবে।

কিন্তু ওরা-বিদ্যার গুণগান করা আরির উদ্দেশ্য নয়। আরির প্রকৃত বস্তু এই যে, সত্যই যদি এই চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যে প্রকৃত বিষয়বস্তু কিছু থাকে, অজানা বন্য লতাপাতার মধ্যে থেকে থাকে কোনো বিষণ্ড ওষধির অস্তিত্ব, তবে তার উপযুক্ত অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। একদা-অজ্ঞাত ওষধি সর্পদংশন আজ চিকিৎসা-জগতে বৃদ্ধান্ত

এনেছে, লক্ষ্য দিচ্ছে নতুন দিগন্তের সন্ধান। কে বলতে পারে হয়তো বা ওই সব নাভিশূলহীন বন্য গাছ-পাছালীর ভিতরই লুকিয়ে আছে এমনই কোনো শক্তিময় ডেম-সর্পদংশনে মৃত্যুর ভয়টুকু পর্যন্ত যে হরণ করে নিতে পারে মানবসমাজ থেকে।

কিন্তু যদি তা না হয়, যদি এর সবটাই লোক ঠকানো এবং ছোঁচুরি ব্যবসা মাত্রই হয়, তাহলে তারও উপযুক্ত অনুসন্ধান হওয়া দরকার। মানুষের প্রাণ নিয়ে ছেলে খেলা করার এই মারাত্মক পদ্ধতিকে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন সভ্যসমাজ থেকে।

আরও এক শ্রেণীর ওরা আছেন পল্লী অঞ্চলে। জ্যাক সাপ ধরে নেওয়াই তাঁদের কাজ। সর্প-গৃহবাসের আভাস থেকে এরা রক্ষা করেন পল্লীবাসীকে। এরা মানুষের অন্যদ্বারা।

যুগ সাপগুলি কি করা হয় সঠিক জায়গায় না। সম্ভবত বিক্রয় করে দেওয়া হয় বেধে কিংবা সাপুড়ের কাছে। অন্যত্র থেকে দূরে নিয়ে নিয়ে ছেড়েও দেব কোঁ কেউ। পোনা তার সর্পবিষ নাকি কবিরাজী ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সত্য-বিষ্মা অজ্ঞাত। তবে একটি কাঠি এবং চেরা ডাইপোজাইট সাহায্যে হলিটি থেকে বিষ সংগ্রহ করে দিয়ে দেবেই অনেককেই।

সর্পবিষের এই যত্ন সংগ্রহ এবং ব্যবহারও নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার অবশ্যই।

আলোকিত জোঁক। বর্ত্তক গৃহীত

বৃষ্টির প্রাচুর্য নিয়ে

বরেন মজুমদার

হে বিমূঢ় ভালবাসা,
হে আমার ক্রান্ত প্রতিবেশী,
কি অস্ত্রে জাগাবো বসো
সুপ্রাচীন বৃক্ষের বকুল,
কি গানে জাগাবো সেই
হৃদয়ের গোপন প্রত্যাহ্বা।
অবিরাম বিষাদের প্রসারিত
ঘরে বসে থেকে
একটি বিমূঢ় ফুল
বাগানেতে দেখে যাবো বলে
বৃষ্টির প্রাচুর্য নিয়ে
চেয়ে দেখি গোলাপের চারা।

হে বিমূঢ় ভালবাসা,
হে আমার ক্রান্ত প্রতিবেশী,
কি গোপন শব্দে তুমি
অজহত হয়েছো আজ বলে

ফেল মোহনার স্রোতে
তোমার হৃদয় আজ ভাসে।
ক্রান্তহীন প্রতিরোধে
আমার সর্বস্ব জ্বলে যায়;
ঘটির খিলানে তব,
ঘর বাঁধ শীতের বেলায়।

হে বিমূঢ় ভালবাসা,
হে আমার ক্রান্ত প্রতিবেশী,
শোনাও রজনী শেষে
রৌদ্রময় দিবসের গান।
চন্দন শোভিত কোন
বৃক্ষের ঘনিষ্ঠ ছায়াতলে
সব দুঃখ ভুলে আমি
রসে থাকবো শূন্য চিরকাল।



দেবার এলেন হুগোবিন্দোর রামকৃষ্ণ রায়

হলঘাটের দৃশ্য:

হুগোবিন্দোর সঙ্গে হলঘাটের ধনিগত ও জম্বোপত্ত মিল আছে। কিন্তু খুঁজে দেখলে আরো মিল পাওয়া যাবে। উভয় স্থানের দৃশ্য চেহারার ও ব্যাখ্যাত্তে আলাদা। হলদিঘাটে দৃশ্য করেছেন স্বাধীন রাশা প্রতাপ সিংহ স্বাধীন মেঘারের গৌরবরক্ষার সংকল্পে। হলঘাটে দৃশ্য করেছেন পরাধীন দেশের বিরোধী সর্ব সেন স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে। হলদিঘাট রাজপুত-বিক্রমের কিস্তি বিকাশ। হলঘাট বাঙালী বিরোধ-বোম্বের দূসেহ অভিযাত্রী... কিন্তু প্রতাপ ও তার সহচরীদের মধ্যে যে দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, বীর ও প্রত্যয় ইতিহাসপ্রখ্যাত হয়ে আছে, সে দেশপ্রেম-নিষ্ঠা-বীর ও প্রত্যয়ই সর্ব সেন ও তার সত্যবীরদের মধ্যে বিরাজিত। কাজেই অলঙ্ঘন ও আত্মদানে উভয় দৃশ্যস্থলে জম্বোপত্ত অপর্যব...।

হলঘাটের আস্তানাটি ভালই জুটেছিল। এখানে আছেন সূর্যবাবু, নির্মলবাবু এবং অপূর্ব সেন। ইহা ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি-র বর্তমান গোপন হেডকোয়ার্টার। কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে সগোপনে এখানে যাতায়াত করেন। এই দুর্দিনে সমস্ত চট্টগ্রামের বিলম্বী-সংস্থাটি পরিচালিত হচ্ছে এ আশ্রয়কেন্দ্রে থেকে, ক্রিয়াকর্মের নির্দেশ যাকে এখান থেকেই। মাস্টারদা ও নির্মল সেন যেখানে—দলের প্রাণ, মস্তিষ্ক ও জেগেজাগ্রিত সেখানে...।

বেশ কিছুকাল যাবৎ পলাতকেরা নিরাপদে এ আস্তানায় বাস করছিলেন। গৃহকর্তার নাম সাবিত্রী দেবী। বর্ষায়াসী বিধবা মহিলা। তাঁর সংসারে আছেন কন্যা স্নেহলতা এবং

পুত্র রামকৃষ্ণ। মাটির দেওলা গৃহ। দেওলায় থাকেন পলাতকেরা। একতলায় থাকেন বাড়ির লোক। মহিলা-বিলম্বীরা এলে সাবিত্রী দেবীর কাছেই থাকতে পারেন। অসুবিধা কিছু নেই এ আস্তানায়।... সম্প্রতি প্রীতিলতা ওয়াস্বেদার বেধুন কলকাতা থেকে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা ছেড়ে হলঘাটের আশ্রয়কেন্দ্রে এসেছেন নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ পেয়ে।...

সেদিন ১৩ই জুন, ১৯৩২ সন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রাত ক্রমে গাঢ় আঁধারে ডুব দিচ্ছে। অপূর্ব সেনের জ্বর। কিন্তু সারাদিন এই মানুসিটি হে-হয়্যা করে কাটিয়েছেন। কী জীবন্ত ছেলে!... অপূর্বের জন্যে বালি জ্বাল দিতে হবে। প্রীতিলতা তাই নীচে গিয়েছেন। বালি তৈরি হয়েছে। পরমানেন্দ্রে অপূর্ব ভা খাবেন। মাস্টারদাকে খাবার দেওয়া হতেই প্রীতিলতা সবেমাত্র উপরে উঠে এসেছেন নির্মলদাকে আহ্বারের জন্যে ডেকে নিতে। এমন সময় তাড়াতাড়ি মাস্টারদা নীচে থেকে উপরে উঠে এসে বললেন : 'পুলিশ!'

চকিতে নির্মল সেন, অপূর্ব সেন ও মাস্টারদা কত'বা স্থির করে ফেললেন। প্রীতিলতা সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। কিন্তু মাস্টারদার আদেশে তাকে নীচে গৃহকর্তার কাছে চলে যেতে হল। প্রাণ দেবার সুযোগ চলে গেল! ক্ষুধা তাঁর মন। কিন্তু নেতার আদেশ যে অলঙ্ঘ্য!...

দেওলায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনটি বিরোধী মৃত্যুদণ্ডের মত। বীরের সাধনায় তাঁরা সিন্ধু দেশপ্রেমের তপস্যায় তাঁরা সার্থক!...

পুলিশ কি করে যেন টের পেয়েছে যে সূর্য সেন এ আস্তানায়ই আছেন। তাই

মহা সমারোহে একদল বিশাখার পুরোজায়ে ক্যাপটেন ক্যামারন এলেন ছুটে। আস্তানায় খেরাও করা হলো। পল্টনের সাহেব বিলম্বীদের নাড়ীলক্ষ্যে স্বাভাবিকভাবে জানেন না।... মিস ক্যামারন গৃহপ্রাণে ঢুকেই হঠাৎ খোলা রিভলভার হস্তে মই বেয়ে দেওলায় উঠছিলেন। মুহূর্তে গর্জে উঠল নির্মল সেনের আগ্নেয়াস্ত্র। বীরবর ক্যামারন ধুলায় গাড়িয়ে পড়লেন।... উভয়পক্ষে চলেছে অবিরাম গুলীবর্ষণ। বন্যাধৌত হলঘাটের মেঘলিশ্র নৈধ-গগন দীর্ঘ করে অজস্র বুলেটের ধ্বনি কোঁপে কোঁপে ছাড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়া বনের সীমা অতিক্রম করে দূর থেকে দূরান্তে।...

সহসা নীচে থেকে শোনা গেল নির্মল সেনের আত্মনাদ। আহত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেছেন মহান বিপ্লবী!... মাস্টারদা ও অপূর্ব সেন নীচে নেমে এলেন। প্রীতিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা পেছনের জঙ্গলা-পথে অজ্ঞাত ভাগ্যের ইসারায় রওনা হলেন। পথ চলাতে শূন্যে পাতা তাঁদের পায়ের চাপে নৈঃশব্দ ভেঙে দিল। পুলিশবাহিনী সহসা সতর্ক হয়ে অন্ধকারে ইতঃস্তত বাকি থাকে গুলী চালাতে লাগল। অপূর্ব সেনের বুকে একটি গুলী বিশেষ গেল। সেনার কিশোর অল্লান সৌন্দর্যে ধূলিশব্দায় ঘুমিয়ে পড়লেন। যে বালক কিছুক্ষণ পূর্বেও দেহে জ্বর নিয়েই হাসাকোঁতুক পলাতকদের আবাসস্থল মুখর করে রেখেছিলেন—তাঁর অল্ল গোপন ছিল কোন্ তপে? তাঁর তরুণ হাসির আড়ালে ঢাকা ছিল কোন্ আগুন?... মাস্টারদা প্রীতিলতার হাত ধরে কি করে

যে শত্রুবোদ্ধিত এ গৃহ ত্যাগ করে এ দৃশ্য জলে-ডোকা পিচ্ছিল পথের অন্ধকারে পানি যেতে পারলেন সে এক বিস্ময়!...

গাথাহিক বসুমতী

পরদিন সূর্যোদয়ের সাথে পুলিশবাহিনী ও নদাগত জিলাকর্তার দৈবদর্শন দেখে দুটি বিপ্লবী চিরনিদ্রা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের পাশে মৃত্যুনিদ্রাঙ্গুষ্ঠিত ক্যাপ্টেন কামারন। বীরের মৃত্যু তিনজনের ভাগ্যই জুটেছে। কাজেই একই ভূমিতলে তিনজনেরই শয্যা। এখানে জাতিবর্ণ ও ধর্মের ব্যবধান নেই। শাসক ও শাসিতের রক্তধারা একই পথে প্রবাহিত, সে রক্তের রঙ অভিন্ন।...পুলিশ নির্মল সেনকে চিনতে পারল। স্বনামধন্য নেতা নির্মল সেনের খোঁজ তারা নিয়ত করছে। আজ ধরা পড়লেও তাঁকে ধরে রাখা গেল না।...কিন্তু সূর্য সেন কোথায়? বিপ্লবীদের 'জাদুকর' এই ক্ষীণসেহী মানুষটিকে হাতের মতোই এনে-ও আনা যায় না! বারে বারে ফস্কি যায়।...

কামারনের মৃত্যু সরকারকে নতুন করে ক্ষিপ্ত করে তুলল। তার জের সামল্যে চট্টগ্রামবাসী হিমসিম খেয়ে গেল। কিন্তু দেশবাসীর মন তাতে টলল না। দুরন্ত সন্তানদের তাই চট্টলার বৃকে আশ্রয়হারা হতে হয় নি। গত দু' বৎসর ধরে লোকে তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে, অর্থ দিয়েছে, স্নেহ ও প্রাণসিক্ত অপূর্ব সাহায্য দিয়েছে। কোথাও কাপণ্য দেখি নি।...

বাংলার বিদ্রোহিণী:

“ঘরছাড়া দিক্‌হার

অলক্ষ্মী তোমার বরদাতী!”

এতকাল লক্ষ্মীছাড়ার পথ খোলা ছিল বাংলার তরুণদের সম্মুখে। কিন্তু ১৯৩০ সাল থেকে ভাইদের পাশে সমরাঙ্গনে এসে ঝড়ালেন বাংলার বোনেরাও বিদ্রোহিণীর হুমিকায় ‘অলক্ষ্মী’-র বরাভয় নিয়ে।... তাঁরা সংকল্পে স্থির। তাঁরা সরাসরি স্বাধীনতা-যুদ্ধে নামবেন। তাঁরা আর পূর্বসূরী হুকুড়িবালা দেবী বা ননীবালা দেবীর মত পরোক্ষ সাহায্য দান করেই তুষ্ট থাকবেন না। সেল তাঁদের-ও। তাঁরা-ও পুরুষদের সমান শরিক হবেন না কেন সশস্ত্র যুদ্ধে? তাঁদের কণ্ঠে:

“কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ

দুর্ধর্য অশ্বেরে বাধি দৃঢ় বঙ্গাপাশে?”...

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অহিংস-আন্দোলনে এরাকি পুরুষের সঙ্গে সমান ভালে শরিক করার আহ্বান জানিয়েছেন। সে আহ্বানে ১৯২১ সন থেকে এই ভারতবর্ষের নারী পর্দা ছিঁড়ে, আগল ভেঙে কাতারে কাতারে এসে যোগ দিয়েছেন আইন-অমান্য যুদ্ধে। তাঁরা কারাবরণ করেছেন, লাঠিগোটা হয়েছেন, ভাগাভাগি করে পুরুষের সঙ্গে সমান দুঃখ বরণ করেছেন। বহু ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর তাঁরা পুরুষকেও হার মানিয়েছেন। তাই বিপ্লবের পথে তাঁরা শূন্য অন্তরাল থেকে সাহায্য

করেই ক্ষান্ত হবেন কেন? ‘দুর্ধর্য’ কে, দুঃসহ্যতম কাজে তাঁরা রতী হবেন না কেন? তাঁরা সংকল্প করেছেন:

“রক্ত দিনের দৃশ্য পাই তো পাব,

চাই না শান্তি, সান্নিধ্য নাহি চাই।”...

১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশন জুলবার নয়। সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ বা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী-বাংলার নারীকে বে আহ্বান জানিয়েছিল তা তাঁদের মর্মে প্রবেশ করেছিল। পর্দামুক্ত নারী সামরিক কারদার কুচকাওয়াজ করার ছন্দে সহসা নিজের সংগ্রামীসত্তাকে আবিস্কার করে ফেললেন।...তারপর এল বিপ্লবের ডাক। মাসিক ‘বেগু’ ও সাপ্তাহিক ‘স্বাধীনতা’ কাগজ দুটি বিপ্লবীদের মুখপত্র।



প্রীমতী শান্তি বোম (দল)

সেইসব পত্রের অগ্নি-অঙ্কুরে বারেবারে তাঁরা নির্দেশ পেয়েছেন বিপ্লবে কাঁপিয়ে পড়ার। ‘চলার পথে’ নামক বাজেরাস্ত পুস্তকখানা ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে বারেবারে পড়তো। তার ছোট গল্পগুলো নারীকে স্বহস্তে সশস্ত্র-বিদ্রোহে নেতৃত্ব নেবার ও বৈপ্লবিককর্মে আত্মদান করার প্রেরণা দিত, সন্ধান জোগাত। ‘বেগু’, ‘স্বাধীনতা’ এবং বিশেষ করে ‘চলার পথে’ সেই যুগে বাংলার তরুণতরুণীর রক্তে ধরিয়েছিল ‘সর্বনাশের নেশা’। তাঁদের স্বপ্নে ছিল বন্দন-মোচনের কামনা। তাঁরা বুঝেছিলেন:

“পূরানো সপ্তয় নিয়ে

ফিরে শূন্য বেচাকেনা

আর চলবে না।”...

আইন অমান্য করতে শিখে গেছেন মেয়েরা। এবার হাতে অস্ত্র তুলে নেবার

সময় এসেছে। তাই দেখি পুরুষের মতোই সর্বসামর্থ্যে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনসনকে হত্যা করলেন দুটি বালিকা—শান্তি বোম ও সুনীতি চৌধুরী। অশ্রুত সাহসে ও নৈপুণ্যে সৃষ্টিবিনাশিনীর ভয়ংকরতায় কাজ হাসিল করে তাঁরা প্রমাণ করলেন—‘আপন ভাগ্য জয় করিবার’ অধিকার তাঁদের অনস্বীকার্য।...এর পর দেবলান বৃটিশসাম্রাজ্যের প্রতীক বাংলার লাট স্টানলি জ্যাকসনকে উড়িয়ে দেবার সংকল্পে এক বিপ্লবিনীর মূর্তি। বীণা দাসের হস্তে সেদিন শৌর্ধশালিনী প্রমীলার আয়ুধ কেন কলমল করে উঠেছিল।... তারপর ক্রমে দেখা গেল এই বাংলারই মেয়েরা পর পর এগিয়ে যাচ্ছেন সশস্ত্র সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। ‘চলার পথে’-র স্বপ্ন তাঁরা অঙ্কুরে অঙ্কুরে রূপায়িত করে গেলেন ১৯৩০—১৯৩৪ সালের বাংলায়। তাঁদের নয়নভোলানো রুদ্র রূপিশাখা সেদিন বাঙালীকে প্রাণ দিয়েছিল, ভারতবাসীকে ভরসা দিয়েছিল।...

১৯৩১ সালের মাঝামাঝি কালের এক আধারঘন গভীর রাত। কাননগোপাড়ার দূরে মাঠ। মাঠের দূরে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি কুটির। ধানের ক্ষেত পাহারা দেবার জন্যে ইতস্তত-ছড়ানো এই ঘরগুলো চাবীরা তুলেছিল। মাঠ এখন ধানশূন্য, কুটিরগুলো জীর্ণশীর্ণ। একটি কুটিরের অভ্যন্তরে এক প্রলয়ঙ্করী কালীমূর্তি। মূর্তির সম্মুখে অনলস দীপশিখা কে’পে কে’পে জ্বলছে। মাস্টারদা গার্মে উপবিষ্ট। তাঁর কাছে ধীরে ধীরে নতুন বিপ্লবী ও বিপ্লবিনীরা সংগোপনে আসছেন রক্ত দিয়ে শপথ গ্রহণ করতে। এ’রা প্রত্যেকে আসছেন একান্ত গোপনে। কাজ শেষ হতেই অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছেন একে অন্যকে না জেনে। বীরা অতি দক্ষতার এই কার্যটি পরিচালনা করছেন মাস্টারদার হুকুমে, তাঁরা দলের বিক্ষতভর কর্মী।...

কিছুক্ষণের মধ্যে একটি মেয়ে এলেন একটি তরুণের সঙ্গে। মেয়েটিকে তরুণ বললেন—‘প্রণাম করো। ইনিই আমাদের মাস্টারদা।’...

মেয়েটি গভীর করে তাকিয়ে দেখলেন— এক মধ্যবয়সী কৃষ্ণকায় পুরুষ বসে আছেন নম্র-ডমালিনীর পদমূলো। মাস্টারদার চোখ দুটোয় কী দীপ্তি, দৃষ্টি কী দূরমনস্ক!... কুন্দপ্রভা সেন চিনে ফেললেন ঐ মানুষকে। ঐ তো তিনি—যাঁকে এক কড়বাদলের রাতে মায়ের তাড়নায় তাঁদেরই গৃহের আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি চোখের জলে, পথের দুর্ধর্যে! সেই পলাতক, সেই নিরীহমান বিপ্লব-তাপস, শরণচন্দের রূপনা তনুজ সেই ‘সবাসাচী’ আজ তাঁর নয়নগোচরে সমাদীন!...চোখে আবার জল এলো!...গভীর

নিষ্ঠার শ্রীশ্রী গায়ের কুন্দপ্রভা সন্ধ্যায়
মান্দারদাকে প্রণাম করলেন।...

তারপর যথারীতি রক্ত দিয়ে মূর্তির পায়ে
বিহ্বল আবেগে সবার মত কুন্দপ্রভা-ও
স্বাধীনতাকামী সৈনিকের পথ গ্রহণ
করলেন।...

এমনি করে এই দলে আরো বহু মহিলা-
কর্মী প্রবেশপথ পেয়েছিলেন পূর্বাপর নানা
সময়ে। তাঁদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়সেদার,
কল্পনা দত্ত, নির্মলা চক্রবর্তী, সূর্যাসিনী
রক্ষিত, নিরুপমা বড়ুয়া, বকুল দত্ত প্রমুখা
বিদ্রোহীণী চট্টগ্রাম-সশস্ত্র-বিদ্রোহে শরিক
হবার কথাই আমরা জানি। আরো বারি
অর্থ, আশ্রয়, সেবা ও কর্ম দিয়ে সাহায্য দান
করে এই বিপ্লববাহিনীকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন
তাঁদের সংখ্যার হিসেব কই? নামী-অনামী
সেই সব মহিলা নারীদের উদ্দেশ্যে আমরা
শ্রদ্ধা অর্পিত করি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাই।...

আশ্রয় দিতে গিয়ে ধলঘাটের সাবিট্রী
দেবী কী দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন
তা আমরা জেনেছি। কিন্তু কী দুঃখ ও
ভাগ্যবরণের মধ্য দিয়ে যে তাঁর পথচলা শুরু
হলো তা জানান হয় নি।

ধলঘাটের যুদ্ধের পরদিন প্রাতে পুলিশ
এ গৃহ থেকে কন্যা ও পুত্রসহ সাবিট্রী
দেবীকে গ্রেপ্তার করেই ক্রান্ত হয় নি। তাঁর
মাটির গৃহটি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তারা
গায়ের ঝাল মিটিয়েছিল। জিনিসপত্র যা
কিছু ছিল তার চিহ্নমাত্র না থাকার ব্যবস্থা
হল।...তারপর সর্বস্বান্ত বিধবা ছেলেমেয়ের
হাত ধরে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। বিচারে
তাঁর দীর্ঘকালীন সপ্নম কারাদণ্ড হলো।
ভৃত্যীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে তিনি মেদিনীপুর
জেলে আনীত হলেন। জেলে একদিন ছেলে
স্বামকৃষ্ণের কঠিন যক্ষ্মারোগ ধরা পড়ল। মা
তা জানলেন না। মা ও ছেলে থাকেন
বিভিন্ন ওয়ার্ডে—জেলের মধ্যে এরূপ অজ্ঞান
শব্দ জেল রয়েছে কয়েদী থেকে কয়েদীকে
পৃথক রাখার উদ্দেশ্যে।...রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর মা
সাবিট্রী দেবী নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-বিধবা। জেলের
অনাচার তাঁর সহ্য করা কঠিন। কিন্তু মেনে
নিরেছেন তিনি এ অদৃষ্টকে। কারণ, তিনি
তো চোখের উপর দেখেছেন বাংলার তরুণের
বুক ফুলিয়ে মৃত্যুবরণ! তিনি তো দেখেছেন
সূর্য সেনকে; দেখেছেন অপূর্ব ও নির্মল
সেনকে দিনের পর দিন তাঁর আশ্রয়ে হাস্য
মুখে সকল দুঃখকে উড়িয়ে দিতে!...কিন্তু
হায় রে ভাগ্য—এখানেই তো দুঃখের শেষ নয়!
একদিন জেলওয়ার্ডার তাকে জেলগেটে ডেকে
নিয়ে গেল। কেন? কে জানে? পাশের
খান্দানীরা উৎসুকচিত্তে তাঁর প্রত্যাগমনের
অপেক্ষা করছেন। 'জেলের মাসীমা' জেল-
হাসিনীদের পরামর্শীরা।...কিন্তু হঠাৎ শোনা
গেল বুকফাটা ক্রন্দন! শোনা গেল যে,
বিধবার একমাত্র পুত্র বন্দী রামকৃষ্ণ নাকি

যক্ষ্মারোগে তিলতিল করে কর পেয়ে এই
মাত্র দেহত্যাগ করেছেন—এবং মাকে শেষ
পুত্র-দর্শন করানোর জন্যে কতাদের তাই
এহেন সৌজনা প্রকাশ!...সাবিট্রীমায়ের বেদনা
তাঁর বন্দীজীবনকে কঠিন কারাগারে কত
দুঃসহ করেছিল তা জেলের বাইরে বসে
সৈনিকর বাংলাদেশের মানুষও কল্পনা
করতে পারে নি।...

এইভাবে নিশ্চিত বিপদ জেনেও বারি
পলাতকদের লালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে
রক্তের মা বিনোদিনী দেবী, দুর্লখা-গ্রামের
মুসলমান চাষীর ধরনী বা কুটির-আশ্রয়ের
ভাঙারগৃহিণীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু
ভাঙারগৃহিণীর আশ্রয়দান ও সেবাস্বরূপের
মধ্যে যে নির্বিড় মমত্ববোধ, রসসৌন্দর্য ও
অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগস্বপ্না প্রতি মূহুর্তে
উপচে যেতো তা বলা হয় নি।...পলাতক
বিপ্লবীর দুঃখ পথচলকে রমনীর করে
তোলার মন্ত্র জানা ছিল এসব আশ্রয়দাতার।
পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য তাঁদের মধ্যে মন্ডিত



শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী (বোম)

পেয়ে দুঃস্বপ্ন বিদ্রোহীকে এগিয়ে দিভো
বৃহত্তর পানে, সুদূরের দিকে। বিদ্রোহী
প্রমত্ত-কণ্ঠের বাণী শুনতেন। শুনতেনঃ—
“সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ’তে
অতল অধারে—অকূল আলোতে।”...

পাহাড়তলী অভিযান:

মহিলা-নেতৃত্বে একটি শৃঙ্খলিত পরিচালনার
কল্পনা কর্তৃক যাবৎই সূর্য সেনকে তম্বয়
করে রেখেছে। বাংলার মাটিতে অহল্যাবাদি,

লক্ষ্যবাহী বা রাজসার জাম দিতে হবে।
নইলে মরণ-রক্তে আহুতিদানের ইতিহাস
সম্পূর্ণ হয় না। বাঙালী তার ধ্যানে রিশদু-
সংহারীণী মহাকালীর দর্শন পেয়েছে, আজ
তাকে কর্মে শোষণালিনী নারী-সাম্রাজ্য দেখা
পেতে হবে। দেখা পেতে হবে এই বাংলা-
দেশেরই নরম মাটির বুকে।...

নির্মল সেন মান্দারদাকে বলছেনঃ “দাদা,
মেয়েদের নেতৃত্বে যে কঠিন কাজ করার স্বপ্ন
আপনি দেখছেন তা প্রীতিলতার নেতৃত্বে
সম্ভব হবে মনে হয়।”

(চট্টগ্রাম-অস্তাগার-লুণ্ঠন)
মান্দারদা স্মিতহাস্যে উত্তর দেনঃ
“তাকে আরো সক্রিয়, আরো চতুর, আরো
বিকল্প ও দুঃসমনীয় করে তুলুন।”

(চট্টগ্রাম-অস্তাগার-লুণ্ঠন)
বিপ্লবী-চট্টগ্রামের নেতৃত্বের গোপন
সাধ চরিতার্থ করার পথে সংগোপনে যে
প্রস্তুতি চলছিল তা গোপন-ই থাক। আমরা
তার অভিনব রূপায়ণ শ্রদ্ধা অবলোকন করবো
এক সংকেতময়ী রাত্রির গোপন অন্ধকারে
বিসময়-বিম্ফারিত নেত্র।...

১৯০২ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর। কাটনীর
আশ্রয়কেন্দ্রে মান্দারদা প্রীতিলতাকেই নেতৃত্ব
দান করে, এক দুর্জয় বিদ্রোহীদলের প্যারোভাসে
তাকে পাঠাচ্ছেন পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান
ক্লাব' আক্রমণের জন্যে।...প্রীতিলতা মহান্
নেতাকে বিদায়কালে প্রণাম করে বললেন—
“আমায় আশীর্বাদ করুন কাজ উদ্ধার করে
আমি যেন শহিদলোকে চলে যেতে পারি।”...

আবেগ গম্ভীর কণ্ঠে মান্দারদা উত্তর
দিলেনঃ “তুমি কর্মে সার্থক হবে। ইংরেজ
জানবে, বিপ্লববাসী জানবে যে—বাংলার মেয়ে
আজ কারো পশ্চাতে নেই। সমস্ত শহীদের
আশীর্বাদ তোমার স্বাভাবিক ঘিরে থাকবে।”

(চট্টগ্রাম-অস্তাগার-লুণ্ঠন)
মান্দারদাকে শেষ প্রণাম জানিয়ে প্রীতি
শেষ বিদায় নিলেন।

রাত প্রায় দশটা। নৃত্যগীতমঞ্চর
‘পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব’। সাহেব-
মেমেরা ছোট ছোট দলে নানা আনন্দে মত্ত।
কোন দল ‘হুইস্টলিং-ইড’ খেলছে, কেউ নাচ-
গানে উচ্ছল, কেউ বা পানাহারে মগ্নগল।
ইউরোপীয়দের সংখ্যা কম নয়। প্রায় ৪০
জন পুরুষ-মহিলা।...দূরে সদর দরজার
পাহারারত সার্জেন্ট, হাবিলদার ও মিলিটারি
পুলিশ। তাদেরই সম্মুখের পথ দিয়ে
গাড়োয়ানের পোষাকে মহেন্দ্র চৌধুরী ও
সুদীপ দে ক্লাবঘরের বারান্দায় ঢুকে গেলেন।
যেন সাহেবদের গাড়ির কোচোয়ানই সাহেব-
মেমের নাচ দেখার লোভ সন্তরণ করতে পারছে
না! কেউ সন্দেহ করল না—কারণ সবার
চোখেই লেগে আছে রক্তিন নেশা।...



শ্রীমতী বীণা দাস (ভৌমিক)

পূর্ব ব্যবস্থা মত ক্লাবের পশ্চাতের ক্ষুদ্র-পরিসর পক্ষে প্রীতিভক্ততার নেতৃত্বে অন্যান্য লগারী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছেন। যথাস্থানে 'টাইম-বন্স' রাখা হয়েছে।...

মহেন্দ্র চৌধুরী ও সুনীল দে এ 'টাইম-বন্স' ফাটার সংকটে পূর্বনির্দেশ মত বোমা নিক্ষেপ করলেন। প্রলম্বক শব্দে এঁদের রামা-ও ফেটে পড়ে হৃদয় ধোঁয়ার আচ্ছন্ন করে দিল। পশ্চাতের দ্বার দিয়ে ভক্তকণ্ঠে প্রীতিভক্তবীর আদেশে বিদ্রোহীরা রিভল্ভার মলাতে-লাগলেন। মহম্মদ হু বুলেট-এর শব্দ দিকদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলল। তৎসঙ্গে শোনা যেতে লাগল ভীতহস্ত বৈতাগ নরনারীর হাহাকার ও ইতস্তত হুটাহুটি শব্দ। ফটকের মিলিটারি পাহারার হল বৃকল যে সূর্য সেনের লোকেরা ক্লাব আক্রমণ করেছে। তারা ছুটে চলল হেড কোয়ার্টারের দিকে। এ ছুটে-চলার পশ্চাতে আতঙ্কিত প্রবণতাই ছিল বেশ।

কার্য সম্পন্ন হয়েছে। অধিনায়কার নির্দেশে বিদ্রোহীবাহিনী অস্ত্র সম্বরণ করে ক্লাবের ত্যাগ করলেন। বাহিনী খানিকটা এগিয়ে যেতেই বিপ্লবীদের ধেরাল হলো যে 'প্রীতিভ' তো আসেন নি। একজন ছুটে পেছনের পথে চলে এলেন। তখন দূরে সম্মানী-আলো ফেলে মিলিটারি-গাড়ি তড়িৎ-গতিতে আসছে। প্রীতি ভেবীর কাছে এসেই সেই ভরূণ বললেন: 'শীপির চলে আসুন!... পলিশ এসে যাচ্ছে! আসুন, দিদি, আসুন!...'

প্রীতিভতা সূদ্রমনস্কতার উদ্বেগ অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন: 'এ আমার গন্তব্য-স্থান!... শহিদকুল আমার ডাকছেন!...'

ভরূণ বিপ্লবী কিছই বুঝলেন না। বললেন: 'ব্যাপার কি? পলিশ এলে সর্বনাশ হবে যে, দিদি!'

—সবাই চলে বাও!... একটু দেরি করেছে

না!... বারে বারে আঘাত হলে শত্রুকে পরাজিত করার চেষ্টা করো, এই আমার শেষ অনুরোধ!... বাও ভাই, শত্রুকে সবার জন্যে। প্রণাম মাস্টারদাকে!...

এই কটি কথা বলেই প্রীতিভতা 'সাইমনাইড' খেয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে চলে পড়লেন সোনার প্রতিমা!...

প্রীতিভতা পূর্বেই তাঁর রিভল্ভারটি ঐ ভরূণের হাতে ছুঁলে দিয়েছিলেন। কারণ, অমন মূল্যবান জিনিসের অপচয় ঘটানো যায় না!... অধিনায়কারী কাছ থেকে পাওয়া 'শ্রেষ্ঠদান'টি নিয়ে গভীর বেদনার বিপ্লবী অস্ত্রকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন!... ততক্ষণে মিলিটারি-বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে!...

মিলিটারি প্রথমেই ক্লাবের ঢুকে গেল। মৃত ও অস্ত্রমৃত দেহগুলো যথাযথ স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। ক্লাব-প্রাঙ্গণে প্রবেশ-পথেই তারা পেল সামরিক পোষাকে সজ্জিত প্রীতিভতার প্রাণশূন্য দেহ। এই দেহখানি ঘিরে পলিশের কী ব্যস্ততা! কল্পনার বাইরে এ এক আবিষ্কার। কোন মহিলা যে বিপ্লবী-নেতার ভূমিকায় সংঘর্ষ পরিচালনা করবেন পলিশ এ-কথা ভাববে কী করে?

প্রীতিভতার দেহ তাল্লাস করে পাওয়া গেল শ্রীকৃষ্ণের ছবি, শহিদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফটো, পাহাড়তলী ক্লাবের প্ল্যান, চামড়ার বেগট একটি, ইন্ডিয়ান 'রিপাব্লিকান' আর্মির নোটিশ, তিনটি কাচুজ (রিভলভারের), একটি শিস-বাশী, প্রীতিভতার স্বহস্ত লিখিত একটি স্টেটমেন্ট। এ স্টেটমেন্টে আছে: 'চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা স্মরণীয় ১৮ই এপ্রিল এবং তৎপরে জালালাবাদে, ফেনী ও কালার-পুলে, চন্দননগরে চাঁদপুর-ঢাকা-কুমিল্লা ও ধনঘাটে যে অপূর্ব বীর্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে কেবল বাংলার নহে সমগ্র ভারতের যুবকস্ববতীদের চিত্ত ও কল্পনা আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছি, আজিকার অভিবান ও তাহারই একটি অংশ। আমাদের মহান নেতা মাস্টারদা যখন আমাদের আহ্বান করেন তখন আমি পূর্ব দায়িত্ববোধের সহিত আজিকার দিনের সংগ্রাম পরিচালনার কর্তব্যভার গ্রহণ করি।'

(চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-স্মৃতি)

সূর্য সেন ও নির্মল সেনের 'মাস্টার প্ল্যান' সার্থক করে তাঁদেরই বিপ্লবী-মনের মানস-কন্যা প্রীতিভতা অস্ত্র গেরবে শহিদ-লোকে চলে গেলেন। পশ্চাতে পড়ে রইল জাতীর ইতিহাসের একটি অধ্যায়, যেখানে বাংলার কাম্বীর রাণীর মৃত্যুহীন আলখা সোনার বর্ণে অঙ্কিত আছে!... তদিকে ইংরেজের মধ্যে বীরা বীর ও দেশপ্রেমী তাঁরা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন এই অধিনায়কার পানে। তাঁরা কি আবিষ্কার করেছিলেন এই নারীর মধ্যে তাঁদেরই 'রাজ্ঞী বোর্ডিসন'-র এক ভেজোদীপ্ত মূর্তি? ও 'আবিষ্কারের ছবি?...

জীবনস্মরণীয় দান

পূর্বেই বলেছি, মাস্টারদা চট্টগ্রাম রাইজিং-এর প্রস্তুতিকালে দলের লোকদের নির্দেশ দিলেন বার বার ঘর থেকে অর্থসংগ্রহ করে একটি অর্থ-ভান্ডার গড়ার জন্যে। কারণ বে-অর্থ দিয়ে প্রস্তুতি শূন্য হবে সে-অর্থ অন্য স্থান থেকে যোগাড় করা চলবে না। ছেলেরা ঘর থেকে অর্থ ও গহনা যোগাড়ের কাজে লেগে গেলেন। পাটির অর্থ-ভান্ডারে প্রায় অশ্ল' লক্ষ টাকা সংগৃহীত হল।

এই অর্থসংগ্রহের ইতিহাসও চমকপ্রদ!... প্রীতিভ চৌধুরী একজন ছাত্রকর্মী। জমিদারের ছেলে। ১৪০০০ টাকা তিনি পিতার সেরেসতা থেকে নিজে এলেন। জীবন ঘোষাল ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে। পিতার নামে চেক জাল করে নিয়ে এলেন তিনি ১৬০০ টাকা। এভাবে যথাসম্ভব অনেকেই অর্থ সংগ্রহে মেতে উঠলেন। পিতামাতা বিরক্ত হলেও কেহই পলিশে খবর দিলেন না। কারণ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরদ্বার ভয় সবারই তৎকালে ছিল!...

এই দানবজ্ঞে একটি বালকের কীর্তি অতুলনীয়। তাঁর নাম ধীরেন দে। ধীরেন চট্টগ্রাম সহরের জে-এম-সেন বিদ্যালয়ের ছাত্র। বড় দুঃখে তাঁদের সংসার চলে। পিতা সামান্য ঘরামারি কাজ করে যা আর করেন তাতে পুত্রের শিক্ষাভার বহন করাও কঠিন। কিন্তু এত দারিদ্র্যের চাপেও ধীরেনের স্বপ্ন-ছোঁয়া মন বৃহত্তর স্পর্শকামনার ব্যাকুল। মাস্টারদার কঠিনতার তাঁর পথচলার আহ্বান, মাস্টারদার মূর্তি তাঁর গন্তব্যস্থানের পথ-প্রদর্শক। ভারতবর্ষের মুক্তিলাভের চেষ্টায় তাঁর তনুপ্রাণ সমর্পিত।

ধীরেনও কান পেতে শুনেছেন মাস্টারদার উক্তি। 'ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ না করলে পর-স্বার্থে আঘাত হানবার অধিকার জন্মে না—একথা ধীরেনও বুঝেছেন। কাজেই ধনিক অথবা সরকারের ধনভান্ডার দেশের কাজের



শ্রীম. শীল সেন

জানো দলারস্ত করতে যাঁরা বঙ্গবন্ধুর ডায়েরি
সর্বপ্রথমে স্বাক্ষর থেকেই অর্থ সংগ্রহ করতে
হবে। দলিঙ্গ ধীরেন দে ভো করিলা বলে
পেছনে পড়ে থাকতে পারেন না। কারণ
তার চিত্তর ঐশ্বর্য ভে সামান্য নয়। ধীরেনের
সংসারে সন্তর বলে কেন কতু নেই। তবু,
এই বন্দানের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আহুতি না
ধীরে তিনি থাকেন কি করে?

সহসা ধীরেনের মনে পড়ে গেল যে, তার
জননীর একমাত্র সম্পত্তি যে হুতার গাছা
হুপোর অলংকার সেদিনও হুতার দ্বারা বন্ধক
ফেঁরা ছিল তা সবেমাত্র মনে করে আনা
হয়েছে।... আর বিলম্ব সইল না। নিশীথের
অন্ধকারে নিদ্রিত পিতামাতার অজ্ঞাতে মায়ে
ভাঙা ট্রাকের গহ্বর থেকে তার একমাত্র
সন্তর ঐ কপাছা হুপোর অলংকার সংগ্রহ
করে ধীরেন দে হঠাৎপনে হু থেকে বেরিয়ে
এলেন।... মাস্টারদার হাতে নিগ্রেশের সন্তর
তুলে দিয়ে বীরেন পরম আনন্দে ও গর্বে
হাঁড়িয়ে রইলেন। মাস্টারদা অতৃপ্তবর্ষ
হুতার সহিত অলংকারগুলো গ্রহণ করে
বললেন: "এ সামান্য অলংকার তোমার
নিগ্রেশের দানের খোরবের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।
আমি এ-দানকে প্রণাম করি। এ আমাদের
সম্পত্তি, সন্তিত হককে আমাদেরই জননী
জেনার গর্ভবারিণীর ভাঙারে।... দূর্ব পেরো
না, ভাই। মায়ের কাছে এক-কতু তুলে রাখো।
এ স্পর্শ করবার অধিকার কেবল তাঁরই।...
তুমি সার্থক। তুমি সুন্দর। তোমার কম
নেই।" জনাবধীভব ভিখারিণীর 'শ্রেষ্ঠদান'
মাথায় তুলে নিরেছিলেন। মাস্টারদা ধীরেনের
'শ্রেষ্ঠদান' মাথায় তুলে নিয়ে বিংশব্দীর
জননীকে হাতে ফিরিয়ে দিলেন।...

চট্রাঙ্গের এই কিদ্রোহের বিপুল সমারোহে
যাঁরা পুর্নেশের হাতে বরা পড়েছেন, যাঁরা
নিহত হয়েছেন বা ফাঁসি গিরেছেন তাঁদের
খোজ আমরা পাই। কিন্তু আরো কত
আছেন যাঁরা দৈব-বিপর্ষের প্রাণ নিরেছেন,
আজগোপনের কথুর পথে আত্মনাশ করেছেন—
অথচ তাঁদের দান ব্যতীত এ-বিরোধের সাক্ষ্য
স্থান হয়ে যেত। আমরা এখনে তাঁদের
হু-একটি চরিত্রের উল্লেখ করবো।

শৈলেশ্বর চন্দ্রবর্তী। কলেজের বৃত্তি-
প্রাপ্ত প্রতিভাবান এই তরুণ কর্মী মাস্টারদার
প্রিয়পাত্র। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদ-
হুধে তার বীর্যের পরিচয় বিংশব্দীর শ্লাঘার
বস্তু। শলাভক-জীবনে সন্তকে শক্তিশালী
করে গড়ে তোলার কাজে, বিংশব্দীর 'আত্মত্যাগ'
হুধে পেতে তৈরি করার কাজে এবং বোমা
তৈরি করার কাজে তার কৃতি নেতাদের
সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

প্রীতিভক্তা ওয়াস্কেদারের নেতৃত্বে পাহাড়-
ভলী-আভ্যন অনর্ন্তিত হবার বহু পূর্বে,
শৈলেশ্বরের উপর তার পড়াছিল 'ইউরোপী-
কান ক্রাবটি আকর্ষণ করার। শৈলেশ্বর

নিজের চুটিতে কাজটি হাসিল করতে পারেন
নি।... বার্ষিকমোদন শৈলেশ্বরের কবীরীর
আন্তরিকতার ফিরে এলেন। ভাবপ্রবণ উদ্বেগ।
কেউ তাঁকে সামান্য অনুযোগ-ও দেয় নি।
কিন্তু তার মন ভারাক্রান্ত। বার্ষিকের এই
জালা তার সকল সম্বন্ধে মেন পুড়িয়ে
দিয়েছিল। সবার অজ্ঞাতে পকেটে থেকে
'সাইমনাইড' বের করে খেয়ে ফেলে হুতার
কোলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তার
পকেটে পাওয়া গেল মাস্টারদাকে লিখিত ছোট
চিঠি: "মাস্টারদা, আপনার জবোয় ও অকম
শিক্ষ জন্মের তরে কিয়র কইতেছে। যে
কাজের ব্যয়িত তাকে নিরেছিলেন সে তা
সমাধান করতে পারে নাই। বার্ষিকের প্যনি
ও পরাজয়ের কলঙ্ক মানিয়া আপনারকে এই
হু কি করিয়া দেখাইব? আপনার কৃতি
সহকর্মীদের পাশে অকৃতী এই অকমের
অবস্থান মানার না। তাই আজ জন্মের মত
বাই-ইতি আপনার অযোগ্য শিক্ষা শৈলেশ্বর।"

সমুদ্র-সৈকতে শৈলেশ্বরের সমাহিত করা
হল। মাস্টারদার কাছে পরখানা সন্তর খোঁজে
ছিলেন একটি কর্মী। পর পড়ে মাথাতুর
কটে মাস্টারদা নির্বেশ্ব ছিলেন: "এ হুস্বাবাদ



শ্রীমতী গীতা 'নগর' (রায়)

সংগোপনে রেখে। এর প্রতিজ্ঞা-ভীষণ হতে
পারে।..."

বন্ধুরা নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে
পালন করার দলের লোক এবং শৈলেশ্বরের
বাড়ির লোক ঘটনাটি সেদিন পর্যন্ত জানতে

পারেন নি। আজ বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস
সংগ্রহের আবরণ মোচন করে দিয়েছে...

(চট্রাঙ্গ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন)

হুস্বাবাদী কর্মী বীরেন দে। অস্ত্রাগার-
লুণ্ঠন ও জালালাবাদ-হুধ এবং তার ওপরে
মাস্টারদার নিজ সহচর ছিলেন এই বিংশব্দী।
শলাভক জীবনে দলের নানা কাজে সহায়তা
করে এই তরুণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।
'বরমা'-র পথে দারোগা শলাভক ভিখারিণীর
যাঁরা রিভলভারের গুলীতে দামন করে-
ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম এই বীরেন দে।

একদিন দলের নতুন কর্মীদের 'সংগোপন'
চালনা শিক্ষা দেয়ার তার পড়ে গেলেন রু-
উপর। রিভলভার বা পিস্তলের একটা
মোহিনী শক্তি আছে। নতুন এ 'কিনস হাত'
পেলে অনেকেরই হে-শ হে-শ যান। তরুণ
এক কর্মীর হাতে একটি পিস্তল তার হাতে
তাতে বীরেন্দ্র নিজের হাতের কাজটি উপ-
দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু রিভলভারের ট্রিগার
আঙুল রেখে অপেক্ষা করেছিল। নির্দেশ
মাথায় একটি গুলী ছুড়ে বহুদিনের বাননা
পূর্ণ করবে! হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতেই ট্রিগারে
টান পড়ে গেছে! দাম্ করে লক্ষ হল। বীরেন
বসে পড়লেন! স্বদেশের হুস্তিহুধে অপিত
তার প্রাণ কথুর অশিকিত হুতের (রিভলভার
থেকে বোঝিয়ে আসা) গুলীতে বাহির হবার
পথে। রক্তের বন্যায় ধরা তল ভেসে গিয়েছিল।

পাহাড়ের নিভৃত স্থানের এক গাছের কাছে
গুটি কয়েক শিক্ষার্থী সমতা। শিক্ষারতারা এই
মুর্খশিক্তক পরিণতি দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পেল।
বীরেন দে বারের বারের ডেকে কইতছিলেন:
'আমায় গুলী করে মেলে কোল এইখানই
কবর দিলে যাপ্ত। নইলে আমাকে নিয়ে
তোমাদের বিপদ হবে।' অগ্নিপ্রস্রাব বস্ত্রধরণে
তিনি ঐতন্য হারালেন।...

বন্ধুরা ঘটনাস্থল থেকে মুক্তি
বিংশব্দীকে কহাকাছি এক গ্রামে একজন
বাড়ি নিয়ে এলেন। মাস্টারদা ও অন্যরা
নায়ক ভারকেশ্বর দাস্তদার সংবাদ পেয়ে ছুটি
এলেন। যে গারে তাঁকে আনা হুতছিল সে-
গাহ পুর্নেশের নজরে থাকায় ধীরেনকে অন্যত্র
নিতে হবে। গাহের তরণ বারিসন্দাটি
পুর্নেশের সন্দেহভাজন। চট্রাঙ্গের কোন
তরুণই সন্দেহের বাইরে উত্থন নয়। জেলার
একুশ হাজার ছাত্র ও বৃষককে নানা রঙের
পরিচয়-পত্র দেখিয়ে বোঝাফেরা করতে হয়।...

মাস্টারদা পাশে এসে বসতেই ধীরেনের
জান ফিরে এসেছে। মাস্টারদাকে চোখ মেলে
দেখেতেই তার সকল স্বপ্না দূর হয়ে গেছে।
হাতখানা বাড়িয়ে তাঁর পারের ধুলো চাইছেন
বীরেন। মাস্টারদা সন্দেহে সেট অত্যাশ
নিজের বৃকে টেনে নিলেন। কতর কটে
বীরেন বললেন: "আমাকে নিয়ে হু-দে-ভোগ
ডেকে আনবেন না। আমরা একটু 'সাইমনাইড'
দিন।"

মাস্টারদা কঠিন বিপ্লবী, কিন্তু তবস্পে
তার হৃদয়টি কুসুমকোমল। এই বীরনকে
ঘিরে তার বিপ্লব-জীবনের কত স্মৃতি
বিজড়িত। বীরনের জীবন-রক্ষার শেষ চেষ্টা
তাদের করতাই হবে। আসুক বিপদ। বিপদে
তাদের কি বা ভয়?...কিন্তু কী করে বীরনকে
বাঁচান যার? কোথায় আশ্রয়, কোথায় ডাক্তার,
কোথায় চিকিৎসা? অথচ বীরনে তো সময়
নেবে না? মৃত্যুই বীরনে?...

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে গ্রামের বুকে।
বীরনের জীবনে-ও হয়তো সন্ধ্যা নেমে
আসার সময় হয়েছে। অসহ্য বন্দগা বীরনের
দর্বাণে, অসহ্য বন্দগা বুলেটের দৃষ্ট ক্ষতে।
কিন্তু অতুলনীর সহশক্তিতে সেই বন্দগা
বীরনে ভুলে আছেন নিঃশব্দে। শব্দ করলে
পাছে বন্দুগা বিপদগ্রস্ত হন, আশ্রয়স্থলটি
অবাহিত লোকের নজরে আসে!...

এমন সময় দলের বিপ্লব কর্মী নীরনের
সঙ্গে একটি অপরিচিত লোক এলেন। সবাই
চকিত। নীরনে সকলের কৌতূহল দূর

করে বললেন : "ইনি হলেন এই 'চলশালা'
গ্রামেরই পথন ঘোষ। আমাদের এ বিপদ
অবস্থার রোগীকে আশ্রয় দিয়ে তার জীবন-
রক্ষার দায়িত্ব ইনি নিতে ইচ্ছুক।"...

গগন ঘোষের নাম শুনলে কেউ কেউ
স্বতীভূত হয়ে গেল। এ ব্যক্তি একজন দাগী



প্রীতিলতা ওয়ালেশ্বার

স্বাধীন হলে এসেছে এসব অপরাধ থাকবে
না, ভাই। আমরা দেশকে স্বাধীন করার
জন্যেই বেরিয়েছি। ভগবান মৃৎ ভুলে চাইলে
আমাদের সবার মৃত্যু একই সঙ্গে ঘটে যাবে।
তোমার দায়িত্ব তোমাকে অমানুষের পথে
টেনে নিরেছিল, কিন্তু অতুলন মনুষ্য
তোমার মধ্যে আমি দেখেছি। তুমি অসাধারণ
কাজ করে থাচ্ছ, এ আমি নিশ্চয় করে
বলে যাচ্ছি।"

বিপ্লবের নেতা, সর্বজনপূজ্য সূর্য সেন
এক দাগী চোরকে বললেন 'ভাই', স্থান
দিলেন তাকে 'বন্দু' রূপে, স্বীকৃতি পেলে
সে মানুষের মর্যাদার!...গগন ঘোষ সাত্ত্ব
অসম্ভবকে সম্ভব করে দিল।

এই দাগী চোরের গৃহেই বীরনের স্থায়ী
হল। গগন ঘোষের পরিবারস্বত্ব সকলে আহত
বীরনে দের জীবনের শেষ একটি সন্তান
তাকে অপূর্ণ স্নেহে ও ষ্ট্রে সেবা দান করে
গেলেন। মাস্টারদা থেকে আরম্ভ করে দলের
বহু নামী পলাতক বিপ্লবীরা এই গৃহে কত
যাতায়াত করে গেলেন সাতটি দিনের পরিসরে।
দূর থেকে বিপ্লব ডাক্তারদের বহুবার আনা-
গোনা হয়েছে। গগন ঘোষের পরিবার মৃত্যু
রোগী শূদ্রা ও আগন্তুকদের পরিচর্যা
কোথাও ছুটি হতে দেন নি।...পাড়ার লোকে
কিছুই টের পেল না। পদলিখের লোক
ভুলেও এই দাগী চোরকে বিপ্লবীর সঙ্গে
যুক্ত করতে পারে নি।...

চিকিৎসা হল নামমাত্র। হাসপাতালে
পাঠান অসম্ভব। অগত্যা ধীরে ধীরে বীরনে
মৃত্যুর পানে পা বাড়তে থাকলেন। যা বিবাহ
হয়ে গেছে। সাত দিনের দিন তিনি
হৃদয়বান গগন ঘোষের গৃহেই শেষনিশ্বাস
ত্যাগ করলেন। মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে তখন
মাস্টারদা, তারকেশ্বর দস্তদার, বিনোদ দত্ত
এবং আরো কতিপয় বিপ্লব কর্মী।...মৃত্যু-
পূর্বে বীরনে দে বলে গেলেন : "যার
অসাধারণতায় আমি তোমাদের ছেড়ে যেতে
বাক্য হলো তার অপরাধ তোমরা নিয়ে না।
তাকে গভীর করে কাছে টেনে নিয়ে। তার
বাক্য কিন্তু আরো বেশি।"...

রাষ্ট্রের অধিকার সকলে মিলে শব বহন
করে নিয়ে এলেন রেললাইনের পার্শ্বেই এক
নির্জন স্থানে। শব সমাহিত হল বিনা
আড়ম্বরে, প্রভুত নিষ্ঠায়। সকলে মিলে
প্রার্থনা করলেন বিদেহী আশ্রয় কল্যাণে।
নিবিড় নিশীথের নিরালায় মাস্টারদার বেদনা
তার দৃষ্টি চোখে অশ্রু হয়ে করে পড়ল। তার
সঙ্গে নীরবে আর একটি মানুষ-ও কেঁদেছিল।
তার নাম গগন ঘোষ। কিন্তু সভ্যসমাজের
বিচারে সে 'দাগী চোর' ছাড়া আর কিছু
নয়!!..

(চট্টগ্রাম-অঙ্গাগার-লুপ্তন)

প্রাউনাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অন্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।

"বৈদ্যানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"

—স্বামী সত্যজ্ঞানন্দ।

"বৈদ্যানি বেধিতে স্নান, বিয়বস্ত্র অবল্য
ও অতুলনীর। একবারি গ্রন্থে এত বহু-
মূল্য বস্তুর সন্নিবেশ পূর্বে আর হয়
নাই।"

—স্বামী শুক্লভূজানন্দ।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি

বর্তমান সবরের সন্ধ্যা ও

ভাষা সমাধা

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

গন্য হুল করে কিন্তু মানুষের বন যদি
পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙিতে বিলম্ব
না মূল্য ১১০ টাকা

বনামধ্যস্ত কথামিশ্রী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

বর্গাদিপি প্রবীণসী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড),

দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩.৫০

বসন্তমতী প্রাইভেট লিমিটেড

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,

কলিকাতা—১২

চোর। বহুবীর জেল থেকেই চুরির অপরাধে।
পদলিখের পাড়নের ভয় বা পুরুষকারের লোভ
তার কাছে উপেক্ষণীয় নয়। তাকে বিশ্বাস
করা চলে কি করে?

এ বিষয়ে তাদাতাড়ি যা হয় স্থির
করতে হবে। বিপদে সবার সিম্ভ্রান্ত গ্রহণে
মাস্টারদা অতুলনীর। তিনি বললেন :
"সাইমনাইড দেওয়ার চাইতে গগন ঘোষের
হাতে ভুলে দেওয়াই ভাল।"

গগন ঘোষ বলল : "বিরাট পরিবার পালন
করবার পথ না পেয়ে বহুবীর চুরি করেছি
এবং সেজন্য পদলিখের মার খেয়েছি,
জেলের মৃত্যু পেয়েছি বিস্তর। ও দুটি
কিন্তুই আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে, বাবু।
এবার না হয় একজনের জীবন বাঁচাবার চেষ্টায়
ও স্বদেশীবাবুদের আশ্রয় দেবার অপরাধে
জেল খাটবো। ও-জন্যে আমি ভাবছি না।"
...দাগী চোর গগন ঘোষের কণ্ঠে এ কী অভয়-
বাণী, অন্তরে এ কী উজ্জল প্রেম! এর
কোথাও ফাঁক মনে হচ্ছে না তো!...

মাস্টারদা তার হাতখানা ধরে বললেন :
"এ গরীব দেশে তোমার মত বিপ্লব মানুষই
চোর হয়, খুনী হয়, ডাকাত হয়। দেশ



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

চার্লিস এখন চার্লিসকে এত নামডাক যে, সিডনে ঠিক করলেন অন্য কাজ না করে তিনি এখন চার্লিস বিজিনেস এক্ফোর্স ম্যানেজ করবেন।

চার্লিস জনপ্রিয়তা এইসময় চরম শিখরে উঠেছিল। 'নিউইয়র্ক' চার্লিস ট্রাম চরিত্রের অনুকরণে পুতুল এবং স্ট্যাটুয়েট তৈরি করে ডিপার্টমেন্ট স্টোরস এবং ড্রাগ স্টোরসে বিক্রি হচ্ছিল। জিগফিল্ড ফলিজের মেসেরা রুশ-লন্ডায়, অর্থাৎ গোর্কি লাগিয়ে, বড় জুতো এবং টাকজলে ব্রাউজার্স পরে স্টেজে এসে গান গায়তো 'দ্যুজ চার্লি চ্যাপলিন ফিট!'

নামা জারগা থেকে যথা বই, জামা, মোমবাতি, খেলনা, লিগারেট বা টুথপেস্টের প্রাতিষ্ঠান থেকে ব্যবসা সংক্রান্ত প্রস্তাব আসতে শুরু করল। আর চার্লি-কানোনের কাছ থেকে প্রত্যাহ অসংখ্য চিঠিপত্র। সিডনে বললেন-দরকার হলে এসব চিঠির জবাব দেবার জন্য আর একজন সেক্রেটারী রাখতে হবে—কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির জবাব চার্লিস উরক থেকে পাঠাতেই হবে।

এখানে কম্পানী এই সময় চার্লিস প্রাতিষ্ঠান ইবি থেকে আর করছিল একশো হাজার ডলার। স্ক্রিপ্ট লিখে, এ্যাকটিং করে এবং ছবির পরিচালনা করে চার্লি পাচ্ছিলেন মাত্র সাততহে মারশো পঞ্চাশ ডলার করে। চার্লিস মনটা অসন্তোষে ডরে উঠল এবং তিনি এদের জানানলেন যে, ছবি তুলতে তাঁর আগও বেশি সময়ের দরকার—এই সময় তিনি দুই বা তিন

সাততহের ভেতর এক-একটি ছবি শেষ করছিলেন। স্পুর তখন শিকাগো থেকে লস্‌এঞ্জেলসে এসে হাজির—চার্লি যাতে কাজে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা পান এজন্য স্পুর ব্যবস্থা করে গেলেন যে, এখন থেকে প্রত্যেক ছবি বাক্স চার্লি বক্স হাজার ডলার বোনাস পাবেন।

এই সময়টাতেই ডি, ডব্লু, গ্রিফিথ তাঁর এপিক ছবি 'দি বার্ব' অভ এ নেশন' প্রডাকশন করে পৃথিবীর অন্যতম সেরা ভিতরের হিসাব খাম করেন।

ডি, মিলও প্রতিভার পরিচয় দেন 'দি হুইসপারিং কোরাল' এবং 'কারমেনের' একটি ভার্সান তুলে। এই কারমেন ছবিটি চ্যাপলিনের খুবই ভাল লাগে এবং এর ওপর একটি 'দু' রিলের বারলেস্ক ছবি করেন চার্লি। এখানে কম্পানীতে এই তাঁর শেষ ছবি। চার্লি এ কম্পানী ছেড়ে যাবার পর এখানকার লোকেরা এ ছবিটির সেন্স অংশ এডিট করবার সময় ছোট্ট দলগেছিলেন। জা আবার জুড়ে দিয়ে ছবিটিকে চার-রিলের করে প্রদর্শনীর জন্য রিলিজ করেছিল। অত্যন্ত মনোহর হলেও এর থেকে একটা বড় দিকটা পেরেছিলেন চার্লি। ভবিষ্যতে চ্যাপলিনের এর পর একটা সত্ত্ব বেগ করে দিচ্ছেন যে, তিনি যে অবস্থায় ছবি শেষ করছেন তার ওপর কারও কোন হাত চালাবার কক্ষতা থাকবে না—কোন কিছু কিস্তিত জা সর্বাঙ্গিকতরনের ব্যাপারে চার্লিস কবাই হবে শেষ কথা।

চার্লি চ্যাপলিনের সময় শেষ হয়ে গেলে স্পুর এসে প্রস্তাব করলেন তিনি চার্লিকে ডিনশো পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবেন—বিনিময়ে চার্লিকে বারটি 'দু' রিলের ছবি তুলে দিতে হবে—অবশ্য ছবির প্রডাকশন কন্ট্রোল স্পুরই দেবেন। চার্লি জবাব দিলেন যে, কন্ট্রোল নই করার সপ্নে সপ্নে তাঁকে আরেই একশো পঞ্চাশ হাজার ডলার বোনাস হিসাবে দিতে হবে—পরে অন্য কথা।

এরপর এখানে কম্পানীর সপ্নে তাঁর সম্পর্ক জিন্ন হয়ে গেল।

ভবিষ্যৎ! হ্যাঁ, সোনালী ভবিষ্যতের দিকে আশাপূর্ণ অস্তরে চেয়ে বইলেন চার্লি। ভবিষ্যৎও তাঁকে বঞ্চিত করে নি—সামল, জর্জ, বক্স অকুশলভাবে জেনে দিয়েছে তাঁর নামনে—ইন্ট এডের সেই উপবাসান্ত্রিষ্ট দ্বিধা জেনেটি কি সৌন্দর্য স্বপ্নও ভাবতে

পেরেছিল যে, সারা পৃথিবী একদিন তার প্রতিভার মুখ হয়ে তার যশোগানে চারিদিক ঘুর করে ভুলবে, টাকার পাহাড় জমে উঠবে তার নিজের রাজগারের অর্ধ থেকে।

সিডনে এই সময়টায় নিউইয়র্ক বসে চার্লিস যেসব নতুন অফারস আসছিল সে-দর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছিলেন। চ্যাপলিন ছিলেন স্যান্টোমিনিকায়—সমুদ্রের ধারে একটি বাড়িতে বাস করছিলেন এবং কারমেন ছবিটার শেষের দিকটা তুলছিলেন।

স্যান্টোমিনিকা পিরায়ের ওপর ছিল নাট গডউইনের ক্যাফে। মাঝে মাঝে সম্মানবেলায় এখানে গিয়ে চার্লিস ডিনার খেয়ে আসতেন। নাট গডউইন একসময় আমেরিকান স্টেজের স্ট্রো অভিনেতা এবং লাইট কমিডিয়ান হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। সেক্সপীরিয়ন জ্যাকব হিসাবে বিরাট নামডাক ছিল তার। ইংল্যান্ডের সর্বকালের বিখ্যাত অভিনেতা স্যার হেনরী অরলিভ-এর তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নাট গডউইনের হৃদয়তাপ্পন ব্যবহার চার্লিস বড় ভাল লাগতো। তা ছাড়া কথাবার্তা থেকেই বোঝা যেত ভদ্রলোক অত্যন্ত কৃষ্টি-সম্পন্ন। সত্যিকার সেন্স অভ হিউমার খুব ভাল লোকের মধ্যেই দেখা যায়—নাট গডউইনের ভেতর এ গুণটি ছিল। তখন তিনি মণ্ডাভিনয় থেকে অবসর নিয়েছেন—সুতরাং তাকে স্টেজে অভিনয় করতে চার্লিস দেখেন নি। কিন্তু তাঁর বিরাট খ্যাতির কথা চার্লিস শুনেছিলেন এবং এজন্য তাঁর প্রতি একটা বিরাট প্রাণা মনে মনে পোষণ করতেন।

দুজনের কথামুঠা রম্য খুব নিবিড় হয়ে উঠেছিল। অনেক সময় শরৎকালের সম্মান—এই সময়টায় ভয়ানক ঠান্ডা পড়েছিল—নির্জন সমুদ্রতীর ধরে হাটতে বেরোতেন। গডউইন যখন শুনলেন যে, ছবিটি শেষ করেই চ্যাপলিন নিউইয়র্ক চলে যাবেন, তখন চার্লিসকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন। তিনি বলেন—

এখন পর্যন্ত তুমি প্রচুর সাক্ষ্য অর্জন করেছ—সামনে রয়েছে তোমার বিরাট ভবিষ্যৎ—তবে সবটাই নির্ভর করবে তুমি কিভাবে নিজেকে চার্লিসে নেবে তার ওপর। নিউইয়র্ক গিয়ে ব্রডওয়ের থেকে দূরে থাকবে—জন-সাধারণের চোখের অন্তরালে থাকতে চেষ্টা করবে। অনেক কৃতী অভিনেতা এই একটি বড় ভুল করে গেছেন—তারা চাইতেন লোক তাদের সামনাসামনি দেখুক, তাঁদের সম্মখে টছসিসত হয়ে উঠুক—কিন্তু এর ফলে আর্টিস্টকে ঘিরে যে রহস্যময়তা থাকে, সে মণ্ডমায়ার জালের আবরণে সবার থেকে আলাদা করে, রাখে, তা নষ্ট হয়ে যায়। নানা জায়গা থেকে তোমার কাছে নেমন্তন্ন আসবে। এর কোনোটাই গ্রহণ করবে না। বাছাই করে নিয়ে একজন বা দুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, বাকীদের কথা মনে মনে কল্পনা করে নেবে। অনেক

বড় বড় অভিনেতা এ ভুলটি করে শেষে পস্টিয়েছেন। যে কোন সামাজিক নেমন্তন্ন পেলেই তারা উপস্থিত হয়েছেন সবার সামনে। উদাহরণ হিসাবে বিখ্যাত অভিনেতা জন ড্রুর নাম করা যেতে পারে। সমাজের উচ্চস্তরের সবারই সে ছিল অত্যন্ত প্রিয়—সবাই তাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করতো এবং ড্রুও সব সময়ই এইসব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতো। এর ফলে তারা ড্রুর খিয়েটারে যেত না—তারা তাকে নিজেরদের জ্বরিররুমে কাছে পেতে ভালবাসতো।

তুমি (অর্থাৎ চার্লিস) সারা পৃথিবীকে আজ তোমার অভিনয়-শক্তি মন্থনমুখর মত করে রেখেছে—যতদিন লোকেরদের থেকে দূরে থাকবে, ততদিনই মন্থন-কিন্ময়ে তারা তোমার স্মৃতি করবে—তাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে এই ইলিউশনটা নষ্ট করো না।

অভিনেতা জন ড্রুর সঙ্গে পাঠকদের কিছুটা পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। ইনি ছিলেন বিখ্যাত আমেরিকান-অভিনেতা-পরিবারের ছেলে এবং নিজের খুব বড়দের অভিনেতা। সফরে ইংল্যান্ড গিয়েও বহুবার অভিনয় করেছেন এবং প্রচুর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এর মা লুইজা ড্রু ছিলেন তাঁর সময়ের ফার্স্ট লেডী অভ দি আমেরিকান স্টেজ। এর ছোট মেয়ে অভিনেত্রী জর্জিনার সঙ্গে বিয়ে হয়, বিখ্যাত লাওনেল, এথেল এবং জন ব্যারিমোরের বাবা মরিস ব্যারিমোরের সঙ্গে।

মরিস ভাল অভিনেতা ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দু-একটি নাটকও লিখেছেন। একবার একটি নাটক লিখে তিনি বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ডকে দেখতে পাঠান। সারা বার্নহার্ডই নাটকটির নাম পাটে নিজের নামে এটি প্রকাশিত করেন এবং মণ্ডপ্ররোগে নাটকটি খুবই জনপ্রিয় হয়।

লাওনেল, এথেল এবং জনের পরিচয় বাংলার নাট্যমোদী জনসাধারণের কাছে নতুন-ভাবে দিতে হবে না। টকী ছবির কুপায় এঁদের তিনজনেরই অভিনয়ের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছে। মণ্ড এবং ছায়াচিত্র উভয়ক্ষেত্রেই (লাওনেল এবং জন—এথেল ছবিতে বিশেষ কাজ করেন নি) এঁদের সময়ে এঁরা ছিলেন প্রায় অপ্রতিবন্দী। জীবনে একবারই মাত্র তিন ভাইবোনে এক-সঙ্গে একটি ছবিতে নেমেছিলেন—সে ছবিটি হচ্ছে এম্, জি, এম্-এর রায়সপুটিন।

সেক্সপীরিয়ন যে সব নাটকে জন ব্যারিমোর মণ্ডাভিনয় করেছেন তার সুন্দর বর্ণনা আছে, জেনি ফাউলারের 'গড নাইট সুইট প্রিন্স' বইটিতে—এটি হচ্ছে জন ব্যারিমোরের জীবনী। জনের সঙ্গে চার্লিস দেখা এবং ব্যারিমোরের হ্যামলেট অভিনয়ের সম্বন্ধে দুজনের আলোচনার কথা যথাস্থানে বলবো।

বাই হোক চার্লিস তো নিউইয়র্ক পেঁছলেন। হোটেলের বাবার পথে সিডনে জানালেন যে মিউচুয়ালের ফিল্ম করপোরেশনের সঙ্গে চার্লিস তরফে তিনি এইভাবে চুক্তি করেছেন—সম্মতাহে দশ হাজার ডলার করে মোট ছশো সত্তর হাজার ডলার চার্লিসকে দেওয়া হবে। তারপর চার্লিস যে মুহূর্তে ইনসিওরেন্স টেস্টের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বোনাস হিসাবে দেওয়া হবে একশো পঞ্চাশ হাজার ডলার।

প্লাজা হোটেল চার্লিস থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাকে সেখানে রেখে সিডনে চলে গেলেন—ল-ইয়ারের সঙ্গে তাঁর লাগু এনগেইজমেন্ট ছিল, বাকী দিনটা তার সঙ্গেই পরামর্শে কাটবে। সুতরাং এই দিনটা চার্লিসকে সম্পূর্ণ একলা কাটাতে হবে।



‘কারমেন’ চিত্রের একটি দৃশ্য



চার্লি আর জার্মানিয়া। 'সিটি লাইটস'

অক্ষুণ্ণভাবে হামলেট থেকে আবৃত্তি করলেন, কাউ আই এম এলোন।'

ন্যাট গডউইনের উপদেশ মনে পড়ল—
পুডওয়ের থেকে দূরে থাকবে চার্লি।' হেটী
কেলীর সঙ্গে বারবার দেখা করতে ইচ্ছে হতে
লাগল। মন্ডিজ যোগ দেবার পর তার
সঙ্গে আর কোনো কন্ট্রোল সম্পর্ক ছিল না।
এই সময় হেটী নিউইয়র্কে তার
বোন মিসেস ফ্রাঙ্ক গোল্ডের বাড়িতে
থাকতো। ফ্রাঙ্ক এভিনিউ খরে চার্লি
হাটতে সন্ধ্যা করলেন—হেটীর বাড়ির নম্বর
ছিল ৮০৪। বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন
চার্লি—মনে মনে ভাবছিলেন হেটী এখন
এখানে আছে কিনা—সাহস পেলেন না
ভাকতে। আধঘণ্টা খরে রাস্তার অপেক্ষা
করলেন—মনে ক্ষীণ আশা হেটী হয়তো হঠাৎ
দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারে এবং
তাকে তখন এভাবে দেখে একেবারে অবাক
মনে যাবে। কিন্তু এমন কিছুই ঘটল না—
না কেউ ও বাড়ি থেকে বাইরে এল, না কেউ
বাইরে থেকে বাড়িতে ঢুকল। আস্তে আস্তে
চার্লি অন্যপথে পা চালালেন।

দুদিন এভাবে একা একা নিউইয়র্কে
কাটল। হঠাৎ মধ্যে ইন্সপেক্টরের ডাক্তাররা
তাকে পরীক্ষা করে গেল। এর কয়েকদিন
বাদে সিডনে এসে জানালেন—সব ঠিকঠাক
হয়ে গেছে—ডুমি ইন্সপেক্টরস টেস্ট পাশ
করেছে।'

কপটাই সই করা হয়ে গেল। চার্লি
দেড়শো হাজার ডলারের বোনাস নিচ্ছেন এই
দৃশ্যটির ছবি তোলা হোল। সোদিন সম্মান
যখন টাইমস স্কোয়ারে চার্লি জনতার মাঝে
দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ দেখলেন টাইমস
বিভাগ—এ ইলেকট্রিক সাইনে জ্বলন্ত অক্ষরে
খবর ফুটে উঠল—চার্লি মিউচুয়ালের সঙ্গে

চুক্তিপত্র সই করেছেন—বছরে তাকে ছ'শো
সত্তর হাজার ডলার দেওয়া হবে।'

রবার্ট পেইন তাঁর চার্লি চ্যাপলিন বইতে
লিখেছেন যে, ছাত্রাচারের জগতে চার্লি (দি
ট্রান্সপ) নিজের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে
চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন, যেমন ডন
কুইকসট চিরকাল বেঁচে থাকবেন সাহিত্যের
জগতে। চার্লি বাস্তবতাকে কখনও অগ্রাহ্য
করেন নি, বরং খুব বেশিভাবেই বাস্তব-
জীবনের দোষত্রুটি প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য রেখে
ঠাট্টা-তামাসার ভেতর দিয়ে তাদের প্রকট করে
তুলতে চেয়েছেন জনসাধারণের কাছে।

হিউমার জিনিসটা কি? এই প্রশ্নের
উত্তরে চার্লি বলেছেন, এটি হচ্ছে মানুষের
মন নামক পদার্থটির সমতা এবং সৌন্দর্য
অবাহিত রাখবার একটি দায়িত্বশীল, শাস্ত
এবং উদার কন্ট্রোল। বাহ্যিক জটিলতা
এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আঘাতে যাতে মানুষ
না ভেঙে পড়ে সেইজন্যই জীবনে হিউমারের
দরকার হয়। চ্যাপলিন বলেছেন, ক্লাউন
হওয়াটা অত্যন্ত দুঃখ এবং কঠিন ব্যাপার
—কোথা থেকে 'চার্লি দি ক্লাউন' চরিত্রটি এল,
কোথায় সে বাড়ে, তার জীবনের আসল
উদ্দেশ্য কি, ধাপে ধাপে পৃথিবীর পথে সে
কতোটা এগিয়ে গেছে—তার আবির্ভাব কিভাবে
সম্ভব হয়েছে—কি কি জটিল কঠোর সে
সম্পন্ন করেছে—এ সব প্রশ্নের উত্তর
চ্যাপলিনের নিজেরও অজানা।

'ক্লাউন-চরিত্রকে রূপান্তরিত করা সত্যিই
প্রাণান্তকর ব্যাপার'—বলেছেন চার্লি।

যতটা ভেবে চার্লি একথা বলেছেন আসলে
ব্যাপারটা তার থেকেও অনেক বেশি প্রাণান্ত-
কর। কারণ পৃথিবী যত বেশি অর্থ-
টোঁটোঁয়ান হয়ে দাঁড়িয়েছে, ততই আমাদের জীবন
থেকে কমেডি নামক বস্তুটি অন্তর্হিত হয়ে

যাচ্ছে। কমেডি একটা কথা আমাদের কাছে
ভালভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, আমরা মানুষ,
অতি-মানুষ বা দেবতা নয়।

চ্যাপলিন এ যুগের প্রেস্টেজ স্টারসদের
মধ্যে অন্যতম। অন্যান্য স্টারসদের মত
তিনিও ক্রমাগত সিরিয়াস প্রশ্ন তুলে গেছেন—
সুতরাং তাঁর কাজকে সিরিয়াসলি বিচার না
করলে তাঁর প্রতি আবিচার করা হবে। চার্লি
হচ্ছেন সেই জাতীয় লোক যিনি আগে থেকেই
জানেন, তিনি কি বলতে চান, এবং বক্তব্যকে
কিভাবে বললে দর্শক স্পষ্টভাবে বুঝবে সে
বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ পারদর্শী। দুঃখের
বিষয় এতকাল ধরে চার্লির সব কথা বুঝেও
আমরা সেই অনুসারে কোনো প্রতিকার করার
চেষ্টা করি নি। তা যদি করা হতো তাহলে
আজকের পৃথিবীর চেহারাও অনেকটাই
শাণ্টে যেত।

আর সবচেয়ে দুঃখের কথা হোল আজকের
দিনের যারা যুবক তারা অনেকটাই চার্লির
কর্মধারার সঙ্গে মোটেই পরিচিত নয়। কারণ,
এদের মধ্যে অনেকটাই চার্লির কোন ছবিই
দেখবার সুযোগ পায় নি। এতে করে তাদের
দোষ দেওয়া যায় না। এরপর পেইন আরার
বলেছেন—চার্লির প্রথম দিকের কোন ছবি
যোগাড় করা আজকাল প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে
উঠেছে। এখন দৈবাৎ চার্লির ছবি দেখবার
সুযোগ ঘটে। হঠাৎ সেদিন সুযোগ ঘটল
(১৯৫২ সালে লেখা) গ্রীনিজ ভিলেজের
একটি গদ্যমঘরে 'পিয়ে দি সার্কাস' ও
'টিউলিপ পার্কেচারড রোমান্স' দেখবার। একজন
চেক্‌ নাপিতের মুখে খবর পেয়ে পেইন ছবি
দুটি দেখতে যান।

হলিউড ব্লভারের ভূগর্ভস্থ একটি
অখ্যাত থিয়েটারে গিয়ে পেইন 'কারমেন'
ছবিটি দেখবার সুযোগ পান। ১৯৫২ সালের
কাছাকাছি 'দি মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট'
ইন নিউ ইয়র্ক কুপারবল্ল হয়ে 'দি কিউ'
ও 'ওয়ান এ এম' ছবি দুটি দেখাবার
বন্দোবস্ত করেন। একবার 'দি পিলগ্রিম'
বইটির একটি ছিন্ন কপি দেখেছিলেন পেইন।
'এডগাস লাইফ' দেখেন নিউইয়র্কীতে এবং
এক সম্পূর্ণ সিরিজের অস্পষ্ট ওয়ান রিলার
দেখতে পান প্যারিসে। ১৯৫১-তে পেইনের
চারবার 'সিটি লাইটস' ছবিটি দেখবার সুযোগ
ঘটে। কিন্তু পনের বছর আগে সেই 'থে
মডার্ন টাইমস' দেখেছিলেন, তারপর আর
এ ছবি কোথাও দেখতে পান নি।

ভারতবর্ষেও কচিং-কদাচিং চ্যাপলিনের
ছবি আসে। অবশ্য কিছুদিন আগে 'দি কিউ'
ছবিটির প্রদর্শনী হয়েছিল কলকাতায়। 'দি
কিং ইন্ নিউ ইয়র্ক', অর্থাৎ চার্লির শেষ
ছবি তো ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত আসেই নি।

অথচ সিনেমা-জগতের সর্বকালের এই
প্রেম্ভ শিল্পীর ছবি যাতে সর্বদেশের নতুন
যুগের দর্শকেরা দেখবার সুযোগ পান এসব

কিন্তু কখনোই বাস্তবের কিসে
কখনোই করা উচিত নয়?

মিউচুয়াল ফিল্মসের সঙ্গে বৃদ্ধ হবার
অগ্রে চ্যাপলিন যেসব ছবিতে কাজ করেছেন
তার একটি তালিকা এবং কিছু কিছু ছবির
আলোচনা এবারে দেব:

দি কিন্টোন ফিল্মস

১৯১৪:

সেকিং এ লিভিং (এক রিল)
কিড অটো রেসেস এ্যাট ভেনিস (ভাঙা রিল)
ম্যাবেলস স্ট্রীজ প্রডিকামেন্ট (এক রিল)
বিটুইন সাওয়ার্স (এক রিল)
এ ফিল্ম জান (এক রিল)
চ্যাপলিন ট্যাংলস (এক রিল)
হিজ ফেভারিট পাসটাইম (এক রিল)
ক্লয়েল ক্লয়েল লাভ (এক রিল)
দি স্টার বোর্ডার (এক রিল)
ম্যাবেল এ্যাট দি হুইল (দু' রিল)
টোরেন্ট মিনিটস অভ লাভ (এক রিল)
কট ইন এ ক্যাবারে (দু' রিল)
কট ইন দি রেইন (এক রিল)
এ বিজি ডে (ভাঙা রিল)
দি ফেটেল ম্যালেট (এক রিল)
হার ফ্রেন্ড দি ব্যাণ্ডিট (এক রিল)
দি নক্ আউট (দু' রিল)
ম্যাবেলস্ বিজি ডে (এক রিল)
ম্যাবেলস্ ম্যারেড লাইফ (এক রিল)
ল্যাফিং গ্যাস (এক রিল)
দি প্রপার্টি ম্যান (দু' রিল)
দি ফেইস অন দি বার রুম ফ্লোর (এক রিল)
রেক্রিয়েশন (ভাঙা রিল)
দি মাস্কোয়েরেডার (এক রিল)
হিজ নিউ প্রফেশন (এক রিল)
দি ব্রাউডার্স (এক রিল)



'টিলিজ পাম্কারড্ রোমান্স' চিত্রে চার্লি আর মেরি নরমান

দি নিউ ক্যানিটর (এক রিল)
দোজ লাভ প্যাগস (এক রিল)
ডেই এন্ড ডিনামাইট (দু' রিল)
জেনেটেলমেন অভ নার্ভ (এক রিল)
হিজ মিউজিক্যাল কেরিয়ার (এক রিল)
হিজ ট্রাইস্টিং স্টোন (দু' রিল)
টিলিজ পাম্কারড্ রোমান্স (ছ' রিল)
গেটিং এ্যাকোয়েটেড (এক রিল)
হিজ প্রাইস্টার্ক পাস্ট (দু' রিল)

দি চ্যাম্পিয়ান (দু' রিল)
ইন দি পার্ক (এক রিল)
দি জিটনে ইলোপমেন্ট (দু' রিল)
দি ট্র্যাম্প (দু' রিল)
মাই দি সি (এক রিল)
ওয়ার্ক (দু' রিল)
এ ওমান (দু' রিল)
দি ব্যাক (দু' রিল)
স্যাণ্ডাইড (দু' রিল)
এ নাইট ইন দি শো (দু' রিল)

দি এসানে ফিল্মস

১৯১৫:

হিজ নিউ বব (দু' রিল)
এ নাইট আউট (দু' রিল)

১৯১৬:

ফারমেন চোর (রিল)
পুলিশ (দু' রিল)

১৯১৭:

ট্রিপল ডাবল (দু' রিল)

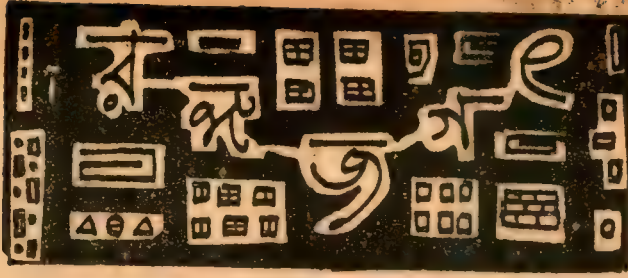
চ্যাপলিনের প্রথম ছবি 'সেকিং এ লিভিং'

কিন্টোন কম্পানীর গভান্দগাতক দ্বারা
অনুসারেই তোলা হয়েছিল। চার্লি হুপসল্জা
নিয়োগিলেন একটি ছিমছাম ধরনের ডিউডের।
ডিউড বলতে ভাণ্ডজাতীয় লোককেই
বোঝায়—ওপরের ঠোঁট চাইনিজ মাস্টার্স।
কইটি মজ্জিলাত করে প্রথম প্রদর্শনী হয়
২রা ফেব্রুয়ারী ১৯১৪। তেমন সুবিধের
হয় নি বইটি—তবে চার্লির অভিনয়ের প্রশংসা
হয়েছিল।



দি রাউডার্স' চিত্রে চার্লি আর ফ্যাটি অর্কাল

(সম্পাদ)



শিশু-চলচ্চিত্র

সিনেমা দেখার নেশা কার না আছে? আ বালবৃন্দবিনতার চোখ সিনেমার নামে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অন্ধকার ঘরে রূপোলী পর্দার সে ই দুই চোখ শেষ পর্যন্ত কি পার? হয়তো একদল বলবেন, আনন্দ পাওয়াটাই বড় কথা; স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিয়ে ছেলেমেয়েরা সিনেমা দেখে আনন্দ পায় হয়তো, কিন্তু সেই ফাঁকে তা দেয় গড় লাভটা হয় কি পরিমাণ—তার একটা হিসেব নেওয়া দরকার। কারণ সিনেমা দর্শক নাথীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। পড়াশুনার কঠিনতা যদি বর্তব্য না হয়, তা হলে সিনেমার গল্প আর চোখে ধামা-লাগানো ছবির বাহার তাদের সামনে কোন আনন্দ এ বং কি আশা তুলে ধরে—তা যাচাই করা প্রয়োজন।

দেশ নাকি গড়ে উঠছে। স্বাধীন দেশ গড়ে উঠুক—এ তো আমরাও চাই। কিন্তু সেই দেশকে গড়ে তুলবে কারা? তাদের সা মনে পথ মাত্র একটি। আর সেই পথ 'নির্দেশিত' হয় রূপোলী পর্দার ওপর নায়ক-নায়িকার আদর্শে। সত্যি বলতে কি, গণের নায়ক-নায়িকা যে ভাষায় কথা বলে, একালে র ছেলেরা জানে তার কোনোটাই সত্য নয়। কেন না, অধিকাংশ সিনেমার অবাস্তব কাহি নী কাউকে কোনো আদর্শের পথে নিয়ে যেতে পারে না। অপরপক্ষে এইসব অপরিশুভ বস্তু দর্শক কেবলমাত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জীবনাদর্শকে অবলম্বন করার জন্যে উন্মুখ হয়। একথা সবাই জানে যে, চলনসই অভিনয় করতে পারলে একদিকে অর্থলাভ, আর এক দিকে খ্যাতি। উপরি পাওনাও আছে। তা হচ্ছে—কোনো পত্রিকার আত্মজীবনী প্রকাশের মাধ্যমে যা হচ্ছে তাই লেখা।

তাই পত্রিকার বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের জন্য যখন নতুন অভিনেতা ও অভিনেত্রী আহ্বান করা হয়, তখন পরিচালকের দোরে ভিড় জ মেনে; এমন কি কোন এক নেশার ঘোরে তারা বোম্বাই পর্যন্ত ধাওয়া করে। কিন্তু শেষ প র্যন্ত তারা কি পার? মরীচিকার পেছনে ছুটে লাভ করে শূন্য হতাশা। বাকি জীব নটাই তাদের সিনেমার পর্দার ওপরে নতুন একেবারেই জলে পড়ে। এর জন্যে দায়ী অ বশ্য বোম্বাই-মার্কী সিনেমা এবং চোরগোস্তা বিজ্ঞাপন। যে ছেলেমেয়েদের সামনে যেমন আ দর্শ সিনেমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, তেমন মৌকি আদর্শ অনুসরণ তারা করবেই। এখা নে সামাজিক দৃষ্টি মাতাপিতাও ছেলেদের সেই পথ থেকে রোধ করতে ব্যর্থ হন।

সেই কারণে এই সমস্যার দিকে আজ আ মাদের তাকিয়ে দেখতে হবে এবং আসল গল্প দূর করতে হবে। আমরা জানি বাংলাদেশে এখনো দূ-চার জন সং পরিচালক ও বিবেচক অভিনেতা আছেন, যারা এই ব্যাপারে কিছু ভাব বেন এবং সারা ভারতের মানুষ সিনেমার মাধ্যমে কি পাচ্ছে তার একটা হিসেবনিকেশ করবে ন। এই হিসেবনিকেশ নামমাত্র সিনেমা দেখার স্বার্থে নয়, জাতির চরিত্র গঠনের জন্য দরকার।

সেই চরিত্র গঠনের স্বার্থে সময় হচ্ছে কি শোরকাল। অথচ কিশোরদের উপযোগী কোনো চলচ্চিত্র তৈরির জন্য পরিচালকরা সহ জে এগিয়ে আসেন না। হৃদয়গের টানে এ সব কিশোর যেসব সিনেমা দেখে তা কখনো সিনেমা সকলের প্রদর্শনযোগ্যরূপে পাশ মার্ক পেয়ে থাকে। সেন্সার বোর্ড না দিয়েই বা কি করবেন? প্রথমত কিশোরদের উপযুক্ত চলচ্চিত্র যখন দূর্লভ, তখন কতনের গ্রিভুজ-মার্কী অনুপযুক্ত ছবিই তাদের চোখের সাম নে তুলে ধরা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। এতে শ্যামল থাকে কল ও থাকে। 'হাউস ফু ল'ও যায়। কিন্তু সর্বনাশ হয় দেশের। কেন না এ কিশোর দল এসব ছবি দেখে পা ড়ি দিতে যায় বোম্বাই। স্বনভংগের পর ছমছাড়া জীবন নিয়ে শেষে যখন বাস্তব জ গতে পা দেয়, তখন দেখে সামনে দূর্ভেদ্য অন্ধকার। রূপোলী ঝিলিক কোথাও নেই।

অতএব কিশোরদের উপযুক্ত চলচ্চিত্র তৈ রির জন্য আমাদের দেশকে সচেতন হতে হবে। এসব ছবি কি ধরণের হবে, তা এখানে বলা র প্রয়োজন নেই। তবে তাদের সামনে এমন কিছু তুলে ধরতে হবে, যা তাদের মরীচিকা র পিছ টেনে নিয়ে যাবে না। বাস্তবের জগৎ থেকে রূপের জগতে, সৌন্দর্যের জগতে, রূপ কথার দেশে তাদের নিয়ে যেতে পারলে তাদের কল্যাণ করা হবে, এ সংগে হবে দেশের কল্যাণ।

—সুজন



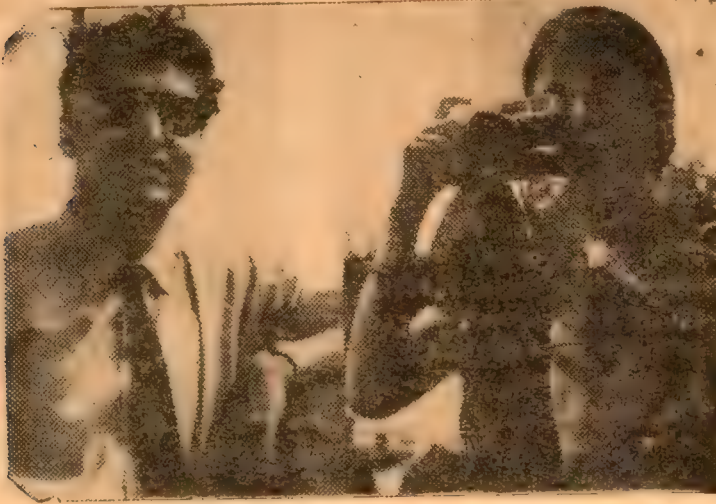
দুঃখিতা সানাল—'দিনান্তের আলো'
ছবির একটি চরিত্রে

চিত্র-আলোচনা

আকাশকুসুম

আর ডি বনশল নির্বেদিত 'আকাশকুসুম' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এ যুগের সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। 'আকাশ কুসুম'ের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক মৃণাল সেন ও কাহিনীকার আশীষ বর্মণ।

কাহিনীর মধ্যে দুই প্রেমীর মর্মকথা রুচ ও করুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্পের গতিতে কোথাও ঘনঘটা নেই। এমন কি চিত্রনাট্যকারম্বর কোথাও অবধা উদ্ভেজনার মুহূর্ত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন নি। সেই কারণে শূন্য হৃদয় দিয়ে নয়, খেলা চোখ ও বুদ্ধি দিয়ে 'আকাশকুসুম'-এর গভীরতার পৌছতে হবে। অবশ্য, কাহিনীর নামকরণের সাহায্যে গল্পের উপসংহার বোঝা কষ্টকর হয় না। তবে কৃতিত্বও আছে সেইখানে। 'আকাশকুসুম' যে-কোনো সাধারণ পরিচালকের হাতে পড়লে একটি সাধারণ কৌতুক চলচ্চিত্রে পরিণত হতে পারত—যার রস ঠাণ্ডা, ঘরের বাইরে আসার পর মনকে নাড়া দিতে পারত না। মৃণাল সেন তা করেন নি। মিলনান্তক রসসৃষ্টির পরিবর্তে সামাজিক



‘আকাশকুসুম’ ছবির একটি দৃশ্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা দাশগুপ্ত

ট্রাজেডিকে তিনি দর্শকচিহ্নে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

কলকাতার বহু মিনারের তুল্য ছোট গলিতে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিচরিত্রে জাজ্বল্যমান হচ্ছে অজয়। সে গুণী। গানের দ্বারা সে মন জয় করেছে মণিকার। মণিকার বাবা বিত্তশালী ব্যক্তি। মণিকাকে মাত করতে গেলে গানই বঞ্চিত নয়, তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে। দালাল ফণীবাবুর পরামর্শে ডিস-পোজালের মাল কিনে অফিস খুলে বসে। এই অফিস, এমন কি অজয়ের জামা পর্যন্ত তার নিজের নয়। বাল্যবন্ধু সত্যেনের বাড়ি, গাড়ি অজয়ের নিজের ভেবে মণিকার মা-বাবা আমদানি হন। অজয়ও তাঁদের কাছে আসল রহস্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। মণিকাকে বলতে গিয়েও বলতে পারে না। শেষে সব কথাই ফাঁস হয়ে যায়। একের পর এক মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়ে মণিকার বাবার কাছে অজয় ঠক, জোচ্চর, ব্রাদার বিশেষণে ভূষিত হয়। অজয়ের বড় লোক হবার স্বপ্ন, মণিকাকে লাভ করার স্বপ্ন সবুয়েই থেকে যায়।

অজয় হচ্ছে এ বুগেরই একজন ফ্রাস্ট্রেটেড যুবক। আশা যার অনেক, কিন্তু কোনো আশাই থাকে সাফল্যের দ্বারে নিয়ে যায় না। অর্থনীতির বেড়াডাঙে পিষ্ট, শিক্ষিত গায়ক অজয়কে এ যুগে সমাজের যত্নের দোষা যায়। দুর্নিবার আশা তাকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু ‘বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাত দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ’ অবশ্য মণিকা বড়লোকের মেয়ে হলেও তার মধ্যে স্বভাবসুলভ ভালবাসার হৃদয়টুকু লক্ষ্য করা

যায়। এই মণিকাই বা কদিনের? অজয়ের সমাজের সঙ্গে তার কোনো পরিচয় সে খয়স পর্যন্ত হয় নি। হলে তার হৃদয় কেমন থাকত চলচ্চিত্রে সে সমস্যাতে তুলে ধরা হয় নি। তুলে ধরা হলে এবং মিলনের পথে না গিয়েও খ্যাতিমান পরিচালক নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করতে পারতেন।

অজয়ের চরিত্রেও একটু বাড়িবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। অজয় যদি ঐ সমাজের প্রতিনিধি-স্থানীয় হয়, তা হলে বলা যায় নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের কজন অমন যখন-তখন গাড়ি চালিয়ে বেতে পারে। অজয়ের দৌত্যগ্যও আছে। সে পেরেছে হৃদয়বান বন্ধু, যে নিজের বিদ্যাবিশিষ্ট জেগে গাড়ি-বাড়ির মালিক। অবশ্য অজয়ের স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরি হয় নি। তার নিজের বলতে কিছুই নেই, এটা সে ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে।

মণিকার সঙ্গে যদি অজয়ের হৃদয়ের যোগ হরও থাকে, তা হলে বগবো মণিকার কাছে সত্যের সমুদ্রীন হবার মতো সাহস তার ছিল না। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাস্তার ধারে তার লুকিয়ে থাকার কারণ চমৎকার—কিন্তু দোটা আয়তলনা। একলের যুবক অর্থোপার্জনের স্থান দেখতে পারে, কিন্তু তার উত্তোমিকটা কি একবারে চিন্তা করবে না? অজয় তা করে নি। হয়তো এখানেই মনে হতে পারে সে বড়লোকের মেয়েকে চায় বড়লাক হয়ে, আত্মশান্তিতে নয়, বরং নিজের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

পরিচালক মশাল সেন আমাদের অনেক কথা ভাবান বলেই এতটা কথা লিখতে হল। সত্যে দু-চার কথা বক্তব্য শেষ করা যায়। অজয় যে পাড়ার ব্যাসিন্দা, সে পাড়ার

রক্তের মাতাম্বকে নিপুণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তার ড্রেনপাইপ প্যান্ট, তার অচরণ প্রভৃতির সঙ্গে অজয়ের যোগ থাকা হয়তো কাহিনীর বিচারে উচিত নয়, তবু সমাজের অবক্ষর দিকটি সেখানে পরিম্পূর্ণ। অজয় তো সেই সমাজের একজন। তবে তার গুল আছে। কিন্তু অর্থহীনতার গুলের সমাদর সাধারণের কাছে থাকলেও বড়লোকের সমাজে নেই। অবশ্য অজয়ের স্বপ্নই অজয়কে স্বপথ থেকে অধিক দ্রষ্ট করেছে।

অজয়ের চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের রূপদান সার্থক হয়েছে। ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তাঁর অভিনয়ে বিশেষ বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। অপর্ণা দাশগুপ্ত মণিকার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন। বিশেষত অজয় যখন তাদের বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয় তখন মণিকার চরিত্রে গ্রহণ ও বিদায়দানের যে সংকটমূহূর্ত সৃষ্টি হয়েছিল তাতে অপর্ণা দাশগুপ্ত বিশেষ অভিনয়শক্তির পরিচয় দান করেছেন। মণিকার মায়ের চরিত্রে শোভা সেন মাতৃহৃদয়ের পরিচয় দিয়ে দর্শকদের মৃগ্ষ করতে পেরেছেন। মণিকার বাবার অভিনয় করেছেন হারাদন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয় ব্যক্তিত্বপূর্ণ, স্থানকালপাত্রোপযোগী। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ‘দালাল’ চরিত্রে অপূর্ণ অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া শূভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লবালা দেবী, রসরাজ চক্রবর্তী প্রভৃতির অভিনয়দক্ষতা মনে রাখার মত। সঙ্গীতাত্মক বাড়িবাড়ি নেই, অথচ নায়ককে নিয়ে তা করা সম্ভব ছিল, এজন্যে কাহিনীর সমস্যা কোথাও খর্ব হয় নি। আবহসঙ্গীতে অভিনব লক্ষ্য করা গেছে। ভূমিকা-লিখন চূড়ান্তপূর্ণ মনে হয়েছে। গণ্যায়র নম্রকের সম্পাদনা প্রথৎসনীয়। অ্যাকশনের মূহূর্তে অ্যাকশনসম্বলিত স্থির-চিত্রগুলি অপূর্ণ। ফটোগ্রাফির মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সূরের আগুন

চিত্রক নির্বোধিত সূরের আগুন সঙ্গীত-প্রধান চলচ্চিত্র। এর মূল কাহিনীকার হচ্ছেন, সমরেশ বসু। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, তপন সিংহ।

যে কাহিনীর শিরায় শিরায় সঙ্গীতের সূর প্রবহমান, তার নায়ককেও অনেক সময় জন্মান্বরণে হাজির করা হয়। হয়তো তাত গল্পের রস বোধ জন্মে। তবে চির প্রচলিত সেই কাহিনীর মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা মানসিক ঠেঙন্য তীব্রভাবে নাড়া খেলেই কাহিনীতে অভিনব ফুটে ওঠে। সেই অভিনব ফুটে উঠেছে জন্মান্ব গোকুল, গোকুলের দ্বিধা লাভ ও জগৎগের স্বামী নিবারণকে

সংবাদ

চলচ্চিত্রশিল্পে সোভিয়েট-ভারত সহযোগিতা

থিয়ে। জামাইবাবু, নিবারণ (বিকশিত রায়) সহজ চরিত্রের মানব নান। পেশায় তিনি কবহারজীবী, কথায় তাঁর তীক্ষ্ণত্ব। তাঁর কাগজে অভিভূত হয়ে ওঠে নিরুপায় গোকুলের জীবন। তখন দিদি লাবণ্যই (অরুণভা দেবী) জন্মানন্দ ভাইয়ের জীবনে একমাত্র অবলম্বন। দিদির প্রচেষ্টাতেই সে সংগীত শিক্ষা করে। শ্রীতিও সে লাভ করে পরবর্তীকালে। তবু, মানুষের জীবন তাতেও ভ্রো স্খী হয় না। জন্মানন্দ গোকুলের জীবনে ভেঁমনি না ছিল যেন সুখ। অভিনেত্রী লীলার ভালবাসার দানও সে বিস্মৃত হতে পারে না।

সূরের আগুনে এইভাবে ফুটে উঠেছে সূরের ঢেউ-এ ঢেউ-এ মানুষের মর্মকথা। সে কথা কেবলমাত্র যথার্থ গোকুলের সার্থকতার মধ্যেই লিপিবদ্ধ নয়, যেন আরো কিছু যথার্থ অন্তর্নিহিত। একমাত্র গানের ভাষায় তাকে প্রকাশ করা যায়। পরিচালক কলাই সেন মানুষের বৃক্কের ভাষাকে গানের ভাষায় প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে সূরের আগুনকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছেন। চলচ্চিত্র অঙ্গতে পরিচালকের প্রশংসনীয় কৃতিত্ব তিনি অবশ্যই দাবি করতে পারেন।

প্রতিটি গান কাহিনীর সঙ্গে সুবিন্যস্ত এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, কোনোটিই চট্টল সংগীত নয়, সূর রচনার মধ্যে সূরকার কালীপদ সেনের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও উপেক্ষণীয় নয়, বিশেষত আধুনিক সংগীতকে

তিনি নতুন সুরারোপে অভিজ্ঞত করে তুলেছেন। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বর্তমানকালে নজরুল সংগীতকে চলচ্চিত্রের গভীর থেকে প্রায় বিদেশ দেওয়া হয় এবং নজরুলের সূরের অনুকরণে অন্য সংগীত হলেও, নজরুলের গানটি আমাদের ভালো লেগেছে।

সূরের আগুনের অভিনয়-নৈপুণ্যই দ্বিতীয়রাশের শৈথিল্যকে জোড়া দিয়েছে কলা যেতে পারে। অরুণভা দেবীর লাবণ্য-চরিত্রে নারীর প্রেমময়ী মূর্তিতে ড্যানিয়েল প্রস্তুতি। নিবারণ-চরিত্রে বিকাশ রায়ের অভিব্যক্তি চমকায়, তবে তাকে প্রায় এক ধরনের চরিত্রে নির্বাচিত করার দিকে পরিচালকের কেন এতো কৌক-তা বোঝা মুশকিল। তাঁর নাট্যপ্রতিভা ভিন্ন জাতীর চরিত্রেও বিকশিত হওয়া দরকার। অজয় গঙ্গোপাধ্যায় জন্মানন্দ গোকুলের ছানিকার অবতীর্ণ হয়ে দশক-দ্বিত্রাতাদের হৃদয়স্পর্শ করতে পেরেছেন। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, হার, লাহা, রাধামোহন ভট্টাচার্য, রবি ঘোষ, দিলীপ রায়, নৃপতি চ্যাটার্জীর অভিনয় চরিত্রানুযায়ী সার্থক। ঐ সব চরিত্র গল্পের গভীরে স্বেচ্ছানুদান করেছে।

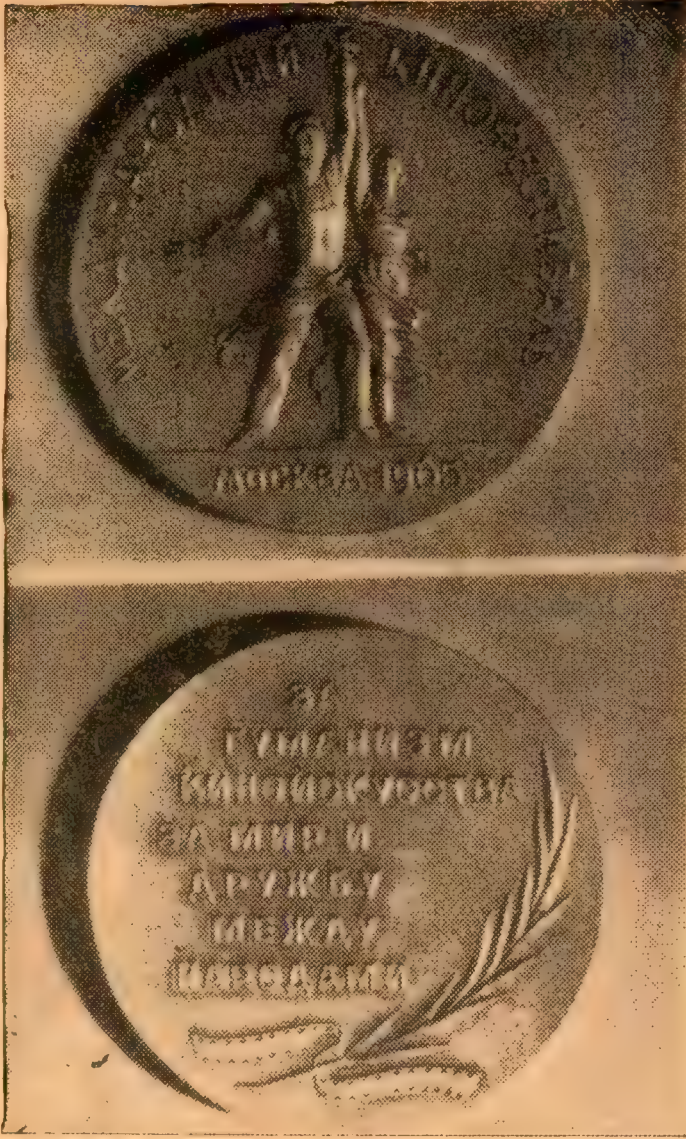
চিত্র গ্রহণের কাজ প্রশংসনীয়, তবে দৃশ্য গ্রহণে সামান্য ত্রুটিও দ্রুতিগাচর হয়েছে। সম্পাদনার দায়িত্ব স্বাধাধ পালিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

সংগতি করেক বছর ধরে চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতা সাফল্যের সঙ্গে বেড়ে চলেছে। সরকারী স্তরে আমাদের উভয় দেশের কল্প-সম্পর্ক এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এখন এটি দ্বিতীয় উল্লেখ করার বিশেষ তাৎপর্ষ্য আছে। তা হল যে, ভারতের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু, সারাক্ষণ অভ্যন্তর কর্মবাস্ত থাকে সত্ত্বেও প্রথম বৃত্তভাবে নির্মিত ছায়াচিত্র "আফানাসি নিকিভিন" সম্পর্কে ভারতীয় ও সোভিয়েট চলচ্চিত্র কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করার সময় করে নির্যেছিলেন। সোভিয়েট-ভারত সৈন্য দৃঢ়তর করার ব্যাপারে তিনি এই ছায়াচিত্রের উপর বিশেষ তাৎপর্ষ্য আরোপ করেছিলেন। এই ছায়াচিত্রটি ১৯৫৭ সালে তৈরি হয় এবং উভয় দেশেই সাফল্য লাভ করে। ভারতে ছবিটি "পরদেশী" নামে চলছিল।

"দি ব্রেনস আর রাইং", "দি ফেট অব এ ম্যান", "দি ব্যালড অব এ সোলজার", এবং "ইলিয়া মুরোমেডস"-এর মত সোভিয়েট স্ক্রিমগুলি করেক বছর ধরে ভারতে দেখা



শংকর চলচ্চিত্র উৎসবে অগ্রেত বিভিন্ন দেশের চিত্রশিল্পীদের সংগে মহাশূন্যচারী প্যারিসে প্রেরণাভিত্তি। ছবিতে ডানদিকে ভারতের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী রাজ কাপুর ও তাঁর পত্নীকে দেখা যাচ্ছে



মস্কা চলচ্চিত্রগুলির শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ কামেরাম্যান, শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীকে যে পদক পুরস্কার দেওয়া হয় তার দু'টির ছবি

হচ্ছে এবং এখনও এগুলা খুব জনপ্রিয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ফিল্মগুলির প্রতি খুব নজর দেওয়া হয়। শ্রুত ১৯৬৪ সালেই 'লগা-যমুনা', 'শহর ঠুর স্বপ্ন', 'অনুপ্রাণ' প্রভৃতি ছটি ভারতীয় ফিল্ম কেনা হয়। সোভিয়েট পরিবেশক সংস্থাগুলি সোভিয়েট জনগণকে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যথাসম্ভব পরিচিত করার চেষ্টা করছেন। ভারত থেকে যত ফিল্ম কেনা হয় সেগুলি সবই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতির ভাষায় (উজবেক, জর্জিয়ান, ইত্যাদি), 'ভাব' করা হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যোগ স্থাপনের

উদ্দেশ্যে এইসব উৎসবের আলোচনা সভার বিশিষ্ট ভারতীয় চলচ্চিত্র-কর্মীদের আমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। রাজ কাপুর, নারগিস, কে, এ, আব্বাস এবং অন্যান্যরা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বোড়িয়ে গেছেন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত ভারতীয় ফিল্মগুলির বিজ্ঞাপন ব্যাপক আকারে দেওয়া হয়। যেসব সোভিয়েট সংস্কৃতি-কর্মীরা ভারতে গেছেন তারা ভারতীয় ফিল্মগুলি দেখানোর আগে দর্শকদের সামনে বক্তৃতা দেন। এসব ভারত ও তার শিল্প সম্পর্কে আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করে।

ভারতে সোভিয়েট ফিল্ম

চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত সোভিয়েট সংস্থাগুলি ভারতীয় জনগণ বাতে আরও

ঘনিষ্ঠভাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে জানতে পারে এবং সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হয় তা সম্ভব করার জন্য চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে 'অপারটিমিস্টিক ট্রাজেডি' (সেভেলোদ ভিশনেভস্কির গ্রন্থ অবলম্বনে), 'আই ওরাক ইন মস্কা', 'ওন ফ্রেশ অ্যান্ড ব্লাড', 'এ ইসারস ব্যালাড', 'দি অ্যাম ফিরিয়ান ম্যান', 'ক্লিমসন সেলস', 'প্রি গ্লাস টু', 'দি স্ট্রিপড ভয়েজার্স' এবং অন্যান্য ছবি ভারতে দেখানো হয়েছে। গত বছর ভারতের অনেক শহরে সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, নাগপুর ও পুণার সংবাদপত্রগুলি সোভিয়েট ফিল্মগুলির উচ্চ মান, শিল্পগত মৌলিকতা এবং কারিগরী সংক্রান্ত নিপুণতার উল্লেখ করে।

এই বছরের গোড়ার দিকে নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এম, শলোখফের লেখা দুটি গল্পের ভিত্তিতে নির্মিত 'এ ডন স্টোরি' এবং কাব্যময় চলচ্চিত্র কাহিনী 'মাই নোটব ল্যাণ্ড' দেখায়। ভারতে চলচ্চিত্র আলোচনা সভার আমাদের প্রতিনিধিদলে ছিলেন 'এ ডন স্টোরি'র প্রযোজক ভি, ফেভিন এবং এই ফিল্মে প্রধান নায়কর ভূমিকা যিনি গ্রহণ করেছেন সেই এল, চুরসিনা। প্রযোজক এম, কালতোজভ প্রতিনিধি দলে ছিলেন ('দি ক্রেনস আর ফ্লাইং' ছবির প্রযোজক)। এঁকে উৎসবের অন্যতম বিচারকরূপে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। উৎসবে সোভিয়েট ফিল্মগুলিই যে অবিসংবাদিতভাবে সাফল্য অর্জন করেছিল এ কথা সুবিদিত। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে গণ্য ইয়েভগেনি লিয়োনফ বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

আজকাল বহু ভারতীয় কোম্পানী সোভিয়েট ফিল্ম দেখাতে আগ্রহান্বিত এবং তারা নিজেরাই ফিল্ম কিনছে ও পরিবেশন করছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় ও সোভিয়েট ফিল্মকর্মীদের মধ্যে যোগ আরও ঘনিষ্ঠ হবে এবং অবিসংবাদিত ভাবে তাতে উভয় দেশের মানবের কল্যাণ হবে।

মস্কা চলচ্চিত্র উৎসবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি

চতুর্থ আন্তর্জাতিক মস্কা চলচ্চিত্র উৎসবে ৬৭টি দেশ যোগদান করেছে এবং এদের মধ্যে ৫৭টি দেশ এবং রাষ্ট্রসংঘ ও ইউনেসকো (রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা) প্রতীবোগিতা বিভাগে ছবি পাঠিয়েছে।

৫ই জুলাই তারিখে উন্মোচনের পর থেকে এ পর্যন্ত যে সব পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনী-চিত্র দর্শক-সাধারণের প্রশংসা পেয়েছে এবং

বিচারকমণ্ডলীর কাছে উপস্থাপন করে মনে হয়েছে, সেগুলির মধ্যে আছে : সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়—পরিচালিত জর্জিয়ান ছবি “এ সোলজার্স ফাদার”, ডিওরিরও দি সিকার “ম্যারেজ—ইটালিয়ান স্টাইল” (ইটালী), নিকোস মেইমাস-এর “দি ইয়াং ওয়ার্ল্ড টু লিভ” (গ্রীস), এদুয়ার্দ বোরসোদিনি-র “স্ট্রোলিং দি ওয়াইল্ড কাইজার” (অস্ট্রিয়া), ডাট্রোস্লাভ মিমিকার “প্রিমিটিভিস ফ্রম ভিশনে-ভিজুয়েল আইল্যান্ড” (যুগোস্লাভিয়া), ফাতি আবদুল ওয়াহাব-এর “ব্যানিশড ফ্রম প্যারাডাইস” (মিশর) প্রভৃতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “দ্য গ্রেট রেস” (পরিচালক এডওয়ার্ডস রেক) ছবিটি সিনেমা শিল্পের কারুকারিতার দিক থেকে উচ্চাঙ্গের হলও, কতগুলি নৃশো রচিত অভাব এবং অপেক্ষাকৃত স্থূল “স্ট্যান্ড-স্টিক” হাস্যরস বিচারকসম্পন্ন দর্শকদের ভালো লাগে নি।

হুম্বল্টের ছবির প্রতিযোগিতা শূন্য হয়েছে ৬ই জুলাই থেকে এবং এ বিভাগেও ৫০টির বেশি দেশ যোগদান করেছে। এ পর্যন্ত প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে মরক্কোর “রোজ অফ দি সাউথ”, কুয়াইতের “মজা-মেদিনা”, বেলজিয়ামের “গেলিসিয়াস অফ গ্রীনল্যান্ড”, সুইজারল্যান্ডের “বেল ফর উরসাই”, নেদারল্যান্ডস-এর “স্বাকুমুলেশন” প্রভৃতি বিচারকমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করেছে।



॥ লোকশিল্পী রাখাল দাস বৈরাগী ॥

কতই না সুন্দর এই বাংলা দেশ। এখানে সবুজের সমারোহ চারিদিকে। মন কেড়ে নেয় জানা-অজানা বিচিত্র পাখীর উচ্ছল কাকলি। প্রকৃতির এই নয়নাভিরাম পরিবেশে আকাশে বাতাসে যে সুর ছড়িয়ে থাকে তাই এসে ধরা দেয় তাদের কণ্ঠে—যারা মনের আনন্দে এই পরিবেশের মাঝে প্রকৃতির কোলে ঘর বেঁধে বাস করেন।

সারাদিন তাঁরা কাজ করেন মাঠ-নদী-বন-পাহাড় আর তারই কাঁকে মনের আনন্দে তাঁরা গান বেঁধে গেয়ে চলে। এ গানে কোন কৃত্রিমতা নেই—নিজেদের জাহির করার প্রয়াসও নেই এ গানের মধ্যে। তাঁদের এ গানের সুরে ওস্তাদের মার-প্যাঁচও নেই—কথাতেও পাণ্ডিত্যের ছাপ নেই। সহজ ও সরল কথায় তাঁরা এ গান নিজেদের মতন করে যুগ যুগ ধরে বেঁধে গেয়ে চলেছেন। যারা এ গান গেয়ে থাকেন তাঁদেরকেই আমরা শিল্পিতেরা লোক-শিল্পী বলে থাকি।

এহেন লোকশিল্পী হলেন রাখাল দাস বৈরাগী। রাখাল দাসের সাথে আমার পরিচয় হয় হালিশহরের পথে ট্রেনে যেতে।

রাখাল দাসের অপূর্ব কণ্ঠস্বর আমাদের মুগ্ধ করেছিল সেইদিন। রাখাল দাস খজনী বাজিয়ে গান গেয়ে ট্রেনে ডিলে করছিলেন। সঙ্গে তাঁর ছোট একটি মেয়ে তাঁর গানের



লোকশিল্পী রাখাল দাস বৈরাগী

সাথে ধরা ধরছিল। রাখালবাবু যে গানটি গাইছিলেন তা একটি ভটিমূলক পল্লী-সংগীত। এ-গানে জীবন-যন্ত্রণার কতবিস্তৃত মনের একটি দরদী চিত্র কণ্ঠে উঠেছে। কৃত-বিস্তৃত মন তাঁর ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের বাসনা নিয়তই প্রকাশ করছে। যেমনঃ—

আর কত দুখ লিখেছি হরি
আমার এই কপালে
রোগে শোকে কর্মভোগে,
জনম গেলে বিফলে ॥
তুরি তোমার নামের গুণে,
শিলা ত' ভাসিল জলে,
আমি পড়িমা অকল পাথারে,
ডাকি তোমার নাম ধরি ॥

রাখালবাবু গান শুনে মুগ্ধ হয়ে মন-পড়ে তাঁর আন্তানার গিয়ে অনেক গানই

শুনেনি। রাখালবাবুর প্রায় সব গানই কেউ-কিছু, ভটিমূলক ও বাউল প্রেদী।

রাখালবাবুর আর একটি গানে বাউলদের পুরুষদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। পুরুষের কাছে পার্থিব দুঃখ, শোকের অবসানের জন্য কর্তব্য আবেদনের সুর পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন—

দ্বিভাপ জ্বালায় জ্বলে মরি পুরুষ
বাতাসে প্রাণ জুড়ায় না,
(ও পুরুষ) কলপতরুর শীতল ছায়া
আমার অঙ্গে কেন লাগে না।

সাদৃশ্যে হরি বলে বক ভাসায় নয়ন জলে,
আমার ভাগ্যে যে জও হল না ॥

‘রাখাল দাস বাবু’ আরও একটি গানে এই পুরুষদের প্রাধান্য খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। যেমনঃ—

(ও মন) পুরুষ বিনা প্রাণ বাঁচে না
আমার ঘরপুরুষ কর্মপুরুষ
মর্মে পুরুষ বাসনা ॥

রাখাল দাস বাবু এ ধরনের অনেক গানই আছে যা সত্যিকারের রত্ন বিশেষ।

রাখাল দাস বাবু বিপরীক—তিনটি শিশু-সন্তানের পিতা। সারাদিন ঘুরে গান গেয়ে ডিলে করে রাখাল দাস বাবু তাঁর শিশু-সন্তান কন্ঠের মুখে দুঃখের অম্ল অনেক কণ্ঠে তুলে দেন।

রাখাল দাস বাবুর মত একজন পুরুষ দরদী শিল্পীর চরম পরিণতির কথা আমাদের প্রত্যেকেরই ভাবা প্রয়োজন। রাখাল দাস বাবুর মত অনেক লোকশিল্পীই আছেন যারা এইভাবে অনাহারে দিন কাটাতে বসেছেন।

—বৃন্দা দেব রায়

সংযুক্ত গণনাট্য শিল্পী-সংস্থা ও উৎপল দত্ত

গত ১০ই জুলাই সংযুক্ত গণ-শিল্পী-সংস্থার তিনটি নাটক দেখে এলাম। অভিনয় পুরুষ হবার আগে বিখ্যাত নাট্যকার এবং নাট্যপরিচালক প্রীতপল দত্ত তাঁর ভাষণে বললেন যে, আজকের দিনে নাট্য আন্দোলনে ধারাটো জনগণের আন্দোলনের ওপরেই দৃষ্টি রেখে হওয়া উচিত এবং এই আন্দোলনকে সজীব ও সক্রিয় রাখবার জন্য, শহর, শহরতলী ও গ্রামে গ্রামে আন্দোলন-বিশ্বাসী বিজয় সংস্থার অভিনয় দেখিয়ে কেড়ানো দরকার। পুরানো দিনের নাটকের পুনরাবিস্তার সম্বন্ধে তিনি একটি সুন্দর কথোপকথন করেছেন—নাটক পুরানো হলেই ক্লাসিক হয় না, ক্লাসিকের পর্ষায় যে নাটক ওঠে সে নাটক সর্বকালেই চিরনবীন। সংযুক্ত গণ-শিল্পী-সংস্থার তিনটি সভ্যসংস্থা তিনটি নাটকের পরিবেশন করলেন মজাপ্রদে। প্রথম নাটকটি হল শিল্পিতেরা



মিনার্ভা থিয়েটারে 'করোল' নাটকের একটি দৃশ্যে উৎপল দত্ত ও অন্যান্য শিল্পিবৃন্দ

'স্বপ্ন'-এর রচয়িতা শ্রীউৎপল দত্ত, নাটকটির পরিচালনা করলেন শ্রীবিদ্যুৎ বোস। নাটকটির চেনাশেলীর ভেতর যথেষ্ট অভিনব আছে। তিনজন মূর্তকর্মীর—পরে রিপোর্টারের মূর্তি যারা মূর্তি আবির্ভূত হয়েছিলেন—অভিনয় বেশ জোরালো। নায়িকা এবং রিপোর্টারের অভিনয়ে প্রাণের অভাব।

নাটকের একটি বস্তু হচ্চে কোন কোন কাগজের কতব্যাক্তিরা কাগজে গরম খবর দেবার জন্য নিউজ ম্যানুফ্যাকচার করে কাগজের কাটাতে বাড়ান এবং এইসব খবর পড়ে জন-জীবনে যে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি এবং বিঘ্ন-বিপদের সৃষ্টি হয় তার দিকে এতটুকু দৃষ্টি মা দিয়ে নিজেদের মনোমগ্ন দিকটাই দেখেন। বস্তুটি অসত্য একথা বলাই না। কিন্তু 'স্বপ্ন' নাটকে ব্যাপারটা এমনভাবে বলা হয়েছে যাতে অনেকের মনে এই ভুল ধারণা হতে পারে যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কাগজেই এই ধরনের মারাত্মক খবর ম্যানু-ফ্যাকচার করা হয়ে থাকে। এ কথাটা তো ঠিক নয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাগজেও যথেষ্ট নিউজ ম্যানুফ্যাকচার করা হয় এবং আরও বেশি মারাত্মকভাবে। সুতরাং সমস্ত সম্প্র-দায়িক কাগজই যে এই ধরনের পদার্থিতর আশ্রয় নিয়ে থাকে সে বিষয়ে আরও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেওয়া উচিত ছিল নাটকটিতে। নাটকটির রাজনীতিক মতবাদ সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই—কারণ আমাদের এই গণ-তন্ত্রের দেশে বিভিন্ন রাজনীতিক মতবাদে

বিশ্বাসী লোক এবং সংস্থা থাকবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় নাটক 'আজকের খবর' মঞ্চস্থ করেন রূপালতরী নাট্যসংস্থা—এর রচয়িতা ও পরিচালক শ্রীজোহন দস্তিদার। প্রচারধর্মী নাটক—বিশেষ রাজনৈতিক মত-বাদের। বস্তু বিষয়ে কোন কিছুই অভিনব দেখলাম না—এই ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে বামপন্থী বহু নাট্যসংস্থা বহু বছর ধরে বহু নাটক পরিবেশন করেছেন। শ্রীজোহন দস্তিদার এবং দালালটি বাদে আর সবারই অভিনয় বেশ দুর্বল লাগল। নাটকটি আরও একটু ভাল করে রিহাস করা উচিত ছিল। এবার তৃতীয় এবং শেষ নাটক মথুসূদনের বড়োশালিকের ঘাড়ের রোর কথা বলাই। এ নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন 'দ্য লিটল থিয়েটার গ্রুপ'—পরিচালনায় শ্রীউৎপল দত্ত। নাটকটি রচিত হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে। উৎপলবাবুর কথার পুনরাবৃত্তি করেই বলাই—নাটক পুরনো হলেই ক্লাসিক হয় না, আর যে নাটক ক্লাসিকের পর্যায়ে ওঠে সে নাটক কালের গভীরে আবদ্ধ থাকে না—সে নাটক চিরনবীন।

এই নাটকের পরিচায়িকা আছে—
'... as yet we have not estab-
lished a National Theatre, I
mean we have not as yet got a
body of sound, Classical Dramas
to regulate the national taste and
therefore we ought not to have
Farces.'

—মথুসূদনের পদ

প্রহসনখানিতে প্রাচীন হিন্দুসমাজকে আক্রমণ করা হয়, সেজন্য পাইকপাড়ার রাজারা তার অভিনয় বন্ধ রাখেন। এই প্রসঙ্গে মথুসূদন তাঁহার পদে লিখেন—

'Mind, you brok' my wings
once about the farces ; if you play
a similar trick this time, I shall
forswear Bengali and write books
in Hebre or Chinese'

এবার অভিনয়ের কথা—সেদিন বেকের্ট জর্জিট দেখে ভাবছিলেন যে, পিটার ওটলের মত অভিনেতা আমাদের দেশের কোথা বা চিরজগতে আজকের দিনে একটিও নেই। আমার সে সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে গেল ওই দিন ভক্ত-প্রসাদের ভূমিকায় উৎপল দত্তের অভিনয় দেখে। চোখ, মুখ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাব-ভঙ্গীতে প্রতিক্ষেপে, ভক্তপ্রসাদকে 'বড়ো শালিক' হিসাবে রূপায়িত করছিলেন শ্রীযুক্ত দত্ত মস্তের ওপর। তাঁর মনোভঙ্গীও হচ্ছিল অত্যন্ত ইফেক্টিভ—বিশিষ্ট পদার কণ্ঠস্বরকে খেলিয়ে সংলাপে অন্তর্নিহিত বস্তুকে যে কি সহজ, সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা যায়—তার পরিচয় পেনাম সেদিন ভক্ত-প্রসাদের অভিনয়ে। পরিচালনা এবং যৌথ অভিনয়ও নিখুঁত। মূলতঃগনে লিটল থিয়েটার নিজস্ব সেট-সেটিংস ব্যবহার করতে পারেন নি—কিন্তু ইফিনে এত প্রভাব হলে হলেও যে, এসব অভাব চোখেই পড়ে নি।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে, আর 'অন দি অরিজিন অব ম্যান' ১৮৫৯-এ। ফরাসী বিপ্লবের মূল আঘাত এসে পড়েছিল 'ভিভাইন রাইট অব কিসেস' বা রাজস্ব ইন্সপেক্টর প্রেরিত এই ভ্রমাত্মক ধারণার ওপর। এবং সৈদিক দ্বিধা বিচার করলে এই বিপ্লবটি সম্পূর্ণভাবে সার্থকতাও অর্জন করেছিল। মার্কস এ বিষয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন। তিনি আত্মমগ্ন করে বসলেন সম্পদের মালিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিভাইন রাইট অব পাওয়ারকে। আর ডারউইনের খিওরিতে নস্যাক করে দেওয়া হল এই অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিকে যে, মানুষ জগৎবাসের দ্বারা বিশেষভাবে সৃষ্ট।

দুটি খিওরির সম্মুখেই উচ্চ প্রশংসা এবং তাঁর নিন্দা ধ্বনিত হয়ে উঠল চারিদিকে। সমাজ এবং বিপ্লবের পটভূমিকার মানুষের স্থান কোথায় এ যেন নতুনভাবে নির্ধারণ করার সময় এল। এতকাল বাইবেলের নির্দেশ অনুযায়ী সবাই মনে করতো যেন মানুষকে কেন্দ্র করেই এবং বিশেষভাবে মানুষের জন্যই জগতের সৃষ্টি। এখন থেকে বোশের ভাগ চিন্তাশীল লোকই বুঝতে শিখল ও ধরনের জগৎ-সৃষ্টির ব্যাখ্যার কোন অর্থই হয় না। এ্যাস্ট্রোনোমার্স, জিওলজিস্টস এবং বাইও-জেনিটিক্সেরা যেসব তথ্য আবিষ্কার করতে লাগলেন তার ফলে মানুষ বুঝতে শিখল যে, বিশ্বজগৎ এন্ট্রোপোসেন্টিক নয়। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভাষা সামাজিক সংগঠন ব্যাপারটির ওপর নতুন আলোকপাত করলো এবং এটোও বোঝাতে শেখাল—কোন পরিবেশে মানুষ কিভাবে গড়ে ওঠে।

অতীতের গ্রীকদের কাছে মানুষের পরিচয় ছিল বীরশূর্য্য হিসাবে—সে যেন আত্ম-সেবতা, প্রায় অলিম্পিয়ান গডসদের সম-শ্রেণীর। এই অলিম্পিয়া পাহাড়ের দেবতারাও ছিলেন মানুষের ভাষ্যবিধাতা। মানুষের সামান্য ভুল-ত্রুটি এমন কি অজানিতভাবেও কোন নৈতিক নিয়মের কোন বিচ্যুতি ঘটলে এসব দেবতার কাছে তার কঠোর বিচার হোত—অবশ্য তখনকার গ্রীকরাই এই ধরনের ভ্রতবাপে বিশ্বাসী ছিল।

এলিজাবীথান আমলেও মানুষের বীর-ব্যক্তিক চেহারাটা বিশেষ পাল্টার নি। তখনও মানুষই যেন পৃথিবীর অধিকর্তা, গর্বোন্মত্ত, প্রচণ্ড তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তার চাওয়ার এবং আশার কোনো সীমানা নেই, তার কমতাও মূর্জর।

উপরি-উক্ত ধারণার ওপর ভিত্তি করেই পোরিট্রিয়েন যুগের এ্যাথেন্সের নাটক এবং এলিজাবীথান যুগের নাটক রচিত। প্রধান চরিত্রগণ সবসময়েই হোড অতিবাস্তব বা 'লার্জার দ্যান লাইফ'—যেমন ইডিপাস বা হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ প্রভৃতি। এমন একটা মহাজাগতিক বিরাট এবং মহাশোকার পরিচয় এইসব চরিত্রে পাওয়া যেত যা পৃষ্ঠক এবং দর্শকের মনে অদ্ভুত বিস্ময়ের সৃষ্টি

বিশ্বের ওদেশে এবং এদেশে

করতো। তাদের জীবনের ভুল, ত্রুটি এবং অসাকল্যে গভীর এবং তাঁর কল্পনাস্রবের সৃষ্টি হোত।

উনিবিংশ শতাব্দীতে কিন্তু মানুষের চেহারা অনেক পাটে মেল। ঐশিক এবং এলিজাবীথান যুগের বিরাট কল্পিত তাকে সাধারণ বাস্তবজীবনের চেহারা নাগিয়ে আনা হল। নতুন সব ভাব ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে নতুন পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে এখন সাধারণ মানুষের মতই দেখা হতে লাগল, আর তাকে আগেকার মত প্রায় দেবতার অবতার বানাবার কোনও প্রচেষ্টা দেখা দেয় না। মানুষ যে ধর্মীয় দ্বিগির সন্তান, তার যে কত দুর্বলতা, নাজিহীনতা, কুসৃত্য, প্রকৃতি এবং পরিবেশ এবং নিত্যনিয়ত বেসর জাগতিক ঘটনা ঘটছে তাকে আরও আনবার শক্তি যে মানুষের নেই—এসব কথা সবাই মর্মে মর্মে এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বুঝতে শিখল। সপ্তে সপ্তে অবশ্য একঘাটিও পরিষ্কৃতি হয়ে গেল যে, মানবমন চির-অনুসন্ধিৎস—সব-কিছুর ভেতর দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করাকেই সে জীবনের রত হিসাবে নিয়েছে। এবং এর ফলেই সামাজিক সম্পদ, সামাজিক আচর, আচরণ এবং ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষ প্রতিনিয়ত বিচার-বিশ্লেষণ করে চলেছে। এই চিন্তাধারাটাই আবার বিরাট এবং কার্য-করী প্রভাব বিস্তার করল উনিবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নাট্যরচনার এবং নাট্যসাহিত্যে।

নতুন আবিষ্কৃত বিজ্ঞানমন্ডলের সঙ্গে যেমন মার্কস এবং ডারউইনের নাম যুক্ত (এবং পরে ব্রুন্সড ও আইনস্টাইনের), তেমনি নতুন নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল নরওয়ে-জিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের নাম। ইবসেনিচ্ছন্ন বলতে সপ্তে সপ্তে আধুনিক যুগের নাট্যজগতের বিরাট বিপ্লবের কথাই সহজভাবে মনে আসে।

এই বিপ্লব যুগেমান নাট্যের বিপর্যয়কর ওপরই আবদ্ধ নয়—নাট্যের টেকনিক এবং শ্রেণীভুক্তও এই বৈপ্লবিক ওলোটপালটের হাত থেকে রেহাই পায় নি। ইবসেন মারা গেছেন ১৯০৬ সালে—এতবছর বাদেও তাঁর বিরাট প্রভাব নাট্যসাহিত্য এবং রংগমঞ্চ থেকে অপ-সারিত হয় নি বা হতে পারে নি।

যদিও ইবসেন করেকটি ঐতিহাসিক এবং কাবানাট্য লিখে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন, কিন্তু প্রধানত বাস্তবধর্মী নাট্যের প্রবর্তক হিসাবেই তিনি নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যমণ্ডের ইতিহাসে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। থিয়েটারে

তিনিই প্রথম রিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা করেন। চিত্রাচারিত নাটক লেখবার রীতিকেও তিনি সম্পূর্ণভাবে বদলিয়ে দিয়ে নতুন ধরনের ভঙ্গীতে নাটক লেখবার পদ্ধতি দেখিয়ে দেন। ফলে কয়েক বছরের ভেতরই তাইই ধারার অনুসরণে ইউরোপের নানা দেশে নাটক লেখা সুরু হল।

আগেই আমরা দেখেছি যে, উনিবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্থাংশ সময়ে কতক-গুলো অতি নিজীব এবং মেকানিক্যাল নাটক রচিত হয়। এর ভেতর বেশ কিছু ছিল ক্লাসিক্যাল নাট্যের অনুকরণে লেখা—এসবের বিষয়বস্তু হোড পুরানো, জরাজীর্ণ ঐতি-হাসিক বা পৌরাণিক কাহিনী। লেখবার স্টাইল ছিল শকাড়ম্বরপূর্ণ গদ্য-কবিতা অনুপ্রেরণা বিবর্তিত প্রাক্কৃতীয় আধুনিকত্ব ছন্দের পদ্য—কলে এসব নাটক অত্যন্ত এক-ঘেয়ে এবং হাস্যকর মনে হোড চিন্তাশীল দর্শকদের। বাকী যেসব নাটক ছিল, ওক কিছু ছিল বাইবেল মেলেজাওয়া, কিছু জোর করে সৃষ্টি করা রোমান্স এবং কিছু বাস্তব-পূর্ণ ফার্সেস।

যে ধরনের নাটকই হোক না, একটা বা-ক-ধরা ছকে এই সময়ের ট্রেপেদিল লেখা হোত। কাহিনী যেন জোর করে তৈরি করা এক প্রমিত (স্টোডারডাইজড)। এসব নাটকে থাকতো যুগ্মগত দুটি বা ততোধিক কিশোরকর ঘটনার সংকটন, আকস্মিক বা ঠকরনের কেন-কিছু হওয়ার ফলে উত্তেজনা-পূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি এবং এইসব কারণে দর্শকদের মনে কৌতুহল জাগিয়ে তুলবার প্রচেষ্টা। নাটকের চরিত্রের মানসিক বিশ্লেষণ বা বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক সম্পর্কের নাটকীয় ব্যাখ্যান এসব কিছুই থাকতো না। নাটকগুলোর স্বাভাবিক এবং পরিণতিও করা হোড যথেষ্টভাবে। লেখক আগে থেকেই যেন ঠিক করে রেখেছেন বাঁধালরা ছকে নাটক শেষ করবেন—এ পরিণতি সহজ বা স্বাভাবিক হোলা কিনা সে নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা ছিল না। কলে দর্শক আগে থেকেই বুঝে নিত নাটক শেষ হবে ধাঁচে বাঁধা গভানুগতিক নক্সা অনুসারে।

এইসব নাটকে না থাকতো কোনো ব্যক্তি-ধারা অনুমোদিত রম্যবিকার এবং পরিণতি, না থাকতো আগাগোড়া কোনো সমতা, অথবা দর্শকমনে বিশ্বাস সৃষ্টি করার মত মাসা-জাল। চরিত্রগুলি হোতো কঠোর পুঙ্খলির মত—কতক পরিচিত টাইপ চরিত্রের ওপর নির্ভর করেই এদের রূপায়ণ করা হোত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

ফলে এসব চরিত্র হত অত্যন্ত অবাস্তব—কাহিনীর জন্য দরকার মত এদের অবতারণা করা হোত—কিন্তু কোন মানবিকতা বা প্রাণ-কততা এসব চরিত্রে থাকতো না।

এসব চরিত্রের সংলাপও হোত বাগাড়ম্বর-দ্রব্য এবং অস্বাভাবিক। মাকে মাকে এইসব সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়তো, তা ছাড়া এসাইড এবং সলিলকির চাপে জারগায় জারগায় নাটকের গতি খুবই ব্যাহত হয়ে পড়তো। কোনো কোনো সময়ে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের লম্বা লম্বা বক্তৃতার দর্শক আশ্বির হয়ে উঠতো।

উনিবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাট্যরচনা ব্যাপারে একটা নতুন ধারা লক্ষ্য করা গেল। এই ধারার প্রবর্তক বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার ইভিজন স্কাইব। ইনি সে সময় করেক শো মটক রচনা করেন এবং ফাদার অব দি ওয়েল-মেড প্লে' এই নামে খ্যাত হন। এ যুগে স্কাইবের কথা নাট্যানুমোদীরা প্রায় ভুলে

পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবিতকালে স্কাইব ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় নাট্যকার। এর কারণ রাস্তানৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন সমাজের কঠামো বদলিয়ে যাচ্ছিল, তেমনি নতুন শ্রেণীর দর্শকেরও সৃষ্টি হচ্ছিল। এর ফলে স্টেজে আগেকার 'রোমান্টিক বাহুল্যের' বিরুদ্ধে একটা প্রতি-ক্রিয়া সূত্র হয়েছিল দর্শকদের মনে। আগেই বলা হয়েছে স্কাইব 'ওয়েল-মেড' প্লে'র প্রবর্তক—'ওয়েল মেড' বলতে এই বোঝাতে চাই যে, এইসব প্লে'ন ঘটনাত্মকিকৈ যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যেতো—হঠাৎ বিনা কারণে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া ইন্সিডেন্টস্ এগুলো নয়। স্কাইবের নাটকের চরিত্রগুলোও ছিলো অপেক্ষাকৃত প্রাণবন্ত এবং নাটকীয় ঘটনাও অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। স্কাইব (এবং তাঁর অনুবর্তী নাট্যকারের দল) তাঁর পরিচিত জীবনের ওপর ভিত্তি করেই নাটক লিখতেন। এই জন্যই তাঁর নাটকের ঘটনা-

কালিকৈ অবিশ্বাস্য মনে হোত না—এর ফলে তিনিই একাধিসাবে পঞ্চপ্রদর্শক হলেন পরবর্তী যুগের সত্যিকার শক্তিশালী নাট্যকারদের অভ্যাগমের জন্য। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার। স্কাইব বা করেছিলেন তা প্রধানত টেকনিকের ব্যাপারে। তাঁর নাটকের কাহিনীর বেশির ভাগই ছিল হালকা ধরণের। চরিত্রগুলো দুর্বল এবং রচনাশৈলী বিশেষতঃ-বলিষ্ঠ। তাঁর নাটককে ঠিক সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না—কিন্তু ড্রামাটিকার (অর্থাৎ কম্পোজিশন অফ্ ড্রামা) দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর দান অপারিসীম। নাট্য-রচনার বেসব নতুন ছাঁচ স্কাইব সৃষ্টি করলেন তারই অনুসরণে ইবসেনের মাস্টারপিপেস রচিত হয়েছিল এবং নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এইসব মাস্টারপিপের স্থান অধিকার করবার মত নাটক এখন পর্যন্ত রচিত হয় নি। স্কাইব সম্বন্ধে অক্সফোর্ড কম্পানিয়ন টু দি থিয়েটারে যে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে তা থেকে খানিকটা ভুলে দিলাম :

Scribe, (Augustin) Eugène (1791-1861), French dramatist, the originator and exponent of the 'well-made play.' A prolific writer he was responsible alone or in collaboration, for more than 400 plays, comprising tragedies, comedies, vaudevilles, and libretti for light opera. - - -

The most successful of Scribe's plays, and the one best remembered; was *Adrienne Lecouvreur* (1849); written in collaboration with Legouvé, who in 1874 wrote Scribe's biography. The play, though incorrect historically, provided a fine part for Rachel, and later for Sarah Bernhardt. In translation it was played by Mme Ristori, Mme Modjeska, Helen Fancit, and many others.

Scribe's popularity has not guaranteed him against almost complete oblation.

His plays are still interesting as examples of dramatic construction, though seldom revived now a days. - - - he was an excellent craftsman. He had an uncanny flair for theatrical effect, and was unrivalled in judging what would appeal to an audience at any given moment.



এই বছরের প্রথম থেকে আমি আপনাদের সাপ্তাহিকের নিয়মিত পাঠক। বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার যোগ ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পর থেকে। দেশকে ভালবাসার জন্যে, আর দেশের স্বাধীনতাকল্পে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে গিয়ে আমাদেরও পুলিশের নির্যাতন ও দীর্ঘ কারা-খাস যে ভোগ করতে হয় নি এমন নয়। নোভাগ্যবশত জীবনের সূর্য থেকেই কলকাতার মূল বিপ্লবীদের সঙ্গে, যেমন হারিশচন্দ্র শিকদার, কালিদাস বোস, অনুকূলচন্দ্র মথোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র দে, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীশচন্দ্র মিত্র (হাবু), শ্রীশচন্দ্র পাল প্রমুখ বিপ্লবীদের সম্পর্কে এসেছিলাম, আর তাদের আজ্ঞা বহন করার সুযোগও পেয়েছিলাম।

আপনাদের সাপ্তাহিকের ১৭ই জুন, '৬৫ তারিখের সংখ্যা থেকে প্রকাশিত শ্রীভূপেন্দ্র-কিশোর রক্ষিতরায় লিখিত 'সবার অলঙ্কার' শীর্ষক লেখাগুলি খুব আগ্রহের সঙ্গেই পড়ে আসছি। ২রা আষাঢ়, ১৩৭২, ৩য় সংখ্যার প্রকাশিত 'সবার অলঙ্কার' শীর্ষক লেখাটির মধ্যে 'রডা-বড়বন্দ' বিষয়টি পড়ে কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে।

কারণ আমি এটা খুব ভালভাবেই জানি 'রডা কোম্পানীর' অমূল্যের ব্যাপারে আসল brain ছিলেন কালিদাস বসু, কিন্তু সে-কথার বিশেষ উল্লেখ নেই। আর এই সম্পর্কে যে বিশেষ সত্য হয়েছিল সে হচ্ছে ৪/০, মলত্রা লেনে, গিরীন্দ্রনাথের বাড়িতে—দাস লেনে হাবু মিত্রের গৃহেই নয় (পৃঃ-১৭১)। এই পরিচালনার বিলম্বিত অংশ বারী গ্রহণ করে-ছিলেন তাঁরা ছিলেন—কালিদাস বসু, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র বানার্জী, অনুকূলচন্দ্র মথোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখ বিপ্লবীরা।

অতীত 'বুখারী', হেমচন্দ্র বোস, হারিশচন্দ্র শিকদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তখন এই পরিচালনার সম্পর্কে আসেন নি। তাঁরা এই কথা জেনে থাকবেন পরে। আমি কালিদাস বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই মিশেছি এবং এখানে তাঁর মুখের কথাই বলছি।

তারপর অনুকূলবাবু ঘটা করে কোন গরুর গাড়ি যোগাড় করেন নি, কিংবা প্রচুর শ্রীহরি-দাস দত্ত সেই গাড়ি চালান নি। এমন হতে পারে যে, তিনি গাড়োয়ান সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তা ছাড়া মালগুলি খালাস করা হয়েছিল 'কাস্টমস হাউসে পৌঁছে' (পৃঃ-১৭২) নয়; 'Cr wnshed' নামক জেটি থেকে। উক্ত জেটি থেকে এ মাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল 'রডা কোম্পানী অবলিম্বত ডান্সিস্টার্স রো-তে' নয়। 'রডা কোম্পানী' আজও বেখানে আছে, তখনও সেইখানেই ছিল, অর্থাৎ Wellesly Palace—এ যে রাস্তাটি গভর্নর হাউসের সামনে থেকে নতুন টোলফোন হাউস পর্যন্ত বিস্তৃত। মালগুলি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, 'আমনিটোরী রো-তে অবলিম্বত রডা কোম্পানীর



গৃহাশ্রমে'। অতঃপর আব্দুল মোসাদ্দ নামক গাড়োয়ানের গাড়িতে একটি বড় প্যাকিং কেসে শস্ত করে প্যাক করা অবস্থায় মালগুলি এনে ফেলা হয় মলত্রা লেনে অনুকূলদার বাড়ির কাছে কালিত মথাজীর লোহার গৃহাশ্রমের উঠানের কটকের সামনে বেলা ৩টা/৪টা আন্দাজ সময়ে এবং আরও কিছুদিন পরে সেই বাক্সটি একটি ঠিকা ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জেলেপাড়া লেনে, প্রচুর ভুলগণ ধরার বাড়িতে। সম-সাময়িক সংবাদে প্রকাশ 'it was at 4.0 P.M.—আমিও নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানি অনুকূল সমগ্রই ঠিক।

এদিকে ঐ মাল ফেলে দিয়েই শ্রীশচন্দ্র মিত্র আত্মগোপন করেন এবং লেখকের ভাষাতেই বিকাল ৫টার দার্জিলিংয়ে আসে..... রংপুর রওনা হয়ে গেলেন।' তাই বর্দি হয় '২টি মাউজার পিস্তল ও ১০০০ বুলেট' তিনি সঙ্গে নেওয়ার জন্যে পেলেন কোথা থেকে? এইভাবে লেখাটির আলোচ্য অংশের বিষয়-বস্তু বা প্রকাশ হয়েছে সবটাই প্রায় সম্পূর্ণ মনে হচ্ছে।

লেখক ও অন্যান্য সকল বিপ্লবীদের প্রতি বন্ধাযোগ্য সম্মান ও প্রজ্ঞা অক্ষর রেখেও বলতে ইচ্ছা হয় যে, এই জাতীয় লেখাকে ইতিহাস বলে গ্রহণ করা যায় না।

ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ দাস
৪১/বি, তালতলা লাইব্রেরী রো,
কলকাতা-১৪

আপনার ১লা জুলাই তারিখের সাপ্তাহিক সংখ্যার 'পাঠকমত' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীমত সত্যীশ দে মহাশয়ের লেখাটি পড়লাম।

লেখাটি পড়বার পর এর প্রতি 'সবার অলঙ্কার' লেখক শ্রীমত ভূপেন্দ্র রক্ষিতরায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি বা বললেন তার মর্ম এই : সত্যীশবাবু একটু ভুল করেছেন। 'রডা-বড়বন্দ' সম্পর্কিত কেহ আর ইহজগতে নেই' মানে এ নয় যে, রডা-বড়বন্দের কার্যটি সম্পন্ন হবার পর সংগৃহীত জিনিসপত্র খারী নাড়াচাড়া করেছেন, নানা স্থানে সরবরাহ করেছেন বা গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছেন, অথবা ঐ জিনিস নিয়ে বিপ্লবকর্মে লিপ্ত হয়েছেন তাঁদেরও কেউ নেই। 'বড়বন্দ' বলতে

গোপন-বেচকে বসে কড়বন্দ-পরিচালনাটির আলোচনা ও গ্রহণ এবং উহাকে কার্যকরী করার জন্য 'ডাইরেক্ট' স্যাকশান' সমাপন। এখানে যে 'রডা-বড়বন্দ', তার নামক তথ্য কর্মীদের মধ্যে এক হরিদাস দত্ত মহাশয় ব্যতীত অন্য কেহ আজ জীবিত নেই।...

আশা করি সত্যীশবাবু এবার আর ভূপেন্দ্র-বাবুকে ভুল বুঝবেন না।

সত্যীশবাবুর লেখাটি পড়ে ভূপেন্দ্রবাবু তাঁর দেওয়া দৃষ্টি তথ্যে তাঁর উদ্দেশ্যে আমার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। প্রথমটি হল—পঞ্চাশ হাজার কার্তুজ নয়, পঞ্চাশ হাজার রাউন্ড কার্তুজ ছিল 'রডা' থেকে লুণ্ঠিত মালের মধ্যে। দ্বিতীয়টি হল, শ্রীশ পাল মহাশয় কৃত অপরাধ একটি স্যাকশান—ঐ আগরপাড়ার স্পাই-হাটা।

আমি প্রাচীন বিপ্লবীদের অন্যতম শ্রীমত সত্যীশবাবুকে আমার প্রজ্ঞা জানাচ্ছি। আমাদের মত আধুনিক ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁদের আদর্শবোধ ও নীতি জন্মলাভ করুক এ আশীর্বাদ তাঁদের মধ্যে বারী জীবিত আছেন তাঁরা যেন নানা লেখার মাধ্যমে করে যান।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ বোস
১২/এ, এলেনবি রোড
কলকাতা-১৭

গত ৮ জুলাই-এর শিশিরকুমার বীষাঙ্গী মহাশয়ের 'পাঠকমত বিভাগে' লিখিত চিঠি-খামি পড়িয়া ভাইর বক্তব্যের বিপক্ষে কিছু লিখিতোঁছি।

প্রথমত তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারত-দর্শন ও বঙ্গদর্শন সংক্ষিপ্ত করিতে, কারণ উপরি-উক্ত বিভাগে যে সব আলোচনা দেওয়া হয় তাহা দৈনিক পত্রিকাদুলিতে পরিবেশন করা হয়। দৈনিক পত্রিকাতে পরিবেশন করা হয় না। কিন্তু সাম্প্রতিক বঙ্গভূমি যে দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আলোচনা করে তাহা একটু ভিন্ন জাতের। এইসব আলোচনা যে-কোন পাঠকের রাজনৈতিক বিচারশক্তি দৃঢ় করিতে সাহায্য করে। সেইহেতু আমার মতে ভারতদর্শন ও বঙ্গদর্শন বিভাগ-দ্বয়কে সংক্ষিপ্ত করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। দ্বিতীয়ত তিনি লিখিয়াছেন 'রঙ্গ-জগৎ বিভাগ'টিকে আরও বর্ধিত করিতে। কিন্তু আমার মনে হয় এই বিভাগটিকে আর বর্ধিত করা উচিত হইবে না। কারণ এই 'রঙ্গজগৎ' লইয়া বহু সাম্প্রতিক, মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা রহিয়াছে, সুতরাং রঙ্গ-জগৎকে এখানে বর্ধিত করিয়া সাম্প্রতিক বঙ্গভূমির বোঝা বাড়িয়া জাত কি? তৃতীয়ত তিনি লিখিয়াছেন—'সাম্প্রতিক বঙ্গভূমি' আরও বাংলার খ্যাতিনামা সাহিত্যিক-দের রচনা সম্বন্ধে প্রায় সজ্ঞানা হয়ে পড়ি।' খ্যাতিনামা বলিতে তিনি কি বুঝাইয়াছেন বলিতে পারি না। কিন্তু সাম্প্রতিক

সাপ্তাহিক বসুমতী

হরপ্রসাদ মিত্র, মহাকব্য: ভট্টাচার্য, সুশীল
স্বামী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ইত্যাদির রচনা নিম্নমিত
পরিবেশিত হইতেছে।

ইহা ছাড়া যদি খ্যাতনামা সাহিত্যিকের
রচনা দ্বারা সাপ্তাহিকটি জড়িয়া থাকে তবে
নবাগত তরুণ লেখকদের স্থান কোথায়?
পরিণামে এই দু'দিনের বাজারে আমরা যে
এতো স্বল্প মূল্যে এরূপ একটি স্মরণস্পর্শ
মূল্যবান রচনাসম্ভারসহ সাপ্তাহিক পাইতেছি
তাহার জন্য সম্পাদিকা মহাশয়কে আমার
অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি।

শ্রীসুদাক্ত শীল

১৫/২, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড
কলকাতা-১১

বেশ কিছুকাল ধরে আমি 'সাপ্তাহিক
বসুমতী' পড়ে আসছি। বিচিত্রা বসুমতীর
বহু অজানা পথ-প্রান্তরও আমার অজ্ঞাত
বহুখ্যাত-জনজীবনের পরিচয় পেয়েছি
'পাঠকমন'-এর ভেতর দিয়ে।

কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করছি যে
'সাপ্তাহিক বসুমতী' বাংলার জনজীবনের
অলিগলি পথ ছ'য়ে ছ'য়ে এবং তার আশা-
জাকান্ধার দাবি মিটিয়ে জনসংযোগ রক্ষা
করে আসছে। তার প্রমাণস্বরূপ দেখতে
পাচ্ছি যে বহু পাঠক যে যে বিষয়ের উপর
অনুযোগ ও আশঙ্ক্য করে তার উন্নতি ও
ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলেন
'সাপ্তাহিক বসুমতী' তার সঠিক মূল্যায়ন
করেছেন। যেমন—'রংগজগৎ' বিভাগের পাতা
বাড়ানো এবং এই বিভাগে বহু তত্ত্বের সংযোগ;
ধারাবাহিক উপন্যাসের সময়কাল সংকুচিত;
শিল্পীর জীবনচরিত, গ্রামবাসীর কথা
পাঠকমনের এরূপ অভাবপূরণের ব্যবস্থা
কেনে বড়ই ভাল লাগছে। এটা বড়ই আনন্দের
বিষয় যে বাংলার পাঠকমন পত্র-পত্রিকার মধ্যে
খুঁজে পেয়েছে তার মর্যাদা। বাংলা দেশের
অন্যান্য পত্র-পত্রিকার কথা জানি না এবং
সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রচারসংখ্যাও জানি
না, কবে ক্ষয় দিয়ে অনুভব করা মিথ্যা হবে
না যে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' বেরূপ গণ-
মানসের দর্শনস্বরূপ হয়ে উঠেছে বাংলার অন্য
কোন সাপ্তাহিক সাহিত্য ও সংবাদপত্র অভ্যন্তর
এগুতে পারে নি। তাই পত্রিকাটি যাতে
জারও সর্বাপসম্পন্ন হয়ে ওঠে, বহু নতুন
নতুন বিষয়ের সমাবেশ হয় তার জন্য আপনাকে
অনুরোধ করছি। পাঠকমনের আশা-
জাকান্ধা, আনন্দ ও পত্রিকা-উন্নতির জন্য
নিরপেক্ষ আলোচনা যদি 'পাঠকমন'-এর
উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমি আমার
আনন্দ ও সামান্য অভিযোগের কথা একটু
কলতে চাই। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র বর্তমান
সংস্করণটি এত গ্রন্থাগারী যে একটি সংখ্যা

সপ্তাহ পর্বন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে
থাকতে হয়। তার কারণ নতুন নতুন বিষয়ের
উপর পত্রিকাটির আলোকপাত; যে সব বিষয়-
গুলি এর আগে প্রকাশিত হত না। যেমন—
প্রকৃতই বিষয়, চন্দ্রলোকে অভিযানের বিষয়
সম্বন্ধে আলোচনা। সবচেয়ে সুখের বিষয়
যে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' স্বাধীনতা আন্দোলনে
বিশ্ববের চমকপ্রদ কাহিনী ও শহীদদের দুর্জয়
ও দুর্বার পথে যাওয়ার জন্য কষ্ট ও ত্যাগ
স্বীকারের ইতিহাস প্রকাশ করে রান্না তথা
ভারতের বিশ্বব ইতিহাসের অতীত জীবনের
পর্দা সরিয়ে কঠোর কৃষ্ণসামান্যতার ভারত-
সেবীদের উজ্জ্বল মুখের সামনে আমাদের দাঁড়
করিয়ে দিয়েছেন। ভূপেন্দ্রকিশোর রায়চন্দ্র-
রায়ের 'সবার অলঙ্কার' পড়ে জীবনের শত্রুকে
নতুন করে জানতে পারলাম। আভ্যন্তরীণ দিনে
নানা সমস্যাজড়িত ও বহু রোম্যান্সের স্রোতে
ভাসমান বৃক্ক-বৃক্কীদের পিছনের ইতিহাস
অলঙ্কার পড়ে থাকছে। বিশলবী বীরদের
পরিচয় উজ্জ্বল জীবনস্মৃতি আধারের মধ্যে
আলোর পথ দেখাবে, আমাদের আত্মীয় চেতনার
যা দিয়ে জাগাবে বেশপ্রেরণা। এরূপ প্রবন্ধ
প্রকাশ করে এই পত্রিকাটি ভাব্যত্ব বাঙালীর
যে উপকার করেছে তার তুলনা হয় না।

হরপ্রসাদ মিত্রের মহাযান প্রবন্ধ
'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' আমাদের মত
সাধারণ পাঠককে মুগ্ধ করেছে। এই প্রবন্ধের
পাতার সংখ্যা বাড়ান উচিত তবে গ্রাম-
বাসীর কথা' ব্যাপক পরিসর এই পত্রিকার
থেকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। একই গ্রাম
নির্ভর দু' সংখ্যা পর্বন্ত লেখা হয়। এর ফলে
অন্যান্য নিম্নমিত প্রবন্ধের স্থান সংকুলান ও
নতুন কোন রচনার প্রকাশ ব্যাহত হয়।
বিদেশী চিত্র-শিল্পীদের জীবন নিয়ে যেমন
প্রবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছে তেমনি আমাদের
দেশের প্রখ্যাত চিত্র-শিল্পীদের জীবনী প্রকাশ
করলে পাঠকমন সত্যিই খুঁদা হয়।

সনৎকুমার নাথ

পোঃ + গ্রাম—সমগ্রগড়
জেলা—বর্ধমান

গত ৬ই জুলাই রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে
'বসুমতী'তে 'গ্রাম বাংলার কথা' বিভাগে
শ্রীমতী পারুল ভট্টাচার্য সোমডাঙ্গাঘড়ে—
নাট্যগড় দীঘড়ে এই 'শীর্ষ' নাম দিয়ে সোমডা
ও সুখাড়িয়া সম্বন্ধে লিখেছেন। এ সম্বন্ধে
আমার কিছু বক্তব্য আছে।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য তার রচনার একেবারে
প্রথমেই 'দেবগণের মর্ত্য আগমন' নামক
বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতার নাম দুর্গাচরণ মিত্র
বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার নাম
দুর্গাচরণ রায় (চক্রবর্তী)। সরকার হতে
তিনি 'রায়বাহাদুর' উপাধি পান।

প্রবন্ধের একস্থানে তিনি লিখেছেন—

সোমডাঙ্গা। দুর্গাচরণ উচ্চ বিদ্যালয়েরই পরি-
চালনার সকালের দিকে একটি প্রভাতী
বন্দোবস্ত আছে।" কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক
তা নয়। দুর্গাচরণ বিদ্যালয় গৃহেই সকালে
অষ্টম শ্রেণী পর্বন্ত মেয়েরা পড়াশুনা করে।
দুর্গাচরণ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি সম্পূর্ণ
আলাদা। অবশ্য নবম শ্রেণী থেকে দুর্গাচরণ
বিদ্যালয়েই সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।
প্রবন্ধে এ কথা উল্লেখ থাকা উচিত ছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিক্রেত শ্রীমতী
ভট্টাচার্যের বিবরণও অসম্পূর্ণ। সোমডা-
বাজার স্টেশনের ঠিক নিচে অবস্থিত 'শীর্ষ'
চরায়াল রকসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'যাযাবর'
সম্মিলনী লাইব্রেরীর (রেজিস্টার্ড) কথা
শ্রীমতী ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন নি। এই
পাঠাগার শ্রীমতী নটক-নট্যালই নয়, বিদ্যালয়-
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রপাঠ্য বহু মূল্যবান
পুস্তকের জোগান দিয়ে এই অঞ্চলের যশে
যশে সুনাম অর্জন করেছে।

স্থানীয় মিত্র সংঘ, অগ্রণী সংঘ প্রতিষ্ঠা
করে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরে
এতদগুলোর জনসাধারণের সংস্কৃতি চর্চায়
সহায়তা করে আসছে। প্রবন্ধের 'শীর্ষ' নামে
উল্লেখ থাকলেও শ্রীমতী ভট্টাচার্য যখন
নাট্যগড়-দীঘড়ে গ্রামের কোন কথা লেখেন নি,
তখন আমরাও গ্রন্থালের কথা নতুন করে
তুলতে চাই না।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য লিখেছেন—'বিশেষ
কোন শিক্ষণ বসতে কিছু নেই সোমডাঙ্গায়।'
এর দ্বারা বোঝা যায় তিনি নিতান্ত অবহেলা
ভরেই 'গ্রাম বাংলার কথা' লিখেছেন। কারণ
সোমডা স্টেশনের নিকটে এবং আশপাশে
হস্তচালিত তাঁতিশিল্পে নিষ্পত্তি আছেন বেশ
কিছু সংখ্যক ব্যক্তি। শ্রীমতী তাই নয় সোমডাঙ্গার
সিফট শিল্প—বিশেষ করে কাঁচাগোলায়
খ্যাত কাটোরা লাইনের সীমা পার হয়ে বহু-
দূর বিস্তৃত হয়েছে। এই শিল্পের দ্বারা বেশ
কিছু লোক জীবিকা অর্জন করে। একথা
শ্রীমতী ভট্টাচার্যের মোটেই অজানা নয়। তবে
তার রচনায় এর উল্লেখ নেই কেন বলা
নয়।

সোমডা-সুখাড়িয়া প্রসঙ্গে মহিলা কবি
নরেন্দ্রবালা সরস্বতীর নাম উল্লেখ করেছেন;
কিন্তু 'ভূজেন্দ্রনাথ কিশোর মহাশয়ের নাম
উল্লেখ করেন নি—যদি অনেকগুলি ঐতিহাসিক
ও সামাজিক সার্থক নাটকের কাগজ এখনও
খুঁজে পাওয়া যায়।

সোমডাঙ্গার বৈদ্যবলের আলোচনা প্রসঙ্গে
শ্রীমতী ভট্টাচার্য রামচন্দ্র সেনের কথা বলে-
ছেন। সেইসঙ্গে তদীয় পত্নী বীরগঙ্গা
বিখ্যাত চারদিকের বিক্রেত কিছু উল্লেখ করাও
উচিত ছিল।

—শ্রীযামাপণ কলকাতা

লিঙ্ক, বিন্দুপুর উচ্চতর বিদ্যালয়

লীগ ফুটবল

ময়দানের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে ১৯৬৫ সালের ফুটবল লীগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম ডিভিশন লীগে এত পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থাকতে পারে নি বহুদিন কোন ক্লাব, তাও আবার প্রায় লীগ খেলার শেষ অবধি। লীগের দৌড়ে মোহনবাগান অপরূপ করেছে এখনও পর্যন্ত মাত্র একটি পয়েন্ট; মোহনবাগানের কাছ থেকে একটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে জর্জ টেলগ্রাফদল। লীগে মোহনবাগানের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এখনও পর্যন্ত নষ্ট করেছে পাঁচটি ম্যাচবান পয়েন্ট এবং অংশগ্রহণ করেছে মোহনবাগানের চেয়ে কম খেলার। মোহনবাগানকে অবশ্য বর্তমানে লীগের দৌড়ে অনুসরণ করেছে ইস্টার্ন রেলদল, কিন্তু পরাজয় এবং ভুলের ফলে তারা হারিয়েছে নয় পয়েন্ট। গত বছরের রোভার্স বিজয়ী ময়দানের অন্যতম শক্তিশালী দল বি এন রেলদল চোম্প পয়েন্ট নষ্ট করে বেন কিম্বেরে পড়েছে।

মোহনবাগান তাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে, দুটি গুরুত্বপূর্ণ খেলার জয়ী হয়ে। কারণ শক্তির দিক থেকে ইস্টার্ন রেল এবং এরিয়ান্স কোন অংশে অবহেলার পাত্র নয়। মোহনবাগানের লীগের পক্ষে এই দুটি টিম বহুকালই বাধা স্বরূপ, প্রতিবারই দু-এক পয়েন্ট এরা ছিনিয়ে নেয়ই। কিন্তু মোহনবাগানের দুর্ভাগ্য মনোবল, উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের সামনে কোন বাধাই টিকতে পারছে না। তাই ইস্টার্ন রেলদল ২-০ গোলের ব্যবধানে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে মোহনবাগানের দুর্বীর গতিবেগের সম্মুখে। এই খেলার একাই দুটি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেন অশোক চ্যাটার্জী। পরবর্তী খেলার এরিয়ান্সের পরাজয় মোহনবাগানের কাছে ০-০ গোলে। মোহনবাগানের অনামাস সাকল্যের সঙ্গে হ্যাট্রিক করেন চণ্ডী গোস্বামী। মোহনবাগান এ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছে মোট ১৯টি খেলার, অবশ্য রাজস্থানের সঙ্গে খেলার দিন রাজস্থানের অনুপস্থিতিতে মোহনবাগান পয়েন্ট পাবে কিনা তা জানা বাবে আই-এফ-এর সাব-কমিটির সভার পর। রাজস্থান মোহনবাগানের সঙ্গে ফিরতি খেলাটি অন্য কোন নিরপেক্ষ মাঠে খেলার জন্য আই-এফ-এর কাছে আবেদন জানায়। কিন্তু আই-এফ-এর সে আবেদন নামঞ্জুর করে, মোহনবাগানের মাঠে রাজস্থানকে খেলার জন্য নির্দেশ দিয়ে চিঠি দেয়। সে চিঠি রাজস্থান ক্লাবের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয় না এবং সোদান রাজস্থান মাঠে অনুপস্থিত থাকে। মোহনবাগান এবং এরিয়ান্সের খেলা অবশ্য এরিয়ান্সের মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়।

ইস্টবেঙ্গল দল বর্তমানে আশানুরূপ খেলাতে পারছে না। হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল কোনক্রমে ১-০ গোলে জয়ী হয়ে তাড়াতাড়ি ফেরে। খেলার প্রায় শেষ



বার্নে অনুষ্ঠিত একটি অল্টার্নেটিভ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাঁচ হাজার দিগার দৌড় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ফ্রান্সের মাইকেল জ্যাঁজি।

গোল করেন। হাওড়া ইউনিয়ন এদিন সত্যি প্রশংসনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। কিন্তু বাই হোক এত ভাল খেলেও শেষ পর্যন্ত তাদের প্রাপ্য পুরস্কার এক পয়েন্ট আর ভাগ্যে জুটল না।

ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং দলের খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় মহামেডান

ক্রীড়াবিভাগ

স্পোর্টিং মাঠে। বহুদিন পর মহামেডান মাঠে এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা অনুষ্ঠিত হল। ইস্টবেঙ্গলও প্রায় বেশ কয়েক বছর বাদে এই মাঠে অবতীর্ণ হল। ম্যাচের বে অবস্থা, তাতে সন্তত এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খেলা এখানে অনুষ্ঠিত না করাই ভাল।

মহামেডান স্পোর্টিং দলের দুর্ভাগ্য তারা

খেলা শুরু হবার সাত মিনিট পরই মহামেডানের পক্ষে গোল করে বসেন সালিমউদ্দিন। এইদিন ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে গোলে খেলাতে নামেন পার্ভিজন জাতীর দলের গোলরক্ষক বলাই দে। কিন্তু আশ্চর্য, মাত্র ছ মিনিট পরই তাঁকে সরিয়ে এনে খগেনাককে পটায়ন হয়। খগেনাক নামের সঙ্গে সংগতি কোনটি হয়। ইস্টবেঙ্গলের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত, খেলা শেষ হতে ঠিক দু মিনিট মাত্র বাকী। চকিতের মধ্যে একটি সাধারণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সূযোগের সদ্ব্যবহার করলেন পার্ভিজন দে একটি সুন্দর গোল করে। চতুর্থ খেলার ইস্টবেঙ্গলদল বালী প্রতিভার বিপক্ষে ১-১ গোলে বিজয়ী হয়েছে বটে, কিন্তু প্রথমে গোল করে বসে বালী প্রতিভাদল। ইস্টবেঙ্গলদলের খেলা দেখে মনে হচ্ছে যে তাদের রক্ষণভাগের কোথায় যেন দুর্বলতা বর্তমান;

সাপ্তাহিক বসুদমতী

মহাশয়জন পেরিয়ার বর্তমানে লীগের তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। তারা মোট ১৭টি খেলায় অংশগ্রহণ করে সংগ্রহ করেছে ২৬ পয়েন্ট। বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে থেকে ইস্টন রেলদলও বীর বিক্রমে এগিয়ে চলেছে। তারা বি এন রেলদলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে সতাই দুটি মূল্যবান পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। বি এন রেলদল এবার সতাই কলকাতার ফুটবল রিসকদের হতাশ করেছে। বেশ কয়েকটি পরাজয়ের ভারে তারা লীগের অনেক নীচের ধাপে নেমে গিয়েছে, তাদের খেলা দেখে মনে হচ্ছে যেন তারা সতাই রণ-ক্লান্ত সৈনিক।

লীডস টেস্ট

এবার কিউইসের ইংলন্ড সফর মোটেই মনোরম হয় নি। পর পর তিনটি টেস্টেই জন রীডার দলের ভাগ্যে জুড়েছে পরাজয়ের আশ্বাদ; আর পরাজয় নয় একেবারে শোচনীয় পরাজয়। প্রথম টেস্টে তারা পরাজিত হয় নয় উইকেটে, দ্বিতীয় টেস্টে সাত উইকেটে আর লীডসের তৃতীয় টেস্টে একেবারে এক ইনিংস ১৮৭ রানের ব্যবধানে।



ইংলন্ড প্রথমে ব্যাট করতে নামে এবং ৪ উইকেটে ৫৪৬ রানের বিরাট রান-সংখ্যা সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই টেস্টের হীরা হলেন ইংলন্ডের ব্যাটসম্যান জন এডরিচ। ট্রিপল সেঞ্চুরী করে তিনি ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় দিকপাল খেলোয়াড়দের পাশে নিজের স্থান করে নিলেন। ইংলন্ডের খেলোয়াড় হিসেবে টেস্টের আসরে ট্রিপল সেঞ্চুরী ইতিপূর্বে করেছেন লেন, এডরিচ হলেন এঁদের সঙ্গে চতুর্থ ব্যাটসম্যান। তিনশত রান সংগ্রহ করতে এডরিচের সময় লাগে ৫২৬ মিনিট। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ওভালের মাঠে ১৯০৮ সালে ৩৬৪ রান সংগ্রহ করার পর ইংলন্ডের ব্যাটসম্যান হিসাবে টেস্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ করলেন এডরিচ লীডসের মাঠে ৩১০ রানে অপরাজিত থেকে। টেস্টের আসরে বাউন্ডারীর সংখ্যায় তিনি সকলকে অতিক্রম করে বিশ্ব-ক্রিকেটের আসরে প্রথম স্থান দখল করলেন। তাঁর অপরাজিত ৩১০ রানে ছিল পাঁচটি ওভার বাউন্ডারী এবং ৫২টি বাউন্ডারী। এই টেস্টে এডরিচের পরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন কেন ব্যারিংটন ১৬০ রান সংগ্রহ করে।

নিউজিল্যান্ড দল প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১০ রান সংগ্রহ করে। লর্ডার ৬৬ রানে ৪ উইকেট এবং ইলিংওয়ার্স ৪২ রানে ৪টি। ফলো অনের সম্মুখীন হয়ে নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে, কিন্তু ১৬৬ রানেই তাদের ইনিংস শেষ হয়। অবশ্য এই ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটাল ইংলন্ডের স্পিন খেলার ফ্রেড টিটমাস। তাঁর মারাত্মক বোলিংয়ের সম্মুখেই সকলেই ব্যর্থতার পরিচয় দেন; একমাত্র পোলার্ড এবং ডাউলিং কিছুটা সাফল্য লাভ করেন। টিটমাস মাত্র ১৬ রানে সংগ্রহ করেন ৫টি উইকেট। টিটমাস অবশ্য মেজাজী বোলার, তাঁর বলের কাজ হতে শুরু করলে এবং কিছুটা উইকেটের সাহায্য পেলেই তিনি হয়ে ওঠেন মারাত্মক। বাই হোক নিউজিল্যান্ড দলের ব্যাটসম্যানদের শোচনীয় ব্যর্থতার ফলেই তাদের ভাগ্য শেষ পর্যন্ত জেটে এক ইনিংস ১৮৭ রানের পরাজয়।

আই-এফ-এ প্রসঙ্গে

একটি সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবেশিত সংবাদে ক্রীড়ামোদীমহলে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হল। সংবাদটি ছিল আমাদের কলকাতা ময়দানের ফুটবল পরিচালক সংস্থা আই-এফ-এর সম্বন্ধে। আই-এফ-এর তহবিলের একটা মোটা অঙ্কের অর্থ তহরুপের একটি জঘন্য কীর্তি ধরা পড়ে এবং আদালতের মামলায় আই-এফ-এর হিসাবরক্ষকের জেল হয়। দোষী বিচারে



ইস্টবেঙ্গল-বালী প্রতিদ্বন্দ্বি খেলার মাটিতে অসহায় গোলরক্ষক; বলটি গোলে প্রবেশ করছে।

ঘটনা কলংকিত করেছে খেলার জগৎকে। এই ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য এক সম্মানিত সর্বভারতীয় ক্রীড়া সংস্থার সভার গৃহীত হয়। সর্বভারতীয় ক্রীড়া সংস্থার এই সম্মানিত সরকারীভাবে প্রচারিত হবার পূর্বে ওই সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা খবরটি পরিবেশিত হওয়ার বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। পরিবেশিত এই সংবাদে আই-এফ-এর কর্তব্যাব্তিরা বেশ বিস্ময় এবং বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে জানা গেল সংবাদটি সত্য, কারণ আই-এফ-এর ওই তহবিল তহরুপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য সর্বভারতীয় সংস্থা নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলকে। সর্বভারতীয় সংস্থার

সাপ্তাহিক বঙ্গবতী



শন এভারিস্ট

গোড়ায় বহিঃগলদ থাকে তবে আমাদের কলকাতা ময়দানের খেলার সবাংগীণ উন্নতির পথ যে সুস্থ।

সমাচার দর্শন
হাটগেড অনুষ্ঠিত সুইডিশ টেনিস

চ্যাম্পিয়ানশীপের কাইন্যালে উইমবলডেনে নিম্নরী রু এসার্সন পরাজিত হয়েছেন স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানার কাছে। এসার্সনকে সান্তানার স্টেটে পরাজিত করেন। পারি-বারিক কারণে সান্তানার পক্ষে এবার উইমবলডেনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

বাংলার ব্যাডনামা মহিলা এ্যাথলেট মৌরিন হোন্ডারকে সিটি টেনেটে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বিদায় জানান হয়। বিগত কয়েক বছর বাংলার এ্যাথলেটিকস জগতের একমাত্র সন্তানী মৌরিন কয়েকদিনের মধ্যে ভারত ত্যাগ করবেন, তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে স্থায়ীভাবে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে বসবাস করবেন।

ইংল্যান্ড এবং সারের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার বিল হিচ ৭৯ বছর বয়সে লন্ডনে পরলোক-গমন করেন। ১৯১১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি অস্ট্রেলিয়া এবং সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রায় সাতটি টেস্ট খেলার অংশগ্রহণ করেন।

একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ২৮৯ ফিট ২ ইঞ্চি দূরে জ্যাভলীন নিক্ষেপ করেছেন ফিনল্যান্ডের জোরমা হিমমুনেন। জোরমার নিক্ষেপ দূরত্বই এবার জ্যাভলীনে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলাফল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজদলকে ভারত সফরে আনার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হল। ক্রিকেট



যানের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে জাপান দিচ্ছেন জার্মানীর বয়োর।

কন্ট্রোল বোর্ডের তৈরি পরিবর্তিত নতুন সফরসূচী শিক্ষাদপ্তর অর্থদপ্তরের কাছে প্রেরণ করে, কিন্তু অর্থদপ্তর তাও নাকচ করে দেয়। নতুন সফরসূচী অনুযায়ী ১৪০০০ পাউন্ডের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ছিল।

সেই চঞ্চল মেয়েটি

আজ থেকে পনেরো বছর আগেকার কথা, আমাদের চলে যেতে হবে সমুদ্রের পেরিয়ে সমুদ্র অস্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েলসের সেই ছোট গ্রাম আলবেরীতে। সেই গ্রামের এক ভদ্রলোক একদিন দেখলেন আট বছরের একটি চঞ্চল মেয়ে স্কুল থেকে ফিরছে কাঠের খাট দিয়ে একটা টেনিস বল পেটাতে পেটাতে। পর পর কদিন ওই একই দৃশ্য দেখে ভদ্রলোক একদিন একটা ছোট টেনিস রাকেট কিনে আনলেন, স্কুল থেকে ফেরার সময় মেয়েটিকে ডেকে উপহার দিলেন সেই রাকেটটি। সত্যিকারের টেনিস রাকেটটি পেয়ে মেয়েটির মন হল যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি তার হাতে এসেছে।

সেই নতুন পাওয়া রাকেট আর টেনিস বলটা হয়ে উঠল তার ধ্যানজ্ঞান, আর সকল সময়ের সাথী। গ্রামের ছোটদের টেনিস ক্লাবে এরপর তাকে সেই রাকেট হাতে নিয়মিত যোগ দিতে দেখা গেল। সেই ক্লাবের কোচ ওয়ালী রাটার ইঠাৎ একদিন মেয়েটির খেলা দেখে চমকিত হলেন, তার দুটি চোখ অজানা আনন্দের উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মনে হল সত্যি বেন কোন অমূল্য রত্ন তিনি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞ সঞ্চানী দুটি বলল যে এ মেয়ে টেনিস রাকেট হাতে নিয়েছে শুধু খেলায় জন্য নয়, বিশ্বজয়ের জন্য। কারণ এত কম বয়সে যে মেয়ে ওইভাবে প্রায় ছেলের মত অত জোরে স্ট্রোক করতে পারে

সে তো সাধারণ মেয়ে নয়।

সত্যি সে সাধারণ মেয়ে নয়—কারণ সে যে মার্গারেট স্মিথ। এরপর রাটার যত্নের সঙ্গে মনপ্রাণ ঢেলে টেনিসের নিপুণ কলা-বিদ্যা শেখাতে লাগলেন মার্গারেটকে। মার্গারেটের এই টেনিস-প্রীতি প্রথমে বাড়ির লোকেরা খুব ভাল চোখে দেখেন নি। কিন্তু মার্গারেটের অদম্য বাসনার সূত্রে, বাড়ির সেই আপত্তি ভেঙ্গে গেল। বারো বছর বয়সে প্রথম প্রতিযোগিতায় আসরে অবতীর্ণ হলেন মার্গারেট স্মিথ। এক এক করে বছর কাটিতে লাগল আর প্রস্ফুটিত হতে লাগল মার্গারেটের অপূর্ব ক্রীড়া-প্রতিভার কুঁড়িটি। মার্গারেটের কল কলন সবার হোঁচ, দেখা গেল অস্ট্রেলিয়ার

জীবনের টেনিস প্রতিযোগিতার কোনটিই শেষ করতে তার আর বাকী নেই। এর পরেই তেঁরা পেল অস্ট্রেলিয়ার টেনিস-জগতে সম্রাজ্ঞীর আসনটি সেই আলবেরীর মেয়ে মার্গারেট স্মিথের দখলে।

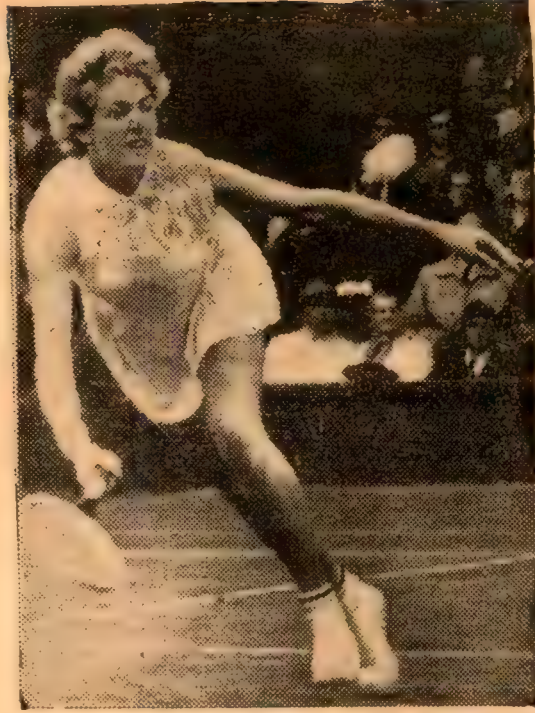
এতদিনে টনক নড়ল অস্ট্রেলিয়ার টেনিস-জগতের ওপরমহলের লোকেদের। হাজার হোক গ্রামের মেয়ে তো, তাই ইচ্ছে করেই তাঁর দিকে এঁরা দৃষ্টি দেন নি, কিন্তু এই বয়সেই যিনি সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার জুনিয়র গ্রাফগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বসে আছেন তাঁকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই।

মেলবোর্ন থেকে ডাক এল মার্গারেট স্মিথের; আর সবচেয়ে বড় কথা যে অতীতের দিকপাল খেলোয়াড় ফ্রাংক সের্জম্যান নিজেকে মার্গারেটকে শিক্ষা দিতে রাজী হয়েছেন। আলবেরীর মায়া কাটিয়ে মার্গারেট চলে এলেন মেলবোর্নে। গ্রামের মেয়ে একবারে পাকা মেলবোর্নের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে মার্গারেটের অবশ্য খুব বেশি সময় লাগল না।

সেজম্যানের নির্দেশিত কঠিন অনুশীলনের দ্বারা ছকে অগ্রসর হতে লাগলেন মার্গারেট। তাঁর অনুশীলনের আশা ছিল নিরমিত টেনিস চর্চা; জিমনার্স্টিক আর দৌড়। সেজম্যানের কড়া নজর এড়িয়ে এতটুকু এদিক-ওদিক করার জো নেই। দৌড় ছিল মার্গারেটের আর একটি প্রিয় খেলা। যেভাবে তিনি টেনিস সাধনা করে গিয়েছেন, দৌড়কে ঠিক সেই-ভাবে গ্রহণ করলে আমরা হইত অলিম্পিক আসরের ভিত্তি স্ট্যান্ডে মার্গারেট স্মিথকে দেখতে পেতাম। মাঝে একসময় দৌড় তাঁকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল টেনিসের অগ্নি থেকে। কিন্তু ছোটবেলা থেকে দেশ ভ্রমণের অদমা বাসনা তাঁকে বাধা দিল; অন্তর থেকে কে যেন তাঁকে বলল—মার্গারেট টেনিসের অঞ্চল দৃঢ় করে ধরে থাক, কারণ তুমি এসেছ বিশ্বজয় করতে, আর সে কাজ এখনও অসম্পন্ন।

মার্গারেট স্মিথ ছিলেন যেমন মিশুক আর তেমনি আত্মবিশ্বাসী। মেলবোর্নে তাঁর থাকার ব্যবস্থাও ছিল বন্দুদের সঙ্গে। অবসর সময়টা তাদেরই সঙ্গে ছেঁ-হুয়েয়াড় করে কাটিয়ে দিতেন; আর তাই প্রবাসে একাকী থেকেও আলবেরীর মাঠঘাট আর বাড়ির দুর্বার হাতছানিকে এড়াতে পেরেছিলেন।

সেজম্যানের কাছে মার্গারেটের পূর্ণ বিকাশ হল, তিনি তাঁর ক্রীড়া-প্রতিভাকে ছাড়িয়ে দিলেন বিশ্ব টেনিসের দরবারে। ১৯৬২ সালের উইমবলডেনের বাছাই তালিকার



উইমবলডেন ফাইনালে ক্রীড়ার মার্গারেট স্মিথ

শীর্ষে স্থান পেলেন উনিশ বছরের অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে মার্গারেট স্মিথ। কিন্তু সে বছর দুর্ভাগ্যের কালোছায়া তাঁকে তাঁর জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভে বাধিত করল। ১৯৬২ সালে বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালেই অস্ট্রেলিয়ার টেনিসের ওপরমহলের বিরাগ-ভাজন হলেন মার্গারেট। অস্ট্রেলিয়ার মহিলা-দলের ম্যানেজার নেল হপম্যানের সঙ্গে বনিবনা হতে না বলে সরকারী দলের সঙ্গে যেতে তিনি আপত্তি জানালেন। মার্গারেটের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বোনা সুদূর হয়ে গেল, প্রাপণ চেষ্টা চলতে লাগল যাতে উইমবলডেনের আগেই তাঁকে কাবু করে দেওয়া যায়। একাকী মার্গারেট অনেক করে শক্তি সঞ্চয় করে মনকে দৃঢ় করে বিদেশ যাত্রা করলেন। কিন্তু মাত্র উনিশ বছরের মেয়ে মাথায় একরাশ চিন্তার বোকা, আশা-নিরাশার স্বপ্নে মনের মধ্যে ঝড় বইছে, উইমবলডেনের আগে তাঁর মানসিক অবস্থা হল বিপর্যস্ত। সেই মরশুমে সাত মাসের অপরাধিতা মার্গারেটের স্বপ্ন ভেঙে চূরমার হল উইমবলডেনের প্রথম রাউন্ডেই পরাজিতা হলেন আমেরিকার বিল জিন মফটের কাছে।

পরের তিনটি বছর জয়-পরাজয় দু'জনকেই মার্গারেট সমানভাবে হাসিমুখে বরণ

করেছেন। ১৯৬৩ সালে প্রথম উইমবলডেনে বিজয়িনীর সম্মান লাভ করলেন তিনি। কিন্তু ১৯৬৪ সালের ফাইনালে পরাজিত হলে রৌজলের মারিয়া বুনোর কাছে। ১৯৬৫ সালের উইমবলডেনের ফাইনালে আবার সেই বুনো-মার্গারেট সাক্ষাৎ। কিন্তু এবার পূর্ণ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবেন বলে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন মার্গারেট; ফাইনালে পরাজিত করলেন মারিয়া বুনোকে। দুটি উইমবলডেন চ্যাম্পিয়ানের সিঁড়ির স্লেট এসে স্থান পেল মাত্র ২২ বছরের তরুণী মার্গারেটের সংগ্রহশালায়। খেলোয়াড়ী-জীবনের প্রায় সব স্বপ্নই সফল হয়েছে মার্গারেটের, পেয়েছেন একজন টেনিস খেলোয়াড়ের আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত বন্দুই। কিন্তু মনে হয় এখনও টেনিসকে দেবার এবং নেবার আরও বাকী আছে মার্গারেটের।

আর আজ স্মৃতির পাতা উল্টে সুদূর অস্ট্রেলিয়ার আলবেরী গ্রামের সেই সহৃদয় ভদ্রলোক হইত পিছরে গিয়েছেন। পনেরো বছর আগে; আনমনে হইত ভাবছেন স্কুল থেকে ফেরা সেই চঞ্চল মেয়েটির কথা, যার হাতে তিনি প্রথম তুলে দিয়েছিলেন সত্যিকারের টেনিস র‍্যাকেট—মার্গারেট স্মিথের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি যেখানে সঞ্চিত তাঁর প্রাপ্য একরাশ মণিমাণিক্য।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৫১৫
আজকের মানুষ		৫১৬
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৫১৭
এখন অনেক রাত্রি (কবিতা)	মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৫১৮
নিভংসে বন্দী মাতাজ (কবিতা)	মিহিরবরণ	৫১৮
নারদের ভাস্মি	গুডাধ মদুখোপাধ্যায়	৫১৯
ভারতদর্শন		৫২১
আন্তর্জাতিক		৫২৫
সাপেক্ষে সেকাল ও একাল	মনপতি সওদাগর	৫২৮
কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন	রবীন্দ্রনাথ রায়	৫৩৩
উপছায়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৫৩৩
স্বপ্নদর্শন		৫৩৫

মাতুল জীবনী

স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
মূল্য—দুই টাকা

“এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙ্গালী
পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ
করিবেন”—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী
“একাধারে ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক,
দার্শনিক ও কর্মী সচরাচর দেখা যায় না।
কাজেই তাঁহার আত্মজীবনী অত্যন্ত
স্বত্বপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।”

—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্পাদক

জ্যোৎস্নার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত

ভারতীয় সম্রাটের ইতিহাস

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ
প্রতি ভাগ—৫।

হারমোনিয়াম শিক্ষা

মূল্য—৩

মোহন মেলা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথাসিঁজীর
রস-সাহিত্য সম্ভার ছাড়াও গল্প ভরণ।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বোনির দিনে, বৃদ্ধদেবের বড়ি,
কাঁঠুরেব কপাল, হাঙর গাছের চোখের গল্প,
ভুলু ব ভুল, মুর্গা চাচা, বৃদ্ধদেবের গল্প, একটাব
বদলে দুটে, নতুন সিনেমার ছবি, দাঁতের
গল্প, ইঁদুরের কীটিকাঁহিনী, বাদরের
মেটুলিচেচড়ি।

ছড়া—ইটমালার যজ্ঞবাড়ী, হোহোহো
বুড়ি করে, পালোয়ান প্যালায়াম, উলটো
বাঁজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্রামের
ব্যায়রাম, হাবুবাঁবুর মনের কথা, আদিক
কালের বড়ি বড়ি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সুর্য রায় কর্তৃক
সুচিত্রিত।

উপহার দিবার মত বই।

হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মজুষা

২৫০

রাজনৈতিক-গগনের দীপ্ত সূর্য—পাঞ্জাবকেপরি

লালা লাজপৎ রায়ে

জীবনী

[ইংরেজিতে]

মূল্য—১০ আনা

রাজনৈতিক জীবনের ঘটনার ঘাত-
প্রতিঘাতময় মহাজীবনী।

জেলের শাস্তি—বিচার-বহুত পর্যন্ত আবুল
ইতিহাস। অসার জীবনী নচে—
লালাজীর জীবন-সাধনার—রাজনৈতিক
সংগ্রাম—দেশাত্মবোধে যদি সুপবিত্র
হইয়া বস্তু হইতে চান ত সমস্ত লাল
লাজপৎ রায়ে জীবনী পাঠে উল্লসিত
হউন—স্বদেশমঙ্গলক্ষেত্রে আত্মহত্যার জসম
আদর্শ দেখিয়া সঞ্চারিত হইবেন।



সূচীপত্র



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সাঁধারমাণিক (যাত্রাবাহিক উপন্যাস)	মহেশ্বেতা ভট্টাচার্য	৫০৯
শহর কলকাতা ...	শ্রীপদাতিক	৫৪২
স্বপ্নের আবেগ গান (গল্প)	অতুলরঞ্জন সেন	৫৪৫
শ্যামবাজারের প্রহরী (কবিতা)	সুস্মিতা মিত্র	৫৪৮
সবার অনক্ষে ...	কুপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৫৪৯
অপরূপ নেহারল—সন এঙ্গেলেস ও		
স্যান ডিয়েগো	এন. কে. গ্রীনবার্গ	৫৫০
বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত	ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরী	৫৫১
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৫৬১
চার্লি চ্যাপলিন	অশোক সেন	৫৬৮
রঙ্গমঞ্চ—ওমেগা এবং এমেগা	শিলালি	৫৬৯
রঙ্গমঞ্চ	...	৫৬৯
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	৫৭০

রক্তস্রবের বিষয়ী গুরু উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নিরুপস্থিতের আত্মকথা, উদগমশী,
সিনকিন, অমৃতানন্দের পত্র, বর্তমান
সমতা, জাতের বিভ্রম, পথের সন্ধান,
বাণীনাথ মাহু, বর্ষ ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বলিত কথাশিল্পী

অপদীপ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

১ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপভাস এবং
৩ খানি বড় লেখা—স্ববৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

বেঙ্গাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বঙ্গ
বাহুবলী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগ—খাসদখল, চোরেয়
উপর বাটপাড়ি, অরুতার প্রভৃতি
১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগ—বিবাহ বিলাট, তরুণা,
ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কার্য সমালোচনা, বিহারী-
লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার
কাব্য, সারদামঙ্গল, বঙ্গবিশ্বকোষ, ১ম
প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, মদ্য শত
বঙ্গবাহু, নিসর্গ-সন্দর্শন, মা দেবী
মুকুন্দ, শবৎকাল, দেবরাণী, উল
বিশ্রুতি, সাধের আসন, কাব্য ও
সঙ্গীত।

মূল্য ৩ টাকা

পরজন করিম: এল্যাবান সংস্কৃত ও বাংলা
রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে
অভিনব আয়োজন।

বিত্তাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর

গ্রন্থাবলী

২য় ভাগ—সীতা, বিজুপ্রিয়া,

মহামায়ার চর ও পুণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপভাস সাহিত্যের প্রদীপ ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার,
সনাতন গোষ্ঠামণি, পুজার মালা ও
রাণী ব্রজমঙ্গলী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রাট, কলিকাতা-১২



৭৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা-মূল্য ২৫ পঃ
বৃহস্পতিবার, ১০ই জুলাই, ১০৭২ বঙ্গাব্দ

Price : 25 Paise
Thursday, 29th July, 1963

ট্রাম কোম্পানির দুঃসাহস

ট্রাম কোম্পানি কর্তৃক ভাড়া বৃদ্ধির
ম্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরো পিটিয়ে
এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা এই ভাড়া বৃদ্ধিকে
ভাড়া পুনর্বিন্যাসের নাম দিয়ে কোম্পানির
স্বার্থে বন্ধ করছেন—এমন কথা বলাও যেতে
পারে। পবিত্রহনমন্ত্রী বলেছেন যে, ১৯৭১
সালে ট্রাম কোম্পানিকে জাতীয়করণের স্বার্থে,
ট্রামে প্রণয়বিভাগ তুলে দেওয়া উদ্দেশ্যে
এবং বিভিন্ন স্টেশনে ভাড়ার মধ্যে সমতা
আনয়নের জন্য রাজ্য সরকার ট্রাম কোম্পানির
সঙ্গে ভাড়া বিন্যাসের চুক্তি করছেন। মন্ত্রী-
মহোদয় ঐ প্রসঙ্গে এ কথাও জানিয়েছেন
যে, ট্রাম কোম্পানি গত সাত বছরের মধ্যে
জাতীয়করণ ভাড়াতে এক পরস্যা জমা দেয়
নি। এখন তাদের আর বৃদ্ধি হলে (বাড়তি
আর ২৫ লক্ষ টাকা হবে বলে জানা গেছে।)
সেই শূন্য ভাড়াতে টাকা জমা পড়বে। নতুন
ব্যবস্থায় যাত্রীদের সুখস্বচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কথাও
অবশ্য ঘোষণা হয়েছে।

ট্রাম কোম্পানি সত্যিই যদি বছরের পর
বছর ক্ষতি স্বীকার করে পরিবহন ব্যবস্থা
চালু রাখতে বাধ্য হয়, তাহলে যে কোনো
উপায়েই হোক ভাড়া বৃদ্ধি করা দরকার। সে
সম্পর্কে কারো শ্বিষমত থাকার কোনো কারণ
নেই। কিন্তু কোম্পানি যদি নিজেদের
মুনাফার দিকটাই বড় করে দেখে থাকে, তাহলে
এমন কোনো ব্যক্তি নেই যম্বাষা বলা যেতে
পারে যে, ভাড়া বিন্যাসের নাম দিয়ে ভাড়া
বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু কোম্পানির হিসেব
থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এদেশ থেকে স্বদেশে
মুনাফা বহন করে যাওয়াই তাদের মূলনীতি।
করণপূর্বণের নামে যে ততাল্প অংশ নির্দিষ্ট
থাকে, তার সাহায্যে পুরাতন গাড়ি মেরামত
করা সম্ভব হয় না, নতুন গাড়ি ক্রয় করাও
কঠিন এবং নতুন লাইন তৈরি করা দূরের
করণপ্রাপ্ত লাইনকে দুর্দশার

হাত থেকে রক্ষা করাও সম্ভব নয়। বর্তমান
সময়ে প্রতিদিনের ট্রামযাত্রীরা যে দুর্ভোগের
মধ্য দিয়ে ট্রামে যাতায়াত করেন তাঁরাই হাড়
হাড় টের পান—নগর ভাড়া দিয়েও তাঁরা
কিভাবে ট্রাম কোম্পানির কাছে লাঞ্ছিত হয়ে
থাকেন। ট্রামে যারা কোনোদিন চড়েন নি
বা চড়েন না, তাঁদের পক্ষে ট্রামযাত্রীদের দুর্দশা-
বর্ণনার ম্যারা বোঝানো সম্ভব নয়।

সরকারের প্রধান বক্তব্য হরতো জাতীয়-
করণের স্বার্থ। কিন্তু সেই স্বার্থকে উপলব্ধি
করে নিরীহ ট্রামযাত্রীদের কাছ থেকে পরস্যা
আমায় করার বৃদ্ধিটা কিরকম—তা আমাদের
মতো অল্পবৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে বুঝে
ওঠা মুশ্কিল। তা ছাড়া এ প্রশ্নও ওঠে যে,
কোম্পানির মুনাফা যখন কথ হয় নি, তখন
জাতীয়করণ ভাড়াতে এক পরস্যা জমা না
হওয়ার কারণটা কি। কোম্পানি যখন ভাড়া
বৃদ্ধির ব্যাপারে আসরে নামলেন, তখনই
সেই শূন্য কোষাগারের দিকে সবকোবের দৃষ্টি
পড়ল এবং উদ্যোগ পিটিয়ে বৃদ্ধির ঘাড় এই
আর্থবাক্যে বলিযান হয়ে তাঁরা যাত্রীদের
কাছ থেকে ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিশ করলেন।
মাত্রাখান থেকে বিশেষী কোম্পানিটি দিনের
পর দিন অপরাধ করে রেহাই পেয়ে গেল।

ভাড়া বিন্যাসের নামে ভাড়া বৃদ্ধির কার-
চুপিত কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে বলে মনে
হয় না। শ্বিষীয় প্রণয়ীরা যাত্রীদের মধ্যে
শতকরা ৭০ জনের ভাগ্যে ভাড়া বৃদ্ধির
দায় বাড়বে বলে জানা গেছে। এদেশের
এমনই দুর্ভাগ্য যে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের
নামে এখানে দাবিদ প্রণয়ীরা ওপব সব ব্যাপারে
চাপ পড়ে। যারা দিন আনে দিন খায়, মাস
মাহিনায় যাদের অর্থেক মাস চলে না, যারা
মহার্ঘ বাজারের গিয়ে একমুঠো চাল কিনতে
হিমসিম খাচ্ছে, তাদের ওপরেই প্রতিবারের
ট্রামযাত্রীর জন্য এক পরস্যা হারে বৃদ্ধি করা

হবে। সেই টাকার কোম্পানি মুনাফা করবেন
এবং সরকারের জাতীয়করণের শূন্য ভাড়া
ভর্তি হবে। এর চেয়ে আর কি পাবিহাস
থাকতে পারে তা আমাদের চিন্তার অগোচর।

ভাড়া বৃদ্ধি করার ব্যাপারটা নতুন নয়,
কোম্পানি সরকারের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে
এর আগেও বাড়িয়েছে। অজুহাত ছিল এই
যে, যাত্রীসাধারণের সুখস্বচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা,
নতুন গাড়ির চাকাচকো চোখ বঁলসে দেওয়া।
কিন্তু কোম্পানি কিছুই করে নি এবং
বর্তমানে ভাড়া পুনর্বিন্যাস তাবা যদি করতে
পারে, তাহলেও জনস্বার্থের উপযোগী কিছুই
করবে না। আর আমাদের সরকার তাদের
কিছু করতে পাববেন কি না সে সম্বন্ধে
আমাদের সন্দেহ আছে। অতীতের ঘটনা-
গুলিই প্রমাণ করতে পারে যে, সে সন্দেহ
অমূলক নয়।

ভাড়া পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে সর্বাত্রে
একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা উচিত—
যে কমিশনই ভাড়া বৃদ্ধি ও কোম্পানির
অতীত ও বর্তমান কাণ্ডকারখানার ইতিহাস
তুলে ধরতে পাবেন। অবশ্য এর আগেও
কমিশন বসেছিল এবং কোম্পানির অনেক
রহস্য উন্মোচিত হয়েছিল, কিন্তু কাজের কাজ
কিছুই হয় নি। তাই ট্রাম কোম্পানির
দুঃসাহস আজ সীমা ছেড়ে গেছে। এই
দুঃসাহসের প্রতিকার করার মত কোনো দল
বা লোক কি বাংলা দেশে নেই?

সম্পাদক

আর্থার মাক্‌গার্গ

রাজনীতিতে মাঝে মাঝে এমন লোকের
রেকর্ড হয় যার সংগে রাজনীতির কখনও
কোনও সম্পর্ক ছিল না। আর এমনও দেখা
গিয়েছে, এই রাজনীতি-সম্পর্কহীন লোকেরাই
শেষ পর্যন্ত সফল, সার্থক রাজনৈতিক নেতা
প্রমাণিত হয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন যুক্ত-
রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ অ্যাডলাই
স্টেভেনসন ছিলেন এমনই একজন লোক,
তাব শ্রদ্ধাভাবিত মিঃ গোল্ডবার্গও ঠিক
তাই। এ ধরনের অপেশাদার রাজনীতিকদের
নিবে লাভবানও হয়েছে দেশ এবং সরকার,
কারণ এদের মধ্যে পাওয়া যায় একটা
মৌলিক ও নতুন বা পেশাদারদের মধ্যে
আব পাওয়া সম্ভব নয়।

গোল্ডবার্গের মধ্যেও যে সে নতুনদের
ক্ষমতা মিলবে সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই।
সন্দেহ নেই তার কারণ আজকের রাষ্ট্র-
পক্ষে অনুন্নত জাতিদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর
অনুন্নত, নীচুদের হয়েই তো গোল্ডবার্গ
প্রত্যক্ষ ও কালো করে এসেছেন। প্রচলিত
অর্থে শ্রমিক আন্দোলন গোল্ডবার্গ অবশ্য
করেন নি, কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থ কিভাবে
দুরীকৃত হয় সেদিকে তাঁর নজর ছিল
বরাবরই। এদিক থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি
যেমন উদার, তেমন কাকচৌধ স্বচ্ছ। হবে
মাই বা কেন, গোল্ডবার্গকে কি কম খাটতে
হয়েছে, কম খাটতে হয়েছে আইনের পৃথি?।
আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসায়
গোল্ডবার্গের জড়ি মেলা ভার, তাঁর প্রস্তাব
এমনই যে, বিরোধী পক্ষের তা মেনে নেওয়া
ছাড়া গন্তব্য থাকে না সম্মান রক্ষা করতে
হলে। সেজন্যই তো প্রেসিডেন্ট জনসন
তাকে আমেরিকার নতুন স্থায়ী প্রতিনিধি করে
পঠিয়েছেন, রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের মার্কিন
নীতির মৌলিকতা, তাব লক্ষ্য ও বক্তব্যের
সাক্ষ্যতা অত ভালো আব কে বোঝাতে
পারবেন?

গোল্ডবার্গের পক্ষে সুবিধে হল, তিনি
আইনের ছাত্র এবং শৃঙ্খলিত নন, আজকের
আমেরিকার তিনি আইন বিষয়ে একজন
সুপারিশিত ব্যক্তি। আইনশাস্ত্র তিনি শৃঙ্খ-
লায়নই করেন নি, মানুষ-মানুষে সম্পর্কের
ক্ষেত্রে গোল্ডবার্গ তা আশ্চর্য সাফল্যের সংগে
ভাজে লাগিয়েছেন। জুরিসপ্রুডেন্স তিনি
একজন ডক্টরেট, কামক্সেত্রও অনেক ব্যাখ্যার
পেশা করতেন। চিকিৎসায় আইনব্যবসা

ইউনিয়নের তিনি ছিলেন আইনবিষয়ক
পরামর্শদাতা, এ দেশের বিখ্যাত শ্রমিক
সংগঠন আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবারও
(এ এফ এল) তাঁর পরামর্শলাভে ধন্য।
শ্রমিকেরা যত ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে তাদের
সার্বিক মঙ্গল ততই ভরান্বিত হবে—এ সত্য
বুদ্ধিতে গোল্ডবার্গের কন্ঠ হয় নি। তাই
তাঁরই পরামর্শে এবং মধ্যস্থতার আমেরিকার
দুই বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন এ এফ এল ও
সি আই ও-র (কংগ্রেস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল
অর্গানাইজেশন) ঐতিহাসিক একীকরণ সম্ভব



আর্থার গোল্ডবার্গ

হয়েছিল। শ্রমিকদের পক্ষে বলাব জেনেই
গোল্ডবার্গ ছুটে গিয়েছিলেন এশিয়া,
ইয়োরোপ, আফ্রিকায়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক
সংঘের (আই-এল-ও) বহু কনফারেন্সে
সি আই ও-র পরামর্শদাতা হিসেবে যোগদান
করেছেন।

তাইনের মত কঠিন বিষয়ে যাব এমন
পাণ্ডিত্য তিনি সবকালের প্রথম দৃষ্টি বোশি-
দিন এভাবে থাকতে পারেন না, গোল্ডবার্গও
পারেন নি। সেবা লোক না হলে প্রেসিডেন্ট
কেনেডিও মন ভুত না, প্রতিটি ক্ষেত্রে।
নইলে যে তাঁর 'নতুন দিগন্ত' (New Frontier)
সফল হবে না। প্রদ-বিবোধ মীমাংসায়
গোল্ডবার্গের কৃতিত্ব গভীর আগ্রহে সংগে
লক্ষ্য করেছিলেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি, তাই
১৯৬১ সালে ডাক্তারি তিনি উপবৃত্ত মনে
করলেন তাঁর প্রশাসনের লেবার সেক্রেটারী
পদের জন্য।

নতুন পদে, রাজনীতির আসরে প্রথম
পদক্ষেপে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে গিয়ে
করেন নি গোল্ডবার্গ, মালিক-শ্রমিকের বহু-
পদ্রোহো বিবোধ তিনি অল্প সময়ের মধ্যে
মীমাংসা করেছেন, তাঁর রূপে খ্রীশ-মনে ফিরে
গিয়েছে দু-পক্ষই। শ্রমিকদের স্বার্থে নতুন
বিধান বাচিত হল, মালিকেরা হুন্টচিত্তে মেনে
নিলেন শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত বহু দাবি ও
অধিকার—গোল্ডবার্গের অনুমোদন বেখানে,
সেখানে কি কারণে স্বার্থ ক্ষয় হতে পারে?

১৯৬২ সাল গোল্ডবার্গের জীবনে নতুন
মোড় নিল, প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁকে আইন-
জীবীর সর্বোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত করলেন—
সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির আসন। প্রেসি-
ডেন্ট জনসনের লক্ষ্য 'গ্রেট সোসাইটি' বা
মহান সমাজ গড়ার, আর তার অন্যতম স্বপ্নটি
গোল্ডবার্গ হবেন না—এ কেমনতরো কথা!

গোল্ডবার্গ নিজের তাঁর দায়িত্বকে জাতি-
সংঘে শান্তির কৌশলী 'Advocate of
peace in the council of nations'
করেছেন। এ কাজই তো তিনি জীবনভোর
করে এসেছেন কোর্টে কোর্টে, কনফারেন্স-
স্টাইল-নায়ে, শ্রমিক-মালিক বিরোধে। আইনজ্ঞ
হিসেবে যে সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন,
রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে সে সাফল্য কি কয়গত
হবে না?

সংশয়ের কোনো কারণ দেখি না।
দেখি না একমুখে যে, আজীবন তিনি সংগ্রাম
করে এসেছেন, পরাজয় স্বীকার করেন নি
কোনোদিনও। মাত্র তিন বছর বয়সে বাবাকে
হারায় যে, তাব ভবিষ্যৎ কী? বিশেষ করে
রাশিয়া থেকে নতুন একটা দেশ আমেরিকায়
সম্পূর্ণ অপরিচিত পাল্লবশে? কিন্তু
দমবার পাত্র ছিলেন না আর্থার জে গোল্ড-
বার্গ। ফেরিঙলার কাজ করলেন কখনও
কখনও বা সেলসম্যানের—কিন্তু সংগে সংগে
চললো পড়াশুনাও। স্কুল থেকে কলেজ,
কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ধাপে ধাপে এগিয়ে
চললেন গোল্ডবার্গ। দারিদ্র্যকে মর্মে মর্মে
বুঝলেন, মাথা নত করলেন না। তারপর
যেদিন নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
জুরিসপ্রুডেন্স ডক্টরেট পেয়েল সেদিন আর
কারণ বুঝতে বাকী রইলো না যে, ভবিষ্যৎ
তাঁর উজ্জ্বল। দাবিদ্রের বিবন্ধে, প্রতিজ্ঞ
কলভাব বিষমুখে সেদিনকার সেই অরপা-
হীন সংগ্রামের পুরস্কারই আজ পেয়েল
গোল্ডবার্গ। গোল্ডবার্গের অধ্যবসায়কে
সম্মানিত করেছে আমেরিকা, আমেরিকার
সম্মান তি তিনি বাড়াবেন না রাষ্ট্রসংঘে?

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হৃদয়সাদ মিত্র

একদিকে এই 'বাঁচতে চাই না' মনোভাব, অন্যদিকে কবিতার বিশেষ জগতে কবিদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা—আধুনিক বাংলা কবিতায় দুই দৃষ্টি দিকই বিদ্যমান। শেষ দিকটি অবিশ্যি অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক কবির রচনায় দেখা যায়। কিছদিন আগে কবিরুল ইসলামের 'আমি' কবিতার মধ্যে পড়ে তাই আমার মন আকর্ষণ বোধ করেছিল। তিনি কবিতার ক্ষুণ্ণতের সেই আলোকিত অঞ্চলের কথাই বিশেষভাবে জানিয়েছিলেন যেখানে বর্ণ, গন্ধ, গীতি, তৃপ্তি সবই নেই। ১০৭১, মাঘ, 'পূর্বশা' থেকে তার সেই ছন্দগুলি আজ আমার নতুন করে পড়লাম—

মামি কবিতার মধ্যে বসবাস করছি সম্প্রতিঃ
যেন হচ্ছে, আমি একটি
ফুলন্ত উদ্যানে শূন্যে আছি
এবং পাশেই একটি বর্ণাঢ্য নদীর কলতাল

বহুল বর্ণের দৃশ্যঃ পাতার ফুলের
আকাশে বর্ণের সিল্প নব পুনর্নব
সূর্যকরোজ্জ্বল নদী নক্ষত্র আকাশে—
অন্যতঃ বর্ণ ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিকে
বর্ণহীন নির্বিরোধে গড়ে আরোজনে।

এবং সুগন্ধ পোড়ে যেন দেবালয়।

বিস্তৃত কবিতাপাঠে ঈশ্বরেরই স্তব।

কবিরুল ইসলামের জন্মবছর আমার ঠিক এনা নেই। হয়তো, শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরই প্রায় সমবয়সী হবেন তিনি। কবিতাপাঠে ঈশ্বরের স্তব,—একথা যে-বয়সের কবির আঙ্গু কেউ কেউ মনে করতে পারছেন, তাঁদেরই সমবয়সী অন্যেরা বলছেন—এ জগৎ অন্ধকার, এ অন্ধকার মোচনের সম্ভাবনা নেই! শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'জরাসন্ধ' মনে পড়ে—

'পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, কৃপণ
জলে তেচোকো মাছেব আঁশ গন্ধ সব
আমাব অন্ধকার অন্তর্ভবে ঘরে সারি-
সারি তোর ভাঁড়ারের মনমশলার পাত্র
হল, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের
হাত দেখি না, পা ফেলি না, তখন তোর
জরায় ভর করে এ আমাব কোথায় নিয়ে
এলি? আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের
হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই

।।- তুই তোব জরায় হাতে কঠিন
বাধন দিস। অর্থ হয়, আমার বা কিছ
আছে তার অন্ধকার নিয়ে গাহনে নামলে
সমুদ্র সরে যাবে, শীতল সরে যাবে, মৃত্যু
সরে যাবে।

তবে হয়ত মৃত্যু প্রসব করেছিল
জীবনের ভুলে। অন্ধকার হয়ে আছি,
অন্ধকার থাকবো এবং অন্ধকার হবে।

গোয়ার চালে চলত এই রচনার ভাণ্ড
দেখে এটিকে কবিতা বলতে হবে। এটি
চিত্রে এবং মস্তজ্যে চিহ্নিত। কিন্তু এখানকার
মোট-কথাটা কী? ১৯৩০-এর জাতক এই
আধুনিক বাঙালী কবি তাঁর এই রচনার নাম
দিয়েছেন—জরাসন্ধ।

মহাভারতের সভাপর্বে মগধের সম্রাট
জরাসন্ধের কথা আছে। তিনি ছিলেন প্রবল
পরাক্রান্ত মানুষ। শিশুপাল ছিলেন তাঁরই
সেনাপতি। কংসের বশুর ছিলেন এই
জরাসন্ধ। জরাসন্ধের দুই মেয়ে 'অস্তিত্ব'
আর 'প্রাপ্তিক' কংস বিবাহ করেন। কংস
তাবপর স্বশরীর সাহায্যে জ্ঞাতপীড়নে উন্মত্ত
হলে কৃষ্ণ-বলরামের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে
হয়। কিন্তু তাবপর আত্মবিশ্বাসের সপক্ষে সন্মুখ
করে কৃষ্ণ বৃত্তে পারেন যে, তিনি শ' বছর
নিরন্তর যুদ্ধ করলেও জরাসন্ধের সৈন্যদের
তাঁরা চূড়ান্তভাবে শেষ করতে পারবেন না।
ভব পেয়ে জ্ঞাত-বন্ধুদেব সপক্ষে কৃষ্ণ-বলরামকে
বৈবর্তক-পর্বতে পালিয়ে আত্মবক্ষা করতে
হয়েছিল। জরাসন্ধ জীবিত থাকতে যুধিষ্ঠির
প্রভৃতি পাণ্ডব রাজাদের পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ
করতে এগিয়ে যাওয়া মোটেই নিরাপদ ছিল না।
শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জরাসন্ধ' কবিতায়
এসব ঘটনাবলি উল্লেখ্যমাত্র করেন নি। তিনি
ঐ শিরোনামের নিচে শব্দ-এইটুকু জ্ঞানিয়ে-
ছেন যে, কোনো এক আদি-কারণকে তিনি
কার্য প্রত্যাহার করতে বলছেন—আমাকে তুই
আনলি কেন, ফিরিয়ে নে'।

মহাভারতের এই 'জরাসন্ধ' নামে প্রবল
পরাক্রান্ত মগধ-সম্রাটকে তিনি সেইসময়েই
শিরোনামে স্মরণ করেছেন। জরাসন্ধের
জীবনের ঘটনাবলীর সপক্ষে ভতো নয়,—বরং
জরাসন্ধের জন্ম-স্তম্ভের সপক্ষেই শক্তি চট্টো-
পাধ্যায়ের এই অন্ধকার-চিন্তার যোগ বেশি।
কবিরুল ইসলামের মতন কোনো স্তব বা
সৌন্দর্য বা দেবালয়-ধারণার সপক্ষে তাঁর মনের
যোগ নেই। জরাসন্ধের জন্ম-কথাটুকু তাই
প্রাণধানযোগ্য। রাজশেখর বসুর মহাভারত

থেকে সে-প্রসঙ্গ দেখে নেওয়া দরকার।
রাজশেখর লিখেছেন—

যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, এই জরাসন্ধ
কে? তার কিবৎপ পরচেম যে অগ্নিতুল্য
তোমাকে স্পর্শ করে পতঙ্গের ন্যায় পড়ে
মবে নি? কৃষ্ণ বললেন, মহাবাহু,
জরাসন্ধ কে এবং আমরা কেন তাঁর বহু
উৎপীড়ন সহ্য করেছি তা বলছি শুনুন।
বৃহদ্রথ নামে মগধদেশে এক রাজা ছিলেন,
তিনি তিন অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি।
কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে তিনি
বিবাহ করেন। বৃহদ্রথ তাঁর দুই ভাৰ্য্যাকে
জ্ঞাতপীড়িত দিয়েছিলেন যে, দুজনকেই
সমদৃষ্টিতে দেখবেন। রাজ্যে যৌবন গত
হল তথাপি তিনি পুত্রলাভ কবলেন না।
উদাযচেতা চন্ডকৌশলক যুধি রাজাকে
একটি মন্ত্রসিদ্ধি আদ্রফল দেন, সেই ফল
দুই খণ্ড করে দুই রাজপত্নী খেলে
এবং গর্ভবতী হয়ে দশম মাসে দুজনে
দুই শরীরখণ্ড প্রসব কবলেন। তার
প্রত্যেকটির এক চক্ষু, এক বাহু, এক পদ

উনিশ বছর আগের

রাজকীয় ভারতীয় নৌবহরের
ঐতিহাসিক বিদ্রোহের
কল্পনা
আজ কলকাতায় প্রতিধ্বনিত
সেই প্রতিধ্বনি
মিনার্ভার চারদেয়াল ছাড়িয়ে
ছড়িয়ে গেছে
সারা কলকাতায়
বাংলা দেশে সারা ভাবতবর্ষে।
কল্পনা স্পন্দনে

কলকাতা 'চঞ্চল'

মিনার্ভা থিয়েটারে কল্পনা
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬।
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬।টায়
চলিতেছে

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

এক অর্থ মৃদু, উদয়, নিভন। রাজারী
জন্মে ও মৃদু তামের সন্তান পরিত্যাগ
করলেন, মৃদুজন ধারী সেই সজীব
প্রাণিষৎ অবত করে বাইরে নিয়ে গিয়ে
কেলে দিলে। সেই সময়ে জরা নামে
এক রাক্ষসী সেখানে এল এবং শব্দ
মুঠিকে দেখে মৃদুশ্য করবার ইচ্ছায়
জব্দ করলে। তৎক্ষণাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ
দীর হুমার উৎপন্ন হল। রাক্ষসী বিস্ময়ে
চক্, বিস্ফারিত করে দেখতে লাগল,
বল্লভূলা পুত্রভার শিশুকে সে তুলতে
পারলে না। বালক তার তালবর্ণ হাতের
মুঠি মুখে পুরে সজল মেঘের ন্যায়
পর্জন করে কাদতে লাগল। সেই শব্দ
শ্রুনে রাজা, তার দৃষ্ট পত্নী এবং অন্তঃ-
পূরের অন্যান্য লোক সেখানে এলেন।
জরা রাক্ষসী নারীমূর্তি ধারণ করে
শিশুটিকে কেলে নিয়ে বললে, বৃহস্পতি,
তোমার পুত্রকে নাও, ধারীরা একে ভাগ্য
করেছিল, আমি রক্ষা করেছি।'

গতি চট্টোপাধ্যায় এই 'জরাসন্ধ' শিরোনাম
গ্রন্থের কবে তার কবিতার লিখেছেন—'তবে
জন্মতো মৃত্যু প্রসব করেছিল জীবনের ভূলে।'

এ থেকে এই 'সিদ্ধান্ত' পৌছোনো

অসম্ভব নয় যে, পৌরাণিক জরাসন্ধ যেমন
ছিলেন জরা-রাক্ষসীর অমৃত কলাকৃতি,
আমাদের জীবনও তেমনি কাটা, ছেঁড়া,
খণ্ডিতকে নিয়ে অদৃষ্টের বিশেষ কারিকুরি।
মানুষ কিচ্ছু। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাই
লিখেছেন—'আমি যখন অনঙ্গ অম্বকারের
হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরার
ভর করে এ আমার কোথায় নিয়ে এলি?'
জীবনের মনে মেলে না। তারি অন্তঃসারহীন
মনে হয় সব কিচ্ছুই। এ সেই অর্থহীন
ভরস্করের রূপক। বাংলার আধুনিক কবিমণ্ডল
যেখানে বিবাদকে এইরকম ভরস্করী মূর্তিতে
দেখছে, সে-সব ক্ষেত্রে বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
'আমল' থেকে আজ পর্যন্ত এই গতি বেশ
সরলরোম্য প্রসারিত বলে অনুভব করা যায়।
একে 'আধুনিক' বলতে বাধা নেই, তবে সে-
আধুনিকতারও বরস হোলো এতোদিনে।
সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণে মনের স্বচ্ছন্দ
গতিতে বাধা পড়ছে—এই যদি বস্তুবোধের
আসল কারণ হয়, তাহলে কল্যাণেই হবে যে
সে বাধা চিরকালই আছে। একালেও কবিতার
বিষয়বস্তু সেই একই বাধাবোধ। তবে, তার
ভাষা বদলাচ্ছে। শব্দ, ইতিহাস, ইশারার ছবি
ইত্যাদি বদলে যাচ্ছে।

জীবনের গতি বৃত্তপন্থী। নতুন যা
কিছু ঘটেতে পারে, সবই মূলত পুরাতনেরই
পুনরাবৃত্তি। অতএব আধুনিক কালের,—
অর্থাৎ আমাদের সমকালীন এ-প্রান্তের এই
বিশ-গ্রন্থ বা দশ-পনেরো বছরের বিষয়ের
প্রকৃতিই যে একেবারে অভিনব কিচ্ছু
একটা হয়ে উঠবে, সে-রকম প্রত্যাশা স্বাভাবিক
নয়। ভালোবাসা, হাস্যকৌতুক, শোক, ক্রোধ,
উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা, বিস্ময় ইত্যাদি মানসিক
সম্ভাবনামূলক মূলত একই রকম আছে।
একালের প্রাবণের মেঘ, আশ্বিনের রোদ,
পৌষের হিম অথবা ফাল্গুনের হাওয়া কি
স্বভাবে নতুন হয়েছে?

নতুন কখনোই চড়াস্ত হতে পারে না।
পুরোনো হাওয়াই ফিরে ফিরে মনের মেঘ
জন্মে তেলে, মেঘ উড়িবেও যাব। তবে
সমসাময়িকতা আর আধুনিকতা—এ দুটি
শব্দের পরোপে ভেদ আছে। এই ভেদটুকু
সাহিত্যের ধারায় খুবই স্পষ্ট চিহ্ন রেখে
যায়। মোটেও অনুভব করা যায় না।

(কম-১)

এখন অনেক রাত্রি

অন্যোবদন চট্টোপাধ্যায়

এখন অনেক রাত্রি, রাত্রি অনেক
নিরন আলোটা তুমি আপাতত
জেরুলানাকো আর
যুকের অনেক কাছে কোনো চাপা,
কামা পুষে নিয়ে
ভরের বোবন ভবে পাল করে
দু' বোতল মদ
কম্পন গোঙানি ভূলে
অম্বকারে বিকিটাও খুঁজবে
হরত প্রেমিকার হাত
হৃদয় থেকে দৃশ্যান্তরে
প্রিয় থেকে প্রিয়তম কোনো
ফুল তুলবো মনে করে
আমার ভাসাম হাত গম্ব নর
রক্ত আছে ছেয়ে।

এখন অনেক রাত্রি, রাত্রি অনেক
ভাষ্যপ কে'দো না তুমি
সুর করে সম্রাটের ধ্বনি।

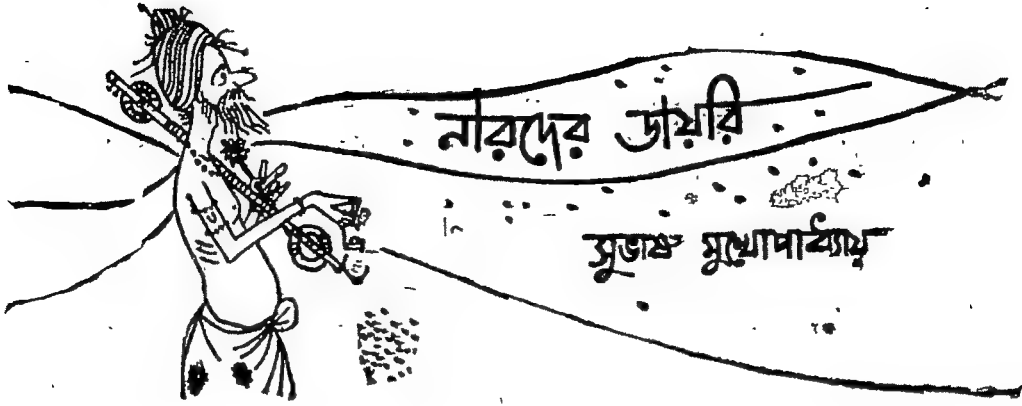
বীতংসে বন্দী মাতাল

মিহিরবরণ ভট্টাচার্য

পাঙ্কলে আবশ্য সভা, দৃশ্য বস্তুদায়
লালসার ক্ষিপ্ততার নিপদ্য ব্যাঘ্রীণী
হাজারো শীতাত রক্ত, শোষিত চৈতন্যে
ঢেলে দেয় ভীতের মাতাল মদিরা
অসহায় ক্রান্তিকর তীক্ষ্ণ সূচনার
দৃশ্য প্রলাপে অগ্রে আশ্রয় শবের প্রাণ
স্মান করে গোলাপের বনঃ
জ্যোৎস্নার মহাফল।

ভোরের আকাশে কিংবা,
কিংবা কোন চতুর বিজয়ে
স্নান চৈতন্যের বোঝা শূন্য হোক,
হত্যা হোক
আর এক মিহির, আর এক
মৃদু, মৃদু দুরারোগ।

বিবসনা নরকের স্মারে শূন্য শবের মিহিলে
গলে গলে জন্ম নিক লক্ষ কোটি কীট।



চার বছর। হ্যাঁ, তা চার বছর হল বৈকি। এখনও কিন্তু মন থেকে সেই ভয়টা একেবারে যায় নি। হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে ছাঁৎ করে ওঠে।

কালকেই এক বন্ধুর গাড়িতে করে গলির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। ছোট ছেলে দেখলেই আমার ভয় করে। থেকে থেকে কখন যে ওদের রাস্তা পার হওয়ার দরকার হবে বলা যায় না। ঘড়ি তো আর আগে থেকে বলে কয়ে উড়ে এসে পড়ে না, টেনিস বলটা তো আর সব সময় অঠার মত সকলের পায়ে লেগে থাকে না। কালকেই জনবরত রাস্তা পার হওয়ার দরকার পড়ে।

গাড়ির মধ্যে আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে বসে ছাছি। আর ভাবছি, কতক্ষণে গাড়িটা থেকে নামব। কেন না কী আতঙ্করেই না পড়ে-ছিলাম সেবার।

সময়টা তখন শীতকাল। এবং সেই শীতকালেও সৈদীন সর্বাঙ্গ যেমে গিয়েছিল। গাড়িতে আমরা পাঁচজন। ওরা বাচ্ছিল জরদেবের মেলায়। রাস্তার আমি ওদের সঙ্গে ছুটে গিয়েছি। আমি ছাড়া বাকি চারজনই বিলেতের বন্দু। ডাক্তার, অধ্যাপক, ব্যারিস্টার, আর্টিস্ট। বড়বরের ছেলেমেয়ে। কিন্তু দেশের কথা ভাবে। চাষী-মজুরের সঙ্গে থাকতে চায়। সাধামত কান্ডও করে। আমার সঙ্গে এদেশে আলাপ।

ইলামবাজারে গ্রামেব ভেতবে ঢুক পূরনো মন্দির দেখতে গিয়ে দু'পূর গাড়িবে বিকল হয়ে গেল। বেলাবেলি মেলায় পেশীছতে হবে। কাজেই মাকে আর কোথাও নামা নয়। পিচের রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের কাঁচা রাস্তায় গাড়ি মোড় নিল। এই মাঠ-রাস্তাটা ধরে আর খানিকটা গেলেই জয়সেবের মেলা। রাস্তার দু'পাশাড়া কাতারে কাতারে চলেছে লোক। পায়ে পায়ে আব গবুদগাড়ির চাকায় দামনটা খুলোর কুশাশা হয়ে রয়েছে।

এমন সময় ব্রেক কষবার একটা বিকট আওয়াজ, বাকুনি আওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা খাডব ভোতা শব্দ—আর উইন্ডস্ক্রীনর ভেতর

দিয়ে কিলিক দিয়ে বাওয়া কচি ছেলের একটা মূখ। সমস্ত এমন তালগোল পারিয়ে গেল যে, কিছ তলিয়ে বোঝবার আর শক্তি রইল না। কলের পুতুলের মত দরজাটা খুলে কিভাবে লাফিয়ে পড়লাম, ছেলেটার অসাড় দেহটাকে কোলে তুলে নিয়ে উত্তেজিত মানুষের মারমুখো ভিড়টাকে তৈলে সরিয়ে দিয়ে কিভাবে ওষু আর ডাক্তারের খোঁজে মেলায় দিকে রওনা হলাম—সেসব স্পষ্ট মনে নেই।

মনে আছে মেলায় বখন কড় হাসপাতালে যাবার কথা বলে আমাদের কিরিয়ে দেওয়া হল তখনকার কথা। কাছোঁপঠে আব হাসপাতাল নেই। যেতে হবে সেই সিউড়ি। যে রাস্তা দিয়ে এসেছি সেই রাস্তা দিয়ে। যে রাস্তার দু'ঘটনাম্বলে অপেক্ষা করে আছে গ্রামের জুহু জনতা। তাকালার। ছেলেটা আমার কোলের মধ্যে কঠর মত নিশ্পন্দ। রগের কাছটা ফোলা। টেঁটের কোণে রক্ত। চোখটা কেমন যেন ওলটানো। হঠাৎ আমার বৃষ্টির ভেতরটা হিম হয়ে গেল। ছেলেটা খুব সম্ভবত বেঁচে নেই। বৃষ্টির কোনো খুকপুক দেখছি না।

গাড়িটা বেন বখাডুমির দিকে অসহায়ভাবে এগিয়ে চলেছে। বেশ বৃষ্টিতে পারছি একটা হিংস্র আক্রোশ রাস্তা আটকে ওং পেতে রয়েছে। কছে আসতেই দু'রের স্তম্ভ ভিড়টা হৈ হৈ করে চক-ভাঙা মোমাঁছব মত আমাদের ছেকে ধরল। ভিড়ের ভেতব থেকে দু'চোখে প্রতি-হিংসার আগুন নিয়ে পাক খেয়ে এগিয়ে এল একজন মুখিয়া লোক। তার হাতের ছড়িটা গাড়ির বনেটের গায়ে লেগে গায়ে-কাটা-দেওয়া একটা কনকন আওয়াজ তুলল। তারপর গলার একটা মর্ম্মান্তক শ্লেষ ফুটিয়ে বলল, কী! সব শেষ তো! এবার তোমাদের শেষ হওয়ার পাল্লা। আমি শুন্যে গলার প্রাপণে বোঝাব চেষ্টা করছি—ছেড়ে দিন, সরে যান। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, সময় নষ্ট করবেন না।

একজন টান মেরে গাড়ির দরজা খুলে দিল। আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে গিয়েছি। লোকটা ষৈশাচিক গলার বংল উঠল, ও তো মরে গিয়েছে। আমি জানি। তবু বাঁচবার

জন্য প্রাপণে বোঝাব চেষ্টা করছি—ছেড়ে দিন, সরে যান। হাসপাতালে যেতে হবে। আর ঠিক ডাক্তার একটাটার এক নিমেষের জন্যে চোখ খুলে ছেলেটা অস্ফুট গলার মূখ বলে কেঁদে উঠল। হঠাৎ আমি বেন প্রাণ দিয়ে পেলাম। তা হলে প্রমাণ হয়ে গেল ছেলেটা বেঁচে আছে। আছাড়-পিছাড় করে কাঁদছিল ছেলেটার মা। একটানে তাকে ভেতরে উঠিয়ে নিলাম। ভিড়টাকে এবার ধমকে বললাম, সম্মনে থেকে সরে যাও। গাড়ি আস্তে এক-পা দু-পা এগোতেই নামনের রাস্তাটা খোলা হয়ে গেল। গাড়ির পেছনে লাঠির একটা ব্যাড়া পড়ল। এবার স্পীডটা বাড়িয়ে দেওয়া হল। আওয়াজ শুন পেছের ডাকিয়ে দেখা গেল সেই মুখিয়া লোকটা কিছ একটা দরকারী কথা বলবে বলে চেঁচিও গাড়িটা থামাতে বসছে। কিন্তু আর এক-দণ্ডও এখান থেকে নাড়। কাজেই গাড়ি স্পীড আবও বেড়ে গেল।

এবার কৃতজ্ঞচিত্তে ছেলেটাব দিকে তাকলাম। তার আবার সেই আগের মূর্তি। দেখে ঠিক ঠাহব করা যাচ্ছে না, বেঁচে আছে কি নেই। চেষ্টা হয়ে এমনভাবে ধবে বসে আছি যে, নাড়িটা টিপ দেখবারও উপায় নেই। কক্ষিটা গলয় লাগাতে মনে হল না, তেমন ঠান্ডা নয়।

এতক্ষণে ছেলেটার দিকে ভাল করে তাকলাম। বছর নয়-দশ বয়স। গাষেব হু বেশ কালো। কচি মিষ্টমত মুখ। বোহ-হয় মেলায় দু-একদিন আগে ঘাড়ে ক্রিপ বুলিয়ে চুল ছেঁটেছে। ঘাড়ের সাদা ভাবটা টাটকা।

আর তার বিহবা মা অন্যদিকে তাকিয়ে সমানে ডুক্রে ডুক্রে কাঁদছে।

তার সবক কামার ভেতব দিয়ে ওদের জীবনের টুকরো-টাকরা খবর কানে আসছে। মাব জীবনের অশেষ নড় ওই ছেলে। ওকে এইটুকু দেখে খাপ মবেছে ওলাউঠে। কত কষ্টে মানুষ করা মাণিক বে আমার। তোকে কত কষ্টে বড় করেছে তোরা ছুটে-ছুটনি মা। ছেলে হয়েছিল সোনার টুকরা।

গাথাহিক বসুদত্ত

জিহ্নে অচিন্ত্য কেঁড়াও! গর দুখা বসুদত্তে
শিখেছিল। মোড়লের বাড়িতে পর চরাভ।
পেট ভাতার। যে হুড়কটুকু পেত, বাড়ি
এনে মাথ-পোষ একটা বেলা তাই ভগি করে
খেত। মা-অন্ত প্রাণ ছেলের। অমন ছেলেকে
ভগবান টেনে নিলেন।

সমস্তই শুনতে পাচ্ছি। আর আমার
চোখও জলে ভরে আসছে। তার ছেলেকে
আমিই কোলে নিয়ে বসে আছি। কখনও
মনে হচ্ছে বকের কাছটাতে ওর এখনও হুক-
পুক করছে। কখনও মনে হচ্ছে—না, সব
শেষ। ওর মাকে কী বলে আমি সামনা
সব।

ছেলেটা চাপা পড়বার সময় যে গাড়ি
চালাচ্ছিল, সে গাড়ি ভাল চালায় বটে—কিন্তু
সদা দেশে ফিরেছে বলে লাইসেন্সটা আর
করে ওঠা হয় নি। কাজেই চলতে চলতেই
ঠিক করে ফেলা হল দোহটা অন্য একজন
নিজের ঘাড়ে নেবে। সারা গাড়িটাতে এখন
একটা ধমধমে ডাব। প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে
এখন অনেক কিছু ভাঙাগড়া চলছে।

মাঝে মাঝে উপছে পড়ছে—আবেগ।
ছেলেটার মাকে কিভাবে সাহায্য করা হবে তার
দুহর জল্পনা। যদি গ্রামে থাকে তা হলে
কিছু চাবের জমি কিনে দেওয়া হবে। সে
জমি ভাগে দিলে কিছু ফসল পাবে। আর
সেইসঙ্গে আজীবন একটা মাসোহারার বন্দো-
বস্ত। আর নইলে ও যদি রাজী হয়, তা
হলে কলকাতার গিরে সুশেষজ্জন্মে থাকতে
পারে—একেবারে বাড়ির লোকের মত।

টাকা? তা সে যত টাকাই লাগুক।
সারা জীবন খোরপোষের ব্যবস্থা হবে।

এসব শুনছি আর ভাবছি, কেন আমি
মিথ্যে এদের দলে নিজেকে জড়াতে গেলাম।
এদের তবু মজ্জহস্ত হতে পারার সামর্থ্য
আছে, আমাব তো-তাও নেই। আমাকে
সারা জীবন দেখে মারবে অসহায় এই স্মৃতি।
গাড়িতে কবে মেলা দেখতে আসার আমার
কোনো দরকাই ছিল না। আমি দিবা
বাসে বুলে বুলে, দিবা দাঁড়িয়ে গুঁতোগুঁতি
করে আসতে পারতাম। শহরের যে বড়-
মানুষরা রাস্তার গাড়ি চাপা দেখে, তাদের
বিরুদ্ধে গণিব গ্রামবাসীদের যে কী জাত-
কোষ তা তো একটু আগে নিজের চোখেই
দেখেছি। বলিষ্ঠঃ ঠালিচোখে শহরের
স্ববুরো, মোটরগাড়ির ফটুর্নি।

গাড়ি বেশ জোরে চলছে। ছেলেটার
মুখেব দিকে তাকাবার আর আমাব-সাহস
নাই। একটা তেমাথার এসে গাড়িটা একটু
ধমকে স্লেজ। ডানদিক না বাঁদিক? মোড়ে
জ্ঞান লোক নেই। আমদজে বাঁদিকে
এগিয়ে হল। দিনের আলো ক্রমেই পড়ে
আসছে। সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ।
কোপকাড়ের গায়ে শীতের কুয়াশা বনিয়ে
পড়ছে। সারাক্ষণ একভাবে বসে আমার পা

দুটো মাসের মত ভারী। বেশ-খানকটা গিরে
পাওয়া গেল একটা বাস্পীপাড়া। একজন
লোক রাস্তার ধারে গরুর দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে
ছিল। জিজ্ঞাস করতে সে বলল আমরা ভুল
রাস্তায় এসেছি। ফিরে গিরে তেমাথা থেকে
নিতে হবে ডানদিকের রাস্তা।

ফিরতে হল। ছেলেটার মা এখন আর
কথা বলে কাঁদছে না। কে'বে কে'সে গলা
চিরে গেছে তার। থেকে থেকে শব্দ
কুপিরে উঠছে। সামনের সিটে সবাই চুপচাপ।
কারও মধ্যে কোনও কথা নেই। হঠাৎ একটা
ঘটাৎ শেষে গাড়িটা একটু কাঁকানি ধরে
ডানদিকে সরে গেল। গাড়ি থামল না।
কে একজন পেছন দিগে তাকিয়ে বলল, গেছে
একটা ছাগলছানা। স্পীডটা বাড়িয়ে দাও।
তেমাথার এসে এবার সোজা রাস্তা।
সিউড়ি আর কতদূর? কোথাও কোনো লেখা
চোখে পড়ল না।

যে গাড়ি চালাচ্ছিল, হঠাৎ তার দিকে
চোখ পড়ল। মূখ দেখে মনে হল গাড়ি
গতিক সুকিধের নয়। ভেলের কাঁটাটির
দিকে বার বার দেখছে। সামনের দিকে চোখ
রেখেই জিজ্ঞাস করল, আর কত মাইল আছে
জানেন নাকি?

আগে এ রাস্তার এলেও, আর কতদূর
আছে না আছে কিছুই ঠাহর করতে পারছিলাম
না। তবু বললাম, আর প্রায় এসে গিয়েছি।
শেষের কথাটা বলবার আগে একটু ঢৌক
দিলতে হল।

ঠিক বলছেন তো?
কোনো উত্তর দিলাম না। সামনের সিটে
কে একজন সিগারেট ধরাল। জানলার মূখ
রেখে মেশলাই কাঠির ফস-করা একটা
আওয়াজ শুনলাম, আশ্চর্য, সিগারেট
ধবলনার কথাটা এতক্ষণ কারো মনেই ছিল
না। সিগারেটের গন্ধে আমারও একটা
ধরবার ইচ্ছে হল। কিন্তু উপার নেই।
দুটো হাতই আমার জোড়া।

এবার একে বেক রাস্তা। মাঝে মাঝে
লোকালয়। বসতি ক্রমে ঘন হয়ে আসছে।
দোকান সম্ভা দিচ্ছে।

দূরে সাদা সাদা খুঁটি পোতা একটা
সাঁকো। পাশ দিগে দৈত্যের মত চলে গেল
একটা লরী।

তাবপর অনেকটা দূর থেকে কপালে
চন্দনের ফোঁটার মত শহরের আলো।
স্টীয়ারিং হুইল বার হাতে, ঘন ঘন সে-ভেলের
কাঁটাটির দিকে দেখছে। তাঁরে এসে ডরী
ছুবে না তো?

সংশয়ে দু'লতে দু'লতে শহরের উপকণ্ঠে
আমবা পেঁাছে গেলাম। হর্ন দিভে দিভে
একে ওকে জিজ্ঞাস করতে করতে বড় হাস-
পতালের দবজার এসে ঘাম দিগে আমাদের
জ্বর ছাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল স্টেচর।
ছেলেটাকে শুইয়ে দিলাম। দেখে মনে হল—
যা, বেঁচে আছে। ঠোঁটের কোণে মজ্জা
জমাট বেঁধে গেছে। আমাদের পেছনে পেছনে
পাথরের মত হাটছে ওর মা। চোখে জল
নেই। শূন্য বিহীন দৃষ্টি। তততরে নিরে
গিরে রবার রুথ পাতা একটা উঁচু বেডের
ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। ছেলেটা আরেক-
বার চোখ চাইল। কীপগলার 'মা' বলে
ডাকতেই ছুটে এল ওর মা। ডান হাত
দিগে ছেলেটা তার মার আঁচল চেপে ধরল।
বড় ভাতার এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে
পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। তখনও
আমাদের কারও মূখ দিগে কথা বেরোছে
না। খানিক পরে গলা থেকে স্টেথোস্কোপটা
খুলে ফেলে হেসে বললেন—না, কিছু না।
চোট শব্দ সামান্য। হাসপাতাল থেকে
দু'দিনে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। আপনারা
কিন্তু ভাববেন না।

হাসপাতাল থেকে চলে আসার সময় মা-র
আঁচলে মোটাকরক টাকা বেঁধে দিগে আসল
হল।

এ দু'দিন ওর মা এই হাসপাতালেই
ছেলের কাছে থেকে যাবে। আঁচলে টাক-
বাঁধতে গিরে এই প্রথম নজরে পড়ল মা-
শরনে শতাজিন মরলা শাড়ি।

তাকে এক কাপড়েই হাসপাতালে জমা
করে দিগে সে রাস্তিটা ডাকবাংলার থেকে
মনগুলোকে আমরা হালকা করে নিলাম।

বলতে গেলে আমাদের দলটা একেবারে
নিখরচার পাব পেয়ে গেল। চাবের জমি,
আজীবন খোরপোষ, শহরে নিগে গিরে রাখা—
কিছুই করতে হল না। ছেলেটা বেঁচে গিরে
অজ্ঞান্তে ওর মাকে সুখের স্বর্গ থেকে-টেনে
নামিয়ে দিল। দু'দিন পরে আবার ও গ্রামে
ফিরে যাবে। মোড়লের গরু চরাবে। পেট
ভাতার। সেই ভাত বাড়িতে এনে মাথ-পোষ-
ভাপ কবে যাবে। একবেলা। কেবল
একবেলা।

পরদিন সকালে বেয়োতে যাবার মধ্যে
আমি বললাম, আমাদের কিন্তু অন্য রাস্তা
দিগে ফিরতে হবে।

কেন?
কল রাস্তির থেকে নিখর গ্রামের লোক
লাঠিসোটা নিগে বড় রাস্তার পাহারা দিচ্ছে।
যদি ওরা দেখে একা আমরা ফিরে যাছি,
তা হলে আর একজনকেও বেঁচে ফিরতে
হবে না।

সুভরা আমরা ফিরলাম অন্য রাস্তার।
ফেরবার রাস্তার আমি হঠাৎ বললাম,
ঐ যা! ওদের নাম-ঠিকানাটা ভো আন
হল না?

এতো ঠান্ডা হাওয়া হাচ্ছিল যে, কথটা
কারও কানেই গেল না।

বাংলার মহান বিপ্লবী শ্রীবটুকেশ্বর দত্ত রাজ আমাদের মধ্যে নেই। আজ শ্রীদত্ত ইতিহাসের পাতার ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম যোগ্য নায়ক। আজ তিনি ইতিহাস, যেমন ইতিহাস এখন বাঙালীর শৌর্য বীর তেজ ও প্রকৃত দেশানুরাগ।

শ্রীদত্তের মরদেহ তাঁর বিদ্রোহী সান্নিধ্য ভগৎ সিং-এর শতভুজ নদীতীরস্থ সন্ন্যাসীর পাশে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় আইনসভা - বোম্বে - কেন্দ্রের এই আসানী (মাত্র তিনিশ বছরের কিশোর তখন এই বটুকেশ্বর) এখন অনন্ত মৃত্তির আশ্রয় লাভ করেছেন।

শ্রীদত্ত যৌবনে আশাবাদী বিপ্লব-সাধক ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে তাঁর হৃদয় নৈরাশ্যে কীর্ণ হয়ে এসেছিল। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহল জানেন, বর্তমান সরকারের অত্যাচারিতা, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত আশার আলো জ্বলেনি যেওয়ার অক্ষমতা এবং সমাজভিত্তিক ভারতবর্ষ গঠনের স্বপ্ন-সাধের সনাক্ত শ্রীদত্তকে বেদনাক্লান্ত করে। আমরণ বিপ্লবী শ্রীদত্তের (বিপ্লবী ভারতের) স্বপ্নের স্বাধীন ভারত তার সেইরূপ ধরিনা নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে নি। এ বেদনা শ্রীদত্তকে বেজেছে। কারণ পরাধীন ভারতে তিনি ও তাঁর সতীর্থগণ এ সমস্তর চ্যনাই বকের ক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছিলেন, গঠন করেছিলেন হিন্দুস্তান সোসাইলিস্ট রিপাবলিকান পার্টি। আর তারই পুরস্কার স্বরূপ আশ্রয়লাভেই জীবনের সর্বমুহূর্ত বন্দীশাখা হাসিনাধে অতি-বাহিত করেছিলেন তিনি।

১৯১০ সালে কলিকাতায় শ্রীদত্তের জন্ম। কানপুরে শিক্ষা। শচীন সিংহ এবং জয়শঙ্কর ভট্টাচার্যের মাধ্যমে তিনি পরিচিতি লাভ করেন তাঁর দুই আদর্শ বিপ্লবী সহকর্মী ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে।

শ্রীদত্ত আশ্রয়লাভে হীপান্তরিত অবস্থায়ও তাঁর সংগ্রামী মনোভাব অটুট রেখেছিলেন এবং সেখানেও তিনি ছিলেন ব্রিটিশরাজের দৃষ্টিভঙ্গ।

দ্বিতীয় নগরীর রাজপথে যখন তাঁর মরদেহটি গোড়াযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সঙ্গে ছিলেন শ্রীদত্তের পত্নী ও কন্যা এবং শহীদ ভগৎ সিং-এর ব্রাহ্ম মাতা ও তসীম কন্যা।

রাষ্ট্রপতির পক্ষে বিপ্লবী বীরের সম্মানে মান্যপািত করা হয় এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজে এই শ্রবযাত্রার তত্ত্বাবধান করেন।

‘ভারতের ইতিহাসে চিরদিন শ্রী বি কে দত্তের নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।’ বলেন প্রধান-মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী।

শ্রীদত্তের ন্যায় ভারতের লোকান্তরিত বীর আবার স্মৃতিই আজ আমাদের একমাত্র বীরত্বের পরিচায়ক।



বটুকেশ্বর দত্তের সংগে নেহরু

এ আই সি সি

বাঙ্গালারের বিখ্যাত কাচবারে গত শনিবার নির্ধারিত ভারত কংগ্রেস কমিটির দুই দিনব্যাপী অধিবেশনে যথাপূর্বং গালভরা বক্তব্যের সমাবেশ হয়েছিল। কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন—দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারীর (ক্লটি তৈরির কারখানা নয়, কর্মহীনতা) অবসান ঘটিয়ে শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্টেট মতুন সম্পদ সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এসব নতুন কথা নয়, আশার কথাও নয়, বক্তৃতার বাণী। আমরা এফ কানে শুনি, আর কানে ত্যাগ করি।

কংগ্রেস সভাপতি দেশের যুব সম্প্রদায়ের ওপরও সেই পুরনো উপদেশই বর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, যুব সম্প্রদায়কে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের ওপর

যে কোনো হামলা প্রতিরোধ করতে হবে তাঁদেরই।

এ সমস্ত কথা শুনেও শ্রবী উত্তেজনা কর বলে মনে হয় বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ জাতীয় বাণীর বাণ যে কোনোই আকৃতি গ্রহণ করে না—দেশের নেতাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ধৃষ্টতা কাছে কাজেই আমাদেহই করতে হয়। যুক্তিপূর্ণ ফ্যালেসি সিচার রক নাও সম্ভবত অনুক্রম উজ্জিত কংগ্রেস সভাপতি বিরত থাকতেন। যে দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার হতোদ্রব্য হয়ে পথে-বিপথে যুরে মরছেন এবং যে দেশে ক্ষমতাশীন দলের দলপতি স্বয়ং অতি পুরাতন আশার বাণী (বেকারী ষোচাতে হবে) পুনরুচ্চারণ করে দেশের ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথা নিঃশব্দেই স্বীকার করছেন, সে দেশের যুব সম্প্রদায়কে পরিশ্রমী হওয়ার জন্য আজ্ঞান করা শুধু এক অযৌক্তিক চ্যনই নয় এ আজ্ঞান যুব সম্প্রদায়কে

সাপ্তাহিক বসুমতী

গতি ঠাটা না বিক্ষিপ, ঘূর্ণ সাধারণ মানুষ তাই-ই
স্বার্থভাবে আজও বুকে উঠতে পারেন না।
কংগ্রেস সভাপতিরা এইসব ঘুরে ব্যাপার এতো
হলে ও চট করে কেননাভাবে যে বোঝেন ও
লেন, তা তাঁরাই জানেন।

সম্পদ ও সমবস্তু

কংগ্রেস সভাপতি বহু-বোধিত সমবস্তুদের
সুও বাক্যলোরে উত্থাপন করেছেন যেন তবু
সাধারণ হাতছানি দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ এ পর্বত
বানরা দেশের বা হালচাল দেখছি; অসাধু
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের যে প্রতাপ ও প্রতিপত্তির
গোড়ায় বাস করছি—তাতে কংগ্রেস সভাপতির
এই আকাশকুসুম আশ্বাসে যথেষ্ট বিশ্বাস
যা রাখা সম্ভবপর হচ্ছে না। বরং দেশের
মানুষ আজ এই দৃষ্টিভঙ্গিই চলে পাকাচ্ছেন যে,
কমপক্ষে হস্ত দারিদ্র্যের গভীর অভলে অধিকাংশ
মানুষকেই তলিয়ে যেতে হবে এবং ধনীরা
এন বৃদ্ধির চাপে প্রাসাদের লোহা-সিনেট-
গাধার নিচে ক্রমশ বিতহীন সম্প্রদায়কে
কবরস্থ হতে হবে। কংগ্রেস সভাপতি
যদি বর্তমান হতাশার সুরাষা করার জন্য
খাও গ্রন্থবোধ্য কিছু পুথি বাতলে দিতেন তবে
সহস্র সাধারণ মানুষ হস্ত ভাগবান স্রোতে
থকটুকুরে বিচালির আশ্রয় খুঁজে পেলেন।

আবকলহ

প্রথম দিবসের অধিবেশনে (ভারতদর্শন
শ্রেণি বাওয়া পর্বত এই দিনের সংবাদই আনা-
সেহ হাতে এসেছে।) আর যে কয়েকটি আলো-
চনা ও প্রস্তাব রাখা হয়েছিল তাতে কংগ্রেসের
বরোদা কোম্পানির বিকৃত চেহারা এবং তৎসংক্রান্ত
মাশভাই সবিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে। বস্তুত-
সক্ষে আসা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি
রাজ্যে উপদলীর সমস্যা আজ কংগ্রেস ঘরের
ইক্যাক বিবর্ত করেছে। অতঃরাজ্য কলহও
গুটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করছে ক্রমশ। কংগ্রেসের
নাগরিক বন্ধন যে কত শিথিল হয়ে পড়েছে,
রাজ্যকে বিভিন্ন রাজ্যের চিত্রই তার প্রমাণ।
এর পরেও যুব সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে ও
হাবলা প্রতিরোধ করতে কংগ্রেস পক্ষে আহ্বান
করান হলে সে আহ্বান অতঃপরোত্তম বলেই
বলে হয়।

অতঃরাজ্য বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির
জন্য একটি উপযুক্ত সংস্থা গঠনের আহ্বান
করান হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। যুক্তিবদ্ধ
কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীমন্ত শ্রীমন্ত যথার্থ কথাই
বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেস বেহেতু আজ আর
কোনো বিরাট ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত নয়,

সেজন্যই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি সংস্থা
গঠনের প্রয়োজন।

এই সংস্থা কিভাবে গঠিত হবে, তা এখনও
চূড়ান্তভাবে স্থির হয় নি। তবে এটুকু নিশ্চয়ই
আশা করা যাবে যে, সেই সংস্থায় যাতে পক্ষ-
পাতিষ ও একদেশদশিতার বীজ উৎপন্ন হতে না
পারে সংস্থা গঠনের সময় সেদিকেও যথেষ্ট নজর
রাখা হবে।

সভাপতি নির্বাচন

নিম্নলিখিত ভারত কংগ্রেস কমিটির সাতজন
সদস্য ১৯৫৮ সালের হায়দ্রাবাদ প্রস্তাব বাতিল
করার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে
সভায় কানরাজ-বিরোধীগোষ্ঠী প্রস্তাবটি সরকারী-
ভাবে উত্থাপনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।
হায়দ্রাবাদ প্রস্তাবানুযায়ী কংগ্রেস সম্পাদক ও
সভাপতি পদে একই ব্যক্তি দ্বারা নির্বাচিত হতে
পারেন না। সুতরাং এই প্রস্তাব বাতিল না করলে
শ্রীকামরাজ পুনর্বার কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে
তাঁর বর্তমান আসন অলঙ্কৃত করার সুযোগ
পাবেন না।

কানরাজ-অনুরাগী দল তাই প্রস্তাবটি বাতিল
করে দ্বিতীয়বারের জন্য শ্রীকামরাজকেই
চান, অন্যপক্ষে প্রস্তাবটি বহাল রেখে কানরাজ-
বিরোধীরা চান শ্রীকামরাজের পুনর্নির্বাচনের
ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে।

তবে আশা করা যায় শ্রীকামরাজের পুন-
নির্বাচনের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত করে



শ্রীকামরাজ

যাতে নিবিবাদেই তাঁকে সভাপতির আসনে বসে
রাখা যায় তার জন্য ক্রমশাশীল মহলের চেষ্টা
শেষ পর্যন্ত সাকল্যলাভ করবে।

আসান :

অসম্পন্ন বন্য

আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতার জন্যই কোটি
কোটি টাকার শ্রাস্ত করণও এদেশে বন্য

রোধ করা যায় না—এবং অভিযোগ এতাবৎকাল
পত্র-পত্রিকায় চীৎকার করে বলা হয়েছে,
কর্তারা কান দেন নি। কিন্তু সত্যের অবদান
অস্বাধীন। অন্তত জোড়হাটের বন্যা এবার
স্পষ্টতই তা প্রমাণ করল।

যদি কেন্দ্রীয় সেচ ও বন্যাজাগরণী ডঃ কে
এল রাও সরেজমিনে তদন্ত করে এই সিদ্ধান্তে



ডঃ কে এল রাও

উপনীত হয়েছেন যে, পূর্বাভাস সত্যকর্তা অবলম্বন
করলে জোড়হাটের বন্যা প্রতিরোধ করা যেত।
বন্যা প্রতিরোধে পাকিস্তানের জন্য জনাদুই
ভারপ্রাপ্ত অফিসারের ওপর তাই গন্তব্য
চার্জসীট গঠন করা হবে এবং উভয়কেই কড়া
তত্ত্বের সম্মুখীন হতে হবে।

যদিচ রাজ্যের বন্যাজাগরণী শ্রী হক-
চৌধুরী বেকারদা বুকে উজ্জ্বল অফিসারদের ওপরই
দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন, বন্যা প্রতি-
রোধে এই শোচনীয় ব্যর্থতার দরুণ তাঁরই
কিছু বন্যাজাগরণীর থেকে সর্বাত্মক এবং
সম্মানে সরে থাকা উচিত। তাঁর পুণঃস্বপ্ন
অপদার্থতার দায়িত্ব তিনি বোঝান মাইনে করা
অফিসার শ্রেণীর ওপরেই চাপিয়েই যদি
নিশ্চিত হবেন, তবে জনসাধারণের কোন
বিশ্বাসের ওপর সন্ধিহীন গদি আঁকড়ে ধাক্কা
পারেন শ্রীহকচৌধুরী তা তিনিই জানেন।

আশ্চর্যের কথা (লক্ষ্যবস্তুর বটে) শ্রীহক-
চৌধুরী কৈফিয়ত স্বরূপ জানিয়েছেন, তিনি
ইতিপূর্বে যখন উপকৃত অঞ্চল পরিদর্শন করেন,
তখনই তাঁর জ্ঞাতসারে উপরোক্ত অফিসারদের
কর্তব্যচ্যুতি করা গড়েছিল। অতঃপর তিনি
নাকি অফিসারদের বিকল্পে খুব কড়া নোটি
দেন আর সঙ্গে সঙ্গে একটি তদন্তও শুরু হয়

(যায় যান, প্রাণীজগৎ যখন বানের জলে তেজে বাড়ে তখনও শুধু তসত্তা)।

কেন্দ্রীয় নবী শু: কে এল রাও বলেছেন, এই ধ্বংসলীলা প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হত যদি সময় থাকতে ফাঁটখরা বাঁধ সারিয়ে তোলায় চেষ্টা করতেন তারপ্রাপ্ত দপ্তর।

এরপর সাধারণে সাশ্চর্যে ভাবতে পারেন, অবস্থা যখন এই এবং রাজ্য বন্যাত্রাণমন্ত্রী স্বয়ং যেখানে অবস্থার অবনতি সম্পর্কে ওরাকি-বহাল ছিলেন, তখন বন্যারোধের ব্যবস্থা না করে তদন্ত কমিটি খাড়া করার প্রয়োজনটাই বা প্রায়শিট পেয়েছিল কেন? অফিসরহরের কর্তব্যচ্যুতি বুঝলান; নবী মহোদয়ের কর্তব্য-পরায়ণতার কিছ বখেট উৎসাহিত হওয়ার কারণ অনুভব করা গেল না। ব্যাপারটা কি তাহলে 'যাক শক্ত পরে পরে' অবস্থার গড়ানার জুযোগ পেয়েছিল।

সুতরাং বঙ্গিসভা-বিরোধীরাপে চিহ্নিত এবং শ্রীহকচৌধুরীর প্রতি বিরাগভাঞ্জন ব্যক্তিক্রমে পরিপণিত শ্রীদেবেশ্বর শর্মার হকসাহেবের উপর বত রাগই থাকুক, তিনি যখন ষোড়হাটের বন্যাকে 'মনুষ্যস্ট' বলে ব্যাখ্যা করেন তখন তাঁর বক্তব্যে যুক্তিহীন বিরাপের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না।

ইন্ডিয়ান প্রেস এজেন্সীর সংবাদে শ্রীশর্মার উক্তি কে চোখ ঠেরে বলা হয়েছে, 'হকসাহেবের প্রতি শ্রীশর্মার ব্যক্তিগত আক্রোশ তিনি এই হওকার চরিতার্থ করতে চান'। বদি তাও সত্য হয়, তবু হকসাহেবের অকৃতকার্যতার সাক্ষাই তার দ্বারা বিশ্বাসযোগ্যভাবে পাওরা সম্ভব বলে ধারণা স্টি হয় না।

কেন না এই মনুষ্যস্ট ষোড়হাট পুাবনে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ছত্রিশ হাজার মানুষ ক্রতিপ্রস্তু এবং প্রায় বৎ লক্ষাধিক মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে।

নবী মহোদয় যেইকপে অফিসরহরের গলদ ধরে ফেললেন, বাঁধ সংস্থার কাছে তখনই তাঁর স্মৃতিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি উল্টোপথে গেলেন। ভারতের তদন্ত কমিটিগুলি যে একান্তই নিষ্ফল তা ভালো করে যেনেই শ্রীহকচৌধুরীও গড়িমসি করেছেন। যার কল এই ধ্বংস, বন্যা, বিনষ্ট। সুতরাং যদি বলা যায়, ষোড়হাটের বন্যা হক-বঙ্গি-ধপ্তরেরই স্টি, তবে কি বেশি বলা হয়।

শোনা বাড়ে পদত্যাগের হুমকি দেওয়ার জন্য এবার নাকি আসাম আইনসভার এগারজন এম-এল-এ একজোটে দুঃ প্রকাশ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ-কারী বিভাজনের নারে ভারতীয় মুসলমানদের

প্রতি রাজ্য সরকার কঠোর ব্যবহার কবজিলেন, এই অভিযোগে তাঁরা পদত্যাগের হুমকি দেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের কলে রাজ্য সরকার অনুপ্রবেশকারী অপসারণ সম্পর্কে পুন-বিবেচিত পদ্ধতি অনুসরণ করছেন বলেও জানা গেল। সম্ভবত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তই এগারজন অনমনীয় মুসলিম সদস্যকে নরম করতে সাহায্য করে থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এম-এল-এগণের অভিযোগে সর্ববভাবে স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন, বরং পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা মৃদু ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন আসাম সরকার।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আসাম কংগ্রেসে বর্তমানে যে ঠাণ্ডা আবহাওয়া বিরাজ করছে, ননে হয়, তা সাময়িক।



শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদ

অপসারণ সংক্রান্ত ব্যাপারেই ক্ষমতাসীন দলের বাছা বাছা হোমরা-চোমরা এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন বিগত ২৮শে জুন তারিখে।

শ্রমমন্ত্রী শ্রীত্ৰিপাঠি উক্ত এগারজন এম-এল-এর বক্তব্যকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে ব্যাখ্যা করেন। অপরপক্ষে অর্থমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদের বক্তব্য,--না, মুসলিম সদস্যগণ একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলেই নাকি হুমকি দিয়ে বসেছেন।

কিন্তু অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে আপাগোড়াই জটিলতার সন্ধান সন্দেহ উদ্ভিক্ত করে। তিনি জানিয়েছিলেন যে, সদস্যগণ কেবলমাত্র একটি পত্র মারফৎ মুখ্যমন্ত্রীকে অনুপ্রবেশকারী অপ-সারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে কয়েকটি 'সাজেশন' দেন। অথচ আসল ঘটনা এই বক্তব্যের বাধ্যবা

ধ্বাণ করে না। সংবাদে প্রকাশ, সন্দেহিত অর্থমন্ত্রী শ্রীদেবন এবং স্বমিত্রী শ্রীহক-চৌধুরীর কাছে একটি বেনোয়োগাওন পাঠাব এবং তার প্রত্যয়িত নকল পাঠান হয় মুখ্যমন্ত্রী-নিকট। মুখ্যমন্ত্রীর নবীর কাছে এই বেনো-র্যাওন পাঠানার ব্যাপারটিতে বখেট সাম্প্র-দায়িক বনোভাইই প্রকাশ পেয়েছে বলে অভিজ্ঞ-মহল মনে করেন।

বেনোয়োগাওনে বলা হয়েছে (১) গত বছরে (দ্বিতীয় অনুবোধিত) যে টাইফ্যানাল গঠন করা হয় তা ভেঙে দিতে হবে; (২) তৎপরিবর্তে অপসারণের আগে সিদ্ধান্তের বাক্যে মপার অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করতে হবে; (৩) ভারতীয় মুসলমানদের অপসারণের ব্যাপারে বিচারালয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত তদন্ত করতে হবে এবং যাঁরা ভারতীয় মুসলিম বলে প্রমাণিত হবেন তাঁদের ফিরিয়ে আনতে হবে; (৪) ভারতীয় মুসলিমদের চিহ্নিতকরণের জন্য একটি জাতীয় রেজিস্টারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

উপরোক্ত দুই মুসলিম মন্ত্রীকে সদস্যগণ বেনোয়োগাওন যোগে আরও জানান যে, বদি নবীর ব্যাপারটির সুরাহা না করেন তবে তাঁরা তো পদত্যাগ করবেনই, তাঁরা আরও আপা করবেন যে, মুসলিম স্বার্থ রক্ষার অপারগ হয়ে নবীরও তাঁদের সঙ্গে পদত্যাগ করবেন।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে এই স্মারকলিপি পঠিত হয়। কার্যকরী সদস্যগণ পদত্যাগের হুমকিতে বিকৃত হন এবং সদস্যবর্গকে তাঁদের এই আচরণের সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নির্দেশ যেন বলে মনস্থ করেন। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা পি-সি-সি'র এই নির্দেশের পরোক্ষ অর্থ এই হয় যে, অর্থমন্ত্রী যে সত্য ঘটনা বিকৃত করেছেন সে সম্বন্ধে পি-সি-সি'র সদস্য-বর্গের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, আসাম কংগ্রেসে বিরোধের মনবটা দেখা দিয়েছে যা সহজে মিটে যাওয়ার নয়।

গুজরাট :

প্রত্যাবর্তন

সৌরাষ্ট্র গুজরাটের অভিজ্ঞমহলে এবং প্রাজ্ঞ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রী ইউ এন শেখরকে নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে। অনেকেই প্রশ্ন, শ্রীদেবর কি আবার ফিরে আসছেন সঞ্জির রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য?

শ্রীদেবর সম্প্রতি পাঁচদিনের জন্য রাজ-কোট আহমেদাবাদ সফর করে গেলেন। এখানে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের বিরুদ্ধে উচ্চভাষ্য করার জন্যই এমন ধারণার স্টি হয়েছে বলে প্রকাশ। আর রাজকোটই শ্রীদেবরের রাজ-মৈত্রিক ঘাঁটি।

রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পর শ্রীধেবর খাদি এবং পানীশিক্ত কামিশনের চেয়ারম্যান পদে কাজ করে আসছিলেন। বর্তমানে তিনি নাকি বিরক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত এক পত্রে বলেছেন যে, পরিকল্পনা কমিশন যদি তাঁদের বর্তমান নীতির যত্নবশত না করেন তবে আর খাদি ও গ্রাম্য শিক্ত কামিশন টিকিয়ে রেখে লাভ কি।

শ্রীধেবর বলেন, কোটি কোটি টাকা যদি শুধু জুতো, পাওয়ার লুব, চালকল প্রভৃতির পেছনেই ব্যয়িত হয়ে যায় তবে খাদি কমিশনের প্রচেষ্টা কী কল গ্রন্থ করবে?

প্রধানমন্ত্রী এখনো সে চিঠির জবাব দিয়ে উঠতে পারেন নি। তবে ব্যাপারটির প্রতি তিনি রাষ্ট্র দিয়েছেন বলে শ্রীশাস্ত্রী লোক সারফং জানিয়ে দিয়েছেন শ্রীধেবরকে।

দারিদ্র্যশীল কংগ্রেসী যুগে আরও প্রকাশ, শ্রীধেবর-খাদি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ফেটে খুশি নন; কেন না তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। আর তাঁর পক্ষে রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করতে হলে ১৯৬৭ সালেই তাঁকে সে সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে তাল পড়বে। সাম্প্রতিক রাজকোট সংস্করণ পেছনে একটি সুরক্ষিত নির্বাচনী এলাকা অনুসন্ধানেরও সম্ভাব ছিল বলে তথাকার রাজনৈতিকমহল বিশ্বাস করেন।

শ্রীধেবর যদি শেষ মুহূর্তে রাজকোট থেকেই আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান এবং লোকসভার আসন সংগ্রহের জন্য স্বতন্ত্র পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী এম আর মাসানীর প্রতিপক্ষে নির্বাচনী দপে অবতীর্ণ হন, এখানকার অভিজ্ঞমহল তাতেও হরত খুব বেশি আশ্চর্য হবেন না। কারণ শেষ মুহূর্তে আবেদন-পত্র লিখিলে চনক স্বর্গতে শ্রীধেবরকেও নলেই সকলে জানেন।

উত্তর প্রদেশ :

নয়া বিধায়ক

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের বিবদমান জোটের ধোঁয়ায় নিতালীর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল, বর্তমানে স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী শ্রীচতুর্ভূজ শর্মা বিরুদ্ধে এক দারীকেন্দ্রিক কুশা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে সেই পুরনো ঝগড়া আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বলে প্রকাশ।

ইতিপূর্বে অটনক রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে কানপুরে মৌনব্যাপার ঘটিত অপরাধের অভিযোগ আলাড়ন হুঁটি করেছিল। প্রকাশ, রাজ্যের উচ্চকর্তাসম্মান অটনক কর্তব্যভিত্তিক পুঙ্কের ওলীতে অটনক পরিচালিকার মত



শ্রীচতুর্ভূজ শর্মা

ঘটেছে। কিন্তু শ্রীচতুর্ভূজ শর্মার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এখন পরিচালিকা হত্যার ঘটনাকে পেছনে ফেলে পানপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি উত্তর প্রদেশের অটনক এক্সিনারার নাকিন পত্নীর সম্মান হানি ঘটিয়েছেন। অভিযোগকারী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীওম্ভের ওপর স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী অতঃপর ইতিয়ান পেনাল কোডের ৫০০ ধারা অনুযায়ী উকিলের চিঠি বর্ণন করার গুণ-সম্বন্ধকণ হাড়ে হাড়ে চটে উঠেছেন।

ঘটনাক্রম ক্রত অবনতির পথ ধরলে রাজ্যপাল শ্রীবিশুনাথ দাস ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীকেও এ ব্যাপারে মাথা গলাতে হয়েছে বলে প্রকাশ।

শ্রীদাস নৈনীতাল থেকে ফিরেই বিবদমান মন্ত্রীদের মধ্যে একটি আপোষ নীমাংসার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা প্রথম পর্যায়ে ব্যর্থ হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সূচোতা কৃপালনীর নেতৃত্বে মন্ত্রিগোষ্ঠাবাদীরা শ্রীশর্মাকে ক্যাবিনেট থেকে বিতাড়িত করার অধিকার দাবি করেছেন কেন্দ্রের কাছে।

নাচার কেন্দ্র এখন ধামো ধামো বলে খবরদারি করছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী খেঁচ খেঁচ করতে বলেছেন এবং রাজ্যপালের বিচার-বিবেচনার জন্য দুই দলকেই অপেক্ষার থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজ্যপাল অনেক চিন্তা-ভাবনার পর শ্রীশর্মাকে উকিলের চিঠি দেওয়ার জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীওম্ভের কাছে কথা প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছেন। এবং গুণ সম্বন্ধকণও ক্যাবিনেট থেকে শ্রীশর্মাকে সরানোর মনি মিল

উকিলের চিঠি প্রত্যাহারের জন্য প্রাশনার ওপর পরোক্ষ চাপ হুঁটি করছেন। কিন্তু শ্রীশর্মার মতলব এ পর্যন্ত অস্পষ্ট।

ঘটনার কল্যাণ যাই হোক, উত্তর প্রদেশের ললাটে নারীঘটিত বিপর্যয় লক্ষ্যীয়। শুধু কৃপালনীর মন্ত্রিসভাকে ঘিরেই কোপল নয়, এখন বহু নাকিন মহিলার আবির্ভাব।

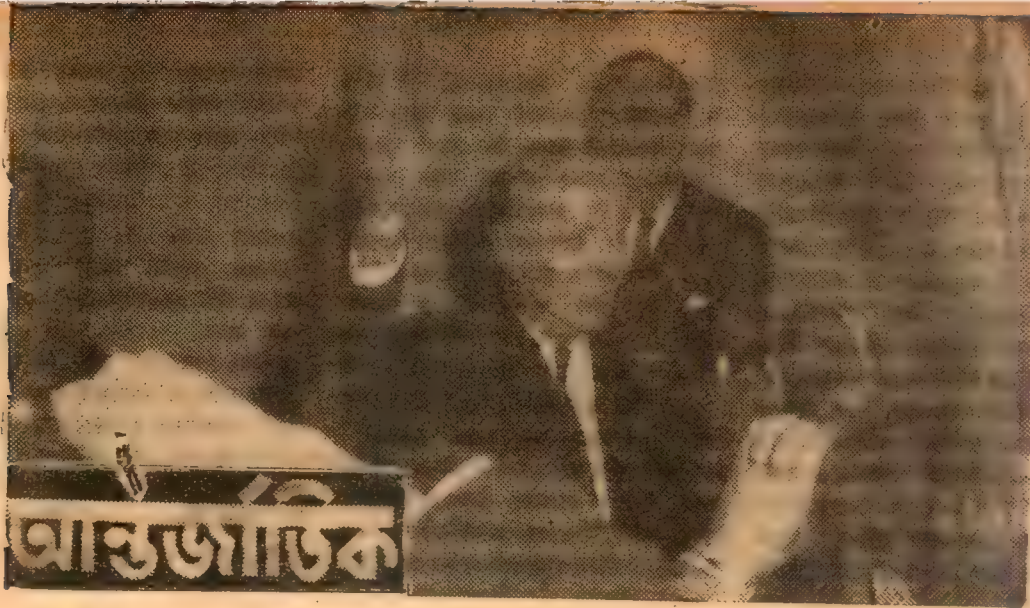
জানা গেছে আলোচ্য নাকিন মহিলা নাকি আবার পাক্ষাবের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও কংগ্রেস এম-পি'র পুত্রবধূ। তাছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি এল নশ ও আবার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর অন্তরঙ্গ সহকর্মী ছিলেন। ফলত শ্রীশর্মা-বিরোধীরা এদিক দিয়েও কেন্দ্রের ওপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন।

অপরদিকে ১৭ই জুলাই অর্ধ ও সন্ধ্যা ফর্ম গণনার দিনও বেশ বিসম্বাদের ঝড় বয়ে গেছে। রাজ্য কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীলক্ষ্মীরমণ আচার্য হাইকোর্টের কাছে এক টেলিগ্রাম যোগে অভিযোগ করেছেন যে, গণনাকার্য চলাকালীন কতিপয় মন্ত্রিগোষ্ঠাবাদী প্রমমন্ত্রী শ্রীবেনারসী দাসের সঙ্গে কর্তব্যমত মত্রে প্রবেশ করে গোপনীয় হুঁটি করেন। প্রত্যুত্তরে মন্ত্রিস-সম্বন্ধক দল প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছেন যে, বিরুদ্ধবাদীরা গণনাকার্যে যথার্থ নিয়মকানুন মেনে চলছেন না। অতঃপর ব্যাপারটা নিয়ে আবার অনুসন্ধান চলবে, চলবে বাদানুবাদ।

কানরাঙ্গের 'না'

শ্রীশর্মার মানহানি সম্পর্কিত ব্যাপারটি শ্রী সি বি ওম্ভের চাপে শ্রীমতী সূচোতা কৃপালনীর চেষ্টায় বাকালোর অবধি ঝগড়া করেছিল। উদ্দেশ্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকানরাঙ্গের ফরমান আদায় করা। কিন্তু শ্রীকানরাঙ্গ স্বশাস্ট্রভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, না, এ ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। বিশেষত শ্রীশর্মার সুনাম যেভাবে কর্তব্যক করা হয়েছে তাতে শ্রীশর্মা কোর্টে গিয়ে যদি নিজের সুনাম রক্ষা করে আসতে পারেন তবে তাতে বাধ সাধতে শ্রীকানরাঙ্গ অক্ষম।

শ্রীওম্ভ যে এখন বেশ বেকারদার পড়েছে বা তাঁর নৌড়পা দেবে ভাল মতই বোঝা যায়। শ্রীওম্ভের প্রভাবাধীন শ্রীমতী কৃপালনীও এখন সি বি ওম্ভে ত্রাণে গর্বিত সক্রিয়। ঘটনার প্যাঁচে এখন গুণ-সম্পদার নিজেরাই জড়িয়ে পড়েছেন। শ্রীশর্মাকে ক্যাবিনেট থেকে সরাতোও (মনোগত ইচ্ছা মতই থাক,) তরসা পাচ্ছেন না তাঁরা। কেন না, তাঁকে সরিয়ে দিলে তাঁর প্রতি বিচারালয়ের মহানুভূতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং তাঁর অপরাধ-কারীদের আচরণ সম্পর্কেও বিচারালয় বিরূপ মতব্য অথবা আদেশ জারি করতে পারেন।



প্রকাশনী দলের নেতৃশ্রী জাভের সিন্ধাস্তের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হিউ

ভিয়েতনাম :

ভিয়েতনামের পরিস্থিতি বহির্বিবেকের জন-সাধারণকে সীমিত চিন্তিত করে তুলেছে। বিবদমান দুই পক্ষই আন্তর্জাতিক সত্তার তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। সত্যি কি শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনামকে কেন্দ্র করে বিশ্ববৃদ্ধ সূত্র হবে?

কিন্তু বর্তমানে বৃদ্ধের কৃৎসি যে কেউই নিতে চায় না, এ বিষয়েও তো কোন সন্দেহ নেই। তাই দেখা যায়, পতীর অশ্বকায়ের মধ্যেও বার বার আলোর আধা। যে সূত্রের মনে হয়, শান্তিপ্ৰতিষ্ঠার আর কোন সম্ভাবনা নেই—আলোচনার সব দ্বার বন্ধ, এবার প্রচলিত সমস্যা সূত্র হবে, তিক তার পরমহুতেরই দেখা যায়, আপোষ-আলোচনার নতুন প্রচেষ্টা সূত্র হয়েছে।

হ্যানের ডেভিস মিশন বার্থ হবার পর প্রায় সবাই ভেবেছিলেন চীন বা উত্তর ভিয়েতনাম কোন মতেই আর আলোচনার বসবে না। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন হতাশ হন নি। তিনি বলেছিলেন, হ্যারল্ড ডেভিসের হ্যানের যাত্রার ফলে বরফ ভাঙে নি বটে, তবে বরফখণ্ড কয়েকটি জায়গায় ছিঁড়ি খেয়েছে। ভবিষ্যৎ আলোচনার পথ অন্তত কিছুটা প্রশস্ত হয়েছে।

উইলসনের ধারণা যে একবারে ভুল নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। উগান্ডার প্রধান-মন্ত্রী মিলটন ওবোতো গত সপ্তাহে পিকিং-এ ছিলেন। তিনি মাও-সে-তুং ও অন্যান্য চীনা নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মাও-সে-তুং ওবোটোকে বলেছেন, উইলসনকে বাদ দিয়ে যদি কমনওয়েলথ শান্তি মিশন গঠিত হয়, তবে সে শান্তি মিশনের সঙ্গে তফাৎ

আলোচনা করতে তাঁরা রাজী আছেন। পিকিং সফরের শেষে ওবোটো টোকিও এলে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণরত উগান্ডার তথ্য, প্রচার ও পর্যটন দপ্তরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী পি. এম. সিকিরা সাংবাদিকদের কাছে এই কথা বলেন।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিনও বলেছেন, উইলসনকে বাদ দিয়ে শান্তি মিশন এনে তাঁরা সে মিশনকে স্বাগত জানাবেন।

চীন ও উত্তর ভিয়েতনাম যদি সত্যি এই মনোভাব গ্রহণ করে থাকে, তবে তা পূর্বের অনুসৃত নীতির পরিবর্তনই সূচিত করছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এর আগে তারা বৃটেনকে বাদ দিয়েও কমনওয়েলথ শান্তি মিশনের সঙ্গে কথা বলতে

চায় নি। কমনওয়েলথ শান্তি মিশনের সঙ্গে আলোচনা করতে অস্বীকার করার ফলে আফ্রিকার দেশগুলিতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, সম্ভবত তার অন্যই চীন ও উত্তর ভিয়েতনামের মনোভাবের এই পরিবর্তন হয়েছে। বৃটেনকে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত কমনওয়েলথ শান্তি মিশন করতে গেলে আফ্রিকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আফ্রিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও চীন-উত্তর ভিয়েতনাম আলোচনা করতে চায় না, এই কথা কলমে আফ্রিকার চীন বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে বাধ্য।

ঘানার রাষ্ট্রপতি কোরমো ননুয়ার বিশেষ প্রতিনিধি কোরেশি আরমা ইতিমধ্যেই সঙ্কম হয়ে হ্যানরের পথে রওনা হয়ে গেছেন। আরমা লন্ডনে ঘানার হাইকমিশনার। ভিয়েতনামের ব্যাপারে আপোষ আলোচনার সূত্র উদ্ভাবনের জন্য তিনি হো-চি-মিনের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছেন। উইলসন সহ অনেকেরই ধারণা ডেভিস মিশন বার্থ হলেও আরমা মিশন বার্থ হবে না। হো-চি-মিনের সঙ্গে কোরেশি আরমার আলোচনার ফলে একটা সমাধান সূত্র বের করা সম্ভব হবে। মার্কিন বৃত্তরাষ্ট্র অবশ্য আরমার হ্যানের যাত্রার ওপর খুব একটা জোর দিচ্ছে না।

তবে চীন ও উত্তর ভিয়েতনাম উভয়েই যে-কোন প্রকার আপোষ-আলোচনার পূর্ব সত্তরূপে উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা, বর্ষণ বন্ধ এবং ভিয়েতনাম থেকে বিদেশী সৈন্যের অপসারণের দাবি জানাবে। এই দাবি মেনে নিলে কি মার্কিন বৃত্তরাষ্ট্র আলোচনার প্রস্তাবে রাজী হবে?

আপোষ-আলোচনার চেষ্টার সূত্র সূত্র



হো-চি-মিন

দুই তরফেই যুদ্ধের জোর প্রস্তুত চলছে। ভিয়েত কং গেরিলারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের চার-পঞ্চমাংশ দখল করে ফেলেছে বলে হ্যানয় বেতার থেকে দাবি করা হয়েছে। ভিয়েত কং গেরিলাদের পরাস্ত করা ও উত্তর ভিয়েতনামকে সার্বভৌম করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে বলে মনে হচ্ছে। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারা সেনাপতিমণ্ডলীর যুক্ত অধ্যক্ষদের সঙ্গে নিয়ে ভিয়েতনামের রণাঙ্গন পরিদ্রমণ করেছেন এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের নেতাদের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ আলোচনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন ফিরে গিয়েই রাষ্ট্রপতি লিনডন বি জনসনের সঙ্গে রুদ্ধাধার কক্ষে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছেন। শোনা যাচ্ছে, ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণ কৌশলের ক্ষেত্রে শীর্ষগির গদরুতর রকমের পরিবর্তন হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চীনের ওপর চরম চাপ দেবার জন্য চেষ্টা করছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, চীন সীমান্ত থেকে মাত্র ৬৭ কিলো মিটার দূরে মার্কিন বোমা বর্ষণের

কোন নাম অবশ্য উল্লেখ করা হয় নি। চীন বা সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে অস্ত্রসাহায্য উত্তর ভিয়েতনাম অনেক দিন থেকেই পাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবক পাচ্ছে কি না, সেইটাই প্রশ্ন। যদি এখনও স্বেচ্ছাসেবক (যা আসলে সৈন্য) না এসে থাকে, তবে অদূর-ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আসবে। বৃটেনের রক্ষণশীল দলের বিশিষ্ট নেতা রোজিন্যান্ড মডলিং সম্প্রতি মস্কো গিয়েছিলেন। মস্কোতে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর তাঁর এই ধারণা হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন, উভয়েই উত্তর ভিয়েতনামে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাবে।

গত সপ্তাহে বৃথারস্টে রুম্যানিয়া কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন উপলক্ষে সমবেত সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক চৌ শিয়াঙ-পেঙের মধ্যে ভিয়েতনাম নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। মার্কিনী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীন, সোভিয়েট ও উত্তর ভিয়েতনামের সম্মিলিত প্রতিরোধের সম্ভাব্য কার্যক্রম নিয়েই তাঁরা আলোচনা করেছেন।

বৃটেন

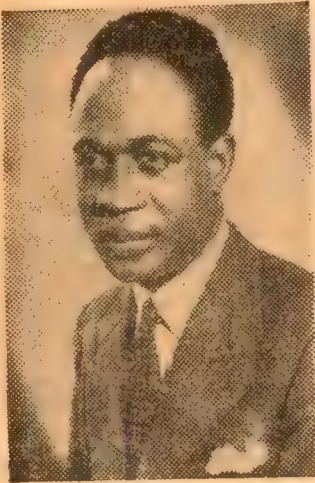
রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব পদ থেকে স্যার আলেকজান্ডার ডগলাস হিউম অবসর গ্রহণ করেছেন। হিউমের পদত্যাগের সংবাদে কেউ-ই বিশেষ বিস্মিত হয় নি, তিনি আরও আগে কেন যান নি, এই নিয়েই লোকের মনে বরং বিস্ময় ছিল।

হিউম যখন প্রধানমন্ত্রী হন, তখন তাঁর মা পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে যে কখনও বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হবেন, এ কথা তাঁর মনেই হয় নি। আলেকজান্ডার ডগলাস হিউম ভাল মানুষ, শিক্ষিত ও পরিমার্জিত রুচির সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তি বা যোগ্যতা তাঁর ছিল না। হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের পদত্যাগের সময় এক-রকম বলতে গেলে অপ্রত্যাশিতভাবেই হিউমকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে। দলের নেতা বা কর্মীদের সকলের ইচ্ছায় তিনি প্রধানমন্ত্রী হন নি। প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে বিবদমান নেতাদের কলহ মেটাবার জন্য ম্যাকমিলান ও চার্চিল রাণী এলিজাবেথকে পরামর্শ দেন, হিউমকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য। তখনকার মত দলাদলির অবসান হলেও দলাদলি একেবারে বন্ধ হয় নি।

হিউমের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দলের পক্ষে সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না, এমন সন্দেহ অনেকেরই মনে দেখা দিয়েছিল। নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিরোধী দলের নেতারা হিউমের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা হয়েছে। তাই রক্ষণশীল দলের মধ্যে

নেতৃত্ব বদলের দাবি অনেক দিন থেকেই উঠেছে। হ্যারল্ড উইলসনের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক দলের মন্ত্রিসভার চার ভোটার সংখ্যাধিক্য বেশি দিন থাকবে না এবং যে-কোন সময় নতুন নির্বাচনের প্রয়োজন হবে, অনেকের মনেই আজ এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আগামী নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রক্ষণশীল দলের একজন যোগ্য নেতা চাই।

এখন প্রশ্ন হল : রক্ষণশীল দলের নতুন নেতার পদে কে অধিষ্ঠিত হবেন? শোনা যাচ্ছে, মঙ্গলবার (২৭শে জুলাই) নতুন নেতার নির্বাচন হবে। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সময় হয়তো নতুন নেতার নাম ঘোষণা করা হয়ে যাবে। বর্তমানে ডিনজনের নাম শোনা যাচ্ছে। এঁরা হলেন : উইথ এডওয়ার্ড হিথ, রোজিন্যান্ড মডলিং ও ক্রিস্টোফার সোমস। নেতারূপে প্রথম দু'জনেরই নাম ডাক বেশি। তবে শেষ পর্যন্ত দু'জনের কলহ মেটাবার জন্য তৃতীয় ব্যক্তিরূপে সোমস-এর ডাক পড়তে পারে বলে অনেকের



মক্সম

মধ্যে। এর পর কি খাস চীনেই বোমা ফেলা হবে? চীন যেন ভিয়েত কং গেরিলাদের কোন সাহায্য না দেয়, এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায়।

মার্কিন আক্রমণের মধ্যে চীন বা সোভিয়েট ইউনিয়নও চুপ করে বসে নেই। সম্প্রতি হ্যানয় বেতারে বলা হয়েছে উত্তর ভিয়েতনাম কতকগুলি কমিউনিস্ট দেশ থেকে অস্ত্রসাহায্য ও স্বেচ্ছাসেবক পাচ্ছে। বাইরের সাহায্য সম্পর্কে এরূপ স্বীকৃতি এর আগে উত্তর ভিয়েতনাম কখনও করে নি। কাদের কাছ থেকে এই সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে সে বিষয়ে



হোলাং

ধারণা। তা ছাড়া সোমস চার্চিলের জামাই। নেতারূপে নির্বাচিত হবার পক্ষে রক্ষণশীল দলে এই পরিচয়ের যথেষ্ট দাম আছে।

তবে যিনিই নতুন নেতা হোন না কেন, তার ফলে ব্যক্তির পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু দলের নীতির ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন হবে না।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র :

কায়রো থেকে চাণ্ডল্যাকর সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। গত ২০শে জুলাই সংযুক্ত আরব

প্রজাতন্ত্রের 'বিপ্লব দিবসে' গামেল আবদুল নাসেরকে হত্যার এক চক্রান্ত ধরা পড়েছে এবং এই চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করেকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ২০শে জুলাই 'বিপ্লব দিবসের' অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য সোভিয়েট বিমান 'ইলিউশন' যখন মাদ্রাস সড়ক করে, তখন চারজন মিশরীয় ইঞ্জিনীয়ার এই বিমানে কিছু বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র ভোলার জন্য চাপ দিতে থাকে। এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং এই চারজন ইঞ্জিনীয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে এই ইঞ্জিনীয়াররা সব কথা স্বীকার করেছেন। চক্রান্ত করা হয়েছিল, বিমান থেকে অস্বাভাবিকভাবে নাসেরের গ্ৰীষ্ম-কালীন বাসভবনে বোমা নিক্ষেপ করা হবে। নাসেরকে হত্যা করে সৈন্যবাহিনীর একাংশ ক্ষমতা দখল করবে এবং জেনারেল নাগিবকে আবার ক্ষমতায় বসাবে। এই চক্রান্তে আল-জিরায়ার মিশরীয় নৌ সৈন্যদেরও বোমা দেবার কথা ছিল। নাগিব পশ্চিমীয়েবা, সুতরাং এই চক্রান্তের পেছনে পশ্চিমীদের হাত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে আরও একটি খবর বেরিয়েছে। কাররোর সরকারী নিয়ন্ত্রিত পত্রিকাগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক 'আল আক-বরর' প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সহকারী সম্পাদক মুস্তাফা আমিনকে গৃপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মুস্তাফা আমিন যখন তাঁর বাড়িতে মার্কিন গৃপ্তচর বিভাগের রুস টেলর ওডেনের হাতে গোপনীয় কাগজপত্র দিচ্ছিলেন, তখন মুস্তাফা আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রুস টেলর ওডেন কাররোর মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারী বলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাসেরকে পছন্দ করে না, এ কথা সবাই জানে। কিন্তু তাই বলে তারা নাসেরকে হত্যা করার চেষ্টা করবে এবং সৈন্যদলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে মার্কিন-অনুগামীদের সাহায্যে ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করবে, এতটা জানা যায় নি।

নাসেরও তাঁর সম্প্রতিক বক্তৃতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁর সমালোচনা করেছেন। নাসের অভিযোগ করেছেন, মার্কিন সাহায্যের বিনিময়ে মার্কিন সরকার সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ওপর অন্যান্য চাপ দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করতে পারবে না, রকেট উৎপাদন বন্ধ করতে হবে এবং মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের জন্য মার্কিন সামরিক ইনস্পেক্টর নিয়োগ করতে হবে। এইসব অসম্মানজনক অস্ত্র মনো নিয়মে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র মার্কিন সাহায্য নেবে না বলে নাসের ঘোষণা করেছেন।

এই বক্তব্যেই নাসের সৌদি আরবের

উদ্দেশ্যে কতো ধমক দিয়েছেন। ইয়েমেনের ক্ষমতাসূত ইমাম বদর ও তাঁর সমর্থক রাজ-তন্ত্রীদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সৌদি আরব সাহায্য করছে এবং এই ব্যাপারে সৌদি আরবের পেছনে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তেন। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ইয়েমেনের বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক শাসনের সমর্থক। নাসের বারে বারে দাবি করেছেন, সৌদি আরব ইয়েমেনের ব্যাপারে নাক গলাতে পারবে না। অপর কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের মধ্যস্থতার বর্তমানে সৌদি আরবের সঙ্গে ইয়েমেনের আলপায়েব চেষ্টা চলছে। নাসের বলেছেন, এই আপোষ-আলোচনা ব্যর্থ হলে, তিনি



নাসের

সৌদি আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। আসলে তাঁর এই ধমক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তেনের বিরুদ্ধে, তা বৃকতে কানও অসুবিধা হয় নি।

পাকিস্তান :

পাকিস্তানকে নতুন করে আর মার্কিন সাহায্য দেওয়া হবে না বলে যে কথা বলা হয়েছে, তাতে সারা দেশে রীতিমত হৈ-ঠে পড়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গঠিত 'বিশ্বব্যাপক' অর্থীন নরটি রাষ্ট্রের অর্থপ্রতিষ্ঠান 'এডু ট্রু' পাকিস্তান জনসং-টিয়ামের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্জাবীকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের জন্য ৫০ কোটি ডলার দেবার কথা ছিল। এই অর্থসাহায্য বিবেচনার জন্য ২৭শে জুলাই কনসারটিয়ামের সভা বসবে ঠিক ছিল। কিন্তু হঠাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়ে দিয়েছে, ২৭শে জুলাই-এর পরিবর্তে ২৭শে সেপ্টেম্বর এই বৈঠক হবে এবং ইতিবাসরে তারা অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আবদু খাঁকে জানিয়েছেন, মার্কিন কংগ্রেস এর জন্য বর্তমানে কোন অর্থ বরাদ্দ করে নি।

অর্থসাহায্যের প্রস্তাব বিবেচনার তারিখ

হুমাস পিছিয়ে দেবার অর্থ আর কিছুই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে পরিষ্কার করে কথা বলে নিতে চায়। পাকিস্তানের চীন-প্রীতি অনেকদিন ধরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পছন্দ বলছে না। সম্প্রতি আবার পাকিস্তান সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গেও বন্ধন করেছে। ভিন্নত-নামের ব্যাপারে পাকিস্তানের মনোভাবও মার্কিনী কতারা চটেছে। আমাদের টাকার বেশ চালাবে, আর আমাদের বিরুদ্ধেই কথা বলবে, এ চলবে না—এই হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব। তাই অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে, এই হুমকী দিয়ে পাকিস্তানকে দিয়ে মাক-কান মূল্যে নিতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই হুমকীতে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিতিরসার সৃষ্টি হয়েছে। তারা খুশি তুলেছে মার্কিন সাহায্য চাই না। মার্কিন সাহায্য ছাড়াই পরিকল্পনার কাজ চালাতে হবে। এমন দাবিও করা হয়েছে, 'সিয়োটো' ও 'সেটো' থেকে পাকিস্তানকে বেরিয়ে আসতে হবে। এই দাবিতে গত ২০শে জুলাই ঢাকার ছাত্ররা এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল। ঢাকার ইউ-এস-আই-এস ডবনে ছাত্ররা ইউ-পার্টকেলও ছুঁড়েছিল। ছাত্রদের ওপর পাকিস্তান পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কান্দুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এর ফলে নিকটবর্তী পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাবের বাড়িটিও ক্ষতি হয়েছে।

কেবল জনসাধারণ নয় পাকিস্তানের সরকারী নেতারাও মার্কিনী হুমকীর বিরুদ্ধে কড়া কড়া কথা বলছেন। আরব বা, জর্দানকার আল ফুটো, গোদার কার্য সবাই বলছেন, চাই না এমন মার্কিন সাহায্য। কি ব্যাপার? হঠাৎ মার্কিন বংশদ্ভূত পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে এসব কথা কেন? বিরোধীরা বলছেন, এ হল প্রগতিশীল শাসনের চেষ্টা। জনসাধারণকে দেখানো হচ্ছে, দেখা, আমরা কত প্রগতিশীল, ভিন্নতনামে সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করছি বলে মার্কিনী কতারা আমাদের টাকা বন্ধ করে দিচ্ছে। তা ছাড়া, সারা দেশে মার্কিন বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ দেবার উদ্দেশ্যও আছে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ত্যাগ করবে না, গৃপ্তচর রাগ দেখালে তারা আত্ম করে ডেকে নেবে, এই ভাষণ হয়েছে পাকিস্তানের নেতাদের।

আসলে যতই কলঙ্ক না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও সামরিক সাহায্য বাদ দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে এক পাও চলা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত মার্কিন কতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের নির্ণায়িত অর্থই পাকিস্তান সাহায্য নেবে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১. সপ্তচর্যারংশ প্রবাহ

সেই শত শত শতাব্দী পূর্বে বাংলা দেশে চিনির ব্যবসার মোড় ঘুরে গিয়েছিল বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক সেই চিঠিতে। এই চিঠি লিখেছিল বাঙালী চিনি ব্যবসারীরা।

তাদের চেয়ে এই সুনির্দিষ্ট পণ্যসম্ভারকে রক্ষা করে এক আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বকবক করে উঠেছিল।

বাংলা দেশের এই চিনির বহু অপচয় হতো। সেটা বুঝতে পারা গিয়েছিল চিঠির একটি কথায়।

কয়েক অফ দি প্রোডাকশান ইজ নট রিগুলায়। দ্যাট ইজ হোয়াই প্রাইস অফ দি ইজ ইজ এভার ইনক্রিজিং ইন দি মার্কেট...

কেনন করে চিনির উৎপাদন একরকম থাকবে? চিনি ভো আর আখগাছ থেকে হয় না। আখের রসের ভেতর থেকে বহু পোস্তের ভেতর দিয়ে চিনি তৈরি হয়। কিন্তু এই আখগাছের চাষ করতে সাধারণ চাষীরা। তারা মাঠে মাঠে ফল্যতো আমন ধান। বুনতো রবিসস্য। সেইসঙ্গে আখ-গাছও লাগাতো। তারা—

তারা অতশত জানতো না, এই আখের রস থেকে কি কি হতে পারে। তাদের দৃষ্টি গ্রামের পরিধির ভেতরে সীমায়িত। ছোট বৃক্ষ ছোট স্বার্থ নিয়ে সুখী, শান্ত পরিহৃত মানুষ। আর জীবন ছিল একেবারে কৃষি-কেন্দ্রিক! মাঠের ফসলের দিকে স্থিরলক্ষ্য রাখা এদের জীবনচক্র স্বাভাবিক ফলের মত অবিচ্ছিন্ন।

যেই আকাশে মেঘে মেঘে আসতো বর্ষার নিমন্ত্রণ, রিমঝিম রিমঝিম শব্দে নামতো বৃষ্টি, কৃষকরা তখন ধানের চারা লাগানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তো। খানগাছ দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠতো। অগ্রহারণে মনে হতো মাঠে মাঠে কে বেন সোনার স্তূপ সাজিয়ে রেখেছে। এদিকে ধান কাটার মরসুমের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য হয়ে যেত আখগাছ কাটার কাজ। বাড়ির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে আখগাছ স্তূপ করে রাখতো।

সেকালের বাঙালী গৃহস্থবাড়ির ছবি পাওয়া যায় মশোর-খলনার ইতিহাসের পাতায়।

বাড়ির প্রাঙ্গণে আখ মাড়াই আরম্ভ হলেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে জাগতো উল্লাসের বিকিরণ। একদিকে দীর্ঘ আখ-গাছের পাতা ছাড়ানো হচ্ছে; আর একদিকে আখ পেয়ার কাজ চলেছে। পেষণযন্ত্রটি ছিল অদ্ভুত। দুটো মোটা মোটা লোহার রড পাশাপাশি ঘুরছে অভ্যন্তরীণ গতিতে। দুই রডের মাঝখানে আখের দণ্ডটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। নিচে একটি বড় গমলার রস চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। মিষ্টি রসের গন্ধে মাছি আসে কীক কীক। বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা বাঁটি, প্লাস, যে বা পায় তাই নিয়ে এগিয়ে আসে। যদি টাটকা রস পাওয়া যায়।

শুধু ছোটরা নয়। বড়রাও এই মিষ্টি রসের আকর্ষণ এড়াতে পারে না। রস জ্বাল

দিয়ে গড় করার আগেই প্রচুর অপচয় হয়। তারপর—

রাতির অন্ধকারে হতো আখ চুরি! গৃহস্থরা এইসময় সারা বছরের গড়ের প্রয়োজনটা ভাড়ারঘরে মজুত করে রাখতো। বেশিরভাগ গৃহস্থই জানতো না গড় থেকে চিনি প্রস্তুত করার প্রণালী। আর চিনি নিয়ে যে আন্তর্জাতিক ব্যবসা হতে পারে এবং নিখিল বিশ্ববাস্তবকে যে ব্যবসাবান্ধব ধারিত হয়ে উঠেছিল, দুই নিহৃত পল্লীর চাষীর পক্ষে তা জানা সম্ভব ছিল না। তাই—

চাষীদের, গৃহস্থদের অজ্ঞতার জন্যই প্রচুর অপচয় হতো। কমে যেত উৎপাদন। বেড়ে যেত চিনির মূল্য। কিন্তু আখগাছের ফসল বারো ফলার সেই চাষীরা। চিনির ব্যবসারী মহাজনেরা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের লোক। তারা অনুসন্ধান করতে সূর্য করেছিল, কেন—কেন উৎপাদন কমে যাচ্ছে। কারণ জেনে নিয়ে প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিল।

সরকার এই পণ্যসম্ভারের ব্যবসার উন্নতির জন্য মনযোগ দিয়েছিল—সেকথা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু—

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সর্বাপেক্ষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলার চিনির উৎপাদনের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পেল না। তখন সরকারী প্রতিনিধিরা বাংলা ছেড়ে অন্য প্রদেশের দিকে নজর দিল।

সেখা গেল, গড়-চিনির আদি উৎস এই আখ বড় অদ্ভুত গাছ। শুধু বাংলার নয়

সাম্প্রতিক বঙ্গদেশ

কোমল মাটি নয়, সংবৃত্ত-প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এমন কি মহারাষ্ট্রের রুম্ম অনূর্বর মাটিতেও আশ জন্মার প্রচুর। তাই—

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দলিলে লিখছে, —সে (গডনামেন্ট) স্টাটেট পারচেজিং কেনস জন্ম নেবারিং প্রতিসেস, মেনলী বেনারস।

ওদিকে বাহিরাতে প্রচুর চাহিদা চিনির। বিদেশী সরকার চিনি কিনতে লাগল বেনারস থেকে, কিনতে লাগল বোম্বাই থেকে, ভারত-বর্ষের আরও বহু বিখ্যাত নগর ও পল্লী থেকে। কিন্তু—

আবার একটি পটভাষা হলো। এই চিঠিরও মূল্য আছে চিনির ব্যবসার ইতিহাসে। ১৭৭৬ থেকে ১৭৯০ সালের ভেতরে এক বিখ্যাত ব্যবসারী লিখেছিলেন সরকারকে। চিঠিটির বঙ্গানুবাদ নিচে দেওয়া হলো:

বাংলা দেশ থেকে ধান, চাল, চিনি, সিল্ক এবং সিল্কের সুতো রপ্তানী হয় প্রচুর। কিন্তু এদের ভেতরে চিনির তুলনা হয় না।

বেংগল সুগার। শব্দ এই কথাটা শুনতে গেলে পৃথিবীর কোন দেশ আর অন্য কোন চিনি কিনবে না। বোম্বে সুগার, মাদ্রাসা সুগার, ইউ পি সুগারের স্বাদ বেংগল সুগারের কাছে কিছুই নয়। বাংলা দেশের চিনির স্বাদ অত্যন্ত মিষ্ট। কিন্তু

অন্যান্য প্রদেশের চিনি কেনন জলো, কেনন পানসে।

শব্দ, তাই নয়। মদ তৈরির হুল উপাদানও কিন্তু গুড় ও চিনি। বাংলার চিনি দিয়ে খুব উৎকৃষ্ট রাম (একধরনের মদ) হতে পারে।

বিদেশে যারা একবার বাংলার চিনি দিয়ে মদ তৈরি করেছে তারা শব্দ চায় বেংগল সুগার।

এই পরিস্থিতিতে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, যদি মহানুভব সরকার চিনির রপ্তানীর পরিমাণ বিদেশে আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন, তাহলে কিছু বিদেশী মদ্রা ঘরে আসে। দেশও সমৃদ্ধ হয়।

এই চিঠিতে কিছু কাজ হয়েছিল। ১৭৯১ সালেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ২৯,৮০৭ টন চিনি—খাটি বেংগল সুগার রপ্তানী করতে পেরেছিল। আর বাংলা দেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশ থেকে রপ্তানী করেছিল ৬৭০,৮৩২ টন।

নিচে চার বছরের রপ্তানীর হিসাব দেওয়া হলো। যেসব দেশে রপ্তানী হয়েছে, সেসব দেশের নাম দেওয়া সম্ভব নয়। শব্দ, আমেরিকা ও লন্ডনের নাম উল্লেখ করা হলো

বর্ষ	রপ্তানীর পরিমাণ মূল্য : লিবার্টাক্স
১৭৯৫—৯৬	৮২০,১৮৬
১৭৯৬—৯৭	১১,৫৭,৭১৫
১৭৯৭—৯৮	৮,৪৬,৭৫২
১৭৯৮—৯৯	৩,২৪,১৬৮

রপ্তানীর পরিমাণ	লন্ডন	আমেরিকা
১৭৯৫—৯৬	০,০৬,০৬১	১,২৬,১৭৯
১৭৯৬—৯৭	৪,৭৭,০০০	৫,৩৪,২৪৮
১৭৯৭—৯৮	১,৮২,৬৫০	৫,১৯,৮০৫
১৭৯৮—৯৯	৬৪,৪৭৮	৬১,২৬২

ওপরের হিসাবে লক্ষ্যীঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা বিদেশী সরকার শত চেষ্টা করেও বছরের পর বছর নিয়মিতভাবে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াতে পারে নি, অর্থাৎ বাড়তে পারে নি বেংগল সুগারের উৎপাদনের পরিমাণ।

পৃথিবীর বহু দেশে বেংগল সুগার কিন্তু আকাশের সুন্দর তারার মতই হয়ে রইল। এই অতীতে, এই না-পাওয়ার বেদনার ভেতর থেকেই কিন্তু লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যতের চিনি ব্যবসার অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির সেই উজ্জ্বল ইতিহাস।

(রসমশঃ)

শুষ্ক ঘর নিত্য প্রয়োজনীয়

বাখাধরা, বাখা ও বেদনা, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েন্স।
প্রতিষেধক নিরামিষ নিশ্চিত ও দ্রুত আরামের
জন্য এলসিড। এলসিড ৫টি কার্যকরী উপায়ে
মিশ্রণে তৈরী যা বাখার উপশম ঘেহ,
অরুণ্য কলার এবং অবসন্নতা দূর করে কৃতি
আনে। এলসিড যাত্রা ছুটি বড়িতেই কাল দেয়।

এ্যান্টল ব্যাক্রমণ প্রতিরোধ করে। ৮-১৫-
হেডার, পোকার কামড়ে এ্যান্টল লাগান—
প্রশিক্ষিত কল পাবেন।
জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য এ্যান্টল
দিয়ে নিয়মিত যত্ন নোহা এবং কুলকুলো
করা বিশেষ ফলপ্রসূ।

পোকা, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক
চর্মরোগের জন্য নিরামিষ, নিত্য প্রয়োজনীয়
ও আরামদায়ক এ্যান্টিসেপ্টিক অয়েলসিড।
কতদূর জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে।
ফলস্বপ্নে বাগ লাগে না।



শুষ্ক ঘরে
রাখুন

■ এলসিড
■ এ্যান্টল ■ এ্যান্টিসেপ্ট

বেঙ্গল ইনিসিটিভ তৈরী



কালকবি রজনীকান্ত সেন

রথীন্দ্রনাথ রায়

কালকবি রজনীকান্ত একটি বিশিষ্ট নামের অধিকারী। তিনি ছিলেন স্বপ্নারু। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে (২৬শে জুলাই, ১৮৬৫—১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯১০) ক্যালারে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর রচনার পরিমাণও বেশি নয়, মাত্র আটখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। তার মধ্যেও তিনখানি কাব্য—‘বাণী’ (১৯০২), ‘কল্যাণী’ (১৯০৫) এবং ‘অমৃত’ (১৯১০) তাঁর আরও কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতা ও গানের অন্তত অর্ধশত জীবনের অন্তিম অব্যাহত হালপাতালে কবে লেখা। এই প্রতিভাবান কবি ও গীতিকার আজ এক বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসে পরিণত হয়েছেন। এর কারণ একাধিক। তিনি ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ। কেউ তাঁকে পদ-পত্রিকার কবিতাগুলি প্রকাশ করতে বললে তিনি কলঙ্কিতেন—‘Love is blind.’ ইতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ই ছিলেন এ বিষয়ে তাঁর প্রধান উৎসাহদাতা। দীর্ঘকাল পরবর্ত্ত কালকবির কাব্যপ্রতিভা বৃহত্তর সাহিত্যিক সমাজের অগোচরেই ছিল। যিতীয়ত, তাঁর কাব্যে শততন্ত্রী বীণার সুস্ব-বৈচিত্র্য ছিল না, ছিল নিঃসঙ্গ বাউলের একতারা। তাই সাধারণ স্নানদেবের বিচিত্রবিন্যাসী জন সেই নিতৃত সাধনার ইতিহাসে বিস্মৃত হয়েছেন। বাতে বর্ণবৈচিত্র্য নেই তা যেমন চোখে নেশা ধরায় না, তেমনি বাতে উদ্ভজন্য নেই তাতে হৃদয়স্পন্দন জাগায় না। কালকবির দেশপ্রেমের গানগুলিতেও তথাকথিত উদ্ভজন্যের অভাব সে যুগের অনেকেই যা দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এই কারণে এক সময়ে রথীন্দ্রনাথের কবিতা পরবর্ত্তও অপারঞ্জন ছিল। বাংলাসাহিত্যে ‘হেম-নবীনের’ সংস্কার কাটতে সময় লেগেছিল।

রজনীকান্তের কবিতা ও গানগুলির সংগে মৃত্যু-নিটোল শরণ-শিশিরের তুলনা করা যায়। শরণকালে ঘাসের বৃকে শিশিরকণিকা করে পড়ে—স্বচ্ছতার ও স্নিগ্ধতার তার তুলনা কোথায়? কিন্তু কর্মবাস্ত পথচারীদের তা চোখে পড়ে না। রজনীকান্ত শান্তরসের কবি, ভক্তকবি, তাই তার স্বার্থে এতই গোপন যে, অনেক সময় নয়ন-মন এড়িয়ে যায়। রজনীকান্তের প্রতিভা মূলত গীতিকারের; ছোট ছোট গানের সংহত রূপের মধ্যেই তার সিদ্ধি। তাঁর রচনার পরিমাণ যেমন বেশি নয় তেমনি স্বপ্নারুত সংগীতের

মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। তাই তাঁর কাব্য ও সংগীতগুলি বস্তুবৃত্তিক সাধারণ পাঠকের ভোজন-বিনোদ মিষ্টান্তও অকম। তা ছাড়া, উপযুক্ত স্বরলিপিও অভাব। এককালে কালকবির গান বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাঁর গানের স্বরলিপি প্রস্তুত হয় নি। আজ মাত্র দু’টিভিন্নজন গায়কের কণ্ঠেই তাঁর গানগুলি মাঝে মাঝে শোনা যায়। ‘সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা’তে মাত্র কতকগুলি গানের স্বরলিপি পাওয়া যায়। রজনীকান্তের গানের স্বরলিপি তৈরি করার বিশেষ প্রয়োজন। হয়তো গ্রামোফোন কোম্পানীতে খোঁজ করলে কিছু পুরনো গানের হিসিস মিলতে পারে। সংগীতবৃত্তিক ও সংগীত-সমালোচকদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

কালকবির জীবন-মৃত্যুকে নিয়ে তাঁর ভাগ্য-বিধাতা এক বিচিত্র প্যারাডক্স রচনা করেছেন। ‘জীবন যখন শূন্য করে যায় কর্ম-সাধনার এসো—কালতর্পণী কবির এই বাণী কালকবির জীবনে সফল হয়েছিল। জীবনের শেষ আট মাস তিনি হালপাতালে ছিলেন। তিনি শুধু কতকষ্ট, জীর্ণদেহ, কিন্তু সাহিত্য-সাধনার বিরাম ছিল না। এই সময়েই তিনি অনেকগুলি নীতিকবিতা ও গান রচনা করেন। এই সময়ে তিনি যে ‘হালপাতালের রোজনামচা’ লিখেছিলেন, তাতে ব্যক্তি ও কবি রজনীকান্ত সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়। এই সময়ে তিনি বাংলাদেশের গুপ্তী-সমাজের যে অফিসে সেরা, সাহায্য ও লহানুভূতি লাভ করেছিলেন, তা অতৃপ্তবৈ। কৃতজ্ঞতার আভিভূত হয়ে কালকবি তাঁর ‘হালপাতালের রোজনামচা’ যা লিখেছেন, যা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : আমি একটি বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা করেছিলাম বলে বাংলা-দেশ আমার যা করলে তা Unique in the annals of Bengali Literature. এই সাহিত্যপ্রিয় বাংলাদেশ, যার—Literature loving section of Bengalees bearing the major portion of my expenses. Is it not unprecedented in a poor country like mine?

ভক্তব্যাকুলতার, গভীর আত্মনিবেদনে ও মৃত্যুবরণের প্রাপ্ত প্রস্তুতিতে তাঁর শেষদিকের কবিতাগুলি অধিকতর মৌহমান্বিত। আমার মত্রে এই জ্যোতির্লোক-অভিযাত্রীর বাগ্ম্যথকে ছায়াঙ্কন করতে পারে নি, বিশ্বাসকে এতটুকুও

ঢলাতে পারে নি। কারণ তিনি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন :

তোমারি দেওয়া প্রাণ,
তোমারি দেওয়া দৃশ্য,
তোমারি দেওয়া বৃকে,
তোমারি অনুভব।

জীবনেই চরমতম সংকটময় মৃত্যুতে কবির কাব্যলক্ষ্যীও তাঁর কণ্ঠে বরমালা পরিণত দিয়েছিলেন। সর্বত্র কবি সেই মৃত্যুতেই জীবনের প্রেত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন।

॥ ২ ॥

কালকবির পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন সন্ধ্যাজ, কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচর তিনি ছিলেন একজন ভক্তকবি। তাঁর ‘পদ-চিহ্নামণিমলা’ রূপবুলিতে লেখা প্রায় সাত্বে চারশত পদের সংকলন। রূপবুলিতে তিনি আর একখানি কাব্য লিখেছিলেন, তার নাম ‘অভয়া-বিহার’—এতে দক্ষ-প্রজাপতির গৃহে সতীর জন্ম থেকে দক্ষবজ্রে তাঁর দেহত্যাগ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য রজনীকান্ত পিতার এই কবিতাপ্রতিভার সত্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

ব্যক্তিভাবে রজনীকান্ত ছিলেন সদালাপী, পরোপকারী ও বন্ধুস্বভাব। মজলিশ গল্প করতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। আর গানের ভোজ্যই নেই—একলগে অনেকগুলি গান গেয়ে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করতে পারতেন। সাহিত্যিক ধীনেরকুমার রায় তাঁর একটি স্মৃতিকথার মজলিশ রজনীকান্তের চমককর একটি ছবি একেছেন : ‘পুত্রের ছুটির পূর্বে একবার তিনি (রজনীকান্ত) বাড়ি হইতে রাজসাহী ফিরিয়া আইতেন; আমিও ছুটির সময় রাজসাহীতে আইতেন।... স্ট্রিমারে উঠিয়া দেখি, স্ট্রিমারের ডেকের উপরে একখানি সতরঞ্চি বিছাইয়া রজনীকান্ত আত্ম-জমাইয়া লইয়াছেন—তাইর গল্প আরম্ভ হইয়াছে। মত্রে, বাতী, তাঁহার চারিপাশে বসিয়া মত্রেবাসন করিয়া গল্প শিলিভেছিল—আর, মধ্যে মধ্যে হাসিয়া ঠালিয়া পড়িতেন।... কত মনে নামিল, উঠিল; কত বিদেশের বাতী জাহাজে উঠিল, জাহাজ হইতে নামিয়া গেল; কিন্তু রজনীকান্তের গল্প শেষ হইল না। অপরূহ ছায় ছাটিকার সময় স্ট্রিমার রাজসাহীর ঘাটে লগ্ন করিল—তখনও গল্প শেষ হয় নাই। আরোও দীর্ঘনিঃশ্বাস ভাগ করিয়া বলিল, ‘বাবু, আপনার কেছা বড় সরেস, এ রকম কেছা আর কখন শনি নাই, বড়ই

সাম্প্রতিক বসুমতী

আশ্রয় নে, শেষ পর্যন্ত শুনতে পাইলাম না। যদি জানিতাম, উহা শেষ করিতে হইবে,—তাহা হইলে জাহাজ খুব দ্রুত চলাইতাম।" রাজশাহীর নানা উৎসব-অনুষ্ঠান রজনীকান্তের গানে সজীবিত হয়ে উঠত।

জীবিকা ও সাহিত্যসাধনা এই দুয়ের মধ্যে অনেক সময় প্রচণ্ড বিরোধ দেখা যায়। জীবনের এই দুই কোটি যেখানে সমন্বিত হয় না, সেখানে নেশা ও শোশা দুই-ই ব্যাহত হয়। পেশাকে অবহেলা করে বারী নেশাকেই একমাত্র স্বেচ্ছা করেন, তাঁদের জীবনে ঘটে অসামান্য ট্রাজেডি। সেই ট্রাজেডির নামক রজনীকান্ত। ওকালতি ছিল তাঁর শোশা, কিন্তু এতে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর জীবনিকার নলিনীরজন পণ্ডিত বলেছেন ওকালতিতে রজনীকান্তের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বাহা কিছ্ উপায় করিতেন, তাহাতে সর্বোত্তম ব্যয়নির্বাহ হইত ঘটে, কিন্তু প্রাণের টানে তিনি কোনদিনও কাছারি হাইতেন না। এ সম্পর্কে দীর্ঘ-পত্নীর কুমার শরৎকুমার রায়কে তিনি বে চিঠি লিখেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য : কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন দুল্লভ্য অদ্ভুত আমাকে এ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম; আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল।—এই অকপট স্বীকারোক্তি ব্যক্তি ও হাবি রজনীকান্তের স্বরূপ প্রকৃতি নির্দেশ করে।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের আগ্রহাতিশয্যে ও তাঁরই সুযোগ্য সম্পাদনার রজনীকান্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বাণী' প্রকাশিত হয় (১৯০২)। গ্রন্থপ্রকাশে তাঁর সংকোচের অবশিষ্ট ছিল না। অক্ষয়কুমার তাঁকে বোলপুরের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন; সাহিত্যিক জলধর সেনের বাসায় সুরেশচন্দ্র সাক্ষ্যপতি রজনীকান্তের গান শুনেন মুগ্ধ হলেন। এর পরে এলবার্ট হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ও জিজ্ঞেসলালের গানের পরেও প্রোত্বেষণ বন্ধন আগ্রহের সঙ্গে তাঁর গান শুনলেন, তখন তিনি কতকটা আশ্বস্ত হলেন। এর তিন বছর পরে 'কল্যাণী' কাব্য (১৯০৬) প্রকাশিত হয়। এই সময় স্বদেশী আন্দোলনের অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কান্তকবির স্বদেশী সংগীত সেই বৃগে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহ-প্ৰবেশোৎসব উপলক্ষে (২১ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬) ও রাজশাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন (১৮, ১৯ মাঘ, ১৩১৬) উপলক্ষে রজনীকান্ত বৃহত্তর সাহিত্যিক সমাজের সঙ্গে

পরিচিত হলেন। দুই অনুষ্ঠানেই কান্তকবি অনেকগুলি গান গেয়ে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিলেন। জীবনের এই আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তে বন্ধন খ্যাতি ও সম্মানের পরিপূর্ণ পানপাত্র তাঁর সম্মুখে, সেই সময় তাঁর জীবনকালে দূর্বোপগের মেঘ ঘনিয়ে এলো। মেডিক্যাল কলেজে তাঁর গলার অস্ত্রোপচার করা হলো। রুমদেহেও তিনি বাংলাসাহিত্যে অমূল্যরত্ন পরিবেশন করেছেন। ১৩১৭ সালের ২৮ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০) হাসপাতালেই এই প্রতিভাবান কবির জীবন-দীপ অকালে নিভে গেল। কান্তকবির শেষাঙ্গার তাঁরই একটি প্রিয় সংগীত গাওয়া হয়—

কবে, তাপিত এ চিত্ত করিব শীতল,
তোমারি রসাল-নন্দনে;
কবে, তাপিত এ চিত্ত করিব শীতল,
তোমারি কমলা-চন্দনে।

। ০ ।

রজনীকান্তের কবিতা ও গানগুলির মূল-ধারা তিনটি : হাস্যরসাত্মক কবিতা, দেশাত্মবোধের কবিতা ও ভক্তিমূলক কবিতা। তা ছাড়া 'অমৃত' (১৯১০) ও 'সম্ভাবকুসুম' (১৯১০)-এর নীতিভিত্তিকগুলিকে ভক্তিমূলক কবিতার শ্রেণীভুক্ত করলেও অনায়াস হবে না। কারণ কান্তকবির ভক্তিমূলক কবিতার একটি

বিশিষ্ট স্তর হলো তাঁর নীতিবোধ ও নৈতিক-দৃষ্টি। কান্তকবির হাস্যরসাত্মক কবিতার ভিত্তিমূলে আছে সমকালীন সমাজ, দেশ, ধর্ম ও রাজনৈতিক জীবনের অসংগতি সম্পর্কে স্প্যানিবোধ। তাই তিনি শ্লেষ-বিদ্বেষের নির্মম আঘাতে জর্জরিত করেছেন :

ধার্মিক বটে সেই, যে দিনরাত
ফোটা তিলক কাটে—
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল
চৈতন নাহি ছাটে।
নিষ্ঠাবান, যে কুজুট-মাসের
মধুর আশ্বাদ জানে;
সেই মহাশয়, সংগোপনে
মদ্যটা আসুটা টানে।

‘বরের দর’ ও ‘বেহারা বেরাই’ কবিতা দুটিতে পণপ্রথার এক নির্মম চিত্র এঁকেছেন। এই শ্রেণীর সমাজচিত্রের উদ্যানে মূলত ‘আর-বান’ শ্রেণীর হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। ‘স্যাটারার’ ও ‘আররান’ ছাড়া কতকগুলি হাস্যরসের কবিতা বিশুদ্ধ রস-কৌতুককর। উদ্ভট বৈরাগ্যবুদ্ধি ও নবদম্পতীর প্রেম-পত্রের কৌতুককর গ্রন্থনে ‘দম্পতীর বিরহ’ কবিতা দুটি কান্তকবির হাস্যরস সৃষ্টির অন্যতম প্রস্তুতি নিদর্শন। বৈরাগ্যকরণ-বিরহবী স্তরীয় পত্রের উত্তরে বৈরাগ্যকরণ-বিরহী স্বামী লিখছেন :

David Hare

Peary Chand Mittra

মূল্য : এক টাকা মাত্র

প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মূল্যবান ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থখানি বসুমতী সাহিত্য মন্দির জাতির পুণ্যপাণ ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য বিবরণী হিসাবে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাই-এর দি টাইমস অব ইন্ডিয়া লিখিতেছেন—

“The Basumati Sabitya Mandir has deserved well of the multitude of Bengalees who cherish the memory of David Hare by bringing out a reprint of his biography by Peary Chand Mittra first Published in 1877. As a pioneer of modern education in Bengal to the promotion of which he consecrated the last thirty-two years of his life in Calcutta. David Hare answers to the description given in a Sanskrit verse of men of expansive minds who think the

world to be their Country and mankind their kinstolk.

“God” says Cousin, “sends special agents when circumstances are ripe for their advent.” To the Bengalees of his day David Hare’s appearance in Calcutta to hold the scales even between the Progressives led by Raja Rammohan Roy and the Conservatives led by Raja Radhakanta Deb appeared providential in as much as he exerted all his might to evolve synthesis out of the clash of ideologies.

Hare believed that in a country like India, whose cultural matrix pattern and tradition could not conceivably be ignored transplantation of a foreign culture must needs be accomplished on the natural soil of her cultural traditions, if the highest aim of education was to be achieved.”

বসুমতী গ্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

অধ্যয়ন উঠেছে চাপে,

রেতে যখন নিদ্রা ভাঙে,

লুপ্ত 'অ'-কারের মত

মরে থাকি জ্ঞানত।

এ যে সন্ধি-নিচ্ছেদের রাজ্য,

কবে হব কত্বাচা,

বিরহ অসমাপিকা ক্রিয়া পাইলে অন্ত।

বাগবৈদ্য, পরিকল্পনার চাতুর্ষ ও বিন্যাস-
নৈপুণ্যই এই জাতীয় কবিতার প্রাণ।

আমাদের ঐতিহ্য-বিমূখতা, উৎকট
মাহেবীয়া, বিকৃত অনুকরণপ্রিয়তা কালত-
ধবির কতকগুলি বিদ্রূপমূলক কবিতার উৎস।
এই শ্রেণীর কবিতার মূল অবলম্বন আচার-
আচরণগত অসংগতি। এই গানগুলিতে তিনি
জিজ্ঞাসুলালের 'হাসির গান'-এর দ্বারা
প্রভাবিত হয়েছেন। ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত
শব্দ-বিন্যাস জিজ্ঞাসুলালের অনেকগুলি
হাসির গানের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। রজনী-
কান্ত এই অভিনব বাণী-বিন্যাসকে তাঁর কাব্য-
রীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শব্দে তাই
নয়, 'কল্যাণী' কবোয় শেষ দিকের চারটি
কবিতা—'পুরোহিত', 'দেওয়ানী হাকিম',
'ডেপুটি', 'উকিল' জিজ্ঞাসুলালের সুবিখ্যাত
'আমরা বিলেত ফেরত ক'ভাই'—গানটির
আদর্শে রচিত হয়েছে।

রজনীকান্তের দেশাত্মবোধক গানগুলির

গ্রন্থে হাসির গানের সংযোগ-সূত্র সুস্পষ্ট।
জাতীয়-জীবনের অসংগতি, দুর্বলতা, পরানু-
করণ ও ঐতিহ্যপ্রণেতার জন্য তিনি শ্লেষ-
বিদ্রূপ অবলম্বন করেছিলেন। এইখানেই
তাঁর ব্যঙ্গকবিতা ও স্বদেশপ্রেমের কবিতার
সংগমভূমি। বঙ্গভাষা আন্দোলনের সেই
চরম সংকটের দিনে যেসব চারণকবি জাতীয়তা-
বোধের উদ্বোধন করেছেন, তাঁদের মধ্যে
রজনীকান্ত অন্যতম। এই মাতৃবংসল
সম্ভানের কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল এক
অভিনব উদ্দীপনার বাণীমন্ত্র—

জননী-তুল্য কে মর-জগতে?

কোটি কণ্ঠে কহ, 'জয় মা! বরদে!'

দীর্ঘ বক্ষ হতে, তপ্ত রক্ত তুলি,

দেহ পড়ে, তবে ধন্য গণি।'

বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের
জাতীয় শিক্ষাকে রক্ষা করার কথা বলেছেন
তাঁর বহুপ্রচলিত একটি সংগীতে—'মায়ের
দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেবে
ভাই'—'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজ-
পতি এই গানটি সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা
প্রাধিকারযোগ্য : 'কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া
মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী-
সংগীত-সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায়
চিরদিন বিরাজ করবে। বঙ্গের একপ্রান্ত
হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত

হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান
কল্পপ্রাণ প্রজ্ঞাপতির ন্যায় কিরণকাল ফুল-
বাগানে প্রাতঃসূর্যের মৃদু কিরণ উপভোগ
করিয়া মধ্যাহ্নে পশ্চিমতে বিলীন হইয়া যায়,
ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান
দেববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর
ন্যায় সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান।'

ভক্তিমূলক গানগুলিই কান্তকবির শ্রেষ্ঠ
রচনা। বাংলাদেশে ভক্তিসাধনার একটি বিশিষ্ট
ধারা আছে। কীর্তন গানে, শ্যামাসংগীতে,
বাউল গানে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনসংগীতে
এর ঐতিহ্য যেমন সুপ্রাচীন, তেমনই সমৃদ্ধ।
কান্তকবি সেই গীতিধারার সঙ্গে আপন কণ্ঠ
মিলিয়েছেন। ভক্তিস-মণ্ডির বিবশ-ব্যাকুল
আত্মনিবেদন, অকৃত্রিম ভগবদবিশ্বাস, দঃখ-
দহনের মধ্যে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যানুভূতি,
বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে লীলাময় চিরসুন্দরের
উপলব্ধি তাঁর ভক্তিসংগীতগুলির প্রধান
বৈশিষ্ট্য। এক জ্যোতির্লোকের দিকে তাঁর
পিপাসাতুর দৃষ্টি প্রসারিত—

তুমি নির্মল কর, মংগলকরে

মলিন-মর্ম' মছায়ে;

তব, পুণ্য কিরণ দিয়ে বাক, মোর
মোহকালিমা ঘুচায়ে।

চিরসুন্দরের সঙ্গে তাঁর মাধুর্যের সম্পর্ক,
তিনি তাঁর লীলা-সহচর—'আমি তো তোমারে
চাই নি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ।'—
এক সহজ-শান্ত সুর, বিশ্বাস-মুগ্ধ অনুভব ও
প্রসন্ন উপলব্ধি কান্তকবির গানগুলিকে অপ-
রূপ দিয়েছে। চিরসুন্দরের মধ্যে নিজেকে
সম্পূর্ণভাবে বিলীন করার মধ্যোই ভক্তকবির
পূর্ণসিদ্ধি—

বেতে দাও!

আমার-মরাল-মন ঐ চলে যায় কার গান গেয়ে,
শোন, ঐ স্রোতোবেগে, মধুর তরঙ্গ তুলি,
বেতে দাও!

কান্তকবির রোগশয্যায় গৃহস্থ রবীন্দ্র-
নাথ যে চিঠি লিখেছিলেন, তাই কান্তকবির
কাব্যজীবনের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা : 'সেদিন
আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার
একটি জ্যোতির্মর প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি।
... কাঠ বউই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত
বেশি করিয়া জ্বলিতেছে। আত্মার এই মৃত-
স্বরূপ দেখিবল সূযোগ কি সহজে ঘটে?'
দৈহিক গ্রানি ও বিপর্ষয়ের উত্তর আনন্দের
তপস্যা কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ ফলপ্রসূতি। রাজ-
কৃষ্ণ মনোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাস' সমা-
লোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন : 'যে
গাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজা ও এক রাজ-
কন্যা দান করিতে পারে, সে মূর্ত্যিভক্সা দিয়া
ভিক্তককে বিদায় করিয়াছে। মূর্ত্যিভক্সা
হউক, কিন্তু সুবর্ণের মূর্তি।'—কান্তকবির
স্বপ্নায়তন রচনা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই
উক্তিই আবার মনে পড়ল।



রজনীকান্ত দেব

উপহাস

॥ চার ॥

নৃসিংহনাথ মিশ্র

নিজের টেবিলে এসে একটা কাঁইল টেনে নিয়ে তার পাতা উলটাতে লাগল বিজ্ঞান। কিন্তু পাতাই শব্দ উলটে গেল। একটা জঙ্করও সে পড়ল না, পড়লও তার কোন মর্ম বোধ হল না। কিসের একটা আশঙ্কা তাকে ভীত, বিমত্‌ এমন কি বিপর্যস্ত করে তুলল।

সহকর্মী সুনীল রায় সামনের দিকে একটু কঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বিজ্ঞানবাব, আপনার কী হয়েছে বলুন তো।'

'কী আবার হবে?'

সুনীল বলল, 'না হলেই ভালো। আমি ভাবলাম বাঁধ কোন অসুখ-বিসুখ—।'

'কখনো কখনো শব্দকনো-শব্দকনো লাগছে।'

বিজ্ঞান বলল, 'ও কিছু না। আমি ভালোই আছি।'

এই সহানুভূতিকে বিশ্বাস করতে পারে না বিজ্ঞান। এর মূলে হয়তো কিছু কৌতূহল আর কৌতুক আছে। আন্তরিকতার সামগন্ধ্যও নেই।

সুনীল একটু হেসে বলল, 'ভালো একলেই ভালো। আমি ভাবলাম—। ভালো কথা, ম্যানেজার আপনাকে ডেকে নিয়ে এই সকালবেলাতেই কী মথিলিখিত সুসমাচার শোনাল বলুন তো?'

এমন ভাগ্যে কথা বলছে সুনীল যেন বিজ্ঞানের সঙ্গে তার কত অন্তরংগতা। অথচ বিজ্ঞান জানে এই লোকটি তার মোটেই হিতৈষী নয়। কতৃপক্ষের কাছে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লাগানোই ভর কাজ। ছোটখাটো দুটি-বিকৃতিকে বাড়িয়ে বলা, কোন দোষ না থাকলেও বানিয়ে বলা তার স্বভাব। কেউ একটু বলে সুনীল কতৃপক্ষের চর। কেরস-শনডেসের কাজটা ওর আসল কাজ নয়। আসল কাজ কে কী করে না করে, বলে না মূলে তার রিপোর্ট দেওয়া। সবাই চেনে সুনীলকে। অনেক ভর করে বলেই খ্যাতির করে।

কিন্তু বিজ্ঞানের এখন আর কোন ভয়ের প্রশ্ন ওঠে না। সে বৃত্তে পারছে তার বা হবার তা হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার ভাগ্য। তার আর নড়চড় হবে না।

সুনীলের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞান একটু হাসল, 'মানে ভাবুক কোন কানে কী বলে মেল এই তো আপনার জিজ্ঞাসা।'

সুনীল বলল, 'অমন একজন সুপুরুষ ডল্লোককে আপনি ভাবুক কখনো? বরং আমাকে যদি বলতেন, তাহলে মানাতো।'

কথাটা শব্দ যে বিনয় করে বলেছে সুনীল তা নয়। কালা মোটাসোটা চেহারা সুনীলের। পুরু ঠোঁট, ঝ্যাকড়া নাকে কোন প্রী নেই। কিছু না কিছু রূপ নিচুরই সুনীলের মধ্যে আছে। যে কোন জীবিত প্রাণীর মধ্যেই রূপ রয়েছে। রূপ নেই শব্দ, মূর্তির। কিন্তু বিশেষ আর ভৈরবস্থির জন্য বিজ্ঞান সুনীলের চেহারার কোন লাভনা, ঢালচালনে কোন সৌজন্য কি সম্ভবতা খুঁজে পায় না।

ভালুক নয়, দাঁত শৃংগালের সঙ্গেই শব্দ সুনীলের তুলনা দিতে পারে বিজ্ঞান।

ইচ্ছা হল, কথাটা একবার বলেই ফেলে বিজ্ঞান। যে রাগ আর আক্রোশ সে ম্যানেজারের কাছে প্রকাশ করতে পারে নি তাই চতুর্দ্বন্দ্ব করে এই ছদ্মসুন্দরের ওপর ঢেলে দেয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংবত করে রাখল বিজ্ঞান। এখন প্রতিশোধ নেওয়ার সময় নয়। বিপদের বেড়াভাল থেকে একবার বেরোতে পারলে পরে উপহাস-পরিহাসের জবাব দেওয়া যাবে।

সুনীল তার সামনের চেয়ারে বসেছিল আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল বিজ্ঞানকে। মনে মনে হাসছিল কিনা কে জানে।

একটু বামে সুনীল উঠে পড়ে বসল, 'বাই বিজ্ঞানবাব। আপনাকে অনর্থক ডিস্টার্ব করে গেলাম। কিছু মনে করবেন না। দেখুন আকাশের অবস্থা। বৃষ্টিটা আবার বেশ চেপে আসছে মনে হচ্ছে।'

সুনীল উঠে গিয়ে নিজের ডিপার্টমেন্টে বসল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখবার ইচ্ছা মোটেই বিজ্ঞানের হল না। সে তাকিয়ে তাকিয়ে সুনীলকেই দেখতে লাগল। খামের আড়ালে তার অর্ধাঙ্গ আবৃত। সামনের চেয়ারে বসে নবাগত নীরদকে সে বেন ফিসফিস করে কী বলছে। কথাগুলি জে বিজ্ঞানের সম্বন্ধেই তাতে তার কোন সন্দেহ নেই।

তার মনে হল শব্দ সুনীল আর নীরদই নয়, সারা অফিসসুখ্য লোক বিজ্ঞানের সম্বন্ধে অমন ফিসফিস করছে। কেউ বলছে, কেউ সাগছে শুনছে। কারোরই মনে কৌতূহল আর উৎসুকতার সীমা নেই।

একটু বামে ফের ম্যানেজারের ঘরে গেল পড়ল বিজ্ঞানের।

মিস সেহানবীশ এবারও তার সামনের চেয়ারটা আড়াল দিয়ে দোঁখরে দিয়ে বসলেন, 'বসুন।'

বিজ্ঞান দেখল এবার তাঁর টেবিলের ওপর কতকগুলি লাগরঙের ডাউটার রয়েছে। মেগাফোন দেখে বিজ্ঞানের মূখ শকিয়ে গেল।

দু-একটা বিল আর ডাউটার বেছে নিয়ে ম্যানেজার বললেন, 'এই সব সিগনেচার কি আপনার?'

বিজ্ঞান নিজের স্বাক্ষরকে স্বীকৃতি দিল। ম্যানেজার বললেন, 'খাক, নিজের সিগনেচার আপনি চিনতে পেরেছেন। অনেকে

আবার পারে না। তাদের জন্যে ছুটতে হয়
স্পেশালিস্টের কাছে।

বিজন চুপ করে রইল।

ম্যানেজার বললেন, 'এইসব বিলের
এগেনস্টে পার্টিকে টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু
তার বদলে মাল এসে পৌঁছয় নি।'

বিজন এবারও কোন জবাব দিল না।

ম্যানেজার বলতে লাগলেন, 'অবশ্য দলে
দ্বাপনি একা ছিলেন না। আপনার একার
দৃষ্টিতে এসব কাজ হয় নি। কিন্তু নাটের
শুরু নিতানন্দ শ্রীবিলাস চক্রবর্তী তো আগে
থেকেই রেজিগনেশন দিয়ে চলে গেছেন।
অবশ্য চলে আর যাবেন কোথায়। থানা-
শুলিস আছে, আইন-আদালত আছে।
তাকে ধরে আনা খুব শক্ত হবে না। অমন
অনেক ধর্ম আমার দেখেছি। কিন্তু আপনি
তার সঙ্গে গিয়ে জুটলেন কেন? কোন
লোভে, কিসের মোহে? ভদ্রলোকের ছেলে
আপনি। হি হি হি।'

বিজন এবারও কোন জবাব দিল না।
সে যেন পৃথিবীর সব ভাষা ভুলে গেছে।
মাতৃভাষাতেও যেন তার আর কোন দখল
নেই।

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার
কি কিছু বক্তব্য আছে?'

বিজন মৃদুস্বরে বলল, 'যা বলবার
ওঁদের কাছেই বলব।'

ম্যানেজার বিজনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে
ঠাকালেন, 'ওঁদের মানে? ম্যানেজিং ডিরেক্টর
আর তাঁর ছেলেকে?'

বিজন বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপাতত ওঁদের সঙ্গে দেখা-
শাকাতের সুযোগ যদি আপনার না হয়?
ওঁরা যদি তা না চান?'

'ওঁরা কি তাই বলেছেন আপনাকে?'

মিসঃ সেহানবীশ একটু হাসলেন, 'ওঁরা
হা বললে কি আমি কিছু বানিয়ে বলতে
পারি? বললে কিছু লাভ আছে আমার?
এখানে আপনিও চাকরি করতে এসেছেন,
আমিও চাকরি করতে এসেছি। দুজনেই
কর্তার ইচ্ছার কর্ম করতে হবে।'

বিজন বলল, 'কিন্তু আমার যা বলবার
আছে তা কি কিছুই শুনবেন না ওঁরা?'

ম্যানেজার বললেন, 'শুনবেন না কেন?
শুনবার সময় হলেই শুনবেন। তা ছাড়া
শ্রদ্ধাতে বসেই যে সব কথা শোনাতে হবে
সেই তো কোন মানে নেই বিজনবাবু।
আপনি লিখে পাঠাতে পারেন। আমি তো
খালি সেই ভালো। ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে
যা বলবার আছে লিখে পাঠানোই ভালো।'

মানুষ এমন নির্মম এমন নিষ্ঠুরও হতে
পারে। বিজনের মনে হল এই ম্যানেজার যেন
তার মৃদুগায়ের প্রতিমূর্তি হিসাবে বসে
আছেন। সে মূর্তি পাথরে গড়া। বিজনের
একবার ইচ্ছা হল প্রচণ্ড আঘাতে ওই

মূর্তিটিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে।
কিন্তু এখন অধীর হবার সময় নয়। বিজন
বেশ বৃদ্ধিতে পারছে এখন ধৈর্য হারালে সব
কিছুই হারাতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে নিজের ক্রোধ
আত্মশ্লাঘা সংযত করে নিয়ে বিজন বলল, 'বেশ
লিখেই জানাব।'

চেরার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল বিজন,
ম্যানেজার বললেন, 'বসুন আরো একটু কাজ
আছে আপনার সঙ্গে। আপনার একথানা
চিঠি আছে। নিয়ে যান।'

'চিঠি!'

বিজনের বৃকের ভিতরটা খুঁজ করে
উঠল।

'হ্যাঁ, চিঠি।'

ছোট পিওনবুটো নিয়েই এগিয়ে
দিলেন ম্যানেজার, আস্তে বললেন, 'সই করে
নিতে হবে।'

'কী আছে এ চিঠির মধ্যে?'

ম্যানেজার বললেন, 'কেন আমাকে আরও
অপ্রিয় কথা শোনাতে বলছেন বিজনবাবু?
খামটা তো খোলাই আছে। ইচ্ছা করলে পড়ে
দেখতে পারেন। বাড়িতে নিয়ে পড়লেই যা
ক্ষতি কী।'

বিজন একথার কোন জবাব না দিয়ে
খামের ভিতর থেকে চিঠিটা বার করে নিল।
ইংরাজীতে টাইপ করা চিঠি। না চাকরি
থেকে বরখাস্তের নোটিশ নয়, সাময়িকভাবে
কর্মচ্যুতির নোটিশ। এই কর্মবিবর্তিত কত-
দিনের তার কোন উল্লেখ নেই, এই শাস্তি
কিসের জন্য সে কারণও স্পষ্টভাবে উল্লেখ
করা হয় নি। কাজে গুরুতর অবহেলার
অভিযোগই শূন্য করা হয়েছে।

বিজন সেই চিঠির দিকে একটুকাল
অপলকে তাকিয়ে রইল। যেন ইংরাজী কথা-
গুলির অর্থবোধ হতে দেরি হচ্ছে তার।

ম্যানেজার বললেন, 'ডিফ্যালকেশনের
চার্জ যে আনেন নি ওইটুকুই আশার কথা।
এখনই বাঁটিয়ে দরকার নেই। কটা দিন
চুপচাপ থাকুন। বাড়িতে যদি বসে থাকতে
লজ্জা হয় কি কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়,
বাইরে কোথাও চলে যান। বললেই পারবেন
ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন। রেস্টের
দরকার। আমি অফিসেও কথাটা গোপন
রাখতে চেষ্টা করব। আমি আপনার শত্রু
নই। আপনি যাই ভাবুন না কেন। কিন্তু
অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এর চেয়ে বেটার
অ্যারেঞ্জমেন্ট কিছু করা আমার পক্ষে সাধ্য
ছিল না।'

বিজন তবু গোঁ ছাড়ে না। বলল, 'কিন্তু
এ চিঠি যদি আমি না নিই।'

এবার ম্যানেজারের অবাধ হবার পালা।
বিজনের দিকে তিনি একটুকাল তাকিয়ে
থেকে বললেন, 'না নিই মানে? অলরোড
তো নিয়েছেন আপনি। সই করেছেন। ইচ্ছে

হলে আপনি অবশ্য সই কেটে চিঠি ফেরৎ
দিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এ চিঠি এখানে
রাখবারও তো জায়গা নেই। রেজিস্টার্ড
পোস্টে চিঠিটা ঠিক আপনার বাড়িতে চলে
যাবে। কড়া নেড়ে নেড়ে পিওন আপনাদের
ঘুম ভাঙবে। অনর্থক লোক জানাজানি
হবে। তাতে কারো কোন লাভ আছে বলে
যদি মনে করেন তাহলে রেখে যান চিঠি।'

বিজন বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। নিয়েই
গেলাম।'

ম্যানেজার বললেন, 'হ্যাঁ, আমার তো মনে
হয় সেইটাই বৃদ্ধমানের কাজ হবে।'

হঠাৎ কোথায় একটা জরুরী ফোন
করবার কথা মনে পড়ে গেল ম্যানেজারের।
তিনি রিসিভার তুলে অপারেটরকে ফোন
নাম্বারটা বলে দিলেন। আর সেই ফাঁকে
বিজন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ইচ্ছা
করেই কোন বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে এল
না।

নিজের চেরারে এসে ফের কিছুকণ স্তব্ধ
হয়ে বসে রইল বিজন। বেরোবার ভেত্রে
ফাইলগুলি তুলে রাখবার কথা বলবে এমন
শক্তিটুকুও যেন তার আর নেই।

বিজনের সামনের চেরারটা খালিই ছিল
কেউ এসে তাতে আর বসল না। কেউ
কোন কৌতূহল মেটাতে এল না, সহানুভূতি
জানাতে এল না। কেউ তার দিকে তাকাল না
পর্যন্ত। বিজনের মনে হল কারোরই আর
কিছু জানতে বাকি নেই। বিজন এ অফিসের
আর কেউ নয় তা সবাই টের পেয়ে গেছে।
দৃষ্টান্তের মত তাই তারা তাকে পরিত্যাগ
করেছে।

পাছে সত্যিই কেউ ফের এসে কাছে বসে
কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ শুরুর করে তাই
সকলের অলক্ষ্যে একফাঁকে উঠে দাঁড়াল
বিজন।

তখন টিফনের সময় শুরুর হয়েছে। কেউ
কেউ বাড়ি থেকে আনা খাবারের কৌটা খুলে
বসেছে। কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে সামনের
রেন্স্ট্রেশনটোর দিকে এগিয়ে গেল।

আর তাদের প্রায় পিছনে পিছনে বিজনও
চলে এল গেটের বাইরে। আশ্চর্য দারোয়ানও
এবারও তাকে দেখে সেলাম জানাল। বিজনও
খুশি হবার ভাণ করে মৃদু হাসল। তারপর
বড় দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা পথে এসে
নামল।

তারপর নিতান্ত অভ্যাসের জোরেই
সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

বাস-ট্রাম সবই চলছে। কয়েকটি কালো
ছাতা দেখা গেল সামনে।

আশ্চর্য, বৃষ্টিটা কি আরো জোরে এল?
হঠাৎ খেয়াল হল বিজনের ওয়াটারপ্রুফট
অফিসেই ফেলে এসেছে।

কিন্তু বিজন আর ওঁদিকে ফিরে গেল
না।

ছাত্রী মিছিল

চুয় দফা দাবি নিয়ে রাজধানীর পথ পারিক্রমা করে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রীগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং রাজ্য-শাল প্রীমতী পদ্মজা নাইডুর নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেছেন।

শিক্ষাসংকট মোচন সম্পর্কে বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন পরিচালিত কলেজ ছাত্রীরা তাঁদের অন্যতম দাবির মধ্যে সেই পুরাতন দাবিটিও পুনর্ব্যার উত্থাপন করেছেন, দুই সফটে ক্লাস চালু করা এবং বিজ্ঞান ও অনার্স ক্লাসের অধিকতর ব্যবস্থা করা। এ ছাড়াও তাঁরা দাবি করেন (১) দ্রুত ব্যবস্থালব্ধন করে চলমান বিদ্যালয়গুলিকে একাদশমানে পরিণত করা হোক। (২) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে বিজ্ঞান পাঠের আরও সুযোগ সৃষ্টি করা হোক এবং (৩) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অধৈনিক শিক্ষা চালু করা হোক। প্রয়োজনে কলেজের মতো স্কুলেও সিসফট প্রথা চালু করার দাবি রাখা হয়েছে।

ছাত্রী মিছিলে শিক্ষানীতির নিষ্পত্তি, শিক্ষাখাতে ব্যয়বৃদ্ধি, ছাত্রী ভর্তির সুবিধা ও অধিকসংখ্যক ছাত্রী আবাসের দাবিতে ধর্নি দেওয়া হয়।

ধীর বিবেচনার ছাত্রীদাবি শুধু যে ন্যায়-সঙ্গত তাই নয়, এ দাবি ছাত্র সম্প্রদায়ের বহু পুরাতন দাবি। সিসফট প্রথা চালু হলে ছাত্র ভর্তি সমস্যার অনেকাংশে সুরাহা হবে। কিন্তু সৈদিক কতৃপক্ষ কেন যে উচ্চবাচ্য করছেন না তা সম্ভবত অনেকেই ব্যাখ্যা করেন, সরকারের শিক্ষা সঙ্কোচন-নীতি হিসেবে। বাংলাদেশে স্যার আশুতোষ ঘরে ঘরে শিক্ষিত যুবক-যুবতী তৈরি করার জন্য বিদেশী সরকারের আমলে যে অশুভ সফল অভিযান করেছিলেন, আমাদের বর্তমান সরকার তার কাগাকড়িও করতে রাজি নন। রামমোহন বিদ্যালয়গর আশুতোষের দেশে আজও 'আমাদের শিক্ষালাভের সুযোগ দাও' বলে ধর্নি দিতে হয়। লক্ষ্য এবং দৃষ্টির কথা।

শুধু ছাত্রীদের দাবিই নয়, বাংলার শিক্ষা-ভিলাষের পথপ্রাধিকারী সর্বকম বাধাবিপত্তি অপসারণের জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে; আর এ ব্যাপারেও যদি বারম্বার সরকারী টনক নড়বার জন্য যানবাহন বন্ধ করে ছাত্রছাত্রীদের মিছিল নিয়ে বার হতে হয়, তবে বক্রতে হবে জনসাধারণকে প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ দিতে সরকার কাপণ্য করছেন, যার বাড়ি লজ্জার বিষয় আর কিছই নেই।

অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় হলেও একথা সত্য যে, কেন্দ্রীয় খবরদারিতে বাংলার রাজ্য সরকারের বহু ক্ষমতাই ক্রমশ অপহৃত হচ্ছে।



শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন দাবিতে ছাত্রী-মিছিল

শিক্ষা কারখানা, সীমান্ত, রেল, ডাক প্রভৃতি জাতীয় অগ্রগতির প্রাঙ্গণশনস্বরূপ ক্ষেত্রগুলির ওপর কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষে রাজ্য সরকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কেন্দ্রের আদেশে গভর্নরী করা ছাড়া এর পর রাজ্যের মন্ত্রিসভার নিজস্ব করণীয় কাজ খুব অল্পই থাকবে। কয়েকটি শিক্ষাপ্রতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারও রাজ্য সরকার বজায় রাখতে পারেন নি।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবংগকে পদানত করে রাখার একটি কূটনৈতিক সার্বিক প্রচেষ্টা অস্পষ্ট থেকে ক্রমশ প্রকাশ্য রাজবেশে আবির্ভূত হয়েছে। বতই দিন বাবে বাংলার ছেলেমেয়েরা পরম্ব্যাপেক্ষী এবং দয়ার পায়ে পর্ষবসিত হবে। সে ক্ষেত্রে বাংলার ছাত্র-সম্প্রদায়ের শিক্ষার সুযোগও হরণ করে নেওয়া হলে পশ্চিমবংগের ভবিষ্যৎ তিমিরা-ছন্ন এবং পঙ্গু হয়ে পড়বে।

এসব দিক দিয়ে চিন্তা করেও কি য্যার আশুতোষের বাংলাদেশ বাংলার ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোকবর্তিকা জেলে দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন অনুভব করবে না?

শিক্ষাক্ষেত্রেও আজ ধনিকুলের আধিপত্য। প্রাচুর্য না থাকলে ডাক্তারী, আইন, ইঞ্জিনীয়ারিং, এ্যাকাউন্ট্যান্স প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণ সম্ভবপর নয়। আর আর্থিক আনুকূল্য যে বাংলার ঘরে ঘরে নেই তা তো সূত্রিত।

তবে কি এই উৎপীড়িত দেশটার চোখের ওপর থেকে শিক্ষার আলোকও ক্রমশ সরিয়ে নেওয়া হবে!

পশ্চিমবংগের প্রতিটি ঘরে আজ শিক্ষিত ও সচেতন নরনারীর প্রয়োজন। রাজ্য সরকারের পশ্চিমবংগবাসীকে সর্বতোভাবে ও সবরকম সুবিধা-সুযোগ দিয়ে শিক্ষিত করে তোলায় চেষ্টায় ক্ষান্ত হওয়া অনুচিত। কারণ ভবিষ্যতের দর্দিনে আত্মরক্ষা করতে হলে এ একটিমাত্র অস্ত্রই অসহার বাঙালীর হাতে থাকবে।

ট্রামগাড়িতে শ্রেণীলোপ

ট্রাম কোম্পানীর কতারা সম্ভবত এখন থেকে রাস্তা মেরামতির দিকে নজর দিতে বাধ্য হবেন। না হলে পৌরসভাই সে দায়িত্ব গ্রহণ করে খরচখরচা সুদসহ আদায় করে নেবেন কোম্পানীর কাছে। সুডুরাং এবার যদি সংবাদপত্রে ভাঙা রাস্তার ছবি ও লোক কলাম অপদার্থতার সংবাদ এড়ানর জন্য ট্রাম কোম্পানী রাস্তা মেরামতিতে নজরও দেন তবেও কি মনে করা অন্যায় হবে যে পৌর-সভার হুমকিই ট্রাম কোম্পানীর টনক নড়িয়েছে।

অন্তত একথা তো ভাববার কোনো কারণই নেই যে, ট্রাম ভাঙা পুনর্বিবাসের সুবিধা-লাভের দরুনই অকস্মাৎ কোম্পানীর দিক

দেহাট দরাজ হয়ে গেল। হলে তো আগেই হত। সেই যখন কলকাতা শহরের বৃক্কে আবালবৃদ্ধের রক্তগণা বহানর পর থেকে এক নয়া পরমা ভাড়া বাড়ানর ধরণ লাখ লাখ টাকা মুনামা লুটে নিয়ে থাকেন তাঁরা, তখনই কোম্পানীর বদান্যতার কিছু পরিচয় পাওয়া যেত। বদান্যতাই বা কেন, লাইন বরাবর রাস্তা মেয়ামতি তো কোম্পানীর পক্ষে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট।

শোনা যাচ্ছে, ভাড়া পুনর্বিব্যাশের পর গাড়ির সংখ্যা নাকি বাড়ানো হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে (বছর দুয়েকের মধ্যে) বিলুপ্ত হবে দ্বিতীয় শ্রেণী।

অনেকেই জানেন, প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা যদিও শাদা চামড়ার মর্যাদা রাখার জন্যই এককালে সৃষ্টি হয়েছিল, তবু দ্বিতীয় শ্রেণী দরিদ্র নাগরিকের স্বার্থ উপকারই করেছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণী, যে-শ্রেণীর সম্বন্ধে বজায় রেখে থাকুক, অল্পবিস্তর মানুষের স্বার্থ হিত-সামনই করেছে। এই পরবর্তী দেশে তিন পরসার মূল্য কম নয়। কারণ একটি শিক্ষিত করণিকের দৈনিক মাহিনাই যেখানে তিন টাকা, সেখানে প্রতিবার সাতারাতে তিন পরসার ছাড় আশীর্বাদম্বরূপ (তথ্যিক দরিদ্রের জো কথাই নেই)। ট্রামভাড়া পুনর্বিব্যাশে সে সুযোগ থেকে সাধারণ অল্পবিস্তর মানুষকে বঞ্চিত করার অর্থ দেশজোড়া দারিদ্রের প্রতি নিষ্করূণ অবহেলা প্রদর্শন করা।

সরকারী বাস দারিদ্রের কথা চিন্তা করে 'ন' (আমাদের গরীর দেশের সরকার অবশ্য বড় অঙ্ক ছাড়া ভাবতেই পারেন না, যদি তা নাথারনের গলা টিপে আদায় করা হয়)। ট্রামে যে কারণেই হোক সেটুকু সুযোগ বর্তমান ছিল। ভবিষ্যতে তাও থাকবে না।

অবশ্য এক হিসেবে তা নিষ্প্রয়োজনই বটে। ভবিষ্যৎ-ভারতে দুটি শ্রেণীই হয়ত থাকবে। হয় গাড়ি জুড়ি, নয় ফাটা-হাঁড়ি। ট্রামে বাসে শ্রেণীর প্রকল্পে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। শ্রেণীর প্রকল্পে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। বিশেষত ১৯৭১ সালে ট্রাম কোম্পানীকেও যখন জাতীয়করণ করা হবে।

সরকারী বাসে দূরদর্শিতার পরিচয় আগেই রাখা হয়েছে। ট্রাম কোম্পানী বিলম্বে কিছু লোকসান গুণেছেন।

ট্রাম কোম্পানীকে একথা বলবার মুখ কোথায় আমাদের। আর মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা তো গ্রীশেল মুখাজীই করে রাখলেন।

জনদরদী আবদুস সাত্তার

বাংলার হৃদয় মন্ডন করে এমন সব মানুষের আবির্ভাব হয়েছে বাঁরা আপন হৃদয় নিড়ে প্রাণরসে সিক্ত করে গেছেন বিস্ময়-বিশ্বক ধরিত্রীকে। তেমন এক প্রকৃত মানুষ আমাদের মধ্যে ছিলেন জনদরদী

আবদুস সাত্তার। আজ তিনি নেই; অবিনশ্বর হয়ে আছে জনগণের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসা। যে ভালবাসা অকৃত্রিম, রাজনীতি-কীটদংশনে অমিয়গরল নয়।

অথচ গ্রীসাত্তারও রাজনীতি করতেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই অক্লান্ত এবং যোগ্যতম কর্মী হিসেবে তিনি বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরে সভাপতির আসনও তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়।

তিনি রাজনীতি করতেন; রাজনীতি তাঁকে সৃষ্টি করে নি। বাংলার প্রমিক-কৃষক দরিদ্র জনগণের অভাব-অভিযোগ মোচনই তাঁকে রাজনীতিতে আকৃষ্ট করেছিল। গ্রাম বাংলার জন্য তাঁর দরদী হৃদয় উন্মেষণ অনুভব করত। রাজনীতি তাই তাঁর পেশা ছিল না, ছিল না আপন স্বাধীসম্বির সোপান। তাই সাতারী-



আবদুস সাত্তার

রাজনীতি ছিল সাম্প্রদায়িকতামুক্ত নিরহঙ্কারী পরার্থপর আদর্শ বিশেষ। তাই আবদুস সাত্তার ছিলেন গ্রাম বাংলার প্রাণের মানুষ, আপন মানুষ।

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাকে ভাষা দেবার জন্য শূন্য তাঁর কণ্ঠকেই নিয়োজিত করেন নি তিনি, বর্ধমানের প্রকৃত চেহারাকে রূপায়িত করবার মানসে জন্মান্বরে প্রকাশিত করে গেছেন স্থানীয় সংবাদ সাময়িকী বর্ধমান বাণী, এবং বর্ধমানের কথা।

অনেক প্রলোভন তুলে ধরা হয়েছিল তাঁর সামনে। লক্ষ টাকার গোপন তোড়াও বশ করতে পারে নি সাধারণ ঘরের অসাধারণ মূবক সাত্তারকে। স্যার নাজিমুদ্দিন তখন মুসলিম লীগের অন্যতম ভাগ্যবিধাতা। তাঁর প্রকাশ্য ঘোষণাটা আজো তাঁরভাবে আমাদের কানের কাছে ধ্বনিত হয়, যে কোনো মূল্যে তরুণ

সাত্তারকে মুসলিম লীগে আনা চাই-ই চাই। নাজিমুদ্দিনের সেই ঘোষণা-ঘোষণাই থেকে গেছে। যাবতীয় ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সাত্তার সাহেব মানুষের কথাই চেবোছেন।

তিনি যখন কোনো বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করতেন—তা ইংরেজি বা বাংলা যাই হোক না কেন—তাঁর উদাত্ত ভাষণে প্রোত্বন্দ মুগ্ধ হত এ কারণে যে, তার মধ্যে থাকতো মার্জিত রুচির পরিচয়, চিন্তাশীলতা ও ভাবাবেগ-মিশ্রিত দরদ। বি-এ, বি-এল পাশ করার পর তিনি এ গুণে হয়তো জীবনের অন্যেক্ষে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন, কিন্তু তার বদলে তিনি জনসেবাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন করে নিয়েছিলেন।

প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী আবদুস সাত্তারকে প্রথম জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেখা গেছিল ১৯৫২ সালে। এ সময় থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন লোকসত্তার সদস্য। তার আগে গণপরিষদের সদস্য (১৯৫০-৫২)। ১৯৫৭ সালে তাঁর উপর পড়ল নতুন দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গের প্রথমমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করা তখন সহজ ব্যাপার ছিল না। কেন না স্বাধীন ভারতে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্কটি তেমন সুমধুর নয়। আর রাষ্ট্র পরিচালনার যেখানে পদে পদে মালিকপক্ষ খবরদারী করতে চায় সেখানে অমিত সাহসে হাল ধরে থাকলেন গ্রীসাত্তার। রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা সবাত্রে বিবেচনা করে তিনি শ্রমিকদের দুর্দশা দূরীণ করণে কঠোর থেকে কঠোরতর মনোভাব গ্রহণ করেন। প্রথমমন্ত্রী হিসেবে তিনি চা-বাগান শ্রমিক, দোকান কর্মচারী ও কেতমজুরদের ন্যায্য রুজির পাওনার দিকে মনোনিবেশ করেন। তাদের সুখ-দুঃখকে এমন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই সাত্তারের নামে প্রস্থায় তাদের মাথা অবনত হয়। সিনেমান কর্মীদের জন্যও তিনি মনোযোগ দান করেছিলেন। এমন কি সংবাদপত্রের সাংবাদিকরাও তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেন। পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে সাত্তারের বড় দান হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য শিক্ষাসংস্থার চাকরির ব্যবস্থা। স্বার্থ লোকাহিত যাকে বলা যেতে পারে, গ্রীসাত্তার মন্থিপদে অধিষ্ঠিত থাকার পাঁচ বছরের মধ্যে তাই করে গেছেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সাত্তার সাহেব ওয়াক্ফ কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন—সেখানেও তিনি যে কাজ করে গেছেন—তা পরবর্তী কালে অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

নদীয়া:

রেশনে রায়শন

নবম্বাণের শহুরে মানুষও রেশন কার্ড পেয়েছেন, পান না নিয়মিত রায়শন। কার্ড ফেললেই অন্ততপক্ষে খাড়া ক্লাস চাল, চিনি, গম, ময়দা সংগ্রহের পরম নিশ্চিন্তও তাঁদের জাগ্রত নেই। খালি আর কার্ড হাতে ক্রেতারা

সাপ্তাহিক বসুমতী

শিক্ষক সম্মেলন

বঙ্গবাসিন:

দুঃসংকল্পে স্বাধীনতা

আউশগ্রাম বানার অন্তর্গত দুঃসংকল্পে স্বাধীনতার দাবীতে সংগঠিত 'ইউপিও' সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশের পর ধারাবাহিক ভিত্তিতে হয়ে গেছে। তদন্ত করেছেন না-কি জেলার মধ্য মধ্যম আর্থিক মর্যাদা। কিন্তু বিস্তারিত সূত্রে প্রকাশ, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে একতরফা বক্তব্য শুনেই না-কি তদন্ত কার্য সমাপ্ত করেন তিনি। আর তারপরই না-কি সমস্ত স্বাধীনতা দাবী চাপা পড়ে যায়।

দুঃসংকল্পে স্বাধীনতার দাবীতে সংবাদ প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত কর্মচারী জড়িত আছেন সন্দেহে শাসিতর দল নেমে এসেছে তারই ওপর। এই হতভাগ্যের ওপর প্রতিশোধ লব্ধ্য অতিশয় ব্যক্তিগত না-কি কলকাতার রাইটার্স' বিল্ডিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৌড়োয়াই করে সম্মেলনকারী কর্মচারীর ওপর কলার নির্দেশ জারি করিয়ে নিতেও সক্ষম হয়েছেন। হতভাগ্য বিনামূল্যে অপরের অন্যায়ের বোঝা বহন করেছেন।

অতঃপর এই দুঃসংকল্পে স্বাধীনতার দাবীতে এক চিত্তবর্তমান। অভিজ্ঞ মহল জানেন, অপর এক ব্যক্তি, ইউপিও'র দ্বারা বিরুদ্ধে দুঃসংকল্পের অভিযোগ প্রমাণিত; তিনি বহাল ভাবেই চাকরী করছেন। উদ্ভূত কড়-পক্ষের পেটোয়া হলে অপরাধের শাস্তি হয় প্রমাণের অথবা অন্যায়ের পুরস্কার।

আমাদের স্বাধীনতার এসময় জেনেও কি না জানার ভাষা করে চোখ ফিঁকির থাকেন। যদি তাই হয়, তবে পিঠ ফিরিয়ে নীতির সঙ্গে কাগজ-কলমে লড়াই কে? আকর্ষণ করছি এবং বিরোধিতার প্রতি পুনরাবৃত্তি

ত্যাগ বিরোধিতার প্রতি কড়পক্ষের দৃষ্টি অনুসন্ধানের জন্য বর্তমান নিবন্ধ মারফত আবেদনও রাখছি আমরা।

যদি তদন্ত রিপোর্টে দুঃসংকল্পের প্রতি অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি পক্ষপাতিতা হয়ে থাকে তবে তার আশ্চর্য্য প্রতিকার আবশ্যিক।

মাননীয় স্বাধীনতা, এদিকে কলকাতা দৃষ্টিমান করুন। স্বাধীনতার কলকাতা আবহাওয়ার বিব বার্তা রোগের বীজ না ছড়ায় তার জন্য প্রয়োজনীয় এবং দৃঢ়তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

বীরভূম

লালকাটা দর

সিউড়ী শহরের বৃহৎ মন্ডপ বেতনভোগ সরকারী কর্মচারীদের নির্মিত কোয়ার্টার বাড়ি-পুলির আশেপাশে যদি কখনো কারও বেড়িয়ে আসার সুযোগ ঘটে তবে তিনি যেন সঙ্গে কিছু 'সিকুইল' ট্যাবলেট সঙ্গে নেন, অথবা একজন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। আর

বিশেষ হস্তে ডিলারের পরীক্ষা থেকে শূন্য হাতে ফেরে আসেন। মাল নেই। মাফ জবাব।

অর্থাৎ প্রত্যয় কর্তেই নষ্ট উপস্থিতি যোগ্যদের।

কেন মাল নেই? মাল নেই যদি তবে কার্ড আছে কেন? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলে না। বৃদ্ধতার উপার নেই। আসলে দারী কে—ডিলার, না সরকার? ধরবার উপার নেই।

সরকারী কোটা যদি না চাইতে জলের মতোই গড়িয়ে আসে, তবে ডিলারের পৌরস্বত্ব সঞ্চার হয় কী করে!

এই জটিল প্রশ্নের সমুচিত উত্তর না পেয়ে স্থানীয় 'লোকবাহিনী' এবিধে একটি তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু আবেদনের ফলে যে ডিলারদের হস্তদত্ত ছোটখাটো বৌদ্ধাঙ্গীড় করতে দেখা যাবে এতোটা আশা করা অনুচিত। তদন্ত-ফলসহ ডিলারগণ বিশেষ ধাবড়বার পাত্র নন। সাধারণ ক্ষেত্রে সশ্রেণে ডিলারস্বত্বের তালিকাভুক্তি ব্যবহার তারা অনায়াসেই চালিয়ে যেতে পারেন, তদন্তের ভয়ানক ডিলারগণ করেন বলে ভো কিস্বাস হয় না।

তা ছাড়া ইদানীং এতো ঘন ঘন তদন্ত হয় (এবং নিষ্ফল তদন্ত হয়) যে তদন্ত ক্ষমতায় ফলে তার 'হুলাস্কীতি'ও ঘটেছে। তদন্ত-নির্ভর আমরা হরত ক্রমশ বৃদ্ধি পে, তদন্তের আদলতাই হল পরনির্ভরশীলতা। এবং তার সমুচিত মান বজায় রাখার ব্যাপারেও আমাদের হাত খুব বেশি কার্যকরী নয়।

রেশন কার্ডে প্রাশনালাইজেশনের চাপ মারীর খাফা ও সরবরাহ অকসেস সমভাবে স্বতমান।

প্রকাশ, পূর্বস্বলী অঞ্চলের অঞ্চল পণ্ডারের সম্পাদককে উত্তর অফিস থেকে শূন্য হাতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে। আর্থিক জনগণ এই দুঃসংকল্পের বাজারে রেশন কার্ডের আবেদন করতে চান। অঞ্চল পণ্ডারের থেকে তাই ফরম চাওয়া হয়েছিল। পাওয়া যায় নি। শূন্য, কড়া উত্তর পাওয়া গেছে, নতুন কার্ড ইস্যু করা হবে না।

দুঃসংকল্পে স্বাধীনতার সাধারণ হস্ত তদন্ত খালি-নিষ্ফল বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। কি বৃদ্ধিতে হবে, নতুন কার্ড ইস্যু হবে না মানে কি 'নতুন ইস্যু'র নতুন পেটের দারিগ্র গ্রহণ করা হবে না? কিন্তু দারিগ্রিক, নতুন পেটের জন্য নতুন কার্ডের আবেদন তো ওদের নয়। তবে কয়ম পেটেরা হচ্ছে না কেন?

তাহলে বক্তব্য কি নিম্নরূপ:

১। কার্ডবৃত্ত পুরানো পেট—সরকারী?

২। কার্ডহীন পুরানো পেট — বৈয়াকরণ?

৩। কার্ডহীন নতুন পেট—বৈয়াকরণ কর্তে বৈয়াকরণ ফল; পেটের দারিগ্র ভোমার, পেট সামলাও তুমি?

সংকীর্ণ চর্চার আদি পটভূমি, স্বল্পবয়সেই পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির নবম বার্ষিক সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল ১০ই থেকে ১২ই জুলাই। বিভিন্ন জেলা থেকে সর্বমোট প্রতিনিধি এসেছিলেন প্রায় তিন শত জন। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অভিজ্ঞ, পরিদর্শক ও শিক্ষকবৃন্দ।

সম্মেলনে শিক্ষার জাতীয়করণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জাতীয়করণের সঙ্গে সম্মত প্রকাশ করেন অধিকাংশ সদস্য। বিস্তারিত আলোচনার জন্য অবশ্য পূর্বা-কাশের পূর্বেই একটি স্বতন্ত্র বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করা হবে।

সেশাল ক্যাডার অথবা সাধারণ পর্বের কার্যসূচী অবস্থার যে সব প্রাথমিক শিক্ষক যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁদের পদোন্নতির জন্য কলকাতা গ্রন্থকলপে শিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

এসময় শিক্ষার হালচাল ফক্টে আশা-করক নয়। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, ছাত্র সম্প্রদায়ের এবং শিক্ষকগণের। ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা করেন, প্রয়োজনে সভা সমিতি। শিক্ষকদেরও সংগঠন আছে। দুঃসংকল্পে পরিচালকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘরোয়া কোললেই ব্যতিব্যস্ত। সম্মেলন করে উন্নততর প্রস্তাবে শিক্ষার সংস্কারের প্রেরণা এঁদের মধ্যে ঘটিত। কারণ সম্ভবত এই ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা স্বল্পকালের জন্য নির্বাচিত। অনেক ক্ষেত্রে এঁদের অনেকই নির্মিতভাবে কমিটি সভারও কোনো পূরণ করেন না। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরু দায়িত্ব এঁদেরই ওপর ন্যস্ত। এঁদের মধ্যে কতজন যে প্রকৃত শিক্ষানুরাগী এবং কতজন মাতাম্বরী লোভী তার কোনো পরিসংখ্যান তৈরি না হলেও অভিজ্ঞ মহল জানেন, স্কুল কমিটিতে সদস্য বা ডেপুটির হওয়ার জন্য ক'টা রাজনীতি ফক্টে সক্ষম।

শিক্ষক সম্মেলনে এসম্পর্কে বিশেষ আলোচনাও সমান অভিপ্রের্ত। শিক্ষক সম্মেলনে ছাত্রদের সমস্যা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা-গুলিরও গুরুত্ব লাভ করা উচিত।

শিক্ষক সম্মেলনে মনে রাখা উচিত, শিক্ষকগণ সাধারণ কর্মচারী শ্রেণীর মানুষ নন। তারা বিশেষ আদর্শগত শ্রেণী গ্রহণ করেছেন। তাই শিক্ষক সম্মেলনে সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র শিক্ষকগণের চাকুরীগত সমস্যার আলোচ্যরূপে দেখতে চান না। শিক্ষক সম্মেলন দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃত নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করুন, আপামর জনসাধারণ সেটুকুও আশা করেন। শিক্ষকগণ সাধারণের যে প্রশ্নের আসনে প্রতিষ্ঠিত তাতে সাধারণের স্বার্থকেও মনে রাখতে হবে যে কি।

সাম্প্রতিক কঙ্গনতী

কিছু ক্রমত দৈত্যাদিনার বিশ্বাস থাকে তবে তাঁকে সঙ্গে রাখতে বলি, ভাঙারসহ জনৈক প্রেতলোকে আবিষ্কারী সাহসী কন্যাকে। কেন না কোয়ার্টার বাড়িগুলির ঠিক মাঝখানেই গাঢ় গলিত শবের অপারেশন রুম। বৃটিশ আমলের লাসকাটা ঘর। দিবসরাত শব্দ পচা মড়ার মাড়ামাড়ি ওখানে। দুর্গন্ধে দম ছেটে আসবে। বিবিসিয়ার দেহমন অসুস্থ হবে। এমন প্রায়শই হচ্ছে স্থানীয় আধিবাসী-দের। অথচ বহু আরবের-নিবেদনেও নাকি মগটি স্থানান্তরের কোনো উদ্দেশ্যই নেই কারও। জনস্বাস্থ্য বিভাগ এসব ব্যাপারে ধীর।

ইংরেজ আমলে সিউড়ীর এমন বাড়ি-বাড়ন্ত ছিল না। শহর ছিল ছোট। চারদিকে হুড়ানো ডালগাজি। এমনি এক ডালগা জমিতে তাই নির্মিত হয়েছিল লাসকাটা ঘর।

কিন্তু বগা বিচ্ছেদের ফলে সবুজই বেনন, সিউড়ীতেও তেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনের মতো বেড়ে উঠল। ফলত লাস-কাটা ঘরকে প্রতিবেশী করে বর্তমানে গলিত শবের অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ হজম করে বসবাস করতে হচ্ছে দুর্ভাগ্য সরকারী কর্মচারীদের। আর পোস্টমেন্টের জন্য লাস আনাখোশাও বিরামহীন।

স্থানীয় সংবাদ সাম্প্রতিক বীরভূম বাসীর সর্বোদে প্রকাশ, 'স্বাধীন হওয়ার পর জেলার' শবের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ফলে সদর জব্বার বিভিন্ন অঞ্চল হতে মতদেহ নিয়ে এসে ঢোকান হয় মগ পোস্টমেন্টের জন্য। পোস্টমেন্ট হতে দেরি হয়।"

সুতরাং অবস্থা যে কোন পর্বত উপনীত জা ভূভোগী না হলেও বেশ বোকা বাস।
দুর্গন্ধের বিষয় বৃত্তে চান না শব্দ জনস্বাস্থ্য বিভাগ।

কলগাইগড়ি:

কলগাইগড়ি

না, বহু লেখালেখি সত্ত্বেও কলগাইগড়ি-রাসী এখনও কলগার হাট পেলেন না। জালচর প্রকল্পের কলগা উদ্যোগ হয়েছে। কলগাই অফিস বলেন, খোলা বাজারে খোঁজ করলেই কলগা পাবেন। এখানে কেন! জন-সাধারণ বলেন, খোলা বাজারে যে পরিমাণ টাকি ভারি করে যেতে হয়, টাকির অকল্যা করে ততদূর স্বাধীনতা নয়। অন্যথায় হয়ত বিক্রয় বাকি চোখে উত্তর দেবে, রাস্তান কাঁচ কোয়ার মশাই। পাওনা আছে। সুতরাং জাপার শব্দই অসুবিধাজনক। এও না, ও-ও না। হাকির শব্দ হাকিরী খুঁশ করতে পারলেই সম্ভব। অর্থাৎ কলগা কলগা তাই বাজার কলগা; এখন যদি কলগা টাকি ফেলো তবে চুলের আগুন জ্বলবে, না হলে হাড়-কুড়ি চুলের দোরে দাও!

এমন সংবাদস্থান কলগাইগড়িবাসী

হাটের উঠেছেন। কলগা নিয়ে এই জাতীয় বধ কেরামতি বধ করার সরকার কবে সজাগ হবেন কে জানে। জনসাধারণের ধৈর্য পরীক্ষা তো অনেক হল।

আর কত কাল!

হুগলী:

এবার মাস্কুতো ভাই

ভারত জুড়ে মামা-ভাগনের ঐশ্বর্যচর আজ কারও অবিদিত নেই। বাংলায় নতুন প্রবাহ বচনের তালিকার বোধহয় দেশটা কার, মামার জাতীয় একটি বচন স্থায়ী আসন সংগ্রহ করে নিয়েছে। এবার শুনাই নতুন হিড়িক। মৌর্য শব্দ, হয়েছে মাস্কুতো ভাই-দেরও। অথচ আশ্চর্য, যে দেশের সিবিল কোর্টের খরচখরচা তুলে দের প্রতি-দিনের ভাই-ভাই বিরোধ, সেখানে মাস্কুতো ভাইরা এমন গলাগালি শব্দ করতেন কী করে।

সর্বোদে প্রকাশ, জনৈক মাস্কুতো ভাই-এর জন্য সরকারী হুগল শব্দ নববলই হয় নি, মাস্কুতো ভাই-এর মাস্কুতো ভাই-এর এক ভ্র-লোকের পকেটও খুলে হয়েছে। সর্বোদে একান্ত স্থানীয় এবং সেরাশ্রেষ্ঠ স্থানীয় সংবাদপত্রের সংবাদকর্ম উদ্ধার করে মাস্কুতো ভাই-এর নয়া রাজত্বের বিচিত্র স্বর আশনাদের কাছে পরিবেশন করি। আশা করি অস্ত্রপত্র টেকার শব্দে মামাইনরা মাস্কুতো ভাই-এর সম্মান করবেন। সংবাদ নিম্নরূপ:

মাস্কুতো, দীর্ঘ ২১০ বছরের ঐশ্বর্যের পর অনেক চিন্তাবাহিনী করিয়া অবশেষে স্থানীয় বি ডি ও গোপীমোহনপুরের রায়-সতীরা-মামা গাড়ার জন্য এক নলকূপ মজুর করেন। সঙ্গে সঙ্গে গাটের পরস খরচ করিয়া নলকূপটি কসাইবার জন্য জব্বারী আদেশ দেওয়া হয়। কলগা হয়, কলগা শব্দ হইলেই সরকারী টাকি দেওয়া হইবে। ১২০০ টাকার জারগার নলকূপ বসবে, এই লিখিয়া দিয়া সর্বশেষ উদ্যোগ সঙ্গে সঙ্গে গাটের পরস খরচ করিয়া গত ২১শে মে হইতে ৩১শের মধ্যে নলকূপ বসাইয়া ফেলেন। কিন্তু, জানা গেল, গত ২১ জুন বি ডি ও এক আজগুবি অভিযোগ দিয়া উদ্যোগ ভুললোকে নলকূপ বসাইতে নিষেধ করেন। শব্দ তাহাই নহে। বি ডি ও উক্ত নলকূপ নামজুর করিয়া পাশেই আর একটি নলকূপ বসাইবার হুকুম দেন বলিয়া অভিযোগ।

অনুসন্ধানে জানা গেল, যেখানে নল-কূপটি বসানো হইয়াছে সে জারগার প্রধানের এক মাস্কুতো ভাই-এর মনঃপুত নয়, অথচ তফাৎ ৫০৬০ হাতও হইবে না। তাহা ছাড়া, যেখানে বি ডি ও নামজুর করিতেছেন সেখানে অধিকাংশ পরিবারের মতেই নলকূপটি বসান হয়। এখন বি ডি ওর কথায় গাটের পরস খরচ করিয়া ভুললোকে যেখান হইয়া গড়িয়াছেন।

সেদিনাপুর:

এক পলাতক

সর্বোদে প্রকাশ, পলায়েত কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও ফলত পুলিশী জলুমের খাফার দাঁতস্ব তালদা অঞ্চলের সাধারণ মানব ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। স্থানীয় অঞ্চলে উপরোক্ত ঘটনার ফলে চমকবাদের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, তালদা, মলয়ান-পুর, চেলিকপুর, নন্দকুড়িয়া, গনিচা প্রভৃতি গ্রামের আধিবাসীরা বসন্তপন্থী নেতাদের কাছে তাঁদের দুঃখ কথা জানিয়ে বলেন, এবং তালদা অঞ্চলে গড়ে কবরস্থ করা হয়েছে তিনশত। বর্ষিত কর গনত্রে অস্বীকার করার আদায়কারী সঙ্গে বচসা হয় এবং পুলিশ অফিসে এসে আনিচ্চ করদাতাকে গ্রেপ্তার করতে আসে। বাথ সাধেন কিছু গ্রামবাসী। তাঁরা করদাতার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা নিশ্চয় করতে অনু-রোধ জানান পুলিশ অফিসারকে। বাস, হয়েছে শব্দ পেলেন পুলিশবাহিনী। নতুন মামলা বৃদ্ধ হয়ে গেল এই মনে যে, জন-সাধারণ পুলিশবাহিনীকে আটক করে রেখেছিল।

অতঃপর, এই অসম্ভব হাস্যকর একটি অভিযোগের ফলেই কিন্তু অস্ত্রপত্র পুলিশ এ জারগার যথেষ্ট ধরপাকড় চালাতে শুরু করেন।

আসামী করা ও খালাস করার ফলে নাকি পুলিশী পকেটে অশোভ, স্তম্ভ টিহিত টাকিও পোরা হচ্ছে এই মর্মেও। এপর্যন্ত বর্ষজন গ্রেপ্তার হয়ে-ছেন, অনেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুলিশের শব্দ গ্রহণও চলছে পুরোদমে। এতোতেও হয় নি। এ জারগার পুলিশী ক্যাম্পে পুলিশপুলগবদের খাওয়াওগার যাতে হুটি না হয় তজন্য গ্রামবাসীদের কাছ থেকে মুরখিরা 'সিধা' আদায় করছেন। সাধারণের দাবি, তালদার পুলিশ ক্যাম্প অপসারিত করতে হবে।

সংবাদ দেখে পাঠকমাত্রেরই চক্ৰবর্তন হবে জানি। কেন না তাঁরা নবাবী আমলে বল করেন না, বগী পেশাদার কথা কেবলমাত্র ইতিহাসেই পড়েছেন এবং বিদেশী শাসক ইংরেজ আমলের শোষণ মনোভাবের পাল্প পরিচিত আছেন; কিন্তু তাঁরা স্বাধীন ভারতে এজাতীয় হামলা অপ্রত্যাশিত ও অনির্ভর্য বলেই মনে করেন।

কর্তারা কি মনে করেন জানি না, কর্তা-ভজারা কি সাফাই গাইবেন শুনবার প্রয়োজন নেই; দরকার মনে করি, অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন অন্যত্র না ঘটে, সেদিকে কর্তৃ-পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার।

আদির ম্যানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস



মহাশেবতা ভট্টাচার্য

(স্ব-প্রকাশিতের পর)

১ পঞ্চদশ

দেহখান থেকেই তাঁর ঘোড়া ফিরে আসে। প্রাসাদের ছাত থেকে রাণী দেখেছিলেন ঘোড়ার পিঠে উপড় হয়ে ঝুলছেন ভূমিপতি দ্বার। পিঠে, কাঁধে, কোমরে অনেকগুলো তাঁর উঁচু হয়ে ছিল।

সব শেষে, সব হয়ে গেলে, তিনিও অনুরোধ করেছিলেন, 'ও'র ইচ্ছে ছিল, আমিও বলি, 'তুমি এ রাজ্য ভোগ কর।'

'তা হয় না।'

আনন্দীরাম কিছতে রাজী হলেন না। তিনি ত' রাজ্য চান নি, তিনি ভাগ্য ক্ষেত্রে এসেছিলেন, সে অনেক দূরখে। ফলেস্বরী তাঁর মনে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, সে জ্বালা ছিল। তাছাড়া অবস্থা না ফেরালে তাঁর মা, ছোটমা, ছোটবউ এদেরই বা প্রতিপালন করবেন কি করে?

'আপনি বিনা স্মিধার এ রাজ্য নিজামতে খাস করুন।'

রাণী তাঁর চেয়ে বিষয়বুদ্ধি রাখেন। ঠিক হেসে বললেন, 'বগী' সফর যাবে না। ওদেরও খাজনা দিতে হবে, নবাবকেও দিতে হবে। এ-রাজ্য খাস করলেও নবাব নিজামতের লাখ হবে না যে এ গভীর জঙ্গলে এসে নজর রাখবে। কুক মাহিতীর সঙ্গে মোটামুটি একটা

আপোষ করা যাক। ওদিকে বগীদের সঙ্গেও যোগ রাখতে হবে।'

তাই হল। বগীরা এ-অঞ্চলে রয়ে গেল বহুকাল পর্যন্ত। তাদের অভ্যাচারে ক্রমে, গঙ্গাজলের মত ছোট ছোট জনপদ সবই অস্তিত্ব হারাতে শুরু করল। ক্রমে, ঘন বন এসে ঢেকে ফেলল সব। উড়িয়ায় বসে বগীরা বারবার মৌদীনীপুরের এ-অঞ্চলে হানা দিতে থাকল।

কোথাও বাধা পেল না তারা। ওদের বাধা দেবার শক্তি সাধারণ চাষীগেরস্তর ছিল না।

ক্রমে, মৌদীনীপুরের দক্ষিণ আবার জঙ্গলে ঢেকে গেল।

আনন্দীরাম তার অনেক আগেই আঁধার-মাণিকের দিকে রওনা হলেন।

নিঃস্ব এসেছিলেন, নিঃস্বই ফিরে চললেন। সঙ্গে নিয়ে চললেন শূঁধু, কিছ, নতুন অভিজ্ঞতা।

বিরাটের মন্দিরে এসে সূর্যকণ্ঠের সঙ্গে দেখা হল।

বিরাটের মন্দির বর্তমানে অতি নিরাপদ জায়গা। পচেত ও সোনামুখীর মাঝমাঝি বিরাটের এই কালীমন্দিরে মারাঠারা আসতে-যেতে পূজো দেয়। ঘন গজাডবনের মধ্যে এ মন্দিরের চড়া আগে দেখা যেত না। বিরাটীস্বরী কালীকে সাধারণত ডাকাডাকা পূজো

দিতে আসত। এখন বগীরা তিন বছর জঙ্গল কেটে আগুয় পরিষ্কার করে ফেলেছে।

বিরাটীস্বরীর মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর। অর্ধেক শরীর মাটি থেকে টেলে উঠেছে। কপাল ও মাথা মেটে সিঁদুরে লেপা, বিরাটী জিত, এক হাতে সত্যিকারের নরকপাল, আর এক হাতে খল।

কিংবদন্তী অনেক আশ্চর্য কথা বলে। যথা দেবীর প্রথম পূজারী পতিভূত মহাশয় দেবীর ভৈরবসহ গোপন লীলা দেখে ফেলে-ছিলেন বলে দেবী তাঁর মাথা কেটে ফেলেন ও হাতে ধরে থাকেন।

এখনো এ-মন্দিরে নরবলি বহুলপ্রচলিত। সেই ভয়ে দিনমানে এ জঙ্গলে রাখাল বালকরা আসে না। পাছে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে বলি দেয়। তবু এখনো এদিকে-ওদিকে মানুস গোপন মানসিক করে। লুকিয়ে গুপ্ত কাজী-পূজো করে চলে যায়। সকালে এলে কবল বুদ্ধভরা কুণ্ড এবং পূজোর নানা উপচার দেখ যায়।

এই লেই বিরাটীস্বরী।

বিরাটীস্বরীর কথাতায় সকলের এমনই বিশ্বাস যে কি ইউরোপীয় কুঠিয়াল, কি মুসলমান রাজকর্মচারী সকলেই গোপনে এখানে পূজো পাঠাতেন। এই সৌদীন অবধি। মারাঠা আক্রমণের পর আর সহজে এখানে

সাপ্তাহিক বসুমতী

কেউ আসে না। এখন শব্দ সাধুসম্মাসীরা মাঝে মাঝে আসে। জঙ্গলের বুক কেটে পরিষ্কার পথ হয়েছে। সৈদিকে চেয়ে বলে 'গণী'রা যা বল, খাসা জাঙ্গাল দিয়েছে।'

এখানেই সুরকঠ রায়কে পেলেন আনন্দীরাম। বর্তমান পুজারী পতিতুড় মহাশয়, এখন সুরকঠের বড়ই ভক্ত। কয়েক বছর থেকে। তিনি সুরকঠকে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আনন্দী-রামকেও দিলেন।

'তুমি এখানে?'

আনন্দীরাম আশ্চর্য হলেন। সুরকঠকে হঠাৎ মন্দিরে পাঠান তা কেন আশ্চর্য করেন নি। 'আমি ত এখানে মাঝে মাঝে আসি।'

'এখানে?'

বিরাটীশ্বরী কালী সম্পর্কে বক্তৃতা শুনেছেন মনে পড়তে আনন্দীরাম যেন কুহক হলেন।

'তুমি এ রকম জরগাম আসবে.....'

'আমার গুরুদেবকে খুজতে খুজতে একবার এসেছিলাম। বড় নিজস্ব জরগামি, আমার ভাল নেগেছিল।'

'ভাল নেগেছিল।'

'নিজস্ব ভাল লাগবে না কেন বল? আমি ত আর কালীপূজা করতে আসতাম না। বাইরে বসে থাকতাম।'

'ভয় করত না?'

মানুষকে ভয় করত, তাই ত' বনে এসে লুকিয়ে থাকতাম। বনের বাঘ ভাঙুককে আঁধার ভয় কিসের? বা হোক, তুমি কোথা থেকে? এ পথে বা এলে কেন?'

'ঘুরতে ঘুরতে, অর্থাৎ একটু ঘুর পথেই দেশে বাছি। বগীর ভয়ে সোজা পথে হাটা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

সুরকঠ একটু হেসে বললেন, 'আসতে কল। আমাদের পতিতুড় মহাশয় বগীর সর্দার লেশপাণ্ডের একজন বিশ্বস্ত চর। কথায় কথায় মানুষকে ধরিয়ে দিয়ে ইনাম আদায় করেন।'

মন্দিরের চাতালে একটি লোক গেরুয়া কাপড় মুড়ি দিয়ে শূরোছিল সে পাশ ফিরল।

আনন্দীরাম বলতে লাগলেন 'সর্বত্র অরাজকতা। বীরভূম বর্ধমানে উৎকৃষ্ট ধান জন্মে। এ দুই প্রধান রাঢ়বাগে লক্ষ্যীর গোলা। বগীর হতে চাষীরা উৎখাত হল। চাষের জমিতে জঙ্গল, গৃহস্থের ভিটেয় শেরাল চরছে। বান্দন পণ্ডিত থেকে সুর করে কাসারী শাখারী, তাঁতি, কামার, কুমার সবাই দিকে দিকে পালিয়েছে।'

সুরকঠ তা জানেন। বললেন, 'সেবার দেওয়ানবন্দীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কাটোয়া যেতে যেতে দেখেছিলাম ভিখারীর ভিক্ষাপাত্র, বৈরাগীর একতারা পথের ধোঁয়া গড়াগড়ি যাচ্ছে। তখনই মনে হয়েছিল যখন ভিখারী বোমটম অবধি নিশ্চিন্তে বাস করত

পারছে না, তখন এ-দেশের বড় দুর্দিন।'

'এখন কেমন দেখছে?'

'এখন কেমন দেখছি।'

সুরকঠ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনেক আঁক কষেছি আনন্দী, অনেক গণনা করে দেখেছি। বৈদিক দিগ্বেই যাই, দেখতে পাই পরিণামে সর্বনাশ, আপাত সর্বনাশ।'

'যেমন?'

'আপাত সর্বনাশ মানে তার পরের পরিণাম অজানা।'

'সে পরিণাম শব্দ না অশব্দ?'

'তা কে বলতে পারে?'

'দেশের দুর্দিনের আর বাকি কি ছিল? চাষীর চাব নেই, গৃহীর কর্ম নেই। বন্যায় মানুষেরা কোথায় গেলে বাঁচতে পারবে সেই কথা ভেবে বড় গম্ভীর পায় হয়ে ইসলামবাদ, মাদকত, বরিশাল, এমন কি চট্টগ্রাম অবধি পালাচ্ছেন।'

'পালাচ্ছেন যেমন, সরছেনও তেমনি।'

'তাও ত' শুনতে পাই। গো-মান, পালকী, নালকি, ডুলি, নৌকা, শালতি, সবই দূর্ভাগ হয়েছ। বড়গাঙ পারের মাঝিরাও বিপন্ন পলাতকদের কাছ থেকে যেভাবে পারে টাকা আদায় করছে।'

'তাও জানি। মানুষের, শ্রেণীবদ্ধ মানুষের স্বভাব পাটোছে। দেখ, গোদা-গাড়ী ঘাট বল, আর গিমোহনী, কুশে, সর্দা ঘাট বল, সর্বত্র মাঝিরাও স্বভাব ছিল অন্যরকম। আমি ত পথের মানুষ, এমন জারগা নেই যেখানে যাই নি, মাঝিরা কীভন গায় শুনেন কত সময়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে বাস অবধি করেছি।'

'কি খেতে?'

'যে যা দিত তাই খেতাম। তখন আমার এ এক ভাব। পিসিমার রামাঘরে বাগদী বড়টুক পিজাকোলা করে এনে বসেয়েছিলাম, দেখেছিলাম জাত কোন পথে যাবে, মনে নেই?'

'খুব মনে আছে। বড় আচার তোমার লম্বা নাক উঠানে ঘষে দিয়েছিলেন।'

দুজনেই হাসলেন। এক সময়ে দুজনে বাল্যবন্ধু, আত্মীয়, সহপাঠী ছিলেন। তারপর দরিদ্র সুরকঠ কাশিমবাজারে জগৎপতি আচার্যের আশ্রয়ে গেলেন। ফুলেশ্বরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে; আনন্দীরামের সঙ্গে জগৎপতির বোন নিদুলীর বিয়ে হবে এই সবাই জানত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ফুলেশ্বরী গেলেন আনন্দীরামের ঘরে। নিদুলী রইলেন অবিবাহিতা। তারপর সুরকঠ ক্রমেই সম্মাসী হয়ে গেলেন।

গ্রামে যখন বগীর আসে তখন ফুলেশ্বরী সুরকঠের বাড়িতেই ছিলেন। তা নিয়ে দুজনেরই মনস্তর হয়। তার আগে থেকেই হয়ত বিশ্বব্বের ফলশ্রুতি ভেতরে বইছিল। কিন্তু আজ, বগীর আরম্ভে যখন রাঢ়বাগ উৎসব, তাঁর বাগিনা, সব রসাতলে গিয়েছে

গরীদিকে বিদ্রোহ, অরাজকতা, গাণ্ডের রাঢ়বাগকে দুর্ভাগ্যবশে এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছে, পলাশীর আম-বাগানে, বালাজীর সঙ্গে যে সন্ধি হয়, সে সন্ধি পরমহুত্রে বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে ভেঙে ফেলার ফলে যে পরিণতি বাংলার ভাগ্যে ক্রমেই অমোঘ হয়ে উঠেছে, তারই চার্চিহের সামনে বসে তবে আজ তাঁরা কখনও মত আলাপ করছেন।

এ চার্চিহে কোন বিশ্বকর্মীর আঁকি কে বলবে। এ চার্চিহে শূরুই ধুমাবতী ও ছিন্নমস্তার ভয়ঙ্কর লীলার দৃশ্য। যে বিশ্বকর্মী একসময়ে সুরকঠের চোখের সামনে শান্ত, সুন্দর, নিশ্চিন্ত গ্রামবাংলার পট মেলে ধরেছিলেন, এ কি তাঁরই আঁকা?

এ চার্চিহে কৃষিকের অরণ্য, বাংলার বন্যশিল্প ছিন্নমস্তা, বন্য শাসক ভাগের হাতে লাঞ্চিত, আর বাংলার সাধারণ মানুষ যাদের চিরদিন, চিরকাল, কোমরে নেকড়া, হাতে লাঠল, শীর্ণ বলহ, এইমাত্র সম্পদ, রাজকল, শ্রেষ্ঠকল, সেকল শব্দে যে হঠাৎ ভরে অস পায় কি পার না, তারা আজ গৃহ-হারা। বিভাঙিত, পথে পথে নিরাশ্রয়।

সুরকঠ যেন মানসচক্রে দেখতে পেলেন সব। সহসা তাঁর ভাবান্তর ঘটল। চোখে জল। তিনি অক্ষুণ্ণে বললেন, 'এরা কি দোষ করেছিল মা? এরা কারো রাজ্য কেড়ে নেয় নি, কারো গৃহহারা করেনি, এরা যে দীনের দীন, অতি দীন, মা গো!'

আনন্দীরামের দিকে চেয়ে বললেন, 'অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে কথা বলছি, বড় আনন্দ হচ্ছে। দেখ আনন্দী, বিশ্বব্ব কিছ না, কিছু না, আজ মনে হচ্ছে তা ভালবাসার আর এক চেহারা।'

সুরকঠের এই অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি শুন্যে আনন্দীরাম অভিভূত হলেন। সুরকঠের হাত ধরে বললেন, 'তুমি অনেক বড় সুরকঠ, তোমাকে কি আমার বিবেচ্য করা সাজে?'

সুরকঠ নিজেকে সম্বরণ করলেন, হাসলেন। বললেন 'গৃহীর কথা, সাবধানে বলা কথা, পাছে আমার মনে আঘাত লাগে। কিন্তু আমার স্বীকার করতে লম্বা নেই আনন্দীরাম, আমি তোমার ঈর্ষা করতাম এক সময়ে।'

'আমাকে।'

'হ্যাঁ, তোমাকে। বালক বয়সে ঈর্ষা করেছি, তুমি না চাইতে নতুন ধতি পেতে, বাপ, মা, সবার ভালবাসা পেতে বলে।'

'তোমায় ত' সবাই ভক্তি করে সুরকঠ। ভক্তি ভালবাসার চেয়েও বড়।'

'জানি না। তারপর, একটু, বড় হলো, যখন মন্দিরে মন্দিরে যেতাম, গরু, খুজতাম, তখন ঈর্ষা করতাম কেন জান?'

'না।'

'এইজনে ঈর্ষা করতাম যে তোমার

সামাজিক কলহ

গর্বেপূর্ব কৃন্দর্শন করেছিলেন, তোমাদের ঘাড়িতে, ঠাকুরঘরে তাঁর জিনিস দেখতে মানুষ আসত বলে, তোমাদের সবাই ধার্মিক ধ্বংস বলত বলে। মনে হত গৃহস্থের সুখ-শান্তি, ভক্তবংশের মর্যাদা সম্মান, সবই তুমি বিনা চেষ্টার পাছ। আর আমার এমন মর্ডাণ্য, যে খড়ি পেতে হাত গুণে তবে একটা পৈন্য আদায় করতে হয়। অথচ, ঈর্ষা হত বলে নিজেকেও ভেমা করতাম। কত সময়ে একা একা আচার্যপুত্রে অভ্যর্থনা গাছের নিচে বসে জলে নিজের ছায়া দেখতাম আর গুণে কলে বলতাম বেটা হিংসুক, আবার বড় বড় কথা বলে বেড়ায়।

এ-সব কথা থাক।

এখন আর সে ভাব মনে নেই, তবে কথা উচিত। আমাকে এ-সব কথা স্বীকার করতে হবে বইকি, নইলে মৃতি নেই আমার।

তুমি কিন্তু অন্যকথা বলছিলেন।

হ্যাঁ, মাকিমারাদের কথা বলছিলাম। তাদের এক সময়ে দেখছি কত শান্ত। কৃপ-পল্লী, গলার কণ্ঠী। কিন্তু এখন দেখছি হত ধনী লোকেরা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে, তাদের কাছ থেকে গলার গামছা দিয়ে টাকা আদায় করছে। মাকিন্দীতে নৌকো নিয়ে ডুবিয়ে ধরছে, কেটেকটে কেড়ে নিচ্ছে।

তবু ত' পালাচ্ছে ওরা।

যারা পালাচ্ছে আমি তাদের বলি মূর্খ! ইচ্ছাধার পালাবে বাবা? ভগবানের রাজ্যে পালিয়ে কোথাও নির্যাত এড়ানো যায় কি? কিসের হাত থেকে পালাবে? লোভ, মোহ, হিংসা, মায়, মৃত্যু, সব ত' তোমার দেহে বাসা বেঁধে আছে। যেখানে যাচ্ছে, দেহটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবে আর তুমি নিরাপদ কিসে? বাঁচবেই বা কি করে?

কিন্তু সুরকণ্ঠ, পাল্লাতে ত' হবেই। আজ রাড়বংশের লোক পশ্চাৎ পেরিয়ে পালাচ্ছে, কাল বীদ ওদেশে হাঙ্গামা বাধে?

আজ যারা রাড় ছেড়ে ওদেশে পালাচ্ছে, কাল, ওদেশে বিপদ বাধলে তারাই আবার এ পশ্চাৎ পেরিয়ে এদেশে পালিয়ে আসবে।

বল কি!

এ আগামীকাল, তোমার আমার হিসেবের আজকাল নয়। ভগবানের হিসেবে সে আসছে কাল আসতে হয়ত অনেক সময় যাবে। কিন্তু আমি তোমায় বলে দিচ্ছি আনন্দীরাম, তখন এই সব মানুষই ফিরে পালিয়ে আসবে এই রাড়বংশে, গংগার কোলে। তখন কি হবে জান?

কি হবে?

আবার এই সব মাকিমারা, যারা মান-মিছন যোগ্যে তারা তাদের মরবে ধরবে। আবার তারা, এখন যেভাবে যাচ্ছে, সেইভাবে কাদতে কাদতে ফিরবে। এ দেশে আসবে বাঁচার আশা। কিন্তু এই যে ডাঙার

না। আবার তারা দেখে করে বয়ে আনবে লোভ, মায়, মৃত্যু, মৃত্যু।

তারপর?

সুরকণ্ঠের কথাগুলো, এ নির্জন বনে, ভয়াল পরিবেশে আশ্চর্য চলমান ছিল। আনন্দীরামকে সুরকণ্ঠ কেন দিব্যদীপ্তি দিয়ে দিয়েছেন। তাই আনন্দীরাম দেখতে পাচ্ছে, আজ ভাগীরথী অসহায়, তাই রাজবংশের লোক পশ্চাৎ ওপাশে আশ্রয়ের জন্যে যাচ্ছে, আবার দেখতে পাচ্ছে আগামী-কালের চিত্র, তারাই ফিরে আসছে বলে বলে, পলায়ক।

এমন কেন হল সুরকণ্ঠ? এমন কেন হবে?

কেন হবে না বল? মানুষের মধ্যে শাপ, লোভ, মাংসক' বেড়েছে, আমার গৃহ-দেব শূন্যেছেন নিশীথে, অগোচরে, ভাগীরথীর জলে কলম শোনা যায়।

ভাগীরথীর জলে কলম?

হ্যাঁ আনন্দী, হ্যাঁ। মানুষ ভূরি ভূরি পাপ করছে, আর ভাগীরথীর জলে স্নান করে কলহে মা, সব পাপ কালন কর। মানুষের পাপ ধারণ করে মা এখন পীড়িত, কাতর। তিনি বড় দুঃখে বলেছেন—এই হর্ষিদাবাদে, এই গংগাতীরে, যুগ অস্ত যাবে।

তুমি যে বলছ পরেও তাই ঘটবে?

নিশ্চয় ঘটবে। আজ মানুষ যে শাস্তি পাচ্ছে, সেও তখন নিজের প্রমাদে ঘটবে। তাই রাজ্যও মরছে, উলুখড়ও মরছে। সৈন্যও তাই ঘটবে। মানুষের মনে, প্রমাদে, সর্বনাশ ঘটবে, আর এমনি করেই এই মানুষই ফিরে আসবে ভাগীরথীর কোলে।

সেই একই মানুষ?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তবে তখন কাল আরও প্রজ্বলিত। মানুষ সেকথা মনে রাখলে হয়। এমনিই যে ঘটবে গো। মহাভারতে, দেখতে পাও না, ভারতের সকল জাতি হুংসু করলে, দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লে। তখন অন্ধারের লোক স্মারকাল এসেছে, কুরুক্ষেত্রের

মানুষ গ্রীহ-কামরূপে এসেছে। আজ তারা যদি সেই দেশে ফিরে যায়, তারা কি ফিরে আসবে তারা স্বদেশে ফিরছে?

মনে রাখবে না?

না। মনে রাখলে ত' মানুষেরই ভয়। যখন যে দেশে থাকবে, সে দেশকে আগুন করবে, তাহলে ত' সব গোল চুকে যায়। এই যে মানবশরীর, এটি হল গংগাগুলোর জায়গা, এই যে দেহের মধ্যে মন, সেটি হল গোল বাধাবার গুরু। কেন জান? অন্যক' ম, ও ক' হুই সারথীই চালাতে চায়, কিন্তু মন যেটা এমন বস্তু, যে ক' এর পরামর্শ আগে নেবে।

তোমার কথা বড় আশ্চর্য সুরকণ্ঠ।

কিন্তু প্রতিটি কথা সত্য।

না আজ হয়েছে, তা কাল হবে, একক' মনে করলে যে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়।

কেন! অসহায় মনে হবে কেন? না আজ হয়েছে, তা কালও হবে, তুমি তোমার কাজ বীরদর্পে করে চলে যাও।

আমার কাজ!

আনন্দীরাম একটু হাসলেন। বললেন, আমার চেহারা দেখছ ন? ভিক্টরের হাল, ডোমের দশা। নৌভাঙার পেছনে ছুটে আমার এই হল।

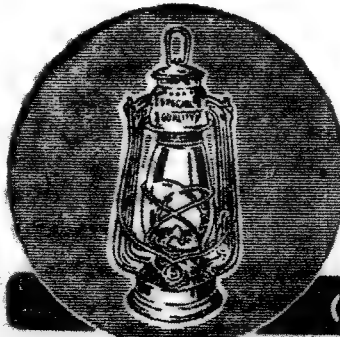
সুরকণ্ঠ সব শুনলেন।

তারপর বললেন 'ঘুরে ঘুরে ত' দেখবে, বিপদে চ পুছদী। অন্যর বাও, কাজের সন্ধান কর, আমি দেখতে পাচ্ছি আনন্দীরাম, দিনকাল পাগেট বাচ্ছে। হাতে তাগা, গলার হার পরে বামনাই করে বেড়ালে উলুখড় যাবে। কাজ সন্ধান কর, কাজ কর।

জানি।

তোমার শব্দে জগৎপতি আচার্য টাক-পয়সা নিয়ে ফরাসভাঙার পালিয়েছেন। তোমার বড় বউ এখন সৈদাবাদে কলসর বাড়িতে। শূন্যেই তাদের বড় দুঃখ।

তুমি ত' সবই জান। দে-সংসার করে আমি সুখশান্তি পাই নি। (রক্তাক্ত)



কিষাণ
লঠন
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস ঐকো:

ফোন-২২-৬৫৮০

২৩৩ ও ৩৩৩ চিত্রা বাজার ট্রাট কলিকাতা-১



প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড

॥ গ্রাম-গঞ্জের কাল থেকে নগরকালের টালিগঞ্জ ॥

আজ বিগড়া বিদ্যাদারী। এককালে যখন চারই উদ্ভাস গড়ে মূল বালিগঞ্জের ধ্রুপদস্থা—তখন উভয় তীরবর্তী বিস্তীর্ণ নিসর্গের তন্দ্র-ভরণ ঠিক কোন স্বরূপে ছিল বিধৃত, আজ তা অবিকল-উদ্ভাস-স্বপ্নকে কোনো নৃত্যবিক্রের সাক্ষাৎলাভ অসম্ভব। এ-সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাসেও কোনো পরিচ্ছদ বা স্তবক দুলভ বলেই বর্তমান নিবন্ধকারও এখানে অসহায়। তবে ধারাবাহিক জনশ্রুতির পথ-পরিভ্রম, বিজ্ঞ প্রবীণবৃন্দের স্মৃতি-মন্দিরে যহু প্রবাদের বিগ্রহ দর্শন এবং লৌকিক কাব্য-গাথার বিশেষ উচ্চারণ স্বকর্ণে বারবার শ্রবণ করার পর, তদানীন্তন যুগের বে-চিহ্নাঙ্কন সূক্ষ্ম প্রবন্ধে খানিকটা সম্ভব—মোটামুটি তা এই :

তখন বিদ্যাদারীর দুর্নিবার কৌমাৰ্যে ক্রান্তিকালের আহ্নান। তাই এপার ভেঙে ওপার গড়া এবং ওপার ভেঙে এপার গড়ার পালা চলাছিল তার বিরামহীন। এই ভাঙা-গড়ার মধ্যেই তার উভয় বাহুর স্নেহ-সঞ্চার ছিল মাতৃস্বের। তাই এপার-ওপারের জাতক-প্রাতিম ভূভাগ তখন হরিৎ-উৎসর্গে বর্ধিষ্ণু। উত্তরভাগের বিস্তৃতি পূর্ব থেকে পশ্চিমে। তার অংশ-বিশেষে বেগু-বেতসের মন্দির বিন্যাস, বিক্ষিপ্ত বসতির অনাড়ম্বর প্রতিষ্ঠা এবং অংশ-বিশেষে বিচিত্রবর্ণ ফসলের অকুপণ দীক্ষণ্য। আবার কোথাও তার উর্ধ্ববাহু

অবিরত তৃণাশ্রয়। এই প্রশস্ত তৃণাশ্রয়েই লগ্নকালের চন্দ্রাতপতলে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর উপাসনা করেন কোনো কোনো সওদাগর—যারা বিদ্যাদারী হয়ে সমুদ্রযাত্রার পথেই সাময়িক নৌগর তোলেন উত্তরভাগে।

কিন্তু বিদ্যাদারীর দক্ষিণভাগ—বর্তমানে যা টালিগঞ্জ নামে পরিচিত—তখন তার প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। কোথাও কোনো বসতি নেই, জনকীর্তি নেই। জুড়েও কোনো পান্থের পদাশ্রয় ঘটলে, এখানে পদক্ষেপের কোনো মোঠো পথ আবিষ্কার করাও তাঁর

শ্রীপদাশ্রয়

পক্ষে অসম্ভব। এদিকে-ওদিকে বন—কোথাও সঘন, কোথাও সীমিত। বিলের পাশে ঝিল, টিলার ধারে টিলা—কোথাও নান, কোথাও বা কাঁটাবনের কুটিল পরিচ্ছদে আবৃত। বনে বনে বাঘের চোখে আগুন জ্বলে, বিলের ধারে সাপের দাঁতে বিষ ফলে এবং টিলার মাধার ঝামঝোলের আখড়া জমে দিনের আলোয়। সারা অঞ্চলে এমনই এক অরাজক পরিবেশ। উত্তরভাগের বসতি নিবিড় নয়, জনসংখ্যাও তার অপ্ৰাতুল্যের অধীন। অভাব সেই সীমিত অধিবাসীদের দিনযাত্রার পক্ষে উত্তরভাগের ভূখণ্ডই স্বথেষ্ট। তাই দক্ষিণভাগ তারা মাড়ায় না। কোনোদিন কোনো খেলাল-বশতও বিদ্যাদারী ভিঙয়ে এপারে পা ফেলতে তাদের দেখা যায় না। তাছাড়া তারা ভয়ও পায়। সাপের ভয়, বাঘের ভয়, অশরীরী অনর্থের ভয় বা ভুতের ভয় তাদের প্রবল।

হয়তো খানিকটা সে-কারণেও বিদ্যাদারীর দক্ষিণভাগ এড়িয়ে চলে উত্তরভাগের আবাল-বৃন্দ-বনিতা।

তবে দক্ষিণভাগের এমন এক নিবসতি পরিবেশেও একদিন দেখা গেল একদল যাযাবরকে। সুদূর কোন অজানা অঞ্চল থেকে হঠাৎ এসে তারা হোগলাপাতার ছাউনি ফেলে টিলার পাশে, বিলের ধারে এবং বনের ছায়ায়। সঙ্গে তাদের বিচিত্র পশুর পাল। সবাই তারা তীরন্দাজ। লক্ষ্য-বস্তুর প্রতি সড়কি বা বল্লম নিক্ষেপেও তারা অব্যর্থ। তাদের দুরন্ত পদপাতেই গভীর গর্তে আশ্রয়গোপন করে আশীবিব, চোখের আগুন নিভিয়ে নিরাপদ দূরে সরে যায় হিন্দে শাদুল এবং ঝিল পেরিয়ে, বন ছাড়িয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায় যামঘোষের দল। জনকঠের বিচিত্র কোলাহলেই মৃদু হলে ওঠে এতদিনের উপেক্ষিত বা ভরাবহ পরিবেশ। সম্ভার শল্য সঞ্চারের তালে তালেই তারার মালার মতো আলো জ্বলে ওঠে বিলের ধারে, টিলার পাশে, বনের ছায়ায়। সে-দৃশ্য হঠাৎ বিস্ময়ের শরজাল নিক্ষেপ করে চোখে চোখে উত্তরভাগের। তাই দিন-দুপুরে উত্তর-অধিবাসীদের অনেকেই আসতে সুদূর করে দক্ষিণভাগে এবং সেই সূত্রেই যেন বিদ্যাদারী তার স্ববন্ধে ধারণ করে এপার-ওপারের একটি নবীন সম্বন্ধের সৈতুবন্ধ।

কিন্তু যাযাবরের নিবাস তো স্থায়ী নয়। কিছুকাল অভিজ্ঞান্তর পর দক্ষিণভাগ থেকে আবার তারা ছাউনি তোলে। সামনে পশুর পাল, পেছনে সশস্ত্র তারা সংযত পদক্ষেপে আবার যাত্রা করে অনির্দিষ্টের দিগন্তপানে। তবে তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় করেকটি পরিবার পেছনে বা পূর্বস্থানেই বহাল থাকে যথারীতি। এক-কয়েকটি পরিবারে জন-কয়েক বৃদ্ধের তখন মরণদশা। তাদের সঙ্গে নিয়ে অনির্দিষ্টের পথযাত্রা নিরাপদ নয়। হয়তো সে-কারণেই তারা থেকে যায় বিদ্যাদারীর দক্ষিণভাগে। তাদের অধিবাসীদের চূড়ান্ত কিছু একটা ঘটলেই আবার তারা রওয়ানা হবে—এমন সিদ্ধান্তই হয়তো গ্রহণ করে। কিন্তু পরে আর কোনোদিনই সে-স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যাত্রার সুযোগ পেলো না তারা। কারণ সেই অধিবাসীদের অন্তিম মূহুর্তের দর্শনলাভ করতে করতেই পাশ কাটিয়ে যায় সুদীর্ঘ সময়। সুতরাং এই সুদীর্ঘ সময়ের পরিব্যাপ্ত সুযোগেই এপার-ওপারের সম্বন্ধ হয় আরও নিবিড়, আরও ঘনিষ্ঠ। উত্তর-অধিবাসীদের সঙ্গে আশ্রয়িতাসূত্রেও আবদ্ধ হয়ে পড়ে অবশিষ্ট যাযাবরগোষ্ঠী। তাছাড়া যাযাবরদের হোগলা-ছাউনির পাশাপাশি হঠাৎ এসে ঘর বাঁধে কিছু ধীবর। এই ধীবরদের জীবনযাত্রার সঙ্গে যাযাবরদেরও আচার-বিচারের কোনো গরমিল অনুপস্থিত বলেই শেষে স্থায়ী গৃহীর ধর্ম আশ্রয়-নিবেদন করে তারাও।

তারপর যুগে যুগে যহু, যুগান্তরের

মহাপ্রয়াণ ঘটে কীভাবে, কীভাবেই বা বিদ্যাধরী তার বোবন পেরিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ধারণ করে প্রৌঢ়ের ক্রান্তি এবং সে-ক্রান্তির পরেও কখন সে প্রবল বর্ষাকালের কাজে হার মেনে দেহত্যাগ করে নিশ্চয়—আজ তার সারাবাহিক কোনো ইতিহাস নেই।

এতদঞ্চল থেকে বিদ্যাধরী যখন সত্যই অন্তর্হিত, তখন দেখা যায় : দক্ষিণভাগের বিস্তৃতি আরও বিশাল এবং তার রূপান্তর ঘটেছে বিভিন্ন জনপদের : বহুপ্রভু মৈকব-মটাও তখন তার অন্তর্গত। প্রতি জনপদের উপকণ্ঠে আবাদী অন্তরের সিঁধ্যা প্রসার। আর বর্ষাকাল বানিল্পদের প্রয়োজনেই কল্যাণ সাপ্তাহিক, কেননা অর্থ-সাপ্তাহিক হাট-বাজারের প্রচলন যেমন ঘটেছে, তেমনই সু-সমৃদ্ধ একটি গজেরও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে দক্ষিণ-ভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম সম্মিলিত। সম্ভবতঃ সাতজন শতাব্দীর দেহরকার কল প্রথম : অগ্নিদেবের শৈলক পূর্ব।

অতীত শতাব্দীর পটভূমিতেই এতদঞ্চল : মাকতীয় জনপদের স্বাধিকার্য্য লাভ করেন টিপু সুলতানের বংশধরগণ। তাঁদের কামদান আনিজার্য্য ফলেই প্রতি জনপদ মটনা এবং প্রতিপত্তির প্রভুত প্রসাদলাভে প্রেরণ করে সমৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমের আশ্রয়িতক ঘর্ষাত্মক সংগে একাধিক সূত্রের সঙ্গীত সহজ সন্ধ্যোগ ঘটে, হাটের পাশে হাট বসে আরও এবং সেই প্রাচীন প্রয়োজনের গজেরও গরিসর ক্রান্তি ঘটে অনন্য স্বরূপে। জন-গণের হিতরথেই সুলতান বংশ প্রেরণ পুরুর প্রতিষ্ঠা করেন এদিকে-ওদিকে এবং রচনা করেন গ্রাম-হাট-কাঠালের রমণীয় উদ্যান।



টিপু সুলতান মসজিদ ও সুলতান কবরখানা

তাছাড়া তারা ধর্মপরিচয় বলেই নির্মাণ করেন শূদ্রকান্তি মসজিদ এবং মসজিদের উপকণ্ঠে এক সমাধিক্ষেত্রও তারা প্রণয়ন করেন স্ববংশের চিরন্তন প্রয়োজনে। এই মসজিদ এবং বিচিত্র ভরলতায় শেলব পরিবেষ্টিত সেই সমাধিক্ষেত্র আজও বিদ্যমান প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের উত্তর বাহুতে।

শোনা যায় : টিপু সুলতানেরই কোনো এক সুদর্শন উত্তরপুরুষ এতদঞ্চলে গোপনে গঠন করেন একটি ইংরেজ-বিরোধী বাহিনী। এ-বাহিনীর অতীত স্বানীর স্বীকৃত, কুবক, তলুবার প্রভৃতি এবং সিরাজের পতনের ফলে কলকাতার অবস্থিত সেনাবা-সৈন্যগণ বৃষ্টি-

চ্যুত হয়ে পড়ে তাদের মরণেও অনেকে। ইংরেজকে এ-দেশ থেকে বিতাড়িত করাই এমন এক বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য। কিন্তু যে-কোনো উপায়েই হোক, এ-বড়বস্ত্রের সংবাদ পেয়ে ইংরেজ সরকার প্রেরণ করেন টিপু সুলতানের সেই সুদর্শন উত্তরপুরুষকে। অতএব দীর্ঘ মেয়াদে তিনি কারারুদ্ধ হন। তবে বছরখানেক পর কারাগারেই তিনি রোগাক্রান্ত হওয়ার ইংরেজ সরকার তাকে মুক্তি দেন। মুক্তি পেয়ে রূপ শরীরেই তিনি আবার লিপ্ত হন ইংরেজ-বিরোধী কার্যকলাপে এবং অচিরেই একদিন কোনো এক ইংরেজ রাজপুরুষকে তিনি হত্যা করেন একা। হত্যা করার পর যখন তিনি পালায়ে আসেন, তখন তাঁর পিছু-ধাওয়া করে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী। তিনি তাই আত্মগোপন করার প্রয়োজনে তাঁরই জমিদারী সেরেসতাব কোনো এক উচ্চতম কর্মচারীর গৃহে প্রবেশ করেন হঠাৎ। সেই কর্মচারী তখন গৃহে ছিলেন না। গৃহে ছিলেন তাঁর একমাত্র ঘোবনবর্তী দূহিতা—বিনি টিপু সুলতানের এই সুদর্শন উত্তরপুরুষের প্রতি গভীর আসক্তা ছিলেন অনেককাল থেকেই। অতএব সেদিন সন্ধ্যোগ পেয়েই তিনি প্রস্তাব পেশ করেন সরাসরি। শাহজাদা যদি তাঁকে পরিচারিকারূপেও গ্রহণ করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি নিষ্কণ্টক করবেন তাঁর পালাবার পথ।

টিপু সুলতানের সেই উত্তরপুরুষ শাহজাদা প্রত্যুত্তরে বলেন : একদা ফেব্রুয়ারী, মর্ষাদা তাঁর বিপক্ষ। সুতরাং গ্রহণ বা বর্জনের কোনো প্রশ্নই এখন ওঠে না। যদি বিদেশীরাঙ্গের দূশাসন নিমূল করে কোনোদিন সম্পূর্ণ স্বাধীনরূপে স্বমর্ষাদার তিনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তবে



নিউ থিয়েটারের স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণের একটি স্থান



টালিগঞ্জের রেন-কোর্স

পরিচালিকা নয়, একান্ত রাণীর মতোই তাঁকে তিনি বরণ করবেন।

এ-কথার পর উক্ত রমণীর কোনো সাহায্য গ্রহণ না করেই গৃহ থেকে সরেগে নিষ্কান্ত হন শাহজাদা। তারপর নিজ বান্ধবলেই তিনি রওয়ানা হন অযোধ্যার পথে। কিন্তু বিধি তাঁর বাম। তাই অযোধ্যা পেঁছেই তিনি ধরা পড়েন যত্নে কোনো ইংরেজ সৈন্যের হাতে। অতএব তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। তারপর যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হন আবার।

পিঁছিয়ে আসে বছরের পর বছর। বৌবন চৌপাশ হয়ে কারাগারেই প্রোচড়ে আত্ম-সমর্পণ করেন সুলতান-বংশের সেই তেজস্বী পুরুষ। এই প্রোচ বসে কী ভেবে আবার তাঁকে মুক্তি দেন ইংরেজ সরকার। কিন্তু এ-মুক্তি তিনি আর উপভোগ করেন নি। বাইরে এসে দিন-তিনেক পরেই তিনি হঠাৎ আত্মহনন করেন নিষ্ফল আক্রোশে।

অজস্র গুণগ্রাহী তাঁর শব্দেহকে রাজকীয় মর্যাদার বহন করে আনে সমাধিক্ষেত্রে। আর তাঁরই জন্মদারী সেরেসতার সেই উচ্চতম কর্মচারীর প্রেম-কাঙালিনী দুঃহিতা—যিনি এতকাল শাহজাদার পথ চেয়েই বৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলিকে নির্বাসিত করেছেন একে একে, তিনিও সেদিন সমাধিক্ষেত্রে এসেই সজলনেত্রে মাল্যদান করেন শব্দেহের গলায়।

যাই হোক, টিপু সুলতানের অন্যান্য উত্তরপুরুষগণ বখোচিত মর্যাদার সঙ্গেই মরছেন এতদঞ্চলে। তাঁদের সেই

প্রতিপত্তি আজ প্রায় অস্তমিত হলেও, প্রভাব খানিকটা জেগে আছে তাঁদের যাবতীয় কীর্তি বা সৃষ্টির জরাজীর্ণ মিনারে।

এতদঞ্চলে 'টালিগঞ্জ' নামের উৎপত্তি ঘটে উনিবিংশ শতাব্দীতে। তখন ইংরেজ সরকারের পরিকল্পনার স্বপক্ষেই একটি সুদীর্ঘ খাল খনন করেন মেজর টল। এ-খাল খিদিরপুর থেকে সুন্দর হয়ে এতদঞ্চলের দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করে এবং এভাবেই তার সর্পিণ গতি অগ্রসর হয় বহুদূর পূর্বাঞ্চলে। সাধারণ মানুষ তার নামকরণ করে টলির খাল—যার অস্তিত্ব হারিয়ে যায় নি একালেও। এই টলির খালের মূল অংশ তখন এতদঞ্চলের গঞ্জের সমীপবর্তী ছিল বলেই 'Tollygunge' বা টালিগঞ্জ নামের প্রচলন সুন্দর হয় দিনে দিনে। তারপর দক্ষিণভাগের বিশাল অঞ্চলে স্থায়িত্ব লাভ করে সে-নামটিই।

উনিবিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্ব থেকেই ধীরে ধীরে শহর-প্রতিম হয়ে ওঠে সমগ্র টালিগঞ্জ। তখন থেকেই এতদঞ্চলে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে একদিকে রেসের মঠ, গলফ ক্লাব, সৌখিন পানশালা এবং অন্যদিকে ইংরেজ বণিক সমাজের একাধিক বাগানবাড়ি। তদানীন্তনকালের সেই বাগানবাড়িগুলি আজ নিরঞ্জন লাভ করেছে সারিবন্দী এক বিশাল বসতির অন্তরালে। এ-বসতি ভাগ্যবান বিত্তশালীদের বলেই পরিবেশে তার বিলাস-বাজনা অপরিসীম। নামকরণের দিক থেকে প্রাচীন বাগনবাড়ির প্রতিধ্বনিই সে গ্রহণ করেছে। তাই বর্তমানেও নার তার রিজেন্ট পার্ক।

টলির খালের ঠিক উপকণ্ঠেই কোনো এক মূর-ব্যবসায়ীরও একটি বাগানবাড়ি ছিল শোনা যায়। পরবর্তীকালে তার সেই বাগানবাড়ির বৃক বেয়েই আত্মপ্রকাশ ঘটে একটি রাজপথের। সে-পথ আধুনিক যুগে আরও অনেক প্রশস্ত এবং সংস্কারসাধিত হলেও, অস্তিত্বে তার মূরের স্মৃতিই উৎকীর্ণ। অর্থাৎ একালেও নাম তার 'মূর এভিনিউ'।

বিংশ শতাব্দীর উন্মেষকাল থেকেই চলচ্চিত্র শিল্পের প্রধানতম কেন্দ্র টালিগঞ্জ। বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পীর শ্রুতকীর্তির শৃভারম্ভ এখান থেকেই। এখানে এসেই তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং নিপুণ কলাবোধের সুপরিচয় দান করার সুযোগ পেয়েছেন স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়া থেকে বর্তমানকালের সত্যজিৎ রায়। সম্ভবত টালিগঞ্জের সানুদ্রাঙ্গ সহায়তা না থাকলে রূপালি পর্দার আপন প্রতিভা প্রদর্শন করে জনপ্রিয় হতে পারতেন না স্বর্গত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাইগল, ছবি বিশ্বাস, প্রভা দেবী প্রভৃতি এবং চট্টল জনচিত্রে হঠাৎ সন্তা প্রসাদ পরিবেশন করার সুযোগ পেতেন না এ-যুগের প্রতিভাহীন নায়ক-নায়িকারা। টালিগঞ্জেই অবস্থিত একাধিক স্টুডিও। উল্লেখ্য নিউ থিয়েটার্স এবং কালী ফিল্ম স্টুডিওই সম্ভবত প্রাচীন।

সুপ্রাচীন ঐতিহ্য টালিগঞ্জের। এ-অঞ্চল নানা কারণেই বিখ্যাত এবং মর্যাদাসম্পন্ন বর্তমান যুগেও। অথচ পরিতাপের বিষয়, বিশেষ বিশেষ অংশ ছাড়া টালিগঞ্জের মূল ভূভাগে চরম দুর্গতির পদযাত্রা প্রতি ঋতুতেই ভয়ংকর। একালেও খোলা নদমা এখানে নানা রোগের বীজাণু-প্রবাহী, মজা পুকুর কটুগন্ধের দুর্বিষহ উৎস এবং অংশবিশেষের অরাজক বসতি আদিম অরণ্য-রীতির প্রতীক। এদিকে প্রধান রাস্তাতেও কোনো ফুটপাথ নেই। অলি-গলি গ্রামদেশের আলপথকেও হার মানায়। তাই মৃদুটিমের প্রধান রাস্তাতেই সীমাবদ্ধ যানবাহন। উপরাস্তায় নিষিদ্ধ তাদের প্রবেশাধিকার।

সমগ্র টালিগঞ্জ পৌরসংস্থার পরিচালনাধীন। অথচ কেবল বিত্তবানদের আধুনিক বসতি অঞ্চল ছাড়া আদি এবং দরিদ্রজনের এলাকার সংস্কারের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই পৌরপতাদের। কেন নেই—এ-প্রশ্ন অনেক কালের। কেন এখানে নিত্যকালের পরিবেশে সর্বনাশের পক্ষ বিস্তার—এ জিজ্ঞাসা হাজার হাজার কণ্ঠে অবিরাম উচ্চারিত, অথচ কোনো উত্তর নেই, জবাব নেই। স্বভাবাসিদ্ধ উপেকার শব্দধারেই আজ এক-একটি শব্দেহ সমস্ত উত্তর।

আরেক যুগে আরেক গান

অতুলরঞ্জন দেব



ভুললোকটিকে বতোই দেখছি, বিশ্বাসের
গাথা উত্তরোত্তর ততোই বেড়ে উঠছে। সঙ্গে
সঙ্গে কৌতূহলও।

নাম প্রিয়তমের ভদ্র। নামটিই শব্দ, প্রিয়
নয়, কিংবা ব্যবহারই শব্দ, ভদ্র নয়, প্রিয়-
দর্শনও বটে। স্বল্পভাবী। অথচ কথা নয়,
যেন কাকলি! তদুপরি গাইরে, বাজিরে,
লিখিয়েও। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কৃতী ছাত্র—এম, এ, (ডাবল)—ফাস্ট ক্লাস
ফার্স্ট বোর্ড ইন্ বেন্গলী এন্ড সেন্সুক্রীটি।

সবাদিক মিলিয়ে বাংলার উপযুক্ত
অধ্যাপক-ই বটে। প্রথম বোর্দিন এলেন,
আমাদের মধ্যে একটা আলোচনার বস্তু হয়ে
দাঁড়ালেন। অতনু বললে, 'দেখেই আমি
বলে দিতে পারি, ইনিও ওই ক্লাইং বাড়ীর
দমগোত্র।'...বিজিত মাধ্যমানে হঠাৎ

ফোড়ন কাটলো, 'ভুললোকটির নিশ্চয় কোন
একটা মতলব আছে। নইলে কোলকাতার
অন্ত জারগার পাকাপোক্ত চাকির ছেড়ে সুদূর
এই মফস্বলে কেউ কি কখনো আসে?'

আমি এইবার মৃদু খুললাম, 'বিজিতের
অন্তবাটা কিছু স্বার্থবোধক। একটু প্রতি-
কটুও।'

চিরজীব তৎক্ষণাৎই আমাকে নিরে
পড়লো, 'তোমার এতো দরদ কেন, বাপু?'

উত্তরটা আর আমাকে দিতে হলো না।
সুপ্রিয়ই দিলো, 'বুঝালি না? এ হলো
কবির প্রতি কবির স্বাভাবিক দরদ-বোধ।'

অস্বাভাবিকতার কথাবার্তার মোড় একটু
ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বললাম, 'আর যা-ই
হোক, আমি অন্তত কবিস্বীকৃতি পেয়ে
পেলাম।'

প্রসঙ্গটা আর বেশিদূর অগ্রসর হলো
না। প্রবীণ সহকর্মী প্রফেসর সেন এই
সময়টায় এসে কমনরুমে ঢুকলেন। সঙ্গে

প্রিয়তোষবাবু। পরিচয়ের প্রথম পর্বটি
এইখানেই শেষ হলো।

মোটকথা, এমন একজন গুণধর ব্যক্তিকে
সহকর্মী হিসেবে পেয়ে আমরা গর্ববোধ
করলাম। 'আমরা' বলায় হয়তো একটু
ভুল বলা হয়ে গেলো। অন্তত আমি।

কলেজের রেওয়াজ অনুযায়ী প্রিয়তোষ-
বাবু প্রথমে প্রফেসরস্ মেসে উঠলেন।
একটা রুম নিয়ে গৃহিণীও বসলেন। পৃথক
বাসা ভাড়া নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন
না। অবিবাহিত।

আমি স্থানীয় অধিবাসী। মাঝে-মাঝে
সমবয়সী সহকর্মী-বন্ধুরা আমাদের বাড়িতে
বেড়াতে আসে। বিশেষ করে মেসের
বাসিন্দারা। তখনকার আসরটা বেশ জমজমাট
হয়ে ওঠে।

এমনি এক আসরে প্রিয়তোষবাবুকে
একদিন নৈমন্ত্য জানালাম। তিনি তা রক্ষা
করেন নি। বললেন, 'আজ থাক। অন্য
একদিন না হয় যাবো।'

'অন্য একদিন' তাঁর কাছে 'অন্য এক-
দিনই' হয়ে গেলো। প্রতিবারই একটা-দু-
একটা অজুহাত দেখান। তাই একটু
দৌরতেই বুকলাম, এসব তিনি পছন্দ
করেন না।

তাই বলে আমি কিছু ঠগর রূপে বাওয়া
ছাড়ি নি। যতদিনই গিরেছি, প্রিয়তোষ-
বাবুর পরিচ্ছন্ন রুটি দেখে মৃদু হয়েছি।
হর সাজানোর কী অপূর্ব পদ্ধতি! কুলদী
হাতের স্পর্শে একটা বিচিত্র প্রদর্শনীর
গৌরব। প্রত্যেকটি জিনিসেরই এক-একটি
সুনির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে—বইপত্রের, জামা-
কাপড়, বাজনার সরঞ্জাম (জলতরঙ্গের বাটি-
কাটি এবং সেতার), ট্রাম্প-স্মুটকেন্স, কালি-
কলম, আয়না-চিরুণী, পেন্সিল-ব্রাশ, স্নো-
পাউডার, সেন্ট-সাবান, জুতা-মোজা ইত্যাদি।
ভুলক্রমেও জারগার একটু হেরফের নেই।
আশ্চর্য।

আরো একটা অসুভূত জিনিস আমি লক্ষ্য
করেছি। সেটা হলো ওঁর বিছানা। ওঁর
তিনি ব্যবহার করেন কিনা সন্দেহ—এতো

প্রিয়গাঠী! নিজের সর্বকণ খোপদরস্ত শোনাতে থাকেন। এইসব গল্পীসুলভ কাজ-কর্ম অন্যদেরও দৃষ্টি এড়ায় নি। এর জন্যে দু-একজন ছিটেকোটা সরস মন্তব্যও করেছেন দু-একদিন। কিন্তু প্রিয়তোষবাবুর চোখে-মুখে বরাবরই রক্তিম সলাজ ছোপ। বুকলাম, তিনি প্রকৃত রাসিক কান্তি নন।

বেশ করেকটা হাস পেরে কথা।

আজ রবিবার। আজকের সাম্য আসরটী হুলাত প্রিয়তোষবাবুর অন্তত বৈশিষ্ট্য-গুরুত্বকে কেন্দ্র করেই জমে উঠলো।

কথাটা প্রথম সুপ্রিয়ই তুললো, 'আশ্চর্য মানুষ প্রিয়তোষবাবু! রূপ ও রূপের ব্যপারে অন্য যে আরেকটা জগৎ আছে, সে সম্বন্ধে তিনি একবারে উদাসীন। কারো রূমে বান মা। গালগল্পও যোগ দেন না। নিজের রুমটিতে ঠিক বসে থাকেন। পড়েন আর পড়েন। ঠিক রূমে ষাও, শব্দ ভরতীর গন্ধ; হৃদাতা যেন একবারেই নির্বংশ। আহ! বেচারীর জন্যে সত্যিই কষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত বুঝি পাগল হয়েই যান নাকি।'

চিরঞ্জীব মন্তব্য করলো, 'পাগল তিনি কবেই হয়ে গেছেন। এখন বলতে পারিস! আজকাল পাগল! কত গুণের কথাই না ও'র শুনলাম—গান জানেন, বাজনা জানেন। হেন-ভেন আরো কত কী! কিন্তু কই, একদিন তো শুনগুন করে একটি গানের কলি গাইতে কিংবা একটু বাজাতেও শুন নি। আসলে কী জানিস? ওই বাদ্যকলগুলি একটা শো।'

বিজিত খেইটা আরো উঁচিয়ে ধরলো, 'তোমরা যে বা-ই বলিস না কেন ভাই, আমি বরাবর একটা জিনিস লক্ষ্য করে আসছি।' সকলের আগ্রহটা একসঙ্গে তিড়িক্ত করে উঠলো। নতুন জিনিসের আশ্বাসে স্নেহে কারো যেন ভর সইছে না।

—সংক্ষেপেই বলে ফেল, বাপু! ভূমিকার প্রয়োজন কী?'

—অর্থাৎ ভুল্লোকাটিকে কোনদিনই খালি করে দেখি নি। এমন কি স্নানের সময়ও না। কাপড়জামায় ফিটফাট হয়ে বাথরুমে ঢোকে, আবার ফিটফাট হয়েই বেরিয়ে আসেন।'

চিরঞ্জীব বক্রোচ্ছিন্ন করলো, 'ওইসব জাদুখোতার আমাদের বড় একটা ব্যাপ আসে না।'

অতনু খানিকটা প্রতিবাদে সরেই কথা-হাতায় যোগ দিলো, 'যায় আসে না সত্যি কথা। তবু একসঙ্গে বাস করছি বলেই ভাবতে হয়। ওই তো দেখ না, একটি বছর প্রায় উত্তরে গেলো—গরম ও পূজোর ছুটি ছুটিও হলো—কিন্তু প্রিয়তোষবাবু একদিনের স্নানও এখন থেকে কোথাও

নড়লেন না। বাড়ি-ঘর, মা-বাবা, প্রিয়-পরিজন কেউই কি ঠিক নেই? আশ্চর্য! রাস্তাঘাটেও সাধারণত বেরোন না। সৈবায় বসিও বেরোন, ঠিক একলাটি বেরোবেন।'

চিরঞ্জীব আবার উত্তর করলো, 'ঠিক হাঁড়ির খবরে মাথা গল্যনোই মানে আমাদের অনাধিকার চর্চা। একটু সামাজিক হলেই বেশ, কারো কোন অনুযোগ থাকতো না।'

এইবার বিজিতের গলা শোনা গেলো, 'এর জন্যে আমরাও কি কম চেষ্টা করেছি?'

সুপ্রিয় বললো, 'ওসব কিছুর হবে না। বুকলি? আসলে ভুল্লোকাটির মনের অসুখ। বড় শব্দ অসুখ।'

এতকথবাদের আমি মুষ বুললাম। বললাম, 'আমার ধারণাটাও তাই, সুপ্রিয়। মোটকথা, প্রিয়তোষবাবু, নিজেই আস্ত একটা রহস্য।'

—'তোমর মৈব' আছে। তুই-ই এই রহস্য ভেদ করতে পারবি।'

—ওসব কথা থাক। এখন একটা কাজের কথা জিজ্ঞেস করি।'

—কী?'

—'কলেজবার্ষিকীর জন্যে প্রিয়তোষবাবুর কাছে লেখা চাইবো কিনা, বল?'

প্রত্যুত্তরে আরো জনদ্বয়েরকও মুষ বুললো, 'তোমর নিশ্চয়ই চাওয়া দরকার। দেয়া না দেয়া ঠিক ইচ্ছে।' সুপ্রিয় শব্দ এখানেই থাকলো না। বললো, 'ঠিক ইচ্ছেটা পাঁজিটিত হবে, না নেগেটিভ হবে আমি এখনই তা বলে দিতে পারি। তুই লেখা পাবি না, সমীর।'

সত্যিই প্রিয়তোষবাবুর কাছ থেকে আমি লেখা আদায় করতে পারি নি। আমার অনু-রোধ তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। বললেন, 'বার্ষিক সন্ধ্যাতানুষ্ঠানের তত্ত্বাব-ধারক হতে ছাত্ররা আমাকে জোর করে ধরে-ছিলো। তাদেরকে আমি ফিরিয়ে দিতে ছিলাম। আজ আপনাকেও ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। সেজন্মে দৃষ্টিত।'

সত্যিকথা বলতে কী সমীরবাবু, একদিন লিখতাম। খুব-ই লিখতাম। আজ আর লিখতে পারি না। ভাবটা তেমন দানা বাঁধে না।'

কথাগুলোতে একটা তিক্ত কল্পনার গন্ধ পেয়েও আমি সুপ্রিয় ধরে টানি নি। কেন না, ওই ধরনের টানার তখনো যথেষ্ট সময় হয় নি।

দেখতে দেখতে আবার গরমের দিনও এলো, ছুটিও হলো। যে বার বাড়িঘরে চলে গেলো। রইলেন শব্দ প্রিয়তোষবাবু। আর রইলো বিগিন—সেদের পুরনো চাকর।

আজকাল মনে হয়, প্রিয়তোষবাবু

কোথাও বাওরাটাই অস্বাভাবিক, না-বাওরাটাই স্বাভাবিক।

আমিও এই ছুটিতে স্থানান্তরে বাই নি। বাড়িতেই আছি। বখন সময় পাই, প্রিয়তোষবাবুর সঙ্গে একটু গল্প করত্রে বাই। ইদানীং তার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। সময় সময় আমাকে বলেন, 'আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। বৈদিন আসেন না, বস্তু খারাপ লাগে।'

বুকলাম, প্রমত্ত সার্বিক হতে চলেছে। তবুও আসার কোনদিনই মনের মত ঠিক ঠিক মনে ওঠে না। কিন্তু মৈব হারাই নি।

তারপর একদিন অনুসন্ধানের মোড় খানিকটা ঘুরিয়ে দিলাম। স্বরচিত একটি কবিতা নিয়ে তার কাছে হাজির হলো। (কোনো উল্লেখ থাকা আবশ্যিক, ভুল্লোকাও প্রিয়তোষবাবু আমার লেখা দেখার আগ্রহ কোনদিন প্রকাশ করেন নি।) মনে হলো, গভীর মনোযোগসহকারে কবিতাটি তিনি পড়লেন। সংক্ষেপে মন্তব্যও করলেন, 'বেশ হয়েছে।'

বক্তব্যটা এইখানটার শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে প্রিয়গাঠী একটু বাড়িয়ে তুললাম, 'পাশ্চ-ভালো' বললেই আমি সন্তুষ্ট হচ্ছি না, প্রিয়তোষবাবু। নিরপেক্ষ সমালোচনা চাই। —সমালোচনা? খানিকক্ষণ কী জানি কী ভাবলেন তিনি।

নিজের সার্বভৌমত্বের ব্যাপার। তাই বুঝি আসরের ময়দাটা এই প্রথমবার দীর্ঘ হলো। জ্বলোও বটে। শেষ পর্যন্ত আধুনিক কবিতার গতি-প্রকৃতি নিয়েও কিছুটা কথা-বার্তা হলো। এতকথ অন্যদিকে ধোঁয়াই ছিল না। বখন উঠতে বাবো, দেখি সন্ধ্যা আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা। কড়ের সূচনা! প্রিয়তোষবাবু বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন। তুফানটা বুঝি একটা ছুটবে।'

তারপর একটা ঢোক গিলে আবার কথা পাড়লেন, 'দেখুন তো মশাই, বিগিনের কান্ডটা! এতকথ অবধি বাজার থেকে কিয়লো না।'

—ওর জন্যে মিছেমিছি আশংকা করবেন না, প্রিয়তোষবাবু। এই দুর্বোঁগের রাতে বিগিন ঠিকই একটা আশ্রয়স্থল খুঁজে নেবে। ওরা রোদ্দে-ঝড়ে মানুষ কিনা—

কথাটা শেষ করতে পারি নি। সাই-সাই শব্দে ঝড় উঠে গেলো। কী ভীষণ ঝড়! একটা বুঝি সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। মাঝে-মাঝে মেঘের গর্জনে ঘরসুখ ভিত পর্যন্ত কে'পে কে'পে উঠছে। কট করে ইলেকট্রিক স্পালাই সড়ক'তা অবলম্বন করলে। কারেন্ট বন্ধ করে দিলে। নীরেট অন্ধকারে তলিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, 'মোমবাতি আছে নাকি, প্রিয়তোষবাবু?'

—একটা অবশ্যি ছিল। কিন্তু কোথায়

রেখেছি, খুঁজেও পাবো না এখন। থাক—অন্যকারেই বেশ আছি।’

আমিও আর কোন কথা বলি নি। কতক্ষণে ঝড় থামবে, সেইটাই এখন জানবার বিষয়। কিন্তু হঠাৎ এ কী আজব লীলা! ঝড়ের মাঝখানেই ভূমিকম্প আরম্ভ হলো। বাইরের এই জাডব নৃত্যের মধ্যেও চতুর্দিক থেকে মানুষের আতঁ কলরব কানে এলো। আমরাও ভাড়াভাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ভাগ্যস! কম্পনটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি—মিনিট ষাটেক হবে বোধ করি। কিন্তু ভিজ্ঞ একাকার হয়ে গেছি। হাওয়াটা যদিও খিঁতরে আসছে, বাতীর সুরটা কিন্তু আবার বেড়ে উঠছে। রমে ঢুকে প্রিয়তোষবাবু বললেন, ‘কাপড় দিচ্ছি। পরনেরগুলো ছেড়ে রাখুন, সমীরবাবু।’

—আপনি বদলে নিন। আমি বাড়িতে গিয়েই পাটচাবো সবাকিছু।’

—বাতীর কথা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু এই ঘটনাতে অন্যকারে যাবেন কী করে? টটটাও আমার বিকল হয়ে গেছে।’

—একটুও ভাববেন না। ঠিক যেতে পারবো। তাছাড়া ঘন্টারানেকের মধ্যে আলো জ্বলবে কিনা সন্দেহ।’

‘তাই নাকি?’

—‘তাই তো বলি, ভিজ্ঞ জামা-কাপড় ছেড়ে একটু ফ্রেস হয়ে বসুন।’

অগত্যা প্রিয়তোষবাবু, অন্যকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে আলনা থেকে জামাকাপড় তুলে নিলেন। অনেক ভেবেচিন্তে গারের জামাটাও আস্তে আস্তে খুললেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার অনুমানটা মিথ্যা হয়ে গেলো। আলো জ্বলে উঠলো।

‘সন্ধ্যোমাশ!’—আতঁস্বরে প্রিয়তোষবাবু, ঠক হয়ে ঠার বসে পড়লেন।

‘আরে কী হলো? কী হলো?’—যেই আমি হাতটা ধরতে গেছি, তিনি খেপে উঠলেন, ‘ছোঁবেন না—ছোঁবেন না বলছি!’

আমি তো একেবারে ষ! পরমুহূর্তেই দৃষ্টি পড়লো ঠর বৃক্কের ওপর, ‘এ্যা! এসব কী প্রিয়তোষবাবু! নিজেকে রহস্যাবৃত রাখার কারণ কি মানুষের এতোই ভয়ঙ্কর হতে পারে?’

কিন্তু মৃদু ফটে আমার একটি কথাও বেরলো না। আমার উপস্থিতিটা তাঁর কাছে আর মৃদুত্বেরও সহ্য হলো না। দারুণ বিরক্তির স্বরে বললেন, ‘আর পারি না! যান—একুপি বেরিয়ে যান বলছি!’

এইবার আমার সবশরীর জ্বলে উঠলো। পূজীভূত ক্ষোভে সাইচটা ঝট করে অন্ধ করে দিলাম। ঝড়ের বেগে ঘর থেকেও বেরিয়ে এলাম।

রাগিতে ভালোভাবে মৃদু হলো না। সেই

বিশেষ অনুভূতিটা বারবার আমাকে গাঁড় দিতে লাগলো।

পরদিন।

সন্ধ্যা তখন উৎরে গেছে। বাইরে থেকে সবোন্ন বাড়ি ফিরেছি। ছোটভাই বাবলু এসে বললো, ‘দাদা, তোমার একখানা চিঠি। কিছুক্ষণ আগে বিপিন এসে দিয়ে গেলো।’

—‘কই?’

‘তার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে ঝটপট খুললাম। প্রিয়তোষবাবু লিখেছেন :

সমীরবাবু,

কমা আপনার ধর্ম কিনা জানি না। তবু বলছি, আমাকে কমা করবেন।

আজকের সন্ধ্যার গাড়িতে এখন থেকে আমি চিরদিনের মত চলে যাবি। কোথায় যাবি, বলার প্রয়োজন নেই। তবে কোলকাতার নয়। এ দীর্ঘ চিঠি লেখার প্রয়োজন হতো না, যদি ঘৃণা করে আপনি নতকাল ফিরে না যেতেন। শব্দ রাগের প্রশ্ন হলে ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যেতো। কেউ আমাকে ঘৃণা করুক, এ আমি সহ্য করতে পারি না। মানসী আমাকে ঘৃণা করেছে। আপনিও ঘৃণা করলেন। তবে হ্যাঁ, দুজনেরই ঘৃণার কারণ স্বতন্ত্র। আস্তে আস্তে সবাকিছুই বলছি।

ছোটবেলার মা-বাবাকে হারিয়েছি। বাবার বাল্যবন্ধু রাজনারায়ণ বসুর কাছে

মানুষ হয়েছি। বাবা নাকি অনেক টাকা কড়িও রেখে গিয়েছিলেন। সে যাক—রাজনারায়ণবাবুর একমাত্র মেয়ে মানসী। একসঙ্গে খেলোছি, বেড়ে উঠেছি, লেখাপড়া করেছি। বয়সে আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। তারপর সেই চিরন্তন আবেগ, হাত হাত রেখে পরস্পরের প্রতিশ্রুতি—সুখসমৃদ্ধ নীড় গড়ার রঙিন স্বপ্ন! আমি তখন সিন্টি কলেজে সবোন্ন চাকরি নিয়েছি। মানসী হিম্মিতে এম. এ. পড়ছে। কিন্তু গাজেন বার সাধলেন, ‘এ বিয়ে অসম্ভব!’

তারপর আবার সেই আরেক আবেগ—শিখর করলাম, কোর্ট-ম্যারেজ করবো। দিন-ক্ষণ সমস্তই নির্দিষ্ট হলো। ব্যাপারখানা বাড়িসুস্থ জানাজানি হয়ে গেলো। লক্ষ্য করলাম, ইতিমধ্যে মানসীর মেন কী হয়ে গেছে! শব্দ ভাবে, আর ভাবে। ‘জিজ্ঞেস করবেও বিশেষ সুবিধা হয় না। কথাবার্তা তেমন বলতে চায় না। মনে হরেক রকম সন্দেহ জাগে। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারি না। দিন দুটেক বাদেই দৌধ তার অন্য এক রূপ—মুখের জলসটা যেন কাঠিন্য এসে মাড়িয়ে গেছে।

কোন একসময় আমার কাছে এলো। ভূমিকা এড়িয়েই বললো, ‘আর কোর্টে যেতে হবে না, প্রিয়না।’

আমি খানিক আশ্চর্যিত হই, ‘তাহলে বাবার সম্মতি পেরেছো কী?’



মৃত্যুর মত বক্তব্যাক
উদ্ভব.....

আপনার দাঁতের মার্টি
নীরোগ থাকবে আর
বুকের দুর্গন্ধ দূর হবে
আপনি শুধু ডেন্টালিক
দিয়ে দাঁত যত্ন
অভ্যাস করুন।

কো কো কি ল
মিশ্রিত ডেন্টালিক
পাইওরিয়া সারাতে
সাধ্য করে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ডেন্টালিক টুথ পাউডার

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী



—কী?

—তবে?

—তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি

গোটা আকর্ষণটা কেন হঠাৎ মাথায় ভেঙে পড়লো, কেন, কেন মানসী? কী হয়েছে? মানসী ততক্ষণে আরো শব্দ হয়ে উঠেছে।

বললে, না—তা আমি কক্ষণে বলতে পারবো না। তুমি আঘাত পাবে।

‘তোমাকে হারানোটা বড়ি আঘাত নয়, মানসী? সবকিছু তোমার খুলে বলতেই হবে।’

সজোরে একটা কানুনি দিই। কিন্তু মানসী কাঠ হয়ে গেলো। মুখ থেকে তার একটি কথাও আর বেরুলো না।

শেষ পর্যন্ত রাজনারায়ণবাবুর কাছ থেকেই বিবরণটা স্পষ্ট হলো—যোগেন্দ্র ভদ্র আমার বাবা নম। কমলা ভদ্রও আমার মামন। তাঁরা নিরুপস্থান ছিলেন। আমি তাঁদের কুড়িয়ে পাওয়া পালিত সন্তান। কোন সংশয়পরিচয় নেই। সেদিনের সেই বন্দাগা আপনাকে কী করে বোকাই, সমীরবাবু? একটা জগদল পাথরের মত বুকে বসে আছে।

তারপর তাঁদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে একটা হোটেলের এসে উঠলাম। কিন্তু ভেতরটা অহর্নিশ জ্বলপুড়ে থাক হতে লাগলো। কিছুতেই শান্তি পাই না। মানসীর ঘৃণা এবং জীবনের পশ্চাৎপট আমাকে বিভ্রান্ত করে তুললো। শেষ পর্যন্ত জীবনধারণটাই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তারপর, তারপর কী হলো—জানেন?

তারপর একদিন রক্তের ল্যাবরেটরীতে গেলাম। বন্ধু মানসী। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার। রাত তখন সাড়ে আটের কটায়। সে একটু কিসের সুয়েই জিজ্ঞেস করলো, ‘হঠাৎ এখানে?’

—‘দরকারী কথা আছে।’

—‘একটু বস। আমি হাতের কাজটা সেরে নিই?’

—‘আচ্ছা।’

ঘর জুড়ে কেমিক্যালের ছড়াছড়ি। আমি ঘুরে-ফিরে ওসব দেখছি। আর ভাবছি, এই তো সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ আর আসবে না। মনের গভীরে অজস্র প্রশ্ন। নিভুল উত্তর মাত্র একটি—মৃত্যু!! এই মৃত্যুতেই অশ্রু শান্তি। সেখানে মানসীর ঘৃণা নেই, বংশপরিচয়ের কোন বালাই নেই। মনের জটিল মন্দ উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে আমাকে উদ্ভাদ করে ফেললো। বুকের ভেতরও অসহ্য আগুন। আর স্থির থাকতে পারি নি। কেমিক্যালের আহ্বানই সত্যিকারের আহ্বান। সেই আহ্বানে আমি সাড়া দিলাম। কন্সেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিডের একটা বোতল বুকের ওপর উল্টে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা আতঁ চিংকর। এই পর্যন্তই—বখন জান হলো, তখন আমি হাসপাতালের কেবিনে।

পত্রিকায় খবর বেরুলো। দু-একজন দেখতেও এলো। কিন্তু মানসী এলো না। ও বসুমতী! না এসে ভালোই করেছে। আমি তাকে সহ্য করতে পারতাম না। মৃত্যুও বড়ি আমাকে ঘৃণা করলো। শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলাম। গোটা কোলকাতার ওপর বিতৃষ্ণা জন্মলো। জন্মলো অশ্রুত ঘৃণাও।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়েও যেন একটা সমস্যার পড়লাম। তারপর একদিন সোজা এখানে চলে এলাম। কাউকে কোন খবর দিই নি।

এবার নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা করবেন না, সমীরবাবু? বুকের এই দগদগে দগদগলি অজ্ঞাতকুলের রক্ত পরিহাস, ভালোবাসার নিষ্ঠুর অভিশাপ। জীবনটা এখন আমার কাছে আরেক মৃত্যু, আরেক গানের মতই করুণ। এই গান আমাকে গেয়ে যেতেই হবে। উপায় নেই।

প্রিয়তোষ।

চিঠিখানা পড়ামাত্রই একটা ভিত্তি অপরাধবোধ আমার সমস্ত চেতনাকে সজোরে নাড়া দিলো। মনে পড়লো, সকালের ডাকে সুপ্রভের চিঠি পেরিয়েছি। সে লিখেছে, ‘ছটিটা প্রায় ফুরিয়ে এলো। মাত্র সপ্তাহদিন বাকী আছে।..... আচ্ছা, প্রিয়তোষবাবু, কেমন আছেন? নতুন কিছুর সন্ধান পেয়ে ন্যাক?’.....

সবকিছু মিলিয়ে একটা তীব্র অস্বস্তি বোধ। ‘আপনাকে ঘৃণা করি নি’—কথাটা প্রিয়তোষবাবুকে যেমন করেই হোক উপলব্ধি করাতে হবে। আর যদি ফিরিয়ে আনতে পারি—

না—আর সেরি করা উচিত হবে না। একটা রিক্সা ডেকে তৎক্ষণাৎ স্টেশনে রওনা হলাম। কিন্তু ‘ল্যাটফর্ম’ চুকতে না চুকতেই পাহাড় লাইনের গাড়িখানা খটা-খট-খট শব্দ তুলে চলতে আরম্ভ করলো। স্টেশনের বৈদ্যুতিক আলোগুলোকে এই প্রথম বড়ই কুণসিত বলে মনে হলো।

শ্যামবাজারের প্রহরী

শ্রীমত চিত্র

চেহারা বিবরণ শোনা গেল স্থানীয় সংবাদে;
জুকের বাঁদিকে ছোট তিল, কপালে ক্ষতের দাগ,
চোখের পানবগলি কাঁপে কি কাঁপে না
অব কিছুর শোনা গেছে সন্ধ্যার বেতারে।...

অনুসন্ধানের জন্য বাহা কিছুর প্রাথমিক
প্রয়োজন ছিল

ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, মনিব্যাগ, স্বর্ণকলম,
এক কোটো উত্তম সিঁদুর
এ-সকল বাবতীর স্মৃতিস্মরণ শব্দেহুগলি
বাটরির শুরুর আছে অচেতন উল্লস শরীরে
শব্দ, তুমি নাই, আদিগন্ত সিঁড়ির উপরে
জন্মোজাত পলচিহ্ন পড়ে আছে অবহেলাভরে।

তথাপি তুমি যে এই হৃদয়েই আছে
এ-সংবাদ পুঙ্খিলে রাখে না,
নিরুদ্ভিদ ভেতরেই খুঁজে মরে দেশে দেশে।
অচঞ্চল থামের আড়ালে,
তুমি যে এই হৃদয়েই আছে
এ-সংবাদ পুঙ্খিলে রাখে না।
গোয়েন্দা পাঠের যারা সন্ধ্যায় শ্যামবাজার মোড়ে,
প্রতি শয্যাগৃহে যারা
হৃদয় নজর রাখে অবিরল জ্যোৎস্নার ভিতর
তাহারা কেহই রাখে না আমার খোঁজ, কেহই
রাখে না;
কেবল যে তুমি চিন্তিতে আমার দেশ, জানিতে
আমারে
তার পরিচয়দীপ হাতে নিয়ে আমি বসে আছি
আমি একা এক যুগ ধরে একা আমি
অপেক্ষায় রক্ত আছি জনহীন শ্যামবাজার
মোড়ে।



সেবার ওলেন্ড্রু

ভূপেন্দ্রবিহারী রক্ষিত রায়

সিংহ—শিখরাস্থ

“পোহাইল বিভাবরী পলাশী প্রাণগণে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী।”

কল্যাণচরিত্র সংঘর্ষের পর ধলঘাটের চকুশাখা-স্থ কিস্তি এলাকার সৈন্যদের কতকগুলো ছাটি বসান হয়েছে। সুতরাং পলিশের ধারণা যে ওসব স্থানে বিপ্লবীরা আর আসবে না। কিন্তু বিপ্লবীরা পলিশের মনস্তত্ত্ব ভালই বোঝেন। তাই ধলঘাট থেকে আইল ভিনেক দূরে ‘গৈরলা’ গ্রামেই সুব সেন তাঁর আশ্রয় গড়েছেন। বিশ্বাসদের বাড়িতে তাঁদের এই আশ্রয়কেন্দ্র। বিশ্বাসরা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর হুময়বান গল্পবাসী। তাঁদের কাছাকাছি হল গ্রাম্য-জমিদার নেত্র সেনের বাড়ি। নেত্র সেনের ছোট ভাই ব্রজেন দলেরই কর্মী। নেত্র সেনের স্ত্রী পলাতকদের খাওয়ার ভালবাসেন। ব্রজেন ও তাঁর বৌদি নেত্র সেনকে বিশ্বাসে সহানুভূতিশীল করে তোলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। নেত্র সেন মাতাল, স্বার্থপর এবং দেশ বা দেশকর্মী সম্পর্কে নির্লিপ্ত। তাঁর জমিদারি খণের বোঝায় টলমল করছে। কি করে অর্থ যোগাড় করা যায় সে-চিন্তা ছাড়া আর কিছুতে তাঁর মন বসে না।

নেত্র সেন ঢালুক লোক। তিনি চোর পেয়েছেন যে, বিশ্বাসদের গৃহে কতজন পলাতক এসেছেন এবং তাঁর স্ত্রী ও ভাই গোপনে তাঁদের নিয়ে মেতে উঠেছেন। সেই লোকগুলোকে তাঁর স্ত্রী প্রায়ই এটোসেটা রান্না

করে যে পাঠান তা-ও তাঁর চোখে পড়েছে।...

এদিকে দেশসম্পদ লোক জানে যে, সুব সেনের নামে কল হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। নেত্র সেন-ও সে সংবাদ জানেন। এ টাকা যে, সুব বাবুকে খরিয়ে দেবে তাইই প্রাণ্য। মাতাল নেত্র সেনের মগজে দুর্বৃত্তি কিলবিল করে ওঠে। এই তো সুযোগ! কিনা পরিপ্রবে এতগুলো টাকা উপায় করা যায়! কল শেষ হবে, ঠাট বজায় থাকবে এবং মদের বোতল-ও আর দুর্লভ হবে না।...

সবুর সইল না। আদর করে গৃহিণীকে কাছে ডাকলেন। স্ত্রীকে ধোলামোদ করে জেনে নিলেন আভার কারা আছেন। প্রস্তাব করলেন যে, একদিন পলাতকদের চর্যাচর্য-লেখ্যপেয় জাতীয় আহার পাঠাতেই হবে; সুব সেন যখন আছেন এ না করলে তাঁর আত্মা ভুত হবে না।...সেনগিরী তো এক পা বাড়িয়েই ছিলেন। আজ স্বামীর সহযোগিতা অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ করে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। আহা, কী ভাগ্য তাঁর দেব-দুর্লভ এই মানুসগুলোকে তিনি প্রাণভরে একটু খাওয়াতে পারবেন!...স্ত্রী পরক্ষণেই কিঞ্চিৎ বদনে জানালেন যে, মাস্টারদারা সে-রায়েই আশ্রয়না বদলাবেন বলে স্থির আছে। উত্তরে নেত্র সেন স্নলেন যে সন্ধ্যায় তাঁদের খাইয়ে দিতে হবে। সং কার্বে গাফিলতি ভগবান সহ্য করবেন না। কথা শেষ করেই তিনি বাজার করার ছলে বেরিয়ে গেলেন। বাজারের পথেই পলিশের সঙ্গে তাঁর যোগা-

যোগ হল। টাকা গ্রহণের এবং সুব সেনকে ধরিয়ে দেবার সকল কল্যানই ঠিক হয়ে গেল।...

সেদিন ছিল ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০ সাল।...

এদিকে সুব থেকেই সুব বাবুরা স্থির করেছিলেন যে, ২রা ফেব্রুয়ারি রাতির অন্ধকারে তাঁরা ‘গৈরলা’-র আশ্রয়কেন্দ্র জাগ্রত করবেন। কেন্দ্রে সৈন্য পলাতকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মাস্টারদারা স্বয়ং, তারকেশ্বর দাস্তদার, কম্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, সুশীল দাসগুপ্ত, মণি দত্ত ও নেত্রবাবুর ভাই ব্রজেন সেন।...

বিশ্বাসদের গৃহে সুব বাবুরা বেশ রয়ে ছিলেন। তাঁদের কাজকর্ম এ কেন্দ্র থেকে ভাল চলাছিল। মাস্টারদারা সে সময় গভীর-মনস্কতার নিযুক্ত ছিলেন ডিব্যাং কম্পিন্থা নির্ধারণ করার কাজে। তাছাড়া মনের নানা চিন্তা-ও এখানে বসে তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।...নির্মল সেন আজ তাঁর পাশে নেই। নির্মলবাবুর অভাব পূরণ করার মত লোক তাঁর দলে আর একটিও ছিলেন না। তাঁর মৃত্যু তাঁকে ভারি বেকারদার ফেলেছে। মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সৈন্য বিহীন বেদনার মাস্টারদারা স্বগতভাষি করেছিলেন—“আজ আমার বড় দুর্দিন। আজ আমার ডান হাতখানাই ভেঙে পেল!”...তারপর চলে গেলেন প্রীতিভায়া। গেছেন বীরেন দের। গেছেন আরো কত কিশোর কীর-চলুচলে মধ্যগুলো তাঁদের মনে পড়ে।...যাক, যেতে দাও গেল যারা।...

সাম্ভাবিক বস্তুত

মান্দারদার চিন্তাধারার একটু আভাস
কুলে দাঁড়ি এখানে 'চট্টগ্রাম অস্কাগার ল'ঠন'
শব্দতক থেকে :-

"বিজয়া" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মান্দারদার
লিখিয়াছেন : ছয় মাসের সফর আরোজনের
পর ১৮ই এপ্রিল রাত্রে চট্টগ্রামে বিপ্লব আশ-
প্রকাশ করিল। প্রত্যেক নেতা তাহাতে
যোগদান করিয়াছেন...আমিই বহু জীবনের
বিজয়ার হেতু, আমার ১৮ জন সংগীকে
মাতৃচরণে উৎসর্গ করিয়া অবশিষ্ট আমার
লুকাইয়া আছি।

"প্রাত্যহ সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া এই
প্রবন্ধের অন্য অংশে তিনি লিখিতেছেন—পনের
দিন পূর্বে আমি তাহাকে স্বহস্তে যোশ্ববেশে
সাম্ভুক্ত করিয়া মৃত্যুর কবলে পাঠাইয়াছি।
প্রীতি স্বহস্তে অমৃত পান করিয়া অমর
হইয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহার অভাব ও
গর্বসঞ্জন ভুলিতে পারিতোঁছি না।..."

বক্তার মত নির্মম এই পুরুষের বুকখানা
যথার্থই কুসুমের মত কোমল ছিল। এ সত্য
তাই গভীর করে বুঝেছেন যারা তাঁর
চোখের ইস্যারায় প্রাণ দিয়েছেন, দুঃখ বরণ
করে ধন্য হয়েছেন।

ক্রমে সম্মুখ নেমে এল গৈরলা-গায়ের
বৃদ্ধ।...পরম পরিতোষে নেত্র সেনের স্ত্রী
মান্দারদা ও অন্যান্য পলাতকদের ভূরি-
ভোজন করিয়ে এসেছেন নিজে, বিশ্বাসদের
গৃহে গিয়ে...কিন্তু কী হল? মান্দারদা
খাওয়াদারার একটু পরই সব বমি করে
দিলেন। পেটে কিছু রইল না। রক্তেন
ছুটে গেলেন দাদা নেত্র সেনের কাছে খবরটা
দিকে, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু
নেত্র সেন নির্বিকার...রক্তেন আশ্চর্য হয়ে
দেখেন যে, তাঁর দাদা একটি ল'ঠন দিয়ে যেন
গিসগ'ন্যাং' করছেন...রক্তেন ছুটে চলে
এলেন মান্দারদার কাছে তাঁর সন্দেহ জানাতে।
...ঠিক সেই মুহূর্তে গৃহের প্রবেশপথে
থেকে বোমা ফেটে পড়ল। 'কার্ফু'-র
দৌরাত্ম্যে নিব্বম গায়ের অতল আধারে
আলোকের তরঙ্গ চমকে গেল।...মিলিটারি
এসে গেছে সদর্পে!...বেরাও হয়ে গেছেন
বিপ্লবীরা!...আর বাঁচার পথ নেই!...
অভিশপ্ত ২রা ফেব্রুয়ারির রাত্রি!...চট্টগ্রামে
মিরজাফরের দৌলতে আবার—

"সিরাজের ছিন্ন মূণ্ড চাঁদ্রিয়া ভূতল
পড়িল, ছাটিল রক্তস্রোতের মতন।..."

আশ্রয়স্থলের পেছনে ঝোপজংগল।
তারপর ময়লা ও নোংরা জলে ভরা একটি
কুড়। গৃহপ্রাঙ্গণের বেড়া ভিত্তিতে হবে।
কুশীল দাসগুপ্ত পুথমে কম্পনা দত্ত ও অপর
কজনকে পাজিকোলা করে বেড়া পার করে
দিলেন। পরে মান্দারদাকে তুলে ধরতেই
জড়াল থেকে পলিশের একটি গুলী এসে
তাঁর হাত বন্ধ করে দিল। মান্দারদাকে
করাব করার ক্ষমতা তাঁর রইল না।

মান্দারদা প্রচুর গুলীবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা
করতে গিয়ে অল্প দূরে একটি বড় গাছের
গুড়ি ধরে বেড়া টপ্কানোর চেষ্টা করতেই
সেখানে লুকিয়ে থাকা একটা গুলী সেপাই
তাঁকে ধরে ফেলল।...তারেকশ্বর ও কম্পনা
দত্ত এবং আহত অবস্থায় শান্তি চক্রবর্তী
ও অপর ক'জন গড়র নোংরা জল পার হয়ে
ওপারের ঘনান্ধকার ভেদ করে প্রাণপণে ছুটে
অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কেবল মান্দারদা ও
রক্তেন সেন বন্দী। সারা রাত উভয়ের উপর
অমানুষিক নির্যাতন চলল। পরদিন দুপুরের
প্রভাত দেখা দিল। পিঞ্জরাবন্ধ মান্দারদা ও
রক্তেনকে নিয়ে উল্লসিত পলিশ ও সৈন্য-
বাহিনী পুটিয়া থানার পথে রওনা হল।

"স্বাধীনতা-শেষ-আশা হইল অধার।"

তারেকশ্বর দস্তিদার

ও

কম্পনা দত্ত

সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন গ্রেপ্তার হবার
পর তারেকশ্বর দস্তিদারের উপর কর্মভেদ



তারেকশ্বর দস্তিদার

এসে গেছে। 'গাহিরা'-র পুর্নর্তনবাসে
তারেকশ্বর ও কম্পনা আছেন প্রায় তিন মাস
ধরে। এঁদের প্রধান কাজ ছিল জেল থেকে
মান্দারদা ও অপর বন্দীদের ছিনিয়ে আনার
প্রস্তুতি ও চেষ্টা করা। কিন্তু গত বিশ
মার্চ (১৯৩০) সে-বড়বন্দ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে।
কাজেই এখন নতুন করে কিছু করার কথা
এঁরা ভাবছেন।...

কিন্তু বিখ্যাত স্যান অনা রুপ!...

হঠাৎ ১৮ই মে (১৯৩০) 'গাহিরা'-র

আশ্রয়কেন্দ্রটি পলিশ ও মিলিটারি বাহিনী
বেরাও করল। তারেকশ্বর দস্তিদার ও
কম্পনা দত্ত ছাড়া আরো লোক সেখানে
উপস্থিত ছিলেন। সংঘর্ষ শুরু হলো।
কিন্তু রাইফেলধারী বিরাট বাহিনীর সপ্তে
মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী রিভলভার দিয়ে কতক্ষণ
যুদ্ধ চালাবেন? আশ্রয়দাতা গৃহবাসী
দু'জন ব্যক্তি ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন।
তাঁদের নাম পূর্ণ তালুকদার ও তাঁর ছোট ভাই
নিশি তালুকদার। এ ছাড়া নিহত হয়েছেন
দলের কর্মী মনোরঞ্জন দাস। নিরপরাধ
গৃহস্থদের অনর্থক মৃত্যু প্রতিরোধ করার
তাগিদে তারেকশ্বর আত্মসমর্পণ করলেন।
কম্পনা দত্ত, তারেকশ্বর দস্তিদার ও গৃহবাসী
আরো চার-পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল পলিশ।
পলিশের জয়েন্টাস 'গাহিরা' গ্রামের সে-
রাতের আকাশেবাতাসে প্রেতধ্বনি ছাড়িয়ে
গেল।...

কথিত আছে তারেকশ্বর দস্তিদার মৃত
হবার পরে মান্দারদার পূর্ব-নির্দেশ মত
বিনোদ দত্তের উপর দলের নেতৃত্ব এসে যায়।
'চক্ৰশালা'-র এক বৈঠকে নাকি বিপ্লবীরা
বিনোদ দত্তকে 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'-র
অধিনায়করূপে গ্রহণ করেন।...

বিনোদ দত্ত চট্টগ্রাম-বিপ্লবের কর্মকাণ্ড
শেষ হয়ে হাবার পর-ও পলিশের চোখে
ধুলো দিয়ে দীর্ঘকাল পলাতক ছিলেন। এটা
তাঁর মস্ত কৃতিত্ব। ১১ বৎসর পর তিনি
ধরা পড়েন। ইতিমধ্যে বহু সাক্ষীসাবুদ
বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য। কাজেই তাঁর মার
তিন বছরের কারাদণ্ড হয়।...

বিভীষণ নিধন

"হে মোর সুন্দর, আজ তুমি হও স্বভবর,
করহ বিচার!..."

মহানায়ক সূর্য সেন একটা কলকমর
পরিবেশে গ্রেপ্তার হলেন। চট্টলার পশ্চিম
দিকান্তে ভারতের স্বাধীনতাকামী-সূর্য চলে
পড়লেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবশ্য এ
কিছু অতিনব ঘটনা নয়। রামায়ণের যুগ
থেকে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান যুগে যা ঘটে
এসেছে তা-ই ঘটেছে চট্টগ্রামের বৃকে। কিন্তু
বিপ্লবীর ক্ষমাহীন বিচারে বিশ্বাসহীনতাকে
শাসিত পেতেই হবে। সর্বশক্তিমান বৃটশের-ও
সাধ্য নেই তা প্রতিরোধ করার।...

হোলো-ও তাই। বিদ্রোহীর গোপন
বিচারালয়ে বিচার হয়ে গেলে নেত্র সেনের।
কিন্তু স্থির হলো যে এ-ক্ষেত্রে একটি
বুলেটের অপব্যয়-ও আবাস্তব।...

সূর্যবাবু গ্রেপ্তার হবার কিছুদিন পরেই
বিচারদণ্ড নেমে এলো বিশ্বাসঘাতকের ওপর।
...নেত্র সেন আহারে বসেছেন। নানাবিধ

জুখাদের সুগন্ধে রসনা লোভাভূর। তাঁর
স্বামী গেছেন রাসাঘরে নতুন একটা ব্যজন
আনার জন্যে। ফিরে এসেই আত্মকিত-
কিস্মে দেখেন তাঁর স্বামীর মাথাটি পড়ে
আছে সুমুখের ধলার ওপরে; দেহ এলিয়ে
পড়েছে বসবার আসনে, মাটিতে! কোন
মৃত্যুদণ্ডের অসির আঘাতে মৃত্যুবিচ্যুত-দেহ
থেকে অজস্র ধারার রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে তা
অবশ্য কেউ জানলো না!...

স্নেহ সেনের মৃত্যুদণ্ডে সেদিন পরিত্যক্ত
হয়েছিল দেশের মানুষ। দেশজননী তাঁর
অন্তহীন দুঃখের মাঝেও হয়তো কিছুটা
সামান্য পেয়েছিলেন বিংশশতাব্দীর এই
মিরজাদার চরম শান্তিলাভের দৃশ্য দেখে!...

মাতারদার মৃত্যুদণ্ডের সম্পন্ন প্রতিবাদ

ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি-র সর্বোত্তম
নেতা, বিপ্লবের মহানায়ক, চট্টগ্রাম প্রিয়তম
কম্বু সুবর্ণ সেনের ফাঁসির হুকুম হয়েছে।
হুটিগের এ উদ্ভূত তরুণ-রক্ত সহ্য করবে কী
করে? আজ বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় কর্মী-
দেহ কেউ মৃত্যুকে বরণ করেছেন, কেউ বন্দী।
সাধারণ কর্মীদের বিপুল সংখ্যা কারারুদ্ধ।
কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের ওপরও চলেছে
সমান নিষেধান।

গত আট বছরের পরিসরে সুবর্ণ সেনের
নেতৃত্বে স্বাধীনবাদী বৃটিশ গণ চট্টগ্রামে বে
দুঃসহ বিরোধিতা নিরস্ত ও সম্পন্ন সংগ্রামে
হাতে হয়েছে তা এবার শিথিল হয়ে এসেছে।
আজ কারাগারের অভ্যন্তরে সেই বিদ্রোহ-শক্তি
অবরুদ্ধ। আজ বিপ্লব-সংস্থাকে বাঁচিয়ে
স্বাধীন মত শক্তি বাইরে নেই।

ইংরেজ ও তার তাবেদারগোষ্ঠী এখন
সুখান্দিয়ার স্বপ্নে ডুবি!...

কিন্তু তরুণ রক্ত উত্তপ্ত করছে!...

"লক্ষ বাক হতে রক্ত রক্তের কদ্রোল!"

চট্টগ্রাম কী করে মেনে নেবে তার
অধিনায়ক সুবর্ণ সেনের মৃত্যুদণ্ড? বিদেশী
শাসকের এই নিলম্ব ব্যাভিচার প্রত্যুত্তরহীন
বেতে দেবে চট্টগ্রামের মানুষ? অসম্ভব!...

এই জানুয়ারি, ১৯৩৪ সাল। নিজাম
পল্টনের মাঠে সাহেবদের ক্রিকেট খেলা
চলছে। আকাশ তখন অস্তসূর্যের শেষ
আলোর রঙিন। চট্টগ্রাম জীবনসুখ-ও
অস্তমিত হবার কাল গুচ্ছেন কারাগারের
অন্তরালে!...কিন্তু 'ভরু' হাসির আড়ালে
জুজুকিত আগুন আবার চমকে উঠলো মাঠের
বুকে। গর্জে উঠল বিদ্রোহীর রিভলভার।
সাহেবদের আনন্দকলরব মূহুর্তে স্তব্ধ হয়ে
গেল। মৃত্যুদণ্ডের সামান্য প্রতিবাদ জানিয়ে
সেদিন সন্ধ্যায় সমস্ত রক্ষীদের সঙ্গে
সংঘর্ষ প্রাণ দিলেন বিপ্লবী নিত্যগোপাল

ভট্টাচার্য ও হিমালয় ভট্টাচার্য, আহত হয়ে
হত হলেন কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তী।
কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তী ফাঁসির মতো
জীবন দিয়ে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করলেন!...

স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচার

চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন বড়মুদ্রা-র
বিচারপর্বের স্তরে স্তরে বিদ্রোহের
রোমাঞ্চকর ইতিহাস উন্মোচিত হতে থাকার
সম্পন্ন ভারতবর্ষ উদ্ভূত হয়ে প্রতিদিন
অপেক্ষা করতো কোর্টের রিপোর্ট পাবার
জন্যে।

এই মামলার জীবন্ত করে রেখেছিলেন
দেশনেতা এবং ভারত বিশিষ্ট ব্যারিস্টার
শরণচন্দ্র বসু তাঁর অসুখ সাহস ও আইনজ্ঞ-
তার প্রচুরে। তা ছাড়া নিরপেক্ষ কম্বী-
বীরদের কাঠগড়ের প্রতিদিকসের উপস্থিতির
মাঝে যে অভিনব বিজড়িত হতে থাকতো
তা মামলার সর্বশেষ একটি বিভা দান
করেছিল।

এ মামলার কংগ্রেস-নেতা ও রাজভোকেট
সম্মত বসুর অবদানও যথেষ্ট।

বিচারকালে বিপ্লবীদের শৌর্য, কর্ম-
কুশলতা, দেশপ্রেম, সংকল্প দৃঢ়তা ও জাগ-
রুশের বাস্তব প্রকাশিত হতে থাকে। সকল
সংবাদপত্রই এসব সংবাদ ছাপিয়ে সাধারণিক-
তার মর্মান্তিক করলেও এ-বিষয়ে চট্টগ্রামের
দৈনিক পাণ্ডুলেখ-র অবদান অতুলনীয়। যে
নিষ্ঠাকতা ও দেশপ্রীতির ভাগিদে 'পাণ্ডুলেখ'
প্রতিদিন তার কাজ করে যাচ্ছিল তার প্রতিদানে

তার ভাষায় জোটে অসীম অভ্যাস। মুন্সি
পুলিশের দৌলতে পাণ্ডুলেখের প্রেস তালমসীর
ওজুহাতে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়।
প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় নির্যাতন ভোগ করেন
অশেষ, জামিন বাজেরাস্ত হয় কতবার!...
পাণ্ডুলেখের প্রাপকেন্দ্র মহিমচন্দ্র দাস এবং
তার সম্পাদক অক্ষয়চরণ দাসের কীর্তি
অজলিহ হয়ে আছে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা পর পর
তিনটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রায় দু-
বছরে সমাপ্ত হয়!...

(ক) প্রথম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের
সভাপতি ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ
ইয়ুনি।

বিচারে গুরুত্ব বোধ, অনন্ত সিং,
লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, রণধীর মন্ডী,
সুবোধ চৌধুরী, সহায়রাম দাস, কাকির সেন,
লালমোহন সেন, সুবোধ রায়, সুশেখর
দাস্তিদার ও রণধীর দাসগুপ্ত সোমী সম্বলিত
ছিলেন। তাঁদের ব্যবস্জীবন স্বীপালতরের
আবেশ হলো। তবে অগ্রাভবনক বলে
কাকির, সুবোধ, সুশেখর, রণধীরের প্রতি
সরকার ইচ্ছা করলে দয়া প্রদর্শন করতে
পারেন এ সুপারিশ-ও ট্রাইব্যুনাল করে দিলেন।

১৯৩২ সালের ১লা মার্চ রায় বের হয়ে
দেশবাসী বড়ই সোম্যাসিত বোধ করেছিল।
কারণ তাদের ভয় ছিল যে, অধিকাংশেরই
হয়তো ফাঁসির দণ্ড হয়ে যাবে!...

(খ) দ্বিতীয় স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের
সভাপতি হলেন চট্টগ্রামের তদানিন্তন জেলা
জজ মিঃ উইলিয়ামস। আসামী হলেন

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেঙ্গলুরু - শ্রীবঙ্গর - গোহাটী

আম্বিকা চক্রবর্তী, হেমেন্দু, দাস্তিদার ও সরোজ গুহ। ১৯৩৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি আম্বিকাবাবুর ফাঁসির হুকুম হলো, সরোজ গুহর হলো যাবজ্জীবন সশ্রীপান্তর এবং হেমেন্দু পেলেন মৃত্যু।

হাইকোর্টে আম্বিকাবাবুর সাজা কমে গিয়ে যাবজ্জীবন সশ্রীপান্তর হয়।

(গ) তৃতীয় স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচার জেলের অভ্যন্তরে তুচ্ছাকৃত মন্তব্য সমাপিত হলো। কারণ বিদ্রোহী সিংহ সূর্য স্কেনকে খাঁচা থেকে বের করে কোর্টে নিভা নিয়ে আসা ও নিয়ে-বাওয়ার ব্যবস্থা করতে ভরসা পেল না জার্ডনেল ব্রিটিশ-শক্তি। লোকচক্ষুর অন্তরালে কোর্ট বসিয়ে অতি সাবধানে বিচারের প্রহসন শেষ করা হয়। এই মাঝলার আসামী ছিলেন সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কম্পনা দস্ত।

ট্রাইব্যুনালের রায় অনুসারে ১৯৩৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদার ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত হন। কম্পনা দস্তের যাবজ্জীবন সশ্রীপান্তরের আদেশ হয়। কম্পনা দস্ত অবশ্য দীর্ঘ ছয় মাসের তাঁর মেসাদ ভোগ করার পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় রাজনৈতিক-বন্দীদের সঙ্গে মৃত্যুলাভ করেন।

মাস্টারদার ফাঁসি

আমার জীবনে লিভিয়া জীবন
জাগোরে সকল দেশ।"

ইংরেজের বীরবীর পরিচয় ইতিহাসে প্রচুর। বীরের সম্মানদানেও তার কাপণ্য ছাড়া নি জালালাবাদের বধ্যভূমিতে মৃত্যুপর্শে লাগিত বিদ্রোহী বীরদের প্রতি। হোক না শত্রু—তবু তাদের উদ্দেশ্যে বীরের সম্মান দিয়েছিলেন ব্রিটিশ-ফৌজ।...কিন্তু দুঃখের

বিষয় ইংরেজের নীচতা ও কাপুরুষতার পরিচয়-ও পরাধীন ভারতের ইতিহাসে রয়েছে কথক্কে। এই নীচ কাপুরুষতার কটক্কে ধরেই আজ তার সাম্রাজ্য খানখান হয়ে গেছে।

বিশ্ববী মহানায়ক সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজ খুশি হবে, আনন্দোৎসব করবে—এ আমরা বুঝি। কিন্তু আমরা বুঝি না বিপুল শক্তির প্রয়োগে এই বিদ্রোহী পুরুষকে শৃঙ্খলিত করার পর তাঁর ওপরে অমানুষিক নির্বাসন করার মূর্খতা। এত বড় বীর, জাতির কম্পনান্তরে তাঁর আসন মহান মানবের—তাকে কিনা বর্বরের মত অর্থনন্দন ও শৃঙ্খলা-বন্ধ্য অবস্থায় পাঠে হাঁটিয়ে গেরলার আশ্রয়-কেন্দ্র থেকে 'পটিয়া' ক্যাম্প পর্যন্ত প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করে নিয়ে এসেছিল ব্রিটিশের পুলিশ ও জেলাকর্তার দল। রক্তাক্ত অবসর দেহে গায়ে-মাথায় ব্যাডেঞ্জ-বাঁধা অবস্থায় মাস্টারদাকে বন্দন থানা থেকে টেনে বের করে ট্রেনে বোম্বে চট্টগ্রাম শহরে এনে জেলে ঢোকান হল, তখন দেশ জেনে ফেলেছে যে, তার শালগ্রামশিলা দস্যুর পদাঘাতে চূর্ণিত।...

১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি। রাত ১২টা থেকে গেছে। স্তব্ধশীত অশ্রুকার কারাগারের সর্বাপেক্ষে বিজড়িত।...বিদ্রোহীর রাজা সূর্য সেন তাঁর নিজস্ব সেলে নিদ্রাচ্চেন। ফাঁসির হুকুম প্রেরণীর চুম্বনের মত তাঁর দুটি চোখে আচ্ছন্নতা এনেছে। মৃত্যুজরীর বিবস প্রবণে সেই সঙ্গীতঃ—

"হিস হির রাখবি অনদিন অনবন,
অতুলন তোঁহার লেহ।..."

সহসা বিদ্রোহীর ঘুম ভেঙে গেল। অসময়ে সেল-এর দ্বার খোলার শব্দ কেন? ভারী বুটের শব্দ-ও শোনা যাচ্ছে? অনেক-গুলো মানবের অস্তিত্বে নৈশ-স্তব্ধতা বেন লাঙ্কিত!...পূর্বাঙ্কে তো কিছুই জানান হয় নি?...সান্দী ঘরে ঢুকে জানাল সংবাদ। ডাক পড়েছে সূর্য সেনের ফাঁসির রক্তভেদে কুলে পড়বার!...এ কি সেই 'মরণ' যাকে বলা চলেঃ—

"তুমি চুরি করে কেন এস চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?"...

কারাগার তখনো নিরুন্ম। পায়াদপত্রী স্তব্ধ রাতে হাজার করোঁদী নিদ্রাভূর। সমস্ত সাম্রাজ্য মাস্টারদাকে সেলের বাইরে নিয়ে এসে। নিয়ে এলো সেলের বাইরে তারকেশ্বর দস্তিদারকেও। উভয়ের কণ্ঠ থেকে উদ্ভাস-স্বরে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উৎকীর্ণ হলে তাঁদের মত ছুটে গিয়ে হাজার বন্দীর কানে পৌঁছিল। হাজার কণ্ঠে বারে বারে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল মহানন্দ 'বন্দেমাতরম'। রাজনৈতিক বন্দী, সাধারণ করোঁদী, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকল অবরুদ্ধ মানব সেই মনোভাঙে সেন-নিশীথে উদ্ভাস হয়ে

উঠল। জেলের আকাশব্যাস দীর্ঘ করে ধ্বনি-বলাকা চট্টগ্রামের পাহাড়-নদী-বনের শীর্ষে গগন জুড়ে ভেসে চলে। নির্ভীক শহরের ঘুম গেল ভেঙে। সবার কণ্ঠে নীরবে ও সরবে বেজে উঠেছে ঐ মন্ত, চোখে নেমেছে জল। তাঁদের প্রিয়তম বন্ধু ও নেতাকে বর্বর ইংরেজ গলা টিপে মেরে ফেলেছে। ঐ ভেসে আসে তাঁর শেষ নিশ্বাস-পরিমল!...

পূর্বেই বলেছি ইংরেজের কাপুরুষতার অন্ত নেই। তার পশুর মত ব্যবহার তাকে বারেবারে হয়ে করেছে। আজও অন্যথা ঘটল না। শৃঙ্খলিত দুটি বীর—কীধসেহী সূর্য সেন ও ভরুণ তারকেশ্বর বধ্যভূমিতে নীত হচ্ছেন।...গলগধার বৃকে রক্ত কাঁধে চলমান বীশুর কথা মনে পড়ে। বর্বর রাজশক্তি যে-রূপে মহামানবকে বিন্ধ্য করা হবে সেই মন্ত ভারী রক্ত-ই তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল জানি। আরো জানি যে পথে পথে তাকে অসহ্য অপমান, সহিতে হরোঁছিল। কিন্তু তথাপি তাঁর 'জগদ্বান'কে তাঁর কণ্ঠ থেকে ছিনিয়ে নেবার অপচেষ্টা করে নি রোমান 'পিলেট'-এর দলকল। অশ্রু এই বিংশশতাব্দীর বৃকে বসে সভ্যতাবিলাসী ব্রিটিশ কারাগারের পথযাত্রার বিদ্রোহীস্বরের কণ্ঠ থেকে বন্দেমাতরম-মন্তটুকু কেড়ে নেবার জন্যে কী পাশবিকতার পরিচয়-ই না দিল! সেল থেকে ফাঁসিগৃহের পথ—কতটুকু তার দূরত্ব? কিন্তু এই পথকে বিবাক ও বিলম্বিত করে দিল মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে মারপিট করার দানববৃন্ধ্য।...এই কাপুরুষের দল ভুলে গিয়েছিল যে মাস্টারদাদের মত লোহমানব তো দূরের কথা, বিশ্ববী-শিশু সূর্য সেনের মত একটি বালককে-ও দুর্ব্ব রাজশক্তি ১৯০৭ সালে বেত মেরে "মা" ডোলাতে পারে নি। সেসব বালকবীরদের বন্দনারই কাব্যবিশারদ গেয়ে উঠেছিলেনঃ "বেত মেরে কি মা ডোলাবে, আমি কি মায়ের তেমন ছেলে?"...

ফাঁসির মণ্ড আরোহণ করলেন তাঁরা। কণ্ঠে তখনো 'বন্দেমাতরম'। তার প্রতিধ্বনি বেজে যাচ্ছে দিকে দিকে!...তারপর সহসা খেমে গেল ফাঁসিমন্ত থেকে আসা সকল শব্দ। কুলে পড়েছে বীরের তনু, অভনুর স্পন্দন-কামনার।

মৃত্যু হলো মাস্টারদার।
মৃত্যু হলো তারকেশ্বরের।
তন্মহত্তে বোঁতে উঠলেন তাঁরা দেশ-কালপরিমারে বিশ্বের নির্বাসিত মনুষ্যের অন্তরে, পৃথিবীর বীরলোভীর হৃদয়ে।
বীশুর "ইনসারেকশান" বিশ্ববী চরণছন্দে, শহীদদের পদযাত্রা এভাবেই সর্ব-রূপে দেশে দেশে সংঘটিত হয়ে আসছে।...

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দুকুমার রায় প্রণীত

মূল্য : এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

মি বসুমতী ও ইন্ডো লিমিটেড

১০৬, বিপ্লববিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

অপরূপ নেহারল-ন্যাটোজেনেসিস

৩ ম্যান চিত্রাণা

লস এঞ্জেলসকে বলা হয় এঞ্জেলদের রাজার শহর। সত্যিই এমন চমৎকার সাজানো-গোছানো শহর পৃথিবীতেই খুব কম আছে। সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার এই মনোরম শহরটি আরতনের দিক দিয়ে আমেরিকার মধ্যে বৃহত্তম এবং লোকসংখ্যার হিসাবে এর স্থান নিউইয়র্ক ও শিকাগোর পরে। লস এঞ্জেলসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এর জলবায়ু। শীতকালেও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এই শহরের দিবাভাগের তাপমাত্রা ষাট থেকে সত্তর ডিগ্রীর মধ্যে থাকে। গ্রীষ্মকালেও এই তাপমাত্রা পঁচাশি ডিগ্রীর বেশি হয় না। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এখানে বড় জোর সায়রিশ দিন বন্টি হয়। এই শহরটি স্থাপিত হয়েছিল ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে।

অ্যারিজোনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান দেখে উইলিয়ামস জারশন থেকে স্যাটা ফি ট্রেন হয়েছিলেন মধ্যরাত্রে। পথে প্রচুর ভুবারপাতের জন্যে ট্রেন লেট ছিল। পরের দিন দুপুরের কাছাকাছি লস এঞ্জেলসে পৌঁছল। লস এঞ্জেলসে পৌঁছানোর আগে দুটি জিনিস আমাকে মুগ্ধ করলে। একটি, উঁচুনাচু ঘন সবুজ জমির বকে সারি সারি পাম গাছের সারি দিয়ে রৌদ্রকালিক্ত প্রশান্ত মহাসাগরের নীল তীররেখা, আর অপরটি হল বোজন বোজনব্যাপী টকটকে লাল পাপড়ির মতো পাতার মধ্যে হুলদে পরয়েলিটিয়া ফুলের উজ্জ্বলিত সমারোহ। এই পরয়েলিটিয়া ফুল হালিউডের বিখ্যাত রোজ প্যারেডে ব্যবহৃত হয়।

লস এঞ্জেলসে এসে সমস্ত দেহমনে আশ্চর্য আনন্দ বোধ করলাম। এখন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। পথে শীতে দারুণ কষ্ট পেয়েছি। লস এঞ্জেলসে গাড়ি থেকে নেমে ওভারকোট, ট্রাউপ ও দস্তানা খুলে ফেলতে হল। এতটুকু শীতের প্রকোপ নেই। বেশ মনোরম আবহাওয়া।

ওয়াশিংটনের অফিস অব এডুকেশন থেকে ৪২৬ সাউথ হিল স্ট্রীটের ক্লাক হোটেলে মিস্টার ব্যানার্জী ও আমার সিট বুক করা ছিল। দশতলার ৩০নং ঘরে আমাদের অস্থায়ী আশ্রয় পড়ল। হোটেলে

জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে আমরা লাগু খেতে বেরুলাম।

সাউথ হিল স্ট্রীটের ওপরে হোটেলের খুব কাছেই একটি ক্যাফেটেরিয়া মিলল। ক্যাফেটেরিয়াটি হোটো, কিনতু খাবার জিনিসের ভালোকাটি বেশ কম। প্রাচ্যদেশীয় বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান খাদ্য-বস্তু ভাত, মাছ ইত্যাদির আধিক্য অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে বিশেষ করে চোখে পড়ল। লস এঞ্জেলসের আন্তর্জাতিক চরিত্র

এস. কে. গ্রীনবার্গ

চিকাগোর চেয়ে বেশি। এর কারণ নিগো ছাড়া ল্যাটিন আমেরিকা, বিশেষ করে মেক্সিকো, চিলি প্রভৃতি দেশ এবং জাপান, চীন, হংকং, সিঙ্গাপুর, ইত্যাদি প্রাচ্য দেশের লোক এখানে ভিড় জমিয়েছে।

বিভিন্ন কাউন্টার থেকে খাবার জিনিস নিয়ে ভাতের কাউন্টারে এসে দাঁড়াতেই সর-বরাহকারিণী একটু হেসে বললেন, 'ভারতীয় তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। ভাতটা এতটু বেশি দিন।'

শুধু বেশি ভাত নয়, মাছও ভালো পাওয়া গেল। তবে সমুদ্রের মাছ, তেমন স্বাদ নেই।

লাগু খেয়ে কাছের একটা পোস্ট অফিস আবিষ্কার করে বাড়িতে একটা চিঠি লিখে দিলাম।

হোটেলে ঢোকার মুখেই দেখি কিছু দূরে একটি সিনেমা হল। আমি বললাম, 'মিস্টার ব্যানার্জী, সিনেমার দেশে এলাম, একটা সিনেমা দেখলে হয় না?'

মিস্টার ব্যানার্জী বললেন, 'প্রতিতে আমার ঘুম হয় নি। বড় ঘুম পাচ্ছে। আপনি দেখে আসুন। পরে দুজনে একদিন দেখা যাবে।'

আমি সিনেমা হলটির দিকে পায়ে পায়ে এগোলাম। হলটির নাম টাউন। তেমন স্বকণ্ঠে তকতকে নয়। বাইরে বিজ্ঞাপনের ছবিগুলি দেখে মনে হল যে, চলচ্চিত্রটিতে মডার্ন আর্টের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখানো হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের ছবিগুলিতে কতগুলি নন্দপ্রায় নারীমূর্তি প্রকটিত।

আমি এখন পৌঁছলাম তখন ছবির মাঝামাঝি জায়গা দেখানো হচ্ছে। শুনলাম এখানে অধিকাংশ হলই সকাল এগারোটা থেকে রাত্রে এগারোটা পর্যন্ত বিরমিত্ব শো চলে। একটি টিকিটে যে কোনো সময় ঢুকে যে কোনো সময় বেরনো যায়। আমি টিকিট কেটে মধ্যে ঢুকে দেখি খুব অল্প লোকেরই সিনেমা দেখছে। তাইলা একজনও নেই। পরে বুকোইলাম এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ফিল্ম ইন্ডার হলেও মানুষ এতো ব্যস্ত যে সিনেমা দেখার সময় তাদের স্বল্প। বাড়ির উষ্ণ পরিবেশে নিজের সুবিধে মতো তারা টেলিভিসন দেখতে পছন্দ বলে সিনেমা দেখার অভ্যাস তাদের কমে গেছে। আর যারাও বা সিনেমা দেখে ভালো মতো সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা অল্প। আমার মনে হয়েছে আমেরিকানদের জীবনে এতো বিভিন্ন বিষয়ের আনন্দের আরোজন রয়েছে যে, কোনো একটা বিশেষ ব্যাপারে তারা ভিড় করে না।

ছবির কয়েকটি দৃশ্য দেখেই চমকে উঠলাম। তুলির বদলে নন্দ নারীসেহে রক্ত মাখিরে ক্যানভাসে তার ছাপ তুলে তথাকথিত মডার্ন আর্ট তৈরি হচ্ছে।

হল থেকে বেরিরে কাছেই ই-স্ট্রীটের ওপরে একটি দোকানে খবরের কাগজ কিনতে চুকলাম। দোকানের সামনের দিকে দোকানী বসে আছে। তার সামনে একটা কনভেন্স মিরর। এই মিররে লম্বা দোকানটির এক জায়গায় একটু বেশি লোকজনের আনাগোনা। এগিয়ে গিরে দেখলাম সেখানে কতগুলি নিউজিস্ট ম্যাগাজিন রয়েছে। এগুলির মধ্যে 'ন্যাশনাল নিউজিস্ট', 'সোলাস', 'আবান নিউজিস্ট', 'সান ইয়ারা', 'নিউজিস্ট ফটো ফিল্ড ট্রিপ', 'নিউজিজম ইন অ্যাকশন', 'জার্নাল অব আমেরিকান নিউজিজম', 'নিউজিস্ট ডাইজেস্ট' প্রভৃতি বিশেষ করে চোখে পড়ল। পত্রিকাগুলির একদিক স্টেপল করা, যাতে পাতাগুলি খোলা না যায়। তাদের কাছে ইংরেজীতে লেখা আছে 'বেশি স্বল্প দাঁড়াবেন না।' একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক একটি ম্যাগাজিন নিয়ে নাড়াচাড়া

করতে দূর থেকে দোকানী বলে উঠল, 'খদি না কেনেন তবে ওভাবে দেখবেন না।'

লোকটি পরিক্রান্তি যথাস্থানে রেখে হস্ত হরে সরে দাঁড়াল। তারপর আমার দিকে চোখ পড়তে বললে, 'করেনার।'

আমি বললাম, 'হাঁ, আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি।'

—আমি আসছি ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে। চলুন বাইরে যাওয়া যাক।'

বাইরে এসে লোকটি বললে, 'আমার নাম হেরেস রেন্ডল। আসুন কফি খাওয়া যাক। আপনার আপত্তি নেই তো?'

—না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলতে ক্রিকেটের কথা মনে হয়। ইংল্যান্ডের কাছ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো রবার জিতছে, না? ভারতবর্ষে থাকতে শব্দ একটি খেলার খবর জানি, পুরো সিরিজের খবর পাই নি।'

—হাঁ। দেখুন, ভারতের ক্রিকেটের মান কমেই উঠছে। তবে তার প্রধান দুর্বলতা সে ফল্ট বলে খেলতে পারে না। আমি ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিরিজ দেখেছি। আমি একজন জ্যামাইকান ফল্ট খেলার।'

আমরা একটি কফিশপে কফি খেতে চুকলাম। কফি খেতে খেতে রেন্ডল বললে, 'আমার দেশ এই আমেরিকা। জানেন এখানে নিউ জার্সির মেন ল্যান্ডিং-এ আমেরিকার সানবোদিং অ্যাসোসিয়েশন আছে? ওহাইওর হোয়াইট হাউসে রয়েছে ন্যাশনাল নিউজিস্ট কন্ট্রোল। নিউ জার্সির সানসাইন পার্কের শব্দ নাম। প্রায় সব স্টেটেই রয়েছে নিউজিস্ট পার্ক। লস এঞ্জেলসে অ্যাকাসিয়া ক্লাব, ক্যালিফোর্নিয়া সোলার বেরাস ও সান-ডায়েরল ক্লাব বিখ্যাত। বাবেন একদিন কোনো একটা ক্লাব দেখতে?'

আমি চুপ করে থাকলাম। রেন্ডল বলতে লাগল, 'নিউজিস্ট স্বেচ্ছায় পক্ষে ভালো। সান বাথে বহু রকম অসুস্থ সেরে যায়। নিউজিস্টরা মনে করে নন্দ দেহ আবৃত দেহের মতোই প্রাথমিক বস্ত্র এবং মডার্ন কালচারে তাকে ক্রমবর্ধমানভাবে স্থান দেওয়া উচিত। নিউজিস্ট ক্লাবে আমি একবার গিয়েছিলাম। সেখানে শিশু, শব্দক-শব্দবতী সকলেই নিউজ। প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক। জানেন তো নিউজ মডেল হয়ে অনেক মেরে এখানে জীবিকা অর্জন করে।'

আমি বললাম, 'হাঁ, শুনছি। কাগজেও তো বিজ্ঞাপন দেখা যায়।'

—শব্দ তাই নয়। প্রতি বৎসর এখানে প্রেস্ট নিউজকে পুরস্কৃত করা হয়। নিউপটিল ডান্স দেখেছেন?'

—না। তবে অভিজ্ঞতা হিসাবে একদিন দেখবার ইচ্ছে আছে।'

—চলুন না একদিন আমার সঙ্গে। কোথায় উঠেছেন?'

—ক্লার্ক হোটলে।'

—আমি উঠছি। কাছেরই বেলমন্ট হোটলে। একদিন ফোন করে আপারমেন্টমেন্ট করে নেব। নিউজিস্ট ম্যাগাজিন দেখেছেন? এই দেখুন—'

সে কয়েকটি ম্যাগাজিন খাণ্ড থেকে বার করলে। কৌতূহলবশত 'ন্যাশনাল নিউজিস্ট' ম্যাগাজিনের পাতা ওলটলাম। ওপরে লেখা 'আন এডুকেশনাল, কালচারাল, অ্যান্ড সার্বোপযোগ্য পাবলিকেশন, ফর দি অ্যাডভান্স-মেন্ট অফ নিউজিস্ট'। কনটেন্টসের মধ্যে রয়েছে 'টিপস টু সানবোদিং', 'দ্য সানওয়ে টু হেলথ অ্যান্ড বিউটি', 'নিউজিস্ট ফর হেলথ', 'এসেখটিং অ্যান্ড নিউজিস্ট' প্রভৃতি। মধ্যে নিউজিস্টের জলজীবা, নৌকা-চালানো, খেলনার খেল খাওয়া, সান বাথ নেওয়া, ফটো তোলা, পিকনিক করা, ভলিবল খেলা, ফল তোলা, মই দিয়ে নাচে ওঠা ওয়াটার পোলো, অ্যাকোয়াটিক ব্যালিট প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের কালো-সাদা অথবা নানা রঙের ছবি। 'সোলাস' নামে অন্য একটি ম্যাগাজিনের ওপরে লেখা রয়েছে 'গডবাই ড্রোঙ্গ'। 'নিউজিস্ট কটো ফিল্ড ট্রিপ' ম্যাগাজিনে নানা বিবরণের মধ্যে আছে 'দ্য নিউজিস্ট টেক ওভার', 'দ্য লোজ লাইফ', 'টুজ কম্প্যানি' প্রভৃতি।

রেন্ডল বললে, 'দেখছেন তো এটা আমেরিকার কম্পোজিট কালচারের একটা দিক। তাই কিছু নমুনা সংগ্রহ করছি। এদেশের অনেক ভালোর মধ্যে এটাও উল্লেখযোগ্য। তাই না?'

—আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?'

—দিন পনেরো। আমি একজন জার্নালিস্ট। এদেশে তিন মাসের একটা অবজারভেশন টুরে এসেছি।'

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রেন্ডল বিদায় নিলে। আমি হোটেলের দিকে পা বাড়লাম। হোটেলের লিফটে উঠে বোডাম টিপে দরজা বন্ধ করতে বাব এমন সময় দেখি টুপি-পরা একজন লোক লিফটে ঢুকছে। মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ব্যস্ততার বোডাম টিপলে। আমি দশতলার বোডাম টিপলাম।

হঠাৎ সে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কোন দেশ থেকে আসছেন?'

আমি উত্তর দিলাম, 'ভারতবর্ষ থেকে।'

—নেহরুর দেশ। আপনারা তো আমাদের সাহায্যই ভরসা। কি, তাই না?'

লোকটা হি হি করে হাসতে লাগল। রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ফরেন এড সম্পর্কে ঠিক এমন উত্তি আমি আগে কখনও শুনিনি। অবশ্য আমেরিকার ভারতবর্ষকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের অনেক প্রশ্নের সমাধান হতে হয়েছে।

কোনো কোনো আমেরিকান ফরেন এডকে তেমন ভালো চোখে দেখে না।

আমি একটু ভীক্ষুকণ্ঠে বললাম, 'ভারতবর্ষ শব্দ আমেরিকা নয়, আরও অন্য দেশের কাছ থেকেও সাহায্য পায়। আবার নেপাল প্রভৃতি অন্য দেশকে সে সাহায্য করে। এই সাহায্য দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির স্বার্থ কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এক-সূত্রে জড়িত, এ কথাটা মনে রাখবেন।'

দশতলার লিফট থামতে আমি লিফট থেকে বেরিয়ে এলাম।

হোটলে আমাদের ঘরে ঢুকে দেখি মিস্টার ব্যানার্জী একটা জরুরী চিঠি টাইপ করছেন। আমি তাঁকে ব্যাপারটা বলতে তিনি বললেন, 'আমেরিকার নানা দেশের লোক এসেছে। সৈদিক দিলে কোনো ব্যাপারকে সকলে একভাবে দেখছে এমন আশা করা যায় না। এ ধরনের রিস্যাকশন এতো শব্দ হবেন না। চলুন ডিনার খেয়ে আসা যাক।'

আমরা ব্রডওয়েতে গিয়ে একটি চমৎকার ক্যাফেটেরিয়া খুঁজে বার করলাম। ক্যাফেটেরিয়ার দ্বারা কাজ করছে তাদের অধিকাংশই মেক্সিকান মহিলা। চমৎকার মাছ পাওয়া গেল। আমরা বেশ ভালো করে ডিনার খেলাম।

ডিনারের পর ব্রডওয়েতে খানিকটা ঘোরা-ঘুরি করে হোটেলের পথ ধরলাম। পথে পার্শ্ব স্কোয়ার পড়ল। এখানে দেখলাম সাধারণ প্রতিক্রমণীর নিয়োগ ও বিদেশীদের ভিড়। দূর থেকেই কাজ সংগীতের সুর কানে এসেছিল। কাছে এসে দেখি সমবেত জনতার অধিকাংশই নাচতে আরম্ভ করছে। কারো টুপি উড়ে যাচ্ছে, কারো কোট খুলে যাচ্ছে, কারো জুতো পা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেসব দিকে কারো খেয়াল নেই। হঠাৎ একজন আমার সামনে একটা খোলা টুপি তুলে ধরে বললে, 'ক্যান ইউ হেল্প মি, সার?'

আমি তাকিয়ে দেখলাম তার ড্রেস আমার চেয়ে খারাপ নয়। পারে নতুন জুতো চকচক করছে। একে প্রফেসানাল ভিখারী বলে মনে করা কঠিন। যা হোক, আমার কাছে এমন একটা লোক ভিক্ষে চাইছে এই ভ্যানিটিতে, ওর টুপির মধ্যে একটা ডাইম ফেলে দিলাম। 'মে গড ব্রেস ইউ' বলে সে চলে গেল।

আমরা লিফটে উঠতে বাব এমন সময় হুড়মুড় করে একটি লোক লিফটের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিশ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কলার ধরে তাকে ছোঁ মেরে তুলে ধরলে। লোকটা বলতে লাগল, 'আমার কোন দোষ নেই সার। বিল আমাকে জোর করে বেশি খাইয়ে দিয়েছে।'

পুলিশের লোকটি বললে, 'যথাস্থানে এসে কৈফিয়ৎ দিও।'

পরে জানলাম একটি নাইট ক্লাবে ঢুকে লোকটি প্রচুর মন্যপান করার রাস্তায় একজন মহিলার গারে টলে পড়ে গিয়েছিল। এখানে নাইট ক্লাবে গিয়ে মদ খেয়ে ডান্স করে ফুর্তি করার কোনো বাধা নেই। কিন্তু ক্লাব থেকে বেরিয়ে পা টলে কারো গারে পড়লেই পুলিশে ধরবে। আমেরিকানদের শৃঙ্খলা-বোধ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হৈ-হুল্লোড়ে যেমন আমেরিকানরা অবাধ, তেমনি কাজের বেলায় আশ্চর্যভাবে নিরাস্থিত। আগে থেকে না জানিয়ে কাজে হঠাৎ ছুটি নেওয়া গুরুতর অপরাধ। স্বতন্ত্র ইচ্ছে রাস্তা জেগে ফুর্তি কর আপত্তি নেই, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে কাজে হাজির হতে হবেই। একটি ছেলে হয়তো একটি মেরের কোমর ধরে একটু বেসামান্য অবস্থাতেই পথে চলেছে। কোনোভাবে কারো সংগে একটু গা ঠেকে গেলে চাকিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বলে উঠবে, 'এক্সিউজ মি'।



স্যান ডিয়োগো জুতো হাতী

মিস্টার ব্যানার্জী তাঁর সূটকেসের একটা চাবি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই পরের দিন সকালে ডাউন টাউনে ট্রাভেলস' ইকুপ-মেন্টের দোকান খোঁজ করতে গেলাম। খুব কাছেই একটি দোকান মিলল। দোকানের বিরাট বিরাট সূটকেস ও স্টিল ট্রাক দেখলে ভয় করে। দোকানে ঢুকতেই দোকানী এগিয়ে এসে বলল, 'মে আই হেলপ ইউ সার?'

মিস্টার ব্যানার্জী বললেন, 'হাঁ, দেখুন আমার সূটকেসের চাবি হারিয়ে গেছে, তাই একটা চাবির দরকার। আমার সূটকেসটি এই—এই রকম।' তিনি একটি সূটকেসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

দোকানী মূহুর্তের মধ্যে একটি চাবি বার করে তাঁর হাতে দিলে। দান মিটিয়ে দেবার পর দোকানী জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনারা কি ভারতীয়?'

আমি বললাম, 'হাঁ, আমরা ভারতবর্ষ থেকে আসছি।'

সে একটু অভিযোগের সুরে বললে, 'দেখুন, নেহরুকে আমরা খুবই শ্রদ্ধা করি এবং ভারতবর্ষকেও প্যালেস্টাইনের লোকেরা বন্দু বলেই মনে করে, তবে নেহরু নাসেরের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনের দাবি সমর্থন করলেন না কেন?'

প্রথম থেকেই দোকানী ও তার সংগীটির পোষাক, বিশেষ করে টপি দেখে সন্দেহ হয়েছিল। এবার বুকলাম এরা প্যালেস্টাইনের ইহুদী। এদেশে ব্যবসাপত্তর করে আমেরিকান বনে গেলেও এখনো নিজেদের প্যালেস্টাইনের অধিবাসীই মনে করে এবং তার সমস্যায় নিজেদের অংশীদার করতে চায়।

আমি বললাম, 'আপনারা এখানে থেকে সব সিচুয়েশন বুঝতে পারেন না। ভারতবর্ষ

কেন কি বলেছে তা ঠিক মতো বোঝা হয়তো সবক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন কাগজের রিপোর্টিংও অনেক সময় বড় গোলমালে হয়।'

দোকানী উত্তেজিতভাবে জ্বার থেকে 'নিউইয়র্ক' টাইমসের কয়েকটি কপি টেনে বার করে বললে, 'এই যে, এই দেখুন। আমি কপিগুলি সংগ্রহ করে রেখেছি।'

আমি বললাম, 'এটা তো 'নিউইয়র্ক' টাইমসের রিপোর্টিং। ভারতবর্ষে কামরাজের প্ল্যান অনুযায়ী মন্ত্রীদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগের ব্যাপারটিকে এই কাগজে ঠিকভাবে রিপোর্ট করা হয় নি। আচ্ছা, এখানে আপনারা কেমন আছেন?'

—'ভালোই। আমাদের কারবার এখানে ভালোই চলছে। তবে কিছু লোক আমাদের একটু বক্তব্যে দেখে।'

আরো দু'চারটে কথা বলার পর দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ দাঁখ একজন মেক্সিকান মহিলা জিনিসভা'র একটি বিরাট থলি টেনে নিয়ে চলেছেন। যেদেশে ছোটো-খোটো সব কিছুতেই কষ্ট ব্যবহৃত হয় সেখানে এই ধরনের কায়িক পরিশ্রমের দৃশ্য কেমন বেমানান মনে হল। ভদ্রমহিলা কাছাকাছি আসতেই তারি করে দেখলাম থলিটির নীচে চারটি চাকা লাগানো রয়েছে এবং তিনি সেটিকে স্বচ্ছন্দ গাড়ির মতো টেনে নিয়ে চলেছেন।

রডওয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে দু'টি সুশাইন বর আমাদের কাছে এগিয়ে এল। মিস্টার ব্যানার্জী তাঁর জুতো পালিশ করিয়ে প'চিশ সেন্ট দিলেন। আমার জুতোর গোড়ালিটা বরফে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি জুতো পালিশ না করিয়ে একটা জুতো সারানোর দোকানের খোঁজ করতে

লাগলাম। পার্শ্ব স্কোয়ারের কাছে একটি দোকান দেখতে পেলাম। মধ্যে ঢুকে দেখলাম একটি জায়গার লেখা আছে—'সু রিপেয়ার হোআইল' ইউ ওয়াচ', 'সোল রিস্ট্রেন্সমেন্ট ইজ প্লি মিনিটস'। আমি দোকানদারকে আমার জুতোটি দেখাতে সে আমাকে বসতে বললে। তারপর দেখলাম মেশিনের সাহায্যে সে জুতোর পুরনো ছেঁড়া সোলটা খুলে তার জায়গায় একটা নতুন সোল বাঁসিয়ে দিলে। তারপর পালিশ, ধার কাটা ইত্যাদি সবই মেশিনের সাহায্যে হল। জুতোটি স্বখন সে 'ঠিক হয়েছে' বলে আমার হাতে দিলে তখনও তিন মিনিট হবার দশ সেকেন্ড বাকী। সাধারণ ছোটোখাটো কাজও এখানে মেশিনের সাহায্যে যেমন দ্রুত তেমনি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

অফিস অব এডুকেশন থেকে আমার স্যান ডিয়োগো বাওয়ার জনো রেলরোডের টিকিট পেয়েছিলাম। আমি পর দিন স্যান ডিয়োগো বাব বলে সকালের ট্রেনে চড়লাম। মিস্টার ব্যানার্জী অসুস্থ বলে যেতে পারলেন না।

স্যান ডিয়োগো এখান থেকে ১২৮ মাইল দূরে। শীতের রৌদ্রালোকিত ককবাক সন্ধ্যা। আমার বেশ ভালোই লাগছিল। একটু একা-একা বোধ হচ্ছিল। নতুন দেশে কেউ সংগে থাকলে একটা নিরাপত্তাবোধ থাকে। তবে একথা ঠিক যে, একা না বেড়ালে সত্যিকার দেশভ্রমণ হয় না। আমেরিকায় অনেক সময়ই স্টেশান বা ট্রেন চেনা মুশকিল। বহুস্থলে স্টেশানের নামও লেখা থাকে না অথবা জায়গাটার এমন কোনো 'প্ল্যাটফর্ম' বা ঘর থাকে না যাতে সেটাকে বিশেষভাবে স্টেশান বলে চেনা যায়। আমি ট্রেনে উঠে কামরার একটি কোণায় চেয়ে দেখলাম, একজন তরুণ পাত্র একজন বৃদ্ধ

ও বৃন্দার সঙ্গ কথ্য বলছেন। আমি সেদিকে এগিয়ে গিয়ে পান্নীটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একিউজ মি, এই ট্রেন কি স্যান ডিয়োগো যাবে?'

তিনি বললেন, 'হাঁ। আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

—'ভারতবর্ষ থেকে।'

—'আপনি এখানে ইচ্ছে করলে বসতে পারেন।'

তার পাশের সিটটি খালি ছিল। আমি সেখানে বসলাম। কথায় কথায় জানলাম তাঁর নাম ইউজেন মিলার, এস জে। ভারতবর্ষের ধর্মতীব্র সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তাঁর এক জ্যেষ্ঠামশাই ধর্মপ্রচারের দ্বারা মাদ্রাজে গিয়ে মারা যান। পান্নীটি যে ভ্রমলোক ও ভ্রমসিঁহিলার সঙ্গ কথ্য বলছিলেন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। তাঁরা স্যান ডিয়োগোতে তাঁদের ছেলেকে দেখতে যাচ্ছেন। ছেলে স্যান ডিয়োগো স্টেট কলেজ অব এডুকেশনের অধ্যাপক। আমার এডুকেশনের প্রোগ্রামে তাঁরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ভ্রমলোক বললেন, 'স্যান ডিয়োগোর স্টেট কলেজ অব এডুকেশনের খুব নামডাক। এখানে অনেক বিদেশী ছাত্র পড়তে আসে।'

—'আমিও তাই শুনছি।'

—'আপনি কি স্টেট কলেজ দেখতে যাবেন?'

—'আজ রবিবার। আজ তো কলেজ বন্ধ। আজই বিকেলের ট্রেনে আমি ফিরে যাবি। পরে আর আসা হবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে এই কলেজ দেখতে পেলে আমি খুশি হতাম।'

পথের দু'পাশের দৃশ্য অতি মনোরম। আমরা দ্রুত স্যান্টো ফি স্প্রিংস, ফুলারটন ডিক্রিন ল্যান্ডের জন্যে বিখ্যাত অ্যানাহেম, অরেন্স, কমলালেবুর দেশ স্যান্টো অ্যানা,

আর্ডিন প্রভৃতি পার হয়ে চললাম। ওশান-সাইডে ট্রেন থামলে কাদার মিলার বললেন, 'ওশানসাইড দিয়ে প্যালোয়ার অবজার্ভেটরিতে যাওয়া যায়। এইখানে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপ আছে। তা ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী দীর্ঘতম পান্নারও রয়েছে এই ওশানসাইডে।'

এরপর কালসবাদ হয়ে এলিসনিটাস। এখানে শুনলাম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরোসেসিটরা ফুলের চাষ হয়।

সড়ে তিন ঘণ্টা পরে স্যান ডিয়োগো পৌঁছলাম। পান্নী ও বৃন্দবান্ধা যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'আবার দেখা হবে।' শুনলাম ও'রা তিনজনেই সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরবেন।

স্যান ডিয়োগো চমৎকার শহর। নাম থেকে শব্দ করে ঘরবাড়ি পথঘাট প্রভৃতিতে প্যানিশ প্রভাব দৃষ্টিগোচ্য নয়। স্টেশান থেকে বাস ধরে প্রথমেই গেলাম স্যান ডিয়োগো জু দেখতে। স্যান ডিয়োগো জু পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। বিখ্যাত ব্যালবোয়া পার্কের মধ্যে এই জু অবস্থিত। এই পার্কের মধ্যেই রয়েছে ওল্ড শ্বেল থিয়েটার, ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, ফাইন আর্টস গ্যালারি, হাউস অব চার্মস, পাম ক্যানিনন, লিাল পুল, ব্যালবোয়া পার্ক বোল, পেপার গ্রোভ পিঅনিক এরিয়া, ইউ এস নেভাল হাসপিটাল প্রভৃতি।

জুতে ঢুকেই চোখে পড়ল বৃক্শোভিত একটি সুদৃশ্য পুলের চারিদিকে দীর্ঘ সারস পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলের পাশে ফোরমরা থেকে রূপালী জলধারা উৎসর্গিত হয়ে একটি মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এর কিছু দূরেই কয়েকটি ময়ূর সবুজ জমির ক্যানভাসে রঙিন পেখমের তুলি বুলিয়ে ঘেঁষে কত ছবি একে চলেছে। সমগ্র জুটি ৪টি মেসো ও ৩টি ক্যানিননে বিভক্ত। এই জু

সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে গরিল্লা, সিংহ, বাঘ, ভল্লুক, গাভার প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও কোনো খাঁচার মধ্যে নেই। তারা নীচু পাঁচিল ও তার পাশে একটি সরু ডিট দিয়ে ঘেরা জায়গার মধ্যে স্বাভাবিক পরিবেশে ছাড়া আছে। বাসে করেও এই বৃহদারতন জু'র মধ্যে ঘোরা যায়। তবে আমি হে'টেই অগ্রসর হলাম।

এবার আমি গেলাম বি-মেসার পাখির খাঁচার মধ্যে। অতি বৃহৎ এই খাঁচার মধ্যে গাছে গাছে পাখির ডিঙি। তাদের বিভিন্ন সুরে এক বিচিত্র ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে। খাঁজলে এই ঐকতানের মধ্যে বিটোফনের বহু সিম্ফনিকে পাওয়া যাবে। বিচিত্র বলের পাখির এমন সমারোহ আমি জীবনে কখনও দেখি নি। দক্ষিণ দিকের খাঁচার রয়েছে জলাভূমি ও তীরচরী পাখির মেলা। উত্তর দিকের খাঁচার আরও পাখির সংগ্রহ। খাঁচার মধ্যে হাটহাটি করতে বেশ ভালো লাগছিল। অনেকগুলো ছবি তুলে ফেললাম। শিশুদের ডিঙিই খাঁচার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কেউ পাখির স্বর নকল করছে, কেউ হাত তুলে পাখিকে ডাকছে, কেউ পাখির দিকে শাবার ছুঁড়ছে। দেখলাম একপাশে একজন একটি টেপেরকর্ডারে পাখির ঐকতান টেপ করছেন।

পেঙ্গুইনদের জন্যে নির্মিত শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কাঁচের ঘরের কাছে এসে দেখলাম মধ্যকার কৃত্রিম চৌবাচ্চার ধারে কয়েকটি ছোটোবড়ো পেঙ্গুইন স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। এরপর ভল্লুক, গাভার, বাঘ, সিংহ, সিম্পুঘোটক, সীল, চিতা, হাতী প্রভৃতি দেখে গরিলার জায়গার এলাম। কৃত্রিম পাহাড়ের ওপর গরিলাটি গম্ভীর হয়ে বসে কলা খাচ্ছিল। এ-মেসার মধ্যে উইজফোর্ড বোল ও চিল্ডেন জুটি খুবই আকর্ষণীয়। উইজফোর্ড বোলে ছাড়া জন্তুদের খেলা বিশেষভাবে উপভোগ্য।

জু দেখে ফেললাম সমুদ্রের ধারে। এখন বিকেল। সারি সারি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। দুটি জাহাজ থেকে মাল খালাস করা হচ্ছে। দীর্ঘ গাছ ও জাহাজের ফাঁক দিয়ে সুবাস্ত্র আসছে। সমস্ত জল ও তীরভূমি লাল আলোয় ভরে গেল। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল একটি অতি পুরাতন আমলের জাহাজের দিকে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, জাহাজের গায়ে লেখা আছে 'Star of India, World's Oldest, Iron Sailing Vessel built in 1853.' পরে অবশ্য জাহাজটির রিফিটিং করা হয়েছে। আরো খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যার ট্রেন ধরলাম।

গাড়িতে আবার ফাদার মিলারের সঙ্গ দেখা হল। উনি আগ্রহের সঙ্গে আমার সারাদিনের কর্মকাণ্ডের খবরাখবর নিলেন। ও'র কাছে শুনলাম স্যান ডিয়োগো বড়



স্যান ডিয়োগো জুতে ভল্লুক

এয়ারক্রাফট ও গাইডেড মিসাইল তৈরির কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত। তা ছাড়া এখানে ইট এস নৌভর একটি বড় ঘাট রয়েছে।

গাড়ি লস এঞ্জেলসে পৌঁছলে মিলার তাঁর মোটরে আমাকে হোটেল পৌঁছে দিলে গেলেন।

অফিস অব এডুকেশন থেকে মিস শ্যাপিঙ্গার সিমস কোনও আমেরিকান ফ্যামিলিতে খ্রিস্টমাসের দিনটি কাটানোর জন্যে ওয়াশিংটন অ্যাকেরাস কাউন্সিলের মিসেস অ্যানি নোভিলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যোগাযোগ করতেন। খ্রিস্টমাসের এখনো একদিন বাকী। সকালে ফ্লাওয়ার স্ট্রীটে কাউন্সিলের অফিসে মিসেস অ্যানি নোভিলের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। উনি জানান যে, আমেরিকান পরিবারের সঙ্গে খ্রিস্টমাসের দিন কাটানোর ব্যাপারে বখাসাধ্য চেষ্টা করবেন। ওর সঙ্গে কথা বলে ফোনটি রেখে শেত করছি, এমন সময় আবার ফোন বেজে উঠল। মিসেস নোভিল জানান যে, মিসেস ফ্রান্সিস শ্যাপিঙ্গার নামে একজন মহিলা আমাদের শহর দেখাতে পারেন এবং আমরা স্বাক্ষরী থাকলে উনি একঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বেন। আমরা আনন্দের সঙ্গে সম্মতি জানালাম।

আমরা ড্রেস করে হোটেলের সামনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক এগারোটার সময় শ্যাপিঙ্গার তাঁর সুদৃশ্য গাড়ি নিয়ে দেখা দিলেন। গাড়িতে উঠে বসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাবেন?'

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'হলিউড'।

কথায় কথায় জানলাম শ্যাপিঙ্গার স্বামী একটি ব্যাকের বড় ডাইরেটর। শ্যাপিঙ্গার একটি জুনিয়র কলেজে সোসাল স্টাডিজ পড়েন। বোর্শদিন তাঁদের বিয়ে হয় নি। এখনো সংসারে কোনো নতুন অতিথির আবির্ভাব ঘটে নি। স্বামীর সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষ ছাড়া প্রায় বহুদেশে পাড়ি দিয়েছেন। এবার ভারতবর্ষে যাওয়ার আশা রাখেন।

হলিউডকে বলা হয় 'এ স্টেট অব মাইন্ড', কেন না যে মূর্তি ও টেলিভিশনের জন্যে এর জগৎ-জোড়া খ্যাতি তাদের বেশির ভাগই এখন তৈরি হয় কলতার 'সিটি', বারব্যাংক, স্যান ফার্নান্দো ভ্যালি প্রভৃতি নিকটবর্তী অঞ্চলে। তাছাড়া সিনেমা ও টেলিভিশন স্টারদের আশ্রয়স্থল এখন হলিউডে নয়। তাঁদের বেশির ভাগই থাকেন বেভার্লি হিলসে। তবে একথা ঠিক যে, এককালে হলিউড মূর্তি এবং পরে টেলিভিশনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল এবং এখনো কোনো কোনো বিষয়ে হলিউডের জুলাই রয়ে গেছে।

মিরা প্রথমেই গেলাম ৬১১৫ হলিউড বুলেভার্ডে অবস্থিত গ্রাম্যানস চাইনিজ



শ্যান ডিরাগো জুড়ে পেগুইন

থিয়েটারে। এটি প্রাচ্য প্যাগোডার মতো বলে এর এই অদ্ভুত নাম। হলিউডের ছবি প্রথম প্রদর্শনী এখানে হওয়ার জন্যে এটি জগৎবিখ্যাত।

থিয়েটারের বিল্ডিংটির কার্কাষ অতি চমৎকার। উজ্জ্বল লাল, নারঙ্গী, গাঢ় ছাই রঙ প্রভৃতির সমন্বয়ে এক অপূরণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। গেটম্যানদের চাইনিজ ড্রেস। এই থিয়েটারে। এটি দেখতে প্রাচ্য প্যাগোডার মতো এর সামনে খোলা বাঁধানো চত্বরের কংক্রিট স্লাবের বৃক্ক অতীত ও বর্তমানের মূর্তি-স্টারদের হাত, পা বা মূখের ছাপের সঙ্গে তাদের স্বাক্ষর। আমি দেখলাম একটি স্লাবের ওপর দুই হাতের ছাপের সঙ্গে লেখা আছে 'লাভ টু ইউ অল শার্লি টেম্পল ৩-১৪-৩৫'। তার পাশে জন ব্রাউনের স্বাক্ষরের সঙ্গে লেখা টু স্ট্যাম্পড ফর টোটের ছাপ। তার নিচে এডগার বাজার ও চার্লি ম্যাকার্থির হাত ও পায়ের ছাপ ও স্বাক্ষরে সঙ্গে লেখা টু স্ট্যাম্পড ফর ওয়ার্ডস থ্যাংকস টু সিড গ্রাম্যান ফ্রম'। তার পাশে হাত ও পায়ের ছাপের সঙ্গে খোদাই করা 'থ্যাংকস সিড ফর দি অনার রে মিল্যান্ড ৪-১১-৪৬'। তার নিচে হাত ও পায়ের ছাপ সমেত লেখা 'থ্যাংকস টু সিড। এমথার উইলিয়ামস ইন অনার অব জি আই জো'। চত্বরের ওপর দিয়ে হটতে হটতে আমার মন অতীতের বিখ্যাত চিত্রতারকাদের সান্নিধ্যে বুরে বেড়াচ্ছিল। এদের মধ্যে অনেকে আজ জীবিত নেই। চত্বরের ওপরেই একটি স্ট্যাণ্ডে কতকগুলি মূর্তিবল বোর্ড রয়েছে। এই সব বোর্ডে আটকানো আছে জগৎবিখ্যাত মূর্তি-স্টারদের সুন্দর সুন্দর ফটো। আমি বোর্ডগুলি দেখতে লাগলাম। বোনাল্ড

কেলম্যান, গ্রেগরি পেগ, আজ গার্ডিনা, আলেক্স হেপবার্ন, স্ট্রার্ট গ্র্যান্ডার, কেরী ব্রান্ট, ওয়াশিংটন বোর, ফ্রেড্রিক মার্চ, গ্যারি কুপার, ডিভিডান লে, চার্লি চ্যাপলিন, উল বার্নার্ড প্রমুখের বহু পরিচিত ছবিগুলি নতুন পরিবেশে নতুন মনে হল। মিসেস শ্যাপিঙ্গার এবার তাকালেন, 'একটু তাকাতাড়ি করুন। এখনো অনেক দেখার বাকী'।

আমরা চত্বরের পাশেই চাইনিজ স্টোরিয়ার ও গিফট শপ থেকে দুটি স্টোরিয়ার ও চারটি পিকচার পোস্টকার্ড কিনলাম। দোকানী একটি সুদৃশ্য গাঢ় কালো রঙের খামে ঐগুলি আমার হাতে দিয়ে বললে, 'আশা করি হলিউড আপনার ভালো লাগছে'। মিসেস শ্যাপিঙ্গার জানান যে কাছেই হলিউড পোস্ট অফিস। সেখানে কার্ড বা চিঠির ওপর হলিউড পোস্টমার্ক দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমি বললাম, আমি এখানেই চিঠি পোস্ট করব যাতে এখানকার পোস্টমার্কের পক্ষে কলকাতার পোস্টমার্ক পড়ে। সেইটাই হবে আমার কাছে দুদেশের যোগসূত্র।

এবার গেলাম হলিউড বুলেভার্ড ও ভাইন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে। মিসেস শ্যাপিঙ্গার বললেন, 'জানেন তো এই কিম্বদন্তিগোষ্ঠী একটা স্ট্যাণ্ডার্ড এক্সপ্রেসন আছে, মিট মি অ্যাট দি কর্নার অব হলিউড অ্যান্ড ভাইন'।

হলিউড বুলেভার্ডের দক্ষিণে ভাইন স্ট্রীটের ওপরে রয়েছে হলিউড প্লাজা হোটেল, ব্রাউন ডার্বি হলিউড, হারিস্টন হারফোর্ড থিয়েটার ও আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর হেডকোয়ার্টার্স। ভাইন ও সেলমার সংযোগস্থলে ক্যালিফোর্নিয়া ব্যাংক বিল্ডিং-এর পাশে একটি প্লাবকের দিকে আমাদের দুটি লাক্ষ্য করে মিসেস শ্যাপিঙ্গার বললেন, 'এখানেই

১৯১০ খৃস্টাব্দে পৃথিবীর প্রথম ফিচার লেখ্য ফিল্ম 'দি স্কো ম্যান' তোলা হয়েছিল। হালিউড ও ভাইন কর্নারের প্রসিদ্ধি প্রায় হালিউড ও ভাইন কর্নারের মতোই। এই-খানেই ও এর কাছাকাছি রয়েছে ন্যাশনাল রুডকাস্টিং কোম্পানীর হেড কোয়ার্টার্স, কলম্বিয়া রুডকাস্টিং সিস্টেমের রেডিও স্টুডিওসমূহ, হালিউড প্যালাডিয়াম, মলিন রুজ, কলম্বিয়া পিকচার স্টুডিওর একটি অংশ, টোরেন্টের সেন্টার ফর হালিউড সিস্টেমটির, প্যারামাউন্ট স্টুডিও, অরকেও স্টুডিও প্রভৃতি। মিসেস শ্যাপিরোর কাছে খুনলাম প্যালাডিয়ামে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বলরুম আছে। মলিন রুজ থিয়েটার রেন্ট্রেরেণ্টের গারে কংক্রিটের ওপরে খোদাই করা রয়েছে বিখ্যাত চিত্রতারকাদের স্বাক্ষর। হালিউড সিস্টেমটির গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম রুডলফ ভ্যালেন্টিনো, ডগলাস ফেরার-শ্যাক্স, টাইরন পাওয়ার প্রমুখ চিত্রতারকা-দের সমাধি।

এবার হালিউড বোলে। হালিউড ফ্রিওরে দিগ্রে হালিউড বোলে ঢোকান মুখে একটি স্টার আছে। এই বোলে সিস্টেমিক আন্ডার দি স্টার্স-এর আয়োজন হয় জুলাই ও অক্টোবর মাসে। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাভাবিক আয়ক্ষি থিয়েটারগুলির অন্যতম। বোলে যখন কোন কিছু হয় না তখন এর মধ্যে ঢুকতে কোনো ফি লাগে না। মধ্যে ঢুকে চমৎকৃত হলাম। হালিউডের ইউকার্ভার্ড পাহাড়ের পটভূমি ও গাঢ় নীল আকাশের চাঁদের নীচে বেল্টটিকে ইন্দুপুত্রী বলে মনে হল। মিসেস শ্যাপিরো বললেন, 'প'চাত্তর একর জমির ওপরে তৈরি এই বোলটিতে কুড়ি হাজার লোকের বসার জায়গা আছে। আমি বিয়ের আগে ও পরে এখানে কবার এসেছি। মৃত্ত আকাশের এখানে যখন সিস্টেমিক হয়, তখন যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।' বোলের অর্ধবৃত্তাকার স্ট্রাকচারের সামনে নীলপুলের মধ্যে ফোরারার জলধারা এক অপূর্ব দৃশ্যের জন্ম দিয়েছে। আমি কয়েকটি ছবি তুলে নিলাম। মিসেস শ্যাপিরো বললেন, 'এবার নিশ্চয়ই আপনাদের ক্রিদে পেরেছে। চলুন আমরা ফারমার্স মার্কেটে গিয়ে লাগু খাব। এই মার্কেট তার আমদানী করা জিনিসপত্র ও খাদ্যবস্তু জন্মে পৃথিবী বিখ্যাত। এখানে ফার কোট থেকে রু জিন, শিক কাবাব থেকে পিজজাই পর্বন্ত পাওয়া যায়।'

উলশায়ার বুলেভার্ডের উত্তরে ফোরার ফার্ম ও থার্ড স্ট্রীটের সংযোগস্থলে ফারমার্স মার্কেটে পৌঁছেতে বেশিক্ষণ লাগল না। মার্কেটের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ল একটি

টওয়ারের গারে ঘাড়ের নিচে লেখা ফারমার্স মার্কেট। অনেক কণ্ঠে গাড়ি পার্ক করে মধ্যে ঢুকলাম। ঢুকে চোখ জুড়িয়ে গেল। খাদ্য-বস্তুর এমন সংগ্রহ আমি জীবনে কখনো দেখি নি। বিশেষ করে ফলের সংগ্রহ চোখে পড়ল। কলা, আপেল, তরমুজ, আঙুর, ভুট্টা, আনারস, নাসপাতি, পেয়ারা, টমেটো, প্রভৃতির ছড়াছড়ি। চারিদিকে বর্ণ ও গন্ধের এমন পরিবেশ জীবনে বেশবার আসার সুযোগ ঘটে না। প্রশান্ত মহাসাগরের স্বাীপগুলি থেকে অনেক ফলের আমদানী হয়। তরকারির মধ্যে বাধাকপি, গাজর ইত্যাদির আরতন বিস্ময়জনক। সব রেস্ট-রেস্টেই খুব ভিড়। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে একটি সান ডেকে ছাতার নিচে বসে লাগু খেলাম। আমি বিল শোধ করতে গেলে শ্যাপিরো বিলটা হাতে নিয়ে বললেন, 'আমি বিলটি শোধ করব। এটি আমেরিকান মহিলার প্রতিভাজ।'

আমরা কোরাল রীফ নামে গিফট শপটির পাশ দিয়ে এলাম। দোকানের সামনে প্রচুর ব্যস্কেট, ব্যাগ ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে।

মিসেস শ্যাপিরো বললেন, 'এবার আমি একটি জিনিস কিনব। আপনারা হাসবেন না।' তিনি একটি পাখির সোঁকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইংরেজী-জানা মরনা আছে?' দোকানদার 'হু' বলে একটি মরনা আনতে সেটি বলে উঠল, 'গুড আফটার নুন। হাই।' মিসেস শ্যাপিরো খুশি হয়ে মরনাটি কিনলেন।

গাড়িতে উঠে তিনি বললেন, 'আমার স্বামী এখন বাসার ফিরবেন। তাই আমাকে এখন বাসায় ফিরে বেতে হবে। বিকেলে আমাদের একটি পার্টিতে বাওয়ার কথা। তা না হলে আপনাদের নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ঘুরতে পারতাম। তবে আর একদিন আপনার সঙ্গে ঘোরবার ইচ্ছে রইল।'

মিস্টার ব্যানার্জী বললেন, 'আপনি যে আমাদের জন্যে এতটা সময় দিয়েছেন এর জন্যে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ।'

তিনি এবার আমার দিকে একটি নোট-বুক বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এতে রোমান স্ক্রিপে আপনাদের পুরো নাম ও দৃ-চারটে বাংলা কথা ও তাদের মানে লিখে দিন। আমি মরনাটিকে শেখাব। ও যখন এগুলো বলবে তখন বিশেষ করে আপনাদের কথা মনে পড়বে।'

আমি আমাদের নাম ছাড়াও 'নমস্কার', 'ধন্যবাদ', 'মনে রাখবেন', 'কেমন আছেন' ও 'ভালো আছি' লিখে দিলাম।

আমি বললাম, 'হালিউড সম্পর্কে বিশ্বের লোকের একটি অশুভ ধারণা আছে। এখানে কেবল হৈচৈ, চিত্রতারকাদের

ঘিরে স্ফুর্তির হাট, শৃঙ্গ নাচগান আর সর্ববন্দন মৃত্ত আনন্দের জোয়ার। অথচ আসল হালিউড আমেরিকার যে কোনো বড় শহরের একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের মতোই নিরাস্ত্র কর্মচাঞ্চল্যে বিশিষ্ট।'

মিস্টার ব্যানার্জী বললেন, 'বিদেশের এই ধারণার জন্যে দায়ী হালিউডের ছবি। এই সব ছবিতে অনেক সময় টেন্সারের কাউবয়ের উচ্চ টুপিও সংকীর্ণ পা-ওয়ালা প্যান্ট পরা আমেরিকানদের বেশব ডোরার ডেভিল স্পিরিটের অ্যাডভেঞ্চার ও হৈহু-ব্রোড দেখানো হয় তা থেকে বাইরের লোকেরা ভাবে গোটা আমেরিকার অধিবাসীরা বৃদ্ধি এই রকমই। চিত্রতারকাদের বিচিত্র বর্ণের সাজসজ্জা, ঘোড়ার চড়ে দূর্বৃত্তের পেছনে ধাওয়া করা, বুনো মহিষ শিকার, মৃহ্মহ্ম গোলাগুলি ছোঁড়া প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী লোকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অবশ্য আমেরিকানেরা যে অপর জাতির তুলনায় অ্যাডভেঞ্চার-প্রবণ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তা না হলে তারা নিজেদের দেশ ছেড়ে বেরবে কেন? কত দেশের লোক এসেছে এখানে। জার্মানী, ইংলন্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান প্রভৃতি আরো কত দেশের লোক। নিজেদের দেশে প্রথাগত জীবনে যারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি তারা ই ভাগ্যান্বেষণে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে এখানে এসেছে।

আমি বললাম, 'এতো পার্টি দেখলাম। সর্বত্রই তো আমেরিকানেরা ইউরোপীয়দের মতো ভ্রমস করে। এখানে বেশ শীতের জন্যে প্যাণ্টের পা একটু সংকীর্ণ হয়—এই যা। আমেরিকানদের কোঁক ইউটিলাটি ও ইকনমির দিকে। তাই সর্বত্রই বাহুল্যের বর্জন। টেন্সারের ব্যাড বয়দের মতো টাইটফিটিং জামা-প্যান্টও তারা কখনো কখনো বাড়িতে পরে। তার প্রভাবে অন্য দেশে চালু হয়েছে স্লেনপাইপ প্যান্ট ও টাইটফিটিং জামা। আমেরিকান ট্রিস্টরাও অনেক সময় সাজে-পোষাক ও হাবভাবে অভ্যস্ত বাজে ধারণার সৃষ্টি করে।'

মিসেস শ্যাপিরো বললেন, 'এ বিষয়ে আমি একমত।'

মিস্টার ব্যানার্জী এবার বললেন, 'দেখে-ছেন তো হালিউডের সিনেমা হলগুলিতে একেবারেই ভিড় নেই। এ থেকে সেই প্রবাদটির কথাই মনে পড়ে—ময়রা নিজের তৈরি মিষ্টি খায় না।'

আমরা হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়তে আমি মিসেস শ্যাপিরোর দিকে আমার 'ইওর অটোগ্রাফ প্লিজ'র খাতাটা এগিয়ে দিলাম। হোটেলের সামনে পৌঁছেলে গাড়ি থামিয়ে উনি অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিলেন, 'ইট ওয়াজ মাই স্পেন্সার টু হেলপ ইউ সি অ্যাড নো এ লিটল অ্যাবাউট আওয়ার কান্ট্রি।'

বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত

গ্রহান্তরে জীবনের সম্ভাব

দ্বীপদিন ধরে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা একটি জটিল প্রশ্নের সমাধান করবার চেষ্টায় আছেন। প্রশ্নটি হলো এই যে : মহাবিশ্ব পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা? এভাবে দুটো বিপরীত উত্তরের জোয়ার মনোভীরা দুলেছেন। এক দলের মতে—একমাত্র আমাদের পৃথিবীতেই জীবজগৎ উদ্ভূত হয়েছে। অন্যদলের মত—না, মহাকাশে পৃথিবীর মত সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহে জীবজগতের উপনিবেশ ছড়ানো রয়েছে।

অন্য গ্রহে জীবন আছে, এই দাবি করে নিছক স্পেকুলেশন ছাড়াও আধুনিক কালে 'প্লাম্‌প্রমাণ' হিসাবে কিছু কিছু টুকরো খবর আমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। যেমন অন্য গ্রহের উপরকার স্পেকট্রোস্কপিক (Spectroscopic) পরীক্ষা করে সেখানে নাকি জৈব অম্লের সম্ভাবনা মিলেছে। উল্কা-শিঙের বিশ্লেষণ করে প্রোটিনজাত অ্যামিনো অ্যাসিডের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার বহির্জাগতিক জীবজগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। আরও কণ্টকলিপ্ত বিচারে কেউ কেউ মহাকাশ থেকে পাওয়া বিশেষ বেতার তরঙ্গের মধ্যে শৃঙ্খলা লক্ষ্য করে সেটা যে গ্রহান্তরের বস্তুমান সভ্যতার অবস্থান এরকম কথাও প্রচার করেছেন।

অন্য গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের মস্তিষ্কপ্রমাণের সম্ভাবন করার আগে যদি ভেবে দেখা যায় যে পৃথিবীর উপরই জীবন কত কঠিন ও অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও অপরাজিত রয়েছে এবং কি বিচিত্র বিভিন্ন প্রকার তার রূপ—তাহলে নিছক ন্যায়ের বিচারেও ব্যাপারটা সম্ভব বলেই মনে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রতিবেশী গ্রহ-উপগ্রহের দিকে একবার তাকানো যাক।

একবারে কাছেই উপগ্রহ চাঁদে কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের সাদা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, কেন না এ পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে চাঁদকে 'মৃত', ধুলোর স্তূপে ঢাকা নিভে-বাওয়া আশেনিগিরির রাজ্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অবশ্য একথা জোর করে বলতে পারি না যে, চাঁদে প্রথম মানুষ পা দিয়ে এসব আশেনিগিরির কোমার খুঁজলে অসম্ভব হু—একটা জীবাত্মের সম্ভাবনা পাবে না। মুস্কিল হচ্ছে এই যে, সে জীবাত্মের উৎস চাঁদ না পৃথিবী, ইদানীংকালের মার্কিনী রেজার ও

রাশিয়ান ল্যাবরটরি গিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে পড়ার পর এ প্রশ্নের দ্বিধাহীন উত্তর কেউ দিতে পারবে না। কারণ এ সব পার্থক্য মহাকাশযান কতটা জীবাত্মমুগ্ধ ছিল তার হিসাব কে রেখেছে?

দূরের গ্রহগুলিতে এখনও মানুষের নিবাস পড়ে নি। কিন্তু ওখান থেকে খবর পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। কাছের উপরে আছে লুপ্ত ও মংগল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাতামাতি হচ্ছে মংগলগ্রহে জীবনের অস্তিত্বের সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে। রক্তবর্ণ এই গ্রহটির বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়া একেবারে পৃথিবীর মতো না হলেও একমাত্র পৃথিবীর সঙ্গেই তুলনীয়। পৃথিবী ও মংগলের কক্ষপথ এমনভাবে অবস্থিত যে প্রতি পঁচিশ মাস অন্তর এই দুটি গ্রহ খুব কাছাকাছি আসে।

নিম্নাংশ রক্তবর্ণের

এ বছর ৯ই মার্চ দুপুর ছিল ছ' কোটি কুড়ি লক্ষ মাইল। আবার ১৯৬৭ সালের ১৫ই মার্চ দুপুর দাঁড়াবে পাঁচ কোটি আটলক্ষ মাইল। এই রকম অবস্থায় মংগলগ্রহ সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করার সুযোগ মিলবে। ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্কিরাপারেলি উনিবেংশ শতাব্দীর শেষদিকে অনেক বছর ধরে খুঁটিয়ে মংগলগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৭৭ সালে পৃথিবী ও মংগলের দূরত্ব যখন খুব কম ছিল তখন আবহাওয়া ভাল থাকলে রোজ দেখতেন।

এই পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তিনি মংগলের যে মানচিত্র আঁকেন তাতে মংগলের গায়ে সরু সরু খাল দেখানো হয়। সমস্ত পৃথিবীই হৈ চৈ করে ওঠে : যদি ঐ খালের কথা মনে নিতে হয় তাহলে বুঝতে হবে ওখানে মানুষের মত বস্তুমান প্রাণী আছে এবং তাদের যন্ত্রসম্ভারও দারুণ।

১৯০৯ সালে আবার যখন মংগল ও পৃথিবী কাছাকাছি এল তখন ঐ খালগুলো সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার জন্য তখন অ্যামেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী লোয়েল অ্যারিজেনার মরুভূমি থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখে বললেন : মংগলগ্রহে খাল আছে। শৃঙ্খলা তাই নয়, বসন্তকালে উত্তর থেকে মেরু প্রদেশের বরফ গলে দক্ষিণে জল যায় এবং হেমন্তে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। এই তথ্য থেকে লোয়েলপন্থীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে মংগলগ্রহে নিশ্চয়ই অত্যন্ত বস্তুমান ইঞ্জিনারদের বাস—কারণ জল আপনাতোপনি গড়ায় না। তাকে চালানোর জন্য পাম্প দরকার।

মংগলগ্রহের উপর জল আছে কিনা সে প্রশ্নের আজও সঠিক রাসায়নিক প্রমাণ মিলে নি। যাকে লোয়েল মেরুপ্রদেশের বরফ বলে মনে করেছিলেন তাইই দেশবাসী বৈজ্ঞানিক কাইশ ১৯৬০ সালে সেটা জমাট নাইট্রোজেন টেট্রোহাইড বলে মত প্রকাশ করেন। আবার অন্য কিছু লোকের মতে ওটা জমাট কার্বন ডাইঅক্সাইড। এঁদের সকলেরই ধারণা যে, মংগলগ্রহে জলের পরিমাণ নিতান্ত কম।

অন্যদিকে রুশ বিজ্ঞানী ডেভিডভ ১৯৬১ সালে একটি প্রবন্ধে পঞ্চাশ বছরের পুরনো এক তত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তিনি বলেছেন মংগলগ্রহে কতগুলো প্রাচীন সমুদ্র জমাট বরফ হয়ে আছে। এখন এসবো অক্সা ধুলোয় ঢাকা। কিন্তু মংগলের বিষুবরেখার নীচে তরল জলের সম্ভাবনা পেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আধুনিককালে মহাকাশ বিজ্ঞান এতটা উন্নত হয়েছে যে, অনেকে ভাষা করছেন একধাপে মংগলগ্রহের গায়ের উপরকার খবর না পাওয়া গেলেও মহাকাশযানের দারুণ প্রথম স্তরে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের সঠিক পরিচয় খুব শীগগিরই পাওয়া যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় মহাকাশ সংস্থার উদ্যোগে মংগলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য উদ্ভূত ল্যান্ডেরার 'ম্যারিনার'—৪ (Mariner-4) নির্মাণ করা হয়েছে। ম্যারিনারের ফোটোমিটারের সাহায্যে মংগলের গায়ের তাপ, বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ইত্যাদি নানা সংবাদ পাওয়া যাবে। এর থেকে বোঝা যাবে মংগলগ্রহের পরিবেশ জীবনের অনুকূল কিনা। সবশেষ সংবাদ হচ্ছে এই যে, ম্যারিনার—৪ এখন হু হু করে এগিয়ে চলেছে মংগলের দিকে। জুলাই মাসের ১৪ই কি ১৫ই নাগাদ মংগলের খুব কাছাকাছি—৫০০০ মাইলের মধ্যে—গিয়ে পড়ে ছবি নেওয়া শুরু করবে।

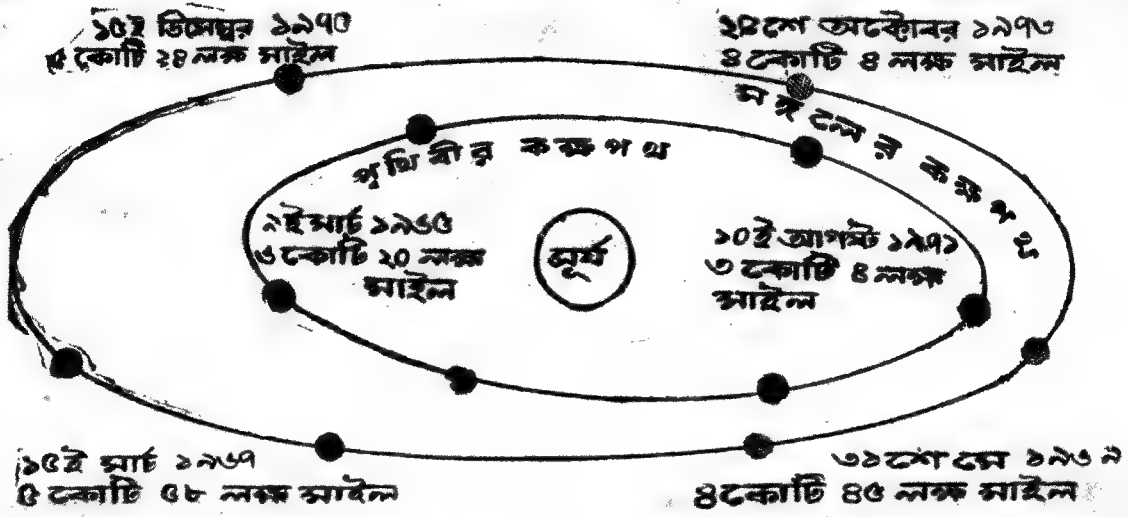
গ্রহান্তরে জীবন আছে কি নেই। সেটা জনবীর নানা রকমের পরীক্ষার কথা বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। যেমন :

(এক) সেখানে প্রোটিন জাতীয় বস্তু হাঁশ মিলে কিনা?

(দুই) সেখানে জৈব বিপাক বা মেটাবলিজের কোনও প্রমাণ মিলে কিনা?

(তিন) মহাকাশযানের টেলিভিশনে তোলা ছবি থেকে গ্রহপৃষ্ঠে জীবনের প্রত্যক্ষ চিহ্ন দেখা যায় কিনা?

মনে রাখতে হবে এ সবই হচ্ছে পৃথিবীতে



আমরা যাকে জীবন বলে জানি ঠিক সেই ধরনের জীবনগতের অস্তিত্বের সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা। যদি মঙ্গলগ্রহে জীবনের বিন্যাস অন্য রকমের হয় তাহলে কি দাঁড়াবে সে কথা এখনও ভেবে দেখা হয় নি। এখনকার পারিকল্পনা অনুযায়ী পরের ধারা একটি অনু-কল্পনামূলক মহাকাশযান মঙ্গলের উপর নামানো হবে এবং সেখান থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে জীবদ্ভূত অস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করা হবে। এই কাজের জন্য নানারকম যন্ত্র ডিজাইন করা হয়েছে। এইরকম একটি যন্ত্র গ্রহপৃষ্ঠ থেকে ধূলা শুষে নিয়ে তার মধ্যে জীবদ্ভূত অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কালচার করে দেখে পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকদের কাছে সংবাদ পাঠাবে। শেষ প্রশ্ন হচ্ছে এই : মঙ্গলগ্রহের জীবদ্ভূত পৃথিবী থেকে পাঠানো কালচার মিডিয়ামে পুষ্টিলাভ করবে কি? সে প্রশ্নের উত্তর আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

বিচিত্র তরল হিলিয়াম

মনে করুন আপনার চোখের সামনে একটি কাঁচের পাত্রে কিছুটা তরল পদার্থ রয়েছে। ছাঁকির থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখবেন সেই তরল পদার্থটা যেন পাত্রের মধ্যে থাকতে চাইছে না। আস্তে আস্তে যেন পাত্রটার গা বেয়ে তরল পদার্থটা উঠে এসে কানার উপর দিয়ে আপনাপ্রাণি বাইরে নেমে আসছে।

স্বচক্ষে দেখলেও এ ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন। মাধ্যাকর্ষণশূন্য অগ্রহা করে গ্লাসের মধ্যকার জল যদি বাইরে বেরিয়ে চলে যায় তবে সেটা ম্যাজিক ছাড়া আর কিভাবে সম্ভব!

যে তরল পদার্থের এই বিচিত্র ধর্ম দেখা যায় তা কোনও সায়েন্স-ফিকশন লেখকে

কল্পনাপ্রসূত নয়—এটা অতিশীতল তরল হিলিয়াম। হিলিয়াম সাধারণ অবস্থায় একটি বায়বীয় পদার্থ। শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে জল থেকে বরফ জমে। এর তুল্য আরও ২৬৮.৮ ডিগ্রী ঠান্ডা করলে অর্থাৎ চরম শূন্যের (Absolute zero) উপরে ৪.২ ডিগ্রী কেলভিনে হিলিয়াম তরল হয়। যদিও এই তরল হিলিয়ামের আচরণ অন্য আর পাঁচটা তরল পদার্থের মতোই কিন্তু আরও ঠান্ডা করলে ২.১৮ ডিগ্রী কেলভিনে এটি হয়ে পড়ে একটি একক অনন্যসাধারণ তরল-পদার্থ। সাধারণ তরলের যেটা প্রধান ধর্ম সেই সান্দ্রতা বা Viscosity এই অবস্থায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সান্দ্রতার জন্যই তরল পদার্থকে এক জারগা থেকে আরেক জারগায় পাঠানোর সময় কঠিন পদার্থের স্পর্শ ঘর্ষণের বাধা অতিক্রম করতে শক্তি ব্যয় করতে হয়—বেশন পাইপের মধ্য দিয়ে জল পাঠাতে গলপ করার প্রয়োজন হয়। অথচ ২.১৮ ডিগ্রী কেলভিনে সান্দ্রতাহীন তরল হিলিয়াম পাইপের মধ্য দিয়ে আপনাপ্রাণি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাবে। পোড়া মাটির গ্লাসে রাখলে গ্লাসের তলাকার সরু চ্যুলের মত ছিদ্র দিয়েও এই তরল হিলিয়াম অবলীলাক্রমে বেরিয়ে বাইরে চলে যাবে।

পদার্থবিজ্ঞানীদের এই তরল পদার্থটির ভূতুড়ে ব্যবহার ব্যাখ্যা করবার জন্য যথেষ্ট খাটতে হয়েছে। প্রায় তিন বছর আগে খ্যাতনামা রুশবিজ্ঞানী পিটার কাপিটমা হিলিয়ামের এই আচরণ প্রত্যক্ষ করেন। আধুনিককালে বৈজ্ঞানিকেরা কোয়ান্টামতত্ত্বের সাহায্যে এ ঘটনা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হওয়ার পর থেকে এই অবস্থায় হিলিয়ামকে কোয়ান্টাম তরল পদার্থ নাম দেওয়া হয়েছে।

তরল হিলিয়ামের আরেকটি বিচিত্র ধর্ম

হচ্ছে এই যে, আরও বত খাঁশ ঠান্ডা করলেও এ থেকে বরফের মত কঠিন হিলিয়াম কখনও পাওয়া যাবে না। কোয়ান্টামতত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তরল হিলিয়ামে পরমাণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ একেবারে অনুপস্থিত বলেই এই অদ্ভুত পরিস্থিতি। সান্দ্রতাহীনতা ব্যাখ্যা করার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন যে ২.১৮ ডিগ্রী কেলভিনে তরল হিলিয়াম এত ঠান্ডা যে পরমাণুগুলোর মধ্যে তাপীয় শক্তি (Thermal energy) নেই বললেই চলে। তাপীয় শক্তি না থাকলে ঘর্ষণের প্রশ্ন নেই এবং কাজে কাজেই সান্দ্রতাও নেই।

তরল হিলিয়ামের এই আচরণের কথা আরেকটি বিষয় মনে আনে। কয়েকটি বিদ্যুৎ-পরিবাহী ধাতুর অতিশীতল অবস্থায় রোধ বা Resistance একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই অধি-পরিবাহিতা বা Super Conductivity ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই অবস্থায় ধাতুর মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবহনের ইলেকট্রনগুলোকে সান্দ্রতাহীন হিলিয়ামের অণুগুলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইলেকট্রনগুলোও যেন অতিশীতল তাপের মধ্য দিয়ে রোধহীন অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

বোঝাই যাচ্ছে, বিশ্বের কোথাও যদি চরম শূন্য বা Absolute zeroর কাছাকাছি কোনও জগৎ থাকে সে হবে এক অতি বিচিত্র জগৎ—সেখানে তরল পদার্থ পাত্রে ধরে রাখা যাবে না, পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করার সময় কেউ পথরোধ করে দাঁড়াবে না, বলে রাখা ভাল, ল্যাবরেটরী বাইরে সে জগতের সন্ধান মানুষ এখনও কোথাও পায় নি!

নব যৌবনের ছোয়ায় চঞ্চল রাজকন্যা
রূপের ডালি হাতে দিল্লীর প্রাসাদের শালিমার
বাগের চারিদিকে চকিত হরিণীর মতন ছুটে
বেড়িয়েছেন। তখনও গোলাপের বাগানে
মধুমক্ষিকার মধুগুঞ্জন হয় নি শব্দ। রাজ-
প্রাসাদে তখনও ভ্রমর প্রবেশ করে নি গন্ধ-
গুনিয়ে। রঙ-বেরঙের প্রজাপতিটি হঠাৎ
এসে ডান কাঁধের ওপর বসলো। পরমুহুর্তেই
উড়ে গেল। ছোট শিশুর মতন রাজকন্যা
প্রজাপতির পিছু পিছু ছুটে লাগলেন—
যেন একটা কুটিল নার্সিস হাওয়ার হেল-
দুলে নাচছে। একটা অজানা ফুটির
ফোয়ারা রাজকন্যার মনে দমকা হাওয়ার মতন
কোথেকে ছুটে এলো। রাজকন্যা নিজেই
জানেন না এ মন-মাতানো চঞ্চলতার উৎস
কোথায়? দূর থেকে কে যেন বাজিয়ে
চলেছে বাঁশ—বসন্তবাহার। কোথায় বাদক?

এ বাজনা তার হৃদয় থেকে বাজছে না তো?
কারা যেন আজকাল তার সাথে রোজ খেলে
চলেছে হোলি—নব নৃত্যছন্দে। প্রকৃতির গায়ে
এখনও লেগে রয়েছে ফাগুয়ার রঙ। এ
ফাগুয়া যে তার মনটিকেও রাঙিয়ে দিচ্ছে
রাজকুমারীর দেহবস্ত্র তার পলকে অপরাধ
শিহরণ অনুভব করছেন। খুশি মনে
একান্ত নিরালস্য নিজেই সরম রত্তরাগে সাই-
প্রাসবীথির দিকে তাকিয়ে থাকেন। দুরন্ত
দক্ষিণ সমীরণে বকের পলাশ রত্তরাঙা দোপাট্টা
উড়ে যাচ্ছিল। ঠিক যেন তার চঞ্চল মনেরই
প্রতীক। দূরের ইউক্যালিপ্টাসের শাখা
থেকে ডেকে উঠলো পাখিরা। উঃ কি মন-
মাতানো ডাক! যেন হৃদয়টা নিড়ে নিতে
চায়। এ ডাক যে এত প্রাণমাতানো, কে তা
জানতো? কতদিন এ ডাক তার কানে
এসেছে। সে ডাকে ভোঁ ছিল না কোনো
দশন। এক্ষণিক গানে পাখিয়ার ডাকের
কর্ণনার মন খুশিতে ভরেছে। নিজের
হৃদয়টিতেও কতবার রাজকন্যা এ কুহু ডাকের
উল্লেখ করেছেন। তখন কে জানতো, এ ডাকের
মাদকতা?

রাজধানীর সাইপ্রাসবীথির পাখিয়ার
ডাক, তার এ নববসন্ত বেশ রাজকুমারীর
মনে এনেছে এক অব্যক্ত অনুভূতি। হৃদয়ের
কাছে আর কিছই গোপন রইল না। মন-
প্রাণ দিয়ে তিনি একটি জিনিষ অনুভব
করলেন। তার হৃদয়টির নাগাল গেছে তার
হাতের বাইরে। সম্রাটনন্দিনী জাহান-আরা
প্রেমে পড়েছেন!

কিন্তু কে এ সুন্দরকান্টি গারক?
রাজধানীর মেওরান-ই-আম। নববাসার
কাছে এর স্বার অব্যাহত। কে দিতে পারে
এ নাম-না-জানা লোকটির ঠিকানা?

রয়বাটত মরুর সিংহাসনে বসে হিন্দু-
স্থানের শাহনশা বাদশা শাজাহান যাকে
ঘাড় দুলিয়ে প্রভাভিবাদন জানালেন, কেউ
ক্বলতে পারেন তার নাম?

জাহান-আরা অন্দরমহলের করোকার



দিল্লী প্রভু

পাশে সিন্দ মার্বেল পাথরটার ওপর বসে
পড়লেন। হৃদয়ের ভিতর যেন কি হয়ে
গেল। রাজকুমারীর সমস্ত দেহের রক্তপ্রবাহ
যেন স্তব্ধ হয়ে এলো।

জাহান-আরা সমস্তটি দিন একটি কথাই
মনে মনে আবৃত্তি করলেন, এ কি হল?
জামি একদিন দময়ন্তী সমস্ত দেবতাদের
পরিত্যাগ করে কেবল নলকেই বরণ করে-
ছিলেন। সমস্ত হিন্দুস্থানের রাজপুত্রদের
ছেড়ে এ হৃদয় যে মুহুর্তে বিভাবের রাজ-
পুত্র বীরের পারে সমর্পণ করে বসলাম জামি
জানি না।

আপন নিপুণ কলমে বীরে বীরে হুঁবাই
লিখলেন। তার ভাবার্থ, “এমন নতি এর
পূর্বে কারা কাছে স্বীকার করি নি—এর

দ্বিবিবেকরতন চতুর্দশ

পরেও করি নি। বিশ্ববাসী বিশ্বাস করে
প্রাথম দর্শন থেকেই তিনি আমার অন্তরের
দেবতা।”

মনে পড়ে সেই ভাগ্যবানটির নাম?
বন্দীরাজ হুশালা।

রাজপুত্র সামন্ত বন্দীরাজ হুশালা
সেদিন আপন অলঙ্কারে পৃথিবী জয় করে-
ছিলেন। পৃথিবী জয়ই তো। রাজা জয়
বিন্দুমাড় শব্দ ব্যাপার নয়। সেনাবাহিনীর
সামান্য রণকৌশলেই একটা রাজ্য জয় করা
যায়। যেটা অপরাধের সেটা হল নারীমণি।
বহু সম্রাট রাজমহিষীর পদপ্রান্তে আপন
স্বর্ণমুকুট পেশ করেও তাদের মনের নাগাল
পান নি।

ভাগ্যবান হুশালা সেদিন বিন্দুমাড় টের
পেলেন না কিভাবে একটা হৃদয়ে তার
হৃদয়টিকে বাঁধা পড়ে গেল। তিনি হলেন এক
বিরাট কবিমনের নব অধীশ্বর। রাজকন্যা
তার নাম-না-জানা হৃদয়-দেবতাটির নাম
দিলেন ‘রাজা’ হুশালা!

হুশালা!

রাজারই অপর নাম হুশালা।

আজকাল কোন একটা পাগলা ছুটে
রাজকন্যাকে পেয়ে বসেছে। সময় নেই,
অসময় নেই রক্তকরমীগছে কবরী সাজিয়ে,
নীলাভ অন্তরী হাতে কার প্রতীকার প্রতিটি
দিন বসে শব্দ প্রহর গোপনে!

কোথায় গেল তার সেই জেজোলাপীত কনি-
প্রতিভা? কোথায় গেল মিলিয়ে সম্রাট
নন্দিনীর গাম্ভীর্যপূর্ণ বাদশা-বেগমের মুখ-
ছটা? একি বিরহিনী সম্রাসিনী বেশ?

হঠাৎ কানটা সজাগ হয়ে ওঠে। ঐ জেজো
কানে আসছে সেই প্রিয় কণ্ঠস্বর যে স্বপ্ন
মরমে প্রবেশ করে প্রাণ আবৃত্তি করে তোলে।
মেওরান-ই-আমের সভা থেকে ভেঙে
আসছে সঙ্গীত লহরী।

কিন্তু এ কি?

হারি উপস্থিতির জন্য দিনের পর দিন
প্রহর গুণিছিলেন রাজকন্যা, বীর কণ্ঠস্বরের
জন্য ব্যগ্রতার সীমা ছিল না, তার উপস্থিতিতে
সর্বশরীরে আসছে কেন এ অবশ ভাব?

সম্রাট চিন্তিত হয়ে পড়েন। রাজসভা বন্ধ
হয়ে যায়। সম্রাট ক্লিকিয়ারা পান না।

কি বিপদ?

এ বেদনা যে গোপন বেদনা। এর মহানে
যে শব্দ একা জ্বলেই শব্দ। সম্রাট বিদ্রোহী
দৃষ্টিকে মেহস্পর্শে কাছে টেনে নেন। কি
করে জানবেন সম্রাট এ দৃষ্ট-হৃদয় আর তাঁর
প্রাসাদে নেই।

কতদিন আর লুকোচুরি খেলা যায়? হৃদয়
নিরে লুকোচুরিতেই সম্রাটনন্দিনীই হার মান-
লেন। সেইদিন সাইপ্রাসবীথি মধু দেলোর
যেন দূর থেকে কাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।
সেদিনের দিল্লীর আকাশের হালকা মেঘখণ্ড
নেচে নেচে গগনে গগনে ছুটে খেলছিল, যেন
প্রৌষক-প্রেমিকার লুকোচুরি খেলা। সেদিন
অট্টালিকার কোণে কপোত-কপোতীর মধুর
আলাপে প্রাসাদে উঠেছিল চম্পা মধু-গুঞ্জন।
রাস্পার্ট পাশের বর্ণচোরা আয়তনের
শাখায় শাখায় দূরে বেড়াচ্ছিল মধুমক্ষিকার
জল। নহবৎখানা থেকে বেজে উঠছিল সানাই।
অন্ধরে চঞ্চলা যমুনা ছুটে চলেছিল যেন বাকী



মোগল রাজ অস্তঃপুরের ঐতিহাসিক করোখা। এই করোখা থেকে জাহান্ন-আরা সর্বপ্রথম তার প্রেমিক দুলেরাকে দেখে প্রণয়ানত হন।

তলোয়ার। নিজেকে হারিয়ে, বাদশা-বেগমের পদমর্যাদাটুকু জলাঞ্জলি দিয়ে জাহান্ন-আরা আপন গোপনে উত্তেজনাকে দিলেন রূপ। সাইপ্রাসবীথিতে শত্রু জ্যোৎস্না পলকিত-শ্লাবিত-আলোছায়ার স্নিগ্ধ পরিবেশে বাদশা-বেগম জীবনের প্রিয়তমকে জড়িয়ে ধরলেন কঠিন বাহুবন্ধনে।

পূর্ববশেষধারী পরিচারিকাকে কেউ চিনতে পারল না। জাহান্ন-আরা নিজের চিনতে পারছিলেন না। নিজের নাম ভুল করে ফেলছিলেন—দরিয়া? না না মরিয়ম? না নসিকা?

দুলেরা অবাক বিস্ময়ে বাদশা-বেগমের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ শিরশ্চাপ কারুর কাছে এতখানি কণ্ঠকে পড়ে নি। সম্রাট শাহজাহানের সামনেও নয়।

অদূরে রাতের পাখী উড়ে যাচ্ছে আকাশে। পথভোলা সাথীহারা পাখী নয়? সঙ্গীত ভালবাসেন রাজকন্যা। সঙ্গীতজ্ঞকে তার চেয়েও বেশি। আজও দুলেরার সেদিনের সঙ্গীতের স্মৃতিচারণা তার কানে ভেসে

আসছে। সে গানের গহরীতে আজও রাজকন্যা নিজেকে হারিয়ে ফেলেন মাঝে মাঝে। রাজকন্যা তাতেই তৃপ্ত নন। তিনি চান প্রিয়জন সান্নিধ্য। তার চাই প্রিয় স্পর্শ। প্রিয়জন আলিঙ্গন। সান্নাধ্যো তারি লোভ নেই। সম্পদ ভোগ যথেষ্ট হয়েছে। তিনি চান একটি ছোট্ট নীড়। সেই নীড়ে থাকবে শৃঙ্গ কপোত-কপোতী। সম্রাজের কোলাহল সেখানে থাকবে না, থাকবে না সম্পদের উন্মত্ত পরিবেশ। মাত্র দুটি প্রাণী জাহান্ন-আরা, আর তার প্রিয়তম দুলেরা। রাজকুমারী, আর তার হৃদয়ের রাজা।

কবে হবে সেই নীড়?

সখাকে চাই সাথীভাবে—জীবনসাথী।

চাই পরিণয়সুদ্রে। চাই বাসরশয্যা। চাই ফুলের অলংকারের বেশ—ফুলশয্যা। কবে আসবে সেই পবিত্র গোম্বালি লগ্ন?

এই বিরাট হিন্দুস্থানে আছো কোনো দূরদর্শী দরদীজন যে, বলতে পারবে পারবেন সম্রাট-নন্দিনী জাহান্ন-আরা বধূবেশ? কিন্তু এই আলো-আধারে চোরা সাইপ্রাস-

বীথিতে দূরে দাঁড়িয়ে কে ও? তাই তো? কোথায় চলে গেলেন প্রাণের দেবতা দুলেরা? কে ও?

দরিয়া বেগম ছুটে আসে। বাদশা বেগম, হুকুম। জাহান্ন-আরা আবেগ ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন কার ছায়া দেখলাম একদাঁপি সাইপ্রাসবীথির আলোআধারের মাঝে।

দরিয়া, মরিয়ম, নসিকা নির্বাক। সবাই নীরবে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে।

জাহান্ন-আরা আবার প্রশ্ন করেন কে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ ঐ অস্পষ্ট ছায়ার আড়ালে।

কম্পিত কণ্ঠে দরিয়া বেগম বলেন বাদশা বেগম, গুস্তাকী মাফ। এ অন্দরমহলে আর কে প্রবেশ করতে পারে? ছায়ার আড়ালে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন নজবৎ খান।

নজবৎ জাহান্ন-আরার প্রণয়প্রার্থী। দিল্লী-আগ্রা উত্তর ভারতের কারুর কাছেই এ খবর অজানা নয়।

ঘৃণায়, অপমানে, লজ্জায় জাহান্ন-আরা যাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ছি ছি কি বেহায়া লোকটা। কতবার তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন রাজকুমারী। তবুও লোকটার লজ্জা নেই।

নিজের অজানাতেই মুখ দিয়ে স্মৃত্যু-প্রশ্ন বেরিয়ে পড়ে, কোথায় রাজা? দুলেরা কোথায়?

মরিয়ম নসিকার দিকে তাকায়। নসিকা মরিয়মের দিকে।

দরিয়াই শৃঙ্গ জানে।

দরিয়া আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে বলে বাদশা বেগম সেই সূক্ষ্মরকান্তি গায়কটির কথা বলছেন? তিনি তো অনেক আগে আপনাকে হাটু গেড়ে অভিমান জানিয়ে চলে গেছেন?

জাহান্ন-আরা নির্বাক নরনে শৃঙ্গ সাথী পরিচারিকাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এসের কেউ জানে কি বাদশা বেগমের হৃদয়ে খেলছে শত সন্দেহের ডেউ? (কমলা)

প্রবীণ রসোপন্যাসিক

শ্রীঅসমজ মুখোপাধ্যায়ের

অসমজ গ্রন্থাবলী

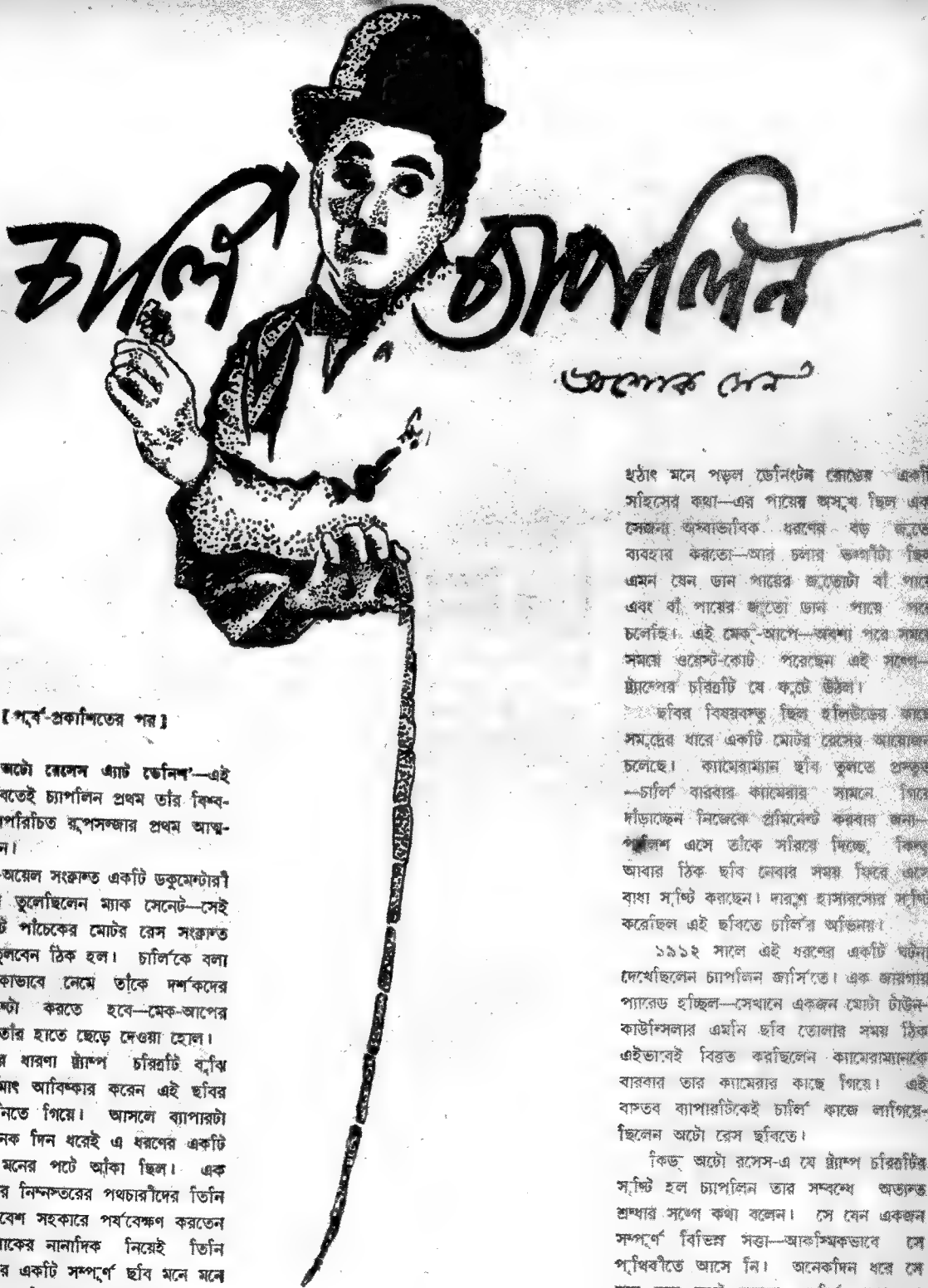
৩খানি বড় উপন্যাস ও ১খানি

নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।

বসন্তমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,

কলিকাতা-১২



【পূর্ব-প্রকাশিতের পর】

‘কিন্তু অটো রেসেস এন্ড ডেনিশ’—এই দ্বিতীয় ছবিতেই চ্যাপলিন প্রথম তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত চরিত্রচিত্র রূপসজ্জার প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

অলিভ-অয়েল সংক্রান্ত একটি ডকুমেন্টারী ধরণের ছবি তুলেছিলেন ম্যাক সেনেট—সেই লম্পে মিনিট পাঁচেকের মোটর রেস সংক্রান্ত এক নক্সা তুলবেন ঠিক হল। চ্যাপলিনকে বলা হোল উটকোভাবে নেমে তাকে দর্শকদের হাসানোর চেষ্টা করতে হবে—মেক-আপের ব্যাপারটাও তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া হোল।

অনেকের ধারণা ট্রাম্প চরিত্রটি বুঝি চ্যাপলিন অকস্মাৎ আবিষ্কার করেন এই ছবির মেক-আপ নিতে গিয়ে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়—অনেক দিন ধরেই এ ধরণের একটি চরিত্র তাঁর মনের পটে আঁকা ছিল। এক সময় লন্ডনের নিম্নস্তরের পথচারীদের তিনি বেশ মনোনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতেন—এইসব লোকের নানাদিক নিয়েই তিনি ট্রাম্প চরিত্রের একটি সম্পূর্ণ ছবি মনে মনে তৈরি করে রেখেছিলেন।

মেক-আপ করতে গিয়ে ম্যাক সোয়েনের গোঁফজোড়াকে ছোট করে ছেঁটে নিলেন—ব্যায়ার ওয়াবের সময় বৃষ্টি অফিসাররা যে ধরণের গোঁফ রাখতেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই নিজের গোঁফটি তৈরি করলেন চ্যাপলিন। ফ্যাটি আরবাকলের বিরাট আকৃতির ট্রাউজার্স এবং ফোর্ড স্টারলিং-এর লম্বা মাথা বৃষ্টি-

জোড়াও নিলেন। আরবাকলের বোলার হ্যাটটি মাথায় বসিয়ে নিলেন—আরবাকলের তুলনায় চ্যাপলিন মাথা বড়। সুতরাং টুপিটি বেশ ছোট দেখাচ্ছিল চ্যাপলিন মাথায়। আর হাতে নিলেন একটি ছড়ি—এই ছড়িটি অনেক সময়েই অনেক কাজে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছবিতে। হাটের ভগ্নাট কি ধরণের হবে?

হঠাৎ মনে পড়ল ডেনিশের রোডের একটি সহিসের কথা—এর পায়ে অসুখ ছিল এবং সেজের অস্বাভাবিক ধরণের বড় জুতো ব্যবহার করতো—আর চলার ভঙ্গীটা ছিল এমন যেন ডান পায়ের জুতোটা বাঁ পায়ে এবং বাঁ পায়ের জুতো ডান পায়ে পরে চলেছি। এই মেক-আপে—অবশ্য পরে সময়ে সময়ে ওয়েস্ট-কোর্ট পরেছেন এই লম্পে—ট্রাম্পের চরিত্রটি যে কটে উঠল।

ছবির বিষয়বস্তু ছিল হাউজের কাছে সমুদ্রের ধারে একটি মোটর রেসের আয়োজন চলেছে। ক্যামেরাম্যান ছবি তুলতে প্রস্তুত—চ্যাপলিন বারবার ক্যামেরার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন নিজেকে প্রদর্শন করতে। কিন্তু পলিশ এসে তাকে সরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আবার ঠিক ছবি নেবার সময় ফিরে এসে বাধা সৃষ্টি করছেন। দারুণ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল এই ছবিতে চ্যাপলিন অভিনয়।

১৯১২ সালে এই ধরণের একটি ঘটনা দেখেছিলেন চ্যাপলিন জার্মিতে। এক জার্মান প্যারেড হাউস—সেখানে একজন মোটা টাউন-কার্ডিন্সলার এছাড়া ছবি তোলার সময় ঠিক এইভাবেই বিবর্ত করছিলেন ক্যামেরাম্যানকে বারবার তার ক্যামেরার কাছে গিয়ে। এই বাস্তব ব্যাপারটিকেই চ্যাপলিন কাজে লাগিয়েছিলেন অটো রেস ছবিতে।

কিন্তু অটো রেসেস-এ যে ট্রাম্প চরিত্রটির সৃষ্টি হল চ্যাপলিন তার সম্মুখে অভ্যস্ত প্রস্থার সঙ্গে কথা বলেন। সে বেন একজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা—আকস্মিকভাবে সে পৃথিবীতে আসে নি। অনেকদিন ধরে সে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে চ্যাপলিন মনে—সে শব্দ বিদ্যেক নয়, তার হাসির পেছনে রয়েছে চাপা কান্নার বেদনাময় ইঙ্গিত।

এই ট্রাম্পকে আবিষ্কার করার পর চ্যাপলিন মনে হয়েছে:

• ‘Even then, I realised I would have to spend the rest of my life finding more about the creature’

সাপ্তাহিক বসুমতী

For me he was fixed, complete, the moment I looked in the mirror and saw him for the first time, yet even now I don't know all the things there are to be known about him.

ম্যাবেলস স্টেজ প্রোডাকশন্স: নায়িকা ম্যাবেল নরম্যাড। তার সেই বিশেষ ভঙ্গীতে হাঁটতে হাঁটতে এসে একটি হোটেলে ঢুকলেন চার্লি। হোটেলে কিন্তু তার বিশেষ কোন কাজ নেই—অথচ মঞ্চে একটা গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে হোটেলে টেলিফোনের কাছে এসে দাঁড়বেন। পকেটে হাত দেবেন—কিন্তু কোন পয়সা নেই পকেটে। পেছন ফিরে ডাকতেই দেখবেন ম্যাবেল এসে ঢুকছেন—সঙ্গে একটি কুকুর, কুকুরের শিকলের একটা দিক ম্যাবেলের হাতে। সেখান থেকে চলে যেতে গিয়ে এ শিকলে আটকে যাবেন চার্লি—কুকুরটা লাফিয়ে পড়ে তাকে আক্রমণ করবে—চার্লি আর কুকুরে সুরু হবে ভীষণ মারামারি। হোটেলে কোরানীটি এসে আরও গোলমাল পাকিয়ে তুলবে। শেষে উদ্ধার পেয়ে নির্লিপ্তভাবে আঙুলের টোকা সেরে শোষকের ধুলো কাড়বেন—টপটো তুলে ধরবেন এবং মৃদু হাসির সঙ্গে বোরিয়ে যাবেন।

দৃশ্যটিতে অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিলেন চ্যাপলিন। অনেকের চার্লির অনেক ছবিতে দেখেছেন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা বিচিত্র ভঙ্গীতে চার্লি থমকে দাঁড়ান। এই অদ্ভুত থমকে দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা প্রথম এই ছবিতেই দেখানো হয়। হোটেলের কেরানীদের পাবার সামনে এক বৃক্ষকে এই ভঙ্গীতে চলতে দেখে সেটা চার্লি আরও করে নির্ভেজাল এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিজের ছবিতে বহুবার এই চলবার ভঙ্গীটি কাজে লাগিয়ে দর্শকদের হাস্যরস পরিবেশন করেছেন।

কই ইন এ ক্যামারে: চার্লির পরিচালনা (সঙ্গে যশ পরিচালক ছিলেন ম্যাবেল নরম্যাড) তোলা প্রথম ছবি। ম্যাবেলও এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। কাগজে চার্লির অভিনয়ের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা হয়।

কই ইন দি রেইন: পার্ক থেকে এক বিবাহিতা মহিলার অনুসরণ করে শেখ-পার্মন্ত তাঁর বেডরুমে গিয়ে হাজির হয়েছেন চার্লি—হঠাৎ সেখানে তার বিরাট জেয়ান স্বামীর আবির্ভাব—দুজনে সুরু হল মারামারি—চার্লি সেখান থেকে বিভাঙিত হলেন।

এ বীজ ডে: কাহিনীকারও চ্যাপলিন। চার্লি সেজেছেন দম্ভাল স্ত্রী। স্বামী অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন—দম্ভাল স্ত্রী তাই দেখে একেবারে হুলস্থূল বাঁধিয়ে

দিল—দর্শকরা এ দৃশ্য দেখে হাসিতে ফেটে পড়তো।

দ্য ফেটাল ম্যান: নায়িকা ম্যাবেল। একটি দৃশ্যে দেখা যায় চার্লি রেগে গিয়ে ম্যাবেলকে এক লাথি লাগিয়ে দিয়েছেন। মহিলাকে লাথি মারা—দর্শকরা প্রথমটায় থমকে যান, তারপর উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন চ্যাপলিনের অদ্ভুত মৃদুভঙ্গী দেখে।

দ্য নক্‌ আউট: বক্স ব্যাপারে চার্লির যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল এবং সেটা এখানে খুব কাজে দিল।

দুই মৃদুভাষা ক্যাটি আরব্যাকল এবং এডগার কেনেডি, চার্লি রেফার। বক্স করতে করতে একজন রেফারিকে বসিয়ে দিলে এক ঘৃষি—চার্লি ছিটকে গিয়ে দড়ির উপর পড়ে জড়িয়ে গিয়ে ছাড়া পাবার জন্য বেসব মডেমট সুরু করেন তা দেখে কারোর পক্ষে হাসি চেপে রাখা অসম্ভব।

ম্যাবেলস ম্যারেড লাইফ: এটাও বক্স-এর ছবি। চার্লির স্ত্রী ম্যাবেল চান তার স্বামী ব্যারম করে সত্যিকার শক্তমান পুরুষ হয়ে উঠুক। বাড়িতে একটি বক্স ডামি এনে রেখেছেন ম্যাবেল। মাতাল অবস্থায় রাগে বাড়িতে ঢুকে সেই ডামিটিকে দেখে চার্লির মনে হোল এ নিশ্চয় তার স্ত্রীর প্রেমিক—তার অনুপস্থিতিতে ম্যাবেলের সঙ্গে প্রেম করতে এসেছে। আর যার কোথায়! “গেটআউট!” ডব্লু সে নড়ে না। পাগলা কুকুরের মত তার উপর কাঁপিয়ে পড়লেন, চার্লি—সঙ্গে সঙ্গে এলোপাখার ঘৃষি বর্ষিত হোল ডামিটার ওপর। দর্শকদের এ দৃশ্য দেখে হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবার যোগাড় হয়।

লাফিং গ্যাস: এ ছবিতে ডেন্টল ডায় শেনের পরিচালক জাতীয় রোলে নেমেছেন চার্লি। ডেন্টল বিব্রটি চিরকালই ক্রাউন-দের বিশেষ প্রিয় সাবজেক্ট। এ নিয়ে ছবি তোলাবার ইচ্ছা চার্লির অনেকদিনের। দাঁড়ের ডাক্তারের সঙ্গে তার রোগীর সম্বন্ধ খুবই খনিষ্ঠ—রোগী একবার দাঁড় তোলার চেয়ারে বসলে পর সম্পূর্ণ ডাক্তারের দম্ভার উপর নির্ভরশীল—রোগীকে নিয়ে তখন ডাক্তার যা ইচ্ছা করতে পারে—আর এ নিয়ে হাসির খোরাক জোগান কর্মেডিয়ানের পক্ষে খুবই সহজ।

কমেডিয়া ডেল আর্টের জন্য স্ক্রামিনো স্কালো একটি বিখ্যাত স্ট্রীট লিখেছিলেন—এ কাহিনীও দাঁড়ের ডাক্তারের সম্বন্ধে মজাদার গল্প।

• লাফিং গ্যাসের সুরুতে দেখা যায় চার্লি ডেন্টলস্টের অফিস ঘরে ঢুকছেন। অত্যন্ত খুশিতে জয় মন এবং এবং প্রাপবলত ভাব-ভঙ্গীর সঙ্গে তিনি চলাফেরা সুরু করেন। দেখে মনে হয় তিনিই বোধ হয় ডেন্টল—অদ্ভুত ভা না হলে নিশ্চয় প্রধান সহকারী।

মঞ্চে একটা বিমর্ষ ভাব এনে রোগীদের সংখ্যা গণে নেন—হাতের দস্তানা খুলে ফেলেন, বাউ করেন, হাতে হাত ঘষে নিরে, পিকদানীটি তুলে বোরিয়ে যান। তবে কি তিনি ডেন্টলস্টের পরিচালক? ঠিক বোকা যার না তিনি সত্যিকার কি কাজ করেন এই অফিসে—তারপর সব নানা ধরণের মজাদার কাণ্ড ঘটে এবং তাই দেখে দর্শকদের ভেতর হাসির হুজুড় ওঠে।

দ্য প্রপার্টিম্যান: মেলাড্রামাটিক কাহিনী—নাচ, গান, মাতালের মাতলামিতে ছবিটিতে প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে।

ডো এ্যান্ড ভিনামাইট: চার্লি এখানে রুটির দোকানের কর্মচারী—পচা ডিম ছোড়া-ছড়িতে বেশ হাসির খোরাক যোগায়। ধর্মঘটী কারিগরেরা একটি রুটির ভেতর গোপনে বিস্ফোরক পদার্থ ঢুকিয়ে দেয়—অতীকৃতি বিস্ফোরণ ঘটে—সুন্দরভাবে এ ব্যাপারটা ম্যানেজ করেছেন চার্লি।

জেলসম্যান অফ দ্য নাক: ম্যাবেলের সঙ্গে চার্লি মোটর-রেস দেখতে এসেছেন—চার্লি বসেছেন একটি মেয়ের পাশে। মেয়েটির হাতে লেমনেডের বোতল ও স্ট্র-রেস দেখার ফাঁকে ফাঁকে স্ট্রে মৃদু দিয়ে সে লেমনেড খাচ্ছে—বেই মেয়েটি রেস দেখার জন্য চোখ ফেরায় অমনি চার্লি চট করে স্ট্রে মৃদু দিয়ে খানিকটা করে লেমনেড টেনে নেন নিজের মৃদু। মেয়েটি আবার এদিকে ঘুরলেই মৃদু ফিরিয়ে নির্লিপ্ত, নিরীহভাবে আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। অদ্ভুত মজার হাস্যরসের সৃষ্টি হয় দৃশ্যটিতে।

টিলিজ গ্যাচার রোমান্স: রতওয়ে থিয়েটারে টিলিজ নাইটেময়ার নাটকটি হিট করেছিল—স্টেজে শ্রোয়াণী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সেকালের বিখ্যাত হাস্য-রসভিনেত্রী ম্যারী ড্রেসলার। এই নাটকের কাহিনী অবলম্বন করেই টিলিজ গ্যাচার রোমান্স ছবিটি তোলা হয়—পরিচালক ম্যাক সেনেট। পুরো এক ঘণ্টার ছবি। বোকা-সোকা গ্রাম্য মেয়ে টিলির রোলে ছবিতেও ম্যারী ড্রেসলারই অভিনয় করেন। আর শহুরে বদমাইসটির ভূমিকায় নামেন চার্লি—তার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রেমের অভিনয় করে টিলির সমস্ত টাকাকড়ি মেয়ে দেওয়া। চার্লির এক প্রশরিনীর ভূমিকায় ছিলেন ম্যাবেল নরম্যাড। ছবিটি সে সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

ম্যারী এক বর্ষিকু চামার মেয়ে—গ্রাম্য থাকেন। তার এক কাকা বা মামা আবার লক্ষপতি। চার্লি শহর থেকে এসেছেন নিরীহ গ্রামবাসীদের মাথার হাত বুলিয়ে কিছ্র টাকা হাডডাতে। মোটা ম্যারীর সাহায্যে তার বাপের কিছ্র টাকা মেয়ে দেবার উদ্দেশ্যে টিলি ম্যারীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় সুরু করলেন।

একদিন ম্যারীর বাবা কোন গুপ্ত জায়গায়
জীবা লুকিয়ে রাখেন খুঁজতে খুঁজতে কয়েকটি
নোট দেখতে পেরে হাতে জুড়ে নিলেন চার্লি
—ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বাপটিও ঢুকলেন। চার্লি
নিম্পূর্ণভাবে সেই নোট দিয়ে বাতাস খেতে
লাগলেন—সম্পূর্ণ উদাসীন একটা ভাব চোখে
আঁখি ফুটে উঠেছে। চার্লির ছবি যাঁরা
দেখেছেন, সহজেই বুঝতে পারেন, এসব দৃশ্যে
চার্লি কি অদ্ভুত অভিনয় করতে পারেন।

ম্যারী এবং চার্লি বেশ কিছু পরসাক্ষি
হ্যাঁতায় নিয়ে তারপরে তো শহরে পালালেন।
সেখানে এসে দুজনেরই ভোল পাতে গেল—
সৌখিন পোষাকে-আমাকে চার্লি বেন একে-
বারে উগ্র অস্বাভাবিক স্বর, আর চাষার ক্ষেত্রে
ম্যারী এমন সাজসজ্জা সুরু করলেন বেন
তিনি একজন লেডী অফ ফ্যান্স। দুজনেই
ছিলেন প্রচণ্ড রাগী আর অন্যায় বিষয়েও
একজনের সঙ্গে অন্যজনের মিলে না। মাঝে
মাঝে চার্লির মনে হয়, এই অসম্ভব রকমের
সুবাসিত ম্যারীকে ফেলে পালাতে পারলেই
তার পরিচয়। এখানে একদিন চার্লির পূর্ব-
ইতিহাস ম্যাবেল নরম্যান্ডের সঙ্গে দেখা।
দুজনে এক সমস্যার এক রেসেতারিতে খেতে
গেছেন। দু'ভাণ্ডারবস্ত্র ম্যারী সেই কক্ষতে
গুরুরের কাছ করছেন সেই সময়-কারণ
এর আগেই চার্লি তার পরসাক্ষি সব নিয়ে
নির্গত। ম্যারী এদের কাছে এগিয়ে এসে
হঠাৎ হাঁটতে হঠাৎ পড়ল। চার্লি'রা সর্বোদয়
বুকে পালালেন।

এরপর আমরা কয়েকটি অদ্ভুত রিগ-
লিস্টিক শট দেখতে পাই—ম্যারীর কফা বা
আমরা চার্লিস কেনেটের পর্বতগোহের দৃশ্য।
হঠাৎ দাঁড়ি ছিঁড়ে যায় এবং তিনি ছিটকে
এসে পড়েন একটি তুষারভূষণের কাঁকে—
কক্ষের সামনে ভেসে ওঠে তার পড়ে থাকা
মৃতদেহটা। ছবিটা বেন কমেডি থেকে
স্ট্রাজেভিতে মোড় ফেরায় হঠাৎ। এই
রীতিতেই একটু বেন এসে-মেজে চার্লি তার
নিজের ছবি কারমেনে পরে ব্যবহার করেছেন
এক অসহনীর মৃত্যু-দৃশ্যের অবতারণা করে।

লক্ষণিত কাকার মৃত্যুতে ম্যারীর ভাব্য
গেল ফিরে—কারণ সেই হল উত্তরাধিকারী।
পাহাড়ের ওপর কাকার প্রাসাদোপম বাড়িতে
সে উঠে এল। এদিকে কাগজে এই খবরটা
পড়ে চার্লি ম্যাবেলকে ফেলে ভীষণভাবে
ছুটে এলেন ম্যারীর কাছে এবং সে ভালভাবেই
ম্যাপারটা বুকে গুঁথবার আগেই তাকে বিয়ে
করে ফেললেন। এই পাহাড়ের ওপরের বিরাট
বাড়িতেই তারা তাদের কিয়র উৎসব
উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করল। উৎসবের স্রোতে
অনিয়ন্ত্রিতভাবে ম্যাবেলও এসে হাজির।
একসময় ম্যারী দেখতে গেল চার্লি অনেক
জলজো ম্যাবেলকে চুম্বন করছে। ম্যারী
মাগে একটার পর একটা পোশাক এদের দুজনের
—বিকে হুঁড়ে মারতে লাগল এবং পোশাকগুলো

লক্ষ্যবস্তু হয়ে এক-একজন অভিনয় দৃশ্যে
গিরে আঘাত করল। আগের একটি দৃশ্যে
আছে বিয়ে করে ম্যারীর হাতে হাত দিয়ে
চার্লি বাড়িতে এসে ঢুকলেন। ম্যারীর মধ্যে
একটা লক্ষ্যক ভাব এবং বোকা হাসি।
চার্লির একটি বাহুর ওপর সে ভর করে
আছে—চার্লির বিবগুণ ওজনের একজন মহিলা
এভাবে ভর করে থাকলে দৃশ্যটা কিভাবে
হাসির হুঁয়োড় তুলবে সহজেই বুঝতে পারেন।
দুসারে ঘটনারের দল অদ্ভুত সাজে দাঁড়িয়ে
আছে এদের অভ্যর্থনা জনাবার জন্য। চার্লি
এদের একজনের মাথায় নিজের টুপিটা ধসিয়ে
দিলেন, একজনের হাতে লাঠিটা ধসিয়ে
দিলেন, তাদের মধ্যে ওপর সিগারেটের ছাই
ঝড়লেন এবং এই পাথরে তৈরি মৃত্যুগলোর
মত প্রহরীসদৃশ ঘটনারের সামনে দিয়ে
ভারিভাবে চলে কয়েকবার বাওয়া-আসা করলেন।
এই ধরনের একটি মজাদার দৃশ্য তিনি পরে
ব্যবহার করেছিলেন দি গ্রেট ডিক্টর'র ছবিতে।
ছবিটিতে ম্যারী ড্রেসলায়ের একটি অদ্ভুত
হাস্যোদ্ভেককারী, চোপো নাচ-আছে।

ম্যারীর সেই কাকাটি কিন্তু সত্যি
সত্যিই মারা বান নি—তিনি হঠাৎ
এসে পড়ে সব দেখেশুনে ম্যারীকে
বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। চার্লি
তাদের পশ্চাৎদর্শন করল। শেষ পর্যন্ত
ওদের দেখা হল এবং ম্যাবেল ও ম্যারীর ভাব
হরে গেল। ম্যারী ম্যাবেলকে বললে—“এ
হতভাগা আমাদের কারোই উপব্রত নয়।”
কাকার কাছ থেকে খবর পেরে পুলিশ এসে
চার্লিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

স্বরাট পেন্ন বলছেন:

'The statement is not strictly
true. He was very good to both
of them, but he was kindest to
Marie, for he made love to her from
a high fence and amused her with
his play with flunkys. These two
scenes were memorable for other
reasons. They showed the
emergence of a sense of style, a
talent for sustained invention.
Previously, Charlie had been able
to invent anything he liked
provided the invention did not
last more than thirty seconds,
and he had never possessed a single
style; he is at least three different
people in Laughing Gas, and his
changes of mood in His Trysting
Place were excessively bewildering.
In Tillie's Punctured Romance

these moods are kept under
control.'

কিন্তু কোন কোম্পানিতে চার্লির শেষ ছবি
হিজ প্রি-হিস্টরিক পান্ট। এ ছবিতে মার্ক
সোয়েন সেজেছেন লর্ড লো-রাউ। গায়ে
লোমশ পশমের জামা, সঙ্গে অসংখ্য উপ-
পত্নী। চার্লি এসে হাজির হলেন লো-
রাউয়ের প্রাসাদোপম শিবিরে। চার্লির
গায়েও একটুকরা লোমশ জামা। চার্লি
এখানে বেশ ভালভাবেই অভ্যর্থনা লাভ করলেন
—মেয়েদের গায়ে মাঝে মাঝে সর্বোদয়
খোঁচাও দিলেন। একটি মেয়ের সঙ্গে কিছু-
ক্ষণ লুকোচুরিও খেললেন। ছবিটি শেষতে
দেখতে মনে হবে যেন সেই অভ্যর্থনার স্রীক
দেবতা প্যান এবং তার অকোঁচিবান ফরেষ্টের
অভ্যন্তরে চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে চার্লি স্বয়ং
থেকে উঠছেন—তা হলে এতক্ষণ পান্ট
দেখাছিলেন! কিন্তু তখন চার্লির চোখ জল।
কিন্তু হোক না স্বপ্ন—যতক্ষণ ছবিটি দেখা
যায়, মনে হয় যেন ম্যাপারটা অত্যন্ত ব্যস্ত।

হিজ নিউ বক: কিন্টোন কোম্পানিতে
তোলা চার্লির প্রথম ছবি। কিন্টোন-শিল্পকেই
বিস্তৃত করা হয়েছে ছবিটিতে—চার্লি একজন
স্টেজহাউসের ভূমিকার নেমেছেন। দি কিন্টোন
রায়নশ' নামে একটি ছবি তোলা হচ্ছে।
নাথক আসে নি বলে চার্লিকে সেই ভূমিকার
নামতে হল। হাস্যরস' কন্সটিউয়ে সঞ্চিত হয়ে
নিজের তিনি—কোরে টেইলস্ মারিভে
জুটোছিল—এমেরডার করা কোর্ট তার
থেকে অন্তত পাঁচ সাইজের বড়। এই
পোশাকে চার্লিকে দেখেই দলক হাসিতে
লুটিয়ে পড়ত। তা ছাড়া প্রত্যেক দৃশ্যই
চার্লি নানারকম ভুল করেছেন যা দেখে হাসি
সামান্যো দর হয়ে ওঠে। রাণীকে নিয়ে
সিঁড়ি করে উঠবেন—সিঁড়িতে জুটিয়ে পড়ছে
তার পোশাকের প্রান্তভাগ—তিনি উঠতে
যাচ্ছেন আর চার্লি অন্যরকমভাবে সেই
পোশাকের প্রান্তভাগের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন
—রাণী সেই সিঁড়িতে উঠলেন, তার
স্কাটের অর্ধেক বুজে এল চার্লির
পায়ের চাপে—এক অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি
হল দৃশ্যটিতে।

এ নাইট আউট: চার্লি আর বেন টারপিন
এক উৎসব থেকে ফিরছেন। দুজনেই ভয়ানক
মাতাল—বেনের নিজের অবস্থাই সাংঘাতিক—
তার ওপর তাকে আবার চার্লিকে সান্দ্রভাবে
হুজু।

(কমপজ)

বসন্তের উদ্দেশ্যে এবং গ্রন্থের নিবেদন

ইউরোপে নাটকের নবজন্ম এবং

পুনরুত্থান:

ইবসেন ছিলেন সর্বদিক দিয়ে একজন দুর্ধর্ষ নাট্যকার। সনাতন প্রাচ্য নাটক লিখে দিলাম আর জনপ্রিয় অভিনেতারায় তার নানা চরিত্রে নেমে আসার মাং করতে থাকলো—এ উদ্দেশ্য নিয়ে ইবসেন কখনও নাটক লেখেন নি।

একদিকে তিনি যেমন ছিলেন স্টেজ-জগতের মাল্টার, অন্যদিকে তেমন ছিল তার জীবন সম্বন্ধে গভীর কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি। রহস্য বিষয়েই তিনি চিন্তা করতেন এবং নাটকের মাধ্যমে তার চিন্তাধারা এবং মতবাদকে জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করতেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাল্জাক, ডিকেন্স এবং টলস্টয়ের যা অবদান, নাটকের ক্ষেত্রে ইবসেনের তিক সেই একই কনট্রিবিউশন—ইবসেনের আগে নাট্যিক মাধ্যমে এ কত কখনও পরিবেশিত হয় নি। এ জিনিসটা কি? তদানীন্তন সমাজের একটা স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা নাটকের মাধ্যমে মণ্ডের ওপর।

ইবসেনের নাটকের সাফল্যের পরিমাপ করতে গেলে এই কথাগুলো ভেবে দেখা দরকার—তার মূল নাটকগুলোর ভাষা হচ্ছে নরওয়েজিয়ান—নরওয়ের লোকেরা ব্যতীত যে ভাষার সঙ্গে বিশেষ কেউ পরিচিত নন, যে নাটকের বিষয়বস্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট্ট একটি দেশের লোকদের জীবনের বাস্তব কাহিনী নিয়ে। অথচ এসব নাটকে দেশ-কালের গন্ডীকে অতিক্রম করে যাবার যে একটা বিরাট প্রয়াস দেখা যায় তাই যেন ইবসনের রচনাকে ইউরোপ এবং আমেরিকায় মঞ্চে এতোটা আকর্ষণীয় এবং জনপ্রিয় করে তুলেছে। আর একটা কথাও এখানে মনে রাখা দরকার। একদিকে যেমন সারা পৃথিবীর তিনি প্রশংসা অর্জন করেছেন, তেমনি আবার বিদ্বৎসমাজের অনেকেই তার লেখা পড়ে যা নাটক দেখে বিরক্ত প্রকাশও করেছেন।

ইবসেন রচনার ক্ষেত্রে অনেক শিষ্য এবং অনুকরণকারী পেয়েছেন—যারা তার লেখার ধারাটাকে অবলম্বন করে নাট্যসাহিত্যে এক বিশেষ শ্রেণীর নাট্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন।

আজকের দিনে অনেকেই ধারণা করতে পারবেন না যে, ইবসেন এসে রংগমঞ্চার ক্ষেত্রে কি বিরাট আলোড়ন এবং আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। তার আসবার কিছুকাল আগে রংগমঞ্চে লোকে মনে করতে সুরু করেছিল একজিভিশন হল—যেখানে তারা আসতো

ইবসেনের হাতে পড়ে রংগমঞ্চার চেহারা গেল ইবসেনের হাতে পড়ে রংগমঞ্চার চেহারা গেল পাণ্ডে—রংগমঞ্চে তিনি এরিনা বা ফেরামে রূপান্তরিত করে সেখানে তুলে এনে ধরতে লাগলেন তার নিজস্ব ভাষাতে দেখা সমাজ-দর্শনের চিত্র, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের গুঁঠাপড়া এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ের জীবন্ত আলোচনা।

আলস্য এবং ঔদাস্যে মগ্ন মজাদার নাটক দেখতে অভ্যস্ত দর্শকের দল এইসব নাটক দেখতে এসে প্রথমটার বেন হক্চাকিরে গেল, তারপর ক্রটিম মামাজালের আবরণ কেটে বেরিয়ে এসে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল। সমাজচিন্তা, সমাজবোধ, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সম্বন্ধ, আত্মবোধ, দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, শ্রমী-পুত্রের সম্বন্ধ, রংগমঞ্চে এইসব বিষয়ের অবতারণা করে ইবসেন ইউরোপীয় দর্শকদের বাস্তবজীবন, বাস্তবসমস্যা, বাস্তব-জীবনের সুন্দর, আশা-হতাশা সম্বন্ধে অনেক বেশি সজাগ, সচেতন, বিনিষ্ঠ এবং সক্রিয় করে তুললেন। কোনো ব্যাপারের সামগ্রিক ধারণাবোধটা বেন মানুষ প্রায় হারাতে বসেছিল। এই সামগ্রিকবোধটা অত্যন্ত সহজ সুন্দরভাবে জাগিয়ে তুলতে লাগলেন ইবসেন তার দর্শক এবং পাঠকদের মনে।

ডিকেন্সের মত ইবসেনের লেখাতেও সমাজ-সংস্কারের একটা বিরাট এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই। সমাজের দোষ-ত্রুটির তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ সমালোচক। তার 'এন্টি-আইডিয়ালিস্টিক প্রে-গুলিতে তিনি সে-আমলে নতুন প্রতিষ্ঠিত আর্থিক স্বচ্ছলতার ভরা বুজেরা সোসাইটিকে অতি তীব্রভাবে বারবার আঘাত হেনেছেন।

'Hacking away at the facade of complacency, self-righteousness and moral smugness, he revealed the rottenness of its (bourgeois society) foundations and the cruelty, dishonesty, hypocrisy and secret vice that it masked'—Elmer Rice.

ফলে থিয়েটারের জগতে সুরু হল এক বিরাট বিক্ষোভ। একদল, যারা তার পুখান্দ-সারী বা গুণমুগ্ধ, তারা বিজয়দুগ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল যে, ইবসেনই হচ্ছেন এ যুগের থিয়েটারের নবজন্মদাতা, মুক্তিদাতা, আলোকবাহী

পথনির্দেশক এবং নাট্যসাহিত্যের বিরাট সৃজনশীল প্রতিভা।

আবার তার বিপক্ষবাদীরা প্রচার করতে লাগলেন যে, রোমাঞ্চকর পরিবেশের সৃষ্টি করে, চাকচিক্যপূর্ণ ঘটনার সাহায্যে এবং সব-কিছুর ভেতর থেকে নোংরামি আবিষ্কার করে লেখার মাধ্যমে এসবকে লোকের চোখের সামনে এনে ইবসেন নিজেকে বড় নাট্যকার বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

কিন্তু ইবসেনের বিরুদ্ধবাদীরা যাই বলুন, যা যে ধরনের অপপ্রচারই তার বিরুদ্ধে করুন, তার দ্বারা তাঁকে কোণঠাসা করে রাখা গেল না।

তার নাটক একটা বিরাট বিপ্লব সুরু করে দিল মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত চিন্তার ক্ষেত্রে এবং নাট্যমঞ্চে এমন একটা প্রাণবন্ততা এবং সমকালীনতার ভাব বিরাজ করতে লাগল যা এর আগে একশো বছরের ভেতর কখনও থিয়েটারে কারো চোখে পড়ে নি। সেন্সর তার কিছু কিছু নাটক সময় সময় বান্ধ করে দিয়েছেন, পুলিশ অনেক সময় প্রদর্শনী বন্ধ করে দিয়েছে—দর্শক প্রচণ্ড উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে তার প্রেরণা অভিনয় দেখেছে—আবার এমনও হয়েছে যে, দর্শক বিরক্ত হয়ে বিদ্রোহপাঙ্ক ধর্মান করে ইবসেন-প্রের প্রদর্শনীকে নস্যায় করে দেবার চেষ্টা করেছে।

ইবসেন-প্রের সম্বন্ধে চিরকালই মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে—আজও সেই মতবিরোধের অবসান হয় নি। তবে আজকের দিনে আর অত জোর গলায় এবিষয় বাকবিতণ্ডা হয় না।

অবশ্য এখনও বহু নাট্যসমালোচকের মতে ইবসেনের নাটককে 'অমর ক্লাসিক' নামে অভিহিত করা হয়। আবার কেউ কেউ আছেন, যারা মনে করেন, থিয়েটারের ইতিহাসে এসব নাটকের একটা বিশেষ স্থান আছে, কিন্তু বর্তমানে ইবসেনের নাটক আউট-ডেটেড। আর একদল আছেন—যারা থিয়েটারকে শুধুমাত্র মেক-বিগল্ডের আশ্রয়স্থল হিসাবেই দেখতে চান—ইবসেনিজমের অভ্যাসমকে কোনকালেই এরা সুনজরে দেখতে পারেন নি। এদের ধারণা নাট্যমঞ্চে থেকে গিলভেড, এজ্ অভ রোমান্টিসিজমের অপসারণের জন্য ইবসেনই সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

ইবসেন (১৮২৮—১৯০৬) বোর্টোলেনে বিশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্বত। তিনি যখন মারা যান সে সময় ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় দেশেই সৃজনশীল প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে গেছে এবং নানা ইউরোপীয় ভাষায় ভাল ভাল নাটক রচিত হয়েছে।

ইবসেনের সময়ে নাটক রচনায় যে বিভিন্ন জাতীয় রচনাশৈলী, বিষয়বস্তু এবং বিন্যাস দেখা যায়—সমগ্র নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না।

উনিবিংশ শতাব্দীর পশ্চিম ইউরোপের নাট্যসাহিত্য গ্রীক বা এলিজাবিথান নাটকের

হাইটে উঠতে পারে নি একথা অবসীকার করি না—কিন্তু ব্যাপকতা, বিস্তৃতি এবং বিভিন্ন বিষয়ক ব্যাপারে এ সময়ের নাটক যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে—তার সঙ্গে তুলনায় গ্রীক বা এলিজাবিথান নাটককেও নতিস্বীকার করতে হবে।

এইসব নাট্যকারদের পর্বায়-তালিকার দিকে তাকিয়ে দেখলে মন সম্প্রদে ভরে ওঠে। ইবসেন ছাড়াও স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে তখন নাটক লিখছিলেন স্ট্রান্ডবার্গ (১৮৪৯-১৯১২) ও বিওর্নসন (১৮০২-১৯১০)। অনেকে মনে করেন স্ট্রান্ডবার্গ ইবসেনের থেকেও বড় নাট্যকার।

জার্মানীতেও আবির্ভাব হয়েছিল হাউস্ট-মান (১৮৬২-১৯৪৬), জুডারমান (১৮৫৭-১৯২৮) ও ভেডেভিকডের (১৮৬৪-১৯১৪) এরা সবাই বিস্ময়কর নাট্যকার। অস্ট্রিয়াতে স্মিটজলার (১৮৬২-১৯০১)। ফ্রান্সে হফ-মানসথল (১৮৭৪-১৯২৯), ইটালীতে জিয়া-কাজা (১৮৪৭-১৯০৬) বের্খালি (১৮৭৫-১৯৪২), দানজিও (১৮৬০-১৯০৮), পিরানদেল্লো (১৮৬৭-১৯০৬), ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে, বেক (১৮০৭-১৯১১), রসট্যাণ্ড (১৮৬৮-১৯১৮), হাভিউ (১৮৫৭-১৯১৫), ক্রুদেল (১৮৬৮), ব্রিয়া (১৮৫৮-১৯০২) ও মোটারলিঙ্ক (১৮৬২-১৯৪৯); স্পেনে বেনাভাডে (১৮৬৬), একিগারে (১৮০২-১৯১৬); আয়ারল্যান্ডে সিম্প (১৮৭১-১৯০৯), ইটস (১৮৬৫-১৯০৯) ও ডান-সেনী (১৮৭৮), রাশিয়াতে শেহভ (১৮৬০-১৯০৪), গোর্কি (১৮৬৮-১৯০৬) ও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০); ইংলণ্ডে হার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০), ওয়াইল্ড (১৮৫৬-১৯০০), পিনেরো (১৮৫৫-১৯০৪), জেন্স (১৮৫১-১৯২৯), গ্র্যান্-ভিল-বার্কার (১৮৭৭-১৯৪৬), ব্যারি (১৮৬০-১৯০৭) ও গলস্‌ওয়ার্থি (১৮৬৭-১৯০৩)।

এরা সবাই দিকপাল নাট্যকার—সারা দুনিয়া জুড়ে এঁদের নামজাক। নরিক এঁরা সবাই ছিলেন ইবসেনের সমকালীন, তবু এঁদের অনেকেই কিন্তু ইবসেনের রচনারীতি বা জীবনদর্শন বা রচনাশৈলীর অনুকরণ বা অনুসরণ করেন নি। এঁদের কেউ কেউ কাব্য-নাট্য এবং সাংকেতিক নাট্য লিখে অদ্ভুত স্রষ্টা এবং রস অর্জন করেন। কিন্তু এসব লেখার ইবসেনের লেখার বিন্দুমাত্র প্রভাব দেখা যায় না।

তবে এ সময়ের প্রত্যেক নাট্যকারের লেখার যে প্রাণবন্ততা এবং সজীবতা দেখা যায় তা এঁদের পূর্বসূরীদের লেখার থাকতো না। ইবসেন যদি আবির্ভূত নাও হতেন তা হলেও এইসব নাট্যকারেরা নিজেদের সৃজনশীল রচনার দ্বারা সারা বিশ্বে প্রচণ্ড নাট্য-আন্দোলনের সৃষ্টি করতে সমর্থ হতেন—সেকথা

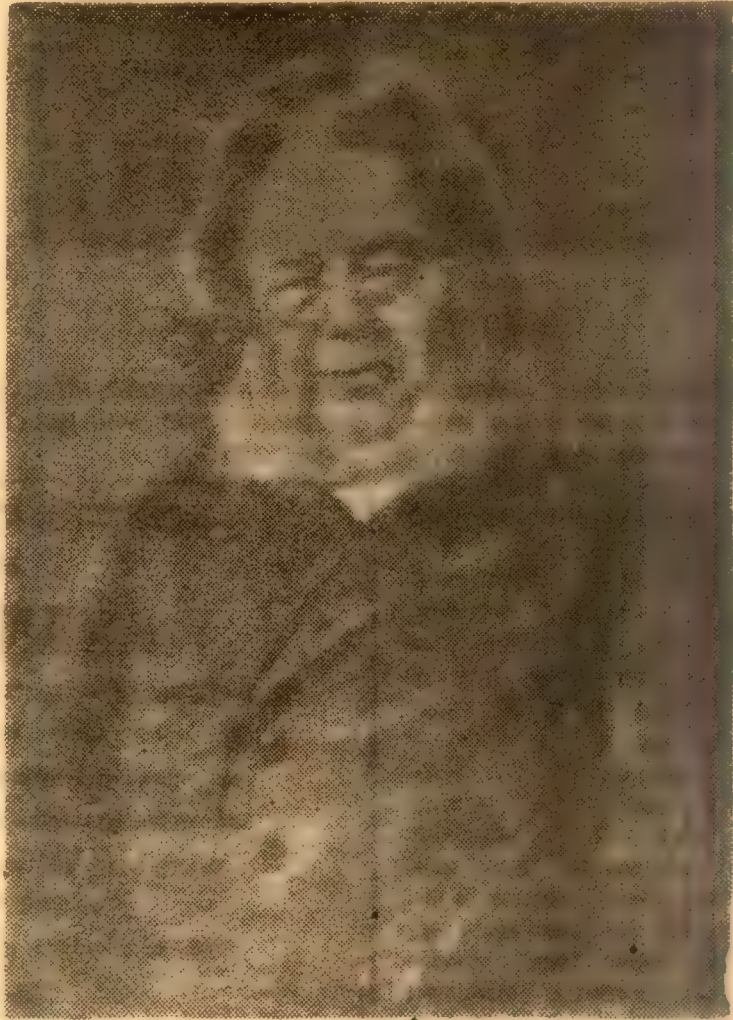
নিঃসন্দেহে বলা যায়। আসলে তখন ইউরোপীয় সমাজে বেসব ঘটনা ঘটিছিল বা বেসব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে শিল্প ও সাহিত্য স্বাভা-বিক্রমে ফুটে উঠছিল শিল্পীর তুলিকার এবং লেখকের রচনার।

এই একই কারণে রেনেসাঁসের সময় সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে একটা বিরাট সৃষ্টির প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল—অত্যাধিক না হলেও উনবিংশ শতাব্দীতেও একই কারণে সংগীত, সাহিত্য এবং নাট্যরচনায় প্রভূত শক্তির পরিচয় দিচ্ছিলেন শিল্পীরা তাঁদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে।

ইটস, ক্রুদেল, রসট্যাণ্ড, হফমানস্‌থল, মোটারলিঙ্ক ও হানজিওকে বাদ দিলে তখনকার বেশির ভাগ নাট্যকারই প্রধানত যে জগতে তাঁরা বাস করতেন এবং সেখানকার মানবচরিত্র সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করে নাটকের

মাধ্যমে তা সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। রিয়ালিজমকেই সবার ওপরে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছিল—আর মধ্যে সমস্যাগ্রহণ নাটকই বেশির ভাগ দর্শকদের কাছে পরিবেশিত হচ্ছিল। এই সময় সামাজিক কঠোর নতুন আকৃতি নেওয়ার, নতুন নতুন পরিবেশ এবং সম্পর্ক আবির্ভাব ঘটিছিল। এইসব ব্যাপারের আলো-চনা এবং বিশ্লেষণের ফলাফলই উপস্থাপিত করা হতো নাটকের ভেতর দিয়ে জনসাধারণের কাছে।

ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের বিবর্তিত রূপের এমন কোন দিক বাকি ছিল না যা নিয়ে নাটক লেখা হচ্ছিল না। এমন অনেক বিষয়, যা আগে জনসাধারণের সামনে বিচার বা বিশ্লেষণ করা তো দূরে থাকুক, প্রাইভেট-লিও কেউ আলোচনা করতো না, এইসব বিষয় এখন খোলাখুলিভাবে তুলে ধরা হতে লাগল মঞ্চের ওপর জনসাধারণের সামনে যে,



হেনরিক ইবসেন—বিখ্যাত নবওরোজিয়ান নাট্যকার



জগদীশ চন্দ্র বসু—স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা

লোককে বিম্মিত হয়ে গেল। প্রতিদিন সূর্য
হয়ে গেল গোড়াপন্থীদের তরফ থেকে—
তারা জেহাদ ঘোষণা করলে এইসব নাটকের
বিরুদ্ধে এবং অনেক সময় চক্ৰান্তের সাহায্যে
এই নতুন শ্রেণীর বাস্তববাদী নাটকের প্রদর্শনী
করতে দেবার ব্যবস্থা করছিল।

শুধু ইবসেনই নয়, বার্নার্ড শ, হাউস্ট-
মান, ট্রিয়া, গলসওয়ার্ড, স্মিটজলার,
গোর্কি, ভেডেকিন্ড, বেক্ প্র্যান্ডিল-বার্করিও
এই সময়ের অন্যান্য নাট্যকারেরা, সমাজ এবং
রাষ্ট্রিক জীবনের কদরতা এবং দৃষ্টান্ত
অপসারণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন।
এদের নাটকে রাজনীতিক এবং বিচার-
বিভাগীয় অনাচার, অবিচার, পক্ষপাত, স্বৈর-
তন্ত্র, নারীজাতিক দাবিরে রাখা, কৈশোর বয়সের
আত্মত্যাগী ক্রিয়াকর্ম, এন্টি-সেমিটিজম, ধনিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব,
বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষের বোন অপরাধ,
কোজদারী আইনের কঠোরতা, যৌনব্যাদি,
অর্থবণ্টনের অসামান্যতা, ন্যায়পরায়ণতা
নির্ধারণের দ্বৈতনীতি, যুদ্ধোৎসাহ নিমিত্ত-
মের যুদ্ধে উৎসাহ দেবার প্রচেষ্টা, ধর্ম-
সম্বন্ধীয় কপটতা এবং অসহিষ্ণুতা, স্তান-

লাইফের দৃষ্টান্তদর্শী এবং আরও এই জাতীয়
বহু সময়ের পরিষ্কার এবং খোলাখুলি
আলোচনা থাকতো।

এই প্রথম মানুষকে সামাজিক জীব
হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হল জনসাধারণের
সামনে। এরা অকুণ্ঠ ভাবের প্রতিপন্ন করে
দিলেন যে, মানুষের ভাগ্যবিধাতা বলতে যে
এতকাল দৈবিকশক্তি বা রাজশক্তিকে মনে
করে আসা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভুল—
আসলে সমাজের জীব মানুষের ভাগ্য বা
ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় সোশ্যাল
কোর্সের দ্বারা।

অনেক সময়ে এইসব নাট্যকারেরা প্রায়
ভবিষ্যৎ বন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন—যেমন শেহজ
তার 'চেরী আর্চ' নাটকে ডেকেরডেট
রাশিয়ার অপদার্থ আপার-ক্লাশের কর্তৃপক্ষ
প্রশংসা ভবিষ্যৎ রাশিয়ান বিপ্লবের ইংগিত
দিয়ে গেছিলেন। স্ট্রান্ডবার্গ এবং আরও দু-
চারজন নাট্যকার তাদের নাট্যিক চরিত্রের মন-
স্তাত্ত্বিক আলোচনার ভবিষ্যতে ফ্রেডের
অভ্যুত্থানের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন।

একথা অস্বীকার করবো না যে, আজকের
দিনে হয়তো এইসব নাটকের সময়সীমা
দিকগুলো অনেকটাই out-dated হয়ে
গেছে—কারণ সমাজ এবং সামাজিক পরিবেশ
ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে এবং বিবর্তনের মাপকাঠি
দিয়ে বিচার করলে সে সময়ের সমাজ এবং
আজকের সমাজ অনেক ভিন্ন এবং সে
সময়ের অনেক সমস্যাই আজকের সমাজে আর
দেখা যায় না। তবুও ঐতিহাসিক বিচারের
মাপকাঠিতে এইসব নাটকের একটা চিরন্তন
মূল্য আছে। তা ছাড়া সমস্যা বাদেও এসব
নাটকের চরিত্র এবং স্ট্রোকচারের দিকটা, ভাষা
এবং ভাবব্যঞ্জনা নাটকগুলিকে কাল শাসনাতীত
করে রেখেছে।

(কমপঃ)

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রী অরবিন্দ

ANANDAMATH

স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর আনন্দমঠের তমর ২২২তম বার্ষিকী

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বসূরী
- আনন্দমঠে—‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রের পুণ্য-প্রকাশ
- আনন্দমঠে—স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার আদর্শ সমন্বিত।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্থশক্তিকর সাধন

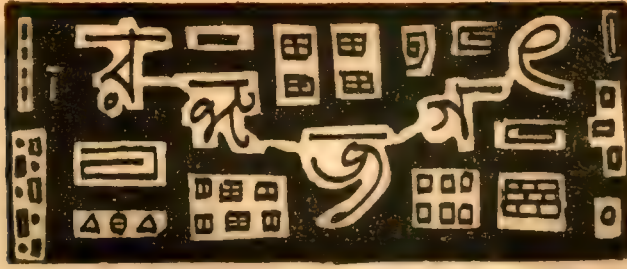
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



বাংলা চলচ্চিত্রের সংরক্ষণাগার

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস গৌরবময়। কিন্তু এই ইতিহাস বিস্মৃতপ্রায় হতে চলেছে। এদেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে এক যুগ আগের নির্মিত চলচ্চিত্র পরের যুগে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত স্বার্থে ছবি নির্মাণ করান, তাঁদের ব্যবসায়ের কাজ শেষ হয়ে গেলে সে ছবির প্রয়োজন তাঁদের কাছে থাকে না। তবুও যে কয়েকটি ছবি ও বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা এই ব্যবসায়ীদের দর থেকেই। বাংলা চলচ্চিত্রের ব্যবসা বড় স্বল্পসম্বারী, একারণে একমাত্র আরো ফিল্ম কর্পোরেশন ছাড়া খারাবাহিক কোন তথ্য অথবা ছবি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে পাওয়া যায় না। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস সম্পর্কে প্রীকালীন মুখোপাধ্যায় বহু প্রমসাদা গবেষণা করেছেন; তিনিই প্রমাণ করেছেন যে, ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম উদ্যোক্তা 'হীরলাল সেন (১৯০৩)। কিন্তু মর্ষভারতীয় ক্ষেত্রে এই সত্য আজ পর্যন্ত সকলের স্বীকৃতি পায় নি। এমন কি সরকারী পুস্তিকাকরও ১৯১২ সালকে সূচনা পূর্ব বলা হয়ে থাকে এবং প্রথম উদ্যোক্তা হিসাবে দাদাভাই ফালকের নাম উল্লেখ করা হয়। এই বিভ্রান্তি ঘটেছে তার কারণ, বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বের কোন ছবি সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। এমন কি নির্বাক যুগের অর্থাৎ ১৯০০ পূর্ব যুগের ছবিগুলিও আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও কোন কোন ছবির নিগেটিভ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু প্রিন্ট করাবার ব্যয় নির্বাহ করবে কে? ব্যবসায়ীরা টাকা দিতে উৎসাহী নাও হতে পারেন, যতক্ষণ না তাঁরা এসব ছবির ব্যবসার সাফল্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহান হন।

স্বাধীন ভারতে সরকারের এ ব্যাপারে একটা ভূমিকা থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে এখন পর্যন্ত উদাসীন। বিশেষ করে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার। আনন্দের কথা মাদ্রাজ, দিল্লী, মহারাষ্ট্র সরকার আঞ্চলিক ছবির সংরক্ষণ ও বিকাশের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। যদিও বাংলা ছবি সারা ভারতে প্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছে, যদিও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলা ছবি ভারতের সম্মান রক্ষা করে আসছে, তথাপি নিজ দেশে বাংলা ছবি ও বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প উপেক্ষিত। কত যে উপেক্ষিত তা এবার ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে পুরনো দিনের ছবি প্রদর্শনের ব্যাপারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নির্বাক যুগেও সবাক যুগের শুরুর্তে যে ছবিগুলি বাঙালীর মনে চাপসা সৃষ্টি করেছিল সেই ছবিগুলি ইতিহাসের সাথে পরিচরলাভে ইচ্ছুকদের কাছে প্রদর্শন করা সম্ভব হচ্ছে না। এই ছবিগুলির সঙ্গে অতীত দিনের পরিচালক ও শিল্পীদের পরিচয় যুক্ত রয়েছে; মাত্র ৩০।৩৫ বছরের ব্যবধানে সেদিনের পরিচালকদের চিন্তাশক্তি ও শিল্পীদের সঙ্গে এ যুগের পরিচয় ছিল হয়ে যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে সরকারের ফিল্ম সংরক্ষণাগার বা ন্যাশনাল আর্কাইভ গঠনের জন্য উদ্যোগী হওয়া উচিত। ফিল্ম সংরক্ষণাগার গঠনের ব্যাপারে মারা ইতিপূর্বে উদ্যোগ গঠন করেছেন এবং নিজ নিজ মাধ্যম অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের সহায়তা গ্রহণ করলে সরকার এ ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে পারবেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে বাংলা চলচ্চিত্রের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে,—এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটি ফিল্ম সংরক্ষণাগার না থাকা সরকারী অপরিণামদর্শিতা ও বাস্তবতার নজির হয়ে থাকবে।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি পুরনো দিনের ছবি প্রদর্শন করে সমিতির সভ্যদের বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসের সাথে পরিচিত করাবার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা বাংলা চলচ্চিত্রের বিকাশের পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপরূপে বিবেচিত হবে। এই প্রচেষ্টার জন্য উদ্যোক্তার হৃদয়বাক্য।



সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি 'দ্যার'-এর
লেটে উত্তমকুমার।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের পুঙ্ক্ষার ঘোষণা

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের কলাকল গভ ২০শে জুলাই ঘোষিত হয়েছে। প্রথম পুরস্কার বা গ্রান্ড প্রিন্স লাভ করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও হাঙ্গেরী যুগ্মভাবে। যুগ্মভাবে প্রথম পুরস্কার লাভ করা মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের মত এবারও প্রথম পুরস্কারের বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল।

গ্রান্ড প্রিন্স প্রাপ্ত ছবি দুটির নাম 'ওয়ার এন্ড পীস' (সোভিয়েট ইউনিয়ন) এবং 'টোরেন্ট আওয়ার্স' (হাঙ্গেরী)। প্রথম ছবিটি লিও টলস্টয়ের বিখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপ। পরিচালনা করেছেন সেগেই বন্দরচুক। শ্বিতীয় ছবিটি পরিচালনা করেছেন জোলটান কোরি। প্রথম মস্কো উৎসবে বন্দরচুকের ছবি 'কট অব এ ম্যান' গ্রান্ড প্রিন্স লাভ করেছিল।

স্বর্ণপদক লাভ করেছে—করাসী ছবি 'স্কাইস এভাড'—পরিচালক—আইভান সিয়াম্পি এবং চেকোস্লোভাক ছবি জিরি কোয়াকুইস পরিচালিত 'দি এটেনশন'।

বিশেষ জুরী পুরস্কার পেয়েছে ইতালীয় ভালেরিও জুরলিনি পরিচালিত 'লা সলডাটেস'।

রোপ্য পদক পেয়েছে—আমেরিকার কমেডি চিত্র 'শি স্টেপস্ অন দি আর্থ' এবং 'দি গ্রেট রেস'।

• প্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পুরস্কার পেয়েছেন 'ম্যারেজ ইটালিয়ান স্টাইল' ছবিতে অভিনয়ের



স্বদেশী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকসমূহের সদস্য রাজকাপুরুষ এম. বন্দরচুক, অভিনেত্রী মাই. শ্বেভসেবা ও প্রযোজক জি. আলেক্সান্দ্রাসের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে।

জন্য সোফিয়া লোরেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন সোভিয়েট ইউনিয়নের সেগেই জ্যাকারিমাজ, 'ফাদার অব এ সোলজার' ছবিতে অভিনয়ের জন্য।

শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফির পুরস্কার পেয়েছেন যুগোস্লাভিয়ার প্রেমোথরাস ফ্রম ভিস্টো-ভিভজা আইল্যান্ড' ছবির ফটোগ্রাফার তমিস্লাভ গিনটর। ফ্রান্সি কেরোথী গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ রূপায়ণের জন্য পূর্ব জার্মানীর ছবি 'দি গ্র্যান্ডভাওয়ার অব ওয়ার্ল্ড' হল্ট-কে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। যুবকদের সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পেয়েছে বুলগারিয়ার ছবি 'ম্যারেজ মাইসেন্স'।

যে দেশে সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়েছে—এমন দেশের জন্য দেয় পুরস্কারটি লাভ করেছে আলজেরিয়া—স্যাচ্ এ ইয়ং 'ম্যান্ড' ছবির জন্য।

এ ছাড়া জুরীরা বিশেষ ডিপ্লোমা দিয়েছে পরিচালক সুসুমি হানি (জাপান), ভ্যাটো-ল্যাভ মিমিকা (যুগোস্লাভিয়া), অভিনেতা মেরাভিল ফ্রান্স, লুডমিলা সাবেলারেভা (সোভিয়েট ইউনিয়ন—ওয়ার এন্ড পীস-এর স্টাটশা), জুলিয়াভিগ্টি (বুটেন ভারলিং' বের অভিনেত্রী)।

স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে 'এ টিয়ার অন বি চিক' (যুগো-

স্লাভিয়া)। স্বর্ণ পুরস্কার পেয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের 'দি টু'। রৌপ্য পদক পেয়েছে—'সিস্টারি সাইকলস' (কানাডা), 'নগুইন ভন ট্রিও উইল লিভ ফর এভার' (উত্তর ভিয়েতনাম), 'সেপার্ড ফ্রম কাওতো (কিউবা)।

'ইন্সপেকসন অন দি স্পট' (পোল্যান্ড) এবং 'এ মান্চ অব পুড সান' (সোভিয়েট) বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টেকনিক্যাল সিনেমাটোগ্রাফিক এসোসিয়েশনের প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ টেকনিকের জন্য পুরস্কারটি লাভ করেছে 'দি গ্রেট রেস' (আমেরিকা)।

এ ছাড়া সোভিয়েটের বৈদেশিক রাস্ত্রের সাথে মৈত্রী সাংস্কৃতিক সমিতি, চলচ্চিত্র কর্মী সমিতি, সাংবাদিক সমিতি, শান্তি কর্মিটি, যুব সমিতি, অফ্রো-এশিয়ান সহোতি সমিতি, গ্লোভেল ব্যুরো, বিমান মন্ত্রী দপ্তর, সিনেমা আর্ট ও সোভিয়েট সিনেমা পত্রিকার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছবিকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।

অতীত দিনের বাংলা চলচ্চিত্র ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক প্রদর্শনের আয়োজন কালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে

২৯শে জুলাই হতে ১৭ই আগস্ট পর্যন্ত পুরাতন বাংলা ছবি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। ক্যাপেড্রাল রোডস্থ লালিতকলা ভবনে বারদিনব্যাপী বাছাই করা ১১টি ছবি প্রদর্শিত হবে। এই ছবিগুলি সবাক যুগের; নির্মাণকাল ১৯৩২ হতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। প্রদর্শিতব্য ছবিগুলি:

- (১) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯৩২) পরিচালক জ্যোতিষ ব্যানার্জী;
- (২) কলংক ভজন (১৯৩৩) পরিচালক—অমর চৌধুরী;
- (৩) চাঁদ সদাগর (১৯৩৪) পরিচালক—প্রফুল্ল রায়;
- (৪) সোনার সংসার (১৯৩৫) পরিচালক—দেবকী বসু;
- (৫) বাগ্যালী (১৯৩৬) পরিচালক—চারু রায়;
- (৬) আলিবাবা (১৯৩৭) পরিচালক—মধু বসু;
- (৭) মৃতি (১৯৩৮) পরিচালক—প্রমথেশ বড়ুয়া;
- (৮) অভিনয় (১৯৩৮) পরিচালক—মধু বসু;
- (৯) দেশের মাটি (১৯৩৮) পরিচালক—নীতীন বসু;

(১০) স্বামী (১৯০৮) পরিচালক—ফণী

মজুমদার:

(১১) গোরা (১৯০৮) পরিচালক—

নরেশ মিত্র:

এই ছবিগুলিতে বীরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে আজ জীবিত নেই; অনেকে অভিনয় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। অতীত দিনের এই খ্যাত শিল্পীদের মধ্যে আছেন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, শিশুবালা, ধীরাজ ভট্টাচার্য, শান্তি গুপ্তা, সানিরা, সুহাসিনী, নীহারবালা, সেবাবালা, ইন্দুবালা, মীরা বসু, কমলা বরীয়া, সাধনা বসু, সুপ্রভা মন্ডালী, প্রমথেশ বড়ুয়া, সেনিকা দেবী, প্রতিমা দাশগুপ্তা, কৃষ্ণদেব দে, সাইগল, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রাণীবালা প্রমুখ।

এই ছবিগুলির সংগে কয়েকটি পুরনো দিনের স্বরূপ দেখার ছবিও দেখান হবে। তার মধ্যে থাকবে মায়াকাজল, বেজার রগড়, আরোহণ কয়েকটি নিউজরীল।

এই সংগে পুরনো দিনের ফিল্ম সংগীতের রেকর্ড বাজাবার এবং একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে থাকবে কয়েকটি চিত্রনাট্য (প্রমথেশ বড়ুয়া ও শিশির ভাদুড়ীকৃত), প্রাচীর চিত্র, খিতরচিত্র, সিনেমার প্রথম যুগের ক্যামেরা ইত্যাদি। এই প্রদর্শনীর সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

২৯শে জুলাই উদ্‌যোহন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ, এবং অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শ্রী বি এন সরকার সহ পুরনো দিনের কয়েকজন অভিনেতা, সংগীত পরিচালক প্রভৃতি।

পুরাতন বাংলা ছবির উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি শ্রীজগদ্বন্ধু কুমার চন্দ্র জানান যে, তাঁরা বহু চেষ্টা করেও ১৯৩২-এর পূর্বের ছবি সংগ্রহ করতে পারেন নি। চণ্ডীদাস, দেবদাস এবং তারও আগের কিছু ছবির নিগেটিভ পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলিকে প্রিন্ট করার যে ব্যয় তা সমিতির পক্ষে একা বহন করা সম্ভব নয়। এই উৎসব আয়োজনেও সমিতির প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয় হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক সাহায্যদানের ব্যাপারে নীরব।

এইবারের উৎসবের পরে সমিতি ১৯৩৯ খাল হতে ১৯৫১ সালে নির্মিত ছবিগুলির আর একটি উৎসবের কথা বিবেচনা করেছে। সম্ভবত নেক্ষত্রের মাসের দিকে সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এরূপ উৎসবের মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসের দুইটি যুগের পরিচয় পাওয়া যাবে।

মহাকাশের তারকা থেকে মণ্ডে'র তারকা'দের মধ্যে

মহাকাশচারী বীর পাবেল পাপোভিচ আবার তারকা'দের মাঝখানে নিজেকে দেখে খুশি হয়েছিলেন। তবে এবার মহাকাশের তারকারাশির মধ্যে নয়, মণ্ডে'র তারকা'দের মধ্যে হাসি-তামাসার কয়েক ঘটনা উপভোগ তারকারাশির মধ্যে নয়, মণ্ডে'র তারকা'দের তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর সংগে কথা বলার জন্য কয়েকটি চাক্ষুষ দেখা দিয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত উৎসবের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন পাপোভিচ। মস্কোর প্রথম চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম মহাকাশচারী গ্যাগারিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখে ইতালীর জিনা লোলোরিজিভা এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, আসন ছেড়ে ছুটে গিয়ে চুম্বন করে গ্যাগারিনকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। মস্কোর চতুর্থ চলচ্চিত্র উৎসবে পাবেল পাপোভিচ সমাগত চিত্রতারকা ও পরিচালক প্রযোজকদের সংগে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে, মহাকাশচারী পাবেল পাপোভিচ প্রত্যক্ষভাবে চলচ্চিত্রের সাথে যুক্ত। তাঁরা মহাকাশে বিচরণের সময় মহাকাশের এবং মহাকাশ থেকে পৃথিবীর চিত্র

গ্রহণ করেছেন। সেই চলচ্চিত্র পৃথিবীর মানুষের দেখে উপভোগ করেছে। মহাকাশ সম্পর্কে দর্শকরা জ্ঞান অর্জন করেছে। এবং তাঁদের গৃহীত ছবিগুলি আধুনিক কয়েকটি প্রামাণিক ছবি, এমন কি ফিচার ছবির অংশ জুড়ে রয়েছে। এ কারণে পাপোভিচ বললেন—আমরা কেবলমাত্র আপনাদের অনুরাগী হিসাবে এখানে আসি নি। আমরা আপনাদের সহ-কর্মী হিসাবে এসেছি, আমরাই তো প্রথম মহাকাশের চলচ্চিত্র গ্রহণ করেছি।

পাপোভিচকে অসংখ্য প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি হাসিমুখে সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বীরা প্রশ্ন করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, মারিনা ভ্যাডিচ, টমাস হলজমান, তামারা মাকারোভা, বিবি জেলিনেক, রায়-কাশ্‌র ও তাঁর স্ত্রী কুলা কাশ্‌র, সেগেই ভোরাসিমভ, কিরিলচকো উশিহারা, আইভান সিরায়িগ, লেভ কুলিমানভ এবং ১৩ বছরের বালক গার্ল্ড মিটারমেরার (আংকল টমস কোবিন' ছবির অভিনেতা)।

পাপোভিচকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—আপনি মনে করেন চল্লিশকে চলচ্চিত্র উৎসব করা সম্ভব হবে?

সত্যজিৎ রায় “কল্লোল” সম্পর্কেঃ

“ভারতীয় নৌ-বিশ্রোহের পটভূমিকায় কল্লোল নটক রচনা ও লক্ষ্য করে উৎপাদিত জাহাজ সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন... .. কল্লোল-এর লক্ষ্যমাত্রা রূপার্থী ও নব্যরীতির লক্ষ্য লক্ষ্যের বিশেষভাবে লক্ষ্যার্থী। টেকনিকের চমকপ্রদ ব্যবহার এতে অনেক আছে, কিন্তু টেকনিক সর্বস্বতার অপবাদ দেওয়া চলে না কারণ টেকনিক বিশ্বব্রহ্মকে হাগিরে কখনও উপগ্রাম্য লাভ করে নি। সর্বশেষে উৎপাদিত নতুন জাহাজ নটকের মতই কল্লোলের সামগ্রিক অভিনয় মতকর্তে প্রকাশ্য করার মত।

এক কথায় কল্লোল সার্থক নটক।”

—সত্যজিৎ রায়

২১।৩।৫৫

মিনার্ভায় কল্লোল প্রতি বৃহস্পতিবার ও
শনিবার ডাটায় রবিবার ৩টা ও ডাটায়

সাপ্তাহিক বসুমতী



বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রেণ্ড অভিনেত্রী পদস্বাক্ষরপ্রাপ্ত ভারতীয় অভিনেত্রী
মাধুরী ডাকরে।

প্যাপোভিচ কলেন—কেন হবে না? আমি
মনে করি সেদিনের দেরি নেই। আমি মনে
করি প্রকৃত ভাল ফিল্ম চল্ললোকে যাবার পথে
অন্তরায় হবে না এবং স্বেসব চলচ্চিত্র নির্মাতা

চল্ললোকে যেতে পারবেন যারা নিজেদের
সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত করবেন। আমি
এরূপ উৎসবে বিশ্বাস করি।

মহাকাশচারীর পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজ
কোনটি—মহাকাশে যাবার প্রস্তুতি, মহাকাশে
ভ্রমণ অথবা মর্ত্যে ফিরে আসার পরবর্তী
পরীক্ষা?

আমি মনে করি সবচেয়ে কঠিন কাজ
মহাকাশ অভিযানের জন্য লোক বাছাই করা।
অবশ্য পরবর্তীকালে একাজও সহজ হবে
যাবে।

আপনি মহাকাশের ছবি তুলবার কাজ
শিখলেন কি করে?

সোভিয়েত ক্যামেরাম্যানদের কাছে আমরা
ছবি তোলা শিখেছি। তাঁদের নির্দেশে প্রথমে
আমরা মর্ত্যের চিত্রগ্রহণ ও ক্যামেরার ব্যবহার
শিখেছি, এখানে নিজের একাগ্রতা প্রমাণ
করেই মহাকাশের চিত্র তুলতে পেরেছি।

মহাকাশচারী আর চিত্রতারকার মধ্যে কোন
ল আছে কি?

আমার মনে হয় আছে। এটা হচ্ছে উদ্ভূত
নিপ্রিয়তা এবং অটোগ্রাফ শিকারীদের কাছ
থেকে আশ্রয়কার জন্য চিন্তা।

আপনি মিলিটারীর লোক—একজন
অফিসার, যুদ্ধ সম্পর্কে আপনার মত কি?

—হ্যাঁ আমি মিলিটারীর লোক। কিন্তু
আমি যুদ্ধকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি।
আমি নিজের চোখে দেখেছি যুদ্ধ মানুষের
জীবনে কত দুঃখ—কত শোক এনে দেয়। কি
করে মানুষের বাড়ির থেকে শিক্ষা সংস্কৃতিকে
নষ্ট করে। আমি শান্তির সমর্থক। আমি
চাই প্রত্যেক দেশ শান্তি ও মৈত্রীতে বাস
করুক।

আইভস সিয়াসিপি বললেন,—আমি
আপনাকে আমার নতুন ছবি দি মস্কাই এরকম
দেখাতে চাই। এই ছবিতে আমি কিছুটা
মহাকাশের বিষয় দেখিয়েছি।

এই কথাবার্তার ফাঁকে অবশ্য সকলেই
পাবেল প্যাপোভিচের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে নেন।

সুডিও থার

শ্রীলেখা মন্ডিতেন নির্বোধিত জে. এন.
সিন্‌হা প্রযোজিত, “পথে হল দেখা” ছবির
সুডিং সমাপ্ত প্রায়। জ্যোতির্ময় রায়ের
কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন
সচীন অধিকারী।

প্রোডাকশন অভিনয় করছেন—

সাবিত্রী চট্টো, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিজা
চট্টো, তরুণকুমার, জহর রায়, রেণুকা রায়,
বিপিন গুপ্ত, ভারতী দেবী, অজিত পায়,
অনু দত্ত। ভি, বালসারা ছবির সুরকার।
রাগ ফিল্মস্-এর পরিবেশনার ছবিটি মুক্তি
পাবে।

নাট্যের কথা

মুকুর সংগঠনী মৃত অগ্নি রংগমণ্ডে লক্ষ্মণ
রায় রচিত “অকেশ্বরী” ও “কামধেনু কবচ”
নামে দুটি নাটকের সঙ্কলনে একটি অনুষ্ঠান
প্রথম উপস্থাপন হইবে ৬ই আগস্ট এবং
তারপর ২০শে আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায়।
প্রথম নাটকটি করণরসাত্মক শ্বিতীয়টি হাস্যরস।
দুইটি নাটকই পরিচালনা করছেন প্রাধানন্দ
ভট্টাচার্য।

এজেন্ট আবশ্যিক

অবসর সময়ে, আমাদের উত্তম কোয়ালিটির
কসমেটিক ও ফাউন্টেন পেনসমূহ বিক্রয়ার্থে
জাসিক ১৭৬, হাইওয়ে ৩০০, ঢাকা ও
কমিশনে এজেন্ট আবশ্যিক। বিনামূল্যে সর্ভ
এবং নমুনা সেটের জন্য অর্ডার লিখুন।

METRO AGENCIES (India).
Pahari Dhiraj (B.M.W)
DELHI-6

ময়দান ফুটবলের আলোচনা

মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি টেনাটি ময়দানী ফুটবলের রূপ সত্যিই যেন বদলে দিয়ে গেল। শ্রদ্ধামাত্র দুই প্রধানের সাক্ষাৎকারই লীগের সুরকে সন্তোষে পৌঁছে দিল। পরস্পরের ব্যবধান যতই থাক না কেন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটির গুরুত্ব অসীম। এই দুই দলের ফুটবল যুদ্ধ সুন্দর ক্রীড়াকৌশলের মাধ্যমে শক্তি পরীক্ষা নয়; এ হোল একেবারে পুরোপুরি স্মার্টবিক যুদ্ধ।

চ্যারিটি অমীমাংসিত হওয়াতে খেলার শেষে দুই দলের ব্যবধান থেকে যায় সেই চার পরস্পর; কিন্তু পরোক্ষভাবে মোহনবাগান খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ড্র মোহনবাগানের মনোবল করল নষ্ট, দলীয় সংহতিতে ধরাল ভাঙন আর দূরত গতিবেগ করল স্তিমিত। চ্যারিটিতে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেবার ফলে মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা মনে হচ্ছে আত্মবিশ্বাস হারিয়েছেন। শ্রদ্ধামাত্র একটি ড্র মোহনবাগানের লীগের বিজয় অভিযানে কত প্রভাব বিস্তার করেছে তা প্রমাণিত হল মোহনবাগান-বাটা খেলার শেষে। মোহনবাগানের পুরোভাগের ছন্দছাড়া দুর্বল আক্রমণধারা বীরত্বের সঙ্গে বাটার একাদশ নওজোয়ান প্রতিহত করে ছিনিয়ে নিলেন একটি মূল্যবান পয়েন্ট।

বাটার বিপক্ষে একটা বিরট গোলের ব্যবধানে মোহনবাগানের জয়ী হওয়া উচিত ছিল। ভারতেও আশ্চর্য লাগে যে নামী দলের দামী খেলোয়াড়েরা নিশ্চিত গোলের সুবর্ণ সুযোগ একের পর এক অনায়াসে অপচয় করতে পারেন। কলকাতা ময়দানের ফুটবল হারীদের খেলার মানের কোন স্থিরতা আছে বলে মনে হয় না। ভাল খেলার আমরা প্রথম ভিভিসনের আসরে দু-চারটে গোল করলেই আজকাল জনপ্রিয় খেলোয়াড়ের আখ্যা পাবার রেওয়াজ হয়েছে। ততমানে দেখা যাচ্ছে যে বড় খেলোয়াড়েরা গ্যালারীর হাততালি কুড়ানোর কলাকৌশল-গুলি খুবই স্বল্পসংখ্যক করেছেন, কিন্তু গোলের সামনে বল পেলে তাঁরা মনে হয় গোলটি ছাড়া অন্য সবকিছুই দেখতে পান। প্রথম ভিভিসনের সাধারণ খেলোয়াড়দের কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু বড় ক্লাবের ফুটবল তারকারা গোলের এমন সুবর্ণ সুযোগের অপচয় করেন যে তাঁদের, আর ফুটবল মাঠের রাম-শ্যাম-বদর খেলার কোন পাথক্য খুঁজে বার করা সত্যিই মুশকিল হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে বিগতদিনের একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়ের অতি দুঃখের সঙ্গে কথা কয়েকটি কথা মনে পড়ে গেল। কথা



রবীন্দ্র সতেরকের ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সুইমিং পুলে লিফটারদের মধ্যে আমেরিকান সন্তরণ শিক্ষক ডঃ ও-কোনার

প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেছিলেন—ফুটবল! সে তো বাংলার মঠ থেকে এখন বিদায় নিয়েছে; এখন যেটা খেলা হয় তাকে আপনারা ফুটবল বলতে পারেন, কিন্তু তাকে ফুটবল বলে স্বীকার করতে আমাদের মন সাজা দেয় না।” সেদিন তাঁর কথাকে একেবারেই গুরুত্ব দিই নি কিন্তু আজ দেখছি সত্যি তাঁর কথা চিন্তা করার সময় এসেছে।

চ্যারিটি খেলার ইস্টবেঙ্গল দল যে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে একথা

ফিরেছে বটে, কিন্তু এই ড্র লীগের যুদ্ধে আবার তাদের আশার আলো দোখায়ছে। এখনও তাদের সঙ্গে মোহনবাগানের ব্যবধান কম নয় বটে, কিন্তু অনুপ্রাণিত ইন্ডিয়ান লাইফ সোসাইটির সুইমিং পুলে লিফটারদের মধ্যে আমেরিকান সন্তরণ শিক্ষক ডঃ ও-কোনার

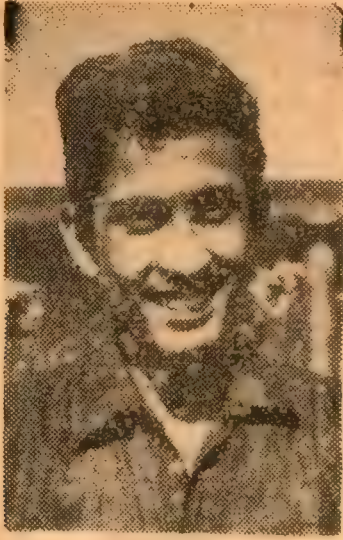
প্রীতিমিতাভ

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবে। মোহনবাগানের ব্যর্থতার পুরোপুরি সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। সেইজন্য প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করে তাঁরা সফল হয়েছিলেন এবং তাঁরা জয়ী হলে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকত না। ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগের খেলোয়াড় পরিমল দের আক্রমণধারা রচনার প্রয়াস উচ্ছ্বাসিত প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর সতীর্থেরা যদি পরিমলের সঙ্গে সমান ভালে পা ফেলে চলতে পারতেন তবে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু মানে, একটি গোল, তাঁদের ভাগ্যে নিশ্চয় জুটত। ইস্টবেঙ্গল মোদিন একটিমাত্র পয়েন্ট সংগ্রহ করে তাবুতে



মডেরকা ফুটবল

কুরালামপুতের মডেরকা ফুটবল প্রতি-
যোগিতায় ভারতীয় দল প্রেরণের প্রস্তুতি
চলছে। এই প্রস্তুতিপর্বের প্রথমে সুরু
হবে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প। ট্রেনিং ক্যাম্পের
আয়োজন করা হয়েছে বোম্বাইয়ে। বাংলার ও
বিভিন্ন রাজ্যের তেত্রিশজন খেলোয়াড় এই
ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করবেন। নির্বাচিত
খেলোয়াড়দের ২৫শে জুলাইয়ের মধ্যে
বোম্বাই উপস্থিত হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া
হয়েছে। মডেরকা প্রতিযোগিতা সুরু হচ্ছে



যামর। আরও আকর্ষণীয় কোন কিছু দেখার
আশা রাখতে পারি।

ইস্টবেংগল এই মাসের শেষে আবার
মিলিত হবে মোহনবাগানের সঙ্গে। এবার
ইস্টবেংগল নিজেদের মাঠে খেলার সুযোগ
পাবে। এই খেলার ওপরই নির্ভর করছে
অনেকাংশে ১৯৪৫ সালের লীগের ভবিষ্যৎ।

চারিটির পর দুটো খেলাতেই ইস্টবেংগল
সহজেই পুরো পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।
গ্রায়ারকে তারা পরাজিত করেছে ০-০
গোলে। এই গ্রায়ার দলের কাছেই প্রথমে
ইস্টবেংগল হেঁচট খেয়েছিল। কারণ প্রথম
খেলায় গ্রায়ার ছিনিয়ে নিয়েছিল একটি
মূল্যবান পয়েন্ট। ময়দান ফুটবলের ডার্ক
হর্স জর্জ টেলিগ্রাফ ইস্টবেংগলের কাছে
০-১ গোলে পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু
শেষ পর্যন্ত তারা বন্ধ করেছে প্রাণপণে।
এই খেলায় ইস্টবেংগলের স্বিতীয় গোলটি
নিজে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকের
মতে গোলটি নাকি অফসাইড থেকে দেওয়া
হয়েছিল। এই স্বিতীয় গোলটি না হলে
খেলার ফলাফল কি হত বলা শক্ত; কারণ
তখন পর্যন্ত খেলার ফলাফল ছিল ১-১।

মহামেডান স্পোর্টিং দল কিন্তু কোন
বাধা না পেয়েই এগিয়ে চলেছে। মহামেডান
দল রক্তক্ষয়কে পরাজিত করেছে ২-০
গোলে এবং বাগীপ্রতিভা দলকে ১-০
গোলে। মহামেডানের মত লীগের ওপর-
হলের দল ইস্টার্ন রেলও গুটি গুটি করে
বেশ চলছে। ভারত জর্জ টেলিগ্রাফকে
পরাস্ত করেছে ২-০ গোলে এবং উয়াড়ীকে
১-০ গোলে। মহামেডান স্পোর্টিং এবং
ইস্টার্ন রেলও লীগের আকাঙ্ক্ষিত
স্বত্বটির অনেক দূরে।



রন ক্লাক

১৪ই আগস্ট থেকে। ট্রেনিং ক্যাম্পের পর
আগস্ট মাসের স্বিতীয় সপ্তাহেই চূড়ান্ত
দল মনোনীত হবে।

কলকাতার আমেরিকান কোচ

আমেরিকার খ্যানানা সন্তরণ কোচ জন
রবার্ট ও-কোনোর কলকাতায় এসেছিলেন
শিক্ষাদানের জন্য। রবার্ট সন্তরণের ইন্ডিয়ান
লাইফ সোভিৎ সোসাইটির সুইমিং পুলে
তিনি স্থানীয় সাঁতারুদের সন্তরণ শিক্ষা

দেন। ও-কোনোর ন্যায় আন্তর্জাতিক
খ্যানাসম্পন্ন কোচের কাছে শিক্ষা গ্রহণের
জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়।
শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থী ছাড়াও বহু
দর্শকের সমাগম হয় তাঁর শিক্ষাদান প্রত্যক্ষ
করার জন্য।

কলকাতার শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে মাত্র
কয়েক ঘণ্টা শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।
কিন্তু ও-কোনোর মত কোচের কাছ থেকে
এই স্বল্প সময়ের শিক্ষা পাওয়ার মূল্যও
অনেক। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাঁতারে অগ্রগণ্য
বাংলাদেশের বহু তরুণ সাঁতারু উপযুক্ত
শিক্ষালাভের সুযোগ পেলে আন্তর্জাতিক
আসরেও অবতীর্ণ হতে পারেন। কিন্তু
সাঁতারের উন্নতির জন্য প্রয়োজন আরও
কিছু বেশিদিনের শিক্ষাদান।

আমাদের বাংলাদেশে উপযুক্ত কোচেরও
সত্যি অভাব। আমাদের বাংলার সাঁতারের
ক্ষেত্রে যে-সমস্ত কোচ আছেন তাঁরা সাধারণ
একটি স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের ক্ষমতা
রাখেন, কিন্তু একজন শিক্ষার্থীকে আরও
উঁচুতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করার ক্ষমতা
ঠিক তাঁদের নেই। আমেরিকান কোচ
ও-কোনোর সেই সত্য অতি অল্প সময়ের
মধ্যেই উপলব্ধি করেছেন। তাঁর মতে আমাদের
এখানে সাবেকী ধরণে শিক্ষাদানের প্রথাকে
ছাড়তে হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা-
দানের কথায় তিনি বেশি জোর দিয়েছেন।
তিনি আমাদের কোচদের এই বিষয়ে জ্ঞান
অর্জনের পরামর্শ দেন। ডঃ রবার্ট ও-কোনোর
সন্তরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁর
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। বর্তমানে সাঁতারে
আমেরিকা পৃথিবীতে কিভাবে প্রথম সারিতে



ক্যাম্পের কোচ



মোহনবাগান-ইস্টবেংগল চ্যারিটি খেলার পরিমল দের একটি সূক্ষ্মর প্রচেষ্টা বার্থ করছেন মোহনবাগান গোলরক্ষক পি বর্মন

স্থান পেয়েছে তা তাঁর আলোচনার পর বোঝা যায়। আমাদের দেশের সেই স্থানে পৌঁছতে অনেক দৌর, কিন্তু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি।

সম্রাটের দর্শন

অসম্ভাব্যে অন্তর্স্থিত একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার দূরপাল্লার দৌড়বার দশ হাজার মিটার দৌড়ে স্বাধীন বিশ্ব রেকর্ড ভংগ করেছেন। ২৭ মিনিট ৩১.৪ সেকেন্ডে দশ হাজার মিটার অতিক্রম করে তিনি নতুন রেকর্ডটি স্থাপন করেন, তাঁর পুরাতন রেকর্ড ছিল ২৮ মিনিট ১৪ সেকেন্ডের।

বিশ্ব হেভীওয়েট মল্টিব্লেশ চ্যাম্পিয়ান ক্যাসিয়াস মহম্মদ আলি ক্রে বলেন যে, পরবর্তী লড়াইয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন ক্রয়েড প্যাটার্সন অথবা জর্জ স্কেলো। কয়েক মাস পূর্বে ফিরতি লড়াইয়ে নক

আউটে পরাজিত করেন সোনি লিস্টনকে। বিভিন্ন দেশের সরকারের আমন্ত্রণে, তিনি প্রদর্শনী মল্টিব্লেশের জন্য শীঘ্রই ইউরোপ এবং দূরপ্রাচ্য সফরে যাবেন।

মেক্সিকো আমেরিকা জোনের ডেভিস কাপের সেমি-ফাইনালে ৫-০ খেলার ব্যবধানে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে ফাইনালে আমেরিকার সঙ্গে খেলার বোগ্যতা অর্জন করেছে। মেক্সিকো এবং আমেরিকার ফাইনাল খেলাটি অন্তর্স্থিত হবে টেনিসের ডাবলসে ৩১শে জুলাই থেকে।

জ্যামাইকার কিংসটনে অন্তর্স্থিত একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমেরিকার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান মহিলা দৌড়বার উইমা টিমস ১০০ গজ দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেছেন। ১০.০ সেকেন্ডের

এই বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ার মারলিন স্মাথুস ১৯৫৮ সালে সিডনিতে।

ফুটবল খেলোয়াড় প্রদর্শন

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা, ইস্টবেংগলের বিপক্ষে খেলেছে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্শ খেলাটি হয়ে উঠেছে সজীব এবং প্রাণবন্ত, উত্তেজনার সমবেত দর্শকেরা অধীর। লীগে ইস্টবেংগলের দুরন্ত গতিবেগের সম্মুখে একে একে নতিস্বীকার করেছে একটির পর একটি দল, কিন্তু স্পোর্টিং দলের তরুণ বীরেরা রুখে দাঁড়িয়েছে। ইস্টবেংগলের সুনিপুণ আক্রমণের ডেউ একের পর এক নিখুঁতভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছে স্পোর্টিং দলের তরুণ গোলরক্ষক কমল সরকার। তাঁর অনবদ্য ক্রীড়াচাতুর্ঘ্য দেখে মনে হল যেন তিনি

দাপ্তরিক বসুমতী

কর্তব্য; মনে হতে লাগল পাতলা ছিপছিপে এই গোলরন্ধক কোন যাদুমন্ত্রবলে আগলে রেখেছেন তাঁর গোল সীমানা। পরদিন দেখা গেল প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই কমল সরকারের প্রশংসায় মুগ্ধ। কেউ কেউ লিখলেন ইস্ট-বেঙ্গল বনাম কমল সরকারেরই খেলা হয়েছে। অবশ্য সেদিন শেষ মুহূর্তের গোলে ইস্ট-বেঙ্গল দুটি পরেট সংগ্রহ করেছিল। এর পর আরও কয়েকটি খেলায় উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে কমল সরকার অল্প বয়সেই হয়ে উঠলেন ময়দান ক্রীড়ামোদী-মহলে যথেষ্ট পরিচিত এবং জনপ্রিয়।

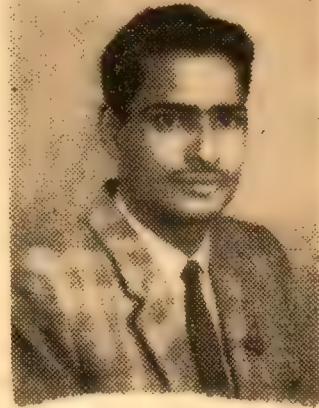
একজন গোলরন্ধকের দায়িত্ব অসীম, নামান্য ভুলের মাশুল তাকে দিতে হয় গোলের দুলো। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণভাগের দাবি দোষী হতে হয় গোলরন্ধককে। একজন গোলরন্ধকের ভাগ্যে খ্যাতির আশ্বাদ পাওয়া খুব সহজ নয়, কিন্তু সামান্য কারণেই বদনামের বোঝা মাথায় এসে পড়তেও দেয় হয় না। সেইজন্য প্রতিটি গোলরন্ধকের নিবিড় বোকাগড়া থাকার অত্যন্ত প্রয়োজন রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের সঙ্গে। তাই একজন জাত-গোলরন্ধক হবেন মজারের ন্যায় ক্রিপ্ত, দৃষ্টি হবে শোনসম আর থাকবে সাহস এবং উপস্থিত ব্যুধির সাহায্যে বিশদ এড়াবার ক্ষমতা। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, এই সমস্ত গুণগুলিকে সাধী করে গোলরন্ধক কমল সরকারের ফুটবল মাঠে আগমন। এই কলকাতার কমল সরকারের জন্ম ১৯৪১ সালে। বাবা শ্রীঅমল্যরতন সরকার এবং মা শ্রীমতী মনোরমা সরকার ছোটবেলা থেকেই কমলকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। তবে প্রথম থেকে তাকে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য এবং উৎসাহ দিয়েছেন স্বর্গত বড়দাদা শ্রীসন্তোষ-চন্দ্র সরকার।

ফুটবলের দূর্বীর আকর্ষণ ছোটবেলায় কমলকে টেনে নিয়ে গেল ম্যাড্রাস স্কোয়ারের মাঠে। সেখানেই তাঁর ফুটবলের হাতেখড়ি হল ম্যাড্রাস বয়েজ ক্লাবে, সূর্যতে কিন্তু রাইট আউটের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এদিকে কমল সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্কুল-জীবন সূর্য করে দিয়েছেন সাউথ সুদার্বন স্কুলে। এরপর রাইট আউটের স্থান ত্যাগ করে কমল নিলেন গোলরন্ধকের দায়িত্ব। অল্প সময়েই গোলরন্ধক হিসাবে যথেষ্ট দক্ষতা দেখালেন এবং স্কুলদলে অতি সহজেই নিজের স্থান করে নিলেন।

তাঁর খেলোয়াড়ী-জীবনের জয়যাত্রা সূর্য ১৯৫৭ সালে, সেবার বাংলা স্কুলদলের পক্ষে কমল মনোনীত হলেন। এইসময়

ময়দানের আসরে তাকে খেলতে দেখা গেল ওয়াই, এম, সি-এর (চৌরঙ্গী) পক্ষে। ১৯৫৮ সালে এসে বোম্ব দিলেন স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলে। পরের দুটি বছর নিয়মিত ভাবে স্পোর্টিং ইউনিয়নের গোলরন্ধা করলেন। ইতিমধ্যে কমল স্কুলের সীমা অতিক্রম করে প্রবেশ করেছেন আশুতোষ কলেজে। আশুতোষ কলেজ দলে গোলরন্ধকের দায়িত্ব পড়ল কমলেরই ক্ষেত্রে এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সে দায়িত্ব তিনি পালন করলেন, ১৯৫৮ সাল থেকে ৬৪ সাল পর্যন্ত দলকে বিভিন্ন ট্রফি জয়ে সাহায্য করলেন। অবশ্য মাঝখানে ১৯৬২ সালে যাদবপুর পলিটেকনিকের পক্ষে জয় করলেন ইলিয়ট শীল্ড।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলে স্থান পাবার সুযোগ তাঁর হয় ১৯৬০ সালে। পূর্বাঞ্চল বিজয় সমাপ্ত করলেন গোলরন্ধপূরের মাঠে। এরপর সেমি-ফাইনাল আর ফাইনাল খেলতে হল জম্মলপুর এবং নাগপুরে। জম্মলপুরের সঙ্গে কলকাতার সেমি-ফাইনাল খেলাটির কথা বলতে বলতে তাঁর দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন যে, এই খেলাটিই তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয়



কমল সরকার

খেলা: আরও বললেন যে, সর্বাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল বিজয়ী হিসাবে সেবার আশুতোষ ট্রফি জয় করে কলকাতাতে আনেন তাঁরাই।

ময়দান ফুটবে ১৯৬১ সালটা তাঁর কাটল খিদিরপুর ক্লাবে। ১৯৬২ সালে এসে বোম্ব দিলেন জর্জ টেলিগ্রাফ দলে। তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া জর্জ টেলিগ্রাফ সেবার লীগে বহু গুণট-পালট ঘটাল: সেই giant killer দলের গোলে অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে খেললেন কমল।

নিরপেক্ষ মতামত গ্রহণ করলে নিঃসন্দেহে সেবার কমলকে বাংলার শ্রেষ্ঠ গোলরন্ধকের আখ্যা দেওয়া যেত। বাংলা দলের ট্রায়ালে ১৯৬১-৬২ সালে তাকে আহ্বান জানান হয় বটে, কিন্তু তখন ছোট ক্লাবের খেলোয়াড় বলেই বোধ হয় তাঁর ভাগ্যে বাংলা দলে স্থান লাভের সৌভাগ্য হয় নি। আমরা আমাদের দেশের খেলাধুলার উন্নতির জন্য বড় বড় প্ল্যান করি, লম্বাচওড়া বুলি আওড়াই, কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ। খেলার উন্নতি হইবে কিভাবে যদি তরুণ খেলোয়াড়েরা তাদের খেলোয়াড়ী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে স্বীকৃতি না পায়। খুবই দুঃখের কথা যে কমল, সরকারের মত সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়কে তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়ে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি না দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাঁর মধ্যে অক্ষুরিত সম্ভাবনার বীজটি।

বাংলা দলে স্থান লাভ করা তাঁর ভাগ্যে হল না বটে, কিন্তু গুণের সমাদর করলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। তাদের সাদর আহ্বানে কমল এসে বোম্ব দিলেন ১৯৬০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে নিয়মিত খেললেন ১৯৬১ এবং ৬৪ সালে। দিল্লীর ডুরান্ড আর রোভার্সের আসরেও ঘুরে এলেন ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে। কলকাতার কোচদের মধ্যে শ্রীরমণী সরকার, শ্রীঅমল দত্ত ও শ্রীশৈলেন মামার কাছে তিনি সত্যি কৃতজ্ঞ। এই মরশুমে কমল মোহনবাগানে এসে বোম্ব দিয়েছেন। মোহনবাগানের পক্ষে ময়দানে প্রথম আবির্ভাবের বাটার বিপক্ষে যে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করতে হয়। মোহনবাগানের পক্ষে যে কটি খেলায় তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন তাতে তাঁর খেলা দেখে মনে হচ্ছে তিনি আরও অগ্রসর হবেন।

বর্তমানে তিনি রিজার্ভ ব্যাংকের কর্মী, সেখানে বোম্ব দিয়েছেন ১৯৬০ সালে। শূন্য ফুটবেই নয় অন্যান্য খেলাতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী। গত তিন বছর তিনি রিজার্ভ ব্যাংকের এ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ান। ক্রিকেট খেলেন মিত্রীয় ডিভিশনে স্যার গুরুদাস ইনস্টিটিউশনের এবং অফিস লীগে রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে। কমল সরকারের কারম, টেবল-টেনিস আর ব্যাটমিন্টন খেলা দেখলেও অবাক হতে হয়। অবসর সময়ে সমাজ সেবার কাজেও তিনি আছেন, কলকাতার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান মহানগর পরিষদের একজন সক্রিয় সদস্য হলেন কমল সরকার। আমরা তাঁর খেলোয়াড়ী-জীবনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

॥ সুজীৱন ॥

বিষয়	লেখক...	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৫৭৯
আজকের মানুষ	...	৫৮০
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	— হরপ্রসাদ মিত্র	... ৫৮১
ভারতদর্শন	...	৫৮৩
আন্তর্জাতিক	...	৫৮৫
স্বপ্নের আলো (গল্প)	— দিলীপ মিত্র	... ৫৮৯
বাণিজ্য সেকাল ও একাল	— ধনপতি সওদাগর	... ৫৯২
গ্রামবাংলার কথা	— পারুল ভট্টাচার্য	... ৫৯৪
বঙ্গদর্শন	...	৫৯৭
উপছায়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নরেন্দ্রনাথ মিত্র	... ৬০১
জাল-জোচ্চুরি-ঊগবাজির সেকাল আর একাল	— অশীশ বর্ধন	... ৬০৩



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মঙ্গলিকমী

প্রেমের অঙ্গকনিকা

জ্ঞানের আকাশগঙ্গা

বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাশেষ আর নাই

চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ

মূল্য পনের টাকা

যে জ্ঞান-স্বর্গের সর্বতোমুখী প্রতিভার
কিরণচ্ছটার ভারত-মহিমা চিত্র-ভাস্বর—
সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও
মনোহার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত
বাস্মাকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঘালা
সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধ-
মালা, শিক্ষাসম্বন্ধ, সমাজসংস্কার নিবন্ধ-
রাশি, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী মাত্র ১।।০

নীলাচলে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীপোরাজ ও প্রকৃষ্ণ

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

মূল্য দুই টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ব্লক, কলিকাতা-১২

সুচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শহর কলকাতা	— শ্রীপদাতিক	১১ ৬০৬
বৈত অধ্যায় (কবিতা)	— কৃতী সোম	১১ ৬০৮
আধারমানিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১১ ৬০৯
গ্রন্থমেলা	— জয়ন্তী সেন	১১ ৬১৪
সবার অলঙ্কার	— ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়	১১ ৬১৫
ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপ	— নরেন ভট্টাচার্য	১১ ৬২০
চার্লস চ্যাপলিন	— অশোক সেন	১১ ৬২৬
রঙ্গজগৎ	—	১১ ৬২৯
রঙ্গমঞ্চ — ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১১ ৬৩৪
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	১১ ৬৭০

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌতুভরত, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা
সদন মহাপবিত্রে ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদভ্যুতর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণভক্তের জন্য যে
উৎকর্ষ, এই 'প্রলাপে' তাহার অভিব্যক্তি।
শ্রীমদভ্যুতর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক
শ্লোক' তাহার একমাত্র রচনা। শ্রী
কৃষ্ণদাস গোস্বামীর মূললিখিত পঞ্চানুবাদে
এই অমিয় মাদুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য
ভক্তিরিত্যমুত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমহল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস
বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপৃজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-
সিদ্ধান্ত সাধন-ভক্তনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

ঋচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত
সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার সুযোগ্য শিষ্য
পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসেব মূললিখিত
পঞ্চানুবাদ।

পাশুপদলন

শ্রীমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর
বিরচিত প্রেমভক্তির লহরী-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটিপত্তন, শ্রীশ্রীশুক-বন্দনা, নামসংকীর্ণন
চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের তট্টোস্তর
শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি
চন্দ্রিকা। মূলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৩ টাকা।

প্রখ্যাত কথাকিশোরী

শ্রীরামপদ যুগোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৫ টাকা

গিরীন্দ্রমোহন দেবীর

গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

বিগতকালের বরণ্য সাহিত্যস্রষ্টা

ত্রৈলোক্যনাথ যুগোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

ফোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম,
ভ্রমরচরিত।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

ভূত না মাহুয়, কঙ্কাবতী, বিজার গল্প,
মুক্তামালা

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বনুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২



৭০ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা—মূল্য ২৫ পা
বৃহস্পতিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

Price : 25 Paise
Thursday, 5th Aug., 1965

ট্রাম কোম্পানি : সরকার : আকাশবাণী

ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ৩০শে জুলাইয়ের হরতাল সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তা' দেশেও আমাদের সরকার সচেতন নন। বরং কোম্পানির পক্ষেই তাঁরা স্বাধীন দেশের জনকল্যাণকামী একটি সরকার কিভাবে বিদেশী মালিকানাধীন জন্য এমন ওকালতি করতে পারেন, তা কল্পনার অতীত।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে আর একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে—তা হচ্ছে কলকাতা বেতার কেন্দ্র। ঐ কেন্দ্র থেকে এবার যেভাবে স্থানীয় সংবাদ প্রচার করা হয়েছে—তা সর্বোৎকৃষ্ট মিত্যা হলো চলে। বিশেষত ২৯শে জুন রাত্রির সংবাদ-বোম্বাশার বলা হয়েছিল যে, কলকাতায় লব ঠিক হ্যায়। অর্থাৎ কোনো গোলমাল নেই, ট্রামবাহনীর বাড়তি ভাড়া দিয়ে ট্রামে বসে নিশ্চিন্তে বিহার করছেন। প্রচারিত এই সংবাদ অসত্য, একবার প্রমাণ তাঁরাই পেয়েছেন সেরি বারী উত্তর কলকাতা অভিমুখে গেছেন কিংবা ট্রামে বাড়তি ভাড়া দিতে সত্যিকার বাহনীদের অস্বীকার করতে দেখেছেন। হ্যাংলিন রোডেও ওপর তিন-চারখানি ট্রাম পড়ে গেল, সে সংবাদও আকাশবাণী রাখেন নি। কেবল অসত্য সংবাদ প্রচার কবে তাঁরা জনসাধারণকে আরও অসুবিধার কেলোছেন।

আমরা ট্রাম পেড়ানো বা ইন্ট-পার্টকেল ছোড়ার সমর্থন করি না। কেন না ঐভাবে মধ্য উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যায়। আনন্দের কথা, আন্দোলনকারীরা বা ছাত্ররা এবার অত্যন্ত সংযতভাবেই এগিয়ে গেছেন। তাঁরা ট্রাম বর্জন করতে বলেছেন ও বাড়তি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কোথাও কোথাও যে অঘটন ঘটেছে (যেমন ২৯শে জুলাই-এর ঘটনাসমূহ) সেই সত্যটাকে বোম্বালম চেপে গিয়ে আকাশবাণী কলকাতা—জনসাধারণকে কোন মন্থিকারে বিভ্রান্ত করেছে, তার মদ্রব্য আমরা আশা করি। এই ব্যাপার

কেউ অস্বীকার করবেন না যে, সত্য কথা তাঁরা না কলোও, অসত্য কলার অধিকার তাঁদের নেই। আকাশবাণীর সংবাদ প্রচারের ইতিহাসে এই অসত্য প্রচারের ঘটনা নতুন নয়।

সরকার পক্ষের প্রচার বাই হোক না কেন, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি করা উচিত কিনা—এটাই এখন বড় প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রী প্রিপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন ট্রাম কতৃপক্ষের ব্যালান্স শীট দেখে ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষেই বাগ দিয়েছেন। ট্রাম বর্জনের আন্দোলনকেও তিনি রাজনীতিকদের আন্দোলন বলে শাসিয়েছেন।

ট্রাম কোম্পানির কাঁড়কারবানা দেখে মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞতা জনদরবার এই ধরনের কথাবার্তার আমরা সতি দুঃখিত। ট্রাম কোম্পানি নির্বাচনের দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণের ওপর উপদ্রব করে চলেছে—এই কথা আমরা মাসাধিক কাল আগেও (২৪শে জুন '৬৫) আমাদের সম্পাদকীয় মারফৎ জানিয়েছিলাম। সে সময় ভাড়া বৃদ্ধির কথা ওঠে নি এবং আমাদের বক্তব্য সে সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কানে পৌঁছেছিল কি না তা আমাদের জানা নেই। শুনলে নিশ্চয়ই তিনি ট্রাম কোম্পানির নির্বাচন থেকে বাতী-দের রক্ষা করতেন। যা হোক, তা তিনি শুনেন বা না-ই শুনেন, কোম্পানির কথায় তিনি এবার এগিয়ে এসে তাঁদের পক্ষে সাহা দিয়েছেন এবং কোম্পানির জিৎ বজায় রাখার জন্য রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন। এই পুলিশের জন্য যে ব্যয় হয়, তাও এই জনসাধারণকেই বহন করতে হয়। জনসাধারণের অর্থে ট্রাম কোম্পানির স্বার্থ বজায় রাখা হলতো জনপ্রতিনিধিমূলক সরকারের পক্ষেই সম্ভব। আর বৈহিসাবী ধর-পাকড়ের কোয়ার ডি আই মুলের অপপ্রয়োগও লক্ষ্য করার মত।

আমরা এখনও অনুরোধ করি, কোনও ভদ্রত কমিশনের দ্বারা ট্রাম কোম্পানির

ব্যালান্স শীট পরীক্ষা করানো হোক। যারা ব্ল্যাকমার্কেট করে তারাও সাধু ব্যবসায়ী সঙ্গে ব্যালান্স শীট তৈরি রখে, যারা কালো টাকার পাহাড় লুকিয়ে রখে তারাও প্রকাশ্যে ভালমানুষ সঙ্গে ব্যালান্স শীট বাড়িয়ে দেখ—সেই ব্যালান্স শীটের মাহাত্ম্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর অস্তত অজানা নয়। বিদেশী ট্রাম কোম্পানিটির ব্যালান্স শীটের ওপর আমরাও আস্থাশীল নই। কারণ মুনাকার খন লুণ্ঠন করে স্বদেশে চালান দেওয়াই তাদের মূলধর্ম। তাদের হিসেব-পত্রের আসল খবর অপ্রকাশ্যই থাকে। তবুও দশ মাসের মধ্যে সুযোগ পেয়ে তারা দু'বাব ভাড়া বৃদ্ধি করেছে। অল্প ছাত্তরীকরণ তহবিলে এক পরসাত জন্মা দেয় নি এবং রিজার্ভ ফান্ডে যে পরিমাণ অর্থ জমা রাখা হয়—তা হাস্যকর। ১৯৭১ সালের পব বিদেশী ট্রাম কোম্পানি এদেশ থেকে বিদায় নিলে দেখা যাবে রিজার্ভ ফান্ড প্রাণ খালি। স্বভাবতই সরকার তখন ভাড়া বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবেন অথবা ট্রামগুলিকে নিলামে চড়তে হবে। কিন্তু কলকাতার ট্রামগুলি কেনার মতো তখন কাউকে পাওয়াও অসম্ভব ব্যাপার।

এই কারণে জনসাধারণের দুঃস্থ দশায় সঙ্গে সরকারের ভবিষ্যৎ দুঃশাও আজ হিসেব করতে হবে। ট্রাম কোম্পানিটি দীর্ঘকাল ধরে ফাঁকির যে ব্যবসা সুরু করেছে, তার প্রতিবিধান না করে তাদের পক্ষে ওকালতি করা জনস্বার্থের পক্ষে একান্তই অকল্যাণকর।

সম্পাদকীয়

অডওয়ার্ড হিথ

মহান ইতিহাস সৃষ্টি হল ব্রিটেন, আর সে-ইতিহাসেব প্রথম নায়ক হলেন এডওয়ার্ড হিথ। এখানকার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল কনজারভেটিভ পার্টি, তার নেতাপদের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় নি এতকাল। কিন্তু স্যার আলেক হিউম যখন ন্যাটকৌশলভাবে নেতৃপদ ত্যাগ করলেন, অপরিহার্য হয়ে পড়ল নির্বাচন।

সে নির্বাচনও আবার যেমন-তেনমন নয়, কনজারভেটিভ এম-পিদের দক্ষুন্নমতো সমস্যায় পড়তে হয়েছিল, কার গলার মালা পরাবেন তাই নিয়ে। সমস্যা এজন্যে যে যোগ্যতার দিক থেকে দু'জন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীই প্রায় সমান, জনপ্রিয়তার দিক থেকেও কেউ কারও চেয়ে কম বানি না। এর ওপর আবার তৃতীয় ব্যক্তিরও আবির্ভাব ঘটল রংগমঞ্চে, কিন্তু তাতে প্রথম দু'জনের মধ্যে কার শাঙ্গা ভারী হলো ভাব্যমানী করা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এডওয়ার্ড হিথ, রোজিনাল্ড মর্ডলিং আব এনক পাওয়েল। শেষোক্ত ব্যক্তিকে বাদ দিলেও হিথ-মর্ডলিং প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন জন-সাধারণের সাগ্নহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তেমনি সৃষ্টি করেছিল উত্তেজনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গোপন ব্যালটে মিঃ হিথ পেয়েছেন ১৫০ ভোট, মিঃ মর্ডলিং ১০০ ভোট আর মিঃ পাওয়েল ১৫ ভোট। শেষ মুহুর্তে মিঃ পাওয়েল এবং মিঃ মর্ডলিং দু'জনেই অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তাদের নাম প্রত্যাহার করেছিলেন।

মিঃ হিথের নির্বাচনে যোগ্যতার বাড়িই যে পুরস্কৃত হলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ব্রিটেনকে যদি ইউরোপের মধ্যে স্থান নিতে হয়, যদি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার মধ্য দিয়ে ব্রিটেনকে তার ঘর গুছোতে হয়, তবে, দেশকে বর্তমান অক্সধায় সে নেতৃত্ব দিতে একমাত্র হিথই পারবেন। কারণ ব্রিটেনের সামনে ইউরোপের লোহফটক বোলায় জন্মে মিঃ হিথই ছুটে গিয়েছিলেন, চমককার যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন গ্রোসেলস-এ কমন মার্কেটের সদস্যবান্ধ প্রতি-নিধিসের কাছে। মিঃ হিথের অতীত কর্মাবলীই তার সামলার চাবিকাঠি।

একদিক থেকে অবশ্য মিঃ হিথের নির্বাচনে কিস্কয়ের কিছু নেই। স্যার আলেক হিউমই তার জন্যে পথ পরিষ্কার করে রাখাছিলেন। জায়া মিনিসভার মিঃ মর্ডলিকে পররাষ্ট্র দপ্তর থেকেরা-হয়েছিল কিন্তু মিঃ হিথকে প্রমিক সরকারের অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিরোধিতার সুযোগ দিয়ে তার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে

দিয়েছিলেন। গত তিন মাসে মিঃ হিথ যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তার বিজ্ঞ কল্পের মাধ্যমে তাতেও তার নির্বাচন একরকম সুনিশ্চিত ছিল। ব্রিটেনের অধিকাংশ সংবাদপত্রের মতও ছিল যে, প্রমিক সরকারকে যুগ্মে হলে বিরোধী দলের চাই মিঃ হিথের মতো জবরদস্ত লোকের নেতৃত্ব।

এডওয়ার্ড হিথের যোগ্যতার পরীক্ষা বহুবাব হয়ে গিয়েছে। ফিনালস বিল নিয়ে পার্লামেন্টে যে বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল তা কি সম্ভব হত মিঃ হিথের মত শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান লোক যদি তার বিরোধিতা না করতেন? কখনও সূক্ষ্ম যুক্তিবাণ দিয়ে, কখনও বা বাণ-বিদ্রোহ করে নায়েহাল করে ছেড়েছিলেন তিনি প্রমিক সরকারকে ফিনালস বিল বিতর্কের সময়।



এডওয়ার্ড হিথ

এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে হিথের জন্ম, হ্যারল্ড। ম্যাকমিলান কিংবা স্যাব বাটলারের কৌলীনি নেই তার বংশের, কিংবা স্যার হিউমের আভিজাত্য। কিন্তু ঠেকে-শেখা মান্দব হিথ, Selt made man. রাজনীতি করার শখ ছাত্রাবস্থা থেকেই, অল্পকোড়ে যখন বিতর্কে অংশ নিতেন তখন থেকেই। বিবিতার বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সেই দুর্ভাগ্যপূর্ণ মুহুর্তগুলি হিথের জীবনেও উত্তেজনা বয়ে এনেছিল, চেম্বারলেনের তোষণ-নীতিবা কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তরুণ হিথ।

কিন্তু তখনো সক্রিয় রাজনীতির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন নি হিথ, তার আগে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে হবে যে নাবসী আক্রমণ থেকে। ইচ্ছা যোগ দিলেন হিথ,

রাজকীয় গোপনদায় বাহিনীতে লেফটেন্যান্ট-কর্নেলের পদ নিয়ে।

যুদ্ধ শেষ হলে হিথকে আর আটকানো গেল না, যে বীরের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড যুদ্ধ জয় করেছে তার দল ছাড়া আর কোন মতোই বা তিনি যোগ দেবেন। তাই চার্চিলের পদপ্রাপ্তে রাজনীতির শিক্ষা নিতে লাগলেন হিথ, কিন্তু বরাবরই নিজের ব্যক্তিগত এবং মৌলিক অক্ষুর-রেখে। ১৯৫০ সালে প্রথম সুযোগ এল তার কাছে, নামমাত্র ভোটাধিক্যে হিথ নির্বাচনে জয়ী হলেন; এম-পি হলেন। আর কমপক্ষে তার প্রথম বক্তৃতাই প্রমাণ করল কি বাড়তে তিনি গড়া, তার চিন্তাধারার স্বকীয়তা পড়ল ধরা।

প্রথমে প্রধানমন্ত্রী স্যার ইডেনের আমলে দলের সহকারী হুইপ ও পরে ১৯৫৫ সালে প্রধান হুইপ হলেন হিথ। পরের বছরে সুয়েজ সঙ্কটের সময় হিথের আরও গুরু প্রকাশ পেল। মিঃ ম্যাকমিলান তাঁকে মন্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদা দিলেন—প্রমমন্ত্রী। তার কিছুকাল পরে তিনি আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন পররাষ্ট্র দপ্তরে। এ দপ্তরে থেকেই মিঃ হিথ কমন মার্কেট প্রসঙ্গ আলোচনা করার সুযোগ পেলেন আর সেই বিতর্কেই তো ঘটল তার পূর্ণ প্রকাশ। গ্রোসেলস থেকে হিথকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল সত্যি কথা, কিন্তু ইংল্যান্ড তাঁকে বীরের অভ্যর্থনা দিয়েছিল, জাতির নেতার আসন পেরিয়েছেন সেদিন হিথ।

ওয়েস্টমিনস্টারের কাছেই অবিবাহিতদের জন্যে নির্দিষ্ট স্ন্যাটে মিঃ হিথ থাকেন। তার মতবাদ স্পষ্ট, বাচনভঙ্গী ব্যক্তিগত। গত সাধারণ নির্বাচনে তার ওপর ছিল দলের প্রচার ভার, টেলিভিশন স্টুডিওয়ের তার ঘরটি কলেবর কে না দেখেছে? হিউম মিনিসভার বোড অফ ট্রেড দপ্তরে থেকেও তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

স্যার হিউম পেবে উঠছিলেন না বুদ্ধিমান সুবক্তা উইলসনের সঙ্গে তর্ক-বৃন্দে। তাই দলের অনেকেই নেতৃত্বের পাবিত্বের দাবী করছিলেন প্রকাশেই। বাস্তবিক-বাকপট, উইলসনের বিরুদ্ধে দাঁড়বার মত প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ হিথ ছাড়া দলে মিঃ আয়ান ম্যাক-লিনডকে বাদ দিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন কি না সন্দেহ। প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি খবর পর্যন্ত যেমন তিনি রাখেন, তেমনি তা উপস্থাপনার অল্পভূত কায়দা মিঃ হিথের।

প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন এতদিন প্রায় একতরফা খেলে যাচ্ছিলেন যেন কমন্স সভার মাঠে, স্যার হিউম তার সমকক্ষ ছিলেন না মোটেই। মিঃ হিথের আবির্ভাবে সে খেলা এখন দুই সমান প্রতিদ্বন্দ্বী লড়াইয়ে জমে উঠবে। আর এমনও তো হতে পারে যে, আজ যিনি কনজারভেটিভ দলের নেতৃপদ লাভ করলেন আগামী দিনে হয়তো তিনিই ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে ব্যাডটার প্রবেশাধিকার লাভ করবেন, ব্রিটেনের প্রধান-মন্ত্রী আসন অলঙ্কৃত করবেন।

সাহিত্যে দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

‘আধুনিকতা’ আর ‘সমসাময়িকতা’ যে এক কথা নহে, সে আমরা সবাই জানি। কিন্তু একালের সাহিত্যে বিবাদবোধের বিশেষ যে কোন আধুনিক পরিস্থিতির ফল, সেটা খুব সহজে বোঝবার ব্যাপার নয়। ‘স্বাসাম্য’-কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে একালের পরিণামচিন্তাহীন খণ্ডিত অস্তিত্বের বস্তুধা হরতো কতকটা বোঝা যায়। এইভাবে দেখাটাই হরতো আধুনিক ভণি, হরতো তা নয়। এ বিষয়ে মনে সন্দেহ থেকে যায়। এই অবস্থার টিফেন স্পেন্ডারের আলোচনা গড়িছিলুম কবেকদিন আগে। তিনি লিখেছেন—আধুনিক শিল্পকলা বলতে তাই বুঝিয়ে থাকে—শিল্পী সেখানে অভূতপূর্ব রূপের অবলম্বনে এবং সমুচিত ভাষার সাহায্যে আধুনিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা প্রকাশ করেন। বলেছেন—বিষয়বস্তুর চেয়ে স্টাইল এবং ফর্মের মধ্যেই—অর্থাৎ রীতি ও রূপের মাধ্যমেই এই আধুনিকতা গৃহীত বেশি ব্যস্ত হয়ে থাকে।

নিজের এই বস্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে, টেনিসন, কার্লাইল বা স্পেন্সরকে তিনি ‘আধুনিক’ বলে না মনে করেন। কেন না তাঁরা যদিও বিজ্ঞানচর্চার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং যদিও সমকালীন নানা ব্যাপারে তাঁদের খুবই উৎসাহ ছিল, তবু তাঁরা ছিলেন গ্ল্যান্সনালিজমের ঐতিহ্যে আশ্রিত—অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধির জোরে মানুষ আত্মস্থ থাকতে পারে বলে তাঁরা মনে করতেন। তাঁদের আত্মবোধ বা অহংজ্ঞানকে স্পেন্ডার বলেন ‘ভল্টেরায়র্ম’। অন্যায় অসংগতি ইত্যাদির প্রাকোপ যে-জগতে, এঁরা যেন নিজেদের সে-জগতের বাইরের মানুষ বলে মনে করতেন। বাইরে থেকে—অর্থাৎ এইরকম অন্যায়ের অঙ্গীভূত না হয়ে—তাঁরা যুক্তি আর কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ করে এই অন্যায়-অসংগতি-অসামঞ্জস্যের বিচার করতে অভ্যস্ত এবং অধিকারী বলে নিজেদের মনে করতেন। তাঁরা নিজেদের দেখতেন সেই ধারায় অবস্থিত যাকে পূর্বসাম্য ভবিষ্যৎবাণীবচনাক্ষম লেখকরা দেখা দিয়ে গেছেন। যে বিশেষ কালের দৃবন্ধনা সম্বন্ধে তাঁরা সমালোচনায় উদ্যত, তাঁরা নিজেবা যেন সে-কালের বাইরের মানুষ।

ভল্টেরায়র্ম-ভাবে এ প্রকৃতি আমার ভেবে লেখবার সুযোগ হয় নি। স্পেন্ডারের লেখাতে এই ব্যাখ্যা পেলে আধুনিক বিবাদবোধের চোরাটা মিলিয়ে দেখবার একটু সুযোগ পাওয়া গেল। স্পেন্ডার অবশ্য বলেছেন—

যে-জড়বাদী সমাজে শিল্পীদের বাস করতে হচ্ছে, সে-সমাজেব মূল্যবোধ তাঁদের শিল্পে ছায়া ফেলাতে বাধ্য। শব্দ ছায়া নয়, সেই বিশেষ মূল্যবোধেব শব্দ। তাঁদের শিল্পসৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী। ভল্টেরায়র্ম-বাস্তব-স্বাভাববাদী বাঁবা, তাঁদের অনেকেই সমাজ-তন্ত্রবাদের ভাবলম্বে প্রভাবিত হয়ে,—প্রগতিতে আস্থা রেখে, সমকালীন সমাজ-নিরীক্ষার অভ্যস্ত ছিলেন এবং তাঁরা মনে করতেন যে, সমসাময়িক এই সমাজেব সূচনা ঘটেছে ফরাসী-বিপ্লবের আমল থেকে। জড়বাদী চিন্তাধারার আধুনিকতম সূত্রগুলির সাহায্যেই তাঁরা তাঁদের নিরীক্ষার কাজটি করে গেছেন।

‘ভল্টেরায়র্ম’ অহং-এর আখ্যায়িত্য তাহলে প্রগতি-চিন্তার সঙ্গে। প্রগতি-বিশ্বাসেই তা আশ্রিত। সমালোচনা, ব্যঙ্গবিদ্যুৎ, আত্মমণ্ডলক রচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে—এই প্রকৃতির লেখক যারা, তাঁরা বিদ্যমান জগতেরই গতি ফেরাবার চেষ্টা করেছেন। বার্নার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস্ প্রভৃতির মধ্যে এই ‘ভল্টেরায়র্ম’ অহং-ই কোনো কোনো ঘটনার ওপর আত্মপ্রক্ষেপ করেছে। কিন্তু অপর পক্ষে, স্পেন্ডারের কথাতাই দেখা যায়,—ব্যাবে, জয়েস, প্রুস্ট—বা এলিয়টের প্রুস্টক ঘটনাব সমালোচক নন, তাঁরা এইসব ঘটনাব স্মারাই প্রভাবিত স্পেন্ডারের নিজের কথাগুলি এই-সূত্রে আমি লিখে রাখলুম—

The Voltairean ‘I’ has the characteristics—rationalism, progressive politics etc.—of the world the writer attempts to influence, whereas the ‘modern’ ‘I’ through receptiveness, suffering, passivity transforms the world to which it is exposed’

আধুনিকতাব এই প্রকৃতিব নমুনা যে বিবাদচিন্তিত হবে, সে তো এ ‘সমসাম্য’, ‘প্যাসিভিটি’ ইত্যাদি শব্দেই সূচিত। দীপঙ্কর দাশগুপ্ত নামে এক সাম্প্রতিক বাঙালী কবির বাংলা কবিতায় আমি এই নমুনাই দেখতে পাই। তিনি ‘জ্ঞানলা’ নামে একটি কবিতায় লিখেছেন—

জ্ঞানলাটা কথ কবে রাখি
খুললেই বিশাল আকাশ,
বুক তর ছোটো শাদা পাকি
দুতগতি স্পন্দিত উল্লাস।

এই বড়ো আকাশ দেখবার উপর নেই বলেই বড়ো আকাশের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মনকে ব্যস্ত রাখবার দৃষ্টই আধুনিক দৃষ্ট বোধ হয়। দীপঙ্কর দাশগুপ্ত সেই বড়ো আকাশ দেখতে পেলে নিজের ছোটো ঘরের বস্তুবোধ করবেন—

চোখে পড়বে ছাদে উপর
হরতো খুঁটেছে নীল ফল,
ভীষণ অচেনা হবে ঘর
সব কিছু মনে হবে ভুল?
একান্তে নিজের কাছাকাছি
আমি আছি, আমি শব্দ আছি।

অবিশ্যি, এবকম দৃষ্টও বাংলা কবিতায় দারায় আগেই দেখা দিয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সে-কবিতা অনেকেরই মনে পড়বে—সেই ‘ছাদে যেও না, সেখানে আকাশ অনেক বড়ো’। আকাশ সত্যিই ভারি চিরকালীন আগ্রহের সামগ্রী। আকাশ সম্বন্ধে সেকালের এবং চিরকালের কবিদের মতন একালের কবিরাও খুবই আগ্রহী। বস্তু সংকীর্ণ ঘর একদিকে, আর আকাশ অন্যদিকে এই দুই বিপরীতের অনুভূতি একালেও দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই গৃহ লিখেছেন—এই দুই বিপরীতের অনুভূতি একালেও দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই গৃহ লিখেছেন—

অনেক কথা বলাব আছে? না, কিছু নেই।
লিখি আপন বস্তু পাবে :
যা আছে তার সকল আলো নীল আকাশেই
অথবা তার অন্য পাবে।

এই চিরকালের কবিতাসমাজের প্রিয় প্রসঙ্গ আকাশ-ই দেখা দিয়েছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘মৌলিক নিষাদ’ কবিতাটিতে। তাতে লেখক অতীতের আকাশের সঙ্গে ইকালের আকাশের তুলনা করেছেন—

এজেন্ট আবশ্যক

অবসর সময়ে, আমাদের উত্তম কোয়ালিটির কসমেটিক ও ফাউন্টেন পেনসমূহ বিতরণার্থে মাসিক ১৭৫, হইতে ৩০০, টাক ও কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক। বিনামূল্যে সর্ভ এবং নমুনা সেটের জন্য অর্দাই লিখুন।

METRO AGENCIES (India)
Pahari Dhiraj (B.M.W)
DELHI—6

শিউমিহ, তোমার আকাশ
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমাব আকাশ নীল নয়।
শিউমিহ, তোমার হৃদয়
নীল—কতখানি নীল ছিল?

আমার হৃদয় নীল নয়
আকাশের হৃদয়ের
যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা।
আপাতত কোন-এক স্থির অন্ধকারে
শুয়ে আছে।

এ আপাতত দুঃস্বপ্ন আমাদের হৃদয়-
বিবেক, বোধ-বুদ্ধি,—আমাদের অন্তর এবং
মস্তিষ্ক স্ব-কিছুই আকৃত; প্লাবিত, নিমগ্ন।
এই নিমগ্নতার বোধটাই সম্ভবত স্পেন্ডারের
‘আধুনিক অহং’-এর স্বভাব। স্পেন্ডার
লিখেছেন—

The faith of the Voltairean egoists
is that they will direct the
powers of the surrounding
world from evil into better
courses through the exercise
of the superior social or cultural
intelligence of the creative
genius, the writer prophet.
The faith of the moderns is
that by allowing their sensibi-
lity to be acted upon by the
modern experience as suffring,
they will produce, partly as
the result of unconscious
processes, and and partly
through the exercise of critical
consciousness, the idioms and
forms of new art.

অর্থাৎ সমাজের বিদ্যমান নিকৃষ্ট অবস্থাটাই
নিজদের সৃজনীপ্রতিভা-ব-শ্রমের সামাজিক
এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতার জোরে কাটিয়ে
দিবে, শিল্পসৃষ্টি সার্থক করে তুলবে,—এই
ছিল ভল্টেরার অহংবোধের ধারণা।
‘আধুনিক’ অহং-ধারণাটা কিন্তু অন্যরকম।
মনকে চারদিকের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির
সম্মুখি,—ইহকালের দুঃস্বপ্নকেই ভাসতে এবং
ভুবেতে দিতে হবে,—এবং তার ফলে, কতকটা
অজ্ঞানে, কতকটা সমালোচনার সজ্ঞান মনন-
বলে নতুন শিল্পকলার বাক্য এবং রূপ দুই-ই
জন্মগ্রহণ করবে।

একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, এদেশে
অথবা অন্য দেশে, সাহিত্যজগতের সর্বত্রই
—বাঁবা ‘সমসাময়িক’, তাঁরা প্রত্যেকেই
‘আধুনিক’ নন। একলে বারো দুঃস্বপ্নের কথা
লিখছেন, তাঁরা সকলেই বস্তুার্থ ‘আধুনিক’-
অর্থে দূষিত নন। ‘নরকে রয়েছে পা; কাঁ
করে দিনকে করি বোরে প্রজাপতি?’—কিংবা
দিন আজো পোষের ষড়্—চিন্তা সিংহের এই
আত্মজিজ্ঞাসার ভাষা এবং ভাষা,—এবং এই-
রকম আরো অনেক নবীন বাঙালী কবির
ভাব-ভাবনার মন কখনো কখনো চমকে ওঠে।
একথা ঠিকই যে, এরা কেউই—অন্তত আজ
পর্যন্ত খুব বেশি স্বীকৃতও হন নি। তবে,
একথা স্বীকার করতেই হয় যে, আমাদের এই
বাংলা দেশেও সমাজ-সংসার সবকিছুই
বদলে যাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে আমাদের
আধুনিক বিষয়বোধও নিজস্ব শিল্পবাহন
গড়ে তুলছে।

দৃশ্য কাব্য - পরিচয়

সত্যজীবন সূত্রোপাখ্যান
দ্বারা দৃশ্য কাব্য

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক-
কালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য
একীকৃত ভূমিতে বিচারিত। বি-এ ও এম-এ
পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও নাট্যসমালোচক
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার বসু এই গ্রন্থখানি
সম্বন্ধে বলেছেন:—

“ * * * তথাকথিত ঘোড়তাত জাতীয়
মকালপক্ এবং বিচারশক্তিহীন আত্মহারা
ও প্রিয়ভাষী সমালোচকদের নিয়ে এতদিন
বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এতদিন পরে
এই বিভাগে দুইখানি অবল্য গ্রন্থ আমাদের
হস্তগত হয়েছে। প্রথমখানির কথা ‘দৈনিক
বঙ্গবন্ধু’তে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়ে গেছে
* * * দ্বিতীয়খানির নাম ‘দৃশ্যকাব্য-পরিচয়’,
রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজীবন সূত্রো-
পাখ্যায়। বইখানির আকার বিপুল। বাংলা
নাটক নিয়ে এমনভাবে সন্তুষ্টিজনক করবার
মানুষ যে আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য
আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুদীর্ঘ-
কালের সান্না ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ রচনা
করতে পারেন না। * * * অষ্ট বছর বড়ালীর
দৃষ্ট নাট্যসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতদিন
কেউ বচনা করেন নি। হালে শ্রীযুক্ত সত্যজীবন
সূত্রোপাখ্যায় বসু সেই চেষ্টা করেছেন এবং দৃশ্য-
কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যজীবনবাবু
অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর। * * * যাঁরা
ঘোড়তাতের ভূমিকায় অভিনয় করতে
ইচ্ছুক নন, এই পুস্তকখানি পাঠ্য করলে
তাঁরা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাহিত্য
সম্বন্ধে একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন।
এত বুট্টিয়া বুট্টিয়া আর কোন লেখকই বড়ালীর
নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পারেন
নি। এইটাই হল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান
সৌন্দর্য। * * * তাঁর সমালোচনাও পবন উপ-
ভোগ্য। সমালোচকের উপযোগী সুস্পষ্ট দৃষ্ট-
নিরপেক্ষতা ও যুক্তিযুক্ত মনোব পবিচয় দিয়ে
তিনি আমাদের আনন্দিত করেছেন। তিনি
কেবল শুধুই দেখেন নি, দেখেও দেখেছেন।
কোথাও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে অভিব্যক্তি
যাক্য বায় করে বক্তব্য-বিষয়কে ক’বে

তোলেন নি বোঁবাটে। * * * বাংলা
নাটকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন,
এই গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। * * *
বাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে
তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। * * *

পশ্চিমবঙ্গ-সবকারের বাংলা অনুবাদক
সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদমল্লিক ভট্টাচার্য এম-এ
মহোদয় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে স্বতঃপ্রসূত
হইয়া লিখিয়াছেন:—

“ * * * বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে
এই ধরনের বই বাংলা ভাষায় আর আছে
কিনা জানি না, থাকিলেও খুব কমই আছে।
গ্রন্থকার শুধু ঐতিহাসিকের দৃষ্ট দিয়াই
তাঁহার আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সমগ্র
সম্প্রদায় তিনি তাঁহার সমালোচনা-শক্তি-ব-
পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেকটি
উল্লেখযোগ্য নাটকের গুণাগুণ তিনি বিচার
করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয়
নাট্যদর্শন সম্বন্ধে রাশিয়া তিনি এই বিচার
করিয়াছেন। বইখানিতে যেমন তাঁহার
অসাধারণ পটভূমি ও অধ্যবসায়, তেমন
তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া
যায়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য।
অন্য সাহিত্য-পিপাসুরাও এই বই হইতে বহু
জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞানতে পারিবেন। ভাষা এই
ধরনের বই-এব সম্পূর্ণ উপযোগী—প্রাচীর্যপূর্ণ
ও প্রাঞ্জল। ”

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক,
নাট্যশালাব ইতিহাসলেখক ও নাট্যের
পরিপোষকানিদ্ শ্রীযুক্ত বুদ্ধেন্দ্রনাথ বসুপাখ্যায়
বলেছেন:—

“এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলির
ইতিহাস সজলিত হইয়াছে। কেবল ছবিভ
লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। * * *
সত্যজীবনবাবুর পক্ষে গুণাব বিষয় এই যে,
তাঁহারই অকুণ্ড পবিত্রমের ফলে অভিনীত
দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একত্র গ্রন্থাকারে
প্রকাশিত হইল। * * * ‘দৃশ্যকাব্য-পরিচয়’
বাস্তবিকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব
বিদূরিত করিয়াছে। এজন্য লেখক সাহিত্য-
মোদিগণের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন। ”

বঙ্গবন্ধু প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

প্রিন্স নুহুমা ফুমা

লাই নাসের শেষ সম্মানে রাজধানীর মাতিয়া গ্রহণ করেছিলেন লাওসের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভারা ফুমা।

প্রিন্স ফুমা ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের ভিয়েতনামে আক্রো-এশীয় শান্তি-বাহিনী সম্পর্কিত প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, এ-জাতীয় প্রস্তাবই ইন্দোচীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানের ওপরই যে লাওস সমস্যার সমাধান একান্ত নির্ভরশীল এবং তজ্জন্য জেনেভা ধরণের একটি সম্মেলনই বর্তমানে একান্ত আবশ্যিক—প্রিন্স ফুমা সে বিষয়েও তাঁর সূচিন্তিত কল্মিত প্রকাশ করেছেন।

ভারতের শান্তি প্রচেষ্টার তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস জ্ঞাপন করে প্রিন্স ফুমা তাঁর ভারত সফরের সাকল্যে আনন্দ প্রকাশ করে গেছেন।

প্রিন্স ফুমার আগমনে ভারত-লাওস মৈত্রীবন্ধন গাঢ়তর হবে এবং ভারতের শান্তিকামী জনগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে শান্তির বাণী বহন করে আসছেন তারই সঙ্গে প্রিন্স ফুমার শান্তিকামী মনোভাব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি প্রচেষ্টার সহায়ক হবে।

শিবির না কনসেন্টেশন ক্যাম্প

শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের নতুন ফতোয়ার মনুষ্য চামড়ায় আবৃত মানুষেরই হৃৎকম্প স্তব্ধ হতে পারে। অন্তত বাংলা দেশের মানুষ তো এই সংবাদ পেয়ে সমুদ্রে বিপদ গণনা করবেনই। কারণ যদিও সারা ভারতের স্বার্থেই এক শ্রেণীর ভারতীয় আজ উদ্বাস্তু, সমগ্র ভারতের চোখে কিন্তু তাঁরা নিতান্তই বঙ্গসন্তান।

কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর নয়া ফরমানে বলেছেন, হুকুমমারিক কাজ করতে অক্ষম হলেই শিবিরবাসীকে শিবির ছাড়তে হবে। দ্ব্যর্থ জাতীয় সরকার তাঁদের সেই 'সইয়ে মারার' নীতিই এবার প্রচণ্ডভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করবেন অসহায় উদ্বাস্তু পরিবারের ওপর। ইতিপূর্বে তাঁরা উদ্বাস্তুদের ভোল বদ্ধ করেছেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্মসংস্থান করে দিতে পারেন নি।

সাম্প্রতিক হুমকিতে সেই কর্মসংস্থানের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সে ইঙ্গিত রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে বলছে, যে কাজ বেছে নেবো, তাই কর, অন্যথায় পথে পড়়ে মর।

গোনা যাচ্ছে, উপরোক্ত কর্ম বণ্টনে শিবিরবাসী মহিলাদের জন্যও কাজের ব্যবস্থা হবে। কাজ না করে বসে থেতে চায় এমন মানুষের গপকে কোথাও কোনো আওরাক উঠবে না, উঠতে পারে না। কিন্তু যে কোন কাজের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা



বিদ্রোহী প্রিন্স নুহুমা ফুমা

যে ঋণশ্রব, তা সাধারণ মানুষে বুঝলেও কেন্দ্রীয় সরকারের ফরমানে তেমন বোধশক্তির পরিচয় নেই। না থাকার কারণও হয়ত দুর্বোধ্য নয়। কারণ ও-রা বাঙালী।

হিটলারের কনসেন্টেশন ক্যাম্পেই একমাত্র কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করতে বাধ্য ছিলেন হতভাগ্য ইহুদী সন্তানরা। কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো কাজের জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ জারি করে পূর্ববঙ্গাগত নতুন ইহুদীদের ওপর তবে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন নাকি।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের মনে রাখা উচিত উদ্বাস্তু প্রহসন তাঁরা বহুকাল যাবৎ টাঙিয়ে রেখেছেন। মনে রাখা উচিত, শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মদী নয়। মনে রাখা উচিত, আজকের যে ভণ্ড-এ বসে তাঁরা লঞ্চাওড়া নির্দেশ জারি করেন, ঐ শত শত নিরীহ মানুষ তাঁদের যথাসর্বস্ব দিয়ে সেই তখত বানিয়ে দিয়েছেন।

লজ্জা এবং ধূগার কথা, আজ অবধি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর উদ্বাস্তুদের জন্য কোনো সুব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি। অর্থাৎ দপ্তরটি সাধারণের অর্থেই পরিপুষ্ট হচ্ছে। বস্ত্র ও উদ্বাস্তু কল্যাণে।

তবে কি পুনর্বাসন দপ্তর সেই মূর্খ বেড়ানটির মতো এক রাতে ই-দুর বংশ নিধন না করে দেশের টাকার অপচয় এবং আপন দপ্তরের গবী টিকিয়ে রাখার জন্যই প্রহসনটুকু ধরে রেখেছেন।

অথ ভেজাল কথা

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের উপরী শ্রীপূর্ণেশ্বর শেখর নন্দরমণায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমান কর্মিটির একাদশ অধিবেশনে নতুন করে আশ্বাসের ভেজালানুত শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আরও ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে খাদ্যে ভেজাল নিরোধক আইন প্রয়োগ করা উচিত।

তিনি বলেছেন, সৈন্যলি প্রয়োজনীয় জিনিসে ভেজাল দেওয়ার চেয়ে জঘন্য কাজ আর কিছু হতে পারে না। যারা একাজ করে তাদের সম্পর্কে নরম হওয়ার কোন কারণ নেই।

কারণ না থাকারই তো কথা। তবু যে কারণগুলি বহাল তবিরতে অবস্থান করছে তাঁর কারণটা সত্তবত কেন্দ্রীয় সবুকারেরই গোচরীভূত থাকার কথা। বুর্জাপাত বীনকর বোম্ব হর সে সম্পর্কে পুরোবস্তর ওয়াকিবহাল নয়। মন্তব্য কেবলমাত্র বাহ্যিকের লোভে এইসব মারামার

উক্তি তাঁর মত কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের উচ্চারণ করা বিবৃতির নয়।

অসার ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ক্ষমতা যে কতদূর সক্ষম করতে পারেন, সে খবর কিন্তু আমরা সম্প্রতিকালের মধ্যেই পেয়েছিলাম। এর পরেও রাজ্যের ওপর স্বরদারি করার ভারপণ কি যথেষ্ট সুবিবেচনার কাজ হল।

ভাড়া 'ব্যাপক' ও 'সক্রিয়' কোন অভিযানটাই রাজ্যগুলির পক্ষে কেন্দ্রীয় সহায়তা ব্যতীত করে ওঠা সম্ভব কিনা এ বিষয়েও প্রশ্ন জাগতে পারে।

কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড থেকে পরোক্ষ উল্টো চাপ যদি ব্যবসায়ীর গায়ে আঁচড়টি পর্বত কাটতে না দেয়, তবে শুধু কি কথামুতাই কাজ হবে।

এদেশের বচনবাণীশ সরকার কথা বলেই তুল করেন।

মন্ত্রীদের আপনাপন কক্ষে অভ্যন্তরীণ সেই প্রাচ্যসুপারীষ বাক্যটি সোনার পাত্রে বাঁধাই করে টাঙিয়ে রাখা উচিত।

বোঝার শব্দ নাই।'

জুজুরাতি :

আপোষহীন বদলা

ওজরাটি কংগ্রেসের ধরোয়া বিবাদের নিশ্চিতি খুব শীঘ্র ও সহজ উপায়ে হওয়ার মত কোনরকম ভরসা দেখা যাচ্ছে না। বরং বিবদমান দুই দলের পরস্পরের ওপর 'বদলা' গ্রহণের ইচ্ছাই ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

বিরুদ্ধবাদী কংগ্রেসী জোটের নেতৃবর্গ স্বপক্ষে কেস গাজাচ্ছেন। তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য শ্রীমোহরজী দেশাই ও তাঁর অনুচরবর্গ।

ওজরাটি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীখিতবন দাস প্যাটেলের কাছে এক স্মারকলিপিতে বিরুদ্ধবাদীরা মোরারজী-জোটের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক শাস্তিবিধান (Victimization) ধরোয়া বিভেদ সৃষ্টি এবং অগণতান্ত্রিক পদ্ধতনের অভিযোগ পেশ করেছেন। তাঁদের পরিকার বক্তব্য, মোরারজী-জোট জীবরাজ-হসিকলাল-রত্নভাই জোটের বিরুদ্ধে দমননীতিমূলক আচরণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং যার দ্বারা পারস্পরিক বিভেদ বিস্তৃতিলাভ করছে। স্মারকলিপি প্রেরকদের মধ্যে আছেন ওজরাটির দুই প্রাক্তন শ্রীমসিকলাল পারিধ এবং শ্রীরত্নভাই আদানী।

প্রতিপক্ষে শ্রীমোহরজী দেশাইও আন্তিন গুটিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন প্রাক্তন পকারেত মন্ত্রী শ্রীরত্নভাই আদানীকে। তিনি বলেন, জীবরাজ-হসিকলাল-রত্নভাই জোটের অভিযোগ তাঁরা যদি উপযুক্ত নিদর্শন সহ প্রমাণ করতে পারেন তবে শ্রীদেশাই উৎসাহিত আচরণের শুধু যে অনসন্ধান করবেন

তাই নয়, তাঁর নিজের বিরুদ্ধেও কোনোরকম অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁরও কদা তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা বিশেষ আপা দেখছেন না। অভিযোগ প্রমাণিত হলেও যে প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছা মলীভূত হবে এমন কোন ভরসা তাঁদের নেই। তব্রাচ কতকগুলি নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে কেবলমাত্র জনসাধারণকে তুল বোঝার সুযোগ না দেওয়ার জন্যই।

মোমোরাগাসের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নি। তবে যতদূর জানা গেছে, তাতে প্রতিহিংসা গ্রহণ ও বিভেদ সৃষ্টির প্রায় মাত দকা প্রমাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। জীবরাজ-হসিকলাল-রত্নভাই হওয়ার পর থেকে গত দুবছর ধরে জীবরাজ-সম্বন্ধকদের অবদমিত করার করেকটি পাকা নিদর্শন পেশ করা হয়েছে বলে প্রকাশ।

মোমোরাগাসটি পেশ করার আগে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমসিকলাল পারিধ বিবদমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে একটি বুঝাপড়ার উপনীত হতে চেষ্টা ছিলেন এই মর্মে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, শ্রীপারিধ তা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, মিথ্যার কোন ক্ষেত্রই প্রস্তত হয় নি এ পর্যন্ত, প্রচেষ্টা তো দূরের কথা।

আপোষের চেষ্টা জি পি সি সি'তে বিরুদ্ধবাদী জোটের মোমোরাগাস পেশ করার পর প্রত্যক্ষভাবেই পুরোপুরি নিকষ উঠেছে। বিরুদ্ধবাদী দ্বারা মজীর প্রমাণসহ মামলাদায়ের করার শ্রীমোহরজী দেশাই ও তাঁর অনুচরবর্গ যে অপেক্ষাকৃত বিক্ষুব্ধ হবেন তা সহজেই অনুমেয়। হুতরাং শ্রীপারিধ যে আপোষ বাঁমাংসার কোনোরূপ আত সম্ভাবনা দেখবেন না এতে আর সন্দেহ কি।

উড়িয়া :

সমামান নির্বাচনে

উড়িয়া কংগ্রেসে একা প্রতিষ্ঠার একটি মাত্রই পথ। তা হ'ল কর্মতাসীন নেতৃত্বকে অন্তর্ভুক্তি নির্বাচনী ধাক্কায় পদীচ্যুত করা। অন্যথায় উড়িয়া কংগ্রেসের ভাঙন অবধারিত।

উপরোক্ত মর্মে সাবধানবাদী উচ্চারণ করেছেন রাজ্যের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কংগ্রেসী নেতা শ্রীমুরজনাথ পট্টনায়ক, এম-পি। তিনি আরও জানিয়েছেন 'যে, শ্রীহরেক্ক মহতাব, এম-পি নিজেও প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির কাছে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

গোনা যার রাজ্যের বর্তমান কর্মতাসীন সরকারের 'ডি ফ্যাক্টো' পরিচালক শ্রীবিজু পট্টনায়ক নিজেও এই নির্বাচনের পক্ষপাতী। তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন, রাজ্যের কুটিল রাজনৈতিক আবর্ত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই অন্ততপক্ষে একটি অন্তর্ভুক্তীতাসীন নির্বাচন হওয়া আবশ্যিক। আর যদি তেন

কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তবে শ্রীপট্টনায়কের বিশৃঙ্খল, কংগ্রেসের একেবারে জয়-জয়কার হবে।

কংগ্রেসের কি হবে না হবে সে গণনার যদি বা কোনো ভুলচুক থাকে, শ্রীপট্টনায়কের নিজস্ব বিজয় সম্ভাবনা নিশ্চয় বর্তমান। এমন আশুস উড়িয়ার আবহাওয়ায় পাওয়া না গেলে তিনি এমন আপাদাপি করতেন না। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল অবশ্য নতুন কথা শুনেছেন : শ্রীপট্টনায়ক নাকি অভ্যন্তরীণ লোকসভায় তাঁর ক্রিয়া-কলাপ স্থানান্তরিত করবেন বলে মনস্থ করেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞ মহলের অবিশ্বাস ঘোচে না। শ্রীপট্টনায়ক সহজে রাজ্য রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াবেন এতটা পরিবর্তন তাঁরা সহজে চিন্তা করতে অক্ষম।

কিন্তু সে বাই, হোক, বিজ পট্টনায়কের প্রস্তাবে অন্ততপক্ষে নির্বাচন কমিশন সম্মতি আপত্তি তুলবেন। যারনিয়ে ১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের ব্যয়ভার কুলিয়ে রেখে আবার একটি ব্যয়সাধ্য অন্তর্ভুক্তি নির্বাচনে কমিশন চট করে সার দেবেন বলে মনে হয় না। বিহার :

আশা আশা!

তিনশ' উনিশজন সদস্য বিশিষ্ট বিহার বিধানসভায় দুশ' পাঁচজনের আত্মমূলক ভোটে চুয়াভরজন সদস্যের অনাস্থা অগ্রাহ্য হয়ে গেল। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিহারের কংগ্রেসী সদস্য সংখ্যা ১০০ জন)।

অনাস্থা বিভক্তকে বলা হয়েছে, মূল্য প্রতি-রোধে, উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং কালোবাজারী ব্যবসায় উৎসাহিতকরণে সরকার কর্মমহীন অপ-দার্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

আমরা আগেও বলেছি, অনাস্থা প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হ'ল প্রধানত দেশের মূল সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সরকার ও জনসাধারণের মনুখে উপস্থাপিত করা। অনাস্থার দ্বারা কর্মতাসীন সরকারের গদীচ্যুতি নয়, তাঁর প্রতি আত্মহীনতা জ্ঞাপন করার বিশেষভাবে ঘোষিত পন্থাই মূলত অবলম্বন করা হয়। বলে তাঁরা সরকারও জামেন গণতান্ত্রিক সরকার সৃষ্টিমেন্টের স্বাধিপুট সহায়তার টিকে থাকে। তাই অনাস্থা প্রস্তাব কর্মতাসীন সরকারের মর্মান্বাহানি করলেও তাকে ইকিটাক নড়াতে পারে না।

অনাস্থা প্রস্তাবের দ্বারা বিহারের উদ্বিগ্ন-জনক খাদ্য পরিস্থিতির কতালসার চেহারা উদঘাটিত হয়েছে। যদিও এ চেহারা কেবল মাত্র বিহারের চতুঃসীমার আবদ্ধ নয়, পাশ্চাত্যী রাজ্যেও সাদ্যবস্থা জনসাধারণের চরম দুর্গতির কারণ হয়েছে। হুতরাং বিহারের অনাস্থা প্রস্তাব কোনো একক রাজ্যের ভয়ান চিত্রই নয়, বর্তমানে 'যা-যা-হই'রাছেন ভারত একটি খণ্ডিত রূপ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর চারদিনব্যাপী যুগোস্লাভিয়া সফর শেষ হয়েছে। শ্রীশাস্ত্রী সফর শেষে নয়াদিল্লীতে ফিরে এসেছেন।

এই সফর সব দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। সফরের ফলে ভারত-যুগোস্লাভ মৈত্রী দৃঢ়তর হয়েছে। ভারত ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে বরাবরই মৈত্রী সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি আন্তর্জাতিক বিষয়ে উভয় রাষ্ট্র একইরূপ মনোভাব গ্রহণ করেছে। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি বোশেফ ত্রোজিটটোর মধ্যে ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। নেহরুর মৃত্যুর পরেও যে টিটোর ভারতের প্রতি বন্ধুত্ব এতটুকু কমে নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল সারমিন বিমান বন্দরে এসে টিটোর স্বয়ং শ্রীশাস্ত্রীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের মধ্যে। কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুযায়ী অপর রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী পিটার স্টামবোলিক এলেই বথেন্ট হত, কিন্তু কূটনীতির গাড়ী অতিক্রম করে টিটো এসেছেন বিমান বন্দরে। ভারতের নেতা ও জনসাধারণের প্রতি এ তার গভীর প্রীতির পরিচয়। যুগোস্লাভ জনসাধারণও সর্বত্র শ্রীশাস্ত্রীকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছে। শ্রীশাস্ত্রীর সঙ্গে এই সফরে তার স্ত্রী শ্রীমতী লালিতা শাস্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সদার স্বরণ সিং ও অন্যান্য কর্মচারীরা ছিলেন।

স্টোর সঙ্গে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীরূপে শাস্ত্রী এই প্রথম সাক্ষাৎ নয়। এর পূর্বে কারোতে তাঁদের মধ্যে আর একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধানদের সম্মেলন উপলক্ষে। এবার দু'জনের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের আলোচনার ভিত্তিতনামের প্রশ্ন বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ভিত্তিতনাম বর্তমান বিশ্বের প্রধান সমস্যা, এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য ইতিপূর্বে ১৭টি জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি আবেদন প্রচার করা হয়েছিল—ভারত ও যুগোস্লাভিয়া এই আবেদনপত্রের অন্যতম প্রধান স্বাক্ষরকারী। বর্তমানেও কয়েকটি জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নতুন করে ভিত্তিতনামের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের কথা উঠেছে। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রী-টিটো আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আরও উল্লেখযোগ্য, উভয় রাষ্ট্রনতার মধ্যে এই আলোচনার পূর্বক্ষেণে মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিনডন বি জনসনের চাম্যমাণ প্রতিনিধি অ্যাভেরান হ্যারিসন টিটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভিত্তিতনামের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন, এবং তাঁর হাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুত্ব সম্মিলিত একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন। এই স্মারকপত্রের একটি নকল হ্যারিসন শাস্ত্রীর কাছেও পাঠান। বেলগ্রেড আসার আগে হ্যারিসন মস্কো গিয়েছিলেন। সেখানে ভিত্তিতনাম



প্রসিডেন্ট টিটো ও শাস্ত্রী

সম্পর্কে তিনি সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলেন।

রাজধানী বেলগ্রেড ও টিটোর রিওনি নবীপের বাসভবনে শাস্ত্রী ও টিটোর মধ্যে ভিত্তিতনাম, নিকরনীকরণ, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভারতের বিরুদ্ধে চীন ও পাকিস্তানের চক্রান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। যুগোস্লাভিয়ার পক্ষে আলোচনায় টিটো ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী পিটার স্টামবোলিক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কারকো নিকোজী এবং অন্যান্য মন্ত্রী ও অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন।

সফর শেষে শাস্ত্রী ও টিটোর নামে যে বক্তৃতা ইমতাহার প্রকাশিত হয়, তাতে অবিলম্বে ভিত্তিতনামের যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে জেনেতা ধরণের সম্মেলন বসার জন্য আহ্বান জানানো হয়। উত্তর ভিত্তিতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ হলে এই আলোচনার পথ প্রশস্ত হবে বলে নেতৃমণ্ডল মনে করেন। ভিত্তিতনামের ব্যাপারে যে-কোন আলোচনায় দক্ষিণ ভিত্তিতনামের মন্ত্রিসভাকেও যে ডাকতে হবে, একথাও উভয় নেতা বলেন।

বেলগ্রেডে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শাস্ত্রী

অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন, যেভাবেই হোক ভিত্তিতনামের যুদ্ধ থামাতেই হবে, না হলে সমগ্র বিশ্ব বিপর্যয় দেখা দেবে। কোন কোন জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে, শাস্ত্রীর কথা থেকে এমন ইংগিত পাওয়া যায়। শান্তি আলোচনায় বসার ব্যাপারে চীনের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ হবে কিনা, এ বিষয়ে তিনি জোর করে কিছু না বললেও উত্তর ভিত্তিতনামের সঙ্গে কথা বলার বিষয়ে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

শাস্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, সকল জাতির স্বাধীনতার মর্যাদাকে ম্বীকার করতে হবে।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগোস্লাভ সাহায্যের বিষয়ে শাস্ত্রী যুগোস্লাভ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যবৃদ্ধির বিষয়েও কথা হয়। শীগগিরই পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী সভাপতি শ্রীঅশোক মেহতা ও বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমানদ্যাই শাহ বেলগ্রেড আসছেন এই সব বিষয়ে আলোচনার জন্য।

ধানার রাষ্ট্রপতি কোরাসে নকুমার বিশেষ তদন্ত লন্ডনে ধানার হাইকমিশনার স্যার আরমা হ্যানের থেকে ফিরে এসেছেন।

আরমা হ্যানের উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো চি-মিন, প্রধানমন্ত্রী ফান ভন ঙ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী নেগুইন ভুই ঙিন ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন, এবং ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য বৃত্ত উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন।

উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হো চি-মিন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভিয়েতনামের ব্যাপারে নকুমার প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানের জন্য উত্তর ভিয়েতনামের চার দফা সর্তের কথা তারা আরম্ভ করে জানিয়ে দিয়েছেন। উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সকল বিদেশী সৈন্যের অপসারণ তাঁদের প্রধান দাবি। কমন্ওয়েলথ শান্তি মিশনের সঙ্গে উত্তর ভিয়েতনামের নেতারা কথা বলতে রাজী আছেন কি না এ বিষয়ে পরিস্কার করে এখনও কিছু জানা যায় নি।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব সম্বলিত রাষ্ট্রপতি লিনডন বি জনসনের একটি চিঠি রাষ্ট্রসংঘে নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্থার জে গোল্ডবার্গ রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্টের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন।

গোল্ডবার্গ নিরাপত্তা পরিষদের কাছেও একটি চিঠি দিয়েছেন। এই চিঠিতে তিনি ভিয়েতনামে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। 'উপযুক্ত রক্ষাকবচের' ব্যবস্থা করা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে স্থায়ীকরণ প্রস্তাবেও রাজী আছে বলে গোল্ডবার্গ তাঁর চিঠিতে লিখেছেন। সুতরাং, নিরাপত্তা পরিষদ হরতো শীগগিরই একটি সভা ডেকে ভিয়েতনামের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে।

কিন্তু শান্তির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রচেষ্টার কেউ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না, যখন তারা পাশাপাশি দেখে জনসন ঘোষণা করছেন, ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা ৭৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার করা হবে। কেবল তাই নয়, ভিয়েতনামে যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের জন্য জনসন সেনেটের কাছে আরও অতিরিক্ত ১০ কোটি ডলার মঞ্জুর করার প্রস্তাব পেশ করেছেন।

অতিরিক্ত মার্কিন সৈন্য ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে আসা শুরু করেছে। ২৯শে জুলাই চার হাজার মার্কিন ছত্রী সৈন্য সাগরগে নেমোছে। এইদিনই মার্কিন সৈন্যরা ভিয়েত কং-এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম আঘাত হানে, এবং ২১৯ জন গেরিলাকে নিহত করে। উত্তর ভিয়েতনামেও মার্কিন বোমাবর্ষণ অব্যাহত চলেছে। হ্যানয়ের উত্তর-পশ্চিমে মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরে মার্কিন বোমাবর্ষণের ফলে একটি ক্ষেপণাস্রম ঘাঁটি বিধ্বস্ত হয়েছে।

অপরদিকে ভিয়েত কং গেরিলাদের আক্রমণও চলেছে পুরোদমে। ভিয়েত কং

আক্রমণের ফলে খাস সাগরগে শহরই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে সাগরগে বিদ্রোহীদের দখলে চলে যেতে পারে।

বটেন:

উনচল্লিশ বৎসর বয়স্ক এডওয়ার্ড হিথ রক্ষণশীল দলের নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। এডওয়ার্ড হিথ, রেজিনাল্ড মডলিং ও এনক পাওয়েল, এই তিনজন নেতৃবৃন্দের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। রক্ষণশীল দলের কমন্স সভা সদস্যরা ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচন করেন। হিথ পান ১৫০ ভোট, মডলিং ১৩৩ ভোট, আর পাওয়েল মাত্র ১৫ ভোট। হিথের থেকে মাত্র ১৭ ভোট কম পান মডলিং। এ অবস্থায় স্বতন্ত্রতার ভোট গ্রহণের দাবি জানানোই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তিনি হিথের জয় স্বীকার করে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেন। ফলে হিথ সর্বসম্মতিক্রমে দলের নেতা নির্বাচিত হন।

হিথের নির্বাচনের ফলে টোরি রাজনীতিতে নতুন যুগের সূচনা হল। এতদিন উচ্চবর্ণের অভিজাত ব্যক্তিরাই রক্ষণশীল দলের নেতা হতেন। কিন্তু হিথ সাধারণ ঘরের লোক, এবং সংগঠনের কাজে অভিজ্ঞ কর্মী। হিথের আমলে দলের সাধারণ কর্মীদের মতের মূল্য বেশি দেয়া হবে, এবং সাধারণ ভোটাভাওয়াও রক্ষণশীল দলের দিকে বেশি আকৃষ্ট হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মডলিং বা অন্য কারও পরিবর্তে হিথের নির্বাচনের আর একটি গুরুত্ব আছে। বটেনের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহল আজ যুরোপের বাজারে ঢুকতে বন্ধপরিষ্কার। আর এ ব্যাপারে



টিটো, পিটার স্টামবোলিক, কারকো নিকোজী প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনারত শাস্ত্রীজী

হিথের আগ্রহ খুব বেশি। আগের বার কমন মার্কেটে প্রবেশে ব্যর্থ হলেও এবার চেষ্টা করা হবে, এবং এ কাজে হিথই হবেন সবচেয়ে উপযুক্ত। রক্ষণশীল দলের আসল মুরব্বী এই শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণীর সমর্থন তাই হিথ পেয়েছেন।

হিথ ভাল বক্তা ও একগুঁয়ে ধরনের লোক। সুতরাং পার্লামেন্টে ও আগামী নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী হয়ারল্ড উইলসনকে এবার একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

গ্রীস:

প্রধানমন্ত্রী রূপে জর্জ পাপিন্দ্রুর পদত্যাগের পর রাজা কনস্ট্যানটাইন জর্জ এথেনিসিয়াডিস-নোভাসকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু নোভাস পার্লামেন্টের আত্মপ্রকাশক ভোটলাভে ব্যর্থ হন।



পাপিন্দ্রু

গ্রীক সংবিধান অনুযায়ী নতুন প্রধানমন্ত্রীকে প্রথম সূযোগেই পার্লামেন্টের অধিবেশন ডেকে আত্মপ্রকাশক ভোট গ্রহণ করতে হবে। গ্রীক পার্লামেন্টের মোট সদস্যসংখ্যা ৩০০। সুতরাং ১৫১ জনের সমর্থন তাঁর প্রয়োজন। ১০০ জন সদস্যের কম উপস্থিতি থাকলে সভার কোরাম হবে না, এবং পার্লামেন্টের অধিবেশন বসতে পারবে না।

নোভাস পার্লামেন্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু ১০০ জনেরও কম সদস্য উপস্থিতি হওয়ার কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। পার্লামেন্টের স্পীকার বাকলাউডিস এই ঘটনাকে নোভাস মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাধ্যক্ষাপন বলে মনে করেন, এবং সংবিধান অনুযায়ী নোভাস সরকারের পতন হয়েছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

এই ঘটনার সবচেয়ে বেশি উল্লসিত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জর্জ পাপিন্দ্রু। পার্লামেন্টে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও



রাজা কনস্ট্যানটাইন

তাঁর কথা না শুনে রাজা নোভাসকে প্রধানমন্ত্রী করার তিনি ক্ষেপে যান। তিনি প্রশ্ন করেন : “কে দেশ শাসন করছে, রাজা না জনসাধারণ?” জনসাধারণ তাঁর এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। পাপিন্দ্রুর সমর্থনে ও রাজার বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ পাপিন্দ্রুর সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। চার হাজার ছাত্র বন্ধন মিছিল করে পার্লামেন্ট ভবনের দিকে যাচ্ছিল, তখন পুলিশের গুলীতে সার্টিরওস পেট্রোলাস নামে একজন ছাত্র নিহত হন। এতে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এখন কি হবে? রাজা কি আবার পাপিন্দ্রুকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানাবেন, এবং সৈন্যদল থেকে দক্ষিণপন্থী অফিসারদের অপসারণে সম্মত হবেন? না, তিনি নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন? নতুন নির্বাচন হলে যে পাপিন্দ্রু ও তাঁর সমর্থকরা আরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন, এ বিষয়ে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সুতরাং রাজা পাপিন্দ্রুকে বাদ দেবেন কি



ম্যাকারিয়াস

করে? দক্ষিণপন্থীদের প্রস্তাবের কি তাঁর শেষ পর্যন্ত সংবিধান বাতিল করে নিজের হাতে ক্ষমতা নেবেন, ও সৈন্যদলের সাহায্যে দেশ চালাবেন? গণতন্ত্রের জন্মভূমি গ্রীসে যদি সত্যি এই অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে বড়কন্মের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

যে পথেই আজ রাজা অগ্রসর হোন না কেন, গ্রীসে রাজতন্ত্রের দিন যে ঘনিরে এসেছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান দ্বন্দ্ব যদি পাপিন্দ্রু জয়লাভ করেন (যার সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ), তবে তিনি যদি রাজতন্ত্রের পূর্ণ অবসান নাও ঘটান, অন্তত তিনি যে রাজার বর্তমান ক্ষমতা অনেক কমিয়ে আনবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই দেশে দাবি উঠেছে রাজতন্ত্র রাখা হবে কিনা, এই প্রশ্নে গণভোট গ্রহণ করা হোক।

গ্রীসের রাজনৈতিক সংকটের স্বেগ স্বেগে অভিযোগ উঠেছে, গ্রীসের দক্ষিণপন্থী নেতারা কেবল পাপিন্দ্রুকেই ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে খাশি নন, তাঁরা সাইপ্রাস আত্মবিশ্বাস



নোভাস

ম্যাকারিয়াসকেও সরাতে চান। নিকোনিয়ায় অন্যতম সরকার সমর্থক পত্রিকা তেলেফাত্তিরা ওরাতে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ম্যাকারিয়াসও যে পাপিন্দ্রুর পরিবর্তে এথেনিসিয়াডিস-নোভাসের ক্ষমতা গ্রহণে খাশি হন নি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পাপিন্দ্রু সাইপ্রাসের জন্য যতটা করা উচিত তা করেন নি বলে পাপিন্দ্রুর বিরুদ্ধে ম্যাকারিয়াস ও অন্যান্য সাইপ্রিয়ট নেতার বিক্ষোভ আছে। তবে তাঁরা পাপিন্দ্রুর অপসারণের পেছনে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত ল্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন।

গ্রীসের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব্যাপারে সাইপ্রাস নিরপেক্ষ, মত্রে এ কথা বলা হলেও ক্রান্ত ম্যাকারিয়াস সরকার নোভাস সরকারের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। নোভাসের প্রধানমন্ত্রী হবার পর ম্যাকারিয়াস তাঁকে কোন অভিনন্দন বাণী পাঠান নি। সাইপ্রাসের প্রায় সকল পত্রিকায় নোভাস ও রাজার আচরণের নিন্দা ও পাপিন্দ্রুর সমর্থন করা

হয়েছে। ম রিয়ল সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রের এই সমালোচনামূলক বক্তব্য জ্ঞান চেষ্টা করা হয় নি।

মালম্বীপঃ

সিংহলের ৪১৭ মাইল দূরে ভারত মহা-
সাগরে অবস্থিত সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ মালম্বীপের দেশ মালম্বীপ পূর্ণ
স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

আত্মসম্মতি ব্যাপারে এতদিন মালম্বীপ
স্বাধীনতা ভোগ করলেও, বৈদেশিক সম্পর্কের
ক্ষেত্রে সে ছিল ব্রিটেনের অধীন। গত ২৬শে
জুলাই কলম্বোতে মালম্বীপের প্রধানমন্ত্রী
ইব্রাহিম নাসির ও সিংহলের ব্রিটিশ হাই-
কমিশনার স্যার মাইকেল ওয়াকারের মধ্যে যে
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেই চুক্তি অনুযায়ী
২৬শে তারিখ থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও
মালম্বীপ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

লন্ডনে কমন্স সভাতেও ব্রিটিশ কমন্স-
ওয়েলথ সচিব আর্থার বটমলী এই স্বাধীনতার
কথা ঘোষণা করেন। তবে এই চুক্তিতে মালম্বীপ
ব্রিটেনের কিছু কিছু সামরিক স্বার্থ মেনে
নিয়েছে। ঠিক হয়েছে, ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত
আব্দু গ্যাটলে ব্রিটিশ বিমান ঘাঁটি থাকবে।

৭০০০ ম্বীপ নিয়ে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র
মালম্বীপ গঠিত—তবে এর মধ্যে মাত্র ২০০০টি
ম্বীপে মানুষ বাস করতে পারে। দেশের
লোকসংখ্যা ৯১,০০০। মালম্বীপের রাজধানী
আমলে—লোকসংখ্যা দশ হাজারের মত।
মালম্বীপে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রয়েছে।
একজন নির্বাচিত সুলতান রাষ্ট্রের প্রধান।
বর্তমান সুলতানের নাম মহম্মদ ফরিদ দিদি।

সুদানঃ

সুদানের দক্ষিণাঞ্চলের আফ্রিকার
পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে জোরদার
আন্দোলন সুরু করেছে। আরব অধিবেশিত
সুদান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি এদের অনেক
দিনের। কিন্তু এখন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের
পথ ত্যাগ করে দক্ষিণীরা সন্ত্রাসবাদী
আন্দোলনের পথ ধরেছে। চারশ' বৎসর
পূর্বে পূর্ব আফ্রিকার যে সম্রাটশালী
আনজানিয়া সাম্রাজ্য ছিল, তার নামে
বিদ্রোহীরা সুদান থেকে দক্ষিণাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন
করে পৃথক 'আনজানিয়া' রাষ্ট্র গঠন করতে
চায়।

১৯৬৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর
গত মাসে সুদানে প্রথম গণতান্ত্রিক
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ
আহমেদ মাজহুব প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের
দিন থেকেই দক্ষিণের আফ্রিকীয়দের সঙ্গে
একটা মীমাংসার জন্য চেষ্টা করে আসছেন।
সুদানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক
জীবনে আফ্রিকীয়দের সমান অধিকার
সংরক্ষণের কথা তিনি ঘোষণা করেছেন, এবং

আফ্রিকীয়রা তাদের ইচ্ছামত ধর্ম ও সংস্কৃতি
পালন করতে পারবে বলে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন। তার মন্ত্রিসভার তিন আফ্রিকীয়
সদস্যও নিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই দক্ষিণীরা
সন্তুষ্ট নয়। তাঁরা আরব আধিপত্য সহ্য
করতে প্রস্তুত নয়।

'আনিয়া নিয়া' নামে সন্ত্রাসবাদী দল
দক্ষিণাঞ্চলে আন্দোলন সুরু করেছে। বড়
বড় শহর বাদে প্রায় সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল আজ
এদের হাতে। সরকারী প্রভাব আজ এই
সব জায়গাে নামমাত্র। বিদ্রোহীরাই কর আদায়
করে, আদালত চালায়, রাস্তা-ঘাট ও সেতু
পাহারা দেয়। স্থানীয় অধিবাসীদের ব্যাপক
সমর্থন আছে এদের পেছনে। 'আনিয়া নিয়া'
সন্ত্রাসবাদীদের আসল নেতা 'সান্দু' দলের



মহম্মদ আহমেদ মাজহুব

প্রাক্তন নেতা ও বর্তমান 'আনজানিয়া
লিবারেশন ফ্রন্টের' প্রধান জোশেফ ওডুহো।
তিনি সুদানের বাইরে থেকে এই আন্দোলন
পরিচালনা করছেন। এতদিন ওডুহোর প্রধান
কর্মক্ষেত্র ছিল উগান্ডার রাজধানী কামপালা।
সম্প্রতি উগান্ডা সরকার তাকে কামপালা থেকে
চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছে।

মাজহুব মহা মুশকিলে পড়েছেন এই
বিদ্রোহীদের নিয়ে। বিদ্রোহীরা প্রশাসনিক
ভেঙে দিয়ে একের পর এক অঞ্চল দখল
করছে, তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে চুপ করে বসে
তা দেখতে পারেন না। আবার বিদ্রোহীদের
দমনের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধেও
দেশে তাঁর জনমত আছে। তা ছাড়া শান্তি-
পূর্ণ আলোচনার পথে দক্ষিণীদের সঙ্গে তিনি
আপোষের যে চেষ্টা করছেন, সৈন্যদের
সাহায্যে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ
হয়ে যাবে। তবু মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দমনের
জন্য সৈন্য প্রয়োগ করতে হয়। গত সপ্তাহে
ইকুয়েটোরিয়া প্রদেশের রাজধানী জুবাত

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল গুলী চালায়,
এবং তার ফলে একঘণ্টার মধ্যে ৫০০ জন মারা
গিয়েছে। এই ঘটনার দক্ষিণীরা তাঁর
প্রতিবাদ জানিয়েছে। সাদার্ন ফ্রন্ট একে
'গণহত্যা' বলে অভিহিত করেছে, এবং আন্ত-
র্জাতিক রেডক্রস, মানবিক অধিকার কমিশন,
আন্তর্জাতিক আইনবিদ কমিশন, রাষ্ট্রসংঘের
নিরাপত্তা পরিষদ ও রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী
জেনারেল ইউ থাণ্টের কাছে এর বিরুদ্ধে
টেলিগ্রাম করেছে।

দক্ষিণের বিদ্রোহীরা রীতিমত আধুনিক
অস্ত্র ব্যবহার করছে। এই অস্ত্র তারা কোথায়
পাচ্ছে? একদলের অভিমত, আরব বিরোধী
ইজরায়েল ও প্রতিদ্বন্দ্বিশীল কংগোর শোম্বা
সরকার বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহ করছে।
আর একদলের মত, কংগোর লুমুম্বাপন্থী
বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহের প্রধান ঘাঁটি ছিল
সুদান। কংগোর বিদ্রোহীদের অস্ত্রই এখন
সুদানের দক্ষিণী বিদ্রোহীরা ব্যবহার করছে।
সম্ভবত দুই অনুমানই সত্য।

সুদান থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র আফ্রিকীয়
রাষ্ট্র গঠনের দাবির প্রতি পার্শ্ববর্তী আফ্রিকার
রাষ্ট্র উগান্ডা, কেনিয়া, কঙ্গো প্রভৃতির ব্যর্থ
সহানুভূতি আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন
রাষ্ট্রের পক্ষেই আনজানিয়ার দাবির প্রতি
প্রকাশ্য সমর্থন জানানো সম্ভব নয়। কারণ,
আফ্রিকার রাজনীতিতে আরব জাতির গুরুত্ব-
পূর্ণ অংশ আছে। আরবদের কেউ চটাত্তে
চায় না। তা ছাড়া অধিকাংশ আফ্রিকীয়
রাষ্ট্রেই নানা জাতির সমাবেশ ঘটেছে।
জাতীয়তার ভিত্তিতে একবার রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন-
করণ সুরু হলে, তার শেষ কোথায় যে
জানো? অল্পবিস্তর সবাই এর স্মার
ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

'আনিয়া নিয়া' সন্ত্রাসবাদীদের আন্দোলন
প্রবল হয়ে উঠলেও, দক্ষিণীরাও যে সকলে
একাত্ম্য তা নয়। সবাই জোশেফ ওডুহোর
নেতৃত্ব মানে না। সুদান আফ্রিকান ন্যাশনাল
ইউনিয়ন' বা 'সান্দু' দলের প্রভাবও খুবট।
আগ্রেই জাতিদের নেতৃত্বে এই দলের চরম-
পন্থীরা পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানানোও
'সান্দু'র নরমপন্থীরা উইলিয়ম ডেভের নেতৃত্বে
যুক্তরাষ্ট্রের দাবি জানাচ্ছে। বৃষ্টি দিউ-এর
সাদার্ন লিবারেল ফ্রন্টও সুদানের অভ্যন্তরে
দক্ষিণের স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক। ক্রিমেন্ট
মোবোরো ও ডারিগোস বোসিরও বিচ্ছিন্নতার
সমর্থক নন।

প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আহমেদ মাজহুবের
ধারণা, দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত দারিদ্রশীল
নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার স্বাধীনতা
তিনি সুদানের অখণ্ডতা বজায় রেখেই একটা
মীমাংসার উপনীত হতে পারবেন। এ ব্যাপারে
তিনি আফ্রিকা একা সংস্থারও (Orga-
nisation of African Unity) সমর্থক চান। শীগগিরই তিনি আফ্রিকার
বিভিন্ন দেশ সফর করে এ ব্যাপারে আফ্রিকার
রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।



দিল্লীপ ফ্রি

স্বপ্নের আলো

পাঁড়িটা একটু আগেই চলে গেছে।

ছুটেতে ছুটেতে যখন এসে স্টেশনে
পাঁড়িলাম, তখন শূন্য শূন্য লাইন। অদূরে
সিগনালের লাল নিশানা। ভাঙা প্লার্টফর্মে
একটু ২০ চুপ করে উদাস হয়ে বসে আছে।

সেই লহমায় কোন দূর-দূরান্তে
দেখা দিতে যাচ্ছে। সূর্যের আলো এত ঘন
জীবন্ত, এত বাসমত হতে পারে এ আমার
জানা ছিল না। মাথাব ওপর দিয়ে পাখিরা
ফিরে যাচ্ছিল।

একটু আগেও লাল বর্জিপাণ্ডটুকু কাব্যে
হাতের মূঠের মধ্যে থেকেও আঙুলের ফাঁক
দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে উর্কিতকি খেলছিল।
এখন সব খেলা শেষ। অন্ধকার।

গ্রামের ধুলোমাখা রাস্তা, স্টেশনের
লাগোয়া কাকের স্তূপ, ছোট ছোট আগাছার
ঝোপের মধ্য দিয়ে যখন এসেছিলাম, হয়ত
তেরমনি একটা সময়ে আমার পা কেটে থাকবে।
আমি চোখ মেলে রক্ত দেখলাম কলতলার
গিয়ে হাতে-মুখে জল ছিটিয়ে শান্তি
পাড়িলাম। কোথা থেকে একটু হাওয়া বইতে
শুরু করবে এতক্ষণে। শান্ত স্টেশন
আশ্চর্যকর্মের শান্ত হয়ে আছে।

এ। সঙ্গে কিছু খাবারও। সীতাংশু
বলল আমার কি বাড়ি যাবি। খুব ভোবে
ট্রেন। রাতটা এখানেই থাক।

সীতাংশু আমাদের গ্রামের ছেলে। পরিচয়
থেকে বন্ধুত্ব দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের
সম্পর্কটা। মাঝে মাঝে সীতাংশুর কাছে
এসে আড্ডা দিই। কখনও থেকেও যাই।
কেন জানি না এই 'হৃদয়পূর্ব' স্টেশনটা আমাকে
দায়ুপ টানে।

সীতাংশু অবিবাহিত। বিয়ের কথা
বললে বলে, দূর। যা বোঝগাব করি নিজেরই
চলে না। এই বেশ আছি 'হৃদয়পূর্ব'।

সীতাংশু কথা বলতে জানে। বেশ কাব্য
কবে বলতে পারে। আমবা যদি বা কখনও
বলতাম, সীতাংশু, আমবা সবাই যখন মৃত
তখন বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র তাকেই জীবন্ত
দেখি। কথা শুনে সীতাংশু হাসত। মানুষের
এত প্রাণখোলা হাসি আজকাল বড় দুর্লভ।

ঘরের মধ্যে সীতাংশু আর আমি।
বারান্দার নাগেশ্বর বৃষ্টি সেকছে। কখনও
গান গাইছে।

বাইবে হয়ত চাঁদ উঠেছে। বাতাবিগাছে
তলার কঠবেড়ালি ছুটেছে। বদমগাছের পাতা
সরসব কবে কাঁপছে। কিছু শুনলো পাতা
খসখস করে উড়ে গেল বোধ হয়। জানালা
খোলা। সীতাংশু উদাস। আমিও কি
বেন ভাবছি।

এক সময় আমি সীতাংশুকে প্রশ্ন
করলাম, এখানে একা থাকিস কি করে? আর
আশেপাশে ঝাঝ থাকে তাদের সঙ্গে তো
তোরা কিছুতেই মনব মিল হতে পারে না।
সত্যি, তোর বড় একঘেরে জীবন বে! আমার
কথায় সীতাংশু হাসল। এক সময় বলল,
একা কোথায় রে? এ তো আরেকজন
রবেছে।

সীতাংশু আঙুল তুলে আমাকে 'কিছু
একটা দেখাল। ফটো। উইপোকায় কুঁচ
কুঁচ খাওয়া ভাঙা টোঁবলের ওপর ঠোঁটে ফুল
ফুটিয়ে হাসা কোন একজনের ছবি। সীতাংশুর
'কল্পনাব' ছবি।

—যখন খুব একঘেরে লাগে, তখন এ
সঙ্গে কথা বলি। অবসর সময়ে বেহালা
বাজাই। সময় কেটে যায়।

কথা বলে সীতাংশু খানিকটা উদাস হল।
সামনে একটা প্রকাণ্ড পুকুর। আয়নার মত
রকরক করছে জল। ঘাসের মত সবুজ
গোলা পদ্মপাতাগুলো জলের ওপর চুপচাপ

শুয়ে আছে।

একটু হেসে বললাম, তোর 'কল্পনাব'
ঘরে আনলেই পারিস। ছাঁচ শূন্য ছবি হলে
থাকলে কি ভাল লাগে বে? ছবি হাট্টো,
হাসবে। কথা বলবে, কখনও কথা বলবে না।
হাত বাড়িয়ে দেবে, কখনও ঢেঁলে না, ভবেই
না সে ছবি সার্থক।

সীতাংশু ম্লান হাসি হেসে বলল, তুই
বুঝবি না। নিজের কথা নিয়ে ছাড়া বোঝে
যায় না। যদি বল কেন পারবি না তুই
বিশ্বাস করবি না। কপটা হয়ত সত্যি।
সীতাংশুর বাড়ির অবস্থা আমি জানি। তি
আব মাইনে পায। সংসারের দায়-দায়িত্ব
অনেক। কড়বা আর প্রেব দুটোকে এ
সঙ্গে বাঁচাতে গিয়ে একটাও প্রাণভরে বাঁচতে
পারেছে না। তা ছাড়া ইতিমধ্যেই সীতাংশু
ভব পেয়ে গেছে। কতদিন বলেছে, যদি
সুখী না কবতে পারি ওকে। চারদিকে বি
সব দেখছি। কত বড় দারিদ্র্য, ভাবভো
অমলেন্দু। শেষে দুজনেই দুজনের কাছে
যে মিথোবাদী হবে যাবো।

খাওয়া শেষ করে বারান্দার এসে বসেই
দুজনে। দূবে বাতাসের শব্দে পদ্মপাতা
গুলি কাঁপছে, কলি কুড়ি নিয়ে ফুলের
ডাটাগুলি নড়ছে। কোথা থেকে খানিকটা
সাদা মেঘ উড়ে এসে পুকুরের আয়নার ঘূর্ণ
দেখছে যেন।

সীতাংশু বেহালা বাজাচ্ছিল। চাপ, ফুল,
মেঘ, বেহালায় বাজনা, দূরের আনন্দকার,
স্টেশনের টিমটিমে আলো, ব' দিহেব বিরাট
শূন্য মাঠ, পুকুর সব মিলিয়ে আমি একটা
ছবি পাচ্ছিলাম। ঝাঝ নাম ফলগা।

এক সময় সীতাংশু পুনর্নবে পড়ল।
বিছানার পাশে বাজনা। মাথাব কাছে ছবি।
আমি ভাবছিলাম এইভাবে সীতাংশুর দ্য

সীতামশু এইবার জাগবে। অন্য সময়েও ঘুমিয়ে থাকে। বাধা সংলাপ বলে, এবারও নিজের কথা বলবে 'কম্পনার' সংগে।

কত রাত জানি না। ঘর অন্ধকার। ছোট লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়েছি। চারিদিকে অন্ধ নিস্তব্ধতা। পাশের ঘর থেকে নাগেশ্বর বোঝায়ধরা মৃদু গলাব প্রার শব্দহীন কন্ঠ্যটা একটু আগেও শুনছি। এখন হয়ত ওর গলা বৃদ্ধি গেছে। আর শব্দ বেরুচ্ছে না।

চাঁদের আলো জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। আবছা অন্ধকার, আবছা আলো, সীতামশুর মৃদুতা দেখতে পাচ্ছিলাম। সীতামশু কাত হয়ে শূরে ফটোটারে দেখছে। মৃদুতা বেন দৃষ্টিতে বসেছে কখনও। চোখ বোজা, তবু আমার মন হচ্ছিল ওর দৃষ্টি অসহায়। ঘুমের ঘোরেই বোধ হয় সীতামশু বাজনার হাত ব্রাফল। অকারণে একটা শব্দ হল। আবার সব চুপ।

জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন কোন পরিচিত দৃশ্য, পরিচিত ছবি দেখলে নিজের কথাগুলো বারবার মনে পড়ে যায়। সীতামশু ঘুমিয়ে আছে। আমি জেগে আছি। এত অস্থির চঞ্চল কাতর বিহবল আগে কখনও হই নি। সীতামশুর জীবনের ঘটনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায়?

বৃকের মধ্যে কী যে বন্দনা আর কন্ঠ্য। কে বেন-হাফকার কবছে ভেতরে বসে বসে। বারবাস তাকে চলে যেতে, সবে যেতে বলছি। সে সবছে না, নড়ছে না, পাখবের মত এক জায়গা বসে আছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকলাম। পাশাপাশি দুজনের বিছানা। আবছা অন্ধকারে কদমগাছে চাঁদের আলো কদম ফুলের ওপব এসেছে। বাইরে বিরট জ্যোৎস্না বৃক মেলে শূরে আছে। মনে হচ্ছিল কে বেন নিশ্চিন্দে আমাকে ডাকছে। খর, ঘুম কিছই আমাকে টানতে পারছে না এখন। কে ডাকছে? কে? প্রাণপণে বাধা দিছি নিজেকে। ঘুমুতে না পারলে ভোরবেলার উঠতে পারব না। ছটার ডিউটি। লেট হলে বড়বাবু বকবে। তবু এ এক ভীষণ আকর্ষণ।

বাইরে না এসে পারলাম না। সীতামশু এখন ওর 'কম্পনার' সংগে প্রাণভাবে কথা বলুক। বৃক, বোঝাক, কোনো লুকোচুরি থাকার দরকার নেই। আমি বাইরে এসে ওদের ভালই হল।

নির্ধুম রেললাইন। অতপ্রবহরীর মত লাল ডিসট্যান্ট সিগনাল। দূরে ধন হয়ে থাকে গাছ-গাছালির বোপ। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না। হঠাৎ মনে হল, আমিও সীতামশুর মত লুকোচুরি খেলছি। কবে থেকে যে অপ্রস্তুত করেছি নিজেই তা জানি না। আরও কতকাল যে খেলতে হবে তারও কোনো সীমানা নেই। মনে হল এই জ্যোৎস্নাবিবৃত রাত্রি চিৎকার করে কাঁদি।

হুটে বাই এ আকাশ থেকে অন্য আকাশ। সীতামশুর ঘবেব মত আমারও ঘরে পোড়ো বাড়ির ভাপসা গন্ধ। শ্যাওলা জমে জমে কালো দেওয়ালের ছবি। অনেক খুঁজে ফুলফুলির মধ্য দিয়ে আলো দেখতে হয়। তাও সব সময় দেখা যায় না। বাকি সময়টা শূন্য অন্ধকার।

চরাচর নিস্তব্ধ। বাতাস স্তব্ধ। চাঁদের অতি মিহি কাপসা আলো আমাকে পাগলের মত করে তুলছে। ইচ্ছে কবছিল শূন্য ছটো-ছটি কবি। নিজের হৃৎপিণ্ড নিজেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখি।

একটু পরে বাতাস এল। এবাব বেন একটু তন্দ্রা আসছে। ওর নাম মনে করলাম। ও জানত, আমি গান ভালবাসি। কবে বেন আমাকে গান শুনিয়েছিল। সেই গান শেনা থেকে একদিন ওকে ভালও বানতে শূন্য করেছিলাম। সে কথাও ওর অজানা নয়।

একদিন গোলাপী একটা শাড়ি পরে ও কসেছিল চেররে। আমি একটু দূরে। ঘরভরা মেথলা দিন। ও গান গাইল। শুনলাম। আগোচরে ফুলের কুড়িতে ফুল ফুটল। ফুল ফুটিয়ে দিয়ে চলে গেল। এখন ভাবি ফুল না ফোটেলেই ভাল ছিল। বড় নিষ্ঠুরা ও।

নামটা বৃকের মধ্যে বারবার বাজছে। ঘরের মধ্যে হয়ত সীতামশু আর 'কম্পনা' এখনও কথা বলছে। ওদের সূখদুঃখের চেউ বেন এগারে এসে আছড়ে পড়ছে। ওপারে ওরা। এপারে আমি।

আমি হাট্টিলাম উদ্বেগহীনভাবে। কখন বেন বেল লাইনের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিলাম। এখানে দাঁড়িয়ে আমার মনের বিভিন্ন সত্তাকে টুকরো টুকরো করে দেখলাম। অনেক সময় এবকম করে মানব আনন্দ পেতে চায় বিশেষ কবে যখন সামনে সবই শূন্য।

হঠাৎ নিজের ছাবকে দেখতে পেলাম বেন নতুন করে। ও বোধহয় আমার পাশাপাশি। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। খুশি খুশি ভাব। ওর খুশি আমার বৃকে খুশি ছোঁরাল।

রূপকথার গল্পের মত আমি বেন ওকে বললাম, তুমি এখন? আমার গল্পার স্বরে সন্দেহ, সংশয়। কিছটা জিজ্ঞাসা। হরিণীর চোখে, ঠোঁটে ফুল ফুটিয়ে ও হাসল। বলল, তুমি না ডাকলে আমি আসতে পারি? তুমি ডেকেছিলে।

—আমি? মনে মনে ভাবছিলাম আমি তো একজন সীতামশু, আব কম্পনার কথা ভাবছিলাম। তাহলে কি চোখে, কানে, কণ্ঠে জড়তা আমার। ও আবার হেসে বলল, তুমি এত ভীতু, আমাকে প্রাণপণে ডেকেছ অথচ সেটা স্বীকার করতে পারছ না।

ওর কথায় বেন বিশ্বাস হল। এমনভাবে বলল। বিশ্বাস না করে পারা যায় না। ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, বন্ধ ভয় করে। কেমন বেন ভীতু হয়ে গেছি। আমাকে, এমন

কি তোমাকেও ভয় করে। অথচ ভীতু হতে আমি চাই নি। জানো, ছোটবেলার আমার খুব সাহস ছিল।

—এখন, আবার সেই সাহসকে ফিরিয়ে আনো। অন্য দরকার। ও আমার দিকে চোখ রেখে বিশ্বাস কথাগুলো বলল। আমার শূন্যতে খুব ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল এখন আমি লড়তে পারি। গান গাইতে পারি। হাসতে পারি। সব কিছই সেই এখন পারি পারি পারি।

কিন্তু—একটু চোখ তুলে তাকলাম ওর দিকে। ও চোখ মেলে আমাকে দেখছিল। বললাম, আমার বোধহয় আর সে সাহস নেই। সাহসের রাস্তাটা ভুলে গেছি। পরিবেশ, জীবন...

—নিজেকে অত ছোট ভাবো কেন? পরিবেশ, জীবন, তাহলে এর কাছেই তুমি আত্মসমর্পণ করবে?

ওর ভালবাসার দৃষ্টিতে কথাগুলো বেন ছবি হয়ে আমার সামনে ভাসছিল। একসময় বললাম, তুমি চলো আমার সংগে।

—কোথায়?

ওর দৃষ্টি এবার কিছটা উদাস। রেল সীতাই জানে না আমি ওকে কোথায় নিয়ে যেতে চাই।

বললাম, আমার ঘরে।

আমাব কথা শূনে ও বেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও বেন ভীষণভাবে ঘামছে। এমন সূখের চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে আড়কে। এই মুহূর্তে বোধহয় ও মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

একসময় জড়নো গলার বলল, তোমার ঘরটা যে বন্ধ ছোট। কত ডিউ। অনবরত পাখিব কিচিরমিচির। আলো দেখা যায় না। দয় বন্ধ হয়ে আসে।

—কিন্তু এর চেয়ে ভাল ঘর আশ্চর্যত আমি পাচ্ছি কোথায় বলো? এই ঘরকে অস্বীকার করে তো বাঁচা যাবে না।

ও চুপ কবে রইল। আমিও চুপ। কদম-গাছের ভাল থেকে একটা ফুল পড়ে গেল। দুজনেই দেখলাম। আকাশের কণী চাঁদ প্রকাণ্ড একটা কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। মনে হল অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ওর মৃদু আরও স্পষ্ট হল। চলে রূপের টিকলির মত কি একটা পরেছে। মনে হচ্ছিল ওতে কদম বৃন শব্দ হয়। ছোটবেলার এইরকম শব্দ আমার কত ভাল লাগত। হায়! ছোটবেলা আর আসবে না।

—একটা কথা ভাবছি।

একটু চুপ রইল ও। বললাম, বলো, কি ভাবছিলে?

ওর কথা সেই। একসময় রূরের মাঠটার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার ঘরটার যেতে আমার ভীষণ ভয় লাগে। মনে হয় গেলেই অসুখে পড়ব। ঘুম হবে না। কেমন বেন খিঁচিখিঁচে মেজাজ হয়ে যাবে। তারপর আমার অসুখ সারাতে গিয়ে তুমিও অসুখ

হয়ে উঠবে।

আমার মনে হল ওব কথাটা ভাববার মত। আমি নিজেও কতদিন এসব কথা ভেবে ভয় পেরেছি। নিজের ঘরকে তো আমি চিনি। কি অবস্থা সেখানে। আর শব্দ নিজেদের ঘর? চারদিকের সমস্ত ঘরেই তো একই অবস্থা।

ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, কিন্তু তুমি না এসে তুমিও কষ্ট পাবে, আমিও কষ্ট পাব। দুজনেই এই ঘরটার আসতে চাইছি কিন্তু পারছি না।

ও বলল, ঠিক বলেছ, তোমার সাহস হবতো আমার সাহস হব না। আমি অপেক্ষা করতে পারি তো তুমি ধৈর্য ধরতে পার না।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম ওর কথা শুনে।
ও আমাকে বলল তোমাকে বকব। দারুণ বকব। বললাম কেন?

ও বলল, বাতাসে যখন হাওয়া বয় তখন সেটা শূন্য আর মানুষ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে সেটা কান্না। কান্না আমার ভাল লাগে না। ফাঁদ, যেদিন তোমাকে পরিপূর্ণ করে পাবো।

—কিন্তু আমার ঘর তো দেখেছ তুমি।

ও হেসে বলল, চিরকালই কি এরকম থাকবে নাকি?

কিছুক্ষণ দুজনে এক সলো হাটলাম। দুজনেরই কথা নেই। মেঘটা সরে গেছে। চাঁদ ভাসছিল আকাশে। মনে হচ্ছিল এত আপন হবে কোনদিন যেন ওকে পাই নি। সারা বিশ্বচরাচরে কেউ নেই। শব্দ আমরা দুজন। আমাদের সঙ্গী চাঁদের আলো, ফুলের মালা। পাখির গান। সবার মধ্যে আমরা দুজনে যেন মিশে গেছি। কি অদ্ভুত আনন্দ! কারও কিছু বলবার নেই। কখনও ও আমাকে ডাকছে, কখনও আমি ডাকাছি ওকে। আর সেই শব্দহীন ডাক বিশ্বচরাচরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হিঙ্গো, ঈর্ষা, নীচতা, দারিদ্র্য সব কিছুকে যেন আমরা সরিয়ে দিচ্ছি। দুজনে চলছি, হাতে জীবনপাখির পালক। মৃত্যু পারের তলায়। চিন্তা ভাবনাহীন। সাহস হয়েছে সঙ্গী।

একসময় ওর মুখ ক্রমশ হল। একটু চপ থেকে বলল, এবার আমি যাবো।

বললাম, আর আসবে না?

ও অভয় বিলানো হাসি নিয়ে বলল, কে বলল আমি আসব না? তুমি ডাকলেই আমি আসব। এসে এইভাবে কথা বলব। সাহস জোগাব। যাতে তোমার অন্ধকার অসুস্থ ঘরটা আরও ভাল হয়ে ওঠে। তখন একটা ফুলের চাবা আমি নিজে হাতে লাগাব।

—গান শোনাবে না?

—হ্যাঁ সেই ফুলগাছের তলায় বসে পা ছড়িয়ে দিয়ে তোমাকে গান শোনাব। পাড়া-পাড়শীরা গান শুনবে।

হেসে বললাম, বাম্বা, তোমার কল্পনা এতদূর পর্যন্ত এগোয়? এত বড় স্বপ্ন দেখতে পার তুমি?

ও হেসে বলল, আমি এবার চেষ্টাও বড় স্বপ্ন দেখি। শব্দ নিজে দেখি না। তোমাকেও দেখাব। দেখতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ মনে হল, ও যেন স্বপ্নের কথা বলে কোথায় উধাও হয়ে গেল। চারদিক তাকিয়েও ওকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ছটফট করছে বৃকের ডেডেরটা ওকে দেখবার জন্য।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ঘরে ফিরবার জন্য পা বাড়লাম। রাত বোঝ হয় শেষ হয়ে এসেছে। জুই গাছেব তলা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি ঘরটার দিকে। সীতাংশু বোঝ হয় এখনও কথা বলেছে 'কল্পনার' সলো। একমুঠা করুণ বিষণ্ণ আলো দলে দলে উঠছে পুকুরের জলে। নিজের কথা মনে হল। কি করলাম এই জীবনে। বয়স বেড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, অথচ আমরা কিছু করতে পারি না। করতে পারলাম না। ঘরে গিয়ে আবার শব্দে পড়ব। ক্লান্ত চোখে শব্দ নিয়ে আসবে। সকালে উঠেই সারাদিনমান চিন্তা। সেই চিন্তার দিনটাও শেষ হয়, আবার আসে নতুন দিন। সেই একই রকম। গতকালের মতই পুনরো।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। সীতাংশু আমাকে ডাকাছিল। বলল, ওঠ, হাতমুখ ধো। চা খা। একটু পরেই টেন আসবে।

স্টেশনঘরে বসেছিলাম। সীতাংশু টিকিট দিচ্ছিল। টিকিট বিক্রী করতে করতেই সীতাংশু বলছিল, কাল একটা দারুণ স্বপ্ন দেখেছি রে অমলেন্দু।

লক্ষ্য কবলাম, কথা বলার সময়ে সীতাংশুর চোখ, মুখ হাসিছিল।

বাইরে শেষরাতের চাঁদের আলো। লোককে টিকিট দিতে দিতেই সীতাংশু খোলা

জানালায় চোখ রাখল। হাত ভাবাচ্ছিল স্বপ্নের কথাটা। সীতাংশুর মত আমিও বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। এক সময়ে হেসে বললাম, আমিও দেখেছি একটা স্বপ্ন। তোব 'কল্পনার' মত ও এসে আমার সঙ্গে অনেক কথা বলেছে।

সীতাংশু আমার দিকে চোখ রাখল। হেসে বলল, কি কথা হল তোদের মধ্যে শব্দ। দেখি মেলে কিনা।

ওব কথা কিছু জবাব দেবার আগেই বাঁশি শোনা গেল। বাইবে এলাম। টেলিগ্রাফের শব্দটি, আকাশের গায়ে হেঁকে থাকানক্ষত্র, দুটো-একটা পাখির ডাক—সব মিলিয়ে অদ্ভুতভাবে ভাল লাগছিল শেষরাতের পৃথিবীটাকে।

আলো এসে পড়ছিল সীতাংশুর ছোট অন্ধকার ঘরটার। ছত্দের মত দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোতে। নিশ্চল সিগনাল পোস্টটায়। সেই আলোকে সবকিছুকে আশ্চর্যভাবে গতিশীল মনে হচ্ছিল আমার কাছে। কেউ থেমে নেই। সবাই যেন চলছে। হঠাৎ অন্ধকার ঘরটার স্থির হয়ে থাকা সীতাংশু ফটো 'কল্পনাও'।

ওব কথা মনে হল। চারদিকে তাকিয়ে গভীর শূন্যতা অনুভব করছিলাম। ভাবছিলাম কেন এমন হবে আর কেনই বা হঠাৎ চলে যাবে। পা দাঁড়ে যেন আর চলতে চাইছে না। ক্লান্ত, অবসন্ন। আবার সেই পুনরো ঘর। পুনরো কথা, পুনরো জীবন। ইচ্ছে করছিল, এইখানেই বসে থাকি চাপ করে। বেশ ছিলাম। দিনের আলোতে আবার সেই পুনরো আমি।

আশ্চর্য, আলোটা এবে আমার মুখেও পড়েছে। তাকিয়ে দেখি সেই পুনরো আমিই যেন হাঁটিছি আলোব সাথে পা মিলিয়ে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

পারফিউমড

তিল তৈল

আয়ুর্বেদমতে কাঁচা
তিল তৈল কেবল
মস্তিষ্ক ও শরীর
শ্রিষ্ট রাখে না -
ইহা কেশোদগ-
মের সহায়তা করে
- কেশকে উজ্জ্বল
ও মৃৎ রাখে।





[পূর্ব-প্রকাশিতের পর্ব]

১ অষ্টচতুর্দশ প্রবাহ ২

চিনির পরে চা।

চা-ও চিনির মতই বাংলার আদি পণ্য-সম্ভার। বাংলার উত্তরাংশে সতর্ক প্রহরীর মত বিশাল হিমালয় পর্বতশ্রেণী আকাশের চিকিৎসিত আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যুগ-যুগান্তর থেকে।

এই হিমালয় শৃঙ্খল উকর, অনুর্বর শিলাখণ্ড নয়। শৃঙ্খল বন্যা গিরিশৃঙ্গ নয়, অনেক অনেক উন্মূল ভবিষ্যৎ আর দেশের বহু সমৃদ্ধির ইতিহাস রচনা করেছে এই হিমালয়।

অপর্যাপ্ত ফসলের সম্ভাবনা নিয়ে মৌসুমী বারু আসে এই হিমালয়ের পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে। অকোমলধারায় বৃষ্টি ধরে। কিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলের দিকে দিকে ভরসাখা মাথা তোলে। চান্দ্র, পাহাড়ের গায়ে সবুজের সমানোহ কলমল কবে।

তরাইয়েল হিংস্র অরণ্য এই হিমালয়ের মুক ও কঠিন মাটিব ওপরেই গা এলিয়ে পড়় আছে। যেদিকে তাকাও চকচকে পাতার ধাম্প্র। রীতিনত বিস্মিত হতে হয়, এই মুক ও কঠিন মাটিব গভীর উর্বরাশক্তি দেখে। চা।

অনেক-অনেকদিন আগে থেকেই চায়ের ব্যবসার প্রচলন ছিল বাংলা দেশে। পাহাড়ের পল্ল মাটিতে যেখানে বৃষ্টি হয় প্রচুর, কিন্তু জমে থাকতে পারে না, সেইখানে চায়ের চাষ হয় খুব ভাল-সে কথা আগে বলা হয়েছে।

ইউরোপে চা রপ্তানী হতো চীন থেকে। কিন্তু বাংলা দেশে যখন বিদেশী ব্যবসায়ীরা

বেশ কার্যম হয়ে বসল, তখন থেকেই চায়ের ব্যবসার ওপর তাদের নজর পড়ল। তারা দ্যাংলিং জেলা, জলপাইগুড়ির উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ডুয়ার্স, দেবাদুন ইত্যাদি পার্বত্য জনপদের এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করল।

বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট দিল, গিট রিকোয়ারস এ্যান্ড স্যাম্পল সাপ্লাই অফ লেবার এ্যান্ড গুড এবল ম্যানেজমেন্ট। পাহাড়ের এখান-সেখানে চায়ের চাষ হতো অবল অবহেলাব ভেতরে। সর্বসংগত কোন ব্যবসায়ী পরিকল্পনা ছিল না, ছিল না এই পণ্যের কোন বিদেশী বাজার। ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে এই পণ্য ব্যবসার একটি প্রধান সম্ভার হয়ে উঠেছিল। চা নিয়ে আসতে সুরু করেছিল ঐশ্বর্য।

বিদেশী ব্যবসায়ীরা চা-বাগানের কুলী আনতে আবিস্কট করল। কুলী এল ছিংশগড় থেকে, কুলী এল বিলাসপুর থেকে। তারা বিলেতে লিখেছিল, ইট ইজ নেসেসারী টু সেটল এমিগ্রান্টস ইন বোথ সেকস ইন টি ট্রাঙ্কিস...

দেখতে দেখতে জমে উঠেছিল চায়ের ব্যবসা। আসামে, বাংলার উত্তরাংশে, সংযুক্ত-প্রদেশে, হিমালয়ের পথেপ্রান্তরে আর সব পার্বত্য জনপদে বিশাল বিশাল চা-বাগান গড়ে তুলল তারা। কিন্তু বিদেশী কোম্পানী যখন চায়ের ব্যবসার দিকে প্রথম মনোযোগ দিয়েছিল তখন শৃঙ্খল বাংলা দেশে নয়। সারা ভারতবর্ষে মোট একচল্লিশটি চা-বাগান ছিল।

আসাম	১০
কান্দা	১৪
চট্টগ্রাম	১
দ্যাংলিং	১১

দেবাদুন	১
হাজাবাগ	১
কুমায়ন	১
গ্রীহট	২

কিন্তু নামমাত্র বাগান। প্রকৃতির নিয়মে অপর্যাপ্ত জলে রোদে চা-গাছ জন্মতো; ধীরে ধীরে পুড়ত হতো। কিছু পাতা খাসাময়ে তোলা হতো আব কিছু অপচর হতো। ভব-ও—

দেশীয় চা-বাগানের মালিকরা এই মর্শ্চন্দ্রে বাগান নিয়েই ব্যবসা সুরু করেছিল শেয়ার বিক্রি করে। একচল্লিশটি বাগানের ভেতবে আঠাশটি বাগানের সাবস্টাইবড ক্যাপিটাল ছিল, ১,৪২,৭০,০০০। এর ভেতরে আবার ১,৪০,৭২,৮০০ ছিল পেড আপ।

রেভারেন্ড কিংগমোহন মল্লিক তাঁর নীক্ষ হিন্দুী অফ বেংগল কমার্শ লিখছেন, এই একচল্লিশটি বাগানের ভেতবে অন্তত ছয়টি বাগানে ইউরোপীয় মালিকানা ছিল। এই ছয়জন বিদেশী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাইরে থেকে ব্যক্তিগতভাবে বাগান কিনেছিল। তারাও শেয়ার বিক্রি করেছিল। তাদের সাবস্টাইবড ক্যাপিটাল ছিল ১০,৮৬,০০০ পাউন্ড যার ১,৪১,০০০ ছিল তাদের পেড আপ ক্যাপিটাল।

কিন্তু দিনে দিনে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এই চা-ব্যবসায় এসে ভিড় করতে সুরু করেনি ছিল, এই শেয়ারের টাকার অঙ্ক ধীরে ধীরে ফুলে উঠেছিল। ফেপে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ তথা বাংলার মাটিতে যারা ব্যবসা করতে এসেছিল, তারা বেশ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল চা-ব্যবসার আলোকোজ্জ্বল

ভাবনাঃ তারা লিখেছিল, 'এন্ডার সিন্স দি
শিপল অফ ইউরোপ লান্ড টু ডিক্লিক টি, দে
ভ্যার সান্দারড বাই চায়না এ্যালোন...'

সেই দূর অতীতে যখন ইউরোপের মানুষ
চা খেতে শিখেছিল, তখন থেকে এই দূরপ্রাচ্যের
চীন থেকেই সরবরাহ করা হয়েছে চা।

কিন্তু—

কিন্তু চীনের পাশে চীনের মতই প্রাচীন
আর এক মহান দেশের কথা কেউ ভাবে নি।
এই দেশের মাটিতে অতি-অতি উৎকৃষ্ট চা
জন্মাতে পারে—

ইন্ডিয়ান টি ওয়াজ ফাইন বাট ইট
রিকোয়ার্ড এ লট অফ লেবার টু মেক ইট এ
ফিনিস প্রোডাক্ট। চায়ের পাতা বাগান থেকে
তুলে নিয়ে আসা পর থেকেই বহু প্রক্রিয়ার
ভেতর দিয়ে তৈরি চা হয়। ভাবতীয় চায়ে
রিফাইন ও ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কাজ একটু
বেশি করতে হয়। দেশীয় চা-বাগানের
মালিকদের এত লোকবল ছিল না, ছিল না
এত অর্থবল। তাই তারা উৎপাদন করতে
পারতো খুব কম। ইউরোপীয় বণিকরা চা-
বাগানের তথা চা-শিল্পের তত্ত্বাবধান করার
পর থেকে তাব কি পরিণতি হয়েছিল, সে কথা
পরে বলছি।

পৃথিবীর ব্যবসার পটভূমিতে বাংলা
দেশের চা পণ্য হিসেবে গণ্য হওয়ার আগে
আমদানী-রপ্তানীর কি পরিস্থিতি ছিল তাই
দেখুন।

১৮৬৯ চীনা কালো চা ১২৪,০৭৭,২৪৪ পাউন্ড
" " সবুজ " ১১,৪০৪,০৭০ "
১৮৭০ চীনা কালো চা ১২৪,০১৭,০০১ পাউন্ড
" " সবুজ " ১০,৭২০,১০৪ "

উপরোক্ত হিসাব শুধু চীন থেকে লন্ডন
বন্দরে চা রপ্তানীর হিসাব। এই হিসাবের
মাধ্যম ওপরে লেখা আছে ছোট একটি কথা,
ভেলভারীজ অফ টি ইন লন্ডন। এর ভেতরে
ভাবতীয় চায়ে কোন নামগন্ধ নেই। কিন্তু—

পটপরিবর্তন হলো। যেমন হয়। রাজার
রাজ্য চিবকাল থাকে না। রাজা বদল হয়।
বদলে যায় মানুষ। বদলে যায় মানুষের চিন্তা
আর পন্থাবলী।

স্বাধীনশীল এই জগতে কিছুই স্থায়ী
নয়। সন্ততবর্ধ তথা বাংলা দেশ থেকেও চা
রপ্তানী সর্বদা হলো। আর সেই সর্বদা হলো
অর্ধন বাঙালার বিদেশী ব্যবসার ভেতরে চা
শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। সবচেয়ে বেশি
বিদেশী মূল্য নিয়ে আসতে আবশ্যিক করল এই
চায়ের পণ্য। এতটা বৃদ্ধির রপ্তানীর হিসাব
নিচে দেওয়া হলো।

১,২০,৫৭,২০৭ পাউন্ড—

মূল্য ১০১,৬৯,৭৪৬ টাকা।

তার তিন বছর পরের হিসাব দেখুন—

১,২৭,৬০,৯১৫ পাউন্ড—

মূল্য ১,০৮,১০,৬০২ টাকা।

তাবপরে—

তারপরে রেভারেন্ড মালিক বলছেন,

ইন্ডিয়ান টি টেকস এ প্রসিনেন্ট পাউন্ড ইন
দি লাইফ অফ গ্রেট ব্রিটেন। লন্ডনের বন্দী,
অভিজ্ঞাতদের ঘবে ঘরে অতিথি আপ্যায়নে
বাংলা দেশের 'ইমালিয়ান টি' শোভা পেতে
লাগল।

(ক্রমশঃ)

ইউ-বি-আই

আপনার সঞ্চয়

বহুগুণিত হয়।

আমাদের নতুন

রেকারিং ডিপোজিট স্কীমে

মাসে মাসে ৫ টাকা

জমা রাখলে—

৪৫ মাসান্তে পাওয়া যাবে ২৫২.৫০ টাকা

৬০ মাসান্তে পাওয়া যাবে ৩৫৫ টাকা

৮০ মাসান্তে পাওয়া যাবে ৫০০ টাকা

১০, ১৫, ২০

প্রতি হারেও জমা রাখা যায়।

আপনার নিকটবর্তী আমাদের যে কোনও
শাখা অফিসে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

সেবার প্রতীক



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক

অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা-১

* সমস্যা

ব্যাংক-কাটোয়া লাইনের গোটা চারেক স্টেশন পেরোলেই খামারগাছ। হাওড়া থেকে যার দূরত্ব প্রায় সহস্র মাইল।

ছোট স্টেশন। জাল কাঁকড়ালা লম্বা টানা স্প্যাটকবর্ম। একদিক উঁচু, অপবদিক নীচু। ছোট স্টেশন ঘর। এতটুকু একটু সবু, বারান্দায় খানদুই বেঁগে ফেলা। খুঁখু রোদ্দু কিংবা অমৃতম্ বর্ষার স্বাদীদেয় মাথা গোলবার ঠাই।

স্টেশন থেকে বেরোলেই সামনেই এতটুকু একটু পায়েরলা কাঁচা পথ। তিন পা এগোলেই এমুড়ো থেকে ওমুড়ো প্রকাণ্ড জম-জমট এক বাজার। কলকাতা থেকে সহস্র মাইলের ব্যবধানে সুদূর পল্লীতে যার আকার এবং আকৃতি প্রায় বিস্মিত করে দেবারই মত। সব পাওয়া যাবে এখানে। চাল, ডাল, আটা, ময়দা, গুড় কিংবা লবণের সওদা থেকে আরম্ভ হবে কাঁচের জিনিস, সিলভারের বালন, মাদুর থেকে মশারী, মিষ্টি থেকে মড়ি-মুড়কী, বিস্কের উপহার, পড়ার টেবিল কিংবা মুখ দেখার আয়না। চায়ের দোকান আছে, চুলকাটার সেলুন আছে, সাইকেল মেরামত, কাঁসালাসন সারাই, এমন কি থিয়েটারের স্টেজ, আলো, পশ্চাপট থেকে আরম্ভ করে নকল গৌর-দাড়ি, পবচুল রং পেটাব সবই পাওয়া যাবে। এই চৌহদ্দির মধ্যেই। আব পাওয়া যাবে রোজ বাজারের কাঁচা শাক-সব্জ প্রচুর এবং টাটকা, নিঃসন্দেহে আশে-পাশের আর পাঁচটা গ্রামের চেয়ে সস্তাও বটে। সেইসঙ্গে মাছ। সিজা বাজারে মাছ কিনতে অনেক ডেলি প্যাসেন্সারই ফিরতি মুখে নেমে পড়েন খামারগাছ স্টেশনে। সওদা করে পাবের ট্রেনে ফিরে যান আবার। আশ-পাশের গ্রামের বাজারে পটল বখন পঁচানব পরসা কিলো, খামারগাছেতে তখন পঞ্চাশ থেকে বাট পরসা। চুনো মাছ উঠছে নামছে এক পঁচিশ থেকে এক পঞ্চাশের বাঁধা-খরা গিঁড়তে। আর অপেক্ষাকৃত বড় রুই কিংবা কাংলার কিশোর সংস্করণ দুই পঞ্চাশ থেকে তিন টাকা কিলো। অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনুভব করবেন—অন্য মাছের দর কোথায়, টাকা-পরসাব কোন সীমানা ছুঁয়ে রয়েছে এবং আরোহণের কোন চড়াই তার গতি।

স্টেশনের নাম খামারগাছ আর ইউনিয়নের নাম সিজা-কামালপুর। হ্যাঁ! ইউনিয়নই। এখনও অঞ্চল পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয় নি এখানে। তবে হবে শীঘ্রই। আশা করা যাচ্ছে প্রায় গোটা সাত-আট গ্রামসভা ক্রমে পৌনে নয় বর্গমাইল অঞ্চলের উপর গড়ে উঠবে সিজা-কামালপুর অঞ্চল। যার লোক-

খামারগাছ—সিজা-কামালপুর

সংখ্যা দাঁড়াবে কম-বেশ প্রায় বাব হাজার। যার মধ্যে হাজার আড়াই তপশীল, কিছু সাঁওতাল এবং স্বাক্ষর-কারস্ব ছাড়া উদ্ভূত প্রায় সবটাই মাহিষ্য। নিয়ে দিয়ে সিজা-কামাল-পুরও দাঁড়াবে কৃষিজীবী মাহিষ্যপ্রধান অঞ্চলই।

ছিম-ছাম পাকা রাস্তাটুকুর দু' ধারে, এমুড়ো-ওমুড়ো বাজারের সীমানা ছাড়ালেই ওপাশে গঙ্গা। সারি সারি দোকানপাট। উঁচু পাকা বাড়ি, রথতলা, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ। —একনজরে সিজা গ্রামের এই সুসাঁটিই ধরা পড়বে ভিনদেশী কোনও হঠাৎ আগন্তুকের চোখে।

খামারগাছ স্টেশন থেকে খামারগাছ গ্রামের দূরত্ব কিন্তু এক মাইলেরও কিছু উপর। স্টেশনে নেমেই কয়েক মত গজের মধ্যে ডাইনে-বাঁয়ে পড়ে যে গ্রাম দু'বানি তারাই যথাক্রমে সিজা এবং কামালপুর। কামালপুর নামে মুসলমানী গম্ব আছে। সহসাই মনে

পারুল ভট্টাচার্য

হতে পারে গ্রামখানি হবতো বা মুসলমান প্রধান। কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ। একদা নবাবী চৌখ আদার করতে আসতেন উচ্চদপস্থ নবাবী কর্মচারী কামাল সাহেব। এইসব স্থান তখন সরকার সাতগাঁও-এবং অন্তর্গত এবং মুর্শিদাবাদের শাসনাধীন। বছর বছর এসে এইখানেই তাঁর ফেলডেন তিনি। জনশ্রুতি—ভারিই নামানুসারে গ্রামখানিরও নামকরণ হল কামালপুর।

যেমন ওপাশে হাতীকান্দা। কার হাতী, কবে, কেনই বা কেনে সাবা হল এখানে সে ইতিহাস খুঁজতে গেলে কিন্তু অম্বকাবেই থাকতে হবে আপনাকে। প্রকৃতপক্ষে ওটি হাতীবান্ধা। অর্থাৎ চৌখ আদার পর্ব শেষ হলে বখন ফিরে যাবার সময় হত, তখন সরকারী হাতী, ঘোড়া এবং অপরাপর জন্তু-জানোয়ারগুলিকে ওইখানে গঙ্গার ধারে বেঁধে রাখা হত। এবং তাবপরে কয়েকদিন ধরে নৌকার কর্বে একে একে পার করা হত তাদের। সেই হাতীবান্ধাই, হাতীকান্দার পরিণত হয়েছে কালক্রমে। তবে একদাও সত্য যে হাতীকান্দার পাশেঘাটে চট-চটে এঁটেল এবং প্রায় অষ্ট কাদার বেরকম নমন্য দেখা গেল তাতে করে যে কোন হাতীকে আজও নাকের জলে চোখের জলে কাঁদিয়ে সারা করবার ক্ষমতা রাখে আপাত নিবীহ নবম মাটির ওই ষঠাল আশ্রয়ণ। মোটেই উপর হাতী-কান্দা তার নামের গৌরব বক্ষা করতে যোগ আনাই সক্ষম।

চাষের জমি ভাল এখানকার। প্রকৃতপক্ষে

এ অঞ্চলের প্রায় বৈশি় ভাগ জমিই একদা প্রবাহিত গঙ্গাপ্রান্তের প্রসাদপুষ্ট। পলি এবং বালির আশীর্বাদে উর্বর। তাই সমবে সুবর্ষণ হলে আটার আনা ফসলের আশা এখানে আকাশকুসুম নয়। আকাশের দেবতা এমনই খেয়ালী যে, কোন মনশ্রম কেননতব ফসলের আশ্বাদ বহন করে আনবে একথা বলতে পারেন না তাবড় তাবড় দৈবজ্ঞও। তাই মাটি যতই ভাল হোক জলের অভাবে ফসল মাঝ খাম অনেক সময়ই।

গভীর নলকৃষ্ণ একটি বসেছে গোড়নই গ্রামে। চালু এখনও হয় নি। হলে কিছু জল পাওয়া যাবে আশা করে এখানকার চাষী। সম্ভব হলে বছরে তিনটে ফসলের স্বপ্নও যে দেখে না এমনও নয়।

ধান, পাট ছাড়া পেঁয়াজের চাষও এখানে প্রচুর, ফলনও শুব। খামারগাছ গ্রামের কোল বেঁসে করে গেছে দেড় মাইল লম্বা এবং অনূমান প্রায় তিন থেকে চার মত ফুট চওড়া এক গভীর খাত। খামারগাছের দু' বা ডাকাতেদহ। গতি-প্রকৃতি দেখে মনে হয় কোন সময় এইখানেই হরতো-বহিতো-গঙ্গার মূল প্রোত। কালক্রমে গঙ্গা গেছে মরে, আপন প্রবাহের একটি স্থাবী স্বাক্ষর ছেড়ে গেছে দহের বৃকে। একদা এর পড়ে পড়ে ছিল গভীর ক্ষুণ্ণ। দুর্ভব ডাকাত দলের আশ্রয়। দিনের বেলায় মান্দুস হাঁটিতো না ওখান দিয়ে, লুটের মাল ওই দহের জলেই লুকিয়ে বেধে দিত তাবা। গ্রামের মান্দুস পরম আতঙ্কে নাম দিবেছিল ডাকাতেদহ। আতঙ্ক গেছে, ডাকাতেদহ নেই, কিন্তু নামটি টিকে আছে কালের বেড়া ডিঙিয়ে। আজ ডাকাতেদহ লাগছে মান্দুসের পবন কল্যাপের প্রয়োজনে। প্রায় দশ হাজার একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করছে এই দহের খাত। সিজা-কামালপুরের পেঁয়াজের ফসলের মালকুমী গা ডুবিয়ে বসে আছেন ওরই জলে।

সেচ ছাড়া মাছের চাষও আছে এখানে। স্থানীয় জেলপাড়ার অনেকগুলি পরিবারেরই ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয় এই দহের জল ছেকে। দুখের বিষয় স্থানে স্থানে দহটি মজে আসতে চাইছে এইবার। শোনা গেল বছর দশেক আগে এটিকে কাটিয়ে পুরোপুরি একটি সরোবরে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন গ্রামবাসী। আরও কয়েক হাজার জমিতে সেচের জল সববাহ এবং মাছ চাষের একটি সুবহু কেন্দ্র স্থাপন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকসহ এসেছিলেন সরেজমিন তদন্তে। সপ্তে তথ্য

এবং তত্ত্ব অভিজ্ঞ অফিসারগণও ছিলেন। সব দেখাশোনার পর তাঁরা রায় দেন যে, সমগ্র পরিকল্পনাটি সফল করতে হলে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় হবে। যদিও অবশ্যই ওই টাকাটা বছর পাঁচ-সাতের মধ্যেই উঠে আসবে বলে আশা করেছিলেন সকলেই, তথাপি অখ্যাত পন্নীর ততোধিক অখ্যাত এক দহের জলে এতগুলো টাকা ঢেলে দেবার সরকারী অক্ষমতা জানিয়ে কতব্য শেষ করেছেন তাঁরা। দীর্ঘদিনের অসংস্কারে দহের জল এখন মরতে শুরু করেছে, তলভূমি এবং দূ-পাশের পাড় ভরাট হয়ে আসছে বছর বছর। কয়েক বৎসর পরে হয়তো বা বাংলার আরও বহু দীর্ঘ বিল কিংবা পুষ্করিণীর মতই এরও পরিণতি ঘটবে জলহীন শূন্যতার।

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দেশের যত্নতর গভীর নলকূপ বসিয়ে বিদ্যুতের অভাবে তাকে অচল করে ফেলে রেখে দেবার চেয়ে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই দহটির সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করা উচিত ছিল কিনা, সে প্রশ্ন করবার অধিকার দেশবাসীর আছে কিনা তা বোধ করি দেশবাসী আজও জানে না। তাই তারা নীরব হয়েই থাকবে। জলের অভাবে ক্ষেতের ফসল তাদের বছরের পর বছর ধরেও যদি অঙ্কুরেই শুকিয়ে যায় তথাপি মহাধিকরণের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের দামী আসনের নামী গদমর্ষাদার শীলমোহর এঁটে প্রকাশিত হয়েছে যে পরিকল্পনা তার প্রতি যথোচিত প্রস্থা এবং বিশ্বাস বজায় রেখেই তারা প্রতীক্ষা করবে সুদূর সম্ভাব্য কোন এক শতাব্দিনের, আর সে শতাব্দিটি যদি আদৌ কখনও না-ই আসে তথাপি তারা বিচলিত হবে না। শূন্য তাদের ধৈর্যের সুতোটাকে টেনে আর একটু বাড়িয়ে নেবে। এই আমাদের মাটির গুণ। দেবতাক্ষা ভারতবর্ষের অটল ধৈর্য আর অক্ষর সহিষ্ণুতা।

আলুর চাষ বিশেষ হয় না এখানে। অপরাপর শাক-সব্জি কিছু প্রচুর। একদা কেল খেসে বয়ে যাওয়া ভাগীরথী আজ সরে গেছেন প্রায় মাইল দেড়েক। সামনে পড়ে আছে দু-খুঁ করা গঙ্গার চর। সারা বছর ধরে অজস্র শাক-সব্জির ফলন এখানে। সমগ্র অঞ্চলের প্রয়োজন মিটিয়েও শীত-গ্রীষ্ম নির্বিচারে কাঁচা তরু-তরকারীর মস্ত চালান খামারগাছি স্টেশন থেকে।

হুগলীর মল্লিক কাসেমহাট, শেওড়াকুলির হাট এবং ত্রিবেণী বাজারের কতকাংশ বলতে গেলে এই খামারগাছির সাক্ষ্য দিয়েই অর্ধেক চাহিদা মিটিয়ে থাকে তাদের।

এই শতাধিক জেলে পরিবারের বাস এখানে এবং সুখের বিষয় এই যে, মিল মজুরীর মারা-মারীচের পিছনে না দৌড়ে আপন-আপন জাত-ব্যবসাতেই টিকে আছে তারা আজও। পাশেই বয়ে যাওয়া গঙ্গা ছাড়াও পূর্বোক্তিক ডাকাতেদহ এবং ছোট ছোট খাল, বিল, দীঘি, পুষ্করিণীগুলিও কম-বোঁশ মাছের জোগান সবসময়েই দিয়ে থাকে



শ্রীরাধারাম ন্যানানস্কারের সিজাশ্রিত ঠোল বাড়ি। বর্তমানে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বাসভবন।

তাদের। মরশুম ফুরোলে জোগান যখন কমে আসে দল বেঁধে জেলেদের একটি বৃহৎ অংশই সমুদ্রে চলে যায় মাছ ধরতে। পরিবারের ভরণ-পোষণ বাদে কিছু উম্মত টাকাও ঘরে নিয়ে আসে তারা বছর বছর। ফলাফল উভয়তই ভাল। জেলেদের ঘরে নেই খুব বেশি দৈন্যদশা, স্থানীয় অধিবাসীরাও তাদের ভ্রম্যকর্মতার সীমানার মধ্যেই দু-এক টুকরো মাছের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারছেন আজও।

কড়াই, মসুর, কিছু ছোলা এবং অঢেল খেসারি। এইসব মিলিয়ে ডাল বা ফলে তাতে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু গম, গুড়, তৈলবীজ এবং আলু এই কয়েকটি খাদ্যবস্তুতে শোচনীয় ব্যর্থতা এঁদের। আরও একটি বিশেষ পরিচিত এবং অতি প্রয়োজনীয় শস্য সোনামুগ। একদা এইসব অঞ্চলে সোনামুগের চাষ ছিল প্রচুর, ফলন এবং সরবরাহ ছিল পৰ্যাপ্ত, কবে কেন কি কারণে সোনামুগ চাষের সেই চলনটাই উঠে গেল তা জানা যায় না। কিন্তু একথা সত্য যে আজকের এই ডাল সংকটের দিনে মুগের নামে অখাদ্য মূত্রের ডাল খেতে খেতে বাঙালী যখন অতিষ্ঠ, তখন সোনামুগ চাষের সেই পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনলে চাষীর লোকসান নেই। আর বাড়তি লাভ যা তা এই যে প্রায় বিলুপ্ত হতে বসা একটি প্রয়োজনীয় ফসলের পুনঃপ্রবর্তন।

গুড় কিংবা চিনির সমস্যা যত বিকট আকারই ধারণ করে থাকুক না কেন, কোন বিকল্প পদ্ধতিতে তার সমাধান করবার চেষ্টা যে দেশবাসীর মধ্যে খুব বেশি প্রসারলাভ করে নি বাংলার গ্রামাঞ্চলে খেজুর এবং তাল-রসের অপচর এবং অপব্যবহারই তার প্রমাণ। গ্রামবাংলার যত খেজুর গাছ এবং তাল গাছ পাইকের দামে অর্পিত হচ্ছে অবাঙালী ঠিকাদারের হাতে। রস সংগ্রহ করে নিচ্ছে তারাি এবং বলাই বাহুল্য মানুষের প্রয়োজনীয় কোন খাদ্যবস্তু তৈরি হচ্ছে না তা থেকে,—

তৈরি হচ্ছে তাড়ি। উপকারের চেয়ে য অপকারেই লাগছে বেশি। এই ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের চেয়েও গ্রামবাসীর সক্রিয় বিরোধিতা খুব বেশি দরকার। গ্রামাঞ্চলের খেজুর গাছ কিংবা তাল গাছ তাড়ি প্রস্তুতের প্রয়োজনে কোন ঠিকাদারের হাতে সঁপে দেওয়া হবে না। অধিকতর মূল্য পেলেও নয়। এমন একটা কঠিনতর প্রতিরোধ-ভাবনা যদি গড়ে তুলতে পারেন দেশবাসী তবেই এই অত্যন্ত অনিশ্চকারী এবং একটি প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুকে অসংস্কারিত অবস্থায় রাখা সম্ভব। অবশ্যই সরকারী আইনের সর্বল হস্ত গ্রামবাসীর সাহায্যে প্রসারিত থাকবে সব সময়েই।

এতগুলি অধিবাসী নিয়ে এমন একটা এলাকার একটিও উচ্চ বিদ্যালয় নেই। অথচ স্থানীয় বে জুনিয়র হাই স্কুলটি আছে, প্রাথমিক ও উচ্চতর বিভাগ মিলিয়ে তার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, এছাড়াও আছে জয়কৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এককালে এটি এন্ট্রান্স স্কুল ছিল। তারপর কবে কেন কি কারণে এর উন্নতি না হয়ে অবনতি ঘটলো তা জানা যায় না। তবে খুঁচুরা-খাচুরা এই সব বিদ্যালয়ের চেয়ে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের এখানে খুব বেশি দরকার আছে। কাছ-পিঠের মধ্যে একমাত্র হাই স্কুল ডুমুরপাহা। দুঃখ বটে। কাঁচা রাস্তার কল্যাণে বর্ষাকালে দুর্গমও বটে। বাস কিংবা রেলগাড়িতে যাতায়াত করলে ব্যয়সাপেক্ষও বটে। এই ত্রিবিধ অসুবিধার বেড়া এককালেই দূর হয়ে যেতে পারে স্থানীয় একটি উচ্চ বিদ্যালয় সংগঠন সম্ভব হলে।

গ্রন্থাগারটি এঁদের চমৎকার। নাম মুক্তকেশী সাধারণ পাঠাগার। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল। নিজস্ব জমির উপরে চওড়া বারান্দা আর বড় বড় দরজা-জানালাবস্ত প্রকাশ ঘর। বই-এর সংখ্যা প্রায় দু-হাজার। দুঃপ্রাপ্য সংরক্ষণও নেহাৎ কম নয়। বাংলা ভাষার খ্যাত-অখ্যাত অনেক পদ্য-পত্রিকাই নেওয়া হয়ে থাকে এখানে। নিষ্পত্ত গ্রন্থাগারিক এবং ভূতাবধারক আছেন এঁদের। পরিচালন ব্যবস্থা মন্দ নয়।

ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাব নাম করা খেলা-ধুলার প্রতিষ্ঠান এদিককার। সবরকম খেলা-ধুলার চর্চাই করে থাকেন এঁরা। সমধিক উৎসাহ ফুটবলে। এঁদের পরিচালিত বিজুতি-ভূষণ কাপের খেলা বিখ্যাত। বিজিত দল পান কুসুম কুমারী মেমোরিয়াল কাপ।

শিবরাত্রি উপলক্ষে গোটা দুই মেলা বসে এ অঞ্চলে। একটি প্রায় পনেরোদিনব্যাপী চালা থাকে। অপরটি দিন তিনেক। ধুম-ধাম দুটিরই আছে। তবে উপবৃত্ত প্রচারের অভাবে মেলা দুটি কিছু নিম্প্রভ।

রাস্তাঘাট তেমন সুবিধার নয় সিজা-কামালপুরের। স্টেশনের লাগোয়া কয়েক শত গজ পাকা রাস্তা বাকী সবটাই প্রায় অগম্য। বড় বড় গর্ত এবং ছোট ছোট

বানো-খন্দর ভায়া। এর মধ্যে বিখ্যাত ত্রিবেণী-গুপ্তিপাড়া রোডও আছে। শোনা গেল সম্প্রতি এর নামকরণ হয়েছে জগন্নাথ তর্ক পণ্ডানন রোড। রাস্তাটি সংস্কারের পরি-কল্পনাও নিয়েছেন সরকার। কাজও শীঘ্রই শুরু হবে বলেই জানা গেল।

শ্রীজগন্নাথ তর্ক পণ্ডাননের নামানুসারে ত্রিবেণী-গুপ্তিপাড়া সরণির নামকরণ সম্বন্ধে ত্রিবেণীবাসী কি মতামত পোষণ করেন জানি না। প্রসংগত এ সম্বন্ধে দুটি-একটি কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

সম্প্রতি মনীষী কিংবা মহাপুরুষদের নামানুসারে রাস্তা, সেতু, সরোবর প্রভৃতির নামকরণ কনকর একটি প্রবল কৌক দেখা দিয়েছে দেশে। অবশ্যই আপত্তি করবার ক্ষেত্রে কিবা থাকতে পারে। তথাপি আপত্তি না থাকলেও অপছন্দের একটা ইশারা থাকতে পারে কোথাও কোথাও। উদাহরণ স্বরূপ এই ত্রিবেণী-গুপ্তিপাড়া রাস্তাটির কথাই বলা যেতে পারে। রাস্তাটি বহু পুরাতন, একদা ঐ পথ দিয়েই বর্গী আসতো দেশে। অনেক কামার কলরোল তুলে, অনেক হত্যা রক্ত আর বহিবন্যা বইয়ে আসতো তারা।

সেই বর্গী ঐ পথ দিয়েই বিতাড়িতও হয়েছে আবার। নবাব আলীবর্দীর শাহী সৈন্যদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেছে তারা বলে দলে। হরতো বা রক্ত-সিক্ত মাটির লালিমা আরও একটু গাঢ়ই করে দিয়ে গেছে আপন আপন বৃকের রক্তে। অনেক ইতিহাসের মুক সাক্ষী; অনেক স্মৃতির স্মারক বহন করা ঐ পথ। যার নাম উচ্চারণেও অতীত যেন কথা কয়। থাক না সে তার পুরানো নামে। জগন্নাথ তর্ক পণ্ডাননের নামে চিহ্নিত হতে পারে এমন অনেক কিছুই আছে বা গঠিত হবে। ঐ পথটি পড়ে থাক তার জঞ্জাল, তার গোরবে, জর আর পরাজয়ের স্মৃতিবিজড়িত কিছু আনন্দে কিছু বা বেদনায়। আশপাশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিক এক রক্তখোঁত ইতিহাসের একটি খণ্ড অধ্যায়।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত; অস্বীকার সাধক; অসাধারণ প্রতিভাধর জগন্নাথ তর্ক পণ্ডাননকে নাই বা নামানো হল পথে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই এখানে। এ নেই, যে কি নেই তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। তবে খামারগাছির অধিবাসীরা এখনও পর্যন্ত তা টের পান নি স্থানীয় কয়েকজন চিকিৎসা-জীবীর কল্যাণে। কিন্তু গরীব মানুষের চরম দুর্গতি। পেটে ভাত জোগাতেই তাদের হাড় হিম, ভিজিট দিয়ে ডাক্তার দেখানো তাদের গঞ্জে প্রায় অসম্ভব বলেই চলে। আর তার পরেও রয়ে যায় ঔষধপত্র কেনাকাটার ব্যয়।

হাট-বাজার, রেল স্টেশন, পোস্ট অফিস সবই রয়েছে এখানে। শূন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হলেই স্বাস্থ্যসংস্কারে একটি পল্লী হিসাবে পরিগণিত হতে পারে সিজা-কামালপুর। অতি

আবশ্যকীয় এই দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা অবশ্যই দরকার।

সিজা গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন বাসিন্দা বোধ করি এখানকার নন্দীবংশ। এবং সম্ভবত ব্যবসাসূত্রেই এঁদের আশ্রয় এখানে। গঙ্গা-তীরে হুগলী তখন বিখ্যাত বন্দর। জলপথে বাণিজ্যসূত্রে দেশী-বিদেশী নানা নৌবহরের নিত্য আনাগোনা। রাণাঘাটের নন্দীবংশও তৎকালীন খ্যাতনামা ব্যবসায়ীদের অন্যতম। গঙ্গার পশ্চিমকূলে সিজা-কামালপুর তখন জঙ্গলাচ্ছন্ন একটি ভূখণ্ড মাত্র।

কিন্তু ঝুনো ব্যবসায়ীর অভিজ্ঞ চোখে স্থানটির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নজর এড়িয়ে গেল না। সর্বপ্রথম লবণ আর তামাকের সওদা নিয়ে গঙ্গাতীরে বসলেন তারা। খরিস্কারও জুটলো অচিরেই। ভিনদেশী বহর নোঙর করতে লাগলো খামারগাছির উপকূলে। ক্রমে ব্যবসা বাড়লো এবং কিছু দিনের মধ্যেই অস্থায়ী বাসস্থানের পালা চুকিয়ে স্থায়ী বসবাসের প্রয়োজনও অনুভব করলেন এরা। নির্মিত হলো বাড়িঘর, প্রতিষ্ঠিত হলেন গৃহদেবতা। সিজা কামাল-পুরে রোপিত হলো খামারগাছির নন্দীবংশের অন্যতম একটি শাখা।

আর একটি প্রাচীন এবং প্রতিষ্ঠাবান পরিবার আজও টিকে আছেন এখানে। দিগসুইয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত দুর্গাচরণ ন্যায়ালঙ্কার-বংশ। এঁদের আদি বাস ছিল বর্ধমানের জোড়দীঘি। কি কারণে জানা যায় না বর্ধমানের বাস উঠিয়ে দিগসুইয়ে চলে আসেন এঁদেরই এক পূর্বপুরুষ। তাঁরই কয়েক পুরুষ পরের আর এক সুসন্তান পণ্ডিত রামরাম ন্যায়ালঙ্কার। দিগসুই ত্যাগ করে সিজায় এসে ইনি বসবাস করেছিলেন। শোনা যায় মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে ইনি সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। কাম্বীর

রাজসভার সমগ্র পণ্ডিতকুলকে পরাস্ত করে কাম্বীররাজের প্রধান পণ্ডিতের মর্যাদাও লাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বয়সে এঁর চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন। এবং শেষ বয়সে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করবার জন্য এঁকে অনুরোধও করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু তেজস্বী ব্রাহ্মণ বেতন নিয়ে বিদ্যা বিক্রয় করতে রাজী হন নি। তবে প্রয়োজন হলে কখনও কখনও ছাত্রগণ সমীপে বক্তৃতা ডিমে দিয়ে আসতেন।

বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার, শ্রীশেখর বাচস্পতি, জগন্নাথ তর্ক পণ্ডাননের মতো তৎকালীন বাংলার ইনিও অন্যতম ব্যরণ্য দিকপাল।

দুঃখের বিষয় খামারগাছি গ্রামে এঁর স্মৃতিরক্ষার কোনো যোগ্য বন্দোবস্ত আজও করা সম্ভব হয় নি।

একবারে পাশের গ্রাম দাদপুর। এখানকারই অধিবাসী নারায়ণ ঘোষের বাড়ি সংলগ্ন বারোয়ারী মনসার ঘরে একটি 'বিষ্ণুমূর্তি' রাখা আছে দেখা গেল। একদা বেহুলার জল থেকে মাছধরা জালে উঠেছিল মূর্তিটি। গ্রামবাসী তাঁকে এনে এইখানে রেখেছেন। এবং মনসা নামে পূজিতাও হচ্ছেন তিনি। (হায় বিষ্ণু!) গঠন-পদ্ধতি এবং মূর্তি সংস্থাপনের বিশেষ যত্নগা কীংমার মূর্তিটিকে 'গালঘুগের বলে ঘরে বেঁধে' যেতে পারে। প্রায় তিন ফুট উচ্চ এবং 'ফুট চওড়া; চতুর্ভুজা, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, নাগশীর্ষ সহস্র দল কল্লাবাড়ি রিবিব্রম বিষ্ণু। দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। পদতলে বৃহত্তম গরুড়। একখানি মাত্র কণ্ঠপাথর কেটে তৈরি হয়েছে মূর্তিটি। বাংলার ভাস্কর্য তথা প্রস্তরশিল্পের অতি আদর্শ নিদর্শন। কিন্তু বর্তমানে বড়ই দুর্গতি পেটেছে মূর্তিটির। অল্পে স্থানে স্থানে ছাড়া ফুটেছে। কোনো কণ্ঠপাথরে ধরেছে সোঁদার ছোপ। কিন্তু তার চেয়েও আশংকার কথা এই যে, মূর্তিটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত নেই। শিল্পনিদর্শন এবং 'মূর্তি' চোরেরা কিন্তু সর্বদাই সক্রিয়। দরজা-জানালা-বিহীন এই অরক্ষিত মেটে ঘরে অপরূপ সূন্দর এই মূর্তিটি আর বেশিদিন পড়ে থাকা নিরাপদ নয় মোটেই। প্রস্তর বিভাগকে অনুরোধ তাঁরা যেন এটির সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করেন।

সিজা - কামালপুরের জনসাধারণকে অনুরোধ চতুর্ভুজ চতুর্ধারী বিষ্ণু যেন মনসা রূপে পূজিতা না হন। হিন্দুর এই দেবদেবীর দেউল বা মন্দিরগুলি শূন্য ধর্মীর অনুষ্ঠানের অগম্য নয়, অনেক উত্থান-পতন আশা-আনন্দ জাতির শিল্প-সংস্কৃতি—এক কথায় জাতীয় ঐতিহ্যের এক-একটি অধ্যায় সংগৃহীত হয়ে আছে এঁদের সঙ্গে। আজ জাতির আত্মশ্রমের প্রয়োজনেই এঁদের উদ্ধার, সংরক্ষণ এবং সম্ভব হলে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে।



দাদপুরের বিষ্ণুমূর্তি



ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিরাট ছাত্র মিছিল

মুজাফফিনী :-

ট্রাম লাইন ও ছাত্র সম্প্রদায়

কলকাতার বৃদ্ধ চিরে বৈদ্যন সর্পিলা ট্রাম লাইন প্রথম পাতা হয় সেদিন কেউ কল্পনা করেন নি যে, এই সমান্তরাল রেখাংশ বৃটিশ আমল থেকে স্বদেশী শাসনকাল পর্যন্ত একইরূপ শোণিত পিপাসায় ভুগবে।

এযাবৎকাল কলকাতার বহু ছাত্রের লবণাক্ত স্রবের স্বাদ গ্রহণ করেছে এই শোণিতপায়ী ট্রাম লাইন। তবু আশা তার মেটে নি। জিহবা ওষ্ঠাগ্রে বাড়িরে ধরে ভালোমানুষ কুমীরের মতো পড়ে আছে অথবা মাকড়সার মত অপেক্ষায় আছে। শোণিত শোষণের অভীশ্মা, ফলা বাহুল্য, তার অতৃপ্ত থাকে না। বাংলার বীর পুলিশবাহিনী আছেন, তাঁরা মাঝে-মাঝে টাটকা শোণিতধারায় তৃষ্ণার রেখা-স্বয়ংকে শাণিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে পালনও করেন সে দায়িত্ব।

ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে শহর সজাতায় আবার স্থাপনবর্ষে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। চাপ্পা হয়ে উঠেছেন পুলিশবাহিনী। এবং অভিযোগে প্রকাশ, তাঁরা ছাত্রদের তাড়িয়ে নিয়ে সোজা বিদ্যালয়গার কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে মার-পিট করেছেন ও কলেজের প্রাঙ্গণে উপাধ্যাককেও অপমান করে এসেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেও লেঠেল পুলিশের দর্শনীয় কৃতিত্বের সংবাদ আছে। বিদ্যালয়গার কলেজের অপ্রীতিকর ঘটনার প্রতি-কারার্থে শিক্ষক পরিবদণ্ড ও আওয়াজ তুলেছেন তাঁদের স্মারকলিপিতে। অর্থাৎ শহর-খনুর

হিলার টান পড়েছে। এবার বাদ-প্রতিবাদ স্মারকলিপির তীর। কিন্তু সমস্ত মাতা-মাতির নেপথ্যে আহত ও যত ছাত্রদের পরিবারে বেদনার যে তিসিরাজমত নেবে এসেছে গোলমালের মধ্যে সে কথা মনে থাকে না আমাদের।

দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য সরকার মহান্বন ছেড়েছেন—১৪৪ ধারা। অর্থাৎ গোলমালকে বাড়িয়ে তোলার আর এক পন্থা।

পরিবহনমন্ত্রী কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর পক্ষে ভিডিও শহরের বৃদ্ধ ১৯৫৩ সালের মতো পুনশ্চ দুর্যোগ বহন করে আনছেন। তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে উপায়ান্তর দেখি না। তিনি চমৎকার অতীতদর্শী রাজনীতিজ্ঞ। বেঙ্গালুম সাধারণের অশক্ত ক্ষুধে মূল্যবান, ভাড়া বাড়ি, ট্যাক্স বাড়ি, চোখ রাখলী বাড়ি করেও সামারনের টুপি থেকে চীনা হামলার পর) টু শব্দটি বের হয় নি দেখে তিনি উৎলাহিত বোধ করেছেন। কিন্তু শহর কল-কাতা যে এখনও কবরখানার পরিণত হয় নি, দুঃস্বপ্ন নগরীর ভ্রাল রূপ যে ছাইচাপা ছিল, তাঁর অতীতদর্শী মনন সেটুকু ধরতে পরাম্ভ। অবশ্য শহুরে পুলিশবাহিনীর ওপর স্বভাবতই ভরসা আছে। এরা অল্পেই বিদ্যালয়ের বিশেষ মর্যাদা ভঙ্গ করতে পারেন। সুরক্ষিত শহরে বর্ধিত গারে লোহার টুপি পরে মণ্টগোমারির দৃশ্য সৃষ্টি করতে পারেন। আবার সীমান্তে এরাই পরদেশী পুলিশের পাঁজকোলায় করে দিনদুপুরে চুরি হয়ে যান। ভাই বলে শহরে এদের রুদ্ধবে কে! ইতিপূর্বে খাদ্য আন্দোলনের সময় এরাই নিরীহ নাগরিকদের বাড়ির বারান্দায় গুলী করে আহত করেছেন। সুতরাং মা ভেঃ!

অনুরোধী প্রীশেল মুখার্জী অন্তত এটুকু মতো ভাবতেই পারেন :

হা রে রে রে রে রে!
কে বলে পুলিশ পোস্ত
নর মারপিটে,
শহরে এদের রোক তো
বেশ পড়ে পিটে!

কিন্তু শব্দ পিটিয়ে ঠান্ডা করব তেবে, অভাব-অভিযোগে বিক্ষুব্ধ জনতাকে তবু থুড়ে তুললে অবস্থা কি দাঁড়াবে মন্ত্রী মহোদয় এবং সরকার তা একটু ধীরভাবে বিবেচনা করলেই ভালো হত। তা ছাড়া লন্ডনের ব্যাপারে যে রেকর্ড আলোচনা হয়েছে, পশ্চিম-বঙ্গ সরকার ডাক্তার ব্রুস্টে মৈত্রেয় পরিচয় রেখেছিলেন। (সে কি ব্যবসায়ীর স্বার্থে!) অথচ ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রীশেল মুখার্জীর এই অধীরতা সকলকে বিস্মিত করেছে। কেন এতো অধৈর্য? কেন আর একটু ধীর বিবেচনা করা যায় না। কেন হিসাবসহ পরীক্ষা করার জন্য সময় নেওয়া অসম্ভব। (এ-ও কি ব্যবসায়ীর স্বার্থে!)

পুলিশ ও এই আই সি

ছাত্ররা অশিষ্ট। তাদের পেছনে শাস্তি-রক্ষক পুলিশবাহিনী শিক্ষায়তন ভেঙে ধাওয়া করবেন বৈকি।

পুলিশও মূর্তমান অশান্ত। ম্যাজন স্ট্রীটস্থ এল আই সি অফিসের ক্যাপ কাউন্টারের মধ্যে ও বাইরে শাস্তিপূর্ণ কাজে বিশ্বাস্ত করে এবং কর্মচারীদের ওপর মারপিট করে শ্রুতকীর্ত পুলিশবাহিনী চমকপ্রদ নজীর সৃষ্টি করেছেন। জনৈক ব্যক্তি প্রিমিয়াম জমা দিতে এসে আহত হয়েছে। ছেলোটর বয়স মাত্র সাতের বছর।

কর্মচারী সমিতির যুগ্ম-সম্পাদকের বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ তিন-তিনবার এল আই সি অফিস আক্রমণ করে এবং অশ্লিষ্ট ছাত্রদের শিল্প করার প্রকাণ্ড দায়িত্ব নিয়ে রাস্তার দাঁড়িয়ে অফিস বাড়িতে ইট-পাটকেল ছোড়ে। তারা একতলায় কর্মরত অফিস, ভূগর্ভস্থ ঘর এবং আসবাবপত্র ও কাগজপত্র তছনছ করেছে। এমন কি এই ঘটনার 'মহিলা কর্মচারীরাও রেহাই পান নি।'

এর পর কি যথার্থীত তদন্ত বসবে, নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে সকলে মিলে সমস্বরে বলব, বাহবা, বাহবা বাহবা নন্দলাল!

শৈলবাবুর সাক্ষাৎ

প্রকাশ, সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহনমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সাধারণের ওপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয় চিন্তা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রাম কোম্পানীকে ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারটা কিছু দিনের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মাসিক দু'লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে, এই সুবাদে সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করে নি ট্রাম কোম্পানী। তা ছাড়া ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারটা ট্রামওয়েজের নিজস্ব ব্যাপার।

উক্ত মন্তব্য। কিন্তু পরিবহনমন্ত্রী কি একটি বাংলা প্রবাদ ভুলে গেছেন, 'কান চানলে মাথা আসে। কর্ণপাতে অক্ষম কোম্পানীর কান হিসেবের খাতায়। যে খাতায় গুরুতর গলদ ধরা পড়েছিল ১৯৫৮-৫৯ সালে শ্রী জি. এন. দাস ট্রাইবুনালের অনু-সন্ধান। তবে সেই লম্বকর্ণে তাঁর ট্রামদরদী যামহস্ত দক্ষিণ করের নীতিপূর্ণ কাজ-কার-বারের জন্য স্থান ছেড়ে দিল না কেন? কলকাতার একটি বাংলা দৈনিকপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে পরিবহনমন্ত্রীর এহেন ক্রিয়াকলাপকে 'দুর্গন্ধযুক্ত' ক্রিয়াকলাপরূপে আখ্যাত করা হয়েছে। পরিবহনমন্ত্রী নিজের কার্যকলাপকে সুবাসিত করার মানসে আর কোনো বিশ্বাসযোগ্য সাফাই গাইতে পারবেন কি?

সে ভরসা আমাদের অল্প। কেন না মন্ত্রী মহোদয় স্বখাত কদমে হস্তপদ গেঁথে ফেলেছেন তাঁর রুদ্ধস্বাস কর্মতৎপরতার জোহা! সাধারণের সুখসুবিধার জন্য এমন শব্দশালয়সুলভ দরদ যদি মন্ত্রী মহোদয়দের থাকত তবে দেশের লোক শৈলবাবুর মতো লোককেও সর্বোচ্চ শিলাখণ্ডে ভবিষ্যতে স্থাপন করতেন।

দুর্ভাগ্য্যত শৈলবাবু সেপথ মাদান নি। তাঁর তৎপরতার বরং ট্রাম কোম্পানী আশ্চর্য ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ভূমিকা নির্বিশেষে গ্রহণ করেছেন। ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ট্রামগাড়িতে নয়া টিকেট দেখা গেছে। এই অস্বাভাবিক তৎপরতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনও দেখাতে পারেন নি। পরিবহন-দপ্তরের মহিমা অপার!

হাইকোর্টে মামলা চলাকালীন বিদেশী বণিক শৈলবাবুর ব্যাঙের ছাতার তলায় আশ্রয় নিয়ে ভাড়া বাড়ালেন, এ-ও এক ভেটিক।

শৈলবাবুর অপরাপর ভেটিক অপেক্ষাকৃত চমকপ্রদ। তিনি বলেন, ট্রামের ভাড়া বাড়তে না দিলে ট্রামের চাকা বন্ধ হবে। কিন্তু দরদ বাড় বালাই। মানুষজন করবে কি তখন, এ্যাঁ! তাই ভাড়া বাড়ান ছাড়া সরকারেরই বা গতান্তর কি?

সঙ্গে সঙ্গে অন্যতর বক্তব্যে গরমিল ধরা পড়ল। বলা হল, ট্রাম কোম্পানীর উপরি আর বিলকুল জাতীয়করণ ভাঙারে জমা পড়বে।

বাহবা হিসেব-বাদ! হিসেবের কারচুপি শুধু ট্রামের ঘাড়ে চাপিয়ে অতিথি বণিকের ওপর দোষারোপ কেন, হিসেব বেহিসেব করার জন্য পরিবহনমন্ত্রীই কি কম পরিশ্রম করলেন। নিজের বয়ানেই বারবার রহস্য ধরা পড়ল। অর্থাৎ সরকারের গতান্তর ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। গতি যার ট্রামসহ...

ট্রামকর্মীরাও বেকের বসেছিলেন। কেন না তাঁরা দেখতে পেলেন, ১৯৬৪ সালের ট্রাম কোম্পানী, রাজ্যসরকার ও কর্মচারীদের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, ভাড়া সংশোধনের



শ্রীশৈল মুখোপাধ্যায়

ফলে তারও মর্যাদা রক্ষিত হয় নি। এজন্য শুধু যে তাঁরা একদিনের জন্য ধর্মঘট করেন, তাই নয়, বর্ষভিত্তিক বাতীদের কাছে ভাড়া আদায়েও কোনো রকম চাপ সৃষ্টি করেন নি কর্মীগণ। কারচুপিটা এখানেও অস্পষ্ট না থাকায় সাধারণের সম্মুখে আরও দৃঢ়মূল হয়েছে।

শৈলবাবু বেপরোয়া। বললে অত্যাঙি হয় না, প্রায় মরীয়া হয়ে কোম্পানীর আশ্রয় রক্ষা করেছেন তিনি। কেন না এতবড় একটা জন-স্বার্থবিজ্ঞিত ব্যাপারে ক্যাবিনেটের অনু-মোদনের জন্যও অপেক্ষা করার বৈধতা

ছিল না। শোনা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর অনু-পস্থিতিতে এই রহস্যময় ব্যাপারটি সংঘটিত হলেও, মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। শৈলবাবুর অতএব সাতখুন মাফ হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এবার রং-মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। বলা বাহুল্য, বেহেতু তাঁর মুখ্য ভূমিকা অতএব সাফাই তিনি গার নি। তাঁর বক্তব্যে জমিদারীগণ শৈলবাবুর তথাকথিত 'দুর্গন্ধ' খোঁচকরণে বিশেষ সাহায্যে আসবে।

গত বৃহস্পতিবার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শেষে তাঁর বক্তব্য— ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারটা খুবই যুক্তিসঙ্গত; এ নিয়ে হেঁচো যদি তোমরা কর, তবে সে কঠোর ক্রমের করে বন্ধ করে দিতে হয় অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাই দেখবেন।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের গরম বক্তব্যে সারা-দেশ সরগরম হলেও কলকাতায় হরতাল স্বাধস্তই পালিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যদিও শান্তিপ্রিয় নাগরিক বলতে চান, তাঁরা অশান্তির ভয়েই হয়ত বা ঘরে ঘরে অগর্লবন্ধ অবস্থায় ছিলেন। বিশ্বাস কি, জনসাধারণের তো জলে ডাঙায় ভয়। 'পান্ডার হাত থেকে যদিবা বেঁচে বাড়ি ফেরা'— পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। তা না হলে সতের বছরের একটি নির্বিরোধী ছেলে লাইফ ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে এসে শান্তিরক্ষকদের হাতে মার খাবে কেন!

পুলিশী মার ও গ্রেপ্তার

মার অনেকেই খেয়েছেন এবং গ্রেপ্তার হয়েছেন কুড়িজন বামপন্থী নেতাসহ খুচরো জনতা।

ট্রাম পড়েছে। ইট-পাটকেল টিয়ারগ্যাস ছুটেছে, সম্ভবমত পটকাও ফেটেছে।

পুলিশ নিরস্ত ছেলেদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে বেশ কাহিল বোধ করেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ জাননা ফুড়ে পুলিশী গ্যাসের অনুপ্রবেশ থেকে আত্মরক্ষা করতে ও ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করতে ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন। জনসাধারণ যানবাহনের অভাবে অশেষ দুর্গতি ভোগ করেছেন।

বহুকাল কলকাতা মৃত ও মূক ছিল, আবার দুর্বিনীত ও উৎসুক হয়ে উঠেছে।

যাই হোক, টিয়ারগ্যাসের চোটে শহর-কলকাতা যতই হেঁপো রুগীর মত বৃক মূড়ে পড়বে, নেপোল দই ততখানিই মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। এদেশে নয়, বিদেশে, ট্রাম কোম্পানীর আপন দেশে। কেন না শরতান চিরকালই গোলমালের সুযোগে তার কৃতকর্ম চাপা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় না ঘটতে পারে। কোম্পানীর হিসেবের খাতায় কোটিতর টাকার যে গলদ তা এই সুযোগে কোম্পানী ও ভাস্য দালালচক্র কবর চাপা দেওয়ার পথ পাবেন।

কে বলে গতান্তর নেই। গোলমালের শেষ-

গতি সাধারণের দুর্গতির-মধ্যেই বাঁচা শেষ করবে।

কোম্পানীর দই, পরিবহনমন্ত্রীর মা ভৈঃ, সরকারের তা-তা-ধৈ এবং জনসাধারণের হৈ চৈ-এর তাগাড় মেখে ট্রাম লাইনের ভাঙা রাস্তা কংক্রিট হবে। আবার ট্রামের চাকা স্ট্রিনারমেই গড়িয়ে চলবে শহরের বুক চিরে।

মৈদীনীপুর :

মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত চল

মিছিল নর, মনুমেণ্ট পাদদেশ বা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারেও নয়, তদন্তের জন্য আওয়াজ তুলেছেন এবার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

কিন্তু খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের তদন্ত নর, কংগ্রেসের আপন ঘরে সদস্য ফর্ম জাল জোড়ার জন্য আনাত অভিযোগের তদন্ত।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এমন প্রকাশ্য অবমাননাকর পরিস্থিতি ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। দেখালেন মৈদীনীপুর জেলা কংগ্রেস। বাংলার আপামর জনসাধারণ স্তম্ভিত, নাচার স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

কলকাতার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, মৈদীনীপুর জেলা কংগ্রেসের বিরোধে আপোষের সম্ভাবনা কম। ব্যাপারটা এ-আই-সি-সি পর্যন্ত যখন গড়িয়েছে, তখন এ-আই-সি-সির তদন্ত করাই উচিত। অর্থাৎ মৈদীনীপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতির দাপট মুখ্যমন্ত্রীও নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে পার্টি অফিস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বিতাড়িত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় উপায়ান্তর না দেখে সরাসরি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের দরবারে সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে মৈদীনীপুর জেলা কংগ্রেসের কারচুপি পরীক্ষার জন্য আদেশ দিতে অনুরোধ করেছেন।

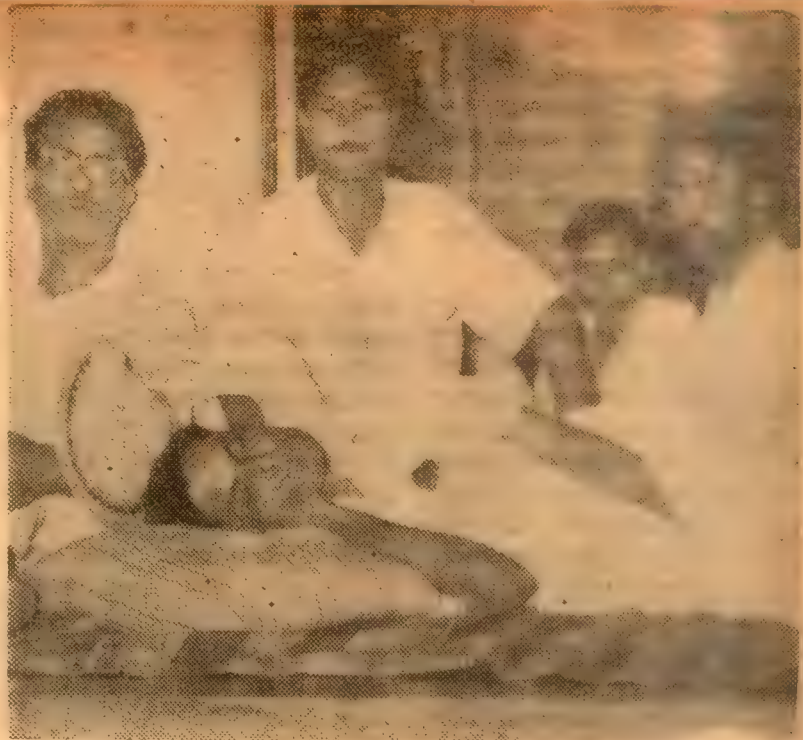
অভিযোগে বলা হয়েছে, মৈদীনীপুর শহর উত্তেজিত। ভূয়া সদস্যের ফর্ম জমা দিচ্ছেন জেলা কংগ্রেস। কতিপয় সদস্যের অনুরোধে শ্রীমুখোপাধ্যায় সরজমিনে ঘটনাক্রম লক্ষ্য করতে গেছেন, কিন্তু জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাকে পার্টি অফিস ত্যাগের হুকুম দেন।

ব্যাপারটির এখানেই ইতি হয় নি। পার্টি অফিসের সামনে যুগপৎ অনশন ও অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন কিছুসংখ্যক কংগ্রেস সদস্য।

জেলা কংগ্রেস বেপরোয়া। জনৈক জেলা কংগ্রেস সদস্য ধর্মঘটী সদস্যদের মাড়িয়েই ভিতরে প্রবেশ করেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই ঘরোয়া কোন্দল বলে প্রথম পর্বতে উড়িয়ে দিতে কিন্না ধামাচাপা দিতে চেষ্টাছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বিফল হয়েছেন অবশেষে।

মৈদীনীপুর জেলা কংগ্রেস অফিসের সামনে ক্রমশঃ ধর্মঘটী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তেজনাও বাড়ছে উত্তরোত্তর।



মৈদীনীপুর কংগ্রেস অফিসের সামনে অনশনরত কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুগা

উল্টো পিঠে মৈদীনীপুর জেলা কংগ্রেস শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অব্যাহত দলবল সহ হামলা করার অভিযোগ আনয়ন করেছেন এবং অভিযোগে বলা হয়েছে একটি নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য তীরাও আগ্রহী। তবে যেহেতু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রত্যক্ষত জেলার বর্তমান ক্ষমতাসীন কংগ্রেস-গোষ্ঠীর প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন, সেজন্য তদন্তের কার্যভার বেন তার ওপর ন্যস্ত করা না হয়।

জেলা প্রদেশের এই পারস্পরিক দোষারোপ যদি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী সামান্য ঘরোয়া কোন্দল মাত্র হ'ত তবে ব্যাপারটা হয়ত ধর্মঘট পর্যন্ত গড়ত না। তাছাড়া স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও নাচার ও হতাশ হয়ে পড়তেন না। সুতরাং গণ্ডগোল বেশ দার্না পাকিয়ে উঠেছে স্বীকার করতেই হবে আর পরে গ্রীসেন সে কথা অস্বীকারও করতে পারেন নি।

বাংগালোর এ-আই-সি-সি অধিবেশনেও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কংগ্রেসী ঘরোয়া কোন্দলকে 'ও কিছু নয়' বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন, অথচ সমগ্র ভারতব্যাপী কংগ্রেসী ঘরোয়া বিরোধ বেভাবে পক্ষ বিস্তার করছে তাতে প্রেফ কাড়ফুৎকে ব্যাপারটা নস্যাক করে দেওয়া অসম্ভব।

ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের পাতায় আশঙ্কাজনক গৃহদাহের সংবাদ আমাদের বারম্বার প্রকাশ করতে হয়েছে; বিহার, আসাম, উত্তর-প্রদেশ, পঞ্জাব ইত্যাদি রাজ্যে রেধারেষি আর দলাদলি বম্ব্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল

পর্যন্ত প্রকলিত করছে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস এক ধাক্কা বাজিমাং করলেন।

তাড়ন, বিতাড়ন, ধর্মঘট পর্যন্ত যুগ্ম স্বপ্ন সময়েই এগিয়েছে। এর পর মারণ মরণটুকুই বাকি থাকে যদি না কটপট একটা কোনো ফরসালা করে নেওয়া যায়।

জলপাইগুড়ি :

কয়েকটি সমস্যা

জলপাইগুড়ির সংবাদ সাম্প্রতিক গ্রিসোত্তা, জলপাইগুড়ির নিতপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপ্রতুলতা ও অব্যবস্থার প্রতি বারম্বার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছেন। বঙ্গদর্শনের পাতার আমরাও তাদের বক্তব্যকে এবং জলপাইগুড়িবাসীর অভাব-অভিযোগ একাধিকবার জুলে ধরার চেষ্টা করছি।

'গ্রিসোত্তা' সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধার করে বর্তমান সংখ্যার স্থানীয় জনগণের কয়েকটি অভিযোগ আমরা পাঠক-বর্গের সামনে তুলে ধরি। আশা করি এ বিষয়ে সরকারও সহদয় দৃষ্টি দেবেন।

"গত ১লা জুলাই করতোয়া বাধ উদ্বেগ-ধনের সময় পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলিয়াছিলেন, রাজগঞ্জ ধানার অন্তর্ভুক্ত ১৯০১-৫০ সন পর্যন্ত আবাদী জমির পরিমাণ ও জনসংখ্যা প্রায় একইরূপ চলিয়াছিল এবং বর্ষে বর্ষে জমি অনাবাদীও পড়িয়াছিল, তাহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছিল যে, যদিচ ওখানে বৎসরে গড়ে ১২০" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত

হয়, কখনও আঁতর্বাঁকি কখনও অনাবাস্তব হয়। এ জমি চাষযোগ্য হইতে পারে নাই। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানগত জনসংখ্যার ফলে ০৫ হাজার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু সেচের জলের অভাবে অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য জমি করিতে না পারায় অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার করতোরায় বাঁধ নির্মাণ করার পারিকল্পনার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। খগেনবাবু বলিয়াছেন পশ্চিম-বঙ্গের অপরাংশে (উত্তরবঙ্গ ব্যতীত) প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁধ তৈরি করিয়া অনাবাদী জমিতে সেচের জল দিয়া আবাদযোগ্য করার ব্যবস্থা হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন সেই তুলনায় করতোরায় বাঁধ একটি খেলনার সামিল। এখানে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে ৮৮২২ হেক্টরের তথা ১১৮০০ একরে ইহার মধ্যে বার্ষিক শস্য ১০৮০০ একরে এবং রবিশস্য হইবে ৮০০০ একরে, অধিক ফসলের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ২৮১৬৭ কুইন্টাল তথা ২৬২২৯০ মণ।

আমরা ঠিক বৃত্তিতে পারি না পশ্চিম-বঙ্গের খাদ্যশস্যের সঠিক পরিমাণ কত। মনে আছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রমথ চন্দ্র সেন সমস্ত সমস্ত বিধান-সভায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গে চাউলের পরিমাণ ১১৮০-১৬ সনেই ছিল ৫২ লক্ষ টন অর্থাৎ ৮ লক্ষ টনের মতো ঘাটতি। করতোরায় বাঁধের ফলে এই খেলনা প্রকল্পে যে ফলন আশা করা হয়, তাহা উপরে লিখিত আছে। অ. রা. হি. বৃত্তিতে পারি না পশ্চিমবঙ্গের অপরাংশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁধ দ্বারা সেচের জল দেওয়া হইবে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের এত অপ্রতুলতা কেন, ইহা সত্যকার অভাবপ্রসূত? অথবা অন্য কিছু?

ডায় সান্যাল মহাশয়ের উপরোক্ত সংখ্যা-জমা আরও দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে আলু উৎপাদনের জমির পরিমাণ ১ কোটি ৬০ লক্ষ একর এবং প্রতি একরে ৮৭ মণ আলু উৎপন্ন হয়, মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৫ কোটি ১৬ লক্ষ টন। এইরূপ আরও নানাবিধ ফসল পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়। তথাপি পশ্চিমবঙ্গে সকল বিষয়েই পরিনির্ভরশীল কেন?

এবার আমরা জলপাইগুড়ির সমস্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রাক্তন জলপাইগুড়ি জেলার যে ৫টি থানায় সর্বাধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত, বাহা পাকিস্তানকে প্রকল্প উপহার দেওয়া হইয়াছে, উহাতেই এই জেলার সর্বাধিক ফসল উৎপন্ন হইত এবং জলপাইগুড়ি দুরভাগবশত তাহা হারাইয়া বসিয়াছে। তথাপি এই জেলার তিস্তার অপর পারশ্বে বিরট অঞ্চলে স্থানে স্থানে এবং এপারের মন্ডলঘাট অঞ্চলে ধানের জাবাদ ভালই হয়। আমরা শুনঃ শুনঃ এই দাবিই করিয়াছিলাম যে, জলপাইগুড়ি জেলার উৎপন্ন সমস্ত ধান (আউস ও আমন) এই জেলাতেই রাখা হউক এবং তাহা সরকারী ব্যবস্থায় অথবা অন্য কোন পাথে কেন জলপাইগুড়ি জেলার বাহিরে না চলিয়া যায়

এক জলপাইগুড়ির জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য-শস্যের বড়ই ঘাটতি পড়ে উহাই বাহির হইতে আনা হউক। কিন্তু দুরভাগবশত এই ব্যবস্থা কিছুতেই গৃহীত ও কার্যকরী না করার এই জেলাকে সমস্ত বৎসরের জন্যই একটি সমস্যাসংকুল জেলায় পরিণত করা হইয়াছে।

...আর একটি সমস্যা করলার আমদানি ও বন্টন।...জলপাইগুড়ির স্থানীয় সরকারের বহুমুখী অযোগ্যতা ইহাকে জলপাইগুড়ি-বাসীর পক্ষে আরও সংকটসংকুল করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সম্পর্কে ত্রিপুরার গত ১১ই জুলাই সংখ্যার প্রধান সম্পাদকীয়তে বিস্তৃতভাবে আমরা আলোচনা করিয়াছি, এই বিষয়ে কোনো প্রতিবন্ধকের চেষ্টা হইতেছে কিনা জানি না। সমস্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। কোন একটি ভিপোতে করলা দিতে আরম্ভ করিলে নিকটবর্তী এলাকা হইতে বহুদূর এলাকার লোকও কার্ড হস্তে দৌড়াইয়া আসেন, বিরট লাইনে স্থান গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হন। লোক করলার গৃহাগৃহ বিচার না করিয়াও করলার নামে বাহা পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হন। এই সুযোগে কুলিরা যেখানে পূর্বে ৪ আনার মোট বহন করিয়া নিত, সেইখানে ন্যূনতম দাবি ১০ হইতে উর্ধ্বে ১ টাকারও ওপরে আদায় করিয়া ছাড়িতেছে। ৩ টাকা ২ পয়সা করলার মূল্যের সঙ্গে এই পয়সাও যোগ করিতে হইতেছে। ফলে করলাও যেন নানাভাবে শোষণের মস্ত বড় কলে পরিণত হইয়াছে। আমাদের ১১ই জুলাই-এ এই সম্পর্কে আলোচনার বর্তমান ভেদটি কমিশনার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। আকৃষ্ট হইয়াছে কিনা জানি না। আমরা শ্রীমশীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের দৃষ্টি এইদিকেও আকর্ষণ করিতেছি। শহরবাসীর দাবি (১) সমস্ত ভিপোতে সর্বসময়ের জন্য করলা মজুত থাকুক, (২) সব ভিপো হইতে একই সময়ে করলা বন্টনের ব্যবস্থা করা হউক। এই পথে বাহা কিছু অন্তরায় তাহা দূর করার দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের বলিয়াই আমরা মনে করি।

ধর্ম্মান :

সরকারী অর্থের প্রাবন

অর্থের প্রাবন শুনে কেউ যদি একবার জামালপুর থানার পাড়াতল অঞ্চলের শ্রীমানপুর মৌজায় ভূবরী হতে আসেন তবে টাকার তেড়ে নির্বাণ ডুব মরবেন তিনি। একবার নয়, গত আট বছর যাবৎ বারবারই সরকারী অর্থব্যয় এ অঞ্চল প্রাবিত হয়।

গত ০০শে জুন শ্রীমানপুর মৌজার রাষ্ট্রপীদহ সংলগ্ন গাইমোহানার স্লাইস বাঁধের পূর্বদিকটা আবারও ধসে গেছে। সরকারী টাকার এ বাঁধ বারবার তালিতাপি খেয়েছে। পরিশ্রমশীল উপহৃত না হওয়ার ব্যবস্থা

বহুজন্মের বয়নও করেছে। এবারের প্রাচীর বিস্তৃত অঞ্চলের কৃষিজমি পরিপ্রাবিত। চারিদিকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন। আবাদী সোনার এখন উল্লীখিত অঞ্চল ভাসছে।

প্রকাশ, স্লাইস বাঁধের মাহাত্ম্যে স্থানীয় চাষীরা বিনীত। শ্রম, প্রাবনের ক্ষয়ক্ষতির ভয়ই নয়, জলকরের জুজুও তাঁদের উদ্বাস্ত করে য়াচ্ছে। স্লাইস নির্মাণের জন্য দোকসলাী জমির ওপর অত্যধিক জলকরতার বহন করছেন তারা, কিন্তু জলাভাবে জলের সুযোগ জুটছে না পোড়াকপালে। অবস্থা এমন শিকের তোলা হয়েছে যে, প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, চাষীরা নাকি গাটের কাঁড় খরচ করেই প্রতি বছর এ বাঁধে মাটি ঢেপে কেবলমাত্র আলুচাবের এক-প্রকার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ছাড়া জলকরের অর্বাচীন ব্যতীত নতুন এখানে কিছুই দেখা দেয় নি।

এই বছরেই সেচ বিভাগ ফাল্গুন-চৈত্রে কানা নদীতে জল সরবরাহ করেছেন। বলা বাহুল্য, সে জল এখানে শেঁছার নি। অথচ রাষ্ট্রপীদহে জল সরবরাহের উপহৃত ব্যবস্থা থাকলে শূন্য আকাশের বিরাগ সত্ত্বেও মাঠে আলু ছাড়া ফলত পাট আখ, কুমড়া, কচু ও আউস বাঁজ।

কানা নদী থেকে রাষ্ট্রপীদহে জল বন্ডা যায়। কিন্তু পাড়াতল, বসন্তপুর, গোহালদহ, পিরজাপুর, শিপতাই ও শ্রীমানপুর মৌজার নিকাশী জল ও সাধুমতী খালের জলও রাষ্ট্রপীদহের ওপর নিকাশ করা হচ্ছে না। ফলে নাকি জল জমে এই অঞ্চলের পাট ও আমন ধানের বাঁজ পাচিরে নষ্ট করে দিয়েছে। চাষীরা হতাশ। রোজগার নেই। বাজার আগুন। চাল একশ' পঁচিশ পয়সা কে জি।

এঁদের দিকে ফিরে তাকাবার মনিষ্য নেই। দীর্ঘদিনের আবেদন-নিবেদন স্লাইস বাঁধের ভাঙনের সঙ্গে ধরে যাচ্ছে। এক টাকার অপচয়।

তা হোক। গৌরীসেন কোম্পানীর টাকা ম্বদেশী রূপায়। বিদেশী মূল্যফা নয়। তাই মাথাব্যথাও বড় একটা কারণ নেই। তলকর আদায় হলেই হল।

কিন্তু সব হওয়াটাই বেশ হত দি কর্তারা গাইমোহানার মধ্যে পরিচয় দিতেন ডবল স্লাইসের বাঁধন। আঁতর্জরহল থেকে সে দাবি উঠেছে। কাতর চাষীরাও চেঁচামেচি কম করেন নি। কিন্তু টাকার প্রাবনে যেখানে অবগাহনের এমন সুযোগ, সিন্দখ ব্যস্তরা মনে করেন, সেখানে জলের প্রাবন রোধ করার মতো গৌরাচূর্ণী গাছভবনের মালিকরা বসবেন কেন।

উপহাস

! পাঠ !

নব্ব্বন্দনাথ চিত্র

বাওয়ার জায়গার অভাব ছিল না। বন্ধু-
দাম্পত্য বা অবশিষ্ট আছে তাদের সংখ্যা
নিতান্ত অল্প নয়। ওদের করো কাছে
বেতে পারত বিজন। তাদের কেউ হয়তো
অফিসে এসেছে, কেউ বা অফিস কামাই
করে বাড়িতে বসে ভাসটাস খেলছে। সদা-
বিবাহিত সূত্রত নন্দীর কথা মনে পড়ল
বিজনের। সে হয়তো স্ত্রীর সঙ্গে বসে বসে
গল্প করছে। এই বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে, সে
নিশ্চয়ই ঘর থেকে বেরোয় নি। ভাির
আরসী আব আরাধাপ্রায় সূত্রত। ওর
বাবার অবস্থা ভালো। বিজনের মত সংসারের
সমস্ত দায়িত্ব সূত্রতকে নিতে হয় নি। অর্থ-
চিন্তা ওকে প্রায় করতেই হয় না। ওর
বাবা ওকালতির টাকায়ই স্বচ্ছলভাবে
এখনো ওদের সংসার চলে। সূত্রত বা
রোজগাব করে স্ত্রী, শ্যালিকা আব বন্ধু-
দাম্পত্যদের নিয়ে 'আনন্দ-উৎসবেই তা সম্পূর্ণ'
নিঃশেষ করে দেয়। বাপের একমাত্র আদরের
ছেলে। ভাই-বোন নেই, কোন দায়-দায়িত্ব
নেই। নিশ্চিন্ত নিভাবনার জীবন। কোন
কোন সময় ঐ জীবনকে বড় সরল আর
স্বচ্ছ বলে মনে হয়েছে বিজনের। যে-জীবনে
কোন সংগ্রাম সংঘাত নেই, কোন জটিল গ্রন্থি
নেই, সে জীবন যেন বাপনের যোগ্য নয়।
স্বচ্ছল বন্ধুর সঙ্গে সুখেব জীবনকে তাই
একটু করুণা, একটু অনুকম্পার চোখেই যেন
দেখে এসেছে বিজন। কিন্তু আজ কর্মহীন
লাজিত অপমানিত বিজনের মনে হল ঐ
সহজ সবল সুখই যেন পৃথিবীর সবচেয়ে
কাম্য সুখ বলে মনে হয়। কিন্তু সেই সহজ
নিশ্চিন্ততা, স্নেহ-প্রীতি, প্রাণ-বিশ্বাসের
স্বর্গে তো ইচ্ছা করলেই যাওয়া যায় না।
একবার সেখান থেকে নির্বাসিত হলে কিরে
যাওয়া বড়ই কঠিন।

ভুবানীপুরে সূত্রতদের বাড়িতে ঢালাও
নিমন্ত্রণ আছে বিজনের। মোটামুটি সে-
বাড়িতে সে সমাদৃত। সূত্রতের বাবা যা
তাকে পছন্দ করেন। সবচেয়ে বেশি পছন্দ

করে বোধ হয় ওর স্ত্রী শমিতা। মেলেই
চা-টা দিয়ে আপ্যায়ন করে। হেসে কথা বলে।
বিজনের কথা শুনতেও ভালোবাসে। কাজের
ওজুহাত দেখিয়ে অসময়ে উঠে যায় না।
সূত্রত মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, 'আমার
বউ দৌশ দিনে দিনে তোমার বস্ত ভস্ত হয়ে
উঠছে। লক্ষ্য তো সুবিধে মনে হচ্ছে না।'
বিজন বন্ধুর এই কৌতুক স্মিতমুখে উপভোগ
করে।

সূত্রতদের ওখানে গেলে সময়টা বেশ
কেটে যায় বিজনের। সংসারে বাবা মার সঙ্গে
যখন রাগান্বিত হয়, অভাব অনটন বেশি প্রকট
হয়ে ওঠে এই বন্ধুর বাড়িতে মাঝে মাঝে
পালিয়ে আসে বিজন। কখনো মনোভূমির তিতর
থেকে সবুজ শ্যামল একটি ওরোসে এসে
আশ্রয় নেয়। কখনো কখনো প্রসন্ন মুহূর্তেও
আসে। ওদের তাদের আসরে বসে। ক্রটিং
কখনো সিনেমা থিয়েটারে সঙ্গী হয়। সবাই
জানে বিজন মোটেই নির্জনতা-প্রিয় নয়।
সামাজিক সঙ্গকামী, সঙ্গদানে উৎসুক মানুষ।
পরিবারে ওর নানা সমস্যা আছে। কিন্তু সেই
সমস্যার কথা যখন তখন বাব তার কাছে তুলে
ধরে অন্য কাউকে পীড়িত তার বিরত করে
তোলার ছেলে বিজন নয়। নিঃসঙ্গ মুহূর্তে
সে নিঃসঙ্গই থাকে। সঙ্গীদের ওপর নিজের
হৃদয়ভার সে চাপিয়ে দিতে যায় না।

সূত্রত একেদিন বলে, বিজন, মাঝে
মাঝে মনে হয় তুমি একটি পরম সুন্দর
মুখোশ পরে চলে। হাসিমুখি আলাপী
সামাজিক-মানুষের মুখোশ। কিন্তু ভিতরে
ভিতরে তুমি একটি পবন অসামাজিক জীব।

এসময়ানেও এসে দক্ষিণগামী চলন্ত
বাস-ট্রামগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিজন
তার এই বন্ধু পরিবারটির কথা ভাবছিল।
হঠাৎ সূত্রতের ওই কথাটা মনে পড়ায় বিজন

চমকে উঠল। সূত্রত ফি সত্যিই কিছু ভেবে
বলেছিল কথাটা? না-কি বলবার আনন্দেই
বলে গিয়েছিল বিজন যেমন বলে? অর্থ কিছু
থাকুক না থাকুক শৃঙ্খল বলতে ভালো লাগে বলে
শুনতে ভালো শোনাবে বলে অনেক কথা
বলে যায় বিজন। সূত্রতও নিশ্চয়ই সেইভাবেই
তাকে অসামাজিক বলেছিল। কিন্তু আজ
সত্যি সত্যিই বিজন অসামাজিক হয়ে উঠেছে।
আজ না, প্রীতিকামবাবুর সঙ্গে যোগ দিয়ে
অনেক আগেই সমাজবিবোধী কাজে সে
প্রবৃত্ত হয়েছে। ধরা পড়েছে শৃঙ্খল আজ।
কি অনেক আগেই ধরা পড়েছে, শাসিত
পেরেছে আজ।

এতদিন যদি মুখোশ পরে চলে থাকে
বিজন সে মুখোশ সে সজ্ঞানে পরে নি।
বরং স্বাভাবিক আনন্দ উল্লাস নিয়েই সে
বন্ধুদের সঙ্গে হেসেছে গল্প করে। কিন্তু
আজ সত্যি সত্যিই একটি মুখোশের দরকার
হবে। শিক্ষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন ভদ্র মানুষের
মুখোশ। চিন্তা-ভাবনা, শৃঙ্খল-ভয়ানক, সুখী-
সুস্থ ভদ্র মানুষের মুখোশ। সেই মুখোশ
কি সত্যিই সবসময় পরে থাকতে পারবে
বিজন? বলা বড় কঠিন।

মতি বদলাল বিজন, গতি বদলাল।
পকেটে সাসপেনসনের অর্ডার নিয়ে বন্ধুর
স্ত্রীবা সঙ্গে গল্পগুঁড়ব করা যায় না।
অন্তর্ধান মনের জোর তাব নেই। শেষে ধরা
পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। শমিতা খুব যে
বৃদ্ধিমতী তা নয়। তবু মেয়েদের যে
সহজ বোধশক্তি আছে তাতেই সে ধরে ফেলেবে।
টের পেয়ে যাবে বিজন স্তম্ভ বড় অনমনস্ক।
সমস্যা সঙ্কটে বিভূর্ত। কথা বলতে গেলে,
হাসতে গেলে বারবার বিজনের মুখে আজ
শ্রান ছায়া পড়বে। তাব চেয়ে না যাওয়াই
ভালো। তাছাড়া গেলে বিজন নিজেকে তো

আনন্দ পাবে না। আনন্দ যখন উদ্দেশ্যহীন স্বাধীনগতহীন তখন তার মধ্যে আনন্দ আছে। নিম্ন সৃষ্টির আনন্দ। কিন্তু প্রত্যয়গা তো আর আনন্দ নয়। তা নিজের মধ্যেই হোক আর অন্যের মধ্যেই হোক।

স্বাভাবিক বাস্তবতা যোগ্যতার কোন কথা ওঠে না। অফিসে আসবার সময়ই তো সে বাড়ি হয়ে এসেছে। এক বাড়িতে আব দিনের মধ্যে কতবার যাওয়া যায়! তাছাড়া গিয়ে কলবেই বা কি বিজ্ঞ। সেখানেও সেই শ্রোতার ভূমিকা নিতে হবে। অসংখ্য মিথ্যার জাল বুনতে হবে সেখানেও।

হঠাৎ বিজ্ঞানের মনে হল তার যাওয়ার কোন জায়গা নেই। যেতে হলে- সর্বত্রই হুম্মবেশে যেতে হবে। আপন বেশে যাওয়ার আব উপায় নেই তার। হুম্মবেশে বাবে অথচ সব সময় ভরে ভরে থাকবে কখন ব্যক্তি ধরা পড়ে। অনর্গল মিথ্যাকে সত্য বলে চালাবে অথচ সব সময় আশঙ্কা সেই মিথ্যা কেউ ব্যক্তি ধরে ফেলে। বিজ্ঞানের মনে হল ব্যক্তি জীবন এমন শঙ্কা আর ভয় নিয়ে তাকে কাটাতে হবে। সে যা নয় তাই তাকে সেজে থাকতে হবে। কি লোকে জোর করে তাই- তাকে লাজিয়ে রাখবে।

রাস্তা পার হয়ে একটা রেকর্ডারেটে ঢুকল বিজ্ঞ। চা চাইল এক কাপ। চা আসবার আগেই সিগারেট ধরল। এই মৃদু শোষ যদি তাকে ফের প্রকৃতিস্থ করতে পারে?

এখনো বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। এই সিন্ধু শীতল আবহাওয়া এর আগে অনেক দিন উপভোগ করেছে বিজ্ঞ। চা খেতে খেতে অলস দৃষ্টিতে এমনি করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে লোক চলাচল যানবাহন চলাচল দেখতে বেশ লাগে বিজ্ঞের। কর্মবাস্তব মনুষ্য কিছুই দেখে না। হস্তদলিত হয়ে সে ছুটতে থাকে, কি ঘুরপাক খেতে থাকে। তার তখন কোনদিকে তাকাবার অবসর থাকে না। কর্মকান্ডে বিভ্রান্ত মানুসই চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পারেন। দেখার ভিতর দিয়েই সে তখন যা কিছু কবে। সৃষ্টি করে আবার ভোগসম্ভোগও করে।

বিজ্ঞ এমনি করে বাইরের জগৎকে অনেক- দিন দেখেছে। রাস্তার চলন্ত মানুসকে দেখেছে আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতরটাও দেখেছে বিজ্ঞ। কেউ বা টেবিলে ঘুমে তারই মত চপচাপ চা খাচ্ছে, কেউ বা কম্বুর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে, কেউ বা ছুঁমুল বিভবকে মেতে উঠছে। সিন্ধু কোঁড়কের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে বিজ্ঞ। এই রূপনারটের যেন শেষ নেই। দুশোর পর দুশ্য বদলাচ্ছে, স্বনিকা উঠছে পড়ছে। এই অন্তহীন জীবনলটের বিজ্ঞ যেন একক দর্শক।

কিন্তু আজ আর সেই মন নেই বিজ্ঞের। সেই চোখ নেই। সামনে মন কলো কানিকা সব দৃশ্যকে যেন আড়াল করে রেখেছে।

রেকর্ডারেটের বিল মিচিরে দিয়ে খানিক ঘর বিজ্ঞ উঠে দাঁড়াল। মন তেরনি- বিক্ষিপ্ত বিস্তৃত বিপর্যস্ত। সেখানে এসো- মেলা হাওয়া বইছে। বোড়ো হাওয়ার যত রাজ্যের খুলো আর বালি উড়িয়ে আনছে। চোখ মেলে ভালো করে তাকবার জো নেই। স্থির হয়ে কোথাও একটু দাঁড়বার উপায় নেই কোন। সেই অস্থির আনন্দচরিতাই বিজ্ঞকে যেন শেষ পর্যন্ত একটা বাসে তুলে দিল। বিজ্ঞ ভেবেছিল সে বোধ হয় নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছে। এ যাত্রা কোনদিন শেষ হবে না। এই বাস থেকে তাকে কখনো নেমে পড়তে হবে না। অক্লান্ত গতি নিয়ে বাসটি চলতেই থাকবে।

কিন্তু বাস ঠিক যথাস্থানে এসেই থামল। বিজ্ঞ যন্ত্রণে নেমেও পড়ল। আর জলকায়ার পথ বত দুর্গমই হোক- নিত্যকার অভ্যস্ততা বিজ্ঞকে ঠিক নিজের-বাড়ির দোরগোড়ার শোঁছে দিল।

দাদা এসেছে। দাদা এসেছে!

ইরা আর রক্টু দোরের কাছে ছুটে এল। তাদের উৎসাহ উল্লাস অন্য দিনগুলিকে ছাপিয়ে গেছে। আনন্দ হবারই কথা। বিকাল-বেলায় দাদাকে তারা খুব কমই দেখতে পায়। রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে বিজ্ঞ যেন জ্বরে কিরতে জ্বনে না। তার জ্বরে ক্লাস আছে, বন্দু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করা আছে। আগে টুইশন কি পার্টটাইম চাকরিও করেছে বিজ্ঞ। সেই যে দোর করে বাড়ি ফেরা অভ্যাস করে ফেলেছে এখন আর কাজকর্মের চাপ না থাকলেও সকাল সকাল বাড়ি আসতে পারে না। এই নিয়ে বাবা মাঝে মাঝে বলেন, মা অভিমান করে বলেন, কীরে তুই। ভাইবোনগুলি সেই সখ্যা থেকে কেবল ঘরবার করে আর ফিরে ফিরে তার পথের দিকে তাকায়। রক্টু তো ঘুমিয়েই পড়ে। তোব কি একদিনও ইচ্ছা হয় না ওদের নিয়ে দু-দু-দু আনন্দ আহ্বাদ করিস। একসঙ্গে বসে খাসটাস।

বিজ্ঞ স্মিত মুখে এই গল্পনা সহ্য কবে। সে ভালো করেই জানে ভাই-বোনদের আশ্রয় সে কম মিটায় না। রাতে তারা তাকে সর্বাঙ্গ না পেলেও দিনের বেলায় তার সঙ্গ তারা খুবই পায়।

আজ তাকে সকাল সকাল ফিরতে দেখে মাও খুব খুশি। হেসে বললেন বাম্বা, ভাগ্যে বৃষ্টিটা নেমেছিল।... তাই বেলা... থাকতেই থাকতেই তার মুখ দেখা গেল।

বিজ্ঞের মুখ যে স্থান বিপর্যয় মুখ মোটেই আর পাঁচজনকে দেখাবার মত মুখ নয় মায়ের স্নেহদৃষ্টিতে চট করে তা ধরা পড়ল না। বিজ্ঞও তাঁর চোখ এঁড়িয়েই গেল।

ইরা হঠাৎ তাব দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক দাদা ছুঁমি যে একেবারে ভিজে চূপসে হয়ে এসেছে। এমন ভিজলে কী করে।' এঁক দাদা তোমার ওয়াটারপ্রুফটা কই? সেটা কি জার্সি কোথাও ফেলে এসেছে না কি?

বিজ্ঞ ভাড়াভাড়ি ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল। তারপর অশ্রুচক্ষুরে বলল, 'চূপ।'

আর চূপ। ততক্ষণে কথাটা যার কাছে যাবার তাঁর কানে ঠিকই চলে গেছে।

বিভূতিবাবু পাশের ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর পবনে ঠিক সকালের মতই একখানা লুঙ্গি। সস্তাদামের একজোড়া করে লুঙ্গি কেনেন বিভূতিবাবু। স্নান করে একখানা শুকোতে দেন আর একখানা পরেন। গায়ের গোলটি একটু ছিঁড়েছে। যখন আরো ছিঁড়ে যায় কিছুতেই আর পরা যায় না, সুতরাং এই- নিয়ে দুবেলা রাগারাগি করতে থাকেন তখন বিভূতিবাবুর মুখে নৈর্ঘাতিক মন্তব্য শোনা যায়, বাসারিস জীবানি এবার তাহলে পরিত্যাগ করতেই হবে দেখছি।

শুধু গোলি নয়, জামা, কাপড়, জুতো পাম্বা সব কিছুর মোহই তাকে এমনি করে বেঁধে রেখেছে। জিনিস বত পুবোনো হয় ততই যেন তার আকর্ষণ বিভূতিবাবুর কাছে গভীর হয়ে ওঠে।

বিভূতিবাবু ছেলের ভিজে জামা-কাপড়ের দিকে একটু কাল নিম্পলক হলে 'রইলেন, তারপর তাঁর কঠিন স্বরে মন্তব্য করলেন, 'গুটা বে যাবে আমি জানতাম। টকা তো আর তোমাদের কাছে টকা নয়, খোলামুড়ির সামিল। আমি শালই শুধু জন্মাবধি তালি দেওয়া জামা-কাপড় টেনে গেলাম।'

বিজ্ঞ বাবার কথার কোন জবাব দিল না। তিনি আরও যা সব বলতে লাগলেন তাও কানে তুলল না।

বতক্ষণ পড়েন বলে যান, বা মুখে আসে বলতে থাকুন। বিজ্ঞ ভাল একনকার মত ওর রাগ আর দুখটা ওয়াটারপ্রুফের ওপর দিয়েই যাক। উনি তো এখনো জানেন না বিজ্ঞ আজ অনেক কিছু হারিয়ে এসেছে।

(রসসংঃ)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মণ্ডক ও ব্রহ্মসংহিতা
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—চরিত্র-স্বষ্টির ইজমু—
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধঃস্থ

চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

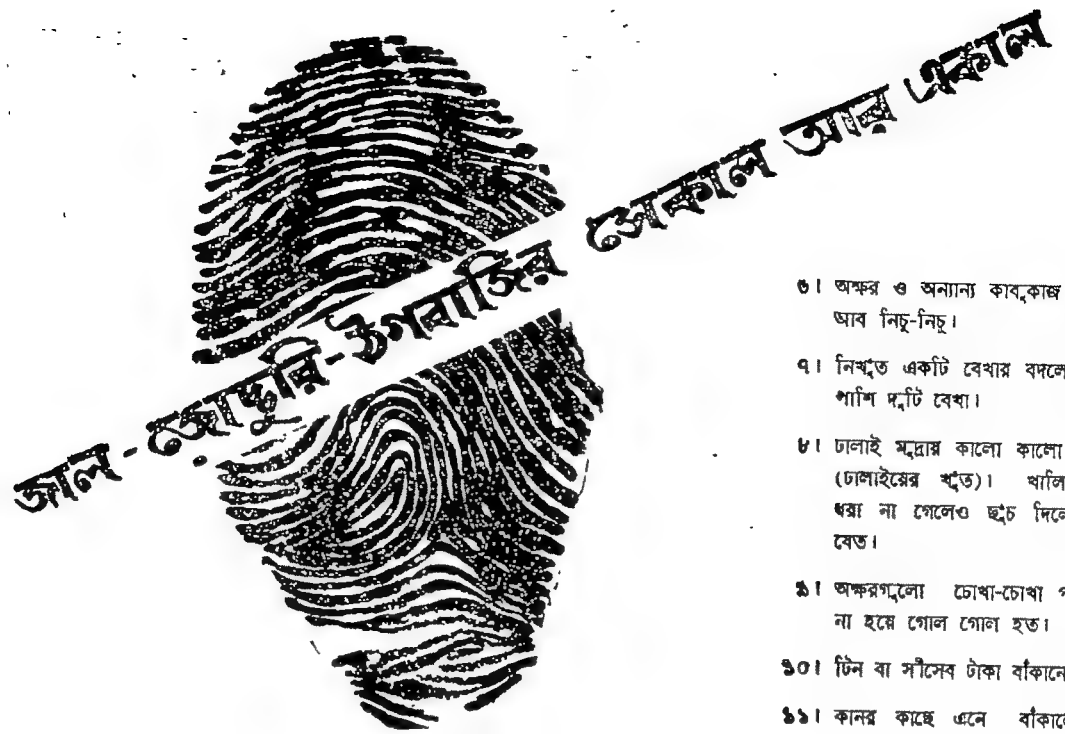
অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সকলসঙ্গে
অনন্ত নিরন্তর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ওপ-
ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলসিঃ
যারনাথ রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য
জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১।০ টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লঃ

১০৬, বিপিনবিহারী পাণ্ডুলীপীট

কলিকাতা-১২



জালমুদ্রা নির্ণয়ের উপায়

জালিয়াং বনাম পুন্ডেশের বুদ্ধিবল
সড়াইও মাঝে মাঝে বিলক্ষণ উপভোগ্য হয়ে
ওঠে। তাই সে যুগের বৈজ্ঞানিকরা অচিরেই
খড়িবাজ জালিয়াংদের খড়িবাজ ধরাব উপায়
আবিষ্কার করে ফেলল। সেই কথাই এবার
বলা যাক।

১৯১২ সালে এ দেশে ১৮০৫ সালেব
সরকারী মুদ্রা চালু ছিল। এ মুদ্রাব ওপরে
কিং উইলিয়ামের মূর্তি আঁকা ছিল। তাব
আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মুদ্রাও চলত
—কিন্তু তা অনেক অল্পই বাজার থেকে
তুলে নেওয়া হয়। এরপরেই কুইন ভিক্টোরিয়ার
প্রতিষ্ঠিতসহ ১৮৪০ সালের টাকা বেরোয়।
তৃতীয়বার মুদ্রা ছাড়া হয় ১৮৬২ সালে—
ওপরে ছিল ক্রাউনের ছাপ। এরপর ১৮৭৪
সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই সরকার টাকা
ছাড়তে থাকে। তবে নতুন ছাঁচে নয়—
১৮৬২ সালেব ছাঁচই চলতে থাকে বছরে বছরে
—তফাৎ মধ্য শব্দ প্রতি বছর সালের নীচে
একটি কবে ফুটকি পড়তে থাকে। কাজেই
১৮৬২ সাল আর ১৮৭৪ সালের মধ্যে
তৈরি মুদ্রার ১ থেকে ১১টি পর্যন্ত ফুটকি
আছে—সাল সেই একই—১৮৬২। এই থেকেই
গুরুত্ব ছাড়িয়ে পড়ে যে, ফুটকিওলা এসব
টাকাই জাল। আর, এক-একটা ফুটকি
মানেই—এক-এক লক্ষ টাকা। এবপর, ১৮৯৪,
১৮৯৫, ১৮৯৬, ১৮৯৯ সাল বাদে সব
সালেই টাকা ছাড়া হয়। ১৮৭৭ সালের
টাকার “ভিক্টোরিয়া কুইন” শব্দ দুটি
পাল্টে লেখা হয় “ভিক্টোরিয়া এমপ্রেস”।
১৯০০ সাল থেকে ইংরেজী অক্ষরে
“Edward VII King and Emperor”

লেখা শুরু হয়। তারপর ১৯১১-র ডিসেম্বরে
দিল্লীসরকারের পর থেকে লেখা হতে থাকে
“George V King and Emperor”

এখন, যত কুদ্দখিই থাকুক না কেন
টাকা জালিয়াংদের, বৃটিশ আমলের টাকার
এই দীর্ঘ ইতিহাস নিয়ে অনেকই মাথা
ঘামাত না, অথবা জানত না। কাজেই
নিজদের মধ্যেই বিস্ময় হত। যেমন, ১৮৬২
সাল থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত সব টাকতেই
ক্রাউন থাকা উচিত। কিন্তু সে খেয়াল না
থাকায় তারা ১৮৬২-র ছাঁচের পেছনে
ভিক্টোরিয়া এমপ্রেস-এর প্রতিমূর্তি বোদাই
করে ফেলত। আবার, ১৮৭৭ সালের ছাঁচেব

অদ্বীশ বর্ষন

পেছনে ভিক্টোরিয়া এমপ্রেসের বদলে
ভিক্টোরিয়া কুইন দিয়ে ফেলত। এই গোপ-
মালের ফলেই—সাধারণ চোখ ধরতে না
পারলেই বিশেষজ্ঞদের চোখে ধরা পড়ে যেত
কোনটা আসল আর কোনটা নকল।

এ ছাড়াও, অধিকাংশক্ষেত্রেই নকল টাকার
একাধিক ছাঁচ দেখা যেত। যেমনঃ

- ১। ওজনে হালকা।
- ২। পাথরে ঠুকলে পরিষ্কার টং আওয়াজ
হত না।
- ৩। পেতল বা সীসের মত ম্যাটমেটে
রঙ।
- ৪। অসমান বেড়া।
- ৫। কিনারার খাঁজও সমান হত না—
হলে থাকত বা আঁকাবাঁকা থাকত।

৬। অক্ষর ও অন্যান্য কাব্যকাজ অস্পষ্ট
আব নিচু-নিচু।

৭। নিখুঁত একটি বেখার বদলে পাশা-
পাশি দুটি বেখা।

৮। ঢালাই মুদ্রার কালো কালো ফুটকি
(ঢালাইয়ের খুঁত)। খালি চোখে
ধরা না গেলেও ছুঁচ দিলেই ধরা
যেত।

৯। অক্ষরগুলো চোখা-চোখা পরিষ্কার
না হয়ে গোল গোল হত।

১০। টিন বা সীসের টাকা বাঁকানো যেত।

১১। কানর কাছে এনে বাঁকালে কটু
কটু আওয়াজ শোনা যেত।

যে কোনো জাল টাকার এতগুলো বৃত্তে
অন্তত দুটি থাকতই। কাজেই জালিয়াংবা
অভিজ্ঞ চোখ এড়াতে পারত না। তবে এ ১২ন
বিস্ময়ের জন্যে এদের হাতেনাতে না ধরলে
গ্রেপ্তার করার কোনো উপায় ছিল না। কেন
না, পুন্ডেশ আসতে দেখলেই কাদামাটির ছাঁচ
ভেঙে ফেলে জাল টাকার কাঁড়ি সমেত সব
কিছু বাড়ির পেছনে উঠানে ফেলে দিত।
তারপর ভালমানুষের মত হাত-পা গুটিয়ে বসে
থাকত। কঠগড়াষ দাঁড়িয়ে নিবীহ মূখে
জানাত, সবটাই পুন্ডেশের কাবসাজি; সাজানো
কেস। পুন্ডেশই জাল টাকা তৈরির সবজামাদি
উঠানে বেখেছে মিছিমিছি তাদের নাজেহাল
করার জন্যে।

পাশ্চাত্যে জালনোট

বিলেতেও সে যুগে জালিয়াতব যন্ত্রপাতি
পাওয়া না গেলে সাধারণত কাউকে দোষী
প্রতিপন্ন করা যেত না। পুন্ডেশের গন্ধ
পেলেই আগেভাগেই অতি সহজে হব তারা
যন্ত্রপাতি লুকিয়ে ফেলত, না হয় পাচার করে
দিত।

কিন্তু এ যুগে এমন একটি পদ্ধতি
আবিষ্কৃত হয়েছে যে, বেচাষীদের বেশ
খুশিক্ষেই পড়তে হয়েছে। এখন যন্ত্রপাতি
সরিয়ে ফেললেও রেহাই নেই। জালিয়াংদের
পোশাকে আর ঘরে যে খুলো পাওয়া যায়,
তা পরীক্ষা কবেই তাদের দোষী প্রতিপন্ন
করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, যে মুদ্রার যে
খাম মিশ্রানো হয়, তারই খাতবকণা
জালিয়াংদের ট্রাউজারের ভাজে বা জামার
পকেটে পাওয়া যেতে পারে। কাগজের টাকার

ক্ষেত্র, ১২ কাগজ দিখে জাল, নোট তৈরি হয়, তাইই ফুটো জালিয়াতের ঘরের কোণে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘবদোর পরিষ্কার করার ব্যাপারে জালিয়াতরা সাধারণত সময় নষ্ট করতে চায় না। অল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির সামনে জালনোট আর এই ফুটো কাগজ রাখলেই যে বশ্যি বিচ্ছুরিত হবে, তাদের চব্বং-নৈব্ব্য এক হওয়া মানেই জালিয়াতির একটা প্রমাণ পাওয়া।

জালনোট খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ জনসাধারণের ভাগ্যে প্রায়ই জোটে না। কেন না, জালনোটের বিবর্তিত ছবি তোলা তাদের পক্ষে বেআইনী। আর, আধুনিক জালনোট এমনই চমৎকারভাবে তৈরি যে, বেজার শক্তি-গালী আতনকাচের নিচে না রাখলে আসল-নকলের ভেদভেদ ধরা সম্ভব নয়।

এরকম সুযোগ পাওয়া গেছিল ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে। ফরাসী পুলিশের তত্ত্বাবধানে প্যারিসে একটা রীতিমত অসাধারণ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। প্রদর্শনীতে বড় স্ট্রীট গ্যালারীর পরিবেশ সৃষ্টি করা হল। বাছাই করা কতগুলো কৃত্রিম পেন্সি, ভাস্কর্য, মার্ভিন বাসন, ফিতে অকৃত্রিম ও আদর্শ নমুনার পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হল জুলনার্মূলক বিচারের জন্য। আইনের হাত-পায়ে কতখানি সুদূরপ্রসারী, সে বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্যই প্যারিস পুলিশের এই প্রচেষ্টা দেখে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকেও অনুদূর প্রদর্শনীর আয়োজন করতে অনুপ্রাণিত করা হল। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড জানালে—অতীত বা বর্তমান কেসের বিবরণ জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করা নগররক্ষী-আইনকার নীতি নয়।

এই প্রদর্শনীতে, শিল্পবিষয়ক যেসব যন্ত্রাতির নমুনা রাখা হয়েছিল, আচর্যের বিষয় হুবহু সেইসব নমুনাই আবার

ইংল্যান্ডের অনেক সংগ্রহশালার রাখা হয়েছে। কিন্তু ফরাসী প্রদর্শনীতে শিল্পবিষয়ক জালিয়াতি ছাড়াও আরও বিস্তারিত নমুনা ছিল। সবচাইতে চিত্তাকর্ষক হল আসল-আর নকল কাগজের টাকার বিপুলভাবে বিবর্তিত ফটোগ্রাফ। যেমন ধরা যাক, বছর কয়েক আগে লিম্বনের প্রতিষ্ঠিত দেওয়া কয়েকটা পাঁচ ডলারের আমেরিকান 'বিল' সরকারের হাতে এসেছিল। প্রতিটি 'বিল'েই একই অনুক্রমিক সংখ্যা ছাপা হয়েছিল এবং তাইতেই ধরা গেল যে, বিলগুলো জাল। ফটোগ্রাফ তুলে এনলার্জ করে পর আরও কয়েকটা তথ্য জানা গেল। লিম্বনের চোখে এত বেশি লেভ দেওয়া যে সে চোখে আর কোনো ভাবাই নেই। তাছাড়াও, আদর্শ 'বিলে' লিম্বনের সার্টের সামনে সারি সারি ঝাড়াই রাখা ছিল। কিন্তু নকলে রকমের ছোট ছোট বিন্দু সারি।

জালিয়াৎ ৩৪ ওস্তাদই হোক না কেন, ছোটখাট এসব ত্রুটি এড়ানো তার পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয়। আসল নোট তৈরি হয় দামী মেশিনে; যে ইম্পাতের পাত থেকে ছাপ ওঠে, অচ্যুত কুশলী খোদাইকারী তা বানিয়ে দেয়। কিন্তু জালিয়াতরা প্রায়ই খুঁতখুঁত পাত নিয়ে এক চালায়; অচিড়-গুলোও নিখুঁত হয় যা বলেই রেখাগুলো সিম্বে না গিরে ভেঙে উঠে যায়। অনুক্রমিক সংখ্যার ককগুলোর মধ্যেও গাফিলতি থেকে যায়। হঠাৎ দেখলে বোকা যায়, সংখ্যাগুলোর মাঝের দৃষ্টি মোটেই সমান নয়। কাগজও নিকট প্রেশীর—অল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির নিচে রাখলেই আসল নোটের সঙ্গে তার পার্থক্য স্পষ্ট স্পষ্টে ধরা পড়ে। তাছাড়া, আসল নোটের একটা বৈশিষ্ট্য জালিয়াতরা আজও নকল করতে পারে না। নকল নোটের রেশমি সূতো দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য

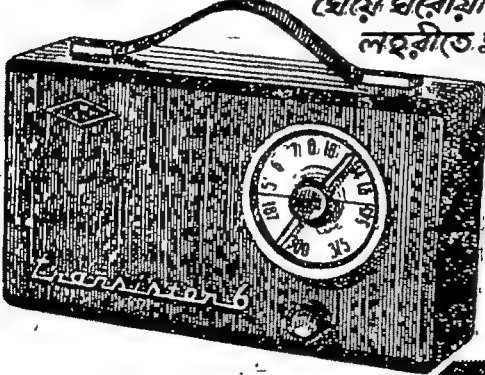
হালকা লাল আর নীল কালি দিয়ে রেখা টেনে মোটামুটি অনুকরণের চেষ্টা করা হয়।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্যান্ক অফ ইংল্যান্ডের নোটের কাগজের ফর্মুলা কখনও লেখা থাকত না—মুখে মুখে বলা হত। বান্ধে নামে এক পাকা জালিয়াৎ ব্যান্ক অফ ইংল্যান্ডের কিছু আসল নোটের কাগজ মসৃণ হওয়ার আগেই কারখানা থেকে সরিয়ে ফেলে। মসৃণ হওয়ার পর কাগজের চুলচেরা হিসেব রাখা হত বলেই অমসৃণ কাগজ নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। এই কাগজ জালনোট ছেপে বাজারে ছাড়া হল। কিন্তু সবদিক দিয়ে নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও কেবল কাগজটা খসখসে হওয়ার দরুন বান্ধেই ধরা পড়ে গেল।

নোট জাল নিরোধের উপায় হিসেবে মাঝে মাঝে আদর্শ নোটও ইচ্ছাকৃত ত্রুটি রাখা হয়। হামেশাই এ ফাঁদে জালিয়াতরা পা দেয়। কয়েকবার ধরা পড়ার পর তাদেরও বন্দী খুলল। খুঁতসমেত নোটেরই কোটো তুলে হুবহু নকল নোট বাজারে ছেড়ে কত পক্ষকে বন্দ্বাদ্ধ দেখালে জালিয়াতমহল। হাম-টোন ব্লক থেকে লিথোগ্রাফিক বা ফটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে নোট জাল করলে তা ধবা বাস্তবিকই খুব কঠিন। তবে এ ক্ষেত্রেও জালিয়াতদের পরম দুঃখময় মার্কটির ভেপার ল্যাম্পের কাছে সব জারিজুর্বি ধরা পড়ে যায়। কাগজের বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য ধরা পড়লেই—ফাঁস হয়ে যায় তাদের অতি সূক্ষ্ম চালাকি।

শোনা যায়, প্রায় চল্লিশ লক্ষ স্টার্লিং মূল্যের জাল অর্থ প্রতি বছর চালু রয়েছে সারা ইউরোপ মহাদেশে। অনেককম উপায়ে এই বিপুল পরিমাণ জাল অর্থ বাজার থেকে তুলে আনার চেষ্টা হয়। এইরকমই কিছু পদ্ধতির বিবরণ মিলবে পত্রীকৃত ক্যান্সন নোট-কেসের চমৎকার কাহিনীর মধ্যে।

সুখের ও জাপানীতের কক্ষপথে আপনাব ঘর আনন্দময় কর
তুলবে রেডিও ইকুইপমেন্ট কোং আর ই জি রেডিও...
আর ই জি-র একটি রেডিও আপনাব ঘরে রাখুন; আপনাব এক
ঘোরে ঘরোয়া পরিবেশ এক মুহূর্তে সুখের ও
লহরীতে হাধুয়াময় করে তুলবে...
আর ই জি মডেলগুলি একান্ত
নির্ভরশীল ও অস্ত্রিশালী...
পৃথিবীর সব স্টেশনই মুহূর্তে
ধরা পড়ে...
৬ ট্রানজিস্টরজ মিডিয়াম ওয়েভ
মডেল-৬টি ৪ মূল্য-১৬৫ টো
স্থানীয় কর অতিরিক্ত



পতু'গাল ব্যাংক-নোট কেস

১৯২৪ সালে বিশ্বাস্য মদ্রক সংস্থার স্যার উইলিয়াম ওয়াটারলোর সঙ্গে দেখা করলেন ম্যারাণ্ড নামে এক ভদ্রলোক। উদ্দেশ্য—কেশ কিছু সংখ্যক পতু'গাল ব্যাংক-নোট ছাপতে হবে। হেগ-স্মিথ পতু'গাল স্কটল্যান্ডের কুটনৈতিক পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিলেন ভদ্রলোক। বিষয়টা যে অত্যন্ত গোপনীয় তাও কথাপ্রসঙ্গে স্যার ওয়াটারলোকে জানিয়ে দিলেন ম্যারাণ্ড।

নোট তৈরি হবে অ্যাংগোলার জন্য। অ্যাংগোলা (পতু'গাল পশ্চিম আফ্রিকা) অর্থনৈতিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ। ম্যারাণ্ডের প্রতিনিধিত্বে একটা ওলন্দাজ সিভিলকট দেবে দশ লক্ষ পাউন্ড। ব্যাংক অফ পতু'গাল এই শুল্ক উদ্যমে সর্বতোভাবে সমর্থন করবে। এসব কথাই অবশ্য ম্যারাণ্ডের কাছেই শুনলেন স্যার ওয়াটারলো।

উক্ত ওয়াটারলো বললেন যে, নোট ছাপার অধিকার ব্যাংক অফ পতু'গালের কাছ থেকে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি নাচারা। ম্যারাণ্ড জানানেন, সে ক্ষেত্রে ওয়াটারলোর লিসবনস্থিত প্রতিনিধির সঙ্গে ম্যারাণ্ডের সেক্রেটারী'র বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার। ওয়াটারলোর লিসবন প্রতিনিধি অবশ্য লন্ডন অফিসকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, এ প্রস্তাব সম্পর্কে ব্যাংক অফ পতু'গাল ওবাকিবহাল নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ এল তাঁর ওপর। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। কেন না লিসবনে ম্যারাণ্ডের সেক্রেটারী'র টিকি দেখা গেল না।

দুই হপ্তা পরে 'রেই' নামে এক ইংলিশম্যানের নামে 'অ্যাংগোলা' গভর্নমেন্টের কার্যে নিযুক্ত সোনার দলিল হাজির করলেন ম্যারাণ্ড। এই দলিল অনুসারে 'অ্যাংগোলা'র ছাড়ের জন্য নোট তৈরি করার ক্ষমতা আছে 'রেই'র। ব্যাংক অফ পতু'গাল আর 'অ্যাংগোলা' গভর্নমেন্টের মধ্যে বাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বড় কিছু নির্দেশের প্রয়োজন, তার প্রতিটিতে স্বাক্ষর করার পাওবাব অফ 'আটলী' প্রদত্ত হয়েছিল ম্যারাণ্ডের ওপর। বিশেষতঃ দিয়ে দলিল পরীক্ষা করিয়ে ওয়াটারলো দেখলেন কোনো ফাঁকি নেই। এমন কি, তিনিজন কনসালও সই করেছেন তাতে। প্রতিটি স্বাক্ষরই আসল। তবে একটি পৃথক কাগজে সই করার পব তা চূড়ান্তপ্রদেব সঙ্গে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল।

এবং সেই ব্যাংক অফ পতু'গালের চেয়ার-মানে 'কাছ থেকে তার অফিসিয়াল নোট-পেপারে একটি চিঠি পেলেন ওয়াটারলো। ম্যারাণ্ডের সই দেওয়াব ক্ষমতার সমর্থন ছিল এই চিঠিতে। সমস্ত বিষয়টির গোপনীয়তা সম্বন্ধেও আর একদফা হুঁশিয়ারী ছিল চিঠিতে। ডাকমারফৎ সংক্ষেপে চিঠিটির প্রাপ্তি স্বীকার করলেন ওয়াটারলো—কিন্তু

সহস্রাঙ্গনকভাবে সে চিঠি গন্তব্য স্থানে পৌঁছোলো না। পৌঁছলেই তৎক্ষণি ক্ষয় হয়ে যেত এই বিরাট চক্রান্ত। বলা বাহুল্য, চিঠিটি পথিমধ্যেই গায়েব হয়ে যায়।

১৯২৫ সালে নোট ছেপে পতু'গালে নিয়ে গেলেন ম্যারাণ্ড। সেই বছরেই ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ হাজার নোট প্রস্তুত করে নিয়ে যাওয়া হল—মাঠে আরও বেশি। দ্রুত নোট বিক্রির জন্যে জালিয়াতরা একটা নতুন ব্যাংকই খুলে ফেললে। ১৯২৫-এব জুলাই মাসে যথার্থিতি শুরু হল ব্যাংকের কাজ। ব্যাংক অফ পতু'গালের অফিসিয়াল প্রিন্টারের ছাপা জাল-নোটই গড়ে উঠল এই নতুন ব্যাংকের পুরো আমানত।

১৯২৫ সালে ব্যাংক অফ পতু'গালে গৃহের পৌঁছলো যে, নতুন ব্যাংকের শাখা-সমূহে কয়েকজন কর্মচারীর হাবভাব একটা সন্দেহজনক। অস্বাভাবিক বিপুল পরিমাণের ৫০০ 'এস্কুডো' নোট দিয়ে বিশেষী মুরা কেনাও চলছে। ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের শরণ নেওয়া হল। অচিরেই গ্রেপ্তার হল একটি শাখার ম্যানেজার।

৫০০ 'এস্কুডো' নোট পবাক্ষর করে বিশেষজ্ঞ বললেন কোন দ্রুতি নেই—আসল স্লেটে ছাপা নোট। কতৃপক্ষ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও তৎক্ষণি সমস্ত নোট বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা করলেন। এরপর শুরু হল আসল আর নকলের প্রভেদ আবিষ্কার। কাজটা সহজ নয় মোটেই। ওয়াটারলোর সাহায্যে ভাও সম্ভব হল। কেন না অননুমিত অক্ষর, সংখ্যা আর ডিরেক্টরের সই আলাদাভাবে ছাপা হয়েছিল। কাজেই পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানটুকু সঠিকভাবে পরিমাপ করে জালনোট ধরা

সম্ভব হল এবং মুরা স্টেট আনাল-নকল উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হলেও বিশেষ সময় ছাপা থেকে ধরা পড়ল জালিয়াতি। অবশ্য এই নিদারুণ কঠোর পন্থাটিতে নোট বাছাই করতে সময় লাগল প্রচুর।

হল্যান্ডে গ্রেপ্তার করা হল ম্যারাণ্ডের। কিন্তু গ্রেপ্তারের অনতিকাল পরেই তিনি উঠাও হয়ে গেলেন চিরকালের দত। আবার পাকড়াও করার মত কোনো দ্রুত প্রচেষ্টা পুর্নিল ভরফে লক্ষ্য করা গেল না এবং আজও তাঁর সত্যিকারের পরিচয় সন্ধান করতে রহস্যই রয়ে গেছে। ম্যারাণ্ডের মৃত্যু তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং নোট জাল সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। সেই আয় ব্যান্ডেরিয়া নামে আর এক ভদ্রলোক—এই দুজনের আদেশ তিনি অক্ষবে অক্ষবে পালন করেছেন—ভেতরকার ব্যাপার কিছুই জানতেন না। পতু'গালে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য কারাবন্দী হয় এই দুই ব্যক্তিই।

১৯৩০ সালে ওয়াটারলোর কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন ব্যাংক অফ পতু'গাল। আদালত থেকে তাঁদের খবচনহ ৫৬৯,৪২১ পাউন্ডের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আপীল করেন ওয়াটারলো এবং ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনেন ৩০০,০০০ পাউন্ডে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার্ডিস অফ লর্ডস-এ ১৯৩২ সালে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ৬১০,৩৯২ পাউন্ডের কম অর্থ ছাপাখানা থেকে পেতেই পারেন না ব্যাংক অফ পতু'গাল। কেবলমাত্র উদ্ভার করা নোটেরই মোট মূল্য ছিল ৩০ লক্ষ পাউন্ড। প্রায় ২০০,০০০ নোট (যে ছাপা হয়েছিল তার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি) ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পতু'গালে।

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতার অমর অবদান

শ্রী অরবিন্দের

ANANDAMATH

শ্রী বাল্লভচন্দ্রের অমর আনন্দমতের তমর ২২রাজ্য ত মুদ্রা

১. আনন্দমত—স্বাধীনতার সক্রিয়, সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গাঙ্গ
২. আনন্দমত—'বন্দেমাতরম' যন্ত্রের পুত-প্রকাশ
৩. আনন্দমত—শ্রী বাল্লভ ও শ্রী অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমতের এই মহামন্ত্রের অষ্টাঙ্গতাকার সাধনে

ভারতের স্বাধীনতা আনন্দ

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৯৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

সাহস কলকাতা * ক্রীড়াতিব

২ উল্টাভাঙা অঞ্চলের নানা পারিচ্ছে

ধীরে ধীরে, বিলের পাতালদেশেই হেঁটে যার চিতার আগুন। পারে-পারে, নিঃশব্দেই আবার এগিয়ে আসে অন্ধকার। অন্ধকারের পরের ভাঙেই চাপা পড়ে সমস্ত বিলটা। এপার-ওপার নিঃসাড়। হোগলার বন, শেওড়ার খোপ, বাঁশের কাড়—কলার বৃকে এক-একটি গভীর কালো ছায়া, যেন ডানুমন্ডার তুতড়ে ভ্রমের মতোই নিখর-নিঃশব্দ-নির্বিকার। বিলেব ঘাটে প্রার সাড়ে তিন ঘণ্টার উদ্ভাসততা এতক্ষণে যেন একটা মৃত মহিষের মতোই শান্ত। ঘাট থেকে বিস্ত্রমুখি পথে একে একে মিলিয়ে যার অনেক জোড়া পা। ডানুমন্ডা তখনো দাঁড়িয়ে। কোথায় যাবে সে? আজ থেকে বর্তমান ঘাটের মতোই একটা ঘাট তার ধর। সেখানে এখন এলোপাতাড়ি পালাকীর্তন চলছে শূন্যতার। অন্ধকার হিস হিস কয়ছে দাপের মতো। লাউ-মাচার নেকড়ের মতো পা ফেলছে হাওয়া। সেখানে সে দাঁড়াবে কোথায়!...হাওয়া চিত্তার মগডাল থেকে মন আবার তার আছড়ে পড়ে ঘাটে। শূন্য ঘাট। ঘোর ঘোর অন্ধকারের হাঁ-মুখ তাকে গিলে ফেলছে। গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠতে চার ডানুমন্ডা। কিন্তু পারে না। কারণ তার কঠনালীতেও বাধার দেয়াল। তুলেছে অন্ধকার এবং আতঙ্ক। কেবল তার সমস্ত বৃকটা একবার ধড়াস করে ওঠে হঠাৎ। দূরের কোন কোপ থেকে একইসঙ্গে তাব কানে ভেসে আসে শশান-পেঁচাব তারম্বর। তারপব পরকণ্ঠেই সে অনুভব করে : কে যেন লোহার সাদাঁশীর মতো শক্ত মূর্তির চেপে ধরেছে তার হাত। খেজুর গাছে বাদুড় পড়লেই যেমন সমস্ত গাছটা একবার ঝনঝনিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি সারা শরীর বেজে ওঠে ডানুমন্ডার। তাব কণ্ঠের পাতাল ফুড়ে কোনমতে বাইরে আসে একটি মাত্র শব্দ : 'ক...'।

উত্তর আসে : 'আমি গো, করালী। তোমার তিনকুলেতে আর কেউই রইলো না। বাপটা ছিল তাকেও তো আজ খেলে। এখন একা একা এমন বাতে ঘাটে দাঁড়িয়ে আব লাভ কী? আমার সঙ্গে এবার এসো।'

আবার একটি অক্ষুট শব্দ বেরিয়ে আসে ডানুমন্ডার কণ্ঠ থেকে : 'কোথায়?'

তার এ-প্রশ্নে একবার হেঁ হেঁ করে হোসে ওঠে করালী। যেন একটা বুনো শূরোর। তার একমুখ গহিতিব মতো দাঁত অন্ধকারেও ঝিলিক দিয়ে ওঠে। শবীবটাও তার জ্ববদন্ত। তাকে ভয় কবে সাবা গায়ের লোক। ডানুমন্ডাকে এবার সে তাব ভালুক-বৃকের কাছে খানিকটা টেনে নিয়ে বলে :

—তোমার ওপর তো আমারও লোভ কম নয় গো। কিন্তু কী করি বলো, আমার সঙ্গে তোমাকে মানায় না। তবু যদি...'

কথা আর শেষ হলো না করালীর। তার পাশব-নিঃশব্দের উত্তাপেই বৃকি জ্বলে গেল ডানুমন্ডার ক্রান্ত চেতনা। তাই কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ অন্ধকার ঘাটেই লুটিয়ে পড়লো তার অসাড় দেহ। এপার-ওপারের নিঃসাড় অন্ধকার নাচিয়ে উড়ে গেল কয়েকটা নিশাচর পাখি। বিলের দক্ষিণে হঠাৎ মরাকামার মতো কাকিরে উঠলো কোনো শূন-শাবক। আর একে একে যেন ছমছম মেঘেই মৃদু লুকিয়ে বাচলো সারা আকাশের কিছু লক্ষ্যবতী তারা।

রাত তখন কত গভীর—কে জানে। ধীরে ধীরে যখন জ্ঞান ফিরে আসে ডানুমন্ডার—তখন সে অনুভব করে : কোনো এক আলো-ফলমল ঘরে সে শূরে। শয্যা বেশ নয়। পাশে যেন দেহে তার মাকড়সার মতো হাত বুলোচ্ছেন এক গোরবর্ণ পুরুষ। তিনি তাঁর রক্তবর্ণ চোখ দিয়েই যেন শূবে নিচ্ছেন ডানুমন্ডার সমস্ত রক্ত।...ডানুমন্ডা তার ক্রান্ত, ভীত চোখ এপাশ-ওপাশ ফেরাতেই করালীকে দেখতে পায় দূরে। ডানুমন্ডাকে লক্ষ্য করে সেখান থেকেই করালী বেশ সবসে গলায় বলে ওঠে : 'কি গো ডানু, ভালো লাগছে তো? আমার সঙ্গে তোমাকে মানায় না। ওই বাবুই তোমাকে বিয়ে করবে। তোমার এমন একটা হিরে করতে গেলেই আমি খুশি।'

এ-কথা বলেই করালী দরজা তুলে বেঁধে যায়। বাওয়ার সময় তার ডান হাতে কিসের একটা ভারী বলি লক্ষ্য কবে ডানুমন্ডা। তাই দমকা হাওয়ার কচি দেওয়ার যেমন ধরখরিয়ে ওঠে হঠাৎ, তেমনি একবার তার সর্বাপ শিউরে ওঠে কী-এক অজানা আতঙ্কে। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই সে লক্ষ্য করে : পাশের সেই গোরবর্ণ পুরুষের রক্তবর্ণ চোখ দুটো অনাহারী জৌকের মতোই এগিয়ে আসছে তার চোখের কাছে। সুতরাং সেই জৌকি দুটোর তড়াত্তি খেয়েই ভীত চোখ আপনিই বৃজে আসে ডানুমন্ডার। আর সঙ্গে সঙ্গে যে-কোনো কারণেই হোক, চোখ বন্ধ কবে সারা ঘরের সমস্ত আলো।

তারপব রাতের শেষে দিন, দিনের শেষে রাত আসে যথারীতি। দিন-রাতের ঢেউ ভেঙেই এগিয়ে চলে সময়। বিয়ে? এ কেমন বিয়ে হলো বৃকতে পারে না ডানুমন্ডা। ঢাকও বাজে নি, পুরুতও আসে নি। মালাবদল বা অশ্লিষ্টপর্শের কোনো ঘটনাও ঘটে নি। অথচ সে-বউ; কেমন বউ-কিছুই-বোঝে না ডানুমন্ডা। তবু সেই বাগানবাড়ীটাকেই

আপন সংসার ছেবে সে দিন কাটার আনন্দে! স্বামীরূপে যিনি সঙ্গ দেন, তিনি সেখানে আসেন কেবল রাত। দিনের আলো ফুটতেই আবার চলে যান। কোথায় যান—সে-ঠিকানা ডানুমন্ডার অজানা।

দেখতে দেখতে, বাগানবাড়ীতেই একটি বছর ফিবে আসে ডানুমন্ডার। বছর ফিরতেই স্বতন্ত্রে সে লক্ষ্য করে কী এক অস্বুত পরিবর্তন। যেন কিসের এক ঢল নেমেছে তার সমস্ত সম্ভার। এ-পরিবর্তনের প্রথম-বন্দ্য দেহের লাঞ্ছ্যও তার জোয়ার নামে আকর্ষণের। সুতরাং সেই সুদে আদর-স্বপ্ন তার বৃষ্টি পার বিশ্বপুণ। কিন্তু আরও কিছু সময় অভিজ্ঞত্বের ফলে সেই ঢল যখন তার সারা দেহের কাণার কাণায় ভরে ওঠে, তখন স্বাভাবিক কারণেই ভীতির টান আসে তার লাঞ্ছ্যে। গ্রহের চন্দের মতো পিচ্ছিরে যার চোখ; চামড়া তুলে এগিয়ে আসে চোয়ালের অস্থি এবং স্বতন্ত্র-বর্ণের উজ্জ্বল বাহরেও পরিক্রান্তি যলিন ছায়া নামে ধীরে ধীরে। আর কটিভ্রের নিম্নভাগ একরোখা উইতিবর মতো ফেঁপে ওঠার দৈহিক আকর্ষণও তখন তার সম্পর্কে পরাক্ত।

ঠিক এমনই সময়ের কোনো এক রাত থেকে অবিরাম অনুপস্থিতি সদু হ'ল সেই পুরুষের—যিনি স্বামীরূপে সঙ্গ দিয়ে থাকেন ডানুমন্ডাকে। তা ছাড়া একে একে বাগান-বাড়ির মালী এবং তার পাইক-সরকমাক্সরাও কী কারণে সরে পড়ার সে-স্থান অরাজক হয়ে ওঠে সম্পর্কে। কেবল একজন বৃষ্টি পরিচারিকার সঙ্গে উদ্ভিন-দিন কেটে যার ডানুমন্ডার।

এভাবেই অকস্মা যখন অভিন্ন করে চরম সোপান, সঞ্চিত আহার বাড়ন্ত হয়ে পড়ে দিনে দিনে এবং ঘনিরে আসে ডানুমন্ডার অঙ্গ ভেদ করে কোনো এক নবীন অর্তিধর নিষ্কান্ত হওয়ার কাল—তখন আবার আকস্মিকভাবেই একদিন বাগানবাড়ীতে উপস্থিত ঘটে করালীর। সে ডানুমন্ডার সামনে এসে বেশ একটু আক্রোশের সুরেই বলতে থাকে : 'ডানু, এই বাগানবাড়ি মালিকটা একটা কুকুর। সে পালিয়েছে বাগানবাড়ীটাও বিক্রি করেছে একজন বিদেশী-কাজে।'

এ-সংবাদে হঠাৎ চমকে ওঠে ডানুমন্ডা। কোনো কথাই সে বলতে পারে না। কেবল খোলাটে চোখ দুটো সে তুলে ধরে বুনো শূরোরের মতো করালীর। বীভৎস মুখের ওপর।

করালী-পারে-পারে এগিয়ে এসেই একটা হাত চেপে ধরে ডানুমন্ডার। তারপর দিলার বেশ খানিকটা দরদ মিশিয়ে আবার বলে :

শ্রদ্ধা-অবস্খার এখানে তো আর থাকে হবে না। কে তোমাকে দেখবে? তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

ভানুমন্দা তখন সত্যিই অসহায়। অবস্খা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। ভিন্ন চিন্তা করার মতো সময়ও বিশেষ আর নেই। অতএব তখন নিশ্চয় এক মলমলম্বার মতো সে অনুসরণ করে করালীকেই।

লোকালয় ছেড়ে বেশ খানিকটা দূরেই একটি কুড়ে নির্মাণ কবে করালী। সেখানেই ভানুমন্দার সঙ্গে সে বসবাস শুরু করে নতুন-ভাঙ্গা-অচিবেই একটি মৃত সন্তান প্রসব করে ভানুমন্দা। করালী কুড়ের পাশেই কবর দেয় সেই সন্তানকে। তারপর-ভানুমন্দার আশ্বাস দেহটাকে সে আবার বিগতাবস্থা মান করার প্রচেষ্টার আত্মনিয়োগ করে রাখাযি।

কিন্তু ভানুমন্দার মনে পদচারণা তখন অন্য পথে। সে কিছুই বোঝে না, কিছুই শোনে না। একা একা কবরের পাশে বসে কখনো কাদে, কখনো হাসে এবং কখনো বা কলিাপ করে বেসামাল। এভাবেই অনাহার-অনিদ্রা এবং ধারাবাহিক অপরিচ্ছন্নতার স্বপ্ন কদাকাব রূপ ধারণ কবে উন্মাদিনী ভানুমন্দা, তখন করালীও একদিন তার সঙ্গ ত্যাগ করে গালিয়ে যায়।

কবালী ভানুমন্দাকে পরিভাগ করার ঠিক দিন করেক পরেই অন্যদিকে সেই পরিভাগ বাগানবাড়ি আবার সংস্কৃত হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। স্বা সময়েই সেখানে আবার ফুল ফোটে, সারা ঘর অলো জ্বলে। তারপর নতুন মালিক এক বিপদ্রাক বিশেষী সাহেবেবও একদিন আবির্ভাব ঘটে সপারিষদ। সেদিন অধরাগ্নি পর্বন্ত সেখানে খোশগল্প, পানাহার এবং সেইসঙ্গে নাকি নাচ-গানেরও অনুষ্ঠান চলে বেশ খোশ মেজাজেই। অধরাগ্নির পর একে একে বিদায় গ্রহণ কবে সমস্ত পারিষদ। বাগানবাড়ির পরিচালক-পরিচালিকা পাইক-ধরকল্লা প্রভৃতি ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর মালিক সাহেবও স্বপ্ন তাঁর প্রধান কক্ষের অলো নিবিরে ক্রান্ত দেহ এলিয়ে দেন শব্দায়— ঠিক তখনই সে-কক্ষের প্রধান দরজার কড়া মাড়াব শব্দ শোনা যায় বার বাব। একবার-দুবার-তিনবার, একে একে অনেকবার কড়া মাড়াব শব্দ শুনে বাধ্য হয়েই শব্দা ত্যাগ করেন সাহেব। তারপর তিনি অলো জ্বলে দরজা খুলেতেই কক্ষে প্রবেশ করে এক কিশুভূতকিমাকার নারীমূর্তি। সে-মূর্তি খিলখিলিয়ে একবার হেসে উঠেই বলতে থাকে :

—কিগো, এতদিনে কিরে এলে? তোমার খোকাকে আমি বাচাতে পারি নি। ওই-ই খালের ধারের মাঠে তার কবর দিয়েছি। একবার চলে না গো দেখে আসবে।'

এ-গভীর-বিস্ময়ে অভিভূত সাহেব। এমন অজ্ঞান পরিবেশের এই ভূতমূর্তি মূর্তি খানিকটা

তিনি আতঙ্কিতও বটে। তবু স্বভাবসিদ্ধ হৃদয় ছেড়ে তিনি বলেন :

'Who are you?'

নারীমূর্তি সাহেবের কথা বোঝে না। সে তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ ভেঙে পড়ে কামায়। এবং সে-ভাবেই আবার সে বলে : 'অমন কেন করছো গো? তোমার খোকাকে আমিই কি মেরে ফেলেছি? ও তো মরাই জন্মেছিল। সত্যি বলছি, আমাকে বিশ্বাস করো...'

এ-কথা বলতে বলতেই সে-নারীমূর্তি সাহেবের দিকে ছুটে যায় সম্ভবত তাঁর পারের কাছে লুটিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যেই। কিন্তু সাহেব করেক কদম পিছিয়ে গিয়েই হাত তুলে নেন সড়কির মতো কী এক সূতীক্ষ্ম অস্ত্র। তাবপর what a ghost it is! বলেই তা ছুড়ে মারেন নারীমূর্তির বক্ষস্থল লক্ষ্য করে। একবার স্মরণ প্রচণ্ড এক

আত্নাদ করেই সে-নারীমূর্তি লুটিয়ে পড়ে মেঝের। তারপর তার ভাজা রঙেই স্বপ্ন লাল হয়ে ওঠে সমস্ত ঘর এবং স্বপ্নময় ছড়ানো রঙের মধ্যেই বার-করেক ছটফট করার পর নিশ্চল নিশ্চল হয়ে যায় সম্পূর্ণ দেহটা, সাহেব তখন বুঝতে পারেন : ghost নয়, সত্যিই সে একজন নারী। তবে তার মস্তিষ্ক স্বাভাবিক ছিল না।

পবদিন প্রাতঃপূর্বে স্থানীয় জনসাধারণও বুঝতে পারে : সেই নিহত নারী প্রকৃত একজন পাগলিই—যার জন্মলগ্নে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ভানুমন্দার স্বাভাবিক কিরণ ছিল মন্দীভূত। সে-কারণেই নাকি আত্মীয়-স্বজন তখন তার নাম রেখেছিল ভানুমন্দা।

ভানুমন্দা-সংক্রান্ত এই উপকথা উল্টাডিম্পী অঞ্চলে প্রথম শোনা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর জন্ম-লগ্নে। এ-কাহিনীতে যে

আগনি জানেন কি ?

১৯৬৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পোস্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে শতকরা স্তদের হার ৩ টাকা থেকে বাড় ৪ টাকা হয়েছে।

এই স্তদ আয়করমুক্ত।

একব্যক্তি ২৫,০০০ পর্যন্ত এবং দুইজন যুক্তভাবে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জমা রাখতে পারেন এবং প্রয়োজনমত আপনার জমা টাকা থেকে যে-কোন পরিমাণ টাকা তুলতে পারেন।

পোস্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে আপনার অ্যাকাউন্ট না থাকলে অবিলম্বে একটি পাশবই খুলুন।

W.B. (L. & P.R.)SS 4840/65

বাস্যমর্ষাদির উল্লেখ দেখা যায়, উল্টাডাঙারী অঞ্চলেই বোনা এক বিশেষ অংশে ছিল তাব অবস্থান। কৃত্রিম স্বামীরূপে ভানুমন্দাকে ধর্মি সঙ্গদান করতেন—সম্ভবত সেই বাঙালি শূদ্রদ্বয়টি ছিলেন ভদ্রানীশনকালের কোনো কৃষ্যামী-নন্দন—সাঁবি বিস্তারিত কোনো পরিচয় কাহিনীতে অনুপস্থিত। পরবর্তী মালিক সেই সাহেবের কাছ থেকেও নাকি উক্ত বাগানবাড়ি পাবে ক্রয় করেন সারপল্লীর রাজা পীতাম্বর মিত্র। তিনি যখন ক্রয় করেন, তখন তা 'ভানুমন্দার বাগান' বলেই পরিচিত ছিল সাধারণের কাছে—এমন অভিমত পোষণ করেন বর্তমানের কেউ কেউ।

যাই হোক, এই উপকথা বা কাহিনীর মধ্যে প্রকৃতই কোনো ঘটনা বা উপঘটনার সম্ভাবনা যদি থেকে থাকে—তবে তা ঘটেছিল কাহিনীরূপে তাব প্রতিষ্ঠালাভের আরও অনেক কাল আগে। সম্ভবত তখন থেকেই বিশেষ বিশেষ বংশপরম্পরায়ের স্মৃতির নদীপথে তা ভাসতে ভাসতে স্বাভাবিকভাবেই এসে ঠেকেছে বর্তমান যুগের উপেক্ষাব বেলোভূমিতে। যদিও একাধিনীর স্বপক্ষে ইতিহাসের সাক্ষ্য আজ দুর্লভ এবং সিঁপিবন্ধ আকারেও কোনো গ্রন্থে তার স্থানলাভ ঘটে নি, তবু কল্পনা-প্রসূত বলে তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ একাধিনীর আদ্যন্ত প্রায় একই ভঙ্গিতে শোনা যায় একাধিকজনের মুখে। সত্যি যদি কল্পনা-প্রসূত হতো, তাহলে অধিকজনের স্মৃতিপটে এমন স্বাভাবিকভাবে এতকাল তার অন্তিম বক্তব্য থাকা সম্ভব হতো না হরতো। অতএব ইতিহাসের উপকরণ থাকলেও কিছু থাকতে পারে—এমন অনুমান থেকেই একাধিনীর অবদাষণা বর্তমান নিবন্ধে।

উল্টাডাঙারী অঞ্চলের উপকণ্ঠেই যে-সুদীর্ঘ ক্যানেল বা খাল একালেও বিরাজমান—আজ তরক কৃত্রিম মনে হলেও তা কৃত্রিম ছিল না চিরকাল। একদা এ-পথেই বয়ে যেতো ভাগ্যবিশীর একটি উপপ্রবাহ। সুতরাং এই উপপ্রবাহের পথেই তখন নৌকাযোগে বিভিন্ন স্থানে চলাচলের সুবিধা ছিল গ্রাম-বাসীদের এবং পাটোয়ারদেরও তা বাণিজ্যের অনুকূল ছিল স্বাভাবিক। পরে এই জল-পথের অংশ-বিশেষ মজে বাওয়ার গ্রামবাসী এবং পাটোয়ারদের আবেদনেই তা খানিকটা ধনন করেন মূর্শিদাবাদের তদানীন্তন

সুবাদার। তারপর নবাব আলীবর্দীও তার বিভিন্ন অংশ ধনন করেন আরও গভীরভাবে। এবং সর্বশেষে ক্যানেলের আদি-অন্ত সংস্কার করে তার স্বাভাবিক গতির আয়ুষ্কাল আরও বর্ধন করার চেষ্টা করেন ইংরেজ সরকার।

এই ক্যানেল-পথেই ভাসতে ভাসতে সেকালের যে-সমস্ত চলাচলের ডিঙ্গী এবং বাণিজ্যের বজরা হঠাৎ তখনদশাপ্রাপ্ত হতো, সেগুলিকে তখন পূর্ববর্তের কোনো এক বিশেষ অংশে তুলে উল্টিয়ে রাখা হতো মেরামতের প্রয়োজনে। দিনে দিনে এভাবেই সেখানে পর পর উল্টে জমে থাকতো অজস্র নৌকা এবং ডিঙ্গী। তাই সেই বিশেষ অংশের একদা নামকরণ ঘটে উল্টাডিঙ্গীর পাড়। তারপর উল্টাডিঙ্গীর পাড় থেকেই উল্টাডিঙ্গারী নাম ধারণ করে তট-সংলগ্ন বিশাল ভূখণ্ড পববর্তীকালে। বর্তমানে উল্টাডিঙ্গারী নামের অপভ্রংশ 'উল্টাডাঙা' নামটিই বিশেষ প্রচলিত।

সারপল্লীতে রাজা পীতাম্বর মিত্রের আমল যখন পরাকার্যের মহৎ-পূর্বে উন্নীত, তখন উল্টাডিঙ্গারী অঞ্চলে তাঁর বাগানবাড়ির পায়শ আরও অসংখ্য বাগানবাড়ির পত্তন ঘটে সাড়ম্বরে। এই শ্রেণীবদ্ধ বাগানবাড়িগুলির পরিবেশ আবও রমণীয় করার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা ঘটে অজস্র পুকুরের। সুতরাং বিভিন্ন বাগানবাড়ির বিচিত্র ভবন, সংলগ্ন-প্রাঙ্গণের পুষ্পখচিত তরুলতা, এবং উপকণ্ঠে শ্রেণীবদ্ধ ভড়াগেব স্বচ্ছ সমারোহে তখন উল্টাডিঙ্গারী সার্বিক চিত্র ছিল নিঃসন্দেহেই সৌখিন।

সম্ভবত তখনই একবার বগী দসাদলের প্রচণ্ড হামলা হয়েছিল উল্টাডিঙ্গারী অঞ্চলে। এ-হামলার উড়ে প্রসারলাভ করে সাবপল্লী পর্যন্ত। সাবপল্লীতে তখন পীতাম্বর মিত্র প্রবর্তিত রাসমেলার সময়। বগীদের নৃশংস দৌরাঙ্কো সৈদিন সমগ্র মেলার উৎসব-মুখর পরিবেশ যেমন হৃদয়ান্তর লাভ করে হাহাকারে, তেমনই উল্টাডিঙ্গারী অঞ্চলের বাগানবাড়ি-গুলিতেও তখন ক্ষতির পরিমাণ খুব একটা উপেক্ষার নয়। রাজা পীতাম্বর মিত্রের দুঃসাহসিক তৎপরতার বগীকুল সৈদিন যদি স্বল্পেই সম্বৃত হয়ে পিছিয়ে না যেতো, তা হলে উল্টাডিঙ্গারী থেকে সূর্য্য করে সারপল্লীর প্রতি ঘরে ঘরে অকাল-সর্বনাশের মে-বান

ডাকডো—পরবর্তী তিন যুগেও তার সম্বরদের মূর্তি-পরিগ্রহণ সম্ভব হতো না হয় তো।

সময়ের অবিরাম পদযাত্রায় কোনো ব্যতিক্রম নেই। যুগের পর যুগ আসে। নবীন যুগ প্রাচীন যুগের উপমানরূপে স্বীকৃতি গ্রহণ করে না আসে। অতএব স্বাভাবিক গতিতেই বিবর্তনের পর আরও অনেক বিবর্তনের জেউ আসে উল্টাডিঙ্গারী অঞ্চলে। সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর মিত্রভীষ্ম থেকেই হস্তান্তর সূর্য্য হয় অধিকাংশ বাগানবাড়ির। তাদের অন্তর্ভাগে বিবিধ কারখানার পত্তন লাভ ঘটে একে একে এবং সেই সূত্রেই উল্টাডিঙ্গারীতে আশ্রয়প্রকাশ করে শ্রমিকশ্রেণীর বিস্তৃত বসতি-অঞ্চল।

তারপর বিংশ শতাব্দীর যাত্রামুখ থেকেই কিছু মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের পাশা-পাশি মূর্তিমের কিছু বিস্তারনের সাড়ম্বরে উপস্থিতির ফলেই উল্টাডিঙ্গারী অন্তর্ভুক্তি ঘটে মিশ্র পরিবেশে। তবে আজও শিল্পাঞ্চল-রূপেই তার বিশেষ প্রাধান্য। লিলি বিন্ধুট এন্ড বালি, ভারত প্লাই উড, লিক্স মেশিনারী, একাধিক ক্লাওয়ার মিল, অরেল মিল এবং সংখ্যাতীত কার্তের কারখানার প্রভাব থেকে সত্যিই মূর্তি লাভের কোনো লক্ষণ নেই উল্টাডিঙ্গারী।

সম্ভবত শিল্পাঞ্চল এবং হারিড শ্রমিক-শ্রেণীর বসতি-অঞ্চল বলেই উল্টাডিঙ্গারী সার্বিক পরিবেশ আজ স্বাস্থ্য-পরামর্শ। তা ছাড়া অবাঙালিদের সুবহু খাটালগুলির ধর্মাবাহিক কদম্বতা এতদঞ্চলেব আবহাওয়ারকে বিপন্ন করেছে আরও। রাস্তাঘাটেও কোনো স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের স্বাক্ষর নেই। প্রতি রাস্তার উভয় বাহুরে খোলা নদীর বিবাক্ত গতি, প্রায় বসতির উপকণ্ঠে মজা পুকুরের পক্ষিক চিত্র এবং অসংখ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সামনে-পেছনে জঙ্গলের কটুগন্ধী স্তূপ সমগ্র উল্টাডিঙ্গারী জীবনযাত্রার পক্ষে নিঃসন্দেহেই দুঃসহ।

জবে ইদনীর ইন্ডুস্ট্রিয়াল ট্রাস্টের কুপায় উল্টাডিঙ্গারী সার্বিক অঞ্চলে যে-উন্নয়ন-মন্ডের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে—তাতে প্রথম অঙ্কের সার্থক আবির্ভাব সমাধা হয়েছে ইতিমধ্যেই। এবার একে একে অবশিষ্ট অঙ্কগুলিরও লাস্যময় পদক্ষেপে যদি চন্দ্রপত্তন না ঘটে, তাহলে উল্টাডিঙ্গারী অচিরেই তার সৌখিন শাড়ি বদলাবার সুযোগ পাবে অবশ্যই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃতী লোক

প্রাপ্ত প্রহরগুলি গেছে

অবিরল বর্ষের দিন

প্রত্যাহারা কেবল চেরেছে

আয়োজন নিরন্তর রঙীন।

ক্রান্ত মনে কুয়াশা ছড়ালো।

আশাহত প্রাণের প্রতীতি

মিথিত হৃদয়ে অবশেষে

স্মৃতি হলো অপসৃত প্রীতি।

তাম্রিকা

ধাতুসাহিত্যিক উপন্যাস



মহাশেবতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

২ একাঙ্ক ১

সুখশান্তি এখন থেকে বাইরে আর পাবে না আনন্দীরাম, অন্তরে সঞ্চার কব।

আমি যে সামান্য গৃহী সুরকণ্ঠ। গৃহীর সব দরকার হয়। ঘর, সংসার, স্নেহ, ভাল-খাসা, সুখ, শান্তি।

এ এমন বস্তু নয় আনন্দীরাম, যে কোন ছাটুয়ে হাটে এ-সব বস্তু নিয়ে বসে আছে, গেলে পাবেই কিনতে পাবে, ঠাই ঠাই ঘুরতে হবে না। এ বস্তু যে চায়, তাকে ফুলে ফুলে ঘুরে মধু এনে মৌচাকে জমা করতে হবে, ঠাই-এ ঠাই-এ পেতে হবে। কোথায় কোনটি পাবে সেই ঠিকানা জানতে জানতেই দেখবে সমস্ত ঘুরিয়ে গেছে।

আনন্দীরাম কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

যে মানুষ্ট চাভালে শুরেছিল, সে উঠে মসল। মূখের কাপড় কেলে দিয়ে বলল, অনেক, অনেকদিন বাদে আমবা একত্র হলাম। সুরকণ্ঠ, তুমি কোন দোকানীর কাছে সব কিনেছ বলত? আমি তোমার সম্মানেই পথে ঘুরিয়েছি।

এ কি, নরপতি?

হ্যাঁ ভাই, আমি নরপতি মিশ্র।

তোমার কপালে কিসের দাগ?

গ্রাম্যই বাস্পীর বউ পারীকে যখন দাছ করি, চিতার আগুন বাশের খোঁচার ছিটকে

এসে কপালে এসেছিল। নামেও নরপতি, তাই কপালে টিকা পরিয়ে দিয়ে রাজা করে দিলে।

তুমি এখানে?

সুরকণ্ঠ আর আনন্দীরাম দুজনেই অবাক হয়ে গেলেন। নরপতি মিশ্র বললে, কেন, এই ত' উৎকৃষ্ট জায়গা। নিজের, অরুণ, পেছনে দেবীপ্রতিমা, আকাশে সন্ধ্যা, একজন গৃহী, একজন সম্যাসী, আমি এক গাঙ্গী, তিনজন বসে আলাপ করব।

একসঙ্গে শেরাল ডেকে উঠল, যেন নরপতির কথাকে বাগ্প করল।

একসঙ্গে শৈশবে, আধারমাণিক গ্রামে সুরকণ্ঠ রাব, আনন্দীরাম মূখোটি আর নরপতি মিশ্র বাল্যের সাথী ছিলেন। তারপর ক্রমে, কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনজনের জীবনের গতি তিনদিকে চলে যায়। আবার এতদিন বাদে তাঁরা একত্র হয়েছেন। ইতিমধ্যে কাবো সংগে করো জীবনেরই প্রত্যক্ষ কোন যোগই ছিল না। সুরকণ্ঠ, তিনি ত' সম্যাসী হবার সাধনাই করছিলেন। আনন্দীরাম সম্প্রান্ত গৃহস্থ। গৃহীর মতই তিনি কণার কণায় সুখ, শান্তি, স্বচ্ছলতা খুঁটে এনে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছেন।

আর নরপতি। তিনি ত দরিদ্র, গ্রামের সকলে তাকে করুণা করত। তাঁর পূর্বপদ্বয় ইতরজাতের ঘরে পড়ে করতেন। সাহিবাদের

অয়ে জীবনধারণ করতেন। সেজন্যে কেউই তাকে অন্য ব্রাহ্মণদের সমান মর্যাদা দেয় নি।

সেজন্যে তাঁর মনে ভীষণ অভিমান ছিল। তারপর, গ্রামের বিচারে বোন্দিন, বেদেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তাঁর বিধবা বোন শূদ্রদর্শকে কড়-আচার্য তপস্বত পনের বিধান দেন। বোন্দিন সেই বালিকা ভয়ে আত্মহত্যা করে, সেদিন থেকেই তিনি নিবাসিত চাকরোর মত ক্রোধ ও ঘৃণাব হলাহল পান করতে শুরু করেন।

আশ্চর্য জীবন বেছে নেন তিনি। পশু-হত্যা করতেও আটকায় নি তাঁর। নিষ্ঠুরতার তিনি চন্ডালদের চেয়েও ভীষণ হয়ে ওঠেন।

কিন্তু এতদিন বাদে তাঁরা একত্র হয়েছেন। ভীষণ জঙ্গল। ভীষণ দর্শনা কালীমূর্তি মন্দিরে শোভা পাচ্ছেন। এমন জায়গায় এলে সকলেরই বুক কাঁপে। মানুষ ভয়ে, আতঙ্ক, হঠাৎ আবিষ্কার করে সে বৃত্ত তুচ্ছ।

এমনি পরিবেশই বোধ হয় তিনজন প্রোড়ের, দীর্ঘদিন বাদে একত্র হবার সম্ভব স্থান। সময়ও অনুকূল। এর আগে তিনজনই আপন আপন মোহে, অতিমানে অন্ধ ছিলেন।

সবচেয়ে কি আশ্চর্য জান আনন্দীরাম, আমরা তিনজনেই যখন-তখন অন্য দু'জনকে বাধ দিয়েই আমাদের চলে। কিন্তু, এখন মনে হচ্ছে সে-ও ভুল। অন্তত আমার ক্ষেত্রে ভুল। নইলে এখন তোমাদের দু'জনকে দেখে আমার

আনন্দ হচ্ছে কেন? বিরাট-আনন্দ অনুভব করছি হে, মনটা আমার মশানতলার মত হয়ে যাচ্ছে।'

সুরকণ্ঠের কথা শুনে নরপতি হেসে বললেন, 'কেন, হবে যেইছে বল। সেবার বীৰভূম ঘুরে এসে সব কথাতেই চন্দ্রবিন্দু দিতে।'

'সুরকণ্ঠ অরো হেসে বললেন, 'আর বল কেন! সে এক দিন গিয়েছে! যে সামুকে পছন্দ হয় তাকেই নকল করি। যখন বার ওপর টান হয়, তার কথা বলা, হাটা, চলা, গজির কলাকেব'দম মরবার চটিও নকল করি। মনকে বোকাই, এইরকম নকল করতে করতেই আনন্দ মিলে যাবে।'

'আর এখন?' আনন্দীরামের গলার মৃদু কোঁকু।

'এখন আর নকল করি না ভাই। এখন দেখছি নিজের মত হওয়াই যে সবচেয়ে কঠিন। কি হলে যে নিজের মত হওয়া যায়, তা বুঝতে বুঝতেই জীবন কাটিয়ে দিলাম।'

যা বলেছ।'

'কিন্তু আসল কথাটা হয়ে থাক আনন্দীরাম। এখন, বিশ্বাস কর, যে আমাদের তিনজনেরই তিনজনের সঙ্গে কোন-না-কোন-ভাবে যোগ রয়েছে?'

'বিশ্বাস করি বই কি!'

আনন্দীরাম মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে ছাড়া একবারটি বলতে দাও সুরকণ্ঠ। তোমাকে আমি চিরদিন গুরু মত শ্রদ্ধা করছি।'

'হিঁ ছি আনন্দী! আমি যে তোমায় ঈর্ষা করতাম।'

'শ্রদ্ধা করছি বলছি বোধ হয় যখনই অস্তির দেখছি তখনই মনে কণ্ঠ পেতাম।'

'তুমি-কণ্ঠ পেতে!'

হ্যাঁ সুরকণ্ঠ। আব নরপতি, তুমি আজ অনেকদিন ধরে আমার ভাবনা চিন্তার সংগী। তোমাকে আমি ভুলতে পারি নি।'

নরপতি নীরব। তিনি সুরকণ্ঠের মত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন না। কেন না তিনি জানেন, তাঁর সম্পর্কে আনন্দীরামের অনুভূত হবার ক্ষেপ্ত কারণ আছে।

'পৃথিকে যখন বড়আচার্য অভিলাপ দেন, সে যখন আত্মহত্যা করে, তখন আমার ছোটমা বলোছিলেন, ওরে তোর কি এতটুকু দয়া নেই? তা যে তোর ছোটবেনের মত ছিল।'

'থাক আনন্দীরাম।'

নরপতি এখনও, এতদিন বাদেও পূর্ণ-দশীর কথা ঠাণ্ডা হয়ে শুনতে পারেন না। তাঁর নিঃশ্ব, শূন্য, হৃৎভাণ্ড জীবনে ছোট-বোনটি ছিল একমাত্র সান্দ্রনা। কিন্তু, এখন তার কথা শুনতে শুনতে আবাব অনুভব করলেন পূর্ণব কথা মনে করতে গেলেই তাঁর এখন নির্মলার কথা মনে হয়। চিতাশয্যার রামাই বাসীর বউ পারীব কথা মনে হয়। দুঃখের দাবিতে ওরা তিনজনেই তাঁর মনে-জায়গা পেয়ে-গিয়েছে।

আ নরপতি আমাকে বলতে দাও। সৌদিন,

ঠিক সে ঘটনা ঘটবার সময়ে আমি গ্রামে ছিলাম না।'

'থাকলেই কি তুমি আসতে আনন্দীরাম? না না, এই কথাটি আমাকে জানতে দাও। থাকলেই কি তুমি ছুটে আসতে? তাই যদি হবে, তা হলে, আজ জিগ্যাস করি, পরে কি তুমি একবারও বড়আচার্যকে বলেছিলে, আপনি অন্যায় করলেন জ্যাঠামশার, ভীষণ অন্যায় করলেন?'

'আজ, আজ সে কথা জেনে কি হবে নরপতি?' আনন্দীরামেব কণ্ঠ বড় কাড়র।

'জানতে দাও, জানতে দাও আমাকে।' নরপতি, দুঃখ সেরে সেরে, আবেগে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন, নিজেকে সামলে ধরে রাখতে পারেন না। এখন তিনি অশ্রুহীন কন্ডার হাংসকার করে উঠলেন, 'তোমার কাছে সত্যি কথাটা জানব, এ আমার প্রত্যাশা আনন্দীরাম, অতি ভীষণ প্রত্যাশা। বিশ্বাস কর, নরকবাসী প্রেত যেমন করে সুখ চায়, বাঁচতে চায়, আমিও তেমন প্রত্যাশার চেয়ে আছি। তুমি আমাকে সুখা দিতে পার আনন্দীরাম। তোমাকে আমি কড় ভালবেসেছিলাম, পৃথিবীর পরই তোমাকে ভালবাসতাম।'

'নরপতি!'

'তোমার শান্ত জীবন, সুন্দর চেহারা, সন্মান, স্বচ্ছলতা, পরিবারের শ্রী, সব দেখে দেখে আমার বুকেরানা ভরে যেত। বলতে আজ লজ্জা নেই আনন্দীরাম, তোমাকে দেখে আমি আমার কু-ভেদের বসে কত আনন্দ করতাম। একা একাই। মনে হত যা হচ্ছে তা আমার ভাইয়ের হচ্ছে।'

'নরপতি, আমি সত্যি কথাই বলব। বড়-আচার্যকে আমি তোমার কথা ভুলে তিরস্কার করি নি। মূখে কটু কথা বলতে আমার খারাপ লাগত। কিন্তু এ-ও বুঝতাম, এ আমার কাপুরুষতা হচ্ছে। বিবেক আমার শান্তি দেয় নি নরপতি। যেদিন শুনলাম পৃথিবীর মৃত্যুতে কাশীশ্বর আর সুরকণ্ঠ ছুটে গিয়েছিল, সেদিন মনে হয়েছিল ওরা আমার না বাওয়ার পাগ যেন ধুরে দিলে।'

'থাক! এ-সব কথাব শেষ নেই।'

'তারপা নরপতি, সমানে চেরেছি, ভগবানকে মনে মনে বলছি, এমন একটা কিছু হোক, যাতে নরপতি আমাকে ক্ষমা করে, ক্ষমা জানাব। না হলে আমার শান্তি নেই। সেই-জেনেই বৌদিন নির্মলিকে বাঁচাবার জন্যে তোমার কাছে ছুটে গেলাম, তুমি আমার অপমান করে ফিরিয়ে দিলে, সেদিন আমার মনে একদিকে দুঃখ হয়, আবাব অন্যদিকে ভারী শান্তি পেয়েছিলাম। তোমার কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই।'

এটুকু বলেই আনন্দীরাম চুপ করলেন। এখন, এতদিনে এদের দুজনকেই জানতে দিলেন। পরোক্ষ, হৃদয়ে গভীরে। এদের দুজনের কাঁধ, আচার, ব্যবহার, কথাবার্তা, সব কিছুই তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করেছে। কেন তিনি ভেবেছিলেন চোখের আড়াল হলেই

মনের আড়াল হয়? হয় না, কখনো হয় না। মানব বড় অসবায়। তার অজ্ঞাতে যে-কোন জিনিস তার জীবনকে প্রভাবিত করে, ভবিষ্যতের যে পথ হচ্ছে সে দিকেই ঠেলে দেয়। যে-কোন জিনিস, বস্তু প্রতি অবৈকী ব্যবহারের জন্যে অনুতাপ, স্মারি চোখের ভাঙিয়াড়তা দৃষ্টি, এমন কি কাশীশ্বরের নিঃপাপ দৃষ্টির ঘৃণা।

'আর আমি!'

নরপতি প্রগাঢ়, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমিই কি তোমায় অপমান করে শাস্তি দেই ছিলাম? আমিই কি তোমার স্মারি নামে অপবাদ দিয়ে শাস্তি পেয়েছি? নির্মলার মূখে আমি পৃথিবীর সন্মুখ দেখেছিলাম আনন্দী, সেইজেনেই রামাই-এর বউকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে গিয়েছিলাম।'

'সে তা বাঁচল না।'

বাঁচবে কি করে? সমাজের বিচার, ও হল জঙ্গলজঙ্গর রথ। যে সামনে পড়বে, তাকেই পিষে চলে যাবে। নইলে এদিকে দেশ উৎসবে চলে গেল, তখনো বড়আচার্য নাসি টানছেন আর বিধান দিচ্ছেন, ভাবলে পরে আশ্চর্য হতে হয়।'

সুরকণ্ঠ এঁদের কথা শুনছিলেন। এখন, ঈষৎ হেসে বললেন, 'প্রথম নির্জনে, দেবস্থানে বসে বার বা মনে আসছে বলে বাছি—কেন বল তা?'

নির্জনেই হয়ত এমন করে বলা সম্ভব। অন্য সময়ে অনেক বাধা এসে পড়ে।

'একটা কথা মনে হচ্ছে। এই যে এমন করে বললে তোমরা, এতে আনন্দ পেলো?'

'জানি না সুরকণ্ঠ।'

'তবু কলব ভালই হল। এরও প্রয়োজন আছে হে, আমরা সবসময়ে বুঝতে পারি না। এই দেখ না, আজ বলি, নরপতি, অনেকদিন তোমায় বলতে ইচ্ছে হয়েছে একটুখানি নিজের দুঃখ থেকে মুখখানা ভুলে বাইরের দিকে চাও। অমন করে নিজের দুঃখে হেঁটমাথা হয়ে থাকতে নেই। জান, আমার কুড়োন কি বলেছিল?'

'কুড়োন কে?'

'লক্ষ লক্ষ জনের একজন। হেতালপুন্দের চাষী। হেতালপুন্দের দিগে আমি তা কমবার একচর বাওরা-আলা করি নি। ওর সংগে চেনা-জানা হয়েছিল।'

'তোমার চেনাজানা?'

হ্যাঁ আনন্দী। অমনি কত মানুষের সংগে যে আমার চেনাজানা আছে, তা বলতে পারি না। ভাবলে মনে হয় রাঢ়বংগ আমার বুকে ধরা আছে।'

'সাথে কি তোমায় ভাগ্যবান বলি?'

'কেন?'

'তোমার বুকে অভাবান ধরে বলে।'

আনন্দীরামের কক্ষ বড় ছোট। মুখোটি-বাড়ির আন্তিনাটুকু তাতে ধরে, এ আন্তিনাটুকু তাঁর হৃদয় ভরে রেখেছে। এ আন্তিনাটুকু

তিনি ধুলোখেলা খেলতেন। তখন ভাড়া ইটের টুকরোকেই মনে করতেন সাত রাজার ঘন।
আবার ঐ আভিনতেই একদিন তাঁর বাবার সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে বিশালাক্ষী এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর হুঁচট! ছোটমা বললেন না কোনদিন, 'অ ছোট' বলে ডাকতেন, সেই ডাকই যাবে গেল।

আবার ঐ আভিনতেই একদিন ফুলেশ্বরী এলেন। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে আনন্দবিষমব বৃক্কে পশম ফুটোঁছিল, শারদ জ্যোৎস্নার অপকৃপ রাত্রে, কাটোয়ার পথে, নির্জন প্রান্তরে পশম-দীপিতে পশমের সৌরভ এখনো মনে পড়ে। কিন্তু সে স্মৃতির সঙ্গেই বগুনা, বেদনা, হাহাকার। স্বার্থের সংসার তাঁর কাছ থেকে শূন্য স্বার্থই চেয়ে এসেছে। এখনো তাঁকে এই নিগড়েই বাঁধা থাকতে হবে।

‘তুমি কুড়োনের কথা বল।’

‘একচক্রার কাছে হেতালপুর, একেবারেই অজগ্রাম। বখনই যেতাম, তখনই দেশতাম কুড়োন হেট হরে হয় ধান রুইছে, নর ধানের চারা সিক্তে দিচ্ছে, নর আগাছা তুলছে।’

একটু থেমে বললেন, ‘ওবা ভাগচাবী। কিন্তু নিজের জমি নয়, বানিকটা ফসল পায়। ভাব ভাগচাবীর জমির ওপর যে কি মাল্য আনন্দী, নরপতি, তোমরা বললে বিশ্বাস করবে না। দেখে দেখে একসময়ে ভাবতাম কুড়োন কি বোকা! যে মাটিটা অবশি তার দর তাবই মাঝার আঁকড়ে পড়ে আছে।’

‘সে কথা সত্য।’

‘ন না নরপতি। সে কথা সত্য নয়। এখন আমি বড়ি, ঐ মাল্যতেই বাচায়। ঐ মাল্য আছে, গুটি ভগবানের দান। মাল্যর এক-একটি খেলনা হাতে ধীরে দেন বলে তুলে থাকতে পার। ওরা মাল্যবশে জমিটিকে আপন মনে কবে ধান ফলার, আনন্দী তাব সংসার-টুকুর মাঝার এত পবিত্র করবে।’

‘আর আমি? আমাকে একটা খেলনা দিতে ঠাকুর তুলে পেলেন কেন বল ত? তিনি না দরামশ?’

‘হয় ত’ দিয়েছেন নরপতি। মৃৎ ভূবিরে আছে তাই দেখতে পাও না।’

‘মৃৎ ভূবিরে থাকি।’

‘কুড়োন বেমন মাথা নিচু কবে থাকত। আমি তখন ছেলেমানুষ। আমাব মনে হত কোনদিনও ওকে পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে দেখি নি। মাঠে যখন আব কেউ নেই, তখনও ও কাজ করত। আমি দূর থেকেই জিগ্যেস করতাম কি কুড়োন, সব ভাল? ও হেট হয়েই দিত হ্যাঁ ঠাকুর, সব ভাল।’

বকুঠ একটু থামলেন। কুড়োনের মাথা উনি এতবৎকেই দেখেছেন, অথবা রাজ্যবংশে দেখেন পেছেন সেখানেই কুড়োনকে দেখেছেন, এ কথা হলো কি এরা বুঝবে? তিনি যে দেখেছেন, রাজা আসে, রাজা যায়, বগী আসে, বগী যায়। এসব যেন আসলে সত্য নয়। অস্তিত্ব কুড়োন তাই বলত। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সে চুপে বলত। কে আসছে, কারে মারছে, সে

যবব নিতে গেল কুড়োনের চলে না ঠাকুর। কুড়োনের এখন অনেক কাজ। ধানচারা নিড়োতে লেগেছি, এখন কি আমি মৃৎ তুলে চাইতে পারি?’

বড় সত্যিকথা বলত। রাজা আসুক, রাজা যাক, ওসব ত’ ছেনেখেলা। এ সংসারে ওসব হল ছেনেখেলা, আসল কাজেব কাজ ত’ ওতে হয় না। আসল কাজ ত’ কুড়োনই কবে চলে। মৃৎটি নিচু করে চোখের সামনে ধরে রাখে তার জগৎসংসার, ঐ ধানের গাছ, আর মাটিটুকু। ‘হে দাদে’ বলেই না সং রাজাউজীব, যে যার বৎস ত পারে? কুড়োন যদি তাব কাজ তুলে যার তা হলে সংসার চলবে কিসেব জোরে?’

সুদূরকণ্ঠ একটু থেমে বললেন, ‘জ্ঞান, কুড়োন হচ্ছে সেই জাতের লোক। যে নিজের গ্রামটুকু ছাড়া কোথাও নড়ে না। তাই, হুঁঠা সোদিন যখন ওকে সেই কানসোনা পাটবাড়ির মাঠে দেখলাম, ভাবি অবাক হলাম।’

‘এমন ত’ কতই হয়েছে সুদূরকণ্ঠ।’

‘না না, আনন্দী, তুমি বুঝতে পারছ না, কুড়োন হচ্ছে সেই জাতের লোক, যে দশবার বাড়ি পড়লে, দশবার সেই একই জায়গার ভিটে তেলে। ওকে পাটবাড়ির মাঠে ধান নিড়োতে দেখে তবে আমি বুঝলাম বগীর একেবারে গাশেগরবাংলার শেকড় ধরে উপড়ে দিচ্ছে। নইলে কুড়োন হেতালপুর ছাড়ত না।’

নরপতি নিশ্বাস ফেললেন। তিনি এই ক’বছর ধরে কুড়োনের মত মানুষদের অনেক দেখেছেন। ওরা ঠিক ঘুবতে ঘুবতে নিজের জায়গার ফিরে আসে। এসে আবার জগল কেটে সেখানেই ঘর তেলে।

‘এই প্রথম দেখলাম কুড়োন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে চেয়ে দেখছে।’

‘বললাম কি কুড়োন?’

‘ও বললে এই যে ঠাকুর। হেতালপুর দিয়ে যখন আসতে যেতে তখন অনেক সময়ে ইচ্ছে হয়েছে তোমার মৃৎখানা দেখি। তা তখন সময় হত না।’

‘আমি জিগ্যেস করলাম, এখন সময় হয়েছে?’

‘ও হোসে বলল, তা হয়েছে বই কি। এই যে, এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কি দেখি। ঐ দেখ, আমাব ভয়ের নাতি ভাত নিয়ে আসছে। গত পাঁচ বছর একে একে সবাই গিয়েছে ঠাকুর। আমাদের গ্রাম এখন যাকে বলে বাঘা জংগল। ছেলে, বউ, কেউ নেই, সব মরেছে একে একে। ভয়ের এই নাতিটাকে পেলাম নদে-তে গিয়ে। ও বগলে, চল আজামশাষ, কানসোনা গিয়ে ধান কাটি দে। চলে এলাম।’

‘আমি জিগ্যেস করছিলাম, কুড়োন, ভাল আছ ত? ও কি বললে জ্ঞান?’

‘সেই কথাটাই বলতে চাই। ও বললে ঠাকুর, মাথা হেট করে বাজ বরতাম, আর হাঁপিয়ে মরতাম। শূন্য ভবতাম আমাব এই বয়স, আর এদিকে আমায় রেখে জোরান ব্যাটা বউ, নাতিপুত্র, বড়ি, ‘তন-তিনটে ভাই সব অপঘাতে বগীর হাতে মল? যব ভাবতাম, তত কণ্ঠ হত। শেষে একদিন, মৃৎ তুলে চেয়ে কি দেখলাম জ্ঞান? দেখলাম এই মস্ত মাঠ, কত লোক কাজ কবছে, ওই পাটবাড়িতে ব্যাটা আসছে, ঘবুর গাড়ি যাচ্ছে, ঠিক যেন আমাদের হেতালপুরের মাঠে দাঁড়িয়ে একচক্রা বের্বছি। দেখতে দেখতে বুকে-পাষাণ একটু কম বোধ হল। তাই এখন মাঝে মাঝেই মৃৎ তুলে চেয়ে দোঁষ।’

‘তোমার কুড়োনও ভাগ্যবান বলতে হবে।’

‘তাই বলি নরপতি, মাঝে মাঝে মৃৎ তুলে চাইতে হয়। তুমি বড় কণ্ঠ পেতে, তাই এ কথাটি বলব অনেকদিন আগেই ভেবে রেখে ছিলাম।’

‘চলো কি দেখব বল?’

‘তা কি আমি বলতে পারি?’

‘আমাকে তোমার সঙ্গে নাও না সুদূরকণ্ঠ। বেশ, ন-হয় নিলাম। তারপর?’

‘তারপর আর কি। তোমাব সঙ্গে ঘুরব।’

‘কতদিন, নরপতি? শেষ অবশি ত’ এক সঙ্গে যেতে পাবব না ভাই এক সময়ে ত’ একলা পড়তেই হবে।’

‘তাব আগে অবশি?’

‘একলা চলতে শেখাই ভালো নরপতি।’

আমি এখনো একলা চলতেই শিখি নি, আবার সেখো নেব? দুব দূর।’



কিয়ান
লঠন
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস ঙ্কো

ফোন-২২-৬৫৮০

২৬৬, ৩৬৬ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

‘আমিই কি তোমার সঙ্গে যাব? আমিও একটা কাজ নিয়ে বেরিয়েছি।’

‘কি কাজ?’

‘কাজটা ভাল নয় ভাই, মন্দ।’

‘কলই না।’

‘একটা-নিরাপদ জায়গা খুঁজছি।’

‘নিরাপদ জায়গা। নিরাপদ জায়গা বলে দাঁড় কোথাও কিছু আছে না কি?’

‘জায়গা একটা খুঁজে পেতেই হবে। কাশী, আমাদের কাশীশ্বর, সে নিম্নলার খোঁজ পেয়েছে।’

‘কোথায়?’

‘ফরাসিভাড়া। কিন্তু নিম্নল কিছতেই আরগসী বেতে বাছী নয়। সে বলেছে, আমাকে নিয়ে গিয়ে রাখতে পার এমন একটা জায়গাই এখন নেই, তখন আমাকে নিয়ে গিয়ে কি হবে তা বলতে পার?’

‘সত্যি কথাই বলেছে। একমাত্র পথ হচ্ছে হামাই বাসার পথ। কিন্তু সে পথে কি নিম্নলকে বেতে দেওয়া উচিত?’

‘আনন্দীর কথা শুনে সুরুকঠ হঠাৎ বললেন, ‘ভাল কথা। আনন্দী, তুমি বুনিকে নিয়ে এলে পারতে। সৈদন্যদে মহাপতি ঘাচারের বড় বিপদ। ওর ওপর ফতচাদি বিরক্ত হয়েছেন। কি কি ঘটছে তা আমি ঠিক বলতে পারব না।’

‘যাব বই কি। সময় হলোই যাব।’

‘সময় হলোই।’

‘আনন্দীরাম কিছতেই বলতে পারলেন না অনেকদিন ধরে তিনি ফুলেশ্বরীর কাছেই রয়েছেন। কিছতেই আর পৌঁছানো হচ্ছে না। তাই বাবর-গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত না পেলে কেমন করে যাবেন? অথচ এই কথাটি সুরুকঠকে বোঝাবেনই বা কেমন করে?’

‘তিনি চুপ করে রইলেন।’

‘নৈসময়ে, সৈদন্যদে, ফুলেশ্বরী-ভাইকে মরণ করছিলেন, মনে মনে ডাকছিলেন।’

‘বড় অসহায় সে ডাক।’

৪ বাহর ৪

‘সৈদন্যদে মহাপতিও তখন বড় বিপদে পড়েছেন।’

‘কেন না, রাজসরকার তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন আর আর বললেই হয়।’

‘হীরালাল শেঠ, বারগসী বসাক, তাঁদের দু’দিনে, মহাপতি তাঁর নিজের সন্তান থেকে কিছু ধার দিয়েছিলেন। সে ঋণ সামান্যই। তাড়াহাড়ি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বণিকদের সমস্ত এতটা মাঝমাঝি ফতচাদি পছন্দ কব- ছিলেন না। সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। ফতচাদি যে কাছ করেন তাকে বিশ্বাস চল না। বিশ্বাস ছাড়াও চল না, বিশ্বাস করাও চল না।’

‘মহাপতির ওপর মহাপতি তাঁর প্রথমে হয় ঋণপতির জন্যে। বৈদিন ঋণপতি গাছিত টাকা নিয়ে নতুনজীবনের সম্মানে ফরাসিভাড়া ওনা হয়ে যান, সৈদিন থেকেই তিনি মহাপতির নামের পাশে একটা ট্যার দিয়ে রাখেন।’

এ ট্যারের অর্থ হল, আর ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা নয়। টাকার সোভ। জিনিসটা, ফলতে গেলে, বাত, স্বেচ্ছা বা চক্রবর্তীর মতই সত্তে মিশে থাকে।

তারপরই মহাপতি হীরালাল শেঠের টাকা ধার দিলেন। টাকাটা আর কারো নয়, একান্ত-ভাবেই তাঁর। মহাপতি সৈদিন অবধি দিল্লীতে ছিলেন। টাকা কেমন করে আসে আর কেমন করে যায় তা তিনি ভুলভাবেই দেখেছিলেন।

‘তিনি বোধ হয় আগেই বুঝেছিলেন, বৈশ্য-যুগ এসে গিয়েছে। লন্ডন, কাদোভা, আম-স্টার্টাম, টিকলিস, আম্কারা, পৃথিবীর অনেক বন্দর আর গল্লিই বৈশ্যযুগের শব্দ বাজিয়ে মালা পাবিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়েছে।’

‘মূলদাবাদে, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ব্যবসারী জাতকে ঘেঁষেঘেঁষি করে বেচাকেনা করতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল হয়ত ব্যবসার পথেই বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে যাবে। ব্যবসার বগীর আক্রমণ দেশের যে অবস্থা হল, সেই চিরন্তন ঘাটতি অবস্থাটাও চলে যাবে।’

‘সেইজন্যেই তিনি নিজের বলতে যা কিছু ছিল, হীরালাল শেঠের কারবারে লগ্নী করেছিলেন।’

‘মূলদাবাদের কাপড়ের ব্যবসারীদের তখন বড়ই দু’দিন। হীরালাল শেঠ মহাপতিকে বলেছিলেন, ‘শেষ পর্যন্ত মশাই, আপনাদের এই সুরুকঠ রায়েল কথাই সত্যি হবে না কি? ভাগীরথীর তীর থেকে বাবলা গুলটেতে হবে আমায়ের?’

‘সুরুকঠকে তাঁর গুরু যে-কথাটি বলেছিলেন, যে এই মূলদাবাদের ভাগীরথীর তীরেই একটি যুগের অন্ত হবে, সে-কথাটি চাপা থাকে নি।’

‘সকলেই ভাবছিল নিশ্চয়ই বগীর আক্রমণ দেখেই সম্রাসী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। নবাব যতদিন আছেন, তবু রকে। নবাব বৈদিন দেহ রাখবেন, সৈদিন বগীরাই-রাজা হবে একথা মুখে মুখে ফিরছিল।’

‘সেই ভয়েই বোধ হয় একে একে যে পারাছিল সেই চলে যেতে চেষ্টা করছিলেন।’

‘এমন কি প্রতি দাবির যে চান্নী, সে-ও মাঝে মাঝে বলছিলেন, ‘য্যামিন আছে, ত্যামিন একরকম। তবে নবাবের ইন্তেকাল ফরমাইলে কি হয় তা বলা যায় না।’

‘মহাপতি হীরালাল শেঠকে বললেন, ‘মশায়, সাধু-সন্ন্যাসীর হিসেব অন্যরকম। উনি কি আর সেই কথাই বলেছেন? উনি বলেছেন তাপের আব সীমা-পরিসীমা নেই। মানুষ তার এত পাপ গণ্যার-বুকে সমর্পণ করেছে তাই গণ্যা বিদ্রূপ হয়েছেন।’

‘‘তাই ত’ ভাবছি, কি করা যায়। বাংলার রেশমের চাব বলুন আর তাঁতেব কাল বলুন, এতদিন ধরে খারা চালিয়েছে তারা চাবও কবেছে, তাঁতেব বুনেছে। কিন্তু এই কয় বছরে যে কি হল। বোঝাট সুরাট থেকে ডুলো আসত, সে বাওয়া-আসা প্রায় বন্ধ হয়েছিল। হালার-হালার মানুষ উৎসাহ উৎখাত

হয়ে মূলদাবাদ থেকে বাঁকড়া, বাঁকড়া থেকে বীরভূম, বীরভূম থেকে মেদিনীপুর, মেদিনীপুর থেকে নবাবীপ, নবাবীপ থেকে মালদহ, মালদহ না গিয়ে কেউ কেউ ঢাকা, বরিশাল, যে যেখানে পারছে পালাচ্ছে, মরছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।’

‘সে কথা সত্যি।’

‘সেই জন্যেই এই অবস্থা হল। আমায়ের একটা বড় শ্বশুর হল সারোব ফারিসবা। কিন্তু এখন, দেশের এ অবস্থা দেখে আলিমান, ফরাসী, ওলন্দাজ ফারিসরা টাকা লগ্নী করতে উদ্য পান। ওদের দোষ দিতে পারি না, আশ্বাই কি মাল দোঙ্গাবার ভরসা দিতে পারি?’

‘কেন করে দেবেন?’

‘তা হ’লে কি শেষ অবধি এই দাঁড়াবে, যে অন্য ফারিস সারোবরা সরে যাবে, আর দাঁতে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পারে বলে ইংরেজরা সর্বেসর্বী হয়ে থাকবে?’

‘হতে পারে।’

‘হতে পারে কি বলছেন, হতে চলেছে। আর, শুভেই জানবেন ব্যবসা মরে। একজনের হাতে গিয়েছে কি অমানি নষ্ট হল। প্রতি-যোগিতা চাই, রেবারের চাই, এই যে, রেশম বাচাইয়ের মরশুমে মূলদাবাদের চক জল্লীর, অমানি, পারসী, হাবসী, সবাই গা-ঠেলাঠেলি করে দরদস্তুর করত, ওদের এই কচকচ শুনলেই ত’ আমার রক্ত নেচে উঠত মশায়।’

‘মহাপতি নিম্বাস ফেললেন। কি কুকণে রুখজী ভৌসলে দিল্লী থেকে বাংলার চৌধ আমায়ের অনুমতি নিয়ে এ দেশে এসেছিল।’

‘হীরালাল শেঠ তাঁর মনের কথা বুঝলেন।’

‘আপনি আমি যা ভাবছি তা ঠিক কি না, এখন আমার মাঝে মাঝে সে সন্দেহ হয়। বগীর আক্রমণ একটা বিরাট ঝাড়া সে-কথা মানি। কিন্তু ইমারত যদি শক্ত হয় তা হলে ত’ সহজে ভাঙে না।’

‘সহজে ত’ ভাঙছে না।’

‘কি বলছেন?’

‘সত্যিই বলছি। একে কি সহজে ভাঙা বলে?’

‘আশ্চর্য, ঠিক এই কথাই অন্যরাও মনে করেছিলেন। ব্যাঙেল চাটে ফাদার আন্তো-নিওনি কসে বসে তার পারের কাছে নতজানু রামাই বাসীর মন্ত্রণামাধিত ছদ্মের হাফাকার শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে গিয়েছিল, আর সেই দিনই লিখেছিল, ‘এদের মহাকাব্যের অন্যতম নায়ক বলেছিল যুদ্ধ না কবলে পরে সূচের ভগায় যতটুকু ধরে ততটুকু জমিও দেবে না।’

‘এখন দেখতে পাচ্ছি এ-দেশের মানুষ কিছতেই হাব মানতে চাইছে না - তারা বাধ্য দিচ্ছে। না, লাঠি, তীর-ধনুক বা বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করে বাধ্য দিচ্ছে না। তবু এই যে এলোডাস চলছে, এর মধ্যেও, প্রত্যেকে যে যার বিশ্বাসমত, সংস্কারমত, এতদিন যে

প্রথা পালন করেছে, যে ঠাকুর পূজো করেছে, যে উৎসব করেছে, সেটিই বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে।

এই যে নিজস্বতা বিসর্জন দিতে অনিচ্ছা, এই যে নিজের নিজের পরিচয় ধরে রাখবার চেষ্টা, এ-ও এক ধরনের শ্রদ্ধা, অথবা, বলতে পারি পরোক্ষ প্রতিরোধ, প্যাসিভ রেজিস্টেন্স।

কিন্তু ওরা জানে না, বর্গীদের পেছন পেছন আছে ইতিহাসের প্রতিশোধ।

ওদের এ-সংগ্রাম মহান, বড় মহান। কিন্তু বর্গীরা ভুলে। এই প্যাসিভ রেজিস্টেন্স, এটা হরতো বাংলাদেশের, হরতো ইন্দো-চীনাই বৈশিষ্ট্য। এতে ভবিষ্যতে হস্ততা সূক্ষ্ম ফলবে। কিন্তু বর্তমানের দিকে চেয়ে মনে হয়, এরা যদি একটু আতঙ্কিত হত, এরা যদি বর্গীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে কিছুটা বাধা দিত, তা হলে বছর বছর বাংলার মাটিতে হাহাকার তুলতে বোধ হয় ওদের এতটা সাহস হত না।

ঠিক এই কথাই আলীবর্দীও বলেছিলেন।

প্রাসাদে, দরবারে, কতিপয় বিশ্বাসভাজনদের নিয়ে বর্গীদের এবাব কিভাবে বাধা দেওয়া যায়, তাই নিয়ে পরামর্শ চলছিল। হাঠাৎ খাঁ আব চুনী রায় বলেছিলেন, 'যদি ওরা বাধা দিত, যদি ওরা চেষ্টা করত।'

কিসের চেষ্টা করবে? দাঁড়িয়ে মার খাবে?'

জেলায় জেলায়, শহরে শহরে, চাষীদের ক্ষতির সবেজমিন তদন্ত করতে করতে দুর্ভাগ্যের মাথার কোয়ারী করা চুল পাতলা হয়ে গিয়েছিল, মেজাজও কড়া হয়েছিল।

কে চেষ্টা করে নি?'

নবাব হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন।

'প্রজারা।'

কে বললে করে নি? আমি দেখেছি, তারা চেষ্টা করেছে।'

তার কথায় ওপর সামান্যমান কেউ প্রতিবাদ করে নি। অন্য নবাব-বাদশার সঙ্গে প্রজাদের দেখাই হত না। কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামার কল্যাণে নবাব আলীবর্দী সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সবসময়ে ওদের দেখছেন। তিনি যদি বলে থাকেন ওরা চেষ্টা করেছে, তাহলে মেনে নিলেই এখনকার মত শান্তি থাকত।

নবাব দেখেছিলেন ওরা বারবার ফিরে আসছে। জঙ্গল কেটে, পোড়া ছাই সরিয়ে, যে যেখানে ছিল সেখানেই ঘর তুলছে, সেই জমিই চাষ করছে।

'ওরা ওদের সাধামত চেষ্টা করছে।'

তিনি আবার, একটু রেগে বলেছিলেন।

মহাপতিও হাবিলাল শেঠকে সেই কথাই বললেন।

হাবিলাল তখনই বলেছিলেন, 'এখানে

যদি সবাই একজোট হয়ে ব্যবসাকে বাঁচায় তবে বাংলার বাণিজ্য বাঁচবে। নইলে 'এরপব ঠাকুর ছোরে ঐ রাজস্থানী, বোখপদরী, আজমেরী, মাড়বারীরা তাঁতদের দান দেবে, ওদিকে কিনবে শ্রদ্ধা ইংরেজরা। আমি আর আমার মত অনায়া চকে বসে ভুগুড়িগি বাজাব।'

সেই সময়েই মহাপতি হাবিলাল শেঠের ব্যবসারে টাকা লাগিয়েছিলেন।

যেমন লাগিয়েছিলেন, তেমন ফিরেও পেলেন।

কিন্তু তাঁর ওপর ততদিনে ফতেচাঁদের সম্ভেদ এসে গিয়েছে। এতদিন ধরে তিনি মহাপতির হাত দিবে যত টাকা খসচ কবেছেন সবকিছুর হিসেব চাইলেন।

মহাপতি হিসেব দাখিল করলেন। কিন্তু সামান্য তিনশো টাকার হিসেব মিলল না। ওটা লেখা ছিল না।

ফতেচাঁদ চট করে বলে বসলেন, 'এ-টাংগা যত সামান্য হোক, হিসেব আপনায় রাখা উচিত ছিল।'

মহাপতি একটু হাসলেন। বললেন, 'এ টাকা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু মশায়, আমার নিজামতের কাছে ঘেন্না এসেছে। আমি আব কাজ করব না।'

ফতেচাঁদ তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে মাপ চাইলেন। বললেন, 'বিপদের সময় বিশ্বাসী লোককে ছাড়তে পারব না।'

কিন্তু মহাপতি জানলেন মাথাব ওপর অবিশ্বাসের ঝলঝলেই রইল। বড় দুঃসময় তাঁর। এদিকে দাদার স্ত্রী, ফুলেশ্বরী নদলে তাঁর ওপর নিভর্শী।

কাকার বিপদ দেখে ফুলেশ্বরীও ভয় পেলেন। সেইজেনাই তিনি স্বামীকে স্বেদন করে কান্দতে লাগলেন। আজকাল প্রায়ই কান্দেন। (ক্রমশঃ)

নেহেরু স্মৃতি সুলেখা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

(সারা ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

বিষয়সমূহ

ইরাজী : দি স্লেস অব নেহেরু ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী

বাংলা : ভারতের ইতিহাসে নেহেরুর স্থান

হিন্দী : ভারতীয় ইতিহাসে নেহেরুর স্থান

বিচারকসমূহের সভাপতি

ইরাজী : অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এল, সি

বাংলা : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দী : শ্রী কে. পি. খৈতান বার-এ্যাট-ল

প্রতিযোগিতার জন্য প্রবন্ধ দাখিল কবির শেষ তারিখ ১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৫। কর্মটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পুরস্কার

উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় প্রথম পুরস্কার : একটি স্বর্ণপদক, প্রতি মাসে ১৬ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেন্ড ও তৎসহ ৫০ টাকার বই।

দ্বিতীয় পুরস্কার : একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্যপদক, প্রতিমাসে ১২ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেন্ড ও তৎসহ ৩০ টাকার বই।

তৃতীয় পুরস্কার : একটি রৌপ্যপদক, প্রতিমাসে ৮ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেন্ড ও তৎসহ ২০ টাকার বই।

এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় ১০টি যোগ্যতানুসারে সার্টিফিকেট অব মেরিট (প্রশংসাপত্র) ও ২৫ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিশদ বিবরণ ও এনরোলমেন্ট ফরমের জন্য লিখুন—

অবৈতনিক সম্পাদক

নেহেরু স্মৃতি সুলেখা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা কমিটি

সুলেখা পার্ক, মাদবপুর, কলিকাতা-৩২



স্মৃতিভারে—জনাদর্শন চক্রবর্তী। জেনারেল প্রিন্সিপাল জ্যোতি পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য : পাঁচ টাকা।

শ্রীজনাদর্শন চক্রবর্তীর খ্যাতি চিন্তাশীল অধ্যাপক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এককাল বেনব গ্রন্থ ভাব কাছ থেকে পেরেছি, সেসব গ্রন্থের অধিকাংশই ছাত্রনির্ভর। এবং অধ্যাপক চক্রবর্তীর কোনো কোনো ছাত্রের গবেষণামূলক গ্রন্থও তাঁর স্বয়ং, সুদূর ও চিন্তা আমরা নক্ষ্য করিছি। এইভাবে ছাত্রসমাজ ও শিক্ষক-সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে শ্রীচক্রবর্তী বাস করছিলেন। 'স্মৃতিভারে' পড়ে মনে হল, এবার তিনি গাণ্ড ভেদ করে সকলের সামনে উপস্থিত। অবশ্য 'স্মৃতিভারে' গ্রন্থটিতে বেদ-ঘটনা, তথ্য ও ভক্তের সমাবেশ লক্ষ্য করছি, তা অধ্যাপক চক্রবর্তীর জীবন-নিবেশে নয়, তবু তাদের আবেদন সর্বজনীন। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অধ্যাপক জনাদর্শন চক্রবর্তীর 'স্মৃতিভারে' আমাদের কাছে ভার-স্বপ্ন নয়, বরং পরম উপভোগ্য গ্রন্থ। একালে যা সচরাচর লাভ করা যায় না। গ্রন্থটিকে তিনি চারভাগে ভাগ করে (হিন্দু, মুসলমান, গুরু-শিষ্য, কালা কিংবা গোরা, বরদার) প্রবন্ধগুলিকে বিষয়ভাবনানুসারী বিন্যস্ত করেছেন। 'হিন্দু, মুসলমানে' সবার উপরে মানব সত্যের বাণী মর্মীত হয়ে উঠেছে। 'গুরু-শিষ্যে' গুরুদ্বয়ের কথা সর্বনিয়ে উচ্চাভিহত হয়েছে। 'কালা কিংবা গোরা'র বৈদেশিক শিক্ষাবিদ ও গণ্যদেব মনুষ্য-মহিমা প্রকটিত হয়েছে। 'বরদার' অংশে আলমুতাব, চিত্তবজ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, নীলরতন, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রয়েছে তাঁদের লোকান্তর প্রতিভার বিশ্লেষণ।

যা হোক এই প্রবন্ধগুলির সহজ মাকর্ষণীয় গুণ এমনই যে, কোথাও তারা তথ্য বা ভক্ত প্রকাশের পর্ব প্রকাশ করে নি। উপরন্তু 'স্মৃতিভারে' যদিও আত্মনিরপেক্ষ নয়, তথাপি কোথাও গ্রন্থকারের আত্মগরিমাব লেশমাত্র নেই। গ্রন্থটি পড়ে পাঠকরা অবশ্যই কৃতিত্ব লাভ করবেন।

মধু মধুরা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশক : প্রগতি প্রকাশনী, ২০৬, বিধান দপণী, কলিকাতা-৬। মূল্য : তিন টাকা।

সাইকো এনালিস্ট ডক্টর অমিত সেনের অধীনে রয়েছে প্রশান্ত ব্যানার্জি। ইউ-নভার্সিটি সেরা ছেলে প্রশান্ত। সংস্কারের রূপেই মা আর বোন। কলকাতা পড়া

সময় প্রশান্তের জন্যে কার আশাই বা কম? সেখানেই প্রশান্তের সঙ্গে পবিচয় হয় কলেজের প্রিন্সিপালের শালী রজনীর সঙ্গে। সেই পরিচয়ের সুত্রপাতের শেষ পরিণতি উপন্যাসটির ঐতিহাসিক কাহিনীকে ঘনীভূত করে তুলেছে। রজনীর সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রশান্ত কিছুটা মেলামেশা সূত্র করেছে এমন কি, ট্যান্ডেমে ভারমন্ডহারবার পর্বন্ত বেড়িয়ে গেছে। তার আগে অবশ্য বিখ্যাত ব্যবসায়ীর স্ত্রী বনলতা দেবীর গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্টের পর হাসপাতালে থাকাকালে প্রশান্তের সঙ্গে পরিচয় হয় বনলতা দেবীর। বনলতা দেবী কামনা করে প্রশান্তকে জামাতা হিসেবে পাবার। কিন্তু বাদ সাধে রজনা। হঠাৎ একদিন রজনা

জরুরী সেন

ও প্রশান্ত বাড়ি ফেরার পর মা ও বনলতা দেবীর কাছে রজনা সম্পর্কে ক্রুর মন্তব্য শুনলে বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে যায়। অবশ্য রজনা অতোটা খারাপ নয়। অমিত সেনের অধীনে তারও যখন চিকিৎসা হয় তখন রজনীর অতীত ইতিহাস লিখে রেখেছিলেন ডাক্তার নিজেই,—তা থেকে জানা যায় রজনীর বেদনা-ময় অতীত কাহিনী। সেই সূত্রেই সে সত্যিকারের ভালবাসা দেয় প্রশান্তকে এবং বোসকে বিয়ে করার পর হঠাৎ একদিন আত্মহত্যা করে। কাহিনীতে লেখক যেসব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রতি তার সহানুভূতি পাঠকদের আকৃষ্ট করে। উপন্যাসটিতে চরিত্র বিশ্লেষণ ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক আবর্তন সৃষ্টিতে পুলকবাহুর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

দেবদাসী—বালকৃষ্ণ ভগবন্ত বোরকর। অনুবাদ—বোম্বায়া বিশ্বনাথহ। ভারতী সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১৯, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। মূল্য : চার টাকা।

শ্রেষ্ঠ ঝারভী সাহিত্যিকদের মধ্যে বালকৃষ্ণ ভগবন্ত বোরকর উপন্যাসিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন এবং দেবদাসী তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসটি গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত। গান্ধীজী একসময়ে আপামর জনসাধারণকে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি জানতেন মুক্তিসাধনার সত্যপথ মানুষের একসাধনায়। আর রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সচর ভেদ-

বিক্ষেপকে প্রবলমান করে দৃষ্টি। এই উপন্যাসে কেশব রাও গান্ধীজীর মস্তাধি। অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের জন্যে সমাজচ্যুত। কিন্তু তার আগমনে হরিজন পল্লীতে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছে। মা শান্তদেবীর মন্দিরে সকলের প্রবেশলাভ ঘটেছে। হরিজনদের সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরলপ্রাণ লোকদের মাদক বজ্রনের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এই কাজে তার সাথী ছিল সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক হরী। দেবদাসী শেবন্তীকেও কেশব রাও আপন করে নিয়েছে। তার দুঃখ-বেদনা উপলব্ধি করেছে। তদানীন্তন সমাজে দেবদাসীদের সামনে মহানন্দা, বাসবদত্তা, পাত্রা প্রভৃতি বারবনিভাদের আদর্শ ছিল। শেবন্তী সে হীনজীবন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছে। শেবন্তীর কাছে কতব্যের আহ্বানই বড়। হরিজনদের শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করেছে। হরীর মানসিক রোগের নিরাময়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে নি। এর ফলে হরীর সংগে একটি নিবিড় সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জাগের মধ্য দিয়ে সেই সম্পর্ককে সে মহত্তর করে তুলেছে শেষ পর্বন্ত। ধর্মের দিক দিয়ে শেবন্তী দেবদাসী। কাজেই দেবদাসীদের মহত্ত্ব উপলব্ধি করেছে। তার বিশ্বাস সমাজকে সংস্কার করতে হলে চাই হৃদয়ের পরিবর্তন, বিবাদের মধ্য দিয়ে নয়। আর এই হৃদয়ের পরিবর্তন অসে তাগের মধ্য দিয়ে। লেখকের বর্ণনানৈপুণ্যে প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে 'দেবদাসী' নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় সংযোজন। অনুবাদক বোম্বায়া বিশ্বনাথহ অনুবাদকালে বালকৃষ্ণ ভগবন্ত বোরকরের জীবনানুভূতির সঙ্গে নিবিড় এক্স অনুভব করেছেন। ফলে কখনই মনে হয় না অনুবাদ পড়ছি। স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাষা, যোগ্য শব্দচর দেবদাসীকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

আভাউ—নিভাগোপাল সামন্ত। বিকল্পদ্র, ভারী কলিকাতা-২৭, ২৪-পরগণা। মূল্য : ৩৫ পয়সা।

ভূতীয় বর্ষের বিশেষ সংখ্যাটি মফস্বল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দেখে আমরা খুশি হলো। এতে প্রবীণ ও নবীন, খ্যাত-অখ্যাত অনেকেই লিখেছেন। অখ্যাত লেখকদের রচনার অনেক সময় রচনাগুণের সম্পূর্ণ সিস্থি না থাকলেও, তাদের গল্প বলার এই সুন্দর। এই পত্রিকায় গল্প, কবিতা, ধারাবাহিক উপন্যাস ছাড়া কয়েকটি আকর্ষণীয় বিভাগও আছে। পত্রিকাটি সাধারণের মন জয় করে নেবে, তা অনায়াসে বলা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, এই পত্রিকা নতুনরা যোগ্য স্থান লাভ করতে পেরেছে। প্রচ্ছদপটটি সিন্ধি ও সুন্দর।



বিহার এল হুদা

হুসেইন কামিলের স্মৃতি-রায়

১. যত ।

প্রচলিত শোষণে সন্ত্রাসের বিপ্লবকাল

১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল। বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসে এই পাঁচ বৎসর এক গৌরবময় কাল। বাঙালীর ছেলে ও মেয়েরা সাহসে, নিয়মানুবর্তিতায়, আত্মবিলয়ে ও দৃঢ়বরণে দুর্জয় হয়ে এই কালে যে ব্যাপকতর রণসজ্জা সাজনা করেছিলেন তা অপূরণ। পূর্বে আমরা এমনটি দেখি নি। বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে ওঠে চট্টগ্রামে। সে-আগুন ছড়িয়ে যায় সারা বাংলায়। তার দাহ বিহার-উত্তর প্রদেশ-মহারাষ্ট্র-পাঞ্জাবকে স্পর্শ করে। বাংলার সমগ্র হৃদয়সমাজ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, পরোক্ষ এতে জড়িয়ে যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমন একটি পরিবারও ছিল না যারা কোন-না-কোনভাবে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে না এসেছে। পুলিশের অত্যাচার প্রতিদিন তীব্রতর হয়ে প্রতিটি পরিবারের উপর বর্ষিত হয়েছে। সে যুগে বাংলা দেশ কার্যত একটি বিরাট মিলিটারি ক্যাম্পে পরিণত হয়। সামরিক আইন-ই প্রকৃতপক্ষে শাসনভার গ্রহণ করেছিল।

মহাত্মা গান্ধীর আইন-অমান্য-আন্দোলন সারা ভারতবর্ষকে দিয়েছিল চৈতন্য, স্বাভাবিক-বোধ এবং দেশসেবার আদর্শ। ভারতবাসী একটি জাতিতে পরিণত হয়ে ইংরেজকে অবাঞ্ছিত পরস্বাপহারাী ভাবে শিখেছিল, ইংরেজের শাসনকে অমান্য করে যে-কোন দৃঢ়বরণে প্রস্তুত হয়েছিল।...

বাংলার কংগ্রেস বিপ্লবীদেরও কংগ্রেস। এখনে তাই অহিংস ও সহিংস মতবাদের মধ্যে তেমন ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যেত না। বাঙালী উভয় পন্থাকে সমানে গ্রহণ করেছিল—কার্য, তাদের একমাত্র কাম্য ছিল 'স্বাধীনতা' লাভ।

কাজেই এই পাঁচ বৎসর ধরে অন্তত বাংলা

দেশের জামিতে কংগ্রেসের অহিংস-সংগ্রাম ও বিপ্লববাদীদের সহিংস-সংগ্রাম পরস্পরের পরিপূরক রূপে কাজ করেছে। কংগ্রেস লোকের ঘরে ঘরে যে যে ইংরেজ বিতাড়নের পথ জানিয়ে দিয়েছে দুর্ভাগ্যবান মানুষকেও, আইন-অমান্যের মাধ্যমে। গণ-আন্দোলন যখন পুলিশের মারের চোটে স্তম্ভ ও হতাশালাভিত, তখন বিপ্লবীর প্রচলিত আঘাতে ইংরেজের শক্তিকেন্দ্রগুলো ধসে যাবে। শক্তিশ্বর ইংরেজ-রাজপুত্রেরা হয় গুলীবিদ্ধ-অবস্থার পথের ধুলোর গড়িয়ে পড়ছে, নরতো রাস্তে পালিয়ে যাচ্ছে বিলেতে, নিজদেশের দেশে! ... ফলে সমগ্র দেশবাসী বৃটিশবিরোধী হয়ে সহিংস-অহিংস যে-কোন বৃটিশদ্রোহী-আন্দোলনকেই বরণ করে নিয়েছে। তাতে চরম দৃষ্টান্ত দেশবাসীরই হয়েছে, চরম ত্যাগস্বীকার দেশবাসীরই করেছে। বাংলার বিপ্লব ও বিপ্লবীরা জনসমর্থন পেয়েছেন প্রচুর। সেই সমর্থনের জন্য জনগণ পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর শাসনিক-অত্যাচারে অজর্জিত হয়েছেও প্রচুর।

ওরিশা-চৌদ্দিশের বিপ্লবকালের সূত্র হলো আইরিশ ঈস্টার-বিদ্রোহের পৃথ্য তারিখে—অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল রাত দশটায়। ১৯৩০ সালের ঐ রোমাঞ্চকর নিশীথে চট্টগ্রামের বৃক বাংলার বিদ্রোহীদের দুর্জয় অভিযানের কথা আমরা বলেছি। এই অভিযানে মজ্জা 'বেলু'-পত্রিকা লিখলেন—“ভাঙ, ভাঙ শংখল!” ‘স্বাধীনতা’ সাপ্তাহিক লিখলেন—“ধন্য চট্টগ্রাম!” ... উভয় কাগজেই বিপ্লবী-বাংলা তথা বাংলার আগামর তরুণ-তরুণীর কাছে দৃষ্ট আবেদন বেরুতে লাগল বিদ্রোহের পথে বেরিয়ে পড়বার!...

১৮ই এপ্রিলের পরই বাংলার সর্বদলের তরুণ-বিপ্লবীদের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রবীণ বিপ্লবীরাও আর সাবধানী-পথিকের মত পা বাড়ানো পারছিলেন না। কাজেই বনেন্দী বিপ্লবীদল ‘অনুশীলন সমিতি’ ও ‘যুগান্তর

পার্টি’ বেকারদার পড়ে গেল। এদিকে তরুণেরা কিন্তু, অথচ প্রবীণেরা ‘প্রস্তুতি’ নেই বলে তাদের সঙ্গে কাঁপিয়ে পড়তে পারছেন না।...

‘অস্তাগার-লুণ্ঠনের’ অবাধিত পরের দলনির্দেশে প্রবীণ বিপ্লবীনেতাদের অধিকাংশকে কারাবদ্ধ করা হয়েছে। বাকি যারা দু-চারজন বাইরে আছেন তাদেরও দিন ধানিয়ে আসছে। তারা ভাবছেন—কিছু না করাই আবার জেলে ঢোকার চেয়ে যে-বিদ্রোহ শুরু হয়েছে তাতে শরিক হওয়াই তো ভাল।...

কাজেই দেখা গেল, সকল দলই নিজের নিজের প্রস্তুতি মত বিরাট এই কর্মকাণ্ডে ক্রমশ যোগ দিলেন। বিদ্রোহ-বাহি ব্যাপকতর হয়ে সারা বাংলার জ্বলে উঠল। প্রবীণ আর তরুণের মধ্যে কোন মতের পার্থক্য রইল না। কাজেরও না।...

‘চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের’ কর্মতালিকা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরে আমরা ‘বেঙ্গল ডল্যান্ডার্স’ নামক বিপ্লবীদের কর্ম-ইতিহাসও প্রকাশিত করব। এ ছাড়া অপরাপর দলগুলোর উল্লিখিত পাঁচটি বৎসরের কর্ম-তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

[এ প্রসঙ্গে ‘বাংলায় বিপ্লববাদ’ গ্রন্থখানার সাহায্য গ্রহণ করেছি।]

আমরা দেখিঃ—

(১) ১৯৩০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) রামানন্দ ইউনিয়ান স্কুলের শিক্ষককে পুলিশের লোক বলে হত্যা করা হয়।

(২) ১৩ই মে হাওড়া শিল্পের খানস এক দারোগার গৃহে বিপ্লবীরা একটি রোমা ফেলেন।

(৩) ১১শে জুলাই রংপুর জেলার গাই-বাধা শহরে গাইবাধা রোড অতিক্রম করার কালে পুলিশকর্মচারীদের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

(৪) ২৪ আগস্ট ময়মনসিংহ-সরকারী-গুদাম-লুণ্ঠন মামলার একজন আসামীকে গ্রেপ্তারকালে একজন কনস্টেবল গুলীতে আহত হয়।

(৫) ২৫শে আগস্ট ডালহৌসি স্কোয়ারে কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। টেগার্ট আহত হন নি। বোমা ফেলতে গিয়ে বিপ্লবী অনুজ সেন নিজের হাতের বোমা ফেটে গুরুতর আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় দীনেশ মজুমদার ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার হন। দীনেশচন্দ্র দীর্ঘ মেয়াদ নিয়ে মেদিনীপুর জেলে অবস্থানকালে জেল থেকে পালিয়ে গান এবং নানা বিপ্লবকর্মের মধ্যে জড়িত থাকার সময় পুনরায় ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। বিদ্রোহী বীর ১৯৩৪ সালের ৯ই জুন ফাঁসির মধ্যে আরোহণ করেন। বীরের এ রক্তদান কোন শোধ চায় না। এ যে—

শুদ্ধ দাবিহীন দান
আগামী দিনের মুখে রক্তমা ফোটেতে।
(প্রেমেন মিত্র)

ডালহৌসি-বোমা-নিষেধের ব্যাপারে ডায়ারিং রায়, ডাঃ ভূপাল বসু, রাসিক দাস, অশ্বত্থ প্রমুখ বিপ্লবীরা পরে গ্রেপ্তার হন। তাঁদেরকে বোমা-তৈরি ও টেগার্ট-হত্যার ফড়ি মামলার সোপর্দ করা হয়। পুলিশ-হাজতে দিনের পর দিন তাঁদের ওপর অকথ্য পালিশী-নিষেধন সীমা ছাড়িয়ে যায়। বিচারে একলেরই কঠিন দণ্ড হয়। কেবল বহু চেষ্টা করেও রাসিক দাসকে আটকাতে না পেরে পুলিশ তাঁকে রাজবন্দী করে।...

(৬) ২৬শে আগস্ট কলকাতা জেড়া-খাগান পুলিশ কোর্টের প্রাঙ্গণে একটি বোমা ফেলা হয়।

(৭) ২৭শে আগস্ট কলকাতা ইডেন গার্ডেনের পুলিশ ফাঁড়িতে একটি বোমা নিক্ষেপ হয়।

(৮) ২৯শে আগস্ট দেশবন্ধু পার্কে (কলকাতা) রতনভূষণ হাজরা নিহত হয়।

(৯) ৩০শে আগস্ট ময়মনসিংহ শহরে ময়মনসিংহের গোয়েন্দা বিভাগীয় ইন্সপেক্টর পবিত্র বসুর গৃহে বোমা ফেলা হয়।

(১০) ২০শে সেপ্টেম্বর খুলনা থানার প্রাঙ্গণে বোমা নিক্ষেপ হয়।

(১১) ১৩ই অক্টোবর ময়মনসিংহ জেলা গোয়েন্দা বিভাগীয় সাব-ইন্সপেক্টর ও তাহার সহকারী 'ওয়ারহাউস-লুণ্ঠন' মামলার দু'জন পলাতক বিপ্লবী আসামীকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে গুলীবর্ষ হয়।

(১২) ১৯৩১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী বরিশাল জেলার গোয়েন্দা বিভাগীয় সাব-ইন্সপেক্টরের গৃহে একটি বোমা পড়ে।

(১৩) ১৭ই মার্চ নদীয়া জেলার গোয়েন্দা বিভাগীয় ইন্সপেক্টরের গৃহেও একটি বোমা ফেলা হয়।

(১৪) ১৭ই মার্চ পর পর বোমা পাড়ে নদীয়া কোতওয়াল থানার এবং পুলিশ সদুপারের বাংলায়।

(১৫) ২৪শে এপ্রিল রেলের কালকাতা গলফ ক্লাবে একটি বোমা ফেলা হয়।

(১৬) ২৭শে জুলাই আলিপুর জেলা ও সেশন জজ মিঃ গালিক নিহত হন। তিনি দীনেশ গুপ্তের বিচারার্থ ট্রাইব্যুনালের সভাপতি ছিলেন।

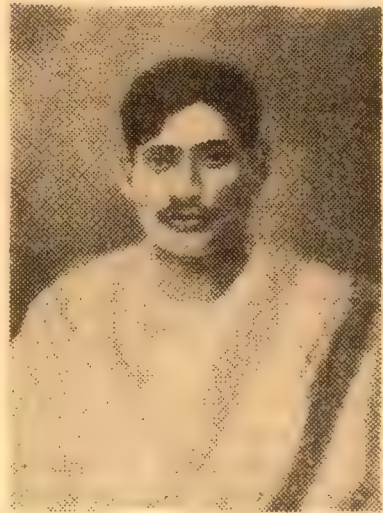
(১৭) ২১শে আগস্ট টাঙ্গাইলে (ময়মনসিংহ) ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ক্যাসেল-সের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়।

(১৮) ১ই সেপ্টেম্বর বর্ধমান কালনা থানায় একটি বোমা নিক্ষেপ হয়।

(১৯) ১০ই সেপ্টেম্বর বর্ধমান মেমারি থানায় 'কমান্ডিং অফিসারের' গৃহে একটি বোমা পড়ে।

(২০) ১১ই নভেম্বর ময়মনসিংহ সের-পুর-মহকুমার ইন্সপেক্টর মনোরঞ্জন চৌধুরীকে গুলী করে হত্যার চেষ্টা হয়।

(২১) ৩০শে ডিসেম্বরে মাণিকতলা-



দীনেশ মজুমদার

ডাকিত-মামলার প্রধান সাক্ষী গৌরীবাড়ী লেনে আক্রান্ত হয়।

(২২) ১৯৩২ সালের ১১শে জানুয়ারী ঢাকার সার্জেন্ট বোনকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে জখম করে তার পিস্তলটি বিপ্লবীরা কেড়ে নেন।

(২৩) ২২শে জানুয়ারী হাওড়া-আমতা রেলওয়ের পাতিহাল-স্টেশনে হাওড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রেলগাড়ির কামরায় বোমা নিক্ষেপ হয়।

(২৪) ৬ই ফেব্রুয়ারী সিনেট হাউসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গভর্নর স্টানলি জ্যাকসনের ওপর গুলীবর্ষণ হয়।

(২৫) ১১ই মার্চ মর্শদাবাদে কান্টনমেন্ট অফিসের একটি বোমা ফেলা হয়।

(২৬) ২৮শে মার্চ রংপুর লালমাগরহাটে সেটেলমেন্ট অফিসারদের পিস্তলগুলি লুণ্ঠ করার উদ্দেশ্যে তাঁদের ক্যাম্পে আগুন দেওয়া হয়।

(২৭) ২১শে এপ্রিল মার্টিন কোম্পানীর মিশন রো আপিসবাড়ীর গুদামে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়।

(২৮) ২৬শে মে কো ল্যাটপ্রাসাদের সম্মুখে কনস্টেবল গার্ডের ওপর হামলা করে তার পিস্তলটি বিপ্লবীরা ছিনিয়ে নেন। কনস্টেবল নিহত হয়।

(২৯) ১২ই জুন ই-বি রেলওয়ের রাজবাড়ি স্টেশনে একটি ট্রেনে বোমা নিক্ষেপ হয়। সেই ট্রেনে ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-সুপার ভ্রমণ করছিলেন।

(৩০) ২৭শে জুন ঢাকা শহরে সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কুখ্যাত কামাখ্যা সেনকে উরাদী তার বন্ধুগৃহে গুলীবর্ষ করে নিহত করা হয়। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে এই ব্যক্তি বিক্রমপুরের কংগ্রেসকর্মীদের ওপর অসম্ভব অত্যাচার করেন বলেই বিপ্লবীদের বিধানে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। এ সম্পর্কে পরে কালীপদ মুখার্জি নামে এক তত্ত্বাবধায়ক গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে ফাঁসির হুকুম হয়। বীরের মাধুর্য তরুণ বিপ্লবী ফাঁসির মধ্যে মৃত্যুকে স্পর্শ করেন ১৯৩৩ সনের ২২শে জানুয়ারী।

(৩১) ৫ই আগস্ট চৌরঙ্গীতে স্টেটস-ম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ওয়াটসনকে গুলী করার প্রথম চেষ্টা হয়। গুলী নিক্ষেপ করেই কাজ হাসিল হয়ে গেছে ভেবে বিপ্লবী অতুল সেন 'সাইমনাইড' খেয়ে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন। কিন্তু ওয়াটসন বেঁচে গেলেন।

(৩২) ২৮শে সেপ্টেম্বর কলকাতা স্ট্র্যাণ্ড রোডে আবীর স্টেটস-ম্যানের সম্পাদক মিঃ ওয়াটসনের ওপর গুলী চলে। এবারকার আক্রমণের চেষ্টা কিছু অভিনব ছিল।... রাস্তা দিয়ে ওয়াটসনের মোটর ছুটেছে, তারই সংগে পাঞ্জা দিয়ে ছুটেছে আর একখানা মোটর। পাশাপাশি আসতেই চলত অবস্থায় দ্বিতীয় গাড়ি থেকে গুলী ছুটে এলো ওয়াটসনের গাড়ির জানলা দিয়ে। কানের পাশ দিয়ে বোঁ-ও কোরে বোরিয়ে গেল বিপ্লবীর বুলেট। ওয়াটসন বেঁচে গেলেন, কিন্তু বৃটিশের মান বাঁচলো না। বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ও বৃটিশ-বাণিক্যবাদের মূখপত্র-সম্পাদককে ভারতবর্ষে রেষা প্রাণে বাঁচানোর ক্ষমতা নেই বলেই ইংরেজ তাঁকে সাততাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিল বিলেতে।

(৩৩) ১৮ই নভেম্বর রাজসাহী শহরে জেলা-সুপার মিঃ লিউককে গুলী করে আহত করা হয়।

(৩৪) ১১৫৩ সালের ৯ই জানুয়ারী

এক ন্যূনসংখ্যক বাহিনীর মিত্র প্রভাবের পশ্চিম
কড়ে নেবার জন্যে তাকে আক্রমণ করা হয়।

(৩৫) ২২শে মে ১৩৬/বি, কন'ওয়ালিস
শীটের পলাতকদের আস্তানা পুলিশ ও
সৈন্যদল ঘিরে ফেললে পলাতক বিপ্লবী
দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস ও জগদানন্দ
মুখার্জির রিভলভার গর্জে ওঠে। স্পেশাল
ব্রাণ্ডের ইনস্পেক্টর এম. ভট্টাচার্যের বিশেষ
আঘাত লাগে। কিছুক্ষণ সংঘর্ষের পর
বিপ্লবীরা ধরা পড়েন। তাঁদের মধ্যে দীনেশ
মজুমদার ও নলিনী দাস জেল-পলাতক
ছিলেন। দীনেশ মজুমদারের ফাঁস হয়
১৯৩৪ সালের ১ই জুন।

(৩৬) ২৪শে অক্টোবর পনের জন সশস্ত্র
যুবক দিনাজপুরের হিলি-রেলওয়ে-স্টেশন
আক্রমণ করে মেলব্যাগ ও নগদ টাকা সবলে
সংগ্রহ করেন। ডাকপিয়নটি নিহত হয় এবং
চারজন পুলিশ ও একটি মেকানিকের দেহে
আঘাত লাগে। সেদিনই পথে সাতজন
বিপ্লবী ধরা পড়েন। বিচারে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী
ও হুম্বাকেশ ভট্টাচার্যের বাবজীবন স্বীকার
হয়। আরো অনেকে দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ
করেন।

(৩৭) ১৯৩৪ সালের ৬ই মে শিবপুর
(হাওড়া) থানার বোমা ফেলা হয়।

১৩৪ সালের পর বাংলা তথা ভারতবর্ষে
বিপ্লবীদের কর্মকলাপ স্তিমিত হয়ে আসে।
১৯৩৫-৩৬ সালে 'আন্তঃপ্রাদেশিক বড়বন্দ
মামলা' ও 'টিটাগড়-বড়বন্দ-মামলা'র মধ্যেই
বাংলা ও ভারতের বিপ্লবচেষ্টা থেমে যায়।
অন্য আন্তঃপ্রাদেশিক ও টিটাগড়-বড়বন্দ
মামলা বিশেষ চাপল্য সৃষ্টি করে। এ দুটো
মামলার দীর্ঘকালীন কারাদণ্ড লাভ করেন
পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত (পূর্ণানন্দবাবু, আলিপুর
জেল থেকে পলায়ন করে পলাতক ছিলেন),
প্রফুল্ল সেন, ধনেন ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন ঘোষাল
প্রমুখ অনুশীলন সমিতির কর্মীবৃন্দ। এ
বড়বন্দের শ্রীমতী পারুল মুখার্জিও সশ্রম
কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হন। তিনি পলাতক
অবস্থায় ধরা পড়েছিলেন।... বা হোক, ইতি-
মধ্যে সমস্ত সংগ্রাম স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাংলার
যৌবন কারারুদ্ধ। দেশ সামরিক-শাসনে
জর্জরিত। শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভাষায়—
'বাংলার লোকেরা বাহিরের কুহস্তর কারাগারে
আজ বাস করছে।'... ইংরেজ তখন কঠোর
হস্তে দেশ জুড়ে শাসনের শান্তি স্থাপন
করেছে।... কিন্তু প্রখ্যাত ব্রিটিশ-রাজনীতিকরা
যুবক ফেলোছিলেন যে, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে
মতো বেশি ঘণা ইতিপূর্বে ভারতবাসীর
অন্তরে দানা বেঁধে ওঠে নি।... বহুস্তর
বিপ্লবের মেঘ দূর গগনে সঞ্চারিত হচ্ছে বলেও
বিজ্ঞজন অভিমত প্রকাশ করেছেন।...

বাংলা দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের অন্যান্য
প্রদেশে বিপ্লব-আন্দোলন তীব্রতায় কম হলেও
১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে
অন্ধপ্রদেশ, বিহার, পঞ্জাব বা মহারাষ্ট্র

একবারে চূপ করে বসে থাকে নি। এসব
প্রদেশের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ থেকে
কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করব।

মহারাষ্ট্র:—১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই।
পূনোর ফারগুসন কলেজের ছাত্র 'গোটে'
ভৈরি হয়ে আছেন বিপ্লবীর দুর্জয় সংকল্প
নিয়ে। তিনি জানেন যে, গভর্নর স্যার
আরনেস্ট হটসনের কাছাকাছি তিনি যেতে
পারবেনই সভার প্রারম্ভ বা শেষে।... পেয়ে
গেলেন সুযোগ। বিপ্লবী 'গোটে'র বিলম্ব
হলো না। গুলী এসে লাগলো গভর্নরের
বুকে-পরানো মোটা ফাউন্টেন পেনের বাঁটে।
ঠিকরে বোঁরিয়ে গেল বুলেট। বেঁচে গেলেন
লাট। কিন্তু অসহ্য নিৰ্বাতন ও দীর্ঘকালীন
কারাদণ্ড লাভ করলেন বীর মারাঠী বিপ্লবী
গোটে।

যুক্তপ্রদেশ:—১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রু-
য়ারী। আলফ্রেড পার্কে পুলিশের সঙ্গে
সংঘর্ষে চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যুবরণ এবং
১৯৩২ সালের ২০শে জানুয়ারী আইরিশ
মহিলা-বিশ্ববিনী সাবিরদেবীর গৃহে পলাতক
বিশ্ববী বংশালের সঙ্গে পুলিশের হুম্ব
কিশম তামসর্গপুর্ন দৃষ্টি সংঘটনা।

বিহার:—১৯৩০ সালের ১০ই অক্টোবর
জামালপুরের ছোট একটি পুলিশদলের সঙ্গে
তিনজন বিপ্লবীর সংঘর্ষে উভয় পক্ষে গুলী-
কর্ষণ হয়। কিন্তু বিপ্লবীরা পালিয়ে যান।

১৯৩১ সালের ২৪শে জুন পাটনার
দু'জন বিপ্লবী বোমা নিক্ষেপ করে একজন
সাব-ইনস্পেক্টর ও একজন হাবিলদারকে
মারাত্মকভাবে ঘায়েল করেন।

পঞ্জাব:—১৯৩০ সালে অমৃতসর, লারাল-
পুর, কথে, লুধিয়ানা, নাওয়ালপাণ্ডি,
লাহোর, গুজরানওয়ালা শেখপুরা প্রভৃতি
স্থানে পুলিশের নানা আস্তানায়, ইউরোপীয়
অফিসারদের ড্রাবে বা গৃহে, রেলপথের ওপর
অথবা ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা
অনেকবার শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করেন।
কিন্তু এ বন্দের তাঁদের অনুদিত্ত বিপ্লবাত্মক
কাজগুলোর মধ্যে একটি ছিল বিশেষ
গুরুত্বপূর্ণ।...

সেদিন ২০শে ডিসেম্বর। লাহোরে
সমাবর্তন-উৎসব সমাপ্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়
থেকে বের হচ্ছেন পঞ্জাবের গভর্নর মিঃ মণ্ট-
মোরেন্স।... ক্রিপ্প গভিতে এগিয়ে এলেন
একটি তরুণ।... চকিতে গভর্নর আহত হলেন
বিশ্ববীর রিভলভারের গুলীতে। হুলস্থূল
পড়ে গেল। বিশ্ববীর বুলেটে একটি পুলিশ
ইনস্পেক্টর, একটি সাব-ইনস্পেক্টর ও দু'জন
মহিলার দেহে আঘাত লাগে। বিশ্ববীর ঘটনা-
স্থলেই ধৃত হন। তাঁর নাম হরিকিশণ।
বিচারে হরিকিশণের ফাঁসির হুকুম হয়।
বিদ্রোহী তাতে নিম্পূহ। কারণ তাঁর কানে
পৌঁছেছে বাণী:

"সুমনে যা পাবে দলে চলে যাবে
অকারণ উল্লাসে"...
(নজরুল)

১৯৩০ সালের ৭ই মে জম্মু-কাশ্মির থেকে
দু'জন বিপ্লবীকে গ্রেফতার করে পুলিশ
সুচ্যেত গড়ে নিয়ে আসেছিল। তাঁদের মধ্যে
আরো দু'টি ব্যক্তি আসেন 'জামিন' হয়ে কদী-
দের মজি নেবার অনুমতি সংগ্রহ করে।
পথে সহসা তাঁরা প্রহরীদেরকে রিভলভার
খুলে আক্রমণ করেন। বিপ্লবীদের গুলীতে
একজন কনস্টেবল নিহত হয়, একজন হাবিল-
দার ও একজন সাব-ইনস্পেক্টরের আঘাত
লাগে।

১৯৩২ সালে সামান্য কিছু বৈশ্ববিক
ঘটনা ঘটলেও ১৯৩০ থেকে পঞ্জাব লুপ্ত
হয়ে যায়। ১৯৩২ সালে অবশ্য পেশোয়ার
ক্যান্টনমেন্টে বিপ্লবীদের একটি বোমা ফেটে
সাহেবমহলে কিছু আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।
তবে কারো ক্ষতি হয় নি।...

লন্ডন:—১৯৩৪ সালে লন্ডনে বীর
উম্ম সিং সুদীর্ঘকাল পর জালিয়ান-
ওয়ালাবাগ হত্যালীলার নায়ক কুখ্যাত
মাইকেল ওডারারকে নিধন করে ফাঁসির
মঞ্চে আরোহণ করেন। উম্ম সিং-এর
অথো জাতি তাঁর আত্মবিশ্বাসকে, সংকল্প ও
বীরবন্তার পরিচয় নতুন করে উপলব্ধি করে।
সে যুগের চাকরির সংকল্প এ যুগের বিপ্লবী
উম্ম সিং-এর কর্মে আমরা প্রাণিত্য করি।...

বাংলা দেশে অনুদিত্ত দু'একটি সাহসে
সুন্দর কাজের উল্লেখ করা হয় নি। তাদের
মধ্যে ১৯৩০ সালের ৩রা জুন মোদীন্দীপুরের
'দাসপুর' থানা আক্রমণের ঘটনটি অন্যতম।
থানার দারোগা ভেলানান্থ সেন নিহত হয়।
এ আক্রমণের মূলে লবণ-সত্তাগ্রহীদের ওপর
পুলিশের অকথা জুলুমের ইতিহাস। চিচুরা-
হাটে-ও এইসময় পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবী-
দের সংঘর্ষ হয়। দাসপুর-মামলার পূর্ণ
চ্যটাক্সি নরেন দিল্লী প্রমুখ বিপ্লবী-কর্মীদের
দীর্ঘকালীন মোয়াদ হয়েছিল।...

১৯৩২ সালের ২০শে আগস্ট 'চরমুগরিয়া
ডাকাতি' মামলার ফরিদপুরের মনোরঞ্জন
ভট্টাচার্যের ফাঁসির হুকুম হয়। এ ডাকাতির
সময় পুলিশের সহিত সংঘর্ষে জোড়িতম সেন
প্রাণ দেন। নেতা সুরেন কর ও ব্রজেন্দর
হাবজীবন স্বীকার করে দণ্ড লাভ করেন।

১৯৩১ সালের ২রা অক্টোবর একটি ঘটনা
প্রকাশিত হয়ে বাংলার বিচিত্র বিপ্লবী-
ইতিহাসের বৈচিত্র্য বাড়িয়ে দেয়। পূর্বদিন
রাতে মাণিকতলায় একটি ডাকাতি হয়ে গেছে
এক মহিলা বিপ্লবিনীর নেতৃত্বে। অবশ্য
সবাই ধরা পড়ে গেছেন। এই বিপ্লবিনীর
নাম বিমলপ্রতিভা দেবী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন
ধীরেন চৌধুরী, কালীপদ রায় ও সুরহারি সেন।
'ডাকাতি' বস্তুটি বড় কথা নয়। কিন্তু
মেয়েদের সরাসরি এ-কাজেও নেতৃত্ব গ্রহণের
চেষ্টা-ই বড় কথা। এই বিমলপ্রতিভা দেবী
বাংলা দেশে রাজনৈতিক কর্মীদেরও অন্যতম।
তাঁর কর্মনিষ্ঠা, ত্যাগবীকার, দুঃসাহসিকতা
ও নেতৃত্ব অনন্যসাধারণ। যে কোন দুঃসাহসী

বিস্ফোৰক প্ৰাক-স্বাধীনতায়ুগে ভাৰতীয়
শাক্তেন প্ৰয়োজনে। দীৰ্ঘকাল কাৰাগাৰে
বাস কৰেও তাৰ কোনদিন পথ চলায় ক্লান্তি
আসে নি।...

১৯০২ সালৰ ১লা ফেব্ৰুৱাৰীৰ ঘটনাটিও
বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বলে এখনে উল্লেখ কৰিব।
...লোথিয়ান-কমিটি' এসেছে এদেশে ভাৰতৰ
উপকাৰ কৰতে। 'শ্ৰুতিশেৰ উপকাৰ ভাৰত-
বৰ্ষ চায় না'। একথাটি ভাল কৰে বুজিলে
দেৱাৰ উদ্দেশ্যে বিপ্লবীয়া দিল্লীৰ হাৰ্ডিঞ্জ
বীজৰ নিচে টাইম-বোমা ৰেখে দিলেন।
লোথিয়ান-কমিটিৰ সদস্য বোকাই ট্ৰেনখানা এ
পথে এলেই ধ্বংস হৱে বাৰে বাৰীসহ।
বোমা ফাটল। কিন্তু কাজ হল না কিছু।
আপাত দৃষ্টিতে বাৰ্থ হলো চমটা। তবে
বাৰ্থ হয় নি উদ্দেশ্য। ইংৰেজ ভাল কৰেই
যুঁকলো যে তাৰে মৃত্যুশ খুলে গেছে! তাৰে
নৰূপ ভাৰতীয়েৰা ধৰে ফেলেছে!...

বাংলাৰ নারী

বাঙালীৰ সাধনা কোন কালেই নারীকে
অপাংক্ৰয় কৰে ৰাখে নি। নারীৰ অবদান
তাই বাংলাৰ জীবনযুদ্ধে সামান্য নহ। নতুন-
বাংলা সৃষ্টিৰ পথে আমাৰা দেখি, কৰ্মেৰ
আহ্বানে নারী ঘৰ ছেড়েছেন, দুঃসহ পথ গ্ৰহণ
কৰেছেন, দুঃসাহসী কাজে নেক্ষত্ৰ দান কৰে-
ছেন। ৰাণী ভবানীৰ বাঁৰ, ৰাণী ৰাসমণিৰ
কামনা এই নারীদেৱীৰ ৰক্তে এককাল স্ফূৰ্তি ছিল।
কিন্তু কান পেতে তাঁৰা শুনলেন ভগিনী
নিবেদিতাৰ উদাত্ত কণ্ঠ, তাঁৰা শুনলেন
এ্যানিবেস্টাণ্ট ও সৰোজিনী নাইডুৰ জ্বালাময়ী
আহ্বান, তাঁৰা বুঝে নিলেন সৰলাদেৱীৰ
বাঁৰপুজা-ৰ মন্ত্ৰ, নবজাগৰণেৰ দুন্দুভি বেজে
গেল তাঁদেৱ কানে। বিপ্লব-বহি আলোকিত
কৰেছিল তাঁদেৱ চতুৰ্দশৰ্বেৰ ঘনাম্বকাৰ।
তাঁৰা লুফে নিলেন 'ৰাণী ৰাসমণি'ৰ বাণী—
'মেৰী ৰাশী নেহি দেউগী!'

আমাৰ পূৰ্বে বলেছি যে গত বিপ্লব যুগে
বাংলাৰ নারী মা-বোনেৰ মমতা নিয়ে বিপ্লবী-
দেৱ সাহায্য কৰেছেন প্ৰচুৰ। সে সাহায্য-
হানেৰ বিনিময়ে দু'কড়িবালা দেৱী বা ননী-
বালা দেৱী জেল খেটেছেন, বহু মা-বোন
বহু দুঃখও বৰণ কৰেছেন ঠিকই। কিন্তু
হাজাৰ হলেও সৈসব ছিল তাঁদেৱ 'প্যাসিভ'-
গোলে। কিন্তু যে-যুগেৰ কথা আমাৰা বলছি
সে-যুগে নারীৰ অগ্ৰগতি অসীম। বিপ্লবেৰ
পথযাত্ৰায় তাঁৰা 'স্বাক্ষাৰ্ভিভ'-গোলে নেমে
গেলেন। শূন্যেহে তাঁৰা বিদ্রোহীৰ কণ্ঠ:

"জাগো দুৰ্দদ যোবন!

এসো, তুফান যেমন আসে।"

(নজৰুল)...

হেমপ্ৰভা মজুমদাৰ, জ্যোতিৰ্ময়ী গাংগুলী,
লীলা নাগ (ৱায়), বিমলপ্ৰতিভা দেৱী,
শম্ভাৰুকুমারী গুপ্তা, নেলী সেনগুপ্তা
প্ৰমুখা নেক্ষস্থানীয়া মহিলাদেৱী সংগঠনশক্তি
সাৰা বাংলাৰ নারীমহলে ১৯২১ সাল থেকে
এক অপূৰ্ব সজ্জা এৰিছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ
অবদান এ-প্ৰসঙ্গে অনস্বীকাৰ্য। নারীৰ বন্ধন

ভাঙাৰ গান ৰবীন্দ্ৰনাথ ও নজৰুল ইসলাম
শুনিয়ে আসেহে প্ৰথম থেকেই, কিন্তু জীবন-
ক্ষেত্ৰে মূৰ্ত্তে এই বন্ধন খান খান হয়ে গেল
আইন অমান্য আন্দোলনেৰ বাদ্-পক্ষে। তাৰপৰ
১৯২৮ সালৰ কলকাতা কংগ্ৰেছ অধিবেশনে
সুভাষচন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত 'বেংগল ডেলাইটমাস'-
এৰ নারীবাঁহনী লতিকা বসুৰ নেক্ষত্ৰে
মেয়েদেৱকে একেবাৰে ৰাস্তায় এনে দাঁড় কৰান
সেনানীৰ বেশে।

লীলা নাগ ও বিমলপ্ৰতিভা দেৱী ছিলেন
বিপ্লবী গোপন সংস্থাৰ সক্রিয় সভ্য। লীলা
নাগেৰ 'দীপালী সংঘ' তৎকালে প্ৰকাশ্যে ছাত্ৰী
ও প্ৰবীণমহলে জাগৰণেৰ বাণী শোনায়ে-ও
সংগোপনে সশস্ত্ৰ-বিপ্লবেৰ পাঠ-ই দিতো
বালিকা-কিশোৰী-তৰুণী ও গৃহীণীদেৱকে।

পূৰ্বেই বলা হয়েছিল যে 'বেং', 'স্বাধীনতা',
'চলাৰ পথে' প্ৰভৃতি পত্ৰিকায় ও পুস্তকে
সবাৰ অলক্ষ্যে পৰিচালিত বিপ্লবী সংস্থা-



শ্ৰীমতী লীলা নাগ (ৱায়)

গুলোৱাই সৱাসিৰ আবেদন থাকতো নারী-
সমাজেৰ কাছ বিপ্লবেৰ প্ৰয়োজনে অবতীৰ্ণ
হবাৰ জন্যে। আৰ নারীকে আশ্বস্ত কৰাৰ
সংকল্পে শৰৎচন্দ্ৰেৰ লেখনীৰ অবদান যে কী
গভীৰ ছিল তা আজকেৰ মানুহ কল্পনা কৰতে
পাৰবেন।...

ফলে দেখা গেল চৰ্চিকাৰ পদভাৱে
বিপ্লবী-নেতাৰ মৰ্যাদাৰ প্ৰীতিভতা ওৱান্দে-
দাৱেৰ মৃত্যুবৰণ। আৰো দেখা গেল বিজয়িনীৰ
গৌৰবে ক্ৰমে ক্ৰমে এ পথে এগিৰে এলেন
সুনীতি চৌধুৰী, শান্তি ঘোষ, কল্পনা দত্ত,
বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদাৰ, পাৰুল মুখাৰ্জী,
বিমলপ্ৰতিভা দেৱী। এ'ৰা সবাই 'স্বাক্ষাৰ্ভিভ'-
গোলে নেমে গেলেন। সাহসে দুৰ্জয়, বিশ্বাসে
অকুণ্ঠ, দেশপ্ৰেমে তন্ময় এই বগদাহিতাদেৱ
কীৰ্তি বিপ্লবেৰ ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।
এ'দেৱ সবাৰই ফাঁসি হয়ে যেতো। কিন্তু
ধৰ্ত ইংৰেজ সে ভুল কৰে নি। কাৰণ তাৰা
বুঝেছিল যে ভাৰতীৰ ৰমণীদেৱ ধৰে ধৰে
ফাঁসিকাঠে কুলিয়ে দিলে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী
দিক্ৰবীদকজ্ঞানশূন্য হয়ে ইংৰেজেৰ বিপক্ষে

চলে যাবে। কাৰণ সে যুগেৰ মানুহেৰা
দেশাস্বৰোধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। মহাত্মা
আসমুদ্ৰাহিমাচল গণসংযোগে ফাঁকি ছিল না।
তখন জাতীয়তাবোধ এক অভাবিত আবহ
সৃষ্টি কৰেছিল সমস্ত দেশ জুড়ে। অহিংস
ও সহিংস এই উভয় আন্দোলনই ব্ৰিটিশেৰ
বিৰুদ্ধে। এ আন্দোলনেৰ বিৰোধিতা যাৰা
কৰতো তাৰা সমাজে ছিল অপাংক্ৰয়। ভাৰত-
বৰ্ষেৰ জেলগুলো এবং বিভিন্ন কনসেন-
ট্ৰেশ্যন-ক্যাম্প ভৰে গিৰেছে বন্দী নৱ-নারীৰ
ভিড়ে। দেশেৰ প্ৰাণ-ই তখন কাৰাৱাৰ।
পুলিশেৰ গুলীতে কত পুৰুষ মৰেছে তাৰ
ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আসামেৰ কনকলতাৰ মত
বহু নারীৰ যে মৃত্যু ঘটেছে পুলিশেৰ বুলেটে
তা ফোতে ও ক্লোথে ভাৰতবৰ্ষেৰ জনতা
জেনেছে। কিন্তু তাতে অবসাদ আসে না
লোকেদেৱ। কাৰণ চক্ৰ বিস্ফাৰিত কৰে
তাৰা দেখে ৰাণী গুইদেৱোৰ মত দুঃসাহসিকাৰ
আবিৰ্ভাব সুদূৰ পূৰ্ব সীমান্তেৰ পাৰ্বত্য
অঞ্চলে। তাৰা দেখে উত্তৰ-পশ্চিম সীমান্তে
সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফ্ফৰ খাঁৰ নেক্ষত্ৰে
পাঠান নারী-পুৰুষেৰ অসহ্য নিৰ্বাতন হাসি-
মুখে বৰণ কৰাৰ ছবি। আবাৰ দেখে বাংলাৰ
নারীৰ বুলেটে মাজিনেট ও গভৰ্ণৰদেৱ পতন,
পুলিশেৰ বাহু ভেদ কৰাৰ দৃশ্য!...

পুৰুষেৰ সমান শৰিক হয়ে বাংলাৰ নারী
জাতীয় জাগৰণেৰ সকল ক্ষেত্ৰে পদাৰ্পণ
কৰেছেন এই বাংলাৰ। ১৯০০-০৮ সালেৰ
পৰিসরে তাঁদেৱ অবদান যে ঐতিহ্য সৃষ্টি
কৰে গেছে তাৰ প্ৰতিপ্ৰতি পৰিপূৰ্ণভাবে
লিখিত রয়েছে অৱণা আসকআলীৰ নেক্ষত্ৰে
'বিয়াৰিশেৰ আন্দোলনে', কৰ্নেল লক্ষ্মীৰ
নেক্ষত্ৰে 'ৰাণী ৰাশী বাঁহনীৰ ৰণযাত্ৰা'।...

এ অধ্যায়ে (পূৰ্বেই উল্লেখ কৰিছি)
'চট্টগ্ৰাম' ও 'বিভিৰ' স্মাক্ষান-গুলো বাদে
অপৰাপৰ দলেৰ, বিশেষ কৰে 'স্বগান্ধৱ' ও
'অনুশীলন' দলেৰ, স্মাক্ষান-গুলোৰ কথাই
উল্লেখ কৰা হয়েছে।...

কানাই ভট্টাচাৰ্যেৰ গাল্ফিক-হত্যাক বিশেষ
তাৎপৰ্য থাকায় 'দীনেশ গুপ্ত'ৰ ফাঁসিৰ কথাৰ
পৰ সে-সম্পৰ্কে বিশদ আলোচনা লিখিত
ৰবে।...

এখানে বীণা দাসেৰ কৰ্মকথায় বিস্তৃত
বিবৰণ উল্লেখ কৰিছি। কাৰণ, বিপ্লবেৰ
ইতিহাসে এই কাজটিৰ মূল্য বিশিষ্টতৰ।...

বীণা দাস

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ সিনেট হ'ল।
সমাবৰ্তন-সভা বসেছে। বাংলাৰ লাট বিশ্ব-
বিদ্যালয়েৰ 'চ্যাম্বেল'। চ্যাম্বেল'ৰ স্ট্যানলি
জ্যাক্সন তাৰ অভিবাদন পাঠ কৰেহে।
মঞ্চে ও বিৰাট হ'ল-এ গম্ভীৰজনী ও মানী
বাঁহীদেৱ ভিড়। স্নাতকেৰ দল নিজেদেৰ
আসনে উপবিষ্ট। সভাৰ সৰ্ব্বত্ৰ স্তব্ধতা।
সবাৰ দৃষ্টি ভাষণ-পাঠে-ৰত চ্যাম্বেল'লাৱেৰ
দিকে।...

কেউ লক্ষ্য কৰে নি।...একটি স্নাতক
আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।...তিনি গভৰ্ণৰেৰ

কাছ থেকে অল্প দূরে এসে দাঁড়িয়েছেন।...
দহসা নৈশেশ্বরের বুক চিরে দারুণ শব্দে
একটি বুলেট বেরিয়ে গেল বিপ্লবিনীর
রিভলভার থেকে, গভীরের কানের পাশ
দিয়ে। চোখ-বলসানো বিদ্যুৎগতির মত
দাঁড়িয়ে এক তরুণী—চমক দিয়ে যাচ্ছে বারে
বারে তাঁর নির্ভীক সত্তা—গর্জে উঠছে
বুলেটের শব্দ মুহূর্তে...মুহূর্তের
ঘটনা! কিন্তু আলোড়িত হয়ে গেল সমস্ত
আবহাওয়া। গভীর চোখে সিরিয়ে ফেললেন
নিজের দেহ পাশবিকের আড়ালে। ভাইস্
চ্যান্সেলার কর্নেল সুরাবিদি তাঁর বেগে
ছুটে এসে বীণা দাসের কণ্ঠদেশ চেপে
ধরলেন। তাঁকে কাড় করতে চাইলেন। কিন্তু
বীণার হাতের রিভলভার থেকে এলোপাড়াড়ি
গুলী ছুটেছে। একটি গুলী এসে লেগে-
ছিল উত্তর দীনেশ সেনের গায়ে। তিনি
দামান্য আঘাত পেয়েছিলেন!...বীণা দাসকে
গুরুত্ব করতে স্বভাবতই সময় লাগলো না।...
তিনি প্রেরণ হইলেন।...বিচারে তাঁর ১ বৎসর
সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।...

ঘটনাটির পরিধি মুহূর্তকাল। যেন এক-
কলক বিদ্যুতের হঠাৎ কলসে বাওয়া। কিন্তু
এর গুরুত্ব অসীম। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।
বাংলার সীমা পেরিয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে
এই বিদ্রোহীণীর বিদ্রোহজিজ্ঞাসা তরুণরক্তে
উদ্ভূত এনেছিল একটিমাত্র বোধঃ

“স্বাধীনতা হীনতার কে বাঁচিতে চায়,
কে বাঁচিতে চায়।”

বৃষ্টি সাম্রাজ্যের প্রতীক বিপুল শক্তি ও
ঐশ্বর্যের ধারক সুবোংলার লাটকে গুলীর
আঘাতে উড়িয়ে দেবার সংকল্পে এক নারীর
আবির্ভাব দুর্দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।
প্রথমত, এ থেকে প্রমাণ হয় যে বিপ্লবী
জাতটা আপোহীন স্বাধীনতা ব্যতীত আর
কোন কিছুর কাঙ্ক্ষা নয়। দ্বিতীয়ত, বাংলার
নারী আবার প্রমাণ করলেন যে—

“বৈবে বা কিছু মহান সৃষ্টি

চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী,
অর্ধেক তার নয়।”

(নজরুল)

বীণা দাসের পিতা দেশখ্যাত শিক্ষাবিদ
রণীমাধব দাস। ঋষিভূষা পুরস্কার। তিনি
শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাগুরু। এই
কণজন্মা পুরুষ দুটিকে ছাত্ররূপে পেয়ে-
ছিলেন তিনি কটকের সরকারী বিদ্যালয়ে।
বেণীবাবুর সাংস্কৃতিক সম্ভাবিচ্ছুরিত বিভার
পরিচ্ছন্ন পরিবারটির শ্রেষ্ঠ অবদান এই
বিদ্রোহী-কন্যা বীণা দাস। বীণার মেধা,
ভাবপ্রবণতা ও সংবেদনশীলতা তাঁকে অনন্য-
সাধারণ হবার সুযোগ দিয়েছিল। ছোট
ঘর থেকেই বেখানে দৃষ্টি ও অপমান
মানুষকে অসহ্য করে দেবে তাঁর চোখে
ছিল এসেছে, অন্যায়কে প্রতিহত করার ইচ্ছা
হৃদয়ে জেগেছে।...

১৯২৪ সালে ‘সাইমন’ কমিশনের

বয়কট করার আন্দোলন বাংলার তাঁর হয়ে
ওঠে। বেথুন কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে
তাঁদের সতীর্থ বীণা দাস-ও আন্দোলনে নেমে
পড়েন। বেথুনে পড়বার কালেই বীণা দাস
তাঁর সহছাত্রী সুহাসিনী দত্ত ও শান্তি দাস-
গুপ্তার সান্নিধ্যে এসে বিপ্লবীদলে ভিড়ে যান।
মেয়েদের সেই কর্মশাখাটির বোগাবোগ ছিল
ডাঃ ভূপাল বসুর সঙ্গে। ডাঃ ভূপাল বসু
পূর্বে হেমচন্দ্র বোধ মহাশয়ের বিপ্লবীদলের
কর্মী ছিলেন। তখন তিনি কারমাইকেল
মৌডিক্যাল কলেজের ছাত্র। ১৯২৪ সালে
ভূপালবাবু ঐ দল ত্যাগ করে নিজেই দল
গড়ার চেষ্টায় রতী হন। কিন্তু ১৯৩০
সালের আগস্ট মাসে ডালহৌসি স্কোয়ার



শ্রীমতী বীণা দাস

বোমার মামলার প্রেরণার হবার পর ভূপাল-
বাবুর দলটি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং
মেয়ে-কর্মীদের সঙ্গে সকল বোগাবোগ তাঁর
দলের ছিন্ন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বীণা দাসের
মত কর্মীর চণ্ডল হয়ে উঠবার কথা। কারণ
এদিকে বাংলা দেশ জুড়ে সার্থক বিপ্লবের
অশির্বাচনা তাড়ব শব্দ করে দিয়েছে।...
চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের সঙ্গে সংগেই ঢাকার
লোম্যান হত হন, হডসন মারামরুরূপে
ঘায়েল হন, রাইটস বিল্ডিং-এর অলিন্দ-
যুগ্মে সিংসপন্ট নিহত এবং আরো আই-সি-
এস সাহেবসবো আহত হন, মেদিনীপুরের
জেলাকর্তা প্যাড ও অলিন্দপুরের জেলা-জজ
গার্লক নিহত হন, কুমিল্লার জেলাকর্তা
স্টিভেনসনকে দুটি কিশোরী বাঘিনীর বিক্ৰমে
হত্যা করেন। মোটের ওপর গোটা বাংলার
বৃকের ওপর দিয়ে তখন বিদ্রোহের অগ্নিরথ
অমিত তেজে পরিচালনা করছে।...সুতরাং
বিপ্লবিনী বীণা দাসের ব্যর্থ-অপেক্ষা সহ্য
হবে কেন? কিন্তু তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে
নেবে কে?...দল কোথায়?...

সে বছর (১৯৩২) বীণা দাস বি-এ পাশ
করেছেন। সমাবর্তন-সভায় যাবেন বি-এ
ডিগ্রিপত্র আনবার জন্যে। মাথায় স্ন্যাকশনের
প্যান এসে গেছে। কিন্তু তাকে কার্যকরী
করার সংস্কারপন্থ বন্দ বে বিকল। কাজেই
অনন্যোপায় হয়ে ছুটে গেলেন তাঁর দিদি

কল্যাণী দাসের কাছে। কল্যাণী দাস
(ভট্টাচার্য) যুগান্তের দলের কর্মী। তিনি
পরিচয় করিয়ে দিলেন বোনকে বিপ্লবী বন্ধু
কমল দাশগুপ্তার সঙ্গে। বীণা দাসের স্তর
সর না। প্রস্তাব করে বসলেন যে, তাঁকে
একটি কাচুজডরা রিভলবার দেওয়া হোক,
তিনি আগামী সমাবর্তন-সভায় লাটকে হত্যা
করার চেষ্টা করবেন। কমলা সমর চাইলেন
দু-এক দিনের। তিনি আলাপ করলেন
কুগান্তরের দায়িত্বশীল কর্মীদের সঙ্গে।
বীণা দাস অন্য দলের কর্মী। সে-দলের
প্রধানদের অনুমতি না নিয়ে তাঁকে দিয়ে কাজ
করান যে রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু উক্ত দলটি
বখন কণ্ঠধারবিহীন ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে
এবং বীণা দাসের মত একটি দুঃসাহসিকা
বখন কাজ করতে চান তখন অনেক ভেবে
কুগান্তর দল তাঁকে সুযোগ দেওয়া স্থির
করলেন।...

বীণা দাস অস্ত্র পেলেন। অস্ত্র হাতে
পেরে মূর্তিমতী সংহারিণীর বেশে আবির্ভূতা
হলেন তিনি স্বাধীনতার শত্রু-প্রতীককে
ধ্বংস করার সংকল্পে।...অথচ দুঃখমতী এই
তরুণীর অন্তর মথচ্ছন্দে ভরপুর, স্বভাব
মধুর। সুসাহিত্যিকা এই বিপ্লবিনীর চিত্র
সুদূরসম্মানী। কঠোরে ও মধুরে তাই এর
মধ্যে অপূর্ব সমাবেশ।...

সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করার পর বীণা
দাসকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রেসিডেন্সি জেলে।
সেখান থেকে তাঁকে চালান দেওয়া হয় মেদিনী-
পুর জেলে। মেদিনীপুর জেলে তখন
শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ছিলেন।
জেলের দুর্ব্যবহারে কিছুদিন পর এঁরা
অনশন রত গ্রহণ করলেন। দিন সাতকের
মধ্যে বীণা দাস ও শান্তি ঘোষকে নিষ্ক্র
বাওয়া হল হিজলি জেলে। সুনীতি
চৌধুরীকে চালান দেওয়া হল রাজসাহী
জেলে।

এইভাবে পুরো সাতটি বছর কেটে যাবার
পর কবিগুরু ও মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায়
অপরায়ণ সজাপ্রাপ্তা বন্দিদের সঙ্গে
বীণা দাস-ও জেল থেকে মুক্তি পান। সেটা
ছিল ১৯৩৯ সাল।

বেরিয়ে এসে তিনি ‘অলিঙ্গার’ হাসিকপত্রের
সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু বিমানাশ্রয়ের আন্দোলনে
আবার তাঁকে জেলে যেতে হয় বছর তিনেকের
জন্যে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল
পর্যন্ত, কংগ্রেস-সভ্যরূপে তিনি পশ্চিমবঙ্গ
বিধানসভার সদস্য থাকেন। কিন্তু সংগ্রামী
কংগ্রেস যখন ধীরে ধীরে ক্ষমতাপন্থের নানা
দোষে জর্জরিত হয়ে উঠল, তখন বীণা দাসও
ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকলেন প্রকৃত
রাজনীতি থেকে। অবশ্য সমাজসেবা জীবন
উন্মাদু সেবার কাজে তাঁর উৎসাহ আজও
আমরা দেখি।

তাঁর “পৃথলবৎকার” পুস্তকখানা
অসামান্য সাহিত্যের মান পোষণে।...

রডা যড়যন্ত্রে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

শ্রী ২৫৮৫৮৩

‘রডা-অন্দ-লুঠন’ ঘটনাটি সম্পর্কে নানা-রকম গল্প শোনা যায়। কোন গল্পটি ঠিক এবং কোনটি অতিক তাহা সাধারণ পাঠকের বোঝা মুশ্কিল। পুলিশ রিপোর্ট বা যড়যন্ত্র মামলার রিপোর্ট হইতে ঘটনার কিছু খবর পাওয়া যায়, আর বাকিটা পাওয়া যায় শোনা গল্প হইতে। সরকারী রিপোর্টে সন তারিখ বা সরকারের জানা (তাহা ভুলও হইতে পারে) তথা পাওয়া যাইবে, কিন্তু শোনা গল্প নানা মূর্খে নানারকম হইতে বাধা। বাহারা সত্যি হাতেনাতে কাজটি করিয়াছিলেন, তাহাদের কেউ কোনো কথা আজ পর্যন্ত বলেন নি বলিয়াই এই বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্য দেশবাসী জানেন নাই। রডা যড়যন্ত্রের যেইটুকু পুলিশ জানে তাহার চেয়ে যেইটুকু তাহারা জানে না তাহার গুরুত্ব কম নহে।

দেশ স্বাধীন হইবার পর আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি যে ‘রডা’ সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দেশবাসীকে জানাইলে ভাল হয়। অল্প কিছুদিন হয় রডা যড়যন্ত্র সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে যথাসম্ভব সমস্ত সংবাদ দিয়াছি। অধিকন্তু রঙপুরে বাহার নিকট গ্রীষ্ম মিত্র (হাব্দ) পলাতক অবস্থায় ছিলেন এবং বাহার মারফৎ গোয়ালপাড়ার (আসাম) ‘রাভা’ নামক পাব/তা-জাতীয় বন্দুকের সাহায্যে তিনি আসাম সীমান্ত পার হইয়া বাইতে চাহিয়া ছিলেন তাহার সঙ্গে পরে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগও আমি সত্যেন্দ্রনাথকে করিয়া দিয়াছি। মজেনবাবুর পূর্বে ভূপেন্দ্রাক্ষর রক্ষিত দ্বারকে আমি রডা যড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু লেখার জন্য বাবতীর তথ্য দেই। ভূপেনবাবু প্রধানত আমার দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই রডা action-এর যে অধ্যায় আজও লোকচকুর অগোচরে রহিয়াছে তাহা প্রবন্ধাকারে লিখিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখান। আমি তাহা ভাল করিয়া পাড়িয়া দিবার পরই তিনি সেই লেখা প্রকাশ করিয়াছেন। স্মৃতিশক্তি থাকে মাঝে বিশ্বাস-হাভকতা করে জানি। কিন্তু রডা যড়যন্ত্রের জাপারটা আমার রক্তের সঙ্গে এমনভাবেই জড়াইয়া আছে এবং এই ঘটনার কথা আমাদের নিজেদের (বাহারা) action-এ জড়িত ছিলেন) মধ্যে এতই আলোচিত হইয়াছে যে, স্মৃতি এখানে বিশ্বাসঘাতকতা না করাই কথা। কাজেই আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ছোটখাট ‘ভুলত্রুটি’ কোথাও কিছু থাকিলেও ভূপেনবাবুর ‘রডা যড়যন্ত্র’ প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক জগৎ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

কিন্তু ‘সাম্প্রতিক বসুমতী’-র (২২শে

জুলাই, ১৯৬৬) পাঠকখন বিভাগে প্রকাশিত ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ দাসের পত্রখানা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।

জিতেনবাবু তাহার পত্রের প্রথমই জানাইয়াছেন যে, তিনি এ সর্ব দলে ছিলেন, বহুকাল দেশের কাজ করেছেন, জেল খেটেছেন এবং কালিদাস বসুর অন্তরঙ্গ ছিলেন। এ সবই সূত্রের কথা। কিন্তু রডা যড়যন্ত্রের তথ্যাদি জানার দিক হইতে এ সব তাহাকে খুব একটা সাহায্য করিবে কি? তাহার সবই তো শোনা কথা—ডাঃ কর্মকাণ্ডের বহু পরে। গুপ্ত-সমিতির ‘সম্মুখিত’ রক্ষার নির্দেশমত গুপ্ত কথা তিনি বহুকাল জানিতেই পারেন নাই। কাজেই উক্তকালে জিতেন্দ্রবাবু কালিদাসবাবুর যত ঘনিষ্ঠই হউন না কেন, বিপ্লবী কালিদাসকে আমি যত দূর জানিতাম তাহাতে মনে হয় তিনি জিতেন্দ্রবাবুর কাছে ‘সম্মুখিত’ রক্ষা করিয়াই গিয়াছেন, আদত কথা গল্পছলেও ব্যস্ত করেন নাই। আমি জানি, কালিদাস বসু ‘ডান কানে শোনা কথা’ তাঁর ‘বাম কানকে-ও’ শুনাতেন না। সে বাহাই হউক বাংলা দেশের পাঠক-গোষ্ঠীর ধারণা যাহাতে বিভ্রান্ত না হয় এবং ভূপেনবাবুর লেখাটি বাহাতে তাহারা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারেন সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া জিতেনবাবুর প্রতিবাদপত্রের উত্তরে আমি এ ব্যাপারে আমার প্রত্যক্ষদর্শনের এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত থাকার কথা কিছু উল্লেখ করিব।

(১) কালিদাস বসুর সহিত জিতেনবাবুর ঘনিষ্ঠতার কথা মানিয়া নিলেও এ কথা সত্য যে, তাহার উক্তি মূলত শোনা-কথার উপর নির্ভরশীল। কালিদাস বসু আমারও অন্তরঙ্গ সতীর্থ। আমার মৃত্যুপথের সহচরী ছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে ভূপেনবাবুর প্রবন্ধের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতেন। তিনি পরম প্রশ্রয় স্বীকার করিতেন যে, রডা-যড়যন্ত্রের জিতেন দাসের ভাষায় brain বলে কিছু থাকলে ঐ গ্রীষ্মচন্দ্র পাল মহাশয়ের নামই করিতে হয়। গ্রীষ্মচন্দ্র পাল ১৯০৮ সালে সার্পেন্টাইন লেনে নন্দলাল বানার্জিকে হত্যা করিয়া গা-ঢাকা দেন। তাহার পর ১৯১০ সালে ঢাকা-শুভাঢ়া ডাকাতের ঈশ-নাম বদলিয়া পলাতক রূপে বৈশ্বিক-জীবন কাটাইতে থাকেন। তাহার ছদ্মনাম তখন ‘নরেন দত্ত’। তিনি সবারই অজ্ঞাত ছিলেন। কেবল সকল দলেই নেতৃ-স্থানীয়রা তাহাকে জানিতেন এবং গভীর প্রশ্রয় করিতেন। আমার জীবনে নেতৃস্থানীয় সাহসী ও কুশলী বিপ্লবী কম দেখি নাই—কিন্তু গ্রীষ্ম পাল মহাশয়ের তুলনা নাই। এত কথা লেখার উদ্দেশ্য এই যে, কালিদাসবাবু

জিতেন দাসকে সম্মুখিত রক্ষার কারণে অবশ্য কথা কিছুই বলেন নি—গ্রীষ্ম পালের কথা ভো বলিতেই পারেন না। কাজেই ‘রডা যড়যন্ত্র’ সম্পর্কে বহু লোকের মত (বিপ্লবী লোকই) জিতেনবাবুর-ও ভুল খারশা থাকিলে দোষের কিছুই নাই।

(২) জিতেনবাবুর খবরমত ‘যড়যন্ত্র সভা’ বসিয়াছিল গিরীনবাবুর বাড়িতে (৪-৩ মলগা লেনে)। জিতেনবাবু জানেন না যে রবার্ট-ওরাইন হত্যার যড়যন্ত্রের (১৯১২) পর গিরীনবাবুর বাড়ি (৪-৩ মলগা লেন), বিপ্লবাবাদ, অনুকূলবাবু, হরিশবাবু, প্রমথ ‘আত্মোন্নতি’-র নেতাদের বাড়িগুলি পুলিশ লার্চ করে এবং তাহার পর হইতে ঐ বাড়ি-গুলির উপর অস্পষ্টতর নজর রাখে। সুতরাং গিরীনবাবুর বাড়ি অর্থাৎ ৪-৩ মলগা লেনে কোনো যড়যন্ত্রের সভা অন্তত সেই সব লোক করিতে পারেন না, বাহারা কোনো ‘যড়যন্ত্র’ হাতে নাতে করিবার ক্ষমতা রাখেন।

ভূপেনবাবুর কথাই ঠিক। আমাদের গুপ্ত-বৈঠক ছাড়াওলা গিলির পার্ক-এ বসে। সে সভার কারা ছিলেন তা ভূপেনবাবুর প্রবন্ধে আছে। আমি নিজে সেখানে ছিলাম। নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্র রায়) ও নরেন যোবচৌধুরী মহাশয় এই ‘ল্যান কার্যকরী করা অসম্ভব বিবেচনার বৈঠক ত্যাগ করেন। তখন তাহাদের বাদ দিয়াই উপস্থিত গ্রীষ্ম পাল, অনুকূল মুখার্জি, আশুতোষ রায়, হাব্দ, মিত্র (গ্রীষ্ম), খগেন দাস, সুরেশ চক্রবর্তী, জগৎ ও বিমান এবং লেখক গ্রীষ্মদাস দত্ত পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। তাহার পর বৈঠক ভাঙিয়া যায় এবং পরিকল্পনাটিকে কিভাবে রূপ দেওয়া হইবে তাহা স্থির করার জন্য ঐদিন রাতেই হাব্দ, মিত্রের গৃহে দ্বিতীয় বৈঠক বসে। এই বৈঠকে ছিলেন অনুকূলবাবু, হাব্দ, মিত্র, গ্রীষ্ম পাল, খগেন দাস ও লেখক (হরিশবাস দত্ত)। এখানে আবারও বলি যে, পুলিশের জানিত গৃহে (৪-৩, মলগা লেনে) অত বড় একটা যড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার জন্য গ্রীষ্ম পালের মত একজন পলাতক বিপ্লবীসহ আমার উপস্থিত হইব ইহা সম্ভব নয়। অধিকন্তু আমি এবং খগেন দাসও ওরাইন-যড়যন্ত্র ব্যাপারের পর পলাতক ছিলাম। কাজেই আমরাও সে বাড়িতে বাইতে পারি না। তাই পার্ক-এর সভা ভাঙিবার অব্যবহিত পর আমরা হাব্দ, মিত্রের বাড়িতেই দ্বিতীয় বৈঠক বসাইয়াছিলাম। হাবুর বাড়ি দাস লেনে ছিল না, ছিল গ্রীনাথ দাস লেনে।

জিতেনবাবুর অবগতির জন্য লিখিতার্থ যে, কালিদাসবাবু উল্লিখিত কোনো সভাতেই উপস্থিত ছিলেন না। সভার উপস্থিত ছিলেন তিনিই দলের প্রতিনিধিগণ এবং direct action-এ বাহারা শরিক হইবেন তাহারা। আত্মোন্নতির প্রতিনিধি ছিলেন অনুকূলবাবু এবং আত্মোন্নতির হাব্দবাবু হবেন direct action-এর direct

শরিক। কাজেই উক্ত সভার কালিদাসবাবুর জাসার প্রয়োজন হয় নি। ঠিক এই কারণেই বিপিনবাবু, গিরীনবাবু প্রমুখ কেমনো নেতারই এ বৈঠকে উপস্থিত হবার প্রয়োজন হয় নি। মনোমুগ্ধ বানার্জির কথা তো আসেই না। কারণ, তখন তাঁর বয়স শব্দে খুব অল্প নয়, তিনি দলেও ঢুকিরছেন সবেমাত্র। তাহার কিছুই জ্ঞানবাবুর কথা নয়।

(৩) জিতেনবাবু বলিযাছেন যে, 'বতীন মুখার্জি', হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিশচন্দ্র শিকদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ পরিচালনার সংস্পর্শে আসেন নি। তারা এ কথা জেনে থাকবেন পরে।' এখন উল্লেখযোগ্য যে কোনো দলের প্রতিনিধিই দলের নেতার অনুমতি ছাড়া 'কড়ম্বল সভার' আসিতে পারেন না। ইহা বিশ্লবীদলের আইন ও নীতিবিবৃতি। সুতরাং মানবেন্দ্র রায় বা নরেন ঘোষচৌধুরী যেমন কখনো বতীন মুখার্জীকে না জানাইয়া এ সভার আসিতে পারেন না, তেমনি অনুকূল-বাবু এবং হাবু মিত্রও হরিশবাবু, বিপিনবাবু, গিরীনবাবুদেরকে এবং গ্রীষ্ম পাল ও হরিদাস দত্ত প্রমুখও হেমচন্দ্র ঘোষকে না জানাইয়া সভায় যোগ দিতে পারেন না।

বতীনদাস-হেমদাস প্রমুখ নেতারা পূর্বাঙ্কেই 'পালিশ' সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং detail-এর সবদায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বিশ্লবীদত্তের কর্মীদের উপর—সেখানে নাক গলাইতে যান নাই।

(৪) গরুর গাড়ি অনুকূলবাবুই যোগাড় করিয়াছিলেন। জিতেনবাবু এ কাজটিই শব্দে দেন নাই মনে হইতেছে। কিন্তু আমাদেব কাজে ইহার গুরুত্ব ছিল শব্দেই। ঐ সব গাড়ি যোগাড় না হইলে 'বডাব মাল' সযান বাইত না। কাজেই 'অনুকূলবাবু ঘটা করে কেনো গরুর গাড়ি যোগাড় করেন নি'—এই বাক্যটি সবার ভিত্তে দাস কোথায় আঘাত করিতে চাইতেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

জিতেন দাস ইহার পবই লিখিয়াছেনঃ 'প্রথমে হরিদাসবাবু সেই গাড়ি চালাইলেন। এমন তত্তে পারেন যে, তিনি গাড়োয়ান সেজে লগে ছিলেন।'

আমি জিতেনবাবুকে সোধ দেই না। কারণ, শোনা গল্প এইরকমই হয়। আমি সঠিক ঘটনা বলিতেছি, বাহা সবার অলঙ্কার ঘটাইয়াছি।

বডা অফিস থেকে সাতখানা গাড়ি (গরু এবং মহিষের) সহ হাবু মিত্র গেলেন মাল খালাস করিয়া আনিবার জন্য। সর্বশুদ্ধাত্তেব গরুর গাড়ির (অনুকূলবাবুর সংগেই) গাড়োয়ান ছিলাম হুম্বেশী আমি। ছয়টা গাড়ির মাল বোঝাই হইবার পর শেষে গাড়িতে হাবুবাবুর নির্দেশে আমাদের প্রার্থিত মালের বাস্তবতা তোলা হইল। ইহার পর কিভাবে কখন আমরা গাড়ি নিয়া মলগা গেলে পৌঁছাইলাম এবং মালগাড়ি অতি অল্প সময়ে

কিভাবে কোথায় নীত হইল তাহা ভূপেনবাবুর প্রবন্ধে সঠিক বর্ণিত হইয়াছে।

এখন কথা হইল যে ঐ 'আমূল দোসাদ' আসে কোথা হইতে? কেস্-এ এবং পুলিশ-রিপোর্টে এই দোসাদ মিত্রের আমবা দেখা পাই বলিয়াই অনেকের ধারণা যে, দোসাদের গাড়িতেই বৃদ্ধি আমরা মাল সরাইয়া-ছিলাম।

পুলিশ ধাবণাই করিতে পাবে নাই যে, বিশ্লবীরা গাড়ি আনিয়া, গাড়োয়ান সাজিয়া, রডার কবল হইতে মাল তুলিয়া লইয়া বাইতে পারে। উহা বা স্থির করিয়া নিখাছিল যে, ঐ গাড়োয়ানগুলির সাহায্যেই ঐ কাজ হইয়াছে। দোসাদকে পুলিশ পবসা দিয়া ও ভয় দেখাইয়া- 'সাক্ষী' বানাইয়া লয়। এবং দোসাদ পুলিশের শিখান কথামত কোর্টেও বলে যে, তার গাড়িতেই অপহৃত মাল হাবুবাবুর নির্দেশে মলগা লেন-এ আসে।

দোসাদকে পুলিশ মলগা লেনের জানিত বাড়িগুলি সার্চ করা সব সময়ে নিয়া আসে। গিরীনবাবুর বাড়ি (৪১০ মলগা লেন) সার্চ করিতে গিয়া গিরীনবাবুর আত্মীয় ও প্রতিবেশী নরেন বানার্জীকে পাওয়া যায়। দোসাদ স্বাস্থ্যবান কিশোর নরেনকে দেখিয়াই আশ্চর্য সনাত্ত কবে যে ঐ কিশোর-ও গাড়ির সঙ্গে ছিলেন। অথচ action-এর গাড়িতে হাবুবাবুর কথা, এ বেচারী এ সম্পর্কে কোনো কিছুই জানিতেন না। সবার জ্ঞাতসারে

দোসাদ গাড়োয়ানটি তাই পুলিশের রিপোর্টে ও মানলাব রেকর্ডে খাঁচিয়া বহিল। আর সবার অলঙ্কার 'ইতিহাস' হইয়া রহিল অনুকূলবাবুর গরুর গাড়ি, ঐ গাড়ির গাড়োয়ান হরিদাস দত্ত মালবোঝাই হরিদাস দত্তের গাড়ি সব সময়ে সলল বিপদ বরণ করিয়া সশস্ত্র গ্রীষ্ম পাল ও স্বগেন দাসদেব মলগা লেন পর্যন্ত আসত ঘটনা। তাবপর 'আয়োমতি' দলের মাঝফতে সমস্ত মালপত্র (বিশ্লবী লেনেব গদ্যদান হইতে শব্দ অর্থে) পরিমাণ কাতুর্জ পুলিশ পবে আবিষ্কার করিলেও 'বৃদ্ধিগাভব' 'আয়োমতি' ও 'মুক্তি সত্ত্ব' প্রমুখ বিসর্বা-প্রতিষ্ঠানেব নন্দন আচ্ছাদ সববরাহ-ও সবার অলঙ্কারই সংঘটিত ঘটনা।

রডা ষড়ষষ্ঠের বৈশম্যটাই হইল যে এক হাবু মিত্রকে ছাড়া direct action-এর সঙ্গে আর কাহাকেও জড়াইয়া মত প্রমাণ, এমন কি সংবাদও পুলিশের সৈন্যদ জানা ছিল না। হাবু মিত্রকে ষড়জিয়া বাহির করা গেল না বলিয়াই রডা-ষড়ষষ্ঠ-মামলা ফাঁসিয়া গেল। হরিদাস দত্ত ও নরেন বানার্জীদেব সাজাও ভাই দুই-এক বছরের বেশি হইল না।

সুতরাং পুলিশ রিপোর্ট বা কোর্ট প্রসিডিংস্ হইতে 'কড়ম্বল ইতিহাস' কিছুই জানিব উপায় নাই। বিশ্লবীদেব কর্মক্ষমতা ও মনুষ্যগণিত-শিক্ষার প্রকৃষ্ট নজির রডা ষড়ষষ্ঠ ও রডা-ব্যাকশন দিয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীস্বামিনবাবুর বন্দ্যোপাধ্যায়

"রচনার রম্যতায়, বাচনভঙ্গীর সাবলীলতায়, সর্বোপরি লেখকের আন্তরিকতায় পুস্তকখানি অপূর্ব। তাহার রচনানৈপুণ্যে বহু দূরত্ব তত ও তথ্য প্রাঞ্জল ও সরসভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। লেখকের এই কৃতিত্ব অসামান্য। পুস্তকখানির সাধকতার জন্য লেখক শব্দ অক্লান্ত পরিশ্রমই করেন নাই, গভীর অধ্যয়নের দ্বারা দেশী ও বিদেশী সমালোচকগণের মত উদ্ধার করিয়া ও তাহার সম্ভবমত আলোচনা ও বিচার করিয়া বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সেজন্য ইহা একদিকে যেমন শিপানুবাগী জনসাধারণকে পরিচুত করিবে, অন্যদিকে তেমনি ভবিষ্যৎ গবেষকগণকে পথ দেখাইবে। বঙ্গ সংস্কৃতির আলোচনাক্ষেত্রে পুস্তকখানি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সংযোজন। পুস্তকখানির বহিরাবরণ, কাগজ এবং মূদ্রণ সবই রুচি-সঙ্গত এবং উচ্চস্তরের। 'বাঁকুড়ার মন্দির' প্রতিটি গ্রন্থাগার এবং বিদ্যাভবনে সমাদরে স্থান পাইবার যোগ্য।"

—দেশ

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীস্বামীনাথকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ভ্রমিকা ও নির্দেশী ভাট কাগজে মুদ্রিত ৬৭টি উৎকৃষ্ট আলোকচিত্র-সংবলিত 'বাঁকুড়ার মন্দির' বঙ্গ-সংস্কৃতিসমীক্ষার ক্ষেত্রে এক দিক-নির্দেশকারী গ্রন্থ। মূল্য পনের টাকা।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

(৫) জিতেনবাবু লিখিয়াছেন, “রডার্স মালপত্র ‘Crown shed’ থেকে খালাস করা হয়”। আমি জানি না কোন মালের কথা তিনি লিখিয়াছেন। তবে আমরা ‘রডা-রাক্-শান’ করিতে গিয়া মালবোঝাই বাস্তুগৃহি খালাস করিয়াছিলাম হাবু মিত্রেব মারফতে ‘কাস্টমস হাউস’ হইতেই। ভূপেনবাবুর লেখাৰ ভুল নাই।

(৬) বডা কোম্পানী বস্তুতই পূর্বে যেখানে ছিল আজও সেখানেই আছে। পূর্বে ওয়েলসলি প্রেসের দিকে তার দরজা ছিল কিনা আমাব মনে নাই। তবে সদর দরজা তবকালে ‘জানিসিটার্ট বো’ নামক রাস্তার দিকেই ছিল বলিয়া সেই পক্ষে নাম ভূপেনবাবু উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে ত্রুটি কিছু হয় নাই।

(৭) জিতেনবাবু আমাদেব জানাইতেছেন যে, ‘দেসাদ নামক গাড়োরানের গাড়িতে একটি বড় প্যাকিং-কেসে শস্ত করে প্যাক করা অবস্থায় মালগুদল এনে ফেলা হয় মলগা লেনে।’ ৫০টি মাউজার পিস্তল, ৫০ হাজার রাউণ্ড বুলেট এবং পিস্তলের অন্যান্য সরঞ্জাম একটি বড় প্যাকেট-এ বন্দি জিতেনবাবু ঢোকাতেই চান তবে সেই প্যাকেটের আয়তন কত বড় হবে? তথাকথিত সেই প্যাকেটের ওজন ও আকৃতির কথা ভাবিয়াও কি জিতেনবাবু তাহার শোনা-কথাকে ‘গল্প’ বলিয়া বুদ্ধিতে পারেন না?... সুতরাং ঐতিহাসিক সভ্য জানিতে হইলে জিতেনবাবুকে মানিতে হইবে যে একাধিক বাস্তব মাল আসে এবং প্রত্যেক বাস্তব ওপর লেখা থাকে ‘R B Rodda & Co’।

(৮) অতএব সবার অলঙ্ঘ্য সংঘটিত রডা-বড়পেত্রের ব্যাপারে ইতিহাস ভূপেনবাবু বাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষদর্শীৰূপে আমি ঐতিহাসিক সভ্য বলিয়া স্বীকার করি।

এ সভ্য প্রাক-স্বাধীনতা যুগে প্রকাশ্যে টম্বাটিত করার উপায় ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পরেও এককাল এ বিষয়ে কেহ উৎসাহ দেখান নাই। ইতিমধ্যে ভাইরেট প্র্যানিং ও র্যাকশানের সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত ব্যক্তি-দেব মধ্যে এক আমি ছাড়া সবাই দেহভ্যাগ করিয়াছেন। এই জন্যই হলে সত্যোদ্ভবনাথ গুপ্তাপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রকিশোর বসিক্তবায় তথ্য সংগ্রহের শৃঙ্খল ইচ্ছা নিয়ে আমার কাছে আসিয়াছিলেন।

আমি এখানে আবাবও বলি যে, মলগা লেন হইতে মালপত্র কিভাবে, কখন, কোথায় নেওয়া হয়—হাবু মিত্রেব কবে, কখন, কিভাবে, কয় সাহায্যে পলাইয়া বান—হাবুর সঙ্গে মাউজার পিস্তল ও বুলেট গিয়াছিল কিনা ভূপেনবাবুর প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে ঐতিহাসিক সভ্য বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং জিতেনবাবুর বিচলিত হইবার কারণ নাই। যদি দুটি তিনি এই অজ্ঞাত ইতিহাস সঠিকভাবে জানিতে চাহেন তবে ন্যূনজনের নিকট হইতে নানা শোনা-কথা দ্বিতীয়বার শুনিয়া যেন এই ইতিহাস রচনার চেষ্টা না করেন।

অতঃপরকার হাবু মিত্রেব সম্পর্কে ভূপেন-

বাবু বাহা লিখিয়াছেন তাহাতে কিছুই অতি-রঞ্জন নাই। এত বড় প্রাণ এবং এত বড় আত্মত্যাগী বন্ধু আমাব সুদীর্ঘ বিপ্লবী-জীবনে খুব বেশি পাই নাই। কিন্তু তাহাকে কেহ চিনিলা না—কেহ জানিলা না।

র্যাকশানের দিনই দার্জিলিং মেলে শ্রীশ-চন্দ্র পাল হাবুকে নিয়ে রংপুর কুড়িগ্রামেব আস্তানায় চলিয়া বান। হাবু মিত্রেব সর্বাধিক গুরুত্ব (importance) ছিল বলিয়াই শ্রীশচন্দ্রের মত কুশলী নেতা তাহাকে নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিয়া বান। শ্রীশচন্দ্রের দক্ষতাৰ ওপর আমাদেব সকলেরই অটুট বিশ্বাস ছিল বলিয়াই মনে হইত যে, এই মানুষটি সঙ্গে থাকা মানে সর্বশক্তিমান এক পুরুষ সঙ্গে থাকা যার শক্তি হয়তো দৈবান্বিত।

এখানে জিতেনবাবু আব একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তিনি লিখিয়াছেনঃ—মলগা লেনে লোহার গুদামের উঠানের ফটকের সামনে বেলা ৩টা/৪টা আন্দাজ সময়ে সেইদিনই মালগুদল ফেলা হয় এবং ‘আরও কিছুদিন পরে’ সেই বাস্তুটি সরান হয়। সুতরাং তাহার প্রশ্ন যে, এই দিনই ৫টার দার্জিলিং মেলে হাবুবাবু ইটি মাউজার ও হাজার বুলেট সঙ্গে লইবার জন্য পাইলেন কোথায়?

পূর্বেই বলিয়াছি যে, মলগা লেন পুলশের জনিত স্থান। রডা-রাক্-শান হইবার পর হাবু মিত্রেব অস্তর্ধানের কথা তাঁর আপিসে বিপোর্টেড হইতে না হইতেই যে পুলিশ এই মালের খোঁজে জানিত বিপ্লবীদের আস্তানাগুদল চাষিয়া ফেলিবে এইটুকু সাধারণ লোকেরও না বুদ্ধিবার বিষয় নয়। সুতরাং কর্মীদেরকে ঝড়ের বেশে সমস্ত কিছু করিতে হইয়াছে এবং পূর্বে হইতেই মাল কোথায় আনা হইবে, কিভাবে কোথায় সেই মুহূর্তে উহা সরান হইবে, কাহার সরাইবার ব্যবস্থা করিবে, ‘রডা’ব ছাপমারা বাস্তুগৃহি এই দিনই নষ্ট করিয়া নিজেদের কেনা ছোট ছোট বাস্তব সেসব কাহার কোথায় বসিয়া ভর্তি করিবে এসব পূর্বাভাসই স্থির করা ছিল। মলগার লোহার গুদামে বা মলগার কোন বাড়িতে জিতেনবাবুর কথামত এই মাল ‘আরও কিছুদিন’ রাখা হইতে পারে এই সংবাদ বাতুলেও বিশ্বাস করিবে না। জিতেনবাবু আজ হইতে জানিয়া রাখুন যে, রডা র্যাকশানের বাহাদুরী হইল। ‘SPEED’ মলগা লেনে আমবা তাহাব দেওয়া সময়ের অনেক পূর্বেই অসি এবং অনুকূলবাবুর নেতৃত্বে মালগুদল অতি সস্তর ভুক্তগ ধরেব বাড়িতে সবার হয়। কালিদাস বসুমতেরই নিষ্কণ্ণ ঘোড়ার গাড়ি ছিল। ভাড়াটে-গাড়ি ব্যবহার করার risk আমরা লইব কেন? কালিদাসবাবু তাহার নিজের গাড়িতেই মালগুদল যথা-উদ্দেশ্যে স্থানে সরাইয়া ফেলেন। এখন এই সময়ের মধ্যে এই বাস্তব ভাগিনা দুইটি পিস্তল ও ১ হাজার বুলেট লইয়া শ্রীশবাবু হাবু মিত্রেব ৫টার দার্জিলিং মেলে খরিবেন ইহা কি

বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার? হহাৎ যে ব্যক্তি অসম্ভব কার্য বিবেচনা করেন এবং মলগা লেনেই মালপত্র ‘আরো কিছুদিন’ রাখা হইয়াছিল বলিয়াই তাহার বিশ্বাস তাহাকে আমার বলার কিছুই নাই। রোমাঞ্চকর নানা বৈশ্বিক action কিভাবে বাংলাদেশে পূর্বাপর সংঘটিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে কিছুমাত্র direct যোগাযোগ তাহাদের ছিল তাহারা জিতেনবাবুর বুদ্ধিতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না।...

হ্যাঁ, এইবারে আবার হাবুর কথার আসা থাক। হাবুকে লইয়া শ্রীশদা গেলেন ‘নাগেশ্বরী’ (কুড়িগ্রাম মহকুমা, রংপুর) ডাক্তার সুরেন বর্ধনের কাছে। সুরেনবাবু আমাদেব বন্ধু। কুড়িগ্রামে তাহার দলের অবস্থা ভাল। তা ছাড়া ‘রাভা’ নামক এক শ্রেণীর পার্বত্য জাতিব মধ্যে সুরেনবাবুর কিছু প্রভাব ছিল। নিজে ডাক্তার হওয়ার তাহার প্রভাবপ্রতিপত্তি তখন গোয়ালপাড়া জেলায় (আসাম) এই তথ্য গোয়ালপাড়া জেলায় (আসাম) এই ‘রাভা’দেব মধ্যে বেশ জমাট বাঁধিয়াছিল।

আমি কিছুদিন পর (অক্টোবর, ১৯১৪) কলিকাতা বাসতলায় ধরা পড়িলাম। আমার ধরা পড়িবার দুইদিনের মধ্যেই আমার বন্ধু ডাঃ সুরেন বর্ধনের এবং আমাদের নাগেশ্বরীর বাড়ি তন্নাস করিবার পরওয়ানা নিয়া কলিকাতা হইতে পুলিশ নাগেশ্বরীতে বাইয়া হাজির হয়। পূর্বে বহুই থানার দারোগা খবরটা জানেন। থানার লোকেরা ডাক্তারের কাছে স্বভাবতই ঝগ-ঝগ। তা ছাড়া সুরেনবাবু এমনিতেই খুব জনপ্রিয় ছিলেন। কাজেই সংবাদ পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই থানার ছোট দারোগা আসিয়া সুরেন বর্ধনকে সাবধান করিয়া গেলেন।

সুরেনবাবু এই খবর পাওয়ারমাত্র বন্ধু নীলকমল বৈবাগী ও আমাব ছোট ভাই যামিনী দত্তকে দিয়া হাবু মিত্রেব গোয়ালপাড়া (আসাম) অঞ্চলে ‘রাভা’দের আস্তানায় পাঠাইয়া দিলেন। ‘রাভা’বা পাহাড়ী জাত। পাহাড়ে ও পাহাড়তলীতে ইহাদের অনেক আস্তানা ছিল। হাবুবাবু এই ‘রাভা’দের সাহায্যে পূর্ব-সীমান্ত পাব হইয়া চাঁনের দিকে বাইবার চেষ্টা করেন বলিয়া অনেক পরে আমরা আমাদেব ‘রাভা’-বন্ধুদের নিকট হইতে খবর পাই। ফ্রাণ্টায়ার পার হইতে গিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে—পুলিশের গুলীতে হওয়ারই অধিক স্বাভাবিক। তাহা না হইলে বেঘোরের পথ হাবাইয়া বা বন্যপশুর আক্রমণে তাহার দেহের অবসান হয়তো ঘটিত। যেভাবেই তাহাব মৃত্যু হউক না কেন, তিনি ছিলেন অক্লান্ত পথের পথিক এবং সজ্ঞানে মনের দিক হইতে) কর্মরত অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি শহীদ। তাহাকে আমার প্রণাম। যে অজ্ঞাত স্থলে তাহার দেহ খুলি-সমাধি লাভ করিয়াছে তাহা তীর্থ। সেই তীর্থকে আমার প্রণাম।

ভারত প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষামূলক

১৮৮০-১৯০২

১৮৭৯-৮০ খৃস্টাব্দে কানিংহাম বিহার ও উত্তরবঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। এই অনুসন্ধানকালে কানিংহাম বুদ্ধগয়া থেকে ধর্মপালের দুটি লিপি সংগ্রহ করেন যা বংশের পালরাজ্যের বুদ্ধনির্ণয়ের স্বার্থে সাহায্য করেছে। তা ছাড়া এই অনুসন্ধানের সুলতানগঞ্জ থেকে বুদ্ধসেন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কিছু মূর্তি এবং মহাস্থান থেকে গুপ্ত রাজ্যের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। জাহ্নগীর এবং কল্যাণীও এর প্রস্তর স্থাপত্য, যা এই অনুসন্ধানের আবিষ্কৃত হয়েছে, মধ্যযুগের শিল্পসংস্কৃতির উপর স্বচ্ছ আলোকপাত করে। বরাবর পাহাড়ের উত্তরে ধারাবত অঞ্চলে কানিংহাম পূর্বেই অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। বর্তমান অনুসন্ধানের তিনি নিকটবর্তী কুনোরা পাহাড় অনুসন্ধান চালান এবং উভয় স্থানের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ধারাবতের ধ্বংসাবশেষ প্রকৃতপক্ষে হিউয়েন সাঙ বর্ণিত গুপ্তমতী নামক সংখ্যার ছাড়া আর কিছু নয়। কানিংহামের উদ্দেশ্য ছিল হিউয়েন সাঙ বর্ণিত পুস্তকখণ্ডের রাজধানীর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা। এই সূত্রে তিনি করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় নামক একটি প্রাচীন স্থানের সন্ধান পান, যা তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে স্বচ্ছ সাহায্য করেছিল।

১৮৮০-৮১ খৃস্টাব্দে কানিংহাম উত্তর ও দক্ষিণ বিহার পরিভ্রমণ করেন। তিনি পুনরায় বুদ্ধগয়ার গমন করেন আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষণ করার জন্য। নতুনভাবে শেষে তিনি তিব্বত যাবার পথে পুনরায় কোঁচা ডোল, বরাবর এবং ধারাবত পরীক্ষণ করেন। অতঃপর তিনি পাটনার গঙ্গা পার হয়ে কসাবা বা বৈশালীতে গমন করেন। সেখান থেকে দাখরা, দাখরা থেকে মজুমদার হয়ে দ্বারভাঙা, সেখান থেকে সীতাকুণ্ড, সেখান থেকে কেশরিয়া ও হাতিপুত্র হয়ে পুনরায় বুদ্ধগয়া। সেখান থেকে পালি ও কোঁচ, তারপর শোণ পার হয়ে দেও-মার্কুন্ড, মহাশিবপুর এবং দেও-বর্ণাবিক। শোণের স্থান থেকে তিনি দ্বীপভাগের প্রপাতি আদিত্য সেনের একটি লিপি আবিষ্কার করেন। ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর কানিংহামের সহকারী বেগলাব অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্থানে আসেন গ্যাবিক। ইনি কানিংহামের সঙ্গে কসাবা ও দাখরা পরিভ্রমণ করেন। কানিংহাম কর্তৃক পরীক্ষিত কয়েকটি স্থানে ইনি পুনরায় অনুসন্ধানকার্য চালান। চৌবির নন্দনগড়ের বিশাল চিহ্নের খননকার্য পুনরায় গ্যাবিক কর্তৃক আরম্ভ হয়। গ্যাবিক কহাঙর বিখ্যাত

মুদ্রগুপ্তের লিপি এবং বুদ্ধগয়ার অল্প প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন।

১৮৮১-৮২ খৃস্টাব্দে কানিংহাম পুনরায় মধ্যপ্রদেশে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। এখানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাজিম, আবগা এবং শিবপুরের প্রাচীন স্থানগুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো। এই তিনটি স্থান থেকে তিনি অল্প লেখমালা ও প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেন। তা ছাড়া তিনি গম্বদের দ্বারা পুঞ্জিত বোরাম দেও-এর মন্দির পরীক্ষণ করেন। সর্বশেষে তিনি মধ্যবায় গমন করেন যেখানে ভাগ্যসেনে তিনি সিংহ-নিম্নবত একটি হেরাক্লিসের (হারকিউলিস) মূর্তি পান যা তিনি কলিকাতা বাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৭-এর মধ্যে কানিংহামের সহকারী কার্ল হিল কালিয়ার খননকার্য চালান এবং তার ফলে প্রাচীন কুশানগরের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়। এখানেই বুদ্ধের মহা-

নরেন ভট্টাচার্য

পারিনির্বাণের বিরাট মূর্তি আবিষ্কৃত হয় যা হিউয়েন সাঙ দেখেছিলেন। মূর্তিটি অতিকায়, দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ডানদিকে পাশ ফিরে বুদ্ধ শায়িত, ঠিক যেমনটি হিউয়েন সাঙ বর্ণনা করেছিলেন।

কানিংহামের উনিবংশতম রিপোর্টের বিষয়বস্তু হচ্ছে তাঁর সহকারী গ্যাবিক কর্তৃক বিহার, মধ্যভারত, পেশোয়ার এবং ইউসফজাই-এ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। ১৮৮১-৮২ সালে গ্যাবিক শাহাবাদ জেলার অনুসন্ধান চালান। অতঃপর তিনি গঙ্গা পার হয়ে বর্মার নদীর বাকি মঠের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষণ করেন যেটি কানিংহামের মত প্রথম গুপ্ত সম্রাট মহাবাজ শ্রীগুপ্ত কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। তারপর তিনি বেওয়ারে হাজির হন প্রাচীন গুর্গি শতাব্দির ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষণ করার জন্য। এখানে একটি পূর্বতে তিনি কলচাবি বংশীয় মহারাজ গায়গয়সেনের একটি লিপি আবিষ্কার করেন। এই সময় পাঞ্জাব সবকাব ইউসফজাই জেলার একটি অনুসন্ধানকার্য চালানেন কল স্থির করেন। এই সুযোগে কানিংহাম গ্যাবিককে সেখানে পাঠিয়ে দেন, বিশেষ করে হস্তনগর এবং চারসদার ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করার জন্য, যা প্রাচীন পৃষ্ণলাবতীর অবশেষ বলেই মনে হয়। ১৮৮২-৮৩ খৃস্টাব্দের শীতকালে কানিংহাম স্বয়ং পূর্ব-রাজপুতানায় অনুসন্ধান চালান। আলোয়ানে তিনি তেজার, রাজগড় এবং পার-

নগরে অনুসন্ধানকার্য চালান। তা ছাড়া তিনি ইন্দোর, সবহট এবং কোটলার দুর্গগুলিও পরীক্ষণ করেন। এ সকল স্থানে তিনি অনেক মুসলিম নিদর্শন দেখতে পান। ভবতপূর্বে তিনি প্রাচীন কদম্ববন পরিদর্শন করেন যেখানকার মন্দিরগুলি ইচ্ছাভূমিস্বরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। আশী-স্তম্ভ মসজিদের ভেতরে তিনি মধ্যযুগের প্রাচীন দৌল-সেন রাজাদের একটি লিপি পান। গোয়ালিন্দে তিনি বিখ্যাত ডুবকুন্ডের জৈনমন্দির পরিদর্শন করেন। গোয়ালিন্দ দুর্গের উত্তরে পায়োলিতে তিনি এক সারি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। মধ্যযুগের তিনি ইন্দো-সিখানী যুগের কয়েকটি প্রাচীন লেখমালা আবিষ্কার করেন। মধ্যযুগের নিকটবর্তী পারশব গ্রামে তিনি একটি বিরাট মূর্তি আবিষ্কার করেন। মধ্যযুগের পাঁচ মাইল উত্তরে কোটতে তিনি অসংখ্য বৌদ্ধস্তম্ভ আবিষ্কার করেন। স্তম্ভগুলির গায়ে ফৌদিত মূর্তির কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চৌমুখে কানিংহাম একটি অদ্ভুত মূর্তি পেয়েছিলেন : চাবটি সিংহের মাথায় চারজন নারী।

কানিংহামের রিপোর্টের একবিংশতম খণ্ডটি দুটি অংশে বিভক্ত : প্রথম অংশে স্থান পেয়েছে রেওয়া ও বৃন্দেলখণ্ডের অনুসন্ধান (১৮৮০-৮৪) এবং দ্বিতীয় অংশে তৎসহ মালব ও গোয়ালিন্দ (১৮৮৪-৮৫)। এই রিপোর্টে তিনি চান্দেল লেখমালাগুলির সামগ্রিক বিবরণ দিয়েছেন। এলাহাবাদের নিকটে বমনাব দক্ষিণ তীরে তিনি একটি বিশাল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর আগে যাব চিত্রগ্রহণ করেছিলেন মেজব কটো এবং যাব নামকরণ করেছিলেন কর্কটক নাগের মন্দির। বেওয়ারে তিনি কলচুরি বংশীয় রাজপুত্র কয়েকটি লিপি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্যান নদীর তীরে অজয়গড় অঞ্চলে তিনি একটি পার্বত্য মন্দির এবং বাকটক বংশীয় রাজা পৃথিবীসেনের একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেছিলেন। গিঞ্জা পাহাড়ের চূড়ার তিনি একটি প্রাচীন লিপি আবিষ্কার করেন যেখানে রাজা ভীমসেনের নাম উল্লিখিত আছে। মদনপুরের ৫০ মাইল দূরে সৌগড়ের উত্তরে কানিংহাম আরও একটি লিপি পান যেখানে রাজা পৃথিবীবাজ চৌহানের জৈনকর্ত্ত্বি জয়ের কথা লেখা আছে। গোয়ালিন্দে ১০০ মাইল দক্ষিণে রাজাপুর্বে কানিংহাম একটি কৈব-স্তূপও আবিষ্কার করেছিলেন।

১৮৭৭ থেকে ১৮৮০র মধ্যে কানিংহামের সহকারী কার্ল হিল গোবখপুর, সারণ এবং গাজীপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজকর্ম চালান। এই অনুসন্ধানের দ্বারা কতগুলি প্রাচীন স্থানের

ঐতিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। যেমন গোরখপুরের দক্ষিণে একটি জগলে প্রাচীন মৌরিয়দের রাজধানী নির্ণয়, বাম-গ্রামের বিখ্যাত নতুপের অবস্থান নির্ণয় ইত্যাদি। তা ছাড়া কলকাতায় কাশ্মীর আরও একটি অতিকায় বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করেন, যা সম্ভবত খ্রিস্টীয় ৪র্থ/৫ম শতকে নির্মিত হয়েছিল। তা ছাড়া এই অনুসন্ধানের ফলে চরাই অঞ্চলে রামপুরেও একটি অশোকের অনুশাসন পাওয়া গেছে। কলকাতায় এই আবিষ্কারগুলি কানিংহামের রিপোর্টের দ্বিবিংশতম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৭৯ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে যে অল্প লেখমালা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেগুলি থেকে অশোকলিপিকে পৃথক করে কানিংহাম একটি গ্রন্থাকাণ্ডে সেগুলিকে প্রকাশ করেন। এইটিই Corpus Inscriptionum Indicarum সিরিজের প্রথম খণ্ড, নাম Inscriptions of Asoka। এই গ্রন্থে শাশ্বতগিরী, খালিশি, নিনার, খোলি, জোগড়, শাসাবাম, রূপনাথ, বৈরাট, খড়্গগিরি প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত অশোকের শিলালিপি, ববাব, মগাজুর্দীন, খড়্গগিরি ও রামগড়ের গুহালিপি এবং দিল্লী, এলাহাবাদ, লৌরিয় অরবাজ, লৌরির নন্দনগড়, কোশম্বী সাঁচী প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত স্তম্ভলিপিগুলি স্থান পেয়েছে।

অশোকলিপি ছাড়াও, প্রাপ্ত অন্যান্য লিপি-গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা ও সেগুলিকে প্রকাশ করা কানিংহামের আগ্রহ ছিল অসীম। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জন ফ্রেডরিক স্মিটকে তিন বছরের জন্য গভর্নমেন্ট-এপি-গ্রাফিস্ট বা সরকারী লেখতত্ত্ববিদ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। Corpus Inscriptionum Indicarum সিরিজের তৃতীয় খণ্ডটি স্মিটের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রথমত গুপ্তলেখমালাই ছিল এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে হুলজ্জ দক্ষিণ ভারতের লেখতত্ত্ববিদরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কানিংহামের পরবর্ত্তকণ প্রধানত উত্তর ও পূর্ব ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিম ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপ যাতে প্রসারিত হয় এই উদ্দেশ্যে জেমস বাজেসের তত্ত্বাবধানে পশ্চিম ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগের সৃষ্টি হয়। ওই একই বৎসরে তদানীন্তন ভারতের সুপ্রীম গভর্নমেন্ট স্থানীয় সরকার-গুলিকে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করবার নির্দেশ দেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন মনে করেন যে, প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে না রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পুনরায় নিয়ে আসা উচিত। ফলে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এইচ. এইচ. কোল প্রত্নতাত্ত্বিক কিউরেটর হিসাবে নিযুক্ত হলেন। ওই বৎসরেই দক্ষিণ ভারতের 'প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষণ সম্প্রদায়' সৃষ্টি হল এবং তাৎ ও ভার অর্পিত হল জেমস বাজেসের ওপর। এদিকে ১৮৮১ থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত দু'বছর কেন্দ্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক কিউরেটর হিসাবে কোল কৃতিত্বের সঙ্গো কাজ করা সত্ত্বেও ১৮৮৩ সালে পদটি তুলে দেওয়া হল এবং প্রত্নতাত্ত্বিক রক্ষণ দায়িত্ব পুনরায় স্থানীয় সরকারগুলির ওপর ন্যস্ত হল।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কানিংহাম অবসর গ্রহণ করেন। ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কানিংহামের অবদান অপরিমিত। বিশেষ করে ধ্বংসাবশেষের প্রাচীন নাম ষড়ার্থভাবে অনুমান করার ব্যাপারে তিনি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে কানিংহাম উদাসীন ছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মারকসমূহ সম্বন্ধে তিনি কোন আগ্রহ দেখান নি, যদিও তাঁর সময় প্রাগৈতিহাসিক চর্চা শুরুর হয়েছিল। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জা. মস্‌দারিয়ে উত্তর প্রদেশের তমসা নদীর তীরে নব্যপ্রস্তম্বযুগের নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে রুস ফুট মাদ্রাজের নিকট প্রথম পুরাতন প্রস্তম্বযুগের নিদর্শন খুঁজে পেরেছিলেন; পরবর্তীকালে তিনি দক্ষিণ ভারতে ও গুজরাটে নব্যপ্রস্তম্বযুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। সে যাই হোক জা. কেন, লেখমালা ও মূর্ত্যাবিষয়ক গবেষণার জন্য কানিংহামের নাম ভারতের ইতিহাসে ঐচ্ছন্দিকভাবে থাকবে।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কানিংহামের উত্তরাধিকারী হন জেমস বাজেস। কানিংহাম ও তাঁর সহকর্মীরা উত্তর ভারতে যে কাজ করছিলেন, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তাব অনুবৃত্ত কাজ করছিলেন বাজেস। ইতিপূর্বেই ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি Indian Antiquary নামক পত্রিকার প্রবর্তন করে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও লেখমালা প্রকাশের সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। বাজেসের প্রিয় বিষয় ছিল স্থাপত্য, এজন্য তিনি স্থাপত্যের ওপর জোর দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে কেবলমাত্র লেখমালা প্রকাশার্থে তিনি Epigraphia Indica নামক সরকারী পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই পত্রিকা এখনো নিবর্তিত প্রকাশিত হয়। ডিরেক্টর জেনারেল পদে বাজেস মাত্র তিন বৎসর ছিলেন। বাজেসের অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সরকার আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপের দায়িত্ব পুনরায় স্থানীয় সরকারগুলির হাতে এসে পড়ে। এর ফলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার আবার নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হলেন। ১৮৯৯ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে পাঁচটি সার্কেলে বিভক্ত করে প্রতিটি এলাকায় জন্য একজন করে আর্কিওলজিকাল সার্ভেয়র নিযুক্ত করা হল। ঐ বৎসরেই লর্ড কার্জন ভারতের গভর্নর জেনারেল হতে এলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপারে তাব আগ্রহ ছিল অপরিমিত। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে ভাষণ দেন, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি এ-বিষয় কতখানি আগ্রহী ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপকে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি প্রাদেশিক সরকারগুলিকে একলক্ষ টাকা সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। তাইই প্রস্তাবমত ডিরেক্টর জেনারেল পদটিকে পুনরুদ্ধারিত করা হল। এই নতুন ব্যবস্থায় ডিরেক্টর জেনারেলরূপে এলেন ছাংশি বৎসর বয়স্ক জন মার্শাল। সেটা ১৯০২ সালের কথা।

মার্শালের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে 'কানিংহাম-যুগের' অবসান ঘটল এবং 'মার্শাল-যুগের' শুরুর হল। অভ্যন্তরীণভাবে মার্শাল প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যবলীর সুপারিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। ১৯০৪ সালে Ancient Monuments Preservation Act নামক আইনটি পাশ হয়। ১৯০৬ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ স্থায়ী সরকারী বিভাগে পরিণত হয়। মার্শালের অধীনে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপ অতীতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। সে কাহিনীর পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পাওয়া যাবে।

রোমাঞ্চ উপস্থানের হাতকর

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি অ্রবহণ ১ ডট ৫০ টাকার
উপস্থাস মূল্য ৩।০ টাকা

২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপস্থাস
মূল্য ৩।০

জাতীয়-কাব্য রচয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রত্নলাল-গ্রন্থাবলী

পদ্মিনী, অ্রবহণকাব্য, কর্মদেবী, কুমার-
সম্ভব, নীতিতত্ত্বমঞ্জলি, কাঞ্চী কাবেরী,
কবির জীবনী ১খানি একত্রে ২.০০।

গ্রাম্যাকাঙ্ক্ষা তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত

নাড়াজ্ঞান-প্রদীপিকা

(নার্জী শ্মশন দ্বারা রোগ নির্ণয় ও
পরমায়ু নিরূপণ)
মূল্য এক টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১৬



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কোনরকমে এসে পৌঁছলেন চার্লি। তখন আন কিছুমাত্র জ্ঞানবুদ্ধি অবশিষ্ট নেই। বিহীন ওপর ছাড়খানাকে খুব বদ্ব্যপ্ত হয়ে দিলেন। জলভেঁটা পেয়েছে—টেলিফোনটাকে জলের জাগ্ বলে মনে হল রঙের নেশায়। যত জাগ্ (অর্থাৎ টেলিফোন) থেকে জল ঢালতে যান, জল আব বেধোয় না। সুতরাং জল পান করা হল না। জানলাকে মনে হল ওয়াবড্রোব—অতএব ট্রাউজারটিকে ভাজ করে তাব ওপব রাখা হল। এব পর জুতেতে কিছুটা টুথপেস্ট মাখিয়ে নিখে জুতো পালিশ করতে বসলেন চার্লি। বেশ ক্ষেপেটা হাসিব দৃশ্য আছে এই ছবিটিতে।

দি চ্যাম্পিয়ানঃ চার্লি এই ছবিতে একজন বক্সার। বিং-এ ঢোকবার আগে তিনি একটি ঘোড়া খুব নাল কুড়িয়ে পান। এর পর রিং-এব দিকে দৃষ্টি পড়ল—দেখেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এক বিবাটকা জায়গেটের মত লোক। চার্লি চট করে নালটিকে নিজেব বক্সিং গ্লাভসের ভেতর পুবে নিলেন। তারপব খঞ্জ-এর সময় সেই নালসুখ প্লাভসেব খুঁষি খুঁষি জায়গেট তো প্রায় কুপোকাং। এই বইয়ে একটি কুকুরও তাঁর সুন্দব অভিনয় করেছে এবং প্রচুর হাস্যবসের খোঁষাক জুগিয়েছে।

দি জিটনে ইলোপমেন্টঃ চার্লি রাস্তায় দাঁড়িয়ে—ওপবে স্প্যানিশ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তাব প্রিয়া—চার্লি সেরিনেউড গাইতে সুব্দ কবলেন। প্রেমিকা একটি চিঠি ফেলে দিলে—রাস্তে যেন চার্লি বাড়ির ভেতর চলে আসে। তাঁকে বলতে হবে তিনি ছেঁচন কাউন্ট ড্রোভিড দ্যা লাইম—কারণ মহিলার বাবা মেয়ে এই পাণিপ্রার্থীটিরই অপেক্ষা করছেন।

চার্লি সেইভাবেই গিয়ে হাজিব হলেন—রাস্তায় মত তাঁকে অভ্যর্থনা করা হল। নৈশ আহারে বসলেন সবাই—কে একজন খাবাবে এত লক্ষ্যকর গুড়ো ছাড়িয়ে দিবেছিল যে, সবাই কাসতে সুব্দ কবল। এই সময় আসল কাউন্ট এসে হাজির—এসেই মহিলাকে নিয়ে তিনি গাড়িতে উঠে পালিয়ে গেলেন। চার্লি'রা পিছ পিছ ছুটলেন ধববার জন্য—এইবার সুব্দ হল ফাস'।

দি ট্রাম্পঃ এই ছবিটিতেই চার্লি প্রথম

নিজেকে খুঁজে পান। অবাধিকভাবে এক সমব সানফ্রান্সিসকোতে এক ভবমাবে কর্ম-সম্পাদনী চার্লি জাতীয় লোকসেব সংগ দেখ হযেছিল। লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং চার্লি তাকে খাবাব ও পানীয় দিয়ে সম্প করে তোলেন। তারপর চার্লি তাঁকে স্বাক্ষর দিয়া গিয়ে মদ্যপান কবান এবং লোকটি হঠাৎ তাব জীবনের কাহিনী বলতে সুব্দ করে। লোকটি জানায়, দায়বহীন এই ভবমাবেব জীবনে সে অশুভ আনন্দ অনুভব করে। ঘুবে ঘুবে গ্রামেব ছীবন উপভোগ কবাব যে কি অপার্থিব আনন্দ, মালগাড়িতে লুকিয়ে ভ্রমণেব আনন্দ, জয়গায় জয়গায় চার্লিদেব বাড়িতে গিয়ে অতিথি হওয়া, তাদের সহজ, সুন্দব এবং সহদব যাবহাবেব কথা এইসব চার্লি লোকটিব কাছে শুনেন মোহিত হয়ে যান। তাব সুন্দব কথাগুলো তাব বলাব ভগ্নী, তাব ভেস্চাবস্ এবং ড্রোপ্রশনস সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন চার্লি। বিদায় নেবাব সময় চার্লি যখন তাব ধন্যবাদ জানানলেন, লোকটি একটু অবাক হয়ে যান—সে বুঝতে পারে না যে চার্লির বাছ পেবে সে যা পেল তাব থেকে অনেক বেশি চার্লিকে দিয়ে গেল। এই ভবমাবে ভবনের ওপব ভিত্তি কবেই দি ট্রাম্প বইটি তোলা। ছবিটি হাসিব, কিন্তু এই প্রথম ছবিব শেষ-দিকটায় একটা বিবাদের প্রলেপ মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা পবে চ্যাপলিনেব প্রাস সব বইতেই দেখা গেছে। বইটিব শোভনকে আছে, যে মেয়েটিকে তিনি ভালবাসতেন তাঁকে তার প্রেমাস্পদেব আলিঙ্গনে ছেড়ে দিয়ে তিনি সুবে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু বাদে প্রাপ কবলেন—অর্থাৎ এ ব্যাপারটা তাঁক প্পা কবছে না, এই ভাব দেখিয়ে চলতে সুব্দ কবলেন এবং লক্ষ্য পথে দিগন্তেব সীমা-বেখায় মিলিয়ে গেলেন।

ওজার্কঃ একটি পেপবহাংগাবের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উদ্‌মানের কাহিনী। এই ছবিটিতে চার্লির বহু সুক্ক কাজ—অভিনতা ও পবিচালক হিসাবে—একসঙ্গে এবং—সুসংগতভাবে যুটে উঠেছে।

দি ব্যাঙ্কঃ গুরুগম্ভীর চালে এসে এব

বিরাট ব্যাঙ্কে ঢুকলেন চার্লি। দেশে মনে হবে ব্যক্তি ব্যাঙ্কেব ম্যানেজার, কিন্তু পরে আবিষ্কৃত হবে আসলে তিনি এখানকার ম্যারবকী।

তা হলে কি হয়? এখানকার একটি সুন্দরী স্টেনোকে চার্লি মনে মনে ভালবাসেন। একদিন এক ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দিলেন মেয়েটিকে—তোড়ার ভেতর চার্লির প্রেমপত্র। মেয়েটি বেগে আগুন—ফুলের তোড়া বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল—চিঠি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলল। হতাশা এবং বেদনার অবসর চার্লি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন—একদল ডাকাত ব্যাঙ্ক লুণ্ঠ করতে এসেছে—চার্লি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সবাইকে বেঁধে ফেললেন এবং সুন্দরী সেই মেয়েটিকে উদ্ধার করলেন। ঠিক এই সময় সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল।

শাহায়েদ: তিন মাতাল খালাসীকে জাহাজে তুলে দেবাব জন্য নিবদ্ধ হলেন চার্লি—পাবিশ্রমিক তিন ডলার। কাজেব সময় দেখা গেল তিনি নিজেই মদে চুর হয়ে আছেন। শাস্তি হল তাকে জাহাজে কাজ করতে হবে। জাহাজে যখন ভীষণভাবে দুঃস্থ—চার্লি সে সময় খাবার পরিবেশন করছেন। কখনও জাহাজের দোলানীতে উঠে পড়ছেন, টেল ঘাচ্ছেন, ডিগবাকী যাচ্ছেন, কিন্তু হাতের ভিসগলো ঠিক ধরে রাখছেন—কোন কিছ্ ছিটকে পড়ছে না বা ভাঙছে না। দেখবার সময় হাসতে হাসতে পেটে শিল ধরে যায়।

এ নাইট ইন দি শো: ঐশ্বর্যভূমিকার অভিনয় করেছেন চার্লি এই ছবিতে। প্রথম ভূমিকা, গানের দলেব সদস্য—আসলে সঙ্গীত-শিল্পীদেব কাজে ক্রমাগত বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছেন। বিবর্তী ভূমিকায় ভবঘুরে।

কারমেন: এই নামে সীসিল বি, ডি, মিল একটি ছবি তুলেছিলেন—তাকে বিদ্রূপ-করার উদ্দেশ্যেই ছবিটি তোলা।

আবাব আগের কথায় ফিরে আসি। নিউইয়র্কে যে কদিন ছিলেন বড় একটা ম্যাগেতা চ্যাপলিনেব। এরপর কাজেব জন্য তিনি লস্ এঞ্জেলস ফিরে এলেন। লস্ এঞ্জেলস এথলিটিক ক্লাবে স্থানীয় নামজাদা লোকেরা এবং বড় ব্যবসাদারেরা সম্মানবোধের আসতেন মদ্যপান করতে। এখনেই চ্যাপলিনের সঙ্গে আলাপ হয় রুডলফ ভ্যালেনটিনোব—হলিউডে এসেছেন ডাগ্যপারীকায়, কিন্তু তখন পর্যন্ত কিছু সুবিধা করতে পারছেন না। এই ভ্যালেনটিনোব মত সুন্দর স্বাক্ষর আঞ্জও বোধ হয় ছায়াচিত্রজগতে আব শ্বিতীয়টি দেখা যায় নি। এর দি শেখ, দি সান অন্ড দি শেখ প্রভৃতি ছবি চিত্রামোদীরা আজও বিস্ময়ের সঙ্গে সম্বরণ করেন।

ভ্যালেনটিনোব সঙ্গে চ্যাপলিনের আলাপ করিয়ে দেন—জ্যাক গিলবার্ট। গিলবার্ট নির্বাক ছবিব যুগের বিরাট অভিনেতা—এদিকে আবাব তিনি ছিলেন গ্রেটা গার্বোর প্রণয়ী। সবাই জানে এদের বিবাহ হবে—

হঠাৎ কি কারণে বিয়ে ভেঙে গেল। সবাক ছবির যুগে গিলবার্টের ডাগ্যডারকা হল অসম্মিত। দেখা গেল তার কণ্ঠস্বর টকী ছবির উপযোগী নয়। নির্বাক যুগে যিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতেন, এত কাজেব ডাক পড়তো যে, সব একসঙ্গে করে ওঠা অসম্ভব হয়ে উঠতো, হঠাৎ দেখা গেল সবাক যুগে তাঁব আব ছবির বাজারে কোন চাহিদা নেই—কেউ আব তাকে ডাকছে না। পূর্ব-প্রেমিকা গ্রেটা গার্বো শেষ চেষ্টা করলেন আবাব জন গিলবার্টকে নতুনভাবে সবাক চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠিত করতে। কুইন ক্লিস্টিয়ানাতে যে রোলে বিখ্যাত ইংরাজ অভিনেতা লরেন্স অলিভিয়ারের অভিনয় কববার কথা, সে ব্যবস্থা বাতিল করে, অলিভিয়ারকে হিসেবে দিয়ে সেই বেলে গিলবার্টকে দিয়ে অভিনয় করালেন। কিন্তু আবাবও গিলবার্ট ফেইল করলেন এবং তাবপর আর কখনও ছবির জগতে ফিরে আসতে পারেন নি। অর্ধচ নির্বাক যুগে কত বড় অভিনেতাই না ছিলেন জন গিলবার্ট—এখনও প্রামার চোখের সামনে ভাসছে দি কমকাস্ ছবিতে তার সেই অস্মৃত অভিনয়ের দৃশ্যগুলি। ভাগ্যের এই নিম্ন আঘাতে গিলবার্টের জীবন যে কতোটা বিষন্ন হয়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সম্মিতক বর্ণনা দিয়েছেন জেনি ফাউলার তার পুন্ড নাইট সুইট প্রিন্স বইতে—এ বইটি হচ্ছে অভিনেতা জন ব্যারিমোরের জীবনী। ফাউলার লিখেছেন: বোজগারব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে ১৯৩১সালটাই ছিল জন ব্যারিমোরের শিল্পীজীবনের সেরা বছর। এ বছর তিনি আর করেছিলেন চারশো ষাট হাজার ডলার। টাকা রোজগার হবাব সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ব্যারিমোর তা খবত করে ফেলতেন। অবশ্য কোন কারণেই কোন কব তিনি রাখতেন না।

এরপরেব বছরটাক কাজের দিক দিয়ে খুব উল্লেখযোগ্য সময়। ১৯৩২ সালে বিখ্যাত গ্র্যাণ্ড হোটেল ছবিতে গ্রেটা গার্বোর বিপরীতে ব্যারিনেব রোমান্টিক রোলে নামলেন জন ব্যারিমোর। সঙ্গে অভিনয় করলেন লাওনেল, ওয়ালেস বেরী, লিউইস স্টোন, জোন ক্রফোর্ড প্রভৃতি।

এই ছবিতে কাজ কববার সময় জন ব্যারিমোর ও গ্রেটা গার্বোর ভেতর একটা সুন্দর বন্ধুত্বের ভাব পড়ে ওঠে। ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩২ সালে একটি খুব কঠিন দৃশ্য তোলা হচ্ছিল গার্বো ও ব্যারিমোরকে নিয়ে। দৃশ্য শেষ হবাব পর গ্রেটা পরিচালক, ক্যামেরা-ম্যান এবং ব্যারিমোরকে বিদ্রূপসূচক মত করে দিলেন—আবেগের সঙ্গে গিবে তিনি ব্যারিমোরকে চম্বন করলেন। উপস্থিত সবাই হতচকিত, বিস্মিত, স্তম্ভ হয়ে রইলেন। গার্বো, যিনি ছবি তোলাব সময় ছাড়া কারোর সঙ্গে কথা বলেন না, কববার দিকে চেয়ে পর্যন্ত দেখেন না, তিনি যে এতোটা ইমোশানাল হয়ে উঠতে পারেন এ তো সবার কল্পনার

অতীত ছিল। গার্বোও বোধ হয় বুঝলেন সবাই তার ব্যবহারে খুব আশ্চর্য হয়েছে। তাই বললেন—

‘You have no idea, what it means to me to play opposite so perfect an artist’

ব্যারিমোর সম্বন্ধে পরেও মিস গার্বো বলেছেন—

‘I admired him greatly. Barry more was one of the very few who had that divine madness without which a great artist can not work or live.’

ব্যারিমোর এরপর R.K.O. স্টুডিওতে স্টেটস এ্যাটরনী ছবিতে কাজ করছিলেন—একদিন রাত্রে বাড়িতে বসে আছেন, হঠাৎ তিনবার গুলী ছোড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন—পরদিন সকালে জানলেন তার প্রতিবেশী জন গিলবার্টই গুলী ছুঁড়েছিলেন গভরায়ে। এক সময়ে গিলবার্টের ছিল প্ল্যামারে ভরা জীবন—টকী যুগে তিনি হয়ে পড়েছেন নামহীন, রিগতবশ এবং খ্যাতিহীন। বর্তমান ব্যর্থজীবনের বিষাদময় কাহিনী গিলবার্টকে হার্বিড এবং নিউরটিক করে তুলেছিল—তার মনে কেমন একটা ধারণা হয়েছিল সবাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সূত্র করে দিয়েছে। তাব বাড়ির সামনে একটি গাড়ি পার্ক করা অবস্থার দেখতে গেলে গিলবার্ট তার জানলা লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলেন গভরায়ে। একটি বুক এবং বুতী তখন স্থানকাল বদলাইল এ গাড়িতে বসে—গুলীর আঘাতে তাদের গাড়ির জানলা এবং তাদের মধ্য স্থান চুরমার করে দেওয়ার অপরাধে জন গিলবার্টকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল এক হাজার ডলার।

এই বছর জুলাই মাসে ব্যারিমোর বিল অন্ড ভিভোসমেন্ট ছবিতে উন্মাদ স্বামীর ভূমিকায় কাজ আরম্ভ করেন। ছবিতে যে সব চরিত্রে জন ব্যারিমোর অভিনয় করেছেন এটি তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলা। তার মেয়ের রোলে অস্মৃত অভিনয়-প্রতিভা দোঁষিয়েছিলেন সে সময়েব নতুন এবং পরে বিশ্বখ্যাতা অভিনেত্রী ক্যাথরিন হেপবার্ন। এ ছবিটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং একথা অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি যে, এ ধরনের উচ্চ শ্রেণীর ছবি আজকাল ওদেশেও বড় একটা তাঁব হয় না। এর পরের ছবি প্যামপুটিন এন্ড দি এমপ্রেস—এতে নেমেছিলেন লাওনেল, এথেল এবং জন ব্যারিমোর। এর আগে কোন নাটকে তা সে মঞ্চেই হোক বা পর্দাতেই হোক, এরা তিন ভাইবোন এবং সঙ্গে কখনও নামেন নি।

চ্যাপলিনেব জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে জন ব্যারিমোর সম্বন্ধে এত কথা বলছি কেন? কিছুটা বাদে চ্যাপলিন এবং ব্যারিমোরের একবার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হওয়া এবং কল্পাপকখনের একটা বিবরণী দেব।



রাসপুটিনে : লাওনেল ব্যারিমোর, এথেল ব্যারিমোর, জন ব্যারিমোর

এই বিবরণীটি ঠিকভাবে উপভোগ করতে হলে ব্যারিমোরের চরিত্র সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার।

এরপর ইউনিভার্সাল স্টুডিওর হয়ে ব্যারিমোর পাঁচটি ছবিতে নামেন। এর ভেতর একটির নাম ছিল 'কাউন্সেলর-এ্যাট-ল'-এটি তোলা হলে পর অন্য ছবি তোলা সূর্য হয় আর কে ও স্টুডিওতে। এই সময় পরিচালক উইলিয়াম ওয়াইলার ব্যারিমোরকে ফের ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে ডেকে পাঠালেন 'কাউন্সেলর-এ্যাট-ল'-এর একটি দৃশ্য রি-টেক'-এর জন্য। ব্যারিমোরের বিপরীতে অভিনয় করছিলেন জন কোয়ালেন।

০০শে অক্টোবর ১৯৩০ সালে সম্ম্যাবেলায় জ্যাক ব্যারিমোর ম্যানেজারসহ গিয়ে হাজির হলেন ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ব্যারিমোর অত্যন্ত ক্লান্ত। ঐদিন সারাদিনে জ্যাক মাত্র দু'গেলাস বিয়ার পান করেছিলেন—তার আগের দিনেও ঠিক তাই। সুতরাং একথা বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, ঐ সম্ম্যায় জ্যাক মোটেই মাতাল হন নি। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একটি প্রপার্টি-সিলভার-পেনসিল তুলে নিলেন প্রপার্টি-ডেস্ক থেকে এবং তারপর ঐ দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি শুরু করলেন—সাধারণত এ ধরনের কাজে কোন সময়েই কোন অসুবিধা হয় নি জ্যাকের।

কোয়ালেন এই ভূমিকায় ছিলেন লোটর পারফেক্ট; কারণ, স্টেজেও এই রোলে তিনি পল মিউনির বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন। ব্যারিমোর তাঁর একটি লম্বা সংলাপ সুন্দর-

ভাবে শেষ করবার পর, কোয়ালেন তাঁর উত্তর দিলেন বেশ সহজভাবে। এর পরের ছোট একটি সংলাপ বলতে গিয়ে ব্যারিমোর কথার মাঝে হঠাৎ আটকে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা কমিক মুখভঙ্গী করলেন জ্যাক এবং যারা সেখানে উপস্থিত ছিল সবাই হেসে উঠল।

দৃশ্যটি আবার সূর্য থেকে তোলবার ব্যবস্থা হোল। ঠিক আগের জায়গায় এসে ব্যারিমোর আবার সংলাপ ভুলে গেলেন। ব্যারিমোরের ছোঁয়াচ যেন লেগে বসল কোয়ালেনকে—তারও ভুল হতে লাগল সংলাপ কখনে। তৃতীয়বার ছবি নেবার আয়োজন হোল—এবারও ব্যারিমোর ফেইল করলেন। এখন আর ঠাট্টা করবার মত মনের অবস্থা তাঁর নেই। রাগে সিলভার-পেনসিলটা ছুঁড়ে মারলেন মেঝের ওপর।

এরপর কয়েকবার এই দৃশ্যটি নিয়ে ট্রায়াল দেওয়া হল—প্রত্যেকবারই জ্যাক ফল্টার করতে সূর্য করলেন। পরিচালক এবার কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দিলেন। ব্যারিমোর সুযোগ পেলেন সিনারিও কমিসান্ট করে নেবার।

আবার কাজ সূর্য হোল—আবার ব্যারিমোর নিজের সংলাপ ভুলে যেতে লাগলেন। পরিচালক ওয়াইলার এবং ক্যামেরাম্যান ব্রোডিনের দৃষ্টি-বিনিময় হোল—দুজনেই কিরকম হতভম্ব হয়ে গেছেন।

ছাপ্পানবার চেষ্টা করেও দৃশ্যটি তোলা গেল না—ব্যারিমোর বারবার ভুল করছিলেন।

শেষে জ্যাকের ম্যানেজার হচনার বললেন—'আজ থাক, কালকে' দৃশ্যটি তুললেই হবে।' কান্ট্রিহাসি হেসে ব্যারিমোর সেট থেকে বেরিয়ে এলেন।

রাস্তার গাড়িতে বাড়ি যাবার পথে ব্যারিমোর একটিও কথা বললেন না। হচনারও কোনও প্রশ্ন করে আর তাঁকে বিরক্ত করতে চাইলেন না। হচনার যখন জ্যাকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন তখন ইংরাজী মতে সকাল একটা। যাবার আগে শূধু বলে গেলেন—'এখন একটু ঘুমে নিলেই সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে শ্টিং-এর সময়।' জ্যাক শূধু মাথা নাড়লেন, তারপর নিজের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে বসে তিনি চিন্তা করে কাটালেন—কি চিন্তা করছিলেন তা অবশ্য জানা নেই, তবে এর পরে বা ঘটল তা হচ্ছে এই—সকাল দুটোর সময় তাঁর দরজার কে খেন নক্ করল। অর্থাৎ হচনার চলে যাবার ঠিক একঘণ্টা পরে। অবশিষ্ট সকালটা ব্যারিমোর বেডাবে কাটিয়েছিলেন তাতে তাঁর পৌরুষ, সাহস এবং অন্তরের উল্লসতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

০১শে অক্টোবর সকাল দুটোর ব্যারিমোরের ঘরে বিনি নক্ করেছিলেন তাঁর নাম হচ্ছে নোল গরনে। ইনি হলিউডের বহু নামডাকওয়ালা অভিনেতার ম্যানেজারের কাজ করেছেন এবং ব্যারিমোরের প্রতিবেশী জন গিলবার্টের ছিলেন কিস্ত কন্ড।

• ব্যারিমোরের পরিধানে বাথরোম এবং স্লিপার্স—দরজা খুলে দিয়ে নোল গরনেকে

ভেতরে আসে ও আত্মন করলেন ব্যাক।
গুরুনে জানােন যে, এখন বলবর সময় হবে
না, জন গিলবার্ট বিপদে পড়েছেন এবং
ব্যারিমোরকে একবার তাঁর সঙ্গে আসতে হবে
গিলবার্টের বাড়ি। গুরুনে আরও বললেন
যে চলে আসবার আগে তিনি গিলবার্টের
ভৃত্যটিকে তাঁর ওপর নজর রাখতে বলে
এসেছেন নিজের অনুশাসিতের সময়টার। তবে
বেশি দেরি হল গিলবার্ট কি করে বসেন
বলা যায় না। সুতরাং ব্যারিমোর যদি একটা
টপ্‌কোট পরে দিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়েন
বড় ভাল হয়। কারণ বাইরে একটা ঠান্ডা।

শান্তকণ্ঠে ব্যারিমোর জবাব দিলেন—সবই
বুঝলাম—আম্বলভা করতে চান গিলবার্ট। তাই
না? থাকলে পোষাক বদলিয়ে নিচ্ছি—একটু
সময় লাগবে—কিন্তু তার জন্য কোনও ভয়
নেই। গিলবার্টের মত একজন অভিনেতা
অভিরূপে সামনে না থাকলে হঠাৎ কিছু করে
হবেই না।

পাশে ব্যারিমোর প্রশ্ন করলেন হঠাৎ
গিলবার্টের মনের অবস্থাটা এরকম হল কেন।

হ্যাঁ, সবই হেভিভলি জ্বিক করছিলেন।

কোনো মহিলা সংক্রান্ত গোলমাল হয়েছে
কি?

হ্যাঁ, ও'র তৃতীয় স্ত্রী ভারজিনিয়া
রুস ও'কে ছেড়ে যাবার ভর পেয়েছেন।
সুখের প্রথম দিকটার গিলবার্ট এমন
জারয়েন্ট হয়ে উঠেছিলেন যে, মিস রুস
বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন।

গুরুনের কাছে ব্যারিমোর আরও
বললেন যে, গিলবার্টের কণ্ঠস্বর

নিরে অনেক ঠান্ডা-ঠিসারা হয়েছে এবং
তাঁর এখন মাথার ভুরুছে যে, জনসমাধানে
তাকে মনে করছে 'শব্দ'। ব্যারিমোর
বিরহ হয়ে বললেন যে, তাঁর কণ্ঠ, বিখ্যাত
হেভিওয়েট মন্টিমোন্টা জ্যাক ডেম্পস্টার
কণ্ঠস্বরও পাখির গলার আওয়াজের মত
অত্যন্ত কণ্ঠ—কিন্তু বড়ামাকী যদি ছাড়া
কেউ কখনও ডেম্পস্টারকে অন্য কোন
মোলায়েম বিশেষণ দিয়ে কখনো করতে সাহস
পাবে? গিলবার্টের বাড়ির কাছাকাছি এসে
ব্যারিমোর জিজ্ঞেস করলেন সম্প্রতি ও'র
একটি বাচ্চা হয়েছে না?

গুরুনে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, একটি মেয়ে
—তিনমাস বরস।

ব্যারিমোর এখন গিলবার্টের বাড়িতে
শৌছিলেন, গিলবার্ট তো অবাক। যুখে
বললেন—এ আমি ভাবতেও পারি নি যে,
তুমি এভাবে এই সময় আসবে। আজকের
রাডটাকে স্মরণীয় করে রাখতে হবে (যদিও
ইংরাজী মতে সময়টা তখন সকাল)।

ব্যারিমোর সংক্ষেপে জবাব দিলেন তা
রাখতে হবে বৈকি!

জ্বিকসের বদোবস্ত কর—গিলবার্ট হুকুম
দিলেন ভূতোর প্রতি।

ব্যারিমোর অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে ভৃত্যটিকে
বললেন,—আজ রাতে কারোর জন্য জ্বিক সন্ড
করবার দরকার নেই—বরোহ?

গিলবার্ট ভৃত্যকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন
যে, মিস্টার ব্যারিমোর তাঁর সঙ্গে তামাসা
করছেন। ব্যারিমোর গিলবার্টকে ধমকে
খামিয়ে দিলেন। তারপর গিলবার্টকে
সম্বোধন করে বললেন—শুনলাম তুমি
নিজেকে যতদূর সম্ভব বোকা প্রতিপন্ন
করছ সবার কাছে। কিন্তু কেন? লোকে
তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলছে যা নিন্দা
করে লিখে এই জন্য? অভিনেতার খবরের
কাগজ পড়ে কেন বুকতে পারি না। তোমার
কি মনে হয় কোন অভিনেতা ভাল অভিনয়
করছে বা খারাপ অভিনয় করছে তার ওপর
নির্ভর করে পৃথিবী চলেছে? এটা তোমার
সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

গিলবার্ট নির্বাকভাবে মেজের দিকে
দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইলেন।

লোকে তোমার গলার আওয়াজ ভাল
বলল, কি মন্দ বলল, তাতে কি এমন এসে
গেল! আর কিছ, যদি না পার, মাটি
কুপিয়েও তো রোজগার করতে পারবে। একটু
খেসে ব্যারিমোর ফের সুরু করলেন—তোমার
তো একটি বাচ্চা মেয়ে রয়েছে? এ কথা
বোধ হয় মাথার আসে নি যে, ওই শিশুটি
তোমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল? খালি
নিজের কথা নিয়েই মগ্ন হয়ে রয়েছ! চল
বেবীটিকে দেখে আসি।

দুজনেই নার্ভার দিকে গেলেন—
ব্যারিমোরের নির্দেশমত গিলবার্ট শিশুটিকে
কোলে তুলে নিলেন।

কানাজে কি লিখেছে তা নিয়ে অত রান্ড

না থাকলে এই শিশুটির কথা একটু ভাবতে
চেষ্টা করো একা খেবে—তাহলেই দেখবে
আজেকালো চিন্তার জট মন খারাপ হবে
না। যেদিন সকাল সাতটা অবধি জন
ব্যারিমোর গিলবার্টের বাড়িতে ছিলেন।
গিলবার্ট ঘুমিয়ে পড়বার পর নিজের বাড়ি
ফিরে এসেছিলেন এবং পোষাক বদলিয়ে
সোফা ইউনিভার্সালে চলে গেলেন ছবির সেই
দৃশ্যটির 'রি-টেক'-এর জন্য।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা সাগরাত এভাবে
না ঘুমিয়ে কাটানোর পরও এইদিন কিন্তু
ছবি নেবার সময় এতটুকু গোলমাল হোল না
—প্রথমবারই 'রি-টেক' সাকসেসফুল হল।
ফাউলার বলেছেন—

Barr more did not falter as he
went before the camera. He
worked expertly, and with the
vitality that he so often strangely
summoned from his own depths
at times when every one thought
him doimed or lost.

গিলবার্টের মধ্যস্থতার 'বুডলফ'
ভ্যালেনটিনের সঙ্গে প্রথম আলাপের পর,
চ্যাপলিনের সঙ্গে তাঁর ফের দেখা হয় প্রায়
বছরখানেক বাদে। এই সময়ের ভেতর
ভ্যালেনটিনো তারকাচিহ্নিত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-
দের শ্রেণীতে উঠে গেছেন। এইবার দেখা
হওয়ার সময় প্রথমটার ভ্যালেনটিনো একটা
নৈরাশ্যবাক্তক মনোভাব নিয়ে বসেছিলেন।

চার্লি বললেন—আমাদের শেষবার দেখা
হবার পর তুমি অমর-শিল্পীদের পরীক্ষণে
উঠে গেছ। এবার ভ্যালেনটিনো দিলখোলা
হাসি হেসে উঠলেন এবং বন্ধুজনোচিত
ব্যবহার সুরু করলেন চ্যাপলিনের সঙ্গে।

চ্যাপলিন বলেছেন — ভ্যালেনটিনোকে
ঘিরে থাকতো সবসময়েই যেন একটা
বিষাদাচ্ছন্ন ভাব। সাফল্য জিনিসটাতে
কিরকম সুন্দরভাবে নিজের চরিত্রের সঙ্গে
খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় তার চমৎকার
উদাহরণ ছিলেন ভ্যালেনটিনো।

'He was intelligent, quiet and
without vanity, and had great
allure for women, but had little
success with them, and those
whom he married treated him
rather shabbily. Soon after one
marriage, his wife started an
affair with one of the men in the
developing laboratory, with whom
she would disappear into the
darkroom. No man had greater
attraction for women than Valen-
tino; no man was more deceived
by them.'

(হুমকি)

হাবেরদেব অপরিহার্য গ্রন্থ
সতীষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালানো

—ইহাতে আছে—

এটি বক্তব্যের রচিত সতীষচন্দ্রের কবিতা—
'সতীষনী-রথ, কবিতা রবীন্দ্রনাথের
'পালানো সমালোচনা' এবং সমালোচক
শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সতীষ-সাহিত্য সমা-
লোচনা। সাধনিক শিক্ষা পথ ও কৃত্তক
কতপঠন গ্রন্থপে নিবন্ধিত

মূল্য এক টাকা

মহাকবি হেমচন্দ্র কল্যাণাধ্যায়ের

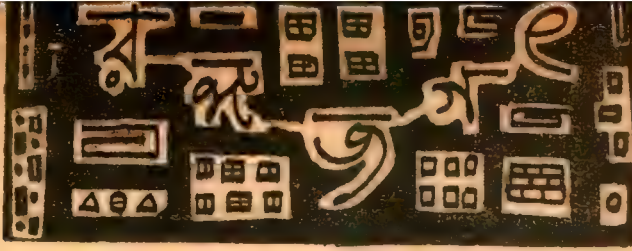
ব্রহ্ম-সংহার কাব্য

মাম—২.০০

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,

কলিকাতা-১২



দশ লক্ষাধিক টাকা পড়ে আছে কেন

একটিবার পূর্ণাঙ্গ ছবি প্রযোজনা করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার এ পর্যন্ত দশ লক্ষাধিক টাকা মুনাক্ষা করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' রাজ্যসরকারকে এই টাকা এনে দিয়েছে। সারা ভারতে এই জনপ্রিয় ছবিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তত একটি লংকাজের দৃষ্টান্ত হয়েছে; এই ছবিটি ভারতের বাইরে থেকে কিছ্ পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও এনে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক জন্মানে যে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের মুনোজ্জ্বল হয়েছে সে কথা বলা বাহুল্য।

কিন্তু এত অর্থ উপার্জনকারী ছবিটির সৃষ্টির কৃতিত্ব ও স্বীকৃতিস্বরূপ সত্যজিৎ রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে কি পেয়েছেন? ছবিটির নির্মাণপর্বে বিশেষ এক সংকট মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থসাহায্য করে ছবিটির নির্মাণ সম্ভব করেছেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তাঁরা মালিকানা শতটা নিজেদের হাতেই রেখে দিয়েছেন, নিজেদের প্রযোজক বলে জাহির করছেন। এত মুনাক্ষা সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায়কে পরিচালনা বাবদ অতিরিক্ত কোন সম্মানী হ্রদন নি। এমন কি পরবর্তী কোন ছবি নির্মাণের জন্য আহ্বানও জানান নি।

অথচ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী 'ডাঃ রায় বলেছিলেন 'পথের পাঁচালী' দেখিয়ে লক্ষ্য অর্থ বাংলা চলচ্চিত্রের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। বাংলা চলচ্চিত্রের কল্যাণ বলতে ডাঃ রায় কি বুঝেছিলেন জানি না, তবে সে সময় কল্যাণী বা দীঘাতে চলচ্চিত্র-নগরী স্থাপন সমবায় ব্যবস্থায় চলচ্চিত্র নির্মাণ ও স্টুডিও পরিচালনা ইত্যাদি কথা উঠেছিল। ওসব কথার কথাই থেকে গেছে। 'পথের পাঁচালী'র দশ লক্ষাধিক টাকাও সরকারী কোষাগারে নিরাপদে রক্ষিত রয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রের অনেক সংকট, যন্ত্রপাতির অভাব, পরীক্ষামূলক ছবির জন্য প্রেক্ষাগৃহের অভাব ইত্যাদি অনেক কথাই উঠেছে কিন্তু রাজ্যসরকার এসব কথায় একেবারে নির্বিকার। তাঁরা টাকার অভাবের কথাও বলেন না—তা হলে যে দশ লক্ষ টাকার কথাটা এসে যায়। এই দশ লক্ষ টাকা দিয়ে বাস্তবিকই রাজ্যসরকার চলচ্চিত্র শিল্পের কল্যাণে কিছ্টা কাজ করতে পারতেন। একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্টুডিওর প্রয়োজন প্রত্যেক চলচ্চিত্র নির্মাতা অনুভব করেন। বর্তমানে অসহ্য গরমের মধ্যে শিল্পীদের ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হয়। শিল্পী ও টেকনিশিয়ানরা ঘেমে অস্থির হয়ে ছবির কাজ করেন। রাজ্য সরকার যদি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি স্টুডিও করতেন তবে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাতারা উপকৃত হতেন। বোম্বাই ও মান্নাজে প্রাইভেট ক্যাপিটালে পরিচালনাধীন তাপনিয়ন্ত্রিত স্টুডিও রয়েছে। এই দশ লক্ষ টাকা থেকে বছরে অন্তত একজন করে প্রযোজককেও ছবির জন্য টাকা লাগি করতে পারা যেতো। ফিল্ম সোসাইটিগুলি চলচ্চিত্রচেতনা ও উৎসর্গ বৃদ্ধির জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে—একজোও সরকারী অর্থ সহায়ক হতে পারতো। বর্তমানে ক্যাল-কাটা ফিল্ম সোসাইটি পুরাতন বাংলা ছবির যে প্রদর্শনী করছে তা আরো সুন্দর ও সার্থক হতো যদি সরকারী অর্থসাহায্য পাওয়া যেতো। প্রসঙ্গত আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে 'পথের পাঁচালী'র অর্জিত দশ লক্ষাধিক টাকা থেকে এসব কাজ করা যেতো।

—স.জন



'অশ্রু দিয়ে লেখা' ছবির নায়িকা
জ্যোৎস্না বিশ্বাস

চলচ্চিত্রে যান্ত্রিক কুশলতা

চল্লিশ দশকের ছবির সাথে আজকের ছবির অনেক তফাৎ আছে। তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে আজকের দিনের ছবির যান্ত্রিক কুশলতা। বিদেশে ও এদেশে চলচ্চিত্রে যান্ত্রিক কুশলতা আশ্চর্যরকম বিকাশ লাভ করেছে। স্ট্যানলী ক্রামারের 'জাজমেন্ট এট নুরমবার্গ' ছবিটি রঙ বা কোন স্কোপ প্রসেসের সাহায্য ছাড়াই কাহিনী এবং বিষয়-বস্তুকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যদিও সেই সাবেকী পদার্থ এছবি তিন ঘণ্টার বেশি সময় প্রদর্শিত হয়েছে তবে এর চিত্রনাট্য দর্শককে হতবাক করে রেখেছে তীক্ষ্ণ শব্দচরন এবং কাহিনী দিয়ে। যাতে করে ক্র্যাশবাক ছাড়াও হিটলারের দাস-কালীন সময়ের চিত্রটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। ছবিতে মাত্র একবারের জন্য কাহিনীর পশ্চাত্তমিতে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। আদালতের দৃশ্য ক্র্যাশবাক করে দেখানো হয়েছে 'কনসেনট্রেশন' ক্যাম্পের দৃশ্যবলী মর্মান্তিকভাবে বাস্তব।

চিত্রনাট্যটিতে ডিজলভস্ প্রকৃতি খুব দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা ছাড়াও এতে বিভিন্ন দৃশ্যের মাঝখানে 'কাট' আশ্রয় নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। অভিব্যক্তি অথবা সংলাপের ধারাবাহিকতার সঙ্গে যার যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে সুন্দরভাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই দৃশ্যটির কথা উল্লেখ করা



দম্পত্য চলচ্চিত্র-উৎসবে রাজকাসদর ও অভিনেত্রী লিডিয়া স্মিরনোভা

যেতে পারে যাতে রেস্টোরার টেবিলে শাস-ভাঙার সংগে সংগে আদালতে জজের টেবিলে হাড়ুড়ি পেটনো দেখান হলো। রেস্টোরার হট্টগোল থেকে আদালতের নিস্তরঙ্গতার মধ্যে ফাট করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি লক্ষণীয়। আদালত কক্ষের আসবাবপত্র সবদৃশ্য মিলিয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে তাও উল্লেখযোগ্য। এই গুরুত্বপূর্ণ সেটটিতে যেসব দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে তাতে 'টেকিং'-এর পদ্ধতিও লক্ষণীয়। অত্যন্ত নিপুণতার সংগে গ্রহণ করা হয়েছে। আদালত কক্ষের ভিতরে চক্রাকারে জুমল্যান্স ব্যবহার এমনভাবে করা হয়েছে যাতে কোন একটি শটেরও পুনরাবৃত্তি মনে মনে হয় না। ছবির শিরোনামা দেখান হয়েছে জার্মান স্বস্তিকা এবং নানা অস্ত্র-শস্ত্রের প্রদর্শনের সংগে—যেখানে উল্লিখিত জিনিসগুলোকে মনে হয়েছে অতিশয় দানবের বাহুর মত। আর প্রথম দৃশ্যেই জার্মান স্বস্তিকার শটটি নেওয়াও কাহিনীর পটভূমিকার অর্থময়।

'দি মিরাকল ওয়াকার' ছবিটি হেলেন ফেলারের জীবনের শৈশবকালের ইতিবৃত্ত। এ ছবিটি সর্বশ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রীর জন্য পুরস্কার লাভ করেছে। ছবির চিত্রনাট্য এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যাতে উৎকণ্ঠা রয়েছে প্রচুর। যে দৃশ্য হেলেনকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সেই বিশেষ দৃশ্যটির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা দুটোই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে ক্যামেরাকে এত চলচ্চিত্রভাবে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত বড় বেশি নেই। যেখানে স্নায়ব্যাকে গভর্নসের শৈশবকে দেখান হয়েছে শৈশবের রিক্ততা অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে সহজ আলোকসম্পাতে আর শব্দযোজনায়। সব মিলিয়ে দৃশ্যটিকে করেছে সমরণীয়।

সাদা কালো ফটোগ্রাফির জন্য যে ছবি অস্কার পেয়েছে সেই 'লংগেস্ট ডে' ছবিটিতে দ্বিতীয় মহাব্যুৎসব কালের একটি বিক্ষুব্ধ দিনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছবির কাহিনী অপেক্ষা ক্যামেরার সাবলীলতাই এ ছবিতে প্রাণের স্পন্দন এনেছে। বিষয়বস্তুর গভীরতাকে পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই সাদাকালোকে মাধ্যমে হিসাবে ইচ্ছা করে বেছে নেওয়া হয়েছে। বুদ্ধিক্ষেত্রের দৃশ্যাবলী এত বাস্তব এবং নিপুণতার সংগে গ্রহণ করা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে এমন বড় বেশি দেখা যায় নি। শূন্যের থেকে নেওয়া একটি দৃশ্য

যাতে নীচের অসংখ্য চরিত্রের কার্যাবলী দেখান হয়েছে তা সমকালীন ছায়াচিত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এ ছবিতে ব্যবহৃত বহু সেটের কথাও প্রসংগত উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধ জাহাজের বিরাট ডেক, নরমান্ডির জলা, এবং ডামী প্যারাট্রুপারগণ।

'টু কিল এ মকিং বার্ড' ছবিতে একটি দক্ষিণ আমেরিকার গ্রামকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর সংগে নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, আসবাবপত্র সব যেন বাস্তব জীবন থেকে তুলে আনা হয়েছে। এ ছবি নির্দেশনার জন্য অস্কার পেয়েছে।

'মিউটিন অন দি বার্ডস্ট' বডিও টেকনিকলার ৭০ এম, এম-এ তোলা তবু নিঃসন্দেহে বলা যায় এ ছবির আসল প্রাণ এর চিত্রনাট্য। যাতে দুটি বিরাট ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ দেখান হয়েছে। কাহিনীকে এমন দক্ষতার সংগে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে দর্শকদের ঔৎসুক্য সব সময় বজায় থাকে। বিদ্রোহ ঘটাবার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্রোহের নায়কের ক্যাপ্টেন রাই-এর নির্বাতন নীরবে সহ্য করে নেবার ব্যাপারটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছবিতে যে বিরাট জাহাজের বহিদৃশ্য ব্যবহার করা হয়েছে ও ইনডোরে যে বহু জাহাজের সেট ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিশেষ এফেক্টের জন্য যে রৌপ্যকা ব্যবহার করা হয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে ক্যামেরা ব্যবহার সত্ত্বেও কোথাও কোন বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় নি।



গুরুত্বপূর্ণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত গুরুত্বপূর্ণ প্রোডাকসনের 'বোধি' ছবির একটি দৃশ্যে কালী বানার্জী, কমল মিত্র, সত্য প্রভতি

চিত্র আলোচনা

দেবতার দীপ

(চিত্ররচন ফিল্মস : প্রভাত মুখোপাধ্যায়)

‘এ জগতে একটামাত্র শিশু আছে এবং সেই শিশুর নাম সব শিশু।’ এই মর্মবাক্যকে কেন্দ্র করে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সদ্য মুক্তি-প্রাপ্ত ছবি ‘দেবতার দীপ’-এর চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ‘মা’, ‘মমতা’, ‘বিচারক’ প্রভৃতি ছবি বাঙালী দর্শকদের স্বীকৃতিলাভ করেছিল। উড়িয়া এবং আসামের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নেও শ্রীমুখার্জীর অবদান রয়েছে। তাঁর সৃষ্ট অসমীয়া ছবি ‘পুণ্ডরিক’ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করে আসামের চলচ্চিত্র শিল্পকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এগিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিন পরে আবার তিনি বাংলা ছবি নির্মাণ করেছেন, সুতরাং এই ছবি দেখার জন্য দর্শকদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

রিত্তা নামে মেয়েটি কিভাবে সব পেয়ে পরিপূর্ণ হতে হতেও একেবারে রিত্তা হয়ে গেল শুম্ভ্রমাত্র এক আশাহত বৃদ্ধার অভিশপ্তাভে—সে মর্মস্পর্শী কাহিনী পর্দায় প্রতিফলিত হয়েছে। অতিশৈশবে মা-বাবাকে

হারিয়ে রিত্তা যখন নিরাশ্রয়, সেই অসময়ে মায়ের বাধ্যবীর করুণার ঠাই গেল তাঁর সংসারে। সে বাড়িতে ভ্রমহিলায় একমাত্র ছেলের সঙ্গে সে পালিত হয়েছে। মহিলা চেয়েছিলেন রিত্তাকে পুত্রবৎ করতে—কিন্তু সে আশা তাঁর সার্থক হলো না। করুণ রিত্তা তার আগেই অন্য একজনের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় করেছে। আশাহত নারী নিজের ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়ার আশাহত হয়ে অভিশপ্তাভ দিল। সে অভিশাপ যে রিত্তার জীবনে এত সত্য হয়ে উঠবে কে জানতো। দেখা গেল রিত্তা তার একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছে, কিছুদিন পরে স্বামীকেও। অতঃপর সব হারা নারী অনাথ-আশ্রমে এসে আশ্রয় নিল। সেখানে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সংগ্রাম করে অমৃতের পরশ লাভ করেছে। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ব্যথিত মাতৃহৃদয় বহু শিশুর সান্নিধ্যে দঃখকে জয় করেছে।

দীর্ঘ ছবিটিতে দর্শকমনোরঞ্জন দিকে লক্ষ্য রেখে নাচ গান কৌতুক ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। একদিকে চিত্রনাট্যের ভাবপ্রবণ মূহূর্ত সৃষ্টি, আর একদিকে মনোরঞ্জন হাল্কা মূহূর্তে ছবিটিকে উপভোগ্য করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। ছবির বক্তব্য দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করবে।

রিত্তার চরিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। প্রথম থেকে

শেষ পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের দর্শন আকর্ষণ করেছে। স্বামী অনুপম হয়েছে অনিল চট্টোপাধ্যায়—তিনিও সমকাল্যে সাথে চরিত্রটির রূপ দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, দীপ্ত রায়, সত্যিন্ত ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, স্মিতা সিংহ, শীতা দে এবং শিশু-শিল্পী বাণী ও চঞ্চল। ছবির সংগীত ও চিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয়।

সুইডি ও শব্দ

ঘোবনের গান

আলোকচিত্রপী ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ডেউয়ের পরে ডেউ ছবিটি তুলেছিলেন। অনেকদিন পর আবার তিনি একটি ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। স্বরচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ করেছেন—এবং ছবির নাম দিয়েছেন ‘ঘোবনের গান’। এই ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে তিনি মনোনীত করেছেন অবনীশ ব্যানার্জী ও সুমিতা সান্যালকে।



সোফিয়া লোরেন সম্পর্কিত এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে সোফিয়া লোরেনকে দেখা যাচ্ছে



‘অপেরেটা অন দি রাইন’ নৃত্যনাট্য উৎসবের দৃশ্য

রাতের অতিথি

ইন্ট ইন্ডিয়া স্টুডিওতে একটি ছবির প্রদর্শন অনুষ্ঠান হলো। ছবির নাম ‘রাতের অতিথি’। পরিচালক দাশগুপ্ত কাহিনী, চিত্র-মালা রচনা করেছেন, পরিচালনার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করবেন। তত্ত্বাবধানে থাকবেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়। মহরৎ দৃশ্যে ক্র্যাপ-স্টিক ধরেছিলেন অভিনেতা বিপিন গুপ্ত। নবাগতা সোনালী ঘোষ ছিলেন সৌন্দর্যের মিলপী।

শ্রেণী

অভিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত শৈলেন্দ্র পিকচার্সের প্রথম নিবেদন ‘রেকা’ ছবির চিত্র-গ্রহণ বিজলীবরণ সেনের পরিচালনার দ্বারা গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রযোজক অভিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন : বিহারক ভট্টাচার্য। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন : রবীন্দ্র চ্যাটার্জী। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনার আছেন : যথাক্রমে : বিশু চক্রবর্তী, গোবর্ধন অধিকারী ও কার্তিক বসু। গান লিখেছেন : প্রণব রায় ও অভয় বানার্জী। গানে কণ্ঠদান করেছেন : সম্মা মুখার্জী, শিপ্রা বসু ও পুর্নদাস বাউল। চরিত্র চিত্রণে আছেন : প্রদীপকুমার, মাধবী মুখার্জী, তরুণকুমার, অনুপকুমার, ললিতা চ্যাটার্জী, ভারতী রায়, নবাগতা সুপর্ণা সেন, নবাগতা উত্তরা দাস, বিকাশ রায়, গীতা দে, গজনা ঘোষাল, রবি ঘোষ, জহর রায়, বীণকম ঘোষ, সন্ধ্যা দত্ত, বিমান বানার্জী, সুবোধ মুখার্জী, মম্বথ মুখার্জী, মনু মুখার্জী, কাজল মুখার্জী এবং সাবিতা চ্যাটার্জী

(বোম্বাই)। এ ছাড়া নৃত্যশ্রেণি থাকবেন শ্রীমতী সন্ধ্যা বোম্বাইয়ের নৃত্যপাটিনসী হেলেন। অপর ফিল্মস ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

রাজা রামমোহন

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের ‘রাজা রাম-মোহন’ ছবিটি বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষিত। ভারত-পশ্চিম রাজা রামমোহন রায়ের কর্মময় জীবনের কাহিনী অবলম্বনে এই অবিচ্ছিন্নগণীয় ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করে-ছেন : ‘ভাগিনী নিবেদিতা’ খ্যাত বিজয় বসু। সুরসৃষ্টি করেছেন : রবীন্দ্র চ্যাটার্জী। রাজা রামমোহন রচিত কয়েকটি গান ছবিটিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উক্ত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন : মানবেন্দ্র মুখার্জী, সম্মা মুখার্জী, মিতু দাশগুপ্ত, নির্মল চৌধুরী ও ডঃ গোবিন্দগোপাল।

বসন্ত চৌধুরী ছবিটির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন : কমল মিত্র, হুসা দেবী, বাসবী নন্দী, হুসা দেবী, অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, কালী সরকার, হারাধন বানার্জী, নির্মল চ্যাটার্জী, নীতিশ মুখার্জী, প্রেমেশ্বর বসু, বনানী চৌধুরী, শ্রীমান তিলক, শিবেন বানার্জী, ঠাকুরদাস মিত্র, ডাঃ হরেন মুখার্জী, মণি শ্রীমানী, বলই মুখার্জী, নবীন পাইন, চন্দ্রশেখর দে, জীবন ঘোষ, নিম্ন ভৌমিক, শৈলেন্দ্র মুখার্জী, তরুণ বানার্জী, রবীন্দ্র বানার্জী, ডি সেন, ক্রীতীশ ঘোষ, প্রদীপ দত্ত, রমা ঘাস ও নবাগতা উত্তরা দাস। কল্যাণ ফোশলের বিভিন্ন বিভাগে রয়েছেন : অজয় মিত্র (চিত্রগ্রহণ) বিশ্বনাথ মিত্র (সম্পাদনা) এবং কার্তিক বসু (শিল্পনির্দেশনা)।

ছবিটির বিশ্ব পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে-ছেন : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাঃ লিঃ।

সুশান্ত সা

অজিত কর ও অর্ধেন্দ্র সেন প্রযোজিত লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্সের প্রথম নিবেদন ‘সুশান্ত সা’ ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ব্যারিস্টার নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত রচিত বহু-পাঠিত ও আলোচিত উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন : অর্ধেন্দ্র সেন। সুর-সৃষ্টি করেছেন : সুধীন দাশগুপ্ত। চিত্র-গ্রহণ, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনার আছেন যথাক্রমে : সন্তোষ গুহরায়, সুনীল সরকার ও বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী। সাড়া-জাগানো এই উপন্যাসটির নায়ক সুশান্ত সার চরিত্রটি রূপায়িত করেছেন : বসন্ত চৌধুরী। নায়িকা তুষারবালার চরিত্রে রূপদান করছেন : সাবিত্রী চ্যাটার্জী। সাবিত্রীর চরিত্র রূপায়ণে আছেন : ললি চক্রবর্তী। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন : বিকাশ রায়, কমল মিত্র, অসিতবরণ, মালিনা দেবী, জহর রায়, জ্ঞানেশ মুখার্জী, শিশির মিত্র, গীতালি রায়, নপিত চ্যাটার্জী, অমর মল্লিক, অমল্য সান্যাল, শিশির বটব্যাল প্রমুখ।

নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন : সন্ধ্যা মুখার্জী ও সম্মা মুখার্জী।

চলচ্চিত্রের অগীত

গত ২৯শে জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে

আমরা কিছুক্ষণের জন্য অতীতের দিনগুলিকে অনুভব করলাম। প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করতেই শব্দেতে পেলাম সেই গানগুলি, বেগুনি দিশ ফসকের বাঙালী তরুণ মনকে মাতারে তুলেছিল। উমাশাশীর গাওয়া 'নূতনের স্বপন দেখি বারে বারে', পঞ্চজ মল্লিকের 'কান্ লগনে জনম নিলাম', কাননী দেবীর 'ওগো সুন্দর—মনের গহনে তোমার মুরতিখানি', সায়গলের 'বাঁধনু মিছে ঘর ভুলের বালুচরে'। গানগুলির সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সবাক যুগের সেই ছবিগুলি, আর এমন কতগুলি চেহারা যারা একদিন সকলের হৃদয় জয় করেছিল।

পুরানো দিনের বাংলা ছবি প্রদর্শনের এক আরেক্ষণ করেছে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। ১৯৩২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এবং ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ছবিগুলি দুই পর্যায়ে দেখানো হবে। প্রথম পর্যায়ে ১১টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৪টি।

এই উৎসবের উদ্বোধন করলেন পশ্চিম-বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী বি এন সরকার, শ্রীচারু রায়, শ্রীদেবকীকুমার বসু, শ্রীমধু বসু, শ্রীঅমর মল্লিক, শ্রীমতী যমুনা দেবী, শ্রীমতী মলিনা দেবী প্রমুখ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর শ্রীমধু বসু পরিচালিত 'আলিবাবা' প্রদর্শিত হয়।

ধরার মেয়ে নাটকভিনয়

ক্যালকাটা আর্ট মিউজিক সেন্টারের পরিচালনার কাশী বিশ্বনাথ মণ্ডে 'ধরার মেয়ে' নাটকটি অভিনীত হয়। এই নাটকানুষ্ঠানে শিল্পবৃন্দ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। তরুণ শিল্পী শ্রীসুকুমার ঘোষের আলোকসম্পাতের গুণে নাটকের এক-একটি মুহূর্ত এমন রহস্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে যে, গুণমুগ্ধ দর্শকদের দ্বারা তিনি বিপুল-ভাবে সম্বর্ধিত হন।

সংবাদ প্রবাহ

'খড়কে-কাঠি' থেকে বিশ্ব-তারকা

মিউনিখের পৌরপিতারা কিছুদিন আগে ইতালিয়ান চিত্রতারকা সোফিয়া লোরেনকে এক বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। পশ্চিম জার্মানীর দর্শকরা সোফিয়া লোরেনকে এইবার নিয়ে পাঁচবার জনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ বিদেশী তারকা-রূপে নির্বাচিত করার মিউনিখের পৌর-পিতারা 'সোফিয়া লোরেনের চমকপ্রদ উন্নতি' নামে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রদর্শনীতে সোফিয়ার তিনশোটি আলোকচিত্র রাখা হয়েছে। দীর্ঘপদী চোদ্দ বছরের কিশোরী থেকে নিজের প্রদেহে সৌন্দর্যের রাণীর খ্যাতি-মাত্র করা চিত্রজগতে 'এক্সট্রা' থেকে শব্দ করে

'গতকাল, আজ, আগামীকালের' অস্কার বিজয়িনী সোফিয়া লোরেনের সুন্দর একটি ধারাবাহিক জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে এই প্রদর্শনীতে। ছোটবেলার দীর্ঘপদী সোফিয়াকে বাড়ির লোক 'খড়কে-কাঠি' বলে ডাকত। সোফিয়া নিজে মিউনিখে এসে 'তার' প্রদর্শনী শুলে গেছে ও নিজের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ফটোগ্রাফারদের বত খুঁশি ছবি তুলতে দিয়েছে।

পশ্চিম বার্লিনে অভিনেত্রী রোমি স্নাইডার

অদ্ভুত ভাবাবেগে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রোমি স্নাইডারকে জার্মান মণ্ডে প্রথম



'বনানীকন্যা' ও 'ব্রেক' চিত্রে বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করেছেন ভারতী রায়।

অভিনয় করতে দেখা যাবে। বে নাটকে রোমি অভিনয় করবেন সেটি পরিচালনা করবেন হারী মেনেন। নাটকটি অবশ্য এখনও ঠিক হয় নি। পরিচালক হারী জানিয়েছেন যে, তিনি এমন একটা ভূমিকা খুঁজছেন যাতে রোমি নাম করতে পারে। হালকা প্রহসনে হারী একজন কৃতী অভিনেতা ও পরিচালক। সহজে-খুঁসি-হয় না বার্লিনের দর্শকদের মন তিনি ইতি-মধ্যেই বহুব্যয় জয় করেছেন। হারী এখন

হার্ব গার্ডনারের লেখা এক প্রেক্ষণ দ্বিত নাটকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন ও পরিচালনাও তিনিই করছেন। কিছুদিন থেকেই হারী ও রোমির বিয়ের কথা কানা-ঘোষায় শোনা যাচ্ছে বটে তবে পাকাপাকি কিছু এখনো জানা যায় নি।

ভাসমান মণ্ডে নৃত্যনাট্য

প্রতি গ্রীষ্মে পশ্চিম জার্মানীর কোবলেন্স শহরে অপেরেটা অন দি রাইন নামে এক উৎসবের আয়োজন হয়। নদীর ওপর ভাসমান ঘূর্ণায়মান মণ্ডে তৈরি করে নৃত্য-নাট্য অভিনয় হয় আর দর্শকরা নদীর তীরে বসে তা উপভোগ করে। গত পনের বছর ধরে এই উৎসব চলেছে। এই মৃত্যুসম্পন্ন খিয়েটোরে এক হাজার দর্শকের আসন আছে। এই অভিনয় দেখার জন্যে কাতারে কাতারে লোক আসে এবং সব টিকিট আগে থাকতেই বিক্রি হয়ে যায়। এ বছরের উৎসবেও অন্তত পঞ্চাশ হাজার দর্শকের সমাগম হবে। এ বছরের নৃত্যনাট্যের নাম 'ক্যুইটেন মারিত জা'। প্রয়োজনীয় থাকবেন পরিচালক এইচ ডবলিউ উলক্ এবং রাজনৈতিক বিশেষ মন্তব্য বৃন্দাপেস্ত অপেরার অধ্যাপক মাইকলোস ফন লুকাসের তত্ত্বাবধানে এতে অভিনয় করবেন হাম্পেরারী শিল্পবৃন্দ। ছবিতে গত বছরের ভাসমান মণ্ডে অভিনয়ের একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

মুক্কাভিনয়

সুপ্রতি রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে বাংলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম মুক্কাভিনেতার এক মনোজ্ঞ মুক্কাভিনয়ের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। শ্রীদত্তের মুক্কাভিনয়ের বিষয় ছিল 'কলকাতার পথেঘাটে, কলকাতার পথিক', মুক্কাভিনয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি নতুন এবং মৌলিক। কলকাতার পথে-ঘাটে কলকাতার পথিকের উৎকর্ষার পথ-পরিভ্রমণ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কলকাতার পথিক পথ-চলার সাধারণ নিয়মটুকুকেও মানতে চান না, তাতে বিপদগ্রস্ত হন নিজেরা এবং পরের বিপদও তাঁরা ডেকে আনেন। দৈনন্দিন জীবনের এইসব অনিয়মিত-বর্তিতার দ্বারা সমস্ত অভিনয়ের মাঝে টুকরো টুকরো করে সাজান হয়েছে। তাতে ফাঁক নেই—ফাঁকিও নেই। শ্রীদত্ত মানুষের এই চরম ভুলের মুহূর্ত-গুলোকে গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে সজ্ঞা করেছেন। কিন্তু এই ভুলকে তিনি চড়াপড়-ভাবে জীবনের সাথে একেবারে জুড়ে দেন নি। শেষের একটা দৃশ্যে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই ভুলের ঝড় শেষ হবে বিপদের পথ-চলার জীবনে একদিন ছেঁদ আসবে—সেদিন জো আর দূরে নয় কারণ নিয়মানু-বর্তিতার নিশান ভুলে এগিয়ে এসেছে আমাদের দেশের ছোট ছোট জাগরণী ভবিষ্যৎ।

বাস্তববাদ ও দেশে এবং বিদেশে

ইউরোপীয়ান নাটকের পুনরুত্থান এবং রিয়ালিস্টদের অভ্যাসে রংমঞ্চে সব দিক দিয়ে একেবারে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। এই পরিবর্তন শুধু ড্রামাটিক টেকনিকেরই ভাঙা পাণ্ডে দিল না, সঙ্গে সঙ্গে টেকনিক এবং এ্যাকটিং, স্টেজ ডিরেকশন এবং সিন-ভিজাইনিংও নতুন পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হতে দুরূহ হল। বাস্তববাদী থিয়েটারের প্রধান উদ্দেশ্য হল এমন একটা মঞ্চমায় সৃষ্টি করা, যার ফলে দর্শকের মনে হবে কেউ বা ঘটছে তা সত্য-সত্যি বাস্তবজীবনের কোনও ঘটনা, তারা যেন অদৃশ্য চতুর্থ দেয়ালের ফাঁক দিয়ে কোন ঘরের কাহিনী লুকিয়ে দেখে নিচ্ছে। সেই ঘরের অধিবাসীরা যে সব ব্যক্তিগত সমস্যা ইত্যাদির আলোচনা করছে তাও যেন দর্শকেরা ইচ্ছাসম্মতের মত শুনতে পাচ্ছে। ব্যাপারটা যাতে বিশ্বাসযোগ্য এবং যথার্থতাপূর্ণ হয় সেজন্য নাট্যকারের দরকার ঠাট্টাকীর চরিত্রদের সংলাপ এবং আচার-আচরণকে বাস্তবানুগ করা—যাতে মনে হয় এটা থিয়েটার নয়, আসল বাস্তবজীবনের কোনও ঘটনা। রিয়ালিস্টিক থিয়েটারে প্রথমত দরকার চরিত্রগুলিকে যথেষ্ট এবং মানসিক আচার, ব্যবহার এবং আচরণ থেকে মুক্ত করা, রেক্টরিক এবং অলংকারপূর্ণ বাক্যের পরিহার করা—কেন তারা কি করছে যা লেছে তার পেছনেও একটা লজিক থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটাও দেখা দরকার যে, চরিত্রের সংলাপ যেন চরিত্রানুগ হয় এবং যা ঘটছে তার সঙ্গে এই সংলাপ যেন অপ্রাসঙ্গিক না মনে হয় দর্শকদের।

এইখানে স্টেজ রিয়ালিজম্ সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলা দরকার। অনেক থিয়েটার-দর্শক, এমন কি অনেক নাট্য-সমালোচকও মনে করেন যে, যে সব নাট্যকার সমকালীন ঘটনাবলী নিয়ে নাটক লেখেন, তাঁরা সত্যিকার শিল্পী নন—আসলে তাঁরা জার্নালিস্ট। অর্থাৎ এইসব রিয়ালিস্টিক নাট্যকার যা চোখের সামনে দেখেন বা শোনে তার হুবহু রিপোর্ট পাওয়া যায় তাঁদের রচনায়। এ কিন্তু একটা ভুল ধারণা। তা না হলে, যে কেউ একটি ক্যামেরা এবং নোটবই নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে চোখের সামনে যা ঘটছে তার কিছু ছবি এবং নোট নিয়ে পরে তা নাট্যিক ফ্রেমের ভেতর ভরে নাট্য রচনা করতে পারতেন। ফ্রেম ওপর লিটারেল এবং ফেডফুল রিপ্রেজেন্টেশন (বাস্তব জীবনের ঘটনার) ফলেই নাটক তৈরি হয় না। এই ধরণের নাট্যকারদের সময়টো আকৃত্যহীনতা

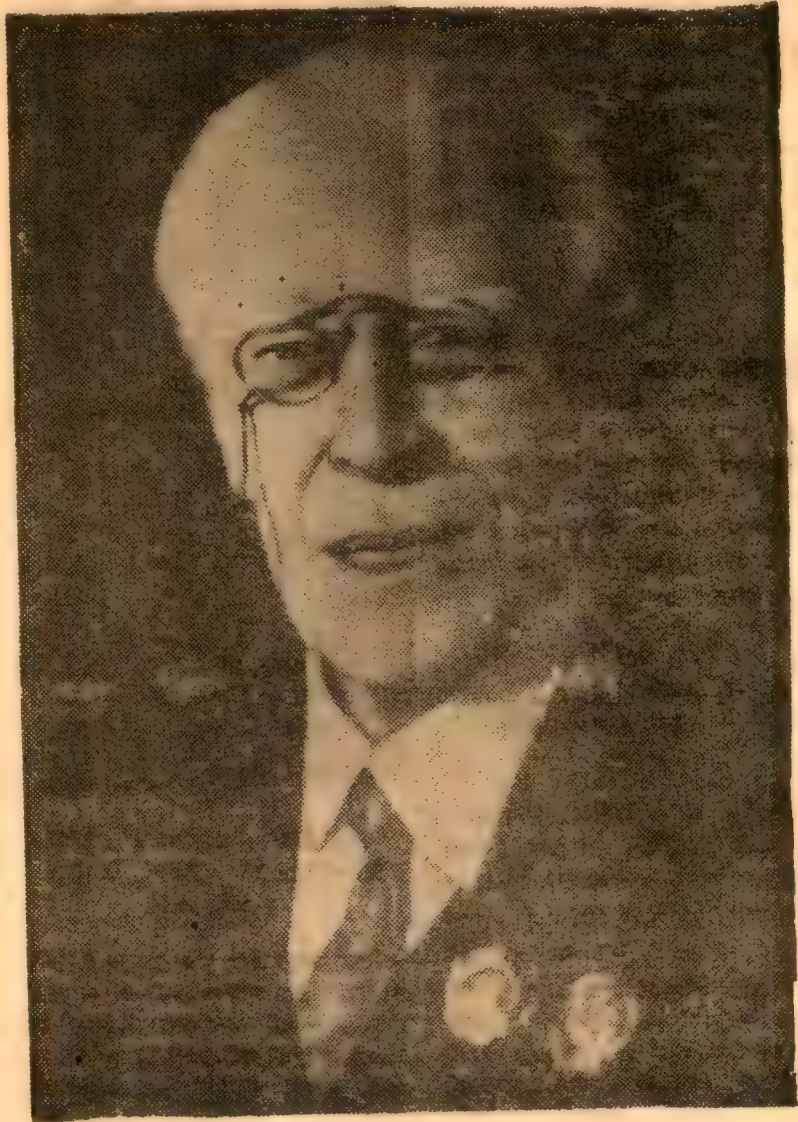
অনির্দিষ্টতা, অসার্থক এবং অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট বলে মনে হয় দর্শকদের।

রিয়ালিজম সব সময়েই লিটারেলিজমকে পরিহার করে এবং যে কোন সিচুয়েশনের মূল সত্যকে ভুলে ধরতে যার রংমঞ্চের ওপর—বাস্তবকে বাছাই, ছাটাই করে এবং শিল্পানু-মোদিত উপারে সাজিয়ে, গুছিয়ে দিতে পারলেই সেটা সম্ভব হয়। অর্থাৎ বাস্তবকে প্রাপ্যলি এডিট করে না নিতে পারলে তা শিল্পের পর্যায়ে উঠতে পারে না। বাস্তববাদী

চেনন অব রিয়ালিটি চান না—তার উদ্দেশ্য ইলিউশন অব রিয়ালিটি সৃষ্টি করা। দু-একটি শব্দ বা বাক্য দ্বারা নাট্যকে অনেক বেশি রিয়ালিস্টিক করে তোলা যায়—তুলনায় সত্যিকার বাস্তবজীবনে ব্যবহৃত কথামতের পাতার পর পাতা স্টেনোগ্রাফিক নোট নিয়ে নাটকে বসিয়ে দেবার পর দেখা যায় নাট্যকটি মোটেই বাস্তববাদী হয় নি, বরং সংলাপ অত্যন্ত অস্বাভাবিক লাগছে।

কেউ কেউ বলেন আধুনিক নাটকে রিয়ালিজম আসবার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য এবং ফ্যানটাসীকে দূরে সরিয়ে দিতে হয়েছে—কিন্তু সেজন্য একথা বলা চলে না যে, রিয়ালিস্টিক ড্রামার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই বা রিয়ালিস্টিক ড্রামা লেখা খুব সহজ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মজার ব্যাপার চোখে পড়ে। সময় সময় বাস্তববাদী নাটক লেখবার ধরণ-ধারণার সঙ্গে গ্রীকদের নাটব



স্ট্যানিসলভস্কি—বিখ্যাত বাস্তববাদী রাশিয়ান নট এবং নাট্যপরিচালক



ইবসেনের 'শিন্নার জিটের' দৃশ্য—কম্পোজিশন দেখবার মত

লেখবার ধারার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও বিষয়বস্তু এবং জীবনদর্শনের ব্যাপারে এই উভয় জাতীয় নাটকে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। ইবসেনের ঘোষ্ট নাটকের সেটিং হচ্ছে মাত্র একটি—অল্প-সংখ্যক চরিত্র এবং অত্যন্ত স্বল্প সময়ের পরিধিতে নাট্যকাহিনী আবদ্ধ। যেন এরিস্টোটলের ড্রামাটিক ইউনিটিজের কথা স্মরণে রেখেই তিনি নাটকটি রচনা করেছেন। তাছাড়া আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করে দেখবার মত। নাটকটিতে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়েছে অতীতের কথা, যার থেকে কার্য-কারণ-রীতি অনুযায়ী প্রসূত হয়েছে বর্তমানের ঘটনা-শলী। ঠিক এইভাবেই বিশ্লেষণ করা যেতে পারে ইউজিন ও'নিলের লং ডেজ জার্নি ইন্টু দ্য হাইট নাটকটি।

নতুন স্টাইলে নাটক লেখবার সঙ্গো সঙ্গো নতুন ভঙ্গীতে তাকে মণ্ডল রূপায়িত করবার আবশ্যকতা দেখা দিল এই সময় রোমান্টিক এবং কৃত্রিমতার ভরা নাটকের প্রকাশভঙ্গী আর এই নতুন বাস্তববাদী নাটকের প্রকাশভঙ্গী তো এক হতে পারে না। সুতরাং মণ্ডল রূপায়ণের ধারাটোও সম্পূর্ণ বদলে গেল। বাস্তবতাকে মূর্ত করে তোলবার জন্য স্টেজের সিন-সিনারির দিক-টোতেও আমূল পরিবর্তন এসে গেল। সব কিছুর ওপরেই একটা বাস্তবতার প্রলেপ মাখিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন পরিচালকেরা।

আগে অভিনেতা, অভিনেত্রীরা খোলা উইংস দিয়ে যাতায়াত করতেন, ব্যাক ড্রুপে এঁকে অস্পষ্টভাবে সংকেত দেওয়া হোত কোথায় ঘটনা ঘটছে সেই স্থানের। এসব দিয়ে তো আর বাস্তববাদী নাটকের সেট-

সেটিং করা চলে না। যেখানে ঘটনা ঘটছে, যথা সেলার, ব্যবসায়ীর অফিস-ঘর, রেস্টোরাঁ বা কোর্টরুম—এসব দেখাবার জন্য মণ্ডলসজ্জার দিকটা সত্যিকার বাস্তবানুগ করতে হোল। স্টেজের পরিবেশকে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে মণ্ডলমায়া সৃষ্টি করতে গিয়ে ওপন সেটকে সরিয়ে দিয়ে দেখা দিল ঢাকা-বস্ত্র-সেট। এখনও ওপেরা বা মিউজিক্যাল কমেডীতে ওপন সেটই ব্যবহার হয়—কারণ এসবের মণ্ডল-রূপায়ণে রিয়ালিস্টিক ইফেক্টের দরকার হয় না।

বস্ত্র-সেটিং-এ সাধারণত মণ্ডলের ওপর তিনদিকে দেয়াল দেখা দিল—এসব সেটে দরজা, জানলা, ফায়ারপ্লেস এবং এ্যাকশনের অগ্রগতির জন্য আর যা যা দরকার সবই ব্যবহৃত হতে সুরু হোল। প্রোসেনিয়াম ফ্রেমের দিকটাই খোলা—যেন চতুর্থ দেয়াল-টিকে ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রোসেনিয়াম স্টেজকে পিকচার ফ্রেম স্টেজও বলা হয়। ঘরের আসবাবপত্রের ওপরেও ক্রমশ নজর দেওয়া হতে লাগল—কারণ আসবাবপত্র থেকেই বেশ স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় নাটকের পাত্র-পাত্রীর স্টেটাস এবং কি জাতের কাজকর্ম করতে তাঁরা অভ্যস্ত এইসব বিষয়ের।

পর্দা ওঠবার সঙ্গো সঙ্গো মণ্ডল-সজ্জা দেখে—এবং পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ সুরু হবার আগেই—দর্শক নাটকের পরিবেশ সম্বন্ধে খানিকটা আঁচ করতে পারতেন। স্টেজ প্রপার্টিজও খুব বিচার-বিবেচনা করে ব্যবহার করা হতে লাগল। আগেকার আবাস্তব নাটকে কচিং-কমাচিং এই স্টেজ প্রপার্টিজের ব্যবহার হোত। সের-

পায়ের নাটকে তো অস্পষ্ট এবং বাস্তবসম্মত ছাড়া কোন স্টেজ প্রপার্টিজই প্রায় বাদ পড়ত না। রিয়ালিস্টরা শব্দ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যই যে এইসব স্টেজ প্রপার্টিজের দিকে বিশেষভাবে নজর দিলেন তা নয়, সত্যিকার ড্রামাটিক পারপাসের জন্যও যে এসবের কত প্রয়োজন তা স্পষ্ট করে তুললেন রিয়ালিস্টিক নাটকের মণ্ডল-পায়ণে। ইবসেন নিজেও খুব জোর দিতেন এই ব্যাপারে—অনেক সময়ে এর থেকে, অর্থাৎ নাটক এবং প্রপার্টিজের ভেতর সামঞ্জস্য আনতে গিয়ে সিম্বলিজমের সৃষ্টি হোত—যেমন ধরুন এ ডল্‌স হাউসের চিঠিটি, হেন্ডা গ্যাবলারের পিস্তল, বা ওয়াইল্ড ডাক নাটকের ডাকুটি।

প্রচলিত ধারার অভিনয়কেও সম্পূর্ণ বদলে দিতে হোল বাস্তববাদী নাটকে। কাঁধে গদ্যের সংলাপ আর অলংকারবহুল অমিত্রাক্ষর ছন্দের সংলাপ বা বাণীমতাপ্রধান সংলাপ বলার ধরণটা তো কখনই এক হতে পারে না। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের কথাবার্তা, জেসচারস্ ইত্যাদির ভেতর যে স্বাভাবিকতা দেখানো দরকার তা না দেখিয়ে যদি আবৃত্তির ধরণে সংলাপ বলা হয়, বা যদি স্টাইলাজড জেসচারসের সাহায্যে অভিনয় করা হয় তবে বাস্তববাদী নাটকের মণ্ডল-পায়ণ দেখে লোকে হাসি সম্বরণ করতে পারবে না। এর উল্টোটা কিন্তু হাস্যস্পদ মনে হয় না। ক্লাসিক্যাল বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা নাটকের অভিনয় রিয়ালিস্টিক স্টাইলে হতে পারে—তবে এ ধরণের অভিনয়কে মম্বস্পর্শী করবে হলে সত্যিকার শক্তিশালী অভিনেতার দরকার। যেমন নাট্যাচার্শ শিশিরকুমারকে দেখেছি চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করত



ইবসেনের 'পিয়ার জিন্টের' দৃশ্য—কম্পোজিসন লক্ষণীয়

কম সময়ে—সময় সময় ক্র্যাসিক্যাল হীত্য, আবার অনেক সময়ে একেবারে ন্যাচারলিস্টিক ধরণে।

এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের আবৃত্তি দৃষ্টান্ত একটা অসুত ব্যাপার লক্ষ্য করোঁ। ইউরোপে আবৃত্তি করবার সময় সাধারণত 'কেনচরস্' বা চোখের কাজ করা নিষিদ্ধ। অথচ শিশিরকুমার এ দুটিই করতেই কবিতা আবৃত্তির সময় এবং এর ফলে তাঁর আবৃত্তি যেন লোককে মন্তমুগ্ধ করে রাখতো। শুধু প্রতিভাবান শিল্পীদের সম্বন্ধে একটি কথা বলা হয়— 'there are rules which follow no rules.' অর্থাৎ প্রতিভাশালী শিল্পীদের নিয়মের গুড়ীতে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। আমাদের দেশেও এ ধরণের উক্তি আছে, যেমন—নিয়তিকৃত নিয়মহীন। তবে বিরাট শক্তিশালী প্রতিভাবান শিল্পীদের সম্বন্ধেই এসব কথা প্রযোজ্য।

বাস্তববাদী নাটকে সংলাপের তাৎপর্য হুঁকু এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই অনুসারে একাক্ষর করিতে হয়। তাছাড়া চরিত্র-মূলি বৈশিষ্ট্যের লোক, নাটকে বর্ণিত সেই সব জায়গার উচ্চারণভঙ্গী বা ভাষার বিশেষত্ব স্থানান্তর দরকার দেখা দিচ্ছিল রিয়ালিস্টিক নাটকে। সুতরাং অভিনেতাদের পক্ষে সুদৃষ্ট অভিনয়ের জন্য সবচেয়ে দরকার হয়ে পড়ছিল নরপাণের মনুষ্যের সঙ্গে ভালভাবে পরিচয় করা, বিভিন্ন প্রেক্ষার, বিভিন্ন সামাজিক স্তরের এবং বিভিন্ন ধরণের কাজ করছে এইসব লোককে জানা। ট্রাডিশন অব স্টেজ পার-ফরম্যান্স নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাতে হচ্ছে অভিনেতাদের।

এর আগে নাটকে অভিনেতার নিজেদের অভিনয় ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু বাস্তববাদী নাটক এ দাঁড়াল জীবনের বিশ্বের ভাষাকার এবং

এই ভাষার দিকটাকেই সহজভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব পড়ল অভিনেতা, অভিনেত্রীদের ওপর। তার মানে এই নয় যে, অভিনেতাদের ইম্পারটেন্স কমে গেল। বরং নতুন প্রেক্ষার এইসব নাটকের ইন্টারপ্রেটেশনের দায়িত্ব এসে পড়তে আরও অনেক বেশি অভিনয়ক্ষমতাসম্পন্ন আর্টিস্টদের দরকার দেখা দিল মণ্ডলিনদের জন্য।

এসব নাটকে অভিনেতা আর সুযোগ পেতেন না ফুট লাইটের সামনে এসে দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার। পরিচালকদেরও কৌশলের সাহায্যে নানা উপায় বের করতে হতো কিভাবে প্রোডাকশনের সব দিককে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করা যায়—তাকে আবার বিশেষভাবে নজর রাখতে হতো যেন অভিনেতার বক্তব্য বা একাক্ষর চাপা না পড়ে আর ব্যাপারের ওপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে। বিশেষত যখন বহুসংখ্যক অভিনেতা স্টেজের ওপর রয়েছেন তখন এমনভাবে তাঁদের মণ্ডলের ওপর সাজাতে হতো যাতে এঁদের কম্পোজিসন দর্শকদের আনন্দবর্ধন করে এবং সৌন্দর্যসম্মত হয়। অথচ কম্পোজিসন ঠিক করতে গিয়ে অভিনয় ব্যাহত না হয় সেটাও দেখতে হতো।

রিয়ালিটি এবং ইলিউশন অব রিয়ালিটি-এর ব্যাপারটা স্টেজ মডুমেণ্টের বেলাতেও প্রযোজ্য। রিয়ালিস্টিক স্টেজ দেখতে গিয়ে আমাদের সময় সময় মনে হয় একেবারে সত্যিকার বাস্তবের দৃশ্য দেখছি—কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারবেন যে, স্টেজ মডুমেণ্ট সব সময়েই স্টাইলাইজড হয় এবং পরিচালকের শ্রম অনুসারে হয়ে থাকে। কারণ মডুমেণ্ট আগে থেকে রিহার্সালের দ্বারা পোক্ত করে না নিলে স্টেজ সত্য নাটকের গতি এবং অভিব্যক্তি বারবার ব্যাহত হতে থাকবে। শ্রমজ্ঞ মডুমেণ্টের আরও দরকার হয় এইসব কারণে—প্রোসেনিয়াম

থিয়েটারে অভিনেতার সমসময়েই স্টেজের ওপর এমন জায়গায় দাঁড়ানো দরকার যেখান থেকে প্রেক্ষাগৃহের সব দর্শক তাঁকে দেখতে পায়। তাছাড়া সহ-অভিনেতাকেও কাতার করলে চলবে না—আর সবার ওপরে এই বিষয়ে এয়ারকে নজর রাখতে হবে যাতে স্টেজে যখন বা ঘটছে বা অন্য অভিনেতা যখন কথা বলছে, তখন কোন কারণেই যেন দর্শকদের মনোযোগ না ব্যাহত হয় তাঁর কোন ভাবভঙ্গী বা মডুমেণ্টে। নির্ধারিত সময়ে স্টেজে ঢোকা এবং বেরিয়ে যাওয়া অভাস করতে হবে অভিনেতাকে—একাক্ষরের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে কোন বিকৃত মডুমেণ্ট করলে সমস্ত স্টেজটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

Elmer Rice বলেছেন :

In a well-directed play, everything that is said or done is carefully planned and rehearsed with an eye to maximum dramatic effectiveness. It is only the amateur playwright, actor or director who thinks that realism means a slavish imitation of life.

রিয়ালিস্টিক থিয়েটার মডুমেণ্ট ইউরোপের রূপমণ্ডে পঞ্চাশ বছরের ভেতরেই বিরাট বিপ্লবের স্ফাবন বইয়ে দিয়ে সবাকিছু ওলট-পালট করে দিল। ইবসেনের প্রথম বাস্তববাদী নাটকটি দি লীগ অব ইউথ লেখা হয়েছিল ১৮৬৯ সালে। ইবসেন, স্ট্রীন্ডবার্গ, শেখ্স, সিজ, টলস্টয়, ওয়াইল্ড প্রভৃতি সব বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকারই প্রথম ওয়াল্ড ওয়ার স্ট্রু হবার আগেই লোকান্তরিত হয়েছিলেন। আর ধরা নামী নাট্যকার ছিলেন তাঁদের মধ্যে কিছু এই সময় রচনা-উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছেন, আর কিছু চরম খ্যাতিলাভের পর-পড়তির দিকে চলেছেন। অবশ্য ক্রমে ক্রমে এইসব নাট্যকারদেরও অনুবর্তীর দল দেখা দিতে লাগলেন ধীরে ধীরে—তবে এঁদের কারোর নাটকই রচনার দিক থেকে ইবসেন, বার্নার্ড শ, শেখ্স, সিজ প্রভৃতির রচনার সঙ্গে কোনো অংশেই তুলনীয় নয়।

এবার আবার আমেরিকান নাটকের আলোচনায় ফিরে যাব—ওপরে বর্ণিত সময়ের কিছু পরেই আমেরিকান রূপমণ্ড এবং নাট্য রচনার ক্ষেত্রে দেখা দিল রেভোলিউশনারী প্রগ্রেস—বহুদিন পেছনে পড়ে থাকার পর আমেরিকানরা যেন এক লাফে এগিয়ে এসে ইউরোপীয়ান রূপমণ্ডের একেবারে গায়ে ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। এলমার রাইস বলেছেন—

For unlike the European movement, which had passed its zenith at the beginning of the war, the American movement did not begin until the war's end.

(রূপমণ্ড)

পূর্ণসঙ্গে সম্ভবত মহামেডান স্পোর্টিং-ক্লাব-বন সাকুলার স্কোলের বাড়িটা থেকে মাঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন সত্যিই তাদের মধ্যে মনে হচ্ছিল যে, যেন তারা কোন যুদ্ধক্ষেত্রে চলেছে। প্রতিটি খেলোয়াড় কেমন যেন চিন্তাম্বিত, গম্ভীর; তাদের মধ্যে নেই কোন কথা, তবে একটা দৃঢ়তার ছাপ যেখানে বর্তমান। কারণ, তাদের এইদিনের চ্যারিটি ফুটবলযুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানের বিপক্ষে।

লীগের আসরে এই মোহনবাগান-মহামেডান চ্যারিটি খেলাটির পূর্বে অসীম। কারণ এই খেলার জয়পরাজয়ের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করছিল লীগের ভাগ্য; এই খেলায় জয়লক্ষ্যীর অনুগ্রহ লাভ না করতে পারলে লীগ জয়ের পথটা দুর্ভাগ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খুবই বেশি। পশ্চাতেই ইন্ট-বেঙ্গল অনুসরণ করছে মোহনবাগানকে তিন পরসেক্টর ব্যবধানে, আর মোহনবাগান দু-এক পরসেক্ট অপচয় করলে পূর্ণ সুযোগ নিয়ে স্বিগ্ধ্র উদ্যমে লীগজয়ের এক শেষ চেষ্টা নিয়ে কাঁপিয়ে পড়বে তারা।

ইন্টবেঙ্গলের বিপক্ষে চ্যারিটিতে ব্যর্থতার বোঝা কাঁধে নিয়ে, এক পরসেক্ট সংগ্রহ করে মোহনবাগানকে ভবিষ্যতে ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু মহামেডানের বিপক্ষে সাধারণ ক্রীড়া-মন্ডা প্রদর্শন করেও জয়লক্ষ্যীর অপার অনুগ্রহে, পুরো পরসেক্ট সংগ্রহ করে ললাটে জয়ভিত্তিক নিয়ে মোহনবাগান দল মাঠ থেকে ফিরল। ভাগ্যলক্ষ্যী বিরূপ ছিলেন বলেই মহামেডান দলের ভাগ্যে জুড়েছে পরাজয়ের তির্যক আশ্বাদ।

মহামেডানদলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানদল বিজয়ী হয়েছে বলেই তাদের একেবারে হেঁচকের মর্বাদা দিলে সত্যিই মহামেডান দলের প্রতি আবিচার করা হবে। প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ফলে শেষ পর্যন্ত মোহন-বাগানের ভাগ্যে জুড়েছে জয়মাল্য। উন্নত



অসীম মৌলিক

খেলা ধূলা



মোহনবাগান-মহামেডান চ্যারিটি খেলার মহামেডানের পুরোভাগের একটি আক্রমণধারা
করছেন গোলরক্ষক কমল সরকার।

ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে এবং সমানতালে মোহনবাগানের গোলে হানা দিয়েও সেদিন মহামেডানকে শূন্য হাতে ভবিষ্যতে ফিরতে হয়েছে; কারণ তারা সব কিছুই করতে পেরেছে কিন্তু পারে নি শেষ কাজটুকু, মানে গোলে বলটি ঠেলে দিতে।

খেলার সূর্যতেই মহামেডানদলের পুরো-ভাগের আক্রমণের ঢেউ আছড়ে পড়ে মোহন-বাগানের গোলে এবং প্রথমই মহামেডানের এই নিশ্চিত গোলর সম্ভাবনাকে অপূর্ণ

প্রীতিমিত্রতা

কৃতিত্বের সঙ্গে বিনষ্ট করে দেয় মোহন-বাগানের গোলরক্ষক কমল সরকার।

এই প্রসঙ্গে গোলরক্ষকের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা না বললে সত্যিই অন্যায্য হবে। মোহনবাগানের পক্ষে এই খেলাটিই কমল সরকারের বড় খেলা। এদিনকার এই গুরুত্ব-পূর্ণ মাঠে কমলের অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রত্যেকটি দর্শকের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে। দু-একটি অবদারিত গোলর সম্ভাবনাকে তিনি যেভাবে প্রতিহত করেছেন

তার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা না করে পারা যায় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে বাটা এক উন্মাদার বিপক্ষে তিনি অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। একবার সকলে স্বীকার করবেন যে, কমল সরকার বিস্ময়কর হস্তে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে মোহনবাগানের গোলরক্ষা করে দলকে জয়লাভে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

খেলার প্রথমে প্রায় সাত মিনিট মহামেডান দলই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, অবশ্য তিন এরপরই মোহনবাগান আবার পাছটা আক্রমণ চালায়। মহামেডানের পুরোভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে গোল করার সহজ সুযোগ পেয়েছিলেন সারমাদ এবং পাপান। মোহন-বাগানের খেলোয়াড়েরাও কম বান নি। তাঁরাও নষ্ট করেছেন গোলর সুযোগ। খেলার প্রথমার্ধের একুশ মিনিটে অরুণকে অবৈধভাবে বাধা দেবার ফলে মোহনবাগান লাভ করল একটা ফ্রিকিক। অরুণের কিকটি থেকে হেড করে গোলর মধ্যে বল ফেললেন চুনী গোস্বামী, সুন্দরভাবে সেই বলটাকে গোলর দিকে ঠেলে দিলেন সুযোগ-সমধানী সেটর ফরয়ার্ড অশোক চ্যাটার্জী; গোলরক্ষক মুনতাকার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে বলটি



কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন সোফিয়া খাতুন।

জালে গিয়ে প্রতীত হল। মোহনবাগান হল ১—০ গোলে অগ্রগামী। এরপর দুই দলেরই গোলের সুযোগ হারানোর কাহিনী এবং শেষ পর্যন্ত তাদের অগ্রগমন অব্যাহত রেখে মোহনবাগান ওই নতুনতম গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়। মহামেডান একটি পেনাল্টির সুযোগ থেকে বাঞ্ছিত হয়েছে বলে কোন কোন মহলের অভিযোগ। পেনাল্টি সীমানার মধ্যে নাকি সারমাদকে অবৈধভাবে বাধা দিয়েছিলেন রহমান; বাই হোক এই সময়ে রেফারীর সিদ্ধান্ত মহামেডানের বিপক্ষেই যায়।

চারিটি ম্যাচটির আগের খেলাটিতে মোহনবাগান পরাজিত করে হাওড়া ইউনিয়ন দলকে ০—১ গোলে। হাওড়া ইউনিয়ন তাঁর প্রতিস্বন্দ্বিতার আভাস দিয়েছিল। মোহনবাগানের পক্ষে প্রথম গোলটি দেন অমল চক্রবর্তী এবং শেষ দুটি অশোক চ্যাটার্জী। জর্জ টেলিগ্রাফ দলের বিপক্ষে মোহনবাগান বিজয়ী হয় ৫—০ গোলে। প্রথম লীগের খেলায় এই টেলিগ্রাফ দলই মোহনবাগানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল একটি মূল্যবান পয়েন্ট। এইদিন মোহনবাগানের সহজ-সাফল্যের মূলে তাদের সুযোগ-সম্মানী সেন্টার ফরোয়ার্ড অশোক চ্যাটার্জীর অবদান কম নয়। অশোক একাই তিনটি গোল দেন। এই খেলাটির পর মোহনবাগানের লীগে অবস্থান হয় ২৪টি খেলায় ৪৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তালিকার শীর্ষে।

লীগসমূহে ইস্টবেঙ্গলদলও একটি বিরাত বাধা অতিক্রম করেছে সাফল্যের সংগে। সুজাতের বিজয়সূচক গোলে ইস্টবেঙ্গল বি-এন-রেলকে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয়ার্ধের ১৬ মিনিটের সময় গোলটি হয়। বি-এন-রেলদলের খেলা হতাশ করেছে সকলকে। বলতে গেলে খেলার ওপর প্রাধান্য ছিল ইস্টবেঙ্গলের। নিম্নমানের খেলার জন্য দায়ী বি-এন-রেলের এলোমেলো প্রশাসনীয় ক্রীড়াধারা।

ইস্টবেঙ্গল এরপর সহজেই স্পোর্টিং ইউনিয়নদলকে পরাজিত করে। এই খেলাটিতে সিংহল থেকে আগত দুজন ফুটবলারের মধ্যে একজনকে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে খেলতে দেখা যায়। ইনি হলেন পিটার উইলকিন্স এবং উইলকিন্স সিংহলের জনপ্রিয় খেলোয়াড়। প্রথম আবির্ভাবে বর্ষগণিত পিচ্ছিল মাঠে উইলকিন্স মন্দ খেলেন নি। সিংহল থেকে আগত অপর খেলোয়াড় আব্দুল রাউফকে এদিন অবশ্য খেলতে দেখা যায় নি। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে এদিন দুটি গোলই করেন সেন্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক। এই খেলাটিতে জয়লাভ করে ইস্টবেঙ্গল ১১টি খেলার মাধ্যমে সংগ্রহ করে ৩২ পয়েন্ট।

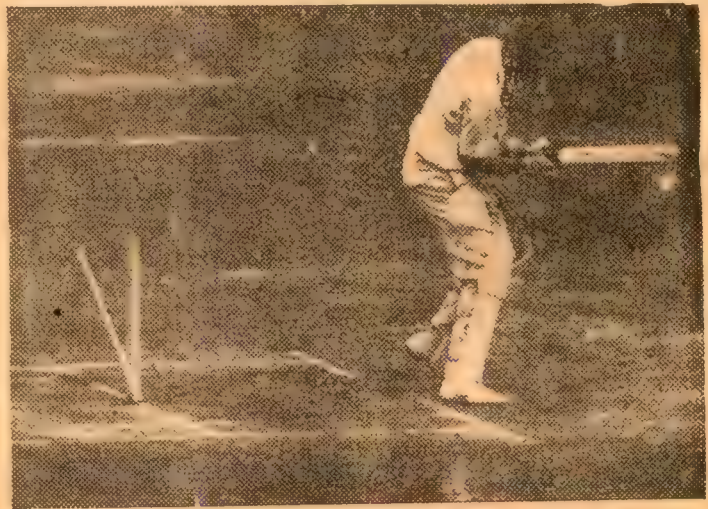
রাজস্থানের কাছে ইস্টার্ন রেলদলের ১—০ গোলে পরাজয় সভাই যথেষ্ট বিস্ময়ের

সৃষ্টি করেছে ক্রীড়ামাদীমহলে। লীগে তৃতীয় স্থানের জন্য জের প্রতিযোগিতা চলছে মহামেডান স্পোর্টিং আর ইস্টার্ন রেলের মধ্যে। মহামেডানদল ১—০ গোলে পরাজিত করেছে কালীঘাটকে। হাওড়া ইউনিয়নের সংগে খেলায় এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে তারা অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেছে। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করছি।

সবুজ গ্যালারীর অবুঝ দর্শক

ময়দানে কিছুদিন শান্তির পর আবার অশান্তির কালোছায়া লীগ ফুটবলকে স্পর্শ করল মহামেডান ও হাওড়া ইউনিয়ন দলের খেলায়। মাঠে উপস্থিত পুলিশ ব্যবস্থা থাকলে হয়ত সেদিন মাঠে এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত না। কলকাতা মহানগরীতে গ্রাম আন্দোলনের জন্য মাঠে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ এখানে উপস্থিত হয় নি।

খেলার দ্বিতীয়ার্ধে মহামেডানের পক্ষে একটি পেনাল্টির সুযোগ দিয়ে, লাইন্সম্যানের মতামত নিয়ে রেফারী যখন তাঁর সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন তখনই সবুজ গ্যালারীর দর্শকরা অবুঝ হয়ে ওঠেন। প্রথমে সবুজ গ্যালারী থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় জুতো, ইট আর চেয়ার বর্ষণ শুরু হয়ে যায় মাঠের মধ্যে, তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে প্রায় শব্দরেক উৎসাহী দর্শক মাঠের মধ্যে নেমে বিপুল বিক্রমে মেয়ে আসেন রেফারী, লাইন্সম্যান আর হাওড়াদলের খেলোয়াড়দের দিকে। তাঁরা হাওড়া ইউনিয়নের তাঁবুতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন নিরুপায় হয়ে। মহামেডানদলের খেলোয়াড়েরা অবশ্য বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন। এই সময়ে মাঠের মধ্যে অশ্বারোহী পুলিশ প্রবেশ করলে অশান্ত দর্শকেরা শান্ত হতে বাধ্য হন। প্রায় আট মিনিট পর পুনরায় খেলা শুরু



লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টে ডাম্রিলের বলে ইংল্যান্ডের রানসের আ

হয়। এই খেলায় অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দায়ী করা চলে রেফারীকে, কারণ তাঁর দৃঢ়তা এবং ট্রেটিং পরিচালনার ফলেই এই ঘটনার উদ্ভব।

আই এফ এন লীগ কমিটির সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ফিরতি চ্যারিটি খেলাটি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পুলিশ কতৃপক্ষ আই এফ একে জানিয়েছেন যে, শহরে বর্তমানে ষ্ট্রাম আন্দোলনের জন্য উদ্ভূত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পক্ষে ওই শনিবারের চ্যারিটিতে পুলিশ সাহায্য দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। আর পুলিশ সাহায্য ব্যতীত এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খেলা অনুষ্ঠিত করা সম্ভব নয় বলেই আই এফ এ খেলাটি হবে না বলে জানিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গল ও রাজস্থানের খেলা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলদল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে চ্যারিটি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে না বলে আই এফ একে যে চিঠি দিয়েছিল, সে সম্বন্ধেও আই এফ এন ২৮শে জুলাইয়ের সভায় আলোচনা করা হয়। এই সভায় স্থির হয়েছে যে ২রা আগস্টের গভর্নমেন্টের সভায় ইস্টবেঙ্গল ও রাজস্থানের খেলায় ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

কীড়াঙ্গনের অভিশাপ

একথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে, এখনও এই সভ্য জগতের কীড়াঙ্গনে সাদা-কালোর ভেদাভেদ তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এখনও এই ঘৃণ্য ভেদাভেদের সংকীর্ণ গম্ভীর মধ্যে থেকে দৃষ্ট দৃষ্টির মত বিরাজ করছে উদার কীড়াঙ্গনের বৃকে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই নীতির জন্য বর্তমানে মলতে গেলে সে একঘরে। একমাত্র দু-একটি শ্বেতকায় দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশই দক্ষিণ আফ্রিকাকে খেলাধুলার আসরে আমন্ত্রণ জানায় না। ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকাকে খেলায় আসরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলতে গেলে পরোক্ষভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার এই বর্ণবৈষম্য নীতিকে সমর্থন করছেন বলেই ধরে নিতে হবে।

কয়েকদিন পূর্বে ইংলন্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হল লর্ডসে। ইংলন্ডের কয়েকজন পার্লামেন্টের সদস্য এই খেলার পূর্বে এক সংযুক্ত প্রতিবাদলিপি পেশ করেন মেরিলিবন ক্রিকেট ক্লাবের সম্পাদক বিলি গ্রীফিথের কাছে। বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা অশ্বেতকায় খেলোয়াড়দের পুরোপুরি স্বীকৃতি দিচ্ছেন, ততদিন আর তাদের কোন খেলায় আমন্ত্রণ না করার জন্য তারা এম সি সিকে অনুরোধ জানিয়েছেন। একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বর্তমানে কালোরাই খেলায় জগৎ জ্বলো করে রেখেছেন। প্রায় সব খেলাতেই কালোরা এখন সাদাদের ছাড়িয়ে বহু দূরে

এগিয়ে গিয়েছেন। ফুটবলে রেজিলের একচ্ছত্র প্রাধান্য। ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সুনাম অক্ষুর রেখেছেন অশ্বেতকায় খেলোয়াড়রাই। অলিম্পিকের আসরের দিকে তাকালেই এ সভ্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। জিম থর্প, জেসি ওয়েন্স আর উইলমা হুডলফের মত অশ্বেতকায় এ্যাথলেটের সমপার্শ্ব্যেই আসেন না কোন এ্যাথলেট; এ তো গেল স্মরণীয় নাম-গুণির মাত্র কয়েকটি অশ্বেতকায়ের নাম। বিশ্ব হেডাওয়ার্টে হুডলফের দুই নারক ক্যাসিয়াস ক্রে আর সোনি লিন্ডেনের কথা নয় বাদই দিলাম।

উদার কীড়াঙ্গনকে বর্ণবৈষম্যের দূষিত



কেন ব্যারিংটন

আবহাওয়া থেকে দূরে রাখার জন্য প্রতিটি সভ্যদেশের উচিত দক্ষিণ আফ্রিকাকে বয়কট করা।

ইংলন্ডের টেস্টযুদ্ধ

কিউইজের পর এবার স্প্রিংবকেরা ইংলন্ডের ক্রিকেট আতিথ্য। নিউজিল্যান্ডের টেস্টযুদ্ধে পরাজিত করার পর, দক্ষিণ

আফ্রিকাকে কিন্তু প্রথম টেস্টে ইংলন্ড পরাজিত করতে পারে নি। খেলার নির্ধারিত সময় যখন শেষ হয়, তখন ইংলন্ডদলের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র ৪৬টি রান এবং হাতে ছিল দুটি উইকেট।

লর্ডসে অনুষ্ঠিত এই প্রথম টেস্টে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মাঠে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করে ২৮০ রানে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান সংগ্রহ করেন গ্রাহাম পোলক। গ্রাহাম পোলকের এই ৫৬ রানের পর উদ্বোধনযোগ্য হল পিটার পোলকের ৩৪ রান আর বটেনের ৩০ রান। ইংলন্ডের বোলারদের মধ্যে রামসে সংগ্রহ করেন ৩টি উইকেট এবং ব্রাউন ৩টি উইকেট।

ইংলন্ডের প্রথম ইনিংসের দ্বিতীয় রান-সংখ্যা দক্ষিণ আফ্রিকার রানসংখ্যাকে অতিক্রম করে গিয়ে পৌঁছায় ৩০৮ রানে। কেন ব্যারিংটন ৯১ রানে আউট হন, মাত্র নয় রানের জন্য তাঁর আর সেঞ্চুরী করার সৌভাগ্য হল না। টিটমাস ৫৯ রান সংগ্রহ করে এবং বারবার ৫৬ রান সংগ্রহ করে বখেট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ডামারিল সংগ্রহ করেন ৩টি উইকেট।

দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। বার্নো ৫২ রান এবং ব্রেড ৭০ রান সংগ্রহ করে দলকে কখনো সাহায্য করেন; কিন্তু দলের মোট রানসংখ্যা হয় শেষ পর্যন্ত ২৪৮। এই ইনিংসেও রামসে এবং ব্রাউন উভয়েই সংগ্রহ করেন তিনটি করে উইকেট।

ইংলন্ডদল যখন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে তখন জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল মাত্র ১৯১ রান, সময় অবশ্য বেশি ছিল না। দ্বিতীয় ইনিংসে কিন্তু ইংলন্ডের দুই উইকেটের পতন ঘটেই থাকে, ফলস্বরূপ চেন্টার কিছটা তাড়াহুড়ো করার ফলেই হয়ত ইংলন্ডের ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটে। বরকট ২৮ রান সংগ্রহ করে এবং কড্ডে ৩৭ রান সংগ্রহ করে দলের পতন রোধ করার চেষ্টা করেন। ইংলন্ডের সাতটি উইকেটের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ডামারিল সংগ্রহ করেন ৪টি উইকেট। খেলা যখন শেষ হল ইংলন্ডের রানসংখ্যা তখন ১৪৫ রানে ৭ উইকেট। খেলার পরিণতি তখন এমন ছিল যে, আরও কিছু সময় থাকলে কার গলে যে জরমাল্য পড়ত তা বলা মুশকিল।

খেলোয়াড় আনন্দের জন্য—সম্মানের জন্য নয়

গত ২৫শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্পোর্টস সংস্থার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীচাগলাকে এক সম্বর্ধনা দেওয়া হয় কালিকাটা ইনফরমেশন সেন্টারে। শ্রীচাগলা তাঁর ভাষণে বলেন যে, বৈদেশিক মন্ত্রণার সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে ভারতকে বিরত থাকতে হচ্ছে



জৈমন্যাস্টিক বারের খেলার এক অপূর্ণ ভাঙ্গলায় ঢৌকিও অলিম্পিক বিজয়ী চেকোস্লোভাকিয়ার ডেরা কাসালভো।

বলে, বর্তমানে আমাদের দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমাদের দেশের খেলাধুলার মান আরও উন্নত করতে হবে। তিনি বলেন যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সফর এবং ভারতীয় কোল্টস দলের সফর বাতিল হওয়া সভাই খুব দুঃখের বিষয়। কিন্তু বাতিল না করে কোন উপায়ই ছিল না। তিনি ভারতের পল্লী অঞ্চলের লোকদের মধ্যে খেলাধুলাকে জনপ্রিয় করে তোলার দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন। কারণ, ভারতের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক বাস করে পল্লী অঞ্চলে। শ্রীচাগলা বলেন লোকদের খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করা উচিত আনন্দ লাভের জন্য, সম্মান বা পুরস্কার লাভের জন্য নয়। লোকে খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করতে সুরু করলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

এই অনুষ্ঠানে প্রায় একশো তেরোটি ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীচাগলাকে মাল্যদান করা হয়। বাংলার পক্ষে যে সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রী সর্বভারতীয় আসরে প্রেস্টেজের মর্যাদা পেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে শ্রীচাগলার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন সোফিয়া খাতুন, রুবি নন্দী, শিখাশ্যাম রায়, গৌরাঙ্গ মল্লিক, রাজীব শা এবং অনিল মজুমদার।

সমাচার দর্পণ

প্রাক্তন বিশ্ব লাইট হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান ফ্রেড মিলসের প্রাণশূন্য গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ পুলিশ লন্ডনের চার্লিং ক্রশ রোডে তাঁর মোটরগাড়ির মধ্য থেকে উদ্ধার করেন। পুলিশের মতে মিলস রাত্রি একটার সময় গুলীবিদ্ধ হন। ফ্রেড মিলসের এই মৃত্যু হত্যা না আত্মহত্যা, এ নিয়ে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। চার্লসের গাড়ি থেকে একটি রাইফেল পাওয়া যায়।

বর্তমানে মিলসের বয়স ৪৬ বৎসর। তিনি ১৯৪৮ সালে বিশ্ব লাইট হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান হন। ১৯৫০ সালে পরাজয়ের পর তিনি লন্ডনে একটি নাইট ক্লাব খোলেন।

* * *

আগামী শীতকালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল ছয় সপ্তাহের সফরে আসবেন পাকিস্তানে। পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক বসির আমেদ বলেন যে, কয়েকদিনের মধ্যেই সফরসূচী তৈরি হয়ে যাবে।

* * *

বটেনেবু দূরপাল্লার দৌড়বীর রন হিল ২৫ কিলোমিটার এবং ১৫ মাইল দৌড়ে নতুন বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বোন্টনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় তিনি ২৫ কিলো

মিটার ১ ঘণ্টা ১৫ মিঃ ২২-৬ সেকেন্ডে এবং ১৫ মাইল ১ ঘণ্টা ১২ মিঃ ৪৮-২ সেকেন্ডে অভিজ্ঞ করে নতুন রেকর্ডটি করেন। এই বিষয়ে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী ছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ার বিশ্বজয়ী দৌড়বীর এমিল জেটোপেক। প্রায় দশ বছর জেটোপেকের এই রেকর্ডটি অক্ষান ছিল।

* * *

ভারত ও জাপানের ডেভিস কাপের পূর্বসংসার ফাইনাল খেলাটি এবার অনুষ্ঠিত হবে ঢৌকিওতে অক্টোবর মাসের প্রথমে। বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের জন্য খেলাটি ভারতে অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হল না। ভারতের পক্ষে অংশ গ্রহণ করবেন রমানাখন কৃষ্ণা, জয়দীপ মুখার্জী, প্রেমজিৎ লাল এবং শিব মিশ্র।

* * *

এবার ভারতের বিভিন্ন টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে চারজন রাশিয়ান খেলোয়াড়ের যোগদান নিশ্চিত। জার্মানীর সেরা খেলোয়াড় বৃংগার্ট এবং অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়কে এই সমস্ত প্রতিযোগিতার জন্য ভারতে আনয়নের চেষ্টা চলছে। আলোচনা সফল হলে তাঁদের ভারতে খেলতে দেখা যাবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিগনিবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মৃদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুচীপত্র

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়
বিপ্লবী হাটে (কবিতা)
এখনো নাচে যদি সঘন শব্দরা (কবিতা)
বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়
ভারতীয় বিপ্লবে অস্ত্রসাধনা
সত্যগ্রহ আন্দোলনঃ কয়েকটি নতুন
বন্দীশালা থেকে বিয়াল্লিশের আগস্ট বিপ্লব
কত মাতা মিল হৃদয় উপাড়
স্বাধীনতা যুদ্ধে মৌদীনীপুরের মেয়েরা
আগস্ট আন্দোলন কি কংগ্রেসের আন্দোলন?
১৯৪২-এর আন্দোলনে মৌদীনীপুর
আমার অভিজ্ঞতা
১০ নম্বর লড্জ সিন্ধা রোডে
জেলখানার সেই ছোট ডাক্তারবাড়
স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রসঙ্গে
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়
দীনেশ গুপ্তের রবীন্দ্রনাথ
পেরিয়েল্লের সমাধি

— দুর্গাদাস সরকার
— আব্দুল কাশেম রহিমউদ্দিন
— অরুণচন্দ্র গুহ
— পাম্মালাল দাশগুপ্ত
— বিজয়সিংহ নাহার
— ত্রিদিব চৌধুরী
— সুনীতি ঘোষ (চৌধুরী)
— আভা মাইতি
— অমল্য সেন
— কুমার জানা
— শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
— সত্যনারায়ণ সিংহ
— বাণী ভৌমিক
— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
— ভূপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
— প্রদ্যুম্নরঞ্জন চক্রবর্তী

৬৪৫
৬৪৬
৬৪৮
৬৪৯
৬৫১
৬৫৫
৬৫৭
৬৬০
৬৬১
৬৬২
৬৬৩
৬৬৪
৬৬৫
৬৬৬
৬৬৭
৬৬৮
৬৬৯
৬৭০
৬৭১
৬৭২
৬৭৩
৬৭৪
৬৭৫

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্কোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের চিত্র আলেখ্য। শাসক সমাজদায়ের দ্বারা নির্ধ্যাতিত বাস্তবায়িত মুকুন্দরাম চণ্ডী ও বেদনারিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তিগত হুঁশে কি করিয়া সর্বজনের হুঁশে হইতে পারে বাঙ্গালার সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হুঁশে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার যোগাটিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বঙ্গবান্দ প্রবন্ধ আছে—

১। মূল কাব্য, ২। ভবিষ্যৎ ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি,
৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (কবি বহিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিবৃত
কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নাহাররঞ্জন গুপ্তের প্রশ্নাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমের চমকপ্রদ বিষয়ক
কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী যৌরোপ-
সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত
বুদ্ধিদীপ্ত কীর্তি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিত্র সাহিত্যে

ডাঃ নাহাররঞ্জন গুপ্তের দ্বিতীয় অধ্যায়

—তেরখানি নির্দোষিত রচনা—

কালো ভ্রম, কয়েক দ্যা মেরে,
হুজুরী রক্তবর্ণী নীলা, পদ্মকোষ
পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তপেচুরা,
দুঃ, কালচক্র, কবর, পাখির
চোখ, সর্প, অজুর্বা, প্রণাম জানাই

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

প্রবন্ধমালা বঙ্গোপাধ্যায়ের

মর্গলাল প্রশ্নাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩০০ পৃঃ—৫



সূচীপত্র



বিবরণ

লেখক

পৃষ্ঠা

বর্তমান মনে পড়ে
জমপাইগুড়িতে '৪২-এর আন্দোলন
ইংরেজ আমলে শ্রমিকদের বিশেষ শাখার কর্মকর্তা
বিকুন্ডা জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়
১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লবের একটি কাহিনী
১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলন
ফুলি নাই
লোকসঙ্গীতে জাতীয়তা
প্রাক স্বাধীনতা যুগ থেকে এযুগের কীড়াগান

— শরৎচন্দ্র সেন
— চারুচন্দ্র সান্যাল
— মনোরঞ্জন গুপ্ত
— ব্রজীন্দ্রমোহন চৌধুরী
— যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
— সুব্রহ্মসেনমোহন ঘোষ
— অনন্ত সিং
— বংশদেব রায়
— শ্রীঅমিতাভ

৬৮২
৬৮৬
৬৮৭
৬৯২
৬৯৫
৬৯৭
৬৯৮
৭০২
৭০৫

প্রচ্ছদ পরিচয়:

১৯০০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের ৬৪ জন মুক্তিযুদ্ধে দীক্ষিত নির্ভীক যুবক কাঁপিয়ে পড়েছিল সশস্ত্র বৃটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে। বৃটিশের অসহায়গণগুলি দখল করে, বহিষ্করণ থেকে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন রেখে সগৌরবে ওরা উড়িয়েছিল জাতীয় পতাকা। শহর থেকে ছয় মাইল দূরে ২২শে এপ্রিল জালালাবাদের পাহাড়ে অনিন্দ্য, ক্রোধ ও পরিশ্রমে ক্লান্ত এই তরুণের দল ইংরেজ অধিনায়কের পরিচালিত গোঁবা ফৌজের সঙ্গে আমত্যা সংগ্রাম করেছিল—তবু ওরা আত্মসমর্পণ করে নি। ওদের সামনে ছিল স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন, মনে ছিল দৃঢ় পন্থা—মুক্তি অথবা মৃত্যু। এই মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত দিগে মুক্তিপথে এগিয়ে যাবার ডাক দিয়ে গেছিল—প্রথম সারি : জিতেন দাস (১৭), নবু দত্ত (২৪), পদ্রিন ঘোষ (১৭); ২য় সারি : নরেশ রায় (২৪), রিপদ্রা সেন (২০), বিধু ভট্টাচার্য (২০), প্রভাস বল (১৮), দশাক দত্ত (১৭); ৩য় সারি : নির্মল লাল (১৭), টেগরা বল (১৫), দ্বিত কানুনগো (১৮)।

রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এস্থাবলী

নিকাসিতের আত্মকথা, উপকণ্ঠী, সিনাকিন, অনুমানের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিভ্রম, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানব, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বালক কথামালা

ঋগদাশ গুপ্তের এস্থাবলী

১ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপজ্ঞাস এবং ৩ খানি বড় ছেঁকা—দ্রুতবৎ এস্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভাতভষণ ভট্টের এস্থাবলী

যেচ্চাচারী, আশা, শব্দজ্ঞা, সন্তপদী
মূল্য—৩ টাকা

রসরস

অমৃতলাল বসুর এস্থাবলী

১য় ভাগে—হারশচন্দ্র, আদর্শ বসু;
ষাটকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোবের
উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি
১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিলাট, তরুণালা,
ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক
প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর এস্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারী-
লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার
কাব্য, সারদামঙ্গল, বজ্রবিয়োগ, প্রেম-
প্রবাহিনী, স্বপ্নদর্শন, সঙ্গীতশতক,
বজ্রসুন্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, মায়াদেবী,
হুমকেতু, শরৎকাল, দেববাণী, বাউল
বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও
সঙ্গীত।

মূল্য ৩ টাকা

নয়জন কবির কল্যাণ সংস্কৃত ও বাংলা
রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে
অভিনব আয়োজন।

বিজ্ঞানসুন্দর এস্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরার এস্থাবলী

২য় ভাগে—দীপা, বিজ্ঞানপ্রদ

মহামায়ার চর ও পুণ্যমায়ালন

মূল্য দুই টাকা

উপজ্ঞাস সাহিত্যের এদীপ্ত ভাস্কর

শচাশচন্দ্র চৌপাধ্যায়ের এস্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার,
সনাতন গোঁবা, পূজার মালা ও
রাগী ব্রজসুন্দরী।

মূল্য—এক টাকা

সাপ্তাহিক বসুমতী



৭০ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পাঃ

মুদ্রণালয়, ২৭শে ব্রাহ্মণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

Price : 25 Paise

Thursday, 12th Aug., 1963

১৫ই আগস্ট সমাগত। জাতির জীবনে এই দিনটির সঙ্গে যে যোগ লাভিত হয়েছে তা চির-অচ্ছেদ্য। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের আশা, আনন্দ, কল্যাণ ও উজ্জ্বল ভারতের জন্মবিড় স্বপ্ন।

আমরা আজ স্মরণ করছি আঠারো বছর আগেকার সেই ১৫ই আগস্ট দিনটির কথা, যেদিন নবলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে সারা ভারত উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। সেদিন না ছিল আমাদের অশ্রু, না ছিল ভূষণ; একমাত্র যা ছিল তা হচ্ছে অফুরন্ত প্রাণেশ্বর্য, অনমর-মায়ী বীরবৃত্তা।

জনতার সেই ঔৎসুক্য আজো আমরা ভুলি নি। আমরা ভুলি নি তাঁদের কথাও, যে সব স্বাধীনতার ঐতিহাসিক পরাধীন ভারতবর্ষকে পেষণ ও শোষণ থেকে উদ্ধার করার সুকঠিন সংকল্পে অতুলনীয় আত্মত্যাগে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। পরাধীনতার ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের শক্তিপরীক্ষার কাহিনী শুনলে আজো আমরা শিহরিত হই। ঐ সব কাহিনী সংগ্রহ করে যথার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এখনো রচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ স্বাধীন ভারতে ঐ সব কাহিনী উদ্ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা মনে রেখে, স্বাধীন ভারতবর্ষে মৃত্যুঞ্জয়ী ঐতিহাসিকদের শ্রদ্ধা জানাতে এবং স্বাধীন ভারতের মর্যাদা তুলে ধরার জন্যে ও তার অতন্দ্র প্রহরীদের গৌরবোজ্জ্বল

স্বাধীনতা দিবস

ঐতিহ্যের দিকে প্রাণবন্ত করার সুমহান সংকল্পে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের কিয়দংশ এই সংখ্যায় প্রকাশ করলাম।

বিপ্লবীদের সুমহান ত্যাগ বরণে অর্জিত স্বাধীনতার আঠারো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আজ দুঃখের সঙ্গে অনেকেই লক্ষ্য করছেন, স্বাধীনতা দিবসের সেই প্রথম আনন্দ জনচিহ্নে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। স্বদেশের কল্যাণের পক্ষে এই ভাবটি অগোরবের। কেন এমন হচ্ছে—সেই প্রশ্নও উপেক্ষা করা উচিত নয়। স্বাধীনতা অর্জন করার পর এই দেশের প্রাণশক্তি ঘুমিয়ে নেই। বাইরের সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর দেশ গঠনের কাজ যথার্থভাবেই সূর্য হয়ে উঠেছে। তার প্রমাণ রয়েছে, ভারতের নানা প্রান্তে। যেসব কল-কারখানা গড়ে উঠেছে এবং বহু-মুখী নদী-পারিকল্পনায় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে—তা নব ভারতের জনচিহ্নকে উদ্বেশ করার পক্ষে নগণ্য নয়। তবুও এমনই ব্যাপার যে, সার্বিক কল্যাণ ভারতের গ্রামের মানুষ, শহরের লোক-জন ও বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায় লাভ করে নি। হয়তো মূলগত গলদটি দূর না হওয়ার জন্যেই কল্যাণমুখী এই রাষ্ট্র অন্যান্য স্তরে উন্নত হলেও অভাবের প্রথম স্তরে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এই অভাব দূর না হলে, কোনো উন্নতি

ফলপ্রসূ হয় না। হয়তো পারস্পরিক সামাজ্যের অভাবেই খাদ্য নামক বস্তুটির অভাবে দেশ জর্জরিত হচ্ছে। স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ থেকে স্বদেশী মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। এই অবস্থা দেশের পক্ষে শূন্য নয়।

একালের কিশোর ও যুবক আগামীকালের দায়িত্বশীল নাগরিক। অথচ এ যুবকদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই—সমাজের মধ্যে দায়স্বরূপ যেন তারা বিরাজ করছে। ফলে স্বাধীনতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দেশহিতৈষিতার ভাব যেন তাদের মধ্যে সূত থেকে যাচ্ছে। বরং বিপ্লবী চিন্তায় বঞ্চিত এদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রকান্ড নৈরাশ, দেশ সম্পর্কে নিষ্কণ্ঠ ভাব। এ অবস্থা কল্যাণকর নয়। প্রসঙ্গত কবির কথাই আমরা স্মরণ করছি— সেথা মৃদু মৃদু দল রাজত্বের হয় না সহায় হয় মহাদার।

এই মহাদার থেকে আমাদের রেহাই পেতেই হবে। ১৫ই আগস্টের পবিত্র স্বাধীনতা দিবস তাদের এবং সমস্ত লোকগোবানদের যেন প্রথম দিনের আনন্দের মতোই মূর্ত হয়ে ওঠে—এই আজ সকলের কামনা।

সম্পাদক

বিপ্লবী হাটে

হুগো মল্লিক

পেনসনভোগী বিপ্লবী হাটে শিয়ালদহের মোড়েঃ

অসহায় বিশ টকা।

আট হাত খুঁড়ি, ময়লা ফতুয়া, পারে তীর
ছেঁড়া চটি।

হাটের নিন্দে আজো গোল কাণ্ডে হাট

গলীর চিহ্ন আঁকা।

হাটতে হাটতে কখনো কাশছে

হাস সে নিচ্ছে জোরে,

হাটছে হাটছে আশিটা বছর

বের হয়ে সেই নিষিদ্ধ নীল ভোরে।

আমার অবসর

একদা সে পেত জেলের ভিতরে

জেলের ভিতর

যেমন দুর্বারি পায়।

হয়তো তখন মৃত্তি-নেশার

ছিল ঢেউ ভেঙে মৃত্তো খুঁজোর দায়।

কীসির সঙ্গে জলাটা বাড়িয়ে

হঠাৎ এসেছে ফিরে,

শুষ্টির মোটা খোলাটা ছাড়িয়ে

এক-মুঠে মৃত্তি এনেছে

মাত সাগরের তীরে।

পেনসনভোগী বিপ্লবী হাটে, — অবস্থাস কথা?

অবস্থাবে তাঁর মাথা

দেখে কে নোমাবে মাথা বা কে জানে নাম?

নেই কোনো বিস্ময়

দিতে হয় তাঁকে বিস্মৃত নামে যদি সেই পরিচয়

সে-নাম শুনে কি গা দিয়ে ছুঁবে ঘাম?

পুরাতন সেই বুকের খবর,

নোনা রক্তের স্মৃতি,

জানে ওস্তাদ করজান জহাদ।

যদিও তারাই চেনা—

ভাষার জন্যে শোধ করা হয় মিথ্যা বাতের সেনা।

কেন না,—রয়েছে আপিস, কলেজ,

রেসকোর্সের মাঠ,

ছব্বকের ঘাড়ে হালের সেলুনে

জুলের নতুন ছটি।

জলাট-লিখন নয় এই সব

অথবা শহরে গ্রামে

দেখছি মানুষ কথা বিলি করে

জয়গারং করা খামে।

পেনসনভোগী বিপ্লবী হাটে শিয়ালদহের মোড়েঃ

তা' দেখে রেলিতে পাগলটা কেন হাসে?

কাচ্ কাচ্ খুঁড়ি ওঠে স্টেট-বাসে।

ভিখারির খুঁটে ধরে

আর এক ভিখারি পারের কাছেই ঘোরে,

ভিক্ষার মেলে হাত।

তারপর চুপ সবাই অকস্মাৎ।

এক নিমেষেই ফাঁকা।

প্রথমে নাচে যদি সব শব্দরী

আব্দুলকালাম রহিমউল্লাহ

এখনো নাচে যদি সখন শব্দরী!

আবার আমি তবে আমাকে কুলে ধরি,

লাগল-সৈকতে আমার মন

বাজুক মাদলের লক্ষ্মীছাড়া বোলে;

দুর্ভিক্ষের কথা ম'পরে দলে দলে

জননের হোক শৃঙ্খলগমন।

নতুন রসিকতা বুকের মেখনার

আবার সারীগানে ডেউরের দেলনার

দোলাতে চায় যদি দোলাক হাস!

এবং কলে তার আমারই দৃঢ়হাতে

শব্দরী আসি হোক অম্বাড-সংঘাতে,

কি কী আসে যদি সর্বনাশ?

মবীন পলাশীর রক্ত-প্রান্তরে

আবার হয় হোক দুর্ভিক্ষীত বড়ো

জাতি-লগ্নের উদ্বোধন,

এবং দিকে দিকে বাজুক মাদলের

লক্ষ্মীছাড়া বোলে আমার মন!

আমার দেশ সে তো আমারই সভার

সভা দিয়ে গড়া, স্বর্গ পারের বার

মরিবে নতজান্দ; আমার দেশ

আমারই জননীর সৃজন-তপোভূমি

আমারই প্রেরণীর প্রথম লীলাভূমি

রূপে ও গৌরবে অনিরূপ!

আমার ভালোবাসা স্বর্জ ঘাসে ঘাসে;

আমার প্রেম আজো ফুটেছে বারোমাসে

খড়ুর সংরাগে ফুলের কাড়,

আমার প্রেরণার ত্রিবেণী নানাসূত্রে

লাগরে ছুটে বার ভাড়িয়ে দূরে দূরে

জাকিনী-যোগিনীর অঙ্ককার!

একদা দেশ যদি পামরে মাথা খোঁড়ি,

তাহলে হয় হোক দুর্ভিক্ষীত বড়ো

অরেক জাতির উদ্বোধন,

এবং দিকে দিকে বাজুক মাদলের

লক্ষ্মীছাড়া বোলে আমার মন॥

পথের দু'ধারে মোতায়েন রাখা—

খুঁড়ির শব্দ ভারি,

হেলমেটধারী আম'ড পলিশের সারি;

উৎসুক দলক;

কোনোখানে নেই বিলুপ্ত রক্তপাত

রাজ্যের অতিথি রাজপথে পলাতক।

হঠাৎ অদূরে ঘটা বাজছে :

অকস্মেৎ কী বেন বুলে!

ভারতের রিগেড ছুটছে ছুটছে—

হুগো পৃথিবী খুঁড়ি বোলা-জলে॥

বাংলায় রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়

অক্ষয় চন্দ্র গুপ্ত

বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলন—১৯০৬

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৬ অক্ষয় প্রাদেশিক সম্মেলন একটি বিশেষভাবে স্মরণীয় ঘটনা। ১৯০৬ অশ্বষট্‌ভিষ্যৎ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। সে বছর প্রাদেশিক সম্মেলনের বৈঠক হয় ময়মনসিংহে। ময়মনসিংহ অপেক্ষাকৃত ধনী জেলা, বড় বড় জমিদার সেখানে ছিল। বরিশালের পক্ষ হতে পর বৎসরের জন্য সম্মেলনকে আহ্বান করার কথাই অনেক ভাব পেল। বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ময়মনসিংহে গান নি; তাতেই বরিশালের প্রতিনিধিদের অন্তরা বেশি সংঘোষিত হল। শেষ পর্যন্ত বরিশালবাসী গুরুত্ব সেন, যিনি ময়মনসিংহে প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন, বরিশালের পক্ষ থেকে সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন আহ্বান করেন। অশ্বিনীকুমার এই সিদ্ধান্তকে সাদরে গ্রহণ করেন। এসব হল এপ্রিল মাসে বা বাংলা বৈশাখ মাসে ১৯০২ সালে। ১৮৮৮ অশ্বষট্‌ভিষ্যৎ প্রাদেশিক সম্মেলন প্রথম স্থাপিত হয়; কিন্তু প্রথম ৭ বছর—এর অধিবেশন কলিকাতার ভারত সভা গৃহে (Indian Association) হচ্ছিল। ১৮৯৫ অশ্বষট্‌ভিষ্যৎ হতে বিভিন্ন মহল্লা শহরে অধিবেশন শুরু হয়। ১৮৯৫ অশ্বষট্‌ভিষ্যৎ বহরমপুরে, ১৮৯৬—কলকাতায়, ১৮৯৭—নাটোরে, ১৮৯৮—ঢাকায়, ১৮৯৯—বর্ধমানে, ১৯০০—ভাগলপুরে, ১৯০১—মৌলভীবাজারে, ১৯০২—হর নি, ১৯০৩—বহরমপুরে, ১৯০৪—বর্ধমানে, ১৯০৫—ময়মনসিংহে অধিবেশন হয়।

অশ্বিনীকুমার এটা বুঝলেন যে অন্যান্য বছরের চেয়ে আগামী বছর সম্মেলনে উৎসাহ ও লোক সন্নিবেশ অনেক বেশি হবে এবং টাকা সংগ্রহ করতে হবে ২।৪ টাকা করে—মোট টাকা দেবার লোক বরিশালে নেই। তাই পূজার পূর্বেই তিনি একটা খসড়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করে পূজার ছুটির মধ্যে গ্রামে গ্রামে লোক পাঠালেন টাকা সংগ্রহের জন্য ও লোকের কাছে এই সম্মেলনের বিশেষ প্রচার করার জন্য। তখন বঙ্গভঙ্গ সূচনিক ও আশঙ্কিত। অশ্বিনীকুমার দেখলেন—এই সম্মেলন তাঁকে একটা অপূর্ণ সুযোগ দিয়েছে—বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করার। বরিশালে তখন প্রায় এমন কেউ ছিল না যে, অশ্বিনীকুমারের প্রভাব এড়িয়ে চলাতে পারে এবং

তার ব্যক্তিগত প্রভাবেই বড় বড় উকিল, ব্যবসায়ী, জমিদার—সবাই এই আন্দোলনকে ও এই সম্মেলনকে সমর্থন করত। পূজার ছুটিতে সবাই বেরিয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামে—এই সম্মেলনের ব্যক্তি প্রচার করতে। এর পূর্বে প্রাদেশিক সম্মেলনে ৫।৬শ' কিংবা বড়জোর হাজারখানেক লোক উপস্থিত হত। কিন্তু বরিশালে মন্ডপ তৈরির ব্যবস্থা হল ৭।৮ হাজার লোক যাতে বসতে পারে। বলা চলে এ বছরই প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনে জনসমাবেশ হয়—কেবল দীক্ষিত 'উন্নতলোকের' ব্যাপার থাকল না।

১৯০৬ অশ্বষট্‌ভিষ্যৎ দিকে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল। অশ্বিনীকুমার হলেন সমিতির সভাপতি; উকিল রজনী দাস হলেন সম্পাদক। এ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব নিলেন ও জন সহযোগী সম্পাদক (Joint Secretary) এবং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে সহকারী সম্পাদক (Assistant Secretary) রাখলেন। উকিল নিবারণ দাস ও হরনাথ ঘোষ, ডাঃ তারিণী গুপ্ত, জমিদার কালীপ্রসন্ন গুহ ও উপেন সেন হলেন সহযোগী সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক হলেন শরৎচন্দ্র গুহ, মথুরানাথ সেন, দেবেন চক্রবর্তী (উকিল), সত্যীশ চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক) ও দেবকুমার রায় (কবি ও জমিদার)। স্বচ্ছসেবক বাহিনীর ভার নিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং তাঁর সহকারী হলেন মকুন্দ সেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞা ইস্তাহার উপেক্ষা করে অশ্বিনীকুমার প্রচার করে দিলেন তাঁর ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা ইচ্ছা করলে স্বচ্ছসেবক বাহিনীতে যোগ দিতে পারবে এবং এর জন্য যদি সরকার ঐ স্কুল ও কলেজের উপর রুখ হয়, তিনি তার জন্য পরোয়া করবেন না। ৩০০ স্বচ্ছসেবকের মধ্যে ২৫০ থেকে বেশি ছিল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র। সমগ্র জেলায় ও শহরে এই সম্মেলন সম্বন্ধে উৎসাহের কোন সীমা রইল না। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের নিকট এক খালি জমিতে সম্মেলনের জন্য মন্ডপ তৈরি হল; বিরাট মন্ডপ—৭।৬ হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা হ'ল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তারা সবাই যে শক্ত ধাতের লোক ছিলেন, তা নহে। অশ্বিনীকুমারের ব্যক্তিগত প্রভাব এমন প্রবল ছিল যে, অনেক নরম ধাতের

লোকও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। পরে শাসনকর্তাদের রক্তচক্ষুর সামনে তারা ঠিক থাকতে পারে নি। এই অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকে পরে বেশ সরকার-ঘোষা হ'ল এবং রায়বাহাদুর ও রায়সাহেবও হয়।

সম্মেলনের নির্দিষ্ট দিন এল। ইংরাজী এপ্রিল মাসের ১৬ ও ১৭ই—বাংলা ১৩২৬ সালের ১লা ও ২রা বৈশাখ সম্মেলনের দিন স্থির হয়েছিল। ইস্তাহারের ১৮৮৫ ছুটি ও বাংলা নববর্ষ—সব মিলে একযোগে ৩।৫ দিন ছুটি ছিল। কলিকাতার ব্যারিস্টার অবদুল রশিদ সম্মেলনের সভাপতি নিযুক্ত হতেছিলেন। বরিশালে কোন রেলের সার্কেল তখনও ছিল না, এখনও নেই। ওটা নদীঘাট জেলা; নদীপথে স্টিমার দিয়ে বহিষ্কৃত করে সঙ্গে এ জেলার সংযোগ। প্রধানত পশ্চিম বাংলা ও কলিকাতার বাসী অসংখ্য পুণ্ড্রী হাজির স্টিমারে এবং ঢাকা ও পূর্ব বাংলার বাসী আসবে নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুর হয়ে স্টিমারে। পূর্ব বাংলা ও আসাম সরকার থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে—কলিকাতার কেউ স্বচ্ছসেবক বাহিনী করতে পারবে না। অশ্বিনীকুমার বুঝেছিলেন—এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে গোলমাল হবার আশঙ্কা আছে। তাই পূর্বাঙ্গেরই তিনি ডিক্রিমেনের কমিশনার সাহেবের কাছে অনুরোধ করেছিলেন—প্রতি-নিষিদের অভ্যর্থনার জন্য স্টিমার বাট হাতে মশাল জ্বালিয়ে, মিছিল করে তাঁদের যাতে আনা যায়। এই কমিশনার অশ্বিনীকুমারের পূর্ব-পরিচিত ও তাঁর গুণগ্রাহী। তাঁর বিশ্বাস ছিল অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে লোকের এই সাধারণ অনুরোধ ম্যাজিস্ট্রেট উপেক্ষা করতে পারবেন না। কমিশনার অশ্বিনীকুমারকে বার বার অনুরোধ করেন জেল ম্যাজিস্ট্রেট ইমার্সনের কাছে অনুরোধ নেয়া জন্য। অনেকটা অনিচ্ছায় অশ্বিনীকুমার ইমার্সনের কাছে গিয়ে ব্যর্থ হ'লেন জেলে। অতীত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন আসবেন তখন তাঁদের প্রাক্তন বৈষম্যের অভ্যর্থনাই করা যাবে না—'স্বচ্ছসেবক' ধর্মান করা বা ভাল-ভালো কোন মিছিলও করা যাবে না।

একদিন স্বচ্ছসেবকদের আকস্মিক অধ্যাপক সুরেন্দ্র মিত্র স্বচ্ছসেবকদের নিয়ে হাম স্টিমারে বাটের ধারে, জজের মাঠে। একটা দূর হতে ইমার্সন এদের দেখে প্রায় দিগ

হয়ে ওঠেন। তাকে জিজ্ঞাসা করেন এরা কারা? তখন তাঁর উত্তর দেয় “হাজার, মাস্টারবাবু, কেবল সেখানেই হাজার।” সবেহ আরো গরম হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—“এদের মাসিনাক কে? Who is in charge of the men?” দুইই এগিয়ে এসে বলেন, I am in charge of these men — আমি এদের অধিনায়ক। জজের মাঠ ছিল সরকারী মাঠ—ফুটবল খেলার মাঠ। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—তোমরা জান, এ মাঠ আমার। সুরেনবাবু বললেন—তাহলে আমরা সরে যাচ্ছি। কিন্তু কয়েকটি কনস্টেবল এসে স্বেচ্ছাসেবক কয়েকজনের নাম লিখে নিল এবং তাদের বিরুদ্ধে দখলি কার প্ররেশের মামলা আনা হবে বলে চয় দেখানো হল। এই হল সম্মেলনের পটভূমিকা।

বরিশালের নেতাদের প্রধান আগ্রহ হল ভালভাবে সম্মেলনের অধিবেশন যাতে শেষ হয়। তাই তাঁরা জেলার শাসনকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটকে কথা দিয়েছিলেন—রাস্তায় বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি করা হবে না। ১৩ই এপ্রিল রাত ৯টা প্রায়—একই যোগে খুলনা হ’য়ে কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিরা এবং নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুর হয়ে—পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিরা এলেন। এই দুই স্টিমার আসার সময় ২ ঘণ্টা আগে-পিছে ছিল; হয়ত সরকারী নির্দেশেই দুই স্টিমার একই সময় এল। কলিকাতার এন্টি-সাকুলার সোসাইটির (Anti-circular Society) সভাপতি প্রধানত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নেতৃত্বে জেদ করলেন—স্টিমার থেকে নেমে তাঁরা বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি করবেনই। বরিশালের নেতাদের প্রতিবাদে কথা স্মরণ করে এবং বিশেষ করে, সম্মেলনের সাক্ষ্যের কথা ভেবে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে অনুরোধ করলেন—এই জেদ ত্যাগ করত। কিন্তু কৃষ্ণকুমারবাবুর দল এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ’লেন—তাঁরা নেতার নির্দেশ মেনে নিলেন। তবে তাঁরা অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। ব্রজমোহন কলেক্টর অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গৃহ কৃষ্ণবাবুর পূর্ব-পরিচিত; তাঁরা রজনীবাবুর গৃহে গিয়ে উঠলেন। রাতে তাঁরা কিছু খেলেন না—সকলের মনেই দুঃসংকল্প—পরের দিন রাজপথে মাতৃবন্দনা করে তাঁরা আহার গ্রহণ করবেন।

খুলনা হ’তে বা নারায়ণগঞ্জ হ’তে স্টিমারে আসার পথে প্রত্যেক স্টিমার স্টেশনে বিরাট জনসমাগম হ’য়ে প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করেছিল; প্রত্যেক স্টেশনেই উদাত্ত-কণ্ঠে বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি করা হয়েছিল। এই দুই স্টিমারে বেসব বিশিষ্ট নেতা এসেছিলেন তাঁদের নাম—সুরেন্দ্র নাথ, বিপিনন্দ্র পাল, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্রজবাবু উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, আবদুল রসূল, মনোরঞ্জন গহুড়াকুরতা,

ললিতাকান্ত হোসেন, আবদুল হালিম গজনভী, আনন্দ রায়, যোগেশ চৌধুরী, গীর্ণাতি কাব্যভীষ, সুবোধ মল্লিক প্রভৃতি। সুরেন্দ্রনাথ এলেন চতুর্থ হ’য়ে। স্টেশনে রাত ৮টা হ’তে ৮:১০ হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। দুটো স্টিমারের আসার সময়ের মধ্যে যদিও ২ ঘণ্টার তফাৎ ছিল, কিন্তু দুটো স্টিমারই এল রীতি ১০টায়। স্টিমারের ভিতরের প্রতি-নিধি ও বাইরে সমবেত ৮:১৫ হাজার জনতার মনে একই কোভ—বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারবে না এবং নশালসহ কোন মিছিলও করতে পারবে না। তখন রাস্তার বিদ্যুতের আলো বন্ধে নি; তাই ১০:১৫টার সময় রাস্তা প্রায় অন্ধকার। ২:৪৫টা লন্টন জ্বালিয়ে সব প্রতিনিধিদের রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে আনা হল। এ হাবেলীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণই



আবদুল রসূল

ছিল সব স্বদেশী সভার স্থান। এটা হল চু-কৈলাসের রাজাদের কাছারী বাড়ি। এবং এর ঠিক উত্তেদিক হ’ল ঢাকার নবাবের কাছারী বাড়ি; সেই রাতে সেখানে পুর্লিশের বিরাট সমাবেশ। রাস্তার দুই পাশে দুই পক্ষের বিরাট লোক সমাবেশ। বরিশালবাসীদের পক্ষ হ’তে প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করা হ’ল; প্রতিনিধিরা মধ্যরাত্রে যার যার নির্দিষ্ট আবাসে চলে গেলেন। কেবল কৃষ্ণকান্ত মিত্রের দল গেলেন অধ্যক্ষ রজনীবাবুর গৃহে।

পরদিন অর্থাৎ ১৪ই এপ্রিল বা ১লা বৈশাখ ভোর হতেই মণ্ডপের সামনে শত শত লোক জড়ো হ’ল সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য। মণ্ডপের দ্বার রক্ষা করছেন মুকুন্দ সেন—দ্বাররক্ষীর উপবৃত্ত অবয়ব তাঁর। ১১টা সময় মণ্ডপের দ্বার খোলা হ’ল।

হাজার হাজার লোক গিয়ে নিজ নিজ স্থান অধিকার করে বসল। তখন ঘোষণা করা হ’ল বেলা ২টার সময় সম্মেলন সূর্য হ’বে। কেউ স্থান ত্যাগ করল না—৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করেও তাঁরা সম্মেলন দেখবে। দুপুরে রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে নেতারা সমবেত হলেন। কথা ছিল সেখান থেকে মণ্ডপ পর্যন্ত প্রায় দেড় মাইল পথ সবাই মিছিল করে যাবে। রজনী গৃহের গৃহ হতে এন্টি-সাকুলার সোসাইটির সভ্যদের নিয়ে কৃষ্ণকুমার বাবুও, রাজাবাহাদুরের হাবেলীর দিকে গেলেন, সভ্যদের বৃকের ওপর ‘বন্দে-মাতরম্’ লেখা ব্যাজ (badge) ছিল। হাবেলীর কাছাকাছি আসতেই পুর্লিশ সাহেব কেম্প (Kemp) সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিবকে প্রহার করলেন; সম্মেলন উপলক্ষ্যে এই প্রথম রক্তপাত। কৃষ্ণবাবু ছিলেন পিছনে, তিনি এগিয়ে এসে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেন। কেম্প প্রথমে বললেন—এদের প্রাণবিক্রম হ’তে দিব না। কৃষ্ণবাবু বললেন—বিশৃঙ্খল হয়ে গেলে তো আরো গোলমাল বেশি হবে এবং পুর্লিশের সঙ্গ সঙ্ঘর্ষ বেশি হবে। তখন কেম্প বললেন—এরা প্রতিনিধি নয়—এদের ধরে দিব না। এবার কৃষ্ণকুমার বাবু তাঁর দিকে বললেন—কি করে বলছ এরা প্রতিনিধি নয়? আমি বলছি এরা প্রতিনিধি। অগত্যা কেম্প এদের হাবেলীতে প্রবেশ করতে দিলে। কিন্তু ফণীভূষণের প্রহারের ও রক্তপাতের কেবল প্রতিকার হল না।

দুটার আগে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্মেলন প্রতিনিধিরা হাবেলী থেকে বের হ’ল—মণ্ডপে যাবে। সম্মেলন সূর্য হ’বে। নেতারা আশে গেলেন, সভাপতি রসূল গেলেন ঘোড়ার গাড়িতে। এন্টি-সাকুলার সোসাইটির সভাপতি ও অন্যান্য প্রতিনিধিরা পিছনে রইল। কতক সভ্য প্রতিজ্ঞাই করেছিল রাজপথে ‘বন্দে-মাতরম্’ ধ্বনি করবেই। সে সুযোগ সহজেই এসে গেল। এন্টি সাকুলার সোসাইটির সভাপতি বের হতেই কেম্প এগিয়ে সোসাইটির সম্পাদক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর বক্ষ হতে ‘বন্দে-মাতরম্’ লেখা ব্যাজ টেনে নেবার চেষ্টা করলেন, শচীন্দ্রপ্রসাদও ব্যাজ আঁকড়ে ধরে রইলেন। তখন কেম্প শচীন্দ্রপ্রসাদকে ঘৃষি মারলেন। হয়ত পূর্বনির্দিষ্ট সংকেত ছিল যে, কেম্প কাউকে প্রহার করলেই কনস্টেবলরা বৃকে নেবে যে, এখন বেপরোয়া মারপিট সূর্য করতে হবে। সুবেদার বাবুরাম সিং চিৎকার করে উঠল, “হুকুম মিল গিয়া—শালা লোককো মারো।”

এরপর সূর্য হল বেপরোয়া লাঠি চালনা ও প্রহার। বিশেষভাবে আহত হলেন মনোরঞ্জন গহুড়াকুরতার ছেলে চিত্তরঞ্জন, ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও অপর কয়েকজন। চিত্তরঞ্জনকে মারতে মারতে রাস্তার পার্শ্বস্থ পুকুরে ফেলে দিয়েছে এবং জলের মধ্যে পড়েও সে ক্রমাগত মার খাচ্ছিল।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা
প্রমাণিত

বৈদ্যনাথ
ঔষধ

সদা ব্যবহার করুন



আয়ুর্বেদীয় ঔষধ

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

শ্রী বৈদ্যনাথ

আয়ুর্বেদ ভবন প্রাইভেট লিঃ

বৈদ্যনাথের ঔষধাবলী ভারতের সর্বত্র ৪০০ বিশিষ্ট এজেন্ট ও
৩০,০০০ এজেন্ট মাধ্যমে সর্বত্র একই নামে সরবরাহ হয়।

কলিকাতা • পাটনা • ঝাঁসী • নাগপুর • এলাহাবাদ • বৈদ্যনাথ

‘বঙ্গ বন্দেমাতরম’ চিৎকার করছিল। তখন জর্দিক হতে কেবল ধনি উঠে ‘বন্দেমাতরম’। কৃষ্ণকুমার মিত্র, অধ্যক্ষ হুজুর্দার, ও কৃষ্ণগরের উকিল বোচারাম লাহিড়ী এগিয়ে এলেন কেম্পের কাছে। হুজুর্দার ও কৃষ্ণগরের বোচারামবাবুও প্রহৃত হলেন; বোচারামবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কৃষ্ণকুমার, যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি তখন কেম্পের কাছে তাঁর প্রতিবাদ করে ফেলেন, ‘তোমার পুলিশরা গুস্তাব মতো আচরণ করছে; এদের না ধামালে ভীষণ কান্ড হবে।’ পুরুষের মধ্যে চিত্তরঞ্জন অবস্থা দেখে একজন কনস্টেবল চীৎকার করে উঠল, ‘আব মেরো না, ও মরে যাবে।’

এ সময়ে সুরেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে কেম্পকে বললেন, ‘Why are your police beating these men? They have done nothing wrong. If you think they have done anything wrong, you can arrest them. I am willing to take the whole responsibility upon myself, you may arrest me if you like.’

তোমার পুলিশরা এদের মারছে কেন? এরা তো কোন অন্যায় করে নি, যদি মনে করো এরা অন্যায় করছে, এদের গ্রেফতার করতে পার। এদের সকলের দাঁড়িই আমি নিচ্ছি, ইচ্ছা হয় আমাকে গ্রেফতার করতে পার।’ কেম্প অমনি বলেন, ‘তোমার গ্রেফতার করছি’

‘you are under my arrest’। সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বিনীকুমার, মতিলাল ঘোষ, ছুপেন বসু প্রভৃতি নেতারা এগিয়ে এসে বললেন—‘আমাদের গ্রেস্তার কর।’ কেম্প জবাব দিলেন, ‘My orders are to arrest Mr. Surendra Nath Banerjee alone’—

‘আমার উপর নির্দেশ হল কেবল সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করার।’ সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে গেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে। অশ্বিনীকুমার, সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয় বিহারীলাল রায়—ও কাব্যাবিশারদ সঙ্গে গেলেন। সুরেন্দ্রনাথের বিচারের প্রসঙ্গ এবং এই সম্মেলন উপলক্ষে যে সব মামলা হয় তা অন্যর বলার চেষ্টা করব। তবে কেবল এইটুকু বলে রাখছি, দু’দফায় সুরেন্দ্রনাথের ২০০+২০০=৪০০ টাকা জরিমানা হয়। তখনই জরিমানার টাকা জমা দেওয়া হয়। বিচারের এই প্রহসনের সময় ইমার্সন সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অত্যন্ত অভদ্র আচরণ করেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য প্রতিনিধিরা বন্দেমাতরম ধ্বনিবাহুতে রাস্তা দিয়ে মিছিল করে সভা মণ্ডপে যান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে যান। তাই অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সহযোগী সম্পাদক নিবারণ

চন্দ্র দাস তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। তারপর সভাপতি নির্বাচন করা হল। যদিও সভাপতি পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল তবুও প্রধানদ্বারী ভূপেশ বসু প্রস্তাব করেন এবং মতিলাল ঘোষ সমর্থন করেন যে, আবদুল রসুল সভাপতি হ’ক। ছুপেন বসু এই প্রস্তাব উপলক্ষে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—ইংরাজ রাজত্বের অবসান ঘনিরে আসছে, কারণ তার ন্যায় বিচারের উপর আর জনসাধারণের আস্থা নেই। সভাগৃহে বার বার ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি হতে থাকে এবং তুমুল ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনির মধ্যে রসুল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

রসুল তখন কতকটা অসুস্থ ছিলেন; তাই সমস্ত ভাষণ তিনি নিজে পাঠ করতে পারেন নি। তিনি ভাষণ পাঠ সুরু করে দেন; বাকি অংশ পাঠ করেন আবদুল হাশেম গজনভী। এখানে বলে রাখা ভাল গজনভীরা মরমনসিংহের জমিদার—দুই ভাই। একজন ছিলেন সরকার সমর্থক এবং আবদুল হাশেম ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক। পূর্ব-বাংলা ও আসামের গভর্নর ফ্লাইং বলডেন—The Right Guznavi and the wrong Guznavi.

অশ্বিনীকুমার ও রসুলের ভাষণ ইংরাজী ভাষায় লেখা ও পঠিত হয়; তখন পর্যন্ত এটাই ছিল প্রথা। রসুলের দীর্ঘ বক্তৃতা একটা ব্যাধি ভুলে দিচ্ছি—

The success of the Swadeshi movement all our India will be more beneficial to the Mahomedans than to the Hindus (Mahomedans being uneducated and poor). I therefore appeal to my Mahomedan countrymen to give up their indifference to politics and join the Hindus in all matters concerning the welfare of the common motherland. Unless you are ready to migrate in a body to Arabia Persia or Turkey, your political interest will ever be the same as those of the people of other denomination in Bengal — অর্থাৎ মুসলমানরা শিক্ষার ও আর্থিক অবস্থার পিছিয়ে আছে, বলে স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যে তারাই বেশি লাভবান হবে। তাই মুসলমান দেশবাসীর প্রতি আমার অনুরোধ রাজনৈতিক ওদাসীনা ভাগ করে মাতৃভূমির সেবার হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিক। যদি দলবদ্ধভাবে সব মুসলমান আরব, পারস্য বা তুর্ককে চলে না-যাও, তাহলে অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের ও তোমাদের রাজনৈতিক স্বার্থ অজ্ঞ থাকবে।

সভাপতির ভাষণের পর মতিলাল ঘোষ

প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন—পুলিশের অত্যাচার ও সুরেন্দ্রনাথের গ্রেফতারের প্রমাণ হচ্ছে যে, বরিশালে আইন অনুসারী শাসন rule of law) নেই এবং সমগ্র পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশে যেভাবে দেশবাসীদের ওপর নিগ্রহ চলছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, এই প্রদেশে কোন বৈশ্বশাসন নেই। তাই এ বংসর—এই সম্মেলন সরকারসাপেক্ষ কোন প্রস্তাব পাশ করবে না; যেসব কাজ নিজেদের চেষ্টায় করা যায়, কেবল সে সমস্ত বিষয়ই আলোচনা করা হবে। গীর্ষপতি কাব্যতীর্থ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করার পর, সর্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হয়। প্রাদেশিক সম্মেলনের পক্ষে এটা একটা নতুন মনোভাবের সূচনা করছে। সরকারের কাছে আবেদন, নিবেদন, বড় জোর প্রতিবাদ এই ছিল এতকাল রাজনীতির মূল কথা, নিজেদের কর্ম-শক্তি ওপর নির্ভর করা ও তদনুসারে কর্ম-পন্থা নির্ধারণ করার মনোভাব এই প্রথম।

এই প্রস্তাব বন্ধন আলোচনা হচ্ছিল, তখন সুরেন্দ্র ও তাঁর সঙ্গী নেতারা মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে বিরাট সভা-মণ্ডপ ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনিতে দ্ব্যধিত হয়ে উঠল। প্রায় দশ মিনিট পর্যন্ত অবিরামভাবে এই ধ্বনি চলতে লাগল। অশ্বিনীকুমার মধ্যে উঠে সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেন। সবাই সুরেন্দ্রনাথকে দেখতে ও তাঁর বক্তৃতা শুনতে বাসত। তাঁর স্বাভাবিক জ্বালাময়ী ভাষায় সুরেন্দ্রনাথ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বঙ্গভঙ্গ রহিত করতে হবে এবং দেশে জনসাধারণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ছিল সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা মূল কথা।

এর পর মনোরঞ্জন গৃহত্যাগের আহ্বান প্রতিনিধিদের নিয়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করেন। আহত পুত্র চিত্তরঞ্জন, ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও অন্যান্য আহত প্রতিনিধিদের ক্ষেত্র ওপর দাঁড় করিয়ে তিনি আহত পুত্রের জন্য গৌরব বোধ করছিলেন। বিকালে আবার রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে বিরাট জনসভার আহ্বান যুবকদের নিয়ে মনোরঞ্জনবাবু বক্তৃতা মধ্য দিয়ে লোকের মনে আগুন ছড়তে লাগলেন। এখানে বলা দরকার মনোবঙ্গবাবুর বাংলা বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। বক্তৃতা মধ্যে নানাপ্রকার রূপক ও কাহিনী দিতে শ্রোতাদের মনকে তিনি নাচিয়ে তুলতে পারতেন। বক্তৃতার পরিণামে তিনি জিজ্ঞাস করলেন—বালকদের রক্তে কল্যাণকর কিলাতী বস্তু আর কেউ ব্যবহার করবেন কি? সভার সবাই বলে উঠল—না—কখনই না। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—বালকদের রক্তে সিঁচ বিলাতী চিনি বা লবণ কেউ ব্যবহার করবে কি? আবার ধ্বনি উঠল—না—কখনই না। বর্তমান লেখক তখন ১৪১৬ বছরের বালক। সভার উত্তেজনা তার মনকে স্পর্শ করে।

প্রথম দিনের সম্মেলন এখানেই শেষ হল।

সৌদি ছিল বাংলা বঙ্গের প্রথম দিন ১লা বৈশাখ। দেশসেবকদের রক্ত দিয়ে নববর্ষ সুরু হল।

পরদিন ২রা বৈশাখ। প্রাতঃকাল হতেই শহরে উত্তেজনা দেখা যাচ্ছিল—জনতার মধ্যেও উত্তেজনা—শাসনকর্তাদের মধ্যেও উত্তেজনা। কি হবে কেউ জানে না—কিন্তু কিছু গুরুতর যে হতে যাচ্ছে সে আশঙ্কা সকলের মনেই ছিল। শহরময় পুলিশ ছুটোছুটি করছিল।

বেলা ১০টা আন্দাজ পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট কেম্প অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন—সৌদি রাস্তায় ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দেবার কোন প্রস্তাব আছে কি না। সম্পাদক বঙ্গনী দাস খোঁজ নিয়ে জানিয়ে দিলেন—সৌদি কোন মিছিল হবার কথা নেই। ১১টার সময় সভার কাজ সুরু হল। সর্বপ্রথমে ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীত হল সবাই দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি প্রাণী দেবাল। এখানে বলা দরকার যে গত বছর মরমনসিংহ অধিবেশনেও ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনিকে জাতীয় ধ্বনি বলে গ্রহণ করা হয় নি; তখন পর্বন্ত আন্দোলনের গতি তেমন তীব্র হয় নি বা আন্দোলন তার নিজ রূপ তখনও গ্রহণ করে নি। মরমনসিংহের সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে ঐ সম্মেলনের কাছে প্রস্তাব পেশ করে যে সম্মেলন বেন ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনিকে জাতীয় ধ্বনি বলে গ্রহণ কবে। তখন পর্বন্ত সভা-সমিতির ধ্বনি ছিল ‘হিপ হিপ হুররে’। এর কিছুদিন পূর্বে সরলা দেবীর আগ্রহে ও প্রেরণায়, সুহৃদ সমিতির এক সমাবেশে—প্রতাপাদিত্য উৎসবে—সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি কবে। সুহৃদ সমিতির সম্পাদক ১৯০৬-এর প্রাদেশিক সম্মেলনের সম্পাদকের কাছে চিঠি দেন যে, H p H rra ধ্বনির পরিবর্তে যেন ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি করা হয়। এই চিঠির কোন জবাব অভ্যর্থনা সমিতি দেয় নি। আর এক বছর যেতে না যেতেই সমস্ত দেশ ঐ ধ্বনির নামে উত্তমত্ত হয়ে উঠল। ঐ ধ্বনি উচ্চারণ করার জন্য যে কোন লাক্ষনা বরণ করতে দেশবাসী সম্মত হয়ে উঠল।

‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতের পর আর একটি গান হল কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাখদের রচিত গান—‘যার যাবে জীবন চলে, জগৎমাঝে তোমার কাছে বন্দেমাতরম’ বলে। আজকার গুণিকদের কাছে এটা নিছক গান—কোন সাড়া তাদের মনে জাগে না। কিন্তু তখন এসব গান কি যে উত্তেজনা জাগাত তা আজ কল্পনা করাও যায় না। গানের একটি পদ ছিল—‘লাল টুপি আর কাল কোর্তা, জঙ্গর ভয় দার কি চলে?’ পাঠকে ও হাত উর্ধ্ব চলে এ গান গাওয়া হল। আজ ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনির সে মর্যাদা নেই। নেহে, সরকার তার সে মর্যাদা কেড়ে নিয়েছে।

এর পর সম্মেলনের নিয়মানুগিতক কাজ আরম্ভ হল—অর্থাৎ প্রস্তাব গ্রহণ। প্রথম

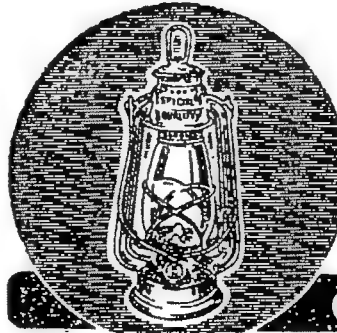
প্রস্তাব হল—রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে সুব্রহ্মনাথের গ্রেফতার ও লাক্ষনার স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন করা হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করা হল এবং তৃতীয় প্রস্তাবে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অনু-রোধ করা হল। চতুর্থ প্রস্তাব হল বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা। এই প্রস্তাবের ওপর সুব্রহ্মনাথের বক্তৃতা পর সমবেত জনতা দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিজ্ঞা করল—‘জগদীশ্বর ও জম্মভূমির নামে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা সাধ্যমত বিদেশী দ্রব্য পরিভ্যাগ করিব, এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব। ভগবান আমাদের সহায় হউন।’ এই চারটি প্রস্তাবে সমর্থনে বারি অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নীচে দেওয়া হল। তা থেকে বুঝা যাবে, উত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলা হতে কি উৎসাহ নিয়ে সব নেতারা এসেছিলেন। ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, মরমনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, চট্টগ্রামের বাচস্পতি সেন, কাছাড়ের কামিনীকুমার চন্দ্র, খুলনার ইন্দ্রভূষণ মজুমদার, হুগলীর মধুলাল গাঙ্গুলী, কুর্নগরের বেচারাম জাহিড়ী, বর্ধমানের ডাঃ আব্দুল হোসেন, ঢাকার বায় স্বতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, রাজ-সাহার রজনন্দ্র বায়, কলিকাতার হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাখ, সুব্রহ্মনাথ প্রভৃতি। এ সব নাম আজ বিস্মৃতির মধ্যে ডুবে গেছে। কিন্তু তখন এরা নিজ নিজ জেলার ও বাংলা দেশে প্রভাবশালী নেতা ছিলেন।

এর পর এল দক্ষবক্তার পুনর্বাণিনয়। চতুর্থ প্রস্তাবের ওপর সুব্রহ্মনাথের বক্তৃতা ও প্রোতাদেব শপথ গ্রহণের পরই পুলিশ এসে দরজায় হানা দিল। পূর্বেই বলাই মজুমদার দ্বারবন্ধক ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সহকারী অধিনায়ক মুকুন্দলাল সেন, বিরাট তাঁর দেহ এবং দেহের উপস্থিত শক্তি তিনি ধারণ করতেন। কেম্প এখন তাঁকে বললেন দ্রব্য ছেড়ে দিতে যাতে তিনি সম্মেলনে প্রবেশ করতে পাবেন, মুকুন্দ জবাব দিলেন—হয় সম্মেলনে প্রবেশের টিকিট দেখাতে হবে, নইলে

কাম্পানের অনুমতি পত্র দেখাতে হবে। এ ছাড়া তিনি কেম্পকে প্রবেশ কবতে। বন না। তখন দ্রব্য হতে কাউকে দিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক বঙ্গনী দাসকে খবর দিতে বললেন। বঙ্গনী দাস বাইরে এলে কেম্প সাহেব তাঁকে নিয়ে রাস্তাব পাশে যান এবং বঙ্গনীবাবুর হাতে দুখানা কাগজ দেন। ঐ দুখানা কাগজ হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইমার্সনের আদেশ—ইংরেজী ও বাংলা ভাষায়। বাংলা আদেশের অনুলিপি নীচে দেওয়া হল। ‘যেহেতু আমরা নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে যে আপনাবা অগ্র বিবিশাল শতবে প্রজমোহন কলেজের উত্তর পার্শ্ব এক সভা করিবা বিনা কাবণশূন্য কর্বে গোলমালজনক কার্য করিতেছেন; অতএব আমি এতদ্বারা আদেশ করিতেছি যে আপনাবা অথবা সর্বসাধারণ কেহই এই সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না, অথবা করিবেন না। প্রকাশ থাকে যে, অগ্র শহরে রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে ও ঐদুপ কোন সভা করিবেন না’—১৬-৪-০৬।

ইহার পরই কেম্প ইমার্সনের নিকট বিপোর্ট করেন যে, তাঁর খবর হল গতকাল যেমন বাস্তব ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি করা নিয়ে শহরে গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছিল, আজও জনতা ও নেতাদের উদ্দেশ্য হল সম্মেলন হতে ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি সহ এরা মিছিল কবে মণ্ডপ হতে বের হবে। তাই কেম্প প্রার্থনা করলেন যেন শহরে ১৭৪ ধার্য অনুযায়ী সভা-সমিতি বন্ধ করা হয়। ইমার্সনের আদেশ ১৭৪ ধারা অনুযায়ী, কেম্পের প্রার্থনা মতোই করা হইয়াছিল।

কেম্প বঙ্গনীবাবুর সঙ্গ সভায় প্রবেশ কবে সবকাবী আদেশ পঠি কবলেন। কেম্প বললেন ‘যদি আপনাবা স্বেচ্ছায় সভা ভোগ কবে চলে না যান, তবে আমি বলপূর্বক সভা ভেঙে দিব।’ এই লেখক তখন সভায় উপস্থিত এবং সে তখন বেশ কিছুটা অসুস্থ ছিল। সভায় মন্তব্য হল। নেতাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল ও বরিশালের নেতা দীনবন্ধু সেন মত দিলেন সভা ভেঙে স্বেচ্ছায় চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু কৃষ্ণকুমার



কিষ্কান
লঠন
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস ঐকোঃ

ফোন-২২-৬৫৮০

২৬৬, ৩৬৬ চীনা রাজাবুট্টা, কলিকাতা-১।

মিত্র প্রতিবাদ করে বললেন তুমি যাও চললো, গুলী করুক, নইলে আমরা ধাব না।

কেম্প তখন বললেন যদি নেতারা প্রতি-
শ্রুতি দেন যে সভাব পর রাজপথে 'বন্দে-
মাতরম' ধ্বনি করবেন না, তাহলে তিনি
সভাব কাজ চলতে দিতে পারেন। কিন্তু এই
অপমানজনক সত্রে কেউ রাজী হল না।
সভায় তখন ভীষণ উত্তেজনা, এমন কি কেম্প
নৈজেকের নিবাপদ মনে করলেন না। চারি-
দিক হতে উত্তেজিত জনতা উঠে দাঁড়িয়ে
'বন্দে মাতরম' ধ্বনি করতে লাগল এবং মণ্ডের
চাবুক ঘিরে জড়ো হল। তখন কেম্প সুরেন্দ্র-
নাথের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন—

I hope I am safe when I am near you.
শ্রদ্ধা করি আপনার পাশে আমি নিরাপদ।
এই উত্তেজনার মধ্যে নেতাদের দৃষ্টি পড়ল
টপস্থিত মহিলাদের দিকে। তাদের অনু-
রোধ করা হল যেন ধীরভাবে সবাই বাইরে
চলে যান। মেয়েদের বের করে নিকটস্থ
বিভিন্ন গৃহে আশ্রয় দেওয়া হল। শেষ
পর্যন্ত স্থির হল—পুলিশের লাঠি চালনার
জন্য অপেক্ষা না কবেই সম্মেলন ভেঙে দেওয়া
উচিত। বোগেশ চৌধুরী (J. Choudhury)
অগ্ররুদ্ধ কণ্ঠে আবেদন করলেন—সবাই মণ্ডপ

ভাগ করে নিজ নিজ গৃহে গিয়ে শপথ নিক
চারিদিকে আগুন ছাড়িয়ে দিতে হবে এবং
সেই আগুনে বিলাতী দ্রব্য পুড়ে ছাই হউক।
'বন্দে মাতরম' ধ্বনি ও উদ্দীপনার মধ্যে সবাই
বিলাতী বজ্রনের শপথ গ্রহণ করে সভা ভাগ
করল।

সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হল;
কিন্তু সম্মেলনের জের চলতে লাগল।
নেতারা বঙ্গনী দাসের গৃহে সমবেত হলেন।
এবং সেখানে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সম্বন্ধে
তীব্র আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক হয়।
সুরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন বসু প্রস্তাব করেন—
সরকারী জলদ্রব্য কথা বিলাতে Secretary
of State for India কে তার করে—
জানানো হক। মতিলাল ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র
পাল এর বিরোধিতা করেন, এ স্থানে উল্লেখ
করা দরকার যে প্রকাশ্য সম্মেলনে প্রস্তাব
পাশ করা হয়েছিল যে সরকারের কাছে
জানাবার মতে কোন প্রস্তাব করা হবে না।
কেবল জাতির আত্মশক্তি উপর নির্ভর করে
এমন কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে। দীর্ঘ
তর্ক-বিতর্কের পর, স্থির হয় যে, ঐ তার-
যাত্রা পাঠানো হবে না। যখন গৃহের
অভ্যন্তরে এই আলোচনা চলছিল, তখন
বাইরে বহু লোক জড়ো হয়েছিল। নেতাদের
কাছ থেকে তারা জানতে চাচ্ছিল—কি এখন
কর্তব্য। প্রথমে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
এবং পরে সুরেন্দ্রনাথ, গণীপতি কাব্যতীর্থ
মৌলবী আব্দুল হোসেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।
সকলেরই এক কথা—বিলাতী বজ্রন ও
স্বদেশী গ্রহণ এবং শাসনকর্তাদের জলদ্রব্য
ও অভ্যচার। এরপর জনতা দাবী করল—
সভাপতি আবদুল বসুকে দেখাবে। বসু
একটু উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে সকলকে অভিবাদন
করলেন। সমগ্র জনতা সম্মুখে তাকে
অভ্যর্থনা করল 'বন্দে মাতরম' ও 'আজা-হো-
আকবর' ধ্বনি দিয়ে।

পরদিন, ওরা বৈশাখ, অনেক প্রতিনিধি
বরিশাল ছেড়ে চলে যান। কিন্তু কলিকাতার
নামকরা নেতারা প্রায় সবাই বরিশালে
রইলেন। পবিত্র কালের গরম Extremist
ও নরম (Moderate) দলের সূচনা
আমরা বরিশালের সম্মেলনে প্রথম দেখতে
পাই। রজনী দাসের গৃহের ঘরোয়া আলো-
চনাজেও তা ফুটে উঠে। পরদিনও তা প্রকাশ
পায় বিভিন্ন জনসভায় ও পরস্পর মেলা-
মেশায়। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গী কালী-
প্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বোগেশ
চৌধুরী প্রভৃতি গেলেন বরিশালের নিকট-
বর্তী রহমতপুর ও লাখুটিয়া গ্রামে—
আঁরি শহরে রইলেন বিপিনচন্দ্র পাল, রত্ন-
বান্ধব উপাধ্যায়, রাজা সুবোধ মল্লিক
প্রভৃতি। রহমতপুরে প্রায় ৮১০ হাজার
লোকের সভায় সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন এবং
পরে। লাখুটিয়াতে আবার বক্তৃতা করেন
তখনকার দিনে Mike ছিল না, কেবল

দলার জোরে ৮১০ হাজার লোকের কাছে
বক্তৃতা করা কি, তা আজকার নেতারা বা
বক্তারা ভাবতেও পারে না। শ্রবতীর দল শহরে
বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে। রক্তমোহন
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকালে ও বিকালে, রাজা
বাহাদুরের হাবেলীর নিকটে লোন অফিসের
(Barisal Loan Company) ও বিভিন্ন
স্থানে এরা বক্তৃতা করেন। এই লেকচার মনে
আছে—গৈরিক বসনধারী সম্মানী উপাধ্যায়ের
ওজস্বিনী বক্তৃতার শব্দবৎ শ্রবকদের মনে কি
উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। পরদিন ৪ঠা
বৈশাখ—সব নেতারা চলে যান। কেবল
মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য দুজন ব্যারিস্টার
বোগেশ চৌধুরী ও বিজয় চট্টোপাধ্যায় শহরে
রইলেন। এখানে কলা দরকার এই সম্মেলন
উপলক্ষে সরকার পক্ষ ও জনসাধারণের পক্ষ
হতে বহু মামলা দায়ের করা হয়েছিল।
এর অনেক মামলা হাইকোর্টে বাব এবং কোন
কোন মামলা হাইকোর্টে হতে বিচারের জন্য
অন্য জেলার পাঠান হয়—কারণ হাইকোর্টের
মনে আশঙ্কা হয়েছিল যে বরিশালে ঐ সব
মামলার সুবিচার হবে না।

এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা
দরকার। প্রাদেশিক সম্মেলনের সঙ্গে সাহিত্য
সম্মেলনও তখন হত। কথা ছিল রবীন্দ্র-
নাথের সভাপতিত্বে পরদিন ১৬ই এপ্রিল বা
ওরা বৈশাখ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন
হবে। এই ঘটনা পূর্বে আর সাহিত্য সম্মে-
লনের অধিবেশন হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ
বরিশালে ২৬ বৈশাখ রাত্রি আসেন। পরদিন
সকালে নদীর পাশে একটি গ্রীন বোট green
boat তাকে আমবা দেখতে বাছি।
লেখক রবীন্দ্রনাথকে এই প্রথম দেখার
সৌভাগ্য লাভ কবে। কবি দেবকুমার রায়
চৌধুরীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ কবে সেখানে
সাহিত্য সম্বন্ধে ঘরোয়া আলোচনা করে
রবীন্দ্রনাথ চলে যান।

বরিশালের ১৯০৬ অবসর প্রাদেশিক
সম্মেলন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক
নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। সরকারী
স্বেচ্ছাচারের উল্লংঘন সম্প্রতি জাতির মনে
একটা সাদা এনে দিল। ইমার্সনের কৃষ্টিতে
সুরেন্দ্রনাথকে বিচারের নামে যে অপমান
করেছিল তার শিক্ষাও জাতির মনে গাথা
রইল। ইমার্সন সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—
'stand up; you are a prisoner'.
অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্য নেতাদের ঘর থেকে
বের করে দিলেন। তাদের মাথায় টুপি
ছিল না, ইমার্সন চিৎকার করে বলেছিলেন—
Get out, get out, you have
no hat'. অশ্বিনীকুমার বলেছিলেন—
'This is my national dress'
ইহাই আমার জাতীয় পোষাক। কিন্তু
এই সব ঘটনা থেকে সবাই বুঝে নিয়েছিল—
সরকার সম্প্রতি বিচারবান্ধি হারিয়েছে। তাই
জাতিকে এখন তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

শ্রীউমাপদ নৃসিংপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ন

মূল্য দুই টাকা

'অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে'—স্বামী অপূর্বানন্দ।

'বৈদ্যানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।'

—স্বামী সদাশিবানন্দ।

'বৈদ্যানি দেখিতে অসুন্দর; বিষয়বস্তু অসল্য
ও অভুলনীয়। একশানি গ্রন্থে এত মহা-
মূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয়
নাই।'

—স্বামী শুক্লানন্দানন্দী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্তমান সময়ের সল্য। ও
জাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি
পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙিতে বিলম্ব
হয় না। মূল্য ১১০ টাকা

অনামধন্য কথাসিঙ্গী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

প্রস্তাবনা

ধর্গাদিগণ প্রায়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড),
দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩.০০

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,

কলিকাতা—১২

ভাৰতীয় বিপ্লব আন্দোলন

সাম্বাল দাশগুপ্ত

বিপ্লবী আন্দোলন বা সংগ্ৰামের স্মৃতি-কথা সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে বলা হয়েছে। হঠাৎ বিপ্লবীদের সম্বন্ধে দেশে নতুন করে একটা জ্ঞানবার আগ্রহ জেগেছে বলে ধরে নিচ্ছি না, তবে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা বিপ্লববাদের মূল্যপূর্ণ নয় 'তারাও বিপ্লবীদের চিন্তা ও চরিত্র প্রকাশ করতে উৎসুক দেখে মনে হয় হয়তো সাধারণের মধ্যে একটা আশা-ভ্রমের কারণ হয়েছে, হয়তো আমবা বা পেল্লম বলে খুব আত্মপ্রত্যয় বোধ করা হচ্ছিল—মূলত অহিংস সংগ্ৰামের পক্ষে, তা যদি ঠিক পাওয়া হয় নি, কেন যেন কোথায় কী ফেলে এসেছি, দেশের অঙ্গাঙ্গিকে পেলেও যেন আত্মটি থেকে বাঁচতে হয়েছি, হয়তো শত্রু অকাতবে প্রাণ দিবাঁছলেন—নেহা প্যাগল ও বোকার মত, হয়তো তাঁদেরও একটা বস্তব্য ছিল ইত্যাদি অস্পষ্ট বিবেকবোধনা থেকে।

স্মৃতিপ্ৰতি শ্রীকালীচরণ ঘোষ The Roll of Honour বলে প্রায় নব্বিশ পৃষ্ঠার একখানা বই বেঁধে কয়েকজন, তাঁতে প্রায় হাজার খানেক শহীদের খবর পরিবেশন করেছেন, আর দিয়েছেন নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামে ১৬৮০ জন শহীদের নাম-ধাম। বইখানার আদব দেশের ঘরে ঘরে হবে কিনা জানি না, কিন্তু অমন একখানা বই গ্রন্থ হাতে নিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়, এতগুলি প্রাণ-বা মহাপ্রাণ ছিল এই সংগ্রামে—একত্র কবে দেখলে নতুন করে ভাবতে হয় দেশের স্বাধীনতার জন্য কার দান সত্যি কত ছিল? তবুও যাবা কেবল কাব্যজীবন কাটিয়েই—সে যাবজীবন স্বাধীনতার খেঁটে হলেও—পাৰ পেঁবে গেছেন তাঁদের নামও এই জাতীয় তালিকা বা Roll of Honour এ স্থান পায় নি—তাঁদের সকলকে যদি ধরা হয়—তবে এই সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে লক্ষ নবনারী যোগ দিয়েছিলেন—নানা ভূমিকায়—একথাও বলা চলে।

তবে এত প্রাণদান কি বাৰ্থ হয়েছে—তাক কেবল ইতিহাসের আঁতাকুড়ই স্থান পাবে? একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যেমন 'সার্থকতা'র চেয়ে বড় 'সার্থকতা' নেই, তেমনি 'বিফলতা'র চেয়েও বড় 'বিফলতা' বোধহয় বড় নেই—যদিও এমন বিফলতাও আছে জগতের ইতিহাসে যার মূল্য অসংখ্য সার্থকতার চেয়ে ঢের বেশি উচ্চ

দরের এবং শেষ পর্যন্ত টের বেশি দামী জাতীয় সম্পদ বলে গ্রাহ্য হয়। কিন্তু এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা বা ভাবের ঘরে চুরি করার কৌশল আবিষ্কার করার অপচেষ্টা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, বরং একঘেয়ে রোমাঞ্চের মূল্যায়নের বিবৃশ্বেই কঠিন সমালোচনার মুখে দাঁড় করাতে চাই—বিগত দিনের সেই বিপ্লবী সংগ্রামকে—কেন না সৈন্যজাতীয় আত্মসমালোচনামূলক বিচার-বিতর্কের পরও যেটুকু সারবস্তু পাওয়া যাবে—সেটুকুই সব 'বার্থ' সাধনখানির' সার্থক অবদান।

১৯০৮ সালে বালক ক্ষুদ্রদাম ও প্রফুল্ল চাকি যখন প্রাণ দিলেন তখন তাঁদের কাছ থেকে কোন ঐতিহাসিক বা রাজনীতিক নিশ্চয়ই ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৈজ্ঞানিক-বিচারসম্মত কোন পথ বা স্ল্যান আশা করেনি, এবং আজও তাঁদের সেভাবে বিচার করা হয় না। তারপর নানাভাবে বিপ্লববাদী বা সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম ও বোম্বাইয়ের নৌ-বিপ্লব বোধহয় সৈন্যজাতীয় সংগ্রামের শেষ ও চূড়ান্ত নিদর্শন। শেষোক্ত দুটি ঘটনা অবশ্য ঠিক গুরুত্ব বিপ্লবী দলের সংগ্রামজাতীয় লিহিন্স নয়—ওদের জাত যদিও আলাদা নয়। এই দুটি সংগ্রাম মহাশব্দের পরিগামজাত, যদিও অস্পষ্টভাবে হলেও সশস্ত্র-বিপ্লবের জন্য বহুদিনের ধূম্যিত ও বহিমান জাতীয় ইতিহাসের একটা দিকের মূর্ত রূপও এতই যেন ফেটে-ফুটে নানাদিক থেকে অহিংসাব্যবর্তী আবরণটা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত সৈন্য-বিস্ফোরণও 'সার্থক' হয় নি, অন্তত সে সংগ্রামের সত্যিকার মূল্য-মূল্যটাও ইতিহাসে অদৃশ্য মেলেনি। অবশ্য ইতিহাস-ববাবের মত লেখা হয়ে যায় না—ইতিহাস ক্রমভাসীন শাসক-বাহিনীত্বের হাতে বাঁধতা, একথা সাম্প্রতিক বিশ্ব-ইতিহাস থেকেও জানা যায়, অর্থাৎ অপর কোন দল যদি সহসা ক্ষমতা দখল করে ফেলতে পারে তবে ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে যাওয়াই তাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এসব কথা বলেও ভারতীয় বিপ্লববাদের পক্ষে কোন চতুর সমর্থন আশ্রয়ণ করার প্রয়োজন নেই। তবু বলা এখনি যাতে ইতিহাসের—যা অতীতের

ঘটনা তাদের—একটা অশুভ কবনে বেঁধে থাকার ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ ইতিহাস যেন কখনই মবে ভূত হবে যায় না—তা সম্ভব করার জন্য।

যে অন্ধকার যুগে পবাবীন ভাৰতীয়রা আপন জীবনের মূল্যটাকেই সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে করতো, মান-সম্মান, ইজ্জত, ধর্ম, দেশ সবকিছুর চেয়ে, অনেক বস্তব্য ও অনেক বহুতা যখন একটা জালগার এসে দাঁড়িয়ে বেত, আর এক পা এগুতে পারতো না, তখন মৃত্যুভয়টা দূর করাটাই ছিল সমস্ত অববুদ্ধ অগ্রগতির চাবিকাঠি। সেটা দেখিয়ে দিলেন সে যুগে ক্ষুদ্রদামেরা। নইলে রণকৌশল কি, ঠিক কোন জায়গাটাতে শত্রুর প্রাণ ও শক্তি অধিষ্ঠিত—তাৰ বিচারের মাপকাঠিতে ওঁরা দাঁড়াতে পারেন না। এক-আধটি প্রাণ নয়, অনেক প্রাণ দিয়ে অর্জন করতে হয়েছিল সৈন্য দেশকে—তাৰ মৃত্যুর দেবত্বের আবিষ্কার করতে। এভাবে যখন নিজের মরণ-বরণটা সহজসাধ্য বিষয় করে তুললেন সৈন্য-কার যুবকরা, তখন প্রশ্ন উঠলো—তাবব? এই মৃত্যুপ্রসাদ চেতনাকে দিয়ে শত্রুকে পরাস্ত করা যাবে কী করে?

আত্মমরণ—সার্থক আত্মমরণ—যাতিব ওপৰ থেকে, শত্রুর সংগঠিত শক্তি ওপৰ কী করে করা যায়? তাৰ এৰাটি ঢেঁড়ার নিদর্শন মেলি চট্টগ্রাম লুণ্ঠনের ঘটনা থেকে। একদিন যাতিতে সমস্ত শহরটা বিপ্লবীদের হস্তগত হ'লে গেল, বিস্ময়ে বিপ্লবীরাও সৈন্য হস্ততো হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, এত সামান্য শক্তি নাকি বৃটিশসিংহের। কিন্তু সে বিস্ময়ের প্রকৃত তাৎপৰ্য অমুদ্রাবন করার পক্ষেই তাঁদের বহুদিনের অভ্যস্ত ধাবগাটা আবার তাঁদের পেৰে বসল, তাঁরা তাঁদের জবাবকে জ্ঞান বলে বুঝতে পারেন নি সৈন্য সে যাতিতে—ফলে তাঁরা বিজিত-শহর থেকেও গাহাড়ে সঁবে গেলেন, যেখানে যাবাব পূৰ্ব-পরিচালনা তাঁদের কিছুই ছিল না। অস্ত্র-গাব লুণ্ঠন করে সমস্ত শহর কবামত কবাটা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অমন সহজে নিজে-দেব জয়কে ফেলে দিয়ে, অধিষ্ঠিত জবটুকুকে বহুস্তর জরোৰ সংগ্রামে সার্থকভাবে প্রয়োগ না করে অমনভাবে সঁবে পড়াটাও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। ইতিহাস একদিন এ ভ্রমেৰ বিচাৰ কববে বোধহয়। বিপ্লবীরাও রেহাই পাবেন না। শহীদ হয়েও দিস্তাব নেই

—ইতিহাস একাদকে যেমন অসীম ও অফলিত উৎসাহে মগ্নমানের বিপ্লবীকে হৃষিত করে, তেমনি কঠোর বিচারের কাঠ-গড়ায় ছাঁড় করিয়ে দেয়।

সকলেই জানেন বিপ্লবীদের স্বাক্ষরের একটা মাথাবাণ ও প্রচেষ্টা ছিল কোথা থেকে আস্ত পাওয়া যায় এই নিয়ে। স্মাগলাবদের পিছে পিছে ঘুরে কত প্রতারকের হাতে বশিত হ্রত হয়েছে তার ইতিহাস মস্ত, কত সময়ে প্রতারক স্মাগলার সরকারেরই হাতিয়ার ছিল এবং তাব জন্য কত হাজার ছেলেকে যে ছেলে যেতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই—সে ইতিহাস যেমন করুণ—তেমনি কৌতুকপূর্ণ। কখনও কখনও এক-একটা মোটা অস্ত্র-সংগ্রহ যে না হলেই এমন নয়—যেমন রডা বেস্পানী থেকে সংগ্রহ করা মোসার পিস্তলগুলো—যা দিয়ে অনেক কীর্তি করার চেষ্টা হয়েছে এবং সে আত্মত্যাগের অংশ ভাগ পায়ের জন্যও কতো আগ্রহী বিপ্লবী যুবকদের কতকাল ধরে কতরকমভাৱে মৃত্যুতে হয়েছে, এখানে-ওখানে ধরা দিতে হয়েছে। রহস্যময় ছিলো সেদিন অস্ত্রের উৎস, আর সে রহস্যের পিছনে ছুটে ছুটে কত উল্লাসই না পশ্চ হয়েছে।

অথচ হঠাৎ যখন অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন করে বিপ্লবীরা দেখলেন সেখানে ৭০০ রাইফেল, মস্ত—প্রচুর—গুলী-বাধুসহ—তখন এ ২০।২৫টি ছেলে অবাক—এত অস্ত্র দিয়ে করবেন কি তারা? প্রত্যেক আকুল আগ্রহে (২) দুটো করে নিয়ে নিলেন, কিন্তু কত ভারী সে বোকা—তার সঙ্গে গুলী-গোলাও যদি নিতে হয়। বাকীগুলো—প্রায় লাড়ে হরশড রাইফেল ও গুলীবাদুসে ধরিয়ে দেওয়া হলো আগুন—পেট্রোল দিয়ে (তা দিতে গিয়েও একটি ছেলে নিজেরই দেহে আগুন লাগিয়ে ফেললে—তখন ওকে বাচানো ও সরানোই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো!)। এও এক আশ্চর্য ব্যাপার, অস্ত্রের জন্যই যদি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হলো, তবে অস্ত্র-অস্ত্র-পেলেও নষ্ট করে দেওয়া হলো কেন—যখন সব ভারতে বিপ্লবীরা অস্ত্রেরই সম্মান করে বেড়াচ্ছেন এবং ১৯৩০ সালের সেই সর্ব-ভারতব্যাপী গণজাগরণের মূহুর্তে আলোড়ন চলেছে, যখন বর্মার ‘খারখতী’ বিদ্রোহ পূর্বোদয়ে চলেছে—যে বর্মী চট্টগ্রামের পাহাড়-গুলির ওপরেই—যে বর্মী তখনও ভারতের অন্তর্গত এবং একই শত্রু-বৃষ্টির সঙ্গে লাক্ষা সশস্ত্র বিদ্রোহে মিশত? কেন সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রগুলি নিয়ে বিজিত চট্টগ্রামের ওপরে পাড়িয়েই নিকটবর্তী পাহাড়ে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত সশস্ত্র সংগ্রাম বা গেরিলা যুদ্ধের পথে সেদিন তারা গেলেন না, কেন সর্ব-ভারতীয় গণজাগরণের ভাবতী—অনুকূল পরিবেশের সুবর্ণ-সুযোগটা তারা ব্যবহার করলেন না, কেন বিদ্রোহী বর্মীদের লাঞ্ছিত হতে পারলেন না বা সে জাতীয় চেষ্টা করলেন না? আর এই জালালাবাদ

পাহাড়ে প্রায় অর্ধ-অর্ধ-রাস্তা অবস্থায় বৃটিশ এমশিনগানের মোকারিলা করতে গেলেন এবং সে অস্ত্র সংগ্রামে নিপুণ হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অস্ত্রগুলি প্রাপ্ত ও সব-কটা আহত রাইফেল ভাগ করে বাকীদের সবে পড়তে হলো এবং আবার সেই যে-কটি গুলি পিস্তল আর হাতবোমা ছিল তারই শরণাপন্ন হয়ে বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধের আশ্রয়স্থলক সংগ্রামে ফিরে যেতে হলো। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সুবর্ণ সেন প্রাপ্ত দিলেন, সংগ্রাম বর্জন করলেন না—শত বিষয় সঙ্কেত। তবে ইতিহাস প্রসন্ন করবে, অস্ত্রাগার কেন লুণ্ঠন করেছিল, কেন শহর দখল করেছিল—যদি তাদের ব্যবহার না-ই করো?

এ ধরনের একটা তাম্বল ব্যাপার বা চিন্তার জড়তা সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসেই খুঁজে পাওয়া যাবে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে বোম্বাই ও করাচী বন্দরে যে নৌ-বিদ্রোহ হয়—তখনকার সেই বিপ্লবী পরি-স্থিতিতেও, যখন অহিংস আন্দোলন পরাজিত হয়ে পড়ে আছে এবং তার নেতারা অপোঘ-রফার আলোচনার মত—সেদিনও ৫০০০০ বিদ্রোহী নাবিকদের হাতে এত অস্ত্র-শস্ত্র ছিল যে তারা অন্যায়সে বোম্বাই শহর দখল করে নিয়ে, বিদ্রোহী জনতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে—সর্বভারতে বিপ্লবের ডাক দিতে পারতেন—এবং আবার দিল্লী চলো এমন ডাক দিতে পারতেন এবং সে ডাক সার্থক হতো এবং ভারতবর্ষ অশান্ত স্বাধীনতাই পেতে পারতো। বোম্বাইতে ২০ খানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্লিগেট জাহাজ আর সমুদ্রকুলবর্তী ঘাঁটিগুলি তাদের সম্পূর্ণ দখলে—এবং তাদের মতে এত অস্ত্র ছিল যে পঞ্চাশ হাজার নাবিক ছবছর পর্যন্ত লাড়তে পারতেন। এতবস্তুও তারা জাহাজেই রাখে রাখেন, যেখানে ষায়া ও মিস্তি জলের অভাব প্রাতি মুহুর্তে বেড়ে যেতে থাকলো—আর দূর থেকে বৃটিশ-রয়েল নৌবাহিনীর বর্মপাঠার কামান ও রয়েল এয়ার ফোর্সের বর্মবাহির সম্ভাবনা ব্রহ্মই ধনীভূত হবে উঠতে লাগলো। ভারতের বিপ্লব নিশ্চয়ই এই বিশালা জাহাজের ওপর ছিল না, ছিল ভারতের জমিনে—তার ৩৫ কোটি জনগণের মধ্যে। কিন্তু তেমন দিনে তারা জাহাজেই রয়ে গেলেন, নিজের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ থেকে আনলেন—যদিও তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কীর্ণ নেতৃত্বের মাধ্যমে। ধর্মব্রতী বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়েও বিপ্লবের পথ ধরলো যখন, তখন এমন সম্ভাবনাটাও আর-উপসাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হলো।

শুব জানা ও পরিচিত প্রধান দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করে দেখাতে চেষ্টা করছি যে, এদেশে বিপ্লবী প্রেরণার এত উল্লস নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও কেন বিপ্লব-বিজ্ঞান বা বিপ্লবী চেতনার এত দৈন্য দেখা যায়? বিভিন্ন দেশে বিপ্লবীরা তাদের যন্ত্রাটাকে আবিষ্কার করেছেন এবং সচেতন সে পথে সার্থক হবার জন্য

চেষ্টা করেছেন এবং সাধকও হয়েছে। অবশ্য সার্থক হয়েছে বলেই আমরা আইরিশ পম্পা, ইটালী পম্পা, রুশ পম্পা, চীনা পম্পা ইত্যাদি শব্দ ও স্মৃতির কথা জানি বা শুন। কিন্তু ভারতে ভারতীয় বিপ্লবীদের পম্পাটি কি তা বোকাই গেল না। হয়তো সার্থক হয় নি বলেই। কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা থেকেই যাবে ভারতীয় বিপ্লবীদের কোন সূচিন্তিত কর্ম-পম্পা ছিল কি না। এবং সে জিনিসের অভাব ছিল একথা স্বীকার করতেই হবে—যদি অভাব না থাকতো তবে তারা এমন ধরনের অসার্থকও হতেন না।

এত দীর্ঘদিনের এই সংগ্রাম কেন তার চোখে ফোটাতে পারলো না—কেন একটা সুস্থ, সবল ও সামগ্রিক রক্ষণাশীল রাষ্ট্র দিতে পারল না? বরাবরই কি এ জাতীয় বিষয়ে মৌলিক চিন্তার অভাব ছিল? সে কথা বলা যায় না। বরং এ সংগ্রামের প্রথম দিকে ‘সম্মা’, ‘কালের ভেরী’, ‘সুগাম্য’ প্রভৃতির ১৯০৭, ১৯০৮ সালের লেখাগুলি পড়লেই দেখা যায় তখন বিদ্রোহী সশস্ত্র বিপ্লবী চিন্তার বড়টা বিকাশ হয়েছিল, পরবর্তী-কালে এসব চিন্তার গবেষণাও যেন কমে যায়। ১৯৩০ সাল নাগাদ এসে ৪৮৮ & Science of armed revolution অবশেষে সবরকম মৌলিক গবেষণাই যেন বন্ধ হয়ে গেল, যদিও তখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলন ও সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, মূর্খিমের লোকদের মধ্যে আবদ্ধ নেই। অবশ্য দিনিসার বিপ্লবীরা গান্ধীজীকে একটা মূল্যোৎসাহ দিলেন, তাঁদের নিজেদের পক্ষ স্বীকৃতি রাখলেন এবং তারা নিজেরা কংগ্রেসে ঢুকে পড়লেন, গান্ধী-নেতৃত্বের বিবর্ত গণ-আন্দোলনকে একদিন নিজের বৈপ্লবিক কাজেও লাগিয়ে নিতে পারলেন—গান্ধীজী যেখানে গিয়ে দাঁড়াবেন, আর চলেবেন না, সেখানে থেকে ওঁরা রওনা যাবেন ইত্যাদি আশা করতেন কেউ-কেউ। কিন্তু কার্যত তারা কংগ্রেসের মধ্যে হারিয়েই গেলেন বলা চলে। দেশে ইতিপূর্বে মরণ-জরী বেসব দুর্দান্ত শহীদ বিপ্লবীরা তৈরি করে নিয়েছেন তার প্রভাবটা জনচিন্তে পড়ে নি একথা ঠিক নয়, বরং একথা বলা চলে যে, গান্ধী-আন্দোলনেও যে মৃত্যুজরী চেতনা সত্যায়নের মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছিল এবং দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে ভয় ও শ্রাসের আরহাওয়াটা দূর হয়ে গিয়েছিল, তাতে বীষ শহীদদের দুর্দান্ত নিশ্চয়ই প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, হঠাৎ গান্ধীজী রাইরে থেকে সমস্ত সাহস আমদানী করেন নি। বরং গান্ধীজী নিজেই অনেক সময় বলেছেন যে, বিপ্লবীরা মৃত্যুকে ভুছ করার যে দুর্দান্ত দোষিয়েছেন তা সামান্য নয় এবং তিনি যদি তাব সূর্ণ তুলনায় কোন বাঁধবাজনার প্রোগ্রাম না দিতে পারেন বা তেমন অকুতো-ভর তবে তিনি দেশের মন জয় করতে পারবেন না—বিপ্লবীদের হাত থেকে। এ যেন

প্রান্তরোপিত—কালো বেশ লোকদের সাহসী করে তুলতে পারে—সংগ্রামী করে তুলতে পারে—সহিংস পথে না অহিংস পথে। কিন্তু বিপ্লবীরা যেন হাল ছেড়ে দিলেন গান্ধীজীর হাতে, তখন তাঁরা যেন হারিয়ে গেলেন এবং বিপ্লব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণাটাও ছেড়ে দিলেন।

১৯২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩ সাল য়ে-

সব বিপ্লবী চেষ্টা হয় তা কিন্তু আর পুরনো বিপ্লবীদের নেতৃত্বে নয়। বরং কংগ্রেসী রাজনীতিতে পুরনো নেতাবা যোগ দিয়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের বিবৃতিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই—যাকে বলে Revolt of Third Group—এ তাদেরই কীর্তি—যুগান্তর অনুশীলন নামক দুটি দল থেকে ভেঙে বোম্বে আসার প্রচেষ্টা

আর, পশ্চিম ভারতে Hindusthan Republican Socialist Association নামে যে দলটি দর্শন সান্যাল, চন্দ্রশেখর আজাদ, ডগং সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাস ইত্যাদির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে তারাও পূর্বতন বিপ্লবীদের অনুগামী নয়—তাব্যে কংগ্রেসী রাজনীতির বিরোধী। তবে এই শেষেষ্ট দলটি রূপ



স্বাধীনতা-দিবসের সংকল্পে

পানোরাই আগষ্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস

এই পবিত্র দিনে আমাদের সংকল্প হোক —

“জাতীয় ঋণ্য বজায় রাখবো”

“কল-কারখানায় আরো বেশি উৎপাদন করব”

“সকলপ্রকার অগচর বন্ধ করব” আর

“জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য করব আত্মোৎসর্গ”

শ্রমিকের দৃঢ় সংকল্প ও কর্মগাঢ়তার মধ্য দিয়েই গ’ড়ে উঠবে নতুন ভারত,

সেই সঙ্গে গ’ড়ে উঠবে তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরাজ্য সুসমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ

বিপ্লবের আইডিয়াল—যদিও তার রপকৌশল নিয়ে নয়। ফলে, বিশেষ করে বাংলা দেশে, আবাব যে নতুন করে, বিপ্লবী প্রচেষ্টা সুরু হয় তা যেন হঠাৎ একটা বহুদিনের Brek-... পর, যার ফলে ১৯০৭-৮ সালের চিন্তা-চেষ্টনা থেকেও তা ছিন্ন হয়ে পড়ে—অর্থাৎ কোন ধারাবাহিকতার সাহায্য তঁরা পান নি, বা নেন নি। ফলে দেশের ভেতরে অতীতে কী ঘটেছিল, তার অনুসন্ধান না করে, তার শিক্ষাদীক্ষা না নিয়ে, দেশের বাইরে থেকেই বিপ্লবের কৌশল সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। এমন পড়ে তখনকার দিনে আয়লন্ডের বিপ্লবী Dan Breen-এর My Fight for Irish Freedom ছিল এই নব্য বিপ্লবীদের বেদ—ও-বইটা কত যে পড়া হতো তাব ইয়ত্তা নেই। অথচ আয়লন্ডের মত ক্ষুদ্র একটি দেশের পরি-স্থিতিতে যে সংগ্রামটা DAN BREEN-এ করেছিলেন, ভারতের মত বৃহৎ দেশে গণ-আন্দোলনের বৃহত্তর পরিবেশে কেমন করে, সর্বভারতীয় সশস্ত্র-বিপ্লবী-সংগ্রামে লাগাতে হয়, সে-জাতীয় চিন্তা-চেষ্টনা ও গবেষণা মোটেই হয় নি।

অথচ ১৯০৬-৭-৮ সালেই যেসব বিপ্লবী-লেখাপত্র তৎকালীন কাগজে-পত্রে পাওয়া যায়—যখন গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের কোন নাম-গন্ধও ছিল না—তা পড়লে, তাব বেগ, আবেগ ও সিঁঝাসনেস অনুভব না করে উপায় নেই। কয়েকটি উদ্যোক্তা দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি।

“এসো, অল্পাধিক যত্নে নামিয়া পড়ি। সবাইকে যুদ্ধ আহ্বান করি। মাকের সন্তানেনা, সবই প্রস্তুত হইতেছেন, আনের, ধরন, ব্যাবহারি অস্ত্রসমুদয় প্রস্তুত করিতেছেন। শত্রুগণ শোন, আমরা কি আর তোমাদের কামান-বন্দুক ভয় করি?”

“অস্ত্র চাই, তাই সব অস্ত্র চাই; সম্মুখে মৃত্যুর দিন সুমাগত। আমরা এ ডাক মুনিত্তে পাই, শত্রুগণ ভাগ্যবান ডাক আসিয়াছে, আর পিছ হটিবার সময় নাই।”

(সম্মা, আগস্ট ১০ই, ১৯০৭)।

“তোমার ধর্মের শত্রুদের বিনাশ করো। তোমার কতব্য সাধনের পথে, যারাই বাধা দিতে আসুক—সে ধনী হোক, দরিদ্র হোক, ছমিদার, রাজা, রাজকর্মচারী অথবা স্বয়ং শ্রমিগণ হোক—তাদের বিনাশ করো।”

(যুগান্তর, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৭)।

২৬শে আগস্ট, ১৯০৭ সালের যুগান্তরে Mad Yogi বা ‘পাগল যোগী’ কী ধরনের বেপরোয়া বিদ্রোহের ও প্রতিহিংসার বাণী হুড়িগাহিলেন, তা পড়লে আজও মাথা কিম কিম করবে হয়তো অনেকে—

“আমাকে পাগলামীতে পাইবাছে। চারিদিকে যখন অশান্তি বহু পাই তখন রক্ত আমার উদ্দেশ্য নেশা জেগে যায়, আমি স্থির থাকিতে পারি না। চারিদিক থেকে লুণ্ঠনকারীর খবর

আসিতেছে, আর আমি যেন স্বপ্নে দেখিতে পাই, চারিদিকে সব গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছে এবং ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্র তখনই কবিতা বেড়াইতেছে। লুণ্ঠ ও ডাকাতিব বেশেই যেন বিদ্রোহ-দেবতা দেখা দিচ্ছে... এই বেপারোয়া বিদ্রোহের দেবতাকেও আমি আহ্বান জানাই, বলি এসো, তুমিই আমার সাথী। তোমাকে সাথী করিয়াই দেশ সশস্ত্র হইবে, তোমার কাছ থেকেই রশ্মিষ্কা ও শেষ পর্যন্ত শত্রুগণ আরম্ভ করিবে। তাই তোমাকেই আমি আজ বন্দনা করি।”

১০ই মে তারিখের ‘সম্মা’ বোমা তৈরী করার ইংগিত দিয়ে লিখেন:

“কী ধরনের প্রস্তুতি হইতেছে তাহা বুঝিতে না পারিলে জনসাধারণের যথেষ্ট সাহস সৃষ্টি হইতে পারে না। অনেকেরই জানিতে চান, কত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ হইয়াছে। বর্তমানে অস্ত্র সংগ্রহ করা শক্ত হইয়া পড়িতেছে। এক ধরনের বোমা আবিষ্কার করার চেষ্টা চলিতেছে যার সাহায্যে সমস্ত রপ-কৌশলেই বিপ্লব ঘটান্না হইবে... তাহা তৈরী করিতে বেশী খরচও হইবে না, হাতে অথবা পকেটে অনায়াসেই বহন করা চলিবে। কিন্তু অস্ত্র সম্বন্ধে আমরা তেমন চিন্তিত বা ভাবিত নই। কিন্তু এমন একদল নির্ভীক যুবক আজ চাই যারা কোন অভাবকেই স্বীকার করিয়া লইবে না, এবং ভারতের মুক্তি আমরা এ বিশ্বাসে কিছুমাত্র সন্দেহ বাদেব নাই, যারা প্রতিজ্ঞা করিবে এবং ঘোষণা করিবে যে ভারত স্বাধীন না করিয়া তাদের কোন কাজ নাই, এমন কি মরাও চলিবে না। এসো আমরা এখনই সংঘবদ্ধ হই।”

১৪ই তারিখের এ পত্রিকা আছে:

“প্রতিটি ঘর, প্রতি গ্রাম, প্রতিটি হাট-বাজার সব এক একটি দুর্গ হইয়া উঠুক। লাঠি, সড়কি, গুলি, ছোবা হাতে লও। তাঁব-খন্দক ও ‘মা কালীর বোমা’ প্রচুর তৈরী করে মজুত রাখ। বোমাতে আগুন লাগাইতে হয় না, গুলিদের মধ্যে একটা সজোবে ছুড়িয়া মাঝেই হয়। ছোড়া মারই একটা শব্দ শুনিত্তে পাইবে, আর দেখিতে পাইবে শত্রুপক্ষের দশ-পনের জন পাড়িয়া গিয়াছে। এই কালী মাকের বোমা তৈরী করিতে মোটেই খরচ নাই, এবং প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা সম্ভব—ছোট বড় যে কোন আকারের তা করা সহজ।”

১২ই আগস্ট, যুগান্তরে আছে:

“কেমন করিয়া এই শক্তিমান শত্রুকে (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে) বিনাশ করার জন্য যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা হইবে?”

“যদি যথেষ্ট দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকে তবে এই কাজও শক্ত নয়। অস্ত্র তৈরী করার কৌশল কোন জাতিবিশেষের একচেটিয়া নয়। প্রত্যেক জাতিই, যদি চায়, তা করিতে সক্ষম। ভারতের মত বিশাল দেশে যেখানে অসংখ্য পাহাড়, পর্বত আর অরণ্য আছে সেখানে এসব করা মোটেই অসম্ভব

নয়। জিনিসপত্র তৈরী ও সংগ্রামের ক্ষেত্র নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত বুদ্ধি ও বিচারের প্রয়োজন আছে।

“রাস্তাশাখের পক্ষে খবর রাখাই সম্ভব নয়, গোপনে কাহারো কোথায় কিসের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

“অন্য উপায়েও অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব। বাঁহা রাশিয়ার বিপ্লবীদের খবর রাখেন তাঁহারা জানেন বিপ্লবীরা সেখানে জয়ের সৈন্যবাহিনীতে ঢুকিয়া যার এবং সেখানে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও বিদ্রোহের জন্য কাজ করে।

“ফরাসী বিপ্লবের এ ধরনের কর্মপন্থা কার্যকরী হয়। আব যদি শাসক শ্রেণী বিদেশী হয়, তবে তো একাজ আবও সহজ-সাধ্য। বিদেশী সরকারকে দেশীয় লোকজন-দেব মধ্য হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি বিপ্লবীরা তথায় ঢুকিয়া স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বাণী গোপনে ছড়াইতে থাকেন, তবে তাঁহারা মহৎ কাজ করিবেন সন্দেহ নাই। যখন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বিপ্লবীরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত সৈন্যদের পাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র-গুলিও পাইবেন।

“তাছাড়া আরও একটা রাস্তা আছে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য। পশ্চিমী ব্যবসায়ীরা অস্ত্রশস্ত্রেরও কাববার করিয়া থাকে—যেখানেই অস্ত্রের বাজার বা চাহিদা আছে সেখানেই তারা আগ্রহী হয়। যদি অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ের রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়, তবে তাদের বৃহৎ ব্যবসায়ই বন্ধ হইয়া যায়। দু-একটা অস্ত্র বিক্রয় করিয়া তাহাদের চলিতে পারে না, কিন্তু সুসংবদ্ধ বিপ্লবী দলের কাছে বেশী পরিমাণ মাল বিক্রয় করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। কিন্তু এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা ও বুদ্ধির প্রয়োজন আছে, যেন শত্রুপক্ষ বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বুঝিতে না পারে।” ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কয়েকটি মাত্র উদ্যোক্তা থেকেই বুঝতে পারবেন সে যুগে তারা কী ধরনের বেপরোয়া ও সিরিয়াস ছিলেন। আর এসব লিখতেন কখন? শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধবদের মত প্রতিভাধর লোকেরা বা নেতারা। তাঁরাও হঠাৎ বিপ্লবের পথ থেকে সরে যাবার ফলে এমন একটা গ্যাপ বা শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে গেল, আর ওদিকে গান্ধীজীর আন্দোলন ও নিয়ম-তান্ত্রিক আন্দোলনের বন্যা বয়ে গেল যে, ওয়গের পর বিপ্লবী চিন্তা ও গবেষণাও নিয়মিত হয়ে গেল আর সে স্থান পূর্ণ হলো না, সূর্য্যমুখ হলো না। বিপ্লবীরা গণ-আন্দোলন করতে গিয়ে বিপ্লব মিস করলেন, আব গণ-আন্দোলনকারীরাও গণ-আন্দোলনকে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথে নিতে পারলেন না। ভাল হলো কি মন্দ হলো, সে কথা আলোচনা—কিন্তু যা হয় নি তাই-ই হলো গেল।

॥ সত্যগ্রহ আন্দোলন : কয়েকটি মুহূর্ত ॥

বিজয়সিংহ নাহার

তখন ছিল এগিরে যাবার যুগ। সশস্ত্র, অবিশ্বাস, দুঃখ, বেদনা, অক্লান্ত সর্বাঙ্গিক অতিক্রম করে স্বাধীনতার সুমেরু শিখরে পৌঁছবার পরিপ্রেক্ষিতেই এই অগ্রগমন অব্যাহত ছিল। অশা ছিল আশ্বাস ছিল না, প্রাণের অফুরন্ত শক্তি ছিল কিন্তু এগিরে যাবার মত উপকরণ আমাদের ছিল না। তাই আত্মিক শক্তিতে বলায়ান হয়ে একেবারে অশঙ্কিত হয়েই আমরা মিলিত হয়েছি তখনই হয়েছে আমাদের জয়, তখনই উপলব্ধি করেছি আমাদের যুক্তির আদর্শ। জীবনের বিচিত্র বিসর্পিল পথে অদৃষ্টদেবতার পরিচালনায় দুঃখাগের ঘন আঁধারে চলবার শেষ কোথায় কেউ জানে না—তবু, চলতে হবে, আন্দোলন সফল করতে হবে। আমাদের চোখে একটি মাত্র স্বপ্ন, বিদেশীর শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করার স্বপ্ন।

শিক্ষাকে আগ্রহের সঙ্গে যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করার মত প্রাণশক্তির প্রাচুর্য প্রায় আমাদের সকলেরই ছিল। মনের জোর ও উপলব্ধির তীব্রতার উদ্ভূত হয়েছে দেশপ্রেমের উদ্ভাসনা। ছাত্র অবস্থায় পরাধীন দেশকে মুক্ত করার নানা ছবি আমার মনে ভাসত। পরাধীন দেশ ও জাতির কথা যখনই উপলব্ধি করেছি তখনই হয় আনন্দানুভূতিতে, না হয় প্রতি-কারের স্পৃহায়, আবার কখনও বা দুঃখ ও বেদনায় মন ভরে উঠত। তাই ছাত্রজীবনের শেষের দিকে দেশমাতার পরাধীনতার আবেগ উন্মোচন করার যখনই সুযোগ পেয়েছি তখনই তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি, আন্দোলনের লগ্নে যুক্ত হয়েছি।

সেদিনের সেই সত্যগ্রহ আন্দোলনের চেউ প্রথম দিকে শব্দ, বাংলার শিক্ষিত সমাজে আনন্দ থাকলেও কিছুদিনের মধ্যেই তা সাধারণ স্তরে পৌঁছে তার বিরাট বিস্তৃতি ঘটে।

হুদীন অগেকার কথা হলেও আমি সেদিনকার সেই স্মৃতি অজল ও ভুলি নি। সেটা ছিল ১৯৩০ সাল। বাংলাদেশ তথা ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক আকাশে আসন্ন বিপদের কালো মেঘ। ইংরেজ শাসক আসন্ন দুঃখের লম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। সত্যগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে দিনের পর দিন পূর্ণোদ্যমে। সাধারণ মানুষও এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে সাহায্য করেছে আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী।

ছাত্রদের মধ্যেও ব্যাপক আকারে এই সত্যগ্রহ আন্দোলন সূর্য হয়েছিল। তখন এ-বি-এস ও বি-এস-ও এই অভ্যাস ছাত্রদল বিশ্বাবিভক্ত ছিল, অর্থাৎ একদল সুভাষচন্দ্রী আর অন্য দল সেনগুপ্তপন্থী। এই প্রতি-ষ্ঠান দুটির মধ্যে দলাদলি নীতিগত দিক

থেকেও উত্তর দল পরস্পর বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু সবার উপরে ছিল আমাদের একটিমাত্র আদর্শ, তা হোল দেশমুক্তির আদর্শ। ছাত্রদের মনের মধ্যে তখন সঞ্চিত ধূমায়মান বহি তীব্র অপমান ও জ্বালায় ফেটে পড়তে চাইছে, বাংলার তরুণ ছাত্র বিপ্লবীরা থেকে থেকে গর্জে উঠছে, লালিত মনের সঞ্চিত বেদনায় জ্বলে উঠছে রক্তশিখা—গ্রেস্তার ও অভিন্যাসের বন্যা বইয়েও এ আল্পন নেভানো সম্ভব হয় নি। তাই সুভাষচন্দ্রী ও সেন-গুপ্তপন্থী এক হল, অনুশীলনী ও স্বদেশতর দলের মধ্যে হল যোগাযোগ এই আন্দোলনে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই দুই দলের মধ্যে এই আন্দোলনকে কে বেশী সাহায্য করবে, কে বেশী করে অংশ গ্রহণ করে দেশমাতার সেবার সুযোগ পাবে এই প্রবণতাই অধিক লক্ষ্য করা গেল। দেশের হিতার্থে সকল ছাত্র একত্র হল। এবং এই আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন বিখ্যাত বিপ্লবী প্রখ্যেয় সতীন সেন। কলেজ স্কোরারের সামনে মীর্জাপুর স্ট্রীটে ছিল আমাদের আপিস বা কেন্দ্র। এই আন্দোলনে যুক্ত হবার আগে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছি, তাই তখন ছিল কলেজজীবন শেষ। জীবনকে নতুন করে দেখতে শুরু করেছি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বদেশীকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এই আন্দোলনের কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছি, পিকেটিং ও বরকট পরিচালনার ভার ছিল আমারই উপর। শুলে শুলে গিয়ে ছাত্রদের বুদ্ধিরেছি, পিকেটিং করার প্রয়োজনীয়তা জানিয়েছি, কোথাও কোথাও ছাত্ররা নিজেদের ইচ্ছার শুলে ছেড়ে এসেছে, আবার কোথাও বা তাদের বুদ্ধিরে বার করে এনেছি। কোন কোন কলেজে ও শুলে অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রদের নিয়ে সভা করেছি। উদ্ভাসনা ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে দিনের পর দিন এগিয়ে চলছি—শব্দ, বাংলা দেশ নয়, সারা ভারতে যাতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সত্যগ্রহ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও সিদ্ধির কথা ব্যাখ্যা করেছি, কেন না তখন একমাত্র লক্ষ্য স্বপ্ন সফল করতে হবে, সত্যগ্রহ আন্দোলনকে সত্য ও সার্থকতার তীরে পৌঁছে দিতে হবে।

কিন্তু এই আন্দোলনে অগ্রসর হবার পথে সর্বপ্রথম বাধা পেলাম প্রেসিডেন্সি কলেজের কাছ থেকে। কেন জানি না তারা প্রথমে এই আন্দোলনকে সাদরে সম্মদ জানায় নি। দেশের সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে যখন ছাত্রসমাজ এগিয়ে যাবার উৎসাহ পেয়েছে তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের এই সিদ্ধান্তে আমরা সকলে বিস্মিত ও হতবাক

হয়েছি। অভিজ্ঞতা দিয়ে একে বিচার করা যায় না। তবে চলমান জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার কারো না কারো কাছে এর কারণ হয়তো অজ্ঞাত থাকবে না। সহজ উপায়ে আবেদনের প্রত্যক্ষভা-তাদের মনকে স্পর্শ করে নি, তাই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সত্যগ্রহ আন্দোলনের সত্যতা বোঝাবার প্রয়াসে আমরা ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছি। সুতরাং অতি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের লক্ষ্যস্থল হল প্রেসিডেন্সি কলেজ। বেমন করেই হোক ছাত্রদের বার করে এই আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে, সর্বশ্রেণীর ছাত্র-দের সহায়তায় তাকে এগিয়ে নিতে হবে। অতএব এই কলেজকে ঘিরে তখন সূর্য হল পিকেটিং করা।

আন্দোলনের প্রথম দিনে আমাদের প্রস্তুতির কথা আগে থেকেই জানতে পেরে ইংরেজী সার্জেন্টরা কলেজ ঘিরে ছিল। পুলিশের বেটনীর ভেত্রে কলেজের ভেতরে সামনে সত্যগ্রহী দল অগ্রসর হবার চেষ্টা করা মাত্রই সূর্য হল তীব্রভাবে ইংরেজী সার্জেন্টের বেটন ও লাঠি চার্জ। নিম্নমতানে লাঠি চালানোর ফলে সঙ্গীদের মধ্যে অনেকে জ্ঞান হারাল, অনেকে আবার প্রায় অধমত অবস্থায় এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। প্রথম দিনে গ্রেস্তারের সংখ্যা নিম্নলিখিত কম ছিল না। সতীনদার নির্দেশে চারজনকে এক-একটা দল দু'ঘণ্টা অন্তর এগিয়ে যেতে থাকে। কেন না এই কৌশলে আন্দোলনের স্থায়িত্ব বীজিত হবে। এই দিনে ৩টি দলকে প্রেরণ করা হল।

বিত্তীয় ও কৃতীয় দিনে প্রথম দিনের মতই পিকেটিং করেই কলেজের ছাত্রদের সাহায্যেই আমাদের চেষ্টা করা হয়। নির্ভর প্রহার ও লাঠির খোঁচায় সত্যগ্রহীদের দমত-গারে নি-বারে বারে 'বন্দেমাতরম' স্বর্গীতে আকাশ-বাতাস মূর্খারিত হয়েছে। একদল যখন পেটের সামনে পুলিশের শ্বারা ঘেরাও হয়েছে তখনই অপরদিকে বান্ধু ইংরেজ পুলিশ অফিসারদের

এজেন্ট আবশ্যিক

অবসর-সময়ে, আমাদের উত্তম কোয়ালিটির কসমেটিক ও ফাউন্টেন পেনসমূহ বিক্রয়ার্থে মাসিক ১৭৫, ইইতে ৩০০, টাকা ও কমিশনে এজেন্ট আবশ্যিক। বিনামূল্যে সর্ভ এবং নমুনা সেটের জন্য অদম্বই লিখুন।

METRO AGENCIES (India)
Pahari Dhiraj (B.M.W.)
DELHI—6

ঘণ্টা দিবে কয়েকজন ছাত্র পিছন দিকের লোহার গেট ডিঙিয়ে একেবারে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বার বার বন্দে-মাতরম ধ্বনিতে এই কলেজের ছাত্রদের মানবিক সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেছে। এদের ভাগ্যেও জুটলো নির্মম প্রহার। দ্বিতীয় দিনের আন্দোলন প্রায় পুরোপুরি সফল হওয়ায় তৃতীয় দিনে কেবলমাত্র কলেজ-হোস্টেলের ছাত্রদের নিয়ে ক্রাশ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় দিনের আন্দোলনে অজিত দাশগুপ্ত, অরুণাংশু দে, প্রমোদ ঘোষাল, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে ছিল। বিপ্লবীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার ফলে দিন দিন এই প্রচেষ্টা সফল হতে থাকে। মধুদা ছিলেন (মধুসূদন রায়) এই আন্দোলনের অন্যতম কণ্ঠধার—আন্দোলনের প্রথম দিনে পুলিশ শত্রুমাত্র মধুদাকে মাথার চুলগুলো ধরে উঁচু করে বেদম প্রহার দিয়েছিল। বিপুল সংখ্যক কর্মীর প্রোত্সাহের পরও তা খণ্ড খণ্ডভাবে এগোতে থাকে। হুটের লাঠি, লাঠির খোঁচা ও অসংখ্য কিল চড় ঘৃষিতে অল্পবয়স্ক ছাত্র-বিপ্লবীরা জ্ঞান হারাতে থাকে, প্রথম প্রথম পুলিশ অজ্ঞান অবস্থাতেই প্রোত্সাহ করতে কিন্তু পরে শত্রুমাত্র নির্মমভাবে প্রহারে অজ্ঞান করে দেবার দায়িত্বটুকু পালন করে ফেলে যেতে থাকে। কিন্তু যারা দেশকে স্বাধীন করার মহানুরত গ্রহণ করেছে তাদের কাছে এই প্রহার নির্মম ও অমানবিক হলেও হাসিমুখেই তারা পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছে, কারাবাসের নির্মম অভ্যাসের দিন দিন মৃত্যুপথযাত্রী হলেও এই আন্দোলনকে স্থিতিমত করতে পারে নি।

অসুস্থ ও অধর্মত সত্যগ্রহীদের সুস্থ করবার প্রয়াসে সর্বজনপূজ্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১নং ওয়েলিংটন স্কয়ারে হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন। এইসব অল্পবয়স্ক আহত ছাত্রদের পুত্রতুল্য জ্ঞানে স্নেহময় পিতার মত সেবা ও যত্ন এদের সুস্থ করেন।

এরপর আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় প্রধাবিত হয়েছে। আন্দোলনের পরবর্তী রূপ ও কর্ম-দলীল নিয়ে সর্বোত্তম সতীনদাকে ঘিরে পরিকল্পনা করতে বসেছি, এমন সময় পুলিশ আমাদের অফিস ঘিরে ফেললো। সতীনদাকে বললাম—সতীনদা, আপনি চলে যান, আমরা এই কজন থাকি, আপনি আমাদের নেতা, আপনি ধরা পড়লে আন্দোলন ব্যাহত হবে। কিন্তু সতীনদা তাতে রাজী হলেন না। মেঘ-মন্দ স্বরে আমাদের বললেন—তোমরা চলে যাও, আমি প্রোত্সাহ হলে ক্ষতি নেই। সনে

রেখা বাইরে থেকে তোমাদের সাহায্যের উপর এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ছাদে গিয়ে তিন-চারটে বাড়ীর ছাদ পেঁয়িয়ে ওয়াটার পাইপ বেয়ে নীচে নেমে পালিয়েছি। পুলিশ এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সার্চ করে কাপজপত্র যা কিছু পেল তা তাদের কাছে এলো না। সতীনদা বন্দী হলেন।

তারপরও আন্দোলন চালান হয়েছে। তখন ঘাঁটি ছিল আমাদের বাড়ীতে। তাছাড়া প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলায় উডবান' পাক' শরৎ বসুর বাড়ীতে আমাদের গোপন সভা বসত। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে সিদ্ধার্থ রায়ের বাবা থাকতেন এবং নানা বিষয়ে উৎসাহ দেখাতেন। এই সময় আমাদের নানা মূল্যবান উপদেশ এবং স্নেহ ও উৎসাহ দিয়ে অগ্রণী করে দেন প্রমোদ্য বাসন্তী দেবী।



সতীন সেন

আন্দোলন চালাবার ফাঁকে ফাঁকে ছাপা-খানাতেও কাজ করেছি। বীণা দাসের বক্তব্যের স্বপক্ষে কিরণশঙ্কর রায়ের যুক্তি ও সমর্থন-গুলি ছাপার আকারে প্রকাশের দায়িত্ব ছিল আমারই উপর। বিষয় ছিল 'গভর্নরকে কেন গুলী করা হল।' এই-ছাপাবার সমস্ত কিছু নিজে হাতে করেছি, তবে আমরা তখন বিভিন্ন প্রেসের বিভিন্ন ছাপার টাইপ ব্যবহার করতাম, কেন না, তাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও বিশেষ ভয়ের কিছু থাকত না। কিন্তু গুপ্তচর ছিল আমাদের মধ্যেই। মৌসিমমান ছিল পুলিশের গুপ্তচর। সেদিন ছিল শুক্রবার। রাত তখন ১০টা। ছাপার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ, বাঁধান-সবে সূর্য হয়েছে এমন সময় সংবাদ এলো কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ আমাদের গুপ্ত ছাপাখানা ঘিরে ফেলবে। আশ ঘণ্টার মধ্যেই দ্রুত সরিয়ে ফেলা হল—রাত একটার সময় পুলিশ এলে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সমস্ত কিছুই অস্বীকার করলাম এবং আমাদের কাজের কোন রকম হাদিসই পেলো না।

আমি আন্দোলনের কোন কোন অংশ পরিচালনা করলেও আমার কাজ ছিল বিভিন্ন-মুখী। বিভিন্ন গোপন কার্যালয়ের সংগে যোগাযোগ করা, সংবাদ আদানপ্রদান এবং অর্থ সংগ্রহ করা সব কিছুই আমি করতাম। আমার সংগে সাহায্য করতেন মধুদা। আজকের দিনে বসে সেই আন্দোলনের রূপ ও ব্যাপকতা আপনারা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। সফলতার সীমা হয়তো সর্বক্ষেত্রেই বাড়েনি তবে ধীরে ধীরে দেশের ছাত্র ও জনসমাজকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বেগ্ন করবার প্রয়াসই ছিল আমাদের কাজের একমাত্র লক্ষ্য।

ইতিহাসের পাঠ্যই হয়তো আন্দোলনের স্থান সংকীর্ণ। সুতরাং ইতিহাসের সোনার তরীতে বিপ্লবী যাত্রীর স্থান স্বল্প। মহৎ ব্যক্তির সুবিশাল কীর্তি বহনের ক্ষমতা এর নেই, তবে মহৎ প্রচেষ্টায় যারা ব্যর্থ, সেই সব নাম না জানা শহীদদের ইতিহাস সাদরে গ্রহণ করবে। হয়তো এরা ইতিহাসের গোণপাত্র, হয়তো এরা কোন কীর্তির ধ্বজা বহন করেনি, তবুও আত্মনিষ্ঠা ও সত্যতায় ওরা উজ্জ্বল ও অবিনশ্বর হয়ে আছে। অভিজ্ঞতা, মানুষ সম্পর্কে আশাবাদ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশা এই বিশ্বাসই আমার মনে জেগেছে যে, আন্দোলনের পথে এরা শত্রুমাত্র সহযোগী নয়, অপরাধেয় মানবাত্মার এক-একটি প্রতিনিধি।

সঙ্গীত-সুধাকর

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বিষ্ণুপুর—দ্বিতীয় দিম্বী

বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের ইতিহাস—
—সঙ্গীত-সাধনা—বিষ্ণুপুরের বাদকগণ—
অভিনয়—কাব্য-সাধনা—কথক-পরিচয়—
বঙ্গীজী সম্প্রদায়—ভূস্বামী ও শিল্পীগণের
জীবন-সাধনার সহিত—ভারত-বিখ্যাত
গায়কগণের লোক-প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-সমূহের
স্বরলিপি অপরূপ সঙ্কলন। সঙ্গে সঙ্গে
বিষ্ণুপুরের কীর্তি-সম্পদ চিত্রে প্রদর্শিত।

মূল্য—১০।

কল্যাণ দেবিশের

প্রিয়ামিনীমোহন কর প্রণীত

মূল্য এক টাকা।

ছেলোদের স্তম্ভ আয় একগুণি রহস্তোপকাস।
পাঠ্য আবৃত্তি করিলে শেষ না করিয়া ছাড়ি

উপহার দিবার যোগ্য বই

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী

শ্রীশৈল চক্রবর্তী দ্বারা সূচিত।

ছাপা ও বাঁধাই মুদ্রকর।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১৬

বন্দিশালা থেকে বিয়াল্লিশের আগস্ট বিপ্লব

ত্রিদিব চৌধুরী

বিয়াল্লিশ সালের আগস্ট বিপ্লব যখন আরম্ভ হয়, আমরা তখন বৃটিশ আমলের ভাবতবন্ধা আইনে দৃবছরের ওপর আটক হয়ে আছি। সে সময়কাল বাঙ্গানৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে যথা পৰিচিত, তাঁরা সকলেই জানেন যিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে ১৯৪০ সালে পশ্চিমী মিত্রশক্তি যখন যুরোপের বণাঙ্গনে বিপর্যয়ের পব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে, সে সময় বৃটিশ গভর্নমেন্ট এদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী ও নেতাদের এক এক করে আটক করে ফেলতে আরম্ভ করেন। ১৯৪০-এর মার্চ-এপ্রিল থেকে শুরুর করে আগস্ট-সেপ্টেম্বর ভেতর বাংলা দেশে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, অনশীলন ও ছাব-এস-পি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ফব-ওয়ার্ড রকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিপ্লবী দল ও উপদলের লোকেরা ক্রমে ক্রমে ধরা পড়ে যেতে থাকেন। এমন কি যুগান্ত-পার্টির নেতাদেরও এ সময় বাংলা গভর্নমেন্ট গ্রেপ্তার করে আনেন। যদিও তাঁরা প্রায় সকলেই সে সময় সরকারিভাবে কংগ্রেস সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সমর্থক অন্যান্য বিপ্লবী দলের মত তাঁরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন নি। কমিউনিস্টরা তো তখন প্রত্যক্ষভাবেই যুদ্ধ-বিবোধী ছিলেন। ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মানী সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করা পর্বন্ত কমিউনিস্ট পার্টি নাৎসী জার্মানী এবং ইতালীর সঙ্গে পশ্চিমী মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধে কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন নি। তাঁরা সে যুদ্ধকে সোজাসুজি 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' আখ্যা দিযা এদেশে বৃটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা আরম্ভ করেছিলেন। কাজে কাজেই যুদ্ধের প্রথম দিকে তাঁদেরকেও বৃটিশ গভর্নমেন্ট যুদ্ধ-বিবোধী ও চমকপন্থী বাঙ্গানৈতিক দল হিসেবে আটক আইনে বন্দী করতে আরম্ভ করেন।

সকলেই জানেন সোভিয়েট ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ার ফলে এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে পশ্চিমী মিত্রশক্তির সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্রতা স্থাপিত হওয়ায় সারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মতো ভাবতব বন্দিশালা থেকে বৃটিশ যুদ্ধ-সম্পর্কে তাঁদের পূর্বতন মত আমল বদলে ফেলেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৪২-এর জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী নাগাদ কমিউনিস্ট পার্টির সকলেই খাইবে চলে আসেন এবং তাঁদের দলের নির্দেশ অনুযায়ী মিত্রশক্তির যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন। এর অপরিহার্য রাজনৈতিক পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, আগস্ট

বিপ্লবের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় গণ-বিপ্লবের প্রথম সাধক আত্মপ্রকাশের বিবোধিতা করতে থাকেন।

আমাদের ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে সিংগাপুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিজলী বন্দী-নিবাস থেকে ঢাকার বন্দী কবে নিয়ে আসা হয়। হিজলী বন্দী-নিবাসের বিরাট ইমারতকে খালি করে তাকে বিমান ঘাঁটির ছেড় কোয়ার্টারে পরিণত করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বেলগের থলপুর বেল জংশন থেকে হিজলী বন্দীশালা মাত্র দুই-তিন মাইল দূরে অবস্থিত। হিজলী বন্দীশালায় এই বাড়ীতেই স্বাধীনতার পরবর্তী কালে গজপুর্বে আই-টি-আই বা ইন্ডিয়ান টেকনোলজিক্যাল ইনসটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯০১ সালে এই হিজলী বন্দীশালাতে বাঙ্গালীদের ওপর যে গুলী-চালনার ঘটনা ঘটে। তাতে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন শহীদ হন। আমাদেরকে যখন হিজলী বন্দীশালা থেকে ঢাকায় বন্দী করা হয় আগস্ট-বিপ্লবের উপক্রমণিকার সূত্রপাত হতে আরম্ভ করেছে মাত্র। নেতাজী তখনো যুরোপ থেকে দূরপ্রাচ্য এসে পৌছন নি। জেনারেল মোহন সিংয়ের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর পতন হয়েছে মাত্র। তারও কিছু পবে, বিপ্লবী নামক রাসবিহারী বন্দু জাপান থেকে মায়ে এসে পৌছেছেন এবং দূরপ্রাচ্যে নেতাজীকে ডেকে নিয়ে এসে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তঁর হাতে তুলে দেবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। বিয়াল্লিশের আগস্ট বিপ্লব তখনো দেড় বছরের ওপর দূরে।

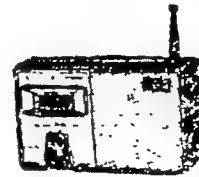
কিন্তু সিংগাপুর পতনের পর থেকেই এদেশে জনসাধারণের মনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়ী সম্পর্কে আস্থা দ্রুত শিথিল হবে আসতে থাকে। ১৯৪১ সালের শেষ দিকে নেতাজী সমুদ্র-পথে সাবমেরিনে করে যুরোপ থেকে দূরপ্রাচ্যে আসেন এবং আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট গঠন করে দেশের বাহিবে ভাবতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংগঠিত সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন। বিয়াল্লিশ সালের গোড়া থেকে নেতাজী বেড়িয়ে মাধ্যমে দিনের পব দিন দেশবাসীর কাছে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্যে যে উদাত্ত আহ্বান করতে থাকেন আগস্ট বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্বে গণমনকে তৈরী করে তোলার কাজে তার প্রভাব বা ভূমিকার কথা এখনে আশা করি বিশদভাবে আলোচনা না করলেও চলেবে। আগস্ট বিপ্লবের ভেতর ভারতের বিপ্লবী গণশক্তির যে অভূতপূর্ব আত্মপ্রকাশ আমরা দেখি, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নৈতিক প্রভাব যে তাতে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল সেটা অনস্বীকার্য

ঐতিহাসিক সত্য। দূরপ্রাচ্যে বণাঙ্গনে পশ্চিমী মিত্রশক্তির পশ্চাদসরণ দূরপ্রাচ্যে এশিয়ার স্বাধীনতাকামী জনগণের সামনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিপ্লবী যোদ্ধা হিসাবে - সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে চমকপ্রদ আবির্ভাব, ভাবতবর্ষের জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেন্টের রাজনৈতিক আপোষ-বফা প্রচেষ্টার অসফল্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-প্রচেষ্টা পরিচালনার আর্থিক বোমা ও শোষণের নিবন্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ—এ সব কিছু মিলে গণমনে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা বিপ্লব প্রচেষ্টার অনুকূলে একটা বাস্তব পরিবেশ গড়ে তোলে।

ভারতের গণমনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর যে অদ্বান্ত এবং অন্তরংগ পরিচয় ছিল তার সাহায্যে তিনি বুঝেছিলেন— বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের এই ঐতিহাসিক মাহেশ্বরগণকে কাজে লাগাতে না পারলে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে আর কোনোদিন ভরতীর জাতীয়তাবাদের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার আসতে বাধ্য করা সম্ভবপর হবে না। এ কথা মনে মনে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর সময় নষ্ট করেন নি। তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীদের অনেকে মনে— যেমন পণ্ডিত জহকলাল বা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচাীর মনে ভিতর সেদিন যথেষ্ট বিধগুস্ত ও দোদুল্যমান অবস্থা ছিল। স্বদেশী সংস্কার-পন্থার বিশ্বাসী রাজাগোপালাচাীর যে কোনো শর্তে হোক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং মসলিম

জ্যাপী পকেট রেডিও

জাপানের পকেট রেডিও আবিষ্কার। বড় বড় রেডিওর মতন আওরাজ। সমস্ত ট্রানজিস্টার এবং লাইট স্পীকার গ্যাবাটী-যুক্ত। জাপানে প্রস্তুত। বেড়াইতে বেড়াইতে গান শুনুন। স্থানীয়ভাবে জগতেব প্রত্যেক স্টেশন হইতে শুনিবাব জন্য গ্যাবাটী-যুক্ত। ব্যবহার ও প্রবণোপযোগী করিয়া সববরাহ করা হয়।



৫ টি সেলে চালাইতে হয়। ক্ষুদ্র এবং হালকা ওজন। ০ বৎসরের গ্যাবাটী-যুক্ত। ৫ টি পি-৮৮ মূল্য ০৫ টাকা ৫ পি-৮৮ চার্জ ৪ টাকা বেডিওর কেসের জন্য ৫ টাকা।

SULEKHA TRADERS
(WBC-88)
BEAT NO. 13, ALIGARH

লীগের সঙ্গে আপোষ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। জহরলালের মনে ছিল ফাসী বিবোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব। তৎকালীন গণতান্ত্রিক সনাতনাবাদের সঙ্গে হোক, যা যে কোনো ধরনের সনাতনাবাদের সঙ্গে হোক, আপোষ করে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করা যায় না—সে প্রত্যয়ে জহরলাল এ সময়ে একেবারে অবচ্যুত থাকতে পারেন নি। যুদ্ধের শরীফে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়তো রাসদী জার্মানী ও অন্যান্য ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়কে ব্যাহত করবে এ রকম একটা আশংকা তাঁর মনে বরাবরই ছিল। কিন্তু মহাস্বাধীনতা মনে এ ধরনের কোনো বিধা বা সংশয় ছিল না। তা ছাড়া তাঁর অপ্রস্তুত রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি বৃটিশ গভর্নমেন্টকে কংগ্রেসের পক্ষে রাজনৈতিক আপোষ করার পথে আসার জন্য দাবি করতে হয়, তাহলে গণ আন্দোলন ও গণ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যে চাপ সৃষ্টি করতে হবে—তার জন্যেও এর চেয়ে অনুকূল অবসর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মহাস্বাধীনতা Do or Die লোগান উচ্চারিত হয় সেই অন্তর্দৃষ্টিসজ্জাত প্রেরণা থেকে।

পুরাতনে চিরনূতন মণিসমুদ্র

সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ
বিবীচিত—হতোম প্যাচার নক্সা। বাংলা
উপন্যাসের প্রবর্তক প্যারীচাঁদ মিত্রের—
আলালের ঘরের দুলাল, পুণ্যকীর্তি
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—ভাষ্টিবিলাস।
একত্রে ৩ টাকা মাত্র।

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডাক্তার পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসন্ততীর পৃষ্ঠায়
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর
লাভ করে। রোমাঞ্চ ও রোমাঞ্চের সত্য
ঘটনায় বইটির আত্মোপাস্ত-পরিপূর্ণ।
রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়;
জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবন্ধনা;
ছন্দ্য ও প্রেমের জীলাব চামড়াকর বইটি
চামড়্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোম-
হর্বক সামাজিক কাহিনী।

দাম্ভ চার টাকা

সুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

হিজলী থেকে আমরা যারা ঢাকা সেন্দ্রাল
জেলের আসি, তাদের রাখা হয় দোতলা পাঁচ
নম্বর ওয়ার্ডে। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড ঢাকা
জেলের অন্য সমস্ত ওয়ার্ড থেকে কিছুটা
বিচ্ছিন্ন ও দূরে একশাসন অবস্থিত হলেও
নানান কারণে এখান থেকে বাইরের সংগঠনের
সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অপেক্ষাকৃত কম দ্রুত
ছিল। তাছাড়া রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে
বেশীদিন জেলে আটক থাকার অভিজ্ঞতা
যাদের আরছ তাঁরা সকলেই জানেন জেল-
প্রশাসনের আভ্যন্তরীণ আইন-কানুনের
কড়াগাড়ি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধ অর্থাৎ
ক্ষমতা গেরো ধরনের। কিছুটা সভ্যতাব
সঙ্গে ব্যবস্থা করতে পারলে বাইরের সঙ্গে
রাজনৈতিক যোগাযোগ রাখা করা, খবরাখব
দেওয়া নেওয়া মোটেই অসম্ভব হয় না।
রাজপুতানায় সুদূর দেউলী বন্দিশালায় বসেও
আমাদের সে অভিজ্ঞতা হেরেছে। আমাদের
এ সময় যোগাযোগ স্বভাবতই ছিল ঢাকা
জেলের বাইরে গিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে
ঐতিহ্যসম্পন্ন মার্ক্সবাদী এবং সমাজতন্ত্রী দল
হিসেবে এই সময়-বিশেষ করে অগস্ট
বিশ্ববের ঠিক অব্যবহিত আগেকার কয়েকটি
মাসে—বাইবে আমাদের দলের (আর-এস-পি-সি)
কর্মীদের সঙ্গে জনস্বাস্থ্য-পন্থী কমিউনিস্ট-
দের প্রতিশ্রুতি তীব্র হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট
পার্টির নেতা ও অভিজ্ঞ কর্মীরা সকলেই তখন
জেলের বাইরে গিয়া ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে
জনস্বাস্থ্যের জিগার তুলে মিত্রশক্তির বৃদ্ধি
প্রচেষ্টায় সক্রিয় জনসাধারণের সহায়তা আকর্ষণ
করাব কাছে ব্যস্ত। আমাদের বাইরেকার
কর্মীরা তখন বেশীর ভাগই বরসে তরুণ ও
রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বা
অপরিণতবুদ্ধি। কিন্তু ভরসাও মধ্যে এটুকু
ছিল কিছু অভিজ্ঞ রাজনৈতিক কর্মী তখনো
আত্মগোপন করে ঘোরাফেরা করতে পারছিলেন।
তাছাড়া আমাদের দলের অন্তর্গত পুরাতন
বিশ্ববী কর্মীদের ভেতর অনেককে—যারা হয়
বার্ষিক চাপে কিম্বা সাংসারিক দায়দায়িত্বের
আর্থিক চাপে সংগঠন থেকে কিছুটা দূরে
চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন—এই সময়ের আবার
নূতন উদ্যমে সক্রিয় হয়ে তরুণ কর্মীদের
সাহায্যে এগিয়ে আসছিলেন।

যুদ্ধের পবিত্র, নেতাজীর রেডিয়ো
বক্তৃতার প্রেরণা দেশের ভেতরকার সামগ্রিক
রাজনৈতিক পরিবেশ সকলের মনেই এ ধারণা
বিস্ময় করে দেয় বৃটিশ শাসনের অবসান
আব বেশী দূরে নয়। তার বিরুদ্ধে জাতির
সমস্ত শক্তি সংহত করে শেখ আদাত হানাব
সময় এসেছে। জেলের ভেতর থেকে সে সময়
বাইরের সংগঠনকে ঢালাও নির্দেশ দেওয়া ছিল
যে, যো কোনো মূল্যে হোক সনাতনাবাদ-
ত্রিরোধী গণসংগ্রামকে সক্রিয় করে তুলতে
হবে এবং সনাতনাবাদের সঙ্গে গণশক্তির সংঘাত
জাগিয়ে তুলতে হবে। সেটাই হচ্ছে দলের
কর্মীদের এই মহত্বের বৈশ্ববিক দায়িত্ব।
ক্রিপস্ মিশনের অকৃতকার্যতার পর কংগ্রেসের

সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেন্টের রাজনৈতিক শক্তি-
পরীক্ষা এবং প্রত্যক্ষ সংঘাত যে অপরিহার্য
এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে সে সম্পর্কে
আমাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।
কংগ্রেসের ১৯৪২ সালের অগস্ট প্রস্তাবের
আকারে যখন সেই সংঘাত বাস্তবে রূপায়িত
হবার দিকে এগিয়ে এলো জেলের বাইরে
আমাদের কর্মীদের সমস্ত শক্তি নিয়ে সেই
সংঘাতের ভেতর জাগিয়ে পড়ার নির্দেশ ছিল।

জেলেব ভেতরে থাকলেও এসময় জেলের
বাইরের দলীয় সংগঠনের সঙ্গে আমাদের
যোগাযোগ যে অবিচ্ছিন্ন ছিল সে কথা আগে
বলছি। জেলের প্রাচীরের অন্তরালে থেকেও
তাই অগস্ট বিশ্লবের সঙ্গে আমাদের যোগা-
যোগ খুব বেশী অপ্রত্যক্ষ ছিল না। কিন্তু
ব্যক্তিগতভাবে হাতে-হাতভাবে একটা আলো-
লনে অংশগ্রহণ করার যে অভিজ্ঞতা, অগস্ট
বিশ্বব সম্পর্কে সে অভিজ্ঞতা অজ্ঞ-কবার
সুযোগ আমরা পাই নি যা আমাদের বাইরের
সহকর্মী বা পেরেছিলেন। আমাদের সাংগঠনিক
যোগাযোগ, ঢাকা সেন্দ্রাল জেলে থাকার ফলে,
ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গের দলীয় সংগঠনের সঙ্গে
বেশী করে ছিল। ঢাকা শহরের আলোচন
এবং গণসংগ্রামের খবর আমরা প্রায় এবেলা
ওবেলা পেতাম বললেও অত্যাঁহ হতে না।
জেলের বাইরে থেকে চোরাই পথে আসা চিঠি,
বুলেটিন, প্রচলিত এসব অগস্ট আলোচন
অংশগ্রহণ করার সন্দেহ বা অভিযোগ এ সময়
প্রতিদিন দুবেলা বাঁবা প্রেতাব হয়ে আসতেন
(খালি ঢাকা থেকেই নয়; কুমিল্লা, চাঁদপুর,
নোরাখালি ও চট্টগ্রাম থেকে প্রেতাব করা
অনেককেও এসময় ঢাকা সেন্দ্রাল জেলে এসে
রাখা হতো) তাঁদের মাঝেমাঝে গণসংগ্রামের
অগ্রগতিও খবর আমাদের কাছে প্রায় প্রতিদিনই
নিয়মিত এসে পৌঁছত। তবে ঢাকা জেল
কতৃপক্ষ ইন্টেলিজেন্স ব্রাণ্ডের নির্দেশে অগস্ট
আলোচন সম্পর্কে দৃঢ় ব্যক্তিদের আমাদের
সঙ্গে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে বা কাছাকাছি কোনো
ওয়ার্ডে এনে না রেখে, তাঁদের রেখেছিলেন
জেলের অপব প্রান্তে পনেরো নম্বর ওয়ার্ডে।
পনেরো নম্বর ওয়ার্ড থেকে পাঁচ নম্বরে আমরা
দিনকাল দিনেব খবর পেতাম না। নূতন
নূতন রাজনৈতিক বন্দীদের এক এক ব্যক্তির
থেকে পাওয়া লিখিত রিপোর্ট চোরাই পথে
কখনো একদিন বা কখনো একবেলা বায়ে
আমাদের হাতে এসে পৌঁছত। কিন্তু মোটের
ওপর জেলেব ভেতরে থেকেও আলোচনের
এবং গণসংগ্রামের বিভিন্ন খবর পাবার জন্যে
আমরা উদ্ভাবী উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতাম।
তেইশ-চব্বিশ বছর আগেকার কথা হলেও
পরিষ্কার মনে পড়ে আমরা তখন নিজদেরকে
বিশ্ববী গণ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী
হিসেবে অনুভব করতে পারতাম। জেলের
ভেতরেও সে আলোচনের ডেট যেন আমাদের
এসে স্পর্শ করতো; আমাদের মনকে সজ্জরে
আলোড়িত করতো। মনে হতো এতদিন
যত কামনোবাক্যে বা চেয়েছিলাম আমরা যেন

তার কাছাকাছি এসে গেছি; আর দেবী-নৈ।

কিন্তু এও ঠিক জেলের বাইরে ঠিক কি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ব্রিটিশ বিরোধী গণ-সংগ্রামের কি ধরনের উত্তাল ক্রোলে উঠেছে সে সম্পর্কে আমাদের—অন্ততঃ পক্ষে আমার ধারণা খুবই অসম্পূর্ণ থেকে যেতো যদি না এ সময়কার বিপ্লবী গণ-সংগ্রামের পরিবেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বহুদর্শী প্রবীণ বিপ্লবী নামক গ্রেস্‌ভাব হয়ে ঢাকা জেলে না আসতেন। তিনি হচ্ছেন অননুশীলন সমিতির অন্যতম সংস্থানাবক নরেন্দ্রমোহন সেন বা নরেন মহারাজ। নরেন্দ্রমোহনের জীবনী এখনো লেখা হয় নি, যেমন হয় নি বিগত যুগের প্রায় প্রত্যেক বিপ্লবী নামক ও কর্মীদের জীবনের বা সাধনার ইতিহাস। কিন্তু ভাবত-ম্বের বিপ্লবী আন্দোলনের পুরানো ইতিহাসের সঙ্গে, বিশেষ করে অননুশীলন সমিতির ইতিহাসের সঙ্গে, বারী পরিচিত তাঁরা জানেন ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনকে সমাজ স্বেচ্ছাসেবক ও গণশক্তি সচেতন করে তুলতে যে কল্পনের অবদান সবচেয়ে বেশী তাঁদের ভেতরে নরেন্দ্রমোহনের নাম অগ্নিগণ্য। জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের যে নতুন 'আইমেনশন' বা 'আরতন' গড়ে উঠেছিল তাব বৈশ্বিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি তাঁর সহকর্মীদের প্রথমাধি সচেতন করে তোলায় চেষ্টা করে আসছিলেন।

১৯২৪-২৫ সালের পূর্ব তিনি কিছুটা অধ্যায় দিকে আকৃষ্ট হন এবং সম্যাসী হিসেবে বামকূক্ষ মিশনে যোগ দেন। তাঁর সম্যাসাত্রের নাম ছিল স্বামী বামকুকানন্দ বা চলিত কথায় নরেন মহারাজ। ইদানীং কালে অননুশীলনের নেতাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে সম্মানার্থ এবং জ্যেষ্ঠ ছিলেন—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী বা ত্রৈলোক্য মহারাজ—নরেন্দ্রমোহন দলে তাঁরও অগ্রজ নেতৃস্থানীয় ছিলেন। সম্যাসী হিসেবে তিনি বহুকাল পুণ্ডলিশের নজর এড়িয়ে আত্মবক্ষা করতে পেরেছিলেন কিন্তু নেতাজী দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে এবং বিশেষ করে অগস্ট আন্দোলনের পরিবেশে তিনি আবার রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়েন।

সম্যাসী জীবনের অধিনিয়ম ও অননুশীলন তাঁকে বেশি অবসর দিতো না। কিন্তু অসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে তিনিও বুঝেছিলেন যে 'গণ-বিপ্লবের' কথা তিনি বহুকাল ধরে তাঁর সহকর্মীদেরকে বোঝাতে এবং উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে আসছেন আজ সেই বিপ্লব আগত। সম্যাসী হয়েও বিপ্লবের সে দুর্বার আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারেন নি। ব্রিটিশ পুণ্ডলিশও অবশ্য তাঁকে বেশাধিন অবসর দেয় নি। অগস্ট আন্দোলন আর্মস্ত হবার কয়েক সপ্তাহের ভেতরেই তাঁর গতি-বিধি লক্ষ্য করে তারা তাঁকে গ্রেস্‌ভাব করে নিয়ে আসে। তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয় আমাদের পাঁচ নম্বর ওবাডেই। দৃ-তিন

দিন ধরে তিনি আমাদের অগস্ট বিপ্লবের পূর্বাপর বিবরণ শোনেন। অগস্ট বিপ্লব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ মানসিক উপলব্ধি নরেন মহারাজের কাছে থেকে সোদন যেভাবে পেয়ে-ছিলাম তা সহজে ভোলাব নয়। এই সর্ব-ভাগ্যী সম্যাসীর চোখ দিয়ে বিপ্লবী গণ-

আন্দোলনের লক্ষ ভোল্ট বৈদ্যুতিক শক্তির মলক যেন দেখাব সুযোগ ঘটেছিল সোদন আমাদের। নরেন মহারাজ আর ইহলোকে নৈ। তাঁকে প্রণাম জানিয়ে অগস্ট বিপ্লবের এই অসম্পূর্ণ স্মৃতিচারণে আপাতত এখানেই ছেদ টানছি।

দৃশ্য কাব্য - পরিচয়

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
দ্বাদশ দশ টাকা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক কালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীর তুলনাপূর্ণ বিচারিত। বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও নাট্যসমালোচক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকমার বসু এই গ্রন্থখানি লিখে বলেছেন:---

“* * * তথাকথিত কোষ্ঠতান্ত জাতীয় অকালপক্ক এবং বিচারণাজিহীন আত্মহারা ও প্রিয়ভাষী সমালোচকদের নিয়ে এতদিন বড়ই অশক্তি বোধ করছিলাম। এতদিন পূর্বে এই বিভাগে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রথমখানির কথা ‘দৈনিক বঙ্গমতী’তে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়ে গেছে * * * দ্বিতীয়খানির নাম ‘দৃশ্যকাব্য-পরিচয়’, রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। বইখানির আকার বিপুল। বাংলা নাটক নিয়ে এমনভাবে সন্তুষ্টিচালনা করা যায় যেন যে আমাদের দেশে আছেন, এ কথা আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।—সুদীর্ঘ কালের সাধনা ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেন না। * * * অষ্ট বাঙালীর সৃষ্ট নাট্যসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতদিন কেউ রচনা করেন নি। হালে শ্রীযুক্ত সত্যজীবন বসু সেই চেষ্টা করেছেন এবং দৃশ্যকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যজীবনবাবু অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর। * * * বাংলা কোষ্ঠতান্তের ভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছা করুন, এই গ্রন্থখানি পাঠ করলে তাঁরা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাহিত্যে সজ্ঞে একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন। এত খুঁটিয়া খুঁটিয়া আঁকা লেখকই বাঙালীর নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পারেন নি। এইটিই হ’ল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গৌরব। * * * তাঁর সমালোচনাও পূর্ব উপভোগ্য। সমালোচকের উপযোগী সুস্পষ্ট, নিরপেক্ষতা ও যুক্তিযুক্ত যুগের পরিচয় দিকে তিনি আমাদের আনন্দিত করেছেন। তিনি কেবল গুণই দেখেন নি, দোষও দেখেছেন। কোথাও তিনি উচ্ছ্বিত হয়ে অভিজ্ঞ বাক্য বায় করে বক্তব্য-বিষয়কে ক’ল

তোলেন নি বোনাটে। * * * বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন, এই গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। * * * বইখানি লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। * * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদকল্প পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদমূলি ভট্টাচার্য এম-এ মহোদয় এই গ্রন্থখানি সফল স্বতঃপ্রসূত হইয়া লিখেছেন---

“* * * বাংলা নাটকের ইতিহাস লিখে এই যুগের বই বাংলা ভাষার আনন্দ কিংবা জিনিষ না থাকিলেও যুগ কমই আছে। গ্রন্থকার শুধু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়াই তাঁহার আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সন্দেহে তিনি তাঁহার সমালোচনা-শক্তিবও পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের গুণাগুণ তিনি বিচার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় নাট্যদর্শন সম্বন্ধে বাস্তবিক তিনি এই বিচার করিয়াছেন। বইখানিতে যেমন তাঁহার অসাধারণ পরিচয় ও অধ্যবসায়, তেমন তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য। অন্য সাহিত্য-পিপাসুরাও এই বই হইতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ভাষা এই যুগের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগী—পাঠ্যার্থীপূর্ণ ও প্রাক্ষর।”

দ্বিতীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক, নাট্যগোলাব ইতিহাসলেখক ও নাট্যীয় পরিসংখ্যানবিদ শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন:---

“এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলির ইতিহাস সজলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত লেখকগণকে বান দেওয়া হয়নি। * * * সত্যজীবনবাবুর পক্ষে গুণাব বিষয় এই যে, তাঁহারই অকুণ্ডল পরিচয়ের ফলে অভিনীত দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একর গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইল। * * * ‘দৃশ্যকাব্য-পরিচয়’ বাস্তবিকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব নিবৃত্তি করিয়াছে। একদা লেখক সাহিত্য-মোদিগণের কতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।”

হাত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি

সুনিষ্ঠি ঘোষ (চৌধুরী)

(১)

এমনি একটি মাঘের কথাই বলবো, যিনি তাঁর হৃৎপিণ্ডটাকে উপড়ে নিয়ে দিয়েছেন এই দেশমাতৃকাব পায়ের, কিন্তু কেউ তবু স্বীকে জানে না।

সে আজ প্রায় তিন দশকের আগেকার কথা। মৌদ্দীনীপুর সেন্ট্রাল জেলের জানানো ফাঁটেকের ঘণ্টা বাজল, ভিতরে এলেন একজন বৃদ্ধা মহিলা—একজন স্বদেশী কর্মসূচী। বৃদ্ধা ফেব্রুয়ারি মাসে পুরা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, লোমকর্ম মৃৎমণ্ডল, রিড অথচ উজ্জ্বল দুটি চোখ। আমরা ছুটে পেলাম তাঁকে ঘরে আনতে আর তাঁর সব খোঁজখবর নিতে। তিনি এসেছেন চট্টগ্রাম থেকে; মাস্টারদারেক (সুর্ব সেন) আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

বয়েজক্রাফ্টা সকল মহিলাকেই মাসীমা বলা প্রায় প্রচলিত। এখানে ঠিক হল পিসীমা বলা হবে বিশেষত ইনি আমাদেরই একজনাব বাবার-দেশেব লোক এটা তাঁরই ইচ্ছা। ইনি হলেন আমাদের পিসীমা—সাবিত্রী দেবী। কখনো তাঁর কাছে বসে, কখনো তাঁর পাশে শুয়ে গল্প শুনতাম তাঁর গৃহের সেই ঘটনাবলী। গল্প বলতে বলতে অনেক সময় পিসীমা উত্তেজিত হয়ে উঠতেন যেন সেই স্থানে সেই কালে তিনি তখনো উপস্থিত। তিনি রাজনীতি বোঝেন না, লেখাপড়া জানেন না কিন্তু মন্ত্রণ ও বিমূর্ত্ত জানেন—শুধু জানেন না সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেন পরার্থী-মতার গ্লানি। জানেন তাঁর দেশ বিদেশীর কবলে, পরাধীনতা জাতিব পাপ, কলঙ্ক, লজ্জা। তাই তাঁর অন্তর সমস্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামী সন্তানদের জন্য, সেই ধরছাড়াদের জন্য কেঁদে উঠেছিল। বাদের দেখলে ঘবে ঘবে দুয়ার বন্ধ হয় তাদের জন্য তাঁর দরজা তিনি খুলে রেখেছিলেন শুধু গৃহের নয় অন্তরেরও। তিনি জননী, স্নেহশীলা-জননী-রূপেই নেত্র এলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। আশ্রয় দিলেন বৃটিশ সরকারের বিশেষ প্ররসকার বিধাযিত মস্তক মাস্টারদাকে।

ছোট গৃহস্থ, চারটি প্রাণী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও নিজে। দাবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবার। দুখানা ঘরের একখানা সারাদিন বন্ধই থাকে বাজে জিনিসপত্র থাকে বলে আর একখানা ঘরে তাঁদের খাওয়া শোওয়া বসা সবই চলে। রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বহু লোক আসে সেই দিনের বন্ধ দরজা ঘবে। ঘর হয়ে উঠে প্রাক্কণ্ডল। নীরব গতি ও ফিস্‌ফিস্‌ কথাবার্তা। সভা হয় পরামর্শ চলে আর মা খুঁটিয়ে চলেন রসদ আর দরদ। এমনিভাবে

দিন যায় বাত আসে, বাত যায় দিন আসে। কেটে গেল বেশ কিছুদিন।

হঠাৎ একদিন নেমে এলো দুর্যোগ। দেখা গেল রাতের অন্ধকারে কালো কালো ছায়া ঘিবে ফেলেছে গোটা বাড়িটাকে। বৃষ্ণতে দেরি হল না এই নিশীথের ছায়া শরীরীরা কে। কি হবে, একমুহূর্তও দেরি নয় পালাতে হবে বেমন কবেই হোক, ধরা দেওয়া চলেবে না। সকলেরই হাতে অস্ত্র কিন্তু তা হলেও পদলিশেব সংখ্যা অধিক, সম্মুখ-বৃষ্ণ সম্ভব নয়। প্রবেশজন হলে আত্মরক্ষার্থে শব্দ, গুলীচালনা, সবাই পালাও। শব্দবৃষ্ণ হল, গালাগালে গেল সবাই, ধরা পড়লেন শব্দ, তিনটি সন্তানসহ গৃহ-স্বামিনী। তার পর? তার পর আবশ্য হলো পদলিশী তাম্বব, অত্যাচার উপপীড়ন নিপীড়ন অমানুষিক নিষাধন। কখনো বা প্রলোভন। ঘবে আগুন ধরিয়ে দিল, ছোট মেরেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল মায়ের কাছ থেকে। হাজতে মায়ের সঙ্গে থাকতে দিল না মেরেকে। মেরেটির চীৎকার কন্ডা কিন্তু মা অটল অচল।

হার ছোট্ট মেয়ে। সেদিন কি সে বুঝেছিল বে, সে তার মাকে হাবাবে, দাদাকে হারাবে? ছোট্ট অবুঝ মন তার ভাবমন্ডল কিছুই বোঝে না। আদর, অর্থ, ভাল খাওয়া থাকা, মিষ্ট কথা, মনভালানো খেলা এসব দেয় আর একটি একটি করে সব জেনে নেয় পদলিশের লোক তার কাছ থেকে। বড় ছেলে সেও হল রাজসাক্ষী। দণ্ড হল মা ও ছোট ছেলেব।

পিসীমার মধ্যে কখনো বড় ছেলের নাম শুনিনি। ওর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে বলতেন, “ও আমার ছেলে নয় ও আমার গর্ভের কলঙ্ক, মেরেকে কমা করতে পারি সে শিশু কিন্তু ছেলেকে নয়।”

Div II-এর কয়েদীর কোন সুযোগ সুবিধাই ছিল না। ছোট ছেলের সঙ্গেই মাসে একবার দেখা করতে পেতেন। দেশের কোন খবর-খবর কেউ কখনো বিশেষ দিতে না। চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিলই না প্রায়। বিধবা বলে নিজে হাতে রেখে খেতে পেতেন। সেই স্বসামান্য জিনিস থেকে আবার নান্য-বকম খাবার কবে রেহাভাজনদের বিসিয়ে দিতেন নিজে খেতেন অতি স্বসামান্য। কতদিন তাঁকে বকেছি, বলেছি আর খাবো না তাঁর খাবার তিনি যদি এমনি কবে সব দিয়ে দেন। তিনি বলতেন, “আমরা তো কভই খেয়েছি পরোহি সাবাজীবন—এখন বড়ো হযোহি আমাদের আবার কত কি? তোমরা এই কচি বয়সে কত কষ্টই না বরণ করে

নিয়েছ, কি আব দিতে পারছি তোমাদেরকে?” এই কথা বলতে বলতে তাঁর দু’চোখ জলে ভরে যেত, আমরা আর কিছু বলতে পারতাম না। তাঁর স্নেহের দান গ্রহণ না করে উপায় ছিল না।

এমনি কেটে গেল বছরখানেক। তার পর মাকে বদলী করে দিল অন্য জেলে। ছেলের সঙ্গে মাসে একবার দেখা হত তাও গেল বন্ধ হয়ে। গান্ধী আন্দোলন গেল থেমে। জেলে রাজনৈতিক বন্দীও আব বেশি রইল না, পিসীমা হবে পড়লেন একবারে নিঃসঙ্গ। সাধাবণ কর্মসূচীদের সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিবেশে তিনি হয়ে উঠলেন পীড়িত; দুর্ভিক্ষ হয়ে উঠল তাঁর কারাজীবন। জেল কঠোরক যেন এটাই চাইছিল। বহু আবেদন-নিবেদনেও কোন সাড়া নেই। আবার অন্য কোথাও বদলী করা হলো না কিছুতেই। একদিন ছেলের চিঠি এলো সে অসুস্থ। মা দরখাস্ত করলেন তাঁকে সেই জেলে বদলী করা হোক যেখানে তাঁর ছেলে আছে। কতদিন তার সঙ্গে দেখা হয় না, একবার তাঁকে দেখতে চায়। কোন সাড়া নেই। ছেলের চিঠি মায়ের কাছ থেকে গোপন হতে লাগল—মা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর পাগল মন পামাথকারার প্রাচীরে ব্যর্থ আঘাতই হানতে লাগল।

এমনি করে কেটে গেল আরো কিছুদিন। তার পর মায়ের বদলীর খবর এলো। মা স্বান্তির নিশ্বাস ফেললেন কিন্তু বৃদ্ধ ভারাক্রান্ত ছেলের চিন্তায়। অনেকদিন কোন খবর পান নি কেমন আছে কে জানে? যত জিজ্ঞাসা কবেন কঠোরক বলে ভাল আছে, তার বেশি তো আর কিছুই জানেন না। মা চলেছেন তার চেয়ে দ্রুত চলেছে তার মন অবশেষে এসে পৌঁছলেন সেইখানে—ছেলের এক অপপ্রসন্ন কণ্ঠে, একটা সেলে-এ বেখানে তাঁর ছেলে টি-বি রোগে অস্তিমশয্যায়। চোখে শব্দ জল নেমে এলো, কথা বলবার ক্ষমতা নেই—উভয়েরই। একবার হাত তুলে মাকে বৃদ্ধি ধরতে চাইল কিন্তু পারল না, শীর্ণ-ক্লান্ত হাত তুলতে পাবল না। দেখার নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল জীবনপ্রদীপের শেষ তৈলবিন্দুটুকুও।

সময় কারুর অপেক্ষা কবে না, তাই পিসীমার সময়ও কেটে গেল। ছাড়া পাবার দিন ঘনিয়র এল। কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি? কার কাছে? কার সঙ্গে যাবেন আবার দেশে ফিরে? বে পিসীমা সব হারিয়েও অস্তিত্বের সর্বদা ছিলেন পরিপূর্ণ

স্বাধীনতা যুদ্ধে মেদিনীপুরের মেয়েরা

জাভা মাইতি

বাপা বলেন : 'কাজটা হবে টানলে কি আর এগুনো যায়? সত্যি তাই। ছেলেদের পাশে পাশে মেয়েরাও না দাঁড়ালে যে কোনও জাপক পরিকল্পনাই ফলপ্রসূ হওয়া অসম্ভব। আমার মা, বোন, সবাইকে নিয়েই গোটা পরিবারেই স্বাধীনতা-যুদ্ধের সেই উত্তেজনার মধ্যবাহু সজ্জা ছিল। আমরা সবাই তারই মধ্যে কড় হইছি। ভাবতে শিখিছি সেই-ভাবেই। এর ব্যতিক্রম কোনও চিন্তা তখন কল্পনাতেও আসে নি। বাবাকে কেন্দ্র করে আমাদের পারিবারিক পরিবেশেই আমরা দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রবণা পেয়েছিলাম। স্বতন্ত্র স্বাধীনতাসংগ্রামে মেদিনীপুরের যে গৌরবময় ভূমিকা তাতে মেয়েদের সম্মিলিত সক্রিয় সহচর্য অনস্বীকার্য।

গাম্খাজীর স্টাশিকার আদর্শ ছিল পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীদের সমান সক্রিয় সহযোগিতা। মেদিনীপুরের স্ত্রী আন্দোলনেও আমরা এই আদর্শই মেনে চলছি। মর্চি, ছাঁড়ি সাজান 'নিবিশেষে সব বাড়ির মেয়েরা ছাত মিলিয়েছে পরস্পরের সঙ্গে। আত্মগোপনকারী পুরুষকর্মীদের আশ্রয় দিয়েছে বাড়ির গোপন কুঠিবিতে। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর সৈন্যের ঘরেও কাউকে কাউকে লুকিয়ে রেখেছে পুলিশের নজর বাঁচিয়ে। মেদিনীপুরেব জাতীয় আন্দোলনে মেয়েরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পুরুষের। তাঁদের বাদ দিয়ে এ জনযুদ্ধ হতে সফল হত না কখনই।

বলতে গেলে আমার রাজনৈতিক জীবনের শুরুর ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লবেব পটভূমিতে। আমি সে বছর প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবে আই-এ পরীক্ষা দিয়েছি। সে সময়ে ছাত্র-আন্দোলন অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ১৯ই ১০ই আগস্ট অনেক ছাত্রলতাও গ্রেপ্তার হল। কর্মী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এব প্রতিক্রিয়ায় এক সভায় আয়োজন করিছিল ১১ই আগস্ট। সে সভাতে আমিও বক্তৃতা করেছিলাম। সেই আমার প্রথম রাজনৈতিক সজ্জা। কাঁধ স্কুল কলেজের মেয়েরা মিলে পিকটিং শুরুর করল। তাদের কাজের মূল

কেন্দ্র হল পটালপুর, ভগবানপুর আর শেজুরী থানা। আমাদের মা-বোনবা একজোট হয়ে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন শুরুর করলেন। স্থাপন করলেন গোপন শিবির। ভগবানপুর থানার কর্মীবা থানা অধিকার করল। পুলিশের গুলীতে হতাহত হল অনেক লোক। প্রকাশ্যেও মেদিনীপুরের মেয়েরা নানাভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। বাড়ি-বাড়ি সার্চ করেছে পুলিশ। আমার মা, বোন, আমি সকলে কাঁধ থেকে সে সময়ে ভগবানপুরে চলে আসি। সেখানে পূর্বচক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে কামদেব মন্ডলের বাড়িতে এসে থাকি। তিনি আলাদা বাড়ি ছেড়ে দেন। সেখান থেকেই আমাদের আন্দোলন চলতে থাকল। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে পুলিশ মেয়েদের গ্রেপ্তার করল না। কিন্তু আমাদের প্রায় প্রত্যেকের নামেই ওয়ারেন্ট ছিল। পুলিশের সতর্ক নজর ছিল সব সময়। মেয়েদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের এ মনোভাবের পেছনে কোনও উদ্বিগ্নতা নেই। বরং গত ১৯৩০ সালে ব্যাপকভাবে মেয়েদের গ্রেপ্তারের অভিজ্ঞতাই তাদের এ মনোভাবের কারণ। সে সময়ে জেলে মেয়েদের স্থান সংকুলান এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। '৪২-এব অক্টোবরে স্বাধীনতা-যুদ্ধ, বন্যাপ্রাণিত অঞ্চলে মেয়েরা গ্রানকার্বে মেতে উঠল। করার-রুম্ব বা আত্মগোপনকারী কর্মীদের পরিজনদের উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় দেওয়া ছিল আমাদের কাজ। সেইসঙ্গে আর্থিক সাহায্য এবং তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাও। কাঁধ শহরে 'হোম' স্থাপিত হল। সেখানে রাখা হল সেসব পরিবারের মেয়েদের। মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা বা অর্ডার, বস্ত্র সংগ্রহের কাজে নামল দুর্গভ-লেব কল্যাণকল্পে। এরপর এল ১৯৪৩-এব দুর্ভিক্ষ। কাঁধ কেন্দ্র থেকে অব্যাহত বইল গ্রানকার্বে। '৪৩-ও কাটল একভাবেই। দুর্ভিক্ষ-দের জন্য ঘর-বাড়ি তৈরি, অনাথ ছেলেমেয়ে-দের আশ্রয়ে ভর্তি করা—এমনি আরও উদ্যোগকার্বে আত্মনিয়োগ করল কর্মীবা।

এদিকে মেদিনীপুর জেলে বাবাব (নিরুপ-বিহারী মাইতি) অবস্থা বেশ অসহ্য হতে দিকে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁকে স্থানান্ত-রিত করা হ'ল প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখান থেকে মেডিক্যাল কলেজে তাঁর চিকিৎসা চলতে লাগল। এব আগে তাঁর সঙ্গে আমাদের কাবও দেখা করার অনুমতি ছিল না। এবা মা ও বোনরা অনুমতি পেলে। কিন্তু আমি প্রথমে অনুমতি পেলাম না। পেলাম আরও কিছুদিন পর। কলকাতায় কলেজ স্ট্রীটে তখন 'শচীন মিত্রের নেতৃত্বে একটি ছাত্র সংসদ গঠিত হয়েছে। সংসদের প্রধান কাজ হল বস্ত্রী উন্নয়ন আর জনশিক্ষা বিস্তার। '৪৩ সালে বাবাব অক্ষা প্রায় মরণাপন্ন। আমি যত্নে নিষে কলকাতায় এলাম। বাবাকে দেখা-শোনার অবসরটুকুতে পড়াশোনা করে প্রাই-ভেটে বি-এ পাশ করলাম। এমনিভাবে শহর কলকাতার রাজনৈতিক জীবনেব সঙ্গেও কিছু পরিচয় ঘটল। কিন্তু মূলত আমার জেলায় কাজ অব্যাহতই রইল। এবপর কলকাতা টা' কলেজে ভর্তি হয়ে '৪৪ সালে ল' পাশ করলাম। আর্থিক অনটনের মধ্যে সংসার চালাতে হত তখন। টাইশারি ক'বে কোন-রকমে পড়া চলত। তাই এম-এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিতে হ'ল। '৪৪ সালে প্রদেশ কংগ্রেসে কিছু বদবদল হল। সুবেশ যশোপাধ্যায় হলেন সভাপতি। সেক্রেটারী হলেন অতুলাবাবু। আমাকে বলা হ'ল কংগ্রেসেব মহিলা বিভাগের দায়িত্ব নিতে। আমি তখন আইন ব্যবসায়ে বোগদানের কথা ভাবছি। দাঁদিকের কথা ভেবে মানানস-যম্ব অনুষ্টব করলাম। রাজনীতি না আমার 'কেরিয়ার'—এ এক সমস্যা। রাজনীতি কবতে গেলে তা পূর্বোপরি করতে হবে। আইন ব্যবসায়ে যাওয়া চলেবে না। বাবার মত চাইত উনি রাজনীতিতে আসার কথাই বললেন। সেই থেকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতেই জীবনের মূখ্য কর্মস্থল বলে মনে নিয়েছি। এখানে আমার কাজ দেশের জনগণকে নিয়ে। এখানে তাই আমার নিজের কথা-আলাদাভাবে বিশেষ বলার নেই।

মাজ ছেলেকে হারিয়ে তিনি সত্যি সত্যিই হলেন সর্বহারার। বড় ভেঙে পড়লেন দেহে মনে। মেয়াদ পূর্ণ হ'লে পিসীমা ছাড়া খেলেন। তাঁর ফেলে-আমা পুণ্যভন পল্লীতেই ফিরে গেলেন।

বার গৃহহারা ছিল সকলের জন্য সোলা তাঁব জন্য আজ সকল আর দুঃস্থ হল। স্বাক্ষরের বিধবা হস্ত জেলের ভাত খেয়েছেন কাজেই

তিনি জাতিভ্রষ্টা, তাঁকে প্রারম্ভিত করতে হবে, তা না হলে সমাজ তাঁকে স্থান দেবে না। নিভে যাওয়া জীবনের শেষ অগ্নি-স্বপ্নলিঙ্গ। কাড়ের হাওয়ার আবার দুর্ভিক্ষ জ্বলে উঠল। প্রারম্ভিত? কিসের প্রারম্ভিত? সে কি কোন হীন কাজ করেছে? আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়েছিল। দেশের জন্য দেশের জন্য সারা প্রাণ উৎসর্গ

করেছিল, দুঃখকে করেছিল দোষের সেই ঘর-ছাড়াদের সর্বহাবাদের সে হয়েছিল আশ্রয়-দাত্রী—তাব কি এই পুরস্কার? তাঁর সমাজের প্রয়োজন কি? কে আছে তাঁর? কাকে নিয়ে তিনি থাকবেন সমাজে? সেই মূহুর্তে সদর্পে চলে গেলেন তিনি গ্রাম ছেড়ে। বেরিয়ে পড়লেন আবার অজানার পথে। প্রারম্ভিত কর তোমরা।

আগষ্ট আন্দোলন কি কংগ্রেসের

আন্দোলন ?

একদ্য মেন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪২-এর গণ-অভ্যুত্থান শেষ অধ্যায় এবং বোধহয় সবচেয়ে বড়ো অধ্যায়। ভেতর থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং বাইরে থেকে দিল্লী চলো অভ্যয়ান পরম্পরের পরিপূরক হয়ে রয়েছে। এ দু'এক সম্মেলনেই দেশমাতৃকার পণ্ডতপা হয়ে তপস্যা করার স্মৃতিটি স্মৃতে উঠেছে। রূপের প্রসাদ অভিলাবী মূর্তিসন্ধানী ভারতের সম্পূর্ণ ছবিটি এ দু'এক সম্মেলনেই দেখতে পেলাম, একটানা ত্যাগের গৈরিক রঙে তা বাতানো চরম দুঃখবরণের দারো তা প্রোচ্ছদল। অপর দিকে চলেছে কথাবাতী, সলাপারামর্শ, চুক্তি-সালিশী—যার মাধ্যমে ভারতবর্ষ বিশ্বাভূত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল।

একথা-সত্য, এ দুটি আন্দোলনই ব্যর্থ হয়েছিল, ইংরেজ শাসকের কঠোর দমননীতিতে স্তম্ভ হয়েছিল। ইংরেজের ভারত ছাড়ার কারণ বিবিধ এবং জটিল। সে আলোচনার স্বাক্ষরে। ফলপ্রাপ্তির কার্যকারণ নিশ্চয়। ঘটনার নৈকট্যের দাবি ইতিহাসে সর্বদাপ্রাচ্য। এবং এদিক দিয়ে বলা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইতিহাসে এ দুটি আন্দোলন সবচেয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনার পরিপূরক হয়ে এবং তাইই অসামান্য অধিনায়কত্বের কার্যকর হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ শব্দ ভারতের ইতিহাসে নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে একটি কিস্তি হয়ে রয়েছে। আদর্শ বা বাস্তবে, পথে বা মতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তার সম্পর্ক সামান্য। দিল্লী চলো অভ্যয়ান পুরোপুরি নেতাজীর পরিকল্পিত, একদা যে নেতাজী—বালোর দুলাল যে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের বামপন্থী কর্মচণ্ডল নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন। কিন্তু আগস্টের ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। কংগ্রেসের সঙ্গে এ সম্পর্ক নির্বিড়, গান্ধীজী এ মস্তুর দ্রুতা এবং কংগ্রেসসেবিগণই এ আন্দোলনের ধারক ও বাহক।

তবু প্রশ্ন জাগে আগষ্ট আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি ও পরিণতি দেখে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) এবং আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০) যেমন পুরোপুরি কংগ্রেসেরই আন্দোলন, আগষ্ট আন্দোলনও কি তাই? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে একটু পশ্চাতে দাঁড়ি নিষ্কেপ করা প্রয়োজন।

রজনীপাম দস্ত তাঁর 'ইন্ডিয়া টুডে এ্যান্ড টমরো' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, গান্ধীজী যখনই কোন গণ-আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেছেন তখনই জনগণের কাছে একটি বৃহৎ মূল্য দাবি করেছেন। সে বৃহৎ মূল্য 'আহিংসা'—কথটা

বোধ হয় মিথ্যে নয়। গান্ধীজী নিজেই তাঁর জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আহিংসাকে মূলমন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর বাজ-নীতি, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অধিনায়কত্বের ধারা আহিংসাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। আহিংসা সত্যগ্রহকে ক্ষুদ্র করে, তিনি দেশের মজিকে কম্পনাধঃ স্থান দেন নি। এ সমীচীনতাব দার্শনিক ব্যাখ্যায় অনুপ্রবেশ বর্তমান প্রবন্ধে অবলম্বিত। শব্দ বসবো, গান্ধীজী একাধিকবার তাঁর আন্দোলনের মাঝে বা শেষ পর্যায়ে হঠাৎ ছেদ টেনেছেন এই কারণে বা অজুহাতে যে 'সত্যগ্রহ' ধর্ম কলুষিত হয়েছে হিংসার আবির্ভাবে। কিন্তু জনতা কর্তৃক উত্তর প্রদেশের (তৎকালীন যুক্ত প্রদেশের) চৌবিতোবা থানার অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশনিধনে ব্যাধিত হয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনে সমাপ্তি টেনে ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের মাঝে যখনই ইংরেজ-শাসকের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধজনতা হিংসার আগ্রহ নিয়েছে তখনই গান্ধীজী তাঁর নিন্দা বর্ষণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩০—৩১-এর গণ-অভ্যুত্থানকে তিনি কবেকজন নৈমিত্তিক সত্যগ্রহীর ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনে পরিণত করলেন এবং তা দাঁড়ালো এক বিবাত-প্রসঙ্গে। সর্বদাই তাঁর মন্তব্য ছিল যে, কংগ্রেসে প্রকৃত সত্যগ্রহীর সংখ্যা মৃদুতমের এবং তাই স্বরাজের রথ এগিয়ে আসছে না ভারতের সিংহাসনে। সত্যই কংগ্রেসে যে নবতাবধারা তরুণ আদর্শবাদীদের ঘিরে প্রবাহিত ছিল, তাতে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের সঙ্গত স্বীকৃতি ছিল বটে, কিন্তু আহিংসার সর্বময় প্রাধান্যের অস্বীকৃতি ছিল। গান্ধীজীর কাছে আহিংসা সত্যগ্রহ ধর্মের অঙ্গস্বরূপ, কিন্তু কংগ্রেসের নবশক্তি উন্মেষের পথে এ ছিল একটি সম্ভাব্য উপায় মাত্র। অবশেষে গান্ধীজী আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের নেতৃত্ব শব্দ নয়, চার আনার সদস্য পদও ত্যাগ করলেন। সেটা ১৯৩৪ সাল। তার পূর্বে নৈমিত্তিক গান্ধীবাদীদের গুরু হয়ে বাপুজী সামাজিক উন্নয়ন, নৈতিক পুনরুদ্ধারের আদর্শ এবং জনসেবার ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণের মহান প্রয়াসে ওয়ারী প্রাঙ্গণে গড়ে তুললেন এক অভিনব তীর্থক্ষেত্র। অবশ্য পবোক্ষে তিনি রইলেন কংগ্রেসের সুদৃঢ়, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক।

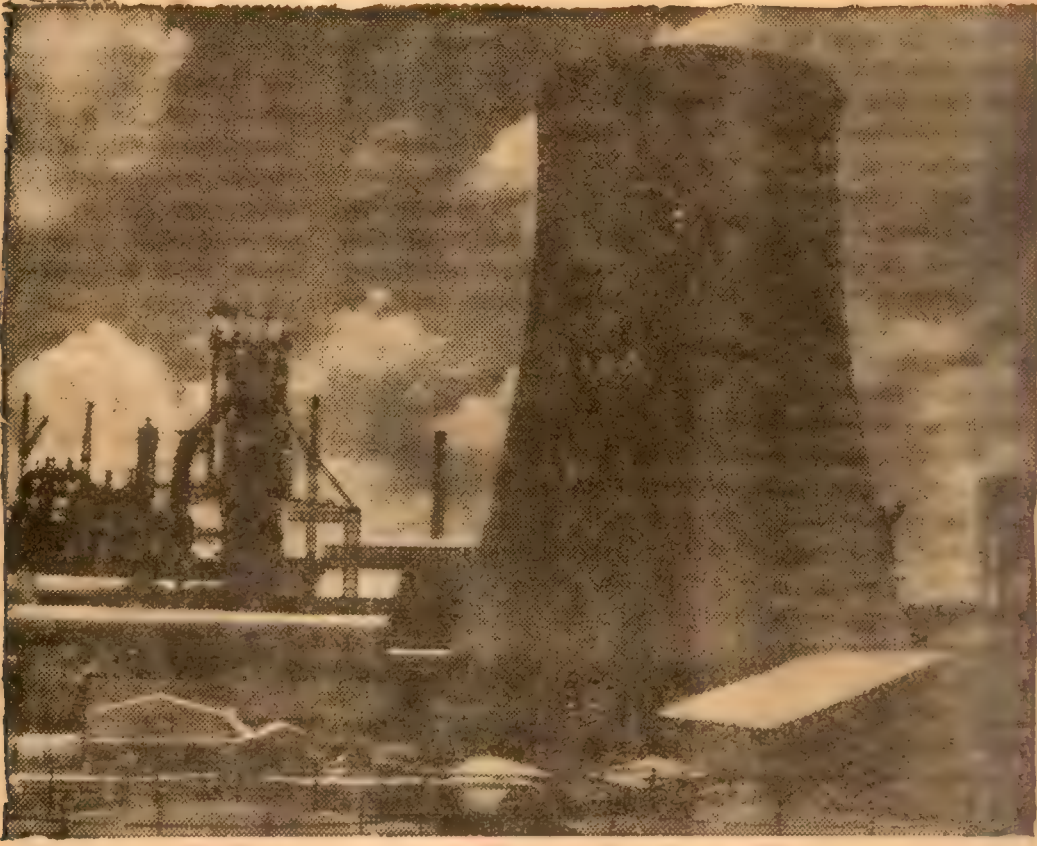
এ মেন তাঁর স্বেচ্ছাকৃত অজ্ঞাতবাস, রাজ-

নীতির কোলাহল থেকে দূরে। কংগ্রেসের তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি প্রায় অনুপস্থিত, যদিও প্রবোজনে পরামর্শ দিচ্ছেন, আশীর্বাদ করছেন কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতাদের এবং হরিজন পত্রিকাকে অপূর্ণ লেখনি চালনা দ্বারা সমৃদ্ধ করছেন। ১৯৪০ সালে কিছুদিনের জন্য তাঁকে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের অনুবোধে অরব পূর্বাভাগে আসতে হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ কর্তৃক ভারতকে তাঁর ইচ্ছার বিবুদ্ধে জড়ানোর প্রতিবাদে আন্দোলন করতে। আবার তিনি জাল-গুটিরে ওয়ারী ফিবে গেলেন। ১৯৪২-এর জুন মাস পর্যন্ত তিনি রইলেন রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন।

ইতিমধ্যে গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদী নেতৃত্বের বিবুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহ এবং পণ্ডিতমহাশয়ের বিদ্রোহ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথমার্ধে মিত্রশক্তির বিপর্যয় এবং ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদে প্রচণ্ড আঘাত, জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান' আন্দোলন, সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক পলায়ন এবং বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্নটি স্থাপন, অক্লান্তি জাপানের অর্জিত অভিযানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃটিশশক্তির চরম দুর্গতি এবং বৃটিশসাম্রাজ্যের কৌহিন্দে অপহরণে তৎপর জাপানের ভারত আক্রমণে ব্যাপক প্রস্তুতি এবং জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ভারতের সক্রিয় সমর্থনভেদে আশায় চাটিল কর্তৃক ক্রীপসুদোতা প্রেরণ ও তার ব্যর্থতা—পর পব এসব ঘটনাবলী ভারতের যে পটভূমিকা নির্মাণ করলে, তা যেমন ব্যাপক তেমনই জটিল। এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে অসামান্য ব্যক্তি ও নেতৃত্বের মূর্তপ্রতীক গান্ধীজীর পুনরাবির্ভাব ঘটলো রাজনৈতিক আকাশে জ্যোতিষ্কবৎ ভাসবতায়।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তখন জওহরলালের প্রভাব অপরিণীম। আদর্শবাদী, সমাজতন্ত্রবাদে অনুরাগী জওহরলাল। তাঁর চেয়ে প্রধান সমস্যা পৃথিবীর সমস্যা, নাৎসিবাদের ঘৃণ্যকবল থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাবার সমস্যা। এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভারতের সংহত জাতীয়তাবাদকে নিশ্চিত ইংরেজ সহযোগিতার পরিচালিত কবতে উন্মুখ ছিলেন, সম্ভাব্য জাপ-আক্রমণকে প্রতিহত করতে অস্ত্রহাতে অগ্রসর হবার প্রয়াসী ছিলেন এবং এ বিশ্বসংকটে ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্নটি মূলত্বী রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু গান্ধীজীর মত ও পথ ছিল আলাদা। এবং জওহরলাল যথার্থই তাঁর বিচারবুদ্ধিকে নতিস্বীকার করলেন হৃদয়বেগেব কাছে। তিনি গান্ধীজীর মতে মত দিলেন। আকুলকালার আজাদ তৎকালীন



স্বাধীনতার এই অষ্টাদশ বার্ষিকী দিবসে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিষ্ট ব্যুরো

৩/২, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১

বিশাল দুর্গাপুর গঠনের ও পরিচালনার অংশীদার প্রতিটি কর্মীকে
পুনর্বার অভিনন্দন জানাচ্ছে

দুর্গাপুর দর্শনের জগ্ন আমরা দূর ও নিকটের সকলকেই আমন্ত্রণ
জানাচ্ছি।

দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা, কোকচুল্লী, মাইনিং মেশিনারী ক্যাক্টরী,
জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাঁধ...এবং এর স্তায্য গৌরবের অংশীদার হতে।

এই বিরাট দুর্গাপুরের দর্শনাকাজীদের সহযোগীতা করার সুযোগ
পেলে আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে ক'রব।



দুর্গাপুরে আমাদের লাক্সারী ট্যুরিষ্ট লজ এবং ট্যুরিষ্ট
গাড়ীর ব্যবস্থা আছে। ফোন : ২৩-৮২৭১

কংগ্রেসের রাজনীতিতে জওহরলালের পরেই যার স্থান—তিনি তাঁর 'ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রাউন্ড' গ্রন্থে এ সময়ের ঘটনাবলী সন্নিহিত করে বর্ণনা করেছেন।

১৯৪২ সালের ৭ই জুন তারিখে গান্ধীজী তাঁর অভ্যন্তর নিরস্ত্রপ কণ্ঠে, শান্ত মৃদুতায় এক মন্ত্র ঘোষণা দেশবাসীর সম্মুখে রাখলেন। —বহুকাল আমি অপেক্ষা করেছি অহিংসার পরিবেশে জাতি বলিষ্ঠ হয়ে উঠে বিদেশী শাসনকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, এই আশা নিয়ে। কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলে না। দেশবাসীকে আহ্বান জানাই কর্মক্ষেত্রে এখনি ব্যাপিয়ে, পড়তে দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনে। হয়তো অহিংসার রূপ এ আন্দোলনে কল্পনায় হবে। কিন্তু আর কোন উপায় নেই।

অন্য বললেন,—জাপানের শত্রু বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ, ভারত নয়। জাপ-আক্রমণভীতি দূর হবে তখনই যখন ইংরেজ এদেশ ছেড়ে যাবে। অতএব 'ইংরেজ, ভারত ছাড়ো।' —আসন্নমুদ্রাহিমাচল ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে এই কীংকণ্ঠের গোরু-মুগ-বাণী প্রতিধ্বনি তুললো, 'ইংরেজ, ভারত ছাড়ো।' ১৪ই জুলাই হল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত। ৭ই আগস্ট বোম্বাইতে এ-আই-সি-সি'র ঐতিহাসিক সম্মেলন এবং ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত হল প্রায় সর্ববাদীসম্মতভাবে, ৪/৫ জন কম্যুনিষ্ট সদস্য মাত্র বিরোধিতা করেছিলেন।

অহিংসার পথে গান্ধীজীর অধিনায়কত্বে অভিনব গণ-অভ্যুত্থানের আহ্বান ঘোষিত হয়েছে ধর্নি তুলে দিয়েছেন সবার কণ্ঠে স্বয়ং গান্ধীজী, 'করেসে ইয়া মেরেসে।' পরিকল্পনা হয়েছে, ধর্নি তুলে দিয়েছেন সবার কণ্ঠে স্বয়ং মগোণে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার নিষিদ্ধ গণ-পরিষদ গঠনের। দেশবাসীকে বাণী দেওয়া হয়েছে—গভীর তাৎপর্যময় বাণী যে, যদি আসন্ন সংগ্রামকালে নেতাদের যথা-বিহিত নির্দেশ আসার পথ বন্ধ পুত্র ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দেয়, তবুও ধামবে না এ সংগ্রাম যতদিন ভারতের মুক্তি না আসে। কর্মপথে তখন প্রত্যেক মৃত্তিকামী যোদ্ধাই তার নিজের পথপ্রদর্শক হবে।

আগস্ট বিপ্লবের প্রারম্ভিকা রচিত হল, রচয়িতা স্বয়ং গান্ধীজী। অপ্রাসঙ্গিক হলেও স্মরণীয়, দেশনায়ক সত্যচন্দ্র তিন বছর আগে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক এটিই চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, দেশ সম্পূর্ণ মুক্ত, ঘড়িতে বেজে উঠেছে জয়ধ্বনির ঘণ্টা, দেশের তরুণশক্তি ও ত্যাগবৃত্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায় রচনা বন্ধপরিষদ, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃত্ব অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সাবধানী, সত্যচন্দ্রের এ আহ্বান তার কাছে সর্বনাশা আহ্বান, কখনও গ্রহণীয় নয়। চরম মূল্য দিতে হয়েছিল সত্যচন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত, কংগ্রেস তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জন করে নিশ্চিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আজাদের গ্রন্থে আছে যে, গান্ধীজী ভেবেছিলেন, বিশ্বযুদ্ধে বিরত ও বিপবিস্ত ইংরেজশক্তি এ বিপ্লবাত্মক কার্যসূচীর হুমকিতে খানিকটা নরম হবে এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সত্যিকার বোঝাপড়ায় আসবে। কিন্তু বৃথাই হল সে ভাব। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর পথ সাম্রাজ্য রক্ষাক্ষেপে আঘাতে জজর রক্তাক্ত ব্যাপ্তির হিংস্র পথ। 'জিৎগো ইম্পিরিয়ালিস্ট' চার্চিল,—ইংরেজ জাতির প্রধানমন্ত্রী ও সমরনায়ক চার্চিলের নির্দেশে লিনলিথগো গান্ধীজীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। ৮ই আগস্ট গভীর রাতিতে এ-আই-সি-সি'র যুগান্তকারী অধিবেশন শেষ হল। ৯ই আগস্ট অতি প্রত্যুষে অতিক্রান্তে নেমে এলো ইংরেজের 'ল এ্যান্ড অর্ডারের ন্যায়দণ্ড'। বন্দী হলেন



মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজীসহ বোম্বাইতে উপস্থিত সকল কংগ্রেস নেতা, কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করা হল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র দেশটাকে চষে ফেলে সর্বভারতীয় এবং প্রাদেশিক নেতৃবর্গকে আটক করা হল। ইংরেজ ভাবলে, আপদের শান্তি হয়েছে, আন্দোলনের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।

কিন্তু এবার হল ইংরেজের ভুল ভাব। 'ভারত ছাড়ো' বাঁজমন্ত্র সর্বত্র যে উপ হুয়েছে, বিদ্রোহগতিতে ছড়িয়ে পড়েছে সে মন্ত্র ভারতের নগরে, বন্দরে, দুর্গম পল্লী অঞ্চলে। জন-গণ-মন-অধিনায়ক ভারত ভাগ্যবিধাতা স্বয়ং এ মন্ত্রের মহা উদ্‌গাতা। শত্রু হল আন্দোলন অহিংস পরিবেশে হরতাল ও মিছিলের মাধ্যমে, পথে পথে সমবোত কণ্ঠের ধর্নি—করেসে ইয়া মেরেসে। ইংরেজ, ভারত ছাড়ো।' নেমে এলো ইংরেজের উগ্রতম চণ্ডনীতি, প্রতিহিংসার ফেটে পড়লো জনগণ, ঘটে গেল হিংসা অহিংসার বাবধান। উত্তর প্রদেশ বিশেষ করে বালিয়া জেলা), বিহার, বঙ্গদেশ (বিশেষত ময়দীনগর

জেলা), মধ্যপ্রদেশ এবং অশ্ব—আন্দোলনের প্রধান প্রধান কেন্দ্র এসব দেশ। ক্রমে আন্দোলন প্রবেশ করলে সড়কপথে, সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মসূচী সমগ্র দেশকে উত্তাল করে তুললো। রেলওয়ে, ডাক ও তার, টেলিফোন, থানা ও পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অচল ও অকর্মণ্য, সরকারী অফিসের কাজকর্ম সর্বত্র ব্যাহত, কোথাও একেবারে বন্ধ, নানা গুপ্ত-ঘাঁটি বিপ্লবীদের সেখানে পাঠা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রয়েছে জাতীয় অফিস, বিচারালয় এবং কারাগার। পটুটি সীতারামাইয়া সম্পাদিত কংগ্রেসের ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত একটি হিসেবে দৃষ্ট হয় যে, আন্দোলনের প্রথম পর্বেই ২৫০টি রেলওয়ে স্টেশন ধ্বংস হয়েছিল, ৫৫০টি ডাকঘর আক্রান্ত হয় এবং তার মধ্যে ৫০টি হয় ভস্মীভূত, ৩৫০০ জায়গায় টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটা হয়, ৭০টি থানা অগ্নিদগ্ধ এবং ৮৫টি সরকারী অফিসভবন ভস্মীভূত। নরহত্যার হিসেবের পাল্লায় অবশ্য ইংরেজ সরকারের কৃতিত্বের দিকটা অনেক ভারি।

সুতরাং আগস্ট আন্দোলন অসহযোগ বা আইন অমান্য আন্দোলনের মতো শূদ্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা নিরস্ত্র বিপ্লব নয়, তার চেয়ে অনেক ব্যাপক। একে দমন করতে ইংরেজ সরকার বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে রক্ষিত সমর-সম্ভার এবং সেনাদল নিয়োজিত করেছিল। কী নিষ্ঠুর চণ্ডনীতির প্রয়োগে, কী অমানুষিক অত্যাচারের পথে ইংরেজ আগস্ট বিদ্রোহ দমন করেছিল, তার খানিকটা পরিচয় রয়েছে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে। নিষ্ঠুর নরমেঘ যজ্ঞের হোতা হয়ে ইংরেজ-শাসক বালক-বৃদ্ধ-নরনারী নির্বিশেষে অজস্র শালদানের নারকীয় উৎসবে মেতে উঠেছিল।

হৃৎসংকটে নেতার আবির্ভাব ঘটে। আগস্ট বিদ্রোহ নেতা আবিষ্কার করেছিল জয়প্রকাশ নারায়ণকে। গান্ধীজীর প্রিয়পাত্র, জওহরলালের উত্তরসূর্য, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী-দলের প্রধান জয়প্রকাশ নারায়ণ পশ্চিমের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করেছেন, বোম্বা রিভলবারসহ গেরিলাবাহিনী গড়েছেন, একাধিকবার জেল ভেঙে পালিয়েছেন, এ বিরাট দেশের বিভিন্ন ঘাঁটির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছেন, সর্বোপরি আগস্ট বিদ্রোহকে নেতাজীর আজাদী হিন্দ ফৌজের গতিবিধি ও কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কংগ্রেসের একমুখী সত্যগ্রহী ও অহিংসবাদী নেতা ও কর্মীরা—মারা এ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন—তারাও অল্পবিস্তর জয়প্রকাশ নারায়ণের পথেরই পথিক। অহিংসা ও হিংসার তুলনামূলক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে, দার্শনিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিয়ে চুলচেরা বিচার অব্যাহত হয়ে গেছে আপধর্মের প্রয়োজনে। ভারতের মুক্তিকে গ্রহণযোগ্য স্থাপন করে এগিয়ে চলেছে ভারতের মৃত্তিকামী জনতা পরম বিপদসংকুল পথে

চরম নিগ্রহকে আলিঙ্গন করে। প্রায় তিন বছরকাল এ বিদ্রোহের অগ্নিশিখা ছিল অনিবার্য।

ইতিহাসের মানদণ্ডে আগস্ট বিদ্রোহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন ভারতের অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আহ্বান নিঃসন্দেহে গান্ধীজীর এবং কংগ্রেসের। কিন্তু এর জন্য কোন কর্মসূচী নির্ধারণ বা কার্যক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের কোন সুযোগ অহিংসার কবি গান্ধীজী পান নি। আন্দোলন তার নিজের গতি থেকে প্রেরণা ও রসম সংগ্রহ করে ঘটনার পর ঘটনার পথ বেয়ে, আঘাত-প্রত্যাবর্তের দোলায় দোলা খেতে খেতে পরিণত হল পূর্বাভাসবিরোধী। অবশ্য কয়েকটি সাকুলার বা সবিম্ভতার প্রচারপত্র আমরা পাই কোন কোন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে, এ আন্দোলনের দ্বারা নির্দেশনায় ও নিয়ন্ত্রণে। বিহার সাকুলার এবং অম্ম সাকুলারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উত্তরের মনোমিলের চাইতে অমিল বেশি। উত্তরের লক্ষ্য অভিন্ন কিন্তু পথে ও মতে বিজ্ঞতা লক্ষ্যীয়। এ-আই-সি-সি-সি নির্দেশ ছিল, প্রত্যেক মূর্তি-ক্রান্তি বোদ্ধা প্রয়োজন হলে নিজেই নিজের পথপ্রদর্শক হবে। এই নির্দেশকেই কার্যকর করেছিলেন আন্দোলনকারী কংগ্রেসসেবিগণ। এ বিদ্রোহে তাই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধও আছে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানও আছে। এবং এখানেই গান্ধীজীর এই ধারণা যাচাই হয়ে গেল যে, কংগ্রেসসেবিগণ তাঁর অহিংসামূলকে সে স্থান দেয় নি, যা তিনি চেয়েছিলেন।

ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় ফতোয়া বের করে, প্রচারপত্র বিলি করে এবং নিখিভূত দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে সিদ্ধান্ত করেছে যে, আগস্ট বিদ্রোহের সকল দায়-দায়িত্ব গান্ধীজীর ও কংগ্রেসের। কথটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। যদিও একথাও সত্য যে, গান্ধীজী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা জেলের বাইরে থেকে এ আন্দোলন পরিচালনা করবার সুযোগ পেলে বিদ্রোহের হিংসামূলক কার্যকলাপকে কখনও সমর্থন করতেন না এবং হয়তো অসহযোগ বা আইন অমান্য আন্দোলনের মতো এরও পরিণতি হতো হঠাৎ পূর্ণক্ষেত্রে বা সাময়িক বিরতিতে। এবং আমরা জানি জেল থেকে বেরিয়ে এসে গান্ধীজী আগস্ট আন্দোলনের দায়-দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন আন্দোলনকারী কংগ্রেসকর্মীদের যে, তাঁরা পদাশ্রয়ের চোখে হালো দিয়ে আর লুকিয়ে না থেকে যেন সত্যগ্রহীত ধর্মপালনে বেরিয়ে এসে আত্ম-সমর্পণ করেন। তাঁরা মেনেছিলেন সে নির্দেশ। তার পর ১৯৪৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করলে— ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত আগস্ট আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে সত্য চট্‌কদারী বীরত্ব আছে বলে, কিন্তু তাতে কোন ছন্দ নেই, আছে

বিকৃতি। এবং গান্ধীজী এ কংগ্রেস এর জন্য লক্ষিত ও অনুভূত।

গান্ধীজী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের এই স্বীকৃতি মূল্যবান মনোভাব কঠোর সমালোচনার যোগ্য। জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি, অচ্যুত পটবর্ধন, রামমোনোহর লোহিয়া প্রমুখ কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক নেতৃবর্গ এ প্রস্তাবকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

যে বাস্তবকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রাকালে, সে বাস্তবকেই ঘটা করে অস্বীকার করলেন বিদ্রোহদমনিত বা স্তিমিত হয়ে যাবার পর। বিশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই ভারতের মূর্তি আন্দোলনে দুটি বিপরীত ধারা কখনও পাশাপাশি কখনও আড়াআড়ি চলছিল। একটি কনস্টিটুশনাল এ্যাজিটেশন (আইন বাঁচিয়ে আন্দোলন), নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অহিংসা সত্যগ্রহের সমন্বয়ে কংগ্রেসী ধারা, আর একটি বোমা রিভলবার ধারা সম্ভ্রাস সৃষ্টির পক্ষে গোপন বিপ্লবী ধারা। পরবর্তীকালে স্বরাজের প্রতি-শ্রুতি গ্রহণ করে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস



শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ

যখন গণ-আন্দোলন শূন্য করলে, তখন বিপ্লবপন্থী দলের নেতা ও কর্মীরা তাতে সক্রিয় অংশ নিরেছিল, অহিংসা সত্যগ্রহকে পালিসি বা নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেসে ক্রমে বামপন্থী ভাবধারা বিকশিত হতে লাগলো এবং ম্ভাবতই গান্ধীবাদী কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব তাকে সুনজরে দেখলে না। ১৯২৪ সালের কংগ্রেসে স্বরাজ দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন শহীদ গোপীনাথ সাহার উপর যে প্রস্তাব এনেছিলেন, তাতে এই বিপ্লবী বৃদ্ধের বীরত্বের একটু প্রশংসা ছিল। গান্ধীজী তার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং সামান্য ভোটাধিক্যে গান্ধীজী ওই প্রস্তাব রদ করিয়ে নিজের সম্মান ও প্রাধান্য বজায় রাখলেন।

কিন্তু কংগ্রেসে বামপন্থী প্রভাব ক্রম-বর্ধমান, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রদলে তরুণ শৈশ-সেবকদের ভিড়, জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র তাঁদের নায়ক ও মূখপাত্র। ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে পূর্ব স্বরাজের আদর্শ গ্রহণে ও পরে তার রূপায়ণে বিপ্লবীদের দান কম নয়, তা পরোকেই হোক বা প্রত্যেকেই হোক।

১৯৩১ সালের করাচা কংগ্রেসে একটি তৎপ-পূর্ণ ঘণ্টা-বিপ্লবী শব্দিক ভঙ্গি নিঃপ্রস্রিত প্রস্তাব গ্রহণ। সম্বন্ধে আদর্শ এই যে, স্বরাজ গান্ধীজী এ প্রস্তাবের সমর্থক। কংগ্রেসে সশস্ত্র বিপ্লবের মতবাদ ১৯২৪ থেকে ১৯৩১—এ সাত বছরে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তারই একটা আঁচ পাওয়া যেন। ১৯৩৪ সালে গান্ধীজীর কংগ্রেস ত্যাগ করার একটি কারণ বোধ হয় এই বাস্তববোধ। অবশ্য কংগ্রেসে গান্ধীবাদই প্রাধান্য নিয়ে রইলো, নেতৃত্ব রইলো তাঁরই অনুগামী শিবাবদে।

তার পর ১৯৪২-এর পটভূমিকায় গান্ধীজীর পুনরাবির্ভাব এবং দিশেহারা ঘৈর্হারা ক্রুদ্ধ জাতিকে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান। বিপ্লবপন্থী নেতারা তখন বেশির ভাগ ভারত-রক্ষা আইনে বন্দী, কিন্তু দেশের আকর্ষণ-বাতাসে তখন ইংরেজ বিষে ও বিপ্লবের সুত্র ধানিত হচ্ছে। চিরবিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী বাণী ও অপূর্ণ কর্মচাক্ষুর কাহিনী সুদূর জার্মানি থেকে রেডিও-তে ভেসে আসছে ভারতের প্রতি গৃহকোণে। এ পটভূমিকায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যে হিংসা ও অহিংসার ভেদ ঘুচে যাবে, এ ধারণা বা আশঙ্কা গান্ধীজীর ছিল। পূর্বোক্ত ওই জুনের ঘোষণা তার প্রমাণ। এবং বিপ্লবের এই ভাবের জোয়ারে অহিংস কংগ্রেসের শেষ পর্যায়ের 'ভারত ছাড়ো' গণ-আন্দোলন পরিণত হল আগস্ট বিদ্রোহ। ভারতের স্বাধীনতা প্রয়াসের দুটি স্বতন্ত্র ধারা — সত্যগ্রহ ও সশস্ত্র বিপ্লব এতদিনে তাদের অঙ্গাঙ্গী মিলনের ভূমি খুঁজে পেয়ে চারিতার্থ হল বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়াগতীর্থ, গঙ্গা-সম্মান সম্বন্ধ-স্থল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই অভিনব প্রয়াগতীর্থে অবগতন করে মূর্তি-পাগল অগণন তীর্থযাত্রী অলঙ্কারে আগরথের আগতপ্রায় স্বাধীনতাস্বর্কে প্রণাম জানিয়ে ধন্য হয়েছে।

স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে বল্লভতাই প্যাটেল—গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী সদাশিব বসু বলেছিলেন—'হিংসা অহিংসার প্রশ্ন অব্যাহত এই আগস্ট বিদ্রোহে।

জগতের কোন মানুষ যদি ওই মানদণ্ডে এর বিরূপ সমালোচনা করে, তবে শয্যাতানের মুখে শাস্ত আওড়ানো হবে। (মূর্তিপাগল) ভারত সর্বশ্ব পণ করে বিয়াল্লিশের বিদ্রোহে কাঁপিয়ে পড়ে তিন বছরের এক অপূর্ণ কাহিনী রচনা করেছে। এটাই বিরাট সীতা এবং এ সত্যের আলোতে আমরা সবাই উদ্ভাসিত হয়েছি।

ডঃ মজুমদারের অপূর্ণ গ্রন্থ 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস' (ইংরেজিতে)—তৃতীয় খণ্ড প্রস্তুত। সমগ্রভাবে এই প্রবন্ধটির জন্য বর্তমান লেখক ডঃ মজুমদারের কাছে কৃতজ্ঞ।

১৯৪২ এর আন্দোলন মেদিনীপুর

কুমারচন্দ্র মান্না

১৯৪২ সালের প্রথমে দিকে, জাপান যুদ্ধে রেজুনে বোমা পড়ায়, সারা ভারতে ভীতির দরকার হয়। জাপানের ভারত আক্রমণের পটভূমিকায়, ভারতবাসীর কি কর্তব্য, তাই নির্ধারণের জন্য, ওয়ার্শিপ অফিস ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকে দুটি মত প্রকাশিত হয়। একমল মহারাজীর নেতৃত্বে এই মানসম্মত বৃদ্ধে কোন অবস্থাতেই সহযোগিতা করা হবে না বলেই মত প্রকাশ করেন। বিশেষ করে ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যগ্রহণের সময়, খনবল ও খনবল দিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করা হবে না বলে অফিস ভারত কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিছু কিছু কংগ্রেস নেতা ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে যুদ্ধে সহযোগিতার কথা তুলেছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে মহারাজী, যুদ্ধে ইংরেজকে সহায়তা না করলেও জাপানকে কিতাবে প্রতিরোধ করা যাবে—সে পক্ষে নির্দেশ দান করেন। বর্তমানে হিংসাত্মক যুদ্ধে সেনাপতিরা যুদ্ধস্থল হতে বহু দূরে নিরাপত্তা স্থান থেকে সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন। কিন্তু অহিংস প্রতিরোধে সেনাপতিগণ শূন্যহাতে খেলা বুকে পক্ষের সামনে দিয়ে দাঁড়াবে, আর কখনো, “আমাদের না বেঁচে আর এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না,” এই আশঙ্কিতে বিশালী বহু নেতৃবাহিনী কংগ্রেস কমিগণ সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। আমি ভৎসালীন অফিস ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা থাকায়, উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম ও মহারাজীর মতকে পূর্ণ সমর্থন করেছিলাম।

কংগ্রেসের মধ্যে বতভেদের ইঙ্গিত পেয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য ক্রীপস মিশনকে ভারতে পাঠায়। ঐ মাসের শেষের দিকে নয়াদিল্লীতে ওয়াকিং কমিটির বৈঠক বসে। মহারাজী ক্রীপস মিশনের সমস্ত কথা অবগত হয়ে এই মিশন সফল হবে না বলে অনুভব করেন এবং ওয়াকিং কমিটির মিটিং ছেড়ে, এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে লেখাপড়া ফিরে যান। ক্রীপস মিশন কয়েকদিন ভারতে থেকে শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে ফিরে যাওয়ার সময়, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একরূপ স্বেচ্ছা হাতছাড়া করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়, এই ইঙ্গিত করে, ১২ই এপ্রিল ভারত ত্যাগ করেন।

মিশনের একরূপ স্বল্পে মহারাজী কুৎসিত ব্যক্তি হয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হন, এর কালে তিনি যে ভগবৎ নির্দেশ লাভ করেন, (১২ই এপ্রিল)

প্রকাশ করে বনছি) :—“১৮ই এপ্রিল ডোবের প্রার্থনার সময় তাঁহার ধ্যানগভীর চক্ষুর সম্মুখে ভেসে উঠে জ্যোৎস্না-উজ্জ্বলিত আকাশে বিদ্যুৎ অক্ষরে লেখা—“Quit India”। ইহাকে তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ বলে অনুভব করেন। এই কথা তিনি সারা ভারতকে জানান এবং ৮ই আগস্ট এই কুইট ইন্ডিয়া প্রত্যাবর্তন ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এদিকে ৪ঠা এপ্রিল ডাঃ প্রকরচন্দ্র বোম্ব ওয়াকিং কমিটি থেকে ফিরে এসে, বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের ক্রীপস মিশনের বিফলতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে কুমিল্লায় কর্মীদিগকে আহ্বান করেন। আমি ঐ মিটিং-এ মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে উপস্থিত হই। ঐ মিটিং-এ এই যুদ্ধে ইংরাজকে সহায়তা করা হবে না এবং জাপান এলে তাদের প্রতিরোধ করবার জন্যে আন্দোলন করা হবে স্থির হয়। বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার ঐ আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেখান থেকে আনন্দা ফিরে এসে ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধে সহযোগিতা না করবার জন্যে প্রচার শুরু করে দিই।

জাপান রেজুন অধিকারের পর, ভারত অধিকারের জন্যে উদ্যোগ উপকলে বা মেদিনীপুর জেলার হগরী নদীর উপকলে অবতরণ করতে পারে এই ভেবে, সত্যচিনি, সন্দীপন, পাঁজরী, কাঁধি ও রাননগর বাংলার অধিবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, যেখানে জাপানী সৈন্য অবতরণ করবে সেইখান থেকে অস্ত্র ৩।৪ মাইল দূরে লোকেরা ঘরের জিনিসপত্র তালচাষি দিয়ে সরে রাখে। মেজাসেবকরা পাহারায় থাকবে। আমাদের সব সময় লক্ষ্য থাকবে যে, জাপানীরা যেন আমাদের কোনও সাহায্য না পায়—বা কেউই যেন নাগালের মধ্যে না আসে। তারা চলে গেলে আমরা যে যার ঘরে ফিরে আসব এই প্রচার করা হয়।

ইতিমধ্যে জাপান রেজুন অধিকার করে নিল, সরকার মেদিনীপুর জেলার হগরী নদীর তীরবর্তী ধানভূমি থেকে, নৌকা, গরুর গাড়ি ব্যক্তিগত প্রভৃতি যানবাহন নিয়ে নেন। কালে এইসব এলাকায় ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়। সাধারণত মেদিনীপুর জেলার ভূমিহীন গরীবরা

রেজুনের সস্তা দরজার আমদানী খুদচালের উপর নির্ভর করে দিন কাটাত। আর এখানকার উক্ত ধান জেলার বাইরে চালান হয়ে যেত।

রেজুনের শতদ ও যানবাহনাদির অপসারণের পর রেজুনের খুদ চাল আগার সম্ভাবনা লোপ পেলে, ---মেদিনীপুরের উক্ত ধান যাতে জেলার বাইরে যেতে না পারে সেজন্য অনেক জায়গায় ১৪৪ ধারা অমান্য করে আলোচন চলতে থাকে। এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় বাইরের চালান একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময়ের একাধি ঘটনার কথা রনছি।

মুভাহাটা ধান উক্ত ধান। যানবাহন বন্ধের জন্য রেজুনের খুদচাল পাওয়া সম্ভব না হওয়ার দেশের উক্ত ধান যদি বাইরে যায়, তবে ভূমিহীন গরীবদের না খেয়ে মরতে হবে এই ভেবে, যে মাসে সমস্ত মুভাহাটাবাসীদের এ অবস্থায় কি করা কর্তব্য, আহ্বান জানিয়ে এক মিটিং ডাকা হয়। ১৪৪ ধারা ধাকা সম্মেলন ২৫।৩০ হাজার লোক এই আহ্বানে নিজেদের বাঁচবার জন্যে ভূমিকারী, ভূমিহীন সকলেই সভায় উপস্থিত হন। তাঁদের বুরিয়ে দেওয়া হয় যে, রেজুনের খুদচাল আমদানী থাকলে, মুভাহাটার উক্ত ধান বাইরে যাওয়ার বাধা ছিল না। বর্তমানে খুদচাল আসার সম্ভাবনা নেই। কাজেই ধান বাইরে যাওয়া রোধ না করলে লুটপাটের সম্ভাবনা আছে। কাজেই উক্ত ধান বাইরে যাওয়া বন্ধ করা একান্ত আবশ্যিক। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেনাপাওনার জন্য যদি বিক্রয় করতে হয় তাহলে কংগ্রেস পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ যে বিচারক থাকবেন, তিনিই ঠিক করবেন, কাদের বিক্রয় করা দরকার। তারপর অনুযুক্ত ধানার ধনমান লোকদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে সেই ধান কিনে রেখে, বিপদের সময় ঐ ধানার অভাব মোটামো হব—এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এর কালে লক্ষ্যিক মণ ধান জমা করা থাকে এবং অসময়ে সেই ধানের দ্বারা অভাব মোচনের ব্যবস্থা হয়। এই কারণে ধানান্তে কোন গোলমাল হয় নি এবং ধানের অভাবও ঘটে নি।

১৪৪ ধারা সম্মেলন এই বিরাট মিটিং-এ, সরকারী পুলিশ পাড়ি বোম্বাই হয়ে এসেছিল এবং মিটিং-এর চতুর্দিক ঘুরে কোনও কিছু না বলে ফিরে যায়। এদিন কোনও ধরপাকড় হয় নি। কিন্তু জুন মাসে আমাকে ১৪৪ ধারা অমান্যের জন্যে গ্রেপ্তার করে এবং গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পরে মেদিনীপুরের ধান-চাল যাতে বাইরে না যায় তার জন্য সরকারী নির্দেশ আসে। তখন আমাদের পক্ষে সেটা শীলমতন্যায় দায়বহণীয় সরকারকে জানান যে, কুমারবাবু

জুস্‌দু মোংলাই খাদ্যের জন্য

আমি নিয়ায়

আজুন

বিরিয়ানী, পরটা, পাসিঙা, চপ, আফগানী
আমিনিয়া স্পেশাল, চিকেন কালিয়া,
চিকেন চপ ও আরও অনেক রকম
খাদ্য পাইবেন।

মনোরম পরিবেশ ও

চমৎকার পরিবেশন

১, কর্পোরেশন প্লেস, কলিকাতা

ফোন : ২৪—১৩১৮

কিন্তু পূর্বে যে হান বইয়ের না যাওয়ার জন্য জন-সাধারণকে সজাগ করে দিচ্ছেন, সরকার ফরেকদিন পরে সেই নির্দেশ দিলেন উচ্ছল্য-তার গলে কুলেব মালা না দিনে—কারাকছ করলেন। তাঁব এই মন্তব্যে সরকার আমাকে জেল থেকে মুক্তি দেন। এবং পাছে ৮ই আগস্টের “কুইট ইণ্ডিয়া” প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্য বোম্বাই যাই, এই কাণে বুজিব সঙ্গে সঙ্গে ডেটিনিউ কবে জেলে আটক কবেন। বোম্বাইয়ে ৮ই আগস্ট অবিল ডায়ত কংগ্রেস কমিটিতে গব-সম্মতিক্রমে কুইট ইণ্ডিয়া পাশ হওয়ায় সরকার মহারাজী সহ সমস্ত নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ কবে। দেশে আন্দোলন দমন করবার জন্য—ব্রিটিশ-সরকার চরম অত্যাচার শুরু করে। তাতে আন্দোলন দগিত না হয়ে, বরং স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বিহ্যং বেগে গাথা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত চাবতে লক্ষাধিক লোক জেলে যায়। বহু লোক চুলীতে মবে। এমন কি একমাত্র বেদিনীপুর জেলেতেই ১২।১০ শত লোক জেলে যায়। এবং এই জেলায় মারমর, গুলী চালান, মরু পুতান প্রভৃতি এমন কি বহু স্থানে মেয়েদের উপবও পাশবিক অত্যাচার হয়। এই লোকপন্থারায় অত্যাচারেব কাহিনী ভরনকার প্রধানমন্ত্রী কমলুল হক সাহেব জানতে পেবে তমলুক মহকুমার মহিষাদল ধানার চণ্ডিপুর গ্রামে এসে জনসাধারণেব নিকট হতে পাশবিক অত্যাচারেব কথা শুনে মর্ষাহত হন এবং মুঃ প্রকাশ কবেন।

এই সময়ে আন্দোলনেব একটি গৌরবপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ না করে পাৰছি না। সেটি এই:—১৯৪২ সালে যখন বেদিনীপুরেব স্বাীয়া দকনে জেলে, সেই বৎসর অক্টোবর মাসে ভীষণ দুর্গাবর্ত ও বন্যায় সমস্ত বেদিনীপুর বিশেষ কবে সমুদ্রোপকূল তমলুক কাঁধি প্রায় বিধ্বস্ত এবং সমস্ত কাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ১৯৪০ সালে ভীষণ দুভিক্ষ ও মড়কের সঙ্ঘাবনা দেখা দেব। দুভিক্ষের গ্রাস থেকে জনসাধারণকে কি করে রক্ষা করা যায় তার জন্য বেদিনীপুর জেলাবাসী ও সরকার পর্যন্ত বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ে। সেই সময়ে ঘনাবন্য স্বপীয়া শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে ও সদ্ব্যক্তিতে তখনকার গভর্নর দুভিক্ষকে সামলবার জন্য বেদিনীপুরের কংগ্রেস নেতাগিকে রিলিক্সেব জন্য জেল থেকে বাইরে আনতে স্বাী হন।

গভর্নর তাঁকে ও চাকার নবাব এবং তাঁর প্রবন্ধনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ কয়েকজন মন্ত্রীকে জেলে নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে দেন। ওঁরা একদিন সকাল ১০টার জেসে উপস্থিত হয়ে আনাদের ডেকে দেখা কবেন। এই দুভিক্ষ থেকে দেশকে রক্ষা করতে নেতাদের রিলিক্স কার্যের জন্য বাইবে আসা প্রয়োজন, বলেন—বেদিনীপুরবাসীরা প্রতি তাঁব এই দরদ-দেকে আমরা মুখ হই এবং সকলেই তাঁব প্রভাবে স্বাী হই। তিনি নির্দেশ দেন, আপনাবা প্রস্তুত থাকুন; আনাবা ৪টার সময় নিজেবা এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাব: হঠাৎ সেদিন বেড়টার সময় তিনি দলবল সহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে জেলে আসেন এবং আনাদের ডাকেন। তিনি মুঃ প্রকাশ কবে বললেন, “আমরা মন্ত্রী হলেও আনাদের কোনও কমজা নেই। কমতার অবিকারী ইনিই, (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখিয়ে)। কাছেই আগনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব বলেছিলাম—তা আব হোল না।” এই বলে তিনি চলে যান। তিনি কলকাতা ফিরে গিবে তাঁব বন্ধিষ ত্যাগ করেন।

তুনেছি যে, শ্যামাপ্রসাদবাবু বিনাসর্থে নেতৃবৃন্দকে ছেড়ে দেবেন, এই কথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানতে পেরে, তিনি গভর্নর সাহেবেব লেক্টেবীকে ফোন করে জানান যে, বেদিনী-পুরের কোনও কোনও ধানাতে ব্রিটিশ সরকারকে না মেনে কংগ্রেস প্যাভালাল গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে। নেতাদের যদি এ অবস্থায়, বিনাসর্থে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত বেদিনীপুর জেলা ব্রিটিশ সরকারেব হাতছাড়া হয়ে যাবে। লেক্টেবী গভর্নরকে এই কথা জানালে সেই দিনই গভর্নর বেদিনীপুরে শ্যামাপ্রসাদবাবুকে বিনাসর্থে নেতাদের ছাড়তে নিষেধ কবেন। তাতে তিনি অপমান বোধ কবে মর্ষিষ ত্যাগ করেন।

এই ঘটনা কবেকদিন পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একদিন সন্ধ্যা এসে, জেলের ভিতর নেতৃবৃন্দেব সহিত দেখা কবেন এবং বলেন—“বেদিনীপুরে আন্ত দুভিক্ষে বিলিকে নেতৃবৃন্দেব বাইবে যাওয়ার দরকার অনুভব কবাছি। তবে তাঁরা, রিলিক্স কবেন—স্বাধীনীতি করবেন না এই গর্থে যেতে হবে।” এই কথা

চিন্তা করে তত্তর সেবা জমা বলে যাক।

আমরা জেলে এক সঙ্গে থাকতাম না। বিশেষ করে আমি বিশ ভিত্তিতে থাকতাম। আমি রাতিতে চিত্তার পর স্থির করি এবং নেতৃবৃন্দকে নিশ্চিতভাবে জানাই যে, বিহারের ভূমিকম্পের সময় ভাঃ স্বাধীনপ্রসাদকে বিনাসর্থে জেল হতে মুক্ত করে রিলিক্স করবাব জন্য পাঠিয়েছিলেন, আমাদিগকে যদি সেইরূপ বিনাসর্থে রিলিক্স কবতে পাঠান হয়—তবেই বাইবে গিয়ে রিলিক্স করতে পারি নচেৎ নফ।

এই কথাব নানারূপ গুত্তর ওঠে। শেষকালে সকল নেতৃবৃন্দ এই কথাব একমত হন। এই কথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

এতে বেদিনীপুরের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে এবং আন্দোলনে পূর্ব সহায়তা করেছে বলে মনে করি।

হংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মজুসা

২৫০

রাজনৈতিক-গগনের দীপ্ত স্বর্ধা—পাঞ্জাববন্দরী

লালা লাজপৎ রায়েব

জীবনী

[ইংরেজীতে]

রাজনৈতিক জীবনেব ঘটনার স্বাত-প্রতিস্বাতময় মহাজীবনী।

জেলেব শাস্তি—বিচার-রহস্ত পর্যন্ত আত্মল ইতিহাস। অসার জীবনী নহে—লালাজীর জীবন-সাধনার—রাজনৈতিক সংগ্রাম—দেশস্বাধাে যদি সুপরিচিত হইয়া ধন্ত হইতে চান ত সকর লাল লাজপৎ রায়েব জীবনী পাঠে উদীপিত হউন—স্বদেশস্বলস্বক্ষে আত্মহিতর জলন্ত আদর্শ দেখিয়া সম্বোধিত হইবেন।

মূল্য—।০ আন।

১৯৬, বিপিনবিহারী মাপ্পলো, শ্রীষ্ট, কলি-১৬ বঙ্গভূমী প্রাইভেট লিমিটেড.

আমার অভিজ্ঞতা

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমরা গান্ধীজীর অহিংস-অসহযোগ নীতি স্বীকার করি নি। আমাদের আপোষ মনোবৃত্তি ছিল না। ইংরেজের অনগ্রহে স্বাধীনতা লাভ আমাদের কাম্য ছিল না। কারণ সে স্বাধীনতা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। বলহীন ভারতবাসীকে শক্তিমান করে তোলাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের নীতি ছিল বলপ্রযোগে ভারতের দাসত্বলোপ। ইংল্যান্ড এই দেশ থেকে বিভাতিত না হলে বিলাতী স্বত্বাধীন অসম্ভব। গান্ধীজীর আদর্শ—অহিংস অসহযোগ দ্বারা শৃঙ্খল আত্মশুদ্ধি ও আত্মার স্বাধীনতা। এখানেই আমাদের সঙ্গে তাঁর আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তিনি স্বর্গব্যোম আর আমরা মাটিতে। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বহুবার বহু সমস্যা আমাদের কথা হয়েছে। বাংলার একজন বিশিষ্ট বিপ্লবীর অসীম সংগঠনশক্তি সম্বন্ধে রাউলট বিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ৫০,০০০ বলিষ্ঠ সন্তান কলকাতা আক্রমণ করে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করবে। সেই নেতৃত্বের কাছে আত্মশক্তির কোন আকর্ষণ ছিল না।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে প্রকাশ্যে বা পরোক্ষ সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিপূর্ণরূপে তা আত্ম-

প্রকাশের চেষ্টা দেখে। কিন্তু সফলকাম হয় নি। তখন নতুন করে আবার প্রস্তুতির আয়োজন চলতে থাকে। এমন সময় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজী উপস্থিত। বৈপ্লবিক নেতৃত্বে নিজেদের প্রস্তুতিব পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অসহযোগ আন্দোলন গ্রহণ করে। জাতির জাগ্রত মনোভাবকে আন্দোলনের মাধ্যমে সক্রিয় রাখবার মানসেই তা করা হয়।

১৯০০ ও '৪২ সালে নতুন করে আবারও চেষ্টা হয়। কিন্তু অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের সহিংস পরিণতি লক্ষ্য কবে আত্মশুদ্ধির নামে তাকে পিছনে টেনে নেওয়া হয়। আন্দোলনের স্বাভাবিক গতি-বেগ উপেক্ষিত হতে দেখেও বৈপ্লবিক নেতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী অন্তর্স্বন্দ্ব হতে দেশকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করে। অনেকে মনে কবে থাকেন সশস্ত্র বৈপ্লবিক নেতৃত্বের পবিত্র এই-খানেই। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা যাবা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে ও শতাব্দী-ব্যাপী স্বাধীনতার বস আন্দোলন করে চলেছে এবং তাদেরই অধিকৃত দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করে রাখার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তারাই আমাদের দেশের বৈপ্লবিক পরিণতিকে নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি

দান করেছে এবং বিপ্লবের ভয়াবহ রূপে বর্ণনা চিন্তা করেছে আপোষজনক স্বাধীনতার নিয়ামক হয়েছে। এমন কি নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের শেষবক্ষায় বিরাট ভূখণ্ডকে বিভক্ত করে নিজেদের স্বাধীনস্থিতি কবতে বিশ্বব্যাপ্য করে নি। এখানেও বিপ্লববাদ দেশকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা কববার নিমিত্ত সংঘত মনোভাব ধারণ করেছে। কেন না সে জানে রক্তক্ষরণের বিভর্তীবিধা, অহিংস নেতৃত্বের অনমনীয় মনোভাব সাময়িকভাবে পশ্চাতে ঠেলে দিলেও, বিপ্লব তার সহস্র ফণা বিস্তার করে একদিন এই মনোভাবকে কঠোব-ভাবে আঘাত হানবে। সে সমস্ত নিজেস্ব সাম্রাজ্যবাদের তার আব সমস্যা থাকবে না। অধিকন্তু শত্রুর রক্তক্ষরণের পরিবর্তে তার সহায়কের রক্তক্ষরণই তখন মুখ্য হবে উঠবে। এই নিষ্ঠুর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করেছে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব অসহায় বোধ করেছে।

বিপ্লব নিজের পথ নিজেই বেছে নেয়। পরাজয়ের প্লানি বলে তাব কিছু নেই। কাজেই জাতির জাগ্রত মনোভাবের বিবাহে অন্তিমায় হওয়া, আপোষজনক স্বাধীনতা গ্রহণ করা, ক্ষমতাব লোভে স্বিজাতিত্ব স্বীকার করে দেশ বিভাগ, এ সব কোন অপবাদের ক্ষমা নেই। এই আমার বিশ্বাস।

হাজি-হাজী, শিক্ষক-শিক্ষিক, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ

৪ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ।

১০০ বছরসমে পর্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ১০০৫

উপেক্ষনাথ ব্রুথোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা যা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অধিতীয় সাতাষাট)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ শব্দার্থ

ইংরাজী চাইতে বাঙলা—৩.৫০ । ইংরাজী চাইতে উর্দু—১.০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

য হা তা র ত

(প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)

(প্রাপ্ত খণ্ড মূল্য আট টাকা)

সম্পূর্ণ-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

(ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র)

মাইকেল ব্রুথোপাধ্যায় দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য।

বীরভদ্রা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক,

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে বোঁ,

একেই কি বলে সভ্যতা ?

মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কুকুমারী নাটক,

শমিতা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব

কাব্য, ভজাঙ্গনা কাব্য, চন্দ্রপদী

কবিতাবলী, বাঁধ কাব্য

মায়ী কানন, হেক্টর বধ ।

মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—

দামোদর ব্রুথোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১.৫০ ২য় খণ্ড ২.৫০

৩য় খণ্ড ১.০০ ৪র্থ খণ্ড ২.৫০

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১০০, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

২৬ নম্বর লর্ড সিন্‌হা রোডে

১০০ নম্বর লর্ড সিন্‌হা রোডে

C/o D. I. G. G. I. B. C. I. D.,
13, Lord Sinha Road, Calcutta."

আজকে নেতাজীর পদাৰ্পণী হাতে নিভেই
বহু পুরোনো কিস্মতপ্রাপ্ত স্মৃতি জাগ্রত করে
দিল।

কলকাতার ১০নং লর্ড সিন্‌হা রোডে
আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বৃটিশ
ইন্টেলিজেন্সের সদর দপ্তর ছিল। যে সব
রাজনৈতিক বন্দীদের বৃটিশ রাজশক্তি ভীতির
মুষ্টিতে দেহত তাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া
হত। সে জায়গা সম্পর্কে আমার নিজের
অভিজ্ঞতা ভুলবার ব্যাপার নয়।

(২)

১৯৩৬ ইংরেজী সালের ১৭ই মে।
আজকের জাহাজটি সাংহাই যাওয়ার পথে
মাদ্রাজে এসে থেমেছিল। হাবসী বুধে
ইতালীয়দের হাতে মাস্টার গ্যাস বোমার
পরাজিত হয়ে আমি জিবুতী বন্দর থেকে এই
জাহাজে চড়েছিলাম। দীর্ঘ ছয় বৎসর পর
এখানে ফিরেছিলাম। রাশিয়া, জার্মানী,
স্ক্যান্ডিনেভিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে বৃদ্ধ
বিদ্যা শিক্ষা ও ডক্টরেট উপাধি পেয়ে দেশের
দিকে পা বাড়িয়েছি। তখন আমার বয়স
২২ বৎসর। মাতৃভূমির পবনব্যতীর বেদনা
আমাকে গ্যাস বোমার পবাজয়ের প্লানি
থেকেও বেশী করে বিধ্বিছিল।

মাদ্রাজ বন্দরে আমাকে অভ্যর্থনা করবার
জন্য ছিলেন একমাত্র বৃটিশ ইন্টেলিজেন্সের
লোক। তার মতলব ছিল কোনও প্রকারে
আমাকে সম্মানবাদীরূপে প্রতিপন্ন করা এবং
তার পর ১০নং লর্ড সিন্‌হা রোডে ফেলে
দেওয়া।

কোনও প্রকারে তার কাছ থেকে মুক্তি
পেয়ে কলকাতা মেলে চেপে বসলাম।
হাওড়ার পৌঁছিয়ে কলকাতার দিকে তাকাতেই
মনে হল এক ভয়ঙ্করী রাক্ষসী হাঁ করে তৈরী
হয়ে বসে আছে আমাকে গিলে ফেলতে।

আমার বাবার মত কোনও নির্দিষ্ট স্থান
ছিল না। তাই স্ট্যান্ড রোড ধরে হাটতে
থাকলাম। অজ্ঞাতেই এসে পৌঁছলাম আউট-
রাম ঘাটে। সেখানে তখন মহারাজা
জাহাজটি আন্দামানের দিকে যওনা হওয়ার
মুখে। দেখলাম, কতিপয় মেয়ে বন্দী তখন
সিঁড়ি দিয়ে জাহাজে চড়েছে। একটি মেয়ের
করুণ মুখছবি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।
মনে হল বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব
মুহূর্তের মর্মবেদনা তাকে অভিভূত করে
ফেলেছে। সে কাতরকন্ঠে ভিজাসা করছে,
“কি অপরাধে আমাকে স্বীপান্তরে পাঠান
হচ্ছে?” জনৈক স্ত্রীলোক ওয়াডার তাকে
নিস্তুরভাবে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে বলল,
“শরতানকী বাচী, চল”।

(৩)

কলেজ স্ট্রীটগামী একখান ঘ্রামে চড়ে
বসলাম। কলেজ স্ট্রীটে এক পুরোনো বন্দুর
বাড়ীতে হাজির হলাম। কিন্তু নিশ্চিন্তে
থাকা হল না। কয়েকদিন পরে পুলিশ এসে
মর খানাজরাসী করে আমাকে হাতকাড়ি
লাগিয়ে নিয়ে গেল লর্ড সিন্‌হা রোডে।

সেখানে একটু ব্রোমাইড খাইয়ে জনৈক
সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে দিয়ে স্বীকার
করবার চেষ্টা করলেন যে, আমি কাশীতে
রাজনৈতিক ডাকাতি করেছি। আর সেই
ডাকাতির টাকার ছয় বছর বিদেশে কাটিয়ে
এসেছি।

“তুমি নিজের অপরাধ স্বীকার কর?”

“সবই মিথ্যা।”

“তা” হলে তোমাকে চাকিৎসার জন্য
পাঠাতে হবে। এখনও সময় আছে। এই
টাইপ করা তৈরী বিবৃতিতে তুমি সই করে
দাও।”

“না করব না।”

“তুমি আমার কথা শুনবে না? সার্জেন্ট
এই শরতানকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।”

প্রথম শেলে দেখলাম একজনকে নির্মম
ভাবে বেগাবাত করা হচ্ছে। তাকে নির্বাক
কবে বাধবার জন্যে মৃগহরুরে কাপড় ঠুসে
দেওয়া হয়েছে। ওর গোটা শরীরটা থেকে
ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে।

আমাকে পুনবার সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘরে
নিয়ে যেতেই সেই বিবৃতিটি সামনে রাখা হল।
আমি আরেকবার সই করতে অস্বীকার
করলাম। তারপর আমাকে সেই ‘টর্চার শেল’
নিয়ে যাওয়া হল।

(৪)

গভীর রাতিতে যখন আমার জ্ঞান ফিরে
তখন পুলিশ প্রহরী বলল আমি মেট্রান
বুদ্ধিজ লোক আপে” আছি।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি “মনোবৃত্ত
বোধ”-এর উপর প্রায় আস্থা-হারিয়ে
ফেললাম।

সংবাদপত্র ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির
আন্দোলনের পরিতাপস্বরূপ আমি মুক্তি
পেললাম।

১০নং লর্ড সিন্‌হা রোডের চৌহদ্দিস
বাইরে যে মস্ত হাওয়া ও সুবর্ণের আভা
আছে তা বিশ্বাস করা শক্ত।

১০নং লর্ড সিন্‌হা রোডের দৃশ্যবন্দ থেকে
মুক্তি পাওয়ার জন্যে আগ্রহ নিম্নে তিব্বতে।

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতার অমর অবদান

শ্রী অরবিন্দের

ANANDAMATH

শ্রীম বুদ্ধমতেন্দ্রের অমর আনন্দমঠের ও মর ২২রাজা তজুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্ণাভাস
- আনন্দমঠে—‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রের পুত্ৰপ্রকাশ
- আনন্দমঠে—শ্রীম বুদ্ধিম ও শ্রীম অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্ঘ্যশতাব্দীর সাধনে
ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৩৯- বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

জেলাখানার ছোট ছোট ডাক্তারবাবু

শ্রীমতী হুমায়ুন কবীর

যশ-হাড়া লক্ষ্মীছাড়ার দল আশা মৌদীন দীর্ঘদিনের মেয়াদ নিয়ে জেলের ভিতর স্থায়ী সংসার পেতে বসলাম, আমাদের চারদিকে শূন্যই চোখরাঙানী, নিবন্ধের শাসন আর শাস্তির মূলধারা। জেলাখানার “সুন্দার”, “জেলার”, ডাক্তার, কুমাদার, জমাদারিণী, মেট্রন এরাই সেখানে আমাদের হত্যাকর্তাবিধাতা। সুখের চেয়ে বালির তাপ বেশী! ইংরেজের হাতেব সরাসরি মারের চেয়ে তাদের এই প্রতিভূদের দাপটই বেশি ছিল আবও ভীত। আপাতদৃষ্টিতে মৌদীনপুত্রের জেলের ছোট ডাক্তারবাবু ছিলেন এদেরই একজন। কালো, বোটে, স্বলকায় গুরুসম্মিত মানবটি দেখতে ঠিক সুন্দর ছিলেন না। প্রথম যখন তাঁকে দেখি, জেলাখানার অন্যান্য বিরূপ করুণ মানব ও পরিবেশের সঙ্গে সহজেই তাঁকেও একত্র করে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম।

হঠাৎ এই সময় জেলের ভিতর আমাদের ওপর একটা আকস্মিক বড় আঘাত এসে পড়ল। সুন্দারীতকে (কুমিল্লা সুন্দারী চৌধুরী)—হঠাৎ একদিন তৃতীয় শ্রেণীর কবেদী কবে, রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্ত মূল্যবোধ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে সামরিক কবেদীদের গাদার মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বিব্রান্ত, অসহায় আমরা যত রক্তমুভাবে পারি এই আবিচারের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবই জেলের অনড় নিয়মতার প্রাচীরে মাঝা খেয়ে নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে সেই জেলের ছোট ডাক্তারবাবু হঠাৎ একদিন এগিয়ে এসে একটু অভূত ভাবে বললেন, “আপনারা এর বিরুদ্ধে পিটিসন করছেন না?”

“হ্যাঁ, পিটিসনের কাগজ চেয়ে পাঠিয়েছি, শীঘ্রই পাঠাব।”

“দাঁড়ান, এখনই পাঠাবেন না, আপনারদের অস্বিকাদা (চেষ্টা) অস্বাভাবিক মতনের অন্যতম নেতা) এখনে আছেন, তিনি একটা পিটিসন ভালো কবে লিখে দেবেন বলেছেন, আমি আপনারদের এনে দেব।”

—কিন্তু আশ্বাসে মনটা আন্দুলত হয়ে উঠল। তাহলে জেলে যত নিসহায় নিজেদের মনে কবি ততটা নই আমরা। দাদারা সহ-যাত্রীরা, এখানেও তাঁদের অদৃশ্য সন্ধান সেনহৃদয় নিয়ে আমাদের ঘিরে রয়েছেন। আর আমাদের নাগালের মধ্যে রয়েছেন আমাদের ছোট ডাক্তারবাবু। —সেদিন থেকে ডাক্তারবাবুকে আমাদেরই একজন বলে ধরে নিলাম। ছোটখাট মমতা আর সহনভূতি দিয়ে ক্রমেই আমাদের একান্তই আপনজন হয়ে উঠলেন তিনি। আমাদের কাবু ওজন কমে যাচ্ছিল—ডাক্তারবাবু সঙ্গ সঙ্গ দূরত্ব ব্যবস্থা

করছেন। সুন্দারীতের ওই সাধারণ করেদীদের কুংসিত কগড়া-গালাগালি আর নোংরামির মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যাবার বোগাড়, ডাক্তারবাবু মাঝে মাঝে ওকে জেলের হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়ে একটু হাঁক ছাড়বার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। সেবার মৌদীনপুত্রের অসহ্য গবম, ডাক্তারবাবু নিজে থেকে আমাদের একটি হাতপাখা এনে দিলেন। সুন্দার জেলার প্রভৃতি দলবেঁধে সাম্প্রতিক পরিদর্শনে এসেছেন, আমাদের ঘরে হাতপাখা দেখে জেলার রেগে আগুন, “জেলেকোডে পাখা দেবার নিয়ম নেই, কোথা থেকে এসব আসে এখানে!”—আমরা তো হতভম্ব, তালপাখার ২ পরসাব একটা পাখা, তার এতো অপরাধ! পেছনে তাকিয়ে দেখি ছোট ডাক্তারবাবু “সুন্দারের” পাশে গিয়ে মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে বলছেন “আমি দিয়েছি, বড় গবম, স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে”,—ইত্যাদি।

—ফাঁসির আসামী প্রদোষ। ডাক্তারবাবু তার খবর এনে দেন আমাদের, পৌঁছে দেন মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে বোনদের বিদায় অভিনন্দন। প্রদোষের কথা বলতে গিয়ে ডাক্তারবাবুর চোখ সজল হয়ে ওঠে।

—একদিন হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এসে বললেন, “আপনারদের কল্পনা দস্ত ধরা পড়ে গিয়েছে।”

“সে-কি ডাক্তারবাবু, কে বললো?”

“জেলের অফিসে বসে আছে দেখে এলাম, জেলেরদের পোষাকপরা একটি মোরে নিশ্চয়ই কল্পনা।”

শিক কল্পনা দেখতে?” বর্ণনার সঙ্গে একটুও মিলনা না, বললাম, শিশুচিত ধাক্কা, ডাক্তারবাবু ও কল্পনা নয়, কল্পনা এখনও এদের কবলের বাইরে।”

—এমনি করে বন্দীদের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার সঙ্গ ছোট ডাক্তারবাবু ৭৭৩ উঠেছিল নিকড় যোগাযোগ। বাইরে তিনি বিজ্ঞাতীয় সবকারের বৈদ্য-ভোগী কর্মচারী—নিত্যন্তই জেলের একজন সামান্য ডাক্তার। কিন্তু অন্তরে তিনি বাংলাদেশের সৈনিকের সেই বৈপ্লবীকরণে সর্বস্বারা বিসর্জিতগোষ্ঠীই একজন।—তার এই যোপন পনিচরের আরও একটি কাহিনী আমাদের কানে এসেছিল। আমরা মৌদীনপুত্র জেলে যাবার অল্প কিছুদিন আগে ব্যবস্থাবিন কারাদণ্ড দণ্ডিত দীনেশ মজুমদার ও অপব দত্তের বন্দী খচনি কর ও সুশীল দাশগুপ্ত জেল থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু দীনেশ ছিল, তাঁর এই অসাধ্যসাধনের একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন আমাদের ওই ছোট ডাক্তারবাবু। সুন্দারীত সাক্ষ্যপ্রমাণ এর আজও কোনওখান থেকে জোগাড় করতে পারি নি। কিন্তু আমাদের মনের সাক্ষ্য এ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়—সংশয়-রহিত।

আজ দীর্ঘদিন চলে গেছে। ডাক্তারবাবু আজ কোথায়, এখনও এই মরুজগতে আছেন কিনা জানি না।—যেখানেই থাকুন আমাদের প্রত্যাশনত অন্তবেব এই কু-বিনামিত কৃত্রিম অভিবাদন আজ তাঁর কাছে পৌঁছাবে না কি?

স বি তা

বিদগ্ধ বাংলা মাসিক পর

স্বাধীনতা সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৭২)

লিখেছেনঃ—

প্রবন্ধ : ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅমরদাশঙ্কর বার, শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যজ্ঞান সেন, শ্রীঅচিন্ত্য ঘোষ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস : শ্রীশ্রীশ্রীমোহন চৌধুরী, ডঃ জনার্দন হাজরা, শ্রীকুমারচন্দ্র জ্ঞান, শ্রীচন্দ্রজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধারাবাহিক স্মৃতি কথা : ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

ধারাবাহিক জীবনী : ডঃ পদ্মনান মন্ডলের ভারতশিল্পী নন্দলাল।

। এছাড়া তিনটি গল্প ও ছটি কবিতা।

II সম্পাদিকাঃ সামনা সোম II

প্রতি সংখ্যা...১.০০। বাৎসরিক...৬.০০। বার্ষিক...১০.০০

—যোগাযোগের কেন্দ্র—

সবিতা কার্যালয়, ৮৬-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪

স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রসঙ্গে

আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রথম প্রকাশ সিপাহীদের বিপ্লব আরোজনে—ইংবেজেরা যার নাম দিয়েছে 'সিপাহী বিদ্রোহ'।

ভারতের বৃহৎ সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়, ১৯০৫ সালে।

কার্জন বাঙলাকে ভাগ করতে চাইলো তার শাসনের তথা ইংরেজের ভেদনীতিক জ্বিহ্নে রাখার সুবিধার জন্যে। বঙ্গবিভাগ বাঙালীর বিদ্রোহী মনটাকে নাড়া দিয়ে গেল। একমুহূর্তে একপ্রাণ হয়ে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিন গঙ্গার স্নান করে পবিত্র হয়ে তারা হাতে 'রাখী' বাঁধিলো।

এর পরে আরম্ভ হল আন্দোলন। আন্দোলন, প্রচার ও বয়কটের ফলে শাসকদল ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

বাঙলা তখন বারুদের স্তূপ। কথার এবং কালে বাঙলার ছেলে-মেয়েরা উল্লসিত হয়ে



সুভাষচন্দ্র

ঠেছে। সভা করে, শোভাযাত্রা করে তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে অবিরাম।

লোকচক্রের অন্তরালে ধীরে ধীরে বিপ্লবী দলের সংগঠন চলছিল।

কংগ্রেসও তখন তৎপর। বয়কট আন্দোলন-বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে। অত্যাচারী ইংরেজ তাব-অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে দেশবাসীর মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল। এমনি দিনে প্রথম আবির্ভাব হল বিপ্লবীদের।

এদের প্রথম প্রচেষ্টা বাঙলার ছোট্টাট মিঃ বোমকিন্ড ফক্সবের টেণ ধুংসের চেষ্টা। ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে এ চেষ্টা হয়। বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৫ ফিট একটা গর্ত হয়ে যায়।

তাবপব গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। সিং

এয়লেনের পেছনে গুলি লাগে। প্রকাশ্য দিবালোকে এই আক্রমণ তরুণ মনে ক্ষেপে উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

কিংসফোর্ড 'বখন' কলকাতায় চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন একটি বালককে অনায়াসে ভাবে বেহেদে দণ্ডিত করেন। এ জন্য তাকে হত্যা করার সংকল্প হয়। বৈশ্বিক সমিতির নির্দেশে কুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী যায় ওকে বোমা মেরে হত্যা করতে। কিংসফোর্ড তখন মজুমদারপুর। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, রাত্রি কালে কুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজুমদারপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ী মনে করে ভুলক্রমে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডির গাড়ীর ওপর বোমা ফেলার ওয়া নিহত হন। কুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী গা ঢাকা দেয়। প্রফুল্ল চাকী মোকামাঘাট রেল স্টেশনে গোয়েন্দা পুলিশের দাবোয়া কর্তৃক ধৃত হবার আশঙ্কায় নিজের রিভলবারের সাহায্যে আত্মবিসর্জন কবলেন। কুদিরাম বসুও পরে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন। কুদিরামের ফাঁসী হয়। এই কিশোরের ফাঁসীর সংবাদে সমস্ত ভারত স্তম্ভিত হয়।

পরের ইতিহাস বহু বিচিত্র আশ্রয় আর অদম্য আকাঙ্ক্ষার রূপাধারের চেষ্টায় মহিমাম্বিত।

১৯৩১-এ শ্বিত্যীর বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এব কিছদিন পব পুলিশ জনকরক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার কবেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুও গ্রেপ্তার হন। কিন্তু অসম্মতাব জন্যে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। ২৫শে জানুয়ারী শোনা গেল, তিনি অন্তর্ধান কবেছেন। জানা গেল তিনি বার্লিনে চলে গেছেন।

সুভাষচন্দ্র, চিরকালই বিপ্লবপন্থী, তাই যুদ্ধ বাঁধাব প্রথম সুযোগই তিনি ভাবত থেকে সরে জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে আত্মরক্ষা ফৌজ গঠন কবেন বার্লিন থেকে তিনি পবে জাপানে চলে আসেন। এখানে এসে তাঁর বহুদিনের ইচ্ছাকে রূপ দেন, গড়ে তোলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা ও ব্যক্তিগত সৈন্যদের মধ্যে বৈদ্যুতিক স্পন্দন সঞ্চিত কবে। তাঁদের সামরিক অভিযাদন হয় 'জয়হিন্দ'। লক্ষ্য হয় দিল্লীর লালকোলা। আব একমাত্র নেতা নেতাজী।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৪২ কাল মহাসংগরামী। এই বৎসরই আরম্ভ হয় আগস্ট বিপ্লব। মহাত্মা-জীব 'ভাবত ছাড়' ধ্বনি হয় জনগণের ধ্বনি। বিপ্লবী তরুণদল আত্মবিসর্জন দিয়ে যে মহান আদর্শ স্থাপন কবেছিল তাই প্রভাবান্বিত করেছিল জনগণকে। তাবা আর মবতে ভয় পায় না। মৃত্যু ভয়, বাজ ভয় জয় করে

ভারতবাসী হয়ে ছিল মৃত্যুঞ্জয়। বিপ্লবে তাই হাজার হাজার লোক প্রাণ দেয়।

১৯৪২ সালের বিপ্লবের পর দেশের আবহাওয়া পাল্টে গেল। ওদিকে ভেসে আসতে লাগল নেতাজীর অলৌকিক কার্যকলাপের কথা। দেশ মরণ-চঞ্চল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শাসকও অবশ্য রক্তপিপাসা শ্বাপদ হবে উঠল। রাইফেল, মেশিনগান, বোমা, কোনটা ব্যবহার কবতে তারা ইতস্ততঃ করল না। অত্যাচারের বিভীষিকা বখন মর্মস্পর্শ হল, কমে এলো আন্দোলনের জোরার, কিন্তু প্রাক্কপন্দন রইল ঠিক, যার বহিঃপ্রকাশ হল ফেরারী আর ডিসেম্বরের বিপ্লবে।

যুদ্ধ থেমে গেল। ইংরেজের জয় হল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীবা ক্বিরে এলেন। মরণ-পাগল দেশ আবার পাগল হয়ে উঠল। আজাদী ফৌজের সেনানী-বিচারের ধমুভার



কুদিরাম বসু

তাবা প্রতিবাদ জানাল, জানাল, জানাল প্রাণ দিয়ে।

স্বাধীনতা কি, তার স্বাদ তখনও জাতি পার নি; কিন্তু প্রাণ দিয়ে যে স্বাধীনতা জানতে হয় সে সহজ সভ্যতা তাঁরা জেনে গেছে। সে মন্ত দিয়েছে জয়হিন্দ। আর সে মন্ত দিয়েছে জয়হিন্দ। আর সে মন্তের প্রকাশ পেল নৌ বিদ্রোহে, ফেরারী আর ডিসেম্বরের বিদ্রোহে।

বোম্বেতে নৌবাহিনীর ভারতীয় সেনানী দের উপর যে অত্যাচার কবা হয় তার প্রতিবাদ জানায় ওরা; ফলে দুই দলে সংঘর্ষ বাধে। ভারতীয় সেনানীবা গুলির জ্বাব ছিল ইংবেজকে গুলি দিয়ে। তাবদেব সংগ্রাম ব্যর্থ যায় নি, যেতে পাবে না। স্বাধীনত সংগ্রামের ইতিহাসে তার কথা লেখা থাকবে রক্তাক্তে।



—মৃত্যু নাম গণেশদাস—

মৃত্যুদাস মৃত্যুদাস ও রাসবিহারী বসু

'Two days later occurred the murder of Nirod Halder in Pathuriaghata... (*Sedition Committee, 1913, Report, Para 69, P-47).—

প্রবোধ প্রিন্সিপাল কর বলছিলেন—কিছুদিন পরেই গার্ডেনবিরের ডাকাতের খবর পেলাম। মনে হল দাদাব কথা, তাঁর রইলাম ডাকের আশায়। এ যেন—

হৃদয় আমার উঠছে দুলে
অকূল জলের অটহাসিতে,
কে গো তুমি দাও গো তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশীতে!*

(২২শে শ্রাব, ১৩৩১ সালে রচিত
২০নং কবিতা—'বলাকা')।

সংগ্রহ দেড় পরে, নিজের কন্ঠাকটারি কাজে, যশোহর-খুলনা লাইনে, সিরাজ স্টেশনে করলা বোকাই করতে গিয়েছিল। কাজ শেষে স্টেশনের বোম্বটে বসে তখন একটু বিশ্রাম করছি। স্টেশনমাস্টার এক টেলিগ্রাম পেয়ে জোব গলায় পড়তে লাগলেন। শব্দগুলি কানে এল।—'...নিরোদ রায় ডেড—বতীন মৃত্যুজী' স্ট. ডাউন...' ইত্যাদি। এই শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় ভেদ করে অন্তরে ঢুকে মনটাকে নিয়ে তোলপাড় করতে লাগল। নানা চিন্তার উদয় হল মনের কোণে। তখনই ফিবে এলাম কলকাতার। অতুল ঘোষের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বলে ওঠেন—তোকেই চাচ্ছিলাম, বিশেষ মরকাত। জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? 'তুই যেখানে ছিলি, দাদাকে সেইখানে নিয়ে যেতে হবে।' কি ব্যাপার?—দাদার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে।

চিন্তাপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ, দাদাব সঙ্গে পাখুবিহারীঘাটার বাড়িতে ছিল। নিরোদ গোয়েন্দা (সি আই ডি নিরোদ হালদার) গিয়ে সেখানে ঢুকছিলেন। তাবপব দাদাকে দেখেই বলে ওঠে—আরে বতীনবাবু, যে, আপনি এখানে? বলতে না বলতে চিন্তাপ্রিয় মশার পিস্তল দিয়ে গুলী ছুড়ে

দিয়েছে। তারপর সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। নিরোদ মরেছিল কি না, কেউ তা দেখে নি। কিছু পরেই পুলিশ আসে। তারা দেখে নিরোদ বোম্বটে আছে। কে বা কারা সেখানে ছিল জিজ্ঞাসা করার নিরোদ বলেছিল—সে কাকেও চেনে না, খালি চেনে বতীনকে। তাই দাদার নামে ওয়ারেন্ট। এই সম্বন্ধে সংবাদে প্রকাশ—

'Shortly after 7 a.m. ... Nirod Prakash Halder appeared in the Lane and began to enquire about his 'Gomas'a' who told him that he lives in No. 79, Pathuriaghata Street. ... For the purpose of enquiry he stood at the gate of



মৃত্যুদাস মৃত্যুদাস

No. 73 and called out and ... entered the premises. On going to the first floor he came across a number of youngmen in front of a room... Recognising the leader of the gang Nirod said, 'Hallo v Jatin, you are here.' (* A. B. patrika, 25. 2. 1915) —

মৃত্তি এবার মৃত্তি আজি
উঠল বাজ

অনাদরের কঠিন ঘরে
অপমানের ঢাকে ঢেলে সকল নগর
সকল গায়ে!*

(২২শে শ্রাব, ১৯২১ রচিত ২২নং কবিতা—
'বলাকা')—

এদিকে লাহোর বাইজিং তখন অবশ্যম্ভাবী মনে হচ্ছিল। রাসবিহারীর প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এই লাহোর বাইজিং-এর কথা অনেকেই জানা আছে। এই পরিস্থিতির বাংলায় সংগেও যোগ ছিল।

---'Rash chhari had a planned for German co operation and help with a German representative sitting in the old palace named Madan Mahal, a few miles from Jabalpoore in 1914. ... Be gal revolutionaries under Jatindra Nath Mukherjee were entrusted with the charge.' (* Rash Behari Bose, His Struggle for India's Independence—Edited by S. P. Chatterjee Page-587)—

কাজেই অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলছিল। অপবাদকে দাদাকে লুকিয়ে বাবার গুপ্তান চিন্তা। এই সম্বন্ধে বলা প্রযোজন, পূর্বাত পাখুবিহারীঘাটার ব্যাপারের পর পুলিশ বতীনদ-নাথের সম্বন্ধে দেশটাকে তোলপাড় করছিল।

'...the Police called at the residence of Dr Henanta Kumar Chatterjee at 275 Upper Chitmore Road to as certain if Jatindra Nath Mukherjee, who is the nephew, was there...The police are making a vigorous search for the mysterious gang... (* A. B. Patrika, 25. 2. 1915) —

শেষ পর্যন্ত লাহোর বাইজিং সম্ভব হয় নি। কৃপাল সিং - প্রমুখ বিশ্বাসঘাতকের জন্য ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। শেষে রাসবিহারী ২২শে তারিখে লাহোর ত্যাগ করে কাশীতে চলে আসেন। কাশীতে অবস্থানের সময়ে তাঁর মদ-ভোগের বিষয় ঠিক হয়। তাবপব বাংলায় পেঁছে তিনি প্রথম ঘান নবম্বীপে। এই সময়ে ববীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রার কথা চলছিল। সেই সুযোগে কবির অগ্রদূত হিসাবে তিনি পি এন টেগোলের নামে সংগ্রহীত একটি পাসপোর্টের সাহায্যে ১৯১৫ সালের ১২ই মে শিবদিবপুর্বে ১২নং জেটি থেকে এস এস সান্দ্রিকমাবু নামে এক জাহাজের সাহায্যে দেশত্যাগ করেন।* (এই তথ্য পূর্বোক্ত 'Rash Behari Basu His Struggle for India's Independence.' নামক বই থেকে সংগ্রহীত, Page. 587) — উক্ত পুস্তকে আরো লেখা হয়েছে—

'At this time poet Tagore's proposed visit to Japan was announced. Rash Behari took this opportunity and managed to

obtaining a passport in the name of Raja P. N. Nath, passing as poet Tagore's divorce emissary there

রাসবিহারী ১৯১৫ সালের ২২শে মে তারিখে অথবা অনুরূপ সময়ে উক্ত উপরে দেশত্যাগ করেছিলেন—একথা সত্য। কিন্তু এই সম্পর্কে একটা কথা উঠেছে, পূর্বোক্ত পুস্তকে প্রথমে ক্রীতশিল্প দাস লিখিত রাজা পি এন টেগোর—কে? রাজা পি এন টেগোর বলতে ১নং মর্মান্বায়ণ ঠাকুর স্ট্রীটের 'প্রফুল্লনাথ ঠাকুরকেই বোঝায়। ১৯১৫ সালে প্রফুল্লনাথ কিন্তু পি এন টেগোরই ছিলেন, তখন তিনি রাজা উপাধি পান নি। প্রথমে ডাঃ যাদুগোপাল তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন—রাসবিহারী.. দেশ ছেড়ে বাইরে আসার নিতে চলে যান। রবীন্দ্রনাথের জাপান যাবার কথা সংবাদপত্রে পড়ে তাঁর মাঝে একটা ব্যঙ্গ মনে যায়। তিনি পি এন টেগোর নাম নিয়ে পলিশের চোখে হুলা দিয়ে জাহাজে চড়ে যান। মনে বাধ্য হলেই হবে রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহশিক্ষক করে 'শশীদা' তাঁকে ১৯০৮ সালে দেবাদনে সরিয়ে দেন। তাই পি এন টেগোর নামটা চুট করে তাঁর মাঝে আসে।'—(পৃঃ ৬২০)। অতঃপর ৩০।৭।০৮ তারিখে চিঠিতে প্রশ্নোত্তরে ডাঃ যাদুগোপাল জানিয়েছেন—'শশীদা—শশীভূষণ রায়চৌধুরী, ইনি ছিলেন শিক্ষকতাই। এ'ব বাড়ি লোদপুরে...'

এই সম্পর্কে যথার্থ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, কেউ কেউ বলেন, 'শশীভূষণ রায়চৌধুরী' তখন পি এন টেগোরের বাড়িতে শিক্ষকতা করতেন। সেইভাবেই তিনি রাসবিহারীর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনও শোনা যায় স্মনাধিনা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁর নাতির জন্য শশীভূষণকে নিয়োগ করেছিলেন। এই নাতিই হচ্ছেন প্রফুল্লনাথ ঠাকুর। মসগড় প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের, পরে বাজা, একটু গরিম প্রযোজন।

'The Raja was born on the 10th November 1887... Parfulla Nath lost his parents in his childhood and was brought up by his grandfather Cally Kissen Tagore. Young Prafulla Nath was educated at home, his education being entrusted to... Scholars like Jogendra Nath Bose, Mohendra Nath Gupta and Mr. Keays. M. A., Bar-at-law... (পরে) Chief Presidency Magistrate, Calcutta... The title of 'Raja' was conferred on him in 1935.' (* Vide 'Bengal Past and Present,' July to Dec. 1938, Page-238)—

প্রফুল্লনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধেন্দ্র শ্রীপূর্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—'রাসবিহারী' পি এন টেগোরের গৃহশিক্ষক কখনই ছিলেন না বা হন নি। যোগীন্দ্রনাথ বসু ছিলেন দেওঘর হাই স্কুলের হেডমাষ্টার। তাঁর আদি নিবাস ছিল জয়মহাধারের 'ন্যাচা' অঞ্চলে। দেওঘরের আদি বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্ভবত যোগীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যোগীন্দ্রনাথকে জানতেন একজন ভালো শিক্ষাবিদ হিসাবে। আবার স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবীদের প্রতিও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের সহানুভূতি ছিল। যেভাবেই হোক বিশেষত্বের সূত্রে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যোগীন্দ্রনাথকে প্রফুল্লনাথের গৃহ-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। কালীকৃষ্ণের দেহান্তর হয় ১৯০৫ সালে। যোগীন্দ্রনাথ উক্ত ঠাকুরগিরিবারে একজন গার্ভিয়ান টিউটর হিসাবে তখন যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কাজেই আলোচ্য সময়ে অন্যান্যদের সঙ্গে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর-স্টেটের একজিকিউটর (সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক) হিসাবে যোগীন্দ্রনাথও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ কোন সময়েই যোগীন্দ্রনাথ তাঁদের দ্বারা অতুলকৃষ্ণ বসুকে 'ডেপুটি টেগোর ভিলার' কেমারটেকার ও লোকাল এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করে নেন। দেবাদনে অবস্থানকালে অতুলকৃষ্ণ ফ্যামিলি কোয়ার্টার সহ সববকম সুবিধার সুযোগ পেয়েছিলেন। অতঃপরে স্টেটের প্রতিনিধি (বা এজেন্ট) হিসাবে তিনি সেখানে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভও করেছিলেন। প্রফুল্লনাথের পিতার পুত্র প্রবোধেন্দ্র শ্রীপূর্ণেন্দ্রনাথ বলেন—'কালীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর অতুলবাবুই ছিলেন তাঁদের দেবাদনে স্টেটের তদারকব জন্য সর্বস্বত্ব। এই সময় প্রফুল্লনাথের স্বাক্ষরিত চিঠিপত্রও অতুলবাবুর কাছে সময় সময় পৌঁছাত। অতুলকৃষ্ণের এইরূপ অবস্থানকালে, ১৯০৮ সাল বাবর, হঠাৎ দেবাদনে আবির্ভাব হয়েছিল রাসবিহারী বসুর এবং অতুলকৃষ্ণও তাঁকে টেগোর ভিলাতে আশ্রয় দিয়েছিলেন প্রফুল্লনাথের অজান্তে।' রাসবিহারী দেবাদনে পৌঁছেছিলেন কপর্দকহীন অবস্থায় এবং স্থানীয় টেগোর ভিলাতে তিনি অবস্থান করেছিলেন প্রায় ৮ মাস। উক্ত টেগোর ভিলা সংলগ্ন বাগানে রাসবিহারী তখন নানা-প্রকার কৃষ্ণসাধন-সুলভ যোগাভ্যাসও নিযুক্ত থাকতেন, আবার যোগা প্রস্তুতও আবেগিত করেছিলেন। এই সুযোগে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা হিসাবে, অতুলকৃষ্ণের সহায়তায়, পি এন টেগোরের স্বাক্ষরের অনুরূপ স্বাক্ষরবৃত্ত এক দরখাস্তের মাধ্যমে, তখনকার ইউ পি সরকারের কাছে থেকে একটি পাসপোর্ট-ও সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে বিশেষ কঠিনসাধ্য হয় নি। এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, তখনকার দিনে এইরূপ পাসপোর্টের ব্যবহার কোন বাধ্যবাধনায় সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হত না। কাজেই উপরে সঙ্গৃহীত পাসপোর্টখানিই তাঁর কাজে লেগেছিল যার সময়ে ১৯১৫ সালে। এই ঘটনার

পরেই যে পাসপোর্টের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত সংবাদে—

'Issue of Passport Regulated.'

'....In connection with the revised rules regulating the issue of passports...persons who desire to obtain passport are strongly advised to apply for them at the earliest possible date...The issue of passports in time to meet the requirements of intending passengers cannot be guaranteed... (*A. B. Patrika, 4, 10. 1915)—

রাসবিহারীর অন্তর্ধানের কিছুকাল পরে যখন এই সংবাদ প্রকাশ পায়—পলিশের টেগোর্টসাহেব তাঁর দলবল নিয়ে প্রফুল্লনাথের গৃহে হানা দিতেও কসূর করেন নি। প্রফুল্লনাথকে তিনি তখন প্রোতার করার জন্য ব্যর্থপরিণত। কিন্তু টেগোর্টের সেই সর্বগ্রাসী লালসা ব্যর্থ হয়েছিল প্রফুল্লনাথের পিতৃব্য মহারাজা প্রদ্যুম্ননারায়ণের অপবিস্ময় প্রভাবে। অতঃপর প্রফুল্লনাথ অতুলবাবুর কাছে কৈফিয়ত লব করার পর ক্রমে সকল তথ্য প্রকাশ পায়। আরো প্রকাশ রাসবিহারীর দেবাদনে অবস্থানকালে উক্ত অতুলবাবু কর্তৃক সহস্র টাকা দেবাদনের টেগোর স্টেট থেকে সরিয়ে রাসবিহারীকে সাহায্য করেছিলেন। এই সমস্ত কারণে অতুলবাবুকে টেগোর স্টেটের কাছ থেকে প্রফুল্লনাথ শেষে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রবোধেন্দ্র বলেন—'অতুলবাবু অবশ্য পূর্বেও তাঁদের কাছ থেকে সম্মান সম্মতি আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন বহুদিন ধরে। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবৃতি থেকে আলোচ্য ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচ্য হতে পারে।

'রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহশিক্ষক সম্পর্কে বিবৃতি'

রাসবিহারী বসু পি এন টেগোরের গৃহশিক্ষক কোনদিনই ছিলেন না। শশীভূষণ রায়চৌধুরী নামীয় কোন ব্যক্তিই আমাদের বাড়িতে কখনই শিক্ষকতা করেন নি।

প্রফুল্লনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন 'যোগীন্দ্রনাথ বসু' ও 'মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত'। যোগীন্দ্রনাথ প্রথমে দেওঘর হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর জীবিতকালে অর্থাৎ ১৯০৫ সালের আগে, যোগীন্দ্রনাথকে দেওঘর থেকে আনিয়া নিয়ে প্রফুল্লনাথের জন্য Guardian Tutor-রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। এই যোগীন্দ্রনাথই পরে উক্ত স্টেটের অন্যতম Executor হয়ে কোন সময়ে অতুলকৃষ্ণ বসুকে দেবাদনে অবস্থিত টেগোর ভিলা Care-taker বা Local Agent হিসাবে নিয়ে আসেন। এবং তিনি পরে তাঁর প্রথম জামাই শশীভূষণ দত্তকে

আমাদের গৃহশিক্ষক হিসাবে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ ১৯০৮ সালে নয়—১৯১৫ সালে আমাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন শশিভূষণ দত্ত। তিনি বাংলায় দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত যখনবি নামক স্থানের অধিবাসী এবং এই শিক্ষকতা গ্রহণের আগে তিনি সরকারী একসাইজ বিভাগে কাজ করতেন।

এই বিষয়ে সত্যেনবাবু রচিত পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি এবং অনুমোদন করছি।
২০শে আগস্ট, ১৯৬৪
৩৫নং দপন্যায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট,
কলিকাতা।

স্বাঃ প্রবোধেশ্বরনাথ ঠাকুর

উপবোধ বিষয়ে প্রশ্নের ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে পুনর্ব্যক্তি করায় তিনি ২৭।৯।৬৪ তারিখের চিঠিতে যা লিখেছেন তার সারাংশও এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—
‘আপনি শ্রীপ্রবোধেশ্বর ঠাকুর ও তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে জেনেছিলেন। শশিভূষণ রায়চৌধুরী তাঁদের গৃহশিক্ষক কোনদিন ছিলেন না। এই সংবাদে পর আমি শ্রীমান জুপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি আমার আমার জানিয়েছেন যে, শশীদা একবার নয়—অনেকবার গৃহশিক্ষকতার কথা তাঁদের কাছে বলেছিলেন। এ ক্ষেত্রে আমি নিজে এবং কিছু বিশেষ কথা বলতে পারব না। রাসবিহারী হয়ত নিজ নামে ওঁদের গৃহশিক্ষক ছিলেন না। দেবাদ্রুনে এমনটা ঘটে থাকতে পারে। ইতিহাসের দিক থেকে এটি একটি জটিল ব্যাপার।’

কিন্তু অন্যর আলোচিত প্রশ্নের অধ্যাপক শ্রীবিজ্ঞানবিহারী বসু (রাসবিহারীর অনুজ) লিখিত ‘কর্মবীর রাসবিহারী’ নামক গ্রন্থে দেখা যায়—স্ববর্ণে বিনোদবিহারী সপরিবারে সিমলা গেলেন এবং রাসবিহারীকেও লইয়া গেলেন। সরকারী প্রেসে...রাসবিহারী কপি হোল্ডাবে চাকুরীতে নিযুক্ত হইলেন।’ (পৃঃ ৭০)। আবার ‘রাসবিহারী পদত্যাগ করিয়া বাটীতে আসিয়া বসিলেন।’ (পৃঃ ৭০)। শেষে ‘...রাসবিহারী অদৃশ্য হইলেন।’ (পৃঃ ৭৪)। অতঃপর ‘বহুদিন পরে কান্সা সিমলা রেলের এক স্টেশনে’ পিতাপুত্র সাক্ষাৎ ইত্যাদি। (পৃঃ ৭৬-৭৭)। এই সমস্ত তথ্যের সঙ্গে উপরি-উল্লিখিত অংশের ও বিবৃতির অনেক মিল দেখা যায়। তাই বর্তমান আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসা অস্বাভাবিক হবে না যে, সিমলায় সরকারী কাজে ইস্তফা দেওয়াব কিছু পরে রাসবিহারী সিমলার বাড়ি থেকে যখন অদৃশ্য হন, তাইই পরে কোনক্রমে দেবাদ্রুনের টেগোব ভিলায় গিয়ে অতুলকুমার বসুর আশ্রয় নেন। এই অতুলকুমারের সঙ্গে রাসবিহারীর পূর্ব পরিচয় ও যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক। তবে প্রশ্নের বিজ্ঞানবিহারী যে লিখেছেন—‘দেবাদ্রুনে পি এন ঠাকুরের বিস্তৃত বাগানের মধ্যে সুসজ্জিত ঘড়ি ছিল। ইহারই উদ্ভাবন করিতেন

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।’ (পৃঃ ১১৭)। সমকালীন সংবাদপত্রেও এই উদ্ভাবনকে নাম অতুলচন্দ্র ঘোষ বলেই উল্লিখিত হয়েছে। তবে আসলে এই নামটি যে ‘অতুলকুমার বসু’ সেই বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ নেই। অতঃপর শোনা যায় উক্ত বাগানে ৭।৮ মাস অবস্থানের পরে তিনি নিজের চাকুরি ইত্যাদি ঠিক করে অন্যর বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ—রাসবিহারী তখন দেবাদ্রুনে ঘোষী মহল্লার একখানি স্থিতল বাড়ীর দ্বিতলে বাসা বেঁধেছিলেন।’ (* ‘কর্মবীর রাসবিহারী’, পৃঃ ১০১)। তবে হার্ডিঞ্জের উপর বোমা কেনার আগে পূর্ব রাসবিহারীর দেবাদ্রুনের বৈশ্বাবিক কেন্দ্র যে টেগোব ভিলাতেই ছিল সে কথা প্রশ্নের শ্রীপ্রবোধেশ্বর কাছে শোনা গিয়েছিল ২০।৮।১৯৬৪ তারিখে। শুধু তাই নয়, হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের পরে টেগোব ভিলাতেও পলিশ খন্যাত্তরানী চালিয়েছিল পূর্ণোদ্যমে।

বিজ্ঞানবিহারী তাঁর ‘কর্মবীর রাসবিহারী’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন—‘ভগবানের বশতরূপে এই বীরের প্রথম কার্য—দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ।’ (পৃঃ ১৬)। রাসবিহারী তখন পূর্ণ সমর্পণে নিভরশীল। এই সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর ‘My Indian Year, 1910-1916’ নামক পুস্তকে লিখেছেন—

‘...On the January (to Dehradun)...in a car from the station to my bungalow I passed an Indian standing in front of the gate of his house with several others, all of whom were very demonstrative in their Salams. On my enquiring...I was told that the Principal Indian there had presided two days before at a public meeting at Dehradun and had proposed and carried a vote of condolence with me on account of the attack on my life. It was proved later that it was this identical Indian who threw the bomb at me.’ (* ‘Rash Behari Basu & His Struggle for Indian Independence.’—Page-534) -

তবে এই বোমা নিক্ষেপকারী আসলে রাসবিহারী ছিলেন না। তাই বিজ্ঞানবিহারী লিখেছেন—‘বোমা নিক্ষেপকারী অদৃশ্য হন। যে বিপ্লবীর চেষ্টায় এই বোমা নিক্ষেপ হয় তিনিও আত্মগোপন করেন।’ (পৃঃ ১২)। অর্থাৎ কয়েক মাস পরে বহু প্রকাশ পেলে দুজনই আত্মগোপন করেন। শোনা যায় আত্মগোপন অবস্থায় প্রথমে ‘কিছুদিন রাসবিহারী যখন চন্দননগরের বাড়িতে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন, তখন কোন নিকট আত্মীয় বা আত্মীয়েরা অর্থের লোভে সেই খবর পলিশের কানে পৌঁছে দেন।

—‘In connection with the L. L. B.

Conspiracy Case... British Govt. got extradition to arrest one Rash Behari Bose, an employee in the Forest Dept. who is just now on six month's leave and was supposed to be living at his house and to search the house where Sirish Chandra Ghose lives’... (* A. B. Patrika, 10.3.1914) —

কিন্তু রাসবিহারীও এই খবর যখন পেয়ে যান এবং সেই বাড়ি থেকে সবে যাওয়া ব্যবস্থা করেন। অতঃপর বিপুল উদ্যমে সূত্র হয় তাঁর ভারতের নানা স্থানে বৈশ্বাবিক কেন্দ্র গড়া ও যোগসূত্র স্থাপন করার কাজ। রাসবিহারী নিশ্চয়ই জানতেন যে, একটা বোমার দ্বারা কোন বৃটিশ প্রতিনিধিকে হত্যা করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। এটা ছিল একটা ভীষণ তত্যাচারের বিপুল বুদ্ধি যোগ্য সাহসী ইঙ্গিত এবং তার মূলে আঘাত করার আভাষমাত্র। তাবতে রাসবিহারীর বৈশ্বাবিক কাজকর্ম প্রথমে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের ‘বন্দী-জীবন’ ২২ খণ্ডে সুবিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। অতঃপর উপর্যুপরি বিশ্লেষণাত্মকভাবে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি বলেছিলেন—‘আহোব আমায় বুকিয়ে দিয়েছে, দেশের ভিতরে থেকে যথেষ্ট কাজ করা সম্ভব নয়। বাহিবে থেকে আরম্ভের দরকার, বাহিবে সাহায্যেরও দরকার।’ (* ‘কর্মবীর রাসবিহারী—পৃঃ ৩৮)। এমনই অবস্থা ঠিক হয় যতীনন্দনাথ মুখার্জীকে বাংলার তথা ভিতরে তার দিয়ে তিনি জাপান যাবেন। এই আলোচনার সময় রাসবিহারী কলকাতার শিলালদহ পোস্ট-অফিসের উপর আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন। একথা জানা যায় ‘কর্মবীর রাসবিহারী’ নামক পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠায়। তাবৎপ শচীন্দ্রনাথ সান্যাল লিখেছেন—‘আমাদের ও গিরিজাবাবুতে গিয়া তাঁহাকে জাহাজে চড়াইয়া আসি। ইহা ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসের কথা। রাসবিহারী জাপান যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অন্য আমদানি চেষ্টা—তিনি জাপান হইতে জার্মানীর সাহায্য অনেক অল্পও দেশে পাঠান। কিন্তু পলিশের হস্তে সমস্তই ধৃত হয়।’ (* ‘বন্দী-জীবন’, ২২ খণ্ড, পৃঃ ৭১ ও ১১৩)।

এইবার প্রশ্নের শ্রীনিধি কবীরের কথা মাধ্যমে ফিরে যাওয়া যাক যতীনন্দনাথের দিকে। তিনি বলেছিলেন—‘খবর এল আহোবে রাসবিহারীর পবিত্রত্বের বিফল হইবে, এই অভ্যুত্থান তখন আর সম্ভব নয়। দাদা বলতেন, —‘ওটা যখন হল না, আর আমি যখন বেরিয়েছি ক্যালকাতা পলিশকে প্যাবলাইজ করা যাক।’ এই সম্বন্ধে তখনকার বিপ্লবী নেতাদের মনোভাবের বিষয় অতি অল্প কথা

জান উল্লেখ করা গেল।—দাদা, বিপিনদা, নরেন ভট্টাচার্য্য এক গা ঢাকা অবস্থায় দেখেছি। সদা সত্য কথা বলিবে—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মঙ্গলপদে তারা যেভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন...। অথচ দাদার হৃদয়—কেউ জ্ঞাত করা দেবে না। সকালে যদি নাম হল 'হরিদাস ঘোষাল' বিকেলে হয়ে গেল 'শ্রবণীধর দামস্ত'।* (* 'বিশ্ববী জীবনের স্মৃতি' পৃঃ ৩৯৪, ৩৯৫)। পুলিশের ভেতর তখন দুটি মান্দু, একটি বসন্ত চ্যাটার্জী, অপরটি সুবেশ মুখার্জী খুব অ্যাকটিভ হয়ে উঠেছিল। সুবেশ মাদারিপুত্রে কোন ব্যাপারে চিঠিপত্রকে খুব খোঁজাখুঁজি করছিল। ঠিক হল লাইফ ফর লাইফ না করে এবার হবে লাইফ ফর নো লাইফ, অর্থাৎ জীবন না দিয়ে কাজ চালান। এই স্ক্যান অনুযায়ী চিঠিপত্রকে গমনে বেখে, নরেন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তিন-চারজন ওরাচ হিসাবে গেলেন হেদোতে বেড়তে। এটা হচ্ছে ১৯১৫ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা। সৌদিন ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যেব জানা ছিল, ইন্সপেক্টর সুবেশ মুখার্জী ইত্যাদি সৌদিন কনভোকেশন স্ট্রীট দিয়ে ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাহারার কাজে যাবেন। কাজেই চিঠিপত্রকে সামনে রেখে ঐভাবে বেড়তে যাওয়া শিকারীর ফাঁদ পাতার মতই মনে হয়। ইন্সপেক্টর সুবেশ মুখার্জী স্বভাবতই সেই ফাঁদে পা বাড়িয়েছিলেন। ষ্ট্রাম থেকে চিঠিপত্রকে দেখে ষ্ট্রাম থেকে নেমে ছুটে গিয়ে তিনি তাঁর তিন-চারজন সহকারীসহ চিঠিপত্রকে জড়িয়ে নরেন। চিঠিপত্রের কাছেও একটি গুলীভবা মশার পিস্তল ছিল। প্রাশ্নের শ্রীমলিনী কর বলেন—মশার পিস্তলে পুরা লোড থাকলে, প্রথমটি মিস ফায়ার হবেই। চিঠিপত্রের বেলাতেও তাই হয়। বাই হোক, চিঠির মাঝীরা তৎক্ষণাৎ সুরেশের ওপব গুলী ছুড়ে তাঁকে ফিনিস করে দেন। এদিকে এস আই কনবিহারী ইত্যাদি সুরেশের সহকারীরা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যান।* (* এই কথাগুলি ৪।১০।৬২ তারিখে প্রাশ্নের শ্রীমলিনী করের কাছে ব্যক্তিগতভাবে শোনা)। এই সমস্ত বৈশ্বিক ঘটনার প্রায় সকল কিছই যে তখন চলত যতীন্দ্রনাথ ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সংযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে—তার আভাস পাওয়া যায় প্রাশ্নের শ্রীযাদুগোপালের স্মৃতি থেকে।—আবার গোয়েন্দা বিভাগের সুরেশ মুখার্জী নিহত হবার পূর্বাণিগজ সারেন্স ফলে প্রমাণিত একটা মেসে বিপিনদা, দাদা, চিত্ত, নীরেন ও মনোরঞ্জন একদিন আশ্রয় নেন। পরদিন প্রাতে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসার ডাকা হয়। (পৃঃ ৪০০)।

অনেকটা এই সময়ে নরেন ভট্টাচার্য্য (এম এন রায়) ও যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (ডাঃ) বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির উপায় সম্বন্ধে এক বয়র পান।

'Ole of Jatin's emissaries Satyen Sen returned from America

via Japan.' (* 'The Legendary Heroism' etc.—A. B. Patrika, Puja Number 1963, p. 68) —

সেই কারণে প্রাশ্নের নলিনী কর বলতে থাকেন, আমরা দাদাকে আরো কিছুদিন আশ্রয়গোপন করে থাকার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনু দাদা বলেন—আমি প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালান না।...বাই হোক, শেষে ঠিক হয় বাইরে থেকে অস্ত্র আসা পর্যন্ত দাদা আশ্রয়গোপন করবেন। এইভাবেই ১৯১৫ সালে মার্চ মাসের শেষের দিকে যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেন।

'Towards the end of March 1915, while he was leaving for Bagnan on his way to alapore, he was told that Mother Sarodamoni (the Holy Consort of Sri Ramkrishna) happened to be present at the Howrah Station. Jatin hastened to receive her blessings. In a closeted compartment he meet her, took the dust of her feet and exchanged a few words with her. When he left, someone asked the Mother, 'What was the talk about'? She replied in a melancholy look in her eyes, 'I saw him as a blazing fire.'* (* A. B. Patrika, Puja Number, 1963 — P-69).

প্রাশ্নের শ্রীমলিনী করের কাছে আরো জানা যায় যে—সৌদিন দাদাকে নিয়ে বাগনানের হেঁড় মল্টার অতুল সেনের বাড়িতে প্রথম বাওয়া হয়েছিল। সেখানে চিঠিপত্র ও বিপিনদাকেও দেখা যায় আশ্রয়গোপন অবস্থায়।...এইভাবে দাদাকে বাগনানে রেখে নলিনী কর ও নরেন ভট্টাচার্য্য (এম এন রায়) বালেশ্বরের মহলাটিয়া নামক স্থানে বান, সেই স্থানটি দাদার আশ্রয়গোপনের পক্ষে উপযুক্ত হবে কি না দেখার জন্য। সেখানে তাঁদের দলীয় মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয়। মণীন্দ্রনাথের পরামর্শে ওখান থেকে আশ্রয় মাইল দূরে একটি দিবা নলিনী করের নামে বৈজ্ঞানিক করান হয়। প্রাশ্নের করের তখন দলীয় নাম ছিল গোপাল রায়। কাজেই ঐ স্থানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'গোপাল দীঘা'। এই নাম পরে প্রকাশ পেয়েছিল বালেশ্বরের স্পেশাল ট্রিবিউনালের সামনে ৪ঠা অক্টোবর, ১৯১৫ সালে জ্যোতিষ পালের বিবৃতিতে।

'Jatish Chandra Paul, aged 25 years said he was sub-contractor under Jotindra Nath Mukherjee under District Board, Jessore and P. W. D. Burdwan..He took me to koptipoda about May. Latter

told me to call him Swamiji and Nalini was known as Gopal Babu... (* A. B. Patrika, 7. 10. 1915) —

প্রাশ্নের কর বলেছিলেন—করেকদিন পরে দাদা ও চিঠিপত্রকে ওখানে রেখে আসা হয়। এই সময় ইউনিভার্সাল এমপোয়রিয়াম নামে বালেশ্বরে একটি সাইকেলের দোকান খোলা হয়েছিল, শৈলেশ্বর বসুর চার্জে। শৈলেশ্বর বসু ছিলেন হরিকুমার চক্রবর্তীর লোক। দু-এক সপ্তাহ পরে এই শৈলেশ্বর বসুই মনোবজ্ঞান ও নীরেনকে নিয়ে ঐ স্থানে পৌঁছে দেন।

অনেকদিন আশ্রয়গোপন অবস্থায় অস্থকারে দিন কাটবার পর, 'গোপাল দীঘার' এসে সুবেশ আলো আর মৃত্ত বাতাসে মনোরঞ্জন, নীরেন ইত্যাদির মন খুঁশিতে ভরে ওঠে। তারা দুটি মশার পিস্তল নিয়ে যুদ্ধে খেলা শুরু করে দেয়। এইভাবে মনোবজ্ঞানের হাতের একটি গুলী অতর্কিতে নীরেনের পায়ে গিয়ে বেঁধে। তখন কোনগতিকে ঐ ক্ষতস্থানে ফার্স্টএডের ব্যবস্থা করে শৈলেশ্বরকে পঠান হয় কলকাতার এম এন রায় ও যাদুগোপাল-বাবুর কাছে ডাক্তারের জন্য। নীরেনের চিকিৎসার জন্য সৌদিন গিয়েছিলেন শ্রীরাম-পুত্রে ডাঃ আশু দাস (পরে হরিপালে প্রতিষ্ঠিত)। ডাঃ আশু দাস ছিলেন আসলে আত্মজাতি সর্মিতির সভ্য, সে আভাস অন্যর পাওয়া গেছে। এইভাবে মাসাধিক চিকিৎসার পর নীরেন সুস্থ হন। ইতিমধ্যে একদিন (বিদেশ প্রত্যগত) এম এন রায় মহলাটিয়ার এসে হাজির হন। তিনি তখন মার্টিন নাম গ্রহণ করে ব্যাটাভিয়ার পথে রওনা হয়েছিলেন অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায়। যাদুগোপালবাবু (ডাঃ) এই সময়ে একদিন মহলাটিয়ার এসে ছিলেন দাদার সঙ্গে পরামর্শ করতে। এই কথা সর্মিতিত হয় নিম্নোক্ত টেলিগ্রাম থেকে।

'The outward Telegram from Madras examined and the following discovered :

'To Jadugopal Mukherjee, 62, Beneatolla Street, Calcutta.

Arrieved here: Starting to night for Balasore, expect to see someone there.

Sd. White.*

(* Confidential Report of J. C. Nixon, I. C. S., 1917—p. 86 87) 1).

এইভাবে সৌদিনকার মানসিক প্রস্তুতির কথা ভাবতে গেলে মনে পড়ে সমকালীন রচিত কবির গান—

নুতন গানে নুতন রাগে
নুতন করে হৃদয় জাগে,
সুরের পথে কোথা যে বাই
না পাই সে উদ্দেশ।

(*২৫শে প্রাণ, ১০৭১—নং ১৫৫, গীতাজি)।

দীনেশ গুপ্তর রবীন্দ্রনাথ- হৃদয়বিশেষের ব্রহ্মিষ্ঠ রায়

বিপ্লবীদের বন্ধুর পথে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ
অসামান্য। এ-প্রসঙ্গে একটি একনিষ্ঠ ভূষণ
বিপ্লবীরা কাছে শোনা "তাব রবীন্দ্রনাথের
কথা আমবা কিছু ব্যস্ত করবে।

দীনেশ গুপ্ত 'রাইটস' 'বিল্ডিংস'-এর
অলিম্ফিক্স-থ্যাট বীর্ষবান সৈনিক। দীনেশ
গুপ্ত স্মিতহাস্যে ফাঁসি বন্ধ কণ্ঠে ধারণ
করেছিলেন। দীনেশ গুপ্ত মৃত্যুর স্বাবে
দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করে গিয়েছিলেন ঐ মন্ত্র:
"বাসারসি জীবনানি এথা বিহাব নবানি গৃহ্যাত
নবোহপরাণি; তথা শব্দবাণি বিহাব জীবনানি-
ন্যানি সংঘাত নবানি দেহী।"

এই যে তত্ত্ব বা সত্য বিপ্লবীর কাছে
অজ্ঞাত বস্তু নয়। কিন্তু এর চেয়েও বহু
গুণে প্রভাবান্বিত হয়েছিল দীনেশের চৈতন্য
মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠবার তপস্যার রবীন্দ্রনাথের
বাসীমন্ডে। এ তত্ত্ব সকলের-হরতো জানা
নেই।

একটি আদর্শচঞ্চল কিশোর-যৌবনের
দৃশ্য পথে পা বাড়তে না-বাড়াতেই পৃথিবীর
মমতা উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় দিব্যধামে চলে
গেলেন-তাব জীবনোচ্ছাস কতটুকুই বা হতে
পারে! কিন্তু এই পারমাণবিক-যুগে কেবল
মাত্র বিজ্ঞানী নয়, মানুষ মাত্রই আজ উপলব্ধি
করেছে যে 'শক্তির পরিচয় কেবল আরম্ভে
আবশ্য থাকে না। দীনেশ গুপ্তর জীবনপর্ব
অতি সংকীর্ণ হলেও তাই তাব জীবন-সত্য
সংকীর্ণ নয়। সুতরাং ঐতিহ্য এই অসীম-
ক্ষমতার তেজোময় রূপ কোন সাহিত্য
থেকে আন্তরিক প্রবেশ লাভ করেছে তা
জানবার ঐচ্ছিক আমাদের থাকবেই।

১৯২৭ সন। বৈশাখ-পট্টিকা আঁপস
তখন ১০/১ এক, বৈঠকখানা বোডের দ্বিতীয়
বাড়িতে। দীনেশ কলকাতা এসেছেন। 'হুম'
কি 'জুন' মাসের এক দুপুর। বন্ধুদের
সেকালে কলকাতার শহরে জমাট আঙা জমতা
বেশ-আঁপসে। সাহিত্যরসিক মজুতবা আলীর
সঙ্গে আমি এক মত-সত্য আঙা ব্যতীত
মানুষ দিশখোলা মনের স্পর্শ পাষ না, দিল-
খোলা মন না হলে বড় কাজ করা যায় না...
বিস্ময়ীরা আঙা-সুখী জীব। কিন্তু সে
আঙাগুলোব ধর্ম ছিল একটু আলাদা। তাদের
মূলে ছিল বিপ্লবাত্মক বোধ, তাদের বসান্বিত
রূপতো সত্যীর্থ-মন। যা হোক সেদিন দীনেশ
গুপ্ত হস্তদস্ত হবে আঁপস ঘরে ঢুকেই
টেবিলের উপর একটি বইয়ের প্যাকেট দুমক
কবে রাখলেন। মনে হল যেন একখানি অড়
এসে ঢুকলো এবং চোখের আশ্রয়ে এসে থাকা
ও'র পক্ষে ক্রমশই দুষ্কর হয়ে উঠছে।

কোন ভূমিকা না করে দীনেশ একটা
দু'লিঙ্গা আমাব হাতে দিয়ে বললেন: ভারত-
বর্ষের সাময়িক স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে একটা
আবোলতাবোল বচনা লিখেছি 'বেশ'-র জন্যে,
আপনি একটু দেখে দেবেন।

আমি দু'দীর্ঘ বচনাটি দ্রুতবে স্নেহে
দিলাম। তৎপরে ঢাকা-প্রত্যাগত দীনেশের
সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম।

আমি বললাম: ঐ প্যাকেটে কি বই
এনেছ?

উজ্জ্বলিত দীনেশ বললেন: সেকেন্ড-
হ্যান্ড কতকগুলো যুদ্ধবিজ্ঞানের বই, একখানা
বলাকা, একখানা গীতাজলি।

আমাব ভারি মজা লাগল। প্রশ্ন করলাম:



দীনেশ গুপ্ত

ঐ মৌসিংগানের সজ্জার সঙ্গে গীতাজলির
সম্মিশ্র ঘটবে কি-কোরে, দীনেশ?

কিশোর দীনেশ তখন সবেমাত্র যৌবনে
পা দিয়েছেন। তাঁর চোখে দু'বের স্বপ্ন,
কামনার বিশ্বকল্পের গুঞ্জন।

'আমাকে উত্তর দিলেন: *বেশ' কেমন
কবে বিপ্লবের তথ্যনির্ভর সঙ্গে ভাল রাখে?

এমন উত্তর আমি এটুকু ছেলের কাছে
আশা করি নি। মনে হল ঐ চিবচঞ্চল
কিশোরকে কোথায় যেন তাঁরই অজ্ঞাতে সঙ্কট
প্রশ্নের উত্তর স্থির হয়ে গেছে।

গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: দীনেশ
তুমি কবিতা ভালবাস?

-বাসি।

-লেখ না কেন?

ভালবাসি বলে-ই লিখি না। কারণ
দু'একটা লিখে দেখেছি, ও আমাব হয় না।

প্রশ্ন করলাম: আচ্ছা, দীনেশ, তুমি তো
ভীষণ চঞ্চল ছেলে, কোন বস্তু পড়বার কালে
তুমি শান্ত হবে বাও?

-কবিতা।

-গীতাব স্নোকেগুলো-ও তো কবিতা।
তবে একদিন বলিছিল কেন যে গীতাব পড়বার
সময় তোমার কণ্ঠ কবে মন বসাতে হয়?

-গীতাব পড়তে ভাল লাগে, কিন্তু
দু'লাইন পড়লেই কুবুদ্ধি-যুগ্মের কথা মনে
পড়ে, আর তখন ভাবতে বসি, কবে আমাদের
যুদ্ধ শুরূ হবে, কবে আমি সে-যুদ্ধের সৈনিক
হব। বাস, গীতাব পাঠ খতম হবে যার।

-কিন্তু কায় কবিতা তুমি স্থির হয়ে
পড়?

-রবীন্দ্রনাথের।

-কেন?

-রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেই আমি
গীতার বাণী মারবে কণ্ঠে যুগ্মে পাই,
আরো পাই এই পৃথিবী ও তাব অগণিত
মানুষকে, পাই আলো-বাতাস জীবজন্তু ও
সবুজ গাছগুলোকে।

-রবীন্দ্রনাথের কবিতা তোমাকে চঞ্চল
করে না?

-অভিভূত কবে, ক্ষিপ্ত কর না। ভাল
লাগে এত বেশি যে আমার রক্তধারা বিবশ হয়ে
আসে, মনে রোমাঞ্চ লাগে। আমি স্থির
হই।

বললাম: তোমার খুব ভাল লাগে এমন
দু'একটি চরণ আবৃত্তি করো না?

দীনেশ শুরূ করলেন:

গেছে বন্ধু, কি চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর স্বারে এসে?

কি তোমারে দিব আমি?

সম্মাদীপখানি।

এ দীপের আলো এ যে নিয়াল কোণের
স্তম্ভ ভবনের।

তোমাব ওলার পথে এরে নিতে চাও জনতার?

এ যে ঘাষ

পথের বাতাসে নেবে যায়।*

চঞ্চল দীনেশ ক্রমশ স্থির হয়ে আসছেন।
আবার বলতে থাকেন:

দাঁধেবে সহসা—

সম্মাদী কবরী হতে *সস

একটি রঙীন আলো কানি ধরখনে

ছোয়ায় পবনমাণ স্বপনে পাবে,

সেই আলো, অজানা সে উপহার

সেই ত তোমার।'

দীনের কণ্ঠ থেকে, কিন্তু কবিতা
তার সত্য অদৃশ্য ভরসালায় বহমান।

আমি বললাম : আবেগ হল।

দীনের শব্দ করলেন :

‘বিরহী তোমার ...

আছি জাগি’

দীনের বাতাসে

ফাগুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।...

ফিরে ফিরে মোর সাথে

দেখা হবে তব বারম্বার

জীবনের এপার ওপার।’

প্রশ্ন কবিতা : তোমার এসব পংক্তিগুলো
অত ভাল লাগে কেন? মারামারি-কাটাকাটি
কথা তো এতে কিছু নেই?

সহস্রে দীনের আবার চম্পক হয়ে ওঠে।

বলে : কেন জানি নে—আমার খুব ভাল

লাগে। এ যে অন্তহীন ‘বিরহী’—তার বাওরা-
মায়া যেন অন্তহীন কালের মধ্যে। তার
মামর কড় আপনাব মনে হয়। তার পৃথিবীতে
আমাদের পৃথিবীরই দীক্ষণ-বাতাসের মর্ম
আছে, ফাগুনের বর্ষমর নিশ্বাস আছে, অখচ
আরো আছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যকার
প্রাচীরকে অস্বীকার করার সাহস।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তুমি গান
চালবাস?

দীনের উৎসাহে উত্তর দেন : খু-

—স্বদেশী গান?

—স্বদেশী গান তো নিশ্চয়ই, এ

গানের মত। তবে খুব ভাল লাগে
রবীন্দ্রসংগীত।

—কল তো দু’একটি তোমার প্রিয় গ
দু’একটি চরণ?

দীনের বলে চললেন :

‘দুঃখের পরে পবন দুঃখ

তারই চরণ বাজে বুকে,

সুখে কখন বুঝিয়ে।।

দেয় পরশমণি

সে যে আসে, আসে, আসে।

আমি বললাম : আরো বল!

দীনের তাব ভাঙারের স্বর খুলে দিয়ে—

অজন্ম গানের অজন্ম চরণ আবর্তিত
চললেন। মনে হল তাঁর কানে বেল
নার কণ্ঠের গীত ভেসে আসছে।
গানের আবর্তিত তাঁর ভ্রমরতাসন্দর।

দীনের কণ্ঠে বেজে উঠল :

‘হিম করে লও হে মোরে,

আর বিলম্ব নয়।

• হুলার পাছে করে পড়ি

এই জাগে মোর ভ্রম

এ ফুল তোমার মল্লার মাঝে

ঠাই পাবে কি জানি না যে,

তবু তোমার আঘাতটি তার

ভাগ্যে বেন রয়।

হিম কবো, হিম কবো,

আর বিলম্ব নয়।’

কিছুকণ চুপ করে থেকে বললাম : আজ,
লোকে যে বলে রবীন্দ্রকাব্যে মেয়ে

চল কণ্ঠ বেশ। ও পড়লে ছেলের ‘সাক্ষ

হয়ে যায়। কিন্তু তোমার কি মনে হয়?

দীনের আমার দিকে একটু তাকিয়ে ব্রীক-
মত কুঁকড়ে বলেন : সেই লোকগুলো রাষ্ট্র

ঠাকুরের একটি কথাও বুঝতে চায় না। ওদের
হাতের কাছে পেলে—

দীনের আর বলা হল না। মনে হল
সেই কলিত মানুষগুলোকে কাছে পেলে

দীনেরচন্দ্র তখনই তাদের ঘাড় মটকে
দেবেন।...

রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক,
গল্প, দীনের প্রিয়তম সাথী ছিল। কবির
কাব্যে দীনের সেই ধ্বনি মর্ম দিয়ে অনুভব
করতেন যে-ধ্বনি তাকে কাল ও দেশের গণ্ডি
পার করে একদা সে-ঈশ্বরের গান শুনিয়েছিল
যার কল্পনা যদিও ছিল তারই রক্তের নিষ্ঠুর
স্পন্দনে।

‘গীতা’ পড়ে দীনের মৃত্যুকে ভয় করেন
নি। ‘গীতার’ মর্ম রবীন্দ্রনাথের ‘কবিতা’

হয়ে সহস্র মনে তার মনে গুঞ্জরিত হতেই
তিনি মৃত্যুকে তুচ্ছমান করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জরী
দীনের রক্তে অনুরাগিত হল :

‘দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন,

ওরে দীন, ওরে উপাসীন

ওই ক্রন্দনের করোলা।’

...‘তার মুকে পথ চিরে চিরে

নুতন সমুদ্র-তীরে

ভরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।’

আদর্শতন্ত্রের তরুণ আপন-বিশ্বাসে দুঃসহ
রে শুনছেন :

• ‘দুঃখের শূন্য হল আরামের শব্দাতল,

।। কর, যাত্রা কর যাত্রীদল,

‘সেই আদেশ

‘বন্দ্যের কাল হল শেষ।...’

দীনের গুপ্তের যাত্রাও আরম্ভ হয়ে গেল :

‘মৃত্যু ভেদ করি

দুঃসীমা চলেছে তরী।’

কেন তরী বেয়ে চলতেই হবে? তার করণ :

‘এসেছে আদেশ—

‘বন্দ্যের কাল হল শেষ।’

আনন্দনিমগ্ন তরুণ। কারণ :

‘স্বপ্নের গান

উঠেছে ধ্বনিয়া নবজীবনের অভিসারে।’

মৃত্যুঞ্জরী দীনের প্রচুর আশাবাদী। প্রচুর
আত্মবিশ্বাসী। কাজেই কবির বাসী তাঁর
হৃদয়তলে তোলে প্রিয় গুঞ্জরণ। কবির ভাষায়
মৃত্যুকে পরম আশার বলতে পেরেছেন তিনি :

‘ভেতরে নাহি কবি ভয়,

এ সংসারে প্রতিদিন তোকে করিয়াছি জয়।

• তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ

দিব, দেখ।

শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন

এক।’

বিশ্বাসী দীনের। আশাবাদী দীনের।

স্বপ্নের কণ্ঠে কবির প্রশ্ন :

‘স্বপ্নের এ রক্তস্রোত,

মাতার এ অশ্রুধারা

এর বত মূল্য সে কি

রার খলার হবে হারা।’

কবির মতই এ প্রশ্ন করো কাছ থেকে
উত্তরের প্রত্যাশায় দীনের গুপ্তও করেন নি।
কারণ, এর উত্তর তাঁর নিজের কাছেই ছিল।
উত্তর জানা ছিল বলেই আত্মদানের সামর্থ্য
তাঁর হয়েছিল।

প্রাণের তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?

—এও তাঁর প্রশ্ন নয়, এ তাঁর শৃঙ্খল-পাওয়া
উত্তর, এ তাঁর স্বপ্নভেদের প্রত্যয়ধ্বনি। তাই
প্রাণের তপস্যা সমাপ্ত হতেই অরুণ-আলোকের
পদধ্বনি তিনি শুনলেন। সেই আলোক পান
করে তিনি মৃত্যুহীন হলেন।

তাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এই তরুণ কারা-
গৃহ থেকে তাঁর মণিদিকে লিখতে পারলেন :

...‘এ তো মালা নয় গো, এ যে

তোমার তরবার।

জ্বলে ওঠে আগুন বেন

বন্ধ হেন ভারি।’

‘গল্প’ হতেও কঠোর পদক্ষেপে দীনের
বিপ্লবযাত্রা, কুসুম থেকেও কোমল অনুভূতি
লাগলে দীনের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞান। পরাধীন-
নতার শৃঙ্খলা বিখ্যাত করবার দুর্দান্ত
শক্তি তিনি উপাসক। দুঃখে-সৈন্য-অগম্যনে
ক্রিষ্ট পবোধীন নরনারীর বেদনার তিনি
ব্যথাকুর। তাই যে-ধ্বনে মহৎ স্মৃতিরই পূর্বে
সূচনা, তা দীনের গুপ্তের কাছে প্রের। তাই
বিপ্লবের পথ তাঁর কাছে বরণীয় শব্দ নয়,
রমণীয়ও।

কঠোর ও কোমল সমাবেশ বিপ্লবীর
সত্তা, কঠোর ও কোমল সমাবেশ রবীন্দ্র-
সাহিত্যে—তাই বিপ্লবী-দীনের জীবনে
রবীন্দ্রসাহিত্যের অত প্রভাব।

দীনের মহাকীর্তি। দীনের বীরের মত
পৃথিবীর সমগ্র সৌন্দর্যকে ভালবেসে পরিপূর্ণ
হয়েছিলেন। সে-সৌন্দর্যবোধই তাকে কখন-
হীন সত্যের পানে নিয়ে গেছে। আলীপুর
জেল থেকে ‘খুঁকু’দিকে দীনের লিখছেন :
‘ভালবাসা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস।
যে বাকে ভালবাসে তার জন্যে প্রাণ দিতেও
কি সে কুণ্ঠিত হয় কখনও?...ভালবাসা হিসেব
জানে না...আমাদের ভালবাসার গণ্ডি বড়
সংকীর্ণ, বড়ই অল্প পরিমিত। একে ব্য
করতে হয়। স্বার্থত্যাগ সে সাধনার প্রথম
কথা।’

দীনেরে এসব কথা তাঁর উপলব্ধি উঠি।
তাই তাঁর চিঠিগুলো পড়ে মনে হয় তবু
দীনের ‘প্রাণের’ অনুভূতি নিয়েই বড়
ভগবান বুদ্ধের কণ্ঠ থেকে নিজ কানে
শুনিয়েছিলেন :

Friend; that love is false
Which clings to love for
Selfish sweets of love

নিজের জীবনকে নিজের দুঃসম্ভবত্বের
ধারণ করে বিপ্লবের বেদীতে আহুতি দিয়ে
ছিলেন দীনেশচন্দ্র। তাঁর অবিচলিত নিন্দা
দিনে দিনে সুন্দর হয়েছিল। তাঁর এই দীক্ষা-
ভরুর মূলে জনসিঙ্ঘন করতো রবীন্দ্রকাব্য,
নে-তরুরকে আলোক ও বাতাস দান করতো
রবীন্দ্রদর্শন, সে-তরু যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে-
ছিল তার প্রতি রক্তকে উর্বর করতো সত্যীর্থ
এবং পূর্বোদ্যমী শহীদদের বন্দু, ত্যাগ, বীর্য
ও আদর্শমগ্নতা।...

বিপ্লবী বিনয় বসুর নেতৃত্বে দীনেশ ও
বাদল রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ঢুকে কারাধিপতি
কর্নেল সিম্পসন ও অন্যান্য রাষ্ট্রপুরুষদেরকে
আক্রমণ করবেন স্থির হবে গেছে। জোয়ান-
হত্যা পর বিনয় বসু আত্মগোপন করে আছেন
দলের শেফটারে। তাঁকে বখা হয়েছে মেটিয়া।
বদুজে রাজেন গৃহে মহাশয়বেব গৃহে। দীনেশ
ও বাদলকে বখা হয়েছে নিউ পার্ক স্ট্রীটের
(সার্কারস পোস্ট আপসেব করছে) এক
ঝিলে। মেটিয়াবদুজ থেকে বিনয়কে রসময়
শব্দ এবং নিউ পার্ক স্ট্রীট থেকে দীনেশ-
বাদলকে নিকুজ সেন ট্যাক্সি কবে খিদিরপুর
পাইপ বোডেব মোড়ে একই সময়ে নিয়ে
আসবেন বলেও স্থির হয়ে রইল। সময়ের
একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই-কারখ
বিনয় বসুকে ধরবার জন্যে দশ হাজার টাকা
পদব্রকার ঘোষণা করা হয়েছে। পদলিখ এ
বাবদে অর্ধেক রাজ্য বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত।...

দীনেশ ও বাদলকে আনবাব জন্যে বখা-
জম্মে নিকুজ সেন নিউ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে
উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে, তরুণ-
কর্ম দ্রুত কর্মচারীর জন্যে তৈরির হয়েছে
কাব্যপাঠে মগ্ন। মতাপথে গা বাড়াবার পূর্ব
মহুত্রে তপস্যানিবড় কঠোর দীনেশ পড়ে
যাচ্ছেন :

শব্দ এইটুকু জানি, তারি লাগি
রাগি-অলঙ্কারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে
বদ্যন্তব পানে
কড়কড়া-বজ্রপাতে ছদালায়ে ধরিতা
সাবধানে অন্তর-প্রদীপগানি।

বাদল মস্তমুছের মত শুনছেন সেই
আবুতি।... দীনেশ পড়ে যাচ্ছেন :

যে মস্তকে ভয় লেখে নাই
লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক-তলক।

দীনেশ আবার পড়ছেন :

‘ভাবপরে দীর্ঘ পথশেষে

জীবনযাত্রা-অবসানে ক্রান্তপদে রক্তসিক্ত যোশে
উত্তরীর একদিন প্রান্তিহবা শান্তির উদ্দেশে
দম্বহীন নিকেতনে।’...

কিন্তু নিকুজ সেনের উপস্থিতি টের
পেতেই তাঁরা কাব্যগ্রন্থ গুটিয়ে রাখলেন।
এবং অন্যায়সে সৈনিকের ক্ষিপ্ততায় ‘এ্যাটেন-
শ্যান’ হয়ে দাঁড়ালেন।...

যাত্রা শব্দ হল।

নির্ধারিত ক্ষণে দীনেশ ও. বাদলকে

খিদিরপুর পাইপ বোডের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে
নিকুজ সেন চলে গেলেন। ঠিক পাঁচ
মিনিট পর আর একটি ট্যাক্সিতে রসময় শব্দ
বিনয় বসুকে সপ্তে সেই স্থানে এলেন।

নির্দিষ্ট কার্যক্রম মত বিনয় বসু অপেক্ষ-
মাণ দীনেশ-বাদলের সঙ্গে মিলিত হলেন।
রসময়বাসু দুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন যে, মিনিট-
খানেকের মধ্যেই একটি চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে
তাকে তাঁরা তিনজনে উঠে বসেছেন।... উল্কা-

বেগে বীরবরীকে নিয়ে ট্যাক্সি উধাও হয়ে
গেল।

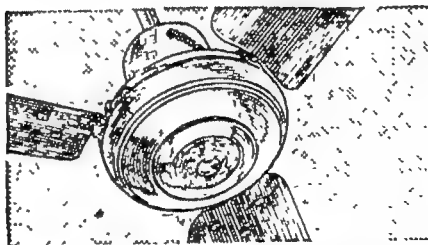
এর পরের ইতিহাস লোকচক্ষুর সম্মুখে
ঘটেছে। তা সবারই কিছ্র জানা। কিন্তু সে-
ইতিহাস অর্থহীন-যদি ইতিহাস-প্রমতা এই
বিপ্লবীদের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণা-উৎসকে
খুঁজে না দেখি। দীনেশ গুপ্তর গভীর মানসে
রবিবর্ষিমর তরুণবিকিরণ কি পরিমাণে ছিল
তার আলোচনা তাই অবাস্তব মনে ববলাম না।

অপূর্ব সুযোগ

সহজ কিস্তিতে পাইবেন

কোনও বাড়তি খরচ নাই

- এখনই কিনলে আপনি কিস্তির হারে সুবিধা পাবেন
- পয়লা আগষ্ট থেকে এই বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে
- বিশেষ বিবরণের জন্য নিকটতম উষা বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।



উষা

একটি
JAY
সামগ্রী

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১
সিটি সেন্স অফিস :—২৬ আর, এন, মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১

মোক্ষের দ্বারদ্বার

প্রবন্ধ

আমি তখন বিবিশাল বি. এম. কলেজে অর্থনীতি ও রাজনীতির শিক্ষক। মুসলিম লীগের কর্মক্ষেত্র সঙ্গে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মতানৈক্য ঘটায় ঢাকা ছেড়ে যেতে হলো। স্বর্গীয় অম্বিনী দত্তের হাতে গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানেই আশ্রয় নিলুম।

ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় দু' হাজার। নতুন অধ্যাপকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঘটতেই ঠাণ্ডা জেনে নিরেছিলেন তাতে অতিরঞ্জন ছিল বৈকি। ফলে আমাব ক্রান্তির বাইরের কাজ কমেই বেড়ে চলেছিল। আমি শুধু 'সুদীপ' 'মোমোবিলাল' সবকিছু পাঠ-চক্র ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লুম।

ভাষাত্মক কমিউনিস্ট পার্টি তখন যুবকদের কাছে খানিকটা বোম্বাস্ট খানিকটা আদর্শবাদ নিয়ে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে চলেছে। আশ্র-প্রত্যয় ও গভীর নিষ্ঠা বার বার খাতি-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত হলেও ক্ষম হই নি। বরিশালে উত্তর কর্মসংখ্যা কম ছিল না। তা ছাড়া জাহাজ করা ফলার ও শিল্পী উত্তর প্রচার

কাজে এগিয়ে এসেছিলেন।

আমি বাইরের লোক। সব খবর রাখতুম না। সরল বিশ্বাসে সবাই সঙ্গে মিশতুম। কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্র তখন অম্বিনীকুমার 'হলে'। বিপ্লবী সতীন সেন অধিনায়ক।

আমি মহাত্মা গান্ধীকে চিঠি লিখলুম—কতদূর পর্যন্ত আমাদের অহিংসার পথে দৃঢ় থাকতে হবে নির্দেশ চেয়ে। বিশ্ববৃদ্ধ ইংরেজ হলে গানি পাচ্ছে না। এখন আমরা সুযোগ পেয়েছি। ছাড়ব কেন? বিশ্ব বনসর আমরা একনিষ্ঠ রয়েছি। গঠনমূলক কাজে গড়ে তুলতে চেষ্টাছি গণ-জাগরণ। আর কেন? এবার শেষ অভিঘাতে সাম্রাজ্যবাদ নিমূল হোক।

উত্তর লিখলেন মহাদেব দেশাই। আমার মনঃপূত হলো না। আবার লিখলুম। কোনও সুবিধে হলো না। অভিমানস্বত্ব মন বোঁকে দাঁড়ালো। ব্যক্তিগত সত্যগ্রহ থেকে সরে দাঁড়ালুম। অর্থাৎ ১৯৩৩ সনে দ্বিবি সুবোধ বালকের মত ব্যক্তিগত সত্যগ্রহ স্বীকার করে নিয়ে কারাবরণ করতে ছিঁয়া হই নি। তখন কিন্তু ছিল যৌবনোচ্ছ্বিত অভিমান ও আত্ম-গরিমাবোধ। সোদীন মানিয়ে নিরেছিলুম। এবার পারলুম না।

একটি বৎসর চুপ করে রইলুম। নিরমিত কাজে ব্যতিক্রম ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ থেকে সাহিত্য পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে জগদীশ আশ্রম, প্রগতি লেখক সংঘ থেকে সপ্তকের সম্পাদকপোষ্ঠী—কিছুই বাদ পড়তো না। সর্বোপরি জিলা কংগ্রেস।

বোম্বাই শহবে এ-আই-সি-সি-র অধি-বেশন। আমি যাই নি। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। খুবই উল্লসিত হলুম। এবার কোনও বাধা থাকবে না।

মহাত্মা কারাগারে। আর কে রুখবে? আন্দোলনের টেকনিক বদলে যাবে। পথে চলব আমরা। কোথায় যাব ঠিক হয়ে গেছে। যত শীগগির পৌঁছতে পাবি

আমি 'খানিকটা' বিখ্যাত পড়ে গেলুম। কর্মক্ষেত্র এতদিন ছিল ঢাকা—আমাব জন্ম-স্থান। এদিকে বরিশালে নিবিড় সম্বন্ধ। বিশেষ করে বিদ্যার্থীদের অপ্রতিরোধ্য আন্দার।

কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে ঢাকা গেলুম। বন্ধুদের সঙ্গে কাজের কথা হলো। এক সম্ভ্রম ধরে বিভিন্ন কর্মীদের মতামতের সঙ্গে পরিচিত হলুম। কেন্দ্রীয় সমিতি সংগঠিত হলো—'ওয়ার্কার্স সোসাইটি'। শুনেন খুবই

আশ্চর্য হলুম। গান্ধীবাদে অকুণ্ঠ নিষ্ঠা বদলের ঠাণ্ডা এলেন। সংখ্যার কম। অভিজ্ঞতা প্রচুর। বন্ধু নিলেন এবার আন্দোলনের রঙ বদলে যাচ্ছে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না।

আমার উপর অনেকেরই ভরসা রয়েছে তখনও। কারণ বরসে আমি অনেকের চেয়ে বড়। শিক্ষকতা করি। আমার কাকা 'বীরেশ চক্রবর্তী' অতীত আলোকে স্থাপন করতাদের মধ্যে অন্যতম। আমি ঠিকই মনে দীক্ষা নিষেছি ইত্যাদি। ফলে আমার উপর চারদিক থেকে অনুরোধ ও নির্দেশ এলো—ঢাকা জিলার কেন্দ্রীয় কমিটিতে যুক্ত থেকে আন্দোলন পরিচালনা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

আমি অস্বীকার করতে পারলুম না। শব্দ বললুম, একবার কিরে গিয়ে বরিশালের বন্ধুদের বাকিরে বিদেয়ে নিরে আসব।

বিবিশাল চলে গেলুম। আবার ঢাকায় ফিরেছি ১৯৩৬ সালে কারাবদ্ধ হয়ে। কেউ অভিযোগ করেন নি।

বরিশালের নেতৃবৃন্দ তখন সব কবাবুজ। কলকাতা থেকে কিরে বরিশাল পৌঁছবার অবসর পান নি। যারা তখন শব্দ পা বাড়িয়ে রইলেন আমাকে চেপে ধরলেন—আমি ওদের কাছ থেকে বিবৃত হতে পারব না। যুবকের দল ঘিবে দাঁড়ালো আমরা কি আপনার লোক নই। মোরা বরিশালের, ছেলে—'অম্বিনী' দত্তের দেশ। মোরা ভীরা নই।

কি করি আমার গতান্তর কি? ঢাকা জিলার কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম পরিচালকের সংগ্রামস্থল বরিশাল। আমি সান্নিধ্যহস্যে বন্ধুদের বললুম—'আজ থেকে আমি তোমাদেরই একজন। আমিও ভীরা নই। এসো যোগদান পড়ি।'

এক দু'দিন আগে আমরা এগিয়ে চললুম। কারুর মনে এতটুকু ছিঁয়া রইলো না। জর আমাদের সন্নিহিত। জরের ডিলক পরে আমরা এসে মারের চরণে প্রণতি জানাবো—'মা, আজ তুমি শ্রেষ্ঠা নও। অপরাধের গোঁয়ে তুমি অধিনায়ক।'

আমাদের আরোজন ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু আকৃতি ছিল অশেষ। তাই এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম। একদিনের কথা আজও মনে পড়ে। আমার এক বিশিষ্ট ছাত্র। ওর বাড়ির তেতলায় দৌর করেছিলাম পেট্রলের অনেকগুলো টিন। বাজার প্রাসাদ। সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ ভুল করেও ওদিকে যাবে না। আমি নিজে থাকি পেনসনপ্রাপ্ত জজ

রোমানা উপজাতির খাঙ্কর

দানেন্দ্রকুমার রায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—খানি সুরহা ডটেকটিভ

উপজাতি মূল্য ৩।০ টাকা

২য় ভাগে—খানি রহস্য উপজাতি

৩।০ টাকা

জাতীয়-কাব রক্তাল বন্দোপাধ্যায়ের

রক্তাল-গ্রন্থাবলী

পানিনী, সুরহা, কর্মদেবী, কুমার-সম্বত, নীতিকুমারজাতি, কাকী-কাবেরী, কবির জীবনী। ১খানি একত্রে ২.০০।

ভ্রাম্যাক্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত

নাড়াজান-প্রদীপক

নাড়া স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও

পর্যায় নিরূপণ)

১খানি এক টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী-পাড়া লীট,

কলিকাতা-১২

সাহেবের বাড়ি। অবশ্য এ বাড়িও রেহাই পায় নি। রাত দশটা। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি। হঠাৎ অন্ধকারের মাঝে দৃষ্টিশ্রের আকাশ লাল হয়ে উঠলো। চেয়ে দেখতে পেলাম তেতলার ছায়ে আগুন। আমি আতঙ্কে উঠলাম। এ যে আমার ছাত্রের বাড়ি। দশ-পনের-মিনিট ধরে ভগবানকে ডেকে চলেছি। চোখে শব্দ লাল আগুনের অনিবার্ণ দীপ্তি।

হঠাৎ চমক ভেঙে দেখি, ছাত্র-পাশে দাঁড়িয়ে থাকছে, 'স্যার'। ধাক্কা দিয়েছি। বোকা চাকরটার হাত খানিকটা জ্বলে গেছে। আব কিছ হুই নি। চারটে টিন নষ্ট হোলো।

এই ছাত্রের মা আমাকে একদিন বাড়িতে জেঁকে নিয়ে বলেছিলেন,—আমাত এই প্রথম সন্তান। ওকে আমি বি-এ পাশ করতে চাই। আপনাব ওপর ভার দিলাম। কোনও দলে ভিড়ে যেন নষ্ট হয়ে না যায়।

আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম,—পেট্রোলসহ ধরা পড়ে জেলে গেলে ওর মাকে কি সম্পত্তি দিচ্চুম।

আজ ঐ পরিবার ও আমি আইনের চক্ষে পরদর্শী। জিমা সহহেবের পাকিস্তান পরি-কল্পনার বাহাদুরী বেশি দিন চলেবে না জানতুম। এক সম্ভার জজ সহহেবের বাড়ি ঘিরে পুলিশের ফৌজ। বি. এম. কলেজের অধ্যাপক রাজদ্রোহ ব্যাপাবে লিপ্ত। ভ্রমভ্রম করে অনুসন্ধান হোলো। আমি গ্রেপ্তার হলুম।

বরিশাল জেলে সিকিউরিটি বন্দীদের বিনা বিচারে আটক রাখা হোলো। আমি তাদের অন্যতম। অনেক জল্পনা-কল্পনা। কেউ জেলের দেয়াল ভাঙিয়ে বাইবে যাবার স্বপ্ন দেখতো। আমি সাব দিই নি।

একদিন সম্ভার বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—হঠাৎ শুনতে পেলাম বাঁশীর আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে জেলের গেট থেকে ফ্রেটে পড়লো—'গুডম-গুডম' কন্দের সখাষ নিনাদ। চমকে উঠলাম। এই অসময়ে 'পাগলা ঘণ্টা'? এলার্ম বেল? দেখতে দেখতে সেপাই ছুটেতে লাগলো। চাবিদকে পুলিশের বাঁশী। আমি চোঁচিয়ে বললাম—সব ঘরে চলে যাও। এক মিনিট দাঁড়িয়ে না। সশস্ত্র পুলিশ চড়াও করবে। শীগগির যাও। আমার ঠিক বাম পাশে দাঁড়িয়ে বি-এম কলেজের খেলার অধ্যাপক আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীসুখীব আইচ। ওঁকে দেখে খানিকটা ভরসা পেলাম। অন্তত দুটো সিপাইকে বুঝতে পারবেন। কিন্তু উত্তেজনার মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিলাম সিপাই হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে আসছে।

আমার ছাত্রের দল তখনও বাইবে দাঁড়িয়ে। আমি ধমকে বললাম যাও—দাঁড়িয়ে না। কে শোনে? নতুন অভিজ্ঞতা।—ওরা তখন বিপ্লবের রূপ-প্রত্যক্ষ করছে। চোঁচিয়ে উঠলো—'ইনক্কার জিন্দাবাদ', 'বন্দেমাভরম'।

আমাকে ২১০ জন এগিয়ে বললে—স্যার, মোবা কি কাপদুর? কন্দের ভরে পালিয়ে বাব? না—কন্দেরই না! আমার বন্দেমাভরম। সুখীরবাব, গোটা জীবন জেলে কাটিয়েছেন,

তিনিও জানেন পাগলা ঘণ্টার সাক্ষাৎ পীর-চর।—আমরা চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওরা তখনও দাঁড়িয়ে। ঘন ঘন 'বন্দেমাভরম'।

আমি কি করি? বেড় স্পর্ধা করে বলে-ছিলাম আমিও ভীরা নই। চলো—কাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু এই কি আমার পৌরুষের পরীক্ষার অপূর্ণ ক্ষণ?

চিন্তা করার অবসর কৈ? বেয়নেট নিয়ে ছুটে আসছে সেপাই। পুলিশ লাইনে খবর পৌঁছেছে। পুলিশ সহহেব নিয়ে চলে এসে-ছেন জেল গেটে।

হঠাৎ চেয়ে দেখি আমার তিন হাত দুই দাঁড়িয়ে লাঠি হেঁকেছে সেপাই। আঘাত গিয়ে পড়লো ডেপুটি জেলাবেব মাথাব। তিনি উঁচুতে আমার চেয়ে আশ ফুটের উপর। তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে। ফির্না দিই রক্ত ছুটলো আমি তখন কি বলেছিলাম জানি নে। কাবণ আমার আওয়াজ শুই অস্পষ্ট। এক মিনিট বাদে চোখ মেলে দেখলাম আমি সিঁড়ির সামনে এগিয়ে এসেছি অস্তত আট ফিট ব্যবধান অতিক্রম করে। মাথাব হাত দিবে দেখলাম—হাত ভিজলো না। পাশে যা লেগেছে। লাঠির ও বন্দুকের বাঁটের। খানিক বাদে এস্বেলেন্স করে নিয়ে গেলো হাসপাতালে আমার বন্দুকের বেছে বেছে। অন্তত পঞ্চাশ জন আহত।

বাইরে জনতার দাবি। অধ্যাপকের ও অন্যান্য রাজবন্দীদের খবর চাই। আমার মৃত্যুসংবাদ রটে গিয়েছিল।

পবদিন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট জেল পরি-দর্শনে এলেন। আমি বন্দীদের পক্ষে বললাম। আদেশ হোলো আমার যারা বিপ্লবের অধিনায়ক—আমাদের নিয়ে যেতে

হবে—কন্ডেম্নড সের-এ অর্থাৎ ফাঁসি আসামীদের নিজের কেঁঠায়। আলা নেই—বাতাস নেই। ওখানেই বন্দ থাকতে হবে।

১৯৪০ সালে ওখান থেকে আমদের সবিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হল জেল কর্তৃপক্ষ—বসন্ত রোগীদের জন্য কয়েকখানা ঘব ব্যবস্থা করতে হোলো বলে। ১৯৪২ থেকে ওখানেই ছিলাম।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জেলের আফিসে আদালতের ব্যবস্থা কবলেন। আমদের বিচার-প্রহসন চললো। আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করি নি। কয়েক বৎসর কবে শ্রম কারা-দণ্ডের আদেশ হোলো।

১৯৪৫ সালের শেষভাগে যখন আমাদের মুক্তি আদেশ এলো—আবাব নতুন জগতে ফিবে এলাম। সম্বর্ধনা সভায় আমাদের বীরত্বের কাহিনী প্রচার করলেন আমার বন্ধু বন্দুরা। আমি শব্দ ভাবিহলে পৌরুষের মর্যাদা দিতে সোঁদন সম্ভার কত-যান আগ্রহ নিয়ে আমি এগিয়ে এসেছিলাম। সিপাই ও ফৌজের উদ্যত বেয়নেটের সামনে। আমার ছাত্র সদস্য হাঁকছে 'মোবা কি কাপদুর?' আমি কি কবে অন্য পথ খুঁজি দাঁড়িয়ে রইলাম। লাঠিব ঘা পড়লো। ওদের চোখে অনেক লজ। অথচ আমি বিশ্বাসী নাযক।

ব্রিটিশ সরকার অভিযোগ আনলেন আমাদের বিবৃতি। জেলে বিদ্রোহ ঘটাবার চক্রান্তে অভিযুক্ত হলুম আমরা—এবং অভি-যুক্তের তালিকা অধ্যাপকের নাম পহেলা নম্বব।

দেশবাসী অভিনন্দন জানালেন—বিংলবীর অনমনীয় পৌরুষ মর্যাদা পেলেছ ওঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা। চুপ করে গুনলাম।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কালকাতা ৫০

নোতি ও বিজ্ঞানানুযায়া ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্ব - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরাডা শ্রীনগর গোয়াটী

হত্যার হাতে পড়ে

শ্রীঅরবিন্দ

বৃহত্তর ও বিদেশী আন্দোলন, বাংলার প্রথম সক্রিয় বিপ্লব প্রচেষ্টা এবং পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলন উপলক্ষে আমার সৌভাগ্যবশত মহানবী শ্রীঅরবিন্দ ও বহু দেশবরেণ্য নেতা, আদর্শ বিপ্লবী এবং নীরব দেশকর্মীর সংস্পর্শে আমি এসেছি। তাঁদের অনেকেই আজ ইহজগতে নেই। আছে শুধু তাঁদের অপূর্ণ দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের ডাম্বর স্মৃতি। 'হত্যার মনে পড়ে'—সেই পুরান দিনের কয়েকটা টুকরো স্মৃতি।

১৯০৫ সাল—তখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে লর্ড কার্জনের রাজনীতি জাতির সম্বন্ধে উচ্চতর মীথ্যা উক্তি এবং বাংলা দেশ বিখ্যাত কবির বিবৃতিতে জনবিক্ষোভ সম্পূর্ণ দানা বাঁধে নি—যদিও জাতীয়তার জনক সুবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার মুকুটহীন রাজা' এবং মনস্বী বাম্পী—বৈপিনচন্দ্রের জ্বালাময়ী লেখনী ও বক্তৃতার বাংলা দেশ সরগম। আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলন আরম্ভ হলো ১৯০৫-এর ৭ই আগস্ট। ঐদিন নেতাদের নির্দেশে বাংলার প্রতি শহরে সভাসমিতি করে জাতীয় প্রতিবাদ শরীত হলো। তখনও নব্য বাংলার (ইয়ং বেঙ্গল) রাজনৈতিক চেতনা সম্যক জাগ্রত হয় নি। ইংরাজ শাসন ও শাসকের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সভাসমিতি 'তীক্ষ্ণ' প্রতিবাদ, আবেদন-নিবেদন ছাড়া সক্রিয় প্রতিরোধের কথা শিক্ষিত সাধারণের মনে তখনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্বিগ্ন হয় নি। বিদেশী শাসন অবসানকল্পে সশস্ত্র বিপ্লব বা সক্রিয় প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম শ্রীঅরবিন্দ স্বর্ষি রাজনারায়ণ বসুর প্রাতঃপত্র ও 'মৈদীনীপুত্র' কলিকাতা স্কুলের শিক্ষক শ্রীঅরবিন্দ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর মূখে। মাস্টার মহাশয় (জ্ঞানবাবু) সত্যেন্দ্রের (নবীন গোস্বাই-এর অন্যতম ধর্মসকারী) অগ্রজ। তখন আমি মূবে মৈদীনীপুত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি এবং ষষ্ঠ্যংগ আন্দোলন আরম্ভ হয় নি। ওরা দু'ভাই ১৯০২ সালের প্রথমদিকে মৈদীনীপুত্র শহরে প্রথম গুরুতর বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। জ্ঞানবাবুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হেমদা (হেমচন্দ্র দাস কানুনগো) কেন্দ্রের প্রথম ও প্রধান সভ্য হন। এই বছরেরই মাঝামাঝি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মাতুলালয়ে জ্ঞানেন্দ্র ও সত্যেন্দ্রের বাড়ি বেড়াতে আসেন

এবং জ্ঞানবাবুর মাধ্যমে হেমদার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন এবং উহাদের মধ্যে প্রধানত বৈপ্লবিক সংগঠন ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পরের বছরের শেষার্শ্বে শ্রীঅরবিন্দ স্থিতীয়বার মৈদীনীপুত্রে আসেন। একথা শ্রীঅরবিন্দ হেমদার মূখে আসিপুত্র জেলে বন্দী অবস্থার ১৯০৮-১৯০৯ সালে।

১৯০৫-১৯০৬ সালে বারান্দাকে (বারান্দা ঘোষ) মধ্যে মধ্যে মৈদীনীপুত্রে সত্যেন্দ্রের বাড়িতে গোপনে আসতে দেখেছি—তখন পরিচয় হয় নি। শ্রীঅরবিন্দ শেষবারের মত মৈদীনীপুত্র এসেছিলেন ১৯০৭-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি-জেলার গবমপল্টী কংগ্রেসী সম্মেলনের সভাপতিরূপে—নারায়ণগড়ে ছোটলাট এল্ড্রু ফ্রেজারের স্পেশ্যাল ট্রেন



শ্রীঅরবিন্দ

ধর্মস করবার ব্যর্থ চেষ্টার কয়েকদিন পরে এবং দু'ভাই কংগ্রেসের পূর্বে। বারান্দা, উল্লাস কর ও বিভূতি সরকার (১৯০৭, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ) গোয়া-বাগান লেনের গুরুতর সমিতির আড্ডা থেকে উল্লাস করের প্রস্তুত ডিনামাইট বোমাটি নারায়ণগড় স্টেশনের নিকট রেললাইনের নিচে বসাতে যান। খজাপুত্র স্টেশন পর্যন্ত আমি তাঁদের সহযাত্রী ছিলাম। সেখান থেকে

বারান্দার নির্দেশে মৈদীনীপুত্রে বাহু—সাধারণের প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য ও শ্রীঅরবিন্দের শহরের আশ্রয় আগমনের অপেক্ষার। ঐ সময় মৈদীনীপুত্রের মোস্তার সত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত ক্ষুদ্রারামের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ হয়। হেমদা তখনও ফরাসীদেশ থেকে ফেরেন নি। হেমদা ছিলেন প্রকৃত উচ্চবর্ণের শিল্পী। তাঁর হাতে আঁকা ছবি তখন গোবাবের বস্তু ছিল। তিনি উন্নত শিল্পশিক্ষার অজ্ঞ হাতে, প্রকৃত পক্ষে বৈপ্লবিক কার্য ও বোমা প্রস্তুত প্রণালী শেখবার জন্য বিদেশে যান ১৯০৬-এর জুন। জুলাই নাগাদ এবং নারায়ণগড় ঘটনার কয়েক দিন পরে জাহাজযোগে ফেরার পথে বোম্বাই পৌঁছেন ১৯০৭-এর ডিসেম্বরে। হেমদা প্যারিস থেকে কলকাতা ফেরার আগে পর্বস্ত উল্লাস করই স্বকীয় চেষ্টার বারান্দার নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী কর্মীদের একমাত্র কার্যকরী বোমা প্রস্তুতকারক। নারায়ণগড়ে ভুলবশত বোমাটি উল্টো বসানো হওয়ার লাইনটি একটু উল্টেই বসে যায়। লাটসাহেবের স্পেশ্যাল ট্রেনের বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় নি এবং লাট-প্রভু অক্ষত শরীরে কলকাতা মসনদে ফিরে আসেন। দু'বর্ষ ব্রিটিশ রাজত্বের বিনম্রাদ বৃদ্ধি শিখিল। দুষ্কৃতকারীদের নিশ্চিন্দা মডারেট ও রাজভক্তের দল মুখর, যদিও তখন বাঙালী ছেলেদের দ্বারা এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য ছিল কম্পনাতীত। খোঁজখবর ধর-পাকড়ের ধুম পড়ে গেল। শেষে ধরাবি তো ধর—৭৮ জন নিরীহ কুলি। দেশীয় পুলিশ তাদের দ্বারা মিথ্যা স্বীকারোক্তি করিয়ে বিচারে হাজির করলো। ইংবাজের 'সুবিচারে' তাদের জীবনস্বাধীন স্বাধীনতার আদেশ হলো। প্রধান অনুসন্ধানকারী দুই পুলিশ পুরুষ—ডেপুটি সুপার 'মজবুল হক' ও ইন্সপেক্টর 'জালালমোহন দাশগুপ্তের' ধন ও যশ দুইই লাভ হলো। বারান্দা, উল্লাস কর প্রভৃতির স্বীকারোক্তি ও আলিপত্র স্বাক্ষর মামলার (১৯০৮-০৯) হাইকোর্টে চড়াস্ত নিষ্পত্তির পর নারায়ণগড় ঘটনা সম্পর্কে দৃঢ় নির্দোষী কুলি করজবান মৃদু পেলো। ওই দুই পুলিশ অফিসারের পরবর্তী কীর্তি আরও চমৎকার। আলিপত্র স্বাক্ষর মামলা আরম্ভ হবার মাসখানেক পরেই—পুলিশের বাহাদুরীর ফলে মৈদীনীপুত্র

শহরেও এক বৃহৎ ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হোলো।
 ষড়যন্ত্র তার অন্যতম প্রধান কারণ পূর্বোক্ত
 আলিপুর ষড়যন্ত্র—এক মেদিনীপুর শহরেরই
 চার ব্যক্তি—ক্ষুদিরাম, হেমচন্দ্র, সত্যেন্দ্র ও
 লেখক। চারজনই জড়িত। মেদিনীপুর ষড়যন্ত্রে
 জংশিন্দ্ৰ অপরাধে রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ ও
 শহরের বহু গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—
 দোকানী পশারী—প্রায় শতাধিক লোক গ্রেপ্তার
 হলো—এবং মিথ্যা রাজসাক্ষী বানিয়ে ষড়যন্ত্র
 মামলা আবিস্কৃত হলো। প্রধান রাজসাক্ষী হলো—
 শহরের এক অখ্যাত যুবক—রাখাল রাহা।
 অতি সমাদর ও নানা প্রলোভনে পুলিশ
 গার্ড বৈষ্ণব হরে থাকলো রাখাল। আসামী-
 দের জড়িয়ে এক স্বীকারোক্তি তৈরি হয়ে
 রাখালকে তা মুখস্থ করানোর
 ব্যবস্থা হলো। পুলিশের অতি
 বিশ্বাসভাজন রাখাল প্রত্যহ পুলিশ
 অফিসে গিয়ে আলমারি খুলে লেখাটা নিয়ে
 গড়ার ভাণ্ড ও গল্পগুচ্ছ করে লেখাটা পুনর্ব্যব-
 স্থানে রেখে বাড়ি ফেরে। ভীত শহব-
 বাসী! এ সাক্ষী ভাঙতে না পারলে রক্ষা
 নেই। বহু চেষ্টার পর রাখালের এক অন্তর্বঙ্গ
 বন্ধু পায়খানার গলি-পথে তার সঙ্গে যোগা-
 যোগ করতে সক্ষম হয়—। রাখাল তার ভুল
 স্বপ্নে পেরে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু সে সাক্ষীর
 কাঠগড়ার না ওঠা পর্যন্ত পুলিশ কিছুই
 স্বপ্নেতে পাবে নি।

মেদিনীপুর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে প্রাথমিক
 তদন্ত আরম্ভ হলো গভর্নমেন্টের তরফে
 ডায়ান্টন স্ট্যান্ডিং কন্সটাবল লর্ড
 সিমস পি সিংহ আসামীদের পক্ষে
 দাঁড়ালেন, “মেদিনীপুরের সিংহের মুকুটহীন
 রাজা” ব্যাবিস্টার কে বি দস্ত। লর্ড সিংহের
 প্রশ্নের উত্তরে রাখাল সাফু জবাব দিল, সে
 আসামীদের অনেককেই চেনে বটে কিন্তু
 ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কিছুই জানে না। হতভম্ব
 সিংহের জেরার উত্তরে বলে স্বীকারোক্তিতে
 ছই তারই বটে, কিন্তু উক্তিটি সম্পূর্ণ পুলিশের
 লিখিত, সর্বৈব মিথ্যা—তাকে মুখস্থ করতে
 দ্বলা হয়েছে মাত্র। মিথ্যার প্রমাণ দেয়—এক
 সূত্রায় লেখা স্বীকারোক্তির অপব খালি
 সূত্রায় বহুস্থানে ছোট অক্ষরে লেখা “সব
 মিথ্যা—রাহা” (বাহা—বাখাল)। কোর্ট স্তম্ভ।
 সিংহ সাহেব বসে পড়লেন—। স্বীকারোক্তি
 মুখস্থকালে কখন যে রাখালচন্দ্র এ কীর্তি
 করেছেন—পুলিশ পূর্বে টেরই পায় নি।
 গভর্নমেন্ট মোকদ্দমা তুলে নিতে বাধ্য হলো—
 আসামীরা মুক্তি পেলো—শহববাসীর নিকট
 রাখাল হলো ধনা।

মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হবার বহু
 আগে থেকেই জ্ঞানবাবু ও হেমদাস সঙ্গে
 আমার পরিচয় ছিল। পূর্ব পরিচয়ে—মেদিনী-
 পুর এসে (১৯০৫ সালের প্রথম দিকে)
 কয়েকজন সহপাঠী বন্ধু সহ জ্ঞানবাবুর
 বাড়িতে এক আলোচনাচক্রে প্রায় প্রতি সপ্তাহ
 মিলিত হতাম। বঙ্গভঙ্গের বাঙ্গালৈতিক
 উদ্দেশ্য, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ফল দেশ-

বাসীর কর্তব্য ইত্যাদি ছিল আলোচনার বিষয়।
 জ্ঞানবাবু অনেক পুরান ও সমসাময়িক
 পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি—যথা সখ্যাম গণেশ
 দেউস্করের “দেশের কথা,” Digly “pros-
 perous British India” শ্যামস্বামী কৃষ্ণবর্মার
 “Indian Sociologist. Hydn-
 nan-এব Articles on India
 ইত্যাদি থেকে পড়ে শোনাতে—কেনন
 করে ইংরেজের শাসনে-শোষণে ভারতবর্ষ দিন
 দিন ইমপোজিভিভ হচ্ছে—দেশের লোক
 ডিহিউমানাইজড হরে পড়ছে। বোঝাতে
 দেশ রক্ষা করতে হলে—দেশের পর্থাধীনতা
 শৃঙ্খলা ভাঙতে এবং স্ববাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা
 করতে হবে। তিনি অভিশব সাবধানী প্রকৃতির
 লোক ছিলেন। বিদেশী ইংরেজ শাসন থেকে
 দেশ মুক্ত করতে হলে কি করা প্রয়োজন তা
 স্পষ্ট করে বলতেন না। শব্দ নানা দেশের
 স্বাধীনতার ইতিহাস বিশেষত ফরাসী বিপ্লবের
 নজীর দেখাতেন। তার স্বভাবজাত অত্যধিক
 সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি রাজ্যের ও পুলিশ
 জালুম থেকে অব্যাহতি পান নি। শেষ জীবনের
 কয়েক বৎসর অতি যোগ্যতার সঙ্গে নাড়া-
 জেলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁনের একান্ত
 সচিবের কাজ করবার পব অতি শোচনীয়ভাবে
 সাময়িক বিকৃতমস্তিষ্ক অবস্থায় দেহত্যাগ
 করেন। বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের
 ইতিহাসে সক্রিয় বৈপ্লবিক সংস্থা সংঘটনে
 অন্যতম প্রথম পথপ্রদর্শক হিসেবে তার নাম
 স্মরণীয়। নাড়াজেল-রাজ নরেন্দ্রলাল খাঁ ও
 কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁনের স্বদেশপ্রিয়তা ও

বদান্যতা ভুলবার নয়। বাজা নরেন্দ্রলাল বান-
 রোষ উপেক্ষা করে বাবান্দা প্রকৃতিব বৈপ্লবিক
 প্রচেষ্টাকে অর্থ-সামর্থ্য নাড়াভাবে সাহায্য
 করছেন এবং পরবর্তীকালে বিনবীণাও তার
 সাহায্য ও সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হয় নি।
 কুমার দেবেন্দ্রলালও এক সময়ে ইংরেজ স্ববাজ্য
 পার্টি'র স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। বহু নিষিদ্ধিত
 দেশহিতরতী তার সাহায্যলাভে সুখী হয়েছিল।
 মেদিনীপুরবাসী নাড়াহোল বাজ-পরিব্রাজক
 নিকট বহু বিষয়ে চিহ্নিত হইল।

ঘটনাচক্রে লেখক জ্ঞানেন্দ্রনাথের সঙ্গে
 পরিচিত হয়, ১৯০০—১৯০১ সালের মধ্যে—
 মেদিনীপুর জেলাব দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে
 তমলুক মহকুমার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম গ্রামের
 এক গ্রাম্য হাটে “দোনা চপট” নামে এক
 জুয়াখেলার আড্ডা—এক হাটে এক টাকার
 বাজীতে সস্তাহাতে পববর্তী হাটে দুই টাকার
 পাবার আশায় বহু গ্রামবাসী সর্বস্বান্ত হয়ে
 পড়ে এবং প্রচণ্ড বিক্ষোভের সূত্র হয়। সব-
 শেষে একদিন উন্মত্ত জনতা জুয়াড়ী ও
 তাদের পুত্রপোষকদের আক্রমণ দোকানদার
 লুটপাট ও বহু খুন-জখম করে। স্থানীয়
 দাবোগাকে তাদের পবোক্ষে সাহায্যকারী ভ্রমে
 অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে। তখন আমি
 তমলুক স্কুলের ছাত্র। এ ঘটনার সংবাদ
 তমলুক পেঁপেলে ক্ষুদ্র শহরের শিক্ষিত
 সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অহেতুক আতঙ্কের
 সঞ্চার হয়—কাণ নাকি নন্দীগ্রামের ‘দুর্দান্ত’
 চাষী প্রজারা বিপ্লবী হয়ে গহরের দিকে
 এগিয়ে আসছে—তারা ট্রেনে দখল করবে,

ভারতের
 আদিতন
 রসাক্ষন



চ্যবনপ্রাশ

আমুর্নৈদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্র



চ্যবনপ্রাশ মৃত্যু ও পুরাতন সর্দি কাশি,
 স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।
 টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের
 দৌর্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি
 মাখন করিয়া স্বাস্থ্যাত্মক পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
 কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

জেল ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করবে, শহর লুটপাট করবে ইত্যাদি—। মনে আছে—চারদিকে যেন সাজ-সাজ রব, এমন কি আত্ম-রক্ষার্থে আমরা পিঠাঠাকুরও তাঁর অব্যাহারে সবচেপড়া বন্দুকখানিও পরিষ্কার করে ফেললেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যেন রাজকুমার বাঙালী ১৮৫৭-বিক্রোহের ইংরাজ লিখিত বিতর্কিতকাহিনী তখনও ভোলে নি। ঘটনার ৫৬ দিন পরে যখন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী-বোম্বার্ড ও রক্তবর্ষণ অবস্থার শতাব্দিক নিরীহ অধ-উল্লসিত গ্রামবাসীদের মাঠ করে মহকুমা শহরে ধরে নিয়ে এলো—তাদের শোচনীয় অবস্থা দেখে সকলেই ব্যথিত হলো। সে দৃশ্য লেখকের মানসপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। তমলুকেই বিচারদর্শন নামে একজন স্পেশ্যাল জজ বসিয়ে দুর্ভাগাদের বিচার হলো। জ্ঞানবাবু তখন সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত ইংরাজী দৈনিক 'বঙ্গলী' পত্রিকায় মেদিনীপুরের সংবাদদাতা। তিনি এলেন মামলা বিপোর্ট করতে। ঐ সময়ে লেখকের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। রিচার্জনের বিচারে বতস্বর মনে পড়ে—৩১৪ জনের ফাঁসি হয় এবং কয়েকজনের স্বাধীনতার ব্যবস্থা হলো। সবকারণকে ছিল এক সাহেব ব্যাবিস্টার। আসামীপক্ষ সমর্থন করেন স্বনামধন্য ব্যাবিস্টার পি. মিত্র—কলিকাতার আদি অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। তখন অবশ্য তাঁর কথা জানতাম না, বহুদিন পরে তাঁর ভীষণাতি মর্তি প্রস্থার সঙ্গে দর্শন করেছি।

ছাত্রদের অপবিহার্য গ্রন্থ
গল্পবচন চট্টোপাধ্যায়ের

পালানো

—ইহাতে আছে—

প্রতি বহুদিনের রচিত গল্পবচনের জীবনী—
'গল্পবচন-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের
পালানো সমালোচনা' এবং 'সমালোচক-
শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর গল্পবচন-সমালোচনা।
মাধ্যমিক-শিক্ষা পর্বৎ কর্তৃক
ছত্রপঠন প্রকল্পে নির্বাচিত

মূল্য এক টাকা

• মহাকবি হেমচন্দ্র ঝাটোপাধ্যায়ের

বৃহৎ-সংহার কাব্য

দাম—২/-

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

উপরোক্ত ঘটনার অনধিক বিশ বৎসর পরে প্রায় অনুদূরপ আয় একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না;—তা হলো মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে দাসপুত্র থানার চে'চোরহাটে। তখন লণ্ডন-আইন ভগ্ন সভ্যগণ আন্দোলন পুরাদমে চলছে। গান্ধীজীর আহবানে জাতিবর্ণনির্বিশেষে গ্রামবাসীরাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাঁদের উৎসাহে গ্রামাঞ্চলে হাটে-বাজারে বিলাতি জিনিস বিক্রয় অচল হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ পুলিশের নির্মম অত্যাচারে সভ্যগৃহী ও নিরপরাধ গ্রামবাসী প্রহরিত। তাদের সহ্যের সীমা অতীত। এ অবস্থার একদিন ঐ হাটে পুলিশের নৃশংস ব্যবহারে ক্রোধোন্মত্ত জনতা সাময়িক উত্তেজনার অহিংস নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল দুইজন দারোগাকে গুলি মর্দন করে। পুলিশের পাঠা তাড়াবে অনেক গ্রাম হলো জনশূন্য। ১৯১৫ জন পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল এবং বহু লোকের হলো স্বাধীনতা।

ঐ ঘটনার ১২ বৎসর পরে তমলুকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে করেগী কি করেগী' প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্ষুব্ধ জনতার সংঘবদ্ধ অভিযান ও বাংলার জোয়ান অক্ষ আকর্ষিত মাতাশিশু হাজার হাজার অপর্যব্রীত কাহিনী আমায়ের স্বাধীনতা-ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

নন্দীগ্রাম 'দানা চম্পট' মোকদ্দমার পর জ্ঞানবাবু বা তাঁর প্রেরিত গুপ্ত সমিতির কর্মীরা প্রায়ই তমলুকে আসা-যাওয়া আরম্ভ করেন—কেউ গ্রামোফোনে (তখন গ্রামোফোন দেশে নতুন) কবি ঝিক্কেল্লালের হাসির গান বা জাতীয় সংগীত শুনিয়ে গেছেন—কেউ বা ম্যাজিক ল্যান্টার্ন সাহায্যে দেশের অতীত গৌরব ও বর্তমান দুর্দশার কথা জানিয়েছেন আবাব কেউ বা রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে কথকতার মাধ্যমে পবিত্রতা ও স্বাধীনতা দ্রোহিতা ব্রাহ্মণ বুদ্ধিরেছেন। ১৯০০-১০৪ সালে ঐরূপ একবার তার দাস (ডাক্তার তবক দাস) ও অপর নক্ষত্র ম্যাজিক ল্যান্টার্ন নিয়ে এসেছিলেন। অপরদিন গবে তাঁরা উভয়েই আমেরিকা চলে যান।

বঙ্গভাঙ্গা ও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভের পূর্বে থেকেই যে কর্ণাট বুদ্ধক মেদিনীপুরে জ্ঞানবাবু বাড়িতে মিলিত হতো তারা মধ্যে মধ্যে হেমচন্দ্রের বাড়িতেও যাতায়াত করত। সেখানে তাঁর জমিদার মামার বাড়ির পঞ্চাতে বহু বাগানে তিনি তাদের বন্দুক ছোড়া শিক্ষা দিতেন। হেমদা তখন মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের অধীনে প্যাট্রন ইন্সপেক্টর হিসাবে জেলাবাসী সর্বত্র পরিভ্রমণ করে গুপ্ত সমিতির ক্ষুণ্ণ বিদ্রোহের চেষ্টা করতেন। তাঁর এবং তাঁর মামার আগ্রহের কারণে লাইসেন্স ছিল।

৭ই আগস্ট, ১৯০৫—আনুমানিকভাবে শব্দ হলো বঙ্গভাঙ্গার বিবরণে তমলুকে আন্দোলন। প্রতি শহরে, গ্রামাঞ্চলে, হাটে-মাঠে নিত্য মিছিল সভা হতে আরম্ভ হলো।

মেদিনীপুর শহরে প্রথম প্রথম সভার বহু জনসমাগমের উপস্থিতি নানা স্থান থেকে স্বাভাবিক দল আনা হতো। প্রথম প্রথম সাধারণের উৎসাহ বর্ধিত হতে লাগল। সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি—বিলাতি কাপড়ের বহুসংখ্যক লোকে লোকারণ্য—সে কি উত্তেজনা। বহু কতিবাদের ধুমায়িত বহি হঠাৎ জ্বলে উঠল। যেন বহুদিনের আত্মবিস্মৃত জাতি মোহভঙ্গে জেগে উঠল। বাংলার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিবাদী হলো উন্মাদ চঞ্চল। গৃহীর হলো, স্বদেশমাতরম মন্ত্র। ঐ ধর্মান্তে দেশবাসী হলো মরতারা। কবি ভাষার—

উঠিল সে ধনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জরসরে—
গাহিল স্বদেশমাতরম্।

মেদিনীর কথা স্মরণ হলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

ঐ সময় (৭ই আগস্ট) স্বনামধন্য স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত (তখন তিনি বরোদার দেওয়ান) মেদিনীপুরে তাঁর জামাতা ব্যাবিস্টার কে. বি. দত্ত সাহেব তখন শহরের প্রক্টর মজরেট দলের নেতা। তাঁরই সেদিনকার সভায় সভাপতিত্ব করার কথা; কিন্তু জ্ঞানবাবুর উপদেশে রমেশ দত্ত মহাশয়কে সভাপতি করার ইচ্ছা—তাঁর অনুমতির জন্য ৩১৪ জন কলেজ ছাত্র ভয়ে ভয়ে তাঁর সঙ্গে 'দেখা' করতে যায়। তাঁর উপর তখন তাদের মধ্যে কয়েকজনের প্রগাঢ় ভক্তি। কারণ ইতিপূর্বেই তাঁরা—তখনকার সাপ্তাহিক বসুমতী—কৃপার রমেশ দত্তের 'মহারাজ জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত্র জীবনসন্ধ্যা', 'মাধবীকল্প', 'বিক্রমচন্দ্রের আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্রের 'বাজুরা' শিলা... ভাষিত শব্দই ঘুমারে রয়, বঙ্গলালের স্বাধীনতা হীনতার কে বাঁচতে চায়, মাইকেল ও দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির গ্রন্থাবলী গোপনে পড়ে এক নতুন আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়েছে। (গোপনে পড়তে হয়েছে কারণ এখনকার মত তখন স্কুলপাঠ্য ছাড়া নাটক-মডেল পড়ার বাঁধ ছিল না)।

কে. বি. দত্ত সাহেবের বাড়িতে উপস্থিত হলে বেরোবার মনোবল খবর পাওয়াবার দেখি প্যাট-শার্ট পরিহিত এক দীর্ঘাকার সোম্য-দর্শন বসীযান একটি পেনসিল হাতে সিঁড়ি বেয়ে টুক টুক করে নেমে আসছেন। বুদ্ধকবা তো সম্প্রমে জড়সড়—কি বলবে, কেমন করে বলবে ভেবে পায় না। তিনিই কিন্তু প্রথম

* উনিবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গ-বাসী ও হিতবাদী প্রতীকস্বরূপে বহুদাকারের সাপ্তাহিক বসুমতী প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯৭-১৮ সালে থেকে 'দুর্গাপুজার' সময়। বসুমতী স্বাধীনকারী প্রীরামকৃষ্ণ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসুমতীর প্রাকবর্ণকে তখনকার সাহিত্যবিগণের গ্রন্থাবলী উপহার বিতরণ প্রথা প্রবর্তিত করেন।

কথা বললেন। যুবকদের সাময়িক বিব্রত ভাব কেটে গেল। যুবকরা উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, “কি হে—তোমরা কি চাও?” তারা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ডাকতে লাগলেন জামাতার নাম ধরে। উনি নেমে আসতেই বললেন—এই তো, ক্ষীরোদকে বল। যুবকদের গৃহ বন্ধ—ওবা ডেবেছিল। স্যাব রমেশকে সভাপতিত্বপে পেলে সভার গুরুত্ব বর্ধিত হতো। ম্যাই হোক, অগত্যা কে, বিদ্যুৎসাহেব দস্তকেই আমন্ত্রণ জানাতে হলো। তিনিও আনন্দে রাজী হয়ে গেলেন। সম্মান সভা হলো—স্থানীয় বেলি হলো। বর্তমানে তা “রাজনায়ক বসু স্মৃতি পাঠাগার”। সভার লোকে লোকারণ্য। সভা আবন্দ হোল “বন্দেমাতবম্” গান। গভীর উৎসাহের মধ্যে সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ প্রস্তাব গৃহীত হলো। সেদিনের উত্তেজনা বিস্মৃত হইনি।

পর্বদিন বৈকালে সভার উদ্যোগী কয়েকজন যুবক বেলি হলে গিয়ে জটলা করছে। কেমন কবে বাস্তব ওপারে কলঙ্ক থেকে পূর্বদিন সভার জন্য আনা বোঁগুগুলি ফেৎস পাঠানো হবে। কোথাও লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সময় এক স্থানীয় উকিল ভদ্রলোক—খগেন ব্যানার্জী উপস্থিত। তিনি ব্যাপার বুঝতে পেয়ে যুবকদের যিক্রম দিয়ে বললেন—“সে কি সামান্য কলখানা বোঁগু লোকের অভাবে সামনে রাস্তার ওদিকে পৌঁছে দিতে পারছে না? আব তোমরা দেশ উদ্ধার করবে?” যুবকরা লজ্জিত, চুপ। তিনি বলে চললেন—“সেদিনের অসভ্য জাপান—পাঁচটি সামুদ্রাই হব্বেব দেশপ্রীতি ও আত্মবলি দানব ফলে আত্মকেব জাপান অসভ্যও নব—নগণ্যও নয। ও পাঁচটি যুবক নিজেদেব দেহেব নৃত্য-তিলকের বিনাময়ে প্রতিজ্ঞা-বন্ধ ইয়েছিল এবং তাতেব আত্মত্যাগেব ফলে জাপান আত্ম বিবেব উন্নত স্বাধীন জাতিব অন্যতম”। আস বলতে হলো না—বোঁগুগুলি স্বাধস্থানে পৌঁছে গেল। ঐ ঘটনার কয়েকদিন পরে—ঐ যুবকদের কয়েকজন জ্ঞানবাবুব নিকট সামুদ্রাইদেব মত দেশের জন্য জীবন পণ প্রতিজ্ঞাব প্রস্তাব করেন। তিনি পিউবিটান রাজ। বললেন, উত্তেজনার আতিশয্যে ওসব কিছুর করা না। সমস নাও—ধীব-স্থিরভাবে চিন্তা কবে মন ঠিক কর। উপস্থিত সকলে নিকন্ত হলো। স্বদেশী আন্দোলনেব কাজ সমানেই চসতে লাগলো। যুবকরা “মাবেব দেওয়া মোটা কাপড়” (তখন বাংলা-দেশে একমাত্র বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল—৩০।৪০ কাউন্টের সূতা ছাড়া কাপড় ঠিকি হতো না), কবচ লবণ, (বিলাতি লিভার-শুল মিহি লবণ তখন বর্জন করা হয়েছিল), মাখা (বিলাতি কাঁচের চুড়ি বর্জন করা হয়েছিল), কাঁটা-কাঠিব দেশলাই (দেশে তখন দেশলাই হতো না) ইত্যাদি শহবে-বাজাবে ফিবি করতে লাগল। সত্যেন্দ্রের বাড়ির নিকট

এক চালাঘরে যুগান্তর-এব কলকাতা ছাত্র-ভাণ্ডারের শাখা খোলা হলো—সেখানে তখনকার দিনে যত সামান্য ধারিকিছুর স্বদেশজাত জিনিস বিক্রি হতো। তাতিশালাও খোলা হলো—পরে নিকটবর্তী অন্য এক স্থানে তাতিশালা ও ব্যায়ামশালা স্থাপিত হব; প্রকাশ্যে কুস্তি, লাঠি ও ছোবা খেলা শিক্ষা হতে লাগলো। লাঠি ও ছোবা খেলার শিক্ষক হিসেবে যাকে রাখা হয়েছিল, শেষে মেদিনীপুরে সাজান ষড়মন্ত্র মামলায় সে অন্যতম রাজসাক্ষীবপে দেখা দিয়েছিল। ইতিমধ্যে যে কয়েকটি যুবক দেশেব জন্য জীবন পণ কবে দীক্ষা নেবার জন্য বাস্তু হয়েছিল তারা পুনরায় জ্ঞানবাবুব নিকট ঐ প্রস্তাব পুনঃস্থাপন করল। তিনি অনেক জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ প্রতিজ্ঞার গুরুত্বের কথা ব্যাখ্যা করে সম্মতি দেওয়ার ক্ষুদ্রবাস সহ নতুন যুবক নিজেদের হাত কেটে পবম্পরকে রক্ততিলক পরিয়ে জ্ঞানবাবুব সম্মুখে প্রতিজ্ঞা-বন্ধ হলো অন্তত ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তারা কেউ বিবাহ বা সংসার কবে না এবং প্রয়োজন হলে দেশের জন্য প্রাণ দেবে—সর্বপ্রকার দুঃস্বপ্ন কবে এবং মন্ত্রগুপ্তি পালন করবে। লোকলম্ভা, ভয়-নিন্দা-প্রশংসা লক্ষ্যে কবে না। তারা প্রতিজ্ঞাটা যাবজ্জীবনের জন্যই কবতে চেয়েছিল, কিন্তু পাছে কথা মিথ্যা হয়—প্রতিজ্ঞা না বাধতে পারে—জ্ঞানবাবু ঐ প্রস্তাবে রাজী হন নি। কিন্তু অপরদিনের মধ্যেই তাদের মধ্যে ২।৩ জন ছাড়া আব কাবও পাত্তা পাওয়া গেল না।

পরের ঘটনা—১৯০৬ সালের সবমতী-পূজাব সময়—মেদিনীপুর শহরের মাঘহাটী কেরা-পূর্বনো জেলে একটি গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড এগ্রিকালচারাল এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিশান হয। সেখানে সত্যেন্দ্র গোপন লেভুয়ে “সোনাব বাংলা” নামে এক সিডিসাস লিফলেট গোপনে বিতরিত হয। প্রথম দিন পুর্লিশ টের পায নি। দ্বিতীয় দিনে ঐ প্রচাপত্র বিতরণকালে এক হেড কনস্টেবল ক্ষুদ্রবাসকে হাতেনাতে ধবে ফেলে। ক্ষুদ্রবাস তৎক্ষণাৎ তাকে ঘুরি লাগাব এবং ধনুতাদৃষ্টিকালে সত্যেন্দ্র হঠাৎ তথ্য উপস্থিত হয বলে ওঠে—স্বাধে—ক্যা কবতা হাব, ডিপুটি সাবকা লেডকা, ছেড দেও, ছোড দেও”। কনস্টেবলটি ভাষাচাফা খেবে ক্ষুদ্রবাসেব হাত ছেতে দেয়। সেই অবসবে ক্ষুদ্রবাস ভিড়ের মধ্যে সবে পড়ে। সত্যেন্দ্র তখনও শহবাসীর নিকট বাজভক্ত সবকাবী চাকুরে। ক্ষুদ্রবাসের মোকদ্দমা উপলক্ষে সত্যেন্দ্র চাকুরী থেকে অবসব নিতে বাধ্য হয। উপবোক্ত ঘটনার প্রায় মাসখানেক পরে এক বাজভক্ত স্কুল-শিক্ষকের সাহায্যে ক্ষুদ্রবাস প্রেক্ষাপ্ত হযে রাজদ্রোহ অপবাধে চালান হয়। মেদিনীপুরেব অপ্রতিশ্রুতী মডাবেট নেতা ব্যাবিস্টাব কে বিদ্যুৎ এগিয়ে আসেন ক্ষুদ্রবাসেব পক্ষ সমর্থনে। যথেষ্ট সাক্ষীর অভাবে ক্ষুদ্রবাস সসম্মানে

মুক্ত হলো। দস্ত সাহেবেব ল্যান্ড-গার্ড ষোড়া খুলে তাকে বসিও দেলেগা গাড়ি টেনে শহব প্রদক্ষিণ করে তারে বীরে মর্যাদায় সম্মানিত কবে।

এদিকে সমিতির কার্য তমশ বেড়েই চলেছে। ১৯০৬-এব ম্যার্মিক বার্মিন্দ দলের “যুগান্তর” ও খ্রীস্টবিন্দ সম্পাদিত ইংরাজী “বন্দেমাতবম্”, রত্নবান্ধব উপাধ্যায় “সন্ধ্যা”, মনোবগ্নন গুহট কুবতাব “নবমতি” ইত্যাদি গবমপন্থী সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজগুলি বার্মিন্দাব “বগনীতি”, “অস্ত্রি কোন্ পথে” এবং “ভবানী মন্দির” প্রভৃতি পুস্তিকা ইত্যাদি বিতরণ ও বিতরণে তার সমিতিই গ্রহণ কবেছিল। কব্বাতার গুপ্ত সমিতিব লোবজন আসা-যাওয়া বন্ধে। অতঃপর সহযোগী চণ্ডল হনো উঠেছেন। বিহু এন্ট করা চাই—সম্ভব-অসম্ভব, নিষ্ঠুর-বর্বণ লনা-বিধ কম্পনা ও আলোচনা চড়ে। কেউ কেউ বা আনন্দমন্ডেব কম্পনাব ভবানী মন্দির, ভবানন্দ, জীবানন্দেব স্বপ্ন দেবেনে। অনেকেই হাযে পড়েছেন তাতিশয় অসুখ। একটা কিছুর কবাই চাই। ঐ সময় পটনা থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত “মানব-তা” পত্রিকায সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটি অনুকরণে “ভবানী মন্দির” গঠন-উদ্দেশ্যে নতুন হিতরতে মৃত্যুবরণে প্রস্তুত হববদেব অহতন জ্ঞানাব হয। লেখক সে উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ কবে। তখন “যুগান্তর” সম্পাদক জুগুপ্তনাথ দস্ত (ডাডাব) সবে বাজভক্ত অপরাধে কাবাবরণ কবেছেন (জুলাই, ১৯০৭)। সত্যেন্দ্রেব কথামতো লেখক কব্বাতার বার্মিন্দেব সহিত সাক্ষাৎ কবে এবং পরদিন তার নির্দেশে তদানীন্তন কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের ওত্র লাসে “যুগান্তর”-এব পবর্তী সম্পাদক এ প্রিন্টারের নামে ডিক্রেসবেশন দেয। কিংসফোর্ড সাহেব দরখাস্তকাবীকে দর্শনাগত নিবৃত্ত হোকবা বলে দরখাস্ত ন্যাত্তর কবল। লেখক কলকাতায় থেকে গেল এবং সোভাগদনত প্রথম খ্রীস্টাবিন্দেব আশ্রম বিনল। তারপর “মজঃফবপূর আউটবেজ” হল ৩০শে এপ্রিল ১৯০৮; প্রফুল্ল চাকিব মৃত্যু ও ক্ষুদ্রবাসের প্রেক্ষাপ (১লা মে) এবং ঐ তারি প্রভাতে (২বা মে) যুবাবিপদকুব বাগানে বার্মিন্দ, উপেন্দ্র, উল্লাসবব ও লেখকসহ ৯ জন প্রেক্ষাপ হল। কলকাতায় হত হলেন খ্রীস্টাবিন্দ, হেমচন্দ্র, কানাইলাল প্রভৃতি আবও পাঁচ-ছয়জন। বার্মিন্দা প্রকৃতিব বিবৃতি ও কাগজপত্র দৃষ্টে অনুশীলনানেব ফলে কলকাতা ও কলকাতাব পাইবে আবও অনেকে ধবা পুেল। যুগান্তর গুপ্ত সমিতিব প্রথম অবশেষে যবানকাপাত হলো।

কলকাতা টাইমস্

এবং আন্দোলন

সিঙ্গল

১৯০৮ সনে কলকাতা টাইমস্‌তে বঙ্গীয়
প্রাদেশিক কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে নেতাজী
সুভাষচন্দ্র 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সূচনা
করার প্রথম প্রস্তাব দেন। আমি ঐ সম্মেলনে
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলাম। পরে
ব্রিটিশ কংগ্রেসে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।
কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূচনা
হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত রাজনৈতিক পরি-
বর্তন হতে লাগলো। জার্মান ও জাপানের
কাছে ইংরেজের পরাজয় ঘটলো। ইংরেজের
বিরাট শক্তির ওপর লোকের যে আস্থা ও
আতঙ্ক ছিল তা শিথিল হতে লাগলো।
১৯৪২-এর আগস্টের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের
সাথে সাথেই কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির
সভ্যদের জেলে আটক করা হল। নেতাজী
ভারত থেকে উধাও হয়ে জাতীয় ফৌজ গঠন
করে ভারত আত্মরক্ষার পরিকল্পনা করেন।
ভারতে অহিংস 'ভারত ছাড়' আর ভারতের
বাইরে সহিংস 'ভারত ছাড়' এই দুয়ে
মিলে সারা ভারতে উঠলো মহাজাগরণের
উত্তাল তরঙ্গ। হিমালয়ের পাদদেশে সুদূর
এই ক্ষুদ্র জেলাতেও ডেউ এসে পৌঁছলো
১৯০৮ সাল হতেই এ জেলার সর্ব মন
প্রস্তুত ছিল। তাই বেশি প্রচার দরকার হয়
নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা জেলা সাড়া
দিল। কংগ্রেসপক্ষ থেকে আমরা যে কর্জন

করলাম। ডাকঘর পোড়ানো, টেলিগ্রামের
তার কাটা, রেললাইন ধ্বংস করার ব্যাপারে
মতভেদ হওয়ার সে কাজগুলি করা হয় নি।
ব্যাপক সত্যাগ্রহ, বে-আইনী সভা ও মিছিল
চলতে লাগলো সারা জেলায়। ইন্সপেক্টর
জেলা ইন্সপেক্টর গেল না। তখন ছিল
বাৎসরিক পরীক্ষা। সেটা বন্ধ হয়ে গেল।
বে-সরকারী ইন্সকুলগুলিকে সরকারী সাহায্য
বন্ধ হওয়া শুরু হল। কয়েকটি
ইন্সকুলের সরকারী সাহায্য প্রায় বন্ধ করা
হল। জেলেরা রক্ত দিয়ে কাগজে লিখলো
ইংরেজ। ভারত ছাড়, আর সেগুলি শহরের
নানা জায়গায় লাগিয়ে দিল। স্থানীয় 'জনমত'
ও 'ব্রহ্মোত্তা' পত্রিকা দুটির প্রকাশ বন্ধ করার
নোটিশ এলো। 'জনমতের' বাঁগা ছাপা-
খানাটিতে চললো ব্যাপক তল্লাসী। সবকবের
সম্মুখ হলো বে-আইনী কাগজপত্রগুলি ওখান
থেকেই ছাপা হয়। সাইক্লোস্তাইলে লেখা
প্রচারপত্র সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়লো।
পুলিশের দল পাগলের মত তল্লাসী চালাতে
লাগলো। প্রায় সকল জায়গাতেই ব্যর্থ হয়ে
গেল। আবও কৈপে গেল। গ্রামে কৃষক ও
শ্রমিক আন্দোলন সূচনা হয়ে গেল।
ধরপাকড় চললো বে-পরোয়াভাবে।
কংগ্রেসের কেউ বাদ গেল না। কংগ্রেসের

বাইরেও বহু লোক গ্রেপ্তার হল। পুলিশের
ভেতরে প্রচার চলতে লাগলো। ফলে সাধারণ
পুলিশের লাঠি সত্যিই চললো মৃদুভাবে।
গুরুত্বপূর্ণ বন্দুকধারী পুলিশ গুলী চালাতে
অস্বীকার করলো। জেলে স্থান না থাকায়
সত্যাগ্রহীদের ধরে শহর থেকে অনেক দূরে
প্রহার করে ছেড়ে দেওয়া হল গভীর রাতে।
গ্রামের লোক গোপনে ও প্রকাশ্যে সত্যাগ্রহী-
দের সাহায্য করতে লাগলো। এমন কি
সরকারী খেতাবধারী দল, পুলিশ কর্মচারী-
দের বাসার মহিলাবৃন্দ গোপনে সাহায্য করতে
লাগলেন এই আন্দোলনকে। মনে হল তখন
কোন ভারতীয়ই চান না ইংরেজ আর
ভারতেশ্বর থাকুক। এইরকম জনসমর্থন
ইতিপূর্বে কোন আন্দোলনে দেখা যায় নি।
মাসখানেক বহু চেষ্টার পর এখানকার ইংরেজ
শাসকদল হাল ছেড়ে দিলেন। তাঁদেরও হয়তো
মনে হল আর এদেশে রাজত্ব করা যাবে না।
এদিকে তাঁদের নিজের দেশের অবস্থাও
সংগীন। সরকারী অত্যাচার থেমে গেল।
বহু লোককে হঠাৎ জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া
হল। দু'মাসের আন্দোলন আপনা হতেই
থেমে গেল। একে বলা যায়, সিন্ধুটি ডেউ
পাট সূঁচ দি ওয়ালা ড—যাট দিনে দুনিয়া
দুলে উঠলো।

*On this auspicious occasion of our
Independence Day*

We offer our respectful Greetings

ZAMAN MANZIL

37, RATU SARKER LANE, CALCUTTA-1

• (Phone No. 34-3147)

ইংরেজ আমলে পুলিশের বিশেষ শাখায় কয়েকদিন জানোবন্ধন শুভ

চব্বিশ পরগণা জেলায় রামচন্দ্রপুর গ্রাম। সুরেন্দ্রনাথ সামন্দের বাড়ি। ভাদ্রমাসের দশম তারিখে রেল লাইনের বিষ্ণুপুর স্টেশনে নামতে হয়। সেখান থেকে মাইল দশেক মটর-বাসে গিয়ে, তারপরে মাইল দুইয়েক হেঁটে সে বাড়িতে পৌঁছানো যায়। মটর গাড়ির রাস্তা থেকে সোজা দক্ষিণে যে গ্রাম্য পথে-চলা পথটি চলে গিয়েছে শস্য-বহুল মাঠের ভিতর দিয়ে, কোথাও বা কোনো কৃষকের বাড়ির উঠোনের উপর দিয়ে কিংবা বাড়ির আনাচে-কানাচের কাছ ঘেঁসে, সেই পথে রামচন্দ্রপুর গ্রামে যেতে হয়। এই পথ সুরেন্দ্রনাথ সামন্দের পূর্ব-মুখো বাড়ির সামনের পুকুরের পশ্চিম পাড়ের উপর দিয়ে দক্ষিণে চলে গিয়েছে। পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটাতে এসে পশ্চিম দিকে ঘুরে দাঁড়ালে সামনেই সুরেনবাবুর বাড়ি।

সুরেনবাবুর বাড়ির ভিতর থেকে বেবেবাব একমাত্র পথ সামনের পেট-কাটা কাছারীর মাঝখান দিয়ে। কাছারীর পরে ডাইনে-বায়ে দু'দিক বেড়া দিয়ে ঢাকা ছোট একটুখানি প্রাঙ্গণ। তারপরে দু'গাম-মণ্ডপ। দু'গাম-মণ্ডপের মাঝখানটার দু'খানা খাট পাতা। দু'গাম-মণ্ডপের সময় ছাড়া সাবা বছর দু'গাম-মণ্ডপটি সাধারণ বৈঠকখানা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বৈঠকখানার দুই পাশে দু'খানা ঘর। দক্ষিণ পাশের ঘরের ভিতর দিয়ে বাড়ির অন্তর-মহলে যাওয়ার পথ। উত্তর পাশের ঘরখানার একটিমাত্র দোর। সেই দোর দিয়ে বৈঠকখানার আসা যায়—আর কোনো-দিকে বেরোবার কোনো পথ নেই।

সুরেনবাবু অল্প পাড়াগারের সাধারণ কৃষকের ঘরের সন্তান হলেও নিজের গ্রামে একটি ম্যাট্রিক স্কুল গড়ে তুলবার চেষ্টা করছিলেন। নতুন স্কুল—এখনো ম্যাট্রিক ক্লাস অবধি খোলা হয় নি—অক্টোবর প্রথম পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি করা চলে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে একদিন একটি মধ্য-যয়স্ক লোক সুরেনবাবুর বাড়িতে এসে আস্তানা নিল। সবাই জানলো যে সে লোকটি গ্রামের স্কুলের মাস্টার হয়ে এসেছে। নাম তার নরেন্দ্রনাথ দে। আই-এ পাশ। বাড়ি। ফরিদপুর জেলায়। চণ্ডী মণ্ডপে বৈঠকখানার উত্তরপাশের ঘরখানায় তাব থাকার জায়গার ব্যবস্থা হলো। কলকাতা থেকে একটি লোক নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যায়। নরেন্দ্রনাথের সত্যিকার

পরিচয় সুরেনবাবু ছাড়া সেখানকার আর কেউ জানে না। স্কুলটাকে ভাল করে গড়ে তুলবার জন্যে তার সাগ্রহ চেষ্টার ফলে নরেন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই সে গ্রামের সবলেরই অতিশয় ঘনিষ্ঠ আপনজন হয়ে উঠেছিল। সকলেই তাকে সাদা-সিঁথে ঠান্ডা ভাল লোক বলে জানে।

তিন মাস পরে একদিন সকাল দশটার সময় নরেন্দ্রনাথ মাস্টার ও স্কুলের আর একটি শিক্ষক সামনের পুকুরে স্নান করে এসে নরেন্দ্রনাথের শোবার ঘরে ঢুকেছে কাপড়-চোপড় পরতে ও মাথা আঁচড়াতে। এমন সময় ভদ্রবেশী চারজন লোক এসে ঢুকলো বৈঠকখানায়। ঢুকেই অগ্রগামী লোকটি চেঁচিয়ে বলতে লাগলো—“বাংগাল মাস্টার কই—কোথায় বাংগাল মাস্টার?” গ্রামের ২১০ জন সাধারণ লোক বৈঠকখানায় বসেছিল। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ও অভাবনীয় যে, তারা সবাই কিসকত ব্যাবমুগ্ধ হয়ে গেল—কারো মুখে একটি কথাও জোঁগলো না। অপর শিক্ষকটি নরেন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই আগন্তুক অগ্রগামী লোকটি তার হাতখানা ধরে ফেললো এবং মস্ত একটা ঝাঁকানি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো—“বাংগাল মাস্টার কই, কল শীশিং, বল!” সেও এমন খতমত খেয়ে গেল যে তার মুখ থেকেও কোনো কথা বেরোলো না। নরেন্দ্রনাথ তখনো তার ঘরের মধ্যে চিবুনি ও দর্পণ দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে। মস্তমস্ত মখেই সে আপন কতব্য শিব্ব করে ফেললো। দেখলো পালাবার কোনো পথ নেই। ঘরের একটি-মাত্র দুরার। সে দু'ঘর দিয়ে বেরোলেই বৈঠকখানায় এদেব সামনেই পড়তে হবে। বেরোতে আর দেরি করাও চলে না। দেরি করলে কাব ঘাড়, কাব পিঠে অনর্থক কিলটা, থাপ্পড়টা পড়ে, তার ঠিক নেই। তাই সে তখন জামাটি গয়ে দিয়ে মনে মনে সবকিছুর জন্যেই প্রস্তুত হয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সে বেরিয়ে, আসতেই অগ্রগামী লোকটি (একটি I. B. Inspector (নাম গিবিজাবাবু) হাতে বিভলভার বাগিষে তার দিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো—“Hand's up, hands up” —“হাত উঠাও, হাত উঠাও। বিভলভারসুখ তার হাত-খানা বেভাবে কাঁপছিলো, তা দেখে নরেন্দ্রনাথ মাস্টারের হাসি পেলো। তখন সে সামনে এগিয়ে আসতে আসতে ধীর-স্থিরভাবে, ঈর্ষ্য হাস্যের সঙ্গে বললো—“আব বীরে

কাজ নেই—যথেষ্ট হয়েছে। কম্পিত হস্তে বিভলভার বাগিষে বীরের পয়াকান্দা দেখে আর লাভ কি?” তাকে হানতে দেবে লোকট বোধ হয় কিছুটা সেরাসিত বোধ করলো এবং বিভলভারসুখ হাতটা নামিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রনাথের এতটা হাত শক্ত হয়ে ফেললো এবং বললো—“আপনার গ্রেপ্তার করলাম” তখন আব একজন লোক এগিয়ে এসে তার হাতে হাত-কাঁড় লাগিয়ে দিল। নরেন্দ্রনাথ কথাটি না বলে চাপ কবে দাঁড়িয়ে বইলো। তখন চব্বিশ পরগণা জেলায় আই-বি ইন্সপেক্টর শশীবাবু জিজ্ঞেস করলেন—“আপনার নাম?”

“নরেন্দ্রনাথ দে।”
“আপনি বাই বলুন, আমরা জানি আপনি কে?”
“আপনারা হলেন সব-জামতা—না জানবেন কেন?”

“আমরা আসবাব সময়ও ভাল করে চোখে দেখে এসেছি। বাব ফটো দেখে এসেছি, তাকেই যে আমরা চিন্তাব করছি, এবে কোনো ভুল নেই।”

নরেন্দ্রনাথ তখন পূর্ব-মুখো হয়ে চণ্ডী-মণ্ডপের মাঝখানটার দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সে দেখতে পেলো, যে লোকটি পথ-প্রদর্শক হয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এ বাড়িতে এসেছিল, দু'টি লোক তাকে দু'দিক থেকে ধরে এনে দাঁড় করিয়েছে পেট-কাটা কাছারীটার মাঝখানে পথের উপরে। দেখে মনে হল, সে নিজের শক্তিতে বেন দাঁড়িতে পারছে না। চক্ষুর নিম্নেই তাতে আবার সিরিয়ে নিষে গেল। তখন তাকে সেই অবস্থান দেখে নরেন্দ্রনাথের মনে হঠাৎ—বেদম প্রহারের ফলেই হয়তো তার উদানশক্তি বহিত হয়েছে এবং অত্যাচার সহ্যে না পেয়ে সে-ই সম্ভবত পুলিশকে তার ধাক্কা জবাবের কথা বলে দিয়েছে এবং এদেব এখানে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

এদিকে সুরেনবাবুর একটি ছেলে—বয়স ১৫।১৬ বছর, সামান্য লেখা-পড়া জানে এখন চাবের কাছে নিবৃত্ত—ভাগ্য হলো—সে হঠাৎ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে স্নেহে আবদ্ধ করলো—“কাকে, ধবতে এসে ককে ধরছে, তার ঠিক নেই—বা খুঁশি, ভা-ই করছে—মাস্টারমশায়ের হাতে হাত-কাঁড় লাগিয়েছে—পেরেছে কি?—এ কি মগের মল্লুক চোরেছে নাকি?”

নরেন্দ্রনাথ তার উত্তরনা দেবে দক্ষিণ হতে উঠলো এবং ভাবলো, এখনই না থামলে-

ওর হাতও হাত-কড়ি পড়তে দোর হবে না। তখন সে সে-ছেলেটিকে নাম ধরে ডেকে কাছে নিয়ে এসে বললো—“পাশলা কোথাকার—এমনথারা করতে আছে? আমার সম্বন্ধে তখন ওদের সন্দেহ হয়েছিল, তখন আমাকে যেতেই হবে ওদের সঙ্গে। ওদের আফিসে গিয়ে যদি দেখে যে, ওদের ভুল হয়েছিল, তখনই ছেড়ে দেবে। তেদের এ নিয়ে মাথা ধরাপ করতে হবে না। আমিই যা হয় ব্যবস্থা করে নেবো। তোরা একটি কথাও ধরাবি না—চুপ করে থাকবি।”

এই সময়ে সুরেনবাবু এসে বললেন—“আপনারা তো মাস্টারমশাইকে নিয়েই যাবেন—আমাদের কিছু কববারও নেই, বলবারও কিছু নেই। কিন্তু ইনি এইমাত্র স্মান করে এসেছেন। এখনো কিছু খান নি। আপনারা কি এই অল্পত অবস্থায়ই আমার বাড়ি থেকে এঁকে নিয়ে যাবেন?”

ইনস্পেক্টরবাবু বললেন—“বেশ তো? দিন না খেতে—আপনি কি? যেখানেই খেতে দিন, আমরা সঙ্গে থাকবো—আমাদের সামনে ঘসে এঁরা যাবেন।”

ডান হাতের হাত-কড়ি খুলে দিয়ে নরেন মাস্টার ও অপর মাস্টারটিকে বাড়ির অন্দর-মহলে খাওয়ার জায়গার বসিয়ে দেওয়া হল। পুলিশরাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পরে তাদের বাইবে নিয়ে এসে এক মাস্টারের ডান হাত ও অপর মাস্টারের বাঁ হাত একসঙ্গে করে হাত-কড়ি পরিবে দেওয়া হল। এই অবস্থায় বড় বাস্তা পর্বন্ত হাটিয়ে এনে, তার পরে পুলিশের মটর গাড়িতে চড়িয়ে কলকাতা পুলিশের বিশেষ শাখায়, অর্থাৎ আই-বি আফিসে নিয়ে আসা হল। পবে জেনেছি যে, সুরেনবাবুকেও সেই সময়ে গ্রেপ্তার কবে নিয়ে আসা হয়েছিল।

হ্যানসন (Hanson) সাহেব তখন বিশেষ শাখার ডেপুটি কমিশনার, অর্থাৎ এই আফিসের বড়কর্তা। নরেন মাস্টারকে গাড়ি থকে নামিয়ে বরাবর হ্যানসন সাহেবের সামনে নিয়ে উপস্থিত করা হল। অন্য মাস্টারটিকে অন্য কোথাও নিয়ে গেল। নরেন মাস্টারকে দেখে হ্যানসনের মুখে হাসি ধরে না।

হ্যানসন জিজ্ঞেস করলো—“Hats your nam (নাম কি?)”

জবাব—“মনোরঞ্জন গুপ্ত।”

নিজের মুখেই এত সহজে নামটা বলোছি লে হ্যানসন খুব খুশি হয়ে বললো—“That's right, that's right. How long you have been there where you have been arrested? বেশ বেশ! যেখানে ধরা পড়লে, সেখানে কত দিন ছিলে?”

জবাব—“I think, you should depend upon your own information (আমি মনে করি, তোমার নিজের সংগৃহীত তথ্যের উপরেই নির্ভর করা উচিত।)”

এই কথার হ্যানসন একবারে তেলে-

বেগুনে জ্বলে উঠে চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে বললো—“It's all depends upon the information supplied by yourself (অর্থাৎ তোমার কাছ থেকেই খবর আসা করে ছাড়বো।)”

এই কথা বলে হ্যানসন হুকুম দিলে—“Take him to the cells (কেয়দখানায় নিয়ে যাও)।”

রামচন্দ্রপুরে আমরাই নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দে। বি-এ পাশ না বলে আই-এ পাশ বোলছি এইজন্যে যে তখনকার দিনে তখন একটি অতি সাধারণ স্কুলের জন্যে বি-এ পাশ শিক্ষক রাখা হতো না—পাওয়াও যেতো না। আমি তখন ডালহৌসী স্কোলের বোমার মাস্টার অন্যতম প্রধান আসামী। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে লক্ষ্য করে বোমার ছোড়া হয়েছিল ডালহৌসী স্কোলের রাস্তার—আমার গ্রেপ্তারের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। দলের প্রয়োজনে আমাকে প্রায়ই কলকাতা আসা-যাওয়া করতে হতো। ষষ্ঠাদিন সম্ভব গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলবার জন্যে আমাকে পরিচর লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। তারই আশ্রয় হিসেবে আমার নতুন নাম-করণ করতে হয়েছিল। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে মুগেই মনে মনে এই স্থির করেছিলাম যে, রামচন্দ্রপুরে আর নিজের প্রকৃত পরিচয়টা দেবো না। তাই দিন নি। কিন্তু আই বি ও সি আই ডি আফিসের বড়কর্তার সবাই আমাকে চেনে এবং আমিও তাদের চিনি। এরূপ অবস্থায় দেখানে পবিচর লুকানোটা নিতান্তই হাস্য্যাপদ ব্যাপার হয়ে পড়ে ফলে জিজ্ঞাসা করা মাত্রই আসল নামটা বলে দিলাম।

হ্যানসনের ভয়ের বাইবে এসে দেখি, বহু লোক এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আই বি এবং সি আই ডি আফিসে বত কর্মচারী ছিল, একটিও বোধ হয় বাদ ছিল না। তারা এসেছিল দুর্ভর্য এক ফেরাবী আসামীকে দেখতে, বাকি ধববার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা ছাড়া, টেগার্ট সাহেবের কড়া তাগিদে প্রায় ছয় মাস ধরে পুলিশের অবিস্ম প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু এই বোঁটেখাটো শীর্ণ-দেহ নিরীহ লোকটিকে দেখে তারা হয়তো আশাভ্রংশ অপসন্ন মনেই ফিরে গিয়েছে।

এই সময়ে সি আই ডি আফিসের বড়-কর্তা নলিনী মজুমদার মহাশয় তাঁর বিপুল দেখানা নিয়ে গটগট করে হেঁটে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—“মনোরঞ্জন-বাবু, খুব কীর্তি রাখলেন—যা হোক।” এই কথা বলে তিনি আবার গটগট করে ফিরে চলে গেলেন।

সেলে যেতে না যেতে আবার আমার বাইরে ডাক পড়লো। বাইরে এসে দেখি, ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল (D. I. G., I. B. C. I. G. বহু সাগোপাঙ্গ নিয়ে স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন। সহাস্য আমার দিকে

চেয়ে সাধাটা একবার এঁদকে, একবার ওঁদকে করে ফিরে চলে গেলেন সাগোপাঙ্গ নিয়ে। বলায়, খাঁচার বাঘ পড়েছে শূনে অতি আগ্রহে তাড়াতাড়িই ছুটে এসেছেন দেখতে। কিন্তু কি দেখতে পেলেন?—বোধ হয়—কি বলবো?—মুরগী বাচ্চা?—না, চড়ুই পাখি?

সেলে ফিবে এসে বসে আছি একা একা একটা লোহার খাটের উপরে। সামনে খোলা দুয়ার। বাইবে কঁধে বন্দুক পাহারাওয়াল পুলিশ। আমি আব্বাছলাম হ্যানসনের কথাটা তার শাসানির স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে যে, একরার আদারের জন্যে আবশ্যক হলে “প্রহারে ধনঞ্জয়” কাকে বলে ভাল করে দেখিয়ে দেওয়া হবে। এখানে ধরে নিয়ে এসে বহু লোকের উপরই অকথ্য মার-খর, নানা রকমের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার একশেষ হয়েছে, এ কথা বহুবার শুনোছি। মার-ধবেব ফলে বহু লোক একরার করে বিপ্লবী দলের বহু কতিসায়ন করেছে—এ কথাও জানা আছে। কিন্তু মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিরূপ অবস্থায় মার খেয়ে মানুষ একরার করে, সে সম্বন্ধে একটা কৌতূহল বসাবই আমার মনে আছে। ভাবলাম,—এবার আমার উপরেও সে পবীক অবশ্যই হবে। আমি কি পবীকায় উত্তীর্ণ হতে পারবো? কে জানে? যে সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, সে সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় কি? আশঙ্কা ও ঔৎসুক্য মেশানো একটা অননুভূতপূর্ব ভাবের সোমার বোদ্ব্যমান মনটার এই প্রশ্নটা আকুল-বিকুল করাছিলো—“কখন পরীক্ষা আবশ্যক হবে? আজ-ই কি? এখনি কি? এখানেই কি? কিংবা কোথায়?—কখন?”

কিছুক্ষণ পরে একটি ইংরেজ ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট রে সাহেব এসে ভিতবে ঢুকে আমার পাশে লোহার খাটের উপরে বসে পড়লেন। ছোকরাটি দাঁড়িয়ে রইলো—আমার ডান পাশে। আলাপের উদ্দেশ্যেই যেন আলাপ কবছেন—এইভাবে সহজ কথের সে সহজ আমাকে বললেন—“Do you recognise me” (আমার চিনতে পারো?)

আমি বললাম—“I think I have seen you somewhere, but I cannot exactly place you.”—(বোধ হয় দেখেছি কোথাও, কিন্তু কোথায়, ঠিক করতে পারছি নে।)

রে সাহেব—“In 1928 when you were arrested, I was there at that time in the Sree Saraswati Press up-stairs. (১৯২০ সালে তোমার গ্রেপ্তারের সময় আমি ছিলাম শ্রীসরস্বতী প্রেসের উপরতলার।)”

আমি—“Are you Mr. Rav (তুমি কি মিষ্টার রে?)”

রে সাহেব— Yes, right you. হয়
ঠিক বলেছি।

এমন সময়ে তাঁর সংগের ছোকরা সাহেবটি
হঠাৎ বলে উঠলো— How long you have
been there where you were found?
(যেখান থেকে তোমাকে নিয়ে এসেছে,
সেখানে তুমি কতদিন ছিলে?)

আমি— In answer to this very
question I have already told D. C.
that I don't like to make any
statement.

(আমি ডি সি-কে ভো বলেই দিয়েছি
যে, আমি কোনো কথা বলবো না)।

ছোকরা—What you. (কি বলবে
না?)

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ছোকরা
এমার মুখের উপর একটার পর একটা-দুটো
ঘুসি বসিয়ে দিলে। রে সাহেব টক্ কবে
জাফিয়ে উঠে তাকে ধাক্কা দিয়ে দিলেন এবং
ভৎসুণাং তাকে নিয়ে সেল্বে বাইরে চলে
গেলেন। বাইরে গিয়ে পাহাড়াওয়াল সেপাইকে
ডেকে বললেন—“ঘবটা বন্ধ কবে দাও”। তার
পরে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের দুয়ারটা বন্ধ
করিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। তাই
ভাবখানা দেখে মন হলো—ঘুসিটা রে
সাহেবের অন্তিমপ্রেরণা ছিল। অপ্রত্যাশিত-
ভাবে যা ঘটে গেল, আবার যাতে সেরূপ কিছু
না ঘটে, সেইজন্যেই, বোধ হয়, রে সাহেব
দুয়ারটা বন্ধ করে দিয়ে গেলেন। পরে যা
শুনোঁছ, তাতেও আমার এই ধারণাটাই যে
ঠিক, সেইটেই বোঝা গেছে।

আমি অবশ্য দৈনিক নির্যাতনের জন্যে
প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। তখনকার দিনে
পুলিশের হাতে রাজনৈতিক বন্দীদের
অপরিসীম লাঞ্ছনা ও অমানুষিক নির্যাতন
ভোগের কথা সর্বজন-বিদিত সাধারণ ব্যাপার।
কিন্তু আমাকে মাঝ-ধব কবা হবে কিনা, সে
সম্বন্ধে বোধ হয় তখনও পুলিশের বড়-
কর্তাদের কাছ থেকে কোনো নির্দেশ আসে
নি। তাই বোধ হয়, রে সাহেব কিছুটা
অপ্রস্তুত বোধ করেছেন ইংবেজ ছোকরার
স্বরূপ বে-পরোয়া পোয়াতুর্মি দেখে। বড়-
কর্তাদের নির্দেশ তখনো আসে নি—
এসেছিল এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে, তা
নেহাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দু-তিনদিন পরে
একটি ছোট ঘটনা থেকে জানা গেল। সেদিন
একটা ঘরের বারান্দায় একটা টুলের উপরে
আমি একা একা বসে আছি। মাঝে মাঝে
২।১টা লোক আমার সামনে দিয়ে এ-দিক
ও-দিক চলে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি, একটি
অস্প-বয়স্ক পুলিশ কর্মচারী আমার সামনে
দিয়ে আস্তে আস্তে যাবার কালে, অন্য
শব্দে না পায়, এমনভাবে খুব তাড়াতাড়ি
নিম্ন-লিখিত কথাগুলি বলে চলে গেল—
“টেগার” রাস্তা এসে বলে গেছে, মায়খর যেন
আপনাকে করা না হয়, করলে পরে গড়গোলা
হতে পারে।”

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম—“এ রাজ্যেও
দৈত্যকুলে-প্রহ্লাদ-জন্মায়।”

সেদিন অনেক রাত্রে আমাকে একটা
গাড়িতে করে লালাবাজার কয়েদখানায় নিয়ে
গিয়ে একটা ঘরে তালা-বন্ধ করে রাখলো।
পরের দিন যাওয়া-যাওয়ার পরে আবার আই বি
আফিসে নিয়ে গেল। এই দিন আই বি
এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সামসুদ্দহার আমাকে
নিয়ে বসলো। হুকুম দেওয়ার মতো তাঁর
কণ্ঠে সে বললো—“আপনাকে একটা বিবৃতি
(statement) দিতে হবে। আমিই প্রশ্ন
করবো, আপনি তার জবাব দেবেন—আমি
সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেবো।”

আমি—“আমি তো হ্যানসন সাহেবকে
ইতিপূর্বেই বলে দিয়েছি যে, আমি কোনো
বিবৃতি দেবো না।”

আই বি কর্মচারীর কণ্ঠস্বর উঁচু পড়দায়
উঠে গেল। সে রুদ্ধ-কণ্ঠে বলে উঠলো—
“বললেই ছোলো, বিবৃতি দেবো না। বিবৃতি
আপনাকে দিতেই হবে।”

আমি চাপ কবে আছি দেখে সে আবার
বলতে আরম্ভ করলো—“চাপ কবে থাকলে
চলবে না। বিবৃতি না দিবা এখন থেকে
পার পারবেন ভাবছেন? বিবৃতি আদায় কবে,
তব ছাড়বো। এখনে যে-ই এসেছে, তাকেই
বিবৃতি দিতে হচ্ছে—কেউ এড়াতে পারে নি—
কোনো মহাত্মাই কেহই—পান নি। আপনাকেও
দিতে হবে—এ কথা নিশ্চিত জানবেন। অমকে
অমকে অমকে বিবৃতি দিয়েছে—আপনিই
বা দাবন না কেন?”

আমি তব চাপ কবে আছি দেখে সে
আমার গায়ের চামড়া জোব কাব এক টান
মেবে কোড নিয়ে টোঁগিলের উপরে ছুড়ে
ফেলে দিয়ে বললো—“বোবা সামলেই কি
কেহই পাওয়া যাবে? কথখানা না। যেমন
কুকুর, তেমনি মঙ্গল চাই। যে রোগেব যা
গুহু, তাই তো বাবস্তা কবতে হবে। কিন্তু
তাব আগে আপনাকে জিজ্ঞেস কবতে চাই,
ভালোব ভালোব বিবৃতি দেবেন কি না?”

আমি—“আমি আর কি বলবো। আপনি
বলছেন, আমাকে বিবৃতি দিতেই হবে—আমি
চাই, আর না-চাই।”

সামসুদ্দহার—“হ্যাঁ, তাই। বিবৃতি দিতেই
হবে।”

আমি—“বেশ।”

সামসুদ্দহার—“বেশ মানে?”

আমি—“মানে আর কি? আপনি
বলছেন—বিবৃতি আমাকে দিতেই হবে।
তাহাল তো দেরই।”

সামসুদ্দহার—“কখন দেবেন? এখনই
দিন।”

আমি—“এখন কিংবা কখন, তাব আমি
কি জানি! ইচ্ছা না থাকলেও মানসে কখন
কি অবস্থায় বিবৃতি দেব, তা আপনি জানেন।
আমি বলবো কেমন করে?”

“কি—” বলে লোকটা যেন ফেটে
খসলো। ভাবলাম, পুলিশটাই যদি রসাজলে

যায়। কিন্তু বতটা গজালো, ততটা বর্ষালো
না। বললো—“কেমন কবে—তা এখনই
দেখিয়ে দিচ্ছি। এমনি এমনিতে হবে না—
তা বোকাই যাচ্ছে। আচ্ছ কবে উত্তম-
মধ্যমের প্রয়োজন। তখন দেখা যাবে, এসব
চং কোথায় থাকে!”

এই কথা বলতে বলতে লোকটা তখনকার
মতন সেখান থেকে উঠে অন্যর চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আর একজন পুলিশ
কর্মচারী এসে আমাকে আর এক ঘরে নিয়ে
গেল। সে কর্মচারীটি গড়োয়ান গোছের
বেঁটেখাটো ভাগড়া চেহারা জেখান একটা
লোককে এনে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে
জিজ্ঞেস করলো—“চেনো একে? দেখে
কখনো?”

লোকটি এসেই হাত জোড় ও মাথা নড়
কবে আমাকে প্রণাম করল। তাব বকম-
সকম দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। আমি
হাসতে হাসতে বললাম—“আমি এখানকার
হোমরা-চোমনা কেউ নই। আমাকে তোমার
প্রণাম করতে হবে না।”

কর্মচারীটি বললো—“কেন, দোষ কি
হয়েছে। আপনার মতো লোককে প্রণাম
কববে, তাব আর কথা কি?”

কর্মচারীর প্রশ্নের জবাবে লোকটি
বললো—“না, আমি কখনো এ বাবকে দেখি
নি।”

তার পরে এলো ভদ্রঘবেব এক ধুবতী
বউ এবং তাব সংগে এক অশীতিপব বৃদ্ধা
নারী। বৃদ্ধা বয়সেব ভাবে নূবে পড়েছে—
সোজা হয়ে চলতে পারে না—লাঠি-ডব দিয়ে
এসে দাঁড়ালো। পুলিশ কর্মচারীটির প্রশ্নের
জবাবে উত্তরেই জানালো যে, তাবা কখনো
এর পূর্বে আমাকে দেখে নি। এব নাম
হচ্ছে Identification parade—আসাম
সনাক্ত কবাব প্রক্রিয়া বা প্রকবন।

বীল সমুদ্র লাল হোল
নাটিকের বক্তৃদ্ধারায়

তোমরা কি শুধিবে
রক্তের ঋণ
অলক্ষ্যে শুধায় তারা

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টা
বিনিবাব ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬টা
মিনার্ভায় “কল্লোল”

শবের দিন খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার আই বি আফিস। আমাষ বরাবর সামসুন্দহায়েব কেতাষ নিয়ে গেল। আজ দোহার মাহেবের ভাবখানা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। আজ সে বেশ শিষ্ট, শান্ত, ভদ্র। আমাকে চেয়ারে বসিয়ে সহজ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলো—“তা হলে, মনোরঞ্জনবাবু! বিবৃতি আপনি কিছুতেই দেবেন না?”

আমি—“দেবো না মানে? আপনি তো বলেছেন—ইচ্ছার হোক, অনিচ্ছার হোক—বিবৃতি আমাকে দিতেই হবে। এখন আবার এ কথা বলছেন কেন?”

সামসুন্দহায়েব—“না—না। সে কি কথা! বিবৃতি কি জোর করে বার করা যায়, ইচ্ছা করে না দিলে। কাল কথায় কথায় হয়তো দু-একটা কথা এমন বলে ফেলোছি, যা না বললেই ভাল হতো। সব সময়ে কি মাথা ঠিক থাকে! ওব জন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না।”

তার এই বিনয় প্রকাশের দরুন আমি একটু সন্নিবিধা পেলাম। আমি তখনই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার কবতেও ছাড়লাম না—বললাম—“বলেন কি? আমি জানি, বিবৃতি আমাকে দিতেই হবে। আমি অত্যন্ত উদ্বেগী হইয়া আছি, মানুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন অবস্থায় কেমন করে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়, তা দেখতে পাব—সম্ভবত অবিলম্বে আমার বেলাতেই দেখতে পাব। এখন দেখি, আপনি টলটো গাইছেন।”

সামসুন্দহায়েব—“আচ্ছা! আচ্ছা! দেখা যাবে এখন! আমি একটু আসি।” এই বলে সামসুন্দহায়েব সে ঘর থেকে চলে গেল।

একটু পরে আমাকে সে ঘর থেকে নিয়ে গিয়ে আর একটা জামগাধা একটা বেগম উপবাসিয়ে রাখলো। সামনে দিয়ে লোকজন হাওধা-আসা করবে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি। আব মনে মনে ভাবি—এখন পর্যন্ত তো নরমে-গবমে চলছে। কখন যে আব এক পদী উঠতে উঠে প্রহারে ধনজবের পালা সুদূর করবে, তার ঠিক নেই। তবে আমাব পথ আমি ইতিপূর্বেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। পথটা এই যে, আমার মতে আমি অবিচলিত থাকবো—একটুকু ক্ষুদ্র হতে দেবো না। কিন্তু মুখে লম্বাই-চঙড়াই করবো না, কটু কথা বলে অনর্থক অন্যকে আঘাত করবো না, যতটা পারি, চুপ করে না থেকে, সব কথার জবাব দেবো এবং ধীরে ধীরে সহজভাবে কথা বলবো কিছুমাত্র উত্তেজিত না হই।

এক সময়ে বুঝা বয়সের একটি আই বি কর্মচারী এসে জড়সড়ভাবে আমাব পাশে বসলো এবং বুঝে সম্প্রদায়ের সঙ্গো কথা বলতে আরম্ভ করলো—“আপনার কত নাম শুনোছি। কত লোক আপনাকে দেখতে আসে ও দেখে যায়। আমিও দেখতে এসেছি।”

আমি—“আপনি কে?”

উত্তর—“আমি সামান্য লোক—গরীব

কর্মচারী এই আফিসেই চাকরী করি। তারপরে ইতস্তত করে বুঝে সম্প্রদায়ের সঙ্গো বললো—“আমি একটা কথা বলতে চাই, যদি কিছু মনে না করেন।”

আমি—“বলুন।”

উত্তর—“দেখুন, আপনি যে বিবৃতি দেবেন, তা যদি আমার মারফতে দেন, তবে আমি গরীব মানুষ, আমার বুঝ উপকার হয়। আপনাবা তো গরীবের জন্যেই সব কিছু করেন।”

আমি একটু উত্তেজিত সুরেই বললাম—“young an (যুবক), তোমার লজ্জা করলো না—তোমাব মাথা হেঁট হয়ে পড়লো না, এ কথা বলতে? এমন হীন প্রস্তাব করতে পারে আজ-কালকার দিনে কোনো বাঙালী যুবক, এ কথা আমি ভাবতেই পারি নে? সাবধান যুবক, এখনো তোমার বয়স অল্প—এখনো তুমি এরূপ দুষ্কার্যে পাকা হও নি। আব কখনো তুমি এ কাজে হাত দিও না—বাঙালী যুবকের নাম কলঙ্কিত কবো না। জীবনে টাকাটাই কি কড় কথা? উচ্চ আদর্শ বলে কি কিছু নেই? দেখতে পাও না—বাঙালী যুবক আদর্শের জন্যে শূন্য হবে না—কেমন করে সত্যবরণ করে? তোমাব মানুষ হও—মানুষের মতো মানুষ হও। তোমাদের কার্য-কলাপ দেখে যেন সম্প্রদায় মানুষের মাথা নুয়ে পড়ে। আর কখনো এরূপ কথা মুখে এনো না।”

যেচারা মাথাটা হেঁট করে রইলো। আর কোনো কথা বলতে পারলো না। তারপরে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। এর পরে আর কখনো তাকে দেখি নি—দেখসেও সেই লোক বলে চিনতে পারি নি।

রাত হয়েছে। আই বি আফিসের একটা ঘরে বসে আছি। গিরিজাবাবু এলেন সেখানে। তিনিই আমাকে গ্রেপ্তার করে এনেছিলেন। আমার গ্রেপ্তারের জন্যে যে পাঁচ হাজার টাকা পুরুস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, তাও তিনিই পেয়েছিলেন। গিরিজাবাবুর সঙ্গে সেই আফিসের একটি মাদ্রাজী কর্মচারীও এসে আমার কাছেই বসে পড়লো। তাব পবে চললো তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা।

মাদ্রাজী কর্মচারী—Girija-Babu, how much have you got to your credit? Indeed, you have grabbed a good amount. you should be thankful to Mr. Gupta.

(“গিরিজাবাবু! টাকার অঙ্কটা কত দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত? অঙ্কটা তো বেশ ভালই বলা যায়। এ জন্যে তোমার ফিস্টার গুপ্তের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।”)

এ আলোচনা গিরিজাবাবুব পক্ষে মোটেই প্রীতিকর নয়, বলাই বাহুল্য। তাই তিনি কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করছেন, মনে হোলো।

মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি আবার বলতে আরম্ভ করলেন—

Really you are fortunate, Cirija B bu. You see, some day you will have to go somewhere there you will require something to fall back upon. You have secured enough for that day. It will stand to you in good stead; no doubt

(“সত্যিই তুমি ভাগ্যবান, গিরিজাবাবু! একদিন তো তোমাকে অন্য কোথাও যেতেই হবে। সেখানে তো তোমার এমন একটা ভরসা চাই, যার উপরে নির্ভর করতে পারো। সেদিনের জন্যে তুমি বেশ কিছু জমিরে নিয়েছ। এই জমা নিশ্চয় সেদিন তোমার কাজে লাগবে।”)

গিরিজাবাবুব মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো, তিনি যেন কথাগুলিব মানে ঠিক মত ধরতে পারছেন না। তিনি কিছু না বলে শূন্য একটু মৃচকি হাসছিলেন। সে হাসিও যেন বেকুবের হাসির মতই মনে হচ্ছিলো।

একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে আই বি আফিসে এসে বসে আছি চুপচাপ। অনেকক্ষণ কেউ কাছে ঘেঁসলো না। বিকেলের দিকে একটি লোক এসে আমাকে ডেকে বিনে গেলো বনবিহারীবাবুব ঘরে। গিয়ে দেখি, বনবিহারীবাবু ও ইনসপেক্টার মণি বোস দুইজনে দুই চেয়ারে বসে অছেন। তখনকার দিনে মণি বোস কীর্তমান পুরুষ ছিলেন। একবার আদায়ের জন্যে কিল-ঘুসি-লাঞ্চ-ধামাড়া সহযোগে নানাবিধ মধুর সম্পদের সম্ভাষণে আত্মপ্রিয়িত করা—খেতে না দিয়ে ভুক-হরতাল করতে বাধ্য করা—শুতে না দিয়ে দেয়ালে হাতকড়ি লাগিয়ে সন্নাক্ষণ ঠার ঠাড় করিয়ে রাখা ইত্যাদি তাঁর কীর্তি-কলাপের অন্যতম। তাই রাজনৈতিক বন্দীদের ভিতরে মণি বোস একজন জ্বরদস্ত কর্মচারী বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আমি সে ঘরে গিয়ে আব একটা চেয়ারে বসলাম। ওরা দুজনে আগে থেকেই একটা ব্যাপার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছিলেন। আমি গিয়েই শুনলাম, মণিবাবু বলছেন—“এ একবারে ছেলে-মানুষী—নেহাং ছেলে-মানুষী।”

বনবিহারীবাবু আমাকে বললেন—“সুভাষবাবুর কথা হচ্ছিলো। তিনি আজ আইন অমান্য করে সভা করতে গিয়েছিলেন। তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।”

মণিবাবু বললেন—“একটা বাহাদুরী ফালানো আর কি? তুই মেয়র মানুষ—তুই নিজে কেন গেলি এমন গোঁরাভূমি কবতে? যেমন মানলো না পুন্ডিশের নিষেধ, পুন্ডিশ-ও তেমন আজ্ঞা করে লাঠি পেটা করে শাস্তা করে দিয়েছে।”

বনবিহারীবাবু—“সত্যিই তো। নিজে না গেলেই তো হতো। এই যে অনর্থক মার-টা খেলি, নেহাংই বৃষ্টির দোষে, বলতে হবে। আপনি কি বলেন? আপনাদেরই তো নেতা সুভাষ বোস—তিনি এটা কি করলেন।”

এই নিয়ে এদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি

করতে যাওয়া পশ্চাৎমনে করে আমি চুপ করে বইলাম।

বনবিহারীবাৰু আবার বললেন—“কি অনৈরঞ্জনবাৰু! একেবারে চুপ করেই বইলেন যে। সুভাষ বোস তো আপনাদেরই নেতা—তাব সম্বন্ধে কথা বলতে বাধা কি?”

আমি বললাম—“সুভাষবাৰু আমাদের নেতা নিশ্চয়—একথা বার সত্য। কিন্তু আপনারা যা আলোচনা কৰছেন, আপনাবাই তা করুন—আমায় কেন ডাকছেন এবং মধ্য?”

বনবিহারীবাৰু—“বলুন না মশাই। এ তো আর বিবৃতি দেওয়া নয়?”

আমি—“আমি কি বলবো বলুন। আমাকে বলতে হলে এ কথাই বলতে হয় যে, যা বোঝেন না, তা নিয়ে অনবিবার চর্চা না করাই ভাল। আপনারা রঞ্জনীতি কি বোঝেন? আব পদলিশের বোঝবার কথাও নয় বাজনাতি। আপনারা তাঁকে খপবে পেয়েছেন, আব বেশ এক হাত নিষে নিয়েছেন। ব্যাস—সব চুকে-চুকে গেল।”

এব পবে মণিবাৰু কি একটা কথা বলতে উদ্যত হয়েছিলেন। বনবিহারীবাৰু তাঁকে থামিয়ে দিবে বললেন—“বাক্ গে, এ সব কথা কাক্স নেই।” তাব পবে আমাকে বললেন—“মনোবঞ্জনবাৰু! আপনি যে কিছুই বললেন না, এটা কি ভালো হলো?”

আমি—“না হলোই বা কি আর করা যায়?”

বনবিহারীবাৰু—“আপনি একটা কিছু বলবেন তো? না হয়, বলুন না, আপনি কিছু জানেন না—আপনি কিছু কবেন নি—শুধু শুধুই আপনাকে ধবে নিয়ে এসেছে। তবু একটা কিছু বলুন না।”

হঠাৎ আমার মূখ থেকে বেরিয়ে গেল—“আপনাবা কি একথা বোঝেন না যে, সত্যি কথা আমি বলতে পারি নে, আব মধ্য আমি বলি নে। তবে আব আমি কি বলতে পারি?”

কথাটা আমি ভেবেচিন্তে বলি নি। বলে ফেলেই আমার মনে হলো—“এ কি বললাম। এবুপ বড়াই কবে কথা বলার মতো বলতে তো আমি চাই নি।” বনবিহারীবাৰু ও মণিবাৰুব পানে চেয়ে তাঁদের মূখ দেখেও মূখলাম যে, তাঁবাও আমার মূখ থেকে এবুপ একটা তীক্ষ্ণ জবাব—এমন নির্ভেজাল সোজা সত্য কথা প্রত্যাশা কবেন নি।

অপ্রত্যাশিত বলেই, বোধ হয় তাঁবা কি জবাব দেবেন, স্থির কবে উঠতে পারছিলেন না। এমন সময় সামসুদ্দহার সাহেব এসে বললেন—“মনোবঞ্জনবাৰু, আপনাকে একবার ডি সি সাহেবের কাছে যেতে হবে। চলুন।”

আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম—একটা অপ্রীতিকর সম্ভাবনাব হাত থেকে বেহাই পেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে সামসুদ্দহারের অনুগমন করলাম। ডেপুটি কমিশনার মিস্টার হ্যানসনের ঘবে গিয়ে দেখি, তিনি একটা টেবিলের সামনে বসে ফাইলের পাতা গুটাজেন। সামসুদ্দহার সাহেব

আমাকে নিয়ে গিয়ে সেই টেবিলের অপব দিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তাব পরে তিনি বলতে লাগলেন—Sir, he has refused to make any statement. I tried my best, but I could not get anything from him. (স্যার, ইনি কোনো বিবৃতি দিতে রাজী হলেন না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই বার করতে পারি নি)।

হ্যানসন—I knew it before hand—knew that his inner consciousness of being a leader of the movement, would stand in the way of his making any statement. He may refuse to say anything to-day, but a day will surely come when he will have to answer for the sufferings of the boys who have got long terms imprisonment in the Dalhousie Square Bomb Case.

(এ তো আমি আগে থেকেই জানতাম। নিজের পদমর্যাদাবোধ ও নেতৃত্বের অহংকারেই সে মুখ বজ্জে থাকবে। কিন্তু সেদিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন ডালহৌসী স্কোয়ার বোমাব মামলার নিবাহ ছেলেদের অনর্থক দৃঃখকষ্ট ভোগের জন্যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।)

আমি—If that day comes, I know how to answer. (সেদিন এলে, কি জবাব দিতে হবে, আমি জানি।)

হ্যানসন—Do you mean to say that you are not responsible for their sufferings? (ভূমি কি বলতে চাও, তোমাব কোনো জবাবদিহি নেই?)

আমি—I mean to say I am responsible for my own actions and they are responsible for theirs. (আমি বলতে চাই, যে আমার কাজের জন্যে জবাবদিহি আমার এবং অন্যের কাজের জবাবদিহি তাদের নিজেদের।)

হ্যানসন—It is useless to carry on this sort of futile arguing. I have no more business with him. You need not bring him to me again. (এরূপ অনর্থক তর্ক কবে আব কি হবে। একে আর আমার কাছে আনবার দরকার নেই।)

তাব পবে আমাকে সেখান থেকে সরায়ে নিয়ে এসে সন্ধ্যাব পবে পানবাস দেওয়ানাব বসেদখানাব পাঠিয়ে দিল। বনবঞ্জন গিয়ে দেখি, দোতলাব প্রশস্ত বাবাসন এবটা ইতি চেষ্টাবের উপবে সুভাষবাৰু ডেপুটি সুভাষ-চন্দ্র বসু) হাত-পা ছড়িয়ে বিপত্ত হবো পড়ে আছেন। আমাকে সেখান নিষ এনে দোতলাব বন্দী-বোঠাব ঢুকিয়ে দিলে। সেই কোঠাব লোহাব শিক-ওয়াল কপাসে সামনেই সুভাষবাৰু ইঞ্জি-চেয়ারে শুল্কছিলেন। আমি তো সেইদিনই আই বি আকস থেকে শুনে এসেছি যে, সুভাষবাৰু সত্যি বসন্ত গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং গ্রেপ্তার কব সম্ব পদলিশ সুভাষবাৰুকেও ভীষণভাবে লাঠিপেটা করেছে। তাই আমি দবজাব সামনে দাঁড়ায় সুভাষবাৰুকে জিজ্ঞেস কবলাম—“ব মাসেছে?”

সুভাষবাৰু বললেন—“চল।” এমন সময় পাহাবাওয়া গাংগ এসে আমার ঘবেব দরজাব খুলে আমাবে অন্ত ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে নিষ গেগেগা সেখান থেকে আব সুভাষবাৰুকে দেখা গেল না। সে বাতটা সুভাষবাৰু সেই বাদল ইঞ্জি-চেয়ারে শুল্কই বাঁটনিছিলেন, কিন্তু ঘর হঠাৎই বিনা, তা জানাবাব যাব সংযোগ হঠাৎ গুঠে নি। পবেব দিন ভোববাব সুভাষবাৰু ইঞ্জি-চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে আমার ঘবেব সামনে পেতে বসে পড়লেন। আমার মধ্য কথা বলার উদ্দেশ্যেই যে তিনি চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে বসেছিলেন, তাও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সুভাষবাৰুব কথা বলতে আবম্ভ করার পূর্বেই পদলিশ আমাকে আবার অন্য ঘবে সরায়ে নিয়ে গেল।

তারপবে আব কখনো সুভাষবাৰু সাংগে আমার দেখা হয় নি। “বনব” কথাটাই সুভাষবাৰুব মূখ থেকে শোনা আমার গেল কথা। সেইদিনই সুভাষবাৰুকে নিয়ে গেল আদালতে বিচারের জন্যে। সেখানে তাঁব সাজা হল—তিনি জেলে গেলেন—তারপবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় নজব-বন্দী অবস্থায় কিছু দিন নিজের বাড়িতে থাকলেন—সেখান থেকেই একদিন তিনি গোপনে জঙ্গালেশে বাবল হঠাৎ জামানীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আমাকেও সেইদিনই পদলিশ পাঠিয়ে দিল আলিপূব নিউ সেন্ট্রাল জেল ডালহৌসী স্কোয়ার বোমাব মামলার দ্বিতীয় দফাব বিচারাবধীন আসামী হিসেবে। কিন্তু শেখ পবন্ত পদলিশ যথোপযুক্ত প্রমাণেব অভাবে আমার নামে কোনো মকদ্দমা দায়ব কবতে না পেবে আমাকে রাষ্ট্রবন্দী হিসেবে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

বিস্তারী হিসেবে গ্রেপ্তারের পবে পদলিশেব বিশেষ শাখায় ঘাণ্ডা আই বি পদলিশের হেপাজতে থাকাকালে ব্যবহটা দিব আমাকে নিষ যে দৃশ্যের পর দৃশ্য অতিনীত হয়েছিল, এইভাবে ঘটলো তব বনবিহারী-পতন—পরি-সমাপ্ত।

বাংলা জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী

বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে বৃটিশ শাসনের কবল থেকে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য বৈশ্বিক কর্মপ্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। বিপ্লব-আন্দোলনের প্রাথমিক প্রয়োজন হিসাবে বর্তমান শতকের একেবারে গোড়াকার সময়টাতে দৈহিক স্বাস্থ্য-গঠন ও মানসিক শক্তির বিকাশের জন্য বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে আখড়া বা ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয়। এই কর্মপ্রচেষ্টার চরমগতিযুক্ত বাঁকুড়া জেলার উত্তর মন্ডির দিকে নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। অগ্নি-হুগের প্রখ্যাত বিপ্লবী বারীন ঘোষের নেতৃত্বে পবিচালিত 'বৃগান্তর' দলের কর্মতৎপরতা এই জেলাতেও সম্প্রসারিত হয়।

এবং ফলে গঠিত হয় বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি স্থানে শরীরচর্চার আখড়া এবং এগুলোর কয়েকটি বিপ্লবী কর্মীগণের প্রশিক্ষণ ও গোপনে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাঁকুড়া শহরে বড় কালী চলায় এখনও পর্যন্ত বর্তমান যে হাবিসভা আছে, তাইই পশ্চিমে রামদাস চক্রবর্তীর প্রাসঙ্গ্য আখড়া বিপ্লবীদের একটি সংযোগ-কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে এবং এ জেলার বিদেশী বন্ধনের যে জোয়ার নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, এটি ছিল তার প্রাণকেন্দ্র। কথিত আছে, স্বর্গত হাবিব পাখোপাধ্যায় এই কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এই ব্যায়ামাগার স্থানীয় জনসাধারণের কাছে রামদাস পাখোপাধ্যায়ের আখড়া নামে পরিচিত ছিল। এই আখড়ার যারা সভ্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে গোবিন্দ মিত্র, শৈলেন ঘোষ, সুব্রেন মুখোপাধ্যায়, রাস্তার মুখোপাধ্যায়, সুব্রেন মন্ডল, চৈতন্য চট্টোপাধ্যায়, বেনী ঘোষ প্রমুখদের নাম জানা যায়। সুস্থ ও সবল দেহগঠনের জন্য শরীরচর্চা, লাঠি-খেলা, ছোবা ও তলোয়ার খেলা, কুস্তি, দৃষ্টিশিক্ষা প্রভৃতিতে অনুশীলন আখড়ার প্রধান কর্ম ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যদেরকে নৈতিক চরিত্র-গঠনে অনুপ্রাণিত করার জন্য বিশেষভাবে গীতা ও উপনিষদ-পাঠ আখড়ার কর্মতালিকার বিশেষ অঙ্গ ছিল।

• এই সময়ে কলকাতা হতে প্রকাশিত 'হুগান্তর' দলের মূখপত্র 'হুগান্তর' পত্রিকা বাঁকুড়ায় আসত। রামদাসবাবু আখড়ায় আগমনের পর থেকেই এই প্রত্যাশার বিপ্লবী নামক বারীন ঘোষ বিপ্লবী শ্রীবিভূতি-ভূষণ সরকারকে বাঁকুড়ায় পাঠান। আনুমানিক

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বারীন ঘোষের চিঠি সংগে নিয়ে তিনি রামদাস চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করেন। এই চিঠিতে হারিসভার কোন আশঙ্কাসমূহ থাকলে তা বিভূতিবাবু সংগে পাঠিয়ে দেবার জন্য বলা ছিল। কিন্তু এখানে এ জাতীয় কিছু পাওয়া যায় নি।

মূলতঃ বহিরাঙ্গম থেকে রক্ষা করবার জন্য সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত সামন্ত সর্দার নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা স্ব স্ব এলাকায় একচ্ছত্র অধিপতিব মত সাড়ম্বরে ও সম্মানে কালযাপন করতেন। কিন্তু বিদেশী শাসনের ফলে, বিশেষভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে তাঁদের অনেকেই ক্রমশ হীনবল ও দরিদ্র হয়ে পড়েন। এবিধ অনিবার্য ফলাফল ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁরা এক স্বাভাবিক বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। তাই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যখন যে অভ্যুত্থান ঘটেছে, এই সামন্ত সর্দারগণ তখন তাকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে সমর্থন কবেছেন। বাঁকুড়া জেলার কংসবতী ও কুমারী নদীস্বরের সংযোগস্থলে অবস্থিত অম্বিকানগরের এমনি লোকপ্রিয় দরিদ্র সামন্ত সর্দার স্বর্গত রাইচরণ ধবলদেব বংগদেশে বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক-রূপে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কারণে প্রদীপ্ত এই দীর্ঘমেয়াদে পুরুষটি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশমাতৃকার পরাধীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য এ অঞ্চলের দেশপ্রেমিকদের নিকট প্রেরণাঞ্চল ছিলেন। রাইচরণ কি উদ্দেশ্যে ও কিভাবে এই বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে অনেকে বলেন, ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের পবিত্র দায়িত্ববোধের উদ্দীপনা তাঁর মধ্যে ছিল। আবার কারো কারো মত হল, স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে এই সামন্ত সর্দারগণ তাদের হুজুরগির পুনরুদ্ধার করতে পারবেন—এই আকাঙ্ক্ষা হয়ত তাঁর মধ্যে ছিল। সে যাই হোক, ইহা নিঃসন্দেহ যে, তিনি আন্তরিকভাবে দেশপ্রেমিক ছিলেন।

• খাতড়া থানার মসিরাড়া গ্রামের কাছে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের জমিদার গোলামদেবের সিমলাবাড়ি ইত্যাদি কয়েকটি মৌজা ছিল। নবেন্দ্রনাথ গোস্বামী (তিনি ইতিমধ্যেই শ্রীরামপুর হুগান্তর দলের সম্পর্কে এসেছিলেন) মাঝে মাঝে সেখানে আসতেন।

সম্ভবতঃ তাঁরই প্রভাব। রাইচরণ ধবলদেব বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

রাইচরণ ধবলদেবের সঙ্গে নরেন-গোসাঁই ও বারীন ঘোষের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। অম্বিকানগরে এই বিপ্লবীদের উপস্থিতির কথা জানা যায়। ধবলদেবের গৃহে কিছুকাল তাঁরা অবস্থানও করেছিলেন। অম্বিকানগরের পথে খাতড়ার বারীন ঘোষের জন্মবৈশিষ্ট্য অবস্থানের কথাও জানা যায়। এই প্রসঙ্গে অনেকে বলেন, বিপ্লবী শহীদ প্রফুল্ল চাকী ও বারীন ঘোষের সঙ্গে অম্বিকানগরে এসেছিলেন। শহীদ কানাইলাল দত্তও এখানে এসেছিলেন, এরূপ মনে করবারও কারণ আছে। তবে অম্বিকানগরে কানাই দত্ত ও প্রফুল্ল চাকীর উপস্থিতি সম্প্রদায়ভিত্তিকভাবে প্রমাণ করবার মত উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বহু চেষ্টা করেও আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, বারীন ঘোষ ও নরেন গোসাঁই ছাড়া আরও দুইজনজন অজ্ঞাতনামা বিপ্লবী অম্বিকানগরে এসেছিলেন। রাইচরণের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহই নাকি ছিল তাঁদের অম্বিকানগরে আসার মূখ্য উদ্দেশ্য। তখন ধবলদেবের যে আর্থিক দুরবস্থার কথা শোনা যায়, তাতে এই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে খুব সমীচীন কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে রাইচরণ ধবলদেবের ক্ষত্রিয় নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিক ডাকাতির স্মরণার্থ সংগ্রহ করা হত। রাইচরণের তখন জমিদারী না থাকলেও স্থানীয় অধিবাসীদের উপর অপরিসীম প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। গ্রামের কয়েকজন সাহসী দূর্ব্য ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি এই দল গঠন করেছিলেন। অম্বিকানগরের নিকটবর্তী কুমারী নদীর ওপারে জঙ্গলাকীর্ণ গিরাই কাটাতে রাইচরণের সহকর্মীগণ শরীরচর্চা করতেন। এই রাজনৈতিক ডাকাতির উদ্যোগ স্বরূপ জনৈক ডাকালীন ব্যক্তি আমাদের বলেছেন যে, মানবাজারের রেন্টাল সাহেবের গালাব কুঠি ছিল; এই সাহেবের ভের হাজার টাকা গোপালনগরের কাছে জিতজুড়িতে লুট করে বারীন ঘোষের কাছে পাঠান হয়েছিল। রাইচরণ, হৃদয়েশ দত্ত, ফেরাওয়াল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এই ডাকাতির দলে ছিলেন। অম্বিকানগরে দেশীয় পিপল প্রভৃতি আগমনের তৈরি হত। এ কারণে হারু হাড়ি নামে

একজন সূক্ষ্ম কাবিগর প্রভুতভাবে সাহায্য করতেন।

১৯০৬ খৃস্টাব্দ নাগাদ ছেঁদাপাথর গ্রামে বিপ্লবীদের একটি কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রুক্মিণী রায় নামে জনৈক ব্যক্তি এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবীদের এই গৃহটি উত্তরকালে রুক্মিণী রায়ের ভেজা নামে উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রাচীন কাগজপত্র দেখবার সুযোগ আমাদের হলে তা থেকে আমাদের অনুমান রুক্মিণী রায় মেদিনীপুরের নন্দ জমিদারদের কাছ থেকে এখানে চাষাবাদের জন্য জমি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ও দুর্গাচরণ ঘোষ এখানে দুর্ভিত্ত বিঘার মত জমি হাসিল বা কর্ষণযোগ্য করে তোলেন। তাঁরা পশ্চিমবর্তী ঘোড়াডোবা গ্রামের নাবাগ মাহাত নামে একজন ব্যক্তিকে তাঁদের ভূতাব্দে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। পর্বতবর্তীকালে এখানকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে স্বদেশীওয়ালা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন মতে রুক্মিণী রায় চাষাবাদ করতেন না; এই বিপ্লব কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজেদের হাবীতকী ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিতেন। তবে খুব সম্ভবত নন্দ জমিদারদের সদর ম্যানেজার ধরনীধর সিংহের উপস্থিতিতে জমিদারদের অন্ততম কর্মচারী মাখনলাল সিংহের কাছ থেকে রুক্মিণী রায় চাষাবাদের জন্য জমি সংগ্রহ করেছিলেন। এজন্য তিনি পাঁচ টাকা মত খাজনা দিবেছিলেন। কিন্তু কোন দাখিলা বা লিখিত আধিকারপত্র এজন্য সংগ্রহ করেন নি। রুক্মিণী রায়ের কাছ থেকে গৃহীত অর্থ কর্মচারীগণ বোঝাতে জমা দেন নি; এবং জমি বন্দোবস্তের ব্যাপারে পবে ঠিক হবে এইরূপ স্থির হয়।

আজ থেকে ষাট বছর আগে ছেঁদাপাথর অঞ্চল ছিল হিংস্র শ্বাপদ-সংকুল দুর্ভেদ্য অরণ্যবৃত্ত, নির্বিড় বনানীর অগভীরবর্তী অস্বপ্নপশু। গ্রামে সামান্য কয়েক ঘর মাহাতের বসবাস ছিল। মেদিনীপুরের গিধূনী বেল-স্টেশন থেকে এর দুবছর সতের মাইল। গিধূনী হতে বিপ্লবগণ হাটপথে ছেঁদাপাথরে আসতেন। এ পথে এ অঞ্চল হতে কেদপাতা সংগ্রহ করে গবুর গাড়িতে মেদিনীপুরের দিকে চালান দেওয়া হত। অনেকের ধারণা, এই কেদপাতার আচ্ছাদনে এখানকার আশ্রয়স্থল অস্বপ্ন পটন হত। ছেঁদাপাথর তখন ছিল রাইপুরে থানার অন্তর্গত।

এখানে যে ঘরে তাঁরা থাকতেন তাব চাবদিক একটি বিঘাট মাটিঘর দেয়াল দিয়ে ঘেঁরা ছিল। প্রাচীরের চাবদিকে দরজা ছিল। গৃহের মধ্যে ঘর ছাড়া একটি কুপও ছিল। কুপটি এখন বৃষ্টি গিশে আত্ম-বিলম্বিত শেষ মুহূর্তটির প্রতীকায় রয়েছে। ঘর প্রাচীর সব কিছুরই চিহ্ন মৃত্তিকার সঙ্গে একাত্মতা রচনা করছে। এ সুগন্ধ বৃষ্টিজীবী কৌতুহলী দর্শকদের চোখের কাছে ব্যর্থ সাধনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছুক

নয়। কিন্তু ছেঁদাপাথর আজ ইতিহাসের অংশ। তাব আবেগ নির্জনতায় দর্শীচরা কবেছেন রাগিত ভপস্যা; পবে বাঁরা অবগোদয় দেখল, তাদের কাছে এ স্মৃতিচিহ্নের মূল্য কি অপরিমিত নয়?

রুক্মিণী বাঘেব এই কেন্দ্রটি স্থানীয় জনসাধারণ গোলকধাড়া বা ছায়াবাজিও বলত। এখন ইহা ক্ষুদ্রবামেব আগ্রম নামে পরিচিত। সমকালীন লোকদের কাছ থেকে জানা যায়, বিপ্লবগণ জমিদারের লোক বলে পরিচয় দিতেন এবং 'নন্দকানন' নামে পরিচিত নন্দ জমিদারের কাছারী বাড়িতে থাকতেন। এই নন্দকাননেই বর্তমানে শহীদ পার্কটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিপ্লবীরা এখানে ব্যায়াম অভ্যাস করতেন, সন্ধ্যার পর কেন্দ্রের বেতন ও ভোরে চলে আসতেন। আশে-পাশের ছোট ছোট পাহাড় বিভলবারের লক্ষ্য ঠিক করতেন বলে শোনা যায়। বিপ্লব-আন্দোলনের লোকেরা নিজেদের হুমকি হিসাবে গোলকধাড়া অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকলে কাচ লাগানো ছিদ্রপথে দিল্লী, কলকাতা প্রভৃতি শহর দেখিবে বেড়াতে। এজন্য তাঁদের গোলকধাড়া লোক বলা হত। একই কারণে তাঁদের ঘরকে গোলকধাড়া ঘর ওখানকার জঙ্গলকে গোলকধাড়া জঙ্গল, মাঠকে গোলকধাড়া মাঠ বলা হত। বছরখানেক পরে তাঁরা চাষাবাদের কাজ অবস্ত করতেন। তখন ঘোড়াডোবা গ্রামের নাবাগ মাহাত এই কাজবর্মের প্রধান দায়িত্ব পালন করতেন। এই কেন্দ্রের লোকেরা নিকটবর্তী বাঁধে মাটি-কাটার কাজও করতেন। ঘোড়াডোবার গ্রামের নাবাগ মাহাত, নইবর তাঁতি ও শ্বারী মাহাতের কাছ থেকে তাঁরা প্রচুর সহযোগিতা পেতেন। ঐ গ্রামের শ্যাম মাহাত নামে আরো একজন ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। স্বদেশী-ওয়ালাগণ গ্রামবাসীদেরকে ছায়াবাজি, ম্যাজিক ইত্যাদিও দেখাতেন। তাঁদের ঘরের কিছু দুর্বে গভীর শালবনে বোমা প্রভৃতি আশ্রয়স্থল

বিকৃত থাকত। এ কেন্দ্রটিতে যে আশ্রয়স্থল ছিল তাতে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই কেন্দ্রটির সঙ্গে ধার্মিক সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে শহীদ ক্ষুদ্রবাম, বাঁহুচরণ, দরজা-দেব ছাড়া রামপালের চমিকর বালিচন্দ্র নাবাগ দেও প্রমুখের নামও শোনা যায়। ঐ সময়ে শ্যামসুন্দরপুরে প্রচুর দেশীয় বন্দুক ও বোমা তৈরী হত। পরে সরকারী নিষেধনের ভয়ে সব নষ্ট করে ফেলা হয়। কোন কোন মতে রুক্মিণী রায়, ক্ষুদ্রবাম ও অরিনাশ—এই তিনজন প্রধানত এখানে থাকতেন। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রচুর চাকী এখানে অনেক দিন ছিল এবং ক্ষুদ্রবাম একবার দুর্ভিত্ত দিনের জন্য এখানে এসেছিলেন। আবার যে মাখনলাল সিংহ রুক্মিণী রায়কে জমি বন্দোবস্ত দিবেছিলেন তিনি আদালতের এক সাক্ষ্য বলেছেন, সত্যেন্দ্র (বিপ্লবী শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু) ও ক্ষুদ্রবাম (বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদ্রবাম বসু) এই কেন্দ্র মাহাতের করতেন। এই কেন্দ্রের সঙ্গে এই প্রখ্যাত বিপ্লবীদের কি সম্পর্ক ছিল সে বহু উল্লেখ করা কঠিন। তবে ইহা লক্ষ্য করবার বিষয়, স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিশ্বাস ক্ষুদ্রবাম এখানে ছিলেন। ১০ নং পাথরের জনৈক বৃদ্ধ ক্ষুদ্রবামের মেদিনী থেকে গবুর গাড়ীতে করে গিয়া এসেছেন বলে দাবী করেন। মেদিনীপুরে গ্রামে দুর্ভিত্তজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা গোলকধাড়া নামে একটি কিশোরকে দেখেছেন বলে আশ্রয়স্থল জানান। তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন রাখা, এই বিশাল ক্ষুদ্রবাম। পুলিশী তত্ত্বাবধি পর থেকে এ কেন্দ্রটি ক্ষুদ্রবামের আগ্রম বলে পরিচিত হয়ে আসছে। অতএব ক্ষুদ্রবামের স্মৃতি এ কেন্দ্রটির ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল—এ মত উপস্থাপনা করা কঠিন। তবে এমনও হতে পারে, শহীদ হিসাবে অতি পরিচিত, বা তাঁর প্রতিটি গৃহে উচ্চাভি, অস্বপ্ননামা চারণের গতিবিধি

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

সম্পাদক : ধীরেন্দ্র দেবনাথ

এ সংখ্যায় লিখেছেন—

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার গুহ, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ বীতানন্দ মৈত্র, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, রামেশ্বর দা, রামচন্দ্র নাথিকী, সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক।

বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা চাব টাকা (গ্রাহকের দায়িত্বে সার্টিফিকেট অব পোস্টেজ যোগে) এবং বৈজ্ঞানিকযোগে সাত টাকা।

অনুসন্ধান: পত্রিকা-সম্পাদক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,

৬৪ স্বাবকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

পরিবেশক: পত্রিকা সিন্ডিকেট (প্রা) লিঃ

১২১ লিডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

ক্ষদ্ররাম নামটি ঘোড়দোবা-ছেদাপাথরের সরলবৃত্তি সাধারণ মানুষদের দেখা কিশোরটির উপর আবোপিত হয়েছে। এই মানুষগুলো বিপ্লব-আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্ব সম্পর্কে নিশ্চয়ই অজ্ঞ ছিলেন ও বিপ্লবীরাও স্বনামে আত্ম-পরিচয় দিতেন না; কিন্তু ছেদাপাথরের কর্মনাটে যখন স্বনিকাপাত ঘটল, তখন তার অন্তরালবর্তী চাপাকঠের কথাবার্তাও কি কোন সত্য আবিষ্কারের সম্ভাবনা ছিল না? কিন্তু রাইচরণ ধবলদেবের সঙ্গে যে এ কেন্দ্রটির ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল তা সন্দেহাতীত। অম্বিকানগর হতে অম্বপুন্ডে রাষ্ট্রব অম্বকারে মৃত্যুবরণ্যে এই ক্ষত্রিয় বীর অবশ্যপক্ষে ছেদাপাথরে যাতায়াত করতেন। তিনি সাধারণত অর্থ-সাহায্যও করতেন। আমাদের বিশ্বাস এই কেন্দ্রটি নন্দ জমিদারদের কর্মচারী ধরণীধর সিংহ ও মাখনলাল সিংহ প্রভৃতিব সঙ্গে যোগাযোগক্রমে গড়ে উঠেছিল। অতএব ইহা মূলতই স্বাভাবিক যে, অন্তত এই দু'জন ব্যক্তি বিপ্লবীদের দৃঢ়তার জনকে চিন্তিতেন। সুতরাং শূর্বোক্তাখিত মাখনলাল সিংহের সাক্ষ্য উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ না করারও কোন কারণ দেখতে পাওয়া যায় না।

কিভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ধরনের টিবি-হুল নিবিড় জঙ্গলে বিপ্লবীগণের অয়েলস্ট্র লগ্নহ ও তাব ব্যবহার শিক্ষা এবং বোমা প্রস্তুত করবার এই কেন্দ্রটি গড়ে উঠে সে সম্পর্কে অনেকব অনুমান, নরেন গোসাই এ সুত্রাক্ত স্থানটির স্থান দিরেছিলেন এবং রাইচরণ এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসী ৫ অন্যান্যদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, জমিদারদের কয়েকজন কর্মচারীর সহায়তায় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ এই কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীগণ জমিদারদের লোক বলে পরিচিত ছিলেন; সুতরাং স্থানীয় লোকেরা তাঁদের সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ ধারণা পোষণ করতেন না। তাঁরা কাছারীবাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতেন। রক্ষণী রায় ও জমিদারদের কর্মচারী ছিলেন বলে জানা যায়। তারপর এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে জমির বন্দোবস্ত হয় তাও একটি মৌখিক বন্দোবস্ত মাত্র। মনে হয়, মেদিনীপুরের বিপ্লবী গোষ্ঠী গিধনীর পথে এখানে এসে জমিদার কর্মচারীদের সহ-যোগিতা এই কেন্দ্র স্থাপন করেন; পরে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত অম্বিকানগরের রাইচরণের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ স্থাপিত হয়।

১৯০৮ খৃস্টাব্দে মাখিকতলার বোমা তৈয়ারীর কারখানা কলকাতার পুলিশ

আবিষ্কার করে। এই সম্পর্কে অত ব্যক্তিদের মধ্যে নরেন গোসাই নিজেকে রাজসাক্ষী বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর স্বীকারোক্তি ফলে এই সকল কেন্দ্রের কথা জানাজানি হয়ে পড়ে। বাঁকুড়া শহরে হরিহর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুলিশ খানাতল্লাসী করে এবং বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই সন্দেহে রামদাস চক্রবর্তী, সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। কিছুদিন হাজত ভোগের পর প্রমাণ ভাবে তাঁরা মুক্তি পান।

অম্বিকানগরে রাইচরণ ধবলদেবের গৃহ তল্লাসের জন্য ছোটনাগপুর ডিভিশনের ডি-আই-জির নেতৃত্বে কোল আর্মড পুলিশ খাতিয়ার এসে উপস্থিত হয়। সেদিন কংসাবতী ও কুমারী নদী প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। পারাপারের জন্য যে ডিগি ব্যবহার করা হয়, তাব সাহায্যে কংসাবতী অতিক্রম করা অসম্ভব হওয়ায় পুলিশবাহিনী অম্বিকানগরে পৌঁছাতে পারে না। রাইচরণের আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করে পানু বজ্র নামে এক ব্যক্তি নিজ জীবনের মারা ত্যাগ করে খরস্রোতা কংসাবতীর উত্তাল বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাঁতার দিয়ে কাসাই অতিক্রম করে কুমারীর দক্ষিণ তটস্থ রাজবাড়ি এসে উপস্থিত হন। তাঁর কাছ থেকে ধবলদেব খাতিয়ার পুলিশের উপস্থিতির কথা জানতে পারেন। ফলে সাবধান হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র অন্যত্র স্থানান্তরিত করা সম্ভব ছিল না বলে সেগুলিকে কুমারীর গর্তে ও রাজবাড়ীর ইঁদারায় নিক্ষেপ করা হয়। সুতরাং অম্বিকানগরে তল্লাসী কার্য ফলপ্রসূ হয় নি। কিন্তু রাইচরণ ধবলদেব, ক্ষয়ীকেশ দত্ত, রানবাহারী রজক, হরাদন হাঁড়, ক্ষেত্রাবাম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। কিছুদিন অন্তরীণ রাখার পর প্রমাণভাবে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পানু বজ্র রাইচরণের গৃহমুখ্য হিসাবে নদী স্তবরণকালে যে নিঃস্বার্থ অমিতবিক্রমের পবিত্র দিয়াছেন তাব ফলে দেশপ্রেমের বীর্ষ-গাথায় তিনি ব্যোম মর্যাদার অধিকারী। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ত অচেতন এই অশিক্ষিত সাধারণ মানুষটির এই কীর্তি দেশপ্রেমিকগণ প্রস্রাব সঙ্গে চিরকাল স্মরণ করবে।

এই সময়ে ছেদাপাথরেও তল্লাসী চলে। সুবোধদের পূর্বে একদল পুলিশ রক্ষণী রায়ের কেল্লা ঘেরাও করে। পুলিশের আগমনের ফলেই গ্রামবাসীগণ গোলাকবীর লোকদের রাজনৈতিক ও বৈশ্ববিক কর্মপ্রচেষ্টার কথা জানতে পারে। কেল্লা ও নিকটবর্তী নন্দন-কাননে তল্লাসী চলে। কিন্তু আপাতকর কোন কিছু না পাওয়ার কাউকেই গ্রেফতার করা হয় নি। শোনা যায়, পুলিশবাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে বিপ্লবীগণ নিরাপদে পলায়ন করতে সক্ষম হন। কাজেই পুলিশ কেল্লা

মধ্যে প্রবেশ করে কাউকে লেগতে পায় নি। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে আমরা শুনেছি, গৃহমুখ্য কপটির মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ মাটি ফেলা হয়েছে এতদুপ দেখা যায় এর অর্থ দাঁড়ায়, বিপ্লবীগণ অস্ত্রশস্ত্র কয়েকটি মাটি চাপা দিয়ে চলে যান। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সমীচীন কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে—পুলিশের আগমনের খবর পেয়ে কপের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দিয়ে চলে যাওয়ার মত পর্যাণ্ত সময় তাঁরা পেয়েছিলেন কিনা এবং পুলিশও কেন কপের অভ্যন্তরে অনু-স্থান করে নি? এই কেন্দ্রে দু' বছরের মত কাজকর্ম চলেছিল। পুলিশী তল্লাসের পর রক্ষণী রায় ও তাঁর সঙ্গীরা কেল্লা ত্যাগ করে চলে যান। অবশ্য নারায়ণ মাহাত এখানে তাবপবও অনেকদিন ধরে বসবাস করেছিলেন।

অম্বিকানগরে বিপ্লববাহি পরাধীনতার জাতীয় শ্রানি উল্লীভূত করার জন্য বাঁকুড়ার বৃকে যে শিখা বিস্তৃত করেছিল তার এইটুকু পরিচয় শুধু আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। পবনপর বিরোধী তথা, অস্পষ্ট জনশ্রুতি, পরবর্তীকালের কল্পিত কাহিনী ইত্যাদির ছোঁচট বে এতে লাগে নি, এমন হয়ত নয়। তবে এর মধ্যে বিপ্লব আন্দোলনের কর্মপ্রচেষ্টার একটি অধ্যায় লুক্কায়িত আছে। আর স্পষ্টই বুঝা যায়, নরেন গোসাইর দেশদ্রোহিতামূলক আচরণে ফলে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার সদ্য উন্মুক্ত অঙ্গুর সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। দক্ষিণ বাঁকুড়ার অরণ্য সমাকীর্ণ নিভৃত অঞ্চলগুলিতে যে বৈশ্ববিক কর্ম-তৎপত্তা চলেছিল তা যদি সাফল্যের সঙ্গে আর কিছুকাল অগ্রসর হত, তবে ভারতবর্ষের বিপ্লব আন্দোলনে ইতিহাসে বাঁকুড়া জেলা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হত। এই প্রসঙ্গে আমরা নিবেদন কবি রাইচরণ ধবলদেবের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাজলি। বিপ্লবের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি রাজনৈতিক ডাকাতের নেতৃত্ব করেছেন, বিপ্লবীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন। অম্বিকানগর ও ছেদাপাথরে আশ্রয়স্বরূপ প্রস্তুত ও উহার প্রয়োগ শিক্ষার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত গুণে অশিক্ষিত দরিদ্র সাধারণ মানুষকেও তিনি স্বীয় অভীষ্ট কর্মে নিয়োজিত করতে পেয়েছেন। অতএব তাঁর গঠনশীল প্রতিভাকে আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবো।

পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনে সময়েও এই লুপ্ত গৌরব ও হৃদসর্বস্ব সামন্ত নায়ক দেশপ্রেমে উদ্বেগ হয়ে রাজনৈতিক কর্ম-দিগকে নানাভাবে সাহায্য দিয়েছেন ও অনুপ্রাণিত করেছেন। প্রমাণভাবে তাঁকে স্বীকৃতিস্বরূপ দণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা সম্ভব না হলেও তিনি যে এ জেলার একজন আদর্শ-নিষ্ঠ বিপ্লবী বীর ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। (সেবিতার সৌজন্যে)

১৯৪২ এর ব্রহ্মপুত্র বিপ্লবের একটি কাহিনী

যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক জীবন কাটিয়ে আজ স্বাধীন অখণ্ড পতিত দেশে জীবনের শেষ দিনগুলি গুণে যাচ্ছি। এই তো সেদিন বিপ্লবী জীবনের অভিজ্ঞতা বিবরণে দীর্ঘ জীবন-কাহিনী পুস্তিকাকারে প্রকাশের জন্য কলকাতার এক প্রকাশককে দিবেছি। তাইই দু-একটি কথা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করব।

আজমীরের ডেউলী ডিটেন্সন ক্যাম্প তো দেশে সুপরিচিত। আমরা প্রায় আড়াই শত মাসী অনশন করেছিলাম। আমার অবস্থা চিন্তাজনক হয়ে পড়ায় ভারত সরকার বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। শ্রী সি বি গুপ্ত লোক শাঠিগণ লক্ষ্যে নিবে এলেন। তখন ১৯৪১ জুন নভেম্বর মাস।

যুদ্ধ শুরুর হতেই কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রণা ত্যাগ করেছে। দশ মাস পরে খেলার ম্যাজিস্ট্রেট সত্যগ্রহণে এক বছর কোন রকমে গুলে একেবারে অচল হয়ে গিয়েছে। গান্ধীজী মলছেন লড়াইয়ের শেষে ইংরেজের সঙ্গে লড়বেন।

লক্ষ্যী এসে গুপ্ত পুলিশের মধ্যে এমনভাবে পড়েছে যে কাবো সঙ্গে মেলা-মেশা করা একেবারে মুশকিল। -বাংলা দেশ থেকে দলের লোকেরা জিতেন মালিককে কুঠিরেছে। তাই ভাল আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল।

পুলিশ তাকে 'সংঘর্ষ' অফিস থেকে ধরে গেল, ভীষণ টাইফয়েডের অবস্থায়। দু দিনের মধ্যেই সে মরে গেল লক্ষ্যী জেলা-জেল। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। এক তেজস্বী কর্মী আমার কাছে এসেই এভাবে প্রাণ হাবল।

আমার বাড়ীর খুব কাছেই কার্ডিনালস্ রেসিডেন্সে আছেন রফি সাহেব। প্রস্থের রফি আহমেদ কিসওয়াই গৃহমন্ত্রী ছিলেন। গুপ্ত পুলিশ পেছনে লেগে আছে বলে আর কোথাও যেতে পারি না, তাই রফি সাহেবের ওখানেই জমত আন্ডা, দুধ দুধ থেকে লোক-জন তাঁর কাছে সাতাষাট করে, আর বোডিও ও বহু সংবাদপত্রাদি তো আছেই।

এদিকে জাপানীরা পাল্ হাববার বিধ্বস্ত করে, ইংরেজের বিব্যাট দুই যুদ্ধজাহাজ Prince of Wales and Repulse-কে ধ্বংস করে স্থলপথে সিঙ্গাপুর দখল করে নিয়ে মর্যাদা দিকে আসছে। অখণ্ড আমাদের কোনই প্রত্যাশা নেই। এমনই সমুদ্র একদিন সকাল

বেলা আমাকে নিয়ে 'লন'-এ পাশচারী করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন রফি সাহেব এবং আমার দিকে তাকিয়েই বললেন, 'যোগেশ বাবু, কংগ্রেসের তো অস্তিত্ব নেই, কমিউ-নিস্টরা ইংরেজের সঙ্গে মিলে গেছে, বিপ্লবীরা এত কাল সংগ্রাম চালিয়ে আসছেন। তাইবাও যদি এখন নিষ্ক্রিয় থাকেন তবে দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে?' আমি তো অবাক। এত প্রশ্ন তো আশা করি নি। তাই একটু ভেবে বললাম, 'রফি সাহেব, আমার বিশিষ্ট সহ-কর্মীরা সবই তো এখন জেলে, কিন্তু দেশের যুবশক্তির কাছে আমি অপরিচিত নই, একটা চেষ্টা তো করতে পারি, আপনি সবতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন কি?' দু'তীর সঙ্গে তিনি বললেন 'নিশ্চয়'। সে কথা তিনি সততাব সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। ১৯৪০ সনে যেমন স্বাধীন ওষাটে এ প্রদেশে আমিই প্রথম প্রেস্তাব হই, তেমনই নেতাদের মধ্যে

১৯৪২ সনে তিনিই প্রায় ধৃত হয়ে জেলে যান। তার ফলে প্রেস্তাব কোয়েন ফর্ডন-এর উপদেষ্টাকে ধরন চেপে ধরেন তখন তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন 'too much with the police'।

এলাহাবাদের আই সি সি দত্ত হন ফেরাব পব ওই মে, ১৯৪২ সনে, রফি সাহেবকে জানিয়েই আমি রফি সাহেবের কানপুরে যাই। এক ঘণ্টা পরে তিনি বদা পান যে, আমার প্রেস্তাব ওষাট লে হয়েছিল। পূর্বের গাড়ীতেই দু'জন নিঃস্ব। দু'গা দেবী ও বাগমন্ড কুঠিরে (সাহেব ও কাকোবী মোহম্মদ খ্যাও) বসেপয়ে পঠিয়ে সে সংবাদ আমাকে জানান। তখনই আমরা পলাতক জীবন আরম্ভ হই।

উত্তর প্রদেশের তো বখাই নেই, বিহারও বহু যুবকের সঙ্গে আমরা হোমবোগ স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতা হতে দু'জনকে মজুরানপুরে

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
অভিধান সিরিজ

SAMSAD ENGLISH-BEGALI DICTIONARY

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি-বাংলা অভিধান। ইংরেজি ও বাংলা শব্দের উচ্চারণ-সংক্ষেপ ও ব্যুৎপত্তি সম্বিষ্ট। সর্ববৃদ্ধিধারী ব্যক্তিদের উপযোগী শব্দকোষ।

[ট ১২.৫০]

SAMSAD LITTLE ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত অল্পবয়স্ক ব্যবহারের উপযোগী একটি সহজ বহনীয় শব্দকোষ। বিশেষ করিয়া ছাত্র ও অফিস-কর্মীদের একান্ত উপযোগী।

[ট ৭.৫০]

সংসদ

বাস্তালা অভিধান

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত ও ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত সংশোধিত বাংলা অভিধান। শব্দ প্রয়োগের উদাহরণ ও ব্যুৎপত্তি সম্বিষ্ট। [ট ৮.৫০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রমুদচন্দ্র রোড,
কলিকাতা ৯

ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলাম- যে রাস-বিহারী আদির আয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বাংলাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। পশ্চিম হতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মবারে ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলায় বেতার বাতী কানপূর হতে নিজ কানে শুনে মনপ্রাণ আমার ভরপুর হবে ছিল।

কিন্তু হাম, অপ্রস্তুত অবস্থায়ই শুরু হয়ে গেল ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন। Quit India Struggle দ্বারা গান্ধীজী তো কংগ্রেসকে আপোষের জন্য কেবল বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, সংগ্রাম চান নি, তাই গ্রেপ্তারের পূর্বে প্রোগ্রামও দিয়ে যান নি। ভারতসচিব এমবী সাহেব আমেরিকা ও যুক্তি জবাব দেবার জন্য লন্ডন হতে বি-বি-সি রেডিওতে কংগ্রেসের নামে প্রোগ্রাম দিলেন। একে কার্যকরী করার জন্য বিশাল-জনতার দেশব্যাপী প্রচেষ্টা ও উদ্যম সন্তোষের ভেতরই একটা মহাবিশ্বল বটিয়ে ফেলল। বাংলার মেদিনীপুর, উত্তর প্রদেশের বালিয়া ও মহাবল্লভের সাতাবার ইংরেজ শাসন লুপ্ত হইছিল। সেদিনে বালিয়ার নেতা ছিলেন আমাদেবই গুপ্ত দলেন সহকর্মী রামজী তিওবারী। তারাই চিন্তা পাণ্ডেব জেল থেকে বেব করলেন। কিন্তু প্রচার হল-কংগ্রেস নেতা চিন্তা পাণ্ডেবই নাম। রামজীকে আজ কে আর জানে! তাকে হতে দেখেছিলাম বালিয়া

মিউনিসিপ্যালিটির এক সভা মাত্র। সম্প্রতি তাকে দেখলাম নৈনীতার তরাইয়ে বদ্রপূবে। সেখানে কিছু জমিন নিয়ে সে জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত। আজকের কংগ্রেসী এম-এল-এ চোর, ডাকাত, খুনীরা সেখানে বিশেষ প্রতি-পত্তিশালী।

যত হলাম শেষটার ১৯৪২-এর ২০শে অক্টোবর এটা জেলার সোবো নামক তীর্থ-স্থানে। সঙ্গে যত হলেন সেনপুত্রীর পুত্র সিংহ, বামলডেতে পাণ্ডে, বাগাঁউর এম-এল-এব ছেলে প্রতাপ সিংহ ও সাহারামপুর জেলার দেওবল্লের ঠাকুর মুকুন্দ সিংহ। সুযোগ পেয়ে দাবোগামশাই বেশ একটা কেস তৈরী করে নিলেন যে, এমন গুলী আমি তাকে ছুড়ে-ছিলাম যে তা তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেছে।

এর পরে এটা জেলে সুন্দর একটা বিচারের প্রহসন হয়ে গেল। এটা জেল তখন আগস্ট আন্দোলনের রাজবন্দীতে ভরা। তাই আমাদের পাঁচজনকে রাখা হল স্ট্রীটের ওয়ার্ডে। জিলাধীশ, J.M.L. ১৯১১-কে বললাম যে মিথ্যা মোকদ্দমা আনা হয়েছে, তিনি আম্বাস দিলেন ন্যায় বিচার করা হবে। কিছু দিন পরেই শুনলাম যে আমাদের মোকদ্দমা সংক্রান্ত পুলিশ ও অপরদের অভিনন্দন করা হয়েছে শহরের পুলিশ ক্লাবে এবং জিলাধীশ স্বয়ং তার নেতৃত্ব করছেন। তারপরে লক্ষ্যে থেকে 'সি-আই-ডি'র ডি-এস-পি খাঁ সাহেব

নসির আলী তদন্ত করে রিপোর্ট দিলেন যে, পুলিশ মিথ্যা কেস সাবজেক্টে। সে রিপোর্ট অনুসারে জিলাধীশ দুজন পুলিশ S.I. কে Suspended করে শহরের পুলিশ ক্লাবে রাখলেন। তিনি এমন কি আমার উকিলকেও বললেন, Chatterji may be a dangerous man, he can be detained in jail, but I do not want that any innocent man be sentenced in my district.

কিন্তু রাজ্য তখন ইংরেজের, হিন্দুস্থানী জিলাধীশের নয়। গভর্নর স্বয়ং এলেন কাসগঞ্জ এবং জিলাধীশকে সেখানে ডাকিয়ে বলে গেলেন যে, চাটোজী রাজ্যের শত্রু। সাজা তো তাকে দিতেই হবে, এবং তোমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে যুদ্ধকালে এত পু শত্রু প্রাণদণ্ড হয়। তারপরে হিন্দুস্থানী জজ আমাকে ১০ বছরের সাজা দিলেন। কিন্তু এর পরে আবার এমন ব্যবস্থা কবলেন যাতে আমার সাজা হাইকোর্টে রিভিশন-এ না বদলে যায়। জজ সাহেব আমাকে বা আমার উকিলকে না বলে আমার কাগজপত্র চূপচাপ হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিলেন। তারপরে আমার আবেদনের উত্তরে হাইকোর্ট আমাকে জানানলেন যে, আমার মোকদ্দমার কাগজ পুর্বেই এক ভরফা হয়ে গেছে।

এটার মোকদ্দমার পরে লক্ষ্যে-এ যে মোকদ্দমা আবার আমার বিরুদ্ধে চলে-তারে আমার আরও সাত বছরের সাজা হয়। সে মোকদ্দমার সরকারী সাক্ষী মালখানার মোহরার বলে যে আমার এটা মোকদ্দমার পূর্বে যখন কলকাতা ও বোম্বাই হাইকোর্ট Special Courts Ordinance ultra vires বলে রাব দেন এবং Supreme Court-ও তাই কার্যকর রাখা। তখন আমাব কেসের Exhibit ৭টি cartridges নষ্ট করে ফেলা হয়। নতুবা আমার কেস তো টিকতই না, কারণ কল্যা হয়েছিল যে এই সাতটাল মধ্যে তিনটি cartridge পিস্তল (বিভলবার) ভরা ছিল, যখন আমি এস, আই-কে গুলী ছুড়ি। এই তিনটি cartridge বিষয়ে আমি এবং আমার উকিল আপত্তি জানিয়েছিলাম। ঐ তিনটি cartridge থাকলে দেখান যেত যে hammer, shell-এ পড়েছে কিন্তু gun powder-জ্বলে ওঠে নি। এর দ্বারা ই পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যেত যে আমার পক্ষে cartridge দ্বারা এস. আই-কে গুলী করা সম্ভবই ছিল না। Hammer mark থেকে এও প্রমাণ হয়ে যেত যে ঐ cartridge এ-পিস্তল হতে ছুড় হয় নি। ইংরেজ রাজত্ব রাজনৈতিক মোকদ্দমা এভাবেই চলত।

David Hare

Peary Chand Mittra

মূল্য: এক টাকা মাত্র

প্যারীচাঁদ মিত্র ওবফ টেকচাঁদ ঠাকুরের ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মূল্যবান ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থখানি বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য বিবরণী হিসাবে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাই-এর দি টাইমস অব ইন্ডিয়া লিখিতেছেন—

"The Basumati Sahitya Mandir has deserved well of the multitude of Bengalees who cherish the memory of David Hare by bringing out a reprint of his biography by Peary Chand Mittra first Published in 1877. As a pioneer of modern education in Bengal to the promotion of which he consecrated the last thirty-two years of his life in Calcutta. David Hare answers to the description given in a Sanskrit verse of men of expansive minds who think the

world to be their Country and mankind their kinstolk.

'God' says Crusin, 'sends special agents when circumstances are ripe for their advent.' To the Bengalees of his day David Hare's appearance in Calcutta to hold the scales even between the Progressives led by Raja Rammohan Roy and the Conservatives led by Raja Radhakanta Deb appeared providential in as much as he exerted all his might to evolve synthesis out of the clash of ideologies.

Hare believed that in a country like India, whose cultural matrix pattern and tradition could not conceivably be ignored transplantation of a foreign culture must needs be accomplished on the natural soil of her cultural traditions, if the highest aim of education was to be achieved."

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

১৯৪২ এর ভারত ছাড় আন্দোলন

সে সময় আমি জেলে। প্রথমে ব্যক্তিগত সভাগ্রহ করার জন্য ১ বৎসর কারাদণ্ড হয়। সভাগ্রহ করি ময়মনসিংহে—সেইখানেই বিচার হয় এবং ১ বৎসরের জন্য দণ্ডদেশ হয়। আমাকে ময়মনসিংহ জেল থেকে আলি-



বিধানচন্দ্র রায়

পুর জেলে বদলী করা হোলো সপ্তে সপ্তেই। সেখানে এসে বাদীর পেলাম—জেলের সাথী হিসাবে তাদের মধ্যে অনেকেই আর ইহজগতে নেই। বসন্তদা, কুমিল্লার বসন্ত মজুমদার—ইনি ছিলেন আমাদের রামাবান্না-খাওয়া-দাওয়ার উদারকের কাজে। বসন্তদার সপ্তে আমার পরিচয় হয় ১৯১৫ সাল থেকে। অমায়িক, দুঃসাহসী এবং, কি বলব—বেশ একটু হৃদয়প্রিয় ছিলেন। তখন থেকে দেখে এসেছি—তার বাড়ি সবসময়ে সহকর্মীদের জন্য খোলা থাকত। আস-যাও—খাও-দাও—কাজ কর। তিনি নিজে খেতে ও খাওয়াতে কড় ভালবাসতেন। তাই তিনি খাওয়ার ভার নিয়োছিলেন জেলে। তাঁর সম্বন্ধে একদিনের একটা কথা বলি—ওর ছিল 'ডাইবেটিস' অথচ মিষ্ট খেতেন তিনি সবচাইতে বেশি। আমি একদিন তাঁকে বলেছিলাম—'বসন্তদা, আপনি এই আত্মহত্যার পথে কেন চলেছেন?' তিনি হেসে বললেন—'ডাঃ বিধান রায়ও তাঁকে এই একই কথা বলেছিলেন, উত্তরে তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে—মৃত্যুর পর সুক্লদেহে এই পৃথিবীর সব ভোগই থাকবে—শুধু খাওয়া থাকবে না। কাজেই বেঁচে থাকতে সেই খাওয়াই যদি ছাড়তে হয় তবে বাচা-

মরার প্রভেদ কি রইল।—এমন সরল হাসি হেসে তিনি বললেন তাঁর বিশ্বাসের কথা যে, আমরা সকলে না হেসে থাকতে পারলাম না। এই প্রসঙ্গ এইখানেই থাক।—১৯১৫ সাল থেকে বিনি সাথী ছিলেন, তিনি দেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলেন না।—বঙ্কিম মৃধাজীও আর আমাদের মধ্যে নেই। ডাঃ জীবনরতন ধর—তিনিও চলে গেছেন। তবে হ্যাঁ, তখনকার দিনের একজন—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আজ আমাদের মৃধামস্তী। জনাব আসরাফউদ্দিন চৌধুরী সাহেব আজ পূর্ব-পাকিস্তানের একজন নেতৃস্থানীয়। সৌমেন ঠাকুরও সেইসময় আলিপুর জেলে।

দেখতে দেখতে এক বৎসর কেটে গেলো। আমাকে খালাসের জন্য জেল গেটে নিয়ে গেল—দরজা খোলাও হোলো—আবার সপ্তে সপ্তে পুলিশের লোক সেই জেলেই নিয়ে এসে বন্দী করে রেখে গেল অনির্দিষ্টকালের জন্য। '৪২ সালের আন্দোলন তখনও অনেক দূরে। হঠাৎ একদিন 'সাইরেন' বেজে উঠলো। কেন? খবর করতে গিয়ে জানা গেল—কোনও 'জাপানী প্লেন' নাকি কলকাতার কাছে এসেছিল। সেই রাতেই আমাকে জলপাই-গড়ি জেলে পাঠিয়ে দিলো। জলপাইগড়ি থেকে রাজসাহী এবং পরে মেদিনীপুর। ইতিমধ্যে '৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেছে। রোজই খবর পাচ্ছিলাম জেল থেকে—বাইরে কি হচ্ছে। সেইসব কথা সবাই আজ জানে। মাতাঙ্গনী হাজারার কথা ইতিহাসে স্মরণ করে লেখা থাকবে। '৪২ সালের আন্দোলন শুধু বাংলাদেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে—সাদা তুলেছিল। মেদিনী-পুর যা করেছিল, বোধকরি তার তুলনা নেই। বাংলার গভর্নর বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, বাংলাদেশের একটি জেলা—মেদিনীপুর তার সামালের বাইরে। মেদিনীপুরে সম্পূর্ণ স্বরাষ্ট্র স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে কংগ্রেসের হুকুম ছাড়া কোনও কাজ কেউ করত না। গভর্নমেন্টের হুকুম নস্যাৎ করে দিচ্ছিল সেই মেদিনীপুর। সেই আন্দো-লনের মধ্যে যারা নেতৃত্ব করেছিলেন তার মধ্যে প্রীসতীশ সামন্ত, প্রীসজয় মৃধাজী এবং

তাঁদের আরও অন্য সহকর্মীদের মেদিনীপুর জেলে গিয়ে পাই। তাঁদের কেউ কেউ আজ আর রাজনীতিতে নেই। একজন—প্রীঅন্নদা চৌধুরী আজ পরলোকে। প্রীরজনী প্রামাণিক, প্রীসুশীল ঘাড়া, প্রীকান্ত দাস প্রমুখ অনেকেই এখনও কর্মক্ষেত্র থেকে তাঁদের সাধা-শক্তিমত কংগ্রেসের সেবা করে চলেছেন।

'৪২ সালের আন্দোলনের সময় নেতাজী সুভাষ রেডিওবোলে রোজ উৎসাহ দিতেন সবাইকে বলতেন—'তোমরা কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলো।' তিনি তাঁর 'আজাদ হিন্দ' বাহিনী নিয়ে আসতে থাকলেন—'দিব্রী চলো—'দিব্রী চলো' বলতে বলতে।



সুভাষচন্দ্র বসু

সেই সংগ্রামের অবসান হোলো ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট—দিব্রীর লালকেন্দ্রার ভারতীয় গিরির জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে—লক্ষ লক্ষ লোকের জয়ধ্বনির মধ্যে।

ভুলি নাই

জনক নিবে

ভারতের বিপ্লবী যুদ্ধের সাহস, ধীর ও আত্মত্যাগের মহান কাহিনী আমরা অনেক জানি। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অলিখিত পাতায় কত শত নীরব কর্মীর অতুলনীয় সাহস ও দেশভক্তির হুমুস-গ্রাহী কাহিনী যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, তা আমাদের জানা নেই। জানা হয় নি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এমন কত ধীরমাতা ও ভগিনীর আত্মত্যাগের কথা, পিতৃভূলা কত শিশুর ব্যক্তি-স্বদেশপ্রেম, সাহস ও স্বার্থ-ত্যাগের মহান ইতিহাস। আর বিস্মৃতির স্তূপীকৃত জগালের মধ্যেই হয়তো সেইসব গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর সমাধি ঘটে।

ব্যক্তিগতভাবে সেই আশ্রমের ইতিহাসের কতটুকুই বা জানি—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গভীর আরোহী সীমাবদ্ধ। তবে এমন সব ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম এবং নীরব স্বদেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্তের পরিচয় পেরেছি যে, মনে হয় সুযোগমত তার কিছুটাও যদি বলে বেতে যা পারি, তবে আমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যাদের দেখেছি, যাঁদের জেনেছি, তাঁদের সবার বিষয় একত্রে কথা সন্ভব নয়। তা ছাড়া আমার সব সময়ই ভয় হয়, নিজের অক্ষমতার জন্য যদি এই সব মহান দৃষ্টান্তের উপলব্ধি হলো হৃদয়গণে সমর্থ না হয়! সেইজন্য আজ মাত্র এমন একটি পরিবার সম্পর্কে বলব, যার সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধ ছিলাম।

ছোট্ট একটি গ্রাম পরিবার। চট্টগ্রাম শহরের উত্তর প্রান্তে ছোট্ট একটি টিলার উপর সেকলে, পাকাবাড়িতে, সাকরনা-গোছানো হুচিস্পায় সুন্দর সুখী পরিবার। বাড়ির কর্তা মনোরঞ্জন গুপ্ত স্বরসারী। স্ত্রী, কন্যা, তিন পুত্র। বন্দ্যোপাধ্যায় বেশির ভাগই সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কর্তা নিজেও তাদের ক্লাবের সভ্য।

১৯২৭-২৮ সাল, জেল থেকে বেরিয়ে অবসর কর্মক্ষেত্রে নেমেছি। আমাদের সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি দু'বছর কথার পরিচয় হওয়ারই কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে পরিচয় হল এবং এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে।

মনোরঞ্জনবাবুর বিত্তীয় পুত্র আনন্দ সরকারী কর্মক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণের নবম শ্রেণীতে পড়ে, আর্য সম্প্রদায় সমাজ সেতার শেষে, জ্বরের চর্চা করে, কখনও কখনও জনসভায় গান ও সেতারের আসরে অংশ গ্রহণ করে। লেখাপড়ায় ভাল, গায়ের রং খুব ফসলি,

সুন্দর চেহারা, স্বভাবে বিনয়ী, নয় ও অতিশয় ভদ্র।

আনন্দের বাবা আমার সঙ্গে একদিন দেখা করে তাঁর এই ছোট্ট ছেলেরটির রকম ভাব নিয়ে অনুরোধ করলেন। একদল গুন্ডা নাকি শাসিয়েছে, আনন্দকে স্কুলে বেতে দেবে না।

এ সময়ে চট্টগ্রাম শহরে কিছু কিছু গুন্ডার উৎপাত ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে এই ধরনের গুন্ডার উৎপাত খুব কঠিন হস্তে আমরা দমন করেছি। আনন্দের বাবা সে কথা শুনে আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আমি ওর কাছে কয়েকদিনের সময় চাইলাম। ইতিমধ্যে সতীদার সঙ্গে পরামর্শ করলাম, কি করা যায়। সতীদা (সতীভূষণ সেন) ছিলেন ব্যক্তিগতসম্পন্ন, বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম এবং এ ধরনের ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশমত চলতাম। আমরা যখন কোন গুন্ডাদমনের ভার নিতাম তখন সমস্ত কৃদিকা শব্দ নিজেদের মাথাতেই নিতে হত। যাঁদের প্রয়োজনে কৃদিক নিতাম, সেইসব অভিভাবকরা অনেক সময়েই আমাদের মাকপথে পরিত্যাগ করতে বিধা করতেন না।

বাই হোক, আনন্দের বাবাকে জানিয়ে দিলাম যে, আমরা আনন্দের নিরাপত্তার ভার নিলাম, তিনি যেন আর চিন্তা না করেন। বসাসময়ে গুন্ডাদমনও করা হল। গুন্ডাদের কারও কারওকে চরমপন্থ মারফৎ জামলালাম যে, যদি তারা ভদ্রতার গুন্ডা ছাড়িয়ে যায়, পরিণতি অতিশয় শোচনীয় হবে। আর তাদের বিশেষ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে এসে তাদের অন্যায়ের কৈফিয়ত চাইলাম এবং শাস্তি-স্বরূপ কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিলাম।

এই সময়ে সমস্ত পরিবারটির সঙ্গেই আমাদের পরিচয় হল। আনন্দের দাদা দেবু (দেবপ্রসাদ) ঠিক আনন্দের মত ছিল না, একটু যেন রুদ্ধ, ভদ্রতার খুব সূক্ষ্ম মাপকাঠি মেপে সে চলত না। কৃতী ছাত্র, চট্টগ্রাম কলেজে তখন তার আই-এ প্রথম বর্ষ। আনন্দ ও দেবুকে প্রথম দেখে আমাদের বিপ্লবী দলের সদস্যরূপে পাওয়া যেতে পারে এরূপ কোন সম্ভাবনার কথা আমাদের মনে হয় নি। গ্রাম পরিবারের, ছেলে, তাদের পরিবেশ, প্রভাব, লোকচার, সবই যেন একটু আলাদা। মনোরঞ্জনবাবু কোনদিনই স্বদেশী আন্দোলনে বা কংগ্রেসে যোগ দেন নি। তিনি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ক্লাবে বাওয়া-আসা করতেন এবং সেইরূপ সান্দ্য পরিবেশের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতেন। এ রকম পরিবারের ছেলেরের সচরাচর আমরা প্রথম স্কুলটিনেই বাঁধ দিতাম। তবে

আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ছিল যে, বিপ্লবী যুদ্ধ সকল স্তর ও সকল প্রকার পরিবারের মধ্যেই ছড়িয়ে পাওয়া যায়।

আনন্দ তথা, আনন্দের বাবার এইরূপ অবস্থার অবস্থা এবং বড় ভাই দেবুর নিশ্চেষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখে আমার মনে হল এক্ষেত্রে গুন্ডাদের দমন করা হলেও এতে স্থায়ীভাবে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এবং স্থায়ীভাবে এর প্রতিকার করতে হলে চট্টগ্রামে হাল্কা আবহাওয়ার পরিবর্তন করতে হবে—যুব সম্প্রদায়কে তাদের কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

যেমন নাকি এদিকে গুন্ডাদের দমন করা হল, ঠিক আবার ভাবলাম, এই দু'টি ছেলেকে এমনভাবে তৈরি করে দিতে হবে, যেন গুন্ডারাই এদের সামনে আসতে ভয় পায়। সুদৃঢ় শরীরচর্চা; সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করলাম তাদের নিয়ে ঘৃষি খেলা, জাপানী কুস্তি, মাটি, ছোরা ও তলোয়ার চালানো শিক্ষা। এই শিক্ষার ফলে তাদের মধ্যে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হল ও আত্ম-নির্ভরতা শিখল। ক্রমে এই দুই ভাই এসে পড়ল আমাদের শরীরচর্চার ক্লাবের গভীরে। তারপর এই আবহাওয়ার ধাপে ধাপে তারাও আমাদের সঙ্গে অগ্রসর হল। ঠিক সময়ে বিপ্লবী সংঘের সদস্যও হল।

আনন্দ যে বছর স্কুল ফাইনাল দেবে, সেই বছর মাস্টারদাই তার জন্য প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হলেন। বলা বাহুল্য, মাস্টারদাকে আনন্দের শিক্ষক নিযুক্ত করার পিছনে দেবু ও আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হাত ছিল। শিক্ষক হিসাবে মাস্টারদার যোগ্যতার কোন প্রশ্নই ছিল না। তিনি যে বিপ্লবী! জেলে ছিলেন। বর্তমানেও যে তিনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী ও আমাদের বিপ্লবী নেতা! আনন্দকে পড়াবার জন্য মাস্টারদার মত একজনকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হল, তখনই বুঝতে হবে, মনোরঞ্জনবাবু ও তাঁর পরিবারের মধ্যে আমাদের প্রভাব কতখানি বিস্তার লাভ করেছিল। এদের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল। ছোট্টকন, আনন্দের ছোটভাই। বছর, আঠেঁকের হবে, যখন প্রথম তাকে দেখি। এখন তারও বয়স দশ বছর। সে খুব রুশন ও দৃবল। তাকে নিয়ে মেসোমশাই-মাসীমা খুব চিন্তিত ছোট্ট কেন দৃবল, রুশন ও ছোট্ট হলে কি হবে, দাদাদের প্রতি তার প্রগাঢ় বিশ্বাস। দাদারা ইউনিফর্ম পরে ভল্যান্টিয়ার বাহিনীতে কুচকাওয়াজ করে, ব্যায়ামশালার শরীরচর্চা এবং আত্মরক্ষার কৌশলাদি শিক্ষা নেয় এবং শরীরচর্চার প্রতিযোগিতা ও নানা

ঝারাম অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ছোট্টকন এতে খুব উৎসাহী এবং আমাদের একজন বিশ্বাসী সহায়ক ও সমর্থক।

আনন্দের বাড়ি বোমা ও অস্ত্রশিক্ষা দেওয়ার ঘাঁটি রূপে ব্যবহৃত হওয়ার আদর্শ স্থল ছিল। প্রথমত, সমস্ত পরিবারটি আমাদের দরদী ও সমর্থক ছিলেন। স্বতীয়ত, আনন্দের বাবা মনোরঞ্জনবাবু, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বন্ধু ও তাদের ক্লাবের সভ্য। তা ছাড়া ছোট্টকন—জ্যোৎস্না গুপ্ত ও আনন্দ আর্ষ সঙ্গীত-সমাজের সভ্য। তাদের বাড়িতেও সঙ্গীত-চর্চা ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আসর মাঝে মাঝে হসত। এমন একটি নিরীহ, মার্জিত রুচি-সম্পন্ন রান্না পরিবার যাদের উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা ছিল না। তৃতীয়ত, সাময়িক দৃষ্টিতে এই বাড়িটির অবস্থানের গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। লোকারণ্যের ও লোকদৃষ্টির বাইরে উচ্চ টিলার উপর এই বাড়িটি অবস্থিত। পেছনে পাহাড় ও সামনের রাস্তার অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে এই বাড়িটির বিলম্বী অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই টিলার উপরে হাতবোমা ছোড়া শিক্ষা দেওয়া আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধা ছিল। মাসীমা, ছোট্টকন ও ছোট্টকনকে কোনও অজুহাতে কোথাও পাঠানো হ'ত। দেবু-আনন্দ সেইরূপ অনু-কূল অবস্থার সৃষ্টি করতে সাহায্য করত। তারপর তাদের অনুপস্থিতিতে একে একে আমাদের মনোনীত যুবকরা আসত, পাহারা নিযুক্ত করতাম ও তাদের অস্ত্রাদি ও বোমার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হ'ত।

এই বাড়িতেই তারকেশ্বর দস্তিদার (যাঁর মাস্টারদার সঙ্গে একই দিনে ফাঁস হয়েছিল) যখন বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতকালে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিল এবং চট্টগ্রামের পুলিশ গুপ্ত সংবাদ পেয়ে সমস্ত চট্টগ্রাম তোলপাড় করে তুলেছিল বিস্ফোরণে মগ্ন ব্যক্তির অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তারের জন্য, তখন একদিন নিরুপায় হয়ে পুলিশের বেড়া-জালের মধ্য থেকে মাসীমা-মসোমশাই ও ছোট্টকনের দৃষ্টির সম্পর্ক অগোচরে তাদের বাড়ির বাইরের বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে তুলেছিলাম। যদিও অনেক সমর্থন পেয়েছি, তবু তাদের কাছে তারকের কথা জানাতে—পাছে অতথানি ঝুঁকি নিতে তাঁরা প্রস্তুত না থাকেন।

এইভাবে প্রায় দু' বছর অতিবাহিত হ'ল। সংগঠন, শিক্ষা ও প্রস্তুতি সমানে চলেছে। শেষের ছটি মাস অস্ত্র সংগ্রহ ও শিক্ষা, বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত, হাতবোমা তৈরি ও মোটরগাড়ি চালানো শেখা প্রতি কাজ সমস্ত মাথা সজ্জ ও পূর্বোদ্যমেই চলেছিল। আনন্দ ও দেবু প্রথম শ্রেণীর সভ্য হিসাবে এইসব

প্রস্তুতির কাজেও সাহস, ধৈর্য ও কৌশলের পরিচয় দিয়েছে অনেক।

যখন আমাদের ভারতের গণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার প্রত্যেকটি সভ্য



তারকেশ্বর দস্তিদার

সম্বন্ধে বিচার করে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন হ'ল তখন আমাদের সমস্যা দেখা দিল দুই ভাইকে নিয়ে। দুই ভাইকে একসাথে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না। তাদের পরিবারের সকলেই বিস্ময়ের পথে সাহায্য করেছে, সহানুভূতি দেখিয়েছে। তাই এই সুখী, শান্তিময় পরিবারের জীবনে এতবড় মর্মান্তিক আঘাত দিতে আমরা কুণ্ঠিত হচ্ছিলাম। আমাদের কেন্দ্রীয় কর্মিটিতে আলোচনা করে স্থির হয়েছিল, দু' ভাই-এর মধ্যে যে-কোন একজনকে বেছে নিতে হবে। সব রকম পরীক্ষার দু'জনেই সমান যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। এখন এই হ'ল সমস্যা, কাকে বাদ দিয়ে কার নাম লিখব।

আমরা কিছু স্থির করতে না পেরে ওদের ওপরেই সমস্যা সমাধানের ভার দিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে তারা তাদের সিদ্ধান্ত জানাল: "দু'জনেই নিতে হবে।"

সত্যিই তো। দেশভক্ত বীর দেশদ্রোহীর চরণে আত্মোৎসর্গ করতে দু'পার্শ্বিক। কি অধিকার আছে আমাদের তাকে নিষেধ করার? তর্কে হার মেনে অবশেষে দু'জনেই গুলি করতে হ'ল আমাদের। কিন্তু মনে মনে একটা অস্বস্তি থেকে গিয়েছিল: একটা সমানভূতিশীল পরিবারের জীবনে অস্বস্তি কি দূর হবে এনে দেবার জন্য নিজেদের অপরাধ মনে হচ্ছিল।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল। সন্ধ্যা আক্রমণের জন্য আমাদের বিস্ময়জনক প্রস্তুত। আনন্দ নতুন শেখলে গাড়ি চালবে অস্বিকাদার নেতৃত্বে যাবে চৌলগাম ও চৌলগাম অফিস ধ্বংস করবে। আনন্দ অনুযায়ী আনন্দের বাড়িতে আনন্দ আসবে। করবে এবং সেখানে আমি গাড়িটি ত্যাগ করব। তারপর সে আমাকে যথাযথভাবে নিয়ে দিয়ে তার গন্তব্যস্থানে যাবে।

আমি সময়মত গাড়িটি টিলার নীচে গেল। আনন্দকে ডাকতে গেলাম। আনন্দের বাড়ি কম্পাউন্ডে ঢুকতেই আনন্দের বাড়ি থেকে দৌড়ে এলেন আমাব কাছে। দু'জনেই দূর্ভাবনায় মাসীমার মুখখানা ফকত হয়ে গেছে। কথা বলতে গিয়ে বারবার থকথক হয়ে যাচ্ছিল। তবু মাসীমা বললেন:

"খোকা (দেবু) বলে গেল, এক সমস্যা। জন্ম বাইরে যাচ্ছে। আবার যখন সমস্যা আমাকে প্রণাম করে বলল, হসত কখনও ফিরবে না। কোথায় গেল, কিভাবে ফিরবে? এই একটু আগে সমস্যার পর কোথাও কোথায় গেল সে—জান তুমি? উত্তরে আশায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে কী উত্তর দেব? বিষয় ব্যাকুল দৃষ্টিতে প্রশ্ন করছেন সন্তানের ভবিষ্যৎ সমস্যার মিথ্যা স্তোত্রবাক্যে কি করে উত্তর দেব? তবু কোনমতে আত্মসংবরণ করে

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যাক্স



মার্কনি ফ্যান

নগদ মূল্যটো

৯টি কিম্বাত দিন

মার্কনি ইলেকট্রিক কর্পো

(প্রা:) লি:

১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮



জন্মটিকে নিখোঁয়া সান্দ্রনা দেবার স্বপ্নে কল্যায়, "তাই নাকি, কই আমাকে তো কিছু বলে নি সে। এই সকালবেলাই তো দেখা হল আমার সঙ্গে। বোধহয় শীগগিরই ফিরে আসবে, তাই আমাকে কিছু বলে নি।"

পুত্রের আসন্ন বিপদের সন্ধাননা কি মায়ের কাছে অজানা থাকতে পারে? আমার কথার একরঙা বিশ্বাস করলেন না মাসীমা, কোনই সান্দ্রনা পেলেন না তিনি। কিন্তু কি করবার আছে! আমাকে কাছে পেয়ে তাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মাসীমা। বারবার আমার কাছেই ব্যর্থ আবেদন জানাতে লাগলেন।

"অনন্দ! তুমি (আনন্দ)ও কেন আজ রাতেই চলে যাচ্ছে? দয়া করে একজনকে ছেড়ে দাও তোমরা। এই আমার দুটি ছেলেকেই মায়ের বুক শুন্না করে নিয়ে যেও না তোমরা। তুমি-থোকা যদি কেউ না থাকে, হবে আমি কী নিয়ে বেঁচে থাকব? তোমার মাসামার ওপর এত নির্ভর হয়ে না।"

পৃথিবীর সমস্ত মুখ ঐশ্বর্যও যে শোক ভালাতে পারে না, তাতে আমি দুটি কথার কি সান্দ্রনা হবে? আর তখন ছো পেছন ফেরার কোন উপায় নেই। প্রণপণে অল্প-স্বপ্ন করে মীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম, মনে হল আমি যেন কত অপরাধী। সেই অপরাধবোধ দ্বারাও প্রবল হয়ে উঠল যখন মাসীমার কাতর আকৃতির সঙ্গে যোগ দিলেন জ্যোৎস্নাদিঃ "একটু ভেবে দেখ। আমাদের দিকটা একটু বিচার করে দেখ। এই বিপদের মধ্যে দু'জনকেই টেনে নিয়ে যেয়ো না। তোমাদের আজকের এই বিপজ্জনক অভিযান থেকে দু'তাই-এর একজনকে কি বাদ দিতে পার না?"

অবশ্য আমার ছিলঃ "আমরা দু'জনকে নিতে চাই নি, তাদের কোনমতে নিরস্ত

করতে পারি নি।" কিন্তু সেই জবাব কি স্নেহমयी ভগিনীর ক্রন্দনের উপশম হবে, মায়ের কান্ডের কি সেই জবাবে আশ্বস্ত হবে, পিতার আশা-শাকাঙ্ক্ষা কি তাতে শূন্য হবে? তাই জবাব দেবার চেষ্টা আর করি নি। নীরবে নতমস্তকে লক্ষ্যত ভ্রমণা সহ্য করছিলাম, আর ভাবছিলাম মায়ের চোখে শুলো দেওয়া যায় না।

এই অসম্ভব অবস্থা থেকে উদ্ধার করল আনন্দ আমাকে। বাড়ির সীমানার বাইরে থেকে ডাক দিল—"ভাড়াটাড়ি আসুন, সময় নেই, দৌঁর হবে যাবে।"

আনন্দ গাড়ি চালাতে লাগল। আমাকে গণেশ ঘোষের বাড়িতে নামিয়ে সে তার নির্ধারিত জায়গায় চলে গেল। ঠিক সময়ে আমাদের প্যানমন্ড রুটিকাবোগে যুগপৎ আক্রমণ করা হল। দু'মিনিটেই যুদ্ধ জয় হল, চট্টগ্রাম শহরে বৃষ্টি-শাসনের অবসান হল।

বিজয়ী, প্রান্ত, রক্তাক্ত বোম্বাস্কর নিয়ে এল তাদের পুলিশ লাইনের শিকার হতে। অর্ধদশ হিমাংশুকে নিয়ে আমরা চারজন—গণেশ ঘোষ, মাখন ঘোষাল, আনন্দ গুপ্ত ও আমি মোটরগাড়ি করে পূর্ব-স্থিরীকৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী শহরের পথে অগ্রসর হলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে শহরে প্রবেশ করলাম। প্রায় একঘণ্টা অভিবাহিত হল। কিন্তু আমাদের প্রধান অংশ তখনও এসে পৌঁছাল না। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম—অস্থির হয়ে উঠলাম। তারপর আবার গাড়ি ঘোরলাম। সেই একই পথে আবার ঘুরে গেলাম। পুলিশ লাইন ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর—"বায়োজিড বেলতানের" দিকে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে লাগলাম। মোটরের আলো জ্বালিয়ে গাড়ি চালানো সাধারণ সাময়িক নিয়মের ব্যতিক্রম, কারণ শত্রু গতিপথের ইঙ্গিত পেতে পারে অনেক দূর থেকে। তবুও আমরা এই নিয়ম ভঙ্গ করে, আলো জ্বালিয়েই ধীরে ধীরে এগোতে থাকি মাত্র একটি উদ্দেশ্যে—যদি আমাদের সঙ্গে প্রধান অংশের আবার সংযোগ হওয়া সম্ভব হয়।

দুর্ভাগ্য আমাদের। তারা সবাই আমাদের গাড়ি দেখতে পেয়েছিল এবং শত্রুর কোন টেলিগ্রাফী গাড়ি ভেবে মাঠে শূন্যে পড়ে আত্মগোপন করেছিল। সারারাত ধরে অনেক চেষ্টা করেও যখন আমরা প্রধান দলটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারলাম না, তখন হতাশ হয়ে আবার শহরে ফিরে এলাম। অবশেষে ভোরবেলা নদীর ধারে মোটরগাড়িটি রেখে ছোট একখানা নৌকা—চট্টগ্রামে যাকে 'সাম্পান্টা' বলে, তাকে একটা ভাড়া করলাম। এই নৌকাটি করে সমুদ্রের দিকে আমরা গাড়ি দিলাম। সারাদিনটি আমরা সমুদ্রের ক্রাফাকাছি "পডেঙ্গা" নামে একটি গ্রামে অভিবাহিত করছি। তারপর বিকেলে আবার শহরে ফিরে এলাম। বীর পদক্ষেপে ও

জাতি সন্তর্পণে শহরের বকের ওপর দিলে আমরা চলেছি। দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্ত পর্বস্ত আমরা আগাগোড়া হেঁটেই এলাম। দেখলাম পথঘাট সব শূন্য। জন-প্রাণী যেন কোথাও নাই। তবু আশা ছিল যদি আমাদের প্রধান বাহিনী সেইদিন শহরে উপস্থিত হয়।

আনন্দের দাদা দেবপ্রসাদ আমাদের প্রধান বাহিনীর সঙ্গেই ছিল। তাই আমরা ভেবে-ছিলাম—আজ রাতে আমাদের প্রধান বাহিনী যদি কোন কারণে শহরে প্রবেশ নাও করে, অন্তত তারা কাউকে না কাউকে এই নির্জন উপকণ্ঠে আনন্দের বাড়িতে আমাদের খোঁজ করতে পাঠাবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আনন্দের বাড়ি যাওয়াই আমরা সাব্যস্ত করলাম।

তখন মাত্র সন্ধ্যা সাতটা বেজেছে। এই বাড়ির ছোট্ট টিলার নীচে এসে দাঁড়িলাম। চারপাশের ভাবগতিক ও অবস্থা নিরীক্ষণ করে মনে হল, তখনও বোধ হয় পুলিশ হানা দেয় নি। কোনদিকেই শত্রুর কোন চিহ্ন-মাত্র ছিল না। কিন্তু টিলার ওপর উঠতে গিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে ভয়ে ভিতরটা শূন্য করে যাচ্ছিল। অপ্রত্যাশিত শত্রুর আক্রমণকেও হয়ত এতখানি ভয় আগে কখনও করি নি। আর কতক্ষণ? কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই আমরা আনন্দ ও দেবর মা, বাবা ও ছোড়দির সামনে গিয়ে দাঁড়াব। জানি না, মাসীমা, মেসোমশাই ও ছোড়দির কাছে আজ আমাদের কি স্থান? যে পরিবার এতখানি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন—এতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তারা কি আমাদের ক্ষমা করতে পারবেন—তারা কি আজ আমাদের এ বাড়িতে স্থান দেবেন—নাকি বিপদের আশংকার আরও সংকটচিত হবেন? সন্দেহ-সম্ভাষণ জানাবেন, না, পথ থেকেই দেখামাত্রই রুঢ় বিদায়বাণী শোনাবেন—রোষে ও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন? এমনি ধরনের শত সহস্র চিন্তার মনটি দোল খাচ্ছিল। তবু সাহসে ভর করে সব সন্দেহ ও ভয় কাটিয়ে আমরা সোজা এসে দাঁড়িলাম মাসীমা, মেসোমশাই ও ছোড়দির সামনে।

সে যে কি এক অপূর্ণ দৃশ্য! কি এক অনাবিল আনন্দ—নির্বাচন মহৎ স্বদেশপ্রেমের কি যে সে মাহুর্ষ। আমাদের সব ভুল মুহূর্তে ভেঙে গেল। মানসিক সকল বিষাদ-বন্ধ যেন এক নিমেয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমাদের কোন সঙ্কোচের অবকাশই তারা দিলেন না। সগর্বে দু'হাত বাড়িয়ে তারা আমাদের বিজয় সম্ভাষণ জানালেন। বীর সন্তানদের বীর জননী, আমাদের সবার মাসীমা, তাঁর গভীর হৃদয়ের শত সহস্র আবেগ প্রকাশ করলেন—অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানালেন!—চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি বিপ্লবী সন্তানের মঙ্গলকামনা করলেন। আমরা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। এত ক্ষতি, এত বিপদ, উৎপীড়ন, নিপেষণের সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কি করে তারা তখনও স্থির ছিলেন জানি না! বিগত

বিশ্বশান্তিকোষ প্রস্তুত—১৯৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০-১০১-১০২-১০৩-১০৪-১০৫-১০৬-১০৭-১০৮-১০৯-১১০-১১১-১১২-১১৩-১১৪-১১৫-১১৬-১১৭-১১৮-১১৯-১২০-১২১-১২২-১২৩-১২৪-১২৫-১২৬-১২৭-১২৮-১২৯-১৩০-১৩১-১৩২-১৩৩-১৩৪-১৩৫-১৩৬-১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১-১৪২-১৪৩-১৪৪-১৪৫-১৪৬-১৪৭-১৪৮-১৪৯-১৫০-১৫১-১৫২-১৫৩-১৫৪-১৫৫-১৫৬-১৫৭-১৫৮-১৫৯-১৬০-১৬১-১৬২-১৬৩-১৬৪-১৬৫-১৬৬-১৬৭-১৬৮-১৬৯-১৭০-১৭১-১৭২-১৭৩-১৭৪-১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০-২০১-২০২-২০৩-২০৪-২০৫-২০৬-২০৭-২০৮-২০৯-২১০-২১১-২১২-২১৩-২১৪-২১৫-২১৬-২১৭-২১৮-২১৯-২২০-২২১-২২২-২২৩-২২৪-২২৫-২২৬-২২৭-২২৮-২২৯-২৩০-২৩১-২৩২-২৩৩-২৩৪-২৩৫-২৩৬-২৩৭-২৩৮-২৩৯-২৪০-২৪১-২৪২-২৪৩-২৪৪-২৪৫-২৪৬-২৪৭-২৪৮-২৪৯-২৫০-২৫১-২৫২-২৫৩-২৫৪-২৫৫-২৫৬-২৫৭-২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১-২৬২-২৬৩-২৬৪-২৬৫-২৬৬-২৬৭-২৬৮-২৬৯-২৭০-২৭১-২৭২-২৭৩-২৭৪-২৭৫-২৭৬-২৭৭-২৭৮-২৭৯-২৮০-২৮১-২৮২-২৮৩-২৮৪-২৮৫-২৮৬-২৮৭-২৮৮-২৮৯-২৯০-২৯১-২৯২-২৯৩-২৯৪-২৯৫-২৯৬-২৯৭-২৯৮-২৯৯-৩০০-৩০১-৩০২-৩০৩-৩০৪-৩০৫-৩০৬-৩০৭-৩০৮-৩০৯-৩১০-৩১১-৩১২-৩১৩-৩১৪-৩১৫-৩১৬-৩১৭-৩১৮-৩১৯-৩২০-৩২১-৩২২-৩২৩-৩২৪-৩২৫-৩২৬-৩২৭-৩২৮-৩২৯-৩৩০-৩৩১-৩৩২-৩৩৩-৩৩৪-৩৩৫-৩৩৬-৩৩৭-৩৩৮-৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৪২-৩৪৩-৩৪৪-৩৪৫-৩৪৬-৩৪৭-৩৪৮-৩৪৯-৩৫০-৩৫১-৩৫২-৩৫৩-৩৫৪-৩৫৫-৩৫৬-৩৫৭-৩৫৮-৩৫৯-৩৬০-৩৬১-৩৬২-৩৬৩-৩৬৪-৩৬৫-৩৬৬-৩৬৭-৩৬৮-৩৬৯-৩৭০-৩৭১-৩৭২-৩৭৩-৩৭৪-৩৭৫-৩৭৬-৩৭৭-৩৭৮-৩৭৯-৩৮০-৩৮১-৩৮২-৩৮৩-৩৮৪-৩৮৫-৩৮৬-৩৮৭-৩৮৮-৩৮৯-৩৯০-৩৯১-৩৯২-৩৯৩-৩৯৪-৩৯৫-৩৯৬-৩৯৭-৩৯৮-৩৯৯-৪০০-৪০১-৪০২-৪০৩-৪০৪-৪০৫-৪০৬-৪০৭-৪০৮-৪০৯-৪১০-৪১১-৪১২-৪১৩-৪১৪-৪১৫-৪১৬-৪১৭-৪১৮-৪১৯-৪২০-৪২১-৪২২-৪২৩-৪২৪-৪২৫-৪২৬-৪২৭-৪২৮-৪২৯-৪৩০-৪৩১-৪৩২-৪৩৩-৪৩৪-৪৩৫-৪৩৬-৪৩৭-৪৩৮-৪৩৯-৪৪০-৪৪১-৪৪২-৪৪৩-৪৪৪-৪৪৫-৪৪৬-৪৪৭-৪৪৮-৪৪৯-৪৫০-৪৫১-৪৫২-৪৫৩-৪৫৪-৪৫৫-৪৫৬-৪৫৭-৪৫৮-৪৫৯-৪৬০-৪৬১-৪৬২-৪৬৩-৪৬৪-৪৬৫-৪৬৬-৪৬৭-৪৬৮-৪৬৯-৪৭০-৪৭১-৪৭২-৪৭৩-৪৭৪-৪৭৫-৪৭৬-৪৭৭-৪৭৮-৪৭৯-৪৮০-৪৮১-৪৮২-৪৮৩-৪৮৪-৪৮৫-৪৮৬-৪৮৭-৪৮৮-৪৮৯-৪৯০-৪৯১-৪৯২-৪৯৩-৪৯৪-৪৯৫-৪৯৬-৪৯৭-৪৯৮-৪৯৯-৫০০-৫০১-৫০২-৫০৩-৫০৪-৫০৫-৫০৬-৫০৭-৫০৮-৫০৯-৫১০-৫১১-৫১২-৫১৩-৫১৪-৫১৫-৫১৬-৫১৭-৫১৮-৫১৯-৫২০-৫২১-৫২২-৫২৩-৫২৪-৫২৫-৫২৬-৫২৭-৫২৮-৫২৯-৫৩০-৫৩১-৫৩২-৫৩৩-৫৩৪-৫৩৫-৫৩৬-৫৩৭-৫৩৮-৫৩৯-৫৪০-৫৪১-৫৪২-৫৪৩-৫৪৪-৫৪৫-৫৪৬-৫৪৭-৫৪৮-৫৪৯-৫৫০-৫৫১-৫৫২-৫৫৩-৫৫৪-৫৫৫-৫৫৬-৫৫৭-৫৫৮-৫৫৯-৫৬০-৫৬১-৫৬২-৫৬৩-৫৬৪-৫৬৫-৫৬৬-৫৬৭-৫৬৮-৫৬৯-৫৭০-৫৭১-৫৭২-৫৭৩-৫৭৪-৫৭৫-৫৭৬-৫৭৭-৫৭৮-৫৭৯-৫৮০-৫৮১-৫৮২-৫৮৩-৫৮৪-৫৮৫-৫৮৬-৫৮৭-৫৮৮-৫৮৯-৫৯০-৫৯১-৫৯২-৫৯৩-৫৯৪-৫৯৫-৫৯৬-৫৯৭-৫৯৮-৫৯৯-৬০০-৬০১-৬০২-৬০৩-৬০৪-৬০৫-৬০৬-৬০৭-৬০৮-৬০৯-৬১০-৬১১-৬১২-৬১৩-৬১৪-৬১৫-৬১৬-৬১৭-৬১৮-৬১৯-৬২০-৬২১-৬২২-৬২৩-৬২৪-৬২৫-৬২৬-৬২৭-৬২৮-৬২৯-৬৩০-৬৩১-৬৩২-৬৩৩-৬৩৪-৬৩৫-৬৩৬-৬৩৭-৬৩৮-৬৩৯-৬৪০-৬৪১-৬৪২-৬৪৩-৬৪৪-৬৪৫-৬৪৬-৬৪৭-৬৪৮-৬৪৯-৬৫০-৬৫১-৬৫২-৬৫৩-৬৫৪-৬৫৫-৬৫৬-৬৫৭-৬৫৮-৬৫৯-৬৬০-৬৬১-৬৬২-৬৬৩-৬৬৪-৬৬৫-৬৬৬-৬৬৭-৬৬৮-৬৬৯-৬৭০-৬৭১-৬৭২-৬৭৩-৬৭৪-৬৭৫-৬৭৬-৬৭৭-৬৭৮-৬৭৯-৬৮০-৬৮১-৬৮২-৬৮৩-৬৮৪-৬৮৫-৬৮৬-৬৮৭-৬৮৮-৬৮৯-৬৯০-৬৯১-৬৯২-৬৯৩-৬৯৪-৬৯৫-৬৯৬-৬৯৭-৬৯৮-৬৯৯-৭০০-৭০১-৭০২-৭০৩-৭০৪-৭০৫-৭০৬-৭০৭-৭০৮-৭০৯-৭১০-৭১১-৭১২-৭১৩-৭১৪-৭১৫-৭১৬-৭১৭-৭১৮-৭১৯-৭২০-৭২১-৭২২-৭২৩-৭২৪-৭২৫-৭২৬-৭২৭-৭২৮-৭২৯-৭৩০-৭৩১-৭৩২-৭৩৩-৭৩৪-৭৩৫-৭৩৬-৭৩৭-৭৩৮-৭৩৯-৭৪০-৭৪১-৭৪২-৭৪৩-৭৪৪-৭৪৫-৭৪৬-৭৪৭-৭৪৮-৭৪৯-৭৫০-৭৫১-৭৫২-৭৫৩-৭৫৪-৭৫৫-৭৫৬-৭৫৭-৭৫৮-৭৫৯-৭৬০-৭৬১-৭৬২-৭৬৩-৭৬৪-৭৬৫-৭৬৬-৭৬৭-৭৬৮-৭৬৯-৭৭০-৭৭১-৭৭২-৭৭৩-৭৭৪-৭৭৫-৭৭৬-৭৭৭-৭৭৮-৭৭৯-৭৮০-৭৮১-৭৮২-৭৮৩-৭৮৪-৭৮৫-৭৮৬-৭৮৭-৭৮৮-৭৮৯-৭৯০-৭৯১-৭৯২-৭৯৩-৭৯৪-৭৯৫-৭৯৬-৭৯৭-৭৯৮-৭৯৯-৮০০-৮০১-৮০২-৮০৩-৮০৪-৮০৫-৮০৬-৮০৭-৮০৮-৮০৯-৮১০-৮১১-৮১২-৮১৩-৮১৪-৮১৫-৮১৬-৮১৭-৮১৮-৮১৯-৮২০-৮২১-৮২২-৮২৩-৮২৪-৮২৫-৮২৬-৮২৭-৮২৮-৮২৯-৮৩০-৮৩১-৮৩২-৮৩৩-৮৩৪-৮৩৫-৮৩৬-৮৩৭-৮৩৮-৮৩৯-৮৪০-৮৪১-৮৪২-৮৪৩-৮৪৪-৮৪৫-৮৪৬-৮৪৭-৮৪৮-৮৪৯-৮৫০-৮৫১-৮৫২-৮৫৩-৮৫৪-৮৫৫-৮৫৬-৮৫৭-৮৫৮-৮৫৯-৮৬০-৮৬১-৮৬২-৮৬৩-৮৬৪-৮৬৫-৮৬৬-৮৬৭-৮৬৮-৮৬৯-৮৭০-৮৭১-৮৭২-৮৭৩-৮৭৪-৮৭৫-৮৭৬-৮৭৭-৮৭৮-৮৭৯-৮৮০-৮৮১-৮৮২-৮৮৩-৮৮৪-৮৮৫-৮৮৬-৮৮৭-৮৮৮-৮৮৯-৮৯০-৮৯১-৮৯২-৮৯৩-৮৯৪-৮৯৫-৮৯৬-৮৯৭-৮৯৮-৮৯৯-৯০০-৯০১-৯০২-৯০৩-৯০৪-৯০৫-৯০৬-৯০৭-৯০৮-৯০৯-৯১০-৯১১-৯১২-৯১৩-৯১৪-৯১৫-৯১৬-৯১৭-৯১৮-৯১৯-৯২০-৯২১-৯২২-৯২৩-৯২৪-৯২৫-৯২৬-৯২৭-৯২৮-৯২৯-৯৩০-৯৩১-৯৩২-৯৩৩-৯৩৪-৯৩৫-৯৩৬-৯৩৭-৯৩৮-৯৩৯-৯৪০-৯৪১-৯৪২-৯৪৩-৯৪৪-৯৪৫-৯৪৬-৯৪৭-৯৪৮-৯৪৯-৯৫০-৯৫১-৯৫২-৯৫৩-৯৫৪-৯৫৫-৯৫৬-৯৫৭-৯৫৮-৯৫৯-৯৬০-৯৬১-৯৬২-৯৬৩-৯৬৪-৯৬৫-৯৬৬-৯৬৭-৯৬৮-৯৬৯-৯৭০-৯৭১-৯৭২-৯৭৩-৯৭৪-৯৭৫-৯৭৬-৯৭৭-৯৭৮-৯৭৯-৯৮০-৯৮১-৯৮২-৯৮৩-৯৮৪-৯৮৫-৯৮৬-৯৮৭-৯৮৮-৯৮৯-৯৯০-৯৯১-৯৯২-৯৯৩-৯৯৪-৯৯৫-৯৯৬-৯৯৭-৯৯৮-৯৯৯-১০০০-১০০১-১০০২-১০০৩-১০০৪-১০০৫-১০০৬-১০০৭-১০০৮-১০০৯-১০১০-১০১১-১০১২-১০১৩-১০১৪-১০১৫-১০১৬-১০১৭-১০১৮-১০১৯-১০২০-১০২১-১০২২-১০২৩-১০২৪-১০২৫-১০২৬-১০২৭-১০২৮-১০২৯-১০৩০-১০৩১-১০৩২-১০৩৩-১০৩৪-১০৩৫-১০৩৬-১০৩৭-১০৩৮-১০৩৯-১০৪০-১০৪১-১০৪২-১০৪৩-১০৪৪-১০৪৫-১০৪৬-১০৪৭-১০৪৮-১০৪৯-১০৫০-১০৫১-১০৫২-১০৫৩-১০৫৪-১০৫৫-১০৫৬-১০৫৭-১০৫৮-১০৫৯-১০৬০-১০৬১-১০৬২-১০৬৩-১০৬৪-১০৬৫-১০৬৬-১০৬৭-১০৬৮-১০৬৯-১০৭০-১০৭১-১০৭২-১০৭৩-১০৭৪-১০৭৫-১০৭৬-১০৭৭-১০৭৮-১০৭৯-১০৮০-১০৮১-১০৮২-১০৮৩-১০৮৪-১০৮৫-১০৮৬-১০৮৭-১০৮৮-১০৮৯-১০৯০-১০৯১-১০৯২-১০৯৩-১০৯৪-১০৯৫-১০৯৬-১০৯৭-১০৯৮-১০৯৯-১১০০-১১০১-১১০২-১১০৩-১১০৪-১১০৫-১১০৬-১১০৭-১১০৮-১১০৯-১১১০-১১১১-১১১২-১১১৩-১১১৪-১১১৫-১১১৬-১১১৭-১১১৮-১১১৯-১১২০-১১২১-১১২২-১১২৩-১১২৪-১১২৫-১১২৬-১১২৭-১১২৮-১১২৯-১১৩০-১১৩১-১১৩২-১১৩৩-১১৩৪-১১৩৫-১১৩৬-১১৩৭-১১৩৮-১১৩৯-১১৪০-১১৪১-১১৪২-১১৪৩-১১৪৪-১১৪৫-১১৪৬-১১৪৭-১১৪৮-১১৪৯-১১৫০-১১৫১-১১৫২-১১৫৩-১১৫৪-১১৫৫-১১৫৬-১১৫৭-১১৫৮-১১৫৯-১১৬০-১১৬১-১১৬২-১১৬৩-১১৬৪-১১৬৫-১১৬৬-১১৬৭-১১৬৮-১১৬৯-১১৭০-১১৭১-১১৭২-১১৭৩-১১৭৪-১১৭৫-১১৭৬-১১৭৭-১১৭৮-১১৭৯-১১৮০-১১৮১-১১৮২-১১৮৩-১১৮৪-১১৮৫-১১৮৬-১১৮৭-১১৮৮-১১৮৯-১১৯০-১১৯১-১১৯২-১১৯৩-১১৯৪-১১৯৫-১১৯৬-১১৯৭-১১৯৮-১১৯৯-১২০০-১২০১-১২০২-১২০৩-১২০৪-১২০৫-১২০৬-১২০৭-১২০৮-১২০৯-১২১০-১২১১-১২১২-১২১৩-১২১৪-১২১৫-১২১৬-১২১৭-১২১৮-১২১৯-১২২০-১২২১-১২২২-১২২৩-১২২৪-১২২৫-১২২৬-১২২৭-১২২৮-১২২৯-১২৩০-১২৩১-১২৩২-১২৩৩-১২৩৪-১২৩৫-১২৩৬-১২৩৭-১২৩৮-১২৩৯-১২৪০-১২৪১-১২৪২-১২৪৩-১২৪৪-১২৪৫-১২৪৬-১২৪৭-১২৪৮-১২৪৯-১২৫০-১২৫১-১২৫২-১২৫৩-১২৫৪-১২৫৫-১২৫৬-১২৫৭-১২৫৮-১২৫৯-১২৬০-১২৬১-১২৬২-১২৬৩-১২৬৪-১২৬৫-১২৬৬-১২৬৭-১২৬৮-১২৬৯-১২৭০-১২৭১-১২৭২-১২৭৩-১২৭৪-১২৭৫-১২৭৬-১২৭৭-১২৭৮-১২৭৯-১২৮০-১২৮১-১২৮২-১২৮৩-১২৮৪-১২৮৫-১২৮৬-১২৮৭-১২৮৮-১২৮৯-১২৯০-১২৯১-১২৯২-১২৯৩-১২৯৪-১২৯৫-১২৯৬-১২৯৭-১২৯৮-১২৯৯-১৩০০-১৩০১-১৩০২-১৩০৩-১৩০৪-১৩০৫-১৩০৬-১৩০৭-১৩০৮-১৩০৯-১৩১০-১৩১১-১৩১২-১৩১৩-১৩১৪-১৩১৫-১৩১৬-১৩১৭-১৩১৮-১৩১৯-১৩২০-১৩২১-১৩২২-১৩২৩-১৩২৪-১৩২৫-১৩২৬-১৩২

র ছোট্ট একটা ঘন্টা ফেলিসাইট ছিল নি-
বও না। সে যে আমাদের কথা নয়।
সরকারের দুর্ভাগ্যের দৃষ্টি তখনও
মান। কতখানি সাহস, কতখানি ঐশ্বর্য,
নি অত্যাচার ও উৎপীড়ন উপেক্ষা করার
নেবল থাকলে তবে আমাদের মত সশস্ত্র
বীদের সেই একটি রাষ্ট্রের জন্য নিজ-
তে স্থান দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব
ছিল।

ই রাষ্ট্রে আমাদের যেন আর কোন ভাবনাই
না। মাসীমা, ছোড়দি ও মেসোমশাই
দের সেই রাষ্ট্রে রক্ষার ভার যেন তাঁরাই
ন্যায় নিলেন। স্থির করলেন, সারারাত
গা তাঁরাই পাহারা দেবেন। আমাদের
নের ক্রান্তির যেন কিছুটা অবসান হলেও
খুশি। আমরা যেন কিছুটা বিশ্রাম
র—নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারি—তার জন্য
তাঁরা যেন ভয়ানক ব্যস্ত।

থেকে যখন ঘুমিয়ে মাসীমা ও ছোড়দি
মাদের বলছিলেন—“আমরা সব জানতাম।
কোনকদিন থোকা ও টুন ভুলে বিছানায়
রত্নলভার ফেলে যেত আর আমরা সে সব
দুর্ভাগ্যের রাখতাম। তোমরা যখন সবাই গেলে
তবে আমাদের কেন শিখিয়ে পড়িয়ে
মাদের সংগে নিলে না...”

তাঁদের কথা শুনে মনে হল সার্থক আমাদের
বিপ্লবী অভিযান। গদ্যী-ভরা রিভলভার
জা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। কখন যে ঘুমিয়ে
পড়ছিলাম জানি না। যখন ঘুম ভাঙল
তখন দেখি জানলার ফাঁকে সূর্যের আলো
এসে ঘরে পড়েছে। চট করে বিছানা ছেড়ে
আমরা উঠে পড়লাম। চা খাওয়ার ডাক
পড়ল। খাওয়ার ঘরে টেবিলের চারপাশে
আমরা গিয়ে বসলাম। কিছু দেরি আছে
কিন্তু আমরা আমাদের রিভলভার ও পিস্তল-
গুলি পরিষ্কার করছিলাম।

ভোর হতে না হতেই মাসীমা ছোট-
নকে মোতারেন করেছিলেন পাহারা দিতে।
এ টিলার নীচে খেলার ভাণ করে সজাগ
কি রেখেছিল চারিপাশে। এদিকে মাসীমা
র ফ্লট হাতে ও পেছনে ছোড়দি চা নিয়ে
র পা বাড়িয়েছে, আর ঠিক-সেই সময়েই
একর শোনা গেল—“মা, আসছে”.....“মা
সেই”। খাবার ফ্লট ও চা তাঁদের হাতেই
লৈ। আমরাও কালক্রম না করে মুহূর্তে
আমাদের নিজ নিজে অস্ত্রাদি সংগে নিয়ে
গাড়ির পেছনে ছোট ছোট পর্বতশ্রণীর মধ্যে
বেশ করলাম।

এই বাড়ির প্রায় আধ মাইল দূরে আমরা
পাহাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলাম।
কতখানেক পরে—প্রায় সকাল দশটা হবে,
বাহসে ভর করে আমরা চারজন—মাখন,
আনন্দ, গণেশ ও আমি—আনন্দের বাড়ির
দিকে অগ্রসর হলাম। যাদের অসহায় অবস্থায়
পুলিসের সম্মুখীন হতে দেখে এসেছিলাম,
তাদের অবস্থা কি হ'ল জানা প্রয়োজন। এই

কর্তব্যবোধে পা টিপে টিপে সন্তপণে পেছন
দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম।

এক। মা ও ছোড়দি অত্যন্ত ব্যাকুল,
বিহ্বল ও ক্রোধান্বিত হয়ে যেন অসহায়
অবস্থায় অনিশ্চিত কোন এক ভবিষ্যতের
দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের হঠাৎ দেখতে
পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন—
ভাবতে পারেন নি যে, আমরা দিনেই বেলায়ই
বিপদকে উপেক্ষা করে কিছুক্ষণের মধ্যেই
আবার ফিরে আসব।

ভীত রুস্ত স্বরে তাঁরা আমাদের জানা-
লেন—আমাদের মেসোমশাইকে পুলিস গ্রেপ্তার
করেছে। আনন্দের বাবার সংগে অশ্লিষ্ট
হিমাংশুর নামে পোড়া ঘরের চিকিৎসার
ওষুধ এবং ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটাও তাঁর
সংগে পেয়েছে। মাসীমাদের এমনি করে
চারিদিক থেকে বিপদের পর বিপদ ঘনিয়ে
এসেছে। এইরূপ মানসিক অশান্তি, আশ-
বিপদের আশঙ্কা—এই অবস্থাতে তাঁদের কি-ই
বা সান্ত্বনা দেব, কি-ই বা অভয়বাণী শোনাব।
কিন্তু এতবড় বিপদেও মাসীমার স্বভাবসিদ্ধ
ঐশ্বর্যের কোন পরিবর্তন হয় নি। খুব
শান্ত ধীরকণ্ঠে আমাদের বললেনঃ “তোমাদের
বাবা আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। এখানে
থাকলে আমরা প্রাণ দিয়েও তোমাদের রক্ষা
করতে পারব না। তোমরা আর কোন
সুরক্ষিত স্থানে চলে যাও।” বলতে বলতে
মাসীমার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। শেষের
দিকে গলার স্বর যেন তাঁর বন্ধ হয়ে
আসছিল। তবু বললেনঃ “আমার প্রাণভরা
আশীর্বাদ রইল। ভগবান তোমাদের রক্ষা
করবেন!”

ছোড়দি নির্বাক নিস্তব্ধ। ছোট্টকন
বিমূঢ় বিম্মনে চেয়ে আছে। সে যেন সব-
টুকু বুঝতে পারছিল না। তবে এইটুকু
বুঝেই সে যেন খুব খুশি যে, তার দাদারা
যত্ন করবে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সংগে।
তবে মার চোখ জল কেন? ছোট্টকন চোখ
কেন তবে ছলছল? ছোট্টকন একবার মার
কাছে আর একবার ছোড়দির কাছে গিয়ে
সান্ত্বনা দিচ্ছিলঃ “তুমি মা কাদিছ?” “দিদি,
তুই বা অমন করছিস কেন?” “দাদারা তো
যত্ন করবে—ভয় কি—আমাদের স্বাধীন হতে
হবে!”

আমরা কেবল নির্বাক দর্শকের মত সব
কিছু দেখে ও শুনে গেলাম। বলবার যে
আমাদের কিছুই ছিল না। আমরা মাসীমাকে
প্রণাম করলাম। আনন্দ—তাঁদের আদরের টুন-
—মাঝের পায়ে ধুলো নিল, দিদির চরণ স্পর্শ
করে বিদায় নিল। করুণ এই বিদায়ের পালঙ্ক।
ছোড়দির সব ঐশ্বর্য, মাসীমার অসীম আশ্র-
সংবরণের ক্ষমতা কোথায় যেন বাতের জলে
ভেসে গেল। দরদর করে অবিরাম চোখের
জলে তাঁরা ডুবেতে লাগলেন।

পেছনের সব টান, সব আকর্ষণ হেঁচ
আমরা উজ্জ্বল গাতিতে সম্মুখপানে চলেছি।
মাসীমা আবার আবুলকাশে বসে উঠলেন।
“তোমাদের হাতে টুন ও ধোকাফে শপে
দিলাম। তাদের ভালোমন্দের সব ভার
তোমাদের উপর। তোমরা বেঁচে থাক।
তোমরা জয়ী হও। তোমাদের স্বাধীনতা-
সংগ্রাম সফল হোক।”

আমরা ততক্ষণ আরও দূরে এগিয়ে
গেলাম। তিনি চীৎকার করে টুনকে
উদ্দেশ্য করে বললেনঃ “তোরা দাদাকে বলিস
আমি তার উপর একটুও রাগ কর নি।
তোদের মা বলে আমি গর্বিত—নিজেকে আর
ধন্য মনে করছি।” অনেকদূর এগিয়ে গেলাম।
চোখের সামনে শূন্য তাঁদের শোকবিহীন
গর্ব-উজ্জ্বল মুখগুলি ভাসতে লাগল। দূর
থেকে শেষবারের মত দু'হাত তুলে তাঁদের
প্রণাম জানালাম।

কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী
বালা ভাষায় অভিনব...

সচিত্র

বিজ্ঞান কোষ

প্রতি সংখ্যার বিজ্ঞানের এক একটি
বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ, চিত্রশোভিত স্বরূপ-
সম্পূর্ণ আলোচনা।

প্রতি সংখ্যাঃ এক টাকা

১। মহাকাশে রকেট ২। এরোস্পেন
৩। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ৪। মহা-
কাশ অভিযান ৫। ইস্পাতের নবযুগ
৬। বিদ্যুৎশক্তি ৭। কমলা ও পেট্রো-
লিয়ামের কথা ৮। আলোর সাথে
পরিচয় ৯। মোটর গাড়ী ১০। বেতার
১১। খনিজ পদার্থ ও ধাতুর কাহিনী
১২। আগুন ও উত্তাপ ১৩। রেল-
গাড়ী ১৪। কাগজ ও মুদ্রণ ১৫। শব্দ
ও শব্দগ্রন্থ ১৬। মানুষের উপকারে
কাঁচ ও রবার

উপহার দেবার ও সংগ্রহে রাখার মত বই

মহাভারত

৪৪টি বহুবর্ণ ও ৪৪টি একবর্ণ চিত্র।
সংক্ষেপিত কাহিনী ও চিত্র পরিচিতি
৯"×১১" পত্র, কাটিজি অফসেট ছাপা।
বর্ণাঢ্য সুচারু জ্যাকেট, রেজিন-বাইন্ডিং।
মূল্য : ১৬.

জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ

১৬/৩, গড়িয়াহাট রোড, কালিকাতা-১৯

ফোন : ২০-২৬২৬

কল্যাণবাই-এর দোকানে খোঁজ লিন।

লোকসংগীতে জাতীয়তাবাদ

বুদ্ধদেব রায়

লোকসংগীত পল্লীর সাধারণ মানুষের গান এবং দরদীর গান ত বটে। যৌদিন মানুষ ভাষা শিখল সেইদিন থেকেই সে তার নিজস্ব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সম-সাময়িক ঘটনার সমর্থন ও প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে আবেগপূর্ণ সহজ ও সরল বাণীবদ্ধ সংগীতের মধ্য দিয়ে। তাই এই সময় থেকেই সভ্যতার ঘাটে ঘাটে দেখা দিয়ে আসছে নতুন রঙে রাঙান নতুন নতুন চেহারার লোক-সংগীত।

ইতিহাসের গতির সঙ্গে এও সমানে ঝগিয়ে চলেছে তাল রেখে। তার সেই পদ-ক্ষেপ ঘরে যখন বাংলাদেশে এসে পৌঁছনো যায়, তখন দেখা যায় সে বাংলার জীবনের মানাদিক আলোকিত করে আছে। এমনি কটা দিক হল জাতীয়তার দিক। নিরক্ষর লোক-কবিদের রচিত সংগীতগুলো অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে, তারা শুধুমাত্র প্রেম বিরহের গানই রচনা করেন নি, জাতীয় চেতনার দিকেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। যখনই কোন নতুন সমস্যা উপস্থিত হয়েছে তখনই এই লোক-কবির দল তাঁদের সংগীত ও গাথার মাধ্যমে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অনেক গান তাঁরা রচনা করেছেন।

একবারে গোড়ার দিকে, এই লোক-কবির দল সোজাসজিভাবে নিজেদের অভাব-অনটন, প্রতিবাদের কথা বলতে পারেন নি। তখন তাঁরা তাদের প্রতিবাদের কথা জানাতেই দেব-দেবীর উপাখ্যান তথা ধর্মের খোলাসের মধ্য দিয়ে—সমাজতন্ত্রের যুগে রাজা বাদশা তথা নওদাগর ও ষড়লোকদের কাহিনীর মাধ্যমে। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই লোক-কবির দল স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর চিত্রেই তাঁদের গানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন দেশের অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের কথা।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের গ্রামবাসীরা জাতীয় চেতনার উদ্ভূত হন ইংরেজ আমলে। ইংরেজ শাসনে আমাদের দেশে গ্রামবাসীদের জমি-জমার ব্যাপারে অনেক নতুন নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়ার দেশের গ্রামা-জীবনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

ইংরেজদের এই নতুন ব্যবস্থার কুসল সারা দেশ জুড়ে এক অসন্তোষের ঢাপা রোধ জাগিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে গ্রামবাসীদের প্রতি-বাদ সূর্য হয়ে পারিশের অনেক স্থলেই বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। তাই তাঁদের গানেও প্রকাশ পায় তাঁদের প্রতিবাদের সূর। ইংরেজ শাসনের সূর্যেই আমাদের দেশের পল্লীবাসীরা তাঁদের বিদেশী শাসককে খুবই

অপছন্দ করে এসেছেন। আমরা তারই পারচয় পাই একটি গম্ভীর গানের মধ্যে—

শিব হে, ইংরেজ বানিয়া হল দ্যাশের পতি,
কি বলব ভাই দ্যাশের গতি
অলক্ষণা সাগর পারের ইংরেজ কাঙাল
নোদের দ্যাশে বাধাইছে জঞ্জাল
ও বড়ো শিব, মোদের কপাল মল্ল অতি॥

ইংরেজরা রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করে। এই জমিদার শ্রেণীর প্রজাদের উপর কোন দরদ ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আদায়। অধিক মাত্রায় রাজস্ব আদায় করার জন্য এই জমিদার শ্রেণী কৃষকদের উপর অনেক সময়েই অত্যাচার করত। কৃষকদের অনেক সময়েই হালবলদ বিক্রয় করে জমিদারের খাজনা দিতে হত। তাই লোকসংগীতে পাওয়া যায়—

আল্লা! একি করলা আমাগো দশা,
হারায়া ফেলছি দিশা,
পানির লাইগ্যা ফসল হয় নাই,
কামনে বাঁচুম হয় বল না।
পরগে নাইকো ত্যানা

প্যাটের জদালা আর সহে না।
হাল বলদ সব বেইচ্যা ফেইল্যা
দিতে হয় খাজনা॥

কিন্তু এ আবেদন যথাস্থানে পৌঁছায় না।

কঠিন বাস্তবের রুঢ় আঘাতে তাদের সব স্বপ্ন ভেঙে যায়। জমিদারের চর আসে উৎপন্ন শস্য কেড়ে নিতে খাজনার বদলে। শক্তিশূন্য কৃষক তাকে ব্যথতে পারে না। কিন্তু গতরে খাটার ফল তাদেরই সামনে থেকে অপরে নিয়ে যাবে এটাও সহ্য করা যায় না। তাই তাদের গানে প্রকাশ পেয়েছে দৃঢ়সংকল্পের শপথ—

হায় রে! জমিদারের চর আইস্যাছে
কাইড়া নিতে ধান,
ছাইরব না ভাই ঘরের লক্ষ্মী
দ্যাহে থাকতে জান!

জলে ভিজা রোদে পুইড়া
আনছি ঘরে লক্ষ্মী,
তোমরা থাইকো সাক্ষী,
আর তারেই আজ গানের জোরে
নিতে আইস্যাছে,
মোরা কবুল করুম জান॥

এ গেল জমিদারের অত্যাচারের কথা।

এ ছাড়া ইংরেজরা বিত্তসর্বস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সামাজিক প্রভাব-প্রতি-পত্তির ও মানমর্যাদার প্রচলিত সমস্ত মানদণ্ড ভেঙে দিয়ে টাকাকেই সর্বপ্রধান সামাজিক

মানদণ্ড করে দে। ফলে যারাই, বিব-তারাই সমাজের মাথা হয়ে দাঁড়াল—তার কতৃষ্ণের অধিকারী হয়ে দাঁড়াল। এই ব্যবস্থা সাধারণ গ্রামালোক সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এতে তাঁদের দুঃখ বেড়েই চলে। তাই জারী কবির দল গাইলেন—

ভাইরে দ্যাশে আছে দুইজা জাত,
একটি থাকে রাজপাটেতে
পথে শুইয়া অন্য জনে,
কাটায় দিনরাত॥ ইত্যাদি।

ক্রমে ক্রমে উনিবিংশ শতকেই পল্লীর জন-সাধারণ জাতীয় চেতনায় পুরোপুরি সচেতন হয়ে তাঁদের অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসককে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন। পরাধীনতার অপমান বেশি দিন কোন জাতির পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে বিদেশী শাসকদের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে ঝুঁক ঝুঁক বিদ্রোহ মাধ্যমে জাতীয় অসন্তোষ প্রকাশ পেতে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে ব্যাপক বিদ্রোহ ও গণ-আন্দোলনের আকার ধারণ করে এবং তাই অবশেষে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছেছে। গ্রামবাসী ইংরেজ শাসনে জর্জরিত হয়ে স্বাধীন-স্বল্পে বিভোর হয়েছিলেন। তাই উল-বাংলার এই গম্ভীর গানে আমরা সেই কথা উল্লেখ পাই!—

শিব হে স্বরাজ পেইলে মণ্ডা দিব
ঘন দুধের বাটি দিব
নইলে কাঁচকলা,

ও ভোলা, ও ভোলা॥

এই উনিবিংশ শতকেই আমাদের চারুণ পল্লী কবি ও গায়ক মুকুন্দ দাস বহু স্বদেশী গান ও বাহা রচনা করে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছেন। স্বাধীনতার আন্দোলনে তাঁর দানও নিতান্ত কম নয়। তাঁর সংগীত রচনাভাণ্ডারী ব্যঙ্গাত্মক; যেমন—

আয় রে বাঙালী আয় সেজে আয়,
আয় লেগে বাই দেশের কাজে
জগৎ জানুক ভীত বাঙালী
দাঁড়াতে জানে বীর সমাজে॥

ইত্যাদি

বহু জীবনের, বহু কষ্টের বিনিময় স্বর-যখন সত্যিই এল তখন আমাদের পল্লীর সাধারণ মানুষের মনে আনন্দের জোয়ার বইল। তাই সেই আনন্দের অভিব্যক্তি স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে এইটুকু গানের মধ্যে। যেমন—

ওরে স্বাধীন প্রজা,

তোরা এবার স্বাধীন সূরে ঢাক বাজা
নবীন তোদের আইন কানুন
নতুন তোদের রাজা॥ ... ইত্যাদি।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকে এ যুগের ক্রীড়াঙ্গন

পরাধীন ভারতে আমাদের ক্রীড়াঙ্গন সত্যি ছিল অনায়াস, অবহেলিত। বিদেশী শক্তির অনুগ্রহ লাভে বাঞ্ছিত খেলাধুলার স্থান ছিল দায়োগারীর স্থান; আপন দেশে যেখানেই তখন তাকে তার চলার পথ করে দেওয়া হত। ইমতি সৈদীন তার চলার পথ তৈরি করে দিলেন। ইমতি ছিল না কোন ছন্দ, কোন সুর; কিন্তু ছিল আন্তরিকতার মধুর ছোঁয়া আর ছিল শূন্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পরশ। 'খেলায় জন্মই খেলা' এই মন্ত্রটি সৈদীনের প্রতিটি ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ামোদী আর ক্রীড়াপরিচালকের মনে জাগ্রত ছিল বলেই ক্রীড়াঙ্গনের প্রতিষ্ঠা কল্পনামাত্র হতে পারে নি। স্বাধীনতার পর কালের আবর্তে হারিয়ে যেতে পারেনি ক্রীড়াঙ্গন। এই দুই দলের শক্তি ছিল। ইয়েছে সম্পূর্ণ খেলোয়াড়ী আবহাওয়া আর বরাবরই দুই দলই জয়-পরাজয়কে সমানভাবে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে; কোন দুষ্টিত আবহাওয়া অথবা মিততির নোংরামির কালোছায়া কোনদিনই আসেনি তার স্পর্শ ঘটতে পারে নি বলেই ক্রীড়াঙ্গনের পরিবর্তন বজায় ছিল—আর তাই ক্রীড়াঙ্গন সত্যি ছিল ক্রীড়াঙ্গন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের শূন্যলগ্নে ভারতের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার পর কালের আবর্তে হারিয়ে যেতে পারেনি ক্রীড়াঙ্গন। এই দুই দলের শক্তি ছিল। ইয়েছে সম্পূর্ণ খেলোয়াড়ী আবহাওয়া আর বরাবরই দুই দলই জয়-পরাজয়কে সমানভাবে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে; কোন দুষ্টিত আবহাওয়া অথবা মিততির নোংরামির কালোছায়া কোনদিনই আসেনি তার স্পর্শ ঘটতে পারে নি বলেই ক্রীড়াঙ্গনের পরিবর্তন বজায় ছিল—আর তাই ক্রীড়াঙ্গন সত্যি ছিল ক্রীড়াঙ্গন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের শূন্যলগ্নে ভারতের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার পর কালের আবর্তে হারিয়ে যেতে পারেনি ক্রীড়াঙ্গন। এই দুই দলের শক্তি ছিল। ইয়েছে সম্পূর্ণ খেলোয়াড়ী আবহাওয়া আর বরাবরই দুই দলই জয়-পরাজয়কে সমানভাবে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে; কোন দুষ্টিত আবহাওয়া অথবা মিততির নোংরামির কালোছায়া কোনদিনই আসেনি তার স্পর্শ ঘটতে পারে নি বলেই ক্রীড়াঙ্গনের পরিবর্তন বজায় ছিল—আর তাই ক্রীড়াঙ্গন সত্যি ছিল ক্রীড়াঙ্গন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের শূন্যলগ্নে ভারতের স্বাধীনতা।

ভারতের ক্রীড়াঙ্গনে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে রণাঙ্গনে সাংগোপাঙ্গ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন হোমরা-চোমরা একদল রাজনীতিবিদ। এদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় খেলাধুলা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে উপলব্ধি মাত্র; দেশের ক্রীড়ামোদীরা প্রত্যক্ষ করছেন ক্রীড়াঙ্গনে রাজনীতির এক বিচিত্র খেলা। দেশের বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনের উচ্চাঙ্গনগুলি রাজনৈতিক নেতারা অলংকৃত করে, হস্তগত করেছেন সমস্ত ক্ষমতা, ফলে যারা সত্যিকারের ক্রীড়াবিদ এবং অতীতের দিকপাল খেলোয়াড় যারা এই সমস্ত ক্রীড়াঙ্গনগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা সরে এসে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। যারা সেখানে কোনক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন তারা

শ্রীঅমিত্য

পরিচালকদের ক্রীড়নক মাত্র। যৌশদ্র বেতে হবে না আমাদের এই কলকাতার ফুটবল পরিচালক সংস্থা আই-এফ-এই আমার কথাগুলির জ্বলন্ত উদাহরণ।

আমাদের দেশের সরকার অকুণ্ঠ চিন্তে অজস্র অর্থব্যয় করেছেন, দিয়েছেন অজস্র সুযোগ-সুবিধা খেলাধুলার ক্ষেত্রে। কিন্তু সব কিছুই অপব্যয় করেছেন আমাদের দেশের গুপ্তমহলের ক্ষমতাশালী ক্রীড়াপরিচালকের দল। তারা নিজেদের অথবা দলের স্বার্থ-সিঁদ্ধির জন্যে সমগ্র জাতির স্বার্থকে বিসর্জন দিতে অথবা দেশের সম্মানকে ভুলটিষ্ঠ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। মনে হচ্ছে এরা উন্নতির জন্যে ভিত খুঁড়তে গিয়ে, খেলাধুলার কবরই খুঁড়ছেন।

দেশের খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য প্রথমে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের। বিভিন্ন শিক্ষালাভের পথ প্রশস্ত করতে হবে। সেই খেলাধুলার বিষয়ে আমাদের দেশের ছেলেদের জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস নামে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে পাতিয়ালার তার মূল্য অসীম দেশের খেলাধুলার ক্ষেত্রে। কিন্তু এই পাতিয়ালার প্রতিষ্ঠানটিও আমাদের হতাশ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই সর্বভারতীয় সংস্থাটির স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল পরিচালকেরা যে খুব ব্যস্ততার পরিচয় দিয়েছেন বলে তো মনে হয় না। বহু অর্থব্যয়ে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার কার্যকারিতা, উপযোগিতা, সুবিধা ও অসুবিধা সব কিছুই

হবে দেখতে হবে, চিন্তা এবং দৃষ্টি হয়ে নিরপেক্ষ ভাষা হলে চাকর গ্রাম্য করে প্রচারের দ্বারা গাঢ়ে ফাঁকা বাহাদুরী হতে হবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। বস্তুত তাই বোধ হয় হয়েছে পাতিয়ালার প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে।

ত্রিবেটে বোম্বাইয়ের প্রেস্টন কলেজের প্রাধান্য বহুদিন থেকে চলে আসছে। তাছাড়া অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রেও এই দুটি রাজ্য অগ্রগণ্য—অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যও পিছিয়ে নেই। রাজ্যব সৌর্য করতে পারে হকি আর এ্যাথলেটিকসের জন্য। সত্যিই সর্বভারতীয় এই ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানটিকে ভারতের একপ্রান্তে ঠাই দিয়ে রাখা ভাল করেনি; অবশ্য পাতিয়ালার মহারাজের অন্যান্য আবদার এবং অনুরোধ রক্ষা করে ধন্য হয়েছেন মনে হচ্ছে পরিচালকেরা। উড়িষ্যা, আসাম বা কেরলের কোন শিক্ষার্থীকে পাতিয়ালার এই শিক্ষণকেন্দ্রে যেতে হলে পথের দুর্ভাগ্য ও দুর্গমতা তার উৎসাহকে অনেকটা কমিয়ে দেবে। এতবড় ভারতের অন্য কোথাও স্থায়ী জুটল না সেখানে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করলে সকল রাজ্যেরই সুবিধা হত।

পাতিয়ালার এই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসের প্রধান উদ্দেশ্য হল যোগ্য ও দক্ষ ক্রীড়াশিক্ষক সৃষ্টি করা। কিন্তু এখানে শিক্ষণপ্রাপ্ত ক্রীড়াশিক্ষকেরা পাতিয়ালার থেকে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে আর তেমন কোন ভাল কাজ জুটিয়ে উঠতে পারছেন না। দেশের এই অর্থনৈতিক অবস্থার বর্তমানে ভারতের মত দেশে ক্রীড়াশিক্ষকের পক্ষে ক্রীড়াশিক্ষণকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্র খুবই সঙ্কীর্ণ। অবশ্য গোয়ালিরের ফিজিকাল এডুকেশন কলেজের পাশ করা স্নাতকদের ভাগ্য ভাল, কারণ তাঁদের বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে না কাজের জন্য।

পাতিয়ালার পাশ করা ক্রীড়াশিক্ষকদের এই দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, ক্রীড়াশিক্ষক নির্বাচন করার আগে এই পাতিয়ালার ইনস্টিটিউট তাদের যোগ্যতা বিচারের পূর্বে সুযোগ লাভ করেননি। যোগ্য ও উৎকৃষ্ট শিক্ষার্থীর অভাবে তারা কাজ চালানো গোছের শিক্ষার্থী নিয়েই অনেক ক্ষেত্রে কাজ সুরু করেছেন। এর ফলে এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্রীড়াশিক্ষকেরা বিশেষ প্রশংসা এবং প্রমোদ অর্জন করতে পারেননি। আইন করে অথবা পারিপার্শ্বিক চাপ দিয়ে এই

কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী
সকলই এক মাত্র ভাবে যোগে দেওয়ার প্রীতিভাজন
হয়ে যাওয়াতে শিক্ষাজীবন স্থলু ন্যা। কারণ
এই প্রবৃত্তির কারণেই শিক্ষাজানা যেহে
তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে, কিন্তু দেশের ছেলের
শিক্ষার খেলাফতের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা-
যোগ্যতা যোগ্যতা অর্জন করেছেন কিনা
সম্পর্কে। কিছুদিন আগে কলিকাতার এক
মাসিকিকার, পাতনামা সন্তরণ কোচ
ডঃ ও. কলার প্রধানের কোচদের বিভিন্ন
বিজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষাগ্রহণের কথা বর্ণনা
গল্পের নিমিত্ত। তিনি প্রথম দর্শনেই
কোচদের কথা বর্ণনা দিয়েছেন তাই শিক্ষার্থী-
দের চেহারা কী শিক্ষারই প্রচুর শিক্ষাভ
এখনও পরিচালনা, এই আকার ইঙ্গিতে
বর্ণনা দিয়েছেন। পাতনামার প্রতিষ্ঠানটির
দুগ্ধে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগসূত্র
বর্তমান আছে বলে তাদের প্রভাবেই এই
প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের ভাগ্য অনেক
সাফল্য ও প্রশংসা প্রাপ্য না হলেও জুটে
যাচ্ছে।

পাতিয়ালার ইন্সটিটিউট অফ স্পোর্টস-
তে আছে, প্রায় তিনশ' একর জমির ওপর
বিভিন্ন ধরনের খেলার মাঠ আর মাঝখানে
সুখ্যা অট্টালিকা। এখানে আছে শিক্ষার্থী-
দের হোস্টেল আর শিক্ষকদের থাকবার ব্যবস্থা।
শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয় হল যথাক্রমে
এ্যাথলেটিকস, ফুটবল, ক্রিস্ট, বান্ধেটবল,
সাতার, হাকি, ভলিবল, টেবল-টেনিস, ব্যাট-
মিন, ক্রিকেট, টেনিস এবং জিমন্যাস্টিক।

এবার অল-ইন্ডিয়া কার্ডিন্স অফ স্পোর্টস আর এরই শাখা-প্রশাখা স্টেট কার্ডিন্স অফ স্পোর্টস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। বর্তমানে ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা হল এটি।

খেলাধুলার জন্য সরকার যে অর্থ দেবেন তা এই অল-ইন্ডিয়ান অন-মোদনক্রমে, স্টেট কাউন্সিল বার করবেন বিভিন্ন রাজ্যে খেলাধুলার উন্নতিকল্পে। এখানেও রাজনৈতিক নেতাদের ভিড় দেখা যাচ্ছে। এঁরা খেলাধুলাই বোকেন না, তা কিসে খেলাধুলার উন্নতি তাই বা এঁরা জানবেন কি করে। অবশ্য এ বিষয়ে চিন্তা তাঁরা মোটেই করেন না, তাঁদের চিন্তা হল কিভাবে ক্ষমতা দখলে রাখা যায়। এঁরা ক্ষমতার লোভে এমন নোংরা রাজনীতির খেলা নিপুণভাবে চালাচ্ছেন, যাতে খেলাধুলা দ্রুতভাবেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কোন খাতে কত ব্যয় হবে, আর অন্যান্য ক্রীড়াসংস্থার গলদ খুঁজে বার করা বা তাঁদের সমালোচনা করাই যদি এদের সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয় তবে বন্ধব যে বাহ্যিক রোকা কাঁধে নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে এই সূত্রো এবং তার শাখা-প্রশাখাগুলি।

এবার আমাদের কলকাতা ময়দানের

খেলাফাত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা থাকে। কারণ ভারতীয় খেলাফাত সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে গেলেই প্রথমে আসে কলকাতার নাম, কলকাতা যে ভারতের স্বাভাবিকগতের পৃষ্ঠপোষক। আমাদের দেশের খেলাফতের উন্নতি হবে কিভাবে, যেখানে কলকাতার মত জায়গায় এখনও পর্যন্ত গড়ে উঠল না কোন পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম। সত্যিই কলকাতার স্টেডিয়াম-ভাগ্য খুবই খারাপ, কারণ বেশ কয়েকবার মন্ডের কাছে পানপাত্র উঠেও ফস্ক গড়ে ভেঙে গিয়েছে। স্টেডিয়াম করার জন্য প্রথম উদ্যোগী হন সন্তোষের মহারাজা, এরপর মুসলিম লীগের আমলে আন্তর্জাতিক ভাবে চেষ্টা করেন বগড়ার মহম্মদ আলি। কয়েকবছর স্টেডিয়াম প্রসঙ্গ ধামাচাপা পড়ে থাকে। এরপর স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য একটা ট্রাস্ট গঠিত হল—সদস্য ছিলেন পর-লোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, স্যার বীরেন মুখার্জী, শ্রীশিব ব্যানার্জী, বর্ধমানের মহারাজা এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাজা। হিন্দু-স্থান কনস্ট্রাকশনের শির ব্যানার্জী স্টেডিয়ামের নক্সাবন্দী পরিকল্পনাকে কার্যে রূপ দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। পৃথিবীর প্রায় সবকিছু বিখ্যাত স্টেডিয়ামই তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং সবশেষে রোম অলিম্পিকের জন্য নির্মিত স্টেডিয়ামটির অপূর্ণ গঠন কৌশল দেখে আকৃষ্ট হলেন। এই স্টেডিয়ামের স্থপতি ইতালীর আনিবেল ভিট্টোলেজারী সংগে যোগাযোগ করলেন। তখন স্টেডিয়ামের জন্য স্থান নির্বাচিত হইয়াছিল এলেনবরা রেসকোর্সে। ভিট্টোলেজী কলকাতায় এলেন, স্থান দেখলেন, পরীক্ষাদি চালানেন এবং অবশেষে নক্সা পেশ করলেন। কিন্তু কলকাতা ময়দানের দুর্ভাগ্য যে ঠিক এই সময়ে পরলোকগমন করলেন শ্রীশিব ব্যানার্জী। এরপর ১৯৬২ সালে শ্রীশিব ব্যানার্জীর ফেলে যাওয়া পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করার আশা দেখা গেল। কিন্তু এবার হানাদার চীন উত্তর সীমান্ত আক্রমণ করে স্টেডিয়ামের আশাকে আরও দূরে সরিয়ে দিল। পৃথিবীর প্রতিটি বড় বড় সহরেই আছে সুন্দর স্টেডিয়াম, এমন কি এশিয়ার সবে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে যেমন জাকার্তা, টোকিও, সিঙ্গাপুর, ব্যানকক প্রভৃতি স্থানে স্টেডিয়াম গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের মধ্যেই উড়িষ্যার কটক গড়ে উঠেছে বরবটি স্টেডিয়াম, খজাপুরে সেরা স্টেডিয়াম জামসেদপুরের স্টেডিয়াম কলকাতার ফুটবল পরিচালকদের অপদার্থতার পরিচয় দিচ্ছে। কলকাতা স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনাকে বানচাল করার পশ্চাতে একদল ক্ষমতামালী নীচ চক্রান্তকারীর সক্রিয় যোগাযোগ। এই দোষ দূর করা খুবই শক্ত গোড়ার গলদ, সর্বের মধ্যেই যে ভুত।

এখন বিচার করে দেখা যাক স্বাধীনতার পূর্ণ অর্জিতম্বু করে এসে নাজর যুগে খেলাফাত মাদানীর দিক কতটা সাপ বদলেছে। সব খেলার আমারা দেখতে পারছি মানের দিকে তা দিন নিয়োগসহই হচ্ছে। ফুটবল ভারতের জনপ্রিয় খেলা। অলিম্পিক আমদের ফুটবলদল যোগদান করছে ১৯ সালের রাজন আলিম্পিক থেকে। ১ সালে মেলাবার আলিম্পিকে ভারত চতুর্থ দখল করে এবং ১৯৬০ সালে রোম এ লিম্পিকে ভারত উচ্চাশ্রমে ক্রীড়ানেপুণ্যের পরিদিয়েছিল, কিন্তু টোকিওর আলিম্পিকের প্রতিযোগিতায় আর ভারত শৌর্যতে পা না ইরানের কাছে পরাজয়ের ফলে। ১ সালে প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত ভারতের রাজধানী দিল্লিতে। সেই এশিয়ান গেমসে কটবেলি বিজয়ী হবার ভারত ফুটবলের হৃৎগোরব পুনরাধার ১৯৬২ সালে জাকাতার এশিয়ান গেম এ্যাথলেটিকসে ভারত আলিম্পিকে এ্যাথল দল প্রতিবারই প্রেরণ করে আসছে। এ দৌড়বার মিলখা সিং ৪০০ মিটার ফাইনালে অল্পের জন্য পদক লাভ করতে পারে নি। ১৯৬০ সালের রোম আলিম্পি টেনিসে ভারতকে আন্তর্জাতিক আসরে স্থিত করার পশ্চাতে রমানাথন কৃষ্ণাশের অবদান। একথা স্বীকার করতে হবে টেনিসে ভারত অনেকদূর আগ্রসর হয়েছে অপেশাদার কুমিত এবং মন্টিষ্মখে ভারতের স্থান মোটামুটি ভালই বলা চলে। অন্য খেলা যেমন ভলিবল, সাঁতার, বাস্কেট প্রভৃতিতে এশিয়াতে আমাদের স্থান মোটামুটি ওপরের দিকেই কিন্তু আন্তর্জাতিক আসর কথা আর উন্নয়ন না করাি ভাল। তবে ক্রিকেটেও মনে হচ্ছে উন্নতি কিছুটা হচ্ছে কারণ স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন দেশের স্টেন্ট খেলার অনেক পরাজয় আমাদের জাগুতেছে বটে, কিন্তু এরই মধ্যে জা অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছে দুবার অ ইংলন্ডকে তিনবার। এখনও আমাদের স্বাধন নীলমাণি গর্বের বস্ত্র হল হকি। ১৯৩ সালে আমস্টার্ডামে হকিতে যে বিশ্বে-চ্যাম্পানের সম্মান আমরা এর্নেছলাম তাও নিয়েছিল আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তান। ১৯৫৮ সালে টোকিওর এশিয়ান গেমসে আসরে, ১৯৬৪ সালে এই টোকিও লিম্পিকের আসরেই ভারত আবার হকির উদ্ধার করল। শুধু হকিতে কেন খেলাতেও ভারত যাতে জগৎসাধারণ আসন পায় তার জন্য ক্রীড়াগুরুদ্বী এগিয়ে এসে ক্রীড়াগমনকে রাজনৈতিক মুক্ত করে এগিয়ে রাখার পথ ঠিক হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।